"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ ১ম খণ্ড } বৈশাখ, ১৩৬৩ { ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক জাতির মধ্যে নববর্ষের আগমন এক শুভদিন। বাংলা ও বাঙালীর কাছে সেইজন্য এই নবাগত ১৩৬৩ সন কল্যাণসম্পদবাহীরূপে আবাহনের যোগ্যতাপূর্ণ। আজ সেইজন্য আমরা পরিপূর্ণ মনপ্রাণে তাহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

কিন্তু জাতি যদি নিজের কল্যাণ ও দশের কল্যাণ প্রকৃতই চাহে তবে তাহার বিচার করা উচিত, সে সেই কল্যাণের আধাররূপে দেশকে ও নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে কিনা। যেমন অশুচি অবস্থায় ... অধিকার থাকে না, তেমনি অশুদ্ধ চিত্তে নববর্ষের আবাহনও ... না এবং নববর্ষের শুভফলে অধিকারও জন্মায় না। আমাদের উচিত এই বিষয়ে জাগ্রত হওয়া, কেননা এই চেতনার অভাবেই আমরা গত কয় বৎসর বৃথা আক্ষেপে এবং অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের চেষ্টায়, উন্মাদের ন্যায় কাটাইয়াছি। ফলে, অন্য অনেক প্রদেশ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আমরা কেবল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার ক্ষমতা হারাইয়া পিছু হটিয়াই চলিয়াছি। এইরূপ যাত্রায় প্রগতি অসম্ভব এবং ধ্বংস অনিবার্য্য।

বাঙালী এককালে—মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও—সারা ভারতের অগ্রণী ছিল। আজ তাহার স্থান বহু পশ্চাতে। তখন বাঙালীর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা, তাহার দূরদৃষ্টি ও ব্যাপক প্রগতিপন্থী মনোভাব প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

আজিকার বাঙালী প্রগতিবিরোধী, অধ্যয়নবিমুখ। রাজনৈতিক মাদক ও যৌনসম্পর্কিত কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছুতে তাহার প্রায় রুচি নাই। সারা ভারতে বাঙালীই প্রথম বহির্জগতের আলোক আহরণ করিয়া নিজের ও দশের উন্নতির কারণ হইয়াছিল। আজ সেই বাঙালীই কূপমণ্ডুক মনোভাবগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া, নিরুদ্দেশ যাত্রায় উদ্দাম গতিতে চলিয়াছে। অন্তর্দ্দাহ ও আত্মকলহে জাতির প্রাণশক্তি তিলে তিলে নষ্ট হইয়া প্রায় নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। এমতাবস্থায় নববর্ষের আবাহন কি করিয়া সার্থক হইতে পারে?

হইতে পারে যদি আমরা প্রত্যেকে সচেতন ও সক্রিয় হইয়া নিজের এবং আপনজনের মনে শুচিভাব আনিতে পারি। সেজন্য সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন আত্মবিশ্লেষণ। মনের ভিতরে সঞ্চিত ক্লেদ দূর করিবার একমাত্র পথ তাহাই। দেহমন এমতে শুদ্ধ না হইলে জয়যাত্রার আরম্ভ নিষ্ফল। জয়যাত্রায় মুহূর্ত্ত আগত-প্রায়, আত্মশুদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে তাহাও কল্যাণপূর্ণ হইবে।

এই শুদ্ধির জন্য প্রথমেই ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দলগত চিন্তার ধারা বর্জ্জন করিতে হয়। যখন সারা পৃথিবী ঝড়ের আশঙ্কায় কাতর, তখন আমরা যদি শুধুমাত্র দলগত স্বার্থের তাড়নায় আত্মকলহ ও গৃহবিবাদে ব্যস্ত থাকি তবে আমরা ক্ষীণবল ও অল্পবুদ্ধি হইয়া জগতের হাস্যাস্পদ হইবই, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যে প্রমাণ তর্কযুদ্ধ ও কূটনৈতিক প্রয়াস আজ বাংলায় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহার একাংশও উন্নয়ন-প্রয়াসে প্রযুক্ত হইলে দেশ কতই-না অগ্রসর হইতে পারিত!

বাঙালীর দুর্ভাগ্য এই যে, যে কংগ্রেস একদিন দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে নেতৃত্ব করিত সেই কংগ্রেস এখন দলগত দুর্নীতি এবং স্বার্থচিন্তায় এতই নীচে নামিয়াছে যে, ভারতে তাহার স্থান অতি নগণ্য। কিন্তু বাঙালীকে তো বাঁচিতে হইবে, বাংলাকে তো তার পূর্ব্বগৌরব ফিরাইতে হইবে, সুতরাং এখন দেশের চিন্তাশীল যাঁহারা এবং দেশের ভবিষ্যতের অধিকারী যাঁহারা তাঁহাদের দূর প্রসারিত দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎকে দেখিতে হইবে। কূপমণ্ডুকের ভবিতব্য মৃত্যুমাত্র, কাজেই আমাদের উদ্ধার হইতে হইবে সে অবস্থা হইতে।

ভারত সরকার কবিগুরুর শতবার্ষিকীর আয়োজন এখন হইতেই করিতে চাহেন। বাঙালী যদি জাগ্রত ও সচেতন হয় তবে ঐ শতবার্ষিকীতে সে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া গৌরবময় ভবিষ্যতের অধিকারী হইতে পারে।

আমাদের নববর্ষের আবাহনে যেন সেইদিনের আহ্বান জাগিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের বাংলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক।

বাংলার ভবিষ্যৎ সমগ্র ভারতের ভবিষ্যতের সহিত অবিচ্ছিন্ন-রূপে জড়িত, আশা করি এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যদি স্বীকৃত হয় তবে আমাদের দেখিতে হইবে আমরা কিরূপে অন্য প্রদেশগুলির সঙ্গে সমবেত ভাবে অগ্রসর হইতে

পারি। আমরা ঘরে বসিয়া রাজা-উজীর মারিব বা আত্মকলহে, পরনিন্দায় কিংবা ভোগসুখে বিভোর হইয়া থাকিব এবং অন্য রাজ্যের লোকেরা আমাদের সব কাজ করিয়া, আমাদের স্কন্ধে তুলিয়া প্রগতির পথে চলিবে—ইহা সম্ভব নহে। তাহারা নিজের কাজ গুছাইবে এবং অগ্রসর হইবে। বাঙালী নিঃস্ব হইতে নিঃস্বতর হইয়া দাস হইয়া যাইবে ইহাই সম্ভাব্য এবং ঘটিতেছে তাহাই। এক কলিকাতায় যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাকাইয়া দেখা যায় তবে তাহাতেই এই সামান্য সাত-আট বৎসরে যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাই অতি আশ্চর্যজনক ও দুশ্চিন্তার কারণ বলিয়া ঠেকিবে। পেশার ক্ষেত্রে, চাকুরির ব্যাপারে, ছোট কারবারে, দোকানে, সর্বত্রই ত আমরা হটিয়াই যাইতেছি। অথচ সেদিকে কাহারও চিন্তার বা প্রয়াসের চিহ্নই নাই। আছে শুধু খেদোক্তি ও সরকারকে গালিগালাজ। এরূপ বিকারগ্রস্ত অবস্থায় আর কতদিন চলিবে?

বাহিরের বিপদও আছে যথেষ্ট। পূর্বপাকিস্থান হইতে উদ্বাস্তুদল ত আসিতেছেই। তাহারা ছিন্নমূল এবং বিভ্রান্তচিত্ত। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসিক শক্তি তাহাদের নাই। না আছে তাহাদের সেই শারীরিক শক্তি বা অধ্যবসায় যাহার বলে পঞ্জাবী বা সিন্ধী উদ্বাস্তু আজ প্রায় স্বাবলম্বী। উহারা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বের খাতেই অঙ্কবৃদ্ধির কারণ, অথচ পাকিস্থানের চক্রান্তে এই স্রোতের প্রবাহ কমিবার সম্ভাবনাও নাই। যদি পশ্চিম বাংলা সবল ও দৃঢ় চিত্তে ইহার প্রতিকারে অগ্রসর হয় তবেই এ সমস্যা পূরণ হইবে। কিন্তু আমাদের সে বিষয়ে চিন্তার বা প্রয়াসের অবকাশ কোথায়? পাকিস্থান বিনা দ্বিধায় এই হিন্দু বিতাড়ন চালাইয়া যাইতেছে, কেননা তাহারা জানে ভারতে অন্তঃকলহ নানাদিকে এবং সর্বাপেক্ষা অধিক গৃহবিবাদ পশ্চিমবঙ্গে।

এ বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা আমাদের ভবিষ্যৎ অনেক অংশে নির্ভর করিতেছে এই সমস্যা পূরণের উপর। ইহা এখন ক্রমেই যে রূপ ধারণ করিতেছে তাহাতে পরিণতিতে কোথায় কি হয় বলা যায় না।

নববর্ষের কল্যাণ যদি আমাদের কাম্য হয় তবে প্রাচীন ও পূর্ণ ভাবে পরীক্ষিত যে প্রগতির পথ আছে সেইগুলিই আবার আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালীকে খুব ভাল করিয়াই চিনিতেন—সেইজন্যই তিনি তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "চালাকীর দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না।" আজিকার বাঙালী বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, স্থিতপ্রজ্ঞ ও পৌরুষগুণযুক্ত কিনা সে বিষয়ে তর্কের অবতারণা চলে, কিন্তু "চালাকী"তে সে যে অদ্বিতীয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহাই বাঙালীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সর্বপ্রধান অন্তরায়। অথচ এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে, আমরা উর্বর-মস্তিষ্ক এবং চেষ্টা করিলে অতি কঠোর সমস্যাও বিচার-বিবেচনার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারি। শুধু এই বিপদ যে, আমরা চিন্তার ক্ষেত্রেও আজ কোনরূপ প্রয়াসে কুণ্ঠিত। এই ভাব আমাদের দূর করিতেই হইবে।

রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতি

কেন্দ্রীয় শিল্পনীতির নূতন ব্যাখ্যা শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার জানাইয়াছেন। সরকারের বর্তমান শিল্প-নীতি ১৯৪৮ সনে গৃহীত হইয়াছিল, এবং ইহার ভিত্তি ছিল মিশ্র অর্থনীতি। ১৯৪৮ সনের পর ভারতীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং প্রধান পরিবর্তন এই যে, কংগ্রেসী সরকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন—সেই অনুসারে তাঁহাদের কার্যক্রমেরও কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। নীতির তাগিদে সব সময়ে প্রয়োজন গড়িয়া উঠে না, সামাজিক প্রয়োজনে নীতি গড়িয়া উঠে। বর্তমান শিল্পনীতি যখন গৃহীত হইয়াছিল তখন পরিকল্পিত অর্থনীতির কল্পনা ছিল না, সুতরাং শিল্পনীতির আশু সংশোধন অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়া অনুসারে শিল্পনীতি সংশোধন করা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ভারতীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য—সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং এই আদর্শের অনুসরণে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত অর্থসন্নিবেশ প্রতিরোধ করিবে। এই ব্যবস্থার গুরু দায়িত্বভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। ভবিষ্যতে খনিজ পদার্থের উত্তোলন এবং বুনিয়াদী ও বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। তবে এই সকল ক্ষেত্রেও নূতন খনি কিংবা শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেসরকারী ও সরকারী যুক্ত প্রচেষ্টার সম্ভাবনা থাকিবে। অধিকন্তু, যে সকল বেসরকারী শিল্প রাষ্ট্রের নিকট হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিবে, সেই সকল শিল্পে সরকার অংশ গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রেও রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

অমৃতসর কংগ্রেসে যে অর্থনৈতিক প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে তাহাই সরকারী নূতন শিল্পনীতির ভিত্তি। সম্প্রতি মোট আয়ের কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা হইবে না; তবে ব্যয়ের উপর কর-ধার্য নীতি সর্বতোভাবে কার্যকরী হইবে। সম্প্রতি এই ব্যাপারে ভারত সরকার কয়েকজন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদের অভিমত চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অভিমত দিয়াছেন যে, মোট আয়ের সীমা নির্দিষ্ট না করিয়া মোট ব্যয়ের উপর কর ধার্য করা উচিত।

নূতন শিল্পনীতি অনুসারে শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিঘোষিত হইবে। প্রথম শ্রেণীর শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকিবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতি অনুসারে ছয়টি শিল্পকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা হইয়াছিল, এবং ইহারা যথাক্রমে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, বিমান উৎপাদন, জাহাজ নির্ম্মাণ। খনিজ তৈল এবং টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার ও রেডিও নির্ম্মাণ। ঐ নীতি অনুসারে আণবিক শক্তি উৎপাদন ও অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ এবং রেলপথের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

নূতন শিল্পনীতি অনুসারে এই নয়টি শিল্প রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে; ইহার সহিত আরও দুইটি যুক্ত হইবে, যথা জীবনবীমা ও বিমান। অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্প-প্রচেষ্টা

যথোপযুক্ত মূলধন সৃষ্টি বা নিয়োগ করে নাই, সেই সকল শিল্পও সরকার নিজের আয়ত্তাধীনে আনিবেন। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বৃহদায়তন ঢালাই, বৃহৎ বৃহৎ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ইঞ্জিন, তামা, সীসা, জিঙ্ক, টিন প্রভৃতি খনিজ পদার্থের উন্নয়ন, এবং খনি খননের জন্য ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহার উৎপাদনও রাষ্ট্র নিজ হস্তে লইবে। এতদিন পর্য্যন্ত এইগুলি ছিল বেসরকারী দায়িত্বের অধীনে। হীরক-খনি উন্নয়ন ও বৈদ্যুতিক তার নির্ম্মাণও প্রথম শ্রেণীর শিল্পের অন্তর্গত হইতে পারে, অর্থাৎ এইগুলি রাষ্ট্রের অধীনে আসিবে। এই সকল শিল্পক্ষেত্রে নূতন নূতন শিল্প-প্রচেষ্টা ব্যাপারে রাষ্ট্র বেসরকারী সহযোগিতাও গ্রহণ করিতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারিবে, একচেটিয়া অধিকার কাহারও থাকিবে না। এই শ্রেণীতে পড়িবে—সার উৎপাদন, লৌহ খনিজ আকর উত্তোলন, ম্যাঙ্গানিজ আকর, ক্রোম আকর, বক্সাইট আকর উত্তোলন। আণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য বিবিধ খনিজ, অ্যালুমিনিয়াম, যন্ত্রপাতি উৎপাদন, ঔষধ নির্ম্মাণের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্য, কৃত্রিম রবার, কাগজ ও বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম মণ্ড, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ এবং সামুদ্রিক জাহাজ পরিচালনা এই শ্রেণীতে পড়িবে। এই সকল ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে কোনও প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না; রাষ্ট্রের নিকট হইতে ইহারা সমান ব্যবহার পাইবে।

অবশিষ্ট যাহা কিছু শিল্প সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইবে, এবং তাহা হইবে বেসরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্র; কিন্তু প্রয়োজন হইলে যে কোনও সময় রাষ্ট্র ইহার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিবে, যদি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অগ্রগতি সন্তোষজনক না হয়। রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে এবং রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত নীতির মধ্যে ব্যক্তিগত শিল্প-প্রচেষ্টা পরিচালিত হইবে। বেসরকারী শিল্পকে অর্থসাহায্য দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে, তবে সমবায় প্রচেষ্টার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী শিল্প রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকতর হারে আর্থিক সাহায্য পাইবে। এই আর্থিক সাহায্যের উপরের সীমা সাত কোটি টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহার অতিরিক্ত সাহায্য প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট শিল্পের অংশ ক্রয় করিবে। আর বৃহদায়তন ও স্বল্পায়তন শিল্পের মধ্যে, পরবর্ত্তী শিল্পকে রাষ্ট্র বেশী করিয়া সাহায্য করিবে। অর্থাৎ, বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত থাকিবে, ইহাদের উপর বৈষম্যমূলক কর ধার্য্য করা হইবে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠান-সমূহের উৎপাদনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। শিল্প-সংস্থার যাহাতে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষিত হয় সে বিষয়ে রাষ্ট্র সমুচিত উপায় অবলম্বন করিবে। বহুলাংশে বর্ত্তমান ব্যবস্থার অনুমোদন নূতন শিল্পনীতিতে বিঘোষিত হইবে। মিশ্রনীতিই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি থাকিবে, তবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের সীমানা পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইবে। সমাজতান্ত্রিক নীতি আরও দৃঢ়তর ভাবে অনুসৃত হইবে এবং তাহার ফলে ব্যক্তিগত শিল্প রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসাবে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থান করিবে এবং প্রয়োজন হইলে যে-কোনও সময়ে ইহাদিগকে জাতীয়করণ করা যাইতে পারিবে। রাষ্ট্রের নীতি অনুসরণ করার উপর ইহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিবে। জাতীয়করণের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার আশ্বাস দেওয়া হইবে না, যেমন দেওয়া হইয়াছিল ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতিতে।

ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত, এক অর্থে ইহা ঐতিহাসিক বিপ্লবাত্মক। রাশিয়া এবং চীন-বিপ্লবকে আমরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে দর্শন করি, কিন্তু ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইহাদের চেয়ে কোনও অংশে কম চমকপ্রদ নহে, তবে নিজের দেশের বলিয়া তেমন প্রশংসা লাভ করে না; পরের হয়ত সব কিছুই ভাল। ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অজানিতভাবে ধীরে ধীরে সম্পাদিত হইতেছে; অজানিত অর্থে খুব অল্পসংখ্যক জনসাধারণই এই বিপ্লবের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়াস করে; চটকদারী বুলি মুখস্থ করার দিকেই আগ্রহ বেশী। মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনবাদ—যাহা শ্রেণী-সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যেন অঘটনঘটনপটীয়সী ভারতবর্ষে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা রক্তপাত ও শ্রেণীসংহারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; ইহা শ্রেণী-সহযোগ ও শ্রেণী-বিবর্ত্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধনীকে মধ্যবিত্তের পর্য্যায়ে টানিয়া আনা এবং নির্ধনকে মধ্যবিত্তের পর্য্যায়ে তোলা ভারতীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও কাম্য; মার্ক্সীয় মতবাদ যে ধনী উত্তরোত্তর ধনী হইতে থাকিবে (Concentration of Capital) তাহা বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই গণতন্ত্র সমাজের নিম্নস্তর হইতে উপর দিকে ক্রমোন্নতিশীল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ভূমিবণ্টন নীতি

দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়াতে ভূমিবণ্টন-ব্যবস্থার প্রস্তাব দেখিয়া অনুমিত হয় যে, ইহা যেন বিচারবুদ্ধির চেয়ে মানসিক প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রস্তাবিত ভূমি-সংস্কারের পিছনে কোন চিন্তাশীল আদর্শ নাই এবং ইহার ফলাফলের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ও গণ্য করা হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনায় জমিদারী-প্রথার বিরুদ্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী কার্য্যকরী হইতে পারে না। যে দুইটি নীতির উপর ভূমি-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই দুইটি নীতি হইতেছে—অর্থনৈতিক পারদর্শিতা ও সামাজিক ন্যায়বোধ। যতদিন পর্য্যন্ত জমিদারী-প্রথা ছিল ততদিন পর্য্যন্ত সামাজিক ন্যায়বোধের প্রয়োজন ছিল, কারণ—ইহার মাপকাঠিতে সামাজিক পর্য্যায় নির্ণয় ও আয়ের বণ্টন করার চেষ্টা ছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভূমি-সংস্কার চারি প্রকারে সাধিত হইবে, যথা—(১) নিজস্ব কৃষির জন্য মালিক যে পরিমাণ জমি রাখিতে পারিবে তাহার সীমা নির্দ্ধারণ; (২) মালিক যে জমি বর্ত্তমানে চাষ করিতেছে তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ; (৩) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমির অতিরিক্ত জমির পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা; (৪) রায়তী নিরাপত্তা এবং খাজনা নির্দ্ধারণ।

যে চাষী জমি তাহারই, এই কথা এতদিন কংগ্রেস বলিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বাক্য আর অনুসরণ করা কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধ করেন না, সেইজন্য ইহার পরিবর্ত্তে নূতন নীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই নূতন নীতির নাম "পারিবারিক জমা" বা পারিবারিক খামার (family farm)। পারিবারিক জমা হইবে—একটি বিশিষ্ট পরিমাণের জমি যাহার খরচসমেত বাৎসরিক আয় হইবে ১,৬৮০৲ টাকা এবং খরচ বাদ দিয়া মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,২০০৲ টাকায় এবং লাঙ্গল-পরিমিত জমির কম হইবে না। লাঙ্গল-পরিমিত জমি উক্ত পরিমাণের খামার নাও হইতে পারে, কিন্তু এই পরিমাণ জমির প্রধান উদ্দেশ্য—পরিবারের সমস্ত কর্ম্মঠ ব্যক্তির পূর্ণ কর্ম্মের ব্যবস্থা করা।

এইরূপ পারিবারিক খামারের প্রধান দোষ যে, ইহার সর্ব্বভারতীয় কোন মাপকাঠি হইতে পারে না। বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন জেলায়, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পারিবারিক খামারের পরিমাণ বিভিন্ন হইতে বাধ্য। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার পারিবারিক খামার নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে আঞ্চলিক জমির উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, এবং ইহা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ভারতবর্ষে প্রকৃতির খামখেয়ালের উপর কৃষি নির্ভর করে বলিয়া বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনের পরিমাণ এবং চক্রকর্ষণে (rotation of crops) বিভিন্নপ্রকার শস্যের উৎপাদিত পরিমাণেরও তারতম্য হইতে বাধ্য। এই ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য যে প্রকার কারণিক ব্যবস্থা এবং যে প্রকার খরচ প্রয়োজন তাহাতে জনসাধারণের যথার্থ মঙ্গল হইবে কিনা চিন্তার কথা।

এই কথা স্মরণীয় যে, এই ব্যবস্থা প্রচলন করিতে হইলে এক বিরাটসংখ্যক কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হইবে যাহাদের অনুমানের উপর সহস্র সহস্র কৃষক-পরিবারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে। বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা শক্তির হিসাবকালীন এই সকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে অসাধুতা ও ঘুষের প্রাবল্য প্রকট হইতে বাধ্য, যেমন হইয়াছে বর্ত্তমানে বাংলাদেশে ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের মধ্যে।

অধিকন্তু, পারিবারিক খামারের পরিমাণ চিরন্তনভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে ব্যক্তিগত আয়ও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে পারিবারিক খামারের পরিমাণ কম-বেশী করিতে হইবে। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি ভাগ হইবে এবং তাহার ফলে পারিবারিক খামারের পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, ইহা প্রতিদিনকার ঘটনা। সুতরাং সরকারী খাসে অতিরিক্ত পরিমাণ জমি থাকার প্রয়োজন—যাহা হইতে দ্বিধাবিভক্ত পারিবারিক খামারকে পুনরায় কাম্য পরিমাণে পূরণ করা যাইতে পারিবে। যেখানে জনসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান সেখানে পারিবারিক খামারের পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বিস্তর জমির প্রয়োজন। রাষ্ট্র এত জমি কোথায় পাইবে এবং এই সকল খাস জমির চাষ করিবে কাহারা? অবশ্য দিনমজুররা, তাহা হইলে কি দিনমজুররা জমির মালিক হইতে পারিবে না। সরকারী প্রচেষ্টায় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে—একদল চাষী হইবে জমির মালিক, আর একদল ভূমিহীন চাষী থাকিবে জমির মজুর হিসাবে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির দুর্দ্দশার কারণ

ভারতীয় ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ সি. এইচ. ভাবা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় বলেন যে, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগিতায়, কেরাণীদের অযোগ্যতা প্রভৃতি কারণে ব্যাঙ্কগুলির খরচের হার ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। শ্রীভাবা বলেন, ১৯৪৮-১৯৫৫ সনের মধ্যে ভারতীয় সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৩৫ কোটি টাকা, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ সেস্থলে বৃদ্ধি পায় ৪৫ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যান হইতেই এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার স্বরূপ বোঝা যাইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির দুর্দ্দশার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ইকনমিক উইকলি" শ্রীভাবার উপরোক্ত মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীভাবা তুলনার জন্য কেন যে ১৯৪৮ সনকে ভিত্তি করিলেন তাহা দুর্বোধ্য। কারণ দেশ বিভাগজনিত চাপ ঐ বৎসরই ব্যাঙ্কগুলির উপর সবচেয়ে বেশী পড়ে। ১৯৪৮ হইতে ১৯৪৯ সনের মধ্যে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানত প্রায় ১০৫ কোটি টাকা হ্রাস পায়; সেস্থলে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় মাত্র সতেরো লক্ষ টাকা। স্পষ্টতঃই ভারতীয় ব্যাঙ্ক হইতে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কে আমানতের হস্তান্তরের জন্যই ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আমানত এইরূপ কমিয়াছিল তাহা বলা যায় না। আমানত হ্রাসের প্রধান কারণ হইল ভারত হইতে পাকিস্থানে তহবিলের হস্তান্তর। ১৯৪৯ সনে ভারত হইতে পাকিস্থানে অর্থপ্রেরণের উপর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (exchange control) ব্যবস্থা প্রচলন করে তখন হইতেই ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আমানত হ্রাস বন্ধ হয়। সুতরাং যদি কোন দীর্ঘমেয়াদী তুলনা করিতে হয় তবে তাহা ১৯৪৯ সনকেই ভিত্তি করিয়া করাই সমীচীন। ১৯৪৯ সন হইতে ১৯৫৫ সনের মধ্যে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ১৩৫ কোটি টাকা বাড়ে, সে স্থলে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বাড়ে মাত্র ৪৪ কোটি টাকা। এই অবস্থায় ১৯৪৮

লনকে ভিত্তি করিয়া তুলনামূলক বিচারের ফলে শ্রীভাবার সিদ্ধান্ত বহুলাংশে ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে।

"ইকনমিক উইকলি" আরও লিখিতেছেন যে, তপশীলভুক্ত ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের উপর যে শক্তিনিচয়ের প্রভাব পড়িতেছে তাহার সম্যক্ উপলব্ধির জন্য ১৯৪৯ হইতে ১৯৫২ এবং ১৯৫২ হইতে ১৯৫৫ সনের স্বতন্ত্র আলোচনা করা দরকার। ১৯৪৯ সনের শেষের দিকে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি দেশবিভাগের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হয় বলা চলে এবং ফলে পর বৎসর কোরিয়ার যুদ্ধজনিত 'গরম' বাজারের সকল সুবিধা তাহারা গ্রহণ করে। এই অবস্থায় ১৯৪৯-৫০ সনে তাহাদের মোট আমানত ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলিও প্রায় সমান ভাবেই উপকৃত হয়, কিন্তু তাহা অপ্রত্যাশিত ছিল না। ১৯৫১ সনের মাঝামাঝি ভারতের বাহিরের কোরিয়া-যুদ্ধের বাজার-গরম শেষ সীমায় পৌঁছে এবং ১৯৫১ সনের নবেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই বাজারমন্দার প্রভাব ভারতের উপর সম্পূর্ণভাবে পড়ে নাই। ১৯৫২ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আমানত বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়। ১৯৫২ সনের শেষ ভাগে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ নাড়া খায় এবং সম্ভবতঃ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি এই সুযোগে তাহাদের প্রতিযোগিতা আরও জোরালো করে। এই সময় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির চাহিদা আমানত (Demand Deposit) হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৫২ সনে গোড়ার দিকে তাহা প্রায় ১৫ কোটি টাকা বাড়িয়া যায়। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি সর্ব্বপ্রকারে আমানতকারীদিগকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় শ্রীভাবা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যদি ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখিতেন তবে তাহার যৌক্তিকতা আংশিক অস্বীকার করা যাইত না।

কিন্তু ১৯৫২ সনের শেষ দিক হইতে ১৯৫৫ সনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯৫৩ সনে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানত ২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় অথচ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানত ১৬ কোটি টাকা হ্রাস পায়। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক রেট বর্দ্ধিত হওয়ায় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির উপর প্রত্যক্ষভাবে তাহার প্রভাব পড়ে, ফলে, তাহাদের চাহিদা আমানত ১৪ কোটি টাকা হ্রাস পায়। কিন্তু তাহাদের মেয়াদী আমানত হ্রাস পায় মাত্র দুই কোটি টাকা। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহাদের আমানতের পরিমাণ বজায় রাখিবার জন্য এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি কি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইহাতে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষতি হইয়াছে বলা যায় না, কারণ ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির মেয়াদী আমানতের পরিমাণ প্রায় ১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়।

মোটামুটি ভাবে দেখা যায় যে, ১৯৫২-১৯৫৫ সনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত ১৬৯ কোটি টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; সে স্থলে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬ কোটি টাকা। এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির মেয়াদী আমানত বৃদ্ধি পায় ৯২ কোটি টাকা, আর এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির বাড়ে ১৩ কোটি টাকা।

উপসংহারে "ইকনমিক উইকলি"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে, সম্প্রতি সর্ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইবার জন্য যে আবেদন জানান এবং শ্রীভাবা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত দাদনের উপর সুদের হার চড়াইবার ব্যাপারে ষ্টেট ব্যাঙ্ক সাহায্য করিতেছে না বলিয়া যে সমালোচনা করেন তাহাতে স্বতঃই মনে হয় যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কজগতের প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তিগণ বোধ হয় মনে করেন, ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত দাদনের উপর সুদের হার বৃদ্ধি করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমতি দিতেছে বলিয়াই ব্যাঙ্কগুলির আয় বাড়িবার সুযোগ হইতেছে না। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, ঋণকারীরা যে হারে সুদ দিতে প্রস্তুত আছেন, কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই তাহা অপেক্ষা চড়া হারে সুদ ধার্য্য করা সম্ভব নহে। কিন্তু অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, বিশেষতঃ বেসরকারী অর্থবিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের কর্ত্তব্য পালন সম্পর্কে কোনই মনোযোগ দিতেছে না।

খনিজ তৈল ও ভারতের সরকারী নীতি

খনিজ তৈল জাতির অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। এখনও পর্য্যন্ত ভারতে খনিজ তৈল উৎপাদন আসাম প্রদেশেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। আসামে প্রথম তৈলখনি আবিষ্কৃত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আসামে ভূগর্ভ হইতে খনিজ তৈল নিষ্কাশনের জন্য প্রথম কূপ খনন করা হয়—সেই কূপের গভীরতা ছিল মাত্র ৬৬০ ফুট। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৯০০টিরই অধিকসংখ্যক কূপ খনিত হইয়াছে। সম্প্রতি আসামে খনিজ তৈলের আরও কয়েকটি আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতীয় খনিজ তৈলশিল্পের বিকাশের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত তৈল-নিষ্কাশণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশী মালিকানার আওতায় ছিল। প্রকৃত পক্ষে, আসাম অয়েল কোম্পানীই তৈলশিল্পে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। আসাম অয়েল কোম্পানী তৈলশিল্প হইতে কিরূপ মুনাফা লুটিতেছে, শতকরা তিন শত ভাগ লভ্যাংশ বিতরণের ব্যবস্থা হইতেই তাহা প্রকাশ পায়। নবাবিষ্কৃত তৈল-অঞ্চলে কার্য্য চালাইবার জন্য ভারত সরকার আসাম অয়েল কোম্পানীর সহিত যুক্তভাবে একটি নূতন কোম্পানী গঠনের জন্য আলোচনা চালাইয়াছিলেন। আলোচনার প্রাথমিক স্তরে ঠিক হয় যে, নূতন কোম্পানীটির সমগ্র মূলধনের এক-তৃতীয়াংশ সরকারের হাতে থাকিবে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ থাকিবে ব্যবসায়ীদের হাতে। মৌলানা আজাদ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতি অনুযায়ী সরকার সমগ্র মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগই

গ্রহণ করিবেন—অর্থাৎ নূতন কোম্পানীটি সরকার-নির্দ্ধারিত নীতিতেই পরিচালিত হইবে।

"ইকনমিক উইক্‌লি" পত্রিকার নয়াদিল্লীস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, নবগঠিত কোম্পানীতে শতকরা ৫১ ভাগ মূলধন সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা সম্ভব হইয়াছে কেবলমাত্র "সহ-অবস্থিত" নীতির জন্যই। ইহা মনে করা মোটেই সঙ্গত হইবে না যে, সরকার হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছেন—তৈল জাতির অন্যতম প্রধান সম্পদ এবং বিদেশীরা উহা লুটিয়া খাইতেছে। তৈলশিল্প সম্পর্কে সরকার এতদিন পর্য্যন্ত কোন সুদৃঢ় নীতি অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, উপযুক্ত মূলধন ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবজনিত মানসিক দুর্ব্বলতা। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের জন্যই সরকার প্রথমে নূতন তেল কোম্পানীটির অধিকাংশ মূলধন বেসরকারী হাতে রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

কি অবস্থায় সরকার নূতন নীতি গ্রহণে সাহসী হইলেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত প্রতিনিধি লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে খনিজ তৈলের অবস্থান ও উৎপাদন সম্পর্কে রুশ বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট এবং আন্তর্জাতিক তৈল চুক্তি-সংস্থার (international oil cartel) বহির্ভূত একটি মার্কিন কোম্পানীর সহযোগিতার প্রস্তাব পাওয়ার পরই সরকার নূতন নীতি গ্রহণের মনোবল লাভ করিয়াছেন।

উক্ত প্রতিনিধি আরও লিখিতেছেন যে, সরকারের নূতন ঘোষণার ফলে আসাম অয়েল কোম্পানী এখন এক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। যদি কোম্পানী সরকারের পরিচালনাধীনে থাকিতে সম্মত না হয় তবে আসামের নাহরকাটিয়া অঞ্চলে ৫০০ বর্গমাইল-ব্যাপী স্থানে তৈল অনুসন্ধানের যে অধিকার তাহারা লাভ করিয়াছে তাহা কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে।

ভারতের খনিজ-সম্পদ

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়া আশু প্রয়োজন। সে বিষয়ে লোকসভায় যে আলোচনা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :

"নয়াদিল্লী, ৯ই এপ্রিল—প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালবীয় লোকসভায় তাঁহার মন্ত্রণালয়ের ব্যয়বরাদ্দ সম্বন্ধে আলোচনার উত্তরে বলেন যে, ভারত সরকার বর্ত্তমানে দুইটি প্রাইভেট কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত বিন্ধ্যপ্রদেশের পান্না হীরক-খনি এবং রাজস্থানের একটি তাম্রখনি রাষ্ট্রীয়করণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন যে, আসামে তৈল উৎপাদন ও তৈলের অনুসন্ধানের জন্য সরকার টাকা মূলধনযুক্ত একটি কোম্পানী সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ পরিকল্পনায় আসাম অয়েল কোম্পানী এক অংশীদার থাকিবেন। সরকার আসাম অয়েল কোম্পানীর নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল সর্ত্তসমূহ লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন, যদি কর্ত্তৃত্ব, পরিচালনা, কারিগরি সংক্রান্ত পরিচালনা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ ব্যবস্থা মানিয়া লইব, অন্যথায় আমরা মানিয়া লইব না।

শ্রীমালবীয় বলেন যে, রাজস্থানে যে প্রাইভেট কোম্পানী সীসা ও দস্তার খনিসমূহ পরিচালনা করিতেছেন, সরকার তাঁহাদিগকে সীসা ও দস্তা পিণ্ডের উৎপাদন এ বৎসর তিন শত টন হইতে বাড়াইয়া পাঁচ শত টন এবং অতি সত্বর এক হাজার টন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীমালবীয় আশা করেন যে, পান্না হীরক খনি সরকারের হাতে গেলে পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে উহার উৎপাদন ৩০ হইতে ৪০ গুণ বৃদ্ধি পাইবে।

তৈল আহরণ সম্পর্কে শ্রীমালবীয় বলেন, ভারতীয় যন্ত্রবিদ্‌গণ আবশ্যক জ্ঞান অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত তৈল অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জন্য বিদেশী তৈল কোম্পানীসমূহের সাহায্যের উপর নির্ভর করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন পাঁচ লক্ষ টনের অধিক নহে; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ভারতে খনিজ তেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টন হইবে। ইহার অর্থ বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয়। এমতাবস্থায় সরকার সম্ভবপর স্থলে বিদেশী কোম্পানীসমূহের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া তৈল অনুসন্ধান ও আহরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

তিনি টাকা মূলধনযুক্ত একটি কোম্পানী গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার ও আসাম অয়েল কোম্পানীর মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছে, উহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ামাত্র পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয় লোকসভায় উপস্থিত করা হইবে।

শ্রীমালবীয় বলেন যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীর সহিত সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী বঙ্গীয় অববাহিকায় তৈল অনুসন্ধান করা হইতেছে। আশা করা যায়, সত্বর পরীক্ষামূলক কূপ খনন আরম্ভ হইবে; তখন জানা যাইবে, আহরণের উপযুক্ত পরিমাণে তৈল আছে কিনা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার কাংড়া উপত্যকায়, রাজস্থানের যশল্মীরে এবং ক্যাম্বেতে তৈলের জন্য অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন। সরকার এখন উত্তরপ্রদেশে গাঙ্গেয় উপত্যকার কোন কোন অংশেও প্রাথমিক অনুসন্ধান করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। অনেক বিবেচনা এবং ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ও ভারতীয়দিগকে সাহায্য করিবার জন্য আগত বিদেশী সংস্থাসমূহের মধ্যে অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পঞ্জাবের যে অঞ্চল তৈল কিম্বা গ্যাস পাওয়ার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছে তথায় পরীক্ষামূলক কূপ খননের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই পরীক্ষামূলক প্রথম কূপ-খনন আরম্ভ হইবে। আশা করা যায়, আমরা সাফল্যলাভ করিব। আমরা যদি অনুকূল কোন স্তর পাই, তাহা হইলে তিন-চার মাস পর আর একটি কূপ-খনন করিব। এইভাবে আমরা আমাদের কারিগরদিগকে ট্রেনিং দিব।

শ্রীমালবীয়ের বক্তৃতার পর একজন সরকারী মুখপাত্র তাম্রখনি-সমূহসম্বন্ধে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, রাজস্থানে বে-সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত একটি তাম্রখনি অবিলম্বে সরকার গ্রহণ করিবেন। বিহারে বর্ত্তমানে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত একটি তাম্রখনি বর্ত্তমান অবস্থায়ই থাকিতে দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে সরাসরি সরকার তাম্র আহরণ করিবেন।

মণিলাল গান্ধী

৫ই এপ্রিল নিম্নস্থ সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

"ডার্বান, ৪ঠা এপ্রিল—মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমণিলাল গান্ধী ডার্বানের নিকটবর্ত্তী ফিনিক্সস্থিত তাঁহার ভবনে আজ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ পীড়িত ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় পুত্র মণিলালের জন্ম ১৮৯৪ সনের ২৮শে অক্টোবর। তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয় ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায়।

১৯১৪ সনে পিতার সহিত তিনি ভারতে আসেন। কিন্তু "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণের জন্য মহাত্মা গান্ধী ১৯১৮ সনে মণিলালকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেন। পিতার নির্দ্দেশ তিনি নতমস্তকে গ্রহণ করেন। আমৃত্যু মণিলাল ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের সম্পাদক ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ঘৃণ্য বর্ণবৈষম্য নীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন মণিলাল। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এজন্য বহুবার তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন এবং অনশন পালন করেন। ১৯৫৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সাত জন ইউরোপীয়ের সহিত তাঁহাকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া পঞ্চাশ ষ্টার্লিং অর্থদণ্ড বা পঞ্চাশ দিনের বাধ্যতামূলক শ্রমদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথমে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীলের নোটিশ দিলেও পরে তিনি তাহা প্রত্যাহার করিয়া পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।"

মণিলাল আমাদের বহু দিনের পরিচিত বন্ধু ছিলেন। মহাত্মার ব্যক্তিত্বের ছায়া একমাত্র মণিলালের মধ্যেই ছিল। এরূপ সরল, স্বচ্ছ অথচ দৃঢ়চিত্ত সন্তান ভারতমাতার অল্পই ছিল।

মণিলালের মৃত্যুর সংবাদে আমরা আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছি। তাঁহার অমর আত্মার কল্যাণ হউক।

ভাষাগত আন্দোলন

আমরা ভাষাভিত্তিক প্রদেশ সৃষ্টির পক্ষে বহুদিন যাবৎ লিখিতেছি। আজ যাঁহারা এ বিষয়ে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের কোনও সাড়াশব্দ এতদিন আমরা পাই নাই। আজ যে উত্তেজনার সৃষ্টি তাঁহারা করিতেছেন তাহার পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে আমরা বুঝিতে অক্ষম। কেননা যদি তাহা সত্য সত্যই কেবল ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের জন্যই হইত তবে তাহার সূচনা অন্ততঃ সাত বৎসর পূর্ব্বে হইত। সুতরাং আমরা পণ্ডিত নেহরুর উক্তি প্রকাশ করিতেছি। আমাদের সকলেরই এ বিষয় চিন্তা করা প্রয়োজন।

"বিজাপুর, ৮ই এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য পঞ্চাশ সহস্রাধিক লোকের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে এই বলিয়া ভাষাগত আন্দোলনের নিন্দা করেন যে, 'এতদ্দ্বারা আপন দেহেই আঘাত করা হইতেছে' এবং ইহার একমাত্র ফল হইবে এই যে, দেশ আরও বিভক্ত হইয়া যাইবে, দেশে আরও অনৈক্য দেখা দিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত জাতির অস্তিত্বই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

শ্রীনেহরু আরও বলেন, কোন কোন স্থানে যে আন্দোলন বা 'সত্যাগ্রহ' চলিতেছে,উহা 'দুই হাতের কলহ' ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীনেহরু কোনও বিশেষ অঞ্চলের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন, একটি রাজ্যে এই আন্দোলন 'চাপ দিয়া কার্য্যসিদ্ধির' কৌশল রূপেই দেখা দিতেছে।

মনে রাখিবেন আমরা সকলেই একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গরূপে রহিয়াছি। একটি অঙ্গুলিতে যদি আঘাত লাগে, তবে, উহার বেদনা সমগ্র দেহেই অনুভূত হয়। ভারত-রাষ্ট্রদেহের অঙ্গরূপেই রাজ্যসমূহ রহিয়াছে।

শ্রীনেহরু বলেন, আমরা যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করি, অনৈক্য আনয়ন করিয়া নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত না করি।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ছায়া

গ্লাব পাশাকে বিদায় করার পর হইতেই পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিম্নস্থ সংবাদে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"লণ্ডন, ১০ই এপ্রিল—জেরুজালেমে জনৈক ইসরাইলী সামরিক মুখপাত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিশরীয় সীমান্তের বিপরীত দিকে ব্যূহ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে ইসরাইলী স্বেচ্ছাসৈন্যেরা লরীযোগে রওনা হইয়া গিয়াছে।

ইসরাইলী মুখপাত্র আরও বলেন, গত তিন রাত্রিতে যে সকল মিশরীয় কম্যাণ্ডো সেনা ইসরাইলী সীমান্ত এলাকায় আঘাত হানিয়াছে, তাহাদিগকে আটক করিবার জন্য ইসরাইল এক অতি বৃহৎ "টানা-জাল" পাতিয়া রাখিয়াছে।

ইসরাইল কর্ত্তৃপক্ষ এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, কম্যাণ্ডো সেনারা গত রাত্রিতে তিনটি বিভিন্ন স্থানে যানবাহনের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইলে দুই জন নিহত ও চারি জন আহত হয়।

অদ্য কায়রো বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, ইসরাইলীদের আক্রমণের ফলে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বলিয়া মিশরীয় সেনাবাহিনী প্রস্তুত রহিয়াছে।

দামাস্কাস, ১০ই এপ্রিল—অদ্য সিরিয়ার জনৈক সামরিক মুখপাত্র বলেন, গত রাত্রিতে ইসরাইলী টহলদার সেনারা যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করিয়া সিরিয়ান এলাকায় প্রবেশ করিলে সিরিয়ান সৈন্যেরা প্রচণ্ড ভাবে গোলাগুলী চালায়।

পশ্চাদপসরণকালে ইসরাইলীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলিয়া যায়।

পাকিস্থান ও ভারত প্রতিরক্ষা

পাকিস্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ অস্ত্রসরবরাহ করিয়াছে ও করিতেছে তাহাতে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে শঙ্কাজনক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর নিম্নস্থ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"নয়াদিল্লী, ২১শে মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, পাকিস্থানে 'প্রচুর পরিমাণ' সামরিক সাহায্য আসার ফলে ভারতের পক্ষে এক 'ভয়ঙ্কর সমস্যা' দেখা দিয়াছে—কেননা—উন্নয়নমূলক কার্যাকলাপে যে সম্পদ নিয়োজিত হইতে পারিত, তাহা সামরিক প্রয়োজনে তলব করা হইতে পারে।

শ্রীনেহরু বলেন, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 'যুদ্ধাশঙ্কার কোন লক্ষণ' দেখা দিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু, জরুরি অবস্থা উদ্ভবের আশঙ্কাও উপেক্ষা করা চলে না।

শ্রীনেহরু বলেন, সামরিক জোট গঠন করিয়া 'আমাদের উপর যে সমস্যা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে', উহার আশু কোন জবাব আমি দিতে পারিতেছি না। কিন্তু, যখনই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক না কেন, স্বভাবতঃই তাহা সংসদকে জানান হইবে। সভা যেন মনে না করেন যে, সমস্যাটি সম্পর্কে আমরা অহেতুক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি। স্বভাবতঃই আমরা কিছুটা উদ্বিগ্ন রহিয়াছি এবং ইহাও ঠিক যে, আমরা নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতেছি না।

বিতর্কে যোগদান করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, প্রতিরক্ষার অন্তর্নিহিত কয়েকটি নীতি এবং বিশেষ করিয়া, ভারতবর্ষ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, সেগুলির প্রতি আমি লোকসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই বিতর্ককালে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুটা উদ্বেগ ও অস্বস্তি এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে এবং আমরা হয়ত তজ্জন্য প্রস্তুত নহি—এমন একটা ভয় ও আশঙ্কা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। সন্দেহ নাই—সীমান্ত অঞ্চলে হাঙ্গামার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া এবং একটি শক্তিমান বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের প্রতিবেশী দেশকে সামরিক সাহায্য দান করিতেছে বলিয়াই এ সকল আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

শ্রীনেহরু বলেন, একটি শক্তিশালী দেশ হইতে সামরিক সাহায্য আসিতেছে বলিয়া ভারতের প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত পরিস্থিতি বিপুলভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। অবস্থার এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে আমাদিগকে সকল কিছু বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

যন্ত্রবিজ্ঞানের দিক হইতে প্রতিরক্ষা বা যুদ্ধাস্ত্রের যে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অন্য কোন ক্ষেত্রেই সেরূপ ঘটে নাই। সমরাস্ত্রের উন্নতির সর্ব্বশেষ ও চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা উদ্ভাবিত হইয়াছে। এদিক হইতে বিচার করিলে প্রচুর আণবিক অস্ত্রের অধিকারী দুইটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশই প্রতিরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। এদেশের প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি পর্য্যাপ্ত কি না, তাহা আমরা কিভাবে বিচার করিব? আণবিক অস্ত্রের অধিকারী কোন শক্তি যদি নিছক সামরিক দিক হইতে ভারত আক্রমণে অগ্রসর হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিরক্ষার কিছুই নাই। কিন্তু, অন্যান্য দিক হইতে আমরা, এমনকি, আণবিক বোমার বিপদেরও সম্মুখীন হইতে পারিব। কেননা, যে জাতির প্রাণ আছে, শক্তি আছে, ঐক্য আছে, যাহারা কোন বিপদের সম্মুখেই আত্মসমর্পণ করিতে জানে না, তাহারা কদাপি পরাস্ত হয় না।"

পাকিস্থান ও মার্কিন অস্ত্র

মার্কিন যুদ্ধ দপ্তর কি ভাবে পাকিস্থানকে সশস্ত্র করিতেছে, তাহার কিছু ছায়া নিম্নের সংবাদে পাওয়া যায়।

"করাচী, ৯ই এপ্রিল—মার্কিন বিমানবাহিনীর জেনারেল জন ও'হারা সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তি অনুসারে পাক বিমানবাহিনীর জন্য সাজসরঞ্জাম প্রেরণ অদূর-ভবিষ্যতেই ত্বরান্বিত করা হইবে।

জেনারেল জন এক সপ্তাহ পাকিস্থানে সফর শেষ করিয়া অদ্য পশ্চিম এশিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পাকিস্থান বিমান-বাহিনীর জন্য মার্কিন সামরিক সাহায্যের বিশদ বিবরণ জানিতে চাহিলে তিনি প্রশ্নটি এড়াইয়া যান।

তিনি বলেন, আমি শুধু এটুকুই বলিতে পারি যে, পাকিস্থান সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের জেট বিমান পাইবে।

একটি প্রশ্নের জবাবে জেনারেল ও'হারা বলেন, সামরিক সাহায্যের পরিমাণ সম্পর্কে পাকিস্থানে বিন্দুমাত্র অসন্তোষও নাই। অবশ্য, আমি স্বীকার করি যে, সাজসরঞ্জাম ধীরে আসিতেছে বলিয়া অসন্তোষ রহিয়াছে।

মন্থরগতিতে প্রেরণের কারণ হইতেছে এই যে, পাকিস্থানকে যে ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা প্রয়োজন সেগুলির মোটামুটি ঘাটতি রহিয়াছে।

জেনারেল ও'হারা বলেন, কোন মজুত ভাণ্ডার হইতে এ সকল অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হইতেছে না—মার্কিন বিমানবাহিনীর নিয়মিত ভাণ্ডার হইতেই এগুলি প্রেরণ করা হইতেছে। পাকিস্থান বিগতকালে ব্রিটেনের নিকট হইতে যে সকল সামরিক সাজসরঞ্জাম পাইয়াছে, সেগুলির সহিত আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা কঠিন হইবে না।

ভারত, কাশ্মীর ও পাকিস্থান

বিগত ২রা এপ্রিল পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর সম্পৃক্ত পাকিস্থানের প্রচার সম্পর্কে তাঁহার মতামত যাহা দিয়াছিলেন তাঁহার রিপোর্ট আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এত দিন পরে পণ্ডিত নেহরু পাকিস্থানের অপপ্রচার সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য কিছু করিয়াছেন বলিয়াই উহা প্রণিধানযোগ্য। বলা বাহুল্য এই মন্তব্য অনেক পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল :

"২রা এপ্রিল, এক সাংবাদিক সম্মেলনে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, তিনি আর কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী নহেন বলিয়া যে ধারণা করা হইয়াছে, তাহা ঠিকই। লোকসভায় তাঁহার বক্তৃতায় তিনি কাশ্মীরে গণভোট চাহেন না বলিয়া যে ধারণা করা হইতেছে তাহা ঠিক কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে প্রধানমন্ত্রী জবাবে বলেন, 'প্রায় সেই রকমই'।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, তিনি সর্ব্বদাই এই সমস্যা (গণভোটের) সম্পর্কে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ; কিন্তু বাস্তববাদী হিসাবে তিনি বলিবেন যে, ইহা তাহাদিগকে 'অন্ধ গলিতে' লইয়া যাইতেছে। 'সুতরাং যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সেইদিক হইতে একটা মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারি'।

শ্রীনেহরু বলেন যে, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী পাকিস্থান জাতীয় পরিষদে গত শনিবার যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, যদি আইনগত ও সংবিধানগত দিক হইতে সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে ইহাই ঠিক যে, পাকিস্থান আক্রমণকারী, এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তি বৈধ ও সম্পূর্ণ ; কিন্তু উহাকে বাস্তব দিক হইতে বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা হইলে গত আট বৎসরে যে বিভিন্ন অবস্থার বা ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সবই বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেখানে বিভিন্ন সংবিধানগত ও বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং আমি বলিতে চাই যে, কাশ্মীর সম্পর্কে মিঃ বুলগানিন এবং মিঃ ক্রুশ্চেভ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা আইনগত, সংবিধানগত ও বাস্তব দিক হইতে সম্পূর্ণ নির্ভুল'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, লোকসভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, সেই বক্তৃতায় কাশ্মীরের প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। ঘটনা সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়াতেই তিনি বিশদভাবে বলিয়াছেন, 'ব্যাখ্যা সম্পর্কে যে মতবৈষম্য তাহা বুঝা যায়, কিন্তু মূল ঘটনা যাহা রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে এবং সেই জন্য সেইগুলির পুনরুল্লেখ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি মনে করি পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সবটাই সম্পূর্ণ ভুল।' অতঃপর শ্রীনেহরু বলেন, এই সমস্ত বিষয় বহুবার বলা হইয়াছে। প্রথম ঘটনা ভারতভুক্তি, ভারতভুক্তি সম্পর্কে আইনগত ও সংবিধানগত কোন সন্দেহই নাই এবং 'যদি মিঃ মহম্মদ আলি ও অপরাপরে বলিতে থাকেন যে, ইহা প্রবঞ্চনা করিয়া করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার এবং পাকিস্থানে অপরদের কোন সুবিধা হইবে না'।

শ্রীনেহরু বলেন যে, পাকিস্থানে মার্কিন সামরিক সাহায্য এবং কাশ্মীরের অভ্যন্তরে গত কয়েক বৎসরে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিতে হইবে। মার্কিন সামরিক সাহায্যের জোরে ভারতের চারিদিকে, এমন কি পাকিস্থান-অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে পর্য্যন্ত, সামরিক ঘাটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উহা ভারতের দেশরক্ষার দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তিনি ইহা উল্লেখ করেন যে, গণভোট গ্রহণের প্রথম সর্ত্ত ছিল সৈন্য অপসারণ। কিন্তু এতৎসম্পর্কে আলোচনার পর পাকিস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহার ফলে সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া সমগ্র পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

তিনি বলেন যে, কাশ্মীরের ভিতরে বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং আরও উন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। শীঘ্রই কাশ্মীর সংবিধান চূড়ান্ত হইবে এবং উক্ত সংবিধানের ভিত্তিতে ঐ রাজ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রী সিয়াটো সম্মেলন সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, শ্রীবুলগানিন ও শ্রীক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন যে, জনগণ কাশ্মীর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং কাশ্মীর রাজ্য ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সোভিয়েট নেতাদের এই অভিমত সম্পর্কে সিয়াটো শক্তিবর্গ সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীনেহরু বলেন যে, সোভিয়েট নেতাদের এই বিবৃতি সম্পূর্ণ সত্য।

পাক প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থান বাহিনী ১৯৪৮ সনে মে মাসে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীনেহরু এই উক্তির প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, পাকিস্থান বাহিনী ১৯৪৭ সনে নবেম্বর মাসেই কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে, উহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে।

কাশ্মীরে যখন গোলযোগ চলিতেছিল, তখন পাকিস্থান আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া পাক প্রধানমন্ত্রী যে উক্তি করিয়াছেন, শ্রীনেহরু তাহারও প্রতিবাদ করিয়া বলেন, হানাদাররা যখন আসিয়াছিল, তখন কাশ্মীরে কোনই গোলযোগ ছিল না। ইহা অনাহূত, অযৌক্তিক, উপদ্রব ও আক্রমণ।'

শ্রীনেহরু বলেন, পাকিস্থানের প্রতিনিধি মিঃ জাফরুল্লা খান যখন প্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন তিনি অনেকগুলি বিবৃতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবৃতিসমূহ আগাগোড়াই মিথ্যায় পরিপূর্ণ। সংসদে আমি ইহা বলিয়াছি এবং পুনরায় ইহার উল্লেখ করিতেছি।

তিনি বলেন, একটি মজার ব্যাপার এই যে, কাশ্মীর আক্রমণের সূচনায় কোন ভারতীয় বাহিনী সেখানে ছিল না। আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর বহুদিন কাশ্মীরে একজনও ভারতীয় সৈন্য যায় নাই। সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা আক্রমণকারীদের নিকট উন্মুক্ত ছিল। শ্রীনগরের জনসাধারণই শ্রীনগর রক্ষা করিয়াছে।

অতঃপর তিনি বলেন, পাকিস্থানের সহিত কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার জন্য আমরা বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিয়াছি; কারণ পাকিস্থানের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করাই আমাদের অভিপ্রায়। কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইতে হইয়াছে; কাশ্মীরে নির্ব্বাচন হইয়াছে এবং সেখানে বিধানসভাও গঠিত হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থান শুল্ক বিভাগের এক ব্যাগ ঘোষণা ফরম সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ১৯৫৩ সনে এই ফরম বাহির করা হইয়াছে। উহাতে 'পর্ত্তুগীজ পাকিস্থান' উল্লেখ আছে। তিনি বলেন যে, পর্ত্তুগালের এই উপনিবেশ ত্যাগ করিবার পর পাকিস্থান গোয়ার উপর একটা দাবি করিবার চিন্তা করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারত অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে যে খবর বাহির হইয়াছে, প্রধানমন্ত্রী তাহা সমর্থন করেন এবং বলেন যে, ইহা পুরাতন ব্যাপার। দুই বৎসর ধরিয়া এই সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে, তবে মাল পৌঁছাইয়া দেওয়ার চুক্তি সম্প্রতি হইয়াছে। অস্ত্র ক্রয়ের নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমরা অস্ত্র ক্রয় সম্পর্কে কোন দেশের সহিত বাঁধা থাকিতে চাহি না, কখন কোথায় ও কি অস্ত্র কিনিতে হইবে তাহা ভারতই ঠিক করিবে।'

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করিতে চাহিয়াছে —এই কথা শ্রীনেহরু অস্বীকার করেন, তবে তিনি বলেন যে, ভারতই রাশিয়ায় সামরিক ও অসামরিক বিমান পাওয়া যায় কিনা, তাহা জানিতে চাহিয়াছিল। আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ব্রিটিশ প্রধান নৌ-সেনাপতি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সহিত বিমানবাহী জাহাজের সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা হইয়াছে।"

পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতি সম্পর্কে আমাদের মত এইমাত্র যে, পাকিস্থান যে ভারতের সঙ্গে শত্রুতা ভিন্ন আর কিছু চাহে না, তাহার ভারতকে বিপন্ন করার চেষ্টার যে অন্ত নাই, এ বিষয়ে বিশ্বজগতে বোধ হয় পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার গুটিকতক চক্রান্তকারী চাটুকার ভিন্ন আর কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। তবে অযথা এইরূপ যাচিয়া বন্ধুত্ব করার চেষ্টার অর্থ কি? গোড়ায় পাকিস্থানের হানাদারদিগের অমানুষিক বর্ব্বরতা ও পাকিস্থান সরকারের ক্রুর ও শঠতাপূর্ণ আচরণের কথা আমরা চাপিয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই ত জাফরুল্লা এই মিথ্যার অভিযানের সৃষ্টি করিতে সুযোগ পান। সুযোগ আরও বাড়ে সে সময় আমাদের এক অতি অযোগ্য ও অপদার্থ রাষ্ট্রদূতের কার্য্যে অমনোযোগে। মার্কিন দেশে যখন পাকিস্থান মিথ্যার বন্যা বহাইয়াছিল, ইনি তখন আমাদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে তাহার খণ্ডনে তৎপর না হইয়া আলস্যে ও বিলাসে সময় কাটাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, অতীতের কথা ছাড়িয়া এখন ভবিষ্যতের চিন্তা প্রয়োজন। আমাদের এখন সকল সামরিক বিষয়ে সচেষ্ট প্রস্তুতির সময় আসিয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু

নিম্নস্থ বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে গৃহীত। আমাদের মন্তব্য সর্ব্বশেষে দেওয়া হইল:

"কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বৃহস্পতিবার ২৯শে চৈত্র কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিপুল হারে উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, পাকিস্থান সরকার নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিশ্রুতি সর্ব্বাংশে রক্ষা করেন নাই। পক্ষান্তরে ভারত ঐ চুক্তির প্রতিটি অক্ষর পালন করিয়া চলিয়াছে।

"শ্রীখান্না উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি সম্পর্কে জানান যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসরকার পূর্ব্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য তিন লক্ষ একরের মত জমি দিতে চাহিয়াছেন।

"তিনি আরও জানান যে, সবচেয়ে বেশী জমি পাওয়া যাইতেছে ত্রিপুরার এক উপত্যকায়। এখানে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশমত ৮০,০০০ একর বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকার পান্না, ছত্রপুর, টিকমগড় ও দাতিয়া জেলা কয়টিতে ৭০,০০০ একর জমি দিতে চাহিয়াছেন।

"ইহা ছাড়া, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার যথাক্রমে ১২,০০০ ও ৫৬,০০০ একর জমি দিতে চাহিয়াছেন। শেষোক্ত এই দুই জায়গার জমি ছাড়া, অবশিষ্ট সব জায়গার জমিই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

"শ্রীখান্না বলেন, সরকারের ইচ্ছা, প্রত্যেক পরিবারকেই সংসার-নির্ব্বাহোপযোগী জমি দেওয়া হয় এবং যেখানে সম্ভব নয় সেখানে আয়-পরিপূরক কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারা এই ব্যবস্থাও করিবেন ভাবিতেছেন যে, জমি উদ্ধার ও উন্নয়নের সময় উদ্বাস্তুগণকে স্ব স্ব পুনর্বাসনের জায়গায় ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হইবে। তাহাতে তাহারা ঐ উদ্ধার ও উন্নয়নকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

"ক্রমবর্দ্ধমান হারে উদ্বাস্তু সমাগম সম্পর্কে পাকিস্থানী নেতাদের নানা মন্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নির্ণয়ের ভার পাকিস্থান সরকারের। তাঁহাদের ভারত সরকারের কর্ত্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া এক্ষেত্রে কোন লাভ নাই।

"শ্রীখান্না এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, পাকিস্থান সরকার নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিশ্রুতি সর্ব্বাংশে রক্ষা করেন নাই। পাকিস্থান সরকারের প্রস্তাব মত ভারত সরকার উদ্বাস্তু সম্পত্তি আইন বাতিল করিলেও পাকিস্থান উহার মেয়াদ আরও এক বৎসরের জন্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, পাকিস্থান কি করে ভারত তাহার অপেক্ষায় থাকে না। ভারত নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিটি

অক্ষর পালন করিয়া চলিয়াছে। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কথা ভারতের পথনির্দ্দেশকস্বরূপ। শ্রীখান্না এরূপ আশ্বাস দেন যে, 'যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি কোথাও চুক্তির কোন প্রকার খেলাপ তাঁহার (শ্রীখান্নার) নজরে আনিতে পারেন, 'তবে নিশ্চয়ই তিনি উহার নিরাকরণের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। এখানে জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিকেরই স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়; ভারত তাহাই দেখিতেছে।

"ভারত সরকার মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সম্পর্কে কড়াকড়ি করিতেছেন কিনা—শ্রীখান্না এই বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে রাজী হন না। তিনি বলেন, যাহারা ভারতে চলিয়া আসিবে তাহাদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাদি করাই পুনর্বাসনমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার কাজ। এই সমস্যাটা অত্যন্ত বিরাট!

"শ্রীখান্নার হিসাবমত অন্যান্য রাজ্য পুনর্বাসনের জন্য নিম্নরূপ জমি দিতে রাজী হইয়াছেন:

"মহীশূর (৪,৫০০ একর), অন্ধ্র (৩,৪০০ একর), রাজস্থান (১,২০০ একর), উড়িষ্যা (৩০,০০০ একর), উত্তরপ্রদেশ (৩,৬০০ একর), এবং আসাম (৬,০০০ একর)। সৌরাষ্ট্রে ৩০০ ধীবরকে বসাইবার আয়োজনও চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আনার চেষ্টা চলিতেছে।

"তিনি আশা করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে আগামী ছয় মাসের মধ্যেই পুনর্ব্বাসনের কাজ সুরু হইয়া যাইতে পারে।

"শিক্ষা ও ক্ষয়রোগ চিকিৎসাবাবদ পুনর্ব্বাসন বিভাগ কি করিতেছেন তাহার এক হিসাব দিতে গিয়া শ্রীখান্না বলেন, উদ্বাস্তুদের মধ্যে ক্ষয়রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। ১লা জানুয়ারী হইতে এযাবৎ তাঁহারা শিক্ষা খাতে ১২ লক্ষ টাকা দিয়াছেন।"

আমাদের মনে হয় উদ্বাস্তু সম্পর্কে বিশেষতঃ পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তু সম্পর্কে এখন নূতন করিয়া অবস্থা ও ব্যবস্থার চিন্তা করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই যে বর্ত্তমানে যেরূপ কার্য্যক্রম চলিয়াছে তাহাতে উদ্বাস্তু সমস্যার কোনও সমাধান হইবে না। পাকিস্থান এ বিষয়ে যে আমাদের কণামাত্র সাহায্য করিবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব হয় আমাদের সমস্ত পূর্ব্ব-পাকিস্থানী হিন্দুদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, নচেৎ অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে পাকিস্থানের এই কূটনীতি বিফল হয়। বলা বাহুল্য উদ্বাস্তু যাহারা তাহারা এতদিন নিজের উদ্ধারের কোন চেষ্টা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করে নাই এবং ভবিষ্যতেও যে করিবে না তাহাই ভাবা উচিত। কেননা তাহাদের কুপরামর্শদাতা ও তাহাদের নৈতিক অবনতির সুযোগে যাহারা স্বার্থসিদ্ধি করে, এই দুই দলই এখনও প্রবল।

জাহাজী উদ্যোগ

লোকসভায় পরিবহণ বিভাগীয় দপ্তরের বরাদ্দ সম্পর্কে বিতর্কের সময় পরিবহণ বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী জাহাজশিল্প সম্প্রসারণের জন্য সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলির উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত শীঘ্রই জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে (গত ৬ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে উক্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হইয়াছে)। তিনি আরও বলেন যে, ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে জাহাজ চলাচলের জন্য যুগোশ্লাভিয়া হইতে আগত এক প্রতিনিধিদলের সহিতও ভারত সরকার আলোচনা চালাইতেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার জাহাজনির্ম্মাণ কারখানাতে ভারতের জন্য জাহাজ নির্ম্মাণ করা যায় কি না সেই বিষয়েও আলোচনা চলিতেছে বলিয়া শ্রীশাস্ত্রী বলেন।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রকাশ করেন যে, মার্চ্চ মাসের শেষে ভারতের জাহাজের পরিমাণ ৪৮০,০০০ টন হইবে। ১৯৫৭ সনের মাঝামাঝি সময় উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ লক্ষ টন হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ নয় লক্ষ টন দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্রীশাস্ত্রী বলেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার জাহাজ নির্ম্মাণের লক্ষ্য হিসাবে দশ লক্ষ টন না ধরায় তিনি কাহারও অপেক্ষা কম দুঃখিত হন নাই। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, বেসরকারী জাহাজ কোম্পানীগুলি অগ্রণী হইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাহাজনির্ম্মাণের জন্য যে সকল সাহায্য ও ঋণদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন। তবে যদি বেসরকারী কোম্পানীগুলি সেরূপ উদ্যোগী না হয় তবে সরকার স্বয়ং জাহাজশিল্প সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করিবেন।

ভারতের বন্দরগুলির উন্নতির জন্য সরকারী প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়া শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, কান্দলা বন্দরের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে, ১৯৫৭ সনের মার্চ্চ মাসের মধ্যেই তাহা সম্পন্ন হইবে। এই বন্দরটি দ্বারা ভারতের বন্দরগুলির ক্ষমতা দশ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কান্দলা বন্দরে আরও দুইটি বার্থ সংযোগ করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বড় বড় বন্দরগুলির উন্নয়নের জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। মন্ত্রীমহোদয় জানান যে, ছোট ছোট বন্দরগুলির উন্নতির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র বন্দরের উন্নয়নার্থক পরিকল্পনা রচনার কাজে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একজন বিশেষভাবে নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র বন্দরগুলির উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আড়াই কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে পরদীপ (উড়িষ্যা), তুতিকোরিন, ম্যাঙ্গালোর এবং মালাপ (মাদ্রাজ) বন্দরগুলির উন্নয়নের জন্য।

৬ই এপ্রিল লোকসভায় উৎপাদন মন্ত্রণালয়ের ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে উৎপাদন দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীসতীশচন্দ্র বলেন যে, দ্বিতীয় একটি জাহাজনির্ম্মাণ কারখানার জন্য কয়েকজন সদস্য যে দাবী জানাইয়াছেন তাহা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত এবং আশা করা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাঝামাঝি সময়ে

সরকার দ্বিতীয় জাহাজনির্ম্মাণ কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিতে পারিবেন। তিনি স্বীকার করেন, হিন্দুস্থান জাহাজনির্ম্মাণ কারখানার দ্বারা ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজগুলির দাবী মিটানই প্রায় কঠিন। তিনি বলেন যে, হিন্দুস্থান জাহাজনির্ম্মাণ কারখানা ১০টি বড় জাহাজসহ ১৪টি জাহাজনির্ম্মাণের অর্ডার পাইয়াছে।

পরিবহণ মন্ত্রণাদপ্তরের বার্ষিক দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বিতর্কের সময় ভারতে জাহাজনির্ম্মাণের মন্দগতির সমালোচনা করিয়া উত্তরপ্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য শ্রীরঘুনাথ সিং বলেন যে, জাপান, জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশের অগ্রগতি হইতে ভারতের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানের জাহাজের পরিমাণ ছিল মাত্র এক লক্ষ টন। এই এগার বৎসরের মধ্যে জাপানের জাহাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৩৭ লক্ষ টন। তিনি জাহাজনির্ম্মাণ ব্যাপারে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহারা যেন "ঘুমাইয়া রহিয়াছেন"।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের কংগ্রেসী সদস্য শ্রী সি. পি. মাথেন জাহাজশিল্পের ভার একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করার অনুরোধ জানান। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী সদস্য শ্রী টি. এন্. সিং এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন হইতে নির্ব্বাচিত কম্যুনিষ্ট সদস্য শ্রী ভি. পি. নায়ার বলেন যে, জাহাজশিল্প তাহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সরকার বেসরকারী কোম্পানীগুলিকে জাহাজ কিনিবার জন্য অর্থসাহায্য ও ঋণ দিতেছেন। শ্রীনায়ার বলেন যে, তিনি এখনই জাহাজশিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কথা বলিতেছেন না, কিন্তু সরকার টাকা ঋণ হিসাবে না দিয়া উহা কোম্পানীর মূলধন হিসাবেও ত দিতে পারেন। তিনি পরিবহণশিল্প সম্পর্কে সামগ্রিক তদন্ত করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠনের জন্য অনুরোধ জানান।

মণিপুরের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীটি. সুব্রমনিয়ম বলেন যে, ব্রিটিশ সরকার রেলপথগুলির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ভারতের জলপথগুলির প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া আভ্যন্তরীণ জলপথগুলির উন্নতির জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে মনযোগী হইতে হইবে। বিভিন্ন নদীব্যবস্থায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল আভ্যন্তরীণ জলপথ এখনও নৌবাহনযোগ্য করা যাইতে পারে বলিয়া শ্রীসুব্রমনিয়ম বলেন।

লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিভাগ

"সোভিয়েত দেশে" প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বৎসর 'লেনিনগ্রাড' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে ভারতীয়, চীনা, কোরিয়ান, জাপানী, মঙ্গোলীয়, আরবী প্রভৃতি নয়টি ভাষাতাত্ত্বিক শাখা রহিয়াছে। নিকট-প্রাচ্যের দেশগুলির ইতিহাস, দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির ইতিহাস ও সুপ্রাচীন প্রাচ্যখণ্ডের ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনার জন্য তিনটি ইতিহাস শাখাও রহিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিভাগে হিন্দী, উর্দ্দু, বাংলা, মরাঠী, পালি ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাহাদের প্রধান শিক্ষণীয় ভাষা ব্যতীত আরও একটি সগোত্র ভারতীয় ভাষা এবং একটি পাশ্চাত্য ভাষা (ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান বা ডাচ) শিখিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মেয়াদ পাঁচ বৎসর।

ভারতের আঞ্চলিক জলসীমা

২৩শে মার্চ্চ এক ঘোষণায় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের তীর হইতে সমুদ্রের ছয় মাইল পর্য্যন্ত জলরাশিকে ভারতের আঞ্চলিক জলসীমার অন্তর্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এত দিন পর্য্যন্ত তীর হইতে তিন মাইল পর্য্যন্ত ভারতের আঞ্চলিক জলসীমা বিস্তৃত ছিল।

আন্তর্জ্জাতিক আইন কোন রাষ্ট্রের উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রের উপর রাষ্ট্রের প্রভুত্ব সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব তীর হইতে কতদূর পর্য্যন্ত জলরাশির উপর বিস্তৃত হইতে পারে সে বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে। সাধারণভাবে উপকূলবর্ত্তী তীর হইতে তিন মাইল পর্য্যন্ত স্থানের উপর রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইত, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত চীন এবং ভারত ব্যতীত খুব অল্প রাষ্ট্রই আঞ্চলিক জলসীমা সম্পর্কিত এই তিন মাইল সীমা মানিয়া চলিত। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের জলসীমা নির্দ্ধারণ করিয়া সময়োচিত কাজই করিয়াছেন। ভারতে অবস্থিত বিদেশী পকেটগুলির উপর এই ঘোষণার প্রভাব কিরূপ পড়ে তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাজারদর বৃদ্ধি

চাউল, আটা, সরিষার তৈল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যপ্রসঙ্গে সাপ্তাহিক "ভারতী" লিখিতেছেন যে, চাউল ও আটা ব্যতীত সরিষার তৈল প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির কারণ স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত দ্রব্যাদির উপর যে নূতন উৎপাদন-শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু শুল্কের হার যেখানে মণপ্রতি মাত্র ২৷৵০ আনা সেস্থলে সেই দ্রব্যের মূল্য প্রতিমণ ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। তৈলবীজের অভাবের দরুন তৈলের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে এই যুক্তিও মানিয়া লওয়া যায় না, কারণ তৈলবীজের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু মূল্যবৃদ্ধি এইরূপ হঠাৎ এবং অস্বাভাবিক হইতে পারে না। এইরূপ হঠাৎ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ মুনাফালোভীদের কাটকাবাজী।

'ধূম্রজালের আবরণে এক 'দুষ্টচক্র' সৃষ্টি করিয়া সাময়িকভাবে সমাজের রক্তমোক্ষণ করাই ইহাদের আসল উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে অসাধু ব্যবসায়িগণের এইপ্রকার অপকৌশলের নমুনা আমরা বহু বার লক্ষ্য করিয়াছি। সরকারী পর্য্যায়ে বা জনসাধারণের মধ্যে কোন আন্দোলন গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ইহারা সংযতভাব ধারণ করে এবং বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রেও যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে না তাহা আমরা জানি। কারণ ইতি-মধ্যেই আমাদের শুনান হইয়াছে যে, তেলের বাজারে এই অস্বাভাবিক অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইবে না, হয়ত আগামী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি বাজারে নূতন তৈলবীজ আমদানী হইলেই তেলের দাম আবার কমিয়া যাইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সরকার এই অপকৌশলের বা ফাটকাবাজির প্রশ্রয় দিবেন কি না? আমাদের মতে এই অসাধু ব্যবসায়িগণ সমাজের পরম শত্রু এবং ইহাদের সম্পর্কে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।"

ত্রিপুরায় খাদ্যাভাব

ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপক অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া স্থানীয় "সমাজ" পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন। ৭ই এপ্রিল এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "সমাজ" লিখিতেছেন, "অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউল আনিয়া রাজ্যসরকারের ষ্টক বৃদ্ধি না করিলে আগামী বর্ষার পূর্ব্বে ও সমগ্র বর্ষাকালে শুধু আগর-তলায় নয় সমগ্র ত্রিপুরায় এক ব্যাপক খাদ্যাভাব এবং অপ্রতিরোধ্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।"

১৬ই মার্চ্চ ঘোষণা করা হয় যে, শীঘ্রই ন্যায্যমূল্য চাউলের দোকান খোলা হইবে, কিন্তু ৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত কোন দোকানই খোলা হয় নাই। হয়ত উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ষ্টক না থাকার দরুনই সরকার ন্যায্যমূল্য চাউলের দোকান খুলিতে পারেন নাই।

ত্রিপুরার খাদ্যসমস্যা সমাধানকল্পে সরকারী প্রচেষ্টার অসারতা ও অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া "সমাজ" পত্রিকার ৩১শে মার্চ্চ তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, রাজ্যসরকারের গেজেটে একরূপ তথ্য, প্রেসনোটে অন্যরূপ তথ্য এবং প্রতিনিধিদলের নিকট প্রদত্ত আর একরূপ তথ্যের কোনটির সহিত কোনটির মিল নাই। "আমরা ইহাকে ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার প্রয়াস না বলিয়া বলিব যে, সরকার স্বীয় প্রকাশিত তথ্যাদিও অবগত নহেন। (ইহাকে মানসিক ক্ষমতার ব্যর্থতা বলা যাইতে পারে।)"

"সমাজ" লিখিতেছেন, "চাউলের বর্দ্ধিত মূল্য রাখিতে চীফ কমিশনার, চাউলের চোরাকারবারী এবং সাম্প্রতিক ফাটকাবাজদের মনোভাবের ও মতামতের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না—কোন না কোন কারণে ইহারা চাউলের বর্দ্ধিত মূল্য রাখার পক্ষপাতী। অথচ খাদ্য উপদেষ্টা ও সরকারী প্রেসনোটে মূল্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীদের দোষারোপ করা হইয়াছে।

"এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বিগত বৎসর বিলোনীয়া সোনামূড়া সাবরুম ও কুমারঘাটে প্রায় ৩০ হাজার মণ করিয়া সরকারী চাউল বিক্রি হইয়াছে ২৲—৪৲ টাকা মণ দরে। (যুদ্ধ-পরবর্ত্তীকালে এই দরে খুদও বিক্রী হয় না।) উক্ত চাউলই বাজারে চড়া দরে বিক্রী হইয়াছে। বিগত বৎসর ফসল উঠার সময় বিরাট বিরাট লটে সরকারী চাউল ছাড়া হইয়াছিল যাহাতে চাষী ও ছোট ব্যবসায়ীরা চাউল মজুত করিতে না পারে এবং পূর্ব্ব মজুত চাউল সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। চাউল সঙ্কট দেখা দিয়াছে সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের যোগসাজসে ব্যবসায়ীদের দ্বারা (a well-knit racket of corruption)। খাদ্য ও কৃষি-দপ্তর খাদ্যশস্য বৃদ্ধির জন্য কি কাজ করিয়াছে তাহাও তদন্ত করিতে হইবে। আমরা পুনরায় বলি, কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্ত না হইলে ত্রিপুরা সরকারের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি ক্রমবর্দ্ধমান হইতে থাকিবে।"

ভারতীয় রাষ্ট্র ও ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ

রাজ্যপুনর্গঠন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্য স্বতন্ত্রই থাকিবে। উহাকে একটি কেন্দ্রশাসিত টেরিটরি রূপেই রাখা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "সেবক" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, কেন্দ্রীয় শাসনে "টেরিটরি"গুলিতে কিরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবে তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই তবে অবস্থা দেখিয়া মনে হয় না যে, ত্রিপুরায় ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধিত্ব-মূলক শাসনব্যবস্থা প্রচলনের কোন ব্যবস্থা করা হইবে।

কেন্দ্রীয় শাসনে ত্রিপুরার জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, গত সাত বৎসরের অভিজ্ঞতায় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের যে নমুনা ত্রিপুরার জনসাধারণ পাইয়াছে তাহা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। "সেবক" লিখিতেছেন : "সামন্তযুগীয় শাসনের অবসান ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে যে শাসন চলিতেছে তাহা অনেকদিক দিয়াই সামন্তযুগীয় একনায়কত্ব শাসন অপেক্ষা উত্তম নহে।···ত্রিপুরা রাজ্য ভারতে যোগদান করিয়াছিল গণতন্ত্রী ভারতের অংশীদার হইবার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন টেরিটরি শাসনে থাকার জন্যও আমরা স্বতন্ত্র [অবস্থিতি] চাই নাই।···"

ত্রিপুরার সকল রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আবেদন জানাইয়া "সেবক" উপসংহারে লিখিতেছেন যে, যদি কেন্দ্রীয় শাসনে ত্রিপুরার জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহার করিবার কোন সুযোগ পাইবার সম্ভাবনা না থাকে তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সম্মিলিত আবেদন করিয়া ত্রিপুরার স্বাতন্ত্র্যের অবসান চাহিয়া আসামের সহিত সংযুক্তির জন্য রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করিবার দাবী করা কর্ত্তব্য। কারণ টেরিটরি শাসনে যদি জনগণের হাতে শাসনক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে চিরকালের মত ত্রিপুরাবাসী গণতন্ত্র হইতে বঞ্চিত হইবে। ঐ অবস্থা স্বভাবতঃই কাহারও কাম্য হইতে পারে না।

দায়িত্ব কাহার ?

স্বাধীনতার পর ডাক বিভাগের যে অবনতি হইয়াছে তাহার উদাহরণ স্বরূপে এই সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য। ২৫শে চৈত্র "সেবক" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"মন্দভাগ্য এক লুসাই যুবক ডাক বিভ্রাটে এবার কৈলাসহর সেণ্টার হইতে প্রাইভেটে আই-এ পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। নাম ডেংহেবা লুসাই, রোল নং ৪। জাম্পুই এম-ই স্কুলের শিক্ষক। রেজেষ্টারী ডাকে বিগত ২২শে মার্চ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'এডমিট' কার্ড পান কিন্তু পরীক্ষা আরম্ভ হয় ১৯শে মার্চ।"

এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তদন্তের ফলাফল জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা ডাক বিভাগের কর্ত্তব্য।

বর্দ্ধমান কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনা

রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎসাহদানকল্পে প্রতি জেলায় একটি করিয়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান কেন্দ্রীয় পাঠাগার এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারপরিষদ গঠিত হয়। পদাধিকার বলে জেলাশাসক পরিষদের সভাপতি এবং সোস্যাল এডুকেশন অফিসার উহার সম্পাদক। জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি, সদর মহকুমা শাসক ও জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক পদাধিকার বলে উহার সদস্য। জেলা শাসক সরকারী গ্রন্থাগারিক এবং তিন জন অপর সদস্যকে ঐ পরিষদে মনোনীত করেন। সম্প্রতি আজীবন ও সাধারণ সভ্যগণ এবং পরিষদের অন্তর্ভুক্ত লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে একজন সহঃ সভাপতি ও সাত জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পরিষদের পরিচালনা-ভার ন্যস্ত রহিয়াছে সম্পাদকের উপর। ২৩শে চৈত্র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বর্দ্ধমান বাণী" সম্পাদকের কার্য্যপরিচালনার সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি উক্ত সম্পাদককে গেজেটেড অফিসারের পদে উন্নীত করা হইলেও "সম্পাদক মহাশয় তাঁহার দায়িত্ব পালনে কৃতিত্বের পরিবর্ত্তে অক্ষমতারই পরিচয় দিয়াছেন।

উল্লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, পরিষদের কার্য্য পরিচালনায় সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট গাফিলতি প্রদর্শন করিয়াছেন কেবল তাহাই নহে, এমন কি গ্রন্থাগার পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী করার ব্যাপারেও তিনি অবহেলা প্রদর্শন করেন। "প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় সম্পাদক মহাশয়ের উৎসাহ অনেক সময় বিপরীত দিকে গিয়া থাকে। পরিষদ যাহা করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি তাহার উল্টা করিয়া থাকেন।"

যে সকল পল্লী গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হইয়াছে তাহাদিগকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রয়োজনীয় পুস্তক সরবরাহ করিবার জন্য একটি গাড়ী নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু দেখা যায় গাড়ীটি পুস্তক বহনের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময়ই অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকে।

"বর্দ্ধমান বাণী" লিখিতেছেন, "কেন্দ্রীয় পাঠাগারটি পরিচালনাও সন্তোষজনক নহে। ইহা কখন খোলা হয় কখন বন্ধ হয় তাহার কোন ঠিকঠিকানা নাই। সম্পাদক মহাশয় এই পাঠাগারে বা পরিষদ কার্য্যালয়ে আসা আবশ্যক মনে করেন না। তিনি তাঁহার বাসভবন হইতেই হুকুম জারী করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।"

অযোগ্য শাসনব্যবস্থার দরুন সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাগুলি কি ভাবে ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে উল্লিখিত বিবরণী তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত সরকার ফতোয়া জারীর মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধনের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেকটি জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা আকর্ষণ করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা না করিবেন সে পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনাই সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

অন্য দিকে সাধারণ যাঁহারা তাঁহাদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। সরকারকে সমালোচনা করিলে সেটা মুখরোচক হয়, কিন্তু নিজে অগ্রসর হইয়া কাজে সাহায্য ও কাজ আদায় না করিলে যাহা চলিতেছে তাহাই চলিবে।

জঙ্গীপুর মহকুমায় পরিকল্পিত অগ্রগতি

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে জঙ্গীপুরে অবস্থার কিরূপ উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে সে সম্পর্কে ২২শে চৈত্র স্থানীয় "ভারতী" পত্রিকা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মহকুমার বিভিন্ন স্থানে যে বিবিধপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই। জঙ্গীপুর শহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মহকুমার ছাত্রদিগের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জ শহরের বিদ্যুৎসরবরাহ ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। শহরের যানবাহন চলাচল এবং পানীয় জলসরবরাহ ব্যবস্থারও কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। "গ্রামাঞ্চলেও বহু প্রাইমারী স্কুল ও গ্রাম্য পোষ্ট আপিস খোলা হইয়াছে। অবৈতনিক উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়ে গৃহ-নির্ম্মাণের কিছু কিছু সাহায্য বরাদ্দ হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ থানায় প্রায় প্রতিটি গ্রামেই দুই-চারিটি করিয়া টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে।..."

পরিকল্পনাকালে মহকুমায় কয়েকটি বিষয়ে উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও প্রধান সমস্যাগুলির কোনই সমাধান যে হয় নাই "ভারতী"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। চাষ ও চাষীদের দুরবস্থা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। "চিকিৎসা-ব্যবস্থার দিক হইতে এই মহকুমার অবস্থা আরও করুণ। সম্প্রসারিত মহকুমা হাসপাতালটির জন্য টাকাও জমা দেওয়া আছে, কখন যে ইহা সুরু হইবে কিংবা ইহা আদৌ হইবে কিনা সে বিষয়ে কোন খোঁজখবর মিলিতেছে না।" মহকুমার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। "কুটীরশিল্পের অবস্থা আরও ভয়াবহ। রেশমশিল্প এই মহকুমায় একদা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রয়োজনীয় শিল্পটি প্রায় অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।...কাংস্য শিল্পের অবস্থাও তদ্রূপ।"

বারাসাত কলেজ

বারাসাতে একটি সরকারী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ রহিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় অঞ্চলের জনসাধারণের উচ্চ শিক্ষালাভের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার পক্ষে কলেজের ব্যবস্থা সুপ্রতুল নহে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্ত্তি হইতে না পারায় অনেককেই বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতা আসিতে হয়। উপরন্তু, কয়েকটি কারণে অনেক মেধাবী ছাত্র স্থানীয় কলেজে ভর্ত্তি হইতেও চাহে না। বারাসাত কলেজের "সময়োচিত ব্যবস্থার একান্ত অভাব" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ২৯শে চৈত্র "বারাসাত বার্ত্তা" কলেজের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইল: "(১) বিজ্ঞান বিভাগে চতুর্থ বিষয় না থাকায় উক্ত বিভাগে বহু ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হইতে পারে না। (২) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের নির্দ্দিষ্ট আসন প্রয়োজনের তুলনায় নামমাত্র। (৩) বাণিজ্য (commerce) বিভাগ না থাকায় বহু ছাত্রছাত্রী প্রবেশে বঞ্চিত। (৪) যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী শিক্ষকতা ও চাকুরী, ব্যবসা ও ক্ষেতখামারে কাজ করিয়া রাত্রে কলেজে পড়িতেছে তাহাদের কোন সুবিধা নাই। (৫) ২য় বর্ষ (Intermediate) শেষ হইলে B. A. শ্রেণীর অভাব এবং উহার সহিত ছাত্রদের প্রয়োজনীয় কমনরুমের উপযুক্ত কক্ষ, হলঘর, খেলার ময়দান, ছাত্রাবাস ইত্যাদি অভাবগুলি উল্লেখযোগ্য।"

ছাত্রগণ স্থানীয় কলেজে পড়িতে উৎসুক নহে, অনেকেই শহরের আকর্ষণে কলিকাতার কলেজে পড়িতে যায় বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "বারাসাত বার্ত্তা" বিগত পাঁচ বৎসরে কলেজের ছাত্রসংখ্যা এবং পাশের হার উদ্ধৃত করিয়া লিখিতেছেন: "ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, স্থানীয় ছাত্রবৃন্দের নিকট কলেজটি ক্রমাগত আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় স্থানীয় কলেজের সম্প্রসারণ ও সময়োচিত ব্যবস্থার অভাবে অভিভাবকবৃন্দ ছেলে ও মেয়েদের কলিকাতা পাঠাইয়া ব্যয়ভার বহন করিতেছেন বা ছাত্রছাত্রীর শ্রম ও সময়ের অপব্যবহার হইতেছে মাত্র নহে, বারাসাত শহর ও নিকটবর্ত্তী পল্লী-অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার সহজ পথ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টাও ব্যাহত হইতেছে। উহার কি উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারে না?"

মহিলা বিমানযাত্রী ও লাগেজ

যোগাযোগ মন্ত্রণাদপ্তরের বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত বিতর্কের সময় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সদস্যা শ্রীইলা পালচৌধুরী ২২শে মার্চ্চ লোকসভায় বলেন যে, নৈশ বিমানে যদি মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র সীট রিজার্ভ করিবার বন্দোবস্ত না করা যায় তবে যেন যাত্রীদের মালের কতকাংশ মহিলাদের সীটের পাশে আনিয়া রাখা হয়। "আমার মনে হয় মহিলারা অপরিচিত পুরুষের পাশে বসা অপেক্ষা লাগেজের পাশে বসা বেশী পছন্দ করিবেন।"

শ্রীজগজীবন রাম বলেন, এই সমানাধিকারের যুগে শ্রীযুক্তা পালচৌধুরীর ন্যায় একজন আলোকপ্রাপ্তা মহিলার নিকট হইতে মহিলাদের জন্য বিমানে স্বতন্ত্র আসনের দাবি কি করিয়া উঠিতে পারে তিনি তাহা বুঝিতে অক্ষম।

এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ২৬শে মার্চ্চ "হিতবাদ" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে সকল বিষয়েই স্ত্রী-পুরুষের প্রতি সমান অধিকার প্রদর্শিত হয় এবং বিমানে স্ত্রী-পুরুষের জন্য সমান ব্যবস্থা বজায় রাখা সকল দিক হইতেই কাম্য। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের সময় মহিলা যাত্রীরা পুরুষদের পাশে বসিতে আপত্তি করেন না, সুতরাং ভারতীয় বিমানের বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কোনই যুক্তি নাই!

কৃষকের পুরস্কার

সম্প্রতি কৃষকদিগকে সরকারী পুরস্কার বিতরণ সম্পর্কে যে সকল প্রচার চলিতেছে তাহার সমালোচনা করিয়া রেজাউল করিম সম্পাদিত "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন, চির-অবহেলিত কৃষককুল পূর্ব্বের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করে কিন্তু এখনও তাহারা দুই বেলা উদর পূর্ণ করিবার উপযোগী খাদ্য পায় না।"

"এই কৃষককুলকে পুরস্কার দিবার কথা যখন কেহ বলে তখন হাসি সংবরণ করা যায় না। কৃষকের আবার পুরস্কার? যাহারা পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পায় না তাহাদের আবার পুরস্কার! আগে তাহার পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য দাও, আগে তাহার জন্য নিজের জমির ব্যবস্থা কর, তাহার আয়কে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর, তাহাকে সর্ব্বপ্রকার অভাব হইতে রক্ষা কর, পরিশ্রমের অনুরূপ মূল্য দিবার ব্যবস্থা কর, তার পর পুরস্কারের কথা। ইংরেজ আমলেও দেখিয়াছি স্থানে স্থানে বড় বড় কৃষি-প্রদর্শনী হইত। আর তাহাতে কেহ কেহ পুরস্কারও পাইত। কিন্তু এই পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ছিল কাহারা? বড় বড় জোতদার—মূল্যবান সার প্রয়োগ করিয়া শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া উর্ব্বর জমিতে যে ফসল উৎপাদন করিতেন তাহার জন্য পুরস্কার পাইতেন। কিন্তু সাধারণ কৃষক সে সব পুরস্কারের সৌভাগ্য লাভ করিত না। ইহাকে 'কৃষকের পুরস্কার' বলা যাইতে পারে না। ইহার নাম জোতদারগণের পুরস্কার।"

বর্ত্তমানে কৃষকদিগকে যে পুরস্কার দান করা হয় পত্রিকাটির অভিমতে তাহাও প্রকারান্তরে জোতদারগণেরই পুরস্কার। জোতদারদিগকে ভাল উৎপাদনের জন্য পুরস্কার দান নিন্দনীয় নহে, কিন্তু যাহারা দেশের কৃষিব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই কৃষককুলের অতি নগণ্য অংশ এই জোতদার সম্প্রদায়। সুতরাং জোতদারদের পুরস্কৃত করিয়া কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যে প্রেরণা সরকার দিতে চাহিতেছেন তাহাতে দেশের কৃষিব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি হইবে না।

"বড় বড় জোতদার পুরস্কার বা প্রশংসাপত্র পাইলে তাহাতে দেশের কৃষির বিশেষ কোন উন্নতি হইবে না এবং তাঁহারা এই

পুরস্কারের মাধ্যমে সরকারের নিকট আরও অতিরিক্ত অন্যায় সুবিধা আদায় করিতে ছাড়িবেন না। পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহাদের জন্য যাহারা শরীরের পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদন করিবে। জোতদার ও খাঁটি কৃষকের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য আছে। খাঁটি কৃষক আজ নানাভাবে শোষিত। তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে জমি দিতে হইবে, তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য যাহাতে পায় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার ঘরে ফসল যাহাতে সঞ্চিত হয়, রোগে-শোকে সে যাহাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ যাহাতে সে পাইতে পারে—সেই সব ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাই কৃষকের পুরস্কার। অন্য পুরস্কার প্রহসন মাত্র।"

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন

১২ই মার্চ্চ ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবার পর রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক যে অব্যবস্থা দেখা দেয় তাহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়ায় গত ২৩শে মার্চ্চ ভারতের রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী এক ঘোষণাবলে ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের শাসনকার্য্য পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। শাসনকার্য্যে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দানের জন্য দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীপি. এস. রাওকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রচলন সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বিদায়ী কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী শ্রীপনমপিল্লী গোবিন্দ মেনন বলেন যে, যদিও তিনি ইহাতে দুঃখিত হইয়াছেন তথাপি ইহা অবশ্যম্ভাবী ছিল। রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য শ্রীমেনন বিরোধীপক্ষের দায়িত্বজ্ঞান হীনতাকে দায়ী করেন।

রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলনের কঠোর সমালোচনা করিয়া রাজ্যের একজন ভূতপূর্ব্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রজাসমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীপট্টম থাণু পিল্লাই বলেন যে, এখন সরকারের কর্ত্তব্য হইতেছে কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া অচিরাৎ সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। শ্রীপিল্লাই আরও বলেন, রাজ্যবিধান সভায় ৫৯ জন সদস্যের সমর্থক কংগ্রেসকে গত বৎসর মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু এবার বিধানসভায় ৬১ জন সদস্যের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও শ্রীপিল্লাইকে মন্ত্রিসভা গঠনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। শ্রীপিল্লাই বলেন: "জনসাধারণের নিকট আমি ইহার বিচারের ভার ছাড়িয়া দিলাম।"

রাজ্যবিধানসভা স্পীকার শ্রী ভি. গঙ্গাধরণ বলেন যে, রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থার প্রবর্ত্তন একটি পরিতাপের বিষয়। তিনি রাজপ্রমুখের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের নিন্দা করিয়া বলেন, বিধান-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যদের সমর্থনপুষ্ট নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ না দেওয়া গণতন্ত্রের হানিকারক। ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনে এই ভাবে যে নজীর স্থাপন হইল তাহা ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হইবে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তন উপলক্ষে ২৫শে মার্চ্চ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, দুই বৎসরের মধ্যে দুইটি মন্ত্রিসভা পতনের পর রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তনের ব্যাপারকে কেহই রাজ্যের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিবেন না। বিগত নির্ব্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারায় রাজ্যের রাজনৈতিক জীবনে একটি স্বাভাবিক অনিশ্চয়তা অন্তর্নিহিত ছিল। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার পতনে দেখা গেল যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নিজেরাও দৃঢ়সংবদ্ধ নহে।

ছয় জন কংগ্রেসী সদস্যের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহারের ফলেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব কংগ্রেসের একচেটিয়া নহে। অপরাপর রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি আরও বেশী অসংলগ্ন প্রমাণিত হইয়াছে। ফলে, প্রত্যেক দল এবং গোষ্ঠীর মধ্যে এইরূপ কয়েকজন রহিয়াছে যাহারা মন্ত্রিসভাদলের সামান্যতম সম্ভাবনাতেই পদলাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। তাহা না হইলে বিধানসভায় বিভিন্ন দলের সমর্থক সংখ্যা এরূপ পরস্পরবিরোধী হইত না।

রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার জন্য "হিন্দু" রাজ-প্রমুখের কোন দোষ দেখিতে পান না। রাষ্ট্রপতির শাসনে জন-সাধারণের লাভ বৈ ক্ষতি হইবার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়াও পত্রিকাটি মনে করেন না।

উপসংহারে "হিন্দু" লিখিতেছেন, যদি রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বুঝিতে পারেন যে, কেবলমাত্র একটি নূতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে চলিলেই রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অনিশ্চয়তা দূর হইতে পারে এবং সে অনুযায়ী যদি তাঁহারা আগামী নির্ব্বাচনে ঘোষিত নীতির ভিত্তিতে কোন দলকে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভোটদানে নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন তবে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘস্থায়ী বা অবিমিশ্রিত দুর্য্যোগ রূপে নাও দেখা দিতে পারে।

দলগতনীতি, বা নীতির অভাব, এবং দলগত স্বার্থ মাত্রের চিন্তা, ইহাই ত্রিবাঙ্কুরের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। আমাদের বাংলা দেশে ঐ প্রকৃতির চিন্তা কিছু কম নাই। যাহার ফলে বাংলার কংগ্রেসের চরম অবনতি হইয়াছে এবং অন্য দলগুলির চূড়ান্ত অধঃপতন হইয়াছে। দেখা যাউক, দেশের লোকের এইরূপ মনের বিকার কত দিনে যায়।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী

ভারত সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৬১ সনে সমগ্র ভারতবর্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী পালনের ব্যবস্থা করিবেন। যাহাতে শতবার্ষিকী উৎসব যথাযথ পালিত হইতে পারে সরকার সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতেছেন।

নিবেদিতা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

নিবেদিতার নাম ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত। শুধু বিবেকানন্দের শিষ্যা বলে নয়—তাঁর ত্যাগ, তপস্যা, অপূর্ব্ব কর্ম্মজীবন, তেজস্বিতা, চরিত্রমাধুর্য্য এবং ভারতবর্ষের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জগতে বিস্ময় এবং প্রশংসার উদ্রেক করেছে। তিনি আইরিশ দুহিতা হয়েও ভারতবর্ষকে একান্তভাবে তাঁর স্বদেশ বলেই সরল চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। প্লেগে, দুর্ভিক্ষে এবং এই দেশে, বিশেষতঃ বাংলা দেশের অশিক্ষিত দুর্দ্দশাক্লিষ্ট নর-নারীর দুঃখ-মোচনে তাঁর সেবা ও প্রয়াস অতুলনীয়। জগতের ইতিহাসে এই রকম আত্মনিবেদন দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যিক প্রতিভা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, স্বদেশপ্রেম, ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শে অকপট নিষ্ঠা ও বিশ্বাস, গভীর চিন্তাশীলতা আর অদ্ভুত মনীষা তাঁর রচনার প্রতিছত্রে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। ভারতের শিল্পকলায়, প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় তিনি নূতন আলোকপাত করেছেন। ভারতের নবজাগরণে তাঁর দান অসামান্য।

নারীর শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে লক্ষ্য রেখে আধুনিক কালোপযোগী যে শিক্ষা-সংস্কার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর রচনায় সুচিন্তিত সারগর্ভ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি নারীশিক্ষার যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গিয়েছেন, এই স্বাধীন ভারতেও সেই শিক্ষা-প্রণালী সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দুঃখের বিষয়, যিনি প্রাণপাত করে ভারতের—বিশেষতঃ বাংলার উন্নতির জন্য আজীবন সেবা করে গিয়েছেন, আমরা কিন্তু অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে উদাসীন।

নিবেদিতার দেহত্যাগের পর সংবাদপত্রে শোকপ্রকাশ করা হয়েছিল। এই সময় আমি বন্ধু-বান্ধবদের সহিত পরামর্শ করে একটি স্মৃতি কমিটি গঠন করেছিলাম। সর্ নীলরতন, সর্ জগদীশ, শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু এবং দেশের অপরাপর নেতৃবৃন্দ উক্ত কমিটির কার্য্যকারী সদস্য ছিলেন। আমি ছিলাম এর সম্পাদক। কলিকাতার নেতৃবর্গের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আমি শেরিফের নিকট গিয়ে টাউন হলে স্মৃতিসভা আহ্বান করতে অনুরোধ করি। ইংলিশম্যান, ষ্টেটস্ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী প্রভৃতি কাগজে শেরিফের বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হয়েছিল। সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীরা নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বিজ্ঞাপন ছাপাবার জন্য এক পয়সাও নেন নি। টাউন হলের বিরাট সভায় সর্ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি ছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ নিবেদিতার স্মৃতিস্বরূপ তাঁর বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় জনসাধারণের নিকট আবেদন করেছিলেন। সেই সভায় মাত্র ১,৭০০৲ টাকার মত চাঁদা পাওয়া গিয়েছিল। বহু চেষ্টা করেও আর কিছু উঠে নি। শেষে নিরাশ হয়ে আমরা নিরস্ত হই। উক্ত সংগৃহীত অর্থ নিবেদিতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য দেওয়া হয়েছিল। যা হোক, রামকৃষ্ণ মিশন সুবৃহৎ শিক্ষাভবন নির্ম্মাণ করে প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ীভাবে স্থাপন করেছেন। বাংলায় তথা ভারতে নিবেদিতার এই একমাত্র স্মৃতির নিদর্শন। এই বিদ্যালয়ের জুবিলী উপলক্ষ্যে ৫০০০৲ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে "নিবেদিতা বক্তৃতা" প্রবর্ত্তন করবার জন্য দেওয়া হয়েছে। দার্জ্জিলিঙের শ্মশানে স্বামী অভেদানন্দের চেষ্টায় একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা হয়েছে। বাংলা দেশের জনসাধারণ আর এ বিষয়ে কিছু করেছেন বলে শুনি নি।

বড়ই দুঃখের কথা যে, আজ পর্য্যন্ত ভ্রমপ্রমাদশূন্য প্রকৃত তথ্যপূর্ণ নিবেদিতার একটি সম্পূর্ণ জীবনচরিত প্রকাশিত হয় নি। এ বিষয়ে ফরাসী মহিলা শ্রীমতী লিজেল রেমঁ ফরাসী ভাষায় নিবেদিতার সমগ্র জীবনী লিখতে সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবী বাংলায় তার অনুবাদ করেছেন।

কলিকাতার ল্যান্সডাউন রোডে 'সারদাশ্রমে' যখন শ্রীমতী লিজেল রেমঁ বাস করতেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। অনেক দিন তাঁর সঙ্গে নিবেদিতা-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তখন তাঁর কতকগুলি ভুল তথ্য ও ধারণা শুনে তা দূর করতে চেষ্টা করি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ইংরেজীতে নিবেদিতার একটি জীবন-চরিত সংশোধিত আকারে প্রকাশ করবেন। তিনি অনুরোধ করায় আমার নিজের জানা কতকগুলি ঘটনা ও তথ্য দিয়েছিলাম। তিনি তখনই তা নোট করে নিয়েছিলেন এবং "In Remembrance of Nivedita" স্বহস্তে লিখে, তাঁর নাম স্বাক্ষর করে ফরাসী ভাষায় তাঁর "নিবেদিতা" বইখানি

আমায় উপহার দিয়েছিলেন—তারিখ ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সন।

অনুবাদিকার কথায় পড়লাম, "নিবেদিতার আত্মীয়স্বজন, বিশেষতঃ তাঁর ভাই-বোন, এদেশে ওদেশে তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দ যাঁরাই নিবেদিতাকে জানতেন তাঁদের কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ হ'ল প্রচুর।" অনুবাদিকার এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। বর্ত্তমান রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী শঙ্করানন্দ আমাকে লিখে জানিয়েছেন :

"প্রিয় কুমুদ, মাসিক বসুমতীতে 'নিবেদিতা' আখ্যায় শ্রীমতী লিজেল রেম লিখিত জীবনীর অনুবাদ শ্রীযুতা নারায়ণী দেবী কর্ত্তৃক ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। উহা তুমি দেখিয়াছ কিনা জানি না। ঐ বিষয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করায় আমি কয়েকটি স্থলে সামঞ্জস্য ও ঘটনাপারম্পর্য্যের অভাব, অতিবাদ ও অজ্ঞতাজনিত সত্যের অপলাপ ইত্যাদি দেখিলাম।

"পূর্ব্বে ফরাসী ভাষায় একটি জীবনী গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছিলেন এবং উহা ৺বিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক কঠোর ভাবে সমালোচিত হইয়াছিল—যাহা এককালে প্রবুদ্ধ ভারতে ছাপাও হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজে থাকাকালে মিসেস জিন্ হার্বার্ট (লেখিকা লিজেল রেম) তাঁহার লিখিত নিবেদিতার জীবনীর কিছু অংশ ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. শেষাদ্রি কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত, আমাকে দেখিতে দেন। উহা পাঠ করিয়া নানাবিধ সম্পূর্ণ অবাস্তব, অদ্ভুত কল্পনাপ্রসূত এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় থাকায় লেখার পার্শ্বে সামান্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে সময় তিনি অতঃপর উহা নূতন করিয়া লিখিবেন এবং আমায় দেখাইয়া লইবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কার্য্যতঃ দেখিতেছি ইংরেজী পুস্তক-আকারে বাহির হইবার পূর্ব্বেই অনুবাদ বসুমতীতে বাহির হইতেছে।* জীবনী বলিতে গেলে লোকের মনোরঞ্জক, কল্পনা-প্রসূত, অবাস্তব ঘটনাবলীর সমাবেশ বুঝায় কিনা সুধিগণের বিবেচ্য।"

অনুবাদিকার কথায় দেখছি, তিনি বলছেন :

"শ্রীমতী রেম যখন তাঁর বইখানি বাংলায় অনূদিত করার জন্য আমায় আহ্বান করেন, নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে দ্বিধা থাকলেও সাগ্রহেই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম।....

"আমার এই বাণীর সাধনায় সহায়ক পেলাম পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনির্ব্বাণকে। মূল ফরাসীর সঙ্গে মিলিয়ে বইখানি তিনি আগা-গোড়া পরিমার্জ্জন করে দিয়েছেন। তিনি হাত না দিলে আমার অনুবাদ গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করত কিনা সন্দেহ।"

শ্রীমতী লিজেল রেম নিবেদিতার জীবন-চরিত ফরাসী ভাষায় লিখেছেন। তাঁর সেই উদ্যম, উৎসাহ এবং পরিশ্রম প্রশংসনীয়—ইহাতে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীমতী রেম নিবেদিতাকে জীবনে কখনও দেখেন নাই অথচ তাঁর জীবন-চরিতখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখতে চেষ্টা করেছেন—এটা তাঁর গুণগ্রাহিতার পরিচয়।

দুঃখের বিষয়, সত্যের অনুরোধে বলতে হচ্ছে রেমের বইখানিতে ঘটনাগুলি অনেক স্থলে ঠিকমত বিবৃত হয় নাই। কতকগুলি ঘটনার যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁরা কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন। একটু বিচারবুদ্ধি ও যত্ন করে সন্ধান করলেই তিনি অনেক জিনিষ পেতে পারতেন। যাঁরা নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই সাগ্রহে সাহায্য করতেন।

শ্রীশ্রীমার নাম ছিল সারদামণি—সারদেশ্বরী নয়। "The Master as I saw him" বইখানিতে "The Holy Women" অধ্যায়ে নিবেদিতা লিখেছেন, বোসপাড়ার একটি ভাড়াটে বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা সেই সময়ে ছিলেন যখন মার বাড়ীতে নিবেদিতার থাকবার বন্দোবস্ত হয়। নীচে একটি ঘর তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। আমি সেই সময় প্রায়ই সেখানে যেতাম স্বামী যোগানন্দ ও শ্রীশ্রীমার দর্শনলাভের জন্য। নিবেদিতা অধিকাংশ সময় দোতলায় শ্রীমা ও অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে থাকতেন। নিবেদিতার সঙ্গে কোনও লোক দেখা করতে এলে নীচের ঐ ঘরেই এসে বসতেন। দোরের সামনে একটা পর্দা টাঙানো থাকত। নিষ্ঠাবান পরিবারের মহিলাদের পক্ষে এক বাড়ীতে মেমসাহেবের সঙ্গে বাস করতে সঙ্কোচ কতকটা তাঁদের নিজেদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের জন্য, আবার কতকটা বিদেশিনী মহিলার ভারতীয় সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অজ্ঞতাজনিত। নিবেদিতা লিখেছেন—"The Swami's influence proved all powerful, and I was accepted by society"। লেখিকা রেম যতটা ফলাও করে কল্পনা চালিয়েছেন সে রকম কিছু দেখি নি। বরং সকলেই কুমারী নোবলকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখতেন—তাঁর কোনও অসুবিধা না হয় তা সেই বাড়ীর সকলেরই লক্ষ্য ছিল। অনুবাদে আছে—"গোপালের মা ত তাঁকে ঢুকতেই দিতে চান না।" এই সংবাদ তাঁকে কে দিয়েছে জানি না, কিন্তু এই সব ভুল ও বিকৃত বর্ণনা। নিবেদিতা স্বয়ং লিখেছেন :

"Gopaler ma would sometimes be in Calcutta and sometimes for weeks together away at Kamarhatty."

গোপালের মা সাধারণতঃ থাকতেন কামারহাটীর

---

* অনুবাদিকা লিখেছেন, সম্প্রতি আমেরিকায় "The Dedicated" নামে এই বইখানির একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

দেবালয়ে, নিবেদিতাকে তিনি কেন শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না? প্রথম প্রথম তাঁর আচার, নিষ্ঠা ও সংস্কারে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন:

"In Calcutta Gopaler ma felt perhaps a little more than others the natural shock to habits of eighty years' standing at having a European in the house. But once overruled she was generosity itself.

সুতরাং এই ঘটনাটি ঠিক বর্ণনা করা হয় নি।

'নিবেদিতা'র অনুবাদে পড়লাম - 'খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের নবীন মঠবাসীর যে সব নিয়ম-কানুন আছে নিবেদিতার জন্য সেই-গুলিই নির্দিষ্ট করে দিলেন।' ১৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, '১৮৯৮, ২৫শে মার্চ্চ সকালবেলা যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা নিলেন নীলাম্বর মুখার্জির বাড়ীতে। এই ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষায় অত্যন্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটি হ'ল।' আবার 'ছিন্নমূল' অধ্যায়ে লেখিকা লিখছেন, 'বেলুড়ে দীক্ষিত হবার পরদিনই নিবেদিতা বিলাতী সংস্কারে দারুণ একটা ঘা খেয়েছিলেন।' এর কোনটা সত্যি? নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে, না বেলুড় মঠে দীক্ষা? এই ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা অধ্যায়টি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এবং প্রায় সবই কাল্পনিক। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ নির্ম্মিত হয় নি। সে বছর উৎসব হয়েছিল বেলুড়ের গঙ্গাতীরে পূর্ণচন্দ্র দাঁর প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ীতে। সেবার বেলুড় মঠ উৎসব বলে যে বর্ণনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মনগড়া। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তখন মঠ ছিল। জন্মতিথির দিন আমি সেখানে অতি প্রত্যূষ থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত ছিলাম। সেদিন সেখানে ব্রহ্মচর্য্য হওয়া দূরে থাক নিবেদিতাকে আসতেই দেখি নি। নিবেদিতা লিখছেন, যা লেখিকা নিবেদিতার চিঠি থেকে সঙ্কলন করেছেন, 'কাল প্রথম দীক্ষার ঠিক এক বছর পরে আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হলাম।' সুতরাং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের আইন-কানুন মত কিছু হয় নি।

এখানে আমি যা দেখেছি তা উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। (মিস নোবল) ব্রহ্মচারিণী হবার পর স্বামীজী যখন কলকাতায় থাকতেন তখন সন্ধ্যার পর নিবেদিতা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসতেন। স্বামীজী কলকাতায় এলে বলরামবাবুর বাড়ীতেই অবস্থান করতেন। একদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে—দেখলাম নিবেদিতা তখনও পর্য্যন্ত না আসায় স্বামীজী উদ্বিগ্ন হয়ে বলছেন, 'নিবেদিতা এখনও এল না কেন?' প্রায় এক ঘণ্টা পরে নিবেদিতা এসে স্বামীজীকে নতজানু হয়ে প্রণাম করলে তিনি কঠোর গম্ভীর স্বরে শুধু সম্বোধন করলেন, "নিবেদিতা"। স্বামীজীর সেই স্বর শুনে নিবেদিতা যুক্তকরে ভীতিপূর্ণ সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্বামীজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার আজ আসতে এত দেরি হ'ল কেন?" নিবেদিতা মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন, 'একজন বন্ধুর সঙ্গে আমি অপরাহ্ণে চৌরঙ্গীতে গিয়াছিলাম, নানা জায়গায় ঘোরাঘুরিতে বিলম্ব হয়েছে। এসেই আপনার কাছে চলে এলাম।' স্বামীজী বেশ গম্ভীর স্বরেই বললেন, "নিবেদিতা, তুমি এখন ব্রহ্মচারিণী, সন্ধ্যার পর কোনও পুরুষের সঙ্গে চলাফেরা এমনকি আলাপ করাও ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে নিষেধ। এমনকি এখানে পর্য্যন্ত আসাও ঠিক নয়। সন্ধ্যায় জপ ধ্যান করার সময় আমি থাকলে শুধু প্রণাম করতে আসতে পার, তার বেশী নয়। রাত্রিকালে এখানে আসাও ঠিক নয়।" নিবেদিতা অনুতপ্ত হয়ে বললেন, 'স্বামীজী, ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ হবে না।' স্বামীজী তখন প্রসন্ন দৃষ্টিতে দু'একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করে নিবেদিতাকে বিদায় দিলেন।

লেখিকা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের নবীন মঠবাসীর নিয়মকানুন যা লিখেছেন তা শুধু কল্পনামাত্র।

স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগ ও শোভাযাত্রা এবং তাঁর অন্তিম সময়ের যে-সব ঘটনা লেখিকা বর্ণনা করেছেন সেগুলি নিতান্তই তাঁর মনগড়া। রোগশয্যায় স্বামী যোগানন্দকে দুই মাস সেবা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—রাত্রি জেগে অপর সেবকদের সঙ্গে। লেখিকা লিখেছেন, "অনেক দিন আগে ইংরেজ ডাক্তার ডেকে এনেছিল নিবেদিতা।" এটি সত্য নয়। রামকৃষ্ণভক্ত খ্যাতনামা চিকিৎসক বিপিনবাবু ও শশীবাবু সর্ব্বদা তাঁকে দেখতেন। প্রয়োজন বোধ করলে তাঁর সাহেব ডাক্তারের পরামর্শ নিতেন। স্বামীজী স্বয়ং ও অন্যান্য গুরুভ্রাতারা তাঁর চিকিৎসার এবং সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতেন। নবাগতা নিবেদিতার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের কোন কারণ ছিল না। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের আয়োজনে অধিকাংশ সময় নিবেদিতা ব্যস্ত থাকতেন। স্বামী যোগানন্দ মুমূর্ষুকালে কি বলেছিলেন, না বলেছিলেন তা তাঁর জীবনী-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। লেখিকা রং ফলিয়ে অবাস্তব ঘটনার উল্লেখ না করলেই ভাল করতেন। শ্মশান-ঘাটে স্বামী সদানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার যাওয়ার কথা সত্য নয়। এই ঘটনার উল্লেখের পূর্ব্বেই লেখিকা কলিকাতার রাস্তাঘাট, বাজার, অলিগলি দেখে যে দু'একটি কাহিনী এবং নিবেদিতার মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা পাঠ করে মনে হয় উপন্যাস পড়ছি। তাঁর নিজের মনোভাবগুলি কল্পনার তুলিতে রং করে নিবেদিতার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। স্বামী যোগানন্দের দেহ যখন শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় তখন

আমিও শ্মশানযাত্রীদের অনুগমন করেছিলাম। স্বামীজী বেলুড় মঠ থেকে নির্দ্দেশ পাঠিয়েছিলেন—কাশী মিত্রের ঘাটে সাধারণ চিতায় যেন তাঁর দেহ সৎকার করা না হয়। শ্মশান-ঘাটের বাইরে শোভাবাজার রাজপরিবারের লোকদের শবদাহ করবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজবাটীর অনুমতি নিয়ে সেই স্থানেই স্বামী যোগানন্দের অন্তিম সৎকার হয়। স্বামীজী বেলুড় মঠ থেকে নৌকাযোগে চলে এসে চিতার উপর দেহ স্থাপিত হয়। স্বামীজী গভীর শোকক্লিষ্ট চিত্তে তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলেন। শোকার্ত্ত স্বরে শুধু বললেন, "এতদিন পরে ইমারতের ইট খসতে সুরু হ'ল।" অগ্নি সংযোগের পূর্ব্বেই স্বামীজী যে নৌকায় এসে-ছিলেন সেই নৌকাতেই বেলুড় মঠে ফিরে গেলেন। নিবেদিতা শবযাত্রায় অনুগমন করেন নি, এটি নিছক কল্পনা।

"নিবেদিতা" বাংলা অনুবাদিত গ্রন্থে লেখিকার নব-গোপালবাবুর বাড়ীতে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা পড়ে মনে হয়েছিল—এটা জীবন-চরিত নয়, কাল্পনিক কাহিনী।

"তিনখানা বড় নৌকায় মশাল জ্বেলে সন্ন্যাসীরা এসেছেন, তীরে লোকের ভিড়। তাঁরা নামতেই শোভাযাত্রা সুরু হ'ল, খোল, করতাল বাজতে লাগল। মার্গারেট দেখলেন…" ইত্যাদি। স্বামীজীর সঙ্গে আমি নিজেই নৌকায় গিয়েছিলাম। প্রাতঃকালে নৌকায় মশাল জ্বালিয়ে যেতে হয় নি। মার্গারেট সেখানে যান নি। বেলা দ্বিপ্রহরে প্রসাদ গ্রহণ করে বেলা চারটার সময় আমরা কলকাতা ও মঠাভিমুখে ফিরে আসি। সুতরাং 'তুমুল শঙ্খধ্বনিতে রাতের জ্যোৎস্না যেন আলোড়িত হয়ে উঠল"—এই সব বর্ণনা পড়লে মনে হয় একটু সামান্য তথ্যসন্ধানেরও কোন প্রয়োজন লেখিকা বোধ করেন নি।

চিঠিপত্রে বা ঘটনার তারিখগুলির কোনও পারম্পর্য্য নেই। লেখিকা লিখেছেন, "স্বামীজীর বিদেশী শিষ্যা হেনরিয়েটা মুলারের সাহায্যে বেলুড় গঙ্গাতীরে ১৫ একর জমি কিনে…" ইত্যাদি। এই সংবাদ তিনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে পেয়েছেন? যদি বেলুড় মঠে সন্ধান করতেন তা হলে জানতে পারতেন যে, পনর একর জমি নয় বাইশ বিঘা জমি। "মূল বাড়ীটা নেহাৎ বেমেরামতি অবস্থায় নোনায় ধ্বসে পড়ছে, এটার সংস্কার করে আর একটা তলা জুড়ে দেওয়া হয়।" কিন্তু আসলে পুরানো একতলাটি ভেঙে চুরে একেবারে নূতন করে তৈয়ারি করা হয়েছিল। ছাদ ফেলে দিয়ে নূতন কড়ি বরগা বসিয়ে নূতন করে নীচের একতলা নির্ম্মিত হয়। একতলায় যে কয়খানি ঘর দোতলায়ও প্রায় সেই কয়খানি ঘর। নূতন দোতলায় 'অনেকগুলো ঘর' নয়, মাত্র পাঁচখানি এবং একতলায়ও প্রায় তাই। নিবেদিতা বইখানিতে আছে—"আর একটা ছোট বাড়ী ছিল তার চারদিকেই খোলামেলা, আগে সেটা অতিথিশালা হিসাবে ব্যবহার হ'ত।" 'আগে'—কত বছর আগে? উক্ত জমি কেনবার পূর্ব্বে ও পরে আমি দেখেছি ছোট বাড়ীটা কখনও অতিথিশালা ছিল না, ওটা চাকরদের ঘর ছিল। এই রকম কল্পনার সাহায্যেই লেখিকা লিখেছেন—বেলুড়মঠের গাড়ী-বারান্দার কথা আর স্বামীজীর বিছানা ঘিরে লাল টালী-বিছানো মেঝেতে দর্শনার্থীরা এসে বসেন। বেলুড়মঠে কোনও দিন গাড়ীবারান্দা বা লাল টালী বিছানো মেঝে ছিল না কিংবা এখনও নাই। কল্পনাটি একেবারে অবাস্তব। আমি জানি শ্রীমতী লিজেল রেমঁ নিজেও অনেকবার বেলুড় মঠে গিয়েছেন এবং অনুবাদিকাও বাঙালী মেয়ে, বোধ হয় একাধিকবার তিনিও সেখানে গিয়েছেন। এ ভুল তাঁদের উভয়ের চোখে পড়ে নি? আশ্চর্য্য!

অনুবাদিকা আচার্য্য সর্ জগদীশ বসুকে 'খোকা' বানিয়েছেন। আমরা দেখেছি তিনি নিবেদিতার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং নিবেদিতা তাঁকে সম্মানের চক্ষেই দেখতেন। সর্ জগদীশ বসু এবং তাঁর পত্নী উভয়েই নিবেদিতার প্রিয়তম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং দার্জিলিঙে তাঁদের বাড়ীতেই নিবেদিতার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়। 'খোকা ও কৃষ্টিন' অধ্যায়টি পড়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি। আরও আশ্চর্য্যের কথা, লিজেল রেমঁ'র 'নিবেদিতা' গ্রন্থের অনুবাদিকা লিখছেন, "প্রিন্স ওডার সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় যাবার জন্য স্বামীজী প্রতীক্ষায় ছিলেন…আপনাকে নিবেদন করে দেবেন করুণাবতার বুদ্ধের পায়ে।" স্বামীজীর জীবন-চরিত এবং নিবেদিতার রচনাবলী ভাল করে পড়লেই এই ভ্রম লেখিকার হ'ত না। বহুপূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরের বাগানে ছিলেন, তখন স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ এই দুই গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি পাঠ করলেই এই ঘটনাটি জানতে পারা যায়। এমন কি "The Master as I saw him" গ্রন্থে "Swami Vivekananda and His attitude to Buddha" অধ্যায়টি ভাল করে পড়লে শ্রীমতী রেমঁ বা অনুবাদিকা এই সব বেফাঁস কথা লিখতেন না। সেই অধ্যায়ে নিবেদিতা স্পষ্টই লিখেছেন:

"The study of Dr. Rajendra Lala Mitra's writings and of the "Light of Asia" could never be a passing event in Swami's life and the seed that fell on the sensitive mind of Ramkrishna's Chief disciple during the years of discipleship, came to blossom the moment he was initiated into

Sanyas for his first act then was to hurry to Bodh-Gaya and sit under the great tree, saying to himself, "Is it possible that I breathe the air. He breathed? That I touch the earth he trod?"

"At the end of his life again similarly he arrived at Bodh-Gaya on the morning of his 39th birthday."

আশ্চর্য্য, যিনি নিবেদিতার জীবনী লিখছেন তিনি নিবেদিতার বইখানাও ভাল করে পড়েন নি।

মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গেই এসেছিলেন ওডা ও ওকাকুরা জাপানের প্রস্তাবিত ধর্ম্মসম্মেলনে স্বামীজীকে নিয়ে যেতে। ড. শ্রীকালিদাস নাগ ১৩৫৪ সনের উদ্বোধনের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় 'জাতীয় শিল্প জাগরণে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"রোগে যখন প্রায় শয্যাশায়ী তখন জাপানী ভিক্ষু Rev. Oda ও প্রাচ্য শিল্পের বিশেষজ্ঞ চৈনিক চিত্রকলার চরম সমঝদার Count Okakura ১৯০১ সালের শেষে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হলেন।···ওডা ও ওকাকুরা আবার জাপানে ধর্ম্মসম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন—কিন্তু সে আশা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জীর্ণ শরীর নিয়ে তবুও স্বামীজী জাপানী অতিথিদের ও সেই সঙ্গে মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অনাগরিক ধর্ম্মপালকে নিয়ে বুদ্ধগয়া ও কাশী পরিক্রমা শেষবার করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে এশিয়াবাসীর আধ্যাত্মিক সত্তার ঐক্য, সূক্ষ্ম ভাবধারা ওকাকুরা স্বামীজীর সহিত ভ্রমণে ও আলাপ-আলোচনায় বুঝেছিলেন। ওকাকুরার 'Ideals of the East' ১৯০৩ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়।

ড. কালিদাস নাগ বলেন, তার গোড়াপত্তন কিন্তু এই বাংলা দেশে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নিবেদিতার মাধ্যমে।

ওকাকুরা, ওডা, ধর্ম্মপাল প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্বামীজী প্রথমে বুদ্ধগয়ায় যান, পরে কাশীধামে। স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দ ওকাকুরাকে ভারতের প্রাচীন শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখতে পাঠালেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী জলগাঁও থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে ওকাকুরা যে চিঠি লিখেছিলেন তার অবিকল নকল নীচে দিচ্ছি। স্বামিজী ওকাকুরাকে কুরু খুড়ো বা খুড়ো বলে ডাকতেন। মঠে এটি ছিল তাঁর ডাকনাম।

খুড়া লিখছেন ঃ

Dear Swamiji,

We arrived this morning and are starting for Ajanta at once. I have been suffering for sometime with a slight malaria and a shadow of a sunstroke and feel in need of rest. After Ajanta I intend to go back to Calcutta to recoup my strength against Oda's coming. Will you kindly inform me C/o. American Consulate if the Mohanto informs you of any decision. The ladies are well and enjoying everything. I have requested Niranjanananda to go back to you as I am going soon to Calcutta. . . . . . Niren has been more than kind,—brother,—nurse and a mother. I am glad that you have such manly workers with you. I shall be back before long in Banaras to thank you for this and all you have given me.

Yours truely

Khuro.

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ কলকাতায় ফিরে আসার সময় মনমদ জংশন থেকে ওকাকুরা চিঠি লিখছেন ঃ

"Our excursion to the Caves have been most successful with moonlight adventures and twilight dreams where our thoughts were ever with you."

অজন্তা ফ্রেস্কোগুলি দেখে ওকাকুরা স্বামীজীকে লিখছেন ঃ

"The Ajanta Frescos has given me the true glimpse into your classic art—shall I say ours? I found all I dreamt of before and more—one Padmapani was nobler than anything what even the early Italians enclothed in their ideal of divine womanhood. Ellora is magnificient. One Buddha in the Tinchan is the finest statue of the Lord. My national weakness make me think that Japan has added something to its tenderness but certainly never enhanced its grandure. The art of Tang dinesty in China decidedly owes its *Roundness of Ideal* to this classique phase of Indian form-Harmoney. This land is great in this as in all other expressions of the soul. Who says that this feeling is dead? The same live idea runs through out the latter development as a stream courses among the fallen leaves. The over-efflorescence of Bhaktt, the Variagated symbolism of Tantrikism have shadowed it with phantasm, but never tempted its pristine purity. Shall we not drink at the fountain again? The cloud of misery—the night of political oblivion whose darkness drew you nearer the stars than ever is waning away. I wait the *dawn in you* and yours more an.

Yours, Kakuzo.

কি গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে এঁরা স্বামীজীকে দেখতেন তা এই পত্রগুলি পাঠ করলে বোঝা যায়। নিবেদিতা প্রাচ্য শিল্পদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্বামী বিবেকানন্দের নিকট থেকেই লাভ করেছিলেন।

শ্রীমতী রেমঁ লিখছেন, "অমূল্য মহারাজ মঠের একজন বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী, তিনি আর সদানন্দ নিবেদিতার কাছে

রইলেন।” মঠ ছেড়ে তাঁরা নিবেদিতার কাছে থাকবেন কেন? বাস্তবপক্ষে, সদানন্দ স্বামী নিবেদিতার ভারতে আসার প্রথম হতে আরম্ভ করে স্বামীজীর আদেশেই কলকাতায় এলে নিবেদিতার তত্ত্বাবধান করতেন। কখনও নিবেদিতার বাড়ীতে বাস করেন নি। নিবেদিতা সব কাজেই তাঁর সাহায্য পেতেন। অন্তিম রুগ্নাবস্থায় শ্রীযুত বশীশ্বর সেন স্বামী সদানন্দকে বাগবাজারে বোসপাড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া করে রেখেছিলেন তাঁর চিকিৎসা ও সেবার জন্য। ঐ বাড়ী ছিল নিবেদিতার বাড়ীর অতি নিকটে। নিবেদিতা প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে দেখতে আসতেন এবং স্বামীজীর প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে আমিও সেই আলোচনায় উপস্থিত থাকতাম। অমূল্য মহারাজ সম্বন্ধে লেখিকা ভুল সংবাদ ও তথ্য দিয়েছেন। বেলুড় মঠ এবং বাগবাজারে বলরাম মন্দির থাকতে নিবেদিতার কাছে কোন সাধু বা ব্রহ্মচারী বাস করবার কথা অবাস্তব। এই বিষয়ে আমি পূজনীয় অমূল্য মহারাজকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, “নিবেদিতার ওখানে থাকতে যাব কেন? নিবেদিতার কোন প্রয়োজন থাকলে আমাদের কথাবার্ত্তা হ'ত। বরাবরই আমরা তাঁর খবরাখবর নিতাম। সদানন্দ তাঁর বাড়ীতে থাকতেন এ সব বানানো মিছে কথা। কল্পনা কতদূর যেতে পারে তা লেখিকার নিম্নলিখিত ঘটনায় প্রকাশ পাবে—“ক্রিষ্টমাসের সময় ওঁরা (নিবেদিতা, স্বামী সদানন্দ, ব্রহ্মচারী অমূল্য) মাদ্রাজে ছিলেন। সদানন্দ প্রস্তাব করলেন ক্রিষ্টমাসের পুণ্য রজনীটি খণ্ডগিরির পাদমূলে গুঞ্জরিত তরুচ্ছায়ায় উদ্‌যাপন করা যাক। স্থানীয় পল্লী-বাসীরা চন্দনকাঠের ধূপ-ধুনা পোড়াচ্ছে— ওঁরা তাঁদের খোলা আকাশের তলে ধুনি জ্বালিয়ে তার চারপাশে ঘিরে বসেন। সদানন্দ আর অমূল্য মহারাজ কম্বল মুড়ি দিয়ে আরমানি চাষার মত করে সাজলেন” ইত্যাদি। কোথায় মাদ্রাজ আর কোথায় খণ্ডগিরি! লেখিকা না হয় বিদেশিনী, কিন্তু অনুবাদিকা ত এদেশের শিক্ষিতা মেয়ে। তাঁর এরূপ ভুল কেন? পূজনীয় অমূল্য মহারাজ—বর্ত্তমান রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের প্রেসিডেণ্ট, এই সম্বন্ধে আমাকে বলেছেন যে, “তারা মাদ্রাজ প্রদেশে ছিলেন বটে তবে মাদ্রাজ শহরে নয়। বাণীরামবাড়ী নামক একটি স্থানে যীশু-খ্রীষ্টের জন্মোৎসব চন্দনকাষ্ঠের ধুনি জ্বেলে উদ্‌যাপিত হয়। তথাকার জনৈক ফরেষ্ট অফিসার সরকারী বন-বিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। তিনি ধুনি জ্বালাবার জন্য পাঁচখণ্ড চন্দন কাঠ দিয়েছিলেন। নিবেদিতা বাইবেল থেকে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম ও তাঁর শিক্ষা বিষয়ে কিছু অংশ পাঠ করেন। তথাকার পল্লীবাসীরা অধিকাংশই তামিল ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা জানে না। এবং সদানন্দ স্বামীও তামিল ভাষা জানতেন না। দু' একটি কথা ফরেষ্ট অফিসার তামিল ভাষায় বলেছিলেন মাত্র, সদানন্দ স্বামী নহে।” অধিকন্তু মাদ্রাজ প্রদেশে ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে শীত বা ঠাণ্ডা থাকে না। অথচ সদানন্দ স্বামী ও অমূল্য মহারাজকে কম্বল মুড়ি দিয়ে আরমানি চাষা সাজানো হয়েছে। বর্ণনার বাহাদুরি আছে। শ্রীমতী রেমঁর অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল যাতে করে তিনি পূজনীয় অমূল্য মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে এ সব ছাড়া আরও অনেক তথ্য জানতে পারতেন।

নিবেদিতা গৈরিকধারিণী ছিলেন না, স্বামীজী তাঁকে এক টুকরা গেরুয়া কাপড় দিয়েছিলেন, সেটা তিনি নিত্য ধ্যানের সময় মাথার উপর চাপা দিতেন। কখনও কখনও তাঁর পরনে লাল ডুরে গাউন বা ঘাঘরা থাকত, একেই অনেকে গেরুয়া বলে ভুল করেছে। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মহারাজ আমাকে বলেছেন, স্বামীজীর বর্ত্তমানে বা তাঁর দেহান্তরের পরেও নিবেদিতা কোনও দিন 'পুরোদস্তুর গেরুয়া' পোশাক ধারণ করেন নাই। কখন কখন পাতলা একটি কাপড় (hood) যা মাথার উপর দিয়ে পরতেন সভায় বক্তৃতা দিতে হলে। তা কতকটা ফিকে কমলালেবু রং, গেরুয়া বলে ভ্রম হতেও পারে। অথচ লেখিকা লিখছেন, “বিবেকানন্দের দেহত্যাগ করার দু'সপ্তাহের মধ্যেই যশোহরে নিবেদিতার ডাক পড়ল, তাঁর গুরু সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে বলে। নিবেদিতা পুরোদস্তুর গেরুয়া পরে সভায় এলেন” ইত্যাদি।

'সাধনা' অধ্যায়টিতে লেখিকা বলেছেন, “রাজনীতিতে অনেকে যখন তাঁকে গুরু বলে বরণ করত, নিবেদিতা আপত্তি করতেন না।” এই ভাবটিকে ফেনিয়ে নিবেদিতা সম্বন্ধে এ অধ্যায়ে যা বলেছেন তা তাঁর জীবনে বা রচনায় কখনও প্রকাশ পায় নাই। এদেশে জনসাধারণ নিবেদিতাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরু বলে মনে করত না। রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু বা শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ কেউ তাঁকে রাজনৈতিক বিপ্লবপন্থী বলে বর্ণনা করেন নি। স্বামীজীর আদর্শে ভারতবর্ষের সেবা এবং দেশপ্রেমে যুবকদিগকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিবেদিতা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তিনি কোন দল বা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘের নামেই আত্মপরিচয় দিতেন। স্বাধীনভাবে তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা করতেন। গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদিও রচনা করে গেছেন। স্বার্থত্যাগী, স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বিপ্লবী যুবকদিগকেও উপদেশ দিতেন এবং তাদের আদর্শের অনুযায়ী বই পড়তে সাহায্য করতেন। রাজরোষে নির্যাতিত যুবকেরা

কারারুদ্ধ হলে তাদের পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা আর আর্থিক সাহায্য করতেও প্রয়াস পেতেন। তাদের স্বার্থত্যাগ এবং দেশের স্বাধীনতার সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টাকে তিনি সক্রিয় সহৃদয়তার চক্ষেই দেখতেন। যদি কেউ এই সব ঘটনা নিয়ে তাঁকে আয়ার্লণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ দলভুক্ত ইংরেজ-বিদ্বেষী একজন নারীরূপে কল্পনা করেন তবে নিবেদিতার চরিত্র এবং বাণীকে বিকৃত করাই হবে।

শুধু রাজনীতিক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, নারীশিক্ষা-বিস্তারে এবং ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে তাঁর সমভাবে উদ্যম, চেষ্টা এবং সহায়তা ছিল। যখন নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে টাউন হলে শেরিফের আহূত সভার আয়োজন হয়েছিল তখন আমাকে এক দিন স্যর্‌ জগদীশ বসু তাঁর বাড়ীতে কথা প্রসঙ্গে বললেন, "নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথাআমরা ধারণা করতে পারব না। দেশ উপযুক্ত হলে তাঁর কদর বুঝবে। কত দিন তাঁর সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি একটা পুতুল বা এক টুকরো পাথরে বিহ্বল হয়ে কি সৌন্দর্য্য, ভারতের প্রাচীন গৌরব দেখতে পেতেন আমরা তা দেখে অবাক হতাম। এই পরাধীন দেশে জন্মে আমরা তা বুঝতে পারি না। সকল বিষয়ে তাঁর অসামান্য প্রতিভা, গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। যদি তিনি তাঁর স্বদেশে ইউরোপে কাজ করতেন তবে নাম, যশ, অর্থ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ত। সেই সব ত্যাগ করে প্রায় অর্দ্ধাহারে তিনি আজীবন আমাদের দেশের জন্য তিলে তিলে প্রাণ দিলেন।" স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিবেদিতা "Dynamic Hinduism," "Aggressive Hinduism" ইত্যাদি বিষয়ে ভাষণ দিতেন। ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে সব বিষয়ে শিক্ষা, সমাজ ও দেশ-প্রেমকে জাগাতে হবে এই ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা। স্বামীজীর নিকট তিনি সম্যক্‌ভাবে বুঝে সেরূপ ভারতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

লেখিকা লিখেছেন, "১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সমাগত নেতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে এসে স্বামীজীর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন। একনাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে যেতেন তিনি। নিবেদিতা তাতে হাজির থেকে স্বামীজী শ্রান্ত হয়ে পড়লে কখন বা ওঁর হয়ে কথাবার্ত্তা চালাতেন।" এ অপূর্ব্ব সংবাদ লেখিকাকে কে দিয়েছে জানি না। স্বামীজী স্বয়ং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর মিস ম্যাক্‌লাউডকে লিখেছেন, "পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের পর থেকে শয্যাগত আছি বললেই হয়। দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হওয়া রূপ অধিক উপসর্গ জোটায় আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও খারাপ।" 'The Master as I saw him' বইয়ে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে স্বামীজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন, "and when the winter set in, he was so ill as to be confined to bed!" কোনও গুরুতর প্রসঙ্গ আলোচনা সে সময় তাঁর কাছে হ'ত না বলেই নিবেদিতা লিখেছেন। কংগ্রেস তখন ডিসেম্বর মাসের শেষে হ'ত। বিশিষ্ট নেতারা ১৭ নং বোসপাড়ায় নিবেদিতার কাছে গিয়ে নিজেরাই ঘনিষ্ঠ ভাবে আলোচনা করতেন, বেলুড় মঠে স্বামীজীর সঙ্গে নয়। নিবেদিতা কখনও কখনও যেতেন মাত্র। যদি কোন পরিচিত নেতা স্বামীজীকে দেখতে আসতেন তখন যদি নিবেদিতা উপস্থিত থাকতেন তবে হয় ত কথাপ্রসঙ্গে দু'একটা কথা বলতেন মাত্র। লেখিকা লিখেছেন, "রাজনৈতিক ব্যাপারে নিবেদিতার আগ্রহ সজাগ হয়ে উঠে। কিন্তু সেটা সক্রিয় আকারে স্ফুট হ'ল কয়েক সপ্তাহ পরে Mrs Bull-এর বাড়ীতে ওকাকুরা যখন সুরেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন তখন।" স্বামীজীর উপদেশে বা প্রেরণায় নিবেদিতার আগ্রহ সজাগ হয় নি, হ'ল সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে ওকাকুরা যখন দেখা করেন তখন! এর চেয়ে আশ্চর্য্য কি? রাজনৈতিক নেতারা বোসপাড়ায় নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা করতে আসতেন এবং তাঁরা নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই মিশতেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামীর পরামর্শমত নিবেতাকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার জন্য মিশনের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হয়। মঠ মিশনকে সম্পূর্ণভাবে সরকারের সন্দেহ আর কোপদৃষ্টি থেকে মুক্ত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। নিবেদিতা প্রত্যেক কাজেই স্বামীজীর গুরু-ভ্রাতাদের পরামর্শ নিতেন এবং শ্রীশ্রীমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করতেন।

লেখিকা লিখেছেন, "সারদা দেবীকে ঘিরে যাঁরা আছেন এঁরা তাঁদের চেয়ে কম পূজাপাঠ করেন না।" এই সময় সারদা দেবীকে ঘিরে থাকবার মতন ছিলেন প্রাচীনা যোগেন মা, গোলাপ মা আর মায়ের দূর সম্পর্কীয়া দু'একটি আত্মীয়া মাত্র। স্বামীজী যখন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাকে নিয়ে পশ্চিম দেশে গমন করেন লেখিকা লিখেছেন তার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় "নিবেদিতা পঞ্চবটীতে প্রার্থনা করলেন যেন তাঁদের আগলে রাখেন।" এ কাদের? এ সংবাদও নূতন। অধিকাংশ স্থলেই লেখিকা একটি তারিখ বা পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর কথা বোঝাবার জন্য, এতে লোককে আরও বিভ্রান্ত করে। ঐ যাত্রায় জাহাজ মাদ্রাজ হয়ে কলম্বো গিয়েছিল। কোয়ারিণ্টিনের জন্য কাউকেও জাহাজে উঠতে দেওয়া হয় নি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নৌকা করে জাহাজের পাশে গিয়ে কিছু ঘরের তৈরী খাবার এবং গঙ্গাজল দিয়ে এসেছিলেন—এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। নিবেদিতা

সেই জাহাজে ছিলেন। নিবেদিতা বইয়ে আছে, "মার্চের প্রথমে সারদা দেবী নিবেদিতাকে ডেকে পাঠালেন ফিরে আসতে।" বেলুড় মঠের বর্ত্তমানে প্রেসিডেণ্ট মহারাজকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "শ্রীশ্রীমা কখনও নিবেদিতাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলে জানা নেই।"

আমরা নিবেদিতাকে দেখি—রাষ্ট্রক্ষেত্রে মনস্বী নেতা শ্রীঅরবিন্দ এবং নির্যাতিত ত্যাগী বীর তরুণ সম্প্রদায়ের পার্শ্বে সাহিত্যক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমীপে, শিল্পার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর নিকটে, আবার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সন্নিধানে। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের ইংরেজী ভাষায় বঙ্গভাষার ইতিহাস প্রণয়নে এবং শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য শিল্প-বিশারদ ওকাকুরার শিল্প সম্বন্ধে গ্রন্থরচনায় তিনি নানাভাবে তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দিয়ে সহায়তা করেছেন। শতদল পদ্মের মত তাঁর হৃদয়খানি ত্যাগ ও নিষ্কাম কর্মের জ্যোতিতে এবং আত্মনিবেদনে দলে দলে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

প্রকৃত জীবন-চরিত লেখা বড় কঠিন। খুব পরিশ্রম করে জীবিত ব্যক্তিদের কাছে তথ্যানুসন্ধান, সত্যাসত্য বিচার এবং তাঁর রচনাবলী অধ্যয়ন করে জীবনের ঐ আদর্শ বুঝতে হয়।' জীবন-চরিতের ঘটনা যদি কল্পনামিশ্রিত থাকে, যদি তাঁতে অসত্য প্রবেশ করে, তবে সেই জীবন-চরিত উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। রচনার মাধুর্যে, অবাস্তব ঘটনার সমাবেশে সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করতে পারেবটে, কিন্তু বস্তুতঃ তা প্রকৃত জীবন-চরিত বলে গ্রহণ করা কঠিন। অনুবাদিকা ফরাসী ভাষার ঠিক মূল গ্রন্থের কথাগুলি অনুবাদ করেছেন আর কতকটা তাঁর নিজের উচ্ছ্বাসের ভাষার সঙ্গে মিশে আছে। কারণ কতকগুলি শব্দ আছে যা তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তা ফরাসী ভাষার অনুবাদ কিনা সন্দেহ। বড়ই দুঃখের বিষয়, যাঁরা নিবেদিতার সংস্পর্শে এসেছেন এবং তার ভাবধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁরা নিবেদিতার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত আজ পর্যন্তও লেখেন নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে কোনও যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিপাত করবেন।

শুভ নববর্ষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শুভ স্থল, জল, অন্তরীক্ষ বায়ু,
শুভ দেহমন, সুদীর্ঘতর আয়ু,
সিদ্ধি ঋদ্ধি, শান্তি পুষ্টি শ্রী,
প্রীতি-বন্ধনে বদ্ধ ধরিত্রী,
সত্য সকল সার্থক সাধু বাক্,
মানুষ করুক মনুষ্যত্ব লাভ।
হউক সকলে শ্রীভগবানের প্রিয়,
হে নববর্ষ, এই মহাদান দিয়ো।

২

সর্ব্বত্রই ভগবানে যেন খুঁজি,
সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীরে পুজি,
সর্ব্বসিতের উপাসক হয়ে রই
শুধু অনাগত অমৃতের কথা কই।
গাঁথো সমাজের নূতন করিয়া ভিত
সকল মানব হোক কল্যাণকৃৎ
যেথা যত আছে উৎপীড়িত ও ভীত—
হউক মুক্ত—ভগবান হোন প্রীত।

৩

হে নববর্ষ, যারা এ ভুবন মাঝে
যপ তপ আর ভগবান লয়ে আছে—
ধরা বিশুদ্ধ যাঁহাদের নিঃশ্বাসে,
দেবতা নিত্য ভ্রমেন যাঁদের পাশে,
অপার্থিবের শুধু যাঁরা কারবারী,
যেন তাঁহাদের মহিমা বুঝিতে পারি।
তাঁদের বিভূতি প্রতি ভালে দাও এঁকে
দিব্য কর সে পদরজ অভিষেকে।

ঘটা
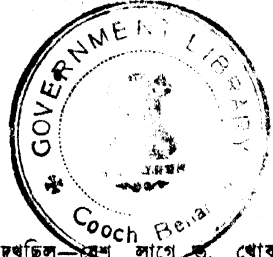
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মামার বাড়ীতে এসেই রন্তু মস্ত এক উৎসবের মধ্যে পড়ে গেল। উৎসবটা ঠিক মামার বাড়ীতেই না হলেও একেবারেই পাশের বাড়ীতে, তার উপর কাজের জন্য এ বাড়ীর সবাই ও-বাড়ীতে এত যাওয়া-আসা করছে যে, মনে হচ্ছে দুটো বাড়ী যেন এক হয়ে গেছে।

খুব বড় না হোক বাপ-কাকা-দাদাদের মত, তবু এই বছর সাতের মধ্যে ঘটা কয়েকরকম দেখেছে বৈ কি; নিজেরই তো জন্মতিথি হয়ে গেল এই ক'দিন আগে, তারও আগে হ'ল দাদার পৈতে, পিসীর বিয়ে। আরও ঘটা দেখেছে কত, নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে, কিন্তু এ ধরনের ঘটা ঠিক দেখে নি। মামার বাড়ীর মতই বেশ বড় বাড়ী, তার সামনে প্রকাণ্ড দুটো শামিয়ানা পড়েছে, তার নীচে কত কি ব্যাপার! একটাতে কেত্তন-গান হচ্ছে, তিন জন মেয়ে আর খোল কত্তাল আরও কি সব বাজনা। একটাতে পূজো হবে, তার জন্য কত কি সব সরঞ্জাম। চারখানা পালং, গদি, বালিশ, চাদর-দেওয়া, মশারি-ফেলা। কত ঘড়া, কত থালা, কত ঘটি, কত গেলাস সাজানো হয়েছে, একদিকে বাছুরসুদ্ধ কি চমৎকার গোরু একটা, মালা-পরানো; একদিকে একটা ধপ্‌ধপে সাদা ষাঁড়, তার গলাতেও মালা; পূজোর জায়গায় কাপড়, শাড়ী, নৈবিদ্যি, কত ফুল, ধুপ ধুনো আরও কত কি—সব বড় বড় পূজোতেই যেমন হয়। আরও খানিকটা সরে দশ-বারো জন বই খুলে মিষ্টি সুরে দুলে দুলে কি সব পড়ছে।

পূজো আরম্ভ হ'ল—সেও কতক্ষণ ধরে! পুরুতের পাশে বসেছে নেড়ামাথা, মোটাসোটা, টকটকে রং, ধপ্‌ধপে কাপড়-পরা একজন লোক। আরও ঐ রকম নেড়ামাথা টকটকে রং ধপ্‌ধপে কাপড়-পরা তিন জন ঘোরাঘুরি করছে আর মাঝে মাঝে এসে বসছে। পূজোর পাশেই প্রকাণ্ড সতরঞ্চির উপর সাদা ধপ্‌ধপে চাদর পাতা, তাতে অনেক লোক রয়েছে বসে।

বাড়ীর ভিতর প্রকাণ্ড উঠোনের উপর মস্ত বড় চাদর টাঙিয়ে একদিকে রান্না হচ্ছে, বড় বড় কড়ায় কত রকম রান্না! একদিকে হচ্ছে খাবার তৈরি—কচুরি, রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, বোঁদে। এক জায়গায় বড় কাঠের বারকোশে ময়দা ঠাসা হচ্ছে।...দই এসেছে! দই এসে গেছে শব্দ হ'ল; রন্তু ময়দা ঠাসা দেখছিল—বেশ লাগে ও, খোকাকে চটকাবার মত, নিজেরও ইচ্ছে করে ঠাসি—শব্দ শুনে ছুটে এল। হাঁড়িতে হাঁড়িতে কত দই! ভাঁড়ারঘর থেকে ক'জন মেয়ে বেরিয়ে এল। "এদিকে নিয়ে এস গো, একেবারে ঘরে তোল।"...বলতে না বলতেই—"ক্ষীর কোন ঘরে রাখা হবে গো?" রন্তু ঘুরে দেখে ছোট হাঁড়ি করে হাঁড়ি হাঁড়ি ক্ষীর!

কত কি যে হচ্ছে, ঘুরে ঘুরে দেখে যেন থৈ পাচ্ছে না রন্তু।

এক জায়গায় পিসীর মত কত মেয়ে, পিসীর চেয়ে বড় আবার পিসীর চেয়ে ছোটও—সবাই এত পান সেজে জমা করে যাচ্ছে। কত গেলাস, কত খুরি, কত পাতা, কত আসন! ঘটা অনেক দেখেছে বৈ কি রন্তু, কিন্তু এ রকম ঘটা ত দেখে নি।

বিকেলে পূজো হয়ে গেল। এবার কাপড়, বাসন, পালং—সব নাকি দিয়ে দেওয়া হবে। কিছু কিছু বাসন তখুনি কত লোকে এসে নিয়ে নিয়ে গেল, একজন খাতা দেখে নাম ডেকে ডেকে বলছে আর সবাই নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক রইলও পড়ে, আরও সবই এসে নিয়ে যাবে। একখানা বিছানা-সুদ্ধ পালং আর অনেকগুলো বাসন রন্তুর মামার বাড়ীর লোকেরা এসে নিয়ে গেল।

তার পর রাত্তিরে সে কি নেমন্তন্নর ঘটা! কত আলো, কত লোক, হৈ-হল্লা! এত বড় নেমন্তন্ন আর কখনও দেখেছে কি রন্তু? কৈ, মনে পড়ে না ত। খুব খেলেও রন্তু; ওকে নেমন্তন্নয় কেউ পান দেয় না, ছেলেমানুষ, জিভ মোটা হয়ে যাবে বলে। এখানে একটার বদলে দুটো পান!

কিসের এত ঘটা তা জিজ্ঞেস করেছিল রন্তু ওর দিদিমাকে। ও-বাড়ীর কত্তা আশী বছরে সগ্‌গে গেলেন কি না, তাই ছেলেরা দানসাগর সেরাদ্দ করেছে। খুব বড় বড় চাকরি করে ত ছেলেরা, অনেক টাকা, দুখানা মটোর। আরও জিজ্ঞেস করেছিল রন্তু, সেরাদ্দ যেমন দেখে নি তেমনি সগ্‌গও ত দেখে নি কখনও। কাউকে যেতেও দেখে নি। দিদিমা বললে সে নাকি এর চেয়েও ভাল জায়গা, আর রোজ রোজ সেখানে নাকি এর চেয়ে কত বড় বড় ঘটা হয়, কত রংবেরঙের আলো। রন্তুরা যদি আর ক'দিন আগে এসে

পড়ত ত দেখতে পেত কত বাজনাবাদ্যি করে, কত পয়সা দো-আনি ছড়াতে ছড়াতে কত সাজিয়ে গুজিয়ে সবাই সগ্‌গে নিয়ে গেল ও বাড়ীর কর্ত্তাকে। সবাই যায় সগ্‌গে, আগে ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা, দাদামশাই-দিদিমারা যায়, তারপর তার ছেলেমেয়েরা, তার পর তার ছেলেমেয়ে—সবাই যখন বুড়ো হয়ে উঠে। পুণ্যির জোর থাকলেই যায়, যেমন টাকার জোর থাকলে তবে ত কলকাতায় গিয়ে বাড়ী করতে পারে লোকে। তবে একবার গেলে আর ফিরতে চায় না। আর কেনই বা ফিরবে? অত ঘটা, অত বাজনাবাদ্যি সেখানে। দেখা হয় বৈ কি সেখানে, ছেলেমেয়েরা যাবে, তার পর তার নাতি-নাত্‌নীরা, তার পর আবার তার ছেলেমেয়েরা, বুড়ো হ'ল। কি করতেই বা আসবে অমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে?

বুড়ো না হলে যায় না, যেতেও নেই; তাইতেই না দিদিমা ও-রকম করে ধমক দিয়ে উঠল রন্তুকে যখন সে বেচারি সব শুনেটুনে যেতে চেয়েছিল সেখানে।

রন্তুরা আসতই মামার বাড়ীতে, আরও একটা মস্ত বড় ঘটা রয়েছে যে এখানে। রন্তুর দাদামশাইয়ের জন্মতিথি। দাদামশাইও আশী বছরে পড়লেন কিনা, তাই এবারে নাকি খুব ঘটা করে হবে আর সেই জন্যই রন্তুরা সবাই এল এবার। নৈলে অত দূর থেকে ত রোজ রোজ আসা যায় না, এই তিন বছর পরে তারা এসেছে, মা বলেন—ঠিক এই তিন বছর পাঁচ মাস পরে। আরও পরে আসত, তবে পাশের বাড়ীতেই নাকি এত বড় কাজ হচ্ছে—দানসাগর ত আজকাল আর কেউ করে না বাপ মায়ের জন্যে—নিজের মোটরগাড়ি করবে, বড় লোকদের পার্টি দেবে, না, বাপমায়ের দানসাগর করবে? তাই, অত বড় একটা কাজ হচ্ছে বাড়ীর পাশেই, আর ওদের সঙ্গে খুব ভাবও ত, দু'দিন আগেই সবাই চলে এল।

বেশ লাগছে এখানে রন্তুর। শ্লেট দ্বিতীয় ভাগ বাক্স, সবাই দেশের চেয়ে আরও ভালবাসে, তার পর এই ঘটার উপর ঘটা। দাদুর জন্মতিথি এসে গেল বলে, আর মাত্র আটটি দিন আছে। তার পরে এ বাড়ীতেও কত আলো, কত ঘটা, কত নেমন্তন্ন!

রন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। আর মোটে তিন দিন বাকি, তবু এ বাড়ীতে ত ঘটার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও-বাড়ীর কর্ত্তার দানসাগরের ঠিক তিন দিন আগে ওরা এসেছিল। তখন থেকেই কত কাজ পড়ে গেছে ও-বাড়ীতে বাসন-কোসন কিনে কিনে আনছে বাজার থেকে—আরও কত সব জিনিস। পালং চারটে বড় বড় মোটরগাড়ি করে এসে পড়ল, তাতে ফিতে জড়ান হ'ল, তারপর বিছানা পাতা হ'ল। বাইরে উঠোন পরিষ্কার করছে কত 'মুনিস' এসে। তার পরদিন শামিয়ানা এসে পড়ল। কত হৈ হৈ করে কত লোকে দাঁড় করাল সে ছুটো। মুনিসদের বাড়ীর মেয়েরা এসে পুজোর জায়গা নিকোচ্ছে গোবর দিয়ে। আরও কত কাজ, রাত্তিরে বড় বড় আলো জেলে করছে সবাই। তার পরদিন বাড়ীর উঠোনের উপর চাদর টাঙিয়ে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল, উনুন তৈরি, ওদিকে উনুন জেলে খাবার তৈরি, এদিকে কুটনো কোটা, কত হৈ হৈ রৈ রৈ। তার পরদিন সকাল থেকে তো কথাই নেই।

ওর মামার বাড়ীতে কিন্তু কৈ সে রকম ত কিছু হচ্ছে না। কাল হয়ে গেলেই ত পরশু, কিন্তু শামিয়ানাও আসছে না, খাট বাসন-কোসন এসবও কিছু আসছে না। মুখটা চুপ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রন্তু। আরও একটা দিন গেল, কাল সকাল হলেই জন্মতিথি, কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

এসে পর্যন্ত দেখছে এ বাড়ীর সবাই ওদের কাজে ব্যস্ত। শুনে এসেছিল মামার বাড়ী গিয়ে সবার কাছে খুব আদর পাবে, তা ত হয়ই নি, দু'এক জন ছাড়া সবার সঙ্গে ভাল করে জানাশোনাও হয় নি যে জিজ্ঞেস করে—দাদুর জন্মতিথি এসে পড়ল অথচ ঘটার কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন। একটু জানাশোনা হয়েছে ছোট মামার সঙ্গে, আর সেই যেন দাদুর জন্মতিথির জন্য একটু ব্যস্ত, কয়েকবার তার মুখেই শুনলে জন্মতিথির জন্য এ জিনিসটা এখনও এসে পড়ল না, ও জিনিসটা এসে পড়ল না। তবে ব্যস্ত বলেই তাকে জিজ্ঞেস করবার সুবিধে হচ্ছে না। তবু ওরই মধ্যে একবার একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—দাদুর জন্মতিথিতে ঘটা হবে না?

ছোট মামা কোথায় যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল, একটু যেন রেগে গিয়ে একটু হেসেই বলল, "এই দেখো। বোকা ছেলে কাজে বেরুচ্ছি পেছু ডেকে দিলে! সেই জন্যই ত যাচ্ছি রে হাবা, ঘটা যখন হবে তখন দেখবি!"

হন্ হন্ করে চলে গেল। সেই থেকে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে সাহসও হচ্ছে না, কে কাজে যাচ্ছে, কে যাচ্ছে না কি করে জানবে? ছোট মামা আদর করে তাই তবু একটু হেসে বকলে, আর কেউ হলে ত চোখ রাঙিয়েই বকত।

মুখ বুজে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রন্তু। এক একবার মনে হচ্ছে হয় ত কোথাও কিছু নেই, একেবারে হুড়হুড় করে সব এসে পড়বে। যেমন গল্প শুনেছে আলাদীন পিদিম জেলে দিলে আর হুড় হুড় করে সবকিছু এসে পড়ল—প্রকাণ্ড বাড়ী, খাট পালং, নানা রকম খাবার, হাতি ঘোড়া। কিংবা

যেমন সিনেমাতে দেখছে, কিংবা যেমন ম্যাজিকে দেখলে সেদিন—কোথাও কিছু নেই, টুপির মধ্যে থেকে ম্যাজিকওলা বের করতে লাগল—রুমাল, জামা হাঁস, তার ডিম, সন্দেশ টাকা। মামার বাড়ি এক আশ্চর্য্য জায়গা সে তো শুনে এসেছেই—ছড়ায়, গল্পে; ওদের দেশের চেয়ে এদেশটা কত বিষয়ে কত নূতন তাও তো দেখে আসছে; এ বিশ্বাসটা করতে মোটেই বাধল না রস্তুর, বরং যতই সময় যেতে লাগল, এখনই কি হয়ে বসে, এইবার বুঝি হু হু করে যোগাড়যন্ত্র আরম্ভ হয়ে যায়—এই রকম একটা আশার সঙ্গে বিশ্বাসটা যেন বেড়েই যেতে লাগল। কোথায় হঠাৎ আরম্ভ হয়ে পড়বে তারই সন্ধানে যেন বাড়ীর এখানে-ওখানে চুপ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই না ঘটতে দেখে ওর বিশ্বাসটা যেন কমে আসতে লাগল, মনটা ক্রমেই নিঝুম হয়ে পড়তে লাগল, যেন স্পষ্ট করে কিছু একটা জানতে না পারলে আর স্বস্তি পাচ্ছে না। এই নৈরাশ্য, তার উপর আর একটা নূতন জিনিস মনে হয়ে ওর এক এক সময় বোধ হচ্ছে যেন কান্না ঠেলে আসছে গলায়।

—দাদুর কথা ভাবছে রস্তু। আহা খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, নয় শুয়ে আছেন, না হয় বারান্দাটিতে চেয়ারে বসে আছেন, নিজে কিছু করতে পারেন না, সামান্য কাজও ডেকে ডেকে করাতে হয়, কেউ যদি একটু না ভাবে তার জন্মতিথির এত বড় ঘটাটা, তিনি নিজে হতে কি করে করবেন? এক একবার দুর থেকে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—চোখ বুজে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে কত কি যেন ভাবছেন দাদু—নিশ্চয় এই সব কথাই—বড় অসহায় বলে বোধ হয় ওঁকে, গলায় কান্না ঠেলে আসে রস্তুর।

ঘুম পাচ্ছে। একটু পরেই দিদিমা ছোটদের ডেকে খাওয়াতে বসাবেন; তার পরেই ঘুমিয়ে পড়বে রস্তু। দাদু চেয়ারে চোখ বুজে বসে তামাক খাবেন, জন্মতিথির কি হবে কেউ ভাববে না সেকথা, আহা! রস্তু দাদুকে ভালবাসে, তাই তার মনে এত কষ্ট, আর দাদুর ত নিজের জন্মতিথি, তাঁর মনে যে কি কষ্টটা হচ্ছে তা কি বোঝে না রস্তু?

তার পর ভাবল একটু গোড়া বেঁধে এগোনোই ভাল, সব কথা ত ঠিকমত জানেও না, এই ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যা ভেবেছিল তা হচ্ছে না; প্রশ্ন করল—"পাঁচ মামা ত তোমার নিজেরই ছেলে দাদু?"

দাদু যে হঠাৎ অমন করে গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে সরিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন কেন রস্তু তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল; দাদু হেসেই বললেন—"ধরে নিলুম আমারই, তা কি বলতে চাস তুই?"

লজ্জায় পড়ে গেছে, রস্তু একবার মাথাটা ঘুরিয়ে চারিদিকটা দেখে নিল কেউ শুনছে কি না। তার পর বলল—"বলছিলাম তা হলে তোমার বেলায় ও-বাড়ীর কত্তার মত ঘটা হচ্ছে না কেন? তোমার ত একজন ছেলে বেশী দাদু।

এবারেও একটু হেসে উঠলেন দাদু, বললেন—"তার যে শ্রাদ্ধ ছিল, ছেলেরা ঘটা করে দানসাগরের উজ্জুগ করেছে।"

একটু আবার ভাবতেই হ'ল, তার পর মাথাটা আর একটু এগিয়ে দাদুর কাঁধে রেখে বলল, "আমিও সেই কথাই বলছিলাম দাদু। তুমি মামাদের ডেকে বলে দাও না—জন্মতিথিটা থাকগে, তোরা বরং সেরাদ্দই করে দে আমার, দানসাগরের উজ্জুগ করে।···আহা, এরা সবাই কতদিন পরে এসেছে ঘটা দেখবে বলে!"

আন্দামানের বন্দী উপনিবেশ

প্রথম যুগ

শ্রীনিখিল মৈত্র

প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যে রমণীয় আন্দামান দ্বীপমালা সর্ব্বপ্রথম ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ইতিহাসের পটভূমিতে স্থান পায় বাংলা সরকারের উপনিবেশরূপে। ভৌগোলিক স্থিতিতে আন্দামানের সর্ব্ব উত্তর অংশ প্রাইস অন্তরীপ থেকে হুগলী নদীর মোহনার দূরত্ব মাত্র ৫৯০ মাইল। বর্ম্মার নেগ্রেইস অন্তরীপ থেকে আন্দামানের নিকটতম অংশের ব্যবধান আরও অনেক কম—মাত্র ১২০ মাইল। বঙ্গ-উপসাগরের মাঝামাঝি ১০° থেকে ১৪° ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা ও ৯২° থেকে ৯৪° ডিগ্রী পূর্ব্ব মধ্যাহ্ন রেখার মধ্যে অবস্থিত ২,৫০৮ বর্গমাইল আয়তনের ২০৪টি ছোট বড় দ্বীপসমষ্টি আন্দামান বিরাট অজগরের মত ২১৯ মাইল দীর্ঘস্থান অধিকার করে রয়েছে, কিন্তু দ্বীপমালা প্রস্থে অপরিসর, কোথাও ২০ মাইলের বেশী নয়।

প্রাচীন কাল থেকে ভারতের পূর্ব্ব তটের বন্দরের সঙ্গে সাগর-পারের অন্য দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। চীন, আরব ও মালয় দেশের নাবিকদের কাছে বঙ্গোপসাগরের পথ অজ্ঞাত ছিল না। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আশ্রয়, পানীয় এবং আহার্য্যের সন্ধানে পণ্যতরণীকে মাঝে মাঝে আন্দামানেও আসতে হয়েছে। কিন্তু, আন্দামান সাগরে যেমন সুগভীর এবং নিরাপদ স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে, তেমনি আবার সে যুগে শিলাসঙ্কুল দ্বীপমালা-বিকীর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত পথে বায়ুর গতিবেগে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল জাহাজের সাহায্যের চেয়ে বিপদের আশঙ্কাই ছিল বেশী।

প্রাকৃতিক বিপত্তির থেকেও বোধ হয় বেশি ভীতিপ্রদ ছিল আন্দামান দ্বীপের খর্ব্বাকৃতি নিগ্রয়েড জাতীয় আদিম অধিবাসীদের নৃশংসতা। শিলারাশির সঙ্ঘাতে জাহাজ জলমগ্ন হলে যে সব নাবিক-দের সলিল সমাধি হ'ত না, আন্দামানীদের হাতে তাদের মৃত্যু এক রকম অবধারিতই ছিল। সেই জন্যেই সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতির যে ধারা বর্ম্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও চীনকে আলোড়িত করেছিল, আন্দামানের আদিবাসীকে তা স্পর্শ করে নি। দ্বীপবাসীরা সভ্যতার জয়যাত্রায় সবার পেছনের সারিতে পড়ে রইল। বোধ হয় পৃথিবীতে এত অনগ্রসর ও আদিম অবস্থায় বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী আর নেই। ক্লডিয়াস টলেমি, মার্কো পোলো, নিকোলাই কাণ্ট এবং বিভিন্ন আরব নাবিকদের বর্ণনাতে আন্দামানের নাম উল্লেখ আছে, সত্য মিথ্যা নানারকম কাহিনীও পাওয়া যায়। তবুও তাঁদের সবারই আন্দামান পরিচয় যে অত্যন্ত ক্ষীণ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি সমুদ্রপথে পূর্ব্ব দেশের সঙ্গে ব্যবসা, বাণিজ্য, দেশ অধিকার এবং তারই সঙ্গে পার-মার্থিক মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মপ্রচার সুরু করল আর এর পরিণতি হ'ল ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বিরাট প্রতি-যোগিতায় এবং প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষে। আন্দামানের পীমা, পাড়ুক, গর্জ্জন, চাপলাশের দুর্ভেদ্য বনানীতে তখনও কোনও বিদেশী শক্তির জয়কেতন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অথচ আন্দামান দ্বীপমালার ৭৫ মাইল
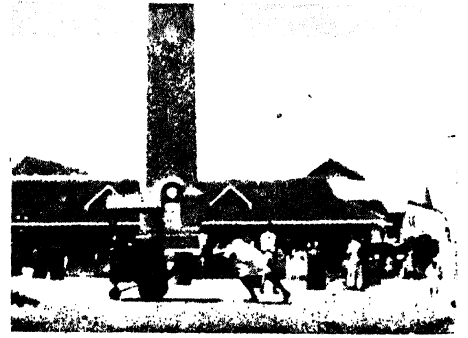
পোর্ট ব্লেয়ার, আবেরডিন বাজারে ঘড়িঘর

দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, মোরাভি-য়ান, দিনেমার প্রভৃতি জাতির ব্যবসাকেন্দ্র, মিশনারী সংগঠন এবং শাসন-অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। ম্যালেরিয়া, নিকোবরী আদিবাসীদের সুস্পষ্ট অসহযোগিতা বা প্রকাশ্য শত্রুতা, যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধা এ সব সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় নিয়ে কারনিকোবর-নানকৌড়িতে উপনিবেশ গড়ার প্রয়াস বহুদিন ধরে চলেছিল। পরে তাওকেন বহু পরিমাণে অসফল হ'ল সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে, এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইউরোপীয় জাতির সমস্ত রকম ধর্ম্মপ্রচার, দেশ-অধিকার, ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপনার মূল প্রেরণা ছিল প্রাচ্যের অলৌকিক বনসম্পদ লুণ্ঠনের বাসনা। গভীর অরণ্যের বনসম্পদ ছাড়া, আহরণ, অর্জ্জন বা লুণ্ঠনের অন্য কোনও উপকরণই তখন আন্দামানে ছিল না। নিকোবরে অন্ততঃপক্ষে নারকেল ও সুপারীর প্রাচুর্য্য ছিল। হেম মৃগের সন্ধানে আন্দামানে আসা ছিল একান্ত বাতুলতা!

প্রথম উপনিবেশ

(১৭৮৯-৯৬)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বঙ্গোপসাগরে কয়েকখানা বাণিজ্য জাহাজ জলমগ্ন হয় এবং আন্দামানের উপকূলে শিলা-সঙ্কুল তটরেখায়

আহত জাহাজের অসহায় নাবিকদের হত্যার খবর বাইরের জগতেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে সুদূরপ্রসারী যাতায়াত পথ সুরক্ষিত করার জন্য আন্দামানের উপর সাধারণ সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য হয়ে উঠল। ১৭৮৮ খ্রীঃ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের লেঃ কোলব্রুক ও ভারতীয় নৌ-বহরের লেঃ আর্চ্চিবাল্ড ব্লেয়ারকে আন্দামান দ্বীপমালায় পাঠান হয়। তাঁদের তথ্যবহুল বিবরণ ও সুপারিশ অনুযায়ী ১৭৮৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ আন্দামানের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে পোর্টব্লেয়ার পোতাশ্রয়ের মুখ থেকে আড়াই মাইল দূরে খাড়ির মধ্যে বার একরের ছোট চ্যাথাম দ্বীপে আন্দামানের প্রথম উপনিবেশ ২০০ জন স্বাধীন উপনিবেশকারীকে নিয়ে স্থাপিত হয়। উপনিবেশের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত হয় লেঃ আর্চিবল্ড ব্লেয়ারের উপর। পরবর্তীকালের বন্দীকারার সঙ্গে এ শিবিরের মূলগত পার্থক্য ছিল। স্থানীয় আদিবাসীদের নৃশংসতা বা নরমাংস ভোজন সম্বন্ধে সত্য, অসত্য নানা কাহিনী প্রচলিত থাকলেও চ্যাথাম দ্বীপে এই নূতন উপনিবেশে কাউকেও বিপদের সম্মুখীন হতে হয় নি। কেবল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বীপ পর্য্যবেক্ষণের সময় ছোটখাটো একটা সজ্ঘর্ষ হয় এবং তাতে এক জন মারা যায়।

১৭৯২ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে লেঃ ব্লেয়ার কর্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তাতে জানতে পারা যায় যে, আবহাওয়া উপনিবেশ-কারীদের ভালই লাগছিল, রোগভোগও খুব কম এবং সব থেকে আশ্চর্য্যের যে, আদিবাসীরা বহুদিন থেকে বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং তারাও বুঝতে পেরেছিল যে বহিরাগতদের ব্যবহার ও উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ।

"The settlement had been so healthy as to suffer no injury from the absence of the surgeon, who had been to Calcutta on leave, and the natives had been perfectly inoffensive for a long time, and are becoming more familiar—they seem now convinced that our interests are pacific."

লেঃ ব্লেয়ার ১৭৯২ খ্রীঃ দু'জন আন্দামানীকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। তারা সম্ভবতঃ অধুনা অতি কুখ্যাত অতি হিংস্র বলে পরিচিত আন্দামানের বৈরী-ভাবাপন্ন জারোয়া উপজাতির লোক।

১৭৯২ সনের শেষাশেষি আন্দামান উপনিবেশের স্থান পরি-বর্ত্তন করে উত্তর আন্দামানের পোর্ট কর্ণওয়ালিশে নিয়ে যাবার তোড়জোড় আরম্ভ হয়। তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেলের ভ্রাতা কমোডোর কর্ণওয়ালিশের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলে মনে হয়। অবশ্য, কমোডোর কর্ণওয়ালিশ প্রতি-রক্ষার প্রশ্নকেই বড় করে দেখেছিলেন। নূতন জায়গার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, আদিম নিবাসীদের সম্পূর্ণ উদাসীনতা এবং কখনও প্রকাশ্য শত্রুতা উপনিবেশ অধিকর্ত্তাদের সামনে বিরাট সমস্যা রূপে দেখা দেয়। তার সঙ্গে, ১৭৯৩ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের সমরানল ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্য সংগ্রামে রূপান্তরিত করে। সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে উপনিবেশের গভর্ণর মেজর কীড সাধ্যমত প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। দুর্গ-নির্ম্মাণ, বন্দরের প্রতিরক্ষার জন্য কামান স্থাপনা, নারী-শিশুদের

ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ, পোর্ট ব্লেয়ার

নিরাপদ সুরক্ষা-ব্যবস্থা এমনি অনেক পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়েছিল। তবে, কোনও সজ্ঘর্ষ আন্দামানে হয় নি।

আন্দামানে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার ব্যয়, স্বাস্থ্যের ক্রমবর্দ্ধমান অবনতি এই সমস্ত কারণে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর উপনিবেশ উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সময় ২৭০ জন শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত কয়েদী ও ৫৫০ জন স্বাধীন মানুষ নিয়ে ছিল উপনিবেশের জনসমষ্টি। স্বাধীন মানুষের মধ্যে ছিল সৈন্য, ইউরোপীয় আর্টিলারী, ভারতীয় এবং ইংরেজ অসামরিক ব্যক্তি ও তাদের পরিবার-পরিজন। উপনিবেশ উঠিয়ে দেওয়ার পর কয়েদী-দের পেনাঙে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

উপনিবেশ উঠিয়ে নেবার সময় কর্তৃপক্ষ আন্দামানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা কাগজে-কলমে করেন, কিন্তু তা কার্য্যকরী হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর উপনিবেশ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, পরবর্ত্তী যুগের বন্দীশিবিরের সংগঠনে এবং শাসনে এর প্রভাব ছিল সামান্যই। কিন্তু আন্দামানের বিচ্ছিন্নতা, অপরিচিতের পরিবেশে সৃষ্ট রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর ধারণা অনেকাংশে কেটে গেল। এখন থেকে আন্দামান ক্রমবর্দ্ধমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই থেকে গেল।

উপনিবেশ উঠে যাবার পর আন্দামানের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন না হলেও, শিথিল হয়ে আসে। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের স্তম্ভে জলমগ্ন জাহাজ ও জাহাজীদের করুণ কাহিনীর মধ্যে আন্দামান দ্বীপ আত্মপ্রকাশ করত। আন্দামানের আদিবাসীদের নিয়ে জলদস্যুরা ক্রীতদাসের ব্যবসা করছে এরকম কথাও মাঝে মাঝে শোনা যেত। এ ব্যাপারে নাকি মালয়বাসীরাই অগ্রণী ছিল। মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার সুলতানদের প্রাসাদে

আন্দামানী ক্রীতদাসকে অলৌকিক জীব হিসেবে রাখা হ'ত। শ্যামের রাজাকে এ রকম ক্রীতদাস দেবার বিবরণও পাওয়া গিয়েছে। পরের যুগে, "Our Relations with the Andamanese" নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ-প্রণেতা এম. ভি. পোর্টম্যানও বলেছেন যে, আন্দামানী ক্রীতদাস ইউরোপের রাজদরবারে খর্ব্বাকৃতি আফ্রিকার নিগ্রো 'পেজ-বয়' হিসাবে থাকাও মোটেই বিচিত্র নয়। ভারতবর্ষের বাদশাহ, নবাব, রাজার হাবসী পোষাদের দলেও হয় ত আন্দামানী ছিল। আন্দামানীরা যে বহিরাগতদের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর, নৃশংস ব্যবহার করত এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নেই। এ নির্মম নির্দয়তা সম্ভবতঃ প্রতিশোধজনিত। দাস সংগ্রহ ও দাস ব্যবসাই আন্দামানীদের বহিরাগতের বিরুদ্ধে এতখানি ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ সার্ব্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ গ্রাণ্টের মতে বঙ্গোপসাগর ব্রিটিশ সাগরে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ সমুদ্রের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্বীপমালা অবাধ্য বন্যজাতির আবাসভূমিতে পরিণত হয়ে থাকবে এ কি

পোর্ট ব্লেয়ারের সংলগ্ন সমুদ্রতট

রকম কথা। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা ১৮৫৪ সনেই এ দ্বীপপুঞ্জে স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছিলেন এবং বন্দীনিবাস হিসাবে আন্দামানকে গড়ে তোলা যেতে পারে কিনা এ নিয়ে পত্রবিনিময় হচ্ছিল।

১৮৫৭ সালে ধীরস্থির ভাবে নিয়মমাফিক কাজ করার সময় কারুরই ছিল না। ১০ই মে সিপাহীদের অসন্তোষ-বহ্নি যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করল তা যেমন অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত উত্তর ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিদেশী শাসকের শোষক যন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরমার করার সাহস ও শক্তি দিল, তেমনি আন্দামানকেও ভারত ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিয়ে এল। বিদ্রোহ দমনের নামে পাশবিকতার যে তাণ্ডবলীলা শাসকসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয়, সে কাহিনী আজ বিস্মৃতির গর্ভে। তবুও বিদেশী ইতিহাসকার বা সাংবাদিকের লেখনীতে এখানে ওখানে এ নির্মমতার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। লণ্ডন টাইমস পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ডব্লু. এইচ. রাসেল 'সিপাহী বিদ্রোহ' সংক্রান্ত ঘটনাবলীর পরিপূর্ণ বিবরণ পাঠাবার জন্য এদেশে আসেন। নরহত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতি দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন :

"......executions of the natives in the line of the march were indiscriminate to the last degree . . . . In two days forthy-two men were hanged on the road side, and a batch of 12 men were executed because their faces were turned the worng way, when they were met on the march. All the villages in his (Renand's) front were burned when he healted . . . . (W.H. Russel's My Diary in India, p. 473-74).

ঝাঁসির রাণী, সেনাপতি তাঁতিয়া টোপী, কুমার সিং, আহম্মদ শা, মঙ্গল পাঁড়ে প্রভৃতি শহীদের আত্মোৎসর্গের কাহিনী সুবিদিত। তাঁদের সঙ্গে আরও বহু সাধারণ সৈনিক, কৃষক, জমিদার, আমির, ওমরাহ, পুরোহিত, মৌলবীর মৃত্যুদণ্ড হয়। ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের নির্ব্বাসন ও জীবন অবসান হয় বর্ম্মার টুঙ্গুতে। এ ছাড়াও হাজার হাজার বীরের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়। পুরাতন ইতিহাস বা সংবাদপত্রের বিস্মৃতপ্রায় পৃষ্ঠায় সামান্য সংবাদ পাওয়া যায়—জনসাধারণ ও সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির অপরাধে মৌলবী আলাউদ্দীনকে হায়দ্রাবাদে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আন্দামানে নির্ব্বাসিত করা হয়। "History of the British Empire in India"র রচয়িতা এল. জি. ট্রটারের ভাষায় :

Imprisonment for life was the doom awarded to the less darkly criminal Mannoo Khan of Lucknow.....A few hundred wretches had to linger out their forfeit lives in the Andamans.... (p. 411).

অবশ্য আন্দামানে নির্ব্বাসিত অভিশপ্ত বিদ্রোহীদের সংখ্যা কয়েক শ' নয়, কয়েক হাজার।

মৌলবী আলাউদ্দিন, মান্নু খান, নারায়ণ, রামলোচন এমনি আরও বহু বীরকে আন্দামানে পাঠানো হ'ল। কিন্তু তার পর? সে ইতিহাস আজও অকথিত।

১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি ছিল নির্মম ও কঠোর। লেখা আছে : "আজকের নির্মমতা অনাগত দিনের মানবতায় রূপান্তরিত হবে।" যুক্তি দেওয়া হ'ত—'প্রাচ্যের লোক অনুকম্পা, কোমলতাকে দুর্ব্বলতা বলে মনে করে।' (পার্সিভাল্ ল্যাণ্ডন প্রণীত গ্রন্থ "১৮৫৭") ১৮৫৮ সনের ১৪ই জানুয়ারী 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' কাগজে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, বোম্বাই থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত ৭৮ জন কয়েদীকে পেনাঙে পাঠানো হয়েছিল। তাদের দেখে নাকি পেনাঙের ইউরোপীয় অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র ঘৃণার ভাব জাগে। তাদের কাজ দেওয়া হয় শহরের সব থেকে নোংরা ড্রেন সাফ করার।

পেনাং, মৌলমিন বা টেনাসেরিমে বন্দীদের পাঠানোর ব্যবস্থা সাময়িক। আন্দামানে আবার উপনিবেশ স্থাপন করার বিষয় নিয়ে

ভারত, বাংলা, বর্ম্মা সরকার ও কোম্পানীর বোর্ডের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছিল। এবার তা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাস্তব রূপ নিল। ২০শে নবেম্বর, ১৮৫৭ সনে আন্দামান দ্বীপমালা পর্য্যবেক্ষণ করে সেখানে কোথায় কি ভাবে উপনিবেশ গড়া যায় এ স্থির করার জন্যে সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেল একটি কমিটি গঠন করলেন। কমিটির সভাপতি বেঙ্গল আর্মির সার্জ্জন এফ. জি. মোয়াট এবং সভ্য বেঙ্গল আর্মির সার্জ্জন জি. আর. প্লেফেয়ার ও নৌ-বহরের লেঃ জে. এ. হীথকট। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জানুয়ারী ১৮৫৮ সালে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল সিদ্ধান্ত করলেন যে লোক-চক্ষুর অন্তরালে পরিবার পরিজন থেকে বহু দূরে বহির্জ্জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য আন্দামানের বিস্তৃত দ্বীপমালা আর তার সুগভীর বনানীর মধ্যেই বন্দী-শিবির স্থাপন করা হবে। ডাঃ মোয়াটের নেতৃত্বে নিযুক্ত কমিটি দক্ষিণ আন্দামানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলকে (যেখানে লেঃ ব্লেয়ার প্রায় সত্তর বছর আগে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনা করে-ছিলেন) বন্দী-শিবির স্থাপনার উপযুক্ত স্থান বলে স্থির করেন।

মধ্য আন্দামানে জনমানবশূন্য সমুদ্রোপকূল

লেঃ ব্লেয়ারের নাম অনুযায়ী এর নাম হ'ল পোর্ট ব্লেয়ার। ১৮৫৮ সনে ২২শে জানুয়ারী কাপ্তেন মনি পোর্ট ব্লেয়ারে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রিটিশ সার্ব্বভৌমত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। আগেও আন্দামানের উপর ব্রিটিশ শাসন কায়েম করার জন্য কোনও যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয় নি বা অন্য কোনও ইউ-রোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষারও প্রয়োজন হয় নি।

১৮৫৮ সনের ১০ই মার্চ্চ আন্দামান বন্দী উপনিবেশের প্রথম সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ডাঃ জে. পি. ওয়াকার ২০০ জন কয়েদী, এক জন ভারতীয় ওভারসিয়র, দুই জন ভারতীয় ডাক্তার এবং একজন ইউ-রোপীয় অফিসারের অধীনে পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় নেভাল ব্রিগেডের গার্ড নিয়ে আন্দামানে বন্দী-শিবির স্থাপনা করলেন। ড. ওয়াকারের শাসন ব্যবস্থার সময় ছিল ১৮৫৮ মার্চ্চ থেকে ১৮৫৯ ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত। বন্দীরা সবাই বিদ্রোহী সিপাহী, তাঁর শাসনব্যবস্থার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে সরকারী ঐতিহাসিক এম. ভি. পোর্টম্যান বলেছেন: "ডাঃ ওয়াকার কয়েদীদের শাসনের জন্য কঠোরতা অবলম্বন প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। সম্ভবতঃ কঠোরতার কিছু আধিক্য হয়েছিল।" ডাঃ ওয়াকারের সাফাই গাইতে গিয়ে এই ভাষ্যকার বলেছেন যে, তখনকার দিনে বিদ্রোহীদের কার্য্যকলাপের
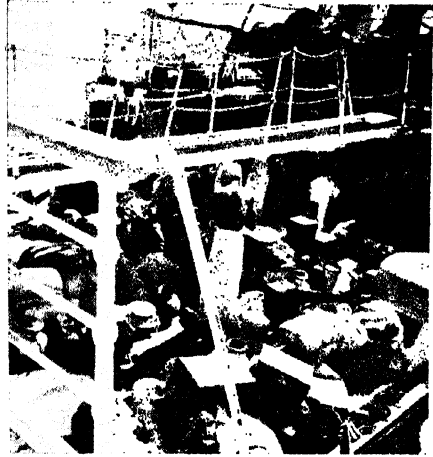
'মহারাজা' জাহাজে বাঙালী বাস্তুহারাদের 'কালাপানি' অতিক্রম

সঙ্গে যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারীরা পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্করুণ কঠোরতা অবলম্বন করাই ছিল স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্য যে, ওয়াকার সাহেবের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত কোনও বন্দী কিছু লিখে রেখে যান নি।

বন্দীর দল এসে আগেকার সেই চ্যাথাম দ্বীপে জঙ্গল পরিষ্কার করে ঘর বানাতে আরম্ভ করল। কয়েকদিন পরে আর একদল কয়েদীকে পোর্টব্লেয়ারের মুখে আশী একর আয়তনের রস দ্বীপে কাজ করতে পাঠান হ'ল। রস থেকে চ্যাথাম দ্বীপের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় আড়াই মাইল। রস দ্বীপকে অল্পপরিসর খাড়ি প্রধান ভূখণ্ড—দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপ থেকে বিভক্ত করেছে। তখন রস দ্বীপ আন্দা-মানের অন্য জনবিরল দ্বীপের মত গভীর বনে পূর্ণ ছিল আর তার মধ্যে আন্দামানী আদিবাসীরা বসবাস করত। আগেকার উপনিবেশ থেকে এবারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংখ্যাতেও বহিরাগতেরা অনেক বেশী এবং তারা গাছপালা, ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করল। আন্দামানের অধিবাসীদের ক্রমশঃ পিছু হটতে হ'ল। তবে অনগ্রসর, হিংস্র বৈরীভাবাপন্ন আন্দামানীরা নিজ বাসভূমে পরবাসী হবার ব্যবস্থাকে বিনা যুদ্ধে স্বীকার করে নিতে পারল না। ফলে, আরম্ভ হ'ল কর্ম্মরত বন্দীদের উপর আক্রমণ। এ ছাড়া বিদ্রোহী সিপাহী আন্দামানে কারাগৃহ তৈরী করে তাতে সমস্ত জীবন নির্যাতিত হওয়ার থেকে আন্দামানের অজ্ঞাত, অপরিচিত বনে জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া শ্রেয় বলে মনে করল।

প্রথম কয়েদী দল আসার চার দিন পরই—১৪ই মার্চ (১৮৫৮) দানাপুরে বিদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন নির্বাসিত বন্দী নারায়ণ চ্যাথাম দ্বীপ থেকে আধ মাইল বিস্তৃত খাড়ি পার হয়ে দক্ষিণ আন্দামানের প্রধান ভূখণ্ডে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ধরা পড়ে তার ফাঁসী হয়। আন্দামানের মাটিতে নারায়ণই প্রথম শহীদ। ২৩শে মার্চ রস দ্বীপ থেকে আবার এগার জন কয়েদী পালায়। পলাতক কয়েদী দক্ষিণ আন্দামানের গহন বনে স্বাধীনতা পেল না। চারদিকে গভীর জঙ্গল, জোঁক আর পোকামাকড়ে ভরা। খাওয়ার

আন্দামানে বাঙালী কৃষকের ঘরে নবান্ন

সংস্থান স্বকীয় চেষ্টায় করা একরকম অসম্ভব, অনেক জায়গায় পানীয় জলও পাওয়া যায় না, তার পর আন্দামানী আকাবী, জারোয়া প্রভৃতি হিংস্র জাতির আক্রমণ। পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে, মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। উপনিবেশ স্থাপনার তিন মাসের মধ্যে সরকারী খতিয়ানের হিসাব :

মোট আমদানী

কয়েদী—৭৭৩

হাসপাতালে মৃত্যু—৬৪

পালিয়েছে কিন্তু ধরা পড়ে নি

(সম্ভবতঃ অনাহারে বা বন্য

জাতির আক্রমণে নিহত)—১৪০

আত্মহত্যা— ১

পালানোর চেষ্টায় মৃত্যুদণ্ড—৮৭

মোট—২৯২

অবশিষ্ট ৪৮১ কয়েদীর মধ্যে ৬০ জন হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছিল।

কয়েদীদের এই বিরাট মৃত্যুহারে কিন্তু সরকার মোটেই বিচলিত হন নি। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব পোর্ট ব্লেয়ারের সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে কয়েদীদের দলবদ্ধ আক্রমণ সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকতে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন—গার্ডদের বন্দুকে যেন সব সময় টোটা ভরা থাকে এবং প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ যেন আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করা হয়। জবরদস্ত ডাঃ ওয়াকার নিয়ম জারি করলেন যে, কয়েদীদের জোড়ায় জোড়ায় হাতকড়িবদ্ধ অবস্থায় কাজ—ওঠা-বসা করতে হবে। আর 'বিপজ্জনক' বলে যাদের মনে করা হ'ত, তাদের ডাণ্ডাবেড়ী-পরিহিত অবস্থায় দিবারাত্রি রাখা হ'ত। এমনকি কাজের সময় নিছক বসিয়ে রাখার জন্য তাদেরও সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাবার নির্দ্দেশ জারি করা হয়েছিল। এই অবস্থায় নিরস্ত্র, অসহায় বন্দীদের উপর আন্দামানীদের আক্রমণ পুরোমাত্রায় চলছিল। চ্যাথামের বিপরীতদিকে দক্ষিণ আন্দামানের ধড়ু অঞ্চলে ৬ই এপ্রিল ১৮৫৯ সনে আড়াইশ' বন্দীর এক দলের উপর আন্দামানীদের আক্রমণে চার জন বন্দী নিহত হয়। বাকি সবাই সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচাল। আন্দামানী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কয়েদীদের হাতে অস্ত্র কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এই বন্দীর দল যে আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় সুনিপুণ সৈনিক। আবার বহুসংখ্যক কয়েদীর রক্ষকরূপে সামান্য কয়েকজন ইউরোপীয় প্রহরীকেও কাজের জায়গায় পাঠানো বিপজ্জনক। সুতরাং সরকার নির্দ্দেশ দিলেন যে কয়েদীদের নিরস্ত্র, অরক্ষিত অবস্থাতেই কাজ করতে হবে। ১৪ই এপ্রিল (১৮৫৮) প্রায় দেড় হাজার আন্দামানী দুই দল বন্দীর উপর আক্রমণ করে। এবারেও তিন জন বন্দী নিহত আর ছয় জন গুরুতর ভাবে আহত হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বার জন কয়েদী চলৎ-শক্তিবিহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। আন্দামানীরা তাদের বন্ধনমুক্ত করে এবং কিছুক্ষণ তাদের নিয়ে নৃত্য করে। যাবার সময় বন্দীদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এবার অন্যান্য বন্দীরা বলে যে, আন্দামানীরা সাধারণ কয়েদীদের উপর একেবারেই আক্রমণ করেনি। বন্দীদশার নিদর্শন—পায়ে বেড়ী, গলায় তকমা বা অন্য চিহ্ন পেলেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বন্দীদের উপরওয়ালা গ্যাঙ্গসম্যানদের (যাদের মাথায় লাল পাগড়ী আর বন্দীদশার কোন চিহ্নই নেই) উপর আদিবাসীরা পুরোদমে হামলা করেছে। এই প্রসঙ্গে সরকারী কর্ম্মচারী ও ঐতিহাসিক এম.ভি. পোর্টম্যানকে আন্দামানীরা পরে বলেছিল যে, কয়েদীদের বিরুদ্ধে ওদের আক্রমণের কারণ যে তারা জঙ্গল কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে। বনের শূয়োর, ফল, মূল, কন্দ—তাদের প্রধান আহার্য্যের অভাব হচ্ছে। কিন্তু তারা এও দেখেছে যে, কয়েদীরা স্বেচ্ছায় কোনও কাজ করতে চায় না। ওভারসিয়র, গ্যাঙ্গসম্যান প্রভৃতি উপরওয়ালা তাদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেয়। এই জন্যই আন্দামানীদের আক্রোশ উপরওয়ালাদের উপর। কোনও পলাতক কয়েদী বোধ হয় আন্দামানীদের এই সব কথা বুঝাতে পেরেছিল। ১৮৫৯ সনের শেষাশেষি পলাতক কয়েদীরা আন্দামানীদের কাছে আশ্রয় পেয়েছে এবং নৃশংস

বন্ধ জারোয়া, আকাবী প্রভৃতি আদিবাসীদের কাছ থেকে আতিথেয়-তারও পরিচয় পেয়েছে।

১৮৫৯ সনে ১৪ই মে "এবারডীন যুদ্ধ" বলে এক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ তদানীন্তন ও পরবর্তী যুগের প্রবন্ধে, পুস্তকে পাওয়া যায়। এবারডীন পোর্ট ব্লেয়ার শহরের কেন্দ্রস্থল এবং বর্তমানে সেখানে এক বাজার গড়ে উঠেছে। তখন অবশ্য এ অঞ্চলে গভীর বনজঙ্গল কাটা সবেমাত্র সুরু হয়েছে। সংক্ষেপে এবারডীন যুদ্ধের ঘটনা—বহুসংখ্যক আন্দামানীদের এবারডীন ও আটালাণ্টা পয়েন্টের উপর দলবদ্ধ আক্রমণ। কিন্তু এবার, নেটিভ ইনফ্যান্টি র চতুর্দশ রেজি-মেন্টের বিদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন নির্বাসিত সিপাহী দুর্দ্দনাথ তেওয়ারি। আক্রমণের অল্প কিছুদিন আগে এক বছর চব্বিশ দিন পলাতক জীবন আন্দামানীদের সঙ্গে কাটিয়ে এসে কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। সেই গুপ্ত খবর আগে থেকে পাওয়ার ফলে আন্দামানীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়। তেওয়ারীর দীর্ঘ আদিবাসী প্রবাস জীবনের রোমাঞ্চকর বর্ণনা থেকে আন্দামানীদের সম্পর্কে অনেককিছু জানা যায়, তবে তার মধ্যে যথেষ্ট কল্পনার কারুকার্য্যও আছে।

ডক্টর ওয়াকারের পর ক্যাপ্টেন হটন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং ১৮৬২ সন পর্য্যন্ত তিনি আন্দামান বন্দী উপনিবেশের সর্ব্বময় কর্ত্তার পদাধিকার করে থাকেন। আগেই বলেছি, তাঁর সময়ে আন্দামানীদের বৈরীভাব অনেকখানি কমে আসে এবং বন্দীদের করণীয় কাজের পরিমাণও বাড়তে আরম্ভ করে। রস, চ্যাথাম এবং পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরের আরও ভেতরে ভাইপার দ্বীপ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করে জেল, আপিস, বাসভবন প্রভৃতি তৈরী হ'ল। দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপের প্রধান ভূখণ্ড এবারডীন ও হাড়ু অঞ্চলও মানুষের বাসোপ-যোগী করে তোলার চেষ্টা চলে। সিপাহী বিদ্রোহের বন্দীদের সঙ্গে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত গুরুতর অপরাধীদেরও আন্দামানে পাঠাতে আরম্ভ হ'ল। ভারত সরকারের নিকট ক্যাপ্টেন হটনের লিখিত চিঠিপত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, আন্দামানীরা ক্যানোতে করে অপ্রশস্ত সমুদ্রের খাড়ি পার হয়ে ভাইপার, চ্যাথাম এবং রস দ্বীপেও আসাযাওয়া আরম্ভ করেছে এবং ধীরে ধীরে আদিম নিবাসীদের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠছে। আন্দা-মানীদের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে দ্বীপের বন্দীনিবাসে তাদের নিরস্ত্র অবস্থায় আসতে হবে এবং যাবার সময় কিছু খাবার, লোহার যন্ত্রপাতি পুরস্কার হিসাবে তারা নিয়ে যাবে। ১৮৬১ সনের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে আন্দামানী আক্রমণকারী দলের কয়েকজনকে বন্দী করে রাখা হয়। তাদের মধ্যে তিন জনকে সভ্য জগতের পরিচয় দেবার জন্ত বর্ম্মায় পাঠানো হয়। বর্ম্মা প্রবাসকালে একজন আন্দামানী মৌলমিনে মারা যায়। পরবর্ত্তী যুগে অনগ্রসর আদিবাসীদের সভ্য করার জন্ত বিরাট তোড়জোড় চলে। তার অবশ্যম্ভাবী মর্ম্মান্তিক পরিণতি আজ অত্যন্ত স্পষ্ট। গ্রেট আন্দা-মানীর আদিবাসী গোষ্ঠী আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

১৮৬২ সনে কর্ণেল টিটলার ক্যাপ্টেন হটনের পদ গ্রহণ করেন এবং টিটলারের সময়েই আন্দামানী আদিবাসীকে সুসভ্য করার জন্ত আন্দা-মান হোম ও অর্ফানেজের প্রতিষ্ঠা করা হয়। আন্দামানের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সভ্য মানুষের অদূরদর্শী নীতি কি বিরাট বিপর্য্যয় সৃষ্টি করেছে তা বুঝতে গেলে এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা জেনে রাখা দরকার। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপ ও

মধ্য আন্দামানের রঙ্গত উপনিবেশের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার

আশেপাশের দ্বীপমালায় দশটি শাখায় বিভক্ত গ্রেট আন্দামানীয় জাতির লোক বসবাস করত। তাদের গণনা ঠিক ভাবে করার প্রথম চেষ্টা হয় ১৯০১ সনে। ১৮৭২ সনে ভারতের প্রথম আদমসুমারীতে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জনগণনা একেবারেই হয় নি। ১৮৮১ ও ১৮৯১ সনে পোর্ট ব্লেয়ার বন্দী উপনিবেশেরই খালি আদমসুমারী হয়, আদিবাসী সংখ্যা নিরূপণের কোনও চেষ্টা করা হয় নি। সুতরাং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও বিচ্ছিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্ত্তী ইতিহাসকারগণ ১৮৫৭ সনে গ্রেট আন্দা-মানীদের মোট সংখ্যা নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন।

এম. ভি. পোর্টম্যানের অনুমান	—৮,০০০
১৯০১ সনের আদম সুমারীর অধিকর্ত্তার অনুমান	—৪,৮০০
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান-গবেষক মিঃ ব্রাউনের মত	—৫,৬৫০

১৯০১ সনের আদমসুমারীতে গ্রেট আন্দামানিজদের সংখ্যা :

বয়স্ক		শিশু		মোট
পুঃ	স্ত্রী	পুঃ	স্ত্রী	
২৬১	২৩৪	৭৪	৫৬	৬২৫

১৯৫১ সনের আদমসুমারীতে গ্রেট আন্দামানীজদের সংখ্যা ত্রিশেরও কম।

এরা ছাড়া, দক্ষিণ আন্দামানের গভীর জঙ্গলে ও জনবিরল পশ্চিম তটে এবং দক্ষিণ আন্দামানের সংলগ্ন রাটল্যাণ্ড দ্বীপে জারোয়া আন্দামান দ্বীপমালার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নর্থ সেন্টিনেল দ্বীপের আদিবাসী ও আন্দামান দ্বীপসমষ্টির সর্ব্বদক্ষিণ দ্বীপ লিটল আন্দা-

মানের ওঙ্গি আদিবাসীরাও আছে। এরা সবাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষী পর্য্যন্ত বৈরীভাবাপন্ন ছিল এবং ওঙ্গি ছাড়া আর দুই আদিবাসী গোষ্ঠী আজও অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন। সুতরাং এদের সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। ওঙ্গিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কোনও দিনই স্থাপিত হয় নি। চল্লিশ মাইলের সমুদ্রের ব্যবধান ও গ্রেট আন্দামানীজ জাতির সঙ্গে সম্পর্কের অভাব থাকায় এবং বন্দী-শিবির বা সরকারী অন্য কোনও বিভাগের কাজ লিটল আন্দামানে না হওয়ায় সভ্য মানুষের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে পেরেছিল এরা।

মধ্য আন্দামানে শরণার্থীদের বসতির জন্য জঙ্গল পরিষ্কার

গ্রেট আন্দামানীজদের অসহযোগিতা ও বৈরীভাব কিছু কমলেই পোর্টব্লেয়ারের চ্যাপলেন রেভাঃ এফ· করবীন এদের সুসভ্য করার জন্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল টিটলারের পৃষ্ঠপোষকতায় উপনিবেশের শাসনকেন্দ্র রস দ্বীপে আন্দামান হোমের প্রবর্তন করেন। আন্দামানী বন্দী স্নোবল এবং জাম্বো ও মাদাম কুপার বলে অভিহিত একটি আন্দামানী স্ত্রীলোক ও একটি বালককে নিয়ে 'হোম' খোলা হয়। 'হোম'-জীবন বন্দীদশারই নামান্তর। কিছুদিনের মধ্যেই আরও কিছু আন্দামানীকে এখানে বুঝিয়ে, লোভ দেখিয়ে বা সবলে সংগ্রহ করে আনা হ'ল। ইংরেজী শিক্ষা, আন্দামান বন্দী উপনিবেশের চলতি হিন্দুস্থানী (উর্দু ঘেঁষা) ভাষার তালিম এবং কায়িক পরিশ্রম করে মাঝি, মজুর, কিষাণ হিসাবে জীবিকা অর্জ্জনের সদুপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও অসভ্য আন্দামানীরা কিছুই শিখল না। নানা রং-বেরঙের জামা কাপড় সুযোগ পেলেই ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ আরম্ভ করল। পালাবার সুযোগ পেলে তখনই তার সদ্ব্যবহার করত।

১৮৬৩ সনের শেষাশেষি কয়েদীরা আবার বনে-জঙ্গলে পালাতে আরম্ভ করল। আন্দামানীরা আগেকার মত হিংস্র আচরণ করবে না—এই ধারণা সম্ভবতঃ কয়েদীদের মনে নূতন প্রেরণা জুগিয়ে ছিল। কর্ত্তৃপক্ষ তখন আন্দামানী হোম ও বিভিন্ন এলাকার বন্ধু-ভাবাপন্ন আন্দামানী মোড়লদের ফেরারী কয়েদী ধরার কাজে নিযুক্ত করলেন। ফলে আবার কয়েদী-আন্দামানী সংঘর্ষ আরম্ভ হ'ল এবং কয়েকজন আন্দামানী নিহতও হয়।

রেভাঃ করবিন ও পরবর্ত্তী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল ফোর্ডের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় করবিন পদত্যাগ করেন এবং তাঁর স্থলে জে. এম. হমফ্রি নিযুক্ত হন। এই সময়কার বিবরণে জানিতে পারা যায় যে, হোমে মাসিক গড়ে দুইটি শিশুর জন্ম হচ্ছে, কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য সত্ত্বেও কোনও শিশুই এক সপ্তাহের বেশি বাঁচছে না। আন্দামান হোমও এ সময় রস থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল। ভাইপার দ্বীপে, পোর্টমোটে এবং আরও কয়েক জায়গায় হোমের সদর বা শাখা দপ্তর স্থাপিত হয়। কিন্তু অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হ'ল না। এই সময় আন্দামানীদের সঙ্গে নেভাল গার্ডদের একটা সংঘর্ষ হয়। নর্থ পয়েণ্টের নেভাল গার্ডেরা আন্দা-মানীদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে গিয়েছিল। ত্রিশ জন স্ত্রীপুরুষ আদিবাসী ব্রিগেডের লোকজনকে ঘিরে বেশ শান্ত ভাবেই কথাবার্ত্তা বলছিল। এমন সময় একান্ত অতর্কিতে গার্ড প্র্যাটকে আন্দামানীরা তীর মেরে হত্যা করে। এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় স্তম্ভিত নেভাল গার্ডদল আন্দামানীদের উপর দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গুলি চালায়। এ ঘটনায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং আন্দামানীরাও প্রতিশোধমূলক হামলা করে। কয়েক মাস পরে আসল ব্যাপার জানতে পারা যায়—প্র্যাট আন্দামানী স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করেছিল বলেই আন্দামানীরা উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করে। নেভাল গার্ডদের আরও নানারকম অসঙ্গত আচরণের সংবাদ পাওয়া যায়।

১৮৭০-৭১ সনে আন্দামান কর্ত্তৃপক্ষ আন্দামানীদের সুসভ্য করা এবং আদিবাসীদের ঘন ঘন বন্দীশিবিরে যাবার কুফল সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারেন। এর পরে আন্দামানীদের কয়েদী ক্যাম্পে আগমন একেবারে নিষিদ্ধ না হলেও, বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আন্দামানী হোম জঙ্গলে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্ণেল ফোর্ডের সময় আন্দামানীদের সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে, ভবিষ্যতে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে হামলা হলে, সমস্ত গোষ্ঠীকে এর জন্য পাইকারী ভাবে দণ্ডদান করা হবে না। মোড়লদের সাহায্য নিয়ে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হবে।

১৮৮৩ সনে জে. এন. হমফ্রির মৃত্যুর পর আন্দামানীদের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এম. ভি. পোর্টম্যানের উপর। সে যুগে যাঁরা আন্দামানে আদিবাসীদের সম্পর্কে এসেছিলেন বা তাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন, পোর্টম্যান নিঃসন্দেহে তাঁদের সবারই থেকে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান।

আন্দামানী হোম পোর্টম্যানের নেতৃত্বে আরও সুগঠিত হয়।

সে সময় পলাতক বন্দী ধরায় পুরস্কার হিসাবে কয়েদী পিছু পাঁচ টাকা করে দেওয়া হ'ত। ১৮৮২ সনের হিসাবে দেখা যায়, সে বছর ২৪ জন কয়েদীকে ধরতে পারায় আন্দামান হোমে ১২০ টাকা জমা হয়। এ ছাড়া সামুদ্রিক শামুক ও কচ্ছপের চামড়া বিক্রী করে ৩১৫৲ টাকা, মধু, পান, ধূপ প্রভৃতি বন-সম্পদ থেকে ৮৩৫৲ টাকা, তীর, ধনুক ইত্যাদি বাবদ ৫২৲ টাকা, বেতের চেয়ার, ঘরের চাল ছাইবার পাতা বাবদ ২০৬৲ টাকা, খুচরা বিক্রী ৪১৫৲ টাকা মোট ২৪৪৫৲ টাকা। এই অর্থ আন্দামান হোম অর্থকোষে জমা হ'ত এবং তাই থেকে ও সরকারী সাহায্যে আন্দামানী হোমের খরচ, ধূমপান সামগ্রী, সামান্য কাপড়চোপড় ও সস্তা বিলাস দ্রব্য দেওয়া হ'ত।

আন্দামানীদের জীবন-ধারায় বিরাট ও ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসা এবং তাদের সুসভ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা বা অপচেষ্টা সবই ব্যর্থ হ'ল। এর উপরে দেখা দিল রকমারি ব্যারাম। স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তির অভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা, সাধারণ চক্ষুরোগ, নিমোনিয়া, হাম প্রভৃতির আক্রমণে বহু আন্দামানী মারা গেল। তারপর ১৮৭৬ সনে সিফিলিস আন্দামানীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। পোর্টব্লেয়ার বন্দী আবাসের এ অভিশাপ অতি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভাইপার দ্বীপের হাসপাতালে কয়েকজন রোগীকে আলাদা করে সরিয়ে রেখে রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ব্যর্থ হ'ল। আন্দামানীদের মৃত্যু সভ্য মানুষের সংস্পর্শ ও তাদের দেশে বন্দী আবাস করার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দেখা দিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক সিফিলিস রোগের সংক্রমণ ভাইপার দ্বীপের ভারতীয় বন্দী ও কয়েদী 'পেটি অফিসার' থেকেই হয়েছিল বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। হয়ত তা ঠিক, কিন্তু আন্দামানী আদিবাসী সমাজের বিলুপ্তির দায়িত্ব কয়েকজন রোগদুষ্ট বন্দীর উপর চাপিয়ে দিয়ে শাসক সমাজ নিজের দোষ স্খালনের যে সহজ পথ বেছে নিয়েছে তা একান্তভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট।

আন্দামানী শিশুদের ইংরেজী শিক্ষা, উর্দু অনুবাদ এবং প্রাথমিক অঙ্কের হিসাব সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য রেভাঃ করবিন একটি অরফানেজ প্রতিষ্ঠা করেন। অরফানেজের অপমৃত্যু অল্প কিছুদিন পরেই হয় এবং সামান্য কয়েকজন বিদ্যার্থীকে আন্দামান হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আন্দামান দ্বীপের জারোয়া, নর্থ সেনটিনেল অধিবাসী এবং লিটল আন্দামানের ওঙ্গি—এরা সবাই বৈরীভাব নিয়ে সভ্য সমাজের সংযোগ সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলছিল। জারোয়াদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ সুরু হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমে। ১৯০২ সনে মিঃ ভজের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র বাহিনী আন্দামানের দুরধিগম্য বনাঞ্চলে প্রেরিত হয় জারোয়া আদিবাসীদের শায়েস্তা করার জন্য। জারোয়ারা তীর মেরে ভজকে মেরে ফেলে এবং সেই প্রতিহিংসার জের আজও অব্যাহত গতিতে চলছে। বর্তমানে ওঙ্গিদের সংখ্যা সম্ভবতঃ শ' পাঁচেক।

আন্দামানীদের ঐ সময় থেকে দেশ দেখানো, বাইরের জগতের বিষয় শেখানো ও সভ্য সমাজকে এই অনগ্রসর আদিবাসী জীবকে দেখানোর জন্য ভারতবর্ষ ও বর্মায় বিভিন্ন জায়গায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বা কোনও উচ্চ রাজকর্মচারীর খেয়ালখুশী মত নিয়ে যাওয়া হ'ত। এই রকম চার জন আন্দামানী পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে মডেল তৈরি করার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তাঁদের সম্পর্কে ই. এইচ. ম্যান লিখেছেন :

. . . While they were quartered for a few weeks in the Zoological Gardens, where they attracted large crowds of Bengalees, who had never before had an opportunity of seeing the people whom they are said to regard as the descendants of the Rakshas(!). Circumstances proved that Port Blair training had not been lost on these representatives of their race, for being asked by their visitors for a souvenir in the shape of a lock of their corckscrew ringlets, they promptly demanded a rupee before giving them the favour and in like manner the pleasure of witnessing an Andaman dance was not to be obtained previous to some *ik-pu-ku* (money) having been bestowed . . . (*The Andaman Islanders—Man. Introduction.*"

অর্থাৎ—তাদের (আন্দামানীদের) কয়েক সপ্তাহের জন্য চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল। সেখানে বহু বাঙালী ওদের দেখতে আসত, কারণ এর আগে বাঙালীদের এ রকম লোক দেখার কোনও সুযোগ ঘটে নি এবং এদের রাক্ষস বংশধর (!) বলে বাঙালীরা মনে করত। ঘটনা দেখে প্রমাণ হ'ল যে আদিবাসীদের পোর্টব্লেয়ার শিক্ষা বিফল হয় নি। দর্শকদের দল স্মারকচিহ্ন হিসাবে আন্দামানীদের গোল আংটির মত ঘুরানো চুলের গোছা চাইলে, তারা তৎক্ষণাৎ দানের বদলে এক টাকা দক্ষিণা চাইত। তেমনি আন্দামানী নাচ দেখার ফরমায়েস হলে ইক্‌-পু-কু (অর্থ) দিতে হ'ত।

এদের নিয়ে চমৎকার বাঁদরের খেলা চলছিল!

আন্দামানী আয়া, চাকরাণী পোর্টব্লেয়ারের ইংরেজ রাজ-কর্মচারীরা অনেকেই রেখেছিলেন এবং কয়েকজন আবার সাগরপারে পেনাং, মৌলমিন, সিঙাপুর প্রভৃতি জায়গায় চাকরি নিয়েছিল।

১৮৬৪ সনে আন্দামানের বন্দী সংখ্যা ছিল ৩,০১৪ এবং কয়েকজন কয়েদীকে কিছুদিন কারাবাসের পর শান্ত আচরণের পুরস্কার হিসাবে টিকেট-অন-লীভ দিয়ে চাষ আবাদ বা অন্য কাজকর্ম করার সুযোগ দেওয়া আরম্ভ হ'ল। দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপের ১৪৯ একর জমিতে ধানচাষও সুরু হ'ল। এর আগে রস, চাথাম ও ভাইপার দ্বীপে তরিতরকারি, ফলমূল লাগানো হয়েছিল। ১৮৬৯ সনে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও দিনেমারদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে

আসে। জলদস্যুদের উৎপাত দমনের জন্য ও আশপাশের দ্বীপে ব্রিটিশ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও আন্দামান মূল বন্দী উপনিবেশের শাখা খোলা হয়। নানকৌড়ি বন্দরের কামোর্ট্রা দ্বীপে এ উপনিবেশ ১৮৬৯-৮৮ সন পর্য্যন্ত থাকে। গড়-পড়তায় এই শাখা বন্দীশিবিরে ৩৫০ জন কয়েদী ছিল।

১৮৬৮ সনে কর্ণেল ম্যান আন্দামানের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েই বন্দীদের বসবাস ও কাজকর্ম্মের অবস্থার উন্নতি হয়। বন্দীশিবিরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর হারও বহু পরিমাণে কমে যায়। মৃত্যুহারের সঠিক পরিমাণ বুঝতে পারা যাবে নীচের হিসেব থেকে :

সন	মৃত্যুহার (শতকরা)
১৮৫৮-৫৯	১৬
১৮৫৯-৬০	৬৩
১৮৬৩-৬৪	২১.৫৫
১৮৬৭-৬৮	১০.১৬
১৮৭২-৭৩	১.৬৪

১৮৭১ সনে জেনারাল ষ্টুয়ার্ট জেনারাল ম্যানের নিকট থেকে কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। তার পরের বছর আন্দামান বন্দী উপনিবেশের অধিকর্ত্তার পদ চীফ কমিশনারের মর্য্যাদা পায়। বর্ম্মার অধীনে আন্দামান কারানিবাস কয়েক বছর রাখার পর আবার এই অঞ্চলকে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগ সরাসরি নিজেদের হাতে নেন।

১৮৭২ সনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়োর আন্দামান আগমন। ৮ই ফেব্রুয়ারী বিকালে পোর্ট-ব্লেয়ার বন্দরের উত্তরতটে দেড় হাজার ফুট উঁচু মাউণ্ট হ্যেরিয়েট থেকে তিনি সূর্য্যাস্ত দেখতে যান। ফেরার পথে হোপটাউন জেটির ধারে তাঁকে পাঠান আততায়ী অতর্কিতে অন্ধকারে আক্রমণ করে এবং সেখানেই লর্ড মেয়োর মৃত্যু হয়। আততায়ীর এ আক্রমণের পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা বা সে ভারতের বিপ্লবী ওয়াহাবি দলভুক্ত ছিল কিনা, অথবা এ হত্যা নিছক ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত দুর্বৃত্তের কর্ম্ম এ নিয়ে বহু বাদবিতণ্ডা চলে। এ রহস্যের সমাধান আজও হয় নি।

গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত বন্দীদের ২০-২৫ বছর কারাবাসের পর কর্ত্তৃপক্ষ তাদের আচরণ সন্তোষজনক হলে মুক্তি দেবার অধিকারী হন। দশ বছর কারাবাসের পর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত পুরুষেরা নারী কয়েদীদের বিবাহ করতে পারত। নিয়ম ছিল যে, বিবাহেচ্ছু পুরুষকে স্বোপার্জ্জনী টিকিটের অধিকারী হতে হবে, ১০ বিঘা জমি চাষবাস করতে হবে, একজোড়া বলদ ও সেভিংস ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ টাকা জমা থাকা চাই। শারীরিক সুস্থতার সার্টিফিকেটও প্রয়োজন। অন্যদিকে পাঁচ বছর কারাবাস করেছে এমন বন্দীনীদের মধ্যে যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক তাদের একত্রিত করা হ'ত। কারাবাসের অধিকারীদের সামনে এই স্বয়ম্বর-সভা বসত। দুই পক্ষের সম্মতি এবং শাসকের অনুমোদনে কয়েদী নূতন করে সংসার আবার শুরু করত। স্ত্রী-সংগ্রহ বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ আনুপাতিক হিসেবে নারীর সংখ্যা বড় কম। তাই বিবাহের পর স্ত্রী-সংরক্ষণ ছিল অতি দুরূহ ব্যাপার।

নীচে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা তালিকা থেকে সমস্যার গুরুত্ব বোঝা যাবে :

	কয়েদী	প্রাপ্তবয়স্ক	মোট
	পুং-স্ত্রী	পুং-স্ত্রী	জনসংখ্যা
১৮৭৪	৬৭৩৩-৮৩৬	৭৬৫৪-৯০৭	৯২৩২
১৮৮১	১০৩২৫-১১২৭	১১৭৬৬-১৩২৯	১৪১৭৮
১৮৯১	১০৮৭৪-৮৬৪	১২৫৩২-১৪৩৯	১৫৫৬০
১৯০১	১১২১৭-৭০০	১৩২৩৫-১৪৭৭	১৬১০৬

পুরুষ ও স্ত্রীর আনুপাতিক হিসাব :

১৮৭৪	পুরুষ	৮.৪৩	স্ত্রী	১
১৯০৬	"	৮.৯৬	"	১

সিপাহী বিদ্রোহীর বন্দীদলের মধ্যে প্রথম কারাধ্যক্ষ ডাঃ ওয়াকারের শাসন, ব্যাপক রোগ, আন্দামানীদের আক্রমণ এবং প্রতিহিংসার শিকার হবার পরও যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁরা আন্দামানের বন্দীনিবাসে নির্ব্বাসিত গুরুতর অপরাধীদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। শুধু তাঁরা নয়, আন্দামানের অন্য বন্দীরাও নিছক বাঁচার তাগিদে ভাষা, ধর্ম্ম, শ্রেণীগত ভেদ-বিভেদ ভুলে বন্দীশিবিরের শত অপমান, অসম্মানের মধ্যে ঘর বাঁধলেন। আন্দামানের এই সমাজ-ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সামাজিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জীবনের জয়যাত্রায় অতীতের কালিমা এখানে দুরপনেয় নয়। অনাগত দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার আশায় এরই মধ্যে ঘরসংসার গড়ে উঠেছিল। এই মিলনের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে এক 'লোকাল বর্ণ' সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। ধর্ম্মান্তরিত না হয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ হ'ত। সাধারণ ব্যবস্থা থাকত যে ছেলে স্বামীর ধর্ম্মমত নেবে আর মেয়ে নেবে স্ত্রীর উপাসনা ধারা। ভাষার ভেদ-বিভেদও বন্দীনিবাসের কটাহে দলিত মথিত হয়ে সার্ব্বজনীন উর্দ্দু-ঘেঁষা হিন্দুস্থানীর রূপ নেয়। মিলিটারি পুলিস ও ভারতীয় ইনফ্যান্ট্রিতে শিখ, পাঞ্জাবী, মুসলমান এবং উত্তরপ্রদেশের সংখ্যাধিক্যের ফলে ভাষা এই রূপ পরিগ্রহ করে।

আন্দামানের সমাজ-জীবনে তখনকার দিনে যে মিলন ও একতারই সুর বাজত তা কখনই নয়। পুরুষ স্ত্রীর সংখ্যা বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া সমস্ত সমাজ-জীবনের উপরেই ছিল। বন্দিনীদের নিয়ে নানারকম ব্যভিচার, খুন, জখম হ'ত আর তার জন্য পরবর্ত্তী যুগে স্ত্রী কয়েদী আন্দামানে পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৮৯৪-৯৫ সনে ১০,৩৬৮ জন কয়েদীদের মধ্যে স্বাবলম্বী টিকিটে ছিল ২,৫৮০ জন। চাষের জমি নিয়ে অনেকে চাষ-আবাদ করছিল। কিন্তু জমির মালিকানা-স্বত্ব কোনও প্রজাকেই দেওয়া হয় নি। সবাই ছিল উঠ-বন্দী প্রজা।

১৮৮৫-৮৬ সনে বর্ম্মা যুদ্ধের বন্দী, ১৮৯১ সনে মণিপুর বিদ্রোহের বন্দী এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের বন্দীরা আন্দামানে

নির্বাসিত হন। মণিপুর রাজবন্দীদের বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। বর্মার বন্দীরা অন্য অপরাধী বর্মী বন্দীদের সঙ্গে মিলে আন্দামানে এক বর্মী সমাজ গঠন করে। বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে '২১-২২ সনের মোপলা বিদ্রোহী ছাড়া আর কেউ আন্দামানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে নি।

১৮৯০ সনে সর্ চার্লস লায়ল এবং সর্ আলফ্রেড লেথব্রিজকে নিয়ে গঠিত এক কমিশন আন্দামান উপনিবেশের আইনকানুন ও জেল-শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে যান। তাঁরা সুপারিশ করেন যে, আন্দামান বন্দীদের আরও কঠোরতর অনুশাসনের মধ্যে রাখা। সুতরাং বড় রকম একটা জেলখানা তৈরি করা আবশ্যক হয়ে পড়ল।

সেই নির্দেশ অনুযায়ী কুখ্যাত সেলুলার জেল তৈরি হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই বিরাট কারাবাসের নির্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয়। সেলুলার জেল তৈরি হবার সময় জনৈক সরকারী ইতিহাসকার লিখেছেন যে, এবারডীনের এই জেল তৈরি হলে দেওয়ালে ঘেরা ছ'কোণা তারার মত দেখাবে। পুণার র‍্যাণ্ড-এমহার্ষ্ট হত্যা মামলা ও আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা সেলুলার জেলকে ভারতবর্ষের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন।

ভারত থেকে সদ্য-আগত ডাণ্ডাবেড়ী পরিহিত নূতন কয়েদী-দলকে সেলুলার জেল দেখাবার দায়িত্ব নিলেন জেলার ব্যারি। টিলার উপরে লাল রঙের বিরাট কারাপ্রাচীর দেখিয়ে তিনি বলতেন —দেখ, ঐখানে আমরা সিংহকে পোষ মানাই। আর এখানে ভগবানও আমি!

বীর বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, সেলুলার জেলে যাবার কয়েকদিন পরে সিপাহী যুদ্ধের এক বৃদ্ধ বন্দীর কাছ থেকে ছোট একখানা চিঠি পেয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল: পুরাতন নূতনকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

শ্যামল অতীত

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়
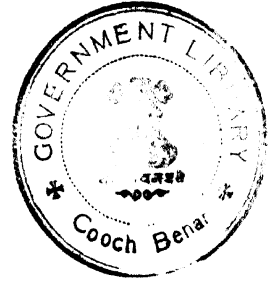
গেছে যৌবন, জরা-জর্জ্জর জীবন-তরু।
চারিদিক যেন সাহারা মরু।
নিষেধ-নিগড় পরেছি কতই, কি দুঃসহ!
শুধু তুমি আছ শ্যাম অতীতের গন্ধবহ।
ভোজ্য প্রচুর, ভোজনের নেই সে অধিকার,
দেহে মেদ বাড়ে; চেপেছে আধি ও ব্যাধির ভার।
কোনমতে চলে ধূসর জীবন গড্ডলিকা।
হয় প্রতিদিন সফল বিফল ইতিহ লিখা।
প্রাত্যহিকের ফাঁকে তবু মন যায় যে উড়ে।
যায় চলে যায় অতীতের সেই স্বপন-পুরে।
যেথা তুমি ছিলে মানসী রমা
প্রেমিকের চোখে শ্যামলী সুতনু তিলোত্তমা।
কোন যাদুকর তুলির স্পর্শে ছিল তব এত রূপ।

আজি যদি বলি সে কথা বারেক, তুমি ভাব বিদ্রূপ।
উজ্জয়িনীর অগুরু অঙ্গে মাখি
সে দিনের তুমি দাঁড়ায়েছ পাশে ভরা যৌবন সাকী।
মুগ্ধ লুব্ধ হৃদয়েতে শুধু কানে বলিয়াছি প্রিয়া।
অনঙ্গ বুঝি করিত রঙ্গ অপাঙ্গে লুকাইয়া।
সতেরো শীতের তুহিনলগ্ন তনুতীরে তব বাণী,
খুঁজিয়া পেয়েছি গত জনমের লুপ্ত প্রেমের বাণী।
কত আকুলতা দিয়া
চপল করেছ রাগে অনুরাগে চল চঞ্চল হিয়া।
ঝরাপাতা দিন হয়েছে বিলীন জানি।
মনের আঁচলে ঝরা ফুলগুলি আজো করে কানাকানি।
সে দিনের ছবি মনে পড়ে সবি নিভৃতে যখন থাকি।
বাস্তব ব্যথা ইতি করে তাই প্রীতির নবনী মাখি।

মন ও চৈতন্য

শ্রীকালিদাস দত্ত

জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মধ্যে দুইপ্রকার বিভিন্ন মতবাদ আছে। একমতে চৈতন্যই জগতের মূল এবং উহা তদুৎপন্ন বিভূতি, মননশক্তির মাধ্যমে অসংখ্য বস্তুর আকারে জগৎরূপে রূপায়িত। অপর মতে জগতের একমাত্র উপাদান বস্তু এবং তদ্দ্বারাই বস্তু স্বভাবে সমগ্র জগত গঠিত ও পরিচালিত।

ভারতবর্ষে শেষোক্ত মতবাদের প্রবর্ত্তক ছিলেন বৃহস্পতি ও চার্ব্বাক। তাঁহারা বৈদিক যুগে আবির্ভূত হন এবং উক্ত মতবাদ এই ভাবে প্রকাশ করেন :

"স্বভাব এব জগতঃ কারণম্, স্বভাবাদেব জগদ্‌বৈচিত্র্যম্ উৎপদ্যতে,
স্বভাবতো বিলয়ং যাতি।"

অর্থাৎ, স্বভাবই জগতের কারণ, স্বভাবেই জগদ্‌বৈচিত্র্য উৎপাদিত হয় ও স্বভাবেই লয় পায়।

"অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতম্ সমস্পর্শস্তথানিলঃ
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ ব্যবস্থিতিঃ॥"

অর্থাৎ, অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, বায়ুর সমস্পর্শতা কাহার দ্বারা সৃষ্ট? স্বভাবের দ্বারা।

তাঁহাদের মতে উক্ত চৈতন্যও বস্তুসংযোগোৎপন্ন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ। যথা :

"অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্যনলানিলাঃ
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥"(১)

অর্থাৎ, ক্ষিতি, তপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি বস্তুর সংযোগে, কিণ্বপদার্থের সংযোগে উদ্ভূত মাদকতা শক্তির ন্যায় চৈতন্য উৎপন্ন হয়।

প্রাচীনকালে এইরূপে বস্তুবাদ ভারতবর্ষে প্রচারিত হইবার বহুদিন পরে উহা গ্রীসদেশে প্রচারিত হয়। যে সকল গ্রীক দার্শনিক উহা প্রচার করেন তন্মধ্যে ডিমোক্রিটাস ও এপিকুরাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বৃহস্পতি ও চার্ব্বাক কথিত ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি বস্তুর পরিবর্ত্তে, তৎকালে আবিষ্কৃত উহাদের সূক্ষ্মতম অংশ পরমাণুই বিশ্বের মূল উপাদান এবং উহার সংযোগে বিশ্বের সৃষ্টি এইরূপ ঘোষণা করেন।

(১) সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ : মাধবাচার্য্য

বর্ত্তমান যুগেও অনেক দার্শনিক ঐ প্রকার মতবাদ বহুবিধ উপায়ে প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কার্ল মার্ক্স ও এঞ্জেলস বিখ্যাত। তাঁহাদেরও প্রধান কথা :

"Matter is not the product of mind but mind is the highest product of matter."

ইদানীং তাঁহাদের মতবাদ নানা কারণে প্রসারিত হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং তদনুযায়ী অনেকের বস্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শাশ্বত এই ধারণা জন্মিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ফলে বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুর উক্ত প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের মতবাদ পূর্ব্বোল্লিখিত অধ্যাত্মবাদীদের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। কারণ দেখা যাইতেছে যে পরমাণুর উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে উহারা দেশকালের সীমায় আবদ্ধ নহে এরূপ একপ্রকার তরঙ্গে পর্য্যবসিত হয়। গাণিতিক সূত্রের মানস প্রত্যক্ষ ব্যতীত ঐ সকল তরঙ্গের অন্য কোন ধারণা মানুষের হইতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ জনৈক পণ্ডিতের ভাষায় উহাদের পরিচয় এইরূপ :

"They are, it appears, completely immaterial waves. They are as immaterial as the waves of depression, loyalty, suicide and so on that sweep over a country."[1]

তজ্জন্য বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সমস্ত অবাস্তব তরঙ্গকে মননশক্তি ভিন্ন অন্য কিছু বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না। জে. বি. বার্কের এই মন্তব্যটি উহার একটি নিদর্শন :

"We can reduce matter to motion and what do we know of motion, save that it is a complex perception or mode of thought . . . . For of motion we know nothing except that it represents a continuous change of certain perceptions in their relations with those of space and time. . . . . Hence one form of thought—our mind—runs parallel to and is concomitant with another form of thought—permanent—though we cannot say, which we call matter, electricity or either. And it resolves itself into mind perceiving mind."[2]

(1) Limitations of Science. Page 68. By J. W. N. Sullivan.

(2) Origin of life. Page 337. By J. B. Burke

এই সকল তথ্য হইতে বিভিন্ন বস্তু উক্ত রূপ মননশক্তিরই নানাপ্রকার বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

কোন কোন বস্তুবাদী পণ্ডিত উহা অস্বীকার করিয়া ঐ প্রকার তরঙ্গকে সর্ব্বব্যাপক বস্তু (all pervasive substance) বলিয়াছেন*। কিন্তু বস্তু যে মোটেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শাশ্বত হইতে পারে না তাহা আইনষ্টাইনের Theory of Relativity দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল উহা এইরূপে সংক্ষেপে বলিয়াছেন :

"The Theory of Relativity by merging time into space time has damaged the traditional notion of substance more than all arguments of philosophers. Matter for commonsense is something which persists in time and moves in space. But for modern Relativity Physics, this view is no longer tenable. A piece of matter has become, not a persisting thing with varying states, but a series of inter-related events. The old solidity is gone, and with it the characteristic that, to the materialist, made matter more real than fleeting thoughts. Nothing is permanent, nothing endures; the prejudice that the real is the persistent must be abandoned."[1]

জেমস জীন্‌স্ এ বিষয়ে বলিয়াছেন :

"Even the physical theory of relativity has now shown that electric and magnetic forces are not real at all—do not even pass the test of objectivity."[2]

এই সকল কারণে বৈজ্ঞানিকগণের নিকটে বাস্তব জগত ছায়ার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহারা বস্তুর স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শাশ্বত সত্তার ধারণা ভ্রান্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। এডিংটনের ভাষায় উহা এই :

"The external world of physics has thus become a world of shadows. In removing our deed we have seen that the substance is one of the greatest of our illusions."[3]

তজ্জন্য তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন বাস্তব জগত গঠনের উপাদান মননশক্তি। যথা :

"The stuff of the world is mindstuff."[4]

* Materialism. Page 215. By M. N. Roy.

(1) Introduction. *History of Materialism*. By Dange.

(2) Physics and Philosophy. page 200. By James Jeans.

(3) Introduction. The Nature of the Physical World. By A. S. Eddington.

(4) The Nature of the Physical World. page 276 (1929). By A. S. Eddington.

জীন্‌সের উক্তিতে উহা আরও বিশদভাবে এইরূপে উল্লিখিত আছে :

"The stream of knowledge is heading towards a non-mechanical reality—the universe begins to look more like a great thought than like a great machine. We are beginning to suspect that we ought rather to hail it (mind) as the creator and governor of the realm of matter—not of course our individual minds but the minds in which the atoms, out of which our individual minds have grown exist as thoughts."[1]

বস্তুবাদের পূর্ব্বোক্ত রূপ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেকের ইহাও ধারণা যে জীবদেহে মনের যে বিকাশ দেখা যায় তাহাও বস্তু-সংযোগে গঠিত মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া (Reflex action) মাত্র এবং মস্তিষ্কের বিনাশে উহার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণসমূহের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, মননশক্তিই বস্তুর মূল এবং উহাই বস্তুরূপে রূপায়িত। সুতরাং বস্তুসংযোগে মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। উহা ব্যতীত মস্তিষ্ক নষ্ট হইলেও জীবদেহে যতক্ষণ চৈতন্য থাকে ততক্ষণ উহাতে যে মনের ক্রিয়া লোপ পায় না তাহাও জানা গিয়াছে কতকগুলি সজীব প্রাণীর মস্তিষ্ক সরাইয়া তাহাদের আচরণ পরীক্ষার দ্বারা। ঐ সকল প্রাণী মস্তিষ্কবিহীন হইয়া যে কয়দিন জীবিত ছিল সেই সময় তাহাদের চৈতন্যের সহিত মনের ক্রিয়াও পরোক্ষে বিদ্যমান ছিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাভলোভের কুকুরের উপর ঐ প্রকার পরীক্ষার বিবরণ এইরূপ :

"Pavlov's experiments have been conducted on dogs, but they deal with such basic phenomena that it is likely that they throw light on certain fundamental processes in higher animals, including human beings. At the sight and smell of food, saliva will flow into the mouth of a normal dog. If the dog has had it's cerebral hemispheres removed, however, it will not salivate until the food is actually thurst into it's mouth."[2]

নিউইয়র্কের রুজভেল্ট হাসপাতালের অধ্যক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার টমসনের লিখিত একখানি পুস্তক হইতে স্বামী অভেদানন্দও তাঁহার "Life Beyond Death" নামক গ্রন্থে ঐরূপ অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহাতে বলিয়াছেন যে, উক্ত চিকিৎসক সেই পুস্তকে শব-ব্যবচ্ছেদের পর সংগৃহীত বহু প্রমাণ-পত্রী ও উহাদের সংখ্যা

(1) The Mysterious Universe. page 187. By James Jeans.

(2) The Limitations of Science. page 110. By J. W. N. Sullivan.

দিয়া লিখিয়াছেন যে, একব্যক্তির মস্তিষ্কের অর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইলেও তিনি জানিতে পারেন নাই কোন্ সময় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সেই অবস্থায় তাঁহার জীবনের কোন ধারাতেই কোন পরিবর্ত্তন দেখা দেয় নাই এবং তাঁহার চিন্তা ও কার্য্য সমানভাবে অব্যাহত ছিল১।

এই শ্রেণীর প্রমাণ ভিন্ন এ প্রসঙ্গে অতি সূক্ষ্ম জীবাণু প্রভৃতি প্রাণীরও উল্লেখ করা যায় যাহাদের মস্তিষ্ক নাই অথচ মন আছে। উদ্ভিদসমেত উক্তরূপ নিম্নতম প্রাণীর উচ্চতম মেরুদণ্ডবিশিষ্ট সকল প্রাণীর মত, মন ও তদন্তর্গত চৈতন্যের প্রধান লক্ষণ দেখা যায় উহাদের বোধশক্তি ও কার্য্যশক্তি প্রভৃতি হইতে। এ্যামিবা নামক এককোশিক জীবেও ঐ সকল শক্তি কিরূপ আছে তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, মন মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া নহে। মস্তিষ্কবিশিষ্ট জীবের মস্তিষ্কের মাধ্যমে উহা ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে স্থূল জগতের সহিত ঐ প্রকার জীবের চৈতন্যকে সংযুক্ত করে মাত্র। উক্ত চৈতন্যই মনের সর্ব্বপ্রকার বোধ ও কার্য্যশক্তি প্রভৃতির মূল। উহা যে কেবল জীবে বর্ত্তমান তাহা নহে, উহা জড়েও আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাহা তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরে আনিয়াছেন। তিনি সেই যন্ত্রের দ্বারা জড়কে মাদক দ্রব্য, ক্লোরোফরম প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ দিয়া তজ্জনিত সাড়া লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। যাহার ফলে জানা গিয়াছে যে এক খণ্ড টিন, একটি গাছের ডগা এবং একটি ব্যাঙের পেশী বাহিরের উত্তেজনায় একই ভাবে সাড়া দেয়২।

উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রতিপন্ন করে যে মানুষ ও অন্যান্য জীবের অন্তরের মত নিখিল বিশ্বে সর্ব্বপ্রকার বস্তুতে শুধু যে এক মননশক্তি (Universal mind) আছে তাহা নহে। তন্মধ্যে এক সর্ব্বগত চৈতন্যও আছে। মানুষ ও অন্যান্য জীবের মন ও চৈতন্য উহারই নানারূপ সংস্কারাচ্ছন্ন infinitesimal অংশ বিশেষ এবং উক্ত নিখিল চৈতন্যই মননশক্তির ভিতর দিয়া জীবগণের বিভিন্ন সংস্কারানুযায়ী নানা বস্তু রূপে বিচিত্র ভাবে রূপায়িত হইয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়।

বৈজ্ঞানিকগণও এখন আর একথা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। উহার প্রমাণ প্লাঙ্কের এই উক্তি :

"I regard matter as derivative of concious-ness. Conciousness I regard as fundamental."[3]

পদার্থ বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে উপরোক্ত রূপে বস্তু স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও শাশ্বত নহে প্রমাণিত হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণের নিকট এখন দেশকালের অতীত বিশ্বের মূল সত্তা অনির্দ্দেশ্য ও সাঙ্কেতিক।

তজ্জন্য এডিংটন বলিয়াছেন :

"Matter and all else that is the physical world have been reduced to a shadowy symbolism."

উক্ত কারণে লিঙ্কন বার্নেটও লিখিয়াছেন :

"A state of existence devoid of association has no meaning . . . . And what the scientist and philosopher called the reality—the colourless, soundness impalpable cosmos which lies like an iceberg beneath the plane of man's perception—is a skeleton structure of symbols."

(1) *Life Beyond Death*. Chapter X. By Swami Abhedananda.

(2) *Response in Living and Non-living*. (1902). By Sir J. C. Bose.

The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus. (1901). Royal Institute.

(3) *Observer*. 25th January. 1931.

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

প্রথম পর্ব

নন্দনতত্ত্বের একটা দুরূহতা-কণ্টকিত প্রশ্নের উত্তর হ'ল মহুয়া কাব্যগ্রন্থ। প্রয়োজনবাদ ও শিল্পবোধ—এ দুটোর সঙ্গতি কোথায়, এদের সমন্বয় সাধন অনায়াসসাধ্য কিনা, এ তত্ত্বের আলোচনায় অনেক ফলহীন প্রয়াস নিঃশেষিত হয়েছে, তবু কোন সুষ্ঠু সমাধান সত্যের মর্য্যাদা পেল না রসিকজন তথা পণ্ডিতজনের কাছে। এই জটিলতাসঙ্কুল সমস্যা কবির বোধের স্বচ্ছ আলোয় সহজ হয়ে উঠল; অনায়াসে কবি দিগ্‌দর্শন করলেন যেখানে তত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতেরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। কবি বললেন যে, প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের বেড়াটা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। প্রয়োজন কখন হঠাৎ অপ্রয়োজনের ঘরে গিয়ে মনোময় রূপ ধরে শিল্প বলে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়, তা পূর্বাহ্নে সঠিক বিচার করে বলা যায় না। জন্ম যার প্রয়োজনের তাগিদে সে হয়ত হঠাৎ অতিরিক্তের রস-রাজত্বে গিয়ে হাজির হয় আর রসিক তাকে শিল্প বলে গ্রহণ করেন। সব সময় প্রয়োজনটা শিল্পানুগ নয় এ ধারণাটা বিভ্রান্তিপ্রসূ। জাতশিল্পীর হাতে প্রয়োজনের রূপান্তর ঘটে। প্রয়োজন চলার বেগে আপনার রূপ পাল্টায়; ফরমাসী কবিতাও সহজ স্বচ্ছন্দ তালে নেচে চলে। সে নাচের তাল, মান, লয় স্বতোৎসারিত নৃত্যছন্দ বলে মনে হয়। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মূল প্রেরণা হয় ত এসেছিল প্রয়োজন থেকে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা সে সাময়িক প্রয়োজনকে অতিক্রম করেছে। মহুয়ার কবিতাগুচ্ছ আন্তর রস-ঐশ্বর্যে সর্বকালের রসিকমনকে অনির্বচনীয় রসধারায় পরিপ্লুত করবে। কবিগুরু মহুয়ার ভূমিকায় বললেন, "মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাসের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎশক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল-ঘোরানো হতেও পারে বাইরের থেকে। কিন্তু সচলতা শুরু হবামাত্রই লেখবার আনন্দকে সারথি হয়ে বসে।" এই ফরমাসের ধাক্কা কাটিয়ে লেখবার আনন্দকে সারথি করে বসিয়ে দেওয়া যে সে শিল্পীর কাজ নয়। যাঁরা জাতশিল্পী তাঁদের পক্ষেই এই প্রয়োজনকে লঙ্ঘন করে শিল্পলোকে উত্তরণ সহজসাধ্য। কবি-কল্পনার আন্তরিক তড়িৎশক্তি সমস্ত সাময়িক প্রয়োজনকে অনায়াসে অতিক্রম করে দুরধিগম্য শিল্পলোকে পৌঁছে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেছেন এবং মহুয়ার কবিতাগুলি সেই প্রতীতি-স্বাক্ষরিত।

নারী ও পুরুষ

এবার মহুয়ার ভিতরে প্রবেশের পালা। মহুয়ার কবিতাগুলি প্রধানতঃ প্রজাপতির উদ্দেশে আর তাঁরই নির্দেশ পালন করেন যে দেবতা তাঁর উদ্দেশে রচিত। নারী, পুরুষ, প্রেম, মিলন, বিরহ—এইগুলি হ'ল এই কাব্যের উপজীব্য। বর্তমান নিবন্ধে আমরা নারী ও পুরুষের রূপ-কল্পনার আলোচনা করব। প্রবন্ধান্তরে প্রেম, মিলন, ও বিরহ-সম্পর্কিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। সন্ন্যাসীর ক্রোধাগ্নি একদিন পঞ্চশরকে ভস্মীভূত করেছিল। তবু তার মৃত্যু হয় নি। অতনুর ভস্মশেষ প্রাণময় হয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল দিগ্বিদিকে—সূক্ষ্ম ভাবময় রূপে সেই অদেহী কামনা প্রত্যেকটি জাতকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাই ত প্রেমের লীলা চলল ভুবনে ভুবনে। তার আদি নেই, সে অনন্ত। সেই অনন্ত প্রেমের কীর্তিকথা হ'ল আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ। কোথাও দেখি সে প্রেমের প্রতিষ্ঠা ঘটল নিছক গীতি-কবিতায়; তার লীলা, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ। সেখানে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আবার আর এক শ্রেণীর কবিতায় দেখি ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল। প্রেমের প্রসাধনকলা নারীকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করে। পুরুষ নারীর মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রকাশ চায়। তাই ত প্রেমে প্রসাধনকলার প্রয়োজনীয়তা। 'যেমন আছো তেমনি এসো আর ক'রো না সাজ'—এ ত পুরুষের কোন এক মুহূর্তের উক্তি। তার সার্বকালিক চাওয়ার কথা ত এর মধ্যে নিহিত নেই। রসলিপ্সু পুরুষ রূপের পূজারী—পুরুষচিত্ত বৈচিত্র্যের রূপময়তায় মগ্ন হয়। তার চিত্তে প্রচ্ছন্ন কামনার আলো জ্বলে; সে পুরুষ প্রসাধনময়ীকে কামনা করে। তাই ত কবি ব্যঙ্গ-সুনিপুণা, বিদুষী নারীর চিত্র অঙ্কন করেন। তাঁর নারী:

> 'প্রসাধন সাধনে চতুরা—
> জানে সে ঢালিতে সুরা
> ভূষণ ভঙ্গীতে,
> অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।
>
> জাদুকরী বচনে চলনে;
> গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে;
> অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
> নিন্দা তার করি দেয় দূর।' (পৃ. ১১০)

ছলনাময়ী নারীর এই ছলনার মাদকতার মাধুর্যটুকু কবি

তাঁর নামী পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে ধরে দিয়েছেন। যা সত্য, যা সহজ তার আবেদন পুরুষচিত্তের কাছে সহজে সত্য হয়ে ওঠে না। সহজ সুরে সহজ কথাটুকুর মাধুর্য বহুদূর অনুসারী হয় না। তাই ত বক্রোক্তির প্রয়োজন হয়। তাই ত নারীর আপনাকে বহুবিচিত্রতায় প্রকাশের এত প্রয়াস। এই রূপবৈচিত্র্য ত মিথ্যা নয়। এই মাদক রূপের মোহময় আবেদনই ত পুরুষকে মাতাল করে। এই রূপসীকে আপন করার জন্য পুরুষের প্রয়াসের অন্ত নেই। এই রূপও যেমন সত্য, এই চাওয়াও ঠিক তেমনি সত্য। এই চাওয়া আছে বলেই এই রূপের এত আদর। পুরুষ চায় বলেই নারীর এই সাজসজ্জা। পুরুষের চোখে সহজ রূপে নেশা লাগে না; রঙের ঘোর লাগে তখনই যখন সহজ কথা ঘুরিয়ে বলা হয়। মনের কথা সহজ ভাবে ব্যক্ত করলে তার রসটুকু গাঢ় হয় না। তাই ত নারীর প্রেমনিবেদনের ধারা বহুবিচিত্র। 'হেঁয়ালি'র রূপ-কল্পনায় তারই আভাস মেলে :

> 'যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।
> নূতন ধাঁধায়
> ক্ষণে ক্ষণে ঢেকিয়া দেয় তারে,
> কেবল আলো আঁধারে,
> সংশয় বাধায়;
> ছলকরা অভিমানে বৃথা সে সাধায়।' (পৃ. ১০১)

নারী-চরিত্রের এই বিভিন্ন ছদ্মবেশ, এই বহুরূপী প্রকাশকে কবি তাঁর অনুপম ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন নামী পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছের মাধ্যমে। প্রেম-সুষমার অনন্ত ঐশ্বর্য নারীসত্তাকে অন্তহীন রূপময়ত্বে ঐশ্বর্যময়ী করে। নানান রঙে, নানান রেখায়, বিচিত্রতর ভঙ্গীতে নারীর প্রেমের বহিরঙ্গ। বাইরের রূপে লাখো তরঙ্গের মেলা; অন্তরে গভীর প্রেমের নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি। বাইরে রূপের বাহার, অন্তরে অপরূপের আসর। পুরুষ আসে—সে আগন্তুক বাইরের রঙে মুগ্ধ হয়, অন্দর মহলের খবর সে রাখে না। সে বার মহলের চাকচিক্যে ভোলে। নারীর অন্তরের শক্তিটুকু সহজ অনাড়ম্বর সৌন্দর্যটুকু তার কাছে অজানা থেকে যায়। নারীর প্রেমের দুর্বারতা, ত্যাগ ও ক্ষমার দ্যুতি, সত্যপথে পুরুষকে চালনার সুতীব্র অভীপ্সা—এই গুণগুলো প্রসাধনের মুখোশের তলায় লুকিয়ে থাকে। সহজ দৃষ্টিতে এদের দেখা যায় না—এরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। নারী যেখানে শুধু নর্মসহচরী, লীলাসঙ্গিনী সেখানে পুরুষ তার চটকদারিতে ভোলে। সে বহুবিচিত্র রূপের রংদার ছবি কবি "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থে অনেক এঁকেছেন। আবার তাকে অতিক্রমও করেছেন অনায়াসে। লীলাসঙ্গীর কামনা-রঙীনমূর্তি অন্তর্হিত হয়েছে; সেখানে আমরা দেখেছি কল্যাণী বধূর রূপ। এই বধূই হ'ল পুরুষের সহধর্মিণী। সহধর্মিণীর প্রসাধনে অনুরাগ নেই। সে পুরুষের সত্যধর্ম পালনের প্রেরণা; ধর্ম-সাধনায় সে তার নিত্য সহচর। নর্ম-সাধনার সাথী ধর্ম-সাধনার সঙ্গীরূপে দেখা দিল সহধর্মিণীর মধ্যে। পুরুষ ও নারীর এই যুগলরূপ তার প্রিয়ার মধ্যে কামনা করে। তাই ত কবি বলেন :

"বধূরে যেদিন পাব—ডাকিব 'মহুয়া' নাম ধরে।"

পুরুষ-ঈপ্সিত বধূ যেন শাল-তাল-তমাল-পরিবৃতা মহুয়া। তার আবেদন সর্বকালের—দুর্ভিক্ষে ও ব্যসনে তার সমান অকাতর ঔদার্য। প্রার্থীর অঞ্জলি সে সব সময়েই ভরে দেয়—অন্নরিক্ত মধ্যাহ্নে আবার বাসনাতপ্ত সায়াহ্নেও। সে নারী বহু দীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ়, উন্নত। বিলাসের চাঞ্চল্য-বিহীন সুগম্ভীর সেই নারীই পুরুষের কানে কানে বলে :

> 'শোনো, শোনো, আছে প্রয়োজন
> একান্ত আমারে তব। আমি নহি তোমার বন্ধন;
> পথের সম্বল মোর প্রাণে। দুর্গমে চলেছ তুমি
> নীরস নিষ্ঠুর পথে—উপবাস-হিংস্র সেই ভূমি
> আতিথ্যবিহীন: উদ্ধত নিষেধদণ্ড রাত্রিদিন
> উদ্যত করিয়া আছে উর্ধ্বপানে। আমি ক্লান্তিহীন
> সেই সঙ্গ দিতে পারি।' (পৃঃ ৮৬)

অবিচল বীর্যের আধার শক্তিময়ী এই নারীর জায়ারূপ পুরুষের নিত্য-প্রেরণার উৎস। অন্তহীন পথচলায় সর্বকর্মে প্রেরণাদাত্রী কল্যাণী আর প্রসাধনময়ী নয়; সে ছলনার আশ্রয় অতিক্রম করে সহজ সরল মাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ হ'ল নারীর জায়ারূপ, নারী যেখানে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, সেখানে সে মহাশক্তির অংশ, তারই প্রতিষ্ঠা দেখি জায়ার মধ্যে, সহধর্মিণীর অন্তরলোকে। তাই ত সহধর্মিণী সকল ধর্ম-সাধনার অঙ্গ। তাই ভগবানের অবতার শ্রীরাম-চন্দ্রেরও স্বর্ণসীতাকে প্রয়োজন হয়। ধর্ম-কর্ম-সাধন সাক্ষী এই সহধর্মিণী পুরুষকে নতুন নতুন কর্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। তার সত্তায় শক্তির আশ্বাস, শান্তির ইঙ্গিত। কর্ম-ক্লান্ত পুরুষের অবসাদ সেবাব্রতার স্পর্শে দ্রবীভূত হয়। অবসন্ন পথচারীকে সেবায়, শুশ্রূষায়, আবার আগামী দিনের কর্মমুখর জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে নারী। সে পবিত্রা, সেবাশুদ্ধা নারীকে পুরুষ যুগে যুগে তার শ্রদ্ধা-বিনম্র অভিবাদন জানিয়েছে। চলার পথে সংশয় বার বার আসে পুরুষের জীবনে—কখনও সংশয় আপনার শক্তিতে, কখনও-বা বিধাতার মঙ্গল কর্মে। পুরুষ সেই দ্বিধা অতিক্রম করে নারীর সাহচর্যে। নারীর বিশ্বাসের সরলতায় সে পুরুষের সংশয় দূর করে তাকে সহজ বিশ্বাসের পথে অগ্রসরণের প্রেরণা দেয়। বিভ্রান্ত পুরুষ আবার সন্মার্গগামী হয়। কল্যাণ, সত্য ও প্রেমের পথে সে আবার লক্ষ্যাভিমুখী হয়। তাই ত নারীর পার্থিব সহজ অস্তিত্বটুকু এক অপার্থিব

মর্যাদায় পুরুষের চোখে ভাস্বর হয়ে ওঠে। কবি সেই অতি-মানবীয় নারীসত্তার প্রতিষ্ঠা করেছেন জায়ার কমনীয়তায়, সহধর্মিণীর একনিষ্ঠতায়। অলৌকিক পদ্মের মতন নারীর নারীত্বের প্রকাশ ঘটে। অন্তহীন কাল, অসীম আকাশ এবং নিদ্রাহীন আলো এই অলৌকিক নারীসত্তার উপাদান। কোন এক অনাদি মন্ত্রবলে এরা মিলে মিশে রমণীর অলৌকিক মাধুর্য ও মর্যাদাকে রূপ দিয়েছে। এই নারী অনন্ত শক্তির উৎস। পুরুষের সর্ব কর্ম-প্রেরণার কেন্দ্রস্থলে এই রমণীর প্রতিষ্ঠা। কবি এই অনন্তশক্তিপ্রদায়িনী নারী-সত্তার উদ্দেশে বললেন :

'যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়
অগ্নিময়ী বেদনায়
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে। (পৃ. ১৩)

এই রূপবর্ণনায় শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তা আছে। এ যেন ভক্তের চোখে দেবীমূর্তি দর্শন করা। যা কিছু অপূর্ণতা, যা কিছু ক্ষুদ্রতা, যা কিছু মালিন্য—তাদের স্পর্শ এখানে নেই। গ্যেটে 'ফাউস্টে' পরমসঙ্গিনীর প্রশস্তি গেয়েছিলেন :

'ধরণীর সব অপূর্ণতা
নারীতে পেয়েছে বুঝি
পূর্ণের মহিমা!'

[Earth's insufficiency here finds perfection]

এই পূর্ণ নারীত্বের রূপ-কল্পনা যুগে যুগে পুরুষচিত্তে দুর্মদ কর্মপ্রেরণা উৎসারিত করে দিয়েছে। লাভক্ষতির সহস্র ছিদ্রযুক্ত ব্যক্তিজীবনে সে এনেছে আর এক নতুন মূল্যবোধ। পুরুষকে পথ দেখিয়ে সে নিয়ে গেছে আর এক আদর্শের জগতে—সে জগৎ উপরের জগৎ। মহত্তর জীবন-বোধ নারীই দিয়েছে পুরুষকে। পুরুষ তার উত্তরাধিকার রেখে গেছে বংশপরম্পরায়। আবার সেই আদর্শ জীবন-চর্যার প্রেরণাও জুগিয়েছে নারী। সর্ব ক্ষুদ্রতার মোহপাশ থেকে মুক্তি পেল পুরুষ এই নারীর সাহচর্যে। যখনই পুরুষ-চিত্তে সংশয় আসে, অবিশ্বাসের প্রেতচ্ছায়া তার বিচারকে আচ্ছন্ন করে তখন পুরুষ স্মরণ করে নারীর অবারিত আত্ম-দানকে, তার ত্যাগের মন্ত্রকে তার উদার জীবনবাদকে। পুরুষ নারীর কাছে তার অবসাদক্লিন্ন জীবন থেকে তাকে ঊর্ধ্ব আকর্ষণ করার জন্য আবেদন জানায়। পুরুষ জানে যে নারীর আকর্ষণীশক্তির চুম্বক তাকে তার সর্ব মালিন্য, সকল ক্লেদ থেকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করবে। নারীর পবিত্র স্পর্শে তার সব কলুষ ঘুচে যাবে। তাই সে বলে :

'হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চির সত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী
অবসাদ হতে লহো জিনি—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।' (পৃ. ৬৭)

এই বাণীপ্রতিম দেবীমূর্তির সৌন্দর্য তার দেহে নয়, তার মনে, তার অন্তরের সতীধর্মে।

নারীর এই দেবীমূর্তি পুরুষের সৃষ্টি। যেমন প্রিয়ামূর্তি পুরুষের কল্পনায় রঙীন, ঠিক তেমনই সহধর্মিণীর এই সতীরূপ পুরুষের শ্রদ্ধায় ভাস্বর। পুরুষ আপন মনের রংঘরে রং তুলি দিয়ে রংদার যে চিত্র অঙ্কিত করে তা অনন্যসুন্দর। পুরুষ আপনার অগোচরে নারীর মাধুর্যটুকু সৃষ্টি করে। কস্তুরীমৃগ যেমন আপনার নাভিগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে গন্ধের উৎসানু-সন্ধান করে ফেরে বন থেকে বনান্তরে, পুরুষও ঠিক তেমনি করে নারী-রহস্য, রমণী মাধুর্যের স্রষ্টা হয়েও সে এই লোকাতীত সৌন্দর্যের উৎস নারীর মধ্যে সন্ধান করে। তার অনুসন্ধানের শেষ নেই। একথা পুরুষ ভুলে যায় যে, রমণীর অতলস্পর্শী রহস্যের সে-ই স্রষ্টা। তার সৃষ্টি তার বুদ্ধিকে অতিক্রম করে। সে তার নাগাল পায় না। তাই ত পুরুষের চোখে নারী চিররহস্যময়ী। কিন্তু নারীর অপূর্ণতা নারীর কাছে বাস্তব, সত্য। তাই সে তার প্রিয়তমকে বলে :

'ভয় হয় পাছে
যে-সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে
সে-যে মোর নাই তাই শেষে পড়ে ধরা—
দেখ দূর হতে এসে, জলাশয়ে জল নাই ভরা।' (পৃ: ১৭)

নারীর অপূর্ণতা পুরুষ ঘুচিয়ে দেয়। সেকথা নারী জানে। সে আরও জানে যে, পুরুষের ভিক্ষাঞ্জলি সে যে ধনে পূর্ণ করে সে সম্পদ পুরুষেরই দেওয়া। নারীর সবকিছু অপূর্ণতা, সমস্ত দীনতাকে পরিপূর্ণ করে দেয় পুরুষের অকৃপণ ঔদার্য। ভাবাবেগের কোন এক নিবিড় মুহূর্তে নারী পুরুষকে বলে :

'তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারই দান,
গ্রহণ করেছো যত ঋণী তত করেছ আমায়।'

নারীর স্বভাবজাত স্থিরবুদ্ধির আলোয় সে সত্যকে দেখে, গ্রহণ করে ধ্রুবকে। প্রেমঘনিষ্ঠ কোন এক পরম লগ্নে সে তার দয়িতকে বলে আপন দীনতার কথা অকপটে। কোথাও কোন আবরণ নেই ; অপ্রকাশের কোন কুণ্ঠা তাকে বিব্রত করে না। সে তার পুরুষকে বলে :

'তুমি যদি মুগ্ধ মনে ভুলে থাক তবু
গভীর দীনতা মোর গোপন করিনি আমি কভু।
মোর দ্বারে যবে এলে অন্যমনা
সে কী মোর কিছু নিয়ে পুরাতে কামনা।

নহে নহে, হে রাজন ! তোমার অনেক ধন আছে,
তাই তুমি আস মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি।'

পুরুষ দেবার অপরিসীম আনন্দে তার ঐশ্বর্য অবারিত করে দেয় নারীর কাছে। নারী সে সম্পদে ঐশ্বর্যময়ী হয়। পুরুষের এই দানেই আনন্দ, নারীর আনন্দ এই মহাদানকে যথোচিত মর্যাদায় গ্রহণ করা। পুরুষ দেবার আগ্রহে উন্মুখ, নারীর রিক্ততাকে পূর্ণ করার জন্য সে সদাব্রতী। এই দেওয়াই পুরুষের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের পুরুষ-কল্পনা তার বৃহত্তর জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথের পুরুষ হেগেলীয় ব্রহ্মের মতই আপনার সৃষ্টি-সান্নিধ্যে আপনার পরিপূর্তি খুঁজে পায়। নারীর অলৌকিক মর্যাদার অভিব্যক্তিতে পুরুষের সৃষ্টি-আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। সে হ'ল পুরুষের সৃষ্টি। আবার সে-ই পুরুষের শূন্যতা পূর্ণ করে। নারীর ক্ষুদ্র পার্থিব সত্তা পুরুষের শ্রদ্ধার পটভূমিতে অপার্থিব মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। মানুষী দেবীমূর্তিতে আবার পুরুষকে নব নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে। এই পুরুষ-প্রকৃতির লীলা চলে যুগে যুগে। পুরুষের কল্পনায় নারীর এই নতুন রূপ-রচনা ; পুরুষের দানে নারীর এই নিত্য নব ঐশ্বর্যলাভ—এ হ'ল নিত্যকালের। ভগবানের অনাদি সৃষ্টির এরাও হ'ল নিত্যসঙ্গী। পুরুষের এই সৃষ্টিশক্তিকে নারী শ্রদ্ধা করেছে, বিশ্বাস করেছে পুরুষের অনন্ত সম্ভাবনায়। সে তার পুরুষকে বলে :

'তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন কর।' (পৃ. ২৭)

নারী তার আপন পুরুষকে তাকে নতুন করে সৃষ্টি করার আমন্ত্রণ জানায়। সে পুরুষ নারীর বহু স্বপ্নের নায়ক। রবীন্দ্রনাথ সে পুরুষের চিত্র এঁকেছেন বলিষ্ঠ রেখায় সুন্দর ভঙ্গীতে। কবির মানসকন্যা কোন্ ভাগ্যবানের কণ্ঠলগ্না হবে, এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। কবি বলেন, সেই ভাগ্যবানই তাঁর মানসকন্যার বরমাল্য লাভ করে যে দুঃসাধ্যের সাধনা করে। নারী তার জন্য তার বরণডালা নিয়ে প্রতীক্ষা করে। প্রতীক্ষাদীর্ঘ রজনীর শেষে নারী বলে :

'হে বীর অপরিচিত, শেষ হ'ল আমার রজনী—
জানা তো হ'ল না কোন্ দুঃসাধ্যের সাধন লাগিয়া
অস্ত্র তব উঠিল ঝঞ্ঝনি। আমি রহিনু জাগিয়া।' (পৃ. ৮৫)

তার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয় না। এই অপরিচিত বীরের সত্যরূপ চিরকাল নারীর অগোচর থাকে না। নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ আসে অনতিদূর ভবিষ্যতে। সে চলমান জনতার মধ্যে তার দয়িতকে আবিষ্কার করে। সে পুরুষ সকলের মধ্যে থেকেও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। সে নিঃশব্দ কৌতুকে চলমান জনতাকে প্রত্যক্ষ করে। তার চিত্তে প্রশান্তি, ব্যক্তিত্বে সুগভীর নিষ্ঠা। নারী তার নিশ্চল ঔদাসীন্যে আকৃষ্ট হয়, তাকে আত্মনিবেদন করে বলে :

'তুমি যেন মহাকাল সমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যান মাঝে উমার ভৈরবী।' (পৃ. ৭৮)

পুরুষের এই মহিমা-ব্যঞ্জিত মূর্তি তার প্রিয়ার চোখে ধরা পড়ে। দয়িতা দেখে তার পুরুষ জনতার দীর্ঘ ছায়ার মাঝে ছায়া বিস্তার করে না। সে অচ্ছায়া, সে আলোক-প্রেরণার উৎস। তার মজ্জায় মজ্জায় শক্তির আশ্বাস, বীর্যের ঘোষণা। পরম পৌরুষে সে তার জীবনসঙ্গিনীকে জয় করে। নারী সানন্দে সাগ্রহে বীরের কণ্ঠলগ্না হয়। সে শ্লথপ্রাণ দুর্বল পুরুষকে কামনা করে না। দুর্বল পুরুষের কামনা-কলুষ নারীর অসম্মান করে। তার নারীত্ব ব্যথিত, ক্লিষ্ট হয় এই ধরনের পুরুষের সান্নিধ্যে। নারী যদি জীর্ণমজ্জ কাপুরুষকে গ্রাহ্য করে, যদি আত্মদান করে নির্বীর্য পুরুষকে তবে দেবতা তার উপর রুষ্ট হন। সে দেবতার কাছে দোষী হয়। তাই কবির মানসকন্যা বলে যে সে বীরভোগ্যা হবে। বীরের সহধর্মিণী হওয়াই তার পরম কামনা। তার আন্তর ঐশ্বর্য পদ্মের পাপড়ির মত আপনাকে প্রতিদিন মেলে দেবে বীরের স্পর্শ পেয়ে। তার নারীত্বের সুগম্ভীর কাঠিন্য তার প্রেমাস্পদের পৌরুষকে চিরকাল উদ্দীপ্ত করে রাখবে। নারীর বিনম্র দীনতা পুরুষের পৌরুষকে খর্ব করে। তাই ত কবির মানসকন্যা সে দীনতাকে পরিহার করে। দুর্বল লজ্জার অক্ষম আবরণ বার বার তার প্রিয়তমের ব্যক্তিত্বকে, তার মর্যাদাকে খর্ব করে, তাই সে এই দুর্বল লজ্জাকে পরিত্যাগ করেছে ; নারী সযতনে আপনাকে যোগ্য করে তোলে তার প্রিয়তমের জন্য। তাকেই ত সে তার শ্রেষ্ঠ দানটুকু দেয়। তার সমস্ত হৃদয়, প্রাণ, মন অবারিত হয় এই পুরুষের প্রেমস্পর্শে। দেবার আনন্দ তাকে ধন্য করে।

নারীর এই অনির্বচনীয় ঐশ্বর্যটুকু পুরুষ গ্রহণ করে তার সমস্ত অন্তরের সঙ্গে। সে নারীকে ধন্য করে, নিজেও ধন্য হয়। তার নিজের দেওয়া ঐশ্বর্য তাকেই মুগ্ধ করে। তার নিজের দেওয়া দান আবার তার প্রিয়ার হাত থেকে গ্রহণ করে সে কৃতার্থ হয়। নারসিসাস আপন রূপে আপনি বিমুগ্ধ আর রবীন্দ্রনাথের নায়ক আপনার সৃষ্ট রূপে আপনি বিভ্রান্ত বিহ্বল পুরুষ ভুলে যায় নারী-মাধুর্যের সৃষ্টি-রহস্যের কথা। লোকাতীত স্রষ্টাকে নারী-সৃষ্টির সবটুকু গৌরব অর্পণ করে ভাবমুগ্ধ কণ্ঠে সে বলে :

'নারী সে যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।' (পৃ. ৮৪)

বাসা বদল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

বাড়ীর সামনে কাঠা চারেক জমি—শক্ত বাখারির বেড়া দিয়ে ঘেরা। জলে রোদে কালো হয়ে ভঙ্গুর হয় বাঁশের খুঁটি—তার পর উই ধরে ভেতরটা ফোঁপরা করে মাটি ভরিয়ে তোলে। কেশব বুদ্ধি করে বেড়ার গায়ে কয়েকটা জীয়ল গাছের ডাল পুঁতে ছিল, তারাই শাখাপল্লবে জীবন পেয়ে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে বেড়াটিকে। রোদে জলে আর উইয়ে জীর্ণ বাখারি মাটির সঙ্গে মিতালি পাতায়, তবু তার দেহাংশের পরিবর্ত্তনে রক্ষা পায় কায়াটা। যে রক্ষা করে তার পরিশ্রমটাও লঘু রকমের।

মালী-বাড়ীতে কেশবকে নিয়ে হয় ত বহু পুরুষ হ'ল, কেশব কিন্তু তিন পুরুষের হিসাব রাখে। বাবা অমৃতকে (ডাক নাম অমত্ত) মনে পড়ে। গোলগাল বেঁটে খাটো মানুষটি—মুখে এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পানের রসে ঠোঁট দুখানি সর্ব্বদাই স্যাঁত-স্যেঁতে, তারই মাঝে পানের-ছোপ লাগা মিশ কালো দু'সার দাঁত। ভোরবেলায় বিছানা ছেড়ে—নিড়েন, খুরপো, শাবল, খন্তা হাতে নিয়ে সটান চলে যেত—বাখারি-ঘেরা ওই জমিটুকুর মধ্যে। গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়ে শিকড়ে কার্ত্তিকের হিম লাগালে গাছের স্বাস্থ্য ভাল হয়, ফুলের বাহারও খোলে চমৎকার। ফুল বড় হয়—ফোটেও অজস্র—রঙেও লেগে থাকে স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যটুকু। অতএব শাবল চালিয়ে মাটি তুলে বার কর—তার শিকড়। কুঁদ ফুলের ঝাড়ের বাঁধনটা আলগা করে তার শাখা-প্রশাখাগুলিকে আলো আর রোদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ করে না দিলে—সারা শীতকালটা অজস্র ফুল দিয়ে বৃত্তি-ব্যবসা বজায় রাখবে কেমন করে? গাঁদার ঋণটাও অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। ইতু পূজার ঘটে—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের যে-কোনও বারব্রতে মাল্য—অঞ্জলিতে দেবতার তুষ্টিসাধনে ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে ওর তুলনা মিলবে না। কিন্তু গাঁদা ত কুঁদের মত রোজ রোজ অজস্র ফোটে না, রাশি রাশি বিলিয়েও যা শেষ হয় না। কিংবা তা এমন নয় যে, প্রতি রাত্রির অন্ধকারে কুঁড়িটি পূর্ণ হয়ে প্রতি প্রত্যূষের আলোর আভাসে ফুল হয়ে ফুটবেই। রাশি রাশি ফুল—একটি বেলার জীবন ওদের, তাই একটি রাত্রির অন্ধকার-মঞ্চে তাড়াতাড়ি রূপ-সজ্জা সেরে ঝাঁক বেঁধে অভ্যর্থনা করে প্রভাতকে। গাঁদার গ্রামভারী চাল। ফুল হওয়ার আয়োজন ওর চলে দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে। ফুল হয়ে ও এক বেলা-কার জীবনই উপভোগ করে না, রয়ে বসে খিতিয়ে জিরিয়ে কয়েকটি দিন আর রাত্রি ধরে বৃন্তে বৃন্তে জবদ রঙের বাহার খুদে নিজে উপভোগ করে পৃথিবীকে, উপভোগ করায় মানুষকে। বেড়ার ধারে ধারে ওরা উদ্যানের রমণীয় জমিটিকে বেঁধে রাখে সুদৃশ্য জবদ রঙের পাড়ের বাঁধনে। দোপাটি, টগর, রঙন, যুঁই, মল্লিকা, অতসী, রজনীগন্ধা এরা এক এক ঋতুর ফসল। জবা আর একপাটি টগরের অত কাল বাছাবাছি নাই, সারা বছরে—কখনও কম—কখনও প্রচুর ফুল দেয়। করবী ওরই মধ্যে একটু খুঁতখুঁতে, স্থলপদ্মেরই মত বছরে দু'বারের বেশী শাখায় শাখায় হাসির লহর তুলতে চায় না। অপরাজিতা ত নগকন্যার নাম গোত্রে চির দুর্লভই। দোপাটি আর সন্ধ্যামণি আর সূর্য্যমুখী এরা কেউ শীতকালে—কেউ বা বর্ষায় আপন আপন পরিচয়পত্র দাখিল করে। তুলসীর ঝাড় আর দূর্ব্বার কোমল আস্তরণ না থাকলে মালী-বাগিচারই অঙ্গহানি। এরা শুধু বার মাসেরই নয়, সর্ব্ব দেব-দেবী অর্চনার আদিভূত বস্তু। সমস্ত পূজায় সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরির উপস্থিতি অনিবার্য্য; শালগ্রামশিলা বিনা কোন দেবতাকেই অভ্যর্চ্চনা করার রীতি নাই—আবার শ্রীহরিও তুলসী-বিরহ সহ্য করতে পারেন না। বহু রূপে যে পরমাত্মা নিখিলের প্রাণসত্তায় গ্রথিত—তাঁরই পূজামন্ত্রে তুলসী চন্দন হ'ল একমাত্র উপকরণ। আর দূর্ব্বা? যেখানে কোন আয়োজন নাই—সেখানে সব রিক্ততার লজ্জা ঘুচিয়ে পূজাকে সার্থক করে তোলে এই জিনিষটি। বহু উপকরণ জমা হলেও—তাকে দিয়েই সুরু হয় পূজা বন্দনা।

রৌদ্রময় উজ্জ্বল দিনের গৌরব যেমন প্রত্যূষের কোমল আলোর ছোপ লেগে সুরু হয়, তেমনি ছোট বড় সমস্ত পূজার উদ্বোধনীতে দূর্ব্বা। তবু এই দূর্ব্বাকে সর্ব্বদা শাসন না করলে চলে না। পরিমিত উপচারে এরা উদ্যানের শোভা, সম্পদও বটে; পরিমাণের বেশী হ'লে উদ্যানের শত্রু এরা। তাই খুরপো নিড়েন হাতে প্রতি সকালে অমৃত এসে বসত এই কাঠা চারেক জমির মধ্যে। সকালের রোদ চড়া হয়ে উঠত, গাছের মাথা ডিঙিয়ে ফুলের গাছ ভাসিয়ে অমৃতের গায়ে চিমটি কেটে বলত, আয় না, এবার ওঠ, খাবার বেলা হয়েছে।

অমৃত চমকে উঠে প্রায়ই বলত, এঃ—বড্ড বেলা হয়ে গেল ত! চট করে চানটা সেরে আসি—ভাত বাড়। খুরপো শাবল বাগানে রেখেই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসত।

তার কাছেই হাতে খড়ি কেশবের। খুরপো দিয়ে ঘাস চাঁচা—নিড়েন দিয়ে ঘাস তোলা—সাবল দিয়ে দো-আঁশ মাটি তুলে—বেলে আর এঁটেল মাটির সঙ্গে মেশানো, কাঁচি দিয়ে গাছের শুকনো ডালগুলি ছেঁটে দেওয়া। ছোট সরু বাখারি দিয়ে রজনীগন্ধার ডাঁটি আর গাঁদার পুষ্পভারাবনত শাখাগুলি বেঁধে দেওয়া, চন্দ্র-

মল্লিকার টবগুলি কখনও ছায়ায় কখনও বা রোদে মেলে দেওয়া, অপরাজিতা আর তরুলতায় লতাগুলিকে বেড়ার গায়ে বেঁধে দেওয়া প্রভৃতি উদ্যান-চর্য্যার কাজগুলি সে অমৃতের কাছেই শিখেছে। মানুষটি এমনিতে সাদাসিধে, হাসিখুসিভরা, কিন্তু রাগলে যেন গন্‌গনে আগুন। যেমন তাত—তেমনি তেজ। সামনে ওই কামারশালায় জ্বলন্ত হাপরের মতই বোধ হয়। সে আঁচ অকারণেই কত বার কেশবের গায়ে এসে লেগেচে: স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে অমৃত।

তারও আগের পুরুষ অর্থাৎ পিতামহকে আবছা-আবছা মনে পড়ে। মনে পড়ে একটি মিষ্টি কোল, নরম স্নেহময় হৃদয় আর অফুরন্ত সোহাগ।

ওটি কেগো—মালী-ঠাকুরদা?

নাতি—আমার নাতি—আমার সগ গে বাতি। বলে গাল টিপে টেনে টেনে তৃপ্তির হাসি হাসত বুড়ো।

এক দিন কোথায় চলে গেল বুড়ো। স্বপ্নের মত মনে হয়। কান্নাকাটি—লোকজনের আনাগোনা, না রান্না—না খাওয়া, সোহাগ আদর দূরে থাক—কেউ চেয়েও দেখল না—সারাদিন কোথায় রইল ছেলে—কি বা খেলে।

তার পর অমৃতও চলে গেল একদিন। স্বপ্নের মধ্যে নয়, পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোতেই। গৃহ থেকে শ্মশান পর্য্যন্ত একটি দুঃসহ তাপ কেশবের অঙ্গ স্পর্শ করে জ্বালা ধরিয়ে দিল; কেশব তখন উনিশ বছরের জোয়ান ছেলে। তাপটা সঞ্চিত হয়ে আছে স্মৃতির মণিকোঠায়, দাহযন্ত্রণার লেশমাত্র আজ আর নাই।

২

সেই বয়সেই কমলার সঙ্গে পরিচয়। অন্য পাড়ার মেয়ে, ফুলের লোভে এসে জুটত সকাল বেলায়। নিড়েন হাতে একমনে গাছের গোড়াকার ঘাস তুলছে কেশব—পিছনে না চেয়েও বেশ বুঝতে পারছে শ্যামলী মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে বেড়ার আগড় ধরে—মুখে চোখে কিছু বিস্ময়, কিছু বা যাচ্ঞার ঔৎসুক্য। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদ্যান-চর্য্যা দেখে ও সাহস সঞ্চয় করে ডাক দিচ্ছে, একটা ফুল দেবে?

ফুল? জানিস—এ ফুলে ঠাকুর পূজো হয়। ঘাড় না ফিরিয়েই কেশব জবাব দেয়।

দাও না—মোটে ত একটি। ঠাকুরের জন্য মেলাই ত রয়েছে।

নরম গলায় অদ্ভুত অনুনয়; যেমন চোখে জল এলে স্বরটা ভিজে ভিজে ঠেকে, কথাগুলি জড়িয়ে জড়িয়ে যায়। একটু কাঁপেও বা মুখ তুলে চাইতেও হয়।

কি ফুল নিবি?

ওই লাল গাঁদাটা।

এই নে, খবরদার আর আসিস নে।

বাঃ—চমৎকার ফুল ত। খোঁপায় পরি। লাফাতে লাফাতে চলে যায় মেয়েটি, সে যেন নৃত্যেরই লয়। জরদা রঙের বড় ফুলটা খোঁপার বৃন্তে বেশী করে হেসে উঠে তখন।

কিন্তু মেয়েটি শুধু কেশবের কাছেই ফুল নিতে আসে না, সতীশের কাছেও যায় টুকরো লোহার সন্ধানে। রাস্তার এপার ওপার দুখানা বাড়ী। মালীবাড়ী—আর কামারবাড়ী। দু'বাড়ীর চালাঘর খড়ের ছাওয়া, দাওয়া মাটির, দাওয়ায় ছোটমত একখানি তক্তপোশ পাতা—কুটুম্ব অভ্যাগতদের আদর সম্বর্দ্ধনার জন্য। মালীবাড়ীর বাইরের ঘর বলতে এই দাওয়া, কামারবাড়ীতে এ ছাড়াও একটি কামারশালা আছে। সেইখানেই 'এসোজন' 'বসোজনের' ভিড়। তিন দিকে মাটির দেওয়াল ঘেরা, ছাউনি অবশ্য খড়েরই—উঁচু ছাউনি। সামনে একটি আগড় আছে—সেটিকে দুয়ার বলা চলে। কানাস্তারার টিন কেটে সেই টুকরোগুলি বাখারির বাঁধনে শক্ত করে বেঁধে তৈরি হয়েছে পাল্লা। বাঁশের একটা হুড়কো-খিল দিয়ে ঘরটা বন্ধ করে সতীশ নিশ্চিন্ত বোধ করে। সবাই জানে এ আগড় চোর ঠেকাবার জন্য নয়। কামারশালার মধ্যে চুরি করবার বস্তু কিই বা আছে! কতকগুলো মরচে-ধরা ভাঙা বাঁকানো লোহার টুকরো, একটি জলভর্ত্তি মাটির নাদা। একটি পায়াভাঙা ঘুণধরা আম কাঠের বেঞ্চি। বাঁশের সঙ্গে কায়েম করে বাঁধা একটা ভস্ত্রা, তার আহার্য্য কিছু কাঠকয়লা, একটা জবরদস্ত নেহাই—তা সেটা এমন ভাবে পোঁতা আছে মাটিতে যা তোলা একরূপ দুঃসাধ্যই। হাতুড়ী, ছেনি, সাঁড়াশী, মুগুর আর নল ভাঙা গাড়ু—ঘর বন্ধ করার সময় বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যায় সতীশ। কিন্তু ওই টুকরা লোহার লোভেই মেয়েটি এসে দাঁড়ায় কামারশালে। বলে, একটু লোহা দেবে?

লোহা? কি করবি রে কমলা?

কেন—হাতা, খুন্তি করব—খেলাঘরের হাতা খুন্তি। আর ছোট্ট একটা বঁটি গড়িয়ে দেবে?

ছোট বঁটির ভাবনা কি, চোত সংক্রান্তির দিন চড়কের মেলা বসবে—কিনিস সেখান থেকে।

পয়সা কোথায় পাব?

কেন চেয়ে নিবি মায়ের কাছ থেকে। আচ্ছা—আমি ত সেই সময়ে গড়ব অনেক বঁটি—দেব একখানা।

বাঃ, বেশ হবে। মেয়েটি খুশিতে নেচে ওঠে। নাচতে নাচতে চলে যায়। খোঁপায় গোঁজা সেই জরদা রঙের গাঁদাটা—দূর পথের বাঁকে মিলিয়ে যাবার আগে কি অপরূপই না দেখায়!

৩

কামারশালে কেশবও আসে। খুরপো, নিড়েন, কোদাল, শাবল দা—এ সবে মাঝে মাঝে শান দিয়ে না নিলে কাজ চলে না। অল্প শ্রমের কাজগুলির পারিশ্রমিক নেয় না সতীশ। সামনাসামনি বাড়ী, প্রতিবেশী, বাল্যবন্ধুও। টুকিটাকি কাজের জন্য পয়সা চাইতে চক্ষুলজ্জা বোধ করে। ব্যবসা চলে একটু দূরের প্রতিবেশীর

সঙ্গে—যাদের সঙ্গে কোন রকম লেনদেন সম্পর্ক নাই। কেশব দাম দেয় না, দাম দেবার কথা মনেও হয় না ওর। কিন্তু প্রতিদিন কিছু দেয়। গাছের ভাল গোলাপ ফুল ফুটলে—ছোট্ট ডালশুদ্ধ ফুলটি তুলে এনে বলে, ঠাকুরের পটের সামনে টাঙিয়ে রাখ্ গে—ভারি চমৎকার বাস, ঘর ম ম করবে গন্ধে।

ফুলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাকের কাছে এনে খুব জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে সতীশ বলে, আঃ—আঃ।

একটু পরে বলে, তা ফুলটা আমায় দিলি যে? বিক্রী করলে পয়সা পেতিস।

ভাল ফুলের দাম নেই। ঠাকমা বুড়ি বলত, দেবতাকে মিনি পয়সায় ফুল দিলে পুণ্যি হয়, কিন্তু পেট চলে না বলে ঠাকুরের পাওনাতেও ব্যবসা করছি। আর বলতো কি জানিস—ফুল ভক্তি করেই দাও—কি ভালবেসেই দাও—দাম নিয়েছ কি সব মাটি। দাম দিয়ে যেমন ভালবাসা কেনা যায় না, তেমনি ফুলও।

সতীশ হেসে জবাব দেয়, তা আমাকে ফুল দিলে ত তোর ভালবাসা সার্থক হবে না! ফুলের মতই যে সুন্দর—

কেশব বলে, তোর রং মিশ কালো আর মুখখানা হুমদো পারা বলে বলছিস বুঝি এ কথা?

বলছিই তো। শুনিস নে—সবাই বলে অসুর, দৈত্য। বলে হো হো করে হেসে ওঠে।

কেশব বলে, কিন্তু সত্যি বলছি—তোকে দেখে হিংসে হয় আমার। লোহা যেমন কালো—তেমনি কালো তোর রং, লোহা যেমন মজবুত—তেমনি মজবুতও। গন্‌গনে আগুন থেকে লাল টকটকে লোহা তুলে—নেহাই-এর উপর রেখে যখন হাতুড়ি দিয়ে পিটতে থাকিস—তখন সত্যি বলছি—কি সুন্দরই দেখায়। ঠনাঠন শব্দ হয়—আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে এধার ওধার—তোর হাতের গুলি বেলের মত ফুলে ওঠে—বুকখানা কি চওড়াই না দেখায়। সত্যি বলছি স'তে—ফুল বাগানে আগাছা নিড়োতে নিড়োতে এক একদিন ভাবি—তোর মত ক্ষমতা যদি থাকত ত এতদিনে ছুটো বাগান তৈরি করে ইন্দিরভুবন করে তুলতাম বাড়ীটাকে।

সতীশ হেসে বলে, দূর বোকা, এই দেহের আবার বড়াই করে কেউ? যেন চোয়াড় চাষা একটি! তোর বাবু বাবু কচ্ছমের চেহারা ছ'দণ্ড দেখে সবাই। ফরসা, কোঁকড়ানো চুল, একহারা গড়ন। জামা জুতো পরলে কে বলবে যে মিত্তিরদের ছোটবাবু নয়। বাড়ী এসেছে শনিবারে, সোমবারে যাবে কর্ম্মস্থলে—শহর কলকাতায়।

ছ'জনেই প্রাণখোলা হাসিতে কামারশালা ভরিয়ে তোলে। কমলাকে নিয়ে ঠাট্টা চলে ছ'জনার মধ্যে।

সতীশ আপন মনে বলে, মেয়েটি ফুল ভালবাসে কি তোকে ভালবাসে কে জানে!

কেশব বলে, ও ফুলই ভালবাসে, আমাকে নয়। না হলে খোঁপায় ফুল গুঁজে কামারশালে আসে ঘর পাতাবার জিনিস খুঁজতে?

ঠিক বলেছিস—ঘর পাতাবার সখই ওর। তাই ফুলটা গোঁজে মাথায়। আমাকে ভালবাসলে ওর লাভটা কি বল—বিয়ে তো হবে না। তোদের স্বজাত—তোরই জয় জয়কার।

কেশব বলে, না রে, মালী-বাড়ীর মেয়েদের শুধু ফুল ভাল লাগলে চলে না, ফুল দিয়ে ঘর সাজাবার ফুরসত কোথায় তাদের। তাদের জানতে হয়—কোন্ কোন্ ফুলে মোড়ক তৈরি করতে হয়—কেমন করে মালা গাঁথতে হয়, কোন দেবতার পূজোয় কি কি ফুল লাগে।

অর্থাৎ, কেশব বলতে চায়—ফুল খোঁপায় পরার সখ থাকলে চলবে না, মালা গাঁথার কারিগরিতে যদি উপার্জ্জন জমে তবেই তা সার্থক। যে মেয়ে এর ব্যবহারিক দিকটা জানে—সেই মালীঘরের যোগ্যা।

কিন্তু বিধাতার হিসাব ছিল অন্য রকম। কমলা কেশবের ঘরেই এল।

৪

সংসারে মানুষজন কম। কেশবের মা নাই, বাবা নাই—আছে এক বুড়ী পিসী। তা সে সংসার যত করুক না করুক—বক বক করে অনবরত। কেশব ফুল তুলে সাজি ভরে তার সামনে রাখে—সে কলাপাতার মোড়কে সেগুলি ভরে ভরে তোলে। ছ'-পয়সা থেকে চার আনার মোড়ক। যোগানের ফুলগুলি আলাদা মোড়কে থাকে—বিক্রীরগুলি থাকে আলাদা। মোড়কগুলি পেতের ভরে—সেই পেতে কাঁকালে নিয়ে এ বাড়ী ও বাড়ী—এ পাড়া সে পাড়া করে বুড়ী। তার পর বকতে বকতে বাড়ী ফেরে। সব মোড়ক সব দিন বিক্রী হয় না—সেদিন বুড়ীর গজর গজর বেড়ে যায়। সেদিন বাড়ী ফিরে কি যে ছাই ভস্ম রাঁধে—নিজেই টের পায় না। খাওয়ার সময় থু থু করে ভাত ছড়ায় আর বলে, মরণ হয় না ত—যম যে ভুলে আছে! নজরের জুত নেই—মনের জুত নেই; এই বয়সে কোথায় ঠাকুর দেবতার পূজো-আচ্ছা করব—না পেতে কাঁকালে ঘুরে মরছি দোর দোর—আর হাঁড়ি ঠেলছি! এমন পোড়া অদেষ্ট আমার!

কমলা এলে বুড়ী পা ছড়িয়ে দাওয়ায় বসে বলল, বাঁচলাম—কেশার সুমতি হ'ল তবু। নিজের ঘরকন্না বুঝে সুঝে নাও বাপু—আমার ত গঙ্গাপানে ঠ্যাং।

পনের বছরের মেয়ে ঘরের মর্ম্ম কি বুঝবে! বাঁশের আড়া—বাখারির বাতা—খড়ের ছাউনি—চার দিকে তার মাটির দেওয়াল। অন্দরে একখানিই ঘর—তার আধখানা জুড়ে রয়েছে বড় একখানা মাইপোষ—তার ওপর একরাশ কাঁথা আর বালিশ আর ছেঁড়া চাদর। ওপাশে একটা বড় কাঠের সিন্দুক—তার ভিতরে নাকি যাবতীয় সম্পত্তি আছে। পিতল, কাঁসার বাসন থেকে গহনাপত্তর

টাকাকড়ি, দলিলদস্তাবেজ, কাপড়চোপড়—সমস্ত। একখানা ছোট জলচৌকির উপর কিছু বাসন, তার পাশে একটি মাটির দেড়কোর একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে মিট মিট করে; ওপরে বাঁশের আলনা টাঙানো—তাতে কাপড় জামা প্রভৃতি যাবতীয় জিনিস, কুলুঙ্গীতে টুটাফুটা কত জিনিস। মাটির দেওয়ালে খানকতক পট—দেশী পটুয়ার আঁকা কালী দুর্গা গণেশ—কালীয়দমন—অন্নপূর্ণা আর রামরাজার ছবি। দিনের বেলায় চালের পরল দিয়ে যা একটু আলো আসে—আর আসে দুয়োর দিয়ে রাত্তিরে প্রদীপের মিটি মিটি আলো, কোন সময়েই ঘরখানা—কি ঘরের ভিতরকার জিনিষগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না। সুতরাং ঘর বুঝে নেওয়ার মানেটিই কমলার কাছে ওই রকম অস্পষ্ট। সে মালীর মেয়ে বটে, বাপ দাদারা কোন্ কালে বৃত্তি-ব্যবসা বন্ধ করে অন্য উপায়ে রোজগার করছে। কেউ মুদিখানার দোকানে কাজ করে, কেউ তাঁত চালায়, কেউ বা করে এটা ওটা কেনা বেচার কাজ। ওখানকার ঘর বলতে দিন-আনা দিন-খাওয়ার একটানা ক্লান্তিকর একটি আশ্রয়। তাতে না আছে ফুলের বর্ণবিভ্রম, না বা চিত্ত-উদ্‌ভ্রান্তকারী সুরভিমণ্ডল রচনার আভাস। এই ফুলের হাটে বসে নতুন চোখে যে ঘরকে সে দেখছে—তাকে কি ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা যায়—সে কল্পনা কমলার আসবে কি করে। তবে খোঁপায় ফুল গুঁজে কৌতুকে পা ফেলে ফেলে নাচের লয় জাগানোর দিন যে ফুরিয়ে গেছে—এটি সে বুঝেছে। সে বুঝেছে সীমন্তে সিন্দুরচিহ্নের সঙ্গে চার পাশের বেড়া দেওয়া গণ্ডীটুকুই তার বধূ-জীবনের বিচরণভূমি। এই আইনের নাগপাশে সে বন্দিনী। সে দুপুরের খরতাপ-পীড়িতা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে জানালায়। জানালার ওপারে গলিত অয়স্কান্তের জুড়িয়ে আসা দেহে হাতুড়ির আঘাত পড়ছে—সেই আঘাতে রূপান্তর গ্রহণ করছে ধাতুদেহ, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের ফুল। দানব-দেহের শিরায় শিরায় প্রাণের তরল প্রবাহ—পেশীতে পেশীতে শক্তির বিস্ফারণ। সামনের ফুল বাগানে নানা বর্ণবৈচিত্র্য ভরা ফুল—আর একটু দূরে তন্দ্রা-পীড়িত কালো কয়লার মুখে আগুনের উজ্জ্বল হাসি। জানালার বাইরে বৈচিত্র্যভরা ঐটুকু স্বতন্ত্র জগৎ—সুন্দর সে জগৎ। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে কমলা। কেশবের ধমকে ওর ধ্যান ভঙ্গ হয়।

ওখানে বসে বসে কিসের ধ্যান হচ্ছে? খাবারটাবার দিতে হবে না?

এমন কর্কশ স্বর কেশবের কণ্ঠে মানায় না। ওর গৌরবর্ণের ছিপছিপে দেহে—শক্তি যেন সৌন্দর্য্যের আকারে লুকিয়ে আছে। কোঁকড়া চুল, পাতলা ঠোঁট, আয়ত দুটি চোখ, মাজা মাজা নাতি-প্রশস্ত কপাল—ওর সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠ বড়ই অশোভন। ধাক্কা খেয়ে জানালা থেকে সরে এল কমলা।

জানালার ধারে এসে দাঁড়াল কেশব। মুখে তার হাসি ফুটে উঠল—ব্যঙ্গের হাসি।

ওঃ—তাই বুঝি জানালা থেকে নড়তে ইচ্ছে করে না? একটা জোয়ান ছেলের পানে অমন বেহায়ার মত চেয়ে থাকতে লজ্জা করে না?

কমলা মাথা নামিয়ে বলে, ও ত সতীশদা।

জানি। সতীশদারও জোয়ান ছেলে হতে বাধা কি। পিসী যদি দেখে ঘরের বৌ পথের ধারে চেয়ে চেয়ে পরপুরুষকে দেখছে—কি কাণ্ডটা হবে—বল দেখি।

কমলা উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মনটি তার কেমনই করতে থাকে। খালি শাসন—আর শাসন। যেমন শাসন ওই ফুলের বাগানে চালায় কেশব, তেমনি শাসন ওর মানুষের উপর।

প্রথম যখন বিয়ের সম্বন্ধ হয়—মনটায় খুশির রঙ ধরেছিল। যে বাগানের ধারে একটিমাত্র ফুলের প্রত্যাশী হয়ে কতক্ষণ ধরে খোসামোদ করেছে কেশবের—সে বাগান তারই সম্পত্তি হয়ে যাবে—সে খুশিমত নানারকমের ফুল তুলবে, পরবে খোঁপায়, বাঁধবে তোড়া, ইচ্ছে হলে বিলিয়ে দেবে কাউকে। বিয়ের পর বুঝল—বেড়ার বাঁধনে গাছগুলি—কেশবের সম্পত্তি—রক্ষণাবেক্ষণের কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, তেমনি বাড়ীর বাঁধনে কমলাও আর একটি সম্পত্তি-রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম এখানেও একতিল শিথিল নয়। বৃত্তির তৌলদণ্ডে ফুল আর সীমন্তিনী তুল্যমূল্য।

চোখের জল আঁচলে মুছে রান্নাঘরের শিকল খুলল কমলা।

৫

কামারশালাতেও পরিবর্ত্তন হয়েছে কিছু। রাস্তার দিকে কামারশালার মুখ। কাঠের তক্তার উপর ছেঁড়া চট পেতে বসলে বাঁ ধারে পড়ে কেশবের বাড়ী। সামান্য একটু ঘাড় ফেরালেই—সে বাড়ীর দৃশ্যটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। সামনে দাওয়া—তার পাশের দেওয়ালে—অন্দরের একটিমাত্র ঘরের একটি মাত্র জানালা। ওটা প্রায়ই বন্ধ থাকত, কমলা আসার পর থেকে খোলা হচ্ছে। বধূ হলেও কমলার বাল-চাপল্য ঘোচে নি। বালিকা-মনের সুলভ কৌতূহলে পথের ধারের জানালা খুলে—পথের প্রান্তে দুই চোখ মেলে দেয় ও। ভস্ত্রার চাপে আগুন উজ্জ্বল হয়ে ওঠার মত ওর দুই চোখ ঝলসে ওঠে মাঝে মাঝে, মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল প্রতিবিম্বে কখনও তা অপরূপ দেখায়।

একটি চোখে পৃথিবীকে দেখার কৌতূহল—কতক্ষণই বা দমন করা যায়। দু'চোখই ফেরায় সতীশ।

কমলা এখন বড়ই হয়েছে। মাথায় ঘোমটা টেনে নতুন হয়েছে, চোখে ওর গৃহিণী-জনোচিত স্থির প্রশান্তির ছায়া ঘন হয়ে উঠছে—যেন মাঝনদীতে নৌকার দু' পাশে ভাঙ্গা ঢেউগুলি কিনারায় একটু ছলছলাৎ সুর টেনে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন এক টুকরো ভাঙা লোহার জন্য ওর কাঙালপনা নেই, কিন্তু কামারশালার দিকে ওর মুগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে সেই বিহ্বল ভাবটি একেবারে লুপ্ত হয় নি। খেলাঘর সত্যিকার ঘর হয়ে উঠেছে, খেলনার বস্তুগুলিও তাই

জয়পুরে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত স্মারক স্তম্ভ

স্মারকস্তম্ভে সৈন্যবাহিনীর বিশিষ্ট অফিসারগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমালা প্রদান। (বাম দিক হইতে)
শ্রীএম. এল. সুখাদিয়া, জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজী প্রভৃতি

নিদাঘে [ফোটো—শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়

মহীশূরের অরণ্যে হস্তীপৃষ্ঠে মহীশূরের রাজপ্রমুখ ও শিকারীবৃন্দ সহ
ইরাণের শাহানশাহ ও সম্রাজ্ঞী
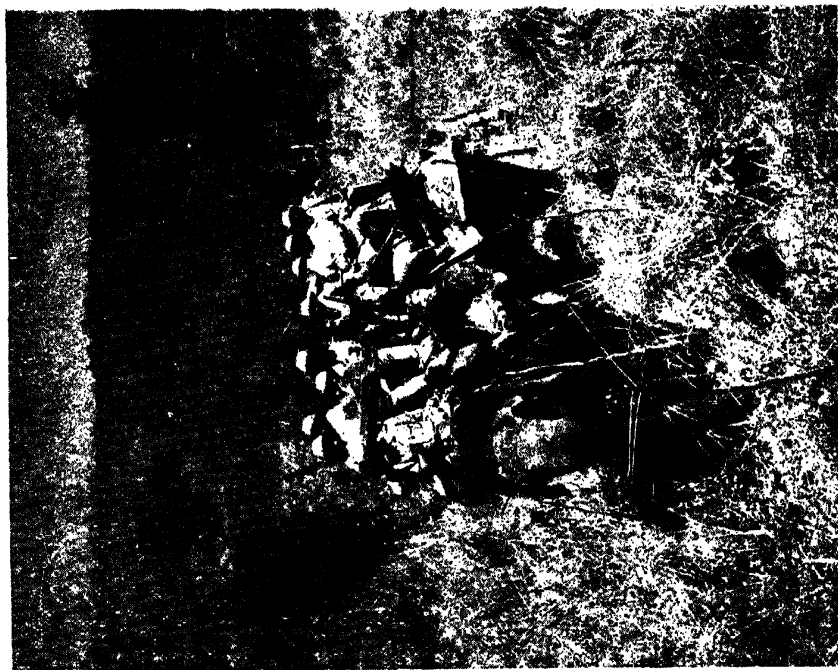
প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। একখানি ছোট বঁটির বদলে একখানি বড় বঁটিই কামনা করে হয় ত।

কিন্তু কেশবের কেন এত পরিবর্ত্তন হ'ল? ওর শাবল খোন্তা নিড়েন কোদাল কি আজকাল বিকল হতে জানে না? বন্ধুর কাছে বিনামূল্যে মেরামত করায় এত সঙ্কোচ ওর কেন? বিনিময়ে দু' একটি ফুল পাওয়া যেত, তা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে সতীশ। কিন্তু ফুল যে সতীশের চাই-ই। কর্কশ হাতে হাতুড়ি পিটে পিটে পেশীর মাংস শক্ত হলেও বুকের মাঝখানের কোমল মনটি ওর ফুলবাগানেই ঘুরে মরে। সে ত কালের রেখায় ধরা দিতে জানল না, বৃত্তির দিনানুদিন অনুবৃত্তিতে অভ্যাসগ্রস্ত হতে পারল না? দূরের ফুল নিকটে এনে—হাতে তুলে—আঘ্রাণ করে শোবার ঘরে শিয়রে রেখে তবে তার তৃপ্তি। কোন কোন মদির রাতে মালীবাড়ীর বাগান ভরে ফুল ফুটলে পাড়াটাই উতল হয়ে ওঠে গন্ধে। সে রাতে চাঁদ থাকে আকাশে, ঘুম হারিয়ে যায় দু'চোখ থেকে, দুয়ার খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সে। পায়চারি করে বাগানের এধার থেকে ওধারে। কি যেন সে চায়—কিসের অভাব তীব্র হয়ে ওঠে। কামনাই হয় ত—যৌবনের কামনা। প্রকৃতির পাত্রখানি পূর্ণ হয়ে ওঠে—সুধায় কিংবা সুরায়, ঐশ্বর্য্য কি মত্ততায়। অনেকক্ষণ ধরে ব্যথাটা বুকের মধ্যে চলাফেরা করে। ভোররাতে হাতে মুখে জল দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। একটি রাত শুধু শুধু কেটে গেল, জীবনের কিছু অংশ বৃথা ক্ষয় হয়ে গেল—এমনি মনে হয়।

কেশব ফুল দেওয়া বন্ধ করলেও—অন্য জায়গা থেকে ফুল জোগাড় করে সতীশ। বাড়ীর মধ্যে অল্প জায়গা। রোয়াকের নীচের হাত-মুখ ধোয়া জল পড়ে পড়ে যে জমিটুকু কাদা পাঁকে ভর্ত্তি হয়ে থাকে—তারই একটু দূরে খানিকটা জমি পাট করল সতীশ। রথের মেলা থেকে কিনল দুটি গোলাপের কলম—একটিতে তার লাল টকটকে ফুল ধরেছে—সেই দু'টি গাছ পুঁতল সেই জমিতে। তার পর জমির সারে আর সতীশের পরিচর্য্যায় গাছ দুটি সতেজ হয়ে উঠল, শাখা-প্রশাখায় ঝাঁকড়া হ'ল। সেই শাখাগুলিতে ধরল অজস্র কুঁড়ি। সতীশের আনন্দ দেখে কে!

প্রতিবেশিনীরা সতীশের মাকে বলল, আর কেন, এইবার বিয়ে দাও ছেলের।

মা সখেদে বললেন, কত বার কত রকম করে বলেছি—ছেলের ধনুকভাঙ্গা পণ, বিয়ে করবে না।

ওরা বিশ্বাস করল না কথা। বলল, ওমা—বল কিগো! জোয়ান ছেলে, উপার্জ্জন করছে, ফুল গাছ পুঁতেছে—ষোল আনা সখ রয়েছে মনে—বিয়ে করবে না কিগো!

মা বললেন, তোমরাই বলে দেখ—যদি বিশ্বাস না হয়!

আমাদের বলা আর তোমার বলা সমান হ'ল! জোর কর। বলগে—বিয়ে না করিস ত আমায় কাশী পাঠিয়ে দে।

সতীশ সব শুনে বলল, কাশী গিয়ে কিন্তু বাবা বিশ্বনাথকে দেখতে পাবে না মা, ওই হাপরই দেখতে হবে।

মা রাগ করে বললেন, কেন—কাশী যেতে পারি না?

আমায় রেঁধে দেবে কে? অসুখ হলে দেখবে কে?

ষাট—ষাট! কথার ছিরি দেখ। বলি আমারও সাধ আহ্লাদ বলে কিছু আছে ত? নাতি নাতকুড়ের মুখ দেখতে সাধ হয়—কি হয় না?

তা হলে আর কিছু দিন সবুর কর—আর একখানা ঘর তুলি। বিয়ে করে ঘরখানি দখল করে তোমাকে দাওয়ায় ঠেলে দিতে পারব না। এতে তুমি দুঃখ পাও, নাচার।

মা তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, কিন্তু সবাই যে নিন্দে করে। বলে আমারই দোষ। এই ত কাল কেশবের পিসী বৌমাকে নিয়ে দুপুরবেলা বেড়াতে এসেছিল। বলল, একটু চেপে ধর ছেলেকে, কাঁদাকাটা কর—না হলে—

সতীশ হেসে বলল, আমি যেদিন দুপুরে হাটে যাই—সেই দিনই তোমাদের মজলিস বসে! তা কেশবের বৌ কি বলল?

বলবে আর কি, পিসশাশুড়ী যতক্ষণ রইল জুজুর মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। বুড়ী ওকে রেখে অন্য বাড়ী বেড়াতে গেলে উঠে ঘরদোর দেখতে লাগল।

সতীশ হো হো করে হেসে উঠল। উঃ, কতই না ঘর! বললেন, সাজানো গোছানো রাজবাড়ী আর কি।

মা রেগে উঠলেন—ওরাই বা কি বড়লোক শুনি! যাই হোক, বৌটি খুব ভাল—লক্ষ্মী মেয়ে। এক একটি জিনিষ দেখে আর বলে, বাঃ, বেশ ত! কে এত সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছে খুড়ীমা। বলে, আপনারা ফুল খুব ভালবাসেন বুঝি? চমৎকার গোলাপ-গাছ দুটি হয়েছে। ঘরের কুলুঙ্গিতে মাটির ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছেও চমৎকার। ফুলদানির মধ্যে জল আছে বুঝি? নুনগোলা জল? ওই জলে বোঁটা ডুবিয়ে রাখলে ফুল তাজা থাকে দু'তিন দিন।

বললাম, ফুলের রাজ্যে বসে সামান্য দুটি গাছ যে তোমাদের চোখে ধরেছে—এই আশ্চর্য্য! তোমাদের বাগানে হেলায় ফেলায় যা ফুটছে আমরা আদেখলার মত তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখছি।

বলল, ফেলাফেলার জিনিষ বলেই যত্ন নেই। যারা বেশী খাবার পায়, তারাই নষ্ট করে বেশী। খানিক চুপ করে থেকে বলল, এবার সতীশদার একটা বিয়ে দিন খুড়ীমা, আপনার খাটা-খাটুনি কমুক।

ইঃ, মেয়েটা এরই মধ্যে বেশ পেকে গেছে ত! হেসে উঠল সতীশ।

কেন সবাই ত ওই কথাই বলে।

সবাইয়ের মুখে যা মানায়—ঐ পুঁচকে মেয়েটার মুখে তা শোভা পায় না। সবে সেদিন যার বিয়ে হ'ল—এরই মধ্যে তার মুখে গিন্নী-গিন্নী কথা।

সতীশ ঠাট্টা করে যাই বলুক—কামারশালায় বসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে মেয়েটি জানালার ধারে এসেছে কিনা?

এক বছর মাত্র বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে এত বিজ্ঞ হয়ে উঠেছে? খেলাঘর থেকে আসল ঘরে পৌঁছতে কতটুকু বা সময় লাগে! কিন্তু মনটাকে দৌড় করিয়ে নিয়ে যাওয়া ওইটুকু সময়ের মধ্যে···আশ্চর্য্য লাগে। কিশোরী কমলাকে যেন ফুলবাগানে আর মানায় না, কামারশালার কর্কশ অঙ্গনে ভারিক্কি চালে ওর পদচারণা সুরু হয়েছে।

৬

কমলা কিন্তু ফুলের রাজত্বেই বাসা বাঁধল। পিসীকে দিয়ে একটা মাটির ফুলদানি কিনিয়ে আনাল। সেটা নুনগোলা জলে ভর্ত্তি করিয়ে বাগানের সবচেয়ে সেরা ক'টি গোলাপ ডাঁটি সমেত কেটে গুছিয়ে রাখল তাঁর মধ্যে। চৌকিটা সরিয়ে আনল—যাতে শিয়রের দিকে পড়ে কুলুঙ্গিটা যেখানে ফুলদানিতে আছে গোলাপ-গুচ্ছ। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠল ঘর। পিতলের পিলসুজটা মাজল চকচকে করে। বাঁশের আগালিতে ঝাঁটা বেঁধে ঘরের ঝুল ঝাড়ল, পরিপাটি করে পাতল বিছানা। বাক্স, সিন্দুক সব ঝেড়ে-মুছে ঘরের শ্রী দিল ফিরিয়ে। সারা দুপুরবেলায় এই সব করল সে। কেশব তখন তাস খেলতে পাড়ায় বার হয়ে গেছে।

অপরাহ্ণে কেশব ফিরল। ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। ঘরের জিনিষ সব উলটপালট হয়ে গেছে। তক্তাপোষটা এগিয়ে এসেছে, বিছানাটা তক্ তক্ করছে—আর মিষ্টি মিষ্টি একটি গন্ধ, কুলুঙ্গিতে ফুলদানির মধ্যে গোলাপগুচ্ছ··· কেশবের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। চীৎকার করে উঠল, পিসী—পিসী, এ সব কি হয়েছে?

রান্নাঘরে খাবার তৈরি করছিল দু'জনে মিলে। পিসী উঠে এসে বলল, কেন, হয়েছে কি? ঘরখানা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে ত মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে নাকি?

হয় নি ত কি! বলি গাছের ভাল গোলাপগুলো কে তুলতে বলেছিল সর্দ্দারি করে? কাল মিটিং আছে স্কুলে, জেলার হাকিম আসবে—তাকে তোড়া দিতে হবে না?

হবে ত হবে, আর যেন ফুল নেই বাগানে। পিসী-অভ্যাসমত ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

ছুত্তোরি কাণ্ড। মেয়েমানুষের ডিম কত আর বুঝবে তোমরা। ফুল নিয়ে সখ করা সাজে আমাদের? মালীর ঘরে সখ, তোর সখের নিকুচি করেছে।

কুলুঙ্গি থেকে ফুলদানিটা নিয়ে আছড়ে ফেলল উঠানে। চীৎকার করে উঠল, ফের যেদিন এ সব দেখব রেয়াৎ করব না বলছি। হাড় এক ঠাঁই—মাস এক ঠাঁই করব।

দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেশব।

৭

সতীশ কামারশালার ঝাঁপ বন্ধ করছিল। কেশব তার সামনে এসে পড়তেই—ডাকল, কি গো বাবু, আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়েছ! দেখাই নেই।

কেশব মুখ তুলে চাইল না, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল খানিকটা।

সতীশ দৌড়ে এসে ওর কাঁধটা চেপে ধরল। বলি, ব্যাপারখানা কি। এত গোসা কেন?

কেশব বিরক্ত স্বরে বলল, ছাড়—ছাড়, কি যে ইয়ার্কি করিস! লাগছে।

লাগার মত কাজ করিস কেন! বলি বিয়ে করে অনেকে—এমন পায়াভারি হয় না কারও। আরে মুখখানা যে গোমরা করে রইলি! বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

কেশবের মনের তাপ ততক্ষণে শীতল হয়ে এসেছে। সতীশের কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল ও। গলার স্বর নামিয়ে বলল, ঝগড়া হয় সাধে! রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করলে কার না রাগ হয় শুনি?

ব্যাপার কি শুনি? আয় বাড়ীর মধ্যে আয়।

কেশবকে বাড়ীর মধ্যে টেনে নিয়ে গেল সতীশ। মাকে ডেকে বলল, মা, কেশবকে নিয়ে এলাম দুখানা রুটি বেশী করে দিও।

রোয়াকের কাছে এসে কেশবের নজরে পড়ল ফুলন্ত গোলাপ-গাছ দুটির উপর। বলল, বাঃ, চমৎকার ফুল হয়েছে ত! কবে পুঁতলি গাছ? কি সার দিয়েছিস?

সতীশ বলল, সার কোথায়! কি জাতের ফুল বল দেখি? গিছলাম রথের মেলায়—লাল টকটকে ফুল দেখে কিনলাম দুটো চারা। একটার ফুল কিন্তু ঘোর লাল হয় নি, কাঁটাও নেই গাছে, ফুলগুলো ইয়া বড় বড়।

ওটা পলনীরো। আর এটা বোধ হয় ব্ল্যাক প্রিন্স। ভাল জাতের গোলাপ।

কথা বলতে বলতে দু'জনে ঘরে এসে বসল।

ঘরের ভিতরে অন্ধকার—সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হয় নি। চৌকির উপর বসে কেশব বলল, বেশ গোলাপ ফুলের গন্ধ আসছে ত এখানে! আর আমাদের বাগানের ধারে ফুলের গন্ধ শোঁকবার জন্য পায়চারি করতে হবে না।

সতীশ হেসে বলল, যা বলেছিস।

মা এসে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে দিলেন। একখানি ছোট কাঁসার রেকাবি করে খান কয়েক রুটি ও খানিকটা গুড় এনে ওদের সামনে রেখে বললেন, তোদের দু'জনের খাবার এক সঙ্গে দিলাম।

জল খাবার শেষ হলে সতীশ প্রদীপের সলতে উসকে দিল। তারপর কুলুঙ্গি থেকে ফুলদানটা তুলে এনে বলল, দেখ দেখি কত বড় ফুল। সবচেয়ে ভাল ফুলগুলি তুলে এতে সাজিয়ে রাখি। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে যে গন্ধ পাচ্ছিলি—তা বাইরের নয়—

ফুলদানিটা একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল কেশব। দৃষ্টি ওর

উজ্জ্বল হয়ে উঠল অকস্মাৎ ; তারপর সেই দৃষ্টির দু'পাশে ছায়া নামল, ঘন গাঢ় ছায়া। সে ছায়া ছড়িয়ে পড়ল মুখমণ্ডলে। প্রদীপের কম্পমান শিখায় মুখটা তার অদ্ভুত থমথমে দেখাতে লাগল। কোন মন্তব্য না করে চুপ করে বসে রইল সে। তারপর তেমনি অকস্মাৎই উঠে হন্ হন্ করে রোয়াক দিয়ে নেমে চলে গেল।

বাড়ী ফিরল অনেক রাত্রিতে। পিসী ও কমলা তখন গভীর নিদ্রামগ্ন।

সকালবেলায় পিসীর চীৎকারে এ পাড়া ও পাড়া থেকে লোক এসে জুটল কেশবের বাড়ীতে। একটানা চীৎকার করে বুড়ী ততক্ষণ হাঁপিয়ে পড়েছে ; কিন্তু নতুন নতুন লোক আসতে দেখে বুড়ীর উৎসাহ বেড়ে গেল। কাঁকালে বাঁ হাত রেখে ডান হাতখানা নেড়ে নেড়ে চীৎকার করতে লাগল, দেখ গো—তোমরাই দেখ। কোন আবাগী সব্বনাশীর গরু সারা রাত ধরে মইমাড়ন করেছে ফুল বাগানে। একটি দুটি নয়--এক পাল গরু। যে যমে-খেকো আগড় খুলে গরু ঢুকিয়ে দিয়েছে বাগানে—সে যেন ঝাড়ে মূলে নিপাত যায়। সে যেন···

কেশব বেরিয়ে এল বাইরে। চেয়ে দেখল ফুলবাগানের পানে। চার পাঁচটি গরুতে সারা রাত ধরে চরে খুটে খেয়েছে—ফুলের গাছ থেকে দুব্বো ঘাসটি পর্য্যন্ত। প'তা, ফুল, কচি কচি ডাল কিছুই বাদ যায় নি ; শুধু শক্ত ডালগুলি শ্মশানভূমিতে পরিত্যক্ত বাঁশ-বাখারির মত ছড়িয়ে আছে।

কেশবকে দেখে ওর পিসী ডুকরে কেঁদে উঠল, ওরে কেশা—সব্বনাশ হয়েছে রে ! একটাও ফুল নেই যে বিক্রী করে—

না থাকুক—এধারে এস। প্রশান্ত স্বরে কেশব বলল। ফুল বেচে আজকাল দিন চলে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এস বাড়ীর মধ্যে।

পিসীকে বাড়ীর মধ্যে এনে দাওয়ায় বসিয়ে বলল, কাঁদ কেন ? আমি মনে করছি—নগদ গহনায় মিলিয়ে যা আছে—তাই দিয়ে তাঁত বসাব দুখানা। এখন কাপড়ের যা দর—তাতে উপার্জ্জন হবে খুব। দুধ আর কাঁচাগোল্লা খেতে পাবে একাদশীর দিন।

পিসীর সুর সপ্তম থেকে উদারায় নামল। দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে আপন মনে গুন গুন করতে লাগল।

কেশব ঘরের মধ্যে এসে কমলাকে বলল, বাক্সর চাবি খুলে যা গহনাপত্তর আছে বার করে দাও তো। আজই ওগুলোর বিলিব্যবস্থা করে তাঁত বসানোর ব্যবস্থা করব।

কমলা একটুও বিস্মিত হ'ল না—একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না। আঁচল থেকে চাবির রিংটি নিয়ে বাক্স খুলল। বাক্স থেকে একে একে বার করল—হার, চুড়ি আর মাথার চিরুণি। সেগুলো তক্তাপোশের উপর রেখে হাতের বালা দু'গাছাও টেনে টেনে খুলল।

গভীর রাত্রিতে পথের ধারের জানালা খুলে কামারশালার পানে চাইলে কমলা। অন্ধকার রাত। দূরের কাছের সমস্ত বস্তুই লেপে পুছে একাকার হয়ে গেছে। শুধু আমগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো আকাশ দেখা যায়। ঘন নীল আকাশ—জ্বলজ্বলে নক্ষত্র ফুটেছে তার গায়ে—ঠিক যেন সতীশদের বাড়ীর ছাঁচতলায় ফুলে ফুলে ভরা বহুশাখাপুষ্ট দুটি গোলাপগাছ কে বসিয়ে দিয়েছে। সেই ফুলগুলিই কি তারা হয়ে ফুটেছে আকাশের গায়ে ?

কিন্তু আকাশ কি উঁচু—আর কত দূরে !

কুন্তী ও সূর্য্য

শ্রীকৃষ্ণধন দে

কুন্তী

তুমি সূর্য্য ?

সূর্য্য

আর্যে, এতক্ষণে অবিশ্বাস ? সূর্য্য আমি,
আসি নিত্য পূর্ব্বাচলে, অপগত হয় যবে যামী।

কুন্তী

তুমি রবি, দিবাকর, মহাদ্যুতি, অন্ধকারহারী,
সর্ব্ব-পাপ-নিবারণ, পূর্ব্বাপরা-গগনবিহারী ?

সূর্য্য

ইচ্ছা হয় দাও মোরে স্তবমাল্যে আছে যত নাম,
তব সম্ভাষণ ভয়ে, সাধ হয় শুনি অবিরাম
ওই ফুল্ল বিম্বাধরে। বার বার ব্যঙ্গ-প্রশ্নছলে
ফোটে চারুরূপরেখা ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রতলে !
একাকিনী বনমাঝে নদীনীরে করি উষাস্নান
"এস, এস সূর্য্য" বলি করেছিলে কাহারে আহ্বান
মনে পড়ে ? বনতলে তব উচ্চ মধুকণ্ঠস্বর
আনিল আমারে হেথা, হেরিলাম যৌবন সুন্দর !

কুন্তী

স্বর্গের দেবতা তুমি ?

সূর্য্য

স্বর্গ ওই বহু ঊর্দ্ধে আছে,
তবু যেথা আছ তুমি, সেকি স্বর্গ নহে মোর কাছে ?
মিলন-সম্ভোগশেষে এ সংশয় এখনো কল্যাণি ?
মোর পরিচয়মাঝে কিবা পেলে অসত্যের বাণী ?

কুন্তী

এই বিশ্বে তব নাম কল্যাণ-আধার বিবস্বান্ ?

সূর্য্য

কেন প্রশ্ন বারে বারে ? আমারি আদেশে ঘূর্ণমান
ধরিত্রীর ঋতু-চক্র। ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, ইন্দ্রধনু, মেঘ,
পুষ্পে বর্ণ, ফলে বীজ, জীবনের স্পন্দন-আবেগ
সকলি আমারি সৃষ্টি। দ্রব করি সঞ্চিত তুষার
আমিই বহাই বিশ্বে বিধাতার ধারা করুণার।
তরুলতাতৃণে আমি আঁকি চারু স্নিগ্ধ শ্যামলিমা,
বেদে সংহিতায় কাব্যে শোন নি কি আমারি মহিমা ?
উদয়-বিলম্ব হেরি জাগে শঙ্কা নিখিলের বুকে,
এবার বিদায় দাও, কিবা ফল প্রশ্নের কৌতুকে ?
অদূরে বনানীপ্রান্তে ধরিব যে দিবাকর-বেশ
লোকচক্ষু-অন্তরালে। হে সরলে, আনন্দ অশেষ
পেয়েছি সেবায় তব। রুদ্ধজ্যোতি দ্বার পূর্ব্বাশার,
চঞ্চল সপ্তাশ্ব মোর ! অবসর কোথা মোর আর ?
হে তন্বি, যামিনীশেষে উদয়াচলের ব্যোমপথে
গতিহীন জ্যোতি-চক্র নিত্য-পরিক্রমণের রথে।

কুন্তী

তুমি চলে যাবে ঊর্দ্ধে, আমি পড়ি রব ভূমিতলে
কৌমার্য্যের গ্লানি বুকে, অনুতপ্ত নিত্য অশ্রুজলে।
ভাগ্যদোষে তব তেজে জন্মে যদি সন্তান আমার,
কি করিব লয়ে তারে ? অবাঞ্ছিত কলঙ্কের ভার
কোথায় লুকাব আমি ? নদীনীরে গড়ি পত্রভেলা
হয় ত ভাসাব তারে, তারপর ফিরিব একেলা
আপন গৃহের পানে, কৌমার্য্যের শুচি-দীপ্ত দেহে।
নির্ব্বাক্ ক্ষুধিত চিত্ত হাহাকার করি মাতৃস্নেহে
খুঁজিবে সন্তানে মোর, কেহ জানিবে না কোন কথা,
রবে চির অন্ধকারে অতিগূঢ় মরমের ব্যথা।
তারপর যদি কোন অতর্কিত অভিশপ্ত দিন
আমার সন্তানে আনে কাছে মোর পরিচয়হীন,
কেমনে চিনিব তারে ? বঞ্চিত ও বঞ্চিতার মাঝে
কোন-সে অলক্ষ্য স্নেহসূত্রখানি ছায়ারূপে রাজে
কে দেবে সন্ধান তার ? কোন্ স্মৃতি কোন্ অভিজ্ঞান
দেবে তার পরিচয় ? তৃপ্ত কোথা জননীর প্রাণ ?
লবে স্বর্গে তুমি সে সন্তানে ?

সূর্য্য

সে যে অসম্ভব অতি,
কেমনে যাইবে স্বর্গে ক্লেদময় মর্ত্ত্যের সন্ততি ?

কুন্তী

পেয়েছিলে পদ্মশিতে ক্লেদময় দেহ মানবীর,
ওগো স্বর্গচারি, যবে আসি তুমি কামনা-অধীর

হরিলে কৌমার্য্য মোর ? কোথা ছিল দেবত্ব তোমার,
মর্ত্ত্যের কর্দ্দমতলে লুটায়েছ যবে বার বার ·
মানবী-যৌবন লাগি ? স্বর্গে তব ছিল না অপ্সরী ?
মানবী এতই প্রিয় ? তাই আসি নররূপ ধরি
মর্ত্ত্যের ধূলির মাঝে ফেলে গেলে দেবত্বের সাজ ?
দেবতার চেয়ে হায় মানবী যে বড় হ'ল আজ।
তুমি চলে যাবে ঊর্দ্ধে, নিয়ে পৃথ্বী তোমারে ধিক্কারি'
মুছাবে আমার অশ্রু, হয়ে মাতা রহিব কুমারী।
একটি মানব-শিশু কোনদিন জানিবে না হায়,
ওই সূর্য্য পিতা তার। চিরদিন স্বর্গ-সীমানায়
প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে। দূরে রহি বঞ্চিতা জননী
অতীত দুঃস্বপ্ন মাঝে শুনিবে শিশুর কণ্ঠধ্বনি!

সূর্য্য

দিগ্‌বধূ-আলিম্পনে রক্তআভা ধরে পূর্ব্বাকাশ
মোর শুভ যাত্রাপথে। ব্যথিতার প্রতপ্ত নিঃশ্বাস
কেন এ বিদায়লগ্নে? আছে মোর বন-অন্তরালে
পরিত্যক্ত দেব-বেশ। কে জানে এখনি উষাকালে
আসিবে তপস্বী কেহ স্রোতস্বিনী হতে নিতে বারি,
তব সাথে হেরি মোরে প্রচারিবে কলঙ্ক তোমারি। ·
হে সরলে ভক্তিমতী, আশীর্ব্বাদ করি চিরদিন
এ তিক্ত-মধুর স্বপ্ন হয় যেন বিস্মৃতি-বিলীন।

কুন্তী

মানুষের বহু ঊর্দ্ধে দিয়াছিনু দেবতায় স্থান,
নিত্য পূজা আরাধনছলে তার কত গুণগান
করিয়াছি মুগ্ধ চিতে। ঊর্দ্ধে চাহি জুড়ি দুটি পাণি
অশ্রু-ছলছল নেত্রে মাগিয়াছি স্নেহাশিসুধানি।
মর্ত্ত্যভূমে দেবতারা নামে মানুষের রূপ ধরি
একথা শুনেছি কত। তাদের কল্পিত মূর্ত্তি গড়ি'
মানুষ করিছে পূজা। কিন্তু আজ একি করিলাম,
কৌমার্য্যলোভীর পায়ে ভক্তিভরে দিলাম প্রণাম!

সূর্য্য

হে তন্বি, অন্তরে যদি দিয়ে থাকি আঘাত কঠিন,
আমারে ক্ষমিও তুমি। ক্ষণিকের রূপ-মোহলীন
হয়েছিল চিত্ত মোর।

কুন্তী

আপনার মনে আসে লাজ,
পাপন্ন দেবতা যিনি, তাঁর এই হীনতম কাজ?

দুর্ব্বাসা দিলেন বর তুষ্ট হয়ে আমার সেবায়,
তাঁর দত্ত মন্ত্রে আমি ডাকি যদি কোন দেবতায়,
সে দেবতা নেমে আসি স্বর্গ হতে ধরার ধূলিতে
করিবেন বরদান যাহা মোর বাঞ্ছা জাগে চিতে।
নির্জ্জন কানন-প্রান্তে উষাস্নান করি নদীনীরে
কৌতূহলে ডাকিলাম সূর্য্যদেবে। প্রশান্ত সমীরে
আকাশ বাতাস ভরি প্রতিধ্বনি তুলিল সে-স্বর।
সহসা আসিলে তুমি নররূপধারী দিবাকর
বন-অন্তরাল হতে, হাস্যমুখে কৌতুক-নয়নে
করিলে জিজ্ঞাসা মোরে—"সূর্য্যে কেন ডাক সুলোচনে?"
আবেগে অধীর চিত্ত, ভক্তিতে সজল হ'ল আঁখি,
করযোড়ে বন্দিলাম। তুমি মোর শিরে কর রাখি
বলিলে মধুর স্বরে—"হে কুমারি আতপ্ত-যৌবনা,
সূর্য্য তরে উষাকালে সুগোপন কেন আরাধনা?"
বাণী সরিল না মুখে, তুমি মোর ধরি দুটি কর
করি কত অনুনয়, মোহময় স্বপন সুন্দর
দেখালে আমার চোখে। অকলঙ্ক নিদ্রিত যৌবন
প্রথম কামনা-স্পর্শে ধীরে ধীরে মেলিল নয়ন
অজ্ঞাত রহস্যলোকে। এ কি মায়া, এ কি ইন্দ্রধনু,
যারে কভু দেখি নাই, তনু ধরে আজি সে অতনু!
অধীর উৎসুক হিয়া এতকাল বঞ্চিত-কামনা
লভিল বিস্ময় নব, আশ্লেষের তপ্ত উন্মাদনা!
সারা অঙ্গ ব্যাপি ছোটে তড়িতের অপূর্ব্ব প্লাবন
শঙ্কায়, আনন্দে, লাজে। রূপে গন্ধে বিচিত্র ভুবন!
প্রতিরোধ-লীলাচ্ছলে করিলাম কত যে মিনতি,
তবু শুনিলে না কানে, নেমে এল নিষ্ঠুর নিয়তি
কৌমার্য্য-বিদায়লগ্নে। সর্ব্বহারা, চাহি তব পানে
বিস্ময়ে রহিনু স্তব্ধ, নারীত্বের ঘৃণ্য অপমানে!

সূর্য্য

ভবিতব্য ছিল যাহা, তার লাগি এ অনুশোচনা
তোমারে সাজে না তন্বি, করিয়াছ সূর্য্য-আরাধনা।

কুন্তী

তুমি দেব বিবস্বান্ নররূপে সম্মুখে আমার,
এ যে কত বড় ভাগ্য জানি আমি। কিন্তু যে ধিক্কার
জাগিছে দেবতা-নামে, তাহারে কেমনে করি দূর?
দেবতা মর্ত্ত্যের দ্বারে নেমে আসি ত্যজি স্বর্গপুর
মানবীর কাছে শুধু ভিক্ষা চায় কুমারী-যৌবন?
এ গ্লানি লুকাব কোথা? কিসে যাবে এ তীব্র দাহন?
যে দেবতা মহাদ্যুতি, তমিস্রারি, সর্ব্বপাপহারী,
নগণ্যা মানবীকাছে দাঁড়াল সে কৌমার্য্যভিখারী!

সূর্য্য

নরদেহে দেবতারা মর্ত্ত্যে যবে করে বিচরণ
ষড়্‌রিপুবশ তারা নরতুল্য ধরে আচরণ
দেবত্ব লুকায়ে রাখি। স্বর্গে আছে স্বর্গের মহিমা,
সে মহিমা লুপ্ত হয় লভে যবে মর্ত্ত্যের এ সীমা।
এবার বিদায় দাও, সপ্তাশ্বের ক্ষুরোত্থিত ধূলি
পূর্ব্বাশার মেঘে মেঘে ছড়াইছে স্বর্ণরেণুগুলি,
বিলম্ব সহে না আর। বনচ্ছায়ে দেবরূপ ধরি'
এখনি উঠিব নভে, তুমি হেথা তিষ্ঠ হে সুন্দরি।

কুন্তী

নভোচারি, যাও নভে। অনির্ব্বাণ শুধু বক্ষতলে
একটি স্মৃতির চিতা তিলে তিলে দহিবে অনলে!
সে প্রদাহ, সে বেদনা আমারে আচ্ছন্ন করি রবে
ভস্মাবৃত বহ্নিসম। জীবনের শত কলরবে
অবাঞ্ছিত শিশু এক কোথা হতে ক্ষীণ কণ্ঠে তার
আমারি উদ্দেশে হায়, উচ্চারিবে ঘৃণায় ধিক্কার
প্রতিদিন স্বপ্নমাঝে। উপেক্ষিতা ভাগ্য-প্রবঞ্চিতা
অলক্ষ্যে রহিব দূরে অতীতের স্মৃতিনিপীড়িতা,
নীরবে মুছিব অশ্রু। শুধু মোর দুঃস্মৃতির মাঝে
তোমার মানবমূর্ত্তি ক্ষণিকের প্রণয়ীর সাজে
দাঁড়াবে কৌতুকহাস্যে। শতরূপা শতপ্রিয়া এসে
কলহাস্যে উচ্ছ্বসিয়া তোমারে যে যাবে ভালবেসে
দেবতাজীবনে তব। মোর কথা ভাবিবে কি আর?
স্মরিবে কি সে রোমাঞ্চ, ক্ষণে ক্ষণে বেপথুসঞ্চার
তৃষাতপ্ত তনুতটে? যে নিভৃত আত্মনিবেদন
করেছে এ উষালোকে প্রেমস্নিগ্ধ আমার ভুবন
সে যে এবে জ্বালাময়! এই শান্ত বন-পরিবেশে
প্রথম অশান্ত হ'ল যে পিপাসা অজানা আবেশে
সে যে অভিশাপভরা! প্রতিদিন স্মরণে তোমার
যেই লজ্জা, যেই গ্লানি কশাঘাত দিবে বার বার
কেমনে ভুলিব তারে? তব স্পর্শে প্রতিরোধহীন
অশুচি যৌবন আজ ফিরে চায় পূত শুভ্র দিন।

সূর্য্য

হে কল্যাণি, ওই দুটি অশ্রুভরা আঁখি-নীলোৎপল
কভু ভুলিব না আমি। চিরদিন করিবে চঞ্চল
তোমার মধুর স্মৃতি। তবু মোর শোন এ মিনতি
আমারে ভুলিয়া যাও, অনুযোগ কেন মোর প্রতি?
আমার উদ্দেশে যদি কর পুনঃ মন্ত্র-উচ্চারণ,
পাবে না আমার দেখা। আমি চির রহিব গোপন।

কুন্তী

ব্যর্থ এ জীবনে মোর সে চিন্তার কোথা অবকাশ?
তোমার আকাশ মুক্ত, মেঘেভরা আমার আকাশ!
তুমি রবে বহু ঊর্দ্ধে, নিয়ে আমি কলঙ্ক-মলিন
চেয়ে রব তব পানে। উষা হতে সন্ধ্যা প্রতিদিন
হেরিব তোমার মূর্ত্তি গৌরবে প্রভায় সমুজ্জ্বল!
নিদাঘ-মধ্যাহ্নে যবে তব কর বর্ষিবে অনল,
বলিব তোমারে ডাকি—"দগ্ধ মোরে কর বিবস্বান্,
মৃত্যু মুছে দিক স্মৃতি, কলঙ্কের হোক অবসান।"
ঊর্দ্ধে চাহি অশ্রুনেত্রে জিজ্ঞাসিব মরমের কথা—
"হে বিধাতঃ, বলে দাও, কারে বলে স্বর্গের দেবতা?"
—যাও তবে দিবাকর, সপ্তাশ্ব-বাহিত দীপ্ত রথে,
দেখিও না তারে আর যে ফুল দলিত হ'ল পথে!

সূর্য্য

হে ভদ্রে, বিদায় তবে, চিরবিরহের পথ ধরি'
যাবে অস্ত এ তপন, মাঝে রবে অনন্ত শর্ব্বরী।

[বনপথে দ্রুত প্রস্থান করিলেন ও কুন্তী অশ্রুসজলচক্ষে দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। নির্ঝরিণীর কলতানে ও অরণ্যের পত্রমর্ম্মরে একটা করুণ সুর ধ্বনিত হইতে লাগিল।]

কালিদাস-সাহিত্যে বিপরীত বর্ণনা

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাব একত্র করিয়া তুলনামূলক ভাবে তাহাদের বর্ণনা করা মহাকবি কালিদাসের 'মায়ালেখনী'র এক মধুরতম বৈশিষ্ট্য। এক এক স্থানে কেবল একটি শ্লোকে নয়, শ্লোকের পর শ্লোকে তিনি ধারাবাহিক ভাবে বিপরীত ভাবের বর্ণনা করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেখানো গেল।

'রঘুবংশে'র পঞ্চদশ সর্গে মহাকবি শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক লবণ নামক এক রাক্ষস বধের বিবরণ দিয়াছেন। তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়া শত্রুঘ্ন যুদ্ধরত লবণ রাক্ষসের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেওয়াতে যখন তাহার বিরাট বপু ভূমির উপর পড়িয়া গেল, মহাকবি বলিতেছেন, তখন

'আননায় ভুবঃ কম্পং জহারাশ্রমবাসিনাং' (রঘু-১৫।২৪)

অর্থাৎ পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, আর আশ্রমবাসীদের কাঁপুনি বন্ধ হইয়া গেল।

রাক্ষসের দেহের গুরুভারে মেদিনী কাঁপিতে লাগিল, আর যে সব আশ্রমবাসীরা অদূরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, আর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেছিলেন, রাক্ষসকে নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহাদের কম্পন বন্ধ হইল।

তাহার পরের শ্লোকে মহাকবি বলিতেছেন,

লবণের দেহের উপর পড়িল আকাশ হইতে শকুনির দল, আর শত্রুঘ্নের দেহের উপর পড়িল আকাশ হইতে দেবতাদের ফেলা পুষ্পবৃষ্টি (রঘু—১৫।২৫)।

শকুনিরা অমঙ্গলের, আর পুষ্পবৃষ্টি মঙ্গলের প্রতীক।

এর পর কি হইল? মহাকবি সে বৃত্তান্তও বিপরীত বর্ণনার দ্বারা জানাইতেছেন—

লবণ রাক্ষসকে বধ করিতে পারিয়া নিজেকে ইন্দ্রজিৎ বিজয়ী লক্ষ্মণের উপযুক্ত ভাই ভাবিয়া শত্রুঘ্নের মস্তক গর্ব্বে উন্নত হইয়া উঠিল, তারপর যখন তপস্বীরা তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার গর্ব্বোন্নত শির লজ্জায় নত হইয়া গেল (রঘু—১৫।২৬,২৭)।

এখানে 'বিক্রমেণ উদগ্রং' অর্থাৎ গর্ব্বে উন্নত, আর 'ব্রীড়য়া অবনতং' অর্থাৎ লজ্জায় অবনত দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাবের কি সামঞ্জস্যপূর্ণ যোজনা।

'রঘুবংশের' পরশুরামের দর্পচূর্ণ গল্প হইতে একটি বিপরীত বর্ণনার উদাহরণ দিতেছি। পূর্ব্বাংশ বা context না জানা থাকিলে শ্লোকটির ব্যাখ্যা বুঝিতে অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া প্রথমে কিছু পূর্ব্বাংশ দিলাম।

রামচন্দ্র মিথিলায় 'হরধনু' ভঙ্গ করিয়াছেন শুনিয়া পরশুরাম আপনার বলবীর্য্যের শৃঙ্গ ভাঙিয়া গেল ভাবিয়া আহত পৌরুষের ক্রোধে আরক্ত হইয়া অযোধ্যায় ফিরিবার পথে রামের পথরোধ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাম যদি তাঁহার ধনুকটায় কেবলমাত্র ছিলা পরাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া লইবেন। রাম অনায়াসে পরশুরামের ধনুকে ছিলা পরাইয়া দিলেন। তখন দুই জনের—পরাজিত ভার্গবের মুখ, ও বিজয়ী রামচন্দ্রের মুখ মহাকবি কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নোক্ত শ্লোকে তাহা দেখানো গেল—

'তাবুভাবপি পরস্পর স্থিতৌ
বর্দ্ধমান পরিহীন-তেজসৌ।
পশ্যতি স্ম জনতা দিনত্যয়ে
পার্ব্বণৌ শশিদিবাকরাবিব॥ (রঘু-১১।৮২)।

দুইজনে তখন পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া—একজন তেজোহীন নিষ্প্রভ, আর একজন তেজের বৃদ্ধিতে প্রফুল্ল—যাহারা ভিড় করিয়া দেখিতেছিল, তাহাদের মনে হইতেছিল, যেন দিনের শেষে একদিকে সূর্য অস্ত যাইতেছেন, আর অপরদিকে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইতেছেন।

পরশুরাম ছিলেন সূর্য্যের মত প্রখর তেজোদৃপ্ত পুরুষ, পরাজিত হইয়া অস্তগামী সূর্যের মত নিষ্প্রভ ও মলিন, আর শান্তস্বভাব রামচন্দ্রের জয়ের আনন্দে প্রফুল্ল বদন যেন, পূর্ণিমার উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ মনোহর চাঁদ।

চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্তের উপমা দিয়া বিপরীত বর্ণনার আর একটি উদাহরণ দিলাম। শ্লোকটি 'রঘুবংশে'র অষ্টম সর্গ হইতে উদ্ধৃত। বহু বৎসর রাজ্যসুখ ভোগ করার পর বৃদ্ধ রঘু শেষ জীবন ভগবদারাধনায় যাপন করিবেন বলিয়া তাঁহার উপযুক্ত পুত্র অজের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে চলিয়া যাইতেছেন, আর তরুণ অজ রাজ্যশাসন করিবেন বলিয়া রাজবেশ ধারণ করিয়া পিতৃদত্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিতেছেন, এই ভাব দুইটি মহাকবি কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র—নিম্নলিখিত শ্লোকে দেখাইতেছি,

'প্রশমস্থিত পূর্ব্বপার্থিবং
কুলমভ্যুদ্যত নূতনেশ্বরম্।
নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলা
মুদিতার্কেন সমারুরোহতৎ॥' রঘু-৮।১৫

অর্থাৎ মোক্ষকামী পূর্ব্ব রাজা (রঘুকে) ও বংশের উন্নতিকামী নূতন রাজা (অজকে) দেখিয়া লোকের মনে হইতেছিল, যেন আকাশের একদিকে প্রভাতের মলিন শশী অস্ত যাইতেছেন, আর অপরদিকে প্রবুদ্ধ সূর্য সমারোহের সহিত উদিত হইতেছেন।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলের' চতুর্থ অঙ্কে এইরূপ চন্দ্র সূর্যের উপমা দিয়া মহাকবি যে বিপরীত বর্ণনা করিয়াছেন, সে শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ; তাহা এই—

'যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতোহরুণ-পুরঃসর একতোর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু ।।' (শকু-৪র্থ অ)

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আর অপর পার্শ্বে সূর্য অরুণকে সম্মুখে রাখিয়া উদিত হইতেছেন। একই সময়ে দুই তেজস্বীর—একজনের উত্থান ও অপর জনের পতন দেখিয়া মানুষের উচিত তাহাদের ভাগ্য বিপর্যায়ের অর্থাৎ জীবনের সুখ ও দুঃখ অবিচলিত ভাবে ভোগ করিতে শিক্ষা করা। এই শ্লোকে মহাকবি যেন বলিতে চাহেন যে, চন্দ্র ও সূর্যের উদয় ও অস্ত যেমন স্বাভাবিক তেমনি মানবের জীবনেও সুখ ও দুঃখ, পতন ও উত্থান স্বাভাবিক ভাবে যাওয়া-আসা করে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ প্রকৃতির নিয়ম নহে, যেমন উদয়ের পর অস্ত, অস্তের পর উদয়, তেমনি সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ আসিবেই। সুতরাং সুখের বা উন্নতির দিনে গর্বে বক্ষের স্ফীতি হওয়া যেমন অন্যায়, তেমনি দুঃখের দিনে বা জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করার সময় মুষড়াইয়া পড়াও তেমনি অবাঞ্ছনীয়।

মহাকবির বিপরীত বর্ণনার আরও একটি সুন্দর উদাহরণ 'রঘুবংশের' ষষ্ঠ সর্গে পাওয়া যায়। ভোজরাজের ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভা, বহু রাজা ও রাজপুত্র নিমন্ত্রিত হইয়া সভার একদিকে বসিয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন, আর অপরদিকে ভোজ-রাজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলে বসিয়া ইন্দুমতীর স্বামী-নির্ব্বাচন দেখিতেছেন। তারপর ইন্দুমতী যখন সকলকে ছাড়িয়া রাজকুমার অজের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিলেন, সেই সময় বরপক্ষের আনন্দ ও অপর রাজা এবং রাজপুত্রদের হতাশ অবস্থা মহাকবি কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে দেখাইতেছি—

'প্রমুদিত বরপক্ষমেকতস্তৎ
ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্লপদ্মং
কুমুদবন-প্রতিপন্ননিদ্র-মাসীৎ।' (রঘু-৮।৮৬)

অর্থাৎ, সভায় একপার্শ্বে তখন বরপক্ষীয় সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, আর অপরদিকে নরপতিদের দল শূন্যহৃদয়ে মলিন হইয়া বসিয়া রহিলেন, স্বয়ংবর-সভা তখন দেখাইতেছিল—যেন উষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরোবরের একপার্শ্বে পদ্মগুলি প্রফুল্ল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, আর অপরদিকে রাত্রের ফোটা কুমুদ ফুল নিমীলিত হইয়া যাইতেছে।

কেবল পূর্ণ শ্লোকগুলিতেই নয়, কতকগুলি শ্লোকাংশেও, এমন-কি কোনও কোনও স্থানে দুই-তিনটি শব্দের দ্বারাও মহাকবি তাঁহার বিপরীত-বর্ণনা-প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির উদাহরণ এখানে দেখানো গেল।

'অসহ্য-বিক্রমঃ সহ্যং দূরান্মুক্তমুদন্বতা'—(রঘু—৪।৫২) অসহ্য-বিক্রম রঘু সমুদ্রতীর হইতে দূরীভূত সহ্যপর্ব্বতে আসিয়া পড়িলেন—এখানে সহ্যপর্ব্বতে অসহ্য বিক্রম রঘু আসিয়া পড়িলেন বলাতে বুঝা যাইতেছে যে, মহাকবি যেন কেবল 'সহ্য' ও 'অসহ্য' এই দুইটি বিপরীতার্থমূলক শব্দের একত্র প্রয়োগ করিবেন বলিয়া 'অসহ্য-বিক্রম' শব্দটি ব্যবহার করিলেন।

আর একটি শ্লোকাংশ—

'শরৈরুৎসব-সঙ্কেতান্ স কৃত্বা বিরতোৎসবান্'—(রঘু—৪।৭৮) অর্থাৎ, উৎসব-সঙ্কেত জাতির বীরদিগকে তিনি শর নিক্ষেপের দ্বারা বিরতোৎসব করিলেন। 'উৎসব-সঙ্কেত'রা ছিল হিমালয় পর্ব্বতের এক যুদ্ধপ্রিয় জাতি, সেই 'উৎসব-সঙ্কেত' জাতিকে 'বিরতোৎসব' করিলেন লিখিয়া মহাকবি যেন 'উৎসব' ও 'বিরতোৎসব' এই দুইটি বিপরীতার্থবোধক শব্দের একত্র প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখাইলেন।

'রঘুবংশের' আর একটি শ্লোকে—

'নিগ্রহোহপ্যয়মনুগ্রহীকৃতঃ'—'আপনার এ নিগ্রহের দ্বারা আমি অনুগৃহীত হইলাম'। শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া পরশুরাম বলিতেছেন, 'পরমপুরুষ আপনি, আপনার এ 'নিগ্রহ' নিগ্রহ নয় আমার প্রতি 'অনুগ্রহ'। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে পরাজিত হওয়া পরশুরামের পক্ষে অপমান নয়, গৌরব।

মহাকবির বিপরীত বর্ণনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ রঘু ও অজ—পিতাপুত্রের তুলনামূলক কার্য্য বর্ণনায়—তাঁহার কবি-প্রতিভার অন্যতম চরম বিকাশ। যতিবেশধারী বৃদ্ধ রঘু ও রাজবেশধারী তরুণ অজের অস্তগামী চন্দ্র ও উদীয়মান সূর্যের সহিত উপমা পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে, তাহার পরও মহাকবি আরও কয়েকটি শ্লোকে উভয়ের কি ভাবে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা এখানে দেখাইব।

কালিদাস বলিতেছেন—

'যতিপার্থিবলিঙ্গধারিণৌ
দদৃশাতে রঘুরাঘবৌ জনৈঃ।
অপবর্গ মহোদয়ার্থয়ো
র্ভুবমংশাবিব ধর্ম্ময়োর্গতৌ।' —(রঘু—৮।১৬)

একজনের রাজবেশ, অপরে সন্ন্যাসী, তাই মহাকবি বলিতেছেন, 'যতিবেশধারী রঘুকে ও রাজবেশধারী রাঘবকে (রঘুপুত্র অজকে) দেখিয়া লোকেদের মনে হইতেছিল, যেন স্বয়ং ধর্ম্ম দুই অংশে বিভক্ত হইয়া, 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' এই দুই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অজ যেন ধর্ম্মের প্রবৃত্তি, ও রঘু তাঁহার নিবৃত্তি মূর্ত্তি।

মহাকবি এই বলিয়াই থামিলেন না, পিতাপুত্রের পরস্পরের বিপরীত ভাবগুলি একত্র করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাব বজায় রাখিয়া বর্ণনা করিয়া চলিলেন, অজ রাজা, রঘু সন্ন্যাসী ; অজ তরুণ, রঘু

বৃদ্ধ : অজ চাহেন সাংসারিক উন্নতি, রঘু চাহেন সংসার হইতে মুক্তি বা মোক্ষ, তাই মহাকবি বলিতেছেন—

'অজিতাধিগমায় মন্ত্রিভিঃ
যুযুজে নীতি বিশারদৈরজঃ।
অনপায়ি পাদোপলব্ধয়ে
রঘুরাপ্তৈঃ সমিয়ায় যোগিভিঃ।'—(রঘু—৮।১৭)

অর্থাৎ, অজের কাজ হইল যে দেশগুলি জয় করা হয় নাই, কি উপায়ে তাহা জয় করা যায় নীতিবিশারদ মন্ত্রীদের সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ করা, আর রঘুর কাজ হইল, কি উপায়ে মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়, তত্ত্বজ্ঞ যোগীদের নিকট হইতে সে বিষয়ে উপদেশ লওয়া।

প্রজাদের নালিশ শুনিয়া বিচার করার জন্য যুবা বসিতেন বিচারালয়ের বিচারপতির আসনে, আর চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করার জন্য বৃদ্ধ বসিতেন নির্জ্জনে পবিত্র কুশাসনে।

একজনের চেষ্টা হইল, কি উপায়ে অন্য সমস্ত রাজাদিগকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করাইবেন তাহার ব্যবস্থা করা, আর অপর-জনের কাজ হইল, কি করিয়া শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গুলি ও পঞ্চবায়ুকে আয়ত্তে আনিবেন সমাধি অভ্যাসের দ্বারা তাহার সাধনা করা।

এর পর মহাকবি আরও বলিতেছেন—

'অকরোদচিরেশ্বরঃ ক্ষিতৌ
দ্বিষদারম্ভ ফলানি ভস্মসাৎ।
ইতরো দহনে স্বকর্ম্মণাং
ববৃতে জ্ঞানময়েন বহ্নিনা।।' (রঘু-৮।২০)।

অর্থাৎ, 'অচিরেশ্বর কিনা নূতন রাজা (অজ) শত্রুদের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার (অনিষ্ট করার) ফল ভস্মসাৎ করিতে লাগিলেন, আর অপর জন (রঘু) জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা নিজ কর্ম্মফল দহন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ভগবদ্গীতায় 'জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ' এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি মহাকবি যেন এই শ্লোকটিতে শুনাইলেন।

একজন চলিয়াছেন বৈষয়িক উন্নতির পথে, অপর জন ধরিয়াছেন বৈরাগ্যের পথ, এই দুই বিপরীত পথের যাত্রীদের আরও বিবরণ দিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন—

দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহার প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করিলে ফল ভাল হইবে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া অজ সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি রকমারি নীতির প্রয়োগ করিতেন, আর রঘু সে সময়ে করিতেন কি? তিনি করিতেন সত্ত্ব রজঃ আর তম, এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থায় আনার চেষ্টায় 'লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে' সমজ্ঞান অর্থাৎ একের নীতি হইল 'ভেদ', অপর জনের হইল 'সাম্য'।

তার পর মহাকবি বলিতেছেন, 'স্থিরকর্ম্মা' নব-প্রভু অজ যে কাজে হাত দিতেন তাহা সফল না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতেন না, আর 'স্থিরধী' প্রাচীন রঘু পরমাত্মাকে দর্শন না করিয়া যোগাসন ছাড়িয়া উঠিতেন না। এইরূপে আপাত দৃষ্টিতে উভয়ের বিসদৃশ কর্ম্মের পরিণতি কি হইল, মহাকবি বলিতেছেন—

'প্রসিতাবুদয়াপবর্গয়ো
রুভয়োঃ সিদ্ধিমুভাবাপতুঃ।।' (রঘু-৮।২৩)

যে যাঁহার লক্ষ্য অনুসারে একাগ্রতার সহিত চলিয়া উভয়ে সিদ্ধিলাভ করিলেন, অর্থাৎ অজ পৌঁছিলেন উন্নতির চরমশিখরে, আর রঘু লাভ করিলেন নির্ব্বাণ মোক্ষ।

রঘুবংশের ষোড়শ সর্গে অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুখ দিয়া তাঁহার অতীতের সৌভাগ্যের দিনগুলির ও বর্ত্তমানের দুরবস্থার কাহিনী মহাকবি কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, অতঃপর তাহাই দেখাইব।

শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পর রামবিহীন অযোধ্যায় আর কাহারও বাস করার ইচ্ছা না হওয়ায় অধিবাসীরা সকলে একযোগে অযোধ্যা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ যিনি অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তিনিও সেখানে বাস করিতেন না, তিনি থাকিতেন কুশাবতীতে। অযোধ্যা তখন পতি-পুত্র-কন্যা সকলকে হারাইয়া শোকগ্রস্তা নারীর মত শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছিল, জনমানব কেহ সেখানে বাস করিত না, বাড়ীগুলি ভগ্ন, ঘাস ও জঙ্গলে পূর্ণ। এমনি সময় এক গভীর নিশীথে অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দীন মলিন বেশে কুশাবতীর রাজপ্রাসাদে মহারাজ কুশের শয়নগৃহে যাইয়া তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করিলেন। দেবীর উক্তির যেখানে যেখানে বিপরীত ভাবের বর্ণনা আছে, কেবল সেইগুলিই এখানে সংক্ষেপে দেখানো গেল। দেবী বলিতেছেন—

'সোপানমার্গেষু চ যেষু রামাঃ
নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যোহতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং
ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে।।' (রঘু-১৬।১৫)

আমার (বাড়ীগুলির) যে সমস্ত সিঁড়ির ধাপের উপর পূর্ব্বে নারীদের আলতা-পরা পাগুলি চলাফেরা করিত, এখন সেই সিঁড়ির ধাপের উপর দিয়া চলিয়া থাকে সদ্যপশুবধজনিত রক্তে লিপ্ত ব্যাঘ্রদের পা!

রাজপথগুলির বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইবার জন্য দেবী দুঃখ করিয়া বলিতেছেন,

'নিশাসু ভাস্বৎ কলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চরোহভূদভিসারিকাণাং।।' ইত্যাদি

অর্থাৎ যে রাজপথের উপর দিয়া নিশীথ রাতে অভিসারিকা নারীরা নূপুরের সুমিষ্ট ধ্বনি করিতে করিতে চলিত, সেই রাজপথ দিয়া চলে এখন শৃগালের দল, মুখে উল্কা লইয়া মাংসের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়।

রাজপথের নিশীথ পথিক—পূর্ব্বে নারীর দল, বর্ত্তমানে

শৃগালের দল। পথের দুর্ভাগ্য এর চেয়ে বেশী আর কি হইতে পারে?

আর এক শ্লোকে মহাকবি বলিতেছেন—

'আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈঃ
মৃদঙ্গ ধীর ধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ
শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি, দীর্ঘিকানাম্ ॥' (রঘু-১৬।১৩)

যে দীঘির জলে স্নান করার সময় নারীরা জলের উপর মৃদু মৃদু আঘাত করিতেন বলিয়া জল হইতে মৃদঙ্গের ধ্বনির মত সুমিষ্ট শব্দ শুনা যাইত, সেই সমস্ত দীঘির জলে পড়িয়া থাকে এখন বুনো মহিষের দল, তাহাদের শৃঙ্গের আঘাতে জলের কর্কশ ধ্বনি যেন শুনিতে পাওয়া যায় না।

রঘুবংশের সপ্তদশ সর্গে কুশের পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র মহারাজ অতিথির জীবনীতে বিপরীত বর্ণনার অনেকগুলি উদাহরণ পাওয়া যায়, পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দেখানো গেল।

'ধূমাদগ্নেঃ শিখাঃ পশ্চাদুদয়াংশবো রবেঃ।
সোঽতীত্য তেজসাং বৃত্তিং সমমেবোত্থিতো গুণৈঃ ॥'
(রঘু-১৭।৩৪)

অর্থাৎ, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে প্রথমে বাহির হয় ধূম, পরে দেখা দেয় তাঁহার শিখা, সূর্য্যও উদিত হয়েন প্রথমে, তারপর বিকীর্ণ হয় তাঁহার কিরণজাল; তেজস্বীদের ইহাই স্বভাব, কিন্তু রাজা অতিথির বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল, রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার গুণরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

আর একটি শ্লোকে মহাকবি বলিতেছেন—

'সর্পস্যেব শিরোরত্নং নাস্য শক্তিত্রয়ং পরঃ।
স চকর্ষ পরস্মাত্তৎ অয়স্কান্ত ইবায়সম ॥' রঘু-১৭।৬৩

অর্থাৎ, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া লয়, তিনিও তেমনি শত্রুদের শক্তি আকর্ষণ করিয়া লইতেন, অথচ সর্পের মস্তকস্থ মণি যেমন কেহ কাড়িয়া লইবার সাহস করে না, তাঁহারও শক্তি সম্পদ কোনও শত্রু বলপূর্ব্বক লইবার সাহস করিত না।

মহারাজ অতিথির সম্বন্ধে কালিদাসের আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

'প্রবৃদ্ধৌ হীয়তে চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি তথাবিধঃ
সতু তৎসমবৃদ্ধিশ্চ না চাভূত্তাবিবক্ষয়ী ॥' রঘু-১৭।৭১

অর্থাৎ, চন্দ্রের বৃদ্ধি হওয়ার পর তাঁহার ক্ষয় আরম্ভ হয়, সমুদ্রের বেলাতেও তাই (স্ফীতির পর হ্রাস), কিন্তু রাজা অতিথির উন্নতি চন্দ্র-সমুদ্রের মত কেবল বৃদ্ধি পাইয়াই চলিল, কিন্তু তাহাদের মত ক্ষয় হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না।

রঘুবংশের আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। দেবতারা রাবণের অত্যাচারে অস্থির হইয়া নারায়ণের নিকট নিজেদের দুঃখ নিবেদন করিতে যাইয়া তাঁহার স্তব করিয়া বলিতেছেন—

'অজস্য গৃহ্নতো জন্ম নিরীহস্য হতদ্বিষঃ।
স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদকস্তব ॥' রঘু-১০।২৪

তোমার জন্ম নাই, তবু তুমি (পৃথিবীতে অবতাররূপে) জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, তোমার কর্ম্ম (কর্ত্তব্যকর্ম্ম) নাই, তবু তুমি শত্রু বিনাশ কর, তুমি যখন যোগনিদ্রায় অভিভূত হও, তখনও তুমি জাগিয়া থাক, তোমার স্বরূপ কে বুঝিতে পারে?

বৈশাখী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এনেছি বৈশাখী চাঁপা, লও তুমি, লও তুমি তুলে।
মধু-মাধবের রাতে উঠেছিল পূর্ণিমার শশী,
সে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না বুঝি অন্তরের অন্তঃস্থলে পশি'
বিকশিয়া তুলেছিল জীবনের সহস্র মুকুলে।
প্রাণ হয়েছিল পূর্ণ বর্ণে গন্ধে বিচিত্র সে ফুলে,
আজো হেথা সে বসন্ত থেকে থেকে উঠে কি নিঃশ্বসি',
সেই চন্দ্রালোকগীতি আজো হেথা উঠে কি উচ্ছ্বসি?
আজো কি সে আকর্ষণে হৃদিসিন্ধু উঠে দুলে দুলে?

হয়ত ফাল্গুন গেছে চ'লে গেছে চৈত্রের রজনী,
দেয় না দক্ষিণা আর সৌন্দর্য্যের সে ঐশ্বর্য্য ঢালি,
কোকিলের কুহুস্বরে উঠে নাকো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি,
অজস্র জ্যোৎস্না মেখে এ আকাশ হয় না রূপালি,
তবু জানি পুষ্পভরা, প্রীতিভরা শ্যামলা ধরণী,
বৈশাখে এনেছি তাই হিরণ্ময় চম্পকের ডালি।

বাসাংসি জীর্ণানি

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শুষ্কসঞ্চ চ্যুতপত্র একটা মাঘ মাসের গাছ। ফুল ঝরে গেছে, পাতা শুকিয়ে একটা একটা করে ঝরে পড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে তবু রস-সজীব গাছটা, পত্রহীন শাখা-প্রশাখায় রস সঞ্চালিত করে দাঁড়িয়ে আছে খসে-পড়া পাতা-ফুলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। যা গেছে, তা গেছে। আবার ত নূতন সম্পদ এসে ঢাকবে তাকে একটু একটু করে। ফাল্গুন ত আবার আসবে।

ভাগ্য-পরিবর্তনের আবর্তে কল্যাণীও ঠিক এমনি একটি গাছের মত দাঁড়িয়ে আছে। এত সব ঠিক বোঝে কিনা কে জানে, কিন্তু দ্বিধাহীন পরিচ্ছন্ন মুখে দুঃখের ছাপ বোধ করি চেপে বসে না। সহায়-সম্বল নেই, আত্মীয়-শুভানুধ্যায়ীরা ঝরে পড়েছে, খসে পড়েছে একে একে জীর্ণ বস্ত্রের মত। কিন্তু কল্যাণীকে কেউ বিষণ্ণ হতে দেখে নি, অসহায় আর্তনাদে একটা দিনও ভেঙে পড়ল না সে। সরস মুখে একটা দাগ পড়ল না, কপাল একটা রেখাতে শ্রীহীন হয়ে উঠল না।

মাত্র সাত বছর বয়স, মা মরে গেল অনেক দিন ভুগে ভুগে। ডাক্তাররা রোগের কোন হদিস পান নি, মাস দুই ভোগের পর মা যন্ত্রণায় কাঁদত দিনরাত। কল্যাণী মাটির পুতুলের মত টুকটুকে সাজে পাশে বসে থাকত। পাড়াগাঁয়ের আশ্রিত পিসীমা টিপ-কাজল পরিয়ে সাজিয়ে দিতেন দু'বেলা, কল্যাণী নরম চোখ দুটি তুলে মায়ের কাছে বসে কান্না দেখত।

—আমি মরে গেলে তুই কাঁদবি ?

ঘাড় নাড়ত কল্যাণী—কাঁদবে না। বাইরে বৈশাখের শুকনো বাতাসে উর্দ্ধমুখী চোরপালতার ভুট্টার মত থোকা থোকা লাল লাল ফুলগুলো ঝিলিক দিত চোখ-ঝলসানো সূর্য্যের আলোয়। চিলের কর্কশ শব্দ ভাসত ওপরের আকাশে। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলত, একমাত্র মেয়েটা না জানি এমনি করে হয় ত কতদিন এসে বসে থাকবে এখানে।

মা মরে গেল একদিন। কল্যাণী কিন্তু কাঁদল না, দেখল শুধু একধারে দাঁড়িয়ে শোকের তীব্র দাবদাহ।

দিন দশ পর পিসীমা সাজিয়ে দিলেন বিকেলবেলা, বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। একটু দূরে মাঠের উপর নিয়ে গিয়ে বাবা দুঃখটা চেপে বললেন, তোর মায়ের জন্ত কষ্ট হয়, না রে ?

না, বাবা।

ক্লিষ্ট পিতার মুখের ওপর নিপতিত হ'ল সরল, আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টি, নিঃশঙ্কচিত্তে প্রশ্ন করল তার পর কল্যাণী, তোমার কষ্ট হয় নাকি ?

হয়।

মিথ্যে কথা। কখখনো না। একটা ছায়াশীতল ছোট গাছ লক্ষ্য করে ছুটতে আরম্ভ করল ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে কল্যাণী।

বছর তের বয়স, বাবাও চলে গেলেন। সেই বিধবা পিসীমার হাতে ছিটকে পড়ল কল্যাণী। স্নেহপ্রবণ পিসীমা, দুঃখে কাঁদেন কেবল অহোরাত্র। এই বিপুল পৃথিবীতে একমাত্র আশ্রয়-স্থল ভাইটি তাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল, মাথার উপর একটি শিশুকে আবার চাপিয়ে দিয়ে। ফুটো নৌকা নিয়ে পার হতে হবে দামোদরের হড়পা বান। ছায়াহীন জলহীন নির্ম্মম দেশ, সত্যিকার সমবেদনা কেউ দেখাবে না। মৃত্যুকামনা করতে ভয় হয়—বোধ করি অসহায় মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়েই।...

বর্ষাকাল। ভাই যাওয়ার পর বছর দুই পার হয় নি, সান্নিপাত একসঙ্গে চেপে বসল পিসীমার দেহে। শরীরটা থর থর করছে ক'দিন। একটানা ঝিমঝিমে বৃষ্টির মধ্যে একটু সকাল সকাল কাজকর্ম্ম সেরে ফেললেন তিনি। কল্যাণীকে খাইয়ে উভয়ে শুয়ে পড়তে যাবেন, নিরীহ মেয়েটার শান্ত মুখখানিটির দিকে চোখ পড়তেই পিসীমার অন্তরটা মোচড় দিয়ে উঠল। হাত ধরে বিছানায় টেনে এনে বললেন, আহা রে! আমি না থাকলে কার কাছে শুতিস ?

হেসে ফেলল কল্যাণী, বলল, যাও না তুমি চলে। আমি বেশ একলা থাকতে পারি।

দূর, পাগলা মেয়ে।

সত্যি পিসীমা। আমার একটুও ভয় করে না।

এবার পিসীমারই মুখ মলিন হবার পালা। যেন হঠাৎ থেমে, থিতিয়ে গেলেন। উপেক্ষা, না নির্বুদ্ধিতা ? শুয়ে শুয়ে বাইরের বৃষ্টির শব্দের দিকে কান খাড়া করে রইলেন কতক্ষণ; ভাদ্রের অন্ধকারে শিশিরের ফোঁটার মত টপ টপ করে জল পড়ছে, খড়ের চালের ওপর একটানা শব্দের গমক একটা। ময়চে-কালি মাখা বিষ্ণুপুরী চৌকো লণ্ঠনটা অতি ক্ষীণ ভাবে জলছে জানালার উপর, পাশের ডোবাটা থেকে শোনা যায় ব্যাঙের অন্তর-চমকানো অশ্রান্ত কলরব। কুসংস্কারে জোড়াতালি দেওয়া পিসীমার মন, নড়বড়ে হয়ে গেল একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায়। এমন অদ্ভুত কথা বলে কেন এই অভাগা মেয়েটা! একলা থাকতে পারে—একটুও ভয় করে না!

চাপা অন্ধকার, ভিজে অস্বস্তিকর আবহাওয়া, পিসীমার ভয় করে উঠল হঠাৎ একটেরে এই বাড়ীতে। অনেকদিন আছেন, কল্যাণীর তখন জন্ম হয় নি। সে সময় এ বাড়ীর রূপ ছিল আলাদা, কেরাসিন ল্যাম্পের আলোয় মত দপ দপ করে জলত এ ঘর থেকে

ও ঘর পরিষ্কার উজ্জ্বলতায়। তারপর বাতির তেল ফুরিয়ে গেল ভরদুপুর রাতে, চৌকো একটা ছোট লণ্ঠন সামান্য একটু আলো ছড়িয়ে ঘরদুয়ারের অন্ধকার আরও ঘন করে তোলে আজ। তাও আবার জোনাকির নরম আলো নয়। কালি-পড়া শিষ-ওঠা কেরোসিনের চোখ-ধাধানো অপ্রীতিকর আলো। ছায়া কালো কালো কিলবিল করছে চারপাশে, দপ করে নিবে গেলেই ঝি ঝি শব্দে আছড়ে পড়বে গায়ের উপর!

—রাম রাম—পিসীমার সুপ্ত মন বলে উঠল নিঃশব্দে।

কল্যাণী তাকিয়ে দেখছে পিসীমাকে, কোনও উদ্বেগের ছাপ নেই তার উজ্জ্বল চোখে। প্রশ্ন করল, তোমার ভয় করছে না, পিসীমা?

চমকে উঠলেন তিনি একটু, ও, তুই ঘুমোসনি?

না।

নীরবে একটু সরে এলেন পিসীমা, ঝিমঝিমে শরীর নিয়ে শুয়ে রইলেন একভাবে। কল্যাণী তাঁর একটা হাত বুকের উপর টেনে এনে চেপে ধরে রইল, একটু কি ভেবে বলল, জানো পিসীমা, আমি মাকে এখনও স্বপ্ন দেখি—প্রায় রোজই। এক এক দিন জেগে জেগেই মনে হয়, মাকে চোখের সামনে দেখছি।

গলায় হাতে কয়েকটা কবচ পিসীমার, নানা ঠাকুরের আশীর্ব্বাদী মন্ত্রপূত রূপার-পিতলের মাদুলীগুলো কল্যাণী আনমনে খড় খড় করে নাড়তে লাগল চুপ করে—আবছা অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে। বলল, কাল রাত্তিরবেলা দেখলাম, মা যেন আমাকে সাজিয়ে দিচ্ছে, পাশে কত গয়না। দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু কেমন যেন পিছনে পড়ে গেলাম, ঘুমটা ভেঙে গেল।

আর কি দেখেছিলি?

পড়ে যেতেই গয়নাগুলো দেখতে পেলাম না। ঢোক গিলল একটা কল্যাণী—ভাদ্রের ভাপসা গরমে খাবি খাবার মত করে—আর—আর—বাড়ীতে যেন শুধু আমি একা।

শিউরে উঠলেন পিসীমা, এ ধারের হাতটাও কেঁপে উঠল। কল্যাণী কিন্তু নড়ল না, পিসীমার হাতটা মৃদু চাপ দিয়ে প্রশ্ন করল, খুব খারাপ, নয়? পড়ে গেলাম যে!

পিসীমা হাতটা টেনে নিলেন ধীরে ধীরে, সাহস দিয়ে বললেন, না, না, স্বপ্নে পড়ে গেলে ভালো ফল হয়।

ভালো ফলের আশা-আশ্বাস দিয়েও কিন্তু পিসীমার নিজের আতঙ্কিত অন্তর শান্ত হ'ল না। সর্দি, বাত চেপে বসতে লাগল আরও, পাটঘোর দিয়ে জ্বর এল একদিন। দিনদশেক বেহুঁশ পড়ে থাকার পর অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন, সেই কাকা বাড়ীর স্বপ্ন। অতগুলো মাদুলী-কবচের রক্ষামন্ত্র বিফল করে পিসীমা দেহ রাখলেন দিন পনের পর। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত তিনি মরবার আগে বেশ জ্ঞান ফিরে পেলেন ঘণ্টাখানেক, কল্যাণীকে ডেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমার যদি কিছু হয়, রমাই কাকার কাছেই থাকবি। পাতানো সম্পর্ক হলেও তার কাকীমা তোকে ফেলতে পারবে না দেখিস। আর—আর—তোর মায়ের গয়নাগুলো হাতে হাতে রাখবি। ওতেই তোর বিয়ে হয়ে যাবে।

কল্যাণীর দুঃখে পিসীমার চোখে জল এল, এই বোধ হয় শেষবার। কিন্তু কল্যাণী কাঁদল না একটুও, স্বচ্ছন্দ নির্লিপ্ততা নিয়ে মাসকয়েকের মধ্যে দাঁড়াল গিয়ে রমাই কাকার পদচ্ছায়ায়। শুধু কিছুদিনের একটা ছায়া সরে গেল, নির্মোক ত্যাগ করে মেঘমুক্ত জ্যোতিষ্কের মত সে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল আরো। শ্যামল শালগাছের স্নিগ্ধতা লাগল মেয়ের গায়ে। কুমোরের চক্রনেমিতে মৃত্তিকাখণ্ড পাক খেতে খেতে শিল্পীর হাতের স্পর্শে রূপায়িত হ'ল একটি সুন্দর মৃন্ময় পাত্র। মৃন্ময় নয়, চিন্ময়—শতদল পাপড়ি মেলল সূর্য্যের প্রাণস্পর্শে। কল্যাণী যেন এতদিনে একটা মলিন কাপড় ফেলে কলকা দেওয়া চওড়া পাড়ের জমজমাট ছাপা শাড়ি পরল।

লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়ে শহরে এল কল্যাণী। রমাই কাকা ডাক্তার, বোধ হয় রোগীদের বিদেয় করে খাতাপত্র দেখছিলেন। কাকাকে বিরক্ত না করে সরাসরি ভিতরে চলে এল কল্যাণী। গৃহিণী রমলা কতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে, চৈত্রের খররৌদ্র তখন মাথার উপর আগুন ছড়াচ্ছে। পায়ের মাটির উপরও লকলক করে শিষ উঠছে এ সময়টায়। কল্যাণী স্তব্ধ হয়ে মৌনভাবে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। কাকীমা প্রশ্ন করলেন, তুমি লক্ষ্মীদির মেয়ে?

হাঁ।

তা হলে তোমার তো কেউ নেই?

না, কিন্তু আপনারা তো আছেন।

কাকীমা নেমে এসে মাথায় হাত রাখলেন কল্যাণীর, বললেন, রোদটা থেকে উঠে চল মা, হাতে পায়ে জল দাও। আহা! দিদিকে দেখেছিলাম সেই কখন একবার, তোমাকে প্রথম চিনতে পারি নি।—রমলা কল্যাণীর চিবুকে হাত দিয়ে চুমা খেলেন, বিস্মিত হয়ে মুখের দিকে তাকালেন বার বার করে। হঠাৎ এক যুগ আগের কথা মনে পড়ল—রমলার মেয়ে মারা গেছে। পানের মত মুখ, চোখের কালো ইশারা, বাঁপাশে চেপে চলার একটু লঘু-ছন্দায়িত পদক্ষেপ—ঠিক সেই মেয়ের মত। বেঁচে থাকলে সে আজ 'মা' বলে হয়ত এমনি করেই কাছে ও এসে দাঁড়াত। বুকের মধ্যে সঞ্চিত কতকটা বাষ্প কণ্ঠ বেয়ে ঠেলে বের হতে চাইল, স্খলিত পদে রমলা কল্যাণীকে হাত ধরে উপরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। হাতে মুখে জল দিলেন নিজে, খাটের উপর এনে বসালেন। সামনের ছোট কাচের আলমারীতে পরিপাটি করে সাজানো পুতুল, মাটির ফল, নানা রকমের খেলনা পালকি। ছেড়ে-যাওয়া সেই মেয়ের স্মৃতিচিহ্ন। কাকীমার দৃষ্টি অনুসরণ করে কল্যাণী দেখল, তিনি আলমারীটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছেন, একটু সঙ্কোচ করে বলল, আমার সুটকেসটা এখানেই থাকবে?

কি আছে ওতে?

কল্যাণী হাসিমুখে সুটকেসটা খুলে বের করল পুটলি একটা, মায়ের দেওয়া অলঙ্কার। তার মধ্যে সোনার গোট, বাউটি দেখে পুলকিত হয়ে উঠলেন রমলা, বললেন, এ সব সেকালের গয়না। এই ধরনের জিনিষই আমার মেয়ের বিয়েতে দেব ভেবেছিলাম—

—আপনার মেয়ে?

কল্যাণীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রমলা বললেন, বেঁচে থাকলে ঠিক তোমার মতই দেখতে হ'ত।...

প্রথম শীতের সকালবেলায় আলতো ভাবে দীঘির জল ছুঁয়ে যেমন কুয়াশা থাকে, তেমনি রমলার স্নেহ কল্যাণীকে ঘিরে জড়িয়ে রইল। ডাক্তার চৌধুরী একদিন চটির শব্দ করতে করতে উপরে উঠে এলেন ছেলেকে ডাকতে—বিমান, বিমান গেল কোথায়? শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে দেখলেন, কল্যাণী তাঁর বিছানা তৈরি করছে, দাঁড়িয়ে পড়লেন: বিমান—

—তিনি নীচের ঘরে পড়ছেন বোধ হয়—

নীচের ঘরে?

অত চেঁচাও কেন?—রমলা বারান্দায় কাপড় মেলতে গিয়েছিলেন, ভিজে হাতটা আঁচলে মুছতে মুছতে এলেন; ইশারায় স্বামীকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, সে নীচের ঘরে না থাকলে পরের মেয়ে—

ও। কিন্তু ওকে যে হাসিরহাটি থেকে দেখতে এসেছে।

আদেশের স্বরে রমলা বললেন, ওদের যেতে বল আজ। আমরা পরে খবর দেব।

কড়া চুরুট মুখে ধোঁয়া উদগিরণ করছিলেন ডাক্তার, প্রশ্ন করলেন, তার মানে?

—মেয়ের বিয়ে আগে না দিয়ে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। কল্যাণীর জন্যে শিবনাথের মায়ের কাছে আমি বিমানকে পাঠিয়েছি। ভাইপোর বিয়েতে এসেছে, কলকাতায় ওদের বাড়ী আছে, ছেলেটি ডাক্তারী পড়ছে। আমার মেয়ে বেঁচে থাকলেও ত এমনি বিয়ে দিতে হ'ত। তা ছাড়া, তোমার লাগবে না এমন কিছু, মা মেয়েকে যথেষ্ট গয়না দিয়ে গেছে।

মুখের চুরুটটা হাতে ধরে ডাক্তার স্ত্রীকে দেখতে লাগলেন। নিষ্ঠাবান হিসেবী লোক, বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বিচার করেন তিনি, রমলা থামতেই বললেন, তুমি পাগল হ'লে নাকি? ও এসেছে, থাক কিছুদিন। তারপর ওর এক মাসীমা আছেন, পাঠিয়ে দেব সেখানে। এসব ঝামেলার মধ্যে যেয়ো না, বুঝলে?

কিন্তু নিজের মেয়ে আজ বড় হলে বিয়ে দিতে না?

নিজের মেয়ের দিতাম। তুমি আগুন নিয়ে খেলতে যেয়ো না। তোমার জানা উচিত, বড় ছেলে ঘরে রয়েছে।

—দাঁড়াও। গমনোদ্যত স্বামীর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন রমলা, মুখের উপরের চুলগুলো সরিয়ে বলে উঠলেন, তুমি রোগী আর মরা মানুষ চেন শুধু, জীবনের আর এক দিকের কি জান? কল্যাণীর মুখের পানে তাকিয়ে দেখেছ?

জবাব দিতে পারলেন না, একটা ভ্রূভঙ্গি করে ডাক্তার চৌধুরী নীচে চলে গেলেন। সিঁড়িতে বঙ্কিম ধূম্ররেখা ছড়িয়ে পড়ল কতকটা। সেই রেখা তখনও মিলায় নি, বিমান উঠে এল, ডাকল—মা!

রমলা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, সম্পূর্ণ সফলকাম হয় নি সে। বললেন সুবিধে হ'ল না বুঝি?

কল্যাণী কি একটা বই নাড়াচাড়া করছিল, একবার চোখ তুলেই বইটা রেখে চলে গেল নিজের ঘরে। বিমান ঘরের মধ্যে গিয়ে বলল, 'কিন্তু' 'কিন্তু' করে কেবল। মেয়ে দেখব, ছেলে কি বলে, এই সব।

এই কথা? আচ্ছা, তুই যা। আর শোন একটা কথা—গলার স্বর বেশ সরু করে রমলা বললেন, তোর বাবাকে বলিস, নিজের কথাটা ভেবে দেখবার জন্যে একটু সময় চাস। পারবি?

মায়ের স্মিতমুখের দিকে তাকিয়ে বিমানও হেসে ফেলল, বলল, একটু কেন মা, অনেক পরে দিও। কিন্তু বাবাকে।

লজ্জা করবে?

চুপ করে রইল বিমান।

—তা হোক, বলিস। বলেই চলে আসবি। দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে উঠলে বলবি। পারবি না?

ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে চলে গেল বিমান।

রবিবার। দুপুরবেলায় বিমান নীচের ঘরে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের একটা ভারী বই তন্ময় হয়ে পড়ছে, কল্যাণী পাশে এসে দাঁড়াল। বিমান চোখ না তুলেই বলল, বস।

—আশ্চর্য্য! বড় বড় বই পড়লে লোকে না চেয়েই দেখতে পায় নাকি?

পায়। তাদের মাথার উপরেও একটা চোখ গজায়।

কল্যাণী বসল না, দরজার দিকে একবার দেখে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, এ রকম চোখ থাকার দরকারও হয়েছে। উপর থেকে নীচে নামিয়েছি, আবার হাতের পাঁচ শুভঙ্করটা হাত ফসকে পিছিয়ে গেল।

বইটা পরিপাটি করে বন্ধ করল বিমান, চোখের কোণ দিয়ে এদিকে একটু দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, সেটা লোকসান হ'ল না লাভ হ'ল ধরতে অবিশ্যি সময় লাগছে।

কল্যাণী খাটের পাশে হাতটা ভর দিয়ে ঝুকে দাঁড়াল, জবাব দিল, আপনাকে দেখলেই বঙ্কিমের নবকুমারের কথা মনে পড়ে। বেচারা পরের জন্যে কাষ্ঠ আহরণ করতে গিয়ে পারাপারের নৌকো হারাল।

কিন্তু তার পর? নবকুমার ত ঠকে নি।

সে গল্পের নবকুমার। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে কল্যাণী উত্তর দিল, তা না হলে যে গল্প জমবে না। সত্যিকার জীবনে কিন্তু তা হয় না।

খাটের ওপর বসে ভাবছিল বিমান মনে মনে কথাটা নাড়াচাড়া করে, মাথা ফিরিয়ে দেখল, কল্যাণী চলে যাচ্ছে। দুটো কথা বলে এভাবে হঠাৎ চলে যায়, বিমান বিস্মিত হয়ে দেখে। বসতে বললেও বসে না। কখন এক সময় আসে, শরতের বৃষ্টির মত এক পশলা কথা বলে, তার পরই থাকে না একদণ্ড। অনেক সময় উপরে গিয়ে দেখেছে, একমনে পড়ছে কিছু একটা, তাকে যেন আর চিনতেই পারে না।

বিকেলবেলা কল্যাণীর মাথা বেঁধে দিতে দিতে রমলা প্রশ্ন করলেন, হাঁ রে, মা শিবপূজো করিয়েছিল?

কাত-করা ঘাড়টা একটু সোজা করে কল্যাণী বলল, আরম্ভ করেছিল কাকীমা, শেষ হয় নি।

হয় নি? তাই বলি বেগ পেতে হচ্ছে কেন।

স্তব্ধ হয়ে বসে বসে আঙুলে কাপড় জড়াতে লাগল কল্যাণী, ধীরে ধীরে বলল, আমার কপাল, কাকীমা। আমি বলি, আমাকে পাঠিয়ে দাও—

সেই মাসীর কাছে, নয়? চল মুখপুড়ী আমার সঙ্গে, ঠাকুরের কাছে চিলেকোঠায়। আমি নিজে হাতে শেখাব তোকে।

রমলার ঠাকুরঘর। ছাদের একপাশে ছোট একচিলতে ঘর। ঘষা কাচের আবরণের মধ্যে দ্যুতিমান ছোট ছোট দুটি পট, কৃষ্ণ আর রাধিকা। নির্মল প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। রমলা পূজোর ব্যবস্থা সব দেখিয়ে দিলেন। কল্যাণী গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে, তার পর রমলার পায়ের ধুলো মাথায় নিল। ঝরঝরে গলায় বলল, আমার জন্মের সময় বিধাতা-পুরুষের ঘুম এসে গিয়েছিল কাকীমা। তাই মা-টা বদল হয়ে কোথায় ছিটকে পড়েছিলাম। ভগবানকে ডেকে বলব, আসছে বার যেন এমন গণ্ডগোল না করেন আর।

—তিড়বিড় করিস নে, বস। কল্যাণী না বসতেই ঠিকমত বসিয়ে দিলেন রমলা, দেখে নে, এমনি করে কাল সকাল থেকে পূজো করবি।

দিন কয়েক পর ভোরবেলা রমলার একটা পাটের শাড়ি পরে কল্যাণী ঠাকুরকে অঞ্জলি দিচ্ছে, রমলা পা টিপে টিপে দূরে দাঁড়ালেন। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উপবিষ্ট নিমীলিতনয়না পূজারিণীর সে স্নিগ্ধতা দেখে পা দুটো যেন আটকে গেল, স্থির বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কল্যাণী বুঝতে পারল না কিছুই। কতক্ষণ পর তেমনি নীরবে এক পা এক পা করে নেমে এলেন রমলা, চোখ দিয়ে পাতলা এক ফোটা জল ঝরে পড়তে চাইল। দীর্ঘকাল লোকান্তরিতা কন্যার প্রতি স্নেহের ধারা, না অসহায় এক বালিকার প্রতি মমতা, তা তিনি বুঝতে পারলেন না। আঁচল দিয়ে মুছে ফেললেন চোখ দুটি। সংসারের কাজ ভুলে গিয়ে নিজের ঘরে সেই আলমারীর দিকে মুখ করে ঠায় বসে রইলেন কল্যাণী না আসা পর্যন্ত, সে এলে পরও তাকিয়ে রইলেন বোকার মত।

—তোমার শরীর খারাপ নাকি কাকীমা? ভীরু গলায় কল্যাণী প্রশ্ন করল।

রমলা বলে উঠলেন, তাই যদি হয়, নিজের কোন ভাবনাই ভাবতে শিখলি না আজ পর্যন্ত, তুই কি করবি বল দেখি?

কল্যাণী আশ্বস্ত হয়ে হাসল একটু, পাশে বসতে বসতে বলল, কি করি বল? ওসব কেমন যেন ধাতে সয় না।

কিন্তু কাল যদি আর ভালো না বাসি?

কল্যাণী উত্তর দিল না, রমলার পিঠের উপর মুখ রেখে চুপ করে রইল।

রমলা ধীরে ধীরে কল্যাণীকে কোলের উপর টেনে আনলেন, পিঠের উপর স্নিগ্ধ একটি হাত মমতাভরে বোলাতে লাগলেন। চামড়া-ঢাকা একটা পাঁজরা আঙুল দিয়ে ধরে বললেন, তুই নিশ্চয়ই খাস না ভাল করে। মনে মনে ভাবিস, না?

কাকীমার কোলের উপর মুখ রেখে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল কল্যাণী। বহুদিন ধরে অনেক জল জমা হয়ে ছিল বুকের মধ্যে, চোখের আনাচেকানাচে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগল। জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রথম কাঁদল কল্যাণী।

দিন কয়েক পর। দুপুরবেলা স্বামীর খাওয়া শেষ হলে রমলা তাঁর হাতে পানের কৌটো তুলে দিয়ে বললেন, আচ্ছা ডাক্তার—

গোটা দুই পান দাঁতের সাহায্যে সবে পিষতে আরম্ভ করেছেন ডাঃ চৌধুরী, থেমে গেলেন। অত দুঃখের সম্ভাষণ হঠাৎ? তোমার কথা কখনো অমান্য করেছি? মায় ছেলের বিয়ে পর্যন্ত স্থগিত রাখলাম—

—ধন্যবাদ দিচ্ছি তার জন্য। স্নিগ্ধ হাসিতে শুভ্র দাঁতগুলি ঝকঝক করে উঠল রমলার, একটা ডাক্তারী কথা জিজ্ঞেস করব বলেই—

তাই ডাক্তার সম্বোধন! বলো—বলো—

রমলা ভাবছিলেন বোধ হয় কথাটা একমনে, গম্ভীরভাবে বললেন, আচ্ছা, আমি তো সামান্যতেই হাসি, কাঁদি, রাগ করি। কিন্তু এমন মানুষও আছে যে, কিছুতেই কিছু অনুভব করে না, কেন বল তো।

মাথা নাড়লেন প্রবীণ ডাক্তার, বললেন, লক্ষণটা সুবিধের নয় কিন্তু। এ সব লোক বড় নিষ্ঠুর হয়, বুঝলে?

নিষ্ঠুর?

হাঁ, একদম হার্টলেস। অনুভূতিগুলো ওদের শুকিয়ে গেছে, অন্তরে শক্ত হয়ে গেছে। এদের সঙ্গে সাবধানে মিশবে, বুঝলে?

বুঝলাম, তুমি ছাই বুঝেছ। রোগ আর চিনতে, সুস্থ মানুষের খবর ছাই জান তুমি।

পানের রসে আরক্ত করে তুলেছেন মুখ ডাক্তার চৌধুরী, উচ্চ-গ্রামে হেসে উঠলেন—আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ তাচ্ছিল্যভরা হাসি। রমলারও ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল, স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন, সত্যিই তুমি এ সব ছাই বোঝ, ডাক্তার।

হঠাৎ ডাক্তার সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু রোগী কে বললে না তো ?

রমলা চলে যাচ্ছিলেন, ঘুরে এলেন। ঠিক এমনি সময়ে কালো একটি তাঁতের শাড়ি পরে খোলা চুলে অদূরে এসে দাঁড়াল কল্যাণী, হাতে একটা চাবি, বোধ হয় কাকীমাকে দিতে এসেছে। আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল রমলার অন্তর, চলে যেতে যেতে চাপা গলায় বললেন, রোগী তুমি গো ডাক্তার, তুমি।

দু'এক মাস নয়, একটা বছর ঘুরে এল।

বিকেলে দমকা বাতাস উঠেছিল একটা, কালবৈশাখীর নটনৃত্য। একখণ্ড কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলল, ছোট শহর ওলটপালট করে দিল। ঝড়ের মুখে লাল ধুলোর বারুদ; আকাশ থেকে নামল বজ্র, বিদ্যুৎ, শিলা আর কালো মৃত্যু। খণ্ড প্রলয় যেন। ঝড়-বৃষ্টি থামল যখন, দেখা গেল পুরনো দালান আর খোড়োবাড়ীর অস্থি-কঙ্কাল পথে পথে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তার পরই প্রকৃতির আর এক রূপ—নরম, ঝিরঝিরে বাতাস ঠাণ্ডা করে দিল উত্তপ্ত শহর।

রাত্রি এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শব্দময় জগৎ ঘুমিয়ে পড়ল একটু একটু করে। শান্ত আবহাওয়া। কল্যাণী জেগে বসেছিল একটা বই নিয়ে, ভাবছিল আকাশপাতাল। সাবধানে নীচে নেমে এল। বিছানার উপর উপুড় হয়ে বিমান পড়ছে তখনো। মুখ তুলেই বিস্মিত হয়ে উঠল, তুমি ? এত রাত্রে ?

খাটের পাশে এসে দাঁড়াল কল্যাণী, ফিস ফিস করে বলল, বেচারা নবকুমার !

সময় অদৃশ্য হাতে কবে অন্তরঙ্গতার সেতুবন্ধন করে দিয়েছে, নিরালা একান্তে তারই পথ দিয়ে পুরনো সেই বিশেষ সম্বোধনটা চলাফেরা করে আজও। বিমান কিন্তু সে ডাকে আজ সাড়া দিল না, নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, এবার তো নিজের ঘরে চললে, আর কেন ?

ওপক্ষ থেকে কিন্তু কোন উত্তর এল না। উৎসুকভাবে চেয়ে রইল বিমান, দেখল টানা টানা দুটি চোখ নির্লিপ্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঋজুদেহা স্নিগ্ধ মেয়েটি মুখ টিপে হাসছে শুধু। অনেক যাওয়া-আসার ইতিহাস জমা হয়ে আছে ঐ দেহমনের মধ্যে, কোনটা সত্য, কোনটা বা অসত্য। কিংবা সবকিছুই হয়ত ছিন্নবস্ত্রের মতই আজ মূল্যহীন। বিমানের চঞ্চল ভাব দেখে ক্রমশঃ হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল কল্যাণীর সমস্ত মুখের ওপর, বলল, ওঠ না বীরপুরুষ, বসে থাক।

কি ভাবতে লাগল সহসা কল্যাণী মুখ নত করে। বিমান বলল, তোমাকে দেখে কেবল একটা প্রশ্ন জাগে। উত্তর দেবে ?

বল।

কোন কিছুই কি তোমাকে স্পর্শ করে না ? তোমার—তোমার অন্তর নেই। অনুভূতি বলে একটা জিনিব তোমার জানা নেই।

বেদনা-কঠিন স্বর। তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল বিমান, একটু একটু করে মাথাটা নেমে গেল কল্যাণীর।

কৈ, উত্তর দিলে না যে ?

কথাটা এড়িয়ে গিয়ে কল্যাণী পাল্টা প্রশ্ন করল, সবকিছুই কি আমরা চাইলেই পাই বিমান-দা ? না ইচ্ছে করলেই নিজেকে যেমন খুশি গড়তে পারি ? অনেক দিন আগে কাকীমাও ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন আমাকে। কিন্তু কি করে বোঝাই বল, যে ভাগ্যের উপর মানুষের কোন হাত নেই !

কিছুই নেই ?

আজকের বিকেলের কালবোশেখীর উপর কোন হাত ছিল মানুষের ?

কিন্তু মানুষ আর প্রকৃতি এক ?

হাসতে হাসতে কল্যাণী জবাব দিল, যদি বলি এক ? মানুষ দুঃখ পায় বিমান-দা, মাথা পেতে দুঃখকে মেনে নিতে পারে না বলে। তার ধৈর্য্য থাকলে—

বিমান বিরক্ত হয়ে উঠল, থামো। বক্তৃতা দিও না। যেন কত বয়েস !

ক্ষণিক চুপ করে গেল কল্যাণী, কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্মিতমুখে বলে উঠল, সত্যিই আমার অনেক বয়েস। কিন্তু যাক সে সব কথা। দিনকতক পরই ত সেই কলকাতার ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্ছ তোমরা। সামনে এসে নত হয়ে কল্যাণী প্রণাম করল বিমানকে, পায়ের ধুলো মাথায় নিতে নিতে বলল, তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছি। আর হয়ত সুযোগ হবে না, কিন্তু—

হয়ত আরও কি বলতে যাচ্ছিল, গলাটা ভারী হয়ে গেল। মুহূর্তে বেরিয়ে গেল কল্যাণী। বিমান হতবাক হয়ে বসেছিল, আর্ত্ত কণ্ঠে ডাক দিল, কল্যাণী !

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কল্যাণী, মুখে আবার দেখা দিয়েছে হাসি হাসি ভাব, বলল, কি বল ?

—কিছু না, যাও। তুমি সুখী হলে আমিও সুখী হব।

মাস দুয়েক পর।

কলকাতায় বৃষ্টি নেমেছে। পাড়াগাঁয়ের উন্মুক্ত আকাশ এখানে চোখে পড়ে না, পাণ্ডুর পরিবেশ, বিষণ্ণ, ঝিমঝিমে বর্ষা। শিবনাথ মাকে এসে বলল, আমি হোষ্টেলে যাব ভাবছি।

—সে কি ? কেন ? কখন যাবি ?

এখনি।

মোহিনী দেবী চমকে উঠলেন, বিয়ের পর হতেই ছেলের উড়ু উড়ু ভাবটা কেমন যেন বেড়েই চলেছে। সংসার গড়ে দেবার জন্যে কলকাতার বাড়ীতে বাস করছেন তিনি, কিন্তু এ ছেলের ধারা আবার উল্টো। এমন সুন্দর বৌ নিয়ে এসেও একমাত্র সন্তানকে ঘরে বাঁধতে পারলেন না, বরং আরও ছন্নছাড়া হয়ে উঠল। সন্দিগ্ধ-ভাবে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে তোর বল দেখি ?

হবে আবার কি! ফাইন্যাল পরীক্ষা আসছে, এখানে নানান্ অসুবিধা।

বৌমা একলা থাকবে?

ওর জন্মে ভেবো না মা, তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল শিবনাথ। ওর এসব কিছুই গায়ে লাগবে না।

আমার অদেষ্ট বাবা, আমার অদেষ্ট। তা না হলে তোমার মত ছেলের হাতে আমাকে পড়তে হয়?

আঁচল টেনে অশ্রু চাপতে চাপতে মোহিনী দেবী চলে গেলেন। কল্যাণী পরমুহূর্ত্তেই এসে দাঁড়াল শিবনাথের কাছে। আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, মাকে কি বলেছ?

—আমি হোষ্টেলে যাচ্ছি।—কল্যাণীর চোখ চিক্ চিক্ করে উঠল, কথা বলতে পারল না আর। স্বামীর গতিবিধি তারও আর অজানা নেই, কিন্তু বোধ হয় এতখানি দুঃসাহস ঠিক কল্পনা করতে পারে নি। পায়ের থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার যেন শরীরটা কেঁপে উঠল, কিন্তু সংযত করে নিল নিজেকে। আচ্ছা বলে কল্যাণী যে দরজা দিয়ে এসেছিল সেই দরজা দিয়েই আবার চলে গেল।

সিঁড়ির পাশে বাড়ীর বুড়ী ঝি অন্নদা মুখ চুণ করে সব শুনছিল। কল্যাণীকে দেখে কাছে সরে এল। ডাকল, বৌমা! আরও একটু কাছে এসে কেউ শুনতে না পায় এমনি গলায় বলল, খোকাবাবুকে যেতে দিও না বৌমা, ওর মতিগতি ভাল নয়। ঘরের বাইরে থাকলে ওর আর কিছু বাকি থাকবে না, তুমি ছেড়ে দিও না, মা।

হু হু করে কেঁদে ফেলল বুড়ী। গ্রামের মেয়ে, অনেক আশা নিয়ে নিয়ে সন্তানের মত মানুষ করেছে শিবনাথকে, একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে কাঁদতে লাগল। কল্যাণী সান্ত্বনা দিল, বলল, কিন্তু তোমাদের খোকাবাবুকে তুমি ত চেন অন্নদা। আমি কি তার কাছে একটা মানুষ!

সেখান থেকে চলে গিয়ে এঘর ওঘর অযথা ঘুরতে লাগল কল্যাণী। কি যেন হারিয়ে গেছে, ঠিক মনে পড়ছে না, সর্ব্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে হাজির হ'ল আবার সেই উপরের ঘরটায়। সেখানে শিবনাথ সুটকেস গুছিয়ে যাবার জন্মে তৈরী হচ্ছে। ঘরে ঢুকে কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গেল, মাথার উপর এক ঝলক রক্ত চনচন করে বোধ হয় জমা হয়েছে এসে। কল্যাণীর সে এক অভূতপূর্ব্ব রূপ। সিঁথির মাঝখানে সিন্দুরের রেখা, পায়ে অলক্তক, নববধূর লাজনম্র লাবণ্য অক্ষুণ্ণ এখনও। আঘাতটা সামলে নিল, সহজভাবে প্রশ্ন করল, এখনই যাচ্ছ?

দেখতেই পাচ্ছ।

কবে আসবে আবার?

ঠিক নেই।

কল্যাণী এগিয়ে এসে সুটকেসটা একটা তোয়ালে দিয়ে ঝেড়ে মুছে বলল, চল, আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

শিবনাথ মনে করেছিল, বিদায়ের সময়টায় অন্ততঃ সাধারণ মেয়ের মত কল্যাণী চোখের জলে একটা ছোটখাটো নাটকের সৃষ্টি করবে, আর সে বিজয়ী বীরের মত উপভোগ করবে দৃশ্যটা। কামনা করছিল অনাদর প্রকাশ করবার সেই চরম ক্ষণটি, কিন্তু অন্য পক্ষ থেকে এমনি ধরনের উপেক্ষা সে কল্পনায় আনতে পারে নি। বিজিত পৌরুষ আহত হ'ল একটু, শিবনাথ বলে উঠল, থাক, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। এগিয়ে ধরতে গেল সুটকেসটা, কল্যাণী একটু হেসে সেটা নিয়ে পা বাড়াল। কয়েক পা এগিয়ে সিঁড়ির একটু নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বলল, সত্যিই কি তুমি পড়াশুনোর জন্মে হোষ্টেলে যাচ্ছ, না আর কোথাও?

চাপা গর্জ্জন শোনা গেল শিবনাথের, তার মানে?

—আমাকে ভাল না লাগুক, বাড়িতে থাকলে আমি তোমাকে কিছু বলতাম না সত্যি, অথচ মা দুঃখ পেতেন না।

যথাস্থানে আঘাত দিলে দুর্জ্জন ক্ষেপে যায়। শিবনাথ পাগলের মত কল্যাণীর হাত থেকে সুটকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

কয়েক মিনিট পর। শ্মশান-স্তব্ধ বাড়ীটার সেই ঘরে কল্যাণী আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিল, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে এল। ছোট একটা এটাচিকেস, খুলে ফেলল ডালাটা। উপরের পকেটে হাত চালাতেই দেখতে পেল মোটা আপিস-খামটা, তার মধ্যে কতকগুলো চিঠি এবং একটি মেয়ের ফোটো। বিয়ের পর একদিন স্বামীর জিনিষপত্র গোছাতে গোছাতে এ বস্তুটা চোখে পড়েছিল, রেখে দিয়েছিল তার এটাচির মধ্যে। শিবনাথের সুটকেসে রাখবার আর সুযোগ হয় নি, রাখব রাখব করে একদম ভুলে গেছে। খাম থেকে এক এক করে সব বের করল। একক ফোটো, খোলা চুলের গুচ্ছ উন্নত বক্ষ বেয়ে সামনের দিকে ছড়ানো, চঞ্চল, চটুল ভঙ্গি। আকর্ষণের বেসাতি সাজানো। উল্টো পিঠে শিবনাথকে উপহার দেওয়ার হস্তাক্ষর এবং তারিখ। বিয়ের মাত্র একমাস আগের প্রীতিচিহ্ন। কিন্তু খামের মধ্যের পত্রগুলোয় প্রেম-নিবেদনের ভাষায় ছবির এ উদ্ধত গৌরব নেই, সেখানে অসহায় এক রমণীর অশ্রুঝরা মিনতি। পড়েছিল একবার কল্যাণী, ক্রীমরঙের লেটার পেপারে লম্বা টানের দুর্ব্বল লেখাগুলো। হাসপাতালের নার্স মেয়েটি, পরিচয় রয়ে গেছে অনেক চিঠিতে। একটা চিঠি আবার বের করল, "বাড়ীতে পড়ে আছি, প্রায় একা। ডিউটিতে যাবার আর মুখ নেই। কি করেই বা যাই বল? এত দিন ধরে এত আশা দিয়ে তুমি যে আমাকে প্রতারণা করবে, এ দুঃস্বপ্ন যেন আর সহ্য করতে পারি না। আজীবন কষ্ট পেয়েছি। কেউ আমার সংসারে নেই, তুমি সবই জান। জানতে পারলাম, তুমি বিয়ে করতে যাবে। সুন্দরী বৌ নিয়ে ফিরে এসে আমার জন্মে একটু কড়া বিষ পাঠিয়ে দিও।" এই সুরের চার পৃষ্ঠা প্রলাপ ছবির মদিরেক্ষণার ছায়াটা যেন চিঠির মধ্যে মরা মরা গলায় কথা বলছে। বিপন্ন ভিখারিণীর শুধু নিঃস্ব হাতের আবেদন। টেবিলের ছবির দিকে আবার তাকাল কল্যাণী। চাপা ভ্রূর মধ্যে বিজয়িনীর দৃঢ়তা, সর্ব্বাঙ্গে কৃশানুর তরঙ্গদীপ্তি।

সেটিই তার জীবনের অপবসন্ত, তার পর শীত আর আসন্ন মৃত্যু।

মিতালি—নাম লিখেছে মেয়েটি। হয়ত এটি তার আসল নাম নয়, শিবনাথের দেওয়া নাম। তাড়াতাড়িতে ভুলে ফেলে গেছে ফোটো আর চিঠির প্যাকেটা। কিসের টানে কোথায় এবার পালিয়ে গেল সবকিছু পেছনে ফেলে, অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল কল্যাণী। একটুও ক্ষোভ হ'ল না, রাগ হ'ল না, ঈর্ষা জাগল না, বরং অন্তরে পরিবেদনা-সজল হয়ে উঠল সেই মিতালি মেয়েটির প্রতি। দেখা ত হ'ল না, হলে বোধ হয় 'দিদি' বলে আপন করে নিতে পারত। তারই মত আত্মীয়হীন অসহায় সে-ও। মুখ পুড়িয়ে লজ্জায় কোন এক কোণে কাঁদছে বসে বসে।

তারপর যা ঘটল, কল্যাণীও অতখানি ভাবতে পারে নি।

অনেক দূরের একটা ষ্টেশন থেকে শিবনাথ পত্র দিয়ে মাকে জানাল, সে দেশভ্রমণে বেরিয়েছে।

সেও কয়েক মাস আগের কথা।

শীতকালের ভরসন্ধ্যা। পিয়ন দরজার কাছে এই অসময়ে চিঠি একটা ফেলে চলে যেতেই মোহিনী দেবীর মনটা খুত খুত করে উঠল, তুলে নিয়ে খুললেন চিঠিটা। পড়তে পড়তে আনন্দের ছায়া ভাসল মুখের উপর; শিবনাথের চিঠি, কলকাতায় আসছে লিখেছে। অনেক দিন পর পর পশ্চিমের দূর একটা জায়গা হতে পত্র দিত, কেবলমাত্র টাকার প্রয়োজনে। মায়ের দুঃখ আর কান্নায় ছেলে কি আর সাড়া না দিয়ে পারে! উৎফুল্ল হয়ে ঝিকে ডাকতে আরম্ভ করলেন, অন্নদা, ও অন্নদা!

অন্নদা কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, হাঁরে, বৌমা কোথায় রে?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্নদা পাল্টা প্রশ্ন করল, কার চিঠি গো? খোকাবাবুর? আসবে লিখেছে বুঝি? তুমি এত করে লিখলে। খোকা হবে—আর কি না এসে পারে গো?

অন্ধকার ঘরটায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে কল্যাণী কি একটা বই পড়ছিল, মোহিনী দেবী সরাসরি ঢুকে পড়ে বললেন, খোকা আসছে বৌমা, একটু ভাল করে কাপড় চোপড় ছেড়ে—

কবে আসছেন মা?

কবে? চিঠিটা চোখের সামনে নাড়তে লাগলেন মোহিনী: তা ত লেখে নি।

দেহটা টেনে টেনে উঠে বসল কল্যাণী, হাঁ করে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে।

কল্যাণীর কথাটা মোহিনী ঠিক গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না, নিজেকে শুনিয়েই যেন বলতে লাগলেন, আসবে লিখেছে যখন এদ্দিন পর, আজকালের মধ্যেই আসবে বৈ কি?

কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ পার হয়ে গেল। মোহিনী দরজা খুলে সেই পিয়নের জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেন, আবার কতক্ষণ পর বন্ধ করতে সুরু দরজা। কল্যাণী তাকিয়ে থাকে জানালার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে—দেখতে পায় না কিছুই। সেই পুরনো কলকাতা, পিচের রাস্তার উপর জনতার সমারোহ, ফিরিওয়ালার চিৎকার, ট্রামবাসের ঘরঘরানি। আকাশের নীচে স্তরে স্তরে অট্টালিকা—জগদ্দল পাথরের মত মাটির বুকের উপর চেপে বসে আছে, হাঁপাচ্ছে ওদের ভারে হুবিষ্ণ পৃথিবী—ওরা বোধ হয় কোন কালে নড়বে না। তারও উপরে ধুলো-ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা, নীচের মানুষের বুক ভরে নিশ্বাস নেবার জন্যে এতটুকু ফাঁকা জায়গাও নেই, একটু নির্মল বাতাসও নেই। বর্ষার জল পেয়ে শরৎকালে সেই গ্রামের বাড়ীর চার ধারে মাঠে মাঠে ডগডগে ধানের গাছগুলো শ্যামল সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, প্রাণের উচ্ছলতায় বাতাসে মাথা দুলিয়ে হাসত খেলত। বছরের পর বছর নূতন রূপে দেখা দিত আরও কত গাছপালায় সবুজশ্রী, চোখে স্নেহের পরশ লাগত তাকিয়ে দেখলে। সেই গ্রাম, সেখানের সেই জীবন। আর এ লৌহ-নিগড় কলকাতা, উগ্র, জরাগ্রস্ত, দুঃস্বপ্নময়।

জীবনটা সত্যিই এবার দুঃস্বপ্ন বলে মনে হ'ল নাকি? ঘুমোতে পারল না কিন্তু এদিন কল্যাণী। শেষ রাতে তন্দ্রার ঘোরে মধুর স্বপ্ন দেখল যেন, আচ্ছন্ন অবস্থাতেই শুনল চাপা শব্দ, খুট খুট।

নীচের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। অন্নদা দরজা খুলে দিয়ে ত্রস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল, খোকাবাবু!

—চুপ।

আর কিছু শোনা গেল না। তারপর সিঁড়ির পথে সতর্ক পদক্ষেপ, ঘরের মধ্যে গড়িয়ে এল শব্দটা। স্বপ্নাবিষ্ট চোখে দেখল কল্যাণী, তার পাশে শিবনাথ এসে বসেছে। ভুলে গেল সব অভিমান, ধড়মড় করে উঠে বসে তার পিঠে মুখ রাখল: কিন্তু মাথাটা এক-ঝটকায় তুলে নিল আবার, বিস্ফারিত চোখে তাকাল, বলল, ওমা, তুমি মদ খেয়েছ নাকি?

কেমন অদ্ভুত মুখটা দেখাচ্ছে শিবনাথের, মাথার চুল বড় বড়, রুক্ষ, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। দাঁত বের করে হাসল, বলল, ও এমন একটু খেতে হয় ডাক্তারদের। মর্গে ঢুকে মড়া কাটতে গেলে—

সে আবার কি?

সে তুমি বুঝবে না।

মড়া কাটছিলে নাকি এতদিন?

তুমি দেখছি আমার উপর খুব রেগে আছ, নয়?

তোমার উপর? না ত। বিড় বিড় করে বলতে বলতে শুয়ে পড়ল কল্যাণী, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে, সারারাত জেগে বসেছিলাম, ঘুম হয় নি।

আমার জন্যে: শিবনাথ জড়ানো ভারী গলায় প্রশ্ন করল।

তোমার জন্যে। বড় ভয় করছে কেন যেন। একটু শোও না আমার কাছে। কল্যাণী পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজল। শিবনাথ তার মাথায় গায়ে হাতটা ছড়িয়ে দিল, সম্মোহিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। এদিকে অন্নদা অপরাধী একটা ছায়ার মত পা টিপে

টিপে সিঁড়ি থেকে দেখল এক সময়, তার পর নিজের ঘরে গিয়ে অনেক দিন-পর আরামে ঘুমিয়ে পড়ল বুড়ী।

সকালবেলায় আচমকা উঠে বসল কল্যাণী। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল, যেন কি একটা তীব্র গন্ধে একেবারে অচেতন হয়ে পড়েছিল। রাত্রের ঘটনাটা যাচাই করতে লাগল ঘরের এ পাশ ওপাশ তাকিয়ে। স্বামী নেই। কিন্তু ভুল নয়, শরীরের উপর তার স্পর্শ যেন লেগে রয়েছে এখনও। পরক্ষণেই হতভম্ব হয়ে গেল কল্যাণী, সর্ব্বাঙ্গের' একটি গয়নাও নেই। চুড়ি, কঙ্কণ, হার, কানপাশা।

তেমনি বোবার মত বসে রইল। অলস দেহ, দেবতার দেওয়া আশীর্ব্বাদের গুরুভার তার উপর, নড়তে ইচ্ছে করে না। রক্তমাংসের প্রতিটি প্রাণকোষ শিবনাথের গৌরব বহন করছে, সেই শিবনাথই তাকে নিরাভরণ করে গেল। তা হোক, যা নিয়ে গেছে, সেটা মেকী, যা দিয়েছে, তা-ই শাশ্বত। ঢাকাটা ঝেড়ে ফেলে নেমে গেল।

অন্নদা বোধ হয় ইতিমধ্যেই মোহিনী দেবীকে সংবাদটা পরিবেশন করে পুলকিত করে তুলেছিল, কল্যাণীর দিকে চোখ বুলিয়ে তিনি বলে উঠলেন, এ কি বৌমা, গায়ের গয়নাগুলো খুললে কেন সকালবেলায়?

গলাটা একটু কেঁপে উঠল কল্যাণীর। দৃষ্টি নত করে বলল, আপনার ছেলে কাল এসে ওগুলো নিয়ে গেছে মা।

নিয়ে গেছে। চলে গেছে নাকি?

তিনি আবার বিয়ে করেছেন কি না। সেই মেয়েটির বড় অসুখ, বিশেষ দরকার টাকার।

অন্নদা এবং মোহিনী দেবীর পায়ের কাছ দিয়ে যেন একটা গোখরো সাপ ছুটে গেল, এমনি ভয়ার্ত্ত মুখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা। কল্যাণী ধীরে ধীরে চলে গেল মুখ-হাত ধুতে।

*

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমল করছে আবার আকাশ। দুপুরবেলায় খোকার পায়ের দিকটা রোদের উপর রেখে কল্যাণী সতৃষ্ণ নয়নে ছেলেকে দেখছিল, সিঁড়িতে অপরিচিত পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল। উল্লসিত হয়ে উঠে দাঁড়াল—কি ভাগ্যি আমার, বিমানদা তুমি এসেছ!

কল্যাণী হাসিমুখে পায়ের ধুলো নিল। বিমান বলল, তোমার কাকীমা যে এদিকে ভেবে সারা। মাসখানেক হ'ল চিঠিপত্র দেওয়া নেই, ব্যাপার কি?

তা না হলে তুমি বুঝি আসতে না?

সেইখানেই মাটির ওপর বসে পড়তে পড়তে বিমান বলল, ঠিক শিবনাথের মত দেখতে হয়েছে রে! সে কোথায়?

কিন্তু আমার কথার উত্তর দিলে না যে বড়! বা-ব্বা, আমাকে আর দেখতে আসতে ইচ্ছে করে না, না? ব্যবস্থা করে দিয়ে বোধ হয় বেঁচেছ।

ঠোঁটের উপর ঈষৎ হাসি ভেসে উঠল বিমানের, তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ কল্যাণী, তোমার ব্যবস্থার জন্তে আমার ব্যবস্থাটাই বাতিল হয়ে গেল।

কল্যাণীও হেসে ফেলল, বেচারা নবকুমার! তা এখনও হ'ল না কেন শুনি?

সে অনেক কথা।

তার মানে?

মানে, কার মত একটি মেয়ে না হলে এখন ছেলের মায়ের আর পছন্দই হচ্ছে না। তবে বোধ হয় এবার হয় হয়।

কার মত?

যে জিজ্ঞেস করছে, তাকে জিজ্ঞেস কর।

অনেক কথা যেন জড়ো হয়ে এল একসঙ্গে, কিন্তু প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে কল্যাণী বলল, অনেক দিন, অনেক দিন কেন, অনেক মাস পরে এলে তুমি এবার বিমানদা। কাকীমা, কাকাবাবু ভাল আছেন ত?

হাঁ। কিন্তু তোমাদের খবর বললে না ত? মায়ের চিঠির উত্তর দাও নি কেন? তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে বড্ড, অসুখ করেছিল নাকি?

অসুখ? আমার? তুমি আবার আমাকে এর চেয়ে অন্য রকম কবে দেখলে?

কল্যাণীর কৃশ পাণ্ডুর শরীরের দিকে তাকিয়ে বিমান বিষণ্ণ কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করল, শিবনাথ কোথায়? মাসীমা?

কল্যাণী চোখ নত করে জবাব দিল, মায়ের মাঝে শক্ত অসুখ গেল একটা, বিশেষ চলাফেরা করতে পারেন না এখনও। আর তিনি মিতালি নামে একটি নার্স মেয়েকে নিয়ে আর এক জায়গায় বাস করছেন।

তবে যে গতবারে আমাকে বললে, সে হোষ্টেলে আছে, পরীক্ষা দিচ্ছে?

কল্যাণী অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, নিজের দুঃখের কাহিনী তোমাদের বলে আর কষ্ট দিতে চাই নি বিমানদা। তুমি বস, একটু শরবত করে এনে দি।

বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল বিমান। আবেগরুদ্ধ হয়ে এসেছিল কল্যাণীর গলাটা, তাই বোধ হয় তাড়াতাড়ি চলে গেল একটা কাজের অছিলা করে। এমন একটা মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু একবারও জানায় নি তাদের। দুঃখের ভাগ আর দিতে চায় নি। অদ্ভুত ধৈর্য্যের সঙ্গে চিরটা কাল এমনি একা সহ্য করে এসেছে সব বিপর্য্যয়। কিন্তু কত আর সহ্য করতে পারে সামান্য একটা মানুষ! শুকনো, নিষ্করুণ শীতের বাতাসে জীর্ণ দেহের রক্তমাংস ক্ষয় হয়ে গেছে, চামড়ায় ঢাকা হাড়ের কঙ্কাল প্রকট হয়ে উঠেছে তাই। শেষ মাঘের পত্রহীন গাছের মত লাবণ্যহীন হয়ে উঠেছে কল্যাণী। আশ্চর্য্য! তবু এখনও হেসে বলেছে, আমার কিছুই হয় নি ত! সেই বাড়ীতে একটি শ্যামলশ্রী মেয়ের ঝরঝরে কথাগুলি মনে পড়ে বিমানের, সংযত অভিসারিকার সেই

নানা রূপে আত্মপ্রকাশ। কিছু বলা, অনেক না বলা। কিন্তু অন্তরের মহিমা গৌরবে জ্বলন্ত সব সময়। আর আজ!

মিনিট কয়েক পরেই কল্যাণী ফিরল, বিমানের হাতে গেলাসটা দিয়ে বলল, এইটুকু খেয়ে নাও। তার পর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বসে আছে বিমান গেলাস হাতে, কল্যাণী উচ্ছল ভাবে হেসে খোকার ওধারে বসে পড়ল, কি দেখছ? খাও।

খাই।

কি হ'ল বলত তোমার বিমানদা? কথা বলছ না যে?

অপরাধীর মত চুপ করে রইল বিমান।

কল্যাণী তাকে বোধ হয় সহজ করবার চেষ্টা করে এবার বলল, তোমারও চেহারাটা কি হয়েছে, জান না বোধ হয়?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে হাসল বিমান, বলল, তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, কল্যাণী। আমি তোমাকে প্রথমে চিনতেই পারি নি।

মুক্ত হাতটা প্রসারিত করে কল্যাণী সেই আগেকার সুরে বলল, বাইরে থেকে দেখতে বোধ হয় একটু রোগা হয়ে গেছি। কিন্তু সত্যিই আমি ভাল আছি বিমানদা।

ভাল আছ! গম্ভীর হয়ে গেল বিমান, ঝলসে গেছ, ঝরে গেছ।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কল্যাণী, দোহাই তোমার, এ সব কোনও কথা যেন আর বাহাদুরি করে কাকীমাকে শুনিও না।

বিমান হঠাৎ বলে বসল, তবে আমার সঙ্গে চল তুমি।

তোমার সঙ্গে আবার কোথায় যাব?

কেন? আমাদের ঘরে।

যাব বৈ কি বিমানদা। আগে বৌদি আসুন, তার পর দেখতে যাব।

পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে ছিল কল্যাণী, বিমান ধীরে ধীরে চোখ তুলতেই নেমে এল আবেগময় সে দৃষ্টি। একমনে হাত পা ছুড়ে খেলছিল ছেলে, বিছানাটা একটু এগিয়ে ধরে বলল, দেখ, দেখ বিমানদা, খোকা কেমন মিটিমিটি হাসছে!

বলে কল্যাণী নিজেও হাসল। একটি সবুজ পাতা নিয়ে নতুন ফাল্গুনের গাছ যেমন হাসে।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক শ্রীহেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

বৌদ্ধদর্শনে যাঁহারা বিজ্ঞানবাদী তাহাদের অপর একটি নাম যোগাচারী। কারণ এই মতের পোষকগণ বোধিপ্রাপ্তির জন্য 'যোগ' ও বোধিসত্ত্বের ভূমিনিচয়ের মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য অনুষ্ঠান বা 'আচার'-এর উপর বিশ্বাসশীল ছিলেন। সাধারণ মতে অসঙ্গকে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জানা গেলেও বাস্তবিকপক্ষে মৈত্রেয়নাথ ইহার সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই অসঙ্গ অপেক্ষা প্রাচীনতর বিজ্ঞানবাদের স্থাপক বলা যাইতে পারে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অসঙ্গ তাঁহার প্রতিভার দীপ্তিতে মৈত্রেয়নাথকে ম্লানপ্রতিভ করিয়াছিলেন বলিয়াই অসঙ্গকে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধুকে বলা হইত দ্বিতীয় বুদ্ধ; তাঁহার সময়ে বিজ্ঞানবাদ দার্শনিক মতবাদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। অসঙ্গ তাঁহার মহাযানসম্পরিগ্রহশাস্ত্রে যোগাচার মতবাদের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে—১। আলয়বিজ্ঞান সকল জীবের মধ্যে বর্ত্তমান। ২। জ্ঞান ত্রিবিধ—মায়োপম, আপেক্ষিক ও পারমার্থিক। ৩। বাহ্য জগৎ ও জ্ঞাতা (subjective ego) আলয়েরই বহিঃপ্রকাশ। ৪। ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব (perfection)। ৫। দশ প্রকার বোধিসত্ত্বের মধ্য দিয়া বুদ্ধত্ব অর্জ্জন করা যায়। ৬। মহাযান হীনযান অপেক্ষা প্রশস্ততর, ব্যাপক বলিয়া অনেক ভাল। ৭। বুদ্ধদেহ ধর্ম্মকায়ের সহিত একীভূত হওয়া হইল জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ৮। বস্তু ও ব্যক্তির দ্বৈতভাবের অবসান ঘটাইয়া চিৎস্বরূপের (Pure consciousness) সহিত ঐক্যসাধন করাইতে হইবে। ৯। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে নির্ব্বাণ ও সংসারের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ১০। যাহা সংসারের দৃষ্টিতে নির্ম্মাণকায়া তাহাই বাস্তবিকপক্ষে ধর্ম্মকায় অর্থাৎ বুদ্ধদেবের চিদ্রূপ স্বরূপ।

বিজ্ঞানকে প্রথমতঃ প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞানরূপে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানকে আবার সাত ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—সর্ব্বাস্তিবাদীদের চক্ষু, ঘ্রাণ, শ্রোত্র, জিহ্বা, কায় ও মন বিজ্ঞানকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার উপর বিশিষ্ট মনবিজ্ঞান বলিয়া সপ্তম একটি বিজ্ঞান ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সপ্তমটি মনবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞানের সেতুস্বরূপ—প্রথম পাঁচটি দ্বারা বস্তর কল্পনা হয়, মনবিজ্ঞান দ্বারা তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করা হয় এবং বিশিষ্ট মনবিজ্ঞানের মাধ্যমে বস্তু সম্বন্ধে হয় অনুভূতি এবং

ইহাদের সকলের পশ্চাতে আছে চিত্ত বা আলয়। লঙ্কাবতার সূত্রে বলা হইয়াছে—

চিত্তেন চীয়তে কর্ম্ম মনসা চ বিধীয়তে।

বিজ্ঞানেন বিজানাতি দৃশ্যং কল্পেতি পঞ্চভিঃ॥ (পৃঃ ৪৬)

লঙ্কাবতার সূত্রে আলয়বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা শাশ্বত, স্থির, অপরিণামী জ্ঞানের বা চৈতন্যের আলয়স্বরূপ।

ইহা বস্তু-ব্যক্তিরূপ দ্বৈতভাবের উপরে বর্ত্তমান (গ্রাহ্যগ্রাহক-বিসংযুক্ত); ইহা উৎপাদ, স্থিতি ও ভঙ্গবিরহিত (উৎপাদস্থিতিভঙ্গ-বর্জ্জ্য)। ইহার মধ্যে কল্পনার প্রপঞ্চ নাই (বিকল্পপ্রপঞ্চরহিত) এবং পূর্ণ নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারাই ইহাকে জানা যায় (নিরাভাস প্রজ্ঞাগোচর)। আলয়বিজ্ঞানের মধ্যে অবিদ্যা কর্ত্তৃক যে অবিরত প্রেরণা দেওয়া হয়—যাহাতে আলয় গ্রাহ্যগ্রাহকরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহাই হইল সৃষ্টির মূল কারণ। এই প্রেরণার আশ্রয় ও বিষয় হইল আলয় স্বয়ং। অনাদি এই প্রেরণা হইতে বহুত্ব জ্ঞানের উদয় হয় (অনাদিকাল প্রপঞ্চ দৌষ্ঠুল্যবাসনা)। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বাহ্যবস্তুর ন্যায় আলয়ের বহিঃপ্রকাশমাত্র। ইহা আলয়ের সহিত একও নয়, বিভিন্নও নয়—যেমন একটি মৃৎপিণ্ড ধূলিকণার সহিত একও নয়, বিভিন্নও নয়। যদি আলয়কে বলা হয় সমুদ্র তাহা হইলে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইল সমুদ্রের তরঙ্গ। যেমন বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া ঢেউগুলি সমুদ্রের উপর নৃত্য করে সেইরূপ অনেক প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বস্তুরূপ বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া আলয়ে নৃত্যরত হয়। লঙ্কাবতারে এই কথাই বলা হইয়াছে—

আলয়ৌঘাস্তথা নিত্যো বিষয়পবনেরিতঃ।

চিত্রৈস্তরঙ্গবিজ্ঞানৈর্নৃত্যমানঃ প্রবর্ত্ততে॥

অসঙ্গ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, জগতের সমুদয় পদার্থ আপেক্ষিক (relative) বলিয়া ক্ষণিক। আর ক্ষণিক না হইলে ইহার উৎপত্তিই সম্ভবপর নয়। নদীর জল সর্ব্বদাই প্রবহমাণ। কিন্তু তত্ত্ব সর্ব্বদাই শাশ্বত। তত্ত্ব অসঙ্গের মতে অদ্বয়। বাস্তবিক ভাবে বলিতে গেলে বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে কোন ভেদ নাই। তবুও সংবৃত সত্যের দিক হইতে বিচার করিয়া আমরা বলিয়া থাকি যে, শুকর্ম্মের দ্বারা বন্ধনমুক্তি হয়—তাই মহাযান-সূত্রালঙ্কারে বলা হইয়াছে—

ন চান্তরং কিংচন বিদ্যতেঽনয়োঃ সদর্থবৃত্ত্যা শমজন্মনোরিহ।

তথাপি জন্মক্ষয়তো বিধীয়তে শমস্য লাভঃ শুভকর্ম্মকারিণাম্॥

যোগাচারী বৌদ্ধগণ বিভিন্ন বিহার ও ভূমির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন। যেমন অগ্নি সুবর্ণকে পরিশুদ্ধ ও ভাস্বর করে সেইরূপ এই ভূমি ও বিহার বোধিসত্ত্বকে শুদ্ধ করে।

বিংশতিকায় বলা হইয়াছে যে, চিত্তার বহির্ভূত ত্রিজগৎ অবস্থান করিতে পারে না। মন, চিত্তা, চৈতন্য, জ্ঞান সমপর্য্যায়ের। লোকে যেরূপ ভ্রমবশতঃ এক চন্দ্রের স্থলে দুইটি চন্দ্র দেখে, কিন্তু মূলতঃ চন্দ্র একটিই, সেইরূপ বাহ্যজগৎ ভ্রমবশতঃ আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্নে যেরূপ সুবর্ণনগরীর প্রাসাদাদির জ্ঞান হয়—যদিও বাস্তবিকপক্ষে ইহাদের অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ বাহ্যজগৎও অস্তিত্বহীন। চৈতন্যই নিজকে জ্ঞেয়-জ্ঞাতা (subject-object) রূপে বিভক্ত করে। অজ্ঞান বা অবিদ্যা দুই প্রকারের—প্রথমটি হইল ক্লেশাবরণ, যাহার জন্য আমাদের সকল দুঃখ উৎপন্ন হয়। অপরটি হইল জ্ঞেয়াবরণ—যাহা আমাদের নিকট হইতে বস্তুর স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে। তত্ত্ব চৈতন্যস্বরূপ। এই তত্ত্ব (বিজ্ঞপ্তিমাত্র) নিজের শক্তিবলে ত্রিপ্রকার বিকৃতি ধারণ করে। ইহার প্রথম হইল আলয়বিজ্ঞান বা বিপাক—যাহা সমস্ত চৈতন্যের আগার স্বরূপ। এই আলয়বিজ্ঞান আবার মন ও বিষয়বিজ্ঞান রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই তিন প্রকার বিজ্ঞপ্তির মূলে আছে পূর্ণ ও পবিত্র জ্ঞান (বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিমাত্র)।

শূন্যবাদের পরমার্থকে বিজ্ঞানবাদে বলা হয় 'পরিনিষ্পন্ন' এবং শূন্যবাদের 'সংবৃতিসত্যকে' বিজ্ঞানবাদে পরতন্ত্র ও পরিকল্পিতরূপে দু'ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যখন বাহ্য জগতের অসত্যত্ব অনুভূত হয়, তখন বসুবন্ধুর মতে কর্ত্তাও (subject) অসত্য হয়, কারণ—কর্ত্তা ও কর্ম্ম পরস্পরসম্বদ্ধ বা আপেক্ষিক বলিয়া একের অবর্ত্তমানে অন্য থাকিতে পারে না। যখন এই কর্ত্তা-কর্ম্ম সম্পর্কের ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়া যায় তখন সামঞ্জস্যপূর্ণ পরমার্থ (Absolute) লাভ হয়। পরমার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে—'তত্ত্ব-চিৎস্বরূপ' এইরূপ বাক্যও অসত্য, কারণ—ইহা জ্ঞানের অংশবিশেষ।

সাধারণতঃ এইরূপ ধারণা করা হয় যে, বিজ্ঞানবাদে বাহ্য জাগতিক পদার্থের সত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে এবং এই জগতের পদার্থ ক্ষণিক বিজ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনা হইতে স্পষ্টতর প্রতীতি হইবে যে, বিজ্ঞানবাদীদের মতে ক্ষণিকত্ববাদ জগতের পদার্থ-বিষয়ক। এই ক্ষণিকত্ব তত্ত্বকে (Reality) স্পর্শ করিতে পারে না।

ছোউ নৃত্যের ঐতিহ্য

শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
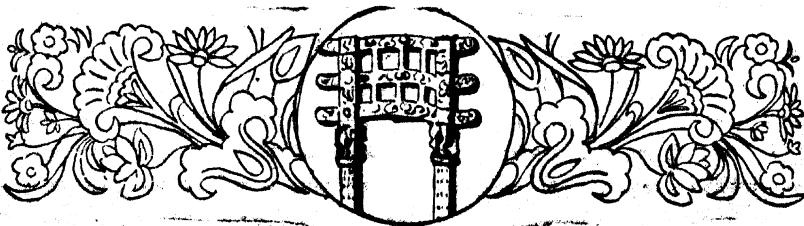
ছোউ নৃত্যের মূল ভিত্তির সন্ধান নিতে কিছুদিন পূর্বে সেরাই-কলাতে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। স্থানটি টাটা-নগরের পরের ষ্টেশন সিনির সাত মাইল দূরে। স্থানীয় যে ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উক্ত নৃত্যের বিকাশ তার মধ্যে প্রাচীন বাংলার এক অবলুপ্ত সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়েছি।

ছোউ নৃত্যের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পরিবেশের মধ্যে বাংলার গাজন উৎসবের প্রক্ষিপ্ত রূপ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বলা চলে যে, ছোউ ও গাজন উভয় পর্বেরই নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে চৈত্র মাসের শেষ। দ্বিতীয়তঃ, সেরাইকেলাতে এই সময়ে ছোউ নৃত্যের মাধ্যমে যে অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় তার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছেন শিব বা নটরাজ এবং বাংলায় গাজন বা চড়কপূজার যে বিধি লক্ষ্য করা যায় তারও প্রাণকেন্দ্র শিব।

বাংলার এই পর্ব ধর্মঠাকুর নামে আর্য ও অনার্য উভয় পদ্ধতির সমাবেশে এককালে রূপগ্রহণ করে। ধর্মঠাকুরের পুজা বহুকাল পূর্বে বাংলার সর্বত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরে তা ভাগীরথীর দক্ষিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত রাঢ় অঞ্চলেই প্রসিদ্ধিলাভ করে। সেরাইকেলা বাংলার এই অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত এবং সেই কারণে উক্ত ধর্মানুষ্ঠানের প্রভাব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, স্থানবিশেষে ধর্মঠাকুরই শিব বা বিষ্ণু আখ্যায় পরিগণিত হতেন এবং সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ ঐতিহাসিকেরা দিয়েছেন।

বিভিন্ন ছোউ নৃত্যে ব্যবহৃত মুখোশ

ছোউ নৃত্যের সঙ্গে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র, পশ্চাতে শ্রীবনবিহারী পটনায়ক

তৃতীয়তঃ, বাংলার ধর্মের গাজনের মুখোশ পরে, মৃতদেহ বা মড়ার মাথা নিয়ে নাচ ও গানের প্রথা ছিল। উত্তর রাঢ়ে এই নাচকে বলা হ'ত "পাতা নাচ" বা "পাত্রনৃত্য"। সেরাইকেলাতেও অনুরূপ ধারার সন্ধান পাওয়া যায় ছোউ নৃত্যের মুখোশ ব্যবহারে।

অনেকের বিশ্বাস, ছোউ কথাটি ছাউনির অপভ্রংশ। বহু পূর্বে পাইক বা সৈন্যেরা ছাউনি খাটিয়ে তার তলায় অবসর-বিনোদনের জন্য যে নৃত্যের অবতারণা করত তা থেকেই

পরবর্তীকালে ছোউ নৃত্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু সৈন্যদের ব্যক্তিগত জীবনের খানিকটা রূপায়ণ যদি নৃত্যে স্বীকার করে নেওয়া যায় তা হলে বীরত্বব্যঞ্জক প্রকাশভঙ্গী অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছোউ নৃত্যে বীরত্ব ছাড়া সুকুমার ভাবধারারও যথেষ্ট স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই কারণে মনে হয় ছাউনি সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা ভ্রান্ত। অবশ্য সেরাইকেলায় তরবারি-হস্তে এক প্রকার নাচের

খরকাই নদীতটবর্তী শিবমন্দির—যাত্রাঘাটের যাত্রা এখান হইতে সুরু হয়

প্রচলন আছে যার নাম "ফরিখণ্ডা"। কিন্তু সুকুমার ভাবধারায় পুষ্ট ছোউ নৃত্যের কাছে এই বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গির প্রসার দিন দিনই কমে আসছে।

অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত শব্দ "ছায়া" থেকে ছোউ-এর উৎপত্তি। নামকরণের মূলে যে কারণই থাকুক না কেন, বর্তমানে ছোউ বলতে মুখোশ ছাড়া আর অন্য কিছু বোঝায় না। মুখোশ-পরিহিত নাচের মধ্যে ছোউয়ের স্থান যে সর্বাগ্রে সেকথা জোর গলায় বলা চলে। উত্তরপ্রদেশের রামলীলা এবং দার্জিলিঙের প্রেত-নৃত্যেও মুখোশের ব্যবহার আছে, কিন্তু সে সব মুখোশে ছোউয়ের মত উন্নত ও রুচিসম্মত নির্মাণপদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নৃত্যেও মুখোশের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তা পুরোপুরি মুখোশ নয়। মুখমণ্ডলকে "মেক-আপের" সহায়তায় মুখোশের মত রূপ দেওয়া হয়।

ছোউ নৃত্যের মুখোশ তৈরি হয় মাটি ও ন্যাকড়ার সাহায্যে। সেরাইকেলার অতি প্রাচীন [illegible] তি এই মুখোশ। মৃৎশিল্পের দান নিয়ে নৃত্যপদ্ধতির বিকাশ—আমার মনে হয়, শুধু সেরাইকেলাতেই সম্ভব হয়েছে। মুখোশ প্রথমে তৈরি হ'ত কাঠ খোদাই করে। পরে সম্ভবতঃ ওজনে হাল্কা করার জন্য টুকরি আকারযুক্ত বাঁশের ফালির উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে মুখোশ তৈয়ার করা হ'ত। তারও পরে লাউয়ের শুকনো খোলার সাহায্যে এ কাজ করা হ'ত। বর্তমানে মুখোশ তৈরি হয় কাগজ, ন্যাকড়া এবং তার উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে। এই মুখোশ নির্মাণের পদ্ধতি হচ্ছে আগেকার আমলের চশমার মত কানের পাক দিয়ে সুতার টানা লাগানো। মুখোশের সঙ্গে কৃত্রিম চুল বা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করায় এই সুতার টানা ঢাকা পড়ে যায়। নৃত্যশিল্পীর যাতে দৃষ্টিবিভ্রম না ঘটে তার জন্য প্রত্যেক মুখোশে চোখের মণির স্থানটিতে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ছিদ্র করা থাকে।

ওজনে হাল্কা হলেও নৃত্যশিল্পীর পক্ষে বেশীক্ষণ মুখোশ ধারণ করা সম্ভব নয় এবং সেই কারণে ভারতীয় নৃত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে সময়ের যে ব্যাপ্তির সন্ধান পাওয়া যায়, ছোউ নৃত্যে তা সম্ভব নয়। অল্প সময়ের পরিসরে একক নৃত্যই হচ্ছে ছোউ নৃত্যের ধারা। অবশ্য নৃত্যনাট্য শ্রেণীর অন্তর্গত, এক সঙ্গে একাধিক শিল্পীর অভ্যাগম যে ছোউ নৃত্যে একেবারেই নাই সেকথা বলা চলে না। শ্রীদুর্গানৃত্যে একাধিক শিল্পীর আবির্ভাব এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। তা সত্ত্বেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, ছোউ প্রধানতঃ একক নৃত্য এবং তাতে পুরুষরাই সর্বক্ষেত্রে এ যাবৎ অংশ গ্রহণ করে আসছেন।

রাজরাজড়ার পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হলেও ছোউ নৃত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া কঠিন। তবে রাজাসাহেবের মুখে শুনলাম, ষোড়শ শতাব্দীতে সেরাইকেলা রাজ্যের ভিত্তি পত্তন হয় এবং সেই সময় থেকেই মুখোশযুক্ত নৃত্যের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা—শৈবমতের পরবর্তী যুগে ছোউ নৃত্যের উদ্ভব হয়। শিবপূজার বিধি নৃত্যপ্রচেষ্টার মধ্যে কতকটা থাকার দরুন এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নাচের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায়, শৈবমতের বাইরেও বহু নৃত্য-পরিকল্পনা এই নাচে স্থান পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে

পারে—শ্রীরাম, পরশুরাম, মধুকৈটভ, শ্রীদুর্গা, মহিষাসুর, চণ্ডী, কালী, চন্দ্রভাগা (সূর্যদেবের প্রণয়িনী), দুর্যোধন, শ্রীকৃষ্ণ, কালীয়দমন, শিকারী, নাবিক, ময়ূর, সাগর, ফুলবসন্ত ইত্যাদি।

নাচের বিষয়বস্তু অনুযায়ী এসব নাম থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পৌরাণিক ও কাল্পনিক চিন্তাধারাকে আশ্রয় করেই এগুলি প্রসারলাভ করেছে। ছোউ নৃত্যকে অনেকে পল্লীনৃত্যের সমস্তরের মনে করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তার বহু উর্দ্ধে এ নৃত্যের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পল্লীনৃত্যের সমমাত্রিক ছন্দ এবং একই দেহভঙ্গিমার পুনরাবৃত্তি ছোউ নৃত্যে স্থান পায় নি। নানা ছন্দ, নানা তাল, নানা ভঙ্গি এ নৃত্যের প্রাণ। নাচের নাম ও তালের প্রয়োগ লক্ষ্য করলেই বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। যথা: আরতি নাচ—সুরফাঁক তাল (১০ মাত্রা), হরপার্বতী নাচ—দাদ্‌রা তাল (৬ মাত্রা), সবার বা শিকারী নাচ—চৌতাল (১২ মাত্রা), চন্দ্রভাগা নাচ—ত্রিতাল (১৬ মাত্রা), ফুলবসন্ত নাচ—ঝাঁপতাল (১০ মাত্রা), নাবিক নাচ—যৎ তাল (৭ অথবা আট মাত্রা), ভূপত্তিমনোরঞ্জন নাচ—ধামার তাল (১৪ মাত্রা)। নাচ আরম্ভ হয় অপেক্ষাকৃত ঢিমা লয়ে, তখন তালের বোল স্পষ্ট রাখা হয়। কিন্তু পরে দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ে যখন দ্বিগুণ ও চৌগুণ গতিতে তাল বাজতে থাকে তখন পরন ও ছন্দপ্রধান কতকগুলি কর্তব্যের অবতারণা করা হয়—যা তবলা বা পাখোয়াজী বোলের ধারা মেনে চলে না। এসব বোল সম্ভবতঃ স্থানীয় বাজনদারদের তৈরি এবং এরই সংস্পর্শে এসে নাচের ছন্দ বিচিত্র আকারে ফুটে উঠে।

ছোউ নৃত্যে নূপুর ব্যবহৃত হয় কিন্তু মুখমণ্ডল মুখোশ দ্বারা আবৃত থাকায় মুখভঙ্গিমা প্রকাশের কোনও অবকাশ নাই। এই অপূর্ণতা অতিক্রম করার জন্যই মনে হয় দেহ-ভঙ্গিমা ও পদসঞ্চালনের মধ্যে বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়েছে। সেরাইকেলার গুণীমহলের ধারণা এসব দেহভঙ্গিমা ও পদ-সঞ্চালন ভরত মুনিকৃত ভরতনাট্যমেরই অনুরূপ। শিক্ষার্থী প্রথমে কতককলি প্রাথমিক ভঙ্গিমার সাহায্যে নৃত্যচর্চা সুরু করে এবং সেগুলিকে "উপলয়" বলা হয়। উপলয়গুলি আয়ত্ত করে পুরোপুরি আকারের শিল্পী হতে হলে ছয় থেকে সাত বৎসর সময় লাগে। সেরাইকেলায় গিয়ে স্থানীয় কয়েক-জন শিল্পীর নাচ দেখে আমার মনে হয়েছে যে, ছোউ সত্যই একটি পরিবর্ধনশীল নৃত্যপদ্ধতি এবং তাতে নৃত্যশিক্ষকদের গভীর চিন্তার বিকাশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিরই সন্ধান দিয়ে এসেছে।

নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলি ছোউ নৃত্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়—ধাংশা বা নাগারা, ঢোল, টোসা বা চর্চরী, মৃদঙ্গ (শুধু রঙ্গমঞ্চের অনুষ্ঠানে), মুহ্‌রী বা সানাই, শিঙ্গা, মদনভেরী, মন্দিরা, করতাল ও বাঁশী। বর্ত্তমান কালের ছোউ নাচের অনুষ্ঠানে অবশ্য নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি অবিকৃত ধারার পরিপোষক নয়।
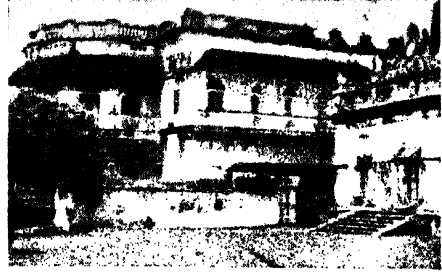
সেরাইকেলা রাজপ্রাসাদের একাংশ—সম্মুখের প্রাঙ্গণে ছোউ নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়

নৃত্যের সঙ্গে গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত নাই। নাচের বিষয়বস্তু অনুযায়ী রাগরাগিণী বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়, যেমন ফুলবসন্ত নাচে বাহার, চন্দ্রভাগা নাচে সাবেরী ইত্যাদি। এই ধরনের রাগরাগিণীযুক্ত যন্ত্রসঙ্গীতের বিন্যাস ছোউ নৃত্যের একটি বিশেষ আকর্ষণ এবং সেই কারণে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের পটভূমিকায় ছোউ নৃত্যের বিচার হওয়া প্রয়োজন।

আগেই বলা হয়েছে যে, আনুষ্ঠানিক ভাবে ছোউ নৃত্যের অনুশীলন সেরাইকেলাতে বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে। চৈত্র মাসের শেষ চার দিন এই নৃত্যানুষ্ঠানের প্রধান সময় এবং সেই কারণে এই নাচকে অনেকে চৈত্রপর্ব নামে অভিহিত করেন। মূল অনুষ্ঠানের তের দিন পূর্ব থেকে প্রত্যহ নৃত্যানুরাগী ভক্তবৃন্দ শহরের কেন্দ্রস্থিত শিবমন্দির হতে নির্গত হয়ে খরখাই নদীতটে মাজনা ঘাটের পার্শ্বে অবস্থিত অন্য একটি শিবমন্দিরে যায় এবং স্থানান্তে পূর্বোক্ত মন্দিরে নটরাজের প্রতীক হিসাবে একটি পতাকা বহন করে আনে। সমস্ত পথটি বাদ্য ও সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠে। তারপর ভক্তবৃন্দ যায় রাজপ্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত একটি বিশেষ অঙ্গনে। চৈত্রের পঁচিশে তারিখ অবধি প্রতিদিন চলে এই সুরের মিছিল।

তারপর সুরু হয় "আখড়া-মাড়া" বা নৃত্যানুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। রাজপ্রাসাদের পার্শ্বস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নটরাজের পতাকা প্রোথিত করে তারই সামনে চলে 'আখড়া-মাড়া'র অনুষ্ঠান। সেই রাতেই "যাত্রাঘটে"র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় সত্যকারের নৃত্যানুষ্ঠান। উপরোক্ত মাজনা ঘাট থেকে জল-

পূর্ণ মাঙ্গলিক ঘট বা যাত্রাঘট, লাল পোশাক-পরিহিত এক ভক্ত কর্তৃক রাজপ্রাসাদ ও তৎপরে শহরের মধ্যস্থিত শিব-মন্দিরে নীত হয়। ঘট ও ঘটবহনকারী উভয়েই যাত্রাঘট নামে পরিচিত এবং শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে তাদের গণ্য করা হয়। যাত্রাঘটের আগমনের সঙ্গে সানাই, নাকাড়া, ঢোল ইত্যাদি এক বিশেষ ছন্দে বেজে উঠে। তার পর যে

ছোউ নৃত্যের প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী রাজকুমার শ্রীশুদ্ধেন্দ্রনারায়ণ সিং দেও

নৃত্যানুষ্ঠান সুরু হয় তারই নাম ছোউ। এই অনুষ্ঠানে উচ্চনীচের কোনও ভেদাভেদ নাই। সকলেই এতে সমান ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। শহরের প্রধান নৃত্যকেন্দ্র বা আখড়া থেকে আগত শিল্পীরাই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অংশ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বা পরবর্তী দিনের অনুষ্ঠানের নাম বৃন্দাবনী। প্রথমে বানরাকৃতিধারী একটি মানুষ নৃত্যের ছন্দে শহর প্রদক্ষিণ করে রাজপ্রাসাদের নৃত্যাঙ্গনে আসে এবং তার পর সারারাত্রি ধরে চলে ছোউ নৃত্যের বিভিন্ন আসর। রাবণের মধুবন বিনাশ করে উক্ত বানরের আগমন সেরাইকেলার শিশুমহলের এক বিশেষ আকর্ষণ। নাচের মাধ্যমে মধুবন বিনাশের উল্লাস যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে!

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানের নাম "গরিয়াভর"। কৃষ্ণ ও গোপিনীদের বিরহ-মিলন এ নৃত্যানুষ্ঠানের বিষয়বস্তু।

চতুর্থ বা শেষ রাত্রির অনুষ্ঠান "কালিকাঘট" বা "কামনাঘট" নামে পরিচিত। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ পথ দিয়ে আসে এই মাঙ্গলিক ঘট এবং তাতে "কামনা" বা আশার বারি সিঞ্চিত থাকে। পূর্বোক্ত যাত্রাঘটের সম-পর্যায়ের এই অনুষ্ঠান। পার্থক্য শুধু এই যে, ঘটবহনকারী ভক্ত লালের বদলে কালো পোশাক ও রূপসজ্জা গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য—কালিকা বা কালীমাতার আবির্ভাব ঘোষণা করা। যাত্রাঘটে যে নৃত্যানুষ্ঠান সুরু হয় কালিকা বা কামনাঘটে তার পরিসমাপ্তি হয়।

সর্বশেষে, ছোউ নৃত্যের প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দের সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি, কারণ তাঁদের সার্থক সৃষ্টির ফলেই ছোউ আজ ভারতের গর্বের বস্তু। পূর্ববর্তীকালে নিম্নলিখিত শিল্পীবৃন্দের পরিচয় পাওয়া যায়—নারায়ণ দাস, বিদ্যাধর হুজ্জ, উপেন্দ্র বিসওয়াল, নন্দীঘোষ সাহু, দীনবন্ধু ব্রহ্ম, হরিহর সিং এবং রাজেন্দ্র পট্টনায়ক। পট্টনায়কবংশীয় প্রথম শিল্পী পীতাম্বর তিনপুরুষ পূর্বে উপেন্দ্র বিসওয়ালের সহযোগিতায় এক নৃত্যকেন্দ্র খোলেন। উপেন্দ্র পরে ময়ূরভঞ্জ দরবারে চলে যাওয়ায় তাঁরই ছাত্র রাজেন্দ্রর (উপেন্দ্রের পুত্র) উপর নৃত্যকেন্দ্র পরিচালনার ভার পড়ে। আজ সে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক বনবিহারী পট্টনায়ক (রাজেন্দ্রের পুত্র)। রাজেন্দ্র পট্টনায়কই হচ্ছেন ছোউ নৃত্যের প্রকৃত প্রাণদাতা এবং তাঁরই প্রভাবে সেরাইকেলা রাজপরিবারে ছোউ নাচের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়। তারই ফলে কুমার শুভেন্দ্র, হীরেন্দ্র ব্রজেন্দ্র ও শুদ্ধেন্দ্র প্রমুখ রাজবংশীয় শিল্পীদের আবির্ভাব ছোউ নৃত্যকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথেই চালিত করেছে। রাজপরিবারের চেষ্টায় ছোউ নৃত্য পাশ্চাত্ত্যেও পরিবেশিত হয়েছে এবং সেখানে এই নৃত্য যে সমাদর লাভ করেছে তাতে একথাই মনে হয় যে, ভারতবাসীর কাছে এ নৃত্য দীঃতম গর্বের জিনিষ।
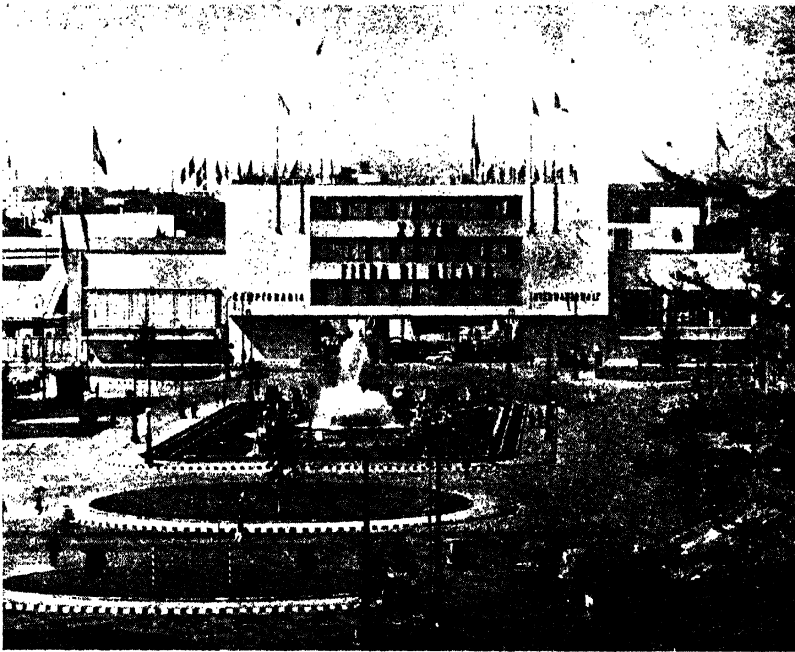
'মিলান ফেয়ারে'র প্রবেশ-পথ

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

সাত

২ই এপ্রিল '৫৪। ইটালী দেশটা ট্যুরিষ্টদের কাছে স্বর্গ—এ খোটা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ানোর যাদের সখ আছে অথবা লোভ আছে তাঁদের কানে বাসি খবর। আর যাঁরা নেহাত শিলং কি উটি, গোপালপুর কি কন্যাকুমারিকা, মাদুরা কি মহাবল্লীপুরম—এর কোন একটিতেও বুড়ী ছুঁয়েছেন, তাঁরাও বলবেন ডুয়ে আর ডুয়ে যে চার হয়, সেকথা দু'বার শোনবার দরকার কি!

না, দরকার তেমন কিছু নেই। তবে অনেক সময় দরকার না থাকলেও শেখর মিলিকে মনে করিয়ে দেয়—কাল তোমার জন্মদিন, মনে আছে ত?

আপনি ফড়েপুকুর-ডালহাউসী, ডালহাউসী-ফড়েপুকুর করে হয় ত অনেক কথাই ভুলে গেছেন। তিন মাস যে ছুটি নিচ্ছেন, যাবেন কোথায়? তাই আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম। চলুন না ইটালীতেই!

আল্পসে যান, পাহাড়ে বরফ দেখুন। রিভিয়েরাতে যান, মনে হবে ফড়েপুকুরে ফিরে না গেলেই হয়। ফ্লোরেন্সে বসে আর্ট নিয়ে মাথা ঘামান। সন্ রেস্তোর ফোক-ড্যান্স দেখুন, ভেরোনা ও রোমের অপেরায় যান। ওসব ভাল না লাগলে ইটালীয়ান ফিল্মের নিও-রিয়্যালিজমের উপর থিসিস লিখুন, নয় ত রোমের ধ্বংসাবশেষ কত বছরের পুরনো তার আঁক কষুন। সবশেষে আসুন কাপরিতে। ছ'আনা সেরের বোম্বাই আঙুর হাতে করে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে রোদে গায়ের চামড়া ট্যান করান। শেষের পরেও আর কি আছে যদি জানতে চান ত বলব, পূর্ণিমারাতে ভেনিসে গন্ডোলায় চড়ে স্বপ্ন দেখুন।

যশোবন্ত এখন আছে ভেরচেল্লীতে। ওখানে 'রাইস রিসার্চ ষ্টেশনে' ও কাজ করছে। ইটালীর শতকরা চল্লিশ ভাগ ধান এই ভেরচেল্লীতেই জন্মায়।

চিঠিটা আমি পেয়েছি গতকাল।

আজ এখন সবে সকাল সাতটা। ফারনাণ্ডোকে ডেকে ওর ভেস্পায় বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়! যশোবন্তকে অন্ততঃ একটু উৎসাহ দিয়ে আসা উচিত। নইলে ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে কোন দিন আবার রিসার্চেও যাবে না হয় ত।

আলের ধারে, ভেরচেল্লী

ফারনাণ্ডো ভেরচেল্লীর নামে নেচে উঠল। ভেরচেল্লী 'বিটার রাইস'-এর শহর। ধানের জমিতে জমিতে সিলভানা মাঙ্গানোদের সারি ধান রুইছে। অতএব শুভস্য শীঘ্রম।

স্কুটার ছুটল মিলানের সবে-ঘুম-ভাঙ্গা অলস বাস-ট্রামগুলোর পাশ কাটিয়ে।

যশোবন্তের রিসার্চ মাচায় উঠল। আমাদের দেখে ত ও চমকিত, পুলকিত।

ফারনাণ্ডো বলল, তোমার ও চালের নমুনা আজকের মত সিন্দুকে তোল। চল, ষ্টেশনে যাই।

যশোবন্ত বলল, ষ্টেশনে কেন?

বা রে! ঐখান থেকেই ত 'বিটার রাইস' সুরু। সুরুটা না দেখে আগেই শেষ দেখে লাভ কি? কি বল কুণ্ডু?

আমি বললাম, সুরু শেষ জানি না। পথে নামি চল, তারপর যেদিকে দু'চোখ যায়।

ষ্টেশনে এসে দেখি, দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অগণিত মেয়ে। মেয়েরা ট্রেন থেকে তখনও নামছে একের পর এক, ছুটিতে বাড়ী-আসা ফ্রন্টিয়ারের সৈন্যদের মত। নামছে লাফিয়ে লাফিয়ে, শিস দিতে দিতে। প্রায় সবারই হাতে একটা সুটকেস, মাথায় স্কার্ফ, নয়ত টুপি।

কুড়ি থেকে চল্লিশ বছরের এই সব মেয়েরা এসেছে ধা রুইতে। এমন নাকি ক'দিন ধরেই আসছে। ভেরচেল্লীর বিভি প্রতিষ্ঠানে এরা কাজ করবে এই দু'তিন মাস। তারপর আব যে যার বাড়ী ফিরে যাবে। ফেরবার আগে বেশ দু' পয়সাও পাবে।

এবার আমরা চলে এলাম ধানের জলো জমিতে। আলের গা ঘেঁষে এক সারি লম্বা গাছ। পেছনে মেঘ আর আকাশ। সামনে মেয়েরা নানা রঙের পোশাকে অদ্ভুত উজ্জ্বল। নীচু হয়ে ধানে চারা রুয়ে যাচ্ছে। তারই সঙ্গে গানও গাইছে। সকলের মাথা চওড়া কিনারাদার খড়ের টুপি।

আমি ত ফোটো তুলতে জমিতে নেমে গেছি। কিন্তু এ গভীর জল ও কাদা যে গামবুটেও শেষ পর্য্যন্ত কুলোল না। উলে প্যাণ্টটায় ভেরচেল্লীর ছাপ নিয়ে মিলানে ফিরেছিলাম।

মাঝে মাঝে দুটো জমির মাঝখানে একফালি খাল, দু'পাশে গাছপালা। মেয়েরা ওখানে ভাল জামা, কাপড়, সাইকেল, দুপুরে লাঞ্চ ইত্যাদি রেখেছে।

এক জায়গায় দেখি ওরা লাঞ্চে বসেছে। যশোবন্ত ফারনাণ্ডোকে বসতে ইশারা জানিয়ে আমি ওদের মধ্যে বসে পড়লাম।

তারপর আলাপ করা ত খুব সোজা। আমরা ইটালীয় বলতে পারি ভাল আর ইটালীয়ানরা আমাদের মতই মিশু ও গায়ে-পড়া। খুব কম সময়েই পাঁচমিশেলী প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদে আলোচনা দানা বাঁধল।

আট

১৭ই জুন '৫৪। মিলান থেকে মাইল কুড়ি উত্তরে ছো শহর অজ্জোনো। ওখানে টেক্সটাইল মেশিনের কারখানা কারনি কোম্পানীতে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম।

সপ্তাহে তিন দিন মিলান থেকে যাই। সন্ধ্যায় হোষ্টেলে ফিরে আসি। মন্তসা থেকে ব্রড গেজের ট্রেন পাল্টে ন্যারো গেজের ডিজেল ট্রেন ধরতে হয়। ফিয়াটের তৈরী দুটো কম্পার্টমেন্টের গাড়ী। বাইরেটা ষ্ট্রীমলাইনড ও নিখুঁত। ভেতরে আরাম যথেষ্ট। ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরের তৎপরতা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতায় অবাক হতে হয়। ওরা যেন পুরোপুরিই যন্ত্রচালিত।

জানালার বাইরে দু'বেলা একই দৃশ্য দেখতে একঘেয়ে মনে হয় না কখনও। সবুজ শস্যক্ষেতের ওপারে আকাশের গায়ে পাহাড়ের সারিটা একরকম দেখি নি কখনও। ওরা রোজই রূপ বদলায়। এমন বোধ করি হলিউডের উগ্র আধুনিকা চিত্রতারকারাও বদলায় না। কখনও ট্রেন চলল বাড়ীর উঠোনের উপর দিয়ে। কোন দিন দেখা যায় গৃহকর্ত্রী উঠোন পরিষ্কার করছে। কিশোরী মেয়েটা পীচ কামড়াতে কামড়াতে ট্রেনের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কখনও আবার বাড়ীর জানলা-দরজা বন্ধ, উঠোনটা নিস্পন্দ। শহরতলীর দোকানী ট্রেনের শব্দে বাইরে এসে দাঁড়ায়। খদ্দের নেই, সময় কাটে না।

ট্রেনের যাত্রীও হরেক রকম। ম্লানমুখ কর্ম্মক্লান্ত আইবুড়ো শিক্ষয়িত্রীর দল, ওদের জীবন-মধ্যাহ্ন প্রায় অতিক্রান্ত। কারখানার শ্রমিক, গাঁয়ের চাষী, সাধারণ যাত্রী, স্কুলের ছেলেমেয়ে—এরাই আমাদের নিত্যসঙ্গী। মাঝে মাঝে পাদ্রীরা আনাগোনা করে। গীর্জ্জাগুলো খোলা কি বন্ধ, হয় ত তা দেখতে। আজকাল রবিবার সকালেও নাকি লোক হয় না। এক দিন এক পাদ্রী বলেছিল—রোমান ক্যাথলিকদের দেশে এটা নাকি ঘোর নাস্তিকতা।

২০শে জুন। আজ বিকেলে আর মিলানে ফেরা হ'ল না। বন্ধু কারলেত্তো ওর বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেল।

'বিটার রাইস'-এর দৃশ্য ভেরচেল্লী

কারখানার মিলিং-মেশিন অপারেটর কারলেত্তো। সেই আমার সুবিধা অসুবিধা দেখত। লঞ্চের ছুটিতে রেস্তোরাঁ অবধি নিয়ে যেত, ছুটির পর ট্রেনে তুলে দিত।

ধান-রোয়া, ভেরচেল্লী

অজ্জোনোর পাঁচ হাজার লোকের জন্তে আছে দুটো টেলিভিশন, একটা সিনেমা-হল, একটি ডান্স-ফ্লোর, আর একটা স্বচ্ছ জলের হ্রদ। কাছেই পাহাড় আছে, উৎসাহীরা পাহাড়িয়া পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।

বিকেলে কারলেত্তো, ওর বোন, বোনের বন্ধু আর আমি অজ্জোনোর লেকে ডিঙ্গি বাইতে গেলাম। নিরিবিলি জায়গায় ক'জন ছিপ ফেলেছে। স্নানে নেমেছে কয়েকজন।

অজ্জোনোর লেকে মাছ ধরা

বাড়ী ফিরে কারলেত্তোর বোন রান্না করল, খাওয়াল, তারপর বাগানে আমাদের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠল। খুব সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে খুঁটিনাটি অনেককিছু জিজ্ঞেস করল। ওর আদরযত্নের আন্তরিকতায় মনে হচ্ছিল যেন দশ বছর পর বোনের বাড়ীতে এসেছি। অজ্জোনো আধা পাড়া-গাঁ, আধা শহর বলেই হয় ত এমনটি হতে পেরেছে।

কারখানার কথা বলতে গিয়ে প্রৌঢ়া নার্সটির কথা বার বার মনে আসে। কাজে ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে ওর ঘরে গিয়ে বসতাম।

একদিন নার্সটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, ঘোড়ার মাংসের ষ্টেক খেয়েছেন কখনও?

আমি অবাক হয়ে বললাম, খাই নি কখনও। কেউ যে খায় এমন ত শুনিও নি।
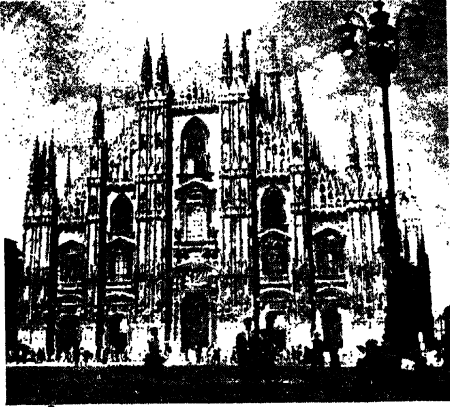
গীর্জ্জা ডুয়োমো, মিলান

—আপনি জানেন না, আমার স্বামী কত রোগা ছিল। আর এখন যা হয়েছে, অনেকে দেখে চিনতেই পারে না। সে ত সম্ভব হয়েছে ঐ ঘোড়ার মাংসের ষ্টেক খেয়ে খেয়ে।

আমি হেসে বললাম, ও, আপনি বলতে চাইছেন যে, আমিও যেন ঐ ষ্টেক্‌ খেয়ে শরীর সারাই। না, তা পারব না। রুচিতে বাধবে।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে দিত নার্সটি।

আর এক দিন বলল, জানেন বোধ হয়, ইটালীয়ান মেয়েরা খুব সুন্দরী।

—সে ত দেখছিই পথেঘাটে। চোখ বুঁজে ত আর পথ চলি না।

—আচ্ছা, ইটালীয় একটা মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় না?

—সে ইচ্ছেটা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মুশকিল হ'ল এই, ইণ্টারন্যাশনাল ম্যারেজে আমার এখনও তেমন আস্থা হয় নি। আমার মনে হয়, দেশী মেয়েকে নিয়ে ঘর করা অনেক সহজ হবে।

এমনি হাল্কা কথাবার্তায় কারখানার একঘেয়েমির হাত থেকে খানিকটা রেহাই পেতাম।

পরীক্ষার আগে হঠাৎ এক দিন নার্সটি আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। একটা ছোট শিশি থেকে একটু জল গেলাসে ঢেলে বলল, খেয়ে নিন।—খেয়ে নিলাম।

ডুয়োমোর সিঁড়িতে লেখক
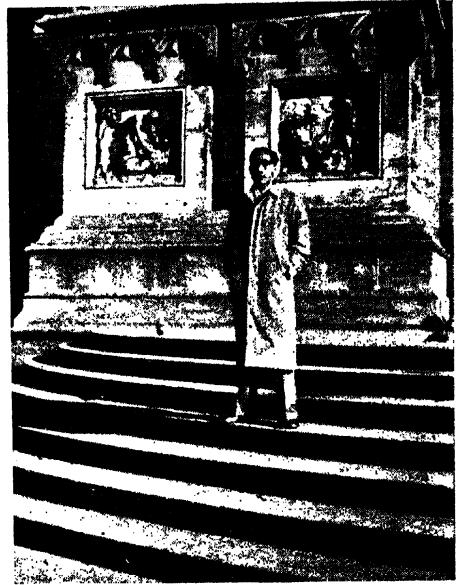
—ওটা আমাদের গীর্জ্জার পবিত্র জল। দেখবেন আপনার পরীক্ষা ঠিক ভাল হবে। প্রার্থনা করি, সবার চেয়ে আপনার পরীক্ষা ভাল হোক।

—ধন্যবাদ, এটা কিন্তু ঠিক আমাদের দেশের রীতির সঙ্গে মিলে গেল। আমার মাও পরীক্ষার সময় পূজোর ফুল মাথায় ছুঁইয়ে দিতেন—যেমন আপনি দিলেন ঐ জলটুকু।

২২শে জুন '৫৪। মিলানের কর্ম্মচাঞ্চল্য পিয়াত্সা ডুয়োমোয়। মাঝখানে বিরাট চত্বর। এক দিকে গীর্জ্জা ডুয়োমো। ইউরোপে এটাই সবচেয়ে বড় গথিক ছাঁচের গীর্জ্জা। ঐ গীর্জ্জাটাই যেন গোটা শহরটার ভারকেন্দ্র।

একসময় চুপি চুপি সন্ধ্যা এসে পড়ে। চারধারে রোশনাই ঝলমল করে উঠে, আর শহরে মেয়েদের চলাফেরা বাড়ে। এমনি একটি মেয়ে সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হলে অনেককিছুই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। বেশ বোঝা যায়, অকৃত্রিম আন্তরিকতা ওদের কাছে ছেলেমানুষি। Cotolette alla Milanese কি করে তৈরি হয় ওরা তা জানে না। ওদের মতে যৌবন-প্রভাতে সংসার করাটা নেহাতই বোকামি। ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না। আদব-কায়দা, প্রসাধন আর ফ্যাশান যাদের শয়নে-জাগরণে একমাত্র চিন্তা, তারা বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটির দিকে নজর দেবে কখন?

ক্রমশঃ

পকেটমার

শ্রীউমাপদ নাথ

ধীর পায়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল মহেন্দির।

বাড়ীর ভেতর থেকে তখনও গড়িয়ে আসছে সুবলের মার গলা—করবে বৈ কি, আলবৎ করতে হবে। দায়িত্ব মাথায় নেবার সময় মনে ছিল না?

বাড়ীতে বউয়ের সঙ্গে খুব যে একচোট ঝগড়া হয়ে গিয়েছে তা নয়। আসল কথা হ'ল, অভাবের সংসার। পেটের আগুন মাথা গরম করে দেয়। কথায় ঝাঁঝা ধরে একটু বেশী। মেজাজ নষ্ট হয়ে যায় সামান্যতেই।

কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল ছিল না। এ দৈন্যের কোনও কৌলীন্য নেই। রেশন-আপিসের আর্দ্দালি ছিল মহেন্দির। যা বেতন পেত, তার বেশী পেত পার্ব্বণী। স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে যেত ওদের সংসারটি। আর সংসার বলতেই বা কি, নিজে, বৌ আর একমাত্র ছেলে সুবল।

কিন্তু ছাঁটাইয়ে পড়ে চাকরি গেল মহেন্দিরের। স্বচ্ছন্দ সচ্ছল গতি বাধা পেল অকস্মাৎ। সমতলের নদী এসে ঠেকল খাড়া পাহাড়ের গায়ে, হয় জমে পচে মরা, নয় পথ করে নেওয়া তার পাশ দিয়ে।

মহেন্দিরের চেয়ে বেশী ভেঙে পড়ল তার স্ত্রী। তাই ত এখন কি হবে! কি করে এখন চলবে? কিন্তু নৈরাশ্যের সঙ্গে সমাধানের কি সম্বন্ধ আছে? নিরুপায় হয়ে মাথা খারাপ করলেই কি উপায় এসে হাজির হয় সামনে? সেটা সুরবালা বোঝে না। এখন যে স্বামীকে উৎসাহ দেওয়াই দরকার, কটু কথা না শুনিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে তাতা-পোড়া দেহে বুলিয়ে দিতে হয় স্নিগ্ধ হাতের একটু স্পর্শ, অতশত বোঝে না সে। অত হিসেব নেই তার মাথায়। ভাবে, এখন কড়া কথায় চেতিয়ে না তুলতে পারলে ও কি আর কোনও পথ দেখবে। সপ্তমে গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠে সুরবালা—সংসার করবার সাধ হয়েছিল যখন, তখন তার ঝক্কি নিতে হবে বৈ কি। এখন গালে হাত দিয়ে বসে ভাবলেই অমনি চলে যাবে? যেমন করে পার—

আর বচন-শ্রবণের অপেক্ষায় থাকে না মহেন্দির। বাসা থেকে বেরিয়ে চলে আসে রাস্তায়। এই ত রাস্তা, কলকাতার রাজপথ। এর এক-একটা রাস্তার কত না ইতিহাস। কত কথা-কাহিনীর পুঁজি এর এক-একটা রাস্তার বুকে। এদের বড় মোহ, বড় আকর্ষণ। এই টানেই ত মহেন্দিরের কলকাতায় আসা। ফতুয়ার পকেটে পড়ে আছে জমিয়ে-রাখা কয়েকটা আধপোড়া বিড়ি। কাছের পান-বিড়ির দোকান থেকে তারই একটা ধরিয়ে নিল জলন্ত দড়িতে ঠেকিয়ে। ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে এক পা দু'পা করে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

বেলা গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা। মহেন্দির তেমনি ঠায় বসে গোলদীঘির সেই বেঞ্চিতে। বিড়ি টানতে টানতে গলি ছাড়িয়ে মির্জ্জাপুর হয়ে সিধে চলে এসেছে গোলদীঘিতে। ভাববার জন্যে একটু ধোঁয়া জুটেছে, এবার জুটে গেল একটু জায়গা।

মহেন্দির ভাবছে। ভাবনা ছাড়া এখন আর কি করবার আছে?

—দেশ-বাঁটোয়ারার ফলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। বাড়ীর অবস্থা যে খুব ভাল ছিল, তা নয়। তবে বাড়ীতে থাকলে খাওয়া-পরার অভাব হ'ত না কোনও দিন। জমির ধান, গাইয়ের দুধ আর বাগানের তরকারি—এর ত আর মার ছিল না। আর মাছ? সে ত সখের আমদানি। মৌজের মেহনত। চিলমারির বাঁক থেকে ফিরে কই-মাগুর-শিঙিতে-ভরা খালুইটা নামিয়ে দিয়েছে সুরবালার সামনে। এ বেলা ঝাল-চচ্চড়ি কর, আর সুবলের জন্যে একটু মাখো-মাখো ঝোল, কম লঙ্কা দিয়ে।

শীতকালে বিলের জল মরে আসে, তখন চালায় পলো। পলোর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেনে তুলেছে কত বড় বড় শোল। ও সুবল, গেঁজের মুখটা খুলে ধর, বাবা! গেঁজে-ভর্ত্তি একটা জ্যান্ত মাছ হাতে ধরে সুবলের সে কি আনন্দ!

এ সব কাহিনী অতীতের, কিন্তু চিত্রগুলি এখনও জল-জ্যান্ত—চক্‌চকে, তাজা।

মহেন্দির বিশেষ লেখাপড়া করতে পারে নি। সে তার বদনসিব, মন্দ ভাগ্য। হাড়ে-হাড়ে বোঝে তা মহেন্দির। আহা, বিদ্যের তুল্য কি বস্তু আছে! ওই যারা হাকিম-হুজুর হচ্ছে, তাদের পুঁজি কি? বিদ্যে নয়? পড়েছে, শিখেছে, বিদ্বান হয়েছে—তারই পুরস্কার।

নিজের দুঃখ ঘুচাতে চেয়েছে ছেলেকে দিয়ে। টিকিট করে হাজরাবাবুদের পুকুর থেকে রুই মেরে এনে তার মুড়োটা খাইয়েছে ছেলেকে। মগজে মগজ বাড়বে। বুদ্ধি বাড়বে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। তেমাথা বুড়োর গল্প শুনিয়েছে বৌকে। যেমন করেই হোক, সুবলকে মানুষ করে তুলতেই হবে।

কিন্তু সুরবালার তেমন আস্থা-ভক্তি নেই লেখাপড়ার

প্রতি। স্বামীর যেন এ সব বাড়াবাড়—কল্পনার আতিশয্য। বলে, তুমিও ত মাইনর পাস দিয়েছ, কিন্তু কি করছ? এই ত জমির খাও আর কাদা খুঁচে মাছ ধর।

মাইনর পাস দেওয়া এবং ফলে দ্রষ্টব্য একটা কিছু না হওয়াকেই চরম সাক্ষ্য রেখে তর্কে অবতীর্ণ হতে চায় সুরবালা।

আরে রাম! মহেন্দ্রির বোঝায়, এটা কি আর একটা লেখাপড়া। এল-এ, বি-এ হলে না কদর?

'ও বাবা'!—একটু বুঝি ঠোঁটই উল্টে ফেলে সুরবালা। 'তোমার ছেলেকে তুমি এল-এ, বি-এ করতে চাও, কর না কেন। একটা হাকিম যদি হয়, সে ত আমার ভাগ্যি।' সুরবালা সমাপ্তি টেনে দেয় তর্কের।

আট বছরে পড়তে গাঁয়ের পাঠশালায় সুবলকে ভর্ত্তি করে দিয়েছিল মহেন্দ্রির।

তার পরে ঐ আরম্ভেই ইতি। বাস্তুহারা হয়ে চলে আসতে হয়েছে কলকাতায়। অনেক ঘোরাফেরা করে, দেশের লোক মুকুন্দবাবুকে ধরে শেষে রেশন-আপিসে আর্দ্দালীর চাকরিটা জুটে যায় ভাগ্যের জোরে। মুকুন্দবাবু তখন ও বিভাগের বড়কর্ত্তাদের দলে।

কয়েক মাসের আয়ের থেকে টাকা জমিয়ে অবশ্য মুকুন্দবাবুর মান রক্ষা করতে হয়েছিল মহেন্দ্রিরকে। কিন্তু তার জন্য আফসোস নেই মহেন্দ্রিরের। মুকুন্দবাবু যে উপকার করেছেন তার কি তুলনা আছে? তিনি না তাকালে সেই অবস্থায় কলকাতার মত শহরে এসে দাঁড়াত কেমন করে! এত বড় একটা হিল্লে করে দিয়ে কিছু দক্ষিণা নিয়েছেন, এ আর আশ্চর্য্য কি। সে নিজেও ত অমনি কত নিয়েছে। একখানা দরখাস্ত পৌঁছে দিয়েছে, কি বড়কর্ত্তা আছেন কিনা একটু সংবাদ নিয়ে দিয়েছে, তার জন্যেই পার্ব্বণী পেয়েছে আট আনা, এক টাকা।

খেয়ে পরেও দু'পয়সা জমা হচ্ছিল হাতে। এই দুর্দ্দিনে অন্য পাঁচ জনের তুলনায় ওদের ভাগ্য ত অনেক ভাল। মুকুন্দবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠে মনে মনে।

সুরবালার কাছে কথা পাড়ে বিশ্রামের সময়। যাক, ভগবানের ইচ্ছায় সুবলকে বোধ হয় মানুষ করতে পারব এবার। কলকাতা শহর, স্কুল-কলেজের অভাব নেই। এ ত আর সেই মুকসুদপুর গাঁ নয়। এখানে যত খুশি পড়। ছাখো, শেখো, মানুষ হও। বাড়ীর খেয়ে বিদ্যা অর্জ্জনের এমন সুবিধে কোথায় আছে?

খুলনা জেলার পাড়াগাঁ মুকসুদপুরের সঙ্গে কলকাতা শহরের তফাৎটা চিন্তা করে দুঃখের মধ্যেও আশ্বস্ত হয় মহেন্দ্রির। একমাত্র ভরসা যে ছেলেটা মানুষ হবে, হয়ত এই কলকাতারই কোনও এক আপিসের বড় সাহেবের গদ্দিতে বসবে এক দিন। চিন্তা করেও সুখ পায় ঢের। বুকখানা গর্ব্বে ফুলে উঠে। কল্পনার ফানুসে অনেক দূর উঠে যায় মন।

এই কল্পনার ইমারত ধ্বসে পড়ল অকস্মাৎ। সার্কুলার শীটে নাম বেরিয়ে গেল অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে মহেন্দ্রিরেরও। রিট্রেঞ্চমেণ্টের নির্ঘাত গুলি এসে বিঁধল ঠিক এই জমাট স্বপ্নের সময়—সৌভাগ্যের ঠিক শীর্ষ মুহূর্ত্তে।

মাথায় হাত দিয়ে বসল মহেন্দ্রির।

সুরবালা যুক্তি দিলে—যাও আর একবার মুকুন্দবাবুর কাছে। হাতে-পায়ে ধরে ছাখো।

সুরবালা যা উপদেশ দিল, তার চেয়ে অনেক বেশীই করল মহেন্দ্রির। পুরো দু'মাসের বেতন বাজি রাখল। কিন্তু হ'ল না কিছুই, মুকুন্দবাবুর কোনই হাত নেই। ছাঁটাইকে রদ করবার মত ক্ষমতা তাঁর এক্তিয়ারে নেই।

মুখ কালো করে ফিরে এল মহেন্দ্রির...

'কি হ'ল'?

ভাগ্যপরীক্ষা করে কখন ফিরে আসবে স্বামী, তার প্রতীক্ষায় ছিল সুরবালা। বাইরে পায়ের শব্দ শুনেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি হ'ল?

'কিছুই না', দুটি কথার একটি সরল উত্তর। কোনও ভূমিকা নেই, নেই কোনও ক্রোড়বাক্য।

এক নিমিষেই চুপ হয়ে গেল সুরবালা। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রতীক্ষা-উদ্বেগের অন্ত হয়ে গেল ঐ একটি উত্তরে।

সুরবালাও চুপ, মহেন্দ্রিরও চুপ। এর পরে কিছু বলার যেন আর কোনও প্রয়োজন নেই—না সুরবালার, না মহেন্দ্রিরের।

সুবল ঘরে বসে পান্তা ভাত খাচ্ছিল, বাইরে আঁচাতে এসে দেখল বাপের চেহারা। সেই সাত-সকালে বেরিয়েছিল, ফিরল এই আন্দাজ তিনটেয়। একে না-নাওয়া, না-খাওয়া, তার উপর হাঁটাহাঁটি আর রোদের তাত। মুখটা চুমড়ে যেন এতটুকু হয়ে গিয়েছে বাপের।

এবেলা গরম ভাত হবার কথা ছিল না। সুরবালা বলেছিল, পান্তা-জলে দুটো মুখে দিয়ে যাও। এই টা-টা রোদে ঘুরবে।

না, এখন নয়, ঘুরে আসি আগে।

মহেন্দ্রির জবাব দিয়েছিল, একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মনটা ভাল লাগছে না। ঘুরেই আসি চট করে। মুকুন্দবাবু আবার আপিসে থাকেন না বেশী সময়।

আসল কথা তা নয়, পান্তা কত ক'টি আছে কে জানে। আগে সুবল ত থাক পেট ভরে।

তার পর? এমনি করে আর ক'দিন চলবে?

উৎসাহ দিতে গিয়ে সে দিন অনেক কথাই বলে ফেলল সুবোলা।

কিন্তু তার জন্যে তেমন দুঃখ নেই মহেন্দিরের। মিথ্যে কথা ত আর বলে নি ও। এই কলকাতায় যদি কিছু না করতে পারে, তবে আর কোথায় কি জুটবে? কলকাতায় যার অন্ন নেই, তার ভাগ্যে হাভাত ছাড়া আর কি?…

ভেবে চলেছে মহেন্দির।

হাতের বিড়ি শেষ হয়ে গিয়েছে কখন। পোড়া পিছন-টুকু টান দিয়ে দূরে ফেলে দিল মহেন্দির। এতক্ষণ ওইটুকুই ঠোঁটে গুঁজে বসেছিল। কি লজ্জার কথা! চাকরিতে থাকতে কত বাবুরা এসে প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরে দিয়েছে সামনে।

আজ যেন কে তাকে জোর করে অপমান করছে। সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরে খান খান করে দিচ্ছে গায়ের জোরে।

সামনেই টলটল করছে গোলদীঘির জল। গরমের সন্ধ্যা, বাবুদের ছেলেরা সাঁতার কেটে স্নান করছে ওই জলে। সবাই লেখাপড়া-জানা ভদ্রঘরের ছেলে। আর এই কলেজ স্কোয়ারের চারদিকের বাড়ীগুলো? সবগুলোই চেনে মহেন্দির। মেডিক্যাল কলেজ, ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ কত কি—সব লেখা-পড়ার পীঠস্থান। পড়াশুনার পাড়া, এই সব জায়গারই ত ছেলে এরা। এরই একটা ঘরে সুবলের পড়ার কথা। ফরসা জামা-কাপড় পরে বই-খাতা নিয়ে কলেজে যাবে। ফিরে এসে একটু জলখাবার মুখে দিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোবে। পেছনে পেছনে লুকিয়ে এসে তাকিয়ে দেখবে সে। সুবল তখন লম্বা-চওড়া রীতিমত ভদ্রলোক—দশ জনের এক জন।

দশ বছরের আগাম স্বপ্ন দেখে মহেন্দির।

কিন্তু এখন? এখন খালি হাতে বাসায় গেলে ও খাবে কি—তার ওই সুবল! বাসাভাড়া না হয় আরও কিছু দিন বাকি রাখা চলবে। ভদ্রলোক কম করে নি। দেশসুবাদে নিজের ভাড়াটে বাসা থেকে একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছে সামান্য টাকায়। টাকাটা অবশ্য মাসের শেষে চুকিয়ে দিতে পারলেই ভাল, কিন্তু না দিতে পারলেই কি আর ঘর ছাড়তে বলবে? চাকরি যাওয়ার পর থেকে ঘোষবাবুর সংসারে হাট-বাজার, টুকিটাকি কাজ খাতিরে করে দিচ্ছে মহেন্দির। কিন্তু পেটের জন্যে দুটো দানা ত চাই। বিশেষ করে ওই ছেলেটার—বার বছরের ছেলে স্বপ্নের কেন্দ্র ওই সুবলের জন্যে।

সন্ধ্যা উতরে বেশ খানিকটা রাত হয়েছে ততক্ষণ। পকেট থেকে আর একটা পোড়া বিড়ি বার করে দেশলাই খুঁজতে লাগল মহেন্দির। যদি কেউ বিড়ি-সিগারেট ধরায়, সেই আগুনে ধরিয়ে নেবে। কিন্তু লোক তখন বেশী নেই সেখানে। প্রায় সব বেঞ্চিই খালি, এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখে মহেন্দির। ওই যে, একটু দূরে মির্জ্জাপুর কলেজ ষ্ট্রীটের কোণের দিকটায় ফুল-ঝোপের কাছাকাছি যে বেঞ্চিটা, সেখানে কে একজন শুয়ে। ভাবল, একবার দেখবে নাকি দেশলাইটা চেয়ে।

উঠে এল কাছে। নাঃ, ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছে, হ্যাঁ, ভদ্রলোকই, হাতে দিব্বি হাতঘড়ি, পায়ে দামী জুতা, পোশাক-আশাকও তেমনি। আর—

বুক-পকেটের ফাঁক দিয়ে জানা যাচ্ছে ভেতরে কয়েক-খানা বড় নোটের অস্তিত্ব। উঃ, কি বোকা ভদ্রলোক! এমন জায়গায় নিশ্চিন্তে পড়ে ঘুমোচ্ছে! যদি পকেট মারা যায়? হাতঘড়িটা কেউ খুলে নেয়? তা পারবে না? খুব পারে। এমন সাফাইওয়ালা আছে বৈ কি কলকাতায়। পথ-চলতি মেয়ের গলা থেকে হার বার করে নেওয়া, ট্যাঁক কেটে টাকা হাওয়া করে দেওয়া—এ সব এদের কাছে জলের মত সোজা। বিলকুল হাতের কেরামতি। যার আছে, তার মারছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে দিব্বি মজা লুঠছে। কি ব্যবসাই না শিখেছে এরা! এ সম্বন্ধে কত গল্পই না চাকরিতে থাকতে শুনেছে সে। বুক-পকেট থেকে মারতে হলে নাকি দুটো আঙুল হলেই হয়, তর্জ্জনী আর মধ্যাঙ্গুলি। আঙুল দুটো ধীরে গলিয়ে দিয়ে সাঁড়াশির মত করে ধর আর প্রেমসে বার করে আন। নীচের পকেটের ব্যাপারে নাকি কাঁচিই সেরা হাতিয়ার। ব্যস, বিনা মেহনতে খোরপোষ। মায় বউয়ের গয়না, ছেলেপুলের—

সুবল আর সুবলের মার ছবি ভেসে উঠে চোখের সামনে। না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে সুবল, আর তার মা চোখ মুছছে দোরগোড়ায় বসে। চোখে এসেছে হতাশার ক্লান্তিজনিত ঘুম।…

ছি ছি, ঘেন্নার কাজ যে! তা হোক, ডান হাতের তর্জ্জনী আর মাঝের আঙুলটা একবার রগড়ে নিল মহেন্দির।

বাঃ চমৎকার পেশা, ভারি মজার! কিন্তু বুকের মধ্যে দুরদুর করছে তখনও। হাতের তেলো ঘেমে উঠেছে উত্তেজনায়, পা দুটো যেন কাঁপছেও। না না, আর দেরি করা চলে না। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিল

মহেন্দ্রির। যাক্, কেউ দেখে নি'মনে হয়, তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে এল, সোজা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে। আর এখানে নয়, এগিয়ে চলল একেবারে শেয়ালদামুখো।

অনেক দূরে এসে বার করল নোটের গোছা। আবার একটা কাঁপুনি এল সারা দেহে। পেছনটা দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি গুনে ফেলল আয়ের অঙ্কটা। দু'আঙুলের আয় দু'শত টাকা। ভয়কে উপচে একটা দারুণ স্ফূর্ত্তি এল ভেতরে, একটা আনন্দের আতিশয্য। মেহনত কিছুমাত্র নয়, সময় আধ মিনিটেরও কম। চাকরি-বাকরি লাগে এর কাছে!

দোকান থেকে খাবার কিনে নিল—ভর্ত্তি একটা বড় ঠোঙা। সুবলকে ডেকে তুলে খাওয়াবে, তার মাও একটু মুখে দেবে।

কিন্তু জিজ্ঞেস করলে কি বলবে? যদি জিজ্ঞেস করে চাল কেনবার পয়সা নেই, মিষ্টি কিনে আনলে কেমন করে? একথা ত উঠবেই, উঠতেই ত পারে। তবে সে আর এমন কি ফ্যাসাদ? বলবে, এক চেনা লোকের চাকরি হয়েছে, তাই মিষ্টি খেতে দিয়েছে। বাড়ীতে ছেলে বৌ আছে, দিয়েছে এক ঠোঙা। হ্যাঁ, মিছে কথাই বলবে—মিথ্যে বলবে, তবু বৌয়ের কাছে ছোট হবে না। আরও আছে, আছে সুবল, ভয় তাকেই সবচেয়ে বেশী। ছেলের কাছে ধরা দেবে চোর বলে, পকেটমার বলে! যে ছেলে এক দিন একটা কিছু হতে পারে, তার লজ্জার ইতিহাস মগজে ঢুকিয়ে দেবে এখনই। চিরদিনের মত মাথা হেঁট করে দেবে ছেলের। অসম্ভব, এর ছোঁয়া লাগতে দিতে পারে না ওর গায়ে। ওকে যে মানুষ করতেই হবে।

টাকা ফুরনোর আগেই আবার চাকুরির চেষ্টা করেছে অনেক। অনেক হেঁটেছে, খোশামোদ করেছে। রোদ লাগিয়ে শরীর খারাপ করেছে। কিন্তু ফল হয় নি কিছুই। ভেবেছে অনেক, এ পথে মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর নেই। নিজেরা মরবে, ছেলেটাকে চোখের সামনে দেখতে হবে কুলিগিরি করছে, না হয় পকেট মারছে, বদমায়েসি করছে। ভাবতে ভাবতে কপাল ঘেমে যায়, আর ছাই ভাবতে পারা যায় না। ওই ভাল, ওই ভাল। নিজে বয়ে গিয়েও যদি ছেলেটাকে তুলে ধরা যায়। একটা পদ্মের সৌরভে যদি পাঁকের কলঙ্ক ঢাকে, তবে ছেলের কৃতিত্বে বাপের পাপ মুছবে না? তার মার্জ্জনা হবে না?

পেশা ঠিক হয়ে গেল মহেন্দ্রিরের, একটার পর আর একটা শিকার করতে করতে হাতও পেকে গেল। তবে হুঁশিয়ার হয়েছে একটু বেশীমাত্রায়। সবখানেই—বাড়ীতে এবং বাইরেও। এদিকে যেমন কোনও রকম গুঞ্জন উঠতে দে[illegible] না, ওদিকে তেমনি নির্ঘাত মৌকা না পেলে মারে না লোভে পড়ে ঝুঁকি নিতে যায় না। আয়ের পরিমাণটা তাই খুব বেশী নয়, কোনও প্রকারে দিন গুজরান হচ্ছে। অভাব অনটনের হাত থেকে একেবারে বেকসুর খালাস হয় নি[illegible] দু'কূল ঠিক রাখা ত বড্ড মুশকিল।

উপরি উপরি ক'মাসের ভাড়া দেওয়া হয় নি। ঘোষবাবু এবার তাগাদা দিয়েছেন। তাগাদাটা একটু কড়া রকমেরই হয়েছে। টাকার অঙ্কটাও ত আর কম নয়। একুনে পঞ্চাশের উপরে, তার পর আর কিছু বাড়তি খরচও আছে নূতন বছরে ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করতে হবে।

ঘোষবাবু তাগাদাটা প্রকাশ্যেই পেশ করলেন। প্রকাশ্যে মানে বাড়ীর ভেতরেই, কিন্তু সুবলের সামনে। ছেলের সামনে বাপকে এমন ভাবে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিল[illegible] মনটা খারাপ হয়ে গেল মহেন্দ্রিরের। যেমন করেই হোক ভাড়ার টাকাটা শিগ্‌গীরই চুকিয়ে দিতে হবে, পারে ত আজই।

ভাবতে ভাবতে ধীর পায়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল মহেন্দ্রির।

পিছন থেকে তখনও কানে আসছে—সুরবালার সংসারের দায়িত্ব-বিষয়ক স্মারকবাণী।

ভগবান, একটা মৌকা যেন আজ মেলে।

মনের মধ্যে একটু রাগও হয় মহেন্দ্রিরের। ভারি একটা নচ্ছার কাজ এই, ভারি হারামি পেশা। লোকে ভাবে [illegible] অমুক ব্যাটা পকেটমার, তবে কত না মারছে। টাকা লুঠছে দু'হাত দিয়ে। সেও এমনি এক দিন ভেবেছে, কিন্তু তখন সে অনভিজ্ঞ, এখন বুঝছে, কত ধানে কত চাল পকেটমার—শুধু নামেরই জেল্লা! এদিকে পেট শুকিয়ে আমসি।...

বাবা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই রাস্তায় এসে দাঁড়াল সুবল। মনটা মোটেই ভাল নয়, সকালবেলায় বাপকে এমন করে অপমান করল! তের বছরের ছেলে, কিছু বোঝে না কি।

মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট থেকে হ্যারিসন রোড ধরে অনেকটা এগোল মহেন্দ্রির, কিন্তু সুযোগ এল না। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরল বড়বাজার মুল্লুকে। একটাও বেহুঁশিয়ার পকেট চোখে পড়ল না। আজ রবিবার, ট্রামে-বাসেও ভিড় নেই, হতাশ হয়ে এসে দাঁড়াল হাওড়া পোলের উপর। একটু ঠাণ্ডা বাতাস লেগে শরীরটা চাঙ্গা ত হোক। এগিয়ে লাভ নেই, এইখান থেকেই আগে নজর রাখা যাক। ছেঁড়া জামার আস্তিন দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিল একবার।

রেলিঙের ধার দিয়ে দিয়ে পায়চারি করছে, হঠাৎ ধ্যা

করে দৃষ্টিতে টান পড়ল। বুক-পকেট নয়, কোমর-তবিলের আসল অংশটাই ঝুলে পড়েছে নীচে। জামার নীচে না নেমে এলেও জামার তলা দিয়ে চোখে পড়ছে সামান্য সামান্য, ঐ সামান্যতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল পাকা চোখের কাছে। থলেটা কোমরে জড়িয়ে তার তবিলটা রেখেছে ঝুলিয়ে। খুশীতে মনটা মেতে উঠল, চমৎকার মৌকা, মালও নিশ্চয় মোটাই।

শুকনো মুখখানা চকচকে হয়ে উঠল আশা-আনন্দে। কিছু মেহনত নয়, শুধু ধারালো হাত-কাঁচিটার একটা পোঁচ। ঘোষবাবুর মুখের উপর ছুঁড়ে দেবে তার গোটা পাওনাটা, এক কিস্তিতেই। নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা শিস বেরিয়ে এল তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে পিছু নিল।

চার পয়সা দিয়ে একখানা প্লাটফরম টিকিট কিনে দাঁড়াল গিয়ে বোম্বাই মেলের প্লাটফরমে। উঃ কি ভিড়, সব যোগাযোগ—ভগবানের দয়া। কুলি-খরচ বাঁচিয়ে পেঁটরা নিয়ে ঠেলে উঠছে ভদ্রলোক ইণ্টার ক্লাসের একটা কামরায়।

ভদ্রলোক কামরায় ঢোকবার আগেই অপারেশন শেষ করে প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে এল মহেন্দির।

পোলের মাঝখানে এসে গোটাকয়েক তামার পয়সা বের করল পকেট থেকে। টুক করে কপালে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিল গঙ্গার বুকে। এ একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে ওর। যখন যা পাবে তার থেকে দেবতার নামে কিছু দেওয়া।

কিন্তু এ কি! সামনে এত হট্টগোল কিসের?

একটু ভড়কে যেতে হ'ল। শব্দটা ত ভাল নয়। সবাই মিলে চেঁচাচ্ছেঃ ধর ধর পকেটমার। সেই কি তবে ধরা পড়ছে। আওয়াজটা পিছন দিক থেকে এলে এতে আর কোনও সন্দেহই ছিল না, কিন্তু সে পথ এক রকম বন্ধ, ও হ'ল ট্রেনের প্যাসেঞ্জার। হতে পারে অন্য কোনও হতভাগা হয় ত ধরা পড়ছে। কলকাতা শহর, চোর-চোট্টার কি অভাব এখানে? কত লোকের এই পেশা, কিন্তু সহবৃত্তিক হলেও সব ব্যাটাকে দেখতে পারে না মহেন্দির। সবারই ত আর এমনি কোনও মহৎ উদ্দেশ্য নেই।

এগিয়ে রাস্তায় পড়তেই দেখে গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়েছে এক জায়গায়, ব্রিজের ঠিক মুখটাতেই। যেমন হুমকি-হামকি তেমনি চটাপট প্রহারের শব্দও। শিকার ধরা পড়েছে বোধ হয় ওদের।

আহা, বেচারি বাঁচতে পারে নি! নিজের অজ্ঞাতসারেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটুখানি সহানুভূতি—সবাইকে মনে মনে পছন্দ না করলেও।

যাক মশাই, খুব মার হয়েছে, এখন থানায় দিয়ে দিন। ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ! বাচ্চারাও নেমেছে এই কাজে! ব্যাটারা সব বংশগত পকেটমার। যা হোক এগিয়ে দেখতে যায় মহেন্দির।

ভিড়ের বৃত্ত ঠেলে মাথা গলিয়ে দিতেই মাথাটা ঘুরে উঠল বোঁ করে। চোখের সামনে হুড়মুড় করে হাওড়া ব্রীজটা বুঝি ভেঙে পড়ল। পড়তে পড়তে কোনও রকমে টাল সামলে নিল মহেন্দির।

ভুল নয়, ঠিকই দেখেছে, ভিড়ের ভেতরে পকেটমার বলে ধরা পড়েছে তার সুবল।

কোরবা নৃত্য

মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের নৃত্যগীত

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

মধ্যপ্রদেশের গহন জঙ্গলে, বস্তার মাণ্ডলা ও চান্দা জেলায় এবং সরগুজা অঞ্চলে যে সমস্ত আদিম অধিবাসীদের দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে কোরবা, ভূঁইহার, কোর্খু, গোন্দ, ওরাওঁ, মারিয়া ও বৈগা জাতি প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া সাতপুরার অরণ্যে আরও বহু শ্রেণীর উপজাতি আছে। এ সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে কোরবা আর পণ্ডো জাতিই এখন পর্য্যন্ত এক রকম খাঁটি অরণ্যবাসী রয়ে গেছে। বর্ত্তমানে কোরবা জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে, 'পহড়িয়া কোরবা' ও 'ডিহরিয়া কোরবা' নামে পরিচিত।

ডিহরিয়া কোরবারা জনপদে সভ্যজাতির সংস্পর্শে এসে বহু লাংশে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। তারা কাপড় পরতে, রান্না করে খাদ্য-দ্রব্য খেতে ও চাষবাস করতে শিখেছে। তাদের ভাষার সঙ্গে ছত্রিশগড় ও বিলাসপুরী ভাষা মিশ্রিত হয়ে একটি নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

পহড়িয়া কোরবাদের সাতপুরা পাহাড় ও অরণ্যে এবং নর্ম্মদার তীরে তীরে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের পোশাকের বালাই বড় নেই; গাছের বাকল তাদের লজ্জা নিবারণ করে। তাদের রঙ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তারা দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ। মাথার চুল তারা কখনও কাটে না, পিঠে গিঁঠ দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় অথবা রশির মত পাকিয়ে রাখে। তাদের প্রধান খাদ্য হ'ল বন্য পশুর মাংস এবং ফলমূল ও কন্দ। তারা পাকা শিকারী, পিঠে তীর ধনু ঝুলিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে বন্য পশুর সন্ধানে ঘোরে, এবং বিষ-মাখানো তীর দিয়ে অনায়াসে পশু শিকার করে আনে ও আগুনে ঝলসে খায়। এঁদের স্বভাবে বৈশিষ্ট্য আছে, এঁরা সাহসী, নির্ভীক, সত্যবাদী, সরল এবং অতিথি-বৎসল। এদের চেয়ে কিঞ্চিৎ উন্নত স্তরে যারা পৌঁছেছে, তারা এক বিচিত্র উপায়ে কৃষি করে। এরা জঙ্গলের একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করে এক শুভদিনে সেখানকার বড় বড় গাছ কাটতে সুরু করে দেয় ও সেগুলো ফেলে রাখে; গ্রীষ্মকালে সেগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সব গাছগুলো পুড়ে গেলে এক একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে সবগুলো ছাই জমির চারদিকে ছড়িয়ে ফেলে। বর্ষাকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে, সেই ভিজা ছাইয়ে চার-পাঁচ রকমের শস্যদানা একসঙ্গে ছড়িয়ে দেয়। প্রথম দুই বৎসর সেই উর্ব্বরা জমিতে চমৎকার ফসল হয়, তারপর ফসল আর তত ভাল হয় না। সেজন্য তারা পাহাড়ের উপর এক স্থানে দুই তিন বৎসরের বেশী ক্রমাগত চাষ করে না। দুই তিন বৎসর চাষ করেই তারা ঐ স্থান ত্যাগ করে জঙ্গলের অন্য স্থানে আবার পূর্ব্বোক্ত ভাবে গাছ কেটে জ্বালিয়ে জমি তৈরি করে। এভাবে ক্ষেত তৈরি করার জন্য বছরের পর বছর তারা জঙ্গলের মূল্যবান গাছগুলি কেটে নিঃশেষ করে ফেলছে। পরিণামে এই হয়েছে—যে সমস্ত ব[ড়] বড় গাছ বৃষ্টির জল শোষণ করত, সেগুলি নির্ম্মূল হয়ে যাওয়া[তে] বর্ষার সময় পাহাড়ের উপর থেকে প্রবল জলধারা গিয়ে নদী নালা[তে] মিলিত হয়, আর সেই সব ক্ষীণকায়া পাহাড়ী নদী বিশালাকা[র] ধারণ করে তীব্র স্রোতে দু'দিককার উৎকৃষ্ট ভূমি এবং এদের পর্ণ কুটীর ধ্বংস করে বয়ে চলে। এই সব আদিম জাতি অন্যভা[বে] ক্ষেত-কৃষি করতে বিশেষ ইচ্ছুক নয়, তারা বিশ্বাস করে ধরিত্রী মাতার উপর হলচালনা করলে মাতার বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

এরা বৎসরে দু'তিন মাস এই অভিনব ধরনের কৃষি করে এব[ং] অবশিষ্ট সময় নাচ-গান আমোদ-প্রমোদে কাটায়। এরা ভূত-প্রে[ত]

টোনা-টানা"য় গভীরভাবে বিশ্বাস করে। সব উৎসবেই এরা জলপান ও নৃত্যগীত করে—এমন কি শবদাহের পরেও।

গোন্দ জাতিরও নাচ-গানের বড় সখ। তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার নৃত্যের প্রচলন আছে। কোন কোন নৃত্য স্ত্রী-পুরুষ কর্তৃক একত্রে অনুষ্ঠিত হয়। করমা নাচে যুবক-যুবতীরা সেজেগুজে যুগলে নৃত্য করে। মাদল বাজে, বাঁশী বাজে, আর এক এক জোড়া যুবক-যুবতী এক হাত গলায় ও এক হাত কোমরে দিয়ে বাজনার তালে তালে নাচে। সাধারণতঃ প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরের সহিত নাচে এবং সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রীও জোড়া হয়ে নাচে। নাচের পূর্ব্বে সবাই প্রচুর মহুয়ার মদ্য পান করে।

আদিবাসীদের মধ্যে পর্দ্দার কোন বালাই নাই। নারীরা মুক্ত-ভাবে মাঠে-ঘাটে বনে-জঙ্গলে চলাফেরা করে এবং সেজন্য নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়, তাতে তরুণ-তরুণীরা প্রেমে পড়ে নিজ ইচ্ছামত বিবাহ করতে পারে। শুধু তাই নয়, বিবাহিতা নারীরা ও অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হলে অনায়াসেই পূর্ব্ব-বিবাহ-সম্বন্ধ ছিন্ন করে দ্বিতীয় বার পতিগ্রহণ করতে পারে, শুধু প্রেমিক ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রথম পতিকে অর্থদণ্ড দেয়। যারা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে, কনেকে তাদের যৌতুক দিতে হয় না। এদের মধ্যে কনেকে যৌতুক পণ দিতে হয় এবং গরীব অরণ্যবাসীদের পক্ষে অনেক সময় সেটা কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক পুরুষ বধূপণ হিসেবে নগদ অর্থ দিতে না পেরে ভাবী শ্বশুরগৃহে মজুরের কাজ করে এবং এক বৎসর দুই বৎসর শ্রমদান করে তবে বধূলাভ করে। এরূপ প্রণয়প্রার্থীদের "লভসেনা" বলে। আদিবাসী স্বামী-স্ত্রীদের "ডোকা" "ডোকী" বলা হয়, বরকে অনেক সময় "দুলহাবাবু" বলে।

আদিবাসীদের কয়েক প্রকার নৃত্যের মধ্যে করমা, বৈগা, বেমর, শৈলা ও চাচর নৃত্য উল্লেখযোগ্য। এদের অনেক গানে উঁচু স্তরের ভাব বা শব্দবিন্যাস কিছুই নেই, শুধু নাচের তাল রাখবার জন্য অনেক সময় কতকগুলো অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করে। তবে জনপদে এসে যে সব আদিবাসী কিঞ্চিৎ উন্নত হয়েছে, তাদের সঙ্গীতে তারা সহজ সরলভাবে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। নাচের বাদ্যের মধ্যে মাদল, মঞ্জিরা, বাঁশী ত আছেই, এ ছাড়া আছে চটকোলা। চাটুকয়া বাঁশ ও কাঠ দিয়ে চটকোলা তৈরি করে এবং নাচের সময় তা দিয়ে চটক্ চটক্ আওয়াজ করে। করতালের মত একটা থালা বাজায় তাকে থালী বলে। আর একটি বাদ্যের নাম হ'ল "টিমকি" একটি মাটির বাটিকে চামড়া দিয়ে মুড়ে নেয় ও তা দড়ি দিয়ে কোমরে ঝুলিয়ে রাখে এবং দুটো কাঠি দিয়ে টিম টিম করে বাজায়।

বেমর নৃত্য একটি অতি কঠিন নাচ। এরা পাহাড়ের উপর চাষের জমিকে "বেমর" বলে। পাহাড়ে ক্ষেত করা যেরূপ কষ্টসাধ্য এই নৃত্যও সেরূপ, সেজন্য একে বেমর নৃত্য বলে। মাদল আর টিমকি তালে তালে বাজতে থাকে, নৃত্যকারীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং একদল অন্য দলের কাঁধের উপর চড়ে নাচে, এই নাচটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

শৈলানৃত্যও খুব কঠিন, এটা হ'ল বীরদের নাচ। পাহাড়ের উপর গোল হয়ে হাতে বর্শা নিয়ে আদিম অধিবাসীরা নাচে, তাতে গানের কথা বড় বেশী থাকে না, সামান্য দু'চার পংক্তি গীতই বার বার গেয়ে তারা নাচের তাল রাখে।

ঐলে ডুঙ্গরিয়া, পৈলে ডুঙ্গরিয়া
বীচমে রহে মটটা
মটটা কে উপর কীক মারে
ঝুলিয়া মঞ্জুরা।

বিবাহ-অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোক কর্তৃক হলুদ মাখানো

—"এদিকে জঙ্গল, ওদিকে জঙ্গল, মধ্যভাগে টিলা, টিলার উপর পুচ্ছওয়ালা ময়ূর নাচে।"

এই শৈলা ও বেমর নৃত্য জগদলপুর ও বস্তার জেলায় বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

সভ্য জগতের সংস্রবে যারা এসেছে সেই সকল আদিবাসীদের গীতে হিন্দী ভাষার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

যখন পাহাড়ের উপর গহন জঙ্গলে দল বেঁধে স্ত্রী-পুরুষ কাঠ কাটতে কিংবা ক্ষেতে কাজ করতে যায়, তখন তারা কাজ করতে করতে গান গেয়ে তাদের শ্রম দূর করে এক পদ পুরুষরা গায় অন্য পদ নারীরা গেয়ে উত্তর দেয়, সাধারণতঃ এ সব গান আদি-রসাত্মক হয়।

পুরুষ। হে মডলেবালে তেরা নৈনা নজর মে
ঝুলেইয়ার হে মডলেবালে রে।

স্ত্রী। হে মডলেবালে, ডরো-সুননা, বিসর
মত জানা, হমারী গলী আনা,
হে মডলেবালে রে।

পুরুষ। পানী তো বরসৈ, পতেয়া কোধী
জরা ইসকে তো দেখো হমার কোধী
হে মডলেবালে রে।

স্ত্রী। উপর কে টোলা বোয়ে তো বারী
তোহে দেখন কে লানে ললক ভারী
হে মডলেবালে রে।

পুরুষ। মাঈ নরমদা, বড়ী তো ধরমী
বিজ্ঞ নৈয়া ডুলাদে, লগী তো গরমী—

স্ত্রী। গইন বজরিয়া, লাইন ভাঁটা
মোরী ভিজ্ঞ চুনরিয়া, ওড়া দে ছাতা
হে মডলেবালে রে।

শিরোভূষণ পরিহিত ভীল বর ও কনে। বরের পরনে সাদা উফানিয়ুনি বস্ত্র

পু। হে মডলেওয়ালা, তোমার নয়নপথে সর্ব্বদা তোমার প্রেমিকের চিত্র ভাসছে।

স্ত্রী। হে মডলেওয়ালা একটু শুন, আমাকে ভুলে যেও না, আমার গলিতে এসো।

পু। পাতার দিকে জল গড়িয়ে পড়ছে, তুমি একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে দেখ, হে মডলেওয়ালা।

স্ত্রী। উপরে গ্রাম, নীচে জল বয়ে যাচ্ছে, তোকে দেখবার জন্ত অত্যন্ত ইচ্ছে হচ্ছে।

পু। নর্ম্মদা মা, তুমি ত বড় ধার্ম্মিকা, বিজলী চমকাও, বড় গরম লাগছে।

স্ত্রী। বাজারে গেলাম, বেগুন কিনলাম। আমার ওড়না ভিজে গেল, ছাতা ধর হে মডলেওয়ালা।"

মণ্ডল জেলার অধিবাসীরা করমানাচে এই গীতটি গায়। এই গানটি প্রেমিক-মনের সহজ সরল অভিব্যক্তি।

যখন অন্য টোলা বা বস্তি থেকে ঠাট্টার সম্পর্কীয় বন্ধুদের বা প্রেমিকের আগমন হয় তখন সেখানকার স্ত্রী-পুরুষেরা আনন্দে দল বেঁধে মাদল বাজিয়ে গান গায় নাচে। পুরুষ ও নারীরা গোল হয়ে পাশাপাশি বসে, এবং দলের দু'এক জন পুরুষ বাজনা বাজিয়ে তালে তালে নাচে। এই গানের নাম হ'ল 'সজনী', এটা হ'ল প্রণয়গীতি—

স্ত্রী। মুরলা রে ঘর সাজন আয়
নাচো পংখ পসার
ঘুমড় ঘুমড় কে বদরা ছায়ে
শীতল চলে বরার

পু। দূর দেশকে হম পরদেশী
করলো কুছ সংকার

স্ত্রী। কা চাহিয়ে জিমনার তুমহারে
ক্যা চাহিয়ে সংকার

পু। তুমহারে ভোজন চাহিয়ে
নৈনো কা সংকার।

স্ত্রী। ঐসী বাতো কহো নহমসে
হো জহ হৈ তকরার।

পু। ভোলা ভালা রূপ তুমহারা
কৈ সে দেঁও বিসার।

স্ত্রী। আয়ো সাজন ছিলমিল করকে

পু। আয়ো সজনী ছিলমিল করকে

দু'জন। বন্ধ করো তকরার।

স্ত্রী। "ময়ূর রে পাখা ছড়িয়ে নাচো, ঘরে প্রেমিক এসেছে গুড়ুম গুড়ুম করে মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, শীতল বাতাস বইছে।

পু। আমি দূর দেশ থেকে পরদেশী এসেছি, আমায় অভ্যর্থনা করো।

স্ত্রী। তুমি কি খেতে চাও, তোমাকে কি রকম অভ্যর্থনা করব?

পু। তোমার তৈরী খাদ্য চাই, আর তোমার নয়নের প্রীতি চাই।

স্ত্রী। এ রকম কথা বলো না তবে ঝগড়া হবে।

পু। তোমার মন ভুলানো রূপ কি করে ভুলি?

স্ত্রী। বন্ধু এসো, মিলে মিশে এসো

পু। বান্ধবী এসো, মিলে মিশে এসো

দু'জনে একসঙ্গে। ঝগড়া বন্ধ করো।

—এটিও প্রণয়গীতি, পুরুষ ও নারীরা দল বেঁধে গানে উত্তর প্রত্যুত্তর করে ও নৃত্যকারীরা তালে তালে নাচতে থাকে মাদল বাজিয়ে।

পূরবৈয়া বৈরন হওয়া চলে,
তেরা মেরা মিল না অব ক্যাইসে হোয়
পু। তেরা মেরা মিলনা কুঁয়ে পে হোয়
স্ত্রী। ননদিয়া বৈরিন পানী ভরৈ
তেরা মেরা মিলনা
পু। তেরা মেরা মিলনা চোক সে হোয়
স্ত্রী। জেঠনিয়া বৈরিন চৌকা করে
তেরা মেরা মিলনা
পু। তেরা মেরা মিলনা ডহর মে হোয়
স্ত্রী। পড়োসিন বৈরিন ডাঁটা লগৈ
তেরা মেরা মিলনা

ডিহরিয়া কোরবাদের যৌথ নৃত্যের প্রস্তুতি

এটা হ'ল অভিসার-গীতি। প্রেমিকার বিরহ সহ্য করতে না পেরে প্রেমিক বলছে, "পূবের হাওয়া শত্রু হয়ে বইতে সুরু করেছে, তোর আমার মিলন এখন কি করে হবে।"

পু। তোর আমার দেখা কুয়োর পাড়ে হবে।
স্ত্রী। ননদিনী শত্রু হয়ে সেখানে জল ভরছে,
তোর আমার দেখা কি করে হবে।
পু। তোর আমার দেখা রান্নাঘরের আঙ্গিনায় হবে।
স্ত্রী। সেখানে বড় জা শত্রু হয়ে বসে বসে লেপছে।
পু। তোর আমার দেখা রাস্তার মাঝে হবে।
স্ত্রী। পাড়া-প্রতিবেশী শত্রু হয়ে সেখানে বাঁশ লাগিয়ে রেখেছে, তোর আমার মিলন কি করে হবে।"

বৈলা চলিন রাই, ঘাট করীদে
বৈলা ছোটে ছোটে রে
ডোঙ্গর মা আগী লগৈ জরত হ্যায় পতেরা
সুন সুন কে হীরা মোর জরু হ্যায় করেজা
ভলা ছোটে ছোটে রে।
কুটকী কে পেজ রাঁধে মাহুল কে দোনা
তোরে বিনা জোড়ী মোর হোইনৌ সুনা
ভলা ছোটে ছোটে রে।
মহুয়া কে লাটা, থমের ঠোলা
নোটকে আওয়ে হমার টোলা
ভলা ছোটে ছোটে রে,
পিপর কে পত্তা, পবন হিলনা
চোলা তরস শৈ কবৈ তো মিলনা
ভলা ছোটে ছোটে রে।

"প্রেমিক বা স্বামী বলদ নিয়ে হাটে চলে গেছে, বিরহিণী স্ত্রী একা ঘরে থাকতে না পেরে বলছে, জঙ্গলে আগুন লেগে পাতা জ্বলছে, আমার মনও শূন্য হয়ে জ্বলে যাচ্ছে তোমার বিরহে, বলদ ছুটে যাচ্ছে।

মহুয়া পাতার ঠোঙাতে কুটকী ডাল আর চালের পাতলা খিচুড়ি করেছি। মহুয়া ফলের লাড্ডু, আর থমের ফলের মিঠাই বানিয়েছি, তুমি আমার গ্রামে ফিরে এসো। পিপল পাতা বাতাসে দুলছে, আমার শরীরও শুকিয়ে উঠেছে, কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, বলদ ছুটে যাচ্ছে।"

"হায় চোলা রোওত হ্যায় রাম
বিনা দেখে পরাণ চোলা রোওত হ্যায় রে
দাদর ঝাওর, ঝোড়ী ঢুঁড়ো
ডোঙ্গর বীচ মঝার, ভৈয়া
সবৈ পতেরন তোলা ঢুড়ো
কহাঁ লুকৈ হায় জার
চোলা রোওত রে।
মায়ালা তৈ কসকে ছোড়ে
সুরতা মোরে ভুলাই, ভৈয়া
মোর মড়ায়া সুনী করকে
কহাঁ করে পহু নাই
চোলা রোওত হায় রে।
ইন নৈ নো মে নীদ ন আয়
হিরদা হোই গৈ সুনা, ভৈয়া
ডোঙ্গর ডহরী তোল ঢুড়ো
বিপদ বড় গৈ দুনা
চোলা রোওত হায় রে

"হায় আমার মন কাঁদছে, তোকে না দেখে আমার দেহমন কাঁদছে। নদী নালা টিলা সব জায়গায় তোকে খুঁজে দেখেছি, তুই কোথায় লুকিয়েছিস, তোর জন্ত আমার মন কাঁদছে।

আমার মায়া ছেড়ে আমাকে ভুলে, আমার কুটীর শূন্য করে কার সঙ্গে তুমি প্রেম করছ? আমার মন কাঁদে।

আমার নয়নে নিদ্রা নেই। হৃদয় শূন্য হয়ে গেছে, তোকে বন-জঙ্গল খুঁজে দেখেছি, আমার জ্বালা বেড়ে গেছে, হায় আমার মন কাঁদছে তোকে ছেড়ে।"

সমতলের জনপদে যে সব আদিবাসী বাস করে তারা নাচের সময় বিশেষ কোন পোশাক পরে না, কিন্তু পাহাড়ী আদিবাসীরা নাচের সময় বিচিত্র পোশাক পরিধান করে। নারী ও পুরুষ উভয়েই কড়ি ও হাড়ের তৈরী অলঙ্কার, হাতে গলায় কোমরে পরে এবং ময়ূরের পালক ও নানা কারুকার্য্যখচিত মুকুট মাথায় দেয়।

আমরা সরগুজিয়া আদিবাসীদের ডেকে আমাদের বাড়ীতে নাচ গান করিয়েছি, তারা পাঁচ-ছয় প্রকারের নাচ দেখিয়েছে, তাতে বেনর ও শৈলা নাচ শুধু দেখতে পাই নি।

করমা নাচে নারীরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কোমর ও গলায় হাত দিয়ে এক সারিতে দাঁড়ায়। সামনে আর এক সার পুরুষ মাদল গলায় ঝুলিয়ে দাঁড়ায়। পুরুষরা মাদল বাজাতে সুরু করে ও নারীরা সেই তালে তালে একবার পুরুষদের সামনে এগিয়ে যায়, আবার পিছিয়ে যায় আর গান গাইতে থাকে।

নারীদের পোশাক, দৃষ্টি ও অঙ্গভঙ্গী শালীনতাপূর্ণ ছিল। গানের মধ্যে ভাবের আতিশয্য থাকলেও নাচের ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গীতে অধীরতা ছিল না। বাদ্যের উন্মাদনা সত্ত্বেও নারীদের যৌথ নৃত্য সংযত ছিল।

বাজনার সুর ক্রমশঃ উচ্চ গ্রামে উঠতে লাগল এবং পুরুষরা মাদল নিয়ে লম্ফঝম্প করতে করতে মাদলে দ্রুত কাঠি চালাতে লাগল। কখন কখন মেয়েদের পায়ের কাছে বসে মাদল বাজাতে লাগল, আবার লাফিয়ে উঠে দূরে সরে দাঁড়াল, এদের এই মাদল নিয়ে নাচটা বেশ উপভোগ্য। তবে নাচের বা গানের তালে বৈচিত্র্য নেই, ছন্দ ও গীত কয়েকটা তালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাই কিছুক্ষণ পরেই সেগুলো দর্শক ও শ্রোতার কাছে একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নৃত্যকারীদের গতিতে কোন ক্লান্তির চিহ্ন দেখা যায় না, সেই একঘেয়ে বাদ্য ও নাচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে, অবশ্য নাচের পূর্ব্বে নৃত্যকারীরা প্রচুর মহুয়া-মদ্য পান করে নেয়।

মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম ভাগে নর্ম্মদাতীরে, একদিকে সাতপুরা পর্ব্বত ও অন্যদিকে বিন্ধ্য পর্ব্বতের বনাঞ্চলে ভীল বনজারা কোমু ইত্যাদি আদিমজাতি বাস করে। ভীলদের মধ্যেও বহু নৃত্যগীতের প্রচলন আছে। মধ্যপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের গীতে যেরূপ হিন্দী ভাষার প্রভাব, ভীলদের ভাষায় তার পরিবর্ত্তে গুজরাটী ভাষার আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়।

ভীল নারীরা যখন মধ্যাহ্নে মাঠে তাদের রাখাল-স্বামীদের জন্য খাদ্য নিয়ে যায় তখন এই গানটি গায়।

শটক সাদেনী রাত। গোয়ালিয়ায়ে লেলে
হুতে কবলা মা কুঁদী
মায়তে বোরা, গোঁউ কাড়িয়া
মে তে ঝিনা ঝিনা পীস্যা।
তিন কাতলা বনায়া
মে তে কলেডী, মা হেক্যা
হু তে মাথে দীনে শালী—
সইয়র ভাঁতা পুযে।
সোরী—কুঁনা লীজায় ভাঁতা?
পেলা সোগালা না ভাতা
গোয়াল আঁমলিয়া মালো মা,
মে তে জাইনে পালো খীসে্যা।
গোয়াল ধীরে ধীরে উঠয়ো
গোয়াল সঙ্গে সুটা সুরম।
গোরী গায়া ফেরতী ভাজে।*

চাঁদনী রাত, আমি শস্যের ক্ষেতে লাফিয়ে পড়লাম। আমি নানা ঘাসের বীজ কুড়িয়ে আনলাম, পিষলাম, তা দিয়ে মোটা মোটা তিনটা রুটি বানিয়ে নিলাম। একটা ভাঙা কলসীর টুকরাতে সেঁকে নিলাম, মাথায় রুটি নিয়ে চললাম, পথে বন্ধু জিজ্ঞেস করল কার খাওয়া নিয়ে যাচ্ছ?

আমি বললাম ঐ পেটমোটা লোকটার খাওয়া নিয়ে যাচ্ছি। রাখালটা অমলিয়া মালে শুয়ে আছে গাছতলায়। আমি গিয়ে তার বুড়ো আঙুলটা টানলাম। রাখাল একটা কাঁটার ডাল নিয়ে আমাকে মারতে লাগল, আমি ছুটে পালালাম।

—এটা হ'ল দুষ্ট রাখাল-বৌয়ের গান, ভাল রাখাল-বৌ গায়—

"চাঁদনী রাত, আমি শস্যক্ষেতে লাফিয়ে পড়ে ভাল শস্য কুড়িয়ে আনলাম, ভাল করে পিষে পাতলা তিনখানা রুটি বানালাম, তা মাথায় করে নিয়ে চললাম, পথে বন্ধু জিজ্ঞেস করল 'কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, অমলিয়া মালের রাখালের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছি। আমি গিয়ে তার পাগড়ীর প্রান্ত ধরে টানলাম। সে ধীরে ধীরে উঠল এবং মিষ্টি রুটি খেল। হে প্রিয়, এখন গরু তাড়িয়ে ঘরে ফিরে চল।"

ভীলদের গানে ঋতুর বা প্রকৃতির বর্ণনা কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের গান কাহিনীমূলক এবং কাব্য হিসাবে উচ্চ স্তরের নয়।

---

* ভীলদের এই গানটি ওলন্দাজ পণ্ডিত ইয়ুব রুট ওলন্দাজ এর নিকট থেকে সংগৃহীত। তিনি ভীলদের সঙ্গে কয়েক বৎসর থেকে তাদের ভাষা শিখে, তাদের রীতিনীতি, বিবাহ, নাচগান ইত্যাদি সম্বন্ধে ইংরেজীতে কয়েকখানা বই লিখেছেন।

১৩

চন্দ্রবাবুর ইচ্ছে হ'ল চাকরী ছেড়ে দেন।

ইস্কুলে তিনি সমস্ত দিন কোন কাজ করতে পারলেন না, আপিসের কাজ, ক্লাস নেওয়া, ক্লাস ইনসপেকশন—কোন কাজ করলেন না, আপিসে বসে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

ওই শম্ভু গড়াঞী পাগল হয়ে যাওয়ার দিন তিনেক পর।

সিদ্ধি খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে নিষ্ঠুর আঘাত পেয়েছেন তিনি। তিনি নিজে এই ব্যাপারের দায়ে আংশিক ভাবে দায়ী হয়ে পড়েছেন। তদন্ত করেছিলেন তিনি এবং ব্রজবিহারী বাবু। চন্দ্রবাবু সঙ্কল্প করেছিলেন—এই ঘটনার নায়ক যে বা যে-যে ছাত্র একজন বা দু'জন—তাকে বা তাদের তিনি ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবেন। রাষ্টিকেট করবেন না, সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করবেন। এবং এতে ইস্কুলের বা বোর্ডিঙের চাকর-ঠাকুর যারা যুক্ত থাকবে—তাদের তাড়িয়ে দেবেন। যে ছেলেরা সিদ্ধি খেয়েছে তাদের প্রত্যেকের জরিমানা করবেন।

নিজেকে তিনি জানেন। ছেলেরা তাকে যতটা ভয় করে ততটা ভয়ের পাত্র তিনি নন। তাঁর হাতে বেত আজ পর্যান্ত ভাঙে নি। তিনি ক্রুদ্ধ হলে চীৎকার করেন খুব কিন্তু বেত মারবার সময় তাঁর হাত ঠিক ওঠে না। যতটাও ওঠে --তার উপযুক্ত বেগে পড়ে না। তাঁর কেমন ভয় হয়। কোথায় কোনখানে মারাত্মক হয়ে যাবে। এবং মার খেয়ে কখন কোন্ ছেলে কোণঠাসা বেড়ালের মত নখ-দাঁত বের করে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে—সে ভয়ও তাঁর হয়। এ সব তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই বিল্বগ্রামে ইস্কুল হয়েছে বারো বছর—এক যুগ। এই যুগটির মধ্যে এমন অনেক ছেলেকে নিয়ে তাঁকে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। ওঃ সে সব ছেলে এক-একটি দৈত্য। রামজয় বলত—ষণ্ডমার্কের দল। অবশ্য একটা যুগ চলে গেছে, যুগান্তর হয়েছে, সে শুধু কাল বা বৎসরের হিসাবেই নয়—সব হিসাবেই। এখনকার ছেলেরা তখনকার ছেলেদের চেয়ে অনেক শিষ্ট হয়েছে। দেশটাও পালটেছে। সেকালে পড়ত শুধু বিল্বগ্রাম এবং আশপাশের অবস্থাপন্ন বিষয়ী ঘরের ছেলেরা। তিনি বলতেন—বাবুর বেটা বাবুরা। তাদের ছিল—পড়লেও ঘরের ভাত, না পড়লেও ঘরের ভাত। না পড়লে লোকে মুখ্যু বলবে, ইংরিজী না শিখলে সভ্য সমাজে অচল হবে, ভাল ঘরে বিয়ে হবে না—তাই পড়ত। যারা একটু বিশিষ্ট ঘরের ছেলে—তারা পড়ত সাহেবসুবোর সঙ্গে ইংরিজীতে দু'চারটে কথা বলতে হবে বলে। এরা—নানা ছাঁদে টেরী কাটত, পকেটে বার্ডশাই রাখত, বাড়ীতে গড়গড়ায় তামাক খেত, দু'চার জন চরস খেত, গাঁজাও এক-আধ জন খেত। এদের শাসন করতে গেলে এরা প্রথম কয়েক মিনিট গোঁ ধরে চুপ করে থাকত; তার পরই উত্তর করতে সুরু করত, তার পর বেত দু'বারের পর উদ্যত হলেই খপ করে চেপে ধরত। সে উপেক্ষা করেও বেত চালাতে গেলে বেত কেড়ে নিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করত। এবং শেষ পর্য্যন্ত চৈতন্যবাবুর স্ত্রী—গিন্নী-

মায়ের কাছে নালিশ করত। মধ্যে মধ্যে এক-আধ জন শক্ত সমর্থ জেদী শিক্ষক এসেছেন—তাঁরা দু'এক জনকে প্রহার করেছেন—ভয় করেন নি, কিন্তু পরিণাম ভাল হয় নি।

বঙ্কিম ঘোষাল—বেত মেরেছিলেন ফার্স্ট ক্লাসের ছেলে কিশোরকে। এক সপ্তাহের মধ্যে বঙ্কিম ঘোষাল তার ফল পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি গ্রামে প্রাইভেট পড়াতে যেতেন, একদিন পড়ানো শেষ করে ফেরার পথে কোন অজ্ঞাত লক্ষ্যভেদীর ঢেলার লক্ষ্য হলেন; ঢেলার আঘাতে প্রথমেই হাতের লণ্ঠনটি ভেঙে নিভে গেল, তার পর কানের পাশ দিয়ে বন বন শব্দে ঢেলা ছুটল। প্রাণভয়ে চীৎকার করতে করতে তিনি কোন রকমে বোর্ডিঙে এসে পৌঁছুলেন এবং পরের দিনই চাকরীতে জবাব দিয়ে চলে গেলেন।

আর একজন—বনবিহারী বাবু। তিনিও এমনি একটি দুর্দ্দান্ত ছেলেকে শাসন করেছিলেন। কিছুদিন পরই এক-দিন ক্লাসে একটি ছেলেকে গালে একটি চড় মারতেই সে অজ্ঞান হওয়ার ভান করে পড়ে গেল, এবং ক্লাসের একদল ছেলে তাকে ঘিরে এমনই হৈচৈ সুরু করে দিলে যে ছেলেটির অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সত্য কিনা যাচাই করবার অবকাশ কেউ পেলে না। ছেলেরা চীৎকার করলে, কাঁদলে, ঘটি ঘটি জল এনে তার মাথায় ঢাললে—সে ভিজে বেড়ালের মত মিট মিট করে চোখ মেলে বললে—মাথাটা কেমন করছে। কথাটা গিন্নীঠাকরুণের দরবার পর্য্যন্ত গেল। বন-বিহারী কাজ ছেড়ে চলে গেলেন।

আরও একটা কারণ আছে। সেটা তাঁর নিজের স্মৃতি। ছেলেদের মারতে গেলেই তাঁর বাবার মারের কথা মনে পড়ে। নিষ্ঠুর ভাবে মারতেন তিনি। সে যন্ত্রণা—সে দুঃখের স্মৃতি তাঁর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। বাবা তাঁকে অনেক দিন পর্য্যন্ত মেরেছেন, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন যখন তখনও মেরেছেন। একদিন তাঁর আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হয়েছিল, কতদিন ঘর থেকে পালাবার সঙ্কল্প করেছিলেন—সে সব তাঁর মনে পড়ে যায়।

পারেন না, ঠিক যতখানি কঠোর হওয়া প্রয়োজন—ততখানি কঠোর হতে তিনি পারেন না। ভয় হয়, মমতা হয়, দুই-ই হয়। ছেলেরা তাঁকে ভীতুই মনে করে, সে তিনি জানেন। ছেলেরা—শাসনের দুর্ব্বলতা নিয়ে—তাঁর ভয় নিয়ে রহস্য করে হয় ত ব্যঙ্গও করে—তাও তিনি শুনেছেন। নূতন ছেলেদের—পুরনো ছেলেরা বলে দেয়—গর্জ্জায় খুব কিন্তু বর্ষায় না। ডাকে জোরে কিন্তু বাজ পড়ে না। বেত উঠবে আকাশে—লক লক করে নাচবে কিন্তু পিঠে পড়বার সময় ঠুক করে। শুধু চীৎকারে না ভড়কালেই হ'ল। খুব হিন্দী আর ইংরিজী বলবে। নিকালো—আভি নিকালো—হামারা ইস্কুলসে আভি নিকালো, নেহি মাংতা হ্যায়। গেট আউট—গেট আউট—দিস ভেরি মোমেণ্ট—ই—মি—ডিয়েটলি—ইউ গেট আউট। গলায় হাত দিয়ে ধাক্কাও মারবে, কিন্তু দোর ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। ব্যস! এ সব তিনি জানেন।

এই কারণেই ব্রজবাবুকে এই তদন্তের মধ্যে নিয়েছেন তিনি। ব্রজবাবু শাসন করতে পারেন এবং ব্রজবাবুর আকর্ষণ বিচিত্র। মার খেয়েও ছেলেরা মর্ম্মান্তিক আঘাতে মর্ম্মে আহত হয় না। তদন্ত চলছে আজ এই ক'দিন ধরে। সব সত্য প্রকাশিতও হয়েছে—নায়ক দু'জন; তারা ধরা পড়েছে। সিদ্ধি দোকান থেকে তারাই নিয়ে এসেছিল। তাঁর ভয় ছিল—হয় ত কেষ্ট এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু কেষ্ট জড়ায় নি—জড়িয়ে পড়েছেন তিনি নিজে। সিদ্ধি খেয়েছিল এরা কচুরী তৈরি করে। কচুরীগুলি তৈরি হয়েছিল তাঁর বাড়ীতে; সেদিন যে কড়াইয়ে সত্যনারায়ণের সেবা উপলক্ষে লুচি এবং তালের বড়া তৈরি হয়েছিল—সেই কড়াইয়ে ভাজা হয়েছিল এবং তার জন্য ঠাকুরকে দায়ী করতে পারা যায় না; ঠাকুর বলেছে—বীণাদিদি দাঁড়িয়ে থেকে ভাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রামজয়ের মেয়ে বীণা। তার সঙ্গে ছিল বঙ্গবালা তাঁর কন্যা। ভাল করে সন্ধান করেছেন তিনি। বীণাও দায়ী নয়। সিদ্ধি এনেছিল বঙ্গবালা। সেই বীণাকে অনুরোধ করেছিল—তুমি করিয়ে দাও বীণাদিদি।

বঙ্গবালাকে প্রশ্ন করবার জন্য তিনি ডেকেছিলেন—বঙ্গবালা!

কঠিন কণ্ঠস্বরে ডেকেছিলেন। বঙ্গবালা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ঘরের দরজাটি ধরে এবং পরমুহূর্ত্তেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। ব্রজবিহারী বাবু ছুটে গিয়ে তাকে তুলে এনে শুশ্রূষা করে চেতনা ফিরিয়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন—আপনি এখন সামনে থাকবেন না মাষ্টারমশাই।

বঙ্গবালার জ্ঞান হওয়ার পর তিনিই তাঁকে বলেছেন—আর না মাষ্টারমশাই। এইখানেই ক্ষান্ত হোন। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।

তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—সে কি উচিত হবে ব্রজবাবু?

—হবে। আমি বলছি।

—কেন একথা বলছেন? এত বড় একটা ব্যাপার বঙ্গ অবশ্য সিদ্ধি এনে দিয়েছে—কিন্তু কে তাকে দিয়েছে তার নাম জানতে হবে। বঙ্গ ছেলেমানুষ, এগার বছরের মেয়ে—তাকে ভোলানো এমনকি ব্যাপার? আমি তাকে আমি তাকে—

তাঁর কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ তীব্র এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

—আমি তাকে রাষ্ট্রিকেট করব। আমি তাকে সিভিয়ার পানিশমেণ্ট দেব। এক্সামপ্লারি পানিশমেণ্ট।

শান্ত স্বরে ব্রজবিহারী বলেছেন—না। এইখানেই শেষ করতে হবে ব্যাপারটা।

—কেন? দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করেছিলেন চন্দ্রবাবু।

—আপনি আমার কথা রাখুন। পরে বলব আপনাকে। পরে। কাল সকালে।

আজ সকালে সমস্ত শুনে তাঁর মনে হ'ল—সমস্ত আঘাতটা ফিরে এসে তাঁর মাথার উপর পড়ল! না—। মনে হ'ল, বিষধর সাপে তাঁকে তাঁর অজ্ঞাতসারে দংশন করেছিল—বিষটা এই মুহূর্ত্তে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, মাথা তিনি আর তুলতে পারছেন না।

ব্রজবাবুর আগেই কথাটা আজ ভোরে তাঁকে শোনালেন তাঁর স্ত্রী সত্যবতী। কাল এই ঘটনার পর সত্যবতী বঙ্গবালাকে নিয়ে রাত্রে আলাদা ঘরে শুয়েছিলেন। ভোরবেলা সত্যবতী উঠে তাঁর ঘরে এসে তাঁর দুটি পায়ে ধরে বলেছেন—সব অপরাধ আমার। যে শাস্তি আমাকে দেবে, দাও। বঙ্গকে আর কিছু বল না। এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করো না।

সত্যবতী অকপটে বলেছেন—এখানে এসে তাঁর দৃষ্টি ঘুরে বেড়াত সম্পন্ন কায়স্থঘরের সুন্দর একটি ছেলের সন্ধানে। বঙ্গুর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। সম্পন্ন ঘরের ছেলে, সুন্দর ছেলে, ভাল ছেলে। হেডমাষ্টারের মেয়ে—তাকে অবশ্যই আদর করে নেবে।

সে ছেলে মিলল। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে মল্লিকপুরের সিংহবাড়ীর রবি সিংহ। সুন্দর ছেলেটি, তেমনি পরিচ্ছন্ন ছিমছাম, পোশাক-পরিচ্ছদে সম্পন্ন ঘরের ছাপ; কেষ্ট বলেছিল—পড়াশুনায় একটু মাঠো। অঙ্ক সংস্কৃততে কাঁচা খানিক। তা—পাস ঠিক করবে। মাষ্টাররা বলে—ম্যাট্রিকের ধাক্কা পার হলে উদিকে গড়গড় করে চলে যাবে। গান জানে। ভারী মিষ্টি গলা। বাড়ীর অবস্থা বলতে নাই। সে একেবারে উরি, চৌরী দক্ষিণ দুয়োরি; মা লক্ষ্মী মড়মড় করছেন—বাখারে বাখারে, ঘরের সিন্দুকে ঝমঝম করছেন।

সত্যবতীর অন্তরের কল্পনা অনুমান করতে কেষ্টর বিলম্ব হয় নি। সে বলেছিল—তা আমাদের বঙ্গর সঙ্গে বিয়ে হলে কিন্তু খুব ভাল হয়।

সত্যবতী বলেছিলেন—তা ত হয়। কিন্তু ওরা কি—? সে ভাগ্যি কি—?

—দেখেন দেখি। চন্দ্র মাষ্টারের মেয়ে, সে ফেলনা না কি। মাষ্টারকে বলেন কথাটা পেড়ে দেখতে। দেখবেন—একবারে কেতাত্ত হয়ে যাবে।

সত্যবতী বলেছিলেন—ছেলে এমন সুন্দর, বঙ্গু ত আমার সুন্দর নয়, পাঁচপাঁচি। পছন্দ না করে যদি?

কেষ্ট বলেছিল—দেখছি দাঁড়ান। ওই ওদের কেলাসের কানু মুখুজ্জে আছে। সে ভারি মাতব্বর—লোকও ভাল। তাকে বলছি। বুঝেছেন।

সত্যবতী বারণ করেছিলেন—না কেষ্ট কাজ নাই।

কেষ্ট বলেছিল—কিছু ভাববেন না। কেউ জানতে পারবে না।

কেষ্ট বলেছিল—কামদেবকে। কামদেব বলেছিল রবিকে। রবি সাগ্রহে মত দিয়েছিল। সত্যবতী কথাটা একদিন তাঁকেও বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—এখন অন্তত দু'বছর ও কথা নয়। ছেলেটা আগে পাস করুক। মূর্খ জামাই আমি করব না।

এরই মধ্যে কথাটা গিয়ে বঙ্গর কানে পৌঁছেছিল। এগার বছরের বঙ্গ সলজ্জ এবং স্বপ্নালু হয়ে উঠেছিল। কথাটা চাপা পড়লেও রবিকে দেখে বঙ্গুর লজ্জা পাওয়ায় ছেদ পড়ল না। সে দিন দিন বেশী লজ্জা পেতে সুরু করলে। রবিকেও তার ছোঁয়াচ লাগল। ফুল ফুটতে লাগল—একটি ষোল বছরের ছেলে ও একটি এগার বছরের মেয়ের মনের আকাশে। ক্রমে কথাটা আর গোপন রইল না। রবির কয়েকজন অন্তরঙ্গ জানল। তার মধ্যে কামদেব এবং ওই শম্ভু গড়াঞী প্রধান। নর্ম্যাল পাস শম্ভুর কাছে বঙ্গবালা মধ্যে মধ্যে পড়া বুঝিয়ে নিতে যেত।

চন্দ্রবাবু এ ভারটা দিয়েছিলেন বৃদ্ধ এসিষ্ট্যাণ্ট বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নকুলবাবুকে, ছেলেরা যাকে বলে মিষ্টার ডেভিড হেয়ার। নকুল ঘোষ পাঠশালার পণ্ডিত; বঙ্গবালা মেয়েটি বুদ্ধিমতী, বাপের কল্যাণে নানান বই পড়েছে অনেক। পড়াতে গিয়ে ঘোষ একটু আধটু বেগ পেতেন। বঙ্গবালার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না। নকুল ঘোষই শম্ভুকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন—বঙ্গুর পড়াটা একটু করে দেখে দিও তুমি। বুঝেছ।

শম্ভুর কাছে পড়ে বঙ্গবালা খুশী হয়েছিল। শম্ভু শুধু ভাল পড়াতেই নয়, এই বিয়ের কথা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে ব্যাপারটিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছিল, যেন আকাশ-কুসুমে মালা গাঁথবার জন্য সুচ সুতো যুগিয়ে দিত।

সত্যনারায়ণ সেবার দিন কামদেব এবং শম্ভু এরা দু'জনেই সিদ্ধি এনে বঙ্গর হাতে দিয়েছিল। বোট ভাজিয়ে এনে দিতে হবে।

বঙ্গর মুখে দ্বিধার ভাব দেখা গিয়েছিল, বঙ্গ সত্যই ভয় পেয়েছিল, বলেছিল—বাবা যদি জানতে পারেন ?

—কিছু জানতে পারবেন না।

—না।

—তা হলে যা বলতে হয় তুমি রবিকে বল। ওই পাঠালে। ওই দেখ—দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যই কুয়োর ধারে রবি দাঁড়িয়েছিল। সে ও দলের অন্যতম পাণ্ডা এবং বঙ্গবালার দিকেই তাকিয়েছিল। এর পর আর বঙ্গ আপত্তি করে নি। সে এসে ধরেছিল বীণাদিদিকে। বীণা দীর্ঘকাল বাপের শিক্ষক জীবনে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। টোলের ছাত্রদের খাদ্যাখাদ্যে গোপন সাধের সঙ্গে তার পরিচয় আছে; তারাও কখনও-সখনও সিদ্ধি খায়, সে সবও সে জানে। ভাইয়ের সাথে বোনের সাহায্য করার মত সাহায্যও করে। ইস্কুল বোর্ডিঙের ছেলেদের সঙ্গেও সহযোগিতা করে। পরীক্ষার পর গোপনে নম্বর জেনে দেয়; ছেলেদের ফিষ্টি হলে তাদের দেওয়া মাছ-মিষ্টি বাপের অজ্ঞাতসারে সেই নেয়; কত ছেলে এল কত ছেলে গেল, বালিকা বীণা ক্রমে ক্রমে যুবতী হ'ল, ছেলের মা হ'ল, বীণা থেকে বীণাদিদি হ'ল—কিন্তু ছেলেদের সহ-যোগিতায় সে চিরকালের সেই এক বীণা রয়ে গেছে। বাটা সিদ্ধি নিয়ে নিজে ময়দার সঙ্গে মেখে বেলে দাঁড়িয়ে থেকে সে রোট তৈরি করিয়ে দিয়েছে এবং একখানা নিয়ে সে নিজে খেয়েছে। বঙ্গবালাকেও আধখানা খাইয়েছিল। এ রোটে কিছু ছিল না; দ্বিতীয় বার আবার রোট ভাজিয়ে নিয়ে গিয়ে-ছিল শম্ভু এবং কামদেব। এবার তারা সিদ্ধি মাখা ময়দা থেকে আটখানা কাঁচা কচুরি তৈরি করে এনে বঙ্গর হাতে দিয়েছিল এবং সাবধান করে দিয়েছিল—খবরদার একটুকরো যেন কম না পড়ে। রবির দিব্বি রইল—হুঁ। বঙ্গবালাই সে সিদ্ধির রোট ভাজিয়ে নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছিল।

সত্যবালা বললেন—বঙ্গু ভাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমি দায়ী। তাকে আর কিছু বল না। সে ভয়ে মরে গিয়েছে। কেবলই কাঁদছে। সারারাত ঘুমোয় নি। এই ভোরবেলা একটু ঘুমাল। আমি তোমার কাছে এসেছি।

চন্দ্রবাবু মাথায় হাত দিয়েছেন তখন থেকে।

সত্যবালা এর পর আরও শোনালেন—আরও একটা কথা তোমার কাছে গোপন করব না। পাগল হয়ে শম্ভু যে শুধুই বলেছে—'ওই নীল উজল তারাটি', ওটা একটা গান; রবি ওই গানটা গায় বঙ্গবালাকে লক্ষ্য করে। বঙ্গকে রবি এই বলেই ডাকে।

চন্দ্রবাবু সেই মুহূর্তে স্থির করলেন—চাকরি ছেড়ে দেবেন তিনি। তিনি অযোগ্য। তাঁর কন্যা থেকেই এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। শম্ভু হয় ত নিজেই রোট খেয়েছে—তার জন্য দায়ী হয় ত সে নিজে। কিন্তু বঙ্গবালা সমস্ত কিছুর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। তিনি বঙ্গবালার বাপ, বঙ্গবালার সঙ্গে তিনি বাঁধা পড়েছেন। বিচারকের আসন থেকে তিনি কন্যার টানে অপরাধীর স্থানে নেমে এসেছেন। শাস্তি তাঁর নেওয়া উচিত। নিজে শাস্তি না নিয়ে কাউকে তিনি শাস্তি দেবেন কি করে ?

তখনই তিনি ব্রজবিহারী বাবুর কাছে গেলেন। সকল কথা অকপটে বলে বললেন—বলুন, আমি কি করব ?

ব্রজবাবু বললেন—এত বিবরণ আমি জানতাম না। তবে মোটামুটি জেনেছিলাম।

চন্দ্রবাবু অধীর ভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন—আমার কর্ত্তব্য কি বলুন ?

—আপনার কর্ত্তব্য বলতে আপনি কি বলছেন ?

—হয় আমাকে বঙ্গকে শাস্তি দিতে হয়—

—বঙ্গ আপনার মেয়ে, তাকে শাস্তি দিলে আমরা কি বলতে পারি ? সে আপনি বাপ হিসেবে করবেন। হেড মাষ্টার হিসেবে কর্ত্তব্য হলে—এ নিয়ে আপনাকে থানায় যেতে হয় মাষ্টারমশায়। গাঁজার দোকানের ভেণ্ডার থেকে অনেক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হয়। বঙ্গকে আপনি শাস্তি দিতে যাবেন কি বলে ?

—আমি ভাবছিলাম—আমি রিজাইন দেব। আপনি আমার চেয়ে অনেক যোগ্য ব্যক্তি ব্রজবাবু। আপনি হেড মাষ্টার হোন।

—আপনি এ নিয়ে বড় বেশী চঞ্চল হয়েছেন।

—চঞ্চল হব না ? বলেন কি মাষ্টারমশাই। আমার মেয়ে—

—আপনার মেয়ে ? বঙ্গবালা দশ-এগার বছরের মেয়ে; সে ভুল করে একটা কাজ করে ফেলেছে। তার উপর এত জোর দিচ্ছেন কেন ? না—না। এসব করবেন না। আরও একটা খবর আপনাকে দিই। ধুতুরার বীজ ঝুল—আরও কি কি মিশিয়ে শেষের সিদ্ধিটা শম্ভু নিজে বেঁটে তৈরি করে-ছিল। তকরার হয়েছিল ওদের মধ্যে—এই রোট যে খেয়ে সহ্য করতে পারবে সে পচিশ টাকা বাজী জিতবে। শম্ভুর পাগল হওয়ার জন্য দায়ী শম্ভু নিজে।

ব্রজবাবুর কথাটা অস্বীকার করতে পারেন নি চন্দ্রবাবু। কিন্তু বঙ্গবালার দায়িত্ব নেই একথাও মানতে পারেন নি। বাড়ী ফিরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলেন সারাক্ষণ। কোন-ক্রমে স্নান-খাওয়া সেরে স্তোত্রপাঠের আসর থেকে আপিস-

ঘ:র এসে চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

কি তাঁর কর্ত্তব্য ? তাঁর কর্ত্তব্য একটা আছে। নিশ্চয় আছে, কি করলে তাঁর মনের এ গ্লানি কেটে যায় ? হঠাৎ একটা পথ যেন তিনি পেলেন। ইস্কুলের শেষ ঘণ্টা। ব্রজবাবু সেকেণ্ড ক্লাসে এডিশনাল ম্যাথামেটিকস কষাচ্ছেন তাঁর নিজের ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস। ব্রজবাবুকেই বলেছেন—তিনি ফার্স্ট ক্লাসে একটা ট্রানস্লেসন টাস্ক দেবেন। ক্লাস দুটো পাশাপাশি মাঝের দরজা খুলে রেখেছেন।

চন্দ্রবাবু হন্‌হন্‌ করে এসে ক্লাসের দরজায় দাঁড়ালেন।

ব্রজবাবু বেরিয়ে এলেন—অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনি এলেন কেন ? আমাকে ডাকলেই ত পারতেন।

—আমি একটা উপায় পেয়েছি ব্রজবাবু। হোয়াট ডু ইউ সে ?

—কি বলুন ?

—শম্ভুর সমস্ত চিকিৎসার খরচ আমি বহন করব।

—চলুন, এখানে নয়। ছ বয়েজ আর ওভারহিয়ারিং। আপিসে এসে ব্রজবাবু বললেন—শম্ভু গরীব ছাত্র, ভাল ছাত্র। তার চিকিৎসার খরচ আপনি বহন করেন, সে ভাল কথা। কিন্তু দায় বলে গ্রহণ করলে আপত্তি করব। আর শম্ভুর খরচ সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা চাঁদা করে দিতে চাচ্ছে। তাদের আমি বলেছি।

—আমি অর্দ্ধেক দেব।

—ভাল। ওকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। ওর বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। আর একটা কথা।

—বলুন।

—গোপাল বাবু আপনি বাইরে যান একটু।

কেরাণী গোপাল বাবু বাইরে চলে গেলেন।

—রবি সিংহের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন ?

—বঙ্গবালার ?

—হ্যাঁ।

স্তব্ধ হয়ে রইলেন চন্দ্রবাবু। কি উত্তর দেবেন ? উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। তাঁর কল্পনা ছিল বঙ্গকে লেখা-পড়া শেখাবেন। সেই হবে এ অঞ্চলের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। সে এখানে মেয়েদের মধ্যে নতুন জীবন আনবে। কিন্তু—কি হয়ে গেল—।

ঢং ঢং শব্দে ছুটির ঘণ্টা পড়ছে।

ব্রজবাবু বললেন—স্থির করুন। বিয়ে যদি দেন ত ভাল। সে মত যদি না থাকে তবে রবি সিং মাস্ট গো ফ্রম হিয়ার। ওকে যেতে হবে।

দল বেঁধে মাষ্টাররা এসে ঢুকলেন।

ক্রমশঃ

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবন একটা কুরুক্ষেত্র—করিস নে তুই অবিশ্বাস।
আরামকে কর হারাম যদি বিজয়মাল্য পরতে চাস।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় বলহীনের ঠাঁই কোথায় ?
পুরুষ মানুষ যুদ্ধ করে,—ক্লীবগুলো সব ঢোল বাজায় !
লড়াই যারা করতে জানে, মরতে যাদের নেইকো ভয়,—
নিঃস্ব হলেও বিশ্বে জানিস তারাই করে দিগ্বিজয়।
তারাই জানিস যুগে যুগে ইতিহাসের পথিকৃৎ ;
ভাগ্যদেবীর দ্যূতক্রীড়ায় সব হারিয়েও তাদের জিত।

স্বর্গ থেকে আগুন এনে পোড়ায় তারা অন্ধকার ;
রক্তে গড়ে স্বর্ণমিনার তারাই মানব-সভ্যতার ;
বন্ধ্যামাটির শূন্যকোলে শস্য ফলায় তাদের শ্রম ;
বিঘ্ন-বাধার পাহাড় ঠেলে তাহাদেরই পরাক্রম
অরণ্যকে নগর করে, জঙ্গলকে চমৎকার ;
লক্ষ্মীছাড়া জাতির গলায় দোলায় তারা রত্নহার।
দুঃখজয়ী সাধক তারা ; তাদেরই তো তপস্যায়
অত্যাচারীর শিকল ভেঙে আধমরা জাত মুক্তি পায়।

লাভ-ক্ষতিরে তুচ্ছ ক'রে যুদ্ধ করাই বীরের কাজ।
গর্জ্জে আসে কালবোশেখী, ঊর্দ্ধে ডাকে ক্রুদ্ধ বাজ;
সামনে কিছুই যায় না দেখা; অন্ধকারে সমুদ্দুর
ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে; ঝড়ের বাঁশির তীক্ষ্ণ সুর
কর্ণে নিয়ে এ দুর্যোগে তুলছে কারা ঐ নোঙর?
কারা এমন দুঃসাহসী? কাদের এমন মনের জোর?

ওরাই তো রে চিরকালের দুঃখজয়ী কলম্বাস।
যুগে যুগে ওরাই বলে: আসুক না কো সর্ব্বনাশ;
ডুববে তরী? ডুবুক না সে। কে করে রে জানের ভয়?
প্রাণটা কি রে চিরদিনের? হয় বিজয়, নয় বিলয়।

জীবন-মরণ তুচ্ছ ক'রে ঐ চলেছে বীরের দল।
পণ্ডিতেরা দাঁড়িয়ে তীরে বলছে: ওরা কি পাগল!
দিকে দিকে গর্জ্জে সাগর, পথের রেখা নেই কোথাও,
এই অকূলে বাতুল ছাড়া কেউ কখনো ভাসায় নাও?
কল্পনাতে আছে কেবল, বাস্তবে যার নেই প্রমাণ,—
সেই অজানার পিছু পিছু ধায় কভু কি বুদ্ধিমান?
ঝোড়ো হাওয়ায় আসছে ভেসে: রইবো না তো আঁকড়ে কূল
সংশয়ে কূল আঁকড়ে থাকা—এর মতো আর নাইরে ভুল।

দিনের পরে দিন কেটে যায়—ডাঙার কোনই নাই হদিস।
ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছু গর্জ্জে কেবল অহর্নিশ
কূলশূন্য গৃহহারা ক্রুদ্ধ ভয়াল নীল সাগর।
কলম্বাসের কর্ণে আসে আকাশবাণী: 'ভয় কি তোর?'
প্রাণে সদাই মাভৈঃ বাণী স্বপ্নে আছে নূতন দেশ,
কল্পনা—সে সত্য হবেই; হবেই হবে পথের শেষ
নূতন দেশের শ্যামল কূলে। অবশেষে মিললো তীর।
ইতিহাসের বায়ে বলে, ভুল হয় নি বিশ্বাসীর।
অবিশ্বাসে সেদিন যারা ছেড়ে যেতে চায় নি কূল—
আজকে মোরা ঠিকই জানি: করেছিল তারাই ভুল।

কে দুনিয়ায় ভুল করে না? ভুল কি এতই মারাত্মক?
ভুলের ভয়ে চলবে না যে—ঘরমুখো সে নপুংসক।
সারা জীবন রইবে পড়ে বৃক্ষসম একই ঠাঁই!
এর চেয়ে যে মৃত্যু ভালো! সত্য যাহা জানতে চাই।
জানতে গিয়ে চলার পথে ভুল যদি হয় বারম্বার—
ভুলের বোঝাই খুলবে শেষে স্বর্ণ-আলোর সিংহদ্বার
দিগ্বলয়ের অন্ধকারে আজকে না হয় কালকে ঠিক।
ঠকবো বলে চলবে নাকো—সেই ভীরুরে একশো ধিক।

তার্কিকেরা তীরে বসে তর্ক ক'রে কাল কাটায়।
কূল-হারানোর ভুল করেই তো কলঙ্কিনী কৃষ্ণ পায়!
সব-হারানোর পথেই আসে সব-পেয়েছির বৃন্দাবন!
সর্ব্বনাশকে ভয় করেছে পুরুষসিংহ বল কখন?
ঘরের আরাম ছাড়তে যাদের প্রাণটা সদাই শঙ্কাতুর
—সেই কুনোদের আসন জানিস অসম্মানের আস্তাকুঁড়।

জীবন একটা রণক্ষেত্র। শুনিস নে কি শঙ্খরব?
কপিধ্বজে কে ঐ ব'সে? ভগবান কি অবাস্তব?
তিনি কি রে ঝিমিয়ে পড়া ঠুঁটো একটা জগন্নাথ—
ভালো-মন্দ ঘটছে যাহা—কিছুতেই যাঁর নাইকো হাত?

না রে, না রে—কান পেতে শোন: ঐ যে তাঁহার কণ্ঠস্বর
ক্লৈব্য ছেড়ে, পার্থ, ওঠো; ধরো বীরের ধনুঃশর।
যুদ্ধ করো তুচ্ছ ক'রে লাভ-ক্ষতি ও দুঃখ-সুখ;
যুদ্ধ করো ভাগ্যে তব জয়-পরাজয় যা-ই আসুক।
পূর্ণ আমার অভাব কোথায়? তবু তো মোর নাই বিরাম।
সৃষ্টিতে সব লণ্ডভণ্ড আমি যদি চাই আরাম।
আমার মতোই কর্ম্ম করো; আলস্যে ঘোর অকল্যাণ।
কাজ না করে খায় যে মানুষ নিশ্চয়ই তার নাই ইমান।

কালোরাতের ছায়ার মতো এলো কখন বিস্মরণ।
বাঁকা বাঁশীর কোমল সুরে তলিয়ে গেল কোথায় মন!
নীরব হ'ল পাঞ্চজন্য; পড়লো খসে ধনুর্ব্বাণ।
পার্থ হ'ল অপদার্থ; বৃহন্নলার নৃত্য-গান
সুরু হ'ল। ইতিমধ্যে ডাকলো কামান ফিরিঙ্গীর।
আমরা তখন একতারাতে গান ধরেছি বৈরাগীর!
নিবে গেছে ক্ষাত্র তেজের বহ্নিশিখা; গীতার শ্লোক
গেছি ভুলে; চক্রবালে মুছে গেছে সব আলোক!

আজকে আবার ডাকি তোমায়! বাজাও তব অভয় শাঁখ!
সর্ব্বনেশে এই জড়তা দিগন্তরে মিলিয়ে যাক।
অপগত হোক এ মোহ! রক্তে জেলে দাও আগুন!
পাঞ্চজন্যে আবার ডাকো: দাঁড়াও উঠে হে অর্জ্জুন!
নিধন করো পাপের সেনা; সত্যের ঠিক হবেই জয়।
কল্যাণ যে করে জেনো, কখনই তার নাইরে ক্ষয়।
জীবন ডাকে—মহৎ জীবন গৌরবেতে দীপ্তিমান।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পার্থ, ধরো ধনুর্ব্বাণ।

সাধক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

ভারতীয় ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সাধনা ছিল দুইকে নিয়ে—আত্মা ও পরমাত্মা, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা উপাসক ও উপাস্যকে নিয়ে আর এই দুইকে এক করে দেখা—উপাসনার মাধ্যমে সত্যের কাছে এগিয়ে গিয়ে সত্য হওয়া। জীবনে ও জগতে সদাসর্ব্বদা ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখা, কারণ "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনিই সুখ-স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই।

এই সাধনমার্গের তিনটি সোপান—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। যাঁরা সত্যদ্রষ্টা তাঁদের উপলব্ধির বাণী শ্রবণ করে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, সেইগুলিকে জীবনের অঙ্গীভূত করে নেওয়া। মনন অর্থাৎ জীবনের ভিতরে আসা। মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে সত্য-স্বরূপকে পাওয়া—অর্থাৎ তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া। নিদিধ্যাসন বা ধ্যান—অর্থাৎ ভগবানকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করে তাঁকে সর্ব্বত্র বিরাজিত দেখা। সান্তের ভিতরে অনন্ত, অপূর্ণের ভিতরে পূর্ণ, দুঃখের ভিতরে আনন্দ-স্বরূপকে উপলব্ধি করা। তাঁরা বলেছেন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই তাঁহার দ্বারা আচ্ছাদিত ও ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করে সেই প্রেমাস্পদকে লাভ কর এবং পরমানন্দ উপভোগ কর।

ভারতের নবযুগে উপনিষদকার ঋষিদের সেই সাধনাকে নূতন করে প্রবর্ত্তন করে গেলেন যুগস্রষ্টা রামমোহন, এবং তাকে আপন সাধনার দ্বারা সঞ্জীবিত করে তুললেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই পথেরই উত্তরসাধক। তিনি বলেছেন, "আমার জন্ম যে পরিবারে, সে পরিবারের ধর্ম্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা···আবাল্যকাল উপনিষদ্ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে"।

সেই অন্তর্দৃষ্টির সামনে তাঁর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষের জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ। তাঁর চিদাকাশে হ'ল নব অরুণোদয়—হ'ল নব চিদাভাস। সেই চিদাভাসের উদ্বোধিত আত্মায় সেই নব অরুণোদয়ের জয়ধ্বনি করে সাধক-কবির বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠল আগমনী সুর:

> জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়!
> পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ম্ময়;
> এস অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি
> অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়!
> এস নব জাগ্রত প্রাণ, চির যৌবন জয়গান,
> এস মৃত্যুঞ্জয় আশা, জড়ত্ব নাশা!
> ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়।"

চিত্তগগনে উদ্ভাসিত এই নব অরুণোদয়ের পানে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এই নবজাগ্রত সাধক শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে, অসত্যকে খণ্ডন করে, বিচার করে, সত্য-স্বরূপকে জীবনে স্বীকার করে নিয়ে আদিত্যবর্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন—"হে জ্যোতির্ম্ময়—আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ—তোমার অনন্ত আকাশের কোটি সূর্য্যালোকে সে জ্যোতি কুলায় না—সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে ফেলো—আমাকে জ্যোতির্ম্ময় করো, আমার অন্য সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি।"

"জ্যোতির্ম্ময় করো—হে জ্যোতির্ম্ময়! আমাকে জ্যোতির্ম্ময় করো।" সাধক-চিত্ত হতে মানবের আদিকাল থেকে অহরহ এই প্রার্থনাই উঠছে তাঁর কাছে, যিনি—"অস্মিন আত্মনি তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ"—যিনি প্রত্যেক মানব-আত্মাতে তেজোময় অমৃতময় পুরুষরূপে বিরাজিত। যিনি সর্ব্বানুভূঃ—যিনি সকলি জানছেন। তিনি জানছেন, আমাদের অন্তরের মাঝে সর্ব্বদা বিরাজিত থেকে, আমাদের দীনতা মলিনতার কথা, আমাদের মূঢ়তা অজ্ঞানতার কথা আমাদের পাপ পরিতাপের কথা। তিনি জানছেন, আমাদের চিত্তের সকল দুর্ব্বলতার কথা। তাই সাধক-চিত্ত নিজের পুরুষকার বা সাধনার সঙ্গে সংহত করতে চায় ভগবৎ কৃপা। ভগবৎ-কৃপাই সাধক-জীবনের নির্ভর ও সম্বল। ভক্তসাধকেরা চিরদিন বলে এসেছেন, "তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভবসঙ্কটে"। সাধক রবীন্দ্রনাথও তাই ভগবৎকৃপাপ্রার্থী হয়ে বললেন—

> "তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে,
> নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে"।

এই ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করেই সাধক তাঁর অন্তরের প্রার্থনা জানালেন যে, তাঁকে যেন ভগবান তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে, তাঁর সমস্ত দীনতা, মলিনতা, পাপ, সঙ্কীর্ণতা পবিত্র আলোকধারায় ধুইয়ে দিয়ে জ্যোতির্ম্ময় করে দেন। জ্যোতিঃ-পিয়াসী সাধক-চিত্তের তাই একান্ত প্রার্থনা:

> "আজ আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও।
> আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলার—ঢাকা, ধুইয়ে দাও।
> যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
> আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
> অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।

বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।
আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান,
তার নাইক বাণী, নাইক ছন্দ, নাইক তান ;
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।"

সাধক-জীবন যখন এই অমৃতালোক-ঝরণাধারায় বিধৌত হয়ে পরিশুদ্ধ চিত্ত ও জ্যোতি-বিভাসিত চৈতন্য লাভ করে, তখন তার অন্তর্দৃষ্টির সামনে থেকে তমসার ও অজ্ঞানতার পর্দ্দা যায় সরে। তখনই সে ভিতরে ও বাহিরে এক আলোকের ও আনন্দের পারাবার দেখতে পায় এবং সত্যানুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন সে বলে ওঠে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"— আনন্দ-স্বরূপ হতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দিব্য অনুভূতি সাধকের জীবনে প্রথমে স্বল্পকালের জন্যই আসে এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটু আভাস মাত্র দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এসেছিল সেই রকম একটি প্রভাত, এবং সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে খসে পড়েছিল তাঁর চোখের সামনের পর্দ্দা। তিনি বলেছেন—"চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য্য উঠছে। যেমনি সূর্য্যের আবির্ভাব হ'ল গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পরদা খুলে গেল। মনে হ'ল মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হ'ল সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম।...দেখলুম, সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ...তখন মনে হ'ল এই মুক্তি। এই অবস্থায় চারদিন ছিলুম।...আবার পরদা পড়ে গেল। আবার সেই অকিঞ্চিৎকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা। কিন্তু তার পূর্ব্বে কয়দিন সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।...সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।...এই যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে তা দেখি নি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ।...এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়।"

রবীন্দ্রনাথ এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়েই সেদিন সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি বিরাজিত আছেন "অস্মিন আত্মনি"—এই মানবাত্মাতে, তাঁকেই দেখেছিলেন 'অস্মিন আকাশে"—এই অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে জগত সংসারে বিরাজিত থাকতে। সেদিন তিনি একদিকে অনুভব করেছিলেন তাঁর সকল চেতনা' বেদনার সেই অতীন্দ্রিয় অরূপ পুরুষের মঙ্গল স্পর্শ। আবার আর একদিকে এই ছায়ার রাজত্বের আকাশের সকল সোনালী, রূপালী, সবুজ সুনীল রংয়ের আড়ালে সেই সত্য পুরুষের আবির্ভাব। সেদিন তিনি সর্ব্বমানবের মধ্যেই দেখেছিলেন সেই এক আত্মাকে, যিনি "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূবো বহিশ্চ"—যিনি সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট থেকে নানান রূপেতে প্রকাশিত হন। যিনি অনাদি অতীতকাল থেকে অনন্ত ভাবীকাল অবধি অখণ্ড সেতুস্বরূপ হয়ে চিরবিরাজিত। সেই সবার অন্তর্নিহিত পরম সত্তা—

"যাঁর লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

রবীন্দ্রনাথও তাঁর অন্তর-প্রদীপখানি সাবধানে জ্বেলে সেই অপরূপ অরূপকে তাঁর আত্মার গভীরে অনুভব করে গাইলেন :

"কে গো অন্তরতর সে!
আমার চেতনা, আমার বেদনা, তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ, কত সুখে দুখে হরষে!
সোনালী রূপালী সবুজে সুনীলে,
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে ;
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে ডুবালে সে সুধা সরসে।
কতদিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়,
নানা পরিচয়ে, নানা নাম লয়ে, নিতি নিতি রস বরষে।"

এই অন্তরতর অন্তরতম দেবতা বার বার মানব—হৃদয়দ্বারে আঘাত দিয়ে আহ্বান করে বলছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—ওঠো, অজ্ঞান-নিদ্রা হতে জাগো। বার বার আমরা তা শুনেও শুনছি না, কিন্তু সাধক-প্রাণ—

"যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে।...তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে জীর্ণ কন্থা, বিষয়বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।
তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ।"

যে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়

অমৃতময় পরমপুরুষের পায়ে সাধক তাঁর ধন, মান, প্রাণ অকাতরে সমর্পণ করে বিষয়বিরাগী, পথের ভিক্ষুক হয়ে বেরিয়ে পড়েন, উপনিষৎ তাঁকেই সম্বোধন করে বলেছেন :

"পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পায়ে আত্মনিবেদন করে বললেন,

"তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রভু ; আমার বিদ্যা, আমার ধন,—'ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব'। তুমি আমার এবং আমি তোমার, তোমাতে আমাতে এই যে যোগ, এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড় সত্য, আমার সকলের চেয়ে বড় সম্পদ। তুমি আমার মহত্তম সত্যতম আনন্দ স্বরূপ।···এই যে যোগ এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষ ভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, সম্পূর্ণ সবলে অবলম্বন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, 'পিতা নো বোধি', তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি তো 'পিতা নোঽসি' পিতা আছ, কিন্তু শুধু আছ বললে তো হবে না 'পিতা নো বোধি' তুমি আমার পিতা হয়ে আছ এই বোধটি দাও। 'পিতা নোঽসি' পিতা তুমি আছ, তুমি আছ—এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের ও জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। সত্যং—এই বলে ঋষিরা তোমাকে জপ করেছেন —সে কথাটির মানে হচ্ছে এই যে, পিতা নোঽসি, পিতা তুমি আছ। যা সত্য তা শুধুমাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা। কিন্তু তুমি আছ এই বোধটিকে তো সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে পেতে হবে! তুমি আছ—এ ত শুধু একটা মন্ত্র নয়—তুমি আছ এটা ত শুধু কবল একটা জেনে রাখবার কথা নয়। 'তুমি আছ'—এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে যেতে না পারি তবে কিসের জন্ম এ জগতে এসেছিলাম?···সেই জন্মেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই 'পিতা নো বোধি' তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ এই সত্যের বোধ আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও।"

ভগবৎ-কৃপায় উদ্বোধিত, আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে আনন্দিত, জাগ্রত বোধিতে সমুন্নত সাধক এইবার সেই পরম পিতাকে, তাঁর প্রভুরূপে, প্রিয়রূপে, চির পথের সঙ্গী, চির জীবনরূপে, পরম পতি ও পরম গতিরূপে দেখে তাঁহার জীবন-বীণায় সাধন-সুরে গান ধরলেন :

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে।
চির পথের সঙ্গী আমার, চির জীবন হে!
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর,
মুক্তি আমার, বন্ধন-ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার, জীবন মরণ হে।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে!
ওগো সবার, ওগো আমার,
বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার, নূতন, নূতন হে।

"সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"—সকলের আত্মারূপে বিরাজিত সেই অদ্বিতীয় একের আহ্বানে জাগ্রত সেই বোধিত সাধক-চিত্তের কর্ণে বেজে উঠল প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল, দ্রষ্টা ঋষিদের ধ্যানের অমৃতময় মন্ত্র—"সত্যং জ্ঞানমনন্তম"—তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ। সাধক রবীন্দ্রনাথ সেই ধ্যানলব্ধ মহামন্ত্রগুলিকে আপনার জপমন্ত্ররূপে সাধন করে তাঁর গভীর উপলব্ধিময় বাণীতে বললেন :

"তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত। এই অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাজিত। সেখানে আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব? সেখান হইতে যে বাক্যমন নিবৃত্ত হইয়া আসে। কিন্তু···এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অগোচর নহেন ····"আনন্দরূপমমৃতম যদ্বিভাতি"। তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।···এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে, এই যে পার্শ্বে, এই অধোতে, এই যে উর্দ্ধে—এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ যে আমার ইন্দ্রিয় মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। —'স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।' এই ত প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?

এই যে যাহাকে আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে। আর ত কোন কারণ থাকিতেই পারে না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কথাই বলিতেছে। যাহা কিছু আছে, এ সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ—সুতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আচ্ছন্ন করিবে? এমন মহান্ধকার কোথায় আছে? ইহার কণাটিকে ধ্বংস করিতে পারে, এমন শক্তি কার! এমন মৃত্যু কোথায়? এ যে অমৃত।"

উপনিষদ বলেছেন, যিনি সত্যং তিনিই "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"—তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি অদ্বৈত এক। এই অদ্বৈত একের সাধনা করে একনিষ্ঠ ব্রহ্মসাধক বললেন—

"অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসঙ্ঘ দশ দিকে ছুটিয়াছে; যিনি শান্তং তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না।···সংসারের অনন্ত চলাচল, আনন্দ কোলাহলের মর্ম্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্ত্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই শান্তং নিয়ত বিরাজ করিতেছেন।···আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্ত স্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে।···এই জগতের মধ্যে যে

প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তং তাহাকেই কলেফুলে প্রাণে সৌন্দর্য্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং তিনিই শিবম্। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দাম শক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গল লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গল রূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মত নিখিল-জগৎকে অনাদি-কাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই রক্ষা করিতেছে।...এই শিবস্বরূপকে সত্য ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ, শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।...তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক। সংসারের সবকিছুকে পৃথক করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু...অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে ত একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে ত প্রতি মুহূর্ত্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না; সমস্ত পৃথিবীকে ত আমরা এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে ত কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম্ম, কত মানুষ, কত লক্ষ কোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে; কিন্তু সে বোঝার ভারে আমাদের হৃদয় মন ত একেবারে পিষিয়া যায় না। কেন যায় না? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্।...এই যিনি অদ্বৈতং তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।"

শান্তং শিবমদ্বৈতম—ব্রহ্ম সাধক এইরূপে সেই অনাদি এককে জীবনে ও জগতের মাঝে দেখে, তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন:

"আমাকে প্রকাশ কর, আমাকে প্রকাশ কর—'অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—আমি অসত্যে আচ্ছন্ন আমাকে সত্যে প্রকাশ কর, আমি অন্ধকারে আবিষ্ট আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ কর, আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট আমাকে অমৃতে প্রকাশ কর।—আবিরাবীর্ম্মএধি। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হোক, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোন বাধা না পা'ক—সেই প্রকাশ বাধা নির্ম্মুক্ত হলেই—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যম্'—তোমার দক্ষিণ মুখের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জন্য রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা।"

সাধক তখন তদ্ভাবে ভাবিত হয়ে, তদ্গত চিত্তে, সত্যমজ্ঞান-মনন্তমের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আরাধনা করলেন---

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুব-জ্যোতি তুমি অন্ধকারে!
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো, দুখ-জ্বালা সেই পাসরে,
সব দুখ-জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী;
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে,
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।"

জ্ঞান-জ্যোতি বিভাসিত সাধকের ধ্যানের গভীরে তখন ধ্বনিত হতে লাগল একটি মন্ত্র "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। তিনি বলেছেন:—

"আমরা সেই মুক্তির মন্ত্র পেয়েছি, কালের স্রোতে ডুবল না সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম—অন্তহীন সত্য, অন্তহীন ব্রহ্মের মন্ত্র। কবে ভারতবর্ষের তপোবনে কোন্ সুদূর প্রাচীনকালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল—অন্ত নেই, তার অন্ত নেই—অন্তহীন যাত্রাপথে সত্যকে পেতে হবে, জ্ঞানকে পেতে হবে।"

কিন্তু কেমন করে সেই সত্যকে, সেই জ্ঞানকে আমরা পাব? কেমন করে তাঁর নামের মাধুরী আমরা বুঝব? প্রেমিক সাধক তার উত্তরে বলছেন:—

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমার প্রেম উদ্বোধিত হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার গভীর অন্ধকার নির্জ্জনতার মধ্যে সেই প্রিয়তম সুপ্ত হয়ে আছেন। সংসারের সকল রসের ভিতরে যে তাঁর রস, সকল মাধুর্য্য সকল প্রীতির মূলে যে তাঁর প্রীতি—এ কথা আমি জানলাম না। আমার প্রেম জাগল না। অথচ তিনি যে সত্যই প্রিয়তম, এ কথা সত্য।...তিনি আমার প্রিয়তম না হলে এত বেদনা আমি পাব কেন?...সমস্ত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে যেদিন সেই সুন্দরকে দেখলাম, সমস্ত মাধুর্য্যের ভিতরে যেদিন সেই মধুরকে পেলাম, সেদিন আমার মাধুর্য্যের পরিচয় দেব কিসে?...যেদিন বলতে পারব যিনি মধুর পরম মধুর, যিনি সুন্দর, পরম সুন্দর, তিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমায় স্পর্শ করেছেন, সেদিন আনন্দে দুর্গম পথে সমস্ত কণ্টককে পায়ে দ'লে চলে যাব। সেদিন জানব যে কর্ম্মে কোন ক্লান্তি থাকবে না, ত্যাগে কোথাও কৃপণতা থাকবে না। কোন বাধাকে বাধা বলে মানব না। মৃত্যু সেদিন সামনে দাঁড়ালে, তাকে বিদ্রূপ করে চলে যাব। সেদিন বুঝব তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে। মানুষকে সেই মিলন পেতেই হবে।"

বিরহী প্রেমিকের মতন তিনি চাইলেন তাঁর সঙ্গে মিলন, নিবিড় মিলন। সেই মিলনানন্দ-সম্ভোগের আশায় তাঁর বিরহী প্রাণের তারে তারে বেজে উঠল তাঁর প্রাণের আবেদন—

'শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার, সারাদিনের তৃষা,
কেমন করে মেটাব যে খুঁজে না পাই দিশা;
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়, সেই কথা বলিয়ো।
হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়;
হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন, দাও গো আমার হাতে
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে!
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয়।"

মিলন হ'ল। সাধক ও আরাধ্য, উপাসক ও উপাস্য এই দুয়ের মিলন হয়ে হ'ল এক। সাধক জ্ঞানেতে যাঁর স্বরূপ জানলেন, ধ্যানেতে যাঁর স্পর্শ পেলেন, প্রেমেতে তাঁর সঙ্গে হলেন মিলিত। তাই তিনি গাইলেন—

"তাই ত প্রভু যেথায় এল নেমে,
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

যুগলসম্মিলনে পূর্ণের প্রকাশ হ'ল। তখন "মধুবাতা ঋতায়তে"। তখন "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"। পূর্ণ মিলনানন্দে চরিতার্থ হয়ে সাধক তখন বলেন :

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে,
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্য্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

ইউরোপের মেয়েরা

শ্রীশেফালি নন্দী

[illegible]মাঝে কিছুদিন বিদেশে কাটিয়ে বোধ হয় বলা সঙ্গত হবে না যে [illegible] দেশের সবকিছু আমি দেখেছি। কারণ সেটা সম্ভব নয়। [illegible]বে যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, যাদের সঙ্গে পড়াশুনা করেছি, যারা আমার দিনরাত্রির সঙ্গী ছিল, তাদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা [illegible]ঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরাটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে [illegible]। তাই ইউরোপের মেয়েদের কথাই কিছু লিখছি, যদিও [illegible]উরোপ দেখেছি আমি অল্পই, আজন্ম ভারতে থেকেও বলতে পারি [illegible]—ভারতবর্ষ আমার দেখা হয়ে গেছে ?

বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদায় বলেছিলেন—"দেবী [illegible]হি, নহি আমি সামান্যা রমণী"…"যদি অনুমতি কর কঠোর ব্রতের [illegible]ব সহায় হইতে আমার পাইবে তবে পরিচয়।" ঠিক এইটিই [illegible]ধ হয় ইউরোপের মেয়েদের পরিচয়।

সাধারণতঃ পশ্চিমের মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলার আগেই [illegible]মরা ধরে নি'—শালীনতা, লজ্জা প্রভৃতি প্রাচ্য নারীসুলভ [illegible]গুলি তাদের মোটেই নেই। কারণ আমাদের যা ভাল ওদের [illegible] মন্দ, আর পশ্চিমের যা ভাল তা আমাদের সমাজে অচল। [illegible] যারা ধর্ম্ম, সমাজ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে থাকেন তাঁরা [illegible]নেন, ভাল সবদেশেই ভাল। কতকগুলি মূল জিনিষ আছে— [illegible]মন—দয়া, ক্ষমা, বিদ্যা, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি সবদেশেই আদর্শ বলে [illegible]কৃত। সে দেশেও ঠিক তেমনি। আবার প্রাচীন সমাজও প্রায় সব [illegible]শেই এক। তবে কোন দেশ কয়েক শ' বছর পিছিয়ে আছে, [illegible] কোন দেশ বা এগিয়ে গিয়েছে, তাই যেমন প্রাচীনপন্থী পিতা-মাতার সঙ্গে অর্ব্বাচীনপন্থী পুত্রকন্যার মতের মিল হয় না, তেমনি কোন কোন সমাজ-ব্যবস্থাও প্রাচীনপন্থীরা মেনে নিতে পারেন না—এই যা তফাৎ।

বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকের ইউরোপের মেয়েদের যা আদর্শ ছিল তা কোন ক্রমেই প্রাচ্য আদর্শের বিরোধী বলা চলে না। পিতৃগৃহে বাল্যকাল কাটাবার পর ক্রমশঃ অন্তঃপুরে অবরোধ, বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পিতা বা সমাজ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বনির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করে তার অন্তঃপুরে স্থানলাভ যৎসামান্য বিদ্যা বা কৃষ্টির সমন্বয়ে স্বামীর মনোরঞ্জনে তৎপর হওয়া—স্বামী যেমনই হোন তাঁকে মান্য করা, ইহকাল পরকালে তিনিই পরম গতি বলে মেনে নেওয়া আর এই নিয়মগুলো না মানলে সমাজের চক্ষে হেয় হয়ে থাকা এই ছিল আদর্শ।

তার পর বিদ্যাচর্চ্চা—"মেয়েদের ত আর দেশ শাসন করতে হবে না, রাজনীতি পড়ে কি করবে?" "তারা কিছু আর অস্ত্রোপচার করতে আসবে না—শারীরবিদ্যা পড়ার প্রয়োজন কি?" "ধর্ম্মতত্ত্বের কচকচানি নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় যে কেন—ওদের ত আর শাস্ত্রালোচনায় ডাকা হবে না। যদি বা তখনকার দিনে বাধানিষেধ এড়িয়ে কোন মেয়ে শেষ পর্য্যন্ত পড়াশোনা করতে পারল—তাদের চাকরি করতে ডাকা হলে কিন্তু তার পরিবারবর্গ ত বটেই, সে নিজেও বলত—কি সাংঘাতিক কথা মেয়েদের জ্ঞানার্জ্জন ত শুধু তাদের স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই, যদি বা ভগবানের কৃপায় খানিকটা সুযোগ-সুবিধা পেলাম তা প্রকাশ করে নিন্দার ভাগী হব

কেন ? সমাজের ভয়ে জর্জ্জ এলিটের মত লেখিকাও ছদ্মনাম নিয়েছিলেন, শুধু তাই নয়—প্রকাশকেরা তার লেখা প্রকাশ বন্ধ রেখেছিলেন কয়েক বছর। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ গ্রেগরী সেকালের মেয়েদের বিদ্রূপ করে মন্তব্য করেছিলেন—"যদি কোন বিদ্যা পেয়েই থাক, যত্ন করে লুকিয়ে রেখো তা অন্তরের মণিকোঠায়।" এই বিদ্যা অর্জ্জন করতেও মেয়েদের কি পরিমাণ আয়াস স্বীকার করতে হ'ত, তার কিছু পরিচয় পাই মাদাম মন্তেসরীর জীবনী আলোচনায়। তিনি ইটালীর প্রথম মহিলা ডাক্তার, ১৮৯০ সনেও ডাক্তারী পড়ার সময় ছেলেদের সঙ্গে তাঁকে পড়তে হ'ত বলে পাছে ছেলেরা খারাপ হয়ে যায় তাই বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ তাঁকে একলা—এমন কি এনাটমির ঘরেও একলা পড়তে বাধ্য করেছিলেন।

ইউরোপের সেই অতীত দিনগুলোর সঙ্গে যখন বর্ত্তমানের তুলনা করি, অবাক্ লাগে সত্যিই। আজ মেয়েরা স্কুল-কলেজ চালাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক হয়েছে, রাজনীতির কথা নাই বা বললাম, তারা এরোপ্লেন চালাচ্ছে, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে করছে সহযোগিতা। বিগত যুদ্ধের সময়কার কলকারখানাগুলো ত সে দেশের মেয়েরাই বাঁচিয়ে রেখেছে।

আজ সেখানে পোষ্ট আপিসে যান টিকিট কিনতে—ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে বলবেন,"কি চাই, ভারতবর্ষের জন্য কত টিকিট লাগবে, দাঁড়াও এক সেকেণ্ড, দেখে দিচ্ছি—এই যে এক শিলিং, ও তুমি রেজিষ্ট্রী করতে চাও বুঝি—তবে যে আরও চার পেনি বেশী লাগবে। হ্যাঁ তার পরের জন এসো।"

দোকানে যান কাগজ পেন্সিল কিনতে, সেখানেও নারীকণ্ঠ—"কি মাপের কাগজ চাই, ও ৯ × ৬—তা ত আজ আসে নি, তুমি আগামী শুক্রবার এসো, পাবে। আচ্ছা এই পেন্সিলটা কেমন, বেশ না ?" ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা—কথা "তোমার দেশ থেকে এসে শীত লাগছে নিশ্চয়ই। পেনি শিলিং নিয়ে অসুবিধেয় পড়তে হয় না। হ্যাঁ, তার পরের জন—"

সেখান থেকে বেরিয়ে কিছু খাবার কেনা যাক, বিক্রয়কারিণী বেরিয়ে এলেন সুবেশা তরুণী,—"এই যে এস, আজ কি আপেল দেব, রান্নার না খাবার ময়দা চাইছ—তা ত এত সকালে পাওয়া যায় না—এই গোটা সাড়ে এগারটার সময় এসো, একটায় ত লাঞ্চের ছুটি—"

সবই ত প্রায় কেনা হ'ল, এবার চলুন বাসে যাওয়া যাক—লেডি কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এর পরের ট্রেনটা ক'টায় বলতে পার, আমার যে খুব তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।' "নিশ্চয়, এই ত বাসটা ৯-৪৫এ ষ্টেশনে পৌঁছবে, ৯-৫২ মিনিটে ট্রেন, সাত মিনিট সময় থাকবে হাতে, টিকিট কিনে খুব ট্রেন ধরতে পারবে।"

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ুন কলেজে, লেকচার দিচ্ছেন লেডী প্রিন্সিপ্যাল, কিংবা লেডী প্রোফেসর। সে কলেজটা যে একমাত্র মেয়েদেরই হতে হবে তার কোন মানে নেই, অক্সফোর্ড কেমব্রিজে মেয়ে লেকচারারের অভাব নেই। যারা "হার টুয়েল্‌ভ মেন" ছবিটা দেখেছেন তাঁরা জানেন—আমেরিকার মত দেশেও প্র[illegible] মেয়ে শিক্ষিকা নিয়ে কি গোলযোগ হয়েছিল। ইউরোপেও হ[illegible] ছিল নিশ্চয়ই, তবে যুগটা যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ !

তার পর আসুন ভূগর্ভস্থিত রেলগাড়ী করে যাওয়া যা[illegible] সেখানেও নিশ্চয়তা নেই, ড্রাইভার কণ্ডাক্টার ছেলে কি মেয়ে[illegible] আপিস আদালতের মেয়েদের সংখ্যার কোন স্থিরতা নেই, কখ[illegible] বাড়ছে কখনও কমছে।

এবার দেখা যাক, কি করে এরা সংসার চালায়। প্রথমতঃ ধ[illegible] একটি নববিবাহিত দম্পতির কথা। ইউরোপের প্রথা অনুযা[illegible] তাদের সংসারে শুধু স্বামী আর স্ত্রী—আর কেউ নেই। সকালে[illegible] উঠে বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে নিল এক জন, এক জন ব্রেক[illegible] তৈরি করল, দু'জনে খেয়ে দেয়ে যার যার কাজে বার হয়ে গে[illegible] দুপুর বেলার খাবার জন্য বাড়ী ফিরতে হয় না। আপিসে স্কু[illegible] কলেজে হোটেলে রেস্তোরায় সস্তায় খাবার বন্দোবস্ত আছে। বিকা[illegible] চায়ের ব্যবস্থাও ইচ্ছা করলেই করা যায় বাইরে। নয় ত বা[illegible] ফিরে এসে স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে চায়ের ব্যবস্থা করে নিল। ত[illegible] এমন একটা কিছু হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড নয়, এক জন গ্যাসটা জ্বে[illegible] নিল একটা দেশলাই-কাঠি দিয়ে—আর এক জন হয়ত জ[illegible] চাপিয়ে দিল; একজন চায়ের কাপ ডিশ পেড়ে ট্রে'র উপর সাজি[illegible] দিল, অপর জন তাকের উপর থেকে কেক-বিস্কুটের কৌটোটা ও[illegible] গোটাকয়েক সাজিয়ে নিল ডিশে, এবার শুধু খেলেই হয়। কিছু[illegible] বিশ্রামের পর দু'জনে মিলে রাত্রের খাবার তৈরি করলে—খাও[illegible] পর গোটাকতক কাপ ডিশ বড় প্লেট ও বাটি ধুয়ে মুছে রাখা—ব[illegible] মিটে গেল হাঙ্গামা। তার পর রাত দশটা-এগারটা পর্য্যন্ত পড়াশু[illegible] গানবাজনা, সেলাই চর্চ্চা, যার যা খুশি! এই ত সারা সপ্তা[illegible] রুটিন। বাড়তি কাজগুলো যেমন কাপড় কাচা, ঘরদোর ঝ[illegible] মোছা, ইস্ত্রি করা, মোজা গেঞ্জী রিপু করা—এগুলো হয় রবিবা[illegible] শনিবার বিকালটা থাকে বিশ্রামের জন্য—বেড়ানো, থিয়ে[illegible] বায়স্কোপ দেখা, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নে[illegible] এগুলোও শনিবারে।

আচ্ছা, তার পর আরও দু'একটা বছর এগিয়ে আনা যা[illegible] এদের। এবার এদের পরিবারে আসবে শিশু, তার জন্যে চাই প্রস্তুতি। নিজের চেয়েও বেশী যত্ন নেয় এরা শিশুর প্রতি, ভাবী কালের নাগরিক সে, তার প্রতি তাই বাপ মা এবং রাষ্ট্রের দায়ি[illegible] রয়েছে প্রচুর। তার জন্য মায়ের দুশ্চিন্তার বাতে লাঘব হয়, [illegible] ব্যবস্থাও সরকার করে থাকেন। হাসপাতালে বিনা খরচা[illegible] চিকিৎসা, মায়ের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা এবং পরিণত অবস্থা[illegible] মাকে বাড়ীতে গিয়ে পরীক্ষা করে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জামা কাপড়, বিছানা এবং প্যারাম্বুলেটর বাতে অল্প খরচায়—কিংবা মাসিক কিস্তিতে কেনা যায় তারও ব্যবস্থা আছে। একমাত্র অসুবিধা হয় মায়ের চাকুরি নিয়ে। সাধারণ পরিবারে দেখাশুন[illegible] করার আর লোক নেই বলে মাকে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে শিশুর প[illegible]

...ায় রত হতে হয়। সেটা প্রত্যেক মা-ই সানন্দে স্বীকার করে ...য়।

শিশু একটু বড় হলে তাকে নার্শারী স্কুলে পাঠিয়ে মা আবার ...জর চেষ্টা করেন। পূর্ব্ব-ইউরোপে যেমন শুনি, পশ্চিম-ইউরোপে ...মাত্র জার্মানী ছাড়া বোধ হয় শিশুদের জন্যে তেমন 'ক্রেশে'র বা ...-রক্ষণাগারের ব্যবস্থা অল্প কোথাও নেই। তাই গরীব, নিম্ন-বিত্ত পরিবার অথবা শ্রমিক পরিবারে—যেখানে মায়ের চাকুরি ...াকলে শিশুর খাবার কেনাও অসম্ভব হয়ে পড়ে সেখানে কয়েকটি ...বার মিলে যার যেদিন কর্ম্মবিরতি পড়ে সে সেদিন সকলের ...মেয়েদের দেখাশোনার ভার নেয়। এমনি কঠোর পরিশ্রমের ও মা শিশুকে অযত্ন করে না। সময়মত খাইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার ...র। সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে সন্তানদের মা বড় করে তোলে। ...র পর পড়াশোনার যখন সময় আসে, তখন মা যদি অবস্থাপন্ন না ..., ত সরকারী স্কুলে বিনা বেতনে সন্তানের পড়াশোনার ব্যবস্থা ...র দেন, আর যদি সামর্থ্য থাকে খরচ করে পড়ানোর, প্রাইভেট ...ল সঙ্গে করে দিয়ে আসেন। পয়সার পড়াই হোক আর বিনা ...সার পড়াই হোক, বিদ্যার 'মান' সব স্কুলেই সমান। এই শিশুও ...ন বড় হয়, তা সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক প্রাথমিক ...শেষ করে নিজেই ভেবে নেয়, কি রকম অর্থকরী বিদ্যা শিখবে। ...ন্তু অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান না হলে ইউনিভারসিটির ডিগ্রী ...র জন্য সকলেই খুব ব্যগ্র হয়ে ওঠে না, কারণ ইউনিভার্সিটির ...গ্রীটাই সেখানে চাকুরির যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি নয়।

যে মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে প্রোফেসরি বা মাষ্টারির ...করি নিল সেও যেমন তেমনি যে মেয়েটি পড়াশোনা চালাতে না ...রে বাড়ীর ঝিয়ের কাজ নিল সেও তেমনি—কাগজে-কলমে এবং ...তঃ তার প্রেষ্টিজ সমান। আমাদের বাসন মাজার ঝি খেঁদী, ...ন্তি পেঁচী ইত্যাদি, স্কুলের শিক্ষিকা—মাসীমা, দিদিমণি। সে ...শে ঝি মিস মাইনর, মিসের কুপার ইত্যাদি আর শিক্ষিকা মিসেস, ...নসন, মিস ওয়াল্টার ইত্যাদি। তার পর ঝি বা রাঁধুনীর নির্দ্দিষ্ট ...ইনে বাঁধা আছে, কাজের নির্দ্দিষ্ট সময়ও বাঁধা। ইচ্ছা করলেই ...কে দু'ঘণ্টার জায়গায় তিন ঘণ্টা খাটানো যায় না। খুশীমত তাকে ...চ শিলিঙের জায়গায় তিন শিলিং দিতে পারেন না। তার জন্য ...ইন-আদালত আছে। শিক্ষয়িত্রীর, মাইনের নিয়ম আছে। স্কুল-...মিটি তাকে ইচ্ছা করলেই ৩৫০ পাউণ্ডের জায়গায় ২৫০ পাউণ্ড ...তে পারেন না, বা ২০০ পাউণ্ড দিয়ে ৩০০ পাউণ্ড লিখিয়ে নিতে ...রেন না। কারণ এ বড় শক্ত ঠাঁই, একবার প্রকাশ পেলে বা ...ান শিক্ষিকা অসন্তুষ্ট হলে সে স্কুল চালানো কঠিন হবে। কাজের ...ধা নিয়মের বাইরের সময় শিক্ষিকাও যেমন অবসর যাপন করেন, ...ঝচারিকাও তেমনি করেন।

মেয়ের বিয়ের বয়স হলে আপনি আমি ত মাথায় হাত দিয়ে ...স পড়ি। তার স্বামীটিকে কোথা থেকে খুঁজে বার করি। সে ...শে কিন্তু এ ভাবনাটা ছেলেমেয়েরা নিজেরাই করে থাকে। খুঁজবেও তারা, উদ্যোগ-আয়োজন করবেও তারা, হয়ত আমাকে আপনাকে সময়মত জানাবে উৎসবটা সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য। খরচটা উপার্জ্জনক্ষম ছেলেমেয়ে ভাগাভাগি করে দেবে। বাপ-মাকে মেয়ে বিয়ের দক্ষিণা ধরে দিতে হয় না। বেশীর ভাগ দায়িত্ব ছেলের নিজের। বিয়ের কথাটা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পর উভয়ে মিলে ঘর খোঁজে, জিনিষপত্র কেনে, তার পর শুভদিন দেখে নিজেদের ঘরে প্রবেশ করে। আমাদের হিন্দু পরিবারের বিয়ের ব্যাপারের সঙ্গে তুলনা করলেই ছেলের বাবারা (শুধু বাবারা কেন দাদারা এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও) বলে বসবেন—আমাদের সমাজে মেয়ের সংখ্যাধিক্য, তাই অর্থনীতির চাহিদা ও সরবরাহের মূলসূত্র ধরে ছেলেকে টাকাপয়সা জিনিষপত্র দিতে হয়। আসলে কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে নারীর সংখ্যা আরও বেশী—হিসাবে বলে এক শত পুরুষে নারীর সংখ্যা প্রায় আড়াই শত। কাজেই ওটা দুর্ব্বল যুক্তি। সমাজে মেয়েদের বাঁচবার দাবি এবং মনুষ্যত্বের দাবি অস্বীকৃত হয় নি।

এবারে সুরু করি পথ চলা। সকালবেলা দেখবেন উর্দ্ধশ্বাসে মেয়েরা ছুটছে রাস্তায়, সময়মত গিয়ে পৌছতে হবে। সে মেয়েরা কিন্তু এখানে আমরা যে ধরনের মেমসাহেব দেখতে অভ্যস্ত তেমন নয়, ঠোঁটে তাদের রঙের বাহুল্য নেই, পোশাকে ঠমক-দেখানো চাকচিক্য নেই, তা বলে অপরিচ্ছন্ন নয় তারা। তারা পরিশ্রমী, এত সাজ-পোশাকের জঞ্জাল জোটাবার সময় কোথায় আপিস টাইমে? সেটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য ত রবিবারই রয়েছে। যা হোক, বাসে হুড়ো-হুড়ি লেগে যায় না, কারণ লাইন করে দাঁড়িয়ে বাসে উঠতে হয়, আপিস টাইমে বাসে যে কয়েকটি ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, তার বেশী আর উঠতে পারে না। সে দেশে বিনা দ্বিধায় ছেলেদের পাশে বসে অথবা দাঁড়িয়ে মেয়েরা যেতে পারে বলে লেডিস সীট নেই বাসে টিউবে। একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোমাদের দেশে লেডিস সীট নেই কেন?" তিনি বলেছিলেন, "ওতে যে আমাদের অপমান এতে। বোঝায় আমাদের ভদ্রতার উপর ওদের ত বটেই আমাদেরই আস্থা নেই, তাই সংরক্ষিত আসন লাগে, পাছে অঘটন কিছু ঘটে।"

একুশ বছর বয়সে সে দেশে মেয়েরা সাবালিকা হয়। ষোল-সতের বছর বয়স থেকেই ইচ্ছামত চলাফেরার উপর তাদের সম্পূর্ণ অধিকার। তবে সে অধিকারের মর্য্যাদা তারা পরিপূর্ণ বজায় রেখেছে, কেউ কারও ব্যাপার নিয়ে অনাবশ্যক কৌতুহল প্রকাশ করে না, তাই বিনা সঙ্কোচে মেয়েরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারে—সে যত রাতই হোক না কেন! অনেক মেয়েকেই ত বাসে, ট্রেনে, কারখানায় নাইটডিউটি সেরে রাত বারটায় বাড়ী ফিরতে হয়, তাতে অবাঞ্ছিত ঘটনা ত বড় একটা ঘটে না, পিছন বা সামনে থেকে অশোভন মন্তব্য করা, কোন মেয়েকে একলা পেয়ে সঙ্গদানের জন্য এগিয়ে আসা, অথবা তার নামে অপযশ রটানোর দায়িত্ব নেওয়া,

কোনটাই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড বা অষ্ট্রিয়ার চোখে পড়ে নি। বছরখানেকেরও বেশী সে দেশে কাটাবার সময় একবারও কিন্তু মনে হয় নি আমি মেয়ে বলে অভিভাবক বা সঙ্গীহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোটা আমার পক্ষে বিপজ্জনক।

পাঠকপাঠিকারা হয়ত ভাবছেন—এত স্বাধীনতা পেয়ে সে দেশের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছে, বিশেষতঃ সে দেশের অনুকরণকারী এ দেশের একটা সমাজ দেখে এ ধারণাটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর একমাত্র উত্তর এই যে, উচ্ছৃঙ্খলতা সব দেশেই কিছু না কিছু আছে এবং থাকবেও, কিন্তু শৃঙ্খলাই যে মানব-সমাজের ভিত্তি একথা ভুললে চলবে না, না হলে সমাজ গড়ে উঠতেই পারত না। সিনেমা-বায়স্কোপ দেখে এবং কিছু কিছু খবরের কাগজ পড়ে আমরা মনে করি ওদেশে বুঝি স্থায়ী বিবাহ-বন্ধন নেই, আছে শুধু বিবাহ-বিচ্ছেদ। মনে রাখা উচিত আ[illegible] বিবাহ-বিচ্ছেদটা একটা ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়।

ইউরোপের সমাজে যা দেখেছি তাতে বুঝলাম, ছেলেপু[illegible] নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ঘর-সংসার বেঁধে জীবন কাটানোটাই সে দে[illegible] লোকেদের প্রধান কাম্য, তবে ঘর-সংসার বলতে সকাল থেকে স[illegible] পর্যন্ত হাঁড়িকুড়ি নিয়ে বসে পরিবারের প্রত্যেকের মনোরঞ্জ[illegible] ভার নিয়ে ব্যস্ত থাকে না তারা। পরিবারের প্রত্যেকের উপর দায়িত্ব আছে তা ওরা ভুলে যায় না বলেই ওদের দৈনন্দিন জী[illegible] যাত্রা অনেক বেশী সুশৃঙ্খল। স্বাস্থ্যনীতি পালন, পরিচ্ছন্নতা, [illegible] শীলতা ইত্যাদি থাকলে যে পারিবারিক জীবন আরও সুন্দর [illegible] সুসহ হয়ে উঠে এটাই ওদের কাছে আমাদের দেশের মেয়ে[illegible] এবং ছেলেদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত।

জননী বসুন্ধরা

শ্রীকালিদাস রায়

দেখেছ বৎস, নিকুঞ্জবন ফুলে ফুলে আলো করা,
তটিনী-বক্ষে লক্ষ তরণী কক্ষে পণ্যভরা।
দেখেছ বৎস ফলভারে নত আম্রকদলী বন,
সোণার ধান্যে ভরা প্রান্তর জুড়ায়েছে দু'নয়ন।
দেখেছ বৎস দূর দিগন্তে সুনীল গিরির শ্রেণী,
মেঘের মতন, ভাবিয়াছে তায় আমার এলানো বেণী।

দেখ নি শতেক যোজন জুড়িয়া মরুভূমি করে ধু ধু
হিমমণ্ডল দেখ নি যেখানে কঠিন তুষার শুধু।
দেখ নি উচ্চ গিরির শিখরে চিরহিমানীর ভার,
দেখ নি গহন রবিকররোধী অটবী আফ্রিকার।
দেখ নি অগ্নিগিরির কটাহে বিদীর্ণ জ্বালানলে
যেথা অবিরত পঞ্জর মোর লাভা হয়ে দ্রুত গলে।

দেখেছ মায়ের হাসিমুখ আর হাতের ব্যজনীখানি
পিয়েছ স্তন্য পেয়েছ অন্ন শুনেছ সোহাগবাণী।
দেখ নি মায়ের শুকানো বদন লুকানো প্রপাতধারা,
কত অকথিত ব্যথিত আকূতি করেছে আত্মহারা।
ভয় ভাবনার ইন্ধনে তার কি অনল প্রাণে জ্বলে
দহিতেছে তার আরাম বিলাস বিশ্রাম পলে পলে।
জান না বৎস, কেবল তোমার হাসি মুখখানি দেখে
আনন্দময়ী সেজেছে মা তার সকল বেদনা ঢেকে।

প্রতীক্ষা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সবারে বেড়াতে বেরিয়ে দিল্লী থেকে হরিদ্বার চলে গেলাম। ায়গাটা আমার বরাবরই ভাল লাগে। আকর্ষণ কিসের তা জানি া। পুণ্যলোভাতুর আমি মোটেই নই। তবু জোরগলায় বলতে ারি, উত্তর-ভারতের দিকে পাড়ি দিলে হরিদ্বার না হয়ে ফিরলে নটা যেন কোনমতেই স্বস্তি পায় না। হয় ত বলবেন সংস্কার। তা বলুন। আমি কিন্তু তা বলতে পারি না। যাক্ ও কথা।

হ্যাঁ, হরিদ্বার গেলাম। পরিচিত পাণ্ডা আমার ছিল—তার ওখানেই উঠলাম। মাত্র থাকব তিন দিন কি চার দিন। তার পর ফিরে আসব—পরিকল্পনা ছিল এই। এক দিন সকালবেলা পা পা করে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর গিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাস্তার পাশে দেখি একটি আশ্রম। কয়েকজন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী গৈরিক পরে ঘুরছেন। কি খেয়াল হ'ল—ঢুকে পড়লাম আশ্রমের ফটক দিয়ে। ভেতরটা দেখতে লাগলাম। আশ্রমবাসী সকলেই অবাঙালী। একটি আবাসিক বিদ্যালয়ও আছে আশ্রমটির মধ্যে। অনেকগুলি ছাত্রও দেখলাম ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে। সেদিন কি বার ছিল মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, সেদিন বিদ্যালয়ের ছুটির দিন। অধ্যয়ন হয় তো হতে পারে, কিন্তু অধ্যাপনা হয় না। ছেলেরা প্রায় সবাই যুক্তপ্রদেশের। বিহারের ছেলেও কয়েকজন আছে। নৈতিক শিক্ষাটা যাতে ভাল হয় সেই জন্য সাধু-সন্ন্যাসীর আওতায় ছেলেদের পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের অভিভাবকেরা। ভাল হবারই কথা। আশ্রমের উপর যাতে চাপ না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি আছে কলের। ছেলেদের খরচ মাস মাস আসে তাদের বাড়ী থেকে। য়েকটি অনাথ ছেলেও আছে, তাদের ব্যয়ভার আশ্রমই বহন করে। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম।

ভোজনাগার, ভজনাগার, পাঠাগার, শয়নাগার প্রভৃতি সমস্তই এক এক করে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাঃ, আশ্রমটি তো বেশ। ানটিও খুবই মনোরম। এক জন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী এসে আমার াম-ধাম সমস্ত জিজ্ঞেস করে গেলেন। রাষ্ট্রভাষায় প্রশ্ন—তাই ভাষা যতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম সেই ততটুকুর মধ্যে িজের ভাবধারা টেনে-টুনে গুটিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রভাষাতেই উত্তর দিয়ে লাম।

'উসকে লিয়ে, ইন্‌কে লিয়ে, মগর লেকিন'—এই ক'টা কথা ামি খুব ব্যবহার করে থাকি। কেমন একটা মুদ্রাদোষ হয়ে গেছে ামার। মানে হয় ত সকল স্থলে কথাপ্রসঙ্গে ঠিক হয় না—কিন্তু া বুঝতে পারি না। বুঝতে পারেন নিশ্চয় আমার শ্রোতারা। বদেশী বলে মাপ করে নেন আমার ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি। াইতে আরও বেড়ে যায় আমার দুঃসাহস। বলতে কেমন আরও ভাল লাগে ঐ ক'টি শব্দ বাংলা দেশের গণ্ডির বাইরে পা দিলেই—ঐ 'মগর, লেকিন, উসকে লিয়ে, ইন্‌কে লিয়ে'।

সাধুজী বুঝলাম আমার উত্তরে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, দেখিয়ে বাবুজী, দেখিয়ে—আরামসে দেখিয়ে।

সম্মান জানিয়ে আমিও বললাম, উসকে লিয়ে আপকা মেহের-বানি, সাধুজী। মগর লেকিন হামলোকতো সংসারী আদমী আছে। ইন্‌কে লিয়ে শান্তি সুখকো ওয়াস্তে মহাত্মা পুরুষ যাঁহা রয়তা—হুঁয়া আতা-যাতা। যো কুছ উসকে লিয়ে আরাম আনন্দ মিল্‌তা—মগর লেকিন ইন্‌কে লিয়ে—

আর আমার ভাষা যোগায় না। কি বলব ছাই! এদিক-ওদিক চাইতে লাগলাম। সাধুজী বুঝতে নিশ্চয় পেরেছিলেন আমার অবস্থাটা। বলেছিলেন, ঠিক হ্যায়, বাবুজী—গুরুজীকা আশ্রম আরামসে দেখিয়ে।

তার পর দেখলাম তিনি রন্ধনশালায় ঢুকে একখানা বড় শাল-পাতায় খানছয় ইয়া মোটা মোটা লাল আটার রুটি এবং খানিকটা ঘন ডাল ও ভাজি নিয়ে বলটুওলা খড়ম পায়ে খটাস খটাস করতে করতে. মুখে কি একটা স্তব আওড়াতে আওড়াতে আশ্রমের একদিকে চলে গেলেন।

তাঁর দিক থেকে মুখ ঘোরাতেই অদূরে নজর পড়ল একটা পাড়-বাঁধানো পাতকুয়ার কাছে একটি বছর বারো-তের বয়সের ছেলে বসে বসে শুকনো ছাই দিয়ে বাসন মাজছে। ছেলেটি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে আর হাত রগড়াচ্ছে একখানা বড় থালার উপর। পরণে হাফপ্যাণ্ট, গায়ে একটা গৈরিক-রঙে ছোপানো ছেঁড়া গেঞ্জি। আমি ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলাম। ছেলেটি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখতে লাগল। কি করুণ চাহনি তার। একটা বুকফাটা তৃষ্ণার জ্বালা যেন সে চাহনিতে ঝরে পড়ছে। ছেলেটির চেহারা কৃশ ও রুগ্ন। গায়ের রঙ কালো। হিন্দুস্থানী ছেলে বলে বোধ হচ্ছিল না। কাছে আরও এগিয়ে গেলাম।

ছেলেটি কেমন যেন একটু লাজুক বলে বোধ হ'ল। নিকটবর্ত্তী হতে সে তার চোখ দুটো নামিয়ে নিলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তার পর পাতকুয়ার মধ্য থেকে এক বালতি জল তুলে সে আপন-মনে বাসন ধুতে লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, তোম্ লোক্‌কো মোকাম কাঁহা?

ছেলেটি উত্তর দিলে, আমি বাঙালী—বর্দ্ধমান জেলায় আমাদের বাড়ী।

কেমন চমকে উঠলাম। বাঙালী—বাংলা দেশের ছেলে—এত দূরে এখানে কি করতে এসেছে! আশ্রমে থেকে পড়তে এসেছে

বোধ হয়। তাই হবে। কেমন আলাপ করতে ইচ্ছে হ'ল—মাথামাখি আলাপ।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

ছেলেটি বললে, সত্যেন।

বর্দ্ধমান জেলায় কোনখানে বাড়ী?

রায়না। তবে আমাদের কলকাতায় বাসা আছে।

এখানে কি করতে এসেছ?

বাবা এখানে পড়াশুনা করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তা বেশ—পড়ছ ত?

ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, হ্যাঁ—পড়ি।

তোমার বাবা কি করেন?

রেল অপিসে চাকরি করেন।

ক'বছর এখানে আছ

তিন বছর।

দেশে যাও না?

ছেলেটি এ কথার কোন উত্তর দিলে না। কেমন ম্লান মুখে চুপ করে রইল।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, দেশে যাও না?

ছেলেটি বললে, প্রথম বছরে বাবা আমায় নিয়ে গেছলেন একবার। তার পর আর নিয়ে যান নি।

কেন?

ছেলেটি নিরুত্তর।

জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ীতে গিয়ে দুষ্টমি কর বুঝি?

আমার কথায় ছেলেটি অমনি ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললে। অতি করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল, না গো—আমি দুষ্টমি করি না। নতুন মা শুধু শুধু বাবাকে বলে আর বাবা আমায় মারধর করেন।

নতুন মা! কি ব্যাপার! ছেলেটির কি আপন মা নেই তা হলে!

কথায় কথায় জানতে পারলাম পরে। ছেলেটির বাপের নাম নিকুঞ্জবাবু—নিকুঞ্জ চক্রবর্ত্তী। সত্যেনের আট বছর বয়সে তার মা মারা যায়। নিকুঞ্জবাবু আবার বিবাহ করেন। নবপরিণীতা স্ত্রী অর্থাৎ সত্যেনের নতুন মা সত্যেনকে মোটেই দেখতে পারেন না। তাই স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে সত্যেনের এই নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সত্যেনের আশ্রমে থাকা, পড়ার খরচ নিকুঞ্জবাবু মাস মাস ঠিক পাঠিয়ে দেন। অবস্থা তাঁর ভালই। তিন বছরের মধ্যে নিকুঞ্জবাবু সত্যেনের সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছিলেন মাত্র দু'বার। চিঠি তিনি মাসে মাসে দেন—খোঁজখবর নেন আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হতে। গত বছর পুজোর আগে তিনি সত্যেনকে একবার ঘরে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। দিনকতক রেখে আবার এখানে পাঠিয়ে দেবেন। সত্যেন সেকথা শুনেছিল। কিন্তু এ বছরের পুজোও সম্প্রতি কেটে গেল। নিকুঞ্জবাবু আসেন নি। তিন মাস আগে সত্যেনের দারুণ উদরাময় পীড়া হয়েছিল। ভুগেছিল অনেকদিন। সে খবর নিকুঞ্জবাবু পেয়েছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন তাঁকে পত্র মারফত। ছেলেকে একবার দেখে যাবার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় সময় করে উঠতে পারেন নি আসবার। সেই থেকে সত্যেন ভুগছে প্রায়ই পেটের অসুখে। আশ্রমে ভাত হয় না। সত্যেনকে খেতে হয় আশ্রমের রুটি না হয় পুরী। একান্ত খেতে না পারলে অসুস্থ হলে—ব্যবস্থা আছে ঘোল ও বার্লির। আশ্রমের মধ্যে চিকিৎসালয় আছে। যথাসম্ভব চিকিৎসা রোগীদের সেখান থেকেই হয়। বেশ ভাল। কিন্তু সত্যেন এখানে অন্য কোন ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বা খেলা করতে পারে না। এ দুর্ব্বলতা সত্যেনেরই। আশ্রমের কাজকর্ম্ম একটু-আধটু সকলকেই করতে হয়। সম্প্রতি সকালবেলা বাসনমাজার কাজ পড়েছে সত্যেনের উপর। লেখাপড়ার উন্নতি তার কতখানি হয়েছে—সেকথা আমি তাকে জিজ্ঞাসাও করি নি বা তাকে পরীক্ষা করবার বাসনাও আমার জাগে নি। যাক্—মোদ্দা কথা—তার কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝতে পারলাম, এক রকম চারা গাছ আছে—যার শিকড় বাংলা দেশের জলোমাটিতে বেশ গজায়—অন্য কোথাও তেমন গজায় না। সত্যেন যেন ঠিক সেই জাতের চারাগাছ। তাকে যেন জোর করে বাংলার মাটি থেকে চড়চড় করে উপড়ে নিয়ে টেনে এনে সারজল দিয়ে গেঁথে গেঁথে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এই উত্তর ভারতের পাথুরে মাটিতে। ফল তার যা হবার ঠিক তাই হয়েছে।

কিন্তু—আহা, ছেলেটা একবার দেখতে চায় তার বাপকে—সে আশা তার মিটছে না। শুনলাম—সত্যেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যেখানে যে কাজই করুক—সেখান থেকে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে আশ্রমের ফটকের দিকে। চেয়ে চেয়ে কেবল দেখে—যত লোক আসছে তার মধ্যে তার বাবা আসছে কিনা! দিনের পর দিন আজ এই পাকা দু'বছর ধরে এইরূপে একান্ত মনে পথপানে চেয়ে থাকার কঠোর সাধনা করে যাচ্ছে সে। হায় রে, নির্ব্বোধ বালকের এ কি কঠোর তপস্যা, নিদারুণ নৈরাশ্যের মাঝে বসে ছলনাময়ী আশার মন্ত্র জপ করে করে।

শেষে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বাবা, তোমার বাবাকে চিঠি দাও না কেন?

সত্যেন বাসন মাজতে মাজতে বললে, দিই ত। বাবা কোন উত্তর দেয় না। বোধ হয় বাবার কোন অসুখ করেছে—তাই আসতে পারছেন না। কিংবা বদলি হয়েছেন বোধ হয় অন্য কোথাও। নইলে বাবা ঠিক আসতেন এত দিনে। আমায় সেবার বলে গেছেন—এইবার এসে নিয়ে যাবেন আমায়।

সান্ত্বনা দেবার ছলে তার মুখের কথাটাই পুনরুল্লেখ করে বললাম, তাই হবে। তোমার বাবা নিশ্চয় আসবেন। শীগগির এসে পড়বেন—মনে হয়।

হঠাৎ মুখ তুলে সত্যেন আমায় জিজ্ঞেস করলে, আপনি আমার বাবাকে চেনেন? আমার বাবা শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী। কলকাতায় পার্শিবাগানে আমার বাবার বাসা।

বললাম, চিনি না তাঁকে। তবে আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমার বাবাকে খবর দেব। তোমার বাবার বাসার ঠিকানাটা কি বল দেখি।

কথাটা বলতেই সত্যেনের চোখে মুখে একটা চকিত আনন্দের দীপ্তি খেলে গেল। খুব আগ্রহ প্রকাশ করে বললে, আপনি লিখে নিন কাগজে—নইলে হয় ত ভুলে যাবেন।

সত্যেন তার বাবার বাসার ঠিকানা বললে। লিখে নিলাম তা বেশ স্পষ্ট করে আমার ছোট পকেট-ডায়রীতে।

তার পর সত্যেনকে যতটা পারি বুঝিয়ে, একটু আশ্বাস দিয়ে চলে এলাম আশ্রমের বাইরে। আর আমার মন চাইল না আশ্রম দেখতে। আসবার সময় ছেলেটির চোখের যে ছলছল করুণ চাহনি দেখে এসেছিলাম—সে চাহনির ভাষা দেব এমন শক্তি আমার নেই। তবে আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বেশ বুঝতে পারছিলাম কিসের খোঁচা যেন আমায় ঠেলা দিয়ে দিয়ে বার করে দিচ্ছে—ঠেলে পাঠাচ্ছে যেন আমায় কলকাতায়—কলকাতার পার্শিবাগানে। খোঁচা অন্য কিছুর নয়—খোঁচা মা-হারা ছেলের করুণ চাহনির।

যাক্, ঠিক করলাম কলকাতায় পৌঁছে পার্শিবাগানে খোঁজ করব সত্যেনের বাপের—খোঁজ করব নিকুঞ্জবাবুর।

যথাসময়ে হরিদ্বার ছাড়লাম। রওনা হলাম ডাউন ডুন এক্সপ্রেসে। ইণ্টার ক্লাস কামরা—কামরাখানায় খুব ভিড়। সকলেই দূরের যাত্রী। দু'টি বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ভদ্রমহিলা বসে আছেন। রোগা ছিপছিপে চেহারা। সর্ব্বক্ষণই পান চিবোচ্ছেন। পাতলা পাতলা ঠোঁট দুটি পানের রসে বেশ রাঙা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে নীচের ঠোঁটটি আপনমনে যতটা পারেন এগিয়ে ধরে এক একবার চেয়ে দেখছেন বোধ হয় রেঙেছে কেমন। গায়ের রঙ ফর্সা। পরনে একখানি রঙিন টাঙ্গাইল শাড়ী। তাঁর পাশে বসে আছেন একটি ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চোখে চশমা। তিনিই মাঝে মাঝে পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে মহিলাটিকে পান যোগাচ্ছেন—যোগাচ্ছেন তারই সঙ্গে সঙ্গে জর্দ্দা, দোক্তা ও কিমাম। গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়িয়ে পুচ পুচ করে পানের পিক ফেলছেন মহিলাটি থেকে থেকে। কোনও রকমে বাচ্চা দুটির এক পাশে যতটা সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটু ঠাঁই করে বসতে পেরেছি আমি। বাচ্চা দুটি শুয়ে শুয়ে যাচ্ছে। মহিলাটি আমায় হঠাৎ বলে উঠলেন, একটু সরে বসুন—ছেলেটার পাটা মুড়ে রয়েছে, সোজা করে দেব। অগত্যা একটু সরেই বসলাম।

গাড়ী চলেছে হু হু করে। এক্সপ্রেস গাড়ী অনেক ষ্টেশনে দাঁড়াচ্ছে না। আমাদের সামনে একটি ছোকরা বসেছিল। ছোকরাটি মহিলাটিকে সম্বোধন করে বললে, দিদি, দাদাবাবুকে বল না—একবার কাশ্মীর ঘুরিয়ে আনতে।

শুনতে পেয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, যাব—যাব, সামনের বছর বেরিয়ে আনব কাশ্মীর। এ বছর আর হবে না। ফ্রি পাস যা নেবার তা সব নেওয়া হয়ে গেল এবার।

অনুমানে বুঝলাম, এঁরা স্বামী-স্ত্রী।

ভদ্রলোকটি বললেন মহিলাটিকে, তুমি একটু শুয়ে পড় এবার। সারারাত জাগলে অসুখ করবে আবার।

মহিলাটি বললেন, না থাক্ এখন শোব না।

তার পর পরস্পর কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন স্বামী, স্ত্রী ও সম্বন্ধীতে। বুঝতে পারলাম, মুসৌরি পাহাড়ে বেড়াতে গেছলেন। এবার ফিরছেন কাশীতে। কাশী হয়ে কলকাতায় ফিরবেন।

কি কথায় কথায় ছোকরাটি জিজ্ঞেস করলে, দিদি, শুনেছি এই দিকে কোথায় না কি সতু থাকে?

বিরক্ত ভাবে উত্তর দিলেন মহিলাটি, কে জানে।

ভদ্রলোকটি বললেন, হাঁা, সতু এইখানেই থাকে। হরিদ্বারে নেমে একদিন থেকে গেলে হ'ত—সতুকে একবার দেখে যেতে পারতাম।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মহিলাটি, থাক—আর হরিদ্বারে নামতে হবে না তোমায়। যেখানে যাচ্ছ সেখানে চল। সতু ত আর জলে পড়ে নি বা আগুনে পোড়ে নি। মাস মাস টাকা তো পাঠিয়ে দিচ্ছ—তা হলেই হ'ল।

এই বলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পুচ করে একটু পানের পিক ফেললেন মহিলাটি।

কেমন চমক লাগল আমার। ছোকরাটির কাছ থেকে রেলের টাইম টেবলটা হাতে নিয়ে একবার পাতা উল্টে উল্টে এর একটু আগে থেকেই দেখে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল টাইম-টেবলের একটা পাতায় নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে কালো কালিতে:

Nikunja Chakrabarty,
Parsi Bagan Lane, Calcutta

এই দেখেই টাইম-টেবলটা ফিরিয়ে দিলাম ছোকরাটির হাতে। চেয়ে রইলাম একটু ভদ্রলোকের মুখের পানে। শুনতে পেলাম ভদ্রলোকটি বলছেন, ছেলেটার অসুখ শুনেছিলাম—কেমন আছে কে জানে?

একটু চাপা বিরক্তির ছায়া ফুটে উঠল মহিলাটির মুখে—উত্তর দিলেন না কিছু। চকিতে মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন খোলা জানালার দিকে চেয়ে।

আর সন্দেহ রইল না আমার। বুঝতে পারলাম নিকুঞ্জবাবুকে ময়াল সাপে গিলেছে। আমাকেও যেন সাপে কামড়েছে মনে হ'ল। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। উঠে দাঁড়ালাম। সামনে বেরিলি ষ্টেশন আসছে। ট্রেন থামবে, নেমে অন্য কামরায় উঠব ঠিক করলাম। চেয়ে আছি দরজা দিয়ে বাইরের দিকে। রাত তখন অনেক। চাঁদের আলো বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। দেখছি খানিকটা উঁচু-নীচু জায়গা সাঁ সাঁ করে যেন পিছু হটে যাচ্ছে। দেখলাম একটা পাড়-বাঁধানো বড় পাতকুয়া। বেশ স্পষ্ট দেখতে

মাজছে একটি বারো-তের বছরের রুগ্ন ছেলে শুকনো ছাই দিয়ে আশ্রমের বাসন মেজে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে যেন আমার দিকে। বুকফাটা বেদনা যেন থই থই করছে দু' চোখের চাহনিতে। কি যেন চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম তাকে এমন সময় কুলীর ডাকে চমকে উঠলাম আমি।

বেরিলি—বেরিলি—

একটা হৈ চৈ-এ ভরা আলো-ঝলমল ষ্টেশন।

ময়াল সাপের দৃষ্টিবিষ এড়িয়ে তথখুনি নেমে পড়লাম ডাউন দুন এক্সপ্রেসের ইণ্টার ক্লাস কামরা থেকে।

বুদ্ধ

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জগৎ অজ্ঞানে লীন, হিংসা নাচে নিশি-দিন,
মত্ত ফণা তুলি';
সে, এক অসুর-প্রায়, শুধু হীন স্বার্থ চায়,
পরমার্থ ভুলি';
'মার', তার সহচর; সেও এক বিষধর
—সে এক পিশুন,
মিথ্যা-মরীচিকা-ফাঁদে মানবে সতত বাঁধে,
করিবারে খুন।
তখন, কালের ভালে, প্রসন্ন প্রভাতকালে,
ফুটে এক ছবি:
সে ছবির পদপুটে পৃথ্বী পদ্ম হয়ে ফুটে,
ভালে ফুটে রবি।
সে ছবির আস্যদেশে হেরে সিন্ধু সৌম্যবেশে
পূর্ণ চন্দ্রে তার;
সে ছবির সর্ব্ব অঙ্গে চুমে আসি' রসরঙ্গে
কান্তি অমরার।
সেই ছবি, সেই তুমি, হে বুদ্ধ, হে মহামুনি,
হে সত্যসম্রাট!
তিন লোকে, তিন কালে, ধর্ম্মের হিল্লোল-তালে,
চলে তব নাট;
তব বাণী-মহোদধি উদ্ঘোষয়ে নিরবধি
ভৈরবী ভূষায়;
মহাবোধি তব গজ ঊর্দ্ধে তুলি' দ্যুতিধ্বজ
করয়ে বিহার।

এই বিশ্ব-জেতবনে, সৃজে নিত্য কুকরমে
ক্লেশের কণ্টক;
দুঃখের দ্রুমের তলে শুষ্ক হয় পলে পলে
অমৃত-কোরক;
প্রবলের দৃঢ়-বাহু দুর্ব্বলের হয়ে রাহু
করয়ে ধর্ষণ;
কামীর কাঞ্চন-স্তূপ ধরি' শেষে লোষ্ট্র-রূপ
করে প্রবঞ্চন।
সেই দৃশ্য নিঃস্বতার, সে দুঃসহ গ্লানিভার,
সেই আর্ত্তনাদ,
তব রাজচিত্তদ্বারে ধেয়ে আসে, লভিবারে
মুক্তির প্রসাদ;
তব স্বর্ণ-সিংহাসন ত্যজি' তুমি সেই ক্ষণ
প্রব্রজ ধূলায়;
ধরার ধূইতে ধূলি কি সে ঊর্ম্মি উঠে দুলি'
তোমার হিয়ায়!
সেই দিন হতে, তুমি জগতের চিত্ত-ভূমি
করিছ কর্ষণ,
বুনিতেছ শীল-বীজ, যাহে শান্তি-সরসিজ
হইবে সৃজন;
সেই দিন হতে, তব ত্রিপিটক অভিনব
বিশ্ব-মরুস্থলে
ত্রিতাপ-তরঙ্গনাশী মরূদ্যান অবিনাশী
রচে কুতূহলে।

গান ও স্বরলিপি

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

ধন্য বিশ্বকবি তুমি, হে রবীন্দ্র, গুণাধার।
তোমার অপূর্ব কীর্তি তুলনা নাহিক তার।
শান্তিনিকেতন, দেশে, রচিলে জনকাদেশে।
সেথা কত শত লোকে শান্তি পায় অনিবার।
তুমি মহাজ্ঞানী গুণী বুঝিয়াছে সর্বজন।
বহু অর্থদান করি রাখিয়াছ সুধীজন,
নানা ভাষাবিদ্‌গণে, সুখে শান্তিনিকেতনে,
জীবন কাটান তাঁরা, কোনো দুঃখ নাহি আর।
তুমি নররূপী দেব, অমর হইয়া আছ।
মার্গসঙ্গীত ভাঙ্গি কত গীত রচিয়াছ।
গোপেশ্বর ও পীঠস্থানে, সুখে আছে তৃপ্ত প্রাণে,
তব কীর্তি হেরি আজি হর্ষে ভাসে হিয়া তার।

২´			৩				0			১			
ধা	ধা	|	পধা	ণর্সা	ণা	|	ণা	ধা	|	পা	পা	-া	|
ধ	ন্য		বি০	০০	শ্ব		ক	বি		তু	মি	-	

২´			৩				0			১			
মা	মা	|	রমা	পধা	পধপা	|	মা	জ্ঞা	|	রা	-া	-া	|
হে	র		বী০	০০	ন্দ্র০		গু	ণা		ধা	-	র	

২´			৩				0			১			
সা	রা	|	ধা	-া	ধা	|	ধা	ণা	|	ধা	পা	মা	|
তো	মা		র	-	অ		পূ	র্ব		কী	০	তি	

২´			৩				0			১			
পা	র্সা	|	ণা	ধা	পা	|	মা	জ্ঞা	|	রা	-া	-া	|
তু	ল		না	০	না		হি	ক		তা	-	র	

২´ ৩ 0 ১
মা পা | পা না না | র্সা র্সা | র্সনা র্সা র্সা |
শা ০ ন্তি নি কে ত ন দে০ ০ শে

২´ ৩ 0 ১
ধা র্সা | ণা ধা ধা | ধা র্সণা | ধা পা -া |
র চি লে জ ন কা দে শে -

২´ ৩ 0 ১
মা ধা | ধা ধা ধা | র্সণা ণা | ধা পা -া |
সে থা ক ত শ ত০ ০ লো কে -

২´ ৩ 0 ১
মা -া | পা পধা মপা | মা জ্ঞা | রা -া -া |
শা - ন্তি পা০ ০য়্ অ নি বা - র্

২´ ৩ 0 ১
সা সা | রা রা রা | রা রা | রা রা জ্ঞা |
তু মি ম হা জ্ঞা নী - গু ণী ০

২´ ৩ 0 ১
মা মা | পা -া পা | পা -া | পা পা পা |
বু ঝি য়া - ছে স - র্ব জ ন

২´ ৩ 0 ১
মা মা | মা -া মা | মা পা | মা ধা পা |
ব হু অ - র্থ দা - ন ক রি

২´ ৩ 0 ১
মা মা | রমা পধা পধপা | মা জ্ঞা | রা রা -া |
রা খি য়া০ ০ ০ ছ সু খী জ ন -

২´ ৩ 0 ১
মা পা | না -া না | না র্সা | র্সা সা -া |
না না ভা - ষা বি দ্ গ ণে -

২´ ৩ 0 ১
র্সা র্সা | না -া ধা | ধা ণা | ধা পা -া |
সু খে শা - ন্তি মি লে ত মে -

২´ ৩ 0 ১
মা ধা | ধা -া ধা | ধা র্সনা | ধা পা -া |
জী ব ন - কা টা ন০ তাঁ রা -

২´ ৩ 0 ১
মা পা | মপা ধা পধপা | মা জ্ঞা | ঋা -া -া |
কো নো দু০ ০ খ না হি আ - র

২´ ৩ 0 ১
সা সা | রা ঋা রা | রা -া | রা -া জ্ঞা |
তু মি ন র রূ পী - দে - ব

২´ ৩ 0 ১
র্মা মা | পা -া পা | পা পা | পা পা -া |
অ ম র - হ ই য়া আ ছ !-

২´ ৩ 0 ১
মা -া | মা মা -া | মা মা | মা ধা পা |
মা - র্গ সং - গী ত ভা ০ ভি

২´ ৩ 0 ১
মা মা | মা -া পা | মা জ্ঞা | রা -া ঋা |
ক ত গী - ত র চি য়া - ছ

২´ ৩ 0 ১
মা পা | না না না | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া |
গো পে শ্ব র এ পী ঠ স্থা নে -

২´ ৩ 0 ১
ণা র্সা | ণা ধা ধা | র্সা ণা | ধা পা -া |
সু খে আ ছে তৃ ০ প্ত প্রা ণে -

২´ ৩ 0 ১
মা ধা | ধা -া ধা | ণা র্সা | ণা ধা পা |
ত ব কী - র্তি হে রি আ ০ জি

২´ ৩ 0 ১
মা -া | পা ধা পা | মা জ্ঞা | ঋা -া -া |
হ - র্ষে ভা সে হি য়া আ - র্

প্রগতির পথে বর্ত্তমান ইটালী

সাম্প্রতিক কালে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইটালী উত্তরোত্তর প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইটালীর মোটর-শিল্প আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইটালীতে যে সকল যন্ত্রপাতি এবং প্ল্যাণ্ট নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলির প্রতিও ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে।

বর্ত্তমান জগতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়মের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সম্প্রতি ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষণের ফলে আব্রুৎসিতে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কৃত হওয়ায় ইটালীর পেট্রোলিয়াম-শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।
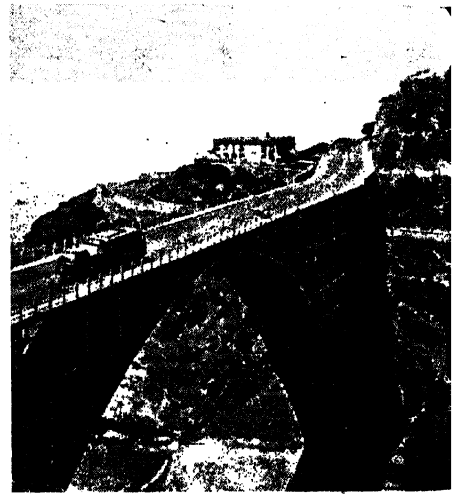
ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষণের প্রস্তুতিকালে কর্ম্মরত যন্ত্র

লেগহর্ণের নিকট অরেলিয়ায় নবনির্ম্মিত রাজপথ

এই আবিষ্কারের পর ১৯৫৫ সনের প্রথম আট মাসে ১০৬,৩[illegible] টন অপরিশ্রুত তৈল পাওয়া যায় এবং ৩২টি তৈল-বিশোধনাগারে মোট ১,৮২,৪০০০ টন বেনজাইন ও ৬,৪৬,০০০ টন পরিশ্রুত তৈল উৎপন্ন হয়।

াতি গভীর নলকূপ বিঁধ করার (Drill)
দ পেসকারার ভালে কুপাতে মাত্র ৫০০
ারের নিম্নে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গিয়াছে।
িলিতে আরও পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের
আব্রুৎসিতে অন্যান্ত 'ডিপজিট' আবিষ্কৃত
য়াছে। এ পর্য্যন্ত এই দেশে প্রতিষ্ঠিত
শটি তৈল-বিশোধনাগারে বৎসরে
৭,০০,০০০ টন অবিশুদ্ধ তৈল (crude
) পরিশ্রুত হয়।

রোমানরা একদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাস্তা
াতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল—
মান ইটালীও সেই ঐতিহ্যের ধারা
ন করিতেছে। রাজপথ নির্ম্মাণের দিকে
ালীয়ান সরকারের মনোযোগও প্রভূত
িমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। যানবাহন
াচলের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য,
গ্র দেশে প্রসারিত রাজপথের উন্নয়ন এবং
প্রসারণের নিমিত্ত রাষ্ট্র একটি পরিকল্পনা
্যকরীকরণে হাত দিয়াছে। ১৯৫৫ সনের
শে জুন পর্য্যন্ত ইটালীর রাজপথসমূহ
প্রসারিত হইয়াছিল ২৪,৮১১ কিলোমি-
রের উপর। ইহা ছাড়া ইটালীর বিভিন্ন
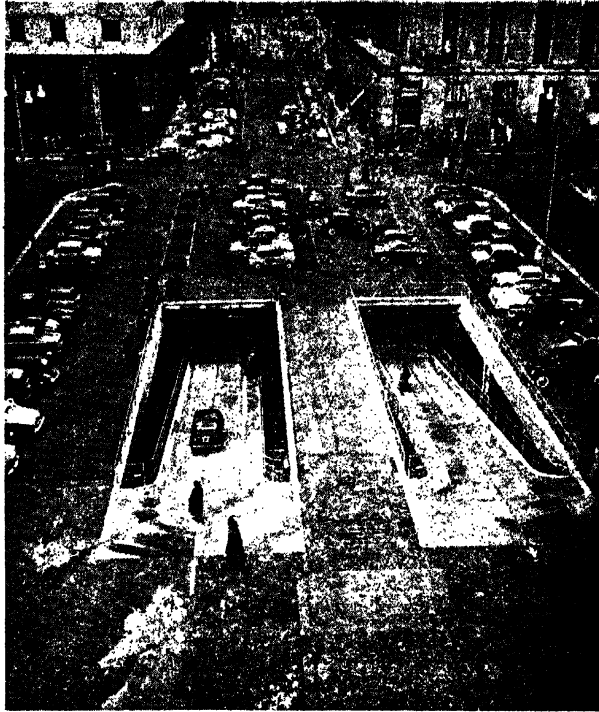
মিলানে ভূগর্ভস্থ নূতন "কার পার্ক"
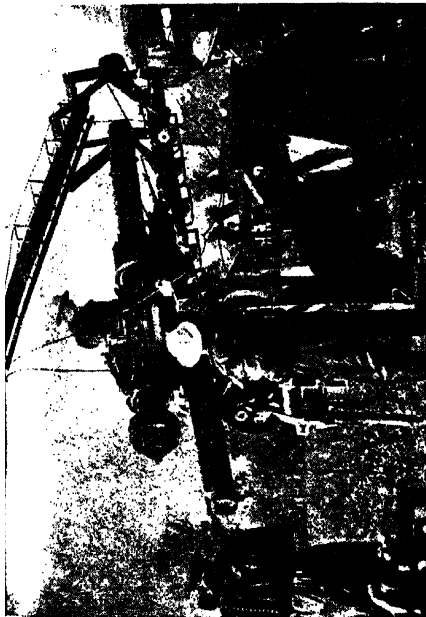
ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষণকালে কর্ম্মরত যন্ত্রপাতির আর একটি দৃশ্য
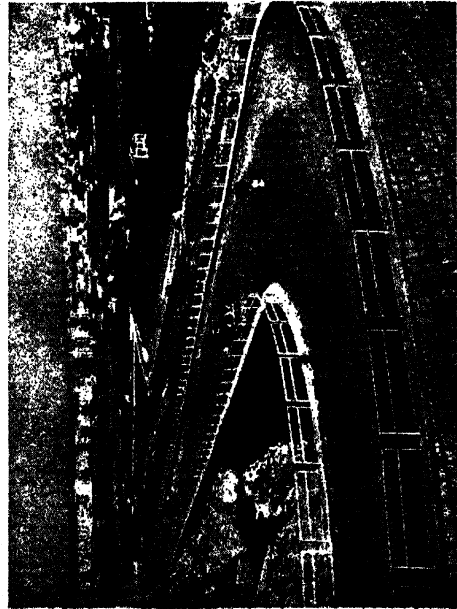
গ্রীক থিয়েটার সিরেকিউজগামী নতুন রাজপথ

পেস্কারার ভাল্লে কুপাতে পেট্রোলিয়ামের জন্ত অতিগভীর নলকূপ বিধ করা
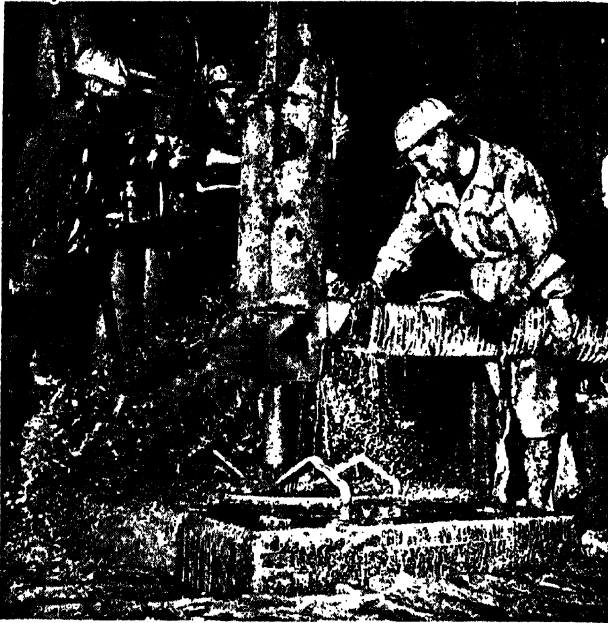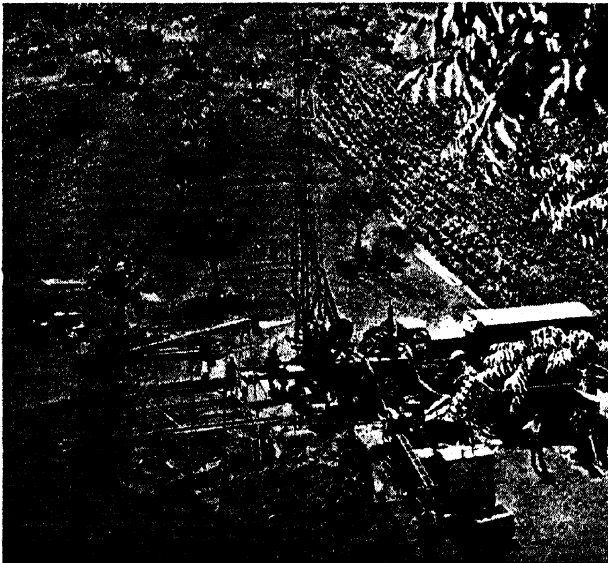
ভাল্লে কুপাতে একটি "ড্রিলিং ইনষ্টলেশন"

অঞ্চলে আরও ১৭৬ কিলোমিটার রাজপ
নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল— ইতি
রাজপথ-নির্ম্মাণ-কৌশলেরও প্রভূত উ
সাধিত হইয়াছিল।

সিসিলিতে টুরিষ্টদের যাতায়াত
দ্বীপের আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে বি
গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এবং সিসিলীয় আঞ
সরকারের (South and the Sicil
Regional Goverment) য
কর্ত্তৃত্বাধীনে আধুনিক প্রয়োজনসমূহ অধি
তরূপে মিটাইবার জন্ত নূতন রাজপথগু
নির্ম্মিত হইতেছে।

ইটালীতে ভূগর্ভস্থ 'কার পার্ক' ইত্যাদি
নির্ম্মাণকার্য্যও সুপরিকল্পিত প্রণালীত
চলিতেছে। ছবিতে পিয়াত্সা ভিস্নাৎস-এ
যে ভূগর্ভস্থ পার্কটি দেখা যাইতেছে তাহাত
৪০০টি মোটরকারের স্থানসঙ্কুলান হইত
পারে। ইহা অতিআধুনিক "ক্লি
ইনষ্টলেশনে"র ব্যবস্থাযুক্ত। টেক্নিক্যা
উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় হই
দাঁড়াইয়াছে মিলান্। এই স্থানে এক
খাড়া (vertical) 'কার পার্ক'
হইয়াছে। এখানে লিফটের সাহায্যে সে
সকল যানবাহনকে 'পার্ক' করা যা
স্থানাভাববশতঃ যেগুলিকে খোলা জায়গ
সাময়িকভাবে রাখা (park) সম্ভব
হয় না।

গল্প লেখার গল্প

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটগল্পের আদর্শ নিয়ে সেদিন বন্ধুমহলে তুমুল তর্ক উঠেছিল। সেই পুরনো তর্ক—যা নিয়ে এককালে সাহিত্যিক মহলে চরম আন্দোলন হয়ে গেছে—সেই তর্ক আবার উঠেছে। ইদানীং সাময়িক সাহিত্যে যে সব গল্প ছাপা হচ্ছে সেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে গল্প বলা চলে কিনা, এই নিয়ে তর্ক চলছিল—বাদানুবাদেরও অন্ত ছিল না। ছোটগল্প এবং বড়গল্প এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কি, মাঝে মাঝে এ সব প্রশ্নও মাথা চাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু তুমুল তর্কের শেষ ফল যা হ'—কোনও মীমাংসাই হচ্ছিল না। গী দ্য মোপাসাঁ, ব্যালজাক, টুর্গেনিভ, টলষ্টয় থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাত-কুমার, বীরবল, ...ক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনকি আধুনিককালের ...ভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত কেউই বাদ ...ছিলেন না।

এই সব তর্কের মধ্যে রমেশ একদম চুপচাপ ছিল। রমেশকে লক্ষ্য করে সতীশ বললে, "রমেশ, তুমি যে একেবারে নিস্তব্ধ ...হ, তোমার কি এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নেই?"

রমেশ বললে, "আমার কথাটা যদি তোমরা মেনে নিতে চাও তা হলে ছোট-...গল্প যে কাকে বলে সেটা আমি বুঝিয়ে দিতে পারি—"

...বললে, "আমাদের কারুর সঙ্গে কারুর আদর্শ যখন মিলছে না, তখন তোমার কথাই মেনে নিতে হবে। তর্কের দ্বারা আমরা যে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব না—সে আমরা বেশ বুঝেছি। ...মাত্র তুমিই আমাদের তর্কের তুফান থেকে ...ং আছ—বিচারক তোমাকেই খাড়া ...াম—এখন ছোটগল্পের আদর্শ সম্বন্ধে ...যা রায় দেবে, তাই আমরা নত শিরে ...ন নেব। আপোষ মীমাংসার এ ছাড়া ...র কোন পথ দেখছি নি—।" জগতের ...য় খুশী হয়ে রমেশ বললে, "আমাকে ...ন ছোটগল্পের বিচারক হিসাবে তোমরা ...ক নিলে তখন আমার আদেশে সবাইকে চুপ করতে হবে। তার পর আমি যা বলব মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও তা হলে ছোটগল্প যে কি জিনিষ সেটা বোঝা সহজ হবে।"

রমেশের আদেশে সবাই চুপ করল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে রমেশ বলতে লাগল, "দেখ, তোমরা প্রত্যেকেই সাহিত্যিক—প্রত্যেকেই লেখক। কেউ ছোটগল্প লিখে নাম করেছ—কেউ বা বড়গল্প-লেখক—উপন্যাসও দু'একজন

আয়ত্ত করছ—আমি কিন্তু কিছুই না। তোমাদের প্রত্যেকেরই লেখা কোন না কোন মাসিকে ছাপা হয়েছে, এবং যশ ও অর্থ-লাভও অনেকের ভাগ্যে ঘটেছে আমার কিন্তু একটি লেখাও কোন কাগজে ছাপা হয় নি—এ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্য-সমিতি থেকে প্রবন্ধ পড়বার জন্য অথবা তোমাদের আজকালকার ভাষায় বাণী দেবার জন্য ডাক আসে নি—এটা কি আমার কম আপসোস। তোমাদের

দেখাদেখি আমিও দিনকতক গল্প লেখায় হাত পাকাতে সুরু ক ছিলাম, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমার হাত কাঁচাই থেকে গেল আশাহত হয়ে অনেক দিন লেখা ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু মনে এখ ব্যথা আছে। তোমাদের আলোচনায় কেন যোগ দিই এতক্ষণে বোধ করি তার কারণটা বুঝতে পারবে। আমি কখনও গল্প লিখতে সুরু করেছিলাম এবং তা ছাপার অক্ষ দেখবার জন্য কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছি—সফ মনোরথ হই নি—সম্পাদকের পর সম্পাদকের কাছ থেকে গল্পগু না মঞ্জুর হয়ে ফিরে এসেছে—তোমরা এক দিনের জন্যও তা টে পেয়েছিলে? এই পরাভবের কথাটা এ পর্য্যন্ত কাউকে জান দিই নি। তোমাদের ছাপা গল্প যখন এই সভায় পঠিত হ' তখন আমার বুকের শিরাগুলি কি বেদনায় টন্ টন্ করত সে তোম বুঝতে না। তোমাদের সকলের মুখ আশায় উৎফুল্ল আর আম অন্তরের মধ্যে নিরাশার কান্না ফেনিয়ে উঠত। হায় মা, বীণাপাণি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র না হতে পারি, কিন্তু এই সব রাম, শ্য যদুদের মত কি একজন সাধারণ লেখকও হতে পারি না? তোম নিজের নিজের লেখার প্রশংসায় মত্ত থাকতে—আমার অবস্থ বুঝতে না। কেনই বা বুঝবে—ব্যর্থতার ব্যথা যে কি জিনিষ তোমরা বোঝ নি বলেই আজ তুমুল তর্ক তুলেছ। বারংবার অকৃ কার্য্য হয়েও আমি কিন্তু বহুদিন হাল ছাড়ি নি। সম্পাদকগে একজোট হয়ে অটল চিত্তে আমার লেখা ফেরত দিয়েছেন, তথা এক দিনের জন্যও তাঁদের স্তবস্তুতি করতে আলস্য বোধ করি নি শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং বিদেশী দু'এক জন লেখকের দু'চারটে নাম-ধাম বদলে নিজের নামে চালাবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু হা দুরাশা—ধরা পড়তে বিলম্ব হয়নি। এ অপচেষ্টা বেশীদিনও চলেনি শেষটা নিজের ক্ষমতায় কুলোয় ত লিখব—নইলে লিখব না এ প্রতিজ্ঞা করে হয়ে নিজের যৎকিঞ্চিৎ পুঁজিপাটা নিয়ে দিনরাত কল্পিত নায়ক-নায়িকার নামজপ করতাম। কি প্রবল বাসনা আমাকে মত্ত করেছিল জানো—আমার ছাপা গল্প হঠাৎ তোমাদে দেখিয়ে দিয়ে একেবারে চমক লাগিয়ে দেব। আমিও যে তোমাদে মত লিখতে পারি—আমিও যে এক জন লিখিয়ে সেইটে তোমাদে জানিয়ে দেওয়া এবং তোমাদের কাছ থেকে কিছু প্রশংসা লাভ আমার একমাত্র কাম্যবস্তু হয়েছিল। লেখকের উঁচু গদ্দিতে ব তোমরা আমাকে পাঠক বানিয়েছিলে—এই আক্ষেপটাই আমাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দিত। এই জীবনটা পাঠকই থেকে গেলাম—লেখকের সম্মানার্হ পদবীতে কখনো উঠতে পারলাম না। তোমাদে কোন গল্পের এতটুকু খুঁত যদি বের করতাম অমনি 'রসবোধ 'ও আর্টের কি বোঝে' ইত্যাদি উক্তি করে তোমরা আমার প্রতি মারমুখো হয়ে উঠতে। কাজেই তোমাদের গল্পের সমালোচন তোমাদের মুখে শুনে তিক্ত লাগলেও আমাকে চুপ করে থাকে হ'ত—কেন না বিপরীত কিছু বললেই তোমরা তৎক্ষণাৎ আমা নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করতে। এই আমার গল্প লেখা

মর্ম্মান্তিক ইতিহাস। এখন শেষটা শোন—তাতেই প্রকৃত আর্টের আঁচ পাবে।

আজ এক বৎসর হ'ল সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়েছি। আঘাতে আঘাতে যদিও মনটা পাথর হয়ে গেছে তথাপি এমন একটা প্রসন্নতা লাভ করেছি তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। যেদিন গল্পের খাতাখানা ঘৃত-চন্দন লিপ্ত করে বহ্নিদেবতাকে অর্পণ করলাম—ব্যথিত মর্ম্মস্থলটায় সেদিন কে যেন সান্ত্বনায় শীতল হস্ত বুলিয়ে দিলে। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আরাম পেলাম—চির বিনিদ্রকে কে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিলে। সেই থেকে আর লিখি না—মনে মনে যাদের বিদ্বেষ করতাম—তাদের আবার ফিরে পেলাম।

এখন বুঝেছি সাহিত্যক্ষেত্রে হিংসার কোন স্থান নাই। যাদের মধ্যে 'গিফ্‌ট' আছে তারাই লিখতে পারে। ও জিনিষটা আসে হাড়ের ভেতর থেকে। সে যাদের নেই তারা হিংসে করে হাজার মাথা কুটলেও পারবে না। টেলেণ্ট এবং জিনিয়াস দুটো সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ—জিনিয়াস লিখবে টেলেণ্ট বড়জোর সমালোচনা করবে। এইটে আগে বুঝতাম না বলে গল্প লিখতে গিয়ে এত কষ্ট পেয়েছি। এই আমার গল্প লেখার গল্পটি হুবহু টুকে নাও, আদর্শ ছোট গল্পের সন্ধান পাবে। এ গল্প একাধারে হাসি-কান্নার অদ্ভুত মিশ্রণ—বীরবলের ভাষায় যাকে বলে ট্রাজি-কমেডি। যারা আমার মত হতাশার আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে গেছে তাদের চোখ দিয়ে সমবেদনার অশ্রু ঝরবে এবং যাদের তরী তোমাদের মত গল্পসমুদ্রের তুফান কাটিয়ে তীরে ভিড়েছে তারা প্রচুর হাসবে।

রমেশ চুপ করল।

রমেশের গল্পলেখার ব্যর্থতার কাহিনী শুনে সকলেই এমনি অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, কিছুক্ষণ কারও মুখ দিয়ে কথা ফুটল না।

সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল হেমেনের কথায়—সে বললে—"রমেশদা, এতদিন তোমাকে চিনতে পারি নি—ক্ষমা কর—তুমি যে এমন একটি আদর্শ গল্পের মূর্ত্ত প্রতীক তা এক দিনের জন্যও টের পাই নি—"

উদীয়মান সাহিত্যিক নরনারায়ণ বললে—"ভাই রমেশ, তুমি আমার মনের কথাগুলো টেনে বলেছ—আমার প্রথম জীবনের সাহিত্যচর্চ্চার সঙ্গে তোমার গল্প-লেখার গল্প হুবহু মিলে গেছে—এই নিয়ে যে একটা ছোটগল্প দাঁড় করানো যেতে পারে—সেই কথাটিই বরাবর এড়িয়ে গেছি। তার কারণ মানুষ নিজের অক্ষমতার কথা, দুর্ব্বলতার কথা সহজে কারও কাছে প্রকাশ করতে চায় না—সেই জন্যই বরাবর ঐ কথাটা চাপা দিয়ে এসেছি। পোষ্টমাষ্টারকে বলা ছিল—আমার লেখার কোন প্যাকেট ফেরত এলে যেন বাড়ীতে বিলি না হয়—আমি নিজে গিয়ে আপিস থেকে নিয়ে আসতাম—স্ত্রীর কাছে পাছে পৌরুষ-গর্ব্বের লাঘব হয়। আজ তুমি ছাই উড়িয়ে দিয়েছ—আসল কথাটি বেরিয়ে পড়েছে। তোমার গল্প মাসিকে ছাপা নাই বা হ'ল—তুমি আমাদের চেয়ে কোন অংশে ছোট নও। আমরা সবাই এক—ছোটগল্পের আদর্শ কাকে বলে আজ তুমিই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছ।"

ভূপতি বললে—"ছোটগল্পের আদর্শ সম্বন্ধে রমেশ যে সুদীর্ঘ বাণী দান করেছে তাতে কিন্তু আমার খটকা আছে—আপিসের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর রমেশ এত সময় পেত কোথায়? এ পর্য্যন্ত ওকে একখানা মাসিকের পাতা ওল্টাতে দেখলাম না—তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে রমেশচন্দ্রের এ কাহিনী আগাগোড়া কাল্পনিক—বিলকুল মিথ্যা—তোমরা বীরবলের নীললোহিতকে জানতে—আমাদের রমেশচন্দ্র হচ্ছেন নীললোহিতের অভিনব সংস্করণ—"

প্রতিবাদ করে রমেশ বললে, "তোমাদের কোন্ গল্পটি সত্যি সেইটি জানতে চাই—"

সতীশ বললে, "তুমি না ছোটগল্পের আদর্শ বোঝাতে এসেছিলে? বিচারকের আসনে বসেছিলে? তুমি কি জান না—গল্পমাত্রই কল্পনার খেলা—"

রমেশ বললে, "তা হলে ধরে নাও আমার ঐ গল্পলেখার গল্পটি আগাগোড়া বানানো—অর্থাৎ, আমি যা বলেছি তার একবর্ণও সত্য নয়। খুব অল্পের মধ্যে মিথ্যাকে যারা মনোহর ভাবে সাজাতে পারে—যা পড়ে মনে হবে এ সত্যি—জীবনে ঠিক ঠিক এমনি ঘটে—গল্প লেখার ভেল্কি তারাই আয়ত্ত করেছে। ঐ দেখ বাইরে তোড়জোড় চলছে—রাতও বোধ করি বারটাই হবে—অতএব আজকের মত সভাভঙ্গ হোক।"

LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
ভারতে প্রস্তুত

উপনদী—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

উপনদী শীর্ণ জলধারায় নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিলেও—এক কালে ইহার বুকে জোয়ার-ভাটার প্রবাহ থাকে; বন্যায় গ্রাম ভাসানো ও ভাঙ্গনের ক্ষুধায় বাড়ীঘর কুক্ষিগত করাও ইহার ধর্ম্ম। এই নদীধর্ম্মী একটি নারী-চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। পটভূমিকায় আছে একটি অনুন্নত গ্রাম।

লেখক সুকবি এবং পল্লী-জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তিনি গ্রামোন্নয়নের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া উপন্যাসের মূল সুরটি বাঁধিয়াছেন এবং গ্রাম্য মানুষের দোষত্রুটি অশিক্ষা দুর্ব্বলতা প্রভৃতির উপর সস্নেহ আলোক-পাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সেবার স্নিগ্ধ পরিমণ্ডলে নায়ক-চরিত্রটি দরদ দিয়া আঁকা। নায়িকা সুলেখার জীবন উপনদীর সঙ্গে তুলনীয়। অশোকের সংস্পর্শে সেই জীবন-নদীতে জোয়ার আসিয়াছে এবং সব ভাসাইয়া লইবার উন্মাদনাও জাগিয়াছে। দৈনন্দিন ঘটনার সংস্থানে মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দুটি জীবনকে বৃত্তাভিমুখী করিয়াছেন লেখক এবং শেষ অধ্যায়ে, যে রুদ্ধস্রোত উপনদী সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে—তাহার সঙ্গে সুলেখার চরিত্রের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া বেদনা-বিধুর ছবিটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এই সঙ্কেতময়তার মধ্যেই লেখকের কবি-মনের পরিচয়।

তথাপি সূক্ষ্ম রসগ্রাহী পাঠক কিঞ্চিৎ অনুযোগ করিতে পারেন উপন্যাসের শেষাংশে বহু ঘটনা ও হৃদয়দ্বন্দ্বের লীলা—যাহা বিস্তৃত হইলে চরিত্রগুলি আরও পরিস্ফুট এবং কার্য্যকারণ সম্পর্কিত বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। হয়ত বা এই কারণেই ঘটনা ও সংলাপে কিছু নাটকীয় ভঙ্গী লক্ষ্যগোচর হয়। তথাপি গল্পটি বেশ জমিয়াছে।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ-পারিপাট্য লক্ষণীয়।

বহ্নি—শ্রীনগেন নিয়োগী। স্বাক্ষর প্রকাশনী। ১৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য আড়াই টাকা।

উপন্যাস। নায়ক শক্তিকুমার আদর্শবাদী যুবক, জননায়কও। জনকল্যাণের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াই তাহার আনন্দ। ধনী কন্যা ডলির সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে ভালবাসায় রূপান্তরিত। আরও বহু চরিত্রের সমাবেশ আছে বইয়ে। ধনসাম্যবাদের চিত্রটি ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন লেখক। কয়েকটি চরিত্রে বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয়ও আছে। কিন্তু গল্পের বিন্যাসটি শিথিল এবং ভাষা দুর্ব্বল। গল্প জমাইবার বহু উপকরণ থাকা সত্ত্বেও গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয় নাই এই কারণেই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
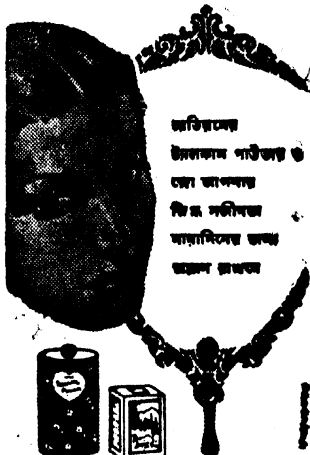
সাঁঝের প্রদীপ—শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ। প্রকা[শক] —শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "মনোরম", কুণ্ডা, দেওঘর। মূল্য দেড় টাকা।

আজকাল যে বই যত বেশী আনন্দ দান করে, যত চিত্তাকর্ষক হয়, তাহার প্রশংসা হয়। কিন্তু কেবল চিত্তাকর্ষকতা থাকিলেই ভাল বই উচিত নয়। সাধারণতঃ আমাদের বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল, এজন্য পুস্তক পড়িয়া আমাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় তাহাই আমাদের চি[ত্তা]কর্ষক হয়। সব সময় বৈধ শুদ্ধভোগ যে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ ক[রে] নয়, অবৈধ ভোগের চিত্রেও আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সাহি[ত্যে] বৈধ ও অবৈধ ভোগ উভয়ই থাকে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তিনি, যি[নি] এরূপ ভাবে অবৈধ ভোগের চিত্র আঁকিবেন যে তাহার প্রতি ক্রোধ ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং এ ভাবে বৈধ ভোগের চিত্র আঁকিবেন যে তাহ[ার] প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। গীতায় ভগবান বলিয়াছে[ন] "ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'—অর্থাৎ, স্বয়ং ভগবানই ধ[র্ম্ম] অবিরুদ্ধ কামরূপে অবস্থান করেন। বৈধ এবং অবৈধ ভোগের চিত্র ম[হর্ষি] বাল্মীকি যেরূপ উৎকৃষ্ট ভাবে আঁকিয়াছেন আর কেহ সে ভাবে আঁকি[তে] পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। একদিকে সীতা-রামের পবিত্র চরিত্র অ[পর] দিকে রাবণ ও সূর্পনখার অপবিত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা। পড়িলেই সীতা রামের প্রতি ভক্তি এবং সহানুভূতিতে হৃদয় বিগলিত হয়, অপর দি[কে] রাবণের অবৈধ ভোগাকাঙ্ক্ষায় ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। হোমা[রের] ইলিয়ডে পেরিস ও হেলেনের অবৈধ প্রণয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয় না, তাহাদের প্রতি কবির সহানুভূতির ভাব দেখা যায়। আধুনিক বা[ংলা] সাহিত্যে অবৈধ প্রেমের চিত্তাকর্ষক চিত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে হ[ইলে] অনেক বিখ্যাত লেখক এবং বিখ্যাত রচনার নাম করিতে হয়। পরাধীন[তার] ফলে ভারতীয় চিন্তার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার যে প্রভাব পড়িয়াছে ই[হা] তাহার এক নিদর্শন।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সাঁঝের প্রদীপ এই পাশ্চা[ত্য] প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত। গল্পগুলির মধ্যে ভালমন্দ দুই প্রক[ার] চরিত্রই আছে এবং স্বভাবতঃ সৎ চরিত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগ্রত এবং অসৎ চরিত্রের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। কালীচরণবাবুর সুদক্ষ লেখ[নী] স্পর্শে সব চিত্রগুলিই বেশ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পগুলি[তে] সকলপ্রকার রসের সমাবেশ আছে, তন্মধ্যে করুণ, মধুর ও হাস্যরস অ[তি] সমুজ্জ্বল। অনাবিল হাস্যরসের সহিত সুনিপুণ ঘটনাবিন্যাসের সমন্বয়ে "শিকা[রী] শঙ্কর" বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। করুণ ও মধুর রসের সমাবে[শে] "অনাথিনী"কে প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্প বলা যায়। বসন্তকুমারীর ই[হ] জীবনের সর্ব্বনাশ হইতে যে একটি সর্ব্বজনহিতকর দেবীমূর্ত্তির আবি[র্ভাব] হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই পাঠকের চিত্তে পবিত্র ভাব জাগ্রত করিবে। [ধর্ম্ম] ও সদাচারের প্রতি শ্রদ্ধা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়া গ্রন্থের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যা[য়]

কলরোল—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য। সোয়ান বুক্‌স, ১।১।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ সিকা।

'স্বপ্ন-বিলাসের' নয়, অংশতঃ 'বুদ্ধিবিলাসের' কাব্য। প্রথম কবি[তা] 'যুগ-বন্দনা'। কবির উক্তি :

> "দেহ আমার ক্ষুধায় কাতর, মন আমার মৃত।
> আমি নই তোমাদের সে কালের কবি।"

কিন্তু কবি-মন যে চিরদিন স্বপ্ন-বিধুর ভাষাতেই কথা বলে। তাই তাঁ[র] কণ্ঠে কখনও শুনি :

সুচিত্রা সেন পছন্দ করেন লাক্স
টয়লেট সাবান
এর
শুভ্রতা ও বিশুদ্ধতার
জন্য।
সুচিত্রা সেনের সৌন্দর্য্যের উৎস
"আপনার ত্বককে মসৃণ
ও সুন্দর রাখতে হলে
ভালভাবে রগড়ে
নিন ...
"পরিষ্কার করে ধুয়ে
নিয়ে শুকিয়ে গেলে
-- ঝরঝরে তাজা
অনুভূতি আপ
নার আসবে।
"লাক্স টয়লেট সাবানের
নবনীসুলভ ফেনা
ও সৌরভ
মোহময়
"আপাদমস্তক সৌন্দর্য্যের
জন্য বড় সাইজ
ব্যবহার করুন যা
আমি করি।"
LUX
TOILET SOAP
বিমল রায়ের "দেবদাস"
এর মনোমোহি অভিনেত্রী

"শিপ্রা নদীর কলোচ্ছ্বাসে
আজ যেন সমুদ্রের ঝড়।"

আবার কখনও শুনি:

"নিরালা মাটির কোণে
নবাঙ্কুর স্বপ্ন বোনে
ভবিষ্যৎ জীবন-তৃষার।"

রূঢ় পরিবেশের মধ্য দিয়েও কবি-চিত্ত নিজেকে সুন্দররূপে প্রকাশ করা চেয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা[illegible]

সংক্ষিপ্ত বয়ন ও রঞ্জন-প্রণালী—শ্রীনিজদাস প্রামাণি[illegible] ইষ্টার্ণ ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সী, ১০৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

লেখক শান্তিপুর বয়ন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক। দীর্ঘ এ[illegible] বৎসর কাল বয়নশিল্প শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিয়া ছাত্রদের হাতেকলমে ক[illegible] শিখিবার পক্ষে যে সকল অসুবিধা তাঁহার নজরে পড়িয়াছে তৎসমুদ[illegible] প্রতিকার-মানসে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বর্তমান পুস্ত[illegible] খানিতে বিভিন্ন অধ্যায়ে তুলা সম্বন্ধীয় বিবরণ—তাঁত জোড়া, তাঁতের ক[illegible] ও বিবরণ, ডিজাইন, হিসাব, কাপড় বিশ্লেষণ, রং, কাপড় ছাপানো ইত্য[illegible] বয়ন ও রঞ্জন শিল্প সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া এবং প্রত্যেকটি বিষয় চিত্রসহযোগে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কারিগ[illegible] বিদ্যাসংক্রান্ত দুরূহ বিষয়কে লেখক এমন সহজ সরল সর্বজনবোধ্য ভা[illegible] বর্ণনা করিয়াছেন যে, সামান্য লেখাপড়া জানা শিক্ষার্থীও ইহা পাঠ কর্[illegible] অনায়াসে কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

পুস্তকখানি বয়নশিল্পের কারিগর এবং বয়নশিল্প-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সক[illegible] পক্ষেই সমভাবে উপযোগী বলিয়া গণ্য হইবে। যাঁহারা বয়নশিল্পের কারখ[illegible] খুলিতে চান তাঁহারাও এই পুস্তক হইতে যথোচিত নির্দেশ লাভ করি[illegible] সক্ষম হইবেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভ[illegible]

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমমাধুরী—শ্রীমদনমোহন ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন। [illegible] রামপুর, পোঃ জোড়দা (জেলা বাঁকুড়া) ভক্তিযোগাশ্রম হইতে গ্রন্থক[illegible] কর্তৃক প্রকাশিত। ১৬+৩৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে চৌদ্দটি 'রহস্যে' ভগবা[illegible] করুণা, গুরুকৃপা, আত্মানুসন্ধান, সৃষ্টিরহস্য, ভবযন্ত্রণা কেন? ভালবা[illegible] জাতি, ব্রহ্মই ভগবান, নবধাভক্তি, ভক্তিসাধনে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া, প্রতি[illegible] পূজা, শ্রীগৌরাঙ্গের অসাম্প্রদায়িক ধর্মনীতি, ছয় গোস্বামীচরিত, গৃহ[illegible] কর্তব্যবিষয়ে গৌরাঙ্গ-উপদেশ, সনাতন ধর্মে হিন্দুর স্থান ও যুবকদের ক[illegible] ইত্যাদি বহু বিষয় শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এবং যুক্তি সহায়ে আলোচিত হইয়াছে। দ্বি[illegible] খণ্ডে ষোলটি 'সোপানে' চরিত্রগঠন, সদাচার, স্বাস্থ্য, ভাগবতধর্ম, শ্রীরা[illegible] কৃষ্ণমাধুর্য্য, সাধকের ক্রমোন্নতি গৌরলীলামাধুর্য্য, নামসঙ্কীর্তন, ব্রজের গু[illegible] মূর্তিতে ব্রহ্মগায়ত্রীর রূপানুভূতি, ব্রজরসাস্বাদন ইত্যাদি বিষয়ে গ[illegible] আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে পাঁচটি 'প্রকাশে' গোপীপ্রেমের বিলাসবৈচিত্র্য, রসের [illegible] বিবেধ, ব্রজের প্রেমধর্ম, রাধার অষ্টাবস্থা, উদ্ধবসংবাদ, গম্ভীরা লীলার প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। ভক্তিপন্থাবলম্বী সাধক জানিবার বুঝিবার অনেক নিগূঢ় বিষয় গ্রন্থে পরিবেশিত হইয়াছে।

কদর্য্য-মুদ্রণ এবং বর্ণাশুদ্ধি-বাহুল্যে গ্রন্থের গৌরব কিছু ম্লান হইয়া মূল্যও অধিকতর সুলভ হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রব[illegible]

বাড়ী যেতে রমেশের ভয় হ'ল...
কাপড় আমার ময়লা করে ফেলেছি রাম। এখন মায়ের কাছ থেকে বকুনি খেতে হবে।
আমার কাপড়ও তো প্রায়ই ময়লা হয়ে যায় ভাই, কিন্তু মা আমাকে কখনও বকেননা। আয় আমার সঙ্গে।
রামের বাড়ীতে :
ও কাঁদছে কেন ?
কাপড় ময়লা হয়ে গেছে বলে ও বাড়ী ফিরতে ভয় পাচ্ছে।
রমেশের বাড়ী :
আবার নোংরা হয়ে বাড়ী ফিরেছো! আর কোনদিন তোমায় বাড়ীর বাইরে খেলতে যেতে দেবোনা!
আহা বাছাকে বোকোনা- খেলতে গেলে সব ছেলেই অমন কাপড় ময়লা করে ফেলে।
ওর কাপড় আছড়ে কাচতে রোজই আমার গলদ্‌ঘর্ম হয়-আর সেইজন্যেই তো ওর কাপড় অতো তাড়াতাড়ি ছেঁড়ে!
সে তো বটেই, আছড়ে কাচলে কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে যাবেই তো, তারজন্যেই অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে!
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে
কিন্তু সান্‌লাইট সাবানে কাচলে আছড়াবার দরকার করেনা। এর প্রচুর ফেণায় অতি সহজেই সমস্ত ময়লা বার করে দেয়, আর সেইজন্যে আপনার জামাকাপড় টেঁকেও বেশীদিন।
এ কথা সত্যি! দ্রুত ফেণপ্রসূ সানলাইট সাবান না আছড়ে কাপড়চোপড়কে সত্যিই সাদা ও ঝকঝকে করে তোলে। তার মানে- কাপড়চোপড় টেঁকেও বেশীদিন আর আমার পয়সাও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
সান্‌লাইট সাবান কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
ভারতে প্রস্তুত

দেশ-বিদেশের কথা

প্রাচ্যবাণী মন্দির

বিগত ৪ঠা মার্চ ডক্টর শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে প্রাচ্যবাণীমন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, প্রাচ্যবাণীর বার্ষিক সাহায্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বঙ্গের বাহিরে প্রাচ্যবাণীর শাখা-সমূহের প্রচারকার্য্যে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। গ্রন্থ-প্রকাশ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই বৎসর প্রাচ্যবাণী হইতে দশখানা এবং এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ১২২ খানা গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশি হইয়াছে। এই বৎসর প্রাচ্যবাণীর সদস্য ও সদস্যাগণ কর্তৃক ভাসে সংস্কৃত নাটক "প্রতিমা" সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হয়।

জয়পুরে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত স্মারক-স্তম্ভ

দেশের সেবায় রাজস্থানের যে সকল সৈনিক বিগত ছয় শত বৎসর যাবৎ নিজেদের জীবন দান করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের স্মৃতিরক্ষাকল্পে নির্ম্মিত স্মারক-স্তম্ভের আবরণ-উন্মোচন অনুষ্ঠান গত ৩১শে মার্চ্চ জয়পুরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। যথোচিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং দুই মিনিটকাল নীরবতার পর, প্রথমে রাজপ্রমুখ প্রধানমন্ত্রীর এবং তাঁহার নিজের তরফ হইতে স্মারক-স্তম্ভের উপর পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অতঃপর রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. এল. সুখাদিয়া, আর্ম্মি ষ্টাফের প্রাক্তন জেনারাল প্রধান রাজেন্দ্র সিংজী, ওয়েষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের জি-ও-সি, আই-এন-সি লেঃ-জেনারাল কলাবন্ত সিং, জেনারাল ষ্টাফের প্রধান মেজর-জেনারাল ওয়াডালিয়া, মেজর জেনারাল ইউ. সি. দুবে, ব্রিগেডিয়ার শর্ম্মা, ব্রিগেডিয়ার বা সিং এবং লেঃ কর্ণেল ডোঙ্কাল সিং প্রমুখ সৈন্যবাহিনীর বিশি অফিসারগণ কর্তৃক পুষ্পমাল্য প্রদত্ত হয়।

রাজস্থানের প্রাক্তন রাজকুমারদের অর্থানুকুল্যে এই স্মারক-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই : "বর্ত্তমান 'ষ্টেট ফোর্সে স'-কে এক অর্থে বলা যায় পুরনো রাজপুত সৈন্যবাহিনীর ধারাবাহী। ইতিহাস ও উপকথা উভয়ই তাহাদের অনন্যসাধারণ সাহস এবং মহান কৃত্যসমূহের এমন সব অগণিত কাহিনীতে পরিপূর্ণ যাহা আমাদের জাতীয় রিক্থের অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।"

প্রয়াগে বাঙালী কবি-সম্মেলন

গত ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় এলাহাবাদের 'বিচিত্রা' সংস্কৃতি-সঙ্ঘের উদ্যোগে, বিচিত্রা কার্য্যালয়ে প্রবাসী বাঙালী কবিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু সুধী উপস্থিত ছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী সাহিত্যের অধ্যাপক ও খ্যাতনামা কবি ড. শ্রীঅরুণকুমার মিত্র এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

সঙ্ঘের কর্ম্মসচিব শ্রীঅমরেন্দ্র দে'র স্বাগত সম্ভাষণের পর একে একে পনের জন কবি তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া সকলের আনন্দবিধান করেন। সভাপতি ড. মিত্র তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে পঠিত কবিতাগুলির প্রশংসা করিয়া বলেন যে, এই ধরনের অনুষ্ঠান কবিদের শক্তিবিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র-রচনার পক্ষে সহায়ক হয়।

সমবেত কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের 'আ মরি বাংলা ভাষা' গীত হইবার পর সভার কাজ শেষ হয়।

বিশ্বভারতীতে সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত দুই বৎসর যাবৎ বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনে এক একজন ভারত-প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞকে সাময়িকভাবে সম্মানিত অধ্যাপকরূপে (Visiting Professor) আনা হইতেছে। গতবার সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন সাহেব আসিয়াছিলেন। এবার সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর-সরস্বতী মহাশয় আসিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স এখন সাতাত্তর। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই বয়সেও সুললিত সুদীর্ঘ তানরাজি অনায়াসে অবলীলাক্রমে তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতেছে। ইহা বিশ্বভারতীর সকলকে মুগ্ধ করিতেছে।

ছাত্র, ছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা তাঁহার নিকট ধ্রুপদ খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা শিখিবার জন্য নিয়মিতভাবে তাঁহার বাসায় যাইতেছেন। তাঁহার কণ্ঠের ঠুংরি, টপ্পা, তরুণ ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। ধ্রুপদ খেয়ালের ত কথাই নাই, ঠুংরি টপ্পারও ভাণ্ডার তাঁহার অফুরন্ত। সোরী মিঞার টপ্পা এবং তাহা ভাঙিয়া রচিত নিধুবাবু প্রভৃতির বহু বাংলা টপ্পা গান সকলে তাঁহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বহু পুরনো গান—যাহা মার্গ-সঙ্গীত ভাঙিয়া রচিত, তাঁহার নিকট হইতে সকলে শিখিতেছেন। ইহার মধ্যে ঠুংরি, টপ্পাও অনেক আছে। কোন হিন্দী গান বা পঞ্জাবী টপ্পার সুর হইতে তাহা রচিত হইয়াছে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা দেখাইয়া দিতেছেন।

শিখাইবার উৎসাহ এখনও তাঁহার যুবকের ন্যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শিখাইয়াও তাঁহার ক্লান্তি নাই। নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষার্থীকেও তিনি শিখাইতে প্রস্তুত। সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ এই বয়সে যাহাতে তাঁহার অতিরিক্ত পরিশ্রম না হয় সেজন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং সময় সীমাবদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি অন্তরে ক্ষুণ্ণ হইতেছেন।

নিজ বাসস্থানে নিয়মিত শিক্ষাদান করিয়াও সঙ্গীতভবনে সপ্তাহে এক দিন তিনি ধ্রুপদাদি শিক্ষা দিতেছেন; এবং সপ্তাহে দুই দিন বক্তৃতাচ্ছলে তাঁহার সঙ্গীত-সাধনার সরস বিচিত্র চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছেন।

গোপাল স্মৃতি সম্মেলন

গত ৩রা ও ৪ঠা চৈত্র ৪৩।২, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সান্যালের গৃহে গোপাল স্মৃতি সম্মেলন উপলক্ষে দুই দিবস-

গোপাল স্মৃতি সম্মেলন সঙ্গীতানুষ্ঠান

ব্যাপী সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন-দিবসে ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ পৌরোহিত্য করেন। স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিকে মাল্যভূষিত করিয়া ডক্টর নাগ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, 'আজ গোপাল স্মৃতি সম্মেলনে যোগদান করে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সান্যালের গৃহে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ সঙ্গীতের চর্চা চলে আসছে এবং এই উপলক্ষে বহু সঙ্গীত-সাধকের সমাগমে এই গৃহ পবিত্র হয়ে আছে। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সঙ্গীত-সাধক ছিলেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরই প্রিয় শিষ্য শ্রীমান জয়কৃষ্ণ সান্যাল। সঙ্গীতের উত্তর-সাধকরূপে তিনি সেই সুরধারারই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন।'

ডক্টর নাগ আরও বলেন, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় এই ধ্রুপদ গানের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে সমাহিতচিত্ত হন। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ডক্টর নাগ বলেন, এই ধ্রুপদ সঙ্গীতই উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী জীবন-ধারাকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করে—তাঁর মহিমান্বিত রূপ-সুন্দর প্রতিভাকে সঙ্গীতমুখর করিয়াছিল।

পরিশেষে সম্মেলনের উদ্যোক্তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া ডক্টর নাগ তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করেন।

শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল তাঁর গুরুদেব গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী পাঠ করিলে পর সঙ্গীতানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ধ্রুপদ ও ধামারে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ সান্যাল, সুবোধরঞ্জন দে এবং খেয়ালে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী কমলা দাস, শ্রীঅনাথনাথ বসু, কালিদাস দে, কুমারী কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহাদের গানের সঙ্গে মৃদঙ্গে সঙ্গত করেন শ্রীরাজীবলোচন দে, জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস এবং তবলায় সঙ্গত করেন শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহানন্দ চক্রবর্ত্তী। সেতার বাজান শ্রীমতী মায়া মিত্র।

দ্বিতীয় দিনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, প্রভাস দে ও শিশির গুহের ধ্রুপদ এবং ধামার গীত হয়। এই দিনের খেয়াল গানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনিমাই সান্যাল ও শ্রীনলিনী চন্দ্র মালাকার। মৃদঙ্গে সঙ্গত করেন বিঠল দাস গুজরাটী ও পতিতপাবন আচার্য্য এবং তবলায় সঙ্গত করেন শ্রীসুবোধ নন্দী। তবলা লহরা বাজাইয়া শোনান শ্রীমান সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার তবলা লহরায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীযুগলকিশোর দত্ত একটি পদকদানের প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বহু সঙ্গীতানুরাগী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

মন্দির-দ্বারে
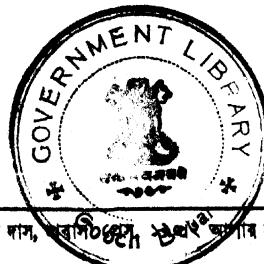
শ্রীমনোজকুমার সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
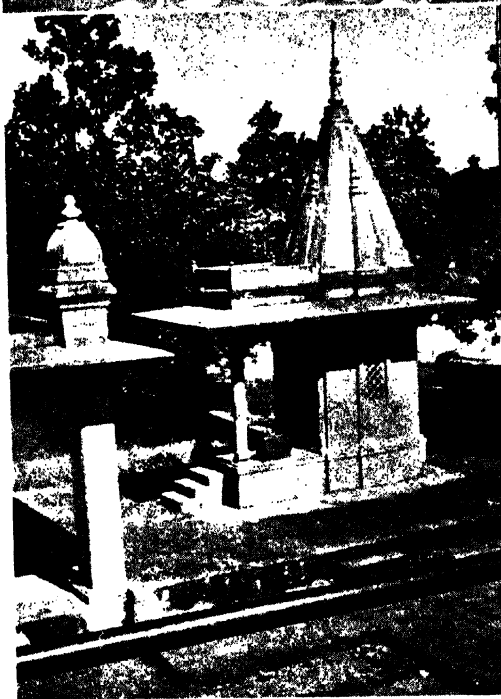
উপরে (বাম দিক হইতে) : বুদ্ধমূর্ত্তি (নূতন), বুদ্ধমূর্ত্তি (পুরাতন)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ
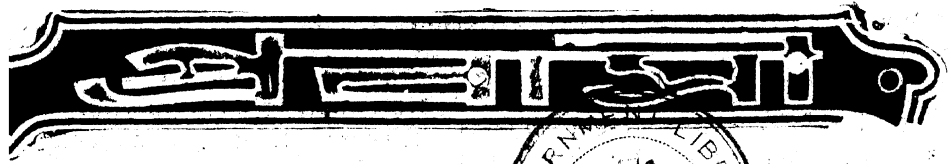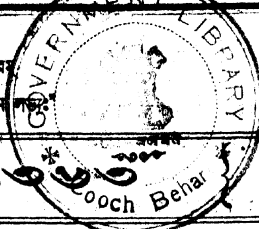
৫৬শ ভাগ ১ম খণ্ড } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ } ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সংযুক্তির ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত রীতিমত সনে পরিণত হইল। শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়ের সিদ্ধান্ত ও হার কারণ আমরা সম্পাদকীয়ের মধ্যে অন্যত্র দিয়াছি। সে য়ে বিশেষ মতামত প্রকাশ নিরর্থক, কেননা এখন তাহাতে নও ফল হইবে না। শুধু এই মাত্র বলা চলে যে, যদি ডাক্তার তাঁহার স্তাবক ও সমর্থকবৃন্দের উপর নির্ভর না করিয়া দেশের ক্ষণ লোকদিগের পরামর্শ পূর্ব্বাহ্ণে লইতেন তবে ঐরূপ প্রস্তাবের ন শোচনীয় পরিণতি হইত না। ঐ প্রস্তাবের মধ্যে অনেক-ছু ছিল যাহা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ উন্নতির বিশেষ য়ক হইত এবং বর্ত্তমানেরও বহু ক্ষতিকর বাধা উহাতে অপ-রিত হইতে পারিত। শঙ্কার কারণ যাহা ছিল তাহার বিষয় মরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সেগুলি দূর করাও অসম্ভব ছিল , বিশেষতঃ যদি ঐ প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই সে বিষয়ে বস্থা করিবার প্রয়াস কর্ত্তৃপক্ষ করিতেন।

সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে নেতিবাদেরই জয় হইল। স্বর্গত শবন্ধু দাশের আমল হইতেই এই নেতিবাদের ধারা চলিয়া সিতেছে। নূতন কাজে উৎসাহের বদলে যাহা গঠিত বা যাহা রিকল্পিত তাহাকে ধ্বংস অথবা ব্যর্থ করিতেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা যুক্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে দেশের সর্ব্বনাশ হইতে লিয়াছে।

যে জাতির গঠনের চেষ্টা নাই কেবলমাত্র আছে অন্যের চেষ্টা র্থ করিবার উদ্যম, সে জাতি যে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে রে না, একথা কি বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন? অথচ আমাদের অবস্থা তাহাতে প্রগতি ভিন্ন আমাদের অস্তিত্বের পথ নাই। ননা আমরা সকল ক্ষেত্রেই এতটা পিছাইয়া পড়িতেছি যে, যদি মাদের উন্নতি দ্রুত না হয় তবে সমস্ত বাঙালী জাতি অনুন্নত ণীতে পরিণত হইবে।

ডাক্তার বিধান রায় নতিস্বীকার করিলেন বলিয়া একদল াক উল্লসিত হইয়াছেন। শ্রীবিধানচন্দ্র রায় ও তাঁহার মণ্ডলী যে বে চলিতেছেন তাহাতে দেশের লোকের মনে একটা আক্রোশ জন্মানো স্বাভাবিক। কিন্তু এই ব্যর্থতায় সেই আক্রোশের জ্বালা কি নিভিবে।

আমাদের দেশে দুঃখকষ্টের অন্ত নাই, তাহার উপর বাস্তুহারার বোঝা বুকের উপর জগদ্দল পাষাণের ন্যায় চাপিয়া বসিয়া আছে। দুঃখদহনের নিবৃত্তির পথ কি খোঁজার সময় হয় নাই? দেশে ত অনাচার, দুর্নীতি ও অত্যাচারের চূড়ান্ত চলিতেছে, পথেঘাটে সকল দিকেই বে-বন্দোবস্ত ও হয়রানি। এর শান্তি কি অত্যাবশ্যক হয় নাই?

তবে এইরূপে নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ আর কতদিন চলিবে?

এই বাংলা ও বিহারের ব্যাপারে যে কেহই কোনদিকেও সক্রিয় অংশ লইয়াছেন তিনিই দেশের ও দশের, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, ক্ষতি করিয়াছেন। কথাটা একটু জটিল শোনায়, কিন্তু স্থির ভাবে চিন্তা করিলে ইহার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

যাঁহারা এই প্রস্তাব আনিয়াছিলেন এবং বিনা বিবেচনায় উহা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাঁহারাই যত বিশৃঙ্খলা ও অকাজের খোরাক যোগাইয়াছেন। আবার যাঁহারা তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন তাঁহারা যেভাবে যুক্তি-তর্কের প্রতি উপেক্ষা করিয়া শুধুমাত্র উদ্দাম প্রতিরোধে দেশকে নাচাইয়াছেন, তাঁহারা দেশের লোকের—বিশেষে যুবজনের—মস্তিষ্কবিকার আরও শঙ্কাজনক অবস্থায় আনিয়াছেন। নেতিবাদের পথে জয় মানেই ধ্বংসের পথের অভিযান, যাহাকে ইংরেজীতে বলে Pyrrhic Victory। ইহাতে বিজিত ও বিজেতা দুইয়েরই লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক।

আজ যদি, অন্য প্রদেশের (অর্থাৎ বাংলা ও বিহার ছাড়া) কাগজপত্রে এই ব্যাপারের সমালোচনা পড়া যায় তবে বুঝা যাইবে—আমাদের মান-মর্য্যাদা আজ কোথায় নামিয়া গিয়াছে। আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার উপর সারা ভারতের শ্রদ্ধা ছিল—'হিংসা'ও ছিল। আজ আমরা বিদ্রূপের পাত্র, অবহেলার ও হেয়জ্ঞানের বস্তু।

কংগ্রেস ত নামিয়া চলিয়াছে অবনতির পথে। সারা ভারতেই এই অবনতি চলিতেছে। কিন্তু বাংলার কংগ্রেসের অধঃপতন যতটা হইয়াছে অতটা বোধ হয় বিহার বা আসামেরও হয় নাই। কেন-না সেখানে কংগ্রেস এখানকার মত অতটা উচ্চেও কোনদিন উঠে নাই। অথচ কংগ্রেসের উদ্ধার ভিন্ন প্রতিকারের পথই নাই।

শিল্প-পল্লী

কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন ; ইহাদের মধ্যে শিল্প-পল্লী প্রতিষ্ঠা নূতন কল্পনার পরিচায়ক। আগামী বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে পাঁচটি শিল্প-পল্লী প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভবিষ্যতে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই শিল্প-পল্লীগুলি প্রথমতঃ নিম্নলিখিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যথা : দিল্লীনগরীর অন্তর্গত ওখলা গ্রামে, সৌরাষ্ট্রের রাজকোটে, মাদ্রাজের গিণ্ডি ও বিরুদ্ধনগরে এবং ত্রিবাঙ্কুরের কুইলন শহরে। অদূর-ভবিষ্যতে কানপুর ও আগ্রাতে এই প্রকার শিল্প-পল্লী স্থাপিত হইবে।

শিল্প-পল্লীতে ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি জমি ক্রয় করিতে পারে কিংবা ভাড়া লইতে পারে। রাষ্ট্র জমি ভাড়া দেওয়া অপেক্ষা বিক্রয় করার পক্ষপাতী বেশী এবং সেই কারণে জমি কিস্তিবন্দীতে বিক্রয় করিতেও আপত্তি নাই। রাস্তা ও নর্দ্দমা নির্ম্মাণ, জল-সরবরাহ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি সরবরাহের জন্য সরকার কিছু কিছু কর স্থাপন করিবেন। যে সকল ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রকার কর দিতে অপারগ হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পাঁচ বৎসরের জন্য সাহায্য হিসাবে এই সব খরচের অর্দ্ধেক দিবে।

শিল্প-পল্লী প্রতিষ্ঠা প্রদেশগুলির দায়িত্ব ; তবে প্রদেশগুলিকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য এই বাবদে খরচ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে প্রদেশগুলিকে দিতে সরকার রাজী আছেন। প্রাদেশিক সরকার নিজেরাই অথবা সহকারী কর্পোরেশন দ্বারা শিল্প-পল্লীগুলির শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারেন। জমি উন্নয়ন, কারখানা প্রতিষ্ঠা, রেলপথ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করিবেন।

শিল্প-পল্লী প্রতিষ্ঠা মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠী-পল্লীর (guild) কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থানীয়করণে সুবিধা হইবে এবং ইহার ফলে বেচাকেনার সুবিধা হইবে ও পল্লীর শ্রমিকরা তাহাদের ব্যবসায়ে দক্ষতা অর্জ্জন করিবে। এই সকল কুটীর-শিল্পের বহুপ্রকার অনুপূরক শিল্প শিল্প-পল্লীর আশেপাশে গড়িয়া উঠিবে।

ভূমিক্ষয় নিবারণ

ভারতবর্ষের বহু সমস্যার মধ্যে ভূমিক্ষয় সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান হারে ভূমিক্ষয় চলিতে থাকিলে আগামী এক পুরুষের মধ্যে ভারতের কৃষিজমির প্রায় ২৯ শতাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ, আগামী ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের কৃষিজমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্রগর্ভে কিংবা নদীগর্ভে চলিয়া যাইবে। ভূমিক্ষয় অর্থে দেশের মৌলিক সম্পদ নষ্ট হওয়া এবং নদী পরি-কল্পনাগুলির উপর যে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে তাহারও কোন সার্থকতা থাকিবে না।

ভূমিক্ষয়ের জন্য মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই সমান দায়ী। ব উৎপাটন এবং সেস্থলে কৃষিচারণ মানুষের অপকীর্ত্তি—যাহা ভূমিক্ষ প্রধান কারণ। আর তীব্র বায়ুবেগ এবং প্রচুর বারিপাত নদী স যোগে ভূমিকে ক্ষয় করিয়া দেয়। নদীতীরস্থ জমি শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হ কৃষিজমি, সবুজ চারণভূমি এবং উর্ব্বরভূমির উপরিভাগ প্রথমে ক্ষ প্রাপ্ত হয় এবং পরে সম্পূর্ণরূপে পতিতজমিতে পরিণত হয়। ভার বর্ষে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে ভূমিক্ষয় নিবারণের নিবিড় স আছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ভূমিক্ষয় নিবারণ করিতে না পারি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতবর্ষ স্বাব হইতে পারিবে না। এমনকি, খাদ্যশস্য উৎপাদনের বর্ত্তমান হা বজায় রাখা যাইবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হইয়াছে যে, আগামী প বৎসরে ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে এ জাতীয় উন্নয়ন সমিতির অভিমতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, অ নৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিবে খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য্যে এ তাহাদের সস্তা মূল্যে। কেন্দ্রীয় সরকার ভূমিক্ষয় ব্যাপারে যে পরি মাণ সচেতন ও চিন্তিত, প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাহার সিকি পরি মাণেও চিন্তিত নহেন ; ইহা অবশ্য ভুলিলে চলিবে না যে, কেন্দ্রী পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবে প্রাদেশিক সরকার।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমিক্ষয় নিবারণের জ নির্দ্ধারিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩·২৫ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরি কল্পনায় এই বাবদ খরচ ধরা হইয়াছে ২৬·৮৩ কোটি টাকা। এ বর্দ্ধিত অর্থের পরিমাণ ভূমিক্ষয় সমস্যা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারে সচেতনতার পরিচায়ক। প্রায় প্রতি প্রদেশেই একটি করিয়া বো স্থাপিত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাদেশি বোর্ডগুলি কার্য্য করে। বিভিন্ন স্থানে গবেষণা ও পরিদর্শন-কে খোলা হইয়াছে ; কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বিভাগের অধীনে একটি ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ স্থাপন করা হইয়াছে। এখন প্রয়োজন সর্ব্বভারতী কার্য্যক্রম ; ভূমি সংরক্ষণ-প্রচেষ্টা পরিচালিত হইবে প্রধানতঃ মরুভূমি এলাকায় ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে, কারণ এই দুটি অঞ্চলেই ভূমিক্ষ দ্রুত প্রসরণশীল।

যোধপুরে একটি মরুবনবির্দ্ধন গবেষণাগার খোলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার কার্য্য বৃদ্ধি পাই যাহাতে রাজস্থান মরুভূমিতে বনবৃদ্ধি দ্বারা মরুভূমির অগ্রগতি রো করা যায়। রাজস্থান মরুভূমির পরিমাণ প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল যোধপুর গবেষণাগারে মরুভূমির উপযোগী বিভিন্ন প্রকার গাছে বীজ জন্মান হইতেছে এবং এই সকল বীজ বিনামূল্যে বিত করা হইতেছে। নির্ব্বাচিত পথে এবং রেল লাইনের ধা ধারে গাছের আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করা হইতেছে। দেরাদুন, কো বসাদ (বোম্বাই প্রদেশ), বেলারী ও উতাকামণ্ডে কেন্দ্রীয় ভূমি

রক্ষণ বিভাগ কর্তৃক গবেষণাগার খোলা হইয়াছে। দেশে হাতে এই ব্যাপারে শিক্ষিত লোক পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে ন্দ্রীয় ভূমি-সংরক্ষণ বিভাগ একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে।

যে সকল জমিতে সেচকার্য্য সম্ভবপর নহে সেই সকল জমির ক্ষ জমি-সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের ষজমির ৫০।৬০ শতাংশ এই ধরনের জমি অর্থাৎ এই সকল মতে সেচকার্য্য প্রায় হয় না বলিলেই চলে। বিশুষ্ক এলাকার মতে আর্দ্রতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা তিন রকম ভাবে হইতে পারে (১) কৃষকের জমিতে আর্দ্রতা রক্ষা করিবার জন্য জমির চতু-কে বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন ; নালাগুলি ভরাট করিতে হইবে এবং রি সারি ভাবে চাষ করা প্রয়োজন ; (২) সারা গ্রামে নদী-রবর্ত্তী ভূমিতে আর্দ্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সমবেত প্রচেষ্টা, া—গ্রামের এলাকার মধ্যে নদীতীরবর্ত্তী জমির সংরক্ষণ ও াচারণ-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, এবং (৩) নদী অববাহিকার তীরবর্ত্তী তিপয় গ্রামে এই সকল উপায় সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা সাধন রিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম উপায়টি কৃষকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব াবে পরিগণিত হওয়া উচিত, দ্বিতীয়টি সারা গ্রামের দায়িত্ব এবং তীয়টি কতিপয় গ্রামের সমবেত দায়িত্ব।

এই উপায়গুলিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে যথোচিত আইন য়ন আবশ্যক যাহার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পারস্পারিক দায়িত্ব নিরূপিত । জমি-সংরক্ষণ উপায়গুলিকে কার্য্যকরীভাবে অনুসরণ করানোর প্রাদেশিক সরকারকে যথোচিত ক্ষমতা দিতে হইবে। জন-ারণের সহযোগিতা লাভের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রধানতঃ নির্ভর করিতে-র জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থাগুলির উপর ; কিন্তু এই সংস্থাগুলির চ মোটেই আশাপ্রদ নয়। নদী-পরিকল্পনাগুলির উপকারিতা ন আছে, তাহাদের অপকারিতাও যথেষ্ট আছে। নদী-পরিকল্পনার বড় বড় জলাধার তৈয়ার করিতে হয় এবং সেইজন্য কিছু পরিমাণ ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ; নদী-পরিকল্পনা একটি মঙ্গল সাধন করিতে । আর একটি অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনে—সেচকার্য্যের সুবিধা তে গিয়া বন ধ্বংস করে এবং তাহার ফলে ভূমিক্ষয়ের কারণ া উঠে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নসীভ্যালীর অধিনায়ক যখন আসেন তখন তিনি নদী-পরি-নার অপকারিতা সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন এবং বলেন ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বন ধ্বংস ও জমিক্ষয়। ডাঃ এলমহার্ষ্ট নি বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের কৃষি-উপদেষ্টা হিসাবে বহুদিন ন) বলেন যে, নদী-পরিকল্পনা বন্যানিরোধের প্রকৃষ্ট উপায় নহে, ণ এই বিরাট বিরাট জলাধারগুলি ১০০।১৫০ বৎসরের মধ্যে মাটি পড়িয়া বোঝাই হইয়া যাইতে বাধ্য, তখন এইগুলিকে ত্যাগ করিতেই হইবে, তাহা না হইলে ভীষণ বন্যা অবশ্যম্ভাবী। না জলাধারগুলি পরিত্যাগ করিয়া নূতন জলাধার নির্ম্মাণ করা আবার কিছু পরিমাণে বন ধ্বংস করা। নদীর গতিকে হত রাখিয়া বন্যানিরোধের প্রধান উপায় বন সৃষ্টি করা। য দেশে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ২৫ হইতে ৩০ শতাংশ, ভারতবর্ষে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ১৮ শতাংশ মাত্র। সুতরাং নদী-পরিকল্পনার চেয়ে আজ ভারতবর্ষের পক্ষে বেশী প্রয়োজন বন-বিস্তৃতি।

রাষ্ট্রীয় শিল্পের পরিচালনা

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-নীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক গলব্রেথকে কেন্দ্রীয় সরকার আহ্বান করিয়াছিলেন ভারতবর্ষে রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্পসংস্থাগুলি সম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার জন্য। অধ্যাপক গলব্রেথের সুচিন্তিত অভিমত অবশ্য প্রণিধানযোগ্য, যদিও সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ থাকিতে পারে। পরিকল্পনার ব্যাপারে রাষ্ট্র যে সকল যৌথমূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং যেগুলি নিজেরাই পরিচালনা করিতেছে, ভবিষ্যতে সেগুলিকে লইয়া অসুবিধায় পড়িবে—টাকার অভাবে নয়, অভিজ্ঞতার অভাবে। এ সম্বন্ধে অবশ্য দ্বিমত কাহারও থাকিতে পারে না যে, রাষ্ট্রীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে গুণী ব্যক্তির অভাব আছে। বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির সাফল্যের উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে, সেই কারণে অধ্যাপক গলব্রেথ রাষ্ট্রীয় শিল্প-সংস্থার চারি প্রকার বিপদের সম্ভাবনার আভাষ দিয়াছেন। এইগুলি যথাক্রমে :

(১) সরকারী শিল্প-সংস্থাগুলির সম্পাদনার মাপকাঠি ব্যক্তিগত সংস্থাগুলির অনেক উপরে। ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পারি-শ্রমিকের বৈষম্য চোখে পড়ে, এবং কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে ভুল হইলে সেই অযোগ্য কর্ম্মচারীকে উচ্চতর পারিশ্রমিকে পদোন্নয়ন দিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কার্য্যে বদলী করিয়া দেওয়া হয়। নিয়োগে দুর্নীতি শুধু স্বীকৃত নহে, অনুমোদিতও বটে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সবকিছুই নির্ভর করে মোট ফলাফলের উপর এবং তাহাদের কোন জনমতের ভয় নাই। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানের পিছনে জনমতের ভয় আছে এবং সেখানে এই সকল দুর্নীতি এবং অনিয়মের স্থান নাই।

(২) সরকারী সংস্থার মাপকাঠি অতি উচ্চ, ফলে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা জনমতের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ব্যগ্র থাকেন। যদিও বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য বক্তৃতা করা হয় ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তথাপি কার্য্যতঃ কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের দিকে ঝোঁক থাকে। আইন-পরিষদে প্রশ্ন উত্থাপন করিবার ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর মন্ত্রী-পরিষদের নিয়ন্ত্রণ উভয়েই কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের দিকে সরকারী সংস্থাগুলিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অধ্যাপক গলব্রেথের অভিমতে রাষ্ট্রীয় সংস্থার সম্পাদনার কৃতিত্ব কেন্দ্রীয় প্রভাবের মধ্যে নাই, আছে অন্যত্র। কর্ম্মচারীদের সাবধানতা ও তাহাদের কর্ম্ম-ক্ষমতার উপর সরকারী সংস্থার উৎকর্ষ নির্ভর করে ; এ কথা স্মরণ না রাখিলে রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। শুধুমাত্র হিসাব পরীক্ষার সুব্যবস্থা দ্বারা কিংবা আইন-পরিষদে প্রশ্নবাণের দ্বারা সরকারী শিল্প-সংস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা যায় না। এই বিষয়ে অধ্যাপক গলব্রেথের অভিমত অতীব সত্য। হিসাব পরীক্ষা দ্বারা

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে চুরি ধরা পড়িয়াছে এবং পড়ে ঠিকই, কিন্তু সম্পাদনার কৃতিত্ব বৃদ্ধি করার তাহাই একমাত্র মাপকাঠি নহে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের এষ্টিমেটস কমিটিও প্রায় এই অভিমত দিয়াছেন যে, সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যৌথমূলধনী কারবার হিসাবে ব্যবসায়ী নীতির দ্বারা চালিত হওয়া উচিত; সরকারী কারবার যদিও আইনসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, তথাপি তাহা যেন রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপার না হইয়া উঠে।

তৃতীয়তঃ, সরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও শিল্পোৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে; উৎপাদক সংস্থায় উচ্চ কারিগরী জ্ঞান প্রয়োজন, কিন্তু অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের কর্তৃপক্ষ এই নীতি কোনও অবস্থাতেই অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রিয়ব্যক্তিদের যখন যেখানে খুশী যে-কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে বসাইয়া দিয়াছেন। ফল হইয়াছে এই যে অজ্ঞ ও অকর্ম্মণ্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা সম্পাদনার দিকে নজর না দিয়া নজর দিয়াছেন চুরির দিকে। গত কয়েক বৎসরের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি চুরি ও অকর্ম্মণ্যতার ইতিবৃত্তে ভরা।

চতুর্থতঃ, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের চেয়ে সংস্থাগত প্রাধান্য অধিক কার্য্যকরী। সরকারী প্রচেষ্টা চালিত হয় উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করিবার দিকে, কিন্তু একজনের দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান চলে না। গলব্রেথ বলেন যে, সংস্থার নিজস্ব প্রাণ থাকা প্রয়োজন, নিজের গতিতে সে চলমান থাকিবে এবং সংস্থাগত দৃষ্টি-ভঙ্গী ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া উঠিতে পারে না। ইহা যেন বুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'। সংস্থাগত উৎকর্ষ ব্যক্তিগত উৎকর্ষকে ছাড়াইয়া যায় এবং ব্যক্তিগত দোষকে ছাপাইয়া রাখে। গুণী ব্যক্তি নির্ব্বাচনে রাষ্ট্র শতকরা ২৫ ভাগ ভুল করিতে বাধ্য, সুতরাং সংস্থাগত প্রাণপ্রতিষ্ঠাই প্রধান কর্ত্তব্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জেনারাল মোটর কর্পোরেশন কিংবা টেনেসীভ্যালী প্রতিষ্ঠান সংস্থাগতভাবে এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে, যে-কোনও উৎপাদনশীল কার্য্যই ইহারা করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া জেনারাল মোটর কর্পোরেশনের কোনও বিশেষ কর্ম্মচারী আর একটি এই রকম উৎপাদক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে নাও পারে। ভারতবর্ষে সংস্থাগত উৎকর্ষ লাভের দিকে ঝোঁক দেওয়া বেশী প্রয়োজন।

ভারতের করপ্রণালী

৫ই মে সাপ্তাহিক মন্তব্য প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের "ইকনমিক উইকলি" অধ্যাপক ক্যালডর ভারতীয় করপ্রণালী সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন তাহা প্রকাশের দাবী জানাইয়াছেন। অধ্যাপক ক্যালডর ভারতীয় পরিসংখ্যান ভবনের (Indian Statistical Institute) অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রিত হইয়া ভারতে আসেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি ভারতীয় করপ্রণালী সম্পর্কে যে গবেষণা করেন তাহার ফলাফল সরকারীভাবে পরিসংখ্যান ভবন কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি কোন একটি অর্থনৈতি[ক] পত্রিকাতে অধ্যাপক ক্যালডর লিখিত নীট সম্পদের উপর বা[র্ষিক] কর সম্পর্কিত খসড়া প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে।

"ইকনমিক উইকলি" লিখিতেছেন যে, ভারতীয় করপ্র[ণালী] সম্পর্কে অধ্যাপক ক্যালডরের ন্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তি যে স[কল] সুপারিশ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং [সরকার]পক্ষের উচিত এইগুলি সম্পূর্ণ আকারে জনসাধারণের সম্মুখে উপ[স্থিত] করা। ঐ সুপারিশগুলির এইরূপ খাপছাড়া এবং আংশিক প্রক[াশে জন]সাধারণের মধ্যে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইবার অবকাশ থা[কে।]

উপরন্তু, আরও একটি বিশেষ কারণেও অধ্যাপক ক্যাল[ডরের] মন্তব্যগুলি প্রকাশ করা প্রয়োজন বলিয়া পত্রিকাটি অভিমত প্র[কাশ] করিয়াছেন। অধ্যাপক ক্যালডরের সুপারিশগুলি কোন বি[শেষ] কর সম্পর্কে নহে—সাধারণভাবে করপ্রণালী সম্পর্কেই সেগুলি [প্রদত্ত] হইয়াছে। সুতরাং ঐ সুপারিশগুলি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জনসা[ধা]রণের অভিমত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। করপ্রণালীর সার্বিক পরিব[র্তন] এক দিনে সম্ভব নহে সত্য, কিন্তু উহার পরিবর্ত্তনের নীতি পূর্ব্বাহ্নেই জনসাধারণ কর্তৃক অনুমোদিত করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাছাড়ে ভূমি সংস্কার

আসামে ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কার আইন রাজ্য-বিধান সভায় [গৃহীত] হইয়াছে। জমিদার উচ্ছেদ আইন এবং ভূমিসংস্কার আইন[ের] ধারাগুলির পারস্পরিক বিরোধিতার কথা উল্লেখ করিয়া ১৪ই [...] এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, [...] জমিদারী উচ্ছেদ আইনে (গোয়ালপাড়া, গারো পাহাড় ও [...] জেলার করিমগঞ্জ মহকুমায় প্রযোজ্য) বলা হইয়াছে, ভূম্যধি[কারী]দের অনূর্দ্ধ ৪০০ বিঘা পর্য্যন্ত ভূমি (বসতবাড়ী ও খাস [...] সমেত) থাকিতে পারিবে। পত্তনীদারদের ক্ষেত্রে এই সর্ব্বোচ্চ [সীমা] হইল ১৫০ বিঘা। ক্ষতিপূরণ ব্যাপারে জমিদার মিরাসদার[গণ] নিজ আয়ের অনুপাতে ১৫ গুণ (১০১০৲ টাকা পর্য্যন্ত [...] ক্ষেত্রে) হইতে ক্রমানুযায়ী দুই গুণ (তিন লক্ষ টাকার উর্দ্ধে [...] ক্ষেত্রে) পাইবে। সম্প্রতি আসাম বিধান-সভায় 'Ceiling [on] Land Holding' সম্পর্কে যে আইন পাস হইয়াছে তা[হাতে] অপর পক্ষে ১৫ গুণ হইতে ৫০ গুণ ক্ষতিপূরণ দিবার [ব্যবস্থা] রহিয়াছে। 'যুগশক্তি' লিখিতেছেন, "এই দুইটি আইন স্থলবি[শেষে] সামঞ্জস্যহীন, এমনকি পরস্পরবিরোধী বলিয়াও প্রতিভাত হই[তেছে] নাকি?"

শ্রীহট্টের যে অঞ্চলগুলি দেশ বিভাগের পর কাছাড় [জেলার] অন্তর্গত হইয়াছে তাহাদের বিশেষ অবস্থার আলোচনা করিয়া ['যুগ]শক্তি' লিখিতেছেন যে, ভূমিব্যবস্থার অত্যধিক জটিলতায় [ঐ] সকল অঞ্চলের ভূমির যথাযথ বা নির্ভরযোগ্য স্বত্ব বিবরণী [...] পর্য্যন্ত সরকার প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার-মিরাশদারদের সংখ্যা এখানে অত্যধিক

তালুক মহলাদি প্রায়ই এজমালী স্বত্ব-বিশিষ্ট হইয়া পড়াই এই জটিলতার প্রধান কারণ। আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অবস্থা কিন্তু ভিন্নরূপ। সেখানে মাত্র কয়েকটি জমিদার পরিবারই সমগ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী এলাকার ভূম্যধিকারী হওয়ায় স্বত্বলিপি (Records of Right) প্রস্তুত করা সহজতর এবং বর্ত্তমানে জমিদার পক্ষ সুপ্রিম কোর্টে মামলা হারিয়া যাওয়ায় রাজ্য সরকার কর্তৃক গোয়ালপাড়ায় জমিদারীগুলি দখল করার ব্যাপারে আর কোন প্রতিবন্ধক দাঁড়ায় নাই।

"কিন্তু করিমগঞ্জের বেলা তাহা সম্ভবপর নহে: এখানে মহাল সংখ্যা চারি সহস্রাধিক এবং তথাকথিত স্বত্বাধিকারী এক লক্ষেরও উর্দ্ধে! তন্মধ্যে দুই হাজার টাকার অধিক আয়বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী (প্রাচীন ও নবীন) সংখ্যায় এক ডজনও হইবেন না। বাকী সব প্রায় বিত্তহীন হইলেও মধ্যবিত্ত নামধারী এবং ইহাদের মধ্যে তালুকদার, মিরাশদাররূপে জমির খাজনা-প্রাপক ততটা নহে—ভাগী, চুক্তিভাগী ইত্যাদি ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগী যতটা। সে যাহাই হউক, এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, করিমগঞ্জ মহকুমায় এই স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে (১৯৫১ সনে) জমিদারী উচ্ছেদ আইন রচনাকালে অমনোযোগী থাকায় এখানে উক্ত আইন প্রয়োগে যেরূপ বেগ পাইতে হইতেছে, ভূমি-সংস্কারমূলক সম্প্রতি প্রণীত আইনটির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ বা ততোধিক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।"

আসামের চা-বাগানের শিক্ষাব্যবস্থা

গত ১৮ই এপ্রিল শিলং সেক্রেটারিয়েট ভবনে আসাম সরকারের ষ্ট্যাণ্ডিং লেবর কমিটির নবম অধিবেশনে আসামের শ্রমমন্ত্রী শ্রীঅমিয়-কুমার দাস আসামের চা-বাগানগুলিতে শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থায় আতঙ্ক প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'শ্রমিক' পত্রিকা ১লা মে লিখিতেছেন যে, শ্রমমন্ত্রীর এই মনোভাবকে আন্তরিক বলিয়া মনে করা যাইত যদি তিনি এই সর্ব্বপ্রথম রাজ্যের শ্রমদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হইয়া এই কথা বলিতেন। "কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রমদপ্তরের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অজ্ঞতার ভাণ করা অথবা কারণাধীন কিছু করিবার অক্ষমতা মোটেই শোভা পায় না। আমরা ইহাকে দায়িত্বের প্রতি পরিপূর্ণ জ্ঞানহীনতাই বলিব।"

রাজ্যসরকারের বিবৃতি অনুযায়ী আসামের চা-বাগানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত ২৯,২৬৯ শিশু আছে এবং প্রচলিত ব্যবস্থায় তাহাদের শতকরা ১৯·৫ জন শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। 'শ্রমিক' এই পরিসংখ্যানের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিতে-ছেন যে, শিক্ষালাভার্থী শিশুর সংখ্যা প্রদত্ত সংখ্যা হইতে অনেক বেশী হইবে এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের বেশী হইবে না।

বাগানে ৫৯৫টি পাঠশালার মধ্যে সরাসরি সরকারী পরিচালনায় রহিয়াছে মাত্র ১৮টি—বাকিগুলি পরিচালনার ভার মালিকের হাতে। "ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ বাগানে শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব কেহই লইতেছেন না। সরকার বলেন, দায়িত্ব মালিকের, আর মালিক বলিতেছেন এত বোঝা বহন করিতে তাঁহারা অসমর্থ।"

সরকারের এইরূপ দায়িত্ব এড়াইবার মনোবৃত্তির নিন্দা করিয়া "শ্রমিক" বলিতেছেন, স্মরণ রাখা উচিত যে, আসাম রাজ্যের বর্ত্তমান সমৃদ্ধি চা-শিল্পের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ এবং মূলধন সৃষ্টিতেও চা-শিল্পের দান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু যাহাদের রক্ত ও ঘর্ম্মে ইহা সম্ভব হইয়াছে কেবলমাত্র ত্রুটিপূর্ণ সরকারী নীতির জন্যই তাহারা জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার অত্যন্ত সামান্য সুযোগটুকু হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছে।

"শ্রমিক" লিখিতেছেন যে, বৎসরখানেক পূর্ব্বে প্রদত্ত "রেগী কমিটি"র রিপোর্ট কার্য্যকরী করিবার কোন ব্যবস্থা সরকার করেন নাই। ১৯৫১ সনের আসাম চা-বাগিচা আইনে বাগানের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির যে সকল বিধি বিধান রহিয়াছে সেগুলিও অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। "সরকার যদি এখনও এই ব্যাপারে পাশ কাটানোর পথই ধরিয়া থাকেন, তবে এর প্রতিক্রিয়া শ্রমিকের মনে তীব্রভাবেই হইবে এবং ইহার সম্ভাব্য পরিণতির জন্য সরকার ও মালিক উভয়েই দায়ী হইবেন।"

ভারতের ভৌগোলিক সীমা ও পাকিস্থান

পাকিস্থান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রাজনৈতিক মানচিত্রগুলিতে জুনাগড়, কাশ্মীর ও জম্মু প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যগুলিকে পাকিস্থানের অংশ বলিয়া দেখান হইয়া থাকে। কেবলমাত্র তাহাই নহে, ঐ সকল মানচিত্রে হায়দরাবাদ রাজ্যকে একটি রাষ্ট্রহিসাবেও দেখান হয়। ড. চৈতরাম গিদোয়ানীর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৪ই মে লোকসভায় উক্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পাকিস্থান সরকারের দৃষ্টি এই ব্যাপারের প্রতি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং দুই দেশের সরকারের মধ্যে এই সম্পর্কে পত্রালাপও হইয়াছে।

শ্রী জি. এল. বানসাল জানিতে চাহেন যে, কয়েকটি "বন্ধু-ভাবাপন্ন সরকার" কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্রেও যে কাশ্মীরকে পাকিস্থানের অন্তর্গত বলিয়া দেখান হয় সে সম্পর্কেও সরকার অবহিত আছেন কি না।

উত্তরে শ্রীনেহরু বলেন যে, অন্যান্য দেশের কয়েকটি পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ঐরূপ বিকৃত তথ্যপূর্ণ মানচিত্র প্রকাশ করিয়া-ছেন বটে তবে অন্য কোন সরকার ঐ ধরনের মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভারত সরকারের জানা নাই।

ভারতের বৈদেশিক বিভাগীয় মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীসাদাত আলী খান জানান যে, বিদেশে পাকিস্থানের এই ভ্রান্তি-পূর্ণ মানচিত্র যাহাতে ভুল ধারণার সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য

গত অক্টোবর মাসে বিদেশে নিযুক্ত সকল ভারতীয় দূতাবাসের নিকট নির্দ্দেশ পাঠান হইয়াছিল যে, তাঁহারা ভারতের সঠিক মানচিত্র প্রকাশ করিয়া স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, পাঠাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেন পাঠায়।

সিঙ্গাপুরে ভারতীয় মালিকানায় পরিচালিত 'ডেলী মেল' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি মানচিত্রে জুনাগড় পাকিস্থানের অংশ বলিয়া দেখান হইয়াছিল কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসাদাত আলী খান তাহা স্বীকার করেন। সিঙ্গাপুরস্থ ভারতীয় প্রতিনিধি উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিলে পত্রিকাটি দুঃখপ্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী সংখ্যাতে সঠিক মানচিত্রটি প্রকাশ করে।

শ্রীসাধনচন্দ্র গুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, সিঙ্গাপুরস্থিত পাকিস্থান ট্রেড কমিশনার কর্ত্তৃক 'ডেলী মেলে'র নিকট উক্ত মানচিত্রটি প্রেরিত হয়। পাকিস্থান প্রজাতন্ত্র দিবস (২৩শে মার্চ্চ) উপলক্ষে অন্যান্য বহুবিধ বস্তুর সহিত ঐ মানচিত্রটি সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয় এবং উক্ত সম্পাদক ২৩শে মার্চ্চ পাকিস্থান প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে উক্ত পত্রিকা যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে তাহাতেই ঐ মানচিত্রটি প্রকাশিত হয়।

মুর্শিদাবাদ সীমান্তে দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার

"মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকার ২২শে বৈশাখ সংখ্যায় এক প্রবন্ধে শ্রীদিলীপ মজুমদার মুর্শিদাবাদ সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্গতি বিবৃত করিয়া লিখিতেছেন যে, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের—বিশেষভাবে হিন্দুদের আজ আত্মসম্মান ও জীবন বজায় রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এক দল স্বার্থান্ধ সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার-কার্য্যের ফলে তাহারা খুন, লুঠপাট, পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি অন্যায় উৎপীড়ন অবাধে চালাইয়া যাইতেছে। ইহার উপর আছে পাকিস্থানে মাল-পাচারের চোরাকারবার।

শ্রীমজুমদার লিখিতেছেন, "আমাদের জেলার জলঙ্গী বা অন্যান্য সীমান্তের অবস্থা কোথায় নেমেছে ভাবতেও ভয় লাগে। এটা পাকিস্থান নয়। তবু পাকিস্থানও যেন এর চেয়ে ভাল ছিল। এটা ঠিক নিমন্ত্রণ খাওয়ার মত ব্যাপার হয়েছে—'না ডাকলে এস না, বাড়ীতেও হাঁড়ি চড়িও না'। ভারতে বাস করে ওখানকার অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় আজ এত দুঃসাহস পায় কোথায়?

"আজ হিন্দুস্থানে বাস করে সীমান্তের সাধারণ হিন্দুরা এত বিপদগ্রস্ত কেন? হিন্দু মেয়েছেলেরা আজ একা বেরুতে ভয় পায় কেন? কার ভয়, কিসের এবং কেন এত ভয়, আজ একথা কাকে জিজ্ঞাসা করব? ওখানকার হিন্দুদের না জাতীয় সরকারকে? আজ কে জবাব দিবে?"

'মুর্শিদাবাদ সমাচার' পত্রিকার ঐ সংখ্যায় "জেলার সীমান্তের কথা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সীমান্তে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে চোরাকারবারের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, উভয় রাষ্ট্রের সীমান্ত ও চরের অধিবাসিগণ পুরুষ-নারীনির্ব্বিশেষে অধিকাংশ বেআইনী মালপাচারে লিপ্ত এবং পাচারকারীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই মুসলমান।

সীমান্তবর্ত্তী জলঙ্গী, রাণীনগর, ভগবানগোলা ও ডোমকল থানাগুলি মুসলমান প্রধান। কিছুদিন যাবৎ সৈয়দ বদরুদ্দোজা সেখানে গিয়া বক্তৃতা দিয়া মুসলমানদের বলিতেছেন যে, আল্লাতালা ব্যতীত আর কাহারও নিকট মুসলমানদের মাথা নত করা উচিত নহে। তিনি গত সাধারণ নির্ব্বাচনে ঐ এলাকা হইতে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়া ব্যর্থমনোরথ হন। এবার পুনরায় নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে তিনি নানাবিধ জনসভা ও বক্তৃতা দ্বারা নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। সম্ভবতঃ বদরুদ্দোজা সাহেবের উপদেশ অনুসরণ করিয়াই সাগরপাড়া গ্রামের দুই জন মুসলমান ছাত্র জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার বিরোধিতা করিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলা কর্ত্তৃপক্ষ এ সকল ঘটনা সম্পর্কে কতখানি অবহিত আছেন এবং অবহিত থাকিলে এ অবস্থা দূরীকরণের জন্য তাঁহারা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা জনসাধারণকে জানানো কর্ত্তব্য। এই সকল ঘটনার প্রতি রাজ্য-সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে কি?

মুসলমান ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা

মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত জলঙ্গী থানার সাগরপাড়া গ্রামের জুনিয়র হাইস্কুলে বহুদিন হইতেই পাঠ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" গীত হইয়া আসিতেছিল। এই গানে এতদিন পর্য্যন্ত কাহারও আপত্তি হয় নাই এবং মুসলমান ছাত্রগণসহ সকল ছাত্রই সশ্রদ্ধভাবে এই সঙ্গীতে যোগ দিত। সম্প্রতি এক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মান্ধ মৌলানার প্ররোচনায় মুসলমান ছাত্রগণ জাতীয় সঙ্গীতের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কারণ উহা নাকি মুসলমানদের ধর্ম্মবিরোধী।

সাগরপাড়া গ্রামের বিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কঠোর নিন্দা করিয়া জনাব রেজাউল করিম "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন:

"মুসলিম ছাত্রদের এই অন্যায় অশোভন ও জাতীয়তা-বিরোধী আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাহাদের জানা উচিত যে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কোন ধর্ম্মের আদর্শবিরোধী নহে। ইহার আবেদন সর্ব্বভারতীয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম ছাত্রগণ নিমিত্তমাত্র। তাহারা ছোট ছোট বালক মাত্র। তাহাদের পশ্চাতে যাহারা উস্কানি দিতেছে তাহাদিগকেই বাহির করিতে হইবে এবং তাহাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। এই উস্কানিদানকারী ব্যক্তিদেরকে জানাইতেছি যে, তাহারা এককালে লীগের ধ্বজা উড়াইয়া দেশের ও সমাজের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে। আজ যদি তাহাদের এই লীগ-মনোভাব দূর না হয়, আজ যদি তাহারা অল্পবয়স্ক বালকগণকে

এই ভাবে ক্ষেপাইয়া থাকে তবে তাহা সহ্য করা হইবে না। আমরা আশা করি, সাগরপাড়ার মুসলিম ছাত্রগণ উহাদের দ্বারা আর বিভ্রান্ত হইবে না এবং যথানিয়মে জাতীয় সঙ্গীতে যোগদান করিবে।"

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা"র মন্তব্য বিশেষ যুক্তিসঙ্গত এবং আমরা ইহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক অবস্থিতি

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-পুনর্গঠন বিলে ত্রিপুরা রাজ্যকে "টেরিটরি" রূপে স্বতন্ত্র রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ত্রিপুরাকে টেরিটরিরূপে রাখিবার প্রস্তাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যগণ বিরোধিতা করিয়াছেন।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ভারত সরকার কর্তৃক রাজ্য-পুনর্গঠন বিল আনয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে লিখিত "সেবক" পত্রিকার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ত্রিপুরার বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ত্রিপুরাকে টেরিটরি রূপে রাখিলে রাজ্যের অবস্থা বর্ত্তমান হইতেও বহুগুণ খারাপ হইবে। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক কিন্তু রাজ্য সরকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মাধ্যমে যে কাজ করা হইয়াছে তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পরিকল্পনার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে আদর্শ গ্রামও স্থাপিত হয় নাই অথবা বেকার সমস্যারও কোন সমাধান হয় নাই।

"সেবক" পত্রিকার মতে রাজ্যের দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ প্রশাসনিক অযোগ্যতা। প্রশাসনিক অযোগ্যতার জন্য বহুলাংশে দায়ী সরকারের কর্ম্মচারী নিয়োগনীতি। কর্ম্মচারী নিয়োগ-নীতির গলদগুলি, "সেবকে"র মতে যথাক্রমে (১) স্থানীয় অফিসার হইলেই অযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। উপযুক্ত হারে বেতন দেওয়া হয় না। পরবর্ত্তীকালে স্থানীয় ভাষা জানে না এমন লোককে দ্বিগুণ, তিন গুণ হারে বহাল করা হয়। (২) বড় বড় পদগুলি ক্রমশঃ স্থানীয় ভাষাজ্ঞানহীন লোকদ্বারা পূরণ করা হইতেছে। (৩) স্থানীয় অফিসারের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করা হয় না। (৪) বেতনের হারে আকাশপাতাল ব্যবধান-ব্যবস্থা রহিত না করা। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে আর একটি মস্ত বড় গলদ বা অসুবিধা দেখা যাইবে যে, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে অনেকগুলি পদ (অফিসারের) আছে যাহার একটা একবার একজন কর্ত্তৃক দখল হইলে তাহার পদ পরিবর্ত্তন কিংবা বদলীর কোন সম্ভাবনা নাই এমনকি তিনি অযোগ্য হইলেও নয়।"

'সেবক' লিখিতেছেন, সরকারের কর্ম্মচারী নিয়োগনীতি টেরিটরি শাসনের আমলে আরও বেশী অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। ত্রিপুরা রাজ্য প্রথমে যে যে কারণে আসামভুক্তির বিরোধিতা করিয়াছিল টেরিটরি আমলে সেই সকল কারণই শতগুণ বর্দ্ধিত রূপে দেখা দিবে। এই অবস্থায় সেবক লিখিতেছেন, "রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ত্রিপুরা আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আসামের অন্তর্ভুক্ত হইলে প্রথম কিছুকাল বহু বাধাবিঘ্ন দেখা দিবে। টেরিটরি শাসনে চিরকালের জন্য অর্দ্ধমৃত থাকার চেয়ে এই সব বাধাবিঘ্ন কিছুকাল সহ্য করাও শতগুণে ভাল বলিয়া আমরা মনে করি।"

ত্রিপুরায় চাউল সঙ্কট

ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকাতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যসঙ্কট চরমে পৌঁছিয়াছে। সাধারণভাবে সকলেই রাজ্যসরকারের অযোগ্যতাকেই খাদ্যসঙ্কটের প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"ত্রিপুরার শাসন সঙ্কটই খাদ্যসঙ্কটের প্রধান কারণ" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'সমাজ' পত্রিকা ২৮শে এপ্রিল লিখিতেছেন, রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলিয়াছেন যে, ত্রিপুরায় মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণ যথেষ্টই রহিয়াছে এবং তাহাতে রাজ্যের তিন মাসের খাদ্যসংস্থান হইবে। "অথচ ২৪শে এপ্রিল উপর্যুপরি কয়েকদিনের অনাহারক্লিষ্ট দুই-তিন শত ভুখা জনতা একদিন বা এক বেলার চাউলের জন্য ডি-এম অফিসে ধর্ণা দিয়া ব্যর্থ হইয়া খাদ্য উপদেষ্টার ভবনে যায় এবং জনপ্রতিনিধি (?) উপদেষ্টার নিকট চাউলের প্রার্থনা জানাইলে তিনি হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠেন, রাজ্য-সরকারের মজুত চাউল নাই। সুতরাং চাউল দেওয়া হইবে না। উক্ত তারিখ রাত্রিতে জেলা শাসকের আদেশ ও আজ্ঞাবহ সদর হাকিমও গোলবাজারে গিয়া উক্ত জনতাকে সরকারী চাউলের অভাবের সংবাদ জানান।"

ত্রিপুরার শাসনতান্ত্রিক গলদ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক তদন্তের দাবি জানাইয়া 'সমাজ' লিখিতেছেন, "অন্যথায় লক্ষ লক্ষ মণ চাউল পাঠাইলেও খাদ্যাভাব সঙ্কট সমাধান হইবে না। আমরা দ্বিধাহীনরূপে বলিতেছি যে, বর্ত্তমান সঙ্কটের কারণ সুগভীরভাবে ত্রিপুরার শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নিহিত এবং চীফ কমিশনার, উপদেষ্টাগণ ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের পারস্পরিক বিরোধিতা ও নাজেহাল করিবার প্রয়াস হইতে উৎসারিত। খাদ্যসঙ্কট ইহারই বাহ্যিক প্রকাশ।

"ত্রিপুরা সরকারের শাসনকাঠামো কিরূপ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহা কিছুটা বুঝা যাইবে অতি সম্প্রতি উদয়পুর, সাবরুম ও বিলোনীয়া মহকুমা কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে আনীত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ হইতে। ইহাদের উপরও যাঁহারা দুর্নীতিমুক্ত হইলে এরূপ ব্যাপক দুর্নীতির খেলা চলিত না। অবিলম্বে ব্যাপক তদন্ত না হইলে কোটি কোটি টাকা ও লক্ষ লক্ষ মণ চাউলেও ত্রিপুরার খাদ্যসঙ্কট সমাধান হইবে না।"

২৩শে বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চাউল সঙ্কট সম্পর্কে তদন্তের দাবী জানাইয়া "সেবক" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কট ত্রিপুরা সরকারের অযোগ্যতার ফলেই দেখা

দিয়াছে। রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক খাদ্যসঙ্কটের উল্লেখ করিয়া "সেবক" লিখিতেছেন যে, অবিলম্বে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্বল্পমূল্যে চাউল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আগরতলায় যে দোকানগুলি খোলা হইয়াছে তাহাতে যে চাউল সরবরাহ করা হয় তাহা মানুষের খাওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সরকারের মজুত চাউলের অপ্রতুলতা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া পত্রিকাটি বলিতেছেন যে, বেসরকারী হিসাব মতে অন্ততঃ ২০-২৫ হাজার টন চাউল আমদানী করা প্রয়োজন।

ত্রিপুরার চাউল আমদানী ব্যবস্থা সম্পর্কে "সেবক" লিখিতেছেন : "কলকলিঘাট রেল ষ্টেশনে চাউল বুক হওয়ায় কেবল চাউল পৌছিতে বিলম্ব হইতেছে না, এই চাউল কি ভাবে আগরতলা কেন্দ্রীয় গুদামে পৌছিবে তাহাও এক বিরাট সমস্যা। প্রথম কিস্তির ৫৪,০০০ মণ চাউলের মধ্যে ৩২,৪০০ মণ চাউল কলকলিঘাট পৌছিয়াছে কিংবা পৌছিবে। এই চাউল আসাম-আগরতলা রাস্তা দিয়া আনান হইবে এবং তজ্জন্য প্রায় ৪৫০টি ট্রাক ও বিশ সহস্রাধিক গ্যালন পেট্রলের প্রয়োজন পড়িবে। একমাত্র মোটর ভাড়া বাবদ সরকারের দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইহার চেয়েও বড় প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, উক্ত সড়কের বর্তমান অবস্থায় ৪৫০টি ট্রাক ৯০০ বার যাওয়া আসা করিলে সড়কটি একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, এই সড়ক নির্মাণে যে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা ত জলে গেলই আরও আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করিয়া রাস্তা মেরামত করিতে হইবে। এখানে টাকার ক্ষতি ছাড়াও জাতির বিশেষ প্রয়োজনীয় সড়কটিও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই সড়কটি দিয়া চাউল আমদানী করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হইতেছে না।"

পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার

হিন্দু উত্তরাধিকার বিলে কন্যার স্থান এতদিনে নির্ণয় করা হইয়াছে। সংবাদপত্রে উহার বিবরণ এইরূপ :

"নয়াদিল্লী, ৮ই মে—অদ্য লোকসভায় হিন্দু উত্তরাধিকার বিল গৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের সহিত কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত হইল।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই বিলটিকে একটি বৈপ্লবিক বিধান বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বলেন, ইহাকে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথে একটি পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। আইন দপ্তরের মন্ত্রী বিলটিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিধান বলিয়া বর্ণনা করেন।

হিন্দু উত্তরাধিকার বিল সম্পর্কে লোকসভায় প্রায় ৪০ ঘণ্টাকাল আলোচনা হইয়াছে এবং অদ্য অতিরিক্ত আড়াই ঘণ্টাকাল অধিবেশন চালাইয়া এই বিল গৃহীত হয়।

হিন্দু উত্তরাধিকার বিলের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু প্রায় ৩৫ মিনিটকাল বক্তৃতা করেন। সমালোচকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, বর্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন পৃথিবীতে বসবাস করা নিরর্থক। ভারতে যে রাজনৈতিক বিপ্লব আসিয়াছে এবং বর্তমানে যে অর্থনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া ভারত অতিক্রম করিতেছে তাহার অতিরিক্ত সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হইলেই ভারত প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক অর্থে তিনি এই বিলটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈপ্লবিক বিধান বলিয়া মনে করেন। কারণ 'ইহা মানুষকে চিন্তার জড়তা হইতে মুক্ত করিবে এবং এই কারণেই আমি ইহাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি।'

ভারতীয় নারী জাতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, কোন দেশের সভ্যতাকে যাচাই করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে দেশের নারীরা কিরূপ অবস্থায় বাস করে এবং নারী সম্পর্কিত দেশের আইন-কানুনই বা কিরূপ।

তিনি বলেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতীয় নারীর অবস্থা মোটেই ভাল নহে এবং তাহাদের এই দুরবস্থার জন্য নিশ্চয়ই তাহারা নিজেরা দায়ী নহে ; সমাজ ব্যবস্থার গলদই এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

হিন্দু সমাজে গতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন এবং বলেন, ইদানীংকালে যে সকল পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা সম্ভব হইয়াছে কারিগরী বিদ্যা এবং উৎপাদন সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তনের ফলে। তবে মূল আদর্শ অপরিবর্তিত থাকিবে—যাহা ভাল তাহা ভালই এবং যাহা মন্দ তাহা মন্দই।

ভারতীয় নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধিকার দানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, এই বিলের দ্বারা এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যাইবে।

হিন্দু উত্তরাধিকার বিলের দ্বারা যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ধরিবে —এই অভিমত তিনি সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন সব পরিবর্তন আসিবে যাহার ফলে সমগ্র মানব সমাজকে নূতন করিয়া সংগঠিত করিতে হইবে।

অদ্য একটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় এইরূপ বিহিত হইয়াছে যে, উইল করিয়া কোন উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রচলিত আইন অনুযায়ী ভরণপোষণের অধিকার লাভ করিবে।

বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে শ্রীপটাশকর বলেন, নারীকে কেবলমাত্র 'দেবী' আখ্যা দান করিলেই তাহার সমস্যার সমাধান হইবে না। তিনি বলেন, কয়েকজন সদস্য ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে যে গর্ববোধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনিও সমরূপ গর্ব অনুভব করেন ; তবে তিনি মনে করেন না যে এই বিল দ্বারা তাহা কোন প্রকার ক্ষুণ্ণ হইবে।

অধ্যক্ষ শ্রীআয়েঙ্গার লোকসভাকে এবং শ্রীপটাশকরকে তাঁহার

ন্ধ পরিচালনার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, যদিও ন নূতন আদর্শ গৃহীত হয় নাই, তথাপি এই বিধানের ফলে শের কন্যা ও ভগিনীগণের অন্তরে নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত হইবে।

অধ্যক্ষ মহোদয় সদস্যগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তাঁহারা ইরূপ সন্তোষ ও ভরসা লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন যে, তাঁরা কোন ভুল করেন নাই এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কাজ করেন ই।"

কন্যার অধিকার সম্পর্কে আলোচনার পূর্ব্বেই মাতার অধিকারের য়ে বিতর্ক হয়। তাহার বিবরণী নিম্নরূপ :

"নয়াদিল্লী, ৭ই মে—অদ্য লোকসভা মাতাকে হিন্দু উত্তরাধিকার লে প্রথম শ্রেণীর অগ্রাধিকারযুক্ত উত্তরাধিকারিণী হিসাবে গণ্য রের সিদ্ধান্ত করেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ ঐ মর্ম্মে একটি শোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিলে লোকসভায় তাহা গৃহীত হয়। রাধিকারী হিসাবে পিতাকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিয়া বলেন যে, কার উপরোক্ত সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। আইন ভাগের মন্ত্রী শ্রী এইচ. ভি. পটাশকর বলেন, জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি থমে মাতাকে প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারিণী হিসাবে গণ্য করার পারিশ করেন, কিন্তু রাজ্যসভা ইহার বিরোধিতা করিয়া ইহার বর্ত্তন সাধন করেন। রাজ্যসভায় গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম্মের মাতাকে প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারিণী হিসাবে গণ্য করার ক্ষে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

অদ্য লোকসভায় হিন্দু উত্তরাধিকার বিলের দফাওয়ারী লোচনা হয়। এই আলোচনায় বিলের দুইটি অনুচ্ছেদ বাদ ওয়া হয়।

যে সম্পত্তি সম্পর্কে উইল করা হয় নাই, সেই সম্পত্তির ক্ষেত্রে , কন্যা, বিধবা, মৃত পুত্রের পুত্র, মৃত পুত্রের কন্যা এবং অন্যান্য জন অগ্রাধিকারযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ মাতাকে প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারিণী সাবে গণ্য করার জন্য এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নেহরু বিতর্কে যোগ দিয়া বলেন যে সরকার এই সংশোধন তাব গ্রহণ করিবেন। তিনি বলেন, তপশীলে ঐ পরিবর্ত্তন তীত অন্য কোন পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হইবে না।"

আমরা হিন্দু উত্তরাধিকার বিলের মধ্যে মাতা ও কন্যার অধিকার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আনন্দিত।

ডাক-বিভাগের অধঃপতন

ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে এদেশের শাসনযন্ত্র যাঁহাদের হাতে ল, তাঁহারা দেশের লোকের জন্যই হউক বা নিজেদের সুবিধার ই হউক, ডাক ও তার বিভাগ দুইটি অতি সচল ও দুর্নীতিমুক্ত তে সক্ষম হইয়াছিলেন। এখন দেশে দুর্নীতি ও সেবাধর্ম্মের বিপরীত ব্যবস্থাই সচল। ফলে এই বিভাগও দোষদুষ্ট। নিম্নস্থ সংবাদটি তাহারই পরিচায়ক :

"ডাক ও তার বিভাগের মেল মোটর সার্ভিসে গোলমাল ঘটায় গত তিন দিন কলিকাতার অধিকাংশ অঞ্চলে নিয়মিত ডাক বিলিতে গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হয় বলিয়া জানা যায়। তাহা ছাড়া গাড়ী পাইতে অসুবিধাহেতু শহরের অনেক অঞ্চলে নন-ডেলিভারী পোষ্ট আপিসগুলিতে গত ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল—দুই দিন জনসাধারণ চাহিদামত ষ্ট্যাম্প কিনিতেও পারে নাই।

ডাক ও তার বিভাগে অনুসন্ধানকালে কর্ত্তৃপক্ষ হইতে এরূপ আশ্বাস দেওয়া হয় যে, অদ্য বৃহস্পতিবার ডাক বিলির ব্যাপারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে।

পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ মেল মোটর সার্ভিসের কতকগুলি মেলভ্যান গত তিন দিনে অচল হইয়া পড়ায় কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে চিঠিপত্র নিয়মিতভাবে বিলি করায় এরূপ বিঘ্ন ঘটে বলিয়া প্রকাশ।

মেলভ্যানগুলি অচল হওয়ার কারণ বর্ণনা করিয়া কলিকাতা অঞ্চলের পোষ্টাল সার্ভিসের ডিরেক্টর শ্রী এস. সি. সেনগুপ্ত বলেন যে, গত কয়েকদিন কলিকাতার তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গাড়ীর পেট্রল 'বাষ্প' পরিণত হয় এবং উহার ফলে কোন কোন গাড়ী অচল হইয়া পড়ে। তিনি স্বীকার করেন যে, মেল মোটর সার্ভিসের ৯১টি গাড়ীর মধ্যে মাত্র ১৫টি গাড়ী নূতন এবং অধিকাংশই পুরাতন।

ভারত উন্নয়ন ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

ভারতের উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের যোগ্যতার তুলনামূলক বিচার অনেক ক্ষেত্রেই অনেকবার হইয়াছে ও হইতেছে। বিগত ২৭শে বৈশাখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অংশ গ্রহণ করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সম্মুখে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার এক নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছে।"

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের নবনির্ম্মিত দশ তলা ভবন—'ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ' বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন করিয়া কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীটি. টি. কৃষ্ণমাচারী সরকারী শিল্পনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা পর্য্যালোচনাকালে বৃহস্পতিবার কলিকাতায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, সরকার একটি সুনির্দ্দিষ্ট শিল্পনীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার ভিত্তিতেই কাজ করা হইতেছে। সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্পক্ষেত্র বহুলাংশে প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করার চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, জনসাধারণই সরকারী নীতির গুণাগুণ বিচার করার একমাত্র অধিকারী। যদি তাঁহারা মনে করেন যে, সরকারী নীতি ভ্রান্ত, তাহা হইলে নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁহারা যে কোন সময়ে সরকারকে গদীচ্যুত করিতে পারেন। সরকারী স্বেচ্ছাচারিতা বোধ করার অস্ত্র একমাত্র জনসাধারণেরই আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, আগামী দশ মাসের মধ্যেই জনসাধারণ সরকারী নীতি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পাইবে। সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন সেই নীতির ভিত্তিতেই তিনি জনসাধারণের মতামত জানিতে ইচ্ছুক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, সরকারী বা বেসরকারী কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার তিনি পক্ষপাতী নহেন। তবে তিনি মনে করেন যে, গ্রামজীবনের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে এবং সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইলেও বেসরকারী শিল্পগুলিতেই প্রধানতঃ ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা মিটাইতে হইবে। ফলে বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ পাইবে। ইহা ব্যতীত সিমেণ্ট, চিনি, চা, লৌহ প্রভৃতি আরও কতকগুলি শিল্পেও বেসরকারী প্রচেষ্টার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, গত কয়েক বৎসরে উক্ত অসন্তোষ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ ১৯৪৬ সন হইতে যে সকল উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আগমন করিয়াছে তাহাদের সকলের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। এই বিরাট সমস্যার সমাধানে বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কতটুকু সাহায্য করিয়াছে তাহা তিনি জানিতে চাহেন।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী মনে করেন যে, ভারতবর্ষের এই বিরাট সমস্যা সম্বন্ধে এমনকি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও সচেতন নহেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এই সমস্যাগুলির কথা স্মরণ করিয়াই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। তিনি বলেন যে, ঐ সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও রচনা করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার দোষগুণগুলি জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরার তিনি পক্ষপাতী। কারণ তিনি মনে করেন যে, পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রয়োজন। সাধারণ লোকের জীবনধারণের মান উন্নয়ন করা ভারত-সরকারের লক্ষ্য। ধনীসম্প্রদায়ের জীবনধারণের মান সীমাবদ্ধ করিলে জনসাধারণের জীবনধারণের মান কিছু উন্নীত করা যায় বলিয়া তিনি মনে করেন।"

বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অসন্তোষ এবং এই প্রদেশের বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কে কৃষ্ণমাচারী যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। এই প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগু[illegible] যে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে নিজেদের লাভ লোকসান দেখেন তাহারই ফ[illegible] দেশের লোকের সমর্থন ও সহানুভূতি তাঁহারা হারাইতেছেন স্বার্থচিন্তা দোষের নহে, কিন্তু যে লোক বা যে প্রতিষ্ঠান শুধু নিজে[illegible] দের নিছক স্বার্থের কথাই ভাবে, অন্যদের নিকট তাহার অস্তিত্বে[illegible] কোনই সার্থকতা থাকে না। এই কারণেই আজ পুঁজিবা[illegible] ঘৃণার বস্তু।

বুনিয়াদী শিক্ষা

"নয়াদিল্লী, ১১ই মে—বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত ষ্ট্যাণ্ডিং কমি[illegible] অদ্য এখানে এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার অব[illegible] নির্দ্ধারণ কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ কার্য্যে পরিণত করার নি[illegible] বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দে[illegible] যথাসম্ভব শীঘ্র এখানে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের একটি সম্মে[illegible] হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা নির্দ্ধারণ কমিটির রিপোর্ট বিবে[illegible] করিবার উদ্দেশ্যে অদ্য এখানে বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত ষ্ট্যা[illegible] কমিটির পঞ্চম অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীমন্নারায়ণ এই সভ[illegible] সভাপতিত্ব করেন। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি অবস্থা নির্দ্ধারণ কমি[illegible] রিপোর্ট পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর কর্ত্তৃক এই অবস্থা নির্দ্ধারণ কমিটি নিযু[illegible] হইয়াছিল।

কমিটি এই সুপারিশ করেন যে, ভারত সরকার এবং বি[illegible] রাজ্য সরকারকে বুনিয়াদী ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ দিব[illegible] নিমিত্ত একটি সর্ব্বভারতীয় পরিষদ গঠন করা কর্ত্তব্য। কমিটি আর[illegible] সুপারিশ করেন যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উচ্চতর শি[illegible] প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক দূর করিবার উদ্দেশ্যে অপরা[illegible] বিদ্যালয়ের যে স্তরে ইংরেজী পড়ান হয়, বুনিয়াদী বিদ্যালয়েরও সে[illegible] স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে একমত হওয়া গিয়াছে যে, যে সকল স্থানে চাহি[illegible] আছে, তথায় বুনিয়াদী-পরবর্ত্তী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেও[illegible] রাজ্য সরকারগুলির কর্ত্তব্য এবং এই সকল বিদ্যালয় মধ্যশি[illegible] ব্যবস্থার অঙ্গরূপেই গণ্য হইবে।

কমিটির অভিমত এই যে, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বুনিয়াদী-পরব[illegible] শিক্ষালয়ের উপযোগী পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন এবং উত্তী[illegible] ছাত্রগণকে মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ[illegible] প্রদত্ত ডিপ্লোমার অনুরূপ ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

ভারতের সহকারী শিক্ষামন্ত্রী ড. কে এল শ্রীমালী, শি[illegible] দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী কে. জি. সৈয়দায়েন এবং কাকাসাহে[illegible] কালেলকরও অদ্যকার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, বুনিয়াদী শিক্ষার প[illegible]

ব্লনায় এখনও অনেক গলদ রহিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র গোঁড়ামী অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই শিক্ষার নীতি এবং মাধ্যম স্থির রায় উহা আড়ষ্ট ও অকেজো হইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রতিকার করে হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তি

গত ২১শে বৈশাখ নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:

"বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তার পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

ভারত সরকারকেও তিনি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছেন বলিয়া জানান।

গত ২৪শে জানুয়ারী তিনি এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ড. শ্রীকৃষ্ণ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তি প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

কিঞ্চিদধিক তিন মাসকাল পর এই প্রস্তাব প্রত্যাহারের কারণ এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়া ডাঃ রায় বলেন যে, সম্প্রতি উত্তর-কলিকাতা হইতে সংসদ-সদস্য উপনির্ব্বাচনে জনসাধারণের অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইয়াই তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এই দিন অপরাহ্ণে বিমানযোগে কলিকাতা ফিরেন এবং সরকারী দপ্তর-ভবনে রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করেন। অতঃপর এক বিবৃতিতে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।"

ডাঃ রায়ের ঘোষণার জের বিহারে ও দিল্লীতে গড়াইয়াছে নিম্নরূপ:

"পাটনা, ১৩ই মে—বিহারের কিষেণগঞ্জ এবং পুরুলিয়া মহকুমা দুটিকে পশ্চিমবঙ্গের নিকট হস্তান্তরের বিরোধিতা করিয়া বিহারের মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া প্রামাণিক সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনের ফলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জনমতের নিকট নতিস্বীকার করিয়া পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন। ড. সিংহের পত্রে এই বিষয়েরও উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বিহারের এলাকা পশ্চিমবঙ্গের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে জনসাধারণ যে অভিমত প্রকাশ করিবেন ড. সিংহও সেই অভিমতের নিকট নতিস্বীকারের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, তিনি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিহারের এলাকা পশ্চিমবঙ্গের নিকট হস্তান্তর সম্পর্কে জনসাধারণ কিরূপ অভিমত পোষণ করে তাহা অবগত হইবার জন্য, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হইতে যাঁহারা সংসদের এবং রাজ্য বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে এবং এই বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া পুনরায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে দেওয়া উচিত।"

"নয়াদিল্লী, ১২ই মে—অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ও সংসদ-সদস্য শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জ্জি অদ্য এখানে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী না করিবার নিমিত্ত বিহারের কতিপয় সংসদ-সদস্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরুকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, শ্রীনেহরু তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শ্রী চ্যাটার্জ্জি বলেন, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের প্রস্তাব সংশোধনের পর কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের যে সকল অংশ পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। তিনি আরও বলেন যে, ঐ সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়াই জানা যায়। এই সম্পর্কে বিহারের সংসদ-সদস্যদের অনুরোধ যখন অগ্রাহ্য হইয়াছে, তখন আর এই বিষয়ে কোন অনিশ্চয়তা বা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্দ্দশা

গত ১৮ই বৈশাখ আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই আয় সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাহাদের দুর্দ্দশার ও তজ্জনিত অসন্তোষের কারণ ইহাতেই বুঝা যায়।

"পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, নানারকম অপরিহার্য্য পণ্যের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ গত দুই মাস যাবৎ কঠিনতর হইয়া পড়িয়াছে। অথচ আনুপাতিক বা আপেক্ষিক আয়বৃদ্ধি না হওয়ায় ঐসব পরিবারকে শতকরা অন্ততঃ পনর-কুড়ি ভাগ বেশী ব্যয় করিতে হইতেছে। খাওয়া ও পরার ব্যাপারেই মূল্যবৃদ্ধির কষ্ট সব চাইতে বেশী।

প্রকাশ, লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট উত্থাপিত হইবার পর মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কায় ফাটকাবাজির ঝোঁক দেখা যাইতেছে। সমাজবিরোধী লোকেরা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছে। চলতি বৎসরের মার্চ্চ মাসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়মাত্রা ৪০২-এর কোঠায় গিয়া উঠে। (১৯৩৯ সনে ব্যয়ের মাত্রা ধরা হইয়াছিল ১০০ এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া এই হিসাব ধরা হইয়াছে।) গত দেড় বৎসরে মধ্যবিত্ত পরিবারের ইহাই সর্ব্বাধিক ব্যয়মাত্রা। এখনও যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে এপ্রিলে এই মাত্রাও ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ চাউলের দাম ধরা যাক। 'কৃষি-বাজার-বিবরণী' (এগ্রিকালচারাল মার্কেট রিপোর্ট) অনুসারে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি সাধারণতঃ যে মাঝারি ধরণের চাউল ব্যবহার করে, গত বৎসর জুলাই মাসে উহার মূল্য ছিল মণপ্রতি ১৭।৶০ আনা (অর্থাৎ, যে সময়ে চাউলের মূল্য স্বভাবতঃই বাড়ে)। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী-

ফেব্রুয়ারী মাসে মাঝারি ধরনের চাউলের দাম ছিল মণপ্রতি ১৭৲ টাকা হইতে ১৭॥০ টাকা। এখন, এই এপ্রিল মাসে এই চাউলের মূল্য মণপ্রতি ২০-২১৲ টাকারও বেশী। মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ আড়াই টাকার মত।

দৈনন্দিন ব্যবহার্য্যের মধ্যে আর একটি জিনিষ হইতেছে ডাল। মুগুর ডালই বাঙালী পরিবারে বেশী চলে। গত বৎসর জুলাই মাসে থাড়ি মুগুর গড়ে প্রতিমণ ১৫॥৶০ আনা দরে এবং ভাঙা মুগুর প্রতিমণ ১১৸৶০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। এখন, এই বৎসর এপ্রিল মাসে থাড়ি ও ভাঙা মুগুর যথাক্রমে মণপ্রতি ২৫৲ টাকা ও ২০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

মশলার মধ্যে গত বৎসর অক্টোবর মাসে কলিকাতায় শুকনো লঙ্কার দাম ছিল প্রতি সের পৌনে দুই টাকা। এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার দাম চড়িয়া সের প্রতি ২৲ টাকা হয় এবং এখন এই এপ্রিল মাসে ২।০ টাকা হইতে ২॥৶০ আনা সের দরে বিক্রয় হইতেছে।

সরিষার তৈল না হইলে কোন বাঙালী পরিবারে রান্না চড়ে না। গত বৎসর অক্টোবর মাসে এক সের সরিষার তৈলের দাম ছিল ১॥৶০ আনা। বর্ত্তমানে ইহা পৌনে দুই টাকা বা দুই টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। নারিকেল তৈলের দাম ছিল সের প্রতি পৌনে দুই টাকা, এখন সোয়া দুই টাকা।

ফেব্রুয়ারী মাসে তরকারীর দাম মোটামুটি ছিল। কিন্তু ইহা এখন খুবই চড়িয়াছে। পটল বার আনা সেরের কমে পাওয়া যায় যায় না, বেগুন আট আনার কম নাই। সুতরাং মার্চ্চ মাস হইতে খাদ্য-ব্যয়ের চাপ অত্যন্ত বেশী অনুভূত হইতেছে।

গত বৎসরের জুলাই মাস হইতে খাদ্যের ব্যয়মাত্রা ধীরে কিন্তু নিশ্চিত গতিতে বাড়িতেছে।

কোন এক বণিক-সভার সংগৃহীত তথ্যানুসারে গত বৎসর জুলাই মাসে খাদ্যের ব্যয়মাত্রা (১৯৩৯ সনে মূল একশতের তুলনায়) ছিল ৪৪৬, গত ডিসেম্বর মাসে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৪৫৫। ফেব্রুয়ারী মাসে বাজারে নূতন চাউল আসিলে উহা হ্রাস পাইয়া ৪৪২ হয়। কিন্তু মার্চ্চ মাসে, কেন্দ্রীয় বাজেটের পর, উহা ৪৫৩ মাত্রায় উঠে।

কাপড়-জামার দাম অত্যধিক বাড়িয়াছে। এই ক্ষেত্রেও গত জুলাই হইতে মূল্যমাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। ঐ মাসে উহা ৪৯৪ হয়। ক্রমান্বয়ে বাড়িতে বাড়িতে উহা চলতি বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে ৫০৭ হয়। কেন্দ্রীয় বাজেটের পর মার্চ্চ মাসে উহা ৫২০ মাত্রা স্পর্শ করে। (বর্ত্তমানে এক জোড়া সাধারণ ধুতি ১২।১৪৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না)।

গত বৎসর জুলাই মাসে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়মাত্রা ছিল ৩৯৪—নবেম্বর ও ডিসেম্বরে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৪০১। বর্ত্তমান বৎসরে ব্যয়মাত্রা ছিল ৩৯৪, কিন্তু মার্চ্চ মাসে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রকাশের পর উহা ৪০২ মাত্রায় উঠিয়া যায়।

উক্ত বণিক-সভার জনৈক অর্থনীতিবিদ্ বলেন, আজ যে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ, সেই পরিবারে ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। আগে যেখানে ১০০৲ টাকা মধ্যে ৭০৲ টাকাই খরচ হইয়া যাইত, সেখানে এখন ১০০৲ টাকা মধ্যে অন্ততঃ ৮৫৲ টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ, যে পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ, সেই পরিবারে মাসের শেষে বেশ বড় রকমের ঘাটা দেখা যাইবে। এই অবস্থার সঙ্গে যদি বেকার-সমস্যাটি গণ্য করা যায়, তবে বোঝা যায়, ব্যবহার্য্য দ্রব্য অথবা কারখানার পণ্যে বাজারে কেন মন্দা দেখা দিতেছে। নিত্যকার অপরিহার্য্য পণ্য অপরিহার্য্য প্রয়োজন মিটাইবার পর ঐ পরিবারের অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য কিনিবার মত কিছু থাকে না।

অনেকে মনে করেন, বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া অপরিহার্য্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত। মাদ্রাজে এরূপ একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায়ই বা এরূপ কমিটি নিয়োগে বাধা কি?

কোন বিপর্যয় ঘটিবার পূর্ব্বেই এই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার।"

রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা ও কংগ্রেস

ছয় সহস্র মুদ্রায় রবীন্দ্রনাথের স্মারক কি নির্ম্মিত হইতে পারে আমরা জানি না, তবে ফুটবল ক্রীড়া দর্শকগণ যে কংগ্রেসের এতটা মুখরক্ষা করিয়াছেন ইহাও ঢের। রবীন্দ্র-স্মৃতি সম্পর্কে ঐ স্থলে করা উচিত সেকথা না বলাই ভাল:

"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নিমতলা শ্মশানে একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণকল্পে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে ৬,০০০ টাকা শনিবার রবীন্দ্রভারতীকে দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রভারতীর সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় শনিবার সন্ধ্যায় সরকারী দপ্তর ভবনে সাংবাদিকদের উপরোক্ত সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করিয়া এইরূপ জানান যে, নিমতলা শ্মশানঘাটে ঐ স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, নিমতলাঘাটে কবিগুরুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণকল্পে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কিছুকাল আগে এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছিল। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে অনুরোধক্রমে ভারতীয় ফুটবল সমিতি এক 'চ্যারিটি ম্যাচ'-এর আয়োজন করেন। ঐ ম্যাচের বিক্রয়লব্ধ উপরোক্ত পরিমাণ টাকা সমিতির পক্ষ হইতে উক্ত স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণকল্পে দেওয়া হয়। স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণকল্পে একটি পরিকল্পনাও রচিত হইয়াছে। নিমতলাঘাটে ঐ স্মৃতিমন্দির নি

রা সম্ভবপর কিনা সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কর্পোরেশন-কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতভাবে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান-কার্য চলিতেছে। ইতিমধ্যে যথাসম্ভব সত্বর স্মৃতিমন্দির নির্মাণ পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য তিনি মেয়রকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার দোগেছিয়া ইউনিয়ন

'পল্লীবাসী' পত্রিকার ২৬শে বৈশাখ সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি বর্দ্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত দোগেছিয়া ইউনিয়নের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, প্রধানতঃ কৃষিনির্ভরশীল ইউনিয়নের দ্বাদশ সহস্র অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান-উন্নতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন উন্নততর যোগাযোগ-ব্যবস্থা। স্থানীয় অন্যান্য সমস্যা ব্যতীত কেবল-মাত্র উপযুক্ত রাস্তার অভাবেই এই অঞ্চলের কৃষি-উৎপাদকদের বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। উক্ত প্রতিনিধি লিখিতেছেন, পূর্বস্থলী থানার মধ্যে মুকসিমপাড়া ও দোগেছিয়া ইউনিয়নের ন্যায় পঞ্চাশখানি গ্রামের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও যাতায়াতের যোগাযোগ-হীন এলাকা আর এ অঞ্চলে নাই। একারণ এই দুইটি ইউ-নিয়নের অধিবাসিগণ সপ্তগ্রাম-কাটোয়া রাস্তার পূর্বস্থলী-কাটোয়া অংশটি যাহাতে এই দুইটি ইউনিয়নের মধ্য দিয়া যায় তজ্জন্য গত বার বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিতেছেন এবং বর্দ্ধমান জেলার দায়িত্বপূর্ণ অফিসারগণ ও প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাহা মানিয়া লইয়া মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধও করিয়াছেন। যদি সরকার অনুমোদন করেন তবে উক্ত পঞ্চাশখানি গ্রামের ২৫,৩০ হাজার অধিবাসীর প্রচুর উন্নতি হইবে এবং তাহারা প্রাণ ফিরিয়া পাইবে।"

আসানসোলে জলকষ্ট

আসানসোল শহরে অন্যান্য বারের মত এবারেও প্রবল জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। জলাভাবে জনসাধারণের দুর্গতির উল্লেখ করিয়া 'বঙ্গবাণী' লিখিতেছেন যে, যদি অবিলম্বে শহরের জলকষ্ট দূরীকরণে পৌরসভা সমর্থ না হন তবে পৌরসভার সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত। ইহাতে বর্তমান সদস্যগণ নিজেদের বিবেকের নিকট মুক্ত হইবেন এবং পৌরসভা পরিচালনার ভার সরকারের উপর পড়িবার ফলে জলকষ্ট দূরীকরণের জন্য সংকার চেষ্টা করিবার সুযোগ হইবেন।

বঙ্গবাণী এইরূপ তীব্র জলাভাবের কারণ সম্পর্কে লিখিতেছেন :

"আমরা শুনিলাম ডি. ভি. সি. নাকি ১৯৪৮ সন হইতে এখন পর্যন্ত জল দেওয়ার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির নিকট প্রায় দেড়, দুই লক্ষ টাকার বিল করিয়াছে। খোঁজ লইয়া জানা গেল এই জলের দাম সম্বন্ধে পৌরসভার সহিত ডি. ভি. সির নাকি পূর্ব্বে কোন contract বা চুক্তিই হয় নাই। নদীজলের অবাধ flow গতি বন্ধ করিয়া উহা ধরিয়া রাখিতেই বা কে বলিয়াছিল আর সেই ধরা জল ছাড়িয়া দিয়া তাহার দাম আদায়ের কথাই বা কে বলিয়াছিল? দামোদর নদের দুইপার্শ্বে যে সকল গ্রামবাসী দামো-দরের জল পান করিয়া থাকে ডি. ভি. সি তাহাদের নিকটও জলের দাম লইবে নাকি? আসানসোল শহর জলাভাবে অবর্ণনীয় কষ্ট-ভোগ করিতেছে আর ডি. ভি. সি জলের দাম শোধ না হওয়ায় জল বন্ধ করিতেছে বা করিবার প্রস্তাব করিতেছে—এ কথা সত্য হইলে ডি. ভি. সি'র মত উচ্চ শ্রেণীর একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের এই বেনিয়াবৃত্তি সম্পূর্ণ নিন্দার্হ ও সমর্থনের অযোগ্য।"

উপসংহারে 'বঙ্গবাণী' লিখিতেছেন যে, পৌরসভার সদস্যদের আশু কর্তব্য হইতেছে সরকারকে অনুরোধ করা যাহাতে ডি. ভি. সি'র কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত জল সরবরাহ করেন। তাহা সম্ভব না হইলে সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত।

বাসযাত্রীদের অসুবিধা ও সরকারী ঔদাসীন্য

"বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন :

"ডিসেরগড় হইয়া যে সকল বাস যাতায়াত করে তাহা যাহাতে ডিসেরগড়ে দামোদরের খেয়াঘাট অবধি গিয়া থামে এবং সেখান হইতে যাত্রী নামাইয়া দিয়া ও নূতন যাত্রী লইয়া তাহাদিগের গন্তব্য পথে যায় এজন্য ডিসেরগড় ও নদীপার অঞ্চলের জনসাধারণ বহুদিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন এবং বাস এসো-সিয়েশন, স্থানীয় এস. ডি. ও এবং আর. টি. এ'র সেক্রেটারী প্রভৃতি সকল স্থানে এই অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দরখাস্ত-আদিও করিয়াছেন। আমরাও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একাধিকবার বঙ্গবাণীতে আলোচনা করিয়াছি। এবং তাহাতে বার বার দেখাইয়াছি যে, এই সামান্য কার্যটুকু না করার ফলে যাত্রীদিগকে কিরূপ কষ্ট ও হয়রানি সহ্য করিতে হয়। অথচ ইহা করিতে বাসমালিকদিগের কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জনসাধারণ ও স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও বাসমালিক অথবা সরকারী কর্তৃপক্ষ কেহই এই সামান্য অসুবিধাটুকু দূরীকরণে অগ্রসর হন নাই। বাসমালিকগণ অর্থলোভী হইয়া হয়ত যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের কলমের এক খোঁচায় এ বিষয়ে অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া সম্ভব সেই সরকারী কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তায় পত্রিকাটি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন!

উপসংহারে "বঙ্গবাণী" লিখিয়াছেন : "আমরা পুনরায় এ বিষয়ে স্থানীয় এস. ডি. ও. এবং আর. টি. এ'-র সেক্রেটারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

বিচিত্রানুষ্ঠানের নামে প্রতারণা

হাবড়ায় "স্বামীজী সেবা সমিতি" নামে কোন প্রতিষ্ঠান কলি-

কাতার বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রীবৃন্দ উপস্থিত থাকিবেন ঘোষণা করিয়া স্থানীয় সিনেমা হলে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায় করেন। নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠানের সময় কিন্তু দেখা গেল যে, বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের মধ্যে কেহই উপস্থিত হইলেন না। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ স্থানীয় শিল্পীদের সাহায্যে অনুষ্ঠান চালাইবার চেষ্টা করিলে দর্শকবৃন্দ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাগণ পলায়ন করার সংবাদে বিক্ষুব্ধ হইয়া সিনেমা হলের আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া তছনছ করে।

১০ই বৈশাখ উপরোক্ত সংবাদ পরিবেশন করিয়া "বারাসাত-বার্ত্তা" "শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী কে?" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন :

"আধুনিক সাধারণ সমাজের অত্যন্ত দুর্ব্বল স্থানে ঘা মারিয়া, চিত্রতারকাদের নামে উক্ত বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক পক্ষ চড়া দামে প্রচুর টাকার টিকিট বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যদি প্রচারিত চিত্রতারকা ও শিল্পীবৃন্দের অনুপস্থিতির কারণ জনতার সম্মুখে দেখাইতে পারিতেন অথবা প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির সর্ত্তরক্ষায় অসমর্থতার জন্য জনতার দাবি অনুযায়ী বিক্রীত টিকিটের মূল্য ফেরৎ দিতেন তবে এইরূপ শোচনীয় পরিণতি ঘটিত না। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ লইয়া ব্যবস্থাপকবৃন্দের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে দর্শক ও প্রেক্ষাগৃহের মালিক পক্ষকে ফেলিয়া আত্মগোপনের পশ্চাতে পূর্ব্বের সুপরিকল্পিত নীতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং ভাওতা (ব্লাফ) দিয়া জনতার অর্থ আত্মসাতের প্রবৃত্তি পরিষ্কার উপলব্ধি করা যাইতেছে। ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে সাধারণ সমাজের মোটা অর্থ হস্তগত করিয়াছেন বলিয়া কেহ অভিমত প্রকাশ করিলে স্বামীজীর নামাশ্রয়ী ঝাবড়ার কোন এক সেবাধর্ম্মী প্রতিষ্ঠানের সুনামে কলঙ্কপাত হইবে না।"

মানভূমের দুরবস্থা

১৮ই বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মানভূমের দুর্দ্দশা সম্পকে আলোচনা করিয়া "সংগঠন" লিখিতেছেন :

"আজ মানভূমের গ্রামে গ্রামে খাদ্যাভাব, তদপেক্ষাও বেশী জলাভাব—আজ গ্রামের মানুষের পানীয় জল নাই, স্নানের জল নাই—এমন এমন গ্রাম রহিয়াছে যে গ্রামে ঘোলা কর্দ্দমাক্ত জলও গবাদি পশুদের পানের জন্য পাওয়া যায় না, অথচ মানভূমে জলাশয়ের নামে, কূপখননের নামে, পুষ্করিণী খননের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হিসাবনিকাশ প্রস্তুত হইল, সরকারী তহবিল হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা উধাও হইল।"

"সংগঠন" লিখিতেছেন, মানভূমের বিহারে থাকা সত্ত্বেও মানভূমবাসী বিহার সরকারের করুণা-বঞ্চিত। ধানবাদে এক ভাঁড় জলের দাম চার টাকা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ২৪৲ টাকা মণ দরেও চাউল মিলিতেছে না। "বিগত কয়েক বৎসরের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যখন হইতে মানভূমকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ও লক্ষ লক্ষ মণ চাউল মানভূম হইতে বাহিরে রপ্তানী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঠিক সেই সময় হইতেই অস্বাভাবিক দরবৃদ্ধি ও মূল্য দিয়াও চাউল প্রাপ্তির অভাব হেতু স্থানীয় অধিবাসিগণকে অন্য খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিতে হয়। উদ্বৃত্ত অঞ্চল ঘোষণা করার ফলেও মানভূম হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানীর জন্যই মানভূমের বুকে দুর্ভিক্ষের ছায়া। মানভূমের এই খাদ্যাভাব বিহার সরকারের অবিবেচনার ফলে বিহার সরকার কর্ত্তৃক সৃষ্ট।"

করিমগঞ্জে রাস্তাঘাটের অসুবিধা

আসামের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার রাস্তাঘাটের দুর্দ্দশা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

"করিমগঞ্জ মহকুমার সর্ব্বত্র পি. ডব্লিউ. ডি. এবং ই. এণ্ড ডি রাস্তার অবস্থা অবর্ণনীয়। মাত্র ৪৫ দিনের বৃষ্টিতে যদি রাস্তা যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হইয়া যায় তবে পুরা বর্ষায় রাস্তাগুলি কিরূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহা ভাবনার বিষয়। নীলামবাজার হইতে আরম্ভ করিয়া চুরাইবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তায় নূতন মাটি দেওয়া হইয়াছে, ফলে মালবাহী ট্রাক বা যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এই রাস্তার গুরুত্ব খুব বেশী; কারণ এই রাস্তা দিয়া নীলামবাজার, পাথারকান্দি, দুল্ল ভছড়া, রাতাবাড়ী অর্থাৎ মহকুমার প্রায় সব বড় বাজারে যাইতে হয়। ত্রিপুরার সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্রও এই রাস্তা। শিলচর-রাস্তায় গত দুই দিন ধরিয়া কোন ট্রাক মাল নিয়া যাইতে রাজী নয়। অন্যান্য রাস্তারও অনুরূপ অবস্থা।"

উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করিমগঞ্জ বাজার ও সন্নিহিত রাস্তাগুলির দুরবস্থারও উল্লেখ করা হইয়াছে। করিমগঞ্জ-লক্ষ্মীবাজার রাস্তায় পূর্ত্তবিভাগ কতকগুলি ঝামা পাথর এরূপ ভাবে ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাতে পথচারীদিগকে বিশেষভাবে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

'যুগশক্তি' লিখিতেছেন :

"রাস্তার এই দুরবস্থার বিষয়ে আমরা ইতোপূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি মার্চেন্টস এসোসিয়েশন শিলঙে মন্ত্রী ও চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে টেলিগ্রাম করতঃ যে প্রকারে হউক রাস্তাগুলি চালু রাখার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং স্থানীয় ট্রাক এসোসিয়েশন হইতেও অনুরূপ টেলিগ্রাম করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। কিন্তু অবস্থা দেখিয়া মনে হয় আমাদের গবর্ণমেণ্টের কাজের কোন সুপরিকল্পনা নাই। কোন কাজই সময়মত হয় না। ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইয়া যাইতেছে—তাই তাড়াহুড়া করিয়া সব রাস্তায় কিছু মাটি ফেলা হইল; কিন্তু কি ভাবে রাস্তা যানবাহনের উপযোগী রাখা যায় সেদিকে দৃষ্টি নাই—ফলে আজ সর্ব্বত্র এই

ব্যবস্থা এবং আমাদের আশঙ্কা এই বর্ষায় কোন রাস্তায়ই বাস বা ট্রাক চলিতে পারিবে না। অনেক পুলের নিকটবর্ত্তী জায়গায় ৩৪ ফুট মাটি দেওয়া হইয়াছে, ট্রাক বা বাস সেই রাস্তা দিয়া গেলে চাকা কাদায় ডুবিয়া যায়। ইহাতে পেট্রল খরচ বেশী হয়, গাড়ী নষ্ট হয়, অতিরিক্ত সময় লাগে, দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির আশঙ্কাও রহিয়াছে।"

সংবাদের উৎস সম্পর্কিত আইন

সিংহলের নব-অধিষ্ঠিত বন্দরনায়ক সরকার স্থির করিয়াছেন যে, রাষ্ট্র সম্পর্কিত সাধারণ গোপন সংবাদ প্রকাশ করিলে সংবাদপত্রগুলিকে তাহাদের প্রকাশিত সংবাদের উৎস প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবে। এই সম্পর্কে আইন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রীসভা আইন-বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীএম. ডব্লু. ডি. ডিসিলভাকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাক্তন কোটলেওয়ালা মন্ত্রীসভাও অনুরূপ একটি বিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু সংবাদপত্রগুলির সমালোচনায় শেষ পর্য্যন্ত উহা পরিত্যাগ করেন।

নেপাল মহারাজের রাজ্যাভিষেক

নেপাল মহারাজের অভিষেকের সংবাদ এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছে :

"কাঠমাণ্ডু, ২রা মে—আজ সকাল ১০৷৷টায় সুপ্রাচীন হনুমান ঢোকা প্রাসাদে মহারাজা পঞ্চশ্রী মহেন্দ্র বীরবিক্রম শাহ দেবের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠান প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের অনুসারী।

ভারত, চীন, ব্রহ্ম, সিংহল, পাকিস্থান, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের প্রতিনিধি দল এবং দালাইলামা ও পাঞ্চেনলামার প্রতিনিধিগণ ইহাতে উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ঠিক ৯৷৷টায় শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অবিরাম মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পুণ্যস্নান আরম্ভ হয়। তার পর সকাল ...টায় রাজা প্রার্থনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেন। জ্যোতিষীর নির্দ্দেশানুযায়ী সকাল ১০টা ৪৩মিঃ শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত হইলে মহারাজা রত্নখচিত রাজমুকুট ধারণ করেন এবং ষাঁড়, বিড়াল, চিতাবাঘ সিংহ ও বাঘের চামড়ার উপর স্থাপিত রাজপ্রতীকবাহী সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় সঙ্গীত বাজান হইতে থাকে।

বর্ত্তমান বিশ্বে নেপালই একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। এই প্রথমবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নেপালের রাজ্যাভিষেকে যোগদান করিলেন। শতাধিক সাংবাদিক ও চিত্রগ্রহণকারী অনুষ্ঠানের বিবরণ সংগ্রহ ও চিত্রগ্রহণ করেন।

উল্লেখ করা যায়, ১৯১৩ সনে রাজা ত্রিভুবনের রাজ্যাভিষেক হয়।"

এই ক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর নেপালে এই প্রথম উন্মুক্ত দরবারে রাজ্যাভিষেক হইল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে নেপালের মহারাজাধিরাজ নামে মাত্র রাজদণ্ড ধারণ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে রাজশক্তির প্রতীকরূপে নিভৃতে প্রতিষ্ঠা করিয়া ও বন্দী রাখিয়া, জঙ্গ বাহাদুরের বংশধরগণ নেপাল শাসন ও শোষণ করিতেন।

ভারত ও পাকিস্থানের লেনদেন

পাকিস্থান কোন দিন ভারতের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করে নাই। ভারতের অনিষ্ট করাই তাহার উৎপত্তির কারণ ও ব্যবহারিক মূলনীতি। তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমরা নিম্নরূপ সংবাদ পাই :

"নয়াদিল্লী, ১১ই মে—ভারত ও পাকিস্থান সরকারের অর্থ-দপ্তরের প্রতিনিধিদের মধ্যে তিন দিবসব্যাপী আলোচনা সমাপনান্তে প্রচারিত একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে উভয় দেশের জনসাধারণকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে উভয় দেশের মধ্যে অর্থপ্রেরণের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির সম্ভাব্যতা ভারত ও পাকিস্থান সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা হয়। পাকিস্থান কর্ত্তৃক দেশ বিভাগের পূর্ব্বেকার ঋণের অংশ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা পরিশোধ এবং সেই বাবদ সুদ ভারতকে প্রদান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সমস্যাসমূহের মীমাংসার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই উভয় দেশের অর্থমন্ত্রীদ্বয় মিলিত হইবেন।

ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রতিনিধিদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয় এবং এই আলোচনার ফলে অর্থমন্ত্রীদ্বয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা হইবে।

কর্ম্মী ও কার্য্যচালনা

ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজি, ডি. আম্বেকার তাঁহার ভাষণে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

এই অভিমত অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ নহে। কেন নহে তাহা আমরা আজিকার অবস্থার বিচার করিয়াই বলিতেছি।

এতাবৎ এ দেশে শ্রমিক-নেতৃবর্গ—অন্য নেতাদেরই পথ অনুসরণ করিয়াই—শুধুমাত্র অধিকার ও দাবীর কথার উপরই জোর দিয়াছেন। অধিকার ও দায়িত্ব যে পরস্পরের উপর শুধু নির্ভর করে না, একের সঙ্গে অন্যের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ আছে, একথা তাঁহারা সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই। শ্রীআম্বেকার তাহার আভাসমাত্র দিয়াছেন, স্পষ্ট ভাবে বলেন নাই যে দায়িত্ব গ্রহণ দাবির অঙ্গ :

সুরাট, ৬ই মে—গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় এমন একটি রীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, যে রীতি অনুসারে উৎপাদনকারী কর্ম্মীদের উপর গণতান্ত্রিক উপায়ে শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব শেষ পর্য্যন্ত অর্পিত হইবে।

"অদ্য এখানে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণে শ্রী জি. ডি. আম্বেকার উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

শ্রীআম্বেকার বলেন, "কর্ম্মীদের উপর রাতারাতি এই দায়িত্ব যে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করা যাইতে পারে না, তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহাই উহা পরীক্ষামূলকভাবে আরম্ভ না করিবার অছিলা হইতে পারে না।"

শ্রীআম্বেকার প্রস্তাব করেন যে, প্রথমতঃ কতকগুলি বিষয়, বিশেষতঃ কর্ম্মীদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পারস্পরিক সম্মতিতে গৃহীত সুনির্দ্দিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ অনুসারে পরিচালনার ভার তাহাদের উপর দেওয়া উচিত। অধিকন্তু উৎপাদন, সংগঠন, শিল্প-সংক্রান্ত সম্পর্ক ইত্যাদির মত বিষয়সমূহ সম্পর্কে কর্ম্মীদের উপদেষ্টা পরিষদ থাকা উচিত। এই পরিষদের পরামর্শ একান্ত প্রতিকূল না হইলে যথেষ্ট কারণ ব্যতীত অগ্রাহ্য হওয়া উচিত হইবে না। ইহার ফলে শিল্পে যে তাহাদেরও স্বার্থ আছে সে সম্পর্কে তাহাদের আস্থা জন্মিবে এবং তাহাদেরও যে শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে দায়িত্ব আছে —এই গর্ব্ব তাহাদের মনে জাগ্রত হইবে।

শ্রীআম্বেকার বলেন যে, স্বাধীনতার ফলে নবচেতনা জাগ্রত হওয়ায় এবং কংগ্রেস সরকার কর্ত্তৃক তাহা স্বীকৃত হওয়ায় কর্ম্মীরা বর্ত্তমানে সমাজে উৎকৃষ্টতর স্থান লাভ করিয়াছে। সামাজিক নিরাপত্তা-লাভ, সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থারও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাহারা এখন সোজা হইয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহাদের স্বাধীনতা পূর্ব্বকালের হীনমন্যতা অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কর্ম্মীরা তাহাদের সমস্যা সম্পর্কে অধিকতর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অর্জ্জন করিয়াছে এবং ইহা অত্যন্ত আশার লক্ষণ। তাহারা তাহাদের সহযোগিতার এবং শিল্প ও শ্রমিকের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বোধ করে।

ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি বলেন যে, মালিকদের মধ্যে যাঁহারা প্রগতিশীল, তাঁহারা শ্রমিক ও তাহাদের প্রতিনিধিগণের সহিত আলাপ আলোচনার এবং শ্রমিকদের দাবি মানিয়া লইবার অল্পাধিক পরিমাণে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। মালিকদের মধ্যে যাঁহারা রক্ষণশীল, তাঁহারা শ্রমিকদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করিতে এবং শ্রমিকদের সহিত আলাপ আলোচনার দ্বারা সমস্যার সমাধান করিতে এখনও অনিচ্ছুক।

কলিকাতা বন্দরে ধর্ম্মঘট

কলিকাতা বন্দরের শ্রমিক ধর্ম্মঘটে বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল। তাহার বিবৃতির ও কারণের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। শ্রমিক-স্বার্থে দেশের ও কোটি লোকের স্বার্থহানি কি ভাবে হয় তাহার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইবে :

"রবিবার কলিকাতা বন্দরের শ্রমিকদের ১৪ দিনব্যাপী কর্ম্ম-বিরতির অবসান ঘটে। ঐদিন ডক লেবার বোর্ডের অধীন প্রায় ৮,০০০ কর্ম্ম-বিরত শ্রমিক ও কয়লা বার্থের প্রায় ২,০০০ কর্ম্ম-বিরত শ্রমিক কাজে যোগদান করে এবং ১৪ দিন পর বন্দরের স্বাভাবিক কাজ আবার চালু হয়। ঐদিন জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাসের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গত ১৫ই এপ্রিল হইতে উক্ত শ্রমিকগণ মধ্য মাসের অগ্রিম মাহিনা দিতে বিলম্ব হওয়ায় কাজে যোগদান করিতে অস্বীকার করে। ফলে, কলিকাতা বন্দরে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ১৪ দিন মাল বোঝাই ও খালাস না হওয়ার দরুন মোট প্রায় ৮০টি জাহাজে ও প্রায় ৫০,০০০ টন মাল বন্দরে আটক পড়িয়া থাকে।

প্রকাশ, রবিবার সমস্ত শ্রমিক কাজে যোগ দেওয়ায় জাতীয় রক্ষীদলের স্বেচ্ছাসেবকগণের একাংশকে বন্দরের কাজ হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে জাতীয় রক্ষীদলের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণকে বন্দরের কাজ হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

রবিবার রাত্রে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ার পর কলিকাতা পোর্ট ও ডক লেবার বোর্ডের চেয়ারম্যান এক বিবৃতিতে বলেন, যথেষ্ট কারণ থাকিলেও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দরের কাজ বন্ধ করিবার মত যথেষ্ট কারণ ছিল না। পোর্টের কমিশনারগণ এবং ডক লেবার কমিটি এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোন মাসের পনর তারিখ রবিবার হইলে পূর্ব্বে যথাযথ নোটিশ দিয়া ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শনিবার কিংবা ইহার পরের দিন বেতন দেওয়া হইবে। ধর্ম্মঘট চলাকালে শ্রমিক প্রতিনিধিগণ আরও কতকগুলি দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু এই সকল দাবির মধ্যে কয়টি যে শ্রমিকদের পক্ষে বাস্তবিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা বলা কঠিন। ইহাদের মধ্যে শ্রমিকগণের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত দাবি কমিশনারগণ এবং ডক লেবার বোর্ড যথাসম্ভব শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসুক।

ধর্ম্মঘট চালু অবস্থায় এক বিবৃতিতে আমরা নিম্নের সংবাদ পাই:

"কলিকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান শ্রীমিত্র সাংবাদিকদের বলেন যে, বন্দরের কার্য্যে নিযুক্ত জাতীয় রক্ষীদলের প্রায় ১২০০ কর্ম্মী সন্তোষজনক কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা এই দিন আর একটি কোল বার্থেও কার্য্য সুরু করিয়াছেন বলিয়া তিনি জানান।

এই সম্পর্কে কলিকাতা ষ্টিভেডোর্স এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শ্রীনরেশনাথ মুখার্জ্জি এক বিবৃতিতে বলেন, গত তিন বৎসরে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ডক লেবার বোর্ডের মাধ্যমে বন্দর শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবিধান, বর্ত্তমানে কলিকাতার রেজিষ্টার্ড ডক শ্রমিকদের ছুটি এবং হাজিরা বেতন ছাড়াও মাসে ন্যূনতম ১২ দিন কাজ এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরে কাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মসংস্থান প্রভৃতি ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকগণ বাজে অজুহাতে নোটিশ না দিয়া ধর্ম্মঘট করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমি শ্রমিকদিগকে অবস্থার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া আইনসম্মত উপায়ে ডক লেবার বোর্ডের নিকট তাহাদের দাবিদাওয়া করিতে আহ্বান জানাইতেছি। আমার বিশ্বাস উহা বোর্ড এবং জাহাজী ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সকলে যথাযোগ্যভাবে বিবেচনা করিবেন।

বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ

অধ্যাপক শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য, এম-এ

জ হইতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ ভ করেন। তাঁহার নির্বাণলাভের পর বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বহু ভেদের সৃষ্টি হয় এবং উহার মূলে ছিল তাঁহার শিষ্যদের নিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্য। বুদ্ধের দর্শন সম্পূর্ণ ভাবে ক্তর উপর প্রতিষ্ঠিত। বিচার ও যুক্তির দ্বারা স্থিরনিশ্চিত হইয়া কোন বাণী গ্রহণ করিতে তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ নাই। তিনি বলিয়াছেন—তাপদাহে যেরূপ অগ্নির দ্ধি পরীক্ষিত হয়, সেইরূপ তাঁহার বাক্য যেন অনুসরণের র্ব পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করা হয়। শ্রদ্ধা অপেক্ষা যুক্তিই বান।[১] এই জগতের স্বরূপ কি, আত্মা আছে কিনা, াণের স্বরূপ কি—এ বিষয়ে শিষ্যগণ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন রিয়াছিলেন, কিন্তু নির্বাণের স্বরূপ জানা অপেক্ষা নির্বাণ-ভের উপায় কি, কোন্ পথে ক্লেশদগ্ধ মানব এই ভবযন্ত্রণা তে মুক্তিলাভ করিতে পারে—তিনি সেই মার্গের নির্দেশ াছেন। দুঃখবিনাশের মার্গ অবলম্বন কর—এই কর্ম-থই মানবের চিরশান্তি লাভ, সেই নির্বাণ-অবস্থায় মানবের ান অস্তিত্ব থাকে কিনা—সে কূট বিচারে সাময়িক ান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্ত তাহাতে চিরতরে স্থ হইবে না। তাঁহার উপদেশাবলী প্রধানতঃ ব্যবহারিক। তিক জীবনের উচ্চতম স্তরে উপনীত হইবার যে পন্থা—হারই নির্দেশ বুদ্ধবাণীর প্রধান অঙ্গ।

বুদ্ধদেবের শিষ্যসম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত—সৌত্রান্তিক, ভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। নির্বাণ সম্বন্ধে ইঁহাদের ধ্যে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে।

ভারতীয় দর্শনের মূল সুর দুঃখবাদ—কিন্তু উহা চরম কথা । দুঃখের পর সুখের আস্বাদলাভের সম্ভাবনা আছে, স্তুতঃ দুঃখ হইতে পরিত্রাণের পথ ত আছেই। দুঃখ যেমন ত্য,[২] দুঃখ হইতে মুক্তি তেমনই সত্য। বুদ্ধদেব চারি কার আর্যসত্যের উপদেশ করিয়াছেন—দুঃখ, সমুদয়, রোধ ও মার্গ। দুঃখ আছে, সমুদয় অর্থে কারণ—ঐ দুঃখের রণ আছে, সেই কারণের নিরোধও আছে এবং সেই দুঃখের ত্যন্তিক উচ্ছেদসাধনের উপায়ও আছে। নৈয়ায়িকপ্রবর দ্যোতকরও এই চারিপ্রকার আর্যসত্যকেই 'অর্থপদ' রূপে ভহিত করিয়াছেন—হেয়, হান, উপায় ও অধিগন্তব্য। হেয় অর্থে দুঃখ ও তাহার কারণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি। হান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান; সেই তত্ত্বজ্ঞানলাভের 'উপায়' শাস্ত্র। 'অধিগন্তব্য' পদের অর্থ মোক্ষ৩। এই সর্ববাদিসম্মত দুঃখ হইতে পরিত্রাণই নির্বাণ।

প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগ হইতে নির্বাণ পদটি মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। মহাভারতে নির্বাণ পদটির বহুবার উল্লেখ আছে। পাণিনির "নির্বাণোঽবাতে:" (৮।২।৫০) সূত্রটির সাহায্যে ইয়ামাকামি সোগেন নামক বৌদ্ধদর্শনবিদ্ অনুমান করিয়াছেন যে, নির্বাণ পদটি পূর্বে অভাবার্থে ব্যবহৃত হইত। প্রদীপের নির্বাণ অর্থে আলোকের অভাবই বটে। এই প্রসঙ্গে তিনি পালিগ্রন্থ হইতে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন৪—দিপস্‌স্ ইব নিব্বানম্ বিমোক্‌খো আহু চেতসো—অর্থাৎ, দীপনির্বাণের মত চিত্তধারার নির্বাণই মোক্ষ। কিন্তু ইহা যে সকল-বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কথা নয় তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

হুয়েন সাঙ্ হীনযান সম্প্রদায়ের 'অভিধর্মমহাবিভাষা শাস্ত্র' নামক অভিধান গ্রন্থটির চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত অনূদিত গ্রন্থে নির্বাণ পদের কয়েকটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণীত আছে। (ক) বান্ অর্থাৎ জন্মান্তরের পথ নির্ অর্থে মুক্ত। অর্থাৎ—যাঁহার জন্মান্তরের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। (খ) বান্-দুর্গন্ধ, নির্—অভাব অর্থাৎ, কর্মবন্ধনরূপ দুর্গন্ধের আত্যন্তিক অভাব। (গ) বান—গহন অরণ্য, নির্—চিরতরে মুক্তি। অর্থাৎ, রাগদ্বেষ মোহ জন্ম স্থিতি বা লয়রূপ গভীর অরণ্য হইতে মুক্ত হইয়া যিনি জ্যোতির সন্ধান পাইয়াছেন তিনি নির্বাণলাভ করিয়াছেন। (ঘ) বান—বয়ন, অর্থাৎ—জন্মমৃত্যুর বয়ন হইতে মুক্তি।

উপরোক্ত অর্থগুলি হইতে প্রতিপন্ন হয়—জন্ম ও ভবযন্ত্রণা হইতে যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি তাহাই নির্বাণ। বৌদ্ধদর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িকপ্রবর উদয়নও বলিয়াছেন—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি যে মোক্ষ এ বিষয়ে কাহারও মত-বিরোধ নাই।৫

এই দুঃখের স্বরূপ কি? বুদ্ধদেব দুঃখ-বিনাশের জন্য

১। কমলশীল—তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা, পৃঃ ১২।

২। ...দুঃখ সংসারস্য দুঃখাত্মকত্বং সর্বতীর্থকরসম্মতম্। সর্বদর্শনসংগ্রহ—...দর্শন।

৩। ন্যায়বার্তিক পৃঃ ১১ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ)।

(৪) S. Yamakami—Systems of Buddhistic Thouht পৃঃ ৩১।

৫। দুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী অত্র বাদীনামবিবাদ এব—কিরণাবলী।

চরম সত্য প্রচার করিলেন—সর্বমনিত্যং, সর্বমনাত্মং, নির্বাণং শান্তম্। এ জগতের সকল পদার্থই অনিত্য ক্ষণমাত্রস্থায়ী। এই ক্ষণিকত্ববাদের উপর বৌদ্ধদর্শনের ভিত্তি। সমস্ত পদার্থই যখন ক্ষণিক তখন জ্ঞানও ক্ষণিক, জ্ঞানের আশ্রয় নিত্য পদার্থ কিছু নাই—নিত্য আত্মার অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না—করিতে পারেন না। কারণ স্থায়ী আত্মা স্বীকার করিলে আত্মাভিমান আসিবে। রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি অবিদ্যার কারণের ক্ষয় অসম্ভব হইবে। অতএব মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করিবে—নিত্য আত্মা নাই। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) ত সিদ্ধ বস্তু। অতএব বৌদ্ধ বিজ্ঞানধারা (Consciousness-Continuum) স্বীকার করেন। এক দেহের ক্ষয় হইলে এই বিজ্ঞানধারা অন্য দেহকে আশ্রয় করে। এইরূপে জন্মমৃত্যুর বন্ধন চলিতে থাকে। অতএব 'নিত্য কোন পদার্থ নাই', 'নিত্য আত্মা নাই' এইরূপ প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে করিতে চিত্তের যে আবরণ তাহার ক্ষয় হইবে।

হীনযান সম্প্রদায়ের মতে দুঃখ ত্রিবিধ—দুঃখ দুঃখতা অর্থাৎ মানসিক ও দৈহিক দুঃখ, সংস্কার-দুঃখতা অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর জন্য যে দুঃখভোগ, এবং বিপরিণাম-দুঃখতা অর্থাৎ সুখভোগের পর যে দুঃখ। নির্বাণে এই ত্রিবিধ দুঃখের উপশম হইবে।৬ চিত্তের আবরণ দুই প্রকার—ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণ। রাগ, দ্বেষ, মান, অবিদ্যা, দৃষ্টি ও বিমতি (সংশয়), চিত্তের এই ছয় প্রকার ধর্মই 'ক্লেশ' নামে অভিহিত। এই ক্লেশগুলির জন্যই পুদ্গল সংসারবন্ধনে আবদ্ধ। এই সকল অনুশয় বা ক্লেশ আত্মাভিমানের উপর নির্ভর করে। আত্মাভিমান দূর হইলে ক্লেশও দূর হইবে। প্রথমে নৈরাত্ম্য বিষয়ে গুরুর উপদেশলাভ—উহা শ্রুতময় প্রজ্ঞা। পরে যুক্তিতর্কের দ্বারা উহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা—উহাই চিন্তাময়। এই মননের দ্বারা মল বা সংশয় দূরে যায়। তখন ভাবনাময় দর্শন বা নৈরাত্ম্যরূপ সত্যের উপলব্ধি। এই মার্গকেই বেদান্ত বা যোগদর্শনে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বলা হইয়াছে। ইহার পর অনাবরণাত্মক জ্ঞানের উদয় হয়। উহাই নির্বাণ। অতএব দুঃখের কারণ সমূহের ধ্বংসের জন্য সর্বদা তৎপর হইতে হইবে, তবেই অনাগত দুঃখের সম্ভাবনা চিরতরে তিরোহিত হইবে। ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকরাজা মিলিন্দ মহাস্থবির নাগসেনকে প্রশ্ন করিলেন "কি কারণে এই তপশ্চর্যা" ? নাগসেন উত্তর দিলেন "মহারাজ ! বর্তমান দুঃখ নিরুদ্ধ হইবে এবং অপর কোন

৬। ন্যায়বার্তিককারের মতে দুঃখ একবিংশতি প্রকার। সাংখ্যদর্শনে দুঃখ ত্রিবিধ।

দুঃখ উৎপন্ন হইবে না, এই জন্য এই উত্তম কা[illegible] থাকি।"৭

পূর্বে যে ছয় প্রকার ক্লেশের কথা বলা হইয়াছে, ঐ [illegible] বা অনুশয়গুলির যাহা মূল তাহাই বৌদ্ধশাস্ত্রে অবিদ্যা [illegible] বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তের অবিদ্যা হইতে বে[illegible] দর্শনের অবিদ্যা মূলতঃ পৃথক। অদ্বৈতবেদান্ত মতে অ[illegible] অনির্বচনীয়। উহা সৎ বস্তু নয়, অসৎও নয়, সদসৎও ন[illegible] অবিদ্যা জগতের উপাদান কারণ (Material cause [illegible] কিন্তু বৌদ্ধমতে অবিদ্যা অনির্বচনীয় নয়। কোন পা[illegible] অনির্বচনীয় হইতে পারে না। অবিদ্যা ভাব-পদা[illegible] যোগাভ্যাসের ফলে নৈরাত্ম্যদর্শনের আবির্ভাব হইলে অবি[illegible] নাশ হয়।

এই নির্বাণের স্বরূপ বিষয়ে এক দিকে সৌত্রান্তিক, [illegible] দিকে বৈভাষিক তাঁহাদের স্বমত প্রচার করিয়াছেন। জ্ঞা[illegible] ধারা সমল অবস্থায় চলিতে থাকে। চতুর্বিধ আর্যস[illegible] অনুশীলন দ্বারা ঐ জ্ঞানধারার নিরোধ হয়। সৌত্রা[illegible] বলেন, মুক্তিতে জ্ঞানধারার বিচ্ছেদ হয়। উহার পর [illegible] কিছুই থাকে না, সবই শূন্য। বিষয়সম্পর্কিত বিজ্ঞান[illegible] একমাত্র সত্য, নৈরাত্ম্যদর্শনের ফলে ঐ বিজ্ঞানধারার [illegible] হয়। কারণ বিষয়ের দ্বারা উপহিত না হইয়া কোন বিজ্ঞ[illegible] থাকিতে পারে না। তাই সৌত্রান্তিক মতে চিত্তপ্রবা[illegible] বিরতিই মুক্তি। গুণরত্ন বলিয়াছেন, নৈরাত্ম্য-ভাবনা হই[illegible] জ্ঞানসন্তানের উচ্ছেদ হয়, উহাই মোক্ষ।৮ অত[illegible] সৌত্রান্তিক মতে নির্বাণ অভাবাত্মক। বাঙালী দার্শ[illegible] শ্রীধরাচার্য এই সৌত্রান্তিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন।৯ শূ[illegible] বাদী বৌদ্ধদার্শনিক নাগার্জুনও সূক্ষ্ম যুক্তিজাল বিস্তার ক[illegible] সৌত্রান্তিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

শান্তরক্ষিত ও কমলশীল ভাবরূপ নির্বাণ স্বীকার করে[illegible] বহুস্থলে তাঁহারা নিজদিগকে সৌত্রান্তিক রূপে অভি[illegible] করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত [illegible] সৌত্রান্তিকসম্মত নয় তাহার পরিচয় আমরা গুণরত্নের উ[illegible] হইতে পাইয়াছি। উপরোক্ত দার্শনিকদ্বয়ের মত বৈভাষি[illegible] সম্মত বলিয়াই মনে হয়। পূর্বে যে অনুশয় বা ক্লেশের ক[illegible] বলা হইয়াছে, ঐ ক্লেশগুলির সহিত চিত্ত অনাদিক[illegible] হইতে যুক্ত থাকে। ক্লেশযুক্ত চিত্তকে ক্লিষ্ট বা উপপ্ল[illegible] বলা হয়। চিত্তের এই উপপ্লুত-অবস্থার নাম সংসার

৭। "ইদঞ্চ দুক্খং নিরুজ্ঝেয্য, অঞ্ঞঞ্চ দুক্খং ন উপ্পজ্জেয্যাতি", মি[illegible] পঞ্হো ৩।৭।৩

৮। সর্বদর্শনসমুচ্চয়টীকা, পৃঃ ৪৭।

৯। ন্যায়কন্দলী পৃঃ ৫৩।

ন। চতুর্বিধ আর্যসত্যকে অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষ বনা করিতে করিতে প্রতিসংখ্যা নিরোধ' হয়। প্রতি-খ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা সমল চিত্তপ্রবাহের গতি নিরুদ্ধ। ঐ নিরোধ হইলে ক্লেশের ধারা স্তব্ধ হইয়া যায়, ক্লেশের হতে চিত্তধারার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। যোগী তখন বনামার্গে প্রবিষ্ট হন। এইরূপে যোগীর চিত্ত উপপ্লব-হিত হইয়া যায়। এই উপপ্লবরহিত চিত্তপ্রবাহ আর ছিন্ন হয় না। তখন শুদ্ধ জ্ঞানধারা চলিতে থাকে। ত্রান্তিক বলিয়াছেন, বিষয়সম্পর্কিত বিজ্ঞানই একমাত্র। বৈভাষিক বলেন, শুদ্ধবিজ্ঞানও সৎ। এই শুদ্ধবিজ্ঞান-বাহের উচ্ছেদ হয় না বলিয়া উহাকে 'ধ্রুব' বলা হইয়াছে।১০ তএব আগন্তুক-মলনির্মুক্ত কেবল চিত্তের স্থিতিই মুক্তি।১১ ধর উহাকেই বলিয়াছেন—'নিখিলবাসনোচ্ছেদে বিগত-ষয়াকারোপপ্লববিশুদ্ধজ্ঞানোদয়ো মহোদয়ঃ'১২ —সকল মনা-বাসনার উচ্ছেদ হইলে বিষয়রহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়, উহাই মহোদয় বা মুক্তি। এই জন্যই বলা হইয়াছে, র্বাণ শিব বা মঙ্গলময় (শিবমিতি নির্বাণমুচ্যতে—তত্ত্বসংগ্রহ ঞ্জিকা ৩:২২)।

১০। মাধ্যমিককারিকা ২৫।৩

১১। আগন্তুকমলাপেতচিত্তমাত্রত্ববেদনাৎ—তত্ত্বসংগ্রহ, শ্লোক ৩৫৩৫-৩৬।

১২। ন্যায়কন্দলী পৃঃ ৫৩।

এই প্রসঙ্গে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব স্মরণীয়। সৃষ্টিকালে প্রকৃতির দুই প্রকার পরিণাম বা পরিবর্তন। প্রকৃতিই (Matter) জগতের উপাদান-কারণ। সৃষ্টিকালে প্রকৃতিই মহদাদি রূপে পরিণত হয়। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। সৃষ্টিকালে কোথাও সত্ত্বগুণের বা রজঃ গুণের কিংবা তমঃগুণের আধিক্য দেখা যায়, উহাই প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম; আবার প্রকৃতিও নিজে নিজে পরিবর্তিত হইতে থাকে, উহা সদৃশ পরিণাম। এই বিসদৃশ পরিণাম স্তব্ধ হইলেও প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম চলিতে থাকে—সেইরূপ বৈভাষিকেরও ক্লেশধারা নিরুদ্ধ হইলে উপপ্লবরহিত চিত্ত-প্রবাহ চলিতে থাকে। উহাই নির্বাণ।

অনেকে পরিনির্বাণ ও নির্বাণের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয় করিয়াছেন। নির্বাণ অর্থে জীবন্মুক্তি, দেহধারণ করিয়া যে অবিদ্যাক্ষয় তাহাই জীবন্মুক্তি বা নির্বাণ। ঐ অবস্থায় পঞ্চ স্কন্ধ অবশিষ্ট থাকে। অতএব উহাকে সোপাধিশেষ নির্বাণ বলা হইয়াছে। নিরুপাধিশেষ নির্বাণই পরিনির্বাণ। উহাই পরমমুক্তি। তখন দেহ অবশিষ্ট থাকে না, পঞ্চস্কন্ধের ধ্বংস হয়।১৩ শিষ্যোপদেশের জন্যই নির্বাণ বা জীবন্মুক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। শিষ্যোপদেশের পর বুদ্ধদেব এই পরিনির্বাণই লাভ করিয়াছিলেন।

১৩। মাধ্যমিককারিকা ২৫।৫।

সাগর-বেলায়

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সাগর-বেলায় ঝিনুক-শামুক কোঁচড়ে কুড়ায়ে নিয়া,
তুমি আর আমি খেলাঘর সাধে গড়িয়া তুলি যে প্রিয়া;
ঝিনুক-শামুক-বালুকণা আর কাঁকরে মিশানো ঘর;—
তা'র গায়ে-গায়ে আলো-আলপনা এঁকে দেয় দিবাকর।
জোছনা-রাতের চাঁদের সুচারু হাসি ঝলকে যে তায়,
তুমি আর আমি গ'ড়ে তুলি ঘর বড়ো সাধে বালুকায়।
কোন্ সে খেয়ালী আপন খেয়ালে তোমার আমার মাঝে
রসের রগড় জমায়ে তুলিছে, কেন, কিছু বুঝি না যে।

ঢেউগুলি ভাঙে গাঙের কিনারে বালুর বেলায় এসে,
ফেনাগুলি যেন হাজার ফুলের দল হ'য়ে যায় ভেসে।
তুমি আর আমি খেয়াল-খেলায় মেতে থাকি অবিরত;—
মনের বুকে ফোটে কত ছবি,—ঝরে গান কত শত।

চারিদিক হতে যুগল-জীবনে জাগে অপরূপ ভাতি;
সাগর-বেলায় খেলা-ঘর গড়ি, ঝিনুকের মালা গাঁথি।
কোন্ সে খেয়ালী খেলায় মাতায় আড়ালে-আড়ালে থেকে;
এ বেলার খেলা ফুরালে বুঝি সে অসীমে লইবে ডেকে!

সাগর-বেলায় বালু-ঘর গড়া একদিন হবে সারা;
সেদিন আবার রসের রগড় জমাবে না জানি কা'রা!
এই বালু-বেলা—এই বালু-ঘর—ঝিনুকের গাঁথা-মালা
সবই ফেলে যাবো; চলিবে হেথায় মিলন-বিরহ পালা,—
কত মমতায় মাধুরী-মেশানো লীলা-খেলা বারে-বারে;
কোন্ সে খেয়ালী জমায় রগড় জীবন-সাগর-পারে!
শত যুগ ধ'রে কোটি যুগলের প্রেম সে কি চেখে-চেখে,
কোটি লয় করে একের ভিতরে, কোটি গড়ে এক থেকে!
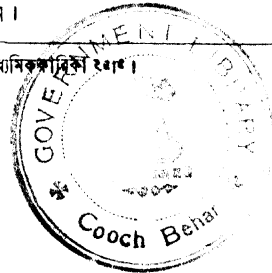
গৌতম-ধারা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[রাঁচি হইতে প্রায় পনের মাইল দূরে পর্ব্বতবেষ্টিত নির্জ্জন স্থানে গৌতম-ধারা নামে বিখ্যাত জলপ্রপাত। তাহারই সম্মুখে জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতগুহায় ভগবান্ বুদ্ধের প্রস্তরমূর্ত্তি বহুকাল হইতে রহিয়াছে। পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে ধর্ম্মশালাতেও বুদ্ধদেবের আর একটি শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আক্রমণের আশঙ্কায় ধর্ম্মশালার সমস্ত দ্বার ও জানালা সুদৃঢ়ভাবে লৌহ-নির্ম্মিত। সকালে নয়টার পূর্ব্বে ও অপরাহ্নে তিনটার পরে জঙ্গলের পথে অগ্রসর হওয়া বিশেষ বিপজ্জনক]

চারিদিকে বন পথ নির্জ্জন পাহাড়তল,
ধূসর ধুলায় থাবা এঁকে যায় বাঘের দল।
উপল-বিছানো মাটিকে আঁকড়ি ধরে'
শাল-পিয়ালের কালোছায়া আছে পড়ে',
দিনরাত শুধু হা-হা করে' হাসে ঝড়,
দোলে বন-অঞ্চল,
বিরাম-বিহীন জাগে চির মর্ম্মর,
ঝরে পড়ে ফুল ফল।

পথ কি হারাও? আরো আগে যাও পাহাড় ঘুরে',
এবার দাঁড়াও, কি শুনিতে পাও কাছে ও দূরে?
অতীতের কথা জাগে বন-নির্ঝরে,
উতল বাতাসে সে ধ্বনি ছড়ায়ে পড়ে;
নত কর' শির, কোথায় এসেছ জানো?
—হও নাই পথহারা,
গৌতমপদে প্রাণের অর্ঘ্য আনো,
এ যে গৌতম-ধারা!

শত নির্ঝর বহে ঝর্ঝর্ পাষাণ 'পরি,
একই ধারা তার ভেদিয়া পাহাড় পড়িছে ঝরি'।
ধারার ছন্দে ওঠে বন্দনা-গান,
হেথা জাগ্রত তথাগত ভগবান,
ধুয়ে লও তব মনের কালিমা যত,
শিরে লও পথ-ধূলি,
জাগুক তোমার চিত্ত ভক্তিনত
মোহ-বন্ধন খুলি'।

তুলি' মধুসুর বাজিছে নূপুর কি সঙ্গীতে
বনদেবী বুঝি এল পথ খুঁজি' শরণ নিতে
অতি নির্জ্জন পূত পরিবেশ মাঝে
আরত্রিকের মধুমঙ্গল বাজে,
অভ্র-প্রদীপে ঝিকিমিকি শিখা-ভাস
কল্যাণ জ্যোতিরূপে,
তরু-নির্য্যাসে ক্ষরে চন্দনবাস
নিত্য অগুরু-ধূপে।

মেঘ-নির্ম্মল নীল নভোতল, সূর্য্যকরে
জলকণাবুকে লীলা-কৌতুকে মাণিক ঝ
অমিতাভ যিনি, কোন্ আভা দেবে তাঁরে,
রামধনু হেথা লাজ পায় বারে বারে,
সকল মাধুরী হয়ে গেছে একাকার
ও দুটি নয়নতলে,
সকল বর্ণ রচিছে আসন তাঁর
শুভ্র প্রেমোৎপলে!

জন্ম-মরণ করে নিবারণ যে সুধা-গীতি
সেই ত্রিশরণ গাহে অনু'খন এ বনবীথি।
গৌতম-ধারা গৌতমপদে মেশে,
প্রণতি জানায় চির পূজারিণীবেশে,
ফেন-উত্তরী লুটায়ে লুটায়ে পড়ে
শিলা হতে শিলা ছেয়ে,
গাথা-গুঞ্জনে পথটি মুখর করে
নৃত্য-চপলা মেয়ে!

কত যুগ হতে নির্ঝরস্রোতে যে-বাণী বা
তারি সঞ্চয় হয় নাই ক্ষয় এ বনমাঝে
স্পর্শ করি' এ প্রপাতের পূতজল
বুদ্ধচরণে নমে ভক্তের দল,
ভব-বন্ধন মোচন করিতে চায়
গাহি' ত্রিশরণ-গান,
গৌতম-ধারা গৌতম-মহিমায়
দেয় পরিনির্ব্বাণ।

হঠাৎ আলোর তীরে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

সকালটা সত্যি সুন্দর। ঘুম ভাঙতেই ফিক করে হেসে উঠল কচি শিশুর মত। রাতে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাতাসে তারই ঠাণ্ডা আমেজ। রোদ উঠল চাঁপার কোমল হলদে স্পর্শ নিয়ে। আকাশ এখন কূলে কূলে উদার নীল।

এমন সকাল ভিড় করে আসে না মানুষের জীবনে। যখন আসে, অনেক দূরের কথা ভাসিয়ে আসে, জাগিয়ে তোলে পুরনো ব্যথা। মানুষ কেমন এক তিক্ত-মধুর আমেজে শয্যায় পড়ে থাকে চোখ বুঁজে।

বিকাশও আজ দেরি করে উঠল। একটা করুণ সুর আপনিই মনের কোণে কতক্ষণ গুঞ্জরণ করে ফিরছিল, বাজারে বেরিয়ে সে ভাবটা আবার আপনিই কখন হারিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, অযথা দেরি করে ফেলেছে। হনহন্ করে বেরিয়ে আসছে, সামনে পথ আগলে দাঁড়াল অনিরুদ্ধ। বিকাশ থমকে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু চিনতে পারলে না। চশমা চোখে এ অনিরুদ্ধ আর এক মানুষ। কোঁকড়ানো চুলের বাবরি ঘাড়ে নেমেছে, গলার খাঁজে মেদবলয়, বয়সের চেয়ে গুরুত্ব বেড়ে গেছে অনেক বেশী। বিকাশ যেন সহসা কথা কইতে পারলে না।

'এখনও চিনতে পারলি নে, আমি অনিরুদ্ধ রে।'

অনিরুদ্ধ!—কিছু আশ্চর্য্য হয়ে বললে বিকাশ, 'এত বদলেছ চেনা দুষ্কর। তার পর এখানে কোথায়?'

'আবার মেসে, অর্থাৎ পুনর্মূষিকঃ।'

কথার অর্থ বুঝলে না ঠিক। বিকাশ আবার জিজ্ঞেস করলে, 'তার মানে?'

'মেসেই চল্ না। কতদিন পর দেখা,...বছর দশেক হ'ল বোধ হয়, কি বলিস?'

'তা হ'ল। কিন্তু...।' বিকাশ তখনও সমীহ করে কথা বলছে। অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছা থাকলেও সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। একটু চেষ্টা করেই বলে ফেললে, 'তার পর কতদিন আছিস এখানে?'

'আমি ত এখানেই থাকি। তোর সঙ্গে দেখা হয় নি, তাই আশ্চর্য্য। দিব্যি করে বলছি, তোকে খুঁজি নি এমন জায়গা নেই, অথচ রয়েছিস হাতের কাছটিতে।'

কথাগুলো ভাল লাগল শুনতে। বিকাশের ইচ্ছা হ'ল [illegible]ায় তা' মেনে, কিন্তু তবু ইতস্ততঃ করতে লাগল। সহসা তার বাজারের থলির উপর নজর পড়তে হেসে ফেলল অনিরুদ্ধ,

'তাই বল, কৃষ্ণের জীব, আপিসের দেরি হচ্ছে, গৃহিণী ওদিকে—।

বিকাশ তার ভাবভঙ্গী দেখে না হেসে পারলে না।—'তোর কল্পনার দৌড় কিন্তু খুব। তাও তো শেষের জনের দেখা মেলে নি এখন।'

'বিয়ে করিস নি, সত্যি? এত বাজার কার তবে?'

'পরের সংসারে বাজার-সরকারি করি।'—হেসে বললে বিকাশ।

'এখানেও সেই ভগ্নীপতির বাড়ী নাকি? বোনের ননদ-টনদ—?'

'সে হিসেব পরে নিস্. আপাততঃ ঠিকানা দিয়ে ছেড়ে দে। ওবেলা বরং দেখা করব।'—বিকাশ বাজারের ফর্দটা ঠিকানার জন্য উল্টে ধরলে। অনিরুদ্ধ লিখে দিতে মনে মনে কি চিন্তা করে বললে, 'কুসুমকুঞ্জ এভিনিউ, খালের ওধারটায় কি?'

'শিওর শট্, ঠিক ধরেছিস।' বলে অনিরুদ্ধ আরও কিছু রসিকতা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিকাশের আকস্মিক প্রশ্নে সহসা ম্লান হয়ে গেল।

'তুই বিয়ে করেছিলি না, বৌদি কোথায়?'—বিকাশ জিজ্ঞেস করলে।

'সে অনেক কথা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না। ওবেলা আসিস।'

বিকাশ হয়ত আর একটু অপেক্ষা করতে রাজী ছিল, কিন্তু যেভাবে অনিরুদ্ধ সহসা পা বাড়ালে তার পর আর তাকে আটকানো চলে না। বিকাশও ফিরে চলল বাড়ী-মুখো। হাঁটতে হাঁটতে আবার কেমন খটকা লাগল। পিছন ফিরে দেখলে, অনিরুদ্ধ আপনমনে হেঁটে চলেছে, বড় একটা চাইছে না কোন দিকে। বাঁ পা-টা বোধ হয় সামান্য দুর্ব্বল। ঢিলে পাঞ্জাবীটা দুলছে একদিক ধরে। কেমন একটি করুণ কোমল ছন্দ! দূর থেকে তাকে দেখে বিকাশের মনে কেমন এক অনুকম্পা জাগে। সেই অনিরুদ্ধ। সেদিনের সেরা এথলেট, উদ্ধত জোয়ান, তরুণ মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে আজ এলিয়ে পড়েছে। কালের কি অসীম শক্তি! কিন্তু না, মনের দিকেও কম বদলায় নি সে। আজ সে কথায় কথায় লঘু রসিকতা করছে। আর সেদিন? কথাই বলত না একরকম, কিন্তু যখন বলত,

একেবারে বুলেটের মত এসে বিঁধত গায়ে, তুরুর হ'ত বিরুদ্ধে তর্ক করা। অন্তের মনের উপর চেপে বসাই ছিল ওর স্বভাব। বেচারা!

ভাবতে ভাবতে বিকাশ ঢুকে গেল বাথরুমে। তার পর কাপড় ছেড়ে নিজের দিকে চাইলে ভাল করে। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে, অনিরুদ্ধর পাশে দাঁড় করালে সেই বরং বেশী বদলেছে। মাথার উপরের চুল অনেক হাল্‌কা হয়ে এসেছে—টাকটা বড় বেশী স্পষ্ট, দেহের পেশীগুলো—।

মনটা কেমন ভারী হয়ে গেল। খেতে বসে কথার উপর কথা এসে জমতে লাগল গলায়। এতদিন পর অনিরুদ্ধর সঙ্গে দেখা, তাও কেন খুশী হতে পারছে না সে? দশ বছরের ব্যবধানটাই কি এত বড় হ'ল—না কি সে ঈর্ষা করছে তার চেহারা দেখে? তাই বা সত্যি ভাবে কি করে? অনিরুদ্ধর মুখে যা শুনল তাতে বরং অনুকম্পাই জাগে মনে। সে হয়ত কত অসুখী আজ, দাম্পত্য-জীবনে হয়ত বা এসেছে চরম ব্যর্থতা।

অনেক চেষ্টা করেও মনের ঠিক সুরটি ধরতে পারলে না বিকাশ। সকাল থেকেই কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিল, কতকগুলো পুরনো কথা ব্যথার আকারে ঘুরছিল মনের কিনারায়, আবার বাজারে গিয়ে ভুলেও গিয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেখা অনিরুদ্ধর সঙ্গে। মনে পড়ল, তার পর থেকেই ব্যথাটা গ্লানির আকারে মনে চেপে বসেছে।

বিকাশ ক'টা এলোমেলো বছর পর পর সাজাবার চেষ্টা করে এবার। চল্লিশ সনের গোড়ার দিকে—হ্যাঁ, বাণীপূজার পরের দিনই বোধ হয়—দিন পনেরর জন্য এসে উঠেছিল অনিরুদ্ধর বোর্ডিঙে।

রিক্‌সার উপর বাক্স-বিছানা দেখে অনিরুদ্ধ অবাক—'ব্যাপার কি রে, হঠাৎ না বলে কয়ে?'

হঠাৎ যখন এসেছে, একটা কারণ দেখাতে হ'ল—'বাড়ীর সবাই চলে গেছে পশ্চিমে, বাধ্য হয়ে।'

'দিদি-জামাইবাবু না হয় বেড়াতে গেছেন, বাড়ীটাও কি বেচে গেছেন সেই সঙ্গে? কৈ, কালও ত বললি না কিছু?'

'আমিই কি জানতাম?'—বিকাশ অভিনয় করলে—'একা একা থাকতে হ'ত, ভাবলাম ক'টা দিন তোর কাছে থেকে হৈ-হুল্লোড়ে কাটিয়ে যাই।'

অনিরুদ্ধ বিরক্ত হ'ল। বিকাশ সংশোধন করে আবার বললে, 'হৈ-হুল্লোড় মানে—আই মীন—তোর আবার পরীক্ষা, খুব বেশী বিরক্ত করলাম কি?'

'তোর পরীক্ষা নেই?'

'এবার আর দেব না রে—একদম তৈরী হতে পারিনি। তা ছাড়া শেষ সময় একটা বাধা—' কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই বিকাশ কথা ঘুরিয়ে বললে, কাল পাশের বাড়ীতে রাতদুপুরে একটি মেয়ে মারা গেল—সারারাত সে কি কান্নাকাটি—আমার ভয় করতে লাগল, তাই পালিয়ে এলাম।

অনিরুদ্ধ সে কথায় থমকে উঠল তাকে। আশ্চর্য্য নয়, সন্দেহ করেছিল হয়ত। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বিকাশকে বললে—'থাক, আপত্তি করব না, কিন্তু এই তোমার দুঃখের ইতিহাস সুরু হ'ল বলে রাখছি। এখনও সময় আছে, ভেবে দেখ।

বিকাশ জানত আর হয় না তা। তবু মুখে আশ্বাস দিয়ে বললে, 'আসছে বছর দেখিস, ঠিক ফার্স্ট ক্লাস।'

বাকিটুকু আর সারা জীবনে সম্পূর্ণ করতে পারে নি। কেবল ছলনাটুকুই সত্যি হয়ে রইল। অনিরুদ্ধর কথাই ঠিক হ'ল। কিন্তু সে কতটুকু? গোটা জীবনটাই যে বাকি রেখে সবকিছু হারাল, এম-এ পাস না করার ক্ষোভ আর তার কাছে বড় নয়। আজ হয়ত তার একটা জবাবদিহি দেওয়া চলত—ছলনা তার স্বভাবে আসে না, কিন্তু কি করবে, সেদিন যে তার কোন উপায় ছিল না।...

বিকাশ আপিসের বাসে ঝুলছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দিনের তীব্র আলো ভেদ করেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—একটি নিষ্করুণ সন্ধ্যার তিক্ত ছবি, যেদিন সে তার পুরনো আশ্রয় ছেড়ে চিরদিনের মত বেরিয়ে পড়েছিল পথের ধুলোয়। সন্ধ্যায় অনিরুদ্ধর সঙ্গে দেখা করবে—ভাবতেও কেমন এক আতঙ্কময় রোমাঞ্চ আসছে মনে। এতদিন পরে পুরনো কথার সূত্র ধরে সত্যি যদি সে প্রশ্ন করে বসে, কি আছে তাকে বলবার, বোঝাবার? কিংবা বিকাশ নিজেই দিতে চায় সে কৈফিয়ত? দশ বছর আগে দু'জনে বেরিয়েছিল দু'পথে—আজ আবার দেখা হ'ল এক জায়গায় এসে। কে কোথায় কতটুকু কুড়িয়ে পেল, হারাল কতখানি—একটা যদি হিসাবনিকাশ হয় আজ, মন্দ কি?

আপিসে এসে বিকাশ তাড়াতাড়ি লেজার বইখানা সেরে পাঠিয়ে দিলে সাহেবের ঘরে। ব্যাঙ্ক-পিয়ন না ফেরা পর্য্যন্ত সামান্য অবসর। এক কাপ চা আনিয়ে মুখে দিতে যাবে, বরাট এসে হাজির হ'ল।—'কি দাদা, আজ, আর পেসাদ পাব না?'

চেয়ে খাওয়া বরাটের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, লজ্জা দেওয়া যায় না। এতদিনের প্রশ্রয়, আজ মানবে না। প্লেটের ওপর অর্দ্ধেক চা ঢেলে তাড়াতাড়ি বিদায় করলে তাকে।

বিকাশ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। টাইপ-রাইটারের পটাপট শব্দ কানে যাচ্ছে। বড় সাহেব পাশ দিয়ে

লে গেল। বিকাশ দেখল না তা। মিস মঞ্জরেকর ীবোর্ডে আঙুল থামিয়ে ইশারা করলে। নতুন এসেছে মেয়েটি। কেমন একটু দুর্ব্বলতা, একটু শ্রদ্ধামিশ্রিত হানুভূতি বিকাশের উপর। সেও কেরানী, কিন্তু একটু ন আলাদা অন্তের চেয়ে, তাই বোধ হয় ভালবাসে কাশকে, দেখে তার কাজ নিয়ে যায়, চিঠিগুলো ছেপে নে পরিপাটি করে—সবার আগে। মঞ্জরেকরের ইশারায় কাশ সজাগ হয়ে অভ্যাসবশে কলম তুলে ধরল। কিন্তু তে তুলেই আবার রেখে দিলে কলমটা। কেরাণীর করির ভয়, কিন্তু বিদ্রোহ মনে মনে—কেরানীও মানুষ, নয় সে। ভয়েই মনুষ্যত্ব যায় বিকিয়ে, আরও চেপে রে সুযোগসন্ধানীরা। বিকাশ উঠে গেল কাউণ্টার ড়ে।

তাড়াতাড়িতে জিজ্ঞেস করা হয় নি অনিরুদ্ধর কাজের । সে যে পরাজিতের দলে নয়, তার চেহারাই তার দিচ্ছে। নইলে এতদিনে চশমার কাচ পুরু হয়ে উঠত, নুয়ে যেত বুকের ভারে, সথ হ'ত না কব্জিআঁটা গেরুয়া রে।

আপন মনেই হাসল বিকাশ। আর একবার হাতখানা বে তাকে? কার না সাধ হয় অজানায়? কিন্তু নই আবার মন প্রশ্ন করে, কি চাও, কি পেলে সুখী হও নে? বিকাশ মনে মনে ভেবে দেখলে, না, সে আর ই চায় না। ধন নয়, মান নয়,—সুখ-সম্পদ কোন প্তেতেই আজ সে সুখী হতে পারবে না। যে লগ্ন বয়ে , তাকেও নিংড়ে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে সেই সঙ্গে। তবু মনে মনে অনিরুদ্ধর তারিফ না করে পারলে না। য় এত ভাল 'কীরোম্যান্সি' জানে তাই কি জানত াশ।...

জানুয়ারীর এক সেঁতানো সন্ধ্যা। বিকাশ অনিরুদ্ধর বোডিঙে। বর্ষার দিনে ছোলা-মুড়ি আনিয়েছে খাবে । ঘরে আরও দুই বন্ধু। অনিরুদ্ধ চার প্লেট ওমলেট ালে। কীরোর হস্তরেখা-বিজ্ঞান নিয়ে তর্ক উঠল। াশ দু'পক্ষের তর্ক শুনছে আর টপাটপ মুড়ি ফেলছে । ক্ষিধেও জোর ছিল। হঠাৎ অনিরুদ্ধ তার হাতটা ধরলে – 'এই হাতটা ছড়া ত একবার?'

কতক মুড়ি মেঝেয় ছিটিয়ে গেল। বাদবাকি মুখে ফেলে াশ হাত বিছিয়ে দিলে।

'আহাম্মক, হাতের তেল মোছ আগে।'

বিকাশ তাই করলে। ইতিমধ্যে তর্ক ছেড়ে সবাই র নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু অনিরুদ্ধ বিকাশের খানাই ধরে রইল। তারপর বইয়ের ভেতর থেকে হাতল দেওয়া একখানা পুরু আতশ কাচ বার করে, তাজুর নানা জায়গায় চাপ দিয়ে রেখাবিচার করতে লাগল। আবার আপনমনেই হাত ছেড়ে দিয়ে ছোলার বাটি টেনে নিলে।

হো হো করে হেসে উঠল আর সবাই—'সেই কাঁঠাল খাওয়ার গল্প হ'ল যে। চালাক ছেলে কিন্তু অনিরুদ্ধ।'

বিকাশ গ্রাহ্য করলে না রসিকতা। দুরু দুরু বুকে প্রশ্ন করলে অনিরুদ্ধকে—'কি দেখলি?'

ছোলা চিবুতে চিবুতে অনিরুদ্ধ চোখ বড় করে জবাব দিলে, কিছু নয়। মুখে তখন আর কিছু বললে না বটে, কিন্তু তার দৃষ্টি দেখে ধরা পড়ার ভয়ে বিকাশ আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল। অনিরুদ্ধই বাঁচিয়ে দিলে অন্য কথা পেড়ে।

খাওয়া সেরে শুতে যাবে বিকাশ, অনিরুদ্ধ ডাকলে— 'এখনই শুবি কি, উঠে এসে বোস।'

তার কণ্ঠস্বর আন্দাজ করে আপনিই উঠে এল টেবিলের ধারে। বিকাশ যেন তার সাহায্য চায়, কিন্তু কি হ'ল, মুখ ফুটে বলতে পারলে না সে কথা। ঠোঁটে এসেও আটকে গেল।

অনিরুদ্ধ পীড়াপীড়ি করল—'কি হয়েছে খুলে বল ত? ভালবেসেছিস কাউকে— বামুন না কায়েত?'

বিকাশ নিরুত্তর। অনিরুদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করছে— 'ঝগড়া করেছিস বাড়ীতে?'

কথা লুকোবার এমন সুযোগ পেয়ে বেঁচে গেল বিকাশ। সত্য মিথ্যা অনেক কিছু সাজিয়ে অনিরুদ্ধর চোখে ধুলো দিয়ে আত্মরক্ষা করলে।

সেই লুকানো কথার সূত্র ধরেই যদি সে আজ আবার প্রশ্ন তোলে। কি জবাব আছে দেবার। বলবে ভাগ্য? কিন্তু সে অজুহাত দিয়েই বা সব কথার শেষ হয় কৈ? না, বিকাশ আজ আর কোন সঙ্কোচ করবে না, লজ্জা করবে না। অকপট স্বীকারোক্তি দিয়েই শেষবারের মত মুছে নেবে হৃদয়ের যা কিছু ক্লেদ আজও অবশিষ্ট আছে। আর—

চিন্তায় বাধা পড়ল। মিস মঞ্জরেকর টেবিলের উপর ছাপা চিঠির তাড়া রেখে দিয়ে মুচকি হেসে বিদায় নিলেন। বিকাশের কানে শুধু দুটি কথা ভেসে এল—বড্ড ভাবছো!

বিকাশ পিঠ টান করে ঘড়ির দিকে চাইলে। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। টাইপ-রাইটারের উপর আবার স্বর-ব্যঞ্জনের কলহ। বিকাশ চিঠির পাঁজা টেনে দেখতে লাগল।

অনিরুদ্ধর মেস খুঁজে বার করতে কিছু রাত হয়ে গেল।

বন্ধ্যা প্রান্তরের বুকে একটিমাত্র দোতলা বাড়ী। ফাল্গুনের পাতাঝরা জ্যোছনায় স্বপ্নময় পরিবেশ। খোলা জানালার সামনে বসে অনিরুদ্ধ কি লিখে চলেছে। মুখ তুলতেই দেখলে, বিকাশ সামনে দাঁড়িয়ে।

'বিকাশ! আয় আয়। খুঁজতে বেগ পেলি বোধ-হয়?'

'মোটেই না।'—বিকাশ বললে—'কি লিখছিলি, গল্প না কবিতা?'

'ও কিছু না, বোস তুই।'

বিকাশ টেবিলের উপর দৃষ্টি ফেলে পেছনে সরে এল।—স্বরলিপি! 'তুই গান গাইতে জানিস, জানা ছিল না ত?'

'কে কার কতটুকু খোঁজ রাখি আমরা, বিকাশ?'

অনিরুদ্ধ এক অনির্ব্বচনীয় উদার হাসি হাসল। এ তার আর এক ভাব। চেতনাতুর ইন্দ্রিয়ানুভূতির সরস কণ্ঠস্বর। সে যেন এতক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্দ্ধে উঠে সম্পূর্ণ এক মনোময় জগতে বিরাজ করছিল। বিকাশের সন্ধানী চোখের সামনে সে এবার কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। বললে—'বড্ড একা ঠেকে, তাই নিজে লিখি, নিজেই গাই। কিছুক্ষণের জন্য বাড়ীটা তবু যা একটু সরগরম থাকে। চল, বাইরে গিয়ে বসি,—কি গরম পড়েছে দেখছিস?'

অনিরুদ্ধ গামছা দিয়ে নিজের ললাট মুছলে। বিকাশ বললে—'না না, নিরিবিলি এই বেশ আছি। তার পর, বৌদি কোথায়?'

বিকাশ ভয়ে ভয়ে কথাটা তুলতেই অনিরুদ্ধ যেন আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠল—'কেন শুনিস নি তুই, সে আজ দু' বছর নেই।'

বাকিটুকু তার মুখের ভাবেই স্পষ্ট হয়ে গেল। বিকাশ স্তব্ধ। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে কেবল বললে—'ব্যাড লাক।'

'তুই কিছুই জানিস নে দেখছি!'—অনিরুদ্ধ আবার বলতে লাগল—'দশ বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। গোয়ালিয়রে প্রোফেসরি করছিলাম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মন মেজাজ বড় খারাপ হয়ে গেল। প্রাইভেট কলেজের তাঁবেদারি আর পোষাল না, ছেড়ে দিলাম। তা ছাড়া একার প্রয়োজনই বা কতটুকু?'

'তা হলে এখন চলছে কি করে?'—প্রশ্ন করে বিকাশ।

'অল্প কিছু জমেছিল হাতে, তাই দিয়ে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা চালাচ্ছি। রাতে গরীবদের জন্য একটা ইস্কুল খুলেছি। সরকার ইতিমধ্যে কিছু কিছু সাহায্য দিতে শু[রু] করেছে, তাতেই চলে যায় আমার।'

অনিরুদ্ধ উঠে বিকাশের হাতে এককপি পত্রিকা দিে[ল]।

'শ্রীকান্ত তুই-ই নাকি?'

পরম আত্মপ্রসাদে বললে অনিরুদ্ধ—আমারই গৃহলক্ষ্মী[র] দেওয়া নাম। আর ওই যে নাইট স্কুল, তাও তিনিই চা[লু] করে গেছলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আর কোন উদ্দেশ্য নে[ই] জীবনে, তাঁরই আরব্ধ কাজে সঁপে দিয়েছি নিজেকে।'

একটু দম নিয়ে বললে আবার—'ঘরকন্না কমই করত[] কেবল নারীসমিতি, শিক্ষায়তন আর শেষের দিকে পত্রি[কা] চালানোর একটা ঝোঁক পেয়ে বসেছিল তাকে।'

'ছেলেপুলে হয়নি?'

'তা একটা কারণ বটে। কিন্তু না, তাও নয় ঠিক[] নিজের সন্তান চাইত না কোনদিন, শুধু ঘরকন্নাতেও খু[শি] হতে পারত না। বাধা দিলে বিরক্ত হ'ত। সত্যিকারে[র] একটা স্পৃহাহীন বৈরাগী মন ছিল তার, নারীজীবনে[] সচরাচর দেখি নি।...কত লোকের সঙ্গেই যে আলাপ হে[] ছিল।'

বিকাশ লক্ষ্য করলে, অনিরুদ্ধ যেন আজ তাকে পে[য়ে] অনেক দিনের আবদ্ধ কথার অর্গল খুলে দিয়েছে। কি[ন্তু] সমস্ত মুখরতা কেবলমাত্র তার জীবনের ওই একটিমা[ত্র] নারীকে কেন্দ্র করে। তাঁর জীবনের নানা খুঁটিনা[টি] আলোচনা করতে করতে সে যেন মাঝে মাঝে কথার সু[র] হারিয়ে ফেলছে। সহসা যেন তার চৈতন্য হ'ল। ক্লা[ন্ত] হয়ে বললে—'ওই দেখ, নিজের কথাই বলছি সেই থেকে[] কেমন যেন একটু বেতাল হয়ে পড়ি আজকাল। দো[ষ] নিস নে।'

'কোন দোষ নিই নি অনিরুদ্ধ।'...সান্ত্বনা দিলে বিকা[শ] —'এত বড় আঘাত, হয়ত সারা জীবনই কেটে যা[বে] ভুলতে।'

অসীম কৃতজ্ঞতায় অনিরুদ্ধ বিকাশের কাঁধে একখান[া] হাত তুলে দিয়ে বললে—'কত ভাগ্য আমার তোর দে[খা] পেলাম। এমনই বন্ধুই খুঁজছিলাম একজন। কিন্তু তু[ই] যে সেই ডুব দিলি! তার পর, কি করছিস আজকাল[?] একটুও বাড়িস নি দশ বছরে—শরীরের দিকে নজর দি[স] না?

'কোন্‌কালেই বা চেহারা ছিল যে যত্ন করব!'—বিকা[শ] হাসল একটু।

'কি যে বলিস, তুই সত্যি হ্যাণ্ডসাম ছিলি!—অনিরু[দ্ধ] বললে—'এম-এ টা-ই না হয় দিতে পারিস নি, দিয়েছিলি?'

বিকাশ মাথা নাড়লে। অনিরুদ্ধ বললে—'সে না হো[ক]

...স্তু তার আগেরগুলো ত ভালভাবেই পাস করেছিলি, ...তে-কইতেও পারতিস।'

আত্মপ্রশংসা শুনে বিকাশ কেমন অস্বস্তি বোধ করলে। ...ড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—'পুরনো কথা আর না ...য়নোই ভাল। অন্য কথা বল।'

'তোর যে এখনও শোনাই হয় নি কিছু।'—বললে ...নিরুদ্ধ—'কি করছিস আজকাল?'

'ব্যাঙ্কের লেজার ক্লার্ক-কাম-পত্রনবীশ।'—খাটো জবাব ...য়ে বিকাশ অন্য কথায় এল—'তোর পত্রিকা চলছে ...মন? অনেক জায়গাতেই দেখি কিন্তু।'

সম্পূর্ণ আত্মগত হয়ে অনিরুদ্ধ কি ভাবছিল। বিকাশের ...থাগুলো বোধ হয় শুনতে পায় নি। বললে—'তোর ত ...রাণী হবার কথা ছিল না বিকাশ?'

'ভাগ্য কি তোর ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারে?'

'তা ঠিক, একশ' বার ঠিক। তবু মন মানে কৈ? যুক্তি ...কটা খুঁজবেই।'

অনিরুদ্ধর দার্শনিক কথায় বিকাশের মনের ভেতরটাও ...মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তবু মনের জ্বালা বাইরে দমন ...রে চেয়ে রইল পথের দিকে। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হয়ে ...ঠেছে। প্রান্তরের বুকে দীর্ঘ ছায়ার ক্ষত। ক্রমে উঁচু হয়ে ...থটা সমান্তরাল হয়ে গেছে নাসিক রোডের মোটর-পথের ...ঙ্গে। মাঝে মাঝে হেডলাইটের তীব্র আলোর হঠাৎ ঝলকে ...খানি জ্বলে উঠছে বার বার। দশ বছরের পুঞ্জীভূত ব্যথার ...নি নিয়ে সামনাসামনি বসে দুই বন্ধু। কিছুক্ষণের অস্বস্তি-...র নীরবতা। বিকাশ আর পারল না। এমন দিনে, এমন ...রে বসে মানুষ বুঝি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ...জের অজ্ঞাতেই হয়ত কৈফিয়ত দিয়ে বসে কোন্ দুর্ব্বল ...হূর্ত্তে।

বিকাশও হঠাৎ স্বীকারোক্তি করে ফেললে—'অনিরুদ্ধ, ...নেক দিন হ'ল তোর কাছে একটা মিথ্যাভাষণের অপরাধ ...রেছিলাম, হয়ত বুঝতে পারিস নি।'

'মিথ্যে বলেছিলি, তুই?'—আশ্চর্য্য হ'ল অনিরুদ্ধ—...শ বছর দেখাই হয় নি, বললি কবে?'

'সেই বোর্ডিংটা মনে পড়ে, দিন পনেরো ছিলাম তোর ...ছে?'

'কোনটা বল ত, সেই ঠনঠনের ধারে? তোর মনে ...ছে! আমার কিন্তু আজও গা ঘিনঘিন করে।'

'তা করে।'—বিকাশ বললে—'সেখানেই এক সন্ধ্যার ...া মনে কর ত? কি বলেছিলি হাত দেখে!'

পুরনো স্মৃতির জট খুলতে খুলতে অনিরুদ্ধ যেন ঠিক জায়গাটিতে এসে বলে উঠল, আই সি, দ্যাট সিলি 'টু-এণ্ড-টোয়েণ্টি' এফেয়ার?'

'ঠিকই ধরেছিলি। কেবল বুঝতে পারিস নি দেউলিয়া হয়েই তোর শরণ নিয়েছিলাম।'

'তাও মুখ ফুটে বললি নি কেন? আমি না কত পীড়াপীড়ি করলাম তোকে!'

'কেমন সঙ্কোচ এসে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল অনিরুদ্ধ। আমি জানতাম, তোকে বললে বিহিত হ'ত, পারতিস তুই বাঁচাতে। কিন্তু···যাক গে, পুরনো কথা ঘেঁটে আজ আর লাভ নেই।'

'তবু ব্যাপারটা খুলেই বল্ না।' পীড়াপীড়ি করলে অনিরুদ্ধ।

'বাকিটুকু বুঝে নে।'—দম নিয়ে বললে বিকাশ—'সেই আমি তোকে ছাড়লাম, পড়া ছাড়লাম, ঘুরতে ঘুরতে এক-দিন ছিটকে এসে পড়লাম এখানে। বাকিটুকু আরও রোমাণ্টিক। ষ্টেশনে বেঞ্চির ওপর শুয়ে রাত কাটাচ্ছি—ক্লান্তিতে মাঘ মাসের শীতেও হুঁস ছিল না,—ভোর রাতে উঠে দেখি মাথার তলা থেকে ব্যাগসুদ্ধ শেষ কপর্দ্দকটি উধাও।'

বিরস হাসি হেসে বিকাশ থামল একটু। তার পর বললে—'বেশী নয়, মাত্র দু'দিন খাওয়া হ'ল না। লজ্জায় বলতে পারি নি কাউকে। ভাগ্যি ভাল, তাই ভিক্ষে আর করতে হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত হঠাৎ এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার সব কথা শুনে বাড়ী নিয়ে গেলেন, কতদিন পরে সেই দুটো বাড়ীর ভাত পেলাম, শুতে পেলাম দোর বন্ধ করে গরম বিছানায়।

তিনিই দয়া করে কাজটি জুটিয়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোকের বাইরে ঘোরা কাজ, তাঁর সংসারের কাজকর্ম্ম দেখি, ছেলে পড়াই; বিনিময়ে বোর্ড-লজিং ফ্রি।'

'তাই বলে আর ভাল কাজ খুঁজবি না।'

'কি দরকার? তাঁরা একরকম আত্মীয়ের মতই হয়ে গেছেন, কোন অপমান নেই।'

'তোর দিদি কোথায়?'

'খোঁজ রাখি না। শুনেছি জামাইবাবু আজকাল টি. ডবল্যু. এ'র টুরিষ্ট অফিসার। কায়রোয় আছেন।'

অনিরুদ্ধ চুপ করে কি ভাবলে কিছুক্ষণ। এবার বললে—কিন্তু যেখান থেকে কাহিনীর সুরু তা ত ছেড়েই গেলি?'

'কেন ঘটা করে পত্রিকায় ছাপাবি নাকি?'

তীব্র প্রতিবাদ করলে অনিরুদ্ধ—'না বিকাশ, এমন

সিরীয়াস ব্যাপারে তামাশা ভাল নয়।—কে মেয়েটি, বিয়ে করেছে ?'

'নইলে ছাড়বে কেন ?'

'লেখাপড়া জানত না বোধ হয় ?'

'বিলক্ষণ, তখনই এম-এ পাস হয়ে গেছে।'

'বলিস কি, তোর চেয়ে বয়সে বড় ? তুই না সেবার ফাইন্যাল ইয়ারে !'

'বয়সটাই বড় করে দেখি নি, বিশ্বাস করেছিলাম তার কথাগুলো। বয়সে হয়ত বা সমানই ছিল, কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী।'

'লেখাপড়ায় সত্যি অশ্রদ্ধা জাগে এসব শুনে।'—অনিরুদ্ধ আবার প্রশ্ন করে—'আচ্ছা কেমন দেখতে ?'

'আজ তাকে ঠিক সুরূপা বলব না, তবে সেদিন মনে হ'ত অনিন্দ্যসুন্দর, ভালবাসার একটা মোহ ত ছিলই।'

'অর্থাৎ রূপের মোহ এই ত ?'

'রূপ !' বিকাশের ললাট কুঞ্চিত হ'ল। বললে—'তা নয়, তা হলে অনেক দিন মন থেকে মুছে যেত সে—তার পরেও অনেক রূপসী খুঁজে পেতাম চাইলে।...হয়ত বা অভিমান, কিংবা হয়ত অপমান—যা খুশি বলতে পারিস—এই দীর্ঘদিন সেই অনাদরের গ্লানিই কুরে কুরে খেয়েছে আমাকে। কিন্তু আজ বুঝেছি সব...আর শ্রদ্ধা জাগে না।'

'একজনকে দেখে তুমি সবার বিচার করবে এতে আমার আপত্তি আছে, বিকাশ। কোথাও ভুল করেছিলে হয়ত। আমার জীবনেও ত নারী এসেছে, তার জন্য তা হলে এতটা ত্যাগ করছি কি করে ?'

'তোমার কথা আলাদা অনিরুদ্ধ, তুমি বিবাহ করেছিলে।' বিকাশ বললে—'কিন্তু আমি একজনকে নিয়েই জগৎ চিনেছিলাম, একজনের জন্যই আজ আমি সর্ব্বহারা, আমার শ্রদ্ধা আসবে কেমন করে, তুমিই বল ?'

'যা, ভাবছি বাধাটা এল কোন্‌দিক থেকে।'

'বাধা ছিল না কিছুই। আমারই দেশের মেয়ে, আমারই পর্য্যায়ের, কেবল ছিল না আমার সঙ্গতি।'

'তোর দেশ কোথায় যেন।'

'নাটোর।'

'ঠিক ঠিক। তার পর ?'

'এর পর আর কি, নটে শাকটি মুড়োল।' বিকাশ করুণ মুখে হাসবার চেষ্টা করলে একটু। তার পর নিজেই আবার বললে—'আজ বলতে হাসি পায়—তিন বছর এক বাড়ীতেই পাশাপাশি থেকেছি, মিশেছি—একান্তভাবে ভালবেসেছি বলতেও আজ আর কুণ্ঠা নেই। এম-এটা হয়ে গেলেই একটা চাকরি নিয়ে কোন দূর বিদেশ গিয়ে ঘর বাঁধব ছিল দু'জনের কল্পনা, সেদিনের পরস্পর স্বীকৃতি। কিন্তু

বিকাশের গলা শুকিয়ে আসছিল। উঠে জল গড়া... গেল। বাধা দিয়ে অনিরুদ্ধ বললে—'শুধু জল খাবি কি চা জলখাবার আনাই দাঁড়া।'

'না থাক।'—বলে বিকাশ ঢক্‌ঢক্‌ করে এক গ্লাস মুখে ঢাললে। মুখ থেকে চলকে বুকের অনেকখানি ভি... গেল।

চাকরকে ডাকতে উঠে অনিরুদ্ধ অনুনয় করল—'এ... চা-ই আসুক ?'

'না না, চা খেলে রাতে ঘুম আসে না, থাক।' বিক... বুকের কাছের জামা ঝেড়ে আবার তক্তপোশে এসে ... হয়ে বসে রইল। দূরের কোন কারখানার খোলা চুল্লি... আগুন জ্বলছে। ফিকে আকাশের গায়ে তারই দগ্‌দগে ল... আভা।

বিকাশ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। আপন ম... কত কি ভেবে এক সময় স্বগতোক্তির মতই বললে—... তাকে দোষ দেব না। দেশের সংস্কার, সমান বয়সের এম... পাস মেয়ে, আমি বেকার। তার উপর উকীলের পয়সা, ... যে একযোগে তাকে বাধ্য করলে !'

'বাধ্য করলে আর সে বদলে গেল ? নিজের শিক্ষাদী... কোন কাজে এল না ?' বিকাশের স্বগতোক্তির সূত্র ধ... বললে অনিরুদ্ধ।

'তাই ত দেখলাম।' অনিরুদ্ধর কথায় আবার ... উষ্মা বাড়ল বিকাশের। বললে—'তারও আবার অগ্নিসা... করে বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে হয় না শুধু আমাদে... দেশের বালবিধবাদের। এ জাত থাকবে অনিরুদ্ধ ?'

'সে ভুলে গেল, আর তুই আজও তাকে ভুলতে পারলি না, আচ্ছা আহাম্মক ত। বিয়ে কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বিকাশ সে কথার কোন জবাব দিলে না। বললে—'তোকে একটা হাসির কথা বলব। তার বিয়ের আ... লুকিয়ে একবার শেষ দেখা করেছিলাম, কি বলেছি... জানিস ?...বলেছিল, যেন আমি ভুলে যাই তাকে। ভা... সে কর্ত্তব্যের কাছেই নিজেকে বলি দিলে। আর বলেছি... অনেকেই ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে, কিন্তু আমাদের গোপ... ভালবাসার কথা তার বাবা-মার কানে উঠলে নিশ্চয় তাঁ... সইতে পারতেন না।'

'এ ডেভিল অফ এ লেডি !'—অনিরুদ্ধ উত্তেজন... চেয়ার ছেড়ে তক্তপোশের ধারে উঠে এল—'তুই ... বললি ?'

'বলতে কিছুই পারলাম না, যেন হিমে জমে গেল...

নকার মত। কিন্তু না, একটা প্রতিঘাত করবার কেমন ক গোপন ইচ্ছা মনে জাগল যেন, বলে ফেললাম, 'সে ত াহ করে পরের ঘরণী হতে চলল, আমি যদি প্রতিজ্ঞা না খতে পারি, আমাকেও যদি কর্ত্তব্য করতে হয়. আমার াহে সে মত দেবে কি ?'

'নাইসলি সেইড !'—বিকাশের কাঁধে প্রচণ্ড এক াকুনি দিয়ে বললে অনিরুদ্ধ—'কে বলে তুই বেকুব ? উত্তর দিলে তাতে ?'

'বোধ হয় বড্ড রূঢ় হয়ে গিয়েছিল।' বলতে বলতে াশের নিজের চোখই বাষ্পাকুল হয়ে উঠল—'কিছুই তে পারলে না, অঝোরে কাঁদতে লাগল মুখ লুকিয়ে।... ই কান্নাই আমার কাল হ'ল, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল ার বিদায়ের নীরব অভিশাপে।'

অনিরুদ্ধ আর বসে থাকতে পারলে না। আবেগে উঠে য়ময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। এক সময়ে ঘুরে ড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে বললে—'তুমি একটি আস্ত ইডিয়ট,— োরই উচিত ছিল তাকে রক্ষা করা। একটি কাপুরুষ মি।'

বিকাশ আশ্চর্য্য হ'ল তার কথা শুনে—তার উত্তেজনা খে। তবু ক্ষীণ প্রতিবাদ করলে—'কিন্তু সে যে ত্ব্যকে বড় করে দেখলে—আমি কি করে ছোট করতাম াকে ?'

'কিন্তু তাই বলে তুমি আজও পরস্ত্রীকে কামনা করবে, াই বা কোন ধর্ম্ম হ'ল ?'

'একে তুমি কামনা বল অনিরুদ্ধ ?' বিকাশ আবার তিবাদ জানালে।

'একশ' বার বলব।'—অনিরুদ্ধ তেমনি রেগেই বলে উঠল াওর এণ্ড সিম্পল প্যাশন এণ্ড নাথিং এল্‌স। মেয়েটির নাম বল ত ?'

অনিরুদ্ধ সহসা 'বল্‌' ছেড়ে 'বল' বললে—বিকাশ া করল তা। কেমন একটা সন্দেহও জাগল মনে।'

হয় ত উঠে গেলেই ভাল ছিল। কিন্তু এমনই এক া দৃষ্টিতে অনিরুদ্ধ চেয়ে রইল তার দিকে যে উত্তর না দিয়েও উপায় ছিল না। আবার পাছে সে কথার প্রতিক্রিয়া তার হৃদয়ের কোন দুর্ব্বল কোণে গিয়ে আঘাত করে সেই ভয়ে বিকাশ মাপ চেয়ে বললে—'এটুকুই বলতে পারব না, ভাই। মাপ করিস আমায়।'

'বলতে পারবে না ?'

বাধা পেয়ে সহসা অনিরুদ্ধ যেন উন্মাদ হয়ে গেল। তড়িদ্‌গতিতে পাশের ঘরে ঢুকেই দেয়াল থেকে একখানা ফটো খুলে এনে ছুঁড়ে দিলে এ ঘরের মেঝের উপর—'দেখ, সেই কিনা।'

ফটোখানা উল্‌টে পড়ে রইল মেঝেয়, খান খান হয়ে ছিটিয়ে গেল ছবির কাঁচ, কোন এক রাতের যুঁইফুলের শুকনো সোহাগ-মালা গড়িয়ে গেল ধুলোর উপর। বিকাশ হতচকিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাই দেখলে, যেন কিছুই আর করবার নেই, বলবার নেই।

'দাঁড়িয়ে দেখছ কি দেখে যাও তাকে।'

কি নিষ্করুণ ভাষা, কি রূঢ় বলবার ভঙ্গী! বিকাশ আর স্থির থাকতে পারলে না। চট করে ফটোখানা হাতে তুলে না চেনবার ভান করে বিস্ময় প্রকাশ করলে—'ছিঃ ছিঃ, এ তুমি কি করলে অনিরুদ্ধ! এঁকে আমি চিনব কি করে ?

তবু সন্দেহ গেল না অনিরুদ্ধর। বললে—'তবে নাম লুকোচ্ছ কেন ?'

ছবির তলায় লেখা নামটা পেয়ে বিকাশ যেন বেঁচে গেল। বললে—'নাম লুকোনোর অন্য কারণ ছিল তাই, কিন্তু আর দরকার নেই। তার নাম ছিল কমলা, ইনি দেখছি সরিতা, আমার বৌদি!'

অনিরুদ্ধ এবার ভেঙে পড়ল। বিকাশের কণ্ঠ জড়িয়ে রুদ্ধ গলায় বললে—'একটিমাত্র বিশ্বাসের জোরে আজও বেঁচে আছি বিকাশ, এ বিশ্বাস ভাঙলে কাল আর বাঁচব না।'

বিকাশ তাকে বুঝিয়ে ফটোখানা যথাস্থানে টাঙিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। তার মনে এইটুকুই সান্ত্বনা—ছলনা দিয়ে সে আর একজনকে বাঁচিয়েছে আজ।

এত আঘাতেও সরিতার মুখে তেমনি ক্ষমার হাসি—এতটুকু ম্লান হ'ল না।
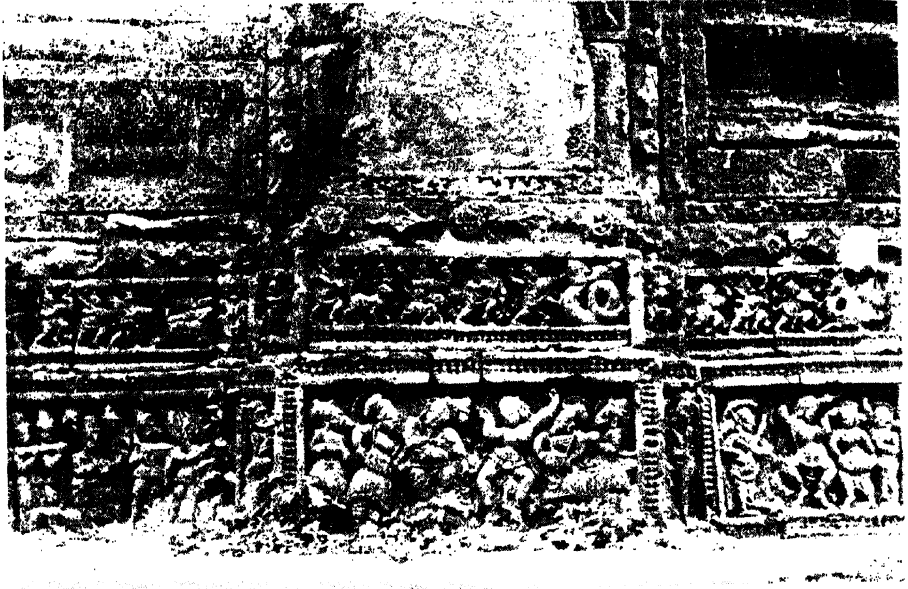
প্রাচীন মন্দির-গাত্রে পোড়ামাটির কাজ

বাংলার মৃৎশিল্প

শ্রীঅমল বিশ্বাস

বাংলার মৃৎশিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ঐ শিল্পে প্রাচীন বাংলার দানের কথা উল্লেখ করতেই হবে। সঙ্গীত ও সাহিত্যের মত শিল্পচর্চ্চার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাংলা যে পিছিয়ে ছিল না—তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন শিল্প-সংগ্রহশালায় রক্ষিত তদানীন্তন শিল্প-নিদর্শনগুলি থেকে অন্ততঃ ঐ কথাই প্রমাণিত হয়। তবে বাংলার মৃৎশিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাসের সম্যক পর্য্যালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কাজেই সংক্ষেপে প্রাচীন ও বর্ত্তমান বাংলায় ঐ শিল্পের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

এ কথা সত্য যে, বর্ত্তমানে শিল্পের Theory বা উপপত্তির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে নানা ভাষায় শিল্পসম্পর্কিত আলোচনা প্রসারলাভ করছে, এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রও স্থাপিত হয়েছে—শিল্পচর্চ্চার সেই সকল উপকরণ আজ সহজলভ্য, প্রাচীন বাংলায় যেগুলির বিশেষ অভাব ছিল। বাংলা দেশের মৃৎশিল্পের প্রাচীন নিদর্শনগুলি পর্য্যবেক্ষণ করলে বেশ বোঝা যায়—তখনকার দিনে শারীর-স্থানের (Anatomy) সূক্ষ্ম মানদণ্ডে শিল্পবস্তুকে বিচার করার জন্য শিল্পীরা ততটা আগ্রহশীল ছিলেন না, যতটা ছিলেন শিল্পবস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব-বিকাশের প্রয়াসে। তাই বলে প্রাচীন বাংলায় শিল্পকলায় 'এনাটমি'র নামগন্ধ একেবারেই ছিল না এমন নয়, তবে শিল্পসৃষ্টিতে ভাবের প্রাধান্যকেই ঐকান্তিক ভাবে বরণ করে নিতেন তদানীন্তন শিল্পী বা পটুয়ারা। এই ভাবের প্রাধান্যই ভারতীয় শিল্পকলার বীজমন্ত্র। বাংলার শিল্পসাধনাও এই মন্ত্রে সঞ্জীবিত। 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বাংলার একান্ত নিজস্ব ভাবময় পরিবেশ বাঙালীকে করে তুলেছে ভাবপ্রবণ, বঙ্গ-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় তার এই ভাবপ্রবণতার ছাপ রয়ে গেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির পার্থক্য আছে—তা স্বকীয় ও স্বতন্ত্র।

প্রস্তর সকলের পক্ষে সহজলভ্য নয়, তা ছাড়া প্রস্তরকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে শিল্পসৃষ্টিতে সময় এবং মেহনত দুই লাগে প্রচুর; তাই স্থায়িত্ব কম হলেও প্রাচীন বাংলায় মৃৎশিল্পের বেশ চলন ছিল। বাংলার মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে বানগড় ও তমলুকের মাটির মূর্ত্তি ও খেলনায় উল্লেখ আছে। ঐ সকল মূর্ত্তি ও খেলনায় খ্রীঃ পূঃ প্রথম থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের শিল্পসৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। স্বল্প সময় ও স্বল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত হলেও 'Terra-Cota' বা পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনগুলি গঠন-কৌশলে ও রূপবৈচিত্র্যে সার্থক সৃষ্টি বলে গণ্য

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের কতকগুলি নমুনা (পোড়ামাটি)
[ফোটো—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের আর একটি নমুনা (পোড়ামাটি)
[ফোটো—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

বাংলায় বিভিন্ন স্থানের পুতুল-শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন
[ফোটো—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

হওয়ার যোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, আশুতোষ মিউজিয়ম ইত্যাদি শিল্প-সংগ্রহশালায় পোড়ামাটির ঐ ধরনের অনেকগুলি সার্থক শিল্প-নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। সাধারণ মূর্ত্তি, পুতুল ইত্যাদি ছাড়া শাস্ত্র বা পুরাণের উপাখ্যান অবলম্বনে বিভিন্ন মন্দিরগাত্র ও অলিন্দে পোড়ামাটির বহু শিল্পসম্ভার রচিত হয়েছে। ঐ সকল কাজে শিল্পীরা কখনও ছাঁচ ব্যবহার করেছেন, কখন হাতের সাহায্য নিয়েছেন, আবার কখনও-বা উভয়ের সহায়তায় শিল্পসৃষ্টি করেছেন। তবে গুপ্তযুগের কাজে ছাঁচেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন পুতুলের মধ্যে নারীমূর্ত্তির আধিক্য দেখা যায় এবং ঐগুলির অধি-

কাংশই যৌবনের লাবণ্যে লীলায়িত। আঙুলের সাহায্যে শিল্পীরা যে সকল মূর্ত্তি গড়েছেন সেগুলিতে দেহের লাবণ্য অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠেছে। পুতুলগুলির মাথা সাধারণতঃ ছাঁচে তৈরি ক... দেহের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে সংলগ্ন করা হয়েছে। পোড়ানো...

বিচিত্র মুখাবয়ব (পোড়ামাটি)
[ফোটো—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক
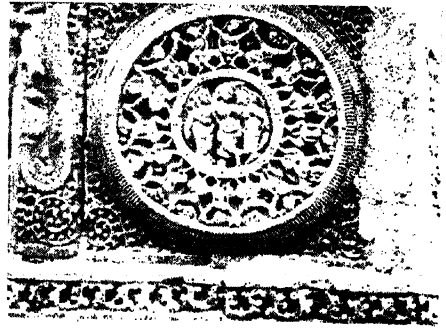
প্রাচীন মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কাজ

তারতম্য অনুসারে পোড়ামাটির কাজ লাল, কালো, ধূসর বা তামা... বর্ণ ধারণ করে। ঐ কাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—রঙের ব্যবহার না ক... কেবলমাত্র গঠন-কৌশলে শিল্পবস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবটিকে ফুটি... তোলা। অবশ্য স্থানবিশেষে পোড়ামাটির কাজে উজ্জ্বল লাল ব... কালো রঙের ব্যবহারও দেখা যায়।

বর্ত্তমান বাংলায় মাটির কাজে কৃষ্ণনগরের দান উল্লেখযোগ্য... মূর্ত্তিনির্ম্মাণ ছাড়া 'নেচারাল কালার' অর্থাৎ হুবহু রঙে রাঙানো... এখানকার 'মডেল' শিল্পসামগ্রী ভারতের তথা বিশ্বের শিল্প-রসিকদে... সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কথিত আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে... রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা মৃৎশিল্পীদের নিয়ে কৃষ্ণ... নগরে একটি স্থায়ী শিল্পী-বসতি গড়ে তুলেছিলেন। অবশ্য একথা শোনা যায় যে, তদানীন্তন রাজধা... কলিকাতার 'রাজা-মহারাজা' অর্থাৎ বড় ব... জমিদার-বাড়ীগুলিতে ধীরে ধীরে মূর্ত্তিপূজা... প্রচলন হতে থাকায় কৃষ্ণনগরের শিল্পী... দলে দলে চলে আসেন কলিকাতা... কুমারটুলী অঞ্চলে। মূর্ত্তিশিল্পের মেহনতী... কাজে অধিকতর পসার জমানোর বাসনা... ক্রমে ক্রমে তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থ... এবং যে স্থানটি ছিল বনজঙ্গলে পূর্ণ, কাল... সেখানে আজকের কুমারটুলীর জনা... শিল্পী-বসতিটি গড়ে উঠে। বিভিন্ন দে... দেবীর মূর্ত্তিনির্ম্মাণে কুমারটুলী প্রসিদ্ধি অ... করেছে; তবে অর্থোপার্জ্জনের তাগি...

পুতুল-শিল্প—জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতি [ফোটো—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

এখনকার শিল্পে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এদিক দিয়ে কুমারটুলীর অনেক মৃৎশিল্পী আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ছেন বলে বোধ হয়। পোড়ামাটির কাজে বাঁকুড়ার নামও উল্লেখযোগ্য। নানারূপ জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি (হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি) নির্ম্মাণে ঐ স্থানের শিল্পীরা বেশ কৃতী। ঐ সকল শিল্পবস্তুর বিশেষ ঢঙ বা গঠন-বৈচিত্র্যের সঙ্গে অপরাপর স্থানের মৃৎশিল্পের বেশ খানিকটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এর অধিকাংশ চাহিদামত ছাঁচের সাহায্যেই তৈরি করা হয়। রঙীন পুতুল বা অপরাপর মৃৎশিল্পে বিষ্ণুপুর, মজিলপুর, চাঁদপাড়া, সিঙ্গুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের নাম করা যেতে পারে।

অধুনা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মৃৎশিল্পের এক সঙ্কটময় অধ্যায় চলেছে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পোৎপাদনে প্ল্যাষ্টিক ইত্যাদির ব্যাপক প্রসারের ফলে মৃৎশিল্পের চলন কমে আসছে। তবে ভারত তথা বাংলার মানব-সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে মৃৎ-শিল্পের দান অনস্বীকার্য্য। বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের দিনে সস্তায় সৌখীন শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের দরুন রুচিবোধের তারতম্য ঘটছে। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পে এই বিবর্ত্তন অস্বাভাবিক নয়। আজ কেন—আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে মৃৎশিল্পী বা পটুয়ারা বরাবরই কেমন যেন অপাংক্তেয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে; ঐ শিল্পীকুলের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বীকৃতিটুকু পেতে আর কত দেরি?

সত্যব্রতা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পুরী উপান্তে ঘন শালবনে সাতশ' ভিক্ষু সাথে
এলেন বুদ্ধ পূর্ণিমা-দিনে ভিক্ষাপাত্র হাতে।
মাথার উপরে ফুলতরু যত
পুষ্পবৃষ্টি করে অবিরত
নগর ছাড়িয়া পুরবাসী শত ছুটিয়া চলেছে বনে।
শুদ্ধোধনও পথচারী হন রাণী গৌতমী সনে।

তৃতীয় দিবসে শাক্যসিংহ মহানগরীতে আসি'
ভ্রমেন ভিক্ষা চাহিয়া চাহিয়া সকলেরে ভালবাসি'।
মহাশ্রেষ্ঠীও পায়সিক' যাঁরে
বহুদিন যেচে আপন আগারে
সে-জন ভিখারী-কুটীর-দুয়ারে অন্ন যাচেন হাসি'।
স্থবিরেরা সবে থমকি থামেন চণ্ডাল-দ্বারে আসি'।

কপিলাবাস্তু প্রাসাদ-সৌধে পড়েছে খুশীর সাড়া।
অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ হ'ল উৎসবে দিশেহারা।
ভিতর মহল হইল উজাড়
আঙিনায় ভিড় কুল-ললনার
বোধিসত্ত্বের কৃপা-কণিকার ভাগী হতে চান তাঁরা।
বহু দিন পরে ফিরেছেন ঘরে কুমার সে ঘরছাড়া।

এলেন বুদ্ধ, ক্ষমা-সুন্দর, সম্ভাষি' জনে জনে।
বহান প্রীতির মন্দাকিনীরে মধুর মিলন-খনে।
জিজ্ঞাসু চোখ চাহে বার বার
পায় না খবর সে যশোধরার
সতীর মতন সে কি আজো তাঁর অনুবর্ত্তন করে?
চীনাংশুকের বসন ছাড়ি কি কঠিন কাষায় পরে।

ভিতর ভবনে গেলেন দণ্ডী সারিপুত্রের সাথে
চলে অনুসরি' মৌদ্গল্যান চারু ভৃঙ্গার হাতে।
যশোধরা বসে ইষ্টের কাছে
স্বামী ও সত্য এক হয়ে আছে
ছিন্ন কেশের চিহ্ন যে বাঁচে চন্দন-পেটিকায়।
রাজবালা পতি-পাদুকা পূজেন সত্যের সাধনায়।

প্রতিজ্ঞা তাঁর, 'সত্যই যদি হই সহধর্ম্মিণী
কোন এক দিন বোধিসত্ত্বকে লইতে হইবে চিনি।
আসিতে হইবে পুরীর মাঝারে
ভাগ্যহীনার পূজা লইবারে
নহি দ্বিচারিণী, কহি বারে বারে, রেখেছি ধর্ম্মে মতি।
চক্ষে আমার এক হয়ে আছে পতি ও জগৎপতি।'

পূজা শেষ করি' যশোধরা যেথা দানিছেন অঞ্জলি,
স্থবিরদ্বয়ের সঙ্গে বুদ্ধ সেথায় গেলেন চলি।
দাঁড়ান বাড়ায়ে যুগল চরণ
পড়িল চরণে পুষ্পাভরণ
অঞ্জলি দিয়া করিল বরণ যশোধরা বুদ্ধেরে।
সত্যব্রতা সম্মুখে আজ স্বামী আসিয়াছে যে রে।

কহেন বুদ্ধ, দেবী যশোধরা সার্থকনামা তুমি,
তোমার যশের বিভায় দীপ্ত হয়েছে ভারতভূমি।
তোমার নিষ্ঠা, সাধনা তোমার
মুগ্ধ আমারে করে বার বার
তব সহায়তা অজ্ঞানতার [illegible]ধার দিয়াছে নাশি।
বুদ্ধের চোখে বোধির আ[illegible]ক উঠে তাই উদ্ভাসি।

কৃষ্ণ-বলরাম লীলা — শিল্পী—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

শিল্পী শ্রীমহীতোষ বিশ্বাসের চিত্রকলা

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

গত ৭ই এপ্রিল কলিকাতার বেলভেডিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারে অধ্যাপক শ্রীযুত হুমায়ুন কবীর যে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রকলার একটি বিভাগ ছিল, এবং এই চিত্রগুলি সমস্তই শিল্পী শ্রীমহীতোষ বিশ্বাসের আঁকা। বাংলার একটি নিজস্ব ধারা এই চিত্রগুলির মধ্যে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রদর্শনী দেখতে দেখতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি চিত্রগুলির প্রশংসা করেন। শিল্পী মহীতোষ দীর্ঘদিন গ্রামে থেকেই শিল্পচর্চা করেছেন, শহরের সঙ্গে তাঁর তেমন যোগাযোগ ছিল না। তাই তাঁর চিত্রকলার সঙ্গে এত দিন শহরের বিশিষ্ট শিল্পরসিকের কোন পরিচয় ঘটে নি। সেই পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ সত্যই একটা ভাল কাজ করেছেন।

শিল্পীর আঁকা প্রায় কুড়িখানি চিত্র প্রদর্শনীতে ছিল। বেশীর ভাগ ছবির বিষয়বস্তু দেবদেবী হলেও গ্রামের কৃষক, ফুল, পাখী, লতাপাতা শিল্পীর রচনাতে ধরা পড়েছে। এই সকল চিত্রের মধ্যে বর্ণলেপনের এমন একটি কৌশল আছে যা চোখকে গভীর তৃপ্তি দেয় এবং বিষয় বস্তুর মর্মকথা ব্যক্ত করে। চিত্রগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ, মাতাপুত্র, লক্ষ্মী, সিংহবাহিনী, দেবী দুর্গা ও কৃষক উচ্চ শ্রেণীর রচনা ব[...] আদৃত হতে পারে।

শিল্পী শ্রীমহীতোষ বিশ্বাসের চিত্রকলা সম্বন্ধে শিল্[...] নিজের মুখের কয়েকটি কথা বলা খুবই প্রয়োজন মনে কর[...] আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পী বললেন :

"আমি বাল্যকাল থেকেই ছবি আঁকছি। বাল্যকা[...] আমার পরিচয় হয় কালনার দুই জন পটুয়ার সঙ্গে। [...] হিসাবে এঁদের কাছেই আমার হাতেখড়ি হয়। বি[...] তখনকার দিনে এই সব অশিক্ষিত পটুয়াদের কাজ দে[...] লোকের কাছে তেমন প্রশংসা পেত না। কাজেই [...] লেখাপড়া শেখার পর আমি "সোসাইটি"তে পূজনীয় ক্ষিতী[...] নাথ মজুমদার মহাশয়ের কাছে ছবি আঁকা শিখতে এলা[...] শিক্ষা শেষ হলে আবার গ্রামে ফিরে গেলাম। কিন্তু আ[...] অন্তর থেকে বাংলার পটের কথা গেল না। আমার অনেকগু[...] ছবি নিয়ে ১৯৪৫ সনে প্রবর্তক সংঘ কলকাতায় এ[...] প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। এই প্রদর্শনীতে এক [...] প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক যামিনীকান্ত সেন মহাশয় এসে[...] তিনিই আমাকে প্রথম পটের পদ্ধতিতে আঁকা আমার স্ব[...] ধারাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট উৎসাহও দি[...] ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—'এ পথে বহু বাধা আস[...] কিন্তু এ পথ ছেড়ো না, একদিন আসবে যখন দেশের [...]

তোমাকে চিনবে, তোমার কাজ বুঝবে ই আশা নিয়েই আমি শিল্পচর্চা করছি। ি দ্র্যলক্ষ্মী আমার পিছনে থেকে মার পথভ্রান্তির চেষ্টা করেছে। কিন্তু খন পর্য্যন্ত তা পারে নি। আমি জও আশা নিয়ে আমার পথে এগিয়ে লছি। যাঁরা বাংলার পটচিত্রের মধ্যে ধু একটা "পল্লী ধারা" দেখেন—আর ান রসের সন্ধান পান না, তাঁরা ভাল- সে বাংলার এই অপূর্ব শিল্পসম্পদকে ল করে দেখেছে বলে মনে হয় না। মি জানি, যে শিল্প ভাবপ্রকাশে সক্ষম ই শিল্পই স্বীকৃতির দাবি রাখে।

বে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন ন করি। তা হচ্ছে এই যে, 'পট'বলতে া আজও সেই 'কালীঘাটের পটে'র া মনে করেন আমি যে সেই টচিত্র' পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছি তা

জাতীয় গ্রন্থাগারে শিল্পী শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস (ডান দিকে দণ্ডায়মান)

নয়, পট অর্থ এখানে চিত্র। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলাতে পটুয়ার বাস ছিল, তাঁদের আঁকবার ধারাও রকমারি ছিল। কিন্তু এই সব চিত্রের হুবহু নকল করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না, তাই কতকটা নূতন অঙ্কনরীতি প্রাচীন পটচিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে বহুদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে একটি নূতন রূপ দানে সক্ষম হয়েছি। আমার চিত্রকলার রূপ যাতে সর্বজনের মনোরঞ্জন করতে পারে সেই দিকে আমি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিয়েছি।

আজকাল দেখি, শিল্পীদের মধ্যে কাজের পদ্ধতি বা রীতি নিয়ে বেশ দলাদলি, মনকষাকষির ভাব আছে। আমি থাকতাম গ্রামে, এ সবের কোন ধার ধারি নি, এখনও নয়। কারণ আমি বুঝি, শিল্পীর রচনার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেই শিল্পীর স্বীকৃতি, খ্যাতি যা কিছু, তা যে পদ্ধতির কাজ হোক না কেন।

কালী ভজি কি কেষ্ট ভজি তা বড় কথা নয়, আলো- চনার কথা নয়। আমি ভক্ত না সত্যকারের সাধক, তা দেখা দরকার।

কিন্তু সাধনা ছেড়ে যদি শুধু কালী বড় কি কেষ্ট বড় এই নিয়ে শাক্ত আর বৈষ্ণবে তর্ক মারামারি হয়, তবে সত্যকার ঈশ্বর সাধনা কারও হবে না।

চিত্রকলা ক্ষেত্রেও আমি এই কথা ভাবি। সেজন্য বাংলার প্রাচীন চিত্রধারাকে ভিত্তি করে আমার নিজস্ব অঙ্কনরীতিকে গড়ে তুলেছি। আমার ছবি রসোত্তীর্ণ হ'ল কিনা সেইটুকু দেখার ভার শিল্পরসিকের।"

শিল্পী—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

নিমাই পণ্ডিত শিল্পী—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

শিল্পীর এই কথাগুলিতে তাঁর শিল্পসাধনা সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। আজ বাংলার চিত্রকলা ক্ষেত্রে বড় দুর্দিন। অধিকাংশ শিল্পী অর্থাভাবে জর্জরিত সুতরাং অভাবের তাড়নায় সত্যকার শিল্পচর্চা ছেড়ে ব্যবসায়ীর জন্য কমার্শিয়াল আর্টের দিকে তাঁদের মন দিতে হয়। এরই মধ্যে যাঁরা সত্যকার শিল্পীমন নিয়ে, অন্তরের তাগিদে নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে শিল্প সৃষ্টি করছেন তাঁদের কাছ থেকেই আমরা কিছু রসের সন্ধান পাচ্ছি। এই সব সাধক-শিল্পী যে দেশের গৌরব ও সকলের ভালবাসা পাবার যোগ্য তা অবশ্যই বলা যায়। নন্দলাল, যামিনী রায়ের পথে উত্তরকালে আমাদের দেশে যে কয়জন শিল্পী আপন সাধনার দ্বারা দেশে শ্রেষ্ঠ আসনের দাবি রাখেন তাঁদের ধারা সার্থক ভাবে বহন করে চলেছেন শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বাংলার নিজস্ব শিল্পশৈলী শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাসের চোখে দেখা দিয়েছে ও তুলির টানে দিয়েছে। বাংলা ভাষার মত বাংলার শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, যাঁরা এই শিল্পসাধনায় রত তাঁদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে. উৎসাহ দিতে হবে। শিল্পী মহীতোষের চিত্রকলা. বাংলার নিজস্ব সম্পদ বলা ত বাহুল্য মাত্র।'

দীননাথ দে

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মিত্র

[পৃ]থিবীতে এমন একশ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা জনতার [মা]ঝখানে আপনার কর্মকৃতির জন্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত [স]মুজ্জ্বল থাকেন; স্তুতি আর প্রশংসার সমারোহে ইতিহাসে [রে]খে যান তাঁরা স্বাক্ষর। তেমনি আর একদল আছেন যাঁরা [পা]ণ্ডিত্যে, ব্যক্তিত্বে আর আচরণে মহোত্তমের পর্য্যায় উন্নীত [হ]য়েও পরিহার করে চলেন মানুষের ভিড়, অভিনন্দন আর [অ]ভ্যর্থনা থেকে দূরে তাঁরা জ্ঞানের তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন।

আজ যাঁর কথা লিখছি তিনি শেষোক্ত দলের। তাঁর [জী]বন আলোচনার মধ্যে দেখতে পাই মনীষী চরিত্রের [আ]লোকচ্ছটা।

উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশক বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক [জা]গরণের শুভ লগ্ন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ তখন বাংলার [কু]সংস্কারসর্বস্ব জড় জীবনে প্রাণবন্যা এনে দিয়েছে; অন্ধ [বি]শ্বাসের জায়গায় ক্রমশঃ স্থান পাচ্ছে প্রবল যুক্তি। [ত]ৎকালীন বাংলা দেশের সূর্যকরোজ্জ্বল সামাজিক আব-[হা]ওয়ায় যাঁরা বেড়ে উঠলেন তাঁদের মননধারা স্বচ্ছ হয়ে [উ]ঠল—জীবনকে তাঁরা অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে সুরু [ক]রেন।

এই ষষ্ঠ দশকেই (২রা সেপ্টেম্বর ১৮৬২) দীননাথ কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন; [“স]রকারবাড়ী লেন” নামে বর্তমানে বাগবাজারে যে রাস্তা [আ]ছে তা তাঁর পূর্বপুরুষের ভিটের উপর দিয়ে গেছে। এ [প্র]সঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন দীননাথের পূর্বপুরুষের সম্পূর্ণ [উপা]ধী ছিল “দে সরকার।” এঁর পিতা শ্যামচাঁদ তৎকালীন বাংলা সরকারে কাজ করতেন। [সে]কালে দীননাথের পড়াশুনা অন্যান্য সাধারণ [ছে]লেদের মতই এগিয়ে গিয়েছিল; পিতা শ্যামচাঁদ দে [আ]পনার কর্মে ব্যাপৃত থাকতেন বলে পুত্রের পড়াশুনার [প্র]তি আগ্রহশীল হলেও ইচ্ছানুরূপ উৎসাহ দিবার অবকাশ [পে]তেন না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দীননাথ ঘনিষ্ঠভাবে [মি]শতেন, গঙ্গায় স্নান করা ছেলেবেলায় তাঁর এক বিশেষ [নে]শা ছিল। খড়ের বড় বড় নৌকার উপর থেকে গঙ্গায় [ঝাঁ]প দেবার মধুর স্মৃতি শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মনে গাঁথা [ছিল]। দীননাথ ধনীর সন্তান ছিলেন না; তাই পিতার [মৃত্যু]র পর তাঁকে আপনার একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর কাছে থেকে পড়াশুনা চালাতে হয়েছিল। জীবনের এই সঙ্কটময় অবস্থায় তিনি আপনাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প করেন।

দীননাথ দে

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি জেনারাল প্রেসিডেন্সীতে অধ্যয়ন সুরু করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কলেজে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞানতপস্যা সুরু হয়। কেবল পাঠ্য পুস্তক নয়, অন্যান্য বহু মূল্যবান এবং পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পুস্তকও পড়তে আরম্ভ করেন। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের এই সংযোগ, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী মননধারার সঙ্গে এই পরিচিতি তাঁর মনে নতুন আলো জ্বেলে দেয়। বাংলার ধর্মীয় আকাশ তখন ব্রাহ্মধর্মের উদারতা আর হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামীর সঙ্ঘাতে ভারাক্রান্ত; যুবক দীননাথ বাহ্যিক অনুষ্ঠানসর্বস্ব হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেন ও তিনি ব্রাহ্মধর্মে অনুরক্ত হন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রচণ্ড বিরোধী হওয়ায় ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে তিনি সংযোগ রক্ষা করতে পারেন নি।

অপমানসূচক বিবরণ দিয়ে আদিপুরুষকে উপস্থিত না করলেই ভাল হ'ত।"

৯১ বৎসর বয়সে লেখা এই চিঠি দেখে বিস্মিত হতে হয়, ৯০ বৎসর অতিক্রম করার পরও দেখেছি তাঁকে প্রচুর মূল্য দিয়েই তিহাসের বই সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতে। পরিণত বয়সে চিন্তাশক্তির এই প্রাখর্য দুর্লভ বস্তু।

কেবল যে বইয়ের ছাপা অক্ষরের মধ্যেই আপনাকে নিমগ্ন রাখতেন দীননাথ তা নয়। জীবনের সমস্যা, সমাজের প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল বৈপ্লবিক মতবাদ থাকায় আত্মীয়স্বজন অনেকে আপন আপন যুবসুলভ সঙ্কল্প তাঁর কাছে জ্ঞাপন করত, কিন্তু তিনি অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তাদের নিবৃত্ত করতেন। নিম্নে উদ্ধৃত পত্রাংশ তিনি তাঁর এক বিবাহবিমুখ নাতিনীকে লিখেছিলেন :

"বিবাহ সম্পর্কে তুমি যে মত পোষণ কর ওটা প্রাকৃতিক নিয়ম, সামাজিক নিয়ম ও নৈতিক বিধির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। প্রকৃতির সমস্ত পদার্থ জড় বা চেতন, নিজেদের প্রকাশ ও বিস্তৃতি করার জন্যে ব্যাকুলিত, সেইটাই তাদের প্রকৃতি-নির্দিষ্ট স্বভাব, তা থেকে বিচ্যুত হওয়া প্রকৃতির নিয়ন্তাপুরুষের অভিপ্রেত নয়। সমস্ত চেতন পদার্থ এক কোষবিশিষ্ট প্রোটোপ্লাজম থেকে অসংখ্য কোষবিশিষ্ট মানুষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের জীবনের কাজ হচ্ছে propagation of species. এবং প্রকৃতিই সেই কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং সেই কাজের প্রবণতা নিহিত করে দিয়েছে··· তার পর একাকী জীবন-যাপন করতে গেলে হৃদয় ক্ষেত্র অবশেষে মরুভূমিতে পরিণত হয়। যে পৃথিবী ত্যাগ করে লোকালয় ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করে তার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তারাই কি প্রকৃতির কাছে নিস্তার পায়, ভরত রাজার উপাখ্যান পড়, কবি Browning এর Paraclus পড়, রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পড়, দেখবে প্রকৃতি শুষ্ক হৃদয়ের কি রকম প্রতিশোধ নিতে পারে।"

ঠিক তেমনি অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে তিনি অপূর্ব উদার ভাব অবলম্বন করেছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি বলতেন :

"আমার দৃঢ় ধারণা যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত না হলে সমাজে মেয়েরা তলিয়ে যাবে—যখন প্রতি গৃহে বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করি তখন মনে হয় যে, বিবাহের যে অসংখ্য গণ্ডী আছে সেগুলো জোর করে উৎপাটিত করে ফেলি, যাতে গৃহের মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারে।"

১৪।৪।৫৬-এ কোন নাতির বিবাহ সম্পর্কে তিনি লিখছেন :

"কন্যা নির্ব্বাচন করতে গেলে নির্ব্বাচন ক্ষেত্র প্রসারিত করা প্রয়োজন এবং inter-caste marriage-এর উপর উন্নাসিকতা স্বাধীন ভারতে যুগোপযোগী হবে না।"

তাঁর জীবন দিগন্ত বিস্তৃত হওয়ার ফলে আত্মীয়স্বজনের সংখ্যাও প্রচুর হয়েছিল, নিকট বা দূর কোন পার্থক্য-রেখা না টেনে সবাইকেই তিনি সমচোখে দেখতেন। নি ইচ্ছে কারোর উপর আরোপ করতেন না। সারা ব চাকরবাকর এবং দু'এক জন নাতি-নাতিনী নিয়ে থাকত কেবল ছুটির সময় দূরদূরান্ত থেকে আত্মীয় অনাত্মীয় স এসে তাঁর কাছে বিশ্রাম নিত। বাড়ীভর্ত্তি লোক, নিজের সময়ানুযায়ী কাজ তিনি করে গেছেন ; স্বাব তাঁর বিস্ময়কর ছিল ; শেষদিন পর্যন্ত কারুর সহায়ত নিয়ে কাপড় কোঁচান থেকে সুরু করে নিজের সব কাজ ক গেছেন।

বাইরে তিনি কঠোর ছিলেন, কিন্তু অন্তর ছিল ফু মত নরম। বাড়ীর পরিচারক-পরিচারিকাদের বেয়াদপি তিনি যেমন উগ্র হয়ে উঠতেন তেমনি তাদের অসম অন্তরঙ্গ সহায়ক ছিলেন। তাঁকে দেখেছি পিতৃসুলভ উ নিয়ে অসুস্থ পরিচারকের দেহের তাপ পরীক্ষা করতে ও পরিচর্য্যার নির্দেশ দিতে। মধুপুরের বিভিন্ন বা কলিকাতাস্থিত উদাসী মালিকদের সঙ্গে তিনি মালী বাকী মাইনে নিয়ে পত্রাদি লিখতেন। পাড়ার নি দরিদ্র জনসাধারণের একান্ত নির্ভর ছিলেন তিনি। পা চোর ধরা পড়লে পুলিসে দেবার আগে তারা ধৃত চোর "জজবাবুর" সামনে হাজির করত। তা ছাড়া মধুপুরে ব বাড়ীতে কত আত্মীয় গুরুতর রোগ ভোগের পর সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

জীবনকে তিনি ভালবেসেছিলেন আপনার অন্তর দি রূপ রস গন্ধময় পৃথিবীর মর্মমধু পান করার সু আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯২৯ সনে জেলাজজ রূপে অবসর গ্র করে শাল মহুয়ার দেশ মধুপুরে অবসর যাপনের ব্য করেন। ঘরের চারপাশে ছিল স্বর্ণ চাঁপা, কুর্চী, ল্যাভেণ্ড আর কামিনী ফুলের ঝাড়—বাগানে ফুটে থাকত ন রঙের ফুল দীননাথ নিমগ্ন থাকতেন সেই সুরভিত আবেষ্ট কাব্য কবিতা আর ইতিহাসের পাতায়। ফুলবাগ ছিল তাঁর অতি আদরের ; যে দিন কোন ভাল গাছের চ লাগান হ'ত, সেদিন হৈ হৈ পড়ে যেত, বাড়ীতে উপস্থি যাঁরা থাকতেন তাঁদের তিনি গাছ পোতবার নির্দিষ্ট জায় ডেকে পাঠাতেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব তাঁ লেখা থেকেই দিচ্ছি :

"মানুষ সম্বন্ধে আমাদের দেশের বাউলরাও বলে, 'সবার উপ মানুষ ভাই, মানুষ উপরে নাই।' বেদান্ত বলেন, 'সোঽহ সঃ (সেই ভগবান) অহম্ (আমি)। সব দেশের সব ভাবুক জ্ঞানীদের এক মত। অপরিমেয় বিলাসব্যসন অবশ্য সর্ব্বতোভা পরিহার্য্য, তাতে মেরুদণ্ড ভগ্ন করে দেয় এবং জীবনের ক পালনে অক্ষমতা আনয়ন করে। কিন্তু তা বলে মোহমুক্ত

ন বস্তু খলু ভাগ্যবন্ত" এ নীতিও অনুসরণীয় নয়, কবি প্রার্থনা
ন—

"এই বসুধার
ত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
শব্দ বর্ণ গন্ধময়।"

স্তুতঃ শব্দ বর্ণ গন্ধময় পৃথিবী উপভোগ না করলে জীবন পূর্ণতা হয় না। একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে, জীবনরস-রসিক যাঁরা নবীনের সাহচর্য লাভে উদ্‌গ্রীব থাকেন; দীননাথের মধ্যেও া তার আভাস পাই; তিনি একবার বলেছিলেন "নবীনের য্য উপভোগ করবার বাসনা আমার বরাবরই প্রবল আছে। ক-বালিকাদের সাহচর্য্য আমার বড়ই প্রীতিকর, তারা যেন নের হাত থেকে সদ্য নির্ম্মিত হয়ে এসেছে—পৃথিবীর আবর্জ্জনা তাদের হৃদয় মন এখনও কলুষিত হয় নি, তাঁদের সাহচর্যে ীর দ্বন্দ্ব কোলাহল বিস্মৃত হয়ে শান্তি লাভ করতে পারা যায়।"

এত জ্ঞান এত আত্মিক সম্পদের অধিকারী হয়েও তিনি র্ণ নিরহঙ্কার ছিলেন, কোনদিন আপনাকে প্রকাশ করতে ী হন নি। সম্প্রতি তাঁর এক নিকটজন তাঁর জীবন-ত রচনা সম্পর্কে উদ্যোগী হলে তিনি তাঁকে এই বলে ত্ত করেন:

"চাকরি জীবনে আরও কত লোক কত ভাল কাজ করে সাময়িক কত লোকের প্রশংসা ও শ্রদ্ধাভাজন হয়, সেজন্য তাদের জীবন-লিপিবদ্ধ করাবার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। যে া ব্যক্তির জ্ঞান, চিন্তা এবং আচরণের দ্বারা সমসাময়িক সমাজ ভবিষ্যৎ সমাজ প্রভাবিত হতে পারে সেই ব্যক্তিরই জীবন-লিখিত হওয়া উচিত। আমি এক নগণ্য ব্যক্তি, আমার কিংকর জীবন এমন দীপ্তি সম্পন্ন নয় যে সমাজের লোক ত ও প্রভাবিত হতে পারে। তোমরা ও কল্পনা পরিত্যাগ তোমাদের শুভেচ্ছা অবশ্য আমাকে অভিভূত করেছে এবং ই আমার পাথেয়স্বরূপ।"

সব প্রশংসাই তাঁর কাছ থেকে বিনম্র প্রত্যাখ্যান লাভ ছে। তাঁর অসীম জ্ঞানগরিমার ইঙ্গিত করায় তিনি তে লিখেছিলেন:

"আমার জ্ঞানের কথা লিখেছ আমি হলুম প্রজাপতি-ধর্ম্মী, ফুলে মধু চেখে চেখে বেড়াই কিন্তু চক্র নির্ম্মাণ করে যে মধু করে রাখব এবং অপরকে বিলাব সে শক্তি আমার নেই, কারণ নির্ম্মাণ করার নিপুণতাই নেই, তবে অনেক মধু চাখতে গিয়ে এক ফোঁটা জিবে লেগে আছে তারই অল্প-স্বল্প কণা ক্ষরিত হয়, তাইতেই যে তোমরা তৃপ্ত হও সেটা আমার গৌরবের ।"

পুতচরিত্র দীননাথ দে গত ২৮শে এপ্রিল মধুপুরেই তাঁর 'অরুণোদয়' ভবনে ৯৪ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মনকে কালের তালে এগিয়ে এনেছিলেন, তাই তিনি মানসিক দীনতা থেকে মুক্ত ছিলেন। তেমনি পরিমিত আহার এবং নিয়মিত জীবন যাপনের ফলে তাঁর দেহ জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি। সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে এবং মুক্ত মনে তিনি চিরযাত্রা করেছেন। রেখে গেছেন বহু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সর্বোপরি নানা স্থানের বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। মধুপুরে চিরস্মরণীয় সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর অতি নিকটেই দীননাথের বাড়ী ছিল। সর্ আশুতোষের সহিত তাঁহার সৌহার্দ খুবই ছিল। মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দীননাথকে অতি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর মৃত্যু খবর পেয়ে রমাপ্রসাদবাবু বলেছেন, "He was an institution by himself"।

দীননাথের মৃত্যুও এক বিস্ময়ের বিষয়। কিছুদিন পূর্বে তিনি এক জামাতাকে লিখেছিলেন—"Drivelling dotard"-এর মত বেঁচে থাকতে চাই না। মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালে তিনি সব কাজই নিয়মিতভাবে করেছেন, কিছুমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন নি, তাঁর নিকটে তাঁর অবিবাহিতা একজন দৌহিত্রী ছিলেন, তাঁর সহিত নানা রকমের কথাবার্তা বলেছেন তাঁর ঘরে চেয়ারে বসে পেন্সনের কাগজ সই করছিলেন—সেই সময় চেয়ারে বসেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, কেউ জানতে পারে নি।

দীননাথের 'প্রদীপ' ও প্রবাসীর সহিত আজীবন ঘনিষ্ঠতা ছিল—প্রবাসী তাঁর সঙ্গীস্বরূপ ছিল, এবং প্রবাসীর প্রত্যেক প্রবন্ধ তিনি অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন। ১৯৫৩ সনের ১৪ই এপ্রিল তারিখের এক পত্রে তিনি তাঁর এক জামাতাকে লিখিয়াছিলেন:

"আমি কিছুদিন থেকে সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে 'খাদ্য উৎপাদন' পত্রিকায় তুমি সম্পাদকের নাম ছাপাবার সময় নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ আর যোগ করছ না। নিজের নাম বলবার সময় বা লেখবার সময় 'শ্রী' যোগ করা যে অনুচিত ভরসা করি তুমি সেটা উপলব্ধি করেই ঐ শব্দটি ত্যাগ করেছ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসী পত্রিকায় এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল তাতে লেখক নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন এবং সুযুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করেছিলেন যে ঐ রকম 'শ্রী' যোগ করা দাম্ভিকতার পরিচায়ক। আমি সেই অবধি শ্রী শব্দ যোগ করা ত্যাগ করেছি।

"উক্ত প্রবন্ধ ছাপা হবার কিছুদিন পরে শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রবাসীতে এক প্রবন্ধ ছাপান, তাতে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন, এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের

প্রবন্ধ ছাপা হবার পরেই রবীন্দ্রনাথ এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার ত্যাগ করলেন।"

আমরা পূর্ব্বোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করেই দীননাথের জীবনকথা শেষ করি—"He was an institution by himself'। তাঁর মত নিরহঙ্কার সতত-সজাগদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীর প্রয়োজনীয়তা আজকার দিনে অত্যধিক।

নূতন প্রভাত

শ্রীলীলাময় দে

জীবনের মিথ্যা অবসাদ
হানে শুধু বাদ ;
যারা চলে ছুটে চলে, আগামী যুগের পথে
নামায়ে চরণতলে অজস্র আলোর ধারা
অনন্তের রথে।
মোর গানগুলি
চুম্বিয়া তাদের চরণ-ধূলি
বারে বারে
ছিন্ন যেন পদ্মের করিবারে
সে নিষ্ঠুর অবসাদ মায়াজাল যত।
চরণের যাহা কিছু ক্ষত
নাহি রহে তিলমাত্র শোণিতলিখায় ;
নিঃশেষে মুছিয়া যেন যায়
আগামী যুগের যাত্রাপথগামীদের
নিঃশঙ্ক চরণের ক্ষীণতম ক্ষতচিহ্ন হতে
জীবন-সংগ্রাম পোতে
আছাড়িয়া পড়ে যদি উদ্ধত ঝড়ের হাওয়া,
ভেঙে দেয় হাল, হানে তীব্রাঘাত ;
তবে ওরে যাত্রীদল, জানিও নিশ্চয়
সম্মুখে জাগিছে ধ্রুব নূতন প্রভাত।

জীবন-অরণ্য

শ্রীশান্তশীল দাশ

জীবন-অরণ্য মাঝে ঘুরে ফিরি : গভীর আঁধার
বার বার একই পথ করি অতিক্রম !
ঘন কুজ্ঝটিকা ঘেরা সে পথের বাহিরে আসার
মেলে না নিশানা কোনো ; ব্যর্থ পরিশ্রম !

তবু চলি সেই পথে, মনে জাগে দুরন্ত দুরাশা,
শেষ হবে একদিন আরণ্য-জীবন ;
অন্তরে আছে মোর যে-আলোর সুতীব্র পিপাসা,
অরণ্যের প্রান্তে তার হবে নিরসন।

আলোকের স্বপ্ন দেখি : পরিক্রমা আঁধারের মাঝে,
নৈঃশব্দ্যের মাঝে শুনি অশ্রুত বিলাপ ;
ঝিল্লীর অক্লান্ত সুর একটানা কানে এসে বাজে,
ভোগ করি জীবনের ক্রূর অভিশাপ।

মন ছুটে চলে যায় জীবন-অরণ্য ভেদ করে,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার হয়ে যায় ম্লান ;
স্বপ্ন মোর দেখা দেবে একদিন সত্য রূপ ধরে,
সেদিনের আজিও তো পাইনি সন্ধান।

স্মৃতিশক্তি

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য, এম-এ,এম-বি

কিৎসকদিগের নিকটে মাঝে মাঝে এমন লোক আসেন, নি বলেন, "ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটার মোটে মেধা-ক্তি নেই! আজ কোন জিনিস পড়লে কাল সেটা মনে রে বলতে পারে না। এ বেলা পড়লে ও বেলা ভুলে য়। ওর স্মৃতিশক্তিটা বড়ই কম! একটা ওষুধ দিতে ারেন যাতে ওটা বাড়ে।"

ডাক্তারবাবু হয়ত প্রার্থীর বাড়ীতে অনেক রোগীপত্র াখেন বলিয়া সেই খাতিরে আপন ঘর বজায় রাখিবার জন্য—থবা প্রার্থিত স্মৃতিশক্তি বাড়ে কিনা তাহা চেষ্টা করিবার িমিত্ত, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটা বা একাধিক ঔষধ িখিয়া দিলেন। প্রার্থী ব্যক্তি সেই ঔষধ পয়সা খরচ করিয়া কিনিয়া দিনকতক খাওয়াইলেন, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, কছুদিন ঔষধ খাওয়ানোর পরও ঐ ঔষধ-সেবী বালক কানও উন্নতিলাভ করে না। তখন অভিভাবক হয়ত মনে নে একটু বিরক্ত হইয়া আবার চিকিৎসকের কাছে যান। াবার ডাক্তারবাবুও একটু অপ্রতিভ হইয়া আবার একটা ্যবস্থা করেন—নূতন কিছু ঔষধ দিয়া। কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তথাকথিত রোগীর স্মৃতিশক্তি যেমন াগে অল্পমাত্রিক ছিল এখনও তাহাই রহিয়াছে। হয়ত কিছু বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা মনে হওয়াই াত্র সার, বাস্তবক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উদ্যমশীল অভিভাবক াল না ছাড়িয়া আশায় আশায় অনেক পয়সা ব্যয় করিয়া নেক ঔষধ খাওয়াইলেন, কিন্তু শেষে একদিন হয় ত ঝিতে পারিলেন, ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে, ঔষধ খাওয়াইয়া শেষ কিছু উপকার হয় নাই। তাহার পর তাঁহারা হয় ত কিৎসক পরিবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোনও উপকার পান, এমন দৃষ্টান্ত কৈ দেখিতে পাই ।

ডাক্তারেরা এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সেই সব ঔষধের বস্থা করেন, যেগুলি অধিকাংশ স্নায়বিক শক্তিবর্ধক, যথা সফরিক এসিড, লেসিথিন অথবা উভয়ের সংমিশ্রণ (যথা ফো-লেসিথিন), ভিটামিন ইত্যাদি। সঙ্গে হয়ত রীরিক শক্তিবর্ধক—যাহাকে টনিক বলা হয়, সেই ঘটিত ধ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ফল বিশেষ পাওয়া যায় না। তা এই যে, স্নায়বিক শক্তিবর্ধক ঔষধে স্নায়ুর শক্তি ড়িতে পারে বা টনিক জাতীয় ঔষধে শরীর আরও সবল এবং পুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু স্মৃতিশক্তি বাড়িবে কেন? স্মৃতিশক্তি কি স্নায়বিক শক্তি বা শারীরিক শক্তির উপর নির্ভর করে? তাহা যদি করিত তবে যুদ্ধ-বিভাগের সেনাপতি বা সৈনিকদিগেরই স্মৃতিশক্তি একচেটিয়া হইত। কৈ তাহা তো হয় না। বরং কত শীর্ণ, ভীরু-স্বভাব, এমনকি রুগ্ন লোকেদের এরূপ স্মৃতিশক্তি থাকিতে দেখা যায় যে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এমন অনেক কৃতী ছাত্রকে আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতে দেখা যায়, যাঁহাদের স্মৃতিশক্তির প্রাচুর্য্য অবিসংবাদিত, কিন্তু যাঁহাদের শরীর ও স্বাস্থ্য শীর্ণ, দুর্ব্বল এবং বিশেষ আক্ষেপের বস্তু।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের কৈশোরে অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার জনৈক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের নিকটে এক-শত সদ্য-রচিত সংস্কৃত শ্লোক একবার মাত্র শুনিয়া তিনি শুটিকতক শ্লোক হুবহু আওড়াইয়া গেলেন। দিগবিজয়ী পণ্ডিত তো দেখিয়া অবাক! উপস্থিত অন্যান্য পণ্ডিতেরাও হতবাক্। এই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে "শ্রুতিধর" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

তিনি না হয় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ এমন অনেক লোকও ত দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা শারীরিক দিক দিয়া দুর্ব্বল, হয় ত আরশুলা দেখিয়া ভিরমি যান, কিন্তু অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন।

সুতরাং একরকম বুঝাই যায় বা স্বীকার করিয়া লওয়াও যায় যে, স্মৃতিশক্তি শারীরিক বল কিংবা স্নায়বিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নহে বা সমগোত্রীয় বস্তু নহে, উহা ভিন্ন বস্তু শারীর বৈজ্ঞানিকেরাও ঐ কথা বলেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মত এই যে, স্মৃতিশক্তি মস্তিষ্কের গুণ বা ক্রিয়া। উহার কেন্দ্র-স্থান—মাথার ঘিলুতে (cerebrum)। মাথার ঘিলু ও স্নায়ু বা শরীর বিভিন্ন জিনিস। শেষোক্ত জিনিস দুইটির প্রভাব প্রথমোক্তের উপর পড়ে না। কাজেই যে সকল ঔষধে স্নায়ু বা শরীর সতেজ হয় সে সকল ঔষধে স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হইবে কেন? আইসল্যাণ্ডে সীল মাছ বাড়িলে কি ভারতবর্ষের লোকের কোনও উপকার হয়? আরবে উষ্ট্র-সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িলে কি চীনদেশে শস্য বেশী জন্মায়? লেখাপড়া বেশী পরিমাণে শিখিলে কি দেহের কৃষ্ণবর্ণ গৌরবর্ণে পরিণত হয়?

যাঁহাদের শারীরিক শক্তি বেশী তাঁহারা হস্তপদাদি দ্বারা সাধনীয় কার্য্য অনেক করিতে পারেন অথবা অনেকক্ষণ ধরিয়া একনাগাড়ে খাটিতে পারেন, কিন্তু স্মৃতির বস্তু বিষয়ে তাঁহারা

কৃতিত্ব দেখাইবেন কি করিয়া ? এইরূপে ধরা যায়—যাহারা শারীরিক শক্তিসম্পন্ন, তাহারা শরৎবাবুর শ্রীকান্ত পুস্তকে চিত্রিত ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক কার্য্যধারা সম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যালয়ে কৃতী মেধাবী ছাত্রদিগকে পড়া মুখস্থ বলিয়া পরাজিত করিতে পারিবে কেন ? এ সমস্যা বুঝিতে হইলে জানা প্রয়োজন মানুষের স্মৃতি দেহের কোন্ যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয় এবং কেমন করিয়া সাধিত হয়।

কোনও বিষয়বস্তু পড়িলে বা চক্ষু কি কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহার ভাবধারা গিয়া পৌঁছায় মস্তকের খুলির মধ্যে অবস্থিত মস্তিষ্কে। সেখানে ঘৃতের মত অর্দ্ধ তরল, অর্দ্ধ কঠিন, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ একপ্রকার পদার্থ থাকে তাহাকে আমরা চলিত ভাষায় বলি ঘিলু। যখন কোন প্রত্যক্ষীকৃত বা বোধগত ভাবধারা ইহাতে প্রবেশ করে তখন সাধারণ সুতা হইতেও যথেষ্ট সূক্ষ্ম একপ্রকার মোল বা গর্ত্ত কর্ত্তিত হয় ঐ ঘিলুর উপর স্তরে। কেন কর্ত্তিত হয় ?

বর্ত্তমান জীবন-বৈজ্ঞানিকদিগের (Biologists) মত এই যে, কোনও ভাবধারা মস্তিষ্কের ঘিলুর মধ্যে প্রবেশ করিলেই সেই পথে একটা রাসায়নিক (?) প্রতিক্রিয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে কলইডাল (colloidal) চর্ব্বিজাতীয় একপ্রকার অম্লবস্তু আনুপাতিক ভাবে সেখানে উদ্ভূত হয়। অম্লবস্তুর সাধারণ ক্ষমতা এই যে, শরীরের যেকোন বস্তু বা 'টিস্যু' ইহার সংস্পর্শে আসিলেই কিছু ক্ষয়িত হয়। গায়ে এসিড লাগিলেই গা অল্পবিস্তর ক্ষয় হইয়া যায়। সেই সূক্ষ্ম ক্ষয় হইতেই সূক্ষ্ম খালের সৃষ্টি হয়। এই সকল অণু-প্রমাণ খাল অনেক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে। এমনকি মানুষের সারাজীবন ধরিয়া আমৃত্যু উহাদিগের অস্তিত্ব থাকিতে পারে। এই খালগুলি স্মৃতির বাসগৃহ বা ভাণ্ডার। যখনই আমাদের প্রয়োজন হয় কোনও কিছু বিষয় মনে আনিবার, তখনই মস্তিষ্কে খনিত ঐ খালগুলি হইতে উহার যোগান হয়। আজ যাহা দেখিলাম বা পড়িলাম, তাহার বিম্ব কিংবা প্রতিবিম্ব আজ অথবা কাল মনে করিতে পারি, পরেও মনে করিতে পারি, এক বৎসর পরে বা দশ বৎসর পরেও মনে করা যাইতে পারে—এমনকি সারাজীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার স্মৃতি আমাদের মনের সহিত বিজড়িত থাকিতে পারে। মস্তিষ্ক স্মৃতিগুলির আড়ত বা ভাঁড়ারঘর। যখনই দরকার তখনই সেখানে দরখাস্ত পড়িলেই সেখান হইতে মাল সরবরাহ হয়।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিল, যদি চিরজীবনের জন্য এই ভাঁড়ারঘরগুলিতে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে তাহা হইলে আমরা অনেক জিনিস ভুলিয়া যাই কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরও বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন। কত লক্ষ লক্ষ খাল এই ভাবে মানু[ষের] প্রাত্যহিক জীবনে মস্তিষ্কে অনবরত খনিত হইতে[ছে]। আমরা সকালে একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি[লাম], তাহার একটা খাল প্রস্তুত হইল। তাহার পর একখ[ানা] বই পড়িলাম ; তাহাতে কত শত খাল নূতন করিয়া ক[াটা] হইল। আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা ক[হিয়া] কত নূতন নূতন বিষয়ের স্মৃতি-খাল মস্তিষ্কে কাটিলা[ম]। অবিরত আমরা হয় কথা কহিতেছি, না হয় কিছু দেখিতেছি, না হয় শুনিতেছি। কাজেই ইন্দ্রিয়সক[লের] মাধ্যমে কত শত বিষয় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের মস্তি[ষ্কে] প্রবেশ করিতেছে। তাহাতে খাল তৈয়ারি হইতেছে। সুত[রাং] এই প্রভূতসংখ্যক খাল সৃষ্ট হওয়াতে সেগুলি পরস্প[র] কাটাকাটি করিয়া ফেলে ও সেখানে হিজিবিজি ঘটিয়া যা[য়]। তাহাতে কতকগুলি খাল চাপা পড়ে। তাহা ছাড়া সকল খাল সৃষ্ট হইবার যে প্রধান কারণ—ঐ কলইড চর্ব্বিজাতীয় অম্ল প্রত্যেক ভাব-আগমনের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হইতেছে সেগুলি এত পুঞ্জীভূত বা স্তূপীকৃত হইয়া [যায়] যে, সেই সকলই আবার কতকগুলি খাল বুজাইয়া ফেলে।

ধরুন একটা জমি, তাহাতে একটা খানা কি গর্ত্ত খো[ঁড়া] হইল। কিছুকাল তাহা ফেলিয়া রাখুন, দেখিবেন খান[া] অর্দ্ধেক না হউক কিছু বুজিয়া আসিয়াছে। কিসে বুজি[য়া] আসে ? চারিদিককার জমা মাটি (যে মাটি খানা খুড়ি[বার] ফলে পাশে জমা পড়িয়াছিল) হইতে মাটি খ[সিয়া] আসিয়া কিছু পূরণ করে, হাওয়া হইতে ধুলা আসিয়া [কি] সঞ্চিত হয়, চারদিককার গাছপালা হইতে স্খলিত জীর্ণ [পাতা] জমা হয়, পর্য্যুষিত লতাপাতাও তাহাতে স্থান পা[য়]। দেখা যায় অনেক সময় বৎসর যাইতে না যাইতে গর্ত্তটি প্র[ায়] বুজিয়া আসিয়াছে ঐ সকল ধুলামাটি লতাপাতার দ্বার[া]। আরও কিছুদিন পরে গর্ত্ত এমন বুজিয়া যায় যে, তা[হা] চারিদিককার জমির সহিত সমতল হইয়া যায় এবং গর্তে[র] আর কোন চিহ্নও থাকে না। কত দিনে যে গ[র্ত্ত] বুজিয়া যায় তাহা অবশ্য নির্ভর করে গর্ত্তের গভীরতার উপর।

মস্তিষ্কে যে প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের খাল কর্ত্তিত হয়—যাহা স্মৃতির রচনা করে—এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম খালগুলির অনুরূপ অবস্থা ঘটে। অন্যান্য ছোট ছোট খাল উপর্যুপ[রি] বিক্ষুব্ধ হওয়াতে পরবর্ত্তীগুলির মাটি অগ্রবর্ত্তী খালগুলি[কে] বুজাইয়া দেয়। এখানে মাটির কাজ করে—কোনও বি[ষয়] মস্তিষ্কের যাইবার সময়ে যে চর্ব্বিজাতীয় অম্লবস্তুর উৎপত্তি হ[য়] সেইগুলি। অবিরত নূতন নূতন ভাব মস্তিষ্কে আসিতেছে এ খাল কাটিতেছে ও খাল কাটিতেছে, কাজেই খালে[র] মাটিগুলিও অবিরত এদিক-ওদিক ফেলা-ছড়া হইতেছে।

কিন্তু কোন জমিতে গর্ত খুঁড়িয়া যদি একেবারে ফেলিয়া না হয়—যদি তাহা হইতে মাঝে মাঝে পরিপূরক মাটি জঞ্জাল তুলিয়া ফেলা হয়—অর্থাৎ মাঝে মাঝে গর্তটি আর খুঁড়িয়া দেওয়া হয়—তাহা হইলে কিন্তু গর্ত আর না। এভাবে মাঝে মাঝে খুঁড়িয়া গর্ত বহুকাল রাখিয়া যাইতে পারে।

স্মৃতির বেলায়ও ইহা ঘটাইতে পারা যায়। যাহা একবার ষ্কের মধ্যে ঢুকিয়াছে ও মস্তিষ্কে খাল কাটিয়াছে, তাহা মাঝে মাঝে স্মৃতিপথে আনিয়া ঐ খাল পুনঃপুনঃ কারে সংস্থাপিত রাখা যায় তাহা হইলে আর স্মৃতি যাওয়া সম্ভবপর হয় না। এই ভাবে দেখা যায়, কোন স একবার পড়িলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে না, বার বার পড়িলে তাহা অনেক দিন টিকিয়া যায়। এই আমরা কোনও বিষয় মনে রাখিবার জন্য মুখস্থ করি, ং বারবার আবৃত্তি করি।

কোনও জিনিস ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িলে তাহা কিন্তু ক দিন মনে থাকে। কেননা বুঝিয়া পড়িলে মস্তিষ্কে বৃত্তির প্রক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহাতে চর্ব্বিজাতীয় াইডাল অল্পবস্তু অধিক পরিমাণে সঞ্জাত হয়। তাহাতে র খাল আরও গভীর হইয়া কর্ত্তিত হয়।

কোন বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিয়াও বা মস্তিষ্কে ভাল পাত না করিলেও অনেক সময় মুখস্থ কিংবা পুনঃপুনঃ ত্তি করিয়াও তাহা মনে রাখা যাইতে পারে। অনেক ণসন্তান সন্ধ্যাহ্নিক মুখস্থ বলিতে পারেন সন্ধ্যাহ্নিকের কিছুমাত্র না জানিয়াও বা না বুঝিয়াও। ইহা তো আমরা াচর দেখিতে পাই। অনেক ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র সংস্কৃত না শিখিয়াও জীবনভোর সন্ধ্যাহ্নিক মুখস্থ বলিতে রন। অবশ্য উচ্চারণে বা বাক্যে হয় ত কিছু স্খলন ত্রুটি হইতে পারে কিন্তু মোটামুটি একরকম চলিয়া। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন, তাঁহারা সেগুলি ধরাইয়া লন, কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় একেবারেই গলান নাই, তাঁহারাও সন্ধ্যাহ্নিকের মোট কাঠামোটা রকম খাড়া করিতে পারেন। ইহা ঘটে পুনঃপুনঃ আবৃত্তির । প্রত্যহ তিন বার সন্ধ্যাহ্নিকের মন্ত্রগুলি তাঁহাদের ষ্কে খনিত-খাল বজায় রাখিয়া যাইতেছে, কাজেই র খালগুলি কিছুতেই বুজে না। হয়ত কোনও শব্দ—ন 'অগ্নিমীলে"র বদলে "অগ্নিমলে" বলে, কিন্তু ও শব্দের গোড়াগুলি ঠিক স্মৃতিতে হাজির হয়, গোলমাল হয় একটু সে বা বাহিরের চামড়ায়।

এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে একটি প্রবচন আছে: 'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।' অর্থাৎ, সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ বুঝিলে তো ভাল, কিন্তু বুঝার চেয়ে আবৃত্তি আরও কার্য্যকরী।

বিশ-ত্রিশ বৎসর আগে দেশে অনেক টোল ছিল। সেখানে শিক্ষার্থী বালকদিগকে সংস্কৃত শিখানো হইত। প্রভাতে টোলে আসিয়া পড়ুয়ারা ব্যাকরণ বা কাব্য শুধু মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া আবৃত্তি করিয়া যাইত। তাহাতে তাহাদের পাঠ্যবিষয় অনেক মনে থাকিত। পরবর্ত্তী পাঠের সুবিধা হইত।

সংস্কৃত শাস্ত্রও এই জন্য সূত্র-বহুল। ব্যাকরণে সূত্র, উপনিষদে সূত্র, ছয় রকম দর্শনশাস্ত্রে কেবল সূত্র। কম কথায় গ্রথিত এই সকল সূত্র মুখস্থ করা সুবিধাজনক, কাজেই স্মৃতিতেও থাকিতে পারে বহুদিন ধরিয়া। এই জন্য সূত্রেতেই এ সকল শাস্ত্র লিখিত।

পুনঃপুনঃ আবৃত্তিতে আর এক প্রকারের উপকার হয়। যদি কোনও পঠিত বিষয় পড়িয়াও ভাল অর্থ বুঝা যাইতেছে না এমন হয়, তাহা হইলে অনেকবার তাহা পড়িলে অর্থ অনেকটা সুগম হইয়া আসে। পুনঃপুনঃ আবৃত্তি যেন প্রাইভেট টিউটর বা অর্দ্ধ শিক্ষকের কাজ করিয়া দেয়। আবার অর্থবোধ হইলেই বিষয়টি মনে (স্মৃতিতে) থাকিয়া যায় অনেকদিন।

কাজেই স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয় পুনঃপুনঃ আলোচনায়। যাঁহারা ঔষধ হইতে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি আশা করেন, তাঁহারা আকাশকুসুম পাওয়ার মত হয়ত নিরাশ হইতে পারেন।

স্মৃতির উপরোক্ত কার্য্যধারা ও কারণগুলি বিজ্ঞানসম্মত। কাজেই তাহা যদি আমরা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে আবৃত্তিই যে স্মৃতিশক্তির উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা তাহা বুঝিতে পারি। ঔষধের দ্বারা কেন যে কোন সুকার্য্য ফল পাই না, তাহাও বুঝিতে পারি। আজকাল অবশ্য পাশ্চাত্য ঔষধ প্রস্তুতকারী বহু কোম্পানী অনেক ঔষধ (এমনকি প্রচুর গবেষণা দ্বারা আবিষ্কৃত, এমন ঘোষণা তাঁহারা করেন!) প্রস্তুত করিতেছেন এবং বিজ্ঞাপন-দামামার দ্বারা সেগুলি বিঘোষিত করিতেছেন, কিন্তু সেগুলির যথেষ্ট ফল পরীক্ষা এখনও হয় নাই। ভবিষ্যতে হয়ত এমন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে পারে, যাহা মানুষের স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট সহায়তা করিবে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ডাক্তারেরা কোন ঔষধেই আস্থাবান হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের শেষ উপদেশ আবৃত্তির দ্বারাই স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটে। তাহার সঙ্গে একটু ভাল করিয়া অর্থ বুঝিয়া পড়িলে, আরও চমকপ্রদ ফল পাওয়া যায়। সুতরাং ভাল করিয়া অর্থ বুঝিয়া পড়া বা দেখা এবং সেই সঙ্গে আবৃত্তি ইহাই প্রায় শেষ কথা।

উৎপলশিখা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

বন্ধুরা উৎপলের নাম দিয়েছে 'লেডি-কিলার'। উৎপল কিন্তু অপবাদটা এতটুকু স্বীকার করে না। সে পাণ্টা প্রশ্ন করে পতঙ্গ যে আলোক-শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা কি আলোর অপরাধ?

কথাটা ব্যাখ্যা করার জন্ম বলে আলো যেমন পতঙ্গ সম্বন্ধে উদাসীন সেও তেমনি নারী-সম্বন্ধে উৎসাহহীন। কিন্তু তা সত্বেও মেয়েরা যদি তার ঘুম ভাঙাতে অহরহ চেষ্টা করে চলে তা হলে সে নিরুপায়। অবশ্য যেটা তার সাধ্যের ভেতর সেটা সে করতে ত্রুটি করে না। নিজেকে আলোকশিখার সঙ্গে তুলনা করলেও আসলে সে মানুষ, নিষ্ঠুর নিষ্প্রাণ আলো নয়। পতঙ্গের দহন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার হৃদয় করুণায় বেদনায় বিগলিত হতে থাকে। ফলে দহনপর্ব্ব সমাপ্ত হবার আগেই সে দপ করে নিভে যায়, নিষ্কৃতি দেয় অর্দ্ধদগ্ধ পতঙ্গকে।

অর্থাৎ পতঙ্গের দহনের পরেই উৎপল বিচলিত বোধ করে, আগে নয়।

কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই অকারণে দিনটা বড় মিষ্টি মনে হচ্ছিল উৎপলের। কলেজে পর পর দুটো সুদীর্ঘ লেকচার দিয়ে একটুও ক্লান্তি অনুভব করল না, মনে হ'ল আরও দুটো লেকচার দিয়ে যেতে পারে এক নিশ্বাসে। লেবরেটরীতে আগের দিনের একটা অসমাপ্ত কাজ পড়ে রয়েছিল, গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে উৎপল কাজটা টেনে নিল। কিন্তু একটু পরেই সবকিছু একপাশে ঠেলে রাখল। নাঃ, আজ আর কাজ নয় নবীনতর ছাত্রদের টেবিলে গিয়ে এটা ওটা নেড়ে চেড়ে দেখল, ছেলেদের গেম সেক্রেটারীর সঙ্গে খেলাধুলা নিয়ে আলোচনা করল, বিশ্রামরত এক সহকর্ম্মীর টাইটা আলগা করে দিল, খোলা জুতাজোড়া দু'দিকে দুটা আলমারির তলায় সরিয়ে ফেলল।

তার পর উৎপল অসময়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিকটা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করার পর কলেজ স্কোয়ারে এসে বসল স্থির হয়ে। বিকেলের সূর্য্য হেলে পড়েছে একদিকে, নিস্তেজ হয়ে এসেছে আলোকরশ্মি। উৎপল তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল আকাশের গায়ে রঙের খেলা। তার পর এক সময় সন্ধ্যা হয়ে এল। গ্যাসের আলোগুলো ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল। উৎপল তখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে।

"উৎপলদা!"

এক স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আর এক স্বপ্নে ডুবে গেল উৎপল। নির্ঝরিণী!

নির্ঝরিণী শৈশবের বন্ধু প্রিয়তোষের ভগ্নী। এককালে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু প্রিয়তোষ বিদেশে চলে যাবার পর থেকে যোগাযোগের সূত্রটা ক্রমশঃই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে। গত দু'বছরের মধ্যে বোধ হয় একবারও উৎপল যায় নি তাদের বাড়ীতে। নির্ঝরিণী এ জন্ম অনুযোগ দিয়েছে, দুঃখ করেছে, বলেছে তা সাধারণ লোক, তাদের বাড়ীতে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করে আসবে উৎপলদার মত মানুষ। নির্ঝরিণীর আত্মীয়দের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে কিন্তু এতটুকু নতুন মনে হয় নি উৎপলের। ঠিক একই কথা সে ঘন ঘন শুনতে পায় এমনি বহু নির্ঝরিণী মুখ থেকে, তাদের বাবা-মা-দাদা-দিদি-ভাই-বোন সবার মুখ থেকে শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে প্রিয়ভাষী ও প্রিয়দর্শন অধ্যাপক ডক্টর উৎপল রায়।

কিন্তু শীতের সন্ধ্যায় কলেজ স্কোয়ারের আবছা আলোয় সে পুরনো কথাগুলিই বড় ভাল লাগল উৎপলের। চোখ মেলে তাকা[illegible] উৎপল। লাবণ্যে টলমল করছে নির্ঝরিণীর সারা দেহ। উৎপলের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে আনন্দে অধীর হয়ে উঠে নির্ঝরিণী, এখখুনি তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যেতে চায়।

বিনা আপত্তিতে উৎপল উঠে পড়ল। একবারও ভেবে দেখ[illegible] না যে এ রকম অদ্ভুত কাজ আগে সে কখনও করে নি।

উৎপলকে কেন্দ্র করে নির্ঝরিণীর অভিভাবকেরা পুরনো স্মৃতি নিয়ে মেতে উঠলেন। সে আলোচনায় হয়ত শেষ হ'ত না যদি না নির্ঝরিণী এক সময় জানিয়ে দিত—উৎপলকে সে ধ[illegible] এনেছে অঙ্কগুলো একটু দেখে নেবার জন্ম।

উৎপলকে নিজের পড়ার ঘরে নিয়ে গেল নির্ঝরিণী। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হেসে বলল, "কি ভাবছ?"

উৎপলও হাসল, "তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি নির্ঝর! আর ভাবছি তুমি কি বুদ্ধিমতী।"

"কিন্তু যদি সত্যি সত্যিই অঙ্কের খাতা বার করি?"

"তা হলে জানব তুমি আরও বুদ্ধিমতী, দু'মাস পরে যে পরীক্ষা সেটা ভুলে যাও নি। ভাল কথা, কেমন হ'ল টেষ্টে? এবার নাকি আই-এসসি'র কোশ্চেন বেশ শক্ত হবে শুনছি।"

ভ্রূভঙ্গী করে নির্ঝরিণী বলল, "থাক আর ভালমানুষি দেখাতে হবে না। অতই যদি দরদ থাকত তবে অন্ততঃ মাঝে মাঝে এসে খোঁজটা নিতে কেমন লেখাপড়া করছি। আচ্ছা তোমার কি চক্ষুলজ্জা বলেও কিছু নেই? দাদা থাকতে রোজ আসতে অথচ দাদা চলে গেলে দু'বছরেও একবার এমুখো হও নি? না কি আমরা পর হয়ে গেছি?"

নির্ঝরিণীর টেবিলে চন্দনী ধূপের গন্ধ। জানালায় আকাশী পর্দার কাশ্মীরী নক্সা। কোণের তেপায়াতে সাদা চায়নার একগুচ্ছ রক্তগোলাপ।

উৎপলের বুকের ভেতরটা হঠাৎ গুম্ গুম্ করে উঠল।

নির্ঝরিণীর চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল উৎপল। গাছের পেপার ওয়েটটা ঘোরাতে ঘোরাতে মৃদু স্বরে বলল, "পর? না, নির্ঝর, পর ভাবব কেন? তবে আসি না কেন? সে অনেক বাধা নির্ঝর। অনেক কিছু।"

একটু যেন বিচলিত হয়ে উঠল নির্ঝরিণী; "কেন, কেন উৎপলদা?"

"সেকথা আমার একান্তই নিজের কথা। বন্ধু ছিল, এসেছি, ক্ষতি ছিল না কিছু! কিন্তু এখন···"

কেন, আমার মা আছেন বাবা আছেন, আমি আছি, ভাই-বোনেরা আছে। আমরা কি কেউ নই?"

একটু হাসল উৎপল, "নির্ঝর, তুমি এখনও ছেলেমানুষ রয়েছ, আমার কথা সব বুঝবে না। তাই বলছিলাম কথাগুলো একান্তই আমার নিজের। সব সময়ই তোমাদের কথা মনে হয়, কিন্তু সাহস পাই না। তুমি যদি ছোট থাকতে, রোজ আসতাম। কিন্তু তুমি এখন বড় হয়ে উঠেছ। ঘন ঘন এলে হয়ত অনেকে···"

নির্ঝরিণী কি বলতে যাচ্ছিল, উৎপল হেসে উঠল, বলল, "না, কি হবে ওসব আবোলতাবোল বকে? তার চেয়ে তোমার খবর বল।"

"কোন খবর চাই?"

"এই তোমার পড়ার খবর, পাড়ার খবর, বন্ধুদের খবর আর তোমার বিয়ের খবর।"

নির্ঝরিণী হাসল: "মেয়েরা বড় হলে তাদের বিয়ের জন্য অভিভাবকেরা চিন্তিত হয়ে পড়েন, আমার জন্যও হয়েছেন। এই হ'ল আমার বিয়ের খবর। কিন্তু তুমি বিয়ে করছ না কেন উৎপলদা? বিয়ের বাজারে ত তোমার অনেক দাম।"

উৎপলের মুখখানা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে উঠল। "বিয়ে?" আপন মনেই যেন প্রশ্ন করল উৎপল। একটু বিষাদের হাসি ফুটে উঠল চোখের কোণে। বলল, "বিয়ে আমার হবে না নির্ঝর।"

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল নির্ঝরিণীর। ব্যথাতুর চোখ দুটি তুলে ধরল। চোখে প্রশ্ন।

উৎপল আবার চোখ নামিয়ে নিল। বলল, "না, বিয়ে আমার হবে না নির্ঝরিণী। যাকে বিয়ে করতে পারতাম সে আমাকে বিয়ে করতে পারত না কিছুতেই। আর বিয়ে করার ইচ্ছেও আমার নেই। তবে আবার যদি কোন দিন মনের মানুষ মেলে তা হলে হয়ত—"

ক্ষণকাল নীরব থেকে নির্ঝরিণী বলল, "মনের মানুষ মেলা কি এতই শক্ত উৎপলদা? তুমি এত বিদ্বান, এত সুন্দর, তোমাকে পেলে কোন্ মেয়ে না ধন্য হয়ে যায়?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল উৎপল। গম্ভীর ভাবে বলল, "জানি নির্ঝর জানি। তারা সবাই চায় ডক্টর উৎপল রায়কে, উৎপল রায়কে নয়, উৎপলদাকেও নয়। সেই ত আমার সব চাইতে বড় দুঃখ নির্ঝরিণী।"

নির্ঝরিণী শুষ্ক দৃষ্টিতে তাকাল উৎপলের দিকে।

সে চোখে উৎপল নিজের ছবি দেখতে পেয়ে ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। একি, একি! যা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তাই সে করতে উদ্যত হয়েছে। পতঙ্গের ঘুম ভাঙাতে আলোকশিখা নিজে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

দারুণ শীতেও ঘামতে আরম্ভ করল উৎপল। গ্লাস থেকে ঢক ঢক করে জল খেল খানিকটা। নির্ঝরিণীর অলক্ষ্যে একবার জলে আঙুল ডুবিয়ে কানের ওপর বুলিয়ে নিল। উত্তেজনা এতটুকু কমল না। তবে কি পরাজয়ের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে উৎপল?

দুঃসহ কয়েকটা মুহূর্ত···পরাজয়? কিসের পরাজয়? জীবনে হয়ত আর কোনদিন তার বুক এমনি দুরু দুরু করে কেঁপে উঠবে না, নির্ঝরিণীও হয়ত আর তার দিকে এমন স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না, এমন মদির সন্ধ্যাটিও হয়ত আর তার জীবনে আসবে না। না, না, নিজেকে ঠকাবে না উৎপল।

আরও গভীর স্বরে বলল, "তাই ত আমার মনের মানুষ খোঁজার বিরাম নেই নির্ঝর। মাঝে মাঝে মনে হয়—এই বুঝি পেয়েছি সে মানুষ, কিন্তু সেইটুকুই। এ পর্য্যন্ত আমি শুধু অঙ্কই শিখেছি, মানুষ চিনতে শিখি নি। তাই মনের মানুষ একেবারে কাছে এসে বসলেও চিনতে ভুল করি, দূরে চলে গেলে ভাবি তবে কি···? পরশ-পাথর হাতে পেয়েও তাকে হারিয়ে ফেলি, এমনি হতভাগ্য আমি।"

নির্ঝরিণীর মুখখানা কি ধীরে ধীরে রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠছে না? সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে সে কি শান্ত করতে চাইছে না বক্ষের প্রলয়-তরঙ্গ?

চোখের কোণ দিয়ে উৎপল নিরীক্ষণ করতে থাকে। না, এতটুকু পরিবর্ত্তন নেই নির্ঝরিণীর। স্মিতমুখে সে বসে রয়েছে টেবিলের বাঁ ধারে, মুক্তোর মত দন্তপংক্তির কয়েকটি একটুখানি দেখা যাচ্ছে ওষ্ঠাধরের মাঝখানে। চোখের দৃষ্টি নিজের নখের দিকে।

মৃদু শব্দে হেসে উঠল উৎপল: "আজকে বোধ হয় আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে নির্ঝরিণী, নইলে এত সব আজেবাজে কথা মনে আসছে কেন? এসেছি পর থেকে তো শুধু আমিই বকে যাচ্ছি। এবার তুমি বল, আমি শুনি। সেই ভদ্রলোকটির খবর কি?"

"কোন্ ভদ্রলোক?"

"সেই যে, যাঁর সঙ্গে প্রায়ই তোমাকে দেখা যায় ট্রামে বাসে? লম্বা পাতলা চেহারা, ফর্সা রঙ, চুল একটু কোঁকড়ানো।"

নির্ঝরিণী বিস্মিত, "কে তিনি? আমাদের কেউ হন?"

চোখদুটো ছোট ছোট করে উৎপল বলল, "খুব সম্ভব। নইলে অত ঘন ঘন দেখি কেন তোমার সঙ্গে?"

এতক্ষণে আশ্বস্ত হ'ল নির্ঝরিণী। বলল, "ও ঠাট্টা করছ, তাই বল।"

"ঠাট্টা! আমার নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে বল?"

নির্ঝরিণী হাসতে লাগল, "অমন মিথ্যে বদনাম দিও না কিন্তু আমার নামে, ভাল হবে না বলে রাখছি।"

উৎপল সোজা হয়ে বসল। টেবিলের উপর সোৎসাহে একটা চাপড় মেরে বলল, "বদনাম? কি বলছ নির্ঝর? সে ত কত গর্বের কথা। কত ভাগ্যবান হলে প্রেমে পড়ে জানো? এই দেখ না, লোকে বলে আমার নাকি বিদ্যে আছে, বুদ্ধিও আছে আর তোমাদের মুখ থেকেই শুনতে পাই আমি নাকি দেখতেও খুব খারাপ নই। কিন্তু কৈ, কিছু কি হ'ল? সত্যিই তোমাদের দেখে হিংসে হয় নির্ঝর।"

"আবার ওসব যা তা কথা বলছ? ভুলে গেছ বুঝি, আমি কি রকম ঝগড়া করতে পারি?"

"মুখখানা কাঁচুমাচু করে উৎপল বলল, আচ্ছা আচ্ছা আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। প্রতিজ্ঞা করছি আমি আর মুখ খুলব না, কাউকে কিছু বলবও না।"

খিলখিল করে হেসে উঠল নির্ঝরিণী: "তুমি দেখছি দুষ্টুমিতেও কম যাও না। তোমার এ বিদ্যেটার কথা ত আমার জানা ছিল না।"

তার পর গম্ভীর ভাবে বলল, "না উৎপলদা, সত্যি বলছি, আমি ওসবের মধ্যে নেই। ছেলেমেয়েরা যে কি ভাবে একে অপরের প্রেমে পড়ে, ভেবে পাই নে। আমার ত মনে করতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

উৎপল আরও একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আবেগভরে বলল, "কিন্তু সব জিনিসই কি নিজের ইচ্ছের হয় নির্ঝর? আগুনের কাছে এলে ঘি গলে যায়। শুধু ঘি কেন তেমন আগুনের কাছে এলে পাথরও গলে যায়। সেটা পাথরের অপরাধ নয়। আগুনেরও গুণ নয়, সৃষ্টির নিয়ম। তুমি নিজে পাথর হয়ে থাকতে পার, কিন্তু কোন হতভাগ্য যদি সেই পাথরে মাথা খুঁড়ে রক্তাক্ত হয় তা হলে তোমার কি বলবার আছে?"

উৎপলের হাত থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধানে টেবিলের উপর একটি সুডৌল বাহুলতা। আলোতে ঝিকমিক করছে একটি ছোট্ট পান্না। চাঁপার কলির মত আঙুলক'টি কি চকিতে টেনে নিতে পারা যায় না নিজের শক্ত মুঠোর ভেতর? এই নিরালায় গুন্‌ গুন্‌ করে কি দুটো কথা বলা যায় না নির্ঝরিণীর কাণে কাণে?

ঘড়িটা টিক টিক করে বেজে চলেছে। অধীর চঞ্চলতায় কাঁপছে দীপশিখা। নির্ঝরিণী প্রস্তরের মতই স্থির।

বহু চেষ্টায় একটুখানি হাসি টেনে এনে উৎপল বলল, "জবাবটা কি আমি পেতে পারি না নির্ঝরিণী?"

"কি জবাব দেব বল? পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের হিসেব রাখতে গেলে সংসার চলে না উৎপলদা।"

"কিন্তু নির্ঝর, মাথা খুঁড়ে মরার বদলে কেউ যদি পাথর গলা[বা]র জন্য আগুন জ্বালে?"

মৃদু হাসল নির্ঝরিণী, "দূরে পালিয়ে যাব।"

"কিন্তু সে যদি পালাতে না দেয়? যদি সে সত্যিই পুরুষে[র] মত পুরুষ হয়? যদি সে বিদ্বান হয়? যদি রূপবান হয়? য[দি] ...যদি...যদি সে হয় তোমার অতি পরিচিত কোন শ্রদ্ধের ব্যক্তি তা হলে কি করতে নির্ঝর?"

একই ভাবে উত্তর দিল নির্ঝরিণী: "তা হলে বাধা দেব আমার মনের জোর আছে।"

"কথা আর কাজ কিন্তু এক জিনিস নয় নির্ঝর। তখন সত্যি[ই] পারবে ত?"

"নিশ্চয়ই।"

কণ্ঠস্বরে তরলতা ঢেলে দিল উৎপল: "তবে দেখব না[কি] তোমার মনের জোরটা পরীক্ষা করে?"

নির্ঝরিণী এতটুকু চমকে উঠল না। হাতখানা এক ইঞ্চি[ও] পিছিয়ে নিল না। স্মিত মুখেই জবাব দিল, "না।"

"না কেন? এই না কত বড় বড় কথা বললে? দেখা যাক না তোমার মনের জোর সত্যিই কতখানি?"

"না।"

নির্ঝরিণী তো যে-কোন মুহূর্তে রূঢ় কথা বলতে পারে? অথ[চ] সৌজন্যের খাতিরে শুধু একটা অজুহাত দেখিয়ে চলে যেতে পা[রে] অন্য ঘরে? যাচ্ছে না কেন?

তবে কি উৎপলই মূর্খ?

পতঙ্গ-দাহক উৎপলের জীবনে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা।

বুকের ভেতরটা কি ফেটে যাবে উৎপলের? কম্পিত ক[ণ্ঠে] ডাকল, "নির্ঝর!"

নির্ঝরিণী চোখ তুলে তাকাল। স্নিগ্ধ হাসিটি একই ভা[বে] লেগে রয়েছে তার মুখে।

"মানলাম নির্ঝর তোমার বাধা দেবার ক্ষমতা আছে। কি[ন্তু] সে যদি বাধা না মানে? রূপকথার রাজপুত্রের মত যদি সে জো[র] করে তোমাকে নিয়ে উড়ে যায় পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে? তা হলে তা হলে তুমি সেই দুঃসাহসীকে ক্ষমা করতে পারবে ত? পারবে ত সেই রাজপুত্রকে বরণ করে নিতে?"

উজ্জ্বল হাসিতে নির্ঝরিণীর মুখখানা ঝলমল করে উঠল, প্রখর বিদ্যুতালোকে হেসে উঠল তার শুভ্র দন্তপংক্তি। গভীর দুটি কালো চোখ একটা অপূর্ব দ্যুতিতে জ্বল জ্বল করতে লাগল। বিলোল কটাক্ষ হেনে নির্ঝরিণী বলল, "এক সন্ধ্যায় রাজপুত্র?"

এক ফুৎকারে নিভে গেল প্রদীপশিখা।...

শুধু উৎপলকে উঠে দাঁড়াতে হ'ল কোনমতে। বুকের প্রল[য়] থেমেছে, কিন্তু হাঁটুদুটো কাঁপছে থর থর করে। ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, "ওঃ, আটটা বেজে গেছে। যাই, মাসীমা কি করছেন দেখে আসি।"

ঘরের বাইরেই প্রশস্ত বারান্দা। সিঁড়ির গোড়ায় মিরর ষ্ট্যাণ্ড। ফ্লুরিসেন্টের নীলাভ শ্বেত আলোকধারার নীচে দাঁড়াতেই উৎপল কেঁপে উঠল। কে? কে? কার প্রেত-বিম্ব আয়নায়?

নির্ঝরিণীর মা সেলাই করছিলেন। তাঁর পাশে গিয়ে বসল উৎপল। নির্ঝরিণী সঙ্গে এল। আবদারের সুরে বলল, "দেখ মা, উৎপলদা এখনি চলে যেতে চায়। তুমি দশটার আগে উঠতে দিও না।"

মা হাসলেন। বললেন, "ওর বুঝি কাজকর্ম্ম থাকতে পারে না?"

বেণী দুলিয়ে জবাব দিল নির্ঝরিণী: "না, থাকতে পারে না। তুমি উৎপলদাকে বলে দাও না মা রোজ আসতে।"

উৎপলের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, "শুনলে ত মেয়ের আদেশ?"

উৎপল হাসার চেষ্টা করে বলল, "আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েকে একেবারে মাথায় তুলেছেন মাসীমা।"

"আদরের কি দেখলে? দু'বছর পর একদিন এলে তাই আর একটু থেকে যেতে বলছি। আমি কি জানি না যে আর তুমি দু' বছরের মধ্যে আসবে না?"

অভিমানে ভরে উঠেছে নির্ঝরিণীর গলা।

"আচ্ছা, আচ্ছা এবার থেকে আমি রোজ আসব। তখন কিন্তু বন্ধুর জন্মদিন বলে পালিয়ে যেতে পারবে না বলে দিচ্ছি।"

"থাক আর ভোলাতে হবে না। আমি ছেলেমানুষ নই। কত আসবে জানা আছে।"

চোখ দুটি ছল ছল করছে নির্ঝরিণীর।

প্রতিশোধ?

সত্যিই দশটার আগে ছাড়ল না নির্ঝরিণী। পরিপাটি করে খাওয়াল, নিজে পরিবেশন করল। উৎপল স্তব্ধ।

সদর দরজায় গাড়ী প্রস্তুত। নির্ঝরিণী সোফারকে আদেশ দিয়েছে উৎপলকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে। বাইরে এসে বলল, "আবার কবে আসছ বলে যাও।"

উৎপল নীরব।

নির্ঝরিণী আবার বলল, "সতের তারিখে ত তোমার ছুটি। এস না সেদিন? আসবে ত? কি, চুপ করে রইলে কেন? ও বুঝেছি আসবে না। তা কেন আসবে? আমরা সাধারণ লোক।"

উপহাস? শ্লেষ?

মাঘ মাসের ঘন কুয়াশার মাঝে একটুখানি গ্যাসের আলো। উৎপল ফিরে তাকাল। নির্ঝরিণীর মুখের ওপর একটা করুণ ছায়া নেমে এসেছে, চিনতে এতটুকু ভুল হ'ল না।

গাড়ীর ভেতরে গিয়ে বসল উৎপল। দরজা বন্ধ করতে করতে নির্ঝরিণী বলল, "এস কিন্তু।" কণ্ঠ উদ্বেগে ব্যাকুল।

তবে কি নির্ব্বাপিত দীপশিখার দুঃখে বেদনার্ত্ত হয়ে উঠেছে পতঙ্গ-হৃদয়?

আর একবার তাকাবার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

নির্ব্বাসিত কবি হেনরি হাইন

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

১৮৫৬ সনের এক বর্ষণমুখর প্রাতঃকালে প্যারিনগরে মঁমার্ত্রে কবরখানায় একটি শবযাত্রা মন্থরগতিতে প্রবেশ করিল। এই শবযাত্রায় কোন আড়ম্বর ছিল না—লোকসংখ্যা মাত্র শ'খানেক—তাহাদের মধ্যে ছিলেন লেখক আলেকজান্দার ডুমা এবং থিওফিল গতিয়ে। ইঁহারা বিখ্যাত জার্ম্মান কবিকে শেষ সম্মান দেখাবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। সমাধিপার্শ্বে কেহই বক্তৃতা করে নাই।

১৭৯৭ সনে ডুসেলডর্ফ শহরে হাইনের জন্ম হয়। ব্যবসা ও প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি যখন প্যারিসে বাসা বাঁধিলেন তখনই তিনি একজন বিখ্যাত লেখক—সকলে তাঁহার কঠোর এবং শ্লেষাত্মক লেখাকে একাধারে ভয় ও প্রশংসা করিত। তিনি ডক্টর অব ল উপাধিপ্রাপ্ত, নানা বিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ইতিমধ্যে তৎপ্রণীত Buch der Lieder (গানের বই), এবং Reisebilder (ভ্রমণচিত্র) প্রকাশিত হইয়াছিল। বার্লিন সাহিত্যমহলের তাঁহার অজানা কেহ ছিল না। কিন্তু Reisebilder-এর কশাঘাত বা চাবুক কেহ সহজে ভুলিল না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে জার্ম্মানীতে অন্নসংস্থান কঠিন হইয়া পড়িল।

অন্য কারণেও তাহাকে জার্ম্মানী ছাড়িতে হইল। তাঁহার প্রণয়িনী তাঁহাকে তাচ্ছিল্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাঁহার স্বাস্থ্য খুবই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং ধর্ম্মান্তরিত ইহুদী হিসাবে জার্ম্মানীতে বসবাস করিবার মত তাঁহার আরামের কিছুই ছিল না। তিনি বলিতেন, "আমি ইহুদী অথচ খ্রীষ্টান, আমার জীবন বিয়োগান্ত এবং মিলনান্ত—উভয় রকম কাব্য।" হাইনের জীবন ছিল পরস্পরবিরোধী ভাবের সমন্বয়কেন্দ্র—বড় কবি, বিখ্যাত সাংবাদিক, স্বৈরতন্ত্রের শত্রু আবার নেপোলিয়নের অনুরাগী। দুঃখবাদী হাইন অপরের ভাবপ্রবণতাকে উপহাস করিতেন অথচ নিজেই ছিলেন ভাবপ্রবণ। স্বেচ্ছায় ফরাসী দেশে নির্ব্বাসিত অথচ স্বদেশের জন্য দরদী হাইনের কবিতা ছিল জার্ম্মান পল্লীজীবনের জন্য গভীর মমতায় পূর্ণ।

প্যারিসে আসিয়া প্রথম প্রথম হাইন খুব উৎসাহ বোধ করিলেন। শহরটি খুব ভাল লাগিয়াছিল—এই বড় শহরের যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, এমনকি ইহার জনতার ভিড়ে ধাক্কা খাইয়াও ইহার প্রশংসা করিলেন। জার্মানী হইতে সুপারিশ-চিঠি লইয়া আসাতে ব্যারন রথচাইল্ডের গৃহে তাঁহার সমাদর হইয়াছিল—এই স্থানেই বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা লিজ (Listz) আর্পা, বেলিনি, মেণ্ডেলজন (Mendelssohn), বের্লিও (Berlioz) এবং রোসিনি কন্সার্ট বাজাইতে আসিত। এই স্থানেই রিচার্ড ভাগনারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়।

অল্প দিনেই হাইন ফরাসী বুদ্ধিজীবী-মহলে সুপরিচিত হইয়া পড়িলেন। অবশ্য সাহিত্যিক মহল অপেক্ষা সৌখীন সমাজেই তাঁহার মেলামেশা বেশী হইয়াছিল। জেরার্ড দ্য নের্ভ্যাল এবং ইউজিন স্যু ছিলেন তাঁহার বন্ধু, বালজাক তাহাকে বেশী প্রশংসা না করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

ভিক্টর হুগো এবং লামার্টিন তাহাকে পছন্দ করিতেন না, কিন্তু এই দুই জন ছাড়া হাইন অন্যান্য তৎকালীন রোমান্টিক লেখকগণের—যথা: ল্যামেনায়া (Lammenais), আলফ্রেড দ্য ভিনি, মেরিমে, বেরাঞ্জে এবং জর্জ সাঁদ-এর সহিত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

অল্প দিনেই প্যারিসে তাঁহার খুব পসার জমিয়াছিল। ১৮৩২ সনের প্রথমে বিখ্যাত মাসিক "La Revue des Duex Mondes" (দুই জগতের নূতন ও পুরাতন সমালোচনা) প্রকাশিত হইল, Reisebilder-এর ফরাসী অনুবাদ বাহির হইল এবং অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই "L'Europe Litteraire" (ইউরোপীয় সাহিত্য) পত্রিকায় 'Die Romantische Schule' (রোমান্টিক স্কুল) প্রকাশিত হইল।

এই সময় জার্মান সংবাদপত্রের সংবাদদাতারূপেও হাইনের সুনাম হয়। তাঁহার সাংবাদিকতা ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের এবং তাঁহার এই সময়ের বাছাই লেখাগুলি পরে Franzosische Zustande (ফরাসী দৃষ্টিভঙ্গী) এবং Lutezia (লুটেজিয়া) এই দুই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সময় তিনি খুবই অমিতব্যয়ী ও সৌখীন জীবন যাপন করিতেন—এজন্য অর্থাভাব লাগিয়াই ছিল। ১৮৩৪ সনে ইউজেনি মিরাতের (Ugenie Mirat) সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং পরে তাহাদের পরিণয় হয়। ইউজেনিকে তিনি মাথিল্ডে বলিয়া ডাকিতেন। ইউজেনি ছিল অল্পশিক্ষিতা, অহঙ্কারী ও অমিতব্যয়ী সুন্দরী পুত্তলীমাত্র। কিন্তু সে তাহার স্নেহ ও প্রেম দ্বারা স্বামীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যদিও স্বামী একজন আদর্শ পত্নীপ্রেমিক ছিলেন না।

১৮৩৬ সনে যখন জার্মান বুণ্ড (সম্মিলিত জার্মান রাষ্ট্র) জার্মানীর তরুণদের উপরে আক্রমণ সুরু করে তখন হইতে হাইনের লেখা জার্মানীতে আর প্রচারের সম্ভাবনা রহিল না। পর বৎসর তিনি Pariser Zeintung (প্যারি টাইমস) নামে একখানি রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন এবং প্রুশিয়ার গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতি চান। তাহাকে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি অবশ্য দেওয়া হয় নাই, সুতরাং] কোন কাগজ প্রকাশিত হইল না।

১৮২৭ সনে যখন হাইনের Buch der Leider (গানে বই) প্রকাশিত হইল তখন রাতারাতি তাঁহার কবিখ্যাতি ছড়াই পড়িল। ইহাতে চারি রকমের কবিতা ছিল। তাঁহার গীতি কবিতা কেবল জার্মানীতে নয়, ইউরোপে এক নূতন ঝঙ্কারের [illegible] করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কোন কবি তাঁহার কবিতায় এরূ সাহসিকতার সহিত প্রকৃতিকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেন নাই কিংবা এরূপ জীবন্ত ভাবে হৃদয় এবং আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি ফুটাইয়া তোলেন নাই। সুবার্ট তাঁহার বহু কবিতার স্বরলিপি তৈরী করিয়াছেন—The Lorelei (লরেলাই-উপকথা) এবং Tw Grenadiers-এর (দুই বন্দুকধারী) স্বরলিপি খুবই বিখ্যাত।

১৮৩৯ সনের মধ্যে হাইন বহু পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলে তার মধ্যে Die Romantische Schule (রোমান্টিক স্কু Florentinische Nachte (ফ্লোরেন্সের রাণী) এবং Eleme targeister (প্রকৃতির আত্মা) বিখ্যাত। ১৮৪০ সনে প্রকাশি হয় Ludwig Boorne (লুডুইগ বোর্ণ) এবং Gediche u Romanzen (কবিতা ও কাহিনী)। ইহার পরে ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—Deutschland (ডয়েটসল্যাণ্ড) ein wintermarchen (একটা শীতের গল্প) এবং Atta Troll (আট্টা ট্রল), ein Sommernachtstraum (একটা গ্রীষ্ম-রাত্রির স্বপ্ন) এবং Die Gottin Diana (দেবী ডায়েনা)।

১৮৪৫ সনে হাইন ভয়ানক ভাবে মেরুদণ্ডের রোগে আক্রান্ত হন—ইহা ১৮৪৮ সন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া রাখিয়াছিল। নিদারুণ রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও তাহার চিন্তার স্বচ্ছতা ও শক্তি হ্রাস পায় নাই। এই পরস্পরবিরোধী মতের অদ্ভুত লোকটি—সুস্থ অবস্থায় যিনি ছিলেন অধৈর্য্য এবং খিটখিটে স্বভাবের, পক্ষাঘাতের সময় কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনিই দেখাইয়াছিলেন অসীম ধৈর্য্য এবং মনের প্রফুল্লতা। বহু নিদ্রাহীন রজনীতে বেদনায় ছটফট করিলেও তাঁহার কবি-কল্পনায় বিরাম ছিল না। সকাল হইলেই তিনি কবিতা লিখিতেন বা একজন লেখক তাহার মুখে শুনিয়া কবিতা লিখিয়া যাইত।

এই সময় তিনি Romanzero (রোমাঞ্জেরো) এবং Nueste Gedichte der Lieder (নূতন কবিতা ও গান) নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঔষধের প্রয়োগে অর্দ্ধনিদ্রিত এবং অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় তিনি যে কবিতা রচনা করিতেন তাহা হইত অপার্থিব অথচ গভীর ভাবে পূর্ণ। এই ভাবপ্রবণ কবিতা-রচনার মধ্যেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি আফিং ও মরফিয়ার অবসাদ এবং অর্দ্ধ অন্ধত্ব হইতে মুক্তির সন্ধানের প্রয়াস পাইতেন।

১৮৫৬ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাহার মাথায় যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি পাইল যে তিনি লেখা স্থগিত রাখিলেন। "আমি আমার মাতা

মণিপুরী নৃত্যশিল্পীগণ কর্তৃক নাগা লোকনৃত্যানুষ্ঠান

চরকায় সুতাকাটা

কালবৈশাখী

বালুচরের যাত্রী

ফোটো : শ্রীঅলক দে
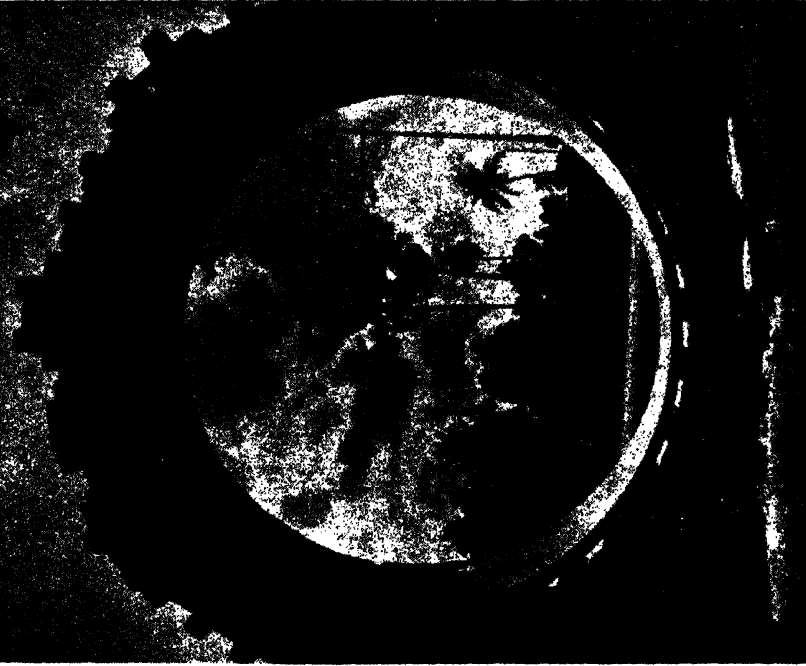
নিকট আর চিঠি লিখিতে পারিব না—আমার আত্মজীবনী শেষ করিতে আমার আরও তিন দিন বাঁচা দরকার"—হাইন বলিলেন।

হাঁ, মাত্র আরও তিন দিনই হাইন বাঁচিয়া ছিলেন। রবিবার আসিল—বেদনা তখন খুবই বাড়িয়াছে। অস্পষ্ট কণ্ঠে তিনি বার বার বলিলেন, "হাঁ লিখিব, আমি নিশ্চয়ই লিখিব।" কিন্তু তাঁহার শক্তি ছিল না। মেথিলডে অপর এক ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল। হাইন আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, কেহ যেন মেথিলডেকে বিরক্ত না করে। নিঃসঙ্গ হাইন ১৮৫৬ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইহধাম ত্যাগ করিলেন। (ইউনেস্কো)

প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

"এ বুকের রক্তে যে ফুল হয়েছে রাঙা
কুঙ্কুম ঘুমভাঙা.
পাপড়ি মেলেই দেয় যদি দুই চোখে,
গুন্ গুন্ করে অলস পাড়ার লোকে
ক্ষমা করো, বুলু, এ বাউল বুলবুলে
রেখো বাতায়ন খুলে।
নিশীথে নীরবে গাঁথ যে ব্যথার মালা
অশ্রুত সুরঢালা।
আমি, সুন্দরি, সেই সৌরভহার
হৃদয়ে তুলিয়া ভুল করে একবার,
তারপর যদি আর নাহি ভাল লাগে
যদি না মহুয়া জাগে,
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ো উদাসীন হেলাভরে
পথের ধুলায় 'পরে।
যতটুকু পাই ভালবাসি, ভালবাসা
মান অভিমান, কান্নাখচিত হাসা
মনে মনে এই লুকোচুরি খেলাখানিক
বুলানো পরশ-মাণিক।
এ রূপ-পেয়ালা কানায় কানায় ভরা
করো ত্বরা, তৃষাহরা।
বুকের বসন খসেছে কখন ফুলে,
দোলা দিল হাওয়া দেবদারুদের চুলে,
রবির কিরণ তরুণী ধরার ঠোঁটে
মানে না সবুর মোটে।

ঝড়ের নেশায় তোমার গানের কলি
তোলে হিয়া টলমলি।
সকল চেতনা চকিতে মাতাল করে
তুফানের ঢেউ মাথা কুটে কুটে মরে
এর চেয়ে ভালো যদি যায় ভেঙে-চুরে ;
ধরা দিয়ে কেন দূরে!"
অবাক আলোয় কেলিল ছ'কালো আঁখি
বলে, বুলু, নীল পাখী—
"বেঁচে থাক্ শুধু চেয়ে না পাওয়ার ব্যথা
পানে পানীয়ের ত্রাণ মিলে কবে কোথা ?
ভোগের বিলাসে মোহ আপনারে মারে
প্রজাপতি কারাগারে।
এর চেয়ে ভালো চোখে চোখে চেয়ে থাকা
থেকে থেকে শুধু ডাকা
যে নাম প্রাণের পদ্মের কোষে মধু,
স্বপনেই যার সৌরভ স্বাদ শুধু,
বিষের দাহ সে নহব ওষ্ঠাধরে
দেহ সের ভুল ভরে।
প্রেমের জগতে জোয়ারে জাগে না ডাঙা
তীর নেই, নীড় ভাঙা।
শূন্যতা দেবে পূর্ণের পরিমাণ,
পেয়ালায় বুকে সেই চিরসন্ধান!
দুটি হাত ধরে মিনতি জানাই মিতা,
বাধারে করো না সীতা।"

১৪

সাত বৎসর পর।

চন্দ্রভূষণবাবু টেলিগ্রাফ পিয়নের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

রাজামিয়া ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ পিওন। সে এসে বেশ উৎসাহিত কণ্ঠে ডাকলে টেলিগেরাপ—মাষ্টারবাবু।—চন্দ্রভূষণবাবু বুঝেছেন। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ালেন আপিসের দরজায়।

—বকশিশ চাই হুজুর!

—নিশ্চয়! পাবি বই কি!

টেলিগ্রামখানা খুলে ফেললেন চন্দ্রভূষণ বাবু।

টেলিগ্রাম করেছেন ব্রজবিহারী বাবু। দীর্ঘ টেলিগ্রাম। বঙ্গবালা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছে। বিধু ইউনিভারসিটিতে ফার্স্ট ষ্ট্যাণ্ড করেছে। ভুবন ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়েছে। অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ব্রজবিহারী।

মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশে বাতাসে যেন হাজার রঙের ফানুষ ভেসে উঠল। চন্দ্রবাবু দরজার বাজুটা চেপে ধরলেন। সারাটা জীবনে এমন বিপুল আনন্দের আকস্মিক আবির্ভাব তাঁকে এক মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন করে নাই। মাথাটা যেন ঘুরে গেল।

—ভূপতি! রাজাকে একটা টাকা বকশিশ দাও। ভূপতি ইস্কুলের নতুন ক্লার্ক। কেষ্ট! কেষ্ট!

কেষ্ট আপিসের পাশের ঘরে বসে ঢুলছিল। চন্দ্রবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠের ডাক শুনে সে ধড়মড় করে উঠে এল—আজ্ঞে!

—মাষ্টার মশায়দের ডাক। এখখুনি!

—আজ্ঞে!

—বিধু ইউনিভারসিটিতে ফার্স্ট হয়েছে, ভুবন পনে[...] টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে। যাও! যাও।—হ্যাঁ। আ[...] বাসায় যাবে একবার। বঙ্গ পাস করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে[...] সব আগে শম্ভুকে খবর দিও।

শম্ভু অর্থাৎ শম্ভু গড়াঞী। সাত বছর আগে সিদ্ধি খে[...] যার মাথা খারাপ হয়েছিল। সুস্থ হতে শম্ভুর লেগেছিল একটি বছর। এক বছর পর শম্ভু আবার এসে ভর্ত্তি হয়েছিল কিন্তু স্মৃতি ও মেধার সে দীপ্তি আর ফিরে পায় নি। নর্মা[...] পাস করা ছেলে—অঙ্ক-সংস্কৃতে পণ্ডিত, ইংরিজীতেও [...] কাঁচা ছিল না; সকলেই প্রত্যাশা করেছিলেন শম্ভু স্কলারশিপ পাবে। কিন্তু ওই ঘটনার পর শম্ভু কেমন যেন ম্লা[...] হয়ে গিয়েছিল। শম্ভু ফার্স্ট ডিভিশনে পাসই করেছিল, স্কলারশিপ পায় নি। অর্থাভাবে পড়ার সঙ্গতি ছিল না, তার উপর শম্ভুর আর দুটি ভাই—তারাও এই ইস্কুলেই পড়ছিল। সেই কারণে শম্ভুর সঙ্গে সঙ্গেই উপার্জ্জন করার প্রয়োজন ছিল। চন্দ্রবাবু নিজেই শম্ভুকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলেন। এখানকার কিফ্থ মাষ্টার এখন সে। বিধু শম্ভু গড়াঞীরই সব ছোট ভাই। বিধু সত্যই চৈতন্য ইনষ্টিটুশনের কপালের অক্ষয় চাঁদ। এ চাঁদ কলায় কলায় ষোল কলায় পরিপূর্ণ হয়ে পূর্ণ চন্দ্র হোক।

আক্ষেপ হচ্ছে—শম্ভুর আর ভাই নাই।

অদ্ভুত মেধাবীর বংশ। বিধুর বড় শম্ভুর ছোট শিবু—সেও দশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল। স্কলারশিপ পাওয়ার দিক থেকে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের ভাগ্য ভাল নয়। তাঁর ভাগ্য ইস্কুলের ভাগ্যের সঙ্গে জড়ানো। ধ্রুবর মত ভাল ছেলে-সে স্কলারশিপ পায় নি। শম্ভুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আর একটি ভাল ছেলে—কালী, সে দশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল। তার পর কয়েক বছরের মধ্যে ওই শিবু পেয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ, একটি মুসলমান ছেলে এবং আর একটি তপশীলী জাতির ছেলে পেয়েছে বিশেষ বৃত্তি। বাকী বৎসরগুলি বন্ধ্যা গিয়েছে।

এ বৎসর অভূতপূর্ব্ব ভাগ্য। বিধু ফার্স্ট হয়েছে ইউনিভারসিটিতে। ভুবন ডিভিশনে ফার্স্ট হয়েছে। তার সঙ্গে বঙ্ক পাস করেছে।

সাত বৎসর পর এ তাঁর যেন সপ্তম স্বর্গ।

সাত বৎসরে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন, ব্রজবিহারী বাবু এখান থেকে ভাল চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছেন। জয় হোক ব্রজবিহারী বাবুর, দিন দিন তাঁর উন্নতি হোক, ভাগ্য তাঁর প্রসন্ন থেকে প্রসন্নতর হোক, তিনি চন্দ্রভূষণ বাবুর কাছে অবিস্মরণীয়; চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনে তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রয়েছে এবং থাকবে। পুরনো কাল চলে যায়, নতুন কাল আসে—পুরনো কালের সঙ্গে যা পুরনো হয় তাকে পুরনো কালের সঙ্গেই যেতে হয়, নতুন কালে তার স্থান নাই—স্থান হয় না। যে নতুন কালের সঙ্গে জীর্ণতা বর্জ্জন করে নবীনত্ব অর্জ্জন করতে পারে, সেই থাকে। ব্রজবিহারী বাবু চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনকে নবীনত্বের মন্ত্র দিয়ে গেছেন। কালের সঙ্গে নবীন হয়ে হয়ে সে সগৌরবে চলেছে। আজ এ কি আকস্মিক প্রকাশ তার! ব্রজবিহারী বাবুই বঙ্গবালার পড়ার ভার নিয়েছিলেন। গত বছর পর্য্যন্ত পড়িয়ে গেছেন তিনি। সাত বছর আগে ওই শম্ভু যখন সিদ্ধি খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে চলে গেল তখন বিচিত্র ভাবে বঙ্গবালার প্রশ্ন এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। রবি সিংহ বলে সেই ছেলেটিকে নিয়ে সে কি সমস্যা!

ব্রজবাবুই বলেছিলেন স্থির করুন। ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন ত ভাল। সে মত যদি না থাকে তবে রবি সিং মাষ্ট গো। ওকে যেতে হবে।

মাষ্টারেরা ঠিক সেই সময়টিতেই দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আর কথা হয় নি এবং তখনই উত্তর দেবার মত মানসিক অবস্থাও তাঁর ছিল না।

ব্রজবাবু বলেছিলেন—আচ্ছা—সেকথা পরে হবে।

মন ঠিক করতে লেগেছিল এক মাস। সুযোগও হয়েছিল—সামনেই ছিল পুজোর ছুটি। রবি বাড়ী গিয়েছিল। তিনিও বঙ্গবালাকে নিয়ে বাড়ী গিয়েছিলেন। সত্যবতী বলেছিল—দোষ কি? ঘর ভাল। ছেলেটি দেখতে যেন রাজপুত্তুর। পড়াতেও খারাপ নয়। দাও-না বিয়ে।

রামজয় বলেছিল—শুভস্য শীঘ্রং।

—কিন্তু এত অল্প বয়সে—

—অল্প বয়স? ওহে অষ্টম বর্ষে গৌরীদান সেদিন পর্য্যন্ত চলিত ছিল। এই ত বাবুদের বাড়ীতে দেখ না, বড়বাবুর মেয়ের দশ বছরে বিয়ে হ'ল। ওই কমলেশের বোনের এগার বছরে—

—ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ আছে রামজয়। আমার ইচ্ছে—

—কি তোমার ইচ্ছে?

—আমার ইচ্ছে রামজয়—বঙ্গবালা লেখাপড়া শেখে।

—বেশ ত শিখুক না। ঘরে পড়াও।

—সে পড়া নয় রামজয়।

—তবে? একটু চমকে উঠেছিল রামজয়।

—আমার ইচ্ছে—বঙ্গবালাকে আমি ইস্কুল-কলেজে পড়াই। অন্ততঃ বাড়ীতে পড়িয়েও পরীক্ষা দেওয়াই। বঙ্গবালা এখানকার প্রথম মেয়ে গ্রাজুয়েট হবে। আমার ছেলে নেই; আমি এখানে প্রথম হাই ইস্কুল করেছি—বঙ্গবালা এখানে প্রথম মেয়েদের হাই ইস্কুল করবে—এই আমার ইচ্ছে।

—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

—কেন রামজয়?

—গোবিন্দকে ডাকব না ত কাকে ডাকব বল? মেয়ে তোমার পাস করবে মাষ্টার হবে, ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে সাদা সিঁথি টেনে—ইস্কুল করবে আর ওদিকে তোমার চৌদ্দ-পুরুষ বংশলোপের সঙ্গে নরকস্থ হবে। এ মতি তোমাকে কে দিলে বল ত? ব্রজবাবু?

—না। তাঁকে দোষ দিও না। এ আমার নিজের ইচ্ছে।

এর পর রামজয় আর বসে থাকে নি, উঠে চলে গিয়েছিল এবং গোটা পুজার ছুটিটাই আর আসে নি। তিনিই একদিন রামজয়ের কাছে গিয়েছিলেন।

—রাগ করেছ?

—না। লজ্জা পেয়েছি নিজের কাছেই।

হেসেছিলেন চন্দ্রবাবু। রামজয় বলেছিল—লজ্জায় আমিই যেতে পারি নি। নিত্যই যাব ভেবেছি কিন্তু লজ্জা পেয়েছি।

তামাক সেজে কায়স্থের হুকোর মাথায় চাপিয়ে চন্দ্রভূষণের হাতে দিয়ে বলেছিল—খাও।

আর একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—তুমি যখন পড়াবে ঠিক করেছ বঙ্গবালাকে—তখন পড়াও। আমার মত আমি পরিবর্তন করেছি। তবে সংস্কৃত পড়িও।

—হঠাৎ?

রামজয় বলেছিল—গিয়েছিলাম মোহনপুর; বর্দ্ধমানের উকীল সন্তোষবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধে। খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক নিমন্ত্রিত ছিল। সেখানে চন্দ্র—ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা—ব্রাহ্মণদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করলে সন্তোষবাবুর মেয়ে। বছর পঁচিশেক বয়স হে; অবাক হয়ে গেলাম। ওহে সভায় বসে আমাদের সব প্রশ্ন করলে! শুনলাম—মেয়েটি সংস্কৃতে এম-এ পাস। সন্তোষবাবু বললেন—মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলেন বাল্যকালে, বছরখানেক পর বিধবা হয়। প্রথম ইচ্ছা করেছিলাম—বিবাহ দেব। কিন্তু মা রাজী হন নি—আমার স্ত্রীও না. সবচেয়ে আপত্তি হয়েছিল মেয়ের। ও বলেছিল—আমাকে পড়ান বাবা, আমি পড়ব। তা ওর বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠাও অপরিসীম। পাস করে গেল একটার পর একটা। এম-এতে ত ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। ওর জন্য আমি নিশ্চিন্ত। গল্প করলেন—এদিকে দেখছেন শান্ত শিষ্ট কিন্তু এই এবার মায়ের অসুখের সময় আমার আগেই ওরা এল এখানে। সেকেণ্ড ক্লাসে আসছে। পথে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উঠলেন সদলবলে। সাহেবের ক'জন চেলাচামুণ্ডা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে মেয়েছেলেদের রক্ষকহীন দেখে চ্যাঙড়াপনা করেছিল। মেয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চামুণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করেছিল। সমানে তর্ক জুড়েই ক্ষান্ত নয়, শেষ একটা ষ্টেশনে নেমে পাশের গাড়ীতে সাহেবের কাছে হাজির। চোস্ত ইংরিজীতে সাহেবকে বলেছিল—তোমরা নিজেদের খুব সভ্য বল, কিন্তু তোমাদের চেলারা এত অসভ্য কেন? মেয়েদের সম্মান করা দূরে থাক—অপমান করে? সাহেব অবশ্য লোক ভাল—সে নিজে সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে অসভ্য চেলা দুটিকে কামরা থেকে নামিয়ে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে গিয়েছে। বলেছিল—আমি ওদের কঠিন শাস্তি দেব। তা ওর মায়া-মমতাও আছে—বলেছে তা করবেন না সাহেব, কারণ ওরা ত আমার দেশের লোক, আমরাই ত ওদের মা। আমাদের কাছেই ত প্রথম শিক্ষা। কে জানে—ওই অসভ্যতা আমাদের দোষেই ওরা শিখেছে কিনা।

গল্প শেষ করে রামজয় বলেছিল—বঙ্গবালাকে এমনই একটি মেয়ে যদি করতে পার তবে সত্যিই আনন্দের হবে আর—

আর একটি মেয়ের কথা বলেছিল—রামজয়ের এক জ্ঞাতি কন্যার কথা। মেয়েটির ভাল বিবাহ হয়েছিল। পাত্রপক্ষে অবস্থা ভাল—ছেলেটিও ভাল। কিন্তু মেয়ের সন্তান হ'ল না বলে তারা ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছে। মেয়েটির অব[illegible] দোষ একটু আছে, সে বাপমায়ের আদরের মেয়ে—সে সতী[illegible] নিয়ে ঘর করতে পারলে না। বাপের বাড়ী এল। বা[illegible] তিরস্কার করলে, ভাই-ভাজ অসন্তুষ্ট হ'ল। মেয়েটা অভিমা[illegible] ঘর থেকে একবস্ত্রে চলে গেল মামার বাড়ী। মামা[illegible] বাড়ীতেই বা ও মেয়ে থাকবে কি করে? সে এখন ভা[illegible] রান্না করছে এক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাড়ীতে। বলে খে[illegible] খাবে।—তুমি শেখাও। ওকে লেখাপড়া শেখাও।—আমা[illegible] বীণা—

রামজয়ের বিধবা মুখরা মেয়ে বীণা।

—ওকে যদি লেখাপড়া শেখাতাম চন্দ্র, আর কিছু [illegible] পারুক গ্রামে পাঠশালা করত। ওতে মনের একটা জো[illegible] হয়, পাড়াকুঁদুলী হয় না। সেদিন রাগ করা আমার অন্যা[illegible] হয়েছিল।

চন্দ্রভূষণ মনে জোর পেয়েছিলেন। স্থির করেছিলেন—বঙ্গকে লেখাপড়াই শেখাবেন। গ্রাজুয়েট। শ্রীমতী বঙ্গবালা ঘোষ, বি-এ। ডটার অব চন্দ্রভূষণ ঘোষ, বি-এ হেডমিষ্ট্রেস—বিশ্বগ্রাম গার্লস হাই ইংলিশ স্কুল।

ছুটির পর এসে ব্রজবাবুকে বলেছিলেন—মনস্থির করে[illegible] ব্রজবাবু। বঙ্গবালাকে আমি পড়াব—রীতিমত পড়াব বিয়ের কথা এখন ভাবব না। যদি পড়াশুনা না হয়—

হা-হা করে হেসেছিলেন ব্রজবাবু। আপনার মেয়ে[illegible] লেখাপড়া হবে না?

—তা হয় না। পণ্ডিত বাপের মূর্খ ছেলের অভাব নেই অনেক।

—সে পণ্ডিত লোকেরা বাপ হিসেবে মূর্খ বলে। আপনা[illegible] বঙ্গবালার পড়ার ভার আমি নেব। আমার স্ত্রী এখন ওকে পড়াবে, আমি তদ্বির করব। তার পর বছরতিনেক পর ফোর্থ ক্লাস থেকে আমি পড়াব।

ব্রজবাবু সেই বারই বাসা করেছিলেন। মেয়েটি শহরের মেয়ে, ম্যাট্রিক পাস। বিয়ের পর বাড়ীতে ব্রজবাবুর কাছেই আই-এ পড়ছিল। চমৎকার মেয়ে। তাঁর কাছে বঙ্গ শুধু লেখাপড়াই শেখে নি—একটা আদর্শ পেয়েছিল—তাঁর মধ্যে।

ব্রজবাবু বলেছিলেন আপনাকে শুধু একটি কাজ করতে। বছরে চারটে পরীক্ষা নিতে হবে। রীতিমত কোশ্চেন ার করে এগজামিনেশন।

রবি সিং সেই বছর ক্লাস প্রমোশনের পর এখান থেকে দফার নিয়ে চলে গেল।

সাত বছর পর বঙ্গবালা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে করলে।

আর বিধু গোটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ছে। ভুবন ডিভিশনে ফার্স্ট হয়েছে। এ আনন্দ তিনি বেন কোথায়? এমন দিন তাঁর জীবনে আর কখনও স নি, হয় ত কখনও আসবে না। না আসবে—আসতে র। দু'বছর পর বঙ্গ যখন আই-এ দেবে, সেবার—ইস্কুলের—সেবার কান্তি বলে ভাল ছেলেটি সে—বিশ্বলয়ে প্রথম হতে পারে।

—মাষ্টারমশায়—

—ও শম্ভু! টেলিগ্রামখানা বাড়িয়ে ধরলেন চন্দ্রবাবু—! বিধু ফার্স্ট হয়েছে।

শম্ভুর চোখ দুটি চিরকালের জন্য কেমন লালচে হয়ে ছ, দৃষ্টির একটা অস্বচ্ছতা যেন চব্বিশ ঘণ্টা ফুটে থাকে। মধ্যে অর্থহীন ভাবে হাসে। শম্ভু হাসছে।

—সে আমি জানি। একটি আঙুল তুলে বললে—এটা আমিও জানি, বিধুও জানে। খুক খুক করে সকৌতুকে হাসছে শম্ভু।—শিবুও হ'ত—ফার্স্ট-সেকেণ্ড একটা হ'ত। কিন্তু সে একটা খারাপ কাজ হয়ে গেল। আমি জানি আর শিবু জানে।

—চন্দ্র!

আজ চন্দ্র বলে আহ্বান করে রামজয় এসে ঢুকলেন।

—এস রামজয়! আজকের মত শুভ দিন আমার জীবনে আর আসে নি।

—বঙ্গবালা পাস করেছে। ফার্স্ট ডিভিশনে। এই যে! আয়—আয়—আয় মা।

বঙ্গবালা ছুটে এসেছে খবর পেয়ে। বঙ্গবালা আজ সলজ্জা কিশোরী। সে প্রণাম করতে লাগল সকলকে।

এদিকে ক্লাসে ক্লাসে কলরব উঠছে। ছেলেরা হৈ চৈ সুরু করেছে।

—ছুটি দাও চন্দ্র।

—নিশ্চয়!

—কেষ্ট! কেষ্ট! না, দাঁড়াও। ভূপতি ইস্কুলের হলে সমস্ত ছেলেদের জড়ো হতে বল। আমি ওদের কিছু বলব। হ্যাঁ কিছু বলা দরকার। তার পর ছুটি। শুধু আজকের মত নয়। কাল ফুল হলিডে। ফুল হলিডে।

ক্রমশঃ

ব্যাপ্তিবাদ ও জ্ঞানকাণ্ড

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

চিন্তামণির অনুমানখণ্ডকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ব্যাপ্তিপঞ্চক (সিংহব্যাঘ্রপ্রকরণসহ), ব্যধিকরণ, পূর্ব্বপক্ষ প্রকরণ, ান্ত লক্ষণ, অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি, সামান্যাভাব, বিশেষ ব্যাপ্তি ও এব চতুষ্টয় এই আটটি প্রকরণকে আচার্য্যপরম্পরায় ব্যাপ্তিবাদ-এবং ব্যাপ্তি গ্রহোপায়, তর্ক, ব্যাপ্ত্যনুগম, সামান্য লক্ষণা, ধি, পক্ষতা, পরামর্শ কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকী, অর্থাপত্তি, য়, সামান্যনিরুক্তি, সব্যভিচার, সাধারণ, অসাধারণ অনুপ-াধি, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি, বাধ ও অসাধকতাসাধকত্ব,—একুশটি প্রকরণকে অনুরূপভাবে জ্ঞানকাণ্ডরূপে ধরা হইয়া দিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার এই যে, ব্যাপ্তিবাদের প্রথম ট, অর্থাৎ, ব্যাপ্তিপঞ্চক ও ব্যধিকরণ প্রকরণে ব্যাপ্তির স্বরূপ-আলোচিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ছয়টি ও জ্ঞানকাণ্ডের াপত্তি পর্য্যন্ত দশটি—মোট ষোলটি প্রকরণে স্বার্থানুমানের আলোচনা রহিয়াছে। অবশিষ্ট অংশে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের অবয়ব প্রকরণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এগারোটিতে পরার্থানুমানের আলোচনা দৃষ্ট হয়। অনুমান যে স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দ্বিবিধরূপে স্বীকৃত তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণের আলোচনায় দেখা যায়। আচার্য্য গঙ্গেশ, কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী প্রভৃতি অনুমান বিভাগ যে অস্বীকার করিয়াছেন তাহা উক্ত প্রকরণদ্বয়ের আলোচনাতেই সুস্পষ্ট। বরং বৌদ্ধন্যায়-স্বীকৃত স্বার্থ ও পরার্থ বিভাগ স্বীকার করিয়াই তিনি যে অনুমান-প্রকরণ আলোচনা করিয়াছেন তাহা তত্ত্বচিন্তামণির পূর্ব্বপক্ষ প্রকরণে উল্লিখিত "স্বার্থানুমানোপযোগি ব্যাপ্তিস্বরূপ নিরূপণং বিনা কথায়ামপ্রবেশাদিতি" এবং অবয়ব-প্রকরণের উপোদ্ঘাত উক্তি—"তচ্চানুমানং পরার্থং ন্যায়সাধ্যমিতি"...ইত্যাদি হইতে ধরা পড়ে।

নব্যন্যায়ের ব্যাপ্তিবাদ ভালভাবে বুঝিতে হইলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার এই যে, প্রাচীন ন্যায়ে যাহা "অবিনাভাব" নব্যন্যায়ে

তাহা "ব্যাপ্তি"। "ব্যাপ্তি" প্রসঙ্গ আদিতে মীমাংসাশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল : আচার্য্য উদয়নই প্রথমে ইহাকে ন্যায় বৈশেষিকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া "কিরণাবলী" গ্রন্থে আলোচনা করেন। কিন্তু তখনও ইহা "অবিনাভাব" লক্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিকাশলাভ করে নাই। আচার্য্য শিবাদিত্যের "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থে দেখা যায়, "তচ্চব্যাপ্তি পক্ষধর্ম্মতা বিশিষ্ট লিঙ্গ জ্ঞানম্" (সূত্র-১২৪) এবং "ব্যাপ্তিশ্চ ব্যাপকস্য ব্যাপ্যাধিকরণ উপাধ্যভাব বিশিষ্ট সম্বন্ধ" (সূত্র-১২৫)। ব্যাপ্তি-বিষয়ক এই দুইটি সূত্র এবং "শব্দস্যাপ্যনুমান বিষয়েনাবিনাভাবোপজীবকত্বের বা অনুমানত্বম্" সূত্রটির দ্বারা উভয় সংজ্ঞাই পাশাপাশিভাবে রাখিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী প্রকরণে তদুভয় যেরূপে আঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে তাহার সমূহ প্রমাণ আচার্য্য গঙ্গেশের উক্ত তত্ত্বচিন্তামণির অনুমানখণ্ডে পাওয়া যায়। এখন "ব্যাপ্তিপঞ্চক" প্রকরণে দেখিতে পাওয়া যে, "ব্যাপ্তি" আর "উপাধ্যভাববিশিষ্ট" নহে এবং উক্ত প্রকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট "সিংহব্যাঘ্রপ্রকরণে" সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বিচার দ্বারা ব্যাপ্তির সহিত "অবিনাভাব" তত্ত্বের সম্বন্ধ বিচার করা হইয়াছে। ব্যধিকরণ প্রকরণে ইহা ছাড়া উক্ত "অবিনাভাব" তত্ত্বসংশ্লিষ্ট 'অভাব' ও ব্যধিকরণ সম্বন্ধ বিচারে ব্যাপ্তিলক্ষণকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রাচীন ন্যায়ের অবিনাভাব যদি ক্রমপরিণতির ফলে নব্যন্যায়ের "ব্যাপ্তি" হয় তবে উক্ত অবিনাভাব পদার্থের 'অভাব' পদার্থ কি সূচনা করে ইহা বিচার্য। 'অবিনাভাব' বলিতে 'বিনাভাবে'র 'অভাব' না 'অবিনার অভাব' না অন্য কিছু বুঝায়—ইহা জানা আবশ্যক। এই সঙ্গে ইহাও জানা দরকার যে, 'অভাব' দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব কি না, অবশ্য অভাবকে প্রতিযোগীরূপে পাইলে যে-কোনও বিষয়ের 'জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় এবং সেই দিক দিয়া বিচারে 'প্রতিযোগিতাকাভাব' ব্যাপ্তিজ্ঞানেরও হেতু, কিন্তু সে স্থলে 'অভাব'-পদার্থের সামানাধিকরণ্য অবস্থা আবশ্যক, কিন্তু ব্যধিকরণ অবস্থায় তাহা সম্ভব নহে।

অবিনাভাব বলিতে কথায় মারপ্যাঁচে অন্য যে-কোনও অর্থ আসার সম্ভাবনা থাকুক, নৈয়ায়িক কিন্তু 'বিনাভাবের' অভাব ছাড়া অন্য কোনও অর্থগ্রহণ করিতে পারেন না। প্রচলিত শ্লোক—

এষ বন্ধ্যা সুতো যাতি খে পুষ্প কৃত শেখরঃ।
কূর্ম্মক্ষীর চয়স্নাতঃ শাশশৃঙ্গ ধনুর্দ্ধরঃ।

মধ্যে যে বহু অসম্ভব বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে "শশশৃঙ্গ" পদটিতে 'শশেশৃঙ্গাভাব' ব্যতীত অন্য কোনও অর্থ নাই, কারণ "শশ" এবং "শৃঙ্গ" উভয় বস্তুই পৃথিবীতে বিদ্যমান। এই জন্যই 'ব্যধিকরণ' প্রকরণের শেষে চিন্তামণিকার বলিয়াছেন যে—গবিশশশৃঙ্গাভাব প্রতীতের সিদ্ধেঃ শশশৃঙ্গং নাস্তীতি চ শশেশৃঙ্গাভাব ইত্যর্থঃ।

"ব্যধিকরণ লক্ষণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "সপ্তপদার্থী-কার" বলিয়াছেন যে—ব্যধিকরণং সদ্ব্যাবর্ত্তকমুপলক্ষণম্। ভিন্ন বিভক্ত্যন্ত পদবাচ্যত্বং বৈয়ধিকরণ্যম্ (সূত্র-১৬০)। ব্যধিকরণ যে সমবায় নহে তাহা মহামহোপাধ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁ[হার] উক্ত প্রকরণ দীধিতি ব্যাখ্যানটীকায় বলিয়াছেন—(সমবায়ি[...] নতত্ত্যধিকরণ ধর্ম্ম)। তবে এই ব্যধিকরণ লক্ষণের উপর যে বি[...] বিচার, প্রথমতঃ শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তী, পরে 'প্রগলভাচার্য্য তৎ[...] জয়দেব (পক্ষধর) মিশ্র এবং অবশেষে বাসুদেব সার্ব্বভৌম [...] হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়। এই সমস্ত মতের বিচার এবং খণ্ড[ন] পরও বঙ্গগৌরব রঘুনাথকে সার্ব্বভৌম-ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীনাথ বি[দ্যা]নিবাসের দ্বিমুখী প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং স্বীয় প্রতি[ভা]বলে একটি মতের খণ্ডন করিয়া অপরটিকে গঙ্গেশের স্বীকৃত পা[...] পুচ্ছলক্ষণরূপে অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে—তাহাতে ধরা প[ড়ে] এই ব্যধিকরণ প্রসঙ্গকে একেবারে উড়াইবার প্রচেষ্টা বহু পণ্ডি[তের] মধ্যে দেখা গেলেও নৈয়ায়িক শিরোমণি 'ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভা[ব] যে বিরল ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মাইতে পারে তাহা প্রমাণ করি[য়া]ছেন এবং এই সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্যধিকরণ ধর্ম্মা[ব]চ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব সমবায় জ্ঞান জন্মায়। ইহা ব্যধিকর[ণ] কেবল প্রথম সূত্র—'অথেদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাদিত্যত্র সমবায়ির[...] বাচ্যত্বাভাবো ঘটে এবং প্রসিদ্ধঃ, ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগি[তা]কাভাবস্য কেবলান্বয়িত্বাৎ দ্বারাই প্রমাণিত তাহা অন্যরূপে প্রমাণিত হয়। অভাব ও সমবায় অনেক বৃত্তি, কিন্তু প্রতিযো[গী] দ্বারা নিরূপণীয়, কাজেই উহারা সহায়সম্পন্ন, সুতরাং সমবায় অভাবের জ্ঞান অন্য নিরূপ্য বলিয়া ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতি[...]যোগিতাকাভাব সমবায় মাত্র। আরও প্রমাণ এই যে, বঙ্গগৌ[রব] রঘুনাথ সমবায়ত্বকে অখণ্ডোপাধি বলিয়াছেন। 'বলভদ্র স[...] মতে আশ্রয়োপাধি শরীরপ্রবিষ্ট ব্যাপকত্বাব্যাপকত্ব তদ্বত্যন্তাভ[াব] অখণ্ড উপাধিঃ [সপ্তপদার্থী ১২৫ সূত্রের সম্যগনুপলভ্য অংশরূ[প] গৃহীতাংশ]। বাঙ্গলায় বিভক্তির ব্যধিকরণে যে সমবায় সম[...] দেখা যায় [প্রবাসী ১৩৫৪ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "সমবায়" প্রস[ঙ্গ] আলোচনা দ্রষ্টব্য] তাহা উক্ত বলভদ্র লক্ষণের সহিত সমন্বযুক্ত সো-দড় উপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত এই ব্যধিকরণ বাদ আধুনিক উপযোগির প্রমাণে সজীব এবং সর্ব্বথা স্বীকারযোগ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আন্বীক্ষিকীর ব্যাপ্তিবাদ মীমাংসা দর্শ[ন] হইতে আসিয়াছে। কিন্তু মীমাংসা দর্শনের ব্যাপ্তি ধর্ম্ম আন্বীক্ষিকী ব্যাপ্তিধর্ম্ম হইতে পৃথক। সুবিখ্যাত ভট্টবাদী মীমাংসক পার্থসারথি মিশ্র তাঁহার "ন্যায়রত্নমালা" গ্রন্থে এই ব্যাপ্তিধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

ভূয়োদর্শন গম্যাহি ব্যাপ্তিরিত্যভিধানতঃ—(পৃষ্ঠা ৬৭)।

কিন্তু "তত্ত্বচিন্তামণি"কার "ব্যাপ্তিগ্রহোপায়" প্রকরণের প্রথমে বলিয়াছেন—সেয়ং ব্যাপ্তি র্ন ভূয়োদর্শন গম্যা দর্শনানাং প্রত্যেক হেতুত্বাৎ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মীমাংসামতে ব্যাপ্তি ভূয়োদর্শন গম্যা, কিন্তু আন্বীক্ষিকী মতে ইহা সেরূপ নহে। "সপ্তপদার্থী" ব্যাপ্তিলক্ষণে উপাধির অভাব স্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্ত[...]

লক্ষণ অবিনাভাবের সহিত একাঙ্গীভূত হইবার প্রয়োজনে ন্যায়িকী শাস্ত্রে ক্রমবিকাশলাভ করিয়াছে ততই উপাধির চারও যে কখনও কখনও ব্যাপ্তিজ্ঞানে সাহায্য করে ইহা স্বীকার তে হইয়াছে এবং ফলে উক্ত উপাধি-প্রসঙ্গ অনুমানখণ্ডের এক ষ্ট অংশরূপে গ্রহণ করিতে আচার্য্য গঙ্গেশকেও বাধ্য করিয়াছে। আলোচনায় আমরা মীমাংসা বৈশেষিক ও আন্বীক্ষিকীসম্মত লক্ষণের পার্থক্য পাইতেছি।

মীমাংসা ও বৈশেষিকের ব্যাপ্তি কতিপয় নিয়মসিদ্ধ। "বলভদ্র ের উল্লিখিত শেষাংশে বলা হইয়াছে যে—তত্তচ্চাত্যন্তাভাবঃ গাভাব বিশেষবৎ ; তত্র প্রতিযোগ্যায়োপহেতুকবী বিষয়াভাববং টিতং নিয়মাচ্চ ব্যাপ্তিরিতি নাস্ত্যাশ্রয়াদিঃ। বৈশেষিকের এই ব্যাপ্তিঘটিত নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত নিয়মসূত্র থ ভাবে পাই না। কিন্তু মীমাংসাশাস্ত্রে উক্ত সূত্র সুনির্দিষ্ট। র্থ সারথি"র উক্ত "ন্যায়রত্নমালা" গ্রন্থে ব্যাপ্তিবাদের তত্ত্ব কায় (পৃঃ-৫৭) আমরা পাইতেছি :

যো যথা নিয়তো যেন যাদৃশেন যথাবিধঃ।

সা তথা তাদৃশস্ত্যেব তাদৃশোঽস্তত্র বোধকঃ।

কারিকার মূল অর্থ—"যে পদার্থ যাহা তাহাই" এবং ইহাই ত্য আন্বীক্ষিকী মতে The Law or Principle of ntity। "ন্যায়রত্নমালা" গ্রন্থে উল্লিখিত কারিকার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ও দুইটি উদ্ধৃত কারিকা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটি রূপ :

সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাঽত্র লিঙ্গধর্মস্য লিঙ্গিনা।

ব্যাপ্যস্য গমকত্বঞ্চ ব্যাপকং গম্যমিষ্যতে।

উক্ত কারিকার অন্তর্নিহিত অর্থে—"যে-কোনও পদার্থই হয় হ, না হয় নাই" এই নিয়ম পাওয়া যায়। বিশ্লেষণ করিলে র অর্থ আরও দাঁড়ায় এই যে, কোনও পদার্থের দুইটি বিরোধী র একটি অবশ্যই থাকিবে, কোনওটি নাই এরূপ হইতে পারে " অর্থাৎ ইহা দ্বারা পাশ্চাত্য The Law or Principle Excluded Middle পাইতেছি।

অন্য কারিকাটি—

যো যস্য দেশকালাভ্যাং সমোন্যূনোঽপি বাস্তবেৎ,

সব্যাপ্যো ব্যাপকস্তস্য সমো বাঽপ্যধিকোঽপিবা।

এই কারিকাটির অর্থে The Law or Principle of ntradiction অর্থ মেলে। এই তিনটি ব্যাপ্তি সংক্রান্ত নিয়ম ংসা দর্শন স্বীকৃত হইলেও আন্বীক্ষিকী প্রকরণে স্বীকারে কোনও বিধা নাই। বরং ইহাদের গ্রহণে উক্ত শাস্ত্রকে আধুনিক যুগোপ-গীরূপে দাঁড় করাইবার বিশেষ সুবিধা আইসে।

এক্ষণে অনুমানের বিভাগ বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। প্তপদার্থী" মতে অনুমানের দ্বিবিধ বিভাগ—"স্বার্থমপরার্থরূপঞ্চ" "পরার্থঞ্চ স্বরূপঞ্চ" রূপে নির্দিষ্ট হইলেও স্বার্থানুমান যে ত্যাশ্রয়ী তাহা পূর্ব্বপক্ষ প্রকরণ-উদ্ধৃত সূত্র প্রমাণে আগেই বলিয়াছি। এই স্বার্থানুমানকে সর্বাংশে পাশ্চাত্য দর্শনের Immediate Inference-এর সহিত অভিন্ন বিবেচনা করা যাইতে পারে। কারণ যে অনুমানে একটি মাত্র কথা হইতে অন্য কোনও কথার সাহায্য না লইয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই Immediate Inference. [Immediate inferences are mere developments out of a single proposition already accepted.] ইহার অর্থ "স্বার্থমপরার্থরূপঞ্চ" এই সপ্তপদার্থী সূত্রের অনুরূপ। বাস্তবিক একটি মাত্র কথা হইতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান বিশেষভাবে আবশ্যক এবং সেই জন্য পূর্ব্বপক্ষ প্রকরণের উক্তি—"স্বার্থানুমানোপযোগি ব্যাপ্তিস্বরূপ নিরূপণং বিনা কথায়ামপ্রবেশাদিতি"—Immediate Inference-এর ভারতীয় সংজ্ঞায়ও স্বীকার্য্য। Mediate Inference-কে পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকেরা Syllogistic ও Inductive এই দুই ভাগ করেন, এই Mediate Inference-এর যে বিভাগ Syllogism-এর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকেও নিঃসন্দেহে পরার্থানুমান বলা যায়, কেননা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উক্তানুমানং পরার্থং ন্যায়সাধ্যমিতি।—অবশ্য পরার্থানুমানেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু তাহা গৌণ।

স্বার্থানুমানও ব্যাপ্তির সম্বন্ধ-নির্ণয় প্রসঙ্গে "কথা"-র যে উল্লেখ আচার্য্য গঙ্গেশ করিয়াছেন তাহার স্বরূপ কি। কথা-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা জগদ্গুরু জয়রাম ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য লিখিত "ন্যায় সিদ্ধান্তমালা" গ্রন্থের ৫৩-৭১ পৃষ্ঠায় দেখা যায়। উক্ত প্রকরণ-মধ্যে"কথা"র যে সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে—নানা-স্থাপনা প্রতিস্থাপনা ভিন্নৈকা কথা (পৃঃ-৫৪)। এই কথার বিভাগ "উদ্ভাবন, উত্থাপন" প্রভৃতি নানা প্রকারের হইতে পারে। জগদ্গুরু জয়রাম বলিয়াছেন—নতু তদুদ্ভাবনেন কথা বিচ্ছেদঃ (পৃ.-৫৭)। কিন্তু উদ্ভাবন (conversion) প্রভৃতি প্রক্রিয়া অনুমিতি ক্রিয়া-সহায়ক কিনা ইহাতে সন্দেহ আসিতে পারে ; কারণ ন্যায় পরিভাষিকার মতে—সর্ব্বেষামপ্যনুমানানাং স্বপ্রতিসন্ধানাদিবলেন প্রবৃত্তত্বা স্বব্যবহার মাত্র হেতুত্বেন চ স্বার্থত্বাৎ। বাক্য প্রতিপন্নেঽপি নতু বাক্য বলাদর্থসিদ্ধিঃ (পৃঃ—১৫৪.৫) বলিয়া উক্ত প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যে আমরা একটি সত্য হইতে অপর এক সত্যে উপনীত হইতে পারি না। একটি ব্যাপারকে যে শব্দসমষ্টি দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকেই কি ভাবে অন্য কতকগুলি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় তাহা দেখানোই ইহাদের কার্য্য। "সকল মনুষ্য মরণশীল" এবং "কোনও মনুষ্য অমর নহে"—এই দুই কথা একই ব্যাপারকে দুই ভাবে প্রকাশ করিতেছে মাত্র, দ্বিতীয় কথার মধ্যে কোনও নূতন সত্যের সূচনা নাই। ন্যায় পরিভাষিকার সেজন্য স্পষ্টই বলিয়াছেন, তদিদমনুমানং স্বার্থং পরার্থং চেতি কেচিদ্বিভজন্তে, তদযুক্তম্ (ঐ পৃঃ ১৫৪)। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বক্তব্য যদি এই যে উদ্ভাবন, উত্থাপন ইত্যাদিতে সিদ্ধান্তটি অনিবার্য্যভাবে কোনও হেতুবাক্য হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা

কোনও নূতন সত্যকে প্রকাশ করে না তাহা হইলে যে কোনও অনুমান সম্বন্ধেই ইহা খাটিবে—অর্থাৎ, আমরা যে সকল প্রক্রিয়াকে অনুমান বলিয়া গণ্য করি তাহাদের কোনওটিকেই প্রকৃতপক্ষে অনুমান বলিয়া মনে করা চলিবে না। কিন্তু বক্তব্য যদি এই হয় যে, কোনও স্বার্থানুমানে আমরা যে সত্যে উপনীত হই তাহা বাস্তবিক হেতুবাক্য হইতে ভিন্ন নহে তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, দুইটি কথা যে দুইটি সত্যকে প্রকাশ করিতেছে তাহারা অভিন্ন অথবা পৃথক তাহা নির্ণয় করা যাইবে কি উপায়ে? কেবলমাত্র সযত্ন পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারাই ইহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ উক্ত ন্যায় পরিশুদ্ধিকার মতেও স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি প্রতি-সন্ধান ইত্যাদি কার্য্য [কিন্তু বাক্যার্থোপস্থাপিত ব্যাপ্তি প্রতিসন্ধানাদিনৈব—পৃঃ ১৫৫]। উদ্ভাবন, অথবা উত্থাপন সিদ্ধান্তের সহিত হেতুবাক্যের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, হেতুবাক্য যে দুই বিষয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে, সিদ্ধান্ত-বাক্য ঠিক সেই দুই বিষয়ের মধ্যে সেই সম্বন্ধ প্রকাশ করে না। হয় একটি বিষয়ের পরিবর্ত্তে অপর একটি বিষয় উপস্থিত হয়, নতুবা সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটে অথবা এই উভয় পরিবর্ত্তনই ঘটিতে পারে। "সকল শিক্ষিত ব্যক্তি দূরদর্শী, অতএব কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি অদূরদর্শী নহেন"—এ স্থলে হেতুবাক্যে আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তু হইতেছে "শিক্ষিত ব্যক্তি" ও "দূরদর্শিতা" এবং তাহাদের মধ্যে 'সরূপ সম্বন্ধ'; কিন্তু সিদ্ধান্তে আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তু হইতেছে, "শিক্ষিতব্য ক্তি" ও "অদূরদর্শিতা" এবং তাহাদের মধ্যে 'বিরূপ সম্বন্ধ'। এ স্থলে যখন দেখা যাইতেছে যে, সিদ্ধান্ত-বাক্যের বিষয়বস্তু হেতুবাক্যের বিষয়বস্তু হইতে ভিন্ন তখন তাহাকে কেবলমাত্র হেতুবাক্যের পুনরাবৃত্তি বলিব কেন। যদি সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র না হইত তাহা হইলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি হেতুবাক্য হইতে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত সত্যই নিঃসৃত হইতেছে কিনা তাহা নির্ণয় করিতে কষ্ট পাইতে হইত না। সুতরাং উদ্ভাবন, উত্থাপন ইত্যাদিকে অনুমান বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ নব্য ন্যায়মতে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানস্থিতি জন্য জ্ঞানই অনুমিতি এবং তাহার করণই অনুমান [অ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান জন্য জ্ঞানমনুমিতি তৎকরণমনুমানম্—তত্ত্বচিন্তামণি অনুমান প্রকরণ]।

শীত রাত্রি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কুয়াশায় ঢাকা ময়দান,
শীত রাত্রি। কমেছে যাত্রীর ভিড়।
চাদর জড়ায়ে ব'সে আছি ট্রামে।
চাকার ঘর্ঘর শব্দে বাজিছে ঘুমের তাল,
তন্দ্রা ভরা চোখ।

রান্না শেষ কখনও হ্যায়,
ছেলেরা ঘুমায়,
সরমায় সারাদেহে গভীর, গভীর, অবসাদ,
ক্লান্তি ভাব, সর্ব্বাঙ্গে আমার।

ট্রাম থামে, নামি পথে, এ কি কলকাতা?
পথ জনহীন।
একটি ভিখারী শুয়ে আছে ফুটপাথে কুণ্ডলী পাকায়ে।

এসেছি গলির মোড়ে,
ছোট চালাঘর,
মাটির দেয়াল।
সরমা দুয়ার খোলে,
হারিকেন মিটিমিটি জ্বলে।

শীর্ণ মুখ মলিন-বসন সরমা আমার।
কত রাত আছে প্রতীক্ষায়,
আরও কত রাত!
জীবনে নেমেছে শীত, শীতল তুহিন,
রক্তে নাই আগুনের তাপ।
স্বপ্ন সব শেষ হয়ে গেছে।
শুধু দুটি অন্ন চাই সন্তানের মুখে,
সকালে চায়ের জল, এক টুকরো রুটি।

সুমুখে প্রান্তর গাঢ় কুহেলি বিলীন
আচ্ছন্ন করিয়া লবে ঘন আবরণে।

ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্ম্ম

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভারতের শিল্প মূলতঃ আধ্যাত্মিক এবং যে নিগূঢ় অধ্যাত্ম-রহস্য হতে এর উদ্ভব তার থেকে একে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পরিপ্লুত এমন এক পরিবেশে এর সৃষ্টি হয়েছিল যা হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত প্রাণসত্তা। কেবলমাত্র মানবিক সম্পর্ক অপেক্ষা অধ্যাত্ম ভাব-কল্পনা ভারত-শিল্পে এত

লক্ষ্মী

বেশী রূপায়িত হয়েছে যে, এদেশের লোকেদের নিকট "শিল্পের জন্য শিল্প" এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক বলে প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ ভারতীয় বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, শিল্পসৃষ্টি সেখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে। শিল্পীকে—তা তিনি চিত্রকরই হোন্ বা ভাস্করই হোন্, পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম ভাব-দ্যোতক প্রতিমূর্ত্তি-সৃষ্টির জন্য যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে, তা যেমন সূক্ষ্ম তেমনই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ।

এই কারণেই, যে আধ্যাত্মিক পারিপার্শ্বকে এগুলির সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা কখনও কখনও তাদের করে তুলেছিল সঞ্জীবিত

নৃত্যকারিণী, (তাম্রমূর্ত্তি, মোহেন্-জো-দড়ো)

তার থেকে এই সকল প্রতিমূর্ত্তিকে বিচ্ছিন্ন করা বড়ই কঠিন। কেননা শিল্পীর রূপ-ভাবনার সঙ্গে সকল সময়েই জড়িয়ে থাকে এমন একটি উদ্দেশ্য যা খাঁটি নন্দনতত্ত্বের এলাকার বহির্ভূত।

শিল্পী সকল সময়েই গ্রহণ করে মানবীয় এবং অতিমানবীয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারীর ভূমিকা।

সরস্বতী

গোড়াতেই পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের মূলগত গভীর পার্থক্যের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সুদূর অতীতকাল থেকে পাশ্চাত্যের শিল্পীরা ক'রে আসছে প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ, তাদের শিল্পসৃষ্টিতে মানুষের তো বটেই, দেবতাদেরও পর্য্যন্ত দৈহিক সৌন্দর্য্যের রূপায়ণই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে—গ্রীক দেবতাদের প্রতিমূর্ত্তিগুলি রূপসৃষ্টির দিক দিয়ে নিখুত, তবে সেগুলিতে দেবদেহের সঙ্গে নরদেহের কোন পার্থক্য নেই। দিব্যানুভূতিসম্পন্ন ভারতের শিল্পী কিন্তু দেহের মধ্যে খুঁজেছেন বিদেহী সত্তাকে, তাই রূপের মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন রূপাতীতকে। গভীর ধ্যানের ফলে তাঁদের মানসলোকে দেবতার যে রূপ প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে তাকেই তাঁরা রূপায়িত করেছেন তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে। ভারতীয় শিল্পে দেবদেবীর রূপ-কল্পনার মূলে রয়েছে সাধক-শিল্পীর ধ্যানলব্ধ সত্যানুভূতি। ভারতীয় শিল্পে বৌদ্ধ এবং হিন্দু দেবদেবীদের যে সকল প্রতিমূর্ত্তি আমরা দেখতে পাই তারও বেশীর ভাগ ধ্যানী-মূর্ত্তি। যৌগিক সাধনায় ধ্যান-ধারণা প্রত্যাহার ইত্যাদি কতকগুলি ক্রমিক স্তর অতিক্রমণের পর এমন অবস্থা আসে যখন সাধক ধ্যেয় বিষয়ের সহিত হয়ে যান একাত্ম—এরই নাম সমাধি। যে জটিল সাধন-পদ্ধতির মূলে রয়েছে এই যোগারূঢ় অবস্থালাভের অভীপ্সা, তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে দেবদেবীর এই সকল রূপ-কল্পনা।

একদিকে যেমন অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ফলে সৃষ্ট এই সমস্ত র তত্ত্ব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে শিল্পশাস্ত্রসমূহে, অন্য তেমনি শাস্ত্রনিবদ্ধ এই সকল নিয়ম অনুসরণ করা শিল্পীর প ছিল অপরিহার্য্য—কেননা বিশ্বাসী ভক্তকে দেবতার দৈহিক প্র রূপের গণ্ডী অতিক্রম করে দিব্যানন্দের এমন এক স্তরে উ হতে হ'ত যেখানে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে পরিণত হয় দে তীত চিন্ময় সত্তায়। ফলে ধ্যানী-শিল্পীর মন তাঁর ধ্যান-ধার আধারের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং সেই অধ্যাত্ম উপলব্ধি তিনি ফুটিয়ে তোলেন ভাস্কর্য্য অথবা চিত্রকর্ম্মের মাধ্যমে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভারতের শিল্পীর লক্ষ্য অধ্যাত্ম অনুভূতির রূপময় প্রকাশ—তা শরীরী আকার পরিগ্রহ ক দেবতার প্রতিমূর্ত্তির মাধ্যমে। ভারত-শিল্পের এই সকল মূল সূ কথা মনে রাখলে এটা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাবে যে, ভার চিত্রকলা এবং মূর্ত্তিশিল্পের পক্ষে একটি অ-সাধারণ পথ অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বুদ্ধ অথবা মহাবীর জৈনের মত লো গুরুদের দৈহিক রূপায়ণেও সেই পন্থাই অনুসৃত হয়েছে।

মহাসম্বোধি লাভের পূর্ব্বে ও পরে বুদ্ধের দেহ শারীর-স্থা (Anatomy) দিক দিয়ে ছিল একই, কিন্তু মহাসম্বোধি পুরো রূপান্তরিত করে দিয়েছিল সন্ন্যাসী গৌতমকে, সমগ্র বিশ্বের উ লাভ করেছিলেন তিনি অখণ্ড আধিপত্য। বস্তুতঃ, শাস্ত্রের বাঁধা নিয়মপদ্ধতিকে জয় করে ধর্ম্মের গুহাহিত সত্যকে মানবজাতি নিকট প্রকাশিত করবার জন্যই হয়েছিল তাঁর জন্ম এবং তি ছিলেন আধ্যাত্মিকতার মূর্ত্ত বিগ্রহ।

গোড়াকার দিকের বৌদ্ধ শিল্প বুদ্ধের এই মূলগত অধ্যাত্মসত্তা মানবীয় আকার দিতে গিয়ে স্বকীয় অক্ষমতা উপলব্ধি করে অবশে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করল। এইখানেই পাশ্চাত্য শিল্পে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের মূলগত পার্থক্য। পাশ্চাত্যের শিল্পীদের দৃ সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে, তাই দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে দিয়েছে তারা মানবীয় রূপ। কিন্তু ভারতের শিল্পী অনুসর করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ, মহিমময় আত্মিক সত্তাকে প্রকাশের জ এদেশের শিল্পী অনবরত শারীর-স্থান বিষয়ক খুটিনাটিকে উপেক্ষ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। শিল্পশাস্ত্রসমূহ থেকে তিনি আহর করেন সেই সকল সুনির্দিষ্ট প্রতীক যেগুলি তার ভাবাদর্শে রূপায়ণের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। তাঁর হাত দিয়ে যে মূর্ত্তি সৃষ্ট হয় তাতে তিনি বিশ্বের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে তার দৈহিক একাত্মতা দেখাবার প্রয়াস পান।

বুদ্ধ যে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করেন তার সঙ্গে তাঁর মানবীয় ব্যক্তিসত্তা হয়ে যায় এক এবং পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচকগণ সেই সকল ভাবকল্পনার উপর জোর দেন যেগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণকারী শিল্পীদের ছিল সহজাত বোধি (intuition)। প্রজ্ঞা পদ্ধতিতে—সুভূতি ছিলেন যার প্রতিনিধি, দৃঢ়তার সহিত এই মত প্রকাশিত হয়েছে যে, একমাত্র প্রজ্ঞা

llumination) ছাড়া আর সবকিছুই মায়া এবং মিথ্যা। গার্জ্জুন তাঁর সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে (dialectical system) দ্ধের পরিদৃশ্যমান জীবন এবং তাঁর প্রকৃত অনন্ত সত্তা—যা ধর্ম-য়া অর্থাৎ ধর্ম্মের দ্বারা গঠিত শরীররূপে পরিচিত—এই দুয়ের ধ্য সীমারেখা টেনেছেন। বুদ্ধের রূপকায়া অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক হকে কল্পনা করা হয়েছে মহাশূন্যের মত নিঃসীম বলে—বুদ্ধের ই যে রূপকায়া তা অরূপ অথচ যাবতীয় রূপ তাতে রয়েছে ধৃত। বজ্রচ্ছেদিকা বলেন—"যারা আমার রূপময় প্রকাশ দেখেছে বং আমার বাঙ্ময় প্রকাশ যাদের শ্রুতিগোচর হয়েছে, ব্যর্থ দের সাধনা, কেননা তারা দেখতে পাবে না আমাকে।"

এতে আরও বলা হয়েছে—"বুদ্ধের দেহকে আশ্রয় করে আছে এবং এই ধর্ম্মকে বোঝাও যায় না, কিংবা বুঝানো যায় না।"

এই শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য হচ্ছে, ধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা হতে পারে কেবলমাত্র বোধির দ্বারা।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের সমগ্র দার্শনিক তত্ত্ব যথা-তি নিহিত ছিল তদানীন্তন সকল শ্রেণীর শিল্প-রূপায়ণের মধ্যে।

এখানে আমরা দেখতে পাই সেই পারস্পরিক সম্পর্কের একটি াদর্শ দৃষ্টান্ত যা ভারতীয় শিল্পকে অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে আবদ্ধ করে কসূত্রে। পারস্পরিক বলা হচ্ছে এই জন্য যে, শিল্প যেমন ়নে চলে রক্ষণশীল শাস্ত্রবিধির নির্দ্দেশ, তেমনি শিল্প-প্রচেষ্টার মোঘ শক্তিতে রক্ষণশীল আদর্শও হয় বিকাশপ্রাপ্ত এবং পান্তরিত। এই রূপান্তরের মূলে থাকে শিল্পীর ধ্যানলব্ধ অনু-তির সুষমাময় প্রকাশ। কাজেই শিল্প এবং অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে যোগ তা অত্যন্ত নিগূঢ় এবং ভারতীয় শিল্পের মর্ম্মমূলে পৌঁছলে তঃই প্রতীয়মান হয় যে, এই দুটি ধারা যেন একীভূত হয়ে ছে।

শিল্প এবং অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক অভিব্যক্ত য় আর একদিক দিয়েও। কেননা প্লাষ্টিক অথবা প্রস্তরের মূর্ত্তি ঠন অথবা চিত্ররচনা করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্পী অল্পবিস্তর জেরই অজ্ঞাতসারে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গীর নুসরণ করেন যা ভারতীয় সভ্যতার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। এ থা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না যে, এই দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে ারতীয় সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতীয় চিন্তাধারায় াণীজগতে কেবলমাত্র মানুষের উপরেই চূড়ান্ত রকমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ত্ব আরোপিত হয় নি। সে প্রকৃতির প্রভু নয়, তার একটি শ মাত্র; এবং শিল্পী দেখাতে চেষ্টা করেন সেই সৌসামঞ্জস্য, ই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন যা উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্য্যন্ত জীবনের বিভিন্ন কাশকে গ্রথিত করে এক অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে। জীবনের এই কত্বানুভূতি ভারতীয় শিল্পীর অন্তরে সঞ্চারিত করে এক গভীর রণা। এই প্রেরণাবশে ইতিহাসের উষাকাল থেকে ইদানীন্তন াল পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পীরা সকল শ্রেণীর প্রাণীর প্রতিরূপ সৃষ্টিতে সাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই উপমহাদেশের বপুলসংখ্যক ইতর প্রাণীকুল ঐ শিল্পের সমৃদ্ধির পক্ষে আনুকূল্য করেছে, তাদের জীবনধারা থেকে শিল্পীরা লাভ করেছেন অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। এই অনুরাগ, এই অনন্যসাধারণ রচনাশৈলীর সৃষ্টি কস্মিন কালেও হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না যদি না থাকত সেই সার্ব্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গী যা ভারতের বহু ধর্ম্মের সাধারণ জিনিষ—যা মনুষ্য-জীবন এবং প্রাণী-জীবনকে প্রতিষ্ঠা করে একই স্তরে। কর্ম্ম এবং জন্মমৃত্যুর নিয়ত ঘূর্ণায়মান যে চক্রে যাবতীয় প্রাণী আবর্ত্তিত হয় তৎসম্পর্কিত ধারণা এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী নয়।

পুরুষের মুখাবয়ব সম্বলিত একটি পদক—ভারহুত
(কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত)

পক্ষান্তরে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মনুষ্যমূর্ত্তিকে রূপ-দানের বেলায় শিল্পীকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করে মনের শ্রেষ্ঠ অবস্থাকে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। অনুভূতিসমূহ, মানসিক গুণাবলী (কখনও কখনও নেতিবাচক) এ সকলকেই তিনি চান প্রকটিত করতে। তাঁর অনুরাগ বহিরঙ্গের প্রতি নয়—এমন কোনকিছুর প্রতি যা গভীরতর—আত্মার মূলগত ধর্ম্মকে ব্যক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য। একথা উত্থাপিত হতে পারে যে, গভীরতর সত্তাকে প্রকাশ করবার জন্য শিল্পীর এই যে আকুতি, কখনও কখনও তা হারিয়ে যেতে পারে বৃহত্তর এবং বহুমূর্ত্তিসম্বলিত দৃশ্যপটে। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, এই সকল ক্ষেত্রে একটি মূর্ত্তিই অধিকার করে মুখ্য স্থান—সেই মূর্ত্তিকে তার পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটিয়ে তুলবার জন্যে যে পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন হয়েছে, ঐ সকল দৃশ্য তারই অংশমাত্র। সবকিছুই আবর্ত্তিত হয় এই কেন্দ্রস্থ মূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বে। প্রতীক-সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এই মূর্ত্তির প্রকৃত স্বরূপ—হাতের ভঙ্গী, মুদ্রা প্রভৃতি সুস্পষ্টরূপে আধ্যাত্মিক অবস্থার নির্দ্দেশ প্রদান করে।

কিন্তু তাই বলে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, অঙ্গভঙ্গীর এই সকল প্রতীক্‌ অভিব্যক্ত হয় স্থূল ভাবে। শিল্পীর প্রায়শঃই লক্ষ্য থাকে মুদ্রাভঙ্গীযুক্ত ঐ সকল হস্তে প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করার দিকে এবং এগুলিতে পরিচয় পাওয়া যায়—বলিষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির। অজন্তা গুহাচিত্রাবলীর ছন্দোময় রেখানিচয়, মূর্ত্তিসমূহের প্রসারিত বাহুতে আধ্যাত্মিক আশ্বাসের ভঙ্গী দর্শকের মনকে বিপুল ভাবাবেগে উদ্বেলিত করে

বুদ্ধের দিব্যপ্রেরণা (গান্ধার পদ্ধতি)

এখন আমরা আসছি ভারতীয় শিল্পের আর একটি মূলগত ভিত্তির প্রসঙ্গে—সেটি হচ্ছে গতি।

মোহেন্‌-জো-দড়ো এবং হরপ্পার যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখি—সেই সুদূর অতীতকালের শিল্পীরা মানুষ এবং পশুর যে সকল মূর্ত্তি গড়েছে কিংবা ছবি এঁকেছে সেগুলি শুধু যে এনাটমির দিক দিয়ে নিখুঁত তা নয়, রূপসৃষ্টিতে গতিবেগ ফুটিয়ে তোলার কৌশলটি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পীরাও আয়ত্ত করেছিল পরিপূর্ণ ভাবে, এবং তাদের শিল্পসৃষ্টি প্রায় এমন এক স্তরে পৌঁছেছিল যে, কালের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও তা জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পের পাশে দাঁড়াতে পারে।

এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র নেই যে, অতি প্রাচীন কাল থেকে, 'গতি' বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল এই সমস্ত প্রায়-ভারতী (Proto Indian) শিল্পীদের মনোযোগ ; এবং প্রাণীকের কা গতিবেগ ফুটিয়ে তোলবার জন্যে আঙ্গিক-কৌশল আয়ত্ত করব দিকেও তারা ঝুঁকেছিল।

কিন্তু মেসোপোটেমিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক এ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের রূপসৃষ্টি সে দে কোন প্রকার সাড়া জাগাতে সক্ষম হ'ল না। সুমেরীয় আর্টের চূড় অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, স্থির নিশ্চল রেখাসমূহের উপরে শিল্পীর নির্ভর। পক্ষান্তরে ওখানকার শিল্প কিন্তু সমসাময়িক ভারতী শিল্পের উপর কতকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বিদেশীয় শিল্পপদ্ধতিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এভাবে সমাদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও, খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্প-রূপায়ণের গু কিন্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি ; কিংবা যে ভাবধারায় সেগুলি সঞ্জীবিত ত ব্যত্যয় ঘটে নি। হরপ্পার আদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা সামান্যই জানি কিন্তু এমন সব প্রমাণ বিদ্যমান যাতে এই বিশ্বাসের সমর্থন মে যে, এর বিশ্বানুভূতি ছিল অন্ততঃ আংশিক ভাবে ভারতের চিরন্ত অধ্যাত্ম অনুভূতিরই অনুরূপ। সেখানেও দেখি, ইতরপ্রাণ রূপায়ণের প্রতি সেই একই অনুরাগ, নারী-সৌন্দর্য্যকে ফুটি তোলায় সেই একই আদর্শের অনুসরণ। তখনকার যুগের কত গুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম্ম যে নৃত্যের সহিত সম্পর্কিত এটা আকস্মিক ঘটনা নয়, হরপ্পার শিল্পীও রূপসৃষ্টির মাধ্যমে ভারতের চিরন্তন প্রাণধর্ম্মকেই প্রকাশ করবার প্রয়াস পেয়ে নৃত্যচ্ছন্দে পদক্ষেপ করতে উদ্যত ত্রি-শীর্ষ দেবতার ধূসর প্রস্ত নির্ম্মিত মূর্ত্তি ইত্যাদি দেখলেই তা বুঝতে পারা যায়। হরপ্পার থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ-চতুর্দ্দশ শতকের অপূর্ব্ব ব্রোঞ্জমূর্তিসমূ অভিব্যক্ত হয়েছে সেই দিব্য ছন্দ যা বিশ্বের সৃষ্টি এবং লয়ে কারণ। সৃষ্টি এবং ধ্বংস এই দুই বিপরীত প্রান্তসীমার মধ্য দি প্রবাহিত যে জীবনধারা তাকে মহিমামণ্ডিত করে তোলে এ নৃত্যচ্ছন্দ। কিন্তু এই গতিশীলতার পেছনে ধ্যানী-শিল্পীর রসচেতনা এমন এক আনন্দলোক উদ্‌ভাসিত হয় যা নিত্য, নিশ্চল এ অস্পর্শ্য। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা অবগাহন করে সেই রূপপ্রবা যেখান থেকে জীবনের উদ্ভব। "অরূপ রতন আশা করেই" শি নিমজ্জিত হন "রূপসাগরে" ; এবং যে অতীন্দ্রিয় জগতে গিয়ে তি উত্তীর্ণ হন সেখানে সকল চাঞ্চল্যের, সকল গতির অবসান—সেখা 'বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।'

এই উপলব্ধি এত গভীর, এত মহান্‌ এবং এত ব্যাপক যে শিল্পী যখন সাঁচির স্তূপে বুদ্ধের নানা জন্মের কাহিনীসমূহ প্রকটিত করতে চান তখনও পর্য্যন্ত তিনি যে 'ধর্ম্ম' থেকে প্রের আহরণ করেন তা যা কিছু পার্থিব তাকে প্রত্যাহার করে নির্ম ভাবে। জীবনের প্রতি এই উদাত্ত বন্দনা-গান উদ্‌গীত হয় তখন যখন শিল্পীর সৃষ্ট মানুষ এবং পশুর প্রতিকৃতিসমূহ এক ব্যাপকত গতির দ্যোতনা করে।

গতিকে ফুটিয়ে তুলবার এই এষণার শিল্পসৃষ্টিতে সংযোজিত হয় ...প্রত্যাশিত খুঁটিনাটি, কিন্তু এই গতিময়তাকে পরিব্যাপ্ত করে ...কে এক আধ্যাত্মিক নিশ্চলতা। এই গতির আনন্দই খাজুরাহো ...কে শ্রীরঙ্গম এবং কাঞ্চীপুরম পর্য্যন্ত মধ্যযুগের মন্দিরগুলিতে নমনীয় নারীমূর্ত্তিসমূহের মাধ্যমে পুষ্পপুঞ্জের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। ...শিল্পী কখনও ভোলেন নি নৃত্যের ছন্দের কথা। কেননা নৃত্য অবশ্য

নারীমূর্ত্তি (খাজুরাহো)

...স্তব ভাবে প্রকৃতির কোনকিছুর অনুকরণ করে না, কিন্তু নৃত্যই ...বিশ্বের মূলগত সত্য—সৃষ্টিমূলক প্রেরণার ছন্দোময় প্রবাহ ...প্রকাশের একমাত্র উপায় বলে প্রতীয়মান হয় এই নৃত্য। এ ...ছে স্রষ্টা এবং সংহারকর্ত্তা শিবের বিশ্বনৃত্য অথবা নবসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত ...ওয়ার পূর্ব্বে সমুদ্রতরঙ্গের উপর বিষ্ণুর নৃত্যলীলা। এমনকি ...তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্মে পর্য্যন্ত নৃত্যরত মূর্ত্তিসৃষ্টির রীতি আছে।

দেহের এই ছন্দোময় গতিভঙ্গী এবং রূপসৃষ্টিমূলক কৃত্যসমূহের ...সম্পর্কের কথা ব্যক্ত হয়েছে চিত্রসূত্র গ্রন্থে। তাতে চিত্রকর এবং ...ভাস্করদিগকে নৃত্যকলা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঔপপত্তিক (Theoretical) জ্ঞান অর্জ্জন করবার জন্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ...তে তাঁরা সৃষ্টিমূলক প্রবাহের একটি বিশেষ মুহূর্ত্তকে ধরে রাখতে ...এবং রূপায়িত করতে সক্ষম হবেন। এই সমস্ত ছন্দের মাধ্যমেই ...তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন পরিপূর্ণ ভাবে স্থিতিশীল একটি ভঙ্গীকে ...য়, কিন্তু তরল গতিময়তার মধ্যে একটি যতির মুহূর্ত্তকে।

কিন্তু ধ্যানী বুদ্ধ অথবা মহাবীর ছাড়া হয়ত বৈদেশিক প্রভাবের ...কেন আরও কিছু কিছু স্থিতিশীল মূর্ত্তি ভারতীয় শিল্পীর হাতে সৃষ্ট হয়েছে। এই যে নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তি—শিল্প-শাস্ত্রে এগুলির নাম সমপদস্থানক। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, এই সমস্ত অনড় (stiff) মূর্ত্তি সাধারণতঃ শিল্পীদের অন্তরে সাড়া জাগাতে সক্ষম হ'ত না। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রূপ দিতে গিয়ে তারা ফিরে তাকাত উদ্ভিদ-জগতের দিকে। এই ধরনের প্রাচীনতম মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়, দিদারগঞ্জের যক্ষিণীমূর্ত্তি—যার সৌন্দর্য্য মুখ্যতঃ নির্ভর করে রেখা-সমূহের কোমলতা ও সর্ব্বোপরি অসামান্য ধীশক্তির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল মুখশ্রীর উপরে।

শত সহস্র বৎসর ধরে এই ধারারই অনুবর্ত্তন করে এসেছে ভারতীয় শিল্প। পূর্ব্ববর্ণিত ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত এই শিল্প বৈদেশিক প্রভাব সত্ত্বেও স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নি। ভারতীয় শিল্প বিভিন্ন শৈলী এবং পদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে বটে, কিন্তু ছিন্ন হয়ে যায় নি কখনও এর অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র।

নটরাজ (মাদ্রাজ মিউজিয়ম)

সুমেরীয় শিল্প, আকিমেনিয়ান পারস্য, আলেকজাণ্ডারের হেলেনিজম, পার্থিয়ানের ইরাণীয় প্রভাব, অথবা সাসানীয় আধিপত্য, এমনকি উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকো-রোমান-বৌদ্ধ পদ্ধতির উদ্ভব অথবা তথাকথিত দ্রাবিড়ীয়-আলেকজেন্দ্রিয়ান পদ্ধতির সমন্বয়—যা পরিলক্ষিত হয় দাক্ষিণাত্যের স্মারক স্তম্ভসমূহে—এই সকল কিছুই স্থানীয় শিল্প-'ধর্ম্মের' পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরসাধন করতে সক্ষম হয় নি। এমনকি পরবর্ত্তীকালে ইসলামের যে প্রাথমিক প্রভাব

ভারতে এসে প্রবেশ করে এবং যার দ্বারা অতি উচুদরের শিল্পধারার উদ্ভব হয় তাও পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের চিরন্তন প্রাণধর্ম্মকে পরিবর্ত্তিত করতে পারে নি। এই নবাগত ইসলামিক শিল্প কিন্তু খাঁটি ভারতীয় শিল্পকর্ম্মসমূহকে কোনও দিক দিয়েই বর্জ্জন করে নি।

চোখে কাজল-লেপন-রত নর্ত্তকী (খাজুরাহো)

ভারতীয় শিল্পের যুগযুগান্তরের ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই তা আত্মসাৎ করে আসছে নূতন রূপ এবং নূতন আঙ্গিককে। ভিন্ন দেশের শিল্পরীতি এ দেশের মাটিতে এসে হয়ে গেছে রূপান্তরিত, কিন্তু এদেশের শিল্পকে স্বধর্ম্মচ্যুত করতে পারে নি। এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করলে মনে হয়, ভারতীয় শিল্প উদ্ভুত হয়েছে ভারতের যে মাটি থেকে তার সঙ্গে তার একেবারে নাড়ীর যোগ। সেই গোপন রহস্যলোক থেকেই হয় এর নব নব রূপের অভিব্যক্তি—মানুষের ইচ্ছা সক্ষম হয় না এর পরিবর্ত্তনসাধনে।

নূতন শিল্পপদ্ধতির আবেদনে সাড়া দেবার এই যে শক্তি, ভারতীয় শিল্পের এই যে অন্তর্নিহিত ঐক্য এর মূলে নিশ্চিতই রয়েছে আংশিক ভাবে ঐতিহ্যের দ্বারা এবং যে আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে এই শিল্পের উদ্ভব তার অমোঘ শক্তি। কিন্তু সর্ব্বোপরি এই শিল্পকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়েছে ভারতের সমগ্র জনগণের অধ্যাত্ম মনোভাব। এ হচ্ছে ভারতের সাধনার সারবস্তু—প্রাচীনকালের শিল্পী যাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন সর্ব্বপ্রযত্নে।

এখন আমরা শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। একটি প্রাচীনতম এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হচ্ছে তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে মৌর্য্যশিল্পের সমৃদ্ধির সময়ে রচিত "ধম্মসামগনি" নামক গ্রন্থ। মহান বৌদ্ধ শিল্পের উদ্ভবের মূলে রয়েছে যে ভারহুত ও সাচি পদ্ধতি

সমৃণাল পদ্ম হস্তে নারী (অজন্তা গুহা)

তারও প্রারম্ভ কালের সমসাময়িক গ্রন্থ এখানি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ অথশালিনী নামে ধম্মসামগণির একখানি মূল্যবান টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁর ভাষ্য স্পষ্টতর এবং পূর্ণতর।

মানুষের মনকে বুদ্ধঘোষ অভিহিত করেছেন "চিত্ত" বলে। এই চিত্তের ক্রিয়াপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মনের অবচেতন লোকে আকাঙ্ক্ষাগুলি থাকে লুকিয়ে, কিন্তু সচেতন অবস্থায়—সুতরাং কর্ম্মে রূপান্তরিত হতে তৈরী থাকে। এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে বুদ্ধঘোষ বলেন, শিল্প-কর্ম্ম হচ্ছে শিল্পীর মনের ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন এবং তা যদিও কতকটা বিষয়াশ্রিত (objective), তথাপি সর্ব্বোপরি শিল্প কিন্তু রূপ-পরিগ্রহ করে একটা আধ্যাত্মিক ভাবনা থেকে। কাজেই শিল্পী যাকে রূপ দেয় সেটা আসলে তার ভাবকল্পনার রূপময় বিকাশমাত্র।

অনেক বাহু সমন্বিত শিবমূর্ত্তি, ভুবনেশ্বর

এখানে আমরা পাচ্ছি শিল্প সম্বন্ধে এক চাঙ্গের ভাবনা যা সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ রে অন্তরতম সত্তার বোধির (intution) পর এবং এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত ওয়া খুবই সহজ যে, সেই আভ্যন্তরীণ পচ্ছবিকে (inner image) লাভ করবার গে বুদ্ধঘোষ যে সকল উপায় অবলম্বনীয় বলে মনে করেন, তীন্দ্রিয়ের ধ্যান—যা যোগের অঙ্গীভূত—সেগুলির অন্তর্ভুক্ত।

একটি হিন্দুশাস্ত্রেও এই একই সমস্যা আলোচিত হয়েছে। সেটি ষ্টে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত শুক্রনীতি-র। শুক্রাচার্য্য বলেন, রূপচ্ছবিকে প্রকাশ করতে হবে, যখন ল্পীর অন্তর-সত্তা তাকে পরিপূর্ণরূপে ধারণা করতে সক্ষম হয়, কেবল খনই তাকে বাস্তব রূপদান করা সম্ভবপর হয়ে উঠে।

শিল্পরত্ন এবং পঞ্চরত্ন নামে অপর দুখানি শিল্পশাস্ত্রেও শিল্প-ষ্টির প্রসঙ্গে বোধি, ধ্যান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। াতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, অন্তরের ভাবকল্পনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প দিতে গেলে প্রচুর আঙ্গিক কৌশল আয়ত্ত করাও প্রয়োজন। ই প্রসঙ্গে একথা বলা আবশ্যক যে, শাস্ত্রগুলির উৎপত্তি হয়েছিল ারিগর এবং সাধারণ শিল্পীদের ত্রুটিসমূহ যতদূর সম্ভব শুধরে দেবার দ্দেশ্যে।

এ বিষয়ে অবশ্য বাস্তবিকই সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় শিল্পীরা ে-কোন বাঁধাধরা নিয়মের অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তারা জানতেন, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল রূপের প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে যায় শাস্ত্রবিধিকে। শঙ্করাচার্য্য যখন কঠোর পরিশ্রম সহকারে জন করে মেপে জুখে সৌন্দর্য্য-রহস্য বুঝাবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন খন সহসা যেন তাঁর দিব্যদর্শন হ'ল—তিনি দেখেন যে, সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত। মন রূপ পরিগ্রহ করেছেন তিনি যা সকল নিয়মকে পরাহত রে দেয়। দার্শনিকের তখন হ'ল সত্যানুভূতি, তিনি বললেন,
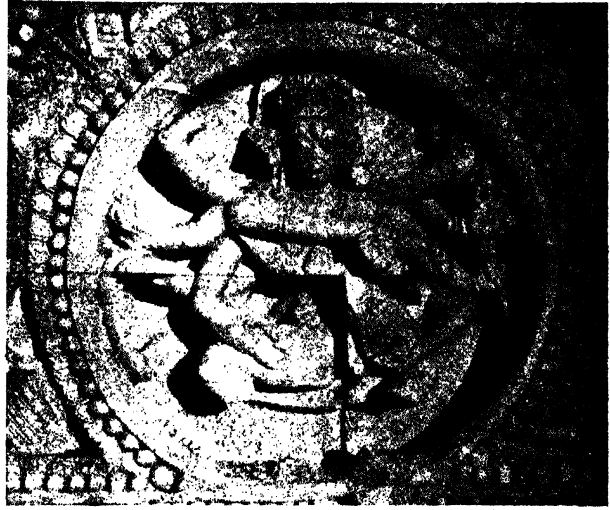
"দেবি, এই সকল বিধি তৈরী হয় নি তোমার জন্যে। আমার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণসমূহ তোলা রইল কেবলমাত্র ধর্ম্মীয় উপাসনার নিমিত্ত নির্দিষ্ট প্রতিমূর্ত্তিসমূহের বেলায় ব্যবহারের জন্য। অয়ি সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অনন্ত রূপে তুমি নিজেকে প্রকাশিত করে থাকো এবং কোন শাস্ত্রেই তার বর্ণনা করতে সক্ষম নয়।

এই শেষের কথাগুলি চিরন্তন সত্য এবং ভারতীয় শিল্পকে বুঝবার পক্ষে এগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, শিল্পী এবং দার্শনিক উভয়েই কোন কোন বিধির কৃত্রিম প্রকৃতির (character) কথা বুঝতে এবং সেজন্যে তাকে ভাঙতেও পারতেন। দৈবী প্রতিভার অধিকারী ভারতীয় শিল্পীরা তাঁদের উপর আরোপিত সকল বিধি-নিষেধ অতিক্রম করে এমন সব অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি করেছেন যা সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়স্বরূপ হয়ে আছে।

পূর্ব্বোক্তগুলি ছাড়া আর একটি শিল্পপদ্ধতি আছে যার আদর্শ ব্যাখ্যাতা হচ্ছেন শ্রীশঙ্কুল। তাঁর মতে, শিল্পের কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুকরণ করা। যদিও এই অনুকরণের ফলে যা সৃষ্ট হবে তা একটি ভিন্ন পর্য্যায়ের। এর তাৎপর্য্য এই যে, শিল্পকর্ম্ম যদিও অনুকরণের ফল তথাপি এ হচ্ছে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র কিছু এবং এর নিজস্ব একটি 'ধর্ম্ম' আছে। এর বিপরীত মন্তব্য করেছেন অভিনবগুপ্ত (৯৫০-১০২০ খ্রীঃ) যাঁর মতবাদের ভিত্তি এই যে, ব্যক্তিগত ভাবাবেগের (emotion) প্রকাশ অনুকরণ নয় এবং তার অনুকৃতিও সম্ভবপর নয়। শ্রীশঙ্কুলের মতবাদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ধ্যানলব্ধ বোধির উপর এর প্রতিষ্ঠা নয়, বরং শিল্পকে

সেখানে বিচার করবার চেষ্টা করা হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের দিক দিয়ে।

এই সমস্ত মতবাদ অনুধাবন করলে ভারতীয় শিল্পে কতকগুলি জীবজন্তু, মানুষ এবং দেবমূর্ত্তির মধ্যে যে অনন্যসাধারণ প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হয়েছে তার মূলসূত্রটি কি তা বুঝতে পারা যায়। প্রতীকতার (Symbolism) কোন আভাস এগুলিতে প্রায় পরিলক্ষিত হয় না বললেই চলে। প্রকৃতির প্রতি এই যে মনোভাব তা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও। মধুমক্ষিকার তাড়নায় উদ্বেজিতা শকুন্তলার আলেখ্য-রচনার বর্ণনা করেছেন কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলায়। মধুমক্ষিকা

আকাশপথে (অজন্তা গুহার ছাদের ভিতরের দিকের চিত্র)

তাতে এমন কৌশলে চিত্রিত হয়েছিল যে, চিত্র-দর্শনকারীরা এটিকে জীবন্ত মনে করে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। এখানে আমরা দেখছি সৃজনধর্মী শিল্পের সেই পুরাতন বিষয়বস্তু যা বাস্তবের সঙ্গে হয়ে যায় একাত্ম। মেঘদূত কাব্যে বিরহী যক্ষ তার প্রণয়িনীর নিকটে মেঘকে দূত হিসেবে পাঠিয়ে নিজের অন্তর্গূঢ় বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছে যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রণয়িনীর অবয়বের সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে সে তার অন্তরের আকুতিকে পরিতৃপ্ত করবার চেষ্টা করে। সঞ্চারিণী লতা, হরিণীর চক্ষু ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিষের সঙ্গে তুলনা করে যক্ষ তার প্রেয়সীর সৌন্দর্য্যকে স্থান দিয়েছে প্রকৃতির উর্দ্ধে।

কাজেই এখানে আমরা এমন একটি মনোভাবের পরিচয় পাচ্ছি যা ধ্যানলব্ধ রূপসৃষ্টি এবং প্রতীকতার সম্পূর্ণ বিপরীত ; এবং ভারতে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির মূলে রয়েছে আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ সম্বন্ধে এই কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী।

এখন আমাদের সামনে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে উপস্থিত এই শি[illegible] দুটি বিপরীত অথচ সহাবস্থানকারী ধারার মধ্যে দোলায়মান। এক দিকে একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্যের সঙ্কেতময় অভিব্যক্তি, অন্যদিকে অন[illegible] বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি এবং জীবনের গভীর অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণি[illegible] রূপসৃষ্টি। কাজেই ভারতীয় শিল্পের অধিষ্ঠানক্ষেত্র স্বর্গ এবং মর্ত্য

শিশুক্রোড়ে নারী (মথুরা)

উভয়ত্রই ; এবং ভারতের শিল্পীর প্রতিভা সকল সময়েই এমন এ[illegible] রচনাশৈলীর উদ্ভাবন করে যা যেমন প্রাণবন্ত তেমনি পরিচ্ছন্ন এই রচনাশৈলীর মাধ্যমে শিল্পীর এমন আবেগাপ্লুত কল্পনা অভি[illegible] ব্যক্ত হয় যা একদিকে যেমন আপনাকে হারিয়ে ফেলতে চায় অন[illegible] আকাশের অসীমতার মধ্যে, অন্যদিকে তেমনি কান পেতে শো[illegible] ধরণীর ছন্দোময় হৃৎস্পন্দন এবং ব্যাখ্যা করে তার সৌন্দর্য্যে চিরন্তন লীলামাধুর্য্যের।*

* রোমের "East and West" পত্রিকায় প্রকাশিত Mar[illegible] Bussagli'র প্রবন্ধকে ভিত্তি করে লিখিত

ইতিহাসের বিচারে শ্রীরাধা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বাংলাদেশের ধর্মাচরণে বৈষ্ণব ভাবধারা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই বৈষ্ণব ভাবধারায় লীলাবাদ এক অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। তন্মধ্যে আবার লীলাবাদের প্রাণকেন্দ্র রাধাবাদ জাতিগত ভাবে বাঙালীর এক তপোলব্ধ রত্নরূপে আখ্যা পেতে পারে। বাঙালীর ধর্ম, বাঙালীর সাহিত্য, বাঙালীর কাব্য এই রসরূপিণী শ্রীরাধাকে অবলম্বন করে নিত্য নূতন ভঙ্গিমার পথে কোন্ বিস্মৃত অতীত যুগের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমধারায় পরিপুষ্টি লাভ করে চলেছে। এমনকি বলা যেতে পারে বাঙালী এই ভাবময়ী শ্রীরাধাকে পেয়ে নূতন রসভূমির আবিষ্কার দ্বারা এক বিস্ময়কর জীবনবেদ রচনা করেছে।

সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য সময়েও বাংলাদেশের দরদী কবিদের কাব্যে প্রেমমূলক গীতিমাত্রেই ব্রজগোপী বা রাধাভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়। সেনরাজার সভাকবি জয়দেব ঠাকুরের শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ নামক অমৃতগীতি গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেমাবলম্বনেই চিরমধুর হয়ে আছে। জয়দেবের সমসাময়িক শ্রীধরদাসের কবিতা সংকলন গ্রন্থ সদুক্তি-কর্ণামৃতে প্রেম কবিতায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ই মূল অবলম্বন। তৎপরবর্তী বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের প্রেমগীতি বৃহদ্‌বঙ্গের কবি বিদ্যাপতির প্রেমগীতি রাধাকৃষ্ণেরই প্রেমগীতি প্রকাশ করে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এ ছাড়া তৎপরবর্তী বৈষ্ণবীয় প্রেমগানে বা প্রেমকাহিনীতে এমনকি নিরক্ষর ভাবকবিদের অপূর্ব রচনাতেও রাধাভাবই প্রাণবন্ত রূপে পরিচিত হয়ে উঠেছে। মৈমনসিংহগীতিকা—পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলি রাধাভাবের আশ্রয়ে মধুর রসাবেদনের মৌলিকত্ব নিয়েই আদর লাভ করেছে। পূর্ববঙ্গগীতিকায় রাধার নাম মহিমা প্রকাশ করে বলা হয়েছে :

> "অষ্ট আঙুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেদা।
> নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা।"

বাঙালীর এই রাধা পক্ষপাত এমন সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এসে পড়েছে যে, বৈষ্ণবভিখারীর ভিক্ষাপ্রার্থনায়ও 'জয় রাধে' ধ্বনিটি মন্ত্রবৎ উচ্চারিত হয়ে থাকে। এমনকি অনুষ্ঠানেও রাধানামের নামাবলী উত্তরীয়। কটূক্তির রচনায় 'রাধে রাধে' নামেই তিরস্কার ঘোষিত হয়। তাই কর্তা গোবিন্দ অধিকারী তার ভাবের গরিমা সম্বল করে অপূর্ব শুকসারীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন তা যেমন ভাব-পরিবেশনে মধুর তেমনই রাধাপ্রীতির এক গভীর অভিব্যক্তি।

> "শুক বলে—আমার কৃষ্ণ মদনমোহন
> শারী বলে—আমার রাধা বামে যতক্ষণ
> নইলে পারবে কেন ?
> ... ...
> ... ...
> শুক বলে—আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান
> শারী বলে—সত্য বটে বলে রাধার নাম
> নইলে মিছে সে গান।" ইত্যাদি

একথা নিশ্চয় করে বলা যায়, মানবের সর্বস্তরে রাধাভাবের এতখানি বিস্তার বাংলা দেশ ভিন্ন ভারতের অন্যত্র কোথায়ও সম্ভব হয় নি।

এইখানেই এসে পড়েছে একটা সন্দেহ বা দ্বন্দ্বের বীজ। কারণ এভাবে আমরা বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে সঙ্গীতে সাহিত্যে ধর্মে যে শ্রীরাধার এ অপরূপ মূর্তিটির গভীর প্রভাব দেখতে পাচ্ছি, তার উৎপত্তি-মূল ও ঐতিহাসিকতা জানবার পক্ষে আমাদের প্রমাণ-অনুসন্ধান সূত্রটি কি? অনেকে রাধাবাদের এই নবরূপ দেখে বলে থাকেন, এটি বাংলারই সৃষ্টি—ভাবপ্রবণ বাঙালীর প্রেমমধুর মানসকল্পনার একটি মনোরম রূপায়ণ মাত্র।

সত্য বটে, বাঙালী কতকাংশে ভাবপ্রবণ জাতি, কিন্তু তাই বলে একটা ভিত্তিহীন কল্পনা এ ভাবে সম্পুষ্ট করে সজীব বিগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছে—এ ব্যাখ্যা সত্য কিনা, পক্ষান্তরে, অপ্রাকৃত রসরূপিণী ভগবদ্‌ভিন্না হ্লাদিনী শক্তি বিগ্রহবতী হয়ে এ ধরায় নেমে এসেছিলেন মানুষের মধ্যে—এই তথ্যেরও ঐতিহাসিক স্বীকৃতি সম্ভব কিনা, এ বিষয় বিশেষ ভাবেই বিচার্য্য। মানবমনের এই সন্দেহের দ্বন্দ্ব এখনও জিজ্ঞাসু চিত্তে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে; কারণ গোপীপ্রেমের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতেই রাধানামের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তা ছাড়া প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থ—বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে গোপীলীলার কথা রয়েছে অথচ রাধানামের উল্লেখ নেই। অপিচ, তখনকার ইতিহাস-গ্রন্থ মহাভারতের কোথায়ও রাধানামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এ ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে কোন লক্ষ্য স্থির না করে যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করে বলা যায়, প্রতিটি গ্রন্থে কারও নাম না

থাকাতে তা প্রমাণবিরুদ্ধ—এ যুক্তি চলে না। কারণ 'পুরাণ'-গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি একই উদ্দেশ্য বা বিষয় নিয়ে লিখিত নয়। অংশবিশেষে কোনটিতে লক্ষ্মী প্রভৃতির, কোনটিতে দুর্গার, কোনটিতে শিবের, কোনটিতে বা বিষ্ণু কিংবা কৃষ্ণের বিষয় বিন্যাসক্রমে পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছে। তাতে প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর বিষয় সন্নিবিষ্ট হলেও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য বিস্তার সঙ্গত হয় না। যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাসলীলার বর্ণনায় এক প্রধানা গোপীর বিশেষ বিবরণ রয়েছে, তেমনই আবার খিল হরিবংশে রাসলীলার কথা রয়েছে বটে, কিন্তু প্রধানা কোন গোপীর সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি, তাতে ভাগবতের কথাকে অপ্রমাণ বলা সঙ্গত হবে কি? তেমনই বহু গ্রন্থে থাকলেও অপরাপর অনেক গ্রন্থে না থাকাতে রাধানামের প্রমাণসিদ্ধতা নেই—একথাই বা কি করে যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে? কারণ রাধানামের প্রমাণ দেবীভাগবত, পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র, নির্বাণতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, সম্মোহনতন্ত্র, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ এবং অন্যান্য উপপুরাণ প্রভৃতিতেও স্পষ্ট পাওয়া যায়। এতগুলি প্রামাণিক গ্রন্থে থাকা সত্ত্বেও রাধা নাম নবাবিষ্কৃত ও অপ্রামাণিক? শ্রীমদ্দেবীভাগবত বলেছেন:

> "কেনচিৎ কারণেনৈব রাধা বৃন্দাবনে বনে।
> বৃষভানুসুতা জাতা গোলকস্থায়িনী সদা।" (৯।৫০।৪৩)

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বলেছেন:

> "চিদানন্দস্বরূপা সা চিদানন্দপ্রদায়িনী।
> সর্বলক্ষণসম্পন্না রাধানাম্নী বিনোদিনী।"
> (পদ্ম-উ-১৬২ অঃ)

নারদপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে:

> "প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী রাধারূপা চ সা মুনে।
> ন কৃত্রিমা চ সা নিত্যা সত্যরূপা যথা হরিঃ॥"
> (নাঃ ৩য় অঃ)

এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে রাধাবিষয় বিস্তৃত ভাবেই বলা হয়েছে। এ দুটি ত মহাপুরাণ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধানামের অনন্তবিভূতি বিস্তার করা হয়েছে। এ ছাড়াও হিন্দুর বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিভিন্ন তন্ত্রে, পুরাণে, সংহিতায় রাধা ঠাকুরাণীর নাম ভক্তপ্রাণের মানস-তিমিরে উজ্জ্বলবর্তিকা রূপে বিরাজমান। পরম পণ্ডিত শ্রীজীব গোস্বামী নানা গ্রন্থে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি অবলম্বনে রাধানামের বহুবিধ প্রমাণোপন্যাস করেছেন। সবচেয়ে কঠিন দ্বন্দ্ব হ'ল শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধানাম নেই কেন? এই অভিযোগটি সর্বাংশে স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ ভক্ত জন বলে থাকেন ভাগবতেও রয়েছে রাধানাম। কিন্তু সেখানে আদর্শেরই প্রাধান্য বলে নাম নিরূপণে দৃষ্টি নেই, তাই মুখ্যতঃ নাম নিয়ে কোন আগ্রহ দেখানো হয় নি। ভাগবতের রাসলীলার বর্ণনায় যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমারূপে কোন প্রধানা গোপীর উল্লেখ রয়েছে, তা ত অতি স্পষ্ট। এই প্রধানা গোপীর অন্য কোন নামও উল্লিখিত হয় নি। অথচ এই প্রধানা গোপীই একান্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণবল্লভা এবং সর্বাধিক প্রিয়কারিণী একথা অন্যান্য গোপীদের মুখে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখানে রাধারূপে নামোল্লেখের উপর ভাগবতকার জোর দেন নি এই কারণে যে, গোপীভাবই ভাগবতের লক্ষ্য, ব্যক্তিবিশেষ নয়। প্রধানা কোন গোপীতে যে গোপীভাবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছিল, সেই গোপীতত্ত্বের আদর্শই বিস্ময়কর রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। এজন্য দেখা যায়—রাধা কেন, সেই প্রধানার কোন নামই ভাগবতকার করেন নি। সুতরাং বলা যায় নামের উপর ভাগবতকারের এক্ষেত্রে ঝোঁক ছিল না। কিন্তু ভাগবতকারের নিকট এ নাম পরিচিত ছিল না বা অন্য নাম ছিল এ বলা চলে না। অন্যান্য পুরাণে, দেবীভাগবত প্রভৃতিতে এ নাম ত রয়েছে। তাই এ রসের আস্বাদ নিয়ে যাঁরা সে দিব্য রসানুভূতি লাভ করেছেন, তাঁদের অনুভূতির প্রসাদে ভাগবত থেকে সে নাম নিঃসৃত হয়েছে। বহ্নির দাহিকা শক্তির প্রমাণ অপরের বোধগম্য না হলেও যে বহ্নির সংস্পর্শে এসেছে সে জানে। সুতরাং ভক্তের অনুভব এবং অন্যান্য বিস্তর গ্রন্থের সমর্থন প্রভৃতি দ্বারা আমরা মনে করে নিতে পারি—রাধানাম আকস্মিক নয়। এজন্যই ভাগবতের—"অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ"—গোপীদের এই উক্তি থেকেই রাধানামের বীজ ভাগবতেও আবিষ্কার করেছেন সাধকগণ।

দেবীভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণে উল্লিখিত রাধানামের যে প্রমাণ রয়েছে, তাকে অর্বাচীনতার অজুহাত দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে লাভ নেই। কথা হচ্ছে তার বীজ অনুসন্ধান নিয়ে। আমরা এক্ষেত্রে বলতে চাই যে, মহাকবি কালিদাস তাঁর অমর কাব্য মেঘদূতে একটি উপমায় মেঘের রূপ বর্ণনায় বলেছেন—"বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ"—অর্থাৎ "তোমার শ্যামতনু (হে মেঘ), উজ্জ্বল কান্তিময় ময়ূরপুচ্ছশোভিত গোপবেশধারী বিষ্ণুর (কৃষ্ণের) শ্যামতনুর ন্যায় শোভমান হবে।" পুরাণ ভিন্ন বিষ্ণুর গোপবেশের কথা অন্যত্র নেই, সুতরাং কালিদাসের সময়ে গোপীপ্রেমপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের কথা একান্ত ভাবেই প্রচারিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা হাল সাতবাহন প্রাচীন কবিদের কবিতা সংকলন করে প্রাকৃত ভাষায় যে সংগ্রহ গ্রন্থ "গাহা সত্ত সাই" বা গাথা সপ্তশতী সম্পাদন

করেন, তাতে স্পষ্টতঃ রাধানামের উল্লেখ রয়েছে। শুধু উল্লেখ নয়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনা রূপেই তার পরিচয় রয়েছে ঃ

"মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহি আএঁ অবণেন্তো।
এ তাণঁ বল বীণং অন্নাণঁ বি গোরঅং হরসি ॥ (১১৮৯)

অর্থাৎ, "হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার (মুখলগ্ন) গোরজ (ধূলিকণা) অপনয়ন করে এই বল্লবীদের এবং অন্যান্য নারীদেরও গৌরব হরণ করেছ।" এই গ্রন্থটি খৃষ্টীয় প্রথম শতকের। কবিগণ নিশ্চয়ই আরো প্রাচীন কালের। তাঁর পরবর্ত্তী সপ্তম শতকে এসেও আমরা দেখছি—কবি ভট্টনারায়ণ তাঁর বেণীসংহার নাটকের নান্দী শ্লোকে যমুনাকূলে রাস সময়ে কেলিকুপিতা রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়-কথা উল্লেখ করেছেন।

"কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুলিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তী মনু গচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্ ॥
—ইত্যাদি

এই ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। আরও পরবর্ত্তীকালের কবিদের লিখিত প্রমাণ সংগ্রহ করে লাভ নেই। কারণ এই দুটি প্রমাণ থেকেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় এই রাধার জীবন-কথা গীতগোবিন্দের রচয়িতা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের জয়দেব বা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তকবিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নি। বিশেষতঃ গীতগোবিন্দের 'মেঘৈর্মেদুর-মম্বরং...' প্রভৃতি বর্ণনার বীজ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের নন্দকর্তৃক গোচারণ বর্ণনাতে স্পষ্ট রয়েছে দেখতে পাই। সুতরাং জয়দেব যে ঐ পুরাণ থেকে তা গ্রহণ করেছেন তা অস্বীকার করা যায় না। আরও একটি কথা—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অমূল্য রত্নস্বরূপ যে দুখানি গ্রন্থ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সংগ্রহ করে এনেছিলেন—তা হ'ল ব্রহ্মসংহিতা আর কৃষ্ণকর্ণামৃত। কৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থখানি গোদাবরীতীরস্থ কৃষ্ণবেম্বাবাসী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-কৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক ভক্তিগ্রন্থ। তাতে তিনি "রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষ শায়িনে" বলে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার জানিয়েছেন। ইনি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। দাক্ষিণাত্যে যে পূর্বাবধি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচিত হ'ত সেই রায় রামানন্দের উক্তিতেই তার প্রমাণ মেলে—যার সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করে শ্রীমন্ মহাপ্রভু মুগ্ধ হয়েছিলেন। পূর্বাবধি এ তত্ত্বের অনুশীলন না থাকলে সকলের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের আলোচনা কি করে সম্ভব? আর রায় রামানন্দই বা এ তত্ত্ব কোথাও পেলেন বা শিখলেন কোথায়? সুতরাং বলা যেতে পারে, এ অমিয় রাধাবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দ্বারা আবিষ্কৃত বা কল্পনার রূপদান মাত্র নয়। এ এক বাস্তব সত্যেরই স্মৃতিরূপে ভারতের সর্বত্র পূর্বাবধি ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত ছিল।

এই পুরাণাদির কথায় বা তৎসমুদয় প্রচারিত রাধাবাদের কথায় আমরা বর্তমান সময় থেকে কালিদাসের সময় পর্যন্ত, সাহিত্যাদির মাধ্যমে—অল্পবিস্তর নানা গ্রন্থের তথ্য আহরণ করে এগিয়ে যেতে পারি। কথা উঠতে পারে—তৎপূর্ববর্তী প্রমাণ নিয়ে। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে তৎপূর্ববর্তী কালের অবস্থা বা পরিবেশ কি ছিল। তৎকালের সমুদয় গ্রন্থই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে কিনা? আর সে সময়টির ব্যাপকতাই বা কত?

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মত গ্রহণ করলে বলা যায়—যুধিষ্ঠিরাদির রাজত্বকাল ছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে। তন্মধ্যে দু' হাজার বৎসরের ইতিবৃত্ত মধ্যে পুরাণাদির কথা আমরা পাচ্ছি। ঐ যুধিষ্ঠিরের সময়েই শ্রীকৃষ্ণের ভগবদ্ রূপে আবির্ভাব। তা হলে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পরবর্তী দেড় হাজার বৎসরের ইতিহাসে শ্রীরাধার প্রামাণ্য বিবরণ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বলা যেতে পারে ঐ দেড় হাজার বৎসরের গোড়ার দিকে যে বিশাল সভ্যতা বর্তমান ছিল, তৎকালে ব্যাস নামধেয় অপৌরুষেয় শক্তিশালী মহাকবি বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শ দিয়ে ইতিহাস লিখছিলেন। তন্মধ্যে প্রতিকল্পের ইতিহাসরূপে পূর্বপ্রাপ্ত প্রচলিত সারমর্ম অবলম্বন করে মহাকবি ব্যাস নূতন ভাবে পুরাণগ্রন্থ এবং তদানীন্তন ভারতের ইতিহাসরূপে মহাভারত রচনা করেন। ঐ গ্রন্থসমূহই সর্বত্র রাজন্যদের মধ্যে, সাধারণ সমাজে, বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর সম্মুখে, ধর্মসভা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হ'ত। এদের প্রভাব অতিক্রম করে সম্পূর্ণ নূতন কিছু সৃষ্টি করবার সাহস যে দীর্ঘকালের মধ্যে কেউ করে উঠতে পারেন নি, অন্ততঃ হাজার বৎসর ধরে এঁদেরই কীর্তিগাথা যে তার ফলে অব্যাহত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। পরবর্তী কালেও যা রচিত হয়েছে বা এখনও যা হচ্ছে তারও অনেক কিছু তাঁদের রচিত কথা-কাহিনী বা বর্ণনার মূলধন নিয়ে।

বস্তুতঃ চিন্তায় ও গভীরতায় বিশাল-বুদ্ধি সত্যবতীসুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষির প্রভাবের তুলনা কোথায়? তার পরবর্তী-যুগ ত বৌদ্ধযুগ। দেখা যায় যে যুগে যার প্রভাব, গ্রন্থাদিও তদনুযায়ীই লিখিত হয়ে থাকে; সুতরাং বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের মধ্যে তখনকার রচিত পুস্তকে ব্যাপকভাবে রাধা-নামের ছড়াছড়ি অস্বাভাবিক। এজন্য দেখা যায়, স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে যাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম বা ভক্তিবাদ ধূমাবৃত হয়ে আপন অস্তিত্বমাত্র রক্ষা করে চলেছিল তাদের মধ্যে

ফল্গু-প্রবাহের স্থায় রাধাবাদও অক্ষুণ্ণই ছিল। এ ভাবধারা একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের সংগ্রহগ্রন্থে কখনও পূর্বকবিদের রচনারূপে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার কাহিনী স্থান পেত না। পুরাণে রাধানাম থাকলেও মহাভারত কৌরব রাজন্যদের ইতিহাস—তাতে গোপীলীলার ক্ষেত্র রচনা করা সঙ্গত নয় বলেই মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের সম্পর্কজনিত শ্রীকৃষ্ণের যেটুকু বিবরণ প্রাসঙ্গিক, তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে দেখা যায়—প্রতিটি গ্রন্থেরই একটা নিজস্ব মুখ্য উদ্দেশ্য রয়েছে, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য বহির্ভূত কোন বিষয়ের উপর অকারণ জোর দেওয়া হয় নি। এজন্য বলা যেতে পারে—বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের মহা আবির্ভাবের কাল থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় রাধার কাহিনী নানা ভাবে প্রচারিত ও পরিচিত থাকলেও সর্বত্র সর্বগ্রন্থে সমান ভাবে তা বিকশিত করা হয় নি।

এ কথা সত্য যে, এই রাধাবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর হৃদয়-সরোবরে এসে যে ভাবে সহস্রদলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, এমনটি পূর্বে সাধারণের মধ্যে দেখা যায় নি। হয়ত কেবল বৃন্দাবনের বনে বনে, রাসলীলায় রাসমণ্ডলে শ্রীরাধারই বিভূতিরূপা, শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গময়ী গোপাঙ্গনাদের হৃদয়সরোজে সে লীলার রসমধু সঞ্চিত হয়েছিল—কিন্তু জগজ্জনের হৃদয়-মণ্ডলে রাসের লীলাস্থল নির্মাণ করে দিয়েছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ। যদিও দাক্ষিণাত্যের রায় রামানন্দ প্রভৃতির মাধ্যমে এর অঙ্কুরোদ্গম হয়ে পূর্বাবধি স্ফুটনোন্মুখ হয়েই ছিল, তথাপি প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মধুর লীলাবিলাসে যে এ রাধাতত্ত্বের সুমধুর পূর্ণরসরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই অপূর্ব রত্নোদ্ধারের অবিস্মরণীয় দান এবং অপরূপ মহিমাটি লক্ষ্য করেই পরবর্তী গবেষকগণ বলে থাকেন—রাধাবাদের স্রষ্টা হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ। প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে, রাধারূপের স্রষ্টা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ।

ঐতিহাসিক প্রমাণই যেখানে মূল্যবান্ প্রমাণ, সে ক্ষেত্রে যদি আজ 'গাথা সপ্তশতী' গ্রন্থ আবিষ্কৃত না হ'ত তবে রাধানামের বিবরণ-প্রমাণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে নেমে আসত। সুতরাং এই গ্রন্থে নেই, আর ঐ গ্রন্থে নেই এ জাতীয় কথায় স্ব-স্ব সিদ্ধান্তের অনুকূল ঐ ছিটেফোঁটা কয়েকটি দৃষ্টান্তের বলে পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা প্রভৃতির প্রমাণকে একেবারে উড়িয়ে দেবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। গভীর ভাবে অনুশীলন করলে স্বতঃই মনে হ'তে থাকে শ্রীমদ্‌ভাগবতের—"অনয়ারাধিতো নূনং" প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যামূলক অর্থ গ্রহণ করে, তাতেই রাধানামের বীজ স্বীকার করে নিয়ে তার ঐতিহাসিকতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে বলেছেন :

"কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে।"—

তাতেই মৌলিক সত্য অন্তর্নিহিত রয়েছে এবং আরও গবেষণা, আরও অনুসন্ধান, আরও নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যই কালক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

জাতীয় সম্পদে বান তৈল

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গন্ধ-বিচারে মানুষের রুচিভেদ থাকলেও গন্ধযুক্ত কোন জিনিষের প্রতি মানুষ স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। শুধুই কি মানুষ—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই। একদিকে যেমন ফুলের সভা মধুমক্ষিকার সমাগমে মুখরিত হয়, অপরদিকে তেমনি পশু বনপথে খুঁজে বার করে নেয় তার শিকার। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, গন্ধ আমাদের মগজের এমনএকটি স্থানকে আঘাত করে যার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা হৃদয়ের সম্পর্ক নেই। তার ফলে সমস্ত প্রাণীজগৎ গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এই দুনিয়ায় এমন কোন জিনিষ নেই বললেই চলে যা গন্ধহীন। সুগন্ধি বলে ফুলের প্রসিদ্ধি সবার উপরে, তার পর চন্দনকাঠ। এ ছাড়াও এমন অনেক জিনিষ আছে যা নাকে কাছে আনলেও কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফেলে তাদের গন্ধও বাইরের জগতে প্রকাশ করা যায়।

এই যে মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ এর উৎস খুঁজতে গিয়ে জানা যায়—এ জিনিষটি লুকিয়ে আছে তেলের মত একটি তরল পদার্থের আকারে গাছে-পাতায়, তৃণে-লতায়, ফুলে-ফলে এবং সব জিনিষের মধ্যে—যেমন সরষে আর তিলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তেল। সরষে ও তিলতেল আর 'গন্ধবাহী' তেল ভিন্ন জাতের। এইজন্য 'গন্ধবাহী' তেলের নাম হচ্ছে 'উদ্‌বায়ী তৈল' বা 'বান তৈল'। যেহেতু বান তেলই সমস্ত সুগন্ধ-দ্রব্যের মূল উ

[ত]দ্রব্য এর ইংরেজী নাম essential oil. ইংরেজী essence থেকে essential এই [শ]ব্দের উৎপত্তি।

প্রকৃতি আদি কাল থেকে মানুষকে গন্ধে আমোদিত করে আসছে। কিন্তু গন্ধের প্রাণস্বরূপ এই বান তেল বার [ক]রে নিয়ে মানুষ নিজের সুবিধামত কাজে লাগাতে কসুর করে নি। কিন্তু এমনিধারা গন্ধি-দ্রব্যের ব্যবহার কবে থেকে যে সুরু [হ]'ল তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। কেউ [কে]উ বলেন, মানুষ যে দিন থেকে পূজো [ক]রতে শিখেছে সেদিন থেকেই ভগবানের [কা]ছে অর্ঘ্য দানের অঙ্গ' হিসাবে কৃত্রিম [গ]ন্ধদ্রব্যের ব্যবহার সুরু হয়। আবার কারুর [কা]রুর মতে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এমন [স]ময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না যখন কৃত্রিম [গ]ন্ধদ্রব্যের ব্যবহার মানুষ জানত না।

উদ্বোধন-ভাষণ পাঠরত কৃষিমন্ত্রী ডক্টর পি. এস. দেশমুখ

এই সমস্ত কথা ছেড়ে দিয়ে এখন আমাদের বান তেলের [প্র]সঙ্গ সুরু করা যাক। বান তেল ও তৎসংক্রান্ত রাসায়নিক [দ্র]ব্যের ব্যবহার আজ মানুষের জীবনে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। [আ]পাতদৃষ্টিতে কেবল এসেন্স, আতর, সুগন্ধি চন্দন ও ধূপই [আ]মাদের কাছে ব্যবহার্য্য সুগন্ধি দ্রব্য বলে মনে হয়। কিন্তু [না]না প্রকার প্রসাধন-দ্রব্য ছাড়াও রবার, প্লাষ্টিক, সুতি, কাগজ, [কা]লি, জুতোর পালিশ, পেণ্ট, আঠা, সাবান, চিঠি লেখার কাগজ [এ]মনি আরও অনেক শিল্পে এই বান তেল কিংবা এতৎসংক্রান্ত [রা]সায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। কাঁচা চামড়া, [য]খানে পাকা করা হয়, দুর্গন্ধের জন্য তার ত্রিসীমায় ঘেঁষা মুশকিল। [কি]ন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বান তেলের ব্যবহারের ফলে পায়ের [জু]তো থেকে সুরু করে বুক-পকেটের মনিব্যাগ সবই ব্যবহার্য্য হয়ে [উ]ঠে। নাম-করা কোন কারখানায় তৈরী ঝরণা কলমের কালির [বো]তল খুললে পাওয়া যাবে একটি সুন্দর গন্ধ। কিন্তু সময় সময় [অ]খ্যাত কারখানায় তৈরী কালির বোতল খুললে বিশ্রী গন্ধে অতিষ্ঠ [হ]য়ে উঠতে হয়।

বান তেল ও তৎসংক্রান্ত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার আজ এত [ব্যা]পক যে এক কথায় বলতে পারা যায়—এমন শিল্প খুব কমই [আ]ছে যাতে বান তেলের ব্যবহার কোন-না-কোন আকারে না [কর]তে হয়। যেমন প্রয়োজনের ব্যাপকতা তেমনি দামেরও [বি]ভিন্নতা। বিভিন্ন প্রকারের বান তেলের মূল্য পাঁচ টাকা পাউণ্ড [থে]কে কুড়ি হাজার টাকা পাউণ্ড পর্য্যন্ত।

প্রয়োগ যতই অপরিহার্য্য হোক না কেন, দেশের বর্ত্তমান [শিল্প]-ব্যবস্থার দরুন আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচা মাল [বি]দেশে রপ্তানি করতে হয়। আর তা রূপান্তরিত হয়ে ফিরে এসে দেশ থেকে কয়েক গুণ বেশী টাকা বের করে নিচ্ছে। আমরা কেবল যে রপ্তানি করছি তা নয়, প্রায় সমসংখ্যক টাকার বান তেল আমদানিও করছি। নীচের মোটামুটি হিসাব থেকেই এর গুরুত্ব বোঝা যাবে:

রপ্তানি (১৯৫১-৫৫)

১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	
১,২৮৮,৭৫১	১,১৫৩,৪০৯	১,৬০২,১১৯	১,৯৩৫,৬৮০	=পাউণ্ড
২১০,৬৯,০২২	১১২,৪৭,০৫৪	১২৬,৭১,২৬৭	২৩৪,১২,৬৮১	=টাকা

আমদানি (১৯৫১-৫৪)

১,০০৯,৭৬২	৮৩১,০৩৭	১,২৩১,১১৩	=পাউণ্ড
১২৯,০৫,৮৫৫	৭৭,৩৬,৯৭০	৮৯,২০,২৩৮	=টাকা

জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির ব্যাপারে বান তেলের প্রভাব যতই থাক না কেন, কাঁচামাল ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের নাই। অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বান তেলের ব্যবসায়ে আমাদের দেশ এককালে ছিল পৃথিবীতে অগ্রণী। অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেই যে কেবল আমাদের ভবিষ্যতের পথ নির্দ্ধারণ করতে হবে তা নয়, জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্যও এ বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে সাফল্য অর্জ্জন করতে হলে বিজ্ঞানী এবং শিল্পপতিদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। সহযোগিতার পথ সুগম করার জন্য গত ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসে দেরাছুনের 'বন গবেষণা মন্দিরে' বান তেল সম্বন্ধে আলোচনার আয়োজন হয়। সরকারী, বেসরকারী, এবং আধা-সরকারী প্রায় শ' খানেক প্রতিনিধি এই আলোচনায় যোগদান করেন। দু' একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও এতে যোগ দেয়।
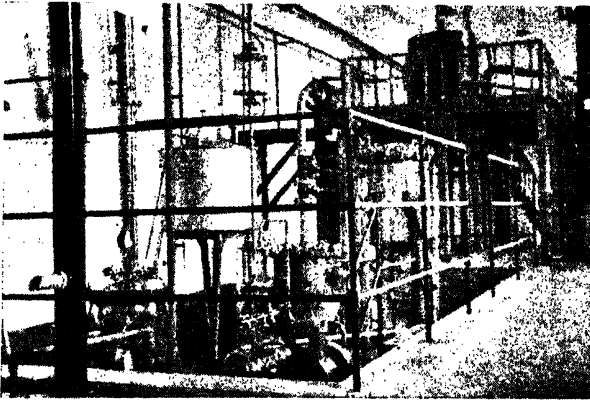
বানতৈল গবেষণাগারের একটি বিভাগের দৃশ্য

সবচেয়ে ভাল বান তেল পাওয়া যেতে পা আবার কিছু কিছু গাছ আছে যেগু আমদানি করতে হয় মালয়, ইন্দোনেশি প্রভৃতি দেশ থেকে। খুব সাধারণ গবেষণ ফলেই এটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, বিজ্ঞানস আবাদ ও চাষবিষয়ক গবেষণা চালিয়ে গেলে এই জাতীয় ভাল বান তেল উৎপাদনকা চারা (যেমন পচৌলী—Pogostemno cablin) আমাদের দেশেই উৎপন্ন করতে পারা যাবে। আবার অনেক চারা আছে যা থেকে অতি দামী বান তেল পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ঐ সমস্ত চারাগাছের চাষ একান্ত নগণ্য। গাছগাছড় বাদেও আমরা নিত্য এমন অনেক জিনি ব্যবহার করি যা থেকে ভাল বান তে পাওয়া যেতে পারে। যেমন করাতে গুঁড়ো। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই গুঁড়ো থেকে বান তেল বার করে নিলেও বর্ত্তমানে এর ব্যবহার তা সম্পূর্ণ ভাবে অক্ষুণ্ণ থেকে যেতে পারে আগে মতই। কমলালেবুর খোসা থেকে নাকি অতি উৎকৃষ্ট বান তে তৈরী হয়। অথচ ভেবে দেখুন আমরা প্রতি বৎসর কত ট কমলা লেবুর খোসা ফেলে দিই। ভারতীয় কয়েকটি বেসরকা প্রতিষ্ঠান কমলালেবুর খোসা থেকে বান তেল তৈরির কাজে ব্যাপৃ আছে। তবে তাদের অভিযোগ এই যে, এ ব্যবসা মোটে লাভজনক হচ্ছে না।

এই সভার উদ্বোধন-ভাষণে ড. পাঞ্জাবরাও দেশমুখ (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) এ বিষয়ে আমাদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, চীনা পর্য্যটক ফাহিয়ান ভারতবর্ষকে সুগন্ধি ফুল-লতা-পাতার দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে চন্দনকাঠের তেল আর চন্দনকাঠই নাকি যেত গাড়ী গাড়ী বোঝাই হয়ে মিশর, গ্রীস, রোম এবং আরও অনেক দেশে। সুগন্ধি-দ্রব্যের জন্য ভারতের নাম পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। ভারতবর্ষের যেসব স্থানে সুগন্ধি-দ্রব্য প্রস্তুত হ'ত তন্মধ্যে কনৌজ, জৌনপুর, গাজীপুর, লক্ষ্ণৌ, পুণা ছিল নাম-করা।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এই শিল্পে আমাদের অবনতি হ'ল কেন? সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ড. পাঞ্জাবরাও দেশমুখ সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে রুচিরও পরিবর্ত্তন হয় বা হতে পারে সে বিষয়ে অবহিত হতে না পারার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ উক্ত শিল্পে আমাদের এই অবনতি হয়েছে। এককালে ছিল তীব্র গন্ধের চলনই বেশী, কিন্তু বর্ত্তমানে ফুরফুরে গন্ধ না হলে আমাদের নাসিকা পরিতৃপ্ত হয় না। আমাদের শিল্পপতিরা সেকথা গ্রাহ্য না করলেও বিদেশীরা তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে আমাদিগকে পেছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

এখন এ বিষয়ে অগ্রগতির জন্য যে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। প্রথমই জানা দরকার আমাদের কি আছে আর কি নেই। যা নেই তা আমাদের দেশে তৈরি করার কোন সম্ভাবনা আছে কি না। না থাকলে কেন নেই। আমাদের দেশ বিরাট। বান তেল তৈরী হতে পারে এমন অনেক গাছ, লতা, তৃণ ভারতবর্ষের নানা জায়গায় বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে আছে। এ বিষয়ে পুরোপুরি জরিপের প্রয়োজন এবং পরে গবেষণা করে ঠিক করতে হবে কোন জাতীয় গাছ কোথায় এবং কি ভাবে জন্মালে

চাষ আবাদের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার দিকটিও সমান ভাবে উন্ন করে তুলতে হবে। অবশ্য কয়েকটি সরকারী, আধা-সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে, কি আরও ব্যাপকভাবে এর প্রসার এবং উন্নততর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন এ বিষয়ে একটি সুপরিকল্পিত নীতি নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক দেরাদুনের বন-গবেষণা-মন্দির বনজ সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বান তেলেরও অধিকাংশ আসছে লত পাতা, তৃণ আর গাছ থেকে। কিন্তু এই গবেষণা-মন্দিরে বা তেল বিভাগটি ছিল ইংরেজীতে যাকে বলে মাইনর প্রজাক্ট হিসাবে—অর্থাৎ, পেছনের সারিতে। তবে সুখের বিষয় এ যে, আলোচনার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগটি ঢেলে সা হয়েছে এবং প্রথম শ্রেণীর মর্য্যাদা লাভ করেছে।

এই গবেষণাকার্য্য যে কেবল চাষ আবাদ এবং কাঁচা মা মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে বান তেল ও সেই সংক্রান্ত রাসায়নিক পদার্থের জন্যও সমানভাবে গবেষণা চালি যেতে হবে। তা না করতে পারলে দিন দিন উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতি বিধান ত সম্ভব হবেই না, উপরন্তু অবনতির সম্ভাবনাই থাক পুরোপুরি। আর একটি বিশেষ কারণ আছে, যার জন্য এ বি

মাদের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তা হচ্ছে জনসাধারণের মনে স্থা সৃষ্টি করা। কেননা উৎপন্ন বান তেলের উপর যদি জনধারণ ও শিল্পপতিদের আস্থা না থাকে তবে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম ই বিফলে যাবে। এই আস্থাসৃষ্টির প্রথম সোপান হিসাবে য়াজন-প্রমাণ (standard) নির্ণয় করা এবং যাতে এই প্রমাণ-ত্তিক বান তেল ও তজ্জাত দ্রব্য তৈরি হয় তার জন্য যথোপযুক্ত বস্থা অবলম্বন করা। ভেজাল মেশানো এবং ব্যবসায়ে অন্যান্য নীতিমূলক আচরণ—যা অতীতে আমাদের অবনতির সহায়ক য়েছে, তা রোধ করতে হলে এ পথ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। নসাধারণ যদি বুঝতে পারে যে, সমান দামে ভাল দেশী জিনিষ নতে পাওয়া যায় তবে তারা যে বিদেশী জিনিষের দিকে ঝুঁকে ড়বে না—তার প্রমাণ দরকার হবে না বলেই মনে হয়। আধা-কারী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় প্রমাণ-মন্দিরের (I. S. I.) এ বিষয়ে নোযোগী হওয়ার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটি প্রমাণ তিমধ্যেই রচিত হয়ে গিয়েছে। তবে এ কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে ভারতীয় প্রমাণ-মন্দির এবং বান তেল গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিক র আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে তা জানালেন দেরাদুন -গবেষণা মন্দিরের রাসায়নিক বিভাগের অধিকর্তা ড. গোপাল। কেবল যে প্রমাণ তৈরির কাজ শেষ হলেই সব চেষ্টার অবসান হ'ল তা নয়, সময় অবস্থা চিন্তাধারা ও রুচির রিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণগুলিকেও পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন করে য়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে।

আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, বান তেল সম্পর্কীয় নন্দিন অগ্রগতির খবর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ননা এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা াতে না পারলে যথেষ্টসংখ্যক উপযুক্ত কর্ম্মী ও বৈজ্ঞানিককে এ-কে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে না। দেরাদুন বন-গবেষণা-মন্দিরে আলোচনার আয়োজন হয়েছিল গত অক্টোবর মাসে, তার সঙ্গে একটি প্রথম শ্রেণীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু ড. সদগোপাল দুঃখ করে বললেন, "অনেক চেষ্টা করেও ভিড়

বান তৈল সম্পর্কিত নানা বিষয় ব্যাখ্যায় রত ড. সদগোপাল

জমাতে পারলাম না।" সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও জানালেন তিনি—যখন এ পথে পা দেন তখন কি বাধা ও নিষেধের গণ্ডী পার হয়ে "উৎসাহবিহীন একলা পথে" বিচরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। বান তেলের ব্যাপারে বিদেশীদের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে কয়টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই আলোচনা-সভায় ও প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছে তাদের প্রচারপত্রের ভঙ্গি ও দৃষ্টি একদিকে যেমন রুচিসম্মত, অন্যদিকে তেমনি চিত্তাকর্ষক।

অভাব আজ আমাদের চারিদিকে। বান তেল তৈরি করতে চাই প্রথম শ্রেণীর পাতক (distillation) যন্ত্র। আমাদের দেশের অনেক গবেষণা-কেন্দ্র ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত পাতক যন্ত্রের অভাবে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারছে না। তবে অভাব পূরণ করার উদ্যম অচিরেই আমাদের মধ্যে জাগ্রত হবে বলে মনে হয়।

প্রভাতের গান

শ্রীউমা দেবী

১

আজ ভোরবেলা তুমি এসেছিলে শয়ন-সীমায়
উষায় উজ্জ্বল হলে নিশীথের দুর্ব্বল স্বপন,
মুহ্যমান অন্ধকার রাত্রিশেষে যখন ঝিমায়
নূতন আলোর সঙ্গে জেগেছিল ঘুমানো নয়ন।
জেগেছি—পেয়েছি সেই ভোরবেলা তোমার স্পর্শন
অসামান্য মমতায় হাতখানি করুণা-শীতল,
জেগেছি—পেয়েছি ভোরে অসামান্য তোমার দর্শন
সুপ্ত আনন্দের বীজ সেইখানে মেলেছে দ্বিদল।
প্রভাতের সিংহদ্বারে রাজকীয় সেই মহোৎসব
ছড়াল মেঘের বুকে রাশি রাশি আলোর আবীর,
জীবন সমুদ্র কোলে মোহমুক্ত মুক্তার বিভব
অলঙ্কৃত করে দিল কেশগুচ্ছ এ সীমন্তিনীর।
মানস-তরঙ্গ-ক্ষিপ্ত শীকরের স্পর্শনে অধীর
সুগন্ধ নিঃশ্বাস ঢেলে বয়ে গেল বসন্ত সমীর।

২

উষায় অনেক পুষ্প বেঁধেছিলে পীত উত্তরীয়ে
এখন সন্ধ্যার পথে ফুলগুলি কোথায় হারালো ?
নিশীথের মাল্য বুঝি গাঁথা হবে তারাদের নিয়ে
হৃদয়ের শৈত্যে বুঝি তাপ দেবে আলোকের আলো !
তোমার দিনের ফুল ফেলে গেলে পথের ধুলায়—
আমার রাতের স্বপ্নে তাদেরই সে সুরভি-উদ্গার
অসামান্য আবেদনে ভরে দিল গাঢ় মমতায়
অসামান্য আনন্দের শোনালো সে বাণী অনুচ্চার।
তোমার মহৎ প্রাণে যে বেদনা হয়েছে মহতী
অলৌকিক যে বিরহে পরিব্যাপ্ত ভুবন তোমার,
সে বেদনা—সে বিরহ যাত্রাপথে এনেছে প্রগতি,
উদ্বেল তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রাণতটে এনেছে জোয়ার।
কায়ার পিঞ্জরমুক্ত ছায়া হাসে বিমল দর্পণে,
শবের সৎকার কর স্মৃতিমুক্ত আনন্দ-তর্পণে।

৩

যে ঐশ্বর্য্য গুপ্ত আছে তুমি তার একক ভাণ্ডারী,
যে মাধুর্য্য সুপ্ত আছে তুমি তার একান্ত রসিক,
তোমাকে করেছি তাই এ তরীর সাহসী কাণ্ডারী
তোমাকে করেছি তাই এ দেহের হৃদয়-প্রতীক্।
পদ্মরাগ মণিদের যত দীপ্তি হারিয়ে গিয়েছে
তারা এসে তড়িন্ময় করেছে এ দেহের শোণিত,
সাগরের যত নীল মেঘেদের রাঙিয়ে দিয়েছে
তারি নীল সুষমায় গড়েছি এ হৃদয়ের ভিৎ।
এ দেহের সে ঐশ্বর্য্য এইক্ষণে তোমাকে দিলাম
এ মনের সে মাধুর্য্য একমাত্র তুমি করো পান,
নিজেকে নিজের খুশি বিনামূল্যে করেছে নিলাম
নিজের দারিদ্র্য সুখে পেয়েছে সে রাজত্বের মান।
এ দারিদ্র্যে তৃপ্ত হ'ল ঐশ্বর্য্যের দৃপ্ত অবসর,
এ মাধুর্য্যে দীপ্তি পেল নয়নাশ্রু-মুক্তার প্রসর।

৪

হৃদয়-পদ্মের মধু কবে হ'ল নয়নে মদিরা,
মদির সঙ্কেতে তার এ পরাণ আশায় অধীর,
উন্মুক্ত জীবনক্ষেত্রে বয়ে গেল স্বচ্ছন্দ সমীর—
হৃদয়-পদ্মের মধু মধুকর কর গো সঞ্চয়,
(বাসনার সোনা-গলা কমলের জ্বালাময় স্বাদ
তোমার স্ফটিকপাত্রে অমরার মন্দার সংবাদ)
আঁধারে মিশাও পাখা—এ আঁধারে নাই কোনো ভ
গভীরের স্পর্শ পেয়ে এ রজনী হয়েছে গভীরা।
স্বচ্ছ নীল পক্ষ দুটি ডুবে যাবে নীল অন্ধকারে,
গভীর অতলে যার ঝিকিমিকি তারার কণিকা,
নয়নের গাঢ় সুধা ভরে নেব ক্ষীণ দেহাধারে
এ দেহ-আধার হবে আঁধারের কমল-মণিকা।
হৃদয়-পদ্মের মধু মধুকর কর গো সঞ্চয়,
গভীরের স্পর্শ পেয়ে এ জীবন হয়েছে নির্ভয়।

পথের ক্ষণিক

শ্রীঅরবিন্দ পালিত

মার্চ-শেষের পড়ন্ত বেলায় সেন্টপলস গীর্জ্জার পাশে হাল্কা সবুজ ঘাসগুলোর উপর এলোমেলো বাতাস লুটোপুটি খেয়ে যায়। পশ্চিম দিগন্তে সারি সারি গাছপালা আর জাহাজের মাস্তুলের ফাঁক দিয়ে বিদায়ী সূর্য্য আকাশের নীল ওড়নায় এক পিচকারী সোনালী রং দিয়ে হাসতে হাসতে ডুব মারে। আকস্মিক কৌতুকাঘাতে আকাশটা কিশোরী মেয়ের মত লজ্জায় লাল হয়ে উঠে। বিস্তৃত ময়দানের এখানে-ওখানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। নরম ঘাসের গালিচায় শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে সুধন্য। শ্যামল তনুদেহটি ঘিরে অমিতার আসমানী সাড়িটাও যেন ডুব মারে এই কোমল আলো-আঁধারিতে। আবছা অন্ধকারের পর্দ্দা ভেদ করে অমিতার আবেগ-কোমল কণ্ঠস্বর শোনা যায়—

"তুমি কিন্তু বেশী দেরি করে বাড়ী ফিরতে পাবে না।"

"কেন?" হাল্কা ভাবে প্রশ্ন করে সুধন্য।

"বা রে!" একটু অভিমানের ছোঁয়া লাগে কণ্ঠে, "আমি যে সারা দুপুর একলা কাটাব, তার বেলা! না, তুমি সোজা আপিস থেকে বাড়ী ফিরবে। তার পর মুখ হাত পা ধুয়ে বারান্দার ধারে ইজি চেয়ারটায় বসবে। আমি চা জলখাবার নিয়ে আসব। দু'জনে মিলে চা খাওয়া যাবে। তার পর দু'জনে বেড়াতে যাব। আমি কিন্তু গলির মোড়ে যে লোকটা বেলফুলের মালা বেচে, তার কাছ থেকে রোজ একটা করে মালা কিনব, খোঁপায় দেব। তখন কিন্তু তুমি বকতে পাবে না, বাজে খরচ করছি বলে। তা আগে থাকতেই বলে রাখছি।

"তার পর?" মৃদু হেসে সুধন্য বলে।

"তার পর"—একটু হেসে অমিতা বলে যায়, "বেড়িয়ে ফিরে কিন্তু আর একটুও সময় নষ্ট করা নয়। দু' কোণের দুই টেবিলে দু'জনে পড়তে বসব। উল্টো মুখে, যাতে পড়ার সময়ে কেউ কাউকে দেখতে না পাই। সাড়ে দশটার পর আমি উঠে ষ্টোভটা ধরিয়ে খাবারগুলো গরম করতে যাব। তুমি আর একটু পড়তে পার। কি চুপ করে আছ যে? আমার প্ল্যানটা বুঝি পছন্দ হচ্ছে না?"

নারী-হৃদয়ের নীড় বাঁধবার সেই চিরন্তন স্বপ্ন। বাংলা দেশের নগণ্য পল্লীর যে-কোন মেয়ের সঙ্গে যে স্বপ্ন একই ভাবে দেখে মহানগরীর কেমিষ্ট্রি অনার্স-পড়া মেয়ে অমিতা চৌধুরী।

সুধন্য ভাবে। বেড়িয়ে ফেরার পথে অমিতাকে রোজ ওদের হোষ্টেলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে অমিতার কথাগুলো ভাবে সুধন্য। সেই অমিতা! এই ত সেদিন—সেদিন পর্য্যন্ত অমিতার সঙ্গে কথায়-বার্ত্তায় সম্ভ্রমভরা দূরত্ব বজায় রেখে সে চলেছে। আর আজ! আজ থেকে কত আর দূরে সেই দিনটা যেদিন ওকে অমিতা আবিষ্কার করল। হ্যাঁ, অমিতারই আবিষ্কার। সে ত ভুলেই গিয়েছিল।...

বি-এসসি পাস করেছিল সুধন্য বেশ ভাল ভাবে, অনার্স নিয়ে। তার পর সায়ান্স কলেজের দিকে আর না গিয়ে সোজা খবরের কাগজের দ্বিতীয় পাতায় ডুব দিল। প্রথম প্রথম নিজের কোয়ালিফিকেশানগুলো লিখে দরখাস্ত ছাড়তে ভালই লাগত তার। দফাওয়ারি ভাবে সাজানো গুণের ফিরিস্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে একটু আত্মগৌরবই বোধ হ'ত। কিন্তু দাদার পয়সায় কেনা ডাকটিকিট লাগাতে লাগাতে কিছুদিন পরেই এল কুণ্ঠা আর বিরক্তি; ক্রমে ক্রমে—ক্রোধ, ক্ষোভ। মাঝে মাঝে এক-আধটা ইণ্টারভিউ অবশ্য মানসিক ক্ষোভে বারিসিঞ্চন করত। কিন্তু তাই নিয়েই বা কতদিন থাকা যায়। যদিও বাড়ীতে কেউ গঞ্জনা দেয় নি, তবুও দাদা একা কি ভাবে সংসারটা চালাচ্ছে, তা ত দেখতেই পাচ্ছিল। চোখের সামনে তার চেয়ে অনেক ভাল এবং অনেক খারাপ রেজাল্ট করা বন্ধুবান্ধবেরা একে একে চাকরি পেয়ে গেল মামা, কাকা, দাদাদের সুপারিশের জোরে। শেষ পর্য্যন্ত হতাশায় দিনগুলো তখন প্রায় বর্ণহীন হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে একদিন ইণ্টারভিউ দিয়ে ফিরছিল এক সরকারী ল্যাবরেটরী থেকে। ইণ্টারভিউ'র রেজাল্ট সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ বা দুশ্চিন্তা ছিল না। জানত, ও চাকরি তার হবে না। ল্যাবরেটরী-এসিষ্টাণ্ট পোষ্টের জন্য ইণ্টারভিউ'র জন্যে ডেকে পাঠিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছে, ইউ. কে. কি? সেখানকার এগ্রিকালচার-মিনিষ্টার কে? দিয়েন-বিয়েন-ফু: প্রব্লেম কি? কোন বাঙালী ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরাচ্ছে? এই সব। গত কয়েক মাস ও খবরের কাগজই পড়ত না, বিরক্তিতে। তাই উত্তর দিয়েছে সব এলোমেলো।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ট্রাম থেকে নেমে, বাড়ী না গিয়ে সোজা হেদুয়ায় এসে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। খেয়ালই করল না, ভাদ্র মাসের খটখটে রোদ বেঞ্চিগুলোকে আগুন করে রেখেছে; মনেই হ'ল না, আজকেই ভাঙা ট্রাউজার আর সার্টটার ক্রিজগুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে; প্যাণ্টের পকেট থেকে খামেমোড়া সার্টিফিকেটগুলো নীচে ঘাসের উপর পড়েই রইল। সুধন্য চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। এখান থেকে কলেজটা পরিষ্কার দেখা যায়। দীর্ঘদিনের আভিজাত্য-ভরা ঐ স্তব্ধগম্ভীর অট্টালিকা। দোতলায় ঐ ত অনার্স ল্যাবরেটরী। এখনও হয়ত ডক্টর ব্যানার্জ্জির সেই হুঙ্কার ছেলেদের তেমনি ভাবেই সচকিত করে তোলে; অতি সাবধানীরা টেবিলের উপর থেকে ভিজে ফিলটার-পেপার নীচের বাস্কেটে ফেলে দেয়। ঠিক তেমনি ভাবেই হয়ত সুধন্যর মত আর একদল ছেলে বেকার-জীবনে প্রমোশন পাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। হাতে-ধরা টেষ্ট-টিউবের তলায় সারি সারি গ্যাস-বার্ণারগুলো জ্বলছে; আর জ্বলছে তাদের চোখে ভবিষ্যতের আশার আলো। হাসি পেল সুধন্যর।

"এ কি ! আপনি এখানে ?"

সুধন্য চমকে তাকাল। অনতিদূরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে তার কলেজ ফাইল। কমলা রঙের ধনেখালি সাড়িটা শ্যামল দেহটিকে জড়িয়ে উঠে, উপর থেকে নেমে আসা দুই বিনুনীকে বুকের উপর আলতোভাবে ছুঁয়ে রয়েছে। তার ভাসা ভাসা কালো চোখ দুটোর কোল জুড়ে হর্ষ আর বিস্ময়। সুধন্য ধড়মড় করে উঠে বসল।

"উঃ ! এই রোদে আপনি এখানে শুয়ে আছেন। আচ্ছা লোক ত। আসুন, ঐ ছায়ার দিকটায়।"

সুধন্য উঠল।

"আপনার কি যেন একটা পড়ে গেছে বোধ হয়।"

সুধন্য ফিরে তাকিয়ে অবহেলাভরে খামটা কুড়িয়ে নিয়ে চলল মেয়েটির পিছু পিছু. ভাদ্রের কাঠফাটা রোদ থেকে সরে গিয়ে অল্প একটু স্নিগ্ধ সবুজ পরিবেশে। চলার ছন্দে অল্প অল্প কাঁপছিল মেয়েটির কমলা-রঙের আঁচল। আর সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুধন্যর মনে দ্রুত ভেসে আসছিল অতীতের কয়েকটা ছবি—সিনেমায় ফ্লাশ-ব্যাকে বলা কাহিনীর মত।...

বুরেটের মেনিশকাশ লক্ষ্য করতে করতে ডক্টর ব্যানার্জ্জির চীৎকার শুনে মুখ তুলে তাকিয়েছিল সুধন্য। ডক্টর ব্যানার্জ্জি ধমকাচ্ছেন মেয়েটিকে। যাতায়াতের পথে মাঝে মাঝে মেয়েটিকে দেখেছে সুধন্য। গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করত। ল্যাবরেটরীতে সহপাঠিনীদের সঙ্গে আজেবাজে কথা কইতে দেখে নি কখনও। সেকেণ্ড ইয়ার সায়ান্সের ছাত্রী যে এত মন দিয়ে প্র্যাকটিকাল ক্লাস করে তা সুধন্য এই প্রথম দেখল। তাই তাকে বকুনি খেতে দেখে সে একটু অবাক হ'ল। যা হোক, একটু পরেই কিন্তু মেয়েটি তার কাছে এল, সল্ট এনালিসিস চার্টের কয়েকটা জায়গা বুঝে নিতে। বললে, আজকেই সল্টটা না বার করলে নয়—দু'দিন ধরে চেষ্টা করছে; কিন্তু একটা জায়গায় কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

অবশ্য অল্প একটু বুঝিয়ে দিতেই মেয়েটি, 'বুঝতে পেরেছি', বলে চলে গেল। তার পরও কয়েকবার এসেছে সুধন্যর কাছে, এটা ওটা বুঝে নিতে, কখনও ল্যাবরেটরীতে কখনও বা লাইব্রেরীতে। সবচেয়ে মজা হ'ল, ওদের টেষ্টের আগে। ও কিছুতেই ফিজিক্স পরীক্ষা দেবে না ; বিরাট কোর্স, বিশেষ কিছুই তৈরী হয় নি। সুধন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক বোঝাল ওকে, ভরসা দিল, শেষ পর্য্যন্ত গোটাকতক কোশ্চেন সাজেষ্ট করে, সেগুলো বুঝিয়ে এক রকম জোর করেই ওকে পরীক্ষা দিতে পাঠাল। আর সেই প্রথম দিন অমিতার অনুপস্থিতিতে, ওর কথা একটু ভাবল। উদ্বিগ্ন হয়ে বেলা চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তার পর কোশ্চেন পেপার নিয়ে অমিতা যখন হাসিমুখে বেরিয়ে এসে জানাল, পরীক্ষা ভাল দিয়েছে ; তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাড়ী ফিরতে উদ্যত হ'ল। অমিতা অবশ্য ওকে ওদের বাড়ী যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল ; সুধন্য একটু মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিয়েছিল ; তার পর ভুলে গিয়েছিল।

এর পর আর একদিন দেখা হয়েছিল। সেদিন অমিতার অনুরোধে সুধন্য ওকে ফিজিক্স আর কেমিষ্ট্রির কিছু সাজেশান দিয়েছিল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য। সেদিনও অমিতা ওকে পূর্ব্ব-নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সুধন্য মৃদু হেসেছিল। কিন্তু অমিতাদের ঠিকানা নেবার কথা ওর মনেই হয় নি।

কলেজী ছাত্র-সুলভ দৃষ্টিতে রোমান্সের রঙীন-চশমা লাগানোর মনোভাব সুধন্যর কোনদিনই গড়ে উঠতে পায় নি। ম্যাট্রিকে ভাল রেজাল্ট করে সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে এল কলকাতায় দাদার বাসায়, পড়তে। এসেই দেখল, দাদার ক্ষণস্থায়ী চাকরিটির আয়ু শেষ হয়েছে। সেকথা বাড়ীতে জানায় নি। তখন কি আর করে। বিলেতে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার স্বপ্ন উপস্থিত বাক্সবন্দী করে টিউশানি সুরু করলে। দাদাও নানারকমে উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে লাগল। এমনি করে দু'ভাই মিলে বাড়ীতে টাকা পাঠাত। বছরখানেক পর দাদার আর একটা চাকরি হ'ল। তখন সুধন্য কলেজে ভর্ত্তি হয়ে আবার পড়াশুনা সুরু করল। সে আই-এসসি. পরীক্ষা দেবার পরই কিন্তু সমস্ত পরিবারটা দেশ ছেড়ে চলে এল কলকাতায়, দেশবিভাগের হাঙ্গামায়। একা দাদার পক্ষে এতবড় সংসার চালানো সম্ভব নয়। তাই পরীক্ষায় ফাষ্ট গ্রেড স্কলারশিপ পেলেও সুধন্য চাকরি নিল এক ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে, কাকার চেষ্টায়। তা ছাড়া টিউশানি ত ছিলই। এমনি করে বছর দুয়েক কাটবার পর দাদার একটা ভাল প্রমোশন হ'ল। দাদাই তখন জোর করে সুধন্যকে আবার পড়তে পাঠাল। একটু অবশ্য টানাটানি করে চালাতে হবে ; তা হোক। ফলে সুধন্য আবার এসে ভর্ত্তি হ'ল বি-এসসি ক্লাসে। ইতিমধ্যে ওর অনেক বন্ধু-বান্ধবই পড়া শেষ করে কর্ম্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পিছিয়ে পড়ায় ও চাইত জীবনের অগ্রগতিতে কয়েক বছরের ফাঁকটা তাড়াতাড়ি পূরণ করে নিতে।

তাই অমিতার সঙ্গে এই স্বল্প আলাপে ও মাথা ঘামায় নি বা হাল্কা রোমান্সের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দেয় নি। অমিতার কথা ও ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ বিগত দিনের ওপার থেকে অমিতা যেন ভেসে এল, সঙ্গে নিয়ে এল ছাত্রজীবনের সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর মধুর স্মৃতি।...

একটা গাছের তলায় ছায়া দেখে ওরা বসল। অমিতাই প্রথম কথা বলল, "চিনতে পারছেন ত। দেখে যেন মনে হচ্ছে ভুলেই গেছেন।"

"না, মনেই আছে। বরং বেশী করে মনে আনার চেষ্টা করছি।" মৃদু হেসে সুধন্য বলে।

"প্রথমেই আপনাকে একটা ধন্যবাদ জানাই। অবশ্য সেটা আপনার পাওনা হয়েছে প্রায় দেড় বছর আগে।"

"কি ব্যাপার বলুন ত ?" কৌতূহলী হ'ল সুধন্য।

"আপনার দেওয়া সেই সাজেসশানটার প্রায় সবগুলিই এসেছিল, যার জন্য সে যাত্রা উদ্ধার হয়েছিলাম।"

"ও।" সুধন্য স্মিত হেসে চুপ করে রইল।

"এবারে কিন্তু একটা অনুযোগ আছে। আমাদের বাড়ী যাওয়ার কথাটা কিন্তু আপনি আজও রাখেন নি। মা আপনার কথা মাঝে মাঝে বলেন।"

"আমার কথা!" এবার সত্যিই অবাক হ'ল সুধন্য।

"হ্যাঁ। মাকে ত আপনার কথা অনেক বলেছি—আপনি যে আমায় কত সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে সেই সাজেসশানগুলোর কথা। মা তাই অনেকবার আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। কিন্তু সেই যে আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হ'ল, তার পর আপনার আর কোন খোঁজই পেলাম না। ডক্টর ব্যানার্জ্জিকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করেছিলাম। তা উনিও বলতে পারলেন না। মা শুনে কত রাগ করতে লাগলেন। আপনার ঠিকানাটা জেনে রাখি নি বলে কত বকুনি দিলেন।"

"তাই নাকি! আমি অবশ্য টেষ্টের পর আর এদিকে বড় একটা আসি নি। আর তা ছাড়া আপনার ঠিকানাটা নিতেও ভুলে গেছলাম।"

"হ্যাঁ! ঠিকানা জানা থাকলে যেন কত যেতেন।" অনুযোগ করল অমিতা।

"না, তা নয়। তবে কি জানেন, পরীক্ষার পর থেকে এত ব্যস্ত রয়েছি যে—"

"যে ভরদুপুরে রোদে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। এই ত!" দু'জনেই হেসে ওঠে।

"আচ্ছা, আপনি এখন কি করছেন?"

"বিশেষ কিছুই না," ম্লান হেসে বলল সুধন্য।

"ও, বুঝেছি। তাই বুঝি—" বলতে গিয়ে থেমে গেল অমিতা। তার পর ধীরে ধীরে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা বলি।"

"না, না, বলুন।"

"আচ্ছা, আপনারা কি বলুন ত", শান্ত, সংযত কণ্ঠস্বর অমিতার, "এত অল্পেই ভেঙে পড়েন কেন?"

"অল্পেই ভেঙে পড়েছি কি করে বুঝলেন?"

"মাপ করবেন। পাস করে বসে আছেন, এখনও পর্য্যন্ত কোনও চাকরি-বাকরি যোগাড় করে উঠতে পারেন নি। এই ত! এর জন্যই ত দুপুরের রোদে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকা।"

"ধরেছেন ঠিকই। তবে বেকার-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—"

"জানি, আমার নেই।" একটু উত্তেজিত হ'ল অমিতা, "কিন্তু আপনাদের ত দেখছি। আমার দাদা আজ এম-এ পাস করে বছর-খানেক বসে আছে। ঠিক আপনার মত তার অবস্থা। তাকে কিছু বলতে গেলেই বলবে, তুই এসব বুঝবি না। চুপ কর দেখি।" মানলাম, বুঝব না, কিন্তু আপনাদের দেখে দেখে কি একটু পরোক্ষ অভিজ্ঞতাও হয় নি?"

"স্বীকার করলাম আপনার কথা। কিন্তু কি করতে বলেন আপনি?"

"এতদিন ধরে লেখাপড়া শিখে যে তৈরি করলেন নিজেকে, তা কি এই এক বছর, দেড় বছরে ভেঙে পড়বার জন্যে? আপনার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, এসবের পরীক্ষা ত এখনই।" উত্তেজনায় মুখটা একটু লাল হয়ে উঠেছিল অমিতার। তা সত্ত্বেও সুধন্য হো হো করে হেসে উঠল। অমিতা একটু আহত হয়ে একদম চুপ হয়ে গেল। সুধন্য হাসতে হাসতেই বলল,—

"আপনি রাগ করবেন না। ওসব কথা আমরাও জানি, আর এগুলো যে নিছক ছেঁদো কথা তা আমাদের জীবনে প্রতি পদে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।"

অমিতা মুখ নীচু করে বসে নখ দিয়ে ঘাস ছিঁড়ছিল, মুখ খুলে ধীরে ধীরে বলল, "একটা কথার জবাব দেবেন?"

"বলুন।"

"ধরুন, আপনার এই শোচনীয় মানসিক অবস্থায় একটা ইণ্টারভিউ এল। কিন্তু আপনি নিজের উপর এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, সেটা যাতে ভাল হয় সে চেষ্টা করবেন কি করে?" সুধন্যর দিকে তাকিয়ে দেখল সে চুপ করে আছে।

"আপনার ত মনে হবে, দূর ছাই, চাকরি ত হবেই না, কি লাভ চেষ্টা করে। ফলে একটা চান্স নষ্ট করে আরও হতাশ হয়ে পড়বেন। আর ক্রমাগত এ রকম ভাবে হতাশা ত বেড়েই যাবে।" শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সুধন্য কয়েক মিনিট মাথা নীচু করে বসে রইল। তার পর মুখ তুলে অভিভূতের মত বলে উঠল, "তুমি—তুমি ত ঠিক বলেছ।" বলেই চমকে উঠল। তার পর সামলে নিয়ে বলাবার চেষ্টা করল, "মানে, আপনি ইয়ে।"

অমিতা হেসে ফেলে বলল, "আচ্ছা হয়েছে। যা স্বাভাবিক তাই বলেছেন। তা হলে আমার কথা স্বীকার করে নিলেন?"

সুধন্য একটু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বলল, "স্বীকার করা মানে? তা হলে শোন" বলে আজকের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করে গেল। সব শুনে অমিতা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, "ছি, ছি, কি করলেন বলুন ত। হয় ত এই চাকরিটাতেই কোন সুপারিশের বালাই ছিল না। ভাল করে ইণ্টারভিউ দিলে হয়ত হতে পারত।" তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, "যাক গে। এবার থেকে আর কিন্তু অমন করবেন না। আমি বলছি, কাজ আপনার হবেই।"

"ভরসা দিচ্ছ তা হলে।"

এবারে অমিতা লজ্জা পেল। কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমাদের বাড়ী কবে যাচ্ছেন বলুন ত?"

"কবে যাব বল।"

"তা হলে পরশু চলুন। ঐ দিন শনিবার আমিও বাড়ী যাব।"

"শনিবার তুমি বাড়ী যাবে মানে ?"

"আমি ত এখানে হোষ্টেলে থাকি। বাড়ী আমাদের শ্রীরামপুরে।

অমিতার বাবা কলকাতার এক মার্চেন্ট আপিসের মাঝারি রকমের চাকুরে। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। অমিতা মেজ। ছোট মেয়েটি স্কুলে পড়ে। দুই ছেলে। সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার, ষ্টেশন থেকে একটু দূরে শহরের ধার ঘেঁষে ছোট একতলা বাড়ী। সন্ধ্যা-বেলায় সুধন্য ছাদে বসেছিল। বাড়ীটার একপাশে একসারি কলাগাছ, এ ছাড়া আম, জাম, নারকেল গাছে ঘেরা চার ধারটা। অনেক দূরে রেললাইনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালটার পাশ দিয়ে সূর্য্য ডুবে গেছে। চারদিকে একটা আবছা আলো-আঁধারি ঘনিয়ে আসছে। এমন সময়ে অমিতা এল চায়ের পেয়ালা নিয়ে। পেয়ালাটা সুধন্যর হাতে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "একলা বসে বসে কি দেখছেন ?"

"সূর্য্য ডোবার পরের এই সুন্দর সময়টুকু দেখতে দেখতে গ্রামের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। গ্রাম ছেড়ে চলে আসার অনেক দিন পর আজ আবার এই সময়টাকে একটু উপভোগ করলাম।"

দু'জনেই একটু চুপচাপ বসে রইল। তারপর অমিতাই মৃদু স্বরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

"কেমন লাগল ?"

"কি ?"

ঘাড়টা অল্প একটু হেলিয়ে সুধন্যর দিকে একবার তাকিয়ে অমিতা বলল, "এই ধরুন, আমাদের সকলকে, আমাদের বাড়ী, এই জায়গাটা।"

"যদি সেন্টিমেন্টাল না বলে বস, তবে বলব, সব মিলিয়ে আজকের দিনটা আমার জমার ঘরেই পড়ল।" সুধন্য আস্তে আস্তে কথাটা বলল। অমিতা একটু সরে এসে আঙুল দিয়ে সাড়ীর আঁচলটা জড়াতে জড়াতে সুধন্যর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, "কেন ?"

"কেন ? নিজের স্বার্থের দিক দিয়ে বিচার করে বললে বলতে হয়, "আমার সব হতাশা যেন কেটে যাচ্ছে। আর তুমি পাশে আছ বলে যেন নতুন শক্তি অনুভব করছি।"

"যা—ও !" বলেই অমিতা ঘুরে আলসেয় ভর দিয়ে দাঁড়াল। সুধন্য কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করল। সুদূর পশ্চিম দিগন্তে তখনও আবছা কালোর উপর গাঢ় লালের অল্প কয়েকটা প্রলেপ লেগে আছে। সেইদিকে তাকিয়ে-থাকা অমিতাকে দেখতে দেখতে ওর মনে হ'ল, অমিতা যেন ওর জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিজে চিররহস্যময়ী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শেষ পর্য্যন্ত ল্যাবরেটরী এসিষ্ট্যান্টের চাকরীটা হ'ল সুধন্যর। মাইনে অবশ্য বেশী নয়, উপস্থিত সব মিলিয়ে শ'দেড়েকের মত। যাক, তাই ভাল; বেকার বসে থাকার চেয়ে অনেক ভাল। অমিতাও সেই কথাই বলল। সেন্ট পলস গীর্জ্জার পাশে, সবুজ ঘাসে-ঢাকা ময়দানে, বিকেলের মায়াময় আলোয় বসে দু'জনে আলোচনা করছিল। সুধন্য খুশী হয়েছিল বটে, কিন্তু খানিকটা ম্লান হয়ে পড়ছিল এই ভেবে যে, জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতি হ'ল দেড়শ' টাকায় জীবন সুরু করা। কিন্তু অমিতা উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বেশ খানিকটা দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল। "তুমি বলছ কি। তুমি কি ভাবছ জীবনের দৌড়ে, একটু পেছন থেকে আরম্ভ করলে বরাবর পেছনেই পড়ে থাকবে। এ কি ধারণা তোমার! উপস্থিত পায়ের তলায় একটু মাটি পেলে ত। দুশ্চিন্তাও আর থাকবে না। এবার না হয় ধীরেসুস্থে কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দেবার চেষ্টা কর।"

"তুমি বলেছ মন্দ নয়। অন্ততঃ এবার একটা ভেবেচিন্তে কিছু করবার সুবিধা হবে।"

দীপ্ত মুখে অমিতা বলল, "আমি বলছি, নিশ্চয় হবে। দেখলে ত, যেদিন ইণ্টারভিউ দিলে সেদিনই তোমায় বলেছিলাম।"

সুধন্য ওর হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "না, তে মার পয় আছে দেখছি। তুমি কি আমার জীবনে কল্যাণী হয়ে দেখা দিলে ?"

অমিতা সলজ্জ হাসি হেসে মুখ নামিয়ে নিল।

কিন্তু বেশী দিন নয়। সপ্তাহের ছ'টা দিন দশটা-পাঁচটা খেটে আর সন্ধ্যাবেলায় টিউশানি করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফেরা। ছুটির দিন রবিবারটা টুকিটাকি কাজ সেরে বিকেলের দিকে অমিতাকে নিয়ে ময়দানে কিংবা টালা পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কিনারায় জলের ধার ঘেঁষে বসা আর এলোমেলো বকা এবং শোনা—কত দিন আর ভাল লাগে। জীবনের আহ্বান যে আরও গভীরে বাজে—তার সুর ত এত হাল্কা জীবনে প্রতিধ্বনিত হয় না। তাই অমিতার ভাবী জীবনের পরিকল্পনায় ত্রুটি দেখা যায়, আলোচনায় ছেদ পড়ে।

সুধন্য বলে, "শুনতে ভালই লাগল। কিন্তু ভেবে দেখ। এ-দিকে বলছ বটে, নিজেদের ছোট্ট সংসার, নিজেরাই চালিয়ে নেব, লোকজনের দরকার নেই। কিন্তু জিনিষটা কি দাঁড়ায় দেখছ। সারাদিন খেটে বাড়ী ফিরে তোমাকে তাড়া দিয়ে চা-টা খেয়ে পড়াতে যাব। রাত্রে ফিরে, আর যাই হোক, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাবার কথা মনেও আসবে না। তোমার খোঁপায় বেলফুলের গোড়ে মালা বা রজনীগন্ধা শুকোতেই থাকবে; তা বোধ হয় দেখবারও অবকাশ হবে না। তখন চারটি খেয়ে শুতে পারলে হয়। সকালে উঠে দোকান-বাজার করে এসে খবরের কাগজটা নিয়ে হয়ত বসলাম, তুমি বললে, সরষের তেল আর হলুদের কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছি। বিনা তেল-হলুদে তরকারী খাওয়া যায় কিনা ভাবতে ভাবতে আমি দৌড়লাম। ফিরে এসে ত আর সময় নেই। তার পর তুমি এক জগতে, আমি আর এক জগতে।"

অমিতা চুপ করে থাকে। এমনি করে ওদের কোন কোন মিলন-গোধূলির কাব্যিক পরিবেশে সাংসারিক গন্ডের সংঘাত হয়। ওরা আরও সচেতন হয়ে ওঠে। অমিতা চায় বাস্তব সমাধানই খুঁজতে। একটা ঘাসের ডগা দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভাবতে থাকে।

"কিন্তু আমিও ত বসে থাকব না। লেখাপড়া যখন শিখেছি, তখন আমিও রোজগার করব। আর তা ছাড়া আমরা আলাদা না থেকে তোমাদের বাড়ীর সকলের সঙ্গেও ত থাকতে পারি। তাতে খরচটাও অনেক কম হবে।"

"খুব ভাল কথা। মানলাম, তুমিও রোজগার করবে। কিন্তু একটা বড় পরিবারের খরচের তুলনায় আমাদের আয় কতটুকু। সেই একই অভাব অনটনের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। বরং কয়েকবছর বাদে পোষ্যবৃদ্ধি হলে অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। কি লাভ এতে। উন্নতিই যদি কিছু না হ'ল, সমাজে চিরটা কাল সেই একই ভাবে যদি কাটাতে হ'ল, তবে কেন এই কষ্ট করে লেখাপড়া শেখা। আর কেনই বা উচ্চাশা পোষণ করা।"

"আচ্ছা, দেখই না আর কিছু দিন। এর চেয়ে ভাল চাকরিও ত পেতে পার। না হয়, ততদিন অপেক্ষাই করব। তাড়াতাড়ির কি আছে। জীবনে দুঃখের পর সুখ ত আসেই।"

আবার অমিতার স্বর ভারী হয়ে আসে। আবার কল্পনায় রঙীন পরিবেশ গড়ে ওঠে।...

সেদিন দুপুরে আপিস থেকে বাড়ী ফিরে সুধন্য দেখল, অমিতা ওর জন্য অপেক্ষা করছে। পরের দিন রবিবার, অমিতার ছোট ভাইয়ের জন্মদিন। ওর মা অনেক করে বলে দিয়েছেন সুধন্যকে যেতে। সুধন্য মৃদু হেসে সম্মতি জানিয়ে জামাটা খুলতে লাগল।

"এই চিঠিটা বোধ হয় তোমার।"

টেবিল থেকে একখানা খাম তুলে নিয়ে অমিতা সুধন্যর হাতে দিল। খামটাকে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে সুধন্য সেটাকে খুলে ফেলল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একখানা পোষ্টকার্ড সাইজ ফটোগ্রাফ। সেটা দেখতে দেখতে সুধন্যর ভ্রূদুটো কুঁচকে গেল। তার পর আস্তে আস্তে ছবিখানা খামের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল।

"কার ছবি দেখি না।"

কৌতূহলী অমিতা সুধন্যর হাত থেকে খামটা নিয়ে ছবিটা বার করল। একটি তরুণী, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল আদুরে আদুরে মুখটা, চোখদুটো গভীর কালো—সব মিশিয়ে বেশ স্নিগ্ধ মুখশ্রী। অমিতা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। একটু পরে হেসে উঠে বলল, "ও, বুঝেছি।"

সুধন্য জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। সেই দিকে তাকিয়েই গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, "না বোঝ নি।"

অমিতা এবার খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "খুব বুঝেছি। আগেকার রাজকুমার যৌবনে পা দিলে, ভাটের মুখে শুনতেন রাজকুমারীর রূপবর্ণনা; এখনকার রাজকুমার চাকরিতে প্রবেশ করে, ফটোগ্রাফের মারফত করেন এ যুগের রাজকন্যার রূপদর্শন। তার পর পছন্দ হলে করেন পাণিগ্রহণ। কেমন, এই ত?"

"অমিতা, দোহাই তোমার। চুপ কর।" সুধন্যর ক্ষুব্ধ স্বরে অমিতা চমকে উঠে দেখল, সুধন্য সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।...

কিছুক্ষণ পর দু'জনেই রাস্তায় বেরিয়ে এল। উভয়েই গম্ভীর।

"কোন দিকে যাবে?" সুধন্য জিজ্ঞেস করল। অমিতা কোন উত্তর দিল না। হাঁটতেই লাগল।

"আজ আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। চল, সোজা একটু বেড়িয়ে আসি।"

অমিতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"অমিতা"—

অমিতা সুধন্যর দিকে তাকাল।

"তুমি কি রাগ করেছ।"

"না, রাগ করব কেন?" বিষণ্ণ হাসি হেসে অমিতা বলল।

"আমি তখন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। তাই ঠিক করে কিছু বলতে পারি নি। এখন বলছি, শোন।"

"নাই বা বললে। যদি কিছু অপ্রিয় বা অন্যকিছু হয়, তবে থাক না"—শান্ত কণ্ঠস্বর অমিতার।

"না, শোন।" সুধন্য বেশ দৃঢ়ভাবেই বলল, "ছোটবেলা থেকেই আমার সখ, বিলেতে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে আসব, তা তোমায় বলেছি। আমার মনোবাসনা চাপা ছিল না। মা-মাসীর মুখে অনেকের কানেই তা পৌঁছেছিল। ছোটবেলায় এ নিয়ে অনেকে আমাকে ঠাট্টা-তামাশা করেছে। সীতা, মানে ঐ মেয়েটির বাবা মণিবাবু ছিলেন আমাদের গ্রামের একজন নামকরা বড়লোক। সীতা তাঁর একমাত্র মেয়ে। ওঁরা বেশীর ভাগ শহরেই থাকতেন। মাঝে মাঝে গ্রামে এলে আমাদের খোঁজখবর নিতেন। কেন জানি না, ছেলেবেলা থেকেই তিনি আমার সম্পর্কে একটু 'ইন্টারেষ্টেড' ছিলেন। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁরও কানে গিয়েছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর আর পাঁচ জনের মত তিনিও শুনেছিলেন, আমি পরীক্ষায় খুব ভাল করব। সেই সময়ে তিনি প্রস্তাব করে পাঠান, যে, তিনি আমাকে বিলেতে পাঠাতে প্রস্তুত আছেন, যদি আমি তাঁর মেয়েটিকে গ্রহণ করি। অবশ্য সে প্রস্তাব আমাদের বাড়ীতে তেমন আমল পায় নি। আমাদের অবস্থাও তখন ভাল ছিল। তার পর ত জানই, কলকাতায় আসার পর থেকে, কি গণ্ডগোল হয়ে গেল। কে কোথায় ছিটকে পড়ল। অনেক দিন পর উনি আবার খোঁজখবর করে মায়ের কাছে পুরনো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তারই নিদর্শন ঐ ছবিটা।"

"তুমি সীতাকে এর আগে দেখ নি?" অমিতা ধীরে ধীরে বলল।

"ছোটবেলায় দু'একবার দেখেছি।" সুধন্য এবার একটু হাল্কা ভাবেই বলল।

"তা এ ত খুব ভাল প্রস্তাব। বিয়েটা কি বিলেত যাবার

আগে হবে, না বিলেত থেকে ঘুরে এসে হবে?" অমিতা কপট গাম্ভীর্য্যে জিজ্ঞেস করে।

সুধন্য সেই ভাবেই জবাব দেয়, "না ভাবছি সামনের মাসেই একটা ভাল দিন দেখে বিয়েটা হয়ে যাক। তার পর সীতাকে নিয়ে পরের মেলেই জাহাজে উঠব।"

এবারে দু'জনেই হেসে উঠল, একটু পরে অমিতা বলল,

"আচ্ছা, তখন ও রকম চটে উঠলে কেন?"

"চটে উঠলাম? কখন?"

"তখন, বাড়ীতে বসে।"

সুধন্য একটু চুপ করে থেকে বলল, "কি জান, সেটা ঠিক রাগ নয়। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে, বেকার-জীবনের হতাশায় মাঝে মাঝে ভাবতাম, সীতার বাবার প্রস্তাব গ্রহণ করলে আজ হয়ত পথে পথে ঘুরতে হ'ত না। ফ্যারাডে হাউসে ইলেকৃটি ক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং-এর ক্লাসে পাঠ নিতাম। তাই অনেক দিন বাদে হঠাৎ যখন ঐ ছবিটা এল তখন কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম।"

"ও!"

"চল, এবার ফেরা যাক।"

"চল," অমিতার গলাটা কি রকম ধরা-ধরা। সুধন্য ওর দিকে তাকাতেই ও হঠাৎ সুধন্যর হাতটা জড়িয়ে ধরে ভারী গলায় বললে, "আচ্ছা, তোমার খুব বিলেত যেতে ইচ্ছে করে, না।"

সুধন্য ওর হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে, "ছি অমিতা।"

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় দু'জনে অমিতাদের বাড়ীর ছাদে বসে-ছিল। একথা সেকথার মাঝে হঠাৎ অমিতা প্রশ্ন করে বসল, "কালকের চিঠিটা সম্পর্কে কি ঠিক করলে?"

"তার মানে?" সুধন্য অবাক হয়ে বলল, "তার আবার ঠিক করাকরির কি আছে।"

অমিতা অনুনয় করে বলতে লাগল, "দেখ, সীতার বাবার সাহায্যে তোমার বিলেত যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মাঝখানে আমি এসে পড়েছি বলেই কি তোমার জীবনের এত বড় স্বপ্ন ভেঙে যাবে! তোমার জীবনে কল্যাণী হয়ে দেখা দেবার এই কি পরিণতি!"

সুধন্য চঞ্চল হয়ে জবাব দিল, "অমিতা, তুমি ভুল করছ। তুমি আসবার আগে সীতার বাবার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতাম কিনা, সে কথা এখন বলা যায় না। কারণ সে পরিবেশ আজ আর নেই। হয়ত নিতাম না; ভাবতাম, পরের সাহায্যে বড় না হয়ে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী যতটুকু পারি করব। কিংবা হয়ত ভাবতাম, এসব সেন্টিমেন্টালিটি এ যুগে অচল। পরের মেয়েকে যখন একান্ত আপনার করে নিতে পারব, তার বাপ-মা-আত্মীয়দের যখন স্বজন করে নিতে পারব, তখন তার বাবার টাকাকেই বা পরের টাকা মনে করব কেন? কিন্তু আজ আর ত এ সব প্রশ্নই উঠে না।"

"কেন উঠে না? বাধাটা কোথায়?"

"বাধা কোথায়?" অধীর হয়ে সুধন্য জবাব দিল, "বাধা তুমি! তোমাকে পাশে নিয়েই আমি আমার জীবনকে একটু একটু করে বিকশিত করে তুলব। সেখানে আর কারও স্থান নেই।"

"কিন্তু আমি তোমার জীবনের উন্নতির বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াব!" আহত অমিতা জবাব দিল, "তার চেয়ে আমার সরে যাওয়াই ভাল।" বলতে বলতে অমিতার গলা ধরে এল।

"তুমি ভুল বুঝ না, অমিতা।" সুধন্য আর্ত্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, মোহ আছে, কামনা-বাসনা আছে, স্বীকার করি; কিন্তু আমি মানুষ বলেই ত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছি, জয়ী হবার চেষ্টা করছি। জীবনে একদিন যার হাতে রাখী বাঁধলাম, নিজের স্বার্থের খাতিরে সে বাঁধন নিজেই কাটব—তুমি কি চাও এতটা ছোট আমি হই।"

বলেই পকেট থেকে সীতার ছবিটা বার করে বলল, "এই ছবিটা তোমার আমার সম্পর্কের মাঝে এত বড় বাধা হয়ে দেখা দেবে, ভাবি নি।" বলেই ছবিটা কুচিকুচি করে ছিড়ে ফেলে দিল। অমিতা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সুধন্যও সে নীরবতা ভঙ্গ করল না। অনেকক্ষণ পর কালো আকাশ যখন তারায় ভরে গেছে, তখন সুধন্য উঠে দাঁড়াল। তারপর, 'আজ চলি' বলে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, অবশ্য "তুমি যদি নিজে থেকে কোন দিন সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাও, আমি তাতে বাধা দেব না।" বলেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ওর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে অভিমান-স্ফুরিতা অমিতার কালো আঁখির প্রান্তে ঘনিয়ে এল সজল ছায়া। আর তার সাক্ষী হয়ে রইল তারায় ভরা কালো আকাশ।

এর পর সপ্তাহ-দেড়েক আর অমিতার সঙ্গে সুধন্যর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।

অমিতার টেষ্ট পরীক্ষা হচ্ছিল। পরীক্ষার পর আবার দু'জনের দেখা হ'ল, টালা-পার্কের সেই কোণ ঘেঁষে জলের ধারে দু'জনে বসে। আজকে দু'জনের কথাবার্ত্তাই একটু কম। কথার মাঝে একটা ছেদ পড়েছিল। দু'জনেই জলের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। একটু পরে অমিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "আচ্ছা, আমি যদি কোন দিন সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাই, আমাকে মনে রাখবে?"

সুধন্য খুব শান্ত ভাবে জবাব দিল, "মনে রাখবার মালিক ত আমি নই। স্মৃতি আর বিস্মৃতি আমাদের অগোচরেই তাদের কাজ করে চলে।"

অমিতা বলল, "জানত, কবি কি বলেছেন,···

তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে গভীর কণ্ঠে সুধন্য বলল, "জীবনের কাব্য সব সময়ে জীবনায়ন হয়ে উঠে না, অমিতা।"

"কিন্তু কোন কোন সময়ে ত হয়ে উঠে। তখন?"

"যদি কোনদিন তেমন সময় আসে, জবাব দেব। যাক, তুমি বাড়ী যাচ্ছ কবে?"

"পরশু যাচ্ছি।"

"আর দু'মাস পরেই ত পরীক্ষা। ভাল করে পড়, এখন আর

সময়ে অসময়ে গিয়ে বিরক্ত করব না। মাঝে মাঝে দেখা করব। কেমন!"

অমিতা ওর মুখের দিকে তাকালে, মিষ্টি হাসি হেসে অল্প একটু ঘাড়টা নেড়ে বলল, "আচ্ছা।"

কিন্তু ছবিটা সুধন্য ছিঁড়ে ফেলে দিলেও প্রস্তাবটা কিন্তু বাড়ী থেকে নাকচ করে দেওয়া হয় নি। অবশ্য সুধন্যকে এখনও খোলাখুলি কেউ কিছু বলে নি। তবে সুধন্যর আপত্তির আঁচ পেয়েছিল। মাসখানেক ধরে সীতার বাবা মণিবাবু আনাগোনা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুধন্যর মা ওর কাছে খোলাখুলি কথাটা পাড়লেন। সুধন্য আপত্তি করতে পারে ভেবে মণিবাবু জানিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে টাকা নিতে সুধন্যর আপত্তি থাকলে, তিনি টাকাটা ধার হিসেবে দিতে পারেন। সুধন্য না হয় পরে শোধ করে দেবে। তিনি পাসপোর্ট, কলেজে সীট পাওয়া ইত্যাদির বন্দোবস্ত এক রকম করেই রেখেছেন। বিয়ে ফিরে এসেই হবে। এখন সুধন্য কথা দিলেই হয়। অবশ্য সুধন্যর যদি অন্য কিছু আপত্তি থাকে, তা হলে তিনি আর বিরক্ত করবেন না।

না, এবার খোলাখুলি সব বলতেই হয় দেখছি—আপিস যাবার আগে সুধন্য ভাবল। অনেক দিন আগে যখন তার মনের পটে কোন রঙীন ছায়াপাতই হয় নি, তখন সীতাকে তার স্ত্রীরূপে কল্পনা করতে কোন বাধাই ছিল না, বরং কেমন একটা অনাস্বাদিত পুলকই অনুভব করত, কিন্তু আজ আর তা হয় না। যাক, কাল রবিবার অমিতাদের বাড়ী যাওয়া যাবে। প্রায় মাসদেড়েক হ'ল ওদের বাড়ী যাওয়া হয় নি। ওর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার। তারপর পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়াই ভাল।

আপিস থেকে ফিরে টেবিলের উপর কলম, পাস ইত্যাদি রাখতে গিয়ে চোখে পড়ল তার নামে একখানা চিঠি। হলদে রঙের খাম, এক কোণে লেখা, 'শুভবিবাহ'। কার বিয়ে! খামটা খুলে চিঠিখানা পড়ল ধীরে ধীরে। কে লিখছে? কার বিয়ে! বুঝতে পারল না ও। আবার পড়তে গিয়ে দেখল, এক জায়গায় লেখা—সহিত শ্রীমতী অমিতার শুভপরিণয়—।" হোঁচট খেল যেন। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল চিঠিটার দিকে। অমিতা! অমিতার বিয়ে! ভুল দেখছে না ত? না, তলায় এই ত অমিতার হাতের লেখা। চিঠিটার কোণায় গোটা গোটা অক্ষরে কয়েকটা কথা লেখা ছিল। সুধন্য পড়ল,

"তোমার কথা বুঝেছি। আমার কথা বোঝবার চেষ্টা করো। জীবনায়ন হতেই চেয়েছিলাম; জীবনের বোঝা নয়। যাচ্ছি।"

এখনও

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

এখনো চাঁদের আলোকে মাধুরী ঝরে,
তারার হাসিতে অপূর্ব্ব বিস্ময়।
রাঙা রামধনু জাগে নীল অম্বরে—
নিখিল-কণ্ঠে উঠে জীবনের জয়।

সূর্যের লিপি ছড়ায় দিগ্বিদিকে,
শেফালির বনে মৌমাছি উড়ে যায়।
প্রতিদিনকার পরিচিত পৃথিবীকে
সহসা নেহারি নবতর সজ্জায়।

এখনো বকুল-বিতানে কোকিল ডাকে
উন্মনা করে সুরের ইন্দ্রজাল।
শিলাই পেরিয়ে পাকুড়তলীর বাঁকে
শুনি আগ্রহে রাখালিয়া ভাটিয়াল।

এখনও নয়নে দীপ্তি সমুজ্জ্বল,
অন্তরে সদা-সঞ্চিত ভালবাসা।
দুর্ব্বার ঝড়ে বক্ষ বিন্ধ্যাচল,
সবার ঊর্দ্ধে জাগে দুরন্ত আশা।

হে মেঘ-কন্যা, এখনো তোমার তরে,
প্রজাপতি নাচে, ফুল ফুটে থরে থরে।

সাহিত্য-সভা ও একটি বিনিদ্র রজনী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সমস্তিপুরে চলেছি।

জায়গাটা মিথিলা-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। আকার-অবয়বে গ্রাম-তুল্য হয়েও শহরের পোশাকটা গায়ে চাপিয়েছে ভাল করে। পীচ-বাঁধানো পাকা রাস্তা, বিজলী-বাতি, স্কুল-কলেজ, ব্যাঙ্ক-আদালত, মোটর-সিনেমা কিছুরই অভাব নাই। আরও একটা বড় অভাব মোচন করেছেন প্রবাসী বাঙালীরা—সাহিত্য-পরিষদ স্থাপনা করে। এই পরিষদের বাৎসরিক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে আমরা চলেছি মিথিলায়।

মিথিলার নাম স্মরণ হতেই কবি বিদ্যাপতি এসে দাঁড়ালেন সামনে।

'কৈশোর যৌবন দুহু মিলি গেলা।'

দূর অতীতের এমনই এক সন্ধিক্ষণে মিথিলার সঙ্গে বাংলার মিলন ঘটেছিল। তখনকার বিদগ্ধ-সভা পরস্পরকে না পেলে গৌরবান্বিত হ'ত না। মিথিলার উপাধি আহরণ করে বাংলার সুধী হতেন পণ্ডিত শিরোমণি। শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে লীলারস আস্বাদন ও বিতরণ করেন—তার মূলে ছিল বিদ্যাপতি-রচিত শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-গীতি-কাব্য। রামায়ণ-কারও আমাদের কম যুক্ত করেন নি মিথিলার সঙ্গে। রাজর্ষি জনক ত পৃথিবীতে অতুলন। আর জনক-দুহিতা সীতা?

বহিঃপ্রকৃতিতেও বাংলা মিথিলা প্রায় অভেদ। হাওড়া থেকে সমস্তিপুরের দূরত্ব কতটুকুই বা। তিন শত মাইলের কিছু বেশী; কিন্তু এক নদী এক শত ক্রোশের ধাক্কা। এ পারে মোকামা ঘাট, ওপারে সিমারিয়া ঘাট, মাঝখানে গঙ্গা। প্রশস্ত গঙ্গা, এক পারে দাঁড়ালে অন্য পারকে মসীলেখার মত বোধ হয়। মাঝখানে বালির চর—ইন্দ্রলুপ্তির মত তার বিভীষিকাটাও কম নয়। এই গঙ্গা পারাপারের জন্য ষ্টীমার রয়েছে। এখন গ্রীষ্মকাল বলে—রেল ষ্টেশন থেকে ষ্টীমারঘাট সরে গেছে দু'মাইল দূরে। ঘাট ষ্টেশন থেকে বেশ কিছুটা পায়ে হেঁটে সটল ট্রেনে উঠতে হয়। সেটা দশ মিনিট কাল ধুকতে ধুকতে যেখানে নামিয়ে দেয়, সেখান থেকে ষ্টীমার আরও পোয়াটাক পথ। তারপর ষ্টীমার আরোহণ। যাত্রীর ভিড়ে ঠেলা খেয়ে খেয়ে এগিয়ে যাওয়া শুধু। বিপদের ঝুঁকি খানিকটা নিতে হয় বৈ কি। মানুষের চাপে জখম না হলেও মানুষের মাথায় চাপানো বাক্স তোরঙ্গ সুটকেসের ধাক্কায় বেসামাল হওয়া আশ্চর্য্যের নয়। তার আগে সটল ট্রেনের সব-একাকার-করা কামরায় মালে মানুষে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে যথেষ্ট। ফলে 'দেহে নাহি অন্তরলেখা' এমন গৌরব করবেন কে!

যা হোক ষ্টীমারে এসে হাত পা ছড়িয়ে বাঁচা গেল। চারিদিকে খোলা-মেলা আকাশ, বীচি-বিক্ষুব্ধ অগাধ জল—দু'পারে ছবির মত মাঠ, বসতি—এত যে দুর্ভোগ এক মুহূর্ত্তে কোথায় হারিয়ে গেল। উত্তর-দক্ষিণ দুই বিহারকে যুক্ত করার জন্য মাইলখানেক দূরে হাতীদায় চলছে ময়দানবের অহোরাত্রব্যাপী কর্ম্মযজ্ঞ। নদীর দু' পাশে রুদ্রজায়ার রোষবহ্নির চিহ্ন, কিন্তু হাতীদার দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল—কত দিন আর চপলাঙ্গী গঙ্গা মানুষকে ভূমিক্ষয়ের ভ্রূকুটি দেখাবেন? হাতীদার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মানুষ ভবিষ্যতের মনোরম ছবি আঁকছে।

এপারেও অর্থাৎ সিমারিয়া ঘাটে পৌঁছে খানিকটা হাঁটতে হয়, তারপর ট্রেন। কিন্তু এত লোক কোথায় যাচ্ছে? কোথাও কি মেলা বসেছে?

মেলাই বটে, বিয়ের লগ্ন চলছে। সারা মাস চলবে সমারোহ। গ্রামকে গ্রাম চলেছে 'বরাতে'র বায়নায়। আর সঙ্গে লটবহরের ধুমই বা কি! বোঁচকা-বুঁচকি ট্রাঙ্ক সুটকেশ হ্যাসাক আলো মাইক লাউড-স্পীকার গ্রামোফোন রেকর্ড খাবার ভর্ত্তি চাঙারি বন্দুক—কিনা সঙ্গে রয়েছে! এ সব ঠেলে ঠুলে কোন মতে ছোট লাইনের গাড়ীতে বসা গেল। এ লাইনে শ্রেণী মান্য করার রীতি নাই, যাত্রী দল ভারী দেখে রেল-কর্তৃপক্ষও অত্যন্ত উদার হয়েছেন বোধ হ'ল।

দু'ধারে রুক্ষ মাঠ, অল্প হাওয়ায় ধুলোর কুয়াশা জমছে দিগন্তে। ছোট-খাটো দু'একটা ষ্টেশন যা পড়ল তা মরুভূমিরই গোত্রজ। এরই মধ্যে বারুণি জংশনের যা একটু জাঁকজমক। চা খাবার ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সমস্তিপুর ষ্টেশনটার কিন্তু বিরাট চেহারা। ষ্টেশন দেখে যদি শহরটাকে আন্দাজ করে বসেন—অবশ্যই ভুল করবেন। নিতান্ত কালিমত একটু জায়গা—শহরের যাবতীয় উপকরণে ঠাসা। পশ্চিমের যে-কোন শহরের মত ধুলো-ভরা নোংরা পথঘাট, ধুলোর মাঝখানে খাবার সাজানো, মাছির জটলা খাদ্যবস্তুর উপর, রাস্তার মাঝখানে পাল্লা খাটিয়ে মাল ওজনের ব্যবস্থা। বালুভুজি মোমফালি আর কটকটিয়া কাঠি ভাজা নিয়ে ময়লা কাপড়-পরা ফিরিওয়ালা ঘুরছে, কারও মাথায় বা কাঁকড়ীর ঝুড়ি। সিনেমা-পোষ্টার সর্ব্বাঙ্গে সেঁটে—ঢোল পিটিয়ে চলেছে একটা মিছিল। ঠেলাগাড়ীতে হরেক-রকমের চোখ-ভোলানো পণ্য সাজিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ক্রেতা টানছে দোকানী···

শহর যাই হোক, শহরবাসীদের সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ। আমরা ত সামান্য সাহিত্য-সেবক—আমাদের পেয়ে কি আনন্দ এদের। এরা সাহিত্যকে বিলাসের বস্তু বলে গ্রহণ করেন নি—প্রাণের জিনিস বলে নিয়েছেন।

বাঙালীর একটা বড় সংখ্যাই চোখে পড়ল। স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, রেল, ইনসিওরেন্স, আদালত প্রভৃতি নানান প্রতিষ্ঠানের বাঙালী কর্ম্মীরা এক জায়গায় মিলে থাকেন মাঝে মাঝে। এই মিলন-আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয় শারদীয়ায়। সেটা সাময়িক মিলন

পর্ব্ব। আর প্রতিদিনের কর্ম্মক্লান্ত মুহূর্ত্তকে সরস করে রাখার জন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মিলন সমিতি। বাণী-সাধনার জন্ত সাহিত্য-পরিষদ। পরিষদের বয়স মাত্র আট বছর। এই অল্প বয়সে সে শুধু চলতে শেখে নি—চালাতেও শিখেছে। নিজেকে নিয়ে অপরকে সাথী করে—নিজেকে বিলিয়ে অন্তকে বুকে টেনে তার জীবন যাত্রার আয়োজন। নববর্ষে ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য-সভার সুযোগে পরস্পরের এই মিলন—স্থায়ী মিলনের ভূমিকা রচনা করছে—এর প্রমাণ সাহিত্য-সভায় পেলাম।

অপরাহ্নে মুজঃফরপুর থেকে এলেন ড. সরোজ দাস, ইনি সভাপতিত্ব করবেন। দ্বারভাঙ্গা থেকে এলেন বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এলেন স্থানীয় শিক্ষাবিদ্ কয়েকজন আর শহরের নবীন প্রবীণ সমস্ত প্রবাসী বাঙালী।

সভায় মহিলা ও শিশুর সংখ্যাও কম নয়। আজকার সভায় নাচ গানের ব্যবস্থা নাই, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার হিড়িক নাই, কোন কৌতুকাভিনয় হবে না, তবু সভাগৃহে তিলধারণের স্থান নাই।

সামনে ছেলেদের ভিড় দেখে মনে সংশয় জাগল—এরা শান্ত থাকবে তো? সভাপর্ব্বের সর্ব্বত্রই পুরোভাগে এদের আসন, এরা স্বভাবতঃই চঞ্চল। নিজ মনের আহার্য্য না পেয়ে গোলমাল এরা করেই এবং বক্তৃতার কিছুমাত্র না বুঝেও সজোরে করতালিধ্বনি দ্বারা বক্তাকে সংবর্দ্ধিত করে। এই হাততালি দেওয়ার কৌতুকেই হয়ত সভারোহণে এত উৎসাহী এরা?

এদের জন্ত কিছু আয়োজন অবশ্য ছিল। সেটি ছিল সভা-শেষে। কিছুদিন আগে আবৃত্তি ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রয়েছে। ছোট ছোট কাপ ও সাহিত্য-গুণান্বিত বই। যাঁরা প্রতিযোগিতায় স্থানলাভ করতে পারে নি তাদেরও সান্ত্বনা-পুরস্কারস্বরূপ একখানি করে শিশুগ্রন্থ দেবার ব্যবস্থাটি ভারি ভাল লাগল। নববর্ষের আনন্দ আয়োজন সকলকার খুশির ছটায় সার্থক হয়ে উঠেছে মনে হ'ল।

কিন্তু তার আগে বক্তৃতা। সেগুলির বিষয়বস্তু শিশু-চিত্তাশ্রয়ী নয়। অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা নিয়ে আলোচনা করলেন। দ্বারভাঙ্গা কলেজের অধ্যাপক গোস্বামী নববর্ষ সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোক সহযোগে কিছু বললেন, ড. সরোজ দাস নিরবধি কাল সম্বন্ধে দার্শনিক ব্যাখ্যা করলেন সংক্ষেপে, আমাদের বক্তব্যও হাসি-কৌতুকের ধার ঘেঁষল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ও তাদের মা ঠাকুরমারা অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে নিঃশব্দে এই সমস্ত গ্রহণ করল।

বাংলা সাহিত্য-সাধনার মর্ম্মকথাটি যেন নিষ্ঠার সঙ্গে অনায়াসে ব্যক্ত হ'ল। এমন শৃঙ্খলা-বোধ ইতিপূর্ব্বে কোন সভাতে লক্ষ্য করি নি।

সাতটায় আরম্ভ হয়েছিল সভা—শেষ হ'ল সাড়ে দশটায়।

বন্ধুবর বিভূতি মুখোপাধ্যায় বললেন, আহারাদি সেরে আমরা দ্বারভাঙ্গায় ফিরব। আপনারা দু'জন সঙ্গে যাবেন।

এই রাতে?

তাতে কি! পীচবাঁধানো ভাল রাস্তা—চব্বিশ মাইল মাত্র। মোটরে বড়জোর ঘণ্টা দেড়েক।

শুক্লা ত্রয়োদশীর একটি প্রসন্ন রাত। জ্যোৎস্নার জোয়ারে লঘু মেঘের টুকরা ভাসছে আকাশে। পৃথিবীতে তার প্লাবন-ধারা। দূরে—থেকে থেকে একটি কোকিল ডেকে উঠছে। এমন 'লাখ উদয় করু চন্দা' রাত্রিতে মনে হয় 'চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।' মিথিলার আকাশ-প্রান্তর ওই পরিপূর্ণ আনন্দ-সঙ্কেতে মধুময় হয়ে উঠল।

দুখানা মোটর এসেছিল দ্বারভাঙ্গা থেকে। একখানা ছিল জীপ গাড়ী—সেখানায় মেয়েরা চাপবেন। অন্তখানাতে আমাদের বাড়তি দু'জনকে নিয়ে ছ'জন। তা ঠাসাঠাসি করে গেলে কি এমন অসুবিধা! কিন্তু প্রথম অসুবিধা সৃষ্টি করল জীপখানাই।

আহারাদি শেষ হতে রাত একটা বাজল। মেয়েরা গুছিয়ে বসলেন জীপে। আমরাও বসলাম অন্ত গাড়ীতে। একটু পরে মেয়েরা নেমে এলেন। জীপের মেজাজ বিগড়েছে। এত রাতে পাড়ি দেওয়াতে ওর ঘোরতর আপত্তি দেখা গেল। বহু সাধ্য-সাধনাতেও যখন ওকে বশে আনা গেল না—তখন ঠিক হ'ল—রাত সাড়ে তিনটের ট্রেনে মেয়েরা ফিরবেন দ্বারভাঙ্গায়—আমরা অবশ্য অগ্রগামী হব।

কিন্তু হায়, এক যাত্রায় পৃথক ফলের কল্পনা বিধাতাও যে করেন নি—সে বুঝবে কে!

ভরা জ্যোৎস্নার জোয়ারে গা ভাসাল মোটর। শহর শেষ হ'ল, দু'ধারে মাঠ প্রান্তর এগিয়ে এল। এগিয়ে এল গণ্ডকী নদীর সেতু। মাথার উপর চাঁদ এগোচ্ছে তর তর করে। নিস্তব্ধ পথ—সেও যেন এগিয়ে চলেছে—কৌতুক ভরে। মাইল তিনেক এসে হঠাৎ মোটর থামাল সারথি। ওর মনেও কৌতুকের আমেজ ঘনিয়ে উঠল কি?

বলল, গাড়ী বড্ড বোঝাই হয়েছে—পিছনের চাকা মাটিতে ঠেকছে। একটা স্প্রিং খারাপ হয়েছিল আসবার সময়—সেইটেই—

অর্থাৎ সময় বুঝে সেইটির কৌতুকস্পৃহা প্রবল হয়েছে।

উপায়?

একজন নামলেই চাকার চাপটা কমবে—গাড়ী ঠিক চলবে।

কিন্তু কে সেই একজন—রাত দুপুরে জনহীন পথে যিনি পরি-ত্যক্ত হবেন?

বিভূতিবাবুর ভাই হরিবাবু নেমে পড়লেন। বললেন, কাছেই মুক্তাপুর ষ্টেশন—শেষ রাতের ট্রেনেই ফিরব।

গাড়ীর কৌতুকস্পৃহা তবু কমল না।

দশ হাত এগোতে না এগোতে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হ'ল।

ব্যাপার কি?

আরও ভার কমান দরকার।

অর্থাৎ ?

আর জন দুই নামলেই গাড়ী ঠিক যাবে।

দু'জন আরোহীর মধ্যে একজন ত নেমেছেন। আর দু'জন, কে নামবেন ? অধ্যাপক গোস্বামীর সঙ্গে একটি মেয়ে আছেন—ওঁরা দু'জন নামতে পারেন না। আমরা দু'জন অতিথি—বিদেশী—আমাদের নামার প্রশ্নই ওঠে না। বিভূতিবাবু আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আরও কিছুদূর গিয়ে যদি গাড়ির কৌতুকরঙ্গ আবার প্রবল হয়ে ওঠে—তখন নিশুতি রাতে জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্তের অবস্থাটি কল্পনা করতে পারেন কি কেউ ?

হরিবাবু ফিরে এসে বললেন, কি ব্যাপার ?

আরও দু'জন না নামলে নাকি ভার কমবে না।

জুলে ভার্ণের সেই বেলুন যাত্রার বর্ণনাটা স্মরণ হ'ল। ভার কমানোর সে কি ভয়াবহ আয়োজন !

বিভূতিবাবু বললেন, গাড়িখানা কোন রকমে সমস্তিপুরে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

স্প্রিঙের ওপর চাপ পড়ছে বহুৎ—বহু টাকা লোকসান হবে। বলে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল চালক।

অগত্যা আমরাও নামলাম।

মাথার উপরে নির্মেঘ আকাশ, মনে হ'ল নির্মমও। পাতলা মেঘের চাদর উড়িয়ে চাঁদ ছুটেছে হাল্কা চালে—সেই চাদর থেকে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে জ্যোৎস্নার বৃষ্টি। মাঠ—ঘাট—গাছপালা সব ভেসে যাচ্ছে। আমরাও ভেসে চলেছি সেই সঙ্গে। কোথায় তীর, কোথায় আশ্রয়, কি উপায় কিছুই ঠিক করা যাচ্ছে না। হাওয়াটাও ঘুরেছে উত্তরে—পাতলা জামার আস্তরণ ভেদ করে গায়ে চিমটি কাটছে তার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আঙ ল দিয়ে। অনবরত চিমটি কেটেই চলেছে সে।

কোন উপায় নাই দুস্তর পথ উত্তরণের। সারথি নিশ্চিন্ত মনে একটি চাল্লা ঘরের দাওয়ায় বসে বিড়ি ধরাল। বিড়ির আগুন নিভলে সটান শুয়ে পড়ল। যাত্রীদের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে যেমন নিশ্চিন্ত আলস্যে গা এলিয়ে দেয় গাড়োয়ান—ওর অবস্থাটাও সেই রকম।

আমরা পায়চারি করতে লাগলাম। খানিক পথে—খানিক বা প্ল্যাটফরমে। তারপর ষ্টেশন-ঘরে গিয়ে বসলাম। খটাখট—খটাখট—খবর আনাগোনার আওয়াজ বাজছে যন্ত্রে। মাঝে মাঝে চোঙটা তুলে নিয়ে ষ্টেশন মাষ্টার ট্রেনের গতিবিধি নিরূপণ করছে। একটি মালগাড়ী লাইন ক্লিয়ার নিয়ে ষ্টেশন পেরিয়ে গেল। দ্বারভাঙ্গার দিক থেকেও একখানা গাড়ী এল।

ওটা নাকি একসপ্রেস—থামবে না এখানে। ব্রাঞ্চ লাইনে একসপ্রেস। দিনের বেলায় এ লাইনে প্রত্যেকটি গাড়ী তো প্রত্যেকটি ষ্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়—রাতের বেলায় এমন শুচিবায়ুগ্রস্ত হওয়ার হেতু ? অদৃষ্ট আমাদের।

তিনটে বাজল। মাষ্টার বললেন, তিনটে চল্লিশে গাড়ী আসে, আজ কুড়ি মিনিট লেট। অর্থাৎ, পুরো চারটের রাত পুইয়ে যাত্রা।

গাড়ীতে কি ভিড় হয় ?

যথেষ্ট। এখন যে বিয়ের বাজার। ট্রেনে উঠতে পারেন ত পরম সৌভাগ্য বলে মানবেন।

পূব প্রান্তে পিঙ্গল রঙ ধরতেই ট্রেন এসে গেল। লম্বা গাড়ি, আকণ্ঠ বোঝাই। যেন বলছে, হঠো—তফাৎ যাও।

কিন্তু ওর কথা শুনলে চলবে কেন—আমাদের যে উঠতেই হবে। অনুনয় বিনয়ে কেউ এক ইঞ্চি সরল না। সরবেই বা কোথায় ? 'বরাতে'র নানান দ্রব্যে বাক্স মেঝে উপচে পড়ছে—খোলা দরজায় তেমনি উপচে পড়ছে মানুষ।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। আমরা তখনও ছুটোছুটি করছি গাড়ীতে উঠবার জন্য।

গাড়ী দুলে উঠল—গাড়ী ছাড়ল। আমরা তখনও প্ল্যাটফরমে।

হঠাৎ কি বুদ্ধি জাগল। আমাদের মধ্যে একজন সঙ্গিনী মেয়েটিকে গার্ডের গাড়ীর সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, গার্ড সায়েব মেহেরবানি করে মেয়েটিকে যদি তুলে নেন—

দয়া হ'ল তাঁর। হয়ত তাঁর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হলেন যিনি নিখিল চরাচরের নিয়ন্তা। এতক্ষণে বুঝি তাঁর কৌতুকস্পৃহার উপশম হ'ল। সে রাতে আমরা দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছব না এইটিই হয়ত চেয়েছিলেন তিনি। রাত্রি শেষ হ'ল যদি—ইচ্ছার গুরুত্ব আর এক হেতু ?

ব্রেক কসল গার্ড। গাড়ী থামল। মেয়েটিকে পুরোভাগে রেখে আমরা উঠে পড়লাম হুড়মুড় করে।

ছোট্ট কামরায় তিলধারণের জায়গা রইল না। গার্ড আতকে উঠল, এত লোক !

কামুফ্লেজ করা শত্রুপক্ষ যেন হঠাৎ জায়গা দখল করে নিচ্ছে। তখন আর উপায় কি—জায়গা দখলের কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—গার্ডকে ঘিরে আমরা ঠাসাঠাসি দাঁড়িয়েছি। গাড়ী ছাড়ার ছাড়পত্র সবুজ আলোটি যে জানালা দিয়ে দেখাবে সে উপায়ও রাখি নি।

এমনি করে সূর্য্য উঠলে—আমরা পৌঁছলাম দ্বারভাঙ্গায়।

অতঃপর বিভূতিবাবুর সুমধুর আতিথ্যে রাতের ব্যাপারটি অচিরাৎ ভুলেই গেলাম।

ঠিক ভুললাম না, ওটিকে দুঃসাহসিক অভিযানের পর্য্যায়ে উন্নীত করে রীতিমত উপভোগ করতে লাগলাম। বিভূতিবাবুর অস্বস্তি দূর হ'ল না কিন্তু। আমরা যে ওঁর আহ্বানে যাত্রা করে সারা রাত পথে বিনিদ্র কাটালাম এই ব্যথাটুকু কিছুতেই ওঁর মন থেকে দূর হতে চাইছিল না।

আহার এবং বিশ্রাম প্রচুর হ'ল। শহর দেখা হ'ল। রাত্রি ন'টার গাড়ীতে চাপলাম—সমস্তিপুর ফিরব বলে। ফেরবার পথে সেই মুক্তাপুর—সেখানে হঠাৎ গাড়ী থামল। এখানটায় গোলযোগ কিছু আছে নাকি?

না—শিকল টেনে ট্রেন থামিয়েছে বরযাত্রীরা। ওদের দলে পুরো একটি গ্রাম—সত্তর আশী জনের কম হবে না। সেই পরিমাণে সাজসরঞ্জাম। মাত্র পাঁচ-দশ মিনিটে সকলকে গুছিয়ে ট্রেনে তোলা সম্ভবপর কি? সুতরাং টান পিথল। গাড়ী থামল প্রায় এক মাইল এসে। থেমে রইল ততক্ষণই—যতক্ষণ না বরযাত্রী দলের সমস্ত মানুষ আর মাল গাড়ীর কামরাজাত হ'ল।

আশ্চর্য্য, রেল পক্ষ থেকে কেউ তদন্তে এসে শুধোল না কে চেন টানল—কেন টানল? বিনা কারণে শিকল টানলে যে টাকাটা জরিমানা দিতে হয়—সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যেন কারও নাই। সুতরাং গাড়ী এক ঘণ্টা লেট হওয়া ছাড়া আর কিছুই ঘটল না—কোন হাঙ্গামাই পোয়াতে হ'ল না কাউকে। সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রে সাধারণদেরই তো জয় জয়কার।

আসে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাধক জগন্মঙ্গল ব্রতী, ভাবুক শিল্পীদল—
স্বপ্নে ও ধ্যানে গড়ে যে দিব্য ভাবের ভূমণ্ডল,
সমুজ্জ্বল সে ভুবনই যে আসে জীর্ণ জগৎপর,
করিতে তাহারে শুচি সুন্দর, বৃহৎ মহত্তর।
মহামানবেরা আজ যা ভাবেন কাল যে তাহাই হয়,
ভাব যে জমিয়া বস্তু হইতে, সময় একটু লয়।
বাল্মীকির সে রামই আসেন—করুণার নাহি সীমা—
মিশে সত্যের অরুণ আলোকে স্বপনের পূর্ণিমা।

২

মনুষ্যত্বে উচ্চ করিতে গুহা-মানবের স্তর,
দেশ ও জাতির ধ্যানীরে লেগেছে এক কোটি বৎসর।
সূর্য্য গিয়াছে ক্ষয়ে কতখানি—কমেছে তারার গতি,
গড়িতে একটি 'অমিতাভ' আহা, একটি জগজ্জ্যোতি।
গরুড়ের স্থির শুভ আকাঙ্ক্ষা জমিয়া ক্ষমার পাকে,—
গড়েছে একটি অপাপবিদ্ধ গান্ধী মহাত্মাকে।
করেছে বঙ্গ কত তপস্যা—কোজাগর নিশি সাথ—
কত শরতের পদ্মের ধ্যানে এলো রবীন্দ্রনাথ।

৩

পিপীলিকা তোলে বল্মীক—তাহা অদ্ভুত কিছু নয়,
ক্ষুদ্র সে—তার স্বপ্ন যে গড়ে—সুবিশাল হিমালয়।
টুনটুনি-ক্রোধ অগস্ত্য হয়ে সাগর শোষণ করে,
মন যে তাহার দর্পহারীর—দর্পীরে নাহি ডরে।
পুণ্যের ন্যায় পাপও ফিরে আসে দেখি মাথা হয় হেঁট,
করে নিষ্পাপ যীশুর বিচার এখনো যে 'পাইলেট'।
যুগ চলে যায় প্রতিহিংসার কিছুই কমে না জ্বালা,
'সপ্তরথী'র ব্যূহ রচে আজও—রচে নব 'কারবালা'।

৪

ত্যাগীর ধ্যানেতে দধীচি গঠিত—তপস্যা ধরণীর,
পেয়েছে ভীষ্ম সম সংযমী—অর্জ্জুন সম বীর।
হয় যে সমাজ সুসভ্যতর, সূক্ষ্ম শিল্পকলা,
'ছড়া' 'দোঁহা' ভাঙি বাহিরিয়া আসে কবির 'শকুন্তলা'।
কবির স্বপ্ন আজও পাতে নব সাম্রাজ্যের ভিত
জীবকে করিছে উন্নততর—তাঁহাদের সঙ্গীত।
ছোট চাতকের কাকুতিতে ভাঙে সুর-সরিতের বাঁধ,
চকোরের ডাকে আগায়ে আসিছে যুগ যুগ ধরে চাঁদ।

৫

সৃষ্টিকে করে শ্রেষ্ঠতর যে স্থির সংকল্পই,
উৎকর্ষ ত লভে না ভুবন ওই উপাদান বই।
তিলোত্তমারে গড়িয়া তুলিছে রসিক শিল্পীমন,
ভাবই রূপের পরিমণ্ডল বাড়ায় অনুক্ষণ।
ফুরায় বন্ধ্যা শতাব্দী কত—নির্ম্মম বর্ষ
প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে বিরাট আদর্শ।
অশোকের সাধ—ইচ্ছাশক্তি কালে যায় নাই ক্ষয়ে,
নব কলেবরে আবার আসিছে—বিপুল শক্তি লয়ে।

৬

করিতে হয়েছে ব্রত সুকঠিন জাতির গৃহশ্রীকে,
ধরায় আনিতে দেবী ও মানবী সীতা ও সাবিত্রীকে।
মাতৃস্নেহ সাত সাগরেতে ঢেলেছে তাহার গা,
নর-নারায়ণে সন্তান পেতে—হতে গোপালের মা।
ধরি নরতনু প্রেম আসে, আসে অবিনাশী পুণ্য,
বসুধাকে দিতে নবৈশ্বর্য্য—নবীন লাবণ্য।
যিনি সৎ চিৎ পরমানন্দ—নাহি পরিবর্ত্তন
বহু বহু রূপে ভাবগ্রাহী সে—আসেন জনার্দ্দন।
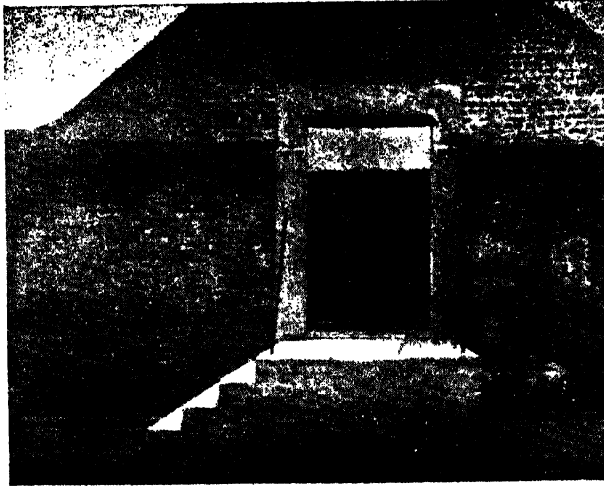
সেলুলর জেলের ফাঁসির ঘর

আন্দামানের বন্দী উপনিবেশ

শ্রীনিখিল মৈত্র

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

এই শতাব্দীর প্রথম দশকে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীদের কারাজীবন আন্দামানে কঠোরতর করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। আন্দামান পোতাশ্রয়ে খাড়ির মধ্যে ক্ষুদ্র ভাইপার দ্বীপ থেকে প্রধান কারাগার স্থানান্তরিত হয় এই সময়ে—পোর্টব্লেয়ার শহরের কেন্দ্রস্থল এবারডীন বাজারের সন্নিকটে আটালান্টা পয়েন্টে। প্রায় আট শ' স্বতন্ত্র সেলে বিভক্ত তিনতলা সেলুলর জেলের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। ভাইপারের কয়েদীদের ও দেশ থেকে নবাগত কয়েদীদের সেলুলর জেলে রাখা হ'ত। সাধারণতঃ ছয় মাস সেলুলর জেলের সেলে আবদ্ধ থাকার পর, কয়েদীদের বিভিন্ন ছোট ছোট কনভিক্ট ষ্টেশনে কাজ করার জন্য পাঠানো হ'ত। প্রথম সাড়ে চার বছর কয়েদীরা এই সমস্ত কেন্দ্রে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করত। কাজের জন্য কোনও পারিশ্রমিক দেবার বিধি প্রচলিত ছিল না। এর পরে আরও পাঁচ বছর এদের শ্রমিক-কয়েদী হিসাবে কাজ করতে হ'ত। তখন বিধি-নিষেধের কঠোরতা বহুল পরিমাণে শিথিল করে দেওয়া হ'ত। যৎসামান্য হাত-খরচাও শ্রমের বিনিময়ে কয়েদীরা উপার্জ্জন করতে পারত। সঞ্চয়ী বন্দীরা সেই অর্থ পোষ্ট-আপিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা করত। উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই অবশ্য সাধারণ বিলাসব্যসনে বা মদ, বিড়িতে ব্যয়িত হ'ত। জুয়াখেলারও রেওয়াজ ছিল। দশ বছর পরে বন্দী 'স্বাবলম্বী টিকিট' নেবার অধিকারী হ'ত, কিন্তু নাগরিক কোনও অধিকারই তার ছিল না। স্বাবলম্বী বন্দীদের জন্য স্বতন্ত্র গ্রাম ছিল, মুক্ত মানুষের গ্রামের মধ্যে বন্দীরা বসবাস করতে পারত না। এমনকি, ব্যবসায়, সামাজিক বা অন্য কোনও কারণে মুক্ত মানুষ বন্দী-গ্রামে গেলে তাকে অনুমতি নিয়ে যেতে হ'ত। স্বাবলম্বী অবস্থায় জমি চাষ করা, বাড়ী তৈরি করা এবং নিজের গো-পাল রাখার অধিকারী সবাই ছিল। সে অবস্থায় নিজের পরিবার পরিজনকেও দেশ থেকে নিয়ে আসার পথে কোনও বাধা ছিল না। আবার অনেকে সাউথ পয়েন্টের নারী-বন্দীশিবির থেকেও ভাবী জীবনের সঙ্গিনী সংগ্রহ করত। সাধারণতঃ আঠার বৎসরের কম এবং চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়সের কোনও কয়েদীকে আন্দামানে পাঠানো হ'ত না।

বন্দিনীদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন প্রায় পুরুষদের মতই ছিল, তবে কঠোরতার মাত্রা একটু কম। পোর্টব্লেয়ার শহরের দক্ষিণ কোণে সাউথ পয়েন্টে আন্দামান উপনিবেশের বন্দিনী-শিবির ছিল। সেলুলর জেলের তুলনায় এই শিবিরের নির্ম্মাণ-কৌশল অতি সাধারণ। কাঠের ও টিনের লম্বা ব্যারাক, চারিদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মেয়ে ওয়ার্ডার ও পোর্ট-অফিসারদের তত্ত্বাবধানে, নির্ব্বাসিতা বন্দিনীরা কাপড় সেলাই, বেতের কাজ প্রভৃতি করত। বন্দী-শিবিরের রান্নাবান্না করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এ সকল কাজও ছিল তাদেরই। নারী-বন্দীনিবাসে—একমাত্র স্বাস্থ্য-বিভাগের সহকারী এবং শিবিরের ছুতোরমিস্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। পাঁচ বছর কারাবাসে থাকার পর

বন্দিনীরা বিবাহ করতে পারত, এবং বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে স্বাবলম্বী বন্দী-গ্রামে গিয়ে বসবাস করত। দেশে ফিরতে হলে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে ফিরতে হ'ত, মেয়াদ শেষ হবার পর একলা কারুর পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বন্দিনী বিবাহিতা হলে পনের বছর আন্দামানে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করার পর দেশে ফিরবার অনুমতি পেত, আর আন্দামানে অবিবাহিত থাকলে শাস্তি-ভোগের সময় বেড়ে হ'ত কুড়ি বছর। পোর্টব্লেয়ারের সরকারী কর্ম্মচারীদের বাড়ীতে আয়া চাকরানী হিসাবে বন্দিনীদের নিযুক্ত করার রেওয়াজ ছিল, তখন অবশ্য তারা মনিবের বাড়ীতেই বসবাস করতে পারত।

পরিত্যক্ত সেলুলর জেলের সেল

অল্প কিছু মেয়াদী পুরুষ-কয়েদীও তখন আন্দামানে ছিল, কিন্তু কারুরই সাজা দশ বছরের কম নয়। সারা জীবনের জন্য দণ্ডিত কয়েদীদের মত একই নিয়মকানুনের মধ্যে মেয়াদীদের রাখা হ'ত। তবে কোনও মেয়াদীই এই শতাব্দীর প্রথম দিকে স্বাবলম্বী টিকিটের অধিকারী ছিল না। ১৯০৫-৬ সনের রস, এবারডীন, ছাড়ু ও গরাচেরামা উপনিবেশ অঞ্চল মুক্ত মানুষের বসতি ছিল। ভাইপার এবং ওয়েস্থারলিগঞ্জ পুরোপুরি কয়েদী-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল।

স্বাবলম্বী টিকিট পাওয়ার আগে প্রত্যেক কয়েদীকে জেলের উর্দ্দি পরতে হ'ত, তারই সঙ্গে থাকত গলায় কাঠের হাঁসুলি সহ কাঠের উপর খোদাই করা বন্দীর পরিচয়পত্র। প্রত্যেক কয়েদীই এই পরিচায়ক তকমা সব সময় গলায় ঝুলিয়ে বেড়াত। তাতে কয়েদীর নম্বর, ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন ধারায় সে দণ্ডপ্রাপ্ত, সাজার তারিখ এবং দণ্ডকাল ও মুক্তির তারিখ খোদাই করা থাকত। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের টিকিটের উপর বড় করে ইংরেজী এল (লাইফার) লেখা থাকত। একই মামলায় কয়েক জনের দণ্ড হলে তাদের টিকিট তারকা-চিহ্নিত হ'ত, এবং কোনও অবস্থায়ই তাদের এক কর্ম্মকেন্দ্রে রাখার প্রথা ছিল না। অনেক সময় নরহত্যা, ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের সাজা নিয়ে কুড়ি-পঁচিশ জন সাংঘাতিক দুর্বৃত্ত একই সঙ্গে একই মামলার কয়েদী হিসাবে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হ'ত। কারাকর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এই সমস্ত দুর্বৃত্তদের বিভক্ত করে, স্বতন্ত্র কর্ম্মকেন্দ্রে পাঠাতে হ'ত। অনেক
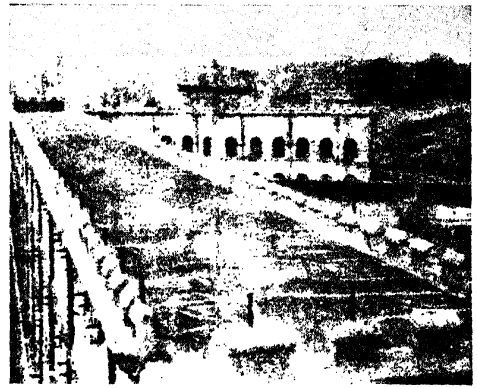
ঘড়ি-ঘর হইতে সেলুলর জেল

সময় এই বিষয়টি জটিল হয়ে উঠত। একই দলের অপরাধী, কিন্তু তারা ধরা পড়েছে বিভিন্ন সময়ে, কোনও ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান দুই, তিন বা পাঁচ বছর। স্বভাবতঃই তাদের বিচার হয়েছে আলাদা আলাদা করে, আন্দামানে এসেছেও বিভিন্ন সময়ে। এদের যোগসাজশের সূত্র বের করে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না।

সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে অশান্ত, স্বভাবদুর্বৃত্ত প্রভৃতি বন্দীদের জন্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ত। অনেকে সারা জীবনটাই সেলুলর জেলের অবরুদ্ধ পরিবেশে কঠোর অনুশাসনের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে। আবার অনেককে পোর্টব্লেয়ারে অন্য কোনও অপরাধ করার জন্য চরম দণ্ডও দেওয়া হয়েছে। সে যুগে স্বভাবদুর্বৃত্ত কয়েদী-দের জন্য যে সমস্ত শাস্তিমূলক 'গ্যাঙ্গ' ছিল তাদের তালিকা এই :

সেলুলর জেলে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ বন্দী, চেন গ্যাঙ্গ, ভাই-পার জেলে আমরণ বন্দী, স্বভাবদুর্বৃত্ত গ্যাঙ্গ, ভাইপার দ্বীপের শাস্তিমূলক গ্যাঙ্গ, অস্বাভাবিক অপরাধীদল, চ্যাথাম দ্বীপ শাস্তিমূলক গ্যাঙ্গ, সন্দেহজনক চরিত্রের 'ডি' (ডাউটফুল) টিকেটধারী দল।

জেল-কর্তৃপক্ষের উপর কঠোর নির্দ্দেশ ছিল যে, একভাষাভাষী জনসমষ্টিকে একই অঞ্চলে যেন কোনওক্রমেই রাখা না হয়।

কারণ এত বড় বন্দীনিবেশে বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা সব সময়ই চিন্তা করা প্রয়োজন। কাজের প্রয়োজনে যেখানেই বহু কয়েদীকে একত্রিত করবার প্রশ্ন উঠত, তখনই ভিন্ন ভাষাভাষী কয়েদীদের নিয়ে সে দল গঠন করা হ'ত। বাঙালী, তেলেঙ্গী, পাঠান, মালাবারী —একত্রে কাজ ও বসবাস করলে, স্বভাবতঃই তাদের মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারকার্য্য করা শক্ত। গোপনীয়তা থাকবে না, হিন্দুস্থানীর মাধ্যমেই কথাবার্ত্তা বলতে হবে। সরকারপক্ষ হতে অবশ্য কয়েদীদের মধ্য থেকে অনেকগুলি গুপ্তচরও নিযুক্ত করা হ'ত। বন্দীশিবিরের অস্বাভাবিক অবস্থায় অতি সাধারণ প্রলোভনেই বন্দী অপরের বিরুদ্ধে সংবাদ দিতে রাজী হয়ে যেত।

সেলুলর জেলের 'হুইপিং ষ্ট্যাণ্ড': এইখানে কয়েদীদের বেত মারা হইত

জেলের মধ্যে পূর্ণ সন্ত্রাসবাদের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা আলোচনা করলে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বন্দীদশার বিভিন্ন পর্য্যায়ের যে বর্ণনা আছে, তাতে রাজনৈতিক বন্দীদের কথা বলা হয় নি। কারণ ইংরেজ সরকার এদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। কালাপানির অপর পারে বিপ্লববাদী, স্বাধীনতাকামী যুবকদের উপর যে নির্ম্মম নিষ্পেষণ চলেছিল তার অতি সামান্য আভাস ইঙ্গিত এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিপ্লবীদের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। এই সব কান্না-কাহিনী অধিকাংশই রচিত হয়েছিল ইংরেজ শাসনের আমলে। স্পষ্ট সত্য নির্ভীকভাবে তখন বলা সম্ভব হয় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, স্বাধীনতার পরও সে কাহিনী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা হয় নি। আন্দামানে নির্ব্বাসিত সিপাহী বিদ্রোহের বন্দীদের কাহিনী আজ আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু, বিংশ শতাব্দীর সেলুলর জেলের ব্যথা-বেদনাময় ইতিহাস আজও রচিত হতে পারে। আন্দামানে সেলুলর জেলের মূল্যবান পুথিপত্র জাপানীরা এসে নষ্ট করে দেয়। জাপানীরা বিগত মহাযুদ্ধে—'৪২ সালে আন্দামান অধিকার করে সেলুলর জেলের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করার সঙ্গে, জেলের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে। সুতরাং রাজনৈতিক বন্দীদের সেলুলর জেলে অবস্থানের ইতিকথা সঙ্কলন করতে হবে ভূতপূর্ব্ব বন্দীদের কাছ থেকে।

আগেই বলেছি যে, সেলুলর জেল নির্ম্মাণের পর প্রথম যে রাজনৈতিক বন্দীদলকে সেখানে অবরুদ্ধ করা হয় তাঁরা মহারাষ্ট্রের। তার কিছুদিন পরে বাংলা থেকে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা যান। বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯১০ সনে পঞ্চাশ বৎসর সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হন। ঢাকা, বরিশাল, হাওড়া প্রভৃতি রাজনৈতিক মামলার আসামীদের আগমনেও সেলুলর জেলের বন্দীসংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সরকারী নিয়মকানুনে বিপ্লববাদী বন্দীদের স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা হয় নি, তাঁদের করা হয়েছিল সাধারণ অপরাধীদের সমপর্য্যায়ভুক্ত। শাসকশক্তি কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হন নি। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সুপরিকল্পিত কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। একজন অতি দুর্বৃত্ত নরহন্তাকে জেলে বা আন্দামানের অন্যান্য বন্দীশিবিরে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হ'ত রাজনৈতিক অপরাধীকে তা থেকে পর্য্যন্ত বঞ্চিত করা হ'ত। সমস্ত জীবন সেলুলর জেলে বদ্ধ অবস্থায় রাখাই ছিল বিধি। ঘানি ঘুরিয়ে তেল বের করা, আটার চাকি ঘুরানো, নারকেলের ছোবড়া কোটা, দড়ি পাকানো প্রভৃতি কায়িক শ্রমের কাজ তাঁদের দেওয়া হ'ত। জেলারের ইঙ্গিতে কয়েদী পেটি অফিসার কাজের সময় বন্দীদের উপর অত্যন্ত নির্ম্মম ব্যবহার করত। নির্দ্দিষ্ট কাজ না করতে পারার অপরাধে অবসন্ন বিপ্লবী বন্দীদের মারধোর ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সাভারকর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, সেলুলর জেলে তিনি ও তাঁর বড় ভাই গণেশ দামোদর সাভারকর উভয়েই বন্দী অবস্থায় থাকলেও, তাঁদের সাক্ষাৎকার হতে বহু সময় লেগেছিল। গণেশ সাভারকর আগে আন্দামানে আসেন, তাই ছোট ভাই বিনায়ক যে নির্ব্বাসিত হয়ে সেলুলর জেলে এসেছেন এ খবর পর্য্যন্ত তিনি জানতেন না। অকস্মাৎ দূর থেকে বন্দীর উর্দ্দি পরনে দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের নিজেদের অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করতে হয় অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। জেলের অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে অসহায় বন্দীদের লড়াই করার একমাত্র পন্থা ছিল—আমরণ অনশন করা। কিন্তু, সেলুলর জেলে তিলে তিলে মৃত্যুবরণের সংবাদ চারিদিকের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেদ করে বাইরে এবারডীনেই বা যাবে কেমন করে এবং সেখান

থেকে আট শ' মাইল সমুদ্রের ব্যবধান অতিক্রম করে দেশবাসীকেই বা সে সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে কি উপায়ে?

আন্দামানের বন্দীশালায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই তিলে তিলে মৃত্যুবরণের কাহিনী বাংলাদেশে তথা ভারতে প্রচারিত হ'ল এক অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ঘটনাকে উপলক্ষ করে। সেলুলর জেলে কয়েক বছর আবদ্ধ থাকার পর আলিপুর মামলার কয়েকজন প্রখ্যাত বিপ্লবীকে বাইরে কন্‌ভিক্‌ট ষ্টেশনে কাজ করার জন্ত নেওয়া হয়। নিজেদের কোনও গোপনীয় সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কর্ত্তৃপক্ষ এ কাজ করেছিলেন কি না তা এখন বলা অসম্ভব। কিছুদিন পরে লালমোহন সাহা নামে একজন সাধারণ কয়েদী জেল-কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয় যে, বিপ্লবীরা গোপনে বোমা তৈরি করছে এবং আগ্নেয়াস্ত্রও তারা ভারতবর্ষ থেকে অবৈধ ভাবে নিয়ে এসেছে। সমস্ত পোর্টব্লেয়ার সচকিত হয়ে উঠল। দেশী মিলিটারী পুলিস ও পল্টনের সঙ্গে ইংরেজ গ্যারিসনকেও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে 'ডিউটি'

সেলুলর জেলের অবশেষ

দেওয়া হ'ল। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের জেলের মধ্যে সেলে দিবারাত্র বন্ধ করে রাখা হ'ল। তারই সঙ্গে চলল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান। 'থার্ড ডিগ্রী'র পরিপূর্ণ বিবরণ ভুক্তভোগী ছাড়া অন্ত কারুর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কয়েকদিন পরে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হ'ল—আলিপুর মামলার অন্যতম দণ্ডিত বিপ্লবী ইন্দুভূষণ রায় আত্মহত্যা করেছেন এবং সেই দলের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান, প্রাণবন্ত যুবককর্ম্মী উল্লাসকর দত্ত পাগল হয়ে গিয়েছেন। অদূরে সেলের রুদ্ধদ্বারের ভিতরে গোঙানির অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এসেছিল বিনায়ক দামোদরের কানে। ইন্দুভূষণ আত্মহত্যা করেছিলেন না নিহত হয়েছিলেন এ প্রশ্নের সমাধান হয় নি। সেই সময়ে বাংলা পুলিসের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার আন্দামানে যান এবং বোমা রিভলবার খুঁজে বের করার জন্ত এক অদ্ভুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এবারডীনের ঠিক নীচে, এখন যেখানে অতি সুন্দর খেলার মাঠ জিমখানা গ্রাউণ্ড সেইখানে, তখন ছিল জলা আর সুন্দরীগাছের বন। কয়েক বৎসর আগে আন্দামান বন্দীশিবির ও এবারডীনে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমাবার জন্ত সরকার সমুদ্রের ধারে দেয়াল গেঁথে সমস্ত জলা জায়গা ভরাট করার পরিকল্পনা কার্য্যকরীকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই সময়-সাপেক্ষ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৯১৮ সনে। কিন্তু ১৯১২ সনে জলাভূমিকে আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখার প্রশস্ত জায়গা বিবেচনা করে পুলিসের কর্ত্তারা সিদ্ধান্ত করলেন যে, এ অঞ্চল খুঁড়ে ফেলা হউক। কাঁকড়া, জোঁক এবং দু' চারটে সাপ ছাড়া অবশ্য অন্ত কিছু বের হয় নি।

ইংরেজ আমলে আন্দামানের চিফ কমিশনারদের মধ্যে সকলের চেয়ে সুপণ্ডিত ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন স্যার রিচার্ড টেম্পল। তাঁর কার্য্যকাল ১৮৯৪ থেকে ১৯০৩ সন পর্য্যন্ত। এই সময়ে ফিনিক্স বে ডক ইয়ার্ড ও কারখানার প্রভূত উন্নতি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯১৩ সনে কর্ণেল এম. ডগলাস আন্দামানের

ফিনিক্স বে, পোর্টব্লেয়ার

শাসনভার গ্রহণ করেন। মহাযুদ্ধের সময়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের স্মরণীয় ঘটনা জার্ম্মান যুদ্ধ-জাহাজ এমডেনের আগমন। এমডেন পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় ২৩৫ মাইল দক্ষিণে নানকৌড়ী বন্দরে যায়। বন্দরের গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট তখন ছিলেন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী নামে এক মহিলা। ইনি পোর্টব্লেয়ারের স্বাধীন বাসিন্দা এবং ব্যবসাসূত্রে নানকৌড়ী গিয়েছিলেন। বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মনিপুণা বলে তিনি সবারই প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন। পরে, তিনি নানকৌড়ীর সরকারী এজেণ্টেরও কাজ নেন। জার্ম্মান জাহাজ নানকৌড়ী খাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু ইন্দ্রাণী রণতরীর উপস্থিতি উপেক্ষা করে কামোর্ট্রা দ্বীপে সরকারী বাসভবনের সামনে ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করেন। দূরে জাহাজের ব্রিজ থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জার্ম্মান ক্যাপ্টেনও এ ঘটনা লক্ষ্য করেন। তারপর যে-কোনও কারণেই হউক ক্যাপ্টেন নানকৌড়ীতে না নেমে, জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দেন। এমডেন জাহাজের উপস্থিতির সংবাদ ইন্দ্রাণী নিকোবারীদের মারফতে 'ক্যানো'তে করে

কার নিকোবারে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে ব্যবসায়ীর জাহাজে খবর যায় পোর্টব্লেয়ারে আর বেতার-সঙ্কেতে সে সংবাদ আসে কলিকাতায়। কিছুদিন পরে ব্রিটিশ নৌবহরের জাহাজ এমডেনকে ডুবিয়ে দেয়।

দিলথামনি জলাশয়, পোর্টব্লেয়ার—সামনে জাপানীদের তৈরী গেট

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষে বিপ্লব-অভ্যুত্থানের যে প্রচেষ্টা হয় তৎসংক্রান্ত রিপোর্ট ইত্যাদিতে আন্দামানের উল্লেখ আছে। রাউলাট কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, আন্দামানে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র, লোকজন নামিয়ে সেখানকার বন্দী বিপ্লবীদের মুক্ত করার পরিকল্পনা নাকি নেতারা করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সিঙ্গাপুরে বিদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত রেজিমেণ্ট তখন আন্দামানে বন্দী। রাউলাট কমিটি অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে, এ ধারণার পেছনে কোনও সত্য ছিল না। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় বিদ্রোহী সৈনিকদের নাকি আন্দামানে পাঠানো হয় নি। অন্যান্য ঘটনা পর্য্যালোচনা করে মনে হয় যে, রাউলাট কমিটি প্রকৃত তথ্য বিকৃত করে দেখিয়েছেন। সে সময় হংকং, সাংহাই, সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, নিকট-প্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু বিদ্রোহী সৈনিককে আন্দামানে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই দলে এক বেলুচ রেজিমেণ্টকে পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তরে লং আইল্যাণ্ডে নিয়ে রাখা হয়। বেলুচ বিদ্রোহীদের তৈরী নারিকেল বাগানে এখন প্রচুর ফল হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয়-উৎসব উপলক্ষে আন্দামানের বহু বন্দী মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। আবার, পঞ্জাবে গণ-বিক্ষোভে দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীরা ঐ সময়ে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হন। হরেদরে রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা বেড়েই গেল।

১৯২২ সনে জেল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী আন্দামানে নারী-কারাগার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সময় অবশ্য সমস্ত বন্দী উপনিবেশ উঠিয়ে দেওয়া ঠিক হয়েছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্দামান সরকার একমাত্র মোপলা-বিদ্রোহের চৌদ্দ শত বন্দী এবং বিভিন্ন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় নির্ব্বাসিত বিপ্লবীগণ ছাড়া অন্য সাধারণ কয়েদীদের নিতে অস্বীকার করেন।

মালাবার কৃষক-বিদ্রোহের শাস্তিপ্রাপ্ত মুসলমান কৃষাণ-মোপলারা আন্দামানে নূতন এক পরিবেশ সৃষ্টি করল। সংখ্যায় তারা যথেষ্ট এবং অনেকেই সরকারের সম্মতি নিয়ে দেশ থেকে স্ত্রী পুত্রসহ আন্দামানে এসেছিল। দণ্ডভোগের পর অধিকাংশ মোপলাই আর দেশে ফিরে গেল না। আন্দামানেই তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে সুরু করল। আজ আন্দামানে নিজেদের শ্রমে বহু মোপলা সমৃদ্ধ গ্রাম গড়ে তুলেছে। তবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য তারা বিসর্জ্জন দেয় নি।

কর্ণেল বিডন ১৯২০-২৩ সালে আন্দামানের চিফ কমিশনার ছিলেন। তাঁর সময়ে কয়েদীদের শাসন-ব্যবস্থার কঠোরতা কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়। যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞা হলেই আন্দামানে নির্ব্বাসিত করার নীতি পরিবর্ত্তন করা হ'ল। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় যারা আন্দামানে আসতে চায়, সেই সব বন্দীকেই কেবল আন্দামানে পাঠানো হবে বলে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হ'ল। তাতে ঘোষিত হ'ল—আসার আগে প্রতিটি বন্দীর সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে যে, সে আন্দামানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে পারবে কিনা। স্বভাবদুর্বৃত্ত বা অপরাধপ্রবণ কোনও কয়েদীকে আন্দামানে পাঠানো হবে না। ভারতবর্ষের জেল থেকে কিন্তু আন্দামানের মুক্ত আবহাওয়ায় যাবার জন্যে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দিয়ে বন্দী এল খুবই কম। বন্দী উপনিবেশ উঠিয়ে দিলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুক্ত কয়েদী ও তাদের সন্তানসন্ততির কি সমস্যা দেখা দেবে সে সম্বন্ধেও সরকার গভীর ভাবে বিবেচনা আরম্ভ করলেন। আন্দামানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্ভর করে বন্দীদের উপর। নির্ব্বাসনে বন্দী পাঠানো বন্ধ হলে ভারত সরকারও আন্দামানের জন্য ঐ পরিমাণে অর্থব্যয় করবেন না। তা ছাড়াও অবশ্য আন্দামানে আট-নয় হাজার কয়েদী অর্দ্ধমুক্ত অবস্থায় রয়েছে, তাদেরই বা কি হবে ? আবার কি তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারাপ্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করলেন। বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব কোন সরকারই আন্দামান থেকে কয়েদী ফিরিয়ে নিয়ে এসে নিজেদের জেলে ভর্তি করতে রাজী হলেন না।

এই সমস্ত বিবেচনা করে চীফ কমিশনার কর্নেল এম. এফ. ফেরার নূতন করে আন্দামান বন্দীনিবাস গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। আন্দামানে সাধারণ কয়েদীরা যাতে যথেষ্ট সংখ্যায় বসবাস করে, সেজন্য আগেকার মত কঠোর পরিশ্রমে প্রথম দশ বছর সময় কাটাবার নিয়ম বাতিল করা হ'ল। কয়েক মাস সেলুলার জেলে আবদ্ধ থাকার পরই বন্দীদের বাইরে কাজ করার অনুমতি মিলত। যে-কোনও কয়েদী ইচ্ছা করলে 'তলবদার' পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারত। কাজের পরিবর্ত্তে মাইনে এবং রেশনে চাল, ডাল, তৈল, লবণ, আটা প্রভৃতি দেওয়া হ'ত। কয়েদীর বিশেষ সাজপোশাক পরার বিধিও উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এই সময়ে বহু বর্ম্মী এবং শিখ কয়েদী

তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে আসে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে।

কর্ণেল ফেরার আন্দামানের চীফ কমিশনার ছিলেন ১৯২৩ থেকে ১৯৩১ সন পর্যান্ত। তাঁর সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—আন্দামানের স্থায়ী বাসিন্দাদের দখলী স্বত্বলাভ। এর আগে জমির উপর কোনও স্বত্ব না থাকায় ভাল করে ঘরবাড়ী তৈরি করার দিকে বড় কেউ মনোযোগ দিত না। সঙ্গতিপন্ন

পোর্টব্লেয়ারে মাছ ধরায় রত জেলে

গৃহস্থও কুঁড়েঘর ছেড়ে অন্য কিছু তৈরি করার কথা ভাবত না। এর পর থেকে আস্তে আস্তে কাঠের ও ঢেউখেলানো টিনের ছাদের সুন্দর সুন্দর বাড়ী গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। আন্দামানী গ্রামের বাড়ীঘর সুদৃশ্য, ছিমছাম। চারদিকে ফলের বাগান এবং সামনেই উপত্যকাভূমিতে ধানের ক্ষেত। অনেকটা ব্রহ্মদেশের গ্রামের মত। মামিও, উণ্ডুর প্রভৃতি গ্রাম কর্ম্মীরাই গড়ে তুলেছিল।

১৯২৫ সনে বর্ম্মার বেসিন জেলা থেকে কারেন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা আন্দামানে বনবিভাগের শ্রমিকরূপে আসে। মধ্য আন্দামান দ্বীপের উত্তর অংশে ওয়েবীতে তারা সুন্দর এক উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। প্রত্যেক পরিবারই নিজের জমিতে চাষ আবাদ করে; কমলা, আনারস প্রভৃতি ফলের বাগানও গড়ে তুলেছে। এরা সবাই খ্রীষ্টান এবং অত্যন্ত শান্ত ও নিরলস কর্ম্মী। আজও কারেনরা তাদের স্বাতন্ত্র্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছে।

উত্তর ভারতের অপরাধপ্রবণ বলে কুখ্যাত যাযাবার উপজাতি ভাণ্ডরা আসে সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে। আসার সময়ই তারা স্থির করে যে, আন্দামানের বন্দী উপনিবেশে নূতন করে ঘর-সংসার পাতবে। ভ্রাম্যমাণ অপরাধী-জীবন ত্যাগ করে ভাণ্ডরা আন্দামানে কৃষক ও মজুর হিসেবে সুনাম অর্জ্জন করে। '৩১ সনে ভাণ্ড উপনিবেশিকদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় তিন শ'।

আলোচ্য ত্রিশ বছরে আন্দামানের আদিবাসীদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক আরও নিকটতর হয়। আদিবাসীদের প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, গ্রেট 'আন্দামানিজ' আদিবাসীর সংখ্যা দ্রুত কমে যেতে আরম্ভ করে। আচারে ব্যবহারে শিক্ষায় দীক্ষায় তাদের

লিটল আন্দামানের আদিবাসী—'ওঙ্গি'

নিজস্ব সত্তা সম্পূর্ণরূপেই তারা হারিয়ে ফেলে। আন্দামানের প্রধান দ্বীপমালা থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে প্রশস্ত সমুদ্রের প্রণালী দ্বারা বিভক্ত লিটল আন্দামানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু ওখানকার ওঙ্গি আদিবাসীদের মধ্যে বর্ত্তমান সভ্যতা বিস্তারের কোনও কার্যাক্রম সরকার গ্রহণ করেন নি এবং বছরে এক-আধ বার লোহার জিনিষ, বিড়ি, চা, দেশলাই প্রভৃতি নেবার জন্য ছাড়া অন্য কোন উপলক্ষে ওঙ্গিরা পোর্টব্লেয়ারে আসত না।

মুশকিল হ'ল কিন্তু জারোয়াদের নিয়ে। জঙ্গল থেকে জারোয়া আদিবাসীদের ধরে নিয়ে তাদের শিক্ষিত করে সমস্ত উপজাতিকে বন্ধুভাবাপন্ন করার চেষ্টা হয়। ১৯০২ সনে ভক্স, রোজার্স এবং বনিগের নেতৃত্বে একটি অভিযাত্রী দল এই উদ্দেশ্যে আন্দামানের গহন বনে যাত্রা করে। এতে কোনও ফল হ'ল না, উপরন্তু জারোয়াদের নিক্ষিপ্ত তীরে ভক্স নিহত হন।

জারোয়া এলাকায় দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিযান হয় মার্চ-এপ্রিল, ১৯১০ সনে। ফসেটের নেতৃত্বে অভিযাত্রী দল জঙ্গলের মধ্যে এক বড় জারোয়া বসতি ঘিরে ফেলে। মিলিটারী কায়দায় বন্দুক উচিয়ে ফসেটের সেপাই সান্ত্রীরা অগ্রসর হতে থাকে। জারোয়াদের চেঁচামেচি কোলাহলও শোনা যাচ্ছিল। এত সব চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু জারোয়ারা ফাঁদে পা দিল না। চারদিকের

দুরধিগম্য জঙ্গলের মধ্যে জারোয়ারা যেন মিলিয়ে গেল, শিশু বা স্ত্রীলোকরাও পেছনে পড়ে রইল না। জারোয়ারাও প্রতিপক্ষের কায়দাকানুন সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ নয়!

১৯১৮ সনে মরগানের নেতৃত্বে ষোল জন পুলিশ এবং পঁচিশ জন অভিজ্ঞ বন্দী শ্রমিক ও কয়েকজন বন্ধুভাবাপন্ন গ্রেট আন্দামানিজ পথপ্রদর্শক—এদের এক বাহিনী জারোয়াদের উপর চড়াও করে। কিছুদিন আগে জারোয়ারা টেম্পলগঞ্জ ও মণিপুরে গ্রামবাসীদের উপর বেপরোয়া ভাবে চড়াও হয় এবং কয়েকজনকে গুরুতররূপে আহত করে। জারোয়াদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি লাল লেংটি পরেছিল আর আক্রমণের সময় দু'একটা হিন্দুস্থানী কথাও তাদের বলতে শোনা যায়। গ্রামবাসীদের মনে এর ফলে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, গ্রেট আন্দামানিজ গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসীরাই তলে তলে এ সব অনাচার করছে। জারোয়াদের পক্ষে হিন্দুস্থানী শব্দ ও তার অর্থ কখনই জানা সম্ভব নয় এবং লাল কাপড়ই বা তারা পাবে কোথা থেকে। মরগানের অভিযান থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'ল যে, আগেকার আক্রমণের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী জারোয়ারাই। একথাও অভিযাত্রী বাহিনীর সবাই বলেছে যে, জারোয়াদের সঙ্গে কোনও পলাতক বন্দী নিশ্চয়ই যোগ দিয়েছে। তারাও হিন্দুস্থানী কথা দূর থেকে শুনতে পেয়েছে। কিন্তু সঠিক ভাবে পলাতক বন্দী সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হয় নি। জারোয়া বসতি অধিকার করে এবারও মানুষ পাওয়া গেল না, মিলল নানা রকমের জিনিষপত্র—ডেকচি, পেরেক, এনামেলের কাপ, খাকির কাপড়, লোহার বহু যন্ত্রপাতি, কয়েদীর নম্বর দেওয়া বাটি। মিঃ মরগান জারোয়াদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার পথও বাতলে গিয়েছেন। ত্রিশ জন সশস্ত্র বর্ম্মী ও তাদের পথপ্রদর্শক কয়েক জন আন্দামানী সদাসর্ব্বদা জারোয়াদের উপর চড়াও হওয়ার জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরলে দুই তিন বছরের মধ্যে নাকি সমস্ত জারোয়াকে আন্দামান থেকে নিঃশেষ করে ফেলা যাবে। সেই সময় থেকে জারোয়াদের দেখলেই গুলি চালানো আরম্ভ হ'ল আর জারোয়া কুঁড়েঘরগুলি পুড়িয়ে ফেলাও হ'ল তাদের কর্ত্তব্য।

কিন্তু এত সব অপচেষ্টা করেও জারোয়াদের ধ্বংস করা গেল না। শুধু বৈরীভাবই বেড়ে চলল। আন্দামানের জঙ্গলে আজও জারোয়ারা রয়েছে। সংখ্যায় সম্ভবতঃ এক হাজারের বেশী নয়, কেউ কেউ মনে করেন পাঁচশ'র বেশী নয়। সবই অবশ্য অনুমান। আন্দামানের বুনো শূয়োর বা হরিণও সভ্য মানুষকে এত ভয় করে না, যত করে জারোয়ারা। মানুষে মানুষে দেখা হলেই সেখানে অনর্থ বাধে, অকারণ রক্তপাতে এ অশুভ সম্পর্ক বহুদিন ধরে বিষিয়ে রয়েছে।

অতি প্রাচীন চীনদেশীয় কবিতা

শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চীনা কাব্য-জগৎ, সে এক অপূর্ব্ব জগৎ। সেখানে হাটে-মাঠে-বাটে, কাননে-কান্তারে, উন্মুক্ত নদীতটে সর্ব্বত্রই কবিতার সুর যেন গুঞ্জন করে বেড়ায়। শিক্ষিত লোকমাত্রই সেখানে কবি। তাঁরা কবিতা লেখেন, একে অন্যকে উপহার দেন, বিনিময়ে আবার কবিতাই ফিরে পান। এ নিয়ে যেন সেখানে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে। দান পেলে প্রতিদান দেওয়া যেমন সভ্যজগতের রীতি, তেমনই কবিতা পেয়ে আরও বাকঝকে কবিতা ফিরিয়ে দেওয়াও সেখানকার রীতি।

তাদের এ রীতি কিন্তু আজকের নয়—এ রীতি সমানে চলে আসছে আজ বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে। কি করে তার আরম্ভ, সে এক আশ্চর্য কথা। সেই পুরনো যুগে যখন অন্যান্য অনেক দেশই সভ্যতার মুখও দেখে নি, তখন একদিন রাজার আদেশ প্রচারিত হ'ল, কবিতাকে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে গ্রহণ করবার জন্য। অর্থাৎ কবিতার রসমাধুর্য, কবিতার স্নিগ্ধ রসাস্বাদন যেন কুলী, মজুর, কামারকুমোর আদি সবারই জীবনকে সুখশান্তিপূর্ণ করে দেয়—এই আহ্বান জানিয়ে রাজা এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। ফলে কবিতা রাজসম্মান পেয়ে উন্নত হতে থাকে এবং অজস্র কবিতার প্লাবনে দেশ ভেসে যায়। সেই থেকেই চলে আসছে এ রীতি।

বাঙালী জাতির সম্বন্ধেও এ বিষয়ে অনুরূপ উক্তি আছে। শোনা যায়—Bengalis are born poets. অবশ্য কথাটা সব সময়ে সদ্ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অকর্মণ্য হয়ে বসে বসে স্বপ্ন দেখতে যখন কাউকে দেখা যায় তখনও তাদের প্রতি ঐ উক্তিরই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমনকি ঐ উক্তির সমর্থনে কখনও কখনও শিক্ষাকেও ত্রুটিপূর্ণ বলে ইঙ্গিত করা হয়। কাজেই এই বিধানে যদি আমরা চীনদেশের কাব্যপ্রবণতাকে উড়িয়ে দিতে চাই তা হলে তারা শুনবে না। তারা বলবে—

আপত্তি ?
বসন্তের জলে এলোনা তোমার আপত্তি।
তোমার সব শব্দ শুরু।
ঐ দেখছ না সূর্য ডুবল বলে :—
এক পেয়ালা খাবে ?......

অর্থাৎ, তারা তা উড়িয়ে দেবে মৃদু হেসে আর পালিশ-করা কথায়।

যাক সে সব কথা। এ নিয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় ; এখানে হাজার বছরের পুরনো কয়েকটি কবিতার কথাই বলব। এ কথা বলার উদ্দেশ্য শুধু সেখানকার পারিপার্শ্বিককে চেনা। কারণ পরিস্থিতি না জেনে যেমন সমাজনীতির বৈশিষ্ট্যের সমালোচনা ত্রুটিপূর্ণ হয় তেমনই অবস্থা না বুঝে টীকাটিপ্পনী করাও উচিত হয় না।

চীনদেশের "বুক অব পোয়েট্রি" (কনফুসিয়স্ সম্পাদিত) সব দেশেই পরিচিত। সে বইখানিতে আছে তিন শ' পাঁচটি বাছাই করা কবিতা। 'বাছাই করা' বললাম এজন্য যে, ইতিহাসে বলে প্রাচীন যে সব কবিতা আজও চীনের আকাশ-বাতাস মুখর করে রেখেছে তার সংখ্যা তিন হাজারেরও উপর। অথচ 'ক্লাসিক পোয়েট্রি' বলে যে কবিতাগুলিকে মেনে নেওয়া হচ্ছে তার সংখ্যা মাত্র তিনশ' পাঁচটি। কাজেই এ মুষ্টিমেয় কবিতা বাছাই করেই সংকলিত করা হয়েছে, অবশিষ্টাংশকে বাদ দিয়ে। এ ছাড়া এর আর কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ কবিতা-সমষ্টির মধ্যে তিন জাতীয় কবিতা পাওয়া যায়। প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক হ'ল 'লোক-সঙ্গীত' কবিতা বা 'ফোক সঙ্'। দ্বিতীয়, জাতীয় সঙ্গীত বা 'Song of the State' ; আর কয়েকটি কবিতা আছে যা আমাদের বেদের মন্ত্রের মত দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত বা দেবতার স্বরূপ বর্ণনায় মুখর কিংবা সৃষ্টিতত্ত্বের মূল উদ্ঘাটনে তৎপর। এক কথায় বলা যায় 'ode' জাতীয় কবিতা। শেষোক্ত 'প্রার্থনা' কবিতাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—'শাং' বংশের রাজত্ব-সময়ে রচিত (১৭৮৩১-১২২ খ্রীষ্টপূর্ব)। এ ছাড়া লোকসঙ্গীতগুলিও প্রায় এরই সমসাময়িক। বিখ্যাত চীনা লেখক কেং শু টুং বলেন, এ কবিতাগুলি রচনার মূলে ছিল কয়েকটি কারণ। প্রথমতঃ, সেই প্রাচীন সময়ে রাজার নির্দেশে যে সব বাৎসরিক মেলা বসত তাদের বৈশিষ্ট্যকে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারিত করার। দ্বিতীয়তঃ, তৎকালে রাজপুরুষগণও ঐ শ্রেণীর সঙ্গীত গেয়ে জনসাধারণের মনোভাব নিরূপণের চেষ্টায় থাকতেন। আর সেই অনুসারে রাজ্য পরিচালনার রীতিনীতি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হ'ত। এটাও রাজ-আদেশ-প্রসূতই। আর তৃতীয়তঃ, জনসাধারণও তাদের মনোভাব কবিতায় গ্রথিত করে ব্যক্ত করত। সুতরাং এ জাতীয় কবিতায় রাজপরিবারের প্রতি স্তুতি এবং ব্যঙ্গও দেখা যায়।

কবিতা-রচনার উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও বিষয় দেখে যদি কারও মনে তার কবিত্ব সম্বন্ধে সংশয় জাগে, তা হলে তা কিন্তু নিছক ভ্রান্ত ধারণাই হবে। কারণ তার উদ্দেশ্য ও বিষয় যাই হোক না কেন, কবিত্বের স্ফুলিঙ্গ তার মধ্যে যেখানে-সেখানে ঝকঝক করতে দেখা যায়। যেমন লোক-সঙ্গীত জাতীয় কবিতার কয়েকটি নিদর্শন :

১। পূর্বতোরণের দ্বার দিয়ে গিয়েছিলাম বাইরে,
মেঘের মালায় দেখলাম সুন্দরীর দল।
বাদল কেন ? আরো কোমল, আরো উজ্জ্বল তারা।
ভিড়ের অজস্রতা।
ঐ ত আমার আলো
ক্ষীণ-তন্বী, গোধূলির আলো-সম-কেবল
সে আমার প্রেয়সী

প্রাকারের মিনারদ্বারে গিয়েছিলাম বাইরে,
বিকশিত ফুলদলে দেখলাম সুন্দরীর মুখ
প্রস্ফুটিত আবেগে যেন জ্বলছে।
কিন্তু সেই ক্ষণে মনে হ'ল,—
আমার প্রেয়সী, দেবী ; তার শুভ্র বসনে রঙের শাসনে সে আমার সব।

২। যাক্ মোর তরী, লাল কাঠে গড়া,
ঐ দিকে বয়ে যাক্।
ঐ যে 'হো'-এর বাঁধন-না মানা স্রোত।
কোথা সেই সাথী মোর !
সাথীহীন এই নায়ে
যাই চলে আজ মরণের স্নেহকোলে !
জননী আমার, হায় ওগো ভগবান !
তুমি বুঝিবে না, তাও কি কখনো হয় !

যাক্ মোর তরী, লাল-কাঠে গড়া,
ঐ দিকে বয়ে যাক্।
ঐ যে 'হো'-এর তলহারা খরস্রোত,
কোথা তুমি প্রভু মোর !
না, না, কভু মোরে, শপথ আমার,
পারিব না দিতে তুলে
জননী আমার, হায় ওগো ভগবান !
তুমি বুঝিবে না, তাও কি কখনো হয় !

৩। সম্মানের সুপীত পোশাক,
নীল বহে নিত্য অপমান।
সাজিলাম নীল সাজে, ত্যজি স্বর্ণসাজ
অনায়াসে ফিরাই এ মুখ।

সাজায়েছি তনু মোর অবজ্ঞার নীলে
কে ধরিবে স্বর্ণসাজ দীর্ঘকাল ধরি ?
ভাবিতেছি জ্ঞান-গুরু ঋষিদের কথা
মিথ্যা যেন নাহি করি তাঁহাদের বাণী।

তারি তরে আজি মোর যত লজ্জা-গ্লানি।
বসে আজ ভাবি শুধু তাই ;—
ভাবিতেছি জ্ঞান-গুরু ঋষিদের কথা,
নারীর হৃদয় বোঝা এতই সহজ !

উল্লিখিত কবিতাগুলির প্রথমটির রচনাকাল ৮০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ, দ্বিতীয়টির ১১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, আর তৃতীয়টির ৭৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এখানে ভাব ও ভাবের আচ্ছাদনে যে রূপ, তা কি গাঢ় নিবদ্ধ নয়? ভাবের গায়ে রূপটি যেন কত দৃঢ় বাঁধনে বাঁধা আছে, তাকে খুলে দেখা শুধু কঠিনই নয়, হয়ত-বা অসম্ভবও। কাজেই বলতেই হবে অর্থ আর অর্থাতীত দুই ই এখানে অভিন্ন। প্রাচীন চীনা কবিতার এ একটি বৈশিষ্ট্য। প্রতি কবিতায়ই ভাব আর রূপ, অর্থ ও মূর্তি এমন দৃঢ়বদ্ধ ও ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত যে দুটিকে পৃথক করা যায় না! দুটি একই অনুভূতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ—এ পিঠ আর ও পিঠ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রার্থনা-সঙ্গীত। এরাও উৎকণ্ঠায়, আগ্রহে ভরা; সময়ে নৈরাশ্যের প্রতিধ্বনিমুখর। আর পূর্বোক্ত অভেদ ত আছেই।

অলাবু এখনো ত্যজে নি তিক্ত পাতা,
চঢ়ুল নদীতে ফুলিয়া উঠিছে জল ;—
বন্ধু আমি যে প্রতীক্ষা-বিহ্বল।

মরা-নদী বুকে এলো যে জোয়ার-স্রোত
কাঁদিছে কপোতী, কোথায় কপোত হায় !
বন্ধু গো মোর দিন যে বিফলে যায়।

শেষ খেয়া—মাঝি ঐ যে হাঁকিছে সুর
যাত্রীদলের যাত্রাও বুঝি শেষ ;—
বন্ধু আমি যে আছি চেয়ে অনিমেষ !

৭১৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত এ কবিতা কি নৈরাশ্য ও আগ্রহের অনুভূতিতে ভরা নয়? তার পর :

প্রভাত গরিমা ভাতিছে শিখরচূড়ে—
আনত আমার শির
রূপহারা আজ সাদা, লাল, নীল, গোলাপী, কুসুম, আর অশান্ত মোর মন।

দূরে ঐ হোথা শুষ্ক-নীরস-ঘাসে
চঞ্চলি ওঠে কিসের ও আলোড়ন !
সচকিতে চাহি,—ঐ বুঝি ধ্বনি, ঐ বুঝি পাদক্ষেপ
হেরিলাম এক ফড়িং ঝাপটে ডানা।

প্রতিপদ চাঁদে শৈলশিখরে উঠি
হেরিলাম তারে দখিণার পথে আসে
হৃদয়ের বোঝা নামানু শিখরচূড়ে
উন্নত মোর শির।

এর উৎকণ্ঠাকে কি অস্বীকার করতে পারা যায়? এ যেন 'পথের উৎকণ্ঠা বেগে অবাধে পাথেয় ক্ষয়'। সৃষ্টির মূলের অভ্রান্ত অগ্রগতির অনুভূতিই যেন এর লক্ষ্য।

আর জাতীয় সঙ্গীত :

রিক্ত বাগান, আগাছা ঢাকা অঙ্গন
চিরের ডালে হাসছে আবার বসন্ত
বসন্তের মুক্তি বুঝি?
ঐ যে পশ্চিম নদীর 'পরে জ্বলছে চাঁদ—

এত দিন 'শিয়াং' রাজার পুরসুন্দরীরা কোথায়?

কিংবা

ধ্বংসের স্তূপ, শহর ধ্বংস, শুনি কেবল হাহুতাশ।
'সুচৌ'র ধারে ঝরছে—ওকি কান্না !
'চৌ' রাজার দালান-শিখরে আর নদীর 'পর বৃথাই ডোবে সূর্য
দালান—সেও ত আধভাঙ্গা আর জঙ্গলে ভরা !

এর ভিতরে ব্যঙ্গের আর প্রজার অতৃপ্তির সুর শোনা যায়।

টেঙ্গি

ম্যাডলাণ্ড ডেভিস

অনুবাদক শ্রীতন্ময় বাগচী

ছোট্ট দোকানের সামনে বসে ধূমপান করতে করতে পরিচিত অপরিচিত সবার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস করাই টেঙ্গির কাজ। তার শান্ত মুখশ্রী দেখে সবার মনে হয়, সে যেন 'সব পেয়েছির দেশে'র অধিবাসী—সংসারে তার মত সুখী আর যেন কেউ নেই। ছোট্ট ছেলেমেয়ে টেঙ্গির অত্যন্ত প্রিয়। তাকেও তারা ভালবাসত সত্যি, কিন্তু তার চেয়ে বেশী বাসত তার দেওয়া মিষ্টি খাবারগুলো। রোজই তাই তার দোকানের সামনে ভিড় লেগেই থাকে।

সেদিন বিকেলে ছেলেমেয়েদের আসতে দেখে টেঙ্গি জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর সব দাদু-দিদিদের? বিকেলে কোথায় ছিলে?'

ছেলেরা বলে, 'যুদ্ধ করছিলাম।'

মেয়েরা বলে, 'রান্না করছিলাম।'

টেঙ্গি হেসে উঠে জবাব দেয়, 'বেশ···বেশ···! বড় হয়ে তোমরা নিশ্চয়ই বিখ্যাত সৈনিক আর পাকা গিন্নী হবে। এখন দেখ দেখি বুড়োর হাতের তৈরী এই খাবারগুলো কেমন হয়েছে?'

প্রত্যেকের হাতে একটা করে মিষ্টি দিল টেঙ্গি। ছেলেমেয়ের দল খেতে খেতে আর আনন্দে চীৎকার করতে করতে চলে গেল। তারা চলে যাবার কিছু পরেই কোকো এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। কোকো শুধু পুরনো খদ্দের নয় টেঙ্গির, একমাত্র বন্ধুও! দু'জনে দোকানের ভিতরে গিয়ে বসে। টেঙ্গি চা করতে আরম্ভ করল।

টেঙ্গির দোকানে জমেছে নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য জিনিস। ভারত আর চীনের নানা রকম বৌদ্ধমূর্তি, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-করা রেশমী কাপড়, ছোটখাটো মিশরীয় পিরামিড, লাল নীল সোনালী কালিতে হাতে লেখা পারস্য দেশের পুঁথিও টেঙ্গির দোকানে পাওয়া যায়।

চায়ের কাপটা কোকোর দিকে ঠেলে দিয়ে টেঙ্গি বলল, 'আজ নতুন কি জিনিস দেখতে চান?'

'টেঙ্গি—আমি ত নতুন কিছুই দেখতে আসি নি—শুধু গল্প করব বলে এসেছি। সত্যি তুমি এত ভাল লোক যে কি বলব!'

'আমি একজন নগণ্য দোকানদার অতখানি প্রশংসার সত্যি যোগ্য নই!'—বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল টেঙ্গি—'আজ যদি টাকা থাকত তবে এই সব প্রাণের চেয়েও প্রিয় জিনিসগুলি কি বিক্রী করি? যে কারণে আমি ওদের পেয়েছি তা ভাবলে অবাক না হয়ে পারি না। কেবলি মনে হয় জিনিবগুলোর মালিক জীবনের পরপারে গিয়েও যেন ওদের কথা ভুলতে পারে নি। হঠাৎ এক দিন ঐ সব মূর্ত্তি থেকে এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাই। আমায় হয় ত পাগল ভাবছেন—কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার কথার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। সে শব্দের হেতু এখনও আমি খুঁজে পাই নি। বোধ হয় স্বর্গ থেকে ওদের মালিক এসে ছুঁয়ে গিয়েছিল।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত টেঙ্গির মুখের দিকে তাকিয়ে কোকো বলল, 'আমার দৃঢ় ধারণা ছিল গ্রামের সবচেয়ে সুখী হচ্ছ তুমি। কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভাঙল! এখন বুঝছি তোমার মনে যে আগুন জ্বলছে, হাসি দিয়েই তাকে ঢেকে রেখেছ।'

এক টুকরা ম্লান হাসি খেলে গেল টেঙ্গির মুখের উপর দিয়ে।

'তোমার কথাই হয় ত ঠিক বন্ধু! চল বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। তার পর তোমায় একটা গল্প শোনাব।'

ইতস্ততঃ খানিকক্ষণ ঘুরে দু'জনে আবার দোকানে ফিরে এল। টেঙ্গি দোকানের এক গুপ্ত স্থান থেকে সূক্ষ্ম কাজ-করা রেশমী কিমানো, একগোছা হলদে চুল, একজোড়া 'গেটা' আর একটা আয়না বের করে আনল। কিন্তু সেগুলির দিকে তাকিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে থেকে নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিল টেঙ্গি। তার পর প্রদীপের সলতেটা উসকে দিয়ে বলতে সুরু করল—

'অনেকদিন আগেকার কথা। এক রাতে মুকুল-ছাওয়া বাদাম গাছগুলি দেখে আমার মনে এক অদ্ভুত আনন্দের উদ্রেক হয়। একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, ভগবান বুঝি প্রকৃতিদেবীর অকৃপণ দান আমার ছোট্ট অন্তরে ভরে দিয়েছেন। আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত আনন্দকে আরও উপভোগ করবার জন্ত সৃষ্টি করেছেন জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর অপূর্ব্ব শোভা। দেখলাম বসন্তরাণী যেন পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সখীদের অনুপম সঙ্গীত আমার প্রাণে ঝঙ্কার তুলল। বুঝলে কোকো, ভালোবাসা মানুষকে কবি করে তোলে আর সেই সময় যদি প্রাণভরে প্রেমের অমৃত পান করা যায় তবে সারা জীবন তারই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

'তখন আমি সত্যি ভালোবেসেছিলাম। ভালোবাসার সঠিক সংজ্ঞা দিতে না পারার অপরাধ নিও না। দুঃখময় অশান্ত জীবনকে শান্ত করে এই ভালোবাসা; একঘেয়ে একটানা জীবনে দেয় নূতনত্বের আস্বাদ!

'কি আকর্ষণে সুরী আমার কাছে এসেছিল জানি না। গরীব জেলের মেয়ে সে। মুখখানা কমনীয়তায় ভরা; বিনম্র স্বভাব; সরল আর উজ্জ্বল তার চোখের চাউনি। কেমন করে সে রূপের ছবি আঁকব কোকো! তখন সুরী আমাকে ঠিক ভালোবাসে না। আমি শুধু তার বন্ধু!···বন্ধু ঠিক নয়—খেলার সাথী বলতে পার।

'সুরীর কাছে কখন যে আমার মন বাঁধা পড়েছিল জানি না। কিন্তু টের যখন পেলাম তখন এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বিয়ের কথা বলামাত্রই সে কিন্তু পালিয়ে যেত। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই হাসতে হাসতে হাজির হ'ত। তার সেই মধুর হাসির রূপ ভাষা দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। এই ঘর এখনও যেন তার হাসিতে মুখর।

ধীরে ধীরে জানতে পারলাম আমার প্রণয়ে আরও এক প্রতিদ্বন্দ্বী এসে জুটেছে। তখন শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় বইতে লাগল প্রতিহিংসার স্রোত! ছলনা দিয়ে মনের ভাবকে ঢেকে রাখা কোন দিনই আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না! তখন কে জানত, প্রেমের খেলা দাবার মতই! সামান্য একটু ভুল চালে খেলা ভেঙ্গে যায়?

সুরী আমার এই অহেতুক ঈর্ষাকে অন্যায় বলে মনে করে নি। সে আমার প্রতি আরও ভালবাসা দেখাতে লাগল—যাতে আমার মনের ভ্রম দূর হয় সে জন্যে। কিন্তু আমার দুর্ব্যবহার সুরীকে উদাসীন করে তুলল। একদিন সে আমায় বলল কি জান কোকো, সে বলল,—'টেঙ্গি! অবিশ্বাসের বীজকে মাথা তুলে বাড়তে দিলে তার ফল ভাল হয় না। কেন তুমি আমাকে সন্দেহ কর?'

'কিন্তু আমি তখন ঈর্ষার আগুনে তিল তিল করে পুড়ছি, তাই তার কথায় আমার সান্ত্বনা কোথায়? কল্পনায় কেবল দেখলাম আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সুকেমিটসুর চেহারা।'

'আর এক দিন সুরী এসে চাইল সুকেমিটসুর সঙ্গে নৌকা-ভ্রমণের অনুমতি!

'জান কোকো, সুরীর সেকথা আমার অন্তরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। মনের ভাব গোপন করে যাবার অনুমতি দিলাম। সেদিন থেকে তাকে ভুলবার, তাকে এড়াবার কত চেষ্টা করলাম। কিন্তু হায়! সবই বৃথা হ'ল!

'সুরী আর সুকেমিটসুর নৌকা ভেসে গেল নদীর বুকে। আমি তীরে দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল এদের এই নিরুদ্দেশ যাত্রা শেষ হবে কোন অখ্যাত পল্লীতে। সেখানেই হবে তাদের পরিণয়। তার পর সুখে শান্তিতে কেটে যাবে ওদের বাকি জীবনটা···

'একমনে কতক্ষণ চিন্তা করেছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখি নৌকা তীরের দিকে ফিরছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম সুকেমিটসু ধীরে ধীরে দাঁড় টানছে আর সুরী যেন স্থাণুর মত হাল ধরে বসে আছে। চাঁদের আলো সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে। সুকেমিটসু সুরীর পাশে এসে বসে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। হাতের সে বাঁধন থেকে মুক্ত হবার জন্য সুরী তাকে ধাক্কা দিতেই নৌকা উল্টে গেল।'

এক মুহূর্ত্ত দেরি না করে জামা-কাপড় খুলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু সুকেমিটসু আমাকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে কেবলই চেষ্টা করতে লাগল। কতবার ডুবলাম, কতবার উঠলাম—তার ঠিক নেই। একবার মনে হয় সমুদ্রেই বুঝি আজ চিরনির্ব্বাণ লাভ হবে, কিন্তু কিছু দূরে নিমজ্জমান সুরীর কণ্ঠ থেকে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ আমার কানে এসে পৌঁছতেই সুকেমিটসুকে বললাম, 'সুরী ডুবে যাচ্ছে, শীগগির ছেড়ে দাও আমাকে।'

উত্তর এল—'ডুবুক গে যাক্‌।'

অনেক চেষ্টা আর কৌশল করে তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সুরীর অচেতন দেহটা তীরে তুলে আনলাম। মুখ ফিরিয়ে জলের দিকে তাকাতেই দেখি এক বিরাট কুমীর প্রকাণ্ড হাঁ করে সুকেমিটসুর দিকে এগিয়ে আসছে। তার মুখখানা ভয়ে পাংশুটে হয়ে গেছে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কুমীর তাকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল তার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

এর পরের ঘটনার প্রায় কিছুই মনে নেই। তবে এটা বেশ মনে পড়ে, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউগুলো তীরের দিকে ছুটে এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। আর আমি আমার শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ঢেউয়ের তালে তালে সুরীর দেহটাকে টেনে এনে তীরে উঠেছিলাম।···

সকালে জ্ঞান হতে দেখলাম আমি সেই সমুদ্রতটে পড়ে আছি, আর কে যেন কোমল স্পর্শ আমার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ মেলতেই সুরীর মুখখানা চোখে পড়ে গেল। আমার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে আছে সে। সমস্ত অন্তরটা অব্যক্ত বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। সুরীকে সামান্য ধন্যবাদ জানানোর ভাষাও খুঁজে পাই না। শুধু দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু। সুরী ফিস ফিস করে বলল, 'টেঙ্গি, সমুদ্র আজ আমাকে যে দুর্লভ জিনিস হাতে তুলে দিয়েছে তা হচ্ছ তুমি।'

টেঙ্গি হঠাৎ চুপ করে যায়।

কোকো এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, 'তার পর! নিশ্চয়ই তুমি সুখী হয়েছিলে।'

'না কোকো না।'—টেঙ্গি মাথা নাড়তে নাড়তে আবার বলতে সুরু করল—'সুরীকে বিয়ে করলাম বটে, কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরে সে একদিন বলল, সুকেমিটসুর সঙ্গে নৌকাভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার জন্য নাকি আমার উপর তার ভালবাসা জন্মে যায়। বিয়ের পরের দিনগুলো হাসি আনন্দের মাঝে কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পেলাম না। কিছুদিন বাদে সুরীর কোল জুড়ে আগমন হ'ল নবজাত শিশুর। আমাদের আনন্দ তখন ষোলকলায় পূর্ণ। তার নাম রাখলাম হাসনাহানা। সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহটাকে বাসায় এনে ফেলতে পারলে আর ভাবনা ছিল না। সুরী গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে পরিতৃপ্ত করত।'

'কোকো, এসব কথা এখন স্বপ্ন বলেই মনে হয়। একদিন কাজের চাপে অনেক দূর যেতে হয়েছিল। ফেরবার পথে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামছি এমন সময় হঠাৎ ভীষণ বজ্রপাত হতে লাগল। উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর শব্দ! পৃথিবী যেন থর থর করে কাঁপছে। সমুদ্রের জল যেন উন্মত্তের মত লাফাচ্ছে! আমার পায়ের তলার মাটি থর থর করে কেঁপে উঠল। প্রবল তরঙ্গস্রোত বন্যার বেগে ছুটে এসে সমস্ত গ্রামখানাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমি সজোরে একটা গাছকে আকড়ে ধরলাম। তা না হলে সে স্রোত আমাকে কোথায় ছিটকে নিয়ে যেত তার ঠিক নেই।

'ঝড় থেমে যেতেই দেখলাম বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বুড়ো-বুড়ীর প্রাণহীন দেহ জলে ভেসে যাচ্ছে। প্রাণের চেয়েও যারা প্রিয় তাদের দেখবার জন্য জলকাদা ভেঙে ব্যাকুল চিত্তে ছুটে চললাম আমার সেই ছোট্ট বাড়ীর দিকে। গিয়ে কি দেখলাম জান কোকো? আমার সুখের মন্দির মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—ভগ্নস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে আছে সুরী আর হানার প্রাণহীন দেহ!...'

বুড়ো টেঙ্কি আবার চুপ করে গেল। তার দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বেদনার অশ্রান্ত অশ্রুর ধারা। সুরীর কিমানোটা হাতে নিয়ে আকুল নয়নে দেখতে লাগল। ধীরে ধীরে চোখে মুখে ফুটে ওঠে আনন্দ উৎসাহের দীপ্তি। বুঝলাম তার শোকের বেগ অনেকটা কমে এসেছে।

কোকো হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—'তোমাকে ও রকম দেখাচ্ছে কেন টেঙ্কি? তুমি কি কাউকে দেখতে পেয়েছ? শীগগির বল...'

টেঙ্কি আনন্দে লাফিয়ে উঠে ঘরের জানালাগুলো খুলে দিল। তারপর রাস্তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দেখ...দেখ...কোকো... তারা এগিয়ে আসছে। অনেকেই আছে দলে...লোকান্তরিত আত্মার কি ভিড়! পাহাড় ডিঙিয়ে...সাগর পার হয়ে...রাজপথ ধরে...ঐ যে ঐ যে, তারা এগিয়ে আসছে...। আমি নিশ্চিত জানতাম সে আসবেই...ঐ দেখ সুরীর কোলে হানা। কোকো... দেখ...দেখ সুরী কি সুন্দর দেখতে...চোখেমুখে কি রকম উজ্জ্বলতা...'

ঘরময় আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, টেঙ্কি আর নিজেকে সামলাতে পারে না। কাঁপতে কাঁপতে সেই যে সে পড়ল আর উঠল না। কোকো তাড়াতাড়ি আয়না, চুলের গোছা টেঙ্কির হাতে দিয়ে রেশমী কিমানোতে সমস্ত শরীর ঢেকে দিল।

বুড়ো টেঙ্কি এত দিনে চরম শান্তি পেয়েছে, সে বিষয়ে কোকোর আর কোন সন্দেহ থাকে না!

উমেশচন্দ্র রায়

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

১৮৩৫ সনে পারিবারিক বিপর্য্যয়ে উমেশচন্দ্র রায় বিহার-প্রবাসী হন। মজঃফরপুর শহরে ফার্সী শিক্ষা করিয়া এখানেই ওকালতি আরম্ভ করেন। ঐ শহরের বর্ত্তমান কেদার-নাথ রোডে বিরাট বসতবাটী ও অন্যত্র বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া ১৯১৫ সনে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বাস করেন। তাঁহার আগমনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই সরকারী কর্ম্মসূত্রে এক দল বাঙালী এখানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন উমেশচন্দ্রের মাতুলস্থানীয়। উমেশচন্দ্র খেয়াযোগে বিশাল পদ্মানদী পার হইয়া কাটিহার পথে ঐ শহরে উপনীত হন। পাচকের কাজ করিতে করিতে তিনি ফার্সী শিক্ষা করেন। ঐ ভাষায় আইন পড়িয়া তিনি 'বারে'র সভ্য হন। এই সময় দুইটি ঘটনা তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়া দেয়। একদিন খেয়াযোগে নদী পার হইতে-ছিলেন। জজ সাহেবের স্ত্রীও সেই খেয়ায় ছিলেন, মাঝ-নদীতে হঠাৎ জলে পড়িয়া যাইবার মত হইলে উমেশচন্দ্র তাঁহাকে ধরিয়া রক্ষা করেন। তিনি স্বামীর নিকট সুপারিশ করিয়া উমেশচন্দ্রের পসার বৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দেন। ঐ সময় জনৈক হিন্দু জমিদারের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া দুই পক্ষ মামলা করেন। উহার এক পক্ষ মুসলমান। এই পক্ষ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, স্বর্গীয় জমিদারের সম্পত্তি তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বেই আছে। কিন্তু খাতাপত্রে গণেশজীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। উমেশচন্দ্র ঐ বিষয়ে বিচারকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলেন, "মুসলমান কর্ত্তৃত্বে থাকিলে খাতায় কখনই গণেশজীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইতে পারিত না। অতএব উহা নিশ্চয়ই হিন্দু-পক্ষের ব্যবস্থাধীনে আছে।" বিচারক যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া হিন্দুপক্ষকে উত্তরাধিকার দেন। তদবধি উমেশচন্দ্রের প্রভাব বাড়িতে থাকে। দ্বারবঙ্গের মহারাজা প্রভৃতি ভূস্বামীগণ তাঁহাকে নিজ উকিল নিযুক্ত করেন। অল্পকালেই তিনি তিন লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেন।

মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার চেতুয়াবাসুদেবপুর গ্রাম উমেশচন্দ্রের জন্মস্থান। এই গ্রামের উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কাশ্যপ দত্তবংশীয় মুরলীধর সম্ভবতঃ বাংলার শিবাজী রাজা

শোভাসিংহের প্রপিতামহ রাজা রঘুনাথ সিংহের (শহীদ ক্ষুদিরামের ভগ্নীবাড়ী হাটগেছে রায়বংশে এই রাজার সন ১০২১।১৫ ভাদ্র তারিখের ছাড় আছে) সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ঠেঙ্গাপুর বা মীরণপুর হইতে রাজকর্ম্মসূত্রে এখানে আসিয়া বাস করেন ও চেতুয়া পরগণার ছয় আনার মালিক হন। এই সময় ইঁহাদের উপাধি হয় রায়চৌধুরী। মুরলীধরের পুত্র দামোদর রায়চৌধুরীর নিকট হইতে রাজা হেমন্ত সিংহ সন ১১১৬ সালের ২৩শে বৈশাখ এই জমিদারী লইয়া ইঁহাদের গৃহদেবতা শ্রী৺রাধাবল্লভ জীউ প্রভৃতির সেবার জন্য বাসুদেবপুর প্রভৃতি সাতটি গ্রামে এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। বাসুদেবপুরের বেড়বাড়ী ও মহাত্রাণ গড়বন্দী ইহার সামিল। পরবর্ত্তী ভূস্বামী সন ১১২৩।৩১ চৈত্র এই দান মঞ্জুর করেন। চেতুয়া পরগণার দামোদরপুর গ্রামটি ইহার নামেই হওয়া সম্ভব। দামোদরের ভ্রাতা হরেকৃষ্ণের পুত্র রামনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলাপ রায় ও কনিষ্ঠ মদনমোহন রায়। গোলাপ রায় বা গুলাব দত্ত বাসুদেবপুর হাটে ইসলামীয় রীতির দেউলটি নির্ম্মাণ করান। বর্দ্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র বাং ১১৬৩।১১ চৈত্র ও ১১৭২।১৩ ফাল্গুন দুইটি সনন্দ দ্বারা ইঁহার পৈতৃক মহাত্রাণ

উমেশচন্দ্র রায়

নিষ্কর দখল মঞ্জুর করেন। গোলাপের পাঁচ পুত্র—পঞ্চানন, জগৎ, নয়নানন্দ, রামশঙ্কর ও ভক্তরাম। মদনের পুত্রদ্বয় গয়ারাম ও দেবীচরণ। ১২০৯ সালের ৫২৫৬৭ ও ৫২৫৭১ নং তায়দাদদ্বয় জগৎ, ভক্তরাম, গয়ারাম, পঞ্চানন প্রভৃতির নামিত। ব্রিটিশ সরকার উহাতে এই বংশের দেবোত্তর, মহাত্রাণাদি স্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

গোলাপের চতুর্থ পুত্র রামশঙ্করের তিন পুত্র কৃষ্ণকান্ত, নবকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ। কৃষ্ণকান্ত অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বাবধি এই বংশে দৈনিক এক শত ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণকান্ত স্বীয় বদান্যতায় বহু পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। নিম্বার্কমঠের তৎকালীন মহান্ত চতুরশরণ ও চৈতন্যশরণ এই সম্পত্তির ক্রেতা। কৃষ্ণকান্তের পুত্রদ্বয় মহেশ ও উমেশ। পারিবারিক বিপর্য্যয়ের সময়ে ১৮৩১ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। কৃষ্ণকান্ত এই সময় নিঃস্ব হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হন ও বর্দ্ধমানরাজ তেজেশ-চন্দ্রের রাজধানীতে কোন মন্দিরে কার্য্য গ্রহণ করিয়া অজ্ঞাত-বাস করিতে থাকেন। নিজের বেতন হইতে দৈনিক এক টাকা দান না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। তিন লক্ষ টাকা সঞ্চয়ের পর উমেশচন্দ্র পিতার সন্ধানে বহির্গত হন ও বর্দ্ধমানরাজের সহায়তায় নাটকীয় ভাবে পিতাপুত্রের মিলন ঘটে। পিতাকে স্বগ্রামের বাস্তুতে বাস করাইয়া উমেশচন্দ্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ, প্রাচীন মণ্ডপাদি সংস্কার, পুষ্করিণী খনন ও সোপান প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করাইয়া দেন। নাড়াজোল রাজবংশের অংশ জোড়াগেড়ে মহাল খরিদ করান ও বাসুদেব-পুর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের পত্তনীস্বত্বের মালিক করিয়া দেন।

কৃষ্ণকান্ত গ্রামে হাট স্থাপন করেন। নিজে সাহায্য করিয়া তিনি গ্রামের সকল জাতির দ্বারা দুর্গোৎসব করাইতেন। এই সময় বাগ্দী, দুলে ও হাড়িরাও তাঁহার সাহায্যে দুর্গোৎসব করিত। সর্ব্বসমেত গ্রামে পঁচিশখানি প্রতিমা হইত। উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের ছাত্র কলমিজোড়-নিবাসী পণ্ডিত লক্ষ্মণ শিরোমণির (ইং ১৮৯২ এর টোলের তালিকায় ইঁহার নাম আছে) দ্বারা নিজ বংশের দুর্গাপূজার পদ্ধতি লিখাইয়া কৃষ্ণকান্ত সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন। কয়েক দিন ধরিয়া ভুরিভোজনের ব্যবস্থায় দিবারাত্রির মধ্যে লুচির কড়া চুল্লী হইতে নামিত না। গ্রামবাসিগণের ঘরে ঐ কয়দিন হাঁড়ি চড়িত না। প্রতি পূজাবাটীতেই সকলের নিমন্ত্রণ তিন দিনব্যাপী। পূজার সর্ব্বপ্রকার যোগাড়দারগণের জায়গা নির্দিষ্ট ছিল। সপ্তমী, সন্ধি ও নবমীতে বলিদান হইত। বাদ্যধ্বনির সঙ্কেতে ৺জয়চণ্ডীর আরতি, তাহার

সঙ্গে বেথুয়াবাটীর কালীমন্দিরে বলি ও সেই সঙ্গে পরগণার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের সকল প্রতিমারই সন্ধিপূজা নিয়ন্ত্রিত হইত। সন্ধির সময় পাটের কাঠি, সোনার শাঁখা, পাড়শখা, মোমবাতি ও মিঠাই নিবেদন করিবার প্রথা ছিল। নবমীর রাত্রে শিবাভোগ ও দশমীতে বিসর্জ্জনের পর রাত্রিকালে দক্ষিণান্তে ও জ্যেষ্ঠক্রমে অপরাজিতা-বন্ধন হইত। কয়েকটি ব্রাহ্মণ-পরিবার পূজার বস্ত্রগুলি বৃত্তিস্বরূপ পাইতেন। ইহার অবশিষ্ট সকলই পুরোহিতগণের প্রাপ্য ছিল। প্রতিমায় গণেশ ও কার্ত্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উপরিভাগে থাকিতেন। চেতুয়ায় দাসপুরের চৌধুরী, বলিহারপুরের রায় (সৌকালিন ঘোষ), রাধাকান্তপুরের তালুকদার, বসু ও সয়লার সিংহ বংশেও এই রীতিতে প্রতিমার দেবতা-বিন্যাস-বিধি। বসুবংশে "কায়স্থ কুলদর্পণ" নামক প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল—উহা মুদ্রিত হইয়াছে। বাসুদেবপুরে দেশনালার উপরিস্থ পাকা পুল ও হেদুয়ার ঘাটের পাশের অষ্টশাল চতুষ্টয় রায়কুলের কীর্ত্তি। বিজয়ার মহামেলাও কৈলাস মুখোপাধ্যায় এবং উদয় রায় স্থাপন করেন।

উমেশচন্দ্রের বিহার গমনের পূর্ব্ববৎসরই বাসুদেবপুরে প্রথম শ্মশানকালী পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। ১২৪২ সালে কৃষ্ণকান্ত নিরুদ্দিষ্ট হইলে মহেশ ও উমেশ মাতার অধীনে পৃথগন্ন হন। ঐ বৎসরই উমেশচন্দ্র ভাগ্যান্বেষণে বিহার গমন করেন। ১২৪১ সালে ঐ পূজা আরম্ভ ধরিয়া আমি ঐ পূজার বয়স পঞ্জিকাসমূহে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। বারোয়ারীর খাতাতেও ঐ বয়স আমার আমল সন ১৩৪৬ সাল হইতেই লিখিত হইয়া আসিতেছে। এই পূজায় আলিপনা, পঞ্চগুঁড়ি, বরণডালা ও দক্ষিণান্ত রায়বংশের বৃত্তি। নানা সাধারণ সৎকার্য্যেও কৃষ্ণকান্ত অগ্রণী ছিলেন। ঐ সকল সৎকর্ম্মের মূল উৎস ছিলেন উমেশচন্দ্র। সমাজের কর্ত্তৃত্ব করিতেন কৃষ্ণকান্ত। ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিকেই তাঁহার নিকট হইতে অশৌচান্তে অনুমতি লইতে হইত। সরকার নিযুক্ত প্রধান বিচারক বা সালিস ছিলেন তিনিই। তাঁহার বিচারের একটি নথি এবং রায় এখনও আমাদের নিকট আছে। অধ্যাপক-সমাজ তাঁহার সময় পর্য্যন্ত বার্ষিক সম্মান পাইতেন। থানাকুল কৃষ্ণনগরের কণাদবংশীয় হরদাস তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণকে লিখিত একটি পত্রে ঐ মানের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণকান্ত কর্ত্তৃক নিষ্কর দানের একটি সনন্দ বিদ্যালঙ্কার-বাটীতে আছে। সামাজিক আচার আচরণ প্রভৃতির তিনিই ছিলেন আদর্শ।

সন ১২৭৭ সালের চৈত্র মাসে কৃষ্ণকান্তের লোকান্তর হইলে যে দানসাগর শ্রাদ্ধ হয় তাহাতে অধ্যাপক-বিদায়ের অধ্যক্ষতা করেন লেখকের পিতামহ সুরনাথচূড়ামণি। ইনি বিখ্যাত নৈয়ায়িক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের একমাত্র পুত্র। এই শ্রাদ্ধসভায় সমবেত অধ্যাপকগণ ইহাকে চূড়ামণি উপাধি প্রদান করেন। বারাণসী, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের শত শত অধ্যাপক আমন্ত্রিত হন। বাসুদেবপুর, চাঁদপুর, রাধাকান্তপুর, বলিহারপুর, হাটগেছে প্রভৃতি গ্রামের সকল বৈঠকখানাগুলিই অধ্যাপকগণের অবস্থানের জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বোচ্চ বিদায় ছিল দুই শত টাকা, পাথেয় এক ভরি সোনা, তৈজস, ছাত্র ও ভৃত্যবিদায় আর সিধা। ষোড়শের একটি খাট এখনও লেখকের বাটিতে আছে। কাঙালী-ভোজনের সময় মুড়ি ও মুড়কি পড়িয়া প্রায় এক পোয়া পথ আচ্ছন্ন হয়। ভূরিভোজনের প্রচুর ব্যবস্থাসমেত এরূপ শ্রাদ্ধ এ অঞ্চলে আর হয় নাই। সমগ্র পরগণাবাসী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ইহাতে আহূত হইয়াছিলেন। গ্রামের শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণকান্তের পুণ্যের পরিচয় আপনি আর আপনার পুণ্যের পরিচয় আপনার পুত্রগণ"—পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।"

মুর্শিদাবাদ-কান্দীর সন্নিহিত যজান গ্রামবাসী বিশ্বেশ্বর ঘোষের সহিত উমেশচন্দ্র মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দেন। ঐ গ্রামেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মী রামকমল সিংহের নিবাস। উমেশচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীরাখালদাস ঘোষ, বি-এ বৃন্দাবন ও অনুপসহরে লালাবাবুবংশীয় কুমার জগদীশ সিংহের জমিদারীর কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তৎপুত্র শ্রীশৈবালকুমার ঘোষ, বি-এসসি, এল-টি মথুরা নেতাজী সুভাষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি বর্ত্তমানে বিন্ধ্যপ্রদেশের সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। রমেশচন্দ্রের সময় বাসুদেবপুরের দক্ষিণ রাঢ়ীয় দত্তবংশের কুমুদনাথ রেভিনিউ বোর্ডের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনিই প্রবাদবাক্যের "বাবু দত্ত কুমুদনাথ, সুবা বাংলা যাঁহার হাত, ইচ্ছা হলে দিনকে যিনি করতে পারেন রাত"। সেরেস্তাদার কুমুদনাথের পৌত্র গণেশনাথ কলিকাতা বড়বাজার ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। উমেশবাবু ও কুমুদবাবু দুর্গাপূজার সময় [illegible] পাল্কিযোগে উলুবেড়িয়ার ষ্টীমারঘাট হইতে বাড়ী আসিতেন। বাড়ী আসিয়া উমেশচন্দ্র সকল জাতিরই ঘরের কুশলাদি লইতেন। সাধ্যমত সকলেরই অভাব অভিযোগ পূরণ করিতেন। প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। ভ্রাতুষ্পুত্রের দুর্ব্যবহারে উমেশচন্দ্র শেষে পত্তনীস্বত্ব ছাড়িয়া দেন।

পুরোহিত-বাটীতে উমেশচন্দ্র সাগ্রহে প্রসাদ পাইতেন। কখনও-বা এজন্য গৃহদেবতাগণের সেবায়েত-বাটীতে প্রচুর সিধা পাঠাইয়া দিতেন। রায়গুণাকর বংশীয় পুরোহিত ন্যায়ভূষণের পৌত্র মহানুভব সতীশচন্দ্র রায়কে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। সুরনাথ চূড়ামণিও সতীশচন্দ্রকে স্বহস্তে সহি

করিয়া কয়েকটি ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার দেন। ১৩১৪ সালে তাঁহার আহ্বানে সতীশচন্দ্র মজঃফরপুর গেলে তিনি কোন শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে কাশ্মীরী শালজোড়া, বিবিধ তৈজস উপহার দেন। ঐ শালজোড়া ও বৃহৎ সামিয়ানা কোন রাজা মামলায় জয়লাভ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সামিয়ানাখানি গ্রামের সকল বৃহৎ কাজকর্ম্মে ব্যবহৃত হইত। গ্রামের শিক্ষিত ও বৃদ্ধ সকলকেই তিনি বহু প্রীতি-উপহার দান করিতেন।

উইলে তিনি বিবিধ সৎকার্য্যে দান করিয়া যান। রাইন গোপালনগরের উমেশ গ্রন্থাগার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। কোন পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে গোপালনগর গেলে উক্ত গ্রামবাসিগণের অনুরোধে তিনি ঐ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার বর্ত্তমান পুলিস কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী তাঁহার নিকট-আত্মীয়। উমেশচন্দ্রের খুল্লতাত প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রাজচন্দ্রের দুই পুত্র, ব্রজেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র। ব্রজেন্দ্রবাবু বি-এ পাস করিয়া অকালে গত হন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু বিহার পূর্ত্তবিভাগের এস-ডি-ও হন। ১৩৫৪ সালে তিনি লোকান্তরিত হইলে "সার্চ্চ লাইট" পত্রিকা আবেগময়ী ভাষায় শোক প্রকাশ করেন। কেবল এই ভ্রাতুষ্পুত্রগণই নহে—অন্যান্য বহু আত্মীয় ও স্বজাতীয় উমেশচন্দ্রের সাহায্যে সুশিক্ষিত হন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের চারি পুত্র সুশীল, সুধীর, সুনীল ও সুবোধকুমার উচ্চশিক্ষিত ও বিহার সরকারে কর্ম্মে নিযুক্ত। ইঁহারা ডিহ্‌রি-অন-শোণের শিবগঞ্জবাসী।

১৩২২ সালের ৩০শে আশ্বিন রবিবার (১৭ই অক্টোবর, ১৯১৫) বিজয়া দশমীর দিন উমেশবাবু পরলোকগত হন।

এক দিন

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

একেক দিন আসে যেন সে কবেকার
হারানো অতীতের নীরব বেদনার স্মৃতির সুধাভরা,
যেন সে পাড়াগাঁর আবেশ-বিহ্বল লাজুক রূপবতী—
গভীর মমতায় দু'চোখ ভরো ভরো
অধর কাঁপে তার আবেগে থরো থরো
প্রথম প্রকাশের নিবিড় নিরালায়!

এমন দিন আমি কখনো চেয়েছি কি
কখনো মনে মনে অথবা কথাতেও?
তবু এ সকালের পাখীর ডানা বেয়ে নরমমিঠে রোদে
সবুজ ঘাস-রঙ শিশির ভেজা সেই সবুজ সাড়িটিতে
সে এসে উঁকি দেয় ডাগর চোখে চেয়ে
নীরব এ-মনের নিতল জানালায়।
আধেক জেগে থাকা, আধেক ঘুম ঘুম
কী এক শিহরণ—
সে যেন ভীরু হাতে প্রথম সেতারের
সলাজ আলাপন!
তখন মনে হয় হৃদয় ডানা মেলে
হাল্কা মেঘ হয়ে শরৎ আকাশের
কোথাও উড়ে যাক—
কোথাও নিঃসীম সুদূর ঠিকানায়;
তখন মনে হয় চেয়েছি এই তো,
চেয়েছি কত শত হারানো দিবসের
সে-দিন-রজনীর জীবন-বাসনায়।
বুঝেছি এ-হৃদয় আশায় বেঁধে বুক
ফিরেছে খুঁজে যাকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে
সারাটা দিনমান, আকুল পথ চেয়ে—
আসে না আসে না সে; মিলনের লগ্ন বিফলে বয়ে যায়।

শিৎস, সুইজারল্যাণ্ড

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

নয়

২৭শে মে, '৫৪। কাশ্মীর যদি ভূস্বর্গ হয়, সুইজারল্যাণ্ড তা হলে স্বর্গই। যে দেশের এমন বিপুল সৌন্দর্য্য-সম্পদ, যেখানে চার পুরুষ ধরে শান্তির ফোয়ারা বইছে, সে দেশ স্বর্গ নয়ত কি!

সুইজারল্যাণ্ডে সাধারণতঃ লোকে বেড়াতেই আসে। অবশ্য বেড়ানোর আবার অনেক রকমফের আছে। আমেরিকান টুরিষ্ট ডলার ছিটিয়ে ছড়িয়ে উড়ে উড়ে চলে। আর ইংলণ্ডে পাঠরত ভারতীয় ছাত্র কন্টিনেন্টে বেড়াতে আসে সারা বছরের জমানো পয়সায়। সে এক জায়গায় চ'দণ্ড দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উপভোগ করতে চায়।

বেড়ানো ছাড়া সুইজারল্যাণ্ডের আরও অন্য আকর্ষণ আছে। বিত্তশালী এশিয়াবাসীরা এখানে আসে এপেণ্ডিসাইটিস অথবা চোখের ছানি কাটাতে। উৎসাহী যুবক-যুবতীরা শীতের দিনে নিরিবিলি ঘরের কোণ ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ডে আসে বরফের উপর স্কি ও স্কেট করতে। টুরিষ্টস লিটারেচারে লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে অনেকে উঠতে আসে ইয়ুঙফ্রাও-য়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান প্রধান দেশের কুটনীতিবিদরাও এখানে হামেশাই হাজির হন বৈঠক করতে। আর যত বিদেশী এদেশে আসে সবারই একটা গৌণ উদ্দেশ্য থাকে ঘড়ি কেনা।

ইণ্টারন্যাশনাল কৃষকারি এগজিবিশনে কৃত্রিম হ্রদ

ইন্টারন্যাশনাল কুকারি এগজিবিশনে আন্তর্জাতিক রেস্তোরাঁ, বার্ন

"ফারনাণ্ডো বলল, "ইটস সুইট অ্যাজ লাইক ইউ, হানি।"

ইন্দ্র বলল, দেখ, এটা মিলান নয়। যত্রতত্র রসিকতা চলবে না।

মেয়েটি ফারনাণ্ডোকে বলল, "দেন হ্যাভ সাম মোর"—'তা হলে আরও কিছু নাও।'

মেয়েটির সঙ্গে ফারনাণ্ডোর আরও কিছু কথাবার্ত্তা হ'ল। তার একটি কথার জবাবে ফারনাণ্ডো গলা বাড়িয়ে কিছু বলার আগেই মেয়েটি ট্রলি ঠেলে চলে গেছে।

ইন্দ্র বলল, বলেইছিলাম ত, এটা মিলান নয়। কেমন হ'ল?

আমি এতক্ষণ নীরব শ্রোতা ও দর্শক ছিলাম। এবার ফারনাণ্ডোকে একটু সহানুভূতি জানালাম—এক মাঘে শীত পালায় না, কি বল ফারনাণ্ডো! দধীচির হাড় আমাদের চাই না। ঐ চকোলেটই আমাদের বজ্র হবে।

হঠাৎ মনে হ'ল সূর্য্য যেন নিভে গেল। চারদিকে মসীকৃষ্ণ অন্ধকার। কিন্তু সে মাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্যে। হঠাৎ আবার দপ করে কামরার আলোগুলো জ্বলে উঠল। বুঝলাম 'সিমপ্লন পাস'-এ ঢুকেছি। চকোলেট-মাহাত্ম্যে আল্পসের টানেলটার কথা খেয়ালই ছিল না।

একটানা একটা গম্ গম্ শব্দ হয়ে চলল।

টানেলের ওপারে সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্ত-ষ্টেশন ব্রিগ। ওখানে আর এক দফা পাসপোর্ট মালপত্র নিয়ে বোঝাপড়া হ'ল। ভারতীয় আমরা কি জানি কেন সব জায়গাতেই চটপট রেহাই পেয়ে যাচ্ছিলাম। অনেক ভেবেও কারণ খুঁজে পাই নি।

আমরাও চলেছি 'বার্ন'-এ। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কুকারি এগজিবিশন দেখা।

আজকের প্রগতিশীল এগজিবিশন-জগতে শুধু ছবি, ফোটো কি বাগবাজারের সার্ব্বজনীন পাঁচমিশেলী পূজা-প্রদর্শনী নয়, এখন ক্যালেণ্ডার, পুতুল, খোদিত এবং খচিত কাঠের গুঁড়ি ও ডাল, ছেঁড়া কাগজের তৈরী জিনিষপত্র, বইয়ের প্রচ্ছদপট, এ সবেরও প্রদর্শনী বেশ জাঁকে উঠেছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক রান্নার প্রদর্শনীর কথা কোন কালেও শুনি নি। গতকাল টমাস কুকের আপিসে শুনে আজই আমরা বার্নের টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে বসেছি।

ইটালীর সীমান্ত-ষ্টেশন দোমোদসসোলায় কণ্ডাক্টরটি ইংরেজী, ইটালীয়ান, ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মান চারটে ভাষায় যেন মুখস্থ আওড়াল—পাসপোর্ট ও যে সব মালপত্র শুল্কবিভাগকে দেখিয়ে নিতে হবে সেগুলো তৈরি করুন।

পাসপোর্ট এবং ওসব হাঙ্গামার পাট চুকল। কণ্ডাক্টর বদল হ'ল, বোধ হয় ড্রাইভারও। ট্রেন চলতে সুরু করলে একটি সুইস মেয়ে ট্রলী ঠেলে চকোলেট বেচতে এল।

খাবার জিনিসের মধ্যে সুইস 'চীজ'টার সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের কোন্ জমিতে যে কাকাও গাছ জন্মায় সেটাই আঁচ করবার চেষ্টা করছিলাম। গরম দেশের গাছ ওটা। পরে অবশ্য ঐ সুইস মেয়েটিই বলেছিল, সুইজারল্যাণ্ড মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কাঁচা চকোলেট কেনে। তার পর দুধ মিশিয়ে অথবা দুধ ও বাদাম মিশিয়ে চকোলেট-বার তৈরি করে। অপূর্ব্ব সুস্বাদু! তৈরির হাত বটে।

মেয়েটির কাছ থেকে চকোলেট কিনে আমরা ত একমুহূর্ত্তেই নিঃশেষ করেছি। খানিক পরে দেখি মেয়েটি আবার ফিরে এসেছে। জিজ্ঞেস করল—কেমন লাগল?

বার্নের ইয়ুথ হোষ্টেলে গিয়ে আবার ফ্যাসাদ বাড়ল। ইন্দ্রর বয়স পঁচিশের উপরে। ওর ইয়ুথ বুঝি প্রায় অতিক্রান্ত। তাই ওকে ইয়ুথ হোষ্টেলে থাকতে দেওয়া হ'ল না। এমন চমকপ্রদ অভিনবত্বের জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ইন্দ্র অগত্যা কাছাকাছি একটা হোটেলে আশ্রয় নিল। আমি আর ফারনাণ্ডো ইয়ুথ হোষ্টেলেই বাসা বাঁধলাম।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বার্ন শহরের গোড়াপত্তনের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত শহরটি যে ভাবে গড়ে উঠেছে, ঠিক সে ধারাটুকু বার্নের বাসিন্দারা সযত্নে রক্ষা করে চলেছে। পুরোনো বলে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন কিছু করার প্রয়াস এখানে নেই। এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাটি সত্যিই চোখে পড়ার মত।

শহরটি ছোট। ঘণ্টাতিনেক হেঁটে বেড়ালেই দর্শনীয় জিনিসগুলো দেখা হয়ে যায়।

সকলের আগে উল্লেখ করতে হয় শহরের সেরা ক্লক-টাওয়ারটির কথা। ঘড়ির ঘণ্টাটি যখন বাজে, তখনকার সেই 'ফিগার-প্লে'

দেখার জন্যেই বিদেশীরা বার্নে আসে। দুপুর বারোটায় স্বভাবতঃই টাওয়ারের আশেপাশে ভিড় হয় বেশী। ঘণ্টাটা যে বারো বার বাজবে।

বেয়াটুস হোলেনের গুহায় "ষ্ট্যালাকমাইট"

ঠিক ঘণ্টাবাজার আগে ক্লক-টাওয়ারের মোরগটি ডেকে উঠে। 'ফাদার টাইম' 'আওয়ার-গ্লাস' ঘুরিয়ে হাতের লাঠিটা দিয়ে মুখ নেড়ে ঘণ্টা গোনে। সিংহ মাথা ঘুরিয়ে 'ফাদার টাইম'-এর দিকে চেয়ে থাকে। নীচে কতকগুলি ভালুক বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। উপরে সোনার বর্মপরা এক নাইট হাতুড়ি দিয়ে ঘণ্টা বাজায়।

মধ্যযুগের স্থাপত্য-শিল্পের একটা আশ্চর্য্য নিদর্শন হ'ল বার্নের আর্কেডগুলি। প্রত্যেক রাস্তার দু'পাশে বাড়ীগুলির নীচ দিয়ে চলে গেছে লম্বা টানা আর্কেড। পথের গাড়ী-ঘোড়া, হট্টগোল বাঁচিয়ে বেশ নিরিবিলিতে বিপণি-সজ্জা দেখে বেড়ানো যায়, নয়ত দল পাকিয়ে গল্পগুজবও বেশ জমে। শীতের দিনে আবার বরফের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়।

বার্ন শহরের আরও একটি বিশেষত্ব হ'ল রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফোয়ারা ও জলাধারগুলি। জলাধারগুলির মাঝখান থেকে একটি করে থাম উঠেছে। থামের মাথায় একটি করে বিশেষ কারও মূর্ত্তি।

অনেক দিন আগে যে-সময়ে বাড়ীতে বাড়ীতে কলের জল পাওয়া যেত না, সেই সব দিনে জলের প্রয়োজন মেটাত ঐ ফোয়ারাগুলিই। ওগুলি তৈরীও হয়েছিল ঐ উদ্দেশ্যেই। তখন গল্পগুজব করার ও খবরাখবর নেওয়ার কেন্দ্র ছিল ঐ ফোয়ারাগুলি। গিন্নীরা জল নিতে এসে সংসারের সুখ-দুঃখ নিয়ে মনের কথা আলোচনা করত। বেশ মনে হয় ঐ ফোয়ারার চারপাশ তখন গুঞ্জনমুখর হয়ে থাকত।

আর আজ ফুলের চারা লাগিয়ে, মূর্ত্তি ও থামগুলি রংচঙে করে ফোয়ারাগুলিকে আরও দর্শনীয় করে তোলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রাণ-স্পন্দন আজ আর নেই। বিদেশীরা দু'চারবার ফোয়ারাগুলির
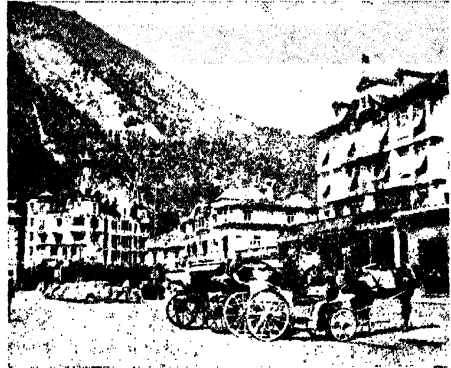
ইণ্টেরলাকেনের অপর একটি দৃশ্য

দিকে তাকায়। স্থানীয় অধিবাসীরা হয়ত ওদিকে তাকাবার ফুরসতই পায় না। আধুনিক ব্যস্ত জীবন পেছনের দিকে তাকাবার সে সুযোগই দেয় না।

২৮শে মে '৫৪। ইণ্টারন্যাশনাল কুকারি এগজিবিশন দেখতে সকাল সকালই প্রদর্শনী-চত্বরে ঢুকে পড়লাম।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে বেশ ছড়ানো প্রদর্শনী। প্রদর্শনী গৃহগুলির আকৃতি ও গঠনে শুধু পারিপাট্যই নয়, নানা রঙের ব্যবহার এবং সৌসামঞ্জস্যও লক্ষণীয়।

প্রদর্শনীর মধ্যেই ঘুরে বেড়ানোর জন্য ডিজেল-চালিত ছোট্ট ট্রামগাড়ী, নৌকা চালাবার জন্যে একটা কৃত্রিম হ্রদ, হ্রদের মাঝখানে ভাসমান রেস্তোরাঁ—এক কথায় একঘেয়েমি এড়াবার মত সব ব্যবস্থাই আছে।

ঘুরে ঘুরে, বাড়ীতে রান্না, রেস্তোরাঁর রান্না, রেস্তোরাঁ-গাড়ী, রান্না সম্বন্ধে বিস্তর বইপত্র, আন্তর্জাতিক রন্ধনপদ্ধতি ইত্যাদি সবই দেখা হ'ল, মাঝে মাঝে রান্না চাখাও গেল।

সবচেয়ে ভাল লাগল ইণ্টারন্যাশনাল রেস্তোরাঁ। ওখানে বিভিন্ন দেশের পাচকেরা নিজের নিজের দেশের সেরা খাবারগুলি রান্না করে দর্শকদের খাওয়াচ্ছে।

ঘুরে ঘুরে যখন প্রায় সবকিছু দেখা শেষ করে এনেছি ঠিক
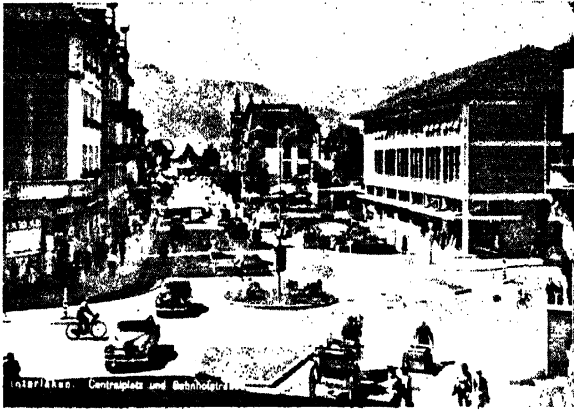
ইণ্টেরলাকেন, সুইজারল্যাণ্ড

তখনই হঠাৎ যেন চোখের সামনে 'চিচিং ফাঁক' দেখলাম। একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ। অভাবনীয়! আমরা তিন জনে একটা 'হপ স্টেপ জাম্পে' ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

লোভনীয় কিছুই পাওয়া গেল না। খেলাম রায়তা, পাঁপড়-ভাজা, তরকারীর চাটনী, ভাত, চিকেন কারী ও দই। রসনার তৃপ্তি না হলেও মনটা একটু খুশী হ'ল।

আমাদের হুমড়ি খেয়ে পড়াটা বোধ করি 'জী উণ্ট এর্'-এর ষ্টাফ ফটোগ্রাফার দেখতে পেয়েছিল। আমরা গোগ্রাসে দই গিলছি, ও এসে আমাদের ফ্ল্যাশ ফটো নিল। সে ছবি ছাপাও হয়েছিল। মিলানে বসে 'জী উণ্ট এর্'-এর সেই সপ্তাহের সংখ্যাটা পেলাম।

মে ২৯ '৫৪। আজ বার্ন থেকে থুন যাব। শেষবেলায় দু'একটা জিনিস কেনার কথা মনে পড়ল। না, ঘড়ি নয়। দেখতে দেখতে যেটা ভাল লাগবে সেটাই কিনব। ইন্দ্র কিনল ঘড়ি। ফারনাণ্ডো কিনল ক্যামেরা। শেষ পর্য্যন্ত আমি কিনলাম ডজন-খানেক চকোলেট-বার। মিলানের বন্ধুবান্ধবদের দেওয়া যাবে।

চোখে ত পড়ল অনেককিছুই, কিন্তু তেমন কিছু যে মনে ধরল না।

সুইজারল্যাণ্ডের হোটেলে থাকা খাওয়ার খরচ বিস্তর, শোনা ছিল। কিন্তু থুনে পৌঁছেই আমাদের কপাল খুলে গেল। মাত্র পাঁচ টাকায় বেশ আরামেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা হ'ল।

মে ৩০ '৫৪। থুন থেকে থুন হ্রদের উপর দিয়ে ফেরী-জাহাজে 'স্পিৎস'এ এলাম।

সুইজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য্য-তালিকায় প্রথমেই পড়বে হ্রদগুলি, আল্পসও নয়, ভ্যালিও নয়—এমনকি সুইস তরুণীরাও নয়।

পাহাড়, নীল আকাশ, পারের গাছ, জলের ওপর রোদের ঝিকিমিকি—সব মিলে যেন আপনিই রোমাঞ্চ জাগায় প্রাণে।

স্পিৎস থেকে আবার বোটে চড়লাম। ষ্টেশনে মালপত্র জমা দিয়ে রেখে এসেছি। সন্ধ্যা ছ'টায় স্পিৎস থেকেই মিলানের গাড়ী ধরতে হবে। এখন চলেছি ইণ্টেরলাকেনে।

ইন্দ্র এতক্ষণ কোথায় ছিল কি জানি। হঠাৎ এসে বলল—বেয়াটুস হোলেনে নামতে হবে। ইণ্টেরলাকেন পরে যাব।

আমি অবাক হয়ে বললাম—কেন, কেন কি আছে বেয়াটুস হোলেনে?

ইন্দ্র বলল—পাহাড়ের ভেতর নাকি একটা অদ্ভুত গুহা আছে। দেখার জিনিস।

—তা বেশ ত চল। কিন্তু বন্ধুল পরে গুহাতেই থেকে যেও না আবার।

বেয়াটুস হোলেনের গুহাটা সত্যিই দেখবার মত। গুহার ভেতরে আছে হাঁটবার অনেকগুলি রাস্তা, নানা রকম জলের উৎস অপূর্ব্বসুন্দর ষ্ট্যালাকটাইট ও ষ্ট্যালাকমাইট—তার মধ্যে কতকগুলি আবার একেবারে স্বচ্ছ। উৎস-মুখে আছে রঙীন আলোর ঝলকানি, স্বচ্ছ ষ্ট্যালাকটাইটের পেছনে আছে সরু একফালি তীব্র রশ্মি, আবার কোথাও জমা জলের নীচে এক আঁজলা ছড়ানো আলো। প্রাকৃতিক সম্পদকে কৃত্রিম আলোর আবরণ দিয়ে আরও সুন্দর করা হয়েছে সম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে।

গুহা থেকে আমরা সবাই আর একটা বোটে চেপে ইণ্টের-লাকেনে এলাম—সবই ফেরী-বোট।

ইণ্টেরলাকেন ছোট শহর। কিন্তু একেবারে আদর্শ শহর বললেই হয়। এই শহরের ছবি আমার মনে গভীর ভাবে গেঁথে আছে। আর কোন শহর এত ভাল লাগে নি।

রাস্তাগুলি ঘরের মেঝের মত ঝকঝকে। দোকানগুলি টুরিষ্ট-দের কেনার মত জিনিসে ভর্ত্তি। সাজানোও এমন লোভনীয় ভাবে যে হাতদু'টা আপনিই মানিব্যাগ হাতড়ে বেড়ায়।

শহরের প্রধান প্রমিনেডটাতে ফুলে ও প্রজাপতিতে রামধনুর রঙের বাহার। ফোয়ারা আছে ওরই মাঝে, মূর্ত্তিও আছে।

ট্রাম-বাসের ভিড় নেই। পথচারীর ঝাঁক নেই। নেই পদে পদে বার ও রেস্তোরাঁর প্রাচুর্য্য।

শহর ছোট হলেও আধুনিকতম! সুইমিং পুল, গ্যাম্বলিং, কাসিনো, নাচঘর, টেনিস কোর্ট সবই আছে এবং ব্যবস্থার নৈপুণ্য হয়ত মোনাকো মণ্টেকার্লোকেও হার মানায়।

শুধু ভিড় দেখলাম অ্যামেরিকান টুরিষ্টের। ওরাই যেন ইণ্টের-লাকেনকে প্রায় শ্যামবাজার করে তুলেছে। গায়ে ডেকরনের

হাওয়াই শার্ট আর পরনে বেয়নের ট্রাউজার। মাথায় কদমফুল ছাট। কাঁধে হাতে গোটা দু'তিন ক্যামেরা।

দোকানে বেশ মজা হ'ল। আমি বারো-চৌদ্দটা মিউজিক বক্স দেখে একটা কিনলাম। আর দোকানদার একজন শাসালো আমেরিকানকে একটা মিউজিক বক্সের নমুনা দেখিয়ে দশটা গছিয়ে দিল।

ফারনাণ্ডো ব্যাপার দেখে খ্যাক খ্যাক করে হাসছিল। ইন্দ্র ত আগেই পালিয়েছে।

শস্য বপন

(বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

(১) আউস ধান (বোনা)—দোআশ ও এটেল মাটি—দোআশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ১ মণ বীজ লাগে; একর প্রতি ১৫-২০ মণ ফলন হয়।

(২) আউশ ধান (রোয়া)—দোআশ ও এটেল দোআশ মাটিতে জন্মে, ৬×৬ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়; শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ১২-১৫ সের বীজ লাগে একর প্রতি ১৫-২০ মণ ফলন হয়।

(৩) আমন ধান (বোনা)—এটেল দোআশ ও এটেল মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, অগ্রহায়ণ-মাঘ মাসে ফসল কাটিতে হয়, একর প্রতি ২৫-৩৫ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ২০-৩০ মণ ফলন হয়।

(৪) আমন ধান (রোয়া)—এটেল দোআশ ও এটেল মাটিতে জন্মে, আষাঢ়-ভাদ্র মাসে ৯×৯ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়; অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল কাটিতে হয়, একর প্রতি ১০-১৫ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ২০-৩০ মণ ফলন হয়।

(৫) ভুট্টা বা জনার—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু দোআশ মাটিতে জন্মে; ১৮ ইঞ্চি অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ১৮ ইঞ্চি অন্তর বীজ রোপণ করিতে হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়; পশুখাদ্যরূপেও ইহার ব্যবহার হয়।

(৬) জোয়ার—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু দোআশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ৬-৯ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৫-৯ মণ ফলন হয়; ইহা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৭) চীনা—উচু বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ৩-৫ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৪-৬ মণ ফলন হয়; ইহার খড় পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৮) অড়হর—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু দোআশ এটেল দোআশ মাটিতে জন্মে, ২।-৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ২।-৩ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়, অগ্রহায়ণ-চৈত্র মাসে ফসল কাটিতে হয়, একর প্রতি ৬-৯ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৬-১০ মণ ফলন হয়।

(৯) বরবটি—দোআশ ও এটেল মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ১৫-১৮ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৮-১০ মণ দানা পাওয়া যায়, ইহা পশুখাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়।

(১০) সয়াবীন—বা গৌরী কলাই—বেলে দোআশ ও দোআশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি হইতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি ফসল হয়; একর প্রতি ১০-১২ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ৪॥ হইতে ৭॥ মণ ফলন হয়।

(১১) বেগুন—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু দোআশ মাটিতে জন্মে; তিন ফুট অন্তর লাইনে চারা রোপণ করিতে হয়; নাবী জাতীয় ফসল আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হয়, একর প্রতি ৪-৬ ছটাক বীজ লাগে, একর প্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

(১২) ঢেড়শ—দোআশ মাটিতে জন্মে, ২ ফুট হইতে ৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া বীজ বপন করিতে হয়, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফসল হয়; একর প্রতি ৩ হইতে ৪॥ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৬০-৮০ মণ ফলন হয়।

(১৩) লাউ—দোআশ মাটিতে জন্মে, ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনিতে হয়; চারা বাহির হইলে সবচেয়ে বেশী সবল চারাটি রাখিয়া বাকী চারাগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়; ৩-৪ মাস পরে ফসল হয়; একর প্রতি ৷১০-৷৵০ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

(১৪) কুমড়া—দোআশ মাটিতে জন্মে, লাউয়ের মত ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনিতে হয়; ৩-৪ মাস পরে ফসল হয়; একর প্রতি ৷১০-৷৵০ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

(১৫) চিচিঙ্গা—দোআশ মাটিতে জন্মে; ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়; শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন

মাসের মাঝামাঝি ফলন হয় ; একর প্রতি ১ সের হইতে দেড় সের বীজ লাগে ; একর প্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয়।

(১৬) করলা—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয় ; ৩ মাস পরে ফলন হয়, একর প্রতি /৮০-/১ সের বীজ লাগে ; একর প্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয়।

(১৭) কাঁকরোল—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ইহা সাধারণত কন্দ হইতে জন্মায়, ৩-৪ মাস পরে ফসল হয়, একর প্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয় ; ইহার জন্য মাচার দরকার হয়।

(১৮) ঝিঙ্গা (পালা)—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪-৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, ২-৩ মাস পরে ফলন হয়, একর প্রতি ১॥-২ সের বীজ লাগে ; একর প্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

(১৯) কাঁকড়ি—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে ; ৪-৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, বর্ষায় ফসল ফলে ; একর প্রতি ৮-১২ ছটাক বীজ লাগে ; একর প্রতি ৮০-১০০ মণ ফলন হয়।

(২০) শিম—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, অগ্রহায়ণ-মাঘ মাসে ফসল হয়, একর প্রতি ৪॥ হইতে ৬ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৯০-১২০ মণ ফলন হয়।

(২১) বাকলা শিম—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৮-১২ ইঞ্চি অন্তর বীজ বুনিতে হয়, তিন মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৪-৬ সের বীজ লাগে ; একরপ্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয়।

(২২) চুকারী—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়, ৫ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৩-৪ সের বীজ লাগে এবং ৪০-৫০ মণ ফলন হয়।

(২৩) মেটে আলু বা চুবড়ী আলু—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪-৫ ফুট অন্তর গর্তের মধ্যে বীজ আলু বপন করিতে হয়। ৮-৯ মাস পরে ফসল হয় ; একরপ্রতি ১০-১৫ মণ বীজ লাগে ; একরপ্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

(২৪) মূলা—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, দুই মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ২-৪ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ১২৫-১৫০ মণ ফলন হয়।

(২৫) শিমুল আলু—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫ ফুট অন্তর লাইন করিয়া ১ ফুট লম্বা ১ ফুট চওড়া এবং ৫-৬ ইঞ্চি গভীর গর্তে ডগা বসাইতে হয় ; ৮-৯ মাস পরে ফসল হয় ও একরপ্রতি ৬০০০ ডগা লাগে, একরপ্রতি ৩০০ মণ ফলন হয়।

(২৬) কচু—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, দেড় দুই ফুট অন্তর মুখী রোপণ করিতে হয়, ভাদ্র-কার্তিক মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ৪॥-৬ মণ মুখী লাগে, একরপ্রতি ১৮০-২০০ মণ ফলন হয়।

(২৭) মানকচু—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৩ ফুট অন্তর মূল বসাইতে হয়, পৌষ ফাল্গুন মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ৫-৬ হাজার মূল বসাইতে হয়, একর প্রতি ১২০-১৮০ মণ ফসল হয়।

(২৮) ওল—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২॥-৩ ফুট অন্তর গর্তে মুখী রোপণ করিতে হয়, ৬ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬-৯ মণ মুখী লাগে, একরপ্রতি ১৫০-২০০ মণ ফলন হয়।

(২৯) টেপারি—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়, ৪-৫ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬-৮ ছটাক বীজ লাগে।

(৩০) শাক, নটে পুঁই, ডাঁটা, ফুলকা ইত্যাদি—যে-কোন জমিতে হয়, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ১-২॥ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬-৮ ছটাক বীজ লাগে।

(৩১) হলুদ—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, আড়াই ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে আধ হাত অন্তর 'মোঘা' বা 'দড়ি' বসাইতে হয়, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল তুলিতে হয়, একরপ্রতি ২-৩ মণ হলুদ লাগে ; একরপ্রতি ১৫-২০ মণ শুষ্ক হলুদ হয়।

(৩২) আদা—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, আড়াই ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে আধ হাত অন্তর 'মোঘা' বা 'দড়ি' বসাইতে হয় ও অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ২-৩ মণ মূল লাগে, একর প্রতি ৬০-১০০ মণ ফলন হয়।

(৩৩) গোলমরিচ—নিম্ন সরস জমিতে জন্মে, চারা সাড়ে চার ফুট অন্তর লাগাইতে হয়, ৩-৪ বৎসর পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ১০০০ কাটিং লাগে, প্রত্যেক লতায় গড়ে এক সের করিয়া ফলন হয়।

(৩৪) চীনাবাদাম—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ইহার জাতি অনুযায়ী লাইন করিয়া ২-২॥ ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ১৮-২৫ সের (খোসা-সমেত) বীজ লাগে, একরপ্রতি ১৮-২০ মণ ফলন হয়।

(৩৫) কলা—উচু দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটিতে জন্মে, তেউড়গুলি ২ ফুট চওড়া ও দেড় ফুট গভীর গর্তে ১২ ফুট অন্তর বসাইতে হয়। তেউড় বসাইবার ১০-১২ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৩০০-৪০০ তেউড় লাগে এবং ৩০০-৪০০ কাঁদি কলা হয়।

(৩৬) পেঁপে—উচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে, চারাগুলির যখন ৩-৪টি পাতা বাহির হয় তখন উহাদিগকে নাড়িয়া ৬-৮ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়, ৮-১০ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৪-৬ তোলা বীজ লাগে।

(৩৭) শশা—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫-৬ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়, ৩ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬-৮ তোলা বীজ লাগে, একর প্রতি ১০০-১২০ মণ ফলন হয়।

(৩৮) পাট—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, আষাঢ়-ভাদ্র মাসে পাট কাটিতে হয়, একরপ্রতি ৩-৪॥ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ১৫-২০ মণ ফলন হয়।

(৩৯) শণ—এটেল ও দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন মাসের মাঝা-

মাঝি শণ কাটিতে হয়, একরপ্রতি ৩০-৪০ সের বীজ লাগে ও ১০-১৫ মণ ফলন হয়।

(৪০) ঝিয়া—এটেল ও দোআশ মাটিতে জন্মে, ২×২ ফুট অন্তর "কাটিং" লাগাইতে হয়, শ্রাবণ-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ২-৩ মণ ফলন হয়।

(৪১) কার্পাস—জল দাঁড়ায় না এরূপ উচু সারবান জমি ইহার পক্ষে উপযুক্ত, আড়াই ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে আড়াই ফুট অন্তর ১।-২ ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে ২-৩টি বীজ বুনিতে হয়, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তুলা হয়, একরপ্রতি ৬-৮ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ১।-২ মণ ফলন হয়।

(৪২) মেড়ি—উচু দোআশ মাটিতে জন্মে, জাতি হিসাবে ৩-৪ ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়, ৭-৯ মাস পরে ফসল হয়, জাতি হিসাবে ৪॥-৬ বীজ লাগে। একরপ্রতি ৮-১০ মণ ফলন পাওয়া যায়।

(৪৩) পান—এটেল দোআশ মাটিতে জন্মে, ৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর "কাটিং" বসাইতে হয়, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ মাসে পান পাওয়া যায়, একরপ্রতি ৩০০০ "কাটিং" লাগে, একরপ্রতি ৬০-৭০ কাহন পান হয়।

(৪৪) বাজরা (পশুখাদ্যের জন্য)—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ২-২॥ মাস পরে ঘাস কাটা যায়, একরপ্রতি ৬-১০ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ২০০-২৫০ মণ কাঁচা ঘাস হয়।

মরা জ্যোৎস্না

শ্রীকরুণাময় বসু
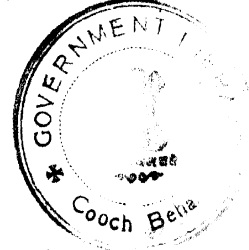
স্বপ্নের ঘোরে দু'হাত বাড়ায় নিশাকর। আয় আয় সোনা আয়, মাণিক আমার, এত কান্না কিসের? ও খোকন তুই হাসলে বুঝি মুক্তো ঝরে, তোর কান্নায় বুঝি পান্নার রং উথলে পড়ে। কাঁদিস নে মাণিক আমার, এত দুঃখ কিসের?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, মেসের ভাঙা তক্তপোশের উপর উঠে বসে নিশাকর। অনেক দিন পরে বুকে কিসের ব্যথা অনুভব করে সে। আজ সকালে দেশ থেকে চিঠি এসেছে নতুন খোকা হয়েছে তার। জানালার ফাঁক দিয়ে শেষ রাতের মরা জ্যোৎস্না ঘরে এসে পড়েছে। সমস্ত শহর নিঝুম নিশ্চুপ। ঘুম-ঘুম চোখে একবার কি ভাবতে চেষ্টা করে নিশাকর; কালো রাত মাকড়সার জালের মত হিজিবিজি রেখা টানে চোখের সামনে তার।

তবু স্বপ্ন দেখে নিশাকর, কতকাল আগেকার স্বপ্ন। সুনন্দা ঘাড় কাত করে নিশাকরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসে। নির্জ্জন রাত্রি আরও রহস্যময় হয় নিশাকরের কাছে। সে সুনন্দাকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করে, কি?

আমার জন্য তোমার ভয় হয় না? আমি যদি মরে যাই?

ইস, মরতে দিলে ত, তা হলে আমিও বাঁচব না।

সুনন্দার করুণ হাসিতে সুদূর নির্জ্জনতা, অর্থহীন আশা, স্বপ্নমোহের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের জন্য স্নিগ্ধ অনুকম্পা। মৃত্যুকে সে দেখেছে ধূসর আবছায়ার মত, হাসিতে বুঝি সেই কথাটাই বুঝাতে চায়।

তুমি ভয় পাচ্ছ কেন সুনন্দা?

আচ্ছা যদি মেয়ে হয়, তুমি দুঃখ পাবে?

কেন, দুঃখ পাব কেন, প্রথম মেয়ে হওয়া ত লক্ষ্মীর চিহ্ন। মেয়ের নাম কি রাখবে, জয়ন্তী?

জয়ন্তী বেশ নাম না গো?

উঁহু অজন্তা আরও ভাল। বেশ তুমি ডাকবে জয়ন্তী, আমি অজন্তা।

যদি ছেলে হয় নিশাকরের সঙ্গে নাম মিলিয়ে দিবাকর রাখা হবে আগেই ঠিক করা ছিল।

সুনন্দা চোখ বোজে। স্থির রাত্রির গভীরতায় কোন আবর্ত্ত নেই। মৃদু নিশ্বাসের উত্থানপতনের মত নিশ্চিন্ত নিস্তব্ধ রাত্রি। কিন্তু নিশাকরের বুকে উত্তপ্ত উদ্বেল তরঙ্গ-মালা। দু'বছর আগে ছ'মাসের খোকন চিরকালের মত চোখ বুজেছে। যে চিকিৎসার দরকার ছিল সে চিকিৎসা করানো গরীব নিশাকরের ছিল সাধ্যাতীত। সেই অগ্নিগর্ভ বেদনা কেবলই নিশাকরের বুকে পাক খেয়ে বেড়ায়। আগ্নেয়গিরির যন্ত্রণা চোখে মুখে ফোটে তার। আজ আবার সেই যন্ত্রণা বুকের মধ্যে গুমরে উঠে। চোখ দিয়ে হু হু করে জল গড়ায় তার। চোখের জলে মনের আগুন নেভাবে সে। আবার নতুন খোকা এসেছে তার।

তবু দিন যায়। হাতের মুঠোয় ধরে আশার রঙীন প্রজাপতি। পূজোর দেরি আছে, তার আগে বাড়ী যাওয়া হবে না। বাঁকুড়ার কোন অজপাড়াগাঁয়ে বাড়ী তার।

পুজোয় কত জিনিষ কেনা দরকার, ফর্দ্দ আছে পকেটে, শুধু পকেট ফাঁকা, তবু স্মরণের মণিমালায় সোনার আলপনা টানে, তবু জানে সে উড়ো মেঘের ছায়ায় দিনের রূঢ় রৌদ্র ঢাকা পড়ে না। স্বপ্নের রং ফিকে হলেই মনের সোনালি যাদু হঠাৎ যাবে মুছে ; তার পর নিরাবরণ নিরাভরণ দারিদ্র্য।

পকেট থেকে ফর্দ্দ বার করে নিশাকর। সুনন্দার লেখা শুধু খোকনের সাজ-পোশাকের দীর্ঘ তালিকা। সাটিনের পাঞ্জাবী, জরীর কাজ করা টুপী, ফুলতোলা জুতো। পাখীর পালকের ছোট লেপ, ঘেরাটোপ দেওয়া মশারি এইসব কথা। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লেখা, খোকন কার মত হয়েছে বল ত ? আমার শরীর ভাল না, সেজন্য চিন্তা করো না।

এটকিনসন কোম্পানীর এক শ' সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকার কেরানী নিশাকর মাথায় হাত দেয়। একবার ভাবে ভবানীপুরে তার বন্ধু রমাপতির কাছে গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার নেবে। মধ্যে মধ্যে রমাপতি ধার দিয়েছে তাকে, কিন্তু হাসিমুখে দেয় নি জানে নিশাকর। যদি না দেয় ছি, ছি, লজ্জার কথা।

দূর থেকে ভেসে আসে খোকনের হাসি—দাঁতহীন মুখের কলকল হাসি ; ভোরের আলোর মত উৎসারিত, অবারিত হাসি। জীবনে দুঃখ অনেক তবু পুজোয় প্রিয়জনের ম্লান মুখ বুকে তীরের মত বেঁধে। লজ্জা ত্যাগ করে নিশাকর রমাপতির কাছে হাত পাতে। হেসে হেসে বলে, তুমি না দিলে কে দেবে ভাই ?

একটু ইতস্ততঃ করে রমাপতি, "তাই ত অল্প মাইনের। কেরানী, শোধ করতে কষ্ট হবে।"—দু'হাত দিয়ে রমাপতির ডান হাতখানা জড়িয়ে ধরে নিশাকর—"এবারকার মত তোমাকে এ উপকারটি করতেই হবে। যত কষ্টই হোক, দু'মাসের মধ্যে তোমাকে শোধ করে দেব এ টাকা।—শেষ পর্য্যন্ত রমাপতি টাকা দিয়েছে নিশাকরকে।

নিশাকর আবার স্বপ্ন দেখে। খোকন হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ীময় ঘুরে বেড়ায় জিনিসপত্র ছড়িয়ে একাকার করে। সুনন্দা যেন টিপিটিপি হাসে, গালে হাত দিয়ে বলে, তুই এত দুষ্টুমি কোত্থেকে শিখলি খোকা ?—খোকন হয়ত একটা আঙুল মুখে পুরে মার দিকে চেয়ে অকারণেই হাসে হি-হি-হি। খোকন আবার হাঁটে দু'এক পা—মাতালের মত টলে, আবার ধপ করে বসে পড়ে।

শরতের সোনার রং জলে স্থলে, আকাশে, শ্যামল অরণ্যে মায়ার আলপনা টানে ; আলপনা টানে নিশাকরের মনে। হিমছোঁয়া বাতাস বুঝি এত দিনে ফুলকাঠির আবাদ, মরিচ-ডাঙার জঙ্গল পার হয়ে ভেসে আসে সুপুরির বন দোলা দিয়ে, নারিকেলপাতা ঝিরঝির করে কাঁপিয়ে, দু'একটি শিমুলতুলো উড়িয়ে দিয়ে পাখীর পালকের মত। কলমী হিঞ্চে বনে নীল ফুলের মেলা, পেঁপেগাছের নীচে মরা রোদ এসে পড়েছে।

খলসেখালির বাওড় থেকে বুঝি গা ধুয়ে ফিরে এল সুনন্দা। বিকেলের ট্রেন এঁকে-বেঁকে চলে গেছে ওই দূর বাঁধের উপর দিয়ে। ইতুগঞ্জের হাট করে লোক ফিরছে ; আবছা অন্ধকারে দু'একটা সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে উঠল কলা-বাগানে, আমবনের ভিতর—হয়ত সরকারবাড়ী কি সামন্তদের ভিটে থেকে।

তাড়াতাড়ি ঘোমটা নীচে নামিয়ে দেয় সুনন্দা, ওমা এর মধ্যে এসে পড়লে ?

এই ব্যাগটা রাখ, যা ভিড় ট্রেনে সমস্ত রাত ঠায় দাঁড়িয়ে, খোকন কোথায় ?

দুই চোখে আগেকার মত মায়া মমতার ছলছল আভাস। নিশাকর দুই হাতে সুনন্দাকে নিজের দিকে টানে, সুনন্দা নিশাকরের মুখ চেপে ধরে। ছি।ছ ছি—এখুনি ছোট পিসী এসে পড়বে।...

ছোট পিসী নিয়ে গেছে সামন্তদের বাড়ী। বসো, একটু জিরোও হাওয়া করি ; কিছুক্ষণ পরে হাত-পা ধুয়ো।...

কত দূরদূরান্তর থেকে এই সব ছবি, এই স্বপ্ন ভেসে আসে নিশাকরের মনে। আচমকা একটা স্মৃতি জেগে ওঠে—ছেলেবেলাকার কথা, মাটির দাওয়ায় বসে আছে নিশাকর পা ছড়িয়ে। শরতের সোনালি রোদ লুটিয়ে পড়েছে কাজল-ডাঙার চরে, উলুঘাস ভর্ত্তি ভিটেপোতার মাঠে, বাড়ীর পাশেই জামরুল-বনে, পদ্মফুল ছাওয়া বুড়োশিবতলা দীঘির জলে। একটা ছোট্ট কাঠবিড়াল কাঁঠালগাছে ছুটে উঠে গেল, আবার নেমে এল তরতর করে, দু'পা তুলে একবার চার-দিক চেয়ে কি দেখলে, তার পর দৌড় দিলে কাঁটা ঝোপঝাপ জঙ্গলে। হঠাৎ খুশিতে ঝিকমিক করে উঠেছিল নিশাকরের সমস্ত হৃদয়। এত দিন পরে সেই ছবি অকারণেই মনে পড়ে গেল তার।

নিশাকর চেঁচিয়ে বলে, অ ভূপতি, আজ দুপুরে আমার সঙ্গে যাবি ভাই ? জিনিসপত্তর কিনব।

কাচের 'শো কেসে'র সামনে নিশাকর কতদিন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। ছোট ছেলের লেপ তোশক বালিশ জামা টুপী সাজানো আছে। কেমন সুন্দর ছোট মোটরগাড়ী, টাকা থাকলে কিনত সে খোকনের জন্য, খোকন চড়ে বেড়াত বাড়ীর চার ধারে সেই মোটরগাড়ীতে।

বালিশের ভিতর থেকে টাকা ক'টা বের করে নিশাকর। ওয়াড় সেলাই করে তার মধ্যে টাকা রেখেছিল সে, হাতে রাখে নি যদি খরচ হয়ে যায়। মেসের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে নিশাকর, ভূপতি পিছনে আছে। শেষ ধাপে নামতেই পিয়ন একখানা চিঠি দেয় নিশাকরের হাতে।

কার চিঠি নিশাকর, বাড়ী থেকে বুঝি? ভূপতি বলে পিছন থেকে।

আশ্চর্য্য, পাথরের মত নির্ব্বিকার নিশাকরের মূর্ত্তি—'খোকা নেই, খোকা নেই ভূপতি।'

কোথায় যাচ্ছ নিশাকর, এস এস উপরে এস।

আসছি, তুমি উপরে যাও নিশাকর।

এক রকম ছুটে রাস্তায় এসে কালীঘাটের বাসে চড়ে বসে নিশাকর। দুপুরবেলা, বাস প্রায় খালি। একটা সীটে বসে নিশাকর দুই হাতে মাথা টিপে ধরে। কি যেন ভাবতে চেষ্টা করে সে, প্রথমেই অনুভব করে একটা অনন্ত অবারিত মুক্তির আকাশ। খোকা নেই, অনেকখানি দায়িত্বও যেন সেই সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। মাস মাস দুধের দাম, সাবু মিছরি কেনার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। হঠাৎ খিল খিল করে একটা অদ্ভুত চাপা হাসি বুকের ভিতরটাকে কাঁপিয়ে তোলে। খোকা চলে গিয়েছে, বাধনছেঁড়া নৌকোর মত হৃদয় টলমল করে ওঠে। যেন পৃথিবীর কোথাও সুখ নেই, দুঃখ নেই, ব্যথা নেই, বেদনা নেই, শুধু অসাড় অনুভূতিহীন মনোরাজ্যের বিস্তীর্ণ পরিব্যাপ্তি। হঠাৎ ভয় হয়, হাতড়ে দেখে নিশাকর অন্ধকার হৃদয়ের আনাচেকানাচে। সত্যিই কি সুখদুঃখহীন একটা আশ্চর্য্য অবস্থা এসেছে তার, তবে কেন কান্না আসছে তার? হাঁ, সত্যিই কান্না ত, হু হু করে বুকের মধ্যে। একবার মনে ভাবে কোথায় কোন্ অচেনা পৃথিবীতে খেলাঘর পাতিয়ে রেখে খোকন পালিয়ে এসেছিল এখানে, সেই জগতের সাড়া এসে পৌঁছয় এই প্রাণচঞ্চল শিশুদের জগতে, তাই কি পাখীর মত ডানা মেলে দিল অনন্ত আকাশের সীমানায়। ওই দূর রঙীন মেঘের ওপারে কি পারাপারের খেয়াঘাট আছে, খোকন সেই খেয়াঘাট পার হয়ে চলে গেল।

হঠাৎ রুদ্ধ কান্না পাক খেয়ে ওঠে। দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে নিশাকর ফুঁপিয়ে কাঁদে। যাকে সে কোন দিন দেখে নি, সেই খোকন যেন এখনও তার বুকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে। দুই ঠোঁট কেঁপে ওঠে তার, বাবা আমার, মাণিক আমার, ধন আমার!...

রমাপতি অবাক হয়ে বলে, খবর কি নিশাকর, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ ভাই, টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন?

না না, রাগ কিসের রমাপতি, টাকার আর আমার দরকার নেই, আমার কষ্ট হবে তাই খোকা তার গরীব বাপকে মুক্তি দিয়ে গেছে ভাই।

সর্ব্বোদয় ও সত্যনিষ্ঠা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বোদয়—অর্থাৎ সকলের উদয়, সকলের উন্নতি, সকলের মঙ্গল। হাঁ, ভারতের ঋষিদের কণ্ঠে যুগে যুগে এই মহান্ আদর্শেরই তো বন্দনাগান। সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সবাই সুখী হোক, সবাই নিরাময় হোক। মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। এ সংসারে কেউ যেন দুঃখী না থাকে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন: লোকসংগ্রহের অর্থাৎ লোককল্যাণের জন্যেও তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

সর্ব্বাধিক মানুষের সর্ব্বাধিক মঙ্গল নয়—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি ব্যক্তির মঙ্গল। 'ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে কি ফাঁকি আমার এই একটা কুঁড়ি রইলে বাকী।' প্রতিটি কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে, তবে তো বনে বনে বসন্তের উৎসব সফল হবে। আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে এই আদর্শই গান্ধীজীর কাছ থেকে পেয়েছি। পূর্ণ স্বাধীনতা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীনতা। একটি মানুষের জীবনও যদি দারিদ্র্যের মধ্যে, অজ্ঞতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত থেকে যায়, ব্যর্থ হয়ে যাবে স্বাধীনতার বসন্ত। ব্যক্তি নিয়েই ত সমষ্টি। দেশ ত আমাদের প্রত্যেককে নিয়েই। তাই বড় হতে হবে আমাকে, বড় হতে হবে তোমাকে, বড় হতে হবে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে। তবেই দেশ বড় হবে। প্রত্যেকটি কাষ্ঠখণ্ড যদি শুকনো থাকে তবেই তো অগ্নিকুণ্ড ভাল করে জলবে।

কিন্তু সকলের মঙ্গল কেন আমরা চাইব? কারণ সকলের সঙ্গে যোগেই আমাদের জীবনের পরম কল্যাণ। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা 'আমি' আছে। এই আমি যেখানে সকলের সঙ্গে মিলিত, সেখানে আত্মার আনন্দময় পক্ষবিস্তারের মধ্যে সে অনুভব করে জীবনের প্রাচুর্য্যকে; যেখানে সে সকলের

কাছ থেকে পৃথক, সেখানে সঙ্কুচিত অস্তিত্বের অবগুণ্ঠনের মধ্যে সে অনুভব করে মৃত্যুর অভিশাপকে। এ সম্পর্কে কবিগুরুর মন্তব্য কি চমৎকার!

'যেদিকে সে পৃথক সেদিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সে দিকে তার চিরকালের আনন্দ; যে দিকে সে পৃথক সেই দিকে তার স্বার্থ, সেই দিকে তার পাপ, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার ত্যাগ, সেই দিকে তার পুণ্য; যে দিকে সে পৃথক সেই দিকে তার কঠোর অহঙ্কার, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্য্যের সার প্রেম।' (শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রনাথ) (২য় খণ্ড)

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরীর রাজা রাশি রাশি সোনার মধ্যে বসে কাঁদছে: 'হায় রে, আর সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।' রাজা বলছে নন্দিনীকে, 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।' কেন এই রিক্ততা কেন এই ক্লান্তি? কেন এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও রাজা এত নিরানন্দ? এর উত্তরে আবার বলতে হয়: যা আমাদিগকে সকলের সঙ্গে মেলায় তারই মধ্যে আমাদের যথার্থ কল্যাণ। রাজা ত সকলের সঙ্গে মিলতে পারছে না। মনকে অনাসক্ত করতে না পারলে সকলের সঙ্গে মিলন কি সম্ভব? রাজার মনে রয়েছে সোনার প্রতি আসক্তি। সোনার লোভ মানুষকে যখন পেয়ে বসে তখন পড়শীকে 'খেয়ে ফুলে উঠতে' কোথাও তার বাধে না। 'রক্তকরবী'তে অধ্যাপকের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন: 'বাঘকে খেয়ে বাঘ বড় হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে উঠে।'

আদর্শবাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। নিজেদের স্বার্থের কথাও যদি তলিয়ে ভাবি তা হ'লেও কি সকলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? কেন গান্ধীজী অর্থনৈতিক সাম্যকে বললেন স্বাধীনতার মন্দিরে ঢুকবার প্রধান চাবিকাঠি? কারণ, কয়েক জন ধনী যদি জাতীয় সম্পদের মালিক হয়ে থাকে, আর লক্ষ লক্ষ নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন মানুষ অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে ক্ষুধাতুর পুত্রকন্যা নিয়ে কষ্ট পায় তবে রক্তসাগরে তরঙ্গ তুলে বিপ্লব ত আসবেই। তখন কোথায় থাকবে ধনীদের টাকাকড়ি, ঘর-বাড়ী—ঐশ্বর্য্যের এই সমারোহ? মানুষ কাঠের অথবা পাথরের মূর্ত্তির মত অন্যায়কে নিঃশব্দে চিরদিন সহ্য করুক—এইটাই কি আমরা কামনা করি? 'গোলাম' হওয়ার চেয়ে 'মানুষ' হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়? গান্ধীজীর, তাই, স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার মন্দির গড়ে উঠবে অহিংসার ভিত্তিতে। কিন্তু ধনীরা যদি সকলের মঙ্গলের জন্য ঐশ্বর্য্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে রাজী না থাকে, বিষয়-সম্পত্তিতে সকলকে সানন্দে ভাগ না দেয় তবে কি হবে? গান্ধীজী বলেছিলেন: 'তবে বিপ্লব হবে—রক্তাক্ত সশস্ত্র বিপ্লব।' রক্তাক্ত সশস্ত্র বিপ্লব এলে দেশের কি দুর্গতি হয় তার পরিচয় দিচ্ছে ইতিহাস। ফরাসী-বিপ্লবের ঝড়ের রাতে গিলোটিনের নীচে নরমুণ্ডের পিরামিডের কথা ভাবলে এখনও আমরা শিউরে উঠি। রাশিয়ার এবং চীনের রক্তাক্ত অন্তর্বিপ্লবের দৃষ্টান্তও লোভের এবং স্বার্থপরতার ভয়াবহ পরিণামের দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করছে।

সকলের মঙ্গলকে বড় করে না দেখলে, কেবল নিজেদের স্বার্থকে আঁকড়ে থাকলে পদদলিত সর্ব্বহারারা একদিন ক্ষেপে উঠে সব তছনছ করে দেবে—এই সাবধানবাণী একদিন জলদগম্ভীর স্বরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও উচ্চারণ করেছিলেন। বঙ্কিমের সময়ে এক দল লোক জোরগলায় বলতে আরম্ভ করেছিল, ইংরেজের শাসন-কৌশলে আমরা ক্রমশঃই সভ্য হচ্ছি এবং আমাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। রেলগাড়ী, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, নবীন চিকিৎসাশাস্ত্র, অট্টালিকাময়ী মহানগরী এবং মুদ্রাযন্ত্র—এগুলি কি প্রগতির নিদর্শন নয়? এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে বঙ্কিম এলেন এবং সকলকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়ে একটি প্রশ্ন করলেন: কার এত মঙ্গল? রামা কৈবর্ত্ত এবং হাসিম সেখ দুইটা অস্থিচর্ম্মসার বলদে ভোঁতা হাল ধার করে এনে জমি চষছে, তৃষ্ণায় মাঠের কর্দ্দম অঞ্জলি ভরে পান করছে, সন্ধ্যার সময় বাড়ী গিয়ে ওরা ভাঙা পাথরে মোটা চালের ভাত নুনলঙ্কা দিয়ে আধপেটা খাবে এবং গোয়ালের একপাশে শয়ন করবে—ইংরেজ শাসনে ঐ চাষীদের কি কোন কল্যাণ হয়েছে? নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন: আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্র না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না।' এখানেই বঙ্কিম থামলেন না। বললেন 'তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?'

দেশের শতকরা যারা আশী জন তারা যদি ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভূমিকম্পে সারা দেশ কেঁপে উঠবে, সভ্যতার ইমারত ভেঙে পড়বে, রক্তবন্যায় সব একাকার হয়ে যাবে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে সাবধান করে দিয়ে বললেন:

"তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি। কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।"

বঙ্কিম সর্ব্বোদয়ের কথা শোনালেন। শোনালেন তাদের মঙ্গলের কথা যাদের কথা আমরা ভুলে ছিলাম, যাদের আমরা উপেক্ষা করতাম গাঁয়ের চাষা বলে। ঋষি বঙ্কিমের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও এই কথা শোনালেন।

শোনালেন, "ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

শোনালেন, "বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

আর রবীন্দ্রনাথ? তিনিও যুগের কানে শোনালেন,

"যেথায় থাকে সবার অধম, দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে
সবহারাদের মাঝে।"

যারা অবহেলিত, পদদলিত তাদের শ্রদ্ধা কর। বিশ্বভূষণ ভগবান দীন-দরিদ্র সাজে যে ওদেরই মধ্যে বিচরণ করছেন।

বর্তমান ভারতবর্ষ যাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় গড়ে উঠেছে তাঁদের একজনও কি প্রাদেশিকতার, সাম্প্রদায়িকতার অথবা জাতি-ভেদের ক্ষুদ্রতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন? কি শোনালেন রামকৃষ্ণ? পৃথিবীতে প্রত্যেকটি ধর্মবিশ্বাসেরই সমান অধিকার আছে বেঁচে থাকবার এবং আমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে প্রতিবেশীর বিশ্বাসকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা। বললেন: "আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি, শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি।" রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধীজী—এঁরা আমাদিগকে শিখিয়েছেন, সর্বাগ্রে ভারতবাসী বলে নিজেদের ভাবতে। এঁরা দেশাত্মবোধকে জাতির মর্মের মধ্যে সঞ্চারিত করে না দিলে আমরা সকল ধর্মের-সকল প্রদেশের নরনারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কি একযোগে লড়াই করতে পারতাম? এঁদেরই কল্যাণে সর্বোদয়ের আদর্শকে আমরা ভালবাসতে শিখেছি।

এইবার প্রশ্ন হচ্ছে—সর্বোদয়ের সঙ্গে সত্যনিষ্ঠার সম্পর্ক কি? সম্পর্ক হচ্ছে: সর্বোদয়ের মন্দিরে পৌঁছবার অপরিহার্য পন্থা সত্যনিষ্ঠা। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসই ত সমাজ-জীবনের প্রাণ। এই বিশ্বাস ভেঙে দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা যদি দুধ বলে জল চালায়, কোথায় যাবে শিশুদের স্বাস্থ্য? জাতির ভবিষ্যৎ তা হলে কি জাহান্নামে যাবে না? ডাক্তার যদি ঔষধ বলে জল ইন্‌জেকশন্ করে, রোগী-দের কি অবস্থা হয়? ভিজিট এবং ঔষধের দাম দিতে গৃহস্থ সর্ব-স্বান্ত হয়ে যাবে কিন্তু রোগী বাঁচবে না। বিচারকেরা যদি ঘুষ খেয়ে চোরাকারবারীকে ছেড়ে দেন তবে অবাধে দুর্নীতি চলবে। খাদ্যে বিষ মিশিয়ে চামড়ার লোভে গ্রামে যে গোরু মারছে তাকে টাকা খেয়ে দারোগা যদি চালান না দেয়—কোন গৃহস্থই মাঠে গোরু ছেড়ে দিতে সাহস করবে না। বস্তুতঃ সমাজের সর্বনাশ করতে মিথ্যার বেসাতির মত এমন জঘন্য বেসাতি আর নেই। সর্বোদয়ের স্বপ্ন ফলবান হতে পারে কেবল সত্যানুরাগের পথে—এতে কি অনুমাত্র সন্দেহ আছে? গ্রামের দুর্জ্জনেরা গ্রাম-বাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যারা জানে তারা ভয়ে সাক্ষ্য দেবে না, সত্য বলতে সাহস করবে না। কেমন করে তা হলে দুর্বলেরা রক্ষা এবং দুর্জ্জনেরা শাস্তি পাবে? সত্যানুরাগের অভাবের জন্যই ত দেশ দুর্নীতির কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। স্বামী বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছিলেন: "চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।" "সত্যানুরাগ, প্রেম এবং মহাবীর্য্যে"র পথই তিনি আমাদিগকে দেখিয়ে গেছেন। সত্যের এবং অহিংসার উপরে গান্ধীজীর এত জোর—সেও ত সর্বোদয়ের স্বর্গে দেশকে পৌঁছে দেবার জন্যে। ইংরেজ শাসন দেশকে সবদিক দিয়েই সর্বনাশের মধ্যে ডোবাচ্ছিল। সেই শাসনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা ভগবানের এবং মানবতার কাছে অপরাধ—কে না জানত? কিন্তু সত্যকে জানা সহজ; তাকে অনুসরণ করাই কঠিন। সত্যাগ্রহের পথ যে দুঃখবরণের বন্ধুর পথ। দুঃখকে স্বভাবতঃই আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। গান্ধীজী এসে দেশের হাজার হাজার মানুষকে সত্যা-গ্রহী করে তুললেন। সেই সত্যাগ্রহের পথে এল স্বাধীনতা আর স্বাধীনতাকে আশ্রয় করে এল দেশের কল্যাণ। সত্যের প্রতি যেখানে দুর্বার অনুরাগ আছে সেখানে অত্যাচার টিকতেই পারে না, সুতরাং অমঙ্গলও থাকতে পারে না।

সমাজে বুদ্ধিমান লোকের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। প্রথম স্তরের রাষ্ট্রনেতা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—সকলকেই আমাদের চাই—কিন্তু সর্বাগ্রে দরকার চরিত্রবান পুরুষ এবং চরিত্রবতী নারী। জাতির নৈতিক চরিত্র যদি দুর্বল হয়ে পড়ে—সমাজের সমস্ত কাঠামো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

ভ্রম-সংশোধন

গত বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "মন ও চৈতন্য" নামক প্রবন্ধে পৃষ্ঠা ৩৯, স্তম্ভ ১, পংক্তি ৩২-এর শেষ হইতে এইরূপ পড়িতে হইবে:

"In removing our illusion we have removed the substance for indeed we have seen that the substance is one of the greatest of our illusions."

ইটালী ও জাপানের সিনেমা

"রোমের সারকোলো রোমানো দেল সিনেমা" নামক ক্লাবটি ইটালীর চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান—জাভিত্তিনি ইহার প্রেসিডেণ্ট এবং ব্লাসেত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া দ্য সিসা, রোসেলিনি হইতে ভিসকন্তি পর্য্যন্ত ইটালীর চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণ ইহার সদস্যশ্রেণীভুক্ত। গত বৎসর এই ক্লাবের উদ্যোগে কতকগুলি নির্ব্বাচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় ও সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনারও আয়োজন করা হয়।

জাপানী কুটনৈতিক দপ্তরের কয়েকজন সদস্য পর্দ্দায় এই সমস্ত চিত্ররূপায়ণ দেখিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এই নির্ব্বাচন বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং ইহার দৌলতে দর্শকমণ্ডলী যুদ্ধপরবর্ত্তী কালে পুনরুজ্জীবিত জাপানী সিনেমায় প্রযোজিত শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির রসোপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অবশ্য পাশ্চাত্ত্যবাসীদের পক্ষে গেম্বাকু-নো-কো নামক ছবিটি—যাহাকে বাস্তবতামূলক (Realistic) ফিল্মের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে—দেখিবার সুযোগ এখনও হয় নাই।

এই উপলক্ষে যে সকল ছবি দেখানো হইয়াছে তন্মধ্যে উগেৎসু মোনোগাতারি নামক ছবিটি চলচ্চিত্র-সমালোচকদের মতে সকলের চেয়ে সেরা। ইহাতে অবশ্য যুদ্ধের নিন্দা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাই এই ছবিটির উৎকর্ষের হেতু নয়। কেন্‌জি মিজোগুচির এই ছবিতে গভীর মানবতা এবং আচার-ব্যবহার ও পারিপার্শ্বিকের যে যথাযথ রূপায়ণ হইয়াছে তাহাই ইহাকে এক প্রামাণ্য শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম্মের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। ইহা মিজোগুচিরই ইচাদাই ওন্না নামক ফিল্মকেও—যাহা ১৯৫২ সনের 'ভেনিস ফেষ্টিভ্যালে' আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করিয়াছিল—উৎকর্ষের দিক দিয়া ছাড়াইয়া গিয়াছে। শিচি-নিন-নো সামুরাই নামক ফিল্মটিও ব্লাসেত্তি এবং দ্য সান্তিসের মত চিত্র-পরিচালকগণ

মিজোগুচির 'সানশো দায়ু' নামক জাপানী ফিল্মের একটি দৃশ্য

কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। কুরোসাওয়ার এই ছবিটির মধ্যে যে কতকগুলি খাঁটি কবিত্বপূর্ণ অংশ আছে তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই দৃশ্যটির কথা বলা যায় যেখানে নকল সামুরাই জ্বলন্ত আগুনের ভিতর হইতে একটি শিশুকে উদ্ধার করিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেছে—"এই শিশু যে আমি—আমিই, যখন আমি ছোট ছিলাম।"

লুচিনো ভিসকন্তির "সেনসো" চিত্রের একটি ভূমিকায় এফ. গ্রেঙ্গার

মোনোগাতারি উগেৎসু নামক শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য ফিল্মটির উৎস-সন্ধান করিতে হইবে সাইকাকু-ইচাদাই-ওন্না (পতিতা ও-হারুর জীবন) নামক তাঁহার অপর ফিল্মের প্রস্তাবনার বর্ণনায়। তাহাতে এই উক্তিটি আছে: "সুদীর্ঘকালের অস্ত্রোপাসনার পর, জাপানী আমরা আজ আমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের গহন গভীরে প্রবেশ করিব। আমাদের জনগণের একথা জানা প্রয়োজন যে, আমাদের সৌজন্য ও কারুণ্যের মূল অভিজাত-সম্প্রদায়ের ভয়াবহ এবং কণ্টকাকীর্ণ জগতে নয়, তাহা নিহিত আছে আমাদের কারিগর এবং চাষীদের আনন্দময় কোমল স্বভাব আর পারিবারিক জীবনের অনাবিলতার মধ্যে।" এই কথাগুলি মিজোগুচিরই অপর ফিল্ম —"টেল অব দি ওয়ান এণ্ড সায়লেণ্ট মুন" নামক ছবিটির সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

এই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম্মের পিছনে যে আধ্যাত্মিক ভাবপ্রেরণা রহিয়াছে, তাহা ইহাকে উন্নীত করিয়াছে মানবতার এক আদর্শ স্তরে। সর্ব্বোপরি ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই ফিল্মটির মধ্যে আদ্যোপান্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে একটি খাঁটি কাব্যিক অনুপ্রেরণা। এই ফিল্মে এমন কিছু আছে যাহা ফুটাইয়া তোলা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল।

ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লওয়ার মধ্যেই যে চরম শান্তি নিহিত তাহা দেখানো হইয়াছে মিজোগুচির সাইকাকু ইচাদাই-ওন্না নামক ফিল্মে। এই ছবির নায়িকা ও-হারু, মধ্যযুগীয় সমাজের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিতা। ও-হারুর বাবা নিজেই অমানুষ—পাপের নিম্নতম সোপানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন সে জরাগ্রস্ত এবং স্বজন-পরিত্যক্ত হইল তখন শান্তির সন্ধান পাইল এক বৌদ্ধ মঠে শরণ লইয়া।

জাপানী চলচ্চিত্র সম্পর্কে এই আলোচনাই একমাত্র ঘটনা নয় যাহা গত বৎসর ইটালীতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র-জগতের মধ্যে সমস্বার্থমূলক যোগসূত্র সংস্থাপনে সহায়তা করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ভারতও ইটালীতে পাঠাইয়াছে একটি বিস্ময়সঞ্চারী ফিল্ম—'দো বিঘা জমিন'। ইহা ইটালীর নয়া বাস্তবতামূলক পদ্ধতির (Neo-realistic School), বিশেষতঃ ড সিকা'র 'সাইকেল চোরেরা'র (Bycycle Thieves) সমগোত্রীয়। ইটালীর ড সিকার মত দো বিঘা জমিনের ডিরেক্টর বিমল রায়ও এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা গতানুগতিক নয়, তাহাতে সমসাময়িক বাস্তবতার কতকগুলি নীতিমূলক দিকের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা করিতে গিয়া তাঁহাকে ইটালীর ড সিকা'র ন্যায় ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফির ঐতিহ্যগত প্রবণতার ফলে উত্থাপিত বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু রায় এই সমস্তকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দো বিঘা জমিন ভারতের জাতীয় জীবনের সেই সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনেরই অংশ যাহার ভিত্তি স্বাদেশিকতা এবং সংস্কার। সাহিত্যে সেই নবযুগের পূর্ব্বসূরী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণের কবি ভারতী এবং উত্তর-ভারতের কৃষক-সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে বহু গ্রন্থ রচয়িতা প্রেমচাঁদ। সাংস্কৃতিক ও স্বাদেশিকতার সেই পুনরুজ্জীবনের সূচনা করেন গান্ধী—এখন ইহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন নেহরু। ইটালী ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক আজ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। এখানে নেহরুর উক্তি হইতে কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে:

"ভারত ও ইটালীর মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয় দেশের পিছনেই রহিয়াছে দীর্ঘকালের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি, যদিও ভারতের সহিত তুলনায়—যাহা একটি অনেক বৃহত্তর দেশও বটে—ইটালীর সংস্কৃতি বহু পরবর্ত্তীকালের। দুইটি দেশই রাজনৈতিক দিক দিয়া বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারতের ন্যায় ইটালীতেও 'জাতীয়তা'র আদর্শ কখনও লোপ পায় নাই; এবং বিভক্ত দুইটি দেশই হইয়াছে বটে, তথাপি কোনওটিরই একত্বানুভূতি কখনও হারাইয়া যায় নাই। যেমন ইটালী পশ্চিম-ইউরোপকে দিয়াছে ধর্ম্ম তেমনি পূর্ব্ব-এশিয়াতে ধর্ম্মবিস্তার করিয়াছে ভারত—যদিও চীন এই দেশের চেয়ে কম প্রাচীন এবং শ্রদ্ধাই নয়।"

এখন সে বিঘা জমিন যে পথ খুলিয়া দিয়াছে, ভারতীয় সিনেমা-শিল্প যদি সেই পথ ধরিয়া চলে তাহা হইলে এই দেশের প্রতি সারা বিশ্বের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে এবং এ ধরনের অন্যান্য ফিল্ম সৃষ্টি না হইয়া পারে না। ঐ দিকে ইটালীর সিনেমারও প্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছে এবং ইহার প্রকৃত অভিব্যক্তির পথে যে সকল প্রতিবন্ধ রহিয়াছে সেগুলির অপসারণের জন্যও ইহার চেষ্টার অন্ত নাই। নগ্ন বাস্তবতা হইতে বাস্তবতায়, ঘটনার স্থূল বিবরণী হইতে জীবনের ব্যাপকতর এবং অধিকতর সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যায় পৌঁছিবার জন্য এখন ইহার অক্লান্ত প্রয়াস।

ইটালীর বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী লুশিয়া বোসে
এই রূপসজ্জায়ই ফ্রান্সেস্কো মাসেল্লির একটি চিত্রে অবতীর্ণ হইবেন

ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক-অভিনেতা (Director-Actor) ড সিসা এবং তাঁহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত জাভাত্তিনি এখন "দি রুফ" (ছাদ) নামক চিত্র-নির্ম্মাণে ব্যাপৃত আছেন। খুবই আশা করা যায় যে, এই চিত্র মুক্তিলাভ করিলে তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কিন্তু সম্প্রতি ইটালীর যে সিনেমা-মরশুম (Cinema Season) শেষ হইল তাহার রেকর্ড আশাপ্রদ নহে। গত ভেনিস ফেষ্টিভ্যালে কাস্তেল্লানির 'রোমিও জুলিয়েট'কে লায়ন অব সেণ্ট মার্ক'স পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা মাত্র ক্ষীণ সাড়া জাগাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষের যে ফিল্ম সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলোচনা হইয়াছে তাহা ফেলিনির "দি ষ্ট্রীট"। কিন্তু ইহারও সার্থকতা সম্বন্ধে প্রচুর সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে। তবে একথা জোর-গলায়ই বলা যাইতে পারে যে, "I vitelloni"-র পরিচালক তাহার সম্প্রতি-সমাপ্ত Il Bodone-এর দৌলতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। ভেনিস আন্তর্জ্জাতিক উৎসবে (Venice International festival) এই ফিল্মখানি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমান বৎসরের ইটালীর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফিল্ম হইতেছে লুচিনো ভিসকন্তির "সেন্‌সো"। ইহাতে আর্টের সঙ্গে বৃহত্তর শিল্প-প্রচেষ্টার এক অভিনব সমন্বয় হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইটালীতে এই প্রথম লাক্স ফিল্মের মত একটি বিখ্যাত কোম্পানী বিরাট আকারের এমন একটি ফিল্ম নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছে যাহাতে আর্টের দাবি উপেক্ষিত হয় নাই। "সেন্‌সো" আর্টের দিক দিয়া যে নিপুণ সৃষ্টি, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক সিনেমার ছবি তৈরির ভার তরুণদের হাতে। মার্চ্চি এবং মালেরবা নামক দুই জন যুবকের প্রথম সৃষ্টি 'নারী ও সৈনিকগণে'র বিষয়বস্তু হইতেছে মধ্যযুগের ইটালী।

আগামী মরশুমে যে সকল ফিল্ম দেখানো হইবে সেগুলির মধ্যে 'গ্লি সবান্দাতি'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাও ফ্রান্সেস্কো মাসেল্লি নামক আর এক জন তরুণ চিত্র-পরিচালকের প্রথম কাজ। ইনি খুবই তরুণ—বয়ঃক্রম এখনো চব্বিশ বৎসরও হয় নাই এবং সমগ্র পৃথিবীতে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ চিত্র-পরিচালক। তিনি যে সকল শিক্ষামূলক চিত্র পরিচালনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট। ভিসকন্তি এবং আন্তোনিওনির গুরুত্বপূর্ণ ফিল্মসমূহের প্রযোজনায় তিনি সহযোগিতা করিয়াছেন। এই তরুণ চিত্র-পরিচালকের মধ্যে চলচ্চিত্রের আঙ্গিক কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞানের সঙ্গে কবিত্বশক্তির এক অপূর্ব্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় এবং অনেকেই এই আশা পোষণ করিতেছেন যে, তাঁহার পরিচালনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই খাঁটি ইটালীয় চলচ্চিত্র পরিপূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইবে। জাপানী, ভারতীয় এবং আমেরিকান চলচ্চিত্রের ন্যায় ইটালীয় চলচ্চিত্রেরও মূল নিহিত বাস্তবতার মধ্যে। এবং এই কথাটির যতই অপব্যাখ্যা করা হোক্ না কেন, সবকিছুর উর্দ্ধে এবং সবকিছুকেই অতিক্রম করিয়া এই বাস্তবতাই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনক্ষেত্র রচনা করিবে।*

ন.ভ.

---

* Efio Rutto'র প্রবন্ধ অবলম্বনে

অন্নপ্রাশন

শ্রীরেণুকা দেবী

হরিপ্রসন্ন বাবুর নাতির অন্নপ্রাশন। প্রাচীন চৌধুরী পরিবারের সে জাকজমক আর না থাকলেও নামের জমজমাট ভাব এখনও আছে। তার উপর বর্ত্তমানে চার শরিকের মধ্যে হরিবাবুর নামটাই এখন ভারী, কাজেই নাতির ভাতে ধুমটাও একটু জোরালো করতে হবে—না হলে ভারসাম্য থাকবে না।

ভাগ্যবান শিশুটি জন্মগ্রহণ করার পর থেকে দেশের ও কলিকাতার চেনা-জানা জ্ঞাতি-বন্ধু সকলের মধ্যে আলোচনা চলল যে, ধুম একটা হবে বটে। ক্রমশঃ সাতটি পূর্ণ চাঁদের মুখ দেখল শিশুটি। এবার আলোচনা চেনামহল ছাড়িয়ে আপনজনের মধ্যে এসে পড়ল। উপযুক্ত, বিবাহিত চার পুত্রের পিতা হরিপ্রসন্নবাবু, কিন্তু এই প্রথম পৌত্রলাভ হয়েছে তাঁর। তৃতীয় পুত্রের দ্বিতীয় সন্তান এই শিশুটি। রেলওয়েতে বড় গোছের চাকরী করতেন তিনি। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করবার মোহ যাদের থাকে—অবশ্য সংকার্য্যের দ্বারা মহত্ত্বর প্রশংসা পাওয়ার নয়, পয়সাওয়ালা বলে, নিজেকে খ্যাতিমান করার বাসনা, চাকুরির ধাপে ধাপে উঠে সেটা সম্ভব নয় তা তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই ছেলেদের মানুষ করেছিলেন অন্যভাবে। এর জন্য বহু গ্লানিকর কাজ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু রজতখণ্ডের উজ্জ্বলতায় সব কলঙ্ক ঢাকা পড়ে এইটাই তিনি বুঝতেন।

চিত্তপ্রসন্ন বড় ছেলে, ব্যারিষ্টার। চারিটি কন্যার পিতা ও হিসেবী পত্নীর স্বামী। মেজ ছেলে নিত্যপ্রসন্ন ইঞ্জিনীয়ার, ভাল মাইনে পান, নিঃসন্তান। ধনীর কন্যা, সমাজ-সেবিকা স্ত্রীর অত্যন্ত বাধ্য স্বামী। সেজ দেবীপ্রসন্ন, শিশুটির পিতা, এম-এ, বি-এল। উকীল হলেও সেদিকে তেমন কিছু নয়, রাজনৈতিক আন্দোলনে দিন কাটিয়েছেন। বহু দল ঘুরে বর্ত্তমানে একটি দলে আশ্রয় পেয়েছেন। নামের আগে পরিচয়বাচক শব্দ যুক্ত থাকলেও এখনও বিশেষ আমল পান নি। এম-এ পাস, অধ্যাপিকা স্ত্রীর স্বামী, আট বছরের কন্যা আছে একটি। অন্য ব্যাপারে যাই হোক, অর্থব্যয়ের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী একমত। ছোট ছেলেও বিলাতফেরত, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। বিয়ে করেছে লণ্ডনে, তবে মেম নয়। লণ্ডন-প্রবাসী বাঙালীর কন্যা, বিয়ের পর দেশে এসেছে। হাসিখুশী পত্নীর স্বামী, একটি বৎসর চারেকের মেয়ে আছে।

বাইরে থেকে দেখতে যতটা ভাল, ভিতরের আর্থিক-স্বাচ্ছন্দ্য ততটা নয়। বড় ছেলের পশার তেমন নয়। মেজ ছেলে বেশীর ভাগ বাইরে থাকে—বদলীর চাকরি। তার উপর বহু কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে সঙ্গে যুক্ত, অবশ্য স্ত্রীর পিতৃদত্ত অর্থও কিছু আছে। সেজ ছেলে ঠিক সাংসারিক খরচের অংশটুকুই দিতে পারে। ছোট ছেলের ভাল মাইনে ও মোটা বোনাস হলে কি হবে, বৎসরে একবার করে আরামদায়ক ভাবে দেশ বেড়াতেই তা শেষ হয়ে যায়। সাংসারিক ব্যয় ও বিলাসের পর কিছুই সঞ্চিত হয় না।

তথাপি বৃদ্ধ হরিপ্রসন্ন বাবু অতি হিসাবের দ্বারা উচ্চদরের চাল বজায় রেখে চলেন। পুত্রদের প্রতি উদার হয়ে, পুত্রবধুদের স্বাধীনতা দিয়ে, নাতনীদের আধুনিক হবার সুযোগ দিয়ে বাইরের লোকের কাছে তাই তিনি বিচক্ষণ গৃহকর্ত্তা আর তাঁর পরিবার আদর্শ পরিবার।

শিশুর জীবনে অষ্টম চন্দ্র সমাগত, হরিবাবু ব্যস্ত এবং চিন্তিত, জাঁকজমক এবং খরচের মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য করতেই হবে।

চিত্তপ্রসন্ন বললেন, বেশ চার শত টাকা দিতে আমার আপত্তি নেই, তবে আমার 'পার্সন্যাল' ফ্রেণ্ড কয়েক জনকে বলতেই হবে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়ই, তোমার ভাইপোর অন্নপ্রাশন বলবে বৈ কি, ওই তোমার জাষ্টিস···ওঁরা সব ত?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তাঁদের কথাই বলছি।

নিত্যপ্রসন্ন টাকা আরও দুই শত বেশী দেবে, কিন্তু স্ত্রীর কথামত কাঙালী ভোজনটা হওয়া চাই।

মাথা চুলকান হরিবাবু, কথাটা মন্দ নয়। ভিখারীদের মুখে জয়ধ্বনি শোনার জন্যে নয়, দীনদরিদ্রের প্রতি তিনি কত সদয়, সেই যশের লোভে।

শিশুর পিতা, দেবীপ্রসন্নর অনর্থক ব্যয় করার সঙ্গতি নেই, তবে কিছু নিজের বাছা বাছা লোক ও কিছু কাগজের তরফের লোককে বলতেই হবে, কারণ সামনের ইলেকশনে একটা "নমিনেশন" তার চাই, চারিশত টাকা সেও দেবে। আলোকপ্রসন্নর মনটা ভাল, পুরো হাজার টাকা দেবে সে, তবে রকমারি বাজনাগুলোর ব্যবস্থা করতেই হবে। রোশনচৌকি, ব্যগপাই, ঝাঁঝর, ঢোল, ডগর কিছুই যেন বাদ যায় না। হরিবাবু নিজেও রিক্তহস্ত নন। পুত্রবিত্তের উপর নিজের ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ভরসা তিনি করেন না। পুত্রদের যৌথ সংসারে তিনিও সমান অংশেই টাকা দেন। মেয়েদের যাতায়াত আছে, পড়ার প্রয়োজনে তাদের দুটি একটি ছেলেমেয়ে থাকেই, কাজেই নাতির ভাতে মেতে উঠে সঞ্চিত অর্থের অনেকখানি ব্যয় করে ফেললে তাঁর চলবে না। তবে কিছু খরচ করবেন বৈকি, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক-বিদায় পর্ব্বটাও সারা চাই, নইলে বাইরের মান অনেকখানি খর্ব্ব হয়ে যাবে।

চিত্ত ঘরে আসতেই বড়বৌ বললে, তুমি যে বাবাকে চারশ' টাকা দেবে বললে, আমাকে ত আলাদা কিছু দিতে হবে। যতই হোক, বাইরে থেকে আমি বড় জেঠীমা ত—ও টাকা দেওয়ায় ত···

—বাবার নাম হবে, তা হোক—কি দিতে চাও তুমি।

'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
- এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
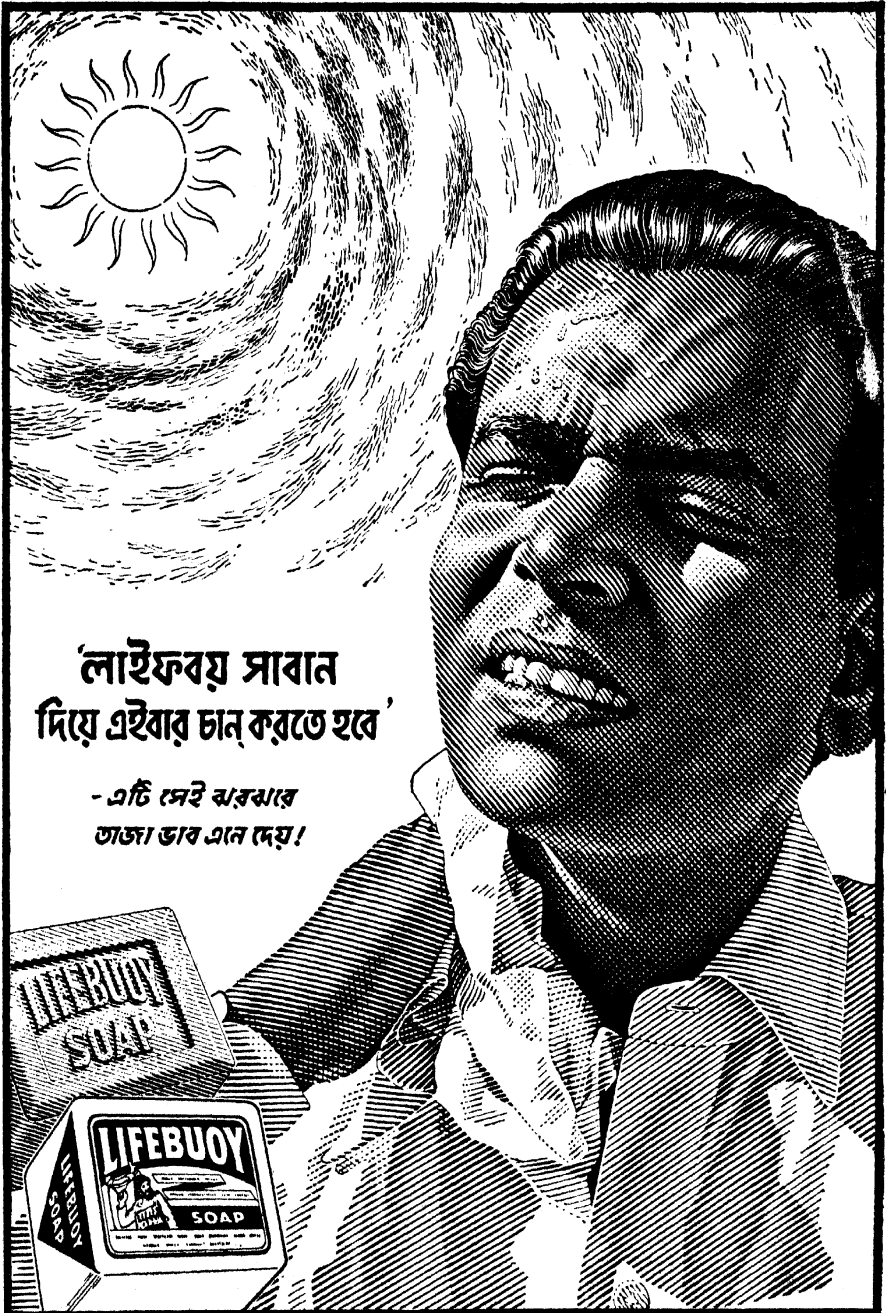
—অন্ততঃ একসেট রূপার বাসন, বাবাকে তিনশ' টাকা দিলেই হ'ত।

শুনতেই বাবা আছেন, খরচ ত সমানই দিতে হয়, না হয় বাড়ীভাড়াটাই লাগে না।

—আরে না—না, আমারও স্বার্থ আছে। জাষ্টিস সোম, দে, ওল্ড ব্যানার্জ্জি, এদের একটা পার্টি দেব, অনেক দিন থেকে ভাবছি। কিন্তু আজকাল তাতেও লোকের চোখ পড়ে। ভাল সুযোগ পাওয়া গেছে, বাবার একমাত্র "প্রাণ্ডসান" বুঝলে না, তুমি আর একশ' টাকার মধ্যে ম্যানেজ করে ফেল দিকি। এবার বড় বৌ খুশী হয়।

মেঝ বৌ বারে বারে বলে—দেখ, তোমার তিনশ' টাকার উপর আমার তিনশ' টাকা দিয়েছি, কাঙ্গালী-ভোজন যেন নিশ্চয়ই হয়, আমাদের বাড়ীর উৎসবে এটাও যদি না হয় আমি মুখ দেখাতে পারব না, বড়লোক খাইয়ে নাম কেনা বলে ঠাট্টা সইতে হবে।

এইভাবে অন্নপ্রাশনের আয়োজন চলে, বহুকাল পরে পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। নাতনীদের ভাতে যা হোক উৎসব হয়েছিল, তবে নান্দীমুখের প্রয়োজন হয় না বলে পুরোহিত ডাকতে হয় নি। বিশিষ্ট হিন্দু-পরিবার বলে খ্যাতির লোভে বৈশাখ মাসে মহাভারত, কার্ত্তিক মাসে গীতা-পাঠের ব্যবস্থা আছে, তাতে খরচ বেশী হয় না, তথাপি যদিও ছেলেরা বিলাত ফেরত, উদারপন্থী পরিবার তৎসত্ত্বেও গোঁড়া হিন্দুয়ানির পরিচয় দেওয়া হয়। বালগোপালের মূর্ত্তি মহাপুরুষের চিত্রপট, দেবদেবীদের নানাপ্রকার দারু বা প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তির দ্বারা সজ্জিত একটি ঠাকুরঘর আছে। কর্ত্তাগিন্নীই পূজা করেন। দেশের বাড়ীতে জ্ঞাতি ভাইপোকে চিঠি দিলেন কুল-পুরোহিতের জন্য। তার উত্তর পেলেন, ঠিক যে ঘর ওঁদের পুরোহিত ছিলেন তাঁরা আর এখন পৌরোহিত্য করেন না। আর বর্ত্তমানে সেই বংশের যাঁরা আছেন তাঁরা শূদ্রঘরেও যাজকতা করেন। তাঁকে দিয়ে ত হরি কাকার চলবে না।

এর পর আর তাঁকে দিয়ে কাজ করানো চলে না। কলিকাতায়ই পুরোহিতের ব্যবস্থা হয়। দেবীপ্রসন্ন বলেন, পুরোহিত কত চাও। হরিবাবু বলেন, দেখ বাপু, চেহারা যেন ভদ্র হয়, আর মন্ত্র যেন ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পাবনা চাটমোহরের বিখ্যাত মহেশ ন্যায়রত্নের বংশ।

আয়োজন সম্পূর্ণ, বাড়ীর সম্মুখ ভাগ আলোকমালায় সজ্জিত করা থেকে প্রতি ছেলের চাহিদামত সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়-বন্ধু কেউই বাদ পড়ে নি নিমন্ত্রণ থেকে। অনুষ্ঠান-সূচী হচ্ছে—সকালে অধিবাসের পর অধ্যাপক-বিদায়, স্বামী ভিক্ষু গোস্বামী আচার্য্য নিয়ে জন পঁচিশেক ব্যক্তি। মাথাপিছু সাইজের কাঁসার রেকাবে এক পোয়া চিনি, চারটি সন্দেশ ও পাঁচটি করে টাকা। দ্বিপ্রহরে দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও ব্রাহ্মণ-ভোজন। ব্রাহ্মণ বলতে যাঁরা বাড়ীতে এলে বাড়ীর মর্য্যাদা বাড়ে কিন্তু রাত্রে আসতে পারবেন না, তেমনি বাছা বাছা কয়েক জন। বাকী সকলের জন্য রাত্রে বিরাট আয়োজন। কাঙ্গালীদের জন্য চালে-ডালে এক মণ খিচুড়ী, একটা তরকারী ও বুঁদিয়া। পরিপাটি ব্যবস্থা।

পুরোহিত এসেছেন, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ছিন্ন পট্টবস্ত্র, গায়ে নামাবলি, হাতে পুথি ও থলি। চারিদিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি হ'ল, পুরোহিতের বেশবাস দেখে। যাই হোক, পুরোহিত ত্রিলোচন তর্কতীর্থ হাত-পা ধুয়ে আসন গ্রহণ করলেন। চৌধুরী-বংশে প্রতি শুভ কাজের আগে কালীপূজার রীতি আছে। হাত-তিনেক প্রমাণ প্রতিমা এনেছেন। প্রথমে কালীপূজা আরম্ভ হ'ল, সামান্য পরমান্ন দিয়ে মায়ের ভোগ হ'ল, এত ব্যস্ততায় মধ্যে এর চেয়ে বেশী সম্ভব নয়। বেলা দশটার কিছু আগে অধিবাস হ'ল।

এই বার নান্দীমুখের কার্য্য আরম্ভ হবে—পূর্ব্বপুরুষদের আহ্বান। পুরোহিত আয়োজনের কাজে বসে দেখেন নিকৃষ্ট আতপ চাল, তাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। তিনি চালের গুণের কথা নয়, পরিমাণের কথা, যে মহিলাটি সব গুছিয়ে দিচ্ছিলেন তাকে জানালেন।

সম্বন্ধে খুড়ীমা তিনি। চিত্তকে ডেকে বললেন চালের কথা। বাপের কাছ থেকে ঘুরে এসে চিত্ত বললেন—ওই দিয়েই চালিয়ে দিন, একটু অল্প করে ভাগ করুন না।—হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে গেলেন ব্যাপারটা।

ত্রিলোচন দেখলেন—কেবল চাল নয়, পৈতাগুলি কোন ব্রাহ্মণের গলায় দেবার উপযুক্ত নয়, দেড় হাত গামছা, সাড়ী মাত্র একখানি, ধুতিও তাই।

একটু পরেই এলেন স্বয়ং কর্ত্তা। বললেন, দেখুন ওই কালী-পূজোর ধুতি সাড়ীটা—মানে আমি কিছু মূল্য দেব, আর আসন-অঙ্গুরীরও ওই ব্যবস্থা করবেন। ওগুলো ভুল হয়ে গেছে—এখন আবার অসুবিধা।

—কেন? আমি তো ফর্দ্দে সব লিখে দিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ তা ওই ভুল, আর ওতে ত আপনাদেরও সুবিধা।

আজ ক'দিন ধরেই বাড়ীতে খুবই অনটন চলছে ত্রিলোচন তর্কতীর্থের। একটি শ্রাদ্ধবাড়ীর কাজে যা পাবেন আশা করে-ছিলেন তার কিছুই পান নি। সব খরচ সমানভাবে হয়, কেবল পুরোহিতের বেলায় সবাই অভাব দেখায়। শুধু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের ভড়ংটুকু চাই। অর্থ তো দেবেই না, শ্রদ্ধাটুকুও নেই। নিজেরাই বলে, সংক্ষেপে সারুন। দুত্তোর কি দরকার নিখুঁত ব্যবস্থার, শুদ্ধ মন্ত্রপাঠের।—হরিবাবুর মুখে সুবিধা কথাটা শুনে আর নিজেকে সামলাতে পারেন না। বলেন, আমাদের সুবিধার জন্যই যখন এই ব্যবস্থা তখন আর কথা কি। কার্য্য আরম্ভ করা যাক।

কুঞ্চিত ভ্রূর মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তি ফুটে উঠল—যেন আস্পর্দ্ধা ত কম নয় পুরুতের। সূর্য্যের চেয়েও বালির তাত বেশী, সবাই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন পুরোহিতের উপর।

আস্ত কাঁচাকলা দেওয়া হয়েছে ভাগ করা তণ্ডুলের উপর।

জ্ঞাতি খুড়ীমা বলেন, কলাগুলো আস্ত দিলেন কেন ছাড়িয়ে দিন।

সৌন্দর্য্যের রানীর কান্তি আপনারও হতে পারে!
দিনে দিনে সুন্দর
হয়ে উঠুন...
হ্যাঁ, আপনারও উজ্জ্বল সুন্দর কান্তির স্বপ্ন সফল হয়ে উঠতে পারে! প্রতিবার স্নানের অথবা মুখ ধোয়ার সময় রেক্সোনার ক্যাডিল সমৃদ্ধ ফেন গায়ে মুখে ভাল করে মেখে ধুয়ে ফেলুন। আপনার কান্তি দিনে দিনে আরও সতেজ আরও মসৃণ লাবণ্যে ভরে উঠবে।
"মিস রেক্সোনা"
১৯৫৫ সালের রেক্সোনা সৌন্দর্য প্রতিযোগীতার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী
Rexona
...রেক্সোনার
সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে
একমাত্র ক্যাডিল* যুক্ত সাবান
* ত্বকপোষক ও কোমলতাগ্রহ তৈলসমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
বড় সাইজেও পাওয়া যায়
RP. 130-X52 BG

—কেন আস্ত দেওয়াই ত বিধি।

—বিধি না আর কিছু, পূর্ব্বপুরুষরা খাবেন খোসাসুদ্ধ, কেবল নিজেদের সুবিধা।

ত্রিলোচন তর্কতীর্থের ইচ্ছা হ'ল বলেন, দেড়হাতি গামছা পরে ওই চাল যদি খেতে পাবেন ত, কলার খোসাও খেতে পারবেন। কিন্তু তা না বলে বলেন, কি সুবিধা—রেখে খেতে পারব ?

—তা কেন, বেচাও যাবে।

—তা কালকের বাজারে গেলে, কলা বেচা যাবে না, যে কিনবে সে ত দেখে নেবে, তবে দান করা চলে—কাঁচকলা দান, মন্দ না।

খুড়ীমা অধৈর্য্য হন—কেন পুরুতরা বেচে না, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, সোনা-রূপো।

—বেচে বৈ কি, অভাব হলে, ওসব সকলেই বেচে।...

—কর্ত্তার মত অনুযায়ী কার্য্য করেই ক্রিয়া সম্পন্ন করা হ'ল, এবার দক্ষিণান্ত করতে হবে। বড় ছেলেকে ডেকে পরামর্শ করেন হরিবাবু। চিত্ত বললে, পাঁচ পাঁচই যথেষ্ট, তার উপর কাপড়-গামছা দিয়ে পঁচিশ-ত্রিশে ঠেকবে। কালীপুজোর এক টাকা দেওয়া হয়েছিল, এতে চার টাকা দেওয়া হ'ল।

—ত্রিলোচন তর্কতীর্থ পণ্ডিত-বংশের সন্তান, শুদ্ধ আচারবিধি অনুসারে বাপ-পিতামহকে কার্য্য করতে দেখেছেন, নিজেও তাই করেন। বেশ ছিলেন পল্লীগ্রামের সরল ধর্ম্মবিশ্বাসী স্বল্পশিক্ষিতদের মধ্যে, অর্থ না দিক বেশ শ্রদ্ধাটুকু ছিল আন্তরিক। অভ্যাসবশতঃ শুদ্ধ কার্য্য করাতে দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গেল।

সকলেই বিরক্ত, কি দরকার বাপু নিখুঁত আচারের, এই ভাব খানিকটা। অবশ্য অনেক ব্রাহ্মণের আহার হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। জলযোগের পর আহার করতে বলায় তর্কতীর্থ মশায় বললেন, বাইরের পাচকের হাতে আমি আহার করি না, আমাকে মার্জ্জনা করুন।

সকলেই হাঁ হাঁ করে উঠেন। হরিবাবু বলেন—সে কি, কেন মশাই বহু সদ্‌ব্রাহ্মণই ত আজকাল—। বাবাকে থামিয়ে নিত্যপ্রসন্ন বলে, খায়, সবাই—কেউ কি মানে আজকাল ? আপনি কেন খাবেন না ?

স্বীকার করে ত্রিলোচন বলেন, হ্যাঁ খায় বৈ কি, মানে কি আর কেউ কিছু।

তবে কেউ গোপনে খায় কেউ সদরে খায় এই ত—বলে নিত্য।

—কতকটা তাই।

—তবে আপনিও খান।

—হয় ত খাই, তবে ওই, যে সদরে খাই না।

—মানে—

খুবই সোজা, অনেকে আবার শুদ্ধাহারী ব্রাহ্মণ চান ত, নইলে নাম খারাপ হয়ে যায়।

চিত্ত বললে, প্র্যাকটিসের অসুবিধা হয় আর কি।

—ঠিক বলেছেন। হেসে উঠেন ত্রিলোচন তর্কতীর্থ।

গম্ভীর হয়ে হরিবাবু বললেন, তা হলে পৌরোহিত্যও একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। আগেকার দিনে, দিনান্তে একমুঠো চালেই সন্তুষ্ট ছিলেন সবাই।

—কিন্তু সেটাও প্রতি দিনান্তে জোটা প্রয়োজন। যাক আমি ত উপবাসী নই আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আপনারা আহার করুন আমি অপেক্ষা করছি।

—তেমন যে খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন সকলে আহারের জন্য সেটা ঠিক নয়। এই না খাওয়ার জন্য কোথায় যেন স্পর্দ্ধা থেকে যাচ্ছে পুরোহিতের। দেবীপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোন বাড়ীতেই আহার করেন না।

—করি, শূদ্রবাড়ী হলে স্বপাক, ব্রাহ্মণবাড়ী হলে বাড়ীর কেউ রন্ধন করলেই চলে।

—তা ত বলেন নি আগে!

আপনারা ত জিজ্ঞাসা করেন নি।

—আমরা ভেবেছিলাম, আমরা যখন খাই, তখন আপনিও খাবেন।

—প্রত্যেকের শ্রেণী বৃত্তি পৃথক সেটা ত মানেন। আপনারা এর জন্য এত উতলা হবেন না। এ আমাদের অভ্যাস আছে। যান আহার করে আসুন।

—ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের ঘরে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রাপ্য চাল, কাপড়গুলি থলিতে রাখতে রাখতে ভাবেন—অতি আশা করেই বড় থলিটি এনেছিলেন, ঘরে চাল নেই এমনকি, আজ কি দিয়ে আহার হবে, তার পর্য্যন্ত স্থিরতা নাই। এই কার্য্য দ্বারা দিনদশেক অন্ততঃ চলবে ভেবেছিলেন। তিনটি শিশু রেখে বড় ছেলে মারা গেছে—বিধবা পুত্রবধূ, গৃহিণী, নিজে, এবং ছোট ছেলে। সে এক কবিরাজী দোকানে কাজ করে, অতি সামান্য পায়, তার যাতায়াত বাদে ঘরভাড়াটা হয় কোনক্রমে।—ভাবেন দেখি প্রাপ্য টাকা কি দেন।

ঘণ্টা পার হয়ে যায়, কর্ত্তাদের কারও দেখা নেই। সবাই খাওয়া সেরে রাতের ব্যাপারের তদারকে ব্যস্ত। কর্ম্মচঞ্চল বাড়ী। কর্ত্তার খাস চাকর বলাই এসে বলে, ঠাকুরমশায় কি এখন যাবেন ?

হ্যাঁ যাব বৈ কি, কর্ত্তাদের বল, আমার প্রাপ্যটা।

—আজ্ঞে, এখুনি বলছি। বলাই চলে যায়।

খবর পেয়ে কর্ত্তারা অবাক, দক্ষিণা ত দেওয়াই হয়েছে, কেন চাল, কাপড় ইত্যাদি উনি নেন নি।

—আজ্ঞে সে সব ত ঠাকুরমশায়ের থলিতে।

বোধ হয় আরও কিছু চান, বলে আলোকপ্রসন্ন।

চিত্ত বলে, কেন খান নি বলে, ভোজনমূল্য।

বলাই এসে জানায়, আজ্ঞে, বাবুরা বললেন, দক্ষিণা ত তারা দিয়েছেন।

বাড়ী যেতে
রমেশের ভয় হ'ল...
কাপড় আমার ময়লা করে ফেলেছি রাম! এখন মায়ের কাছ থেকে বকুনি খেতে হবে।
আমার কাপড়ও তো প্রায়ই ময়লা হয়ে যায় ভাই, কিন্তু মা আমাকে কখনও বকেনা। আয় আমার সঙ্গে।
রামের বাড়ীতে:
ও কাঁদছে কেন ?
কাপড় ময়লা হয়ে গেছে বলে ও বাড়ী ফিরতে ভয় পাচ্ছে।
রমেশের বাড়ী:
আবার নোংরা হয়ে বাড়ী ফিরেছো! আর কোনদিন তোমায় বাড়ীর বাইরে খেলতে যেতে দেবোনা!
আহা বাছাকে বোকোনা- খেলতে গেলে সব ছেলেই অমন কাপড় ময়লা করে ফেলে।
ওর কাপড় আছড়ে কাচতে রোজই আমার গলদঘর্ম হয়-আর সেইজন্যেই তো ওর কাপড় অতো তাড়াতাড়ি ছেঁড়ে!
সে তো বটেই, আছড়ে কাচলে কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে যাবেই তো, তারজন্যেই অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে!
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে
কিন্তু সানলাইট সাবানে কাচলে আছড়াবার দরকার করেনা। এর প্রচুর ফেণায় অতি সহজেই সমস্ত ময়লা বার করে দেয়, আর সেইজন্যে আপনার জামাকাপড় টেঁকেও বেশীদিন।
এ কথা সত্যি! দ্রুত ফেণপ্রসূ সানলাইট সাবান না আছড়ে কাপড়চোপড়কে সত্যিই সাদা ও ঝকঝকে করে তোলে। তার মানে- কাপড়চোপড় টেঁকেও বেশীদিন আর আমার পয়সাও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
ভারতে প্রস্তুত

—দক্ষিণা দিয়েছেন, কিন্তু কালীপূজা নান্দীমুখ সব পারিশ্রমিক কি এই পাঁচ টাকায় সারা হ'ল ?

চিত্তপ্রসন্ন পিছনেই ছিলেন। না খাওয়ার জন্ত তাঁর যেন জ্বালাটা বেশী ছিল। এগিয়ে বলেন—শুধু পাঁচ টাকাই নয়, আনুষঙ্গিক আছে। আর এই নিন, আপনার ভোজন মূল্য এক টাকা।

প্রথম অপরাহ্নের আলোক তির্য্যক্ ভাবে এসে পড়ছে। অনাহারী দারিদ্র্যপিষ্ট ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে যেন আগুন জলে উঠল, তথাপি আত্মসংযম করে বললেন, থাক, ভোজন করি নি কাজেই তার মূল্য আমি চাই নি। তার পর থলিটি উপুড় করে চাল, কলা, কাপড়, গামছা ইত্যাদি মাটিতে ঢেলে দিয়ে বললেন, আচ্ছা, আসি, নমস্কার।—বার হয়ে আসেন তিনি।

—সে কি, ওগুলো, নেবেন না আপনি।

আসতে আসতে বলেন, না, ও ত আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বাস্তু-দেবতা নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া, আপনারাই প্রসাদ পাবেন।

শূন্য থলি হাতে বাড়ী আসেন ত্রিলোচন। গিন্নী বলেন, এ কি কিছুই যে আন নি, ওঁরা বুঝি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। যাক বহু কষ্টে কিছু ধার করে বাছাদের চাল-ডাল করে দিয়েছি। চাল কত গো, সের পনের হবে ?

—এক কণিকাও নয়, ওরা সব বড়লোক বুঝলে, রাত্তে হাজার লোক খাবে, আর পুরুতের বেলায় পাঁচটি টাকা, আর নিকৃষ্ট দ্রব্য। তাও ওদেরই দিয়ে এসেছি।

গৃহিণী চুপ করে রইলেন, বুঝলেন, বিশেষ কোন কারণ না ঘটলে তিনি সব ছেড়ে আসতেন না।

ওদিকে হরিবাবুর বাড়ী, সন্ধ্যা থেকেই খাওয়ানো আরম্ভ হয়েছে, বিরাট ব্যাপার, বাড়ীর সব স্থানেই খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবুও একদল ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের মায়েরা খেতে বসেছেন।

নিত্যপ্রসন্ন বললেন, এরা দাঁড়িয়ে কেন, জায়গা নেই, আচ্ছা ওই যে কোণের ঘরে কি, নান্দীমুখ হয়েছিল ? আচ্ছা, দে দে ওটাই পরিষ্কার করে দে—বলাই, পাঁচুর মা—যাও শীগ্‌গির।

দাদাবাবুর কথায় ঝি চাকরে মিলে, মেঝের সেই চাল, কাপড় ইত্যাদি তাড়াতাড়ি এক কোণে ঠেলে দিয়ে, আসন পেতে জায়গা করে দিল। খাওয়ার শেষে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল পায়ে তারই কতক অংশ ছড়িয়ে দিয়ে গেল, তার পর পরিবেশক, দর্শক ও ভোক্তাদের যাতায়াতে সেই চাল—যে কদন্ন ভোজন করে, ব্রাহ্মণ পরিতৃপ্ত হলে হরিবাবুর পূর্ব্বপুরুষেরা তৃপ্তিলাভ করতেন, তা সকলের পদতলে পিষ্ট হতে লাগল। তখন সারাদিনের অনাহারী ব্রাহ্মণ, পরের দিন শিশুদের অনাহারের আশঙ্কায় নিদ্রাহীন।

হরিবাবুর বাড়ীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবার ভোজনে বসেছেন। তিনি স্বয়ং সমাদর, আপ্যায়ন করছেন। চার ছেলে কাছে কাছে আছে। পরিবেশকরা একে একে আসছে, হরিবাবু বলে চলেছেন, হ্যাঁ দিয়ে যাও—দাও, দাও—এ হ'ল গোবিন্দভোগ চালের নিরামিষ পুষ্পান্ন—অপেক্ষা করছ, কেন ? খাবেন বৈকি—গোলাপসরু চালের মৎস্যান্ন। নেবেন, নিশ্চয়ই নেবেন, এই হচ্ছে—পেশোয়ারী চালের পলান্ন।

সকলে বলে উঠলেন—এ কি, এ যে, রাজকীয় কাণ্ড !

উচ্চাঙ্গের হাসির ভঙ্গিমায় তাচ্ছিল্যের ভাব মিশিয়ে, হরিবাবু বললেন, এটুকুও যদি না হবে—তা হলে আর অন্নপ্রাশন কি !

সুচিত্রা সেন পছন্দ করেন লাক্স
টয়লেট সাবান
এর
শুভ্রতা ও বিশুদ্ধতার
জন্য।
সুচিত্রা সেনের সৌন্দর্য্যের উৎস
"আপনার ত্বককে মসৃণ
ও সুন্দর রাখতে হলে
ভালভাবে রগড়ে
নিন ...
"পরিস্কার করে ধুয়ে
নিয়ে শুকিয়ে গেলে
—ঝরঝরে তাজা
অনুভূতি আপ
নার আসবে।
"লাক্স টয়লেট সাবানের
নবনীসুলভ ফেনা
ও সৌরভ
মোহময়
"আপাদমস্তক সৌন্দর্য্যের
জন্য বড় সাইজ
ব্যবহার করুন যা
আমি করি।"
LUX
TOILET SOAP
বিমল রায়ের "দেবদাস"
এর মনোমোহি অভিনেত্রী

কালের বিচার—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস। প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ দাস, দাস ভিলা, ২১ শ্যামনগর রোড, দমদম, কলিকাতা-২৮। মূল্য ২৲ টাকা।

বহুদিন পূর্ব্বে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী-চরিত্রের পরিণতি লইয়া শরৎচন্দ্র অভিযোগ তুলিয়াছিলেন। আদর্শনিষ্ঠ বঙ্কিম নাকি রোহিণীর মৃত্যু ঘটাইয়া চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করেন নাই, রক্ষণশীল সমাজকে খুশী করিতে গিয়া সৃষ্টি-মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের অভিযোগ বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল বেশ। আলোচ্য নাটকখানির বিষয়বস্তু ঐ বাদ-প্রতিবাদকে লইয়াই। ইহার মধ্যে গল্প নাই—নাটকীয় গতির অভাব—তবু নবীন নাট্যকার নাটকের মধ্যে দুই পক্ষের বক্তব্যকে কতকগুলি চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

নাটকের পাত্র-পাত্রী বলিতে উপন্যাসে অঙ্কিত পুরাতন চরিত্রগুলিই; ভ্রমর, রোহিণী, গোবিন্দলাল, রমা, রাজলক্ষ্মী, কমল এবং এই সকলের স্রষ্টা বাংলা-সাহিত্যের দুই দিকপাল সাহিত্যিক বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ বক্তব্যসমেত কালের বিচারশালায় হাজির হইয়াছেন। চরিত্রগুলির সীমাবদ্ধতা নাট্যরস বিকাশের সহায়ক নহে, তথাপি ঘটনাগুলিকে বাছিয়া বক্তব্যকে গুছাইয়া নাট্যকার উহারই মধ্যে নাট্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। সে রস যে ফিকে হয় নাই—তাহা নাটকখানি পড়িলেই বোঝা যায়। রোহিণীর প্রতি সমবেদনা দেখাইয়াও শরৎচন্দ্র রমা এবং রাজলক্ষ্মীকে সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন—কিন্তু কমল হইয়াছে বর্ত্তমান কালের পথিকৃৎ। তবু কোন প্রশ্নই শেষ প্রশ্ন নহে এবং কালের বিচারে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে ডিগ্রী জারি করাও মুশকিল। নাট্যকারও সে চেষ্টা করেন নাই। দুই পক্ষের সৃষ্টিকার্য্যের প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই ধরণের দুরূহ একটি বিষয় নির্ব্বাচনে নাট্যকারের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটির মঞ্চ-সাফল্য পরীক্ষার বিষয় হইলেও সাহিত্য-সৃষ্টিগত সমস্যাটি যে পাঠককে নূতন করিয়া চিন্তা করিবার সুযোগ দিবে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। নাট্যকার নবীন হইলেও শক্তিমান, —বাংলা নাট্য-সাহিত্য পরিপুষ্ট করিবার উদ্যম তাঁহার ব্যর্থ হইবে না।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শিকারী জীবন—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

সাহিত্য-জগতে গ্রন্থকার অপরিচিত নন। রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণকে যাঁহারা জানেন না, লেখক ধীরেন্দ্রনারায়ণের কবিতা-গল্পের সঙ্গে তাঁহাদের অনেকেরই হয়ত পরিচয় আছে। লালগোলার সহিত সাহিত্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। রাজর্ষিকল্প যোগীন্দ্রনারায়ণের দানেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গোড়ার দিকে গড়িয়া উঠিয়াছে। ধীরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের পৌত্র। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর এই রাজবংশের সহিত আত্মীয়তা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আচার্য্য ত্রিবেদী ধীরেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষাগুরু এবং সম্বন্ধে মাতামহ।

ইংরেজীর মত বঙ্গ-সাহিত্য শিকার-কথায় সমৃদ্ধ না হইলেও অনেকেই শিকার-কাহিনী লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি সুখপাঠ্য। শাস্ত্রকারেরা ব্যসন বলিয়া নির্দ্দেশ দিলে কি হইবে, ধনুর্ব্বাণ হইতে আরম্ভ করিয়া উইনচেষ্টার রাইফেলের যুগ পর্য্যন্ত শিকারের মাদকতা সমভাবে বর্ত্তমান। শিকারের মধ্যে যে উত্তেজনা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দুঃসাহস এবং দারুণ বিপদের মধ্যেও একটা দৃকপাতহীন মনোভাব আছে, তাহা প্রতিনিয়ত আমাদের আকর্ষণ করে। তাই শিকার-কাহিনী চিরদিন পাঠকের এত চিত্তগ্রাহী। আলোচ্য গ্রন্থে এ সবই আছে, কিন্তু ইহাই শুধু "শিকারী-জীবনে"র বৈশিষ্ট্য নয়। যেখানে জীবনকে প্রকৃতভাবে প্রকাশ করা হয় সেখানেই সাহিত্যের সার্থকতা। "শিকারী-জীবন" যদি শুধু শিকারেরই বর্ণনা হইত, যদি শুধু ইহাতে শিকারের উন্মাদনা, আনন্দ, ভয়াবহতা, অনিশ্চয়তা এবং সাফল্যের কথাই থাকিত তাহা হইলে পুস্তকখানি কৌতূহলোদ্দীপক হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা খাঁটি সাহিত্য হইত না। "শিকারী-জীবনে"র সর্ব্বত্র সেই মানুষটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে মানুষ শুধু শিকারী নয়, শুধু রাজকুমার নয়, শুধু বংশগৌরবে গৌরবান্বিত নয়, যে মানুষ মানবধর্ম্মে ঐশ্বর্য্যশালী, যে সাধারণ হইতে নিজেকে তফাৎ করে না, যে বন্ধুবৎসল সখা, পিতৃভক্ত পুত্র, সন্তানবৎসল পিতা, যে আভিজাত্যের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী নয়, যে বিশিষ্ট হইলেও পৃথিবীর জনগণের একজন। লেখক তখন ছেলেমানুষ, বয়স বছর দশেক, মাতুলালয়ে গিয়াছেন, মাতুল পাল্কী চড়িয়া শিকারে যাইতেছেন, বলিলেন,

"পাল্কী নামা—ওরে বড্ড গরম, একটু পাখা কর্।" "আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তালবৃন্তের ব্যজন সুরু হ'ল। আমার মনে হ'ল, বাতাসটা কার পাওনা? ঘর্মাক্ত-কলেবর বাহকদের, না পাল্কীতে সুখাসীন মাতুলের?" এই রকম একটু তুলির ছোঁয়াতে লেখক যেমন নিজেকে তেমনি পারিপার্শ্বিক মানুষদেরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জীবনের প্রকাশ আছে বলিয়াই "শিকারী-জীবন" সাহিত্যপদবাচ্য এবং এ সাহিত্য রসসাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। লেখকের পাঁচ জন দেহরক্ষী ছিল, "তাদের চিরদিন এড়িয়ে চলতাম। এর মধ্যে একটা আড়ম্বর আছে; মনে হ'ত আমি যেন একটা আলাদা মানুষ, জনসাধারণের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন।" কিন্তু গ্রন্থকার শুধু গম্ভীরভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেখার মধ্যে একটি লঘু-লীলায়িত ভঙ্গী আছে। তিনি পাকা শিকারী, লক্ষ্য অব্যর্থ, কিন্তু লেখার কোথাও অযথা বাহাদুরী লইবার প্রয়াস নাই। লেখকের কৌতুকবোধ যথেষ্ট, তাই শিকার-কাহিনীতে শুধু বীররসের অবতারণা নাই, হাস্যরসের ভিতর দিয়া ঘটনাগুলি উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বাভাস, শিকারী-জীবনের গোড়াপত্তন, শিকারী-জীবনে হাসি, পদ্মার চরে বাঘ, শিকারের নেশায়—কুমীর, শুয়োর, পক্ষী ও ব্যাঘ্র, গানের আসর থেকে বাঘের আসরে, কার বাঘ কে মারে, পুরীতে পাটকীয়া জঙ্গলে, চিল্কাহ্রদে পক্ষীশিকার, কোণারকে, বালিঘাই, পদ্মায় পক্ষীশিকার, একই দিনে বাঘ ও জোড়া ভালুক, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও 'ফেন' ব্লকে হরিণ শিকার, হাজারীবাগের বাঘ—গ্রন্থে এই পনেরটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ বিয়োগান্ত। একেবারে শেষের দিকের এই করুণ এবং সংক্ষিপ্ত বিয়োগ-বেদনার ইতিহাস আমাদের মনকে ব্যথিত করিয়া তোলে। হাসি ও অশ্রু-মিশানো এই "শিকারী-জীবন" রসজ্ঞ পাঠকের একান্ত আকর্ষণের বস্তু। মাত্রাবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া লেখা আতিশয্যবর্জ্জিত। দুই-চারিটি মাত্র কথায় অরণ্য, পদ্মার চর এবং প্রকৃতি রেখায়িত চিত্রের মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রচনা সাবলীল। ঘটনা প্রবহমাণ। পড়িতে বসিলে শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া উপায় নাই।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শিক্ষা প্রসঙ্গ—স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়। ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা। মূল্য ১॥০।

স্বামী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র ধর্মনায়ক নন, তিনি আধুনিক ভারতের একজন প্রধান চিন্তানায়ক। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর উপদেশাবলী গভীর ভাবে অনুধাবনযোগ্য। "মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্তমান, তাহারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা।" তাঁর এ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, কতকগুলি মত, তত্ত্ব অথবা বুলি আওড়াতে পারলেই শিক্ষা হয় না; আন্তরিক শক্তির স্ফুরণই শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য।

আলোচ্য গ্রন্থে স্বামীজীর শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনা নয়টি প্রবন্ধের আকারে সঙ্কলিত হয়েছে: (১) শিক্ষার মূলতত্ত্ব (২) শিক্ষালাভের উপায় (৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য (৪) বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষ ও তন্নিরাকরণের উপায় (৫) ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (৬) শিক্ষা ও ছাত্র (৭) স্ত্রীশিক্ষা (৮) জনশিক্ষা (৯) আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-প্রণালী।

স্বামীজীর মনস্বিতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রবন্ধগুলিতে পরিস্ফুট। তাঁর জ্ঞানদীপ্ত চিত্তের প্রভাবে পাঠকের মন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

ভারতের মুক্তিসাধনায় অরুণাচলের অবদান—শ্রীঠাকুরদাস রায়। অরুণাচল মিশন। মূল্য ॥০।

অরুণাচল ধর্মাশ্রম। পুস্তিকাখানি প্রচারমূলক। আমাদের মনে হয়, সাধকদের পক্ষে আত্মপ্রচার থেকে বিরত থাকাই শোভন।

আলোর তৃষা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম: পণ্ডিচেরী। মূল্য ১৷০।

'মায়ের দিকে', 'আলোর তৃষা', 'অন্তর্জীবন' প্রভৃতি অধ্যাত্মভাবমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ।

মুস্কিল আসান—নারায়ণ সান্যাল। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৷০।

হাস্যরসের নাটিকা। লেখকের 'ছাত্রবয়সের লেখা'। সুতরাং এতে কাঁচা হাতের ছাপ থাকা অপ্রত্যাশিত নয়।

জীবনকাব্য—শ্রীপতিচরণ পড়ুয়া। ৫।২ডি, রাজেন্দ্র সেন লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ১।০।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও যৌবনান্ত—জীবনের বিভিন্ন অবস্থার কথা পদ্যের সূত্রে গাঁথা। অনুভূতি হয়ত সত্য, কিন্তু তার প্রকাশ কবিতা হয় নি। ছন্দেরও বাঁধুনি নেই।

বার্নার্ড শ'—শ্রীসত্যনারায়ণ লাহিড়ী। ৮।১ডি, হাজরা লেন। মূল্য ১॥০।

প্রধানতঃ শ'য়ের চিন্তাপ্রণালী ও দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা। যাঁরা বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে শ'য়ের সম্বন্ধে কিছু জানতে ও ভাববার খোরাক পেতে চান, তাঁরা পড়ে উপকৃত হবেন।

শ্রীদীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
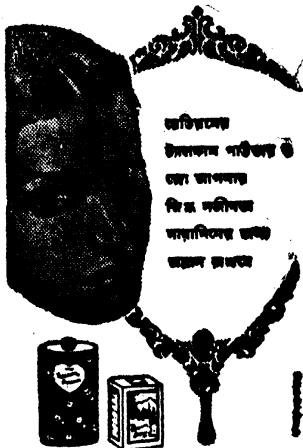
শান্তির বারতা (১ম খণ্ড)—স্নেহময় ব্রহ্মচারী। অযাচক আশ্রম, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা। কথোপকথন-সূত্রে লেখকের গুরু স্বামী স্বরূপানন্দ যে সব উপদেশ দিয়েছেন, তার সঙ্কলন।

আঁখিতে রহ গো—শ্রীআশীষ গুপ্ত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩॥০।

এক সময়ে আশীষ গুপ্তের গল্প অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার পর সাহিত্যজগতে দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন প্রায় নিখোঁজ। অনেক দিন পরে এ বইয়ে তাঁর বিদ্রূপ-করুণা-নিপুণ রচনার পরিচয় মিলল। বইখানিতে নন্দদুলাল, সহধর্মিণী, আমাদের যুগের সুনন্দ, ও হে ঈশ্বর—এই চারটি গল্প আছে।

ভারত-আত্মার বাণী—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। ডবল ডিমাই, ২৮৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲।

অজর অমর শাশ্বত সনাতন আত্মার শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া জড়বাদী ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্ত্য শক্তিবৃন্দ দিকে দিকে জড়বিজ্ঞানের বিজয়-কেতন উড়াইয়া দুনিয়ার মালিকানা দাবি করিতেছে। আধ্যাত্মিক প্রাচ্য জাতি-মণ্ডলকে যেন সদর্পে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, 'জড়বাদের প্রতাপ লক্ষ্য কর, আকাশে এরোপ্লেন, জলে সাবমেরিন ও ডেষ্ট্রয়ার, স্থলে ট্যাঙ্ক, কামান-বন্দুকের অজস্র সম্ভার, তদুপরি এটম ও হাইড্রোজেন প্রভৃতি বিশ্ববিধ্বংসী মারণোপকরণ, সুতরাং আত্মিক শক্তির বড়াই না করিয়া তোমরা আমাদের বশবর্তী হইয়া চল। মোটর, রেডিও, টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক রেল, টেলি-ফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি জীবনের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক উপ-করণাদি আহরণ করিয়া তোমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া দিব।' দুইটি বিশ্বমহাযুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবৃন্দের এই জড়বাদী সভ্যতার পরিণাম লক্ষ্য করা গিয়াছে। অতঃপর গ্রন্থকারের 'ভারত-আত্মার বাণী' শুনাইবার প্রয়োজন কি? জড়বিজ্ঞানের এই অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপাদি দর্শনে চমৎকৃত বিশ্বজন আধ্যাত্মিকতা, মানবতা ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে কি? কিন্তু জীবনদর্শনাভিজ্ঞ প্রাচীন গ্রন্থকার ইহাতে দমিত না হইয়া বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত, বুদ্ধবাণী প্রভৃতি হইতে প্রাচীন ভারতের বাণী ও বর্তমান কালের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও দর্শন হইতে অজস্র উক্তি ও রচনাংশসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, কালপ্রবাহে কত সুপ্রাচীন সভ্যতার পতন ও বিলোপ ঘটিয়াছে, কিন্তু ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার বিনাশ নাই। এখনও তা কালের বিশ্বগ্রাসী অমোঘ শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অটল অটুট ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, আত্মার চিরভাস্বর ও চির-অম্লান জ্যোতিতে দেদীপ্যমান, মহীয়ান ও বলীয়ান।

বইখানি বার বার পড়িতে ইচ্ছা হইবে, কারণ গ্রন্থকার প্রচুর শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভারত-আত্মার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ও জবাহরলালের প্রতি-কৃতি দেওয়াতে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। মলাটের পরিকল্পনা সুন্দর।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

শান্তি-সাহানা—শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী। "কবিতা-বিতান।" ৪১, বামাচরণ রায় রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪। মূল্য এক টাকা।

'শান্তি-সাহানা' কবিতার বই। ঠিক আধুনিক কবিতা নয়—চিল, শকুন, শিয়াল, কুকুর, বন্ধ্যা, নাগিনী প্রভৃতি কুড়িয়ে-আনা শব্দপ্রয়োগে অতি-

আধুনিকতার ছাঁচে ঢালাই করা। ফলে স্থানে স্থানে মর্মোদ্ধার দুরূহ হওয়ায় আর কৃত্রিমতার প্রলেপ পড়ায় কবিতার প্রসাদগুণ ব্যাহত হয়েছে। তাঁর কথায় বলি :

"থামো ফেনাটিক কবিপুঙ্গব ; যে কথা বলছি শোনো :
আমদানী-করা কলমের চারা সৌখিন-টবে যতই কেননা বোনো
কোনো-ই কুসুম ফুটবে না তাতে,—যদি এ-দেশের মৃত্তিকা-পয়োধরে,—
এদের দৃপ্ত কিশলয়-প্রাণ বাঁচার খাদ্য না পায় সুধায় ভ'রে।"

—প্রোগ্রেসিভ, পৃঃ ২৯।

উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু অতি-আধুনিক হওয়ার মোহ মাঝে মাঝে তা ব্যর্থ করেছে। অবশ্য তাঁর সার্থক কবি-কর্মের প্রমাণও রয়েছে এ বইয়েই—

"নদীর ও-পারে আকাশের নীচে পদ্মার সমতলে
আবির-ঝড়ের অরুণ-ওড়না রক্তের শতদলে
স্রোতের আবেগে মেলে যে পাপড়ি তার,
আকাশ, পৃথিবী সমতল—একাকার !
বাতাসের বাঁশী তখন পুরবী-শান্তির লিপি লিখে'—
পাঠায় আগামী, উজ্জ্বল পৃথিবীকে।
আরক্ত-চাঁদ জেগে ওঠে ধীরে সোনালী-মেয়ের ডাকে
যৌবন-ভরা পদ্মার বাঁকে বাঁকে।" সোনালিয়া, বলো—পৃঃ ৮।

লেখক জাত-কবি। শক্তির অপচয় না করলে এবং অতি-আধুনিকতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারলে এঁর কাছে রীতিমত ভাল কবিতা পাওয়া যাবে।

কাগজের ফুল—দেবপ্রসাদ। হোমশিখা প্রকাশনী বিভাগ। উমাচরণ মুখার্জ্জী লেন, কৃষ্ণনগর। প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা আট আনা।

'কাগজের ফুল' উপন্যাস। কালিন্দী আর তার স্বামী অমূল্যের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতাই এর কাহিনীর উপজীব্য। গ্রামের গরীব-ঘরের কিশোরী মেয়ে কালিন্দী। সুন্দরী বলে উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত ছেলে অমূল্যের সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল। কলিকাতার উপকণ্ঠে সাহেবি ভাবাপন্ন পরিবার—লেখাপড়া, নাচগান শিখিয়ে ঐ পরিবারের উপযুক্ত করে তোলা হ'ল কালিন্দীকে। তার পর পারিবারিক জীবন ছাড়িয়ে সামাজিক জীবনে ছড়িয়ে পড়ল কালিন্দীর কার্য্যকলাপ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কালিন্দী বুঝতে পারল—তার আর তার স্বামীর মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধানের প্রাচীর রয়েছে। কিন্তু কোথায় তা সে ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না। এদিকে কালিন্দীর সঙ্গে বিয়ের আগে স্বামীপরিত্যক্তা বনলতার সঙ্গে অমূল্যের হয়েছিল অন্তরঙ্গতা এবং এই অবৈধ মিলনের ফলে একটি ছেলেরও জন্ম হয়েছিল—নাম তার নীলু। কালিন্দীকে বা অন্য কাউকে অমূল্য একথা জানায় নি, অমূল্যের সঙ্গে বনলতার কোন যোগাযোগও অবশ্য ছিল না। হাসপাতালে মারা যাবার সময় বনলতা কিন্তু সাত বছরের ছেলে নীলুকে অমূল্যের হাতে সঁপে দিয়ে গেল। অমূল্য নীলুকে বাড়ী নিয়ে এল, সদ্যমাতৃহারা অসহায় এ ছেলের পরিচয় দিল তার এক নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর পুত্র বলে। কালিন্দী নিঃসন্তানা—নীলুকে নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগল সে। হঠাৎ একদিন অমূল্যের পকেটের এক চিঠি থেকে কালিন্দী নীলুর পরিচয় জানতে পারল। এক মুহূর্ত্তে স্বামীর এত দিনের আচরণের অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠল কালিন্দীর কাছে। এর পর স্বামী-স্ত্রীতে চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।—লেখক ঝরঝরে ভাষায় গল্পটি আগাগোড়া বর্ণনা করে গেছেন। স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও আবেগ প্রাধান্য লাভ করায় গল্পের গতি কতকটা ব্যাহত হলেও লেখকের সাবলীল ভাষা শেষ পর্য্যন্ত মনকে টেনে নিয়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

দেশ-বিদেশের কথা

সাহিত্যতীর্থে কথা-সাহিত্যিক ও কবিসম্মেলন

গত ৩০শে চৈত্র, ১লা বৈশাখ ও ২রা বৈশাখ এই তিন দিন ধরিয়া কলকাতায় বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান সাহিত্যতীর্থের দ্বিতীয় বার্ষিক কথা-সাহিত্যিক ও কবিসম্মেলন ৬৬।১, পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীটের 'মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে' অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্রসংক্রান্তির সন্ধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস এই উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্যতীর্থের বাংলা কবিতা পুস্তক-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই দিন কথা-সাহিত্যিক সম্মেলনে স্বরচিত ছোটগল্প পাঠ করেন বাণী রায়, রণজিৎকুমার সেন প্রভৃতি। কথা-সাহিত্যিক সম্মেলনের প্রারম্ভে 'বাংলা ছোটগল্প' এই পর্য্যায়ের আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তী গল্পকারদের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে অভিনবত্বের কথা উল্লেখ করেন। এই দিবস এবং পর দিবস সাহিত্য-তীর্থের তীর্থপতি কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সভা পরিচালনা করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন-সঙ্গীত করেন বাণী দাশগুপ্তা।

১লা বৈশাখ কবি সম্মেলনে প্রাচীন ও আধুনিক, প্রবীণ ও নবীন কবিদের মধ্যে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত করেন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি।

২রা বৈশাখ প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার ঊনঅশীতিতম জন্মজয়ন্তী দিনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। সভায় আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ত্তা-সম্পাদক শ্রীহরিপদ মহলানবিশ সভাপতিত্ব করেন। সাহিত্য-তীর্থের তীর্থঙ্করদের পক্ষে শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক অভিনন্দনপত্রে বলেন, "কথার পরে কথা গেঁথে আপনি যে অমর কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন, বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীর তা অমর সম্পদ, অক্ষয় সম্পদ।" সভায় বহু বিশিষ্ট

অতিথির মধ্যে শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সভাপতির ভাষণের পরে শ্রীদক্ষিণা-রঞ্জন মিত্র মজুমদার সংবর্দ্ধনার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া সাহিত্যতীর্থের তীর্থঙ্করবৃন্দকে আন্তরিকতার সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করেন।

হরনাথ তত্ত্বপ্রচারিণী সভা

'পাগল' হরনাথ বলিয়া পরিচিত সিদ্ধ পুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হরনাথ তত্ত্বপ্রচারিণী সভার পরিচালকবৃন্দ ১৯১২ সনে পুরীধামের স্বর্গদ্বারে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমটি ধর্ম্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান। পুরীর তীর্থযাত্রীরা বিনা খরচে তিন দিন তথায় থাকিতে পারেন। প্রতিদিন তথায় নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করা হয়। একটি দাতব্য চিকিৎসা-লয় ও বিধবাদিগের জন্য গৃহশিল্প ও কারুশিল্পের একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা উক্ত সভার কর্তৃপক্ষের আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে 'সভা'র অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। টাকাকড়ি নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরিতব্য :

শ্রী এস. কে গাঙ্গুলি। ৫৩-বি, সারপেনটাইন লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়ের সম্মান

উত্তর প্রদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত আয়ুর্ব্বেদিক ও টিব্বি একাডেমি রাজবৈদ্য ডাঃ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম-এ, আয়ুর্ব্বেদ বৃহস্পতিকে ইংরেজী ভাষায় তাঁহার রচিত "ক্যান্সার রোগের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" (Ayurvedic Treatment of

শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়

Cancer) নামক গ্রন্থখানির (১৯৫৫-৫৬ সালের) জন্য দুই শত টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। বাংলা দেশের কবি-রাজগণের মধ্যে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম এই পুরস্কার লাভ করিলেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পল্লীপ্রান্তে

শ্রীঅসিতরঞ্জন বসু

উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধ (তক্ষশিলা : ৫ম শতাব্দী)

পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি (মথুরা : গুপ্তযুগ ৫ম শতাব্দী)
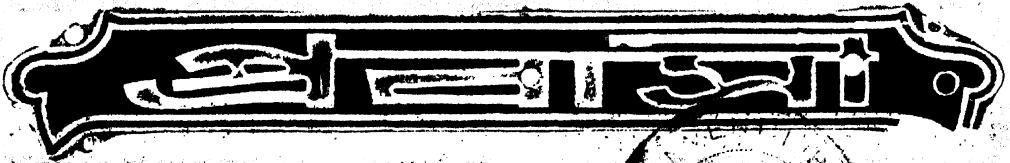
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
১ম খণ্ড } আষাঢ়, ১৩৬৩ ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নৈতিক মান

বোম্বাইয়ে বিগত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার মধ্যে নৈতিক মান সম্পর্কিত প্রস্তাবটিই বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। অধিবেশনের অল্পদিন পূর্ব্বে খড়্গপুর ও কাসকার রেল ধর্ম্মঘটিগণের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও দুষ্কৃতি এবং অধিবেশনের মুখে, বোম্বাইয়ে সংযুক্ত-মহারাষ্ট্র দলের প্রবল বিক্ষোভ, এই কয়টি ঘটনা পরে পরে আসায় কংগ্রেস কমিটির চৈতন্যের উদয় হয়। ফলে তাঁহারা অনেক প্রয়াসের পর একটি দীর্ঘ উপদেশমূলক, আপ্তবাক্য প্রচার করিয়া দেশের লোককে কৃতার্থ করেন।

কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা একটি সংবাদ দিতেছেন যে, বর্ত্তমানে এই নগরীতে কিশোর ও যুবজনের মধ্যে উদ্দাম যথেচ্ছাচার ও দুর্নীতি ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে। ফলে নাগরিকদিগের জীবন-যাত্রার পথে এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রগতির পথে উহা বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং পুলিশ বাধ্য হইয়া এই সকল ব্যাপারে প্রতিকারের পথ খুঁজিতেছে।

রোগ ত সারা দেশে মহামারীর ন্যায় দেখা দিয়াছে। প্রতিকারের জন্য কংগ্রেস মাদুলী দিয়াছেন ও স্থানীয় পুলিশ টোটকার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু রোগের কারণ ও তাহার প্রতিক্রিয়া যদি সম্যক ভাবে বিচার না করা হয় তবে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা কি করিয়া হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

কংগ্রেস ত বর্ত্তমানে নৈতিক অধঃপতনের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। নিজের ঘরে যদি অনাচার, ব্যভিচার ও দুষ্কৃতির চূড়ান্ত চলিতে থাকে তবে পরকে উপদেশ দেওয়া যায় কোন মুখে? ছলে বলে কৌশলে পরকে বঞ্চিত করিয়া যিনি নিজের পাতে ঝোল টানিয়াছেন তিনি অন্যকে কি বলিয়া সততার পথে লইয়া যাইবেন? নিজের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া যে সরকার দুষ্ট ও দুর্বৃত্তের কাছে নতি স্বীকার করে, কি করিয়া সে জনসাধারণের সাহায্যে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সক্ষম হইতে পারে?

অল্পদিন পরেই দেশের ও রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অধিকার লইয়া নির্ব্বাচনের অভিযান আরম্ভ হইবে। তাই আজ কংগ্রেস কমিটির মাথা ব্যথা, সেই জন্য আজ কলিকাতায় পুলিস কমিশনার দুশ্চিন্তায় মগ্ন। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ও সময়ে সকল দলের সকল মুখপাত্র বাক্যের ফোয়ারা খুলিবেন। কেহ-বা দেশে রামরাজ্য স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিবেন, কেহ-বা বাজাইবেন সাম্যের ঢোল, কেহ-বা পিটিবেন জনকল্যাণের কাঁসর। নির্ব্বাচন হইয়া গেলে যিনি ও যাঁহারা জিতিবেন তাঁহারা সকলেই প্রথমে নিজের স্বার্থ এবং পরে দলের পুষ্টি এই দুই মূলনীতি গ্রহণ করিয়া অন্য সকল চিন্তা বর্জ্জন করিবেন। এই তো সনাতনী প্রথা এবং বর্ত্তমানে এদেশে যে তাহার ব্যতিক্রম হইবে তাহার কোনও লক্ষণ তো আমরা দেখিতেছি না।

দেশের ভবিষ্যতের আলোক যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের নৈতিক অধঃপতন যে ব্যাপক ভাবে হইতেছে সে তো এখন সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু তাহার প্রতিকার কি এতই সহজ যে, পুলিশ কমিশনারজাতীয় অধিকারী দ্বারা তাহা হইতে পারে? কলিকাতার পথেঘাটে যাহারা চলাফেরা করে, যাহারা সাধারণ ভাবে কলিকাতার নাগরিক জীবনের সমস্যাগুলি দেখে তাহারা জানে কলিকাতার পুলিস কি প্রকার জীব। পুলিস কমিশনার আগে নিজের ঘর শোধন করিয়া পরে কিশোর ও যুবকের সমস্যা হাতে লইলে ভাল হয়। যদি কিশোর ও যুবকেরা কলিকাতার পথেঘাটে দেখিতে পায় যে হঠকারিতার জয় সর্ব্বত্র, তবে সে নিজেও যে ঐ দিকেই যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শিক্ষক যদি ক্লাসে ছাত্রের সম্মুখে অনাচারের আদর্শরূপে বসিয়া থাকেন তবে পড়ুয়ার আদর্শের বিকার হইবে না কেন?

নৈতিক মানের অবনতির দৃষ্টান্ত তো বিধানসভায়, লোকসভায় ও রাজ্যসভায় ভূরি ভূরি রহিয়াছে। কংগ্রেসের ত শতকরা ৯০ জন, যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিবার জন্য শঠতার পথে আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা নৈতিক মানের বুঝেনই বা কি আর দেখানই বা কি?

দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়াপত্তনী

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে জাতীয় আর্থিক পরিস্থিতি খুব আশার বাণী সঞ্চার করে না; প্রগতি যেন হঠাৎ কিসে ধাক্কা খাইয়া থমকিয়া গিয়াছে, কিম্বা বিপরীত গতি অবলম্বন করিয়াছে। হিসাবের খতিয়ানে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কতখানি হইয়াছে তাহা ভাবিবার কথা। সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে যে, জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ব্যক্তিগত আয় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ আশাপ্রদ, কৃষি উৎপাদনের সূচী ৯৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১১৫তে আর ১৯৫১ সন হইতে ১৯৫৫ সনের মধ্যে শিল্পোৎপাদনের সূচী ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিবহন-ব্যবস্থা, বিশেষতঃ রেলপথের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী খাতে খরচ হইয়াছে ২,১০০ কোটি টাকা, আর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খরচ হইবে ৪,৮০০ কোটি টাকা। আগামী পাঁচ বছরে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ এবং ব্যক্তিগত আয় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। হিসাবের রঙে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন রঙ্গিন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেন আলেয়ার পিছনে ধাবমান।

দেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, মূল্যমান বাড়িতেছে এবং সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছে জীবনযাত্রার খরচ। সাধারণ মানুষের সরকারী হিসাবের ভেল্কীতে তাক লাগিয়া যায়, কিন্তু কেহ খুব আশান্বিত হয় না। ১৯৫৩-৫৪ সনে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১০,০৪০ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত আয় ছিল বছরে ২৬৯ টাকা। ১৯৫৪-৫৫ সনে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১০,১৭০ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত আয় ছিল ২৬৯ টাকা। এই হিসাব ধরা হইয়াছে ১৯৪৮-৪৯ সনের মূল্যস্তর দ্বারা। বর্তমান মূল্যস্তর দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ১৯৫৩-৫৪ সনে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১০,৪৯০ কোটি এবং ব্যক্তিগত আয় ছিল ২৮১ টাকা। ১৯৫৪-৫৫ সনে জাতীয় আয় হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৯,৯১০ কোটি টাকায় এবং ব্যক্তিগত আয় নামিয়া আসে ২৬২ টাকায়। অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীবনযাত্রার মান অবনত হইয়াছে এবং ইহার প্রধান কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। মূল্যমান বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। ১৯৫৫ সনে মোট ৬,৫০ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল তাহা অতিক্রম করা হইয়াছে; খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবের খাতায় অতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়াই ধরা হয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখিয়া মনে হয় যে, সরকারী হিসাব অবিশ্বাস্য। এই অপ্রকৃত হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া ১৯৫৫ সনে ৮০,০০০ হাজার টন চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়া হইয়াছে।

এই বৎসরের নূতন বাজেটের ফলে ফাটকা বাজারের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য কালাবাজারের ব্যবসায়ীরা ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। সরিষার তৈল প্রভৃতি কয়েকটি খাদ্যজাতীয় দ্রব্যের উপর কর স্থাপনায় ফলে ফাটকাবাজারীরা মনে করিল যেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা পূর্ণোদ্যমে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিল। কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ অবশ্য মূল্য বৃদ্ধি ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট, কারণ এই সামান্য মূল্য বৃদ্ধিতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মাথায় কাহারা ঢুকাইয়া দিয়াছে যে, ভারতে মুষ্টিমেয় ধনীরাই কেবল রাষ্ট্রকে কর দেয়, আর আপামর জনসাধারণ দেয় না। ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে দরিদ্রকেও কর দিতে বাধ্য করা হইবে এবং তাহার প্রকৃষ্ট উপায় খাদ্যদ্রব্যের উপর কর স্থাপন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতির পরিপন্থী। মূল্যমান বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই সঙ্গে জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় তথা ব্যক্তিগত আয়ের প্রকৃত পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য যে জাতীয় আয় ও ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি করা তাহা ব্যাহত হইবে।

দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সরকারের কতকগুলি আশা ও সদিচ্ছার সমষ্টিমাত্র, বাস্তবক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি পূরিত হইবে কিনা সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশনে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। শ্রী কে. সি. নিয়োগীর অভিমতে পরিকল্পনার কল্পনায় ভারসাম্যের অভাব আছে, কল্পনা আর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দুইটি এক জিনিষ নয়। আজিকার দিনের প্রধান সমস্যা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ইহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভবপর হইবে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন, যে, আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই।

আর্থিক পরিকল্পনা আর প্রকৃত পরিকল্পনা দুইটি ভিন্ন জিনিষ; আর্থিক কল্পনার মাপকাঠিতে পরিকল্পনার বাস্তব সাফল্য কিংবা প্রগতি বিচার করা যায় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান দোষ কয়েকটি এই ভাবে ধরা হয়—প্রথমতঃ, অর্থাভাব। প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত করদ্বারা তোলা সম্ভবপর হইবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পিত খরচের পরিমাণ কম করিয়া ধরা হইয়াছে; দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, শিল্পোৎপাদনের নির্দ্ধারিত পরিমাণের পক্ষে পরিবহন-ব্যবস্থা অনুপযুক্ত। ইহার প্রমাণ আমরা পাই—কলিকাতায় বর্তমানে জ্বালানি কয়লার অভাবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেলপথ, জাহাজ ও অন্যান্য পরিবহন-ব্যবস্থার জন্য যে খরচের পরিমাণ ধরা হইয়াছে তাহা অত্যল্প। আর খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও অল্পকালের মধ্যে প্রয়োজনীয় সরবরাহ বিদেশ হইতে পাওয়া যাইবে না। কয়েক মাসের মধ্যেই বোম্বাই

বন্দরে রোজ প্রায় ২,০০০ হাজার টন করিয়া ইস্পাত আসিবে, কিন্তু বর্ত্তমানের পরিবহন-ব্যবস্থা দৈনিক মাত্র ৮০০ টন বহন করিতে পারিবে। ভারত স্বাধীন হইবার সময় হইতেই পরিবহন-ব্যবস্থার স্বল্পতা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিকে ব্যাহত করিয়া আসিতেছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী সামর্থ্য প্রায় সীমাবদ্ধ। এই অবস্থায় পরিবহন-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ও প্রসারের জন্ম বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, বিশেষতঃ জাহাজ-নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আর একটি দোষ এই যে, উপযুক্ত লোকের অভাব। শুধু পরিকল্পনা কাগজে-কলমে তৈয়ার করিলেই কার্য্যকরী হয় না; তাহাকে কার্য্যকরী করার জন্ম উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষে এই প্রকার কর্ম্মচারীর যথেষ্ট অভাব আছে। এখানে সবাই মাছিমারা কেরাণী হইতে পারে; প্রথম পরিকল্পনার অনেকগুলি কল্পনাই চিন্তাশীল কর্ম্মচারীর অভাবে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, যেমন কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রোজেক্ট। ইহার জন্ম আমাদের কর্ত্তৃপক্ষও যথেষ্ট দায়ী। তাঁহারা অতীতের কর্ম্মচারিতান্ত্রিক লৌহ কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়াছেন এবং কর্ম্মচারীদের নিরেট ইস্পাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে নূতন সৃজনীশক্তির স্থান নাই।

সর্ব্বশেষে আসে মুদ্রাস্ফীতির ভয়। দেশের মূল্যমান ক্রমবৃদ্ধির দিকে। বাজেটের আলোচনার সময় লোকসভায় জনৈক সভ্য এই ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেশের মূল্যমানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রধান উপায় হইতেছে, বর্দ্ধিত হারে খাদ্যশস্য, কাঁচামাল, বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্য উৎপাদন। ইহার উত্তরে অর্থমন্ত্রী গীতার নিস্পৃহ দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াইয়া সমস্যাটিকে এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি যে ঠিক কি বলিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তবে ইহাও ঠিক যে, অর্থমন্ত্রী নিজে কি বলিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই ভাল করিয়া বোঝেন নাই। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন—"একজন সভ্য অভিমত দিয়াছেন যে, মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার প্রধান উপায় বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্যের বর্দ্ধিত সরবরাহ। অঙ্কের হিসাবে ইহা ঠিক, কিন্তু পরিকল্পনার দিক দিয়া ইহা ভুল; কারণ অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতার প্রয়োগ এক জিনিষ আর পরিকল্পনার দ্বারা অতিরিক্ত উৎপাদনশীলতার সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করার প্রচেষ্টা ভিন্ন জিনিষ।" সত্য কথা বলিতে কি অর্থমন্ত্রীর ধোঁয়াটে উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গেলে সবই যেন ধোঁয়া হইয়া যায়। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় সবই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ব্যবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে—অতিরিক্ত উৎপাদনশীলতা স্বাভাবিক হউক কিংবা পরিকল্পিত হউক তাহাতে এমন কিছু পার্থক্য হয় না; লক্ষ্যের বিষয় তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার। যখন শ্রী কে. সি. নিয়োগী দেখাইলেন যে, খাদ্য, বস্ত্র, ইত্যাদির অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যতীত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না, তখন প্ল্যানিং কমিশন তাহা গ্রহণ করেন। গত বৎসর ভারতবর্ষে বস্ত্র ও চিনির উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণে হইয়াছে, তথাপি ইহারা বাজারে অগ্নিমূল্যে বিকাইতেছে। ভারতবর্ষে চিনির প্রয়োজন প্রায় ১৮ লক্ষ টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তাই কর্ত্তৃপক্ষ চিনির আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর তাঁহাদের হাতে যে আমদানী চিনি ছিল তাহা তাঁহারা বেসরকারী ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। ভারতে আভ্যন্তরিক চিনির উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় এখনও ঘাটতি আছে। সেই অবস্থায় আমদানী বন্ধ করার ফলে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। কর্ত্তৃপক্ষ বোধ হয় মনে করেন যে, ৩৫ কোটি লোকের মাঝখানে যদি ৫০০ জন অতিরিক্ত লাভ করে ত করুক না কেন, তাহাতে কাহার বা কি ক্ষতি হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও আইনপরিষদ হ, ব, ব, র ও ল'য়ের সংমিশ্রণ—একদিকে আছেন উগ্র সমাজতান্ত্রিক, অন্য দিকে আছেন উগ্র ধনতন্ত্রবাদী, মাঝখানে আছেন বিভিন্ন পর্য্যায়ের উদারনৈতিক মতাবলম্বী যাঁহারা শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখিবার প্রয়াস পান। ইহা যেন এরোপ্লেন, রেলগাড়ী, গরুরগাড়ী ও রিক্সকে একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া দিয়া চালাইবার প্রচেষ্টা। ফলে কেহ চায় উড়িতে, কেহ বা চায় মাটিতে পড়িয়া থাকিতে, আর কেহ বা চায় হামাগুড়ি দিয়া যাইতে। এই অবস্থাকে বোধ হয় সুকুমার রায় কল্পনা করিয়াছিলেন "হাতিমির" দশা বলিয়া। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রতিক্রিয়াপন্থী অর্থমন্ত্রীকে বিদায় দেওয়া অতি অবশ্য প্রয়োজন।

বহির্বাণিজ্য পরিস্থিতি

যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাব ঘাটতিতে পূর্ণ। ১৯৪৭ সন হইতে ১৯৫৫ সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই ঘাটতি হইয়াছে, কেবলমাত্র ১৯৫০ সন ব্যতীত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বহির্বাণিজ্যে ভারতের প্রায় ১১২০ কোটি টাকার মত ঘাটতি পড়িবে, কারণ এই সময়ে যন্ত্রপাতির আমদানী বৃদ্ধি পাইবে। প্ল্যানিং কমিশন এই ঘাটতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন, কিন্তু ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা কিছু করেন নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কতকগুলি প্রস্তাব করা হইয়াছে এই ঘাটতি পূরণের জন্ম। যথা: বিদেশী মুদ্রার জমা হইতে খরচ, বিদেশের বাজারে ঋণ গ্রহণ, ব্যাঙ্ক দাদন ও রপ্তানী ঋণ, বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণ, বিদেশ হইতে ব্যক্তিগত মূলধন আমদানী ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলি কেবলমাত্র আশার প্রতীক ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

১৯৫৫ সনে ভারতবর্ষ ৬৪৭ কোটি টাকার মাল আমদানী করে ও রপ্তানী করে প্রায় ৬০৫ কোটি টাকার মাল, ঘাটতি হয় প্রায় ৪২ কোটি টাকার মত। ১৯৫৪ সনে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি ছিল প্রায় ৫৫ কোটি টাকার মত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ যদি লাভ করিতে না পারে তাহা হইলে দ্বিতীয় পরি-

কল্পনার অনেক অংশ কার্য্যকরী হইতে পারিবে না। প্ল্যানিং কমিশনের মতে আগামী পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষ গড়ে বৎসরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর মতে এই হিসাব খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ভারতের রপ্তানী প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ বৎসরে প্রায় গড়ে আট শত, সাড়ে আট শত কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানী করা হইবে। তিনি বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রভাবে ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ইহা অতিরিক্ত আশা।

বহির্বাণিজ্যের প্রধান কথা এই যে, ইহার গতি দুমুখী, অর্থাৎ আমদানী ও রপ্তানী প্রায় সমান ভাবে চলে। শুধু রপ্তানী করিব, বিক্রয় করিব, কিন্তু আমদানী করিব না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহা হয় না। অপর দেশের জিনিষ না ক্রয় করিলে তাহারা আমাদের জিনিষ ক্রয় করিবে না, ইহা সোজা হিসাব। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতবর্ষের রপ্তানী হ্রাসের একটি প্রধান কারণ আমদানী হ্রাস ও টাকার মূল্য হ্রাস। যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ প্রায় ৭০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিত। কিন্তু পরে যেই আমদানী হ্রাস করিয়া দেওয়া হইল, সেই অনুপাতে রপ্তানীও হ্রাস পাইল। সুতরাং ভারতবর্ষের অনুধাবন করা উচিত যে, রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইলে কিছু পরিমাণে আমদানীও বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহা আখেরে লাভ হইবে। কারণ আমদানী দ্রব্য দ্বারা দেশের মূল্যমান নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। আর মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া ভারতবর্ষ যে প্রাথমিক ভুল করিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ আজও শেষ হয় নাই। মুদ্রামূল্য হ্রাস ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষতিকারক হইয়াছে।

কলিকাতার হাসপাতালের ঔষধ কোথায় যায়?

সম্প্রতি কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়া শহরের বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল হইতে অপসারিত প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের ঔষধ ও ডাক্তারী সাজ-সরঞ্জাম উদ্ধার করে। ঔষধগুলির অনেকগুলির গায়ে হাসপাতালের নাম ছাড়া রোগীদের "বেড" নম্বর পর্যান্ত লেখা ছিল বলিয়া প্রকাশ।

এই উপলক্ষ্যে "ব্যর্থ হানা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কলিকাতার সান্ধ্য দৈনিক "ফ্রীল্যান্স" লিখিতেছেন যে, শহরের বিভিন্ন ঔষধের দোকান এবং গুদাম হইতে বিভিন্ন হাসপাতাল হইতে অপহৃত ঔষধপত্র পুলিস কর্ত্তৃক উদ্ধারের দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম নহে। কয়েক মাস পূর্ব্বে পুলিস বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক গুণে বেশি মূল্যের ঔষধপত্র এইভাবে উদ্ধার করে। তখনও কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যখন হাসপাতালগুলিতে এইরূপ অনাচারের কথা প্রকাশ পায় তখন চারিদিকেই বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায় এবং যতদূর স্মরণ হয় কলিকাতার কোন বৃহৎ মেডিক্যাল ভবনের অধ্যক্ষ যিনি ঐরূপ অনাচার উদ্ঘাটনে সাহায্য করেন—তাঁহাকে বেনামী পত্র দিয়া শাসানো হয় যে, ঐ ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু কয়েক দিনের আলোড়নের পরই ব্যাপারটি চাপা পড়ে এবং শহরের বুকে এইরূপ সমাজ-বিরোধী কাজ সম্পর্কে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনিতে পাওয়া যায় না।

"ফ্রীল্যান্স" বলিতেছেন, সাম্প্রতিক পুলিস হানার ফলাফলে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, হাসপাতালগুলির ঔষধ লইয়া যে অবৈধ ব্যবসা চলিতেছিল যে কোন কারণেই হউক পুলিসের পূর্ব্বতন প্রচেষ্টার ফলে তাহার অবসান ঘটে নাই। বর্ত্তমানে যে বিভিন্ন ধরনের এবং মূল্যের ঔষধপত্র ধরা পড়িয়াছে তাহাতে একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল স্বচ্ছন্দে চালান যায়। ইহাতে স্বতঃই সন্দেহ জাগে যে, হাসপাতালে যে কেবল নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মীরাই এই ব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াছেন তাহা নহে। পরিপূর্ণ নির্ব্বোধ ব্যতীত কেহই ইহা মনে করিবেন না যে, হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে দিনের পর দিন এরূপ ভাবে যাদুমন্ত্রবলে হাসপাতালের মহামূল্যবান ঔষধপত্র ও ডাক্তারী সাজসরঞ্জাম অপসারিত হইতে পারে। এই অসাধু ব্যবসায়ের মূল আরও গভীরে নিহিত রহিয়াছে এবং ইহার পিছনে একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত রহিয়াছে মনে হয়। সুতরাং পুলিস যদি সত্যই এই চক্রান্তের অবসান ঘটাইতে চায় তবে তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে, এইরূপ সাময়িক হানা পরিত্যাগ করিয়া চক্রান্তকারীদের মূল অনুসন্ধান করিয়া তাহার উৎখাত করা।

পরিবহন সমস্যা

"ইকনমিক উইক্লি" লিখিতেছেন, রেল বিভাগীয় মন্ত্রণাদপ্তর ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতি পরিবহন তত্ত্বাবধানের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতেই বোঝা যায় যে, পরিবহন-সমস্যা কিরূপ জরুরী আকার ধারণ করিয়াছে। বিভিন্ন মহল হইতে সরবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পরিবহন-ব্যবস্থার দোষেই দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে, কিন্তু কেহই বলিতে পারেন নাই পরিকল্পনার অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু হইতে সম্পদ সরাইয়া আনিয়া কি ভাবে পরিবহন অচলাবস্থার সমাধান করা যাইতে পারে।

যদি ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতির পরিবহনকে সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তবে সাধারণভাবে পরিবহন-সমস্যার সমাধান না হইলেও যে, স্বতন্ত্র সংস্থা ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি পরিবহনের সুরাহা করিতে সক্ষম হইবেন সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু পরিবহন-ব্যবস্থার রেশন করা হইলেও কেবলমাত্র ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতিকে সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিলেই চলিবে না; কয়লা এবং সিমেণ্টও বিভিন্নস্থানে বহন করিতে হইবে। অনুরূপভাবে খাদ্যশস্য এবং অত্যাবশ্যক ভোগ্যদ্রব্যের পরিবহনও অগ্রাধিকার দাবি করিবে এবং পরিকল্পনা সফল করিতে চাহিলে এইগুলির

কোনটিই অবহেলা করা যাইবে না। অপরপক্ষে, ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতির পরিবহনকে সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে, উহাদের পরিবহনের যেরূপ সংখ্যক যানবাহন দেওয়া প্রয়োজন কার্য্যতঃ তদপেক্ষা অনেক বেশী দেওয়া হইতে পারে। এরূপও হইতে পারে যে, যখন ইস্পাতের প্রয়োজন সেরূপ জরুরী নহে তখনও সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতির জন্যই রেলগাড়ী নির্দ্দিষ্ট করা থাকিবে।

"ইকনমিক উইকলি" লিখিতেছেন, হয়ত পরিবহন রেশনিং এবং অগ্রাধিকার স্থাপন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু সেই চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে সকল প্রকার পরিবহন কাজে লাগাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন একটি পরিবহন বোর্ড গঠন করা যে বোর্ড বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিবেন।

রেলওয়ে বোর্ড চতুর্থ দশকের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এখনও মনে করেন যে, রেল ভিন্ন অন্যান্য স্থলযানে মাল চলাচলের অতিরিক্ত ব্যয়ভার শিল্পগুলির পক্ষে বহন করা সম্ভব হইবে না, অতএব যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে মাল রেলপথেই বাহিত হওয়া প্রয়োজন। "ইকনমিক উইকলি" এই মনোভাবকে হাস্যকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় আসীন হইয়া অত্যধিক কর বসাইয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে রোড ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থার বিকাশের পথে সকল প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কি রেলবোর্ডের নিকট একবারও উদয় হয় না যে, স্বল্পদূরবর্ত্তী স্থানের পরিবহন-ব্যবস্থা যদি মোটরযানগুলির উপর অর্পণ করা হয় তবে রেলবিভাগ অধিকতর যোগ্যতার সহিত নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন? রেলপথের সমান্তরাল পথে যাহাতে অন্যান্য যানবাহন চলাচল করিবার লাইসেন্স না দেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যে রেলকর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রদানকারী সংস্থাকে প্রভাবিত করিবার জন্য বিশেষ একদল কর্ম্মী নিয়োগের যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন অবিলম্বে তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য "ইকনমিক উইকলি" পরামর্শ দিয়াছেন।

জঙ্গীপুর কলেজে বি-এ ক্লাশ

"ভারতী" লিখিতেছেন :

"সংবাদে প্রকাশ জঙ্গীপুর কলেজে এ বৎসর বি-এ ক্লাশ খুলিবার পরিকল্পনা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সংবাদটি যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি দুঃখকর। গত বৎসর যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এখানে বি-এ ক্লাস খুলিবার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তখন সমগ্র জঙ্গীপুরবাসী ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিল এবং ছাত্র ভর্ত্তিও সুরু হইয়াছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করতঃ এই পরিকল্পনা বাতিল করেন এবং যে কয়জন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছিল তাহাদের টাকা ফেরত দেন। সেই সময় স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দকে কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, আগামী বৎসর বি-এ ক্লাস নিশ্চয়ই খোলা হইবে এবং তাঁহারা যেন এই সময়টুকু ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করেন। তদবধি সকলেই এই একটি বহুর সুতীব্র আশা লইয়া প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহাদের এই আশা ফলবতী হইল না।"

জঙ্গীপুর কলেজে বি. এ. ক্লাশ খোলার প্রধান বাধা বাহ্যত অর্থনৈতিক। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কলেজে নূতন ক্লাশ খোলার ব্যাপারে পরিপূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। তবে একটি সর্ত্ত ছিল যে, বি. এ. ক্লাশ খোলার জন্য যে অতিরিক্ত চারিজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন, তজ্জনিত ব্যয়ভার স্থানীয় জনসাধারণকেই বহন করিতে হইবে—অর্থাৎ কলেজটি যদিও সরকার পরিকল্পিত ও সরকার যদিও সকল ঘাটতি বহন করেন তথাপি বি. এ. ক্লাশ খোলার জন্য সর্ব্বনিম্ন যে চারিজন অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন তাহার ব্যয়ভার সরকার বহন করিতে সম্মত নহেন। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ এই অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকিয়াই গত বৎসর বি. এ. ক্লাশ খোলার আয়োজন করেন। ইতিমধ্যে সরকার অতিরিক্ত অধ্যাপকদের দুই জনের ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সমস্যা হইল অবশিষ্ট দুই জন শিক্ষকের ব্যয় সঙ্কুলান করা।

"ভারতী" লিখিতেছেন যে, হয় ত একজন শিক্ষক কম লইয়াও এ বৎসর ক্লাশ খুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি দিতেন। তিন জন নূতন শিক্ষকের মধ্যে দুইজনের ব্যয়ভার সরকার বহন করিতে স্বীকৃত হওয়ায় একজন অতিরিক্ত অধ্যাপকের বেতন প্রভৃতি ছাত্রদত্ত বেতন হইতে তোলা মোটেই অসম্ভব হইত না। "কাজেই এ বৎসর বি. এ. ক্লাশ না খুলিবার পক্ষে কোন যুক্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।"

শিক্ষক কম হইলে পড়াশুনা কিরূপে হইবে তাহা আমরা বুঝিলাম না।

কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বি. এ. ক্লাশ খোলার সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিলেন কেন তাহার আলোচনা করিয়া "ভারতী" বলিতেছেন যে, ডিসপার্সাল স্কীমে গঠিত কলেজে বি. এ. ক্লাশ খোলা হইলে সরকার আর বেসরকারী কলেজগুলিকে সাহায্য করিবেন না এইরূপ একটি বেসরকারী খবর পাইয়াই কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বি-এ ক্লাশ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বতন সিদ্ধান্ত নাকচ করেন। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ আচরণের সমালোচনা করিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন :—

"আমরা কর্ত্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতে পারিলাম না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ডিসপার্সাল কলেজে একসঙ্গে বি. এ. ক্লাস খুলিবার পরিকল্পনার কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদ আমরা পাই নাই। দ্বিতীয়তঃ, সরকারের এইরূপ কোন পরিকল্পনা থাকিলেও ঠিক কোন্ বৎসরে তাহার কাজ সুরু হইবে তাহাও জানা যায় নাই। তৃতীয়তঃ, কোন স্থানে যদি জনসাধারণ উদ্যোগী হয় তবে পরে তাহারা সর্ব্বপ্রকার সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। বরং জনসাধারণ অগ্রণী হইলে সর্ব্বপ্রথম সেই

কলেজেই সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিবে ইহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং নিজেদের প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকারের দিকে তাকাইয়া বসিয়া না থাকিয়া স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করাই অধিকতর সমীচীন। তাহা ছাড়া স্থানীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে ইচ্ছা থাকিলেও ছেলেপিলেদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। এ অবস্থায় স্থানীয় চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে ভাল করিতেন বলিয়া আমরা মনে করি। যাহা হউক, এখনও সময় অতীত হইয়া যায় নাই। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া অবিলম্বে সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। আশা করি, আমাদের এ আবেদন উপেক্ষিত হইবে না।"

অর্থের অভাবে তো প্রাথমিক শিক্ষাই ব্যাহত। উচ্চ শিক্ষার খাতে কি আছে আমরা জানি না।

পাকিস্থান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

পাকিস্থান সরকার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ১৯৬০ সনের মধ্যে দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধিসাধন। পরিকল্পনাকালে মোট ১১৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে—সরকার ব্যয় করিবেন ৮০০ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি আনুমানিক ৩৬০ কোটি টাকা। পরিকল্পনাটিকে সফল করিতে ৫৩০ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হইবে বলিয়া প্রকাশ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল, খাদ্যোৎপাদন শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি করা; সেচ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির প্রসারসাধন, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের ক্ষমতার উন্নতি করা যাহাতে পরিকল্পনার শেষে প্রতি বৎসর পাকিস্থানের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্য্যের জন্য ৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

পরিকল্পনা বোর্ড সরকারী কর্ম্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার কথা চিন্তা না করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে এখন হইতে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করিতে হইবে।

খসড়া পরিকল্পনাটি (১৯৫৫-৫৬—১৯৫৯-৬০) সর্ব্বসাধারণের আলোচনা ও পরামর্শদানের জন্য ১৪ই মে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাকিস্থানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ উপলক্ষ্যে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "জনশক্তি" লিখিতেছেন যে, আজিকার দিনে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা আর বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে। দেশের প্রকৃত প্রয়োজন সম্পর্কে যথাযথ অবহিত থাকিয়া একটি সার্থক পরিকল্পনা রচনা করার জন্য যে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পাকিস্থান প্ল্যানিং বোর্ডের সদস্যদের তাহা আছে কিনা কার্য্যক্ষেত্রেই তাহা ধরা পড়িবে।

"জনশক্তি" লিখিতেছেন, "আজিকার দিনে যে কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হয় যাহারা এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার দায়িত্বগ্রহণ করিবেন তাঁহারা কোন মনোবৃত্তি লইয়া কাজে নামিবেন। দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের জন্য পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইবে তাহারা এই বিষয়ে কতটুকু উৎসাহী আছে অথবা আজ না থাকিলেও অনতিবিলম্বে এই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহী করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে।"

"জনশক্তি" পাকিস্থান পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন যে, দৈনন্দিন সাধারণ কার্য্য পরিচালনাতেই পাকিস্থানের মন্ত্রীমহোদয়গণ ও সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ যেরূপ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পর ইহাদের দ্বারাই সংগঠনমূলক কার্য্যাবলীর জটিল সমস্যাগুলির সহজ সমাধান হইয়া যাইবে ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। ফলে, মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী কনট্রাক্টর শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কেহ যে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী হইবেন তাহা মনে হয় না।

ভারতে বেআইনীভাবে মুসলমান আগমন

পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে নিয়মিতভাবে মুসলমানগণ বে-আইনী ভাবে ভিসা ও পাসপোর্ট ব্যতিরেকেই দলে দলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করিতেছে। মাঝে মাঝে এই বে-আইনী প্রবেশের সময় যাহারা ধরা পড়ে তাহাদিগকে জেল-জরিমানা প্রভৃতি শাস্তি প্রদান করা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে এই অনুপ্রবেশ বিন্দুমাত্রও কমে নাই। সাম্প্রতিক তথ্য হইতে বিপরীত পক্ষে উহাই প্রমাণ হয় যে, এইরূপ অনুপ্রবেশ আশঙ্কাজনকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্থানী মুসলমানদের আসামে এইরূপ বে-আইনী অনুপ্রবেশে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া "যুগশক্তি" ১১ই জ্যৈষ্ঠ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, আসামের সর্ব্বত্রই উহারা যে ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে "আসামের অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও ভাবিবার আছে। এই মুসলমানেরা অনেকে হয়ত শীঘ্রই ভারতের নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া এই রাষ্ট্রে থাকিয়া নানারূপ গোলযোগ সৃষ্টির সহায়ক হইতে পারে। সুতরাং সময় থাকিতে ভারত ও আসাম সরকারের এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন—যাহাতে পাসপোর্ট, ভিসা না নিয়া এইভাবে পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া মুসলমানেরা না আসিতে পারে তজ্জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।"

বর্দ্ধমানের জেলাশাসক

২৮শে বৈশাখ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "দামোদর" পত্রিকা

বর্দ্ধমান জেলাশাসকের আচরণের বিশেষ সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন : "আমাদের বর্দ্ধমানের জেলাশাসক মহাশয়ের অনারারী সার্ভিস কিনা বুঝিতে পারিতেছি না। বেলা সাড়ে দশটায় বিচারক, অফিসার প্রভৃতি সকলেরই অফিসে উপস্থিত হওয়ার নিয়ম, কিন্তু কোন দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত দেখা যায় না। অবশ্য জরুরী ব্যাপারে জেলাশাসককে জেলার বিভিন্ন স্থানে যাইতে হয়। কিন্তু কোন দিনই তিনি সময়ে উপস্থিত হইবেন না—ইহা কেমন কথা ?"

"দামোদর" অভিযোগ করিয়াছেন যে, জনসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে ঐ সময়ে অধিকাংশ দিনই জেলাশাসক মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। পত্রিকাটি আরও বলিতেছেন যে, গত ৫ই মে মধ্যরাত্রে আর. এম. এস-এর মধ্যে কর্ম্মরত কর্ম্মচারীদের উপর একদল গুণ্ডা হামলা চালাইলে জেলাশাসক মহাশয়কে জানান হয়। কিন্তু জেলাশাসকের প্রহরী নাকি জবাব দেয় যে, রাত্রে সাহেবকে বিরক্ত করা চলিবে না—ফলে সংবাদটি আর সাহেবের নিকট পৌঁছাইতে পারে নাই।

মানভূমে আসন্ন দুর্ভিক্ষ

মানভূম বর্ত্তমানে বিশেষ দুরবস্থার সম্মুখীন। অন্নকষ্ট ও স্থানে স্থানে জলকষ্ট চরমে উঠিয়াছে। বিহার সরকার মানভূমের দুরবস্থার কথা প্রথমে স্বীকার করিতে চাহেন নাই, কিন্তু তাহাদের পক্ষেও অধিক দিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। ২১শে এপ্রিল তারিখের রিলিফ কমিটির মিটিং-এ মানভূমের ডেপুটি কমিশনার স্বীকার করেন, মানভূমের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, শীঘ্রই সর্ব্বত্র সাহায্যদানের ব্যবস্থা না করিলে মানভূম-বাসীর দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। উক্ত মিটিংে স্থির হয় যে, রিলিফ তহবিলে যে ত্রিশ হাজার টাকা মজুত রহিয়াছে অবিলম্বে তাহার সাহায্যেই কাজ আরম্ভ করা হইবে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন রিলিফকার্য্য শুরু হয় নাই।

মানভূমের আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুর্দ্দশা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "সংগঠন" পত্রিকা ২২শে জ্যৈষ্ঠ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিহার সরকারের ঔদাসীন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। "সংগঠন" লিখিতেছেন :

"বর্ত্তমানে মানভূমের গ্রামে গ্রামে বেকার নিরন্ন অভুক্ত জনসাধারণ যে দুর্গতির মধ্যে কালযাপন করিতেছে তাহাতে অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে সরকারী সহায়তার প্রয়োজন। কিন্তু বিহার সরকার মানভূমের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মাইনর ইরিগেশন প্রভৃতি স্কীম মঞ্জুর হইয়াছে কিন্তু এজেন্টরা অর্থ পাইতেছে না, বার বার আসামীর মত কোর্টে হাজিরা দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। আমরা বিহার সরকারকে সেবার মনোভাব লইয়া দুস্থ জনতার সেবা করিতে অনুরোধ করি। গ্রামে গ্রামে কাজ আরম্ভ করা হউক যাহাতে প্রতি শ্রমিক কাজ করিতে পারে। গ্রামে গ্রামে কৃষিঋণ ও ধান কর্জ্জ দেওয়া হউক যাহাতে কৃষকসম্প্রদায় চাষ করিতে পারে এবং আগামী বৎসর নিজেদিগকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। অবিলম্বে যদি বিহার সরকার সেবাকার্য্যে অগ্রসর না হন তবে তাঁহাদের নির্ম্মম শোষণ, শাসন ও পেষণের জন্য মানভূমের বুকে যে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে তাহা সমস্ত অন্যায় ও আবিলতার পুঞ্জীভূত জঞ্জালকে পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া দিবে এবং তাহা হইতে বিহার সরকারের পরিচালকবর্গ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।"

কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি

কাঁচড়াপাড়া পৌরসভার নির্ব্বাচন গত ফেব্রুয়ারী মাসে সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত নূতন বোর্ড গঠিত হয় নাই। এইরূপ অহেতুক বিলম্বের মূলে রহিয়াছে দলাদলি। পুরাতন বোর্ডই এখনও পর্য্যন্ত কাজ চালাইতেছেন, কিন্তু পুরাতন বোর্ডের বহু সভ্য নির্ব্বাচনে পরাস্ত হওয়ায় নিজ নিজ কর্ম্মসম্পাদনে বহু সভ্যকেই সেরূপ উৎসাহী দেখা যায় না।

"২৪-পরগণা বার্ত্তাবহ" ২২শে জ্যৈষ্ঠ এক সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"সকল বিপর্য্যয়ের মূলে রহিয়াছে দলাদলি যাহার সহিত জনসাধারণের যোগাযোগ এতটুকু নাই। ফলে জনসাধারণের কর দিয়া নাম গান করা ছাড়া আর কোন গতি নাই। এই দ্বিতীয় পক্ষের মাঝখানে বিষফোঁড়ার মত বিষকণ্টকিত স্থান লইয়াছে এক্‌জিকিউটিভ অফিসার। নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব হইতেই তিনি কায়েমীভাবে মৌরসী পাট্টা লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। ত্রিফলার আঘাতে জর্জ্জরিত জনসাধারণ নানা পকেটে অর্থ দিয়া তাহাদের কার্য্যোদ্ধার করিতেছেন।"

ভাষাভিত্তিক রাজ্য আন্দোলন ও শিক্ষক সম্প্রদায়

সাম্প্রতিক বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনা করায় জন্য বর্দ্ধমান জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদিগের বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সমালোচনাপূর্ব্বক ৭ই বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "দামোদর" লিখিতেছেন যে, ভাষাভিত্তিক আন্দোলন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। "ইহার প্রথম বলিরূপে জামালপুর থানার গুয়ে-কালনার শ্রীরাধারমণ পালকে তাহার নিজ গ্রাম হইতে শতাধিক মাইল দূরবর্ত্তী একটি বিদ্যালয়ে বদলী করা হইয়াছে। বিধানসভায় সরকার পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ দিয়া বলা হইয়াছে, এই আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তি দিবার অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই। জেলা স্কুলবোর্ডের সভাপতিও এরূপ কথা আমা-দিগকে বলিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধারমণ পালকে ফিরাইয়া আনিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতেছি, তাঁহাদের শয়তানী অব্যাহত ভাবেই চলিয়াছে।..."

ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ এবং অংশ গ্রহণের দরুন প্রাথমিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন যে, যদি এরূপ কোন নিয়ম থাকিত যে প্রাথমিক শিক্ষকগণ কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারিবেন না, তাহা হইলে কাহারও অভিযোগ করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষকগণ কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিলে কোন দোষ হয় না, কেবলমাত্র বিরোধী দলগুলি-পরিচালিত আন্দোলনে যোগদান করিলেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে শিক্ষকগণ অপরাধী হন। "যেখানেই কংগ্রেসের সভা হয়, তাহার সঙ্গেই শিক্ষক সমিতির সভা হয়। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আবার একটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হইয়া বসিয়াছেন। কংগ্রেস রাজনীতি করিতে শিক্ষকদের দোষ নাই যত দোষ অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সহিত সংযোগ রাখা।..."

এই অভিযোগের জবাব কংগ্রেস দিবেন তবে শিক্ষক বদলী হইলেই যে তাহা শাস্তি এটা শুধু বাংলা দেশেই শোনা যায়।

ভারতে পঙ্গপাল অভিযানের সম্ভাবনা

লণ্ডনস্থিত পঙ্গপাল-বিরোধী গবেষণা-কেন্দ্র জানাইতেছেন যে, জুন মাসে ভারত, পাকিস্থান, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশে পতঙ্গ অভিযানের আশঙ্কা রহিয়াছে।

সাধারণতঃ এপ্রিল মাসে এবং মে মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম-এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চল হইতে পতঙ্গের ঝাঁক আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। পঙ্গপালদল যাহাতে পূর্ব্বদিকে আসিতে না পারে সেজন্য সৌদী আরবে একটি নিয়ন্ত্রণ-ঘাটি রহিয়াছে। পঙ্গপালদল সেই নিয়ন্ত্রণ-ঘাটি অতিক্রম করিয়া আসিলেই সকল দেশকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়! সৌদী আরবে অবস্থিত এই নিয়ন্ত্রণ ঘাটিটি যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিচালনাধীন।

টিটো ও মলোটভ

৩রা জুন মাদ্রাজের ইংরেজী দৈনিক "হিন্দু" 'টিটো ও মলোটভ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, মার্শাল টিটোর মস্কো আগমনের প্রাক্কালে মলোটভের পদত্যাগ ঘোষিত হইয়াছে। এই পদত্যাগ অপ্রত্যাশিত এমন নহে। অনেকদিন হইতেই বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রদপ্তর এই ঘোষণার প্রত্যাশায় ছিলেন। কিন্তু ঘোষণাটির সময়ের মধ্যে ইহার তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। যুগোস্লাভ নেতার বিরুদ্ধে কমিনফর্ম যে আক্রমণ চালাইয়াছিল তাহার প্রতি মলোটভের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল; এবং যখন রুশ নেতৃবৃন্দ টিটোর সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুগোস্লাভিয়া যান তখন মলোটভ যিনি বহু বৎসর যাবৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন— তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয় নাই। শেপিলভ যিনি মলোটভের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত হইয়াছেন, তিনি যুগোস্লাভিয়া গমনকারী সোভিয়েট প্রতিনিধি দলে ছিলেন। তাঁহার পক্ষে যুগোস্লাভ নেতৃবৃন্দের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলা কঠিন হইবে না। সতত-পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ যে সকল ভ্রান্তিপূর্ণ পথে স্বতঃই আগাইয়া চলেন মলোটভ যখন ঐরূপ একটি তত্ত্বগত 'ভুল' করেন তখন শেপিলভ সম্পাদিত "প্রাভদা" পত্রিকাই তাঁহার বিশেষ সমালোচনা করে। মলোটভ বলিয়াছিলেন, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পরে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি "তত্ত্বগত দিক হইতে ভ্রান্ত", কারণ রাশিয়াতে ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বিশ্বাস করা কঠিন যে, এই একটিমাত্র ভ্রান্ত বক্তব্যের জন্য মলোটভ চাকুরী হারাইয়াছেন। ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে, পুরাতন বলশেভিকদের মধ্যে একমাত্র মলোটভই ষ্ট্যালিনের বিধ্বংসী প্রক্রিয়া অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়াছিলেন।

"হিন্দু" লিখিতেছেন, পররাষ্ট্র বিষয়ে শেপিলভের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তবে তাঁহার পিছনে ক্রুশ্চেভের সমর্থন আছে বলিয়া মনে হয়। রাশিয়াতে বর্ত্তমানে এই সমর্থনের বিশেষ মূল্য আছে। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর যখন বেরিয়ার প্রাণদণ্ড হয় তখন মনে হইয়াছিল যে, এক নেতার শাসনের পরিবর্তে রাশিয়াতে কমিটি শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং মস্কো হইতে ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। মলোটভের পদত্যাগের ফলে রুশনীতি—বিশেষ পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণের আসন হইতে বঞ্চিত হইলেন। ম্যালেনকভের অধোগতি ইতিপূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। "কমিটি" যেন ক্রমশঃই জনবিরল হইয়া আসিতেছে।

রাশিয়াতে সরকারীভাবে মার্শাল টিটোর আগমনের উদ্দেশ্য দুইটি দেশ ও দুইটি দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এ ক্ষেত্রে মলোটভের অপসারণ বিশেষ অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিবে। টিটো তাঁহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিবেন এইরূপ সম্ভাবনা অল্প। পশ্চিমের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া যুগোস্লাভিয়ার লাভ হইয়াছে এবং টিটো ব্রিটেন, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার নিরপেক্ষতার নীতি বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে। যুগোস্লাভিয়া কম্যুনিষ্টদের মধ্যে যদি কেহ বেলগ্রাদ ও মস্কোর মধ্যকার বিরোধকে নিন্দা করিয়া থাকিয়া থাকেন তাহাতে টিটোকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয় নাই। বস্তুতঃ 'টিটোবাদ" আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। মার্শাল টিটো সর্ব্বদাই সমাজতন্ত্রে পৌঁছাইবার জন্য নিজস্ব পথ বাছিয়া লইবার অধিকার দাবি করিয়াছেন। মস্কো পরিদর্শনের ফলে টিটোবাদের অবসান ঘটিবে না। কিন্তু রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে গোঁড়া কম্যুনিষ্টদের নিকট তাঁহার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য হইবে। এই বিষয়ে যুগোস্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টিতে আর গভীর ফাটল দেখা দিবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। রাশিয়ার সহিত তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান বন্ধুত্ব পশ্চিমী রাষ্ট্র-

গোষ্ঠীর—বিশেষতঃ ওয়াশিংটনের নিকট বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইবে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে একদল লোক আছেন যাঁহারা সর্ব্বদাই টিটোর কার্য্যাবলীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত। মলোটভের পদত্যাগ হইতে বুঝা যায় যে, যুগোশ্লাভিয়ার সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারকে রাশিয়ানরা কতদূর গুরুত্ব দান করে।

টিটোর রুশ ভ্রমণের কোন প্রত্যক্ষ বা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফল নাও দেখা দিতে পারে। তবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বলকান কম্যুনিষ্ট ফেডারেশন সম্পর্কে যে সকল কথা শোনা গিয়াছিল তাহা এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বলকান ফেডারেশনের মূল কথা হইল যুগোশ্লাভিয়া, বুলগারিয়া, আলবানিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে একটি ফেডারেশনে আবদ্ধ করা হইবে। মার্শাল টিটো এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কমিনফর্ম হইতে বহিষ্কারের পরও মার্শাল টিটো ঐ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন নাই। কার্য্যতঃ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে তিনি আর এক ধরনের বলকান ফেডারেশন গঠনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ঐ পুরাতন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে পুনরায় আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে থাকিবে টিটোর নিরপেক্ষ-বাদ যাহার দ্বারা যুগোশ্লাভিয়ার আংশিক উপকার সাধিত হইয়াছে। যুগোশ্লাভ সংবাদপত্রগুলিতে বলা হইয়াছে যে, টিটোর রুশ-ভ্রমণ যুগোশ্লাভিয়ার সহিত পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কের উন্নতি-সাধনে সহায়তা করিবে। টিটোর সহিত যে প্রতিনিধি দল রুশ-দেশে গিয়াছেন তাহা বিশেষ শক্তিশালী করিয়া গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। স্বভাবতঃই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়াই আলোচনা চলিবে। পশ্চিমের দেশগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত এই সকল আলোচনার ফলাফল লক্ষ্য করিবেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের ব্যাপারে মার্শাল টিটো বিশেষ অনুকূল অবস্থায় রহিয়াছেন। যুগোশ্লাভ প্রতিনিধি দলের মস্কো ভ্রমণের ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য হইতে পারে। সকলেই ইহা আশা করেন।

গোয়া ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত গোয়াবাসীদের এক সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু পশ্চিমী শক্তিবর্গকে গোয়া সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব স্পষ্ট ও খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করিবার দাবী জানান। শ্রীনেহরু বলেন যে, যাঁহারা ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষ বলিয়া অভিযোগ করেন তাঁহারা নিজেরা কেন গোয়ার ব্যাপারে নিরপেক্ষ রহিয়াছেন তাহা তিনি জানিতে চাহেন।

গোয়া সম্পর্কে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মনোভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "হিতবাদ" লিখিতেছেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের, নীরব সমর্থনের দরুনই পর্তুগাল তাহার ভারতীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপনিবেশটি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস পর্তুগীজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কুনহার সহিত যুক্ত বিবৃতিতে গোয়াকে পর্তুগালের প্রদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া পর্তুগালকে প্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। অনুরূপভাবে অতি পুরাতন এক চুক্তির ভিত্তিতে পর্তুগাল ব্রিটেনের সমর্থন লাভের আশা করিতেছে এবং ব্রিটেন নীরবে পর্তুগালকে তাহার উপনিবেশগুলি আঁকড়াইয়া থাকিবার উৎসাহ যোগাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই আজ পৃথিবীতে গণতন্ত্রের পতাকা বহন করিতেছে এবং কম্যুনিষ্ট একনায়কত্বের কবল হইতে অন্যান্য রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যখনই পশ্চিমী জগতের ঔপনিবেশিকবাদের প্রশ্ন উঠে তখন তাহারা বিজ্ঞের মত নীরব থাকেন। ব্রিটেনের ক্ষেত্রে খোলাখুলি ভাবে ঔপনিবেশিকবাদের সমর্থন করা হয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মুখে গণতন্ত্রের বুলি যথেষ্ট শোনা হইয়াছে। এখন প্রয়োজন ঔপনিবেশিকবাদ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব দ্বিধাহীন ভাবে প্রকাশ করা।

ব্রিটিশ যখন ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তখন মনে হইয়াছিল যে, স্বাধীনতার মূল্য বোধ হয় পরিশোধ হইয়াছে এবং শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে দেশ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে একটি তুচ্ছ ইউরোপীয় দেশ আজ ভারতের একাংশকে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। ভারত স্বেচ্ছায় যে আত্ম-সংযমের পরিচয় দিয়াছে তাহাতেই পর্তুগীজরা এরূপ বর্ব্বরতা চালাইবার সাহস পাইয়াছে। এই প্রচেষ্টায় তথায় রক্তনদী প্রবাহিত করিয়াছে। পর্তুগীজগণ গোয়াকে এখন একটি সশস্ত্র শিবিরে পরিণত করিয়াছে।

"হিতবাদ" লিখিতেছেন, "কিন্তু এ ভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রবাহকে রুদ্ধ করা যাইবে না।" ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের সহিত ভারতে যে ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে এবং ফরাসীদের ভারতত্যাগের ফলে যাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ভারতীয় জনসাধারণ কখনই একটি ক্ষুদ্র ঔপনিবেশিক শক্তির সশস্ত্র হুমকির দ্বারা ইতিহাসের সেই গতিকে প্রতিহত হইতে দিবে না। ভারতের অন্যান্য অংশের জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের পর গোয়াবাসীরাও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ভারতীয় ভূমিতে বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতি ভারতীয় সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিতেছে। গোয়া (পর্তুগাল সরকার) ও পাকিস্থানের মধ্যকার মিতালী আজ আর কাহারও অজানা নাই। ইহা ব্যতীত গোয়া উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সদস্য। পাকিস্থান যেরূপ সিয়াটো ও মেডো (মধ্য এশিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থা)র সাহায্যে কাশ্মীর সম্পর্কে তাহার দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, সেইরূপ পর্তুগালও গোয়াতে অনুসৃত নীতির স্বপক্ষে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার সদস্যদের সমর্থন-লাভের চেষ্টা করিতেছে। এরূপ অশুভ পরিস্থিতিতে ভারত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সিংহলস্থিত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি

সিংহলের নবনির্ব্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীসলোমন বন্দরনায়ক ঘোষণা করিয়াছেন যে, সিংহলে ব্রিটিশের যে দুইটি সামরিক ঘাঁটি রহিয়াছে তাহাদের অপসারণ করিতে হইবে। এই সম্পর্কে "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রিকা যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী মহল এই ঘোষণায় বিশেষ সন্তুষ্ট হন নাই। "টাইমস" পত্রিকা সিংহল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে অর্থনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্ব উভয় দিক হইতেই অসার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "টাইমস" এরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের আগামী সম্মেলনে অপরাপর প্রধানমন্ত্রিগণ শ্রীবন্দরনায়ককে তাঁহার এইরূপ চিন্তাধারার অযৌক্তিকতা এবং অসারতা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবেন এবং সিংহল সরকার যাহাতে সামরিক ঘাটি সরাইয়া লইবার দাবী পরিত্যাগ করেন সেজন্য শ্রীবন্দরনায়কের উপর সকল প্রকার চাপ দিবেন।

"টাইমস"এর যুক্তি অনুযায়ী সিংহল হইতে ব্রিটিশ সামরিক ঘাটি অপসারণ করিলে সিংহলের অর্থনৈতিক দুর্গতি দেখা দিবে এবং কমনওয়েলথ প্রতিরক্ষা শৃঙ্খলের একটি অংশ ছিন্ন হইবে। ব্রিটিশ সামরিক ঘাটির অবস্থানের ফলে সিংহলের সার্ব্বভৌমত্বের কোন হানি ঘটে নাই এবং ব্রিটেন কখনও ঘাটিগুলিকে রাজনৈতিক চাপ দিবার জন্য ব্যবহার করে নাই।

মার্কিন পত্রিকাটির অভিমতে কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীদের কর্ত্তব্য হইবে, সিংহলের প্রধানমন্ত্রীকে ইহা বুঝান যে, সিংহলের ব্রিটিশ সামরিক ঘাটিগুলি "ব্রিটিশ" ঘাটি নয়, কমনওয়েলথ ঘাটি। ঐ ঘাটিগুলি কমনওয়েলথের সুবিধার জন্যই সিংহলে রহিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বিশ্বের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকেও সাহায্য করিতেছে।

"নিউইয়র্ক টাইমসে"র উপরোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের সমালোচনা করিয়া "বোম্বে ক্রনিকল" লিখিতেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "সর্ত্তহীন" সাহায্য হিসাবে যে ৫০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করিয়াছে, তাহার কালি শুকাইবার পূর্ব্বেই ওয়াশিংটনের এই বেসরকারী মুখপত্রটি সিংহল সরকারের উপর চাপ দিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছে। যে দেশ সামরিক ঘাটি দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার পক্ষে নিরপেক্ষ দেশগুলির শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভব নহে।

"বোম্বে ক্রনিকল" উল্লেখ করিতেছেন যে, এমন কি ব্রিটিশ সরকার পর্য্যন্ত বন্দরনায়কের বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় মার্কিন হস্তক্ষেপ সমস্যাটিকে আরও জটিল করিয়া তুলিবে। সামরিক ঘাটি তুলিয়া লইলে সিংহলের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্ব্বল হইবে বলিয়া "টাইমস" যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা খণ্ডন করিয়া "বোম্বে ক্রনিকল" বলেন, যদি ভবিষ্যতে সিংহল বিপদগ্রস্ত হয় তখন সহজেই সে ব্রিটেনের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে। যদি কমনওয়েলথের দেশগুলি মনে করে যে, কমনওয়েলথের প্রতিরক্ষার জন্য সিংহলের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করা প্রয়োজন তবে ঘাটিগুলি সিংহলের হাতে তুলিয়া দিলেই সব দিক দিয়া সুবিধা হয়।

বর্দ্ধমান পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা

গত ৫ই মে রায়না থানার কামারগড় গ্রামে অবস্থিত বড়বেনান ইউনিয়ন বোর্ড আপিসের সন্নিকটস্থ স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে অরুণ মালিক নামক একটি দিনমজুরকে হত্যা করা হয়। কিন্তু এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিনের মধ্যেও পুলিস তথায় যাইয়া কোনরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা মনে করে নাই বলিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন। উক্ত পত্রিকাটির বিবৃতি অনুযায়ী প্রকাশ যে, যদিও ইউনিয়ন বোর্ড আপিসের পার্শ্বে এই রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে এবং যদিও গ্রামে দফাদার ও চৌকিদার ছিল তথাপি দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে কেহই উপস্থিত হয় নাই। "এত বড় ঘটনার সংবাদ ইউনিয়ন বোর্ড হইতে মাত্র চার মাইল দূরবর্ত্তী রায়নার পুলিস থানায় দেওয়া হইল না।" ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে থানায় সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি নাকি অস্বীকৃত হন। ঘটনার পরদিন অনন্যোপায় হইয়া নিহত ব্যক্তির পুত্র স্বয়ং থানায় খবর দিতে গেলে দারোগা নাকি বলেন যে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের নিকট হইতে পত্র লইয়া না আসিলে তিনি আসিতে পারিবেন না। এইরূপে স্থানীয় পুলিস যখন ঘটনাটি সম্পর্কে কোনরূপ দায়িত্ব লইতে অস্বীকৃত হইল তখন মৃতের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মৃতদেহ শুদ্ধ বর্দ্ধমানের পুলিস অধ্যক্ষের নিকট যায়। পুলিস অধ্যক্ষের নির্দ্দেশে বর্দ্ধমান সদর থানায় কেস গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এই শোচনীয় ঘটনার উপর এক সম্পাদকীয় আলোচনায় "দামোদর" লিখিতেছেন,

"৫ই মে শনিবার বৈকালে ঘটনা ঘটিয়াছে, ৬ই থানায় সংবাদ গিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় ১০ই মে এই প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংবাদ সেখানে এ পর্য্যন্ত পুলিস উপস্থিত হয় নাই। কামারগড়ে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে যে, সূর্য্যাস্তের পর কেহ রাস্তায় বাহির হয় না। আমরা বহুদিন হইতে সংবাদ পাইয়া আসিতেছি, উক্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চুরি, রাহাজানির প্রচেষ্টা, দলগতভাবে নিরীহ ব্যক্তিদের প্রহার প্রভৃতি চলিতেছে, থানায় ডায়েরী করিতে গেলে, তাহা গৃহীত হয় না। এই সমস্ত প্রশ্রয়ের জন্য অঞ্চলটি অরাজকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পর মিলিত বঙ্গ অপেক্ষা বর্ত্তমান খণ্ডিত বাংলায় পুলিসখাতে বরাদ্দ অন্ততঃ চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। তাহাতেও যদি প্রকাশ্য দিবালোকে খুনের ঘটনায় স্থলে পুলিস উপস্থিত

না হয় এবং আততায়ীকে গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা না হয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষ দাঁড়াইবে কোথায়? আমরা বর্দ্ধমানের পুলিস অধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, অবিলম্বে ঐ অঞ্চলে সাময়িকভাবে এক পুলিসবাহিনী প্রেরণের এবং বাহিরের কোন উপযুক্ত অফিসারকে দিয়া তদন্তের ব্যবস্থা করুন। রায়নার থানা অফিসার স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি নিরীহ প্রজার জীবনকে এরূপ অবহেলা করিবার প্রেরণা কোথা হইতে পাইলেন, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। একদিকে এ অঞ্চলের জরুরী নিরাপত্তা ও অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট অফিসারের উপযুক্ত বিচার আমরা দাবি করিতেছি। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষকে কীট-পতঙ্গের মত হত্যা করা চলিবে না।"

কিশোর সমস্যা ও পুলিস

নিম্নস্থ সংবাদটি আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার দিয়াছেন। ইহাতে যে সমস্যার কথা রহিয়াছে তাহা জাতীয় জীবনের একটি সাংঘাতিক বিপদের আকর।

কিন্তু আমাদের মনে হয় না যে, যে পথে পুলিস কমিশনার ঐ সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে। পুলিস কমিশনারের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই এবং যে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা তিনি করিতেছেন তাহাও সংগ্রহ করা নিতান্তই প্রয়োজন এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু রোগের কারণ নির্ণয় হইলে পরে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা শেষ হয় না, ঔষধ-পথ্যেরও প্রয়োজন।

কিশোরের জীবনে নানা প্রভাব আসে এবং সেইগুলির সমষ্টিগত ফলে তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত ও গঠিত হয়। অভিভাবক, শিক্ষক, ক্রীড়াকৌতুকের চালক, সঙ্গীদলের নেতা, ইহারা সকলেই কিশোরের জীবনের এক-একটি পর্য্যায়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ লইয়া থাকেন। পুলিস এই কয়টির মধ্যে কেবলমাত্র সঙ্গীদলের নাগাল পাইবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে পুলিস কি বা করিতে পারিবে?—

"নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করিয়া কলিকাতা এবং তাহার আশে-পাশে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধমূলক কার্য্যকলাপের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকায় রাজ্যের পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের মনে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পুলিসের সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা গিয়াছে যে, ইদানীং খুব অল্প বয়সেই অনেকে নানারকম সমাজ-বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

ঐ সকল কার্য্যের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হয়, কখনও বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এইভাবে তাহাদের মন হইতে অপরাধপ্রবণতা (তাহা যে কারণেই জাগিয়া থাকুক) সমূলে দূর করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা পুনরায় অপরাধমূলক কার্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং কেহ কেহ অবশেষে প্রকৃত অপরাধী হইয়া উঠে বলিয়া পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন।

এই সামাজিক সমস্যার যতদূর সম্ভব প্রতিকার করিবার জন্য কলিকাতার পুলিস কমিশনারের উদ্যোগে শীঘ্রই লালবাজারে এক "জুভেনাইল ব্যুরো" খোলা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ষোল বৎসরের নিম্নবয়স্ক অপরাধ-প্রবণদের উন্নতির ভার এই ব্যুরো গ্রহণ করিবেন।

এই জুভেনাইল ব্যুরোর কাজ হইবে, যে সকল অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে অপরাধমূলক কার্য্যকলাপের ফলে পুলিসের নজরে বা রক্ষণাধীনে আসে, তাহাদের অপরাধ-প্রবণতার মূল কারণ ও পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করা। শুধু তাহাই নয়—তাহারা কি পরিবেশে মানুষ হইয়াছে, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা, তাহাদের জীবনের সুবিধা ও অসুবিধা, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদিরও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। তাহার পর কিভাবে এবং কি অবস্থায় সেই সব শিশু অপরাধীদের মন হইতে অপরাধ-প্রবৃত্তি দূর করা যায় এবং কিভাবে তাহাদিগকে সহজ ও সুস্থ সামাজিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহারই চেষ্টা করিতে ঐ ব্যুরো তৎপর হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা

'বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য যে পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছিলেন, তাহা গৃহীত হইয়াছে।

শিক্ষাদপ্তরটি আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানেই থাকিবে, অপর কোন মন্ত্রীকে এই দপ্তরের ভার দেওয়ার বা এজন্য নূতন কোন মন্ত্রী নিয়োগের সম্ভাবনা নাই।

স্বরাষ্ট্র (পুলিস) দপ্তরের ভারও হস্তান্তর হইবার সম্ভাবনাও এখন কম।"

আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা উপরে উদ্ধৃত সংবাদটি দিয়াছেন। বাংলায় শিক্ষার অবনতি তো চূড়ান্ত হইতেছে। পরীক্ষায় পাশের নম্বর কমাইয়া যেখানে ছেলে পাশ করান হয়, সেখানে শিক্ষার মূল্যই বা কি আর কার্য্যকারিতাই বা কি? অন্যদিকে শিক্ষায় কারখানার "ভূরি-উৎপাদন" ব্যবস্থা আরও প্রসারিত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদিগের জীবনে বিনয়-শৃঙ্খলা কোনও স্থান পাইতেছে না। আদর্শহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষার ফলে তাহাদের জীবনও ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দামগতিতে চলিতেছে। সত্য বলিতে কি, বাংলার ও বাঙালীর এই জীবনমরণের সন্ধিস্থলে, সুশিক্ষার অভাব সমস্ত দেশে যে বিষ ছড়াইতেছে তাহার প্রতিক্রিয়া অতি ভয়ানক। এরূপ ক্ষেত্রে অতি যোগ্য ও কর্ম্মঠ একজন মন্ত্রীর প্রয়োজন যিনি দিবারাত্র এ বিষয়ে চেষ্টিত ও ব্যস্ত থাকিবেন। ডাঃ রায় নিজে কোন প্রতিকারের উপায় করিতে পারিবেন না।

কলিকাতায় শান্তিশৃঙ্খলা

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার নিম্নস্থ সংবাদটি দিয়াছেন। পরে অবশ্য ঐ দুর্ব্বৃত্তগণের মধ্যে অনেকে

গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু কলিকাতার বড় রাস্তায় এইরূপ ডাকাতি ব্রিটিশ আমলেও কমই হইত। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কতটা শিথিল হইলে ডাকাত এতটা সাহস পায় তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাও শোনা যায় যে, আক্রান্ত গদী হইতে টেলিফোন পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ সময় মত উপস্থিত হয় নাই :

"গত বুধবার রাত্রি প্রায় সোয়া দুই ঘটিকার সময় ইণ্টালী এলাকায় একদল সশস্ত্র লোক ১ নং কনভেণ্ট রোডস্থিত এক মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীর গদিতে হানা দিয়া তিনটি ক্যাসবাক্স এবং একটি লোহার সিন্দুক সহ অনুমান ১৮ হাজার টাকা নগদ এবং ৫০ তোলা পরিমাণ সোনা লুণ্ঠন করিয়া বাহিরে অপেক্ষমান এক লরীযোগে সরিয়া পড়ে।

ঘটনার বিবরণে আরও প্রকাশ, ঐ সময় গদির মধ্যে ছয়জন কর্ম্মচারী নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহারা চীৎকার করার চেষ্টা করিলে দুষ্কৃতিকারিগণ চারজনকে ছুরিকাহত করে। তন্মধ্যে মঙ্গিলাল নামে ৪৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি নীলরতন সরকার হাসপাতালে প্রেরিত হওয়ার পর মারা যান। অপর দুইজনকে ঐ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। ইহা ছাড়া, একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ঘটনা সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগে প্রকাশ যে, দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে রিভলবার, ছোরা এবং লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ছিল।"

কলিকাতার পথঘাট

নিম্নস্থ বিবরণটি আনন্দবাজার পত্রিকায় ১২ই জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত হয় :

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত এবং রেজিষ্ট্রার ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী একমাত্র দৈবানুগ্রহেই শুক্রবার রক্ষা পাইয়াছেন বলিতে হয়। ঐদিন প্রাতে চৌরঙ্গী রোডে তাঁহাদের গাড়ীখানির সহিত একখানি চলন্ত লরীর প্রচণ্ড সজ্ঘর্ষ হইলে তাঁহারা ভীষণ এক দুর্ঘটনার কবলে পতিত হন। লরীটির ধাক্কায় গাড়ীখানির সম্মুখভাগ বিশ্রী রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উহার চালক আশু বিপদের মুখেও ধৈর্য্য না হারাইয়া তড়িদ্গতিতে ষ্টিয়ারিং ঘুরাইয়া দেয়। ফলে উহা আলু ভর্ত্তি লরীর প্রচণ্ড ধাক্কায় শোচনীয় পরিণতি হইতে রক্ষা পায়। ভাইস-চ্যান্সেলার ও রেজিষ্ট্রার মস্তকে ও দেহে অত্যন্ত ঝাঁকুনি বোধ করেন এবং তাঁহাদের মস্তক গাড়ীর বডিতে ধাক্কা খায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে উভয়েই অক্ষত থাকেন।

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের মোড়ে শুক্রবার সকালে স্যার আশুতোষের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠানে যোগদানের পর রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে ভাইস-চ্যান্সেলার যখন গাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন এসপ্লানেডের অদূরে চৌরঙ্গী রোড ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডের মোড়ে এ দুর্ঘটনা হয়। রেজিষ্ট্রারের গাড়ীখানি দক্ষিণ অভিমুখে যাইতেছিল। হঠাৎ পূর্ব্বদিক হইতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড বরাবর একখানি আলু বোঝাই লরী এ স্থানে আসিয়া পড়ে এবং উহার সহিত রেজিষ্ট্রারের গাড়ীর ভীষণ সজ্ঘর্ষ হয়। উক্ত গাড়ীর চালক কোনক্রমে গাড়ীর মুখ ঘুরাইবার চেষ্টা করিয়া অধিকতর শোচনীয় পরিণতির হাত এড়ায়। উহার পিছু পিছু বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর গাড়ীও আসিতেছিল। তাঁহারা এ দুর্ঘটনা দেখিয়া গাড়ী থামান এবং ভাইস-চ্যান্সেলার ও রেজিষ্ট্রারের ভগ্ন গাড়ীখানির দিকে ছুটিয়া যান। তাঁহারা উভয়কে অক্ষত দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। প্রকাশ, ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট বোঝাই লরীটি নাকি হু হু শব্দে গড়ের মাঠের রাস্তা ধরিয়া ছুটিতেই থাকে। রেজিষ্ট্রারের ভগ্ন গাড়ীর চালক ইহা দেখিয়া নিজে প্রবল ঝাঁকুনি ও আঘাত লাগা সত্ত্বেও ছুটিয়া জনৈক অধ্যাপকের গাড়ীতে করিয়া এ লরীর পিছু ধাওয়া করে। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা খিদিরপুরের নিকটে গিয়া ট্রাফিক পুলিস ও বেতার গাড়ীর টহলদারী পুলিসের সাহায্যে লরী থামাইতে সক্ষম হয়। পুলিস লরী চালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

কলিকাতার পথ তো অশিষ্ট ও দুর্দ্দান্ত লরী, বাস ও ট্যাক্সী চালকের রাজত্ব। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে রাত্রে চলাফেরা আরও বিপজ্জনক। কিন্তু প্রতিকারের কোন চেষ্টাই আমরা দেখি না।

পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতাল

আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার নিম্নস্থ সংবাদটি দিয়াছেন :

"ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখা কর্ত্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে নগরীর হাসপাতালসমূহের অবস্থা সম্পর্কে যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহা যেমন ভয়াবহ, তেমনি উদ্বেগজনক।

শুক্রবার এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বি. পি. ত্রিবেদী এক সাংবাদিক বৈঠকে ঐ কমিটির তদন্তের ফলাফল এবং হাসপাতালগুলিতে যে সকল গুরুতর ত্রুটিবিচ্যুতি ও অব্যবস্থা বিদ্যমান, উহার প্রতিকারকল্পে তাঁহাদের সুপারিশসমূহ বিবৃত করেন।

তদন্তের ফলে কমিটি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন : ১। হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং এবং অন্তর্ব্বিভাগে রোগীর চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এই বর্দ্ধমান চাহিদা পূরণের মত অতিরিক্ত ব্যবস্থা নাই ; ২। পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবসায়ী সহ সমাজের সুবিধাভোগী প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই প্রধানতঃ বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে হাসপাতালে বিনামূল্যের শয্যা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন ; ৩। বেসরকারী হাসপাতালগুলিকে মুখ্যতঃ জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া উহাদের পক্ষে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারী হাসপাতালের ন্যায় মান প্রবর্ত্তন করা, এমনকি ন্যূনতম সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না ; ৪। অধিকাংশ হাসপাতালেই প্রয়োজনের তুলনায় কর্ম্মচারীর সংখ্যা কম এবং অত্যাবশ্যক সাজ-

সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির অভাব বিদ্যমান ; ৫। হাসপাতালের অধস্তন কর্ম্মচারীদের বেতন অল্প, কিন্তু কাজের সময় বেশী ; ৬। কয়েকটি সরকারী হাসপাতাল সহ অধিকাংশ হাসপাতালেই পেনিসিলিন, সালফা ড্রাগ, এ টি এস প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ঔষধ বহির্বিভাগ হইতে রোগীদের সরবরাহ করা হয় না। বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে এমনকি অন্তর্বিভাগের রোগীদিগকেও ঐ ধরনের ঔষধ ক্রয় করিতে হয়। ইহার ফলে আর্থিক অনটন হেতু প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাবে সুচিকিৎসা পাওয়া সম্ভব হয় না ; ৭। অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর অভাবে এমার্জেন্সী কেসগুলিও অবহেলিত হয় ; ৮। কলিকাতায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে অত্যন্ত গুরুতর কেসেরও কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসা হয় না।"

হাসপাতালে অভাবের ও অব্যবস্থার ফিরিস্তি তো ঐরূপ। কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটি অভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হাসপাতালের কর্ম্মিগণের দয়ামায়া ও মনুষ্যত্বের। ঐ সংখ্যার আনন্দবাজারেই অন্যত্র একজন বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মন্তব্য আছে। তাহাতে আমরা পাই যে, রোগীর বালিশের নীচে পয়সা না থাকিলে সে শত চীৎকারেও কোন সেবা পায় না।

সিদ্ধার্থ নগরে শ্রীনেহরুর ভাষণ

দেশে যে হিংসাত্মক অনাচার ও দুর্নীতির প্লাবন বহিতেছে সে সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ আনন্দবাজার পত্রিকা এইরূপে দিয়াছেন :

"সিদ্ধার্থনগর, ২রা জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ওজস্বিনী ভাষায় দেশে যে সমস্ত বিভেদসৃষ্টিকারী, হিংসাত্মক, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও নীচাশয় শক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে, তৎসমুদয়ের তীব্র নিন্দা করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, 'ক্ষুদ্রতায় মগ্ন হইলে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও দেশে তাহার শ্রদ্ধা ও সম্মান হারাইবে। হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ দমন করিতে গিয়া কংগ্রেস নির্ব্বাচনে পরাজিত হইবে, এই ভয়ে কি আমরা ভীত হইব ? আমরা যদি নির্ব্বাচনে পরাজিত হই, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। নির্ব্বাচন জাহান্নামে যাউক। আমরা যেন মানুষের মত আচরণ করি।"

শ্রীনেহরু বলেন যে, এই হিংসাপ্রবণতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীর কর্ত্তব্য। ভারতে ভারতীয়েরা ভারতীয়গণকে হত্যা করিতেছে, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন : 'আমরা পূর্ব্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিয়াছি। কিন্তু আমরা অহিংসভাবে ও সহিষ্ণুতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছি। ভারতীয়েরা তখন আহত হইয়াছে ও ক্ষতের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। কোন শত্রু আঘাত করিলে তাহার বেদনা সহজেই বিস্মৃত হওয়া যায়। কিন্তু ভাই ভাইকে আঘাত করিলে সে ক্ষত চিরদিন বেদনাদায়ক হইয়া থাকিয়া যায়। তাহা সহজে নিরাময় হয় না।'

দেশ বিভাগের পর রাজপথসমূহে মৃতদেহসমূহের উপর স্তূপীকৃত মৃতদেহের কথা তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, এই হাঙ্গামার ফলে সহস্র সহস্র হৃদয় খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : 'আপনারা কি মনে করেন যে, এই সমস্ত ভগ্নহৃদয়ের বেদনা কি কখনও দূর হইবে ? গত আট বৎসর যাবৎ এই ক্ষত নিরাময়ের জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াছি। এখনও একার্য্য দুঃসাধ্য হইয়াই রহিয়াছে।'

তিনি ঘোষণা করেন : 'কংগ্রেস টি কিয়া থাকুক বা না থাকুক, আমরা এই হিংসাপ্রবণতাকে বৃদ্ধি পাইতে দিতে পারি না। আমাদিগকে ইহা দমন করিতে হইবে, ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে।'

শ্রীনেহরু বিশেষভাবে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক কার্য্যাবলী এবং খড়্গপুরে ও কালকায় রেলকর্ম্মীদের হাঙ্গামার বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, পাঞ্জাবে আন্দোলন মূর্খতার পরিচায়ক। কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া যদি শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হইয়া থাকে, তবে তাহা পাঞ্জাবে হইয়াছে। তবে সেখানে লোকেরা ঢিলপাটকেল ছুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে কেন ? আমরা এইরূপ সহিংস কার্য্যকলাপ বরদাস্ত করিব না এবং আমাদের সর্ব্বশক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিব।

খড়্গপুর ও কালকার কর্ম্মীদের হিংসাত্মক কার্য্যের নিন্দা করিয়া তিনি বলেন যে, তাহারা ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়াছে। তাহার গুরুত্ব তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উন্নতি কখনও হিংসাত্মক কার্য্যের ভীতি প্রদর্শন ও আকস্মিক ধর্ম্মঘটের সাহায্যে হয় না।"

শ্রীনেহরুর উন্নত মনোভাব, সততা ও দৃঢ়চিত্ততা যদি তাঁহার সহকারী ও সহকর্ম্মিগণের মধ্যে থাকিত তবে এই বক্তৃতা সার্থক হইত।

কালকায় হাঙ্গামা

কালকা ষ্টেশনে যে সংঘর্ষ হয় তাহার বিবরণ নীচে দেওয়া হইল :

"আম্বালা, ২১শে মে—অদ্য সকালে পুলিস কালকা রেল কারখানায় একদল বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীর উপর গুলীবর্ষণ করে।

গুলীবর্ষণের ফলে চারিজন বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী নিহত এবং সাতজন আহত হইয়াছে।

প্রবীণ পুলিস কর্ম্মচারীদের সমভিব্যাহারে পুলিসের একটি বড় দল এই স্থান হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী কালকায় রওনা হইয়া গিয়াছে।

এইস্থানে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, রেলওয়ে কর্ম্মীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিস অদ্য সকালে কালকায় (পাঞ্জাব) শূন্যে গুলীবর্ষণ করে। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীজি. পাণ্ডে একখানি রেল কারে সিমলা যাইবার সময় রেলের এই সমস্ত কর্ম্মী রেল কারখানি আটক করে।

নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা ১৮ মিনিট পরে রেল কারখানি কালকা ছাড়িয়া চলিবার উপক্রম করিলে রেলের কয়েকজন কর্ম্মচারী গাড়ীখানি ঘিরিয়া ফেলে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। তাহারা বলে যে, রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট তাহারা তাহাদের দাবির একটি সনদ পেশ করিতে চাহে।

শ্রীপাণ্ডে তাহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, সিমলায় পৌঁছিবার পরই তিনি তাহাদের দাবি যথাসম্ভব শীঘ্র বিবেচনা করিয়া দেখিবেন; কিন্তু বিক্ষোভপ্রদর্শনকারিগণ দাবি করে যে, এই স্থানেই তাঁহাকে তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইতে হইবে।

রেল কার লক্ষ্য করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয় বলিয়াও প্রকাশ। ফলে গাড়ীর কাঁচের সার্সি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের মধ্যে একজন জনৈক পুলিস কর্ম্মচারীর রিভলবার ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। তাঁহাকে প্রহারও করা হয়। বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীরা পুলিসের উপর প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করে। উহার ফলে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস সুপার সহ কয়েকজন পুলিস আহত হয়। বিক্ষোভপ্রদর্শনকারিগণ তখন লোকো শেডের সামনে রেলপথের উপরে বসিয়া পড়ে এবং ইঞ্জিন চলিতে দিতে অস্বীকার করে। ট্রেন চলাচল বন্ধ করিবার জন্য রেলের রাস্তার উপরে পাথরকুচি স্থাপন করা হয়।

বিক্ষোভপ্রদর্শনকারিগণ ক্রমেই বেপরোয়া হইতে আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিসকে উপরের দিকে গুলী নিক্ষেপ করিতে হয়।

পাঞ্জাব পুলিসের ইন্সপেক্টর-জেনারেল স্বয়ং অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে মোটরযোগে আম্বালা হইতে কালকা যাত্রা করিয়াছেন।

রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপাণ্ডে অদ্য বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কালকাতেই আটক পড়িয়া আছেন।

আম্বালা, ২৯শে মে—অদ্য লোকসভায় কালকার ঘটনা এবং জনতার যে উন্মত্ত আচরণের জন্য পুলিস গুলী বর্ষণ করিতে বাধ্য হয় তাহার বিষয় উল্লেখ করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপন্থ গত সপ্তাহে খড়্গপুরে চালকবিহীন অবস্থায় একটি ট্রেনকে চালাইয়া দেওয়া অপেক্ষা এই ঘটনাকে "অধিকতর ভীষণ বলিয়া" মন্তব্য করেন।"

মানুষ কতটা স্বার্থচিন্তায় উন্মত্ত হইলে এরূপ অমানুষিক কাণ্ড ঘটায় সেইটাই এখন চিন্তার বিষয়।

লোকসভায় খড়্গপুরের ঘটনা

খড়্গপুরের ঘটনার আলোচনার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

"২৮শে মে—দৃঢ় হস্তে বেআইনী কার্য্যকলাপ দমন করিবার জন্য সরকারের সঙ্কল্প গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গণ-আন্দোলনে হিংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বনের বিরুদ্ধে একটি ঘোষণা প্রচারে সম্মত হইতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতি আবেদন জানান।

অদ্য লোকসভায় খড়্গপুর ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে দুই ঘণ্টাব্যাপী বিতর্কের মধ্যে শ্রীনেহরু বলেন যে, খড়্গপুর ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটান অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ ও অধিকতর অপরাধজনক কার্য্যের বিষয় তিনি চিন্তা করিতে পারেন না। তিনি বলেন: 'ইহা নিছক হত্যা বা হত্যার চেষ্টা এবং ইহা তাহা অপেক্ষা আদৌ ন্যূনতর নহে।'

গত শনিবার ধর্ম্মঘটী রেলকর্ম্মীদের এক জনতা ট্রেন হইতে ইঞ্জিন চালক ও ফায়ারম্যানকে টানিয়া নামাইয়া ট্রেনখানিকে চালাইয়া দিলে তাহা খড়্গপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর উঠিয়া পড়ায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং তাহার ফলে ৬৩ জন আহত হয়। অদ্য লোকসভায় শ্রীফিরোজ গান্ধী এই ঘটনা সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, 'যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী' অথবা এই ইউনিয়ন 'সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং তাহার অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন নাই।' তিনি স্পষ্টভাবে জানান যে, তিনি কর্ম্মীদের উপর বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর রুষ্ট নহেন। তিনি সমস্ত কর্ম্মীরই নিন্দা করিতেছেন না। কারণ, ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে যাহারা আহত হইয়াছে, তাহারাও কর্ম্মী।

তিনি বলেন, "আমি ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষপাতী। কিন্তু যাহারা সর্ব্বদাই দুষ্কার্য্যে তৎপর, তাহারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে পঙ্ককুণ্ডে টানিয়া নামাইবে, ইহা আমি চাহি না।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত পথে প্রসারলাভ করুক, ইহাই তিনি দেখিতে চাহেন। তিনি ধর্ম্মঘট করিবার অধিকারও স্বীকার করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে যেরূপ ভুল পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতে তিনি উদ্বেগ বোধ করেন। ইহা তাহাদের নিজেদের পক্ষেই কলঙ্কের বিষয়।"

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ঠিক সেই অমানুষিক স্বার্থচিন্তায় আপ্লুত যেমন দেশের প্রত্যেকটি অনাচারী স্বার্থসেবীর দলের। ভুক্তভোগী এবং নিপীড়িত যাহারা তাহারা দেশের লোকের শতকরা ৯৮ ভাগ। কিন্তু তাহাদের নেতৃত্ব কে করিবে? রেলকর্ম্মীর অসাধুতা ও অত্যাচারের ভুক্তভোগী প্রায় সকল যাত্রীই। কিন্তু প্রতিকারের পথ কেহই খুঁজিয়া পায় না।

রেলপথের যাত্রী

রেলে ভীড়ের প্রতিকার সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্য নিম্নে দেওয়া হইল। পণ্ডিতজী কি মনে করেন যে রেলে লোকে চাপে মনের সুখে?—

"নয়াদিল্লী, ১৬ই মে—ট্রেনে অত্যধিক ভীড়ের প্রশ্নে উত্ত্যক্ত হইয়া প্রধানমন্ত্রী নেহরু অদ্য লোকসভায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ

করেন যে, ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া ট্রেনে ভ্রমণ নিয়ন্ত্রিত করা হইবে কিনা, তাহা একটি বিবেচ্য বিষয়।

শ্রীচারু পালের একটি প্রশ্নের পর যে সমস্ত অতিরিক্ত প্রশ্ন করা হয়, তাহার উত্তরে শ্রীনেহরু বলেন, আমাদের দেশে নিঃসন্দেহে ভ্রমণের অভ্যাস বাড়িয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগকে এখন দেখিতে হইবে, ট্রেনের ভাড়া বাড়াইয়া দিয়া তাঁহারা ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করিবেন—না চীন দেশের প্রথা অনুযায়ী ভ্রমণের জন্য অনুমতিপত্র প্রবর্ত্তন করিবেন? পরে শ্রীনেহরু নিজেই বলেন যে, তিনি নিজে দ্বিতীয় উপায়টি পছন্দ করেন না এবং এই সম্পর্কে তাঁহাদের চীনা পদ্ধতি অনুসরণের ইচ্ছা নাই। যদি ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে রেলপথগুলি রিটার্ণ টিকিট প্রভৃতি দ্বারা লোক-জনকে ভ্রমণ করিতে প্রলুব্ধ করিতেছে কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনেহরু বলেন—আমাদের এই বিরাট দেশে কি ব্যাপার ঘটিতেছে, লোকজন যাহাতে তাহা দেখিতে পায়, তজ্জন্যই এই সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিনা কারণে ভ্রমণে উৎসাহদানের জন্য এই সব ব্যবস্থা করা হয় নাই।

দারিদ্র্য বিতরণ?

লোকসভায় ও রাজ্যসভায় একদল লোক গিয়াছেন যাঁহাদের মনস্তত্ত্ব অতি সরল অথচ অতি ক্ষুদ্র। তাঁহারা মানুষকে উঁচু করার চাইতে খাটো করাতেই আনন্দ পান। তাঁহাদের ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত নেহরু মন্তব্য করিয়াছেন।

"নয়াদিল্লী ১৮ই মে—প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন যে, সমাজতন্ত্রকে দারিদ্র্যের চরম পর্য্যায়ের সহিত সমীকৃত করা চলে না। তিনি বলেন, আয়ের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নহে। এই আদর্শকে আপনারা কার্য্যে রূপদান করিতে পারেন না। আপনারা শুধু মানসিকভাবে সন্তোষলাভ করিতে পারেন।

সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ বার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকায় বাঁধিয়া দিবার জন্য রাজ্যসভায় একটি বে-সরকারী প্রস্তাব করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক কর্ম্মচারীর সর্ব্বোচ্চ বেতন মাসিক ১,৮০০৲ টাকায় বাঁধিয়া দিতে বলা হয়।

এই প্রস্তাব সম্পর্কিত বিতর্কের সময় শ্রীনেহরু বলেন, "সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের মাথা কাটিয়া তাঁহাদের বেতন হ্রাস করার প্রস্তাব অস্বাভাবিক। অবশ্য আমি জানি যে, কোন কোন চাকুরীতে উচ্চ বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ কর্ম্মচারীই ভাল বেতন পান না। অন্যান্য দেশে তাঁহাদের মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক অনেক বেশী বেতন পাইয়া থাকেন।"

শ্রীনেহরু বলেন, "তাঁহার এই ভাষণ পূর্ব্ব-পরিকল্পিত নহে। সভায় কি আলোচনা হইতেছে তিনি জানিতেন না। সভায় আসিয়া তিনি কিছুক্ষণ আলোচনা শুনিয়াছেন। কেহ কেহ সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, যাহাদের আর কিছু বেশী তাহাদের সকলের শিরশ্ছেদনই বুঝি সমাজতন্ত্রের অর্থ। আবার কেহ কেহ উচ্চ জীবনযাত্রার মান এবং বিলাসিতার বিরোধিতা করিয়াছেন। বিলাসিতার প্রশ্রয়দান অথবা সমাজ-স্বার্থবিরোধী জীবনযাপন কেহই পছন্দ করে না। আমরা চাই, বৈষম্য দূর করিতে। কিন্তু যখন সর্ব্বোচ্চ আয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়নের প্রশ্ন উঠে, তখন উহা কল্যাণকর হইবে বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু উহা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার মনে সংশয় রহিয়াছে। উহা সাফল্যমণ্ডিত না হইয়া সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরও হইতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সমাজতন্ত্রকে দারিদ্র্যের চরমপর্য্যায়ের সহিত সমীকৃত করা চলে না। সমাজতন্ত্র তখনই সমাজতন্ত্র হয় যখন সমবণ্টনের উপযুক্ত সম্পদ থাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে সম্পদের সমবণ্টন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সর্ব্বাধিক প্রয়োজন উৎপাদন-বৃদ্ধি।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "উক্ত প্রস্তাবে জাতীয় জীবনের গতি-শীলতার দিকটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। এই প্রস্তাবে একটা কৃত্রিম সমতা স্থাপনের প্রয়াস হইয়াছে।" তিনি বলেন, "দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। বৈষম্য দূর করিয়া সকলের জন্য সমান সুযোগের সংস্থান কিরূপে সম্ভব ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইবে।"

কাশ্মীর সমস্যা

"উতকামণ্ড, ১৩ই জুন—ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে. এন. কাটজু অদ্য এখানে সাংবাদিকদের সহিত এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পুনরায় বলেন যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান হইতে পারে বলিয়া ভারত বিশ্বাস করে।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, সিরিয়ার পাকিস্থানী দূত দামাসকাসে বলিয়াছেন যে, 'কাশ্মীর লইয়া পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।'

এই সংবাদ সম্পর্কে উপরোক্ত বিবৃতি দিয়া ডাঃ কাটজু বলেন, 'এইরূপ বিবৃতিতে ভারতের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইবার হেতু নাই।'

ভারতের মনোভাবের কোনও পরিবর্ত্তন না হইতে পারে, অন্ততঃ ডাঃ কাটজু যে দলের প্রতিনিধি তাহাদের না হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ এইরূপ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতে চায় যে, ঐরূপ ভয় প্রদর্শনে শঙ্কিত হইবার সত্যই কারণ নাই। অর্থাৎ প্রতি-রক্ষার ব্যবস্থা আমাদের শুধু আছে মাত্র নহে, তাহা ক্রমেই শক্তি-শালী এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিযুক্ত হইতেছে।

আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, শান্তি ও স্বাধীনতার মূল্য দৃঢ় ও বলিষ্ঠ প্রহরীর ও অবিশ্রান্ত-অপলক সতর্কতা। এই মূল্যদানে শৈথিল্য হওয়ার ফলে আমাদের ছয় শত বৎসর দাসত্ব ভোগ করিতে হয়।

সিংহলে ভোজবাজী

"কলম্বো, ১৩ই জুন—প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সর জন কোটলেওয়ালা সরকারের বিরুদ্ধে সিংহলের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীবন্দরনায়ক আজ এই অভিযোগ আনিয়াছেন যে, তাঁহারা আভ্যন্তরীণ জন-নিরাপত্তা দপ্তরের এবং সম্ভবতঃ সিংহলে ব্রিটিশ সামরিক ঘাটি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীবন্দরনায়ক আজ বলেন যে, দেরাজের আনাচে-কানাচে কিছু কিছু নথিপত্র পড়িয়া থাকিতে দেখা গেলেও আভ্যন্তরীণ জন-নিরাপত্তা সম্পর্কিত বাকি সমস্ত কাগজপত্র প্রাক্তন সরকার বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

সিংহলে ব্রিটিশ সামরিক ঘাটি সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ব্রিটিশদের ত্রিনকোমলী ও কাতুনায়াকে ব্যবহার সম্পর্কে বা কি কি সর্ত্তে ব্রিটিশরা এই দুই এলাকা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোনও দলিলপত্র আমি খুঁজিয়া পাই নাই। দলিলপত্র দূরের কথা, এক টুকরা কাগজ পর্য্যন্ত নাই। প্রাক্তন সরকারের ইহা এক অসাধারণ কীর্ত্তি।"

উপরোক্ত সংবাদটি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকার দেশ ছাড়িবার মুখে এইরূপ কাজ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কয়েকজন এদেশীয় কর্ম্মচারী—বিশেষে ভি, পি, মেনন—ঐরূপ ব্যাপারের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া অনেক কিছু ফাইল সরাইয়া রাখায় সেই নথিপত্র নষ্ট করার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। সিংহলে কি দেশাত্মবোধযুক্ত কর্ম্মচারী কেহ ই ছিল না?

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার রিপোর্ট সংসদে পেশ করার বিবরণ নিম্নরূপ :—

"নয়াদিল্লী, ১৫ই মে—পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণের স্বাক্ষরসমন্বিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রিপোর্ট অদ্য সংসদে পেশ করা হয়।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৬ সন হইতে ১৯৬১ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে আনুমানিক ২৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে। ইহার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে শতকরা ২৫৲; টাকা দেশের শিল্পায়ন দ্রুততর হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ হইবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের পল্লীজীবন নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা, শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করা, জনগণের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বলতর ও অনগ্রসর, তাহাদের জন্য সম্ভবপর সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং দেশের সকল অংশের সুসমঞ্জস উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জাতির সম্মুখে যে বিরাট কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন বলেন, 'যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যাহত হইয়াছে, তাহার পক্ষে এই কাজগুলি গুরুতর সন্দেহ নাই; কিন্তু চেষ্টা করিলে এবং ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

দেশে মোট অর্থ বিনিয়োগের হার ১৯৫৫-৫৬ সনের শতকরা ৭৲ টাকা হইতে ১৯৬০-৬১ সনে ১১ শতাংশ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থাও যেমন একদিকে করা হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে দেশের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় দেশের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে উন্নয়ন-কার্য্য শেষ হইবে, এইরূপ পরিকল্পনার কথাও বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল শেষে অর্থ বিনিয়োগের হার ক্রমেই বাড়ান হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত না ইহা জাতীয় আয়ের ১৬ অথবা ১৭ শতাংশ পর্য্যন্ত হয়। এই ধাচের উন্নয়নের গতি ক্রমে ক্রমে বাড়িবার ফলে জাতীয় আয় ১৯৬৭-৬৮ সনের মধ্যে দ্বিগুণ হইবে এবং ১৯৭৩-৭৪ সনের মধ্যে জনপ্রতি আয় দ্বিগুণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর বিশেষতঃ মৌলিক শিল্পগুলির উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বৃহদায়তন শিল্প এবং খনি খাতে ৬৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আরও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প খাতে। সাকুল্যে শিল্প ও খনি বাবদ মোট বরাদ্দের ১৯ শতাংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিল্প ও খনিতে এই উন্নয়ন সাধন করিতে হইলে পরিবহনের বিশেষ করিয়া রেলওয়েসমূহের অনেক উন্নতি সাধন করিতে হইবে। পরিকল্পনায় রেলওয়েসমূহের উন্নয়নের জন্য ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। খাদ্য ও শিল্পোপকরণের উৎপাদন-বৃদ্ধির কার্য্যও অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে আগামী পনর বৎসরের মধ্যে সেচ-সুবিধা যাহাতে দ্বিগুণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ছয়গুণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। মোট বরাদ্দের মধ্যে কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ১১·৮ শতাংশ; সেচ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন বাবদ ১৯ শতাংশ; শিল্প ও খনি বাবদ ১৮·৫ শতাংশ; পরিবহন ও যোগাযোগ বাবদ ২৮·৯ শতাংশ; সমাজসেবা বাবদ ১৯·৭ শতাংশ এবং বিবিধ খাতে ২·১ শতাংশ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পরিকল্পনাটি এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে, উহা রূপায়ণের সময় প্রয়োজনবোধে উহার পরিবর্ত্তন করা চলিবে। কাজকর্ম্মের সামগ্রিক গতি নির্দ্ধারণ ও সংশোধনের সুবিধার জন্য কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা আছে।"

আমরা এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে মতামত এই সংখ্যায় পূর্ব্বেই দিয়াছি। এখানে সরকারি বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল। ইহাতে আমাদের মন্তব্যের সহিত সরকারী দৃষ্টিকোণের পার্থক্য অনুভূত হইবে। সরকারী বিবরণে সময়কে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া দূর ভবিষ্যতের কথাই বলা হইয়াছে। ততদিন যদি বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের বৈষম্য দূর না হয় তবে কি হইবে তাহা বলা হয় নাই।

পঞ্চশীল

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

নেহেরু-চাউয়েন-লাই সংবাদের এক অপূর্ব্ব ফলরূপে "পঞ্চশীল" শব্দটি তাহার আড়াই হাজার বৎসরের জীর্ণ কায়া ত্যাগ করিয়া নবকলেবরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে উহা ছিল ধর্ম্মের অঙ্গ, এখন হইয়াছে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির একটি প্রধান অঙ্গ। শুনা যায়, রাজনীতি-ক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্র সঙ্ঘপন্থী (কমিউনিষ্ট) কোনও রাষ্ট্র জনপন্থী (ডিমোক্র্যাট), কোনও রাষ্ট্র ইহুদী, কোনও রাষ্ট্র ইসলামিক, কোনও রাষ্ট্র স্রেফ নাস্তিক হইলেও নূতন পঞ্চশীলের গুণে নাকি সুখে থাকিতে পারিবে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত ভিন্ন প্রসঙ্গে যিনি পঞ্চশীলের দেশনা করিয়াছিলেন, জগতে শান্তির অগ্রদূত সেই বুদ্ধদেবের আশীর্ব্বাদে নবযুগের রাষ্ট্রনায়কগণের আশা সফল হউক।

শীল শব্দের অর্থ আচার বা নিয়ম। পঞ্চশীল পাঁচটি আচার বা কর্ম্মনীতি। বৌদ্ধেরা দীক্ষাকালে এই পাঁচটি নীতি অনুসরণের প্রতিজ্ঞা করেন। পরেও নানা উপলক্ষে একক বা সমবেতভাবে পঞ্চশীল উচ্চারণ করেন। অষ্টশীল দশশীলও আছে, কিন্তু পঞ্চশীলই প্রধান।

তন্মধ্যে প্রথম শীলটি হইতেছে (পালিভাষায়)—পাণাতিপাতা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়া মি। অর্থাৎ প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকিব—এই শিক্ষা গ্রহণ করিলাম। অন্য চারিটি হইতেছে (পালি মূল আর না-ই দিলাম)—যে দ্রব্য তাহার স্বত্বাধিকারী আমাকে দেয় নাই তাহার গ্রহণ হইতে, কামজ ব্যভিচার হইতে, মিথ্যাকথন হইতে, মাদকদ্রব্য সেবন হইতে বিরতির শিক্ষাও গ্রহণ করিলাম। সংক্ষেপে বলা যায়, হিংসা, চৌর্য্য, পরস্ত্রীগমন. মিথ্যাকথন ও মাদকসেবন বর্জ্জনীয় হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে সমাজে প্রথম উদ্ভূত হয় তথায় এই পাঁচটি দোষ নিন্দিতই ছিল, বুদ্ধ নূতন কিছু বলেন নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি", কোনও প্রাণীকেই হিংসা করিবে না। তবে "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত"—অগ্নিষোম যজ্ঞে (এবং অন্যান্য যে যজ্ঞে পশুবলির বিধি আছে তাহাতে) পশুবধ করিতে পার। অর্থাৎ যজ্ঞে বধ—অবধ। ঐরূপ মদ্যপান নিন্দনীয় (এবং বোধ করি কিঞ্চিৎ উত্তরকালে সুরা-ব্যবসায়ী সমাজে ঘৃণ্য) হইলেও কোনও কোনও যজ্ঞে সোমরস পান কর্ত্তব্য ছিল, উহাও মদ্যবিশেষ। বুদ্ধ বলিলেন, হিংসা, মদ্যপান ইত্যাদি সর্ব্বাবস্থায় বর্জ্জনীয় হইবে। এইখানে তাঁহার ধর্ম্মে কিছু বিশেষ।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম যখন এমন সকল দেশে গেল যেখানে মাংস খাদ্যের প্রধান অঙ্গ বা সকল শ্রেণীর লোক অবাধে নানা প্রকার মাংস খাইতে অভ্যস্ত তখন কিছু গোল বাধিল। যেমন ব্রহ্মবাসীরা ও চীনারা ভীষণ মাংসখোর; তাহারা এবং তদবস্থ অন্য জাতিরা বলিল, বুদ্ধ ত মধ্য পথ ধরিয়া চলা অনুমোদন করিয়াছেন, তখন আমরা যদি স্বহস্তে প্রাণীহত্যা না করিয়া অন্য কর্ত্তৃক নিহত প্রাণীর মাংস খাই তাহাতে দোষ কি? এইরূপে পঞ্চশীলের প্রথম ও প্রধান শীলটি দেশীয় রুচি অনুসারে বিকৃত হইয়া গেল।

কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধের সময়েও এদেশের বৌদ্ধেরা উক্ত যুক্তি অনুসারে মাংস খাইত। প্রবাদ আছে—বুদ্ধ স্বয়ং কতিপয় শিষ্যসহ এক কর্ম্মকারের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে শূকর মাংস খাইয়া মৃত্যুরোগগ্রস্ত হন। এই প্রবাদ নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও ইহা বিশ্বাস করেন নাই; তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, শূকরের মাংস নয়, শূকরের প্রিয় খাদ্য ভূগর্ভজ কন্দ ছত্রক ইত্যাদি। তাঁহারা বলিয়াছেন, truffles খাইয়া থাকিবেন, অথবা এটা রূপকবিশেষ। যিনি অহিংসা ধর্ম্ম জীবনে দু'দশ দিন নয়, পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত ভাবে প্রচার করিয়াছেন, তিনি শিষ্যদিগকে বলিবেন—তোমরা অন্যের কাটা পশুর মাংস খাইতে পার এবং স্বয়ং আশী বৎসর বয়সে ভিক্ষুগণসহ মাংস খাইবেন ইহা নিতান্তই অবিশ্বাস্য।

পতঞ্জলির যোগদর্শন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে প্রবলই ছিল। পতঞ্জলির উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ একটি অঙ্গ। উহার নাম যম। তিনি বলিয়াছেন, এইগুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইলে এবং সার্ব্বভৌম হইলেই মহাব্রত অর্থাৎ সম্যক্ পালিত হয়। অহিংসা ধরিয়াই এ বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। যদি কোনও ধীবর বলে, আমি আমার জাতিধর্ম্ম অনুসারে মৎস্যহিংসা করিব, অন্য প্রাণী হিংসা করিব না, তাহা হইলে তাহার অহিংসা জাতি-

দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইল। যদি কেহ বলে আমি কেবল তীর্থে হিংসা করিব না, কিংবা কার্ত্তিক মাসে ও চতুর্দ্দশী পূর্ণিমায় মৎস্যাদি ভোজন করিব না—তাহা হইলে তাহাদের অহিংসা দেশ বা কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইল। "সময়" শব্দের অর্থ—আচার। দেবপূজা বা ব্রাহ্মণাদির ভোজনের প্রয়োজনে মাত্র হিংসা করিলে সে অহিংসা সময় দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইল। এখানে যজ্ঞে বধ অবধ এইরূপ কোনও ফাঁক রাখা হয় নাই। কেননা অবধ সার্ব্বভৌম হইবে।

আরও বলা হইয়াছে, হিংসাদি অল্প বা অধিক যে-কোনও মাত্রায় কৃত, কারিত বা অনুমোদিত এবং লোভ ক্রোধ মোহপূর্ব্বক হইলেও নিন্দনীয়। নিজে কৃত পশুবধ যেমন দোষের অন্যকে দিয় করাইলে এবং অন্যে নিজ হইতে করিলে তাহার অনুমোদন করিলেও তেমনই দোষের কারণ হইবে।

সত্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উহার মূলও অহিংসা বুঝিতে হইবে। সুতরাং যদি সত্য বলিলে নরহত্যার সম্ভাবনা থাকে, তবে সত্য না বলাই ভাল। এই একটু ফাঁক। বুদ্ধের উপদেশে তাহাও দেখা যায় না। পরস্ত্রীগমন ও চৌর্য্য হিন্দুশাস্ত্রে মাহাপাপ বলিয়া গণ্য। অসত্য এবং মদ্যপানও পাপ বলিয়া গণ্য।

পঞ্চশীলের কোনও শীলেই মধ্যপথ সমর্থিত হয় নাই। অহিংসা সম্বন্ধে জৈনেরা কিছু বাড়াবাড়ি করেন ইহা সকলেই জানেন। সেটা বাড়াবাড়িই। বৌদ্ধ বা হিন্দু কোনও মতেই এবং কোনও কালেই অতটা অনুমোদিত হয় নাই। কিন্তু তাহাকেও মধ্যপথ বলা ঠিক নয়। কেননা হিংসা স্বল্পমাত্রায়ও নিন্দনীয়। প্রকৃত মধ্যপথ হইতেছে যেখানে দুই কোটিই নিন্দনীয় (যেমন এক কোটিতে পানহারে উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্য কোটিতে দীর্ঘকালব্যাপী অনশন) তথায় আহার বিষয়ে সংযম মধ্যপথ। গীতায় সাত্ত্বিক আহারের প্রশংসা আছে। অযথা জেদ বশতঃ আত্মপীড়নের নিন্দাও আছে।

বস্তুতঃ বৌদ্ধমতে মধ্যপথ বলিলে "আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ"ই বুঝায়। ঐ অষ্টমার্গ হইতেছে, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম (পঞ্চশীল), সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি (ধ্যান) ও সম্যক্ সমাধি। এইগুলির ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের বাহিরে যে বৌদ্ধধর্ম্মে ও পঞ্চশীলে বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহার এক কারণ এই যে, বৌদ্ধপ্রচারকগণ কোনও দেশেই প্রচলিত সংস্কার বা ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ উৎখাত করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রচলিত ও জাতীয় চরিত্রে নিতান্ত বদ্ধমূল আচারবশে বৌদ্ধশীল ষোল আনা পালিত না হইতে পারিলে তাঁহারা তেমন অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন না। এইরূপে সিংহলে বৌদ্ধপূর্ব্বযুগে প্রচলিত "দেবতা"-দিগের পূজা, ব্রহ্মে নাটদিগের পূজা, তিব্বতে প্রাচীন "বন"-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নানা আচার ও অভিচারাদি বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। চীনে ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখাবিশেষে ভিক্ষুরা বিবাহও করেন।

চৌর্য্য, পরস্ত্রীগমন এবং অবস্থাধীনে মিথ্যাকথন (যেমন মিথ্যা সাক্ষ্য) সকল দেশেই সমাজের বিপর্য্যয়কারক বলিয়া —রাজশক্তি দ্বারাই দণ্ডনীয়। মাদক সেবন, অসত্য, গোপনে ব্যভিচারও সকল দেশেই নিন্দনীয় হইলেও সাধারণ লোকের মধ্যে অপ্রচলিত নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম তৎসমুদয় কোনও অবস্থায়ই অনুমোদন করে নাই। এখানে মধ্যপথের কথা উঠে না।

বৌদ্ধধর্ম্ম ইদানীং পাশ্চাত্ত্য দেশে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডে নানা বৌদ্ধসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম মুখ্যভাবে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বলিয়া ইসলাম বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মত সামাজিক ভাবে উপাসনার কোনও বিধান উহাতে হইতে পারে না। কিন্তু পুস্তক ও পত্রিকা এবং সময় সময় বিশেষ বিশেষ সম্মেলন ইত্যাদিতে বক্তৃতা দ্বারা ঐ সকল দেশে উহার প্রচার হইতেছে। তথায় অনেকে আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয়ও দিতেছেন। সকলে উপাসক-উপাসিকা মাত্র থাকিয়াও তৃপ্তি পাইতেছেন না; কেহ কেহ শ্রমণ এবং অনাগারিক দশাও অবলম্বন করিয়াছেন। ভিক্ষুর সমস্ত নিয়ম পালন অসাধ্য দেখিয়া অতি অল্প লোকই ভিক্ষুত্ব বরণ করিয়াছেন। ঐ সকল দেশে বলা হইতেছে যে, যদি তথায় রীতিমত ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপিত হয়—তাহা হইলে ভিক্ষুজীবনের কোনও কোনও অতি কঠোর শীলকে একটু নরম করিয়া লইতে হইবে। যেমন মুদ্রা স্পর্শ করা, যে বাড়ীতে স্ত্রীলোক থাকে তথায় বাস করা, খাট-পালঙ্কে শোয়া, বেলা বারটার পরে এবং একবারের অধিক খাওয়া ভিক্ষুর পক্ষে নিষিদ্ধ। মুদ্রা স্পর্শ না করিতে পারিলে ট্রামে বাসে চলিতে একজন সঙ্গী লইতে হয়, তাহা সর্ব্বদা সাধ্য নয়। বাসগৃহের সমস্যাও দুরতিক্রমণীয়। শীতের দেশে দ্বিতীয় বার ভোজন না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব। অন্ততঃ ঔষধজ্ঞানে দ্বিতীয় বার ভোজন আবশ্যক হইবে। উক্ত নিয়মগুলি পঞ্চশীলের অতিরিক্ত শীল। পঞ্চশীল শিথিল করার প্রয়োজনের কথা উঁহারা বলেন না। তবে ঐ সকল দেশে সাধারণ উপাসক ও উপাসিকাদিগের পক্ষে মাংস ও মদ্য বর্জ্জন বোধ করি দুঃসাধ্য হইবে।

বুদ্ধের কীর্তি

আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার

বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে পূর্ব মহাদেশে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক এবং প্রচণ্ড এক পরিবর্তন ঘটেছে, যাকে বিপ্লব অর্থাৎ 'রেভল্যুশন' বলা উচিত। ভারতবর্ষের একটি ছোট রাজ্য হতে বার হয়ে এই পবিত্র ধর্মস্রোত প্রায় সমস্ত এশিয়ার লোকদের মধ্যে চিত্তের শান্তি ও নৈতিক বল ঢেলে দিয়েছে, কত কত নিষ্ঠুর বর্বর যাযাবর জাতিদের মানুষ করে তুলেছে, তাদের মনে দেবতার মত হবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছে। যে ধর্মচক্র তিনি কাশীর কাছে একটি হরিণ চরার বাগানে পাঁচ জন লোকের সামনে প্রথম ঘুরিয়ে দেন. তা আজও ঘুরছে। অশোক রাজার প্রচারকগণ শুধু গ্রীকদের বাইরের বসতিতে, এশিয়া যেখানে আফ্রিকা ও ইউরোপকে ছুঁয়েছে, সেই পর্যন্ত পৌঁছে। আর আজ, ছোট ছোট আইওনিয়ান রাজ্য ছেড়ে যে সব মহাদেশের নাম পর্যন্ত অশোক শুনেন নাই, সেখানেও বিজয়যাত্রা করেছে—আদর পেয়েছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা এই সব সভ্যদেশের কত সুধী, কত মহাপণ্ডিত, কত ভক্ত প্রগাঢ় চিন্তা এবং আজীবন পরিশ্রম করে বৌদ্ধ শাস্ত্ররাশি পড়ছেন, জগতের হিতের জন্য তার ব্যাখ্যা প্রকাশিত করছেন।

এত বড় জয়লাভ একজন ফকির কিরূপে করলেন? এটা তাঁর সর্বস্ব ত্যাগের ফল। মানব-কল্যাণের জন্য সিদ্ধার্থ সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, তাই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

আমাদের মহাকবি সত্যই বলেছেন:

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই!
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

বুদ্ধের জন্মের আগে তাঁর মা মায়াদেবী স্বপ্ন দেখলেন যে, একটা সাদা হাতী আকাশ থেকে এসে তাঁর জঠরে ঢুকল। সাদা হাতী অতি কম দেখা যায়, ওটাকে লোকে মহা সুলক্ষণ-যুক্ত বলে বিশ্বাস করে। দৈবজ্ঞরা রাণীর স্বপ্নের এই অর্থ করলেন যে, তাঁর ভাবী সন্তান সমস্ত দেশের উপর চক্রবর্তী সম্রাট হবে, অথবা খুব বড় একজন সাধু ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা হবে। আজ হতে আড়াই হাজার আশী বছর আগে শাক্য বংশের রাণীর গর্ভে যে পুত্র জন্ম নেন, তিনি এর দুটোই হয়েছেন। জগতের শতকোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি রাজার উপর অধিরাজ হয়ে বসে আছেন, তাঁর ধর্ম আজ পৃথিবীর প্রায় সিকি পরিমাণ মানুষ মেনে নিয়েছে। তিনি চক্রবর্তী অর্থাৎ সম্রাটের পদ লাভ করেছেন যুদ্ধবিজয় করে নয়, লক্ষ লক্ষ লোককে মেরে, দাসত্বে বন্দী করে নয়।

এই কীর্তি অর্জন সম্ভব হয়েছে তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত দেখে, তাঁর কথাগুলি শুনে, তাঁর হৃদয়ের অসীম করুণার ফলে। এই জন্যই তাঁর খাঁটি শিষ্য প্রিয়দর্শী অশোক লিখে গেছেন—

এষ চ মুখ্যতমঃ বিজয় দেবানাম্
প্রিয়স্য যঃ ধর্ম-বিজয়ঃ।
ইচ্ছতি হি দেবানাম্ প্রিয়ঃ
সর্বভূতানাম্ অক্ষতিং সংযমং
সমচর্য্যাং মার্দিবং॥

অর্থাৎ,

"ধর্ম-বিজয়ই আমার সবচেয়ে প্রধান জয়লাভ। আমি চাই সবলোকের কল্যাণ, সংযম, সমান ব্যবহার, আনন্দ"। বুদ্ধ এই আদর্শই মানবজাতির সামনে দাঁড় করে দিয়ে গেছেন।

শাক্য বংশের এই রাজপুত্র সংসারের সব সুখ, রাজপদের সর্ব গর্ব কেন ত্যাগ করলেন? তাঁর দয়াভরা প্রাণ বড় ব্যথা পেয়েছিল, বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল, মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে। প্রথম যৌবনে, অসীম ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেও তিনি দেখতে পেলেন একজন রোগী লোককে। সে তাঁর মতই মানুষ, তার হাত-পা চোখমুখ ঠিক তাঁর মত অথচ ব্যারামে তার শরীর যেন ধূলার মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। আর একদিন দেখলেন একজন বুড়ো মানুষ। জরাতে সে যেন মাটিতে নুইয়ে পড়েছে। তৃতীয় দিন তিনি দেখলেন একটা মৃতদেহ দাহ করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মানুষের শেষ দশা, একদিন তাঁর ভাগ্যেও তা হবে। শেষ দিন দেখলেন এক ভিক্ষু সন্ন্যাসী, যে সব দুঃখ শোক জরা চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে পথ নিয়েছে। তার কোন বন্ধন নাই, সে যেন একটা সুস্থ সবল পাখী—আনন্দে উড়ে যাচ্ছে।

তখন এই শাক্য রাজকুমার স্থির করলেন যে, জীবের দুঃখ শোক কেন হয় এবং কি করলে তা দূর করা যায়, তার কারণ ভেবে বার করতে হবে, নচেৎ তাঁর জীবনই বৃথা। তিনি যে এই গভীর সত্য আবিষ্কার করেন, তা

বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ঘোষণা করছে। অসংখ্য বৌদ্ধমূর্তির নীচে এই কথাগুলি খোদা আছে :

যে ধর্ম্মাঃ হেতু প্রভবাঃ হেতুস্তে-
ষাম্ তথাগতঃ হি অবদৎ।
তেষাম্ যঃ নিরোধঃ এবং
বাচি মহাশ্রমণঃ॥

অর্থাৎ,

"সংসারে আমরা যে সব দৃশ্য, যে সব ঘটনা দেখতে পাই, তা কোন্ কারণে হয়েছে ? আর এগুলি কি করলে থামান যায়, শেষ করা যায় ? তাও এই মহাসন্ন্যাসী বলে গেছেন। সৃষ্টির এই নিগূঢ়তম সত্য আবিষ্কার করা, এইরূপ নিজের হৃদয়ে চরমজ্ঞানের আলোক পেয়ে সম্বুদ্ধ অর্থাৎ যে সব বুঝে এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ হওয়া, শাক্য রাজপুত্রের পক্ষে একদিনের কাজ ছিল না। যৌবনের পূর্ণ জোয়ারের মধ্যে সুখের জীবন, রাজগদি, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, চাকর সব ছেড়ে দিয়ে তিনি একা পথে বেরুলেন ঘর ছাড়া ভিক্ষুক হয়ে। কয়েক বছর কঠোর তপস্যা করে, শরীরকে যন্ত্রণা দিয়ে কোন ফলই পেলেন না। তখন বুঝলেন যে, সুখে গা ঢেলে দিলেও মুক্তি নাই, কষ্টের মধ্যেও মুক্তি নাই, তবে অন্য উপায় বের করতে হবে।

ছয় বৎসর ধরে একা নির্জনে ভেবে ভেবে অবশেষে এই প্রশ্নের উত্তর পেলেন আর এক বৈশাখী পূর্ণিমায়—উরুবিল্ল গ্রামের কাছে পথের ধারে এক বটতলায় বসে বসে। এর মধ্যে শয়তানের কত বাধা কত বিপদ তাঁকে টলাতে পারল না। মুক্তির ঠিক উপায় আবিষ্কার করা মাত্র তাঁর হৃদয় স্থির হ'ল, তিনি মাটি ছুঁয়ে পৃথিবীকে সাক্ষী করলেন, "দেখ, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, আমি সম্বুদ্ধ, এবার আমি মানুষের দুঃখ শোক জরা জন্ম ঘুচাতে পারব। আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি ঐ বটগাছের কাছে খোলা জমিতে সতের বার পা ফেলে হাঁটলেন, আর প্রতি পদক্ষেপের জায়গায় এক-একটি পদ্ম ফুটে উঠল। এখন সেখানে শ্বেতপাথরের পদ্ম রাখা হয়েছে।

এই নূতন তত্ত্ব, এই মুক্তির সত্য পথ, এটা কি ? বুদ্ধের শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে যে, অসংযত ভোগ আর অসীম কষ্ট-সাধনের জীবনযাত্রা এ দুটিই ভুল, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যে পথ, অর্থাৎ সরল, সংযত সংসারযাত্রাই মানুষকে জীবনে শান্তি, মরণে মুক্তি দিতে পারে। এই মধ্য পথের আটটা অঙ্গ আছে, অর্থাৎ এই পথে চলতে হলে আট রকমের চরিত্রগুণ ও চেষ্টা অভ্যাস করতে হবে। কিন্তু সেগুলিকে সংক্ষেপ করে তিনটা বললেও কাজ চলে। বিদিশানগরের বাইরে বেটোয়া নদীর পারে যে দু'হাজার বৎসরের পুরাতন গরুড়-স্তম্ভ আছে, তার সব নীচে এই কথাগুলি ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদা আছে :

ত্রিণি অমৃতপদানি সু-অনুষ্ঠিতানি
নিয়ন্তি স্বর্গম্—
দমঃ ত্যাগঃ অপ্রমাদঃ॥

অর্থাৎ, "ইন্দ্রিয় দমন, স্বার্থ ত্যাগ এবং স্থির বুদ্ধি এই তিনটি পা ফেলতে পারলে স্বর্গে পৌঁছান যায়। এই কথা-গুলিতে বুদ্ধের বাণী এক নিশ্বাসে শেষ করা হয়েছে। এই তিনটিই ত ভারতের চিন্তা-নেতাদের আবহমানকাল হতে মেনে নেওয়া চির সত্য।

প্রথম, বাসনার দমন। আমাদের দুঃখভোগের প্রধান কারণ উন্মত্ত বাসনাগুলি। গয়াশীর্ষ পর্বতে হাজার ভক্তের সামনে ব্যাখ্যা করার সময়ে বুদ্ধ বলেছেন—"সব জিনিস আগুনে পুড়ছে—মন, ইন্দ্রিয়ের বস্তুগুলি সব বাসনার, কামের আগুনে জ্বলছে। যদি বাসনা ত্যাগ করতে পার, তবেই মুক্তি, অর্থাৎ আত্মার স্বাধীনতা লাভ করবে ; সংযত পবিত্র ভাবে জীবন কাটালে তার পর আর পুনর্জন্ম নাই। এই বাসনা যখন পুড়ে শেষ হয়, ছাই মাত্র পড়ে থাকে, তখন মন শীতল হয়, ইহাই নির্বাণ। তার পর ত্যাগ, পরের জন্য নিজের সর্বস্ব নিঃশেষে দান করলে, তবেই প্রকৃত ভোগ করা যায়। সেই কত পুরাতন উপনিষদের যুগের বাণী—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে।

অবশেষে অপ্রমাদ, অর্থাৎ স্থির হয়ে নিজে চিন্তা করে যা সত্য তাকে বিশ্বাস করা, অর্থাৎ এই যুগের অতি প্রিয় শ্লোগান আওড়ান, হুজুগে মেতে দল বেঁধে মামুলী কথার চীৎকার তার সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস।

বুদ্ধের প্রচার-বাণীতে, তাঁর মুখ হতে শোনা গল্প যাকে জাতক বলে তাতে, সর্বত্রই এই কথা বলা হয়েছে যে, মানবের মুক্তি হয় শুধু একটি ক্রমোন্নতির পথে জন্মান্তর স্থির ভাবে চললে তবে। যেমন আমরা ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ধাপে ধাপে উপরে উঠি, প্রথমে ম্যাটিক পাস করে, তার পর আই-এ, সেটা পার হলে বি এ, শেষে এম-এ। ঠিক সেইমত সৎ লোক প্রথমবারকার মানবজন্মে কতকগুলি পুণ্য কাজ করে, ত্যাগ দমন অভ্যাস করে। তার পর জন্মে ঐ সাধনার পথে আরও উঁচুতে উঠেন, তাঁর পক্ষে সাত্ত্বিক জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়ে উঠে, তৃতীয় জন্মে তাঁর আরও বেশী আত্মার উন্নতি হয়। এইরূপে ক্রমে দশ-বিশ জন্মের পর তিনি পূর্ণ বুদ্ধ হন, তার পর তাঁর আর জন্ম নাই। এই সব আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অক্লান্ত পথচারীদের বোধিসত্ত্ব নাম দেওয়া হয়েছে।

আড়াই হাজার বৎসরে, বুদ্ধের শিক্ষা ক্রমে ক্রমে অগণ্য

শাস্ত্ররাশি আর তর্কের বোঝাতে প্রায় চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু এর আদি ও অকৃত্রিম রূপ তাঁর খাঁটি শিষ্য অশোক অতি সহজে অতি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, পাথরে খুদে চিরকালের জন্য রেখে গেছেন :

ধর্মঃ সাধুঃ। কিয়ান্ তু ধর্মঃ ইতি? অপাস্রবঃ বহু-কল্যাণম্ দয়া দানম্ সত্যম্ শৌচম্।...অভ্যভূত-শুশ্রূষা, মাতাপিতৃ-শুশ্রূষা, গুরুণাম্ শুশ্রূষা—দাস-ভৃতকেষু সম্যক্ প্রতিপত্তিঃ।

অর্থাৎ, "লোকে ধর্ম ধর্ম করে, বেশ কথা। কিন্তু ধর্ম কি? ধর্ম হচ্ছে পাপ হতে দূরে থাকা জনসাধারণের মঙ্গল কাজ করা, দয়া, দান, সত্যনিষ্ঠা, শুদ্ধ থাকা। আর্য্যদের, পিতামাতার, গুরুজনের সকলের সেবাশুশ্রূষা, ভৃত্যদের প্রতি যত্ন ও সম্মান দেখান।"

আড়াই হাজার বৎসরেরও বেশী হয়ে গেল, এই মহাশ্রমণ, এই তথাগত অর্থাৎ অবিরাম ভ্রমণকারী জনশিক্ষক পৃথিবীর মধ্যে চিরশান্তির বারি বর্ষণ করে যান। যে জাতি তাঁর কথা না শুনবে, যে জাতি বাসনাকে ভোগকে জীবনতন্ত্র করে নেবে, তারাই লোপ পাবে। সেই পরম কারুণিক সব জীবকে —মানব পশু কীটপতঙ্গকে পর্যন্ত ভালবাসতেন, তাদের সুখ-দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখের সমান মেনে নিতেন। তাঁর সন্ন্যাসী দলের মধ্যে পৃথিবীর সব জাতির সব গোত্রের সব ব্যবসায়ের লোককে ডেকে স্থান দিয়েছিলেন, মুক্তির দুয়ার সকলের জন্য খোলা রেখেছেন।

বুদ্ধদেবের এই করুণার ধারা কেমন করে ফল্গু নদীর মত বালি ফুটো করে বার হয়ে আসে তার একটা দৃষ্টান্ত দিব। আনন্দ নামে একটি বালক তাঁর শিষ্য হতে আসে। সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। একদিন বুদ্ধ তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজগীরের গৃধ্রকূট পাহাড়ে ধ্যান করতে গেলেন। একটা চূড়ার নীচে এক গুহায় ঢুকে বুদ্ধ নিজে ধ্যান করতে বসলেন, আনন্দকে দূরে অন্য এক গুহায় গিয়ে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝতে পারলেন যে, কতকগুলি শকুন আনন্দের গুহার উপরের চূড়ায় বসে পাখা ঝাপটাচ্ছে, আর সেই নির্জন স্থানে একাকী বালকটি ভয় পেয়েছে। অমনি বুদ্ধ নিজের ডান হাত বাড়ালেন। হাত ছোঁওয়া মাত্র পাহাড় গলে গিয়ে গুহার পাশে একটা ছিদ্র হ'ল, সেই ছিদ্র দিয়ে তাঁর হাত বার হয়ে ক্রমে লম্বা হয়ে আনন্দের গুহায় ঢুকে, সেই বালকের মাথায় আদরের সাহস দিয়ে বললেন, "ভয় করো না, আমি আছি।" কলিকাতার জাদুঘরে ডান দিকে নীচতলায় গান্ধার প্রস্তরগুলির মধ্যে শ্বেতপাথরে খোদাই করা এই দৃশ্য আছে।

আজ বিশ্বজগতের দশা দেখে মনে হয় যেন যত অসুর, রাক্ষস, দৈত্য সব একজোট হয়ে মানবজাতিকে নাশ করতে আসছে, এশিয়াতেই প্রথম আণবিক বোমা ফাটান হয়, আর এখন এশিয়াতেই নূতন নূতন শক্তিশালী বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাই আজ আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বুদ্ধ আছেন, তাঁর ধর্ম আছে, তাঁর সংঘ এখনও কাজ করছে।

বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি
ধম্মং শরণম্ গচ্ছামি
সংঘং শরণম্ গচ্ছামি।

বুদ্ধ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ব্যাকুল পৃথিবী করে, হে প্রশান্ত, তোমারে আহ্বান,
সন্দেহে সন্ত্রস্ত আজ সচকিত মানবের মন,
মোহে মুগ্ধ, ভয়ে ক্ষুব্ধ, আর্য্য পথ করেছে বর্জ্জন,
করুণায় তারে তুমি স্নিগ্ধ কর, শান্তি কর দান।
হিংসার অনল জ্বলে, দিকে দিকে শিখা লেলিহান;
তোমার অমৃত-বাণী, আজ তার বড় প্রয়োজন,
মানবে অভয় দাও, কর তার সংশয়-ভঞ্জন,
তোমার প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত কর তার প্রাণ।

এসেছিলে এক দিন, এনেছিলে নূতন জীবন,
পঁচিশ শতাব্দী বুঝি তার পর হয়ে গেল পার,
নূতন আলোকে সেই ভ'রে গেল অর্দ্ধেক ভুবন,
বিপন্ন পৃথিবী আজ, এ সঙ্কটে কে করে উদ্ধার!
আলো দাও, বল তবে, বুদ্ধ তব লইনু শরণ,
সে ধর্ম্ম—পরম ধর্ম্ম, অপূর্ব্ব সে—প্রেম নাম তার।

রোজ-ভিলা

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

শেষ রাত্রের দিকে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেছে। হেমন্তর ভোর। শীতের আমেজ দিয়েছে।

ঘুম ভাঙতেই গায়ে চাদর জড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ভোরের ধূম্র-ধূসর অস্পষ্টতা অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। নির্মল অবারিত আকাশের অনেকখানি স্পষ্ট দেখা যায়। সামনেটা বেশ ফাঁকা। কোথাও কোন আড়াল নেই।

বাড়িটা একটা উঁচু টিলার উপর।

সামনের রাস্তাটা পার হয়ে বিস্তৃত ঢালু জমিটা যেন নীচে গড়িয়ে গেছে। তলিয়ে গেছে বোধ হয় একটা ছোট পাহাড়ী নদীর গর্ভে।

জমির বুকে ইতস্ততঃ ছড়ানো বড় বড় কালো পাথরের চাঙড়। গড়াতে গড়াতে সেগুলো যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে নিচে থেকে ধাক্কা খেয়ে।

বাড়ির দেয়ালের ধারে বড় বড় ইউক্যালিপটস। এক-হারা সাদা ধপধপে গুঁড়িগুলো ভোরের ঝাপসা আলোয় ঝলঝল করছে নিটোল মসৃণ মেয়েদের দেহের মত। বাড়ির সামনে খানিকটা জমিতে ফুলের ক্ষেত। অজস্র গোলাপ ফুটেছে, রকমারী রঙের—লাল, গোলাপী, সাদা, জরদা। সার্থক হয়েছে বাড়ির 'রোজ'-ভিলা নাম। দেয়ালের ধারে স্থলপদ্ম, রক্তকরবী, জবা, গন্ধরাজ, কামিনী, টগর, শিউলি।

প্রতি নিশ্বাসে ঝরা শিউলির গন্ধে-ভরা বাতাস।

জায়গাটা মনোরম মনে হ'ল। বাড়িটা ভালই পাওয়া গেছে। ছুটির অবকাশের জন্য দরকার এমনই মুক্ত আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস আর বিস্তৃত নির্জনতা। বেশ নিরিবিলি, পরিচ্ছন্ন আর ফাঁকা লাগল।

আমি বাগানে নেমে খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম।

পায়ের তলায় এই রঙীন ফুলের জগৎ। মাথার উপর বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ নীল আকাশ আর দূর দিগন্তের ঢেউ-খেলানো ধূসর পাহাড়।

শীতের প্রথম কুয়াশায় সবুজ ঘাসে ঢাকা জমিগুলো হলদে হয়ে এসেছে।

গাছের মাথায় পাখির দ্বিধাজড়িত কাকলি—প্রভাতী বন্দনা গান গেয়ে গাছের মাথা থেকে বিদায় নিচ্ছে। দূরে কোন্ দেবালয়ে প্রভাত আরতির কাঁসরঘণ্টা বাজছে।

আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

সব ঘুমিয়ে আছে।

একা আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি প্রকৃতির এই সৌন্দর্যরাজ্যে। বুক ভরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে শুষে নিচ্ছি ফুলের গন্ধ-ভেজা ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস।

—কিগো, বাড়ি পছন্দ হয়েছে?

পাশে এসে দাঁড়াল আমার স্ত্রী লীলা।

দু'জনে চোখাচোখি হ'ল।

দৃষ্টির সংঘর্ষ হ'ল। যদিও চোখে নেই বিদ্যুৎ। দৃষ্টিতে নেই বহ্নি।

নাই থাক, চিরদিন কিছুই থাকে না। তবুও দুজনে হাসলাম। বিস্মৃত যৌবনের হাসি।

আমি হাসতে হাসতে তার হাত ধরে বললাম, চমৎকার, সত্যিই বাড়িখানা ভালই পেয়েছ। বাড়ির চেয়ে ভাল কিন্তু বাইরের এই বাগানটা।

লীলা চোখে ঝিলিক দিয়ে চাপা গলায় বললে, তোমরা যে বাইরের খদ্দের। ভিতর পর্যন্ত তোমাদের দৃষ্টি ত পৌঁছয় না। তোমাদের দৌড় বাইরে পর্যন্ত।

—তাই নাকি? ভিতরে কি এত সৌন্দর্য আছে নাকি? এই ফুলের রাজত্ব আর আকাশের মায়া?

লীলার মুখে ফুটে উঠল হাসির ঢেউ। বললে সত্যি। চমৎকার বাগানটি। ফুলে ফুলে ভরে আছে।

—আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।

—কি?

চোখ তুলে তাকাল আমার পানে লীলা। জোর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, শুধু আমরাই ফুরিয়ে গেলাম।

গায়ে ধাক্কা দিয়ে লীলা কটাক্ষ হেনে বললে, ইস্! ফুরিয়ে অমনি গেলেই হ'ল? ভালবাসা কি ফুরোয় নাকি?

—দিদি, চাকরকে পাঠিয়ে দিন। গাই দোওয়া হচ্ছে।

আমি চমকে উঠলাম।

লীলা উত্তর দিল, দাঁড়াও ভাই। আমার চাকরের ঘুম থেকে ওঠবার সময় হয় নি এখনও।

পাশের বাড়ির কম্পাউণ্ড থেকে টুকরো হাসির শব্দ এল।

একটি মেয়ে হাসির ঢেউ তুলে মাঝের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে এল।

লীলাকে জিজ্ঞেস করলে, দাদাবাবুর আসতে কাল অনেক রাত হয়েছে। ট্রেন লেট্ ছিল বুঝি ?

লীলা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মেয়েটির। আমাদের বাড়ির এবং পাশের বাড়ির মালিক।

সুশ্রী হাসিমুখ মেয়েটির। বয়সও অল্প বলেই মনে হ'ল। মুখে চোখে তারুণ্যের প্রখর দীপ্তি।

এক সময় লীলা বললে, আমাদের বাড়ির চেয়ে বাড়িউলি কিন্তু ইন্‌টেরেস্টিং এবং মিস্টিরিয়স্।

—কি রকম ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লীলা বললে, ওর ঐ হাসির নীচে লুকিয়ে আছে অশ্রুর সমুদ্র।

—কেন ? আর কে আছে ? স্বামী নেই ?

—তা জানি না। তবে আছে একজন, দেখিয়ে আনব একদিন। গেলেই দেখতে পাবে।

পাশের বাড়ির নাম 'প্রেম-রেণু'।

মেয়েটির নাম মুরজা।

সন্ধ্যার পর লীলার সঙ্গে গেলাম প্রেম-রেণুতে। মুরজার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হ'ল। স্পষ্ট করে কাছ থেকে দেখলাম তাকে।

অপূর্ব শান্তির রূপ। তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে পরম আদরে গড়েছেন তার বিধাতা। চোখ দুটিতে তপস্যার ছায়া। মুখে চোখে প্রগাঢ় প্রশান্তি। হাসি উপচে পড়ছে ঠোঁটের দু'কূল ভেঙে ভারী মিষ্টি হাসি।

মুরজাকে আমার ভাল লাগল।

মাঝে একখানা হলঘর। দু'পাশে দু'খানা ছোট সাইড রুম। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি।

মাঝের হলঘরেই আমাদের নিয়ে গেল মুরজা। ঘরখানি পরিচ্ছন্ন। ফিটফাট সাজান।

মেঝেয় বিচিত্র পুরু কার্পেট। কোচ, সেট, টিপয়। টিপয়ে বিচিত্র মিনে করা ভাস। ভাসে তাজা ফুলের গুচ্ছ। দেওয়ালে বড় আর্শি আর ল্যাণ্ডস্কেপ ছবি।

ধূপ আর ফুলের গন্ধে ঘরখানি ভরে আছে। ঘরে ঢুকেই মনে হ'ল দেবালয়ে এলাম।

ছায়ামূর্তির মত, ঝাপসা আলোয় চোখে পড়ল একটি মূর্তি। ঘরের একপাশে একখানা কোচে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে একটি হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি তরুণ।

একজন চাকর ইতিমধ্যে ঘরে একটা হ্যাসাক্ আলো জেলে নিয়ে এল।

উজ্জ্বল আলোয় তার পানে চেয়ে দেখলাম। গায়ের রং ফর্সা।

মুরজা কাছে গিয়ে বললে, ও বাড়ির দাদাবাবু এসেছেন, ভানু, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।

যুবকের নাম ভানু।

ভানু চঞ্চল হয়ে উঠল। ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে নড়ে উঠল তার নিস্পন্দ অবশ হাত দু'খানি। মনে হ'ল, সে হাত দু'খানা তোলবার চেষ্টা করলে, পারলে না। মুখে ফুটে উঠল একটা করুণ হাসি। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট ধ্বনি। সব যেন কেমন এলোমেলো, খাপছাড়া।

ভানু পক্ষাঘাতে পঙ্গু, অবশ, অথর্ব। নিশ্চেতন জড়ের মত সে মুরজার পানে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে নিথর হয়ে গেল। দৃষ্টি প্রখর কিন্তু তাতে চৈতন্য নেই। যেন মানুষের দৃষ্টি নয়।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করেও চাপতে পারলাম না। মধুর আচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে সব যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

মুরজা প্রশ্নভরা ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকাল। হাসতে হাসতে বললে, এই আমার অবলম্বন। আমি ওরই ছায়া।

আমি নিজের অজ্ঞাতসারে প্রশ্ন করে বসলাম, আপনার স্বামী ?

মুরজা অপরূপ ভঙ্গীতে ছেলেমানুষের মত হাসতে হাসতে উত্তর দিল, ন', ও আমার ভানু। ওই আমার সব। ওর জন্যই আমার বেঁচে থাকা।

—কতদিন ওর এ রকম অবস্থা হয়েছে ?

—সাত বছর।

—চিকিৎসায় ফল হ'ল না ?

—চেষ্টার ত্রুটি করি নি।

আমরা বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। দ্বিধাভরে চেয়ে দেখলাম ভানুর মুখের পানে। সুন্দর সুশ্রী চেহারা। কিন্তু সব যেন কেমন বেখাপ্পা। বেমানান্। তার বশের বাইরে। একটা সুন্দর মূর্তি যেন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

সাজ-পোশাকের বাহুল্য না থাকলেও পরিচ্ছন্ন বেশবাস। মাথার ঝাঁকড়া কালো কুচকুচে চুলগুলি সুবিন্যস্ত। পাষাণ মূর্তির সর্বাঙ্গে যেন ভক্তের হাতের সেবার ছাপ।

মুরজা থাকে থাকে সপ্রেম সোৎসুক দৃষ্টিতে ভানুর মুখের পানে চেয়ে দেখে দু'চোখ ভরে, মা যেমন দু'চোখে অগাধ স্নেহভরে অসহায় শিশুর পানে চেয়ে দেখে। মাঝে মাঝে মুখের উপর হতে তার লতানো চুলগুলি সরিয়ে দেয়। অসংযত শিথিল হাত দু'খানিকে সরিয়ে কোলের উপর জড়ো করে দেয়। যেন নিজেরই একটা অঙ্গ।

মুরজার মাঝে দেবদাসীর প্রতিশ্রুতি। পাষাণ মূর্তির সেবায় দিয়েছে নিজেকে উৎসর্গ করে। শালগ্রাম শিলার মাঝে দেখেছে বৈকুণ্ঠনাথের দুর্লভ রূপ।

নিজের হাতে চান করিয়ে দেওয়া, খাওয়ানো, শোওয়ানো হাসিখুশি, গালগল্প, বই পড়ে শোনানো, গান গেয়ে ওর মনকে খুশী রাখা। অবোধ শিশুকে মা যেমন আদরে-আব্দারে ডুবিয়ে রাখে।

এই কি সব? আবার ওর মন ভোলাবার জন্য সন্ধ্যার দিকে মুরজাকে একটু সাজ-পোশাক করতে হয়। নিজেকে সুন্দর করে তুলে ওর কাছে বসে ওকে গান শোনাতে হয়। নিজের জীবনের শূন্যতা ভরাতে হয় অন্তরের নিবেদনকে মধুর কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলে।

এই ওর অভিসার।

ওকে দেখে ত মনে হয় না যে ওর মনের কোথাও কোন শূন্যতা আছে। ও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। ঐ রুগ্ন, অথর্ব পঙ্গু যেন ওর সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ওর সমস্ত শরীরে ওর প্রিয়জনের সর্বব্যাপী স্পর্শ অবিরাম বিরাজমান। ও দেহমন দিয়ে সত্যরূপে সম্পূর্ণভাবে ওকে জয় করেছে। এই পাওয়াই ওর কাছে পরম পাওয়া। নিজেকে তার কাজে লাগাতে পেরে তার সেবার অধিকার পেয়ে সে যেন পরিতৃপ্ত।

মুরজার শান্ত স্নিগ্ধ শুভ্র সুকুমার মুখের মাঝে কোথাও একটু অতৃপ্তির ছায়া পর্যন্ত নেই। কি অজস্র স্নেহ ওর চোখ দুটিতে, আনন্দের রেখা ওর মধুর অধরে! আমি ওর মহিমায় ও মাধুর্যে বিস্মিত।

কাজে কি গভীর নিষ্ঠা মুরজার। চার-পাঁচটা গাই। দুধ বিক্রি করে।

জমি। ক্ষেতখামার। শাকসব্জী হাটে বিক্রি হয়। নিজেই সমস্ত দেখাশুনা করে। গরুর সেবা করে নিজের হাতে। উদয়াস্ত সে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে।

তারই মাঝে সবচেয়ে বড় কাজ তার ভানু। অসহায় রুগ্ন ভানুর সেবা। নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য দেবসেবার মত। তাকে বাদ দিয়ে মুরজার জীবনের কোন ব্যাখ্যা থাকে না। ওর সমস্ত জীবনধারাটাই যেন অতি পবিত্র, অতি আনন্দময়।

রাশিকৃত কালো চুল ওর শুভ্র পিঠের উপর ঝলমল করে। কোমরে আঁচলের কষি জড়িয়ে সে এধার-ওধার করে চঞ্চল প্রজাপতির মত। আমি অবাক্ হয়ে দূর থেকে ওর পানে চেয়ে দেখি। মাঝে মাঝে আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দৌড়-ঝাপ করে চপল বালিকার মত।

সত্যই মুরজা আমায় প্রচণ্ড আকর্ষণ করেছে। মুরজা আর ভানু আমায় যেন পেয়ে বসেছে। ভানু উপলক্ষ্য, মুরজার আত্মপ্রকাশের উপকরণ।

ভানুর জন্যই মুরজা এত দামী। কিন্তু ভানু ওর কে? ওদের সম্বন্ধের আসল চেহারাটা দেখবার জন্য আমার ঔৎসুক্য অধৈর্য হয়ে উঠল।

লীলাকে মুরজা দিদি ডাকে। সেই সম্পর্কে মুরজার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা মধুর। কাজেই সে ঠেকাতে পারলে না আমার উদ্দাম অসহিষ্ণু কৌতূহলকে।

একদিন মুরজা সবিস্তার বর্ণনা করলে তার বিস্ময়কর প্রেমের কাহিনী।

চমকে উঠলাম মুরজার পূর্ণ পরিচয় পেয়ে।

মুরজা ভূতপূর্ব নটী। জনপ্রিয় ফিল্ম-স্টার।

মুখের পানে চেয়ে মনে হ'ল, এ ত আমাদের চেনা। আশ্চর্য! এতদিন একে চিনতে পারি নি।

আশ্চর্য হবারই কথা। পর্দার গায়ে এর রূপশ্রী দেখে, এর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। লীলার সঙ্গে একে বহুবার দেখেছি, বহু ছবিতে।

যাক সে কথা।

সৌন্দর্যময়ী ছায়ানটী মুরজার জীবনে তখন বিস্ময়-বৈচিত্র্যের জন্ম হচ্ছে পলে পলে। জীবনের চারিপাশে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর জটলা আর ঐশ্বর্যের ইন্দ্রজাল। মেক-আপ আর পালিশ-করা স্বপ্ন-রঙীন জীবন তার হাওয়ায় পাখা মেলে দিয়েছে। ঠিক তেমনই দিনের এক সুন্দর প্রভাতে তার আলো ঝলমল মনের আকাশে ভানুর উদয় হ'ল স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রের মত।

রাজপুত্রের মতই রূপ আর ঐশ্বর্য ভানুর।

মুরজার মনে ঝড় উঠল, সে মেতে উঠল ভানুকে নিয়ে। সে এক নতুন ধরনের চেতনা। সব পেরিয়ে তার মন ছুটল মুক্তির সন্ধানে। নদী প্রসারিত হ'ল সমুদ্রের পানে। মিলে-মিশে এক হয়ে বিরাম লাভ করতে চাইল। তারই মাঝে অসীম অগাধ মুক্তি, অফুরন্ত আনন্দ।

ভানু তার রক্তে দোলা দিয়েছে। তাকে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখিয়েছে। তাকে শুচিশুভ্র মহত্তর জীবনের কল্যাণময় পথে তার চিরজীবনের সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

মুরজার মনের আকাশে নতুন আলো, নতুন রঙ। ভানু তার জীবনের আদর্শ বদলে দিয়েছে, তাকে ভেঙে নতুন করে গড়েছে, তার ভেতরের চিরন্তন নারীকে সে জাগিয়ে তুলেছে। মুরজা জলে উঠেছে।

সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নটীর জীবনে ইস্তফা দেবে। সে নেমে আসবে অবাস্তবের মায়ালোক থেকে শান্তিময় নির্ঝঞ্ঝাট গৃহকোণে।

সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তারা দু'জনে কাছাকাছি এগিয়ে এল দ্রুতগতিতে। তাদের শক্তি আছে, স্বাস্থ্য আছে, সাহস আছে, প্রতিরোধের প্রচুর ক্ষমতা আছে। আসলে তাদের অন্তর্লোকে সত্যের আলো জ্বলেছে। মেয়েপুরুষে যেখানে সত্যিকার মিলন ঘটে।

তবে বাধাটা কোনখানে ?

কোন বাধাই ছিল না তাদের পথের ধারে। কিন্তু একদিন বিস্ময় এসে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল আকস্মিক।

নিয়তির চক্রান্তের মত নিষ্ঠুর সে আক্রমণ। অতর্কিতে ভানুকে ধরাশায়ী করে দিল। সে প্রচণ্ড আক্রমণের গতিবেগ রোধ করতে পারল না।

বাবা তার মত বদলেছে। তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে তাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে। অথচ অনেক আগেই সে তার বাবার সম্মতির আশীর্বাদ পেয়েছিল। পেয়েছিল বলেই সে এত দূর এগিয়ে ছিল। স্নেহময় পিতার মাতৃহীন সন্তান সে। তার নয়নের মণি। বিস্ময়ের সে রূঢ় আঘাত তার স্নায়ুগুলো সহ্য করতে পারলে না। শিরা-উপশিরাগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হতবাক্ ভানু মরণোন্মুখ ভঙ্গীতে মুরজার কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

মুরজা সজল চোখে তার নিশ্চেতন মাংসপিণ্ডের মত বিশৃঙ্খল দেহটাকে আঁকড়ে ধরলে।

মুরজা তার চিকিৎসা করাল সাড়ম্বরে। পীড়িত প্রিয়তমের সেবার ভার তুলে নিল নিজের কোমল হাতে। রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করল তার আত্মীয়স্বজনের আসার আশে।

ভানুর বাবাকে মুরজা খবর দিল। কিন্তু তার পরিজনদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ এল না তাকে চোখের দেখা দেখতে।

নটীর গৃহে তারা আসবে কেমন করে ? নিষিদ্ধ গৃহকোণে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভানু তাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে। মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে তাদের মানসম্ভ্রমকে।

মুরজার ভিতরের আগুন দীপ্তশিখায় জ্বলে উঠল। সে সত্যের আগুন। মিথ্যের সমস্ত জঞ্জাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে হোমানল শিখার মত নিজের আভা বিস্তার করল। সে আগুনে সিনেমা-স্টার মুরজা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তার আসল পরিচয় দীপ্তিলাভ করল তার সর্বাঙ্গে।

মুরজা নিজেকে ভুলল। জীবনকে নিবেদন করল মরণের কাছে। মুরজা নিজেকে তুলে ধরল। আত্মসচেতন মন তার আনন্দের উপচার সংগ্রহ করল নিজের প্রেমের মধ্যে দিয়ে। সান্ত্বনা পেল প্রেমাস্পদের অক্লান্ত সেবার মধ্যে দিয়ে। অন্তরের পানে চেয়ে সে নিয়তির এই নির্মম আঘাতকে হাসিমুখে মাথায় তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বছর কেটে গেল।

চিকিৎসায় কোন ফল হ'ল না, দুরারোগ্য ব্যাধি। ডাক্তার হতাশ হ'ল। এমনই বিকলাঙ্গ হয়েই ওর জীবন অবসান হবে।

প্রচুর আলোবাতাস এবং ভানুর জীবনস্বপ্নকে সফল করে তোলবার জন্তই মুরজা পশ্চিমের এই নিরিবিলি শহরপ্রান্তের এই রোজ-ভিলা কিনল। প্রচুর টাকা ছিল হাতে। পাশের জমি কিনে নিজের মনোমত নতুন বাড়ি তৈরি করল নিজেদের বসবাসের জন্ত। পরিচিত পৃথিবীর সবকিছু পেছনে ফেলে মুরজা তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাটিকে এক নতুন লক্ষ্যের পথে টেনে নিয়ে চলল।

বছরের পর বছর কেটে গেছে। আজও সে অতন্দ্র।

বিহঙ্গীর মত বিকলাঙ্গ প্রণয়ীকে স্নেহপক্ষপুটে ঢেকে এই দীর্ঘদিন সে কঠিন নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে প্রেমের সাধনা করে চলেছে।

ক্লান্তি নেই, অসন্তোষ নেই, বিষাদ নেই, বিরাম নেই। নিজের বিশ্বাসের খুঁটি ধরে প্রশ্নের মত প্রেমের উপাসনা করে চলেছে।

এই তার অভিসার। পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, দুর্গম। লক্ষ্য আনন্দময় আলোতীর্থ।

আমি যেন বিশ্বাস করতে পারি না। মুরজা যেন একটা জটিল রহস্য।

লীলা মুরজাকে জিজ্ঞেস করেছিল, জীবনটাকে মিথ্যে মনে হয় না ?

মুরজা হাসতে হাসতে নিঃসঙ্কোচে জবাব দিয়েছিল, মিথ্যে মনে হবে কেন ? প্রেম যদি সত্য হয়, জীবন মিথ্যে হবে কেন ? মন ত আমার শূন্য নয়। মন ত ভরে আছে।

—আর কোন সুখসাধ নেই ?

সসঙ্কোচে লীলা তাকে প্রশ্ন করেছিল।

মুরজা বলেছিল, অভাবটা আমার কোনখানে দেখলে ? জীবনটা ত ও আমার রসে ভরে রেখেছে। ও পঙ্গু অথর্ব বলে ভাবছ ? হলেই-বা। ও অসহায় অথর্ব না হলে কি এমন একান্ত হয়ে আমার কাছে ধরা দিত, না নিজেকে এমন ভাবে ওর ভোগে নিবেদন করতে পারতাম ? এ ত আমার ভালবাসার পরীক্ষা। আমি ওকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছিলাম। লোভও ছিল বৈকি। লোভের বাসা ভেঙে গেল বলেই না আমার ভালবাসা সত্যি হয়ে উঠল।

এ কেমনতর ভালবাসা ? বাঁধন নেই, কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কায়িক সম্ভোগের সকল স্পর্শ থেকে মুক্ত। আমাদের চোখে এ পরম বিস্ময়। কিন্তু এর সৌন্দর্য অনুপম।

তার প্রেমসাধনার যোগোদ্যানে দাঁড়িয়ে স্বামীস্ত্রীতে আমরা মনে মনে প্রেমতপস্বিনীকে প্রণাম করেছিলাম। চোখের দৃষ্টি কান্নায় ঝাপসা হয়ে এসেছিল।

হুইটম্যান জন্মবার্ষিকী

শ্রী...

হুইটম্যানের জীবনের সায়াহ্ন বেলার দিনগুলি নিউজার্সির ক্যাম্পডেন শহরে কেটেছে। অকৃতদার কবি ১৮৮৪ সনের ২৬শে মার্চ থেকে ১৮৯২ সনের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুকাল অবধি ক্যাম্পডেনের মিকল ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই বাস করে গেছেন। এই জায়গাটি ডেলোওয়ারে শহর থেকে খুব দূরে নয়। এখানকার শান্ত পরিবেশ, কুহেলী-ছাওয়া আকাশ, খেয়ানৌকোর ঘণ্টা আর দূরের বাঁশির আওয়াজ কবিকে মুগ্ধ করত। তিনি এ জায়গাটিকে খুব পছন্দ করতেন। বাড়ীতে তাঁর সঙ্গী ছিল পোষা কুকুর, নানা রকম পাখী, একজন পরিচারক, আর মিসেস মেরী ডেভিস নামে জনৈক নাবিকের বিধবা পত্নী।

তখন বিশ্বের বহু খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তি কবির দর্শনলাভের জন্য এখানে এসেছেন। অস্কার ওয়াইলড, ডাঃ জন জনষ্টন, 'লাইট অব এশিয়ার' লেখক সর এডুইন আর্ণল্ডের মত বিখ্যাত ব্যক্তি কবি সন্দর্শনে এসেছেন। কবির নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গদান করে আনন্দ সঞ্চার করেছেন তাঁরা। আর এসেছেন, প্রায় প্রতিদিন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ও প্রকাশক হরেস ট্রাউবেল। ট্রাউবেল পরিবার আইনস্টাইন পরিবারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। চিরনিদ্রায় শয়নকালে তাঁরই হাতে হাত রেখে বলে গেলেন :

> প্রিয় বন্ধু, তুমি যে কেউই হও না কেন,
> আমার এই চুম্বন গ্রহণ করো...
> আমার মনে হয়, যারা দিনান্তে কর্মাবসানে,
> ক্ষণকাল বিশ্রামের তরে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে
> আমিও তেমনি তাদের মত জগতের সব কিছু থেকে
> বিদায় নিচ্ছি।
> আমি তোমায় ভালবাসি...

হুইটম্যানের স্মৃতি-বিজড়িত বহু পুস্তক-পুস্তিকা, কবিতার পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত তৈজসপত্র ঐ গৃহেই সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁর এই বাসগৃহটিকেই স্মৃতিসৌধে পরিণত করা হয়েছে।

যে কেউ এই পুণ্যস্থান পরিদর্শনে গেছেন তাঁদের সকলেরই দৃষ্টি তাঁর বহু টীকা সমন্বিত একখানি পুস্তকের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। প্রায় সকলেরই মনে প্রশ্ন জেগেছে—ঐ পুস্তক তিনি পেলেন কোথায়?—এ ত আজকের কথা নয়, আগামী ৩০শে মে তার ১১৭তম জন্মবার্ষিকী দিবস। এ একশত বছরেরও আগেকার কথা। হুইটম্যানের মৃত্যুর এক বছর পরে ১৮৯৩ সনে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো শহরের ধর্ম-মহাসম্মেলনে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন।

বইখানি হচ্ছে ভগবদ্গীতার একটি পকেট সংস্করণ। কবি হুইটম্যান সব সময়েই নাকি এই বইখানি তাঁর কাছে রাখতেন। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এমার্সন কবিকে এই বইখানি উপহার দিয়েছিলেন।

হুইটম্যানের কবিতার অনেক জায়গায়ই দেখা যায় গীতার অতীন্দ্রিয়তার সঙ্গে আত্মসমর্পণের মনোভাবের সমন্বয়। 'তাঁর লীভস অব গ্রাস' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম। ১৮৫৫ সনে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। কবির তখন ৩৬ বৎসর বয়স। এমার্সন কবিকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি মন্তব্য করলেন—"তোমার এ কবিতায় আধুনিক সাংবাদিকতার আঙ্গিকের সঙ্গে ভগবৎগীতার ভাবের সমন্বয় ঘটেছে।—মহান্ ভবিষ্যতের দিকে যাত্রারম্ভে তোমাকে অভিনন্দন জানাই।" সুয়েজখালের উদ্বোধনের পর কবি 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' শীর্ষক কবিতায় লিখলেন :

> কল্পনা আমাকে নিয়ে যায়
> সেই প্রাচীন জনাকীর্ণ পৃথিবীর সর্ব সমৃদ্ধ দেশে
> চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাদের ছবি
> আমি যেন দেখি সিন্ধু, গঙ্গা তাদের
> বহু শাখা উপশাখার স্রোতধারা বয়ে যায়...

১৮৫৫ সনে মাত্র বারটি কবিতা আর কবির কাব্যাদর্শ সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা নিয়ে "লীভস অব গ্রাস" প্রথম প্রকাশিত হয়। অখ্যাত অপরিচিত কবির পরিচয়ের স্বাক্ষর ছিল একমাত্র কবিতায়। কবির একটি প্রতিকৃতি ছাড়া পরিচয়ের কোন চিহ্নই, কবির নাম-ধাম কি কোন কবিতার কোন শিরোনামা কিছুই ছিল না। কবি কেবল নিজের হাতে কবিতাই রচনা করেন নি, অক্ষরের পরে অক্ষর সাজিয়ে এই বই ছাপার কাজও সম্পন্ন করেছিলেন। প্রথমে ৮০০ কপি ছেপেছিলেন। গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নামবিহীন এই পুস্তকে যে প্রতিকৃতিটি ছিল তা দেখে তাকে কবি বলে মনে করবার কোন উপায়ই ছিল না। মাথায় মস্ত টুপী, মুখে একগাল দাড়ি, গায়ে রঙীন সার্ট—কবি ত নয়, যেন একবারেই সাধারণ লোক।

যে সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী, যে ছন্দে এতকাল কাব্য রচিত হয়েছে সেই সমাজ-বন্ধন ও ছন্দবন্ধন মুক্তন

যুগের কবি হুইটম্যান, মেনে চলেন নি। আগামী কালকে আবাহন করে কবি যে গান গাইলেন তা একমাত্র চিন্তাশীল কবি ও দার্শনিকদের ছাড়া জনচিত্তে তেমন সাড়া জাগায় নি। আমেরিকার এমার্সন ও থরো ব্যতীত, ইংলণ্ডের দার্শনিক রাসকিন, কবি সুইনবার্ণ ও টেনিসন এবং ডব্লিউ. এম. রসেটিও কবিসত্তার মূলভাব ও মূল প্রেরণা উপলব্ধি করে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

কবি জন্ম নেয় কেবল বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও। তাই যাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র বর্তমানেই নিবদ্ধ তাদের কাছে কবির বাণী অস্পষ্ট, কবিকে তারা বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করতে সামান্যতমও সঙ্কোচ বোধ করেন নি। ইতিহাসের অতিক্রান্ত পথে এমনি বহু শিল্পী ও কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যারা অনাদরে অবহেলায় ভগ্নমনোরথ হয়ে আত্মহনন করেছেন।

হুইটম্যানের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবে তিনি অপরিসীম প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বোস্টন ইনটেলিজেন্সার নামে একটি পত্রিকায় এই কাব্য-গ্রন্থকে আত্মকেন্দ্রিক এবং অতি নিম্নরুচির পরিচায়ক বলে মন্তব্য করা হয়েছিল। এমন কি সমালোচক এই পুস্তকখানি কোন বিকৃত মস্তিষ্কের কীর্তি বলে ধরে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া যে সকল পুস্তক কবি আমেরিকার লেখকবর্গকে উপহার দিয়েছিলেন তারা অতি অপমানকর মন্তব্য করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবি তখন তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, মহাকালই আমার কাব্যের বিচারক, আমার কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব কালের কষ্টিপাথরেই নির্ণীত হবে।

হুইটম্যানের জীবন অতি বৈচিত্র্যময়। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি "লং আয়ল্যাণ্ডার" নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিলেন। তখনকার দিনে ছোট ছোট পত্রিকার সম্পাদকের কেবলমাত্র সম্পাদনা ও প্রকাশনার ভার নিলেই চলত না, পত্রিকা বিলিবণ্টনের ভারও তাদের নিতে হ'ত। এই সময়ে বহু অভিজ্ঞতাই তিনি অর্জন করলেন। কিন্তু কোন কাজেই তিনি বেশী দিন বাঁধা পড়তেন না। ১৮৪৬ সনে "ব্রুকলীন ঈগল" নামে আর একটি পত্রিকায় এসে যোগ দিলেন। এই পত্রিকায় তাঁর কোন কোন কবিতা প্রকাশিত হয়। এ ছিল প্রাথমিক প্রস্তুতি, "দি সং অব দি সেলফ" জাতীয় রসোত্তীর্ণ কবিতা প্রথম যুগের এই সব রচনার মধ্যে পাওয়া যায় না। এর কিছুদিন পরে "লীভস অব গ্রাস" প্রকাশিত হয়। কবির স্বদেশে এ্যান্টনী কমস্টকের মত কতিপয় প্রতিক্রিয়াপন্থীর বিরুদ্ধতার ফলে এই পুস্তক প্রকাশ কিছু দিনের জন্ত নিষিদ্ধ হয়, এই কাব্যগ্রন্থকে তারা অশিষ্টোচিত অন্তর্ঘাতী ভাব-ধারার বাহন মনে করতেন। কিন্তু পনর বছরের মধ্যে হুইট-ম্যানের সমর্থকদেরই জয় হয়।

ওয়াল্ট হুইটম্যান

হুইটম্যানের পিতৃ-পরিচয়েও অসাধারণত্ব কিছুই নেই। ১৮১৯ সনে নিউ ইয়র্কের লং আয়ল্যাণ্ডে সাধারণ চাষী ও ছুতোর মিস্ত্রীর ঘরে জন্ম। এগারটি সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। দরিদ্রের সংসার। এগার বৎসর বয়সে স্কুলের পড়া ছেড়ে তাঁকে ব্রুকলিনে অফিস বয়ের কাজে যোগ দিতে হয়। সেখানে বালক হুইটম্যান এক বছরের বেশী থাকে নি। বারো বৎসর বয়সে একটি সংবাদপত্রে শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন, তার পর জাহাজে করে বাড়ী থেকে পালিয়ে যান। কুড়ি বৎসরের মধ্যেই তিনি পুস্তক মুদ্রণ ও পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

বহু সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন, কিন্তু নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দিতে সম্মত না হওয়ায় কোন জায়গায়ই তাঁর বেশী দিন কাজ করা সম্ভব হয় নি। তিনি রাজনীতি চর্চা করেছেন, সভা-সমিতিতে বক্তৃতাও দিয়েছেন, নানা কাজ করেছেন, কিন্তু ছত্রিশ বৎসরের পূর্বে তাঁর প্রতিভার প্রস্ফুরণ হয় নি—১৮৫৫ সনে

তাঁর আত্মবিকাশ ঘটে, এ যেন বিশাল আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্‌গিরণ।

তিনি বললেন, "ব্রুকলীন ও নিউইয়র্কে যে জীবন-যাপন করে এসেছি সেই জীবনের অভিব্যক্তিই আমার এই কাব্য, পনর বৎসর ধরে যে লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে ভালবাসা ও প্রীতিস্নিগ্ধ, মুক্ত আবহাওয়ায় আমার দিন কেটেছে তারাই রয়েছে আমার কাব্যে।"

মানুষের সামগ্রিক রূপই তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল বত্রিশটি কবিতা। ১৮৬০ সনে ১৩২টি এবং ১৮৯২ সনে তাঁর মৃত্যুকালে ১১তম সংস্করণে ছিল ৪২৩টি কবিতা। কালাতিক্রমণে তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হওয়ায় পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে—কলেবর বৃদ্ধির পর তিনি একবার বলেছিলেন "এই পুস্তকে পাবে মানুষের মর্মবাণী, মানুষের প্রাণের স্পর্শ।"

১৮৬০ সনে আমেরিকায় শুরু হল গৃহযুদ্ধ। কবি আহত সৈনিকদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে জীবন-চক্রবাল আরও দূরপ্রসারিত হল, কাব্য পেল নূতন ভাষা। চারদিকে যখন অশান্তির আগুন জ্বলেছে, আশাহত অনেকেই ভেঙ্গে পড়েছে, তখন কবি গাইলেন :

> নিরাশায় ভেঙ্গে পড়োনা,
> প্রেমের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার
> স্বপ্ন হবে সফল,
> যারা ভালবাসতে পারে
> তাদের পরাজয় নেই।

মানুষের প্রতি এই ভালবাসা ও প্রেমের বাণীই হুইটম্যান-কাব্যের মর্মকথা। কবি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এই পৃথিবীর সবকিছুরই একটি নিজস্ব স্থান রয়েছে, অধিকার রয়েছে—কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি ধনী, কি নির্ধন কেউ ছোট কেউ বড় নয়। "লীভস অব গ্রাস" কাব্য-গ্রন্থের মধ্য দিয়ে হুইটম্যানের যে অবদান অসামান্য হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে অনন্তের উপলব্ধি, সীমাহীন ব্যক্তিত্বের অনুভূতি।

কবি হুইটম্যান জীবনের বহুক্ষেত্রে বিচরণ করে গেছেন। অফিস বয়, প্রেস কম্পোজিটার, স্কুলশিক্ষক, সাংবাদিক, ওয়াশিংটনে হাসপাতালের নার্স, যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিভাগে কেরানি হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু ঐ বিভাগের সেক্রেটারী "লীভস অব গ্রাস" প্রকাশিত হওয়ার পরে ১৮৬৫ সনের ৩০শে জুন তারিখে তাঁকে বরখাস্ত করেন। এই ঘটনার পরে ১৮৭৩ সন পর্যন্ত তিনি এটর্নি জেনারেলের আপিসে কাজ করেছেন।

"লীভস অব গ্রাস" ছাড়া হুইটম্যান 'ড্রাম ট্যাপস" (১৮৬৫), "প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" (১৮৭১), "ডেমোক্র্যাটিক ভিস্টাস" (১৮৭১), "মেমোরেণ্ডা ডিউরিং দি ওয়ার" (১৮৭৫) "টু রিভ্যুলেটস" (১৮৭৬), "স্পেসিম্যান ডেজ এ্যাণ্ড কালেকট" (১৮৮৩), "নভেম্বর বাউজ" (১৮৮৮), "গুডবাই মাই ফ্যান্সী" (১৮৯১), প্রভৃতি কাব্যপুস্তক রচনা করেছেন। একক কবিতা হিসাবে "আউট অব দি ক্র্যাডল এণ্ড লেসলী রকিং", লিঙ্কনের স্মৃতিতে লিখিত "হোয়েন লিল্যাকস্ লাস্ট ইন দি ডোর ইয়ার্ড ব্লুমড" ও "ক্যাপ্টেন মাই ক্যাপ্টেন" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হুলা নাচের দৃশ্য

হাওয়াই দ্বীপে সাত দিন

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

গোধূলির স্নিগ্ধ আলোকে ৬-৩০ মিনিটে প্যান-আমেরিকান বিমান নামল হনলুলু বিমান বন্দরে। কল্পনার স্বপ্নপুরী হাওয়ায় রচা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হনলুলু। বিমান-ঘাঁটিতে অনেকে এসেছে মালা নিয়ে বন্ধুদের অভ্যর্থনা জানাতে।

আমার জন্য এসেছিলেন মিসেস ম্যারোজি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ দের কথা বলেছিলেন। ম্যারোজি একজন ইটালীয় ভাস্কর। স্বামী বিবদিবানন্দের নিকট ইনি হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছেন। এদের জন্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কথামত এক শিশি গঙ্গাজল নিয়ে গিয়েছিলাম।

ট্যাক্সি করে মিসেস ম্যারোজি আমায় নাপুয়া হোটেলে নিয়ে গেলেন। ট্যাক্সিতে লাগল ২ ডলার ৬০ সেণ্ট—অনেকগুলি টাকা দিতে হ'ল বলে একটু কষ্ট হ'ল। নাপুয়া হোটেলে শুধু থাকবার জায়গা খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। খেতে হবে বাইরে—হোটেলের ফাঁকা ফাঁকা ছোট ছোট ঘর—ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই। তবে এক সপ্তাহের ভাড়া ২০ ডলার দিতে হবে।

মিসেস বাড়ী গিয়ে স্বামীকে নিয়ে এলেন। ম্যারোজি বক্তৃতার ব্যবস্থা করবেন বললেন। তবে অর্থ দিতে পারবেন না বললেন। মেয়েদের মন স্নেহপ্রবণ, মিসেস আমার খাওয়ার কথা বলছিলেন—কর্ত্তা বললেন, "সে পরে হবে।" তখন মনে খানিকটা কষ্ট হ'ল—কারণ সেই রাতে অজানা স্থানে খেতে পেলে সুবিধাই হ'ত। ওরা বিদায় হলেন—কোথায় খাবার পাওয়া যাবে বলে গেলেন—কিন্তু আমি অচেনা জায়গায় রাতে আর বার হলাম না। কাজেই খাওয়াও আর হ'ল না।

যাদের জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে গঙ্গাজল আনলাম, তাদের কাছে আর একটু দরদ আশা করেছিলাম। অবশ্য ম্যারোজি ভেবেছিলেন পরে একদিন ভাল করে খাওয়াবেন এবং খাইয়েও ছিলেন।

হনলুলুর ওয়াইকিকি সমুদ্রতট সুবিখ্যাত। প্রাকৃতিক দৃশ্যে অনুপম—শান্ত বালুবেলায় স্নানার্থীর ভিড়। কালাকাউয়া এভিনিউ বেয়ে সেখানে ক'দিন সকালে যাত্রা সুরু করেছিলাম—একটা ছেলে ভুল খবর দিল যে সমুদ্রতট বহুদূর, তাই ফিরে এলাম।

হনলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চার্লস মুর ৯টা ৯৷টায় আসবেন কথা ছিল। তাঁর জন্য বসে রইলাম। অনেক পরে তিনি ফোনে খবর দিলেন—বিকাল আড়াইটায় আসবেন। কাজেই বাসে করে ওয়াইকিকি বেলাভূমে গেলাম। এই বেলাভূমে হনলুলুর নাম করা হোটেল যথা হাওয়াইয়ান, মোয়ানা, হাইলকুলানি প্রভৃতি অবস্থিত।

আড়াইটায় চার্লস মুর এলেন। দার্শনিক পণ্ডিত তিনি, কিন্তু কথাবার্ত্তায় বেশ সুচতুর বলে মনে হ'ল। মিষ্ট কথা বললেন, কিন্তু আমার জন্য বিশেষ কিছু করবেন সে ভরসা হ'ল না। এ জন্য তোর দোষ দেই না—আমি অধ্যাপক নই—আমার লেখা ইংরেজী দার্শনিক বই নেই, কাজেই উচ্ছ্বসিত আবেগ আশা করবার কোনও কারণ ছিল না।

চার্লস মুর চলে গেলে একা একা ভ্রমণে বার হলাম। নাপুয়া হোটেলের কাছেই একটা সুন্দর পার্ক। তার পাশে এদের একাডেমি অব ফাইন আর্টস চিত্রশালায় ছবির সংগ্রহ মোটামুটি সুন্দর, সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেলাম এদের সাধারণ পাঠাগারে।

আমেরিকার প্রত্যেক বড় শহরেই একটি সরকারী খরচে চলা পাঠাগার আছে, আমাদের দেশে সম্প্রতি এই ধরনের পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে।

ওয়াইকিকি সমুদ্রে নৌবিহার

১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার। ডোল কোম্পানীর আনারসের কারখানা দেখতে গেলাম। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অর্দ্ধেক আয় আসে আনারস থেকে। আনারস তৈরী করতে এবং টিনে বোঝাই করতে বহু লোক অন্নের সংস্থান করে। যখন পৌঁছলাম তখন ৭৷টা, ৯টার আগে দেখাবার ব্যবস্থা নেই, কাজেই বসে বসে কাগজের ঠোঙায় আনারসের রস পান করলাম আর কিছু সাময়িক পত্র পড়লাম। ৯টা বাজতে দশ বার জন দর্শনার্থী এল, আমাদের নিয়ে এদের একজন সব দেখিয়ে দিল। ন'টা কোম্পানী আছে, তাদের তেরটি বাগান, ১,৮০,০০০ বিঘা জমির উপর আনারসের চাষ। ন'টি কারখানায় মরসুমে প্রায় ২০,০০০ লোক এই ব্যবসায়ে খাটে। কারখানাগুলিকে বলে cannery। আস্ত আনারস কলের ভিতর ছেড়ে দিলে খোসা ছাড়ান হয়ে যায়—তার পর পরিষ্কৃত হয়ে যায় যেখানে মেয়েরা বসে বসে এর চোখ ছাড়িয়ে দেয়—তার পর খণ্ড খণ্ড হয়।

ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে এলাম রাজপ্রাসাদে। সেখানে হাওয়াই রাজাদের সিংহাসন-ঘর দর্শকদের দেখান হয়। এখানকার তত্ত্বাবধায়কের নাম মিঃ ব্রে—মিঃ ব্রে বললেন তার এক অতিবৃদ্ধা পিতামহী ছিলেন হিন্দু মেয়ে। মিঃ ব্রের চরিত্রে দেখলাম ভাবালুতা এবং দৈবশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। মিঃ ব্রে বললেন, তাঁর কাছে আছে এক শিলা—যে শিলাকে তাঁরা মন্ত্র পড়ে পূজা করেন। আমাকে সেটা দেখাতে চাইলেন।

বাসায় ফিরে ওয়াতুমল দম্পতীর জন্য বসে রইলাম। ওয়াতুমল সিন্ধী বণিক। তার এখানে বড় রকম ব্যবসা আছে। তাঁর স্ত্রী একজন ডেনিশ মহিলা। ওয়াতুমল ভারতীয় বিদ্যা প্রচারের জন্য কিছু টাকা ব্যয় করেছেন—আমি তাদের বৃত্তি চেয়েছিলাম—এই বৃত্তি পরিচালনা করেন মিসেস ওয়াতুমল। তিনি বললেন—তাঁদের টাকা এখন জন্মশাসনে ব্যয় হবে—ভারতীয় দর্শন প্রচারে আর হবে না। ওরা ১২-৪০ মিনিটে এলেন—একটা বড় হোটেলে নিয়ে গেলেন—সেখানে চার্লস মুরও অভ্যাগত ছিলেন—লাঞ্চ খাওয়ালেন।

এখান থেকে চার্লস মুরের সঙ্গে গেলাম হনলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যক্ষের নাম Sinclair। লোকটি চমৎকার, মিষ্টভাষী, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত—আমাকে বললেন, "টাকা থাকলে আমাকে হনলুলুতে কিছুদিনের জন্য থাকতে বলতেন।" চার্লস মুর আমায় হোটেলে পৌঁছে দিলেন।

খানিক বিশ্রাম করে হোটেলের নিকট যে Lincoln School সেখানে গেলাম। হেডমাষ্টার অতিশয় সদাশয় লোক। মঙ্গলবার দিন ৯টায় ছেলেমেয়েরা আমায় কিছু বলতে বললেন। স্বীকৃত হয়ে গেলাম এদের আদালত দেখতে। খানিকক্ষণ সব দেখে-শুনে হনলুলুর প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "Star Bullatin" আপিসে গেলাম। সেখানে ওরা আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় লিখে নিল। পরদিন সেটা ওদের কাগজে বার করেছিল। তার পর Honolulu Advertiser নামক অন্য একখানি বড় কাগজের আপিসে সাক্ষাৎ করে বাসায় ফিরলাম। ফিরে ক্লান্তি ভরে সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম।

শনিবার দিন সকালে একা একাই চললাম Koko Head নামক পাহাড়-চূড়া দেখতে। হনলুলু থেকে অনেক দূর—বাস পরিবর্তন করে বাসে চলতে সে প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্য্যময় নগরের উপকণ্ঠের মধ্য দিয়ে—। জীবনে একাকিত্ব আমার যেন লেগেই আছে—আমার সঙ্গে কেউ যায় নি—পথে অন্য যাত্রীরও দেখা মিলল না—কাজেই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হ'ল না—তবে যতদূর উঠেছিলাম সেখান থেকে শান্ত সমুদ্রের লীলাচঞ্চল রূপ খুব নয়নাভিরাম লাগল।

যে পথে গিয়েছিলাম সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফেরার জন্য হনলুলুর অনেকখানি দেখা হয়ে গেল।

পথে একটি জাপানী বধূর নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করলাম। ম্যারোজী দম্পতী মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও আহার শেষে স্থানীয় চিড়িয়াখানা এবং জীবজন্তুর আবাস দেখে ফিরলাম।

হোটেলের সহকারিণী মিস ইভা, হাওয়াইয়ান মেয়ে। তার সঙ্গে আলাপ হ'ল। তার চেহারায় দেশের মেয়েদের কথা মনে পড়ে। তার ছবি তুলব বললাম, সে বললে সোমবারে সেজেগুজে আসবে। তার ছবি তুলেছিলাম, কিন্তু আনাড়ি আমার হাতে সেটা ওঠে নি। ওর কাছ থেকে খানকতক বই চেয়ে নিয়ে এলাম। আমাদের দেশের মত দিবানিদ্রা এখানে আরামদায়ক।

পরে আদালতে গেলাম। সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। তার পর পাঠাগায় ঘুরে পাঁচটায় ফিরলাম। ম্যারোজিয়া বলেছিলেন হোটেলে রাত্রে Hula dance দেখতে নিয়ে যাবেন, কিন্তু পরে জানা গেল আজ আর হবে না। হোটেলটি একটি জাপানী দম্পতীর। ডক্টর কানসুর হচ্ছে মালিকের নাম। ডক্টর কানসুর বেশ সদালাপী। তিনি বললেন, "আগামী কাল রাত ৮টায় হবে, তখন যেন যাই।"

সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাসে Alewa Heights নামক পাহাড় চূড়ায় বেড়াতে যাবার জন্ম। কতকগুলি পর্ব্বতশ্রেণীর তলদেশে সুবিস্তৃত সমতলের উপর হনলুলু শহর। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের ন্যায় এই তরুগুল্মময় পাহাড়গুলি শহরের শ্রীতে দেয় গাম্ভীর্য্য এবং চারুতা।

বাসে আলাপ করলেন বৃদ্ধ বোম্যান। ভদ্রলোক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ভ্রমণে এসেছেন, অযাচিত আলাপ করলেন। খানিক আলাপ শেষে বললেন, "চলুন আমার সঙ্গে এদের দেশের ভিতরটা দেখে আসবেন"। তার সঙ্গে চললাম Leper Asylumএ। সেখানে বোম্যান একখানি মোটর চেয়ে নিলেন। তাতে করে আমাকে নিয়ে পার্ল হারবার দেখিয়ে ওয়াইকিকি সমুদ্রতটে নিয়ে এলেন।

তার পর বাসায় ফিরে ম্যারোজি দম্পতীর আয়োজিত হলে বক্তৃতা দিলাম। ম্যারোজি বক্তৃতার শেষে তিন ডলার দক্ষিণা দিলেন। এই প্রথম দক্ষিণা বলে সেটা নিয়ে নিলাম।

সকালে খাওয়া হয় নি। স্নান শেষে Alewa Heights, Pacific Heights এবং Nuana Avenue বেড়িয়ে এলাম। পথে পড়ল বনানীর মধুর শোভা এবং নগর প্রান্তের ও নুয়ানা উপত্যকার সৌন্দর্য্য।

প্রদোষের দিকে চললাম বোম্যানের ওখানে। তার পর বোম্যানের গাড়ীতে করে মোয়ানা হোটেলে Hula dance দেখতে গেলাম।

হুলা নাচ এদেশের দেশীয় নাচ। ফুলের মালা পরে মেয়েরা নাচে ও গান গায়। এটা শুধু উৎসব নয়, এটা মাঙ্গল্য ক্রিয়া। মোয়ানাতে অনেকক্ষণ ধরে নানা ধরনের নাচ, গান ও কৌতুক দেখে আমরা তার পাশের বড় হোটেল রয়াল হাউইয়ান দেখতে গেলাম। সেখানে নাচ ছিল না, তবে তার সাজ-সজ্জা, তার উপবনের ঐশ্বর্য্য মন ভুলায়। এখানে বোম্যানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ হ'ল। আমি প্রশ্ন করলাম, "বিয়ে কর নি কেন?" বলল, সে তার জীবনের দুঃখের কাহিনী, যে মেয়েটিকে সে ভালবাসত, তাকে বিয়ে করতে যথেষ্ট পয়সা ছিল না। তাই সে অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু মেয়েটি অপেক্ষা করল না, অন্যকে বিয়ে করল। তাই তার বিয়ে করা হয় নি। কিন্তু সে বিয়ে করতে অরাজি নয়, এখনও মনের মানুষের সন্ধানে আছে—যদি মেলে তবে তাকেই জীবনসঙ্গিনী করবে। বৃদ্ধের বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম—তাকে ভারতীয় সংযম ও সাধনার বাণী শুনিয়ে লাভ নেই। আর সত্য কথা বলতে কি, আমাদের দেশেও ত বোম্যানের জুড়ি শত সহস্র আছে। দিলখোলা বোম্যানকে তবু তার সত্যভাষণের জন্ম খুব ভাল লাগল।

সোমবার ১৩ই সেপ্টেম্বর সকালে উঠে ডাক ঘরে গেলাম। সামুদ্রিক ডাকে দীপার নামে এক বাণ্ডিল ছবি পাঠালাম, ৪৪ সেণ্ট খরচ হ'ল। তার পর ডেভিড রের ওখানে গেলাম।

কালাকউয়া এভিনিউ

দেখলাম, আইওলানি প্রাসাদ, হাওয়াই রাজাদের বিলাস নিকেতন। সিংহাসন-ঘরে বসে হাওয়াই দ্বীপের অতীতের কথা মনে জাগে।

সাগরের বুকে আগ্নেয় পাহাড়ের চূড়ায় জন্মাল কয়েকটি দ্বীপ, কোন অতীতে কেউ জানে না। সেখানে ভেসে এল ডোঙ্গায় করে টাহিটি প্রভৃতি পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে বীর একজাতি। তারা এসেছিল ভারতবর্ষ থেকে। তার পর মালয় প্রভৃতি আদিবাসীদের

বিয়ে করে তারা মিশ্র জাতিতে পরিণত হ'ল। হাওয়াই দ্বীপে যারা এসেছিল, তাদের নাম দিয়েছে এরা মেনহুন।

এদের গাথার সঙ্গে পলিনেশীয় গাথার চমৎকার সাদৃশ্য ও মিল আছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন কুক এই দ্বীপপুঞ্জ দেখতে পান। তখন ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে ভিন্ন ভিন্ন রাজা ছিল। দিগ্বিজয়ী কামেহামেহা সকল দ্বীপের সার্ব্বভৌম রাজা হয়ে বসেন ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। তার

আনারস কারখানার একটি দৃশ্য

পর দ্বিতীয় কামেহামেহা, তৃতীয় কামেহামেহা, চতুর্থ কামেহামেহা, পঞ্চম কামেহামেহা, রাজা লুনালিলো, রাজা কালাকাউয়া, রাণী লিলিউয়ো কালানি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়াই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের উনপঞ্চাশতম রাষ্ট্র, কিন্তু একে এখনও রাষ্ট্রের মর্য্যাদা দেওয়া হয় নি। তাই নিয়ে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে।

ডেভিড ব্রে বলল, হাওয়াইয়ের আদিবাসীরা কাহুনদের ভক্তি করে। এরা আমাদের দেশের গুণীনের মত, মন্ত্র,তন্ত্র, বশীকরণ জানে, রোগ নিরাময় করে। ব্রে এদের অলৌকিক এবং অতি লৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী। সে দেখাল তার শালগ্রাম শিলা—পুরোহিতদের মন্ত্রপূত পাথরের গোলক।

ব্রে বলল, এটা তাদের পূর্ব্বপুরুষ পলিনেশিয়া থেকে নৌকায় করে নিয়ে এসেছিল, এর জন্য তাদের নৌকা ডোবেনি। আমি ওকে ভারতের কথা বললাম। ব্রে ভারতের প্রতি ভক্তিমান্। সে বলল, হাওয়াই দ্বীপের লোকেরা মূলতঃ ভারতীয়। সে আমায় কয়েকজনের সন্ধান দিল, যারা ভারতের সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপের মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।

ব্রের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরলাম। চার্লস মুর ১০-১৫ মিনিটে এলেন। তিনি আমাকে বিসপ মিউজিয়ম দেখাতে নিয়ে গেলেন। এই প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে অনেক চমৎকার জিনিষের সংগ্রহ আছে।

এখানে দেখলাম, কাহুনদের অরণি, কেমন করে এরা আগুন জ্বালত। এদের ঘরের নির্ম্মাণ-প্রণালীর সঙ্গে আমাদের দেশের খড়ের ঘরের মিল চোখে পড়ল। এই যাদুঘরের যিনি পুরোধা তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি বললেন, হাওয়াই দ্বীপের লোকেরা পলিনেশীয়ান। ইন্দোনেশিয়া থেকে সেখানে তারা এসেছিল। ভারত থেকে প্রথমতঃ এলেও বহু শতাব্দী তারা ইন্দোনেশিয়ায় ছিল। তাই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ়।

এই সুবৃহৎ সংগ্রহটি তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে দেখবার মত নয়, কিন্তু এ দেখে বুঝবার মত বিদ্যা আমার নেই আর তা ছাড়া মুরও অনেক সময় দিতে পারেন না। কাজেই ওখান থেকে আমরা ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরলাম।

২-৩০ মিনিটে ব্যোমান এলেন। তার সঙ্গে লেপার এসাইলাম পর্য্যন্ত মোটরে গেলাম ও এলাম, কিন্তু দুপুরের রোদে বেশ ঘুম পেল। তাই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাধুরী উপভোগ বেশী হয় নি।

পৌনে ছয়টায় হনলুলু এডভার্টাইজার থেকে রিপোর্টার এল। তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল।

হাওয়াই জবা ফুলের দেশ। নানা বিচিত্রবর্ণ জবার সমারোহ চোখকে জুড়িয়ে দেয়। লাল জবা হাওয়াই রাষ্ট্রের সরকারী ফুল। জবা আমাদের দেশের প্রাচীনতম ফুল। এটা ভারতের আদি অধিবাসী কিনা, সে তত্ত্ব আমি জানি না। তবে ভারত থেকে ইন্দোনেশিয়ার পথে জবা হাওয়াই দ্বীপে অনুপ্রবেশ করেছে কিনা সেটা ভাববার বিষয়।

রাত আটটায় এলেন রেভারেণ্ড ডেভিড. কে. পিমায়ু, হিব্রু আইটিয়ান থিয়োলজিষ্ট। ষ্টার বুলেটিং কাগজে আমার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বার হয়ে ছিল সেটা পড়েই ইনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসেন।

ভদ্রলোক গোঁড়া, বাইবেলের উক্তি উদ্ধার করে তিনি প্রমাণ করতে চান যে হাওয়াই দ্বীপের লোকেরা আসলে এসেছে প্যালে-ষ্টাইন থেকে, আব্রাহামের যে ছেলে অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিল, সেই এদের পিতৃপুরুষ। ভদ্রলোকের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত না হলেও তার বিশ্বাসের আন্তরিকতা ভুলবার নয়। রাত সাড়ে নয়টায় ম্যাজিক লণ্ঠনে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের ছবি দেখালেন ডাক্তার কানমুর

বান্ধবী, এক জাপানী মেয়ে। ছুটিতে দুর্গম দক্ষিণ আমেরিকার নানা প্রদেশে এই দুঃসাহসিকা মহিলা যে সব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন, তার ছবি খুব সুন্দর ভাবে তুলে এনেছেন।

দক্ষিণ আমেরিকার হাটের ছবি যেটা দেখাল তার সঙ্গে আমাদের পাড়াগাঁয়ের হাটের ছবির হুবহু মিল আছে। মেয়েটি স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তার অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য্য, মধুর কণ্ঠ, দৃষ্টির বিশালতা আমার খুবই ভাল লাগল।

পরদিন সকালে লিনকন স্কুলে বক্তৃতা দিলাম। বক্তৃতার শেষে ছোট ছোট মেয়েরা ও ছেলেরা নানাবিধ প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করল। দেখলাম এদের শিখবার ও জানবার কি চমৎকার আগ্রহ।

দুপুরে লায়ন ক্লাবে যাওয়ার জন্ত বোয়্যান বলেছিলেন। খুঁজে খুঁজে সেইখানে গেলাম। লায়ন ক্লাব চমৎকার একটি সংস্থা, আমেরিকার নানা শহরে এদের শাখা আছে, সভ্যেরা তা থেকে সুবিধা ও সুযোগ পায়। এখানেও এমন ধরনের একটা থাকবার ব্যবস্থা আছে। বোয়্যান সেইখানেই ছিলেন। সেখানে থাকার ও খাওয়ার খরচ খুবই সামান্ত, অথচ সুযোগ ও সুবিধা প্রচুর।

এই দিনের অধিবেশনে হাওয়াই রাষ্ট্রের প্রাক্তন গর্ভনর টম বক্তৃতা দিলেন। লিচুফলের চাষ বাড়ালে কেমন করে ধনে-ধান্তে হাওয়াই পূর্ণ হবে, সেটাই ছিল বক্তৃতার বিষয়।

রাত্রে এখানকার ইণ্ডিয়ান ক্লাব বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন। এই ক্লাবের পিছনে আছেন চার্লস মুর, ওয়াতুমল দম্পতী প্রভৃতি। তাদের নিজস্ব ঘর নেই—প্যাসিফিক হাউস নামক স্থানে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় মুর ঠিক করে দিয়েছিলেন—মনু ও নেহেরু।

ভারতের প্রাচীন সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবনের সঙ্গে বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তনের তুলনামূলক আলোচনা। চার্লস মুরের নিজের গাড়ী বিগড়ে গিয়েছিল—ভদ্রলোক অন্তের গাড়ী করে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি বেশী কেউ আসে নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে বড়জোর কুড়ি জন নারী ও পুরুষ এলেন। আমার বক্তব্য শেষ হলে প্রশ্নবাণ এল। চার্লস মুর নিজেই অনেক প্রশ্ন করলেন—আমি তার যথাযোগ্য উত্তর দিলাম।

ফিরলাম এলসেন দাশের গাড়ীতে—এই মেয়েটি ঢাকার উপেন্দ্রকুমার দাশ নামক একজন রাসায়নিককে বিয়ে করেছিলেন—হঠাৎ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তার পর থেকে ভদ্রমহিলা ওয়েকিকি বিচে একটা ছোট দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করছেন।

মেয়েটি খুব আলাপী নন—আমার প্রশ্নের জবাবে দু' চারটি কথা মাত্র বলেছিলেন। ভারতীয় বধূর ভারতের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক, কিন্তু সে ধরনের কোনও ঔৎসুক্য বা কৌতূহল তাঁর দেখতে পেলাম না। হয়ত অপরিচয়ের আড়াল অন্তরায় হয়েছিল।

তাঁকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলাম। মনে হয়েছিল হয়ত মেয়েটি বলবেন—আমার দোকানে বেড়িয়ে যেও। না, সে সব কিছু বললেন না। সকালে উঠে আদালতে গেলাম। চীফ জাষ্টিস টাউসের সঙ্গে দেখা করবার সময় স্থির ছিল। ভদ্রলোক খুব অমায়িক—নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল—কথাপ্রসঙ্গে জাপানের চীফ জাষ্টিসের কথা উঠল। আন্তর্জাতিক

কাষ্ঠ খোদিত মূর্ত্তি—বিশপস মিউজিয়ম

আইনের কথা উঠল। সমস্ত পৃথিবীতে রণডঙ্কা শেষ হয়ে মৈত্রীর যজ্ঞ আরম্ভ হবে কবে, সে প্রশ্নে তিনি বললেন—'হবেই, তবে আজ হউক আর কাল হউক।'

হাওয়াই দ্বীপের কথা উঠল। তিনি বললেন, "আমেরিকা হাওয়াইকে সমগ্র রাষ্ট্রের মর্য্যাদা দিলে ভাল করবে।" তারপর

হাসতে হাসতে বললেন যে, এতদিনে এটা হয়ে যেত কেবল রাজনৈতিক দলাদলির ফলে হয় নি।

ওখান থেকে গেলাম পাঠাগারে। আজ বিদায়ের দিন—বহু বর্ষ আগে মার্কটোয়েন হাওয়াই সম্বন্ধে যা লিখেছেন—সে কথা আজ

হাওয়াই তরুণী

আমার কাছে খুব ভাল লাগল। আমার মনেও অনুরূপ ভাব জেগেছে :

"No alien land in all the world has any deep strong charm for me but that one, no other land could so longingly and so beseechingly haunt me sleeping and waking, through half a life-time, as that one has done.

"Other things leave me, but it abides other things change, but it remains the same. For me its balmy airs are always blowing, its summer seas flashing in the sun, the pulsing of its surf-beat is in my ear; I can see its garlanded crags, its leaping cascades, its plumpy palms drowsing by the shore, its remote summits floating like islands above the cloud-rack.

"I can feel the spirit of its woodland solitudes, I can hear the plash of its brooks, in my nostrils still bears the breath of flowers that perished twenty years ago."

মার্ক টোয়েনের এই পংক্তিগুলো কেবল ভাবালুতা নয়। বাস্তবের রূপাঙ্কন। তালীবনরাজি নীলা হনলুলুর বালুবেলাতট, তার পুষ্পলতার সমারোহ—তার দিগন্তবিলীন পর্ব্বতের শোভা আজিও মনে ভাসে।

বারটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে লাঞ্চ খেতে এলাম মারোজি দম্পতীর ওখানে। মারোজি তাঁর ভাস্কর্য্যগৃহ দেখালেন। তার পর মারোজি গাড়ী করে চারটি বুদ্ধ মন্দির দেখিয়ে আনলেন। এগুলি চীনা ও জাপানীদের।

এখানে চীনা ও জাপানীরা বেশ আরামেই আছে। জাতিবৈর হাওয়াই দ্বীপে নাই। পরস্পর মৈত্রী ও ঐক্যে এরা বাস করছে—যে যার ধর্ম্মমত অনুসারে পূজা-অর্চ্চনা করছে। আইনের চোখে সবাই যেমন সমান, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও তেমনই রয়েছে সহৃদয়তা এবং সৌজন্য।

ওখান থেকে ফিরে হনলুলু এডভার্টাইজার পত্রিকায় প্রবন্ধ দিয়ে এলাম—সে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল কি না জানতে পারি নি। বাসায় ফিরে মারোজি দম্পতীর নিকট বিদায় নিয়ে বাসায় বসে রইলাম উড়ো জাহাজের বাসের জন্য।

বাস এলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। ফলে জাপানে কেনা ভাল ক্যামেরাটি ফেলে এলাম। একজন নিগ্রো এসে আমার জিনিষপত্র নামাল। তার সঙ্গে নিগ্রোদের অবস্থার কথা আলোচনা হ'ল। লোকটি লেখাপড়া জানে, বললে, "আমাদের যথেষ্ট আয় নেই—যথেষ্ট আয়ের সুযোগও নেই।"

তার পর হঠাৎ ধরা পড়ল যে আমার ক্যামেরা নেই। তখনই ওদের আপিসে গিয়ে নাপুয়া হোটেলে ফোন করলাম। ডাঃ কানন্থর বললেন, ট্যাক্সি করে লোক দিলে, ক্যামেরা পাঠিয়ে দিতে পারেন—তবে ট্যাক্সি ভাড়া আমার দিতে হবে। তাতেই রাজি হলাম।

ফলে ২ ডলার ১০ সেণ্ট দিতে হ'ল। তবে ক্যামেরাটি ফেরত পেলাম এই যা।

তার পর বিমান আরোহণের পালা। কাল যাওয়া যাবে আমেরিকার কালিফোর্নিয়ার সানফ্রানসিসকো শহরে—সেই নূতনের মাধুর্য্য মনকে সচকিত করে—অথচ সাতটি দিনের স্মৃতি ক্রমেই যেন মনকে ব্যথিত করে তোলে।

আসন গ্রহণ করে জানালার ফাঁকে হনলুলুর দিকে চেয়ে রইলাম। চোখে পড়ল—আলোকস্তম্ভ। হনলুলু বন্দরের মুখে এই সু-উচ্চ স্তম্ভটি পোতযাত্রীদের বিস্ময় জাগায়।

ওয়াহু দ্বীপে হনলুলু বন্দর এবং পার্ল হার্ব্বার অবস্থিত বলে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে অধিক। ব্রিটিশ জাহাজ বাটারওয়ার্থের কাপ্তেন ব্রাউন ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হনলুলুর বন্দর হওয়ার যোগ্যতা আবিষ্কার করেন। তার ফলেই হাওয়াই দ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব কমে যায়।

ওয়াহুর উপর দিয়ে বিমান চলতে আরম্ভ করল। পিছনে

কাঠের গামলা—বিশপস মিউজিয়ম

রইল কল্পনার রথ্যা দিকেতরে নিসর্গ দৃশ্যের মনোরম মাধুরী মিশেছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মানুষের সরল যৌগিক সংস্কৃতির সঙ্গে—সব মিলে গড়ে উঠেছে এক আশ্চর্য্য, অভিনব সুষমায় পরিবেশ।
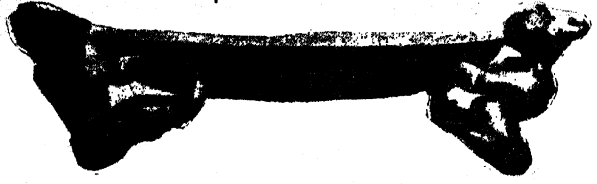
প্রশান্ত মহাসাগরের স্বপ্ন-পুরী ভূস্বর্গ হাওয়াই দ্বীপে ফেরা হয়ত আর হবে না তবু তার বাহু আজও যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে তার আরামের ও বিরামের মাঝখানে। ডাকছে তার বালুবেলাতট—ডাকছে তার চন্দ্রালোক—তার পুষ্পলতা বিটপী—তার ছোট ছোট পাহাড়—তার পাদপাদপ—ডাকছে তার নানা মানুষের ধারা।

পার্শ্ববর্ত্তিনী আমেরিকান মহিলা বললেন, "কেমন লাগল আপনার?"

উত্তর দিলাম, "খুবই সুন্দর"।

"তবে শুনেছি আপনাদের ভারতবর্ষে এর চেয়ে সুন্দরতর স্থান আছে।"

"তা আছে, তবে ঠিক এমনটি নেই, ভারতের সমুদ্রতীরের সবখানি দেখা আমার হয়নি, কিন্তু এমনটি আছে বলে জানিনি।"

মহিলা হাসলেন, বললেন, "এটা হয়ত বিজ্ঞাপনের যাদু।"

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন, "কর্ম্মক্লান্ত আমরা এখানে পাই বিরাম, তাই আমাদের উচ্ছাস অপরিমিত।"

সেই অনুরাগই বহু মুখে ব্যক্ত করে পৃথিবীতে গড়ে তুলেছে হাওয়াই দ্বীপের এত নাম।"

স্বপনগন্ধা ! জ্যোছনায় ভিজে বিরলে থেকো না ঘুমি'

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রতি দিবসের সান্ধ্যের সুরে বুদ্ধি চেতনা লয়ে,
চির যাযাবর চলেছি কোথায় ? কোন্ সীমাহীন স্রোতে !
পরম প্রেমেতে চরম যাতনা নিতি অন্তরে বয়ে
ভেসে যাই কোথা মায়ার লীলায় আত্মিক স্তর হোতে !
সৌরভ মম যৌবন মাঝে পরশ পেয়েছি যার
অনন্ত সুরে সেকি ডাকে মোরে দূর হোতে অনিবার !

বিশ্ব আকাশে অসংখ্য তারা ওঠে আর নিবে যায়,
পৃথিবীর পথে বিবর্ত্তনের আলো আঁধারের খেলা।
অসীম সত্য বহু রূপে জাগে মননের মমতায়
হৃদয়-নিবিড়-উৎস কিনারে পড়ে আসে কেন বেলা ?
জীবন মরণ একীকরণের সময় হোলো কি মোর ?
শীতালি তৃণের শিয়রে ঝরিছে রাতের অশ্রু লোর।

তোমার প্রণয় প্রচ্ছদপটে স্বাক্ষর যাবো রেখে,
ভগ্ন নীড়েতে স্মৃতিটুকু শুধু উজ্জ্বল করে রেখো।
বহু জনমের গতি প্রকৃতির পথ গেছে এঁকে বেঁকে
সেই পথে যেন ক্ষণ অভিসারে নাম ধরে মোরে ডেকো।
আশা আনন্দ দুঃখ বেদনা সব কিছু লয়ে তুমি
স্বপনগন্ধা ! জ্যোছনায় ভিজে বিরলে থেকো না ঘুমি'।

(১৫)

দিন পনের পর।

সে দিন তিথিতে পূর্ণিমা। এদিকে মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষ্যে ইস্কুলের ছুটি। পর পর দু'দিন ইস্কুল বন্ধ। শনিবার ছুটি, রবিবার যথানিয়মে ইস্কুল বন্ধ। চন্দ্রবাবুর বাসায় সেদিন প্রায় মহোৎসব। অনেক কাল পর আবার তাঁর বাড়ীতে সত্যনারায়ণ সেবার আয়োজন হয়েছে। সেই প্রথম বাসা পত্তনের পর সেই যে সত্যনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা হয়েছিল—যার আয়োজনের মধ্যে ছেলেরা সিদ্ধির কচুরী ভেজে খেয়েছিল—শম্ভু পাগল হয়ে গিয়েছিল—সেই সত্যনারায়ণ সেবার পর এ পর্য্যন্ত আর কোন সমারোহ তাঁর বাসায় তিনি করেন নি। ছোট সংসার, বরুবালা ছাড়া সন্তানও নেই; সংসারে একমাত্র অবশ্য পালনীয় পর্ব্বের মধ্যে পিতৃ ও মাতৃশ্রাদ্ধ। সেও তিনি আগে ঠিক করতেন না, এখন করেন। সে উপলক্ষ্যেও ইস্কুলের শিক্ষক কয়েক জন ছাড়া আর কাউকে নিমন্ত্রণ করেন না এবং তাতে কোন ঘটাও তিনি করেন না। মধ্যে একবার সত্যবতীর ব্রত প্রতিষ্ঠা গিয়েছে। ভাদ্র মাসে অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত প্রতিষ্ঠা। রামজয় বলেওছিলেন—চন্দ্র, এতকাল এখানে রয়েছ—এখানকার সমাজে সকলের বাড়ীতেই তোমার নেমন্তন্ন হয়, বহুজনের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছে, এই উপলক্ষ্যে দশ জনকে তুমি একদিন নেমন্তন্ন কর না কেন? খেয়েই থাকবে চিরদিন?

চন্দ্রবাবু হেসে বলেছিলেন—আমি ত সামান্য লোক রামজয়, মাষ্টার পণ্ডিত মানুষ, আমার কি সাধ্য বল? সত্য বলতে আমি ত গরীব সামান্য লোক।

রামজয় বলেছিলেন—চন্দ্র, কথাটা ঠিক হ'ল না ভাই। এ অঞ্চলে যত বড় বড় লোক সব তোমার ছাত্র না হয় ছাত্রের বাপ। তোমার বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হলে তুমি কাকের মুখে বার্ত্তা দিলে দশটা যজ্ঞের আয়োজন ভারীর কাঁধে চাপিয়ে তোমার ঘরে তুলে দেবে।

চন্দ্রবাবুর মুখ স্মিতহাস্যে ভরে উঠেছিল। বলেছিলেন—কথাটা ষোল আনা সত্য না হলেও আট আনা সত্য বটে। ভাবতে ভালই লাগে। কিন্তু চাইতে আমি ঠিক পারব না।

—আমি চেয়ে আনব। ও ভারটা আমার হাতে দাও। আমি বামুন মানুষ। আমার অভ্যেস আছে।

তা আছে। রামজয় গৃহস্থ হিসাবে আদৌ অভাবী নয়, স্বচ্ছল গৃহস্থ। এমন কি সামান্য বেতন এবং চাষবাসের আয় থেকে সংসার চালিয়ে যা সঞ্চয় করে পোস্ট আপিসের খাতায় জমা করে বিধবা কন্যার জন্য। তার অভাব নাই। তবুও সে নানা উপলক্ষ্যে নানা স্থান থেকে ভিক্ষে করে আনে। ছাত্র আছে, শিষ্য-সেবক আছে, অবস্থাপন্ন লোক আছে যারা শিষ্যও নয়, ছাত্রও নয়, তাদের কাছে গিয়ে রামজয়ের হাত পাততে কোন সঙ্কোচ নেই। মাটির ঘর হচ্ছে—রামজয় কারও কাছে গিয়ে দুটো তালগাছ, কারও কাছে জামগাছ, কারও কাছে অর্জ্জুন গাছ চেয়ে সংগ্রহ করে আনে। বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হলে কারও কাছে মাছ, কারও কাছে কাঠ চেয়ে নেবে। এমনকি খড়, সাবুই এ সবও চাইতে তার দ্বিধা নাই। যে সব ছাত্র কলকাতায় থাকে তাদের কাছে পালা করে পত্র যোগে বরাত পাঠায়। 'আমার জন্য এক জোড়া তালতলার চটি আনিবে।' 'গতবার তুমি যে চমৎকার ধূপশলাকা আনিয়া দিয়াছিলে তাহার গন্ধে দেবতা সন্তুষ্ট হন। অতএব ঐ ধূপশলাকা এবারও কিছু আনিবে।' 'আমার পূজার সময় পরিধানের পট্টবস্ত্র ছিঁড়িয়া কষ্ট পাইতেছি; একখানি মটকার ধুতি তোমার নিকট দাবী করিতেছি।

অবশ্য অবশ্য লইয়া আসিবে। ঐ ধুতি পরিয়া পূজার্চ্চনা করিব এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।' "এবার শীতকালে আমার শীতবস্ত্র নাই। দীর্ঘদিনের বাসনা একখানি বালাপোষ গায়ে দি'। তুমি বহরমপুরে আছ। মুরশিদাবাদ উৎকৃষ্ট বালাপোষের জন্ম বিখ্যাত। তোমার নিকট হইতে একখানি বালাপোষ চাহিতেছি। আতর ইত্যাদির গন্ধে প্রয়োজন নাই। তবে বেশ 'ফাইন' হওয়া চাই। তোমার নিকট হইতে খেলো দ্রব্য আমি লইব না।"

এ নিয়ে অনেক বার অনেক কথাই উঠেছে ইস্কুলে।

রামজয় অকপটে অসঙ্কোচে স্বীকার করেছে, বলেছে—হ্যাঁ চেয়েছি। দিয়েছে। নিয়েছি। কিন্তু এরা ত প্রাক্তন ছাত্র—'এক্স্‌ স্টুডেন্ট'। ওদিকে ত খাতা দেখার সময় পারশিয়ালিটি করে অধিক মার্ক দেবার সম্ভাবনা নাই। ওরা সব কৃতী ছাত্র, কেউ চাকরী করে, কেউ পড়ে, কত বাজে খরচ করে সেখানে। যে বিদ্যার জোরে করে তার কিছুটা আমি শিখিয়েছি, অকৃপণ ভাবে শিখিয়েছি। পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতন পাই। দৈনিক তা হলে দেড় টাকা। আজকাল যারা ঘরামির কাজ করে, যারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে তারা পায় পাঁচ সিকে দেড় টাকা। তাতে আপত্তি করি না। কারণ সারাটা জীবন ছেলেদের প্রণাম পাই, মনে মনে জানি অভাব হোক, অভিযোগ হোক ওরা আমার পূরণ করে দেবে। আগেকার কালে দিয়েছে—একালেও দেবে। যেদিন জানব দেবে না, সেদিন আর চাইব না, ইস্কুলেও চাকরী করব না। দেখুন, আগেকার কালে জমির আল ভেঙে গেলে বেটাদের কোদাল নিয়ে ছুটতে হ'ত। জল বাঁধ না মানলে পিঠ দিয়ে শুতে হ'ত! গরু চরাতে হ'ত গুরুর। সেকাল অবিশ্যি নেই। কিন্তু একখানা বালাপোষ পনের-ষোল টাকা দাম, একখানা মটকার ধুতি—দশ-বারো টাকা দাম—আট আনার ধূপশলাকা, দেড় টাকা পাঁচ সিকের তালতলার চটি—এ চাইবার অধিকার আমার আছে মশায়।

কথাটা বলেছিলেন নতুন এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার সৌরীন বাবুকে। ব্রজবিহারীবাবু চলে যাবার পর এসেছেন সৌরীন্দ্র ঘোষ। কলকাতার লোক। আধাবয়সী মানুষটি একটু কেমন খটরোগা মানুষ। ডিসপেপ্‌সিয়ার রোগী—অন্যথায় লোক মন্দ নন। মাখনবাবু সেকেণ্ড মাষ্টারও চলে গেছেন। এখান থেকে এম-এ পাস করে এই জেলারই এক শহরের ইস্কুলে হেড মাষ্টার হয়ে গেছেন। তার জায়গায় চন্দ্রবাবু বেছে নিয়েছেন বসন্তকে। এই ইস্কুলেরই ছাত্র বসন্ত। এখানকারই ছেলে। শান্ত মেধাবী গরীবের ছেলে। বেচারীর মা অনেক কষ্টে ছেলেটিকে বি-এসসি পাস করার খরচ জুগিয়েছে। চরিত্রবান মিষ্ট স্বভাবের ছেলেটির উপর চন্দ্রবাবুর সস্নেহ দৃষ্টি অনেক দিনের। অজাতশত্রু ছেলে বসন্ত। চন্দ্রবাবু বসন্তকে ডেকে বলেছিলেন—পাস করলে এবার কি করবে?

ছাত্র ইস্কুলের পড়া পাস করেই হোক আর ফেল করে তিক্ত হয়েই হোক ছেড়ে বাইরে গেলেই চন্দ্রবাবু তাকে আর তুই-তুকারি করেন না—তুমি বলে থাকেন।

বসন্ত উত্তর দিতে পারে নাই। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। আশা-আকাঙ্ক্ষা ত অনেক। আবার দরিদ্র পল্লী যুবকটির ভীরুতারও অন্ত নাই। ইচ্ছা হয় আরও পড়ে, বিলাত যায়, আই-সি এস হয়ে আসে—জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়, ইচ্ছা হয় ব্যারিষ্টার হয়ে আসে; ইচ্ছা হয় ব্যবসা করে—ওই চৈতন্য বাবুদের মত বিশাল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ইচ্ছা হয় ওই রকম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা সেল্সম্যান ওই রকম একটা কিছু হয়; আরও অনেক আকাঙ্ক্ষা হয়। কখনও উত্তেজনার মুহূর্ত্তে চকিতের মত মনে হয় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের পন্থা অনুসরণ করে দেশনেতা হয়ে ওঠে। কিন্তু ভয় হয়। নিদারুণ একটা ভয়। কিছুক্ষণ ভাবতে ভাবতেই অন্তরাত্মা যেন জলমগ্নের মত হাঁপিয়ে ওঠে। মনে হয় এই সব বিশাল বিস্তীর্ণ জীবন সমুদ্রের মত দিশাহীন—তলহীন; এর কূল নাই কিনারা নাই, আছে শুধু বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, মুহূর্ত্তে গ্রাস করে নেয়, সে তার মধ্যে ডুবে যাবে, তলহীন অনন্ত গভীরতার মধ্যে। সে গরীব ঘরের ছেলে, তার মা তাকে বাল্যকাল থেকে শিখিয়েছে—ওই সব বড় ঘরের ছেলেদের কথা আলাদা বাবা, ওদের ভাগ্য আলাদা। ওদের ওপর ভগবানের দয়া আলাদা। ওদের সঙ্গে সঙ্গ করো না।

গল্প বলত মা; বলত—বাবা, এক রাজার ছেলে আর এক গরীবের ছেলে একই লগ্নে একই রাশিচক্র নিয়ে জন্মেছিল। দু'জনেরই পাঁচ বছর বয়সে স্বর্ণপ্রাপ্তি যোগ ছিল। পাঁচ বছর বয়সে একদিন দু'জনেই খেলা করছে। রাজার ছেলে রাজার বাগানে আর গরীবের ছেলে তাদের বাড়ীর পাশে—শুকনো ডোবার ধারে। রাজার ছেলে মাটির তলা থেকে পেলে একটা হলুদ-বরণ মাটির ঢেলার মত ঢেলা; সেটা হ'ল সোনার একটা বাট; কোন কালে হয় ত ওই রাজবাড়ীরই কেউ বাগানে হারিয়েছিল। আর গরীবের ছেলেও পেলে মাটির তলা থেকে হলুদ-বরণ একটা কি। সেটা হ'ল—মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া একটা সোনা ব্যাঙ।

এই গল্প এবং মায়ের ওই ভীরু সযত্ন পক্ষপুট আচ্ছাদনের প্রভাব তার জীবনের সাহস এবং উদ্যমকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। নইলে তারই চোখের সামনে এই ইস্কুলের ছাত্র এই বিধগ্রামের ছেলে শ্যামাপদ ফেল করে করে কোনমতে বি-এ

পাস করে বড় ব্যবসায়ী হয়েছে; দেশনেতা না হোক এই অঞ্চলের একজন নেতা হয়েছে। একজন এম-এসসি পাস করে সরকারী হিসাব বিভাগের পরীক্ষা পাস করে বড় চাকুরে হয়েছে; যারা কোন পাসই করে নি, তারাও বংশপ্রতিষ্ঠার গৌরবে প্রতাপশালী এবং অনেক কিছু। ভীরু বসন্তের অন্তরতম গোপনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষাই উঁকি মারুক—তারা কোন দিন প্রকাশ্যে মাথা তুলতে পারে নি; তার সচেতন প্রকাশ্য অন্তরের আশা ছিল স্বল্প স্বচ্ছল আয়, অমুদ্ধত খানিকটা প্রতিষ্ঠা; আশার মধ্যে যেটুকু ছিল বৃহৎ—যেটুকু ছিল মহৎ—সে হ'ল লোকের স্নেহ এবং প্রশংসা। সে দিক দিয়ে শিক্ষক জীবন তার পক্ষে আদর্শ জীবন। কিন্তু চন্দ্রবাবু নিজে ডেকে তাকে যখন প্রশ্ন করলেন—কি করবে এখন। তখন তার জবাবেও সে ইস্কুলে কোন চাকরীর কথা বলতে পারে নি। চন্দ্রবাবুই নিজে বলেছিলেন—সেকেণ্ড মাষ্টার মাখনবাবু চলে গেলেন, লোক চাই; মাষ্টারী করবে?

সেই পুরাতন কালের ছাত্রের মত ঢোক গিলেই সে বলেছিল—করব স্যার্।

—কাল থেকেই এস তা হলে। পরে ম্যানেজিং কমিটিতে তোমাকে পারমেনেণ্ট করে নেব।

ষাট টাকা মাইনে। বসন্ত সেদিন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। বসন্ত এখন সেকেণ্ড মাষ্টার। মাখনবাবুর পর গেছেন ব্রজবিহারী বাবু। এসেছেন সৌরীনবাবু। সর্ব্বাগ্রে গেছেন ভূতনাথ বাবু থার্ড মাষ্টার, মোক্তারি পাস করে চলে গেছেন। বাকী মাষ্টারদের সবই চন্দ্রবাবু ও রামজয় পণ্ডিতের ছাত্র। সেই কারণেই রামজয় এখন প্রায় অকুতোভয়। সৌরীনবাবুর কথার জবাবে বেশ রসালো এবং ঝাঁঝালো করে কথাগুলি বলতে আদৌ ভয় পায় না। এবং চন্দ্রবাবুকেও এমনই কোন উপলক্ষ্য করে অধিকতর প্রবলপ্রতাপ হতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু চন্দ্রবাবু তাতে উৎসাহ প্রকাশ করেন না। স্ত্রীর ব্রতপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে মাছ কাঠ চাল তরিতরকারী নিয়ে বিশ্বগ্রামে সমারোহ করে খাওনদাওনের প্রস্তাবেও তাই তিনি রাজী হন নি। রামজয়কে বলেছিলেন—না রামজয়, তা হয় না।

রামজয় বলেছিলেন—কেন? ঘুষ না হোক উপঢৌকন নেওয়ার অপরাধে অপরাধী হবে?

হেসে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—দেখ রামজয় যে বৃত্তি নিয়েছি সে বৃত্তি ব্রাহ্মণের। শিক্ষাদান গুরুর কাজ, ব্রাহ্মণের কাজ। তুমি নিজে এ কাজ করছ।

—নিশ্চয়। প্রমোশন ত তোমার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রমোশন পেয়ে তার মত কাজ করতে হবে ত। তাই ত করতে বলেছি। ভিক্ষের ঝুলিটা কাঁধে নাও। কানের কলম—কায়স্থের চিহ্নটা সরাও, হিসেবনিকেশটা তোল।

—সেই ত। সেই ত বলছি। আমার কাছে লেখাপড়া শিখে পরীক্ষা পাস করে, কিন্তু তোমার কাছে কানে মন্ত্র নেওয়ার মত মন্ত্র ত নেয় না; সে দেবার ত অধিকারও হয় না, সে হেডমাষ্টারই হই আর প্রফেসরই হই। তখন ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নেবার কি দক্ষিণে নেবার অধিকার আমাদের কি করে হয় বল? ভাই, সংসারে সব জিনিসটা কুণ্ঠাহীন অপরাধবোধহীন মনে করবার ক্ষমতাই আসল ক্ষমতা। সেটা তোমাদের আছে আমাদের নাই।

—তা নাই। হেসেছিলেন রামজয়।—তোমরা বামুনদের যতই ছোট আর যতই হীন ভাবতে চেষ্টা কর, আমাদের গায়ে দাগ লাগে না হে। তোমরা চাও না—থাকার গৌরবে, আমরা চাই না-থাকার গৌরবে।

এতকাল পর চন্দ্রবাবু রামজয়কে ডেকে বলেছিলেন—এবার একদিন ভাল করে সত্যনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা কর রামজয়। খুব ভাল করে। মানে এখানকার স্থানীয় ভদ্রলোকেদেরও খাওয়াতে চাই। শুধু একটা ভাবনা—

—কি?

—সত্যনারায়ণ সেবায় মাছ করব কি করে? আর মাছ না হলে খাওয়া-দাওয়াই বা ভাল করে কি করে হয়? বাঙালীর খাওন-দাওন ত।

—তার আর কি? সত্যনারাণের সঙ্গে মা কালী মা চণ্ডী জুড়ে দাও। বজবালা পাস করেছে, ইস্কুলের ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট; পূর্ণিমার দিন মা চণ্ডীর স্থানে পুজো দাও। শুধু মাছ কেন—মাছমাংস দুই হোক; তার সঙ্গে রাধাবল্লভী—মালপো—। সে একবারে ষোড়শোপচারে ভোজন; মধু গুড় একসঙ্গে।

ব্রাহ্মণ রামজয়ের এই সব বুদ্ধির তারিফ না করে উপায় নেই। পরমুহূর্ত্তেই বলেছিলেন—এই ত পূর্ণিমেতে মুসলমানদেরও কি পরব আছে। তাও খানিকটা জুড়ে-টুড়ে দাও। ওদের মসজেদে কি কি সব পাঠাতে হয় পাঠিয়ে দাও। জেয়াউদ্দিনকে ডাক। ব্যস, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হয়ে যাবে। চণ্ডীতলায় পুজো দাও, পুরুত ওঝা আমাদের ছাত্র, সে দেখবে মায়ের স্থানে ঝপাঝপ দুটো মানতের পাঁঠা যা জমা আছে—কেটে ফেলে পাঠিয়ে দেবে। মসজেদে পুজোভেট পাঠাও, ওরাও শোনপাপড়ি ফলমূল পাঠিয়ে দেবে, মের্জ্জাদের বিলায়েৎ-এনায়েৎ দুই আমাদের ছাত্র। যদি একবার ঘাড় নেড়ে ইসারা দাও ত দুটো খাসিও পাঠিয়ে দেবে কোরবাণী করে। আর যদি বল—তাই ত এনায়েৎ-বিলায়েত—জনকয়েক যে আবার বলে বিড়িয়ানী পোলাও

খাব—কি বলে তার সঙ্গে পক্ষীমাংস খাব তা হলে ত দিল-দরিয়া খুনী হয়ে সব তরিবৎ করে বেঁধে বেড়ে পাঠিয়ে দেবে। দেখবে সত্যিব্রাহ্মণের সেবার লুচি, সুজির পায়েস, আটা, রাধাবল্লভী বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। কেউ খাবে না। ওই আমি আর শম্ভু চাটুজ্জে। ওই ত বসন্তকে জিজ্ঞেস কর না। কি বাবা বসন্ত—কি খাবে তুমি? এনায়েতের বাড়ী পাকানো—পলাণ্ডু রসুন সুরভিত পোলাও এবং পক্ষীমাংসের সুরুয়া অথবা মা চণ্ডীর প্রসাদী মাংসের ঝোল—মৎস্যের অম্বল অথবা সত্যনারায়ণের প্রসাদী নিরামিষ লুচি পায়েস আটা রাধাবল্লভী?—কিসে রুচি? অকপটে কহ। একে মিথ্যা কথা বলা পাপ। তদুপরি গুরুর সম্মুখে—ডবল গুরু। বল!

বসন্ত মৃদু হেসে বললে—সত্যি বলতে যখন বলছেন তখন পণ্ডিতমশায় বলি—ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় যখন হচ্ছে—তখন তাই হয়ে যাক। অল্প-অল্প করে সবই খাওয়া যাবে।

সকলেই হেসে উঠল কিন্তু চন্দ্রবাবু কি যেন গভীর চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

সমারোহ করে সেই উৎসব। হাসি-তামাসা করে রামজয় যা বলেছিলেন—চন্দ্রবাবু তার একটিও বাদ দেন নি। কথা-গুলি তাঁর মনে অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। ইদানীং তিনি দিন দিন অনুভব করছিলেন যে, মুসলমান ছাত্রেরা যেন ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে। উনিশশ' একুশ সনে একটা আশা জেগেছিল—হয়ত-বা হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদটা এইবার যাবে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামক যে একটি বিচিত্র ব্যক্তি ভারতবর্ষের জীবন ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁকে তিনি খুব প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি; লোকটির ধারণা-কল্পনাও তাঁর বিচারে ভ্রান্ত—পুরাপুরি পদার্থহীন—কোন মূল্য নাই। বিশ্ববিজয়ী—কূটবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়—রাজনীতি বিজ্ঞানে ধুরন্ধর—ইংরেজের সঙ্গে অহিংসা আর অসহযোগ অবলম্বন করে লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে জয়ের প্রত্যাশা! এর চেয়ে ভ্রান্তি আর কি হতে পারে? তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আজ গোটা দেশটাকে নিরুৎসাহিত—অবসন্ন করে ফেলেছে। ব্যর্থ হয়ে গেছে সে আন্দোলন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম বয়কট করে কি ফল হয়েছে? ফল হয়েছে—সব মন্দ, সব মন্দ, সব মন্দ! সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ফল হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে—ছেলেদের রাজনৈতিক আন্দোলনে টেনে দেশের শিক্ষার ভবিষ্যতের সর্ব্বনাশ করা হয়েছে!

অমরবাবু একদিন উনিশশ' একুশ সনে কাউন্সিল ইলেকশনের সময় এখানে এসেছিলেন—আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—বানিয়াটা দেশের সর্ব্বনাশ করে দিলে! দেশের লোক সব ইডিয়ট। নইলে দেশের লোকেই ওর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিত।

অমরবাবু তখন কাউন্সিলে নির্ব্বাচন-প্রার্থী। মহাযুদ্ধের বাজারে প্রচুর উপার্জ্জন করেছেন। দেশে কীর্ত্তির পর কীর্ত্তি করে যাচ্ছেন। সরকারের ঘরে বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রতিটি কাজে সরকার সহযোগিতা করেন। তাঁর কথার ভঙ্গী তখন ওই রকমই হওয়ার কথা। ও ভঙ্গীটা তাঁর ভাল লাগে নি কিন্তু বক্তব্যের মোটামুটি অর্থটার একাংশ তিনি মনেপ্রাণে সমর্থন করেছিলেন। সর্ব্বনাশই হ'ল দেশের। শুধু এক-স্থানে আশা জেগেছিল, মনে হয়েছিল এইবার বোধ হয় হিন্দু মুসলমান এক হবে। কিন্তু তাও হ'ল না। বাংলাদেশের চীফ মিনিস্টার হলেন ফজলল হক সাহেব। ওদিকে খিলাফৎ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল। মুসলমানেরা আবার সরে গেল এবং যাচ্ছে, দিন দিন সরে যাচ্ছে। পূর্ব্ববঙ্গে ওরা সংখ্যায় বেশী, এ অঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম—এতকাল পর্য্যন্ত সত্যকথা বলতে ওরাই একঘরের মত থেকেছে। বিশেষ করে এই বিগ্রাম অঞ্চলটিতে মুসলমানেরা সংখ্যাতে শুধু কমই নয়—অবস্থাতেও ওরা এখানকার দরিদ্র। এখানকার জমিদারী, জোতদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই হিন্দুদের হাতে। কয়েকঘর অবস্থাপন্ন চাষী ছাড়া অধিকাংশ মুসলমানই দৈহিক পরিশ্রমে দিন আনে, দিন খায়। ভাড়ায় গাড়ী বয়, ইট পাড়ার কাজ করে, মাটি কাটে, রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, কিছু আছে লাঠিয়াল শ্রেণীর লোক—তারা জমিদার-জোতদারের ঘরে পাইকের কাজ করে, আর করে এ অঞ্চলের চাষী মজুরের কাজ। এখানকার জমিজমার অধিকাংশই হিন্দুদের মালিকানা হলেও সে জমি কৃষাণ হিসাবে চাষ করে এই মুসলমানেরা। চাষী তারা ভাল, সত্যকারের ভাল চাষী। সেই সূত্রে প্রায় সকল হিন্দুবাড়ীতেই ওদের যাওয়া-আসা রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু সেখানে ওরা প্রায় অস্পৃশ্য। প্রায় কেন—পুরাপুরিই তাই। ওদের হাতে জিনিস দেয় আলগোছে। ওদের হাতের জিনিস আলগোছেও নেয় না, ওরা নামিয়ে দেয় সে জিনিস জল দিয়ে ধুয়ে ঘরে তোলে। ছোঁয়া পড়লে নিষ্ঠাবানেরা স্নান করে। মুসলমানেরা অবশ্য হিন্দুদের বাড়ীতে খায় না, হিন্দুদের উৎসব-পার্ব্বণ পরিহার করে, অন্ততঃ করতে চেষ্টা করে, মসজিদেও উঠতে দেয় না, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সম্পদসমৃদ্ধ হিন্দুসমাজ তার কোন কিছুই অনুভব করে না। অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই এতকাল পর্য্যন্ত এ সব চলিত আচার-আইন প্রকৃত পক্ষে কোন দলকেই স্পর্শ করত না। সয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সেই সয়ে নেওয়ার কালটা চলে গেল। মুসলমানেরা আর

সইবে না। তারা উঠে দাঁড়াচ্ছে। তবে একটা দোষ ওদের ছিল—সেটা আজও আছে, এবং সেটা যেন বাড়ছে। হিন্দুদের ধর্ম্মকে ওরা সুযোগ পেলেই আঘাত করেছে, সেই আঘাতের স্পৃহা ওদের বাড়ছে। এরা স্পর্শদোষের সৃষ্টি করে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছে—ওরা সেটা ঘুচিয়ে আক্রমণ করতে আগেও চেয়েছে এখন বেশী করে চাইছে। হিন্দুকে মুসলমান ওরা অনেক ক্ষেত্রে জোর করে করেছে। আরও একটি মারাত্মক অপরাধের বোঝা ওদের ঘাড়ে চেপে আছে। সেটা অবশ্য কোন সম্প্রদায় বা কোন ধর্ম্মের দোষ নয়, সেটা দুষ্ট প্রকৃতির লোকের স্বভাবগত দোষ। সে দোষ নিজেদের সমাজ ও ধর্ম্মকে পীড়ন করেই ক্ষান্ত থাকে না, অপর সমাজেও হানা দেয়। সেই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা নাকি সরকারী তথ্য অনুযায়ী ওদের সমাজে বেশী। সেটা নারী-ঘটিত অপরাধ। রামজয়েরা ওই কথাটাই ওদের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। কিন্তু এখানে সে অপরাধের সংখ্যা বেশী নয় এবং যাও দু'চারটি ঘটে থাকে—তারও অধিকাংশের পিছনেই আছে প্রথম হিন্দুর অপরাধ। ছলে-বলে হিন্দুদের ব্যভিচারী অবস্থাপন্ন যুবকেরা যে সব অসহায়া হিন্দুনারীকে পথভ্রষ্ট করে—বিপথে টেনে শেষ পর্য্যন্ত সমাজের বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়—সেই অসহায়াদের ওরা সুবিধা পেলেই ওদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করে নেয়। জোর জবরদস্তির ঘটনাও আছে। আজ এই উঠে দাঁড়ানোর প্রথম কালে—ওরা সব দোষগুণ নিয়েই উদ্ধত ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইস্কুলের মধ্যে চন্দ্রবাবু নিত্য তার উত্তাপ অনুভব করছেন। প্রায়ই তাঁকে অনুযোগ শুনতে হয়—কোন মুসলমান ছেলে হিন্দুদের গ্লাসে জল খেয়েছে। তিনি ডেকে তিরস্কার করেন—তারা প্রশ্ন করে—ও-ও মানুষ আমিও মানুষ; ও গ্লাসে জল খেলাম ত হয়েছে কি? আমাদের গ্লাসটা অপরিষ্কার ছিল তাই খেয়েছি এবং ধুয়েই ত রেখে দিয়েছি।

—ওরা ত তোমাদের গ্লাসে খায় না। তা যখন খায় না, সেই যখন ওরা মানে, তখন সেটা মানতে তোমাদের ক্ষতি কি? পরস্পরের রীতিনীতির প্রতি সহনশীলতা থাকা ভাল নয় কি?

এ কথার জবাব ওরা দেয় না কিন্তু এ সহনশীলতা ওদের নেই—সে ওরা মানবে না। এই গত বছরেই বিজয়ার দিনে—বিষগ্রামে লাঠি নিয়ে ওরা দাঁড়িয়েছিল; সদর রাস্তার ধারে একটা আমগাছের তলায় পীরতলা হয়েছে নূতন, সেখান দিয়ে বাজনা বাজিয়ে প্রতিমা নিয়ে যেতে দেবে না।

সমস্ত কিছুর আঁচ ইস্কুলে এসে নিত্যই লাগছে। নিত্যই একটা-না-একটা ঘটনা ঘটে থাকে। তবু জেয়াউদ্দিন এখনও মৌলবী আছে বলেই এই ঘটনাগুলি প্রশ্রয় পেয়ে ফুঁ দিয়ে জ্বালানো আগুনের মত জ্বলে উঠতে পায় না। কিন্তু এর জন্য মুসলমান ছাত্র এবং অভিভাবক দুই তরফেরই মনে মনে অভিযোগের সীমা নাই। মধ্যে মধ্যে বেনামী দরখাস্ত হচ্ছে জিয়াউদ্দিনের বিরুদ্ধে। জিয়াউদ্দিন এখানকার মুসলমানদের মধ্যে সম্মানিত বংশের দৌহিত্র এবং গুরুর শ্রদ্ধার অধিকারী। এখনও ঈদের নমাজ প্রভৃতি ইসলামী পর্ব্বে-পার্ব্বণে তার নেতৃত্ব অবিসম্বাদী। তাই তার বিরুদ্ধে ইসলাম-বিরোধী বলে দরখাস্ত হয় না, দরখাস্ত হয়—তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি ইংরেজী জানেন না বলে। মুসলমানেরা এখন এখনকার কালের কোন নতুন ইংরেজী ও ফার্সী-জানা মৌলবী চায়। হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধিতা করে তাদের উঠে দাঁড়াবার পথে সে তাকে সাহায্য করতে পারবে। এই সময়ে রামজয় পরিহাস করে কথাটা বললেও চন্দ্রবাবু কথাটাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ভয়ও হয়েছিল। যদি কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব অঘটন ঘটে! বলা ত যায় না! তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখেছিলেন ব্রজবিহারী বাবুকে। এবং তাঁকে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। "আপনাকে আসতেই হবে। বঙ্গবালা আমার কন্যা কিন্তু বঙ্গবালার গুরু আপনি। আপনি তাকে পথ দেখিয়েছেন—তার পথ মুক্ত করে দিয়েছেন। আপনি না এলে এ আয়োজনের কোন সার্থকতাই নেই আমার কাছে।" তারপর এই সঙ্কল্পের কথা লিখে প্রশ্ন করেছিলেন—"একি ঠিক হবে? আপনার মত না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি সঙ্কল্প স্থির করতে পারছি না।"

ব্রজবিহারী বাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন—"আমি নিশ্চয় যাব। যে সঙ্কল্প করেছেন সে সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকুন। এর সুফল হয় ত কিছু পাবেন না, তবে কুফলের ফলন কিছু কম হলেও হতে পারে। কিন্তু নিজেদের কাছে জবাবদিহি করা হবে। শেষ পর্য্যন্ত যত সর্ব্বনাশই হোক সে সময় নিজের কাছে বলতে পারবেন—সর্ব্বনাশ যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা নিজস্ব করে তুললেন কেন? ইস্কুলের উৎসব করতে ক্ষতি কি ছিল? ইস্কুলের এত বড় রেজাল্ট হ'ল—উৎসব করারই ত কথা। তাতে এর মূল্যটা অনেক বড় হ'ত। হ'ত না?"

তা হ'ত। সে কথাও চন্দ্রবাবুর মনে হয়েছিল। কিন্তু সাহস করেন নি। হিন্দুপ্রধান বিষগ্রাম বাইরে থেকে জামায়-কাপড়ে ফ্যাশনে বাক্যে খুবই প্রগতিশীল কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার বিপরীত। এখানে সায়েবসুবোর সঙ্গে মেলা-মেশায় তাদের সঙ্গে ডিনার লাঞ্চ চা খাওয়ায় খুব উৎসাহ। বক্তৃতায় বড় বড় কথা বলে। কিছুদিন আগে ইস্কুলের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসন মিটিঙে সস্ত্রীক ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং

জজসাহেব এসেছিলেন। ওদের মহলে পবিত্রবাবুর খুব খাতির। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রীর নারীকল্যাণে খুব উৎসাহ, সমিতি গড়ে বেড়ান। স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য মিটিং করেন। তাঁর উপস্থিতিতে, চৈতন্যবাবুর বাড়ীরই একজন—ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটিরও সভ্য—সভায় মহিলাদের অনুপস্থিতি নিয়ে ওজস্বিনী ভাষায় আক্ষেপ করে বক্তৃতা করেছিলেন—"আমরা স্ত্রীকে বলি সহধর্ম্মিনী। যিনি সহধর্ম্মিনী আজকের এই ধর্ম্মাচরণের ক্ষেত্রে আমরা যখন এখানে রয়েছি তখন তাঁরা এখানে নেই কেন ?" হাততালি নিজে দিয়েছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট-সহধর্ম্মিনী, প্রতিধ্বনিও উঠেছিল সভা জুড়ে। কিন্তু চন্দ্রবাবু মনে মনে হেসেছিলেন। কারণ এই যুবকটি বছর-ছয়েক আগে একটি দশ বৎসরের ধনিকন্যার পাণিগ্রহণ করে তার বালিকা বিদ্যালয়ে পড়া বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তার পাড়ায় বালিকাসুলভ স্বভাবে ও আগ্রহে ঘোমটা খুলে বের হওয়ার পথেও পাহারা বসিয়েছিল। নিজের ঘরের জানালায় পর্দা টানিয়েছে। গ্রামে সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বগ্রামে এখনও অনেক কড়াকড়ি। তিনি কায়স্থ, মাষ্টার-দের মধ্যে আরও অনেক জাতি আছে, বোর্ডিঙে ত আছেই নানান জাতের ছেলে ; গ্রামে কোন বাড়ীতে তাঁদের নিমন্ত্রণ হলে—তাঁদের বসবার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হয়, কারণ তাঁরা বোর্ডিঙে জাতিবিচারটা বিশেষ মেনে চলেন না। এক রামজয় সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে বসে। এরা সাহেবদের সঙ্গে বাগান-পার্টিতে খেলেও মুসলমানদের সঙ্গে একসঙ্গে কখনও খান না—খাবেনও না। তবুও ইস্কুলের সেক্রেটারী পবিত্রকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি বল ? ইস্কুল থেকে করলে হয় না ?

পবিত্র চৈতন্যবাবুর মত ধনীর সন্তান হয়েও বিনয়ী, মিষ্ট মধুর স্বভাবের লোক, কিন্তু দুর্ব্বল ভীরু প্রকৃতির লোক, সে বলেছিল—আপত্তি হবে মাষ্টার মশায়।

শুধু তাই নয়, বলেছিল—আপনাকেও বারণ করছি। আপনি নিজে করবেন—এই প্রথম করবেন—তখন কোন বাধাবিপত্তির আশঙ্কা জোর করে টেনে আনছেন কেন ? কি গোলমাল হয়, কে করে তার ঠিক কি ?

চন্দ্রবাবু বিব্রত বোধ করেছিলেন।—বন্ধ করে দিতে বলছ ?

—না, তা বলি না। তবে হিন্দু মুসলমান জড়িয়ে এ সব করে কাজ কি ? একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—আপনি হিন্দু আপনার সমাজ নিয়ে করুন। না হয়—। না-হয় পৃথক পৃথক করুন। একদিন সব হিন্দু, একদিন সব মুসলমান।

ব্রজবিহারী বাবুর পত্র পেয়ে চন্দ্রবাবু সঙ্কল্পে দৃঢ় হলেন। একদিনেই সব করবেন এবং মাছ মাংস পোলাও ভাত এ সব উঠিয়ে দিলেন। পুজো সর্ব্বত্রই দিলেন। মহাপীঠে-মসজিদে পাঠালেন পুজো—সে সবই ফুলফল মিষ্টান্ন ধূপ ইত্যাদির উপচারে।

বকুবালা সতের বছরে পা দিয়েছে। বাপের মতই সে মাথায় একটু ঢেঙা হয়ে উঠেছে। তবে বেমানান ঠিক দেখায় না। দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণা মেয়েটিকে যেন ভালই দেখায়। চোখ দুটি ডাগর, মাথায় প্রচুর চুল, সাদা জমির কালা-পেড়ে শাড়ী পরে মুখে সলজ্জ স্মিত হাসি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চন্দ্রবাবু তাকে বলেছেন—লজ্জা করে ঘরে চুপ করে বসে থাকলে হবে না বকু। তোমাকে বেরিয়ে সকলকে প্রণাম করতে হবে, নমস্কার করতে হবে—অভ্যর্থনা করতে হবে। আজ তোমার ভবিষ্যতের পত্তন হয়ে যাক। এখানে আমি ছেলেদের হাইস্কুল করেছি। তুমি বি-এ পাস করে এখানে গার্লস হাই ইস্কুল করবে। পারবে ত ?

বকুবালা হেসে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—পারব বাবা।

ঠিক এই সময়েই ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ব্রজবিহারী-বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল - কই মাষ্টার মশায়। বকুবালা কই ?

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

দ্বিতীয় পর্ব

প্রেম

রবীন্দ্র-দর্শন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেছে সামান্যের মধ্যে, বিশেষের বৈশিষ্ট্য সেখানে অতিক্রান্ত। ব্যক্তি-মানসের ছোট বড় সুখ-দুঃখের কথা গোষ্ঠী-মানসের বৃহৎ পটভূমিতে এক অসামান্য মর্যাদা লাভ করেছে। যা একান্ত ব্যক্তিগত, তাই হয়ে উঠেছে সমষ্টির চেতনার অঙ্গীভূত। ঘটনার আকস্মিকতা নিত্য কালের সম্পদ হয়ে উঠেছে। এ হ'ল কবিপ্রতিভার জাদু। কবির চোখে নরনারীর মিলন-বিরহ এক নতুন মূল্য পেল। এ প্রেম দেহাতিরিক্ত, অতীন্দ্রিয় অনন্ত চক্রবলয়িত। এর সীমা নেই, শেষ নেই। দেহের তটে এ প্রেমের উদ্দাম ঊর্মিমালা বার বার আপনাকে উৎসর্গ করে না। দেহাভিমুখী প্রেমের সাময়িক শান্তি আছে। দেহবিমুখ প্রেম চির অশান্ত। লক্ষ্যহারা নিত্য চাওয়ার দুর্নিবারতায় এ প্রেমের অনন্তলীলা। অশ্রুত কোন এক গানের ছন্দে দুটি হৃদয় নিত্যকাল দোলায়িত—এ অদ্ভুত দোলার উৎস হ'ল দেহবিচ্ছিন্ন ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথের এই প্রেম-ধারণা প্লেতোনিক প্রেমের সমধর্মী। কবিগুরু এই প্রেমের কল্যাণ-ধর্মকে আবিষ্কার করেছেন। এই কল্যাণধারার স্রোতোপথ দুটি নরনারীকে ঘিরে রচিত হয় নি। সর্বমানবের কল্যাণ-কামনায় এ প্রেম অভিনিবিষ্ট। মানুষের তপস্যাপূত এই প্রেমধারা আপনাকে বিস্তার করে দেয় মানুষের সকল মঙ্গলকর্মে। প্রকৃতির মধ্যেও তার বিস্তৃতি ঘটে। তাই ত নরনারীর মিলন-লগ্ন আর প্রকৃতির পূর্ণতা-লগ্ন একই সময়ে আসে। ঋতুচক্রের আবর্তন-পথে প্রকৃতি যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে রূপে ও রসে, যখন বর্ণগন্ধের সমারোহে পূর্ণতার বার্তা ঘোষিত হয় বন থেকে বনান্তরে সেই লগ্নে নরনারীর মিলনও সম্ভব হয়। এ মিলন ত আকস্মিক, বিচ্ছিন্ন ও নিরর্থক নয়। বিশ্ববিধানের সঙ্গে এর নিগূঢ় যোগ আছে।

প্রেম আপনার আন্তর মাধুর্যে পাত্রপাত্রীকে সৃষ্টি করে, সৃজন করে তার পরিবেশ। কবির ভাষায় বলি—"প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে, নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনই করে অন্তরে-বাইরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে।" (মহুয়া কাব্যগ্রন্থ, ভূমিকা) প্রেমের প্রসাধনই ত ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ। প্রেমের বারণহীন প্রকাশ-ব্যাকুলতা অনির্বচনীয় রূপ-ঐশ্বর্যে আপনাকে ব্যক্ত করে। পুরুষের ক্লাসিক মনস্বিতার ইমারতে রোমান্টিক কল্পনার রং এসে লাগে। ব্যক্তি-মানস সাধন-সৌন্দর্যে প্রতিদিন সুন্দরতর হয়ে ওঠে—তার প্রসার ঘটে নব নব তপস্যার তীর্থপথে। নারী ধর্মে কর্মে সেবায় মাধুর্যে অনন্যা হয়ে ওঠে। পুরুষ বীর্যে, শৌর্যে ও ক্ষমায় অনন্যসাধারণ হয়। প্রেমের জাদু পুরনো কাঠামোয় নতুন মূর্তি গড়ে—তার রং, তার রূপ মনোহরণ করে মানুষের। এই নতুন সৃষ্টিটুকুকে পুরনো কাঠামোর সঙ্গে অসম্পৃক্ত বলে মনে হয়। সখ্যসন্ধানী দুটি প্রাণ বিনিসুতোর বাঁধনে বাঁধা পড়ে। এদের মধ্যে বন্ধনের বেদনা নেই। আবশ্যিকতার সামাজিক নাগপাশ কোথাও ক্ষুণ্ণ করে না এদের সহজ অস্তিত্বটুকুকে। পুলকসমৃদ্ধ কোন এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে হঠাৎ আলোর ঝলকানি এসে লাগে দুজনার চোখে—রঙীন হয়ে ওঠে সমস্ত বিশ্বসংসার। নারী ও পুরুষের জীবনে এই দুর্লভ মুহূর্তটি পরম কাম্য। জীবনের সবটুকু মধুর স্বাদ গ্রহণ করতে করতে লীলাচঞ্চল দুটি প্রাণ স্বগতোক্তি করে :

> "আমরা চকিত অভাবনীয়ের
>
> কচিৎ কিরণে দীপ্ত।" (মহুয়া, পৃঃ ৫৩)

অভাবনীয়ের অলোক আলোকদীপ্তি দুটি মানুষকে এক অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান দেয়। দেহের দাবী সেখানে নেই। আত্মার মিলনে দুটি মানুষের প্রেম সার্থক হয়। সার্থকতার সেই দুর্লভ লোকে আর সব মিথ্যা হয়ে গেছে। দুঃখ, মৃত্যু সবই সেখানে অসত্য। দুঃখতাপকে অনায়াসে তারা অস্বীকার করে। পুরুষের পৌরুষ আপনাকে সহস্র প্রকাশপথে ব্যক্ত করে। নারীর নয়নে যে শক্তির আশ্বাস তা-ই সঞ্চারিত হয় পুরুষের অস্থিতে, মজ্জায়। পরম নির্ভরতার সঙ্গে পুরুষ নারীর কানে কানে বলে :

> "ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
>
> ভিক্ষা না যেন যাচি,
>
> কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—
>
> তুমি আছ, আমি আছি।" (মহুয়া, পৃঃ ৫০)

এই প্রেমের স্থান বিলাসীর কল্পনাস্বর্গে নয়। দুঃখ-বেদনাদীর্ণ অসংগতি-কণ্টকিত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই প্রেমের প্রতিষ্ঠা। প্রতিদিনের জীবনসত্য এই প্রেমকে ম্লান করে না; বস্তুর সংঘাতে প্রেম আপাত উজ্জ্বলতর হয়। সত্যকে পরিহার করে অবাস্তব কল্পনাবিলাসে এ প্রেমের ঋদ্ধি নেই। জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রেমের

অনন্ত সম্ভাবনা ও পরম পরিণতি। দুঃখের তিমির রজনীতে পুরুষ কঠোর বীর্যে দুঃখ জয়ের সাধনা করে। সাধনায় কৃচ্ছ্রতা সে হাসিমুখে সহ্য করে যদি নারী তার পাশে এসে দাঁড়ায়, স্নেহে, প্রীতিতে, প্রেমে সে যদি পুরুষকে অনুপ্রাণিত করে। নারীর সঙ্গসুধা পুরুষকে শক্তি দেয়, আনন্দ দেয়। সঙ্গাতিরিক্ত কোন কামনা পুরুষ বা নারীর নেই। সাংখ্যের প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিলীলা চলে পুরুষের সান্নিধ্যে। সেই সান্নিধ্যটুকু প্রকৃতির অনন্ত সৃষ্টি-লীলার উৎস। রবীন্দ্রনাথও পুরুষ এবং নারীর প্রেমের সার্থকতার কল্পনা করেছেন এই সান্নিধ্যকে কেন্দ্র করেই। তার অতিরিক্ত কোন কিছু আবেদন এদের জগতে সত্য নয়। ফুলগন্ধমন্থর মধুযামিনীতে দেহসম্ভোগের আতিশয্য নেই। সে রাত্রে বাসকশয্যা রচিত হ'ল না। মিলন-বিহ্বল দুটি নরনারীর অসার্থক মিথুন-সম্ভোগ সার্থক প্রেমের অন্তরায়। তাই ত কবির 'পুরুষ ও নারী' তাদের ভালবাসাকে আস্বাদন করতে চায় জীবনের দুঃসহতম কাজের মধ্যে। রুক্ষ দিনের দুঃখ-দহনে তাদের প্রেমের পরীক্ষা হয়। তারা জয়ী হয় সেই পরীক্ষায়। দুটি প্রাণ পরস্পরকে আশ্রয় করে—একের মধ্যে অন্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কবির ব্যক্তিগত জীবনে আমরা মহুয়ার এই প্রেম দর্শনের ছায়াপাত লক্ষ্য করি। কবিপত্নীর অকাল মৃত্যুর পরে 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্মিনীর উদ্দেশে বেদনা-মধুর অপূর্ব কথায় এই দর্শনেরই প্রতিধ্বনি করে বললেন :

> "আজি আমি একা একা　　দেখি দুজনের দেখা
> তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—
> আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।" (প্রতিনিধি)

বিচ্ছেদজয়ী এই জীবনদর্শনই 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর। কবির মানসপুত্র বলে :

> "দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
> দোঁহারে দেখিছি দোঁহে—
> মরু পথ তাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
> ছুটিনি মোহন-মরীচিকা-পিছে-পিছে,
> ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে—
> এই গৌরবে চলিব এ ভবে
> যত দিন দোঁহে বাঁচি।
> এ বাণী প্রেয়সী,　　হোক্ মহীয়সী
> তুমি আছ, আমি আছি॥" (মহুয়া, পৃঃ ৫১)

দু'জনের চোখে দু'জনার জগৎ দেখার ইতিকথাই 'ও' প্রেমের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। এই প্রেম ব্যক্তিসত্তার আংশিক অবলুপ্তি ঘটায়। এই অবলুপ্তি কল্যাণকর কারণ এর মধ্যেই পুনরুজ্জীবনের অমোঘ মন্ত্র ঘোষিত হয়। একের ব্যক্তিসত্তা অপরের সত্তায় বিলুপ্ত হলে ব্যক্তি-জীবন আপেক্ষিক অমরত্ব লাভ করে। ব্যক্তিজীবনে এই অমরত্বটুকু আরোপ করার জন্যই প্রেম দুটি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ সত্তাকে অবলুপ্ত করে না। প্রেমের কাজ হ'ল উদ্দেশ্যবিহীন। প্রখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট শিল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, শিল্পেরও একটা উদ্দেশ্য আছে এবং তার স্বরূপ হ'ল 'purposiveness without a purpose'; শিল্পকলার যেমন উদ্দেশ্যটুকু উদ্দিষ্ট নয়, অনুক্ত, তার স্বরূপ অনির্দেশ্য ঠিক তেমনি করে প্রেমের লীলার যদি কোন গোপন উদ্দেশ্য থেকে থাকে দুটি নরনারীর মিলন সঙ্ঘটনে, তবে তা-ও হ'ল অনির্দেশ্য। জৈববাদীদের মত রবীন্দ্রনাথ এ কথা বললেন না যে, প্রেমের কাজ হ'ল বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা করা। সৃষ্টিকে রক্ষা করার মধ্যে যে স্থূলতা রয়েছে সেটা কারুকার ব্রহ্মার পক্ষে প্রশংসনীয় হলেও চারুকার মন্মথের পক্ষে তা-ই অপযশের। শিবলিঙ্গের পূজা আদিম মনকে অভিভূত করলেও আধুনিক মানুষের কাছে তার আবেদন ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সভ্যতার প্রথম পাদে সৃষ্টি ছিল মানুষের চোখে পরম বিস্ময়ের। সৃষ্টির স্থূলতা ও আদিম নগ্নতা তাদের কাছে অশ্লীল বলে মনে হয় নি। আধুনিক মননরীতিতে মনস্বী রবীন্দ্রনাথের কাছে সৃষ্টি রচনার এই তত্ত্বকথার আবেদন একেবারেই পৌঁছল না। তিনি প্রেমকে দেখলেন অকারণ অবারণ শক্তি হিসাবে। বিচিত্র পথে প্রেম সর্ব্বত্রগামী হয়েছে—তার লীলা চলে ভুবন থেকে ভুবনান্তরে। এর রহস্যময়তা বুদ্ধির অগম্য। প্রেম সার্থক তার লীলামাধুর্যে; বিধাতার সৃষ্টিকথার কাছে প্রেমের খবরদারী নেই। এর বাইরে কোন প্রশ্ন যদি করা হয়, যে কেন প্রেমের এই লীলা, তবে আমরা বলব যে, এ হ'ল 'অতিপ্রশ্ন'। মানুষের সাধারণ বুদ্ধির অগোচর এই প্রেমতত্ত্ব হ'ল অনির্বচনীয়। আমরা অনির্বচনীয় তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করছি তার কারণ এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

এই প্রেমের সত্তা অসঙ্গ স্বয়ং সম্পূর্ণ। এ হ'ল abstract বা অনাশ্রয়ী। নরনারীর হৃদয়াধার অতিক্রান্ত এই প্রেম বিদেহী, ভাবময়। এর সত্তায় অমরতার ইঙ্গিত। মহাসত্য হ'ল প্রেমের লক্ষণ; আংশিক আপেক্ষিক সত্য, যা আমাদের চারপাশের বাস্তব জগতে ছড়িয়ে রয়েছে, তা প্রেমের সত্য থেকে স্বতন্ত্র। বস্তুতন্ত্রে এই সত্যের হদিস মেলে না। স্বপ্নলোকের অধিবাসী হয়েও ধরণীর সব অপূর্ণতাকে প্রেমই পূর্ণ করে। তাই ত কবির মানস-কন্যা লাবণ্য অমিতকে দিয়েছিল এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের অমৃত আস্বাদ। তার কথা উদ্ধৃত করে দিই :

> "বিস্মৃত প্রদোষে
> হয় তো দিবে সে জ্যোতি,

হয় তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়।
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়
সে আমার প্রেম।"

প্রেমের অমরত্বায় কবি বিশ্বাস করেছেন, মানসনেত্রে অবলোকন করেছেন তার মৃত্যুহীন সম্ভাবনা। তাই প্রেমকে তিনি পৃথক, স্বতন্ত্র হৃদয়-অনাশ্রয়ী মহৎ সত্যের মর্যাদা দিয়েছেন। নরনারীর হৃদয় আশ্রয় করা প্রেমের পক্ষে একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। যদি মানব-হৃদয়ের সঙ্গে প্রেমের কোন আত্মিক, নিগূঢ়, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকত তা হলে তার অমরতার দাবিটুকু গ্রাহ্য হ'ত না। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমেরও শেষ হত। কেননা, যে হৃদয়ে প্রেমের অধিষ্ঠান তার বাস হ'ল মানুষের দেহে। প্রেম যদি দেহাশ্রয়ী কোন এক যৌগিক সত্তা হ'ত তবে তার বিনাশও স্বতঃসিদ্ধ হ'ত। তাই ত কবি প্রেমকে অসঙ্গ, অনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তারূপে কল্পনা করলেন। এইরূপ কল্পনা হ'ল যুক্তিসিদ্ধ। অবশ্য কবি ন্যায়শাস্ত্রের অনুশাসনের দিকে লক্ষ্য রেখে যে এই রূপকল্পনা করেছেন এ কথা আমরা বলছি না। কবির সর্বগ্রাসী বোধির আলোয় সত্য উদ্ঘাটিত হয়। তিনি তাঁর 'বাসরঘর' কবিতায় প্রেমের এই অবিনশ্বরতার কথা ঘোষণা করলেন :

"যায় নাই, যায় নাই
নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।"

কবিগুরুর প্রেমের ধারণা হ'ল আদর্শীভূত প্রেমের ধারণা। জীবনের সকল তুচ্ছতা ও মালিন্য মুক্ত এই প্রেম। বৃহদারণ্য বনস্পতি যেমন মাটির গভীর থেকে প্রাণ-পাথেয় সঞ্চয় করে আপনাকে আলোকের এবং বাতাসের সীমাহীন বিস্তারে প্রসারিত করে দেয় প্রেমও ঠিক তেমনি করেই জীবনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করে, জীবনাতীত অসীমতায় আপনাকে বিস্তার করে দেয়। এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কালের ব্যাপ্তির দ্বারা এই প্রেমের মূল্য নির্ণীত হয় না। প্রেম স্বয়ংসম্পূর্ণ এ কথা আমরা আগেই বলেছি। সুচিরকাল দু'জনা দু'জনকে ভালবাসলে তবেই সে প্রেমের সার্থকতা, এ বিশ্বাস হ'ল সাধারণ মানুষের। তারা কালকে প্রেমের সত্য নিরূপণের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে। কবি এই প্রত্যয়ের অংশভাগী হন নি। তাঁর চোখে প্রেমই প্রেমের মানদণ্ড। দার্শনিক যাকে 'End in itself' বলেন, প্রেম হ'ল মানব-জীবনের সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য। কালের ব্যাপ্তি, নরনারীর হৃদয়-আতিশয্য এ সবই হ'ল অতিরিক্ত। প্রেমের জগতে এরা আগন্তুক, অপরিচিত। তাই ত কবি এ কথা বললেন :

"চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল—
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক্ সেই চিরকাল ;
তার পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাব না আমি শপথ তোমার,"

এই চপল ছন্দ-মাধুর্যের পিছনে যে গভীর প্রত্যয়ের কঠোরতা আছে তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ প্রত্যয় ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তি অনুসারী। কাল এখানে নিরপরাধ দর্শকের ভূমিকায়। বোহেমীয় জীবনবাদ বুঝি এই ধরনের প্রেম-বাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। প্রয়োজন এখানে বাহ্য। অপ্রয়োজনের অতিরিক্ত রসরাজত্বে প্রেম সার্বভৌম। প্রমাদবশে আমরা জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থে প্রেমের বিচার করি। তাই তার সত্যস্বরূপ আচ্ছন্ন হয় ; হৃদয়-আতিশয্য ও দেহাসক্তি কখনও বা সাময়িক বিভ্রান্তি ঘটায়। তবু মেঘনির্মুক্ত সূর্যের মত প্রেম সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে স্বস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। কবি প্রেমের এই তিমিরজয়ী রূপ কল্পনা করলেন তাঁর মুক্তরূপ কবিতায় :

"আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপচ্ছায়া
মুগ্ধ চেতনার পরে রচে তার মায়া,
তাই নিয়ে ভুলাব কী আমার জীবন।
গাঁথিব কী বুদ্বুদের হার।
তোমারে আড়াল করে তোমার স্বপন
মিটাবে কী আকাঙ্ক্ষা আমার॥
বিরাজে মানব শৌর্যের সূর্যের মহিমা,
মর্ত্যে সে তিমিরজয়ী প্রভু—
অজেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম্ম নহে কভু।" (মহুয়া, পৃঃ ৮৩)

এই প্রেমেই নারী জীবনের চরম সার্থকতা, পরম পরিসমাপ্তি। পুরুষের জন্মগত অধিকার হ'ল নারীর প্রেমে। নারী নিঃশেষে আপনাকে উৎসর্গ করে তার প্রিয়তমের কাছে। তার সত্তার অবলুপ্তি ঘটে ; পুরুষসত্তায় সে বিলীন হয়। নারীর যা কিছু মহৎ, যা কিছু শ্রেষ্ঠ সবই সে তার প্রেমাস্পদকে উৎসর্গ করে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। এই আত্ম-বিলোপই হ'ল প্রেমের ধর্ম। প্রেমের বোধন হয় ত্যাগে ; প্রেম নারীকে স্বর্গের সব দাক্ষিণ্যটুকু পুরুষের পায়ে অঞ্জলি দিতে উদ্বুদ্ধ করে। এই আত্মদানেই নারী পুরুষকে জয় করে। প্রেমের পরম লগ্নে নারী প্রাণের অনন্ত উপহারটুকু তার দয়িতকে নিবেদন করে বলে :

"কণ্ঠহারে
গেঁথে দিব তারে
যে দুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাত সম।
পায়ে দিব তার
যে এক মুহূর্ত আসে প্রাণের অনন্ত উপহার।" (মহুয়া, পৃঃ ২৩)

এই প্রাণের অনন্ত উপহারটুকু পূর্ণ প্রাণের স্রোতে উপজিত হয়। এ সম্পদ হ'ল ভিতরের; নারীর মর্মমূলে তার বাস। সে উৎসের সন্ধান একমাত্র নারীই জানে। নারী কামনা করে তার দান সাগ্রহে পুরুষ গ্রহণ করবে। তবেই সার্থক হবে তার প্রেমের তপস্যা। কবির মানস-কন্যার মর্মকথাটি নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলিতে অভিব্যক্ত হয়েছে:

"নব বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণী হিল্লোল উঠে প্রভাতের
স্বর্ণকূলে।
আমার দেহের বাণীতে সে দোল
উঠিছে দুলে,
এ বরণ-গান নাহি পেলে মান
মরিব লাজে—
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম
ছন্দ বাজে।" (মহুয়া,)

নারীর এই ঐকান্তিক প্রেম ব্যর্থ হয় না কেননা পুরুষও যে নারীর পরিপূর্ণ প্রাণের প্রসাদ প্রত্যাশী। মানুষের অসংবেদনশীল মনের তির্যক কটাক্ষ তাকে প্রতিপদে ব্যথিত করে। সমাজের অসংখ্য অকরুণ বিধিনিষেধ তার প্রতিভাকে অসংলগ্ন বলে, অস্বীকার করে তার তপস্যাকে। তার শক্তি, তার চারিত্রসত্তা সংসারের ঘূর্ণিপাকে বিপর্যস্ত হয়। সে তখন প্রত্যাশা করে তার দয়িতাকে। তার কাছে সে সান্ত্বনা চায়, চায় তার ব্যর্থ পৌরুষের স্বীকৃতি। নতুন প্রেরণায় সে অনুপ্রাণিত হতে চায়; তার মানসীর কল্যাণস্পর্শে সে ধন্য হতে চায়। সুনিবিড় চাওয়ার প্রত্যাশানিবিড় মুহূর্তটি মিলনের প্রাক্-মুহূর্ত। নারী যখন তার বরণডালা নিয়ে পুরুষের হৃদয়ের বারমহলে দ্বিধাজড়িত আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করে তখন পুরুষও জীবনের ব্যর্থতাকে ভোলার জন্য অন্তরে অন্তরে তার রমণীর আগমন প্রতীক্ষা করে। উভয়ের প্রতীক্ষাই সার্থক হয়, প্রত্যাশা পূর্ণ হয়। তাদের মিলন হয়, নারীর আত্মনিবেদনের ধারা ধন্য হয়। পুরুষ পরম প্রাপ্তির স্পর্শে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পুরুষ নারীকে বলে:

"তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে।
অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্য প্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।"

পুরুষের এই নারী-বন্দনা দেবী-বন্দনার মতই শান্ত ও সুন্দর। কামনাকলুষহীন পুরুষচিত্ত পরম রমণীকে আবিষ্কার করেছে তার প্রিয়ার মধ্যে। প্রেমই সম্ভব করেছে পুরুষের চোখে নারীর এই অতিমানবীয় রূপ-কল্পনা। এই বরাভয়-দাত্রী প্রেয়সী রমণীর জন্য পুরুষের তপস্যার শেষ নেই, তার প্রত্যাশার বিরাম নেই। পুরুষের ক্লান্তি, বেদনা, দুঃখ, নৈরাশ্য—এ সবই দূর হয়ে যাবে তার প্রিয়ার পবিত্র স্পর্শে, এ কথাই পুরুষ যুগে যুগে বিশ্বাস করে এসেছে। পুরুষের প্রেমপবিত্র দৃষ্টি নারীকে দেবীমাহাত্ম্য দান করেছে। এই বরাভয়দাত্রী দেবীর কাছে পুরুষের অনন্ত প্রত্যাশা। আবার পুরুষের প্রেম নারীকে সৃষ্টি করে; শৌর্য-স্নাত যে প্রেম পুরুষ দিতে পারে তার জন্য নারীর সমগ্র সত্তা উন্মুখ। নারী সর্বদেহে মনে পুরুষের প্রেম-স্পর্শ কামনা করে। পুরুষের প্রেমেই নারীর সত্য পরিণতি, যথার্থ মর্যাদা। যদি নারী তার দয়িতের কাছে শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করে তবেই সে পূর্ণ হয়, সে ধন্য হয়। তাই কবির মানসকন্যা বলে:

"সত্য যদি হই তোমা কাছে
তবে মোর মূল্য বাঁচে—
তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।
প্রেম তব ঘোষিবে তখন—
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার।" (মহুয়া, পৃঃ ৩৩)

নারীর এই আজন্ম প্রতীক্ষার পূর্ণ ফল পুরুষ যুগে যুগে দিয়েছে তার সর্বস্ব ত্যাগ করে। নারীত্বকে পুরুষ দিয়েছে দেব-দুর্লভ সম্মান। পুরুষের প্রেমে নারীর যে রূপান্তর ঘটেছে, তার সত্যমূল্য পুরুষের চোখে ভাস্বর। নারী তার খবর রাখে না। পুরুষের প্রাণের বিরাট বিস্তৃতিতে প্রেমের মন্ত্রে নারীর রাজেন্দ্রানীর মতই অভিষেক হয়েছে। তার সুচির সঞ্চিত আশা পূর্ণ হয়েছে। এদিকে পুরুষও আবার নারীর প্রেমে তার পরম আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছে। কত পুরানো ঘর ভেঙেছে, আবার গড়ে উঠেছে কত নতুন ঘর। পুরুষের শক্তি নারীর ইঙ্গিতে নিয়োজিত হয়েছে এই ভাঙা-গড়ার খেলায়। পুরুষ ও নারীর এই পারস্পরিক মিলন-অভীপ্সা কোনদিনই পরস্পরের প্রত্যাশাকে ব্যর্থ হতে দেয় নি। নিঃসঙ্গ জীবনের মর্মান্তিক বেদনা তখনই দুঃসহ হয়ে ওঠে যখন মানুষ ভরা মনে বসে থাকে দেবার প্রত্যাশায় অথচ নেবার মানুষ তখনো অনাগত। প্রেমের ফাঁদ পাতা বিশ্ব-ভুবনে। দুটি প্রাণের এই চরম নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে প্রেমের দেবতা আসেন ফুলরথে, পুষ্পধনুতে শরযোজনা করেন; প্রেমমুগ্ধ পুরুষ ও নারীর মিলন হয় বিশ্বভুবনের একটি অসীম কোণে। সেখানে যুগল প্রাণের পদ্মাসন পাতা হয়, প্রেমের অভিষেক ঘটে দুটি প্রাণের সঙ্গম-তীর্থে।

সৎপণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী

(মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত গ্রন্থকার)

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

বাংলার বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর প্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন পরগণার রাজবংশের আশ্রয়ে বহুতর বিদ্যাসমাজ মেদিনীপুরে বিদ্যমান ছিল এবং অধ্যাপকশ্রেণী ব্যতীত বহু গ্রন্থকার নানা শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করিয়া বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ও সংস্কৃত গ্রন্থের বিষয়ে বর্ত্তমানে কাহারও বিশেষ গৌরব বোধ নাই এবং তাহাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র গবেষণা হয় নাই। আমরা দিগ্‌দর্শন স্বরূপ মেদিনীপুরের সমুজ্জ্বল রত্ন-স্থানীয় গোপাল চক্রবর্ত্তীর পরিচয়াদি ও গ্রন্থরাজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া মেদিনীপুরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের এই তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের প্রতি তরুণ গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গ্রন্থপঞ্জী: গোপাল চক্রবর্ত্তীর নাম বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র চণ্ডীর টীকাকার রূপে সুপরিচিত। এই টীকা বটতলার কৃপায় বহুকাল হইল মুদ্রিত হইয়া সুপ্রাপ্য হইয়াছে—সুতরাং ইহার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। বঙ্গদেশে নিত্যপাঠ্য দেবীমাহাত্ম্যের বহুতর টীকা রচিত হইয়াছে—আমরা ২০।২৫টি বাঙালী রচিত টীকা দেখিয়াছি। তন্মধ্যে গোপাল চক্রবর্ত্তীর (১) তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। মধ্যযুগে বাঙলার গুণগ্রাহী পণ্ডিতসমাজে বাঙলার এক প্রান্তে বসিয়া রচিত এই টীকা সমুচিত সমাদর লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীর দার্শনিক তত্ত্বসমূহের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা রচনা করিয়া গোপাল চক্রবর্ত্তী চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পূর্ব্বতন টীকাকার বিদ্যাবিনোদের ব্যাখ্যা গোপাল বহুস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং একস্থলে (মসী কজ্জলবিকার ইতি) "বিদ্যাবিনোদ-বিদ্যাভূষণৌ" বলিয়া এক অজ্ঞাত টীকাকারের নাম করিয়াছেন। আমাদের ধারণা "পূর্ব্বগ্রামী" রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় নানা গ্রন্থকার মহাপণ্ডিত বিদ্যাবিনোদও মেদিনীপুরনিবাসী ছিলেন—এ বিষয়ে সমুচিত গবেষণা হওয়া আবশ্যক। গোপাল কর্ত্তৃক উদ্ধৃত "উৎকলদেশীয়" পাঠ, মন্ত্রকৌমুদীব্যাখ্যানং, রায়মুকুটপঞ্জিকা প্রভৃতি লক্ষণীয়। টীকার শেষে গোপাল বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার সামাজিক প্রতিষ্ঠা সূচনা করিয়াছেন। যথা,

> আসীদ্ বন্দ্যকুলোজ্জ্বলো গয়ঘড়ী শ্রীমান্ হিরণ্যঃ কৃতী
> চত্বারস্তনয়াস্ততঃ সমভবন্ যেষামনন্তো ঽগ্রজঃ।
> খ্যাতো যোঽপ্যপরঃ শিবঃ শিব ইব প্রাবেব তস্যাত্মজৌ
> জাতৌ জ্ঞানমহেশ্বরৌ দ্বিজবরৌ দুর্গাভিধো জ্ঞানজঃ॥
> দুর্গাদাসসুতঃ শ্রীমান্ গোপালঃ কৃতিনাং বরঃ।
> অকরোচ্চণ্ডিকাটীকামেতাং তত্ত্বপ্রকাশিকাম্॥

পরে এই বংশ পরিচয় আলোচিত হইল।

গোপাল বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—চণ্ডীটীকা ব্যতীত সমস্তই এখন বিলুপ্তপ্রায়। আমরা একটি সূচি সঙ্কলন করিয়া দিলাম। সেকালে প্রবাদ বাক্য ছিল "অব্যাকরণকস্তন্ধঃ"—শাস্ত্রচর্চ্চার প্রথম সোপানেই ব্যাকরণগ্রন্থ নিপুণভাবে অধ্যয়ন করিতে হইত। নতুবা পাণ্ডিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না। গোপাল সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ "কবিচন্দ্র" নামক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া তদুপরি (২) "সারার্থদীপিকা" নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন। টীকাটি গোপাল নামে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বৎসমাজে এক সময়ে প্রচারিত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্ধিপাদের একটি খণ্ডিত পুথি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা কারক, সুবন্ত ও সমাসপাদের "গোপাল" সংগ্রহ করিয়াছি—টীকাটি বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অভিরাম, ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতির ব্যাখ্যার সহিত তুলনা করিয়া পড়া আবশ্যক। সমাসপাদের পুষ্পিকা উদ্ধারযোগ্য :—

> ইতি শ্রীকবিচন্দ্রাঙ্ঘ্রি রজোরঞ্জিতমস্তকঃ।
> অকরোদ্দ্বিজগোপালঃ সমাসটিপ্পনীং মুদা॥

ইতি বিবিধবিদ্যাবিশারদশ্রীকবিচন্দ্রচরণারবিন্দদ্বন্দ্বমৌলিন্দবন্দ্যঘটীকুলোদ্ভবশ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং সারার্থদীপিকায়াং সপ্তমঃ সমাসপাদঃ সমাপ্তঃ। টীকার বহুস্থলে কবিচন্দ্রের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইয়াছে—তন্মধ্যে কতিপয় কারিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(৩) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত সাত্তকাণ্ড অধ্যাত্মরামায়ণের উপর গোপালরচিত বালবোধিনী টীকার সম্পূর্ণ পুথি এসিয়াটিক সোসাইটীতে এবং খণ্ডিত পুথি লণ্ডনে আছে। গ্রন্থশেষে স্পষ্ট পরিচয় থাকাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই :

> দুর্গাদাসসমাহ্বয়োঽভবদথো জ্ঞানাত্মজস্তৎসুতঃ
> শ্রীগোপালধরামরঃ সমতনোৎ টীকামিমাং সম্মুদে॥

গোপাল এই দুরূহ গ্রন্থের দার্শনিক তত্ত্বের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া স্বকীয় সম্প্রদায়সঙ্গত স্বরস পরিব্যক্ত করিয়াছেন—তিনি অদ্বৈতবাদী হইয়াও পরম ভক্ত ছিলেন।

যথা গ্রন্থশেষে,

> প্রীয়তাং রামচন্দ্রো মে কর্ম্মণানেন নিত্যদা।
> ময়া তু তস্য সংপ্রীত্যৈ কৃতমেতন্ন কীর্ত্তয়ে॥
> বক্তা যস্য শিবঃ স্বয়ং শ্রুতিময়ী শ্রোত্রী চ সা পার্ব্বতী
> বেদান্তাগমবেদসারমমলং যদ্দ্বৈতধীশোধনম্।
> তদ্ব্যাখ্যানকথাসু কোঽস্মি জড়ধীর্হাস্যায় তন্মে ততঃ
> কিন্তু শ্রীরঘুনাথপুণ্যচরিতাৎ পাপক্ষয়ে মচ্ছ্রমঃ॥

টীকাটিতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত আছে তন্মধ্যে বিষ্ণুস্বামী ও বেদান্তসার-কারের নাম উল্লেখযোগ্য। পুষ্পিকায় "সৎপণ্ডিত" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। (৪) গোপাল-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যালেশ-টীকার সম্পূর্ণ পুথি লণ্ডনে আছে (পত্র সংখ্যা ৮৬)। দুইটি পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—

> ইতি তৃতীয়স্কন্ধস্য ব্যাখ্যালেশো যথামতি।
> গোপালশর্ম্মণাকারি গোপালতোষহেতবে॥
> এবং চতুর্থস্কন্ধস্য পদ্যানাং তু কচিৎ কচিৎ।
> গোপালশর্ম্মণাকারি ব্যাখ্যানং তু যথামতি॥

এই সংক্ষিপ্ত টীকায় ভাগবতের দার্শনিক তত্ত্ব বেদান্তের অদ্বৈতবাদ-সম্মত বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কিত স্থলসমূহেরই ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে। আমরা টীকাটির প্রথম ৯ পাতা মাত্র এক স্থানে দেখিয়াছিলাম—শ্রীধরস্বামী ব্যতীত মধুসূদন সরস্বতী ও জীব গোস্বামীর বচন তন্মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য না থাকিলে অধ্যাত্মরামায়ণ বা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় দুরূহ গ্রন্থের টীকা রচনা করিতে কেহ অগ্রসর হয় না। ব্যাখ্যাংশের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য :

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥

গোপাল প্রথমেই শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত গৌড়ীয় পুস্তকে উপলভ্যমান আদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহা কোন টীকাকারই ধরেন নাই :

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি, পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা, তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশকায়॥

[এতৎ পদ্যং টীকাকৃতাব্যাখ্যাতত্বাৎ "গায়ত্র্যা চ সমারম্ভ" ইতি পুরাণবিরুদ্ধত্বাচ্চ শ্রীভাগবতস্য ন, কিন্তু গৌড়ীয়পুস্তকস্যাদৌ সর্ব্বত্র বিদ্যত ইতি ব্যাখ্যায়তে।]

(৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মেদিনীপুরের অন্তর্গত "যদুপুর" নিবাসী রাজেন্দ্রলাল গোস্বামীর গৃহে ১৬৩২ শকাব্দে অনুলিখিত গোপাল-রচিত "জ্যোতীরত্ন" গ্রন্থের সন্ধান পান—ইহার পত্রসংখ্যা ১৫৪। প্রারম্ভে আছে :

বরাহাদিকৃতান্ গ্রন্থানালোক্য বহুশো ময়া।
নিরূপ্যন্তে কর্ম্মকাণ্ডঃ সবিশেষং সতাং মুদে॥

সৌভাগ্যবশতঃ গ্রন্থশেষে রচনাকাল লিখিত আছে :—

বেদাঙ্কবাণাবনিসংমিতেঽব্দে
শাকে দিনেশে প্রমদাং গতে চ।
গোপালশর্ম্মা সমপূরি শাস্ত্রং
মিদং মুদা রূপবতী (-তনুজঃ)॥

অর্থাৎ ১৫৯৪ শকাব্দের আশ্বিন মাসে (১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে) ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেই "সারার্থদীপিকা" এবং অন্যান্য বহু টীকা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কারণ, প্রারম্ভের একটি শ্লোকে লিখিত হইয়াছে :

শব্দাগমং সুনিপুণং কবিচন্দ্রপাদাৎ
যোঽধীত্য তত্র × × × স্বয়কং ব্যতানীৎ।
কাব্যাদিশাস্ত্রনিবহেষু তথা × × ×
যঃ সর্ব্বদা ব্যরচয়ৎ বহুশস্ত পঙ্ক্তান্॥

দুঃখের বিষয়, গোপাল-রচিত কোন কাব্যাদির টীকা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কেহ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পুথি ঘাটিয়া আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহার সম্ভাবনা কম।

(৬) রূপগোস্বামীর হংসদূতের উপর গোপাল চক্রবর্ত্তীর টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তাহাতে রচনা কালও লিখিত ছিল—কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা তাহার বিবরণ লিখিতে অপারক।

(৭) গীতগোবিন্দের উপর "অর্থরত্নাবলী" নামে উৎকৃষ্ট টীকা শেষ বয়সে গোপাল রচনা করিয়াছিলেন—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উলায় (অর্থাৎ বীরনগরে) একটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করাইয়াছিলেন (পত্রসংখ্যা ১২২)। ইহার মনোহর মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি জয়দেবের অনুকরণ :

স্বস্বক্ দ্যুতিভির্জিতঃ শশধরো মালিন্যমুদ্রাঙ্কিতো
মন্দং মন্দমুদেতি ভামিনি ধিয়া ব্রীড়াগতো দৃশ্যতাম্।
ইত্থং চাটুকথাসু দত্তহৃদয়ামালিঙ্গ্য রাধাং চিরং
চুম্বন্ প্রেমরসাবশাং হরিরসৌ পায়াদপায়াম্মুদম্॥

ইহারও শেষে রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

নবাঙ্কবাণেন্দুমিতে শকাব্দে, মাসে মধৌ চণ্ডকরস্য বারে।
টীকামিমাং রূপবতীতনূজো, গোপালশর্ম্মা ব্যতনোৎ সমগ্রাম্॥

অর্থাৎ ১৫৯৯ শকাব্দে চৈত্র মাসে (১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

কুলপরিচয় : গোপাল তাঁহার সমস্ত রচনায় নিজের কুলপরিচয় "গয়ঘড়-বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব" সমুজ্জ্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং পৃথক শ্লোকে তাঁহার পিতৃপিতামহাদির নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, চণ্ডীটীকার শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—অর্থরত্নাবলীর শ্লোকটিও উদ্ধৃত হইল :

আসীদ্বন্দ্যকুলোজ্জ্বলো গয়ঘড়ী ধীমান্ হিরণ্যাভিধঃ
তৎসূনুঃ শিব ইত্যভূচ্ছিবসুতো জ্ঞানাহ্বয়োঽস্তুতঃ।
দুর্গাদাস ইতি প্রমোদবসতিস্তস্যাত্মজো যঃ কৃতী
গোপালঃ কিল তেন নির্ম্মলধিয়া টীকা কৃতেয়ং মুদা॥

এতদ্দ্বারা গোপালের বংশকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। হিরণ্য একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী পৃ. ১২১ দ্রষ্টব্য)—তিনি আদি কুলীন মহেশ্বরের অধস্তন দশম পুরুষ। নামমালা এই : মহেশ্বর—মহাদেব—দুর্ব্বলি—অনন্ত—নন্দন—বনমালী—পদ্মনাভ—সুধাকর—বাসু—হিরণ্য। নন্দন সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন (পৃঃ ১৩) :—

তৎপুত্রঃ কুলভূষণো বহুধনো দানৈককল্পদ্রুমো
জাতঃ শাস্ত্রবিশারদো গয়ঘড়ী শ্রীনন্দনো নামতঃ।

শান্তিপুরের নিকটে গয়ঘড় নামে গ্রাম আছে—তাহাই এই সুবিখ্যাত বংশধারার আদিস্থান বলিয়া ধরা হয়। হিরণ্যের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম কুলগ্রন্থানুসারে "আনাক্রি"—তাহার বিশুদ্ধ রূপ ধ্রুবানন্দের মতে অনিরুদ্ধ ("অনিরুদ্ধশ্চ তপনো বিদ্যানন্দঃ শিবাখ্যকঃ" পৃঃ. ১২১) এবং গোপালের মতে অনন্ত। সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিবানন্দের জন্মকাল অনুমান ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ধরা যায়। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানের সম্বন্ধে ঘটককেশরীর কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে (গয়ঘড় প্রকরণ ৬।১ পত্র) :

জ্ঞানস্য ব্রাহ্মণভূমিনিবাসিনঃ রাজ্ঞঃ কন্যাবিবাহঃ।

জ্ঞানের একমাত্র পুত্র দুর্গাদাসই সম্ভবতঃ দৌহিত্রসূত্রে ব্রাহ্মণভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা রাজা রঘুনাথের রাজত্বকালে (১৫৭৩-১৬০৩ খ্রীঃ) হইয়া থাকিবে এবং গোপাল চক্রবর্ত্তীর

আবির্ভাবকাল নিঃসন্দেহে ১৬০০-১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করা যায়। গোপালের মাতার নাম ছিল "রূপবতী"।

অধস্তন বংশধারা : আমরা বর্দ্ধমান অঞ্চলের একটি কুলপঞ্জীতে গোপাল চক্রবর্ত্তীর সম্পূর্ণ বংশাবলী পাইয়াছিলাম—তন্মধ্যে কাহার কয় কন্যা ছিল এবং কোন বংশে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল তাহাও লিপিবদ্ধ আছে। সংক্ষেপে এই বংশাবলী উদ্ধৃত হইল। গোপাল চক্রবর্ত্তীর তিন পুত্র ও দুই কন্যা—কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল যথাক্রমে অগ্রদ্বীপ চট্টবংশীয় রামকৃষ্ণসুত মধু ও খড়দহ মুখবংশীয় গোপীরমণ সুত রামজীবনের সহিত।

১) গোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দরাম বিদ্যালঙ্কার—তাঁহার ধারায় পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রব্যবসায় দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। নন্দরামের তিন পুত্র—মথুরেশ বিদ্যাবাগীশ, ত্রিলোচন সার্ব্বভৌম ও রামরাম। রামরামের দুই পুত্র কামদেব ও বাসুদেব—উভয়েই নিঃসন্তান। মথুরেশের চারি পুত্র মহাদেব সিদ্ধান্তবাগীশ, রামদেব, মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চানন ও কৃত্তিবাস—রামদেব ভিন্ন সকলেই অপুত্রক ছিলেন। রামদেবের তিন পুত্র জয়দেব (নিঃসন্তান), বিজয়রাম ও বংশের শেষ পণ্ডিত ভোলানাথ বাচস্পতি (অপুত্রক)। বিজয়রামের পুত্র দাশরথি, তৎপুত্র "ভৈরবীচরণাদয়ঃ"—গোপালের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাঁহারা প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

২) গোপালের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দরাম বাচস্পতি। তাঁহার দুই পুত্র কমলাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র রামচন্দ্র নিঃসন্তান। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র দয়ারাম, তৎপুত্র সার্থকরাম, তৎপুত্র রামনারায়ণ ও রূপনারায়ণ (গোপালের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ)।

৩) গোপালের কনিষ্ঠ পুত্র ভবানী সিদ্ধান্ত—তাঁহার পাঁচ পুত্র প্রাণবল্লভ, রমাবল্লভ (নিঃসন্তান), রামেশ্বর (নিঃসন্তান), কাশীশ্বর ও সদারাম। প্রাণবল্লভের দুই পুত্র ঘনশ্যাম ও সিদ্ধেশ্বর উভয়েই নিঃসন্তান। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর সদারামের এক পৌত্র দুর্গাপ্রসাদকে দত্তক গ্রহণ করেন। কাশীশ্বরের পুত্র শত্রুঘ্ন নিঃসন্তান। সদারামের পুত্র দেবীচরণ—তাঁহার দুই পুত্র রামজয় ও (সিদ্ধেশ্বরের পোষ্যপুত্র, দুর্গাপ্রসাদ। বাহুল্যবোধে কন্যাদের বিবরণ পরিত্যক্ত হইল। কুলপঞ্জীটিতে ইহাদের বাসস্থান লিখিত আছে—"এতে বহুপুর-নিবাসিনঃ।" এই বহুপুর ব্রাহ্মণভূম পরগণায় অন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম। তথায় গোপালের বংশধারা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

বর্ষায়

শ্রীকালিদাস রায়

এসেছে বরষা দলিতাঞ্জন-বিগলিত ধারা ঝরিয়া পড়ে
নব ঘনরূপ রামের নয়নে সীতাশোকে যেন অশ্রু ঝরে।
আজি ছাপাছাপি নদনদী-বাপী সলিল ধারায় ভরিয়া যায়,
পম্পার তীরে চিত্ত ধায়।

শিহরি উঠেছে কদম্ববন, পবনে কেতকী গন্ধ ভাসে
আমার উটজ অজন পত্রে গৈরিক তরু কুটজ হাসে।
জম্বুবনের পানে চেয়ে চেয়ে মন ছুটে যায় বিন্ধ্য শিরে।
ঘুরিয়া বেড়ায় রেবার তীরে।

রজনী তিমিরে গুণ্ঠিত আজি বজ্রকণ্ঠে জলদ মাতে।
চপলা-চমকে মাঝে মাঝে বটে, দ্বিগুণিত হয় আঁধার তাতে।
মন ছুটে যায় উজ্জয়িনীর পুরপথে হাতে ধরিয়া বাতি,
অভিসারিকার হইতে সাথী।

মেঘৈর্মেদুর অম্বর আজি মাঝে মাঝে জাগে ইন্দ্রধনু
মনে হয় শিখিপুচ্ছ-মৌলি গগনে শোভিছে শ্যামের তনু।
মন ছুটে যায় যমুনার কূলে কদম্ববনে সে ব্রজধামে,
যেথা রাধা শোভে কানুর বামে।

বক্ষা পাথারে প্লাবিয়া দুকূল কল কল বয় হৈমবতী
মনে হয় যেন উমার বিরহে কাঁদিয়া ভাসায় মেনকা সতী।
কৈলাশ হ'য়ে মন ছুটে যায় যেথা কাঁদে গিরিরাজেশ্বরী
উমার বারতা বহন করি।

আমার ভারত কাব্য ভারত যুগে যুগে আমি তাহার কবি
জাতিস্মারিকা বরষায় হেরি শত জনমের স্বপন ছবি।
যুগে যুগে রুত সঙ্গীত কত ঝঙ্কার আমার তৃষিত শ্রুতি
বরষা আমার স্মৃতির দূতী।

বুদ্ধের মস্তক (চুনাপাথরের। গান্ধার হইতে : ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী)

মায়াদেবী—বুদ্ধের জন্ম (পাথরের)

মায়াদেবীর স্বপ্ন (পাথরের মূর্ত্তি। ভারহুত ঃ সুঙ্গ যুগ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দী)
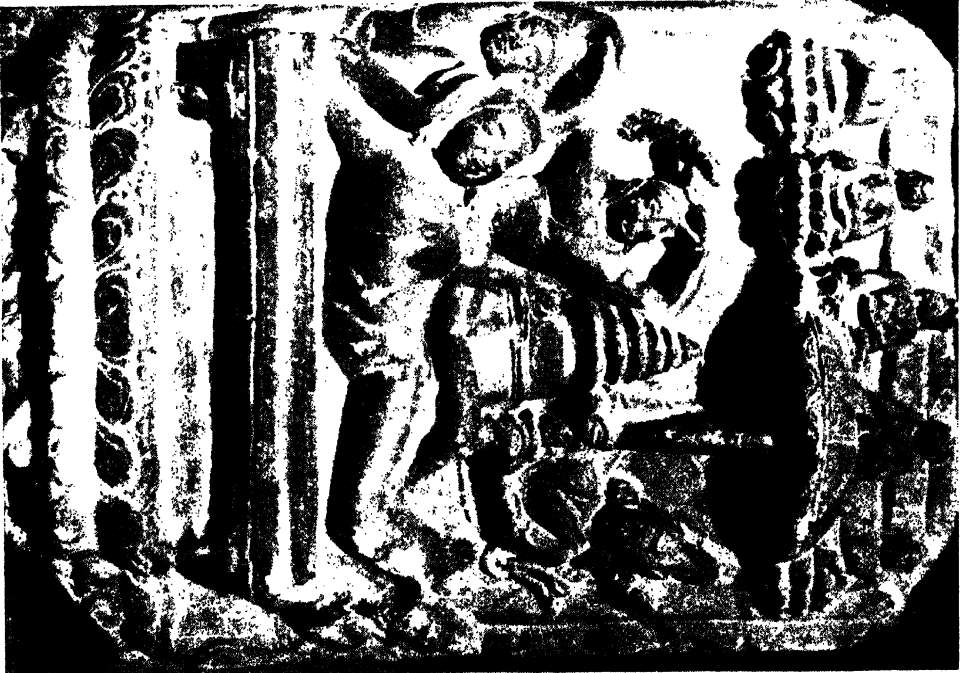
মহাপরিনির্ব্বাণ (পাথরের মূর্ত্তি। বঙ্গদেশ ঃ ১০ম শতাব্দী)

মানুষ

শ্রীসুভাষ সমাজদার

[প্রৌঢ় শিক্ষক জিতেন চক্রবর্তীর বৈঠকখানা। দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও সারদা দেবীর ছবি। ছবি দুটোর ফ্রেমে বেলিফুলের দুটো মালা জড়ানো রয়েছে। একটা টেবিলের দুই পাশে দুটো চেয়ারে বসে আছেন জিতেনবাবু ও তাঁর দেশসেবক আদর্শবাদী কনিষ্ঠ ভাই সত্যেন]

জিতেন। কৈ রে সত্যেন, রাত আটটা বেজে গেল, তবুও গৌরদাস তো এল না? রজনী মোক্তারেরও পাত্তা নেই!

সত্যেন। আচ্ছা দাদা, তোমরা কি গৌরদাসের চালচলনে ভগবানের বিভূতি দেখতে পেয়েছ?

জিতেন। আরে গৌরদাসকে তুই তো চিনিস। আমাদের পাশের গ্রাম পতিরামের কেশব মালাকরের ছেলে গৌরদাস—

সত্যেন। ও! গৌর! সে তো ছোটকালে আমাদের বাড়ীতে আসত। আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট—

জিতেন। হ্যাঁ, আমিও একটু অবাক হয়েছি। শুনলাম, গৌরদাস না কি কৃষ্ণনাম শুনলেই বিভোর হয়ে যায়। কীর্ত্তন গাইতে গাইতে ওর চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। তাই ত ওকে আজ আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে আসতে বলেছি।

(প্রতিবেশী গৌরদাসের ভক্ত দেবেন প্রামাণিক ও হরেন সাহার প্রবেশ)

দেবেন। (জিতেনকে) কি ঠাকুরকর্ত্তা, বালক-সাধু গৌরদাস এখনও আসেন নি?

জিতেন। আরে! দেবেন হরেন এসেছ? এস, এস গৌরদাস এখুনি এসে পড়বে। দুজন লোক পাঠিয়েছি তার আশ্রমে—

দেবেন। হরি! হরি! বুঝলেন ঠাকুরকর্ত্তা, নদীয়ার নিমাই যিনি, তিনিই স্বয়ং গৌরদাসের ভেতরে কায়া ধরেছেন। মহাপ্রভুর সব লক্ষণ হুবহু মিলে যায়।

সত্যেন। আমার মনে হয় দেবেন কাকা, রজনী মোক্তারই ওকে ভগবান বানিয়ে তুলেছে। ঐ বয়সে কত ছেলেরই কত রকমের বাই থাকে।

হরেন। চুপ কর ছোট ঠাকুরকর্ত্তা, তুমি একটা ঘোরতর নাস্তিক। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছয় সাত বৎসর বয়স থেকে সমাধিস্থ হতেন, তন্ময় হয়ে শিবপূজা করতেন, এগুলো বুঝি সব কাঁচা বয়সের ছেলেরাই করে? যা বলবে, ভেবে বল কর্ত্তা।

দেবেন। সত্যি ছোট ঠাকুরকর্ত্তা, তোমার কথাবার্তার কোন মাথামুণ্ড নেই। এই বয়সে গৌরদাস কেমন সুন্দর কীর্ত্তন গায়—কেমন সুরেলা গলা! প্রাণ মন যেন একেবারে উজাড় করে ঢেলে দেয় গানে।

জিতেন। হ্যাঁ আমিও শুনেছি, কীর্ত্তন গাইবার সময় ওর নাকি ভাব হয়, ভক্তরা হুড়োহুড়ি করে পায়ের ধুলো নেয়।

দেবেন। আপনি বোধ হয় জানেন না ঠাকুরকর্ত্তা, রজনী মোক্তারই ত গৌরদাসকে আবিষ্কার করলেন। ওর বাপকে ডেকে বললেন, এ ছেলে সামান্য নয়। পূর্ব্বজন্মের অনেক তপস্যায় এমন যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ এসেছেন—হেলা করবেন না।

হরেন। রজনী মোক্তারের কি সত্যদৃষ্টি দেখেছ প্রামাণিক! রজনী মোক্তার—

দেবেন। ঠিক বলেছ বসাক, মোক্তারবাবু বালক-সাধুর দিকে লক্ষ্য না করলে ওর সাধন-ভজন, ওর ভক্তিময় মনটা অকালেই মুকুলের মত ঝরে পড়ত।

জিতেন। সংসারের এই নিয়ম বুঝলে হে প্রামাণিক! রামকৃষ্ণের যেমন রানী রাসমণি, তেমনি তোমাদের বালকসাধুর পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক হলেন রজনী। বড় প্রতিভা হলেও একজন প্যাট্রনের দরকার হয়।

দেবেন। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন কর্ত্তাঠাকুর। মোক্তার বাবুই ত শেষ পর্য্যন্ত গৌরদাসের সব ভার নিয়েছেন। মাহীনগরে টিনের একটা ছোট চালাঘর করেছেন। আশ্রমে চতুর্দ্দোলে আছে রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি, বিধিমত পূজোর সরঞ্জাম। গৌরদাস দিনরাত্ত পূজো নিয়ে মেতে আছে। আশ্রমে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয় আর ভক্তদের কি ভিড়!

সত্যেন। দেবেনকাকা (মুখে অবিশ্বাসের হাসির মৃদু রেখা) তা হলে গৌরদাস তার চাষী বাপ-মাকে ছেড়ে আশ্রমে বাস করছে! রজনী-দাও কি মোক্তারী ছেড়েছে?

হরেন। (বিরক্ত হয়ে) ছাড়বে না? বিরাটকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করলে অনেক বড় ত্যাগ করতে হয় ছোট ঠাকুরকর্ত্তা। বুদ্ধদেব অতবড় রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করেছিলেন আর বালকসাধু ওঁর বুড়ো বাপ-মা ছাড়তে পারবেন না?

সত্যেন। কিন্তু দাদা কপিলাবস্তুর রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ও তাঁর গৃহত্যাগের মাঝখানে কোন রজনী মোক্তার ছিল না কিন্তু। সিদ্ধার্থ সংসার ছেড়েছিলেন—

জিতেন। নিজের প্রেরণায় তুমি একথা বলবে তো? কিন্তু তাঁকেও কেউ প্রেরণা দেন নি—ইতিহাস সেকথা নাও বলতে পারে।

হরেন। আরে ঠাকুরকর্ত্তা, ছোটকর্ত্তার সঙ্গে তুমি মিছিমিছি তর্ক করছ! উনি তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরে আর কিছুই স্বীকার করবেন না।

জিতেন। হ্যাঁ, রক্ত এখনও গরম আছে। দুঃখের অভিজ্ঞতা না থাকলে জ্ঞান আসে না।

দেবেন। হরি বলো! হরি বলো—বুঝলে ছোটকর্ত্তা, ভগবানের বিভূতি কার ভেতর দিয়ে কখন প্রকাশ পায় তা ঠিক করা সহজ নয়।

হরেন। আরো ত কত ছেলে আছে! এমন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে দিনরাত বিভোর হয়ে থাকে কয় জন শুনি?

সত্যেন। কি জানি, আমি কেন যেন রজনী মোক্তার আর গৌরদাসের ভেতরে রহস্তের আঁচ পাচ্ছি। ধর্ম্মমূঢ়তায় অন্ধ ভক্তি-বাদের দেশে আশ্চর্য্য ঘটনা কিছুই নেই—

হরেন। তার মানে তুমি কি বলতে চাও ছোট ঠাকুরকর্ত্তা?

সত্যেন। (উদ্দীপ্ত হয়ে বলল) ফকির-সাধু-মোহান্তকে নিয়ে এদেশের লোক হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে। সাধুসন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির কথা মুখে মুখে ছড়ায়। কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান উড়িষ্যার পাগল-বাবাকে পরে দেখা যায় মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবারীরূপে। কত শোনা যায়, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী শক্তিমান সন্ন্যাসীর আখড়ায় পুলিস হানা দেয়। তদন্তে প্রমাণ হয় তিনি নামজাদা গুণ্ডা!

জিতেন। থাম—থাম, তুই থাম। তোর ভাল না লাগে, তুই চুপ করে থাক—

দেবেন। দেখ ছোট ঠাকুরকর্ত্তা, রজনী মোক্তার বালক-সাধু আর তাঁর ভক্তদের সামনে আবার কিছু বলে ফেল না—

সত্যেন। না দেবেনকাকা, অত মূর্খ নই আমি। আর আমি যা বলছি তা নাও হতে পারে ত, তবে দেখ রজনী-মোক্তার লোকটা—

(হঠাৎ নেপথ্যে বহু লোকের মৃদু গুঞ্জন ভেসে এল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আকাশ কাঁপিয়ে শব্দ হ'ল)

বালক-সাধু গৌরদাস বাবাকি জয়! শ্রীরাধাকৃষ্ণকি জয়!

জিতেন। আরে! এই ত গৌরদাস এসে পড়েছে—

(নেপথ্যের দিকে ছুটে যেতেই রজনী মোক্তার ও গৌর-দাসের প্রবেশ। তাদের সঙ্গে জন-দুয়েক ফোঁটা-তিলক কাটা, নামাবলী গায়ে দেওয়া ভক্ত। গৌরদাসের তরুণ মুখখানায় মধুর হাসি। পরনে লালপেড়ে গরদের ধুতি। গায়ে বৃন্দাবনী ছাপের চাদর। মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা, তাতে আবার বেলীফুলের মালা। কালো, গোল-গাল রজনী মোক্তার খোঁচা খোঁচা গোঁফে হাত বুলিয়ে বলল)

রজনী। কৈ মাষ্টারমশায়? (জিতেনবাবু) বালক-সাধু কোথায় বসবেন ঠিকঠাক করেছেন কিছু?

জিতেন। (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠল) এই হরিপদ, জলচৌকিটা পাঠিয়ে দিতে বল তোর বৌদিকে—

(লক্ষ্মীর পায়ের ছাপের আলপনা আঁকা জলচৌকিটা নিয়ে চাকর হরিপদের প্রবেশ। সে ঘরের দেয়াল ঘেঁসে জলচৌকিটা বসিয়ে দিল। সত্যেন চেয়ারেই বসে রইল আগের মত)

রজনী। (গৌরদাসকে) বাবা যান আপনি, আপনার আসন গ্রহণ করুন—

(বালক-সাধু বসলেন। ভক্তরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল)

জয় বালকসাধুকি জয়! জয়, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকি জয়!

(রজনীমোক্তার হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে চোখ বুজে বালকসাধুর সম্মুখে বসল। ভক্তরাও বসলেন)

১ম ভক্ত। সাধুবাবা, আপনি শরীর খারাপ বোধ করছেন না ত?

গৌর। (উদাসীন দৃষ্টিতে দূরে তাকিয়ে) না।

২য় ভক্ত। এখন কি নামগান করবেন?

রজনী। না, না, তোমরা থামো না বাপু। মাষ্টারমশায় তাঁর বাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মোৎসবের জন্য ডেকেছেন। উনি যা বলবেন তাই হবে—

(চাকর হরিপদের প্রবেশ)

হরিপদ। দাদাবাবু, (জিতেনকে) পাড়ার মাইরা অন্দরে আইছে। সাধুবাবার দর্শনের লাইগা হুড়াহুড়ি পইড়্যা গ্যাছেগা। তাগো আইতে কইমু?

জিতেন। থাম এখন। তোর বৌদিকে বল তাঁরা যেন একটু পরে আসেন। ঠাকুরের জন্মোৎসবটা আগে শেষ হতে দে—

সত্যেন। তুমি কি করবে ঠিক করেছ দাদা?

জিতেন। ভেবেছিলাম, ঠাকুরের বাণী পাঠ করাব গৌর-দাসকে দিয়ে। আসরের সবাই শুনবে।

(নেপথ্যে হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা গেল। কারা যেন করুণ গলায় চীৎকার করে বলল)

আমরা ভেতরে যেতে চাই—বালক-সাধুকে দর্শন করতে দাও—আমরা বড় দুঃখী—

(নেপথ্যের দিকে ছুটে গেল হরিপদ। প্রবলভাবে হাত ঝাকিয়ে বলল)

হরিপদ। তোগো এখানে কে আইতে কইছে? ঠাকুরের সভা হইতাছে—

(হরিপদের পাশ কাটিয়ে এক রকম জোর করেই তিন-জন দুঃস্থ লোকের প্রবেশ। তাদের পরনে শতচ্ছিন্ন মলিন বসন। চোখেমুখে নিদারুণ দারিদ্র্যের ছাপ।)

জিতেন। তোরা এখানে কি চাস রে?

রজনী। ওরা নিশ্চয়ই সাধুবাবার কাছে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে—

জিতেন। তোরা একপাশে দাঁড়া। তোদের বক্তব্য পরে বলিস। [হরিপদের প্রস্থান]

রজনী। মাষ্টারমশাই, যা করতে হয় তাড়াতাড়ি করুন। বালক-সাধুর শরীরটা তত ভাল নয়। দেখবেন যেন বেশী পরিশ্রম না হয় বাবার—

জিতেন। তোমার চেয়ে গৌরদাসের উপরে আমার কি দরদ কম রজনী? ও সকলের কাছে মহাপুরুষের সম্মান পেলেও আমাদের কাছে গৌরদাস পতিরামের কেশব মালাকরের ছেলে—

(রজনীর চোখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটল। সে উঠে জিতেন-বাবুর কানের কাছে ফিস ফিস করে কি যেন বলল)

সত্যেন। কি রে গৌরদাস, আমাকে চিনতে পারছিস?

গৌরদাস। (মুখ নীচু করে, লজ্জা-জড়ানো গলায়) কি যে বল ছোড়দা, তোমাকে চিনতে পারব না? কলকাতা থেকে কবে এলে? আজ রাত্রে তোমার কাছে কিন্তু কলকাতার গল্প শুনব—

রজনী। (অধৈর্য্য হয়ে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে) কৈ হে তোমরা কে কে বালক-সাধুর পায়ের ধুলো নেবে? এগিয়ে এস। তোমাদের যা যা প্রার্থনা আছে বল—

(দুঃস্থ দরিদ্র তিন জনের ভিতরে একজন এল)

১। বাবা আমার ছেলেটার বড় অসুখ। বাঁচবে ত?

গৌরদাস। (চোখ দুটো আধ-বোঁজা করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে) আমি কি জানি? আমি কে? একমনে গোপালকে ডাক। যা করবার তিনিই করবেন—

২। সাধুবাবা! তুমি ত অন্তর্য্যামী। তুমি সব দেখতে পাও, বলতে পার—কি দোষে আমার বৌ সব সময় আমাকে দাঁত ছটকানি দিয়ে কথা বলে? এমনিই ত অভাবের সংসার—

১। তুমি যে নেশাভাঙ্গ করে রাতদুপুরে বাড়ী ফের চাঁদ—

২। তুই চুপ কর। মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। তুমি খুব সাধু না? তুই তোর বিধবা পিসীমার সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিস বলেই ত তোর ছেলে অসুখে মরতে বসেছে—

হরেন। এই—এই তোমরা থামো। বালক-সাধুকে যা বলবার আছে বল। নিজেরা ঝগড়াঝাটি যা করতে হয় বাড়ী গিয়ে কর। মনে রেখ, এটা মাষ্টারমশায়ের বাড়ী।

(গাঢ় নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল চারিদিক। রজনী গৌরদাসের কানে কানে কি বলল। গৌরদাস মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল)

গৌরদাস। (২নং কে) তুমি সৎ হয়ে ভদ্রলোকের মত জীবনযাপন কর। স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ হও। তা হলেই তোমার স্ত্রী তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করবে—

৩। বাবা, দেশভাগের ফলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এদেশে এসেছি। সব বাস্তুত্যাগীদের 'রিফিউজি লোন' দিচ্ছে। কিন্তু আমি চাইতে গেলেই রিলিফ অফিসার তেড়ে মারতে আসে—

রজনী। বাপু হে, তুমি কি খালি হাতে রিলিফ অফিসারের কাছে 'রিফিউজি লোন' চাইতে গিয়েছিলে?

৩। কিছু হাতে থাকবেই যদি তা হলে আর ধার চাইতে যাব কেন?

রজনী। কানে জল ঢুকলে কি করে জল বের করে জান?

৩। হ্যাঁ, আরও কয়েক ফোটা জল কানে দিতে হয়।

সত্যেন। রজনীদা, ওকে এই দুর্নীতি শেখাচ্ছ কেন? কেন ও অফিসারকে ঘুষ দিতে যাবে? (তিন নম্বরকে) ও হে তুমি আমার সঙ্গে যেও আপিসে। আমি তোমার রিফিউজি লোনের ব্যবস্থা করব—

৩। (গৌরদাসকে) সাধুবাবা, কি বলেন, যদি কিছু মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে অফিসারের সুমতি করতে পারেন—

গৌরদাস। আমি কি করব? সবই কৃষ্ণের কৃপা। তিনি ইচ্ছা করলে রাজাও হতে পার, আবার চোখের পলকে একেবারে পথের ভিখারীও হয়ে যেতে পার—

দেবেন। তাঁর ইচ্ছাতেই ত আমরা বেঁচে আছি—চলছি, ফিরছি। গাছের পাতা নড়ছে। তাঁর দয়া না হলে আমরা ঐহিক কোন সুখই পেতে পারি না—হরি! হরি!

(গৌরদাস ভাবাবেগে দুলছে। অস্ফুট স্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করছে। নেপথ্যে অন্দরমহল থেকে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল। হঠাৎ নেপথ্যে স্ত্রীকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল)

গোপালরে—আমার গোপাল! তুই যে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিস—

(আলুথালু বেশে, চুল এলো করে উন্মাদিনীর মত নিঃসন্তানা সরকার-গিন্নী তরুবালার প্রবেশ)

তরুবালা। (গৌরদাসের মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে) বাড়ীর ভেতরে তোর জন্য অপেক্ষা করে করে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলাম। এবার তোকে পেয়েছি আর ছেড়ে দেব না।

(গৌরদাস লজ্জায় মাথা হেঁট করল)

সত্যেন—খুড়ীমা, কি হয়েছে তোমার? গৌরদাসের গলা জড়িয়ে ধরছ—ছিঃ, ছিঃ, তোমার লজ্জা হচ্ছে না—

তরু। ছেলের গলা জড়িয়ে ধরতে আবার লজ্জা কিসের রে? কাল রাতেই যে ওকে আমি স্বপ্ন দেখেছি।

১ম ভক্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি ঠিক চিনেছেন।

২য় ভক্ত। মনে আকুলতা না এলে ত উনি দর্শন দেন না।

হরেন। মা, আপনার গোপাল কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন। আর ভাবনা নেই আপনার। আপনার দুঃখ নিশ্চয়ই ঘুচবে।

(হরিপদের প্রবেশ)

হরিপদ। (হরেনকে) কত্তা, আপনার চাকর আইছে। ডাকতাছে আপনাকে। আপনার পোলার অসুখ বাড়ছে।

হরেন। এ্যা—(বালক-সাধুর পায়ের কাছে বসে) তুমি বলে দাও ঠাকুর—কি করলে আমার ছেলে ভাল হবে।

গৌরদাস। খুব ভাল করে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে নারায়ণ-পূজা দাও—যাও।

হরেন। নারায়ণ-পূজা দিলেই ভাল হবে ঠাকুর—হবে?

গৌরদাস। হ্যাঁ ভাল হবে।

(কুঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে হরেনের প্রস্থান)

৩। (হঠাৎ আবেগে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল) বাস্তুভিটে ছেড়ে এদেশে একেবারে পথের ভিখারী হয়ে এসেছি। কিছু দিয়েই তোমার সেবা করতে পারলাম না ঠাকুর। নাও নাও তুমি আমার মন উজাড় করা ভক্তি নাও। তুমি আমাকে কৃপা কর।

(সজোরে মাথা ঠুকতে লাগল গৌরদাসের পায়ের কাছে আর দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল)

জিতেন। আরে—আরে, লোকটা মরে যাবে যে?

রজনী। ছেড়ে দিন মাষ্টার মশাই! ওর ভাব এসেছে!

(৩ নং হঠাৎ টান হয়ে শুয়ে পড়ল। হাত-পা শক্ত কাঠের মত হয়ে গেল)

সত্যেন। এই হরিপদ—জল—জল নিয়ে আয় শীগগির—এক ঘটি জল। 'সেন্সলেস' হয়ে গেছে।

(হরিপদ ছুটে প্রস্থানোদ্যত হতেই আবার সত্যেন ডাক দিল)

এই হরিপদ শোন—শোন। ব্লটিং পেপারের টুকরো আর দু' একটা শুকনো মরিচ নিয়ে আসিস।

হরিপদ। কোথায় হইত ঠাকুরের উৎসব। তা না ভাল রঙ্গ সুরু হইল দেখতাছি।

[প্রস্থান]

রজনী। ওর কানের কাছে গিয়ে কেউ হরিনাম উচ্চারণ কর। জ্ঞান ফিরে আসবে।

১। (তিন নম্বরের কানের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলতে লাগল) হ রি বল—হ রি বল—রাধাকৃষ্ণ বল।

২। (তিন নম্বরের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে) কিরে শ্রীকৃষ্ণ-ঠাকুরের দর্শন পেলি? তিনি তোর রিফিউজি লোন সম্বন্ধে কিছু বললেন?

(ব্লটিং পেপারের টুকরো, দুটো শুকনো মরিচ আর এক ঘটি জল নিয়ে হরিপদের প্রবেশ)

সত্যেন। এই সরে যাও—সরে যাও সব। যত সব বুজরুকের আড্ডা হয়েছে এখানে।

রজনী। আমাদের ভক্তদের এ রকম বলো না।

সত্যেন। থামো তো তুমি রজনীদা।

রজনী। বেশী ইয়ে করলে সাধুবাবাকে নিয়ে যাব।

গৌরদাস। রজনীদা, ছোড়দার সঙ্গে ওরকম করে কথা বলবেন না।

(সত্যেন তিন নম্বরের মাথায় জলের ঝাপটা দিতে লাগল। ব্লটিং পেপার আর শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া তার নাকে দিল)

৩। (সমস্ত শরীর মুচড়িয়ে জড়িত গলায় বলল) এ কি আমি কোথায়? আমি বালক-সাধুর কাছে রিফিউজি লোনের জন্য এসেছিলাম না?

সত্যেন। হ্যাঁ, এসেছিলে, এবার বাড়ী যাও।

জিতেন। (এক, দুই, তিন নম্বরকে উদ্দেশ্য করে বলল) ওহে তোমরা এখন বাড়ী যাও তো। তোমরা বালক-সাধুর আশ্রমে গিয়ে দেখা কর। যাও—যাও।

[এক, দুই, তিন নম্বরের প্রস্থান]

রজনী। ও বাবা যে সে সাধু নয়! ওর চোখে চোখে তাকালে যে কেউ অজ্ঞান হতে বাধ্য।

(গ্রামের পুরোহিত নিতাই ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

নিতাই। হুঁ সাধু না আরও কিছু! বুঝলেন, মাষ্টার মশাই, হাবাগোবা ছেলেটাকে নিয়ে মোক্তারী প্যাঁচ খেলিয়ে রজনী কারবার খুলেছে ভাল। আরে মায়ের পেট থেকে পড়েই কেউ সাধু হয় না। সাধন-ভজন চাই বুঝলেন? একদিন এই বুজরুকি ভাঙবে দেখবেন।

(বালক-সাধুর দুই জন ভক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। এক নম্বর ভক্ত লাফিয়ে এসে পুরোহিতের ঘাড় ধরে বললে)

১ম ভক্ত। কেন, কোন সাহসে তুমি আমাদের বালক-সাধুকে অপমান করছ ঠাকুর?

২য় ভক্ত। তোমার বুঝি অন্ন মারা যাচ্ছে, না? তাই তোমার গা জ্বালা করছে।

নিতাই। হ্যাঁ হ্যাঁ—একশো বার বলব এসব বুজরুকি—সব তোমাদের শেখানো-পড়ানো।

১ম ভক্ত। মুখ সামলে কথা বল ঠাকুর।

২য় ভক্ত। বিশটা গ্রামের লোকে যাঁকে শ্রদ্ধা করে তাঁর সম্বন্ধে এ রকম বল না।

জিতেন। ওসব বল না নিতাই। অনেক দূর থেকে এসেছে ওর সব ভক্তরা। এখুনি ওরা মারমূর্ত্তি হয়ে উঠবে।

নিতাই। কি, মারপিটের ভয়ে সত্য গোপন করব না কি? (চাদরের নীচ থেকে পৈতে বের করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল) আমি এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি।

রজনী। কি বলছ? কি তোমার সত্য কথাটা শুনি?

নিতাই। আমি গৌরদাসের বাবা কেশবের কাছে গিয়ে-ছিলাম। কেশব কেঁদে বলল, রজনীবাবু আমার ছেলে কেড়ে নিয়েছে। তাকে সঙ সাজিয়ে প্রচুর পয়সা রোজগার করছে।

রজনী। বুঝলেন মাষ্টার মশাই, সব মিথ্যে বলছে শালা।

১ম ভক্ত। তবে রে শালা, চালকলা-বাঁধা ঠাকুর। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

২য় ভক্ত। মেরে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেব।

(দুই ভক্ত নিতাইয়ের পিঠে বৃষ্টির মত কিল চড় মারতে লাগল)

জিতেন। এই—এই ও কি হচ্ছে। কি হচ্ছে? দাঙ্গাবাজী করবার জায়গা এটা নয়। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও ওকে।

(নিতাই অব্যক্ত যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। জিতেন ভক্তদের হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের দ্রুত প্রস্থান। নেপথ্য থেকে তার আক্রোশ-ভরা গলার স্বর শোনা গেল)

নিতাই। (নেপথ্যে) দেখ—এই চক্রান্ত একদিন সকলেই জানতে পারবে। রজনী আশ্রমে কতকগুলো গুণ্ডা পুষছে।

জিতেন। রজনী, তোমার ভক্তদের আশ্রমে যেতে বল।

রজনী। কেন? ওরা তো—

জিতেন। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। এই মুহূর্তে ওদের যেতে বল।

তরু। আহা! নিতাই ঠাকুরকে এখুনি মেরে ফেলত ওরা। কি সব ডাকাতের মত চেহারা।

সত্যেন। এটা চক্কোত্তি বাড়ীর বৈঠকখানা। 'বক্সিং' খেলবার মাঠ নয়।

জিতেন। ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তোমাদের ডেকেছি রজনী। আজকের এই পুণ্যদিনে আমারই বাড়ীতে এই অশোভন অপ্রীতিকর ঘটনা।

রজনী। (ভক্তদের) ওহে তোমরা যাও—

[ভক্তদের প্রস্থান]

গৌরদাস। আমি বড় ক্লান্ত। আমাকে বাতাস কর।

জিতেন। এই হরিপদ—পাখা নিয়ে আয় ত একটা জলদি—(নেপথ্যে তাকিয়ে হাঁক দিল)

(দুটো পাখা নিয়ে হরিপদের প্রবেশ। একটা পাখা ছো দিয়ে কেড়ে নিল তরুবালা। হরিপদ আর তরুবালা দু'জনে গৌরদাসের দু'দিকে দাঁড়িয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল)

জিতেন। রজনী, গৌরদাসের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

দেবেন। বড় ঠাকুরকর্ত্তা, আমার একটা নিবেদন আছে বালক-সাধুর কাছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি তাঁকে বলবার সুযোগ পাই নি হট্টগোলের ভিতরে।

জিতেন। তোমার নিবেদন বালক-সাধুকে বলেই চলে যেতে হবে কিন্তু। আমাদের এখানে বড্ড জরুরি কাজ আছে।

দেবেন। তাই যাব বড় ঠাকুরকর্ত্তা।

(বালক-সাধুর পায়ের কাছে বসে ভক্তিভরে বলল)

আচ্ছা সাধুবাবা, যক্ষ্মারোগে পর পর দুটো জোয়ান ছেলে আমার মারা গেছে। সেজ ছেলেকেও রাজরোগে ধরেছে। কত ওষুধ-বিষুদ করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না কেন বলতে পার?

গৌরদাস। তোমাদের বংশে গুরুতর পাপ ঢুকেছে।

দেবেন। পাপ! কিসের পাপ? ত্রিসন্ধ্যা জপ তপ না করে আমার বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ অন্নজল গ্রহণ করেন নি। পনের বছর বয়সে আমরা দীক্ষা নিই।

গৌরদাস। তোমাদের তিনতলা দালানটা কেমন করে হয়েছে প্রামাণিক?

দেবেন। কেমন করে আবার? বাবা সাহেব-কাছারীর পাটোয়ারী ছিলেন, তাঁর উপার্জ্জনেই হয়েছে।

গৌরদাস। সাহেব-কাছারীর তহবিল ভেঙ্গে ভেঙ্গে তোমার বাবা ঐ দালান তুলেছিলেন।

(দেবেনের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। হঠাৎ চিৎকার করে গৌরদাসের পায়ে আছড়ে পড়ল। আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বলল)

দেবেন। যে কথা কেউ জানে না, সে কথা তুমি কি করে জানলে ঠাকুর?

রজনী। যোগবলে—

দেবেন। কি করলে আমাদের এই গ্রহ কেটে যাবে ঠাকুর?

রজনী। তুমি কাঁজিয়ালসী গ্রামের নারায়ণ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছ ত?

দেবেন। আজ্ঞে হ্যাঁ!

গৌরদাস। ওতে কিছু কাজ হবে না। তোমাকে সস্ত্রীক হরিদ্বারের শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দের কাছে দীক্ষা নিতে হবে।

দেবেন। দীক্ষা নিলেই দোষ কেটে যাবে বাবা?

গৌরদাস। নিশ্চয়ই। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সবাই পাপের বৈতরণী পার হয়ে যায়। মন দিয়ে সাধন ভজন করলে তুমি পারবে না কেন?

দেবেন। গ্রহ কেটে যাবে বাবা? দীক্ষা নিলেই গ্রহ কেটে যাবে?

গৌরদাস। হ্যাঁ।

(উত্তেজিত হয়ে দেবেন গৌরদাসকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল। আর চিৎকার করে গান সুরু করল)

দেবেন। জীব তরাতে এসেছেন নিমাই
দেখে নে রে দু' চোখ ভরে'

(রজনীও ভাবাবেগে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল)

জিতেন। এই দেবেন—কি হচ্ছে? ওকে নামিয়ে দাও—কাঁধ থেকে পড়ে যাবে যে।

(গৌরদাসকে জলচৌকিতে বসিয়ে দিয়ে দেবেন তার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল)

দেবেন। যাই ঠাকুর—সস্ত্রীক হরিদ্বারে যাবার ব্যবস্থা করি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর ঠাকুর।

(গৌরদাস ডান হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে আশীর্ব্বাদের মুদ্রা করল। আবার মাটিতে লুটিয়ে তাকে প্রণাম করে দেবেনের প্রস্থান)

সত্যেন। (তরুবালাকে) খুড়ীমা, আপনার গোপালকে ত দেখলেন, এবার বাড়ী যান। রাত হয়েছে।

তরুবালা। একদণ্ড ওকে চোখের আড়াল করলে বুকের ভেতরটা যে হু হু করে রে! তুই আমাকে যেতে বলিস না সত্য।

রজনী। রাত হয়েছে। মাষ্টার মশায় ঠাকুরের সেবার সময় উতরে যাচ্ছে।

হরিপদ। (জিতেনকে) বড় দাদাবাবু! মা কইছেন বালক-সাধু আজ রাত্রে আমাগো বাড়ীতে থাকবেন।

রজনী। দেখুন মাষ্টার মশায়, কাল ভোরে আবার খাসপুরের জমিদার বাড়ীর মেয়েরা আশ্রমে আসবেন। তাঁরা খবর পাঠিয়েছেন। আমি তাঁদের কথা দিয়েছি—

জিতেন। রজনী, তোমার ত সাহস কম না! আমাদের চক্কোত্তিবাড়ী চিরকাল এই তল্লাটের বিশটা গ্রামের মাথা! আমার মায়ের একটা সামান্য অনুরোধ থাকবে না?

গৌরদাস। আজ আমি এখানে থাকব রজনীদা। তুমি আপত্তি করো না।

রজনী। বেশ, বেশ ত! তোমারই অসুবিধে যদি হয় তাই বলছিলাম।

গৌরদাস। (জিতেন, সত্যেনকে ইঙ্গিত করে) এই বড়দা ছোড়দাকে ছোটকাল থেকে নিজের দাদার মত দেখে এসেছি। ওঁরা আমার নিজের দাদার চেয়েও বেশী! ওঁদের এখানে একরাত্রি থাকলে আমার হবে অসুবিধে—তুমি বলছ কি রজনীদা?

(জিতেনের স্ত্রী সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। (জিতেনকে) ওগো শুনছ, গৌরদাস মা'র সঙ্গে তাঁর ঠাকুরঘরে বসে খাবে। মা বুড়ো মানুষ। ওর জন্য অপেক্ষা করে করে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন।

সত্যেন। যাও গৌরদাস, বৌদির সঙ্গে তুমি ভিতরে যাও।

(সুনীতি, গৌরদাস, তরুবালা ও হরিপদের প্রস্থান)

রজনী। আমিও এই সঙ্গে যাই না কেন মাষ্টার-মশায়?

জিতেন। তুমি ত আচ্ছা ঠোঁটকাটা হে রজনী! শুনলে ত মা গৌরদাসকে একলা চেয়েছেন। সেখানে তুমি যাবে কি রকম?

রজনী। না, এই মানে, বালক-সাধুর সেবার যদি কোন বিঘ্ন ঘটে।

সত্যেন। ঘটে—ঘটবে। গৌরদাস সকলের কাছে বালক-সাধু হলেও এ বাড়ীতে কেউ ওকে জীবন্ত ঠাকুর বা মহাপুরুষ বলে ভাববে না। আমার ভাইপোর সঙ্গে ও বহুবার এ বাড়ীতে এসেছে। আগে ওর যেমন স্নেহ ও যত্নের ত্রুটি হয় নি, তেমনি এবারও হবে না।

জিতেন। শোন রজনী, তোমাকে আর গৌরদাসকে যে জন্য ডেকেছি।

রজনী। হ্যাঁ, সে ত ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মোৎসবের জন্য ডেকেছিলেন, কিন্তু—

জিতেন। ধূপধুনো দিয়ে জাঁকজমক করে ঠাকুরের দুটো বাণী আউড়ে গতানুগতিক ভাবে তাঁর জন্মতিথি পালন করার পক্ষপাতী আমি নই। ঠাকুরের সরল, উদার ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য সত্যিকারের কিছু কাজ করতে চাই।

রজনী। কি করতে চান? আমরা কি করব?

জিতেন। তোমাকে কিছু করতে হবে না, শুধু মোক্তারবারে ফিরে যেতে হবে আশ্রম তুলে দিয়ে। আর আমি গৌরদাসকে কলকাতায় বেলুড়মঠে নিয়ে যেতে চাই।

রজনী। (আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল) গৌরদাসকে! বেলুড়মঠে। কেন?

জিতেন। গৌরদাসকে যতই তুমি বালক-সাধু বলে প্রচার কর না কেন, আসলে ও সাধুটাধু কিছু নয়—

রজনী। তবে কি ও?

জিতেন। গৌরদাসের মনটা শুভ্র, অপাপবিদ্ধ ফুলের মত পবিত্র। ও খাঁটি ভক্ত। বেলুড়মঠে গেলেই ওর উন্নতি হবে। ও পথ খুঁজে পাবে—

রজনী। না, না! দয়া করে এই কথাটি বলবেন না মাষ্টার-মশাই। এ অঞ্চলের হাজার হাজার দুঃস্থ আর্ত্ত মানুষ শুধু গৌর-দাসকে একবার দর্শন করেই সান্ত্বনা পায়। এদের সকলের মায়া-মমতা শ্রদ্ধা দিয়ে তিলে তিলে গড়া এই বালক ভগবানকে এই বহুর স্রোতে ভাসিয়ে দেবেন না। আমাদের অনাথ করে দেবেন না, দোহাই মাষ্টারমশায়।

সত্যেন। তোমার বালক-সাধুর আশ্রমে দৈনিক কতজন ভক্ত আসেন রজনীদা?

রজনী। তা দু'বেলা প্রায় শ'খানেক লোক আসে। দূর দূর গ্রাম থেকে গোরুর গাড়ী করে আসে।

সত্যেন। তাদের প্রণামী থেকে তোমার কত আয় হয়?

রজনী। আয়? মানে—বলছ কি সত্যেন? আমি জন-সাধারণের স্বার্থে মোক্তারী ছেড়ে আশ্রম তৈরি করেছি। বালক-সাধুকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছি। নিয়মিত ভাগবত পাঠ হয়—

সত্যেন। তা ত হ'ল। কিন্তু মোক্তারী ছেড়ে দিয়ে তোমার সংসার চলছে কি করে?

(নেপথ্যে স্ত্রীকণ্ঠের একটা আকুলকরা চীৎকার ভেসে এল)

বালক সাধু কি এখানে আছেন?

(সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে একটা ভারী গলায় ডাক শোনা গেল)

কৈ হে জিতেন মাষ্টার আছ না কি?

জিতেন। শশী ডাক্তারের গলা বলে মনে হচ্ছে! শশীদা না কি? ভেতরে এস—

(শশী ডাক্তারের প্রবেশ। গলায় কণ্ঠির মালা। নাকে রসকলি। কপালে তিলক। তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাইঝি, আঠার বছরের বিধবা তরুণী কল্যাণী। কল্যাণীর গায়ের রঙ শ্যামলা। বড় বড় দুটো উজ্জ্বল চোখ)

নিশ্চয়ই বালক-সাধুর খোঁজে এসেছ শশীদা ?

শশী। আর বল কেন ভাই, সারাটা জীবন ত সাধুসন্ন্যাসী নিয়েই কাটিয়ে দিলাম। বিদেহী এবং দেহধারী মহাপুরুষদের প্রতি আকর্ষণ আমি আর কাটিয়ে উঠতে পারলাম না ভাই—

সত্যেন। তাই ত দেখছি শশীদা! অন্ধ আবেগে সাধু-সন্ন্যাসীর সেবায় অনেক খেসারত দিয়েছেন। কিন্তু আপনার স্বভাব শোধরায় নি—

শশী। স্বভাব আর বদলাবে না ভাই!

জিতেন। কিন্তু মেয়েটি কে শশীদা ?

শশী। আরে ওর জন্যই ত আসা। ও আমার ভাইঝি কল্যাণী। কল্যাণী গৌরদাসকে মনে করে দেহধারী কানাই। কিন্তু ঠাকুর ওকে আমল দেয় না। তাতে ওর কোন দুঃখ নেই। মুগ্ধ, তন্ময় অপলক চোখে ঠাকুরকে দেখেই ওর আনন্দ।

জিতেন। এত ভক্তি! এত ধর্মবিশ্বাস এতটুকু মেয়ের! ওকে বেলুড়মঠে পাঠিয়ে দাও না শশীদা ?

শশী। (আবেগে বলতে সুরু করল) সত্যি, ওর নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই জিতেন! লেখাপড়া কিই বা জানে। তবু ওর মুখে ধর্ম্মের কথা শুনে অবাক না হয়ে পারি না। আমি বলি, 'তুই বালক-সাধুর আশ্রমেই থেকে যা'। কল্যাণী হেসে বলে—'কাকা, অকূলে না ভাসলে কূল পাওয়া যায় না; চমৎকার কীর্ত্তন গায়।

জিতেন। রাত হয়েছে অনেক। শশীদা, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?

শশী। না। খাওয়ার জন্য ব্যস্ত কি? সে সব পরে হবে—

কল্যাণী। আমি আগে বালক-সাধুকে দর্শন করতে চাই-—কাকাবাবু ?

রজনী। কথা কি জানেন মাষ্টার মশাই! দেখছি ত এত ভক্ত আছে বালক-সাধুর। কিন্তু কল্যাণীর মত কেউ নয়। এত দয়া, এত করুণা, তবু ঠাকুর ওকে দেখলেই কেমন যেন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন—

সত্যেন। কেন? নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন কেন ?

রজনী। যে যত বড় আধার, তার পরীক্ষা যে তত বেশী।

জিতেন। আমাদের দেশের মেয়েদের সহজ ধর্ম্মবিশ্বাস আর গভীর ভক্তিনিষ্ঠার তুলনা নেই শশীদা!

শশী। ঠিক বলেছ জিতেন। মথুরার রাধাকুণ্ডে এক বুড়ীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছর ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেছেন। রাধাগোবিন্দের ভাবে বিভোর। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মা তাঁর দেখা পেলেন? মৃদু হেসে তিনি বললেন—সব দিতে পারলাম কৈ বাছা? ষোল আনা মনপ্রাণ দিতে পারলাম কৈ? হয়ত উন্মাদিনী এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে—

সত্যেন। একটা কথা বলব শশীদা, আপনি কিছু মনে করবেন না কিন্তু—কল্যাণী আপনার ভাইঝি। আমারও স্নেহের পাত্রী। তাই ভাবছি—

শশী। বল না হে। ইতস্ততঃ করছ কেন ?

সত্যেন। ভরা বয়স ওর। আপনার কথামত বালক-সাধুর আশ্রমে থাকলে কিন্তু—

শশী। তুমি বলছ লোকে খুব নিন্দা করবে। আমিও সেকথা ভেবেছি। তাই ত কল্যাণীকে বলেছি, গৌরদাসের কাছে মন্ত্র নিয়ে বাড়ীতে বসে সাধন ভজন কর।

(হঠাৎ কল্যাণী ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল কাকার পায়ের কাছে। ব্যাকুল কান্নাভরা গলায় বলল)

কল্যাণী। না, না! এমন কথা বলবেন না কাকাবাবু। লোকে যা খুশি বলুক। কলঙ্কের বিষে রাধার সোনার অঙ্গও কালো হয়ে গিয়েছিল। বালক-সাধুর ঐ রাঙা চরণ দুটো ছাড়া ত্রিভুবনে আমার আর ঠাঁই নেই। যেদিন প্রথম দেখেছি ওঁকে, সেদিন থেকেই কচি কিশোর ঢল ঢল মুখখানা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে কাকাবাবু।

রজনী। আমিও বহুবার ওকে বলেছি সত্যেন। সকলের চোখ ত এক রকম নয়।

কল্যাণী। (ভাবে বিভোর হয়ে চোখ দুটো আধবোজা করে) বালক-সাধু বড় নিষ্ঠুর দেবতা! আমাকে দুঃখ দিয়েই আনন্দ দেয়।

সত্যেন। (চাপা বিরক্তিভরা গলায়) হোপলেস সেন্টিমেন্টালিজম্—

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। (জিতেনকে) তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবে না? মা-র ঘরে গৌরদাসের খাওয়া ত প্রায় হয়ে এল—

(হঠাৎ কল্যাণীকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুনীতি। কল্যাণীর কাছে এগিয়ে এসে, তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সুনীতির চোখে বিষাদের ছায়া নামল। আর্ত্ত গলায় বলল)

কল্যাণী! এ কি বেশ তোর? তোর কপাল পুড়ল কবে?

শশী। ভাল ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলাম বৌমা! ছেলেটি ছিল ডাক্তার। কিন্তু ওর কপালই মন্দ—

জিতেন। ওঃ, তোমার এই ভাইঝিরই 'হাজবেণ্ড' বোধ হয় রেলে কাটা পড়ে—না শশীদা ?

শশী। হ্যাঁ, হ্যাঁ অপঘাত মৃত্যু।

সুনীতি। (পরম স্নেহে কল্যাণীর চিবুক স্পর্শ করে বলল) এই ত এক বছর আগে বিয়ের রাতে তোকে আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দিলাম—(জিতেনকে ইঙ্গিত করে) কৈ কল্যাণীর কথা তুমি কিছু বল নি ত ?

জিতেন। শশীদার আরও ত ভাইঝি আছে। বেলা, জুঁই, পারুল। কার স্বামী মারা গেছে, তা ত ভাল করে জানতাম না—

শশী। এ আলোচনা ছেড়ে দাও বৌমা। মৃত্যুর মত এমন স্বাভাবিক পরিণতি জীবের আর কি আছে? হরি বল! হরি বল! (জিতেনকে ইঙ্গিত করে) আমাকে এখখুনি যেতে হবে জিতেন, আমার বাড়ীতে আবার অষ্টপ্রহর আছে—

সুনীতি। কল্যাণী আজকের রাতটা আমার কাছেই থাকবে। আপনি কাল এসে নিয়ে যাবেন শশীদা—

শশী। তাই ভাল হবে বৌমা। তোমার কাছে ও খুব আনন্দে থাকবে—

জিতেন। কাল কিন্তু এস শশীদা। (শশীর প্রস্থান)

সুনীতি। চল কল্যাণী ভেতরে চল। (জিতেনকে) তুমিও সবাইকে নিয়ে এস। রান্নাঘরের বারান্দায় সকলের খাওয়ার জায়গা হয়েছে—

জিতেন। চল হে রজনী।

কল্যাণী। ভেতরে গেলে ঠাকুরের দর্শন পাব ত কাকীমা?

সুনীতি। হ্যাঁ পাবি। গৌরদাসের খাওয়া প্রায় হয়ে গেছে।

(জিতেন, রজনী ও কল্যাণীর প্রস্থান। সবশেষে সুনীতি প্রস্থানোদ্যত হতেই চাপা গলায় সত্যেন ডাকল)

সত্যেন। বৌদি শোন।

সুনীতি। ওমা! তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন ঠাকুরপো? চল খেয়ে নেবে চল—

সত্যেন। আচ্ছা বৌদি, তোমরা মেয়েরা ত মানুষের মন 'এক্স-রে' করতে পার না?

সুনীতি। এই রাতদুপুরে আবার কি হেঁয়ালী সুরু করলে ঠাকুরপো? যা বলতে চাও সোজাসুজি বল না বাপু।

সত্যেন। (সুনীতির কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায়) কল্যাণীকে কেমন বুঝছ?

সুনীতি। সে আবার কি কথা? কেন ও ত খুব ভক্তিমতী মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছে। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে ত, তাই বেচারা জপতপ পূজো নিয়ে আছে—

সত্যেন। কিন্তু বৌদি! আমার ত মনে হচ্ছে, কল্যাণীর চোখ দুটোয় কিসের যেন নেশা টলমল করছে।

সুনীতি। দূর্ কি যে বল ঠাকুরপো? তুমিই আইবুড়ো হয়ে রয়েছ কিনা, অই কল্যাণীই তোমার চোখে নেশা ধরিয়েছে। এত করে বলছি, বিয়ে থা কর একটা।

সত্যেন। না, না বৌদি ঠাট্টা নয়। শোন, কল্যাণীর এসব অর্থহীন কথার কলকাকলী আর গৌরদাসের ওপর গভীর অনুরাগ দেখে শুনে মনে হয়—

সুনীতি। কি মনে হয় ঠাকুরপো?

সত্যেন। মনে হয় কল্যাণী গৌরদাসের অনুরাগিনী হয়েছে।

সুনীতি। (কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে) তুমি বলছ এ কথা ঠাকুরপো?

সত্যেন। হ্যাঁ। কল্যাণীর চোখের দৃষ্টি এ কথা বলছে।

সুনীতি। আমারও তাই মনে হয় ঠাকুরপো। রজনী মোক্তার, এমনকি গৌরদাস পর্য্যন্ত কত দিন কল্যাণীকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবুও সে আশ্রমে যায়। ছয় মাস থেকে গৌরদাসের আশপাশে ছায়ার মত ঘুরছে। তোমার অনুমানই হয়ত,

(নেপথ্য থেকে জিতেনের ভারী গলায় ডাক শোনা গেল)

জিতেন। (নেপথ্যে) সুনীতি, এদিকে এস। আমরা যে সবাই খেতে বসেছি—

সুনীতি। আমি যাই ঠাকুরপো। গৌরদাসকে একলা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বরং খোলাখুলি ভাবে ওকেই জিজ্ঞাসা কর। আমারও মতামত তোমারই মত ঠাকুরপো—ধর্ম্মের মেকী আচার-অনুষ্ঠানে ডুবে থেকে জীবন-যৌবনের অপচয় করা শুধু অন্যায় নয়, পাপও—

সত্যেন। ঠিক বলেছ বৌদি, সত্যি যদি গৌরদাসও কল্যাণীকে ভালবাসে—তা হলে রজনীর খপ্পর থেকে ওকে উদ্ধার করে সংসারে ফিরিয়ে দিতে হবে—

সুনীতি। দেখ, সেই চেষ্টা করে। কল্যাণীর ব্যর্থ রুক্ষ জীবনটা ফুলে ফলে ভরে উঠবে তা হলে— (প্রস্থান)

(গৌরদাসের প্রবেশ। চোখেমুখে নিদারুণ বিরক্তির ছাপ)

সত্যেন। আয়, আয় গৌরদাস। তোর মুখ ভার কেন রে?

গৌর। আর বল কেন ছোড়দা? অষ্টপ্রহর মাছির মত ছেঁকে ধরে থাকে মানুষগুলো। এসেছি তোমাদের বাড়ী। দেখ পিছু পিছু শশী ডাক্তার এসেছে, তার ভাইঝিটাকে পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছে—

সত্যেন। তোর ত এ সব ভালই লাগে গৌরদাস। দিব্যি শত শত লোকের পূজো পাচ্ছিস। প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করছিস। তুই ত দেবতা রে!

গৌর। (দাঁতে দাঁত চেপে ধরে) দেবতা—না ছাই! ছোড়দা, বিশ্বাস করুন; রজনীই আমাকে ওর স্বার্থে দেবতা বানিয়ে তুলেছে। আমি ছোটকাল থেকে কৃষ্ণনাম করি। লক্ষীর পাঁচালী সুর করে পড়তে ভাল লাগে—এর চেয়ে বেশী আর কিছু নয়—

সত্যেন। তুই তা হলে ভগবান নস। রজনী যে বলে বেড়ায়, 'চোখ বুজলেই বালক-সাধু বিশ্বরূপ দেখতে পান'—

গৌর। ওসব রজনীর সাজানো কথা ছোড়দা। আমাকে ভক্তদের উপদ্রব থেকে বাঁচান। (গলার স্বর নামিয়ে চাপা যন্ত্রণাভরা গলায়) আমি আর পারছি না ছোড়দা! আমি মানুষের মত হেসে-কেঁদে, ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে বাঁচতে চাই ছোড়দা—

সত্যেন। তুই রজনীর এই লাভের ব্যবসার উপকরণ হয়ে না থেকে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বাড়ী চলে যা না কেন?

গৌর। ছোড়দা, ছেড়ে দে বললেই কি ছাড়া যায়? রজনী যে মোক্তারী প্যাঁচ কষিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমাকে—

সত্যেন। কি রকম? তোকে কিছু মাইনে দেয় না কি দেবতার ভূমিকায় তোর অভিনয়ের জন্য?

গৌর। পয়সাওয়ালা বহু ভক্ত মেয়ে-পুরুষ দুবেলা আসে আমাদের আশ্রমে। পাশের ঘরে শুনি, তাদের সঙ্গে রজনী মোক্তারের ফিস ফিস কথাবার্ত্তা; টাকা-পয়সার টুং টাং শব্দ। দৈনিক প্রচুর আয় করে রজনী। আমাকে এক পয়সা দেয় না। শুধু বাবার হাতে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা দেয় রজনী। ওতেই আমাদের দিন চলে—

সত্যেন। ওদিকে তুই সন্ন্যাসী হয়ে গেছিস বলে, তোর বাবা কাঁদছে—

গৌর। বাবা-মা কাঁদছেন তার কারণ, আমি আশ্রমে ভগবান হয়ে থাকলে তাঁরা কোন দিনই ছেলের বৌয়ের মুখ দেখতে পাবেন না—

সত্যেন। তুই জোয়ানমদ্দ আছিস। খেটে বাবা মাকে খাওয়াবি। রজনীর লোকঠকানো ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আয়—

গৌর। বেরিয়ে আসতে পারি ছোড়দা, কিন্তু—

সত্যেন। কিন্তু কি? খোলাখুলি বল্। যদি কেউ পারে, আমিই পারব বুড়ো রজনীর শয়তানী ষড়যন্ত্র আর কতকগুলো আধ পাগলা লোকের ক্ষ্যাপামি থেকে তোকে উদ্ধার করতে। চল আমার সঙ্গে কলকাতায়। তোকে আমি মানুষের মত করে বাঁচতে শিখিয়ে দেব—

গৌর। (সারা মুখ জুড়ে আনন্দের বিদ্যুত ঝকমক করে উঠল) ছোড়দা, তুমি ত আমার চেয়ে মাত্র বছর চারেকের বড়। তবুও তোমাকে বলতে লজ্জা হচ্ছে—

সত্যেন। বলেই ফেল না। আমার কাছে তোর কোন লজ্জা নেই।

গৌর। ছোড়দা, আমি কল্যাণীকে ভালবাসি।

সত্যেন। কল্যাণীকে দেখে মনে হয়, তারও তোর প্রতি দুর্ব্বলতা আছে—

গৌর। একদিন আষাঢ়ের এক মেঘলা সন্ধ্যায় প্রথম কল্যাণী এসেছিল আমাদের আশ্রমে আমাকে দেখতে। মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মত কমনীয়তা-মাখা ওর মুখখানা, পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মত ওর উজ্জ্বল দুটো চোখ সেদিনই আমাকে মাতাল করে দিয়েছে ছোড়দা।

সত্যেন। প্রথম দিন তুই ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি শুনলাম—

গৌর। হ্যাঁ দিয়েছিলাম ছোড়দা। ওর দুটো টানা টানা চোখের অপলক দৃষ্টি আমাকে চঞ্চল করে দিয়েছিল। কল্যাণীকে দেখেই বুঝতে পারলাম আমি দেবতা নই, রক্তমাংসের মানুষ ছোড়দা!

সত্যেন। রজনী নিশ্চয়ই পরস্পরের প্রতি তোদের এই দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরেছে?

গৌর। হ্যাঁ। ওর শকুনির মত দুটো চোখের দৃষ্টি সর্ব্বদা আমাকে পাহারা দেয় ছোড়দা। কল্যাণী আমার সামনে এলেই ওকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

সত্যেন। কল্যাণীও কি তোর ভগবানের এই ছদ্মবেশের আড়ালে তোর ভিতরের মানুষটাকে দেখতে পেয়েছে?

গৌর। নিশ্চয়ই পেয়েছে। কল্যাণী ত দেবতার কাছে আসে নি। পতঙ্গের মত ও আমার কাছে ছুটে এসেছে।

(সুনীতি ও কল্যাণীর প্রবেশ)

সুনীতি। (কল্যাণীকে) এই যে তোমার ঠাকুর—নাও হ'ল ত? বাবাঃ, কি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে! (সত্যেনকে) ঠাকুরপো তোমার দাদা লাইব্রেরীঘরে বসে রজনীবাবুর সঙ্গে গল্প করছেন। তুমি খেয়ে নেবে এস।

সত্যেন। ওরা কি আলাপ করছে বৌদি?

সুনীতি। গৌরদাস সম্বন্ধেই আলাপ করছেন। তোমার দাদা ওকে বেলুড়ে নিয়ে যেতে চান। রজনীবাবু সেই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী নন।

সত্যেন। নাঃ, গৌরদাসকে ত আচ্ছা আড়কাঠিতে ফেলেছে! দেখি কি করতে পারি! চল—চল।

[সুনীতির সঙ্গে খুব ব্যস্ত এবং উৎকণ্ঠিত ভাবে সত্যেনের প্রস্থান]

কল্যাণী। সত্যি, তুমি কি বেলুড় মঠে চলে যাবে?

গৌরদাস। কি জানি! বড়দার বিশ্বাস, বেলুড়ে গেলেই আমি ঠিক পথ খুঁজে পাব। (হঠাৎ আগুনঝরা চোখে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল)

কেন তুমি এখানে এসেছ? কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?

কল্যাণী। অকারণে তুমি এত নিষ্ঠুর হচ্ছ কেন? আমাকে দুঃখ দিয়ে তুমি আনন্দ পাও?

গৌর। একদিকে তুমি আর একদিকে রজনী মোক্তার। দু'দিক থেকে দুটো তীর এসে বিঁধেছে আমার পাঁজরে।

কল্যাণী। না তোমার ভুল হ'ল একটু। রজনী মোক্তার চায় তোমার ফোঁটা তিলক কাটা বাহ্যিক ভড়ংটাকে। আর আমি চাই—

গৌর। থাক থাক খুব হয়েছে—আর বলতে হবে না।

কল্যাণী। আজ তোমার এত তিরিক্ষি মেজাজ হয়েছে কেন বল ত? জিতেনকাকার বাড়ীতে এসে নতুন কোন সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে? কিন্তু মনে রেখ, দোলপূর্ণিমার রাত্রে আশ্রমের কামিনীগাছের নীচে দাঁড়িয়ে তুমি কি বলেছিলে।

গৌর। কি বলেছিলাম? না—না (ভয়ার্ত্ত গলায়) সে তোমার অতিরিক্ত পীড়াপীড়ি আর আগ্রহে।

কল্যাণী। চুপ কর। তোমরা পুরুষরা যেমন সহজে ভালবাস, তেমনি সহজে অস্বীকারও করতে পার। তোমাদের হৃদয় বলে কোন পদার্থই নেই।

গৌর। না—না—সে অসম্ভব! (মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের মনেই অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল) না-না, তোমার ভুল—তোমার।

কল্যাণী। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় বাগানে দাঁড়িয়ে সেদিন তোমার চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলাম, সেই দৃষ্টি কোন তরুণী মেয়ে বুঝতে ভুল করে না। তুমি আমার হাত ধরে কাতর গলায় বলেছিলে—

গৌর। কল্যাণী!

কল্যাণী। বুকভরা কামনা নিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে চিরকাল মানুষকে ত ফাঁকি দেবেই, নিজেকেও দেবে।

গৌর। (চারিদিকে তাকিয়ে খপ করে কল্যাণীর হাত দুটো ধরে করুণ গলায়) কিন্তু তোমাকে বিয়ে করলে রজনী মোক্তার যে আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেবে।

কল্যাণী। দেবে তাতে কি? আমি থাকলে তোমার দুঃখ অনেক হাল্কা হবে। সংসারের আর দশটা লোকের মত দুহাতে খাটব, খাব, হেসে-কেঁদে মানুষের মত বাঁচব।

গৌর। কিন্তু বাবা-মা?

(হঠাৎ বৈঠকখানাঘরের জানালায় রজনীর মুখখানা উঁকি দিয়েই সরে গেল। নেপথ্যে তার কর্কশ গলার স্বর শোনা গেল)

রজনী। (নেপথ্যে) বালকসাধু, তোমাদের শাস্ত্র আলোচনার আর কতটুকু বাকী আছে?

(কল্যাণী ও গৌরদাস, দু জনেই সরে দাঁড়াল। রজনীর প্রবেশ। মুখে ধূর্ত্ত হাসি)

রজনী। বালক-সাধু! তুমি মনু পড়েছ ত? মনু বলেন, নিরালায় মার সঙ্গেও দীর্ঘকাল আলাপ করিবে না। সাধন-ভজনের পথে কামিনী বিষবৎ পরিত্যজ্য।

গৌর। আমরা জীবন আর সংসারের কথাই আলাপ করছি রজনীদা।

রজনী। উহু উহু, এত রাত্রে নির্জ্জন ঘরে আগুনের শিখার মত এই মেয়ের সঙ্গে তুমি মায়াময় সংসারের আলাপ করছ, এমন কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না—(কল্যাণীকে) যাও ত মা কল্যাণী তুমি ভিতরে যাও।

গৌর। না ও যাবে না।

রজনী। কি?

গৌর। চোখ রাঙিও না বলছি। আমি কারও চাকর নই।

রজনী। তুমি বালক-সাধু সেজে সারা মুল্লুকের প্রণাম কুড়োবে আর নিরালা ঘরে সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে ব্যভিচার করবে?

গৌর। মুখ সামলে কথা বল। ব্যভিচার করছ তুমি আমাকে বালক-সাধুর সঙ সাজিয়ে! আমি প্রণাম কুড়োচ্ছি। তুমি দু'হাতে টাকা লুটছ।

রজনী। ওরে হারামজাদা, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! নিশ্চয়ই সত্যেনবাবু তোর চোখ ফুটিয়েছে। ভুলে যাস না, আমি তোর বাপ মাকে, তোর গুষ্টিকে পুষছি।

গৌর। লোকঠকানো পাপের টাকায় আমার বাবা-মা ভাত খাচ্ছেন বলে প্রতিটি রাত্রি আমি কেঁদেছি আর ঠাকুরকে বলেছি এই অবস্থা থেকে আমাকে বাঁচাও।

রজনী। যত নষ্টের মূল এই মেয়ে—(হঠাৎ সজোরে চুল ধরে কল্যাণীকে হিড় হিড় করে টেনে) যা, যা ভেতরে যা, নিজের কপাল পুড়িয়ে এখন ওর মাথা খেতে বসেছে।

(নেপথ্যে জিতেন, সত্যেন, ও সুনীতির সম্মিলিত গলার স্বর শোনা গেল)

এই—এই কি হচ্ছে? কে কাকে মারছে? আরে আরে এটা যে ভদ্রলোকের বাড়ী—এই রজনী।

কল্যাণী। (গর্জ্জন করে) কোন সাহসে তুমি আমাকে অপমান করছ?

(জিতেন, সত্যেন ও সুনীতির প্রবেশ)

সত্যেন। কি হয়েছে গৌর?

গৌর। রজনীদা কল্যাণীকে অপমান করছে।

জিতেন। কেন? কল্যাণী ত তোমার সঙ্গে ধর্ম্ম আলোচনা করছিল।

রজনী। (মুখ বিকৃত করে) ধর্ম্মালোচনা করিছিল না ছাই করছিল। বুঝলেন মাষ্টার মশাই, শয়তান ঐ শশী ডাক্তার—বিধবা ভাইঝিটাকে ওর কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে সরে পড়েছে।

সত্যেন। মুখে সামলে কথা বল রজনীদা। মনে রেখ, চক্কোত্তিবাড়ীর অন্দরমহল এটা।

জিতেন। ব্যাপারটা আমাকে খোলাখুলি বল ত। সোজাসুজি বলবে। কোন মোক্তারী প্যাঁচ কষিও না।

সুনীতি। হ্যাঁ। খুব স্পষ্ট ভাষায় বলুন। আপনারা ত দিনকে রাত করতে পারেন। খুনীর আসামীকে বেকসুর খালাস দিতে, আবার নিরপরাধকে খুনী করতে পারেন।

জিতেন। শোন রজনী, সত্যি যদি ওরা কোন অশোভন ব্যবহার করে তা হলে আমি ক্ষমা করব না। তুমি বল।

সত্যেন। কৈ রজনীদা, চুপ মেরে গেলে যে! বালুরঘাট 'বারে' দাঁড়ালে তোমার মুখে যে খৈ ফুটত!

(জিতেন, সুনীতিকে চোখের দৃষ্টিতে কি এক ইঙ্গিত দিল)

সুনীতি। কল্যাণী, তুই আমার সঙ্গে ভেতরে আয়।

(সুনীতি ও কল্যাণীর প্রস্থান)

জিতেন। এবার বল ত রজনী, গৌরদাস কি অশোভন কথা বলেছে?

রজনী। সে অতি গুরুতর কথা! (অকারণে চাপা গলায় ফিস ফিস করে) বুঝলেন মাষ্টারমশাই, এই গৌরদাসের ওপরে কল্যাণীর আসক্তি আছে। আমাদের আশ্রমের বাগানে পূর্ণিমার রাত্রে ('গৌরদাসকে ইঙ্গিত করে) এই শ্রীকৃষ্ণ ঐ শ্রীরাধিকার সঙ্গে লীলা করেন—

সত্যেন। (হো হো করে হেসে) আসক্তি—লীলা—এসব কি বলছ রজনীদা? বল ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসে।

জিতেন। (তিক্তবিরক্ত হয়ে গম্ভীর কর্কশ গলায়) রজনী, তুমি যা বললে, ওটা তোমার অনুমান নয় ত?

রজনী। অনুমান। মানে বলছেন কি? আমি নিজের কানে ওদের পরামর্শ শুনেছি।

জিতেন। কিসের পরামর্শ?

রজনী। ওরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে।

জিতেন। (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল) বিয়ে! বালক-সাধু সেজে তলে তলে এই সব শয়তানী ফন্দী? একটা বিধবা মেয়ের সর্ব্বনাশ?

রজনী। সর্ব্বনাশ মানে? রেগুলার ক্রিমিন্যাল কেস! প্রহিবিটেড রিলেশনসের কোন মেয়ের হাত ধরলেই আই. পি, সি।

জিতেন। গৌরদাস, এর বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?

(মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ভয়ে, লজ্জায় কাঁপতে লাগল গৌরদাস)

সত্যেন। দাদা, এ তুমি কি বলছ? গৌরদাস কল্যাণীকে ভালবাসে।

জিতেন। (নেপথ্যে তাকিয়ে) সুনীতি, কল্যাণীকে নিয়ে এস ত। (গৌরদাসের দিকে তাকিয়ে) আমি তোমাদের দুজনকে পাড়া থেকে বের করে দেব (উত্তেজিত হয়ে ক্রুদ্ধ বাঘের মত পায়চারী করতে করতে) আমি তোমাদের এমন শিক্ষা দেব—

রজনী। মাষ্টারমশায়! না, না, গৌরদাসের কেলেঙ্কারীটা বাইরে প্রকাশ করবেন না।

জিতেন। কেন, বালক-সাধুকে নিয়ে তোমার 'বিজনেসে'র ক্ষতি হবে?

সত্যেন। দাদা, এ তুমি কি করছ? কল্যাণী আর গৌরদাসের কোন দোষ নেই। জীবনের দাবি, যৌবনের দাবি সবচেয়ে বড়।

জিতেন। তা মানি। তাই বলে নীতি, ধর্ম্ম, চরিত্র বলতে কিছুই থাকবে না? (অধৈর্য্য হয়ে আবার নেপথ্যে তাকিয়ে চীৎকার করে ডাকল) কৈ সুনীতি দেরি করছ কেন? কল্যাণীকে নিয়ে এস। ওর জবানবন্দীটা আমাকে নিতে হবে (দাঁতে দাঁত চেপে ধরে) আমার বাড়ীর মাটির ওপর দাঁড়িয়ে এ সব উচ্ছৃঙ্খলতা।

(সুনীতির সঙ্গে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী, তুমি এদিকে এস।

সত্যেন। দাদা, তুমি ভেবে দেখ।

সুনীতি। প্রেম ভালবাসাকে তোমার শ্রদ্ধা করা উচিত।

জিতেন। (শক্ত করে কল্যাণীর হাতটা ধরে টেনে এনে) লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন ধরে তোমাদের এই আলাপ-সালাপ চলছে?

সুনীতি। ছিঃ ছিঃ, তুমি বাপের বয়সী হয়ে ঐ একফোঁটা মেয়েকে এ সব বলছ—লজ্জা হচ্ছে না?

জিতেন। সত্য, দেয়াল থেকে ঐ ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের ফটোটা পেড়ে নিয়ে আয় ত?

সুনীতি। কি গো? তোমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

জিতেন। আঃ চুপ কর। সত্য, যা বলছি, তাই কর।

(রজনী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ফটোটা নামাতে গেল জিতেন আর্ত্তনাদ করে উঠল)

আহা—আহা—তুমি ও ফটো স্পর্শ করো না রজনী।

(সত্যেন পরমহংসের ফটোটা নামিয়ে এনে জিতেনের হাতে দিল। ফটোর ফ্রেমে জড়ানো দুটো বেলফুলের মালা হাতে নিয়ে জিতেন বলল)

গৌরদাস! কল্যাণী! খবরদার! আর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করো না। এই নাও, দিবালোকে তোমাদের গল্প করবার, প্রাণ-ভরে ভালবাসার ছাড়পত্র।

(মালা দুটো কল্যাণী ও গৌরদাসের হাতে দিয়ে বলল)

দাও—পরস্পরকে পরিয়ে দাও।

(সুনীতি সজোরে উলুধ্বনি দিয়ে উঠল। কল্যাণী আর গৌরদাস পরস্পরকে মালা পরিয়ে দিল)

সত্যেন। তাই বলি! আঃ বড়দা! কলেজের থিয়েটারে তুমি যে মেডেল পেয়েছিলে—সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

রজনী। (আর্ত্ত চীৎকার করে দু'হাতে বুক চেপে ধরে বসে পড়ল) এ আপনি করলেন কি মাষ্টারমশাই? ছেলে-মেয়ে নিয়ে একেবারে পথে বসব!

(হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল)

(নেপথ্যে সম্মিলিত জনতার কোলাহল শোনা গেল)

জনতা। (নেপথ্যে) ভোর হয়েছে। আমাদের বালক-সাধু সারারাত এখানে আছেন—আমরা আমাদের বালক-সাধুকে দর্শন করতে চাই—আমাদের ভেতরে যেতে দেওয়া হোক—

সত্যেন। (নেপথ্যের দিকে এগিয়ে এসে) ওহে, তোমরা বাড়ী ফিরে যাও, তোমাদের বালক-সাধু আর সাধু নেই—মানুষ—মানুষ হয়ে গিয়েছেন তিনি।

জনতা। (নেপথ্যে) বলে কি রে! মানুষ হয়ে গিয়েছেন?

(রিফিউজি লোন প্রার্থী সেই তিন নম্বরের প্রবেশ)

৩। বললেই হ'ল মানুষ হয়ে গিয়েছেন! সাধু যদি মানুষ হয়ে যান, তা হলে আমাদের কি হবে।

(হঠাৎ বালক-সাধুর দিকে নজর পড়তেই স্তব্ধ হয়ে গেল, কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কল্যাণী আর গৌরদাসের দিকে তাকিয়েই চীৎকার করতে করতে প্রস্থান)

ওরে চল—চল সত্যিই বালক-সাধু মানুষ হয়ে গিয়েছেন—ডাক্তারের ভাইঝি সেই ডাগর মেয়েটাকে বিয়ে করেছেন।

জিতেন। কল্যাণী, গৌরদাস, তোমরা ঠাকুরের প্রতিকৃতিকে প্রণাম কর—প্রার্থনা কর—

রজনী। (বিষাক্ত গলায় চীৎকার করে উঠল) তোমাকে বুঝলে মাষ্টার—আমি—আমি তোমাকে 'কেসে' ফেলব,—তোমাকে—

সত্যেন। এই রাস্কেল, বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

(রজনীর প্রস্থান। নেপথ্যে শোনা গেল তার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ-স্বর)

রজনী। (নেপথ্যে) তোমাদের দুই ভাইকে, সবাইকে আমি—একটা মেয়েছেলেকে 'কিডন্যাপ' করে বিয়ে দেওয়ার 'চার্জে' ফেলব।

জিতেন। বুঝলে গৌরদাস, ঠাকুর বলেছেন—'সংসার করবে, কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরের দিকে', মনে তীব্র ভোগবাসনা নিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

(সুনীতি আবার সজোরে উলুধ্বনি দিল। কল্যাণী ও গৌরদাস পরমহংসের প্রতিকৃতিকে প্রণাম করল)

যবনিকা

কস্তুরী মৃগ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ভেবেছিনু মনে, মনেরি ভরমে
চিনেছি তোমারে স্বামী
মিছে অভিমান, মিছেই চেনার ভান,
অন্তর-মাঝে অমৃত-মূরতি
দেখি নাই চেয়ে আমি
ভুল ক'রে করি সরণির সন্ধান।

দেখেছি তোমার ছায়ার মুরতি
তুলির চিত্র বটে
দেউলে দেয়ালে করেছি আরতি
বিগ্রহে ঘটে পটে।

আপন মনের মোহের মায়ায়
চিত্রতুলির ছায়া-সুষমায়
প্রতিবিম্বিত নভো নীলিমায়
সাগরে তটিনী-জলে
ইন্দ্রধনুর বর্ণালী মালা
সজল জলদ তলে।
প্রতি অবয়বে—ভরিয়াছি ধবে
তোমারি আবির্ভাব
ভাবি নাই আমি কস্তূরী-মৃগ
কস্তূরী-ভরা নাভ

আমারি হৃদয়ে দিয়েছি আগল
তুমি জাদুকর জানো কত ছল
ভুলায়ে নয়নে বুলায়ে দিয়েছো
মায়ার কাজল-রেখা
সিন্ধু মরুর বিন্দু ও কণা
গুণেই চলেছি একা!
হৃদয়ের ঘরে বসে আছ তুমি
একেলা একেশ্বর
খুঁজি সব ঠাঁই কোথাও না পাই
কোথায় বেঁধেছো ঘর?
অন্তর-মাঝে বাঁধিয়াছো বাসা
ভুবন ভ্রমিয়া কাটে না কুয়াসা
জাহ্নবী তীরে অন্ধ শুধায়
কোথা হায়! সরোবর
বিশ্ব-নিখিলে সলিলে বা নীলে
কোথা ভুবনেশ্বর।
কস্তুরী-মৃগ মৃগ্য সুরভি
খুঁজে মরে চরাচরে
নিষাদের স্বরে মরে তার পরে
তারি বিষাক্ত শরে।
সিন্ধু ফেলিয়া পিয়াসী চাতক
চাহে সে বিন্দু জল
করুণা-সিন্ধু তোমারে ফেলিয়া
পান করি হলাহল।

বর্ষা-বন্দনা

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

(১)

উপনিষদের ঋষির ধ্যানদৃষ্টিতে বিশ্বস্রষ্টার সত্যস্বরূপটি ফুটে উঠলো, "কবির্মনীষী"রূপে। বৈচিত্র্য সৃষ্টিই হ'ল অন্যতম কবিকর্ম। সেই বৈচিত্র্যই আবার রসিকচিত্তে সঞ্চার করে "রসের," যা' নিয়ে আসে আনন্দ-মধুর চমৎকৃতিকে। এই নিখিল বিশ্বে দিকে দিকে বিলসিত হয়ে আছে অনন্ত বৈচিত্র্য অপূর্ব মাধুর্য। তাই ত তিনি "কবীনাং কবিঃ"। কালে কালে, দেশে দেশে, ঋতুতে ঋতুতে দেখি কত নবীনতা, কত বিচিত্রতা! এই মহাশিল্পী তথা মহাকবি ধরণীর রঙ্গমঞ্চে ষড়-ঋতুর নিত্য নূতন অভিনয়ে নিয়ত প্রকাশিত করে চলেছেন তাঁর আনন্দ-সুন্দর রূপটিকে। এমনি করেই কালচক্রের আবর্তনে নটরাজের ঋতুরঙ্গশালায় রাজসমারোহে নববর্ষার হ'ল শুভাগমন। বর্ষার কবি কালিদাস তাই বর্ণনা করছেন :

> "সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর—
> স্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
> সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনি—
> র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে॥" (ঋতুসংহারম্)

"জলকণাবর্ষী মেঘ এই মহারাজের মত্ত মাতঙ্গ; তড়িৎ হ'ল পতাকা, আর অশনি হ'ল মাদল ধ্বনি।" জ্যৈষ্ঠশেষের তপ্ত দিনের রুদ্র মূর্তি দেখেছি। ধরণীর বুকে রচিত হয়েছে বিগত বর্ষকে ভস্মীভূত করার জন্য গ্রীষ্মের মহাশ্মশান। রুদ্র-রৌদ্র-বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ-ধূসর প্রান্তরের মধ্যে যেন বিশ্বপ্রকৃতি নববর্ষার জন্য করছে উদগ্রতপস্যা। সেই দুঃসহ তপস্যার অবসানে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" নিশান উড়িয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিজয়ীর বেশে সমাগত হ'ল ঋতুরাজ বর্ষা। তাই, যুগান্তরের কবি এই মহান্ অতিথির সম্বর্ধনার জন্য "তড়িৎ-চকিত-নয়না" জনপদবধূ এবং "তরুণী পথিক-ললনাদে"র জানাচ্ছেন আহ্বান :

> "আনো মৃদঙ্গ-মুরজ-মুরলী মধুরা
> বাজাও শংখ উলুরব করো বধূরা।
> এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী।
> ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
> মেঘ-মল্লার রাগিণী॥" (বর্ষামঙ্গল—কল্পনা)

এই বর্ষা শাশ্বতকালের মানব-হৃদয়ে পেতেছে তার স্থায়ী আসন। মানুষের বসবাস ত কেবল লোকালয়ে নয়, বিশাল বিশ্বেও। নিখিলের সঙ্গে রয়েছে তার প্রাণের নিবিড় যোগ। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতি যখন মিতালী পাতিয়ে চলে, উভয়ের মধ্যে যখন জাগ্রত হয় ঐক্যবোধ, তখনি প্রকাশিত হয় সৌন্দর্য, যা "আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।" তা'রি অনুবর্তনে যুগে যুগে নিত্য নূতন কবিচিত্তে এই বর্ষা "নিতুই নব"-রূপে হয়েছে প্রতিভাত। ঋক্, যজুঃ এবং অথর্ববেদের বহু স্থানে এই বর্ষার এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রকারের মেঘ, জল, বিদ্যুৎ, মত্তদাদুরীর ঐক্যতান প্রভৃতির বহুল বর্ণনা ছড়িয়ে আছে দিকে দিকে। ঋগ্বেদের ঋষি দাদুরীকুলকে বর্ষার আবাহনী গাইবার জন্য জানাচ্ছেন আহ্বান—

> "সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ।
> বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং প্রমণ্ডূকা অবাদিষুঃ॥" (৭।১০৩।১)

"যে মণ্ডূককুল ব্রতচারী ব্রাহ্মণের মত সারা বৎসর বর্ষা-বিহনে নীরব ছিল, ধারাবর্ষণের প্রাচুর্যে তারা এখন পর্জন্য-প্রীতিকর ধ্বনিতে সকল দিক্ মুখরিত করে তুলুক্।" প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে বৈষ্ণব কবির "মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী, ফাটি যাও— অত ছাতিয়া।"

অথর্ববেদের ঋষি ত বর্ষার আবাহনে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। এই বেদের চতুর্থ কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের পঞ্চদশ সূক্তটি বিশ্ব-সাহিত্যে বর্ষা-বরণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছ বলে মনে করা যেতে পারে। বর্ষার বহু বিচিত্র রূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ সরস বর্ণনায় ঋষিকণ্ঠ মুখর হয়ে উঠেছে। "বায়ুচালিত মেঘরাজি মহাবৃষের মত করছে গর্জন; তাদের শব্দায়মান জলধারা পৃথিবীকে করুক তৃপ্ত; বৃষ্টিজলের এই রসামৃত ওষধির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে ধরণীকে করুক শস্য-শালিনী।" বর্ষার স্নেহধারা বিভিন্নরূপে বর্ষিত হয়ে মানব-জীবনকে করে তুলুক সুন্দর, এই ত কবির প্রার্থনা—

> "সংবোবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
> মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু॥
> আশামাশাং বিদ্যোততাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ।
> মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা সংযন্তু পৃথিবীমনু॥" (৪।৩।১৫।৭-৮)

"অজগরের মত ধেয়ে চলে আসে যে বাদলের ধারা, তারা সবারই মঙ্গল বিধান করুক। মরুদ্গণের দ্বারা প্রেরিত মেঘরাজি পৃথিবীর উপর 'পাগলা-ঝোরার ধারার' মত অঝোরে করুক বর্ষণ। দিকে দিকে বিকীর্ণ হোক বিদ্যুতের ছটা,

আর সকল দিকে প্রবাহিত হোক সুশীতল সমীরণ। তৃষিত ধরণী সিক্ত হোক বায়ুবিতাড়িত মেঘের বর্ষণে।"

যজুর্বেদে বহুবিধ জলের বন্দনা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সকল প্রকারের মেঘেরও বন্দনা। বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী মেঘ, স্ফূর্জৎ মেঘ, বর্ষণশীল মেঘ, ধারাসার বর্ষণশীল মেঘ, উগ্রবর্ষণশীল মেঘ, সত্বর বর্ষণশীল মেঘ, মৃদুমন্দ বর্ষণশীল মেঘ প্রভৃতির আহ্বান ধ্বনিত হ'য়েছে যজুর্বেদে। জলের বন্দনায় যজুর্বেদের ঋষি বলছেন—

"হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ যাসু জাতঃ
সবিতা যাস্বগ্নিঃ।
যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ
শংস্যোনা ভবন্তু॥" (১।৬।৫।১)

"হিরণ্যবর্ণ, শুচি এবং পাবক যে জল; সবিতা ও অগ্নি যে জল থেকে উৎপন্ন হ'ল; এবং যে জল অগ্নিকে গর্ভে ধারণ করে, শোভনবর্ণা, আবিলতাশূন্য সেই জল আমাদের রোগনাশক ও সুখদায়ক হোক।"

এমনি করেই এই বর্ষা চিরকালের কবিচিত্তকে নব নব ভাবে করেছে উদ্বোধিত। বাল্মীকির বর্ষা বিরহের বেদনা নিয়ে হয়েছে উপনীত। সীতা-বিয়োগবিধুর রামচন্দ্রের মনে এই বেদনাই আজ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। বর্ষাকালীন প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের এক গভীর যোগ ব্যঞ্জিত হয়েছে আদি কবির কাব্যে। মন্দমারুতের তপ্ত নিঃশ্বাসে এবং সন্ধ্যা-চন্দন-রঞ্জিত মেঘের ঈষৎ পাণ্ডুরতায় বিরহের বেদনারুণ, ব্যথা-করুণ ছবিটিই যেন ফুটে উঠেছে।—

"মন্দ-মারুত-নিশ্বাসং সন্ধ্যা-চন্দন-রঞ্জিতম্।
আপাণ্ডু-জলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্॥
এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারি-পরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি"॥ (কি—২৮।৬।৭)

বর্ষার সেই তৃষার্ত চাতক, মানসযাত্রী হংসবলাকা, প্রথম মুকুলিত নীপবনে ময়ূরের নৃত্য, শ্যাম জম্বুবন, অরণ্যনির্ঝরের প্রপাতধ্বনি, সলিল-শীকর-সিক্ত কেতকীপরাগের সুরভি—এই সবই বাল্মীকি এবং কালিদাসের বর্ণনায় ছড়িয়ে আছে পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে। আদি কবি বলছেন—

"সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং
বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃংগেষু মহীধরাণাং
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥" (কি—২৮।২২)

"জলের গুরুভার বহন করে গর্জন করতে করতে মেঘগুলো উত্তুঙ্গ শৈলশীর্ষে বিশ্রাম করে করে প্রয়াণ করছে।" মেঘদূতেও যক্ষ মেঘকে নির্দেশ দিচ্ছে—

"খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘুপয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য॥" (পূ-মে-১৩)

বাল্মীকির বর্ষা বিরহের সুরকেই বেশী মনে করিয়ে দেয়। পরবর্তী ভট্টি প্রভৃতি কবিকুল রামচন্দ্রের বিরহ-বর্ণনায় আদি কবিকেই অনুসরণ করেছেন। কালিদাস 'মেঘদূতাদিতে' যেমন বিপ্রলম্ভকে গ্রহণ করেছেন, তেমনি "ঋতুসংহারাদিতে" সম্ভোগশৃঙ্গারকেও গ্রহণ করেছেন পূর্ণভাবে। তবুও বিপ্রলম্ভের ক্ষীণ রেশটুকু তাতেও দেখা যায়। কারণ, "ন বিনা বিপ্রলম্ভেণ সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।" বিরহ বিনা মিলন তো পূর্ণ হয় না। মহাকবি শূদ্রক "মৃচ্ছকটিকম্"-এর পঞ্চম অঙ্কে অভিসারকালে বর্ষার অপূর্ব বর্ণনা করেছেন। সম্ভোগ শৃঙ্গারের পরিপূর্ণ সার্থকতা ফুটে উঠেছে অভিসারান্তে প্রিয়ালিঙ্গনবদ্ধ চারুদত্তের প্রার্থনায়—

"বর্ষশতমস্তু দুর্দিনমবিরতধারম্ শতহ্রদা স্ফুরতু।
অস্মদ্বিধদুর্লভয়া যদহং প্রিয়য়া পরিষক্তঃ॥"

"শত বৎসর ধরে অবিরত ধারায় বর্ষণমুখর দুর্দিন হোক্, ঘন ঘন স্ফুরিত হোক্ বিদ্যুৎ। কারণ, আমাদের মত লোকের পক্ষে একান্ত দুর্লভ যে প্রিয়তমা, তারি ভুজপাশে আজ বদ্ধ হয়েছি আমি।" তিনি আরো বলছেন:

"ধন্যানি তেষাং খলু জীবিতানি যে কামিনীনাং গৃহমাগতানাম্।
আর্দ্রাণি মেঘোদক-শীতলানি গাত্রাণি গাত্রেষু পরিষ্বজন্তি॥"

"যারা স্বয়ং আগত অঙ্গনাদের বৃষ্টি-শীতল আর্দ্র অঙ্গ আলিঙ্গন করতে পারে, তাদের জীবনই ধন্য।" একটি শ্লোকের মধ্যদিয়েই সুনিপুণ কবি কী অপূর্বভাবে বর্ষার সমগ্র রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন! কর্দমলিপ্ত মুখ ও ধারা-বর্ষণে আহত ভেককুল বৃষ্টির জল পান করছে; কামার্ত ময়ূরগণ কেকাধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক মুখরিত করে তুলছে; কদম্বতরু নববিকশিত ফুলের পশরা নিয়ে প্রদীপের মত আচরণ করছে; কুলদূষণকারী ব্যক্তি যেমন সন্ন্যাসধর্মকে কলঙ্কিত করে, তেমনি মেঘরাজিও চন্দ্রকে করছে আবৃত; আর হীন কুলোৎপন্ন যুবতীর মত বিদ্যুৎও সদাই চঞ্চল, কোথাও এক মুহূর্ত স্থির থাকছে না"—

"পংকক্লিন্নমুখাঃ পিবন্তি সলিলং ধারাহতা দর্দুরাঃ
কণ্ঠং মুঞ্চতি বর্হিণঃ সমদনো নীপঃ প্রদীপায়তে।
সন্ন্যাসঃ কুলদূষণৈরিব জনৈর্মেঘৈর্বৃতশ্চন্দ্রমা
বিদ্যুন্নীচকুলোদ্গতেব যুবতির্নৈকত্র সন্তিষ্ঠতে॥"

কবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে মেঘের চাঞ্চল্যকে মানব-স্বভাবের সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে। "মানুষ হঠাৎ বড় লোক হলে তার বাইরের আড়ম্বরের সীমা থাকে না। অসংযত এবং চঞ্চল আচরণে কখন কি করবে দিশে পায় না। ভুলে যায় সুসংযত কর্মপদ্ধতি। বর্ষার মেঘও যেন তাই। কখনো উড়ছে, কখনো নামছে, কখনো বর্ষণ করছে, কখনো গর্জন করছে, আবার কখনো হঠাৎ সবদিক অন্ধকার করে তুলছে:

"উন্নমতি নমতি বর্ষতি, গর্জতি মেঘঃ করোতি তিমিরৌঘম্।
প্রথম-শ্রীরিব পুরুষঃ করোতি রূপাণ্যনেকানি॥"

এই কবি বৃষ্টির ধারা পতনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এক অপূর্ব ঐক্যতান সঙ্গীত, শ্রুতিমধুর সুর-ঝঙ্কার—

"তালীষু তারং, বিটপেষু মন্দ্রং,শিলাসু রুক্ষং, সলিলেষু চণ্ডম্
সংগীতবীণা ইব তাড্যমানাস্তালানুসারেণ পতন্তি ধারাঃ॥"

"তালবনে উচ্চশব্দে, তরুশাখায় গম্ভীর শব্দে, উপলতলে কর্কশ শব্দে এবং জলে তীব্রশব্দে তালে তালে বাদ্যমান সঙ্গীতবীণার মত বৃষ্টিধারা সুরলহরী সৃষ্টি করে ধরণীর বুকে বর্ষিত হচ্ছে।"

মেঘমেদুর অম্বরতলে তমালতরুর শ্যামল বনে বর্ষার বারিধারা চিরকালের 'অকথিত বাণী' এবং 'অগীত গান'কে মূর্ত করে তোলে। বর্ষাসমাগমে প্রাচীন ভারতে হ'ত কর্মবিরতি। গৃহবাসী তখন প্রবাসীর প্রতীক্ষায় আকুল আগ্রহে দিন কাটাতো। আর, ঘরমুখো প্রবাসীও উৎসুক হয়ে উঠতো প্রিয়মিলনের জন্য। এই ভাবটিই নিবিড় হয়ে মিশে গেছে ভারতীয় চিত্তে। বাংলার বৈষ্ণব কবিকুলের অপূর্ব মানস-সৃষ্টি নায়িকাশিরোমণি রাইকিশোরী রসিকচূড়ামণি কৃষ্ণকিশোরের উদ্দেশে যখন অভিসার যাত্রা করছেন, তখনো—

"গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥" (রায়শেখর)

তাই তো বর্ষায় নরনারী বিরহে ব্যাকুল হয়ে মিলনের আশায় কাটায় কত উৎকণ্ঠিত রজনী। কবি মোহিতলাল বর্ষণমুখর দিনের সেই বেদনাকে করেছেন রূপায়িত।

"কত আঁখি অশ্রুজলে বরিয়াছে শ্রাবণ-শর্বরী
প্রিয়াহারা বিরহী সে বারিধারে হৃদয় বিধুর।
কত রাধা বায়ু রবে শুনিয়াছে শ্যামের বাঁশরী
নিশীথের নীলাঞ্জনে আঁকিয়াছে বদন বঁধুর॥" (স্মরগরল)

মিলন-বিরহ, স্নেহ-প্রীতি, সুখ-দুঃখের ক্ষেত্রে দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে মানব-চিত্তে রয়েছে একটা সুগভীর যোগ। মানব-মনের এই অনুভূতিগুলি সর্বজনীন ও সার্বকালিক। তাই, বর্ষার বিরহিণী রূপটিই যুগযুগান্ত ধরে কবিচিত্তকে করেছে উদ্বোধিত। এই কারণেই কালিদাসের মন্দাক্রান্তার মেঘমন্দ্র স্বরে সেদিন নিখিল বিশ্বের বিরহীচিত্তের বেদনাই সঘন সঙ্গীতের মাঝে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।—

বৃষ্টিঘেরা চারিধার ঘন শ্যাম অন্ধকার
ঝুপ ঝুপ শব্দ আর ঝরো ঝরো পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
মনে পড়ে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমাল তল নীল যমুনার জল
আর দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।" (পত্র-মানসী)

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম মাধুরী এবং যক্ষ-দম্পতীর বিরহ-ব্যথা প্রাচীন হয়েও চিরনবীন। কবিচিত্ত আজ বর্ষার আহ্বানে হয়েছে অন্তর্মুখী। মানব-জীবনের অতীত রূপের সঙ্গে বর্তমানের ঐক্যতান সঙ্গীতই আজ গীত হচ্ছে কবিকণ্ঠে—

"আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।"

এবং

"এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।"

আষাঢ়ের প্রথম দিনে রবীন্দ্রনাথও কালিদাসের সঙ্গে এই কালের যোগটা অনুভব করেছিলেন নিবিড়ভাবে। বাইরের জগতে দেশ-কালের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন হলেও বাদল-দিনের কাজল-ঘন আঁধারে নির্জন অন্তরায়তনে বিরহ-বিধুর এই কবিকুল পরস্পর প্রতিবেশী। ষড়ঋতুর প্রতিটি পরিবর্তনই কালিদাসের চিত্তে অনুরণিত হলেও নববর্ষার একটা বিশেষ আবেদন ছিল তাঁর প্রাণে। তাই তো, তাঁর কাছে শুনি—"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।" রবিকবিরও মনের কথা এইটি। কল্পলোকে বসে রবীন্দ্রনাথ যখন বর্ষার আবাহনী গেয়েছেন, তখন বৈদিক ঋষিকুল, বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব এবং বাংলার বৈষ্ণবমহাজনদের কণ্ঠই তাঁর কণ্ঠে নতুন ভাবে হয়েছে প্রতিধ্বনিত। পুরানো গানই নতুন যুগের কবিকণ্ঠে বিচিত্র সুরে নিত্য নতুন ঝঙ্কারে হয়েছে অনুরণিত। আবার শত শতাব্দী পরে এই সুরনাই নিত্য নতুন পরিণতিতে হবে উৎসারিত। প্রাচীন কবিকুলের সংহত মনীষার ধারক এবং বাহক রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠাহীন চিত্তে স্বীকার করে নিয়েছেন এই ঐক্যমন্ত্রের সাধনা তথা ঐক্যতান সঙ্গীতের কথা।—

"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা
শত শত গীত মুখরিত বনবীথিকা।" (বর্ষামংগল—কল্পনা)।

পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের দিকে দিকে কবি দেখেছেন বিরহে-মিলনে মধুর এক অখণ্ড প্রেমলীলা। সেইটিই যেন আবার দাঁড়িয়ে আছে মানব-জীবনের সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের একটা সার্থক পটভূমিকার মতো অথবা নিরন্তর গীত হচ্ছে নেপথ্য সঙ্গীতের মতো। এই নেপথ্য সঙ্গীতের সঙ্গে মানবের জীবন-সঙ্গীত মিশে গিয়ে সৃষ্টি করেছে এক অখণ্ড সুর-সুষমা। যুগযুগান্তের প্রবাহে ভেসে এসে সে সঙ্গীত আজ আমাদের মনের সায়রে তুলেছে তরঙ্গ।

এই বর্ষা মানুষের হৃদয়-দুয়ারে জানায় মুক্তির আহ্বান; দৈনন্দিন দীনতা হীনতা থেকে অলকার অমরাবতীতে গমনের আহ্বান। প্রেমের মুক্তি এবং তার ভিতর দিয়ে ব্যক্তি-জীবনের মুক্তির সঙ্গীতটিই অনুরণিত হচ্ছে বর্ষার সঙ্গীতে। প্রভুশাপাহত যক্ষ আজ ধন্য! কারণ, অপূর্ণতার বিরহই তাকে পরিচালিত করেছে পূর্ণের পানে, সেই অলকাপুরীতে—

যেখানে—

"যত্রোন্মত্ত-ভ্রমর-মুখরা পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ।"

যেখানে—

"নিত্য জ্যোৎস্না-প্রতিহত-তমো বৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ।"

এবং যেখানে—

"আনন্দোত্থং নয়ন-সলিলং যত্র নান্যৈ নির্মিত্তৈঃ॥" (মেঘদূতম্)

কল্পনার দানে এই অলকা ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা, সুখ-সৌন্দর্য-প্রেমের অনন্ত লীলাভূমি। বর্ষার মেঘের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি-জীবনের প্রেমও চলেছে অভিসারে— "মানসলোকের" অগম্যপারে স্থিত তার দয়িতের সন্ধানে, শূন্য হতে পূর্ণে, সসীম হতে অসীমে। তাই, বৈষ্ণবকবির এই আকৃতিই মূর্ত হয়ে উঠেছে বর্ষার ধারামুখরিত রজনীতে।—

"ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া॥
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন-রাতিয়া॥"

যিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বপালক, বিশ্বচালক, তিনিই তো আবার নটরাজ। ঋতুগুলো যেন তাঁরি রঙ্গপীঠ। তাই ঋতুতে ঋতুতে চলেছে তাঁর বিভিন্ন নৃত্যলীলা। তাঁর তাণ্ডব-নৃত্যের এক পদক্ষেপে বহির্বিশ্বের রূপলোক হচ্ছে আবর্তিত; আর অন্য পদক্ষেপে অন্তরলোকের রসবোধ হচ্ছে উৎসারিত। অন্তরে বাইরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিলে জগতে ও জীবনে উপলব্ধি করা যায় লীলাময়ের অখণ্ড লীলা-রস। আর সেই অনুভূতির আনন্দে প্রাণ-মন অমৃত-আলোকের দিব্যস্পর্শে হয়ে উঠে শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।

শেষের বেলায় প্রার্থনা করি, সকল প্রাণীর প্রাণভূত এই বর্ষা বিতরণ করুক সবারি কাম্য কল্যাণ—

"জলদ সময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি।" তুস(ঋতুসংহারম্)

জ্যোৎস্না আঁকা রাত্রি যেন

শ্রীকরুণাময় বসু

জ্যোৎস্না আঁকা রাত্রি যেন পথ ভোলা মৌমাছি উৎসুক,
এখনি আসিল কাছে, এই দণ্ডে কোথা যাবে উড়ে,
কাজ যদি নাহি থাকে, বস' কাছে, ফিরায়োনা মুখ,
আমি কথা, তুমি গান, প্রাণ দাও মোর বীণা সুরে।

তুমি আমি দুটি তীর, প্রেম যেন নদী জলস্রোত,
সংকীর্ণ সীমার মাঝে স্বপ্ন দেখি সাগর-মোহনা;
যেখানে হৃদয় মেশে, মিশিয়াছে অনন্ত জগৎ,
তুমি আমি ক্ষণস্থায়ী, এ মুহূর্ত তবু ভুলিবনা।

একখানি ছবি যেন এই সন্ধ্যা, সোনালি আকাশ,
শ্যামল অরণ্য বাঁকে নদী প্রান্তে ঢালু বালুচর,
মেঘেরা বলাকা গাঁথি উড়ে যায় যেন বুনো হাঁস,
ওই শোন কথা কয় বনান্তের পল্লব মর্মর।

আকাশে উঠেছে চাঁদ, স্বপ্নময়ী বকুল বীথিকা,
চলো যাই এই বেলা কুড়াইব শিথিল কুসুম;
যে ফুল গাঁথিনু আজ, কাল ভোরে শুকাবে মালিকা,
প্রেমের সমাধি কাল; আজ চোখে আনিও না ঘুম।

জ্যোৎস্না আঁকা রাত্রি যেন পথ ভোলা মৌমাছি চঞ্চল,
হাসির আড়ালে আনে বিদায়ের ম্লান অশ্রুজল।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রতি বৎসর ৮ই মে হইতে 'রবীন্দ্র-পক্ষ' সুরু হয়। লক্ষ্য করিবেন, 'রবীন্দ্র-সপ্তাহ' নয়, 'রবীন্দ্র-পক্ষ'—পনর দিন ধরিয়া রবীন্দ্র-জয়ন্তী চলে কিনা, তাই রবীন্দ্র-পক্ষ। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া বাঙালী আমোদ-উৎসবে মাতিয়া উঠে। অনেকে ইহার নিন্দা করেন, আবার ইহার সমর্থকদের সংখ্যাও কম নয়। বাংলা দেশে এখন ছায়াছবির অন্ত নাই; শহর, গ্রাম, গঞ্জ যেখানেই যাই দেখি সিনেমা-হাউস। বাঙালী আমোদ চায়। তাহার পিপাসা ছবিতে মিটে না, সে আরও কিছু চায়। আগেকার দিনে দেশ-গাঁয়ে যাত্রা ছিল, কথকতা ছিল; রামায়ণ গান, মনসার ভাসান, কবি, টপ্পা, কীর্ত্তনগান, জারিগান—কত কি ছিল। তাহাতে লোকে আমোদ পাইত, আবার লোকশিক্ষারও অঙ্গ ছিল এ-সব। পল্লীর তো কথাই ছিল না, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার মত বড় শহরে কত যাত্রা কথকতা হইত। আজ কি পল্লী কি শহর সকল স্থান হইতেই যেন এ সমুদয় বিদায় লইয়াছে। সিনেমা, ছায়াছবি ইহার স্থান প্রায় জুড়িয়া বসিয়াছে, কিন্তু মানুষের মন ভিজিতেছে না। ক্ষণিক আমোদ বা উত্তেজনার রেশ কত সময় থাকে?

রবীন্দ্র-জয়ন্তী আজ বাংলার নগরে পল্লীতে প্রতিপালিত হইতেছে। আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয় এই উৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গ। লোকেরও ভিড় খুব। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই আসিয়া সভায় জমায়েত হন; কখন সঙ্গীতাদি আরম্ভ হইবে তাহার প্রতীক্ষায় থাকেন তাঁহারা। এখানে বক্তৃতার অবকাশ নাই, রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা চলিতে পারে না, এরূপ ভিড়ের মধ্যে কোনও গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা একান্তই নিষ্ফল। কেহ কেহ বলিতেছেন, রবীন্দ্র-জয়ন্তী?—না রবীন্দ্র-বারোয়ারী? শ্রীযুত অমল হোম লিখিয়াছেন,* ব্রিজ ক্লাব বা তাসের আড্ডা হইতে রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে সভাপতিত্ব করিবার জন্ত তাঁহার নিকট আহ্বান আসিয়াছিল! তিনি ইহাতে চটিয়া গিয়াছেন, আক্ষেপও করিয়াছেন। কিন্তু তাসের আড্ডার সভ্যেরাও ত মানুষ। এ মরুময় জীবনে গতানুগতিক পন্থা হইতে মানুষ খানিকটা নিষ্কৃতি চায়, তারা আমোদ করিবে, আবার দশ জনকে সেই আমোদের ভাগ দিবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এই দিকটার কথা যে আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই। আগে দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া কত আমোদ-উৎসবের আয়োজন ছিল; এখন তাহাদের স্থান যে-সব জিনিষ লইয়াছে, তাহাতে মানুষের আমোদ হয় না; গায়ে জ্বালা ধরে, মনের অশান্তি বাড়ে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্য করিয়া নিখরচায় বা সামান্ত খরচায় যদি কিছু আমোদ-আহ্লাদ করিয়া লওয়া যায়। ইহাকে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর চটুল দিক বলুন বলিতে পারেন, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করার তো উপায় নাই। সুতরাং এ সকল ব্যাপারে উন্নাসিকতা প্রদর্শনে বিশেষ 'ফয়দা' হইবে না। কি করিয়া, এ-সব মানিয়া লইয়াও, উৎসবকে সুনিয়ন্ত্রিত, সফল ও শিক্ষাপ্রদ করা যায়, আসুন সেই কথা একবার ভাবি।

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' কি ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে, সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। অধ্যাপক, গ্রন্থকার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক—অনেকেরই এ বিষয়ে কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহারাও আমার কথায় হয়ত সায় দিবেন। শহর পল্লী প্রতিটি স্থান সম্বন্ধেই এ-সব কথা কমবেশী প্রযোজ্য। ধরুন, সভা পাঁচটায় সুরু হইবার কথা। সভাপতি মহাশয়কে দূর হইতে ঠিক সময়ে আনা হইয়াছে, কিন্তু সভা-মণ্ডপ জনশূন্য। সাড়ে পাঁচটা বাজে, ছ'টা বাজে, লোকের দেখা নাই; সাড়ে ছ'টার সময় কিছু লোক হয়ত সভাক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইলেন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হইতে হইতে প্রায় সন্ধ্যা সাতটা। সভার সম্মুখেই শিশু ও বালক-বালিকার দল। তাহারা অবশ্য আগেই আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ছেলেমানুষই; নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঢের পরে সভা আরম্ভ হইতেই তাহারা অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় যদি কোন বক্তা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ করেন তাহা হইলে তাহার ফল কি হয় একবার ভাবিয়া দেখুন। বক্তা মাইকের মুখে অনর্গল গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিয়া যাইতেছেন, দু'হাতের মধ্যেই ছেলের দল সমানে চেঁচামেচি গোল-মাল সুরু করিয়া দিয়াছে! কি বিসদৃশ ব্যাপার। একটি অনুষ্ঠানে এই অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। যতক্ষণ তিনি বক্তৃতা দিলেন ততক্ষণ গোলমাল আর থামিল না! কোন কোন সভায় দেখিয়াছি, ৫টা হইতে ১০টা কি ১১টা পর্য্যন্ত আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য চলিয়াছে। সভাপতি-বেচারা নিরুপায়; ঠায় পাঁচ ঘণ্টা নিশ্চল বসিয়া থাকার ধাক্কা কাটাইতে তাঁহার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তেমন সবল সুস্থ ব্যক্তি হইলে অবশ্য ভিন্ন কথা। সভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরে যখন সভাপতি বক্তৃতা করিতে উঠিলেন, দেখা গেল, তখন সভা প্রায় জনমানব শূন্য, উদ্যোক্তারা কয়েকজন মাত্র এদিক-ওদিক আনাগোনা করিতেছেন!

হয়ত আপনি কলিকাতা হইতে দেড়, দুই কি আড়াই ঘণ্টার রেলপথে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে পৌরোহিত্য করিতে গিয়াছেন। সময়মত আপনাকে ট্রেন ধরিতে হইবে। সভা পাঁচটায় বলিয়া ছ'টায় আরম্ভ। অনুষ্ঠানাদি চলিল। পরে যখন সভাপতির ভাষণ, তখন আর সময় নাই; আপনাকে 'বোলে হরিবোল' দিয়া সত্বর ট্রেন ধরিতে হইল। আবার কোন সভার সভাপতি হইলেও

---

* পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ।

ভাষণ যদি সামান্যও দীর্ঘ হয় অমনি উদ্যোক্তাদের কেহ আসিয়া পাশে এমন কাতর ভাবে তাকাইবেন যে, অমনই তাঁহার কথা শেষ করিতে বাধ্য হন। একটি সভার কথা জানি, সেটি 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' সভা না হইলেও একই পর্য্যায়ের বলিয়া উল্লেখ করি। কলিকাতা হইতে খানিকটা দূরে। সভা ৪টায় শুরু হইবার কথা, আরম্ভ হইল ৬টার পরে। ৭টার সময় থিয়েটার। দর্শনার্থীর জন্ম টিকেটের ব্যবস্থা। সাড়ে ছ'টা নাগাদ দর্শনার্থীদের ভিড় জমিয়া গেল। আর কি সভা চলে। বক্তৃতার তোড়ে মাইক কাটিয়া যাইবার উপক্রম, তবু গোলমাল আর থামে না; সভাপতিকে অগত্যা নিরস্ত হইতে হয়। 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে যে-সব সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সত্য সত্যই জনসভা—এখানে সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বস্তরের লোক আসিয়া সমবেত হন। গানের আসরের মত এখানকার প্রধান আকর্ষণ নৃত্যগীত, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনয়ানুষ্ঠান। রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা বা রবীন্দ্র-কীর্ত্তি প্রচারের স্থান ইহা নয়। আজ সুদূর পল্লীতেও রবীন্দ্র-জয়ন্তী; ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সেদিন জনৈক জেলা-শাসক বলিলেন, শহর হইতে দূরে, দুর্গম বিল অঞ্চলে (এখন রাস্তা দ্বারা যুক্ত) তিনি সকালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গিয়াছিলেন, সেখানে বেশ জনসমাগম হয়, সভার কার্য্যও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছিল।

ভারত সরকার আগামী ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। সরকারী ঘোষণা বা কার্য্য, ইহার মূলে অনেকে অনেকরকম মতলব খুঁজিতে পারেন। কিন্তু এই ভাবে সমগ্র ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে রবীন্দ্র-স্বীকৃতিতে কাহার প্রাণে না আনন্দ উপজয় হয়? আমরা ভারতবাসী হইয়াও বাঙালী, আমরা যে খুবই উৎফুল্ল হইয়া উঠিব, এ তো একান্তই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে জাতীয় সঙ্গীত দান করিয়াছেন, ভারতবাসীর জাতীয়তার মূল উৎসের সন্ধান দিয়াছেন, ভারতীয় সাহিত্যকে বিশ্ব-দরবারে গৌরবের আসনে বসাইয়াছেন। একটি মানুষের পক্ষে এ কি কম কথা? কেহ কেহ বলেন, হাজার বৎসরেও এমন একটি প্রতিভা যে দেশে জন্মগ্রহণ করে সে দেশ ধন্য। আমরা ধন্য যে, এমন এক মহামনীষী এদেশে আমাদেরই যুগে জন্মিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে আমরা পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি যে-সব সূত্র ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার আংশিক অনুসরণ ও অনুশীলনেই পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হইতে দেশ সক্ষম হইয়াছে। ঝড়ের আগে শুক্‌নো পাতার মত বিদেশী শাসনের খোলস কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।

এখন, আসল কথায় আসা যাক্। কয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি, রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা রবীন্দ্র-জন্মোৎসব কতকগুলি ক্লাব বা সঙ্ঘের যেন একচেটিয়া। এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ এবং কলেজসমূহ বন্ধ থাকে, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীরা যে যাঁর নিজের 'ঘরে' ফিরিয়া যান। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবশ্য প্রায়ই খোলা থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকের পক্ষেই 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' সাড়ম্বরে পালন করা সম্ভব হয়। তাই প্রায় সর্ব্বত্রই সংঘ বা ক্লাব এই উৎসব উদ্‌যাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। বড় বা ছোট শহরে, এমন কি গঞ্জে ও গ্রামে—পাড়ায় পাড়ায় সংঘ। ইতিমধ্যে একটি জায়গায় গিয়াছিলাম; ইহাকে একটি বড় গ্রাম বা ছোট শহর বা কিছু বলিতে পারেন। শুনিলাম সেদিনে ঐ স্থানে পাঁচ-ছ'টা রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভা। একটি স্বল্পায়তন অঞ্চল, অথচ সেখানে একই দিনে প্রায় একই সময়ে পাঁচ-ছ'টি রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভা, শুনিতেও বিস্ময় লাগে।

ছোট্ট জায়গায় 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব একসঙ্গে করা যায় না কি? রবীন্দ্র-জয়ন্তী জাতীয় উৎসবের মর্য্যাদা লাভ করিতেছে। এ সময় অল্প-পরিসর স্থলেও কি যুবকগণ একসঙ্গে উৎসব পালন করিতে পারেন না? এক সঙ্গে উৎসব উদ্‌যাপনের উপকারিতা কত তাহা বলিতেছি। একটি কারণে ইহা অতিশয় প্রয়োজনীয়ও বটে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনের মূল উৎসে যেমন, তেমনি ইহার বিভিন্ন বিভাগেও আলোকসম্পাত করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ের আলোচনা এক দিনে সম্ভব নয়, উৎসব করিলেও নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য তথা রবীন্দ্র-শিক্ষার দুইটি দিক—একটি গুরুগম্ভীর, অপরটি আনন্দের—যাহার প্রকাশ নৃত্যগীত, নাট্যাভিনয়ে; যাহাকে এক কথায় বলিতে পারি আমোদ-উৎসবের দিক। একই সঙ্গে এই দুইটি উদ্‌যাপন করা সম্ভব নয়। গুরুগম্ভীর দিক অপেক্ষা আমোদ-উৎসব দিকটিরই উপর লোকের বেশী নজর পড়িতেছে। আর ইহার জন্যই হয়ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর এবম্বিধ আয়োজনাদির মধ্যে চটুলতাই বেশী দেখিয়া থাকেন। তাহা তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ছোট্ট শহরে বা গ্রামে সকলে মিলিত হইলে এই উৎসব দুই দিনে উদ্‌যাপিত হইতে পারে। একদিন—বাছাই-করা লোকেরা রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করিবেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা এই সকল আলোচনার মধ্যে ধরিয়া দেওয়া চাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপরে প্রতিযোগিতা-প্রবন্ধ আহূত হইয়া উৎকৃষ্টগুলি এখানে পাঠেরও ব্যবস্থা করা যায়। অর্থে কুলাইলে প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে। আবৃত্তি, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠেয়। এই দিন সাধারণ সভা; কারণ ইহা মুখ্যতঃ রবীন্দ্র-স্মারক স্বরূপ তাঁহার কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত এবং নাটক অভিনয় মারফত আমোদ-উৎসব। জনসাধারণ ইহা দ্বারা নিছক আনন্দ পাইবেন, অথচ অবাঞ্ছিত বক্তৃতার বালাই থাকিবে না। সাহিত্যালোচনা বৈঠকী জিনিষ, জনসভার বিষয় নয়। এ কথাটি উৎসবের উদ্যোক্তাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাঁহাদের আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন এই উৎসব জনশিক্ষার উপায়স্বরূপ হয়। যাত্রা, কথকতার ভিতর দিয়া আমরা শুধু আমোদ পাই না, আমরা শিক্ষাও লাভ করি। আমোদের মাধ্যমে যে শিক্ষা আমরা পাই তাহা অনায়াস-লব্ধ; সহজেই হৃদ্‌গত হইয়া যায়।

এখন, বিভিন্ন সংঘের করণীয় সম্বন্ধে কিছু বলি। উপরে যাহা

যাহা বলিলাম, এক-একটি সংঘ সম্বন্ধেও তাহা খাটে। অপিচ, আরও কিছু তাঁহারা করিতে পারেন। গত কয়েক বৎসরে বিভিন্ন সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে বর্তমান লেখককে নানা সূত্রে যোগদান করিতে হইয়াছে। সংঘ পাঁচমিশালি বস্তু। এখানে বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলের জন্যই কিছু কিছু আয়োজন আছে। খেলাধুলার ব্যবস্থা রহিয়াছে; সঙ্গে একটি গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগার না বলিয়া পাঠাগার বলিলেই হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব করেন, কিন্তু এক একটি সংঘের শক্তিসামর্থ্য কতটুকু? দুই দিন ধরিয়া উৎসব করা প্রত্যেকটির পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহারা প্রত্যেক বারই পাঁচ-মিশালি আয়োজন না করিয়া এক একটির উপর এক একবার বেশী করিয়া ঝোঁক দিতে পারে। কোন বার সঙ্গীত ও নাটকাভিনয়ের সুষ্ঠু আয়োজন করুন, যাহাতে লোকে বেশ খানিকক্ষণ অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আবার, কোন বৎসর শিশু ও বালক-বালিকাদের লইয়া উৎসব করুন। রবীন্দ্রনাথ শিশু এবং কিশোরদেরও যে কত প্রিয় তাহা তাহারা জানিতে পারিবে। 'শিশু ভোলানাথে'র তারিফ করিবে তাহারা। কোন বার রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চ্চা, প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইতে পারে। তবে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, ইহা সর্ব্ব-সাধারণের জন্য নহে, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের মধ্যেই ইহা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকিবে। সংঘের যদি অর্থ-সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে প্রতি বৎসরই এই তিনটি ধারাতে কাজ চলিতে পারে, আর যদি তাহা না থাকে তবে এক-একটি একবার করাই সুবুদ্ধির কাজ। নিষ্ঠা ও সংযমের সঙ্গে কার্য্যে অগ্রসর হইলে প্রত্যেকটি সংঘ রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করিয়া জনশিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারিবে। আর ইহাই ত কাম্য।

এই সম্পর্কে আরও কিছু বলা দরকার, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন সংঘের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে। ধরিয়া লই, এক একটি কেন্দ্রে একাধিক সংঘ আছে। সংঘগুলি সাধারণতঃ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। সংঘ শক্তির উৎস, আবার আকরও বটে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্য করিয়া তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া প্রতিবেশী হইতে পারে; তাহাতে প্রত্যেকটিরই ব্যষ্টি ও সমষ্টি-গত ভাবে শক্তি বাড়িবে। বিষয়টি আর একটু তলাইয়া বলি। সংঘনিচয় শুধু নিজেদের সভ্যদের মধ্যে নয়, বিভিন্ন সংঘের সভ্যদের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক, সঙ্গীতবিষয়ক, আবৃত্তিবিষয়ক প্রতি-যোগিতা আহ্বান করুন। কিশোর, যুবক প্রত্যেকের উপযোগী প্রতিযোগিতা। সম্বৎসর ধরিয়া না হউক, অন্ততঃ ছয় মাস বা চারি মাস ধরিয়া এই কার্য্য চলুক। রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা রবীন্দ্র-পক্ষে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হইবে। ইহাতে দুই রকমের লাভ হইবে: (১) বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি পাইবে, (২) রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব। রবীন্দ্র-পক্ষের জন্য শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়; আবৃত্তি, সঙ্গীত, প্রবন্ধ বা বক্তৃতা সম্বৎসরের আলোচনা-অনুশীলন-অনুধ্যানের নিমিত্ত। আবার শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য কেন, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র হইতে আধুনিককালের শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত ক্লাসিক সাহিত্য আলোচনায়ও সংঘগুলি প্রবৃত্ত হইতে পারে। বিভিন্ন সংঘের সাহিত্য-বিভাগই এই কার্য্যে অগ্রণী হইবেন, আমি শুধু সাহিত্যঅংশের কথাই এখানে বলিতেছি। এ ভাবে ক্লাসিক সাহিত্য যুবকদের মধ্যে সুষ্ঠু আলোচনার সুযোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র-ভারতী, গীত-বিতান, অরবিন্দ-পাঠচক্র হইতে সংঘ-কর্ত্তারা এ বিষয়ে কতকটা নির্দেশ পাইবেন।

উক্ত উদ্দেশ্য কি ভাবে সাধিত হইতে পারে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিন-চার বৎসর পূর্ব্বের কথা। কলিকাতা হইতে আটাশ মাইল দূরে বসিরহাট মহকুমার বসুহাটি গ্রামে গিয়াছিলাম। গ্রামে সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভা। গান, আবৃত্তি, ক্রীড়া সব রকমই আছে। প্রকাশ্য সাধারণ সভায় কিছু কিছু নমুনা প্রদর্শন, এবং বক্তৃতাদি কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত। শুনিলাম বসুহাটিকে কেন্দ্র করিয়া অন্ততঃ কুড়িখানা গ্রাম প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছে। এই রকম এক একটি কেন্দ্রে কুড়িটি না হউক, অন্ততঃ দশটি কি পাঁচটি সংঘও যোগ দিতে পারে। আবার কলিকাতার সন্নিকটে একবার রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে যাইতে হয়; সেখানেও দেখি দূর দূর অঞ্চল হইতে যুবকেরা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। কিছুকাল আগে হইতে এই সব আয়োজন চলে। হৈ-হুল্লোড়ে রবীন্দ্র-জয়ন্তী 'রবীন্দ্র-বারোয়ারী'তে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কলিকাতায় কোম্পানীর বাগানে আজ দু'বৎসর যাবৎ সাতদিন-ব্যাপী রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হইতেছে। আমরা যাই নাই, তবে শুনিয়াছি, ইহাতেও খানিকটা হৈ-হুল্লোড়ের ব্যাপার। অন্যত্রও বিরাট আকারে হইয়াছে। এক বন্ধু বলিলেন, সেন্ট্রাল এভিনিউর ফাঁকা জায়গায় বাড়ী উঠিয়াছে, এখন আর কার্নিভাল সার্কাসের স্থান নাই। বিরাট আকারের রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভা সেই সব কার্নিভাল সার্কাসের অভাব পূরণ করিতেছে। আমরা অত দূর বলি না। তবে প্রত্যেক বিষয়ে সংযম চাই, নিষ্ঠা চাই, নহিলে তাহা হৈ-হুল্লোড়েই পর্য্যবসিত হয়। এখন শক্তি সঞ্চয়ের সময়, শক্তি অপচয়ের সময় নাই। রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে ভিত্তি করিয়া আমরা যেন সংঘবদ্ধ, সংহত এবং শক্তিমান হইবার প্রয়াস পাই।

রবীন্দ্র-জীবনকথা আলোচনা হওয়া দরকার। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল ধারা বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে চলিবে কেন? মহর্ষিদেবের নির্দ্দেশে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, উপনিষদের মন্ত্র-আবৃত্তি, আশৈশব শারীর চর্চ্চা এবং অধ্যয়ন-অনুশীলন, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর স্বাদেশিকতা, হিন্দু মেলার সাজাত্যবোধ-উদ্দীপক পরিমণ্ডল, অগ্রজদের সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা-নিরত হইয়াও প্রাচীন আর্য্য ভারতের আদর্শে শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, স্বদেশী সমাজের আদর্শ-প্রচার, স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণরসসঞ্চারী গীতিমালা, উপনিষদের মানবপ্রেমমন্ত্র কাব্যে গানে প্রবন্ধে প্রকাশ—এই সকল

দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্য-অনুশীলনকারীর সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি যে কত গভীর তাহা ১৯১৯ সনে, পাঞ্জাবের অনাচারকালে, তৎকর্ত্তৃক 'নাইটহুড' উপাধি-ত্যাগের মধ্যেই সুপ্রকট। শ্রীযুত অমল হোম 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথে' এই বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়াছেন। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উত্তোক্তাদের প্রত্যেককেই এই ছোট্ট বইখানি পড়িতে বলি। রবীন্দ্র-জীবন কথা আলোচনায় রবীন্দ্র-পার্ষদগণেরও বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করুন। এই ভাবে রবীন্দ্র-জয়ন্তী সার্থক হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা। অন্যথায় শক্তির অপচয়ই ঘটিবে।

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

দশ

৬ই আগষ্ট। ভেনিসে যাবার পথে ভেরোনায় যে একবার নামবই, সে শুধু দুটো প্রধান আকর্ষণের জন্য। প্রথমটি হ'ল জুলিয়েটের বাড়ীর খোলা-বারান্দাটা দেখা, দ্বিতীয়টি—ভেরোনার রোমান এম্ফিথিয়েটারে খোলা আকাশের নীচে এই অপেরা মরশুমের সময় পৃথিবী-বিখ্যাত একটি ক্লাসিক্যাল অপেরা দেখা-শোনাও বটে।

জুলিয়েটের বাড়ী : ভেরোনা, ইটালী

আমার বলিভিয়ান বন্ধু গুসমান তো ভেনিসের দিকেই সোজা পা বাড়িয়ে আছে। সেক্সপীয়ার যে জলো-জিনিষটাকে নিয়ে কাব্যিক রোমান্স করে গেছেন, তাতে নাকি ওর বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই। আর মিলানের স্কালাতে যে একবার অপেরা দেখেছে তার আর দ্বিতীয়বার অপেরায় যাবার দরকার হয় না।

আমি বললাম—দেখ গুসমান, যুক্তি দেখিয়ে যাব কি যাব না এই তর্কবিতর্কে নামলে লাভ হবে এই, ট্রেনটা যথাসময়ে ছেড়ে যাবে, আমরা তখনও সেক্সপীয়রতত্ত্বে কাঁচা চুল পাকাতে থাকব। আমার যাওয়া ঠিক। এখন তুমি তোমার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া কর।

খানিক ভেবে গুসমান বলল, গোঁ যখন ধরেছ, তাই যাও।

—যাও নয়। তাই চল।

—চল।

না, ট্রেনটা ছাড়ে নি। তবে বসবার জায়গাটা আর মিলল না। বিমর্ষ গুসমানকে আমার এটাচিটার ওপরেই বসিয়ে দিলাম।

ভেরোনা শহরটি রোমিও ও জুলিয়েটের প্রেমকথার জন্য সুপরিচিত। ভেরোনাকে ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ তালিকায় লাল টিক দিয়ে গেছেন সেক্সপীয়ার। সে বহুদিন আগে। আজও জুলিয়েটের বাড়ীর সামনে পুলকিত-প্রাণ বারান্দা-প্রেমে বিশ্বাসীদের ভিড় একটুও কমে নি।

আমরাও কালকের দিনের আলোয় দেখব বলে জুলিয়েটের বাড়ী যাওয়া আজ মুলতুবি রাখলাম।

৭ই আগষ্ট '৫৪। বেড-টিতে চুমুক দিয়েই এটাচি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। ব্রেকফাষ্টের জন্য সবুর করতে গেলেই পরের দিনের ব্রেকফাষ্টও ঘাড়ে চাপবে। দিনের বেলায় ঘুরে-ফিরে রাতারাতি পথে পা বাড়াবার পক্ষপাতী আমি। হোটেলের ঘর-ভাড়াটা বাঁচে। ট্রেনে যদিও ঘুমোবার অবকাশ বড় একটা মেলে না তবু ঘুম পেলে সুযোগ করে নেওয়া যায় ঠিকই। গুসমানও বলল, ঠিক আছে। ভেনিসে তাড়াতাড়ি পৌঁছলেই হ'ল। খাওয়া আর ঘুম বাতিল কর, আমার আপত্তি নেই।

জুলিয়েটের বাড়ী দেখে তো প্রায় ভিরমি লাগে আর কি। এই নাকি সেই উপকথার রোমাণ্টিক ব্যালকনি! এত এক দরজার সামনে কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ীর মত একটুখানি বারান্দা। অবশ্য একজন দাঁড়িয়ে থাকার মত প্রশস্ত বটে। আর দেওয়ালের

কি শ্রী। প্রাচীর নেই পনের আনা, ইটের পাঁজর দৃষ্টিকে পীড়িত করে। অনাদরের ছাপ নিয়ে এই আছে অবশিষ্ট।

লোকে চাইবে, জুলিয়েট যখন বারান্দায় এসে দাঁড়াত তখন বাড়ীটি যেমন ছিল তেমনটি দেখতে খুবই স্বাভাবিক। অথচ সে রংও নেই, সে বাহারও নেই। খুঁতখুঁতে কেউ বলবে, ঠিক কেমন ছিল, তাই বা কে জানে? আমি বলব, কেমন ছিল তা নিয়ে গবেষণা করে, লেখালেখি করে, মস্তা একে একটা পুরো বছর পার করে দাও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপাততঃ আমাদের মন ভোলাতে মন-গড়া একটা পালিস দিতে ক্ষতি ছিল কি?

এই কথাটা জুলিয়েটের বাড়ীর তত্ত্বাবধায়কেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। অথচ ঐ লোকটি পিকচার-কার্ড বিক্রি করছে, ওতো দু'হাতে কার্ড বেচেও পেরে উঠছে না। কারণ, ওর কার্ডে জুলিয়েটের বাড়ী রঙের জলুসে ঝিকমিক করছে, জুলিয়েট হাত বাড়িয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে, আর নীচে রোমিও ঊর্দ্ধমুখ হয়ে হাত কচলাচ্ছে। কেন বিক্রি হবে না? টুরিষ্টরা ডজন ডজন কিনছে ওদের জুলিয়েটদের জন্ত।

ছাতার নীচে বাজার: ভেরোনা, ইটালী

'আইদা' অপেরায় প্রস্তুতি: ভেরোনায় এম্ফি থিয়েটার

ওসমান হঠাৎ বলে উঠল—হ্যাল্লো জুলিয়েট!

আমি তাড়াতাড়ি ওর গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বললাম—এই অসভ্য রোমিও, এটা উনিশ শ' চুয়ান্ন সাল।

কিন্তু ওসমানকে থামাতে পারলাম না। ও সোজা গিয়ে এক ভদ্রমহিলার হাত ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল। ভদ্রমহিলার মুখে হাসি দেখে আশ্চর্য্য হলাম। ওরা পূর্ব্ব-পরিচিত।

ওদের ছেড়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। শহরটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখব। ওসমানকে বলে এলাম, রাত্রে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে দেখা হবে।

শহরের গীর্জ্জা, দুর্গ, পিয়াতসা ইত্যাদি দেখতে দেখতে একটি অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। একটি বাজার। বিরাট বিরাট কাপড়ের ছাতার নীচে প্রত্যেকটি দোকান। বাজারটি স্থায়ী বাজার, সাধারণ সাপ্তাহিক বাজারের মত নয়।

বাজারের ভেতরে ঢুকে পড়ে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্য্যন্ত একটা টহল দিয়ে নিলাম। একটি দোকানে অনেক রকম টুকি-টাকি জিনিস দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছি। এক প্রৌঢ়া মহিলা এগিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে বলল, কি চাই, সিনিয়রে?

আমি ওর কথাগুলো আন্দাজেই ধরে নিলাম। কারণ মহিলাটি ইটালীর একটি উপভাষায় কথাগুলি বলেছিল। আমি অবশ্য শুদ্ধ ইটালীয়ানই বলি, তবে উপভাষার ভাবটি হাঁতড়ে নিয়ে কি বলতে চায় সেটুকু আঁচ করে নিতে পারি।

আমি বললাম, কি যে চাই, আমিও ঠিক জানি না। পাঁচটা দেখতে দেখতে যদি কোনটা মনকে টানে!

—বেশ, বেশ। দেখুন।

—আপনাদের এই বাজারটি ভারি সুন্দর কিন্তু।

—ও, আপনি ঐ ছাতাগুলোর কথা বলছেন!

—হ্যাঁ, ঐটুকুই ত এই বাজারের বিশেষত্ব, সৌন্দর্য্যও বলতে পারেন।

গ্র্যাণ্ড ক্যানাল : ভেনিস

একটু পরে মহিলাটি হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আপনি কি ইটালিয়ান ?

আমি একটু হেসে বললাম, কেন, সন্দেহ হচ্ছে কি ? আমি ত সিসিলির লোক।

—আমিও সেই রকমই ভাবছিলাম।

একটা চামড়ার মনিব্যাগ কিনে দামটি হাতে দিয়ে চলে আসবার সময় বললাম, আমি ভারতীয়। আমার মত ঘন খয়েরি চামড়ার লোক সিসিলিতে একটিও নেই। আজ আর সময় নেই। আরিভেদেরচি (আবার দেখা হবে) !

এইবার সোজা এরিনাতে চলে এলাম। অপেরা 'আইদা'র টিকিট কাটতে হবে। হঠাৎ চোখের সামনে অসংখ্য লোক দেখে বেশ দমে গেলাম। ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চ্যারিটি ম্যাচে র‍্যাম্পার্টে যেমন জনসমুদ্র দেখা যায়, এও যেন তেমনি।

দু'হাতে লোক ঠেলতে ঠেলতে কাউণ্টারে পৌঁছতে ঠিক আধ ঘণ্টা লাগল। টিকিট যে মিলবে, এমন দুরাশা এক মুহূর্তের জন্তও মনে উঁকি দেয়নি। অথচ পনের সারির পেছনে একখানা টিকিট পেয়ে গেলাম পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে।

ভেতরে ঢুকে বসে পড়লাম। এরিনার সমস্ত ধাপগুলো ছেয়ে গেছে লোকে। সামনে 'আইদা'র দৃশ্যবহুল বিশাল সেট। উপরে তারা-ঝিকমিক স্বচ্ছ আকাশ। ঐতিহাসিক রোমান এম্ফিথিয়েটারে সারা পৃথিবীর লোক এসেছে অপেরা দেখতে।

কনসার্ট পার্টি একটা সুরের ঝঙ্কার তুলতেই সমস্ত এরিনা জুড়ে মোমবাতি জ্বলে উঠল। প্রায় সব দর্শকের হাতে একটা করে বাতি। এটাই নাকি এখানকার ট্র্যাডিশন। বৃত্তাকার সারিতে সারিতে এই সহস্র সহস্র জ্বলন্ত বাতির দৃশ্য কোনদিনই মন থেকে মুছে যাবার নয়। না দেখলে এ দৃশ্য সত্যিই কল্পনা করা যায় না অপেরা শুরু হ'ল।

ছোট্ট করে বলতে গেলে 'আইদা'র গল্প হ'ল এই : ফারাওর রাজত্বকালে মিশরের সঙ্গে ইথিওপিয়ার লড়াই বাধে। মিশরের প্রধান সেনাপতি রাদামেস যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন দেখে যুদ্ধযাত্রা করল। ভাবল, বিজয়ী হয়ে ফিরে এসে রাজসভায় ইথিওপিয়ার চিরদাসী আইদাকে বিয়ে করার অনুমতি চাইবে রাজার কাছে। কিন্তু কেউ জানে না, আইদা শত্রুপক্ষের প্রধান আমোনাসরোর মেয়ে।

যুদ্ধজয় শেষে রাজা রাদামেসকে তার মেয়ে আমনেরিসকে বিয়ে করতে বলল। আমনেরিস রাদামেসকে ভালবাসে। অথচ রাদামেস চায় আইদাকে।

ইথিওপিয়ার বন্দীরা যারা মুক্তি পেল তাদের মধ্যে আমোনাসরোও ছিল। ও আবার লোকজন যোগাড় করে মিশরের সঙ্গে যুদ্ধে নামল। আমোনাসরো শত্রুপক্ষের মতলব সব জানতে পেরেছিল। এই সময় আমোনাসরো রাদামেসকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আইদাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে। রাদামেস রাজী হ'ল। এই কথোপকথন আমনেরিস শুনে ফেলেছে। আমনেরিসকে দেখেই আমোনাসরো ওকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। কিন্তু রাদামেস ও তার রক্ষীরা বাধা দিল এবং রক্ষিদল আমোনাসরোকে বধ করল।

এর পর রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ভগবানের বেদী-

অপেক্ষমাণ গণ্ডোলা : ভেনিস

ভূলে রাদামেসের জীবন্ত সমাধির আজ্ঞা হ'ল। রাদামেস নিজেকে বাঁচাতে চাইল না।

আইদা সমাধিতে রাদামেসের সঙ্গ নিল ও সহমরণের বাসনা জানাল।

শেষ দৃশ্যে একটি প্রেম-সঙ্গীত প্রেমিক-প্রেমিকার জন্ত স্বর্গদ্বার খুলে দিল।

আইদার সঙ্গীত-সুর জুসেপ্পে ভের্দির।

এখন নিঃসন্দেহে বলতে পারি, কন্টিনেন্টের অবশ্য-দ্রষ্টব্যগুলোর মধ্যে ভেরোনার এই এম্ফিথিয়েটারের অপেরা একটি।

মারিও দেল মোনাকোর কণ্ঠসঙ্গীত এক কথায় অপূর্ব্ব বলা যায়।

আইদার শেষ দৃশ্যটি যেমনি করুণ ও আবেদনপূর্ণ, রাদামেসের বিজয়-গৌরবের দৃশ্যটি তেমনি জমকালো ও নয়নাভিরাম। ঐ দৃশ্যের বিরাটত্ব এবং গভীরতা মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত করে রাখে।

প্রত্যেক দৃশ্য শেষে হাজার হাজার দর্শকের সশব্দ করতালি আকাশ-বাতাস আলোড়িত করছিল।
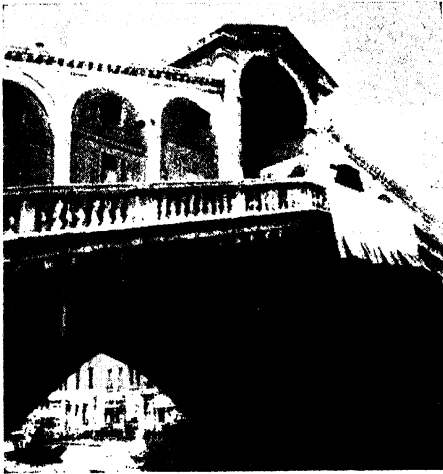
রিয়াল্‌তো ব্রীজ : ভেনিস

রাত্রে, মানে গভীর রাত্রেই বলতে হবে, ভেরোনায় ষ্টেশনে এলাম। প্ল্যাটফর্মে ওসমান হাজির, সেই জুলিয়েটও সঙ্গে আছে।

আমি ওসমানকে ইসারা করে ট্রেনে চড়ে বসলাম। ট্রেন ছাড়লে ওসমান এল। জুলিয়েটকে দেখলাম না।

৮ই আগষ্ট '৫৪। ভেনিস, এই সেই সুপ্রাচীন গণ্ডোলা-খ্যাত স্বপ্নের শহর। একশ' কুড়িটি দ্বীপের ওপর আজব শহর এই ভেনিস। অল্প কয়েকটি সরু পায়ে-চলা রাস্তা, গ্র্যাণ্ড ক্যানাল, আরও বহু ছোট খাল, জমা জলের একটা আঁশিয়গন্ধ, বড় বড় প্রাসাদের সারি, গায়ে গা ঠেকিয়ে চলা পিঁপড়ের সারির মত ট্যুরিষ্টরা, অপেক্ষমান গণ্ডোলাওয়ালাদের হাঁকডাক, আর আধুনিকতম লিডোর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা—সংক্ষেপে এই হ'ল সমস্ত পৃথিবীর অদ্বিতীয় শহর ভেনিস বা ইটালীয়ান ভাষায় ভেনেৎসিয়া।

সেন্ট মার্কস স্কোয়ার ভেনিসের কেন্দ্র। বিশাল চত্বরময় যত লোক, বোধহয় তত কবুতর। আর, ফটোগ্রাফারদের ব্যস্ততাও বিশেষ করে লক্ষণীয়। দেহাতীরা কবুতর কাঁধে নিয়ে দাঁত খিক-খিকিয়ে ফটো তোলাচ্ছে।

কানোভা'র তৈরী নেপোলিয়ানের ভগিনীর মর্ম্মর মূর্ত্তি : রোম

দুপুরে ষ্টীমারে চড়লাম সেন্ট মার্কস স্কোয়ার থেকে লিডো যাব বলে। লিডোই ভেনিসের আধুনিকতম সংযোজন। ক্রমবিকাশও বলা যেতে পারে। এই লিডোতেই ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল হয়, ফ্যাশন প্যারেড হয়, কাসিনোয় গ্যাম্বলিংয়ের আসর জমে, নাইট-ক্লাব কাবারেতে উল্লাসের জোয়ার বয়।

এই ভরদুপুরে আমার একমাত্র ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অ্যাড্রিয়াটিকে একটি বিলম্বিত সমুদ্র-অবগাহন। সেই জন্তই লিডোতে আসা।

এখানকার সমুদ্রতীর অনুপম। লম্বা টানা ভিজে নরম বালির চর। জলে সামুদ্রিক ঢেউ একেবারেই নেই। ঠাণ্ডা, নিস্পন্দ জল। অদ্ভুত মনে হ'ল, জলে খুব অল্প লোক দেখে। তীরে বালুতে বহু লোক, যে যার কাজে যেন ডুবে আছে। সুন্দরীরা চোখ বুজে মড়ার মত শুয়ে আছে, গায়ের ধবধবে রংটা যদি একটুও

বাদামীর দিকে ঘেঁষে তো সৌন্দর্য্য নাকি আরও খুলবে। দু'চার জন ছাতার নীচে উপুড় হয়ে বই পড়ছে। পাশেই হয়তো কি একটা পানীয় পড়ে আছে। আর এক জায়গায় একটি যুবক-স্প্যানিশ গীটারে আঙুল চালাচ্ছে, আর গোটা দলটি একটা ল্যাটিন গানের মহড়া দিচ্ছে। তিনটি ছেলে তাস খেলছে। ভাবছি, উনুন নিয়ে এসে রান্নাটাই বা বাকি আছে কেন।

মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরী মর্ম্মর মূর্ত্তি—ডেভিড : ফ্লোরেন্স

ফেরবার পথে গ্র্যাণ্ড ক্যানালের ওপর রিয়াল্‌তো ব্রীজ দেখা গেল। ব্রীজটি বেশ শক্ত কাঠামো দেখেই বোঝা যায়। ব্রীজের ওপর দোকানপাটও বিস্তর।

আর একটি কথা হঠাৎ খেয়াল হ'ল। ভেনিসে কুকুর-বিড়াল জাতীয় প্রাণী অথবা সাইকেল জাতীয় যানবাহন একটিও নেই, অন্ততঃ চোখে পড়ে নি। খালি কবুতর আর গণ্ডোলা, মোটরবোট ও ষ্টীমার।

লাঞ্চে বসে ওসমান বলছে—আজ তো ভাল চাঁদের আলো থাকবে। গণ্ডোলায় রাত্রে চড়া যাবে, কি বল?

—না, আমি তোমার সঙ্গে গণ্ডোলায় চড়তে রাজী নই।

—কেন?

—ভেনিসে চাঁদের আলোয় কখনো দুজন পুরুষ গণ্ডোলায় চড়ে না। এ-খবরও কি রাখ না? লোকে দেখলে যে হাসবে।

—ও, তা এখন গার্ল-ফ্রেণ্ড তোমার জন্ত আমি জোটাব কি করে?

—তাই তো বলছি আমি চড়ব না। তুমি বরং যাও।

২৫শে আগষ্ট '৫৪। গতকাল রোমে এসেছি। জুলিয়াস সীজারের রোম। অগাষ্টাসের রোম।

বেরনিনি'র তৈরী মর্ম্মর মূর্ত্তি সেন্ট টেরেসা : রোম

প্রবাদ আছে রোমকে ঠিকমত চিনতে হলে পুরো একটি জীবন-কাল রোমে কাটাতে হবে। সেটা শুনে সত্যিই ঘাবড়ে গেছি। রোমে থাকব তো মাত্র চার-পাঁচ দিন।

আজকের দিনটা তাই ঠিক করেছি বাইরেই বেরোব না। আগামী তিন দিনের প্রোগ্রাম আজ খাতায় কলমে ঠিক করে ফেলি। কাল থেকে লিষ্টটা দেখব আর ঘড়ি ধরে ঘোড়দৌড় করব।

এই ষ্টুডেণ্ট হষ্টেলের অনুসন্ধান-ঘর থেকে যতদূর সম্ভব সব খবর নিয়ে এসেছি। এখন রোম সম্বন্ধে দুটো-তিনটে গাইড বই ও একটা বড় ম্যাপ খুলে বসেছি।

২৮শে আগষ্ট '৫৪। বিকেলে নেপল্‌স-এর ট্রেনে চেপেছি। একই কামরায় একটি বাঙালী দম্পতীও যাচ্ছিলেন। আলাপ হতে এক মুহূর্ত্তও সময় লাগল না। বিশেষ করে, বহুদিন পর বাংলা
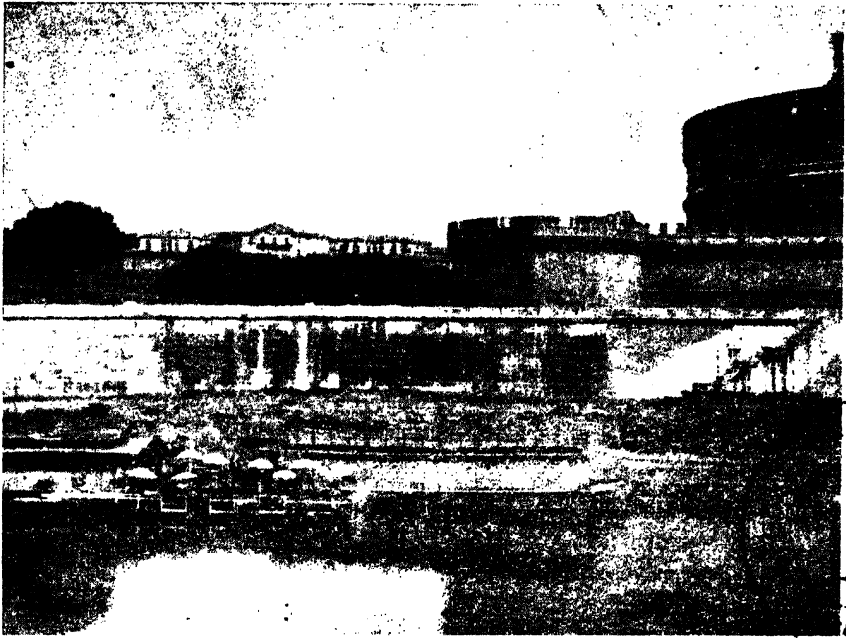
রোমান হলিডে'র ড্যান্সিং ক্লাব : রোম

বলার সুযোগ পেয়ে ওঁদের সামনের লোকটিকে ঠেলে তুলে দিয়ে জায়গা বদল করলাম।

ওঁরা হলেন মিঃ ও মিসেস সেন। মিঃ সেনের এটি দ্বিতীয় বার ইউরোপ পর্য্যটন। এইবার এসেছেন নিছক বেড়াতে—হানিমুনে।

কথায় কথায় রোমের কথা উঠল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— রোম কেমন লাগল? সব দেখা হয়েছে?

মিঃ সেন বললেন—রোম অপূর্ব্ব। বিশেষ করে রাত্রে। ফাউণ্টেনগুলো এত অদ্ভুত আলো দিয়ে সাজায়! তবে সব নিশ্চয়ই দেখা হয় নি। আপনিই বলুন না কোথায় কোথায় গেছেন।

—প্রথম দিন রাত্রে বাথস অফ কারাকাল্লায় একটা অপেরা দেখলাম। পরদিন রোমান ফোরাম, শনির মন্দির ও কোলোসিয়াম দেখে সুপ্রাচীন রোমের একটা ধারণা করলাম। সেণ্ট পীটার্স দেখলাম, ভাটিকান যাদুঘরে ঘণ্টা চারেক পাক দিয়েও সব দেখা হ'ল না। তবে মিকেল আঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেল দেখে মুগ্ধ হলাম। ভাটিকান ডাকটিকিট সেঁটে একটা খাম ছাড়লাম বাড়ীর ঠিকানায়। ফাউণ্টেন অফ ট্রেভিতে একটা পয়সা ছুঁড়েছি, যদি আবার রোমে ফিরে আসতে পারি! একদিন সন্ধ্যায় রোমের আধুনিকতম ফ্যাশন-মহল ভিয়া ভেনেতোর এ-মাথা ও-মাথা বার দুয়েক হেঁটেছি। পিঞ্চো বাগানের টেরাস থেকে রোমকে দেখলাম, আবার ত্রিনিতা দেই মন্টির সিঁড়ি ভেঙে শহরে নামলাম। কিন্তু এত সব করেও শেষ পর্য্যন্ত একটা দর্শনীয় স্থানই বাদ পড়ে গেছে।

মিসেস সেন বলে উঠলেন—সেটা কি?

—টিভোলি গার্ডেন্স। রোম থেকে একটু দূরে।

—কৈ আমরাও তো সেখানে যাই নি।

মিঃ সেন বললেন—যাই-ই নি তো। উনি যে অত জায়গার কথা বললেন, ওর সবগুলোই কি দেখেছ নাকি?

—না।

—তবে?

মিঃ সেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, আপনি টাইবারের ওপারে সেণ্ট এঞ্জেলস দুর্গে যান নি?

—হাঁ, নিশ্চয়ই। দুর্গের নীচে জলের ধারে একটা ড্যান্সিং ক্লাব আছে, লক্ষ্য করেছেন কি?

—যেখানে রোমান হলিডের কতকগুলো দৃশ্য তোলা হয়, সেটার কথা বলছেন তো?

—হাঁ।

—জায়গাটা কিন্তু বেশ।

আমি বললাম—ও আর একটা জায়গার কথা বলি নি। সেটা হ'ল ভিল্লা বরগেজে। সুন্দর বেড়াবার জায়গা। গাছপালা, হ্রদ ইত্যাদিতে সাজানো। ওখানে একটু বেড়িয়ে বরগেজে আর্ট গ্যালারীতে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়েছিলাম। আর্ট গ্যালারীটা দেখেছেন নিশ্চয়ই?

—হাঁ। ওটা বাদ দিই নি।

—আচ্ছা, কাল্লোভার তৈরি নেপোলিয়ানের ভগিনীর মর্ম্মরমূর্ত্তিটি লক্ষ্য করেছেন তো?

—আপনি যা বলতে চাচ্ছেন, আমি বুঝতে পেরেছি। লক্ষ্য তো করেছিই, এমন কি আমার স্ত্রী তো হাত দিয়ে অনুভব করতেও ছাড়ে নি। বসবার গদিটা এত স্বাভাবিক হয়েছে যে, অনেকেই হাত দিয়ে খুব মোলায়েমভাবে আস্তে অনুভব করতে চেষ্টা করে গদিটা কত নরম। কিন্তু আসলে পাথর। সত্যিই অদ্ভুত ক্ষমতা।

সম্রাট অগাষ্টাসের সময়কার রোমের মডেল: রোম

—তা হলে ফ্লোরেন্সে মিকেল আঞ্জেলোর ডেভিডের কথাও বলতে হয়। রোমে বেরনিনির সেণ্ট টেরেসার মূর্ত্তিও কিছু কম যায় না। হাঁ, আরও একটা জায়গার কথা মনে পড়েছে। রোমান সিভিলিজেশানের একটা মিউজিয়াম আছে। সেখানে গেছেন কি?

মিসেস সেন বলে উঠলেন—কৈ না তো! আমরা তো এসব কিছুই দেখি নি। কি তুমি!

মিঃ সেন একটু ফিকে হেসে অপরাধ স্বীকার করে নিলেন।

আমি বললাম—ওখানে রোমান আমলের ব্যবহৃত অনেক জিনিষ আছে। আর আছে সম্রাট অগাষ্টাসের সময় রোম কেমন ছিল তার একটি মডেল। ওটি মাটি, সিমেণ্ট, বোর্ড ও প্লাষ্টার দিয়ে তৈরি। মডেলটি দেখবার মত।

মিঃ সেন বললেন—তাহলে মশাই অনেক কিছুই দেখি নি। একলাই হয় না, তার ওপর দুজন। সঙ্গে এমন স্ত্রী-লাগেজ থাকলে কি কিছু হয়? তা দু'বার যখন হয়েছে, বার বার তিন বার হবেই। আর একবার একলা এসে সব দেখে যাব।

মিসেস সেন জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন। মৌন থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেছেন বোধ হয়।

ক্রমশঃ

অমূল্য প্রত্নশালা—রাজবলহাট

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

আমি গত ১৩৬১ সালের চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকাতে আমাদের প্রত্নশালায় পুরাবস্তু সংগ্রহের কথা কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। উপস্থিত আরও কতকগুলি নূতন সংগৃহীত পুরা দ্রব্যের কথা এখানে বলিব।

১। প্রাচীন সোলার ছবি—প্রত্নশালায় সংগৃহীত একখানি প্রাচীন শোলার ছবি রহিয়াছে। শিল্পী, শোলাগুলিকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া অতি মনোযোগ সহকারে এই ছবিখানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছবিখানিতে একটি গৃহ, বাগান, গাছপালা ও গৃহের

প্রাচীন সোলার ছবি

নিচে নদী ও নদীর উপর সেতু ইত্যাদির দৃশ্য, শিল্পী অতি অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছবিখানিতে কোন রং না লাগাইয়া কেবল খণ্ড খণ্ড শোলাগুলিকে কাটিয়া ছবির উপরে যে ভাবে ধৈর্য্য-সহকারের সংযোগ করিয়াছেন, তাহা সত্যই মনোমুগ্ধকর। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। শোলাগুলিও আমাদের দেশীয় শোলা নহে। বেলজিয়ম শোলা বলিয়া অনুমান হয়। যদিও শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই, তথাপি তাঁর এই সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম্মের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

২। প্রাচীন অভ্রের উপর অঙ্কিত ছবি—এই অভ্রের ছবিখানিও অতি প্রাচীন ও মূল্যবান। একখণ্ড শুভ্র অভ্রের উপর এই ছবিখানি তৈয়ারি করা হইয়াছে। ছবিখানিতে একটি বৃক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখীসহ ঝুলনযাত্রার দৃশ্য অঙ্কন করা হইয়াছে। ছবিখানির মাপ ১০×৭ ইঞ্চি। প্রাচীনতার দিক হইতে ছবিখানির মূল্য খুব বেশী, কারণ ইহার অঙ্কনপ্রণালী কাংড়া রীতির অঙ্কনের ন্যায়। এইরূপ অভ্রের উপর আঁকা ছবি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। এইরূপ মূল্যবান সংগ্রহ ছাড়াও প্রত্নশালার শিল্পবিভাগে, রাঢ়ীয় সংস্কৃতি বজায় রাখিবার মানসে, বহু 'রাঢ়ের পট' রাঢ়দেশীয় পটুয়ার দ্বারা অঙ্কন করাইয়া রাখার

ব্রহ্মদেশীয় শিল্প-সংগ্রহ

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাঢ়ের অতীত গৌরব এই 'পটশিল্প' এবং 'পটুয়া' জাতি উভয়েই এখন রাঢ়দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করা বাংলার প্রধান কর্ম্ম। অভ্রের ছবিখানি ১৫শ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়।

চীনদেশীয় শিল্পের নিদর্শন

৩। ব্রহ্ম ও চীন দেশীয় শিল্পসংগ্রহ—আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া এই চীনদেশীয় শিল্পসম্ভারগুলি সংগ্রহ করিয়া, পল্লীবাসীর অজ্ঞতা দূরীকরণের নিমিত্ত প্রত্নশালায় সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ পারেথ তাহা চীন দেশ পরিভ্রমণ কালে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়া এই শিল্প সম্ভারগুলির মধ্যে হাতে-বোনা রেশমের একখানি সুন্দর ছবি রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, চীনদেশের বারখানি বিভিন্ন স্থানের দৃশ্যের সুদৃশ্য কার্ড রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত পারেথ প্রথম দফায় উপরোক্ত দ্রব্যগুলি এবং দ্বিতীয় দফায় তিনি অতি সুন্দর দুইটি কাচের পাখি ও হাঁস দান করিয়া এই পল্লী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য আমরা তাঁহাকে এবং সংগ্রহ ছাত্রসংহতিকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আশা করি, বাংলার ছাত্রসমাজ শিক্ষা বিস্তারকল্পে, অকুণ্ঠভাবে এইরূপ পল্লী প্রতিষ্ঠানগুলিকে দান করিয়া, সারা পশ্চিম বাংলার মুখোজ্জ্বল করিবেন। এগুলি ছাড়াও, ব্রহ্মবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী পি. সি. চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে এই প্রত্নশালা ব্রহ্মদেশীয় একসেট বিভিন্ন শিল্পসংগ্রহ, একটি সুন্দর শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তিসহ প্রায় তিরিশ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি দান পাইয়াছে। আমরা তাঁহাকেও আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।
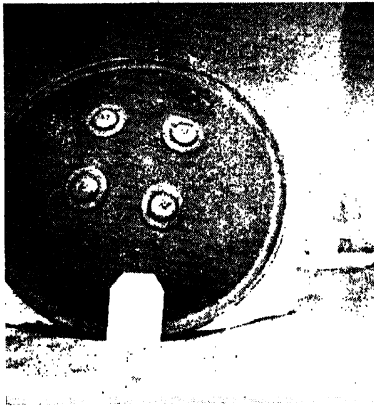
রাঢ়ের প্রাচীন ঢাল

৪। রাঢ়ের যুদ্ধাস্ত্র ও ঢাল—নিষ্ঠুর কালের গতিতে, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আমাদের রাঢ় অঞ্চলে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ, তাহাদের ব্যবহৃত বহু যুদ্ধাস্ত্র এখনও রাঢ়দেশের সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। এমনকি প্রত্নপ্রস্তর যুগের, পাথরের বহু যুদ্ধাস্ত্রসমূহ কিছু কিছু রাঢ়দেশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।১

আজকালের বৈজ্ঞানিক যুগে যদিও ঐ সকল যুদ্ধাস্ত্রের প্রচলন বা ব্যবহার লোপ পাইয়াছে, তথাপি ঐ প্রকার অস্ত্রসমূহের গঠনপ্রণালী ও তাহার ব্যবহার দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তখনকার দিনেও অর্থাৎ দুই শত হইতে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও এই ঢাল ও তলোয়ারই ছিল নৃপতিদিগের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। দেশের স্বাধীন নৃপতিগণ সর্ব্বপ্রথমে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে, নিজেরাই কারিগর বা শিল্পী নিয়োগ করিয়া, নিজ তত্ত্বাবধানে এই সকল অস্ত্রশিল্পের পুরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। আমি অন্যান্য অস্ত্রের কথা এখানে আলোচনা না করিয়া, কেবলমাত্র একটি সামান্য 'ঢাল' অস্ত্রের কথাই আপনাদের বলিব। কারণ এই 'ঢাল' শিল্প 'রাঢ়দেশ' হইতে এখন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র এখন ভারতের দু' একটি স্থানে সখের শিল্প হিসাবে জীবিত রহিয়াছে।
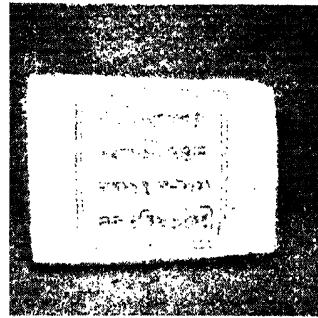
প্রাচীন বাংলার শিল্পলিপি

গোয়ালিয়র, হায়দরাবাদ, রাজস্থান এবং পুণায় কিছু কিছু এই 'ঢাল-শিল্প' তৈরি হইতে দেখা যায়। তৈয়ারি এবং ব্যবহারের অনুপাতে এই শিল্প এখন মৃতপ্রায়। এখন যেসব ঢাল তৈয়ারি হয় তাহা পূর্ব্বের ন্যায় ভাল এবং মজবুত হয় না। পূর্ব্বে এই শিল্প ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রের নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্ম্মিত হইয়া প্রধান শিল্পহিসাবে বহু লোকের অন্নসংস্থান করিত।

আমরা ঐরূপ ১৫শ শতাব্দীর প্রাচীন দু' একটি ঢাল এবং তলোয়ার প্রত্নশালায় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমাদের রাঢ়দেশের বিভিন্ন স্থানে যথা: হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের শিল্পীগণ ঢাল তৈয়ারী করিতে জানিত। তাহার প্রমাণস্বরূপ আজও রাঢ়ের বহু উচ্চ বংশসম্ভূত জমিদার এবং প্রাচীন নৃপতিগণের বংশধরগণের গৃহে খোঁজ করিলে এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় শিল্পীগণ প্রথমে গণ্ডারের পেটের এবং পিঠের মোটা চামড়া মাপ দিয়া গোল করিয়া কাটিয়া লইত। পরে ঢাল তৈয়ারির জন্য ভারী পাথরের চাপ দিয়া চামড়াগুলিকে ঠিক লক্ষ্মীর সরার ন্যায় বাঁকাইয়া লইত। পরে চামড়াগুলিকে শুকাইয়া, কাল রং বা ভুসা এবং কয়েকটি দ্রব্যের সংমিশ্রণে এক প্রকার প্রলেপ তৈয়ারি করিয়া ঢালটির উপর এবং নিচে লাগাইয়া শুকাইতে দিত। এইরূপ তিন-চারি বার প্রলেপ লাগাইয়া শুকাইবার পর পালিশ করিয়া

১ 'আমরা বাঙালী'—শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২

উজ্জ্বল করিয়া লইত। এই পালিশ এত সুন্দর হইত যে পালিশের উজ্জ্বলতার বর্ণে লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া যাইত এবং লোহার ঢাল বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত। পরে ঢালটির মাঝখানে চারিটি ছিদ্র করিয়া ধরিবার জন্য লোহার কড়া লাগাইয়া দিত। কোন কোন ঢালে লোহার কড়ার সহিত লোহার শিকল ব্যবহার করা হইত। নির্দ্দিষ্ট মাপের কোন ঢাল তৈয়ারি হইত না। শিল্পীগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ছোট বড় বিভিন্ন আকারের ঢাল তৈয়ারি করিয়া রাজদরবারে উপঢৌকন পাঠাইত। পরে নৃপতিগণ তাহাকে গুণানুপাতে পুরস্কৃত করিয়া দেশে শিল্পের প্রসার করিতেন এবং শিল্পও পরিপুষ্টি লাভ করিত।

পরবর্ত্তী মুসলমান যুগেও ঐরূপ চামড়ার এবং বেতের উপর নির্ম্মিত ঢালের প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। এখন আর কোনরূপ ঢাল দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্নশালায় ঐরূপ চামড়া এবং বেতের দুই প্রকার ঢাল সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা

কাঠের মনসা মূর্ত্তি (প্রাচীন)

করিতেছি। এই মূল্যবান ঐতিহাসিক সম্পদগুলি হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চোংদার মহাশয় তাঁহার পিতার স্মরণার্থে 'ললিত স্মৃতি' হিসাবে প্রত্নশালাকে দান করিয়া হুগলী জেলার গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। তিনি প্রত্নশালার একজন পরম হিতৈষী, বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।

প্রাচীন বাংলা অক্ষরের শিলালিপি—উপরোক্ত শিলালেখটি ১৪৫ বৎসরের প্রাচীন তাহা সন ও তারিখ দেখিলেই জানা যায়। ১২১৭ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ। উক্ত ৺দাতারাম দাস দত্ত মহাশয় তাঁহার নিজ কুলদেবতার নাম শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর মহাদেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্রীচন্দ্রশেখর মহাদেবের মন্দির এখনও হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতকালের সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও লেখাটি প্রাচীন তাহা হইলেও শিল্পীর সৌন্দর্য্য-বোধ কম ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ শিলালিপির ধারের লাইনগুলি সোজা করিয়া কাটিতে পারেন নাই। ভাষা এবং অক্ষরের সমতাও রক্ষা করা হয় নাই। শিলালিপির অক্ষরগুলি প্রাচীন বাংলা অক্ষরের দলীলের লেখার ন্যায়। পাথরের রং কাল। মাপ ৮″×৬″। কাল স্লেট পাথর বলিয়া অনুমান হয়।

প্রত্নশালায় রক্ষিত বিষ্ণু মূর্ত্তির মস্তক

সাদা পাথরের ছোট লিঙ্গেশ্বরী মূর্ত্তি—প্রত্নশালায় আর একটি সাদা বালী পাথরের ছোট মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। আমি এই মূর্ত্তিটি 'লিঙ্গেশ্বর' বা এক লিঙ্গেশ্বরী মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিতেছি। কারণ 'লিঙ্গসারী তন্ত্রে' 'শিবপার্ব্বতী' সংবাদে এইরূপ শিব ও শক্তির একত্রে সম্মিলিত রূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যথা :

১। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং লিঙ্গরূপী হরং প্রিয়ে।
২। ইতি তে কথিতং দেবী মম নাম—শতোত্তমম্।
৩। ...অহঞ্চ জগদাধারো মমাধারস্তমেবো হি।
৪। তৎসমা প্রকৃতিনাস্তি মৎসমো নাস্তি পুরুষঃ
৫। তব যোনিং সমাসাদ্য সর্ব্বমেব করোম্যহম।

এই বার দেখুন এই পাষাণ মূর্ত্তিটিতে শিবলিঙ্গের সঙ্গে শক্তিরূপী যোনীর একত্রে সংযোগ রহিয়াছে। নিম্নদিকের লিঙ্গের সহিত উপরে শক্তিরূপী যোনীর বেষ্টনীর বন্ধন রহিয়াছে। মূর্ত্তিটি ছোট এবং সাদা বালী পাথরের। মাপ ৬×৩ ইঞ্চি মাত্র। লিঙ্গরূপ শিব এবং যোনীরূপ শক্তির রূপ ছাড়া মূর্ত্তিটিতে অন্য কিছু খোদাই করা হয় নাই। মূর্ত্তিটি ১৬শ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন কাঠের মনসামূর্ত্তি—এই বৃহৎ কাঠের মনসামূর্ত্তিটি কিছু-দিন হইল হুগলী জেলার কোন এক গণ্ড গ্রাম হইতে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়ার সময় সংগৃহীত হইয়া এই প্রত্নশালায় সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। যদিও মূর্ত্তিটির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি, এখনও যাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই উপলব্ধির বস্তু। মূর্ত্তিটি একখানি মনসা কাঠের গুড়ি হইতে খোদাই করিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে। ইহা রাঢ় বাংলার প্রাচীন কাষ্ঠশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা

সম্রাট সাহজাহানের বলিয়াই মনে হয়। কারণ মুদ্রাটির উপর সাঙ্কেতিক চিহ্ন সম্রাট সাজাহানেরই রহিয়াছে। মুদ্রার উপর এবং পার্শ্বে নানারূপ ছিদ্র করিয়া তখনকার দিনে, নবাবী আমলে সম্রাটগণের নিজ নিজ সাঙ্কেতিক চিহ্ন করিয়া দিতেন। ৭নং মুদ্রাটিও খুব প্রাচীন। তবে সম্রাটের নাম, মুদ্রা তৈয়ারিকালে কাটিয়া গিয়াছে, তাই পাঠ করিবার উপায় নাই। ৪নং মুদ্রাটিতে আমাদের বাংলা অক্ষরের এইরূপ লেখা মুদ্রিত রহিয়াছে :

(ক) ৪···শ্রীশ্রীহরগৌরী চরণারবিন্দ মকরন্দ মধুকরস্য

(খ) ৪ (অপর পৃষ্ঠায়)···শ্রীশ্রীস্বাঙ্গদেব শ্রীলক্ষ্মী সিংহ

নৃপস্য শাক ১৬৯৮···।

এখন শকের সহিত ৭৮ বৎসর যোগ করিলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। তাহা হইলে ১৬৯৮+৭৮ বৎসর=১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইল। তাহা হইলে ১৯৫৬—১৭৭৬=১৮০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা গেল। এখন দেখা যাক···শ্রীলক্ষ্মী সিংহ নামীয় কোন বাঙালী নৃপতি রাজত্ব করিতেন কিনা। আমি নিজে অবশ্য মুদ্রা গবেষক নই। তবে অনুমান হয় যে, আসাম অথবা ত্রিপুরায় ঐরূপ কোন হিন্দু নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীহরগৌরীর নাম মুদ্রার একপৃষ্ঠায় খোদাই করিয়া নৃপতি নিজ রাজকীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। অপর পৃষ্ঠায় নৃপতির নাম···শ্রীলক্ষ্মী

মনসা কাঠ সাধারণতঃ খুব নরম এবং হাল্কা। মূর্ত্তিটি উচ্চতায় আড়াই হাত। মূর্ত্তিটির গঠনে, শিল্পী তাঁহার একাগ্রতা এবং ভাবতন্ময়তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কারণ, মূর্ত্তিটির গঠন, হাত, পা, হাতের আঙুল, সাপ দুটি এবং গহনাগুলির কারুকার্য্য অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম। মূর্ত্তিটির হাতের আঙুলগুলির ও সাপ দুটির ফণা দেখিলে শিল্পীর সৃজনী শক্তির কলাকৌশলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। এইরূপ কাষ্ঠশিল্পও রাঢ়দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

সংগৃহীত প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা—প্রত্নশালায় যে সকল প্রাচীন মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারও কিছু কিছু বিবরণ আপনাদের দিব। সংগৃহীত মুদ্রার সংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ শতাধিক হইবে। তন্মধ্যে যে কয়টি ভারতীয় মুদ্রার প্রাচীনতা হিসাবে মূল্য খুব বেশী, এখানে কেবলমাত্র সেই কয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

ছবির প্রথম লাইনের ১, ২ নং, দ্বিতীয় লাইনের অর্থাৎ ৫নং, এই তিনটি মুদ্রা সম্রাট সাহজাহানের রৌপ্য মুদ্রা। মুদ্রা তিনটির আকার এবং ওজন এক নহে।

ওজন এক ভরী হইতে সওয়া ভরী। মুদ্রার উপরের লেখাগুলিও বিভিন্ন প্রকারের তবে ১, ২ এবং ৫নং মুদ্রায় সম্রাটের নাম সন (হিজীরা) ও তারিখ খোদাই করা রহিয়াছে। ৬নং মুদ্রাটিও

বিষ্ণুমূর্ত্তির আর একটি মস্তক, পাল-সংগ্রহ

সিংহ, সন (শক) এবং তারিখ খোদাই করিয়া মুদ্রাটির প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নামের পূর্ব্বেও শ্রীশ্রীরাজদেব নামটি কাহার? এখানেও ঐরূপ কুলদেবতার নাম খোদাই করিয়াছেন। কারণ, দেবতাগণের নামের পূর্ব্বে শ্রীশ্রী থাকার ফলে দেবতার নাম এবং শ্রী স্থলে নিজ নাম অনুমান হইতেছে। মুদ্রাটি খাঁটি রৌপ্যের দ্বারা নির্ম্মিত। এরূপ অষ্টকোণবিশিষ্ট রৌপ্য মুদ্রা বড় একটা দেখা যায় না। মুদ্রাটি ক্ষুদ্রাকৃতি। ওজন এক ভরী। এখন ৮নং মুদ্রাটি দেখুন। উহা সামন্তদেবের সময়ের মুদ্রা। মুদ্রার উপরে 'শ্রীসমন্ত' লেখাটির ছাপ কেবলমাত্র উঠিয়াছে। 'সমন্ত' লেখার পূর্ব্বে 'শ্রী' কথাটির মাত্র (ী) দীর্ঘইর দাঁড়ী মাত্র ছাপ উঠিয়াছে। 'সমন্ত' কথাটি কেবলমাত্র ভালভাবে পড়িতে পারা যায়। 'সমন্ত' লেখার নীচে একটি ষাঁড় অঙ্কিত রহিয়াছে। ষাঁড়টির মুখের, গলার নীচের দিকে এবং সামনের পায়ের কিছু কিছু অংশ ছাপ দিবার
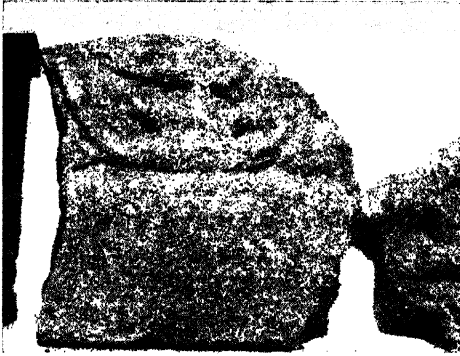
পাল-সংগ্রহ

সময় কাটা পড়িয়া বাদ হইয়া গিয়াছে। পিছনের দিকে কেবলমাত্র কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের প্রকৃতির ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। মুদ্রাটি ক্ষুদ্রাকৃতি, ওজন পাঁচ আনা। ৯নং মুদ্রাটি 'গধিয়া' মুদ্রা বলিয়া পরিচিত। ৮নং এবং ১০নং মুদ্রাগুলি খুব মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য। ঐগুলিকে 'পাঞ্চমার্ক' বা কার্ষাপণ মুদ্রা বলা হয়। ঐগুলি নানা আকারের এবং বিভিন্ন ওজনের প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রাগুলি নাকি আমাদের প্রথম প্রচলিত মুদ্রা। এই মুদ্রা সকলের পরিবর্ত্তে রাজসরকারগণ তখন দেশে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিতেন। রাজসরকারগণ এই মুদ্রা তৈয়ারী করার জন্য প্রথমে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা রৌপ্যের পাতকে, বিভিন্ন প্রকারের ছাপ দিয়া দিতেন। পরে ঐগুলির সমতা এবং অংশ বজায় না রাখিয়া কাটিয়া প্রচলন করিতেন। ফলে কাটিবার সময় ঐ ছাপেরও কিছু কিছু অংশ বাদ পড়িয়া যাইত। ঐ মুদ্রাগুলির উভয় পৃষ্ঠে নানা রকমের ছাপ দেখা যায়, যথা:—পর্ব্বত, সূর্য্য, চন্দ্র, ফুল, বলদ (ষাঁড়), গৃহ ইত্যাদি। মুদ্রাগুলি খাঁটি রৌপ্যের, ওজন তিন আনা হইতে চারি আনা। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শাল, স্যার জন কানিংহাম, সি. জে. ব্রাউন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মজুমদার ইত্যাদি মনীষীবৃন্দ এই মুদ্রা সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতীয় মুদ্রার প্রকৃত জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন।

১১নং প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রাটি ভারতের গ্রীক মুদ্রা। এই দুইটি প্রত্নশালার খুব মূল্যবান সংগ্রহ। ভারতের গ্রীক অভিযানের ফলে এই মুদ্রাগুলির প্রচলন হইয়াছিল। ইহাকে 'মিনান্দার' বলা হয়। মুদ্রাগুলির উপরে রাজার নাম ও রাজার মস্তকদেশের ছাপ দেখা যায়। রাজার মাথার উপরে গ্রীক্ ভাষায় তাঁহার নাম খোদাই করা হইয়াছে এবং পর পৃষ্ঠায় অর্থাৎ (১১ খ) একটি নারী মূর্ত্তি এবং গ্রীক্ ভাষায় কিছু লেখা খোদাই করা হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলির ওজন আট হইতে দশ আনা।

পাল-সংগ্রহ, পাথরের মূর্ত্তির কিয়দংশ

পাল সংগ্রহে নূতন অবদান:—হুগলী জেলার মহানাদ গ্রাম নিবাসী শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার 'পাল সংগ্রহে' এই বৎসর বহুবিধ পুরাদ্রব্য দান করিয়া এই সংগ্রহটির উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি এই বৎসরে বহু গুপ্ত, পাল, সেন এবং মুসলমান যুগের পুরাদ্রব্য দান করিয়া এই পল্লী-প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত পুরাবস্তুগুলির মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। পাল যুগের মৃৎশিল্পের ভগ্ন নারীর অংশগুলি, শ্রীকৃষ্ণের মস্তক, চূড়া, শরীরের অংশগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইগুলি 'পাল যুগে' মৃৎশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। মূর্ত্তিগুলি দেখিলে বেশ ভাল ভাবে মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, 'পাল-যুগের' কাল পাথরের বিষ্ণুমূর্ত্তির মস্তকদেশ, বাহুদ্বয় ইত্যাদিও মূল্যবান সম্পদ।

শ্রদ্ধেয় পাল মহাশয় আমাদের প্রত্নশালার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি সকল সময় এই প্রত্নশালার

উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গুপ্তযুগের, পালযুগের বহু দুষ্প্রাপ্য পুরাদ্রব্য দান করিয়া আমাদের অশেষ ঋণী করিয়াছেন।

প্রাচীন বৌদ্ধযুগের দুইটি নিদর্শন :—প্রত্নশালায় বৌদ্ধযুগের পাথরের দুইটি মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। একটি পাথরের ছোট বৌদ্ধ বিহার (চৈং বা স্তূপ)। তাহার মধ্যে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন। বিহারটি সাদা বেলে পাথরের। মাপ ৬॥×৫ ইঞ্চি; অপরটি ঐ সাদা পাথরের চতুষ্কোণ খণ্ডের মধ্যে বড় হইতে ছোট দ্বাদশটি বুদ্ধের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি দর্শনীয় বস্তু। মাপ ৫×৭ ইঞ্চি। এগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্নশালায় সংগৃহীত হইয়াছে।

দুর্দ্দিনের ডাক

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জনমনগণভগবান,
সর্ব্ব অমঙ্গল শঙ্কার বুক ভেদি'
করো তুমি আজি উত্থান।

ব্যক্তির পুঁজিবাদ দর্পে হাঁকায় রথ
শোষকেরা ছাড়ে হুঙ্কার,
বক্ষিয়া শোষিতেরে অভ্র ভেদিয়া শির
পর্ব্বত উঠে মুনফরে।

জাতির খাচ্ছে ঐ মিশায় মৃত্যুবিষ
পুঁজিবাদী যত সয়তান,
দুঃখ পরিত্রাণে চূর্ণিতে দুর্নীতি
করো তুমি আজি উত্থান।

জনগণ পাপব্রত ঘুষেতে মগ্ন দেশ
আদর্শ করে হাহাকার,
জাতি সে জীবন্মৃত নেতারা ভণ্ড আজ
কে করিবে এর প্রতিকার?

আজি অতি দুর্দ্দিন যারা অতি হীন তারা
ঊর্দ্ধে চাহিছে অধিকার,
ছাগের ভয়েতে আজ করে আছে মাথা নত
ভল্লুক হাতী গণ্ডার।

বর্ব্বরতার পায়ে গুণীরা পিষ্ট আজ
পণ্ডিত লাজে হতমান,
দুঃস্থ করিয়া বহে রাষ্ট্রে বাঁচার লাগি
ভিক্ষুক সম অপমান।

অত্যাচারীরা ঐ সত্যেরে পায়ে দলে
মিথ্যার উঠে ঘন জয়,
ধর্ম্মের বিদ্বেষে রক্তেতে রাঙা পথ
হত্যা চলেছে দেশময়।

সিংহ শিশুরা আজি হয়েছে ধর্ম্ম মেষ
মার্জ্জার দেখাইছে ডর,
মহান কৃষ্টি গাথা সংস্কৃতি মণিমালা
ছিঁড়ে পড়ে আজি ঝর্ঝর।
দুর্নীতি মহাপাপ সহিতে নারিয়া আর
ধরণীমা কাঁদে হতমান,
শোষণে অত্যাচারে দারিদ্র্যে জ্বলে দেনা
জাগো তুমি গণ ভগবান!
বঞ্চক শোষকের অত্যাচারের হাতে
অবসান করো শঙ্কার,
ভণ্ডেরে দণ্ডিতে প্রলয় কোদণ্ডেতে
ঘন ঘোর দেহ টঙ্কার।
দম্ভের স্তম্ভকে ফাটাইয়া আজি তুমি
গর্জ্জিয়া করো উত্থান,
নৃসিংহ সমবেশে আর্ত্ত পরিত্রাণে
জাগো তুমি গণভগবান।
সর্ব্বহারারা কাঁদে অত্যাচারের তারা
জানে নাতো কোনো প্রতিরোধ,
নিঃস্পেষিতের দল সহজ সরল তারা
জানেনা তো নিতে প্রতিশোধ।
তাহাদেরে রক্ষিতে উদ্যত করো তুমি
লক্ষ লক্ষ কোটি হাত;
তোমার মাভৈঃ লভি আর্ত্ত মানবনারী
চরণে করুক প্রণিপাত।
নিজের লাগিয়া নয় অসহায়দের লাগি'
ডাকি এই বুক চেরা ডাক্,
এ মহা পাগল ডাকে জানি তুমি জাগিবেই
কেটে যাবে লাখো মৈনাক।
বাঁশী নয়—বীণা নয়—লক্ষ বজ্র হানি
দুর্দ্দিন করো অবসান,
আজি এই বিশ্বের বিস্ময় সম জাগো
নিঃস্বের তুমি ভগবান।

পল্লী প্রদর্শনী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অবিভক্ত বাংলার কয়েকটি জেলা বা মহকুমার উপরেই কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী প্রধানতঃ অনুষ্ঠিত হইত এবং এই সকল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের ভার থাকিত—সরকারী, বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গঠিত একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর। প্রধানতঃ জেলা-শাসক বা মহকুমা-শাসক এই সকল সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেন। বলিলে ভুল বলা হইবে না যে, জেলা-শাসক বা মহকুমা-শাসকগণের উদ্যোগে, উৎসাহে ও প্রেরণাতেই এই সকল প্রদর্শনীর আয়োজন হইত এবং তাঁহারাই জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিগণের নিকট প্রদর্শনীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থে "চাঁদার" জন্য আবেদনপত্র পাঠাইতেন। বলা বাহুল্য, প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহাদের প্রকৃত সহানুভূতি থাকুক, আর নাই থাকুক, শাসক মহোদয়গণের সন্তোষ বিধানের জন্যই হউক বা তাঁহাদের ভয়েই হউক কিংবা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্যই হউক চাঁদার জন্য আবেদন নিষ্ফল হইত না।

তবে ইহার ব্যতিক্রম যে ছিল না তাহা নহে। যত দূর জানি চিরস্মরণীয় দানবীর স্বর্গত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় "বান জেটিয়া প্রদর্শনী"র জন্য প্রতি বৎসর স্বেচ্ছায় প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। এইরূপ ভাবে অর্থ সংগ্রহ ছাড়া জনসাধারণের নিকট হইতেও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইত। সরকারী সাহায্য এবং জেলা-বোর্ডের তহবিল হইতেও কিছু পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাইত। সাধারণতঃ প্রদর্শনীতে কোন "প্রবেশ-ফি" থাকিত না, তবে আমোদ-প্রমোদ (প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে আনীত থিয়েটার) দেখিবার জন্য নির্দিষ্ট "প্রবেশ-মূল্য" দিতে হইত।

লেখক এইরূপ বহু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের সহিত সাক্ষাৎভাবে জড়িত ছিলেন। এই সকল প্রদর্শনীতে প্রকৃত কৃষক শ্রেণীর সমাবেশ তত বেশী হইত না, সাধারণতঃ তাঁহারা মনে করিতেন—এই সকল প্রদর্শনী "বাবুদের" দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং তাঁহাদেরই "আমোদ-প্রমোদের" স্থান: তবে কলিকাতা হইতে আনীত থিয়েটার দেখিবার জন্য জনসাধারণের ভিড় প্রচুর হইত এবং লেখক অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন যে, অনেকেই ঋণ করিয়া (এমনকি ঘটি, বাটি প্রভৃতি বাঁধা দিয়া) থিয়েটার দেখিতে আসিতেন।

মোট কথা, যে কোন কারণেই হউক, ঠিক প্রদর্শনীর প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ খুব কমই ছিল, আমোদ-প্রমোদের প্রতিই আকর্ষণ বেশী ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও মনোভাব এইরূপই ছিল। ১৯১৪-১৫ সনে মিষ্টার জে. এ. উডহেড, আই-সি-এস (পরে স্যার জন উডহেড—বঙ্গদেশের অস্থায়ী গভর্ণর) ফরিদপুরের জেলা-শাসক ছিলেন—তিনি ফরিদপুর প্রদর্শনীর নাম দিয়াছিলেন—"It is an annual Tamasha" অর্থাৎ "বাৎসরিক তামাসা"। লেখক সেই সময়ে ফরিদপুরের জেলা-কৃষি কর্মচারী ছিলেন এবং ফরিদপুর শহরের উপর অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইহা বলা প্রয়োজন যে, সাধারণতঃ এই সকল প্রদর্শনীর স্থায়ী কমিটি, স্থায়ী তহবিল, স্থায়ী নিয়ম-কানুন, স্থায়ী প্রচারকার্য্য, পুরস্কার অর্জ্জনের জন্য কোন স্থায়ী নিয়মাবলী, কোন প্রকার নূতন কৃষি বা শিল্প প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল না। প্রতি বৎসর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের ২।৩ মাস পূর্ব্বে 'সাজ-গরম' পড়িয়া যাইত। জেলা শাসকের সভাপতিত্বে তথাকথিত এক সাধারণ সভা আহূত হইত। সেই সভায় একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইত এবং প্রদর্শনীর বিভিন্ন কার্য্যের জন্য 'সাব-কমিটি'ও গঠিত হইত। ইহার পরে জেলা বা মহকুমা শাসকের স্বাক্ষরিত চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির ছড়াছড়ি হইত। মোট কথা, বিভিন্ন স্থানে এইরূপ এলোমেলো ভাবে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইত, কোন ধারাবাহিক প্রণালী ও উদ্দেশ্য থাকিত না, হাতে-হেতেড়ে কাজ দেখাইবারও কোন ব্যবস্থা থাকিত না। আমোদপ্রমোদের দিকেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হইত—এবং এই আমোদ-প্রমোদ—বিশেষতঃ কলিকাতা হইতে আনীত থিয়েটারের প্রবেশ-মূল্যের দ্বারা প্রদর্শনীর তহবিল পুষ্ট হইত।

লেখকের প্রস্তাবে এবং ফরিদপুর জেলার তদানীন্তন জেলা-শাসক মিষ্টার জে. এ. উডহেডের অনুমোদনে ফরিদপুর জেলার অভ্যন্তরে (বন্দর খোলা, বালিয়া কান্দি প্রভৃতি গ্রামে) কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী প্রথম অনুষ্ঠিত হয় এবং ফরিদপুর শহরের উপরের প্রদর্শনী কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকে। ফরিদপুর জেলার গ্রামাঞ্চলের প্রদর্শনীসমূহ স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে অধিকতর আকর্ষিত করে ও ঐ সকল প্রদর্শনীতে কৃষকগণের সমাবেশ অধিকতর হয় এবং তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম প্রচুর ভাবে দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলের প্রদর্শনীতে আমোদ-প্রমোদেরও আয়োজন করা হইত, তবে কলিকাতা হইতে থিয়েটার আমদানী করা হইত না। স্থানীয় আমোদ-প্রমোদের (যাত্রা, জারি, কবি গান ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা হইত এবং ইহার জন্য কোন 'প্রবেশ-ফি' থাকিত না। ইহা ছাড়া সুবিধা ও সুযোগ অনুসারে নৌকার বাইচ খেলা, ষাঁড়ের দৌড় ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিত। সাধারণতঃ, এই সকল প্রদর্শনী স্থানীয় হাটে কিম্বা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইত—এবং প্যাণ্ডেল প্রস্তুতের খরচ কিছুই ছিল না, অন্যান্য খরচও খুব কম হইত; জনসাধারণ মনে করিতেন ইহা তাঁহাদেরই গ্রামের অনুষ্ঠান, সুতরাং ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত

করিবার জন্ত তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন, এই ধারণার ফলে অনেকের নিকট হইতে অনেক রকমের সাহায্য পাওয়া যাইত। এই সকল প্রদর্শনীতে হাতে-হেতেড়ে কৃষি ও শিল্পের কাজ দেখানোর ব্যবস্থা কতকটা থাকিত। পরে যখন ফরিদপুর শহরের উপর বার্ষিক কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়, উহাকে নূতন ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করা হয়—প্রদর্শনীর সঙ্গে প্রদর্শন-উদ্যান (Demonstration garden) রচনা করা হয় এবং নানাবিধ শিল্পের কাজ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত হাতেকলমে দেখানোর ব্যবস্থা হয়—যেমন পাটি প্রস্তুত, সাবান প্রস্তুত, বস্ত্রাদি প্রস্তুত, কৃষ্ণনগরের পুতুল প্রস্তুত ইত্যাদি। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ আর্কুহার্ট প্রভৃতি মনীষিগণ এই সকল প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন এবং প্রদর্শনীর ব্যবহারিক দিক দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সকল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের ভার মুখ্যত লেখকের উপর অর্পিত ছিল।

গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর হইতে পল্লী-অঞ্চলে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং বর্ত্তমানে ইহার সংখ্যা খুবই বাড়িয়াছে, কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় বহু স্থানেই পূর্ব্বের সকল ত্রুটিই রহিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ কোন রকম উন্নতিই চোখে পড়ে না। অথচ, আজিকার দিনে পল্লী-অঞ্চলের প্রদর্শনীর স্থান খুবই উচ্চে এবং ইহার মূল্য ও গুরুত্ব খুবই বেশী। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে জনশিক্ষার জন্ত, জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্ত এবং আরও অনেক কারণে (রাজনৈতিক) পল্লী-অঞ্চলের প্রদর্শনী অধিকতর উন্নত প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সম্পর্কে সরকারী ও বে-সরকারী দুই মহলই যেন বিশেষ উদাসীন, পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সহযোগিতা নাই বলিলেই চলে, তবে সরকারী সাহায্য স্বরূপ ২।১ শত টাকা দান, সরকারী কর্ম্মচারীর প্রদর্শনীর উদ্বোধন সভায় ২।১ ঘণ্টার জন্ত উপস্থিতি, সরকারী বিভাগ কর্ত্তৃক প্রেরিত কয়েকখানা প্রাচীরপত্র বা মামুলী কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি যদি সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার পরিচয় দেয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, সরকারী মহল উদাসীন নন্। এই প্রসঙ্গে এই কথাও বলা দরকার যে, যদি কোন মন্ত্রীমহোদয় কোন প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেন কিম্বা পুরস্কার-বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন ও ইহা পূর্ব্ব হইতে ঘোষিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রদর্শনীর প্রতি সরকারী মহলের মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী পড়ে এবং উচ্চ পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীর মধ্যে ২।১ জন উদ্বোধন বা পারিতোষিক-বিতরণ সভায় উপস্থিত থাকেন। অভিজ্ঞতা হইতে এই কথাও বলিতে পারি যে, কোন এক পল্লী প্রদর্শনীতে এক জন মন্ত্রী মহাশয়ের যাইবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে অনিবার্য্য কারণবশতঃ তিনি যাইতে পারেন নাই, কোন বিভাগের একজন উপরিস্থ কর্ম্মচারী এই কথা শুনিয়া প্রদর্শনীর পুরস্কার-বিতরণ সভায় উপস্থিত থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন এবং পরের ট্রেনেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সরকারী মহলের এইরূপ উদাসীনতা ও অমনোযোগের বহু উদাহরণ দিতে পারি এবং পল্লী প্রদর্শনীর সহিত জড়িত অনেকেরই এই রকমের অনেক অভিজ্ঞতা আছে।

যাহা হউক, পল্লী প্রদর্শনী কি ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত তাহা এখন অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রত্যেক পল্লী প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের জন্ত স্থানীয় একটি স্থায়ী কমিটি থাকা আবশ্যক। এই কমিটিতে জাতি-ধর্ম্ম-পেশা-রাজনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি নির্ব্বিশেষে সকল উদ্যোগী ও উৎসাহী ব্যক্তিদের স্থান থাকিবে, বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ব্যক্তিদের এই কমিটিতে প্রাধান্ত থাকিবে। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, কি কি কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির কি ভাবে কিরূপ উৎকর্ষ সাধনের জন্ত কি কি পুরস্কার দেওয়া হইবে, নূতন নূতন কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রবর্ত্তন ও প্রচলনের জন্ত কি কি পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং উহার নিয়মাবলী, অন্তান্ত রকমের গঠনমূলক কার্য্যের জন্ত কি কি পুরস্কার দেওয়া হইবে—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সারা বৎসর প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে এবং এই প্রচারকার্য্যের ভার কমিটিকে গ্রহণ করিতে হইবে, অবশ্য সরকারী জাতিগঠনকারী বিভাগগুলি কমিটিকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক প্রদর্শনীর বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহা সারা বৎসর ধরিয়া জনসাধারণের গোচরে আনিতে হইবে। যে সকল কৃষক ও শিল্পী প্রদর্শনীর নিয়ম অনুসারে কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিতে ইচ্ছা করেন কিম্বা নূতন নূতন কৃষি ও শিল্পের প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করিতে ইচ্ছা করেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে কমিটির নিকট নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্মে নাম পাঠাইতে হইবে। কমিটি ইঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিবেন এবং মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিবেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দকে এ সম্বন্ধে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং উপরোক্ত যোগাযোগ স্থাপনের জন্ত তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্ত একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে।

প্রদর্শনী আদৌ ব্যয়-বহুল হইবে না। প্রদর্শনীর জন্ত পৃথক 'প্যাণ্ডেল' করিবার কোন প্রয়োজন নাই, স্থানীয় বিদ্যালয়-গৃহই প্রদর্শনীর উপযুক্ত স্থান, তবে ইহার অভাবে স্থানীয় হাটের আটচালায়, স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণের গৃহের প্রাঙ্গণে বা নাট মন্দিরে প্রদর্শনীর স্থান হইতে পারে। প্রদর্শনী সজ্জিত করার ভার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ও স্থানীয় যুবকগণের উপর অর্পিত হইবে। ইহার জন্ত অতি স্বল্প ব্যয় হইবে। তবে প্রদর্শনীর জন্ত অর্থের সংস্থান করিতেই হইবে। এবং ইহার জন্ত একটি বাজেট প্রস্তুত করিতে হইবে; স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেই হইবে, তবে ইহার জন্ত কোন 'জোর জুলুম' করা উচিত হইবে না, যিনি যাহা পারেন তাহা স্বেচ্ছায় দিবেন; অতি অল্প হারে মাসিক চাঁদাও ধার্য্য হইতে পারে; ইহা ছাড়া ধনী ব্যক্তিদের গৃহে বিবাহ, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদির সময় তাঁহাদের নিকট

হইতে কিছু চাঁদা সংগৃহীত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, কমিটির একটি স্থায়ী তহবিল থাকিবে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে হিসাব-নিকাশ রাখিতে হইবে এবং প্রতি বৎসর উপযুক্ত পরীক্ষকের দ্বারা হিসাব-নিকাশ পরীক্ষিত হইবে। মোটামুটি ভাবে আয় অনুসারে ব্যয় হইবে। সরকার, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি প্রদর্শনীর তহবিলে উপযুক্ত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করিবেন। বর্ত্তমানে যে নিয়মে ও যে হারে সরকার সাহায্য করেন সেই নিয়ম ও হার বদলানো দরকার। স্থান বিশেষে প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সরকারী সাহায্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। সাধারণতঃ একটি নির্দ্দিষ্ট হারে প্রথম কয়েক বৎসর সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। বর্ত্তমানে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের সাহায্যের নিশ্চয়তা ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। বিভিন্ন বিভাগ এইরূপ সাহায্য বণ্টন না করিয়া জেলা-শাসকের উপর বণ্টনের ভার অর্পিত করিলে সকল দিকেই সুবিধা হয়। প্রত্যেক জেলার পল্লী অঞ্চলের প্রদর্শনীসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করিবেন, এবং জেলা-শাসকই প্রত্যেক প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক প্রদর্শনীর তহবিল পুষ্ট করিবেন। ইহা হইলে জেলা-শাসকের সহিত পল্লী অঞ্চলের প্রদর্শনীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইবে, এবং এইরূপ যোগাযোগ খুবই বাঞ্ছনীয়।

পল্লী অঞ্চলের প্রদর্শনীর আকার খুব বৃহৎ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক অঞ্চলের প্রদর্শনীতে সেই অঞ্চলের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎকৃষ্ট নমুনা, নূতন প্রবর্ত্তিত দ্রব্যাদির নমুনা, স্থানীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎকর্ষের নমুনা প্রভৃতির সমাবেশ থাকিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইরূপ কৃষক ও শিল্পীর কার্য্যাবলীর সহিত প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষের যোগাযোগ থাকিবে। বর্ত্তমান পদ্ধতিতে সাধারণতঃ প্রদর্শনী-কর্ত্তৃপক্ষ কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শিত নমুনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না—কেহ একটা বৃহৎ আকারের কুমড়া বা লাউ প্রদর্শন করিলে সকলেই 'বাহবা' দেন—কিন্তু উহা কাহার দ্বারা কোন অঞ্চলে উৎপাদিত, বা কোন্ রকম চাষের প্রণালী অবলম্বন করিয়া উহা এত বৃহৎ হইয়াছে কিংবা কত পরিমাণ জমিতে উহার চাষ হইয়াছিল এবং জমিতে এইরূপ বৃহৎ আকারের কয়টা কুমড়া ফলিয়াছিল—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কাহারও কোন জ্ঞান থাকে না—অথচ এইরূপ নমুনার জন্য মোটা পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। এই কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না যে, এইরূপ একই নমুনা বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখানো হইয়া থাকে। আটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীতে এই ধরনের ২।১ রকম নমুনা দেখিয়া এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, "এই একই নমুনা সেদিন "—" প্রদর্শনীতে দেখিয়া আসিয়াছি।" সুতরাং এই রীতির পরিবর্ত্তন করা একান্ত দরকার। প্রত্যেক প্রদর্শনীতে বিভিন্ন বিভাগ থাকিবে—(১) সরকারী বিভাগ কর্ত্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের নমুনা, (২) উন্নত প্রণালী অবলম্বনে সাধারণের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদির নমুনা, (৩) স্থানীয় প্রণালী ও প্রথা অনুসারে উৎপাদিত দ্রব্যাদির নমুনা, (৪) কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্যাদির নমুনা ইত্যাদি। যতদূর সম্ভব demonstrations-এর অর্থাৎ হাতে-হেতেড়ে কাজ দেখাইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে ইহাই প্রত্যেক প্রদর্শনীর প্রধান অঙ্গ হইবে। বিশেষতঃ কুটীর-শিল্পের কাজ হাতে-হেতেড়ে দেখানো একান্ত দরকার।

প্রদর্শনীতে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকিবে—তবে ইহা কোন মতে ব্যয়বহুল হইবে না; লোকশিক্ষামূলক স্থানীয় আমোদ-প্রমোদকেই (যাত্রা, জারি, তর্জ্জা প্রভৃতি) প্রাধান্য দিতে হইবে। বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন আমোদ-প্রমোদ প্রধান স্থান অধিকার না করে। প্রদর্শনীতে বা আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন প্রবেশ-মূল্য থাকিবে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক পল্লী প্রদর্শনী স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে এবং সহযোগিতায় এইরূপ ভাবে গঠিত করিতে হইবে যেন জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ইহা তাঁহাদেরই অনুষ্ঠান এবং স্থানীয় জীবনে ইহার মূল্য খুবই বেশী—তাঁহাদের সকলের স্বার্থের ও উন্নতির সহিত ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মাইতে পারিলে—সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব হইবে না অর্থের অভাব হইবে না। চাই কেবল স্বার্থশূন্য নেতৃত্ব। সরকারী মহলের প্রতি নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন পল্লী অঞ্চলের উন্নতির দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক প্রদর্শনীর সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করেন, কোন্ মন্ত্রী বা কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন বা উহার পারিতোষিক বিতরণী-সভায় পৌরোহিত্য করিবেন ইহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেন সাহায্য ও সহযোগিতার তারতম্য না করেন। লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, স্থানীয় কৰিতকর্ম্মা একজন কৃষক বা শিল্পী কিম্বা স্থানীয় নেতার দ্বারাই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হওয়া বাঞ্ছনীয়—মন্ত্রী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রদর্শনী পরিদর্শন করিতে যাইবেন—তাঁহাদের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন—এবং স্থানীয় জনসাধারণকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিবেন। স্থানীয় জনসাধারণও তাঁহাদিগকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন। মোট কথা বর্ত্তমান যুগে আগেকার সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। Public Servant (সাধারণের সেবক) এই কথাটির আসল তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রীজবাহরলাল নেহরু এই সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় সরকারী মহলের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। অনেকের এই সম্বন্ধে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

পল্লীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যেই পল্লী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং ইহার নাম হওয়া উচিত পল্লী উন্নয়ন প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর সহিত কৃষি-শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্য মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রভৃতি সবই জড়িত হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে

ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত আঁটপুর গ্রামে প্রতি বৎসর যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়—তাহার নাম পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী এবং এই প্রদর্শনী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও পল্লীর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের প্রতি ইহার দৃষ্টি থাকে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করিয়াছেন এবং কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের প্রশংসা করিয়াছেন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহোদয় বলেন, "এখানকার প্রদর্শনী একটা মামুলী ব্যাপার নয়।" বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় বলেন, "গ্রামকে কেন্দ্র করে পল্লী-কল্যাণ সমিতি গড়ে তোলবার চেষ্টা চলছে—এই প্রদর্শনী তারই আনুষঙ্গিক উদ্যোগ।" বর্ত্তমানে আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী আঁটপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান স্বরূপে পরিণত হইয়াছে।

প্রতিবন্ধক

শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার

সকালে বেড়ান বন্ধ করতে হয়েছে। মনের উপর ত আর জোর চলে না।

কদমতলা থেকে রেলপুল পর্য্যন্ত যাতায়াতে মাইল তিনেক পথ। বেড়ানর পক্ষে সত্যিই চমৎকার। শান্ত শীর্ণ জলাঙ্গী নদীটি পটে-আঁকা ছবির মত পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। কোথাও কাছে, কোথাও দূরে। একদিকে মাঝে মাঝে হালফ্যাশনের নতুন নতুন বাড়ী; অন্যদিকে বড় বড় খেঁজুর গাছ, ছোটখাট ক্ষেত, চিতে ও ভেরেণ্ডায় বেড়ায় ঘেরা উদ্বাস্তুদের টিনের ঘর। রাস্তার ধারে জায়গায় জায়গায় সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা চলেছে কন্টিকারীর বেগুনী ফুল ও কালকাসুন্দার হলদে ফুলের মধ্যে। বাবলার চারায় কচি ডালে সাদা সাদা কাঁটা বেরিয়েছে। আরামে পা মেলে বসে আছে আকন্দ ফিকে রঙের আভা ছড়িয়ে। এ গাছে শালিক, ও গাছে শ্যামা। জলের কিনারায় কয়েকটা বক। পুলের নীচে দু'চারখানা জেলে ডিঙি। প্রকৃতির আসল রূপ উপলব্ধি করা যায় ভোর বেলায়। মানুষের কোলাহল জেগে উঠলে জীবন্ত প্রকৃতি রূপান্তরিত হয় প্রাণহীন পটভূমিতে।

শীতের শুরুতে বেড়াতে আরম্ভ করি। এক সপ্তাহের মধ্যে শরীর ও মন সজীব হয়ে ওঠে। উৎসাহ বেড়ে যায়। ভোরে শয্যা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি পথে। সেদিন বুধবার। মালোপাড়ার মোড়ে এসে দেখি বাঁধান বেঞ্চির উপর বসে দাঁতন করছেন দয়াল হালদার। দয়াল বাবুর পৈতৃক নিবাস আমাদের পাশের গ্রামে। সরকারী বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত ছিলেন। রিটায়ার করে কৃষ্ণনগরে বাস করছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—এত সকালে এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

সংক্ষেপে উত্তর দিই—বেড়াতে।

—কলেজের সুন্দর মাঠ থাকতে ধুলোয় রাস্তায় কেন?

—নির্জ্জন নদীতীর ভাল লাগে।

—আপনার আশীর্ব্বাদে আমার বড় ছেলেটি কাটোয়ার বনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে চাকরি পেয়েছে।

—শুনে সুখী হলাম। ভগবানের কাছে কামনা করি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।

—কোন রকমে মাথা গোঁজবার মত বাড়ী করেছি এ পাড়ায়। একদিন দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন। আপনি দেশের লোক—একান্ত আপনার। এলে ভারি খুসী হব।

—আচ্ছা, সুবিধামত যাব আপনার নতুন বাড়ীতে।

মিনিট পাঁচেক দেরী হয়ে যায়। ইতিমধ্যে পূর্ব্বদিক লাল হয়ে উঠেছে। নদীর বুকে সূর্য্যোদয় হচ্ছে। কি মনোরম দৃশ্য! জোরে জোরে হাঁটি আর ভাবি। ছেলেবেলায় আম কুড়ুতে গিয়ে বিলের ধারে সূর্য্যোদয় দেখে এমনি ভাবেই মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। আজ আমি প্রৌঢ়ত্বে পা বাড়িয়েছি কিন্তু দৃশ্যমান জগৎ তেমনিই নবীন আছে। অরুণ ঠিক তেমনি করেই তার সোনার ঝুলিতে আশার লিপি বহন করে আনে আমার সংসার-পীড়িত হৃদয়ের দুয়ারে।

রবিবার। অঞ্জনার খালের ধারে পৌঁছেছি। সার্কিট হাউসের পিছনের রাস্তা দিয়ে হন হন করে এগিয়ে আসেন ব্রজেন বিশ্বাস। গায়ে কাশ্মীরী মলিদা, গলায় কম্ফার্টার, পায়ে বাটার বাদামী রঙের রবিন, পরনে মান্দ্রাজী ধুতি, হাতের মোটা লাঠিটা কাঁধের উপর চড়ান। ব্রজেনবাবু কালেক্টারিতে কাজ করতেন। চাকরির শেষ দিকে নির্ব্বাচন বিভাগে বেশ নাম কিনেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর শাস্ত্র চর্চ্চা ও শরীর চর্চ্চা দু'দিকেই সমান মনোযোগী। হাসিমুকুলিত মুখে বলেন, স্যার মর্নিং ওয়াক আরম্ভ করেছেন! খুব ভাল। শীতকালটা চালিয়ে যাবেন। আমি বিকেলে রোজ ব্রীজ অবধি যাই। আরও অনেকে যান—সরকার মশাই, সেন মশাই, বিধুবাবু, বিপিনবাবু।

গলা একটু নামিয়ে বলেন, শুনেছেন বোধ হয় আমাদের হারু

অধিকারী বি. টি. পড়তে গিয়েছে। কৃতবিদ্য কৃতকর্ম্মা হলে কি হবে, বি-টি না হলে ত হাই স্কুলের হেড মাষ্টার হতে পারবে না। জীবেন্দ্র বালিকা বিদ্যাপীঠে জীবন নষ্ট করা হারুর উচিত নয় কোন মতেই। যাই হোক, আমাকে ওর জায়গায় বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে অনেক চেষ্টা করে। আমি কাজ ভালবাসি। তাছাড়া পড়ানোর একটা আনন্দও আছে। সকালে স্কুল। আজ ছুটি, তাই বেরিয়েছি। রোদ উঠে গিয়েছে। আপনি এগোন। আমাকে একবার যেতে হবে সেক্রেটারীর কাছে। বেসরকারী বিদ্যালয়ের ঝামেলা কম নয়।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে ব্রজেনবাবু বিদায় নেন। আমি দ্রুত চলতে শুরু করি। গেট রোডের শেষ বাড়ীটি পেরিয়ে যাই। গৃহস্বামীর রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ আছে। তারের বেড়ায় তরুলতা, লোহার গেটের দু'পাশে ঝাউ গাছ, উঠোনের মাঝখানে ফুলগাছের কেয়ারী। একটু যেতে না যেতেই গাছপালার ভিতর থেকে বিপুল বিস্ময়ের মত বেরিয়ে পড়ে জজ সাহেবের কুঠি। এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে পুল পার হয় লালগোলাগামী মালগাড়ী। তার ঝন ঝন ধক ধক শব্দ সাময়িক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার পর যে বিজনতা সেই বিজনতা। আমাদের জীবনটাও ক্ষণিকের কলরব নয় কি ?

বৃহস্পতিবার। কত কি ভাবতে ভাবতে আপন মনে হাঁটছি। জীর্ণ স্মৃতিমন্দিরটা ছাড়িয়ে খানিকটা এগোতেই শুনতে পাই—'স্যার, স্যার'। পিছন ফিরে দেখি মোহনলালকে। কালো র‍্যাপারের উপর কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলছে ঢেউ খেলান চুল। মোহনলাল আমার ছাত্র। কয়েক বছর আগে বি-এ পাস করে বেরিয়েছে। জিজ্ঞাসা করি—খবর কিহে ? মোহনলাল প্রণাম করে বলে, আজ্ঞে, কালেক্টারীতে একটা অস্থায়ী কাজ পেয়েছি। সেক্রেটারিয়েটের ক্লার্কশিপ পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা আছে। পি-এস-সি থেকে ফর্ম্ম আনিয়েছি। কতকগুলো জায়গা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার বাড়ী গিয়ে বুঝিয়ে নেব ভেবেছিলাম কিন্তু সময় পাচ্ছি না। সকালে এ পাড়ায় টিউশানি করি। যদি আপনার অসুবিধা না হয় ত দেখাই।

গরজ বড় বালাই। অনুমতির অপেক্ষা না করেই মোহনলাল পকেট থেকে ফর্ম্মখানা বার করে আমার হাতে দেয়। আমি সেখানার উপর ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মোহনলালকে বুঝিয়ে দিই কোন্ জায়গায় কি লিখতে হবে আর কি কি জিনিস পাঠাতে হবে দরখাস্তের সঙ্গে। সে কুণ্ঠিত ভাবে বলে, আপনি একখানা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেবেন স্যার।

আমি প্রতিশ্রুতি দিই। বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জোড়া বাংলার একটার মধ্যে ঢুকে পড়ে মোহনলাল। তার পাল্লায় পড়ে আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। বেশী দূর বেড়ান হয় না।

সোমবার। 'শশিনিবাস' পিছনে ফেলে গজ কুড়ি পঁচিশ গিয়েছি এমন সময় নগেন্দ্রনগরের মাঠ থেকে আম গাছের নীচে দিয়ে পাকা রাস্তায় উঠে আসেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মতিলাল মিত্র। কিছুকাল আমার সহকর্মী ছিলেন। সৌখিন মানুষ। দামী শাল, পশমী মোজা, সাদা কেড্স, বাহারে ছড়ি, চকচকে টাকের পাশে পাকা চুলের মিহি ছাট। ডিগডিগে ডিসপেপসিয়া রুগী। মিত্তির মশাই জিজ্ঞাসা করেন, এই যে ভায়া, আপনাকে কোনদিন বেড়াতে দেখিনি ত ?

—পূজার ছুটিতে বাইরে যাওয়া হয় নি। বড় একঘেয়ে লাগে, তাই আজকাল একটু বেড়াচ্ছি।

—বেশ করছেন।......কলেজে মর্নিং শিফ্ট হয়েছে, তাও অনেকে ভর্ত্তি হতে পারে নি। ব্যাপার কি ?

—উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ দিন দিন বেড়ে চলেছে। স্বাধীন দেশে খুবই স্বাভাবিক।

—সে ত বটেই, তবে মফঃস্বলে আরও কলেজ হওয়া দরকার। কলকাতায় ছেলেমেয়ে পড়াতে পারে ক'জন এই অর্থ সঙ্কটের দিনে ? আমার ভাইঝিটি থার্ড ডিভিসন ব'লে জায়গা পায় নি। বহরমপুর গার্ল'স কলেজে পড়ছে। দেখবেন যদি কোন ফাঁকে ট্রান্সফার নিয়ে আসতে পারে।

—আচ্ছা, লক্ষ্য রাখব।

—হ্যাঁ, কলেজে আজকাল ভাল ভাল অনুষ্ঠান হচ্ছে। সম্ভব হলে আমাকে একটু জানাবেন। ক্রমেই ব্যাক নাম্বার হয়ে পড়ছি। ছেলেরা চিনবে কি করে ?

—ঠিক কথা। ছেলেদের বলব আপনাকে কার্ড দিতে।

—অনেক ধন্যবাদ। মাঝে মাঝে পাকিস্তানে যাই কিন্তু সময় যেন আর কাটে না।

অস্বস্তি বোধ করি। বেলা বাড়ে। সবুজ ঘাসের উপর ক্ষণ-জীবিনী উষার বিদায়কালীন অশ্রুবিন্দু শুকিয়ে যায়। আমার মনের ভাব বুঝতে পারেন মতিবাবু। লজ্জিত ভাবে 'আজকের মত আসি' বলে চলে যান। অবসর গ্রহণ করলেও কলেজের ব্যাপারে আজও মশগুল তাঁর মন। আমি চঞ্চলতা প্রকাশ না করলে হয়ত এক ঘণ্টা ধরে কলেজ প্রসঙ্গ চলত। এমনিই হয়। জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় মানুষ বার বার ফিরে চায় তার ফেলে-আসা কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে। কর্ম্মক্ষেত্র হয়ে ওঠে তীর্থক্ষেত্র।

তিন দিন বাধাহীন ভাবে কাটে। যাবার ও ফিরবার সময় পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে নীরব নমস্কার বিনিময় ছাড়া আর কিছু হয় না। শুক্রবার 'রাধালয়ে'র কাছাকাছি দামোদর দত্তের সঙ্গে দেখা। বিরাট ভুঁড়ি, চলতে কষ্ট হয়। হাঁটছেন আর হাঁপাচ্ছেন। এর অভিযান যে মেদ-বাহুল্যের বিরুদ্ধে সেটা অনায়াসে অনুমান করা যায়। প্রাতঃভ্রমণকারীদের সমস্যা কত বিভিন্ন! ক্ষীণকায় মতিলাল ও স্থূলকায় দামোদর একই পথের পথিক! দামোদর বড় ব্যবসাদার, আবার ভজন-সাধনও করেন। বাড়ীতে মাঝে মাঝে কীর্ত্তন, কথকতা বা ভাগবত পাঠ হয়। মিষ্টি কথা, মধুর ব্যবহার। অত্যন্ত সাদাসিধে পোষাক। দেখে বোঝবার জো নেই যে টাকার কুমীর। মুখোমুখি হতেই বলেন, সরু চাল করেক বস্তা রয়েছে।

কাঁকর খুব বেশী বলে পাঠাই নি। ভাল গম এসেছে। কতটা লাগবে জানাবেন।

'আচ্ছা' বলে পাশ কাটাতেই পিছু ডাকেন—নতুন আলু উঠেছে, আধ মণটাক পাঠিয়ে দেব কি?

—দিতে পারেন।

বেড়াবার সময়েও দোকান আর বাজারের কথা। কি বিরক্তি-কর! দামোদর কারবারের বাইরে কোন জগতের খবর রাখেন না, রাখবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। বেসুরো মন নিয়ে বাড়ী ফিরি। প্রত্যহের পরিচিত চিত্রগুলি নজরে পড়ে। বাড়ীর রোয়াকে বসে কালী কন্‌ট্রাক্টর তামাক টানছেন আর কাসছেন। মোমিন পার্কে ধোপারা কাপড় শুকুতে দিচ্ছে। কেটের কাপড়-পরা বৃদ্ধারা ঘাটে যাচ্ছেন সংসারের কথা ও পাড়ার ঘটনা আলোচনা করতে করতে। ভজু চামারের ধাড়ী শূয়োরটা একপাল বাচ্চা নিয়ে ওঁচলার ঢিবির ওপর রোদ পোয়াচ্ছে। গর্তর ধারে ভাঙা বাড়ীর ছাদের পূর্ব্ব আলসেতে ছেঁড়া আসমানী শাড়ীখানা যথারীতি ঝুলছে, মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-ফেলা মোষের গাড়ীখানা মন্থরগতিতে চলেছে।

মঙ্গলবারের অভিজ্ঞতা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। 'পাত্রম্যান-সনে'র কাছে আমার পিছু নেন নিকুঞ্জ কবিরাজ। ভদ্রলোককে আমি চিনতাম যদিও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। প্রায় প্রতিদিনই বালাপোশ মুড়ি দিয়ে তাঁকে যেতে আসতে দেখেছি। আর দেখেছি নিঃসঙ্কোচে আমার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানতে। সে দৃষ্টির অর্থ আজ বুঝতে দেরী হয় না। আমার গা ঘেঁষে চলতে চলতে হঠাৎ অতি পরিচিত জনের ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করেন, প্রাতঃভ্রমণে উপকার পাচ্ছেন কিছু?

বিস্মিত ভাবে বলি, উপকার! বেড়াতে কেমন লাগে জানতে চান? বেশ লাগে।

—মনের প্রফুল্লতা ত হবেই। সে কথা নয়। মানে আপনার শারীরিক উন্নতি হচ্ছে কি? আপনার ব্যাধি নিশ্চয় কোষ্ঠকাঠিন্য।

—কই, সে রকম অসুখ ত আমার নেই।

—আপনার চেহারা দেখে তাই মনে হয়। আপনি হয়ত বুঝতে পারেন না কিন্তু আমাদের চোখে ধরা পড়ে। কবিরাজি করে চুল পাকিয়েছি। এ রোগে প্রাতে বায়ু সেবন প্রশস্ত। ফল অচিরেই পাবেন।

কবিরাজের গায়ে-পড়া ভাব ও অযাচিত উপদেশ আদৌ ভাল লাগে না। কথার জবাব না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলি। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। কিছুক্ষণ আগে সিউলিরা খেজুর গাছ থেকে রসের কলসি নামিয়ে নিয়েছে। নলের মুখ থেকে টপ টপ করে রস পড়ছে। একটা টিয়াপাখী লম্বা ঠোঁট দিয়ে রস খাচ্ছে। একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। তাদের মুখে চোখে ঔৎসুক্যের চেয়ে ঈর্ষাই ফুটে উঠেছে বেশী। টিকালো নাকটি তুলে কবিরাজ বলেন, মিষ্ট দ্রব্যে শিশুদের লোভ অপরিসীম। দুঃখের বিষয় দুর্মূল্যের বাজারে উপযুক্ত পরিমাণ মিষ্ট দ্রব্য তাদের ভাগ্যে জোটে না।

'হ্যাঁ', 'না' কিছু না বলেই ফিরতে উদ্যত হই। কবিরাজকে এড়াতে চাই। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। বিদ্যাসাগরী চটি জোড়া মাটিতে ঠুকে শিশির-ভেজা ধূলো ঝেড়ে বলেন, চলুন, আমিও যাব ঐদিকে। শ্রীগোপাল বস্ত্রালয়ে একটু কাজ আছে। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। আপনি যে ব্যায়রামে ভুগছেন তা প্রৌঢ় বয়সে অনেকেরই হয়, বিশেষতঃ যাঁরা অঙ্গ চালনার চেয়ে মস্তিষ্ক চালনা বেশী করেন। চিন্তার কারণ নেই। তিন মাস পরীক্ষা করে দেখুন প্রাতঃভ্রমণ ফলদায়ক হয় কিনা। যদি না হয় আমাকে খবর দেবেন। আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে কোষ্ঠশুদ্ধির চমৎকার ব্যবস্থা আছে। ফল অব্যর্থ। শান্তিপুরের হরিগোপাল সান্যাল মশাইকে হয়ত জানেন। তিনি কোষ্ঠবদ্ধতায় দীর্ঘকাল ভুগে জরা-জীর্ণ হয়ে পড়েন। আমার চিকিৎসা তাঁকে নবজীবন দান করেছে। এখন তিনি বেশ কর্ম্মক্ষম। মেদিনীপুর জেলার কোন্ কলেজে (নামটা মনে আসছে না) অধ্যক্ষের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত। দেবনাথ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জ্ঞানানন্দবাবুও আমার ঔষধের ফল পেয়েছেন হাতে হাতে। এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি হার মেনেছে কবিরাজির কাছে।

আমার নীরবতায় বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হয়ে অনর্গল আত্ম-প্রশংসা করে যান কবিরাজ। আমি শুনবার ভান করি আর পথ চলি। বাড়ীর কাছে এসে নম্র নমস্কার জানাই। কবিরাজ প্রতি-নমস্কার করে বলেন, রাগ করবেন না, অনেক সময় নষ্ট করেছি আপনার। আবার দেখা হবে।

কবিরাজের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। প্রশ্নমুখর পথ ছেড়ে নির্ব্বান্ধব গৃহচূড়ায় আশ্রয় নিয়েছি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। এখানে স্কুল কলেজ, হাট বাজার, আপিস আদালত, ডাক্তারি কবিরাজির আবহাওয়া নেই। আছে সীমাহারা আকাশ, কুলভাঙা নদী, অরুণের বর্ণসমারোহ, বিহগের বিচিত্র কলরব, শুভ্র বালুচরের কঠোর বৈধব্য, মায়াবী বনের অধীর আমন্ত্রণ। কোন প্রতিবন্ধক দেখিনে আমার ও প্রকৃতির মাঝখানে।

আন্দামানের বন্দী উপনিবেশ

(তৃতীয় পর্ব)

শ্রীনিখিল মৈত্র

১৯১৯ সনে ভারত সরকার যে জেল কমিটি গঠন করেছিলেন, তাঁরা আন্দামান বন্দী উপনিবেশ দেখে এসে বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের বাইরে নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে কয়েদী পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন। আর আন্দামানকে উপনিবেশরূপে স্বাধীন মানুষের বসবাস-যোগ্য স্থান হিসাবে গড়ে তুলতে হলে সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা নিয়ে একেবারে নতুন জায়গায় কাজ আরম্ভ করতে হবে। মধ্য আন্দামান দ্বীপে বসতি গড়ার পরিকল্পনাও জেল কমিটি সমর্থন করেন নি। এ সব সিদ্ধান্ত কিন্তু আন্দামানের বন্দী নির্বাসন বন্ধ করতে পারল না।

তা সত্ত্বেও জেল কমিটির সুপারিশ এবং ভারতবর্ষে আন্দামান ও অন্যান্য জেল সংস্কারের জন্য বিরাট আন্দোলন ধীরে ধীরে আন্দামানের বন্দী উপনিবেশ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এল। কারা-শাসন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পুনর্নির্দ্ধারিত হ'ল—বন্দীকে জেলের গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখার প্রয়োজন যাতে সে আবার অপরাধ না করে; আর জেলের শাসনে তার চরিত্রের উন্নতি করার চেষ্টা করা হবে। এই মাপকাঠি দিয়ে আন্দামানের কারা-উপনিবেশের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় যে, ১৯৩১-৪১ সনে এই কয়েদী শিবিরের শাসনব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। প্রথমতঃ যে-কোনও কর্মক্ষম গুরুতর অপরাধী নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা (যাবজ্জীবন বা মেয়াদী) পেলেই তাকে আন্দামানে নিয়ে আসার নিয়ম রদ করা হয়। স্বভাবদুর্বৃত্ত বা জঘন্য অপরাধীকে পারতপক্ষে এ সময়ে আন্দামানে নিয়ে আসা হ'ত না। আন্দামানে আসার পর কোনও অপরাধ করলে তাকে দণ্ড দিয়ে ভারতবর্ষের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত।

১৯৪১ সনে আন্দামানে নির্বাসিত কয়েদী মাস ছয়েক সেলুলার জেলে কাটাবার পরই তলবদার পর্যায়ভুক্ত হতে পারত। সুস্থ সামাজিক জীবন গড়ে তোলার জন্য দু'বছর পরে তাকে পরিবার-পরিজন নিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া হ'ত। নিজেই সে সরকারী খরচে দেশে গিয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে আসতে পারত। প্রয়োজন হলে দেশের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও কয়েদীর স্ত্রী ও সন্তানদের কোনও আত্মীয় রক্ষকের তত্ত্বাবধানে আন্দামান পাঠিয়ে দিতেন। তলবদারদের কয়েদীর সাজপোশাক পরার নিয়মও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নিজেদের ইচ্ছামত কাপড়জামা তারা পরতে পারত। মাঝে মাঝে এর ফলে যে মুস্কিল হ'ত না তাও নয়। ফিটফাট পোশাকের কারুর সঙ্গে নবাগত সরকারী কর্মচারী হয়ত পরম সমাদরে আলাপ-আলোচনা করছেন, পরে খবর পেলেন যে, ঐ ব্যক্তি একটি তলবদার, আন্দামানে নব পরিবেশে কয়েদী জীবন কাটাচ্ছে! এই ভাবে ঠকার ফলে এক জবরদস্ত ডেপুটি কমিশনার নিয়ম জারি করলেন যে, তলবদাররা সাধারণ পোশাকের উপর বিশেষ কোনও পরিচয় চিহ্ন পরবে। পরে সে নিয়ম বদলে হ'ল যে, জামার সঙ্গে তকমা ঝুলোবার কোনও প্রয়োজন নেই, কেবল পরিচয় কার্ড সঙ্গে রাখলেই চলবে।

তলবদাররা কালাপানিতে প্রথম দু'বছর বিভিন্ন কয়েদী কেন্দ্রে থেকে কাজ করত। মাইনে মাসিক দশ টাকা থেকে আঠাশ টাকা পর্য্যন্ত। রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে কয়েদী কেন্দ্রের বাসিন্দারা বাইরে বেড়াতেও যেতে পারত এবং ইচ্ছা করলে কৃষকের ক্ষেতে, ব্যবসায়ীর দোকানের কাজে বা কারিগরী করে তাদের পয়সা উপার্জন করারও কোন বাধা ছিল না। দু'বছর পরে তলবদার 'টিকেট অন লীভ' পদে উন্নীত হ'ত, তখন তার মাইনে বেড়ে যেত এবং অনেকেই ক্ষেতের কাজ বা ব্যবসা করে রোজ উপার্জ্জনের পথ বেছে নিত। যারা সরকারী চাকরী করত, তাদের পরিবারের জন্য বিশেষ ভাতা দেবার ব্যবস্থা ছিল। স্ত্রীর জন্য পাঁচ টাকা এবং প্রতি সন্তানের জন্য দু'টাকা। পোর্টব্লেয়ার শহরের ভিলানীপুর অঞ্চলে মাসিক আট আনা ভাড়ায় সরকারী কোয়ার্টারও পাবার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণতঃ দ্বীপান্তরিত কয়েদী আট-দশ বছর শান্ত ভাবে আন্দামানে বসবাস করলে তার দণ্ডকাল শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হ'ত। তখন তার পক্ষে দেশে ফিরে যাবার পথে কোন বাধা ছিল না।

১৯৪১ সনে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় আন্দামানের পূর্ণাঙ্গ জনগণনা ও তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় নি। অতি সংক্ষিপ্ত যে তথ্য তখন সরকার প্রকাশ করেছিলেন তাই থেকে জানতে পারা যায় যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসংখ্যা ছিল একুশ হাজার আর তার মধ্যে পোর্টব্লেয়ার ও আশেপাশের এলাকায় উনিশ হাজারেরও বেশি লোক। স্ত্রীপুরুষের সংখ্যানুপাতিক বৈষম্য অনেকখানি দূর হলেও পুরুষের সংখ্যা পোর্টব্লেয়ার এলাকায় ছিল তের হাজার আর স্ত্রীলোক দু'হাজারেরও কম। পোর্টব্লেয়ার অঞ্চল প্রায় আশীটি ছোটবড় গ্রাম নিয়ে গঠিত। সেই সময় প্রায় ন'টা বড় বড় কনভিক্ট স্টেশন ছিল। মিডলপয়েণ্ট, পাহাড়গাঁও

হামফ্রিগঞ্জ, ডাণ্ডাস পয়েণ্ট, উইম্বারলিগঞ্জ, রস, নমুনাঘর, হ্যাডো এবং আঠালাণ্টা পয়েণ্ট। তা ছাড়া, এলিফণ্টি পয়েণ্ট এবং তুসনাবাদ অঞ্চলেও ছোট ছোট অর্ধমুক্ত কয়েদী-কেন্দ্র ছিল।

আন্দামানের শাসনব্যবস্থার সর্বময় কর্তৃত্ব আজকের মত তখনও চীফ কমিশনারের উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কোনও ভারতীয়কে এই পদে নিযুক্ত করা হয় নি। এমনকি ডেপুটি কমিশনারও একজন ভারতীয় ছাড়া আর কেউ হয় নি। মিলিটারী বা ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের জাঁদরেল চাঁইরা এই দুটি পদ অলঙ্কৃত করতেন। একমাত্র স্বাস্থ্যবিভাগ ছাড়া দায়িত্বশীল কোনও উঁচু পদে ভারতীয় কর্মচারীকে আন্দামানে বদলী করা হয় নি। জেলার, ওয়ারলেস অপারেটর প্রভৃতি কম মাইনের দায়িত্ব-শীল পদে সাধারণতঃ এংলো-ইণ্ডিয়ানদের নিযুক্ত করা হ'ত। ডেপুটি কমিশনারের অধীনে দু'জন এসিস্টাণ্ট কমিশনার—একজন কর বিভাগের এবং আর একজন শাসন বিভাগের। দ্বিতীয় কর্মচারীর পদকে সেটেলমেণ্ট এসিস্টাণ্ট কমিশনার বলা হ'ত। ঐ পদাধিকারী সাধারণতঃ পুলিস বিভাগের কোনও ইংরেজ কর্মচারী হতেন। কয়েদীদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর। ১৯৩৩ সন থেকে আন্দামানে আবার নবপর্য্যায়ে বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক বন্দী নিয়ে যাওয়ায় সেলুলর জেলের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেওয়া হয় এবং বিশেষ একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এ পথে নিয়োগ করা হয়।

১৯৪১ সনে আন্দামান বন্দীনিবাসে প্রায় ১২০ জন ইউরোপীয় সৈনিকের এক কম্পানী একজন ক্যাপ্টেনের অধীনে রস দ্বীপে থাকত। প্রতি ছ'মাস পর পর এই কম্পানীর বদলী ভারতবর্ষ থেকে যেত। ব্রিটিশ সৈন্যদের আন্দামানবাস বায়ু পরিবর্তনেরই নামান্তর। রাত্রে চীফ কমিশনারের বাসগৃহ বা গবর্নমেণ্ট হাউস পাহারা দেওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনও কাজ ছিল না। তবুও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জাপানী অধিকারের আগে পর্যন্ত এই কম্পানী আন্দামানে ছিল। বন্দীশিবিরের সুরক্ষা—বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে আসার পর সরকারের সামনে বিরাট এক সমস্যা রূপে দেখা দেয়। সে কাজ ইংরেজ সরকার কি নিখুঁত ভাবে করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় আন্দা-মানের মিলিটারী পুলিশের গঠন দেখলে। বন্দী উপনিবেশের প্রধান প্রহরী ছিল মিলিটারী পুলিশ। সাধারণ সিবিল পুলিশের সংখ্যা ছিল মাত্র দু'শ। ভারতীয় মিলিটারী পুলিশ চারটি কম্পানীতে বিভক্ত—শিখ ও ডোগরা এক-একটি কম্পানী, পঞ্জাবী মুসলমান পল্টন, পুলিস দুই কম্পানী। প্রত্যেক কম্পানীর উপরে একজন সুবেদার এবং বিভিন্ন সুবেদারের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল সুবেদার মেজরের উপর। মিলিটারী ও বেসামরিক পুলিসের উপরওয়ালা কমাণ্ডাণ্ট মিলিটারী পুলিস। তিনিও ইংরেজ।

১৯৩১-৪১ সনে আন্দামানে কয়েদী চালান করার জন্যে মহারাজা জাহাজই ব্যবহৃত হ'ত। উত্তর-ভারতের আন্দা-মানগামী বন্দীদের কলকাতার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে এসে রাখা হ'ত। জাহাজ ছাড়ার দিন খুব ভোরে ডাণ্ডা-বেড়ী পরিহিত অবস্থায় বন্দী নিজের ছোট বিছানা এবং জেলে উর্দি নিয়ে জাহাজঘাটে বন্দী গাড়ীতে চড়ে কড়া পুলিস পাহারায় আসত। মহারাজা জাহাজের নীচের ডেকের মাঝখানে বয়লারের ঠিক উপরে সারি সারি ছোট ছোট সেল। তারই মধ্যে কয়েদীদের রাখা হ'ত। সেলে ঢুকলে ডাণ্ডাবেড়ী রাখা নিয়মবিরুদ্ধ। কামার এসে ঐ সব কেটে দিত। দিনে ঘণ্টাদুয়েকের জন্য উন্মুক্ত বাতাসের মাঝে শান্ত্রীর পাহারায় উপরের ডেকে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম ছিল। পোর্টব্লেয়ারেও বন্দীদের আলাদা করে নামিয়ে নিয়ে খানা-তল্লাসী করে সেলুলর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত।

এই সময়ে রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামানে নিয়ে আসা আর এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৩৫ সনে সেলুলর জেলে রাজ-নৈতিক বন্দীর সংখ্যা ছিল প্রায় দুই শত। পি-আই বা পারমানেণ্টাল ইনকারসিরিটেড (পাকাপাকি বন্দী) বলে তাঁদের বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল এবং সেলুলর জেলের কঠোর অনুশাসন ও রুদ্ধ সেলের বাইরে তাঁদের পাঠানো হ'ত না। নিজেদের অধিকার নিয়ে বিপ্লবী বন্দীরা আবার আন্দোলন সুরু করলেন। সেই চিরাচরিত পথে—প্রায়োপবেশন করে জেল কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে বন্দীত্বের অবমাননা বিনা প্রতিবাদে তাঁরা কিছুতেই মেনে নেবেন না। অনশনে কয়েকজনের মৃত্যুও হ'ল। ১৯৩৭ সনের ভারতবর্ষ এ সংবাদ শুনে বিরাট প্রতিবাদ আন্দোলন আরম্ভ করল। ভূস্বর্গ আন্দামান বলে ভারত সরকার বহু প্রচার চালিয়েছিলেন। কিন্তু, জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের আন্দামানের কারাকক্ষে নির্বাসন ভোগ করতে দিতে রাজী হ'ল না। দেশব্যাপী বিপুল আন্দোলনের সামনে ইংরেজ সরকার নতি স্বীকার করলেন, রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ইংরেজ শক্তির আদেশ অমান্য করার অপরাধে কিছু সৈনিককে আন্দামানে নিয়ে আসা হয়েছিল। জাপানী আক্রমণ এবং আন্দামানে জাপানী শক্তির অধিকারের সম্ভাবনায় সে সমস্ত বন্দীদের '৪১ সনের শেষাশেষি দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৪২ সনে সিঙ্গাপুর, মালয় ও বর্মার পতনের সঙ্গে আন্দামানের উপরেও জাপানী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তা সুনিশ্চিত ভাবে ইংরেজ সরকার বুঝতে পারেন। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাঁদের পরিবার-পরিজন, ইংরেজ পল্টন, ভারতীয় মিলিটারী পুলিশের এক বিশেষ অংশ এবং কিছু ভারতীয় কর্মচারীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা ভারত সরকার করেন। আন্দামান বন্দী উপনিবেশের অস্তিত্বও জাপানী অধিকারের দিন থেকে শেষ হয়ে যায়। '৪৫ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করার পর আন্দামানে আবার সাড়ম্বরে ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলিত হয়, ইংরেজ এবং ভারতীয় পল্টনও আন্দামানে আসে। কিন্তু, বন্দী-শিবির হিসেবে আর আন্দামানকে ব্যবহার করা হবে না—একথা খুব স্পষ্ট করেই ভারত সরকার ঘোষণা করেন।

ভারতবর্ষের একাঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি যখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী রাজশক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, তখন থেকেই ভারতবর্ষের বাইরে দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত বন্দীদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সুমাত্রায় বেনকুলেনে প্রথম ভারতীয় বন্দীর দল নির্বাসিত হয় ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বেনকুলেন ডাচ-কর্তৃপক্ষের শাসনাধীনে চলে যায়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বন্দীদের তখন সরিয়ে নিয়ে আসেন পেনাঙে। দু'বছর পরে পেনাঙের বন্দী-নিবাস উঠিয়ে সিঙ্গাপুরে কয়েদীদের নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৭৩ সন পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে ভারতীয়, বর্মী, মালয়, সিংহলী প্রভৃতি বন্দীদের এক উপনিবেশ থাকে। পরে সেখানকার কয়েদীদের আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, আন্দামানকে ফরাসীর কুখ্যাত নির্বাসন দ্বীপ ডেভিল্‌স্ আইলাণ্ডের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা করা সম্ভব নয়। নিছক প্রতিশোধবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আন্দামান বন্দী শিবির গড়ে উঠে নি। এখানে অতি ভীষণ নরহন্তা, স্বভাব-দুর্বৃত্তকে সংশোধন করার চেষ্টা হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে তাঁরা দেখাবেন আন্দামানের 'লোকাল বর্ণ' সমাজ (যাঁদের কেউ কেউ নিজেদের আণ্ডামানিয়ান নামে এখন অভিহিত করেন)। এই সমাজের স্রষ্টা অধিকাংশই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুরুতর অপরাধীরা। সিপাহী বিদ্রোহের বন্দীরা নব পর্যায়ে আন্দামান উপনিবেশের প্রথম বাসিন্দা। কিন্তু, কয়েক বছরের মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার, নির্যাতন, আদিম নিবাসীদের অবিশ্রান্ত আক্রমণ এবং বিভিন্ন রোগে অধিকাংশ বিদ্রোহী সিপাহীর মৃত্যু হয়। সে যুগে আন্দামান নিশ্চয়ই ফরাসী গায়নার কারানিবেশকে টেক্কা দিত, যে সামান্য বিপ্লবী এত বিপদের মধ্যেও বেঁচে ছিলেন তাঁরা নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেললেন সাধারণ কয়েদীদের প্লাবনে। কোনও নরঘাতিনী বন্দিনীর সঙ্গে বিপ্লবী সিপাহীর বিবাহও হ'ল এবং পরের যুগে সমস্ত কয়েদীদের সন্তান-সন্ততি এক সঙ্গে মিলে গেল।

আন্দামানের এই সমাজ বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং ধর্মমতের লোকের সংমিশ্রণে গঠিত। খ্রীষ্টান মিশনারিরা কয়েদীদের মধ্যে প্রথম দিকে কিছু কিছু কাজ করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করতে পারেন নি। সেলুলার জেলের মধ্যে হিন্দুকে মুসলমান করার অপচেষ্টার কিছু বিবরণ বীর সাভারকরের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। তবে পরবর্তী সময়ে এ সমস্যা খুব তীব্র আকার ধারণ করে নি। আন্দা-মানের হিন্দুসমাজও নিছক বাঁচার তাগিদে ছুতাছুত, খাওয়ার ব্যাপারে গোঁড়ামি এবং আরও বহু অনুশাসনের বন্ধন শিথিল করে দেয়। শিখ এবং বর্মী সমাজ স্বতন্ত্র ধারায় নিজস্ব রীতি-নীতি মেনে নিয়ে চলে। ভারতবর্ষ ও বর্মার রাজ-নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর ১৯৩৭ সনে কিছু বর্মী কয়েদী আন্দামান ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যায় কিন্তু অনেকেই আন্দা-মানের বসতি আঁকড়ে পড়ে থাকে। মোপলা (মালাবারী মুসলমান) সমাজও আন্দামানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।

বন্দী উপনিবেশের শেষ পর্যায়ে আন্দামানের স্থায়ী বাসিন্দা সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। সরকারও উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। ফলে ডাক্তার, মাস্টার, সরকারী চাকুরে, কারিগর প্রভৃতিও এই সমাজ থেকে বেরোতে আরম্ভ করে। শান্ত সামাজিক জীবনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল বিরাট এক কয়েদী সমাজ। নারী-ঘটিত কলহ-বিবাদের ফলে খুনোখুনিই হ'ত। একবার নরহত্যার সাজা পাবার পর দ্বিতীয়বার আবার কারুর প্রাণ নিলে, ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে তার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। তাই ফাঁসীও খুব অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। মদ্যপান ও জুয়া খেলার রেওয়াজও ছিল খুব বেশী।

ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের মত আন্দামানকে যে কখনও বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে পারে একথা ইংরেজ সরকার কখন চিন্তাও করেন নি। ফলে রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় নি। '৪১ সনের শেষে জাপানী অগ্রগতির সামনে আন্দামান পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কয়েদীদের জাপানীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে ঠিক হ'ল। '৪২ সন জানুয়ারী মাস থেকে জাপানী উড়োজাহাজের আনাগোনা আরম্ভ হ'ল। উদ্দেশ্য বোমা ফেলা নয়, পর্যবেক্ষণ করা, দেশে ফিরে যাবার জন্যে সবাই

ব্যগ্র। সরকার অবশ্য এ অবস্থায় কঠোরভাবে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলেন। মার্চ মাসের ১৩ তারিখে (১৯৪২ সনে) এস-এস-স্কুলিয়া আন্দামান থেকে অবশিষ্ট যাত্রিদল নিয়ে ভারতবর্ষের পূর্বতটের বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। পোর্টব্লেয়ারে গুরখা রাইফেলের অবশিষ্ট লোকজন, ব্রিটিশ সৈন্য এবং কিছু সরকারী কর্মচারী নিয়ে জাহাজ ছেড়ে গেল। অতি সামান্য মালপত্র যাত্রীরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিল। তারপরে প্রায় পঞ্চাশ টনের ছোট 'মোটর ভেসেল কিসমতে' আন্দামানের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার, ইঞ্জিনীয়ার ও হারবার মাস্টার, কমানডাণ্ট মিলিটারী পুলিশ, সেলুলার জেলের জেলার প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। চীফ কমিশনার সি. এফ. ওয়াটরফল আই-সি-এস এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আন্দামানে থেকে যান।

ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদ আন্দামানে যে শিথিল হয়ে আসছে এবং সমস্ত দ্বীপমালা অতি শীঘ্র যে জাপানী অধিকারে চলে যাবে তা কয়েদীরাও ভাল করে বুঝতে পেরেছিল। অথচ এই পরিবর্তনের অনিশ্চিত সময়ে গোলমাল একেবারে হয় নি বললেই চলে। জাপানী অধিকারের পরে একথা আন্দামানবাসীরা মর্মে মর্মে বুঝেছিল যে দুর্দান্ত কয়েদীদের স্বাধীন করে দিয়ে তাদের মধ্য থেকে শাসক সংগ্রহ করার ফল কত মর্মান্তিক হতে পারে। বর্মা, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে জাপানী অধিকারের যুগে যে ভাবে ভারতীয় জাতীয়-বাহিনী (আই-এন-এ) গড়ে উঠেছিল, আন্দামানে তা মোটেই হয় নি। উপরন্তু বিরাট কয়েদী-বাহিনী এবং স্থানীয় অধিবাসীরা একে অপরের নামে অবিরাম দোষারোপই করেছিলেন এবং জাপানী শাসনকে আরও কঠোরতর করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

কয়েদী যুগে পাঞ্জাবী সংখ্যাধিক্যের জন্য এবং সরকারের পরোক্ষ প্রোৎসাহে উর্দু আন্দামান উপনিবেশের সাধারণ চলতি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও পোর্টব্লেয়ার সরকারী হাইস্কুলে একমাত্র উর্দু ভাষাতেই লেখাপড়া শেখানো হ'ত। পোর্টব্লেয়ার তথা আন্দামানে উচ্চ-বিদ্যালয় একটিই এবং ১৯৩৭ সন পর্যন্ত রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

আন্দামানের উর্বর জমিতে মুক্ত কয়েদী চাষ-আবাদ করতে আরম্ভ করে কিন্তু কৃষিকেই প্রধান উপজীবিকা করেছিল এ রকম লোকসংখ্যা খুব কমই ছিল। শতকরা ৭০ ভাগ সাবালক পুরুষ কোনও না কোনও সরকারী কাজ করত, তারই সঙ্গে অবসর সময়ে চাষবাস। ফলে কৃষি-ব্যবস্থা কখনও খুব উন্নত ধরনের ছিল না। বন্দী উপনিবেশের বাধানিষেধ, কৃষিকার্য, ব্যবসায় এবং স্বাধীন বৃত্তি প্রতি কাজেই অনাবশ্যক বহু বাধার সৃষ্টি করত। জাপানী অধিকারের যুগে খাদ্যবস্তুর জন্যে পরনির্ভরশীলতার কঠোর দণ্ড আন্দামানবাসীদের দিতে হয়েছিল।

বন্দী উপনিবেশের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় স্বাধীন চিন্তা, ভাবনার বা রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে উঠার কোনও সুযোগ ছিল না। ১৯২১ ও ৩০ সনের জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগর এবং সরকারী বাধানিষেধের প্রাচীর ভেদ করে আন্দামানে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। এমন কি সেলুলার জেলের মধ্যে বিপ্লবী বন্দীদের অনশন এবারডীন বাজারে অতি সঙ্গোপনে আলোচিত হ'ত মাত্র, তাই নিয়ে কোনও বিক্ষোভ কোথাও দেখা দেয় নি। সরকারী অনুকম্পায় গঠিত একমাত্র লোকাল বর্ণ এসোসিয়েশন ছাড়া অন্য কোনও সংগঠন এখানে গড়ে উঠে নি।

সর্প

শ্রীসুবোধ বসু

প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া বাড়ি ফিরিতে একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল। বাড়ির কাছাকাছি নরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। বাজারের ব্যাগ হাতে বাজারের দিকে চলিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া যথারীতি সবিনয় নমস্কার করিলেন।

নরেশবাবু আমার প্রতিবেশী। আমার বাড়ির পাশে শালিখডাঙার বাবুদের যে ঘোড়ার আস্তাবলগুলি সামান্য অদল-বদল করিয়া ইদানীং মানুষদের কাছে ভাড়া দেওয়া হইতেছে, ইনি মাসছয়েক আগে তাহার একটি দখল করিয়াছেন। পাড়ার ছোকরাদের সরস্বতী পূজা-কমিটির মিটিঙে মাসতিনেক আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। তার পর হইতে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন ভদ্র নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি।

বছর চল্লিশের শান্ত, নিরীহ ভদ্রলোক। কোন এক মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। কয়টি ছেলেপুলে বলিতে পারিব না; কিন্তু তাঁর বাড়িতে কখনও কোনও চেঁচামেচি, হাঁকডাক শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বস্তুতঃ, এমন নিঃশব্দ প্রতিবেশী পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। আমার স্ত্রী জানালা হইতে ইঁহাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিবার পর সার্টিফিকেট দিয়াছেন, 'গরীব হলে কি হবে, সুখী পরিবার!' প্রতি সন্ধ্যায় নরেশবাবুকে সস্ত্রীক লেকের দিকে হাওয়া খাইতে যাইতে দেখিয়া একথা বহুবার আমারও মনে হইয়াছে। আর এও মনে হইয়াছে, সুখের জন্য সবচেয়ে যেটা বেশী দরকার সেটা একটা বিশেষ মনোবৃত্তি, বৈভবের প্রাচুর্য্য নয়।

'এমন উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে কেন? অসুখ-বিসুখ নয় ত?'

'না, স্যার।' নরেশবাবু কহিলেন। 'অসুখ নয়। দু' রাত্তির ধরে ঘুমোতে পারছি না। আপনি শোনেন নি বুঝি?...'

'কি ব্যাপার?', সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম।

'গাঙ্গুলি সাহেবের গ্লাস-কেস থেকে কি করে তাঁর একটা বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে গেছে। আমাদের আস্তাবল-বাড়িতেই নাকি এসে লুকিয়েছে সেটা। এখনও ধরা পড়ে নি। ভয়ে দু'রাত ধরে সপরিবারে জেগে বসে আছি...'

আস্তাবল-বাড়ির পাশেই গাঙ্গুলী সাহেবের চার তলা প্রাসাদ। গাঙ্গুলী এক সময় করেষ্ট অফিসার ছিলেন। খুব মোটা রকম ঘুষ খাওয়ায় তাঁর চাকরি যায়। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধের বাজারে তিনি কণ্ট্রাক্টরী শুরু করেন এবং শীঘ্রই লাল হইয়া উঠেন। শহরের তিনি একজন গণ্যমান্য লোক। কিন্তু একটি বন্য সখ তাঁর আজও রহিয়া গেছে। সাপ পোষা। বিচিত্র ধরনের বহু সাপ কাচের বাক্সে পুরিয়া তিনি একটা হলঘর সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দেশী-বিদেশী বহু লোক এই সর্প-সংগ্রহ দেখিয়া তারিফ করিয়া যায়। তাঁর 'চিত্রিণী', 'শঙ্খিনী' 'হিল্লোলিনী'দের মধ্যে অস্বস্তিকর রোমাঞ্চ বোধ করিতে করিতে আমিও গাঙ্গুলী সাহেবের এই ভয়ঙ্কর সখের অনেক তারিফ করিয়াছি। ইহাদের একটি ছাড়া পাইলে পাড়ায় কি রকম বিপদের সৃষ্টি হইতে পারে, নরেশবাবুর মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া ও তাঁহার দুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিলাম।

'না না, অত ভয় পাওয়ার কি আছে?' ভদ্রলোককে নিছক আশ্বাস দানের উদ্দেশ্যেই কহিলাম।

নরেশবাবু প্রায় আহত হইলেন। কহিলেন, 'আপনারা তিন তলার ওপরে থাকেন, তাই বলছেন। আমরা ত ভয়ে জুজু হয়ে আছি। আর এ কি রকম বেয়াড়া সখ বলুন ত! ভদ্রলোকের পাড়ার মধ্যে সাপ পোষা! এখন যদি কাউকে কামড়ায় কে তার দায়িত্ব নেবে?' বলিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট মুখে তিনি বাজারের দিকে পা বাড়াইলেন।

রাত প্রায় আটটা। সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া স্ট্যাণ্ড হইতে নিক্ষিপ্ত বিদ্যুতের আলোয় "এ ক্রিটিক অব পিওর রিজন্" পড়িতেছি। মনোনিবেশ বোধ হয় বেশ গভীরই হইয়াছিল, এমন সময় স্ত্রী আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, 'শুনছ, পাশের বাড়িতে ঝগড়া লেগেছে। নরেশবাবু বোধ হয় তাঁর বৌকে ধরে মারছেন...'

'দূর্!' আমি বই রাখিয়া কহিলাম।

'দূর্ কি!' গৃহিণী অসহিষ্ণু ভাবে কহিলেন। 'শুনছ না ঝগড়ার শব্দ?'

উত্তেজিত কথাবার্ত্তার একটা মিশ্রিত আওয়াজ এবার আমার কানেও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

'নিশ্চয়ই সাপটা বেরিয়েছে।' আমি কহিলাম।

'সাপ না কচু।' গৃহিণী ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কহিলেন, 'ভয় পেয়ে লোকে এমন বিশ্রী গালাগালি করে? জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একবার শুনে এস।'

ভদ্রতার নিয়মাবলী বিসর্জ্জন দিয়া অন্ধকার কামরার জানালা হইতে নিচের বাড়িতে আড়ি পাতিতে গেলাম। নরেশবাবুর বাড়ি সম্পূর্ণ অন্ধকার, কিন্তু উচ্চ ক্রুদ্ধ ধারালো আওয়াজ যে ঐখান হইতেই কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আর কি তীক্ষ্ণ হিংস্র কণ্ঠধ্বনি! যেন শব্দের একটা বিষাক্ত-ছোরা নরম অন্ধকারকে বেপরোয়া আঘাত করিয়া রক্তাক্ত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে।

'মেরে ফেলব হারামজাদী, মেরে ফেলব!'

'পাজি, বদমাস, কসাই। লজ্জা করে না? আর এক পা এগো দেখি, কত বড় তুই মরদ!'

'জিব উপড়ে ফেলব বলছি। আবার গাল দিবি ত টেনে জিব উপড়ে ফেলব, দজ্জাল মেয়েমানুষ!'

অপর পক্ষ হইতে এবারও ইহার উচ্চতর ও তিক্ততর পাল্টা জবাব আসিল। কোনও লজ্জা নাই, আব্রু নাই, প্রতিবেশীরা যে স্বামী-স্ত্রীর এই নির্লজ্জ কলহের প্রতিটি শব্দ শুনিতেছে, সেদিকে দু'জনের ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই।

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিজেরই যেন লজ্জা করিতে লাগিল। নরেশবাবুর বাড়ি হইতে কোনদিন একটা জোরে হাঁকও শুনি নাই। এমন ঠাণ্ডা শান্ত পরিবার সচরাচর দেখা যায় না। স্বামী-স্ত্রীতে মনের মিল আছে, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে আজ অকস্মাৎ তাঁহারা এমন করিয়া সকল ভদ্রতা বিসর্জ্জন দিয়া বসিলেন কি করিয়া?

সাপের ভয়ে দুই রাত্রি অনিদ্রা ইহার কারণ নয় ত? ক্রোধকে সাময়িক উন্মাদরোগ বলা হয়। দুই রাত্রি না ঘুমাইয়া ইহারা সত্যই পাগল হইয়া উঠে নাই ত? স্বকর্ণে না শুনিলে কিছুতেই বিশ্বাস করিতাম না যে, এমন হলাহল এই দম্পতী পরস্পরের প্রতি উদ্গিরণ করিতে পারে।

'কেমন, এখন বিশ্বাস হ'ল ত সাপ নয়?' গৃহিণী কাছে হাজির হইয়া মাষ্টারের ভঙ্গিতে কহিলেন।

'সাপ এতে সন্দেহমাত্র নেই।' আমি কহিলাম। 'এ সাপ দেহের কোথায় যে লুকিয়ে থাকে, স্নায়ুর জটের কোন্ তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে মড়ার মত চুপ করে পড়ে থাকে, ঠিক নেই। তারপর কি করে একদিন এই সাপের গায়ে অকস্মাৎ অসতর্ক পা পড়ে। মুহূর্ত্তে গর্জ্জন করে ওঠে নির্জ্জীব সর্প, ফোঁস করে ফণা তুলে দাঁড়ায়। দাঁত থেকে বিষ টপটপ করে পড়তে থাকে, যাকেই সামনে পায় নির্ব্বিচারে তাকেই ছোবল মেরে বসে। এমন ভয়ঙ্কর সাপ আর জগতে নেই। মানুষে মানুষে সম্পর্ক এক পলকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে এই সরীসৃপ!'

'তোমার ও সব দার্শনিক হেঁয়ালি রাখ।' বলিয়া আমাকে আর কোনরূপ আস্কারা না দিয়া গৃহিণী তাচ্ছিল্যভরে স্বকাজে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিতেছি। রাস্তায় নরেশবাবুর সঙ্গে দেখা। স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যথারীতি সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কারও মুখেই গতরাত্রের ঘটনার কোনও ছাপ নাই। এক রাত ও এক বেলার মধ্যেই তাঁরা নিজেদের মতভেদ ও মনোমালিন্য মিটাইয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

'গাঙ্গুলী সাহেবের সাপটা আজ সকালবেলা ধরা পড়েছে, শুনেছেন?'

'ওঃ, তাই নাকি?' আমি কহিলাম।

'তাঁর নিজের বাড়ির বইয়ের সেলফের পেছনেই গুঁড়ি-গুড়ি মেরে বসেছিল। বই ঝাড়তে গিয়ে বেয়ারা দেখতে পায়।' নরেশবাবু কহিলেন। 'অথচ এই সাপের ভয়ে আমাদের দু'দুটো দিন কি করেই না কেটেছে।...বাড়ি ফিরছেন বুঝি? আচ্ছা চলি, একটু হাঁটতে বেরিয়েছি...'

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কপালে হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া আগাইয়া গেলেন। সাপ ধরা পড়ার স্বস্তি তাঁহাদের চোখে-মুখে সুস্পষ্ট।
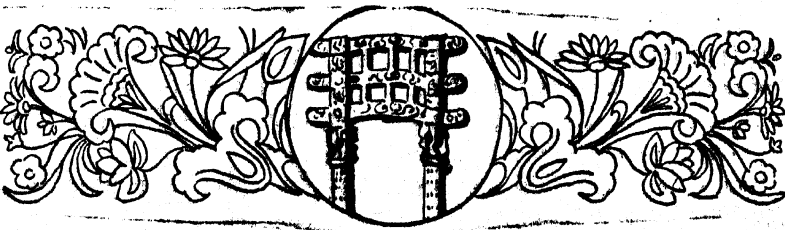
দাঁড়াইয়া ছিল কৃষক বালিকা
রঙিন ঘাঘরা পরি।
ঢেকে আছে মন গোটা—
রামধনুকের সপ্ত রঙের
এই সব ছিটে ফোঁটা।

৭

চলেছে মোদের ষ্টীমার সজোরে
শুনিলাম যেতে যেতে,
'মণিপুরীদের' নৃত্য হইবে,
চণ্ডী মণ্ডপেতে।
আলো লয়ে সবে করে ছুটাছুটি,
আনন্দে উৎসাহে,
অপেক্ষমান গ্রামবাসিগণ
আগ্রহে পথ চাহে।
সাবাস স্মৃতির দাবী!

'মণিপুরী দল' এলো কিনা সেথা
এখনো যে আমি ভাবি।

৮

স্মৃতির খেয়ালই রঙিন ঝুলিতে
আহরি রেখেছে মরি,
সুদীর্ঘ মোর জীবনপথের
এই সব মাধুকরী।
কোথাও সিঁদুর আবীরের দাগ,
প্রসাদের রেণুকণা,
তীর্থ মহিমা মাখানো মধুর
গন্ধের আনাগোনা।
উৎসব গেছে মুছি,
মনে ভেসে আসে চাল-চিত্রের
ভাঙা রাঙতার কুচি।

লাল সাহেব

শ্রীউমাপদ নাথ

লাল সাহেবের কথা এখনও ভুলতে পারি নি। লাল নরেন্দ্রনারায়ণ দেব।

উড়িষ্যায় রাজবংশের ছেলেদের সাধারণ নাম লাল সাহেব। নরেন্দ্রনারায়ণের ঠাকুরদাদার থেকে এরা সিংহাসনের অধিকার হারিয়ে রাজ-পরিবারের মর্য্যাদা নিয়ে নিজ প্রাসাদে বাস করছেন। এর ঠাকুরদাদার বড় ভাই ছিলেন রাজা, আর উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুসারে তাঁর সাক্ষাৎ বংশধরই তখন রাজ্যের শাসক। লাল নরেন্দ্রনারায়ণ বৃত্তিভোগী রাজবংশধর। নিজেদের পৃথক তালুক-দারিও আছে। বিত্তের দিক দিয়ে না হলেও বৃত্তির দিক দিয়ে রাজকীয়। আচারে-ব্যবহারে চাল-চলনে সাধারণের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

তথাপি লাল সাহেব বড় মিশুক। রাজকীয় ঐতিহ্যের বোঝা মাথায় নিয়েও মেজাজটিকে রেখেছিলেন অতি সরেস। জামদানী পাঞ্জাবীর ঢিলে আস্তিনটা একটু পিছনে টেনে ডান হাতখানা সামনে এগিয়ে দেন, ইওর হাণ্ড প্লিজ। হাতটা ভাল করে বাড়িয়ে দেবার আগেই নিজের থেকে ধরে একটা মৃদু ঝাঁকানি দেন। তার পর উজ্জ্বল আয়ত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন মুখের দিকে। মুখে লেগে থাকে একটা সরল সৌন্দর্য্য—একটা অভিজাত সস্মিতি।

একটা সঙ্গত উক্তি, একটা সাচ্চা কথা শুনলেই তাকে আপ্যায়ন করেন এমনি করে। মোসাহেবীকে ঘৃণা করেন লাল সাহেব। অপৌরুষ বড় অসহ্য।

এই লাল সাহেব ছিলেন মস্ত বড় শিকারী। রাজ্যে আর রাজ্যের বাইরেও তাঁর নাম। লাল সাহেবের গুলির আঘাতে কত যে নরখাদক বাঘ, বুনো হাতী, ভালুক, বাইসন প্রাণ দিয়েছে তার সংখ্যা নেই। অব্যর্থ গুলিটা লাগে গিয়ে ঠিক দুই চোখের মাঝ-খানে, নাকের উপরে। অনেক বিলিতি ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে লাল সাহেবের শিকার-কাহিনী। অনেক হোয়াইট হাণ্টারের সঙ্গে তাঁর ভাব।

একদিন বুইক হাঁকিয়ে সটান চলে এলেন আমার বাংলোয়। স্নিগ্ধ, সৌম্য অথচ সুদৃঢ় চেহারা। অভ্যর্থনা জানাতেই আন্তরিকতার কপাট খুলে দিলেন লাল সাহেব। বললেন, আলাপ করতে এলাম।

বাজে কথা খরচ করেন না, অল্প কথাতেই আলাপ জমাতে জানেন লাল সাহেব। আরও আগে আসতে পারেন নি, তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

লোকপ্রিয় বলে আমারও খ্যাতি কম ছিল না, কিন্তু এই ভদ্র-লোকটির কাছে যেন হেরে গেলাম। আমার নেমন্তন্ন হয়ে গেল লাল সাহেবের বাড়ীতে। পর দিন ডিনার খেতে হবে তাঁর প্রাসাদে।

পর দিন যথাসময়ে লাল সাহেবের গাড়ী এল। তৈরী হয়ে বেরোলাম।

লাল সাহেবের বাড়ীতে সেই আমার প্রথম পদার্পণ। ঘরে ঢুকেই রীতিমত ভড়কে গেলাম। দরজার পাশেই দেওয়ালের সঙ্গে ষ্টীলের হুকে চেনে বাঁধা মস্ত একটা বাঘ—একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। লাফ দিয়ে পিছনে সরে আসব, লাল সাহেব

বাঁ হাতখানা চেপে ধরলেন। বললেন, সরি, এ্যাটাক করবে না, আমার সঙ্গে আসুন। সে কয়েক মুহূর্তের স্মৃতি কখনও ভুল হবে না। আমাকে এক রকম হাত ধরে টেনে নিয়েই বসালেন লাল সাহেব।

'লাইভ নয়, সব ট্যাক্সিডার্মি করা। মাইসোর থেকে করানো। বড় সুন্দর করেছে, না?'

ট্যাক্সিডার্মি! খাঁরেল নয় তবে? হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কত জানোয়ার এমনি চতুর্দ্দিকে সাজানো।

কাছে গিয়ে দেখতে তথাপি সাহস হয় না, সেগুলো এমনি জীবন্তের মত। বিরাট হল-ঘরে একটা চিড়িয়াখানা বিশেষ। বাঘ একটা নয়, এমনি পাঁচ-ছটা। কোনটা হাঁ করে গাঁক্ করে তেড়ে আসছে, কোনটা জিভ বার করে দাঁড়িয়ে, কোনটা 'কীল'-এর দিকে তাকিয়ে আছে লোভাতুর অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে। লাল সাহেব সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। হলের মাঝখানটায় শ্বেত পাথরের উঁচু গোল টেবিলের ওপর বসানো আছে একটা এগার ফুট ম্যান-ইটার। মানুষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার আগের পোজটি, বললেন, একজ্যাক্ট এই। যেমন করে ইঁদুর ধরবার আগে বিড়াল তার সামনের পা দুটো বিছিয়ে পিছনের পায়ের হাঁটু ভেঙে বসে, ঠিক তাই। গোঁফের লোমগুলো সব খাড়া, ভিজে জিভটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে রক্তলোভের আতিশয্যে। চোখ দুটো আগুনের গোলা। উত্তেজনা, দার্ঢ্য আর সঙ্কল্পের প্রতিবিম্ব চকচক করছে।

লাল সাহেবের স্পর্শ পেলাম আমার হাতে। 'দেখুন কি সুন্দর! কি রোমান্টিক!'

মিথ্যা নয়। কিন্তু লাল সাহেব নিত্য দেখছেন, তবু যেন তাঁর বিস্ময়ের শেষ নেই। ওর ভেতরেই ডুবে আছেন তিনি।

অনেক দেখলাম। অনেক রকম শিকারকে জিইয়ে রেখেছেন লাল সাহেব। দেওয়ালে দেওয়ালে ভেলভেটের চাদরের গায়ে বসানো রয়েছে অনেকগুলি শিঙশুদ্ধ মাথা। এক জায়গায় ঝুলছে বিরাট দু'জোড়া হাতীর দাঁত।

বললেন, ওয়েস্ট ম্যাড। এক দিনে দুটো হাতী শিকার করেছিলাম। ওন্‌লি টু শটস টু কিল টু। একটু মৃদু হাসলেন লাল সাহেব। একটুখানি সরল আত্মপ্রসাদের হাসি। সংক্ষেপে এবং অনাড়ম্বরে জানিয়ে দিলেন নিজের কীর্ত্তিমত্তার কাহিনী।

বাইসনের শিঙ জোড়া দেখছেন? বিরাট এক জোড়া শিঙের কাছে দাঁড়ালেন লাল সাহেব। 'বিগেষ্ট এভার কিল্ড।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কি মজবুত আর কি ভয়ঙ্কর! কপালের লোমগুলো পর্য্যন্ত রাখা হয়েছে।

একটা লম্বা টেবিলের ওপর একটা বিরাট কুমীর। খুদে চোখ দুটোর চেহারা দেখলে মনে হয় তখনও জ্যান্ত।

'এটার জন্তে দুটো হিট লেগেছিল। একটা কপালে আর একটা পিঠে।' দুটো ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে দিলেন লাল সাহেব।

দেওয়ালের বাকী জায়গা সব বাঘের চামড়ায় ঢাকা।

বললেন, 'বাঘটাই আমার সব চেয়ে প্রিয়।'

বলতে বলতে গোল টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'দেখুন, কি সুন্দর!'

হলদের ওপরে কালোর ছাপ। বললেন, 'দেখুন দেখি কালো নক্সাগুলো কত এনচ্যান্টিং! যেন এক-একটা পাখীর কালো ডানা। ধারগুলোতে দেখুন কি মিহি সেড! ওয়াণ্ডারফুল!'

ভয়ঙ্করের মধ্যেও যে সৌন্দর্য্য খুঁজে পেয়েছেন, চোখে-মুখে আবার সেই সাফল্যের ঔজ্জ্বল্য।

'দাঁড়ান, এর বন্দুকটা আপনাকে দেখাই—যেটা দিয়ে একে মারা হয়েছে।'

আমি একটা চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলাম লাল সাহেবের পৌরুষের কথা। কানে শুনেছিলাম অনেক, কিন্তু চোখে এতটা দেখি নি।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলেন লাল সাহেব। হাতে একটা বন্দুক। কিন্তু যে উদ্দীপনা নিয়ে ওটা আনতে গেলেন, তার যেন একান্ত অভাব এখন। বন্দুকটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে নেহাত যেন কথা রক্ষা করলেন। কিছু বুঝতে পারলাম না, ভাবান্তরের কারণ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করাও সঙ্গত মনে করলাম না।

ডিনার শেষ হ'ল। মুখে একটা পান ফেলে সিগারেট ধরিয়েছি। লাল সাহেব একখানা এলবাম বার করে সামনে ধরলেন। দেখুন, সব নেই, তবে কিছু পাবেন।

প্রায় পাঁচ শো ফটোর মোটা এলবাম বই। বলা বাহুল্য, সবগুলিই তাঁর শিকারের ছবি। অধিকাংশই ব্যাগ-করা শিকারের সঙ্গে লালসাহেব দাঁড়িয়ে। কোন-কোনটা টিপ করবার পোজের ছবি। একখানায় টিপের ছবি দেখিয়ে বললেন, এটা একটা বাজি জেতার ছবি। রায়গড়ের রাজাসাহেব হতেন তাঁর মামা। তাঁর সঙ্গে একবার বাজি হয়েছিল। মামা-ভাগ্নে বন্দুক নিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন, পথে বাজি রেখে উড়ন্ত বক মেরে লালসাহেব জিতলেন। বাজির গরমে দ্বিতীয় বাজি রাখা হ'ল। বাড়ী ফিরে এলেন। পয়সার মাপের একটা টিনের চাকতি সুতোয় বেঁধে টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল। লালসাহেব চার শো গজ দূর থেকে গুলি মেরে সেটাকে উড়িয়ে দিলেন। মামা হার মেনে ভাগ্নেকে হাসি মুখে হাতের বন্দুকখানা উপহার দিলেন।

ফটোগুলো দেখে চমৎকৃত হলাম। বললেন, বাকী আছে সিংহ-শিকার। আফ্রিকায় যাওয়া এখনও হয়ে ওঠে নি। সখ ছিল, কিন্তু আর হবে কিনা—

কথার আর জের টানলেন না, থেমে গেলেন। কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। একটা বিষাদের পাতলা পর্দা দেখলাম যেন মুখে। আনন্দ-রাজ্যের মেলা ফেলে কোন্ বেদনা-রাজ্যে সরে গেলেন যেন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য।

বয়স হয়েছে আন্দাজ চল্লিশ। ভারী অথচ আঁটো চেহারার

সামর্থ্যের জলন্ত চিহ্ন। ফিটফিটে গৌর বর্ণে রাজবংশের আভিজাত্য। কপালের ত্রিবলী-রেখায় চরিত্রের সংযম আর কর্মের সঙ্কল্প।

বিপত্নীক জীবনে বন্দুককেই করেছিলেন একমাত্র সহচরী। শিকারের নেশায় মশগুল হয়ে ছিলেন লালসাহেব। চোখে দেখতেন বাঘের মগজ আর বন্দুকের টিপ।

সেই চোখে দেখলাম বেদনার একটা থমথমে ভাব। এক টুকরা ক্লেশের অন্ধকার।

লাল সাহেবের কবি-মন কোথায় চলে গিয়েছে জানি না, কিন্তু অবস্থাটা মোটেই উপভোগ্য নয়। কথা বলতে হ'ল। বললাম, 'আফ্রিকায় না গেলেও আপনার কৃতিত্ব কম নয়।'

মনের ওপর অদ্ভুত আধিপত্য দেখলাম তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন তাঁর কল্পবিহার থেকে। একদম স্বাভাবিক হয়ে।

একটু হাসলেন। বললেন, বিশেষ কিছুই করি নি। তবে সংখ্যায় আছে। এ পর্য্যন্ত যা শিকার হয়েছে তার নমুনাগুলো থাকলেও একটা বেশ বড় গুদামের দরকার হ'ত। লাইফ রিস্ক করেছি অনেকবার, কিন্তু পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে বিপদ এসে গা ছুঁতে পারে নি।

মনে একটা লোভ ছিল, সেটা প্রকাশ করে ফেললাম। বললাম, আপনার একটা শিকার-সামগ্রীর প্রতি আমার লোভ আছে—অবশ্য আপনার ষ্টকে যদি থাকে।

'দয়া করে বলুন।' স্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। একটা কিছু প্রেজেন্ট করতে পারবেন ভেবে বেশ খুশী হয়েছেন।

বললাম, একখানা 'হরিণের চামড়া। বাবাকে দিতাম। তিনি একটু সাধন-ভজন করেন কিনা।'

একটু যেন লজ্জা পেলেন। মুখখানা একটু ছোট হয়ে গেল। বললেন, খুবই খুসী হতাম, 'কিন্তু দুঃখের বিষয় হরিণের চামড়া সব শেষ। ও জিনিষটা আবার হাতে থাকে না, ওর চাহিদা অনেক।'

'তবে নেক্সট ব্যাগটা আমার।'

বললেন, 'দু'এক দিনেই পেয়ে যেতেন। কিন্তু—সে একটা ইনসিডেন্ট, বোসবাবু। জীবনের একটা ব্লু।'

জিজ্ঞাসায় দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম।

'একটা ব্যাড ইনসিডেন্ট করে ফেলেছিলাম একদিন। বছর তিন-চার হ'ল। সেই থেকে আর শিকার করিনি। যদি কোন দিন বন্দুক ধরি, আপনাকে নিশ্চয়ই দেব। একটা কেন, যে ক'টা চান আপনি।'

'কিন্তু এত বড় সখটা আপনার ছেড়ে দিলেন! এত বড় একটা অসামান্ত কেরিয়ার!'

'বলি তবে, শুনুন। আর দু'এক জনকে মাত্র বলেছি, বেশী কেউ জানেন না।' মুহূর্ত্ত সময় মৌন থেকে তাঁর দুর্ঘটনার কাহিনী আরম্ভ করলেন লাল সাহেব: 'শিকারে গিয়েছি, এই ষ্টেটেরই মধ্যে—বামুণ্ডা পীড়ের ফরেষ্টে।'

বললাম, 'নাম শুনেছি, বামুণ্ডা পীড় ফরেষ্ট—মস্ত বড় বন।'

'এখানকার মধ্যে খুব রীচ ফরেষ্ট। বনের উত্তর-পশ্চিম বেড়ে রয়েছে বিশকোশী বেল্ট। হাইয়েষ্ট পীক্ সাড়ে ছ'হাজার ফুট উঁচু। তারই মাথা থেকে নেমে এসেছে বেণীর মত পাঁচটি জলের ধারা, নীচে নেমে এক সঙ্গে মিশে নাম নিয়েছে পঞ্চবেণী। যে জায়গায় মিশেছে তার নাম হ'ল ভৈরব তট, লোকে বলে ভৈরী গাঁ। আমাদের পাহাড়ে জায়গায় গাঁ মানে ত জানেন, দু'চারটে টুঙ্গী হলেই হ'ল। এই ভৈরী গাঁ আর তার আশপাশের নদীর ধারে পাবেন অজস্র সম্বর, বাঘ আর বরাহ।

'বলছি যেখানকার কথা, সে ঐ ভৈরী গাঁ। লোকমানবহীন অরণ্যলোকে কয়েকটি মানুষের এক টুকরো লোকালয়। নদী, পাহাড় আর ঘন বন। সত্যিই সে সমন্বয়ের সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। অনেক বনে-জঙ্গলে ঘুরেছি, কিন্তু এমনটি সচরাচর চোখে পড়ে নি। ভৈরব তট শিব-পার্ব্বতীর লীলায় যোগ্য ভূমিই বটে।

ভৈরী গাঁয়ের যে ক'ঘর বাসিন্দা—সব আদিবাসী। তারই মধ্যে একটি ছোট্ট ঘর, ঘরে এক জোড়া প্রাণী। বাষট্টি বছরের বুড়ো বাপ আর বাইশ বছরের কুমারী মেয়ে। তিরিং আর রাণী।

এদেরই বাড়ীর কাছে গাড়ী রেখে পায়ে হেঁটে গিয়েছি পঞ্চবেণীর ধারে। গাছের আড়ালে বসে অপেক্ষায় আছি, জল খেতে একটু পরেই হয়ত আসবে সম্বর আর বরাহের পাল। একটু অপেক্ষা করতেই জলের শব্দ এল কানে। বনের ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি চালালাম, দেখা গেল গোটা কয়েক বরাহ জল খাচ্ছে। টিপ করলাম তার একটাকে। জল থেকে পালিয়ে যাবার আগেই তাকে ঝরিয়ে দিলাম শুকনো পাতার মত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লাল সাহেব। 'কিন্তু কি মারলাম জানেন? বরাহ নয়, মানুষ। জল খেতে এসেছিল নদীতে, বুনো শুয়োর দেখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমি তাকে আর পালাতে দিলাম না। আই কিল্ড তিরিং, আঃ, দি ইনোসেন্ট ওল্ড ফেলো!

'আর এই যে সেই আগ্নেয়াস্ত্র—ছাট কার্স্‌ড গান্।' টেবিলের ওপরের সেই বন্দুকটা দেখিয়ে দিলেন আঙুল দিয়ে।

অনুতাপে আর গ্লানিতে মুখখানা বড় শুকনো দেখাল লালসাহেবের।

এতক্ষণে বিষাদের সূত্র কিছুটা বুঝলাম।

একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন তিনি। বললেন, 'হদিশ বের করতে দেরী হল না, মরা বাপকে নিয়ে রাণীর কাছে এসে দাঁড়ালাম। কি বলব, কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু ক্ষমা চাইলাম। অপরিসীম অপরাধ; বললাম, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

কোন কথা বলল না রাণী, জানতে পেরেছে রাজা-ঘরের লোক—শুধু অঝোরে চোখের জল ফেলে যেতে লাগল মুখে কাপড় গুঁজে। গাঁয়ের আর পাঁচ ঘরের লোক এসে দাঁড়াল। কারও মুখে

অভিযোগ নেই, এ যে রাজঘরের ছেলে—লাল সাহেব! সবাই বললে, শিকার ভেবে মেরেছেন, হুজুরের দোষ নেই। হাতের বন্দুক তখনও তিনটে শট ভর্ত্তি।

গ্রামবাসীদের বিদেয় করে দিলাম তিরিংয়ের সৎকারের জন্যে।

রাণীর মুখে তখনও ভাষা নেই। সংসারের একমাত্র খুঁটোটি অপসারিত করেছি আমি। আমার সঙ্গে কি কথাই বা তার থাকতে পারে—অভিযোগ যখন অবৈধ!

উঠোনে পড়েছিল একটা বোম্বাই-দড়ির খাটিয়া, বোধ হয় আমার জন্যেই কেউ বের করে দিয়ে থাকবে। বসে পড়লাম সেইটায়। বললাম, রাণী, এ পাপের ক্ষমা নেই, আমি জানি। আমাকে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দাও। তোমার আর কেউ নেই, তোমার ভার আমার।

বুঝতে পারলাম, রাণী এতটা আশা করেনি। তার অশ্রুস্রাবী চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কষ্টের মধ্যেও অতি সুন্দর দেখাল রাণীকে। হায় পিতৃহারা রাণী! হাত দুটো চেপে ধরলাম তাঁর। বললাম, যত দিন তোমার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে না পারছি, ততদিন আমার শিকার বন্ধ।

সেই থেকে আর ঘোড়া টিপি নি, বোসবাবু।'

বড় দুঃখের কাহিনী আর আন্তরিকভাবেই লাল সাহেব এর সঙ্গে জড়িত। তাই কোন হাল্কা মন্তব্যে গুরুত্বের মেঘকে পাশে ঠেলা যায় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'রাণী এখন কোথায় আছে?'

'তার কুটিরেই, ভৈরী গাঁয়ে। জানেন তো আমাদের রাজ-পরিবারের আদব-কায়দা,' একটু থেমে নিজের থেকেই বলতে লাগলেন লাল সাহেব, 'আমরা যে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারি নে। রাজ্য না থাকলেও রাজরক্তের বিধি মেনে চলতে হয়। এর অন্যথা করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। একটা গোঁয়ার্ত্তুমিও বলতে পারেন।'

আর কোন প্রশ্ন করি নি, চুপ করে গিয়ে সেদিনের আলাপ শেষ করেছি।

তার পর অনেক যাতায়াত করেছি লাল সাহেবের বাড়ীতে। লাল সাহেবও অনেক এসেছেন আমাদের বাসায়। কিন্তু রাণী-প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করি নি। হরিণের চামড়া না পাওয়ার নৈরাশ্যের জন্য মন খারাপ করি নি, দুঃখ হয়েছে তাঁর শিকার প্রমাদের জন্য।

সেদিন বদলি হয়ে যাচ্ছি। লাল সাহেবের কাছ থেকে আগেই বিদায় নেওয়া হয়েছে। তাঁর সাহচর্য্য জীবনের একটা বিশিষ্ট স্মৃতি-সংগ্রহ হয়ে রয়েছে।

সপরিবার ট্রেনে উঠে বসেছি। দেশীয় রাজ্যের ন্যারো গেজের গাড়ী। এখান থেকেই লাইনের আরম্ভ, মিশেছে গিয়ে কোম্পানীর বড় রেলের সঙ্গে।

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। গার্ড সাহেব বাঁশী বাজিয়ে পাখা দেখিয়েছেন। এঞ্জিনের চাকা ঘুরতেই লাল নিশান দেখিয়ে গাড়ী থামিয়ে দিলেন আবার। দেখি, লাল কাঁকর-বিছান শড়ক দিয়ে একখানা মোটর-কার ছুটে আসছে তীর বেগে। চিনতে পারলাম লাল সাহেবের সেই বুইকখানা। মোটরে থেকে ইঙ্গিত দিয়ে থাকবেন ট্রেনটা একটু ধরে দেবার জন্যে।

ষ্টেশনের ফটকের পাশে ঘ্যাচ করে গাড়ী থামিয়ে লাফিয়ে পড়লেন লাল সাহেব। সঙ্গে নামলেন একটি মহিলা। লাল সাহেবের হাতে কাগজে মোড়া একটা বড় প্যাকেট। ভাবলাম, কোথাও যাবেন বোধ হয়। আমি জানালা দিয়ে হাত বার করে আহ্বান জানালাম লাল সাহেবকে, 'এই যে আসুন!'

'হ্যালো, আপনার জন্যই।' তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন আমার কামরার কাছে। 'এই নিন।'

প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। 'হরিণের চামড়া, ট্যান করিয়ে নেবেন। দু'খানা আছে, খুব ভাল জিনিষ।'

চকিতে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। লাল সাহেব যে শিকার করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যত দিন না—

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন লাল সাহেব। একটু নির্ম্মল ছাকা হাসি। বললেন, 'এখন শিকার করছি যে।' সঙ্গের মহিলাটির দিকে আমাদের দৃষ্টি টানলেন, 'এই যে, হিয়ার ইজ রাণী।'

এই সেই রাণী! লাল সাহেবের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্তা তিরিং-কন্যা! কালো কুঞ্চিত কেশের মাঝখানে টকটক করছে সিঁথির সিন্দুর। আমার স্ত্রী জানালার কাছে এগিয়ে এসে নির্ব্বাক হয়ে রাণীকে দেখছে। আর দেখছে লাল সাহেবকেও। লাল সাহেবের রাজ্য নেই, কিন্তু রাণীর চোখে উনি চিরকালের রাজা।

'আর লেট করাব না।' লাল সাহেব হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে গার্ড সাহেবকে ট্রেন ছাড়বার ইঙ্গিত করলেন। 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ।'

আবার তীব্র স্বরে গার্ড সাহেবের বাঁশী বেজে উঠল। ভোঁ বাজিয়ে ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করে দিল।

হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার জানালাম সাহেবকে। জানালাম রাণীকেও।

ট্রেনের ধীরে ধীরে গতি বাড়তে লাগল। আমরা জানালা-পথে মুখ বার করে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। মনে পড়ল লাল সাহেবের সেই চ্যালেঞ্জের কথা। লাল সাহেব হয় ত গোঁয়ার্ত্তুমি করেন নি, হয় ত চ্যালেঞ্জে জিতেছেন।

তখনও তাঁরা প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে। সেই অরণ্যকন্যা রাণী আর বিখ্যাত শিকারী লাল নরেন্দ্রনারায়ণ দেব।

নূতন পরিবেশে ইটালী

দ্বিতীয় মহাসমরকালে ইটালীর উপর দিয়া যে ধ্বংসলীলা চলিয়াছে, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন কর্ম্মপ্রয়াসের ভিতর দিয়া তাহা কতকটা কাটাইয়া উঠিতে সে আজ সক্ষম হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইটালীর নব রূপায়ণে নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে তথাকার অধিবাসীরা উদ্যোগী হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে তাহারা মিলনাকাঙ্ক্ষী। ইহার উপায়ও তাহারা অবলম্বন করিতেছে।

মেলা বা প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাহারা এই মিলন কতকটা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিলান শহরের প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করা যায়। এই প্রদর্শনীতে চুয়াল্লিশটি দেশ বা রাষ্ট্র যোগদান করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পঁয়ত্রিশটি সরকারী ভাবেই আসিয়া ইহাতে যোগ দিয়াছে। প্রদর্শনীতে যাঁহারা দ্রষ্টব্য বস্তু পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা হইবে ১২,৭৩৮। ইঁহাদের মধ্যে ৩,৭৫৬ জন বিদেশী। আন্তর্জাতিক মেলামেশার উপায় হিসাবে এই ধরনের মেলা বা প্রদর্শনীর উপকারিতা ইটালী বর্ত্তমানে বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছে।

ইটালী পরিদর্শন বা পর্য্যটনে যে সব বিদেশী আসেন, নূতন কায়দায় নির্ম্মিত সেতুগুলি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই। বিধ্বস্ত ইটালীর রাস্তাঘাট অনেকটা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই আপনাকে বহু সেতু পার হইতে হইবে। সেতুগুলি কোন কোনটি খুবই চওড়া; কম চওড়া সেতুও অনেক রহিয়াছে। ১৯৪৫-৫৫ এই দশ বৎসরের মধ্যে ইটালীতে বহু ভাঙা সেতু পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ সেতুর সংখ্যা ৭,২০৬। নূতন করিয়াও অনেক তৈরী করা হইয়াছে। এরূপ সেতুর সংখ্যা ৪০২টি। এগুলির মধ্যে ১৭৯টি অন্ততঃ দশ মিটার করিয়া প্রশস্ত।

নানা বিষয়েই ইটালী আজ উন্নতি-পথযাত্রী। রেজিও ক্যালাব্রিয়া এবং মেসিনার মধ্যে রহিয়াছে মেসিনা প্রণালী। উভয় অঞ্চলের মধ্যে যাত্রী ও মালপত্র পারাপারের কাজ অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। দুই দিকেই সমসময়ে ট্রেন যাতায়াত করে। কিন্তু সময়মত এপার হইতে ওপারে যাইতে না পারিলে বা মালপত্র ঠিকমত না পৌঁছাইলে লোকের বড়ই অসুবিধা হয়। মেসিনা প্রণালীতে খেয়া নৌকা পূর্ব্বে যে ছিল না তাহা নয়। কিন্তু বর্ত্তমানের সঙ্গে অল্পসংখ্যক খেয়া নৌকা ঠিক তাল রাখিতে পারে নাই। এখন ফেরিবোট বা খেয়া নৌকার সংখ্যা হইয়াছে পাঁচখানি। এইরূপ ছোট ছোট ব্যাপার হইতেই ইটালীর প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়।

সমগ্র ইউরোপে শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইটালী ছিল একটি প্রধান আকর্ষণ। তাহার স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, শিল্পকলা কত বিদেশীকেই না তাহার দিকে টানিয়া লইয়াছে। দ্বিতীয় মহাসমরের পর ইটালীতে বিদেশী পর্য্যটক বা পরিদর্শকের সংখ্যাও অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৫৫ সনের পরিসংখ্যানই ধরুন না। এই এক বৎসরে সেখানে গিয়াছেন ১,০৭,৮৮,০০০ বিদেশী-বিদেশিনী। এখানে যাতায়াতের কোন বিশেষ সময় নাই। সম্বৎসর ধরিয়া তাঁহারা ইটালীতে আসেন এবং নয়নমন তৃপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন।

খেলাধূলার জন্যও ইটালীর খ্যাতি কম নয়। শীতকালে ওখানকার বহু অঞ্চল বরফে একেবারে ঢাকিয়া যায়। বরফ সরাইয়া খেলার মাঠ পরিষ্কার করা দরকার। আগে কিছু কিছু চেষ্টা হইত, কিন্তু তাহা তেমন ফলপ্রদ হইত না। বর্ত্তমানে বরফ সরাইবার নিমিত্ত একপ্রকার কলের লাঙ্গলের খুব চলন হইয়াছে। এই কলের লাঙ্গল তৈরীর একটি শিল্পও ধীরে ধীরে সেখানে গড়িয়া উঠিতেছে। বরফে-ঢাকা খেলার মাঠ পরিষ্কার করা, খেলার মাঠে যাইবার পথ হইতে বরফ সরাইয়া ফেলা—এই সব কাজে এ ধরনের কলের লাঙ্গল খুবই প্রযুক্ত হইতেছে।

বিমান-শিল্পেও ইটালী বেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সেখানে মনোপ্লেনের প্রয়োগ সাধারণের মধ্যে চালু হইতেছে। এ কারণ বিমান নির্ম্মাণের জন্য কারখানার কাজও বাড়িয়া গিয়াছে। এরোপ্লেন চালনা শিক্ষার যে-সব স্কুল আছে সে সব স্কুলেই শিক্ষার্থীদের এই বিমান ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে। এই বিমান ৫৫০ এম-পি-এইচ'এ দশ হাজার ফুট উচ্চে উঠিতে পারে।
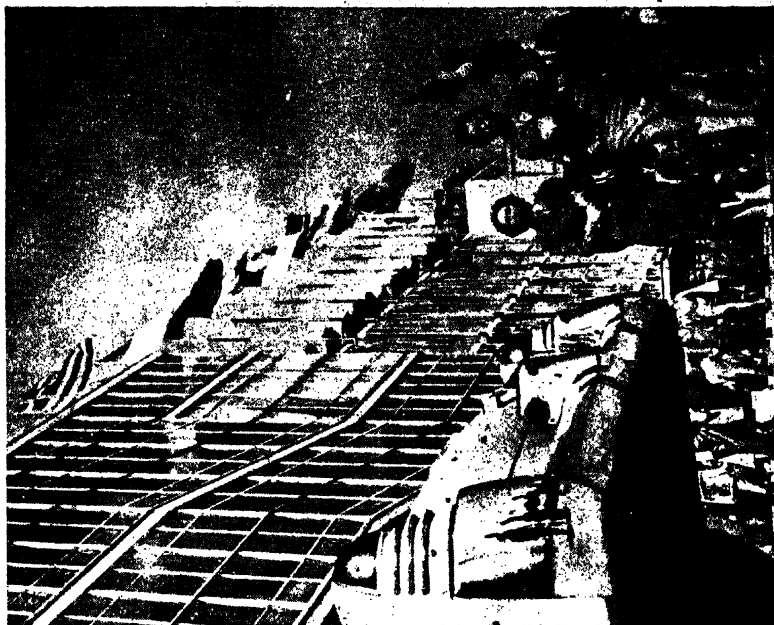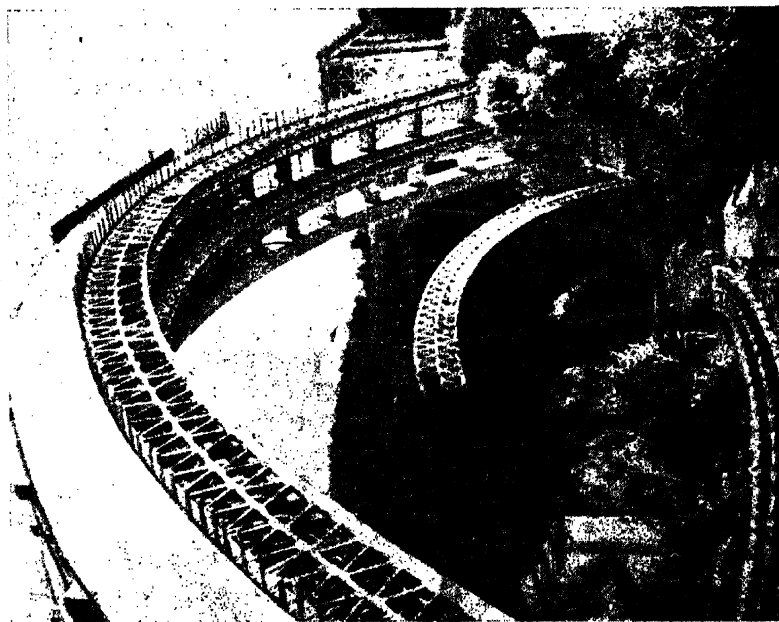
য. চ. ব.

জেনোয়া-স্যাভয় পথিমধ্যে রিও আরং.জ.কার উপরে নবনির্ম্মিত বিরাট সেতু

মিলান প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

রোমে একজন 'টু-রিষ্ট' মহিলা

ইটালীর নব-নির্ম্মিত 'মনোপ্লেন'

বরফ সরাইবার নব-নির্মিত যন্ত্র

মেসিনা প্রণালীতে নূতন 'ফেরী বোট'
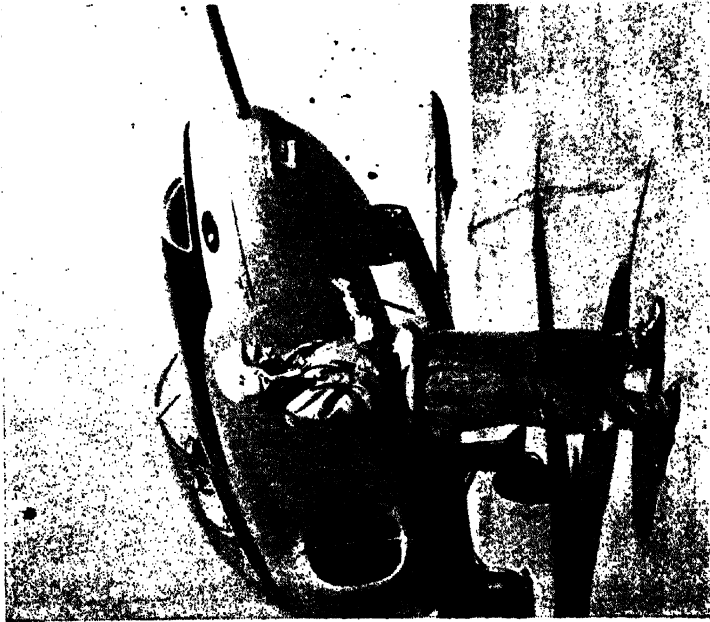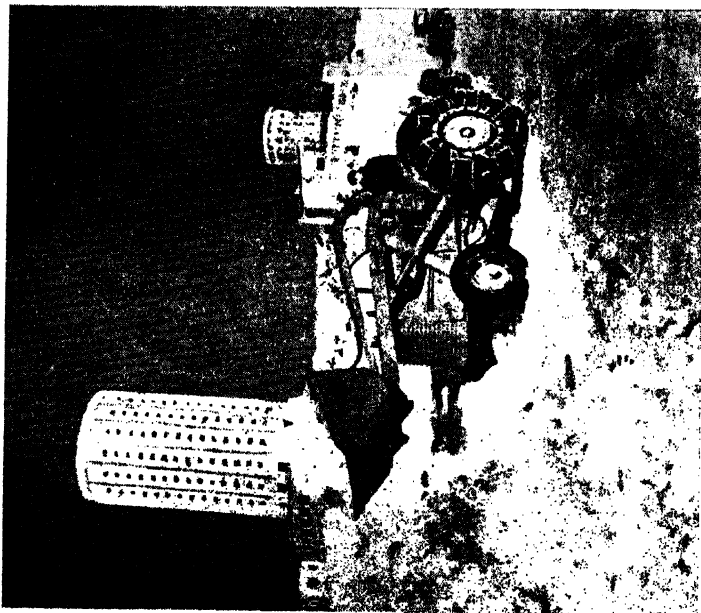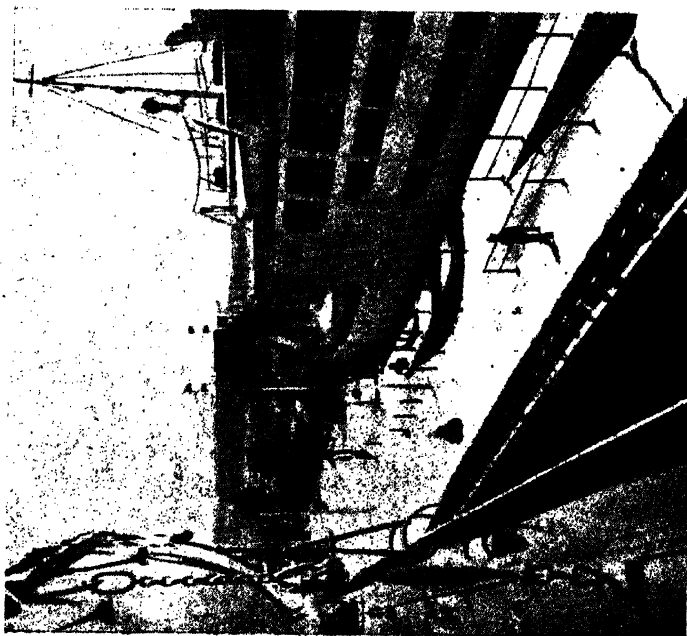
প্রাকবিদ্যালয় অন্ধ শিশু

ডাঃ এডওয়ার্ড জোনাথান
প্রিনসিপ্যাল, পালামকোটা অন্ধ-বিদ্যালয়

ভারতে অন্ধের সংখ্যা কত এ পর্যন্ত তার সঠিক গণনা না হলেও বিশ লক্ষ বলে ধরা হয়। তার মধ্যে ২৫,০০০ হাজার থেকে ৫০,০০০ হাজার হচ্ছে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশু। কিন্তু অন্ধদের বিদ্যালয়ে আসবার আগে বাড়ীতে তারা কেমন অবস্থার মধ্যে কাটায়? ভারতে আছে মাত্র ৫০টি অন্ধ বিদ্যালয়। সেগুলিতে শিক্ষা পায় পাঁচ বছরের কম বয়সের মাত্র ২,০০০ শিশু।

কাজেই ভারতে প্রাকবিদ্যালয় অন্ধ শিশুগণের জন্য যে কিছুই করা হয় নি, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। অন্ধ শিশুগণের মাতাপিতাকে পরামর্শ ও শিক্ষা দেবার মত কোন গৃহশিক্ষক বা শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজকর্মী নেই। ভারতের কোথাও অন্ধ শিশুগণের জন্য একটিও উপযুক্ত শিশুনিকেতন বা পরিচর্যাশ্রম দেখা যায় না। তবে দক্ষিণ ভারতে পালামকোটায় তার একটির সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। এই শিশু-নিকেতনে এখন আছে পাঁচ বছরের কম বয়সের মাত্র চারটি শিশু।

দরিদ্রের ঘরেই অন্ধ শিশুর সংখ্যা বেশী। অন্ধত্বের সাধারণ কারণ হচ্ছে, ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে কোন রকমের ক্ষতি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যাধি, ভিটামিনের স্বল্পতা ও উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্যের অভাব। এই শেষোক্ত কারণটি কিন্তু তুচ্ছ নয়। তার পর চক্ষু রোগাক্রান্ত শিশুগণকে ভুল ঔষধ প্রয়োগের ফলেও তাদের অন্ধত্ব ঘটে।

পরিবারে অন্ধ শিশুর জন্ম হলে বা শিশু দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে, মাতাপিতা অসহায় বোধ করেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানে হন অপারক। জন্মান্ধ শিশু তার এই শারীরিক ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন নয়। তারা নিজেদের সাধারণ শিশুর মতই অনুভব করে এবং তাদেরই মত ইন্দ্রিয় গ্রামপরিচালনা করে থাকে। কাজেই তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিতে হবে মাতাপিতাকেই। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি শিশুটির ভবিষ্যৎ মানসিক অবস্থা মাতাপিতার মানসিক অবস্থার উপরই নির্ভরশীল। অন্ধ শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে তখন বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে। সেজন্য তার মানসিক অবস্থা যথাযথ ও অভ্যাসগুলি রীতি অনুসারী হওয়া উচিত। প্রায়শঃই দেখা যায়, অন্ধ ব্যক্তির জীবনের দুঃখময় ঘটনা কেবল তার অন্ধত্ব নয়, তার প্রতি পরিবারের ও সমাজের সকলের অপ্রীতিকর আচরণও। মাতাপিতার কাছে প্রথমে যাবেন চিকিৎসক-সমাজকর্মী। সমাজকর্মী ধৈর্য ও কৌশলের সঙ্গে মাতাপিতাকে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করাবেন যে, তাঁদের সন্তানটি অন্ধ। শিশুটি যাতে ভারতের সাধারণ ও প্রয়োজনীয় নাগরিক হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাকে তাঁদের যথাসাধ্য শিক্ষাদান বিষয়ে উৎসাহিতও করতে হবে। যদি তাঁরা তাতে তিক্ততা বোধ করেন এবং শিশুটির অন্ধত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হন, তাহলে শিশুটি হয়ে উঠবে অসাধারণ। তাদের অন্তর হবে নৈরাশ্যে পূর্ণ।

অন্ধ শিশু প্রথমতই শিশু এবং দ্বিতীয়ত সে অন্ধ। দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন শিশুর বুনিয়াদী প্রয়োজনগুলি যা তারও তাই।

১৯৫২ সনে আগষ্ট মাসে হল্যাণ্ডের বুস্যুম সম্মেলনে ইউ-এস-এর অন্তর্গত ওহিওর কুমারী টোটমান তাঁর "প্রাক-বিদ্যালয় অন্ধশিশু"র সামাজিক প্রয়োজন ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে তিনি বলেছেন শিশুদের বুনিয়াদী প্রয়োজনগুলি নিম্নরূপ :

১। ভালবাসা ও নিরাপত্তা।

২। তার নিজ মূল্যসম্বন্ধে বোধ (নিজ সত্তার অধিকার)।

৩। একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই জ্ঞান (প্রয়োজনীয়তা)

৪। কোন ঘটনা বা অবস্থার সম্মুখীন হবার মত পর্যাপ্ততা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে বোধ।

৫। অর্জন বা অবদান সম্বন্ধে অনুভূতি।

৬। ক্রমবর্ধমান আত্ম-প্রসার।

অন্ধ শিশুও সক্রিয় এবং নিজের কাজ নিজেই করতে চায়। তার প্রয়োজন মাতাপিতার ভালবাসা কাজেই গুরুতর কোন কারণ ব্যতীত তাকে নিজের বাসগৃহ থেকে বঞ্চিত করা কল্যাণের নয়। যেখানে সম্ভব প্রাকবিদ্যালয় বছরগুলিতে শিশু নিজ বাড়ীতেই থাকবে। এই সময়ে মাতাপিতার অভিজ্ঞ কর্মীর নির্দেশে চলা দরকার।

অন্ধ শিশুকে তার নাগালের মধ্যেই প্রধান প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি পেতে হবে। প্রায়শঃই সে কণ্ঠস্বর চিনতে শেখে, কিন্তু সেই সঙ্গে তা অস্পষ্টও হয়। কারণ শব্দটা যেখান থেকে আসে সেই উৎপত্তিস্থলটি সে দেখতে পায় না। শিশুটি যখন হাঁটতে আরম্ভ করে তখন সে কেবলমাত্র শব্দের সাহায্যেই নিজেকে স্থাপন করে থাকে।

তাকে দিতে হবে এমন সব খেলার সামগ্রী যেগুলির সাহায্যে তার মধ্যে জেগে উঠবে সাংগঠনিক, মানসিক ও দৈহিক সক্রিয়তা। তার প্রয়োজন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা। সে নিরাপদ স্থানে চলে-ফিরে বেড়াবে এবং সেই সঙ্গে সকল রকমের ভূমির উপর হাঁটতে শিখবে। তাকে বড় বল, ভলি বল, দেওয়া যেতে পারে যা সে এদিক-ওদিক ছুড়বে এবং নিজেই আবার সংগ্রহ করে আনবার চেষ্টা করবে। তাকে পাতা, ফুল ও গাছ অনুভব করতে এবং উঁচু জায়গায় চড়তে উৎসাহ দিতে হবে। অতিরিক্ত বেতার সঙ্গীত সে যেন না শোনে। তাকে শেখাতে হবে সহজ ভারতীয় ছড়া।

ইউ-এস-এতে অন্ধ শিশুদের জন্য আবাসিক শিশু-নিকেতন আছে খুবই অল্প। ইংলণ্ডে অনেকগুলি শিশু-বিদ্যালয় আছে। সেগুলি সমস্ত অন্ধ ও ছোট ছোট শিশুদের খবরদারী করে থাকে। আর ডেনমার্কে অন্ধ শিশুরা বাস করে নিজ গৃহে। শিক্ষিত সমাজকর্মীরা তাদের মাতাপিতাকে কোন পথে চলতে হবে সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ভারত বিশাল দেশ। এখানে এক বা একাধিক সমাজ-কর্মীদের পক্ষে বিশেষ একটি অঞ্চলে সকল অন্ধ শিশুর মাতাপিতার কাছে যাওয়া সম্ভব কিনা তা চিন্তার বিষয়। এই সব বিকলাঙ্গ শিশুর মাতাপিতা দরিদ্র ও নিরক্ষর। তাঁরা অভিজ্ঞ সমাজকর্মীদের পরামর্শ ও পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ না করতেও পারেন। কর্মীদের কথা হৃদয়ঙ্গম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। আর, প্রায়শঃই তাঁরা অন্ধ শিশুদের জন্য অর্থ ব্যয় বা সময়ক্ষেপে অসমর্থ। উপেক্ষিত অন্ধ শিশুর চরিত্রে দেখা দেয় "অন্ধত্ব" বা মুদ্রাদোষ যা পরবর্তী জীবনে উচ্ছেদ করা অতি কঠিন।

আমাদের দেশের অনেক গৃহস্থের অবস্থা বিবেচনা করে অন্ধ শিশুদের জন্য আবাসিক শিশুবিদ্যালয় ও আশ্রয় নির্মাণই সমীচীন। ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালে প্রাকৃবিদ্যালয় অন্ধ শিশুদের জন্য কতকগুলি শিশু-বিদ্যালয় স্থাপনের আশা করছেন। সেন্ট্রাল সোস্যাল ওয়েল-ফেয়ার বোর্ড (কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ) ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও উৎসাহিত করবেন যদি তাঁরা অন্ধ শিশুদের জন্য শিশুবিদ্যালয় খোলেন।

অতএব প্রাকৃবিদ্যালয় অন্ধ শিশুর পক্ষে তার নিজ বাসগৃহই সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান। যেখানে গৃহের অবস্থা যথোপযুক্ত নয় সেখানে অন্ধ শিশুকে শিশুনিকেতনে বা অন্ধ শিশুবিদ্যালয়ে গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রাকৃবিদ্যালয় অন্ধ শিশুদের প্রতি আরও বেশী করে মনোযোগ দেওয়া দরকার। তারা যাতে স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য তাদের পরিবেশকে প্রীতিকর ও আদর্শস্বরূপ করা উচিত।

প্রাকবিদ্যালয় বধির শিশু

শ্রী এ, সি. সেন

প্রিন্সিপাল, লেডি নয়েস মূক বধির বিদ্যালয়, দিল্লী

প্রারম্ভেই প্রাকবিদ্যালয় শিশুর বয়স স্থির করা প্রয়োজন। ভারতে পাঁচ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়সের বধির শিশুকে বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয়।

অনভিজ্ঞ মাতাপিতা বধির ও সাধারণ শিশুর মধ্যে পার্থক্য সহজে ধরিতে পারেন না। শিশুর দ্বিতীয় ও তদূর্ধ্ব বয়সের সময়ে মাতাপিতা তাহার বাক্‌শক্তিহীনতা সম্বন্ধে দুঃখের সঙ্গে সচেতন হইয়া উঠেন।

কাজেই দেখা যাইতেছে, প্রাকবিদ্যালয় বধির শিশুরা দুই হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে পড়ে। ইহার অর্থ এই নয় যে, দুই বৎসরের কম বয়সের বধির শিশুকে শ্রবণ-শক্তিসম্পন্ন শিশু হইতে চিনিয়া লওয়া যায় না। তিন মাস

ও তদূর্ধ্ব বয়সেও ইহা সম্ভব। শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশু ছয় মাস বয়সেই তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে চোখ তুলিয়া তাকাইবে। আসল কথা এই যে, শিশুটি সাধারণ বা পৃথকধরনের তাহা জানিতে কেহই উদ্বিগ্ন হন না। মাতা-পিতা যতক্ষণ না বাধ্য হইয়া বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের শিশুটি বিকলাঙ্গ ততক্ষণ তাহাকে সাধারণ শিশু বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। এই উদ্বেগহীনতা কিন্তু একেবারে খারাপ নহে। শিশুটি যে বিকলাঙ্গ তাহা না জানার দরুন তাহাকে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন সাধারণ শিশুর মতই অকুণ্ঠিত ভাবে লালন-পালন করা হয়। যখন জানা যায়, শিশুটি বধির এবং তাহার প্রতি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন সাধারণ শিশুর মতই ব্যবহার করিবার জন্ম মাতাপিতাকে পরামর্শ দেওয়া হয়, তখন তাঁহারা তাহা করেনও বটে কিন্তু তাঁহাদের কুণ্ঠিত মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে। কাজেই আচরণটা অল্প-বিস্তর অস্বাভাবিক হইতে বাধ্য। আবার, যে শিশু আংশিক বধির তাহার এই অবস্থাটা আগেই জানা খুবই দরকার। ঐ ধরনের শিশুদের জন্ম আজকাল চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক কিছু করিতে পারা যায়। শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও বিকলাঙ্গ শিশুর মধ্যে যে তারতম্য তাহা অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব।

শিক্ষা বনাম বিদ্যালয়ে শিক্ষা—প্রাকবিদ্যালয় বধির শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাকালে শিক্ষা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন।

তৃতীয় দলভুক্ত বধির শিশুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সম্ভব। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্ম যে সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করা হইবে তাহার সহিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমানুপাতিক হইবে না। তবে বর্ধনশীল দেহীর পক্ষে শিক্ষা কেবল সম্ভব নহে আবশ্যকও। অঙ্গী তাহার পরিবেশের সহিত প্রতি ক্ষণে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বর্ধিত হইবে। কাজেই বধির শিশুর জন্ম আমরা যে পরিবেশ সৃষ্টি করি তাহাই দৈহিক বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। এই পরিবেশ দেহীর সাধারণ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহায়ক বা প্রতিবন্ধক হইলে তাহার শিক্ষাও সফল বা বিফল হইবে।

সম্পূর্ণ বধির দল—বধির শিশুগণ এক জাতীয় নয়—নানা প্রকারের বধির শিশু আছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নানা পার্থক্য দেখা যায়।

আধুনিক শিশুবিদ্যালয়—বহুকাল আগে রুশো তাঁহার "এমিল" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, আসল শিক্ষক হইতেছে অভিজ্ঞতা ও ভাব। ইথেল ম্যানিন মন্তব্য করিয়াছেন যে, শিশুবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের প্রবেশকে তিনি ভাল চোখে দেখেন না। বিজ্ঞান যেন মাতৃত্বের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়া তাহার স্থলে সেবিকাত্বকে বসাইতেছে। শিশুর হৃদয়ে ও মানসলোকে কি ঘটিতেছে তাহার সহিত সেবিকাত্বের কোন সম্পর্ক নাই; তাহার সম্পর্ক কেবল নিজের বৈজ্ঞানিক, নিপুণ, উচ্চ শিক্ষানুসারী তত্ত্বাবধানের সহিত। এ দেশে ও ইউরোপ-আমেরিকায় কতকগুলি দেশে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশুদের কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় আমি দেখিয়াছি। কেবল-মাত্র বধির শিশুদের জন্ম কয়েকটি বিদ্যালয়ও দেখিয়াছি। সেই সব বিদ্যালয়ের সরঞ্জামাদি খুব মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিলে সেখানকার বয়স্ক পরিচালকের শিশুবিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি নিখুঁত দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে মনে আতঙ্কই জাগে। কারণ সেখানকার বয়স্ক পরিচালকগণ শিশুমনকে শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে বেশ সচেতন ভাবেই যত্নশীল। ইহাতে শিশুমন স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইবার সামান্ত সুযোগও লাভ করে না। ইহা হইতেছে শিশুগণকে তাহাদের শৈশব উপভোগ করিতে না দিবার সুসংগঠিত প্রচেষ্টা।

শিশুনিকেতন—আধুনিক মানস-বিজ্ঞান মানুষের সম্পর্ক ও আচরণকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আমাদের বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করিয়াছে। সমস্যাবিজড়িত শিশুর উদ্ভব সমস্যাবিজড়িত গৃহ হইতে এবং অপরাধ সামাজিক অব্যবস্থার ও অসংযোগের ফল। ফ্রয়েড, অ্যাডলার ও অপরাপর পণ্ডিতগণ এই সত্যটি দেখাইয়াছেন যে, শিশুদের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে বয়স্কগণের প্রত্যেকটি শুভ প্রচেষ্টায় শিশু আত্মরক্ষায় তৎপর ও বয়স্কগণের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিতে পারে। যে শিশুর ইচ্ছা অনবরত উপেক্ষিত হয় সে অপরের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ না করিয়া বাড়িয়া উঠে। শিশুকে তাহার অহমবোধের মধ্য হইতে বাহিরে আসিতে হইবে। সে নিজেকে তাহার সামাজিক পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবে। কিন্তু শিশুবিদ্যালয়ের জগদ্দল কার্যাবলীর ফল ঠিক ইহার লক্ষ্যের বিপরীত হইতে পারে।

এই বয়সের প্রধান আবশ্যক—আমাদের বিশ্বাস এই বয়সে নিজ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর কেহ নাই এবং মাতার রক্ষণাবেক্ষণ অপেক্ষা আর কাহারও রক্ষণাবেক্ষণ উত্তম নহে। বৃদ্ধির পক্ষে শিশুগণের তিনটি জিনিষ প্রয়োজন।

১। নিরাপত্তা ও ভালবাসার পরিবেশ। একমাত্র মাতা তাহা সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহ পারেন না।

২। নিজ বৃদ্ধির জন্ম শিশুর আবশ্যক নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। শিশু নিজ জগৎ সৃষ্টি ও তাহার মধ্যে বাস করিবে। বয়স্কেরা

যেমন পছন্দ করেন না কেহ তাঁহাদের কার্যের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে তেমনি সকল বয়সের শিশুর, বধির শিশুর ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার।

৩। শিশুগণই শিশুনিকেতনের সরঞ্জাম নির্বাচন করিবে। ঘড়ি ভগ্ন ও সময়-তালিকা দগ্ধ হইতে পারে। যে শিশু পথের ধারের বালু দিয়া প্রাসাদ নির্মাণ করে বা কাগজের নৌকা গড়িয়া জলাধারের জলে ভাসায় অথবা সামান্য কাদা দিয়া পুতুল বানায় সে সৃজনী আবেগে মশগুল। তাহাকে শিশুনিকেতনের তৈয়ারী সরঞ্জাম দেওয়া অর্থে তাহার সেই আবেগে বাধা দান। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, শিশু যে কোন তৈয়ারী সামগ্রী পাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা সে তাহার নিজ সৃজনী কাজকর্ম হইতে যে আনন্দ লাভ করে তাহাই অধিক। একটিতে তাহার আত্মবিকাশ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্র থাকে অপরটি তাহা ক্ষুন্ন করে।

৪। প্রাক-বিদ্যালয় বধির শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, তাহার সহিত সংযোগ রাখা যায় না। সে দলের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের একজন নয়। ফলে সে দল হইতে সরিয়া যায়। এই প্রাক-বিদ্যালয় কালে যদি কিছুর দাম থাকে, তাহা হইতেছে, মধ্যপথে তাহার সহিত সংযোগের পন্থা বাহির করা এবং যে ভাষা সে বুঝিবে সেই ভাষার সাহায্যে তাহার সহিত সংযোগ রক্ষা। ইহা অবশ্য কর্তব্য। ইহাই দলের সহিত তাহাকে যুক্ত করিবে।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, শিশুটির বৃদ্ধি, আর সবই গৌণ।

পাহাড়িয়া

ফ্রেদা বেদি

উত্তর হিমালয় অঞ্চলে আশী লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের বাস। তাহারা আনন্দ ও সাহসের সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সেখানকার অপেক্ষাকৃত নিঃসঙ্গ ও কঠোর জীবনের সম্মুখীন হয় এবং সযত্নে প্রাচীন আচার-ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করে। ইহাতে বৈচিত্র্য আছে। ইহা এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের। এই সকল অধিবাসীদের দেখা যায়, হিমালয় পর্বতমালার অতুলনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত ক্রোড়স্থিত অঞ্চলে। এই অঞ্চলটি এক দিকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য হইতে হিমাচল প্রদেশের মধ্য দিয়া পাঞ্জাব শৈলমালা, কুলু, কাংড়া, লাহাউল ও স্পিতি পর্যন্ত প্রসারিত। তাহার পরও উত্তর-প্রদেশের শৈলাঞ্চল, আলমোড়া, নইনিতাল, ডেরাডুন, গাড়োয়াল ও টেহরী গাড়োয়াল পর্যন্ত ইহারা ছড়াইয়া আছে। এমন কি, এই অঞ্চল হইতে আরও দূরে বিহারের দিকে, যেখানে পাহাড়িয়াদের বসতি আছে সেখানে, বাংলার দার্জিলিঙেও ইহাদের দেখা যায়। এই অঞ্চলে বাস করে লেপচা, নেপালী, শেরপা ও ভুটিয়াগণ।

এই আশী লক্ষ অধিবাসীর অধিকাংশই পাহাড়িয়া। ইহারা ঐ নামেই পরিচিত। পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশে যাহারা বাস করে তাহারা এক ভাষায় কথা বলে। ইহার নাম 'পাহাড়ি' ভাষা। এই ভাষাই কিছুটা পরিবর্তিত আকারে শোনা যায় জম্মুতেও।

ইহাদের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন—যখনকার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না সেই কুয়াশাচ্ছন্ন ও বৈদিক যুগের। এই ঐতিহ্যকে ইহারা বিশ্বাস ও ভাবের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। ইহাই এই সকল পাহাড়িয়াদের কেবল সুদূর অতীতের সহিত নয়, একালের পাহাড়িয়াদেরও সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের বাসভূমি তুষারাচ্ছন্ন; সুদূর গ্রামাঞ্চলে ও হিমরেখার নিচে বাসগৃহগুলিতে নামে তুহিনভরা শীতের কঠোরতা ও স্বল্পকালস্থায়ী গ্রীষ্ম। ইহাতেও ইহাদের আনন্দ আছে। ইহাদের সাধারণ সমস্যা হইতেছে, নিঃসঙ্গতা ও অপেক্ষাকৃত মন্দ যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এখানকার অধিবাসীদের জীবিকার প্রধান উপায়, কৃষি। কাজেই উপযুক্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন না হইলে, খাদ্যের অভাব ঘটে এবং তাহা সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। জীবিকার্জনও তখন কষ্টকর।

উত্তর-ভারতের শ্রমিক ও গৃহভৃত্যগণ প্রধানতঃ পাহাড়িয়া। ইহাদের মধ্যে অনেক সময়ে পাহাড়িয়া নারীও দেখা যায়। ইহার কারণ কি? এমন হইবার কারণ কি, এই অঞ্চলে যাহারা বাস করে তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিতে ইহারা হীন? যদি ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ব্যাপার তাহা নয়। একটি জিনিষ চোখে পড়িবে। তাহা এই যে, সমতলবাসীদের মত তাহারা শিক্ষার সুযোগ পায় নাই। এই অভাবই প্রায়শঃই ইহাদের

হীন কাজ ও শ্রমিকের কর্ম গ্রহণে বাধ্য করে। তৎসত্ত্বেও ইহারা নিজদের ঐতিহ্যে গর্ব বোধ করে, যখনই সম্ভব একত্র মিলিত হয় এবং রাজপুতগণের মতই অনুভব করে যে, ইহারা যে মনিবের হুকুম তামিল করে তাহাদের চেয়ে উন্নত।

এই সকল পাহাড়িয়াদের অধিকাংশ কেবল তখনই চাকরি করিতে আসে, যখন তাহাদের গ্রাম তুষারে ঢাকিয়া যায়, জীবিকার সংস্থান কঠিন হইয়া পড়ে। আবার অন্যেরা হাজারে হাজারে সমতলভূমিতে আধাস্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসে।

তাহাদের লক্ষ্য, যথেষ্ট উপার্জন করিয়া নিজকে বাঁচানো এবং যাহাদের গৃহে ফেলিয়া আসিয়াছে তাহাদের কিছু কিছু পাঠানো এবং পাহাড়িয়া পরিবারকে ঋণমুক্ত করা অথবা বিবাহের খরচ যোগানো। অনেকে তাহাদের অর্ধেক জীবন পরিবার হইতে দূরে কাটাইয়া দেয়, কেবল স্বল্পকালের ছুটিতে দেশে যায়। তারপর বৃদ্ধ বয়সে ঘরে ফিরে।

উত্তর-প্রদেশের রিপোর্টে কর্মপ্রার্থীর যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্তম্ভিত হইতে হয়। ৫০০,০০০ লক্ষ পাহাড়িয়া সমতল প্রদেশে আধাস্থায়ী কর্ম অন্বেষণ করিতেছে এবং ৭০,০০০ হরিজন (এক তৃতীয়াংশ হরিজন) ঋতুবিশেষে কর্মপ্রার্থী। উত্তর-প্রদেশের পাহাড়িয়া অধিবাসীদের মোট সংখ্যা হইতেছে ২৫০,০০০ লক্ষেরও কম। কাজেই শতকরা অনুপাত অত্যন্ত উচ্চ। এই কর্মপ্রার্থীদের আর একটি প্রধান পথ হইতেছে সৈন্যবিভাগে কর্ম। ঐ বৃত্তিটির সহিত আছে রশুইকারের কাজ, পরিচারকের কাজ, কুলিগিরি, দ্বারোয়ানি, মোটর চালক ইত্যাদির কাজ।

এই সব মানবীয় সমস্যা ও দুর্ভোগের অর্থ কি? ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে পর্বতীয় পটভূমিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

দুর্নীতিপূর্ণ নারীব্যবসায়—আইনমান্যকারী ও ধার্মিক ব্যক্তির দেহে কর্কটরোগের মত পর্বতীয় অঞ্চলে নারীব্যবসায় চলে। চাহিদা ও সরবরাহ এই চিরন্তন নিয়ম অনুসারে এই পর্বতীয় অঞ্চলের সুন্দরী নারীদের সমতলপ্রদেশের পতিতালয়ে চালান দেওয়া হইয়াছে। দারিদ্রের মধ্যে, বিশেষ করিয়া একটি দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে এই বিনিময় প্রাচীন প্রথানুসারে চলিত আছে। ইহা লোপ পাইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

সেন্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের (কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ) নৈতিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য সমিতি এই সরবরাহের কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করার এক সুদূর প্রসারী পন্থার হদিস দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ চলিবারকালে এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে অনেক কিছু করার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আলমোড়া-নৈনিতাল অঞ্চলের একজন পুরাতন কর্মীর মতে, কোন সরকারী সংস্থা বা আইন এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না যে-পর্যন্ত না এই সমস্যার সংস্কারের পশ্চাতে জনমত থাকে। এই বীভৎস ব্যবসায় হইতে সহজেই অর্থলাভ হয়। এমন কি, যাহারা চালায় তাহাদের পরিবারের নিয়মিত মাসিক আয়ও হইয়া থাকে। বহুকালের অভ্যাসের ফলে বিবেক মরিয়া যায়। প্রচুর আয়ের এই সহজ পথ ছাড়িয়া কঠোর পরিশ্রমে সামান্য আয় করিতে আর ইচ্ছা হয় না।

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধীনে রক্ষী বাহিনী স্থাপন এবং প্রতিরোধ কার্যাবলীর সহিত স্থানীয় সংস্থার বেশী করিয়া সহযোগও অন্যান্য কার্যের সহিত করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। সমতল প্রদেশে ভুয়া "বিবাহ সংস্থা"; তথাকথিত "নারী নিকেতন"গুলিকেও নিবৃত্ত করা আবশ্যক।

যে সমাজে কর্মক্ষম পুরুষেরা গৃহ হইতে একটানা দূরে থাকে সে সমাজে পরিত্যক্ত নারীদের কষ্ট অত্যন্ত গভীর। কতকগুলি পর্বতীয় অঞ্চল যে বিশেষ করিয়া বাছিয়া লওয়া হয়, তাহার মধ্যে অর্থ নিহিত আছে। এই সব স্থান হইতে বহুকাল হইতে নারীদের লইয়া বড় বড় শহরের পতিতালয়ে চালান দেওয়া হয়। উত্তর-প্রদেশের পর্বতীয় অঞ্চলের কতকাংশ, হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি ও মাহাসুর্ব, পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকা ইহা দ্বারা আক্রান্ত। উত্তর-প্রদেশের নাইক ও ডোমের বালিকাদের এই পাপব্যবসায় হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই অঞ্চলের বালিকাদের বিক্রয় করিয়া একটি সম্প্রদায় শত শত বৎসর ধরিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া আসিতেছে।

সমাজ কর্মিগণ ও পর্বতীয় অঞ্চল—অধিকাংশ সমাজকর্মী এই বিষয়ে একমত যে, যদি পাহাড়িয়া নারী ও শিশুদের অবস্থার উন্নতি করিতে হয় আর সমতল প্রদেশের মত একই ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজ তাহাদের মধ্যে চালাইতে হয়, তাহা হইলে যে সব সমাজকর্মী কঠোর অবস্থার মধ্যে কাজ করিবে তাহাদের উচ্চ বেতন দেওয়া আবশ্যক। এই কাজে পাহাড়িয়াদেরই দেওয়া ভাল। কিন্তু পাহাড়িয়া তরুণী ও স্ত্রীলোকেদের শিক্ষিত করিয়া এই কাজে নিযুক্ত করিতে এখনও বহু বৎসর লাগিবে।

শিক্ষার অভাব ও অপরাপর বাধা—যে নিষ্ঠা ছোট পাহাড়িয়া বালকদের বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য বারো মাইল পথ হাঁটায় আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে,

পাহাড়িয়াদের জাগ্রত বুদ্ধি ও জিদ্ আছে। একবার সুযোগ দিলে উহারই বশে তাহারা আকুল আগ্রহে শিক্ষাকে গ্রহণ করে। অনেক অঞ্চলে বুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষার অভাব থাকায় সামাজিক শিক্ষারও অভাব ঘটে। হিমাচল প্রদেশে শতকরা আট জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে। সম্ভবত এই হিসাব ঠিক। তবে কুলু উপত্যকায় শতকরা পনর জন শিক্ষিত, এই সংখ্যা সম্ভবতঃ খুবই বেশী। টেহরি-গাড়োয়াল, কুলু বা লেঃর বিশাল অঞ্চলের কোথাও কোন কলেজ নাই। বড় বড় পর্বতীয় বসতি ছাড়া স্ত্রীলোকেরা কদাচিৎ শিক্ষা পায়।

অনগ্রসর শ্রেণীর ভবিষ্যৎ—পাহাড়িয়াগণ সম্ভাবনা ও বুদ্ধি সত্ত্বেও "অনগ্রসর শ্রেণী" রূপে চিহ্নিত। ইহার প্রধান কারণ তাহাদের শিক্ষা ও আর্থিক অসুবিধা। তাহারা কোন বিশেষ সরকারী দান বা পরিকল্পনায় সাহায্য পায় না। কারণ অধিকাংশক্ষেত্রেই সাধারণভাবে তাহারা উপজাতি। পূর্ব-ভারতে ও আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ বা জম্মু ও কাশ্মীরে ইহা অবশ্যই সত্য নয়। কাজেই পর্বতীয় অঞ্চলে আমাদের এক অসামঞ্জস্যের সম্মুখীন হইতে হয়। সেখানে তপশীলী শ্রেণী ও উপজাতিরা শিক্ষায় সাহায্য লাভ করিতে পারে, অপরাপর পাহাড়িয়াগণ তাহা পারে না।

চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সমস্যা ও পর্বতীয় অঞ্চল—পর্বতীয় সমস্যাবলীর কতকগুলি হইতেছে চিকিৎসা বিষয়ক। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ও যৌন ব্যাধিকে পর্বতীয় অঞ্চলের উৎপাত বলা যাইতে পারে। যৌনব্যাধি ঐ অঞ্চলের অন্যান্য সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের পথে সম্ভবতঃ বিপরীত স্রোত। পাহাড়িয়া পরিচারকগণ দীর্ঘকাল তাহাদের পরিবারবর্গ হইতে দূরে থাকে বলিয়াই এরূপ ঘটে। গাড়োয়াল অঞ্চলে কুষ্ঠের আক্রমণ বেশী কিন্তু সে অঞ্চলে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র নাই। অন্ততঃ বৎসর দেড়েক পূর্বে ত ছিল না। তবে হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে কতকগুলি ডিসপেনসারি আছে। সেখানে বাহিরের রোগীদের চিকিৎসা করা হয় এবং ঔষধ ও প্রচারের সাহায্যে এই রোগকে প্রতিরোধের চেষ্টা হইতেছে।

পর্বতীয় অঞ্চলে যক্ষ্মার কারণ, উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও খারাপ, আলো-বাতাসহীন ঘরে এক সঙ্গে অনেক লোকের বাস। ইহার ফলেই স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। এই রোগটিকে দূর করিবার জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টা অনেক সুফল দান করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষৎ

কোন প্রতিষ্ঠানের জীবনে তিন বৎসর সময় দীর্ঘ নয়। কোন প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাতের অল্পকাল পরেই তার কাজের মূল্য নির্ধারণ করার মধ্যে তার দিক থেকেই বাধা আছে। তবুও মাঝে মাঝে তার কার্যাবলী পরীক্ষা করলে তার চলার পথে সাহায্য করা হয়। তার দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির অবদান ও ত্রুটির পরিমাণ নিরূপণ করা যায় এবং তার কার্যে ফলপ্রসূতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পন্থা ও উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব। ১৯৫৬ সনের আগষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের তিন বৎসর পূর্ণ হবে। পর্ষৎটি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে তার একটি অংশ ছিল স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণের কাজ। সেই অংশটির অবস্থা কেমন ছিল তা পরীক্ষা করলেই সংস্থাটির অবদান স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সমাজের হতভাগ্য, শোষিত বা অনগ্রসর ব্যক্তিগণকে সাহায্যের ব্যাপারটি সময়ে সব সমাজকল্যাণ নামে অভিহিত হয় নি। কিন্তু মানুষ, এমন কি পশুও এই ধরনের সাহায্য ভারতে অতি প্রাচীনকালে সেই বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগ থেকে পেয়ে আসছে। তবে রাজা রামমোহন রায় ও গত শতাব্দীর মধ্যভাগের সমাজ-সংস্কারকগণ থেকেই সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টা একালের ভারতীয় জীবনযাত্রার একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সকল অগ্রপথিকের কাজের ও ভারতে খ্রীষ্টান যাজকসম্প্রদায়ের আগমনের এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠার ফলে উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত বিধবা ও নারীগণের, কুমারী-জননীগণের, বৃদ্ধগণের এবং হতভাগ্য শিশুগণের সাহায্যকল্পে সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের একটা কাঠামো দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সকল সংস্থা সংখ্যায় ছিল অল্প এবং দেশের বিরাট সমস্যাবলী সমাধানে পর্যাপ্ত ছিল না।

বস্তুতঃ জাতির জনক গান্ধীজীর মিলনের সঙ্গেই প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে সমাজসংস্কার জাতীয় জীবনের একটি অংশ হয়ে

দাঁড়ায়। গ্রামে গ্রামে কাজে, নারীদের চরকা কেটে অর্থার্জনে সাহায্য করে। খাদি ও গ্রাম্যশিল্পে উৎসাহদান, মদ্যপান ও পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচার, বর্ণবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার মত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা প্রভৃতি ঘটে। কাজেই তখন দেশের চারিধারে এই মহান নেতার দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র নারী হয় সমাজকর্মীর অথবা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যক্তিগত ভাবে উদ্বুদ্ধ হন।

আবার সমাজকল্যাণের প্রত্যয় সম্বন্ধেই পরিবর্তন আসছিল। শিক্ষাপ্রাপ্ত কল্যাণকর্মীর প্রয়োজনীয়তা বেশি করেই অনুভূত হচ্ছিল। টাটা পরিবার সমাজকল্যাণমূলক কাজ শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বোম্বাইতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

উত্তর স্বাধীনতা আন্দোলন—জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকর্মিগণের আশা স্পষ্ট ভাবে জেগে ওঠে। তখন তাঁরা মনে করলেন, দীর্ঘকাল উপেক্ষিত মানুষগুলির কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ভাবে কাজ ও কাজের উন্নতি করা সম্ভব হবে। তাঁরা আশা করলেন, রাষ্ট্র এ কাজে অনেক দূর অগ্রসর হবেন এবং সকল রকমের সম্ভাব্য সাহায্য দান করবেন। ফলে, এতকাল ধরে তাঁরা যা কামনা করছিলেন তা লাভে সমর্থ হবেন। বিভিন্ন কল্যাণ-সম্মেলন থেকে কেন্দ্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রীদপ্তর প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা জানান হতে থাকে। রাজ্যসরকারেও যাতে সমাজ-কল্যাণ বিভাগ থাকে সেজন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন করা হয়। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই নানা ধরনের সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা সরকারী পরিকল্পনায় ক্রমে বেশি করে স্থান লাভ করে। এইগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন বিভাগের অধীনে ন্যস্ত হয়। এই কাজগুলি হচ্ছে, শিক্ষা, শ্রম, পল্লীমঙ্গল ও উন্নয়ন। উপজাতিগণের কল্যাণ ও অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণমূলক কাজকর্ম, ঐ উদ্দেশ্যেই পৃথক ভাবে গঠিত বিভাগগুলির হাতে দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র বিভাগ অপরাধী শিশু ও কয়েদী প্রভৃতির কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে।

সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি—যেসব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় সমাজকল্যাণমূলক কাজের ভার নিয়েছেন তাঁরা পুরানো ও নূতন দুই রকমেরই সমস্যা সমাধানে তৎপর। দেশ খণ্ডিত হবার ফলে, যুদ্ধের দরুন অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটায় ও দ্রুত নগরাদি পত্তনের কারণে সমাজজীবনে অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিয়েছে। এটাই সমাজের নূতন সমস্যা। আগেই সমাজের সমস্যাগুলি ছিল ব্যাপক, কিন্তু সেগুলি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল। এগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল বিশেষজ্ঞের সাহায্য। সমাজকল্যাণের কোন জাতীয় পরিকল্পনা না থাকায়, স্থানীয় দলগুলির প্রচেষ্টায় ছিল বিশৃঙ্খলা। সেজন্য কোন কোন অঞ্চলে এই সব দল ছিল একাধিক। তাদের কার্যক্রমও ছিল সেই রকমের। ফলে, বহু শক্তি ও অর্থ অপচয় হয়েছে। আবার, অপর পক্ষে বহু অঞ্চলে কোন কার্যই হ'ত না, দীর্ঘকালের সামাজিক সমস্যাগুলির কথা কেউ চিন্তাও করত না।

সামাজিক সঙ্গতির স্বল্পতা—যে অংশে স্বেচ্ছামূলক ভাবে সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ হ'ত সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থাভাব বাধা ঘটাত। তার ফলে পুরনো সমস্যাগুলির সমাধান করা যেত না, নূতন কাজ ত পরের কথা। সমাজ-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। লোকের কাছ থেকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে মোটা দান পাবার দিনও শেষ হয়ে আসছিল। দানের উৎসগুলি শুষ্ক হয়ে পড়ছিল। সেইজন্য সমাজকর্মীরা প্রায়শঃ তাঁদের হাতে যে কাজগুলি ছিল সেগুলিকে উপেক্ষা করে ঠিক সেই সব কাজের জন্যই অর্থ সংগ্রহে তাঁদের শক্তি ক্ষয় করছিলেন। স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমেই সরকারের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করছিলেন। তাঁরা আশা করছিলেন, সরকার তাঁদের কিছু আর্থিক সাহায্য করতে অগ্রসর হবেন যার ফলে তাঁরা তাঁদের আরব্ধ কাজগুলি যা একদিন নিঃসহায় অবস্থায় সম্পাদন করছিলেন, কোন রকমে সম্পাদন করে যেতে পারবেন।

পরিকল্পনার উদ্ভব—তখন উপস্থিত হ'ল প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা। সমাজকর্মীদের আশা আবার জাগ্রত হ'ল। তাঁরা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ায় তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন, তাতে সামাজিক কল্যাণের কোন ব্যবস্থা আছে কি না। তাঁরা দেখে খুশি হলেন যে, সমাজ-কল্যাণের জন্য একটি পৃথক পরিচ্ছেদই আছে। আবার, ঐ সঙ্গে একেবারে হতাশও হলেন যে, সেই উদ্দেশ্যে অর্থ-ব্যয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। ঠিক এই সময়ে শ্রীমতী দুর্গাবাঈ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যা নিযুক্ত হন। তাঁর হাতে দেওয়া হয় সমাজকল্যাণমূলক কাজের ভার। সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে তাঁর সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ছিল। তার অল্পকাল পরেই পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত ও সমগ্র রূপটি প্রকাশিত হয়। সমাজকর্মীরা দেখে আনন্দিত হন যে, সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য ৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির প্রচেষ্টা ঐ সঙ্গে স্বীকৃত হয়ে স্থির করা হয়েছে যে, সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রধান দায়িত্ব থাকবে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে। তাঁরাই সে-সব কাজকর্ম করবেন। এই রকমের নীতির পক্ষে খুব শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত কারণও ছিল।

স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা—প্রথমতঃ কল্যাণমূলক

সমস্যাবলীর প্রকৃতিই এমন যে, সেগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে মানবতার স্পর্শের প্রয়োজন। এই অতিপ্রয়োজনীয় স্পর্শ সরকারী শাসনযন্ত্রে সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে সরকারী শাসনযন্ত্রের চেয়ে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা ভাল। দ্বিতীয়তঃ, তখনও সরকারী সঙ্গতিকে সীমাবদ্ধ বলে বিবেচনা করা হ'ত। সরকার পারতেন কেবল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মত বুনিয়াদী সমাজসেবার কাজ করতে। এগুলি যে কোন সভ্য সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। কিন্তু সরকারী সঙ্গতির সঙ্গে পরিপূরকরূপে সামাজিক সঙ্গতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন। কারণ, কতকগুলি বিষয়ের বিশেষ যত্ন নেওয়া আবশ্যক, যেমন নারী, শিশু, ঐ সঙ্গে বিকলাঙ্গ ও সমাজের যারা দুষ্টব্রণস্বরূপ তাদের। অপর দিকে, পরিকল্পনাকারিগণও স্বেচ্ছাকর্মী ও প্রতিষ্ঠানগুলির অসুবিধাগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন। সেজন্য স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তিন-চারটি প্রধান খাতে তার ব্যবস্থা করেন।

নূতন পরিচালকমণ্ডলী—ঐ চার কোটি টাকা বণ্টনের উদ্দেশ্যে পরিচালনাকারিগণ একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। এই কাজের ভার তাঁরা সরকারী বিভাগের মন্ত্রী-দপ্তরের হাতে দেন না। তাঁরা একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করতে মনস্থ করেন। এই পরিষদের রূপ হবে স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানের মত। তারা নিজেরাই তাদের অধিকার মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা দ্রুত কার্যকরী করতে পারবে। এই কেন্দ্রীয় পর্ষদের আর একটি নূতন রূপ এই হ'ল যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও অর্থ এই চারটি মন্ত্রীদপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হবেন বেসরকারী ও দুটি লোক-সভারই প্রতিনিধিগণ।

প্রথম পদক্ষেপ—ভারতের নানা অংশে স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান বিস্তৃত। মণ্ডলী বা পরিষদ ঐ সব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও অভাব কি তা জানবার জন্য বেসরকারী সমাজকর্মীদের প্রতিনিধিদের সাহায্যে তা জানতে মনস্থ করলেন। পরিষদ বুঝতে পারলেন, দিল্লীতে বসে কোন কেন্দ্রীয় পরিষদ সারা দেশে বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অভিযোগ ও অভাব কি তা বুঝতে পারবেন না। সেজন্য রাজ্যসরকারগুলিকে 'সমাজকল্যাণ পরামর্শ পরিষদ' গঠনের জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং এখানেও পরিষদের সেই পূর্ব ধাঁচকে অনুসরণ করে পরামর্শ পরিষদে বেসরকারী সদস্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়। সেজন্য কেন্দ্রীয় পরিষদের কাজ বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী কার্যনির্বাহক সংস্থা স্থাপন করে তাঁদের উপর ভার দেওয়া হয় আবেদনপত্রাদি গ্রহণ ও তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার, প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনের, তাদের প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ধারণের এবং তাদের কতটা সাহায্য দেওয়া দরকার পরিষদের কাছে তার সুপারিশ করার।

নূতন কার্য—এই সময়ে বাণিজ্যিক দুর্নীতি, পাপ ও নারী এবং শিশু ব্যবসায় সমাজকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। ভারতের সামাজিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য সংস্থাও পরিষদকে সারা দেশের এই বিষয়ের একটা হিসাব নিয়ে ফলপ্রদ উপায় গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। পরিষদ তাতে অবিলম্বে সাড়া দেন। এজন্য দুটি কমিটি নিযুক্ত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা—পর্ষৎ প্রথম পরিকল্পনাকালে যে যে কাজ করেন তাঁদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্ভব তা থেকে। দেশের ৩১৫ পনেরটি জেলায় একটি করে সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে তাঁরা প্রত্যেক জেলায় আগামী পাঁচ বৎসরে আরও তিনটি করে সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। পরিষদ প্রথম পরিকল্পনায় ১৭৬০টি প্রতিষ্ঠানকে ২৫০০টি সাহায্য করেছেন। আগামীতে তাঁরা ৮০টি আশ্রম স্থাপন করবেন। প্রত্যেক জায়গায় থাকবে পাঁচটি করে আশ্রম। এই পাঁচটির মধ্যে একটি হবে নারী-উদ্ধার আশ্রম। প্রত্যেক আশ্রমে থাকবে শিল্প-উৎপাদন উদ্দেশ্যে একটি করে বিভাগ। পরিষদ যে যুক্ত কর্মতালিকা গ্রহণ করেছেন তার জন্য অর্থাগম হবে বিভিন্ন মন্ত্রী-দপ্তর ও রাজ্যসরকারগুলির কাছ থেকে। প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রাম-সেবিকা, ধাই ও ধাত্রীর কাজের জন্য শিক্ষা দান করা হবে।

অসামান্য তৎপরতা—পরিষদ গত তিন বৎসরে যা করেছেন এবং আগামী পাঁচ বৎসরে যা করবেন উপরে তার কিছু আভাস দেওয়া হ'ল। ঐ থেকে দেখা যায় পরিষদ কি অসামান্য তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন। সমাজকর্মীদের পক্ষে গত ত্রিশ বৎসরে যা শুরু ও সমাধা করা সম্ভব হয় নি, পরিষদ মাত্র তিন বৎসরে তা করেছেন। তাঁরা "সমাজ-কল্যাণ"কে লোকের কর্তব্য কর্মে পরিণত করে বহু অলস ব্যক্তিকে এই কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

একত্রে কার্য—আজকালকার কল্যাণমূলক কাজের অত্যন্ত জটিল সমস্যা হচ্ছে, একত্রে কাজ। পরিষদ এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেও একটি সংস্থা গঠন করেছেন। তাতে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি-গণকে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী বিভাগের, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি বিভাগের প্রতিনির্ধিগণ ত তার সদস্য আছেনই।

তবুও পরিষদের কাজকে আরও সুষ্ঠু ও উন্নত করার অনেকগুলি ক্ষেত্র রয়ে গেছে। পরিষদ সে বিষয়ে অবহিত এবং যে কোন ত্রুটি অপসারণে আগ্রহশীল।

দেশবন্ধু স্মরণে

শ্রীক্ষেমঙ্করী রায়

কলেজে পড়িতে পড়িতে ১৯১৮ সনে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ি। সেই সময়ে বহুবাজার নিবাসী স্বর্গত শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের চতুর্থ পুত্রবধূ লোকান্তরিতা কৃষ্ণভামিনী দাস আমার জন্য অত্যন্ত চিন্তিতা হন। দেশবন্ধুর (চিত্তরঞ্জন দাস) দ্বিতীয়া ভগিনী স্বর্গতা অমলা দাসের সহিত তিনি নিগূঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া দাস মহাশয়া আমাকে পুরুলিয়ায় বায়ুপরিবর্ত্তনে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

আজীবন কৌমার্য্যব্রতধারিণী অমলা দাস মাতৃ-পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাদের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া পিতা ৺ভুবনমোহন দাসের পুরুলিয়াস্থিত 'দি রিট্রিট' নামক বাড়ীতে একা বসবাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি কলিকাতায় আসিতেন। সেবার বড়দিনের ছুটিতে তিনি কলিকাতায় আসিলে, কৃষ্ণভাবিনী দাস মহোদয়া আমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। সেটা ১৯১৮ সনের ডিসেম্বরের কথা। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই স্নেহশীল, উদারহৃদয় দাস-পরিবারের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছি।

দীর্ঘ ছয় অথবা সাত বৎসর পুরুলিয়ায় ছিলাম। ইঁহাদের চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও যত্নে পুনরায় ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই।

মাসীমার (অমলা দাসের) ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে মাতৃ-স্মৃতিরক্ষার্থে নিস্তারিণী বালিকা বিদ্যালয় নামে মেয়েদের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব তিনি আমার উপর ন্যস্ত করেন। এই সূত্রে দীর্ঘকাল আমি তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগ করি ও পরমানন্দে পুরুলিয়ায় থাকিয়া যাই।

সুতরাং ইঁহারা স্নেহ, আদর ও যত্নের দ্বারা আমায় মুগ্ধ করিয়া আপন পরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন এবং এই আত্মীয়তাসূত্রে আমায় মামাবাবু মামীমা, মাসীমা বলিবার অধিকার দিলেন। পিতৃহীনা পিতা পাইয়া ধন্যা হইল। এমন অনাবিল স্নেহ কাহাকে না অভিভূত করে?

অমলা দাসের মৃত্যুর পর আমাকে পুরুলিয়া ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি ইঁহাদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হই নাই।

অবলা বসুজায়া মহাশয়ার প্রতিষ্ঠিত নারী-শিক্ষা-সমিতির পরিচালনায় ১৯২১ সনে বালিগঞ্জে একটি উচ্চ প্রাইমারী শিক্ষালয় স্থাপিত হয়। বসুজায়ার নির্দ্দেশানুসারে একটিমাত্র ছাত্রী লইয়া আমি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করি। তখন বালিগঞ্জ ছিল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। শৃগাল ও সর্পের উপদ্রবে সদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিতাম। এই সময়েও এই স্নেহশীল পরিবারটি সর্ব্বদা আমায় খোঁজখবর লইতেন। এমনই মহানুভবতা এই পরিবারের।

তখন বালিগঞ্জের গৃহে গৃহে ম্যালেরিয়া, আমিও ইহার আক্রমণে অস্থিচর্ম্মসার হইলাম।

উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা ও তাহার ফলে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহাতে এবং সর্ব্বত্র কংগ্রেসের অক্লান্ত সেবা করিয়া মামাবাবুর (দেশবন্ধু) স্বাস্থ্য ভাঙিতে আরম্ভ করে। ডাক্তারগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও জলপথে ভ্রমণের পরামর্শ দেন।

ডাক্তারের নির্দ্দেশানুযায়ী একখানি (এস. এস. দুরানী) আসাম-গামী ষ্টীমারের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী রিজার্ভ করা হইল।

দেশবন্ধু তাঁহার চতুর্থ ভগ্নী (ঊর্ম্মিলা দেবী) তাঁহার পুত্রকন্যা, মামাবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা (কল্যাণী), নববিবাহিতা পুত্র ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য জলপথে ভ্রমণে চলিলেন। স্নেহময়ী মামীমা (বাসন্তী দেবী) ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী ন'মাসীমা (ঊর্ম্মিলা দেবী) আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমাকেও ইঁহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। ইহা ১৯২১ সনের অক্টোবর মাসের কথা।

ষ্টীমার ছাড়িবার আগের দিন আমরা সকলে ষ্টীমারে গিয়া রাত কাটাইলাম। মামাবাবু পরদিন সকালে ষ্টীমারে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণার প্রথম পুত্র সেই দিন ভূমিষ্ঠ হওয়ায় মামীমার যাওয়া হইল না। জগন্নাথঘাট হইতে ষ্টীমার রওনা হইল। ব্যারিষ্টার ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সস্ত্রীক আমাদের সঙ্গী হইলেন।

জলপথ ভ্রমণের এই কয়েকটি দিন মামাবাবুর নিকট হইতে যে নিবিড় পিতৃস্নেহের স্পর্শ পাইয়াছিলাম তাহা আজীবন স্মরণে থাকিবে।

আজ জীবনের সায়াহ্নবেলায় দাঁড়াইয়া যখনই সেই মধুর দিনগুলি স্মরণ করি, হৃদয় মন শ্রদ্ধায় অবনত ও আনন্দে অধীর হয়। মামাবাবুর অসুখ ছিল, পেটে একটা ভীষণ যন্ত্রণা হইত। ডাক্তারের পরামর্শে পথ্যের উপর নির্ভরই ছিল তাঁহার আরোগ্যের উপায়। পথ্যাপথ্য বিষয়ে ন'মাসীমাই ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞা। সুতরাং সুপথ্যের বন্দোবস্তের দায়িত্ব তিনি আপন হস্তে তুলিয়া লইলেন। আমিও রোগাক্রান্ত, দিনের পর দিন ন'মাসীমার প্রস্তুত নিত্য নূতন পথ্য পাইয়া ক্রমে ক্রমে সুস্থ ও সবল হইতে লাগিলাম।

পূর্ব্বে মামাবাবুকে বরাবর কর্ম্মব্যস্ত দেখিয়াছি। এই এক মাস তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে দেখিলাম এবং আমরা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইলাম।

তিনি যে কিরূপ সাহিত্যানুরাগী, হাস্যকৌতুকরসিক, মিষ্টালাপী ও স্নেহশীল ছিলেন, তাঁহার পরিচয় এই সময়ে একে একে পাই।

কল্যাণী (দেশবন্ধুর কন্যা) আমায় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। আমার বিবাহ স্থির হইলে মামাবাবু অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। বিশেষ কার্য্যগতিকে তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে যাইতে হয়। সেই জন্য আমাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য বিবাহ-বাসরে উপস্থিত থাকিতে মামীমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া যান।

আমাদের বিবাহের কয়েকমাস পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বড় সভায় মামাবাবু সভাপতি হইয়াছিলেন। আমরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভান্তে তাঁহাকে উভয়ে প্রণাম করিলাম। মৃদু হাসিয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন।

ষ্টীমারে ন'মাসীমা রন্ধনের ও বৈকালের চায়ের সঙ্গে জলখাবার তৈয়ারী করিবার পালা করিয়া দিলেন। রান্নার নিত্য নূতন পালা চলিতে লাগিল। একদিন ভাজা মশলার আলুর দম রান্না করিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহরে ভোজনের সময় মামাবাবু বলিলেন, সুনিপুণা রাঁধুনির চিনির দমটা আর একটু দাও। বুঝিলাম মিষ্টি বেশী হইয়াছে।

মামাবাবুর সঙ্গে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। সামান্য কিছু খাইতে হইলেও তিনি কাঁটাচামচ ব্যবহার করিতেন। তিনি একদিন ছুরি ও কাঁটার সাহায্যে পাকা পেঁপে খাইতেছিলেন, মামাবাবু দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,"জিবটা খেয়ো না যেন।" চড়ায় নৌকা দেখিলেই আমাদের ডাকিয়া বলিতেন, "তোমাদের নৌকা যাচ্ছে দেখ।" আবার বাজার হইতে তরকারী আসিলে ডাকিয়া বলিতেন, "লাউ ঘণ্ট দিয়ে লুচি খাওয়াবে ত?"

এই জ্ঞানী, গুণী, বিখ্যাত আইনজীবী যে এরূপ কৌতুকপ্রিয় তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই।

বিকালের জলখাবার তৈরীর সময় সকলেই ঘুমাইয়া থাকিত। মামাবাবু একা ডেকের উপর পায়চারী করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-আলো-আঁধারের খেলা উপভোগ করিতেন। মাঝে মাঝে আসিয়া কি খাবার তৈয়ারী হইতেছে জিজ্ঞাসা করিতেন। সেই দৃশ্যটি এখনও সুস্পষ্টরূপে চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

একদিন যখন কচুরি ভাজিতেছিলাম, তখন তিনি হঠাৎ আসিয়া সরল শিশুর মত হাত পাতিয়া একখানি কচুরি চাহিলেন। বলিলেন, "ভয় নাই, ছুটকী কিছু বলবে না।" ঘিয়ের জিনিস খাওয়া ডাক্তারের নিষেধ ছিল। কি করি মহাসমস্যায় পড়িলাম। ছোট শিশুকে যেমন করিয়া ভুলায় তেমনি করিয়া আমি একখানি ছোট্ট কচুরি ভাজিয়া তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম। তাহাতেই খুশী হইয়া তিনি মধুর হাসি হাসিলেন। তিনি যে শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন তাহার পরিচয় এই ঘটনায় পাইলাম।

আমাদের আসামগামী ষ্টীমারখানি যে সকল ষ্টেশনে মাল তুলিয়া লইত অথবা মাল নামাইয়া দিত, সেই সকল ষ্টেশনে তিন-চারি ঘণ্টা, কখনও কখনও সারারাত্রি নোঙ্গর করিয়া থাকিত। সেই সুযোগে আমরা সকলে ষ্টেশনে নামিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া আসিতাম এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও তরিতরকারী কিনিয়া আনিতাম।

ষ্টীমার দিবারাত্রি চলিত, কেবলমাত্র মাল নামাইবার ও তুলিবার জন্য ষ্টেশনে ষ্টেশনে থামিত। এক রাত্রিতে আমরা যখন সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত, তখন হঠাৎ ভয়ানক শব্দ হইয়া ষ্টীমারটি থামিয়া গেল। মনে হইল নদীর মধ্যে কোনও চড়ায় ধাক্কা লাগিয়াছে। আমরা সকলেই সভয়ে জাগিয়া উঠিলাম। কিন্তু মামাবাবু তখনও নিদ্রিত। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহাকে পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা বলা হইলে হাসিয়া বলিলেন, "আমি তো জেগেই ছিলাম, তোমাদের সকলের নাক ডাকা শুনছিলাম।" এইরূপ সরল হাস্য-পরিহাস দ্বারা তিনি সকলের আনন্দবিধান করিতেন।

তিনি রসগ্রাহী বৈষ্ণবচূড়ামণি ছিলেন। রাত্রির আহার সমাপনান্তে আমরা সকলেই টেবিলে বসিয়া গল্পগুজব করিতাম। তাসও খেলিতাম। মামাবাবু সমানতালে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রসের ব্যাখ্যা তিনি এক এক রাত্রিতে করিতেন। তিনি বলিতেন, সর্ব্বরসের সার মধুর রস—গোপীপ্রেম। এই সকল তত্ত্ব বুঝাইতে বুঝাইতে আবেগে প্রায়ই অশ্রুবর্ষণ করিতেন। কোনও দিন বা তাঁহার স্বরচিত কিশোর-কিশোরী, সাগরসঙ্গীত, অন্তর্যামী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ হইতে কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন। আবার কোনও কোনও রাত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ হইতে মনোনীত কবিতাগুলি সুর, ছন্দ ও তাল লয় সহকারে মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতেন। আমরা এই ভাববিহ্বল কবির আবৃত্তি স্তম্ভিত, বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া শুনিতাম। এই আমোদ-প্রমোদে দীর্ঘ একটি মাস কাটাইয়া সকলেরই দেহ মন সুস্থ ও সবল হইল। ক্রমে ভ্রমণও শেষ হইল।

একটি মাস পরস্পরকে একান্তভাবে পাইয়া আমাদের ও ষ্টীমারের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আত্মীয়তার ভাব নিবিড় হইয়াছিল। মামাবাবু অধ্যক্ষ ও খালাসীদের ডাকিয়া বকশিস দিয়া বিদায় লইলেন। তখন তাহাদের চক্ষু সজল দেখিলাম।

এবার ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পালা। কিন্তু এই একটি মাসের আনন্দপূর্ণ মধুর স্মৃতিটি আজও স্মৃতির ভাণ্ডারে মহামূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত আছে।

মহাকালের নিষ্ঠুর বিধানে অকালে স্নেহময় মামাবাবু ও ভাই চিরঞ্জনকে হারাইয়াছি। কিন্তু সত্যই তো বিধাতার রাজ্যে কিছুই হারাইয়া যায় না। কবিগুরু কথায়:

"মোর যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে,
সব যদি দেই সঁপিয়া তোমাকে,
তবে যে গো হায়, সব জেগে রয়,
তব মহা মহিমায়।
তোমাতে রয়েছে কোটি শশী ভানু,
হারায় না তারা অণু পরমাণু,
আমার এ ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
রবে নাকি তব পায়?"

মনে হয় দেশবন্ধুর অমর আত্মা পরলোক হইতেও আমাদের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন, সুখে দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতেছেন।

মামাবাবু দানবীর, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ, অক্লান্তকর্মী দেশসেবক,

প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার রূপেই সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু তাঁহার অন্তরটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় স্নেহধারায় যে সদাসর্ব্বদা কিরূপ সরস থাকিত তাহার সন্ধান পাইবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। সেই স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের কি তুলনা আছে? তিনি দাতা ছিলেন, কর্ম্মী ছিলেন, রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। দিন কয়েকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাঁহার চরিত্রে মনুষ্যত্বের যে বিরাট মহিমা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা অতুলনীয়। আজ সেই 'মানুষ' চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হইলাম।

ভাওয়াইয়া গান ও বাউদিয়া সম্প্রদায়

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

ধূলি-ধূসরিত পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে বাউদিয়া তার দো-তারা হাতে নিয়ে। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যায় সে। আপনার খেয়ালেই কখন সে দাঁড়ায় নি এক জায়গায়। বিলীয়মান সূর্য্যরশ্মির দিকে চেয়ে হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই ঝঙ্কার তোলে দো-তারার তারে। বিবাগী মনের মণিকোঠা থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে আলোর ঝলকানি। ফেলে-আসা দিনগুলির কথা স্মরণ করে নিয়েই হয়ত সে আবেগের সঙ্গে গেয়ে উঠে:

"সখী আর কি দেখা পাব জীবনে,
আমার দিনে দিনে তনু অইলো ক্ষীণ
সখী ভাবদে ভাবদে তাহারি।
দুই নয়নের জলে আমার বক্ষি ভাসে নদী
সখী এতদিনে ক্ষয় হইতাম পাষাণ হইতাম যদি।

হইতাম যদি জলের কুমীর
খুজ্যা দ্যাখতাম জলে
(সখী) হইতাম যদি বোনের বাঘ রে
খুজ্যা দ্যাখতাম জোঙ্গলে,
হারে দারুণ বিধি যদি দিত পাখারে
সখী দ্যাখতাম নয়ন ভরে।"

বাউদিয়া আবার এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলাই ত তার ধর্ম্ম। বিবাগী বা 'বাউড়া' কথা থেকে বাউদিয়া শব্দের উৎপত্তি ধরে নেওয়া চলে। তাই এদের অধিকাংশ গানের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের সুর খুজে পাওয়া যায়।

এই বাউদিয়া সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া যায় সাধারণতঃ দিনাজপুর, রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চলে। এরা সাধারণতঃ ঘর বাঁধে না। কোন সামাজিক সংস্কারেরও বড় একটা ধার ধারে না। এদের সাধনা-পদ্ধতি, জীবনযাত্রা-প্রণালী সবই যেন একটু আলাদা ধরনের। এরা একাধারে বাউলের মত আত্মভোলা, কিন্তু গীতগুলি ঠিক সেই অনুপাতে অধ্যাত্মভাব সমৃদ্ধ নয়। অপর দিকে পূর্ব্ববঙ্গের উদাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও রয়েছে এদের প্রচুর মিল। তাই এদের গানে বৈষ্ণবের মত বিচ্ছেদ, অভিসার, পূর্ব্বরাগ, পরকীয়া প্রেমের সন্ধান মিলবে। কিন্তু তাই বলে কোন নির্দিষ্ট মূর্ত্তি বা গণ্ডীর মধ্যেও এদের আটকান যাবে না। এরা সারা জীবন প্রেমের দেবতাকে খুজে বেড়ায়। হয়ত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও এদের এই খোঁজার শেষ হয় না। তাই এরা ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, মাঠে ঘাটে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তারা তাই ঘর বাঁধারও কোন আবশ্যকতা বোধ করে না। যদি বা কখনও কোথাও আস্তানা গড়ে, তবে তা হয় ক্ষণস্থায়ী। দু'দিন ঘর করতে না করতেই যেন হাঁপিয়ে উঠে। প্রতিমুহূর্ত্তেই যেন কান খাড়া করে থাকে বাঁশীর সুরের দিকে। দূর হতে আগত বাঁশীর সুরে ভুলে যায় তার ঘরের কথা। হাতের কাজ যাই থাকুক না, ফেলে দিয়ে অমনি বেরিয়ে পড়ে। এদের ভিতরেও মিলন বিরহ আছে। কিন্তু সে জন্য কোন খেদ নেই—কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

সবচেয়ে মজার কথা ছিল এ সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচলিত ধর্ম্ম নিয়ে কোন ভেদাভেদ নেই। তাই এদের গানে বাউল, বৈষ্ণব এবং সাই, দরবেশ ও সুফীদের ভাব ও সুর এক হয়ে মিশে গেছে। বাউদিয়া হ'ল একটা সম্প্রদায় মাত্র, জাত নয়। এই খেয়ালী বাউদিয়া আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করে যে গীত-লহরী তাকেই নাম দেওয়া হয়েছে ভাওয়াইয়া।

'ভাব' থেকেও 'ভাওয়াইয়া' কথা এসেছে হয় ত। সত্যিই এদের গান ত আর নিছক সময় কাটাবার জন্য নয় বা কোন বিশেষ উপলক্ষেও রচিত নয়। একদিকে অধ্যাত্মবাদ ও অন্যদিকে মনস্তত্ত্ব সবই পাওয়া যাবে এই গানে।

ভাওয়াইয়া গানের ভিতর যে একটু লঘু রসের খোরাক যোগায়—সংসারের সুখ, দুঃখ, হাসি, ঠাট্টা—এগুলিকে "চটকা' আখ্যা দিতে হবে এগুলি বেশী শুনতে পাওয়া যায় কুচবিহারে। তা ছাড়া মহিষ চরাতে চরাতে যে গান গায় বা গরু চরাতে চরাতে বা গাড়ী চালাবার সময় যে সকল গান হয় তাকে বলা হয় 'মৈষাল' ও 'গাড়োয়ালী' গান। এই গাড়োয়ালী গানের সুরের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের ভাটিয়ালী গানের একটা সুরগত ঐক্যও দেখতে পাবেন। এ ছাড়া মৈষাল গানের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের রাখালী গানের মিল ত পাবেনই। কিন্তু আমাদের বাউদিয়া ততক্ষণে এগিয়ে চলেছে নদীর কিনারায়।

কালবৈশাখী দেখা দিয়েছে। আকাশ মুখ ঢেকেছে তার ভ্রমর কালো মেঘের ওড়নায়। হয়ত তার মাঝে ক্ষণিকের তরে দেখা

দেয় তার চটুল চাহনি—ঝিলিক মেরে উঠে ক্ষণপ্রভার হাসি। বাউদিয়ার বুকের মাঝে হু হু করে উঠে তার প্রাণবঁধুর কথা মনে করে। সে আর থাকতে না পেরে গেয়ে উঠে :

"প্রেম জানে না অসিক (রসিক) কালাচাঁদ
ও সে ঘুইরে মরে মোন
কতদিনে বঁধুর সনে হইবে দরশন।

হাটিয়া যাইতি নদীর জল
খাবলুম্ কি থুকলুম্ কি
খলাল খলাল করে রে
(হায় হায় পরাণের বন্ধুরে)
(বন্ধু) তোমার আশায় বইসে থাকি
বট বিরিক্ষির তলে
মন আমার উড়াম বাইরাম করে রে
উড়াম বাইরাম করে।"

পাঠকগণ এই ফাঁকে লক্ষ্য করুন এদের গানের শব্দ চয়ন এবং সুর ঝঙ্কারের প্রতি। এক প্রেমিক অভিসারে চলেছে, পথিমধ্যে আছে চিরল নদী। নদীর গর্জ্জন ভীষণ। এর উপর আছে বরুণ-দেবের ভ্রূকুটি। নদীর গর্জ্জনের সঙ্গে ঝড়ের মিতালিতে এর তখনকার অবস্থা কি অপূর্ব্ব ভাবে ফুটে উঠেছে এই গানে। নদীর জলকল্লোল, কিংবা অশান্ত মনের দুরন্ত ভাবরাশি যেন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে এদের গানের মাধ্যমেই। স্বভাবকবি বাউদিয়ারা সাধারণতঃ নিরক্ষর। কিন্তু দেখুন কি অপূর্ব্ব তাদের রসবোধ, সেই সঙ্গে কাব্য-শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এরা সজ্ঞানে কেউ কোন শব্দ চয়ন করে নি।

নদীর ঘাটে এসে পৌঁছেছে অভিসারিকা। ওপারে তার বঁধুর বাড়ী, এপারে সে অবলা নারী। কি করেই বা সে এই দারুণ নদী পার হবে ভেবে ঠিক করতে পারে না। স্পষ্ট কণ্ঠেই সে ঘোষণা করছে, যে তাকে এই দুস্তর নদী পার করে দেবে সেই মাঝিকে শুধু যে তার গলার রত্নহারই উপহার দেবে তাই নয়—তনু, মন সবই দিতে প্রস্তুত। ভরা যৌবনের বাঁধনছাড়া জলধারা জীবননদীর কূলে কূলে ভরাট করে মহাপ্লাবনের শুচনা করেছে। বাউদিয়ার হাতের দো-তারা আর কণ্ঠের অপূর্ব্ব সুরে মায়াজাল রচনা করে চলে :

"যে মোরে করিত্তোরে পার
দান করিতাম গলার হার
পার হইয়া যৈবন করতাম দান।
ওই পারে বন্ধুর বাড়ী
এই পারে মুই নারী
মধ্যে আছে চিরল নদীর ধারা।

বাহুতে আধিনু (রাধিনু) বাহুতে বাঁধিনু
জলেতে ভাসাইয়া দিলাম হাড়ী।

আর বিয়ার সোয়ামী মইলে
খাব মাছ আর ভাতরে
(আর) পান (প্রাণ) বঁধুয়া মইলে
হব আড়ি (রাড়ী—বিধবা)।
না জানি সাতাররে, না জানি পাহাড়
না জানি ঘুর‍্যা বাইর (বারে)
আমি অকুল দড়িয়ায়
ক্যামনে হব পাওয়ার (পার)।"

তবেই বুঝুন, এত যে প্রেম প্রীতি সবই বুঝি হ'ল বালু-সৈকতে সৌধ নির্ম্মাণ। তা হোক, আমার প্রেমের দেবতাকে যদি পাই তা হলেই ত আমার সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া, সকল চাওয়ার শেষ চাওয়া সাঙ্গ হ'ল। আর ত কিছুই চাই না। আজ যদি আমার বিয়ে করা স্বামী মারা যায় সেজন্যে কিছুমাত্র দুঃখিত হব না, বৈধব্য বেশও ধারন করব না, বিধবার লক্ষণস্বরূপ মাছ ভাত খাওয়াও ছাড়ব না। কিন্তু যদি সত্যি আমার প্রাণপ্রিয়ের কোন দুর্ঘটনা ঘটে তা হলেই ত আমি সত্যিকারের বিধবা হব।

পরকীয়া প্রেমের এত বড় নিদর্শন একমাত্র পদাবলী-সাহিত্য ছাড়া জগতের যে-কোন সাহিত্যেই দুর্লভ। তত্ত্বজ্ঞানী বাউদিয়া তাই আবার তার দো-তারার তারে টঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠে :

"প্রেমের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি
মুই সেন জান।
বন্ধুর ঘরে প্রেম করা ভালো
কেইন্দে কেইন্দে চোক্ষের জল মোর
হোল সারা রে।
মুই সেন জান।
চন্দ্র সূর্য্য যাচ্ছে জ্বলিয়ারে
আরে ওই রকম ওই নারীর প্রাণ
সদাই ঝরেরে।"

বসন্ত সমাগমে গাছে গাছে ফুটল নতুন ফুল। সবুজে সবুজে ছেয়ে ফেলল বন-প্রান্তর। ঝোপে ঝাড়ে ডেকে উঠল 'বৌকথা কও' পাখী। অশোক-কিংশুকের মেলায় মন হরণ করে নিল কবির। প্রকৃতি হেসে উঠল আবার এত দিন পর। নতুন জীবন পেল পুরাতন ধরিত্রী। কিন্তু বাউদিয়া? তার ত ঘরও নেই, বাড়ীও নেই। তার কি আর চলার শেষ হবে না? খুঁজে কি পাবে না তার জীবনধনকে? কেন, এই যে দো-তারা! এই ত তার জীবনের সাথী, এই ত তার প্রেয়সী! এই দো-তারাকে সঙ্গী করেই ত সে ঘর ছেড়েছে।

"(আরে ও) মরি হায়রে হায়
নবীন বয়সে মোক্ করলিরে বাউদিয়া।
যখন দো-তারা তোকে নিলাম হাতে
নিরত (নিন্দে) করে মোক্ পাড়ার লোকে

নির্ম্মলা শিক্ষা পেলো...
মালতীর ছোট্ট ছেলে মুন্না সবসময় নিচের বাসাতে খ্যালনা ফেলতো-
মুন্না! দুষ্টু ছেলে! আবার তুমি খেলনা ফেলেছো!
নির্ম্মলার বাসা
না এখন না- ছেলেটাকে ভালমত শিক্ষা দিতে হবে...
মুন্নার খ্যালনাটা মালতীকে ফিরিয়ে দাওনা কেন?
পরে
দেখ! এবার ফেলেছে একটা তোয়ালে!
ভেবেলোক্কিন্তু কি পরিষ্কার করে কাচা! সত্যিই আশ্চর্য্য...
মালতির বাসা
নির্ম্মলা! তুমি বুঝি মুন্নার খ্যালনা নিয়ে এসেছো...!
হ্যাঁ-আর তোমার তোয়ালেটাও নিয়ে এসেছি - আচ্ছা আমায় একটা কথা বলবে-
বলতো, তোয়ালেটা এত ধবধবে সাদা কি করে করলে? আমি তো কখনও তোমার বাড়ী থেকে কাপড় আছড়াবার আওয়াজ পাইনি।
কিন্তু আমি তো আছড়াইনা, - আমি যে সানলাইট সাবান ব্যবহার করি।
আছড়ালে কাপড়ের বুনুনী ফেঁসে যায় আর সেইজন্যে ছেঁড়েও তাড়াতাড়ি।
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে।
সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনা বিনা আছাড়েই পরিষ্কার করে কাচে – আর সেইজন্যে কাপড় টেঁকেও বেশী দিন।
সত্যিই! সানলাইট সাবানে বিনা আছাড়েই সাদা আর ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার হয়-কাপড় টেঁকেও বেশী দিন আর আমার খরচও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
S. 238-X52 BG

নিরন্ত করে মোক (আমাকে) দয়াল বাপ ভাই ।
তোর জন্ত মোর গেমাম বাদী

আজ তুই দো-তারা রাখলিরে মাথ
রূপা দিয়া মুই বান্ধাবরে কান···।"

হয় ত গাড়োয়ানের বেশেই চলেছে তার প্রাণ-প্রিয় । বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না । কিন্তু তার অব্যক্ত কথা প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিয়েছে বাউদিয়া । দো-তারার তারে ঘা মেরে গেয়ে ওঠে তার মনের কথা—

"ওকে গাড়ীয়াল ভাই
উজান উজান করে গাড়ীয়াল
উজানে বাঘের ভয় ।
গাড়ী ধরিয়া গাড়ীয়াল
বাড়ী ফিরিয়া যায় ।
ভাত ও মাগো খাইয়া গাড়ীয়াল
মুখে না দেয় পান,
চালের বাতায় ধরিয়া কন্তা
জুড়িছে কান্দন ।

না কান্দ না কান্দ কন্তা
ভাজিবে রসের গোড়া
আর এক দিন ফিরিয়া আসিলে
সোনা দিয়া বান্ধিবেয়ে গলা ।"

কখনও বা আর থাকতে না পেরে কেঁদেই ফেলে :—

"চ্যাংড়া বন্ধুরে—
আমারে ছাড়িয়া যাবিরে কোথায় ।
তোমার জন্তে ভেইব্যে ভেইব্যে
হইলামরে গাছের বাকল
চ্যাংড়া বন্ধু তুই মোর নয়নের কাজল ।

চ্যাংড়া বন্ধু মোর আউলাইল পরাণ···।"

কখনও বা আপনার মনেই প্রশ্ন করে, তবে সে কি প্রেমপ্রীতি কিছুই জানে না ? তাই যদি না হবে তা হলে তার বন্ধু কেন আসছে না । কি এমন তার অপরাধ ?—

"ওকি ধন ধনরে
তোর শরীলে এতইরে গোঁসা
পিরীতি মুই জান না—
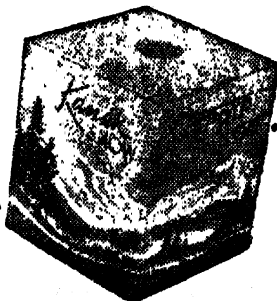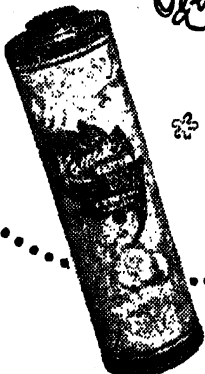
একে ত আন্ধাইরা রাতি
হাউসের (সাধের) বন্ধু আমার
গোঁসা হইয়্যা যায়।"

একদিকে তার প্রাণ-বঁধু অন্যদিকে ঘরের শাশুড়ী-ননদ। শাশুড়ী-ননদের কথা শুনতে গেলে, সংসারধর্ম্ম পালন করতে গেলে বঁধুর সঙ্গে মিলন হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সে হয় ত অভিমানভরে চলেই যাবে। অন্য দিকে বঁধুর সনে মিলতে গেলে সাংসারিক নির্যাতনও কম সহ্য করতে হবে না :

"আমার শ্বশুর করে ঘুশুর মুশুর
ভাশুর করে গোঁসা,
নিদয় হেন স্বামী আইস্যা
ধরল চুলের খোসা।"

দোটানায় পড়ে অস্থির হয়ে উঠেছে তার মনপ্রাণ। তুষের অনলের মত ধিকি করে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত অন্তরাত্মা। অথচ করবারও ত তার কিছুই নেই। বাউদিয়াই বা কি করবে এক্ষেত্রে? সেও ত এই ভাবেই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। মাথার চুল হয়েছে তার সাদা। দৃষ্টি হয়ে আসছে ঝাপসা। পার্থিব সুখ, দুঃখ এখন তার কাছে সব একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু তার পরমাত্মার সন্ধান কি এখনও মিলল না?

শ্রান্ত দেহে উদাস মধ্যাহ্নের উদার মাঠের মাঝে এসে বসে বাউদিয়া। জগৎসংসার সবই তার কাছে মায়া বলে মনে হচ্ছে। এখন সে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে চলেছে। নিজের কাজেরই ফল-ভোগ করতে হচ্ছে তাকে। সুতরাং এজন্যে আর অন্যকে দোষ দিয়ে কি হবে?—

"আপন কর্ম্মদোষে সব হারালি
দোষ দিবি তুই কারে।
মোনরে পূবান পচ্চিমে বাও
রাধা কৃষ্ণের ভাঙ্গা নাও
ঠমকে ঠমকে ওঠে পানী।
মোনরে ইঙ্গলা পিঙ্গলার ঘর
ঘুমে করেছে জড় জড়
খস্যে পড়ল তোর বত্রিশ বান্ধনের জোড়া।

ওপারে কদম্বের গাছ
ঝিল মিল ঝিল মিল করে পাত
তার উপর জোড় বগিলার বাসা।
আহারের লোভেরে জমিনে পরিয়ারে
সেইনা বগা ঠেকলো মায়াজালে।"

সন্ধ্যা নেমে আসে। বাউদিয়া আবার পথ চলতে সুরু করে। হাতের দো-তারা তার তখনও বেজে চলে এক উদাস সুর তুলে। মাঠের পর মাঠ, প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হয়ে যায় সে। দো-তারার সুরে সুর মিলিয়ে সে গেয়ে চলে :

"ওরে জীবন ছাড়িয়া না যাইস মোরে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে আদর করবে কে?
ভাই বল ভাতিজা বল সম্পত্তিয়োরে ভাগী
আগে করবে ধনের আশা
পিছে করবে দেহার গতি।

চিত্রগুপ্তের খাতা লয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী
পরমায়ু শেষ হলে হস্তে দিবে দড়ি।
দুই জনাতে যুক্তি করে আনল ভবের হাটে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলি নিধুয়া পাথারে।"

দেশ-বিদেশের কথা

সাহিত্য-সেবক সমিতি

ঔপন্যাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সেবক সমিতি কলিকাতার একটি বিখ্যাত সাহিত্যালোচনা প্রতিষ্ঠান। বাংলা দেশের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক এই প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন।

সম্প্রতি সাহিত্য-সেবক সমিতির ৪৪তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৩১৭ সনে জনকয়েক সাহিত্যসেবীর উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় মাত্র নয় জন সভ্য লইয়া এই সমিতির গোড়াপত্তন হয়। প্রতিষ্ঠা কাল হইতে আজ দীর্ঘ ৪৩ বৎসর ধরিয়া সমিতি অগ্রগতির পথে চলিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে সমিতির ২৪টি সাধারণ সভা এবং ৭টি কর্ম্মী-সংসদের বৈঠক বসে। তাহাতে গল্প প্রবন্ধ কবিতা নাটিকা ইত্যাদি পঠিত হয় এবং সঙ্গীত সহযোগে বক্তৃতা হয়। ২৯শে বৈশাখ বুধবার শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের ভবনে শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চতুর্নবতিতম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর '৫৪ শনিবার কলেজ স্কোয়ারস্থ ষ্টুডেন্টস হলে ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সমিতির ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৪ সনের ৩১শে অক্টোবর শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের ঢাকুরিয়া শহীদনগর কলোনীস্থ বাসভবনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৬২ সনে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডক্টর সুবোধকুমার সেনগুপ্ত বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ইহার সভাপতি

পদে বৃত হইয়াছেন। এই সমিতির প্রাক্তন সভাপতিগণের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কামিনী রায়, জলধর সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর প্রভৃতি সম্পাদকরূপে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রাধারমণ সম্মিলন সমিতি

গত ২০শে মে ডুমুরদহ ধ্রুবানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাধারমণ সম্মিলন সমিতির ৪১শ বার্ষিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই অনুষ্ঠানে হুগলী জেলাশাসক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য আই. এ. এস মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম. এল. এ., মহোদয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। বর্দ্ধমান রাজ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভুজঙ্গ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ডি-লিট, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি উভয়েই এই পল্লী-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করিয়া এবং পল্লীগ্রামের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। অধ্যক্ষ মিত্র, ডক্টর ভট্টাচার্য্য এবং বিভূতি দত্ত মহাশয়ও বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সভাপতির ভাষণে জেলাশাসক মহাশয় ডুমুরদহ গ্রামটিকে বাংলার একটি বিশেষ পুণ্যতীর্থ বলিয়া মন্তব্য করেন। এই পল্লীর সংগঠনে উত্তমাশ্রমের আচার্য্য শ্রীমদ্‌ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের কর্ম্মতৎপরতা শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হয়।

কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় একটি বাণী প্রেরণ করেন।

সভার কার্য্য শেষ হইলে প্রসিদ্ধ বেতারশিল্পী শ্রীশশাঙ্কমোহন সিংহ মহাশয় সদলে শ্যামাসঙ্গীত ও পল্লীগীতি গাহিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৮৫২-১৯৫২)—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং 'বাংলার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', 'বাংলার লোকসাহিত্য', 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা। এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ। কলিকাতা-১২। মূল্য পনর টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলায় ধারাবাহিক ভাবে আধুনিক ধরনের নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই ইহার সূচনা হইলেও সে সময় হইতে ইহা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন ধারার সাহিত্যেরও বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ নেপালে যে কয়খানি বাংলা নাটকজাতীয় গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে সেগুলি ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন বাংলা নাটকের সন্ধান এ পর্য্যন্ত মেলে নাই। মনে হয়, এই কারণেই গ্রন্থকার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে তাঁহার গ্রন্থের সূত্রপাত করিয়াছেন। দীর্ঘ একশত বৎসর যাবৎ বাংলা নাটকের ইতিহাসে ক্রমবিবর্ত্তনের যে ধারা পরিলক্ষিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থকার প্রদান করিয়াছেন। বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার আলোচ্য বিষয়কে তিনটি যুগে ভাগ করিয়াছেন—আদিযুগ (১৮৫২-১৮৭২), মধ্যযুগ (১৮৭৩-১৯০০), আধুনিক যুগ (১৯০১-১৯৫২)। আধুনিক যুগের শেষে অতি আধুনিক যুগের আলোচনা করা হইয়াছে। যাত্রা, গীতাভিনয়, অপেরা প্রভৃতি নামে পরিচিত এক বিশাল সাহিত্য বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক মস্ত বড় অংশ জুড়িয়া আছে। দুঃখের বিষয়, উহার কোনও বিবরণ বা পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থশেষে দুইটি পরিশিষ্ট আছে। একটিতে ১৮৫২ সন হইতে ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাংলা নাটকের কালানুক্রমিক তালিকা ও অপরটিতে শব্দসূচী বা আলোচিত গ্রন্থ, গ্রন্থকার প্রভৃতির নামের সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্ট দুইটিই পাঠকদের বিশেষ কাজে লাগিবে। বাংলার নাট্যসাহিত্য আলোচনায় গ্রন্থখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্র-দর্শন—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য দুই টাকা।

কাব্য এবং দর্শন দুইয়ের বিচরণ ক্ষেত্র পৃথক। বিভিন্ন দেশের কবি, দার্শনিক এবং সমালোচকেরা এই দুই বস্তুকে মিলাইয়া দেখিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে কবির সৃষ্টি সুসংবদ্ধ নহে, প্রমাণের অপেক্ষাও রাখে না—স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ ফেনপুঞ্জের সমষ্টি মাত্র। তাহা একক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অপর পক্ষে দার্শনিক যুক্তি বিচারের আলো জ্বালাইয়া ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাবভূমিকে আবিষ্কার করিতে ভালবাসেন। তথাপি যাঁহার রচনার পরিমাণ বিপুল, বহু বিচিত্র কল্পনা ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া জীবন স্রোতকে ধ্বনি ও বেগ-মুখর করিতে যিনি দক্ষ—তাঁহার কবিকৃতির সঙ্গে জীবন-প্রীতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধটি কোন্ সূত্রে কেমন করিয়া নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে—তাহার গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিবার প্রয়াস সুধীজনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে দর্শনের নিকষপাথরে ফেলিয়া যাচাই করিবার চেষ্টা বহু জনে করিয়াছেন। তাহার সব কয়টিই যে পাঠক সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে এমন নহে। দর্শনের দুরূহ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা কোথাও কবিকে, কোথাও বা তাঁহার সৃষ্টিকর্মকে রীতিমত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সুখের বিষয়, আলোচ্য গ্রন্থখানি ইহার ব্যতিক্রম। ইহার প্রধান গুণ নিত্যদৃষ্ট সহজ উপমার সাহায্যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দিবার প্রয়াস। লেখার প্রাঞ্জলতাও সহজ বোধ্যতার অন্যতম উপকরণ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে তাঁহারই সাহিত্য কর্ম্মের (কাব্যে ও প্রবন্ধে) মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করায় রবীন্দ্র-দর্শন তত্ত্ব সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য হইয়াছে। দর্শনের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করিয়াছেন লেখক। বস্তু পরিচয়, দর্শনের মার্গ, বিশ্বের রূপ, সত্যোপলব্ধি, মানুষের ধর্ম্ম এই কয়টি অধ্যায় ছাড়াও দর্শন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনা একটি অধ্যায়ে রহিয়াছে। এই অধ্যায়গুলিতে রবীন্দ্র-দর্শনের মূল চিন্তাধারা, অনুভূতি ও মননমার্গের বিশ্লেষণ, অনুভূতিমার্গের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্বের হেতু, সর্ব্বেশ্বরবাদ প্রতীতি প্রভৃতি সংক্ষেপে সহজ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনায় লেখকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের সঙ্গে কবি-জীবনের গভীর যোগসূত্রটি এই আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেবা ও প্রেমের শক্তিতে মানুষ যে পরম সত্তার পূর্ণ রূপটিকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহার দ্বারাই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যুক্তিক্ষেত্র প্রস্তুত

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই
লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
L. 261-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

হইয়া উঠে—রবীন্দ্র-দর্শনের এই সহজ সত্যটিকে দৃষ্টান্ত, যুক্তি ও ব্যাখ্যার দ্বারা বোধগম্য করাইয়া দিয়াছেন লেখক।

রবীন্দ্র-সমালোচনা-সাহিত্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জতুগৃহ—শ্রীসুনীল দত্ত। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২১। দাম এক টাকা আট আনা।

একখানি বিয়োগান্ত পঞ্চাঙ্ক নাটক। অঙ্কগুলি দৃশ্যাবলীতে খণ্ডিত নয়। শ্রমিকসাধারণের অবস্থার উন্নতির আন্দোলনকে ভিত্তি করে নাটকখানি রচিত। নাটকে চরিত্র আছে নয়টি। সেগুলির মধ্যে নারী চরিত্র মাত্র একটি। চরিত্রগুলি সাধারণ ও জীবন্ত। এই ধরনের নাটকাভিনয়ের জন্য মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যাবলী ও সাজপোশাকের আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। নাটকের ভাল-মন্দ বেশির ভাগই অভিনয়ের উপর নির্ভরশীল। দর্শকগণের ভাল লাগা, তাদের চিত্তকে প্রভাবিত করার মধ্যেই তার সার্থকতা। নাটকের প্রাণবন্ত চিত্তচমৎকারী, সংলাপ ও নাটকীয় দৃশ্যাবলী যার খুব বড় একটা অভাব আলোচ্যমান নাটকখানিতে নেই।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। দি বুক এক্সচেঞ্জ, ২১৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ১১৬। মূল্য দুই টাকা।

দুই বৎসর এগার মাস সতর দিনের আলোচনার পর ১৯৪৯ সনের ২৬শে নভেম্বর ভারতের শাসনতন্ত্র গণপরিষদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী হইতে কার্য্যকরী হয়। এই শাসনতন্ত্র রচনায় ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারত একটি ধর্ম্মনিরপেক্ষ সার্ব্বভৌম গণতন্ত্ররাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতি ইহার অধিনায়ক হইলেও তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শমত কার্য্য করিয়া থাকেন। মন্ত্রিমণ্ডলী যতদিন পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন থাকেন ততদিনই রাষ্ট্রশাসন করিতে পারেন। ভারতরাষ্ট্র আবার কয়েকটি উপরাষ্ট্র বা রাজ্য বা প্রদেশে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকেরই আবার আইন সভা, রাজ্যপাল প্রভৃতি রহিয়াছে। রাষ্ট্রের কাঠামো অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল), কিন্তু ঠিক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত নহে। আবার ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেকটা ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মত। বর্ত্তমান সময়ে রাজ্যগুলিকে নূতন করিয়া গড়া হইতেছে এবং এজন্য গঠনতন্ত্রের সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে। ১৯৫৫ সন পর্য্যন্ত (চতুর্থ সংশোধন) সংশোধন এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। গঠনতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা আছে অথচ দেশে গণশিক্ষা অনগ্রসর ইহাই দেশের একটা গভীর সমস্যা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষা সম্পর্কীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিবার বিপুল চেষ্টা চলিতেছে।

আলোচ্য পুস্তকখানি মূল ইংরেজী গ্রন্থের শুদ্ধ অনুবাদ। ভূমিকায় গ্রন্থকার শাসনতন্ত্রের ইতিবৃত্ত, রূপ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠকগণের কাজে লাগিবে। এরূপ পুস্তকে ব্যবহৃত পরিভাষার একটি তালিকা থাকিলে পাঠকের সুবিধা হয়। আশা করি, গ্রন্থকার ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা করিবেন। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রতন্ত্রের যে বৃহৎ সংশোধন চলিতেছে পুস্তকের ক্রেতাদের সুবিধার জন্য তাহা পৃথক ভাবে মুদ্রিত করিয়া যথাসময়ে বিতরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমরা পাঠকগণের বিশেষতঃ ছাত্রগণের মধ্যে ইহার বিপুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কাশ্মীর—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৲ টাকা।

ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু পুস্তকখানিতে শুধু ভ্রমণ-বৃত্তান্তই স্থান লাভ করে নাই—কাশ্মীরের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কথাও ইহাতে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা সহজগতিসম্পন্ন। ভ্রমণলিপ্সু ব্যক্তিদের নিকট এই তথ্যবহুল পুস্তকখানি "গাইড বুক" হিসাবে গণ্য হইতে পারে। উনসত্তরখানি ছবি পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ছাপা মোটেই ভাল হয় নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সুচিত্রা সেন পছন্দ করেন লাক্স
টয়লেট সাবান
এর
শুভ্রতা ও বিশুদ্ধতার
জন্য।
সুচিত্রা সেনের সৌন্দর্য্যের উৎস
আমি করি।"
LUX
TOILET SOAP
বিমল রায়ের "দেবদাস"
এর মনোমোহি অভিনেত্রী
চিত্র-তারকাদের বিশুদ্ধ শুভ্র সৌন্দর্য্য সাবান

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃ. ৬৬। মূল্য এক টাকা।

পুস্তকখানি বাংলার শিশু ও কিশোরদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। বালক-বালিকারা ইতিহাস-পুস্তকে চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কতটুকুই না জানিতে পায়। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাঁহার জীবন ও কর্ম্মকথা সরল ভাষায় গল্পের মত করিয়া বলা হইয়াছে। পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বাংলার স্ত্রীশিক্ষা—(তত্ত্ব ও প্রয়োগ)—শেফালিকা শেঠ। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃ. ১২+২২৪+২৮। মূল্য দুই টাকা।

লেখিকা স্বদেশ এবং বিদেশের শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া বাঙালী মেয়েদের নিমিত্ত শহর হইতে দূরে, প্রাকৃতিক নিরালা পরিবেশে 'মা লক্ষ্মীর আলয়' নাম দিয়া একটি আদর্শ স্ত্রীশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবেন এইরূপ বাসনা ছিল। শুধু বাসনা বলিলে ভুল হইবে, এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনাও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, পরিকল্পনা রচনা শেষ করিয়াই, লণ্ডন ত্যাগের পূর্ব্বে, ১৯৫৪ সনের ৩১শে আগষ্ট মারা যান। তদ্রচিত পরিকল্পনাই আলোচ্য পুস্তকের বিষয়-বস্তু।

লেখিকা পরিকল্পনাটি মুখ্যতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন: (১) মা লক্ষ্মী আলয়ের কর্ম্মপন্থা এবং (২) মা লক্ষ্মী আলয়ের জ্ঞানপন্থা। 'প্রস্তাবনা'য় তিনি মোটামুটি মূল উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। পরিকল্পনার প্রথম ভাগে গৃহস্থালী, শিল্পকলা, স্বাস্থ্যচর্য্যা, বস্তুজ্ঞান, প্রকৃতি পরিচয়, পদার্থতত্ত্ব এবং সঙ্গীত এই ছয়টি বিষয়ের মূল কথা এবং শিক্ষার বিষয় লেখিকা আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে আছে—উপকথা, বঙ্গভাষা, উপভাষা, মাতৃভূমি (ইতিহাস ও ভূ-বৃত্তান্ত), গণিত, উচ্চশিক্ষা, উচ্চশিক্ষায় ঐচ্ছিক বা নির্ব্বাচনী বিষয়াবলী বিষয়ক আলোচনা ও শিক্ষার নির্দ্দেশ। বর্ত্তমানে শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা যে ঢালিয়া সাজা আবশ্যক একথা চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এ সময়ে এই পুস্তকখানিতে সন্নিবদ্ধ পরিকল্পনাটি শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষাব্যবস্থাপকগণের বিশেষভাবে চিন্তার খোরাক যোগাইবে। এই প্রসঙ্গে মনীষী-প্রবর ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর *National Education and Modern Progress* পুস্তকখানিও তাঁহাদের পড়িয়া দেখিতে বলি। তিনি ছেলেদের শিক্ষার কথা বলিলেও ব্যবস্থা বা প্রণালী মেয়েদের বেলায়ও হয়ত খানিকটা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে পরিশিষ্ট এবং গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রনাথ শেঠ লেখিকার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা গ্রন্থারম্ভে দিয়াছেন। লেখিকা এই পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে বিদুষী শ্রীইন্দিরা সরকারের সহযোগিতা লাভের আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা পূর্ণ হউক এই কামনা।

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ—শ্রীঅমল হোম। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা ৭৮। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি স্বল্পপরিসর: কিন্তু ইহাতে যে ক'টি বিষয় সন্নিবেশিত ও আলোচিত হইয়াছে তাহা আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমানে স্বাধীনতার ইতিহাস রচনায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের অন্ত নাই। সে ক্ষেত্রেও পুস্তকখানি হইতে যথেষ্ট অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাতপূর্ব্ব উপাদান লাভ করা যাইবে। প্রধান চারটি এবং অ-প্রধান তিনটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রকথা নানা দিক হইতে আলোচিত হইয়াছে। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, কেরাণী রবীন্দ্রনাথ, জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নাইটহুড উপাধি ত্যাগ ও এই বিষয়ক পত্র, অমৃতসর কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রভৃতি রবীন্দ্রজীবনের রবীন্দ্র-সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকে যেমন আলোক সম্পাত হইয়াছে তেমনি আমাদের তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অবাঞ্ছনীয় মনোভাবের কথাও বিবৃত হইয়াছে। পঞ্জাব অনাচারের সময়ে লেখক লাহোরের সুবিখ্যাত 'ট্রিবিউন' দৈনিকের সম্পাদনায় কিছুকাল লিপ্ত ছিলেন। এই সময়কার কলিকাতা-পঞ্জাব-দিল্লী এবং অমৃতসর কংগ্রেসের কথা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আলোচনা করায় ইহা বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছে। রবীন্দ্র-কথা আলোচনা করিতে গিয়া লেখকের নিজের কথাও কিছু কিছু আসিয়া পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের চিঠিখানিও পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথকে যেন আমাদের চোখের সম্মুখে আবার ধরিয়া দিয়াছে। 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। পুস্তকখানির বহুল প্রচার আশা করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

যশোদা-দুলাল

শ্রীমায়া দাস

জল্‌কে চল্‌

জীবে প্রেম [ফোটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
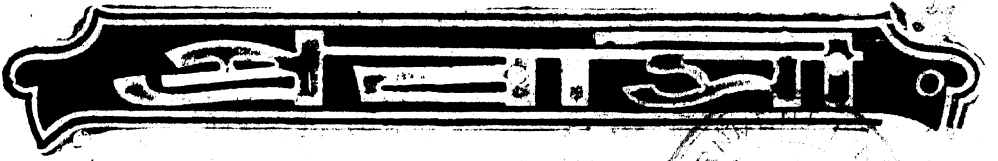
৫৬শ ভাগ ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৬৩ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্কুল ফাইনালের ফলাফল

এইবারের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল অনেক বিষয়ে আমাদের চিন্তার কারণ যোগাইয়াছে। তাহার সম্যক্ বিচার কোথাও হইতেছে কিনা জানি না, কিন্তু হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরীক্ষা দিয়াছিল ৭০৯৪৯ জন। ইহাতে হয় ত অনেকে একটু আশার আলোক দেখিবেন, কেননা ৭০৯৪৯ জন ছেলেমেয়ে স্কুল ফাইনাল পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়াছে ইহাও একটা কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শিক্ষালাভ করিয়াছে কয়জন ?

মোটামুটি ৪৫০০০ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলে নিয়মমত পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াছে এবং ২৫৯৭০ জন প্রাইভেট শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষা দেয়। রেগুলার ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৫৫·১ ও প্রাইভেটদিগের শতকরা ৩৬·৬ জন পাস হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩৫০০০ ছেলেমেয়ে পাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পাসের ব্যাপারেও অনেকে আশার চিহ্ন দেখিবেন, কেননা গতবার অপেক্ষা এবারে রেগুলার ছাত্রছাত্রীগণ শতকরা প্রায় ৭ এবং প্রাইভেট প্রায় শতকরা ১০ বেশী পাস করিয়াছে।

কিন্তু কিভাবে পরীক্ষার মান নামাইয়া এই সকল পরীক্ষার্থী-দিগকে পার করাইবার চেষ্টা হইয়াছে তাহার পরিচয় আমরা পাই যখন খোঁজ লওয়া যায় যে, ঐ ৩৫০০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কোন কোন শ্রেণীতে কতগুলি পাস হইয়াছে।

দেখা যায় যে, প্রথম শ্রেণীতে মাত্র কয়েকশত পাস করিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও সামান্ত কয়েক হাজার। সুতরাং পাসের মধ্যে শতকরা ৮০-৯০ জন কোনক্রমে তৃতীয় শ্রেণীতে ঢুকিয়া স্কুললীলা সাঙ্গ করিয়া পিতৃকুল-মাতৃকুলকে ধন্ত করিয়াছে।

এবারে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যেরূপ সহজ হইয়াছিল, এবং পরীক্ষক-গণকে যেভাবে পাস করাইতে বলা হইয়াছিল, উপরন্তু যেভাবে গ্রেস-মার্ক ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, অন্ততঃ শতকরা ৭৫ জন পাস করিবে এবং তাহার মধ্যে অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ প্রথম শ্রেণীতে ও অর্দ্ধেকের উপর দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইবে, যেরূপ বহু পূর্ব্বেকার দিনে এণ্ট্রান্স ও ম্যাট্রিকে হইত। তাহার স্থলে এই অপরূপ ফল!

বলা বাহুল্য এইরূপ সহজ পরীক্ষায়ও যাহারা ফেল হইয়াছে তাহাদের শিক্ষা, শিক্ষক ও পাঠাভ্যাস, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব কিছুই অপরূপ। আমাদের শুধু জানিতে ইচ্ছা করে যে, কি ভাবিয়া তাহাদের পরীক্ষায় পাঠানো হইয়াছিল। যদি শতকরা দশ-বিশটি ফেল হইত তবে না হয় বুঝিতাম যে, অনেক ছাত্রের মধ্যে কিছু কাঁচামাল পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যেখানে অর্দ্ধেকের মত ফেল ও পাসের মধ্যে শতকরা ৯০ জন কোনক্রমে পার, সেখানে বলিতেই হইবে যে যাঁহারা এইরূপ ছাত্রছাত্রীদিগকে পরীক্ষার উপযুক্ত বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই শিক্ষাসম্বন্ধে জ্ঞান অতি হীন বা অসম্পূর্ণ।

বস্তুতঃপক্ষে বাঙালী জাতির সর্ব্বনাশের আকর দাঁড়াইয়াছে এই পাসের মোহ। শিক্ষাদানের যোগ্য ব্যবস্থা নাই, ছাত্রছাত্রীদের পাঠে মন নাই এবং শিক্ষালাভ বা বিদ্যার্জ্জনে কোনও উৎসাহ বা চেষ্টা নাই। সর্ব্বোপরি ছাত্রজীবনের যেটি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ সেই "ডিসিপ্লিন" বা বিনয়, যাহাতে চরিত্রগঠন ও মেধার উৎকর্ষসাধন দুই-ই হয়, সেদিকে কাহারও বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই। তবে এই শিক্ষার মূল্যই বা কি এবং ইহাতে কোন কাজের যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় ?

বাঙালী ছেলেমেয়েদের শরীর দুর্ব্বল। দৈহিক ক্লেশ বা কঠোর পরিশ্রম তাহারা সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং কায়িক পরি-শ্রমের ক্ষেত্রে বাঙালী হটিয়াই চলিতেছে। ছিল একমাত্র ভরসা মানসিক প্রখরতায় ও তীক্ষ্ণ মেধায়। তাহাও যদি এই ভাবে অবনতির পথে চলে তবে জাতির ভবিষ্যৎ যে কি অন্ধকার তাহা কি বলা প্রয়োজন ?

একথা তো আমরা সকলেই জানি যে, স্কুল-কলেজের নির্দ্দিষ্ট ধাপে যে পা দিয়াছে, সে ক্রমেই জীবিকানির্ব্বাহের অন্ত সকল পথ হারাইয়া একমাত্র বুদ্ধিজীবীর বৃত্তির কথা ভাবিতে পারে। যখন সে উচ্চতম সোপানের দিকে অগ্রসর হয় তখন তাহার ক্ষেত্র শুধু সঙ্কুচিত নহে বরঞ্চ অতি কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। এবং যে প্রতিযোগে

হোঁচট খাইয়া কোনক্রমে সব কয়টি সোপান পার হইয়াছে, তখন তাহার সম্মুখে জীবনযাত্রার অন্য সকল পথই প্রায় রুদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে যাহারা কঠিন প্রতিযোগিতায় যুঝিতে সক্ষম বা যাহাদের দেহমন দৃঢ় ও সুগঠিত তাহারাই উচ্চশিক্ষার ফল অর্জ্জনে সফল হয়, একথা তো সর্ব্বজনবিদিত।

একদিন ছিল যখন ভারতে বাঙালীর প্রতিযোগী ছিল অল্প পারসী এবং মান্দ্রাজী। সকল পেশায় ও চাকুরীতে বাঙালীকে প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছে ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত। ইংরেজ সিভিলিয়ান, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যবহারাজীব, প্রফেসার ইত্যাদিকে হটায় বাঙালী। এবং ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীর কর্ম্মক্ষেত্রও প্রসারিত হয় সারা ভারতবর্ষে।

সেইদিন বাঙালী যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল তাহার পিছনে ছিল অধ্যবসায় ও **একাগ্র চিত্তে শিক্ষার সাধনা।** ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি যে তখন বাঙালীর ছিল না তাহা নয়, কেননা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবিবৃত্তিতে তাহার পরিচয় অনেক পাওয়া যায় এবং সেই অধর্ম্মে অর্জ্জিত টাকাই "বনেদী বাঙালী"কে চূড়ান্ত অধঃপতনের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুনর্ব্বার বলি, বাঙালীর সকল গৌরব, সকল খ্যাতির মূলে ছিল বিদ্যার একাগ্র সাধনা। একমাত্র এই সাধনার ফলেই বাঙালী বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, ইতিহাসে, চিকিৎসায়, এককথায় সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে, যশঃগৌরব অর্জ্জন করিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে অর্থাগমও হইয়াছে প্রচুর।

সেইজন্যই উচ্চশিক্ষার পথে বাঙালীর এত আগ্রহ ছিল এবং এই কারণে সে অন্য সকল পথ অপেক্ষা এই মার্গই নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য প্রশস্ত মনে করে।

এই পথ পছন্দের কারণ আরও একটি ছিল ও আছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং যন্ত্রাদিযোগে কলকারখানায়, শারীরিক পরিশ্রম, এবং তৎসঙ্গে প্রথমে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়। শিক্ষার সোপানে দাঁড়াইয়া বাঙালী যখন দেখিল যে, বুদ্ধির ও শিক্ষার পথে ঐ কায়ক্লেশ এড়াইয়া চলা যায় তখন সে ক্রমেই অধিক সংখ্যায় এদিকেই চলিতে লাগিল। এমনকি, বাঙালী ছুতার, কর্ম্মকার, কারুবৃত্তিজীবী সকলেও ধীরে ধীরে নিজের পিতৃ-পিতামহের বৃত্তি ছাড়িয়া মসীজীবী বা বাক্যজীবী হইতে লাগিল। ফলে, চাকুরীর বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

বাঙালী যন্ত্রচালনায় ও শিল্পকৌশলেও প্রথম দিকে অশেষ খ্যাতি লাভ করে। বাঙালী মিস্ত্রী এই সেদিনও রেলওয়ে কারখানায়, জাহাজঘাটায় ও যন্ত্রশিল্পাগারে পেশোয়ার হইতে রেঙ্গুন—এমনকি বম্বোয়া হইতে হংকং-সাংহাই পর্য্যন্ত—খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। জামসেদপুরের লৌহ-ইস্পাত কারখানায় ইংরেজ ও আমেরিকানের পরেই বাঙালী প্রতিষ্ঠালাভ করে ও খ্যাতির সহিত কাজ করিয়া প্রচুর অর্থাগম করে।

কিন্তু এই শ্রমকৌশলজীবী বাঙালীও ছিল সাধক। ফাঁকি, চাতুরী ও ছলনা তাহাদের মধ্যে খুবই কম দেখা যাইত। আজ বাঙালী মিস্ত্রীর কুখ্যাতি যে কত সে কি বলা প্রয়োজন? তাহাকে কেহই চায় না কেন সে ত সকলেই জানে।

যাহাই হউক, বাঙালীর শ্রমবিমুখতার কারণেই হউক বা তাহার বুদ্ধির প্রাচুর্য্যেই হউক, ক্রমে ক্রমে আজ তাহার জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র পথ দাঁড়াইয়াছে তাহার শিক্ষা ও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি। তবে সে এখন ভুলিয়া গিয়াছে যে, বুদ্ধিবৃত্তির সহিত যদি শিক্ষা ও বিনয়—অর্থাৎ ডিসিপ্লিন—না থাকে তবে সেই বুদ্ধি শুধু অধঃপতন ও সর্ব্বনাশের কারণ দাঁড়ায়। বর্ত্তমান জগতে শ্রম-বিমুখ গোমূর্খের অন্নসংস্থানের কোনও পথ নাই একথা বাঙালী যুবক-যুবতীর ও তাহাদের অভিভাবকবর্গের জানা নিতান্তই প্রয়োজন। শুধু সুপারিশ ও খুঁটির জোরে বা "আমাদের দাবি মানতে হবে" চীৎকারে একটি সমগ্র জাতির অন্নসংস্থান অসম্ভব। উপর-চালাকীতে কাজ জুটিতেও পারে কিন্তু সে কাজ টিঁকিতে পারে না, যতই উৎপাত বা ষ্ট্রাইক হউক না কেন। ঐরূপ উপদ্রবের ফলে কলকারখানা হইতে বাঙালীর স্থান গিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলিও সরিয়া গিয়াছে।

সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙালী-বিদ্বেষের কারণে আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ পায় না, একথা চতুর্দ্দিকেই শুনা যায়, এবং আমরাও তাহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু কিছুদিন যাবত ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অংশ লওয়ার কারণে অর্জ্জিত যে অভিজ্ঞতা, তাহার ফলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ঐ অভিযোগ অতি খেলো ভিত্তির উপর স্থাপিত। অবশ্য একথা সত্য যে, প্রাদেশিকতা সর্ব্বপ্রদেশের লোকের মধ্যেই প্রবল—যদিও বাঙালীই সেটা দোষ মনে করে—এবং তাহার ছায়া সকল পরীক্ষায়ই দেখা যায়, কিন্তু অতি সীমাবদ্ধ ভাবে।

কিন্তু আজ প্রত্যেক প্রদেশেই শিক্ষার মান উচ্চে উঠিতেছে—শুধু এক বাংলায় তাহা ধাপে ধাপে নামিয়াই চলিতেছে। ইহারই ফলে কঠোর প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী হটিতেছে। আমরা আট-দশটি পরীক্ষায় বাঙ্গালীর অকৃতকার্য্য হওয়ার কারণ যাহা প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখিয়াছি তাহা শুধু বিদ্যার অভাব ও জ্ঞানের অভাব। উপরন্তু, শিষ্টাচার জ্ঞানের অভাবও এরূপ দেখিয়াছি যে, অন্য পরীক্ষক-দিগের অবজ্ঞার হাসিতে আমাদের মাথা হেঁট হয়।

আজ সকল ক্ষেত্রেই সর্ব্বভারতের প্রার্থীদিগের কঠোর প্রতি-যোগিতা। সেখানে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ফাঁকিবাজের স্থান কোথায়? এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সচেতন হওয়া প্রয়োজন অভি-ভাবকদিগের। যাঁহাদের সন্তান ফেল বা তৃতীয় শ্রেণীতে পাস হইয়াছে, তাঁহাদের যদি বুদ্ধি-বিবেচনা কিছুমাত্র প্রয়োগ করার সময় থাকে তবে তাঁহাদের চিন্তা করা প্রয়োজন যে, এরূপ সন্তানের ভবিষ্যৎ কি এবং সে বিষয়ে তাঁহাদেরই বা কর্ত্তব্য কি?

যে ছেলে গোড়াতেই এইরূপ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছে, তাহার এইরূপ অবস্থার কারণ কি তাহা নির্ণয় করিয়া সময়মত

তাহার সংশোধন ও ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমের যোগ্যতা অর্জ্জনের পথ-নির্দ্দেশ এই দুই-ই অবিলম্বে করা প্রয়োজন। নহিলে সে উচ্ছন্নে যাইবেই যাইবে।

অভিভাবকদিগের জানা উচিত যে, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের সৎপরামর্শ দিবার ও ভবিষ্যতের জীবনপথের ব্যবস্থা করার লোক একমাত্র তাঁহারাই। তাঁহাদের সন্তানদিগকে উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল মূর্খে পরিণত করার সহায়ক পথে-ঘাটে, স্কুলে-কলেজে অসংখ্য। উপরন্তু, তাহাদের মস্তক চর্ব্বণে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও উদরপূর্ত্তি-কারক রাষ্ট্র-ধ্বংসবাদী রহিয়াছেই।

সেদিন একটি বাঙালী যুবক তর্কের প্রসঙ্গে সজোরে বলে যে, যে লোক কার্য্যক্ষম ও যোগ্য সে বেকার থাকিতেই পারে না। কথাটা আজিকার দিনে ষোল আনা সত্য না হইলেও চৌদ্দ আনা সত্য নিশ্চয়। অন্যদিকে অলস, ফাঁকিবাজ ও অশিক্ষিতের কার্য্য-সংস্থান আজ প্রায় অসম্ভব। এটা আমাদের সকলের বুঝা উচিত।

এদেশে হরতাল

এদেশে অকারণে হরতাল কি ভাবে চলে তাহার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা ২৩শে আষাঢ়ের হরতাল:

"রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার ন্যূনতম দাবীর প্রতি উপেক্ষা ও অবিচারের প্রতিবাদে শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে হরতাল পালিত হয়।

বিগত ছয় মাসের মধ্যে অনুরূপ উদ্দেশ্যে এইবার লইয়া রাজ্যব্যাপী তিন বার হরতাল হইল। কিন্তু পূর্ব্বেকার দুইবারের তুলনায় কলিকাতায় এবারকার হরতাল তেমন সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বব্যাপী হয় নাই বলা যায়। তবে খাস শহর অপেক্ষা শহরতলী অঞ্চলগুলিতে হরতাল অপেক্ষাকৃত ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে।

রেলপথে কলিকাতা মহানগরীর সহিত অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। একেবারে ভোরের দিকে হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে কয়েকটি ট্রেণ আনাগোনা করে বটে, কিন্তু শহরতলী অঞ্চলে জনতা রেলপথে বসিয়া পড়ায় অথবা পথরোধ করায় সকাল সাতটার পর হইতেই নির্দ্দিষ্ট ট্রেণগুলির যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়।

দমদম বিমান ঘাটিতে বিমানের আনাগোনা স্বাভাবিক থাকে।

শহরের অভ্যন্তরে যানবাহনের দিক হইতে একমাত্র খিদিরপুর রুট ছাড়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত সারাদিনে আর কোন রুটে ট্রাম চলাচল করে নাই। খিদিরপুর রুটে স্বল্পসংখ্যক যাত্রী লইয়া সকাল দশটার পর স্বাভাবিক অপেক্ষা অর্দ্ধেক সংখ্যক ট্রাম আনাগোনা করে।

বেসরকারী বাস একটিও চলে নাই। কিন্তু রাজ্য পরিবহন বিভাগীয় মোট ৩০০ বাসের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক সরকারী বাস স্বল্পসংখ্যক যাত্রী লইয়া কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট রুটে চলে। অন্যান্য রুটেও সরকারী বাস চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু মধ্য কলিকাতায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটে সরকারী বাসের উদ্দেশ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে বাস-চালক আহত হয়। তাহাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই সম্পর্কে পুলিস ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। ফলে শ্যামবাজার ও অন্যান্য রুটে আর বাস চলে নাই।

ইটপাটকেল নিক্ষেপ, পিকেটিং, পথরোধ ইত্যাদি নানা অভিযোগে এইদিনে কলিকাতায় প্রায় ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।"

বামপন্থী দেশে হরতাল

পোলাণ্ডের পোজনান নগরের শ্রমিকেরা খাদ্যের অভাবে বিক্ষোভ করায় কি ঘটে তাহার বিবরণ নিম্নস্থ সংবাদে পাওয়া যায়:

"লণ্ডন, ২৯শে জুন—পোলিশ সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদে প্রকাশ, গতকাল পশ্চিম পোল্যাণ্ডের পোজনান শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে মোট ৩৮ জন নিহত ও ২৭০ জন আহত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে পোলিশ সৈন্য ও নিরাপত্তা বিভাগের লোকজনও আছে। আজ সকালে অধিকাংশ শ্রমিক কারখানায় কাজে যায় এবং ট্রলি এবং বাস চলাচল পুনরায় আরম্ভ হয়।

গতকালের দাঙ্গাহাঙ্গামার পর আজ শহরের অবস্থা শান্ত আছে। আজ সকালে এখানকার আন্তর্জাতিক মেলাও যথারীতি বসে। উহাতে ব্রিটেন ও অন্যান্য ৩৪টি দেশ অংশ গ্রহণ করিতেছে।

প্রকাশ, পোজনানের ষ্টালিন কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্বে হাঙ্গামাকারীরা 'আমরা খাদ্য চাই' ধ্বনি করিয়া রাস্তা পরিক্রমা করিতে থাকে। তাহারা সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী এক স্থান হইতে অন্যত্র গমনাগমন করে। যখন তাহারা একটি পুলিস সদর দপ্তরের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের উপর গুলী চালান হয় এবং ট্যাঙ্ক আমদানী করার পর হাঙ্গামা বন্ধ হয়।

গতকাল হাঙ্গামার পর শহরে রাত্রি নয়টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত কার্ফ্যু জারী করা হয়। সৈন্যদল ও পুলিস রেলষ্টেশন ঘেরাও করিয়া রাখে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ১৫ হাজার শ্রমিক হাঙ্গামায় যোগ দেয়।"

হরতালের গুরুত্ব

বিগত ২৩শে আষাঢ় আনন্দবাজার "অর্থহীন হরতাল" শিরোনামায় এক সুচিন্তিত সম্পাদকীয় প্রকাশিত করেন। সংবাদপত্রের যে একটি প্রধান কর্ত্তব্য বিভ্রান্ত জনমতকে পথনির্দ্দেশ করা, একথা এত দিনে ইঁহারা সাহসে ভর করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানাইয়া তাহার একটি অংশ আমরা নীচে দিলাম। তবে আমাদের মতে এরূপ হরতাল কেবল অর্থহীন নয়। উহার অর্থ বাঙালী জাতির ধ্বংসসাধন:

'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বঙ্গ-বিহার ভূমি হস্তান্তর বিলের আলোচনা উপলক্ষ্যে যে হরতাল আহ্বান করা হইয়াছে তাহার অসমীচীনতা প্রদর্শন করিয়া শহরের প্রায় সকল সংবাদপত্র একযোগে তাহাতে আপত্তি জানাইয়াছে এবং উদ্যোক্তাদিগকে এই অবিবেচনা-

প্রস্তুত প্রয়াস হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু এই সমবেত অনুরোধ সত্ত্বেও উদ্যোক্তারা নিবৃত্ত হইতে সম্মত হন নাই। বরং যাহারা অনুরোধ করিয়াছিল তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি কটূক্তি বর্ষণ করা হইয়াছে। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতেছেন সকলেরই তাহা চাওয়া উচিত। সুতরাং যাহারা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিবে তাহারা আক্রমণের পাত্র হইবে বৈকি? নিজেদের ইচ্ছাটাকে তাঁহারা এত অতিরিক্ত মাত্রায় বড় করিয়া তুলিয়াছেন যে, জনসাধারণের দিকটা দেখিতে পাইতেছেন না এবং আপনাদের আচরণের অসঙ্গতিও উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিলের আলোচনা শুক্রবারেই শেষ হইয়াছে।

হরতালের উদ্যোক্তা দুই কমিটি—একটি, বামপন্থীদিগের "ভাষাভিত্তিক কমিটি" এবং অন্যটি, বামপন্থী, হিন্দুমহাসভা, জনসঙ্ঘ, ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী প্রভৃতির পাঁচমিশালী "রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি।" উভয় কমিটি বলিয়াছেন, ভাষাভিত্তিক দাবীর জন্য তাঁহারা হরতাল আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি কিরূপ অর্থহীন এবং হরতাল আহ্বান কিরূপ উদ্দেশ্যহীন তাহা এই দুই কমিটির দাবীর পরস্পরবিরোধিতা লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধি হইবে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি বলিতেছেন, তাঁহারা ত্রিপুরা চাহেন, কাছাড় চাহেন, গোয়ালপাড়া চাহেন এবং আন্দামান চাহেন; বামপন্থী কমিটির লোকেরা বলিতেছেন, তাঁহারা এইগুলির কোনটিই চাহেন না। কেবল ইহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে প্রধানেরা বলিতেছেন, এইগুলি দাবী করা, "জমিদারী দখলের মনোবৃত্তি" ছাড়া আর কিছুই নহে। যেখানে দুই কমিটির মধ্যে এইরূপ বিরুদ্ধতা এবং একপক্ষের দাবীর প্রতি অপর পক্ষের এইরূপ মনোভাব সেখানে উভয়েই স্ব স্ব দাবীর সমর্থনে হরতাল ডাকিলে লোকে কি করিবে? কাহার দাবী সমর্থন করিবে? কোন্ দাবী সমর্থনের জন্য হরতাল আহূত হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে?

প্রশ্ন এই, হরতাল নামক ব্যাপারটির কোন বিশেষ গুরুত্ব আছে কিনা, যদি থাকে তাহা হইলে যে কোন সময়ে, যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি বা দল জনসাধারণের উপরে এই হরতালের এই দায় চাপাইয়া দিতে পারেন কিনা? হরতাল ডাকিলে জনসাধারণকে যেরূপ বিব্রত হইতে হয় তাহাতে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধী হরতালের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন চূড়ান্ত অস্ত্র হিসাবে এবং নিতান্ত অপরিহার্য্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য। বঙ্গ-বিহার বিলের আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া যাঁহারা হরতাল ডাকিয়াছেন তাঁহারা হরতালের এই মূল কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছেন। এই হরতালের প্রস্তাবে জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে, দুই দিক দিয়া তাহার প্রমাণ পাইতেছি। "পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী শিল্প সংস্থার" পক্ষ হইতে এই হরতালের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, "বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্কটজনক বিধায় খুশীমত হরতাল হইলে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইয়া পড়ে। আমরা এই প্রকার হরতালের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।" ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির কলিকাতা শাখার সভাপতি এক বিবৃতিতে হরতালের ফলে চিকিৎসকগণকে কিরূপ দুর্ভোগ ভুগিতে হয়—তাহা জানাইয়া বলিতেছেন—"অতীতে হরতালের সময় চিকিৎসকদের যাতায়াতে বাধা দেওয়া হইয়াছে, বিঘ্ন ঘটান হইয়াছে এবং তাঁহাদের গাড়ীর ক্ষতি করা হইয়াছে। ইহা আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি।" হরতাল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই যে দুই বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে, ইহা হইতেই লোকের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। ইহারা প্রকাশ্যে জানাইতে পারিয়াছেন। বেশীর ভাগ লোকেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। অসহায় ভাবে সহ্য করিয়া যায়। হরতালের উদ্যোক্তারাও যে ইহা না বুঝেন তাহা নহে। তাঁহারাও বিবৃতিতে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন—"যে অল্পসংখ্যক লোক হরতাল করিতে চাহিবে না তাহাদের উপর যেন কোন জবরদস্তি না হয়।"

ভারতের বহির্বাণিজ্য

যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘাটতি। ঘাটতির কারণ হয়ত অনেক দেখানো যায়, কিন্তু কারণগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সুযুক্তিপূর্ণ নহে। ১৯৫৫ সনও কোনও ব্যতিক্রম দেখায় নাই, ঘাটতি দিয়াই বৎসর শেষ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী দপ্তরের হিসাব অনুসারে ১৯৫৫ সনে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি হইয়াছি ৪০ কোটি টাকা; রপ্তানীর পরিমাণ ৬০৪ কোটি টাকা ও আমদানীর পরিমাণ ৬৪৪ কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৫ কোটি টাকায়; আমদানী হইয়াছে ৭৪৭ কোটি টাকার ও রপ্তানী হইয়াছে ৬৪২ কোটি টাকার। গত পাঁচ বৎসরে, মোট ঘাটতি হইয়াছে ৫০৬ কোটি টাকার।

প্রধান রপ্তানীগুলির মধ্যে আছে পাট-শিল্পজাত দ্রব্য (১২০ কোটি টাকা); চা (১১০ কোটি টাকা); বস্ত্র (৮৬ কোটি টাকা); ধাতব আকর (২৫ কোটি টাকা); চামড়া (৩২ কোটি টাকা); কাঁচা তুলা (৪৪ কোটি টাকা) এবং ভেজিটেবল তৈল (৪৩ কোটি টাকা)। ১৯৫৪ সনের তুলনায় ১৯৫৫ সনে প্রায় ৮ কোটি টাকার কম পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে; চা রপ্তানীর পরিমাণও বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে; ১৪৬ কোটি টাকা হইতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ১১০ কোটি টাকায়।

আমদানী ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভারত-সরকার ১৩৯ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছেন; তাঁহাদের আমদানীর মধ্যে প্রধানতঃ আছে খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রধান আমদানীগুলি যথাক্রমে—যন্ত্রপাতি (১০৯ কোটি টাকা); খনিজ তৈল (৬৯ কোটি টাকা); ইস্পাতদ্রব্য (৫৮ কোটি টাকা); কাঁচা তুলা (৫৮ কোটি টাকা); যানবাহন (৩৯ কোটি টাকা);

ঔষধপত্র (২১ কোটি টাকা) এবং কাঁচা পাট (১৮ কোটি টাকা)। কাঁচা পাটের আমদানী ৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৯৫৪ সনের তুলনায় ; ইস্পাত দ্রব্যের আমদানী ১২৩ শতাংশ এবং যন্ত্রপাতির আমদানী ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যানবাহন, ঔষধপত্র ও কাঁচা তুলার আমদানীও ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী খাতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী ৬৬ শতাংশ কম হইয়াছে, কিন্তু যন্ত্রপাতির আমদানী ৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫৪ সনের তুলনায় ১৯৫৫ সনে ৯ শতাংশ আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার প্রধান কারণ আমদানী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি। গত বৎসর রপ্তানী বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯৫৪ সনের তুলনায় ৭ শতাংশ হইয়াছে। কতকগুলি জিনিষের রপ্তানী অভূতপূর্ব্বভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; যথা, ভেজিটেবল তৈলের রপ্তানী বৃদ্ধির পরিমাণ ৯৭ শতাংশ ; কাঁচা তুলার রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে ৯৬ শতাংশ আর কাঁচা চামড়ার রপ্তানী বৃদ্ধির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।

গত পাঁচ বৎসরে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসর, অর্থাৎ ১৯৫১ সনে দেশে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি ছিল। কোরিয়া যুদ্ধের জন্য দেশে কিছু পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি হয় এবং তাহার ফলে আমদানী বৃদ্ধি পাওয়ায় বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। পরবর্ত্তী দুই বৎসরে অল্প মন্দা দেখা দেয় এবং ইহার কারণ মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা। এই মন্দার ফলে আভ্যন্তরিক শিল্পোন্নতির গতি কিছু পরিমাণ শিথিল হয় এবং ১৯৫২-৫৩ সনে আমেরিকার বাজারে মন্দার ফলে ভারতের রপ্তানী হ্রাস পায়। কিন্তু রপ্তানী হ্রাস পাইলেও আমদানীর পরিমাণ অব্যাহত থাকে, ফলে, ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইদানীং সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেখাইতে চান যে, ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের চলতি হিসাবে সব সময়ে লাভ থাকে, কিন্তু ইহা একটি অপচেষ্টা মাত্র। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলিতে চান যে, ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সনে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে লাভ ছিল ; কিন্তু ইহা সত্যের অপলাপ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৯৫২ সনে রপ্তানীর মূল্য ছিল ৬০১ কোটি টাকার এবং আমদানীর পরিমাণ ছিল ৬৩৩ কোটি টাকার এবং বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩২ কোটি টাকার মত। ১৯৫৩ সনে রপ্তানী হয় ৫৩৯ কোটি টাকার এবং আমদানী হয় ৫৯১ কোটি টাকার ; ঘাটতি হয় ৫২ কোটি টাকার। Net Invisibles খাতে যে টাকা পাওয়া যায় সেই টাকা দ্বারা ঘাটতি পূরিত হয়,ফলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুব ফলাও করিয়া দেখান যে, ভারতের বহির্বাণিজ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ আছে। কিন্তু Net Invisibles-এর মধ্যে কি আছে—ইহার মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত ঋণ, আমেরিকার নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ এবং কলম্বো প্ল্যান দেশগুলি হইতে অর্থসাহায্য। ইহা সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় ঋণ ও সাহায্য হিসাবে আসে এবং প্রকৃতপক্ষে রপ্তানীর অন্তর্গত নহে। কিন্তু ব্যবসায়ে ঘাটতি পূরণের জন্য এই সাহায্যকে বহির্বাণিজ্যের অংশ হিসাবে দেখানো হয় যাহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। ১৯৪৯ সনে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯৫৫ সনের হিসাবে দেখা যায় যে, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় গত বৎসর ডলার দেশগুলি হইতে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ দুই-ই বৃদ্ধি পাইয়াছে ; এবং সরকারী সাহায্যও অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর ডলার দেশগুলি হইতে সরকারী দান হিসাবে ৪৬ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুব ফলাও করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ডলার দেশগুলির সহিত চলতি বাণিজ্যের হিসাবে ভারতবর্ষের অতিরিক্ত ৪৯ কোটি টাকা লাভ আছে। ষ্টার্লিং দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ১৯৫১ সনেই ভারতবর্ষ সবচেয়ে অধিক রপ্তানী করিয়াছিল ; তাহার পর হইতে রপ্তানী ক্রমহ্রাসমান। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থাভুক্ত দেশগুলি হইতে (O. E. E. C.) ভারতবর্ষের আমদানী সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে ঘাটতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসর এই দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের প্রায় ৮৪ কোটি টাকার ঘাটতি হইয়াছে। পৃথিবীর অবশিষ্ট দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ; যথা : রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক চুক্তির ফলে রাশিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ২,০০,০০০ পাউণ্ড চা আমদানী করিয়াছে। ইদানীং ষ্টার্লিং দেশগুলিতে ভারতীয় চা রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে।

গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে ভারতবর্ষ দান হিসাবে পাইয়াছে ৯৭ কোটি টাকা এবং সরকারী সাহায্য পাইয়াছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সনের শেষে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের পরিমাণ ছিল ৭৬১ কোটি টাকা।

ভারতবর্ষের পেন্সিল-শিল্প ও আমদানী নীতি

ভারতবর্ষের বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকেরা যখনই কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পান তখনই তাঁহারা দাবি করেন বিদেশী দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য। স্বদেশী যুগে বিদেশী দ্রব্য আমদানীর বিরুদ্ধে যে নীতিগত বিরুদ্ধতার প্রয়োজন ছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষে সে নীতির প্রয়োজন নাই এবং তাহা থাকা উচিতও নহে। এখনকার মাপকাঠি হওয়া উচিত, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেশের অর্থনৈতিক মঙ্গল এবং সস্তায় ব্যবহারিক দ্রব্য যাহাতে জনসাধারণ পাইতে পারে। ব্যবহারিক দ্রব্যের উৎপাদক শিল্পপতিকে সাহায্য করিবার মানসে আমদানী বন্ধ করিবার অর্থ ঐ শিল্পপতিকে ভারতের বাজারে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া—ইহার ফলে ঐ উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অযথা বৃদ্ধি পায় এবং উৎকৃষ্টতা দিন দিন অবনত হয়। শিল্পপতিদের জনস্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত মুনাফালাভের দিকে নজর থাকে বেশী। ভারতের শর্করা-শিল্প ইহার একটি বড় নিদর্শন।

১৯৪৯ সনে শুল্ক কমিশন (Tariff Commission) অভিমত দিতে বাধ্য হন যে, ভারতীয় শর্করা-শিল্পপতিদের কার্য্যকলাপ জাতীয় স্বার্থবিরোধী। এই অবস্থায় তাঁহাদের আর বিদেশী আমদানীর বিরুদ্ধে সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নহে। সরকার মাঝে মাঝে যখন চিনির আমদানী বন্ধ করিয়া দেন (মনে হয় যেন শর্করা-শিল্পপতিদের অধিক মুনাফালাভের ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য) তখন ভারতবর্ষে চিনির মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। মাঝে টাটারা দাবি করিয়াছিলেন, ভারতে যেসকল বিদেশী সাবানের কারখানা আছে সেগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়ার। কারণ তাঁহারা সস্তায় ভাল সাবান বাজারে বিক্রয় করায় দেশী সাবান কম বিক্রয় হয়। ভারতে অবস্থিত বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আর একটি প্রধান দোষ এই যে, তাহারা তাহাদের ভারতীয় কর্ম্মচারীকে অত্যধিক হারে মাহিনা দেয়, যাহা ভারতীয় শিল্পপতিরা দিতে অনিচ্ছুক কিংবা অক্ষম।

সম্প্রতি ভারতীয় পেন্সিল-শিল্পের মালিকেরা দাবি তুলিয়াছেন যে, বিদেশী পেন্সিলের আমদানীর ফলে দেশী পেন্সিলের কাটতি তেমন হয় না। তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন যে, বিদেশী পেন্সিলের মূল্য যদিও অধিক কিন্তু তাহার বিক্রয় হয় বেশী। আর দেশী পেন্সিলের মূল্য যদিও সস্তা তথাপি লোকে কিনিতে চায় না; সুতরাং তাঁহারা দাবি করিয়াছেন যে, বিদেশী পেন্সিলের আমদানী বন্ধ করা প্রয়োজন। ভারতের পেন্সিল-শিল্পের মালিকেরা অর্থ-নীতির সাধারণ নিয়ম বুঝিতে চান না। ইহাকে বলা হয় "Consumer Resistance", কিংবা "ক্রয়-বিমুখতা।" অর্থাৎ সস্তায় ভাল জিনিষ পাইলে ক্রেতারা বেশী দাম দিয়া খারাপ জিনিষ ক্রয় করে না। বেশী দাম দিয়া লোকে ভাল জিনিষই কিনে। সুতরাং বেশী মূল্যে লোকে বিদেশী ভাল পেন্সিলই ক্রয় করে। এমন একদিন ছিল যখন স্বদেশীর অজুহাতে শিল্প-মালিকেরা খারাপ জিনিষে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছেন এবং জনসাধারণ তাহাই ক্রয় করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ফলে, স্বদেশী জিনিষ হইলেও খারাপ হইলে তাহা লোকে কিনিতে চায় না। ভারতের পেন্সিল-শিল্প ও ঝরণা-কলমের গোড়ার ইতিহাসে দেখা যায় যে, জার্ম্মানী ও জাপান হইতে তৈয়ারী জিনিষ আসিত দেশী শিল্প-মালিকদের নামের ছাপ লইয়া। জনসাধারণের স্বাদেশিকতার সুযোগ লইয়া এই সকল বিদেশী জিনিষই স্বদেশী বলিয়া ভারতের বাজারে চালু করা হইয়াছে। সেইদিন স্বদেশী শিল্পপতিদের এই প্রবঞ্চনায় নীতিবোধে কোন আঘাত লাগে নাই।

ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ২,৪০০,০০০ ডজন পেন্সিল উৎপাদিত হয়। এদেশের বছরে প্রয়োজন ৭২ লক্ষ ডজন। বৎসরে ১০ শতাংশ পেন্সিলের দাবি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতে পেন্সিলের চাহিদা দাঁড়াইবে ১০৮ লক্ষ ডজনে। ১৯৫৪ সনে ভারতবর্ষে ১৮ লক্ষ টাকায় ১২ লক্ষ ডজন পেন্সিল আমদানী হয় এবং ১৯৫৫ সনে ২৬ লক্ষ টাকায় ২৪ লক্ষ ডজন পেন্সিল আমদানী করা হয়। বিদেশী আমদানী বন্ধ করিলে দেশী পেন্সিলের মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইবে। আর দেশী পেন্সিলের উৎপাদন দেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। দেশী পেন্সিলের কাটতি বৃদ্ধি করিতে হইলে তাহার উৎকর্ষ সাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দেশী ব্যবহারিক শিল্পের মালিকেরা ভাল জিনিষ উৎপন্নের দিকে তত নজর দেন না, যত নজর দেন মুনাফা লাভের দিকে। তাঁহারা চান সরকারী সাহায্যে বিদেশী প্রতিযোগিতা নিরোধ করিয়া একচেটিয়া মুনাফা লাভ। সীস ব্যতীত পেন্সিলের অন্যান্য উপাদান যথা: কাঠের ফালি, মাটি ও মোম বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ১৯৫০ সনে ভারতীয় ফিসক্যাল কমিশন দেশী শিল্পকে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সাবধান করিয়াছিলেন। কমিশন বলিয়াছিলেন যে, সংরক্ষণ ব্যবস্থার নামে যেন অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দেওয়া না হয়,কারণ তাহা হইলে নিকৃষ্ট জিনিষ অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রিত হইবে। তবে এই সাবধান-বাণী আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ সকল সময় মনে রাখেন না। সম্প্রতি যে আমদানী-নীতি ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এগুলির আভ্যন্তরিক সরবরাহ প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

হিন্দু উত্তরাধিকার

"নয়াদিল্লী, ১৮ই জুন—সংসদের উভয় সভায় গৃহীত হিন্দু উত্তরাধিকার বিল গতকল্য রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এই বিল আইনে পরিণত হওয়ায় ১৯৪৭ সনে রাও কমিটির প্রস্তাবিত হিন্দু সংহিতার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পাদিত হইল। হিন্দুর বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত ১৯৫৫ সনের হিন্দু বিবাহ আইন দ্বারা উক্ত প্রস্তাবিত সংহিতার প্রথম অংশ সম্পাদিত হয়।

হিন্দুর উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভারতের সর্ব্বত্র একইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এই হিন্দু উত্তরাধিকার আইন করা হইয়াছে।

এই আইনের ফলে পুরুষের ন্যায় নারীও একইভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। অতীতে অনেক ক্ষেত্রে নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেও কেবলমাত্র জীবিত স্বত্ব ভোগ করিতেন। দান-বিক্রয়ের অধিকার তাঁহার ছিল না। এই আইনে কন্যাও এই প্রথম পিতার সম্পত্তির অংশ পাইবার অধিকারিণী হইলেন।"

এই বিলের অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের নারীর নূতন অধিকার লাভ হইল। এত দিন তাহাদের প্রাপ্য ছিল শুধু স্তোক-বাক্য। এখন বাস্তব কিছু তাহার সহিত যুক্ত হইল।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন

নিম্নে যে আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত সংবাদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব সকলেই অনুভব করিবেন।

"পশ্চিমবঙ্গের পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় গত শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় অধিবেশনে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে ক্রমাগত

দলে দলে উদ্বাস্তু আসিতে থাকার এই রাজ্যে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া নবাগত উদ্বাস্তুগণের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যাইতে রাজী হইবার সাতিশয় প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

শ্রীমতী রায় বলেন, আমাদের ওয়ার্ক-সাইট ও ট্রানজিট ক্যাম্প-গুলিতে প্রায় ২ লক্ষ উদ্বাস্তু আছে। এই দুই লক্ষের মধ্যে কিছু সংখ্যককে এই রাজ্যে পুনর্ব্বাসনের জন্য আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। অবশিষ্ট উদ্বাস্তুদের এবং এক্ষণে যাহারা নূতন আসিতেছে তাহাদের পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান সামর্থ্যের মধ্যে এই রাজ্যে পুনর্ব্বাসন করাইবার কোন আশা নাই।"

শ্রীমতী রায় তাঁহার বিবৃতির উপসংহারে সভার সকল সদস্য ও বাহিরের জনসাধারণ সকলের নিকট এরূপ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান যে, উদ্বাস্তুরা যাহাতে নিজেদের সন্তোষজনক ভাবে পুনর্ব্বাসন করিয়া ভারতের নাগরিক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে তাহাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে যাইবার প্রয়োজনীয়তা যেন সকলে নবাগত উদ্বাস্তুদের বুঝাইয়া দিয়া রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেন।

আমরা বহুদিন যাবৎ বলিয়া আসিতেছি যে, এক দল অতি নীচ প্রকৃতির লোক এই উদ্বাস্তুদিগের দুর্দ্দশা ও যাতনা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাইতেছে। কলিকাতার রাজনৈতিক গোলমাল, মূল্যবান জমি জবরদখল, নানা নামে পতিতালয় স্থাপন এবং সাধারণ ভাবে শান্তিশৃঙ্খলা ও নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা বানচাল হইলে যাহাদের লাভ সেই শ্রেণীর ও দলের লোকেদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না হইলে শ্রীমতী রায়ের আবেদন নিষ্ফল হইবেই।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ভূমি

পশ্চিমবঙ্গের চাষী তো নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্যই যথেষ্ট জমি পায় না। উপরন্তু এই প্রদেশে অসংখ্য ভূমিহীন কৃষিমজুর জমির অভাবে দুর্দ্দশা এবং অভাবগ্রস্ত। এইরূপ অবস্থায় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য কতটুকু জমি এ প্রদেশে পাওয়া যাইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

অন্য প্রদেশে যে জমি আছে তাহা যদি চাষের উপযোগী হয় তবে উদ্বাস্তুদিগের যদি পুনর্ব্বাসনের ইচ্ছা কিছুমাত্র থাকে তবে তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করা উচিত। যাহারা উহার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি দেখায় তাহারা যে শুধু পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অনিষ্টসাধক শত্রু তাহা নয়, তাহারা উদ্বাস্তুদিগেরও অধঃপতনের সহায়ক।

এইরূপ লোককে দমন না করিলে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুর উদ্ধার নাই।

"নয়াদিল্লী, ১৯শে জুন—পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগকে ভারতের সর্ব্বত্র পুনর্ব্বাসনের উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি পরিকল্পনা বিন্যাস করিয়াছে। উহাকে এক্ষণে রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই উদ্দেশ্যে ১২টি রাজ্যে পরস্পরসংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে।

যেসব এলাকায় উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন করা হইবে, সেসব এলাকা পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসারগণ পরিদর্শন করিয়াছেন। ঐসব জমি যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকদের বিশেষভাবে উপযোগী হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের কৃষিজাত আয়ের সহায়ক কুটীরশিল্পও পূর্ব্বোক্ত ভূখণ্ডগুলিতে গড়িয়া তোলা হইবে। নূতন পরিবেশে কৃষকগণ কোনরূপ অসুবিধায় না পড়ে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য বঙ্গভাষী ওয়েলফেয়ার অফিসারগণকে প্রতিটি এলাকায় পাঠান হইবে। এ পর্য্যন্ত ১২টি রাজ্য পুনর্ব্বাসনের জন্য জমি দান করিতে সম্মত হইয়াছে। বিহারের চম্পারণ, পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও ভাগলপুরে ১২ হাজার একর কৃষি জমি দেওয়া হইবে। আটটি এলাকায় ৪৪৯টি কৃষক পরিবার, ১১৫টি ধীবর পরিবার এবং ৪৭টি কারিগর পরিবারের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা মঞ্জুর হইয়াছে।

উড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় একলাগোয়ায় ৩০ হাজার একর পরিমিত জমি আপাতদৃষ্টে উদ্বাস্তুদের উপযোগী হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ এলাকায় কয়েকজন অফিসার প্রাথমিক তদন্ত করিতেছেন। উড়িষ্যা সরকার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ১০ হাজার চাষযোগ্য পতিত জমি ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

উত্তর প্রদেশে বড়বাকি জেলায় ২,৪০০ একর পরিমিত জমি পুনর্ব্বাসনের জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ঘেরিয়া জেলার লাখামা তহশীলে ১,২৮৪ একর জমিও পুনর্ব্বাসনের উপযোগী বলিয়া জানা গিয়াছে।

আসাম সরকার কাছাড়ে ৬ হাজার একর জমি দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার ৫৬ হাজার একর জমি দিবেন। উহাদের মধ্যে ৩১ হাজার একর বস্তার, ১৫ হাজার একর জমি সরগুজার ও ১০ হাজার একর জমি রায়গড় জেলায় অবস্থিত। ঐসব এলাকার মাটি পরীক্ষার পর চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হইবে। বিন্ধ্যপ্রদেশের পান্না, ছত্রপুর, টিকানগর ও দাতিয়া জেলায় ১০ হাজার একর জমি আছে। মহীশূর, ৪৫০০ একর এবং রাজস্থান ১২ হাজার একর জমি দিবে।

সৌরাষ্ট্র সরকার নববন্দরে ৪ শত ধীবর পরিবারের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষজ্ঞগণ ঐ স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন।"

কলিকাতায় খানাতল্লাসী

কলিকাতায় কয়েক দিন পূর্ব্বে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাসী হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নে কয়েকটির বিবরণ আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত হইল।

উহা ভিন্নও আরও ৮।১০টি স্থলে কঠোর খানাতল্লাসী হইয়াছে। অন্য সংবাদে শুনা যায় যে, সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ে চোরাই আফিং

চালান এবং তাহার পরিবর্ত্তে সোনা ও মহামূল্য বস্তাদি আমদানী, এই চোরাকারবারে কোটি কোটি টাকার হিসাবে কলিকাতায় চলিতেছে। তাহারই নিরোধে এই অভিযান :

"গত বুধবার কলিকাতায় এক বৃহত্তম তল্লাসীর অভিযানকালে জল ও স্থল শুল্ক বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীরা কয়েকজন ক্রোড়পতি শিল্পব্যবসায়ীর ৪টি বাসভবনে হানা দিয়া ব্যাপক তল্লাসী চালায়।

প্রকাশ, চোরাই আমদানী স্বর্ণ ও জহরতাদির সন্ধানে একই সঙ্গে প্রায় একই সময়ে ঐ ৪টি বাসভবনে উক্ত তল্লাসী চালান হয়।

তল্লাসীকালে শুল্ক বিভাগীয় পুলিসবাহিনীর লোকেরা এ চারিখানি বাসভবনের চতুর্দ্দিকে কড়া পাহারা দিতে থাকে এবং অপরাহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া বুধবার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত এ খানাতল্লাসী চালান হয়।

অভিযোগে প্রকাশ যে, বুধবার রাত্রের মধ্যেই এ তল্লাসীকালে এমন কিছু পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে নাকি হংকংয়ের মার্কা ছিল। তাহা ছাড়া কতকগুলি মূল্যবান পাথরও আটক করা হইয়াছে। শুল্ক বিভাগ হইতে এরূপ অভিযোগও করা হইয়াছে যে, এই তল্লাসীকালে যে সব স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর আটক করা হয় সেগুলির মধ্যে কতকগুলি নাকি গোপনপথে বিনা শুল্কে এই দেশে আনীত হইয়াছে এবং সেগুলি অলঙ্কারে পরিণত করা হইয়াছে।

শুল্ক বিভাগীয় পুলিস উপরোক্ত যে চারিটি বাসভবনে তল্লাসী চালায় সেগুলি হ্যারিসন রোড, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও বড়বাজারে অবস্থিত।"

কলিকাতায় জীবনযাত্রা

এই আজবশহর কলিকাতায় লোকজনের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নের সংবাদে পাওয়া যায়। আমরা বলিতে বাধ্য যে, এইরূপ দুর্ঘটনা এই শহর ও এই প্রদেশের বাহিরে হওয়া সম্ভব নয় :

"রবিবার বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বালিগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসনের ওভারব্রীজ ভাঙিয়া এক মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনায় ৩ জন স্ত্রীলোক সহ ১৭ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক সহ ৫ জনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া জানা গিয়াছে। দুর্ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যে আহতদের শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পথচারী লোকজনের চাপে ওভারব্রীজের আনুমানিক ছয় ফুট দীর্ঘ ও ছয় ফুট প্রশস্ত কাঠের পাটাতন অকস্মাৎ ভাঙিয়া পড়ে এবং পনেরো জন পথচারী পাটাতন সমেত সতের ফুট নীচে রেল লাইনের উপর পড়িয়া গুরুতররূপে আহত হন। দুই জন পাটাতনের প্রান্ত ধরিয়া ঝুলিতে থাকেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে ক্যানিংগামী একখানি ট্রেন শিয়ালদহ হইতে আসিতেছিল। দুর্ঘটনার স্থল হইতে আনুমানিক ২৫ গজ দূরে রেলওয়ে কেবিনের নিকটে অতিকষ্টে ট্রেনটি থামানো হয় এবং আহত ব্যক্তিরা শোচনীয় পরিণতির হাত হইতে রক্ষা পান।

প্রকাশ, মেরামতীর অভাবে উক্ত ব্রীজের পাটাতনগুলি পচিয়া বহুদিন যাবৎ অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে টালার নিকটে ব্রীজ ভাঙিয়া আর একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে।

ভারত সরকারের খনিজ তৈলনীতি

খনিজ তৈল জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভারতের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খনিজ তৈলের সরবরাহ বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। ভারতের খনিজ তৈলের চাহিদার অধিকাংশ বর্ত্তমানে আমদানী মারফত মিটান হয়। ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্প বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিদেশী কোম্পানীগুলির করায়ত্ত। ভারতে খনিজ তৈল উত্তোলনের ভার রহিয়াছে বার্ম্মা-শেল গোষ্ঠীর অন্তর্গত আসাম অয়েল কোম্পানীর উপর এবং খনিজ তৈল পরিশোধনাগারগুলির পরিচালনা-ভার রহিয়াছে মার্কিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী এবং বার্ম্মা-শেল অয়েল কোম্পানীর উপর। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম এবং বার্ম্মা-শেল তৈল পরিশোধনাগারগুলি যে হারে মুনাফা লুটিতেছে তাহাতে ভারত সরকার বিশেষরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ভারত সরকারের নিকট হইতে এই কোম্পানীগুলি যে সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছে প্রকৃতই তাহা অপরিমিত। ২৫ বৎসরের মধ্যে কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করা হইবে না বলিয়া আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে। উপরন্তু তাহাদিগকে বিশেষ সুবিধাজনক হারে ভারতে তৈল বিক্রয়ের মূল্যনির্দ্ধারণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। "ইকনমিক উইকলি" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র এই একটি সর্ত্তের দ্বারাই কোম্পানীগুলি তাহাদের লগ্নীকৃত অর্থের অনুপাতে বহুগুণ বেশী মুনাফা আদায় করিতে পারে। অপর একটি মত অনুযায়ী ভারত সরকার প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্দ্ধিত হারে কোম্পানীগুলির উপর কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার নাকি বর্ত্তমানে ঐ সকল চুক্তির সর্ত্তগুলি বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছেন যাহাতে পরিশোধনাগারগুলির পূর্ণ উৎপাদন আরম্ভ হইলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্ত্তগুলির পরিবর্ত্তন করা যায়। কোম্পানীগুলি এরূপ আলোচনা চালাইতে সম্পূর্ণরূপে গররাজী নহে। এই দৃষ্টান্ত হইতে সরকারের অদূরদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ অববাহিকায় তৈল অনুসন্ধানের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীকে লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত মার্কিন কোম্পানী পূর্ব্ব পাকিস্থানেও তৈল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। "ইকনমিক উইকলি" সম্পাদকীয় মন্তব্যে

লিখিতেছেন যে, ষ্টাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানীকে পশ্চিমবঙ্গে তৈল অনুসন্ধানের লাইসেন্স দেওয়াতে প্রথমেই একটি বিরাট ভুল করা হইয়াছে। খনিজ তৈল সম্পর্কে যাঁহাদেরই কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারাই জানেন যে, পেট্রোলিয়াম যেখানে পাওয়া যায় সেখানে তাহা বহু হাজার মাইল ব্যাপিয়াই অবস্থিত থাকে। ভূমধ্যস্থিত এই তৈল "নদী" স্বভাবতঃই কোন রাজনৈতিক সীমা মানিয়া চলে না। তৈল নিষ্কাষণের আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোন দেশ এই সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে যথাসম্ভব তৈল নিষ্কাষণ করিতে পারে। ফলে পূর্ব্ব পাকিস্থানে তৈল নিষ্কাষণ আরম্ভ হইলে পশ্চিমবঙ্গ অববাহিকা হইতে তৈল টানিয়া লইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কারণে ষ্টাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানী পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব পাকিস্থানে তৈল নিষ্কাষণেই বেশী আগ্রহ দেখাইয়াছে। সম্প্রতি ষ্টাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানী পশ্চিমবঙ্গের জন্য আনীত একটি খনন যন্ত্র পূর্ব্ব পাকিস্থানে চালান করিয়া দেওয়ায় অনেকেরই মনে উপরোক্ত সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়াছে।

ভারত সরকারের তৈলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "ইকনমিক উইকলি" পত্রিকার দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, ভারতের তৈলনীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ভারত সরকার যেরূপ আনাড়িপনা দেখাইয়াছেন ভারতের জাতীয় প্রচেষ্টার অপর কোন ক্ষেত্রেই তাহা দেখা যায় নাই। তৈলনিষ্কাষণ সম্পর্কিত জটিল কারিগরি জ্ঞানের অভাব ইহার একটি কারণ হইতে পারে কিন্তু তৈলনিষ্কাষণ, পরিবহন, বিতরণ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভেরও কোন সুসংবদ্ধ চেষ্টা করা হয় নাই।

তৈলনীতি নির্দ্ধারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংগঠনিক দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিয়া উক্ত সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তর রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় তৈল অনুসন্ধানের কার্য্যাবলীর জন্য দায়ী রহিয়াছে। অপরপক্ষে, যে সকল অঞ্চলে খনিজ তৈল প্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে সেইসকল অঞ্চলে তৈল অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইয়াছে বার্ম্মা-শেল অয়েল গোষ্ঠীর অন্তর্গত আসাম অয়েল কোম্পানীকে। পশ্চিমবঙ্গে ঐ কাজের ভার রহিয়াছে মার্কিন ষ্টাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীর উপর। ফলে, যে সকল অঞ্চলে খনিজ তৈলপ্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা সেই সকল স্থানে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার কোন সুযোগই নাই।

তৈল-পরিশোধন ব্যাপারেও ঐ একই জটিলতা রহিয়াছে। উৎপাদন মন্ত্রণাদপ্তর ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত পরিশোধনাগারগুলির সম্পর্কে দায়িত্বগ্রস্ত অথচ পূর্ব্বাঞ্চলে নূতন পরিশোধনাগার স্থাপনের জন্য আলোচনা চালাইতেছে প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তর।

"ইকনমিক উইকলি"র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু তৈলের অনুসন্ধান ও খনন ইত্যাদি অতিশয় জটিল বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। উপরন্তু তাহাতে অনিশ্চয়তার ব্যাপার খুবই বেশী। সরকার নিজে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার আগে ঐ দুইটি বিষয়ে সম্যক বিবেচনা না করিলে চাকীর দায়ে মনসা বিক্রয় সম্ভব। এ দেশের লোকের ঐ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা কিছুমাত্রই নাই, সুতরাং প্রথমে সেইটা প্রয়োজন। তবে দেশের স্বার্থরক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য

পশ্চিমবঙ্গে অন্নাভাব সম্পর্কে বিধান সভায় ও নানা পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়। তাহার উত্তরে মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আনন্দবাজার হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কেন্দ্রীয় সহকারী খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এম. ভি. কৃষ্ণাপ্পা, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী এস. ব্যানার্জ্জি, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী বি. সেন, আঞ্চলিক খাদ্য ডিরেক্টর শ্রী জে. এস. নারায়ণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রী এস. কে. গুপ্ত সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের কালেক্টরগণ, অন্যান্য অফিসার ও স্থানীয় নেতৃগণ সমভিব্যাহারে ১৪ই ও ১৫ই জুলাই তারিখে ২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমা হইতে আরম্ভ করিয়া নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পাকিস্থানের সীমান্ত বরাবর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যুক্ত সফর করেন।

সফরকালে তাঁহারা সরেজমিনে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্ব পাকিস্থান সীমান্তবর্ত্তী জেলাগুলিতে চাউলের অভাব নাই এবং চাউলের কলসমূহ ব্যবসায়ী ও চাউল উৎপাদকগণের নিকট যথেষ্ট চাউল মজুত আছে। তাঁহারা আরও জানিতে পারেন যে, বহু স্থানে এবার আশু ধান্যের প্রচুর ফলন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যেখানেই প্রয়োজন, চাউলের মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে ন্যায্য মূল্যের দোকানসমূহ পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শ্রীসেন শ্রীকৃষ্ণাপ্পা ও অন্যান্য মন্ত্রিসহ সদলবলে সীমান্ত এলাকায় ষ্টীমলঞ্চ ও মোটরগাড়ীযোগে প্রায় তিন শত মাইল ভ্রমণ করেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা প্রায় ১২৩ মাইল ইছামতী নদী দিয়া ষ্টীমলঞ্চযোগে ভ্রমণ করেন। এই নদীটি ভারত ও পাকিস্থানের সীমান্ত রচনা করিয়াছে। তাঁহারা প্রধান চাউল উৎপাদক এলাকাগুলির অন্যতম হিঙ্গলগঞ্জ পরিদর্শন করেন। এখানে পাঁচটি চাউল কল আছে।

তাঁহারা শুল্ক পরীক্ষা-ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। তাঁহারা অতর্কিতে স্থানীয় বাজারও পরিদর্শন করেন। তাঁহারা চাউল ক্রেতা ও চাউল উৎপাদকগণের নিকট ধান্য ও চাউল সংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। পূর্ব্ব পাকিস্থানের সীমান্তবর্ত্তী এই দুইটি জেলায় সাধারণের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল আট আনা সের দরে বিক্রয় হইতেছে তাঁহারা দেখিতে পান। তাঁহারা পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে আগত ব্যক্তিগণের নিকট সরেজমিনে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানের সীমান্তবর্ত্তী জেলা-

গুলিতে পাকিস্থানী মুদ্রায় ৩৫্ হইতে ৪০্ টাকা মণদরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। তবে এই সমস্ত এলাকায় বর্ত্তমানে চাউলের মূল্য হ্রাস পাইতেছে।

কোন কোন সমাজবিরোধী ব্যক্তি ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিলেও চাউলের কলসমূহ এবং ব্যবসায়ী ও চাউল উৎপাদকগণের নিকট যে যথেষ্ট চাউল আছে, তাহার প্রমাণ তাঁহারা পাইয়াছেন। আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও জনগণ আদৌ বিচলিত হয় নাই, তাঁহারা দেখিতে পান।

মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বে-আইনী চালান ব্যবসা

২৫শে আষাঢ় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকা মুর্শিদাবাদ সীমান্তে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বে-আইনী মালচলাচলের সমস্যা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ বে-আইনী ভাবে পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রের যে ক্ষতি হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া দেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তার খাতিরে অবিলম্বে এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসার বিলোপসাধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

কিন্তু এইরূপ বে-আইনী ব্যবসা বন্ধ করা বিশেষ সহজসাধ্য নহে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাষায় "জেলা সীমান্তে যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে যাহারা পাচার ব্যবসার একবার মধুর আস্বাদ পাইয়াছে, তাহাদের মুখ হইতে সে আস্বাদ দূর করা অসম্ভব। সীমান্তে স্থলশুল্ক, পুলিশ বা অপরাপর সরকারী লোক যাহাদের রাখা হইয়াছে, তাহারা হঠাৎ ধনী পাচারকারীদের কিছু করিতে পারেন না। কারণ ধরপাকড়ের চেষ্টা করিলে মাল ধরাও যাইবে না, উপরন্তু উপরি যে লাভ মাস মাহিনার মত বরাদ্দ আছে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছেন যে, পাচার বন্ধ করা যখন সম্ভবই নয় তখন নিজেদের আলগা রোজগারের পথ নিজের হাতে বন্ধ করা মূর্খতা ব্যতীত কিছুই নহে।..."

কি উপায়ে এই বে-আইনী ব্যবসা চালান হইতেছে তাহার বর্ণনা দিয়া "সমাচার" লিখিতেছেন—"কিছু দিন হইতে দেখি প্রতিদিন চার-পাঁচ ট্রাক বোঝাই চাউল সাইথিয়ার দিক হইতে বহরমপুরে আসে এবং এই চাউল নিশ্চয়ই শহরের বাজারেই প্রতিদিন কাটে না। রাত্রি দশটার সময় ট্রাকে চাউল বোঝাই হইতেও আমরা দেখিয়াছি। দিনের বেলাতেও ট্রাকে চাউল বাহিরে যায়। সংবাদ লইলে জানা যাইবে বেশির ভাগ চাউল ও ধান্য ভরতি ট্রাকের গন্তব্যস্থল সীমান্তবর্ত্তী কোনও গঞ্জ বা গ্রাম। এখানে যে চাউলের দর মণপ্রতি ২২ টাকা পাকিস্থানে তাহার দর ৪০।৪৫ টাকা। চাউলের বস্তা ট্রাকযোগে জলঙ্গী বা কাতলামারীতে পাঠানো, ঘাট খরচ, পুলিশের পার্ব্বণী প্রভৃতি ধরাবাঁধা খরচ ৪।৫ টাকা পড়ে। তদুপরি নৌকা ভাড়া এবং পাক পুলিশের প্রাপ্য আছে। এই ভাবে এক মণ চাউলের দাম পাকিস্থানে পৌঁছানোর পর ৩২।৩৫ টাকা ধরা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চাউল পাচারের ব্যবসাই এখন সবদিক দিয়াই একমাত্র লভ্যজনক ব্যবসা এবং বহু ব্যবসায়ী এই সহজ মুনাফার লোভে মাতিয়া সব ভুলিয়া গিয়াছেন।"

কিন্তু কেবল চাউল লইয়াই যে এই চোরা কারবার চলে তাহা মনে করা ঠিক হইবে না। ভারত হইতে আলকাতরা, বিড়ির পাতা এবং খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য বহু পণ্য এই চোরাপথে পাকিস্থানে চালান যাইতেছে।

"সীমান্ত অঞ্চলের বাড়ী মাত্রেই পাচারকারীদের গুদাম বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না," "সমাচার" লিখিতেছেন। "বড় ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ এমন এমন বাড়ীতে মাল রাখে, যেখানে মাল থাকা সম্ভব বলিয়া মনে করাও যায় না।...সীমান্তের পাচার ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, কারণ মুনাফার লোভে সীমান্ত অঞ্চলে কে যে 'পাচার ব্যবসা' করে না তাহা বলা অসম্ভব..."

ত্রিপুরার খাদ্যসঙ্কটে সরকারী দায়িত্ব

ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যসঙ্কটে সরকারী দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আগরতলা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "সমাজ" পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, যদিও বন্যার পূর্ব্ব হইতেই খাদ্যাভাব দেখা গিয়াছিল তথাপি আখাউড়া ষ্টেশন হইতে একমাসের মধ্যেও শহরে চাউল আনা হয় নাই—অথচ ষ্টেশনে হাজার হাজার মণ চাউল মজুত ছিল এবং তাহা সময়মত খালাস না করিতে পারার জন্য ডেমারেজ দেওয়া হইতেছে।

"সমাজ" লিখিতেছেন:

"বিগত ২২শে মে আখাউড়া ষ্টেশনে কেন্দ্রীয় সরকার প্রেরিত চাউলের তৃতীয় স্পেশাল ট্রেনখানি যথারীতি পৌঁছায়। কয়েক দিনের মধ্যে চতুর্থ স্পেশাল ট্রেনখানিও চাউলসহ আসিয়া পৌঁছায়। আখাউড়া ষ্টেশন আগরতলা সহর হইতে মাত্র ৬।৭ মাইল এবং সর্ব্বদা যে কোন যানবাহনের যোগ্য পীচঢালা রাস্তা। ২২শে মে হইতে ২২শে জুনের মধ্যে উক্ত চাউল কেন আগরতলায় আনা গেল না? বর্ত্তমান কণ্ট্রাক্টারের পূর্ব্বে নিম্নতম রেটের যে কণ্ট্রাক্টার নিযুক্ত ছিলেন তিনি মাত্র ৮।৯ দিনের মধ্যে অসম্ভব দুর্য্যোগময় আবহাওয়ার মধ্যেও ৪২ হাজার মণ চাউল আখাউড়া হইতে আগরতলায় আনিতে পারিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কসবকলিঘাটেও উক্ত পূর্ব্ব নিম্নতম রেটের কণ্ট্রাক্টারের তৎপরতায় ও কর্ম্মনিষ্ঠার ফলেই সরকারী বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী হুকুমসৃষ্ট ঝামেলা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রেরিত চাউল সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে পারে নাই। অথচ উক্ত কণ্ট্রাক্টারের পরিবর্ত্তে অধিকতর সময়ের মেয়াদে ও রেটে অন্য কণ্ট্রাক্টর কোন অফিসার কি কারণে নিযুক্ত করিয়াছেন?"

"সমাজ" সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ষ্টেশনে চাউল জলে

ভিজিয়া নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অজুহাত প্রদর্শন করিয়া হয়ত বা চাউল অধিকতর মূল্যে পাকিস্থানে রপ্তানী করা হইতেছে। সন্দেহের কারণ আছে কিনা এ বিষয়ে সরকারী তদন্ত প্রয়োজন আমরা মনে করি।

শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষের ছায়া

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "জনশক্তি" শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, জেলাতে চাউলের মণ পঞ্চাশ-ষাট টাকা হওয়ার ফলে শতকরা ৮০ জনই আজ অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। মফঃস্বলের কোন কোন বাজারে পয়সা দিয়াও নাকি চাউল পাওয়া যাইতেছে না।

জেলার খাদ্যাবস্থা বর্ণনা করিয়া "যুগশক্তি" ১৩ই আষাঢ় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত শ্রীহট্ট জেলায় বন্যাও আসিয়া যোগ দিল। কয়েক দিনের অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলেই খাসিয়া পাহাড়, লুসাই পাহাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যের জলরাশি নদীপথে আসিয়া সমগ্র জেলা-ব্যাপী প্লাবনের সৃষ্টি করিল। ক্ষুধিত কৃষক শীঘ্রই আউস মুরালী পাইবে বলিয়া আশায় বুক বাঁধিয়াছিল, কিন্তু তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল। আমন ফসলও জলমগ্ন হইয়াছে। তাহার কত অংশ যে রক্ষা পাইবে তাহা ঈশ্বরই জানেন। তবে আউস ফসল শতকরা ৮০ ভাগই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিকৃষ্ট চাউলও জেলার সর্বত্র ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। মৌলবীবাজার মহকুমার কোন কোন স্থানে ৬০৲ পর্য্যন্ত দর উঠিয়াছে, তাহাও সর্ব্বদা সহজলভ্য হইতেছে না। কচু ও কলাগাছ খাইয়া মানুষ ক্ষুধা নিবারণ করিতেছে বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী আমরা পাইতেছি। প্রকৃতির শস্য-ভাণ্ডার শ্রীহট্ট জেলায় এত নিদারুণ অন্নকষ্ট এবং চাউলের অবিশ্বাস্য উচ্চ মূল্য স্মরণাতীত কালে কেহ প্রত্যক্ষ কিংবা কল্পনা পর্য্যন্ত করেন নাই। বিগত ১৩৫০ সনে বাংলার মন্বন্তরের কালেও মাত্র কয়েক দিনের জন্য শ্রীহট্টে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের দর উঠিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের বাজারের কাঁচা পয়সায় সেই দুর্মূল্যতা লোকের ক্লেশকর বোধ হয় নাই।"

এইরূপ পরিস্থিতিতে শ্রীহট্ট জেলাকে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সমগ্র জেলায় রেশনিং-এর পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিবার জন্য "জনশক্তি" দাবি জানাইয়াছেন।

আমরা মফস্বলের সংবাদপত্রে একরকম দেখি এবং মন্ত্রীমণ্ডলের উক্তিতে অন্যরকম শুনি। সত্য কি তাহা নিরূপণের ক্ষমতা আমাদের অতীত। কিন্তু চাউল মহার্ঘ না হইলে এইরূপ কথা কিরূপে কাগজে আসে তাহাও আমরা বুঝিতে অক্ষম। সত্য যাহাই হউক, শ্রীহট্টে চাউলের মূল্য নামাইবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। ইহাতে তো তর্কের অবকাশ নাই।

সংবিধানে ষষ্ঠ সংশোধন

সংবিধানে ক্রমান্বয়ে সংশোধন চলিতেছে। উহা অবশ্য অনিবার্য এবং সকল দেশেই উহা চলে কিন্তু এই সংশোধনের সম্পর্কে বিরোধী দলের আশঙ্কা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বাঙালীর অন্নবস্ত্রের সমস্যা এখনই অতি সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই সংশোধনের ফলে কি হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা প্রয়োজন। নিম্নে বিধান সভার রিপোর্ট আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত করা হইল :

"বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন (ষষ্ঠ সংশোধন) বিল অনুমোদন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষীয় সদস্যগণ এই বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত সং-শোধনের দ্বারা নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উপর করধার্য্যের অবাধ ক্ষমতা রাজ্যসরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। এ বিলটি ইতঃপূর্ব্বে সংসদে গৃহীত হইয়াছে।

বিতর্কের উত্তরে ডাঃ রায় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির উপর যাহাতে করধার্য্য না হয় তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। অবশ্য বিধানমণ্ডলী যদি মনে করেন যে, দ্বিতীয় পাঁচসালার পরি-প্রেক্ষিতে দেশোন্নয়ন কাজের জন্য করধার্য্য প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে তাঁহারা স্বাধীনভাবেই উহা স্থির করিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোন অনুমতি গ্রহণের আবশ্যক হইবে না।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সংবিধান সংশোধন (ষষ্ঠ সংশোধন) বিলটি উত্থাপন করিলে প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়-চৌধুরী বলেন যে, সংবিধানের এই সংশোধনের দ্বারা রাজ্য-সরকারের হাতে নূতন করধার্য্যের ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। রাজ্যসরকার ইচ্ছা করিলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর এখন হইতে করধার্য্য করিতে পারিবেন। তাঁহাদের আশঙ্কা যে, সরকার নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহের উপর একের পর এক করিয়া ট্যাক্স বসাইতে থাকিবেন। শ্রীরায়চৌধুরী ঘন ঘন সংবিধান সংশোধনেরও বিরোধিতা করেন।

মফঃস্বলে মেডিক্যাল কলেজ

১৫ই আষাঢ় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "দামোদর" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রবল বাধা সত্ত্বেও বাঁকুড়ায় মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫০ সন হইতেই বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিতেছিল এবং ১৯৫৪ সনে কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ ও ছাত্র ভর্ত্তির আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াও কেবলমাত্র সরকারী বিরোধিতার জন্যই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে নাই। অবশেষে সকল প্রকার সরকারী প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান বৎসর হইতে কলেজটি যে কার্য্য আরম্ভ করিতে চলিয়াছে তাহাতে পশ্চিম-বঙ্গের সকল অধিবাসীই আনন্দিত হইবেন। সরকারের প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কলেজটিকে অনুমোদন দান

করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সাহসিকতার পরিচয় দান করিয়াছেন "দামোদর" তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

বাঁকুড়াতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন উপলক্ষ্যে "দামোদর" বর্দ্ধমান শহরেও একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবীর পুনরুত্থান করিয়া লিখিতেছেন যে, বর্দ্ধমান শহরে যে মেডিক্যাল স্কুলটি ছিল তাহা পশ্চিমবঙ্গের মেডিক্যাল স্কুলগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিয়াছিলেন যে, মফঃস্বলে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বর্দ্ধমানেই সর্ব্বপ্রথম তাহা করা উচিত। "অতঃপর বর্দ্ধমানে যদি হয়, তাহা হইলে প্রথম হইবে না, দ্বিতীয় হইবে। তবে সরকার যদি অগ্রসর হন, তাহা হইলে ইহা মফঃস্বলে প্রথম সরকারী মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইতে পারে।"...

এই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, নির্দ্দেশটির বলে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও জলপাইগুড়ির মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে বলা ছিল যে, যাবতীয় মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজে পরিণত করা উচিত, কেননা চিকিৎসায় শিক্ষার মান দুই প্রকার হওয়া উচিত নয়। ঐ নির্দ্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রে স্কুল কলেজে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি পুরান স্কুল লোপ পায় মাত্র!

হাসপাতালে দুর্নীতি

সরকারী হাসপাতালগুলিতে কিরূপ ব্যাপক দুর্নীতি চলিতেছে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল হইতে অপহৃত ঔষধ উদ্ধারের মধ্য দিয়া তাহা বিশেষ প্রকট হইয়াছে। সম্প্রতি বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে উপযুক্ত অনুসন্ধানে সর্ব্বত্রই একই প্রকার দুর্নীতি ও অরাজকতার রাজত্ব হয়ত প্রকাশ পাইবে।

২২শে আষাঢ় সংখ্যায় পাক্ষিক "বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকা লিখিতেছেন, "বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালের একজন বর্ত্তমান ডাক্তারকে উৎকোচ গ্রহণকালে গত ১৪ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জেলা শাসকের ওয়ারেণ্টবলে স্থানীয় এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলেন। পুলিস তাহার পকেট হইতে চিহ্নিত ষোল টাকার নোট হস্তগত করেন। পুলিস তাহার জামা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র 'সীজ' করিয়াছেন। এ ঘটনায় সমগ্র জেলায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার পর দীর্ঘ ১৬ দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীটিকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই, তাঁহাকে সাসপেণ্ড করা হয় নাই, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কোন চার্জ্জশীট দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।"

মফঃস্বলের হাসপাতালগুলিতে নানারূপ দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারের সংবাদ প্রায়ই প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংবাদ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে আমরাও বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বিজয়চাঁদ হাসপাতালের প্রকাশিত খবরে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অভিযোগগুলির পশ্চাতেই বিশেষ সত্য থাকিতে পারে। এই প্রকার দুর্নীতিপরায়ণতা দূর করিতে হইলে সুসংবদ্ধ, দৃঢ় অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবে কেবলমাত্র অনুসন্ধান করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে কোন ফলই হইবে না যদি না অপরাধী ব্যক্তিকে—তা তিনি যতই উচ্চপদস্থ হউন না কেন—কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে হাসপাতালগুলিতে দুর্ব্যবহার ও দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ এবং তাহার প্রতিকার সম্পর্কে সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" যে সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে সার্ব্বজনীন অভিযোগগুলি আলোচনা করিয়া বঙ্গবাণী লিখিতেছেন:

"সাধারণতঃ হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে এইপ্রকার অভিযোগই শুনিতে পাওয়া যায়—(১) হাসপাতালে স্থানাভাব। অনেক সময় সাধারণ লোক গিয়া যখন স্থানাভাবের অজুহাতে ভর্ত্তি হইতে পারে না তখন সুপারিশওয়ালা লোক গিয়া সেই সময়ই ভর্ত্তি হইতে পায়। (২) ইনজেক্‌সনের ও অন্যান্য দামী ঔষধের অভাব। সাধারণ লোককে অনেক ক্ষেত্রেই জীবনরক্ষার জন্য এই সকল ঔষধ বাহির হইতে কিনিয়া দিতে হয় কিন্তু কোন influential বা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি আসিলে তাঁহাকে হাসপাতাল হইতেই এই সকল ঔষধ দেওয়া হয়, (৩) নার্সদিগের অমনোযোগ ও দুর্ব্যবহার, (৪) রোগীর খাদ্য ঠিকমত না দেওয়া এবং তাহা হইতে চুরি করা, (৫) রোগীর আত্মীয়স্বজনের সহিত ভদ্রতাসম্মত ব্যবহার না করা। যদিও সরকারী অনেক অফিসের দেওয়ালে লেখা থাকে 'Civility costs nothing', তবুও সরকারী হাসপাতালে রোগী-দিগের উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজনের সহিত একটু সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার না করিয়া কর্কশ ও হৃদয়হীন ব্যবহার করা হয়।

"(৬) সরকারী ডাক্তারদিগের সাধারণ রোগীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়া এবং এমন ঔদাসিন্য দেখান যাহাকে অপরাধের পর্য্যায়ে (criminal) ফেলা যাইতে পারে এবং যাহার ফলে রোগীর জীবনান্ত অবধি হইয়াছে, এরূপ শোনা গিয়াছে।"

হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি (২০শে আষাঢ়) বহু পুরাতন, কিন্তু তথাপি তাহাদের প্রতিকার হয় না। এই সম্পর্কে অনুযোগ করিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন যে, পুলিসের যে সকল অফিসারের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে দেখিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নথিপত্র দেখিতেছেন। তিনি "কি হাসপাতালের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি তদন্ত করিতে পারেন না? তাঁহার মত চিকিৎসক থাকিতে হাসপাতালগুলির দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি আরোগ্য হয় না কেন? আমরা আশা করি তিনি সচেষ্ট হইলে ইহারও প্রতিকার হইবে।"

জঙ্গীপুর কলেজে বি-এ ক্লাস

জঙ্গীপুর কলেজে বি. এ. ক্লাস খোলা সম্পর্কে গতমাসে আমরা "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া-

ছিলাম। সর্বশেষ সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত কলেজে বি. এ. ক্লাস খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আপাততঃ বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, অর্থনীতি ও বিশেষ বাংলা এই কয়টি বিষয় পঠনপাঠন হইবে।

১৪ই আষাঢ় এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "ভারতী" লিখিয়াছেন, "কিছু বিলম্বে হইলেও শেষ পর্যন্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কর্তৃপক্ষ যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।"

কলেজের অধ্যক্ষও ঐ মর্মে আমাদের জানাইয়াছেন।

পুলিসের দুর্নীতিপরায়ণতা

পুলিসবিভাগের দুর্নীতিপরায়ণতা সম্পর্কে "বর্দ্ধমানবাণী" পত্রিকার ৮ই আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীআবদুস সাত্তার একটি সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি অভিযোগ তুলিয়াছেন যে, কালনা মহকুমার কোন থানার দারোগা জনৈক ব্যক্তির বন্দুক মামলায় অছিলায় বিনা রসিদে লইয়া যায়। "মামলা শেষ হইল, সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইল, কিন্তু সে বন্দুক আজও পাইল না। থানার দারোগা তাহাকে ডাকাইয়া বলিল—দুই শ' টাকা দাও, ভাল রিপোর্ট দিব। সে ব্যক্তি টাকা দিল না, তাই আজও সে বন্দুক পাইল না—থানাতেই পড়িয়া আছে।"

আসানসোল মহকুমাতেও একটি ব্যাপারে স্থানীয় পুলিসের দারোগার ব্যবহার সম্পর্কে তিনি বিশেষ অনুযোগ করিয়া লিখিতেছেন যে, আসানসোল "গোধূলি" সিনেমার দখল দিবার জন্য, কোর্টের নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করিতে নাজির স্থানীয় পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিলে পুলিস তাহাকে সাহায্য না করিয়া প্রতিপক্ষকেই নাকি সাহায্য করে। শ্রীসাত্তার বলিতেছেন যে, "জানিয়া শুনিয়াও পুলিস আদালতের রায়কে বলবৎ করিবার জন্য নাজিরকে সাহায্য করে নাই—সাহায্য করিয়াছে অপর পক্ষকে, যাহারা আদালতের আদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্যায়ভাবে ঐ সিনেমা গৃহকে দখল করিয়া থাকিতে চায়। সংশ্লিষ্ট সাব-ইনস্পেক্টর সম্পর্কে আমরা কিছু বলিব না—সাবজজ যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি:

". . . he did nothing to help the Nazir in the matter of delivery of possession. I am inclined to believe that he submitted an incorrect report most likely because he is more familiar with the people who are now running the Godhuli Cinema. It would be a bad day for the country if Police officers of this sort are asked to maintain law and order."

এ সম্পর্কে আর অধিক কিছু বলিব না। আসানসোল থানার সাব-ইন্সপেক্টর সম্পর্কে সাব-জজ যে মন্তব্য করিয়াছেন আমরা উর্দ্ধতন পুলিস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিতেছি।"

পুলিসের অবনতি তো চতুর্দ্দিকেই হইতেছে। কিরণশঙ্কর রায়ের মৃত্যুর পর ওদিকে দৃষ্টি দিবার লোক নাই, ইহাই প্রকৃত কারণ।

ক্ষেতমজুরদের দাবী

৩০শে জুন ও ১লা জুলাই বর্দ্ধমান জেলার মেমারীতে বর্দ্ধমান জেলার ক্ষেতমজুরদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে তাহাদের দাবীর যাথার্থ্য এবং সেই দাবী আদায়ের জন্য ক্ষেতমজুরদের সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া "বর্দ্ধমান বাণী" পত্রিকার ২২শে আষাঢ় সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীআবদুস সাত্তার লিখিতেছেন যে, যখন শ্রমিক, কেরাণী এবং অপেক্ষাকৃত ধনী চাষীরা নিজের নিজের সংগঠন গড়িয়াছে তখন ক্ষেতমজুরদেরও সংঘবদ্ধ না হইবার কোন কারণ নাই।

ক্ষেতমজুর কাহারা? শ্রীসাত্তার বলিতেছেন যে, যাহারা অল্প জমির মালিক, নিজের জমিতে চাষ করিয়া যাহাদের অন্নসংস্থান না হওয়ায় অপরের জমিতে খাটিয়া খাইতে হয়, অপরের জমি যে ভাগে চাষ করে ও পরের চাষে যাহারা মজুরী করিয়া খায় তাহারা সকলেই ক্ষেতমজুরের পর্য্যায়ে পড়ে। আমাদের দেশে বড় বড় কৃষি ফার্ম্ম বেশি না থাকায় অধিকাংশ স্থলেই ক্ষেতমজুরদিগকে মধ্যবিত্ত ও অপেক্ষাকৃত ধনী গৃহস্থ বাড়ীতে খাটিয়া খাইতে হয়। এইরূপে অসংখ্য মালিকের অধীনে কাজ করে বলিয়া ক্ষেতমজুরদিগের সংগঠন গড়িয়া তোলা বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার।

ক্ষেতমজুরদিগকে কি ভাবে শোষণ করা হয় সেই সম্পর্কে শ্রীসাত্তার লিখিতেছেন:

"কোথাও পথ চলিতে দেয় বলিয়া, কোথাও পুকুরের ঘাট সরিতে দেয় বলিয়া, আবার কোথাও পুকুরের পাড়ে কুঁড়ে বাঁধিতে দিয়াছে বলিয়া ক্ষেতমজুরদের নিকট হইতে বেগার আদায় করা হয়। ইহা বে-আইনী কিন্তু ইহা আজও কোথাও কোথাও চলিতেছে। জমি চাষ ভাগে করিলে ভাগীদার ফসলের কি অংশ পাইবে তাহার বিধান আইনে আছে। কিন্তু আজও সেই মত ধান, খড়, চাউল সকল জায়গায় হইতেছে না। এমন স্থান আছে যেখানে ভাগীদারকে ফসলের অর্দ্ধেকও দেওয়া হয় না। চাষের সময় জমির মালিক যে টাকা ধার দেয় তাহার দরুন চড়া সুদ ধরিয়া লয়।

এই সকল অন্যায় অবিচারের প্রতিকারসাধনের জন্যই ক্ষেতমজুরদের আজ সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে শুনা যায়। প্রকৃত অবস্থা কি তাহার নির্ণয় অবশ্য প্রয়োজন।

ভাঙনের মুখে জঙ্গীপুর শহর

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "ভারতী" পত্রিকা ২১শে আষাঢ় "কথাপ্রসঙ্গে" লিখিতেছেন:

"সম্প্রতি স্থানীয় ফৌজদারী কোর্টের সম্মুখে ভাগীরথীর গর্ভে একটি চর উদ্ভূত হইয়াছে। চরটির দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাইল। এইরূপ একটি অতিকায় চর উদ্ভূত হওয়ার ফলে নদীটি এই স্থলে প্রায় দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে এবং ইহার প্রধান জলধারাটি জঙ্গীপুর

শহর ঘেঁসিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এজন্য জলের চাপ ঐদিকে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত দু'তিন বৎসর হইতে আমরা লক্ষ্য করিতেছি বর্ষাকালে ভাগীরথী স্ফীতিলাভ করায় মিউনিসিপ্যাল এলাকার কিয়দংশ প্রতিবারই নদীগর্ভে বিলীন হইতেছে। ভাঙন এইভাবে চলিতে থাকিলে আমাদের আশঙ্কা হয় জঙ্গীপুর শহরের বসতি অঞ্চলও ভবিষ্যতে কাটিয়া যাইতে পারে। আরও উদ্বেগের বিষয় এই যে, জঙ্গীপুর কলেজের নবনির্ম্মিত ভবনটি একেবারেই নদীর তীরবর্ত্তী। কাজেই ভাঙন একটু তীব্রতর হইলেই এই মূল্যবান অট্টালিকাটিও আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

"এ অবস্থায় আমাদের মনে হয় এখন হইতে যদি ভাঙন প্রতিরোধ করিবার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তবে অদূরভবিষ্যতে শহরটিকে রক্ষা করা দুরূহ হইতে পারে। আমাদের মনে হয় নবোদ্ভূত চংটিকে যদি ড্রেজার দ্বারা সরকারী ব্যয়ে এখনই কাটিয়া ফেলা হয় তবে অতি সহজেই জঙ্গীপুরের পারে জলের চাপ রোধ করা যাইতে পারে ও শহরটিও রক্ষা পায়। আমরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি।"

বাঁকুড়া শহরে বিদ্যুৎ কোম্পানীর অব্যবস্থা

১৯শে আষাঢ় "হিন্দুবাণী" পত্রিকায় "শ্রীদুর্ম্মুখ" লিখিতেছেন যে, বাঁকুড়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী কর্ত্তব্যকর্ম্মে যেরূপ অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে তাহাতে সমগ্র শহরটি একটি "মৃত্যুর ফাঁদে" পরিণত হইতে চলিয়াছে। বৈদ্যুতিক লাইনগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। "সামান্য বৃষ্টি হইলেই (ঝড় হইলে কথাই নাই) লাইনের এখানে-ওখানে সর্ট-সার্কিট হইয়া যায়, কোথাও পোল-চার্জ্জ হইয়া থাকে, পাশের গাছ বা দেওয়ালে লাগিয়া তাহাকেও বিপজ্জনক করিয়া তোলে। প্রায় সর্ব্বত্রই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কমার্স বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল হয় নাই।"

উক্ত পত্রিকার ৫ই আষাঢ় সংখ্যায় বাঁকুড়া শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কোম্পানীটি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গুরুতর অভিযোগ করিয়া বলা হয়: "আমরা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ইহুদী কোম্পানীর বহু অন্যায় এবং লাইসেন্সের সর্ত্তবিরোধী কার্য্যকলাপের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। জানি না কোন রহস্যময় কারণে তাহার প্রতিকার পাওয়া দূরের কথা, কোম্পানী সর্ব্বতোভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সমর্থন' পাইতেছে। কমার্স ডিপার্টমেণ্ট প্রায় সব জেলার শহরের বৈদ্যুতিক কোম্পানীগুলির (বর্দ্ধমান, সিউড়ী, মালদহ প্রভৃতি) লাইসেন্স যে কারণে বাতিল করিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী অন্যায় কাজ বেপরোয়াভাবে করিয়া চলা সত্ত্বেও ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছু করিতেছেন না।"

নাগা বিদ্রোহ

আসামে বিদ্রোহী নাগাদলগুলি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেছে। এ বিদ্রোহের অবস্থা এখন গুরুতর সন্দেহ নাই। প্রথম দিকে এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ না করায় অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে বর্ষা নামায় এ অঞ্চলে প্রতিরক্ষা দুরূহ দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে আসাম সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি, পুলিসের ও সৈন্যদলের সংবাদ সংগ্রহে অকৃতকার্য্যতা এবং ভৌগোলিক বাধাবিঘ্ন সবকিছুই আছে। উপরন্তু কেহ কেহ বলেন যে, বিদেশ হইতে নাগাদিগকে অস্ত্র সরবরাহও করা হইতেছে। সেই সম্পর্কে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের বিবৃতি নিম্নে দেওয়া হইল।

"নয়াদিল্লী, ১৫ই জুলাই—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ আজ এখানে কংগ্রেস সংসদীয় দলের নিকট নাকি বলিয়াছেন যে, নাগা বিদ্রোহীরা বর্ত্তমানে বৈদেশিক সূত্র হইতে অস্ত্রশস্ত্র পাইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। তাহাদের হাতে যে অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে, তাহা গত মহাযুদ্ধের শেষদিকে মিত্রসৈন্য ও জাপানী সৈন্যরা ফেলিয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি জানান।

আজ দলীয় সভায় কয়েকজন সদস্যের অনুরোধে পণ্ডিত পন্থ নাগা সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেন। প্রকাশ পণ্ডিত পন্থ আরও বলেন যে, নাগা সীমান্তে অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সময় লাগিবে। কারণ সামরিক বাহিনী অভিযান পরিচালনাকালে শান্তিপূর্ণ নাগাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাইতে চাহেন না।"

পণ্ডিত নেহরু ও ব্রিটেনের সংবাদপত্র

বিগত ৩রা জুলাই শ্রীনেহরু ও নিউজীল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসিডনী হল্যাণ্ড লণ্ডন নগরীর শ্রেষ্ঠ পৌর সম্মান "ফ্রীডম অব দি সিটি অব লণ্ডন" দ্বারা ভূষিত হন। লণ্ডনের "গিলডহল"-এ সম্মানদান উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মানের তাৎপর্য্য সম্পর্কে "রয়টার" বলিয়াছেন, "পৃথিবীবাসীর অথবা কমনওয়েলথের কিম্বা ব্রিটিশ জাতির সেবায় বিশেষ উচ্চ পর্য্যায়ের কল্যাণকর কার্য্য কেহ করিলে তাঁহাকে 'ফ্রীডম অব দি সিটি অব লণ্ডন' সম্মানে ভূষিত করা হয়। যাঁহারা এই সম্মান লাভ করেন, তাঁহাদের নাম 'রোল অব ফেম'-এ (উচ্চসম্মানে ভূষিত বিখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দের তালিকা) পঞ্জীভুক্ত হইয়া থাকে।"

অতীব বিস্ময়ের বিষয় এই যে, লণ্ডন নগরীর এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের সংবাদ লণ্ডন নগরীর অধিকাংশ সংবাদপত্রই প্রকাশযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। ৮ই জুলাই-এর "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় উক্ত পত্রিকার লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা শ্রীজেমস কাওলে এই ঘটনা সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। শ্রীকাওলে লিখিতেছেন যে, ভারতীয় জনসাধারণ ভারতীয় সংবাদপত্রে লণ্ডন নগরীতে শ্রীনেহরুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিয়া পুলকিতচিত্তে হয়ত ভাবিয়া থাকিবেন যে,

ব্রিটিশ জনসাধারণও নিশ্চয় সংবাদপত্র পাঠে ঘটনাটির গুরুত্ব অনুভব করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত। ব্রিটেনের জাতীয় পত্রিকাগুলির অধিকাংশই এই ঘটনাটিকে কোনরূপ স্বীকৃতি দান করে নাই। "মেল", "হেরাল্ড", "নিউজ ক্রনিক্‌ল", "মিরর", "স্কেচ" পত্রিকার পাঠকগণ বৃথাই ঐ ঘটনাটির সংবাদ অনুসন্ধান করিবেন—কারণ ঐ পত্রিকাগুলির কোনটিতেই গিলডহল অনুষ্ঠানের কোনরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। "এক্‌সপ্রেস" পত্রিকাটিতেও অনুষ্ঠানের কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই, তবে এই উপলক্ষ্যে পত্রিকাটি সম্পাদকীয় কলমে শ্রীনেহরুর প্রতি একটি কটাক্ষ হানিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই ভাবে ঐ ছয়টি পত্রিকার এক কোটি ষাট লক্ষ পাঠক গিলডহল অনুষ্ঠান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকিয়া যাইতেন যদি না ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের দৈনিক সংবাদ বুলেটিনে উহার খবর প্রচারিত হইত।

শ্রীকাওলে লিখিতেছেন যে, লণ্ডনের পত্রিকাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র "টাইমস" ও "টেলিগ্রাফ" পত্রিকা দুইটিতেই শ্রীনেহরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন বক্তৃতার যথোপযুক্ত সারমর্ম কেবলমাত্র "টাইমস" পত্রিকাই প্রকাশ করে।

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকায় অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি কথাও প্রকাশিত হয় নাই। অবশ্য "গার্ডিয়ান" সম্পাদকীয় পাতায় অনুষ্ঠান সম্পর্কে জনসাধারণের উদাসীনতার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। ফ্লিট ষ্ট্রীট দিয়া বিগত ৪০ বৎসর যাবত যতগুলি শোভাযাত্রা গিয়াছে তাহাদের প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, "গিলডহল" অনুষ্ঠানের সময় যে উদাসীনতা দেখা গিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব্ব।

বলা বাহুল্য, এইরূপ উদাসীনতায় ভারতের কোনই লোকসান নাই; বরঞ্চ লাভ আছে। ব্রিটিশ জনসাধারণ যে কি বস্তু তাহার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়।

ষ্টালিনের নিন্দা ও কম্যুনিষ্ট সমাজ

সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক দলের ভূতপূর্ব্ব নেতা যোসেফ ষ্টালিনকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করার ফলে বিশ্বের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে যে দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা দিয়াছে অভিজ্ঞ পর্য্যবেক্ষকদের অভিমতে তাহার সঙ্গে কেবলমাত্র ষ্টালিন-ট্রটস্কী বিরোধিতার সময়কার অবস্থাকেই একমাত্র তুলনা করা চলে। যে ষ্টালিনকে একদা বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রচার করিত আজ তাহাকেই প্রকারান্তরে প্রবঞ্চক, হত্যাকারী, কাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৎসরখানেক পূর্ব্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ষ্টালিনকেই রুশিয়ার জনসাধারণের ত্রাণকর্তা বলিয়া প্রচার করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়া বলা হইতেছে যে, ষ্টালিন রাশিয়াকে রক্ষা করা দূরে থাকুক উপযুক্ত সতর্কতার সংকেত পাওয়া সত্ত্বেও তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যাহারা "বার্লিনের পতন" শীর্ষক সোভিয়েট ছায়াচিত্রটি দেখিয়াছেন তাঁহারাই স্মরণ করিবেন যে, ছবিটিতে সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধে জয়লাভের প্রধান কৃতিত্ব ষ্টালিনকেই দেওয়া হইয়াছে। সমসাময়িক অসংখ্য সোভিয়েট পত্রপত্রিকাতেও ষ্টালিনকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি বলা হইতেছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েট বিজয়ে ষ্টালিনের কোনই কৃতিত্ব নাই—যুদ্ধবিজয়ের যাহা কিছু কৃতিত্ব তাহা সোভিয়েট জনসাধারণের এবং সেনাপতিমণ্ডলীর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষণ ব্যাপারে কাহার ভূমিকা কিরূপ সে সম্পর্কে বর্ত্তমানে নূতন করিয়া একটি চলচ্চিত্র মস্কোতে নির্ম্মিত হইতেছে।

সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক ষ্টালিনের এই প্রকাশ্য নিন্দায় বিশ্বের কম্যুনিষ্ট মহলে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যাঁহারা কোনদিন প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সমালোচনা করেন নাই তাঁহারাও সোভিয়েট রাষ্ট্র, নেতৃবৃন্দ এবং সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট মহল হইতে যে সকল সমালোচনা করা হইয়াছে তাহাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ সমালোচনা করা হইয়াছে এই জন্য যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ষ্টালিনের ক্রটিবিচ্যুতি সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ যে গোপন রিপোর্ট প্রদান করেন তাহা প্রকাশের পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে জানান হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা ষ্টালিনের এইরূপ একতরফা নিন্দাবাদ করাকেই নিন্দা করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, ষ্টালিনের জীবিতকালেই কেন ষ্টালিনের এই সকল ক্রটিবিচ্যুতি সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয় নাই।

ইউরোপের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে ইটালী, ফ্রান্স, বৃটেন ও নরওয়ের কম্যুনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিও সোভিয়েট পার্টির সমালোচনা করিয়াছে। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সমালোচনা না করিলেও ষ্টালিনের গুণাবলীর প্রতি পার্টি সদস্যদিগকে সচেতন থাকিবার জন্য স্বরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছে তাহাতে ষ্টালিনের একতরফা নিন্দাবাদের প্রচ্ছন্ন সমালোচনাই করা হইয়াছে।

তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তাহার নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন ইটালীর বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীপামিরো তোগলিয়াতি। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন কেন বর্ত্তমান সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ষ্টালিনের জীবদ্দশায় এই সকল সমালোচনা প্রকাশ করেন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কি ক্রটির ফলে ষ্টালিনের মত স্বেচ্ছাচারীর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। বৃটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টিও তোগলিয়াতির বিবৃতির সমর্থনে অনুরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা লেখক ষ্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত হাওয়ার্ড ফাষ্ট বলিয়াছেন যে, এখন হইতে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের বন্ধু থাকিবেন বটে তবে প্রয়োজনে উহার কঠোর সমালোচনা করিতেও পশ্চাদপদ হইবেন না।

পৃথিবীব্যাপী এইরূপ প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিরূপ মনোভাবে সোভিয়েট উইনিয়নের নেতৃবৃন্দ যে কিয়ৎ পরিমাণে বিচলিত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ ৩০শে জুন সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটি। উক্ত প্রস্তাবে বিভিন্ন দেশ হইতে উত্থিত সমালোচনার জবাব দিবার চেষ্টা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ষ্টালিনের জীবদ্দশায় তাঁহার সমালোচনা না করিবার কারণ সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের কাপুরুষতা নহে। সকল সময়েই ষ্টালিনের বিরুদ্ধে একটি লেনিনবাদী চক্র দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজ করিয়া যাইতেছিল বলিয়া প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে। ইটালীর কম্যুনিষ্ট নেতা পামিরো তোগলিয়াত্তির বিবৃতির সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনরূপ গলদের জন্য ষ্টালিনের মত স্বেচ্ছাচারীর আবির্ভাব ঘটিতে পারিয়াছিল বলিয়া তোগলিয়াত্তি যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব ভ্রান্ত। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রপরিবৃত পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রহিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে ঐতিহাসিক অবস্থায় ছিল তাহাতে ক্ষেত্র এবং সময় বিশেষে সোভিয়েট রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সংকোচসাধন এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐরূপ ঐতিহাসিক অবস্থার জন্যই ষ্টালিনের স্বেচ্ছাচারিতার অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টি যেরূপভাবে তাহাদের সর্ব্বশেষ প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া তাহাদের মানসিক অশান্তি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ব্যবহারকে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতরূপে তুলিয়া ধরিবার জন্য মানসিক ব্যাকুলতাও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারা কোন প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর না দিয়া বিশ্বের কম্যুনিষ্টদিগের ভাবাবেগ উদ্বেলিত করিবার প্রয়াসে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে সাহায্য না করিতে আহ্বান জানাইয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্বের যুদ্ধের বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য বিশ্বের পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আবেদন করিয়াছে। ইহার প্রচ্ছন্ন অর্থ সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার দোহাই পাড়িয়া অপরাপর দেশগুলির কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মুখ বন্ধ করা। সেই প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই তাহার প্রমাণ ষ্টালিনের সমালোচনা সম্পর্কে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক প্রস্তাব। ভারতীয় পার্টি সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের আচরণের সমালোচনা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সোভিয়েট পার্টির প্রস্তাবটি প্রকাশিত হওয়ায় ভারতীয় পার্টি একটি অপেক্ষাকৃত মোলায়েম প্রস্তাব পাশ করিয়াছে।

সোভিয়েট পার্টির প্রস্তাবে যে কয়টি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর নাই তাহা হইল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে লেনিনবাদী চক্র থাকিয়া থাকিলে সেই চক্রের সদস্য কাহারা ছিলেন? এতদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েট পার্টি ত ষ্টালিনকেই লেনিনের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও উত্তরাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছিল। ষ্টালিনের জীবিতকালে ষ্টালিনের প্রকাশ্য নিন্দা করিতে অসমর্থ হইলেও কেন তাঁহারা ষ্টালিনকে প্রশংসা করিয়া মাথায় তোলেন? "ষ্টালিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা", "ষ্টালিন সংবিধান" প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ষ্টালিনকে সকল কৃতিত্ব অর্পণ ইহা কি কেবল একা ষ্টালিন দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল?

সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলির সত্যবাদিতা

সোভিয়েট রাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলি রাষ্ট্র এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সংগঠনগুলির দ্বারাই প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির "লাইন" সঠিক প্রমাণ করিবার জন্য সংবাদপত্রগুলি অনেক সময়েই যে সত্য গোপন করে অথবা বিকৃতরূপে প্রকাশ করে সে সম্পর্কে বহু দিন হইতেই অভিযোগ করা হইতেছে। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সাম্প্রতিক রুশ সফরের সময় সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি তাঁহার বক্তৃতার অংশবিশেষ প্রকাশ করে নাই।

এতদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েট সংবাদপত্র কর্ত্তৃক সত্য গোপনের অভিযোগ কম্যুনিষ্টরা স্বীকার করিতে চাহিত না। সম্প্রতি তাহারাও সোভিয়েট পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে সত্যগোপনের অভিযোগ করিতেছে। নিউ ইয়র্ক "ডেলী ওয়ার্কার" (মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র) পত্রিকার এক প্রবন্ধে পত্রিকার বৈদেশিক সম্পাদক শ্রীযোসেফ ক্লার্ক মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ইউজিন ডেনিস কর্ত্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ "প্রাভদা" পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশের সময় সোভিয়েট রাষ্ট্রে ইহুদীদের উপর নির্যাতন সম্পর্কে শ্রীডেনিসের কয়েকটি মন্তব্য বাদ দিয়া ছাপানর জন্য "প্রাভদা" পত্রিকার নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদি সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের ইহাই ধারণা থাকে যে, ডেনিসের মন্তব্য সত্যানুগ নহে তবে তাঁহারা বক্তব্যটি বাদ না দিয়া উহা প্রকাশ করিয়া অভিযোগটির সত্যতা অস্বীকার করিতে পারিতেন।

শ্রীক্লার্ক লিখিতেছেন, "উপরন্তু, বিগত পঞ্চম দশকের শেষার্দ্ধে শ্রেষ্ঠ ইহুদী সোভিয়েট লেখক ও কবিদের শারীরিক বিনাশ (physical annihilation) সম্পর্কে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের কৈফিয়ত দেওয়া বহুদিন হইতেই প্রয়োজন হইয়াছে।"

শ্রীক্লার্ক সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রেসিডিয়ামের নূতন মহিলা সদস্যা একাটেরিনা ফারতসেভাকে তিরস্কার করিয়াছেন। বামপন্থী "ন্যাশনাল গার্ডিয়ান" পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী ফারতসেভা সোভিয়েট রাষ্ট্রে ইহুদীদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া দিবার অভিযোগ অস্বীকার করেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে ইহুদী নেতৃবৃন্দের জীবনাবসান ঘটাইবার অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

তৃতীয় পর্ব

মিলন ও বিরহ

ভারতীয় প্রেমসাধনায় দেহের স্থান আছে; দেহাতীত যে প্রেম তারও গুণকীর্তন বিরল নয়। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে ঐন্দ্রিয়জ কামের কথা একটু বেশী বলা হয়েছে। দেহাতীত যে প্রেম তার কথা কমই শুনেছি দেবভাষার মুখপাত্রদের মুখে। মহাকবি কালিদাস বারবার নিছক দেহজ কামনার কথা বলেছেন। ভোগতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে সে যুগের কাব্যে ও সাহিত্যে। স্মরণ করুন শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রথম দর্শনের কথা। দুষ্মন্তের ভোগলিপ্সার উগ্রতা রুচিবান সহৃদয় পাঠককে ক্লিষ্ট করে। দেহোত্তীর্ণ যে প্রেম তার আবেদন হয় ত সে যুগের মানুষের কাছে ধারণাতীত সূক্ষ্ম বস্তু ছিল। এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মহাকবি কালোত্তীর্ণ হলেও সমকালীন প্রভাব তাঁর মননে এবং কথনে থাকবে। 'ইথস্' গণমানসের প্রতিফলন। নীতিশাস্ত্রবিদ্‌রা বলেছেন যে, মানুষকে তার সমসাময়িক নৈতিক আবহাওয়া থেকে নৈতিক শুচিতা এবং অশুচিতা, দুটোকেই কিছু পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়। দেশের মানুষের মনে যদি দেহজ কামনার জোয়ার জাগে তবে কবির মনের তটেও সে ঢেউ এসে আঘাত করে। কবি দেহের জয়গান করেন, জয়গান করেন মিলনের; সে মিলনে দেহের আকুতির পরিসমাপ্তি। সে আকুতির তীব্রতা নানান বর্ণে চিত্রিত হয়েছে অনেক কবির লেখনে।

কালিদাস বললেন এই দেহজ মিলনের কথা তাঁর অনন্তসুন্দর ভাষায়। স্বল্পখ্যাত কবিরা মহাকবিকে অনুসরণ করলেন। কবি নরসিংহ, মনোবিনোদ, রাজশেখর, শ্রীহর্ষদেব, ধর্মকীর্তি এঁরা সকলেই প্রেমের মধ্যে কামের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেহজ ভোগ ও ইন্দ্রিয়জ তৃপ্তিকে এঁরা প্রেমসাধনার প্রধান সহচর হিসাবে দেখেছেন। এ যুগে হয়ত এই ধরনের প্রেম-ধারণা আমাদের কাছে খুব বেশী গ্রহণযোগ্য নয়। দেহজ কামের মোহকে আমরা অতিক্রম করে প্রেমের অমরাবতীর সন্ধান করে ফিরছি দেহবিমুখ আত্মিক শুদ্ধ প্রেম-ধারণার মধ্যে। একথা শুধু ভারতবর্ষেরই কথা নয়; এ তত্ত্ব আজ সারা পৃথিবীর সত্য। ইংলণ্ডের কথাই বলি। সেখানেও আজ সাধারণ মানুষের কাছে দেহজ মিলন প্রেমসাধনার একমাত্র পরিণতি হিসাবে গৃহীত হচ্ছে না। ওয়ালটার এম. গালিচান বলছেন তাঁর "Sexual Apathy and Coldness in Woman" শীর্ষক গ্রন্থে:

"Platonic affection so-called is far more usual than it was fifty years ago in England. A host of youths and maidens are good Companions, without any obvious intrusion of actually erotic interest."

বিংশ শতাব্দীতে প্রেম দেহবিমুখ হয়েছে, শুধু কাব্যে বা সাহিত্যে নয়, রক্তমাংসে গড়া মানুষের জীবনে।১ কথাটা অদ্ভুত শোনালেও পণ্ডিতজনেরা একথা বলেছেন। এর সপক্ষে নজীর আছে।

অবশ্য আধুনিক-পূর্ব যুগেও দেহোত্তীর্ণ প্রেমের কথা যে সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের একেবারে শোনায় নি তা নয়। মহাকবি ভবভূতির মধ্যে আমরা এই দেহধারার উত্তরণ লক্ষ্য করি। ভবভূতি আমাদের এক অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকের সন্ধান দেন, যেখানে দেহকামনা নিবৃত্তি লাভ করেছে। দেহ যেখানে অতিরিক্ত, বিদেহী প্রেমের সেই রসরাজত্বই ত যথার্থই প্রেমিকের লীলাভূমি। সম্ভোগ থেকে দেহ-ভোগাতীত রসধারায় অবগাহন করে মানুষ যে গভীর আনন্দ লাভ করে তার জুড়ি মানুষের অভিজ্ঞতায় বিরল। এই স্থায়ী প্রেমরসেই যথার্থ প্রেমিকের পরিতৃপ্তি। কি মিলন, কি বিরহ কোথাও ভবভূতি নিছক দেহাশ্রয়ী হয়ে পড়েন নি; তাই তাঁর কাব্যও এই দেহমুখীনতা থেকে মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই দিক থেকে ভবভূতির উত্তরসাধক। কালিদাসপ্রমুখ দেহবাদী কবিদের প্রভাব হয়ত কিছু কিছু পড়েছে 'কড়ি ও কোমল' থেকে আরম্ভ করে 'মানসী'র কোন কোন কবিতায়, কিন্তু 'মহুয়া'র রবীন্দ্রনাথকে অসংকোচে ভবভূতির পন্থানুসারী বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্লেটনিক প্রেম-ধারণায় বিশ্বাসী, একথা আমরা আগেই বলেছি।২ এ প্রেম দেহবিমুখ। মনের মিলন অনাড়ম্বর, দেহের মিলনে আড়ম্বর আছে। দেহের প্রত্যাশা, তার পূর্তিজনিত উল্লাস, না পাওয়ার বেদনায় দেহের বিকার, এ সবের বর্ণনার ক্ষেত্র সুপরিসর। কিন্তু মনের আকাশে কোন বাধাই ত বাধা নয়; সেখানে মিলনও যেমন সহজে ঘটে, বিরহও তেমনই স্বাভাবিক। কোথাও কোন রং নেই; বর্ণসমারোহের অবকাশই বা কোথায়? মন হ'ল ইন্দ্রিয়-

১। ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'রবিদীপিতা' দ্রষ্টব্য।

২। প্রবাসী, বৈশাখ ও আষাঢ়, ১৩৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গোচরতার বাইরে; তাই তার বিকারকে বোঝাতে হলে উপমার আশ্রয় নিতে হয়। বাইরেকার প্রকৃতি থেকে চিত্র আহরণ করতে হয় আন্তরপ্রকৃতিকে দুটি হৃদয়ের মিলন-মাধুর্যটুকুকে বোঝাবার জন্ম। অন্তরলোকে এই গভীর মিলনের রসঘন চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর কল্পনার রঞ্জনরশ্মির সহায়তায়। দুটি মনের মিলনে আদিরস অবিরল ধারায় ঝরিয়ে দেওয়া যায় না। আর এই আদিরসের ছোঁয়াচ না থাকলে মিলনচিত্র বা মিলনদৃশ্য উত্তরে যায় না। এ হ'ল সাধারণ নিয়ম। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি আদিরসের প্রাবল্য না ঘটিয়েও শুদ্ধ আত্মিক প্রেমের নায়ক-নায়িকার হাজারো ছবি আঁকলেন। কোথাও দেহের আবিলতা রইল না। সর্বত্রই দেহকে তিনি অনায়াসে অতিক্রম করে মনলোকের সীমাহীন বিস্তৃতিতে দুটি হৃদয়ের মিলন ঘটাবার সুযোগ দিলেন। আলো জলল না, বাঁশীও বাজল না দেহের কিনারে কিনারে; কিন্তু মনের নীলিমায় আকাশপ্রদীপ জ্বলে উঠল লক্ষ বর্তিকায় আর শাঁখ বেজে উঠল শুভ-মিলন ঘোষণা করে। দেহের মিলনকে বর্ণনা করা সহজ; অ-দেহী যে মিলন তার ছবি আঁকা দুরূহ। তাই কি মহাকবি কালিদাস মিলনের আদিরসাশ্রিত ছবি আঁকলেন? হয়ত বা সে যুগের রুচিকে, সে যুগের মানুষের হাততালিকে বেশী মূল্য দিয়ে মহাকবি আপনার কাব্যে দেহজ প্রেমকেই প্রাধান্ত দিলেন। ভবভূতির মত হয়ত কালিদাস আশাবাদী ছিলেন না। নিরবধি কাল, বিপুল পৃথিবীর কথা ভেবেও তিনি হয়ত ভবিষ্যতে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তাই বিদায় নিলেন নগদ মূল্যে। এ কথা স্বীকার্য যে বিদেহবাদ, যা আমরা রবীন্দ্রনাথে পেয়েছি, বিরহমিলনের চলচ্ছবি আমাদের উপহার দেয় না। রবীন্দ্র-নাথের সমগ্র জীবনদর্শন ক্ষুদ্র থেকে ভূমায় যাওয়ার ইতি-কথা। তাই ত প্রেমদর্শনেও তিনি দেহের ক্ষুদ্রতাকে অনায়াসে অতিক্রম করেছেন। মহুয়ার রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি দেহবিমুখ প্রেমের উপাসক; তাই ত মহুয়া কাব্যগ্রন্থে দুটি নরনারীর মিলননিবিড় মধুর ছবির একান্ত অভাব। দেহের জন্ম দেহীর যে ব্যাকুলতা, তজ্জনিত সুগভীর বিরহ-বেদনার আভাস এই কাব্যগ্রন্থখানির কোথাও নেই। সাধারণ অর্থে মিলন, বিরহ এরা মহুয়ার প্রেমের জগতে অবান্তর, অতি-রিক্ত। মহুয়ার কবি আত্মিক মিলনে বিশ্বাসী, তাই ত সেখানে আশাবাদের ক্ষেত্রও সুবিস্তৃত। ব্যর্থ প্রেমিকের নৈরাশ্য বেদনা কবির প্রেমের জগতে অনুপস্থিত; প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের সন্দেহ দোলায় যে ছন্দ, যে রস, যে মাধুর্য, তার আভাসটুকুও কবির প্রেমের জগতে নেই। যে পুরুষ বিশ্বাস করে যে, নারীর প্রেমে তার অধিকার হ'ল জন্ম-জন্মান্তরের এবং এ অধিকারটুকু বিধাতার অদৃশ্য লিখনের ফলস্বরূপ, তাকে ত নারীর ছলাকলা প্রতারিত করতে পারে না। সে জানে নারীর প্রেমলীলার পরিণতি। সে পুরুষের জীবনে না-পাওয়ার বেদনাও তীব্র হয়ে উঠতে পারে না। সে জানে ক্ষণিক বিরহের পরে মিলন অবধারিত। তাই ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শন আশাবাদিতায় ভরপুর। নিরুদ্বেগ, নিরুত্তাপ চিত্তে কবির মানসপুত্র তার প্রেয়সীর আগমন প্রতীক্ষা করে। কবির জীবনদর্শনের সঙ্গে তাঁর প্রেমদর্শন গভীর ভাবে সম্বন্ধ। কবির জীবনদর্শনের মর্মবাণীটি নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টিতে অভিব্যক্ত হয়েছে:

> "যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
> ইন্দ্রের অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
> মুক্তদ্বার; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত;
> তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
> নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।"
>
> (জন্মদিন, সেঁজুতি)

বুভুক্ষুর লালসাকে কবি জীবনের সর্ব কর্মে অপাংক্তেয় করে রেখেছেন। প্রেমের রাজ্যেও তার প্রবেশ নেই। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যকে কবি প্রতিষ্ঠা করেছেন জীবনের সকল প্রয়াসে। এ বৈরাগ্য মিলন এবং বিরহকেও নতুন মর্যাদা দিল। সর্বকর্মে নিরাসক্তি, গীতোক্ত সেই পরম নিষ্কাম কর্মের আদর্শ কবির জীবনের মূলে বাসা বেঁধেছিল। তাই শুনি কবিকণ্ঠে বার বার নিরাসক্ত তপস্বীর শান্ত বাণী। 'অপরাজিত' কবিতায় নিস্পৃহ প্রেমিকের প্রেমগাথা গাইলেন কবি। আকাশচারী মেঘপুঞ্জ হাওয়ায় দিগলগ্ন প্রত্যাশী হয়। এদিকে নিম্নে নিবিড় অরণ্য। সে চায় মেঘের স্নেহস্পর্শ। সহস্র বাহুর শ্যামল অঙ্গুলি ইঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানায়। তবু সে কামনায়, সে মিলনাকুতিতে 'সবলা'র দার্ঢ্য আছে, লালসার লোলুপতা সে কামনাকে কলুষিত করে না। অরণ্যের আমন্ত্রণ বুঝি ব্যর্থ হয়। বিমুখ মেঘ চলমান। নারীর চিরন্তন ছলাকলা অধরের মায়ামাধুর্য বিকাশের অনুকূল। তাই মেঘের এই লীলা। অরণ্যের প্রতিনিধি বনস্পতির সুপ্ত পৌরুষ আপনাকে প্রকাশ করে নবতর তপস্যার পথে। বনস্পতি তখন:

> 'নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে
> দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।'
>
> (অপরাজিত, মহুয়া)

দহনজয়ী সন্ন্যাসীর দুস্তর তপস্যায় বনস্পতি প্রেমের সাধনা করে। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে অচিরেই। অরণ্যানীর বুকে আকাশের জলভরা মেঘের আত্মনিবেদনের ধারা পূর্ণ হয়। পুরুষ এবং নারীর দেহাতীত আত্মিক মিলন

সম্ভব হ'ল তপস্যার, সন্ন্যাসের অ-কল্পিত পথে। জয় হ'ল পুরুষের, জয় হ'ল নারীর। নারীও এই পরম প্রেম-পর্বের অংশভাগী। কবির মানসপুত্রই শুধু আপন প্রেমের সার্থক পরিণতি সম্বন্ধে আশাবাদী নয়, তাঁর মানসকন্যাও জানে যে, তার কাঙ্ক্ষিত তারই পাশে ফিরে আসবে পরম মিলন লগ্নে। পুরুষের বিবাগী চিত্ত অশান্ত, ভ্রান্তিহীন তার বিহার। তবু সব শেষে দুটি ডাগর কালো আঁখির তিরস্কার মাথায় বয়ে তাকে ফিরে আসতে হবে তার প্রিয়তমার অঞ্চল-ছায়ায়। তাই পরম নির্ভয়ে রমণী বলে :

"হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হ'তে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ লিখন—
আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সথা। আমার প্রাঙ্গণ দ্বারে
যে পথ করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ।"
(প্রত্যাগত, মহুয়া)

প্রেমের শেষ হ'ল মিলনে। এই পরম আশার কথা কবি আমাদের বার বার শুনিয়েছেন, কখনও পুরুষের মুখ দিয়ে আবার কখনও বা নারীকণ্ঠে সে কথা শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের মূল জীবনদর্শনের সঙ্গে এর নিবিড় যোগ রয়েছে। যে আশাবাদের আলোয় রবীন্দ্র-জীবনদর্শন ভাস্বর, তারই প্রতিফলনে তাঁর প্রেমাদর্শও উজ্জ্বল।

নরনারীর মিলন ভোগাসক্তি রহিত। বর্ষার অতিরিক্ততার মধ্যে এ মিলন সংঘটিত হয় না। বসন্তের রাগরক্ত সমারোহেও এই মিলনের আসন পাতা হয় না। বর্ষার ধরিত্রী সৃষ্টি-সম্ভবা। সৃষ্টির ইঙ্গিতটুকু বুঝি প্রয়োজনকে প্রচ্ছন্ন রাখে। প্রয়োজনের দরবারে প্রেম ত কুর্ণিশ করে না, প্রেম যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বসন্তের প্রকৃতিও বুঝি বর্ণ-সম্ভারের আচ্ছাদনে আপনার আদিম বাসনার তৃপ্তি খোঁজে। তাই ত কবিকল্পিত মিলন-বাসর এই দুই ঋতুকেই পরিহার করে চলে। এ মিলন দেহচর্চা নয়, এ মিলন হ'ল নির্লিপ্ত, আত্মসাধনায় তৎপর দুটি হৃদয়ের পরস্পর সান্নিধ্য লাভ। এই নারী ও পুরুষের আদর্শ হ'ল উমাপতি শিব ও শিবপ্রিয়া উমা। তাই তাদের মিলনও পরম বৈরাগ্যের গৈরিক তিলক লাঞ্ছিত। রবীন্দ্রনাথ এই মিলন বাসরের ছবি আঁকলেন তাঁর অনুপম ভাষায় :

"বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে।
অগ্রগল্ভা ধরিত্রী সে প্রণামে লুটিত,
পূজারিণী নিয়তপ্রণত,
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে।
দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিল প্রবাসী।
সেই স্নিগ্ধ ক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে
পূর্ণতার—গম্ভীর অম্বরে,
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে চক্ষু নাহি জানে।"
(লগ্ন, মহুয়া)

এই হ'ল কবির চোখে মিলনের যথাযোগ্য পরিবেশ ও প্রস্তুতি। ইন্দ্রের অমরাবতী তার আনন্দের ভাণ্ডারটুকু অবারিত করে দেয় এমনিধারা নিরাসক্ত দুটি হৃদয়ের মিলন-সম্ভাবনায়। চিত্তের গহনে প্রেমাস্পদের যে রসঘন মূর্তি গড়া হয়েছে সে ত চির-অদেখা। কখনো হয়ত তার চকিত আবির্ভাব ঘটে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষে। তাই ত ভাল লাগে নারীর একটি বিশেষ পুরুষকে এবং পুরুষের একটি বিশেষ নারীকে। তারা অভাবনীয়ের মাধুর্যটুকু সারা অঙ্গে মেখে নিয়ে মনোহর, অপরূপ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। দেহাতিরিক্ত মিলনের এই ধারণা স্বয়ংসম্পূর্ণ একথা আমরা আগেই বলেছি। পাত্র-পাত্রীর প্রয়োজনও সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ তাদের আবশ্যকতার ব্যাপ্তি। কোন বাধাই হৃদয়ের গতি-পথকে বাধা দিতে পারে না। বাইরের দুস্তর ব্যবধান, অনায়াসে অতিক্রম করে দুটি হৃদয় পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করে। দেহের দূরত্ব মনের নৈকট্যকে কখনো খর্ব করে না। কবির প্রেম-ধারণা এমনই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, প্রেম-নিবেদনেই প্রেমের সার্থকতা এমন কথাও কবি বললেন। গ্রহণটাও সেখানে অবান্তর। আত্মনিবেদন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। নারী পুরুষকে বলে :

"বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে
তাহাতে মোর যা হয় হোক ক্ষতি—
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হয়ে
চরণে তব গোপনে তার গতি।"
(দিনান্তে, মহুয়া)

কবির প্রেমদর্শনে বিরহ-বিচ্ছেদ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। হৃদয়ে যে মিলন বাসা বাঁধে সে কখনও বিচ্ছেদের দ্বারা খণ্ডিত নয়। এ মিলন-স্পর্শ—সোহাগ, বাহুবন্ধন ও চুম্বনের দ্বারা চিহ্নিত নয়; পুলক, স্বেদ, মূর্চ্ছা এই সব প্রেমলক্ষণও এই আত্মিক মিলনের জগতে অবাঞ্ছিত। দুটি হৃদয় আপন

আপন স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পরস্পরকে একান্তভাবে আশ্রয় করে ; যখন একের সত্তা অপর একটি সত্তার মধ্যে অনুসৃত হয় তখনই মিলন পূর্ণ হয়। এই পরিপূর্ণ মিলনের ছবি এঁকেছেন কবি :

"শুভক্ষণ আসে সহসা আলোক জ্বেলে,
মিলনের সুধা যার ভাগ্যে মেলে।
একার ভিতরে একের দেখা না পাই,
দু'জনার যোগে পরম একের ঠাঁই
সে একের মাঝে আপনারে খুঁজে পেলে।"

(পরিণয়, মহুয়া)

প্রেম একটি সত্তাকে অপর একটি সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে। অন্তরে অন্তরে যেখানে বিরহ, সেখানে মিলনও সহজ। মানসিক প্রস্তুতিটুকু সম্পূর্ণ হলেই মিলন হয় হৃদয়ে হৃদয়ে। একটি হৃদয় দেশকালের বেড়া ভেঙ্গে আর একটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাই ত আমরা বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ইন্দ্রলোকে নিত্য মিলন, নিত্য বিরহ। কোন অলক্ষ্য পথে বিরহ পূর্ণ হয় মিলনের সুধারসে, আবার মিলন বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে লাঞ্ছিত হয় সে কথা বলা শক্ত। দেহাতীত প্রেম নৈর্ব্যক্তিক। বিলাসী ব্যক্তিসত্তা অবিলাসী প্রেমকে স্পর্শ করে না, কেননা প্রেম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আশ্রয়ী নয়। আত্মার চিন্ময়লোকে প্রেমের অধিষ্ঠান। তাই ত কবি বারংবার আত্মাকে এবং প্রেমকে মৃত্যুহীন বলে ঘোষণা করলেন :

"তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্য লোকে তোমার পরম আগমন।
লভিলাম চির স্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।"

(অন্তর্ধান, মহুয়া)

ব্যক্তির অন্তর্ধান তার আপন শূন্যতাকে পূর্ণ করে আপনার চিন্ময় রূপ-মাধুর্যে। অবস্থান এবং অন্তর্ধান সমর্থক হয়ে উঠেছে কবির প্রেমদর্শনে। রমণী কোন্ 'চিরস্পর্শ-মণির' আসল উজ্জ্বলতায় কবির বেদনা-বিহ্বল চিত্তে শান্তি-বারি সিঞ্চন করে, সে তত্ত্ব চিররহস্যে ঢাকা। তবু এ কথা কবির কাছে অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যে, তার প্রিয়ার বিচ্ছেদ-শূন্যতা পরম মাধুর্যে আপনাআপনি ভরে ওঠে। রমণীর দান অলক্ষ্য পথে আসে, আত্মার গোপন পথে তার গতায়াত। কবির মানসকন্যা যুগ যুগ ধরে বিভ্রান্ত পুরুষকে বলবে :

"—কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃত প্রদোষে
হয় তো দিবে সে জ্যোতি,
হয় তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি।"

(বিদায়, মহুয়া)

তাই ত আমরা বলেছি রবীন্দ্রনাথের 'প্রেম' সকল বিচ্ছেদজয়ী।

মিষ্ট হাসি সারদার

শ্রীমহাদেব রায়

ভারতীয় সাধনায় তন্ময় তনয় যোগাচারে
একান্তে জীবন-প্রান্তে উপনীত যণ্ণবতি-পারে—
'স্বস্তিকে'র বক্ষে তুমি' সারদায় ধ্যানে-আরাধনে,
ভাবে নাই কোনদিন—দিবে দেখা সাধনা-কেতনে
মান-দানে সমারোহ। অকস্মাৎ অপলকে চাহি'
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ কহে, 'হায়, আজি সেদিন ত নাহি,
স্বচ্ছন্দে নিবেদি মান্য অতিথিরে স্বাগত সম্ভার
দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে, আনিল যে বর উপহার
দ্বারে মোর সযতনে। হে অতিথি, অক্ষমতা ক্ষম',
বিশ্বের বিদ্যার পীঠ করপুটে কহে, 'নমো নমঃ,'
ত্রুটি মাগে শ্রদ্ধা ভরে যোগিজনে স'পি' কণ্ঠহার,
অচিতের কণ্ঠ্র করে সমাদৃত অঞ্জলি সম্ভার
সঙ্কুচিত ব্রীড়া ভরে। সভাজন হেরিল অন্তরে
মিষ্ট হাসি সারদার প্রস্ফুটিত মুগ্ধ ওষ্ঠাধরে।

---

* বাঁকুড়া কলেজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব সমাবর্ত্তনে আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে ডি. লিট. উপাধি নিবেদন উপলক্ষে রচিত।

১৫

বঙ্গবালা ভূমিষ্ঠ হয়ে ব্রজবাবুর পায়ে প্রায় লুটিয়ে পড়ল।

ব্রজবাবু হঁ-হঁা করে উঠলেন—ওকি ? খানিকটা পিছিয়ে গেলেন তিনি।

বঙ্গ একটু হাসল। তখন তার প্রণাম সারা হয়ে গেছে।

—এই বুঝি শিক্ষার ফল হচ্ছে !

ব্রজবাবু বঙ্গবালাকে শিখিয়েছেন—এক বাবা আর মা ছাড়া আর কারও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে না। কারও পায়ে হাত দেবে না। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে আমাদের জাতটার সঙ্গে দেশটার মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। নমস্কার করবে।

বঙ্গ প্রথম দিন বলেছিল—রামজয় জ্যাঠামশাইকে নমস্কার করলে ক্ষেপে যাবেন উনি।

ব্রজবাবু হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা ওঁকে প্রণাম করবে।

—আর আপনাকে।

—খবরদার। কখখনো না।

আজ বঙ্গবালা অতর্কিতে প্রণাম সেরে উঠে হাসতে হাসতে চলে গেল। বলে গেল—আজ শুনব না আপনার কথা। আমি চা নিয়ে আসছি।

চন্দ্রবাবু মৃদু মৃদু হাসছিলেন। উপভোগ করছিলেন তিনি গুরু ও শিষ্যার ওই মধুর আলাপটুকু।

ব্রজবাবু বললেন—আমি যে একটি কাজ করে এসেছি মাষ্টারমশাই। দুটি নূতন নিমন্ত্রণ করে এসেছি আপনার হয়ে।

—দু'জন কেন ? দশ জন করলেই বা কি হ'ত ? আজকের এ আনন্দ এ সাকসেস এ ত আপনার জন্যই। বঙ্গবালাই হোক—আর বিধুই হোক এদের এই সাকসেসের পিছনে আপনি যে কতখানি সে ত সকলেই জানে। কিন্তু কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করেছেন ? আমি কি আবার লোক পাঠাব ?

ব্রজবাবু বললেন—পাঠানো উচিত। ষ্টেশনে রয়েছেন—

—ষ্টেশনে ?

—হ্যাঁ। আমাদের ছাত্র ছিল— রবি সিং।

—রবি সিং ? চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু। সেই রবি সিং! ব্রজবাবুই তাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে প্রমোশনের পর এখান থেকে ট্রানসফার সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করেছিলেন। বঙ্গবালার মা যে প্রিয়দর্শন অবস্থাপন্ন স্বজাতির ছেলেটিকে দেখে বঙ্গবালার সঙ্গে বিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। কথাটা ওদিকে পৌছেছিল রবির কানে এদিকে বঙ্গবালার কানে। যার ফলে—

ব্রজবাবু বললেন—জানেন নিশ্চয় রবি গত বৎসর এম-এসসিতে ম্যাথামেটিকসে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে !

তাও জানেন চন্দ্রবাবু। নিশ্চয় জানেন। রবি সিং এখান থেকে ট্রানসফার নিয়ে রামপুরহাট গিয়েছিল। ব্রজবাবুই পাঠিয়েছিলেন। সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করেও তিনিই তাকে সস্নেহে বলেছিলেন—তুমি রামপুরহাটে যাও। ওখানকার হেডমাস্টার বড় ভাল লোক—আমার বন্ধু।

রামপুরহাট থেকে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছিল। আই-এসসি পাস করেছিল বহরমপুর থেকে সেও ফার্স্ট ডিভিসনে। বি-এসসি কলকাতার সেন্টজেভিয়ার্স থেকে।

ম্যাথামেটিকসে অনার্স নিয়ে পাস করেছিল। স্কলারশিপও পেয়েছিল। গত বৎসর এম-এসসিতে ম্যাথামেটিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। জানেন বৈ কি। তিনি জানেন— ইস্কুলের মাষ্টারেরা জানে—বঙ্গবালার মা—বঙ্গবালা এরাও জানে। এখানকার ছেলেরাও জানে। সম্প্রতি নাকি মস্ত বড়লোকের ঘরে তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে তাও শুনেছেন। বিয়ের পর বিলেত যাবে।

ব্রজবাবু বললেন—ট্রেনে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কলকাতা থেকে বাড়ী আসছে। আমাকে দেখে আমার গাড়ীতেই এসে উঠল। আমি নিমন্ত্রণ করলাম। চল। মাষ্টার মশায়ের বাসায় আজ - সেই সত্যনারায়ণের পর এই প্রথম উৎসব। আমি নিমন্ত্রণ করছি। হয় ত রাজী হ'ত না। নানারকম ছুতো তুলছিল—বাড়ীতে বাবা মা আজই রাত্রে পৌঁছতে বলেছেন। স্টেশনে গাড়ী আসবে। না গেলে ভাববেন। কিন্তু শিবনাথ ওর সব আপত্তি প্রায় হেসে উড়িয়ে দিলে। না বলতে পারলে না। শিবনাথকেও বলেছি।

—শিবনাথ!

—হ্যাঁ। শিবনাথ হোম ইনটার্ণড হয়ে এল। বর্দ্ধমানে উঠল ট্রেনে।

বিল্বগ্রামের শিবনাথ! দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে চৈতন্য ইনস্টিটুশনের পাঠানো প্রথম সৈনিক। রতনবাবুর হাতেগড়া সেই শ্যামবর্ণ ছেলেটি! সেই পড়াশুনার চেয়ে কবিতা লেখায় অনুরাগী শিবনাথ। সে ফিরল?

কিন্তু খুব খুশী হয়ে উঠলেন না চন্দ্রবাবু। একটু চুপ করে থেকে বললেন—তা হলে শম্ভুকে পাঠিয়ে দিই। শম্ভু রবির সঙ্গে পড়ত, শিবনাথের সঙ্গে ওর বেশ আলাপ আছে। ওই যাক।—কেষ্ট! শম্ভুবাবুকে পাঠিয়ে দাও ত একবার!

ব্রজবাবু বললেন—আপনি কি খুব খুশী হলেন না মাষ্টার মশাই?

—না-না-না। সে কথা কেন বলছেন?

—আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ—তা একটু—। ম্লান হেসে চন্দ্রবাবু বললেন—মনের কথা আপনাকে লুকোব না। মন বিচিত্র ব্রজবাবু। খবর শুনে খুশী হই নি তা নয়, হয়েছি, সত্যই হয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে আশ্চর্য্য ভাবে উল্টো রকমের চিন্তা মনে জেগে উঠছে। কি করব? রবি সিংহের কথায় মনে হচ্ছে—আজ বঙ্গ কি ভাববে? বঙ্গ হয় ত ভাববে—এর সঙ্গে ত আমার বিয়ে হতে পারত। বাবা দেন নি। বিয়ের কথাটা তার মনের মধ্যে নতুন করে বাসা গাড়বে। নিজেও ভাবছি, মেয়েকে পড়াব—এম-এ পাস হয় ত করাব, কিন্তু ওকে ত সংসারী দেখে যাব না। নিজের ঘরদোর স্বামী-পুত্র সংসার—এ সাধ যে জন্মগত। বিশেষ করে মেয়েদের।

ব্রজবাবু বললেন—আমি রবিকে কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই নিমন্ত্রণ জানালাম মাষ্টারমশাই। কথায় কথায় রবিকে বললাম, রবি সে সময় যদি মাষ্টারমশায়ের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'ত তা হলে কিন্তু তুমিও এম-এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে না, হয় ত এম-এ পর্য্যন্ত পড়তেই না। এত দিনে দুটি-তিনটি পুত্রকন্যার বাপ হয়ে হয় ঘরে বসে তোমার স্বচ্ছল সংসার দেখতে, পাইক পেয়াদা নিয়ে সুদ আদায় করতে, পাওনাগণ্ডার হিসেবনিকেশ করতে। আর বঙ্গও ম্যাট্রিক পাস করত না। সিংহী বাড়ীর বউ গিন্নী হয়ে ঠাকুরবাড়ী থেকে বাড়ীর কানাচ পর্য্যন্ত অনাচার ইনসপেকসন করে বেড়াত। বাইরের বাড়ীতে মাটির হাঁড়িতে তোমাকে মুরগী রান্না করে খেতে হ'ত লোভ-টোভ হলে। হাসতে লাগল। বললাম—চল—তুমি এম-এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ, বঙ্গ ফার্ষ্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করেছে—বাড়ীতে পড়ে সেটা কম গৌরব নয় তার; ম্যাটিকে তুমি যা রেজাল্ট করেছিলে সেই রেজাল্টই সে করেছে। চল দেখা করে আসবে। কংগ্র্যাচুলেট করে আসবে তাকে। চুপ করে রইল। মিথ্যে কথা আমিও বলব না। আমি নিয়ে এলাম ওকে ওই জন্যই। অবশ্য বাল্যপ্রেমের খুব মূল্য আমি দিই না। কারণ বিশেষজ্ঞেরা বলেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রে অল্পবয়সের প্রেম যাকে বলে, যাতে এমন দেখা যায় যে, বাধা পেলে তারা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়, আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাতেও যদি তাদের নব্বই দিন দেখাশুনো হতে না দিয়ে পৃথক করে রাখা যায় তা হলে সে মোহ তাদের কেটে যায়। ওদের যদি কেটে না থাকে তা হলে ওই দেখা হওয়া থেকে বিয়ের নতুন সুযোগ আসবে মাষ্টারমশাই।

—রবির খুব বড় ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ব্রজবাবু। আপনি জানেন না। চন্দ্রবাবু গভীর চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন কথা শুনতে শুনতে। উত্তরে শঙ্কিত স্বরেই কথাগুলি বললেন—মেয়ে শুনেছি সুন্দরী। বিলেত যাবার খরচ দেবে তারা। এ ক্ষেত্রে অনিষ্ট হলে বঙ্গবালারই হবে।

—ভাববেন না আপনি তার জন্য। আমি শুধু রবির মনটা বুঝে নেব। বঙ্গবালাকে ওর কাছে একবার ছাড়া আসতে দেব না। ইউ ডিপেণ্ড অন মি। বঙ্গবালা আপনার মেয়ে কিন্তু ওকে আপনার চেয়ে আমি বেশী বুঝি। ওর ভেতরে খুব একটি শক্ত মেয়ে আছে। তাকে আমি আমার স্ত্রী দু'জনে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছি।

শম্ভু গড়াঞী এসে দাঁড়াল।—আমাকে ডেকেছিলেন? আপনি সার ভাল আছেন? ব্রজবাবুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে শম্ভু।

—তোমরা আর আমার শিক্ষাটা নিলে না। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাটা আর ছাড়লে না। এখন বিধুর অভিনন্দনটা তুমিই নাও। কারণ এটা আসলে তোমারই প্রাপ্য। এ রেজাণ্ট তোমারই করার কথা, কিন্তু সিদ্ধি-সাধনা করেই ভোম্বল বাবাজী হয়ে গেলে তুমি। এখন যাও দেখি একবার ষ্টেশনে। আমাদের রবি সিং—তোমাদের সঙ্গে পড়ত, সে নেমেছে আমার সঙ্গে। তাকে মাষ্টারমশায়ের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এস এখানে। আর গ্রামে গিয়ে শিবনাথকেও নিমন্ত্রণ করে আসবে। সেও আজ বাড়ী এসেছে হোম ইনটার্ণড হয়ে।

বঙ্গবালা চা আর রেকাবীতে খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াল।

—ও ভাবনা আমার পরের ভাবনা ব্রজবাবু। আপনি রবির কথা আগে বললেন আমিও ওই কথার জবাবটাই আগে দিলাম। আমার আগের ভাবনা রবির জন্য নয়—শিবনাথের জন্য।

—ইণ্টার্ণড বলে বলছেন? না। সে ভাবনা বিশেষ নেই। তাকে পুরোপুরি ছেড়েই দেবে—তার আগে বাড়ীতে পাঠিয়েছে। ঠিক হোম ইণ্টার্ণমেণ্টও নয়, ওকে বেঙ্গলের অন্য জেলাগুলি থেকে এক্সটার্ণ করে—এই জেলাতে এক রকম ছেড়ে দিয়েছে। জেলার মধ্যে কোথাও যেতে আসতে কোন বাধানিষেধ নেই। শুধু সপ্তাহে একবার থানায় গিয়ে হাজরে দিয়ে আসতে হবে।

—কিন্তু—। কুণ্ঠিত ভাবেই বললেন চন্দ্রবাবু—আমার দায়িত্বের কথাটা ভেবে দেখেছেন ব্রজবাবু? এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ পুরুষের দায়িত্ব। শিবনাথ এখানে এল—এ তার বাড়ী—বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেলে, আনন্দের কথা। তার মায়ের মুখে হাসি ফুটল। আমি তার শিক্ষক—আমারও অনেক আনন্দ। তবু আমার দায়িত্বের কথা ভেবে আমি ভয় পাচ্ছি। আমি আজকের কথা ভাবছিও না। বড় জোর আমার কাছে কৈফিয়ত চাইবে—"তুমি নিমন্ত্রণ করেছিলে?" আমি বলব—"আমার ছাত্র—এককালে আমার প্রিয় ছাত্র ছিল। আজ যখন গ্রামের সকল ভদ্রজনকে নিমন্ত্রণ করেছি তখন তাকে কি করে বাদ দেব? করেছি নিমন্ত্রণ।" আমি ভাবছি ভবিষ্যতের কথা। এখানকার ছেলেরা ওর কাছে ছুটে যাবে। বারণ শুনবে না। রাজনীতির বীজ ওদের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে। সে যে কি আকার নিয়ে বের হবে সে ত কেউ জানে না। প্রকাণ্ড প্রাসাদ তার একটি চুলের মত ফাটল—সেখানে গিয়ে পড়ে একটি বটের বীজ। চারা গজায়; একটু বাড়তে পেলে আর রক্ষা থাকে না। কেটে ফেলে—আবার গজায়। আবার কাটে আবার গজায়। তখন আর সে গাছ শাখাপ্রশাখায় পাতায় পল্লবে বাড়ে না বাড়ে ভিতরে ভিতরে শিকড়ে শিকড়ে। সে রাজপ্রাসাদ যত বিরাটই হোক তাকে ফাটিয়ে ছেড়ে দেয়। ভেঙে পড়ে যায়। বাস হয় সরীসৃপের। এও তাই হবে ব্রজবাবু। এ একবার ঢুকলে আর রক্ষা থাকবে না। এর শেষ নেই। আমি অনেক কষ্টে চৈতন্য ইনস্টিটুশন গড়ে তুলেছি। শিবনাথ বটের বীজের মত এর কোন ফাটলে পড়ে আজ পাতা মেলে বেরিয়েছে। একে একদিন শেষ করে দেবে। শিক্ষা বড় পবিত্র জিনিস। জ্ঞান—তার মূল্য শুধুই জ্ঞান। কোন স্বার্থের সংস্পর্শই তার সহ্য হয় না। চাকরীর স্বার্থেই শিক্ষার চেহারাটা কি হয়েছে দেখেছেন। রাজনীতি অতি উগ্র বিষ, ও বিষ ঢুকলে আর রক্ষা থাকবে না। আমি তাই ভাবছি।

হেসে ব্রজবিহারী বাবু বললেন—আপনি একটু বেশী ভাবছেন মাষ্টারমশাই। ভেবেও ত আপনি এর গতিরোধ করতে পারবেন না। এ কালের গতি।

—হ্যাঁ। কালস্য কুটিলা গতি। ও রোধ করা মানুষের সাধ্য নয়।

কণ্ঠস্বর রামজয় পণ্ডিতের। কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ব্রজবাবু চন্দ্রবাবু জানতে পারেন নি।

—পণ্ডিতমশায়?

—হ্যাঁ। কুশল আপনার?

—হ্যাঁ। আপনি।

—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ হবিষান্ন খাই—মাসে তিন-চারটে উপবাস করি, অসুখ হবার উপায় কি? কিন্তু আর ও আলোচনা করবেন না। শিবনাথ এসে হাজির হয়েছে। শিবনাথের সঙ্গে রবি সিং। ওই আসছে।

রবি সিং এবং শিবনাথ এসে দাঁড়াল।

চন্দ্রবাবু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন রবি সিঙের দিকে। রবি সিং ছেলেবেলায় রূপবান ছেলেই ছিল। সুকুমারকান্তি কিশোর। পরিপূর্ণ যৌবনে সে হয়ে উঠেছে অপরূপ সুন্দর।

চন্দ্রবাবুর সে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রামজয় একটু হেসে চলে গেলেন সেখান থেকে। তিনি মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন কালই তিনি রবির বাড়ী গিয়ে তার বাপের কাছে ধর্না দেবেন।

—ভাল আছেন স্যার।

প্রণাম করলে শিবনাথ, তার পরে রবি।

—তোমরা ভাল আছ ? আমি খুব খুশী হয়েছি, তোমরা এসেছ। বস। বস। রবি তোমার উন্নতিতে আমি অত্যন্ত সুখী। অত্যন্ত সুখী। এ ইস্কুল থেকে তুমি পাস না কর, তবু আমার ইস্কুলেরই ছাত্র তুমি। তুমি এম-এসসিতে ম্যাথামেটিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ এ আমার গৌরবের কথা। উই আর প্রাউড অব ইউ।

রবি লজ্জিত হ'ল, লজ্জিত ভাবেই সে চুপ করেই রইল। উত্তর দিলে শিবনাথ—রবি বিলেত যাচ্ছে—আই-সি-এস হতে, না হলে শেষ ব্যারিষ্টারি। আমি বললাম—সে কি ? ম্যাথামেটিকসেই হায়ার ষ্টাডি করে এস। তোমার মত ছেলে চাকরীর জন্য পড়বে কি ? পড়ার জন্য পড়। আপনারা ওকে বলুন। বিলেত না গিয়ে ও বরং জার্ম্মানী চলে যাক। পোষ্টওয়ার জার্ম্মানীর দুর্দ্দশা অনেক কিন্তু সত্যিকারের সায়েন্টিষ্ট থাকে ত জার্ম্মানীতেই আছে।

—শিবনাথ ভাল কথা বলেছে রবি। ব্রজবাবু বললেন আর বিয়ে করে সেই টাকায় বিলেত যাওয়াটাও তোমার ঠিক হচ্ছে না।

—তবে স্যার বিয়ের টাকায় বিদেশে যাক বা না-যাক, বিয়ে করে যাওয়াটা ভাল।

—কিন্তু তুমি এখন কি করবে শিবনাথ ? গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন চন্দ্রবাবু।—দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করা অবশ্যই গৌরবের কথা। কিন্তু আজ এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে যে যুদ্ধে আমরা হেরেছি। এখনও ইংরেজের শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আমরা অর্জ্জন করতে পারি নি।

শিবনাথ একটু হেসে বললে—ভাবছি এখানে চরখা তাঁত নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে তুলব।

—ইউ মীন—দোজ টিপিক্যাল আশ্রমস ? যার উপরটায় ওগুলো নেহাতই একটা আইওয়াশ ভিতরটায় শুধু পলিটিক্স ! ইনোসেণ্ট ভাল ছেলেগুলিকে ধরবার একটা ট্র্যাপ ? বোমা পিস্তল নিয়ে—

—না স্যার। আমি হিংসায় বিশ্বাস করি না। আমি গান্ধীজীর অহিংসায় বিশ্বাসী। মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি ওই পথেই আমাদের স্বাধীনতা আসবে। বিশ্বাস করি বিশ্বজগতের দরবারে ওই অহিংসায় বিশ্বাস নিয়েই আমাদের যেতে হবে—আমরা যাব—পৃথিবীকে গ্রহণ করতে হবে এই অহিংসা।

শিবনাথের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। চন্দ্রবাবু শঙ্কিত হয়ে বললেন—থাক ওসব কথা শিবনাথ। লোকজন আসছেন সব, ছেলেরা ঘুরছে চারিদিকে, এসে সব জমে জটলা পাকাবে। ও সব কথা থাক।

—বসুন ব্রজবাবু—আমি দেখি কে কে যেন এলে। মনে হচ্ছে।

উঠে পড়লেন চন্দ্রবাবু।

ব্রজবাবু মৃদু স্বরে বললেন—তুমি এখানে আশ্রম তৈরি করবে শুনে উনি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন—ইস্কুলের জন্য।

—জানি স্যার। সেই এণ্টি-ম্যালেরিয়েল ওয়ার্কের কথা আমার মনে আছে। একটু হাসলে শিবনাথ।

—কিন্তু তুমি যেন ওঁকে ভুল বুঝো না। তুমি বোধ হয় জান না। কথাটা তোমাকে বলি। তোমার জানা দরকার।

পুরনো কথা। শিবনাথ এখান থেকে পাস করে কলকাতায় পড়তে গিয়ে প্রথম বৎসরই সন্দেহভাজন হিসেবে ভারতরক্ষা আইনে ধরা পড়েছিল। পুলিস ওকে সেবার বাড়ীতেই নজরবন্দী করে রেখেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর ইণ্টার্ণমেণ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে শিবনাথ এখানেই সমাজসেবার কাজ সুরু করে। সেবাধর্ম্মই তার মধ্যে প্রধান কলেরা এপিডেমিক থেকে সূত্রপাত। তার পর করেছিল একটি ফায়ার ব্রিগেড। তার পর ধরেছিল ম্যালেরিয়া নিবারণী কাজ। রবিবার রবিবার তার কর্ম্মীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে গ্রামে গ্রামে কেরোসিন তেল নিয়ে পাঠাত, খানায় ডোবায় তারা কেরোসিন ছড়িয়ে আসত। ছেলেরা দলে দলে তার সমিতিতে এসে জুটতে চেয়েছিল। কিন্তু হেডমাষ্টার আপত্তি জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে বোর্ডিঙের ছেলেদের কঠোর নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন তারা যেন না যায়। শিবনাথ ব্রজবাবুর কাছে এসেছিল। ব্রজবাবু ম্লান হেসে বলেছিলেন বোর্ডিঙের ছেলেদের বাদ দিয়েই তুমি কাজ কর শিবনাথ। মাষ্টার মশাই ওদের যেতে দেবেন না। গ্রামের ছেলেরা অনেকটা স্বাধীন, অন্ততঃ তারা নিজেদের অভিভাবকদের অধীন। তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না উনি। কিন্তু বোর্ডিঙের ছেলেদের উনিই অভিভাবক। উনি যেতে দেবেন না। তুমি ত জান উনি পলিটিক্সকে কি রকম ভয় করেন। শিবনাথ বোর্ডিঙের ছেলেদেব বাদ দিয়েই কাজ করত। এর কিছু দিন পর দেশে ইউনিয়ন বোর্ড হ'ল। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হলেন পবিত্রবাবু। ওদিকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ছেলেরা চঞ্চল হ'ল। শিবনাথকে দ্বিতীয় বার পুলিস রাউলাট আইনে ধরে নিয়ে গেল। তখন ছেলেদের ওদিক থেকে ফেরাবার জন্য সরকারী পরামর্শে পবিত্রবাবু ইউনিয়ন বোর্ড থেকে ম্যালেরিয়া নিবারণী কাজ সুরু করলেন। চন্দ্রবাবু তখন ছেলেদের অনুমতি দিলেন সে

কাজে যোগ দিতে। ব্রজবাবু তখন মৃদু অনুযোগ জানিয়ে বলেছিলেন ভাল কাজ সব সময়েই ভাল কাজ মাষ্টার মশাই। আজ ছেলেদের সে কাজ করতে অনুমতি দিলেন, আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু শিবনাথ যখন বলেছিল তখন অনুমতি দিলে আরও খুশী হতাম। সে আমাদের ছাত্র। আদর্শ-বাদী—

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—সমস্ত সত্ত্বেও আমি ওকে পছন্দ করি না ব্রজবাবু। শিবনাথ আমাকে নিরাশ করেছে। ওকে আমি আরও বড় দেখতে প্রত্যাশা করেছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ। ব্রজবাবু এই স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি বিশ্বাস করি না। এতে কিছু হবে না। দেশকে আগে শিক্ষিত করতে হবে। তার পর। তার পর! তার আগে নয়। শিবনাথ লেখাপড়া শেষ করে যদি এ আন্দোলনে যোগ দিত আমি তাকে প্রশংসা করতাম আশীর্ব্বাদ করতাম। কিন্তু লেখাপড়ার বয়সে—সেই বয়সের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে যে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করলে তার নিজের জীবন ব্যর্থ এবং যে পরধর্ম্ম সে পালন করতে গেল তাও ব্যর্থ। ও অনেক বড় হতে পারত। ও ছাত্রজীবনে লিখত। পদ্য লিখত। ও বড় কবি হতে পারত। সে সম্ভাবনাও নষ্ট হয়েছে। আমি পড়ার সময় পদ্য লেখার জন্য তিরস্কার করেছি, সে পড়াশোনায় অবহেলার জন্য। নইলে প্রত্যাশা করতাম বৈকি ও একজন বড় কবি হবে। ওর সম্পর্কে আলোচনা যখন হবে তখন তাতে লিখতে হবে তার শিক্ষা হ'ল চন্দ্রভূষণ হেডমাষ্টারের কাছে। সে শিক্ষা নিয়েছিল এই চৈতন্য ইনস্টিটুশনে। সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমি ওকে পছন্দ করি না।

ব্রজবাবু বললেন—ওর সে মুখ চোখের চেহারা আজও ভুলতে পারি নি শিবনাথ। দু'চোখ ভরে জল টলমল করে উঠেছিল। উনি চট করে মুখ ফিরিয়ে ঘরে ঢুকে গিয়ে-ছিলেন। তুমি যেন ওকে ভুল বুঝো না।—এই বিচিত্র মানুষটিকে চেনা সহজ নয়—অত্যন্ত কঠিন শিবনাথ। ছাত্র অবস্থায় তোমরা চিনবে কি তোমাদের বয়স অল্প তার উপর লেখাপড়া নিয়ে পুরোপুরি ব্লাড আর স্কলার-এর সম্বন্ধ।

একটু হেসে বললেন—প্রথম যখন স্বদেশী বক্তৃতা করতে তখন বিদেশী শাসকদের উল্লেখ করবার সময় পুলিস দারোগা আর মাষ্টারদের মূর্ত্তিই ভেসে উঠত তোমার চোখে।

শিবনাথ হেসে উঠল—না স্যার! ওকথা বললে আমার উপর একটু অবিচারই করা হবে।

ব্রজবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—সেটা অবশ্য খুবই ভাল কথা। আশীর্ব্বাদ করব তোমাকে আর এক দফা। তবে ভেসে উঠে থাকলে দোষ দোব না।

তার পর গম্ভীর হয়ে বললেন—আমারই চিনতে অনেক দিন লেগেছে। তোমরা বোধ হয় জান না বজবালায় বিয়ে না দিয়ে ম্যাট্রিক পড়ানোর কারণ বাল্যবিবাহে আপত্তি নয়; উনি চান বজবালা বিয়ে না করে লেখাপড়া শিখে ওর ব্রত গ্রহণ করে। ছেলে নেই। একটি মেয়ে। মেয়েকে দিয়েই সাধ মেটাতে চান। এম এ পাস করাবেন বজবালাকে। কল্পনা করেন সে ফার্ষ্ট ক্লাস পাবে। প্রফেসরী করবে। ফার্ষ্ট ক্লাস না পায় বি-টি পাস করিয়ে এখানে বজবালাকে দিয়ে গার্লস হাই ইংলিস স্কুল করবেন। বজবালা পাস করার জন্যে এই কারণেই ওর এত উৎসাহ, এত সমারোহ করছেন উনি।

হঠাৎ শম্ভু গড়াঞী ব্যস্ত হয়ে এসে ডাকলে—মাষ্টার মশাই!

—কি? ব্যাপার কি শম্ভু?

—গণ্ডগোল পাকিয়ে গেল, স্যার।

—গণ্ডগোল? কোথায়?

—চায়ের আসরে! হিন্দু-মুসলমানের আলাদা খাওয়ার জায়গা হয়েছে ত। তা সবাই অবশ্য ঠিক ঠিক বসেছে, শুধু গোলাম হোসেন চৌধুরী হিন্দুদের টেবিলে একখানা চেয়ারে বসে গেছে। কেউ কিছু বলতেও পারছে না। মুখ তাকাচ্ছে এ ওর। মাষ্টার মশাই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। উনি আপনাকে ডাকছেন।

—চলুন, স্যার। আমিও যাই। শিবনাথ ব্রজবিহারী বাবুর আগেই উঠে পড়ল।

বসে রইল শুধু রবি।

ব্রজবাবুর শেষ কথাগুলি তার মনের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় এর মধ্যে কয়েকবারই যেন সে হেডমাষ্টারের বাসার ভিতর থেকে কারও অস্পষ্ট ইঙ্গিত অনুভব করেছে। দু'বার যেন বাইরের জানালাটি খুলেছে, বন্ধ হয়েছে। কে যেন একবার কাকে বলেছে- কেউ নেই যে এঁদের চা দিয়ে পাঠাই। ওঁরা কখন থেকে বসে আছেন। কি বিপদ বল দেখি! কণ্ঠস্বর চেনা তবু তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। একবার খিল খিল হাসি কানে এসেছে।

রবি বসেই রইল। তার বুকের মধ্যে হৃৎস্পন্দন উল্লাসে বা বেদনায় বা কামনায় বা দ্বন্দ্বের তাড়নায় প্রবল গতিতে ছুটে চলছে, যেন মাথা কুটছে। তার যেন উঠবার শক্তি নাই। অবসন্ন হয়ে গেছে।

ওদিকে বোধ করি চায়ের আসরেই কলরব উঠছে, প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

হঠাৎ চন্দ্রবাবুর বাসার সামনের ঘরের দরজার পর্দাটি খুলে

গেল। ঘরের ভিতরের আলো পিছনে রেখে বেরিয়ে এল দুটি মূর্ত্তি। নারী মূর্ত্তি।

দীর্ঘাঙ্গী তরুণী একটি। শ্যামবর্ণা মেয়েটিকে দেখে আজকের সকালে দেখা সূর্য্যালোকিত একখানি জলভরা মেঘের শ্যাম লাবণ্যের কথা তার মনে পড়ে গেল। মেঘখানির চারি পাশের সাদা মেঘ রোদের ছটায় ঝলমল করছিল এই মেয়েটির সাদা ধবধবে কাপড়খানির মত। এই ত বঙ্গবালা! এমন অপরূপা হয়েছে বঙ্গবালা! সঙ্গে কে?

সঙ্গে বাসার ঝি। ঝিয়ের হাতে একখানি থালার উপর চায়ের কাপ ও ডিসে জলখাবার সাজিয়ে বঙ্গবালা এসে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল রবি।

—আপনি একা বসে আছেন? মাষ্টারমশাই, শিবনাথদা এঁরা কোথায় গেলেন।

—ওঁরা, ওদিকে গেছেন। কি জানি যেন একটা গণ্ডগোলের উপক্রম হয়েছে।

—আপনি চা খান।

এক কাপ চা এক ডিস জলখাবার সে নিজের হাতে তুলে বাড়িয়ে ধরলে।

—তুমি ভাল আছ? মা ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। আপনারা?

—ভালো আছি। কিন্তু তুমি কত বড় হয়ে গেছ।

হাসলে বঙ্গবালা। বললে—বাঁচলেই বয়স বাড়ে, বড় হয়, আবার বুড়ো হয়! তুমি খাবার জল নিয়ে এস চিত্তর আর এগুলি নিয়ে যাও।

চিত্ত ঝি চলে গেল।

রবি বললে—তুমি ম্যাট্রিক পাস করেছ, ভারী খুশী হয়েছি।

—আপনি ত এম-এসসিতে ফার্স্ট হয়েছেন—বিলেত যাচ্ছেন!

—তা হয়েছি। তবে বিলেত যাচ্ছি কি যাচ্ছি না সে ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু তুমি ত আমাকে অভিনন্দন জানাও নি। আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমার পাসের আনন্দভোজে বিনা নিমন্ত্রণে ছুটে এসেছি। তোমাকে আমি ভুলি নি। তুমি আমাকে ভুলে গেছ।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইল বঙ্গবালা। তার পর মৃদু স্বরে বললে—কেন যান নি জানি না। ভুলেই যাবেন আমাকে।

তার পর সে শান্ত ধীর পদক্ষেপে বাসার দিকে চলে গেল।

—বঙ্গ!

—কারা সব আসছেন।

বলতে বলতে সে পর্দ্দার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

হলা সহি, কারে কাহ কাহার ক্রন্দন
কালি স্তব্ধ অর্দ্ধ রাতে করিনু শ্রবণ
তব চারু তনুতটে! কোন্ দেহহীনা
অনন্ত রহস্যময়ী সেথা তন্দ্রালীনা-
বন্দীসম নিশিদিন অন্ধ কারাগারে?
আলেয়ার আলোসম ভুলায় আমারে
সেই চিরকুহকিনী সারাটি জীবন
শত ছলে। দেহাতীতে করি অন্বেষণ—
নশ্বর রমণী-দেহে! আঁখির মায়ায়,
ওষ্ঠপুটে, শ্রোণিতটে, কুন্তল-ছায়ায়
যতবার খুঁজি তারে—যায় দূরে সরি'
মরুমরীচিকাসম ব্যর্থতায় ভরি'
এ হৃদয়। কালি রাতে শুনিয়াছি তার—
তব দেহ-গেহ মাঝে ক্ষুব্ধ হাহাকার!

বাংলা অভিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শতাধিক বৎসর যাবৎ বাংলায় অনেক অভিধান সংকলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু স্থলে সংকলয়িতাদের প্রচুর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের নিদর্শন বর্তমান থাকিলেও পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক অভিধানের অভাব এখনও দূরীভূত হইয়াছে বলা চলে না। অবশ্য বাংলা অভিধানের আদর্শ ও ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে বিশেষ কোনও আলোচনা হয় নাই। প্রকাশিত অভিধানের গুণাগুণ সম্পর্কেও কোন বাদপ্রতিবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ অভিধান পর্যালোচনার অভ্যাস বাঙালি পাঠকসাধারণের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। যাঁহারা মাঝে মাঝে অভিধান দেখেন তাঁহারাও ইহার দোষগুণ লক্ষ্য করেন না।

অভিধান শব্দের অর্থ নির্দেশ করে এবং সেই প্রসঙ্গে শব্দের রূপ ও অর্থ পরিবর্তনের ধারার আভাস প্রদান করে। অভিধান ভাষার শব্দসম্পদের ধারক ও বাহক—যুগে যুগে এই সম্পদ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহার পরিচয় অভিধান হইতেই পাওয়া যায়। আদর্শ অভিধানে কালানুক্রমিক অর্থ নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে থাকে প্রয়োগের উদাহরণ। এ কার্য অতি দুরূহ সন্দেহ নাই। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' এই দুরূহ কার্য সম্পাদনের কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আকরনির্দেশ সর্বত্র ভ্রমশূন্য না হইলেও বিশেষ উপযোগী। এ কার্যে যতদিন পূর্ণ সাফল্য লাভ করা না যায়—যতদিন সমস্ত শব্দের সকল অর্থে প্রয়োগের উদাহরণ সংকলিত না হয় ততদিন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যে অভিধানে শব্দটি ও তাহার নির্দিষ্ট অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে তাহার নাম করা যাইতে পারে। এ কাজ তেমন কঠিন নয়। বিশাল সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুমে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে। বোটলিঙ্ক ও তদনুসারী মনিয়র উইলিঅমসের বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে অন্যত্র অপ্রাপ্ত অর্বাচীন শব্দ সম্পর্কে শব্দকল্পদ্রুমের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। ফলে কোন্ শব্দ বা কোন্ অর্থ প্রাচীন তাহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বিভিন্ন প্রদেশে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি বা যাহাদের বিশিষ্ট অর্থ অর্বাচীন কালে সেই সেই প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণ সংস্কৃত অভিধানে ইহাদের আকর উল্লিখিত না হওয়ায় অনুসন্ধানী পর্যালোচককে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। শব্দকল্পদ্রুম হইতে এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা হইতেই আমরা জানিতে পারি 'সধবা' শব্দ জটাধরের অভিধানে ধরা আছে—'বালিশ' শব্দের অধুনা প্রচলিত অর্থ শব্দমালা নামক অভিধানে উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলা অভিধানেও এইরূপ আকর নির্দেশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়—অন্যথা পদে পদে সন্দেহের সম্ভাবনা।

নানা কারণে সাধারণ বাংলা অভিধানের অর্থনির্দেশ অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নহে। সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিত অনেক সময় বাংলা অভিধানের অর্থ নির্দেশ দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। এই অর্থ নির্দেশ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার নিকট অমূলক ও ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। মূল সংস্কৃতের অপব্যাখ্যা বা দুর্বোধ্যতা, লেখকবিশেষের বিকৃত বা ভ্রান্ত প্রয়োগ, ব্যবহার ও আসল বস্তুর সহিত অপরিচয় ও অনুমান এবং ব্যুৎপত্তির উপর নির্ভর প্রভৃতি কারণে অভিধানের অর্থ নির্দেশে কিছু কিছু গোলমালের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যথাযথ আকরনির্দেশের অভাবে গোলমালের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কোন শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কৃতোদ্ভূত এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিলেই আকরনির্দেশ সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক হইতে পারে না। সংস্কৃত বলিলেই একটা প্রাচীনতার ধারণা হয়। কিন্তু সংস্কৃতের আকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত শব্দই প্রাচীন নয়—বহুলপ্রচলিত অনেক শব্দের সংস্কৃত অভিধানে কোনও স্থান নাই। মহালয়া, বৃদ্ধপ্রপৌত্র, ঝটিকা প্রভৃতি অতিপরিচিত শব্দও এই শ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার আছে যেগুলির প্রচলিত অর্থ সংস্কৃত অভিধানে নাই। তাহা ছাড়া, উনবিংশ শতাব্দী কি তাহার পূর্ব হইতেই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা প্রকাশের জন্য সংস্কৃতের আদর্শে এমন অনেক শব্দ গঠিত হইয়াছে যেগুলিকে সংস্কৃত বলিয়া নির্দেশ করিলেই তাহাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আবার সংস্কৃত ব্যাকরণবিরোধী—ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে অর্থহীন। আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক, জীবনবেদ প্রভৃতি অধুনাপ্রচলিত অগণিত শব্দ এই শ্রেণীতে পড়ে।

বাংলা অভিধানে শব্দের অর্থনির্দেশ প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ 'ক্রন্দসী' শব্দ আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। বেদে ইহার অর্থ দ্যাবা-পৃথিবী বা স্বর্গমর্ত্য। সাধারণ সংস্কৃত অভিধানে শব্দটি নাই।

বাংলা অভিধানে ও প্রয়োগে ইহার অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে। 'মদকল' শব্দের অমরকোষ ধৃত অর্থ মদমত্ত হস্তী—অর্বাচীন অভিধানে উল্লিখিত অর্থ মত্ততা জন্য অব্যক্ত মধুর ধ্বনিকারী। শেষোক্ত অর্থেই শব্দটি ভবভূতির উত্তররামচরিতে এবং মাইকেলের মেঘনাদবধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন অভিধানে এই অর্থ আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। গহনার নৌকাকে চিত্রাঙ্কিত নৌকা বা 'অনেক যাত্রী লইয়া চলাচলকারী নৌকাবিশেষ' বলিলে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য ধরা পড়ে না; বস্তুতঃ নির্দিষ্ট ভাড়ায় নির্দিষ্ট স্থান হইতে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে যে নৌকা যাত্রী লইয়া যাতায়াত করে তাহাই গহনার নৌকা। গণ্ডগ্রাম শব্দের অভিধানোক্ত অর্থ বড় গ্রাম—কিন্তু ব্যাবহারিক অর্থ ক্ষুদ্র গ্রামও উপেক্ষণীয় নয়। শেষোক্ত অর্থেই রবীন্দ্রনাথ 'পোস্ট মাস্টার' গল্পে ও 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। মিত্র শব্দের অপভ্রংশ রূপে পরিচিত ইতু বা ইথু শব্দের 'সূর্য্য পূজার ঘট' এইরূপ অর্থ নির্দেশ করার কারণ বুঝা যায় না। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন অর্থের মধ্যে এইটিকেই প্রথম স্থান দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমে মুখ্য অর্থ উল্লেখ করিয়া পরে গৌণ ও লাক্ষণিক অর্থ নির্দেশ করাই সমীচীন পদ্ধতি। অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অর্থ নির্দেশের আরও কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

কাকু—বক্রোক্তি; চার্বাক—নাস্তিক মুনিবিশেষ—ইনি আত্মা, পরলোক প্রভৃতিতে অবিশ্বাসী ছিলেন; নিবীত—কণ্ঠে ধারণীয় যজ্ঞসূত্র; প্রেত—(প্রধানতঃ নরকগামী বা অতৃপ্ত) মৃতের আত্মা; প্রেতকর্ম—মৃতের দাহন ও সপিণ্ডীকরণাদি কার্য; কর্মপ্রবচনীয়—অব্যয় পদবিশেষ—যাহা কোন বিশেষ্য বা সর্বনামের পর ব্যবহৃত হইয়া উহাকে কোন কারকে আনয়ন করে বা বিভক্তিযুক্ত করে। অভিধানের অর্থ নির্দেশে এ জাতীয় ত্রুটি প্রশংসনীয় নহে অথচ প্রচলিত অভিধানগুলিতে ইহাদের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নহে। ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে চাই সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতের আন্তরিক সহযোগিতা।

অবশ্য সংস্কৃত পণ্ডিতগণও সর্বত্র শব্দের অর্থ সম্পর্কে সর্বথা নিঃসন্দেহ নন—সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাকপক্ষ এইরূপ একটি শব্দ। ইহার প্রাচীন আভিধানিক অর্থ বালকের শিখা। রাজকুমারদের চঞ্চল কাকপক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়—ইহার সংখ্যা ছিল পাঁচ। আধুনিক অভিধানের অর্থ 'জুলপি'র সহিত ইহার সামঞ্জস্য হইতে পারে কিভাবে? 'ঝুঁটি' এই অর্থ কতটা সঙ্গত ভাবিয়া দেখা দরকার। 'দময়ন্তী কথা'য় দময়ন্তীর বর্ণনায় যে চিকিৎসাবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে তাহাকে আধুনিক শুশ্রূষা-বিদ্যা কল্পনা করা সেই প্রাচীন যুগের পক্ষে কত দূর সঙ্গত বলা কঠিন। মহাভারতে স্ত্রীলোককে কুচেল দ্বারা রক্ষা করার কথা বলা হইয়াছে—কিন্তু ময়লা কাপড় পরাইয়া তাহাকে প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করার কথা বড়ই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। সম্ভব হয়, প্রকৃত অর্থ এখানে বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রাচীন বাংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা।

বাংলা অভিধানে মূলতঃ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সন্নিবিষ্ট হইবে ইহাই স্বাভাবিক। সংস্কৃত হইতে অনেক শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে—নূতন নূতন ভাব প্রকাশের জন্য বাংলায় অনেক নূতন শব্দ গঠিত হইয়াছে। সেগুলি বাংলা ভাষার অঙ্গ—সুতরাং সেগুলি অবশ্যই অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। বাংলায় সাধারণতঃ অপ্রচলিত যে সমস্ত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ শব্দ মূল বা পরিবর্তিত অর্থে বিশিষ্ট লেখকের লেখায় কোথাও কখনও ব্যবহৃত হইয়াছে অভিধানে তাহাদেরও স্থান করিতে হইবে। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির লেখায় এই জাতীয় অনেক শব্দ পাওয়া যায়। মাইকেলের বরকুচিবিচ্যমান, মহেষ্বাস, কামধুকে প্রভৃতি শব্দ—রবীন্দ্রনাথের কমিক, সাম্রাজিক বা সাম্রাজ্যিক, বিশ্বহৎ, মৌলিক্য (=মৌলিকতা), কাকুধ্বনি (=ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ), শাস্ত্রিক (=শাস্ত্রীয়), উজ্জ্বলিত, চঞ্চলিত, নিজকীয় (=স্বকীয়), কদুৎসাহী, পরিপ্রেক্ষণা (=পরিপ্রেক্ষিত), খণ্ডিতা (=খণ্ডীকৃতা), বৈপায়নতা, উৎসর্জন, প্রদোষ (=উষা), ঔৎকর্ষ্য প্রভৃতি শব্দ বাংলা অভিধানে গ্রহণ করিতে হইবে। দুঃখের কথা এই যে, বিশিষ্ট লেখকের ব্যবহৃত এইরূপ অজস্র শব্দ বাংলা অভিধানে স্থান পায় নাই; অথচ বাংলায় অব্যবহৃত—অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারের অযোগ্য—অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ঘৃতার্চি, ঘৃতোদ, উদ্বপন, উপারত, উদীরিত, ধম্মিল্ল, ধেয়, নন্দ্য, গন্তা, মর্ত্ত্যকাম (?) এ জাতীয় প্রচুর শব্দ বাংলা অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। 'আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান' 'চলন্তিকা'তেও এইরূপ অনেক শব্দ স্থান পাইয়াছে—'সুপ্রচলিত' 'প্রচলনযোগ্য' বা 'অল্পপ্রচলিত' ইহাদের কোন শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে না এমন শব্দের সংখ্যাও উহাতে কম নয়। বাংলা অভিধানে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য দর্শনে বিরক্ত হইয়া শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩২০ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'বাঙ্গালা শব্দকোষে'র 'সূচনা'য় বাংলা-অভিধান হইতে সংস্কৃত শব্দ বর্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ না হইলেও অন্ততঃ আংশিক ভাবে তাঁহার প্রস্তাব

অনুসারে কার্য করা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকার কারণ নাই। কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল তাঁহার প্রস্তাব কোন অভিধান সংকলয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

উপদেশ পরম্পরার আধার; যাহা উপদেশ পরম্পরারূপে আছে।" 'ইতিহাস' শব্দের এই যে অর্থ কোন কোন অভিধানে দেওয়া হইয়াছে তাহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। শব্দটির তাৎপর্য বাংলায় সুপরিচিত—অর্থ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়।

অভিধানে বাংলায় ব্যবহৃত শব্দগ্রহণ সম্পর্কেও কিছু বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে অনেক লেখক বাংলায় প্রতিদিন যে নূতন নূতন শব্দরাশির আমদানি করিতেছেন সেগুলি সকলই যে এখনই বাংলা অভিধানে গৃহীত হইতে পারিবে এমন কথা বলা যায় না। অর্থের অস্পষ্টতা ও ব্যাকরণের অবিশুদ্ধি সত্ত্বেও কিছু কিছু শব্দ হয়ত ভাষায় চলিয়া যাইবে এবং কালক্রমে অভিধানে স্থান পাইবে। অভিধানে স্বীকৃতি লাভের পূর্বেই অনেকগুলির অকালমৃত্যু হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। ইতিমধ্যে তাহাদের দোষত্রুটি পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তবে ভাষা ও শব্দ বিষয়ে আমরা উদাসীন। প্রাচীন ধারা এখন লুপ্ত—পূর্বের মত পংক্তি ব্যাখ্যা ও প্রতিটি শব্দের বিশ্লেষণে আমাদের আর রুচি নাই। আবার আধুনিক ধরনে ভাষার শব্দসম্পদ বিশ্লেষণে ও বিচারেও আমরা অভ্যস্ত হই নাই। যাহা হউক, যে সকল গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যের আসরে একটা নির্দিষ্ট স্থান লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দগুলি সুন্দর হউক অসুন্দর হউক, শুদ্ধ হউক অশুদ্ধ হউক সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ অভিধানে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। না হইলে পাঠকদের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। সত্য সত্যই উপযুক্ত অভিধানের অভাবে প্রাচীন সাহিত্য বা আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে লেখা পত্রপুস্তক এখন পাঠকের দুর্বোধ্য—এমনকি যে সমস্ত নামকরা বই সাম্প্রতিক কালে লেখা তাহাদেরও সকল শব্দ ভাল করিয়া বোঝা সম্ভবপর নয়। আমরা মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে লইয়া গর্ব করি কিন্তু তাঁহাদের লেখা যাহাতে যথাসম্ভব অনায়াসে সাধারণ পাঠক সহজে বুঝিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বোধ করি না। তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দের স্বতন্ত্র অভিধান ত দূরের কথা সাধারণ অভিধানের মধ্যেও তাহাদের সকলের স্থান নাই। বস্তুতঃ, সমগ্র বাংলা সাহিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া অভিধান-সংকলনের কাজে এখনও হাত দেওয়া হয় নাই। এ কাজ একজনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না—এজন্য চাই বহুজনের সমবেত সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। পুণার ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট বৈজ্ঞানিক ধরনে সংস্কৃত ভাষার অভিধানপ্রণয়নে ব্রতী হইয়া দেশবিদেশের সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন—বিভিন্ন পণ্ডিতের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে শব্দসংকলন করান এই প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রেত। সংকলিত শব্দগুলি কালানুক্রমে সজ্জিত করিয়া অভিধানে সন্নিবেশিত হইবে। পনর বছরের মধ্যে তাঁহারা এই বিশাল অভিধান প্রকাশ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত সরকারের সহায়তায় কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা হিন্দীভাষার অভিধান 'শব্দসাগর'কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা হইতে সংকলিত শব্দের সমাবেশে পূর্ণাঙ্গ করিবার কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। বাংলা অভিধানের বেলায়ও অনুরূপ আয়োজনের আবশ্যকতা আছে—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন।

ঘরছাড়া, পথহারা

শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন

শিশুরা দেবতার প্রিয়, মানুষের কামনার ধন, কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে সেই শিশুই যে কত অনাদরের মাঝে, অবহেলার চাপে অমানুষ হয়ে দাঁড়ায় পূজার ফুল অকালে শুকিয়ে যায় তার হিসাব কে রাখে? আজ সমাজের এক স্তরে চেতনা জেগেছে, অবজ্ঞাত শিশুদেবতাকে ধুলো থেকে তুলে এনে তার যোগ্য স্থানে বসাবার চেষ্টা চলেছে, তাই কয়েকটি শিশুর বিড়ম্বিত জীবনের চিত্র পাঠকের কাছে উপস্থিত করছি।

১

ছেলেটির নাম জীমূত—বয়স বারোর কাছাকাছি, গায়ের রং ফর্সা, চুল কটা, গালে একটা কাটা দাগ। মুখে কেমন বেপরোয়া ভাব, যেন সে কাউকে কেয়ার করে না। বাপ-মা আছেন, তবু কেন সে পথে পথে ঘোরে? জিজ্ঞাসা করতে প্রথমে অজস্র মিথ্যা কথা বলে সে নিজের চারিপাশে আত্মরক্ষার একটা প্রাচীর রচনা করল। সত্যমিথ্যা অপূর্ব ভাবে মিশেছে তার কাহিনীর মধ্যে। কিন্তু দরদী মনের পরিচয় পেয়ে কখন যে দেয়াল ভেঙে গেল, তা সে নিজেও জানে না।

অপরূপ তার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস। পাকিস্থানে তার বাপের অবস্থা ছিল চলনসই। পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করে তিনি যা কিছু রোজগার করতেন তাতে সংসার চলে যেত। শহরের বিলাসিতার সঙ্গে পরিচয় ছিল না, অভাবও ছিল না। তার পর সেই একঘেয়ে করুণ ইতিহাস, উদ্বাস্তুর ভাগ্যবিপর্যয়। মহানগরী কলকাতায় এসে তাদের জীবনের ধারা একেবারেই বদলে গেল। ভদ্র পরিবার, কিন্তু এখানে বসতি হ'ল সাধারণ বস্তীতে, একখানি মাত্র ঘরে। তারও যা অবস্থা, পল্লীবধূর চোখ সজল হয়ে ওঠে। বাবার দিন কাটে অর্থ উপার্জনের ধান্দায়, অভাবের সংসারে মা হাঁপিয়ে ওঠেন। একই ঘরে চার-পাঁচটি সন্তান, নিজেরা দু'জন, বুড়ো শাশুড়ি—না আছে শোওয়ার জায়গা, না আছে দিনের বেলা একটু নড়াচড়ার উপায়। নড়তে গেলে পায়ে বাজে। গৃহ নেই তবু গৃহকর্ম, অভাব-অসুবিধায়, লাঞ্ছনায় মায়ের চিত্ত বিমুখ হয়ে ওঠে। কোনমতে দিনগত পাপক্ষয়ের মত খুদকুঁড়ো রেঁধে সে বুভুক্ষু ছেলেমেয়ের মুখে ধরে দেয়। আর নিজে থাকে অর্ধাশনে, অনশনে। কোলের ছেলেটি ছাড়া আর কারু দিকে তার নজর নেই, অন্য ছেলেমেয়েরা খাওয়া শোওয়ার সময়টুকু ভিন্ন বাইরে বাইরে কাটায়, সে ভ্রূক্ষেপও করে না, বরং তাতেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। শরীর ভেঙে পড়ছে, মন তাই খিঁচড়ে গেছে।

বাবা ঘোরেন বাইরে বাইরে, আয়ের পথ করতে পারছেন না, সঙ্গে যা সামান্য এনেছিলেন, তা নিঃশেষ হয়ে এল। এখন বাড়ী ফেরেন কোন্ মুখে? যতটা পারেন এড়িয়ে চলেন এদের। ঠাকুমা চালের বাতার দিকে তাকিয়ে যাবার দিন গোণেন আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। শুধু অদৃষ্টকে নয়, তাঁর ভৎর্সনা বধূর ওপরেও বর্ষিত হয়, ছেলেগুলি যে উচ্ছন্নে গেল। কিন্তু উপায় হয় না।

ছেলেরা বাইরে সঙ্গী পেয়েছে। আজকালকার বাজারে খারাপ পথে টানবার লোকের অভাব নেই। জীমূত দেখতে সুশ্রী, মাথায় বেশ বুদ্ধি খেলে—এ রকম ছেলেকে দিয়ে কত কাজ পাওয়া যায়। সুযোগ বুঝে এগিয়ে আসে মানু। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত জীমূত ঘরে ফিরল না, বাবা একটু আগেই ফিরেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখেন বড় ছেলেটি ঘরে ফিরেছে, কিন্তু জীমূতের এখনও দেখা নেই। বড় মেয়েটি দুঃখের সংসারে চোরের মত বেড়ায়, আজ ঘরে তেল নেই বলে আলো জ্বালতে পারে নি, তাই বাবার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। এরই মধ্যে জীমূতের মা সেদিন জ্বরে শয্যাগত। ব্যাপার আজ ষোলকলায় পূর্ণ। বাবারও সহ্যের সীমা আছে। একটু বেশী রাতে জীমূত ফিরলে তাকে দিলেন বেদম প্রহার। অবস্থা বিপর্যয়ের যত ক্ষোভ, নিজের অক্ষমতার যত পুঞ্জীভূত গ্লানি, সব যেন এই সময়টিতে ছাড়া পেয়ে তাঁর প্রহারের মধ্যে প্রকাশ পেল। প্রহারের মাত্রা একটু বেশী হয়ে গেল বলাই বাহুল্য। জীমূতের কচিমন ব্যথার উপশম হলেই হয়ত ভুলে যেত। কিন্তু মানু দেখলে, এই তার সুযোগ। এই যে জীমূত বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে, তার পরই সুরু হ'ল তার পতনের ইতিহাস। যদি কখনও বাড়ী আসে, বাবাকে লুকিয়ে ঠাকুমার কাছে পায় প্রশ্রয়, এদিকে মা ও নির্বিকার। দেখেও দেখেন না। তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেছে, ভাবনা-চিন্তার শেষ সীমা পর্যন্ত এসে তিনি থমকে গেছেন, তাঁকে মানুষ না বললেও চলে।

এই মানুর পাল্লায় পড়ে জীমূত ছোট বোনের হাতের ব্রোঞ্জের চুড়ি একদিন খুলে নিয়ে পালাল—শিক্ষানবিশির সময়ও ত কিছু রোজগার করা চাই, নইলে মানু কি বসিয়ে খাওয়াবে! এতটুকু ভালো করতে সময় লাগে প্রচুর, কিন্তু

এতখানি মন্দ করা যায় মিমেষে। বেশী দিন সময় লাগল না, জীমূত আজকাল আর ঘড়ীর ছায়া মাড়ায় না। এর পকেট মারা, ওর দোকানে ঢোকা, ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল। এখন বেশ বুঝেছে, আশ্রয় কোথাও নেই। কিছু এনে দিলে সর্দার খাওয়াবে, না আনলে এখানেও প্রহার জুটবে। বিপদের মুখে তাকে এগিয়ে দিয়ে নিজে সরে থাকার বিদ্যে সাহ্ন বেশ জানে—কার ওপর আর জীমূতের নির্ভর? এখন বাড়ী ফিরলে কেমন হয়? ঠাকুমা এত দিনে বেঁচে আছেন কি? মা ত পাথরের মত হয়ে গিয়েছিলেন, বড়দিরই কি আর ওর জন্ম মায়া হবে? গেলে বাবা নিশ্চয় এবার মেরেই ফেলবেন। জীমূতের আর ফেরা হয় না।

কিন্তু মন তার ঘুরে ফিরে বস্তীর সেই ছোট বাড়ীটির কাছেই পড়ে থাকে। ভাবে, একবার যদি কিছু শিখে, ভাল পথে কিছু রোজগার করে নিয়ে বাড়ী যেতে পারে, তবে বোধ হয় আবার সে ঘরের ছেলে ঘরে থাকতে পারে। এই অবাঞ্ছিত পরিবেশে সর্দারের গোলামি তাকে করতে হয় না। তার ভাল হবার, ভাল পথে চলার উপায় কি হয় না? এখনও তাকে বাঁচান যায়, এখনও সময় আছে। কিন্তু কোথায় সে সুহৃদ?

২

আর একটি ছোট মেয়ে। নাম তার দুলারী। জন্মের প্রথম শুভমুহূর্তে কেউ নিশ্চয় আদর করেই নামটা রেখেছিল। আজ তার অঙ্গে কোথাও সেই আদরের চিহ্ন নেই গায়ের রং ধূসর, অযত্নে অনাদরে স্বাভাবিক বর্ণ কোথায় মিলিয়ে গেছে, বেশবাস বলতে ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের একটি টুক্‌রো গায়ে জড়ান আছে, পরনে শতছিন্ন এক ময়লা পাজামা, তেলের অভাবে চুলগুলি দড়িপাকানো। বয়স আন্দাজ করা শক্ত, শিশুর লাবণ্য তার অঙ্গে কোথাও নেই। কিন্তু মুখে একটা সপ্রতিভ ভাব, সংসারের সুখে দুঃখে উদাসীন। ডকের নিষিদ্ধ এলাকায় কয়লা কুড়োতে গিয়ে ধরা পড়েছে, পুলিস তাকে ধরে এনেছে। সহচর সহচরী তার অনেক আছে, তারাও এসেছে। তাদের কারু মুখে সামান্য লজ্জার অপ্রতিভ ভাব, কারু মুখে বেপরোয়া উপেক্ষার ভাব, যেন বলতে চায়, আজ ধরা পড়েছি, কালও আবার ধরা পড়তে পারি, তবু কালই আবার যাব ঐ ডকের অঙ্গনে। খেলায় সঙ্গী আছে, অত্যন্ত কাজ আছে, এ কাজ যাদ গেলে চলবে কেন? দুলারীর মনোভাবও প্রায় এদেরই মত।

এরা যাবে কোথায়, খাবে কি, থাকবে কি নিয়ে? জন্মেছে কেউ অনেক ভাইবোনের মাঝে, গরীব মাবাপের কুঁড়ে ঘরে, কেউ এসেছে অবাঞ্ছিত এ পৃথিবীতে, পৃথিবীর ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাটাচ্ছে নিজেদের শৈশব আর বাল্যকাল। কে জানে কোথায় কি ভাবে কাটবে এদের পরিণত বয়স? অযত্নেও যে গাছ বাড়ে, ঝড় জল যেমন সহজে তাকে স্পর্শ করে না, এদেরও তেমনই জীবন, মাটির বুকে আগাছার মত বেড়ে চলে লক্ষ্যহীন, আলো-আশাহীন জীবনের পথে। তবু আশ্বাস বুঝি কিছু আছে এদের জন্ম নইলে পঙ্কে পদ্মের মত, নিঃসীম অন্ধকার আকাশে তারার আলোর মত ক্ষণিক দ্যুতি এদের মাঝে ফুটে উঠত না।

দুলারীর তাই বেশবাস মলিন, কিন্তু মুখে মিষ্টি হাসি। জানে না কে তার বাবা, লোকে বলে, তাই শুনেছে; তার বাপ বহুদিন মারা গিয়েছে, মা পরে বিয়ে করেছে ভিন্ন দেশী, ভিন্ন জাতের এই লোকটিকে। এই নতুন স্বামীর মন দুলারীর মা পায় নি, ক্ষণিকের মোহ কেটে গিয়ে এখন এসেছে একটানা নির্যাতনের পালা। তার মধ্যে দুলারী একটা কাঁটার মত ওদের বিঁধছে, এখন সেই কাঁটা তুলে ফেলাও মায়ের পক্ষে কঠিন। মা কাজ করে, কিন্তু মেয়েকে খেতে দেওয়া তার পাপ। নতুন স্বামীর আদেশ জারি হয়েছে। মা তাই এ সব ভুলতে মদ ধরেছে, আর মদের কড়ি জোগাড় করে দিতে হয় দুলারীকে। যেদিন কিছু আনতে পারে মা লুকিয়ে খেতে দেয়, যেদিন কিছু না পায় সেদিন উপবাস। উপরি পাওনা প্রহার। কাজেই দুলারী তৎপর থাকে, কখন কোন্ ফাঁকে এক ঝুড়ি কয়লা সরাতে পারবে, কখন এক ফাঁকে হাত সাফাই করে তার মায়ের খাঁকতি মেটাতে পারবে।

এ যে তার আত্মরক্ষার উপায়, কাজেই এ পথ সে ছাড়তে পারে না। পথের বন্ধুদের সঙ্গে সে বেশ বনিবনাও করে থাকে, কিন্তু মায়ের নতুন স্বামীর সঙ্গে তার মোটে বনে না। তার শিশুচিত্তও বোধ হয় বোঝে যে মায়ের সঙ্গে এই লোকটি প্রবঞ্চনা করেছে। ছোটখাটো উপায়ে দুলারী তাকে বিব্রত ও বিরক্ত করতে পারলে ছাড়ে না। কতবার এই নতুন বাবার তাড়া খেয়ে ও তার আশ্রয় ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু আবার আসে, বার বার আসে। মায়ের ওপর টানটুকু যায় না, কিন্তু মা যে আর মানুষ নেই। ডকের নিষিদ্ধ এলাকায় যাওয়ার অপরাধে ও কতবার পুলিসের হাতে ধরা পড়ে, বিচারের জন্মে তাকে আনা হয়, বিচারে ছাড়া পেয়ে ছুটে চলে যায়। কখনও মায়ের কাছে, কখনও ফুটপাথের কোলে। আবার চলে সেই ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার পুনরুক্তি। মোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত কবে কোথায় গিয়ে ঠেকবে। কে তার হদিশ রাখবে? ধরণীর ধুলোয় ধূসরিত হবে, কিন্তু করুণার স্নিগ্ধ বারিসিঞ্চনে সেই ধুলো কি ধুয়ে মুছে যাবে কোন দিন?

৩

মরিয়াম্মার কাহিনী আরও করুণ। এককালে সে দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল, তাতে কারু সন্দেহ হবে না। নিটোল স্বাস্থ্য, টানা টানা চোখ দুটি, তুলি দিয়ে আঁকা দুটি ভুরু তাকে বেশ একটা শ্রী দিয়েছে—রং যতই কালো হোক। শহরের এক বিচারালয়ে সে একটি কাঠের বেঞ্চির ওপর বসেছিল। তার মুখের লাবণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সুন্দর মেয়েটির মুখে কি গভীর বিষাদের ছায়া, একটু হলেই যেন কান্নায় ভেঙে পড়বে। কিসের ব্যথা তার, প্রশ্ন করে জানা গেল, ছেলে তার চোর বলে ধরা পড়েছে। একবার নয়, দু'বার নয়, এই নিয়ে তিনবার হ'ল। আর ত সে সইতে পারছে না। এ ছেলেকে এ পথ থেকে ফেরাবার সাধ্য তার নেই। ছেলে একেবারে তার হাতের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু কেন এমন হ'ল ?

মরিয়াম্মা যদি বিধিলিপির দোষ দিতে পারত তবে বোধ হয় তার এত আত্মগ্লানি থাকত না। কিন্তু সে বলে, দোষ তার কর্মের, তাই সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না, আর তাই সে আজ হতাশায় ভেঙে পড়ছে। দেশ তাদের দক্ষিণ-ভারতের একটি ছোট গ্রামে, জীবিকার অন্বেষণে স্বামীর সঙ্গে সে এসেছিল এই মহানগরীতে। স্বামীর একটা কাজ জুটতে তেমন দেরিও হ'ল না, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এই ছেলে তখন মোটে তিন বছরের ; সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও শ্রীমণ্ডিত তাদের শিশুপুত্রটি সকলের আদর সহজেই পেত। দিন কোন রকমে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু শহরের জীবনযাত্রা তাদের চোখ ঝল্‌সে দিল। নিত্য নতুন অভাববোধ মনকে পীড়িত করে তুলল। তখন স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ করে ঠিক করল যে দু'জনেই কাজ করবে, স্বামী যে বাড়ীতে ভৃত্যের কাজ করত সেই বাড়ীতেই মরিয়াম্মা পেল আয়ার কাজ।

সমস্যা হ'ল ছেলেকে নিয়ে। মনিব বাড়ীতে ছেলেকে নিয়ে যাবার অনুমতি মিলল না। দুশ্চিন্তার অবসান করে দিল মরিয়াম্মার প্রতিবেশী বাবুলালের স্ত্রী। তারও ত ছেলেপুলে আছে, তাদের সঙ্গেই উত্তম থাকবে, খেলবে। সামান্য কিছু টাকা খোরাকি বাবদ পেলেই সে তাকে খাওয়াতেও পারবে। আর রাত্রিবেলা ত মাবাপ দু'জনেই ঘরে ফেরে। ব্যবস্থাটা ওদের বেশ মনঃপূত হ'ল। রোজ কাজে যাওয়ার সময় মা ছেলেকে কত কিছু বুঝিয়ে বলে যায়। বাবা উত্তম, ভাল ছেলে হয়ে থেক, মাসির কথা শুনো, রাস্তায় যেও না, তোমার বই নিয়ে পড়া করে রেখ। এমনই সব উপদেশ দিয়ে যায়।

কিছুদিন বেশ কাটল। ছেলে ভাল আছে, রাত্রিবেলায় ছেলেকে কাছে পায় আর ছুটিছাটা পেলেই এসে দেখে যায়। কিন্তু এসে ছেলের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখে মায়ের মন খারাপ হয়। দু'এক দিন হঠাৎ কাজ থেকে বাড়ী এসে দেখে ছেলে ঘরে নেই, বাবুলালের বউ বলে, ছেলে বড় হয়েছে, এখন কি আর তার কথা শুনবে ? সে ত প্রায়ই এ রকম করে, এখন ছেলেকে ইস্কুলে দেওয়া দরকার। মরিয়াম্মা তাই করলে। কিন্তু তাতেও ত সমস্যা মিটল না, ছেলে ইস্কুল ফাঁকি দিয়ে বাইরে চলে যায়, তার সঙ্গী জুটেছে। বাবুলালের বউ বিরক্ত হয়ে উঠেছে, বলে, এবার তুমি অন্য ব্যবস্থা কর, নয়, নিজে কাজ ছেড়ে দিয়ে ছেলেকে দেখ। নিরুপায় মরিয়াম্মা সেই ব্যবস্থাই করবে ঠিক হ'ল। সে আর সারাদিনের কাজ রাখবে না, ঠিকে কাজ করে দিয়ে আসবে। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। মাত্র দশ দিনের জ্বরে ভুগে উত্তমের বাপ মারা গেল। তখন উপায় কি ? তাকে কাজ রাখতেই হ'ল, ছেলেকে খাওয়াতে হবে, নিজের অন্ন সংস্থান করতে হবে।

ছেলের উপায় করতে গিয়েই এবার ছেলের বয়ে যাবার পথ সে মুক্ত করে দিল। বাপের আদর-শাসন দুই থেকেই উত্তম বঞ্চিত হয়েছে, মায়ের মন ভেঙে গেছে, তাতে অবকাশ মোটে নেই, রোজগারের দিকে অধিকতর মন দিতে গিয়ে এবার ছেলের উপর তার প্রভাব একেবারে হারিয়ে গেল। ধাপে ধাপে নামতে নামতে ছেলে এখন যা খুশী করে বেড়াচ্ছে। দু'বার দলে মিশে চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে। যেমন হয়, দলটি সরে পড়ে, অনভিজ্ঞ ছোট ছেলেরাই ফাঁদে পড়ে। দু'বারই মায়ের তত্ত্বাবধানে তাকে বিচারক ছেড়ে দিয়েছেন। আশায় বুক বেঁধে সে ছেলেকে বাড়ী নিয়ে গেছে। কিন্তু বিফল হয়েছে তার সব চেষ্টা। আদর যে চায় না, শাসন যে মানে না, তাকে কি করে মরিয়াম্মা সুপথে ধরে রাখবে ? উত্তম যে মায়ের চোখের জলে ভেজে না, একেবারেই তার হাতের বাইরে গিয়েছে।

এবার তাকে বিচারক যেন কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন, যেখানে সে মানুষ হবে। মায়ের চেয়ে যোগ্যতর কারও হাতে তার শাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা হোক, এই আজ মরিয়াম্মার প্রার্থনা। নাই-বা সে তাকে দেখতে পেল, সে ত অমানুষ হয়ে যাবে না। কিন্তু তার সঙ্কল্প বুঝি টলে যায়, উত্তম হাত জোড় করে, মাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, মা, এই বারটা মাপ কর, এবার আমি ভালো হব। কিন্তু এই ত প্রথম নয়, প্রত্যেক বারেই সে এ রকম বলে, আর যেই বাড়ী আসা, অমনি সব ভুলে যায়। জননীর অক্ষমতাই তাকে উত্তরোত্তর অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এবার মরিয়াম্মা শক্ত হতে চায়। ছেলের ভালোর জন্যে ছেলেকে আজ কষ্ট দিচ্ছে, ছেলে কি তার মূল্য দেবে ?

বর্ত্তমান বিশ্বভারতী বিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-স্থাপত্য

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্থক ও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের কৃতিত্ব অনেকখানি। হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ ও সক্ষম না থাকলে মানুষ যেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ ও সক্রিয় না হলে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণসত্তা প্রকাশের একান্ত অভাব ঘটে।

উচ্চশিক্ষাদান এবং গবেষণাদ্বারা জ্ঞানভাণ্ডার হতে নূতন তথ্যাদি আবিষ্কার ও প্রকাশ করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষকদের হাতে তাঁদের স্ব স্ব চাহিদামত উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বই ও পত্রিকাদি সরবরাহ করে তাঁদের কাজে সাহায্য করা গ্রন্থাগারের কর্ত্তব্য। দেখা যায়, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা এবং গ্রন্থাগার পরস্পরের কাজে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেজন্য আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের স্থান ও দান বিশেষ সুস্পষ্ট।

গ্রন্থাগারকে সক্রিয় ও সম্পূর্ণ করতে হলে চাই—আধুনিক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান অনুযায়ী সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার-গৃহ। গ্রন্থাগার-গৃহ সুপরিকল্পিত না হলে—পাঠক, বই ও গ্রন্থাগারকর্ম্মীর মধ্যে সহজ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এর ফলে অনর্থক শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সুপরিকল্পিত নয়। সে কারণ শক্তি ও অর্থের অপব্যয় এবং অন্য দিকে কাজের সুবিধার অভাব বিশেষ করে চোখে পড়ে।

আধুনিক জগৎ গ্রন্থাগার-স্থাপত্য নিয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করছেন এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থাগার-গৃহকে যথার্থ রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। বর্ত্তমানে আমেরিকাতে এবং ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার-স্থাপত্য নিয়ে যে সব আলোচনা ও পরিকল্পনা চলেছে তা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে আর নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে বেড়ে চলে গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা। এই সকল ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের প্রয়োজনমত উপযুক্ত পুস্তকাদি আনান, সেগুলি যথাযথ রাখার সুব্যবস্থা করা, পুস্তকাদি আদান-প্রদান ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত ও দ্রুত কার্য্যকরী এবং অমূল্য সেবাকে (Reference service) প্রাণবন্ত করা গ্রন্থাগারিকের কাজ। গ্রন্থাগারিকের উদ্দেশ্য হবে এই সব ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যের মাধ্যমে সফল ও

সক্রিয় রাখা এবং প্রচার ব্যবস্থার দ্বারা গ্রন্থাগারের সাদর আহ্বান সকলকে জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ পুস্তক, পত্রপত্রিকা, মানচিত্র, চিত্র-সংগ্রহ, সংবাদপত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড ও মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি রাখা হয়। এই সব জিনিষের স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী রাখার ব্যবস্থা না করলে ব্যবহারের সুবিধা হয় না। পত্রিকাগুলি যদি গুদামজাত হয়ে থাকে, পুস্তক ও এর কার্ডগুলি যদি সহজে দেখা না যায়, পুঁথিশালায় যদি রেকর্ড বাজাতে হয় বা মানচিত্রগুলি টাঙ্গিয়ে রাখা হয় তা হলে এগুলো রাখার সার্থকতা কোথায়? এই সব বিশেষ বিশেষ জিনিসের ব্যবহারের জন্য বিশেষ স্থান ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন গ্রন্থাগার

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার অনেকগুলি বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সমষ্টি। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এই সব বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালনা করা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সকল বিভাগীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাদির ও নিজস্ব সূচী রাখা এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আদান-প্রদান ব্যবস্থা সহজ করা। পূর্ব্বে একটি বিরাট জমকালো গ্রন্থাগার-গৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিষয়ের পুস্তক ও পত্রপত্রিকাদি একত্রে রাখার ব্যবস্থা ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে যে, এ ব্যবস্থা আদৌ সুব্যবস্থা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগগুলি স্থানে স্থানে ছড়ান। প্রতি বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রকে যদি তাঁদের স্ব স্ব বিষয়ের পুস্তকাদি দেখা ও পড়ার জন্য প্রতিবার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আসতে হয় তা হলে যথেষ্ট সময়ের অপ-ব্যবহার হয়। তা ছাড়া আলোচনার সময় যদি সেই বিষয়সংক্রান্ত পুস্তকাদি হাতের কাছে না থাকে তা হলে কাজেরও অসুবিধা হয় অনেক। এই সকল দিক বিবেচনা করে বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় পরিচালনায় বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বইপত্র পড়ার জন্য সে কারণ পড়াশুনার যাতে সুবিধা সেই দিকে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। বিভাগীয় গ্রন্থাগার চালু করার ফলে দ্রুত আদান-প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য বিশেষ ভাবে সাহায্য-ব্যবস্থা
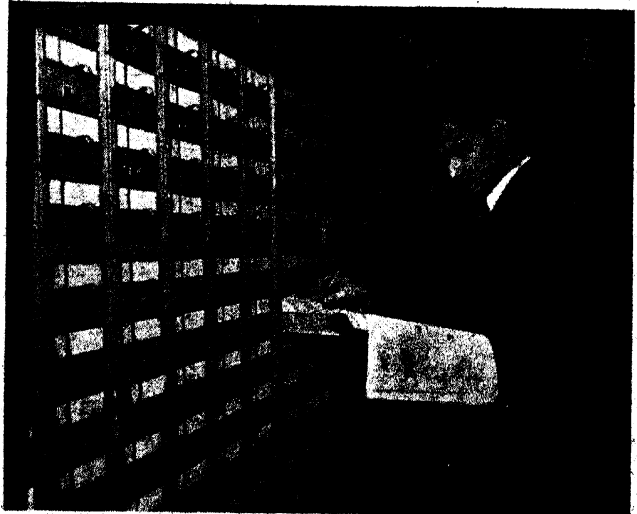
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার: গ্রন্থ-তালিকা কক্ষ

কথা সম্ভব হয়। বিরাট জমকালো থামওয়ালা বাড়ী ছবিতে দেখতেই ভাল কিন্তু গ্রন্থাগারের পক্ষে এরূপ বাড়ী কতখানি কার্য্যকরী সে বিষয়ে ভাবা দরকার। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত কলম্বিয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারও আগে ঐ রকম বড় বড় থাম ও গম্বুজওয়ালা জমকালো বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু কাজের অসুবিধা হওয়ায় এবং অযথা আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য রক্ষায় স্থান অপচয়ের জন্য তারা নূতন পরিকল্পনা করে গ্রন্থাগার গৃহের নূতন রূপ দিয়েছে। এই গৃহের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য কার্য্যকারিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি।

আরাম-কক্ষ : কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে স্থানের আবশ্যকতা খুব বেশী। কারণ যেখানে (১) নূতন বইপত্রাদি রাখার গুদাম, (২) বইপত্রাদি গ্রন্থাগারে ব্যবহার উপযোগী করবার দপ্তরখানা, (৩) বইপত্রাদি ব্যবহারের জন্য তাকে রাখবার উপযুক্ত স্থান, (৪) অনুলয় সেবা ও আদান-প্রদান বিভাগের প্রশস্ত ব্যবস্থা, (৫) দপ্তরীখানা, (৬) দামী ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রাখার বিশেষ ব্যবস্থা, (৭) ফটো কপি করবার স্বতন্ত্র ঘর, (৮) প্রচার দপ্তর, (৯) পাঠকদের ধূমপান ও আরাম কক্ষ এবং (১০) সংবাদপত্র, মানচিত্রাদি রাখারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা চাই। এ ছাড়া পাঠকদের বসবার ও কাজ করবার জন্য যথেষ্ট স্থানের ব্যবস্থা ত রাখতেই হবে। সেজন্য গ্রন্থাগার-গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ের প্রতি সচেতন না থাকলে পরিকল্পনা সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় গ্রন্থাগারের কাজও ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সেজন্য পরিকল্পনার সময় বর্ত্তমান সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে সজাগ থাকা উচিত।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্থানের চাহিদা হয় —বইপত্র রাখার ও পাঠকদের বসবার ব্যবস্থার জন্য। আধুনিক মত অনুযায়ী প্রতি পাঠকের জন্য ২৫ বর্গফুট স্থানের ও যথেষ্ট আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। বই রাখার জন্য তাকগুলি যেন ৭ ফুটের বেশি উঁচু না হয়। তা হলে বইপত্র পাঠকের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

গ্রন্থাগারের মধ্যে শব্দ ও প্রতিধ্বনি যাতে না হয়, তাপ-

প্রদর্শনী কক্ষ : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মাত্রা যাতে সুসংযত থাকে, বাইরের ধুলা ও পোকামাকড় যাতে সহজে ঢুকতে না পারে এবং অগ্নিনিরোধক ও যথেষ্ট আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা থাকে সে সকল দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনায় একাধারে স্থপতি ও গ্রন্থাগারিকের সাহায্য প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের চাহিদা বিশেষ

বই রাখবার সেল্ফ: এডেলেড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ধরনের। সে কারণ যে কোন গৃহ গ্রন্থাগার-গৃহ হবার উপযুক্ত নয় এবং যে কোন স্থপতি গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনার অধিকারী নন।

গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ৫ দফা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত:

১। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন সুপরিচালনার সহায়ক হয়;

২। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন গ্রন্থাগারের সকল কাজের জন্ম অযথা শক্তি ও অর্থের অপচয় দূর করে;

৩। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন আড়ম্বরহীন সহজ ও সুন্দর হয়।
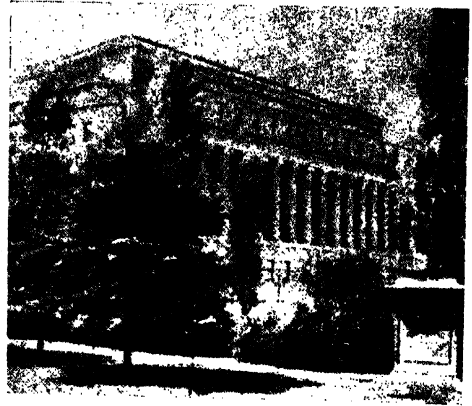
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গ্রন্থাগার

৪। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কাজের অনুকূল হয়;

৫। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন পাঠক, বই ও গ্রন্থাগারকর্ম্মীর মধ্যে সহজ যোগাযোগ রক্ষার সহায়ক হয়।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন গ্রন্থাগার-গৃহের পরিকল্পনা করেছেন। শীঘ্রই গ্রন্থাগার-গৃহ নির্ম্মাণের কাজ সুরু হবে এবং আশা করি,ভবিষ্যতে আধুনিক চিন্তাধারায় পরিকল্পিত এই গ্রন্থাগার-গৃহটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-স্থাপত্যের আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হবে।

নাগার্জ্জুনের জীবনী ও যুগ-সমস্যা

শ্রীমদনমোহন চক্রবর্ত্তী

পৃথিবীর সমস্ত দেশই নিজের দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করছে। এই গবেষণার ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আরও উদ্দেশ্য আছে। হিন্দু যুগে ভারতে রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-দর্শনের বিভিন্ন শাখায় কতটা উন্নতি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে অনেক ভারতীয় মনীষী গবেষণা সুরু করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। আজও অনেকে করছেন। গবেষণায় অসুবিধা অনেক। সেকালে হিন্দু পণ্ডিতগণ তাঁদের বিদ্যা ও পুঁথি নিজস্ব গণ্ডী ছাড়া প্রকাশ করতেন না। যেমন মিথিলা থেকে নব্যন্যায়ের গ্রন্থ বাইরে আনতে দেওয়া হয় নি। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাশেষে পণ্ডিতগণ দেশে ফিরতে দিতে রাজী ছিলেন না। আলবেরুনী হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে সামান্য জ্ঞানলাভ করেন। তাই সে যুগের এইসব খ্যাতনামা ঐতিহাসিক বা ভূপর্যটকের বিবরণী সংক্ষিপ্ত। অস্পষ্ট এবং ভ্রান্তিকর। অনেক সময় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের জ্ঞান-গরিমা পুঁথির আকারেও প্রকাশ করতেন না। যতটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা পুঁথির আকারে এবং রক্ষিত হ'ত মঠে, মন্দিরে। কালের করাল-গ্রাসে এবং মুসলমান সমরনায়কদের অত্যাচারে সে সবই আজ নিশ্চিহ্ন। মহাকালের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি যে-সব গ্রন্থ আজিও বর্ত্তমান রয়েছে—তাদের পাঠ সর্ব্বত্র নির্ভরযোগ্য নয়। সেগুলি একসঙ্গে পাঠ করে সিদ্ধান্ত করতে হবে এবং সে যুগে তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি যে-সব দেশের সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক যোগসাধন হয়েছিল—সেখানেও গবেষণা করতে হবে। উৎসাহী গবেষককে সংস্কৃত, পালি, তিব্বতীয়, চীনা, জাপানী প্রভৃতি ভাষার পুঁথিপত্র পাঠ করতে হবে—তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই।

এই উদ্দেশ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় খ্যাতনামা ফরাসী রসায়নী ও প্রাচীন ইউরোপের রসায়ন ইতিহাসের লেখক ম সিয়ে বার্থেলোর উৎসাহে ভারতের ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রসায়নশাস্ত্রসমূহ ছাত্র-মনোবৃত্তি নিয়ে দীর্ঘ বারো বছর অধ্যয়ন করে "হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" রচনা করেন। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আচার্য্যদেব বলছেন, এই অধঃপতিত জাতিই একদিন বিজ্ঞানচর্চ্চায় জগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছিল ভাবলে ভবিষ্যতে আশার সঞ্চার হয়। চরক, সুশ্রুত, কণাদ, বরাহমিহির, নাগার্জ্জুন, চুণ্ড কনাথ প্রভৃতির প্রতিভা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি, ভবিষ্যৎ চিত্রে এর প্রভাব কেনই বা পড়বে না। কালিদাস, ভবভূতি, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট, শঙ্কর, রামানুজের প্রতিভা হিন্দুগণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। এরা শুধু হিন্দু সমাজের নন, সমগ্র জগতের গৌরবের বস্তু। পৃথিবীর প্রাচীন রসায়ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত হয় নি। ইউরোপের ঐতিহাসিকগণ অনেকেই আরবীয়দের রসায়ন-বিজ্ঞানে মূল ব্রতী ঘোষণা করেছেন। সুদূর অতীতে গ্রীক সভ্যতার শেষ রশ্মিটুকু বিলীন হয়ে গেলে প্রাচ্যের বিস্তীর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠত্বজ্যোতি নিয়ে আরবীয়গণ ইউরোপে উপস্থিত হন। আরব থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা ইউরোপে প্রসারিত হয়। তাই ভারতের নিকট আরবের ঋণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। আর সেজন্যই এবিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। পণ্ডিত মোক্ষমূলর, অধ্যাপক ম্যাকডোনেল, কোলব্রুক, উইলসন, জাথাউ, ভীটস, কিউবটন, শ্লেগেল, ভুষ্টেন-ফেল্ট প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করেন, পারস্যের মধ্য দিয়ে গ্রীক-পণ্ডিতগণ হিন্দু দার্শনিক কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

বৌদ্ধযুগের অন্যতম দার্শনিক ও রসায়নী হচ্ছেন নাগার্জ্জুন। হিন্দু রসায়ন ও দর্শনের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে হলে নাগার্জ্জুনের সময়কাল জানা প্রয়োজন। কিন্তু নাগার্জ্জুনের জন্মকাহিনী, জীবনী ও সময়কাল সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই—এই প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

দক্ষিণ-ভারতে বিদর্ভদেশে (বেরার) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে নাগার্জ্জুনের জন্ম। "চতুরশীতি মহাসিদ্ধ জীবনী সংগ্রহ" পাঠে জানা যায় নাগার্জ্জুনের জন্ম কাঞ্চীদেশের কাহোরে। জন্মের পর দৈবজ্ঞগণ বলেন, এর আয়ু সপ্তাহকাল মাত্র। আয়ুবৃদ্ধির জন্য শত ভিক্ষু ও শত ব্রাহ্মণকে দান-ভোজনে সন্তুষ্ট করায় আয়ু সাত বছর হয়। সাত বছর পরে তার পিতামাতা সন্তানের মৃত্যুদর্শন ভয়ে এক নির্জ্জন স্থানে পাঠান ও অবাধ ভ্রমণের সুযোগ দেন। বালক নাগার্জ্জুন দেশ-দেশান্তর ঘুরে নালন্দায় উপস্থিত হন। সেকালের নাম-করা পণ্ডিত সরহ তখন নালন্দায়। তাঁর উপদেশে দীর্ঘজীবন লাভের আশায় বোধিসত্ত্ব অমিতায়ুর সাধনা করেন। আট বছর বয়সে সরহের কাছে নাগার্জ্জুনের বৌদ্ধমতবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা সুরু হয় এবং উনিশ বছর বয়সে "শ্রীমান্" নাম নিয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁকে "মিথ্যা দৃষ্টি ছেদক"ও বলা হয়। অতঃপর নাগার্জ্জুন মহা-মায়ূরী ও কুরুকুল্লা দেবীর আরাধনা করে বজ্রকায় ও অন্যান্য সিদ্ধি-বিদ্যা লাভ করেন। আর রত্নভের কাছে রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা করেন। কিছুকাল পরে নালন্দায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি স্বর্ণপ্রস্তুত-করণ বিদ্যার সাহায্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে বিহারের দুঃখ-মোচন করেন।

নাগরাজ তক্ষকের কন্যা নাগার্জ্জুনের ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নাগলোকে নিয়ে যান। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি যোলখণ্ড গ্রন্থ ও নাগলোকের পবিত্র মাটি সঙ্গে আনেন। ঐ গ্রন্থে ত্রিপি-

টকের কিছু অংশ ও কয়েকটা ধারণী থাকায় তাঁর নাম হয় "নাগার্জ্জুন"। তিনি তিন বার ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন। প্রথমে নালন্দায় বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী শঙ্করকে স্বধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত করেন। তার পর মাধ্যমিক মতবাদ প্রচার করেন। মধ্যদেশে তাঁর প্রচেষ্টায় একশো মন্দির এবং মহাকালের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। পরিশেষে উত্তর কুরু থেকে জম্বুদ্বীপে আসার সময় রাজা পুঞ্জকালকে রত্নাবলী গ্রন্থ উপহার দেন। দক্ষিণে জটাসংঘের পাঁচ শ' জন বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করায় নাগার্জ্জুনের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

নাগার্জ্জুন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে (উত্তরবঙ্গ) রসায়নশাস্ত্র প্রচার করেন। সুপণ্ডিত হয়পাল ত্রিপিট পণ্ডিত গুহশ্রীর শিষ্য। নাগার্জ্জুনের তারাতন্ত্র শিক্ষালাভ করেন হয়পাল ত্রিপিটের শিষ্য হয়ঘোষের কাছে। আর মহাকাল ও কুরুকুল্লাতন্ত্র শিক্ষালাভ করেন ধান্যকটক বিহারে তারাদেবীর কাছে।

তিব্বতবাসীদের ধারণা, নাগার্জ্জুন মধ্যদেশে দু'শ বছর, উত্তরদেশে ও নাগলোকে বার বছর, দক্ষিণদেশে দু'শ বছর আর শ্রীপর্ব্বতে এক শ' বছরেরও কিছু বেশী, মোটমাট পাঁচ শ' বছর জীবিত ছিলেন।

নাগার্জ্জুনের কর্ম্ম ও ঘটনাবহুল জীবনের শেষ অধ্যায় শ্রীপর্ব্বতে। তিনি এক রাখাল বালককে বিদেহরাজ্যের অধিপতি পদে অধিষ্ঠিত করান। এই রাখাল রাজার নাম শালবদ্ধ। কথিত আছে রাজা শুভচর্যার কনিষ্ঠ পুত্র সুশুকি মাতৃ প্ররোচনায় শ্রীপর্ব্বতে নাগার্জ্জুনকে হত্যা করেন। মতান্তরে স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে তাঁর মস্তক প্রার্থনা করলে তিনি স্বেচ্ছায় দান করেন।

সঠিক ভাবে নাগার্জ্জুনের সময় নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। প্রাচীন ইতিহাসে এ নামে অনেক ব্যক্তির পরিচয় আছে। দু'জন নাগার্জ্জুনের অস্তিত্ব আমরা মেনে নিয়েছি—তাঁদের একজন মাধ্যমিক ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক দার্শনিক আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ভারতীয় রসায়নের যুগপ্রবর্ত্তক—তির্যকপাতন, উর্দ্ধপাতন, ভস্মীকরণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক। পরবর্ত্তী হিন্দু রসায়নের গতি এরই নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত। ঔষধ বিজ্ঞানের যুগে রচিত গ্রন্থাবলীতেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাগার্জ্জুনের প্রভাব সুপরিস্ফুট। হিউয়েন সাঙ, তারানাথ প্রভৃতি মনীষীর ধারণা দার্শনিক ও রসায়নী নাগার্জ্জুন একই ব্যক্তি।

লাসেনের মতে নাগার্জ্জুন কনিষ্কের সমসাময়িক। আনুমানিক ২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত কুষাণ রাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত হন। কালক্রমে বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযান ও হীনযানবাদী নামে বিশিষ্ট দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ প্রকট হওয়ায় শ্রমণদের মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর দূর করবার জন্য কনিষ্কের আহ্বানে বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যগণের যে অধিবেশন হয় ইতিহাসে তা চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ-সঙ্গীতি। মহাযানপন্থীদের কর্ণধার হিসাবে নাগার্জ্জুন তাতে প্রতিনিধিত্ব করেন। "সর্ব্বং শূন্যং" মতের পরিপোষক মাধ্যমিক দর্শনের উদ্ভাবক নাগার্জ্জুন মহাযানবাদ প্রসারের জন্য দায়ী। একাদশ শতাব্দীর অন্যতম মনীষী "রাজতরঙ্গিণী" প্রণেতা কহলন মিশ্রের ধারণা নাগার্জ্জুন শাক্যসিংহেরও প্রায় দেড়শ বছর পরে জীবিত ছিলেন। এই মতে নাগার্জ্জুনের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারত পরিদর্শনে আসেন। তিনি নাগার্জ্জুনকে পৃথিবীর চতুঃসূর্য্যের অন্যতম বলে বর্ণনা করেছেন। ৪০১ থেকে ৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্বের জীবনী চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, বৌদ্ধ-রসায়নী নাগার্জ্জুন রাজা সাতবাহনের বন্ধু ছিলেন। সমসাময়িক কবি বাণভট্টের "হর্ষচরিত" গ্রন্থে হিউয়েন সাঙের মতবাদ সমর্থিত হয়েছে। চীন ও তিব্বত দেশের অনেক গ্রন্থে নাগার্জ্জুনের সঙ্গে রাজা সাতবাহনের সখ্যতার কথা আছে। ঐ সব সূত্রে রাজা উদয়নের সঙ্গে ঋষির বন্ধুত্ব কাহিনীও উল্লেখযোগ্য। "রসরত্নাকর" গ্রন্থে নাগার্জ্জুন রাজা সালিবাহনের সঙ্গে তাঁর পারস্পরিক কথাবার্ত্তা লিপিবদ্ধ করেছেন। উদয়ন, সালিবাহন এবং দক্ষিণ ভারতীয় নৃপতি সাতবাহন একই ব্যক্তি এবং সাতবাহন রাজাদের বংশধর। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে সাতবাহন (অন্ধ্র) সাম্রাজ্যের পতন হয়। সুতরাং আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে নাগার্জ্জুন ভারতীয় রসায়ন সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছিলেন মনে করলে কোন ভুল হয় না। আবার রসরত্নাকর গ্রন্থে সালিবাহনের চরিত্রকে কাল্পনিক মনে করবারও প্রমান আছে।

অনেকের মতে নাগার্জ্জুন একাধিক অথবা প্রাচীন ভারতে রসায়ন বা বৌদ্ধ শ্রমণ সম্প্রদায়ের প্রধান নাগার্জ্জুন পদবীতে ভূষিত হতেন। 'কক্ষপুটতন্ত্রের' মুখবন্ধে লেখক সেকালে চারজন নাগার্জ্জুনের আভাস দিয়েছেন। পরবর্ত্তীকালে তারানাথ তিব্বতীয় ভাষায় নাগার্জ্জুনের যে জীবনী লিখেছেন তাতে বহু অবিশ্বাস্য কথা বর্ত্তমান। তারানাথ নাগার্জ্জুনকে একজন ঐন্দ্রজালিক রসায়নী হিসাবে অঙ্কিত করে তাঁর সময়কাল নির্দ্ধারণ করেছেন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে।

তিব্বত ও চীনদেশীয় তথ্যগুলি আলোচনা করে ভালেসার বলেছেন, "যার নাম আমরা সঠিক ভাবে জানি না, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান, যাকে নানা গ্রন্থের প্রণেতা বলে মনে করি তারই নাম নাগার্জ্জুন।" ভালেসার সাহেব অন্যত্র বলেছেন, "যবনিকার অন্তরালে, গূঢ় রহস্যচ্ছায়ে নাগার্জ্জুনের ব্যক্তিত্বকে বেষ্টন করেছিল একটা ভাবধারা। তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কত কাহিনী, গড়ে উঠেছে একটা অনাবদ্ধ অপরিমিত জীবনকাল। এই অসীম ঐশীশক্তি অর্জ্জনের গৌরব তাকেই দেওয়া হয়।" "ইণ্ডিয়ান্ হিসটোরিক্যাল্ কোয়ার্টারলীতে" সম্প্রতি এক নিবন্ধে অধ্যাপক সুনীতি কুমার পাঠক মন্তব্য করেছেন, তিব্বতীয়গণ দুই পৃথক নাগার্জ্জুনকে একীভূত করে ফেলেছেন। রসায়নী নাগার্জ্জুনের কাল নির্ণয়ে ঐ সব তথ্য তাই নির্ভরশীল নয়।

নাগার্জ্জুনের অন্যতম গ্রন্থ "কক্ষপুটতন্ত্র"। ঐ গ্রন্থের তথ্যাবলী থেকে বলা যায় তাঁর সময়কাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে একই নামধারী দার্শনিকের সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব। "সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার" পত্রিকায় সম্প্রতি এক প্রবন্ধে শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, কক্ষপুটতন্ত্র প্রণেতার যুগ নিশ্চিতভাবে ষষ্ঠ শতাব্দী বা তারও পরে। তাঁর মতে রসায়নিক ও দার্শনিক নাগার্জ্জুন দুই বিভিন্ন ব্যক্তি। শেষোক্ত নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব খ্রীষ্টধর্ম বিকাশের প্রারম্ভে।

নাগার্জ্জুন বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রসমূহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অতীত ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলন প্রধানতঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবে অনুসৃত হয়েছিল—রসায়ন জ্ঞানের মূল উৎস মৃতসঞ্জীবনী—মানুষকে অমরতা দান। পরবর্ত্তীকালে এটি ধর্ম্মানুশীলনের পর্য্যায়ে পড়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়—ইন্দ্রজাল, প্রেততত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, পরশ পাথরের সন্ধান প্রভৃতি রহস্য এই সব গ্রন্থের উপপাদ্য। হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে তন্ত্রের অবদান অসামান্য। ভারতীয় আলকিমির উদ্ভব এবং স্বরূপ তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। তন্ত্র সাধনার অতি গৌরবময় যুগে "রসার্ণব", "রসহৃদয়", "রসসার", "রসরত্নাকর" প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে যেখানে হর ও পার্ব্বতী সর্ব্বজ্ঞানের উৎস, বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রে সেখানে একজন বুদ্ধ, তথাগত বা অবলোকিতেশ্বরকে অবতারণা করা হয়েছে। রসরত্নাকরতন্ত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের সংমিশ্রণ হয়েছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের অবনতির যুগে নিজ নিজ তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। তান্ত্রিক মতবাদের প্রাধান্য সবই গুপ্তোত্তর যুগে। এর আগে কোন তন্ত্রশাস্ত্র পাওয়া যায় না। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কক্ষপুটতন্ত্র রচিত হয়েছে গুপ্তযুগের পরে, যে যুগের অবসান ঘটেছে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। বীরেশ্বরবাবু কক্ষপুটতন্ত্রে "দীনার" কথাটির উপর আলোক সম্পাত করেছেন। রোম দেশীয় মুদ্রা "দীনারিয়াস" ভারতে প্রথম প্রচলিত হয় কুষাণরাজ বিম কদফিস বা ২য় কদফিসের সময়ে। র‍্যাপসন্, টমাস প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে তাঁর রাজ্যশাসনকাল ৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে দীনার কথাটি স্থান পেয়েছে আরও পরে গুপ্তযুগে। কক্ষপুটতন্ত্রে এর উল্লেখ থাকায় মনে হয় তৎকালে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আনুমানিক গুপ্তযুগে অথবা তারও কিছু পরে সংস্কৃত সাহিত্য যখন পুনরায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে—গ্রন্থের লেখক সেই সময়ের।

দুই পৃথক নাগার্জ্জুনের অস্তিত্ব পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ও গিউসেপী টুসি সমর্থন করেছেন। তিব্বতীয় তথ্যের উপর নির্ভর করে শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য বলেছেন, দার্শনিক নাগার্জ্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর এবং রসায়নী নাগার্জ্জুন সপ্তম শতাব্দীর। গিউসেপী টুসি বলেন, "এত প্রবন্ধ এত পুস্তিকা যা আমরা নাগার্জ্জুনের বলে মনে করি তা নিঃসন্দেহে পরবর্ত্তী যুগের অবদান এবং অন্য এক নাগার্জ্জুনের (সিদ্ধ-নাগার্জ্জুন) রচনা।" এই সব প্রমাণ থেকে মনে হয় "রসরত্নাকর", "কক্ষপুটতন্ত্র", "আরোগ্যমঞ্জরী", "নাগার্জ্জুনতন্ত্র", "রত্নাবলী", "মহাভৈরীসূত্র" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক রসায়নী নাগার্জ্জুন বা সিদ্ধ-নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব কাল সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি।

বৈদ্যরাজ সিংহগুপ্তের পুত্র ভাগবত তাঁর "রসরত্নসমুচ্চয়" গ্রন্থে আলকিমি বিদ্যাবিশারদ সপ্তবিংশতি বুধমণ্ডলীর অন্যতম জ্ঞানে নাগার্জ্জুনকে বন্দনা করেছেন এবং "ধাতুবাদ" সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছেন। বৃন্দ, চক্রপানি এবং "রসেন্দ্রচিন্তামণি" প্রণেতা চুণ্ডুকনাথ নাগার্জ্জুনের স্তুতি গান করেছেন। বৃন্দ ও চক্রপানির মতে নাগার্জ্জুনই কজ্জলের আবিষ্কর্ত্তা। সুশ্রুতের যে ভাষ্য এখন চলিত, ডল্লন ও অন্যান্য অনেকের মতে তা বৌদ্ধ রসায়নী নাগার্জ্জুনের সঙ্কলিত। কিন্তু তাঁর লেখার ভাবে মনে হয় নাগার্জ্জুন ভিন্ন অপর প্রতি সংস্কর্ত্তারও পূর্ব্বে প্রসিদ্ধি ছিল "প্রতি সংস্কর্ত্তাপীহ নাগার্জ্জুন এব।" নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের সংস্কর্ত্তা স্বীকার করলে এই নাগার্জ্জুন কে তা স্থির করা কঠিন। সুশ্রুতে পারদের জরা-ব্যাধি-নাশকতা গুণের উল্লেখ না থাকায় সিদ্ধ-নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুত-সংহিতার লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না। দার্শনিক নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের ভাষ্যকার বলবার কোন প্রমাণ বৌদ্ধ গ্রন্থে নেই। তবে সুশ্রুতের মধ্যে সুভূতি গৌতমের উল্লেখ প্রভৃতি দু-একটি কথা থেকে যদি অনুমান করি সুশ্রুতের সংস্কার হয়েছিল বৌদ্ধযুগে তাহলে অসঙ্গত হয় না। এ কথা স্বীকার করলে বলতে হয় সুশ্রুতের সংস্কার হয়েছে দু-হাজার বছর আগে। এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুন দু-হাজার বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে চরকোক্ত ক্ষয়জ-কাস প্রভৃতির পাঠ সুশ্রুত সংহিতায় স্থান পাওয়ায় মনে হয় সুশ্রুতের সংস্কর্ত্তা চরকের পরবর্ত্তী যুগের। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন আপনাকে পাল নৃপতি সহনপালদেবের বল্লভ হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। পাল রাজারা খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। ডল্লন ও চক্রপানি উভয়ের মধ্যে কেউই কারও নাম না করায় মনে হয় উভয়েই এক সময়ের। ডল্লন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।

চরক, সুশ্রুত বা বাগভটের চেয়ে নাগার্জ্জুনের গ্রন্থাবলী সারগর্ভ সারবান্ এবং ভাষার লালিত্যে প্রাণবন্ত। সুতরাং নাগার্জ্জুনের সময়কাল বাগভটের পরবর্ত্তী। ইৎসিং নামক চীনা পরিব্রাজক সপ্তম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণে আসেন। তাঁর গ্রন্থে বাগভটের উল্লেখ থাকায় মনে হয় বাগভট খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। "নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে" একটি ঔষধের প্রস্তুতি ও ব্যবহারবিধি বৃন্দ ও চক্রপানি উভয়েই সঙ্কলন করেছেন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় রসায়নী নাগার্জ্জুন বৃন্দ ও চক্রপানির পূর্ব্ববর্ত্তী। চক্রপানি দত্ত গৌড়াধিপতি নয়পালের রাজবৈদ্য নারায়ণের পুত্র। নয়পাল ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চক্রপানি বৃন্দ লিখিত "সিদ্ধযোগ" অনুসরণ করে নিজ গ্রন্থ রচনা করেন, বৃন্দ আবার মাধব

করের "নিদান" গ্রন্থ অবলম্বনে সিদ্ধিযোগ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রমাণ হতে মনে হয় বৃন্দ চক্রপানির এক বা দুই শতাব্দী পূর্ব্বে নবম বা দশম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পাটলিপুত্রের স্তম্ভে নাগার্জ্জুনের উল্লেখ থাকায় তাঁকে বৌদ্ধাচার্য্য বলেই মনে হয় কেন না পাটলিপুত্রে বৌদ্ধগণের বিহার ক্ষেত্র ছিল। তন্ত্রাচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি নাগার্জ্জুনের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন এ কথা নাগার্জ্জুন স্বীকার করেছেন এবং চন্দ্রকীর্ত্তি নাগার্জ্জুনের মতবাদে গভীর আস্থাবান ছিলেন।

আরবীয় ঐতিহাসিক আলবেরুনী ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পরিক্রমায় আসেন। তিনি বলেছেন, "আলকেমী বিদ্যার মূর্ত্ত প্রতীক নাগার্জ্জুনের জন্ম সোমনাথের নিকট দাহিক দুর্গে। আমাদের একশো বছর আগে তিনি জীবিত ছিলেন।" বিজ্ঞানেতিহাসের অন্যতম দিকপাল জর্জ্জ সারটনের মতে নাগার্জ্জুন অষ্টম শতাব্দীর। বিখ্যাত রসায়নী এবং রসায়ন ইতিহাসের খ্যাতনামা লেখক পারটিংটন মনে করেন নাগার্জ্জুন নবম শতাব্দীর।

এই সব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি বলা যায় সিদ্ধ-নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব নবম শতাব্দীতে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন এবং নাগার্জ্জুনের গ্রন্থ সমূহের আভ্যন্তরীণ তথ্যাবলীর আলোচনার মাধ্যমে সুমীমাংসা সম্ভব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাগার্জ্জুনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। "নাগার্জ্জুন পুরস্কারের" ব্যবস্থা করে। রসায়নের শ্রেষ্ঠ গবেষকদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়। হায়দ্রাবাদ রাজ্যসরকারে প্রচেষ্টায় কৃষ্ণা নদীতে "নাগার্জ্জুন সাগর পরিকল্পনা" এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যে "নাগার্জ্জুন স্তম্ভ" প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ১২ই ডিসেম্বর ঐ পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন ও স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করবেন।

গ্রন্থ ও পত্রিকা স্বীকৃতি

১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়: "স্পর্শমণি"—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩১।

২। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়: হিন্দুরসায়নী বিদ্যা (শ্রীভবেশ চন্দ্র রায় অনূদিত)।

৩। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন: আয়ুর্ব্বেদ পরিচয়।

৪। অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক "আচার্য্য নাগার্জ্জুন ও চন্দ্রকীর্ত্তি"—জগজ্জ্যোতিঃ, মাঘী পূর্ণিমা সংখ্যা, ১৯৫৪।

৫। ডাঃ কালিদাস নাগ: স্বদেশ ও সভ্যতা।

6. Sir P. C. Roy: *History of Hindu Chemistry* (Vol. I and II).

7. Dr. J. R. Partington: *History of Chemistry*.

8. Bireswar Banerjee: "Age of Nagarjuna"—*Science and Culture*, November, 1954.

9. G. Sarton: *Introduction to the History of Science*, Vol. I.

10. R. M. Chatterjee: *Siddha Nagarjuna Kakshaputam*.

11. M. Walleser: *Life of Nagarjuna from Tibetan and Chinese Sources*.

12. S. Pathak: "Life of Nagarjuna"—*Indian Historical Quarterly*, March, 1954.

13. *Studies in the Tantras*.

14. Brown: *Coins of India*.

15. Vidhushekhara Bhattacharjee: *Mahajanavimsaka*.

16. Guiseppe Tucci: *Dinnaga Buddhist Texts on Logic from Chinese Sources*.

17. D. C. Bhattacherjee: "New Light on Vaidyaka Literature"—*Indian Historical Quarterly*, Vol. 23, 1947.

জ্যোতির্ম্ময়

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

আলোর সাথে প্রথম প্রাতে
তোমার নীরব বাণী,
পাঠিয়ে দিলে ভুবন তলে
নিবিড় তিমির হানি'।
সেই বাণী যে তরু-লতায়
জাগায় তৃষা আকুলতায়
সেই বাণী যে দখিন বায়ে
করে কানাকানি॥

নিত্য-ঝরা নির্ঝরিণীর
মতো তোমার সুরে,
দূরের গীতি দোল দিয়ে যায়
মনের মধুপুরে।
আলো-ছায়ার মিলন ধারা
করবে জানি আপন হারা
সেই সুরেতে তোমায় আমায়
হ'বে জানাজানি॥

গঙ্গার ইলিশ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি বিশেষ স্থানে রোদ এসে পড়তেই সুমথ থলি হাতে করে মন্থর পদে অন্যমনস্ক ভাবে বাজারের পথে অগ্রসর হয়ে চলে। ভাঙ্গা বাজারে জিনিষপত্র সস্তায় পাওয়া যায়। এ নিয়ে রোজই তাকে গঞ্জনা সইতে হয় কিন্তু সে নিরুপায়। অবস্থার বিপর্য্যয়ে আজ যেখানে এসে তারা দাঁড়িয়েছে তাতে এর চেয়ে ভাল কিছু তার চোখে পড়ে না—নইলে ছেলেদের মাঝে মাঝে একটা ভাল মাছ কিম্বা কিছু টাটকা তরিতরকারি খাওয়াতে পারলে সে নিজেই কি কম খুশী হ'ত? গোনাগুনতি কয়েক আনা পয়সায় তাকে ব্যবস্থা করতে হয়—বেশী খরচ করবার সামর্থ সুমথর নেই। কলোনীর একপ্রান্তে এককালি জমি দখল করে ছোট কুঁড়ে ঘরখানি তুলতেই তার সঞ্চিত অর্থের একটা বৃহৎ অংশ শেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্টাংশও জীবন ধারণের প্রয়োজনে এই ক' বছরে ব্যয় হয়েছে। সেও আজ প্রায় দু' বছর হ'ল। তার পর থেকেই চলেছে এই সংগ্রাম।

স্ত্রী সরমা জেনে শুনেও যে কেন মাঝে মাঝে অধৈর্য্য হয়ে পড়ে সুমথ তা বোঝে না। অর্থহীন চেঁচামেচি, যুক্তি নেই বিচার নেই। তবে একথা সে জানে যে, সরমার এ গর্জ্জন ক্ষণস্থায়ী তাই নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে বর্ষণের।

সে দিনেও বাজার থেকে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'ল। আরম্ভটা মৃদু কণ্ঠে হলেও কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে পঞ্চমে উঠল। নির্ব্বিরোধী শান্তিপ্রিয় সুমথ কাতর কণ্ঠে বারে বারে শুধু বলতে থাকে, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে সরমা! ছেলেদের তুমি যেমন মা আমিও তেমনি বাপ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। রেগে গেলে সরমার জ্ঞান থাকে না। তাই বলে এতখানি মাত্রাজ্ঞানহীনতার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আর কোনদিন দিয়েছে বলেও সুমথর মনে পড়ে না। আজ যতখানি সে ব্যথিত হ'ল তার চেয়ে ঢের বেশী হ'ল বিস্মিত।

সরমা তখনও বলে চলেছে, এখানে তুমিই শুধু একলা মানুষ নও—তোমার মত আরও হাজার হাজার বাস করছে। তাদের যদি চলতে পারে তোমার চলবে না কেন?

কঠিন প্রশ্ন। এর কোন জবাব সুমথ দিতে চায় না। শুধু অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সরমা থামতে পারে না। উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে থাকে, কবে কি খেয়েছ আর কি পরেছ তাই ভেবে তোমার দিন চলতে পারে কিন্তু সকলের চলে না। আমাকে রোজ দুটি বেলা ছেলেদের সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দিতে হয়। ওদের সব রকমের বায়না আমাকেই সইতে হয়।

আশ্চর্য্য এতেও সরমা সুখী নয়—সুমথ অন্যমনস্ক ভাবে ভাবছিল, সে আজও দুটি বেলা ছেলেদের সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দিতে পারছে। এ যে কত বড় পাবা তা সরমা বুঝতে না চাইলেও সুমথ অনুভব করে, কিন্তু অভিযোগ করে না।

সরমা তেমনি বলে চলেছে, কত আর মিথ্যে দিয়ে ওদের ভুলিয়ে রাখব?

সুমথ এতক্ষণে কথা কইলে। শান্ত ব্যথিত দুটি চোখ তুলে সে সরমার পানে তাকালে, বললে, ওদের সত্য কথাটা এতদিন তোমার জানিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল।

তাতে তোমার সম্মান বাড়ত না—সরমা উচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলে।

সুমথর মুখে বড় সুন্দর একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে তেমনি শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, অক্ষমকে অক্ষম বললে তাকে অসম্মান করা হয় না সরমা। আমি ব্যথা পেলেও এক বিন্দু দুঃখিত হব না। আমার এ কথাটা অন্তত তুমি বিশ্বাস করো।

সুমথর কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানি না, কিন্তু সরমা অকস্মাৎ নিজের অজ্ঞাতেই চমকে উঠল। স্বামীর মলিন মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই তার এতক্ষণের মারমুখী ভাব এক নিমেষে মিলিয়ে গেল এবং সহসা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করে ধীরে ধীরে বললে, আমার দুঃখ তুমি কোন দিন বুঝলে না।

সুমথ পুনরায় চোখ তুলে স্ত্রীর মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকালে। সরমা এ চাহনি সহ্য করতে পারলে না। পালিয়ে আত্মরক্ষা করলে। এতবড় মিথ্যা অনুযোগ বুঝি ইতিপূর্ব্বে আর কোন দিন সে করে নি।

বিচিত্র মানুষের মন। সুমথ ভাবছিল। কিন্তু জবাব সে দিলে না। সরমাকে সে জানে তাই বৃথা তর্ক করে ওকে আর নূতন করে লজ্জা দিতে চায় না। তা ছাড়া যে অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা চলেছে, মনের উপর যে অসহ্য চাপ পড়ছে তাতে এমনি দু'চারটে অসংলগ্ন কথা যদি সরমার মুখ থেকে বেরিয়েই আসে তাই নিয়ে ক্ষেদ করে কি হবে। আর তাতে তার অক্ষমতার গ্লানি কিছুমাত্র লাঘব হবে কি?

রান্না ঘর থেকে বিন্দিবৌয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, সরমাদির বাজার এল বুঝি এতক্ষণে? রাঁধবে কখন? ঐ দুধের ছেলেদের খেতেই বা দেবে কখন?

অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্ন। পাড়াপড়শীরা এ প্রশ্ন সকলকেই করে থাকে। কিন্তু সরমা জবাব দিলে না। অন্ততঃ সুমথর কানে এসে উত্তরটা পৌঁছল না।

বিন্দিবৌ দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলে, তোমার থলির মধ্যে কি রেখেছ দিদি—ওঁ'স মাছিতে ছেঁকে ধরেছে যে?

সরমার জবাবটা এবারে সুমথর কানে এল। সরমা বলছিল, আজ কি নূতন দেখছ বোন? শেষ বাজারের জিনিষ ওর চেয়ে ভাল হয় না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর। জ্বালা আছে। প্রচ্ছন্ন শ্লেষও হয়ত রয়েছে, তবে তা কার উদ্দেশে বর্ষিত হ'ল তা বুঝতে না পেরে সুমথ চঞ্চল হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবার মত মনের অবস্থা তখন তার নয়। নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিন্দিবৌ পুনশ্চ বললে, তোমারও কিন্তু দোষ আছে দিদি—কণ্ঠস্বরে খানিকটা কৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ পেল। চেষ্টা করেও ঢাকতে পারে না বিন্দিবৌ।

সরমা বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওকে ঠিক বুঝতে পারে না সে। বলে, এর মধ্যে আবার দোষ খুঁজে পেলে কোথায় তুমি বোন।

বিন্দিবৌ বড় বড় চোখ করে তাকাল, তার পরে হেসে বললে, কোন কথাই যদি তোমরা না বুঝবে তা হলে অভাব ঘুচবে কেমন করে। তোমরা দু'জনেই হয়েছ সমান। এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ।

সরমা করুণ হেসে জবাব দিলে, দিন রাত অভাব অভাব করে চিৎকার করলে কি দুঃখ দূর হবে? তা ছাড়া মন্দই বা আছি কি···

হাত মুখ নেড়ে বিন্দিবৌ পুনরায় বলে, তুমি অবশ্য সব সময়ই তাই বল, কিন্তু ছেলে দুটো যে দিনরাত ছোক ছোক করে এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। তা ছাড়া ওদের আর দোষ কি—ছেলেমানুষ। আমরাও মানুষ দিদি তা তোমরা যতই অগ্রাহ্যি কর না কেন। পারলাম কি চুপ করে থাকতে। কর্ত্তা হাতে করে গঙ্গার ইলিশটা নিয়ে এল আর ছেলে দুটো সেখানে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলে, ইলিশ মাছ বুঝি? খেতে খুব ভাল তাই না কাকী। বললাম, তোর বাপকে বলিস এনে দেবেন। ওরা একসঙ্গে জবাব দিলে, বাবা কুঁচো চিংড়ি আনেন। বড্ড কষ্ট হ'ল দিদি। চোখের সামনে নিয়ে এল মাছটা—বসিয়ে রেখে দিলাম খানকয়েক ভেজে—

কথার মাঝে বাধা দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে সরমা জিজ্ঞেস করলে, আর ওরা তাই বসে বসে খেলে—

আহা খাবে না—বিন্দিবৌ বিগলিত কণ্ঠে বললে, সোনামুখ করে খেলে। বলে, এমন ওরা কোনদিন খায় নি। তা বাপু তুমি রাগ করলে কি হবে। ছেলেমানুষ সব সময়ই ছেলেমানুষ। মাঝে মধ্যে এনে দিলেও পার—

না পারি না—সরমা ভেঙে পড়ল, কিন্তু তুমি ত ছেলেমানুষ নও বোন। তুমি কি বলে ওদের মাছ দিতে গেলে—

বিন্দিবৌ একমুখ হেসে জবাব দিলে, তুমি কি যে বল দিদি! মানুষের চামড়া নেই আমাদের গায়।

সরমা ইতিমধ্যেই সামলে নিয়েছে। সে শান্ত কণ্ঠে বললে, না বৌ ভবিষ্যতে তুমি এ ভাবে ওদের আস্কারা দিও না। ওদের বাবা এ সব পছন্দ করেন না।

বিন্দিবৌ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে তা হলে ছেলেদের ঘরে বন্ধ করে রেখে দিও নইলে তোমাদের মান সম্মান সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকবে না।

সরমা কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করলে। বললে, কিছুই ত নেই বৌ শুধু ঐটুকু ছাড়া। আমার অনুরোধ বোন এ দিকে তোমরা নজর দিও না।

বিন্দিবৌ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সহসা সে বসে পড়ল। বার কয়েক মাথাটা এ পাশ থেকে ও পাশে হেলিয়ে বলতে সুরু করলে, আমিও সবসময় এই কথাটাই বলি, কিন্তু সে মানুষটা কি কথা শোনেন? বলে, সময় অসময় অমুকদার কাছে অনেক উপকার পেয়েছি—টাকা পয়সা দিয়ে না পারি দুটো মুখের কথা দিয়েও যদি—

কথাটা বিন্দিবৌ শেষ করতে পারে না। সরমা তাকে বাধা দিয়ে বলে, উনি যে কোন কথাই শুনতে চান না এ তোমাদের কত বার বলব বৌ। ওঁর সেই এক কথা, দেনা করব তা শুধব কেমন করে? যদি কারবারে লোকসান হয়ে যায়? সরকার কি তখন আমায় রেয়াৎ করবে?

বিন্দিবৌ খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, আমাদের উনি ত সেই কথাই বলেন। সরকারী দেনা আবার শোধ করতে হবে কেন—এ খবরটাও তোমরা জান না? এ যে আমার ছোট ছেলেটাও জানে। আজকের দিনে এই ভাল মানুষটাকে লোকে নাকি ভণ্ডামী বলে—

সরমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। উত্তেজনায় সে কাঁপছিল। বললে, যে ভাবেই হোক দিন হয়ত তোমাদের ভালই যাচ্ছে, কিন্তু তার গরমে অকারণে মানুষকে অপমান করতে এস না বৌ—

বিন্দিবৌ পিছু হঠবার পাত্রী নয়। শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে সে জবাব দিলে, কথাটা আমার কাছ থেকে আজ নূতন শুনলে নাকি? আমি বরং যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েই বললাম। উনি দাদা বলে ডাকেন তাই।

বিন্দিবৌ উঠে দাঁড়াল। আর একবার আড়চোখে সরমার মুখের পানে চেয়ে দেখে হেলে দুলে প্রস্থান করলে।

সরমা বিস্মিত ব্যথিত দৃষ্টিতে তার চলার পানে চেয়ে থাকতে থাকতে দু'চোখ জ্বালা করে জলের ধারা নেমে এল। বিন্দিবৌর এই অকারণ আক্রমণের কোন হেতুই সে খুঁজে পায় না।

সরমা যে কতক্ষণ এমনি অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিল তা তাঁর হুঁশ ছিল না; সহসা পুত্রের আহ্বানে চেতনা ফিরে এল এবং তাকে আর দ্বিতীয় কথা বলার অবকাশ না দিয়ে তার গালের উপর ঠাস ঠাস দু'ঘা বসিয়ে দিয়ে অস্বাভাবিক রূঢ় কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, হতভাগা ছেলে আমার কাছে এসেছ কেন? লজ্জা করে না

আমাকে মা বলে ডাকতে? দূর হয়ে যা আমার চোখের সুমুখ থেকে। যাদের কাছে হাত পেতে ইলিশ মাছ খেয়েছিস সেখানে যা হারামজাদা নচ্ছার—সহসা ছেলের মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই সরমা থামলে। তার দু' চোখে জলের ধারা।

আঘাতের চেয়েও মায়ের চোখের জল এবং অকারণ অভিযোগ গোপালকে কেমন যেন অভিভূত করে ফেলেছে। সরমা থামতেই গোপাল কাতর ভাবে বলে উঠল, তোমাকে কেউ ভুল খবর দিয়েছে মা। বৃন্দাবন কাকা যখন মাছ নিয়ে আসেন আমি আর দুলাল সেখানে ছিলাম। মাছ ত খাইনি আমরা। কাকা দিতে চাইলেন আমরা নিই নি। কাকীমা কত রাগ করলেন কাকাকে।

সরমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছেলেকে অকারণে তাড়না করবার জন্যে অনুতপ্ত হ'ল। বিন্দিবৌর আজকের আক্রমণের কারণটাও এতক্ষণে সে কতকটা অনুমান করতে পেরেছে। ওদের সে বহুদিন থেকেই জানে। অকারণে মানুষকে বিব্রত করেই ওরা আনন্দ পায়। কিন্তু তাই বলে দুটি অবোধ শিশুকে নিয়ে এই—কথাটি ভাবতে গেলেও সরমার মন ছোট হয়ে যায়।

মায়ের বেদনা-মলিন মুখের পানে চেয়ে পুনরায় গোপাল বললে, তুমি দুলালকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবে মা।

সরমার চোখে জল দেখা দিল। সে গোপালকে সহসা বুকের কাছে টেনে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে, দুলালকে জিজ্ঞেস করতে যাব কেন? আমার গোপাল কি তার মার কাছে মিথ্যে বলতে পারে?

গোপাল দুঃখ ভুলে হাসিমুখে চলে গেল। সরমার বুকের উপর থেকে এতক্ষণের পাষাণভার এক নিমেষে নেমে গেল। কিন্তু সুমথ আত্মগ্লানির কঠিন চাপ থেকে তার মনটাকে কিছুতেই মুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছিল না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পায় পায় সে বহুদূরে চলে এসেছে। মনটা চলে গেছে আরও দূরে। সুমথ ভাবছিল তার নিজের কথা। যেগুলো ঠিক কথা নয়—ঘটনাগুচ্ছ। যার সৌন্দর্য্য ছিল—সুবাস ছিল। সে ঘ্রাণ আজও তার নাকের পাশে লেগে আছে। তাঁর চেতনায় এর অবস্থিতি। আর সেই সঙ্গে সে স্পষ্ট দেখতে পায় সানুকে। ওকে সুমথ চেনে। শুধু চেনে বললে সব বলা হয় না। মনে হলেই ভিতরে বাইরে সে চঞ্চল হয়ে উঠে। সানুর চিন্তাকেও সে ভয় করে—সানু এ সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে। এক পাল সহপাঠীসহ তার চোখের সম্মুখে জীবন্ত হয়ে উঠে। সুমথর কাছে বর্ত্তমান মুছে যায়—আত্মনিমগ্ন হয়ে বসে আছে সে। আর তার চোখের সামনেই সানু তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মায়ের কাছে হাজির হয়েছে। সানুর মা একমুখ হেসে বললেন, আজ তোদের ছুটি বুঝি?

বন্ধুর দল চিৎকার করে উঠল, হ্যাঁ মাসীমা। আজ আমাদের ইনসপেক্টর এসেছিলেন যে তাই।

সানুর মা তেমনি হাসিমুখেই জবাব দেন, তাই বুঝি মাসীমাকে উদ্ধার করতে এসেছ!

সানু প্রতিবাদ জানায়, বারে তুমি নিজেই ত বললে আজ তাল-পিঠে হবে—

মা হেসে উঠে সস্নেহে বলেন, তার মানে কি পিঠে খাবার নেমন্তন্ন যে সানু? কিন্তু তোরা হ্যাংলার দল এলি কোন মুখে—

সানুর মা এমনি করেই ওদের অভ্যর্থনা জানান। সকলেই তা জানে। এর পরে তাঁকে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা যায়। ওদের সামনে বসিয়ে পরম যত্নের সঙ্গে খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় দেবার আগে আবার আসবার কথা বলে দেন।

সানুর সমস্ত অন্তর জুড়ে তার মা। বাবা আছেন এই পর্য্যন্ত। তিনি থাকেন তাঁর ব্যবসা নিয়ে। সংসারের কোন কিছুর ধার ধারেন না তিনি। মায়ের স্নেহের ছায়ায় হেসে খেলে সানু বড় হতে লাগল। শৈশব গেল। কৈশোরও যাই যাই প্রায়, এমনি দিনে সানুর বাবা তাকে ব্যবসায়ে টেনে নিতে চাইলেন। মা বাধা দিলেন। তাঁর সানু আগে লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক তার পরে···কিন্তু তার পরের কথা নিয়ে মাকে আর বেশী দিন মাথা ঘামাতে হয় নি। তার আগেই তাঁকে চলে-যেতে হ'ল। সানুর জীবনে একটা পরিবর্ত্তন ঘনিয়ে এল। পড়াশুনা সেইখানেই ইতি হ'ল। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার তার সাহসও নেই, শক্তিও নেই। তা ছাড়া মার মৃত্যুর কয়েক মাসের ব্যবধানেই তার বাবা যেন অনেক বছর এগিয়ে গেলেন। সানু ভয় পেল। এমনি এক সম্ভাবনার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। কোন দিন কল্পনা করতেও পারে নি। তাই সংসারে দুঃখের এই বাস্তব রূপ দেখে সে শঙ্কিত হ'ল। বাবার কাছে সানু পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলে।

কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেকে বিয়ে দিয়ে বাপ তাঁর ভাঙা সংসারে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলেন। কথাটা শুনে প্রথমে চমকে উঠলেও বিয়ের পরে সে চমক শিহরণে রূপান্তরিত হ'ল। রূপে, রসে আর গন্ধে তার জীবন সরস হয়ে উঠল। মায়ের অভাব ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এল। স্ত্রী তার মনের একটা বৃহৎ অংশ ভরে রেখেছে—সেবায়, ভালবাসায়, হাস্যে আর লাস্যে।

সানু মন দিয়ে ব্যবসা করে। পড়শীদের দুর্দ্দিনে বুক দিয়ে দাঁড়ায়। অর্থ দিয়ে করে সাহায্য।

সানুর স্ত্রী দুটি পুত্র সন্তানের জননী হয়েছে। তার অনেক কাজ। মৃত শাশুড়ীর শূন্যস্থান সে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। একথা সানুর বাবা রোজই এক বার করে বলে থাকেন। দিন দিন তিনি ছেলেমানুষ হয়ে পড়ছেন। কি যে সব আবদার করেন তিনি সানুর স্ত্রীর কাছে। সে মনে মনে হাসে। এ আবদার তার ছোট ছোট ছেলেরা করলেই যেন মানায়। অপরিসীম তৃপ্তিতে আর গর্ব্বে তার বুক ভরে ওঠে। মার কথা আবার নতুন

করে মনে পড়ে। আজ তিনি বেঁচে থাকলে তাদের দিনগুলি না জানি আরও কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারত।

দিন চলে যায়। দেখা দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কিন্তু তাদের গ্রামে যুদ্ধের বিন্দুমাত্র আঁচ লাগে নি। দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত ঘটে নি তাদের আশেপাশে কোথাও। এত যে হানাহানি, এত যে টানা-টানি তাতেও ওদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। কিন্তু এরই পরে এল স্বাধীনতা। যারা চলে গেল তারা ছড়িয়ে গেল মারাত্মক তীব্র বিষ। সে বিষের জ্বালায় জ্বলে গেল কত অগণিত সুখী সংসার। মিলিয়ে গেল তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন। ভেঙে গেল তিল তিল করে গড়ে তোলা সামাজিক জীবনের সকল আশা আর আকাঙ্ক্ষা।

সানু আজ কোথায়? কোথায় আজ তার আনন্দমুখর সংসার। বিগত দিনের সবকিছুই আজ নিছক একটা সুখস্বপ্ন। ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখে তারা হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে শূন্যে দৃষ্টি রেখে—

সানু কাউকে দোষ দেয় না। দেশব্যাপী এত বড় একটা পরিবর্তন যখন হয় কিছু লোককে তার জন্য আত্মাহুতি দিতে হবে বৈকি। তাই সর্বস্বান্ত হয়েও এখানে এই মাথা-গোঁজার স্থান পেয়ে নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করতে চায়। অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে প্রাণপণে এগিয়ে চলতে চেষ্টা করে। বারে বারে চোখ রগড়ে সামনে, পিছনে, ডাইনে এবং বাঁয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে আলোর সন্ধান করে। খোঁজার তার বিরাম নেই। কিন্তু সানুর বাল্য-বন্ধুর দলই আজ তার সঙ্গে সকলের চেয়ে বেশী শত্রুতা করছে।

সুমথ অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠল পুত্রের আহ্বানে। তুমি এখানে—আর আমি খুঁজতে কোথাও বাকি রাখিনি।

সুমথর একটি নিঃশ্বাস পড়ল। সে দিনের সানুই আজকের সুমথ। যার জীবনের সকল আনন্দ আর কোলাহল থেমে গেছে। তাই সে ভুলতে চায় অতীতকে, ভুলতে চায় বর্ত্তমানকে—শুধু আগামী কালের আশায় বুক বাঁধে। তার বংশধরগণ যেন পেয়ে হারাবার দুঃখ না পায়। দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়েই ওদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠুক। তাকে জয় করে ওরা বাঁচার মন্ত্র শিখুক। কিন্তু সুমথর এ আশা পূরণ হবে কোন পথে! যে পথেই পা বাড়ায় সেখানেই বিষাক্ত কাঁটার ছড়াছড়ি। এগোতে গেলেই অপমৃত্যু।

তবুও সুমথ থামতে পারে না। এগিয়ে চলে। জীবন মৃত্যু ত হাত ধরাধরি করেই চিরদিন চলে। বিষের ভয়ে পালিয়ে গিয়েই কি বাঁচতে পারবে। প্রতিনিয়ত সুমথর মনের সঙ্গে চলছে যুক্তির লড়াই। বৃন্দাবন, রাজেন আর নিবারণের উপদেশ সে গ্রহণ করতে পারছে না বলেই তার মনে এই জিজ্ঞাসা।

সুমথর ছেলে পুনরায় ডাকলে, তোমার জন্য আমরা কেউ যে খেতে পারছি না বাবা—

চমকে উঠে সুমথ। বলে, তুমি আর দুলা খেয়ে নাও গিয়ে। আমি ততক্ষণে একটা ডুব দিয়ে আসছি।

সকালের সে উগ্র মূর্ত্তি এ বেলায় আর সরমার নেই। বরং সে মূর্ত্তি যেন বেদনায় ম্লান হয়ে গেছে। মিনতি করে সে স্বামীকে বললে, তোমাকে এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে।

সুমথ বিস্মিত ও শঙ্কিত হ'ল। বললে, এত বছর পরে হঠাৎ এ কথা কেন সরমা! আর আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ত তোমার অজানা নয়।

তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না—সরমা ভেঙ্গে পড়ে বলে, এখানের সংসর্গ থেকে আমার গোপাল আর দুলাকে সরিয়ে না নিলে ওরা যে মানুষ হবে না গো।

সুমথ একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, পালিয়ে কোথায় যাবে বলতে পার সরমা? ঘরের মধ্যে জানালা কবাট বন্ধ করে ত মানুষ বাঁচতে পারে না—

সরমার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর! সে বললে, তুমি বলতে চাইছ কি?

সুমথ বলে, সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। তফাৎ শুধু—প্রকাশের রকমফের। তার চেয়ে বিষের ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে তাকে আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ হওয়া যায় না কি?

খানিক চুপ করে থেকে উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলে সরমা, ও সব কেতাবী কথা শুনতেই ভাল। নইলে বিষ খেয়ে যে মানুষ বাঁচে না তা তুমিও যেমন জান আমিও তেমনি জানি। একটু থেমে সে পুনশ্চ বললে, এ সব যুক্তি হ'ল অক্ষমের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সহজ পথ। মোট কথা এখানে থেকে তোমার বন্ধুদের উপহাস কুড়োতে আমি আর পারছি না।

সরমা রাগ করে প্রস্থান করে।

সুমথর নিজেকে আজ বড় অসহায় মনে হ'ল। যে মাটির উপর সে দাঁড়িয়ে থেকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে এতদিন লড়াই করে এসেছে সেটুকুও কি আজ তার পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে?...তার শেষ এবং একমাত্র ভরসাস্থল।...

আঙ্গিনায় ঘরের কোণে ছিটাবেড়াকে আশ্রয় করে লতিয়ে ওঠা গাছটাতে গোটা কয়েক ফুল ধরেছে। ফুলগুলি নীল। লতাটার নেই স্বাস্থ্যসম্পদ। গোড়ায় বাসা বেঁধেছে উঁই পোকার দল। মাথার দিকে এখনও দেখা যায় গোটাকয়েক সবুজ পাতা। ক'দিন পরে ও ক'টিও হয়ত আর অবশিষ্ট থাকবে না। সুরুতে এই সময় নীলমণির নীলে চোখ জুড়িয়ে যেত। আজ জাগে বেদনা। ও নীলে নীল সেই আছে বিষ। যার জ্বালায় ও নিজেও জ্বলছে...

বাজে চিন্তায় সুমথর অনেকখানি সময় অযথা নষ্ট হয়েছে। যা কিছু কেনাবেচা তা এই সময়টাতেই হয়। দড়িতে রাখা ছাতকাটা সার্টটি দ্রুত হাতে তুলে নিয়ে কতকটা ছুটতে ছুটতে সে রাস্তায় এসে উপস্থিত হ'ল।

পর দিন সকাল বেলা। সুমথ বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সরমা এসে সম্মুখে দাঁড়াল। কোন প্রকার ভূমিকা না করে বললে, চাল নিয়ে এলে তবে রান্না হবে। একটু সকাল সকাল ফিরে এসো।

কোন জবাব না দিয়ে থলি হাতে সুমথ রওনা হতেই সরমা আর একটু কাছে সরে এসে বললে, আর একটা কথা ছিল।

সুমথ বললে, কি কথা?

সরমা একটু ইতস্ততঃ করে বললে, এই আংটিটা নিয়ে যাও। ছেলেদের জন্ত একটা গঙ্গার ইলিশ আনতে হবে'।

সুমথ কোন কথা বললে না। এক বার আংটিটির পানে এক বার সরমার মুখের পানে সে তাকিয়ে দেখে নিঃশব্দে হাত পেতে তা গ্রহণ করলে। এটি ওদের বিয়ের আংটি।

এই নীরবতা সরমাকে আঘাত করল। সে মৃদুকণ্ঠে বললে, কিছু বলবে না?...

সুমথ একটু হাসবার চেষ্টা করে জবাব দিলে, বলবার কি আছে সরমা। কত কষ্টে যে তুমি এটা হাতছাড়া করতে চাইছ সে ত বুঝতেই পারছি—

সরমার মুখের ভাব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে গভীর কণ্ঠে বললে, দুঃখ না আনন্দে। আমার একথাটা তুমি বিশ্বাস করো।

সরমার কানের পাশে গোপালের কথাগুলি আর এক বার ধ্বনিত হয়ে উঠল, বৃন্দাবন কাকার ওখানে আমরা ইলিশ মাছ খাইনি মা। তুমি ভুল শুনেছ—

কথাটা সুমথকে বিস্মিত করল। তথাপি সে প্রশ্ন করলে না।

এইখানেই সরমার দুঃখ। সুমথর এই অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততার কোন অর্থই সে খুঁজে পায় না। তবুও সে থামতে পারে না। সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরটাও সে মুখে মুখে বলে যায়।

সুমথ নীরবে কান পেতে শোনে।

সরমা বলতে থাকে, ওরা ছেলেমানুষ। আজ লোভকে জয় করতে পেরেছে বলেই তাদের আকাঙ্ক্ষা মরে যেতে পারে না। তাই...আর তা ছাড়া ওদের জন্তেই আমাদের সব। তুমি রাগ করলে না ত?

সুমথ একথারও কোন জবাব না দিয়ে একটুখানি ম্লান হেসে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলে। কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে আংটিটি বের করে এক বার সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখে পুনরায় তা পকেটে রাখে। পাঁচটি টাকা তার কাছে আছে। গত সন্ধ্যার মোট আমদানী। সেটা পুরো খরচ করবার অধিকার তার নেই। অথচ তাকে চাল কিনতে হবে—একটি গঙ্গার ইলিশও কিনতে হবে। আংটি বাঁচিয়ে এই দুটি বস্তু কেনা সম্ভব কিনা মনে মনে হিসেব করে দেখছিল সুমথ।

বৃন্দাবনের আহ্বানে সে ফিরে দাঁড়াল।

বৃন্দাবন বলছিল, দাদা আজ যে বড় সকাল সকাল বাজার যাচ্ছ—

সুমথ যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠে জবাব দিলে, চাল না আনলে—একেবারে শূন্ত কিনা তাই।

বৃন্দাবন ততক্ষণে চলতে সুরু করেছে, একে বলে কোন লাভ নেই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুমথ এসে চালের দোকানে উপস্থিত হ'ল। আগে চাল তার পর অন্ত চিন্তা।

সুমথ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। মালিকের যুবক পুত্রের খেয়াল নেই। অল্প বয়স। নতুন বিয়ে করেছে। বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে বৌর কথা নিয়ে। নানা সম্ভব-অসম্ভব রঙীণ গল্প। রীতিমত এক স্বপ্নের দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহা বেচারার এই সুখস্বপ্নটা ভেঙে দেবে সুমথ! সবে সংসার-সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। ঢেউ দেখে তাই আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। প্রচুর উচ্ছ্বাস ওর চোখেমুখে। নোনা জলের স্বাদ পায় নি। কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে সে। ও পাশ থেকে চাল নিয়েছে এ পাশে দেবে দাম।

সুমথ বলে, চালের দামটা—

যুবকটি এ পাশে মুখ ফিরিয়ে তাকালে। কিছু বিরক্তি ওর চোখেমুখে। হাত বাড়িয়ে বললে, দিন।

পুনরায় সে তার অসমাপ্ত কথার সূত্র ধরে সুরু করলে। সুমথ তার হাতে পাঁচ টাকার নোটখানি দিলে। যুবকটি তা সম্মুখে খোলা কাঠের ক্যাস বাক্সে ছুড়ে ফেললে। গল্প তখনও চলেছে। সুমথ বাকি টাকা দাবি করলে। যুবকটি লজ্জিত হ'ল। তাড়াতাড়ি বাকি টাকাটা সুমথর হাতে দিয়েই সে পুনরায় গল্পে মন দিলে।

বাকি টাকাটা হাতে আসতেই সুমথর চোখের সম্মুখে তার পকেটে রাখা বিয়ের আংটিটা আর এক বার ভেসে উঠল। চাল চাই—গঙ্গার ইলিশ চাই। সত্যই ত আজ লোভকে দমন করতে পেরেছে বলেই কি আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়ে গেছে। দশ সের চালের দাম নিয়ে তাকে এতগুলি টাকা ফেরত দিলে কেন দোকানের মালিক-পুত্র? সে তাকে ওর আনন্দের অংশ দিতে চায় নাকি? পকেটে তার এতদিন যত্নের মত আগলে রাখা মধুর-স্মৃতি বিজড়িত আংটিটি। দাবি তার মাত্র একটি গঙ্গার ইলিশ। যার দাম অন্ততঃ চার টাকা। সুমথ অন্তমনস্কভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তার মাথার ভিতরটা যেন খালি হয়ে গেছে। স্থির হয়ে কিছু ভাবতে পারছে না সে। অথচ চিন্তার হাত থেকে রেহাইও পাচ্ছে না। আকাঙ্ক্ষা তো মানুষের থাকবেই, তাই বলে লোভকে দমন করতে শিখবে না? কিন্তু সরমার আংটিটি কোন কিছু ভাবতে দিতে চায় না। সুমথ উদ্দেশ্যহীনের মত বহুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। বার কয়েক চালের দোকানের কাছেও সে ফিরে এসেছিল কিন্তু স্থির হয়ে সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারে নি। পুনরায় সে ফিরে আসে মাছের বাজারে। মাত্র দুটি ইলিশ অবশিষ্ট আছে একটি-মাত্র দোকানে। সুমথ চোখ কান বুজে তারই একটি তুলে নিলে তার থলিতে। টাকাটা ফেলে দিয়ে সে চোরের মত সতর্ক গতিতে বাড়ীর পথে ফিরে চলল।

রাজেন ডাকলে, বড় সকাল সকাল যে আজ—

সুমথ অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা

এত দ্রুতবেগে চলতে সুরু করেছে যে তার মনে হ'ল যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে।

রাজেন কিন্তু দাঁড়াল না। অথচ সুমথ তখনি রওনা হতে পারল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম নিয়ে একটি নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় চলতে সুরু করলে।

আঙ্গিনায় পা দিতে চোখে পড়ল নীলমণি গাছটা। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল বৃন্দাবনের ছাগলটা সেটুকুও বাকি রাখে নি। ছাগলটা তখনও খাচ্ছিল। সুমথ বাধা দিলে না। দু'দিন পরে হয়ত আপনি শেষ হয়ে যেত।

ঘরে প্রবেশ করতেই সরমা ছুটে এল। স্বামীর হাত থেকে থলে দুটো নিজের হাতে নিলে। সুমথ তখনও হাঁপাচ্ছিল। এতটা রাস্তা কে যেন তাকে পিছন থেকে তাড়া করে নিয়ে এসেছে। সর্ব্বাঙ্গ তার ঘামে ভিজে সপ সপ করছে।

সরমা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, তোমার কি হয়েছে—শরীর খারাপ বোধ করছ নাকি?

সুমথ সামলে নিয়ে জবাব দিলে, ও কিছু নয় সরমা। বাইরে বড্ড রোদ তাই হয়তো—

সরমা কোমল কণ্ঠে বললে, তুমি খানিক বিশ্রাম করে রান্নাঘরে যেও। আমি ততক্ষণ সব গুছিয়ে নিচ্ছি। সে চলে গেল।

সুমথ অন্যমনস্কভাবে চুপ করে বসে আছে আর ভাবছে, এটা সে আজ কি করলে, কেমন করে তার পক্ষে এ কাজ সম্ভব হ'ল! এত বড় একটা অন্যায়—

রান্নাঘর থেকে গোপাল আর দুলালের আনন্দ-কোলাহল তার কানে এল। একেবারে গঙ্গার ইলিশ মা? কি সুন্দর যে দেখতে—অনেকগুলো মাছ হবে ত মা?

সরমার জবাবটাও তার কানে এল, হবে বৈকি বাবা। অনেক হবে। তোমাদের যতগুলো খুশী খেও।

ছেলেরা কোলাহল করতে করতে চলে গেল।

সুমথ তখনও ভাবছে। এত বড় একটা অন্যায় আর এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এর কোনটা সত্য?

সহসা সরমার আহ্বান তার কানে এল। এক বার এখানে এস না গো।

সুমথ উপস্থিত হতেই সরমা মৃদু ব্যথিত কণ্ঠে জানাল, এত ভাল মাছটা নিয়ে এলে, কিন্তু এমনিই কপাল কাটার পরে মনে হচ্ছে—

সুমথ চমকে উঠল। তার কণ্ঠনালি থেকে একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল। তার বিবর্ণ মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে সরমা মৃদু স্বরে সান্ত্বনাচ্ছলে বললে, তুমি মিথ্যে ভেব না। যা হোক একটা গতি হবেই।

মাছের একটা গতি সরমা অবশ্যই করেছিল, কিন্তু সুমথর মনের পাষাণবোঝা তাতে একবিন্দু হ্রাস পেল না...

সুমথ ভারাক্রান্ত মনে এসে শুয়ে পড়ল। এমনি বহুক্ষণ পড়ে থাকার পর একসময় সে ধড়ফড় করে উঠে বসল। নাকের পাশে তখনও ভাত ধরে যাওয়ার একটা তীব্র গন্ধ লেগে আছে। ভাতটাও বুঝি গেল। ঠিকই হয়েছে। সুমথ উঠে এসে পকেটে হাত দিয়ে আংটিটা অনুভব করে দেখলে। না ওটা যথাস্থানেই আছে। ভাতটাও নাকি ধরে যায় নি। ব্যাসনের সাহায্যে মাছেরও একটা গতি সরমা করেছে। কিন্তু খেতে বসে ভাতের গ্রাস বারে বারেই সুমথর গলায় আটকে যাচ্ছিল।

গোপাল আর দুলাল হাসিমুখে বলছিল তাদের মাকে, গঙ্গার ইলিশ কিনা খালি তেল আর তেল—মুখে দিতেই গলে যাচ্ছে। খুব ভাল মা...বড্ড ভাল—

সুমথ অকারণেই বিষম খেলে। নাক মুখ দিয়ে একসঙ্গে একরাশ ভাত বেরিয়ে এল, আর চোখ দিয়ে অনেকখানি নোনা-জল।

মুক্তধারা

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা খুব উচ্চ নয়। এর কারণ প্রধানত দুটি। প্রথম, নাট্য-রচনায় তিনি এদেশে একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেছেন এবং নূতনকে গ্রহণ করবার জন্য চিত্তের যে নমনীয়তা প্রয়োজন তা আমাদের নেই। তা ছাড়া, নাটকগুলি ভাবাত্মক হওয়ায় কিছু দুর্গ্রহ; সাধারণ-শিক্ষার মান উন্নত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণে এদের স্বীকৃতি দিতে স্বভাবতই কুণ্ঠিত হবে। ইংলণ্ডের সমসাময়িক নাট্য-পরিস্থিতি লক্ষ্য করে মনস্বী মর্লি যা বলেছিলেন আমাদের দেশের পক্ষেও তা সমান প্রযোজ্য—"The great want of the stage in our day is an educated public that will care for its successes." দ্বিতীয়ত, কবি-রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে এত বড় হয়ে আছেন যে, নাট্যকার-রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর পাশে ঠাঁই করে নেওয়া কঠিন হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কবি হিসাবে তাঁর স্বীকৃতিও খুব সহজসাধ্য হয় নি। অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে পথ করে নিতে হয়েছে। আমার মনে হয় 'রেপার্‌টরি' থিয়েটারের আদর্শে একটি চরিষ্ণু নাট্য-চক্র গঠন করে যদি এই 'রূপক'-নাটকগুলির অভিনয় পালাক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখিয়ে বেড়ান যায় তা হলে এই বিরাগের ভাবটা দূর হতে দেরি হয় না। এই ভাবেই আধুনিক কালে ইংলণ্ডে জনপ্রিয় মামুলী নাটকগুলির সঙ্গে সঙ্গে গল্‌সওয়ার্দি, ইয়েটস, ইলিয়ট প্রভৃতির ভাব-নাটকগুলি জনচিত্তে আসন করে নিয়েছে। প্যারিসে আঁদ্রে আঁতোয়ান্‌ 'Theatre Libre'-র প্রবর্ত্তন করে নূতন-ধরনের নাটকের রূপায়ণের পথ খুলে দিয়েছিলেন। অনুরূপ ভাবে আয়র্লণ্ডে ফ্র্যাঙ্ক ফে রাসেল এবং ইয়েটসের লেখা নাটকগুলির অভিনয় করিয়ে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আমাদের দেশের কোন সাহসী নাট্য-প্রযোজকও যদি কোমর বেঁধে এই কাজে লাগতে পারেন, তা হলে বোধ হয় জন-রুচির হাওয়া বদলে যেতে পারে। এ ছাড়া, স্থানে স্থানে শেক্সপীয়র-সোসাইটির মত নাট্য-সঙ্ঘ ও মজলিস গড়ে তোলাও দরকার; আশ্বাসের কথা, এদিক দিয়ে প্রশংসনীয় উদ্যম ইদানীং দেখা যাচ্ছে। এই ভাবে দেশ জুড়ে একটি সমঝদার-গোষ্ঠী গড়ে উঠবে এবং নাট্যকার-রবীন্দ্রনাথ কবি-রবীন্দ্রনাথের খুব পিছনে পড়ে থাকবেন না এ কথা জোর করেই বলা যায়। কারণ দুর্গ্রহতা সত্ত্বেও নাটকগুলির মধ্যে নাট্যরস যথেষ্টই আছে।

মুক্তধারা-নাটকের পটভূমি স্থাপিত হয়েছে সম্ভবত রাজপুতানার আরাবল্লী অঞ্চলে। এই অনুমানের কারণ এই যে, শৈবধর্মের ব্যাপক অভ্যুত্থান হয়েছিল ঐ অঞ্চলে। প্রত্ন-লিপি থেকে জানা যায় খ্রীঃ সপ্তম শতকের শেষ পাদ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত গৃহস্থগণের ও রাজবংশের মধ্যে শিবোপাসনার এই ধারা অব্যাহত ছিল। তা ছাড়া, যে মৌলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটকটির উৎপত্তি (অর্থাৎ শিবতরাইয়ের লোকদের মুক্তধারার জল বন্ধ করা) সে সমস্যাটা বিশেষ করে রাজপুতানায় মরু অঞ্চলের হওয়াই সম্ভব। 'শিবতরাই-এর লোকেরা কান-ঢাকা টুপী পরে,' আর 'উত্তরকূটের লোকেরা কাপড় পরে মালকোঁচা মেরে'—'ওরা ভাঁড়ভাঙা পোড়া মাটি দিয়ে গড়া, ওরা শক্ত'—নাগরিকদের এই সব উক্তি থেকেও এই ধারণারই সমর্থন মেলে। বলা বাহুল্য, ভৈরব মত শৈব মতেরই প্রকারভেদ মাত্র। সে যা হোক, নাটকের ঘটনাগুলি ঘটেছে একই স্থানে এবং একটি পরিমিত কালের মধ্যে; কাজেই এতে অঙ্ক বা দৃশ্য-বিভাগের কোন প্রশ্নই নেই। মঞ্চ-ব্যবস্থাপনার এই সরলতা অভিনয়ের দিক থেকে সুগম করেছে নাটকটিকে। একমাত্র ভৈরব-মন্দিরের পথেই ঘটেছে বর্ণিত ঘটনাগুলির অধিকাংশ, কোন কোনটি ঘটেছে পথিপার্শ্বস্থ রাজশিবিরে কিংবা তরুচ্ছায়ায়। দৃশ্য-বৈচিত্র্যের বিরলতাজনিত ক্ষতি পূর্ণ হয়েছে ঘটনা-সংস্থাপনের ক্ষিপ্রতায়। ছায়াছবির মত ঘটনাগুলি অনবচ্ছিন্ন-ধারায় বয়ে গিয়েছে, কোথাও মন্থর হয়নি তাদের গতি। প্রচলিত রীতি অনুসৃত না হলেও শুধু এই কারণেই এর আকর্ষণ মন্দীভূত হয় না একটুও। প্রয়োগ-পদ্ধতির জটিলতা সখের অভিনয়ের পক্ষে একটা বড় বাধা; সেই বাধা অপসারিত হওয়ায় নাটকটির রূপায়ণের পথ মুক্ত হয়েছে। ভৈরবপন্থীদের গান দিয়ে এর সূচনা এবং ঐ গান দিয়েই এর সমাপ্তি। মন্দির-পরিক্রমায় রত সন্ন্যাসীর দল ঘটনার মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়ে ঐ গান দিয়ে যেন প্রবাহের মধ্যে ছেদ টেনে দিয়েছে। ঐ গানের দ্বারাই নাটকের 'পতাকা'-সন্ধিগুলি চিহ্নিত হয়েছে—অর্থাৎ অঙ্ক-বিভাগ-সূচক যবনিকার কাজ করেছে ঐ 'জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর'—গানটি। যবনিকার আসল উদ্দেশ্যও তাই, অঙ্ক থেকে অঙ্কান্তরের অবকাশ-সৃষ্টি। প্রাচীন প্রথায় পূর্ব্বরঙ্গে নির্গীত বাদ্য ও নৃত্যাদির ব্যবস্থা না থাকলেও এই ভৈরব-স্তোত্রটিকে একাধারে পূর্ব্বরঙ্গের নান্দী ও ধ্রুবা বলা যেতে পারে। যবনিকা না থাকলেও নেপথ্য অবশ্যই আছে এবং কুশীলবগণের আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটেছে সেই পথেই। ভৈরব-গীতিটি ছাড়া অন্তর্গীতিও (contextual music) আছে অনেকগুলি এবং নাট্যরূপের দিক থেকে সংলাপাংশের চেয়ে এই গীতাংশের মূল্য কিছু কম নয়।

উত্তরকূটে অবস্থিত এই ভৈরব-মন্দির, নগরবাসীরা সকলেই এই ভৈরবের উপাসক। এই দেবতা একাধারে শঙ্কর ও প্রলয়ঙ্কর—রক্ষক ও সংহারক; রুদ্ররূপে তিনি সংহার করেন, কল্যাণরূপে করেন রক্ষা। সমগ্র নাটকের পূর্ব্বভাষ হিসাবে স্তোত্রনিবদ্ধ ভাবটি একান্ত সঙ্গত। উত্তরকূটের প্রজাপুঞ্জ যখন শক্তির মত্ততায় উঠেছে মেতে,

প্রাণের উপরে আসন দিয়েছে যন্ত্রের, সেই সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে এই ভৈরব-গীতিটির একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। 'শম'-কর সংহার করেন কল্যাণের কারণেই ; প্রলয়ের দেবতা হলেও মঙ্গলের নিলয় তিনি। তাই মানুষের অভ্রভেদী শক্তির অহঙ্কারকে চূর্ণ করে বেজে ওঠে তাঁর 'বজ্রঘোষ বাণী', উদ্যত হয় রুদ্রের সংহার-ত্রিশূল।

অচলায়তনের মত মুক্তধারাও নব্যতন্ত্রের নাটক। কি আকৃতি কি প্রকৃতি, কোন দিক দিয়েই পূর্ব্ববর্তী নাট্যধারার সঙ্গে এর মিল নেই। নাটক সম্বন্ধে মূল্যবোধ এ যুগে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে, কাজেই প্রাচীন, প্রতীচ্য অথবা প্রাচ্য, কোন মান দিয়েই এর পরিমাপ করা চলে না। অভিনয়ের 'আঙ্গিক' অংশ ক্রমশ হ্রস্ব হয়ে 'বাচিক'কে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। 'আহার্য্য' অর্থাৎ অঙ্গরাগের অংশও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হয়েছে। অভিনয়ের চতুর্থ অঙ্গ 'সাত্ত্বিক'ও দেহাত্মক ; অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অশ্রুপুলকাদি আটটি সাত্ত্বিক ভাবের ইঙ্গিত করাই এর কাজ ; এই সব প্রতীক-নাটকে তার স্থানও স্বভাবতই খুব সঙ্কুচিত। ঘটনা-সঙ্ঘাতের স্থান অধিকার করেছে ভাব ও আদর্শের সঙ্ঘাত ; কাজেই ঘটনা-প্রধান নাটকের মত আঙ্গিকাভিনয়ের প্রয়োজন হয় না এজাতীয় নাটকে। ভাবের ব্যাপ্তি ও গভীরতা যত বেশী হবে, আঙ্গিকের উপযোগিতাও তত কমে যাবে এবং বাচিক হয়ে উঠবে বড়। এই কারণেই এই সব নাটকের সংলাপ-রচনায় বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শব্দগুলি এমন সুনির্ব্বাচিত এবং তাদের গ্রন্থন এমন নিপুণ হওয়া চাই যে, সেই সন্দর্ভ-রূপের মধ্য দিয়ে নাটকের নিভৃত ভাবটি যেন আভাসিত হয় অনায়াসে। ভাষার অতি-ব্যক্তি অভিব্যক্তির অন্তরায়, অতি-সংবৃতি থেকে আসে দুর্গ্রহতা। সুতরাং রিক্ততা ও অতি-রিক্ততার মাঝামাঝি একটা মধ্য-পথ বেছে নিতে হয় সংলাপ-কল্পনায়। অলঙ্কারের ব্যবহারও পরিমিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ ধ্বনির প্রসারণের দিক থেকে অলঙ্কার ভার ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন একটি কথাও থাকা উচিত নয় সংলাপের মধ্যে যা অবান্তর—সমগ্র সন্দর্ভ-রূপের দিক থেকে যা অনভিপ্রেত। কথার জন্য কথা, অথবা চমক লাগাবার জন্য বাগ্‌বিন্যাস নাটকের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর। গলসওয়ার্দির ভাষায় "নাট্য-সংলাপ ভাল 'লেসে'র মত, শব্দসূত্র দিয়ে শিল্পীর হাতে সযত্নে বোনা ; এমন একটা ঘেইও থাকে না এর মধ্যে যা নাটকের সৌন্দর্য্য ও শক্তিকে বাড়িয়ে না দেয়।"* ক্ষেমেন্দ্র-প্রমুখ আলঙ্কারিকরাও ঔচিত্যকে রস-পাকের লবণ বলে নির্দ্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সব সঙ্কেত-নাটকের সংলাপ-রচনায় যে ঔচিত্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তাকে অনন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্ত দিই :

দূত···কীর্ত্তি গড়ে তোলবার গৌরব ত লাভ হয়েইছে, এখন কীর্ত্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড় গৌরব তা লাভ কর। (পৃ, ১১)

বিভূতি···কীর্ত্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল ; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। তাকে ভাঙবার অধিকার আমার নেই। (পৃ, ১১)

মন্ত্রী···দুঃখের জোরে ছোটরা বড়দের ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে। (১৫)

রণজিৎ···ও বললে, এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষার শব্দ শুনতে পাই। (১৫)

অভিজিৎ···কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। (২৭)

সঞ্জয়···যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে। (২৮)

ধনঞ্জয়···মানকে নিজের কাছে রাখিস নে ; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁর পায়ের কাছে রেখে আয়। (৩৫)

" ···মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মারতে, নয় পালাতে থাকিস, দুটো একই কথা। (৩৭)

এই জাতীয় রসোচিত বক্রোক্তি আছে এই নাটকের পাতায় পাতায়। এক একটি উক্তির মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চরিত্রের এক একটি চিত্র। অলঙ্কারবহুল ভাষায় ভাবের এই উৎক্ষেপ কখনই সম্ভব হ'ত না। এদের যে কোন একটিকে ভাষান্তরিত করতে গেলেই বোঝা যায় যে, তা কত শক্ত ; দশ গুণ কথা বলেও এর দশ ভাগ প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। বিদগ্ধ-সমাজে স্ফুটতার চেয়ে স্ফোটতার সমাদর এই কারণেই। মেটার্‌লিঙ্ক-এর মতে বিষাদ-নাট্যের নিগূঢ় সৌন্দর্য্যটি ফুটে ওঠে শুধু 'কথার সন্ধ্যালোকে'।

অন্তর্গীতিগুলি গাঁথা আছে এই সংলাপের সঙ্গে। ভাব-নাটকের পক্ষে এরা অপরিহার্য্য। যখনই কবি অনুভব করেছেন শুধু সংলাপের মাধ্যমে ব্যঞ্জনাটি ঠিকমত ফুটছে না, তখনই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সুরের। 'কথা যেখানে পায়ে হেঁটে যেতে পারে না, সুর সেখানে উড়ে যায়' অনায়াসে—মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনুদ্দেশের দেশে। অবশ্য, রঙ্গ-পীঠে সুগীত না হওয়া পর্য্যন্ত এদের পূর্ণ প্রভাব অনুভব করা সম্ভব নয়। তবুও এ কথা অসঙ্কোচে বলা চলে যে, ভাবপ্রবণ এই গানগুলি রস-পরিপুষ্টির প্রকৃষ্ট হেতু। সাধারণ নাট্যগীতির মত এগুলি প্রক্ষিপ্ত নয়, আক্ষিপ্ত—ভাব-কল্পনার সঙ্গে একান্ত সম্পৃক্ত। একঘেয়েমি-নিবৃত্তি অথবা বৈচিত্র্য-সম্পাদনই এদের উদ্দেশ্য নয়—নাট্য-বিগ্রহের এরা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ভরতের মতে ভাবানুকীর্ত্তনই নাটক ; 'শীলে নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্' —এও তাঁরই কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুক্তধারায় সৃষ্টি করেছেন শীলানুকূল সংলাপের সাহায্যে ভাবানুকূল একটি পরিমণ্ডল। কি চরিত্র-কল্পনা, কি প্রসঙ্গ-রচনা, সর্ব্বত্রই শোভন সঙ্গতি নাটকটিকে একটি সংহত সৌন্দর্য্য দান করেছে। এর প্রধান চরিত্র অভিজিৎ —তার ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করেই ঘটনার তরঙ্গগুলি আবর্ত্তিত হয়েছে। প্রাণ ও প্রেমের প্রতীক সে। তার প্রতিস্পর্দ্ধী যন্ত্ররাজ বিভূতি—প্রাণের উপরে যে স্থান দিয়েছে তার পূর্ত্তকীর্ত্তিকে।

* "Some Platitudes concerning Drama."

হিমালয়ের মনোরম কুলু উপত্যকা

পথতরু শ্রেণী

ইউরোপের পথে দিল্লীর বিমানবন্দরে কাম্বোডিয়ার প্রাক্তন রাজা ও মন্ত্রীর সহিত শ্রীনেহরু

দিল্লীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিদপ্তরে ভারতের ফরাসী উপনিবেশগুলি হস্তান্তর অনুষ্ঠান

প্রকৃতি-শক্তিকে পরাভূত করার—অহংকে অভ্রংলিহ করে তোলার নেশা এমন করে পেয়ে বসেছে তাকে, যে সে অবকাশই পায় নি মানুষের হৃদয়ের দিকে তাকাবার। ফলে প্রাণশক্তির সঙ্গে বেধেছে যন্ত্রশক্তির সঙ্ঘাত এবং এই শক্তিদ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে মুক্তধারার বন্ধন-মুক্তিতে; হাজার হাজার মানুষের তৃষ্ণার্ত বুকের উপরে উঠেছিল যে যন্ত্রমূর্তি প্রাণের প্রচণ্ড আঘাতে তার বনিয়াদ গিয়েছে ধ্বসে। একটা সংশয় তবুও থেকে যায় নাটকটির নায়কত্ব-প্রসঙ্গে। এর প্রকৃত নায়ক কে? অভিজিৎ—যে তার প্রদীপ্ত প্রেম ও সমুচ্চ আদর্শের প্রেরণায় প্রাণ দিল, সে? না বিভূতি—যার অভিচার-লব্ধ সিদ্ধি ভেঙে, ভেসে গেল মুক্তধারার উন্মত্ত আক্ষেপে? উত্তরকূটে সাক্ষাৎ দেবশিল্পীরূপে সম্মানিত এই মানুষটির সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল একমুহূর্তে—ভৈরব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে তার অভ্যর্থনার আয়োজন গেল নিভে! আশাভঙ্গে বিহ্বল এই জীবন্ম ত মানুষটিকেই এই বিষাদ-নাটকের নায়ক বলে সন্দেহ হয়। অন্য পক্ষে, অভিজিৎকে নায়ক বললে নাটকটি আর ট্র্যাজিডি থাকে না, কারণ সে প্রাণ দিয়েছে প্রাণেরই প্রেরণায়—দধীচির মত আত্মবলি দিয়েছে বিশ্বকল্যাণের বেদীমূলে; যন্ত্রের উপরে উড্ডীন হয়েছে তার প্রেমের বৈজয়ন্তী। এ দিক দিয়ে নাটকটির আস্বাদ আদৌ বিষাদাত্মক নয়। তার বিয়োগজনিত বেদনা ডুবে যায় তার সঙ্কল্প-সিদ্ধির গৌরবে, এরিষ্টটল-এর ভাষায়—'The pity we feel for his outward misfortune is sunk in our admiration of the courage with which it is borne'। বিভূতির মধ্যে আছে সেই দুর্লভ প্রতিভা—সেই দুর্বার চিত্তশক্তি যা সাধনার একাগ্রতায় অসাধ্যকেও সাধ্য করে তোলে। কিন্তু সেই মনীষা মলিন হয়ে গিয়েছে মনুষ্যোচিত সমবেদনার অভাবে; শত শত মানুষের দুঃখের মূল্যে তাকে লাভ করতে হয়েছে তার কামাফল। আত্মম্ভরিতার এই রন্ধ্র-পথেই শনি এসে ভর করেছে তার ভাগ্যে—মহত্ত্বের শিখর থেকে ঘটিয়েছে তার অতর্কিত পতন। তপোলব্ধ কীর্তির এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি ক্ষণকালের জন্য আমাদের অভিভূত করে। কিন্তু সহানুভূতি অন্য পক্ষে থাকায় বিষাদটা ঠিক দানা বেঁধে উঠতে পারে না। কবিও বিভূতিকে বাঁধভাঙার খবরটাই শুধু শুনিয়েছেন; এই মর্মান্তিক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে তার মনের অবস্থা কি হ'ল তা জানান প্রয়োজন মনে করেন নি। শুধু ছোট কয়েকটি কথায় তার মনোভাবের আভাস আমরা পাই:—'বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে? তার নিস্তার নেই।' সংবাদটি শুনেই তার মনে প্রথম যে প্রতিক্রিয়াটি দেখা দিয়েছে তা ক্ষোভ নয়, দুঃখ নয়, অমিশ্র প্রতিশোধ-স্পৃহা। অনেকটা এই কারণেই যে সহানুভূতি সে আকর্ষণ করতে পারত তা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতে প্রতিপক্ষের প্রতি পাঠকের অনুকম্পাও গিয়েছে বেড়ে। 'তা হলে তাঁকে কি আর পাব না?' গণেশের এই বিষণ্ণ প্রশ্নটির মধ্যে অনুভব করা যায় অনুকম্পার সেই কম্পনটি!

বস্তুনিষ্ঠ লেখকের মত রবীন্দ্রনাথ ঘটনাকে আলগোছে উপর থেকে দেখেন না। কবিদৃষ্টিতে প্রত্যেকটি বস্তু কোন না কোন ভাবের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়। অভিজিতের কথায় বলা যায়—'মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন।' এই অলিখিত রহস্য-লিপির পাঠোদ্ধার করেন কবি এবং তার নিগূঢ় মর্মটি তুলে ধরেন প্রেপসু পাঠকের সম্মুখে। বস্তুর মত ব্যক্তিকেও তিনি দেখেছেন ভাবের প্রতীকরূপে এবং এই কারণেই ব্যক্ত-রূপকে অতিক্রম করে তার অব্যক্ত ভাব-রূপটিই বড় হয়ে উঠেছে তাঁর নাটকে। কিন্তু, রূপের পথেই করেছেন তিনি অরূপের অন্বেষণ; তাই তাঁর নাটকগুলিতে ভাবের সঙ্কেতটি প্রধান হলেও তার আধানটিও উপেক্ষণীয় নয়। এই ভাব-রূপায়ণের জন্য তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে একটি অভিনব পথ। বস্তুনিষ্ঠ না হলেও এই আঙ্গিক সর্বথা বাস্তববর্জিত নয়; অন্য কথায় কার্যকে স্বীকার করেন বলেই তিনি তার কারণ-নির্ণয়ে ব্যগ্র। তাঁর নাট্যকৃতিগুলি বুদ্ধিদীপ্ত হলেও, পিরানডেলোর নাটকের মত, বুদ্ধিসর্বস্ব নয়, আবেগ ও চিন্তার এমন হরগৌরী-সঙ্গম নাট্য-কাব্যে অতি অল্পই দেখা যায়। চরিত্র-চিন্তা কতকটা নৈর্ব্যক্তিক হ'লেও চরিত্রগুলি ব্যক্তিত্ববর্জিত ক, খ, গ অথবা নং ১, ২, ৩ নয়;* বীজগণিতের প্রণালীতে জীবন-সমস্যার সমাধান এ নাটকে নেই; ব্যক্তিত্বের স্তোকস্পর্শে চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে জীবন্ত ও উজ্জ্বল। তা ছাড়া, expressionist-দের মত অব্যক্তকে অভিব্যক্তি দেবার ছলে রূপকের কুহক সৃষ্টি করে কিংবা রূপকথার রঙমহল তৈরি করে পাঠককে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টাও করেন নি তিনি। বস্তুবাদীর আলোক-চিত্র কিংবা সমীক্ষাবাদীর রঞ্জনালেখ্য এগুলি নয়; এরা সৃষ্টি—কবি-প্রতিভার অনিন্দ্য অবদান। ফ্রয়েড-এর মনঃসমীক্ষণের সূত্র ধরে অবচেতনার চিন্তা অথবা প্রুস্তের চুলচেরা বিচার নেই এ নাটকের মধ্যে। এই আঙ্গিক অবশ্য তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়, এর ইঙ্গিত তিনি পেয়েছিলেন মেটারলিঙ্কের কাছে। রবীন্দ্রনাথের মত মেটারলিঙ্কও ছিলেন বাস্তবতার বিরোধী—আত্মার অন্তরতম ভাবচ্ছবিটি তিনি এঁকেছেন ব্যঞ্জনাময়ী বাণীর বর্ণে।

চরিত্র ও চিত্রাবলীর একটু আলোচনা করলে বিষয়টা আরও বিশদ হবে। রাজার নাম রণজিৎ, প্রেমের দ্বারা প্রজার চিত্তজয়ের চেয়ে বলের দ্বারা তাদের বশীভূত করার আগ্রহই তাঁর বেশী। অভিজিতের সঙ্গে তাঁর মত ও পথের মিল নেই একটুও, উভয়ের মধ্যে মেরুর ব্যবধান; তবুও মুক্তধারার ধারে কুড়িয়ে-পাওয়া, সৃষ্টিছাড়া এই ছেলেটির জন্য তাঁর মমতা ফল্গু-ধারার মত বয়ে চলেছে অলক্ষ্যে, বাইরে তার প্রকাশ নেই। এই অবরুদ্ধ স্নেহ

* 'রক্তকরবী' নাটকে কয়েকটি ক্ষেত্রে কবি নামের বদলে সংখ্যার ব্যবহার করেছেন; আবার কোন কোন পাত্রকে চিহ্নিত করেছেন বৃত্তিদ্বারা, যেমন অধ্যাপক, গোঁসাই, পালোয়ান, চিকিৎসক ইত্যাদি; বিশু, কাঙালী, চন্দ্রা, কিশোর পরিচিত নিজ নিজ নামে।

অবারিত হয়ে পড়েছে শুধু একবার, বাঁধ-ভাঙার খবর শুনে তার চরম অমঙ্গলের আশঙ্কায়। খুড়া বিশ্বজিৎ ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষেই ছিলেন এতদিন, কিন্তু অভিজিতের সঙ্গে সংসর্গের ফলে বলের রাজ্য থেকে ফিরে এসেছেন প্রেমের রাজ্যে।

কবি-কল্পনার অনুপম সৃষ্টি অভিজিৎ। মুক্তধারার মতই মুক্ত তার মনটি—আকাশের মত উদার, 'গৌরীশিখরে'র শৃঙ্গের মত উত্তুঙ্গ। অভি সত্যই অভী; ভয়কে সে ভয় করে না, জয় করে প্রেমের অস্ত্রে। মুক্ত মনুষ্যত্বের প্রতীক সে; পুত্রবিরহিণী অম্বার, পুত্রশোক-কাতর বটুর বেদনার সে সমব্যথী—শিবতরাইয়ের প্রজাদের বিপদকে নিজের বিপদ বলেই মনে করে। রাজপুরীর পাষাণ-বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য সে ব্যাকুল, মুক্তধারার মধ্যে তার 'অন্তরের কথা আছে', 'উত্তরকূটের সিংহাসনই তার জীবন-স্রোতের বাঁধ'। শিবতরাইয়ের লোকেরা তাকে ভালবাসে, শক্তিদৃপ্ত বিভূতির দল তাকে দেখে সন্দেহের চোখে। যে যন্ত্র-দানব হাজার হাজার লোকের তৃষ্ণার জল হরণ করে তাদের চোখের জল ফেলিয়েছে, সেই শক্তিমূর্তির উপর হেনেছে সে প্রাণের প্রচণ্ড আঘাত—রক্তাক্ত হৃদয়ের উপর করেছে প্রেমের অভিষেক। সঞ্জয়ের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটি বড় মধুর—বড় মর্মস্পর্শী। সঙ্গী হবার আবেদন জানিয়ে সঞ্জয় যখন কোন সাড়া পেল না তার কাছে, তখন সে তার ব্যথার স্থানগুলির প্রতি ইঙ্গিত করতে লাগল একে একে। কিন্তু তার শান্ত দৃঢ়তার গায়ে ঠেকে সব কৌশল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল; আর তখন থেকেই আমাদের মন প্রত্যাসন্ন পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। একটা খটকা লাগে অভির চরিত্র-প্রসঙ্গে। তার স্বভাবত অনাসক্ত পথিক-মনকে আরও সংসার-বিমুখ করবার জন্য তার জন্ম-রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোন প্রয়োজন ছিল কি? মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে জন্ম-সূত্রে যুক্ত হলেই সে মুক্তিপ্রাণ, এ যুক্তি দুর্বল। গোরার বেলায়ও রবীন্দ্রনাথ এই ভুলই করেছিলেন।

বিভূতি আত্মশক্তির বিভূতিতেই অন্ধ; মানুষের তুচ্ছ বাঁচা-মরার প্রশ্নে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার। ভৈরব-মন্দিরের স্বর্ণশীর্ষকেও ছাড়িয়ে যায় তার কীর্তির চূড়া। বীরাচারী তান্ত্রিকের মত শবাসনে বসে সে করতে চায় শক্তির সাধনা; জানে না যন্ত্রের সাধনা করতে করতে মানুষ নিজেই শেষে পরিণত হয় যন্ত্রে—অপরের মনুষ্যত্বকে আঘাত করতে গিয়ে দলিত করে নিজেরই মনুষ্যত্বকে।

ধনঞ্জয় বৈরাগীকে এর আগেও আমরা দেখেছি 'প্রায়শ্চিত্ত'-নাটকে। তরুর মত সহিষ্ণু, তৃণের মত বিনম্র এই সদানন্দ পুরুষ শিবতরাই-এর আপামর সাধারণের গরিষ্ঠ গুরু ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু—সংশয়ে বুদ্ধি, সঙ্কটে সহায়। ভাষণের ভাস্বরতায়, অন্তরের শুচিতায়, প্রেমের মহিমায় সে সমস্ত নাটকটির উপর বিকীর্ণ করেছে একটি স্নিগ্ধ প্রভা—তার কণ্ঠের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে যেন তার অকুণ্ঠ অন্তরটিকে ছোঁওয়া যায়। রাজার মুখের ওপর সে অকুতোভয়ে বলতে পারে, 'আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়'; শুনিয়ে দিতে পারে, 'ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে'। বৈরাগীর ভক্তির মধ্যে যে এতখানি শক্তি থাকতে পারে—কুসুমের মৃদুতার মধ্যে যে বজ্রের দৃঢ়তা লুকিয়ে থাকতে পারে তা ধারণা করাও শক্ত। 'তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাইনে তাই ভয় করি নে।' এই তার চরিত্রের স্বরূপ। এই ভক্তির আদর্শ কবি তুলে ধরেছেন নৈবেদ্যের মধ্যেও (নৈ ৪৫)।

প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সুন্দর সমন্বয় দেখি মন্ত্রীর চরিত্রে। রাজা রণজিতের পরম হিতৈষী তিনি। রাজা কিন্তু তাঁর হিতোপদেশে কান দেন না, ফলে দেখা দেয় সঙ্কট। বাঁধ-বাঁধার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের অভাবকে রাজা বিভূতির প্রতি তাঁর ঈর্ষ্যা বলেই সন্দেহ করেন। তাঁর মতে বলের বদলে প্রেম দিয়ে বাঁধলেই সে বাঁধন হয় শক্ত। অভিজিৎকে শিবতরাই-এ পাঠাতে চেয়েছিলেন তিনি দুটি কারণে। প্রথম, হৃদয় জয় করার মন্ত্র সে জানে; দ্বিতীয়, তার ঘরছাড়া, পথ-চাওয়া মনকে সংসার-বন্ধনে বাঁধবার একমাত্র উপায়ই ঐ। কিন্তু এ মন্ত্রণা রাজার মনঃপূত হ'ল না। তিনি চাইলেন দুঃখ দিয়ে প্রজাদের বশ করতে, প্রেম দিয়ে নয়। মতান্তর হ'ল রাজায়-মন্ত্রীতে;—মন্ত্রী সতর্ক করে দিলেন রাজাকে—দুঃখের জোরে ছোটরা বড়দের ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে'। এই সুনৃতটির মধ্যে আমরা তাঁর দূরদৃষ্টি ও ভূয়োদর্শনের প্রমাণ পাই।

বহুক্ষেত্রেই কিন্তু চরিত্রগুলি তাদের ব্যক্তি-সত্তা অতিক্রম করে জাতি-সত্তায় পরিণত হয়েছে অর্থাৎ ব্যষ্টি-রূপের বিশিষ্টতা ত্যাগ করে সদৃশগুণবিশিষ্ট এক একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, চরিত্রগুলি পূর্ব্বব্যবস্থিত একটি নাট্যকল্পনার নির্লিপ্ত উপাদানে পরিণত হয়েছে, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বেগে পরিণামকে তারা ঘটিয়ে তোলে নি। তা ছাড়া, তাদের মুখের প্রত্যেকটি কথায় একটা শান্ত নিস্পৃহতা ফুটে উঠেছে যা ব্যক্তি-পাত্রের মুখে প্রত্যাশিত নয়। আবেগের প্রবলতা ও উচ্ছলতার অভাবে ট্র্যাজিক-নাট্যের রসটি ঠিক-মত ফুটে উঠতে পারে নি। জয়সিংহের আত্মবলিদানের পর রঘুপতির উক্তি ও ব্যবহারের সঙ্গে অভিজিতের আত্মাহুতির পরে রণজিতের উক্তি ও ব্যবহারের তুলনা করলে এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ মিলবে। প্রচলিত নাট্যরীতিতে চরিত্র-সন্দর্ভ থেকেই হয় প্লটের উৎপত্তি; অপর পক্ষে, এই সব ভাবনাট্যে প্লট অর্থাৎ সন্দর্ভ-পরিকল্পনাটাই আগে, চরিত্র-ভাবনা আসে পরে। অল্প কথায়, এইসব নাটকে চরিত্রের জন্য প্লট নয়, প্লটের জন্যই চরিত্র। এই কারণেই প্রায়শ্চিত্তের বৈরাগী ধনঞ্জয়কে দেখি এই নাটকেও। খুড়া-মহারাজকেও রাজা বসন্ত রায়েরই সগোত্র বলে মনে হয়।

কোন কোন আধুনিক নাট্য-পদ্ধতি প্লটকে অস্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ একে উপেক্ষা করেন নি কোনদিন। প্লটের অর্থ যদি চরিত্র ও ঘটনার সুব্যবস্থিত বিন্যাস হয় তা হলে বলতে হবে একটি

সুচিন্তিত ও সুসংহত সমবায়-রূপ আছে এই নাটকের। এমন একটি ঘটনাও এতে স্থান পায় নি যা রস-সিদ্ধির দিক থেকে অবান্তর। গুরু-ছাত্রের দৃশ্যটি আপাতদৃষ্টিতে বিষয়বহির্ভূত মনে হলেও আসলে তা নয়। শাসক-পক্ষ-সমর্থিত বিশেষ বিশেষ মতবাদগুলিকে (যেমন ফ্যাসি-বাদ, নাৎসি-বাদ) ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে এইভাবে শিশু-স্তর থেকেই গজিয়ে তুলবার চেষ্টা হয়েছে সব দেশেই। উত্তরকূটও তার ব্যতিক্রম নয়। যন্ত্র-চিন্তার বিষকে ছাত্রদের মনে ছড়িয়ে দেবার এই ব্যাধিত উদ্যম]সমগ্র-রূপ-কল্পনার দিক থেকে আদৌ অবান্তর নয়। গুরুর দুটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল থেকেই গৌরব করতে শেখে তার কোন উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাই নে', 'উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায় একদিন এই সব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু।' যন্ত্র-জীবনের নিন্দা এবং মুক্ত-জীবনের জয়গান করেছেন কবি চিরদিনই; যন্ত্র-সভ্যতার প্রতি তাঁর এই উষ্মা নানাভাবে ও আকারে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সাহিত্যে। ইলিয়ট, এজরা পাউণ্ড-এর মধ্যেও আছে জীবনের যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এই অসহিষ্ণুতা; 'The Waste Land', 'Polite Essays' প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে এর অচ্ছন্ন অভিব্যক্তি। জীবনের এই নূতন নৈতিক মূল্যবোধ পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তাকেই আলোড়িত করেছে। 'অচলায়তনে', 'রক্তকরবী'তে সর্বত্রই দেখি এরই সঙ্কেত। জৈব-জীবনের পিছনে যে অতিজৈব অর্থটি প্রচ্ছন্ন আছে তাকে আবিষ্কার করা এবং সুষ্ঠু রূপ দেওয়াই সাহিত্যের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য-সিদ্ধির পূর্ণ পরিচয় বহন করছে মুক্তধারা-নাটক।

ইবসেন-এর মত রবীন্দ্রনাথও অব্যবহিত সাময়িক সমস্যার দ্বারা তেমন প্রভাবিত হন নি, আদর্শগত চিরন্তন সমস্যাগুলিই প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর চিন্তায়। আলোচ্য নাটকেও সেই চিরন্তন সমস্যারই অবতারণা করেছেন তিনি। জীবনের সত্য-স্বরূপ কি? সভ্যতার গতি কোন্ পথে? মানুষ কি তার সমস্ত সুকুমার বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে প্রাণহীন যন্ত্র-জীবনকেই বরণ করে নেবে? 'হিংসার উন্মত্ত,' যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অতিকায় যন্ত্র-রূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁর কবি-মানসে যে ব্যথা জেগেছিল, সেই ব্যথার উৎস থেকেই এই নাটকের উদ্ভব। বিজ্ঞানের দানকে কবি অস্বীকার করেন নি কোন দিন। কিন্তু মানুষের মনীষাকে যখন মনুষ্যত্বের নিষ্পেষণের কাজে লাগান হয়, যখন সে কল্যাণের ধ্রুব পথ পরিত্যাগ করে স্বার্থসিদ্ধির সর্বনাশের পথে পা বাড়ায় তখনই তা হয়ে ওঠে ভয়াবহ। যন্ত্র যদি অতিমাত্রায় স্ফীত হয়ে যন্ত্রীর উপরে প্রভু হয়ে বসে, তা হলে মনুষ্যত্বের বনিয়াদ যায় ধ্বসে। প্রশ্নটি তাই মনুষ্যত্বের চিরন্তন অধিকারের প্রশ্ন—অবচেতনা ও অধিচেতনার শাশ্বত দ্বন্দ্ব। যুগে যুগে এইভাবে পশু-শক্তির যূপে বলি-প্রদত্ত হয়েছে মানুষের ধী ও ধর্ম। কিন্তু এর সমাধান কোন্ পথে? বল দিয়ে বলকে ঠেকান যায় না, প্রাণ দিয়েই জাগাতে হয় প্রাণকে, মানুষের শুভবুদ্ধির উদ্বোধন সম্ভব শুধু এই পথেই। গান্ধীজীর অহিংস-নীতির গন্ধটুকু ছড়িয়ে আছে এর সর্বাঙ্গে। এই অহিংস-নীতির প্রতীক ধনঞ্জয়; 'প্রহারেণ'-নীতি তার নয়, 'মারকে না-মার দিয়ে' মারার মন্ত্র তার। এই হিংসা-অহিংসার দ্বন্দ্বে কে জয়ী হবে, তার ওপরই নির্ভর করছে মানুষের ভবিষ্যৎ। কিন্তু অভিজিতের প্রাণোৎসর্গ সার্থক হয়েছিল কি? এ পৃচ্ছার উত্তর নেই নাটকটির মধ্যে; বাঁধ-ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই এর পটক্ষেপ; সিদ্ধান্তের সঙ্কেতটা রয়ে গিয়েছে উহ্য। হয়ত কবির মতে যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণের অভিযানটাই এখানে বড় কথা, সিদ্ধির সম্পূর্ণতাটা নয়। কিন্তু যন্ত্রীর যন্ত্র-জয়ের চেয়ে তার চিত্ত-জয়ই তো আরও গৌরবের—সেই তো স্থায়ী কল্যাণের পথ। এ দিক দিয়ে বিচার করে প্রশ্নটিতে কবির চিন্তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। সৃষ্টিকে আঘাত করলে স্রষ্টাকে উত্তেজিত করা হয় মাত্র, তার দৃষ্টির রূপান্তর ঘটান যায় না। অতএব আঘাত-স্থানটির নির্বাচনে কবির হিসাবে ভুল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সে যা হোক, মত ও পথ—ভাব ও আদর্শ এসব সাহিত্যের উপাদান-মাত্র, কবি-মনের রসায়নে জারিত হয়ে এরা পরিণত হয় বিশুদ্ধ স্বর্ণে; মুক্তধারা-নাটকটিও এ সত্যের ব্যতিক্রম নয়।

রত্নাকর

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

সুখলাল দুই বারের জেলফেরতা দাগী আসামী। আজ ছয় মাসের উপর হ'ল এবার জেল থেকে খালাস পেয়েছে। কিন্তু সময়টা এবার তার মোটেই ভাল যাচ্ছে না। এই ছয় মাসের ভেতর একটা বড় শিকার জুটল না—দশ-পনেরটা যা জুটেছিল সে ত মশা মেরে হাত কালি করা—মজুরী পোষায় না। ফলে ব্যারাকপুরের ফুলমণির বাড়ীতে আর তার স্থান হচ্ছে না। জেল থেকে বেরুলে কিছুদিন ফুলমণি তাকে আদর করেই নিয়েছিল বটে, কিন্তু দুটি মাসের ভেতর সে পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশী তার হাতে দিতে পারে নাই। তা ছাড়া হারাধন নামে এক ব্যাটা জুয়াড়ী এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে এসে ফুলমণির বাড়ীতে আসন গেড়ে বসেছে—কাজেই তার স্থান এখন পথে পথে।

সুখলালের জীবনেতিহাস বিচিত্র। পাঁচ বছর বয়সের সময় তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল নামকরা গুণ্ডার সর্দ্দার মতিলাল। তার পর থেকে সে গুণ্ডার আড্ডায় আড্ডায় মানুষ। বছর দশেক বয়স থেকেই তার হাতেখড়ি। পকেট থেকে খুচরো পয়সা—মনিব্যাগ তুলে নেওয়া এই সব। ছোট ছেলে দেখে ধরা পড়লে প্রথম কিল-চড়ের উপর দিয়েই যেত। কুড়ি বছর বয়সে তার প্রথম শ্রীঘর যাত্রা। এখন বয়স তার সাতাশ-আটাশের ভেতর।

পিতামাতার কথা তার মনে পড়ে না—কোন আত্মীয়-স্বজন তার কোনদিন ছিল কিনা তাও সে জানে না। সারাটা জীবন ধরে দেখেছে চোর, জুয়াচোর আর গুণ্ডার দল। আর দেখেছে এই সব আড্ডার কাছাকাছি যে সব স্ত্রীলোক তাদের। সুরা আর পাপে পঙ্কিল যে পথ—সেই পথ; এই পথেই এত দিন ধরে সে চলে এসেছে। জুয়াচোর, চোর, আর দেহবিলাসিনী—বারবনিতা এ দুই রূপ ছাড়া জগতে অন্য নরনারীর রূপ সে বড় একটা দেখে নাই।

আজ সুখলালকে হঠাৎ বড় অভিভূত করে ফেলেছিল—এমন আর তার জীবনে কোন দিন ঘটে নাই। দমদম স্টেশনে বিকেলের দিকে চুপ করে বসেছিল—ভেবেছিল সন্ধ্যার দিকে রানাঘাটগামী কোন একটা গাড়ীতে উঠে আজকের অদৃষ্ট পরীক্ষা করবে।

একখানা থ্রু ট্রেন একেবারে প্লাটফরমের উপরে এসে গেছে এমন সময় হঠাৎ একটি ছোট ছেলে দৌড় দিয়ে লাইন পেরুতে নেমে গেল।

আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল সমস্ত লোক—গেল, গেল—মুহূর্ত্তমধ্যে ছেলেটি একেবারে শেষ হয়ে যাবে। ঝপ করে লাফ দিয়ে লাইনের ভেতরে নেমে গেল একটি লোক, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঠেলে দিল ছেলেটাকে লাইনের বাইরে। কিন্তু নিজে আর সামলাতে পারল না। দুখানি পা চাকার তলায় একেবারে পিষে গেল। উঃ, সে কি রক্ত! লোকজন ধরাধরি করে প্লাটফরমের উপরে নিয়ে এল। মিনিট পনের বেঁচেছিল—সেই পনের মিনিট ধরে শুধু তার মুখে লেগেছিল একটা কথা—কানাই, আমার কানাই বেঁচে আছে ত? লোকটি ছেলেটির বাবা। মৃত বাপের বুকের উপরে পড়ে ছেলেটির সে কি কান্না! সুখলাল শেষ পর্য্যন্ত দেখতে পারল না—প্লাটফরমের এক প্রান্তে ঘাসের উপরে এসে শুয়ে পড়ে রইল বহুক্ষণ। শেষে রাত গোটা নয়েকের সময় মনটা একটু ভাল হলে রানাঘাটগামী এই গাড়ীটায় চড়ে বসেছে সুখলাল।

নৈহাটিতে গাড়ী একেবারে খালি হয়ে গেল। শীতের রাতের এগারটা অনেক রাত। ওপাশের বেঞ্চিতে জন দুই লোক আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে—বোধ হচ্ছে অনেক দূর যাবে।

এপাশের বেঞ্চিতে একটিমাত্র বৃদ্ধ একটা টিনের সুটকেশ মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। শিকারীর দৃষ্টি সুখলালের—সুটকেশটার দিকে তাকিয়েই তার মনে হ'ল এটার ভেতরে কিছু মাল আছে। কামরার মেঝেয় পা ঠুকে ঠুকে মাথার কাছে গিয়ে বসল। না—লোকটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সুখলাল। গাড়ী ততক্ষণ কল্যাণী ছাড়িয়ে এসেছে। সুখলাল ভাবছিল শিমুরালী স্টেশনটির কথা। সেটা তার জানা জায়গা। লাইন ধরে বরাবর উত্তর দিকে কিছুটা এলে আর জনমানবের সাড়া নেই। একটা মস্ত বড় প্রান্তর শুধু ছোট ছোট আগাছায় ভরা—তারই মাঝে মাঝে দুই-একটা শ্যাওড়া, গাব ও নিম গাছ মাথা খাড়া করে রয়েছে। আরও কয়েকবার এইখানে এসে কাজ পেয়েছে সুখলাল।

মদনপুর থেকে গাড়ী ছাড়বার সময় ধাক্কা লেগে বৃদ্ধের মাথাটি এক পাশে খানিক গড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুখলাল আর একটি ধাক্কা দিয়ে মাথা থেকে সুটকেশটি একেবারে আলাদা করে দিল। শিমুরালী ষ্টেশনে গাড়ী থামতে না থামতেই সুটকেশটি গায়ের চাদরে ঢেকে নেমে হন্‌হন্ করে উত্তর দিকে হেঁটে চলল সুখলাল।

একটি শ্যাওড়া গাছের তলায় এসে দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে সুটকেশটি ভেঙ্গে একে একে ভেতরের জিনিস খুঁজে দেখতে লাগল সে। ইস্ বাপরে। কার মুখ দেখে আজ উঠেছিল সুখলাল। একগাদা নোট—টর্চ্চের আলো ফেলে গুণে দেখল পুরোপুরি পাঁচশ'।

টাকাগুলি ভাল করে কোমরে গুঁজে পুনরায় টর্চ্চের আলো ফেলে সুটকেশটা খুঁজে দেখতে লাগল। একখানা পুরনো ধুতি, গামছা ছাড়া অন্য জিনিষ বিশেষ কিছু নাই। সুটকেশের ওপরের দিকে একখানি খামের চিঠি গোঁজা ছিল —সেখানা খুলে দেখল। না, খামখানির ভেতরে কিছু নাই —কেবল একখানি চিঠি। কাঁচা কাঁচা মেয়েলী হাতের লেখা। কি মনে করে টর্চ্চের আলোয় চিঠিটা পড়ে ফেলল সুখলাল।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

বাবা, তোমার কাছে পর পর দুখানা চিঠি দিয়েছি। একখানারও ত জবাব দিলে না! আমার শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়েছে বাবা। এবার আর বাঁচব না। পেটে হাতে পায়ে জল লেগেছে। সব সময় জ্বর থাকে। তাই নিয়ে এদের সংসারের কাজ করতে হয়। যখন না পারি শুয়ে পড়ি। দিনরাত গালাগাল শুনতে হচ্ছে। আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও বাবা। আজ যদি মা বেঁচে থাকত —তুমি কি এমনি করে চুপ করে থাকতে পারতে? পাঁচ শ' টাকা কি কোনমতেই যোগাড় হয় না বাবা? টাকা নিয়ে না এলে এরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না—উলটো তোমাকেই হয় ত অপমান করবে। আজ দেড় বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে—এর ভেতর তোমাকে দেখি নি বাবা। যে প্রকারেই হোক টাকাটা যোগাড় করে আমাকে নিয়ে যাও নইলে আর হয়ত আমাকে দেখতে পাবে না বাবা। ইতি—

তোমার স্নেহের
মনোরমা।

খামের উপরে চোখ বুলিয়ে দেখল সুখলাল—ঠিকানা লেখা রয়েছে শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, ৩নং রাধা বোস লেন, কলিকাতা। কি ভেবে চিঠিখানা খামের ভেতরে ঢুকিয়ে জামার পকেটে রেখে দিয়ে উঠে পড়ল সুখলাল। ভাঙা সুটকেশ সেখানেই পড়ে রইল।

আধ ঘণ্টার ভেতর একটা ট্রেন আছে—ধরতে পারলে রাত সাড়ে বারটায় ব্যারাকপুরে পৌছান যায়। স্টেশনের দিকে পা চালিয়ে চলল সুখলাল।

২

ব্যারাকপুর নেমে রেললাইন ধরে হেঁটে চলল সুখলাল। পল্লীটির কাছাকাছি এসে পৌছে গেছে আর কি—দুই-একটি স্খলিত গানের কলি তার কানে ভেসে আসছে। ঐ ত দূরে ফুলমণির ঘরে এখনও আলো জ্বলছে—আজ আর সেখানে স্থান পাবে না। আশে পাশের কারু ঘরে আজ গিয়ে উঠবে —এই রাত্রিতেই সেখানে গিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসবে। মোট কথা সাড়ম্বরে জানিয়ে দিতে হবে ফুলমণিকে সে আর ফেল্‌না কেউ নয়—রীতিমত কদর আছে তার। তার পর কাল দিনের বেলায় সুযোগ বুঝে ফুলমণির ঘরে ঢুকে খানদশেক দশ টাকার নোট তার সামনে ছড়িয়ে দেবে। টাকাগুলো লুব্ধ দৃষ্টি মেলে কুড়িয়ে নেবে ফুলমণি। তার পর আর তাকে পায় কে! কয়েক মাসের মত ত নিশ্চিন্দি!

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল সুখলাল। কিন্তু এ কি হ'ল—হঠাৎ রেললাইনের উপরে বসে পড়ল যেন সে। মাথা ঘুরে নাকি? কই না ত। কি হ'ল সুখলালের সে নিজেই ভেবে পেল না। কি একটা অনুভূতি যেন সির সির করে বুকের ভেতর থেকে মাথার দিকে উঠতে লাগল তার। চোখ বুজল সুখলাল। বন্ধ চোখের ভেতরে জ্বল জ্বল করে উঠল তার কয়েক লাইন কাঁচা হাতের আকাবাঁকা লেখা— "আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও বাবা। আজ যদি মা বেঁচে থাকত তুমি কি এমনি করে চুপ করে থাকতে পারতে? পাঁচশ' টাকা কি কোন মতেই যোগাড় হয় না বাবা।"

একি হ'ল সুখলালের। কোথা দিয়ে এ দুর্বলতা এসে তার মনের ভেতরে বাসা বাঁধল। পাঁচ মিনিট গেল—দশ মিনিট গেল সুখলাল তেমনি ঠায় বসেই রইল। অবশেষে ঘণ্টাখানেক বাদে সে উঠে দাঁড়াল বটে কিন্তু পা চালাল স্টেশনের দিকে।

স্টেশনে এসে একটা আলোর নিচে গিয়ে দাঁড়াল সুখ-লাল। কি মনে করে পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে খুলে দেখল—চিঠিখানা এসেছে কৃষ্ণনগরের আনন্দ পালিত রোডের হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী থেকে। কতক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবল তার পর নিকটে একটা খালি বেঞ্চে গা এলিয়ে দিল।

ভোরের দিকে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একখানা আপ ট্রেন শব্দ করে স্টেশনে এসে থামল। গাড়ী-খানার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল সুখলাল—লালগোলার গাড়ী—কৃষ্ণনগর হয়ে যাবে। তড়াক্ করে লাফ দিয়ে একখানা কামরায় উঠে বসল সে। গাড়ী ছেড়ে দিল। সুখ-

লাল বসে বসে ভাবতে লাগল। আজ সে নিজেই বুঝতে পারছে না কি করছে সে। কে একজন যেন তার দেহের ভেতরে ঢুকে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আজকের সুখলাল আর গতকালের সুখলাল কোন মতেই এক ব্যক্তি নয়। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত টেনে নিয়ে এল সুখলালকে কৃষ্ণনগর শহরে আনন্দ পালিত রোডে। সেখানে যদি হরেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বসন্ত চক্রবর্ত্তীকে দেখা পায়—কি করবে সে—কি বলবে তাকে সে? কিছুই তার জানা নাই—যা হয় হবে যা ঘটে কপালে ঘটবে। এও এক রকমের বেপরোয়া হয়েছে সুখলাল।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর এক ভদ্রলোক বললেন—হরেন চাটুজ্যের বাড়ী খুঁজছেন আপনি? সে ত আমাদেরই পাশের বাড়ী। হাঁ হাঁ, বসন্ত চক্রবর্ত্তীর মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে হয়েছিল—কই বসন্ত চকোত্তি ত আসেন নি; কাল তাঁর মেয়েটি মারা গেছে।

—মারা গেছে!

—হাঁ কাল সকালে।

পথের ধারের একটা গাছের ছায়ায় অনেকক্ষণ বসে রইল সুখলাল। তার পর ধীরে ধীরে স্টেশনের দিকে চলল। তার মন আজ ক্রমাগত এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে যাচ্ছে এই অনুভূতির জোয়ারে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিছুতেই স্বভাবে ফিরতে পারছে না।

কলকাতার গাড়ীতে চড়ে—বেঞ্চির এক পাশে চুপ করে সে চোখ বুজে বসেছিল। চোখের উপরে ফুটে উঠছিল টুকরো টুকরো ছবির মত।—বুড়ো মানুষ, ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারে অনেকগুলো পোষ্য। কোন কারখানায় হয়ত সামান্য মাইনের কাজ করে, সংসারে অভাব-অনটন নিত্য লেগে আছে। যা কিছু শেষ সম্বল ছিল খরচ করে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছে। তবু সব টাকা যোগাড় হয় নি—তাই হয় ত পণের পাঁচশ' টাকা কম পড়েছিল। তাই ত মেয়েটিকে আজ দেড় বছরের ভেতর নিয়ে যেতে পারে নি। আজ দেড় বৎসর ধরে না খেয়ে তিল তিল করে টাকা জমিয়ে এই পাঁচশ' টাকা করেছিল। এর প্রতিটি নোটে কত যে বুকের রক্ত জড়িয়ে আছে—কত যে আশা-আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে এর খবর কে রাখে। সুখলালের মনে হ'ল তার কোমরের নোটগুলি যেন জীবন্ত হয়ে তাকে ধিক্কার দিচ্ছে।

গাড়ী থেকে নেমে সুখলাল দেখতে পেল শিয়ালদহ ষ্টেশনের এক পাশে একটি বুড়ো লোক দুই হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল সুখলালের। এই লোকটিই নয় ত? তার মুখখানা ত সে দেখতে পায় নি—গায়ে এমন একটা চাদরই হয়ত জড়ান ছিল। ধীরে ধীরে লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। প্লাটফরম প্রায় খালি হয়ে গিয়েছে ততক্ষণ।

হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন চাপা গলায় ডাকল—আরে সুখলাল যে—

সুখলাল তাকিয়ে দেখল তার একজন পুরনো সাঙাৎ।

—কি করছিস্ এখানে।

—এ লোকটি কে ভাই—কাঁদছে কেন বল ত?

লোকটি এগিয়ে গিয়ে হেসে বলল—আরে এ ত পাগল। আজ সাত-আট দিন এখানেই ঘুরছে। তার পর কোথায় গেছিলি? যাবি না বারাকপুর?

—না রে এখন যাব না।

—কেন, মনের দুঃখে সন্নিসি হবি নাকি—তোর ফুলমণির বাড়ীতে যে গুলজার করে বসে আছে হারাধন জুয়াড়ী।

সুখলাল জবাব দিল না—সব কথা হয়ত ভাল করে তার কানেও গেল না।

—আমি যাই ভাই, ঐ ইস্টিশান থেকে রাণাঘাটের গাড়ী ধরব।

ধীরে ধীরে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এল সুখলাল। আজ দু'দিন ধরে সে বিশেষ কিছু খায় নি। পেট জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে এসে খানদুই রুটি আর তরকারী কিনে খেল। তার পর উদ্দেশ্যহীন ভাবে কলকাতার রাস্তায় নেমে পড়ল সে।

সারাটা দিন সে পথে পথে ঘুরে বেড়াল—পরের দিন বিকেলের দিকে ৩নং রাধা ঘোস লেনের বাড়ীটার কাছে এসে পৌঁছল সুখলাল। ছোট একখানা একতলা ভাঙা বাড়ী—বাইরের দেয়ালটা হাড় জিরজিরে—রোয়াকটি ভেঙে-চুরে এবড়োখেবড়ো হয়ে পড়েছে। সেই রোয়াকটার উপরে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইল সে। কদাচিৎ ভিতর থেকে এক-আধ টুকরো কথার শব্দ ভেসে আসছে। সাগ্রহে কান পেতে রইল সুখলাল। অনেকক্ষণ পরে দরজা ঠেলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। সারা দেহে দারিদ্র্যের ছাপ—চোখেমুখে যেন একটা চাপা আতঙ্ক। সুখলালের দিকে খানিকটা তাকিয়ে রইল মেয়েটি। সুখলাল ডাক দিল—শোন ত খুকী।

মেয়েটি এগিয়ে এল।

—তোমার নাম কি?

—আরতি।

—তোমার বাবার নাম কি?

—শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী।

—তোমার বাবা কোথায়?

—তাঁকে আজ দুপুর বেলা পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

—পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে? কেন?

—বাবা নাকি কোম্পানীর পাঁচশ' টাকা চুরি করেছেন? বলতে বলতে মেয়েটি কেঁদে ফেললে। বললে—ওরা মিথ্যে বলেছে আমার বাবা কোনদিন চুরি করেনি—খুব ভাল লোক আমার বাবা।

—বাড়ীতে তোমার আর কে কে আছেন?

—পিসীমা আছেন আর আমার ছোট ছোট দুটি ভাই আছে।

একটা বুদ্ধি মাথায় এল সুখলালের। কোমর থেকে নোটগুলি বের করে একখানা কাগজে জড়িয়ে মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল—এটা তোমার বাবার কাছ থেকে পথে পড়ে গিয়েছিল আমি কুড়িয়ে পেয়েছি—তোমার বাবা বাড়ী ফিরে এলে দিও—এখন তোমার পিসীমার কাছে দাও গে।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল—এর ভেতরে কি আছে?

—আমি জানিনে—তোমার পিসীমাকে দিয়ে এস, আমি বলছি। মেয়েটা ভিতরে চলে যেতেই সুখলাল পথে নেমে দ্রুতপদে চলতে লাগল লক্ষ্যহীনের মত।

জিনিষপত্রের দুর্মূল্যতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

যে মহলেই যাই না কেন, যে প্রসঙ্গই উঠুক না কেন, কোথা হইতে জিনিষপত্রের দুর্মূল্যের কথা উঠিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ ত প্রকাশিত হয় এবং কখনও কখনও অতি কটু বাক্যও ব্যবহৃত হয়। জানি না এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন্ খানে কতটা দায়ী এবং তাঁহারা ইহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করিতে পারেন। তবে এই কথা জানি কি শহরে কি পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণ এই সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট। এইরূপ তীব্র অসন্তোষের ফল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মোটেই শুভ নহে এবং যদি কোন উপায়ে যতটা সম্ভব তাঁহারা ইহার প্রতিকার করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে।

আমরা—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা—প্রতিদিনই জিনিষপত্রের দুর্মূল্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং "সংসার" চালাইব কি করিয়া সে কথাও ভাবি, কিন্তু কোন্ জিনিষের মূল্য কখন্ হইতে কত বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে সে সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখি না—মনে করি আজ আলুর দাম দুই এক আনা বাড়িয়াছে, কাল হয়ত কমিয়া যাইবে—এইরূপ সব জিনিষের অল্প বিস্তর দাম বাড়া সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমাদের এই কথাই মনে হয় এবং আমরা নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের পরিমাণ কমাইতে পারি না। যদিও ক্রমশঃ আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া "সংসার" চালান আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইয়াছে তথাপি দৈনন্দিন ব্যয় হ্রাস করিতে পারিতেছি না। সাধারণতঃ গৃহিণীরা কমানোর পক্ষপাতী মোটেই নহেন। তাঁহারা বলেন, "তোমরা যাকে পুষ্টিকর খাদ্য বল তা কি ছেলেমেয়েরা এখন পাচ্ছে, এতেই কুলাতে পারছি না, এর চেয়ে কম করলে সকলকে কি খেতে দেব, তার চেয়ে স্পষ্ট বলে দাও সকলে উপোস কর"। না হয় রবীন্দ্রনাথের মোক্তার কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিবেন, "তবে ছেলেগুলো না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও চলিয়া যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব সস্তায় চালাইতে পারিবে"। গৃহিণীদের কথার সত্যতা মেনে নিতেই হয়। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে কয়জন ছেলে-মেয়েদের সমান ভাবে উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য দিতে পারছি; যাই-হোক অশান্তি বা মনকষাকষি নিবারণ করিবার জন্য কর্ত্তারা বলেন, "যাক্ গে, যা হবার হবে, যত দিন পারি চালিয়ে যাই, কোথায় গিয়ে ঠেকব বা কি রকম ধাক্কা খাব কে জানে।" কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকেই ঠেকেছেন এবং বেশ ধাক্কা খাচ্ছেন। জানি বলেই এই কথা লিখছি। ঠেকার কিম্বা ধাক্কার উদাহরণ দিলাম না। সেই সকল উদাহরণ বড়ই করুণ।

গত ১৯শে জুনের "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন কখন হইতে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কোন্ জিনিষের দাম কত পরিমান বাড়িয়াছে। তাঁহারা ৩৫টি জিনিষের মূল্যের হিসাব ধরিয়া দেখাইয়াছেন যে ১৯৫৫ সনের জুন মাসের তুলনায় ১৯৫৬ সালের জুন মাসে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে এই ৩৫টি জিনিষের সামগ্রিক (overall) মূল্য শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়াছে এবং ১৯৫৬ সনের জানুয়ারী মাসের তুলনায় শতকরা ২৬ ভাগ বাড়িয়াছে। অর্থাৎ এক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় খরচের জন্য ১০০্ টাকা লাগিত, বর্ত্তমানে ১২৬্ টাকা লাগিতেছে। যাঁহাদের আয় সীমাবদ্ধ তাঁহাদের পক্ষে সমস্যা কত কঠিন সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার মোটামুটি সহজ অর্থ হইতেছে যে টাকায় এক বৎসর পূর্ব্বে ৩০ দিন চলিত এখন সেই টাকায় ২২।২৩ দিন চলিবে। হয় খরচ কমাও, না হয় অবশিষ্ট ৭।৮ দিন উপোস দাও। খরচ হয়ত কমানো যায়, কিন্তু তাহার ফলে কি সবল সুস্থ কর্মঠ ভবিষ্যতের নাগরিক সৃষ্টি হইবে?

ষ্টেটসম্যানের হিসাবটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

জিনিষের নাম	মূল্য জুন'৫৬	জানু'৫৬	জুন'৫৫	১৯৫৬ জানুয়ারীর তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা	১৯৫৫ জুনের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা
চাউল প্রতি সের	।/০	।৶১০	।৶১০	২০	২০
ডাল প্রতি সের মসুর	।৵০	।৶০	।৵০	৪৩	৬৬
মুগ কাঁচা	।৵০	।/০	।৶০	১১	৪৩
মুগ ভাজা	১।০	১৲	১৲	২৫	২৫
তারতম্য				২৬	৪৫
সবজী প্রতি সের					
আলু	।/০	।১০	।৵০	১০০	৫০
বেগুন	৸০	।০	।০	২০০	৫০
পটল	৸০	—	।৵০	—	২০
তারতম্য				১০০	৪০
মাছ প্রতি সের					
রুই (কাটা)	৩৸০	২৸০	৩৲	৩৬	২৫
রুই (ছোট)	২।০	১৸০	২।০	৪৩	১১
ইলিস	৩।০	২।০	১৸০	৫৫	১০০
তারতম্য				৪৫	৪৫
মাংস প্রতি সের					
ভেড়া	২৸০	২৸০	২৸০	বাড়ে নাই	কমে নাই
ছাগল	২।০	২।০	২।০		
গরু	১।০	১।০	১।০		
তারতম্য		...		...	
ডিম (২০)					
মুরগী	২।০	১৸৵০	২।০	৩৩	১১
হাঁস	২।০	২৲	২।০	২৫	—
তারতম্য				২৯	৫৫
রন্ধনের সামগ্রী মসলা, ঘি ইঃ					
সরিষার তৈল					
প্রতি সের	২৵০	১।৵০	১।০	১১	৪২
ভেজিটেবল ঘি ২ পাঃ	২।/১০	২।১০	২৲	১৪	৩০
নারিকেল তৈল					
প্রতি সের	২৵০	১৸০	১৸০	২১	২১
মাখন (১ পাঃ)	৩।০	৩।০	৩।০	৮	—
গাওয়া ঘি প্রতি সের	৮।০	৮৲	৮।০	৬	—
হলুদ /১	১।০	১৸০	১৸০	১৪	ভাগ কম
লঙ্কা /১	২।০	২৲	১।০	২৫	৬৭
সুপারি /১	৩।০	৩৲	২৸০	১৭	২৭
চিনি	৸৵০	৸/০	৸/০	৮	৮
তারতম্য				৭·৫	৭·৫
কয়লা ১ মণ	১৸১০	১৸০	১৸০	২	২
বস্ত্রাদি					
ধুতি শাড়ী ১ জোড়া					
মিডিয়ম	৯।০	৮।০	৮৵০	১২	১৪
ফাইন	১১৸০	১০।০	১০।০	১২	১৫
সুপার ফাইন	১৫।০	১৯।০	১৩৲	১৫	১৭
সার্টিং (প্রতি গজ)					
লং ক্লথ (সাধারণ)	১/০	৸৶০	৸৶০	১৩	১৩
আদ্দি	২।৵০	১৸৵০	১৸৵০	২৭	২৭
কেমব্রিক	২।৵০	১৸৵০	১৸৵০	২৭	২৭
ছেলেদের সর্ট	৩৲	২।৵০	২।৵০	১৪	১৪
সার্ট (হাফ হাতা)	৩।০	২৸৵০	২৸৵০	১৩	১৩
তারতম্য				১৭	১৭
সামগ্রিক বৃদ্ধি				২৬	২০

উপরোক্ত হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সকল জিনিষের দাম সমান ভাবে বাড়ে নাই। চাউল, ডাল, সবজী, মাছ, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, লঙ্কা, সুপারি এবং বস্ত্রাদির মূল্য বৃদ্ধি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অথচ আমাদের জীবন নির্ব্বাহের জন্য এই জিনিষগুলি অতি প্রয়োজনীয়। মাংসের মূল্য বাড়েও নাই, কমেও নাই, হলুদের দাম কমিয়াছে—কারণ কি? আমরা জানি সরবরাহ ও চাহিদা অনুসারে জিনিষের দাম বাড়ে কমে, সরবরাহ যদি বেশী থাকে চাহিদা কম হয় জিনিষের দাম কমে, সরবরাহ যদি কম হয় চাহিদা যদি বেশী হয় দাম বাড়ে। তাহা হইলে কি মনে করিতে হইবে যে মাংসের বেলায় সরবরাহ ও চাহিদা সমান সমান আছে সেইজন্য মাংসের দাম বাড়েও নাই, কমেও নাই। আর হলুদের বেলাতে কি মনে করিতে হইবে যে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেশী আছে। কিছু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে চাউলের মূল্যের উপরেই আর সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে। চাউলের দর কমিলেই আর সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য কমিবে। চাউলের দর ত ক্রমবর্দ্ধমান তবে মাংসের দর স্থির কেন, হলুদের দরই বা হ্রাসের দিকে কেন। আমরা সাধারণ লোক এই সকল কথা বুঝিতে পারি না—অর্থনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন।

ভারতের সামুদ্রিক রাজ্য

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য তিন হাজার মাইলের উপর। সুদীর্ঘ উপকূল থাকা সত্ত্বেও ভারতের ভৌগোলিক সীমা-সংলগ্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সিংহল ব্যতীত অপর কোন উল্লেখযোগ্য দ্বীপ নাই। ভারতের ভূগোলের ইহা একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মূল ভূখণ্ড হইতে প্রায় সাত শত মাইল দূরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। ইরাবতীর ব-দ্বীপের সর্ব্বদক্ষিণ-পশ্চিম অন্তরীপ নিগ্রেইস ও আন্দামানের উত্তর প্রান্তের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ১২০ মাইল। নিকোবরের শেষ প্রান্ত ও সুমাত্রার মধ্যে দূরত্ব আরও কম, কিঞ্চিদধিক নব্বই মাইল। ভৌগোলিক দাবীতে না হইলেও ঐতিহাসিক কারণে দ্বীপপুঞ্জ দুইটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত। ইহাই ভারতের একমাত্র সামুদ্রিক রাজ্য।

আন্দামান নামের সহিত একটা অপ্রীতিকর স্মৃতি জড়িত। ভারত ও ব্রহ্মদেশের গুরু অপরাধে দণ্ডিতদের নির্ব্বাসন ভূমি এবং স্বাধীনতা-পাগল দেশপ্রেমিকগণের বন্দীশালা ছিল আন্দামান দীর্ঘ সাতাশী বৎসর। বহুকালের বেদনার স্মৃতি আমাদিগকে আন্দামানের প্রতি বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। রাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গের পরিচয় লাভ স্বাধীন দেশের নাগরিকের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ জ্ঞান নাগরিকদিগকে তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। আন্দামানের কৃষ্ণ-কুঞ্চিত্ত আদিবাসিগণ একটি নৃতাত্ত্বিক প্রহেলিকা। শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সত্যান্বেষী বিজ্ঞানীগণ আন্দামান ও নিকোবরে সমীক্ষা অভিযান পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের জনৈক প্রাক্তন অধ্যাপক ১৯৫১ সন হইতে তিন বৎসরকাল আন্দামানীদের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের রীতিনীতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সাত বৎসর আগে আমাদের ডাঃ গুহ এবং চার বৎসর পূর্ব্বে ডঃ সরকার দুই দল নৃতত্ত্বানুসন্ধানীসহ আন্দামানে সমীক্ষাকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা যেখানে তথ্য-সংগ্রহে আগ্রহান্বিত, সেই অঞ্চল সম্বন্ধে উদাসীন থাকা আমাদের শোভা পায় না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্দামানে চার হাজার পরিবার, কমবেশি বিশ হাজার ভারতীয়, স্থাপিত করিবার প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। চলতি বৎসরের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ৫৭৫টি বাস্তুহারা বাঙালী পরিবার আন্দামানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। আমাদের এই সকল স্বজন মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের পরপারে অভিনব পরিবেশে কি ভাবে কালযাপন করিতেছে তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। আন্দামান ও নিকোবরের ১৯৫১ সনের জনগণনার সদ্য-প্রকাশিত বিবরণী এবং অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থাদির সাহায্যে এখানে ভারতের সামুদ্রিক রাজ্যের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হইবে।

উৎপত্তি, অবস্থান ও আয়তন—ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মদেশের পশ্চিমস্থ আরাকান ইয়োমা পর্ব্বতমালা প্রসারিত হইয়া সুমাত্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অজানা অতীতে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে নিগ্রেইস অন্তরীপ ও সুমাত্রার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতাংশ বসিয়া গিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। ককোদ্বীপসমূহ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং উহাদের আশপাশের অন্যান্য দ্বীপ এই নিমজ্জিত পর্ব্বতমালার উন্নত শীর্ষদেশ বই আর কিছুই নহে। ভৌগোলিক হিসাবে ককোদ্বীপাবলী আন্দামানের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহারা ব্রহ্মদেশের অধিকারে আছে। ককো, আন্দামান ও নিকোবর-পুঞ্জের দ্বীপসমূহ উত্তর হইতে দক্ষিণে পর পর অবস্থিত থাকিয়া একটি ধনুকাকার বাঁকা মালার রূপ ধারণ করিয়াছে। মালয় উপদ্বীপ যেন এই ধনুকের ছিলা। মাঝখানে রহিয়াছে সুগভীর আন্দামান সাগর। ছয়টি সুপ্রশস্ত প্রণালী দ্বারা আন্দামান সাগর পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগরের সহিত যুক্ত এবং পূর্ব্বদিকে মালাক্কা প্রণালী স্থাম উপসাগরের সহিত ইহার সংযোগসাধন করিয়াছে। জাপান দ্বীপপুঞ্জ ও জাপান সাগরের সহিত আন্দামান-নিকোবর দ্বীপমালা ও আন্দামান সাগরের বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

ককো, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৯২° ও ৯৪° পূর্ব্ব-দেশান্তরের মধ্যে অবস্থিত। শিলঙের প্রায় সোজা দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এই দ্বীপমালা বিরাজমান। ৬°৪৫′ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ১৩°৩৪′ উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত নিকোবর ও আন্দামান উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। কলম্বো হইতে মাদ্রাজ আন্দামান ও নিকোবরের সম-অক্ষাংশে অবস্থিত।

আশী মাইল প্রস্থ ও তিন হাজার ফুটের অধিক গভীর দশ ডিগ্রী প্রণালী আন্দামান হইতে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে আন্দামান ও ককো দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্র-নিমজ্জিত পর্ব্বতের এক শিখরে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অন্য শিখরে অবস্থিত। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বৃহৎ আন্দামান ও ক্ষুদ্র আন্দামান, এই দুই নামেই দীর্ঘকাল পরিচিত ছিল। পরে দেখা গিয়াছে চারিটি অতি সঙ্কীর্ণ প্রণালী দ্বারা বিভক্ত পাঁচটি দ্বীপকে অভিন্ন মনে করিয়া বৃহৎ আন্দামান নাম দেওয়া হইয়াছে? বৃহৎ আন্দামানের প্রধান দ্বীপ পাঁচটির নাম উত্তর হইতে দক্ষিণে যথাক্রমে উত্তর-আন্দামান, মধ্য-আন্দামান, দক্ষিণ-আন্দামান, বারাটাং ও রাটল্যাণ্ড দ্বীপ। বৃহৎ আন্দামানের দৈর্ঘ্য ১৫৬ মাইল। ইহার চারিদিকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রহিয়াছে। বৃহৎ আন্দামানের দক্ষিণে ৩১ মাইল চওড়া ডানকান প্রণালীর পরপারে ক্ষুদ্র আন্দামান। ইহার দৈর্ঘ্য ২৬ মাইল ও প্রস্থ ১৬ মাইল। আন্দামানের দ্বীপসংখ্যা নাকি ২০৪। এই দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বাধিক দৈর্ঘ্য ২১৯ মাইল এবং সর্ব্বাধিক

প্রস্থ ৩২ মাইল। স্থলভাগের মোট পরিমাণ ২,৫০৮ বর্গমাইল; বাঁকুড়া জেলার প্রায় সমান।

উনিশটি দ্বীপ লইয়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। উহাদের সাতটিতে লোকের বসতি নাই। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বাধিক দৈর্ঘ্য ১৬৩ মাইল এবং সর্ব্বাধিক প্রস্থ ৩৬ মাইল। জনগণনার বিবরণী অনুসারে ইহার আয়তন ৭০৭ বর্গমাইল, বিষ্ণুপুর মহকুমার সমান। আন্দামান ও নিকোবরের ভূমির মোট পরিমাণ ৩,২১৫ বর্গমাইল, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার মিলিত আয়তনের সমান।

ভূ-প্রকৃতি—বৃহৎ আন্দামানের দ্বীপ কয়টি পাহাড়ময়। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা রহিয়াছে। পাহাড় ও উপত্যকা অতি নিবিড় উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যানী আচ্ছাদিত। পাহাড়, বিশেষতঃ পূর্ব্বভাগে, বেশ উচ্চ। উত্তর আন্দামানের ২,৪০০ ফুট উচ্চ জিন (saddle) চূড়া হইতে ক্রমনিম্ন কয়েকটি চূড়ার পর রাটল্যাণ্ড দ্বীপের চূড়া ১,৪২২ ফুটে শেষ হইয়াছে। উত্তর প্রান্ত ব্যতীত ক্ষুদ্র আন্দামানকে সমতলক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। আন্দামানে নদী নাই; নিত্যবহা ছড়ার সংখ্যাও নগণ্য।

আন্দামানের গভীর দাঁতকাটা উপকূলে বেশ কয়েকটি নিরাপদ পোতাশ্রয় ও জোয়ার চলা খাড়ি আছে। বহু স্থলে দেখা যায় খাড়ি ঘিরিয়া রহিয়াছে গরাণ বৃক্ষ সমাকীর্ণ জলাভূমি।

প্রাকৃতিক দৃশ্য সর্ব্বত্রই বিচিত্র ও মনোহর। অপেক্ষাকৃত নিরালা খাড়ির প্রবালক্ষেত্রে কি বিচিত্র নয়নানন্দকর রঙের খেলা! আন্দামানের পোতাশ্রয়ের দৃশ্য আমাদের হ্রদ কিলার্নির সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। উহারা যে ব্রিটিশ হ্রদ স্মরণ করাইয়া দেয় এ বিষয়ে মতভেদ নাই। পোর্টব্লেয়ার পোতাশ্রয় বিশেষরূপে কাম্বারল্যাণ্ডের ডারওয়েন্টওয়াটার হ্রদের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের স্মৃতি ইংরেজদের মনে জাগ্রত করিয়া থাকে।

নিকোবরের বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন ধরনের পাহাড়। বৃহৎ নিকোবরের পাহাড়ই সর্ব্বোচ্চ, ২,১০৫ ফুট। ক্ষুদ্র নিকোবরে তিনটি চূড়া ১,৩৫৩ ফুট হইতে ১,৪২৮ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠে মিঠা জলের অভাব। কার নিকোবরে ভূপৃষ্ঠের জল নাই বলিলেই চলে। ভূগর্ভস্থ জল কিন্তু অল্প খনন করিলেই পাওয়া যায়। একমাত্র বৃহৎ নিকোবরেই বেশ বড় ও সুন্দর তিনটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। এখানকার একটি ছোট নদীর নাম গঙ্গা।

নানকৌড়ি নামে একটি স্থলেঘেরা বৃহৎ পোতাশ্রয় আছে। আর একটি পোতাশ্রয় অতি ছোট। নোঙর করিবার অন্যান্য স্থানগুলি উন্মুক্ত সাগরের অগভীর তলদেশ মাত্র।

দ্বীপকয়টিতে বেশ রকমারি দৃশ্য চোখে পড়ে। কার নিকোবর প্রবালে আবৃত সমতল দ্বীপ; চৌরাও সমতল কিন্তু দক্ষিণাংশে একটি মালভূমি সদৃশ পাহাড়; টেরেসা একটি বাঁকা পাহাড়ের শ্রেণী; বম্পোকা একটি মাত্র পাহাড়, উহা নাকি আগ্নেয়গিরি; টিলানচঙ একটি দীর্ঘ সংকীর্ণ পাহাড়; কামোর্টা ও নানকৌড়ি, দুই-ই পাহাড়ে দ্বীপ, ট্রিংকাট সম্পূর্ণ সমতল, কাচ্চাল পাহাড়ময়; ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নিকোবর পার্ব্বত্য দ্বীপ। সমুদ্রতটে নিরবচ্ছিন্ন নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণী কার নিকোবরকে উষ্ণমণ্ডলীয় রূপদান করিয়াছে। পক্ষান্তরে, দীর্ঘ সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে বনবৃক্ষের আবির্ভাবে চৌরা, টেরেসা, বম্পোকা, কামোর্টা ও নানকৌড়ি উপবনের মত দেখায়। সমুদ্র হইতে কাটচাল এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নিকোবরের দৃশ্য বেশ রমণীয়। নিকোবরের শোভা সুন্দর, কোন কোন স্থানে অতীব মনোহর।

ভূতত্ত্ব—ভূতাত্ত্বিক বিচারে আন্দামান আরাকান ইয়োমার দক্ষিণাভিমুখী সম্প্রসারিত অংশ। দুইটি পাললিক শিলাশ্রেণীর এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; পোর্ট ব্লেয়ার ও আর্কিপেলেগো নামে উহারা পরিচিত। পরিবর্ত্তিত আগ্নেয় শিলা এবং আগ্নেয় গিরিসঞ্জাত শিলা উহাদের মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। পোর্ট ব্লেয়ার সিরিজ আরাকানের নিগ্রেইস সিরিজ হইতে অভিন্ন। ধূসর বেলে পাথর ও তাহার নীচে স্লেট জাতীয় নরম শিলা। স্থানে স্থানে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ও ধূসর রঙের চূণা পাথর। চূণাপাথর মৌচাকের মত ঝাঁঝরা। কয়লা, বালি ও শ্বেত কর্দ্দমে গঠিত আর্কিপেলেগো শিলাশ্রেণী। দুইয়ের মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ার সিরিজই অধিকতর পুরাতন। ইহাতে ক্রোমাইট, অ্যাসবেসটস ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজের সন্ধান করা উচিত। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য উত্তম প্রস্তর, ইট প্রস্তুত করিবার ভাল লাল মাটি ও লালচে মার্ব্বেল পাথর পোর্ট ব্লেয়ারের অপরাধী উপনিবেশে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানের গৈরিক মৃত্তিকা গর্জ্জন তেলের সহিত মিশ্রিত করিলে ঘরের চালে ব্যবহারের জন্য উত্তম প্রলেপ প্রস্তুত হয়। পোর্ট ব্লেয়ার পোতাশ্রয়ে নেভি বে পাহাড়ের আশপাশে ব্যবসায়ের উপযোগী অভ্র দেখা যায়।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তামা ও টিনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা পরীক্ষিত হয় নাই। কামোর্টা ও নানকৌরির সাদা মাটি বৈজ্ঞানিক প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে।

বনজসম্পদ—উষ্ণমণ্ডলীয় নিরবচ্ছিন্ন অরণ্যানী আন্দামানের স্বাভাবিক উদ্ভিদ। একই অক্ষাংশে অবস্থিত থাকায় আন্দামানের বৃক্ষাদি ইন্দোচীনের বনজের সগোত্র। মালয় জাতীয় তরুলতাও ইহার সহিত মিশ্রিত আছে। আন্দামানের বন উপকূলীয় ও অনুপকূলীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত। আর্থিক হিসাবে উপকূলের বনাঞ্চলই অধিকতর মূল্যবান।

উপকূলের গরাণের বন বহুবিস্তৃত ও মূল্যবান। তাল জাতীয় প্যান্ড্রানাস ও নিপা বৃক্ষ সাগরতীরে বেড়া-সৃষ্টিকারী গাছপালার অন্তর্ভুক্ত। ইহাদেরও আর্থিক মূল্য আছে। আন্দামানের উপকূলে ঝাউ ও নারিকেল বৃক্ষের অভাব বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। অদূরে ক্ষুদ্র আন্দামানে ঝাউ এবং ককো ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নারিকেল বৃক্ষ প্রচুর। তটভূমির বনে ইন্দো-মালয় বৃক্ষাদির সুস্পষ্ট লক্ষণ বর্ত্তমান।

প্রকৃত আন্দামানীয় বন চিরহরিৎ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। বৃক্ষ-

গাছ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে লতার গুচ্ছভার। পত্রপতনশীল বৃক্ষের এক এক চাপ ও বাঁশের ঝাড় মাঝে মাঝে দেখা যায়। শৈল শিরায় বৃক্ষ খর্ব্বাকৃতি ও নিবিড় লতাজালে আচ্ছন্ন। উৎকৃষ্ট বৃক্ষ জন্মে পাহাড়ের ঢালে। আন্দামানের আভ্যন্তরীণ অরণ্যের বৃক্ষাদির বেশ কিছু অংশ বিশেষ ভাবে এই দেশেরই গাছপালা, সাধারণতঃ অন্ত দেশের বনজের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য নাই। কিন্তু কয়েক প্রকার বৃক্ষ আন্দামান সাগরের পরপারের টেনাসেরিমের অরণ্য বৃক্ষের সমজাতীয়।

আর্থিক হিসাবে মূল্যবান কাঠ পরিমাণে যেমন প্রচুর তাহাদের রকমারিও বহু। আন্দামানের কাঠের রাজা প্যাডাউক সেগুনের সমকক্ষই শুধু নহে, কোন কোন বিষয়ে সেগুন কাঠকে ইহার নিকট হার মানিতে হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার প্যাডাউকের খুব আদর। তার পরই স্থান গর্জ্জন কাঠের। গর্জ্জন বৃক্ষের তৈল রং করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরাণ কাঠে টেলিগ্রামের তারের থাম হয়। ধূপ ও পলিতা দেয়াশলাইর বিশেষ উপযোগী। প্লাইউড ও প্যাকিং-কেসের জন্ত এখানকার বহু কাঠের চাহিদা প্রচুর।

আন্দামানের অরণ্য হইতে এখন বার্ষিক ১৩৫,০০০ টন কাঠ সংগ্রহ করা হয়। দ্বীপগুলির বহুলাংশই অরণ্যময় হইলেও সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত অঞ্চলের কাঠ সংগ্রহ করা পূর্ব্বে সম্ভব হইত না। উপকূলের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের গাছ কাটিতে কাটিতে বন ধ্বংস হইতে চলিয়াছিল। কিছুকাল যাবৎ এই দুই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। হাতিতে-টানা ট্রাম গাড়ীর লাইন বসাইয়া কাঠ আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতীয় বনবিভাগের পদ্ধতি অনুসারে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। দ্বীপ-পুঞ্জের বনবিভাগের অধিকর্ত্তার মতে এই ১৩৫,০০০ টন কাঠের জন্ত ৭৫০ বর্গ মাইল বনাঞ্চলই যথেষ্ট। সুতরাং প্রায় ১,৭০০ বর্গমাইল ভূমি অরণ্যমুক্ত করিয়া চাষের জন্ত রাখা যাইতে পারিত। কিন্তু ভারতে কাঠের দারুণ অভাব হেতু সম্প্রতি চাষের জন্ত কেবল-মাত্র ৩০০ বর্গ মাইল সমতল ও তরঙ্গায়িত ভূমি রাখিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কাঠের জন্ত রক্ষিত এই বন হইতে ভবিষ্যতে বার্ষিক প্রায় ৬৭৫,০০০ টন কাঠ সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। বনবিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত পোর্ট ব্লেয়ারের করাত-কল এশিয়ার বৃহত্তম করাত-কল বলিয়া বিবেচিত হয়।

নিকোবরের বনজ-সম্পদের বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই। তবে উহা যে আন্দামানের বনসম্পদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা নিঃসন্দেহ।

জীবজন্তু—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কোন স্তন্যপায়ী হিংস্র জন্তু ছিল না। কামোর্টা দ্বীপে পাদরীদের দ্বারা পরিত্যক্ত গো-মহিষাদি বুনো হইয়া গিয়াছে। এক প্রকার শূকর বা বন-বিড়াল খাদ্যের জন্ত আন্দামানীরা শিকার করিয়া থাকে। আন্দামানে নানা প্রকার বিষধর সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নিকোবরে নদীগর্ভে, সমুদ্রতটে এবং অন্ত কোন কোন স্থানে কুমীর দেখা যায়। ক্ষুদ্র নিকোবর, বৃহৎ নিকোবর ও কাটচাল দ্বীপে বানরের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক।

আন্দামান ও নিকোবরের উপকূল রেখা প্রায় ১,২০০ মাইল দীর্ঘ এবং সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রের পরিমাণ প্রায় ১৮,০০০ বর্গ মাইল। মৎস্য সম্বন্ধীয় সরকারী গবেষণা বিভাগ পোর্ট ব্লেয়ারে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। মৎস্য ধরা ও উহার ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ হইলেও বর্ত্তমানে উহা স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বড়শী আর ক্ষেপলা জাল মাছ ধরিবার প্রধান হাতিয়ার। এই উপায়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার মণ মাছ ধরা পড়ে।

জলবায়ু— আন্দামানের জলবায়ু সমভাবাপন্ন, শীত ও গ্রীষ্মে উষ্ণতার প্রভেদ অতি অল্প। চৈত্রের শেষার্দ্ধ ও বৈশাখের প্রথমার্দ্ধ বৎসরের উষ্ণতম কাল; সেই সময় গড় চরম উত্তাপ ৮৯° ও নিম্নতম তাপ ৭৫°। অগ্রহায়ণের মধ্য ভাগ হইতে ফাল্গুনের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত তাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম থাকে সুতরাং ইহাকে শীতকাল বলিতে হয়। কিন্তু তখন চরম উষ্ণতা ৮৪°-৮৬° এবং নিম্নতম উষ্ণতা ৭৩°-৭৪°। কলিকাতার শীতকালের চরম উষ্ণতা আন্দা-মানের গ্রীষ্মকালের চরম উষ্ণতার সমান। কলিকাতায় শীত ও গ্রীষ্মের চরম উষ্ণতার প্রভেদ ২৪°, আন্দামানে ঐ প্রভেদ মাত্র ৩° হইতে ৫°। জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগে ১১০°-১১২° উত্তাপে যখন কলিকাতার লোক ছটফট করিতে থাকে আন্দামানে তখন কলিকাতার শীতের মত মনোরম মৃদু উষ্ণতা। আন্দামানের গ্রীষ্ম-কালে স্নিগ্ধকর সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাপ হ্রাস করিলেও গুমট সম্পূর্ণ ভাঙিতে পারে না। জলবায়ুর উপর সামুদ্রিক প্রভাবের দরুন শীত ও গ্রীষ্মের প্রভেদ বিশেষ অনুভূত হয় না। সারা বৎসর ধরিয়া প্রায় একটানা মৃদু উষ্ণতা চলিতে থাকে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিঙ শহরে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৪৫,১২৮ ও ১২৬ ইঞ্চি; পোর্ট ব্লেয়ারে বার্ষিক গড় বারিপাতের পরিমাণ ১২৩ ইঞ্চি। কিন্তু সমগ্র আন্দামানের গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১৪০ ইঞ্চি।

বৃষ্টিপাতহীন মাস পোর্ট ব্লেয়ারে নাই। জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগ হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত একমাসে বারিপাত সর্ব্বাধিক, ২২½ ইঞ্চি। ঐ সময়ে জলপাইগুড়ি শহরে বৃষ্টি হয় ২৬ ইঞ্চি। জলপাইগুড়ির আর্দ্রতম মাস আষাঢ়ের শেষার্দ্ধ ও শ্রাবণের পূর্ব্বার্দ্ধ, বৃষ্টিপাত ৩২ ইঞ্চি। সেই সময়ে পোর্ট ব্লেয়ারে বৃষ্টিপাত জলপাই-গুড়ির অর্দ্ধেকেরও কম, সাড়ে পনর ইঞ্চি মাত্র। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত হইতে বিদায় লইবার পর কার্ত্তিকের শেষভাগ হইতে ছয় মাস কাল এই দেশ থাকে বৃষ্টিহীন। কালে-ভদ্রে যে বর্ষণ হয় তাহা অকালের ফলের মত প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রচুর। পোর্ট ব্লেয়ারে কিন্তু এই সময়ে ২৫ ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে। এই জল বহিয়া আনে উত্তর-পূর্ব্ব

অনুমতি লইয়া বিবাহ করিতে পারিত। অথবা কয়েদীদিগকে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইত না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি স্বীকার করা হইত। কেবলমাত্র স্বজাতির মধ্যেই বিবাহের নিয়ম ছিল। বিবাহে হিন্দুপ্রথা অনুসৃত হইত এবং চীফ কমিশনারের দপ্তরে উহা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিত। মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদের বিবাহে অসুবিধা ছিল না। এরূপ বিবাহের সন্তান সন্ততি local born বা আন্দামানজাত বলিয়া পরিচিত। গুরু অপরাধে দণ্ডিত পিতামাতার সন্তানের চরিত্র কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা জানিবার আগ্রহ স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধানে যে দুইটি অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সারাংশ এখানে দেওয়া যাইতেছে। ১৯০১ সনের জনগণনার অধিকর্তা লিখিয়াছেন, "শৈশবে ইহারা দীপ্তিমান্, মেধাবী ও সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান্ থাকে। তরুণ বয়সে ইহারা অস্বাভাবিক উগ্রতা বা পরদ্রব্য অপহরণ-প্রবণতার পরিচয় দেয় না। কিন্তু সাধারণ নীতিজ্ঞান যে অতি নিম্ন স্তরের তাহা সুস্পষ্ট। মেয়েরা অতি অল্প বয়সেও প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করিয়া থাকে। আন্দামানের প্রকৃত বাসিন্দা বলিয়া একটা উদ্ধত অভিমান, মানসিক ক্ষিপ্রতা, কিন্তু কর্ম্মে আলস্য, কায়িক শ্রমে অনিচ্ছা এবং বয়োবৃদ্ধ ও কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অসম্মানের ভাব তাহাদের আচরণে প্রকাশ পায়।"

"বংশগতির প্রভাব উগ্রতায় নহে, হীনতায় প্রকাশিত হয়। বয়স্কগণ কলহ ও মোকদ্দমাপ্রিয়। তাহারা যত পারে ধার করে; জমি হইতে যত শস্য উৎপাদন করা সম্ভব তাহা করে না; প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধনের চেষ্টায় বহু সময় ব্যয় করিয়া থাকে। এই বর্ণনা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। অনেকে স্থায়বুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা, শ্রমশীলতা এবং আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিয়াছে। মোটের উপর যতটা আশঙ্কা করা গিয়াছিল, ইহারা তদপেক্ষা ভাল। সরকারের উপর নির্ভর করিবার ঝোঁক এই সম্প্রদায়ের বড় বেশী।"

১৯৫১ সনের গণনা-পরিচালক বলেন: "আন্দামানের জনসমষ্টির প্রধান অংশই হইতেছে 'আন্দামানজাত' জনগণ। উনিশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই প্রায় দশ হাজার। ইহাদের ধারণা যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রকৃত মালিক এরা, অন্যান্য আগন্তুকেরা এখানে অনধিকার প্রবেশ করিতেছে। ইহা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে একটা হীনতাবোধ সদাজাগ্রত। মোটামুটি ধরিলে ভারতের সমপর্য্যায়ের লোকের অপেক্ষা ইহাদের আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল।

"কর্ত্তৃপক্ষ ও রাজবিধির প্রতি শ্রদ্ধা ইহাদের চরিত্রের লক্ষণীয় উপাদান। ইহাদের বাসস্থানের আশপাশে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় নাই। 'আন্দামানজাত'দের দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয়, বংশগতির সহিত অপরাধের কোন সম্পর্ক নাই। অপরাধ প্রবণতা জন্মগত নহে, অবস্থাগত।

"ভারতীয় জাতিগঠনের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ এক পরীক্ষা এই 'আন্দামানজাত'দের মধ্যে চলিতেছে। ইহারা জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও প্রাদেশিক বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে অবাধ বিবাহ ভেদবুদ্ধি লোপ করিয়া ঐক্য স্থাপন করিতেছে। এই ঐক্য সাধনের সহায়ক হিন্দুস্থানী ভাষা সকলেরই ভাবের বাহন। ধর্ম ইহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমাজ ও বৈষয়িক ব্যাপারে ধর্ম্মের স্থান নাই। এই মিশ্রণের ফলে একটি কৌতূহলোদ্দীপক, ক্ষিপ্র ও বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন এক নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।"

উদ্বাস্তু—১৯৪৫ সনে আন্দামান পুনর্দখলের পর কয়েদীদিগকে মুক্তিদান ও ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনেচ্ছুকদিগকে সরকারী ব্যয়ে পৌঁছাইয়া দিবার সুবিধা দান করা হয়। প্রায় ৪০০০ লোক ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের এই সুযোগ গ্রহণ করে। ইহার ফলে কম বেশী ৩০০০ একর জমি পতিত পড়িয়া রহিল। ভারতে যখন খাদ্যাভাব তখনও আন্দামানের জনগণ খাদ্যের জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী। 'অধিক খাদ্য ফলাও' ধ্বনি তোলা হইল বটে কিন্তু লোক নাই, খাদ্য ফলাইবে কে? চাষীর অভাব পূরণের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী চাষীদিগকে আন্দামানে প্রেরণের প্রস্তাব করা হইল।

বাঙালী উদ্বাস্তুর প্রথম দল আন্দামানে প্রেরিত হয় ১৯৪৯ সনে। এই দলে ছিল ১১১টি পরিবার। ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রতি পরিবার এক জোড়া মহিষ, একটি দুগ্ধবতী গাভী, চাষের যন্ত্রপাতি, বীজ ও নগদে মোট ২,৩৩৩ টাকা পায়। এই দলে সাতটি ছুতার পরিবারও ছিল। পরের বছর আসে ৪৯টি চাষী পরিবার। ছয় বৎসরে পরিশোধের করারে এই দলের প্রত্যেক পরিবার ঋণ পাইয়াছিল ২,০০০ টাকা। উভয় দলের প্রতি পরিবারকে ৫ একর নিম্ন ভূমি এবং ৫ একর পাহাড়ের ঢালের জমি দুই বৎসরের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫১ সনের জানুয়ারীতে আসিয়াছে ৩৪টি শ্রমজীবী এবং ৪৭টি কারিগর ও ব্যবসায়ী পরিবার। ইহাদের সাহায্যের সর্ত্ত ও পরিমাণ ১৯৫০ সনের অনুরূপ। এই দলের কয়েকজন ম্যাট্রিক যুবক সাধারণ মজদুরের কাজ করিতেছে। ১৯৫১ সনের ফেব্রুয়ারীতে উদ্বাস্তুদের সর্ব্ব মোট সংখ্যা ছিল ১,৫০০। দক্ষিণ আন্দামানের পতিত জমিতে চাষবাসের জন্য ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ হইতে ১,৮৬১ জন উদ্বাস্তু আনয়ন করা হইয়াছিল। উহাদের ৩৩৪ জন ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। যাহারা রহিয়াছে তাহাদের কার্য্যকলাপ বিশেষ সন্তোষজনক বলা যায় না। "হতাশা ও পরাজয়ের ভাব তাহাদের হৃদয়ে; দীর্ঘকাল সরকারের দানে প্রতিপালিত হইবার ফলে আলস্য ও জড়তা বাসা বাঁধিয়াছে তাহাদের দেহে। দান পাইয়া সরকারী দানের উপর দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মনে হয়। অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এ কথা অবশ্য সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের সাধারণ ব্যবহার সরকারী নীতি পরিবর্ত্তনের

কারণ হইয়াছে। আন্দামানের শ্রমিক ও অন্ন সমস্যা দূর করিবার জন্ত শ্রমিক ও কৃষকের প্রয়োজন। বাঙালী উদ্বাস্তু দ্বারা এই অভাব পূরণ করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ হইতেছে। মধ্য ও উত্তর আন্দামানের ২০,০০০ একর ভূমি অরণ্যমুক্ত করিয়া ৪০০০ পরিবার বা ২০,০০০ লোক বসতির ব্যবস্থা পাঁচ বৎসরে সম্পন্ন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই বসতি বাঙালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে অর্দ্ধেক লোক নেওয়া হইবে। বাঙালী উদ্বাস্তু প্রেরণের সময় তাহাদের কর্ম্ম ক্ষমতার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে বর্ত্তমান সনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ৫৭৫টি পরিবার আন্দামানে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে আছে ৪০০ খ্রীষ্টান কারেন। শ্রমিকরূপে আসিয়া তাহারা এখন উন্নতিশীল কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। তাহারা সরকারের সাহায্যে নিরপেক্ষ সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহারা এখন ভারতীয় নাগরিক।

আন্দামানের উন্নয়নে বর্ম্মীদের দান প্রচুর। ইহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। ৯৭০ জন বর্ম্মী ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করিবে না, আন্দামান ছাড়িতেও অনিচ্ছুক।

ইহা ছাড়া আছে মালাবারের মোপলা সম্প্রদায়। মোপলা বিদ্রোহীদের অবশিষ্ট লোক, তাহাদের সন্তান এবং স্বেচ্ছায় আগত মোপলাদের লইয়া বেশ এক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। নবাগতদের সংখ্যা ক্রমশঃ এত বাড়িতেছিল যে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ নিবারণের উদ্দেশ্যে মোপলাদের আন্দামানে আসিবার অনুমতি প্রদানে কড়াকড়ি করিতে হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু ভাষার সারণিতে দেখা যায় মালয়ালম ভাষী পুরুষ ১,৭০৩ এবং নারী ১,১১২। নারী ও পুরুষের হারে প্রভেদ অল্প। স্থায়ী বাসিন্দার মধ্যেই এরূপ হইয়া থাকে। মনে হয়, ইহারাই মোপলা এবং ইহাদের সংখ্যা ২,৮১৫।

এই হিসাবের বাহিরে যাহারা আছে তাহারা চলার পথের অতিথি। কাজের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তাহারা আন্দামান ত্যাগ করিবে। শ্রমিকেরা আন্দামানে আসে এক বৎসরের চুক্তিতে। বনের শিবিরসমূহের মোট লোক সংখ্যা ২,৫৫২। ডক ও করাত-কলে অনেকে কাজ করিয়া থাকে। উরাঁও এবং তামিল ভাষী শ্রমিকের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক মনে হয়। উরাঁও ভাষী পুরুষ ১,০২৪ ও নারী ৪১; তামিল ভাষী পুরুষ ১,১৭৩; নারী ৪০১।

নিকোবরী—নিকোবরের অধিবাসী ও আন্দামানের আদিবাসী যে এক জাতীয় নহে তাহা উহাদের আকৃতি, গঠন, বর্ণ ও মানসিক শক্তির তারতম্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। আবলুসের মত কাল আন্দামানীরা নাকি পৃথিবীর কৃষ্ণতম মানুষ। নিকোবরীদের বর্ণ পীতাভ বা লালচে পাটল। আন্দামানী বর্ষ্ণ, ৫ ফুটের কম উচ্চ; নিকোবরীর গড় উচ্চতা ৫ ফুটের বেশী। আন্দামানীর গড় ওজন এক মণ পাঁচ সের, নিকোবরীর ওজন দেড় মণের অধিক। নিকোবরীদের নাক চেপটা, চক্ষু বাঁকা, মুখ বড়। পণ্ডিতদের মতে নিকোবরীগণ বর্ম্মী ও মালয়ীদের সগোত্র। কিন্তু নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ইহাদের আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। উনিশটি দ্বীপের মধ্যে বারটিতে লোকের বসতি আছে। সকল দ্বীপের নিকোবরীই এক খণ্ডজাতির অন্তর্ভুক্ত। পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা স্থানিক, বংশগত নহে। বৃহৎ নিকোবরের সোম পেনগণ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ আদি নিকোবরীর নিদর্শন। ইহাদের মালয়ী আকৃতি সুস্পষ্ট। নারীগণ বস্ত্র এবং পুরুষেরা অন্যান্য নিকোবরীদের মত কটিবাস পরিধান করিয়া থাকে। সকল নিকোবরীদের কটিবস্ত্রের পশ্চাতে একটি লেজ পরিবার রীতি আছে।

আন্দামানীগণ ক্ষীয়মাণ, নিকোবরীগণ বৃদ্ধিশীল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এক শত বৎসরে আন্দামানীদের সংখ্যা ৬০০০ হইতে ১০০০-এ নামিয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে পঞ্চাশ বৎসরে নিকোবরীদের সংখ্যা হইয়াছে প্রায় দ্বিগুণ। নিকোবরে ১৯৪১ সনে বিদেশী ছিল ২০০; ১৯৫১ সনে বিদেশীর সংখ্যা এক শতের অধিক নহে। নিকোবর রহিয়াছে নিকোবরীদেরই দেশ কিন্তু আন্দামান এখন বিদেশীদের উপনিবেশ। আন্দামানের জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি কৃত্রিম, বহিরাগতসংখ্যার উপর নির্ভরশীল। নিকোবরে লোকের হ্রাসবৃদ্ধি জীববিদ্যার স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। নারীদিগকে দেশে রাখিয়া বহু পুরুষ অর্থোপার্জ্জনের জন্ত আন্দামানে আসিয়া থাকে। সুতরাং আন্দামানে পুরুষ ১২,৭৩৪ এবং নারী মাত্র ৬,২২৮, পুরুষের অর্দ্ধেকের কম। নিকোবরে নারী ও পুরুষের সংখ্যার মধ্যে প্রভেদ অল্প; পুরুষ ৬,৩২১, নারী ৫,৬৮৮। শিল্প-শহর বার্ণপুরে পুরুষের হাজার প্রতি নারী ৫৩৬, আন্দামানে নারীর হার ৫৬৭। উত্তর প্রদেশের প্রতি হাজার পুরুষে নারী ৯১০, নিকোবরে ৯০০। বিদেশী পুরুষের বাহুল্য নিকোবরে নাই, নারীর হারে তাহাই সূচিত হইতেছে।

জনবিন্যাস—দক্ষিণ আন্দামানের ৫০-৬০ বর্গমাইল স্থানে, বন্দিনিবাস অঞ্চলে, ১৭,০০০ লোকের বাস। অন্যান্য দ্বীপ জনহীন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বন্দিবাসের ৫,০০০ একর কৃষিভূমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে। এখানে বসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ২৮০, আসামের আড়াই গুণ, উড়িষ্যার ঘনতা হইতে কিছু বেশী।

নিকোবরের বিভিন্ন দ্বীপেও বসতির ঘনতার তারতম্য বিস্তর। উনচল্লিশ বর্গমাইল কার নিকোবরের লোকসংখ্যা ৮,৩৭৪। চৌরা দ্বীপের আয়তন মাত্র তিন বর্গমাইল। সেখানে লোক ১,০৭৬ সুতরাং ঘনতা ৩৫৮·৭। এই দুই দ্বীপের ৫২ বর্গমাইল স্থানে নিকোবরের তিন চতুর্থাংশের অধিক লোকের বাস। পক্ষান্তরে ৩৩৩ বর্গমাইল বিস্তৃত বৃহৎ নিকোবরের লোকসংখ্যা মাত্র ১৮১।

নিকোবরীদের বিভিন্ন দ্বীপে ছড়াইয়া পড়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পুরাতন স্থান ত্যাগের স্বাভাবিক অনিচ্ছা ছাড়াও

আর একটি বাধা আছে। নারিকেল ও অন্যান্য ফলমূল ইহাদের প্রধান খাদ্য। যতকাল নারিকেল গাছে ফল না ধরে নূতন স্থানে তাহাদের বাঁচিবার উপায় থাকিবে না। এজন্যই ইহারা কার-নিকোবর ও চৌরার পুরাতন নারিকেল বাগান আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহে।

কৃষি—আন্দামানে ৮,০৫৪ একর জমিতে চাষ চলিতেছে। প্রধান শস্য ধান, উৎপাদন প্রতি একরে ১৫ হইতে ২০ মণ। গম চাষের পরীক্ষা চলিতেছে কিন্তু সুফলের আশা কম। গোল আলু উৎপাদনের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইয়াছে। আখ খুব ভাল জন্মে। বাঙালী উদ্বাস্তুগণ ডাল ডাল ও লঙ্কা উৎপন্ন করিতেছে। ভারতীয় সকল সব্জীই এখানে জন্মিয়া থাকে। জাপানী অধিকারের সময় তাহারা টেপিয়োকা, মিঠা আলু ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করিত। পাহাড়ের গায়ে থাক কাটিয়া সিকিমীদের মত ধান উৎপাদনের সফল প্রয়াসের পরিচয় কোন কোন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। বৃষ্টিপাত যখন কম থাকে জলসেচ সমস্যা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীর রক্ষা করিয়া সমুদ্রের লোনা জল বাধা দেওয়া সরকারের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। কিছুদিন পূর্ব্বে অসংস্কৃত দেওয়ালের ফাটল দিয়া সমুদ্রের জল প্রবেশ করিবার ফলে ৫০০ একর জমি চাষের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। নারিকেল বৃক্ষ আছে প্রায় চার হাজার একর ভূমির উপর। রবার বৃক্ষ ৪৩০ একর, কাজু বাদাম ১১৬ একর, কফি ৩১ একর এবং ম্যাঙ্গোষ্টীন ৮ একর জমিতে আছে।

আন্দামানে শতকরা ২৪ জন কৃষিজীবী। নিকোবরে উদ্যান-পালক (planter) আছে, কৃষিজীবী নাই। নারিকেল ও সুপারি-বাগান নিকোবরীদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়। আন্দামান খাদ্যশস্যে এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে, ভারতের মূল ভূখণ্ড হইতে অর্দ্ধেক শস্য আমদানী করিতে হয়।

আন্দামানে ভূমির মালিক গবর্ণমেণ্ট। কৃষকগণ সরকারের নিকট হইতে জমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পত্তন নিয়া থাকে। অন্যান্য মজুরের মত এখানে ক্ষেত-মজুরের বিশেষ অভাব।

বিবিধ তথ্য—আন্দামানে ক্ষুদ্রায়তন, বৃহদায়তন শিল্প বা কুটীর-শিল্প নাই বলিলেই চলে। শিল্পকর্মী হিসাবে যাহাদিগকে দেখার হইয়াছে তাহারা করাতী, ছুতার, খরাদী (turner) প্রভৃতি কাঠের কারিগর। কাঠের প্রাচুর্য্য হেতু আন্দামানের ভাল বাড়ি কাঠের তৈরি। সুতরাং কাঠের কারিগর বেশী থাকাই স্বাভাবিক। ধাতু-শিল্পিগণ হয় সেকরা, লোহার, টিনের ঝালাইকর অথবা সরকারী জাহাজ মেরামত কারখানার কারিগর। দুই-চার জন তাঁতী, দর্জ্জি, নারকেল তৈল ও ঘি-মাখন প্রস্তুতকারক আছে। ঝাড়া, দড়ি, বেত ও বাঁশের দ্রব্যাদিও হয়। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোং পোর্ট ব্লেয়ারে কাঠের পাত তৈরি করিয়া থাকে।

জনগণনার পরিভাষায় নিকোবরের শিল্পশালা তথাকার সুপারি-বাগ আর নারিকেলবাগান। বহু শিশু এবং প্রায় সকল নারীই পিতা ও স্বামীর সহিত এই সকল বাগানের কাজে নিযুক্ত থাকে।

খুচরা দোকানীরাই আন্দামানের বাণিজ্যের কোঠায় পড়িয়াছে। এখানে ব্যাঙ্ক বা বীমা-ব্যবসায় নাই। নিকোবরে নারিকেল ও সুপারির বিনিময়ে বিদেশীদের সহিত কারবার চলে।

আন্দামানের স্বাবলম্বীদের এক তৃতীয়াংশের অধিক লোক সরকারের বনবিভাগে, করাত কলে, ডকে ও সরকারী দপ্তরখানায় কর্ম্মে রত আছে। আন্দামানে বেকার নাই।

পোর্ট ব্লেয়ারই এই রাজ্যের একমাত্র শহর, লোকসংখ্যা ৮,০১৪। বিজলি বাতি, কলের জল, পিচের রাস্তা ও ট্যাক্সির ব্যবস্থা থাকিলেও উহা পল্লীবেশমুক্ত হয় নাই। কলিকাতা হইতে পোর্ট ব্লেয়ার ৭৮০ মাইল দূরে অবস্থিত; কলিকাতা হইতে দিল্লীর দূরত্ব আরও বেশী।

আন্দামানে উচ্চ বিদ্যালয় একটি, মধ্যবিদ্যালয় দুইটি, প্রাথমিক বিদ্যালয় উনিশটি ও বুনিয়াদি বিদ্যালয় পাঁচটি আছে।

১৯৫৪-৫৫ সনে আন্দামান ও নিকোবরের জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয় এবং ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

গঙ্গার উপরে সেতু [ফোটো : লেখক

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ"
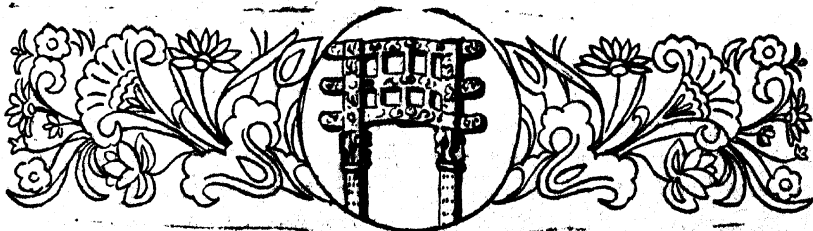
শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আকাশবাণীর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান শোনার আশায় কাঁটা ঘোরাচ্ছি, হঠাৎ অগুন্তি লোকের কলরবে যেন বেতার যন্ত্রটি ফেটে পড়বার মত অবস্থা। ব্যাপার কি! আস্তে আস্তে সমস্ত গোলমাল পেছনে রেখে প্রশ্ন শুনতে পেলাম, "সাধুজী, কুম্ভ-স্নানের মাহাত্ম্য কি?" উত্তর শুনলাম, "মোক্ষলাভ হয়।" অর্থাৎ, আর ফিরে আসতে হবে না এই পৃথিবীতে—। জড়িয়ে পড়তে হবে না পাপে-তাপে; দুঃখ পাবে না প্রতিদিনকার দারিদ্র্যের কশাঘাতে, শোকে দগ্ধ হতে হবে না পরম প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায়। কিন্তু কবি বলেন, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" মানুষ মোক্ষ চাইবে, কিন্তু সেই মোক্ষ চিত্তশুদ্ধির।

এবারে হরিদ্বারে ছিল অর্দ্ধকুম্ভ। প্রায় লাখ পাঁচেক লোক মহাবিষুব সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে হর কি পৈড়ীর ঘাটে স্নান করে দেহমন শীতল করবার চেষ্টা করেছে। অন্যান্য বারের অনুপাত হিসেবে আশা ছিল প্রায় তের কি চৌদ্দ লাখ লোক আসবে স্নান করতে। কাজেই আশানুরূপ লোক হয় নি বলতে হবে। এর কারণ হিসেবে কেউ কোন বিশিষ্ট মত খাড়া না করলেও প্রয়াগের গতবারের ভয়াবহ দুর্ঘটনা লোককে কিছু পরিমাণে পেছনে টেনেছে বলে মনে হয়। তবে কর্ত্তৃপক্ষ এবার যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

স্নানের ঘাট হিসেবে হর কি পৈড়ী ঘাট খুবই মনোরম। তবে একসঙ্গে অনেক লোক যেমন ওখানে স্নান করতে পারে না, তেমনি ঘাটে আসবার রাস্তা সঙ্কীর্ণ বলে, ভিড়ের চাপে যে-কোন সময় বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান। কিন্তু সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে এ অসুবিধা দূর করতে হয়েছিল কর্ত্তৃপক্ষের। প্রয়াগের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে এবারকার যোগাযোগ-ব্যবস্থায় কোন ফাঁক রাখবার ঝুঁকি নিতে পারেন নি কর্ত্তৃপক্ষ। কয়েক লাখ টাকা ব্যয়ে যে ব্যবস্থা হয়েছিল তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। লোকজনের যাতায়াত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটে আলাদা পুল তৈরী হয়েছিল গঙ্গার উপর। কোথাও ভিড় জমতে দেওয়া হয় নি কোন সময়ে। তা ছাড়া অল্প দূরে দূরে মাইকের ব্যবস্থা নিয়মিত ভাবে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছিল যাত্রীদের খবরাখবর। প্রায় চল্লিশখানা বিশেষ ট্রেন কিছু সময় অন্তর অন্তর হরিদ্বারের ষ্টেশন কাঁপিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ফিরতি পথের লোককে নিয়ে ছুটোছুটি করছিল। এদের সময়-সঙ্কেতও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছিল মাইকের মারফত। ঘাটে ওস্তাদ সাঁতারুর ব্যবস্থা করে যাত্রীদের হঠাৎ ডুবে মরার সম্ভাবনাকে বাতিল করেছে। মোট কথা, কোন উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনাবিহীন এরূপ সুচারু ব্যবস্থা লোকের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনবে সন্দেহ নেই।

যেখানে এত লোকের সমাগম সেখানে মহামারী যেন ওৎ পেতে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। তাই যেমন স্নান-ঘাটের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা প্রয়োজন, তেমনি পথ-ঘাট, পান-ভোজন এবং সবার উপর যাত্রী-সাধারণের স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়ে সর্ব্বতোমুখী শুচিতার প্রতি নিষ্ঠাও বজায় রাখা দরকার পুরামাত্রায়। কেননা ব্যবস্থা যতই নিখুঁত হোক না কেন জনসাধারণ তা মানতে না চাইলে বা

পথের ধারে সাপুড়ে ফোটো : লেখক

বাধার সৃষ্টি করলে বিধিব্যবস্থা আর নিষেধের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পুণ্যলোভাতুর মানুষের গাফিলতি অনেকখানি। থুতুফেলা নাকঝাড়ার কথা ছেড়েই দিলাম; বসন্তের টিকা এবং কলেরার সুই বা প্রতিষেধক হিসেবে খুবই জরুরি তা এড়িয়ে চলতে মানুষের চেষ্টার অবধি নেই। কাগজে কাগজে এ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও নামকাওয়াস্তে একটা ডাক্তারী দলিল সংগ্রহ করার চেষ্টা থাকে, কেউ বা অনুরোধ জানায় যার সত্যিকারের দলিল আছে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওটি হস্তগত করবার। অর্থাৎ, নিজের কিংবা আর যার যাই ঘটুক না কেন যাওয়া চাই-ই। তবে এবারে হরিদ্বারে ঢোকবার সবগুলি পথে দু'জায়গায় বিশেষ কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকার ফলে এমনি অপব্যবহার একেবারে নির্ম্মূল না করতে পারলেও অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অশিক্ষা ও কুসংস্কার এর জন্য অনেকাংশে দায়ী একথা সত্য, কিন্তু এর উপর আর একটি মনোভাব খুব গোপনে আমাদের মধ্যে কাজ করছে—সেটি এই যে, আমাদের নাগরিক চেতনা খুব কম। আমার অবহেলার জন্য আর দশ বা হাজার লোকের ক্ষতি হতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা পুরোপুরি সচেতন নই। এ বিষয়ে দায়িত্ববোধ বাড়লে যে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ সহজ ভাবে রক্ষিত হতে পারে তাই নয়, তা ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষের দিক থেকে গাফিলতি করবার সাহস থাকে না যদি আমরা সচেতন হই।

এ সব বাদ দিয়েও এবারকার হরিদ্বারের ব্যবস্থা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পোকা-মাছির অভাব, রাস্তার পরিচ্ছন্নতা, দেহমনের শুচিতা রক্ষা করতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের আপিসটিতে এই নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। কর্ম্মসচিবগণ শহর ও স্নানঘাটের ব্যবস্থা পরিদর্শন করে এসেছেন দপ্তরে। কোথাও কিছু নেই, কোথা থেকে হঠাৎ একটা মাছি উপপ্রধানের টেবিলের উপর বন বন করে ঘুরে পাক খেতে লাগল। অধস্তন কর্ম্মচারীরা একটু শঙ্কিত হ'ল বৈকি। কি সর্ব্বনাশ, একেবারে থানার মধ্যেই চোর! কয়েক সেকেণ্ড মাত্র! মাছিটা দু' চার পাক ঘুরে অবশ দেহে পড়ে মরল টেবিলের উপর। উপপ্রধান এবার পরিহাস করে বললেন, "ওহে ছেলের দল, দেখেছ তোমরা যে মক্ষিকাকুল নিধনযজ্ঞে ব্রতী হয়েছ তারই প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমাদের দপ্তরে এসে হাজির হয়েছিল, কিন্তু

ভীমগঙ্গার একাংশ [ফোটো : লেখক

পথিমধ্যে ওর দেহে যে বিষের আঘাত লেগেছিল তাতে আর ও নিজেকে সামলাতে পারল না।"

আর একটি বিশেষ উদ্যোগ এবারকার মেলার আকর্ষণ বাড়িয়ে ছিল, তা কৃষি-প্রদর্শনী। নানা রকমের ছবি ও সহজবোধ্য কথায় গরু, মোষ প্রভৃতি বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রজনন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আজ আমরা জাতীয় উদ্যোগ পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে। সাফল্যের জন্ত চাই সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা—তা সক্রিয় হোক বা নিষ্ক্রিয় হোক। যেখানে লাখ লাখ লোক নিজের তাগিদে জড়ো হয় সেখানে এই সুযোগে এমনিধারা সকলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় ও ভাবে বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা একান্ত কাম্য।

এ ছাড়া রথদেখা কলাবেচার সংখ্যা নেহাত নগণ্য নয়। সাধুবেশে ভিখিরী, পথের ধারে সাপুড়ে, পথে পথে, আনাচে কানাচে খেলনা খাবার এবং আরও কত দরকারী অদরকারী জিনিষের দোকান। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রশ্ন বড় নয়! কত মা এসেছেন মাসীর কোলে ছেলে রেখে, দাদু-দিদিমণিরা এসেছে কত নাতি-নাতনীর আবদার-ভারী মুখকে পেছনে ফেলে, তা ছাড়া আরও কত চোখের জল, মিনতি ফিরতি পথে মনকে উদ্বেল করছে! কোন পুণ্যই সার্থক হবে না যদি ফিরে গিয়ে বাকস-পেটরা খুলে সবাইকে খুশী করতে না পারা যায়। যদিও বিদেশী মাল আর চটকদার খেলনায় বাজার ছেয়ে আছে তথাপি কিছু কিছু দিশী মাল যে বেচাকেনা হয় না তা নয়। এটুকু সহায়তা না পেলে দেশী শিল্প যে একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যাবে!

সাধুর শোভাযাত্রা; অদূরে গঙ্গার ঘাট ...

কুম্ভমেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে মত ও আখ্যায়িকা অনেক প্রচলিত। কারুর মতে সমুদ্রমন্থনে অমৃতকুম্ভ নিয়ে দেবাসুরে লড়াই হয় বার দিন ধরে, সে সময়ে যে চার জায়গায় (হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী) অমৃত কুম্ভ রক্ষা করা হয়েছিল সেখানে সে তিথি উপস্থিত হলে কুম্ভমেলা হয়। কেউ কেউ বলেন, বালানন্দজী নামে এক প্রভূত প্রভাবশালী সাধুর নেতৃত্বে শিষ্য সম্প্রদায় ন্যূনাধিক তিন বছর পর পর যে ক্রম পর্য্যায়ে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়নী ভ্রমণ করে ধর্ম্মপ্রচার ও বিপক্ষ দলন করতেন সে ক্রমানুসারেই কুম্ভমেলার প্রবর্ত্তন। মতান্তরে শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িককালে এর উৎপত্তি এমনি ধারণা আছে। (এর প্রবর্ত্তনের বিস্তৃত বিবরণের জন্ত ১৩৬০ সাল মাঘ মাসের প্রবাসীতে কুম্ভমেলা শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

মুখ্যতঃ পুণ্যলাভের আশায় লাখ লাখ লোকের সমাগমে কর্ত্তৃপক্ষের উপর সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কঠিন দায়িত্ব এনে দেয়। কিন্তু বিচার করে দেখলে এ-সব অনুষ্ঠানের একটা জাতীয় স্বার্থের দিক আছে যাকে জাগিয়ে তুলতে কোন প্রচেষ্টাই নগণ্য নয়। এই যে অগণিত লোক একে অপরের গা ঘেঁষে স্নান করছে, কেউ কাউকে চিনছে না, কিন্তু তবুও একান্ত অজ্ঞাতে মনে করিয়ে দিচ্ছে এরা, আমি, সবাই একই দেশের অধিবাসী—এই যে বিচিত্র চেহারা, বিভিন্ন ভাষাভাষী এরা আর আমি সকলেই ভারতবাসী। জাতীয় ঐক্যবোধ সম্পর্কে যে সন্দেহ, যে বিরোধ আজ আমাদের অনেকের মধ্যে জেগে উঠেছে তাতে এমনি জনসমাবেশ আমাদের মনের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক করতে অনেকাংশে সহায়ক বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে।

অঙ্গার

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

নিউ মার্কেটের ঠিক সামনে "পল এণ্ড সন্স" কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্টের দোকানে পাশের সিঁড়ির গায়ে ছোট একটা পিতলের সাইনবোর্ড—ডাঃ এ. এ. এ্যরন্—বার্লিন। কিছু দিন আগেও এ সাইনবোর্ডটা ছিল না। ডাঃ এ্যরন্ যে বাঙালী একথা অনেকেই জানত না। যারা জানত তারা আজ কেউ বেঁচে নেই বললেই চলে ; একজন ছাড়া—তার নাম এ. আঢ্য। অরূপরতন আঢ্যের বয়স সত্তর পার হয়ে গেছে। তিনি রিটায়ার্ড ইঞ্জিনীয়র। খুব বৃদ্ধ বটে কিন্তু জরাগ্রস্ত নন। লম্বা চেহারায় বাঁক ধরে নি, কিন্তু মুখে লম্বা চুরুট। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সঙ্গে মানানসই গোঁফ। চুরুটের ধোঁয়ায় শুধু যে সেগুলোই তামাটে তা নয়, হাসলে দাঁতও তামাটে দেখায়। মাথার চুল একেবারে ছোট করে ছাঁটা, কেবল কপাল আর তালুর ওপরের চুল একটু বড়। সিধে দু'ফাঁক টেরী আঁচড়ানো চলে। পরণে ধুতি, গলাবন্ধ সাদা কোট, হাতে মোটা বেতের লাঠি, পায়ে মোজা ও এলবার্ট জুতো।

রোজ আসেন ডাঃ এ্যরনের বাড়ী সকাল-সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে। ডাঃ এ্যরন আরও কিছু বেশী বয়সের হবেন। তাম্রাভ ঝকঝকে ইউরেশিয়ান রং, স্থূলকায় এবং চাঁচা গোঁফ-দাড়ি। পরনে দামী স্যুট, খুব উচ্চাঙ্গের আভিজাত্যপূর্ণ। চোখে দামী ফ্রেমের চশমা আঁটা। মাথা-জোড়া চকচকে টাক।

ডাঃ এ্যরন নড়তে পারেন না বললেই ভাল। চাকা-লাগান চেয়ার যথেচ্ছ চালিয়ে নিয়ে বেড়ান। তবে হাঁটতে চাইলে হাঁটতে পারেন। অত্যধিক স্থূলতার জন্য নড়তে চান না।

এক মাত্র অরূপ আঢ্যই জানতেন এ, এ, মানে একনাথ আইচ। এ্যরন নামটি কোথা থেকে পেলেন সেই কাহিনী বলার জন্য এই ভূমিকা।

অরূপ আর একনাথ উভয়েই 'এ' মার্কা 'এ' ক্লাস ছাত্র। কলকাতার পাশে চন্দননগরে মানুষ। ফরাসী, ইংরেজী, সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য। পরবর্ত্তীকালে অরূপ পড়ে ইঞ্জিনীয়ারিং আর একনাথ ডাক্তারি। দু'জনেই একজন্ম ফরাসী জাহাজে প্যারিস যায়।

তার পর অরূপ দেশে চাকরি পেয়ে ফিরে আসেন। আর একনাথ হঠাৎ প্যারিস থেকে অন্তর্হিত হয়ে বার্লিনে গিয়ে পাকাপাকি বসবাস সুরু করেন। কারণ এক জার্মান ইহুদী তরুণীর প্রণয়ভিক্ষায় সাফল্য ; ফলে বিবাহ এবং বার্লিনের বুকে বসে জীবিকা উপার্জন। প্রথম জীবনের সেই সাহেব-সাহেব খেলায় প্রমত্ত যুবক নতুন নাম নেন—এ, এ, এ্যরন। কারণ স্ত্রীর নাম ছিল রুথ এ্যরন।

এখন যখনই দুই বন্ধু একত্রিত হন, বেশীর ভাগ কথা হয় এই রুথ এ্যরনকে নিয়ে। একনাথ যুদ্ধের ডামাডোলে তাকে ফেলে ভারতে পালিয়ে এসেছেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রুথ ফিরে আসছে ভারতে। শুনে একনাথ আতঙ্কিত। আতঙ্ক সেই স্ত্রীর দাপট। বিবাহিত জীবন ছিল নিঃসন্তান। স্ত্রীর ছিল শরীর খারাপ বাতিক, তৎ-সহযোগে ছিল ডাঃ এ্যরনের প্রতি অনাদর ও উপেক্ষার অভিযোগ। দীর্ঘকাল এই কয়টি উপসর্গসঙ্কুল ঘরণীকে নিয়ে বাস করার ফলে আতঙ্ক স্বাভাবিক।

ডাঃ এ্যরন তার পেয়েছেন সেই রুথ ভারতবর্ষে আসছেন। ছাড়পত্র পেয়েছেন। টাকার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। আড্ডি গেছে টমাস কুকের সঙ্গে সেই ব্যবস্থা পাকা করতে।

এ্যরন সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন,—"খবরদার, নগদ টাকা দিও না ;—কোম্পানীকে বলো মদ যা চায় দিতে, যেন নগদ টাকা না দেয়। টাকা দিলে ও হয় ত ইস্তাম্বুলে নেমে বলবে 'কেপটাউনে যাব', কেপটাউনে গিয়ে বলবে 'উরুগুয়ে চলেছি'। ভাই, ওকে কলকাতাতেই এনে ফেলার ব্যবস্থা কর। আমি ভেবেছিলাম, শান্তি পাব ! পাব কেন ? বুড়ো বাপকে কম কষ্ট দিয়েছি আমি ?"

ডাঃ এ্যরন তাঁর চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে বসে তাঁর আসন্ন বিপৎপাতের কথা চিন্তা করছেন, এমন সময়ে তাঁর ঘরের দরজায় বেল বাজল। তাঁর আর্দালি খবর দিলে একটি ভদ্রলোক আর একটি মুসলমান ফেরিওয়ালা দাঁড়িয়ে।

"কি চায় ?"

"হুজুরকে কি বলবে। জরুরী।"

রোগী ভেবে ডাঃ এ্যরন সম্মতি দিলেন।

ঘরে ঢুকল কলকাতার ফুটপাথে যেমন লুঙ্গিপরা ফেরি-ওয়ালা দেখা যায়, পুরনো মাল বিক্রী করে, তেমনই একটি যুবক। তাঁর সঙ্গের লোকটির মাথার চুল পাকা, বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। এমনই ভগ্নস্বাস্থ্য, কিন্তু চোখ দুটি মমতায় ও করুণায় আচ্ছন্ন। পরনে বাঙালী ভদ্রলোকের সাজ—ধুতি, শাদা শার্ট আর পায়ে বিদ্যাসাগরী লাল চটি।

ডাঃ এ্যারন মুখ তুলে চাইলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে মুসলমানটি বললে—"আপনার কি কোনও ডাক্তারি বই চুরি গেছে?"

ডাঃ এ্যারন অবাক—"কই, না!"

লোকটা তার হাতের তিন-চারখানা বই একসঙ্গে সামনের মেঝেয় নামিয়ে বলল—"দেখুন ত, এ বই আপনার কিনা!"

নেহাৎ কর্ত্তব্যবোধে ডাঃ এ্যারন একখানা বই তুলে নিলেন। দেখেই কিন্তু চমকে উঠলেন। তার পর সোজা হয়ে বসলেন। অন্য বইখানা হাতে নিলেন। দু'চার বার নাড়াচাড়া করেই হঠাৎ তৃতীয়খানার মলাট দেওয়া কাগজ খুলে ফেলে দিতেই কয়েকটি গোলাপের পাঁপড়ী পড়ে গেল। সেগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে হাতের তেলোয় রেখে শুঁকতে চাইলেন। গন্ধ না পেয়ে বললেন—"এতদিন কি গন্ধ থাকে?"

আ...লি বুঝতে না পেরে বললে—"হুজুর!"

সম্বিৎ পেয়ে ডাঃ এ্যারন বললেন—"কোথায় পেলে এ বই?"

লোকটা সোৎসাহে বললে—"কেন হুজুর? আপনার বই?"

কথা না বলে ধীরে ধীরে ডাক্তার এ্যারন কোলের উপর বইখানা রাখলেন। হাতের মুঠোয় গোলাপ পাঁপড়ি তখনও গুঁড়ো হচ্ছে।

লোকটা বললে—"এমনি বই দশ বারোখানা এই লোকটা এনেছে। আমি ত জানি হুজুর এ সব কত দামী বই। সবই যে ডাক্তারির বই। বড় বড় অক্ষরে এ, এ, লেখা। ভুল কি হয়? লোকটা কিছুতেই কবুল করতে চায় না কার বই। তাতেই ত সন্দেহ হ'ল! এই কারবারি একজন খেয়াল করে বললে আপনার নাম এ, এ, আপনি ডাক্তার, তাই আপনার কাছে এসেছি। আমার দোকান মার্কেটের বাইরে ফুটপাথে। আপনার নাম এ পাড়ায় ভাল করেই জানা হুজুর। আপনার বই—আপনারই বাড়ীর সামনে বেচে যাবে, একেবারে সামনাসামনি, তাজ্জব হিম্মৎ লোকটার। পুলিসে খবর দি' হুজুর?"

ডাঃ এ্যারনের তখনও কোন সম্বিৎ নেই। তিনি কেবল একখানা বই রাখেন, অন্যখানা দেখেন। যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছেন। লোকটার কথাও তত মন দিয়ে শোনেন নি।

ডাঃ এ্যারনের আত্মবিহ্বল ভাব দেখে আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন—"এ বই কি আপনার চেনা?"

"চেনা? হ্যাঁ খুবই চেনা। তবে আজকের কথা ত নয়। ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। আপনি এ বই কোথা থেকে পেলেন? গোলাপ পাঁপড়িগুলোর গন্ধ নেই দেখতে পাচ্ছি।"

"এ বই? এ আমার পৈতৃক। আমার পিতা ডাক্তারি পড়বার সময় কিনেছিলেন।"

"আপনার পিতা?" বিস্মিত এ্যারন জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার পিতা? জীবিত তিনি?"

প্রভাহীন দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে ভদ্রলোক বললেন—"জীবিত? না, জীবিত কি করে হবেন? মা বিধবা। —নাঃ আমার পিতা জীবিত নেই। ঠিক জানি না।"

"মা বিধবা, অথচ পিতা জীবিত কিনা ঠিক জানেন না। আপনি কি উন্মাদ না জোচ্চোর?"

ফেরিওয়ালা ব্যস্ত হয়ে বললে—"হুজুর, লোকটা বিলকুল হাম্‌বাগ। পুলিসেই দিন। ডাকি পুলিস?"

ডাঃ এ্যারন বিরাট চিৎকার করে বললেন—"পুলিস? এ ব্যাপারে পুলিস কি করবে? এ সব কি তোমার বই? তোমার এত গরজ কেন? খসে পড়।"

লুঙ্গীপরা লোকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল—"আজ্ঞে আমি ত ভাল জেনেই এসেছিলাম। হুজুরের হারানো বই পাইয়ে দিয়ে কিছু বকশিশের আশা ছিল হুজুর।"

"বকশিশ? বকশিশ চাই?" ছুঁড়ে ফেলে দিলেন পাঁচ টাকার নোটখানা।—"ভাগো, যাও।"

সেলাম দিয়ে লোকটি ত পালিয়ে বাঁচল।

সেই ভদ্রলোক তখনও দাঁড়িয়ে।

বাপ তার বেঁচে আছে কিনা জানে না। মা বিধবা তবু কেন...

ডাঃ এ্যারন লোকটিকে বললেন—"বসুন।" কিন্তু এই বসুন বলার আগে আধ ঘণ্টা সময় এমনই কেটে গেছে। এ বুড়োও জানে নি কোথা দিয়ে কেটেছে, ও বুড়োও জানে নি কোথা দিয়ে কেটেছে!

হঠাৎ ডাঃ এ্যারন বললেন—"এ রকম বই আপনার আর ক'খানা আছে?"

ভদ্রলোক বললেন—"দুটো আলমারী ভর্তি। আমার মাতামহ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই আমার পিতৃদেবকে পড়ার জন্য এ বই কিনে দেন—আমার মাতৃদেবী স্মৃতি হিসেবে এ বই কখনও কাছছাড়া করেন নি।"

"তবে আজ করছেন কেন?"

"আজ? আজ বড় দুর্দিন। যুদ্ধের পর ব্যাঙ্ক ফেল, পূব বাংলার ভাগ, সব মিলিয়ে যা ছিল এখন তার ছায়াও

নেই। আমার যোগ্যতাও সামান্য। কখনও কোনও কাজ শিখি নি। অ-কাজের নেশায় পরিপক্ব। বাগান, বাজনা আর মা এই তিন নিয়েই জীবন কাটিয়েছি। বিবাহ করার কথাও কখনও মনে আসে নি ; অ-কাজের নেশা যাদের পায় তাদের এমনই হয়। মা-ই আমার সব আনন্দে আনন্দময়ী। কিন্তু আর বুঝি থাকে না আনন্দ। দুর্দিন চরম। মায়ের কষ্ট আর দেখতে পাচ্ছি না, তাই লাইব্রেরিটা বিক্রী করে কিছু সংগ্রহ করে একখানা দোকান করে চালাবো ভাবছিলাম।"

"এই বয়সে কি দোকান করবেন আপনি? ব্যবসা বাণিজ্যও যে জানার দরকার হয়।"

"কলকাতায় বিদেশী ভাষার বইয়ের দোকান নেই।— সেই দোকান আর কিছু বিদেশী সাময়িক পত্রিকা।"

"আপনি বিদেশী ভাষা জানেন?"

"মা জানেন, তিনিই শিখিয়েছেন।"

"আপনার মা বিদেশী ভাষা জানেন? চমৎকার! কি কি ভাষা জানেন?"

"ইংরিজী ত জানেনই, ফরাসী, জার্মান আর ইটালিয়ানও জানেন।"

"বেশ ভাল জানেন?"

"আমি তাঁরই কাছে শিখেছি। আমি ভাল জানি বলে অনেকে বলে।"

"হঠাৎ তিনি বিদেশী ভাষা শিখলেন কেন?"

"বোধ হয় সখ ছিল। বলতেন—সব জানতে শিখতে হয়। কখন কোথায় দরকার হয় শেখা ভাল। আমাদের বংশে বহু ভাষা শেখা নাকি নতুন নয়।"

"বাঃ বাঃ, তা হলে ত আপনি কাগজেও লিখতে পারেন।"

লোকটি বললে—"না, আমি গুছিয়ে কিছুই করতে পারি না। ডাক্তাররা বলেন, আমার মন ও চিত্ত অশান্ত, অবাধ্য আর অসুস্থ। মাতৃগর্ভকালীন জীবনেই আমার একটা বড় ধাক্কা লাগে, মানসিক ধাক্কা।"

"তাই নাকি? কেন?"

"সঠিক জানি না, তবে মায়ের পক্ষে একটা বড় ধাক্কা, যার ফলে আমার মা প্রায় পুরো গর্ভকালই অর্দ্ধউন্মাদিনী ছিলেন। তাতেই লোকে ভাবত আমি যীশু বা শ্রীচৈতন্য গোছের কিছু একটা হব। হলাম অকর্মণ্য!"

"না, না, অকর্মণ্য কেন? নিজেকে অত ছোট ভাবতে নেই, বাইরে থেকে কেই-বা আমরা কাকে চিনি?"

"কিন্তু আমি ত কোন কাজেই এলাম না। মানুষের যখন কাজ করার বয়স তখন ত আমি একেবারেই বিহ্বল ছিলাম। অল্পেই সংজ্ঞা হারাতাম। এখন অনেকটা ভালই বরং।"

"হ্যাঁ, এখন থেকে ভালই থাকবেন। ভয় করবেন না।" ডাক্তারের কণ্ঠে ভরে উঠল সান্ত্বনার মধুতাপ।

লোকটি বলল—"কিন্তু একটা কথা জানার ভারি ঔৎসুক্য হচ্ছে। জানতে পারি কি?"

হঠাৎ ডাঃ এ্যরন অনুভব করলেন যে, তাঁর প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং তাঁর সমস্ত জীবনের আয়াসলব্ধ ইউরোপীয় শালীনতার বিরুদ্ধে আপাত অনাবশ্যক প্রশ্নজালে তিনি এই বাঙালী বৃদ্ধকে ব্যতিব্যস্ত করেছেন, তাঁর পারিবারিক সংবাদ সম্বন্ধে তাঁকে উদ্ব্যস্ত করেছেন। অথচ এই ভদ্রলোক তাঁর সম্বন্ধে একটি কথাও ত জিজ্ঞাসা করেনই নি, বরং এতক্ষণে একটি প্রশ্ন করার জন্য সবিনয় অনুমতি চাইছেন। ডাঃ এ্যরন বললেন—"অবশ্যই, কি বলুন?"

"আপনি বললেন বইয়ের মালিককে আপনি চেনেন। জানতে পারি কি, কি ভাবে আপনি তাঁকে চেনেন? আপনি ত জার্মান ; ইহুদী ত বুঝতেই পারছি। লোকটাকে যে বললেন, বইগুলো আপনার সে ত আমাকে ওর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই বললেন। কিন্তু কি করে চেনেন তাঁকে?"

"কি করে জানলেন আমি জার্মান ইহুদী?" প্রশ্ন করেন ডাক্তার ইংরেজী ছেড়ে জার্মানে।

ভদ্রলোকও ইংরেজী ছেড়ে জার্মানে বললেন—"আপনার ইংরেজী বলার ধরনেই। নামে বোঝা যায় ইহুদী ; এ্যরন নাম ইহুদীর হয়।"

"কি করে জানলেন?"

"মাকেই বলতে শুনেছি।"

"আপনার মা বুঝি এ্যরন নামের জার্মান কারুকে চেনেন?"

হেসে লোকটি বলে—"না না ; মা সে ধরনেরই নন। মা একেবারে সেকেলে। খাটি বাঙালী হিন্দু মহিলা। তবে মায়ের জানার পরিমাপটা আমাদের ধারণার বাইরেকার জিনিস।"

"তাই নাকি?" বলে ডাঃ এ্যরন আবার কোন্ চিন্তা-সাগরে ডুব মারলেন।

বৃদ্ধ আবার বললেন—"আমার পিতার বই আপনার চেনা, কি করে চিনলেন?"

"চেনা এই হাতের লেখা। এই লোকটি প্যারিসে পড়বার সময় আমার সহপাঠী ছিলেন। তাই এ হস্তলিপি আমার পরিচিত। আপনার অমত না হলে আপনার

লাইব্রেরি কিনে নিতে আমার অমত নেই। আমি এখনও চিকিৎসা করি কিনা! বইগুলি আমার কাজে লাগবে। তা ছাড়া আপনি ত আমার আত্মীয়-বন্ধুর সন্তান। আমাদ্বারা যদি কোনও উপকার হয়...”

বৃদ্ধ অভিভূত হয়ে বললেন—“বড়ই অনুগৃহীত হলাম।”

“দাম?” ডাঃ এ্যরন জিজ্ঞাসা করেন।

“যা দেন; আপনি ত বইয়ের দাম জানেন। আপনি আর কি কম দেবেন? আপনি ঠকাবেন না, আমি জানি।”

হেসে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন—“কি করে জানেন?”

ভদ্রলোক বলেন—“আপনার বয়স, আপনার চেহারা, আর আপনার চোখের দৃষ্টি।”

“কি পেলেন এই দৃষ্টিতে?”

“কি? কি করে বলব? অনেক দিন ধরে চাইছিলাম এমনই কারুকে দেখি। হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার পর মন যেন বলছে যাকে চাইছিলাম সেই লোকটিই এই।”

হাসতে হাসতে ডাক্তার বললেন—“তাই নাকি? তাতেই বুঝলেন ঠকাব না? যারা ঠকায় তারা এমনি চেহারা নিয়েও ঠকায়। যান আপনার মায়ের কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব বলবেন। সব বই, দুটো আলমারির সব বই, ঐ মেহগনির আলমারিসমেত কত দাম?”

ঘাবড়ে গিয়ে বৃদ্ধ বললেন—“কিন্তু আলমারির কথা, মেহগনির আলমারির কথা আপনি কি করে—”

উত্তেজিত হয়ে ডাঃ এ্যরন বলেন—“বলবেন দাম দেব আঠারো হাজার ছ-শ’ তিন টাকা আর দু’ছড়া সোনার মালা।—এতে হবে কি, হবে কি এতে? জিজ্ঞাসা করবেন।”

বিহ্বল বৃদ্ধ বলেন—“করব; কিন্তু আপনি এ সব জানেন...”

“অনেক জানি ছোকরা, অনেক জানি। কাল দুপুরের মধ্যে খবর না দিলে হয় ত এ জিনিস কেনা আর হয়ে উঠবে না। সময় নেই—কাল দুপুর; কেমন?”

লোকটি উঠে বেরিয়ে যাবেন। ডাঃ এ্যরন দোর খুলে দিচ্ছেন। দেখলেন সিঁড়ি দিয়ে তাঁর বন্ধু অরূপরতন উঠে আসছেন। লোকটি বেরিয়ে গেল। অরূপরতনকে নিয়ে ডাঃ এ্যরন তাঁর বসবার জায়গায় ফিরে এলেন।

অরূপরতন ত ডাক্তারকে পায়ে হেঁটে কারুকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দেখে অবাক।

“দেখলে অরূপ, কে নেমে গেল?” বিষণ্ণ ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার।

“কে বল ত? তুমি উঠে এসে এগিয়ে দিচ্ছ, বিসমার্ক কি জিহোভা নন ত?” দাড়িতে হাত দিয়ে অরূপরতন জিজ্ঞাসা করেন।

উদাসকণ্ঠে ডাক্তার বলেন—“বন্ধু, আজ তুমি এমন এক-জন লোককে দেখলে যার মত হতভাগ্য আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই, যদি না তুমি আমায় ধর।”

অরূপ বলল—“তোমার জীবন ত নাটক আর নাটকীয় ভাবে ভর্তি। এও তারই একটা হবে হয় ত। সে কথা পরে হবে। আপাততঃ তোমায় যা জানাতে এলাম। শ্রীমতী কাল এসে পৌঁছচ্ছেন। প্লেন যদি কাল ঠিক সময়ে পৌঁছয়, আমি তাঁকে নিয়ে তোমার ঘরে ঢুকব বিকেল পাঁচটায়।”

“শুনে আমার প্রাণ জল হয়ে গেল।”

“মিসেস্ এ্যরনকে এত ভাল লেগেছিল এককালে, আজ এত খারাপ লাগল কেন?”

এ্যরন বসে পড়েছিলেন তাঁর আরাম-কেদারায়, পাইপটায় জোর টান দিচ্ছিলেন। “সে ভাল লাগার রোমাঞ্চ আমার আজও মনে হয়। তখন মনে হয়েছিল আমি যেন মন্ত্রে আবিষ্ট ইচ্ছাশক্তিহীন চলমান পিণ্ড। তাই ত রুথের সঙ্গে প্যারিস ত্যাগ। রুথের প্রথম প্রেম; মনে নেই তোমার অরূপ সে সব দিন?”

খুব মনে ছিল অরূপের। কোনমতেই সেই দুরন্ত প্রেম থেকে অরূপ তাকে ফেরাতে পারে নি। বাংলা দেশ থেকে চিঠির পর চিঠি আসে। অরূপের ওপর দিয়ে কি ঝড়ই গেছে। অরূপের মাধ্যমে জামাতাকে ফিরে পাবার কত চেষ্টা একনাথের শ্বশুরের। হঠাৎ একনাথ বিশাল ইউরোপে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অরূপ একলা দেশে ফিরেছে। পারে নি একনাথের খবর আনতে। চেষ্টা করেছে একনাথের শ্বশুর আর স্ত্রী কনকের সঙ্গে দেখা করে। অতখানি আশা জলাঞ্জলি হয়ে যাবার পর একনাথের পরিবারের প্রতি অরূপের কোনও কর্তব্য আছে কিনা জানতে চন্দননগরে গিয়ে তাদেরও কোন খবর পেল না সে। সে কথাও একনাথকে জানাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোথায় একনাথ কে জানে?

চন্দননগরের বুকে এই বিপৎপাত অক্ষয় হয়ে রইল। হাই কমিশনার, ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তর, সর্বত্র খোঁজ করার চেষ্টা ব্যর্থ হ’ল। হয় ত আরও চেষ্টা চলতে পারত; তার মধ্যে এল প্রথম মহাযুদ্ধ। সব গুলিয়ে গেল অতলে। কোথায় অরূপ, কোথায় কনক, কোথায় কনকের বাপ, কিছুরই আর হদিস রইল না।

“অথচ আজ আমি কোথায়? রুথ ভেবেছিল সন্তান

পাবে, গৃহিণী হবে। সংসার রচার মত মেয়েই ছিল বটে। ও জানল সন্তান হবে না, সার্জিক্যাল অপারেশনও হবে না। প্রথম প্রথম ভেঙে পড়লো শুধু। তার পরে রাগ, আমার ওপরে রাগ। বিধাতার চক্রে ওতে আমাতে দেখা, বিধাতার চক্রে প্রেম। ওর জন্য, ওর দেহের ব্যর্থতার জন্য, আমার এই ব্যর্থতাকে ও যেন রাগ দিয়ে চেপে পিষে মারতে চায়। উন্মত্ত আগ্নেয়গিরির মত ওর জীবনের উদ্গার ওকে আমাকে পারিপার্শ্বিককে জ্বালিয়ে দিতে লাগল। ইহুদীরা ত মদ বিশেষ খায় না, আর মেয়ে মাতাল তখনকার দিনে এই জাতটার মধ্যেও একটা ব্যভিচার বলেই গণ্য হ'ত। যে দিন রুথ প্রথম মদ খেল সেদিন খুবই বিস্মিত হলাম। কিন্তু এখন মদের মধ্যে ডুবেই থাকে ও। আমায় মনে করে যেন ওর জীবনের হলাহল। অথচ আমি এখনও, এখনও অরূপ ওকে দেখি সেই প্রথম দিনের রুথ। ভুলতে পারি না ওর দৌলতে আমি প্রেমের কি রূপ সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি…"

অরূপ বিরক্ত হয়ে বলে—"থাকগে তোমার স্তবগান। হাজার বার শুনেছি, আবার কেন ?"

"বলতে দাও, অরূপ। আর আজ আমার বলার একটা বন্যা এসেছে। বিশ বছর ধরে নিবিড় করে বেঁধেছে ও; মনে পড়লে মনে পড়ে যায় এ দেশের সীতা-শৈব্যার কথা। তখন বার্লিনে স্বল্প আয়, চলে না। ইহুদীরা ওকে ত্যাগ করেছে, জাতিগত ব্যাপারে ওরা এত গোঁড়া। সেই অস্বচ্ছলতার মধ্যে হাসিমুখে ও আমায় নিয়ে সংসার করেছে। বিবাহ হ'ল যখন আমাদের পরিপূর্ণ আয়। সেদিন যেন যুদ্ধজয়ের আনন্দ। সে আনন্দের মধ্যে আমরা নাম বদল করলাম। ও হ'ল রুথ আইচ-এ্যরন, আমিও হলাম এক-নাথ আইচ-এ্যরন। এত দিনে আইচ-এ্যরন এ্যরনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু হু-হু করে তখন উপার্জন। আমার যশ সমগ্র মধ্য ইউরোপে ব্যাপ্ত। অর্থ উপার্জন করে ঐশ্বর্য একত্র করলাম। ঐশ্বর্য হয় অরূপ, হয় না শান্তি। সন্তানহীন জীবনে নিথর মরুভূমি। মা হবে না জানার পর পাগল হয়ে উঠল রুথ। মদ খেতে খেতে ও যেন পিশাচী হয়ে উঠল। কত রোগে পড়ল, মরতেও ত পারত, মরল না। আমার জীবনে শেলের মত বেঁচে রইল। একটা যুদ্ধ গেল, দুটো যুদ্ধ গেল। ইহুদীর মেয়ে পালিয়ে রইল আমেরিকায়। ডাক্তার বলে নাৎসীরা আমায় ছাড়ে নি। ব্যাভেরিয়ার এক বন্দীশালায় ডাক্তার হিসাবে আটকে রাখল। রুশেরা ব্যাভেরিয়া দখল করারপর যুগোশ্লাভিয়া-ইরাণ হয়ে জন্মভূমিতে ফিরে আসি। এসে অবধি প্রার্থনা করেছি রুথের সঙ্গে যেন আর আমার দেখা না হয়।…শুধু মরতে চাই এখন।

"গিয়েছিলাম চন্দননগর। শিশুবয়সের পরিচিত স্থান, নাড়ীর ধ্বনি বাজে পথের চলায়। সেই স্কুল, চার্চ, বটের তলা, বাজার। সেই ঘাটের চাতাল যেখানে তোমায়-আমায় প্রথম খেলার পরিচয়। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল একটি সন্ধ্যার কথা। বেনারসী-পরা সেই সন্ধ্যাটির সুখময় কনে'-চন্দনের টিপ। স্তিমিত ভ্রূ-লতার তলায় ভীত-শঙ্কিত একজোড়া চোখ। পাছে বিলাতে গিয়ে ডাকিনীদের খপ্পরে পড়ে যাই তাই ভাবী শ্বশুর ও পিতৃদেব পরামর্শ করে গেঁথে দিলেন। বেশ ছিল মেয়েটি। নরম, সুশ্রী, চন্দনের টিপের মত। আমায় ফুলের পাঁপড়ি মুঠোয় মুঠোয় এনে দিত, ওর মাথায় ছড়িয়ে যাতে খেলা করি। প্রথম ছ-শ' তিন টাকা বরপণ ঠিক হয়। বিমাতার সঙ্গে পরামর্শ করে বাবা কি করলেন জানি না, বিবাহ-বাসরে বাবা আমায় আঠারো হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রী করলেন। দুই মায়ের জন্য দু'ছড়া হারও চান। আমার মা বহুদিন আগে মারা গিয়েছিলেন। শ্বশুরমশায় টাকা দিয়ে জামাই কিনলেন। দু'ছড়া হারের মধ্যে এক ছড়া যোগাড় হ'ল, অন্য ছড়া যোগাড় হ'ল না। মনে পড়ে জলজলে ঘটনা। শ্বশুরমশায় হার ছড়ার জন্য সময় চাইছেন, বাবা ইতস্ততঃ করছেন। ফস্ করে সেই বালিকাবধূ তার গলা থেকে হার খুলে আমার বাবার হাতে রাখল। বাবা হার নিলেন। আঠারো হাজার ছ-শ' তিন টাকা আর দু'ছড়া সোনার হারে আমি শ্বশুরের কেনা হয়ে গেলাম। তখন ভেবেছিলাম বিশ্বসংসারে এই মেয়ে ছাড়া আর কোথায় কি থাকতে পারে! শ্বশুরমশায় বই কিনে দিলেন, দিলেন মেহগনির দুটো আলমারি, তাতে বই থাকত। ডাক্তারী বই, ফরাসী, ইংরেজিতে লেখা। সেসব বইয়ের ভেতরে কনকের রাখা গোলাপ পাঁপড়ি। বইয়ে গোলাপ পাঁপড়ি রাখা তার একটি সখ ছিল। এই-ভাবে মাত্র শেষ বছরটি আমি আর কনক স্বামীস্ত্রী ভাবে থাকতে পাই। নইলে কনক থাকত তার হস্টেলে, চন্দন-নগরে; আর আমি থাকতাম কলকাতায়। শ্বশুরমশায়ের কড়া শাসন ছিল।…তার পর প্যারি—তিন বছর—তার পর নিরুদ্দেশ। তার পর জার্মানী—ওঃ কত দীর্ঘ, দীর্ঘ কাল। মন থেকে কনক মুছে গিয়েছিল। চন্দননগরে, কলকাতায়, কোথাও ভাবি নি কনক আবার জীবনে ফিরে আসবে। মনের সুড়ঙ্গপথের এফোঁড়-ওফোঁড় হয়েছিল রুথ আর রুথের আতঙ্ক! অতীত আর ভবিষ্যৎ। তার প্রেমও যত দারুণ, তার অত্যাচারও তত নিদারুণ, অথচ…"

থেমে গেলেন ডাক্তার এ্যরন।

"অথচ— ?" প্রশ্ন করেন একনাথ।—"অথচ কি ?"

"অথচ আজ সিঁড়ি দিয়ে যাকে নামতে দেখলে সে কে জান অরূপ ?"

"কে সে ?"

"আমারই ছেলে।...হ্যাঁ, হ্যাঁ। হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি ? কনকের গর্ভজাত আমারই সন্তান। আমি যখন কনককে ত্যাগ করে যাই তখন কনকের সন্তান সম্ভাবনা হয়। আমি জানি নি। আর প্যারিতে যাবার পর আমি যে ডুব-সাঁতারে ডুব দিলাম, উঠলাম একেবারে আজ এপারে ;—নইলে কনক আর আমি, মাঝে সমুদ্র।"

"ভুল করছ একনাথ। সমুদ্রই নয় শুধু। সমুদ্রের মাঝে দ্বীপের মত আমি তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সন্তানের কথা। আমি জানতাম। প্রতিবার হেসে উড়িয়ে দিয়েছ। একটা গুণগান তোমার আমায় করতেই হবে—রুথকে নিয়ে যখন ডুবে ছিলে তখন সব নোঙর ছিঁড়েই ডুবেছিলে। সততার অভাব তোমার হয় নি। সেই ছেলে ? বুড়ো ছেলে বল। পঞ্চাশ বছর হবে।"

"হোক পঞ্চাশ। আরও বেশী হোক। সন্তান ত! সে ছেলে জার্মান, ইটালিয়ান, ইংরেজী, সংস্কৃত সবই জানে। তার মা শিখিয়েছে। আভিজাত্যে টলমল করছে। অভিনব সভ্যতার অভিনব অবদান। মা মানুষ করেছে—ভারতের মা মানুষ করেছে ভারতের ছেলে তার পিতার সমকক্ষ হবার স্পর্দ্ধায়..."

উৎফুল্ল হয়ে অরূপ বলেন—"চিত্রাঙ্গদা মানুষ করেছে বভ্রুবাহনকে!"

"সেই ছেলে খেতে না পেয়ে আজ বই বেচতে এসেছে। বাপের পড়া ডাক্তারী বই। সেই মেহগনির আলমারিতে বাঁধা বই। তার গায়ে এ, এ, লেখা। বইওয়ালা চোর ভেবে আমার ছেলেকে আমারই কাছে ধরে এনেছে।"

"বললে তুমি পরিচয় ?" আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করেন অরূপ।

"পারি ? পারি পরিচয় দিতে ? অপরাধী আমি, এত সহজে পারি ? যে মহিমময়ী নারী নীরব তপস্যায় স্বামীর সন্তানকে হোমশিখার মত সঞ্চয় করে জ্বালিয়ে রেখেছে এই পঞ্চাশ বৎসর কাল, যে মহিমময়ী নারী স্বামীর আদর্শে এতটুকু কালিমা না দিয়ে সুশিক্ষা দিয়ে ছেলেকে লালিত করেছে, সে আজ পঞ্চাশের পাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিল ছেলেকে দ্বীপান্তরের বন্দীর কাছে—তার কাছে আমি পারি আমার গ্লানিময় পরিচয় দিতে ?"

"তুমি না পার আমি পারি। বল ঠিকানা, আমি যাব।"

"জানি তুমি যাবে। যাবে জেনেই ইচ্ছে করেই আমি তার ঠিকানা নিই নি। কাল আসতে বলেছি বই নিয়ে। আসবে, কি বল ? আসবে না ?"

"নাম কি ?"

"তাও জিজ্ঞাসা করি নি। না করেছি নেই—নেই। আসবে ত সে ? কি বল ? আসবে, আসবে। আমি জানি আসবে!"

তাই এল।

পরের দিন চারটের সময়। আর্দালি কার্ড আনতেই ডাক্তার এ্যরন খুব শক্ত হয়ে আত্মসম্বরণ করে বললেন—"ভিতরে আন।"

সেই ভদ্রলোক!

এসেই এ্যরনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। দুই বুড়ো তখন দু'জনে জড়িয়ে ধরল।

অনেকক্ষণ।

দু'জনেই বসলেন।

ডাক্তার এ্যরন বললেন—"কি হ'ল ? বই ?"

ভদ্রলোক বললেন—"মা বললেন বই বেচবেন না, বই তাঁর। আমায় কিনতে পারেন। আমি তাঁর তত আপন নই, তত মায়ার নই, ঐ বইগুলো যত আপন, যত মায়ার।"

ডাক্তার এ্যরন বললেন—"পারবেন তোমার মা তোমায় বেচে দিতে ?"

"মা পারবেন।"

"কি করে জানলে ?"

"আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।"

"মা কি বললেন ?"

"মা বললেন 'ছেলে কিনতে যারা জানে তাদের বেচতেও জানতে হয়'।"

শক্ত হয়ে ডাক্তার এ্যরন বললেন—"কত দাম দিতে হবে ?"

ইতস্ততঃ করতে লাগলেন ভদ্রলোক।

ডাক্তার এ্যরন বললেন—"আর সময় নেই, তাড়াতাড়ি বল কত দাম।"

"মা বলেছেন, তাই আমি বলতে সাহস করছি—"

অসহিষ্ণু হয়ে ডাক্তার বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ বল। সাহস কর, দেরী করো না। যত দাম হয়, যত দাম—আমি দেব। আমি তোমার মার দাবী পূরণ করব।"

"মা বললেন 'একটি নারীর সম্পূর্ণ যৌবন!' দিতে পারেন ? পারেন দিতে আপনি ?"

কাঁপতে কাঁপতে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন। "পারেন

না আপনি ; আংরাকে পল্লবিত মঞ্জরী করে তোলা আপনার সাধ্যায়ত্ত নয়।"

ডাঃ এ্যরন উঠতে পারলেন না।

কোলাহল শুনে চোখ চেয়ে দেখেন অরূপ আর রুথ এ্যরন এসে পড়েছে।

এসেই রুথ চীৎকার সুরু করেছে—"নোংরা—ইঁদুরের জাত সব—কেবল নোংরামি—আসছি জেনেও নীচে নেমে রিসিভ করতে পার নি। লজ্জার কথা! আমার চেয়ে দামী সঙ্গ ঐ বুড়োটার—নোংরা বুড়োটা?—কই হুইস্কি-টুইস্কি—কই, বেয়ারা!..."

বেয়ারা দৌড়ে এসে হুইস্কির গেলাস তৈরি করতে লেগে গেল।

অরূপ বলল—"আজও ত লোকটিকে নেমে যেতে দেখলাম। নাম-ঠিকানা নিয়ে রেখেছ ত?"

"না, আজও ভুলে গেছি।" বললেন ডাক্তার এ্যরন।

"আর বইয়ের লেনদেন?"

উদাস দৃষ্টি মেলে বুকফাটা কণ্ঠস্বরে ডাক্তার এ্যরন বললেন—"মিটিয়ে দিয়েছি, এ জন্মের মত মিটিয়ে দিয়েছি!

শুধাই তোমারে বন্ধু আমার

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

মনে হয় তুমি কত আপনার কত জনমের সাথী,
অনাদি-অতীত যুগ-যুগ ধরি' আছে যেন পরিচয় ;
কত শত নব জনমের মাঝে জীবন-বাসর রাতি
মিলাইয়া গেছে, এ জীবনে তাই নূতন অভ্যুদয়।

শুধাই তোমারে বন্ধু আমার, কেন এত ভালোবাসো ?
আপনার মত কেন এত ভাবো, কেন মোরে কাছে টানো ?
'এই দুনিয়ার ভবঘুরে আমি' যত বলি তুমি হাসো,
আমি ত বুঝি না মনের খবর, তুমি শুধু একা জানো।

বিশ্বপথের পথিক, তবুও মনে যেন নেশা লাগে,
মনে জাগে যেন নীড়ের স্বপ্ন বসুধার এক কোণে,
তুমি আছ মোর প্রীতির অমিয়া জীবনের পুরোভাগে ;
বেহাগের মাঝে হৃদয় আমার আশাবরী যেন শোনে।

ও সব কিছু না—বন্ধু আমার শোনো বলি তুমি শোনো,
মনের ও সব খেয়াল-খুশীর খাপছাড়া পাগলামি ;
ধরণীর ধূলি-ধূসরিত প্রেম আমাদের নেই কোনো,
স্বার্থবিহীন সার্থক প্রীতি ঝরে শুধু দিবাযামী।

রূপে-রসে ভরা এই ধরণীতে মিলিব না মোরা কভু,
মিলিব যে মোরা প্রাণের তীর্থে হৃদয়ের মোহানায়,
জগৎ জানিবে আমরা অমিল, মিলেছি আমরা তবু,
পরিচয়-হীন আমরা অজানা, পরিচিত অজানায়।

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

এগার

৩০শে আগষ্ট '৫৪। নেপলসে এসেছি পরশু, কিন্তু আজ সকাল পর্য্যন্তও শহর পরিক্রমার সুযোগ পাই নি। অথচ লোকে বলে, See Naples and then die. দেখার সময় যদি নাই পাই ত যাবার বেলায় ভাবা যাবে, লোকে কি না বলে!

নেপলসের সমুদ্রতীরের রমণীয়তা নাকি অতুলনীয়! দূর থেকে ভিসুভিয়াসকে এক নজর দেখারও সময় পাই নি। সমুদ্রতীরে যে যাই নি! এখানকার সাদাসিধে ও মিশুকে লোকদের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলারও অবসর পেলাম না। নেপলসের খানাপিনার যে এত সুখ্যাতি পশ্চিম দুনিয়ায়, তারও একটু প্রমাণ নেব, সে সুযোগও করে নিতে পারিনি। সান কার্লোয় অপেরা না হোক অন্তত ওর সাজসজ্জাটাও ত দেখে আসা উচিত ছিল, তাও ত গেলাম না।

এত সব হবে কোত্থেকে! আমার আমি ত পরশুই পৌঁছে গেছি। কিন্তু আমার মিলান থেকে পাঠান মালপত্রগুলো এল কিনা, এই খবরটুকু জানবার জন্তই ত কাল সারাটা দিন এ-রাস্তা ও-রাস্তা করতে হ'ল। এক ট্রাভেল এজেন্সির মারফত পাঠিয়েছিলাম। সারা দিনে পরার্থে অনেক অর্থ দিলাম। অনর্থও দু' একটা বাধালাম। সন্ধ্যের মুখে প্রায় অসমর্থ অবস্থায় হঠাৎ সেই ট্রাভেল এজেন্সীর অফিসের সামনে এলাম। অথচ ঐ রাস্তা দিয়েই কম করে বার দুয়েক খুঁজে গেছি, কিছুই চোখে পড়েনি। অবিশ্যি চোখে পড়ার কথাও নয়। অফিস দোতলায়, তার ওপর সিঁড়ির মুখে দু'ইঞ্চি চৌকো প্লেটে বিবর্ণ অক্ষরে অফিসের নামটি লেখা। অলৌকিক ক্ষমতা না থাকলে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভবই।

যাই হোক, শেষ খবর হ'ল আমার লোটা কম্বলগুলি বাহাল তবিয়তেই জাহাজ কোম্পানীর অফিসে জমা আছে।

তাই ত আজ সকালে লয়েড ত্রিয়েস্তিনোর অফিস খুলতেই হাজির হয়েছি। না, মাল ঠিকই আছে। বেমালুম বেহাত হয় নি।

—আরে, কুণ্ডু যে! এখানে কি করছ?

আমি ত প্রায় চমকে উঠেছি। আকাশ বাণী নয় ত! দেখি, কলকাতার বন্ধু বঙ্কিম ঘোষ।

আমি বললাম—তুমি এখানে কি করছ? ছিলে ত মিশিগানে!

—মধুদার দোকানে ডালমুট কিনছি। মাধবীর চিঠি নিয়ে এসেছে ওর ছোট ভাই। একটু ডালমুট দিয়ে হাতে রাখতে হবে ত?

—ও সব পুরনো ছেঁদো কথা রাখ। কাল 'ভিক্টোরিয়া'তে যাচ্ছিস নাকি?

—হ্যাঁ। সেই রকমই ত কথা আছে। তুই?

—আমিও। ভালই হ'ল।

টিকেটগুলি দেখিয়ে সব ঠিকঠাক করে আমরা রাস্তায় নামলাম।

বঙ্কিম জিজ্ঞেস করল—এখন কোথায় যাবি, কিছু ভেবেছিস?

—চল না পম্পেই হারকিউলেনিয়াম যাই। সন্ধ্যেয় আবার ফিরে আসব।

—চল, পড়েছি তোর হাতে, ঠ্যাঙে কি আর ব্যথা না ধরিয়ে ছাড়বি?

হারকিউলেনিয়াম যাবার বাস ধরলাম দু'জনে। বাস ত নয় যেন টাট্টু। টগবগিয়ে চলেছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেঠো পথে যে বাসগুলি ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, এ বাসের অবস্থা তার চেয়েও বোধ হয় কাহিল। জোরে চলবার আগ্রহ ষোল আনা। প্রচেষ্টা হয় ত বার আনা। কিন্তু মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দে আমাদের ভিরমি লাগে প্রায়।
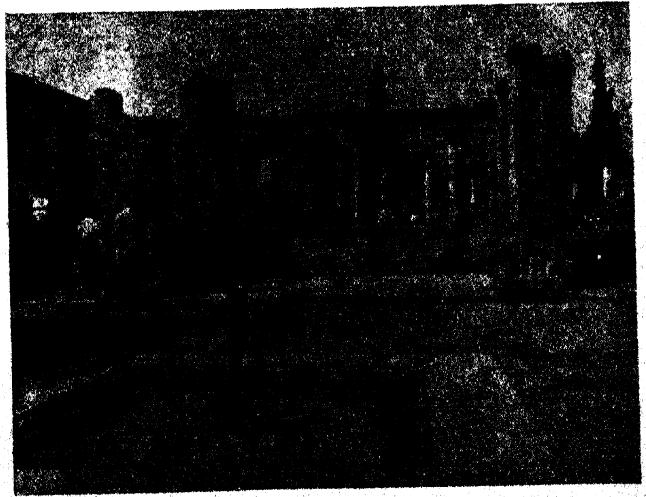
পম্পেই, ইটালী

রাস্তা পাথর বাঁধান। দোকানপাটগুলি যেন পোস্তার আলু-পট্টি। বাসের ভেতরে চারদিকের চাপে সোজা খাড়া হয়ে আছি। রড ধরার কোন প্রয়োজনই নেই।

বঙ্কিমের দিকে আমার তাকাবার সাহসই হচ্ছিল না। মুখ ভেংচে দেবে হয় ত।

ওই হঠাৎ বলল—ও জাহাজের টিকেট দুটো তুই ছিঁড়ে ফেলতে পারিস। এখনি ত একটা ট্রাম কি ট্রাকের সঙ্গে ঠোকর খেয়ে

রাস্তায় কাপড়-শুকানো

বাসটা লোহার স্ক্র্যাপ হয়ে যাবে। আর আমরা পিকাসোর কম্পোজিশন হয়ে নামব।

আমি বললাম—আমাদের দেশের বাসগুলি কি উড়ে উড়ে চলে? এর চেয়েও ঢের ঝরঝরে বাস আমাদেরও আছে।

—আহা, আমি সেটা ত অস্বীকার করছি না। আমি বলছি, এই যে নড়বড়ে বাসটাকে ডার্বির ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, সত্যিই যদি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয় ত তখন কি হবে?

—অ্যাকসিডেন্ট হলে যা হয় তাই হবে। ব্যতিক্রম ঘটবে না নিশ্চয়ই। ডাক্তার এসে মাথায় ফেটি বাঁধবে। মরে গেলে কাগজে নাম ছাপা হবে।

—যা হয় হবে, দুর্গা দুর্গা!

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত অক্ষত শরীরেই হারকিউলেনিয়ামে এলাম। ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয়, ছোট্ট এক টুকরা জনপদ ছিল সে সময়ে। এখন, ভাঙ্গা দেওয়াল, অক্ষত পাথর-বাঁধান সরু রাস্তা, কয়েকটা পরিমার্জিত অথচ জীর্ণপ্রায় আবাসিক বাড়ী—এই হ'ল হারকিউলেনিয়ামের উন্মুক্ত কবর।

এখন ইট কাঠের টুকরো দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ হচ্ছে। কিন্তু ক্ষত সারছে না। বেমানান হচ্ছে। দোষ কার জানি না, মিস্ত্রিরও হতে পারে, হাতুঁড়ি-বাটালিরও হতে পারে। কিংবা আমাদের চোখেরও হতে পারে। হারকিউলেনিয়ামে পরিরক্ষণের চেষ্টা আছে, কিন্তু সে-চেষ্টা প্রায় বিফল বলা চলে।

বঙ্কিম আর আমি ট্রেনে চেপে বেলা একটায় পম্পেই এলাম। পম্পেইতে ট্রেনটা খালি হয়ে গেল। সবই টুরিষ্ট। আবার দেখলাম ট্রেনটা ভর্ত্তি হয়ে গেল। পম্পেই থেকে প্রায় একই সংখ্যক লোক উঠল। আর এত লোক কেনই বা আসা যাওয়া করবে না? দেশে-বিদেশে পম্পেইর নাম ত বহুল বিজ্ঞাপিত। একি আমাদের পাঁচমারি যে, যখন রাষ্ট্রপতি স্বাস্থ্য-অন্বেষণে ওখানে গেলেন তখনই লোকে কাগজ মারফৎ জায়গাটির নাম জানল? নইলে কে পাঁচমারির খোঁজ রাখত? অবিশ্যি পম্পেইর যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, পাঁচমারির বেলায় তা শূন্য। কিন্তু তা হলে বলতে হয়, যে লোক ইতিহাসের অতীত ঘেটে দেখে না সে কি পম্পেই না দেখে ফিরে আসবে! না। এই প্রচার-সর্ব্বস্ব যুগে সব চেয়ে আগে চাই সারা বিশ্বময় ব্যাপক বিজ্ঞাপন।

বঙ্কিম ত প্ল্যাটফর্ম্মে পা দিয়েই বলল—খালি পেটে রোমান সভ্যতার কালচার আমার সইবে না। আগে কিছু খাই চল। অনেক কালচার করেছি।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে পাঁচ সিকে করে দক্ষিণা জমা দিয়ে ধ্বংসাবশিষ্টের যাদুঘর খনিত পম্পেইতে ঢুকলাম।

সামনেই কতকগুলো দেওয়াল, আর্চ্চ, দেওয়ালবিহীন বাড়ীর মেঝে ও উঠোন। এ সবের মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে নানা মাপের থাম। রোমান স্থাপত্য-নিদর্শন যেখানেই আছে, সেখানেই এই স্তম্ভকুলের প্রাচুর্য্য। আর এই সব ধ্বংসাবশেষগুলোর পেছনে অদূরে ভিসুবিয়াসকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। পম্পেই ও ভিসুভিয়াসের মাঝখানে একফালি ঘন সবুজ জমি।

এই গ্রীক-রোমান শহরের এলাকা বেশ বড়ই ছিল। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অ্যাপোলোর মন্দির, জুপিটারের মন্দির, গৃহস্থ-বাড়ী, বিচারালয়, ইত্যাদি। সবই অবশিষ্ট যদিও, গোটা ত কিছুই নেই।

এই ধ্বংসাবশেষের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রায় দু'হাজার বছরের পুরনো পম্পেইর কথা ভাবতে বেশ রোমাঞ্চ হয়। ঐ উদ্যানবাটিকায় বসন্ত সন্ধ্যায় কে যেন লায়ার বাজাত। বাজারের পথে মালিককে তার ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে চাবুক মারতে দেখা যেত। কোন এক

বিশেষ বৈকালিক উৎসবে এম্ফিথিয়েটারের জনকলরবে উল্লাসের জোয়ার বইত।

তার পর উনআশি খ্রীষ্টাব্দের এক অশুভ দিনে হঠাৎ শমন এল। ভিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ঝড় পম্পেই হারকিউলেনিয়ামের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেল। দুটো জনবহুল জনপদের সমাধি হ'ল। আবার কবর খোঁড়া হ'ল। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন

হারকিউলেনিয়াম: ইটালী

বাড়ল। দিকে দিকে প্রচারিত হ'ল পম্পেই শহরের কথা। দর্শক আসতে লাগল।

আর আজ স্বামী-স্ত্রীতে হানিমুনে এসে সন্ধ্যার নিরিবিলিতে লায়ারের শব্দ শোনার প্রয়াস করে। প্রত্নতত্ত্বের ছাত্ররা দেওয়ালের নক্সার গবেষণায় তুমুল তর্ক তোলে নয়ত ইট পাথর মাপজোখ করে। টুরিষ্টরা এক ডজন স্ন্যাপ নেয় ও আধ ডজন পিকচার পোষ্টকার্ড কেনে। আর যার কিছু করার নেই, সে হয়ত তেমন কারও সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে, নয় ত কুটিল কটাক্ষে বিষম অবজ্ঞা-ভরে ভিসুভিয়াসের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে।

৩১শে আগষ্ট '৫৪। আজ বঙ্কিম আর আমি নেপলস্-এর এ-মাথা ও-মাথা চষে ফেললাম। বাছা খাবার খেলাম। সমুদ্র-তীরে নানা রকম লোকের সঙ্গে আলাপ করলাম। দ্রষ্টব্য স্থানগুলোতে একবার করে বুড়ি ছুঁয়ে এলাম।

নেপলসের বিখ্যাত পিৎসা (Pie, সেঁকা মশলা চাপাটি ধরণের খাবার) সত্যিই সুস্বাদু। সমুদ্র-ধারটিও মনোরম। বেড়াবার পক্ষে ম্যারিন ড্রাইভের চেয়েও সুন্দর, বিশেষ করে যে দিকটায় নতুন বাড়ীঘর তৈরি হচ্ছে।

এই শহরের লোক দেখলাম বেশ মিশুক ও কিছুটা সরল। ওরা যেমনি গরীব তেমনি অলস। ভাল খাওয়া ও গান বাজনা করা এদের খুব প্রিয়। গরীব বলেই বোধ হয় কিছু লোক বিদেশীদের ঠকাবার ফিকির খোঁজে। কিছু দেখলাম ভিক্ষাও করে।

দক্ষিণের ঠিক উল্টো উত্তরের মিলানের লোকগুলো। মিলানবাসীরা মোটেই মিশুক নয়। কাজের সময় পথে ব্যস্ততাই বিশেষ করে চোখে পড়ে। ওরা গরীব নয় এবং ভিক্ষা করতে কাউকেই দেখি নি।

এই প্রভেদের কারণও আছে সুস্পষ্ট। ইতালীর শিল্প যা কিছু সবই উত্তরে। দক্ষিণে খালি চাষ ও বাস। অতএব যা খুব স্বাভাবিক তাই ঘটেছে।

নোংরা ও সরু গলি নেপলসে দেখার জিনিস। বোধ করি ইউরোপে আর দ্বিতীয়টি নেই।

সকালবেলায় ফেরিওয়ালা কানে তালা ধরিয়ে বাক্স-গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে যায়। ও নিজে যত চেঁচায় তার চেয়ে জোরে খট খট করে পাথুরে রাস্তায় ওর গাড়ীর চাকা। হবু যুবকেরা বাড়ীর সিঁড়িতে জমায়েত হয়। ওদিকে বাচ্চারা রাস্তার আবর্জ্জনা-রেণু গায়ে মেখে খেলা সুরু করে দেয়। আর সবচেয়ে মজার দৃশ্য হ'ল রাস্তার এপারে-ওপারে দড়ি টাঙিয়ে জামা-কাপড় শুকানো। অবিশ্যি

হারকিউলেনিয়াম: ইটালী

উপায়ও নেই। ওদের বাড়ীতে বারান্দা ত নেই-ই এমন কি খোলা উঠানও নেই। অগত্যা।

এর পরও লোকে কেন যে বলে, See Naples and then die, আবিষ্কার করতে পারছি না।

বার

৪ঠা সেপ্টেম্বর '৫৪। পরশু জাহাজে উঠেছি। বাড়ী ফিরছি কথাটা ভাবলেই কেমন একটা হঠাৎ-পুলকে মনটা নেচে উঠছে। এই সমুদ্রের অফুরন্ত জল ঠেলে ঠেলে আবার একদিন বোম্বাইয়ের ডাঙ্গাতে গিয়ে ঠেকব। 'সুইট হোমে' পা দিয়েই 'এটা কর সেটা কর'র তুফান তুলে বাড়ীর লোকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলব।'

পম্পেই ঃ ইটালী

'লেল্যাণ্ডে'র দোতলায় বসে মনুমেন্টের দিকে তাকিয়ে হয়ত ভাবব, কত যুগ যেন বাংলা বলি নি। নয়ত বাধো বাধো ঠেকছে কেন!

বিকেলের পড়ন্ত রোদে ডেকে দাঁড়িয়ে আর কত কি যে ভেবে যেতাম কে জানে। বঙ্কিম এসে বলল, চল একটু খেলি।

—কি খেলবি?

—টেবল টেনিস।

—চল।

জাহাজে দল পাকাতে বেশী সময় লাগে না। আমাদের দলটাও দিন দুয়েকের মধ্যেই বেশ ভারী হয়ে উঠল। মাদ্রাজের শিল্পী মিঃ পানিকার, গুণ্টুরের পিল্লাই, করাচীর খাঁ সাহেব আর আমরা কলকাতার জনা চারেক। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাত্রে চারবেলা নিয়মিত আড্ডা বসছে। যথারীতি মিঃ পাণিকার ও বঙ্কিম বকবক করে চলে, খাঁ সাহেব ফোড়ন কাটেন, আমি শুনে যাই আর বেশ উপভোগ করি, পিল্লাই হঠাৎ কোন কোন দিন উঠে পালিয়ে যায়।

যাবার সময় অবিশ্যি বলেই যায়—দেখি, কেউ একলা বসে আছে কি না।

আমি জানি, জাহাজে একলা বসে থাকার মত তিনজন আছে। একজন আশী বছরের বৃদ্ধা। অপরটি একটি কিশোরী, ওর একটা পা খোঁড়া, হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়। তৃতীয় জন হ'ল, পিল্লাই। প্রায়ই দেখি, হয় ঐ বৃদ্ধা নয়ত ঐ কিশোরীটির সঙ্গে বসে পিল্লাই গল্পগুজব করছে। আর যখন কাউকেই পায় না, নিজেই একলা বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

জানি না, আর সবার কেমন মনে হয়, কিন্তু আমার কাছে ফেরবার পথে জাহাজের দিনগুলি যেন ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে আসতে লাগল। সব কিছুই কেমন যেন পুরনো মনে হয়। হয় ত আমারই দোষ এটা, সব সময় নতুন কিছু খুঁজে বেড়াবার প্রবৃত্তিটা।

সেই একই রকম আড্ডা বসছে, দফায় দফায় খাচ্ছি, পোর্ট এলে চিঠির তাড়া নিয়ে বসছি ও পোর্টে টহল দিতে যাচ্ছি, লাউঞ্জে সেই কালো কফি আর ঘুরে-ফিরে কনসার্টেরও সেই একই সুর, রাত্রে নিয়মিত 'হাউসি হাউসি' ও 'টম্বোলায়, হারছি জিতছি, জাহাজের অর্দ্ধেক লোক যখন 'সি-সীক্' তখন আমরা গুটিকয়েক প্রাণী এক ফোঁটাও জলীয় পদার্থ না খেয়ে লবঙ্গ চুষে ডেকের উপর খোলা হাওয়ায় বসে আছি। ফ্যান্সি ড্রেস বলের জন্য রোজ একবার করে ভাবতে বসি কি পোষাক পরা যায়, ক্যাপ্টেন্স ডিনারের জন্য জিবটাকে শানাচ্ছি, এই ত সেই খোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-খোড়।

ভূমধ্যসাগর পার হলাম, কিন্তু সুয়েজ খালের যেন শেষ নেই। কবে যে আসবে এডেন, কবে আসবে বম্বে।

১২ই সেপ্টেম্বর '৫৪। আজ ডায়েরীটা খুলে বসেছি। ভাবলাম, আর একবার দেখি, পরিচিতির পাতায় কে কি লিখেছে।

সানরেমোয় যার সঙ্গে বাগান দেখেছিলাম, সেই জার্মান ছেলেটি রুদল্ফ লিখেছে—যে কয়েক ঘণ্টা আমরা একসঙ্গে রইলাম এর কথা আমি কোনদিন ভুলব না। ইচ্ছে হয়, তোমার কথা, তোমার দেশের কথা অনেক শুনি। কিন্তু তুমি ভাল জার্মান জান না, আর আমি ভাল ইটালীয়ান জানি না। তবু যেটুকু শুনলাম, যেটুকু জানলাম, যেটুকু শিখলাম, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই।

মিলানের বান্ধবী সাবিয়াপিয়া লিখেছে—আমিও এর একটা পাতায় আঁচড় কাটলাম।

ফিলিপিনের ওয়েজিও লিখেছে—

"I shall pass this way but once! any good therefore that I can do or any kindness that I can show, let me do it now. Let me not defer or neglect it for I shall not pass this way again."

ইন্দ্র লিখেছে—

Remember! Friendships are like wine—older they are, more precious they become! Go where thy glory take you! But wherever the glory takes thee don't forget me. Not good-bye but so long!

মিলানের একটি ইটালীয়ান বন্ধু লিখেছে—ভারতবর্ষ আমার কাছে একটি কাল্পনিক সব-পেয়েছির দেশ, যেখানে আমি কখনও যেতে পারিনি। ভাষা, আচার-ব্যবহার সব কিছুই আমাদের থেকে ভিন্নতর। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী ও ঐকান্তিক। সময় চলে যাবে, হয় ত আমাদের আর দেখা হবে না, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব মনে গাঁথা থাকবে সব সময়ের জন্য।

সহদেব শুধু লিখেছে—মায়···। আর কিছু লেখে নি। হয় ত বাহ্যিক উচ্ছ্বাসে লিখবার মত মনের আগ্রহটি চাপা পড়ে গিয়েছে।

শিল্পী পানিকার শুধু একটি কার্টুন এঁকে দিয়েছেন।

লেখক বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

প্যারিস, ভেনিস, রোম সব হলে দেখা
এই কথা বাকি থাকে শেখা—
যেখানেই যাই আমি, আমারেই সঙ্গে নিয়ে যাই,
সে কোন অবাক দেশ, সেই ভার যেখানে নামাই।

যাযাবর লিখলেন—স্মরণের বেলাভূমিতে পরিচিতির ঢেউ কি লেখা লেপে, কি ছবি আঁকে?

বুদ্ধদেব বাবু ও 'যাযাবরে'র সঙ্গে আলাপ এই ফিরতি জাহাজেই।

পুরনো দিনের রোমন্থন মনটাকে উদাস করে দেয় ঠিকই, তবে তারই মাঝে আনন্দও জোগায়। আবার যখন পথে পা দেব, পাথেয় হয়ে রইবে পরিচিতির এই পাতাগুলি। কোন অলস

নেপলসের গলি: ইটালী

মধ্যাহ্নে অথবা কোন কর্ম্মক্লান্ত সন্ধ্যায় এই স্মৃতি-রোমন্থন মনটাকে বহু দূর দেশে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে।

সমাপ্ত

শিব ওঙ্কার

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রতি কাঁটার পদ্ম হোক বসন্ত-কুসুমানন্দ সুন্দর।
যত ব্যথা-অশান্তি আলোয়াকান্তি জাগুক ভ্রান্তি অন্তর।

হোক সত্য অমৃত-কল্পনা,
জানি মিথ্যা বেদনা মরণ-চেতনা, মিথ্যা গরল-জল্পনা।
হোক তুফান-ক্লান্ত হৃদয় শান্ত লভি' শ্রীচরণ-বন্দর।
শুনি' তোমার শঙ্খ ডমরু-ডঙ্ক পঙ্কজ হোক কঙ্কর।

যেন জীবনের বাধা বন্ধন,
সাধি' মুক্তিলীলার ছন্দ তোমার ক্রন্দনে রচে নন্দন।
যেন শঙ্কিত প্রাণ শোনে পেতে কান বেসুরারো বুকে মর্ম্মর;
শুনি' তোমার শঙ্খ ডমরু-ডঙ্ক পঙ্কজ হোক কঙ্কর।

ঐ শৈল-বিটপি বীথিকা
গায় সুষমার সুরে যেমন অদূরে তোমার গগন-গীতিকা,
যেন তেমনি তোমার আলোঝঙ্কার দেয় দিশা কোথা অম্বর।
শুনি' তোমার শঙ্খ ডমরু-ডঙ্ক পঙ্কজ হোক কঙ্কর।

যুগ যুগান্তরের প্রার্থনা :
আনো দীপান্তরের বুকে রোদনের রূপান্তরের মূর্চ্ছনা।
যেন মৃত্যুঞ্জয় তব বরাভয় আনে আনন্দ শঙ্কর!
শুনি' তোমার শঙ্খ ডমরু-ডঙ্ক পঙ্কজ হোক কঙ্কর।

প্রেমের বোধোদয়

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

"শুনি তোমার নাম যে বাজে, রেশমী রেশের ছন্দে
ভোর আরতির ঘণ্টাতে কোন মন্দিরে আনন্দে।
তুমি তো সেই নারী
রূপের কথা কয়েছিল সোনার খাঁচার সারী।
পায়ে চলার পথ যেখানে মাঠের শেষে এসে
থমকে গিয়ে চমকে উঠে ফুলের রাশে হেসে,
সূর্য্য ডোবে দূরে
উতলা কালো এলোকেশের গন্ধ হাওয়ায় উড়ে।
রাত দুপুরে চাঁদ উঠে আর কোথায় কোকিল ডাকে,
মক্ষিরাণীর স্বপ্নবিভোর মৌমাছিরা চাকে,
সেই তো, বুলু, তুমি
ঝিমিঝিমি নেশায় পাওয়া আবছা বনভূমি।
মোর জীবনের মৃদঙ্গে যে তুমি মধুর বোল
ঘর-ভোলানো দূর সাগরের সুরের কলরোল;
ছিলেম ঘাসে বসে
তাই তো তারা স্বর্গছাড়া পড়লে বুকে খসে।"
তেপান্তরের মায়াপুরীর খোলে ছায়ার দ্বার
বললে বুলু, "রামধনুকের কথার গাঁথো হার?
দেখতে যদি চেয়ে
পাপড়ি-ঢাকা লজ্জা-মাখা সাধারণ এক মেয়ে!

ফোটা ফুল আর ঝরা চাঁদের ইতিহাসের পাতায়
মোর পরিচয় অধিক তো নয়, সত্য করে যা, তাই।
হিয়ায় হিয়া দোলে
উছল রসের প্লাবন বাজে কালের শাসন খোলে।
নতুন-তারার-আলোয়-খোঁজা আধ-বোজা এই চোখে
আদি কবির ফল্গুধারা ফাগুন আদি শ্লোকে,
ওষ্ঠাধরে লিখা
পলাশবনের রাবণচিতার সর্ব্বনাশী শিখা।
কিসের বিষাদ, নিলাজ নিষাদ? মরুক ভীরুর ভয়,
তরুণ করো করুণাহীন এ তনু মন জয়।
সুন্দর বৈশাখী!
চঞ্চলতার অকূলে নাও এক অকূলে ঢাকি।
বাঁচার মরণ তোমার চরণ, পাই যে জীবন আরো,
আমার ছুটি উঠবে ফুটি, বাঁধতে যদি পারো।
উদয় হলে বোধ
ভালবাসা পাওনা দেনার শুধার পরিশোধ।
ময়ূরকণ্ঠী ঘোমটা টানে পারের বধূ-বেলা,
তিমির বাসর, সুরের আসর, আগুন সুধার খেলা।
নিঝুম নিশুত রাতে
সৌরভে ঘুম নামবে নিবিড় স্নিগ্ধ শিশির পাতে।"

এক ফোঁটা জল

শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী

গত বছর এধারে একবারে বৃষ্টি হয় নি। তার ফলে চাষীর ঘরে ধান তেমন ওঠে নি। দু'চার বিঘা করে যে যা রোপণ করেছিল, তার সব ধানই ঋণ শোধ করতে সুদে আসলে মালিকের মরাইয়ে উঠেছে। খাল, বিল, নদী, নালা সব এর মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে। মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আখ আর এবার পোঁতা হয় নি। মুগ, মুসুরীও তেমন হয় নি। এ অঞ্চলে এবার বড্ড জলকষ্ট হয়েছে।

হরিরামপুর গ্রামটির নাম। গ্রামবাসীরা সব গোপ, দিগার, মণ্ডলের দল—চাষবাসই প্রধান জীবিকা। কেবল এক ঘর ব্রাহ্মণ আছে। সে একটু থাকা গোছের লোক, অবস্থা কিছু ভাল। সামনে গন্ধেশ্বরী নদী চলে গেছে। ছোট নদী, মানুষ-ঘেরা নদী। একে মরা নদী; তার উপর গত বছর বর্ষা না হওয়ায় বেচারা একবারও ফাঁপতে পায় নি, গতবার বেচারার জীবনে বসন্তের ছোঁয়াচই লাগল না। দারোকেশ্বর নদের সঙ্গে এর যোগাযোগ রয়েছে। দারোকেশ্বরে বান এলে, তার আঁচ পাওয়া যায় এতেও। বর্ষায় বান এলে সে জলের রেশ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ক্ষীণ আকারে থাকে। চাষীরা স্রোত টেনে টেনে এক এক জায়গায় বালি তুলে পাড়ে শালগাছের ডাল বেঁধে ছিচ চালায় বা দনি লাগিয়ে জল তুলে গন্ধেশ্বরীর পাড়ের বালিমাটির জায়গায় জায়গায় শুনা চাষ করে। তাতে কোন রকমে চাষীদের চলে যায়। বড় গৃহস্থের মোটা আয়ও হয়। এবার সে সবের বালাই নেই। বালি তুললেও এক ফোঁটা জল নেই। কি রোদের তেজ—ঘর থেকে বেরোন দায়। চাষীরা সব গালে হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

কেষ্ট বললে, বউ আজ আর শরীর বয় না—আজকের মত চাল আছে?

বউ মতিসুন্দরী বললে, ওকথা বলে আর লজ্জা দাও ক্যানে, সবই ত জান।

কেষ্ট আর কথা না বাড়িয়ে বললে, তা হলে যাই—আর পারি না বাপু। বাউরি মালদের কাজ কি চাষীদের দ্বারা হয়। আর মুখুজ্জেও হয়েছে সেই রকম। বার আনা চুরা (চৌকা) মাটি কেটে কে কবে পরিবারের আর নিজের দুটো লোকের পেট চালাতে পারে। সারাদিন মাটি কাটলেও চৌদ্দ আনা এক টাকার বেশী রোজগার নেই।

হঠাৎ কেষ্টর মুখে চোখে হাসির রেখা ফুটে উঠল, হাঁ গো বউ চল্ কাজে আমার সঙ্গে?

বউ সুন্দরী বললে, কুথা গো?

—মাটি কাটতে। আমি কাটব, তুই বইবি। এ দুর্ভিক্ষের বছরে সবাই ত মেয়ে মরদে মুখুজ্জের মরা পুকুরে পাঁক তুলতে যাচ্ছে।

সুন্দরী বললে, আমি লারব।

—লারব ক্যানে, চল না; দু'দিন কাটব, একদিন বিশ্রাম যুব। তা ছাড়া মুখুজ্জেও কাল বলছিল।

—কি বলছিল?

কেষ্ট বললে, বলছিল বউকে আনিস নেই ক্যানে? দু'জনে মাটি তুললে বেশী পয়সা পাস।

সুন্দরী বললে, বেশী রোজগার হয় না গো? সোমত্ত বউ মাটি কাটবে, ঝুড়িতে করে পাহাড়ে তুলবে তা দেখতে তা হলে মুখুজ্জের বেশ লাগবে, না—তুমি কিন্তু আমার বড় সোহাগের সোয়ামী হয়েছ।

কেষ্ট বললে, তবে থাক। আজ ধার করে এ বেলা চাল আনিস, বৈকালে শোধ দেব। কেষ্ট হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল।

সুন্দরী ডাকল, এই, ওগো শুনছ।

—কি বলছিস?

সুন্দরী হাত নেড়ে ডাকল।

কেষ্ট কাছে এসে দাঁড়াল। সুন্দরী বললে, আমি যে বলেছিলাম তার কি হ'ল? পাশের গাঁয়ের জাত ভাইরা সব অবস্থা ফাপিয়ে ফেলেছে। শুনছি কেউ কেউ কোঠা বাড়ী তুলেছে। এ গাঁয়েও ত হরিঠাকুরপোর সংসার বেশ চলছে।

কেষ্ট কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল, দুর ও আমি পারব না। জল-মিশান কাজ আমার দ্বারায় হবেক নেই।

—হবেক নেই ক্যানে, সবাই পারলে তুমিই বা পারবে নাই ক্যানে? কেষ্ট কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। সুন্দরী মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রইল।

পাশের গ্রামের চাষী গোপরা অনেকেই দুধের ব্যবসা ধরেছে। কেউ বা ধার করে গাই কিনেছে, কেউ বা পরের কাছে দুধ কিনে জল মিশিয়ে শহরে বেচতে যাচ্ছে। শহরের মোহ পেয়েছে তাদের, শহর তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। লাভও কম নয়। দু' সের খাঁটি দুধ, তার সঙ্গে আধ সের তিন পোয়া জল মিশালেও চলে। মোষের দুধ হলে ত কথাই নেই। বটের ক্ষীরের মত গুরু দুধ। দু' সের দুধে তিন পোয়া জল মিশালেও কেউ ধরতে পারে না। বার আনা দশ আনা সের। তাই কি, সংসার বেশ চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ সাইকেল কিনেছে, দুধের ড্রাম কিনেছে। আয়না, কাচের

ফেলে সাইকেলে চেপে ট্রামে দুধ ভর্ত্তি করে শহরে চলেছে। অফিসের বাবুরা তাদের আশায় বসে আছে। দুধ না এলে বাবুদের সকালে চা খাওয়া হয় না, দোকান বন্ধ, বাচ্চাদের কান্না বেজে ওঠে। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, পাশের গাঁয়ের চাষীরা চাষ ছেড়ে দেবে, দুধের ব্যবসাই এবার সকলে করবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কেষ্টকে এত করে ক'দিন ধরেই বলা হচ্ছে, সে ও কথায় কান দিচ্ছে না। মনের মত স্বামী না হলে মেয়েদের এমনি দুঃখই হয়। আবার বলা হচ্ছে, চাষীরা কি চাষ ছেড়ে দুধ বিকতে পারে—জমি মা লক্ষীকে ছেড়ে অন্ত জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাবে?

তা ছাড়া তাদের জমি মা লক্ষীই বা কই? নিজের বলতে ত মোটেই বিঘা দুই মোল জমি। তাতে ক'মাস যায়? ভাগ চাষ নইলে গতি নেই। গ্রামের আশেপাশের সব জায়গাই ত বাইরের লোকদের; শহরের বাবুদের কাছে অনেক খোশামোদ করে ভাগে নিতে হয়, আর হরি মুখুজ্জের যা বিঘা ত্রিশেক জমি আছে। কিন্তু সত্যি যারা মাটির একান্ত বন্ধু, যারা মা বলে জানে মাটিকে তাদের ত ঐ দু'চার বিঘা কি খুব জোর আট-দশ বিঘার বেশী জমি নেই।

কেষ্ট কি দিয়ে এবার চাষই বা করবে? বলদগুলি ত কঙ্কালসার হয়ে গেছে—এক ফোঁটা জল নেই, ডাঙ্গায় ঘাসের চিহ্ন নেই, বাঁধে নদীতেও জল নেই। অন্ত বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে মাঝে মাঝে কালবৈশাখীর ঝড় হ'ত, জল হ'ত মাঝে মাঝে। কচি কচি ঘাস গজাত, সিরিস গাছের ফল পড়ত। গরুগুলি খেয়ে বাঁচত। এবার কি ও গরু নিয়ে চাষ করা যাবে?

সুন্দরী আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। কিন্তু ভাবলে আর কি হবে? বুড়োরা বলছে এর যা হোক একটা বিহিত করতে হবে।

রাতও একটু হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে রাত আটটা অনেক রাত বইকি। বাজে কাজে কেরোসিন আর কে খরচ করে, দু'পয়সার কেরোসিন হলেই এক রাত চলে যায়। দিনের ভাতই জল দেওয়া থাকে—রাত্রে আলু পেঁয়াজ ভাজা আর ভাত খেতে যা কেরোসিনের ডিবেটা দরকার হয়। তার পর সকলে গরমের রাতে উঠানে তালাই কি খুব জোর মাদুর পেতে কি কখনও বা 'সিজ' (বিছানা) পেতে শুয়ে পড়ে। আজ সেই যে সকালে কেষ্ট গেছে এখনও ফেরার নাম নাই—সুন্দরী ঘর বার করছে।

গরমও পড়েছে ছাই সেই রকম। আষাঢ় এল, অন্ত বছর এত দিন বীজ ধান ফেলা হয়েছে। একবার করে লাঙ্গল দেওয়া হয়েছে জমিতে। এবার তাও এখনও হয় নি।

কিন্তু কেষ্টর হ'ল কি? আ, কি পাখিটা এত 'কুক' 'কুক' করে কদম গাছটার টুকরে চলেছে। 'ফটিক জল, ফটিক জল' বলে ওটা আবার এত চেঁচায় কেন? মর মুখপোড়া—জল, জল—পাখি বোঝা, দেবতা যে কাণা দেখতে পায় না, তার সৃষ্টি এবার গেল।

বাইরে থেকে কেষ্টর গলা শোনা গেল।

সুন্দরী বললে, এত রাতে আসা ক্যান—ঘরের কথা কি মনে থাকে নাই?

কেষ্ট সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, জানিস শহরের রায় বাবুদের বাড়ী গেছলাম, দশ বিঘা জমি ভাগ চাষ করব ঠিক করে এলাম।

—এ্যাই?

—এই নয়—মুখুজ্জের সঙ্গে সলা পরামর্শ করলাম, কৃষি-লোনের জন্তে দরখাস্ত করব।

সুন্দরী বললে, বলি চাষ ত করবে তা ধানের কিছু করলে? কি দিয়ে চাষ হবেক? মুনিস, মাহিন্দার চাই না—ধান চাই না?

কেষ্ট বললে, রায় বাবু বললে, ধান ত মরাইয়ে নাই তবে কিছু টাকা দেব। কি করি বল এবার দেড়া সুদেও কেউ ধান ধার দিচ্ছে না।

সুন্দরী বললে, তবে চাষ ছাড়। হাড়সার গরুগুলি দিয়ে চাষ হবেক নাই—পরিশ্রমই সার। আর ও মুখুজ্জে মিনসের কথার কোন দাম আছে—বুড়া বয়সে ওর ভীমরতি ধরেছে।

মুখুজ্জে—আর মুখুজ্জে। মুখুজ্জের নাম করলে সুন্দরী জ্বলে ওঠে। কিন্তু যুগোপযোগী মানুষ মুখুজ্জে, অদ্ভুত মানুষ। সে গ্রামের সকলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে, আবার প্রয়োজনে সকলের যেন নিকট আত্মীয়। আজ যে তার ত্রিশ-চল্লিশ বিঘা জমি আছে, সে ইতিহাসও অপূর্ব্ব। গাঁয়ে দলাদলি হয়েছে, কীর্ত্তন হয়েছে, পূজা-পার্ব্বণ হয়েছে—মুখুজ্জে তার পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এক-জনের বিরুদ্ধে আর একজনকে লেলিয়ে দিয়েছে। ঝগড়াঝাটি, মারামারি, মোকর্দ্দমা লেগেছে তাদের মধ্যে। আর মুখুজ্জে এক পক্ষকে টাকা দিয়ে পলতে উষ্কিয়েছে—ফলে জমি এসেছে তার হাতে। প্রয়োজনে গাঁজা, মদও খেয়েছে কিন্তু নেশা তাকে বশে আনতে পারে নি। এ সব খেয়েছে বিশেষ কারণে; কেবল জমি মা লক্ষীকে ঘরে আনবার জন্তে।

মুখুজ্জে বলে, জমি লক্ষীকে আনতে গেলে একটু এ মোড় ও মোড় না ঘুরে সোজা রাস্তায় গেলে সে আসবে কেন?

সে যে কষ্টের জিনিষ—বড় আদুরে মা আমার।

কিন্তু প্রকৃত রূপ তার ধরা পড়ে নি। এক জনকে গ্রাস করে, আবার নতুন কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে।

সুন্দরী বলে, লোকটার এর চেয়েও আর একটা খারাপ দোষ আছে—লোকটা একটু উপরচোখো। নিজের কন্যা বড় হয়েছে, দু'দিন পরে জামাই আসবে তবু আর স্বভাব বদলাল না। মর, মর হতভাগা। আমাকে শুধু ইসারা করে বিজসে।

ও-বেলায় ভিজে ভাত খেয়ে কেষ্ট উঠছে—বাইরে হরি-বিলার ডাকলে, কেষ্ট আছ, বৌঠান বইছ?

সুন্দরী একটা চাটাই পেতে দিয়ে বলল, বসো ঠাকুরপো—বসো। কেষ্ট বললে, কি খবর হরি?

হরি কোনরূপ ভণিতা না করে বললে, গতবার চাষ হয় নাই—এবারও আবার হবার আশা নাই। মরা আকাশ, একবিন্দু জল মেঘের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই—কেবল সাদা সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ।

আষাঢ় মাসের আজ বাত্তো দিন চলছে ; বীজ ফেলা হ'ল না এবার। ঠায় দাঁড়িয়ে মরতে হবেক।

কেষ্ট বললে, কপাল রে ভাই—আর বিধাতার হাত৺

হরি বললে, গুহ বাবুরা আর একটা দোকান খুলেছে। আরও দুধ চাই, তুমি আমার সঙ্গে দুধ নিয়ে চল না।

কেষ্ট অন্যমনস্কভাবে বললে, হাঁ রে হরি. কেমন লাভটাভ হয়?

হরি বললে, মন্দ হয় না—এই তো ছাতনার জাস্ত ভাইরা দালান তুলেছে।

সুন্দরী অবাক হয়ে বললে, সত্যি ঠাকুরপো?

হরি বললে, বিশ্বাস না হয় কেষ্ট যেয়ে এক দিন দেখে আসুক।

সুন্দরীর মনে ঝড় উঠল। এক নিমেষে সে দেখতে পেল তার স্বামী চলেছে মাথায় ঝুড়ির উপর দুধে ভর্ত্তি ভার নিয়ে শহর অভিমুখে। মুসলমান ব্যবসায়ীরা এসে বলদ দুটো দু'কুড়ি পাঁচ টাকায় কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কেষ্ট বলছে দূর ছাই, সে কি আগে জানত—তা হলে কতদিন চাষ ছেড়ে দিত। আজ সেও কোঠা-বাড়ী তুলতে পারত, হয়ত সাইকেলও একটা কেনা হ'ত।

সুন্দরী বললে, ঠাকুরপো আমি বলছি তোমার দাদা কাল থেকে যাবেক।

হরি বললে, তা হলে আমি আজ উঠি—কাল বিকাল থেকে কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

হরি চলে গেলে কেষ্ট বললে, বউ এ কি করলি—শেষকালে চাষীর ছেলে হয়ে আমি চাষ ছাড়ব?

সুন্দরী রাগতস্বরে বললে, না, উপোষ দিয়ে মরবে।

কেষ্টর মুখ রক্তহীন, ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, বড় অশ্বত্থ গাছটার প্রাণটুকু যেন কে এক নিষ্ঠুর হঠাৎ নিয়ে নিল।

তালাই পেড়ে কেষ্ট শুয়ে পড়ল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিছানায় একটু শুতে না শুতেই চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে এল। সুন্দরীও গৃহস্থালীর কাজ সেরে লম্ফটা ফু দিয়ে নিভিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল।

মাঝরাতে কেষ্টকে নড়িয়ে সুন্দরী বললে, ওগো শুনছ।

—হু।

সুন্দরী বললে, তুমি রাগ করেছ কি?

—না।

—আমি একবার বাইরে যাচ্ছি, তুমি একটু জেগে থেকো।

—দাঁড়িয়ে থাকব কি?

—না, আমি যেতে পারব।

সামনে একটু জায়গা তালপাতা আর বাঁশ দিয়ে ঘেরা। ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। সুন্দরী যেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, পেছন থেকে একটা বলিষ্ঠ হাত এসে তার ডান হাতটা চেপে ধরল।

—কে?

—চুপ, আমি গো আমি···।

—আমি···আমি কে···?

বলিষ্ঠ হাতখানা উঠে গেল সুন্দরীর মুখের উপর। মুখ টিপে বললে, আস্তে—আমি মুখুজ্জে—তোমার রূপের কাঙাল।

সুন্দরী প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল কিন্তু তা নিমেষের জন্য। তার পর সে হাতখানা চট করে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, দূর, দূর মুখপোড়া—ঝাঁটিয়ে বিষ দাঁত ভেঙে দোব। ওগো শুনছ?

ভিতর থেকে শব্দ এল, কি?

—একটু কাছে এসে দাঁড়াও ত।

মুখুজ্জে ছুটে পালিয়ে গেল। কেষ্ট বাইরে এসে বললে, কার সঙ্গে চেচাচ্ছিস রে?

সুন্দরী বললে, একটা হাড়ী-খেকো কুকুর তেড়ে এসেছিল—তাই দূর দূর করছিলাম।

রাত আর বোধ হয় বেশী নেই। দু'একটা পাখী ডাকতে আরম্ভ করেছে, আর দু'তিন ঘণ্টা রাত আছে। কিন্তু কেষ্টর আর ঘুম ধরল না। সারাদিন রোদে ঘুরে আর তামাকের চুটি টেনে ধাতটা চড়া হয়ে গেছে। নানা রকম চিন্তা এসে ঘিরে ধরল তাকে। রাত কাটলে তার পক্ষে অশুভ দিন খবর নিয়ে আসবে, বলবে, ওরে আর চাষ নয়—দুধ বিকতে চল। হায়রে, অন্য বছর এতদিন জলে-ভেজা মাটির একটা মিষ্টি গন্ধ বেরিয়েছে। দু'একটা চিল, কাক, বোনা, শালিক পাখী কেঁচো আর সোদা পোকা ঠোঁট দিয়ে ধরছে। জল পড়ছে কখনও জোরে, কখনও আস্তে। এ ধারে বলে ছাগলতাড়া জল হচ্ছে—কখনও বৃন্দাবনি বর্ষণ হচ্ছে, কখনও ধারা নেমেছে। হায় দেবতা! বুড়োরা বলছে, আর দু'একদিন দেখে অষ্ট প্রহর হরিনাম করবে—যদি বৃষ্টি-দেবতা প্রসন্ন হন।

উঃ, কি অসহ্য গরম—ঘরে টেকা দায়। কেষ্ট কাছে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর হঠাৎ তার মনে হ'ল যেন শীতল বাতাস বইছে, যেন সামনের থেকে কি একটা শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। কেষ্ট এগিয়ে গেল। কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল—হরি, নিবারণ, সতীশ কে কোথায় আছিস, ওরে দেখবি।

প্রত্যেকের দরজায় দরজায় কেষ্ট গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল, উঠ রে, উঠ—গন্ধেশ্বরীতে বান এসেছে।

দেখতে দেখতে গ্রামখানা কোলাহলমুখরিত হয়ে উঠল। গন্ধেশ্বরীতে হড়পা (হঠাৎ) বান এসেছে। বান ক্রমশঃ বাড়ছে। অন্য কোথায় বোধ হয় জোর বৃষ্টি হয়েছে, তারই চিহ্ন নিয়ে শুভ সংবাদ বহন করে এসেছে গন্ধেশ্বরী। মরা গন্ধেশ্বরী এবার নাচছে, দুলছে, আমোদে খেলা করছে।

কেষ্ট বললে, তোরা দেখছিস কি—কোদাল, ঝাড়া নিয়ে আয়। পাহাড় দিয়ে গন্ধেশ্বরীকে বেঁধে জমিতে জল নিয়ে যেতে হবেক।

বুড়ো হরিহর বললে, একটু অপেক্ষা কর বাবা—সকাল হউক; জলের টান একটু কমুক, তখন পাহাড় বাঁধার ব্যবস্থা করিস।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হ'ল না।

সতীশ সকলকে সজাগ করে চেঁচিয়ে বললে, আকাশটা পানে চেয়ে দেখ—কেমন ধরে আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সারা আকাশটা কাল হয়ে উঠল। গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডেকে উঠল—গুর-গুর-গুর-গুর।

কোথায় যেন বিকট শব্দে একটা বাজ পড়ল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে না?

কেষ্ট বললে, আমার গায়ে এক ফোটা জল পড়েছে রে।

কিন্তু বিরহকাতরা মেয়ের সলজ্জ চোখের কান্নার মত ফোটা ফোটা জল কেন? না, না, এক ফোটা, দু'ফোটা জল নয়—এবার আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল।

কেষ্ট ছুটে এল। সসব্যস্ত হয়ে ডাকল, বউ কোদালটা দে—জমির আল (আইল) বাঁধতে যাব।

সুন্দরী কেষ্টর ডান হাতটা চট করে ধরে বললে, সকাল না হলে তোমায় যেতে হবেক নাই লক্ষীটি।

কেষ্ট সুন্দরীকে হড় হড় করে বাইরে টেনে নিয়ে এল। বললে, বউ বছরের প্রথম জল—ভিজ—ভিজে নে।

বহু-প্রত্যাশিত বৃষ্টির ধারা তাদের সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়ে পরিষ্কার করে দিতে লাগল।

সুন্দরী বললে, তোমার আনন্দ দেখে মনে হচ্ছে চাষীকে চাষ ছাড়তে বলে ভুল হয়েছে গো।

কিন্তু তখন কে কার কথা শুনে। অশ্রান্ত মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুৎ আর বাজ পড়ার শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

কীটসের প্রতি

শ্রীকালিদাস রায়

মাতা দিল মৃত্যুরোগ কাল যক্ষ্মা বিষ
পিতা দিল দারিদ্র্য চরম,
শেলী দিল পাশে ঠাঁই, দিল শুভাশিস
হাণ্ট দিল বন্ধুত্ব পরম।

হৃদয় সঁপিল ক্যানী তব শীর্ণ হাতে
চ্যাপম্যান হোমারের স্বাদ
সেভার্ণ করিল সেবা মরণ শয্যাতে
ল্যাম্ব তোমা দিল সাধুবাদ।

স্বদেশ তোমারে দিল ব্যথা অনাদরে
লকহার্ট বিষশর হানি,
কল্পনা বৈভব দিল গ্রীস অকাতরে
রোম দিল চির শয্যাখানি।

বিধাতা তোমারে দিল দুর্লভ অজেয়
কবিশক্তি দিব্য অনুপম,
সেই সঙ্গে দিল স্বল্প আয়ুর পাথেয়
শরদভ্রে ইন্দ্রধনুসম।

প্রকৃতি তোমারে দিল তৃতীয় নয়ন
সত্য শিব সুন্দরে হেরিতে,
অসীমে যাত্রায় দিল মহাকাল স্থান
সনাতন সোনার তরীতে।

আমি বাঙ্গলার কবি বিংশ শতাব্দীর,
তবু আমি সগোত্র তোমার।
স্মরিয়া তোমার ঋণ নত করি শির
প্রণিপাত দিনু লক্ষ বার।

শেলীর প্রতি

শ্রীকালিদাস রায়

মহাসিন্ধু ছাড়া কেবা তোমার সে বিরাট আত্মারে
বহিতে, সহিতে কিম্বা ধরিতে বা পারে?
তাই তারি মাঝে আত্মা হইল বিলীন
তাহারি অসীমে তব ধ্বনিতেছে বাণী নিশিদিন।

মহাকাল তব সৃষ্টি বৈজয়ন্ত রথে
নিয়ে গেল যুগে যুগে দেশে দেশে অনন্তের পথে।
অমর হইয়া আছ সৃষ্টির মাঝারে,
ডুবিবে না, ভাসিবে তা নিত্যকাল কাল পারাবারে।

অস্থিমাংসময় দেহ তরঙ্গ ঠেলিয়া দিল কূলে
গৃধ্রের আহার্য্য তাত, বাইরনও যায় নাই ভুলে
খুঁজে নাই তাই শবাধার
করিল অনল যোগে তারে ভস্মসার।

সুন্দরের বৈতালিক অসুন্দর অসহ তোমার।
পাছে ব্যাধি জরা শোক করে অধিকার,
সে শঙ্কায় তনু তব যৌবন শোভন
অনন্ত-যৌবনসিন্ধু—ঊর্ম্মি করে করিলে অর্পণ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৌদ্ধ চিন্তা

শ্রীস্মরণকুমার আচার্য্য

ভগবান বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী এক অপরূপ শিল্প-সুষমায় পরিমণ্ডলে স্থাপিত। ধর্মপ্রচারক বুদ্ধদেব খণ্ডিত, সীমায়িত। আপন সম্প্রদায়ের সীমায় মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকাশের যে পথগুলি তিনি নির্দেশ করেছেন, সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সেগুলির মূল্য সম্বন্ধে হৃদয়বান মানুষ সন্দেহাতীত।

রাজভোগ বিলাসের মোহময় আবরণ ছিন্ন করে বুদ্ধদেব যেদিন জন্মমৃত্যু-সমাকীর্ণ এই বিশ্বের পটভূমিতে এসে দাঁড়ালেন সেদিন তাঁকে সর্ব্বাধিক পীড়িত করেছিল মানবাত্মার দুঃসহ অবমাননা। তাই বুদ্ধদেবের সাধনার মূল কথাই হ'ল মানুষকে তার আত্যন্তিক মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করা; দুঃখ, জরা আর পশুত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে ধীরে ধীরে পরম সত্তায় উন্নীত করা—এই ত মুক্তি—নির্ব্বাণ। দীর্ঘ সাধনায় মানব-মুক্তির মন্ত্র লাভ করলেন তিনি—মৈত্রী, করুণা, প্রেম। লোভ, হিংসা, দ্বেষ আর স্বার্থপরতা প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষকে খণ্ডিত করছে, বিদ্ধ করছে, আকর্ষণ করছে অতলস্পর্শ অন্ধকারের গহ্বরে যেখানে মানুষ পশুর সঙ্গে এক বন্ধনে বাঁধা।

ভগবান তথাগত চাইলেন এই ভয়াবহ দুঃখের অন্ধকূপ থেকে মানুষকে মৈত্রী, করুণা আর প্রেমের জ্যোতির্লোকে নিয়ে যেতে। তিনি অষ্টমার্গের নির্দেশ দিলেন—সততাই যার মূলকথা। অষ্ট-মার্গের প্রতিটি মার্গই একান্ত ভাবে মানবিক মূল্যে সমৃদ্ধ।

যত সহজে এ পথের কল্পনা করা যায় তত সহজে পৌঁছান যায় না সেখানে। এর জন্য মূল্য দিতে হয়। ব্যক্তি-জীবনের অশেষ কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব দেখালেন এ পথে যেতে হলে চাই আত্মত্যাগ, চাই দুঃখবহনের সীমাহীন শক্তি। বৌদ্ধ জাতকের পাতায় পাতায় অসংখ্য আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল কাহিনী এই সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। বুদ্ধদেব কোন অলক্ষ্য অরূপ দেবতায় সাধন নির্দেশ দেন নি। পুষ্পাঞ্জলী দিতে বলেন নি কোন কাল্পনিক দেবতাকে। এই পৃথিবীর ধূলিধূসরিত মানুষকেই তিনি দেবতায় সীমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কেবল ভাবজগতের উন্নয়নই সবটুকু নয়, বস্তুজগতেও মানুষকে বিকশিত হতে হবে পরিপূর্ণ রূপে। সুন্দরের সাধনাই মানুষকে জড়জগতের জীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়। তাই ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগের অধ্যায় শিল্প, সংস্কৃতি ও বিত্ত-বত্তায় শীর্ষস্থানীয় হ'য়ে আছে। অগণিত বুদ্ধমূর্তি, স্তূপমালা, স্তম্ভ ভারতের নানা প্রান্তে আজও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, শিল্প আর সুরুচির জয় ঘোষণা করছে। বৌদ্ধযুগের বৈভবের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্ত্তী যুগের সেই বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোন কালে হয় নাই।"

কাল-বিচারে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছে বৌদ্ধযুগ থেকে। আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এর মধ্যে এসেছেন অগণিত চিন্তানায়ক মনীষী। তাঁরা বিশ্ববাসীকে দিয়েছেন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বাণী। আজ মানুষ বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতিকে অনায়াসে আয়ত্তে এনেছে। কিন্তু নিপীড়িত মানবাত্মার সমস্যা আজও তেমনি আছে। লোভ, হিংসা আর স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নামমাত্র মূল্যে মনুষ্যত্বকে বলি দেয় মানুষ। রবীন্দ্রনাথ কবি। মানবাত্মার এই ক্লীবতা, এই সঙ্কীর্ণতা ব্যথিত করেছে তাঁর অনু-ভূতিপ্রবণ কবিমনকে। তিনিও চাইলেন, প্রতিটি মানুষকে স্বর্গ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে।

আগেই বলেছি বৌদ্ধদর্শনের গভীর তাৎপর্য্য যাই হোক বৌদ্ধ-ধর্ম মানবতার ধর্ম। মানুষকে কেন্দ্র করেই তার সূচনা এবং শেষ হয়েছে। আর যে পথ ধরে সে এগিয়ে গেছে সে পথ সুন্দরের পথ, শিল্পের পথ। কবিও সুন্দরের সাধক। কিন্তু নিরবলম্ব সৌন্দর্য্য-সাধনা কবির নয়। এই পৃথিবী, এই মানুষ কবির সাধনপীঠ। তাই কবিও চান মানুষকে বরণীয় করে তুলতে।

একান্ত অবশ্যম্ভাবী কারণেই বৌদ্ধ জীবনাদর্শ, বৌদ্ধচিন্তা, বৌদ্ধ শিল্পসংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছে রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্ত। জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সূক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন রুচি আকর্ষণ করেছে রবীন্দ্রনাথের কবি-মনকে। তাই দেখি কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে নানা ভাবে বৌদ্ধ-চিন্তাকে রূপদান করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ধর্মপ্রচারক কিম্বা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বুদ্ধদেব কবিকে আকর্ষণ করে নি। সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগের অলক্ষ্যে, বৃক্ষদেহে রসসঞ্চারের মত যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ভারতবাসীর অন্তরলোককে পরিশুদ্ধ করছে রবীন্দ্রনাথ তারই উপাসক। তিনি বলেছেন—

"সিনেমা ছবিতে, গ্রামোফোনের ধ্বনিতে যে বুদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে সে ত ক্ষণকালের বুদ্ধ; সুদীর্ঘকাল মানুষের সজীব চিত্তের সিংহাসনে বসে যিনি অসংখ্য নরনারীর ভক্তি প্রেমের অর্ঘ্যে অলঙ্কৃত হয়েছেন তিনি চিরকালের বুদ্ধ। তাঁর ছবি সুদীর্ঘ যুগ-যুগান্তরের পটে আঁকা হয়ে চলেছে।"

বৌদ্ধধর্ম্মের জটিল দর্শনতত্ত্বে কবি-মন সায় দেয়নি। কিন্তু তার

সর্ব্বব্যাপ্ত মানবপ্রীতি রবীন্দ্রচিত্তকে আলোড়িত করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্ব্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালো মন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছে, তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ।"

আত্মত্যাগের এই মহান বাণী কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। হিংসাকে অস্ত্র দিয়ে জয় করা যায় না, জয় করতে হয় প্রাণ দিয়ে—মনে প্রাণে রবীন্দ্রনাথ এ সত্যকে বিশ্বাস করতেন। তাই বৌদ্ধ জাতকের আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের গল্পগুলিকে নানা ভাবে রূপায়িত করেছেন তাঁর কাব্য-নাটকে।

সমস্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুসন্ধান করলে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধকাহিনী বিষয়ক রচনার সংখ্যা হবে সুপ্রচুর। কাব্য নাটক, প্রবন্ধ সর্ব্বত্রই নানা ভাবে বুদ্ধের কল্যাণময় করুণাবাণীকে সশ্রদ্ধ চিত্তে উল্লেখ করেছেন কবি। এমনকি বিশ্বভারতীর পরিকল্পনার মধ্যেও বৌদ্ধ আদর্শের কথা উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্ত গঙ্গোত্রী ইহার উদ্ভব।"

রবীন্দ্রকাব্যে বৌদ্ধ-প্রভাবিত কবিতা প্রচুর। এইগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা চলে। ভাগ দুটি যথাক্রমে বৌদ্ধকাহিনীমূলক এবং বুদ্ধ প্রশস্তিমূলক।

বৌদ্ধকাহিনীমূলক কবিতাগুলির উৎস রাজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্কলিত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধীয় একখানি ইংরেজী গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থখানি থেকে একাধিক কাহিনী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটি কবির স্বকীয় প্রতিভার স্পর্শে নবরূপ ধারণ করেছে।

'কথা ও কাহিনী'র যুগেই রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিক বৌদ্ধকাহিনীমূলক কবিতা রচনা করেন। এর কারণও খুব স্পষ্ট। 'চৈতালি' থেকেই রবীন্দ্রকাব্যে একটি নূতন সুর ধ্বনিত হয়েছে। বর্ত্তমান বাস্তব জগতের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে কবি প্রাচীন ভারতের মহৎ জীবনে প্রবেশ করেছেন। 'কল্পনা' আর 'নৈবেদ্যে' এই সুর আরও স্পষ্টতর। ভাবলোকে কবি ভারতকে ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তিতে দেখেছেন, জীবনেও চাই তার প্রতিফলন। তাই কবি মুখ ফিরিয়েছেন বৌদ্ধকাহিনীর দিকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এক সময় আমি যখন বৌদ্ধকাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারার উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।"

১৩০৪ সাল থেকে ১৩০৬ সালের মধ্যে তিনি যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, পূজারিণী, অভিসার, পরিশোধ, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠকাহিনী কাব্যগুলি রচনা করেন। আত্মত্যাগ, দুঃখজয়ের মহান আদর্শে এই খণ্ড কাব্যগুলি সমুজ্জল। কাহিনীগুলির মধ্যে মহৎ জীবনাদর্শের বাণীটি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে সহজেই স্পর্শ করেছিল। তাই কবিহৃদয়ের সহানুভূতি লাভ করে কাহিনীগুলি নবজন্ম লাভ করেছে। এগুলি মহৎ জীবনের চিত্রশালা। কাহিনীগুলির কাব্যরূপেই কবি সন্তুষ্ট থাকেন নি, পরবর্ত্তী কালে এর অনেকগুলিকেই তিনি নাট্যরূপ দান করেছেন।

বুদ্ধ প্রশস্তিমূলক কবিতাগুলির অধিকাংশই কবির শেষ বয়সের রচনা। যুদ্ধ-পীড়িত বিশ্বে মানুষের হাহাকার রবীন্দ্রনাথকে কাতর করে তুলেছিল। হিংসার ঘাতপ্রতিঘাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য কবি স্মরণ করেছেন ভগবান তথাগতের করুণা আর মৈত্রীর বাণী। ভিক্ষু, বোরোবুদুর, সিয়াম, বুদ্ধদেবের প্রতি, বুদ্ধজন্মোৎসব প্রভৃতি কবিতাগুলি পরিশেষ (১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। বুদ্ধভক্তি নবজাতক কাব্যগ্রন্থে এবং পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের সতের সংখ্যক কবিতা 'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটির রূপান্তর। বোরোবুদুর, সিয়াম প্রভৃতি কবিতাগুলি যাভা ভ্রমণ কালে বৌদ্ধতীর্থ দর্শনে লিখিত। বোরোবুদুরের অপরূপ শিল্পকলা আজও মানুষের অন্তরে বুদ্ধের অমর প্রেমবাণীর সাড়া জাগায়। তাই কবি বলেছেন :

"কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র—'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।"

সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহারের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত 'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতায় হিংসাজীর্ণ বিশ্বে বুদ্ধের অমৃতবাণী আহ্বান করেছেন—

'চিত্ত যেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিত আয়ু
আয়ু কর দান।'

বুদ্ধভক্তি কবিতায় বর্ত্তমান বিশ্বের বুদ্ধপূজারীদের কবি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করেছেন। বুদ্ধদেবের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করে আজ মানুষ চলেছে প্রাণ হনন করতে। বুদ্ধ-বাণীর এই চরমতম পরিহাস কবিকে বেদনা দিয়েছে। তাই তীব্র বিদ্রূপবাণ হেনেছেন কবি। 'বুদ্ধভক্তি' কবিতার ভূমিকায় কবি লিখেছেন :

"জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানী সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ-মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্কলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের সঙ্কলন থেকে রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনীগুলির কাব্যরূপ দান করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে নাটকীয়তার আভাস তিনি পূর্ব্বেই পেয়েছিলেন। কবি নিজেই বলেছেন :

"এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটি মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।"

কাব্যায়িত বৌদ্ধ-কাহিনীগুলির অনেকগুলিকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তীকালে নাট্যে এবং নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন।

বৌদ্ধ-কাহিনী অবলম্বনে কবির প্রথম নাট্যসৃষ্টি 'মালিনী'।

নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের 'মহাবস্তু অবদানে'র অন্তর্গত একটি কাহিনী নাটকটির মূলে আছে। কবি-প্রতিভার স্পর্শে এই কাহিনীর পরিবর্তন ঘটেছে বিস্তর। মালিনী রচনা কালে (১৩০৩) কবির মনে চলেছে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিরোধ। প্রকৃত ধর্ম কি? ধর্ম্মের কোন্ আদর্শ মানবের পালনীয়? অনুভূতিহীন, রসহীন আচার-সর্ব্বস্বতাই কি ধর্ম্মের স্বরূপ? এই সময়ের একাধিক কাব্যনাট্যে কবি এই সমস্যার সত্যরূপ উদঘাটন করেছেন।১

ক্ষেমংকর সনাতন ধর্ম্ম আচারকেই পালন করে চলেছে। তার হৃদয়ে দুর্ব্বল অনুভূতির কোন স্থান নেই। কিন্তু তারই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু সুপ্রিয় অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। ধর্ম্মের প্রাণহীন আচার-আচরণ তাকে বিড়ম্বিত করেছে। মালিনী সত্যধর্ম্মের উপাসিকা। কি এই সত্যধর্ম্ম? এই সত্যধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মের ছদ্মবেশ তাতে আর সন্দেহ থাকে না। বৌদ্ধধর্ম্ম মানবকল্যাণ ও হৃদয়াবেগের ধর্ম্ম। মালিনীর ধর্ম্মও তাই। নারী ধর্ম্মসাধনায় অপাংক্তেয় নয়। কর্ম্ম-জীবনের মত ধর্ম্মজীবনেও নারী পুরুষের কল্যাণ-লক্ষ্মী। যেখানে তাদের দূরে রাখা হয়েছে সেখানেই ঘটেছে অনর্থ। সুজাতার অন্নেই একদিন গৌতম প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

১৩১৭ সালে প্রকাশিত 'রাজা' নাটকখানিও বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে লেখা। বৌদ্ধসাহিত্যের কুশজাতক কাহিনী নাটকটির উৎস। বাইরের রূপ-বৈভব দিয়ে সুদর্শনা পেতে চেয়েছিল রাজাকে। কিন্তু ব্যর্থ হতে হ'ল। তার পর সুরু হ'ল অন্তর-লোকের সাধনা—ধরা দিলেন রাজা।

রূপ-অরূপের এই তত্ত্বটি রবীন্দ্র-দর্শনের মূল কথা। মানসীর যুগ থেকেই কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপলোক পার হয়ে ইন্দ্রিয়াতীত রূপের সাগরে ডুব দিতে চেয়েছেন। উল্লিখিত বৌদ্ধকাহিনীতে কবি সমর্থন লাভ করেছেন তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা। রাজা নাটক সম্বন্ধে কবির মন্তব্য:

"অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল, সে প্রভু কোন বিশেষরূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই। যে প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এই নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

বৌদ্ধ জীবন-জিজ্ঞাসার মৌলিক সত্যটিও এই।

রাজার কিছুদিনের ব্যবধানে রচিত 'অচলায়তন' নাটকটি প্রত্যক্ষতঃ বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে লেখা না হলেও এটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার পরিবেশে পরিকল্পিত। এখানেও সেই ধর্ম্মের সত্যরূপ উদঘাটনের চেষ্টা। সেই শুষ্ক আচারকেন্দ্রী ধর্ম্ম সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়ানুভূতি জড়িত ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব। অচলায়তনে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলিও লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। 'নটীর পূজা', 'কথা'র যুগে লেখা 'পূজারিণী' কবিতাটির নাট্যরূপ। অজাতশত্রু হিংসাধর্ম্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধের অহিংসা-ধর্ম্মের বিরোধ। এ-বিরোধ অস্ত্রের বিরোধ নয়, প্রাণের বিরোধ। শ্রীমতীর প্রাণোৎ-সর্গের পটভূমিতেই ধর্ম্মের মহত্ত্ব স্থাপিত। শ্রীমতীর আত্মত্যাগ কবির কল্পনাপুষ্ট জীবনাদর্শকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই শ্রীমতীর নাটকীয় জীবনকে তিনি নাট্যরূপে বেঁধে দিলেন। 'নটীর পূজা' নাটকে কবি স্বয়ং বৌদ্ধ ভিক্ষু উপালির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ জীবনাদর্শের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধার এটিও একটি সাক্ষ্য।

অবদান শতকের আর একটি বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে 'চণ্ডালিকা' রচিত। চণ্ডালকন্যা প্রকৃত বুদ্ধ শিষ্য আনন্দকে চেয়েছিল মোহ-মুগ্ধতার সীমায়। কিন্তু কোন্ শক্তি তাকে বাঁধবে! সে তাকে বাঁধল মন্ত্রতন্ত্র আর ইন্দ্রজাল দিয়ে। কিন্তু বাইরের বাঁধন তো ক্ষণস্থায়ী। পরমকারুণিক বুদ্ধের কৃপায় আনন্দ মুক্ত হ'ল সে বন্ধন থেকে। মন্ত্রতন্ত্র আর বাইরের বন্ধনের শক্তিকে আবার তুচ্ছ প্রমাণ করলেন কবি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই মৌল তত্ত্বটির সুন্দর কাহিনীরূপ কবি পেয়েছেন বৌদ্ধ-সাহিত্যে।

নাট্যরূপকে আরও সুন্দরতর করে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস দেখা গেল নৃত্যনাট্যে। সেখানেও তিনি বৌদ্ধ চিন্তাকে দূরে রাখতে পারেন নি। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা পূর্ব্বে নাট্যকৃত চণ্ডা-লিকার নৃত্যনাট্যরূপ। অনুভূতির সীমাকে আরও সুদূরপ্রসারী করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। নৃত্যনাট্যই তার উপযুক্ত বাহন। কাহিনী নির্ব্বাচনেও উপযুক্ততার কথা কবি ভুললেন না—তাই বৌদ্ধকাহিনী 'চণ্ডালিকা' আর 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের রূপ লাভ করল। 'শ্যামা' 'পরিশোধ' কাব্যখণ্ডের নাট্যরূপ।

বৌদ্ধধর্ম্মের সুরুচি, পরিচ্ছন্নতা, সর্ব্বমানবিক আবেদন কবির বহু রচনার রসদ জুগিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে বৌদ্ধ আদর্শ কেবল সাহিত্যেই আবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রচেতনাতেও ভারতবর্ষের বৌদ্ধ আদর্শ অনুকরণীয় এই ছিল কবির মত। তিনি বলেছেন—

"এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কাণা হইয়া আছে।"

সর্ব্বব্যাপ্ত মানবপ্রেম, মানব কল্যাণের আদর্শ, মানুষের ইহ-লৌকিক পারলৌকিক উন্নতিবিধান, পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ—এই নিয়েই বৌদ্ধসংস্কৃতি। ভারত যদি এই পথ অনুসরণ করতে পারে তবেই তার সার্বিক উন্নতি—এই কবির বিশ্বাস। তাই তিনি বলেছেন—

"ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখ রূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্য্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষাদান করিয়াছিল। সেই জন্য ভারতবর্ষ সেদিন ধর্ম্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল।"

১। 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস' প্রভৃতি কাব্য নাট্যগুলি দ্রষ্টব্য।

মিলন

শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায়

আড়াই বছরের ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে উঠল, বলল, "মা'র কাছে যাব।" অমিয় কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারে না, বলে, "ওই যে ওদিকে দেখছ মণি, ওই ওখানে, কেমন একটা নীল পাখি এসে বসেছে—।" কিন্তু খোকনের কান্না আর থামে না। বহু চেষ্টা করেও সে খোকনের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাতে পারল না। অমিয় বিব্রত বোধ করল।

অপর দিকে মেয়েটিও অবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল খোকনের দিকে। তার পর একবার অমিয়ের দিকে তাকায়, আর একবার খোকনের দিকে তাকায়। অমিয়র সঙ্গে দু'একবার চোখা-চোখিও হয়ে গেল ইতিমধ্যে। এতে অমিয় আরও বিব্রত মনে করল নিজেকে। কিন্তু মেয়েটি কিছু না বলে হঠাৎ এসে খোকনকে অমিয়ের কাছ থেকে নেবার জন্তে দু'হাত বাড়িয়ে বলল, "দিন, খোকনকে আমার কাছে দিন।" যেন অমিয়র অনুমতি এখানে অবান্তর, এই ভাবেই সে প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করেই অমিয়র কাছ থেকে খোকনকে তুলে নিল। অমিয় একটু সম্বিৎ পেয়ে বলল, "ওকে আপনার সামলাতে বিব্রত হতে হবে।" মেয়েটি কিছু না বলে শুধু একটু হাসল। আশ্চর্য্য, অমিয় দেখল, খোকন কিন্তু মেয়েটির কাছে গিয়ে একেবারে চুপ। সে মেয়েটির ঝোলান চুলের দিকে এক এক বার তাকাচ্ছে আর এক এক বার মেয়েটির মুখের দিকে তাকাচ্ছে—আর তার চোখের জল মাখান মুখে একটা প্রশান্তির হাসি ফুটে উঠছে। কিন্তু এ ভাবে আর একজনের কাছে ছেলেটিকে দিয়ে অমিয়ও স্বস্তি বোধ করছিল না। সে দু'একবার চেষ্টা করেছিল খোকনকে নেবার—কিন্তু খোকন যেন তার বাবাকে ইতিমধ্যে ভুলে গেছে। সে কিছুতেই আসবে না মেয়েটির কোল থেকে। মেয়েটিও যে অমিয়র দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করছে এমন বলে মনে হ'ল না। বরং অমিয়ই বলল, "আপনার কাপড় জামা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওর জুতার ধুলোতে—বরং আমায় ওকে দিন।" মেয়েটি হাসল, বলল, "থাক্ না আমার কাছে খানিকক্ষণ।"

কিন্তু এই খানিকক্ষণটা যে এ রকম ভয়াবহ হয়ে দেখা দেবে এ কথা মেয়েটিও কল্পনা করতে পারে নি—অমিয় ত নয়ই। যেখানে অমিয়র নামবার কথা সেখানে অমিয়র নামা হ'ল না। মেয়েটি যেখানে নামবে সেখানেই ওকে নামতে হবে, তাছাড়া উপায় কি? মেয়েটির নামবার সময় হলে অমিয় চেষ্টা করল খোকনকে নেবার। কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই হ'ল না, বরং হ'ল উল্টো—ছেলেটি তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিল। মেয়েটি অমিয়কে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোথায় নামবেন?"

"আমার যেখানে নামার দরকার ছিল, অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি। এখন দেখুন বাস থেকে নেমে একবার চেষ্টা করা যাক্। হয়ত রাস্তায় ও আমার কাছে আসতে পারে।"

কিন্তু বাস থেকে নেমেও যখন খোকন কোল থেকে নামল না, তখন সুলেখাই বলল অমিয়কে, "চলুন না, আমাদের বাড়ী, এই কাছেই।"

অমিয় বলল,—"কিন্তু—"

কথাটি তাকে শেষ করতে দিল না সুলেখা, বলল, "কিন্তু, কি করছেনই বা বলুন আপনি? আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন, এখনি ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে।"

সত্যিই এতক্ষণ ত অমিয় আকাশের দিকে তাকায় নি। দেখল সারা পশ্চিম আকাশ জুড়ে কালো মেঘ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। একটু ইতস্ততঃ করে অমিয় বলল, "এটা কিন্তু অত্যন্ত উৎপাত হচ্ছে আপনার উপর।"

অবশ্য অমিয়কে সুলেখার বাড়ীতে আসতেই হ'ল। দরজার কাছে পা বাড়িয়ে সুলেখা নীচু গলায় বলল, "খোকনের মা কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়বে।"

এগিয়ে বলল, "আসল গণ্ডগোল ত সেইখানেই—খোকনের মা প্রায় ছ'মাস হ'ল মারা গেছে।"

'ইস' আপনা থেকেই সুলেখার মুখ থেকে বেরল। তার পর সে সম্পূর্ণ ভাবে একবার অমিয়র মুখের দিকে তাকাল, কি যেন হঠাৎই খুঁজল সেখানে, তার পর তাকাল খোকনের দিকে। খোকনের দৃষ্টি তখন পড়েছে ঘরের ভেতর ফুলদানির ফুলের উপর। সে হাত বাড়াল সেই দিকে। খোকনকে নামিয়ে রেখে সুলেখা তাড়াতাড়ি গেল ফুলদানির কাছে, তার পর সব ফুলগুলি এনে খোকনকে দিল। অমিয়র দিকে তাকিয়ে বলল, "আসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?" 'না যাই'—কি যেন ভাবতে ভাবতে অমিয় উত্তর দিল।

ওদিকে আকাশ জুড়ে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়ে গেছে। একটা চেয়ারের উপর বসে অমিয় ভাবছিল এই আশ্চর্য মেয়েটির কথা। কোথা থেকে সম্পূর্ণ এক অচেনা লোককে অত্যন্ত সঙ্কোচ-হীন ভাবে ঘরে ডেকে নিয়ে এল, একটুমাত্র বাধল না, বা একটুমাত্র সঙ্কোচের ধার দিয়ে গেল না। অথচ এই মেয়েটির কথায় বার্তায়, আচারে আচরণে এমন একটা মিষ্টিভাব আছে, এমন একটা ভদ্র ব্যবহার আছে যেটা অমিয়র আর কোন মেয়ের কাছে দেখেছে বলে হঠাৎ মনে হ'ল না। ইতিমধ্যে খোকন গেছে সুলেখার সঙ্গে অন্তঃপুরে—সেখানে খোকনকে নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ জমে গেছে এর আভাস বাইরের ঘরের মধ্যে বসেও অমিয় পেল।

খানিকক্ষণ পরে সুলেখার বাবা রামরতন বাবু ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ইনি নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। তার পর অমিয়র সঙ্গে আলাপ করলেন। একটু আস্তে আস্তে কথা বলেন ; বললেন, "এই হাঁপানির টানটি আমাকে কাবু করেছে—তাই অনেক আগেই প্রফেসারি থেকে রিটায়ার করেছি। এখন যেন একলা বড় হাঁপিয়ে উঠি। তোমাদের—তোমাদের বলছি বলে যেন কিছু মনে করো না বাবা—"

'আজ্ঞে না, আপনি আমায় তুমিই বলবেন' অমিয় বলল।

'হ্যাঁ ছেলেদের প'ড়িয়ে পড়িয়ে এমন বদভ্যেস হ'য়ে গেছে যে, মুখ থেকে আপনিই যেন তুমি বেরিয়ে পড়ে।'

তারপর ক্রমে অমিয়র পরিচয় নিলেন, অল্প বয়সে স্ত্রী মারা গেছে শুনে দুঃখ করলেন। সুলেখার মার মৃত্যুর কথা বললেন। বড় মেয়ের বিয়ের গল্প করলেন, কথা তাঁর যেন আর শেষ হয় না। আর শেষ হয় না যেন বৃষ্টির। সে যে বৃষ্টি নেমেছে, এখনও একবার ধরবার নাম পর্যন্ত নেই। ইতিমধ্যে ঘরে দুবার চা এসে গেছে। ঘড়িতে যখন রাত ন'টা বাজে তখন সুলেখা আবার ঘরে ঢুকল—ঢুকে বাবার কানে কানে কি বলল। চমকিয়ে উঠে বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ বাবা অমিয় তুমি আজ এখানে খেয়ে যাবে।'

'সে কি কথা'—অমিয় সাত হাত জলের মধ্যে পড়ল। 'না না, সে কি, সে না হয়—' ওর বিব্রত ভাব দেখে সুলেখা হেসে বলল। আর হাসতেই সুলেখার চোখের সঙ্গে ওর চোখ এক মুহূর্তের জন্ম মিলল। তার পর সুলেখাই চোখ ফিরিয়ে নিল অন্তধারে—আর চোখ ফেরাতেই অমিয়র এক অদ্ভুত জিনিষ চোখে পড়ে গেল—সুলেখা ঘাড় ফিরাতেই অমিয়র চোখে পড়ল সুলেখার চিবুকের বাঁ ধারে একটা তিল ; আর সেই গ্রীবার অপূর্ব ভঙ্গি, হুবহু এক। অমিয় এক মুহূর্ত্ত চোখ ফিরাতে পারলে না। সমস্ত অতীত যেন এক মুহূর্ত্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

তার পর খেয়েদেয়ে ঘুমন্ত খোকাকে নিয়ে সে যখন ট্যাক্সিতে উঠল, তখন রাত সাড়ে দশটা। আর আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা যখন ট্যাক্সিতে বসে অমিয় ভাবল তখন সবটাই যেন অবিশ্বাস্য বলে মনে হ'ল। কোথায় যাবে বলে সে বেরিয়েছিল, আর কোথায় অযাচিত ভাবে সে এক অজানা অচেনা বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী চলল।

বাড়ী ফিরতেই অমিয়র মা জিজ্ঞেস করলেন—'হ্যাঁরে এত রাত অবধি কোথায় ছিলি ? আমি ত ভেবে ভেবেই সারা। যা বৃষ্টি নেমেছিল আমি ত খোকনের জন্ম ভেবেই অস্থির।'

অমিয় বলল, 'সে এক কথা মা, শুনলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে।' বলে সে সমস্ত ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বিবৃত করল। সব শুনে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নাম বললি রামরতন মিত্তির, প্রফেসার ? কোথায় থাকে বললি—কাঁটাপুকুরে ? আচ্ছা' বলেই মা বললেন 'যা শুতে যা, অনেক রাত হয়েছে'।

কিন্তু অমিয়র মা যে রামরতন বাবুকে চিনতেন একথা অমিয় কি করে জানবে ? আর কি করেই বা সে খবর রাখবে ইতিমধ্যে রামরতন বাবুর বাড়ীতে তার মা সুলেখাকে দেখে এসেছেন—দেখে এসে মুগ্ধ হয়েছেন। আরও বেশী আশ্চর্য করেছেন সুলেখার সঙ্গে তাঁর মৃতা পুত্রবধূর মিল দেখে। অনেকটা একই রকম দেখতে। খোকনের ভুল ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। হয়ত এই মিলের জন্যই সে বলেছিল, 'মার কাছে যাব।'

কিন্তু অমিয়র মনকে ভরে রেখেছে, সুলেখার সেই গ্রীবাভঙ্গীর আর সেই চিবুকের বাঁদিকের তিল। যে তিল আর যে গ্রীবাভঙ্গি অমিয়কে কেবল শান্তার কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রথম বার যাকে বিয়ে করেছিল অমিয় সেও তার মায়ের পছন্দ মতই—কিন্তু বিয়ে করেও অমিয় ভুলতে পারে নি শান্তাকে। শান্তার সঙ্গে যে তার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয় সে কথা অমিয় জানত, শান্তাও জানত। শান্তা জানত যে অমিয়র যে স্বভাব তাতে সে অসবর্ণ বিয়ে করে তার মার মনে আঘাত দিতে পারবে না। তবুও সহপাঠিনী শান্তার বিয়ের পর থেকে অমিয় যেন কেমন বিষণ্ণ, কেমন অদ্ভুত হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর শান্তারও অমিয়র এই ভাব চোখ এড়াতে পারে নি। এমনকি, এর পর মায়ের বার বার অনুরোধে অমিয় যখন ইলাকে বিয়ে করে তখনও যে সে বিয়েতে সে সুখী হয় নি শান্তার চোখকে তাও এড়িয়ে যেতে পারে নি। তার পর অনেক বারই শান্তা অমিয়র বাড়ীতে এসেছে, ইলার সঙ্গে ভাব করেছে নিজে থেকেই। একদিন অমিয়কে শান্তা নিজেই বলল, নিভৃতে, চোখ দুটো মাটিতে রেখে—'আমার জন্যেই বৌদির জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।'

অমিয়র সেদিন হঠাৎ রাগ হ'ল শান্তার উপর—তার কথাটা একবারও শান্তা বলল না, শান্তার জীবনে অমিয়র কি একটুও স্থান এখন নেই ? অমিয় শুধু বলল একান্ত বিষাদ স্বরেই—'ওর জীবন কেন নষ্ট হবে শান্তা ? আমি ত ওকে সবই দিয়েছি।' শান্তা চকিতে একবার অমিয়র মুখের দিকে চাইল—যেন অমিয়, যে তাকে কোন দিন অপমান করে নি, আজ তাকে চরম অপমান করল, আর সে নিজে যেচে সেই অপমান যেন কুড়োল। তার পর থেকে শান্তা আর অমিয়র সঙ্গে দেখা করে নি। বোধ হয় অমিয়কে সে একে বারেই ভুলে গেছে।

কিন্তু তার মা এদিকে অন্য কাণ্ড করে বসে আছেন। একদিন অমিয় যখন খেতে বসেছিল তখন মা বললেন, 'আমি রামরতন বাবুকে কথা দিয়ে এসেছি অমিয়। জানি, তুই আমার কথার উপর কথা বলতে পারবি না।'

অমিয় বলল, 'কিন্তু আমি যে আর বিয়ে করব না মা।'

মা রেগে গেলেন—'বেশ ত তোর যা ইচ্ছে হয় করগে। আমি আর কদিন বাঁচব, কিন্তু খোকনকে কে দেখবে ?'

অবশেষে কোন কথাই টিকল না। অমিয়র জীবনের সঙ্গে সুলেখার জীবনের যোগসূত্র খোকনকে দিয়েই রচিত হ'ল।

বিয়ের পর একদিন ইলার ছবির তলায় দাঁড়িয়ে সুলেখা বলল অমিয়কে, 'আচ্ছা, অনেকে বলেন দিদির সঙ্গে আমার নাকি অনেকখানি মিল আছে। কিন্তু আমি ত ছবি দেখে কিছুই বুঝতে পারি না। আচ্ছা, সত্যি কি মিল কিছু আছে?'

অমিয় সেদিকে না চেয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা না হলে খোকন ভুল করবে কেন?' এর বেশী সে কিছুই বলতে পারল না। কি করে বলবে, অমিয় এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী মিল আছে শান্তার সঙ্গে—শান্তার গ্রীবাভঙ্গির সঙ্গে, শান্তার গালের তিলের সঙ্গে?

বার্দ্ধক্যে বর্ষা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আজি ঝরঝর বরষায়
কবিরা হাঁকিছে দরজায়—
দোর খোল ভাই মেঘভরা ঐ
আকাশেতে শোন্ ঝম্‌ঝম্,
ভুলে যা দুঃখ গান গাই মোরা
শোন্ বসে তুই হরদম্।
আমি তাহাদের আহ্বান শুনে
নাই পাহি কোনো ভরসাই,
বার্দ্ধক্যের জরা মোর দেহে গরজায়,
থমকিয়া বসি আধখানা খোলা দরজায়।
বৃষ্টির ছিট্ বাঁচাইয়া চলি
মন করে তবু আন্‌চান,
যৌবন হায় ঝরে গেছে কবে
তবু কেঁদে ওঠে মনপ্রাণ—
ইহাদেরি ডাকে, নিজেরে ভুলিয়া ক্ষণকাল,
সাধ যায় ওরে পরিতে স্বপ্ন মায়াজাল।
ছুটে যায় মন মেঘের মাদোলে
শুনিতে ঝড়ের খ্যাপা গান,
ঝম্‌ঝম্‌ঝম্ ছন্দেরি করি দ্রাক্ষাপান।
দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো রয়েছে দরপণ,
তখনি তাহাতে জরার মূর্ত্তি করিয়া নিজের দরশন—
ঘুচে যায় হায় সকল স্বপ্ন হতাশে অমনি চমকাই,
বাজ ফেটে হেঁকে তখন আমারে ধমকায়।

অট্টহাসিয়া বিদ্যুৎ করে উপহাস,
জানেনা সে মোর তিনদিন থেকে উপবাস।
পাঁচদিন থেকে নাড়ীতে রয়েছে লেগে জ্বর,
হাওয়া লাগিলেই শীতে কাঁপে দেহ থরথর,
বেরসিক সম জান্‌লাটা তাই
আধখানা রেখে ঢাকিয়া,
বিদ্যুতালোক চোখে মুখে নিই মাখিয়া।
বার্দ্ধক্যের জ্বর ও জরার অভিশাপ,
তাই দিয়ে হায় শেষযাত্রায়
জীবনকে আজ করি মাপ।
আনন্দ সুখ ওজনের আজি মন তার,
ঝরে গেছে তার ছায়ানট মেঘমল্লার।
জানলার ফাঁকে হাওয়া লেগে তাই চমকাই,
বিদ্যুৎ মোরে বজ্রে ফাটিয়া ধমকায়,
মনে মনে তাই পাই না যে ভাই বর্ষায় আজি ভরসা,
বৃদ্ধের লাগি নয় ওরে এই বরষা।
তবু ভালো লাগে বিদ্যুৎ হানা মেঘের বাদ্য হরদম্,
ভালো লাগে তবু বৃষ্টির ধারা ঝম্‌ঝম্।
মনের কোণেতে লুকানো যে আছে যৌবন,
বয়স ঝরেছে ঝরেনি তো তাই যৌবন।
বন্ধদুয়ার ঘরে বসে তাই দেহ নিয়ে জরা জর্জ্জর,
চোরের মতন শুনিতেছি বসে ঝর্ঝর ঝর ঝর্ঝর।

ভ্রম-সংশোধন—গত আষাঢ় সংখ্যায় "দুর্দ্দিনের ডাক" কবিতাটির লেখক শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বাংলা লিপি সংস্কার

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

বাংলা টাইপের বর্তমান রূপটি বহুলাংশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশের শতবার্ষিকী গত বৎসর (১৯৫৫ খ্রীঃ) মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইল। 'বর্ণপরিচয়' (দ্বিতীয় ভাগ) এর প্রয়োজনেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রেসের টাইপ লইয়া ভাবিতে হইয়াছে ধরিয়া লইলে বর্ণপরিচয়ের প্রথম সংস্করণ ও আধুনিক লাইনো বা মনোটাইপে মুদ্রিত যে কোন গ্রন্থ হইল বাংলা টাইপের মুদ্রিত রূপের দুই মেরু-প্রান্ত। বাংলা টাইপের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্তি বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ ভুলিয়াছে, কিন্তু প্রেসের টাইপ কেসে এই কীর্তিটি স্বীকৃত হইয়া আছে। আজও প্রেসে টাইপ সাজাইবার রীতিটিকে 'বিদ্যাসাগরী' বলা হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল বাংলা লিপি লইয়া বিশেষ কেহ মাথা ঘামান নাই। অন্ততঃ [illegible] প্রবন্ধে ইহার বিশেষ কোন নজীর পাই না। তবে প্রেসের সুবিধার্থে কখনও কখনও একটু-আধটু পরিবর্তন হইয়া থাকিতে পারে। বাংলা লিপিতে যে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে এবং প্রচার ও আন্দোলনের দ্বারা তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন—এ বিষয়ে প্রথম বোধ-করি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যা-নিধি। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি ৩৩ পৃষ্ঠাব্যাপী। প্রবন্ধের পাদটীকায় পত্রিকা-সম্পাদক লিখিয়াছেন, "এই প্রবন্ধে বর্ণবিন্যাসের ও বর্ণের রূপের যে নূতন রীতি অনুসৃত হইয়াছে, তাহা লেখক মহাশয়ের নিজস্ব; সাহিত্য পরিষৎ এই নূতন রীতি সম্বন্ধে কোন মতামত এ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নাই এবং তজ্জন্য কোন রূপে সম্প্রতি দায়ী নহেন।" দায়ী না থাকিলেও বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনুসৃত অভিনব লিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সেই যুগে যত্নের সহিত এইরূপ প্রবন্ধ ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়া পরিষদ নিজেকে বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহার দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আচার্য যোগেশচন্দ্র এইখানেই থামেন নাই। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে একখানি ব্যাকরণ (পরিষদ গ্রন্থাবলী নং ৩৮) প্রকাশ করেন। সেই ব্যাকরণে বহুল ভাবে সংস্কৃত (reformed) লিপি ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাকরণে এবং পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় লিপি সংস্কার বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব এবং বাস্তব প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা পরে প্রসঙ্গতঃ বিবৃত করিব। এখানে শুধু ইতিহাসের কথাটুকু উল্লেখ করিতেছি। ব্যাকরণ ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ব্যতীত ১৩১৬ কার্তিকের ও ১৩১৭ বৈশাখের প্রবাসীতে 'বাঙ্গলা অক্ষর' নামে আচার্য যোগেশ চন্দ্রের দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর বহুকাল লিপি সংস্কার বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নাই। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবগুলি দীর্ঘকাল প্রস্তাবাকারেই রহিয়া গেল, কোন মুদ্রাকর বা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব লইলেন না।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "Type Sub-Committee of the Bengal Text-books Committee" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সদস্য ছিলেন: রবীন্দ্রনাথ (চেয়ারম্যান), শ্রীরাজশেখর বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার। এই সমিতিকে রবীন্দ্রনাথ 'অক্ষর সমিতি' বলিতেন। সমিতির প্রথম অধিবেশনে অজরচন্দ্র সরকার টাইপ সংস্কার বিষয়ে এক দীর্ঘ ও বিশদ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন এবং সমিতিও তাহার কয়েকটি ধারাবাহিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সরকারের প্রস্তাবিত সংস্কারের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করে। অজর বাবু এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় কার্যনিরত ছিলেন এবং 'বাংলা টাইপ ও কেস' নামে তিনটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রবাসীর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঁচ দফায় সম্পূর্ণ হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনটির পরে আর প্রকাশিত হয় নাই।

যাহা হউক, উপরোক্ত 'অক্ষর সমিতি'র প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকার সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন—সাধারণে, বিশেষত সাহিত্যিক ও লেখক মহলে এই লিপি চলিবে কিনা। ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি:

"আমাদের বিশ্বভারতী, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রবাসী যদি তোমার এই ছক অবলম্বনে ছাপতে সুরু করে, তা হলে সাধারণই বল, আর অসাধারণ সাহিত্যিকই বল ক্রমে এই ছকের মত লিখতে আর ছাপতে বাধ্য হবে।"

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী কিম্বা প্রবাসী কেহই যত দূর মনে হয় এই ছক মানিয়া লন নাই বা তাহা অনুসরণ করিবার দায়িত্ব পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং সাধারণ-অসাধারণ সাহিত্যিকেরাও লিখিতে বাধ্য হন নাই। আসল কথা, লিপি সংস্কার কেবল প্রস্তাব পাস, সমিতি গঠন বা প্রবন্ধ রচনার ব্যাপার নয়, সুপরিকল্পিত ভাবে কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠান, মুদ্রাকর, টাইপ-ফাউণ্ডার এবং বর্ণপরিচয় (primer) রচয়িতার সক্রিয় সহযোগিতায় কাজ চালাইতে হইবে, এরূপ কোন ব্যবস্থা অদ্যাবধি হয়

নাই। লিপি সংস্কারের দিকে এ পর্যন্ত আমূল পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যে সুপরিকল্পিত বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা হইল বাংলা লাইনো টাইপ আবিষ্কার। বিশ্ববিদ্যালয়,'অক্ষর সমিতি'র প্রস্তাবের উপরই প্রধানতঃ ভরসা করিয়া লাইনো টাইপের লিপি সংস্কার করা হয়। লাইনো টাইপের প্রসঙ্গে স্বর্গতঃ সুরেশচন্দ্র মজুমদারের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে নিঃসন্দেহ।

বাংলা লাইনো টাইপ আবিষ্কারের পর হইতে অদ্যাবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু বই ও প্রশ্নপত্র, কয়েকটি বাংলা সংবাদপত্র এবং অধুনা কতকগুলি প্রেসে ছাপা পুস্তক নূতন লাইনো টাইপের লিপিতে ছাপা হইয়া বাজারে বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি লাইনো টাইপের বহুল প্রচার হইয়াছে এবং বাজারে বাংলা টাইপ-রাইটারও আসিয়া গিয়াছে। লোকে প্রথম প্রথম কষ্ট করিয়া এবং অনেক আপত্তি করিয়াও বটে—লাইনো টাইপ পড়িতে সুরু করিয়া আজকাল বেশ সহজে পড়িতে পারে। কিন্তু তাহাতেও বাংলা লিপি সংস্কারের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। আজও শিশুগণকে প্রথম পাঠের সময় 'ত' এবং ু কলা শিখিয়াও কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে 'ত যে র কলা হ্রস্ব উ' লিখিবার সময় মাত্রাযুক্ত 'এ' লিখিয়া তাহার পাশে একটি উর্ধমুখী শুণ্ড জুড়িয়া দিতে হয়! 'ত' এবং 'ু' লিখিতে জানিয়াও 'কিন্তু'র বেলায় 'ন' এর নীচে 'ও' লিখিয়াই বুঝিতে হয় 'ন-তয়ে হ্রস্ব উ'কার লিখিয়াছে! 'ক' এবং 'ত' লিখিতে শিখিলেও 'ক-য়ে ত' লিখিতে পারিবার কোন নিশ্চয়তা নাই! উপায় নাই, অদ্যাবধি কোন প্রথম ভাগ লাইনো টাইপে ছাপা হয় নাই। সুতরাং যতদিন পর্যান্ত যাঁহাদের এই বিষয়ে অগ্রণী হইবার কথা তাঁহারা না আগাইয়া আসিবেন ততদিন পর্যান্ত শিশুরা 'স্বাস্থ্য' লিখিবে পড়িবে 'স্বাস্থ্য' এবং বানান করিবে 'স-য়ে হ-য়ে য-ফলা স্থ্য'!

যাহা হউক, ইতিহাসের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অক্ষর সমিতির চেষ্টা ব্যতীত আর একটি প্রয়াসের কথা উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা হইল, বাংলা দেশে রোমক লিপি সমিতির আন্দোলন। যদিও বাংলা লিপি সংস্কার ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ইহারা পুরাপুরি বাংলা ছাঁটিয়া বাদ দিয়া সেই স্থানে রোমান লিপি প্রচলনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। তথাপি বাংলা লিপি ব্যবস্থার যে সকল গলদের কথা এই সমিতি উল্লেখ করিয়াছিল, তাহা প্রণিধানযোগ্য। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ। ড. চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৫ সনে "Calcutta University Phonetic Studies" এ "A Roman Alphabet for India" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুনীতিবাবু তাঁহার প্রবন্ধে দেবনাগরী জাতীয় ভারতীয়, ফার্সী, আরবী ও রোমান—এই তিন পদ্ধতিরই গুণাগুণ বিচার করিয়া ভারতীয় পদ্ধতির তিনটি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন—

(1) Complexity of the letters,

(2) Syllabic and not purely alphabetical character of writing,

(3) Use of conjunct characters, involving the necessity of additional abbreviated forms of a great many of the letters, and in some cases the development of entirely new additional letters . . . very fine founts of complicated conjuncts and other letters are economically unsuitable, they are apt to get blurred, broken and so become useless in a short time . . . the conjunct consonants increase the cost and the time and labour required in printing and they form an extremely cumbersome business.

১। অক্ষরের জটিলতা ২। বর্ণাশ্রয়ী লিপির পরিবর্তে যুগ্মাক্ষরিক লিপি ৩। যুক্তাক্ষরের ফলে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন অক্ষর সৃষ্টি···ইহা ছাড়া অন্যান্য দোষের মধ্যে যুক্তাক্ষরের খুব সূক্ষ্ম টাইপগুলি বেশি দিন টিঁকে না,···যুক্তব্যঞ্জন মুদ্রণ ব্যয়, সময় ও পরিশ্রমসাধ্য। এবং সবকিছু মিলিয়া এক দুরূহ জটিলতা সৃষ্টি করে।

কথাগুলি দেবনাগরী সম্বন্ধে বলা হইলেও বাংলা টাইপ সম্বন্ধে সমান ভাবে প্রযোজ্য। বাংলা ও ইংরেজী টাইপ কেসের তুলনা করিতে যাইয়া সুনীতি বাবু জানাইতেছেন :

In Roman type cases . . ., there are in all 152 chambers for types plus numerals, brackets and punctuation marks and all accessories in the shape of spaces, leaders, etc. (The capital letters in English mean a duplication of 28 type chambers, included within the 152). Contrasted with this in the Bengali type case, there are 455 chambers. . . . In printing, Bengali no less than 563 separate type-items are required.

রোমান টাইপ কেসে সংখ্যা, চিহ্ন ইত্যাদি ব্যতীত ১৫২টি ঘর আছে। ইহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় বাংলায় ৪৫৫টি ঘর এবং বাংলা ছাপিতে সর্বসাকুল্যে ৫৬৩টি ভিন্ন ভিন্ন টাইপের সাহায্য লইতে হয়।···

কি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার কল্পনা করুন। অথচ এ বিষয়ে পণ্ডিত সমাজ পরম নির্বিকার চিত্তে বসিয়া আছেন এবং এই ৫৬৩টি অক্ষরের গন্ধমাদন টাইপ কেস সম্মুখে রাখিয়া সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড গণনার ন্যায় দুঃসাধ্য কাজে ব্রতী রহিয়াছেন কম্পোজিটরের দল। দেশে লাইনো টাইপ আসিয়াও ইহাদের দুঃখের অবসান ঘটে নাই। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ নাকি এক লিপি সংস্কার সমিতি গঠন করিয়া এ বিষয়ে আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে চান।

এইবার সংক্ষেপে লিপি সংস্কার কল্পে যে সকল প্রস্তাব করা

হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য উপস্থাপন করিব। আমার নিজের প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। এই পর্যন্ত যাঁহারা লিপি সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই প্রেসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কারের কথা বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে উচ্চারণের সহিত সঙ্গতিবিধানের কথাও রহিয়াছে। প্রেসের সমস্যা লিপি সংস্কারের কার্যে একটি বিশেষ চিন্তনীয় বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল প্রেসের কথা স্মরণ করিলেই চলিবে না। হস্ত লিখিত লিপির সুবিধার কথাও মনে রাখিতে হইবে। এই কারণে যাহাতে লেখনী অধিক না তুলিয়া টানা লেখা যায় এবং অক্ষরগুলির শেষ প্রান্তটি দক্ষিণমুখী হইয়া দ্রুত লিখনে সাহায্য করে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া, প্রথম শিক্ষার্থীদের কথাও ভাবা দরকার। ইংরেজীতে বর্ণমালার ২৬টি অক্ষর শিখিলেই শিক্ষার্থীর অক্ষর পরিচয় সাঙ্গ হয়, কিন্তু বাংলার স্বর ও ব্যঞ্জনের বর্ণমালা শিখিয়াও সব অক্ষর চেনা যায় না, যুক্তাক্ষরের নামে শিশুকে নিত্য নূতন অক্ষররূপের পরিচয় লাভ করিতে হয়।

লিপি সংস্কারের ব্যাপারে একটা বিপ্লবাত্মক আমূল পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়। কেননা ভাষার ন্যায় লিপিরও একটা নিজস্ব ধারা আছে, তাহার ভিতর দিয়াই সে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়; অকস্মাৎ আইন করিয়া তাহাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা ফলবতী হওয়া দুষ্কর। সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞানসম্মত লিপি-পদ্ধতি হওয়া প্রয়োজন বটে, তবে ইহাও সত্য যে, পরিপূর্ণ ভাবে বিজ্ঞানসম্মত ছক মানিয়া পৃথিবীতে কোন ভাষার লিপিই লিখিত হয় না। যেটুকু অসুবিধা থাকিবে তাহা মানুষ আপন কলম চালাইবার সময় নিজ নিজ ব্যবস্থা মত সহজ করিয়া মিলাইয়া লইবে। বস্তুত এখনও লিখিত ও মুদ্রিত লিপির মধ্যে যে ফাঁক, তাহার কারণ ইহাই।

যাহা হউক এইবার বর্ণমালা ধরিয়া আলোচনা সুরু করা যাক।

'অ'—ইহার সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রস্তাব নাই।

'অ' লিখিতে যদিও মাঝে কলম উঠাইতে হয়, তৎসত্ত্বেও ইহার রূপ বা লিখন পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ কেউ করেন না। বিশেষত, শব্দের প্রথমে ভিন্ন মাঝে 'অ' প্রায় লিখিতেই হয় না, শব্দের মাঝে আসিয়া হঠাৎ কলম উঠাইতে লেখার গতি যতটা ব্যাহত হয়, প্রথম বর্ণে তুলিতে ততটা হয় না।

'আ'—সম্বন্ধেও একই কথা।

'ই'—সম্বন্ধে শ্রীপান্নালাল দে* ভিন্ন আর কাহারও প্রস্তাব নাই। দে মহাশয় বাংলা 'ই' তুলিয়া দিয়া নাগরী 'इ'র প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহা অনাবশ্যক। ই ও इ উভয়েই সমান জটিল, ই-র পরিবর্তে इ লিখিয়া কোন সুবিধা হইবে না। 'ই' সম্বন্ধে প্রেসের একটি আপত্তি থাকিতে পারে। 'ই' মাত্রার উপরেও খানিকটা স্থান জুড়িয়া থাকে। কিন্তু বাংলা বর্ণ-মালায় বহু অক্ষর ও বহু চিহ্নই এই দোষে দোষী। ঝটিতি ইহার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

'ঈ'—সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা বিচার যোগ্য। *(পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ইহার ফলে, 'ই' এর সঙ্গে দীর্ঘ 'ঈ'-এর একটা সামঞ্জস্য থাকিবে, যেমন উ, ঊ-এর বেলায় আছে। দ্বিতীয়তঃ প্রথম শিক্ষার্থীদের লিখিতে শিখিবার সময় 'ঈ' লিখিতে যাইয়া পেন্সিলের উত্থান-পতন আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য। তাহার ফলে অধিকাংশেরই 'ঈ' লেখা অসুন্দর।

'উ, ঊ'—সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব নাই।

'ঋ'—সম্বন্ধে শ্রীপান্নালাল দে 'ঋ'-এর পার্শ্বস্থিত 'া' চিহ্নটি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অনাবশ্যক দাঁড়িটি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য। 'ঋ'-এর অন্য কোনরূপ সংস্কারের প্রস্তাব আমার নাই। তবে, ঋষি, ঋতু, ঋণ, ঋজু প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ভিন্ন বিশেষ কোন প্রচলিত শব্দ ঋ-যুক্ত নয়। ঐ কয়েকটি শব্দের জন্য বর্ণ-মালায় একটি অক্ষরকে স্থায়ী আসন দেওয়া কতদূর যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া দেখা দরকার। ঐ কয়েকটি শব্দকে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় লিখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বোধ হয় জ্যেষ্ঠ ৠ-এর ন্যায় কনিষ্ঠ ঋ-কেও বর্ণমালা হইতে চিরতরে বিদায় দেওয়া যায়।

ঌ—এই অক্ষরটি এখনও কিরূপে কোন কোন বর্ণপরিচয়ে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা বুঝিতে পারা মুশকিল।

ঋ, ৠ, ও ঌ লিপি সংস্কারের এক্তিয়ারের বাহিরে, তবে ইহারা বর্ণমালা হইতে অপসৃত হইবার পথে। সেই পথেই আর একটু ত্বরান্বিত করিবার জন্য উপরোক্ত কয়েকটি কথা বলা হইল।

এ, ঐ, ও, ঔ—সম্বন্ধে শ্রীপান্নালাল দে মহাশয় অ-য়ে ে, ো, ৈ, ৌ-কার দিয়া কাজ সারিতে চান। কিন্তু ইহা অনাবশ্যক। লিপি সঙ্কোচ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, লিপি সংস্কার আমাদের আলোচ্য বিষয়। এ, ঐ, ও, ঔ-এর মাত্রাহীনতার কারণ বোধ হয় ত্র এবং ত্ত-এর অবস্থিতি। ত্র ও ত্ত-এর সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। যাহা হউক, যতদিন ত্র, ত্ত আছে, ততদিন এ হইতে ঔ পর্যন্ত অক্ষরকে মাত্রাহীন থাকিতেই হইবে, পরে মাত্রান্বিত করিতে হইবে।

আকার, ইকারাদি চিহ্ন—

'ি' সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাব—ি আগে না লিখিয়া ব্যঞ্জনের পরে লেখা উচিত। কেননা উচ্চারণ ও বানানের সময় আমরা ি-কারটি পরেই বলিয়া থাকি। তিনি 'বি' না লিখিয়া 'ব'-এর পরে উলটাইয়া 'ি' লিখিবার পক্ষপাতী। এই সম্বন্ধে আমার একটি বক্তব্য আছে—আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন কোন অক্ষর লিখিবার সময় তাহার শেষ প্রান্তটি যেন ডানদিকে শেষ হয়, তবে পরের অক্ষরটি ধরিতে সুবিধা হয়, লেখার গতিও বাড়ে। ি-কে উলটাইয়া লিখিলে লিখিবার সময় আমাদের পিছাইতে হইতেছে। অথবা 'ী'-এর সহিত

* ১১।২।৫৬ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতা।

একরূপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই কারণে আমি বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাব মানিতে পারিলাম না। আমরা ি ব্যঞ্জনের পূর্বে, কিন্তু ী ব্যঞ্জনের পরে লিখি—এই অসামঞ্জস্য ঠিক নয় বটে, তবে উভয় ক্ষেত্রেই লেখার ক্ষিপ্রতা ঠিক কথা ইহা লক্ষণীয়। এখানে যেরূপ উচ্চারণের সহিত লিখনপদ্ধতির বিপর্যয় ঘটিয়াছে, ইংরেজীতেও সেইরূপ উচ্চারণ ও বানানের মধ্যে বিষম বিপর্যয় আছে, 'but' ও 'put' তাহার প্রমাণ।

ু, ূ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন, নীচে না লিখিয়া ব্যঞ্জনের পাশে ব্যঞ্জনের সমস্থান জুড়িয়া লেখার ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে প্রেসের space বাঁচিবে, লেখার গতিও ব্যাহত হইবে না। এই প্রস্তাবানুযায়ী লিখিলে লেখা দ্রুততরই হইবে। বিদ্যানিধি মহাশয় একই ভাবে ূ স্থলে ডবল হ্রস্বউ লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয় নূতন এর ন্যায় কূ লিখিলেও ক্ষতি নাই। ডবল হ্রস্বউ-এর আকৃতিটি একটু জটিল। ইহা ছাড়া রু, রূ, লিখিবার রীতি অবিলম্বে তুলিয়া দেওয়া দরকার। লাইনো টাইপ ইহা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত 'কিন্তু' লিখিবার সময় 'ু' টিকে ন্ত-এর সহিত এক অদ্ভুতরূপে জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা প্রাচীন বাংলা হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে উহাও আপত্তিকর। দুই তিন রকম ু প্রথম শিক্ষার্থিগণের নিকট একটা অনাবশ্যক বোঝাস্বরূপ। অজয়চন্দ্র সরকার ু, ূ কে ব্যঞ্জন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনের উকারান্ত রূপ পৃথক পৃথক ভাবে না রাখিয়া পৃথক 'ু' ও 'ূ' দিয়া কাজ চালানো যাইবে, এবং প্রেসের অক্ষরের সংখ্যা কমিবে। কিন্তু তদপেক্ষা বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবই অধিকতর গ্রহণীয়। আর বস্তুতঃ অজয়বাবুর প্রস্তাবানুযায়ী লিখিতে গেলেও অবশেষে বিদ্যানিধি মহাশয়ের রূপই ধারণ করিবে। অজয়-বাবুর নির্দেশ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: (প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৫৩)। শু, গু, সু, হু প্রভৃতি লিখিবার রীতি বর্জনীয়।

ঋ-কার—বিদ্যানিধি মহাশয় ৃ টিও 'ু'-এর মত মাত্রা হইতে লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পূর্বোক্ত কারণে ইহাও গ্রহণযোগ্য। হ-এর সহিত ৃ যোগ করিবার জন্য যে নূতন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যথা 'হৃ'—তাহা বর্জনীয়।

'ে' সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় ি-এর মত 'ে' টিকেও ব্যঞ্জনের পর লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার যুক্তিতে যে কারণে বিদ্যানিধি মহাশয়ের ি গ্রহণযোগ্য নয়, সে কারণেই উলটানো 'ে' অচল।

ৈ। সম্বন্ধেও একই কথা।

পান্নালালবাবু ৌ কারের পূর্বের অনাবশ্যক 'ে' চিহ্নটুকু তুলিয়া দিতে চান। ইহার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। তবে ৌ-কার উচ্চারণের ভূমিকায় ো-কারের রেশ রহিয়াছে। তাই লিখিবার সময় ও-কারের রেশটুকু রাখিলে প্রথম শিক্ষার্থীকে বুঝাইতে সুবিধা হয়। ৌ-কার সম্বন্ধে উভয় পক্ষেরই যুক্তি প্রবল। তবে বিদ্যানিধি মহাশয় একটি নূতন চিহ্নের প্রস্তাব করিয়াছেন—ঈষৎ ই-এর জন্য ী ব্যবহার। এই পরিপ্রেক্ষিতে পান্নালালবাবুর 'ী' চলে না।

এইবার ব্যঞ্জনবর্ণের প্রসঙ্গে আসা যাক।

ক বর্গ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব নাই।

চ বর্গে ছ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আছে—ব-এর মত চ-এর পেট কাটিয়া 'ছ' লেখা। ইহাতে বিশেষ কাজ আগাইবে না। অধিকন্তু প্রেসের প্রুফ যাঁহারা দেখেন তাঁহারা বলিতে পারেন ব এবং ধ-এর মধ্যে কি পরিমাণ গণ্ডগোল হয়। সেই গণ্ডগোল চ, ছ-এর ক্ষেত্রেও দেখা দিবে।

ট বর্গে কোন প্রস্তাব নাই।

ত বর্গে 'ত' সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় ত-এর ত্রিশঙ্কু অবস্থা নিরসন করাইয়া উহাকে মাত্রার সহিত যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবার কথা নয়। বস্তুতঃ 'ত' যে মাত্রার সহিত যুক্ত নহে এই তথ্যটি অনেকের কাছে জ্ঞাত নয়। 'ধ' সম্বন্ধে আমার একটি প্রস্তাব আছে। ধ-এর আঁকড়িটি ঊর্ধ্বমুখী না করিয়া পাশে দীর্ঘ উ-এর মত লিখিলে অনেক সুবিধা হইবে। যে-কোন যুক্তব্যঞ্জনে ধ-এর চেহারা ওইরূপই হইয়া থাকে যথা দ্ধ। যুক্তব্যঞ্জন লিখিবার সময় একপ্রকার 'ধ', খুচরা লিখিবার সময় অন্যরূপ 'ধ' এই অসঙ্গতিটি কাটাইবার ইহাই সহজ পথ।

'ভ' সম্বন্ধেও বিদ্যানিধি মহাশয়ের ত-এর ন্যায় একই কথা বলিয়াছেন। 'ভ'-কেও মাত্রার সহিত যুক্ত করা প্রয়োজন।

'ব'-লিখিবার বিদ্যানিধি মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ সুবিধা দেখিতেছি না। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

র-এর বর্তমান রূপ লইয়া সকলেই প্রায় বিরূপ। কেহ র-এর স্থানে নাগরী র চালাইতে চান, কেহ র-এর নীচের বিন্দুটিকে মূল অক্ষরের সহিত জুড়িয়া দিতে আগ্রহী। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) সকলেরই যুক্তি বিন্দুটিকে পৃথক রাখিতে গেলে লিখিবার সময় কলম তুলিতে হয় এবং প্রেসেও কিছুদিন পর বিন্দুটি উধাও হইয়া যায়। প্রেসের ব্যাপার সম্বন্ধে বলিতে পারি না, তবে ইংরেজীতেও বিন্দুওয়ালা অক্ষর আছে i j। এবং 'র' লিখিতে কলম না তুলিতে হইলেও তাড়া-তাড়ি লিখিবার সময় ব ও প্রস্তাবিত 'র' গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। নাগরী র গ্রহণের বিরুদ্ধে আমার যুক্তি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ব, ক, ধ ও র একই জাতীয় অক্ষর হওয়ায় লিখিবার সুবিধা হয়। র লিখিতে হইলে নূতন ধরনের অক্ষর শিখিতে হয়। তা ছাড়া আমাদের লিপিতে অসুবিধা আছে বলিয়া অপর ভাষার লিপি হইতে ধার লইব, এই যুক্তিটিও আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান মনে হয় না। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবিত ড়, ঢ় এবং য় সম্বন্ধেও র-এর যুক্তিই প্রযোজ্য।

অন্তঃস্থ 'ব' সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় যে নাগরী ব-এর প্রস্তাব

করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধেও আমার একই কথা। আর অন্তস্থ 'ব'-এর উচ্চারণ যখন অন্য অক্ষরের সাহায্যে বাংলায় লিখিবার ব্যবস্থা আছে, তখন অন্তস্থ 'ব' বর্ণমালা হইতে বাদ দিলেই বা ক্ষতি কি?

'ৎ'-টি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিনব আবিষ্কার। কিন্তু বর্ত্তমানে উহাকে বাদ দিলে ভাল হয়, ত-এ হসন্ত দিয়াই কাজ চলে।

তিনটি স-এর সংযুক্তিকরণ সম্বন্ধে পান্নালালবাবু একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অবান্তর, লিপি সংস্কারের এক্তিয়ারের বাহিরে।

'ং'-টি সম্বন্ধে অনেকের মত ব্যঞ্জনের পর মাত্রার উপরে একটি বিন্দু দিয়া অনুস্বার লেখা উচিত। ব্যঞ্জনযুক্ত ঙ, ঞ সম্বন্ধেও একই বিন্দু ব্যবহৃত হইবে। এবং যে বর্গের ব্যঞ্জনের সহিত ব্যবহৃত হইবে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ বুঝাইবে। উদাহরণ—চ˙চল—চ-এর সহিত যুক্ত বলিয়া বিন্দুর উচ্চারণ ঞ বুঝিতে হইবে। বর্গ ভিন্ন অন্য অক্ষরের সহিত যুক্ত হইলে বিন্দুর অর্থ হইবে অনুস্বার যথা: অহ˙। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি। তবে সন্তান-এর বেলায় এ নিয়ম খাটিবে না অর্থাৎ স˙তান লেখা চলিবে না। 'বঙ্গ' কথাটিকে 'বঙগ' লিখুন এই অনুরোধ। কেননা 'ঙ্গ' অক্ষরটিকে বিলোপ করা প্রয়োজন।

এইবার যুক্তাক্ষরের পালা। যুক্তাক্ষরগুলিকে লাইনো টাইপের ন্যায় যতদূর সম্ভব ভাঙিয়া দিতে হইবে। এই বিষয়ে লাইনো টাইপের অক্ষরগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বাংলায় যুক্তাক্ষর সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলির অংশবিশেষকে অনেক সময় হারাইতে হইয়াছে—'হ্ম' বা ক্ত তাহার প্রমাণ। ইহার ফলে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলিকে প্রথম শিক্ষার্থী খুঁজিয়া পায় না। উর্দুতে এই ব্যবস্থা আরও কয়েক ধাপ অগ্রসর হইয়া 'মিলাওট' সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার ফলে উর্দু লিপিতে এক অনাসৃষ্টি ঘটিয়াছে।

যুক্তাক্ষর ভাঙিবার নামে 'ক্ষ'-টিকে ভাঙিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা ক্ষ-এর উৎপত্তি হইতে ইহার প্রয়োগের মধ্যে কোন যোগ-সূত্র নাই। ক্ষ-টির অভ্যন্তরে যে দুটি বর্ণ লুক্কায়িত রহিয়াছে 'ক্ষ' তাহাদের নির্ব্বিশেষে হজম করিয়াছে। সুতরাং ক্ষ-টিকে বর্ত্তমানে নূতন অক্ষর বলিয়া ঘোষণা করিয়া হ-এর পাশে স্থান করিয়া দেওয়া হউক। রবীন্দ্রনাথ সহজপাঠে তাহাই করিয়াছেন। উহাকে যুক্ত খ বলা ভাল। শুধু একটি কথা, ক্ষ-এর সহিত ণত্ববিধানের একটি বিধি জড়িত। উহার অভ্যন্তরে 'ষ' আছে বলিয়া পরবর্ত্তী ন, ণ হইয়া যায়। ইহার ব্যবস্থা করার জন্য ঋ র ষ-এর সঙ্গে ক্ষ-কে জুড়িয়া দিলেই আইন বাঁচিবে।

রেফ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঘুচাইয়া দিলে (যাহা বহু পূর্ব্বেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে) প্রেসের অনেক টাইপ কমিবে, প্রথম শিক্ষার্থীরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে।

লিপি সংস্কারের প্রথম ধাপহিসাবে আমি যুক্তাক্ষরগুলিকে পাশা-পাশি লিখিবার বিরোধী। ইহাতে হসন্তের ব্যবহার অনাবশ্যকরূপে বাড়িয়া লেখার রূপ হাস্যকর হইয়া দাঁড়াইবে। কিছুকাল উহারা একে অপরের স্কন্ধেই বাস করুক। যুক্তাক্ষরে 'ধ' ব্যবহারের একটু অসুবিধা আছে। 'ধ'-কে কাহারও স্কন্ধে চড়িতে হইলে ধ-এর আঁকড়ির সম্যক বিকাশস্থান থাকে না। এই বিষয়ে আমার প্রস্তাব মতো ধ-এর রূপটিকে পরিবর্ত্তন করিয়া ব করিলে সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

যুক্তাক্ষরগুলিকে ভাঙিয়া একের স্কন্ধে অপরকে জুড়িয়া লিখিলে কয়েকটি অক্ষর প্রথম প্রথম একটু দৃষ্টিকটু লাগিবে। যেমন—ত্ত, ত্র—ত্র, ষ্ণ—ষঞ, জ্ঞ—জঞ, ভ্র—ভ্র, হ্ন—হন। এইগুলিকে প্রথম ধাপে হাত দেওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়া আমার ধারণা। অন্যগুলি সম্বন্ধে চোখ ও হাত অভ্যস্ত হউক, পরে এই অক্ষরগুলির রূপ পরিবর্ত্তনের কথা ভাবা যাইবে। এমনও হইতে পারে উপরোক্ত অক্ষর কয়টিকে ব্যতিক্রম হিসাবে নবলিপির সহিত এক পংক্তিতে বসাইয়া লওয়া হইবে। কেবল 'ষ্ণ' সম্বন্ধে আমার একটি নিবেদন। কি বিষ্ণু, কৃষ্ণ, কি তৃষ্ণা কোন ক্ষেত্রেই আমরা 'ষ' এবং ঞ-এর উচ্চারণ করিতে পারি না—'ষ এবং ণ'-এর উচ্চারণ করিয়া থাকি। আমার মনে হয় 'কৃষ্ণ' এইরূপ না লিখিয়া কৃষণ লিখিলেই গোলমাল মিটিয়া যায়, উপরন্তু আমাদের একটি ভুল উচ্চারণের হাত হইতে রেহাই দেওয়া হয়।

ইহার পর 'ফলা'র কথা। র-ফলা সম্বন্ধে দে মহাশয় নাগরী র-ফলা প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি বাংলা র-ফলাটি অনাবশ্যক পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু তাহা হইলে তো অনেক অক্ষরকেই পা বা হাত গুটাইয়া বসিতে হয়। আর ্র-ফলাটি পা ছড়াইয়া বসিলেও উহা লিখিতে কাহারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফলাগুলি কত সহজলেখ্য হইয়াছে তাহার নিদর্শন ট-ফলা। যদিও যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে প্রস্তাবানুযায়ী ট-ফলার আর থাকিবার অনুমতি নাই, তথাপি ব্যতিক্রম বলিয়া ট্র-টিকে বজায় রাখিলে মন্দ হয় না।

আমার একটি বক্তব্য আছে রেফ সম্বন্ধে। আমরা রেফটি সাধারণতঃ যে ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারণ করি, তাহার মাথায় বসাইয়া থাকি, কেহ কেহ পরেও বসাইয়া দেন। আবার অনেকে ঠিক কোথায় বসানো উচিত তাহা না জানিয়া যত্রতত্র লাগাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে একটা বিধিসম্মত ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় উচ্চারণানুগ করিয়া উহাকে ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে বসাইলে ভাল হয়। যথা—র্বর্গ।

প্রচলিত হসন্তের রূপটিকে পরিবর্ত্তন করিবার বিশেষ প্রয়োজন আমি অনুভব করিতেছি না। তা ছাড়া ভাষায় যত কম হসন্তের প্রয়োগ করা যায় ততই ভালো। বস্তুত বাংলা শব্দান্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণের কোন নিয়মের বালাই নাই—মত্ কিন্তু যত, অথচ দুইটিকেই একভাবে লেখা হয়, কি কথাটির ক-এ হসন্ত আছে, কিন্তু কয়জন তাহা লিখিয়া থাকেন

ইহার উপায় কি ? আমার মনে হয়, হসন্তের বিধিটিকে কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া পাঠকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়িলে হস চিহ্ন ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন।

বর্ণমালার অন্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সূচনায় বলিয়াছিলাম, বর্ণমালায় লিপি পদ্ধতিতে অবৈজ্ঞানিক প্রথা রহিয়াছে, তাহাকে বিজ্ঞানের নিয়মের ছাঁচে বলপূর্ব্বক ফেলিলে সুবিধা হইবে না। সেই কারণে আমি কেবল প্রচলিত প্রবণতাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কিছু কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছি। আমার প্রস্তাবে, প্রেসের অক্ষর সংখ্যা বিশেষ না কমিলেও, অক্ষরের লেখ্যরূপে অনেকখানি সরলতা আসিবে মনে হয়।

বর্ণমালা ছাড়িয়া সংখ্যা লিখন পদ্ধতির দিকে চাহিলেই বুঝা যাইবে কিরূপ অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন পদ্ধতিকে আমরা অতি সহজে মানিয়া লইয়াছি। একমাত্র রোমান সংখ্যা ভিন্ন কোন ভাষায় সংখ্যা লিখনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যবোধ নাই। অথচ তাহাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় কি ?

প্রবন্ধের উপসংহারে একটু নিবেদন আছে, সেইটুকু সারিয়া লই। ভাষার ক্ষেত্রে যেরূপ আইনের হুমকি কখনও কার্যকারী হয় না, লিপির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। এইরূপ বলিতে হইবে বলিলেই লোকে বলিবে না, লিখিতে হইবে বলিলেই লোকে লিখিবে না। এই সকল বিষয়ে বিপরীত দিক হইতেই নিয়ম চলিবে অর্থাৎ লোকে যেরূপ লিখিবে তাহাকেই মানিতে হইবে। ভাষা ও লিপি পূর্ণ গণতন্ত্রপন্থী। তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু বলিয়া বুঝাইয়া সংস্কার করা দরকার। কিন্তু এই সংস্কারকে প্রবর্তন করাইবার যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা উদ্যোগী না হইলে আমরা চেঁচামেচি করিয়া কতটুকু করিতে পারিব ? স্বয়ং বিদ্যানিধি মহাশয়ও বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই।

নূতন লিপি চালাইবার দুই একটি সূত্র এইবার আলোচনা করিব। প্রথম ধাপে,

(১) বিশ্বভারতী, সাহিত্য-পরিষদ ইত্যাদি বিজ্ঞ প্রকাশকেরা অত্যন্ত কঠোর নিয়ম করিয়া নূতন লিপি তাহাদের গ্রন্থে ব্যবহার করুন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রেসে মুদ্রিত ও স্কুল কলেজে পাঠ্য সবকিছুর ক্ষেত্রে নব লিপি ব্যবহার করুন।

(৩) অন্ততঃপক্ষে ২।৩টি অভিজাত মুদ্রক নূতন লিপির বই ছাপিতে সুরু করুন।

(৪) একটি সমিতি গঠন করিয়া অনবরত প্রচার ও অন্ততঃ-পক্ষে একটি সাময়িকপত্র নব লিপিতে ছাপার ব্যবস্থা করা হউক।

সবশেষে যে সূত্রটি উল্লেখ করিতেছি সেইটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

(৫) শিশুদের বর্ণপরিচয় (primer) গুলিতে এই নব-লিপি ব্যবহৃত হউক। তাহার ফলে শিশু-বয়স হইতেই তাহারা এই লিপি দেখিতে অভ্যস্ত হইবে, ধীরে ধীরে চোখ তৈরী হইবে। তাহাদের শিখাইতে যাইয়া অভিভাবক ও শিক্ষকগণকেও নবলিপির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ইহার ফলে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে।

সবশেষে একটি বিনীত নিবেদন রাখিতেছি। সাহিত্য-পরিষদ-এর এক সভায় শ্রদ্ধেয় শ্রীসন্তোষকুমার বসু কথাটি বলিয়াছিলেন। লিপি সংস্কার বিষয়ে যে ব্যবস্থা বা কার্যক্রমই লওয়া হউক না কেন, তাহা যেন একক ভাবে পশ্চিমবঙ্গে গ্রহণ করা না হয়। বাংলা ভাষার অপর অংশীদার পূর্ববাংলার কথাও মনে রাখতে হইবে। এবং সেই কারণে পূর্ববঙ্গের পণ্ডিত-সমাজের সহিত একত্রে বসিয়া যে কোন সিদ্ধান্ত লওয়া কর্তব্য। বসু মহাশয়ের এই কথাটি যেন আমরা বিস্মৃত না হই। প্রবন্ধের শেষে পরিশিষ্টে বিভিন্ন প্রস্তাবের নূতন লিপির রূপ দেওয়া হইল। ইহাদের সহিত মিলাইয়া পড়িলে প্রবন্ধে বর্ণিত বক্তব্য বুঝিতে সুবিধা হইবে।

প্রস্তাবিত নূতন অক্ষর

ম্যাডাম কামা

শ্রীআরতি সেন

স্বাধীনতা দিবসের দিন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে আজ আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকি। যে দেশসেবক ও দেশসেবিকারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করতে দ্বিধা করেন নি, তাঁদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করি, সে সম্মান ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে পৌঁছুবে ম্যাডাম কামার উদ্দেশ্যে। কারণ তিনিই প্রথম উত্তোলন করেছিলেন ভারতের জাতীয় পতাকা সুদূর বিদেশে জার্ম্মানীতে ১৯০৮ সনের ১৮ই আগষ্ট দিবসে।

এই ভুলে-যাওয়া নারীর জীবন বৃত্তান্ত এতদিন প্রায় অজ্ঞাত ছিল, ব্রিটিশ শাসনের আমলে এই বিপ্লবী মহিলার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের খবরাখবর কারুরই হয়ত জানবার সুযোগ ঘটে নি। এখন মনে হয় ভারতের প্রত্যেকটি মহিলা জানুক এই মহিয়সী মহিলার দুঃসাহসের ইতিহাস।

ম্যাডাম কামা ছিলেন জাতিতে পার্শী, তাঁর জন্ম বোম্বাইয়ে। তাঁর বাবার নাম সোরাবজী ফ্রেমজী প্যাটেল। সোরাবজী ছিলেন মস্ত ব্যবসায়ী। বাপ মেয়েকে অনেক সুখ-সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের পরিবেশে মানুষ করেছিলেন, কিন্তু মেয়ে সে সুখৈশ্বর্য্যে প্রলোভিত ছিলেন না। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অতি সহজ ও সরল। গরীব দুঃখীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না এবং মহিলাদের যে-কোন সংগঠন-মূলক কার্য্যে তাঁর সহায়তা ছিল সর্ব্বপ্রথম।

ম্যাডাম কামার পুরো নাম ছিল ভিক্ষু ভিক্ষায়জী কামা। তাঁর জন্ম হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। ম্যাডাম কামা ছিলেন তাঁর বাবার আদরের সন্তান। তাঁর ভাইরাও ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী। ভিক্ষুজীর বিয়ে হয়েছিল বোম্বাইয়ে রুস্তম কামার সঙ্গে। তাদের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না।

ম্যাডাম কামার দাম্পত্য জীবন সুখের হয় নি, কিন্তু তার জন্য তাঁর আক্ষেপ ছিল না; জনসাধারণের জন্য তিনি যে কাজ করতেন তাতেই ছিল তাঁর আনন্দ।

একসময়ে ম্যাডাম কামার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়, ডাক্তাররা রোগ ধরতে না পারায় ম্যাডাম কামাকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। সেখানে কিছুদিন থাকবার পর তিনি চলে যান প্যারিসে এবং সেখানেই তিনি বসবাস স্থাপন করেন। ইউরোপে যাওয়ার পর বহু ভারতীয় রাজনৈতিকের সঙ্গে ম্যাডাম কামার পরিচয় হয়। লণ্ডনের 'হাইড পার্কে' ম্যাডাম কামা প্রায়ই সভা করতেন এবং 'ভারতের লোকদের উপর ইংরেজের অত্যাচার' এই কথাটাই বার বার বলতেন। স্বাধীনতাপ্রিয় যে সকল ইংরেজ সেই সভায় যেত তারা এই শীর্ণকায়া রমণীর ভারতে ইংরেজ শাসনের

ম্যাডাম কামা

বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ ও সেই শাসনকে বিপুল অবহেলার মনোবৃত্তি দেখে অবাক হয়ে যেত। এই কারণেই ইংরেজ সরকার ম্যাডাম কামাকে ইংলণ্ড ত্যাগ করবার আদেশ দেন এবং তিনি প্যারিসে যেতে বাধ্য হন।

প্যারিসে ম্যাডাম কামা একটা বোর্ডিং হাউসে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকতে আরম্ভ করেন এবং পরে সেটাই ইউরোপবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের মিলবার একটা আস্তানা হয়ে উঠে। ভারত ছাড়বার আগে পর্য্যন্ত ম্যাডাম

কামার রাজনৈতিক ব্যাপারে উদ্দামতা বা সে বিষয়ে তাঁর কার্য্যকলাপের কিছু জানা যায় না। ইউরোপে থাকাকালীন নানা যায়গা থেকে ম্যাডাম কামার কাছে সাহায্য ও উপদেশের আবেদন নিয়ে লোক আসত, অনেক রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নিমন্ত্রণ আসত বক্তৃতা দেবার জন্য। ম্যাডাম কামা যখনই সেখানে বক্তৃতা দিতেন তার বিষয়বস্তু ছিল সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী।

১৯০৬ সনে বীর সাভারকর ও কৃষ্ণবর্ম্মার সঙ্গে ম্যাডাম কামার পরিচয় হয়। এই দু'জনের অনুপ্রেরণাতেই ম্যাডাম কামা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবার সুযোগ পান। কৃষ্ণবর্ম্মার জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষে, কিন্তু মৃত্যু হয় জেনিভাতে। ম্যাডাম কামা যখন প্যারিসে ইনিও তখন প্যারিসে। এই সময়ে এঁরা ও আরও কয়েকজন মিলে চুপে চুপে "ইণ্ডিয়ান হোমরুল লিগ" প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল কিকরে ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যায়। ম্যাডাম কামা ছিলেন এই গুপ্তদলের একজন বিশেষ উৎসাহী কর্ম্মী।

ভারতবর্ষের আজ নূতন জাতীয় পতাকা হয়েছে, আর এর পূর্ব্বের জাতীয় পতাকা ছিল মুসলমান রাজাদের সময়। মাঝখানে ভারতবাসীকে মাথা নোয়াতে হ'ত ইউনিয়ন জ্যাকের কাছে। এই ক্ষুদ্রকায়া বীর রমণী ম্যাডাম কামাই প্রথম কল্পনা করেন ভারতবাসীদের একত্র করতে হলে একটি পতাকার তলে আনা দরকার। তিনি কল্পনা অনুযায়ী পতাকা তৈরিও করেছিলেন এবং তা উত্তোলন করেছিলেন সুদূর জার্ম্মানীতে। তার পতাকার রং ছিল সবুজ লাল ও কমলা রং, সবুজ রংটার উপরে সুতো দিয়ে তোলা ছিল আটটি পদ্মফুল, কমলা রঙের উপরে হিন্দীতে লেখা ছিল "বন্দেমাতরম্" আর লাল রঙের উপরে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতীক বোঝাতে আঁকা ছিল পাশাপাশি সূর্য ও চন্দ্র।

জার্ম্মানীতে সোস্থালিষ্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে ম্যাডাম কামা তাঁর নিজের পরিকল্পিত পতাকা উত্তোলন করে সেদিন ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ভারতের জাতীয় পতাকার প্রথম কল্পনা ও সৃষ্টির সম্মান ম্যাডাম কামারই প্রাপ্য।

সেদিনকার এই সোস্থালিষ্ট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন 'হের সিঙ্গার'। আর সেই অধিবেশনে হাজার ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন যার অধিকাংশই ছিল ইংরেজ। এই ইংরেজরা সেখানে কোন্ মতলবে এসেছিল সেটা চিন্তা করে দেখবার বিষয়।

ম্যাডাম কামা সেখানে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মিঃ হিন্দম্যান বলে একজন বড় ইংরেজ সোস্থালিষ্ট তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড কামার এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীর অধিকাংশই তাতে সায় দেয়।

এই প্রস্তাবকে সামনে রেখে ম্যাডাম কামা এক জোরাল ভাষণ দিয়েছিলেন, এর মর্ম্ম ছিল—ব্রিটিশের শাসন ভারতবাসীর যতদূর সম্ভব ক্ষতি করছে, পৃথিবীতে যত মুক্তিঅভিলাষী মানুষ আছে সকলেরই এই দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত করবার প্রস্তাবে সহানুভূতি দেখান উচিত।

লালা লাজপত রায়কে মান্দালয়ে অন্তরিত করা সম্বন্ধে ম্যাডাম কামা বলেছিলেন: "ইংরেজের এই দারুণ অন্যায় আমাদের অন্তরকে প্রজ্জলিত করেছে। আমি আশ্চর্য্য হই কি করে কোন মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে এ আশা করতে পারে যে, আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে এ অত্যাচার সহ্য করব। আমার ইচ্ছে করে যে কারাগারের দ্বার নিজে ভেঙে দিয়ে আমি লজপত রায়কে মুক্ত করে আনি।"

এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্ব্বেই ১৯০৫ সনে প্যারিসে তিনি "বন্দেমাতরম্" নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। কাগজখানি প্রায় আট-ন' বৎসর চলেছিল। এই কাগজে তিনি ভারতে ইংরেজ শাসনকে আক্রমণ করে বার বার ইংরেজকে ভারত-ত্যাগের কথা শুনিয়েছেন।

সেই সময়ে তিনি 'তলোয়ার' নামে আরও একখানি কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাগজের নাম দেখেই বোঝা যায় সে পত্রিকাখানি ছিল বিপ্লবপন্থী। এ কাগজও বেশীদিন স্থায়ী হয় নি।

১৯০৭ সনে সার্ উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলির হত্যাব্যাপারে ম্যাডাম কামা, বর্ম্মা, রাণাজি, এবং সাভারকরকে বন্দী করবার কথা হয়। কিন্তু একমাত্র সাভারকর ছাড়া আর সকলেই সেই সময়ে ফ্রান্সে অবস্থান করাতে ইংরেজ তাঁদের কিছুই করতে পারে নি। সাভারকর সেই সময় ইংলণ্ডে থাকাতে একমাত্র তাঁকেই তারা আইনতঃ বন্দী করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাকে বিচারের জন্য জাহাজে করে ভারতবর্ষে আনবার সময় তিনি জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন এবং সাঁতরে ফ্রান্সের কূলে এসে উপস্থিত হন। ফরাসী সরকার তাকে বন্দী করে ইংরেজের হাতে সঁপে দেন, তিনি ভারতবর্ষে নীত হন। ফলে তাঁর দীর্ঘকাল কারাবাস করতে হয়।

১৯১৪ সনে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ম্যাডাম কামা প্যারিস ত্যাগ করে মার্সেলিস যান এবং সেখানে ভারতীয় সৈন্যদের অস্ত্র ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। তার অনুযোগ ছিল যে, এযুদ্ধে ভারতবর্ষের কোন স্বার্থ নেই।

এই ব্যাপারে ফরাসী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে ভিচিতে ও পরে বোর্ডোয় রাখেন। ইংরেজ তাঁকে তাদের হাতে সমর্পণ করবার জন্য ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানায়, কিন্তু ফরাসী সরকার সে অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকার করেন এবং নিজেরাই প্যারিসের বাইরে একটা দুর্গে ম্যাডাম কামাকে বন্দী করে রাখেন।

যুদ্ধ অবসানের পর ম্যাডাম কামা মুক্তি পান এবং প্যারিসেই বসবাস করতে থাকেন। কারাবাসের ফলে তিনি তখন জীর্ণশীর্ণ, কিন্তু তাতে তাঁর মনের বল এতটুকুও কমে নি। মুক্তি পেয়েই ম্যাডাম কামার প্রধান কাজ হ'ল রাশিয়ান বিপ্লবী খুঁজে বার করা যারা ভারতীয় কয়েকজন বিপ্লবীকে বোমা তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে পারে।

লেনিনও ম্যাডাম কামাকে বহুবার রাশিয়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু ম্যাডাম কামা লেনিনের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি তখন ভারতবর্ষে আসবার জন্য উন্মুখ কিন্তু ইংরেজ তাঁকে ভারতে আসবার ছাড়পত্র দেয় নি। ১৯৩৪ সনে ৭৪ বৎসর বয়সে ম্যাডাম কামার স্বাস্থ্য যখন একেবারেই ভেঙে পড়তে লাগল তখন সেই কারণেই ম্যাডাম কামা ভারতে আসবার অনুমতি পেলেন।

১৯৩৫ সনে বোম্বাইয়ে এসে ম্যাডাম কামা সোজা পার্শী জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার মালপত্র ইতিপূর্ব্বেই তদানীন্তন গোয়েন্দা বিভাগ হাতে নিয়েছিল। খানাতল্লাস করে তাঁর জিনিষপত্র থেকে তারা পেল কিছু নিষিদ্ধ কাগজপত্র ও তাঁর পরিকল্পিত কিছু-জাতীয় পতাকা। কাগজপত্রগুলো ছিঁড়ে ফেলা হ'ল, আর তাঁর সাধের জাতীয় পতাকাগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

১৯৩৬ সনে ১২ই আগষ্ট হাসপাতালেই এই মহীয়সী মহিলার জীবনাবসান ঘটে। তখন তিনি ৭৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধা। প্যারিসে থাকাকালীন ম্যাডাম কামা তাঁর সমাধির উপর লিখে রাখবার জন্য তাঁরই প্রাণের এই কয়েকটি কথা রচনা করেছিলেন:

"He who loses his liberty loses his virtue. Resistance to tyranny is obedience to God."

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে বার্নেতে ভারতের রাষ্ট্রদূতের আবাসস্থল থেকে একটি বই ছাপা হয়েছে। এই বইয়ে ভারতের জাতীয় পতাকার অনেক বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু সবচেয়ে আগে আছে ম্যাডাম কামার নমুনা দেওয়া পতাকার ছবি।

ম্যাডাম কামা আজ মৃত, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের জাতীয় পতাকা ভারতের গৌরব বহন করবে ততদিন পর্য্যন্ত জাতির গৌরব এই মহীয়সী মহিলার স্মৃতি আমাদের মনে জাগরূক থাকবে নিশ্চয়।

প্রেম-ভালবাসা

শ্রীলীলাময় দে

প্রেম-ভালবাসা কি যে বলে সব
বুঝি নাকো ছাই আমি
ফুট-পাথে শুয়ে যত ভাই-বোন
কাটায় দিবস-যামি
তারা কি করিছে মৃত্যু সাথে
চুপি চুপি কানাকানি
মাটি ভালবেসে মাটি কি হতেছে
দর্শন দশা জানি?
প্রেম আমি জানি ফুলের সুরভি
নির্ম্মল বায়ে বয়
ঊর্দ্ধ আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়
মাটির সে কিছু নয়।

মাটির যা কিছু মাটিরে ছাড়ায়ে
যত ঊর্দ্ধেই যাক
মাটিতে তাহারে ফিরিতেই হয়
পশিলে মাটির ডাক।
পঞ্চ শরের পঞ্চম বাণে
মনে দেহে ডাকে বান
সর্ব্ব কাজেই সব কিছু ভুলে
শুধু করে আনচান।
প্রেম-ভালবাসা শুধু ফাঁকা ভাষা
কিছু নয় কিছু নয়
মাটির বুকের প্রেম-ভালবাসা
কর্ম্মে ফলিত হয়।

স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে
যদি কিছু থাকে ভুল
প্রেম-ভালবাসা সেই কাননের
মায়া মরীচিকা ফুল।

রাহুল-মাতা

শ্রীইন্দিরা দেবী

খেয়ালী বলে বিধাতা পুরুষের দুর্নাম আছে, কিন্তু খেয়ালের প্রতিযোগিতায় ইতিহাস-বিধাতা তাঁকেও অনায়াসে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর সোনার তরীর পরিসর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সেই সঙ্কীর্ণ পরিবেশে যাঁরা স্থান লাভ করেন তাঁরা নিতান্তই ভাগ্যবান।

যুগ থেকে যুগান্তরে কালস্রোতে ভেসে চলেছে এই তরী, কিন্তু যাঁরা তাতে স্থান পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বেশীর ভাগকেই ফিরে আসতে হয়েছে ঠাঁই নাই, 'ঠাঁই নাই ছোট এ তরী'—এই কথা শুনে।

যাঁদের ঠাঁই হ'ল না তাদের মনে হয়ত দুঃখ নেই। তবু এমন এক-একটি চরিত্র ইতিহাসের চলমান পর্দায় চকিতে প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায় যিনি স্থান পেলেন না বলে অন্যদের পক্ষে দুঃখ বোধ করা স্বাভাবিক। এমনই একটি চরিত্র রাহুল-মাতা।

ইতিহাস-বিধাতা তাঁর সবটুকু অভিষেকবারি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছেন রাহুল-পিতার উপর, রাহুল মাতার জন্য তাঁর ভাণ্ডারে একটি বিন্দুও অবশিষ্ট নেই। রাহুল-মাতার কথা ভাবলে মনে পড়ে কবিগুরুর 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধের গোড়ার কথা।

"কবি তাঁর কল্পনা উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার জন্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি যে ম্লানমুখী, ঐহিকের সর্ব্বসুখবঞ্চিতা রাজবধূ সীতা দেবীর ছায়াতলে অবহেলিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবি কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেক বারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চিত হইল না? হায় অব্যক্ত-বেদনা দেবী উর্ম্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মত মহাকাব্যের সুমেরু শিখরে একবার মাত্র উদিত হইয়াছিলে, তার পরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায়-বা তোমার অনন্তশিখর তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।"

উর্ম্মিলার মতই অব্যক্ত বেদনা রাহুল-মাতার। কিন্তু কবি তাঁর কল্পনাবিলাসী মন নিয়ে কল্পলোকে যথেচ্ছ বিহার করেন। তাঁর অনন্তপ্রসারী কল্পনার আকাশে কত প্রাণীই বিচরণ করে; তাঁর চোখে কেউ ধরা পড়ে কেউ পড়ে না। কবি তাঁর নায়ক বা নায়িকার যূপকাষ্ঠে অনায়াসে বলি দেন পার্শ্বচরিত্র অভিনেতাদের। তাই অভিযোগের ক্ষেত্র সেখানে স্বভাবতঃই স্বল্পপরিসর। কিন্তু ইতিহাসের রাজ্যে কল্পনা ব পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই। সেখানে সমস্তক্ষণ দাঁড়িপাল্লায় সত্যমিথ্যার দর যাচাই চলছে। তবু এমন এক-একটি চরিত্রের দেখা পাওয়া যায় যেখানে ইতিহাস-বিধাতার দৃষ্টিকে অপক্ষপাতদুষ্ট বলা চলে না। এমনই চরিত্র রাহুল-মাতা।

সুন্দরী কিশোরী একদিন অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্ম-গোপন করে, অলঙ্কারভূষিতা হয়ে কপিলাবস্তুর শাক্যরাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন। শাক্য রাষ্ট্রনায়কের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর উপযুক্ত মর্য্যাদার আসন তাঁর জন্য পূর্ব্ব থেকেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। সেই মর্য্যাদা থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। কিন্তু শাক্যনায়ক আশা করেছিলেন নববধূর সংস্পর্শে তাঁর পুত্রের মতিগতিতে পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাবে। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী শুদ্ধোদনের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পুত্রের সহজাত সংসার বৈরাগ্যের প্রবৃত্তি এই কিশোরী রাজবধূর সান্নিধ্যে অপসৃত হবে এই ছিল শুদ্ধো-দনের অন্তরের কামনা। সুতরাং শাক্যবধূরূপে গোপা যে মুহূর্ত্তে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন সেই মুহূর্ত্ত থেকেই শুদ্ধোদন এবং মাতা প্রজাবতীর আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ঘিরে একটি নিশ্চিন্ততার দুর্গ রচনার প্রয়াস করেছিল। এই দুর্গের দুর্ভেদ্যতার কষ্টিপাথরে বিচার হবে রাজবধূ গোপার রাজ-অন্তঃপুর প্রবেশ করার সার্থকতা, অলঙ্কার ভার অপেক্ষাও দুর্বহ এই ভাবটি এই তরুণীর মনে সেদিন কোন সংশয়ের ছায়াপাত করেছিল কিনা কে জানে।

তার পর গতানুগতিক ভাবে অন্তঃপুরের যবনিকার অন্তরালে অতিক্রান্ত হয়ে চলল রাজবধূর প্রাত্যহিক জীবনের গতি। সুখে দুঃখে আশায় ভয়ে আনন্দে কল্পনার রামধনুতে বিচিত্রমধুর হয়ে উঠেছিল উদ্ভিন্ন যৌবনা এই নারীর জীবন। তারপর একদিন রাজবধূ লাভ করল নারী-জীবনের চরম সার্থকতা—মাতৃত্ব। রাহুল ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ-অন্তঃপুর ও রাজধানী উৎসবমুখর হয়ে উঠল। সেই দিনটি রাহুল-মাতার জীবনে অবিস্মরণীয়। তাঁর মনে হ'ল অন্তঃপুরে প্রবেশ মুহূর্ত্তে শাক্যকুলের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘিরে রচিত হয়েছিল, পুত্র রাহুলের রূপ ধরে সেই আকাঙ্ক্ষা যেন আজ তাকে সার্থকতায় অভিনন্দন জানাতে এসেছে। কিন্তু রাহুল-মাতার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মাত্র ক'টি মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই সিদ্ধার্থ গৃহ ত্যাগ করলেন। একদিন রাত্রির দ্বিতীয় যামে নবজাত পুত্রকে বুকে জড়িয়ে রাহুল-মাতা যখন গভীর ঘুমে অচেতন, সমগ্র রাজপ্রাসাদ

নিস্তব্ধ, পথপ্রান্তর নির্জ্জন, তখন সকলের অলক্ষ্যে সিদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হলেন মানুষের মুক্তির সন্ধানে। সমগ্র মানব ইতিহাসে এই নিষ্ক্রমণের মুহূর্ত্তটি শাশ্বত হয়ে রইল। কিন্তু রাহুল মাতা এই মুহূর্ত্তটিকে অভিনন্দন জানাতে পেরেছিলেন কি? আদর্শের প্রেরণায় সিদ্ধার্থ ব্যক্তিগত জীবনের সুখ, ঐশ্বর্য্য অকাতরে বিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু রাজবধূ গোপার জীবন সে আদর্শনিষ্ঠার প্রভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি। সেদিন আদর্শ নিষ্ঠার প্রেরণা অথবা বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণসাধনের সম্ভাবনা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পতির অভাবকে এতটুকু লাঘব করতে পারে নি। রাজবধূর জীবন এবার পর্য্যবসিত হ'ল রাহুল মাতার জীবনে। রাহুল মাতা —এই একটিমাত্র পরিচয়ই তিনি পেতে চাইলেন জীবনের সার্থকতা। কিন্তু বধূ জীবনের এই অকাল বিদায় মাতৃ-জীবনে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছিল কিনা ভাবতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ। মাত্র ক'টি বছর আগে আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে যে কিশোরী অনাগত ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন নিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে পদার্পণ করেছিলেন, নিষ্ক্রমণের মুহূর্ত্তটি তাঁর জীবনকে ধিক্কৃত করে তোলে নি কি?

পরদিন ছন্দকের মুখে যখন সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের সংবাদটি প্রচারিত হ'ল তখন গোপা দুঃসহ বেদনায় ভূমি-শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হ'ল, জীবনের পাত্র তিক্ততায় ভরে উঠেছে। তিনি কেশ ছেদন ও অলঙ্কার বর্জ্জন করে কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বেছে নিলেন। মাতৃত্বের গৌরব দিয়ে তিনি চাইলেন নারী জীবনের রিক্ততাকে পূর্ণ করতে। কিন্তু এ অবলম্বনটুকুও ভাগ্যবিধাতা তাঁর কাছে থেকে ছিনিয়ে নিলেন।

শুদ্ধোদনের উপর্য্যুপরি অনুরোধে বুদ্ধ কপিলাবস্তু দর্শনে এসেছেন। রাজধানীর উপকণ্ঠে ন্যগ্রোধ আরামে অগণ্য শিষ্য পরিবৃত হয়ে তিনি অবস্থান করছেন। পরদিন প্রভাতে তিনি যথারীতি ভিক্ষাপাত্র হাতে রাজধানীর পথে নিষ্ক্রান্ত হলেন। রাজপথের দুই পার্শ্বে যত গৃহ ছিল তার বাতায়ন থেকে পুরনারীগণ সেদিন গভীর শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ে যখন এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীটিকে দেখছিলেন তখন রাহুল মাতাকে বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াতে দেখা যায় নি। দুর্জ্জয় অভিমানে আহত হয়ে তিনি স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আপন কক্ষে। পরে শুদ্ধোদন বহু উপরোধে বুদ্ধকে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণে সম্মত করালেন। মাতা প্রজাবতী যখন স্নেহরসে অভিষিক্ত করে পুত্রের সামনে আহার্য্য তুলে ধরলেন তখন রাজ-অন্তঃপুরের প্রত্যেকটি নারী অন্তরাল থেকে তথাগতকে সম্ভ্রম জড়িত চক্ষে দর্শন করে ধন্য হচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিনও এই দর্শনপ্রার্থিনীদের মধ্যে রাহুল-মাতাকে দেখা যায় নি। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁরা তাঁকে বুদ্ধদর্শনের সুযোগ গ্রহণের উপদেশ দিলে তিনি শান্ত সংযত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"তাঁর যদি নিজের প্রয়োজন থাকে তা হলে তিনিই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।" কতখানি আত্মত্যাগের স্পৃহা আর সংযম আর অভিমান এই নারীর মনে সেদিন সঞ্চিত হয়েছিল তার পরিমাপ ইতিহাসের পাতায় নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত রাহুল-মাতারই জয় হ'ল। প্রিয় শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত আর মৌদগল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ নিজেই এলেন রাহুল মাতার কাছে। অধীর আবেগে চঞ্চল হয়ে গোপা বহুবাঞ্ছিত পরমপুরুষের চরণে লুটিয়ে পড়লেন, পরমুহূর্ত্তে শিষ্যদের দেখে সম্বৃত হয়ে তিনি এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। দু'জনের মধ্যে কোন বাক্য বিনিময় হয়নি। শুদ্ধোধনের কাছে গোপার কৃচ্ছ্রসাধনের কথা শুনে তথাগত শুধু বললেন, 'রাহুল মাতা যথোচিত কাজই করেছেন।' তার পর যতদিন বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে ছিলেন তত দিন রাজপ্রাসাদে তিনি আতিথ্যগ্রহণ করেছেন। রাহুল-মাতা অন্তরাল থেকে তাঁকে দর্শন করতেন; কিন্তু একান্তে তাঁর দর্শন লাভের কোন আকাঙ্ক্ষাই তিনি প্রকাশ করেন নি।

বুদ্ধ যেদিন কপিলাবস্তু ছেড়ে রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন সেদিন রাহুল-মাতা পুত্রকে ডেকে রাজপথে বুদ্ধকে দেখিয়ে বললেন, "রাহুল, এই শ্রমণ তোমার পিতা, এর কাছ থেকে তুমি তোমার পিতৃধন চেয়ে নিও।" বুদ্ধদেব আহার্য্য গ্রহণের জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। মায়ের নির্দ্দেশে বালক তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললে—'শ্রমণ, আমার পিতৃধন দিয়ে যাও।' বুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত নিরুত্তর হয়ে রইলেন। তার পর রাহুলের সঙ্গে কিছুক্ষণ তাঁর অন্য বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা হ'ল। বালক পিতৃধনের কথা ভুলে গেল। কিন্তু রাহুল-মাতা ভোলেন নি। তিনি আজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে নির্বাসনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে স্থিরসঙ্কল্প। বুদ্ধ আহারান্তে যখন প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে উদ্যত তখন মায়ের নির্দ্দেশে রাহুল আবার তার পিতৃধনের দাবী জানাল। বুদ্ধ তাকে তাঁর অনুসরণ করতে বললেন। রাজপুরী থেকে বেরিয়ে রাজপথ দিয়ে বুদ্ধ চলেছেন ন্যগ্রোধ আরামে—সঙ্গে জনকয়েক শিষ্য, সকলের পিছনে বালক রাহুল। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল রাহুল মাতা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আজ তাঁর সারা অন্তর বৈরাগ্যের ছায়ায় পরিপূর্ণ। শোক দুঃখের অতীত তাঁর মন। ন্যগ্রোধ আরামে বুদ্ধের নির্দ্দেশে সারিপুত্র রাহুলের হাতে তুলে দিলেন তার সুকুমার দেহে চীবর বস্ত্র আর তার কানে

শোনালেন বুদ্ধের অমৃতময় বাণী। সংবাদ পেয়ে শুদ্ধোদন ছুটে এলেন। প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হল। রাহুল ফিরে এলো না। সে পিতৃধন পেয়েছে, প্রাচুর্য্যের ঐশ্বর্য্যে তার প্রয়োজন নেই।

শেষ অবলম্বনটুকু রাহুল-মাতা স্বেচ্ছায় অবহেলায় ত্যাগ করলেন। ইতিহাসের পাতায় বুদ্ধের আত্মত্যাগ আর সাধনার কথা সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে কিন্তু রাহুল-মাতার আত্মত্যাগের কাহিনীতে মুখর হয়ে উঠে নি ইতিহাসের পাতা। তাঁর আত্মত্যাগের মুহূর্ত্তটি মহাভিনিষ্ক্রমণের মুহূর্ত্তের মত চিহ্নিত হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করে নি। অন্তঃপুরের যবনিকার অন্তরাল ছিন্ন করে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। লক্ষ লক্ষ নরনারীর স্তবগানে মুখরিত হয়ে উঠে নি তাঁর জীবনের কাহিনী। কোনও শিল্পী পাথরে অথবা তুলির রঙে রেখাঙ্কিত করেন নি তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি। ইতিহাস তার ললাটে এঁকে দেয় নি জয়তিলক। শাক্য রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করার মুহূর্ত্তে যাঁর জীবনের উদয়াচল চকিতে একবার দেখা দিয়েছিল, তাঁর জীবনের অস্তগিরি চিরকালের মত ঢাকা পড়ে রইল বিস্মৃতির অন্তরালে।

নির্ব্বাণ পরিচয়

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বর্ত্তমান যুগে 'নির্ব্বাণ' শব্দটি এমন একটি শক্তি বহন করে যে, শব্দটি শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্র ভগবান্ বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্মের কথাই মনে পড়ে। তার কারণ স্বরূপে বলা যায় বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ সমার্থক অমৃত, অজর, সত্য, জ্যোতিঃ, পরায়ণ, শরণ প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ গৃহীত হলেও ঐ পরম পদটিকে অসাধারণ শক্তিমণ্ডিত করে একমাত্র ঐ একটি শব্দ দ্বারাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। আর্য্য ধর্ম্মের বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতে নির্ব্বাণ শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার থাকলেও ঐ পদটিকে ভগবৎপ্রাপ্তি—মোক্ষ-অমৃত-নির্ব্বাণ এইরূপ নানাবিধ শব্দের সাহায্যে তুল্যভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে বলে একটি শব্দেরই উপর গুরুত্ব পতিত হয় নি। আরও একটি কারণ এই যে, আর্য্য ধর্ম্মানুসারে ব্রহ্ম বা ভগবৎসত্তায় চিরস্থিরত্বই অমৃতত্ব বা নির্ব্বাণ শব্দের অভিধেয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রহ্ম বা শাশ্বত ভগবৎসত্তা অস্বীকৃত বলে ঐ পরম পদটি প্রকাশ করবার আর কোন উপায় নেই, আর তাতেই হয়েছে বহুবিধ বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

নির্ব্বাণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থবৈষম্যও লক্ষ্য করবার মত। আর্য্যধর্ম্মে নির্ব্বাণ শব্দটি নির্-উপসর্গযোগে গত্যর্থক 'বা' ধাতু থেকে ভাবে অনট করে নিষ্পন্ন। 'বান' অর্থাৎ গতি বা চাঞ্চল্য, 'নির্ব্বাণ' অর্থাৎ গতিহীনতা বা স্থিরত্ব। এ ভাবে মানসিক যাবতীয় গতি বা বাসনাজনিত চাঞ্চল্যের চির অবসানে পরমাত্মতে ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠাই নির্ব্বাণ বা মোক্ষপদের অভিধেয় হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে 'বান' অর্থ বন্ধন-নিব্বান বা নির্ব্বাণ—বন্ধনহীনতা অর্থাৎ তৃষ্ণার বন্ধনহীনতাই নির্ব্বাণ। তৃষ্ণা বা বাসনাই জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, সাধনা দ্বারা তৃষ্ণার ক্ষয়ে বন্ধনাশ, সুতরাং দুঃখরাহিত্য, তাতেই বন্ধনহীনতা আসে বলে নিব্বান। লক্ষ্য প্রায় একরূপ হলেও ব্যুৎপত্তিভেদ ঘটেছে। বান শব্দের বন্ধন অর্থটি ধাতু প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন শুদ্ধিপূত করে রক্ষা করা কঠিন। অবশ্য বন্ধন 'বান্ধ', তা থেকে 'বান্'—এ ভাবে অপভ্রষ্ট শব্দরূপে পরিগণিত হতে পারে এবং পালি ভাষাতে গৃহীতও হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বাণ শব্দের যোগার্থ যাই হোক, নির্ব্বাণ পদাভিধের তত্ত্বটি গভীর এবং তাকে চরম লক্ষ্য বলেই বৌদ্ধানুসারিগণ গ্রহণ করেছেন। নির্ব্বাণের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় আচার্য্য 'অনুরুদ্ধ' "অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ" গ্রন্থে বলেছেন, নির্ব্বাণ লোকোত্তর বিষয়রূপেই পরিগণিত। যার উৎপত্তি ও বিনাশ রয়েছে তাই হ'ল লৌকীয়, লোকোত্তর সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—"কতমে ধম্মা লোকুত্তরা"? চত্তারো চ অরিয় মগগা, চত্তারি চ সামঞ্ঞ ফলানি অসঙ্খতা চ ধাতু, ইমে ধম্মা লোকুত্তরা তি" অর্থাৎ চার প্রকার আর্য্য মার্গ, চার প্রকার শ্রামণ্য ফল বা মার্গজ ফল এবং অসংস্কৃত ধাতু, এই সব ধর্ম্মই লোকোত্তর। এই চারি আর্য্যসত্য দ্বারা শ্রামণ্য ফলের অন্তর্গতই হ'ল নির্ব্বাণ বা পরমপদ। এই নির্ব্বাণ স্বভাবানুসারে অদ্বিতীয়, কিন্তু অভিব্যক্তির স্তরভেদে দ্বিবিধ—"সউপাদি শেষ নিব্বান," আর 'অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ' উপাদি হ'ল পঞ্চস্কন্ধেরই নামান্তর। কামনা, বাসনা উপাদানাদি দ্বারা এদের পরিজ্ঞান হয় বলে পঞ্চ স্কন্ধকে উপাদি বলা হয়। উপাদির অভাব অনুপাদি। অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভের পক্ষে পঞ্চশীলাদির অনুসরণ, যোগমার্গ এবং তপঃপূত প্রজ্ঞার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই সকল অধিকার লাভ কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। এই কঠিন সাধনায় নানাবিধ স্তর অতিক্রম করে যেতে হয়, সাধনার চরম কালটিই হ'ল অনুপাদি শেষ নির্ব্বাণ, তার পূর্ব্বে ক্রমধারায় অগ্রসর হয়ে সাধক যখন যাবতীয় ক্লেশগ্রাম ও বাসনাদি অতিক্রম করে যান, কেবলমাত্র মূল স্কন্ধ পঞ্চক অবশিষ্ট

থাকে অর্থাৎ তার কার্য্যকারিতা স্তব্ধ হয়ে যায়; তখন তাকে বলা হয় "স—উপাদিশেষ নির্ব্বাণ", আর তদূর্দ্ধে উত্থিত হয়ে সাধক যখন স্কন্ধপঞ্চকের বিলয় করে দেন, "সর্ব্ববিধধ্বংস"—অর্থাৎ কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, এমন কি মূল ধাতুগুলিও বিলীন হয়ে যায়—তখন বলা হয়, অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ।

পূর্ব্বোক্ত এই তত্ত্বটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঠিক যেন আর্য্যশাস্ত্রের সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধির বর্ণনা। সবিকল্প সমাধিতে মন ব্রহ্মে বিলীন হয়েও সম্পূর্ণ ভেদহীন হতে পারে না, স্বকীয় সত্তা এবং সাধ্যসাধকভাব বিদ্যমান থাকে। তথাপি যাবতীয় পার্থিব ক্লেশ বিদূরিত হয় বলে পরমানন্দেরও উপলব্ধি আসে। তারই উর্দ্ধে সর্ব্ববিধ ভেদবোধ বিলয় করে আপন সত্তাটিকেও ব্রহ্মের মধ্যে হারিয়ে একীভূততাই নির্ব্বিকল্প সমাধি। দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্রের নির্ব্বাণও এপথেই আপনরূপ প্রকাশ করেছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই নির্ব্বাণকে প্রত্যক্ষগম্য বলেছেন—আর্য্যমার্গ জ্ঞানের সাহায্যে এর প্রত্যক্ষ করতে হয়। "সাচ্ছিকাতব্ব" অর্থাৎ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য। এখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন এসে পড়েছে যে, নির্ব্বাণ যদি সাক্ষাৎকরণীয় তত্ত্ব হয়ে থাকে তবে "সর্ব্বং শূন্যং"—এই সর্ব্বশূন্যতাময় অভাবাত্মক তত্ত্বটির সঙ্গে বিরোধ ঘটে। সর্ব্বাস্তিত্বরহিত অভাবাত্মক তত্ত্বের প্রত্যক্ষীকরণ অসম্ভব। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ বিষয়তা দ্বারা এর বিদ্যমানতাই স্বীকার করা হ'ল। সুতরাং এ তত্ত্ব নিতান্ত অভাবাত্মক হতে পারে না, আর—বিদ্যমানতা স্থির হলে তত্ত্বরূপে তার পারমার্থিকতাই স্বীকৃত হ'ল, 'অসং' হতে পারে না। অথচ বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্ব্বাণকে শূন্য, অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। এই অসঙ্গতি সমাধানের জন্যে বৌদ্ধব্যাখ্যাতৃগণ বলে থাকেন—শূন্য কথাটি এখানে সর্ব্বাস্তিত্ব শূন্যতা অর্থে প্রযুক্ত হয় নি। পাণ্ডিত্যাভিমানী বিরোধী ব্যক্তিগণই অস্তিত্বশূন্যতারূপ অভাবাত্মকতা প্রকাশ করেছেন। নির্ব্বাণ রাগদ্বেষমোহশূন্য, এমন কি সর্ব্ববিধ সংস্কারশূন্য—অবিদ্যাশূন্যতত্ত্ব, এজন্যই এই তত্ত্বটিকে শূন্য বলা হয়। "ভবনিরোধো নিব্বানং···। নিব্বানং ভগবা আহ সব্ব গন্থ পমোচনং" (সংযুত্তনিকায়)। আর এ তত্ত্বটি রাগাদি নিমিত্ত রহিত বলেই অনিমিত্ত ও প্রনিধি অর্থাৎ আসক্তি বা তৃষ্ণা রহিত বলে অপ্রনিহিত। বস্তুতঃ তা' এক অদ্বিতীয় নিত্যতত্ত্ব। তাই, তাকে, অনন্ত, অচ্যুত, অকৃত, অনুত্তর বলে অভিহিত করা হয়। এর আর শেষ বা অবসান নেই বলে তা অনন্ত। কোনরূপ চ্যুতি নেই বলে অচ্যুত। "নিব্বান পদং অচ্চুতং" (সুত্তনিপাত) প্রত্যয়াদি দ্বারা কৃত নয় বলে অকৃত বা নিত্য এবং এতদপেক্ষা, উৎকৃষ্ট কোন তত্ত্ব নেই—তা সর্ব্বোত্তম, এ জন্যে অনুত্তর। এ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের বাণীতে তাই প্রকাশিত হয়েছে. তিনি বলেছেন—"অত্থি ভিক্খবে অজাতং অকতং অসঙ্খতং", মজ্ঝিমনিকায়ে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের বাণী অধিকতর স্পষ্ট, সেখানে তিনি বলেছেন—অজাতং অজরং···অসতং···অমৃতং··· নিব্বানং অজ্ঝগমং"—জন্মহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন এক সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব সুতরাং নিত্য ধ্রুব।

এই নিত্য তত্ত্বটিকে তা হলে নির্ব্বাণ শব্দে পরিচিত করা হ'ল কেন? এর উত্তরে তাঁরা বলে থাকেন, তৃষ্ণাই সর্ব্ববিধ বন্ধনের হেতু। তৃষ্ণা প্রাণিগণকে কাম-রূপ অরূপ যাবতীয় লোকে বন্ধন করে, নানাবিধ ঘোর কর্ম্মে আবদ্ধ রাখে, দুঃখসাগরে ডুবিয়ে রাখে। এই তৃষ্ণার ক্ষয়েই দুঃখেরও ক্ষয়। নির্ব্বাণে তৃষ্ণার ক্ষয় সাধিত হয়, তৃষ্ণার আত্যন্তিক ক্ষয়ই তৃষ্ণার নির্ব্বাণ বা দুঃখনির্ব্বাণ। "তণহায় বিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি বুচ্চতি" (সুত্তনিপাত) অর্থাৎ তৃষ্ণার বিনাশই নির্ব্বাণ একথা বলা হয়। "নির্ব্বাণ" শব্দটি এখানে উপমাকারে প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তৃষ্ণাটি যেন প্রদীপের তৈল এবং দুঃখ হ'ল দীপ-শিখা। তৈল হেতু দীপশিখা প্রজ্বলিত থাকে, তৈলাভাবে সব শেষ, নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। এই দীপ-নির্ব্বাণের উপমায় এখানে দুঃখ-নির্ব্বাণের পরিচয়ে 'নির্ব্বাণ' শব্দ দ্বারা এ তত্ত্বটি প্রকাশ করা হয়েছে। "নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং প্রদীপঃ।" (সুত্তনিপাত)

এতাদৃশ ব্যাখ্যায় আবার পূর্ব্ব প্রশ্ন ঘুরে এল যে, নির্ব্বাণ ত তা হলে দুঃখধ্বংসমাত্রই—অর্থাৎ অভাবাত্মিকা সর্ব্বশূন্যতা। তাতে এ তত্ত্বের প্রত্যক্ষীকরণতা প্রভৃতি বিবৃতির সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বিরোধ পূর্ব্বাবস্থায়ই থেকে যায়। এজন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে—নির্ব্বাণ শান্ত স্বভাব। ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়—তথাবিধ দুঃখের নিরোধই শান্তি। এই শান্তির অপর পরিচয় সুখ। সুখ হলেও তা বিষয়জনিত সুখ নয়। "নতু বেদয়িতং সুখং"। ভগবান্ বুদ্ধ নির্ব্বাণের স্বরূপ পরিচয়ে বলেছেন, "নির্ব্বাণং পরমং সুখং"। মজ্ঝিম নিকায়ের একই অধ্যায়ে দু' বার ও ধর্ম্মপদে দু' বার নির্ব্বাণকে পরম সুখ বলা হয়েছে।

"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খরা পরম দুখা।
এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং।" সুখবগ্গো, ইত্যাদি।

অর্থাৎ ক্ষুধা কঠিন রোগ, সংস্কার দারুণ দুঃখ, এজন্য ধীমান্ এই সত্যটি উপলব্ধি করে পরমসুখরূপ নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করেন। এই পরম সুখোপলব্ধির উপায়রূপেই পূর্ব্বোল্লিখিত স উপাদি শেষ নির্ব্বাণ ধাতু ও অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ ধাতু এই দু'টি প্রকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

এ ভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে আমরা নির্ব্বাণের পরিচয়ে যে তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটিত হতে দেখছি, তাকে উপনিষদের সে অদ্বিতীয় পরম অমৃত-তত্ত্ব থেকে ভিন্ন বলে দূরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ, এই যে পরম সুখাভিধেয় নির্ব্বাণ, তা যদি দুঃখাদি-শূন্য বলে শূন্য, আর স্বভাবতঃ "অজর, অমত, অকত" বলে অনন্ত ও ধ্রুব নিত্য হয়ে থাকে, তবে উপনিষদের পরম আনন্দ তত্ত্ব থেকে তার পার্থক্য কি দিয়ে করা যেতে পারে? বিশেষতঃ পরম সুখ আর সে পরম আনন্দ একার্থক। যে আনন্দ "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ", "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "ভূমৈব সুখম্" প্রভৃতি অজস্র শ্রুতিতে পরমসুখরূপী আনন্দাত্মক ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিষদের একমাত্র লক্ষ্যরূপ অমৃততত্ত্ব বলে পরিচিত, সেই অমৃততত্ত্বই যদি নির্ব্বাণেরও স্বরূপ হয়ে থাকে তবে উভয়ে যে একই তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়েছে এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ

বিচারের কোন অবকাশই থাকে না। পক্ষান্তরে অনুকূল মতবাদই সুদৃঢ় হয়ে উঠে যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে যেমন "অত্থি ভিক্খবে অজরং অমতং অকতং···নিব্বানং···" প্রভৃতি বুদ্ধবাণীতে—অজর, অমৃত, অকৃত এবং অভয় পরায়ণ প্রভৃতি শব্দে নির্ব্বাণকে বিশেষিত করা হয়েছে, ঠিক তেমনি উপনিষদেও এই একই তত্ত্ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যক্ত রয়েছে—

"এতদ্বৈ প্রাণায়ামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণম্"—ইত্যাদি। (প্রশ্নোপনিষৎ)।

যদিও এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আপত্তি উঠতে পারে যে, মাণ্ডুক্য-কারিকায় দেখা যায় আচার্য্য গৌড়পাদ স্পষ্ট করেই বুদ্ধদেবের সঙ্গে উপনিষদুক্ত মতের প্রভেদ দেখিয়েছেন, বলেছেন—"নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্" ইত্যাদি। তথাপি এখানে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায় আচার্য্য গৌড়পাদ বিস্তৃত কারিকাবলম্বনে যে অদ্বৈতবাদ প্রকাশ করেছেন, তাতে স্বপ্নাদি দৃষ্টান্তে বাহ্যমাত্রের অসং-রূপতা, জ্ঞানমাত্রের সত্তাস্থাপন প্রভৃতি দ্বারা বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে একান্ত সাম্যই যেন দেখান হ'ল, যে কথা আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যে বলেছেন—"যদ্যপি বাহ্যার্থনিরাকরণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাদ্বয়বস্তু-সামীপ্যমিত্যাদি"—। এই আশঙ্কা অপনোদনের জন্য উভয়ের অধিকতর সাম্য সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখাবার অভিপ্রায়েই এখানে গৌড়পাদ বলেছেন—

"ক্রমতে নহি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তায়িনঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মা স্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্॥"

অর্থাৎ উপনিষদের অন্যান্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে বৌদ্ধমতের একান্ত সাম্য থাকলেও যেমন পরমার্থদর্শী পুরুষের জ্ঞান কখনো বিষয়াদিতে লিপ্ত হয় না স্বকীয় স্বভাব বলে নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গরূপে অবস্থিতি করে, ঠিক তেমনি যাবতীয় আত্মাই (সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ) এবং তদীয় জ্ঞানও কোথায়ও লিপ্ত হয় না স্বভাবতঃই অসঙ্গরূপে বিরাজমান। একমাত্র স্থিরস্বভাব অসঙ্গ পুরুষই আগন্তুক দোষে লিপ্ত বলে মনে হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ তিনি সর্ব্বদাই এক-স্বভাব-অসঙ্গ-নির্ম্মল। এ তত্ত্বটি বুদ্ধদেব বলেন নি। এটুকুই পার্থক্য। এর তাৎপর্য্য হ'ল পরমাত্ম-চিন্তায় বিলীন হলে বিষয়াতীত ব্রহ্মের উপলব্ধিতে যে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভেদবর্জ্জিত পারমার্থিক অদ্বয়াবস্থার সংপ্রাপ্তি বা লাভ ঘটে—তা' প্রকৃতপক্ষে কোন উপার্জ্জিত তত্ত্ব লাভ নয়। এই অবস্থাটি শাশ্বত একরূপ। দোষনিবন্ধন তা এতকাল পরিজ্ঞাত হয় নি, দোষ নিরস্ত হওয়াতে স্বরূপ পরিজ্ঞাত হ'ল মাত্র। যেমন সূর্য্য ভাস্বরস্বভাব, মেঘের বিরোধিতায় দৃষ্টিগোচর হয় নি বলে সূর্য্যে কোন ধর্ম্ম সংক্রামিত হয়েছে বলা ভুল—সূর্য্য আবৃতও হন নি, প্রকাশিতও হন নি যেমন ছিলেন তেমনটিই আছেন। মেঘ কেটে গেল বটে, সূর্য্যের নূতন স্থির উদ্ভব হয় নি। এই আত্মার ক্ষেত্রেও তাই, প্রকৃতপক্ষে বন্ধনও হয় নি, তিনি মুক্তও হন নি—যেমন ছিলেন তাই আছেন—এই হ'ল উপনিষদের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধমতে এই চিরস্থির একস্বভাব আত্মতত্ত্বের স্বীকৃতি নেই বলে এই রীতিতে ব্যাখ্যা চলে না—এইখানেই পার্থক্য ঘটেছে।

কিন্তু তাতেও মূল সত্যের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে নি বলেই আমরা মনে করি। কারণ এই বিরোধটিকে দার্শনিক চিন্তাধারায় একটি প্রকারান্তররূপে গণ্য করা যেতে পারে। বৌদ্ধমতে শাশ্বত আত্মা-বলে পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করা হয় নি, সবই ক্ষণভঙ্গুর, আত্মাও চিত্তা-তিরিক্ত নয়, চিত্তপ্রবাহকেই আত্মা বলে ব্যবহার করা হয়। যোগা-ভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ নানাবিধ স্তর অতিক্রম করে চিত্তের যখন রূপ-অরূপ, কুশল-অকুশল সমুদয় অবস্থার উর্দ্ধে উঠে দাঁড়ান সম্ভব হয়, সেই অবস্থায় যে উপলব্ধি—"সর্ব্বমনিত্যং দুঃখং ক্ষণিকং—ইত্যাদি এবং তৎপরবর্তী যে চরম অবস্থা "নির্ব্বাণং পরমং সুখং" যা পূর্ব্বে বলা হয়েছে "অনুপাদিশেষ নিব্বান ধাতু"—যখন কোন কিছুরই, স্কন্ধাদিরও, বোধ নেই, সেই অদ্বয়াবস্থার সঙ্গে উপনিষদুক্ত মতের সত্যিকারই কি খুব গুরুতর পার্থক্য কিছু রইল? তাই দেখি, উপনিষদ্ যেমন বলেছেন ব্রহ্মতত্ত্বের পরিচয়ে—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং" তেমনি নির্ব্বাণ পরিচয়েও খুদ্দকনিকায়ে বলা হয়েছে, সূর্য্যচন্দ্রাদি সেখানে প্রকাশমান নন অথচ সেখানে অন্ধকার নেই—

"ন তত্থ চন্দিমা ভাতি তমো তত্থ ন বিজ্জতি···
···অথরূপা অরূপা চ সুখ-দুক্খা পমুচ্চতি।"

বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল গ্রন্থাদি আলোচনা করে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে যে পরিচয় আমরা পেলাম, তা' থেকে যদি এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ কথাটি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাস্তিত্ব রহিত শূন্যাত্মকতা নয়, রাগদ্বেষাদি অবিদ্যাশূন্যতাময় নিত্য-অমৃত-তত্ত্ব,—তা হলে এ সিদ্ধান্তও সমর্থন করা যায় যে, বস্তুতঃ আর্য্য-উপনিষদের মূল সত্য ব্রহ্মাত্মক অমৃততত্ত্বই বুদ্ধদেবের এই নির্ব্বাণ। এই বিশ্লেষণে আজ একথাও তা' হলে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান্ বুদ্ধ হিংসাপ্রধান যাগ-যজ্ঞাদির নিন্দাকারী হলেও হিন্দুসভ্যতার প্রতিপক্ষরূপে কখনও আবির্ভূত হন নি এবং আমাদেরই ঔপনিষদিক মূল্য সত্যকে আচার-প্রধান বহিরনুষ্ঠানের দুর্ভেদ্য বর্ম্ম থেকে কোষমুক্ত করে কঠিন জ্ঞানমার্গের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নূতন দৃষ্টির নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করেই দিয়েছিলেন—তাই তিনি প্রকৃতই বিষ্ণুর অবতার!!

হিন্দু বিধবাবিবাহ আইনের শতবার্ষিকী

এম. ভি. রামনরাও

(প্রাক্তন সম্পাদক, "ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক")

১৯৫৭ সনে জাতি যদি ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রামের উৎসব করে, তবে এই বৎসরেই ভারতীয় নারীগণেরও তাঁদের মুক্তির শতবার্ষিকী পালনের অধিকার আছে। কারণ ভারতীয় নারীগণের মুক্তি বস্তুত: আরম্ভ হয় ১৮৫৬ সনের হিন্দু বিধবাবিবাহ আইন থেকে। এই আইনটির পূর্বে কি ছিল এবং পরেই বা কি হয়, তা বলতে গেলে শোনাবে এক ভয়ঙ্কর ও মর্মন্তুদ কাহিনীর মত। ক্ষীণভাবে হলেও হিন্দু বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে অন্ধসংস্কার এখনও দেশের বহু অঞ্চলে কোন না কোন আকারে বর্তমান। দেশাচার ধর্মের মুখোশ পরতে এখনও ছাড়ে না। তা এখনও লোকের গলা টিপে ধরে আছে।

গোঁড়াদের যুক্তি ছিল, হিন্দু বিধবাবিবাহ বেদ ও উপনিষদে নিষিদ্ধ। কিন্তু এ যুক্তি অনেক পূর্বেই নস্যাৎ হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন রায় হিন্দু বিধবাগণের পক্ষে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁরা নিষ্ঠুর "সতীদাহ" প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে তা নিষিদ্ধ করেন। যে অভিশপ্ত বিধান বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করে তাকে বৈধ শবদেহে পরিণত করেছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হয়। তার ফল ১৮৫৬ সনের আইনটি। এই আইনটি পরিশেষে হয়ে দাঁড়ায় দৈবানুগ্রহের মত। এই আইন সংস্কারকের বাহুতে বল সঞ্চার করে সামাজিক দোষগুলির বিরুদ্ধে আরও শক্তি ও প্রত্যয়ের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁকে সাহায্য করে।

হিন্দু বিধবাবিবাহ আইনের দ্বারা এই ভাবে আইন-বিষয়ক অসুবিধা দূর হলেও হিন্দু বিধবা পূর্বের মতই ঘৃণার পাত্র ও অন্ধসংস্কারের লক্ষ্য হয়ে থাকে। আর তার বিবাহ পূর্বের মতই সুকঠিন থেকে যায়। এই বিবাহের ফলে সমাজ-চ্যুতি ঘটত এবং ভয়ঙ্কর নির্যাতন ভোগ করতে হ'ত। যাঁরা অত্যন্ত বলিষ্ঠচেতা কেবল তাঁরাই সমাজকে গ্রাহ্য করতেন না। কাজেই বিধানটি দীর্ঘকাল অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। বর্তমানের অস্পৃশ্যতা আইন ভঙ্গ করা যেমন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য, তেমনি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে হৃদয়হীন সমাজ কর্তৃক সমাজচ্যুত ও একঘরে করাটাকে যদি আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হোত তা হলে বিষয়টি জোরদার হয়ে উঠত এবং আন্দোলনটিও গতি লাভ করত। তবে সামাজিক অন্ধ-সংস্কারের কঠোরতা ও নির্মমতা সত্ত্বেও সংস্কারকগণের সেবা-কার্যে শৈথিল্য বা বাধা ঘটে নি।

বিষয়টির মধ্যে একটি নিষ্ঠুর অসঙ্গতি আছে এই যে, হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের ফলে উচ্চবর্ণীয়দেরই সমাজচ্যুতির কঠোরতা ভোগ করতে হয়, কিন্তু নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রথা বর্তমান। হিন্দুধর্মের ছত্রছায়াতলেই কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত। এ এক বিচিত্র রীতি বলে মনে হয়। কাজেই হিন্দু-সংস্কারককে বোঝাপড়া করতে হয় প্রথা ও অন্ধসংস্কারে ফাটলধরা এক সমাজের সঙ্গে। আর ওগুলো হচ্ছে ধোঁয়াটে অসঙ্গতি ও হেঁয়ালীঢাকা এক ঐতিহ্যেরই অংশ।

ষাট বৎসরের অল্প কিছুকাল পূর্বে দক্ষিণ দেশে যখন পণ্ডিত বীরেশলিঙ্গম্, যাঁকে যথার্থরূপেই বলা হয় দক্ষিণের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হিন্দু বিধবাবিবাহকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন প্রচণ্ড সামাজিক বিক্ষোভ দেখা দেয়। বাংলা ও উত্তরদেশে এই আন্দোলনের সমর্থকগণ ছিলেন। তাই সেখানে সামাজিক বা নৈতিক বিক্ষোভ জাগ্রত না করেই আন্দোলনটি দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু দক্ষিণ দেশে, যেখানে ধর্ম জগদ্দল পাথরের মত সমাজের বুকে চেপে বসেছিল এবং দেশাচার লাভ করে-ছিল শ্রদ্ধার আসন, সেখানে নূতন আন্দোলনে দরকার হয়েছিল ধর্মযোদ্ধার ঐকান্তিক উৎসাহ ও যাজকের অলন্ত আগ্রহ। বীরেশলিঙ্গম্ ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। তাঁর অস্ত্র ছিল পবিত্র শাস্ত্রবচন, আর বিষয়টি যে ন্যায়সঙ্গত এই বিশ্বাসের মধ্যে তিনি ছিলেন সুরক্ষিত। এই ভাবে অস্ত্র-

সজ্জিত ও সুরক্ষিত হয়ে তিনি নির্ভীক বীরের মত হিন্দু বিধবাগণের পক্ষে সংগ্রাম করেন। তাঁকে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের সক্রিয়, এমনকি সহিংস প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অগ্রসর হতে হয়।

একদিকে সুপ্রাচীন ও ঘৃণিত প্রথা, অপরদিকে যা ন্যায় তা করবার নৈতিক তাড়না ও আবেগ। সমাজ ছিল এই দু'টির মাঝখানে। বীরেশলিঙ্গমের উদাত্ত আহ্বান দক্ষিণে সমাজকে আলোড়িত করে তোলে এবং গোঁড়াদের সুদৃঢ় শক্তিসত্ত্বেও বিধবাবিবাহ সংঘটিত হয়। আর গোঁড়ারা দম্পতীকে সমাজচ্যুত করে নিজেদের শক্তি জাহির করে। বিবাহিত তরুণ দম্পতীকে যে কি দুর্দশা সইতে হ'ত তা লেখকের মাতা-পিতা প্রায়শঃই বর্ণনা করতেন। তাঁরাও ছিলেন তাঁদের সময়কার লোকগুলির ক্রোধের বলি। তাঁদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হ'ত না; গ্রাম-সীমায় প্রায় অচ্ছাদন-হীন কুটিরে জীবন-যাপন করেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত; রাত্রে গ্রাম যখন নিশুতি হ'ত, গ্রামবাসীরা শুয়ে পড়ত কেবল তখনই, তার পূর্বে নয়, তাঁরা পুণ্যতোয়া গোদাবরী থেকে জল আনতে পারতেন।

বর্তমানে ও ধরনের নির্যাতন কল্পনা করা যায় না সত্য, কিন্তু বিশেষ করে শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে এখনও ওগুলি দেখা যায়। তবে তার রূপ নিরীহতার ছদ্মবেশে আবৃত। এখনও দেখা যায় জাফরানী রঙের স্থূল বস্ত্রাবরণে ঢাকা মুণ্ডিতশির যা হচ্ছে হিন্দু নারীর বৈধব্যের অতি জঘন্য ও বীভৎস কলঙ্কধ্বজা। এখনও হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত বিধবা কপালে বর্ণ-চিহ্ন ধারণের অধিকারী নয়। এখনও এই অন্ধ-সংস্কার আছে যে, যদি পথে বার হয়েই আপনি প্রথমে কোন বিধবাকে দেখেন, তা হলে আপনার ব্যবসায় একদম মাটি। গোঁড়াদের তূণে হিন্দু বিধবাদের বিরুদ্ধে আরও কত অস্ত্র আছে তার হিসাব করা অনর্থক। তবে এগুলি আজও আছে, এবং কখন কখন এগুলির রূপ অসহনীয়। এ হ'ল আমাদের সামাজিক পরিতৃপ্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান এবং কৃষ্টি ও সভ্যতা যে কেবল বাইরেটাই স্পর্শ করছে তার প্রমাণ।

এখন আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, বর্ণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি। আমরা এমন এক ব্যবস্থার বিবর্তনের চেষ্টা করছি যাতে অসাম্য বিদূরিত হবে। আমরা বিবাহ-ব্যাপারের নারীর সম্পত্তিতে অধিকার ও উত্তরাধিকার আইনের সংস্কারের চেষ্টা করছি; চেষ্টা করছি, নারীর অবস্থার উন্নতির। তথাপি আমরা এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে পারি না যে, এক শ' বৎসর পরেও যাঁরা আমাদের মধ্যে শিক্ষিত বলে পরিচিত তাঁরা বিধবাবিবাহ ব্যাপারে পশ্চাদপদ।

১৯২৯ সনের শিশুবিবাহ নিরোধ আইন বিধিবদ্ধ হবার পর থেকে সমস্যাটি এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। শিশু-বিধবা আর হতে পারে না। কিন্তু বিধবা, শিশু বা প্রাপ্ত-বয়স্ক যেই হোক, এখনও গোঁড়াদের মনে যে ভাবের উদ্রেক করে তা সাধারণ মানবোচিত ব্যবহার নয়। হিন্দুগণ বিধবা ও কুমারী, এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য চিন্তা করবেন না, তা সে বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারেই হোক বা সামাজিক কোন আচার-আচরণেই হোক। কোন প্রকার বিরূপতা প্রকাশ হওয়া অনুচিত।

এক শ' বৎসর যে, ভারতে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপুল পরিবর্তন এনেছে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ঘটনা। আবার, ঐ সঙ্গে একথাও সত্য যে, দেশের সামাজিক বিবেক প্রাচীন ভ্রান্ত ধারণা ও অনড় কুসংস্কার থেকে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নি। সমাজকল্যাণ কেবল লোকের সাধারণ ভাবে আর্থিক অবস্থার উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অনিষ্টকারী কুসংস্কার প্রতিরোধ করা এবং যে কোন প্রকার সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লোকের বিবেককে জাগ্রত করাও তার কর্তব্য।

হিন্দু বিধবার আইনের দিক দিয়ে মুক্তির শতবার্ষিকী সমাজ এখনও যে মানসিক পীড়ন ভোগ করছে তা থেকে তাকে মুক্ত করবার প্রয়াসে অনুপ্রেরণা দান করবে।

আমার পরিচারক বন্ধু

এম. এস. সাবেরওয়াল

১৯৫২ সনের আগষ্ট মাস থেকে আমি ভারতের রাজধানীতে বাস আরম্ভ করি। আমার মনোভাব ও জ্ঞানের দরুন নিজেই নিজের প্রতি আমি ছিলাম অসন্তুষ্ট। আমার ধারণা হ'ল, নিজেকে আরও ভাল করে জানতে চেষ্টা করা উচিত। অন্তর্দর্শন ও অতীতদর্শনে বুঝলাম, আমার মধ্যে অনেক ত্রুটি জমেছে। ভাবতে লাগলাম, কেমন করে আমি ঐ সব বদ-অভ্যাসগুলো গড়ে তুলেছি। ছায়াচিত্র-স্রোতের মত আমার চোখের সামনে দিয়ে পর পর চলে গেল, আমার শৈশব, আমার কৈশোর ও আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠকাল। পাশাপাশি পরীক্ষা করলাম শত শত তরুণ-তরুণীর জীবন যারা ছায়া-চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভের উন্মাদনায় তাদের যৌবন ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে। বাড়ি ছাড়বার পর তারা হয়েছে

তাদের পরিবারের দুশ্চিন্তার কারণ; আর, এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যার ফলে তাদের জীবন হয়েছে নিষ্ফল ও নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ।

যে অঞ্চলে বাস করতাম, তার চারধারে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম শ্রমজীবীদের একদল কিশোরকে। তারা নিকটস্থ বস্তিতে বাস করে, বিদ্যালয়গামী ছাত্রদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায় এবং রাস্তা থেকে আধপোড়া সিগারেট কুড়িয়ে ধূমপান করে থাকে। আগে থাকতেই বুঝতে পারলাম, ভবিষ্যতে তারা কি হয়ে উঠবে। তাদের প্রকৃতি ছিল গুণ্ডার মত। তারা আশ-পাশের বাড়িগুলোর ফুলের টব ও সার্সি ভাঙত, আর রৌদ্রে শুকোতে-দেওয়া কাচা কাপড়-গুলো চুরি করত। তাদের দৈহিক, মানসিক ও ভাবগত অবস্থা ও দীন বেশভূষা থেকে এই সিদ্ধান্ত করলাম যে, এরা হচ্ছে প্রাক-অপরাধপ্রবণ কিশোর। তাদের ভাষা ছিল রুক্ষ ও অশ্লীল। চারধারের বাড়িগুলিতে বা বয়স্ক ব্যক্তিদের গায়ে ঢিল মারাতে ছিল তাদের আনন্দ। এই প্রবণতা ও যুক্তিহীন আচরণের কারণ, দারিদ্র্য, গৃহে নিরাপত্তাহীনতা, মাতা-পিতার স্নেহ-ভালবাসার অভাব এবং পথিকদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এই ভাবে প্রাক-অপরাধপ্রবণতা নিম্নলিখিত কারণগুলি থেকে উদ্ভূত হচ্ছিল—

(ক) বস্তি, নৈতিকসঙ্কট, সস্তা ধ্বংসাত্মক ও নীচ সৃজনাত্মক কাজকর্ম, (খ) অবহেলা, শিক্ষার সুযোগের অভাব, (গ) স্বাস্থ্যবিধিবিরোধী, অস্বাস্থ্যকর ও অসুখকর আবহাওয়া এবং পরিবেশ। এই কিশোরদের জীবনযাত্রার নৈতিক ও আর্থিকমানের কথা চিন্তা করে, তাদের জন্যে আমার মন দুঃখে ভরে উঠল। উপলব্ধি করলাম, এ বিষয়ে কিছু করতেই হবে। জানতাম যে তামাকের নেশা থেকে মুক্তি নেই। এই থেকে স্বাস্থ্য ও সুখ বিনষ্ট হচ্ছিল। এর পরিণামে জাতীয় অবনতি ও দুঃখ। তাই তাদের কাজকর্ম সংযত করবার সংকল্প করলাম।

সংকল্প গ্রহণের পর আমার স্থানীয় বন্ধুগণের সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমার অনুজ আমাকে সাহায্য করল। আমরা উভয়ের বন্ধুগণকে নিয়ে একটি দল গড়ে তুললাম। কাজ আরম্ভ করতেই লাভ করলাম একটি যুব-সম্প্রদায়ের সহযোগিতা। অপরাধপ্রবণতার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হলাম।

আমরা কাজ আরম্ভ করলাম, প্রথমে স্থানীয় পরিচারক-দের পূর্ব পাটেলনগরের "ইলেকট্রিক পোস্টের" কাছে জড় করে। আমাদের প্রথম দলটির মধ্যে ছিল দুই ভাই। তারা আমার এক প্রতিবেশীর বাড়িতে বাবুর্চি ও পরিবেশকের কাজ করত। তারা সিগারেটের পর সিগারেট খেত—ইংরেজীতে যাদের বলে "চেন স্মোকার"। তাদের মনিব ছিলেন মাতাল। তিনি "ঠাণ্ডি আলমিরাতে" সঞ্চয় করে রাখতেন বোতল কয়েক হুইসকি ও রম্। ছেলে দুটির ক্ষুধা ছিল প্রচণ্ড। মনিবের বাড়ি থেকে নিরাপদে যা-কিছু চুরি করতে পারত তাই-ই রাক্ষসের মত গিলত। এই ভাই দুটি বয়সে কিছু বড় ছিল, এবং মাইনেও পেত ভাল। তাই প্রতি রাত্রে যে-সব স্থানীয় গৃহস্থ-বাড়ির পরিচারকদের সঙ্গে আড্ডা জমাত তাদের কাছে ছিল তাদের খাতির। এক-ঘেয়ে ঘরোয়া কাজে বিরক্ত হয়ে তারা মনিবদের আচার-ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করত। আমি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরম্ভ করলাম। যে-কোন ভাষায় সবচেয়ে মিষ্টকথা সম্ভবতঃ "তুমি আমার বন্ধু।" এই কথাগুলি যখন অন্তরের সঙ্গে বলা যায় তখন কানে সঙ্গীতের মত বাজে। তাই তাদের বলতাম, "তোমাদের সকলকে খুব ভালবাসি। তোমরা আমার বন্ধু।" তাদের প্রধান ভাবনার বিষয় ছিল, তাদের ঘর-সংসার ও তাদের বহুক্রোশ দূরের গৃহ-কোণ। এই হ'ল তাদের জগৎ। সারাদিনের ক্লান্তিকর কাজের পর আমোদ-প্রমোদের জন্যে একত্রে জমায়েৎ হওয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাতে উপস্থিত হতে লাগল অনেকে। তাদের যে কতকগুলো কু-অভ্যাস আছে সে কথাটা আমি এড়িয়ে যেতে লাগলাম; তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবার জন্যে অনুপ্রাণিত করতে থাকলাম। তাদের মনে ধারণা হ'ল, জীবনে অগ্রসর হবার, উঠে দাঁড়াবার এবং আরও বড় কিছু লাভ করবার উপায় বার করতেই হবে। তারা লেখা-পড়া করতে সম্মত হ'ল। আমাদের কর্মীদের মধ্যে একজন তাদের হিন্দী শিক্ষা দিতে লাগলেন, আর একজন গান-বাজনার দল গড়ে তাদের শিখাতে লাগলেন গান। স্থানীয় এক নারী-কর্মী রান্নার কৌশলে আরও উন্নতি কিসে হয় তার শিক্ষা দিতে লাগলেন আর রন্ধনশালায় ও গৃহে যে স্বাস্থ্য-রক্ষা নিয়মগুলি পালন করা দরকার তা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। আমার উপর ভার দেওয়া হ'ল, প্রত্যেকের জীবন সম্বন্ধে পূর্বাপর সংবাদ নেওয়া এবং কি উপায়ে তাদের জীবনকে উন্নত করা যায় তা অনুসন্ধান করা।

চণ্ডু ছেলেটি ছিল চমৎকার। তার অন্তরে ছিল ভাল-বাসা। সে ছিল অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান। কিন্তু সে অবিরাম সিগারেট টানত আর ছিল মদখোর। সিগারেট ধরাবার সুন্দর একটি কল নিয়ে সে ক্লাসের মধ্যেও সকলকে সিগারেট খেতে উৎসাহিত করত। দেখা গেছে, নেশার দ্রব্য ছাড়াই কেউ নেশাখোর হয়ে ওঠে নি বা সিগারেট না ধরিয়ে কেউ

সিগারেটখোর হয় না। কাজেই ওগুলো যাতে হাতে না পড়ে তা করা দরকার। রোগ হবার আগেই তার গোড়া মারতে হবে। একদিন চণ্ডু যখন বলছিল, কি করে নেশা ধরা যায়, তখনই সেখানে আঘাত দেওয়া হ'ল। লোকে একদিনেই নেশাখোর হয়ে ওঠে না। নেশার অভ্যাসটা ক্রমে বাড়ে। প্রথমে লোকে সিগারেট ধরে। চণ্ডু বললে, "আমি নিজে সিগারেট খাই। কিন্তু সেটা কোন কাজের কথা নয়। তার পর মদ ধরলাম। প্রায়ই মদ খাই।" আর সেই সঙ্গে বার বার বলতে লাগল, "সেটা কোন যুক্তি নয়। মনে হয়, আমাদের সিগারেট খাওয়া বন্ধ করা দরকার। খুব নেশা হয়। ওটা খারাপ।" সকলেই তার স্বীকারোক্তিতে খুশী হ'ল। সে সিগারেট ছেড়ে দিলে।

আমরা সকলেই তার সম্বন্ধে সতর্ক হলাম, তাকে দেখা-শোনা করতে লাগলাম। সে পাংশু হয়ে গেল। অবশেষে সফল হ'ল। সে সিগারেট ও মদ ছেড়ে দিলে। তার দেখাদেখি তার অধিকাংশ বন্ধু তাই করলে। আমরা খুশী হলাম। এই সকল পরিচারকগণের অধিকাংশই আসে দারিদ্র্যপীড়িত কাংড়া, কশৌলী, আলমোড়া ও মুশৌরীর পর্বতীয় অঞ্চল থেকে। যখন তারা শহরে কাজ করতে আসে তখন অনেকেই চলে আসে মাতা-পিতাকে না জানিয়েই। আমরা প্রত্যেককেই ভাল করে জানবার সুযোগ পেলাম। তাদের মাতা-পিতার সঙ্গে মিলনের চেষ্টা করে তাতে সফলও হলাম। এখন কোন গৃহ-পরিচারকের সঙ্গে আমাদের পথে দেখা ও কথাবার্তায় তার নাম মনে করতে পারি বা না পারি, যখন জানতে পারি সে দেশে গিয়েছিল এবং তার প্রিয়জনদের সঙ্গে বড় সুখে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছে তখন আমরাও সুখ বোধ করে থাকি।

এই সংশোধিত কিশোর পরিচারকগণ আমার ও আমার বন্ধুদের বহুসংখ্যক অপরাধপ্রবণদের ফিরিয়ে আনবার কাজে খুব বড় সহায় হয়েছিল। পথের ছন্নছাড়া ছেলেগুলোকে সংশোধন করতেও তারা আমাদের সহযোগিতা করত। আমরা পথের ছেলেগুলোকে জড় করে তাদের ঝগড়া মারা-মারি না করতে উপদেশ দিই। আমরা অন্তরে ভালবাসা ও দরদ নিয়ে তাদের কাছে যাই। তাতে তাদের জিনে নিই। তাদের আশ্রয় দেবার মত আমাদের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তাদের সাহায্য করবার মত টাকাও আমাদের নেই। তবুও তাদের কাজে লাগবার মত উপায় পেয়েছিলাম।

আমি জুতোয় চিক তুলতে শিখেছিলাম, তাও একজন বড় সেনাপতির কাছ থেকে। আসবাবপত্র ও মেঝে পালিশের কৌশলও জানতাম। আমার বন্ধুগণ এই সব ছন্নছাড়া, ভবঘুরে কিশোরদের একদিন বিকালে মিষ্টকথায় ভুলিয়ে এক জায়গায় জমায়েৎ করলেন। আর আমি তাদের সামনে হাতে-কলমে কাজ করে দেখালাম। সেই সঙ্গে বললাম, কি ভাবে তারা কিছু কিছু উপার্জন করতে পারে। তাদের শিখবার কৌতূহল বৃদ্ধি পেল, এবং তারা কৌশলটি শিখেও নিলে। তাদের প্রত্যেকের জন্যে এক কৌটো করে পালিশ, একটা বুরুশ ও একটুকরো ন্যাকড়া এবং একটা জল রাখবার পাত্র জোগাড় করতে আমাদের লাগল এক মাস। জুতো পালিশকরা বৃত্তিটার ভেতরকার কথাটা কি তা তারা জানত। তাই কিছু করে রোজগার করতে তাদের বেশি দিন লাগল না। এখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ কনট-সার্কাসে দিন ৩।৪ টাকা রোজগার করে। আর যারা কিছু দিন আগে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা ধূমপান নিবারণ করার জন্যে একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা বোধ করে থাকে। আমাকে প্রায়ই বলে, "বাবু, চিনিকে মারুন। সে এখনও সিগরেট ফোঁকে।"

আজ মোহনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে আমায় বললে, "বাবু, আপনি আমাদের কষ্ট থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনার জুতো জোড়া পালিশ করতে দেবেন না? এখন আমি রোজগার করি। আপনার দরদ আর সাহায্যেই তা হচ্ছে। না হলে ভিখারী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম। আমার কথা বিশ্বাস করুন, কালু, চিনি, পান্নু, রামু, সুরিন্দর আর আমাদের অন্য সব বন্ধু ভিখারী হয়ে থাকত। কিন্তু আপনি কি আমাদের পুলিস আর মিউনিসিপালিটির জুলুমের হাত থেকে বাঁচাবেন না?"

এই দৃশ্য আমার অন্তরকে পুলকিত করে তুলল। আমরা যা লাভ করেছি আমার বন্ধুরা সকলেই তার জন্য গর্বিত।

উত্তর অঞ্চলের সভাপতিগণের ও আহ্বায়কগণের সম্মেলন

নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রীয় সমাজ-কল্যাণ পরামর্শদাতা সংস্থার উপরোক্ত সম্মেলনে, পরিকল্পনা কমিশনের ইউনিয়ন মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বলেন, "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রের অর্থ হচ্ছে, সর্বোদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ।" তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রের অর্থ কেবল এই নয় যে, তাতে হবে শিল্পোন্নতি বা তার দ্রুত জাতীয়করণ। আর গণতন্ত্রের অর্থও মাথাভারী সমাজব্যবস্থাও নয়। এই দু'টিকে লাভ করতে হলে, কল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলিকে দরিদ্রতম নাগরিকটি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সকল নাগরিককেই তাঁদের সহনাগরিকগণের সেবায় যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে।

শ্রীনন্দ কর্মিগণকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, সমাজ-কল্যাণকে বাড়তি বা অবসর সময়ের কায বলে মনে করা যেতে পারে না। এই কাজ করতে হবে সুসংবদ্ধ পথে। তিনি আরও বলেন, যদি সমাজতান্ত্রিক সমাজ লাভ করতে হয় এবং যদি গণতন্ত্র রক্ষা করতে হয় তা হলে ক্রমেই বেশি করে স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টা করতে হবে, কেবলমাত্র সরকারের কাজের উপর নির্ভর করলে চলবে না।

গোড়ার দিকে শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখ, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান, সংস্থাটির কাজের একটা বিবরণ দেন। তাঁর বিবরণ দানের উদ্দেশ্য ছিল ওয়েলফেয়ার একসটেনসন সার্ভিস সেণ্টারের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন কোন মহলে যে গোলমেলে ধারণা আছে তা দূর করা। তিনি বলেন, "সি. পি. এ-র ও আমাদের কাজের কোনটিই কারও উপর গিয়ে পড়ে নি। কারণ আমাদের ওয়েলফেয়ার একসটেনসন প্রজেক্ট বিশেষ ধরনের মানুষদের যেমন, নারী, শিশু, বিকলাঙ্গ ও অপরাধপ্রবণদের জন্য কাজের ভার নিয়েছে। কম্যুনিটি প্রজেক্টের কর্মতালিকায় এদের কোন সেবার ব্যবস্থা নেই।"

শ্রীমতী দেশমুখ আরও বলেন, "এই কেন্দ্রগুলিকে বিভিন্নবিষয়ক কাজের কেন্দ্র করে গড়ে তোলবার প্রভূত চেষ্টা চলছে। নারীগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সামাজিক শিক্ষা, হাতের কাজ শিখবার ব্যবস্থা, শিশু ও প্রসূতি নিকেতন, শিশুস্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা—এই সকল কাজেরও ভার নেওয়া হয়।"

দিল্লী স্টেট বোর্ড সম্মেলনটির আয়োজন করেন। সম্মেলনটির উদ্বোধন হয় ১৯৫৬ সনের ৪ঠা এপ্রিল এবং চার দিন চলে। এই সময়ের মধ্যে পঞ্জাব, পেপসু, হিমাচল প্রদেশ, বিন্ধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, জম্মু ও কাশ্মীর, আজমীঢ় ও রাজস্থানের সভাপতি ও আহ্বায়কগণ যোগ দেন এবং তাঁদের বিবরণী পাঠ ও তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সমস্যাগুলির আলোচনা করেন।

সকলেই উপলব্ধি করেন যে, বর্তমানে একজন গ্রাম সেবিকা ও একজন ধাত্রী মাত্র এই দু'জন কর্মী যথেষ্ট নয়, আরও একজন করে লোক দরকার যিনি প্রত্যেক কেন্দ্রে হাতের কাজ শিক্ষা দেবেন। চেয়ারম্যান বলেন, প্রত্যেক কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই একজন করে শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সম্মেলনে যোগদানকারী আহ্বায়কগণ বলেন, "শিক্ষাপ্রাপ্ত ধাইয়ের চেয়ে ধাত্রীদের সাহায্যই বেশি কাজের হবে।" কিন্তু চেয়ারম্যান তাঁদের বুঝিয়ে দেন যে, প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করে শিক্ষিত ধাত্রী নিযুক্ত করা সম্ভব নয়। তবে তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, প্রত্যেক প্রজেক্টের জন্যই একজন করে ধাত্রী নিযুক্ত হতে চলেছে। আগামী পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায়, দেশের স্বাস্থ্য পরিকল্পনার অংশ হিসাবে যে শত শত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হবে আহ্বায়কগণ তার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন।

আহ্বায়কগণ তাঁদের কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট নয়, এ প্রশ্নও তোলেন। তাঁরা চান তার দ্বিগুণ অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু চেয়ারম্যান কতকগুলি কারণ প্রদর্শন করে বলেন, টাকার পরিমাণ এখন বৃদ্ধি করা যেতে পারে না। তবে বাইরের দান তাঁরা সংগ্রহ করতে পারলে কেন্দ্রীয় সংস্থা কিছু বেশি টাকা সাহায্য করতে পারেন।

প্রতি কেন্দ্রের সংগঠন সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। যে সকল সদস্য সমাজ-কল্যাণ কাজে অত্যন্ত আগ্রহশীল থাকা সত্ত্বেও সময়ের অভাবে বা অন্য কারণে সক্রিয় সহযোগিতা করতে অক্ষম তাঁদের জায়গায় যাঁরা কাজ করতে পারেন চেয়ারম্যান সেই সকল ব্যক্তিকে গ্রহণের পরামর্শ দেন।

তিনি আরও বলেন যে, বাড়ীগুলি কেবল প্রসূতি-নিকেতনরূপে ব্যবহৃত হবে না, সেখানে অন্যান্য সমাজ-কল্যাণ কাজেরও ঠাঁই করে দিতে হবে। দান আদায়েরও ব্যাপক ও প্রবল চেষ্টার প্রয়োজন।

সম্মেলনে সভাপতিগণ ও আহ্বায়কগণ নিজেদের ঘরোয়া সমস্যা আলোচনার মূল্যবান সুযোগ লাভ করেছিলেন।

ভারতে সমাজকল্যাণমূলক সাংবাদিকতা

শ্রীপাতঞ্জলী ভদ্রেন্দু

১৮৩০ সন। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথার অবসান করলেন। গোঁড়া হিন্দুসম্প্রদায় সতীদাহ প্রথা অবসানের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন, "স্বামীর সঙ্গে সহমরণ প্রত্যেক হিন্দু রমণীর পুণ্য কর্ম।" রাজা রামমোহন রায় তাঁর প্রগতিশীল গোষ্ঠীদের নিয়ে তাঁর কাছে পাল্টা আবেদন পেশ করলেন। তাতে গোঁড়া সম্প্রদায় সপারিষদ রাজার কাছে আর একটি আবেদন পাঠালেন। আর, রায়গোষ্ঠী গোঁড়া সম্প্রদায়ের ঐ আবেদনকে নস্যাৎ করবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে তাঁদের বক্তব্য প্রচার করতে লাগলেন। পরিশেষে বিলাতের প্রিভি কাউনসিল লর্ড বেন্টিঙ্কের আদেশের পক্ষে তাঁদের রায় দিলেন। ফলে বাগবিতণ্ডার অবসান হ'ল। ইতিমধ্যে দু' পক্ষেরই মতামতকে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে কয়েকখানি পত্রিকার জন্ম হয়েছিল। ভারতে সেই সম্ভবত সমাজকল্যাণমূলক সাংবাদিকতার প্রারম্ভ।

ভারতে ১৭৭৬ সনে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও পত্রিকার সঙ্গে জনসাধারণের প্রথম সংযোগ হয় (ইংরেজী) ব্রাহ্মিনিক্যাল ম্যাগাজিন, (বাংলা) সংবাদ কৌমুদী, (ফারসী) সিরাৎ-উলআখবর্ প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলির মারফৎ। সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করবার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় এগুলি প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাগুলি ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে অর্থপূর্ণ ও অক্ষয় ছাপ রেখে গেছে। পরে সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সমাজকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে দেশের নানা অংশে অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে বিশিষ্ট ছিল, লোশণ্ডের 'দীনবন্ধু', গোখেলের 'সোস্যাল রিফরম', রাণাড়ের 'ইন্দুপ্রকাশ', বীরেশ লিঙ্গমের 'বিবেক বর্ধনী', নটরাজনের 'ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফরমার', এম. কে. গান্ধীর 'হরিজন', এম. কে. মুন্সীর 'সোস্যাল রিফরমার' ও নামের 'দি রিফরমার'। পরবর্তীকালে বহু সমাজসেবী শিশু, নারী, তরুণ প্রভৃতির কল্যাণের জন্য বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।

এখন দেশে সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন বিষয়ের অনেক পত্রিকা বর্তমান। সাধারণ সংবাদপত্রের সঙ্গে সমান তালে সেগুলি প্রকাশিত হয়।

'দি ইণ্ডিয়ান কাউন্‌সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার' দিল্লী থেকে প্রতি মাসে 'নিউজ বুলেটিন' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে তাঁদের কাজ-কর্মের সংবাদ থাকে। এই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা শিশুকল্যাণ কর্মীদের উৎসাহ দেন। পশ্চিমবঙ্গের শিশুকল্যাণ পরিষদ প্রকাশ করেন 'দেবানামপিয়।' তাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের রচনা প্রকাশিত হয়। নিখিল-ভারত নারী সম্মেলন নিউ দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন 'রোশনি।' এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক ন্যায়-বিচার ও সাম্য স্থাপন।

বোম্বাইয়ের "দি টাটা ইনষ্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্স" প্রকাশ করেন, দুখানি পত্রিকা—'দি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ সোস্যাল ওয়ার্ক' ও 'কর্মযোগী।' এ দুইয়ের মাধ্যমে তাঁরা সমাজসেবায় জনমত গঠনের চেষ্টা করছেন।

ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সংস্থা দিল্লী থেকে 'বন্য-জাতি' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার উদ্দেশ্য উপজাতির সেবা। এইগুলি ছাড়া আরও বহু পত্রিকা আছে। সেগুলির উল্লেখ স্থানাভাববশতঃ করা গেল না।

যা হউক, আমাদের সমাজকল্যাণমূলক সাংবাদিকতার ঐতিহ্য এমন যে তার জন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারি। এখন সেগুলির সঙ্গে প্রকাশিত হয়, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের (সেন্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের) দু'খানি মূল্যবান পত্রিকা 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার' ও 'সমাজকল্যাণ।' পত্রিকা দু'খানি গুরুকর্মভার সম্পাদন করছে।

গঙ্গা

শ্রীমতী সাবিত্রী গোয়েল

প্রথম শৈশবের কথা মনে করতে গেলেই গঙ্গার অন্তর কিছুটা ব্যথিত ও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে—সেই শৈশব যখন সে নিজের খুশিমত কাজ করতে পেত, যা চাইত পেতও তাই। কিন্তু সে অনেক বছর আগের কথা। সে তার মায়ের মুখ সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। সে যখন দু' বছরের তখন তিনি মারা যান। তার বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। তবে আর সকলের বেলায় যেমন হয়ে থাকে তার বিমাতা তেমন ছিলেন না। তিনি ছিলেন অন্য রকমের। তার এই নতুন মা ছিলেন চমৎকার। তাকে খুব যত্ন করতেন। বরং তার যত্নটা হ'ত অতিরিক্ত। তাঁর ক্রমাগত আদর-যত্নে ছোট্ট গঙ্গা উত্যক্ত হয়ে উঠত। দামী পুতুলের বায়না ধরে সে আর মাটিতে শুয়ে পড়তে পেত না। কারণ তার নতুন মা তাকে তার বাঞ্ছিত

সামগ্রীটি দিতেন। কিন্তু তাকে দিনের মধ্যে অনেকবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবার ভীষণ ঝঞ্ঝাটে পড়তে হ'ত। মায়ের অবাধ্য হবার আনন্দ থেকে সে এই ভাবে বঞ্চিত হ'ত, তবে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে নয় একটা সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে। তাতেই হ'ত তার পরাভব।

সে যখন শৈশব ছাড়ল তখন আবার পড়ল, ওর চেয়ে কঠোরতর এক শৃঙ্খলার মধ্যে। তার বহু খেলার সাথীর কাছে স্কুল এক ভয়ঙ্কর জায়গা। তবে তার কাছে সে রকমটা হয় নি। তার অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পোশাক, ঠিক সময়ে বইপত্র কেনা, বাস না পেলেও স্কুলে হাজির হওয়া—এই সব তার প্রতি স্কুলের শিক্ষিকাগণের স্নেহ ও প্রশংসা আকর্ষণ করেছিল। আর সে ছিল তার সহকর্মিনীগণের রাণী। তার প্রকৃতির মধ্যে ছিল প্রভুত্বসূচক একটা ভাব, অন্তরে ছিল দুঃসাহসিক কর্মে নিযুক্ত হওয়ার একটা প্রবণতা।

তবে বাড়ীতে তাকে শিক্ষা দেওয়া হ'ত ভবিষ্যতের গৃহিণীর কাজকর্মগুলি। সেই সঙ্গে তার প্রতিটি কাজ পরীক্ষা করে তার অভিভাবকেরা তাকে সংযত করতেন। বলতেন, "গঙ্গা, ও রকম করে পা দুলিয়ো না। ওটা বিশ্রী! চুপ! ও রকম করে চেঁচিও না।...খারাপ অভ্যাস...চুমুক দিয়ে খাবার সময় ঠোঁটে ও রকম বিশ্রী আওয়াজ করো না, তোমাকে পরের ঘরে যেতে হবে।...তোমার শাশুড়ী ও সব পছন্দ করবেন না।...তোমার শাশুড়ী কি বলবেন...ওর জন্যে একদিন তোমায় ঠ্যাঙাবে।...তোমার ভাইয়েদের নকল কর না।...মেয়েদের পরের ঘরে যেতে হয়।..."

"গোল্লায় যাক তোমাদের পরের ঘর।...আমি সেখানে যাচ্ছি না।" রাগে লাল হয়ে এই কথা বলেই গঙ্গা ছুটে পালাত।

আর তখন শুনতে পেত তার মা-বাবা হাসতে হাসতে বলছেন, "মেয়েটা বড় মিষ্টি কিন্তু ওর মেজাজ।..."

তার বাবা গর্বের সঙ্গে বলতেন, "ব্যাপারটা তা নয়। ও নিজের খুশিতে চলে...ওর সাহস আছে..."

"নিজের খুশিমত চললে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ওর হবে মুশকিল। ওর ফলে মেয়েরা মুশকিলে পড়ে।"

গঙ্গা আর কিছু শুনতে পেত না। সে কাঁদত। তার নিজের মাকে মনে পড়ত যে আর ইহজগতে নেই। তার যৌবনোন্মুখ অন্তরে সে কত ছবি আঁকত, কিন্তু যা সে গড়ে তুলতে চাইত তার আদর্শের মহান সৌন্দর্যের সঙ্গে তার একটিরও মিল হ'ত না। তার নতুন মায়ের সুন্দর ও করুণা মাখা মুখখানি তার চোখের সামনে বার বার এসে পড়ত। কিন্তু তার নিজের মা তার কল্পনা থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন যেমন করে তিনি এই পার্থিব জগতে তার বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছেন।

গঙ্গার স্বামী শিক্ষিত। কিন্তু তাদের জমিদারী সরকারী আইনে চলে যাবার ও তার পিতার মৃত্যুর পর সে তাদের গ্রামের বাড়ীতেই বাস করে। অনুপস্থিত জমিদারদের দিন শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট জমি নিজের হাতে রাখবার জন্যে তাকে চাষ-আবাদ করতে হয়। গঙ্গা তার শাশুড়ীর যে রূপ কল্পনা করেছিল তিনি সে রকমের কোন রাক্ষসী নন। গঙ্গার পোশাকে-আচরণে, পান-ভোজনে কোন দোষ তিনি দেখতে পান না। তিনি তাঁর গৃহলক্ষ্মীর হাতেই সংসারের সব ভার তুলে দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, মা মিছামিছি ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে অনাবশ্যক গোলমাল করতেন। সে এখানে তার রূপ ও নিপুণতা নিয়ে স্বামীর ঘর ও অন্তর সাজিয়ে বসেছে।

গঙ্গার সন্দেহ কিন্তু শীঘ্রই আবার তার মনে উদয় হ'ল। তার শাশুড়ী, আর সকলের মতই স্থির বিশ্বাস করতেন যে, প্রথা ও সমাজ বধূর জন্যে যে ঠাঁইটুকু নির্দেশ করেছে সে থাকবে সেইখানেই। বধূর অবগুণ্ঠনের উদ্দেশ্য অন্যের চোখে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি নয়। ওটা থাকবে বরাবরের জন্যে এবং তার নৈতিক চরিত্রকে রক্ষা করবে, যেমন করে বাড়িতে তার মা তাকে ওদিকে রক্ষা করেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে, তার মায়ের শিক্ষা বৃথা হয়েছে। কিন্তু কেন তিনি তাকে বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি দিতেন? তাকে আদৌ স্কুলে পড়াবার এবং সাংঘাতিক পরীক্ষাগুলো পাস করাবার দরকার কি ছিল? কেন আঠারো বছর ধরে সে বাইরের জগতে বেড়াতে পেয়েছে? তার সেই শিশুকাল থেকে কেন তাকে পর্দার আড়ালে রাখা হয় নি? তা হ'লে ত আর সে তার পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠত না। তাকে যদি একজনের ওপর নির্ভরশীল হতেই হয় তা হলে তার প্রথম গৃহ থেকে কেন তাকে উন্মূলিত করে আনা হ'ল? কেন তাকে প্রতি বারেই একজন করে নতুন মা নিতে হবে?

এখন তার বোধ হতে লাগল, তার জীবনের প্রতি স্তর ক্রমেই হবে আরও শোচনীয়। তার পুরনো বাড়ীর জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল! তার বিমাতা যিনি তাকে বাইরে যাবার স্বাধীনতা দিয়ে ছিলেন তাঁর জন্যে মন কেমন করতে লাগল। মন ব্যাকুল হ'ল তার বাবার জন্যে। তিনি তার সাহস ও নিজ থেকে কর্মোদ্যোগের জন্যে গর্ব অনুভব করতেন। যারা নিরক্ষর মূর্খ তারা কত সুখী! তাদের বিবেকের দংশন অনুভব করতে হয় না। যারা শক্তিহীন তারাও সুখী!

বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল কিন্তু চাপ হতে লাগল বেশি। লোকে বলে, একসঙ্গে বাস করতে করতে বোঝাপড়া বাড়ে। কিন্তু এখানে পর পর প্রত্যেক দ্বন্দ্বে পার্থক্যটা আরও উদগ্র হয়ে উঠতে লাগল। গোড়ার দিকে গ্রামখানি তার কাছে ছিল নতুন। তাই বেশি সময় সে বাড়িতেই থাকত। ক্রমে অনেকের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়। সে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া শুরু করে। তার অপরাধের গুরুত্ব বাড়তে লাগল নিষেধের বেড়াজালের বাঁধুনির সঙ্গে সঙ্গে।

তাদের গ্রামখানা পড়েছিল কমিউনিটি প্রজেক্টের চৌহদ্দির মধ্যে। সরকারী কর্মচারীরা তার স্বামীকে তাদের কাজে সাহায্য করবার জন্যে বেশ সহজেই হাতের কাছে পেয়ে গেল। যে মহিলা কর্মীটির হাতে সমাজ-শিক্ষার ভার ছিল তিনি একেবারে তাদের বাড়ি চড়াও করলেন। গ্রামে একজন শিক্ষিতা ও কৃষ্টিসম্পন্না মহিলাকে পেয়ে তিনি ত অবাক। তিনি গঙ্গাকে গ্রাম-সেবিকা হবার পরামর্শ দিলেন। গঙ্গা সোৎসাহে তাতে সম্মত হ'ল।

কিন্তু বাড়িতে উঠল সোরগোল। "ঘরের বউ" কি করে গ্রামে বার হবে, লোকে তাকে দেখবে? বড় ঘরে কেউ কোথাও এ রকম শুনেছে? গঙ্গাকে কাজের ভার দেওয়া হ'ল, কিন্তু সে বাড়ির বার হতেই পারলে না। একটি মাস কেটে গেল, সে কিছুই করলে না। সে সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করলে, এমন কি তার স্বামীরও। সে চুপচাপ পড়ে ভাবতে লাগল, মন গেল হতাশায় ভরে। সে যে খুবই অসুখী তা প্রত্যেকেরই নজরে পড়ল। তার অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল এক জোয়ার যা তাদের চোখে ধরা পড়ছিল না। আর সেই জোয়ারের আঘাতে তার চার-ধারে যে পিঞ্জর গড়ে উঠেছিল তার কাঠামো যাচ্ছিল ভেঙে চুরমার হয়ে।

না, নিজের ঘরে সে বন্দিনী হয়ে রইবে না।

সে কি গঙ্গা নয়—যে লক্ষ লক্ষ নরনারীর আনন্দ ও শক্তির চির-উৎস? সে স্বয়ং নিষ্কলুষতা। গঙ্গা তার স্বামীর কাছ থেকে এই শপথ আদায় করেছিল যে, সে তার পথের বাধা হবে না। সে সমাজ-কর্মী হবার সঙ্কল্প করলে। এই সঙ্কল্প তার অন্তরে নিয়ে এল শান্তি। অন্তরের শান্তি দৃঢ়তাকে পুষ্ট করে তুলতে লাগল।

সে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে তার স্বামীকে বললে, "আমি চলে যাচ্ছি।"

তার স্বামী আশ্চর্য হয়ে বললে, "কোথায়?" সে তখন ডেস্কে বসে খুব ব্যস্ত হয়ে কাগজপত্র দেখছিল।

গঙ্গা বললে, "থানাপুরে···মহিলাদের শিক্ষাশিবিরে। তোমরা যদি না চাও, আমি আর ফিরে আসব না।" শেষের কথাগুলি বললে তার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে। শৈশবের সেই উদ্ধতভাব তার মধ্যে ফিরে এসেছে। মুক্তি ছাড়া তার কাছে আর সব তুচ্ছ। স্বাধীনতা চাই-ই। এ ভাবে সে বেঁচে থাকতে পারে না। তার শাশুড়ীকে, স্বামীকে, বাড়ি-ঘরকে সে হেয়জ্ঞান করতে লাগল; এমনকি নিজেকেও সে হেয়জ্ঞান করতে লাগল এত দিন নিজকে বিসর্জন দিয়েছিল বলে। সেই মুহূর্তে সে ঐ সব শৃঙ্খল ভেঙে ফেলছিল। তাকে যদি মারতে মারতে মেরেও ফেলা হয় তবুও সে নিরস্ত হবে না।

তার কথাগুলির অর্থ তার স্বামীর মনে এক চমকে খেলে গেল। রাগ-বিস্ময়শূন্য অন্তরে সে গঙ্গার দিকে নীরবে তাকাল। গঙ্গা তার নব সৌন্দর্যে উজ্জ্বল! মাত্র সিদ্ধান্তই তার মুখে এনেছে এক নতুন ভাব। তাঁর ঠোঁট দুখানি দৃঢ় সংবদ্ধ। গঙ্গা যৌবনে, উদ্যমে টলমল করছে। তার স্বামীকে ছেড়ে সে একা সংসারের পথে বেরিয়ে পড়তে চায়? নিজের সর্বনাশ করতে সে কি গঙ্গাকেও ধ্বংস করবে?

"এই তোমার জন্যে মনিঅর্ডার···"

"কি করেছি যে আমি টাকা পাব? তুমি কি মনে কর, আমি টাকা চাই?"

কিন্তু তার স্বামীর কান তার কথার দিকে ছিল না। সে তাড়াতাড়ি মনে মনে হিসেব করছিল···সে কিসে জড়িয়ে পড়বে, সর্বনাশে বা আশীর্বাদে? নগদ টাকা। মা এটা খুব পছন্দ করবেন। গ্রামে তার মতও অবস্থাপন্ন চাষী আছে যাদের কিছুরই অভাব নেই, কিন্তু তারা বাড়তি টাকা দিতে পারে না। সে তার মাকে এগুলো দিয়ে খুশী করতে পারবে।

সমাজ-শিক্ষা কর্মচারী রঞ্জনার কথা তার মনে এল। মহিলাটির কি নৈতিক চরিত্র নেই? ইজ্জৎ নেই? না, সে সব যথেষ্ট আছে। তার নিজের চেয়েও বেশী আছে। জেলাশাসকের সঙ্গে সে কি রকম করে কথা বলে। তার চেয়েও ভাল ভাবে। একদিন তার স্ত্রীও ঐ রকম করে কথা বলবে। সেও একদিন হবে সমাজ-শিক্ষা কর্মচারী। কেবল ওর চাই ওর নিজের পথে চলবার স্বাধীনতা।

হঠাৎ বহুকালের বোঝা থেকে সে হ'ল মুক্ত। সে উপলব্ধি করলে, তা যেন তার অন্তরকে এতকাল পীড়ন করছিল। সে বলে ফেললে, "তুমি আমার আশীর্বাদ নিয়ে যাও। আজ থেকে তোমার ইচ্ছামত পথে তুমি যাত্রা কর।"

সেইক্ষণটিতে এক স্বাধীন পুরুষ মুখোমুখী হ'ল এক স্বাধীন নারীর—যে তার চিরজীবনের সাথী।

এখন রেক্সোনায় নতুন একটা কিছু আছে!

ভারতবর্ষে ভেষজ শিল্পের প্রসার

ডক্টর মোহিনীমোহন বিশ্বাস

বর্তমান ভেষজ শিল্পসমূহের উৎপত্তি হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং তখন প্রাচীন ফারমাকোপিয়াসমূহ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভেষজ শিল্পের ক্রমোন্নতি দেখা দিতে লাগল এবং সেই সঙ্গে ক্রমশঃ দেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ভেষজ প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠল। ভারতবর্ষও বিভিন্ন শ্রেণীর ভেষজ দ্রব্য, রাসায়নিক এবং এণ্টিবায়োটিকস প্রস্তুতের প্রতি মন দিল। ক্রমশঃ ভেষজ প্রস্তুতের জন্য দেশব্যাপী একটা সাড়া পড়ে গেল।

ভেষজ শিল্পকে মূল দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথম অংশ বিবিধ রাসায়নিক ও ভেষজসমূহের উৎপাদন সম্বন্ধে। দ্বিতীয় অংশ উৎপন্ন দ্রব্যাদির মান ও মাত্রা নির্ণয় করে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রয়োগ সাধন। এই দুই অংশের পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক। এই সকল ভেষজ দ্রব্য তৈরীর জন্য কতকগুলি মূল রাসায়নিক (basic chemicals) প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। রঞ্জন শিল্প (dye-stuff industry) জার্মানী, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। এই শিল্পের জন্য প্রস্তুত রঞ্জন দ্রব্যাদি সমগ্র পৃথিবীর বাজার জুড়ে বসেছে। রঞ্জন দ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিকসমূহ বিবিধ ভেষজ শিল্পেও ব্যবহৃত হয়। এজন্য ঐ সব দেশের রঞ্জন ও ভেষজ উভয়বিধ শিল্পই প্রচুর উন্নতি সাধন করেছে। সুতরাং রাসায়নিক ও ভেষজ উভয়বিধ শিল্পের মধ্যে একটি আন্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ভেষজ শিল্পের প্রভূত উন্নতি দেখা গেল। মেপাক্রিণ, প্যালুড্রিণ, পেনিসিলিন্ প্রভৃতি নূতন নূতন ঔষধের আবিষ্কার হ'ল। গবেষণা দ্বারা ভিটামিন ও হরমোন প্রভৃতি আরও বহু নূতন ঔষধের সন্ধান মিলিল। আমেরিকা আজ গবেষণা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন, অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, টেরামাইসিন প্রভৃতি আরও অনেক ঔষধের উৎপাদনে মূল অংশ গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ভেষজ শিল্পে দীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য ভেষজসমূহ ব্রিটিশ শাসনের সময় এদেশে আমদানী হয়। দেশীয় গাছগাছড়া থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরি হ'ত এবং দেশবাসী ঐ সব ভেষজ দ্রব্যের গুণাবলীতে এত সন্তুষ্ট ছিল যে, পাশ্চাত্ত্য ঔষধের প্রচার বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষে ভেষজ শিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা হ'ল। ক্রমশঃ পশ্চিম ভারতের বরোদা রাজ্যের শ্রীটি. কে. গাজর এবং রাজমিত্র বি. ডি. আমিন এর চেষ্টার ফলে এই শিল্পের আরও উন্নতি দেখা দিল। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ফলে এই শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি দেখা গেল না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভেষজ দ্রব্যের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেল এবং আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ একেবারে বন্ধ হ'ল। যুদ্ধের পর আবার পূর্বাবস্থা ফিরে এল এবং ভেষজ শিল্পে আবার অবনতি ঘটল। ১৯৩০ সনে আবার চেষ্টা আরম্ভ হ'ল এবং সিরাম, ভ্যাক্‌সিন, ইথার, ক্লোরোফর্ম, ন্যাপথালিন, ক্রিসল প্রভৃতি প্রস্তুত হতে লাগল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভেষজ শিল্পে আরও উন্নতি দেখা গেল। এফিড্রিন্, স্যানটোনিন্, ষ্ট্রিকনিন্, মরফিন্, এমিটিন্, এট্রোপিন্ প্রভৃতি এলক্যালয়ড জাতীয় ঔষধ প্রস্তুত হতে আরম্ভ হ'ল। সিরাম ভ্যাক্‌সিন তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং ভেষজ শিল্পে প্রচুর উন্নতি সাধিত হ'ল। এমন কি কতিপয় ঔষধের রপ্তানীও আরম্ভ হ'ল। ক্রমশঃ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা দেখা গেল এবং বিদেশী শিল্পপতিগণের দ্বারা ভারতবর্ষে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত কারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এর ফলে ভারতীয় শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি দেখা দিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর গত কয়েক বৎসরে ভেষজশিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। ১৯৫৫-৫৬ সনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্য শেষ হবে। এই পঞ্চবর্ষকাল ভেষজ শিল্পের উন্নতির পথে কতকগুলি অন্তরায় সৃষ্ট হয়েছে তা দূরীভূত করতে পারলে এ শিল্পে প্রচুর উন্নতি সাধিত হবে। সর্ব্ব প্রথম অন্তরায় হ'ল ভেষজ শিল্পের উপযুক্ত মান নির্দ্ধারণ এবং প্রয়োজন মত ভেষজ দ্রব্যের মান উন্নয়ন। উক্ত উন্নয়ন কার্য্যের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশগুলি মেনে চলা উচিত :—

(১) কাঁচা মাল ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর রাসায়নিক পরীক্ষাকার্য্য আরও কঠোর হওয়া আবশ্যক।

(২) ভেষজ দ্রব্যের আধারসমূহ যথাসম্ভব বিলাতীর সমতুল্য হওয়া আবশ্যক।

(৩) বাজার হতে ভেজাল ও জাল ঔষধ উচ্ছেদ করবার জন্য ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা দরকার।

প্রথমোক্ত নির্দ্দেশ মানলে ভেষজসমূহের মান নির্দ্ধারণ করা সহজ হবে। ভেষজ দ্রব্যসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সঠিক হওয়া একান্ত দরকার। এ কারণ ভেষজ রাসায়নিকের দায়িত্ব খুব বেশী। মেজর জেনারেল এস, এল, ভাটিয়ার মতে ভেষজসমূহের সঠিক বিশ্লেষণ এবং রাসায়নিক পরীক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং ভেষজ শিল্পের উন্নতির পক্ষে তা অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় নির্দ্দেশেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ভেষজ দ্রব্যের আধারসমূহ এবং প্যাকিংয়ের গুরুত্ব বিশেষ কম নয়। দেশের শ্রেষ্ঠ উপাদান থেকে শিশি-বোতল প্রভৃতি তৈরি হওয়া আবশ্যক। শিশি-বোতলের কাঁচের প্রকৃতি এবং গঠন উন্নত ধরনের হওয়া আবশ্যক এবং বিলাতীর সমকক্ষ যাহাতে হয় তার প্রতিও দৃষ্টি রাখা দরকার। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচের সংস্পর্শে রাখলে ভেষজ-দ্রব্যাদির মান ক্ষুণ্ণ হয় এবং কিছুদিন পরে অব্যবহার্য্য হয়ে যায়। তৃতীয় নির্দ্দেশ ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আইন সংক্রান্ত। এই আইন জনসাধারণের হিতার্থে এবং এই আইনভঙ্গকারীদের সাধারণ ক্ষতিকারীদেরই মত শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। ভেষজসমূহ তৈরি করবার জন্য রাসায়নিক এবং শিক্ষিত ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে। ঔষধের কারখানাগুলিও আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত হবে এবং ঔষধ বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার কড়াকড়ি করতে হবে। বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে ঔষধ আমদানী করা হবে মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করতে হবে যাতে ভেজাল ঔষধ না বিক্রয় হয়। ঔষধের দোকানের মালিকগণ এবং গৃহস্থেরা সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত ঔষধের শিশি-বোতলগুলি নষ্ট করে ফেলবেন যাতে করে ফিরিওয়ালারা ঐগুলি হাতে না পায়। এই সমস্ত ব্যবহৃত শিশি-বোতলগুলি ভেজাল ঔষধ প্রস্তুতকারীদের হাতে পড়লে তারা ভেজাল ঔষধ তৈরি করে ঐগুলিতে ভরে আবার বাজারে বিক্রয় করবে এবং তাতে জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হবে।

১৯৫৫ সনে দিল্লীতে নিখিলভারত ভেষজ বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনকালে ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রী শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি কেন্দ্রীয় পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। তিনি দেশীয় ঔষধের মনোন্নয়নের এবং ভেজাল বন্ধের জন্য বলেন। দেশীয়

শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি উৎসাহ দেন। তিনি বলেন, এ দেশে খাদ্য ও বস্ত্রের মান হয়ত কিছুটা নামান যায় কিন্তু ঔষধের মান সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

বর্ত্তমানে কয়েকটি ভেষজ তৈরির কারখানা সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। মেজর জেনারেল এস, এস, সোখের পরিকল্পনানুযায়ী ভারত সরকার পুণা শহরের নিকট পিম্প্রীতে পেনিসিলিন তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। এই কারখানায় ভারতবর্ষের বার্ষিক ২০,০০০ বিলিয়ন ইউনিট চাহিদার মধ্যে প্রায় ৯০০০ বিলিয়ন ইউনিট তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পেনিসিলিন উৎপাদনের মাত্রা ১৫০০০ বিলিয়ন ইউনিট বৃদ্ধি পাবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট বেসরকারী কারখানার সাহায্যে পেনিসিলিনের ঘাটতি অংশ পূরণ করতে চান।

ম্যালেরিয়া কীটঘ্ন ঔষধসমূহ—যেমন বেঞ্জিন হেক্সা-ক্লোরাইড (বি, এইচ, সি) এবং ডি, ডি, টি বৎসরে ২০০০ টন তৈরী হয়—যদিও বার্ষিক চাহিদা ৫,৫০০ টন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইথার, ক্লোরোফরম, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট্ এবং সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম সাল-ফেট্, এমোনিয়াম ও পটাসিয়াম ব্রোমাইড প্রভৃতি কয়েকটি রাসায়নিক প্রস্তুতের প্রচুর উন্নতি সাধন ঘটেছে। ভিটামিন ঘটিত ঔষধের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে চলেছে। সাধারণতঃ এসকরবিক এসিড (ভিটামিন সি), থায়ামিন, নিকোটিনিক এসিড, রাইবোফ্লাভিন (ভিটামিন বি ২) পাই-রিডক্সিন, প্যানটোথেনিক এসিড, ফলিক এসিড এবং ভিটা-মিন বি ১২—এই কয়েকটি উপাদান দ্বারা গঠিত ভিটামিন বি কম্‌প্লেক্স, ভিটামিন কে এবং ভিটামিন ই ঔষধে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত ভিটামিনগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে।

বর্ত্তমান যুগে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গবেষণা-গুলির মধ্যে কয়েকটি ম্যালেরিয়ার ঔষধ যেমন প্লাসমোচিন, এটিব্রিন, প্যালুড্রিন, কয়েকটি সালফনামাইড জাতীয় রোগ-নিরোধক ঔষধ, হামের জন্য গামা গ্লোবুলিন, কীটঘ্ন ঔষধ যেমন ডি, ডি, টি ও বি, এইচ, সি, এণ্টিবায়োটিক যেমন পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন এবং ক্লোরাম ফেনিকল স্থান পেয়েছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে ভেষজ বিষয়ক গবেষণার প্রচুর আদর হয়েছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ এবং কাউন্সিল অব সায়ান্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের তত্ত্বাবধানে দেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে কয়েকটি সালফনামাইড জাতীয় ঔষধ, কুষ্ঠরোগের জন্য সালফোন, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার ঔষধ এবং এণ্টিবায়োটিক্‌স সম্বন্ধীয় গবেষণা কার্য্য হচ্ছে। কাউন্সিল অব সায়ান্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের তত্ত্বাবধানে (১) দেশীয় গাছগাছড়া, (২) রাসায়নিক সংশ্লেষণ দ্বারা প্রস্তুত ম্যালেরিয়ার ঔষধ (৩) এণ্টিবায়োটিক ও কীটঘ্ন ঔষধসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত গবেষণা মন্দিরে সালফাড্রাগস রাওলফিয়া প্রভৃতি গাছড়া জাত ঔষধ, কুষ্ঠরোগের সালফোন জাতীয় ঔষধ, লিভার একষ্ট্রাক্ট এবং এণ্টিবায়োটিক ঔষধ প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং এই সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। বিলাত থেকে আমদানী রাসায়নিক হতে কয়েকটি ঔষধ তৈরী হচ্ছে এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এই শিল্পের উন্নতির অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

দেশ স্বাধীন হবার পর ভেষজশিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশে প্রচুর সাফল্য দেখা গেছে। ভেষজ এবং রসায়ন শিল্পে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এই শিল্পের অগ্রগতি অনেকটা ব্যাহত করেছে। ভারত সরকারের আমদানী নীতির পরিবর্তন করে ক্রমশঃ দেশীয় শিল্পের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিলে এ শিল্পের আরও উন্নতি হবে। আশা করি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূরীভূত হবে এবং ভারতবর্ষ ভেষজ শিল্পে সম্পূর্ণ স্বাবলম্ব হতে পারবে।

স্বীকৃতি

আষাঢ় (১৩৬৩) 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "মানুষ" শীর্ষক নাটিকাটি ১৩৬১ সালের শারদীয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিত "বালক সাধু" নামে নিবন্ধের ছায়াবলম্বনে রচিত।
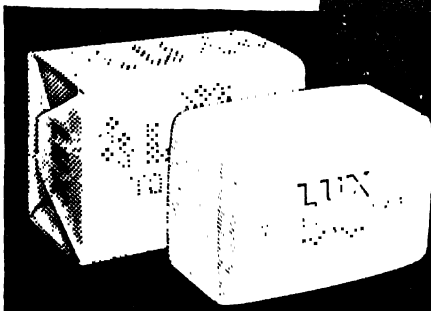
"বুদ্ধ প্রসঙ্গ"

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

জ্ঞান তপস্বী স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ঘোষ রচিত, প্রবাসী পত্রিকার ভাদ্র, ১৩৩০, ভাদ্র, ১৩৩১ ও কার্ত্তিক ১৩৩৪ সংখ্যাতে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে* সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে গৌতম বুদ্ধের আত্মচরিত, সাধনা ও সিদ্ধি এবং নির্ব্বাণতত্ত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা আছে।

প্রথমেই গৌতমের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে। ইহা গতানুগতিক জীবনী নহে। ত্রিপিটক গ্রন্থে প্রাপ্ত বুদ্ধের নিজস্ব উক্তিসমূহ সংগ্রহ করিয়া, লেখক বিচারপূর্ব্বক ঐতিহাসিক প্রণালীতে জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:

১। গৌতম বাল্যকালে ভোগ-বিলাসের মধ্যে পালিত হইয়াছিলেন।

২। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু, এই তিনটি বিষয়ে চিন্তা করিয়া (দৃশ্য দর্শন করিয়া নহে) তিনি সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন।

৩। তিনি অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করেন নাই। যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন মাতাপিতা অশ্রুমুখ হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

৪। গৌতম গৃহেই কেশশ্মশ্রু ছেদন করাইয়া এবং গৃহেই কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গৌতম দুই জন যোগীর শিষ্য হন। তাঁহাদের একজন আলাড়-কালাস এবং অন্যজন রামপুত্র উদ্রক।

গৌতমবুদ্ধ যোগের নবম স্তর (বা অন্তিম স্তর) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি ইহার সপ্তম স্তর পর্য্যন্ত আলাড়-কালাসের নিকট এবং অষ্টম স্তর উদ্রকের নিকট শিক্ষা করেন।

আলাড়মুনি ঐ সপ্তম স্তরকে এবং উদ্রকমুনি অষ্টম স্তরকেই যোগের শেষ স্তর মনে করিতেন। কিন্তু গৌতম উহাকে অসম্পূর্ণ জানিয়া গভীর তপস্যার দ্বারা সর্ব্বশেষে নবম স্তর প্রাপ্ত হন। ঐ স্তরকে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে "সংজ্ঞাবেদিত নিরোধ" (Complete suppression of consciousness and sensation) বলা হইয়াছে।

আলাড় ও উদ্রকের নিকট গৌতমের যোগশিক্ষার এই ইতিহাস প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। মহেশচন্দ্রও ইহা তাঁহার গৌতম-জীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উদ্রকের আশ্রম ত্যাগ করিয়া উরুবেলা গ্রামে গৌতম যখন তাঁহার সর্ব্বশেষে তপস্যা সুরু করেন এখন অপূর্ব্ব মনঃসমীক্ষণের দ্বারা কি ভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে ভয়কে পরাভব এবং কাম, ব্যাপাদ (=অপরের অশুভ কামনা, বিদ্বেষ-বুদ্ধি) এবং হিংসাকে দূর করিলেন, তাহার অতি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা মহেশচন্দ্র তাঁহার এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরিত্র গঠনে এবং মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে আগ্রহশীল ব্যক্তি ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

গৌতমের ধ্যানপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গৌতম স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি দেহকে স্থির করিয়া, বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, এক দিবারাত্রি, দুই দিবারাত্রি, তিন দিবারাত্রি, চারি দিবরাত্রি, পাঁচ দিবারাত্রি, ছয় দিবারাত্রি এবং সাত দিবারাত্রি…বাস করিতে পারি।"

"আমার যখনই ইচ্ছা হইত, তখনই আমি…প্রথম ধ্যানে… দ্বিতীয় ধ্যানে, তৃতীয় ধ্যানে,…চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইয়া বিহার করিতাম।"

গৌতম যখন সমাধিস্থ হইতেন তখন বাহিরে প্রলয়কাণ্ড ঘটিলেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইত না। ইহার দৃষ্টান্তও মহেশচন্দ্রের গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে:

বুদ্ধ যেখানে ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন সেখানে দারুণ ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। ঐ বজ্রপাতে তাঁহার সন্নিকটে দুইজন কৃষক ও চারিটি বলীবর্দ্ধ বিনষ্ট হয়। তথাপি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয় নাই।

ইহার পর বুদ্ধ-প্রচারিত আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধ-প্রচারিত এই মার্গকে বুদ্ধ স্বয়ং প্রাচীনমার্গ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা তিনি নির্মাণ করেন নাই, আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীনকালের সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ এই মার্গে বিচরণ করিতেন। ত্রিপিটকে, বুদ্ধ-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে এই কথা বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। মহেশচন্দ্রও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বুদ্ধের সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহারের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া গ্রন্থকার সর্ব্বশেষে নির্ব্বাণতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে নির্ব্বাণের প্রতিশব্দ, লক্ষণ ও বর্ণনা এবং উপনিষদ হইতে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অনুরূপ বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করিয়া লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ব্রহ্ম এবং নির্ব্বাণ এক।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, নির্ব্বাণ ও ব্রহ্মকে এক প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে সমুদয় উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,

---

* বুদ্ধ প্রসঙ্গ। মহেশচন্দ্র ঘোষ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, সংখ্যা ১১৯। বিশ্বভারতী, ৬৷৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭। মূল্য আট আনা।

নির্ম্মলা শিক্ষা পেলো...
মালতীর ছোট্ট ছেলে মুন্না সবসময় নিচের বাসাতে খ্যালনা ফেলতো·
মুন্না! দুষ্টু ছেলে! আবার তুমি খেলনা ফেলেছো!
নির্ম্মলার বাসা
না এখন না - ছেলেটাকে ভালমত শিক্ষা দিতে হবে...
মুন্নার খ্যালনাটা মালতীকে ফিরিয়ে দাওনা কেন?
পরে
দেখ! এবার ফেলেছে একটা তোয়ালে!
(ভাবলো) কিন্তু কি পরিষ্কার করে কাচা! সত্যিই আশ্চর্য্য...
মালতির বাসা
নির্ম্মলা! তুমি বুঝি মুন্নার খ্যালনা নিয়ে এসেছো...!
হ্যাঁ· আর তোমার তোয়ালেটাও নিয়ে এসেছি - আচ্ছা আমায় একটা কথা বলবে-
বলতো, তোয়ালেটা এত ধবধবে সাদা কি করে করলে? আমি তো কখনও তোমার বাড়ী থেকে কাপড় আছড়াবার আওয়াজ পাইনি।
কিন্তু আমি তো আছড়াইনা, - আমি যে সানলাইট সাবান ব্যবহার করি।
আছড়ালে কাপড়ের বুনুনি ফেঁসে যায় আর সেইজন্যে ছেঁড়েও তাড়াতাড়ি।
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে।
সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনা বিনা আছড়েই পরিষ্কার করে কাচে - আর সেইজন্যে কাপড় টেঁকেও বেশী দিন।
সত্যিই! সানলাইট সাবানে বিনা আছড়েই সাদা আর ঝকঝকে পরিষ্কার হয়-কাপড় টেঁকেও বেশী দিন আর আমার খরচও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
S. 284-X52 BG

তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধ ত্রিপিটকাদি প্রাচীন গ্রন্থের পরবর্ত্তী। তাহাদের কেহ কেহ যে বৌদ্ধ প্রভাবপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া মাণ্ডূক্য (মাণ্ডুক্য নয়) উপনিষদের (গৌড়-পাদের আগমশাস্ত্র বা মাণ্ডূক্যকারিকাও দ্রষ্টব্য) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তাহা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে,প্রাচীন ভারতের সাধনার ধারা বিচিত্র হইলেও তাহার মধ্যে ঐক্য ছিল। সকলেরই লক্ষ্য ছিল, মুক্তি, মোক্ষ বা নির্ব্বাণ। এই শব্দগুলি পৃথক হইলেও উহাদের ভাব এক। শুধু তাহাই নহে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধমতের বহু সাধক ঐ তিনটি শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন।

বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ বা বৈদিকদের মোক্ষ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি যে একই অবস্থা তাহা মহেশচন্দ্র উদ্ধৃত নির্ব্বাণের এই বর্ণনা হইতেই বোঝা যাইবে:

রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, এবং মোহক্ষয় ইহাকেই নির্ব্বাণ বলা হয়। সংযুক্ত, ৪।২৫১। ঐ ৪।২৬১। ঐ ৪।৩৭১।

নির্ব্বাণ অমৃত। মজ্‌ঝিম, ১।১৬৭।

ধম্মপদে ও বহু স্থানে (নির্ব্বাণ অর্থে) অমৃত ও অমৃতপদের কথা আছে। ধম্মপদ, ১১৪, ৩৭৪ শ্লোক।

নির্ব্বাণ অজর, অমর, অশোক। থেরিগাথা।

নির্ব্বাণ অভয়, অকুতোভয়। সংযুক্ত, ১।১৯২ ইতিবৃত্তক; ১১২।

নির্ব্বাণ শিব। সুত্তনিপাত, ৪৭৮।

নির্ব্বাণ পরমসুখ। ধম্মপদ ২০৩, ২০৪ শ্লোক। মজ্‌ঝিম, ১।৫০৮—৫১০। অঙ্গুত্তর ৪।৪১৪।

অনুরূপ আরও বহু বাক্য মহেশচন্দ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও, অশ্বঘোষ প্রভৃতি দার্শনিকগণ নির্ব্বাণের ও পরমার্থের যে সব উপমা ও বিশেষণ দিয়াছেন, তাহা হইতেও বোঝা যাইবে যে, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের পরমতত্ত্ব, পরমার্থ, নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে। যথা—

"দগ্ধ-ইন্ধন-অনলবৎ।" বুদ্ধ-চরিত, চতুর্দ্দশসর্গ।

"শান্ত, অজর, অমর, পরমপদ।" ঐ দ্বাদশসর্গ। ১০৬ শ্লোক।

"ধ্রুবপদ।" ঐ চতুর্দ্দশসর্গ।

শূন্যবাদী নাগার্জ্জুন ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় পরমার্থের বর্ণনা দিয়াছেন:

"অনিরোধ, অনুৎপাদ, অনুচ্ছেদ, অশাশ্বত।" মূলমধ্যমক-কারিকা, ১।১।

মহাভারতও বলিতেছেন, "এরূপ অবস্থায় শাশ্বতই বা কি উচ্ছেদই বা কি?" শান্তিপর্ব্ব, ২১৯.৪১

"পরমার্থ সদ্ নহে অসদ্ নহে, সুখ নহে, দুঃখ নহে।" বোধি-চর্য্যাবতারপঞ্জিকা, ৯ম পরিচ্ছেদ।

"অনাদি ব্রহ্মকে সদ্‌ও বলা যায় না অসদ্‌ও বলা যায় না।" বেদান্তদর্শন, ৩।২।১৭।

"যাঁহার লক্ষণ নাই, তাঁহাকে অস্তি-নাস্তি দুই-ই বলা যায়।" মহাভারত, শান্তি, ২১৮।২৬।

"ব্রহ্ম সুখও নহে, দুঃখও নহে।" মহা, শান্তি, ২৫০।২২।

"পরমার্থ স্বভাব হইতেছে—সর্ব্বদ্রষ্টব্যপ্রশমিত, শিবলক্ষণযুত, সর্ব্বকল্পনাজাল বিরহিত, জ্ঞানজ্ঞেয়নিবৃত্তস্বভাবসমন্বিত, শিব। পরমার্থ অজর, অমর, অপ্রপঞ্চ, শূন্যতাস্বভাববান্ নির্ব্বাণ। মন্দবুদ্ধি এবং অস্তিত্বনাস্তিত্বাদি মতবাদে অভিনিবিষ্ট, আসক্ত বা আবদ্ধ বলিয়া অজ্ঞজন ইহাকে দেখিতে পায় না।" মূলমধ্যমককারিকাভাষ্য, ৫।৮।

"এই পরমতত্ত্বকে কোনরূপেই বুদ্ধির গোচরে আনা যায় না। কেমনে তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিবে? সমস্ত উপাধি বর্জ্জিত হওয়ায় কিরূপে কোন কল্পনায় তাহাকে দেখিবে? কল্পনার ও অতীত হওয়ায় তাহা শব্দের বিষয়ীভূত নহে। শব্দ হইতেছে কল্পনা বা ভাবের প্রকাশক, যাহা কল্পনা বা ভাবের অতীত, তাহা কেমন করিয়া শব্দের বিষয় হইবে? সেই অনভিলাষ্য পরমার্থতত্ত্বকে কিভাবে প্রতিপাদন করিবে।

"যদি পরমার্থতত্ত্ব কায়-বাঙমনের বিষয়ীভূত হইত, তাহা হইলে তাহাকে পরমার্থতত্ত্ব সংজ্ঞা দেওয়া যাইত না।" বোধিচর্য্যাবতার-পঞ্জিকা, ৯ম, পরিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য ইহা উপনিষদেরই পুনরুক্তি।

ব্রাহ্মণ বাস্কলী যখন বাহ্বকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে এবং বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রী যখন বিমলকীর্ত্তিকে অদ্বয় (পরমার্থ) সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন উভয়েই নিরবতা বা নিরুত্তরতার দ্বারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া-ছিলেন। বেদান্তদর্শন, ৩।২।১৭। বিমলকীর্ত্তি নির্দ্দেশ, Eastern Buddhist, vol. IV. 1927, pp. 177-83 দ্রষ্টব্য।

বৈদিক ও বৌদ্ধ, কে কাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা, এই সমালোচনাকে দীর্ঘ করিয়া তুলিবে। ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয় সাধনার এই উভয় ধারাই এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

সুধী মহেশচন্দ্রের এই মূল্যবান প্রবন্ধ তিনটি পুস্তকাকারে শুভ পরিনির্ব্বাণ জয়ন্তী দিবসে প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগ বাংলা দেশের বিদ্বৎ সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

সাহিত্য-প্রকাশিকা—প্রথম খণ্ড। সম্পাদক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য দশ টাকা।

বিশ্বভারতী গবেষণাবিভাগে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত মূল্যবান্ গবেষণা করিয়া থাকেন বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ নানা পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থমালার মারফত তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী অ্যানালস্'-এর অনুকরণে সম্প্রতি তাঁহারা বাংলায় 'সাহিত্য-প্রকাশিকা' নামে এক নূতন গ্রন্থমালা প্রকাশের সূচনা করিয়াছেন। ইহাতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক গবেষণার ফল প্রকাশিত হইবে। ইহার প্রথম খণ্ডে আছে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের 'কবি দৌলত কাজির সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার নাথ সাহিত্য'। ঘোষাল মহাশয় মধ্যযুগের মুসলমানী বাংলা-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—'মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ'—'সতী ময়না'র দৌলত কাজি লিখিত অংশের একটি শোভন সংস্করণ এই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। হামিদী প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্করণ ও পরলোকগত মৌলভি আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি পুথি আলোচ্য সংস্করণের অবলম্বন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে কোথাও নাই। প্রাচীন কোন গ্রন্থ প্রকাশের সময় উহার উপলভ্যমান হস্তলিখিত পুথি ও উহার কোন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার যে প্রথা পণ্ডিতসমাজে চলিয়া আসিতেছে তাহার অনুসরণ বর্তমান সংস্করণে করা হয় নাই। তাই ইহাতে অন্য পুথির কথা দূরে থাকুক আবদুল করিম সাহেবের পুথিখানিরও কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই—ইহার বা হামিদী প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্করণের কোন দোষগুণের আলোচনাও করা হয় নাই। আলোচ্য সংস্করণের কোন বৈশিষ্ট্যের কথাও ইহাতে বলা হয় নাই। গ্রন্থখান সাধারণতঃ সতী ময়নামতী বা লোর চন্দ্রানী নামে পরিচিত—বর্তমান সংস্করণে কোন কারণ নির্দেশ না করিয়াই উহাকে 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কাহিনীতে ময়নামতী, রাজা লোর ও চন্দ্রানী সকলের কথাই আছে সত্য, তবে নামকরণে সকল প্রধান চরিত্রেরও উল্লেখ করা হয় না। গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকায় গ্রন্থসম্পাদক মহাশয় অনেক মূল্যবান বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছেন—যথা গ্রন্থকারের পরিচয়, গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইহার উপর বিভিন্ন প্রাচীন কবিদের প্রভাবের বিবরণ ও ইহার ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। গ্রন্থমধ্যে অনেক নূতন শব্দ ও বিচিত্র প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কতকগুলি 'শব্দসূচী'তে সংগৃহীত ও সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সূচীতে এই জাতীয় সমস্ত শব্দেরই সঙ্কলন ও বিস্তৃততর আলোচনা বাঞ্ছনীয়। ভূমিকায় উদ্ধৃত অংশগুলি সম্পর্কে বর্তমান সংস্করণের স্থলে হামিদী প্রেস প্রকাশিত সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রদত্ত হওয়ায় বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়।

'বাংলার নাথ-সাহিত্য' একটি সুলিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধ। ইহাতে এই সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে 'এ আলোচনা তত্ত্বপূর্ণ বা তথ্যপূর্ণ নয়, সাহিত্যিক সমালোচনা'। এই প্রসঙ্গে গোরক্ষনাথ-মনীনাথের কাহিনী ও গোপীচাঁদের কাহিনীর বিভিন্ন অংশের এবং বিভিন্ন লেখকের রচনার বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের মধ্যে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের যে নিদর্শন রহিয়াছে সেগুলির দিকে সাহিত্যিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সমস্ত আলোচনার শেষে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নাথ সম্প্রদায়ের 'সাহিত্যে প্রাণ আছে, লাবণ্য আছে, সুরভি আছে, স্বাদ আছে, সেই সঙ্গে আছে একটি স্বাতন্ত্র্য। এর মধ্যে যে পরিমাণ কাব্যের বীজাণু আছে সমালোচনার অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে প্রত্যক্ষগোচর করে তুললে এর কুলীন সাহিত্যের সমাজে পাংক্তেয় হবার দাবী অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে।' এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অপরাপর বিভাগ আলোচনা করিলে তাহাদের মধ্যেও কিছু কিছু সৌন্দর্যের নিদর্শন মিলিতে পারে। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মুখ্যতঃ সাধারণ লোকের চিত্তবিনোদনের জন্য রচিত এই সাহিত্য বর্তমান যুগের শিক্ষিত পাঠকের রস-পিপাসা তেমন ভাবে মিটাইতে পারে না। তথাপি প্রাচীন সাহিত্য যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের কর্তব্য—এই সাহিত্যের মধ্যে যে সমস্ত সুন্দর জিনিষ পাওয়া যায় সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করা এবং যথোচিত ভাবে সাজাইয়া-গুছাইয়া সেগুলিকে গুণীদের দরবারে উপস্থিত করা। শ্রীযুক্ত সুখময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কর্তব্য সুন্দররূপে পালন করিয়া সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পরিক্রমা—শ্রীতুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্ট এণ্ড লেটারস্ পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। বোম্বাই হইতে আওরঙ্গাবাদ-দৌলতাবাদ তথা হইতে অজন্তা-ইলোরা—পরিক্রমার পথ মাত্র এইটুকু। এই সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে ভারত-তীর্থের অখণ্ড রূপটিকে ধরিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন লেখক। অজন্তা-ইলোরা বিশ্ব-সুধীজনের শিল্প-তীর্থ। শিল্পী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, পণ্ডিত, বস্তুনীতিবিদ্ প্রভৃতি নানা গুণীজন এর শিল্প-সৃষ্টিকে নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির মান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকও সেই চেষ্টা করিয়াছেন—একটু পৃথক ভাবে। শিল্প-বস্তুটিকে তদ্গত চিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া অনেকের মত তাহার এক-একটি অংশ লইয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন নাই লেখক, পটভূমি সমেত বস্তুর সমগ্র সত্তাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। রাষ্ট্ররূপের বিবর্তনের মধ্যে শিল্পীরা কোন্ যুগে কি ভাবে প্রথম সৃষ্টির কাজটি আরম্ভ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইতিহাসের ধারা-বিবরণী সাধারণতঃ নীরস হইয়া থাকে। কিন্তু এই বই-খানিতে বৌদ্ধযুগ হইতে মুসলিম যুগ, মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুদয় ও পতন কাহিনী, নিজামশাহী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সহিত কিংবদন্তী কাহিনী সংযুক্ত হওয়ায় বক্তব্যটি আগাগোড়া সরস হইয়াছে। ইহার সঙ্গে আছে বিদ্বজ্জনোচিত সময়োপযোগী মন্তব্য। সব মিলিয়া ভ্রমণ-কাহিনীটি উপাদেয় হইয়াছে। সবচেয়ে প্রশংসার কথা—শিল্প বা প্রকৃতি রূপমুগ্ধ মন কোথাও ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া বিষয়বস্তুকে আচ্ছন্ন করে নাই। পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে ভাষা, লেখাতেও মুন্সিয়ানার পরিচয় যথেষ্ট। লেখক ভ্রমণ করিয়াছেন খোলা চোখে, দু'পাশের দৃশ্য ও বস্তুকে গ্রহণ করিয়াছেন অভি-নিবিষ্টচিত্তে। শিল্প-শৈলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় অবশ্য দেন নাই, কিন্তু প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি-তৃষ্ণার পরিমাণটিকে যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও পাঠককে জানাইয়া দিয়াছেন। এক কথায়, পরিক্রমার পথটি ইতিহাসের দূরবর্তী কালে বিস্তৃত হইলেও সুধী পাঠক বিনা ক্লেশে লেখকের অনুবর্তী হইতে পারিবেন।

ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি নিঃসন্দেহে বাংলা-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন।

শ্রীরা৽পদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীগুণময় মান্না। বেঙ্গল পাবলিশার্স। দাম সাড়ে চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মার্ক্সপন্থী শ্রীগুণময় মান্না সমাজশক্তির সংঘর্ষের পটভূমিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন তাহা অন্তর্দৃষ্টির স্বচ্ছতার অভাবে সার্থক হইয়া উঠে নাই। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যকে মার্ক্সীয় জাঁতাকলে ফেলিয়া কোনরকমে একটা কাজ-চলা গোছ ব্যাখ্যা দিতে হইলেও যে পরিমাণ অধ্যয়ন ও মননসাধন করিতে হয় তাহার অভাব পুস্তকখানিতে লক্ষ্য করা গিয়াছে। ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার স্বলিখিত ভূমিকায় পুস্তকের এই দৃষ্টিভঙ্গীগত ত্রুটিবিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থখানির সর্বত্রই এই ধরনের অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যাজাত অপূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছি। স্থানে স্থানে ন্যায়শাস্ত্রগত হেত্বাভাস দোষও ঘটিয়াছে। যিনি মার্ক্সবাদের দ্বন্দ্ব-নীতিকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার-প্রয়াসী হইবেন তাঁহার এই ধরনের বিচ্যুতি নিন্দনীয়। একটি উদাহরণ দিই। গুণময়বাবু লিখিতেছেন: 'স্বদেশী আন্দোলনের দুইটি দিক, একদিকে নৈরাশ্য ও তজ্জনিত রুক্ষ সংগ্রামী মনোভাব, অন্যদিকে আন্দোলনের উচ্চ আদর্শ, যাহার মধ্যে এই আন্দোলনের বাঞ্ছাপূর্তি ও উল্লাস নিহিত আছে।' (পৃঃ ৫৮) মানুষের আদর্শ হইল সাময়িকভাবে অলব্ধ বস্তু। এই আদর্শ মানব-মনের অভাববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শ ও না-পাওয়ার বেদনা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। যে মুহূর্তে আদর্শ বাস্তবে পরিণত হয় তখন সে আর আদর্শ থাকে না। আদর্শের মধ্যে না-পাওয়ার বেদনা আছে; বীক্ষণশক্তি হয়ত সে বেদনায় সুপ্ত আনন্দের সন্ধান পায়। তবু সে আনন্দ বাঞ্ছাপূর্তির 'উল্লাস' নয়। লেখক এই সহজ সত্যটিকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

পুস্তকখানির ভাষা মোটামুটি ভাল। রচনাশৈলী সাবলীল। ছাপার ভুল বড় একটা চোখে পড়িল না। মুদ্রণ পারিপাট্য ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

ডাল্‌ডা
আমার
পক্ষে
ভালো
DALDA
ডালডা
ডাল্‌ডা
মার্কা
বনস্পতি

অন্তরাল—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা। নবযুগ প্রকাশনী। ১-সি, সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা-১৭। মূল্য তিন টাকা।

উপন্যাস। কবি-সাহিত্যিক সাহা মহাশয়ের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। সমালোচ্য পুস্তকখানিতে জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের মনের উপর কি ভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাহাই তিনি নায়ক অজয়, নায়িকা অসীমা ও রেবার চরিত্রের মাধ্যমে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অসীমার সহিত অজয়ের বিবাহ ঠিক ছিল কিন্তু একটা পারিবারিক গোলযোগে তাহা স্থগিত থাকে। অসীমা কিন্তু অজয়ের পথ চাহিয়া দিন গোনে। অজয় এই গোলযোগের জন্য অন্যত্র চলিয়া যায়। অসীমার মায়ের আহ্বানে একসময় অজয় ফিরিয়া আসিলেও অসীমাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে। কারণ অজয় তখন রেবাকে কেন্দ্র করিয়া এক স্বপ্ন-সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে। অসীমা এত খবর রাখিত না বলিয়াই অজয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং একটা মটোর দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। অজয় এবং রেবার মধ্যের সম্বন্ধ তাহার কাছেও গোপন রহিল না। তার পরে নানা ঘটনার সাহায্যে অজয় ও রেবার মধ্যে একটা সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটিল—এইখান হইতেই নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়া জটিল হইয়া উঠিল প্রত্যেকটি পাত্র-পাত্রীর জীবন। আবর্ত রচনা করিয়া চলিল তাদের চলার পথে। এবং শেষ পরিণতি ঘটিল অসীমার বিলাত যাত্রার পর অজয়ের মৃত্যু-চিতা রচনা করিয়া।

স্থানে স্থানে উপন্যাসখানি কিছুটা দুর্ব্বল মনে হইয়াছে, রেবার চরিত্রটি অনবদ্য হইয়া উঠিতে পারিত যদি তার বিগত জীবনের অতি বাস্তব ঘটনাগুলি অতটা নগ্নভাবে দেখান না হইত। অজয় বেশী ভাবপ্রবণ। অসীমা অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পার্শ্ব চরিত্রগুলি চমৎকার ফুটিয়াছে। প্রচ্ছদপট ও ছাপা সুন্দর। ভাষা সহজ ও স্বচ্ছন্দ।

দক্ষিণাপথে—শ্রীমানদাচরণ সাহা। ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

ভ্রমণ-কাহিনী। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দর্শনীয় তীর্থস্থান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যায়। লেখক তাঁর দরদী চোখ দিয়া যাহা দেখিয়াছেন সুললিত ভাষায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শুধু মামুলী বর্ণনা-কাহিনী নয়। মাদ্রাজ ও তাহার আশেপাশের বহু অঞ্চলের উপর তিনি কিছুটা নূতন আলোকপাত করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন।

প্রতীক্ষা—শ্রীসমীরণ রুদ্র। রুদ্র এণ্ড কোং লিঃ। ৩২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

বড় গল্প। ব্যর্থ প্রয়াস।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ডাকের চিঠি—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪৫। দাম আড়াই টাকা।

গ্রন্থখানি লেখকের নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনে অদৃশ্য বন্ধুর উদ্দেশ্যে লিখিত উনত্রিশখানি পত্রের সমষ্টি। কতকগুলি পত্রে বাংলার যে অংশে তিনি ছিলেন সে অংশের, বিশেষতঃ বর্ষার চিত্রগুলি সুন্দর, স্নিগ্ধ ও কোমল। কয়েকখানি পত্রে স্থানীয় কয়েকটি চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা আছে যেগুলি লেখকের রস-সৃজনীশক্তির পরিচায়ক। গ্রন্থখানিকে উপন্যাস বা কতকগুলি গল্পের এক-সূত্রে গ্রন্থনের সমষ্টি বলা যায় না। এক নূতন পথ ধরেই রচনাটি সম্পূর্ণ হয়েছে। ভাষা সুমিষ্ট ও স্বচ্ছন্দগতি। রসিক পাঠকজনের কাছে যে গ্রন্থখানির সমাদর হবে এমন আশা করা যায়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই
লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
L. 261-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

দৃষ্টফল চিকিৎসা—প্রাণাচার্য্য কবিরাজ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রায় প্রত্যেক রোগের আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। শুধু শাস্ত্রীয় ঔষধ পাচন প্রলেপ তৈল প্রভৃতিই নয়, জনসাধারণের নিকট যাহা টোটকা বলিয়া পরিচিত গ্রন্থকার সেইসব ঔষধেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি একজন যশস্বী চিকিৎসক। আশা করি, এগুলি ব্যবহারের ফল তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ডাক্তারের পক্ষে যেমন ডাক্তারি হ্যাণ্ডবুক কবিরাজের পক্ষেও এই গ্রন্থখানি সেইরূপ প্রয়োজনীয়। শুধু তাঁহারা নন গৃহস্থমাত্রেরই ইহা প্রয়োজনীয়। বইখানা ঘরে থাকিলে গৃহিণীরা সময়ে অসময়ে সহজলভ্য পাতার রস, গাছের ছালের চূর্ণ প্রভৃতি সুলভ ঔষধের সাহায্যে ছোটোখাটো বহু রোগেরই চিকিৎসা করিতে পারিবেন। এরূপ একখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া কবিরাজ মহাশয় সমাজের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

পূষা—শ্রীতারক ঘোষ। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম এক টাকা।

এক ফালি ঘাস—শ্রীসুধীর সেন। আলোক-সংঘ। করিমগঞ্জ, আসাম। দাম এক টাকা।

কয়েদী—শ্রীসুধাংশুকিরণ ঘোষ। ধারিকা প্রেস এণ্ড পাব্লিকেশন। উত্তর-বাংলা, শিলিগুড়ি। দাম পাঁচসিকা।

বল্লরী—পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম অনুসন্ধান সমিতি। কাটোয়া, বর্দ্ধমান। দাম আড়াই টাকা।

সব কখানিই কবিতার বই। প্রথমখানির নামের প্রেরণা এসেছে উপনিষদ্ থেকে: "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপি হিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" প্রথম কবিতাতে ঐ শ্লোকেরই ছায়া পড়েছে। কিন্তু সব কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবের নয়। জীবনের সুখ দুঃখ প্রেম সৌন্দর্য্য কবির মনকে স্পর্শ করেছে, তারই অনুভূতিকে কবি সুন্দর রূপ দিয়েছেন। জগতের কত শোভা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল:

মনের এ আয়নায় ছবি হাসে, ফের মুছে যায়।
এ জীবন ভরে গেল মরে-যাওয়া মধুর মায়ায়।

সব কবিতাতেই একটি গভীর আন্তরিক সুর বেজেছে। রচনায় শৈথিল্যের নিদর্শন নেই।

'এক ফালি ঘাসে'ও খাঁটি কবি-মনের পরিচয় আছে। রচনা স্নিগ্ধ মধুর। কোন কোন কবিতায় বাংলার পূর্ব্বপ্রান্ত ও আসামের পাহাড় বন ঝরণার মনোরম ছবি উঁকি দিয়ে যায়। আবার কোথাও কোথাও রেলগাড়ি বা কারখানার দৃশ্য চোখে পড়ে। একদিকে—

"তবুও ছায়ারা আসে অরণ্যের কোল হতে নেমে,"
"মৌচাক রচি বনানীর ছায়—ঝাউ সরলের বন",

অন্যদিকে—

"টানেলের মুখে ঝড়ের আবেগে ছুটে অজগর ট্রেন",
"কেবলি ড্রিলিং মেশিনের গানে দেহে আনে উল্লাস।"

'কয়েদী'র অনেক কবিতা নজরুলের ব্যর্থ অনুকরণ। "আমি বিদ্রোহী বীরবর, আমি এ যুগের ভাস্বর" কিংবা "আমি জালিমের বুকে সমসের হানি মুর্দ্দারে করি কুশাসন"—এ যুগে সমাদর পাবে বলে মনে হয় না। "আমি নাচব, আমি নাচব" পদ্য লিখে ঘোষণা করা কি ভাল হয়েছে?

'বল্লরী'তে পুরোনো এবং নতুন মুসলমান কবিদের কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। সবগুলি ভাল বলতে পারি না, তবে মুসলমান কবিরাও বাংলা ভাষার সেবায় আনন্দ পেয়েছেন ও পাচ্ছেন এবং তাঁদের অনেকের দানে বঙ্গ-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, এ সত্য সঙ্কলনের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে।

বসন্তবাহার—শ্রীগোপাল ভৌমিক। গ্রন্থজগৎ। ৭-জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য দেড় টাকা।

নূতনত্বের আগ্রহে কোন কোন কবি-যশঃপ্রার্থী ভয় লাগিয়ে দেন। মনে হয়, কাব্য-জগৎ থেকে বুঝি বিদায় নিল রূপ, রং, সুর, তাই রঙিন মনের সন্ধান পেলে ভাল লাগে, আশ্বস্ত হই। গোপালবাবুর 'বসন্তবাহার' রং আর সুর নিয়েই এসেছে। কঠোর বাস্তব পরিবেশের মধ্যেও এনেছে রং আর সুর।

"চৌবাচ্চায় জল ঝরে রুজি রোজ সুরু হ'ল ফের।
* * *
কেটলিতে চায়ের জল, পেয়ালা পিরিচ শুনি বাজে"

তারই মধ্যে এক টুক্‌রো স্বপ্ন:

"বিদিশার রাজকন্যা, কি তোমার নাম ?"
বিনিদ্র মধ্যরাত্রে—"পৃথিবী ঘুমায়, রাজপথে শুনি টুংটাং রিকশার।"
কোনদিন মনে জাগে হারানো পূর্ববঙ্গের ছবি :
"বিজন গাঁয়ে কুটীরখানি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালা,
আকাশ জুড়ে দেখি শুধু হাজার তারার মালা।"
সে-দেশের পরিচিতা তরুণী আজ "লেডি টাইপিষ্ট ম্যাকেঞ্জি লায়ালে।"
'গুহায়িত' নাগরিক জীবনে কখনও মন বলে উঠেছে :
"শিলীভূত এ জীবনে চাই তবু সমুদ্রের ঝড়।"
কোথাও কোথাও লঘু চাপল্য বা অসতর্কতা কবির ভাব-সৌন্দর্য্যকে ঈষৎ ক্ষুন্ন করেছে।
"যৌবন-হিল্লোলে দুলে সে-দিন সিঁড়িতে
সময় দেখালো রামী দেহবল্লরীতে"—বড়ই চটুল।
"হনলুলু থেকে কামাচকাটকা" আর "প্রাণক্লোরোফিল"
কবিতায় শ্রুতিকটু। কোথাও কোথাও পংক্তিবিন্যাস ছন্দের অনুগামী হয় নি। মুদ্রণকালে এবিষয়ে দৃষ্টি রাখলে ভাল হ'ত।

মনের কোণে—শ্রীস্নেহলতা দেবী। চীন-ভারত সংস্কৃতি। ঠাকুর পুকুর, ২৪ পরগণা। দাম দুই টাকা।

লেখিকা বয়সে প্রবীণা, তাঁর কবিতাগুলিতেও প্রবীণোচিত গাম্ভীর্য্য আছে। অথচ তাঁর মনোভাব নিতান্ত 'সেকেলে' নয়। নতুন যুগের যে সকল মহৎ আদর্শ মানুষকে তার সামাজিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং সার্ব্বজনীন মিলনের পথ প্রশস্ত করেছে, তার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীলা। ছন্দ ও ভাষায় অভিনব প্রয়াসের প্রতি তাঁর লোভ নেই, মনের কথা অভ্যস্ত রীতিতে সহজ করে বলেই তিনি খুশী। তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত মন বেছে নিয়েছে পরিচিত ভাষার সরল সুগম পথ। 'সাহিত্যের এ কমল-বনে নাই বা হ'ল স্থান', তা নিয়ে কবির আক্ষেপ নেই।

'থাকুক না সে অনাদরে
দখিন বায়ে উতল তবু গন্ধবিহীন প্রাণ'।

'প্রথম অসহযোগ', 'নেতাজী-স্মরণে', 'ভারতভিক্ষা', 'ইলা মিত্র' প্রভৃতি কবিতায় কবির আদর্শপ্রবণ দেশপ্রেমিক হৃদয়ের পরিচয় পাই। কৃষক-কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করে জমিদার-ঘরের বধূ ইলা মিত্র পাকিস্থান কারাগারে বন্দিনী। মর্ম্মন্তুদ তাঁর লাঞ্ছনার কাহিনী। লেখিকা তাঁকে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। শেষ কবিতা 'চই চই'—হাঁসেদের কথা নিয়ে—বড়ই মনোজ্ঞ এবং সরস।

"প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক, চল রাজের মত বিশ্রাম করি।
না—না—না, এখন আর গোলমাল নয়।
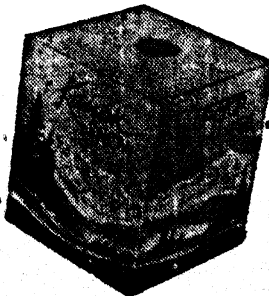
চুপ কর বাচ্চারা সব, আর কথা নয়।
এখন পাখার ভিতর ঠোঁট গুঁজরে নিয়ে
যার যার ঘুমের চেষ্টা দেখ দেখি।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছবিতে রামায়ণ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ, ৩২।এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৯। মূল্য ১।০।

লেখা ও ছবি দুই-ই খ্যাতনামা শিল্পী রচিত। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আগাগোড়া তিন-রঙা ছবির সাহায্যে বলা হইয়াছে। ছবির নীচে নীচে রামায়ণের সমগ্র ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, বড় বড় ঝকঝকে হরফে মুদ্রিত লেখাগুলি সহজেই চোখে পড়ে। ছবিগুলিতে সেকালের হুবহু চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রাসাদে, শহরে পোষাকে, পরিচ্ছদে, যানবাহনে, সব কিছুতেই অতীতকালের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের ছাপ। রামায়ণের গল্পে বাঁদর ও রাক্ষসের ভীষণ যুদ্ধ প্রভৃতি ছেলেরা বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে উপভোগ করিবে। ছবিগুলি অতি সুন্দর, নয়নরঞ্জন ও ভাবব্যঞ্জক। প্রকাশক ও শিল্পী উভয়ের কৃতিত্বই প্রশংসনীয়।

ওলোট্ পালোট—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। বোর্ড বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০।

কতকগুলি মজার কবিতা চিত্রে রূপায়িত করিয়া কিশোরদের জন্য রচিত হইয়াছে। কবিতা ও ছবিগুলি রঙীন কালিতে মুদ্রিত, ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত মলাট। ছবিগুলি যেমন মজাদার, কবিতাগুলিও তদ্রূপ। কবিতাগুলি দেশের ও পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচিত। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই 'ওলোট পালোট', ছাগল ও গরু হিংস্র হইয়া নিরীহ পথচারীকে শিং নাড়িয়া গুঁতাইয়া ফিরিতেছে, হিংস্র ব্যাঘ্র খাঁচা হইতে বাহির হইয়া মানুষের সহিত প্রেম করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, রামছাগলে 'ঘোড়ার ডিম' খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, 'মেছো মানুষ' জলবিহারী হইয়া মাছ ও কুমীরের সঙ্গে মিতালী করিতেছে, ইত্যাদি। 'পঁচিশ বছর পরে' ও 'আকাশকুসুম' বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অত্যাশ্চার্য্য আবিষ্কার ও প্রগতি চমৎকার ফুটিয়াছে। 'বিশ বছর পরে' কলের মানুষ পোষাক পরিয়া বোতাম টিপিয়া অফিস যাইবে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবে, কলের পুলিস, কলের দারোয়ান, কলের পেয়াদা সব কাজ করিবে, কলে অন্ধ মানুষ করিবে, ছেলে পড়াইবে, কারও কিছু ভাবনা থাকিবে না, সবই কলে করিবে। আকাশকুসুমের সন্ধানে মানুষ যদৃচ্ছ গ্রহ-নক্ষত্রে বিচরণ করিবে, আকাশ বাতাস ও জল হাওয়ার গতি ও প্রকৃতি গবেষণা করিয়া বেড়াইবে।

পুরু কাগজে সুমুদ্রিত বইখানি ছেলেরা আমোদের সহিত উপভোগ করিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শেষ শিক্ষা
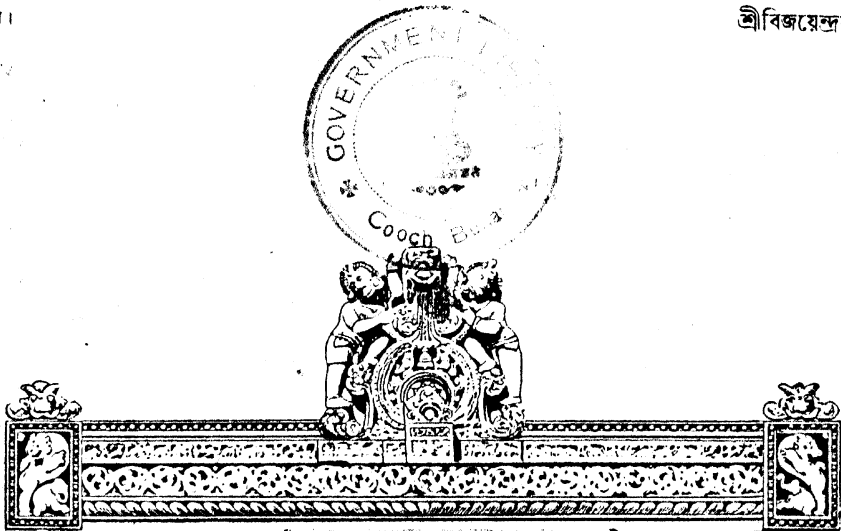
শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
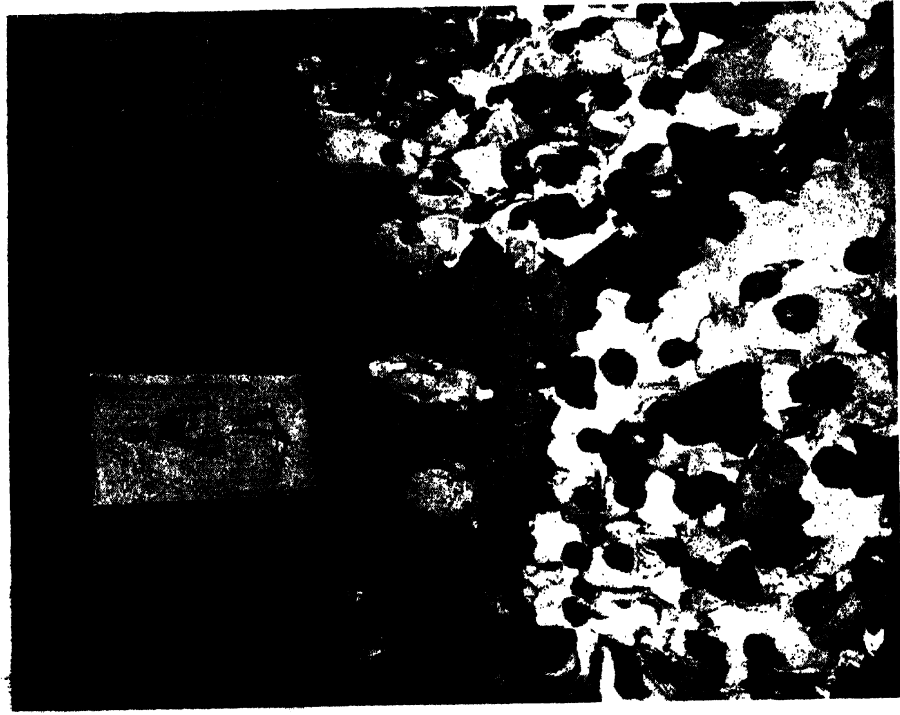
লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় ছাত্রদের সভায় বক্তৃতারত
পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু

বিদর্ভের "বিদরি ওয়ার্কস সেণ্টারে" রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
১ম খণ্ড
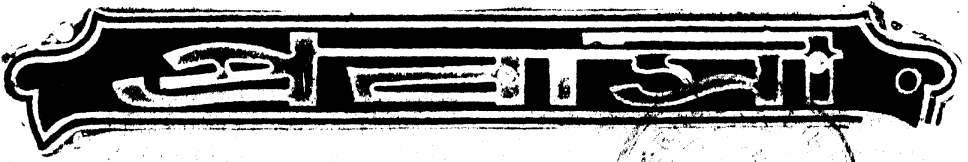
ভাদ্র, ১৩৬৩

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

এই বৎসরের স্বাধীনতা দিবস, ঘরে ও বাইরে, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা-পূর্ণ ছিল। বিগত মাসে আমাদের বাংলা দেশের প্রায় নিঃশেষিত ভাণ্ডার শূন্য হইতে শূন্যতর হইয়া গিয়াছে দুইটি রত্নের তিরোধানে। বস্তুতঃ পক্ষে এবার আনন্দের দিন বিষাদ কালিমাপূর্ণ ছিল। তাহা সত্ত্বেও নূতন আশা ও নূতন উদ্দীপনার আবাহন যথাযথ ভাবে করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং তাহা উচিতই ছিল।

বহির্জগতে সুয়েজ খাল লইয়া পাশ্চাত্য দেশের শক্তিবর্গ প্রায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া সামরিক অভিযানের ব্যবস্থা দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে করিতে থাকে। সেই সঙ্গে মার্কিন দেশকেও আহ্বান করা হয় মিশরের এই স্বাধীনতা প্রকাশে বাধা দেওয়ার জন্য। বোধ হয় এই আকস্মিক অধিকার লোপে ঐ দুই দেশের অধিকারীবর্গের "সাময়িক মস্তিষ্কবিকার" ঘটে।

মার্কিন দেশেরও বর্ত্তমান অধিকারীবর্গ একটু গোলমাল বাধাই-বার উপক্রম করেন। প্রকৃতপক্ষে সুয়েজ খাল লইয়া এই যে বিষম সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে ইহার প্রধান কারণও মার্কিন অধিকারীবর্গের কার্য্যকলাপ।

সোভিয়েট-বিরোধী শক্তিপুঞ্জের মিশর-বিদ্বেষ কিছুদিন যাবৎ ক্রমেই বাড়িতেছে। উহার কারণ মিশর আরব জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে ক্রমেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—যাহার ফলে উত্তর-আফ্রিকায় আরবদিগের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং এশিয়ায় বাগদাদ চুক্তির বিরোধে মিশরের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে। এবং মিশর দেশের বর্ত্তমান অধিনায়ক নাসের এই সকল বিষয়ে মুক্তভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করিয়া অনেকক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন কার্য্যক্রমে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করেন।

অতএব নাসেরের পতন ইঁহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কেননা নাসেরের নেতৃত্বে মিশর দ্রুতগতিতে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত ও শক্তিমান রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে। সুতরাং নাসেরকে অপদস্থ ও ব্যর্থপ্রয়াস না করিলে এই পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে বিশেষভাবে ব্যাহত হইতে বাধ্য। বিশেষতঃ যখন নাসের বিনা দ্বিধায় সোভিয়েট-গঠিত শক্তিবর্গের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় ব্যবস্থা সচল করিলেন তখন তাঁহাকে ধ্বংস করার চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ অধীর হইয়া উঠিলেন।

মিশরের সমস্ত ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নূতন আসওয়ান বাঁধের উপর নির্ভর করিতেছে এবং এক হিসাবে নাসেরের সমস্ত দেশ-প্রগতি পরিকল্পনাও ঐ ব্যবস্থা-সংযুক্ত। এই সমস্ত বিচার করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন দল স্থির করিলেন যে, ঐ বাঁধ নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যবস্থাই বানচাল করিতে হইবে। কি ভাবে সহসা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভাঙিয়া ইঙ্গ-মার্কিন দল ঐ বাঁধ নির্ম্মাণে অর্থসাহায্য অস্বীকার করেন তাহা এখন সর্ব্বজনবিদিত।

আমরা মার্কিন কাগজের অধিকাংশেই প্রথমে দেখি যে, মিশরের প্রতি এই রূঢ় ব্যবহারে একটা উল্লাসের ঢেউ বহিতেছে। এমন কি নিউইয়র্ক টাইমসের মত সংবাদপত্রও যাহা লেখে তাহার ভাবার্থ, "বড় আশায় আসিয়াছিল মিশরের রাষ্ট্রদূত অর্থ সাহায্যের জন্য, মিশর প্রতি-শ্রুতিও দেয় যে সোভিয়েট হইতে অর্থ সাহায্য সে লইবে না। মিঃ ডালেস তাহাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় মার্কিন দেশ অর্থসাহায্য করিতে প্রস্তুত নহে। মিশর রাষ্ট্রদূত হতভম্ব হইয়া ফিরিয়া যায়…। অন্য দিকে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষও কোন কারণ না দেখাইয়াই সাহায্য দানে অস্বীকার করেন। এইবার নাসেরের পতন অনিবার্য্য, কেননা আমরা জানি সোভিয়েটও আসওয়ান ব্যাপারে সাহায্যদানে প্রস্তুত নহে।"

এইরূপ উল্লাসধ্বনি ব্রিটিশ ও ফরাসী সংবাদপত্র জগতেও ধ্বনিত হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই আসিল সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সংবাদ। সেই আকস্মিক "বিনা মেঘে বজ্রপাতে" কি ভাবে পাশ্চাত্য দল স্তম্ভিত ও পরে ক্ষিপ্ত হয় তাহাও এখন জগৎবিদিত। কিন্তু এশিয়াখণ্ডে ও স্পেন, গ্রীস ইত্যাদি দেশে নাসেরের কার্য্যের পূর্ণ সমর্থন আছে। মার্কিন দেশ উহা লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ-আয়োজনে বাধা দেয়। তাহার পরের অবস্থা এখনও তরলই রহিয়াছে।

আমাদের দেশেও ঠিক ঐ ভাবেই অধিকার ও দায়িত্ব এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে বিকৃত বিচারের ফলে গুজরাট অঞ্চলে প্রবল অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। কোথায় যে তাহার শেষ তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই।

স্বাধীনতা দিবসে শ্রীনেহরুর ভাষণ

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পণ্ডিত নেহরু যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার চুম্বক আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। দেশে যেভাবে "গণআন্দোলন" চলিতেছে সে সম্পর্কে যে তাঁহার উদ্বেগের কারণ আছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। রাষ্ট্রধ্বংসকারী, ক্ষুদ্রচেতা ও স্বার্থ-সর্ব্বস্ব কতিপয় মুষ্টিমেয় দলের প্ররোচনায় এইরূপ বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন, না হইলে দেশের অপরিণতমস্তিষ্ক যুবক-যুবতীর অধিকাংশ উচ্ছন্নে যাইবে :

"১৫ই আগষ্ট—ভারতের নবম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য পূর্ব্বাহ্নে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লাল কেল্লার প্রাকার হইতে এক বিরাট জনসমষ্টির নিকট বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই আশা প্রকাশ করেন যে, আগামীকাল লণ্ডনে যে সম্মেলন আরম্ভ হইবে, উহাতে মিশরের মর্য্যাদা ও সার্ব্বভৌম অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুয়েজ খাল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান উদ্ভাবিত হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, সুয়েজ খাল সমস্যা গুরুতর সম্ভাবনাসমূহ দ্বারা পূর্ণ। তিনি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বল প্রদর্শন বা প্রয়োগ দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কোন স্থায়ী সমাধান উদ্ভাবনের পরিবর্ত্তে বিশ্বব্যাপী দাবানলের সৃষ্টি করিবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় দেশে হিংস্র ও উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ কার্য্যে রত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, সংসদে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, কোনও রকম ভীতিপ্রদর্শনেই তাহার পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

শ্রীনেহরু ঘৃণাবিজড়িত কণ্ঠে বলেন, যাঁহারা হিংসার পক্ষপাতী, তাহারা এই দেশের—বুদ্ধ ও গান্ধীর—মহান ঐতিহ্যের উত্তরসাধক নহে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ যে বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজও তাহা কোটি কোটি ভারতবাসীর মনে জাগরূক রহিয়াছে। ইহাই ভারতের মর্ম্মবাণী—প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শ। গান্ধীজীও ঐ একই আদর্শের দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন—নিরস্ত্রভাবে অহিংস উপায়ে শত্রুর সহিতও সংগ্রাম করা যায়।

বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদের লক্ষ্য করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, এই সকল লোক—বিপুল ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের পর লব্ধ আমাদের স্বাধীনতার মূল ও ভিত্তি ধ্বংস করিতে চাহে। হিংসা কি সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায়? অতীতে কি লোকে তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য কখনও হিংস পন্থা অবলম্বন করিয়াছে? আমার পক্ষে বড় দুঃখের বিষয় এই যে, এই দেশের যুবকগণ গান্ধীজী কর্ত্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত এবং তৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়াছে।"

ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা-মায়ের কৃতী সন্তান যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই একে একে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। দেশের এই চরম দুরবস্থার মধ্যে আমাদের এই পরম স্নেহশীল গুরুও লোকান্তর গমন করিলেন।

হরেন্দ্রকুমার বাস্তবিকই এ যুগের প্রায় সকল বাঙালীরই গুরুস্থানীয় ছিলেন। জ্ঞানে, গুণে, দানে তাঁহার যে কীর্ত্তি তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও মানবপ্রেম কিরূপ উচ্চ ছিল তাহার বর্ণনা অসম্ভব। তাঁহার উদার হৃদয়ে ছোট-বড়, দোষী গুণী, নির্ব্বোধ সুবোধ ইহাদের মধ্যে মানুষ হিসাবে কোনও পার্থক্যের স্থান ছিল না। বস্তুতঃই এই স্নেহশীল সদাপ্রসন্ন সজ্জন বাইবেলের Good Samaritan-এর প্রতীক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অতি শ্রদ্ধেয় গুরুর বিয়োগক্লেশ অনুভব করিতেছি :

"বাংলার অন্যতম খ্যাতনামা মনীষী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রাক্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি ১৮৭৭ সনের ৩রা অক্টোবর (১২৮৪ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন) কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ভারতীয় খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে এবং কলেজে তিনি বরাবরই কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৩ সনে কলিকাতার রিপণ কলেজিয়েট স্কুল হইতে তিনি প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন এবং ১৮৯৫ সনে রিপণ কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

"স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজের হাতখরচের পয়সা হইতে স্কট ও ডিকেন্সের গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া ঐগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। ইংরেজীর প্রতি এই আকর্ষণের জন্যই তিনি বি-এ ক্লাসে ইংরেজীতে অনার্স গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যখন বি-এ'র চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পড়াশুনায় বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই সময় তাঁহার মনও গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয় এবং তিনি বি-এতে অনার্স ছাড়িয়া দেন।

"বি-এতে অনার্স ছাড়িয়া দিলেও ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আকর্ষণের কোন লাঘব হয় নাই। ফলে তিনি ইংরেজীতেই এম-এ পড়িতে যান এবং ১৮৯৮ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

"এম-এ পাস করার পরে কয়েক মাস তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ঐ স্থানে কার্য্যকালেই তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ব্রজমোহন কলেজে কিছু দিন অধ্যাপনার পর সেখানকার প্রিন্সিপাল অন্যত্র গমন করায় তরুণ হরেন্দ্রকুমার কলেজের প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন।

"১৮৯৯ সনে তিনি সিটি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯১১ সনে ইংরেজী সাহিত্যে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ইংরেজীতে প্রথম পিএইচ-ডি।"

"১৯১১ সন হইতে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর লেকচারার ছিলেন। ড. মুখার্জ্জির বিদ্যাবত্তা ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকারের জন্য ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। স্যার আশুতোষের অভিপ্রায় অনুসারেই ড. মুখার্জ্জি ১৯১৬ সন হইতে ১৯১৮ সন অবধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময়ে ড. মুখার্জ্জি স্যার আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র ড শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জিরও প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯১৮ হইতে ১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইন্সপেক্টর পদে কার্য্য করেন। ১৯৩৭ সন হইতে ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯ সন পর্য্যন্ত তিনি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯৩৮ সন হইতে ১৯৪০ সন অবধি তিনি নিখিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ সন হইতে ১৯৩৯ সন পর্য্যন্ত তিনি নিখিল-ভারত খ্রীষ্টান পরিষদের সভাপতি পদে বৃত ছিলেন। তিনি ১৯৩৯ সন হইতে ১৯৪৪ সন পর্য্যন্ত নিখিল-ভারত খ্রীষ্টান পরিষদের জেনারেল অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ছিলেন।

"১৯৩৭ সন হইতে ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত তিনি অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সময়েই শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাহা রাজনীতির ক্ষেত্রে বিস্তারলাভ করে। পরিষদের বিতর্কে তাঁহার পারদর্শিতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় এবং তিনি পরিষদকক্ষে ভারতীয় খ্রীষ্টানদের এক অংশের মুখপাত্র, জাতীয়তার অন্যতম উদ্গাতা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। পরিষদে লীগ-কংগ্রেস বিতর্কে তিনি কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতেন এবং এই কারণে প্রদেশের অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে প্রদেশের বাহিরেও তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে।

"১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার পর ড. মুখার্জ্জি ভারতীয় গণপরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে ড. মুখার্জ্জিই ভারতীয় সংবিধান রচনার অধিকাংশ বিতর্ককালে গণ-পরিষদের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ১৯৫১ সন পর্য্যন্ত তিনি গণ-পরিষদের সহকারী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৭ সন হইতে ১৯৪৮ সন পর্য্যন্ত তিনি মাইনরিটি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৯৫১ সনের ২৫শে অক্টোবর ড. মুখার্জ্জি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন এবং ১লা নবেম্বর তারিখে উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

"জীবনে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থের প্রায় সবই তিনি দেশের ও দশের কল্যাণে দান করিয়া গিয়াছেন। দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৪ লক্ষ টাকার অধিক তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। ইহার মধ্যে ৯ লক্ষ টাকা তিনি রাজ্যপাল হওয়ার পূর্ব্বেই বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য একটি ট্রাষ্ট গঠনে উক্ত অর্থ প্রদত্ত হয়। ১৯৫২ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি আরও এক লক্ষ টাকা দান করেন। সর্ত্ত থাকে যে, উহার সুদ হইতে বাংলার সন্তানদিগকে প্রতি বৎসর সামরিক শিক্ষার জন্য দেরাদুন প্রিন্স অব ওয়েলস সামরিক শিক্ষালয়ে প্রেরণ করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে তিনি তাঁহার মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বেতন হইতে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে একটি ধনভাণ্ডারে ৫ হাজার টাকা করিয়া দান করিয়া আসিতেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্সিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য উক্ত ফাণ্ড ব্যবহৃত হইবে; তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামে উক্ত ফাণ্ডের নামকরণ করা হইবে।

"রাজ্যপাল রূপে ড. মুখার্জ্জির অপর এক কীর্ত্তি এই যে, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিরক্ষাকল্পে দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষা ধনভাণ্ডার খোলেন এবং ঐ ভাণ্ডারে ৫ লক্ষাধিক অর্থ সংগ্রহ করেন। উক্ত সংগৃহীত অর্থে দার্জ্জিলিং-এর 'ষ্টেপ এসাইড'কে (এখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) কেন্দ্র করিয়া 'দেশবন্ধু স্মৃতি চেষ্ট ক্লিনিক' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আরোগ্যের পর যক্ষ্মারোগীদের বসবাসের জন্য একটি যক্ষ্মানিবাস নির্ম্মাণের নিমিত্তও তিনি যক্ষ্মা-আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ তহবিল গঠন করেন এবং এই জন্যও তিনি অর্থসংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন।"

সমবায় প্রথার উন্নয়ন পরিকল্পনা

সমবায় প্রথা সম্বন্ধে সম্প্রতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে পরিসংখ্যান তালিকা প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫৫ সনে ভারতবর্ষে মোট ২১৯,২৯৮টি সমবায় সংস্থা ছিল। এই সমিতিগুলির মোট সভ্যসংখ্যা ১·৬০ কোটি এবং তাহাদের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৯০ কোটি। মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ সমবায় প্রথার আওতায় পড়ে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমবায় প্রথার বিস্তৃতি সমান নয়; ক শ্রেণীর প্রদেশগুলিতে ইহা অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিষ্ণু, এবং গ শ্রেণীর প্রদেশগুলিতে সমবায়ের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে।

ভারতবর্ষের সমবায় প্রথার একটি প্রধান দোষ কৃষিঋণ সমিতিগুলির আধিক্য। মোট ২,১৯,২৯৮টি সমিতির মধ্যে কৃষিঋণ সমিতিগুলির সংখ্যা ১,৪৩,৩২০ অর্থাৎ ৭৮·৮ শতাংশ। ইহার ফলে অন্যান্য প্রকার সমবায় সংস্থাগুলি উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কৃষিঋণ সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা অত্যল্প হওয়ার ফলে এইগুলি লাভ রাখিতে পারে না, ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অল্প সভ্যসংখ্যা, স্বল্পায়তন কার্য্যকরী এলাকা, অল্প মূলধন এবং অতিরিক্ত ঋণগ্রহণ এই সমিতিগুলির দুর্ব্বলতার কারণ। সেই কারণে সর্ব্বভারতীয় কৃষিঋণ অনুসন্ধান সমিতি অনুমোদন করিয়াছেন যে, কৃষিঋণ সমিতির কার্য্যকরী এলাকা বিস্তৃত করা অতি অবশ্য প্রয়োজন এবং কয়েকটি গ্রাম জুড়িয়া একটি কৃষিঋণ সমিতি অবস্থান করিবে। ভারতে প্রয়োজনীয় কৃষিঋণের মোট ৩ শতাংশ সমবায়

সমিতিগুলি হইতে আসে। ১৯৫৫ সনে কৃষিঋণ সমিতির মোট দাদনের পরিমাণ ছিল ৩৫·৪৮ কোটি টাকা। কৃষিঋণ সমিতির নিজস্ব অর্থের পরিমাণ ৩৮ শতাংশ; আমানতের পরিমাণ ৯ শতাংশ এবং গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৫৩ শতাংশ। এই অতিরিক্ত পরিমাণে বাহিরের সাহায্যের উপর নির্ভরতা—সমবায় প্রথার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।

কৃষিঋণ সমিতিগুলির আধিক্য দেখা যায় বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র এবং পঞ্জাবে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পঞ্জাবে অ-কৃষিঋণ সমিতির প্রাচুর্য্য দেখা যায় এবং জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ মাদ্রাজ, বোম্বাই, অন্ধ্র ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে সীমাবদ্ধ। সমবায় আন্দোলনে বাংলা দেশের অনগ্রসরতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে মোট ৯টি কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। বলা বাহুল্য যে, কোনও কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক বাংলা দেশে নাই। ইহাতে কি প্রমাণিত হয় যে, কৃষিপ্রধান বাংলা দেশে দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণের প্রয়োজন নাই; অথবা এখানকার কর্ত্তৃপক্ষের ইহা উদাসীনতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক?

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ৯,৩৪৮টি অ-কৃষিঋণ সমিতি আছে এবং ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ২৮ লক্ষ। ইহাদের কার্য্যকরী মূলধন মাত্র ৭৮ কোটি টাকা। কৃষিঋণ সমিতির তুলনায় অ-কৃষিঋণ সমিতির আমানতী অর্থের পরিমাণ অধিক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অ-কৃষিঋণ সমবায় প্রথা উন্নয়নের জন্য জোর দেওয়া হইতেছে। সম্প্রতি যে ছয়টি সমবায় শিল্প অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ ইদানীং অ-কৃষি সমবায়ের দিকে ঝোঁক দিতেছেন।

যুদ্ধোত্তর যুগে সমবায় কৃষি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সম্প্রতি মুসৌরীতে সর্ব্বভারতীয় যে সমবায় অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, চলতি বৎসরে জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য্যাবলী অঞ্চলে অন্ততঃ পাঁচ শত সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। সর্ব্বভারতীয় কৃষিঋণ অনুসন্ধান সমিতির সুপারিশ অনুসারে সমবায় প্রথার সহিত ক্রয়বিক্রয় ব্যবস্থা জড়িত করা হইবে। সেই অনুসারে আগামী চার বৎসরে ১৩০০ ক্রয়বিক্রয় সমবায় সমিতি স্থাপিত হইবে। ইহা ব্যতীত চলতি বৎসরে ২২টি কেন্দ্রীয় গুদামঘর তৈয়ার করা হইবে কৃষিজাত দ্রব্য মজুত রাখিবার জন্য।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক মিশন যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহা ভারত সরকার অনেকদিন যে কেন প্রকাশ করেন নাই তাহা বুঝা যায় না। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক কমিশনের অভিমতগুলি সুযুক্তিপূর্ণ এবং সমালোচনা যাহা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে গঠনমূলক। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য বিশ্বব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে। এই প্রশংসা শুধু যে অর্থনৈতিক উন্নতির (যথা, জাতীয় আয়-বৃদ্ধি কিংবা উৎপাদনবৃদ্ধি) জন্য করা হইয়াছে তাহা নহে, অন্যান্য কতকগুলি অবদানও বিশ্বব্যাঙ্ক কমিশন লক্ষ্য করিয়াছেন। যেমন, জনসাধারণের মধ্যে আশার উদ্দীপনা ও জাতীয় জাগৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা এবং বিশ্বাস। ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই জাতীয় মনোভাব অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কম্যুনিটি পরিকল্পনাদ্বারা কর্ত্তৃপক্ষ যে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করিয়াছেন তাহাতে ব্যাঙ্ক কমিশন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক সম্পদ বিষয়ে ব্যাঙ্ক মিশন কতকগুলি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, যথা,—(১) ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, (২) সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কার্য্যাবলী—যাহা জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগে তাহার জন্য বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যনির্দ্ধারণ করা—ইহাতে রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে, এবং (৩) বিচক্ষণতার সহিত নূতন নূতন কর ধার্য্য দ্বারা রাজস্ব-আয় বৃদ্ধি করা এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে সাধারণের উদ্বৃত্ত করার প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ না হয়। ঘাটতি ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা স্বীকার করিলেও মিশন অভিমত দিয়াছেন যে, পরিকল্পিত পরিমাণে ঘাটতি ব্যয় করিলে ইহা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে গ্রহণ করা সাধ্যাতীত হইবে না; এবং ইহার ফলে দেশের মূল্যমান বৃদ্ধি পাইবে ও টাকার মূল্য হ্রাস পাইবে।

মিশনের অভিমতে সরকারী রাজস্ব-আয় বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা আছে। যথা, রেলওয়ে রেট বৃদ্ধিকরণ, বিদ্যুৎ-সরবরাহ ও সেচকার্য্যের জন্য জল সরবরাহের উপরে কর স্থাপন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বন্দর-কর স্থাপন। বর্দ্ধিত জাতীয় আয়ের কতক অংশ পুনরায় মূলধনসৃষ্টির জন্য নিয়োগ করা প্রয়োজন এবং তজ্জন্য সরকারী শক্তি সরবরাহ, সেচকার্য্য ও যানবাহনের প্রতিষ্ঠান-গুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত দেখাইতে হইবে। কারণ, ইহাদের উপর অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে এবং সেইজন্য সরকারী মূলধনসৃষ্টির ইহারা হইবে প্রধান উৎস।

এই অনুমোদনগুলির যথার্থতা অবশ্যস্বীকার্য্য। সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর সেবা-ভারের (service charges) পরিমাণ অত্যল্প হইলে তাহা জাতীয় অর্থনৈতিক অপচয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং ইহাতে নূতন মূলধন সৃষ্ট না হইয়া বর্ত্তমান মূলধন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ভারত সরকার এই বিষয়ে বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হইলে তাঁহাদের রাজস্ব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রেল টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; আভ্যন্তরিক বিমান যানবাহনের মূল্যবৃদ্ধি সম্ভবপর এবং অন্যান্য পথযানের সেবাভারও বৃদ্ধি করা যায়। তবে দ্রব্যবহনের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যদিকে শক্তি সরবরাহের খরচ বাড়াইতে হইলেও

ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ বিবেচনা করিতে হইবে, একই হারে কর বৃদ্ধি করিলে চলিবে না।

করনীতি ব্যাপারে বিশ্বব্যাঙ্ক মিশন উদ্বৃত্ত রক্ষার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহ দিবার পক্ষপাতী। ইহার প্রধান উপদেশ এই যে, মূলধনসৃষ্টির হার উন্নয়ন করিতে হইলে ব্যক্তিগত আয়ের উপর প্রত্যক্ষ কর সর্বতোভাবে বৃদ্ধি করা চলিবে না, ইহাতে বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন সৃষ্টি ব্যাহত হইবে এবং জাতীয় আয়ের পরিকল্পিত বৃদ্ধির হার আশানুরূপ হইবে না। ব্যাঙ্ক মিশন মনে করেন যে, ভারতে প্রত্যক্ষ করের হার অত্যধিক হওয়ার দরুন বিদেশী বেসরকারী মূলধন ভারতে আসিতে ভরসা পায় না। বিদেশী মূলধন আসিলে তাহার সঙ্গে আসিবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং তাহাতে ভারত দুই ভাবেই উপকৃত হইবে।

বিশ্বব্যাঙ্ক কমিশনের অভিমত সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, কমিশন একটি জিনিষ বোধ হয় ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। তাহা এই—ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। ইহার ফলে বেসরকারী ব্যক্তিগত ক্ষেত্র কিছু পরিমাণে উপেক্ষিত হইতে বাধ্য। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ সরকারী ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা হইবে আর এক তৃতীয়াংশ আসিবে ব্যক্তিগত বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও মোট ব্যয়ের মাত্র এক-চতুর্থাংশ আসিয়াছে বেসরকারী ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হইতে। অর্থাৎ, বিগত পাঁচ বৎসরে বেসরকারী ক্ষেত্র মোটে পাঁচ শত কোটি টাকার মূলধন সৃষ্টি করিয়াছে, সুতরাং ইহার বাৎসরিক গড়পড়তা হার দাঁড়ায় ১০০ কোটি টাকায়, ইহা আদৌ আশাপ্রদ নহে। ভারতীয় বেসরকারী শিল্পপতিরা risk capital নিয়োগে একেবারেই উৎসাহী নহেন, তাঁহারা নিরাপদে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রয় করিবার জন্য অধিকতর আগ্রহশীল। সুতরাং, বর্তমান অবস্থায় দেশের মূলধনসৃষ্টির প্রধান দায়িত্বভার আছে রাষ্ট্রের উপর, বেসরকারী ব্যক্তিগত ক্ষেত্র কেবল অনুপূরক হিসাবে কার্য্য করিতেছে। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ সৃষ্ট হইতেছে সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা।

আর একটি কথা। সরকারী সেবাভাড়ের বৃদ্ধি করিলেই তাহা বর্দ্ধিত হারে মূলধনসৃষ্টিতে সাহায্য করে না। ইহার বড় নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা। সবার অজ্ঞাতে রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থার সব কয়টি বাস রুটেই ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে পরিবহন ব্যবস্থার মূলধন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ব্যাঙ্ক মিশনের মতে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অতিরিক্ত উচ্চাশার পরিচায়ক। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে অভিমত দিয়াছিলাম, ব্যাঙ্ক মিশনও প্রায় সেই অভিমত দিয়াছেন। মিশন সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত—এই অবস্থায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার গুরুভার ইহার পক্ষে বহন করা সম্ভবপর হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, এই অতিরিক্ত পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি তথা মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইতে বাধ্য। সেই কারণে ব্যাঙ্ক মিশন সন্দেহ প্রকাশ করেন, ভারত সরকার যে পরিমাণে ব্যবহারিক দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য কুটীরশিল্পের উপর নির্ভরশীল তাহাতে ব্যবহারিক দ্রব্য দেশের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন অনুসারে পাওয়া যাইবে না, ফলে, মুদ্রামূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইবে ও পরিকল্পনার ব্যয় দ্বিগুণ হইবে। শিক্ষিত ও উপযুক্ত-সংখ্যক কর্ম্মচারীদের অভাবও একটি বড় অসুবিধা।

ব্যাঙ্ক মিশন বিদেশী মূলধন আমদানীর পক্ষপাতী, কিন্তু মিশন মনে করেন, ভারতবর্ষে শিল্পপতিরা ব্যক্তিগত ভাবে বিদেশী মূলধন আমদানীতে আপত্তি করেন, কারণ বিদেশী মূলধনের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী মূলধন আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

ইণ্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন

গত ২৫শে জুলাই আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা বা ইণ্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন গঠনের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয়। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির উদ্দেশ্য হইল বেসরকারী ব্যবসায়-প্রচেষ্টায় অর্থসাহায্য করা। ইহা বিশ্বব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক অনুমোদিত সংস্থা। বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণের জন্য যেরূপ সরকারী গ্যারাণ্টির প্রয়োজন হয়, নূতন আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থ হইতে ঋণগ্রহণের সময় সেরূপ কোন সরকারী গ্যারাণ্টির প্রয়োজন হইবে না। ৩১টি দেশ কর্পোরেশনের সদস্য হইয়াছে। কর্পোরেশনের বর্ত্তমান মূলধন ৭,৮৩,৬৬,০০০ মার্কিন ডলার। কর্পোরেশনের মূলধন গঠনে যে সকল রাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারা হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৩,৫১,৬৮,০০০ ডলার), যুক্তরাজ্য (১,৪৪,০০,০০০ ডলার) ফ্রান্স (৫৮,১০,০০০ ডলার), ভারতবর্ষ (৪৪,৩১,০০০ ডলার) এবং জার্ম্মান ফেডারেল রিপাবলিক (৩৬,৫৫,০০০ ডলার)। কানাডা, পাকিস্থান, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও সুইডেন প্রত্যেকে দশ লক্ষ ডলার বা ততোধিক দান করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের অপরাপর সদস্য-রাষ্ট্রগুলি হইল—বলিভিয়া, সিংহল, কলম্বিয়া, কষ্টারিকা, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, মিশর, এল সালভাডর, ইথিওপিয়া, ফিনল্যাণ্ড, গুয়াতেমালা, হাইতি, হণ্ডুরাস, আইসল্যাণ্ড, জর্ডান, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পানামা ও পেরু।

ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মার্কিন ছাত্রদের চিত্রপ্রদর্শনী

মার্কিন ফুলব্রাইট ছাত্রবিনিময়-পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল মার্কিন ছাত্র ভারত, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী, নেদারল্যাণ্ডস, মিশর এবং যুক্তরাজ্যে অধ্যয়ন করে, আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক নগরীতে এইরূপ ত্রিশ জন ছাত্রের অঙ্কিত একটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। ডুভীন-গ্রাহাম গ্যালারীতে এই প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন গ্যালারীর কর্ত্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাসংস্থা।

দশ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রবিনিময় সংক্রান্ত ফুলব্রাইট আইন পাস হয়। তখন হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মার্কিন ছাত্র ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। উহাদের মধ্যে ২৩০ জন চিত্রশিল্প সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। বর্ত্তমানে ফুলব্রাইট পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫টি বিভিন্ন দেশে মার্কিন ছাত্রগণ অধ্যয়নে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

ব্রায়নি সম্মেলন

পৃথিবীতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির নীতির জন্য যে কয়টি রাষ্ট্র বিশেষ ভাবে সচেষ্ট রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে ভারত, আফ্রিকা মহাদেশে মিশর এবং ইউরোপে যুগোস্লাভিয়ার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। তিন মহাদেশের এই তিনটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ সম্প্রতি যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত ব্রায়নি দ্বীপে একটি সম্মেলনে মিলিত হন। ১৮ই ও ১৯শে জুলাই এই দুই দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন—ভারতের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু, মিশরের পক্ষ হইতে প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী গামাল আবদেল নাসের, এবং যুগোস্লাভিয়ার পক্ষ হইতে প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী জোসিপ ব্রজ টিটো। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহারা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে "বিস্তারিত মতবিনিময়" করেন। আলোচনান্তে ২০শে জুলাই একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়।

তিন জন রাষ্ট্রপ্রধান বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলির প্রতি তাঁহাদের আনুগত্যের পুনরুল্লেখ করিয়া বলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে যে পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হইয়াছে, অবিলম্বে তাহার বিলোপসাধন প্রয়োজন। আশু নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া তাঁহারা বলেন যে, কালবিলম্ব না করিয়া সকলপ্রকার আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে সকল রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে যাবতীয় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে ত্রিনেতৃবর্গ গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সকল আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টাই সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মারফত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাসৃষ্টির প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে সকল রাষ্ট্রেরই সদস্য-পদ পাওয়া উচিত।

বিশ্বশান্তিকে অধিকতর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন-ব্যবস্থাকে দ্রুততর করিবার প্রচেষ্টার উপর তিন রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষ জোর দেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা "আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সহযোগিতার গুরুত্ব" সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ তহবিল (Special U.N. Fund for Economic Development) গঠন করিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী করা প্রয়োজন এবং বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহকে অব্যাহত করিবার প্রয়োজনীয়তার উপরও তাহারা জোর দেন।

ব্রায়নি সম্মেলনের শেষে নেতৃত্রয় যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, উত্তেজনা ও সম্ভাব্য বিরোধের প্রধান তিনটি এলাকা হইতেছে—মধ্য-ইউরোপ, সুদূরপ্রাচ্য এবং ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্ত্তী মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চল। নয়াচীন সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত সুদূরপ্রাচ্যের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং নেতৃত্রয় আশা করেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে গণতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। তাঁহারা আরও আশা করেন, যে সব রাষ্ট্র রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য-পদের জন্য আবেদন করিয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদ অনুযায়ী যাহাদের সদস্য-পদের যোগ্যতা আছে তাঁহাদের সদস্য বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

তাঁহাদের অভিমতে মধ্য-ইউরোপের সমস্যা জার্ম্মানীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই গুরুতর সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে জার্ম্মান জনসাধারণের অভিপ্রায় অনুযায়ী করা প্রয়োজন।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পরস্পরবিরোধী স্বার্থসংঘাতের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান তাহাদের নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে করা উচিত। সকলেরই ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া উচিত, তবে মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের স্বাধীনতার স্বীকৃতির উপরই সকল সমাধানের ভিত্তি হওয়া সমীচীন। প্যালেষ্টাইনের পরিস্থিতি বিশ্বশান্তির পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক রূপ ধারণ করিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বান্দুং সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, নেতৃত্রয় তাহার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

আলজিরিয়া সমস্যার উল্লেখ করিয়া যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, প্রশ্নটি যে কেবল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাই নহে, আলজিরিয়ার জনগণের স্বাধীনতা দাবির মৌলিক অধিকার স্বীকৃতির দিক দিয়া এবং ঐ অঞ্চলে শান্তিপ্রচেষ্টার সাফল্যের দিক বিবেচনা করিয়াও ইহার আশু সমাধান প্রয়োজন। আলজিরিয়ার জনগণের স্বাধীনতার দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া নেতৃত্রয় বলেন যে, ঐ প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের সকল প্রচেষ্টাকেই তাঁহারা সমর্থন করিবেন। আলজিরিয়াতে অবস্থিত ইউরোপীয় অধিবাসিবৃন্দের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া উচিত, কিন্তু সেজন্য আলজিরিয়ার জনসাধারণের স্বাধীনতার দাবির ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকৃতির পক্ষে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নহে। বর্ত্তমানে আলজিরিয়াতে এক হিংসাত্মক এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহার অবসান করিয়া অবিলম্বে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে এবং উভয় পক্ষই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজিলে প্রশ্নটির শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হইবে।

আসওয়ান বাঁধ ও সুয়েজ খাল

মিশরের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মিশর সরকার নীলনদের উপর

আসওয়ান নামক স্থানে যে একটি উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক তাহাতে মোট ২৭ কোটি ডলার অর্থসাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ ১৯শে জুলাই ঘোষণা করা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন তাহাদের পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থসাহায্য করিবে না। ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্য হইতেও মিশর বঞ্চিত হয়। প্রতিশ্রুতিপালনের অস্বীকৃতির কারণ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বলেন যে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাঁধ নির্ম্মাণের অর্থনৈতিক দায়িত্বপালনের ক্ষমতা মিশরের নাই। উপরন্তু বাঁধ নির্ম্মাণ সম্পর্কে মিশর নীলনদের তীরবর্ত্তী অপরাপর রাষ্ট্রগুলির সম্মতিলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই দুইটি কারণের কোনটিই যে সাহায্যদানের অস্বীকৃতির প্রকৃত কারণ নহে সে সম্পর্কে সকল দলের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণই একমত। যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মিশরের সম্পর্কের উন্নতি এবং মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণাত্মক বাগদাদ চুক্তির বিরোধিতার জন্য পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী মিশরের নাসের সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা আসওয়ান বাঁধের ন্যায় ঐতিহাসিক কার্য্যের কৃতিত্ব নাসেরকে দিতে স্বীকৃত নহেন বলিয়াই পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

আসওয়ান বাঁধের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্য দিতে অস্বীকার করিয়া যদি পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ আশা করিয়া থাকেন যে, মিশর চাপে পড়িয়া তাঁহাদের দ্বারস্থ হইবে তবে পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে তাঁহাদের সেই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। ব্রায়নি সম্মেলনের সমাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্ত্য শক্তিদ্বয় সাহায্যদানের অস্বীকৃতি ঘোষণা করে। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রেসিডেন্ট নাসের ২৬শে জুলাই সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণের ঘোষণা দ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর দেন। তিনি বলেন যে, ব্রিটেন এবং আমেরিকা ৭ কোটি ডলার সাহায্য দিতে অস্বীকার করিয়াছে। সুয়েজ খালের বার্ষিক আয় ১০ কোটি ডলার—মিশর সেই অর্থ দ্বারা আসওয়ান উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করিবে।

সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণ করার ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকারী মহলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মিলিত আমন্ত্রণক্রমে ১৬ই আগষ্ট হইতে লণ্ডনে একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন চলিতেছে। মিশর এবং গ্রীস আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সম্মেলনে যোগ দেয় নাই। মিশর ঘোষণা করিয়াছে যে, মিশরের সার্ব্বভৌমত্ব হানিকারক সুয়েজ খাল সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থাই সে মানিয়া লইবে না।

পাকিস্থানের অর্থনৈতিক প্রগতি

পাকিস্থানের নবম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রচারিত একটি সরকারী বিবৃতিতে স্বাধীনতালাভের পর পাকিস্থানের অর্থনৈতিক প্রগতির এক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, দেশবিভাগের ফলে নানা সমস্যায় জড়িত থাকা সত্ত্বেও পাকিস্থানের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পাকিস্থান সরকার কোন ত্রুটি করেন নাই। পাকিস্থান গঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই একটি উন্নয়ন বোর্ড (Development Board) গঠন করিয়া তাহার উপর সকল উন্নয়নমূলক প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ভার দেওয়া হয়। পরে বোর্ডের কাজ একটি পরিকল্পনা কমিশন এবং একটি অর্থনৈতিক পরিষদের (Economic Council) উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৫০ সনে কলম্বো পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর পাকিস্থান সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি ষষ্ঠবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে মোট ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। তন্মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে ১২০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হয়। ঐ ষষ্ঠবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করাই এই দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে একটি কর্ম্মসূচী রচনা করিবার জন্য ১৯৫৩ সনের জুলাই মাসে একটি পরিকল্পনা-বোর্ড গঠিত হয়। উক্ত বোর্ড কর্ত্তৃক যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রায় ৮০ কোটি টাকা পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন হইবে।

সরকার একটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদও গঠন করিয়াছেন। এই পরিষদের কাজ হইল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থনৈতিক, বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক নীতি সম্পর্কে পরামর্শ দান করা। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদের সভাপতি। চার জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে তিন জন করিয়া মন্ত্রীও এই পরিষদের সদস্য।

১৯৫৫-৫৬ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে পাকিস্থানকে বিভিন্ন রাষ্ট্র মোট ১৪৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেয়—তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কলম্বো পরিকল্পনার সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলির পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ হইল ২৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার মত।

উক্ত পাঁচ বৎসরের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা-খাতে সরকারী ও বেসরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ও ২০০ কোটি টাকা। সমগ্র উন্নয়নমূলক ব্যয়ের প্রায় শতকরা ২৬ ভাগ অর্থ আসে বৈদেশিক সাহায্য হইতে। দেখা যাইতেছে যে, উন্নয়নমূলক ব্যয়ের অধিকাংশই মিটানো হয় পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ সম্পদ হইতে।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার হিসাব লইলে দেখা যায়, ১৯৫১-৫২ সনে যেখানে মাত্র ৪১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা

ব্যয়িত হইত, ১৯৫৪-৫৫ সনে সে স্থলে ব্যয় হয় ৮১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সনে উন্নয়নমূলক কার্য্যে সরকারী ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সনে লগ্নীর হার ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৫.৪ ভাগ; ১৯৫৪-৫৫ সনে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয়ের শতকরা নয় ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

এই সকল উন্নয়নমূলক কার্য্যের ফলে পাকিস্থানের অর্থনীতির বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। জাতীয় আয়বৃদ্ধির পরিসংখ্যান হইতে এই উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৯-৫০ সনে মাথাপিছু গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল ২২৫৲ টাকা; ১৯৫৪-৫৫ সনে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ২৩৭৲ টাকা।

গোল্ড কোষ্ট নির্ব্বাচন

আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গোল্ড কোষ্টে সম্প্রতি যে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রহিয়াছে এই কারণে যে, উক্ত নির্ব্বাচনের ফলাফলের উপরই গোল্ড কোষ্টের স্বাধীনতা এবং কমনওয়েলথভুক্তির প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। এই নির্ব্বাচনের ফলে গোল্ড কোষ্ট প্রথম আফ্রিকান সদস্য হিসাবে কমনওয়েলথে যোগদানের অধিকারী হইবে।

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ: কনভেনশন পিপলস পার্টি (বর্ত্তমান সরকারী দল) ৭১টি আসন; জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (প্রধান বিরোধী দল) ১২টি আসন, নর্দার্ন পিপলস পার্টি ১৫টি আসন এবং অন্যান্য ৬টি আসন। গোল্ড কোষ্টের এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার মোট আসন-সংখ্যা হইল ১০৪টি।

গোল্ড কোষ্টের ভবিষ্যৎ সংবিধান গঠনের বিষয় সম্পর্কে কনভেনশন পিপলস পার্টি এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দেয় সে সম্পর্কে গোল্ড কোষ্টের জনগণের অভিমত নির্দ্ধারণের জন্য গত মে মাসে ব্রিটিশ উপনিবেশ-সচিব লেনক্স বয়েড গোল্ড কোষ্ট সরকারকে একটি সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে, নির্ব্বাচনের পর গোল্ড কোষ্ট আইনসভা যদি "যুক্তিসঙ্গত সংখ্যাধিক্যে" স্বাধীনতার দাবি জানাইয়া কোন প্রস্তাব পাস করে তবে ব্রিটিশ সরকার তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন। গত ৩রা আগষ্ট গোল্ড কোষ্ট আইন-সভায় ৭২-০ ভোটে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায়, ব্রিটিশ সরকার তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া অবিলম্বে গোল্ড কোষ্টকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিবেন।

স্বাধীনতালাভের পর গোল্ড কোষ্টের নূতন নাম হইবে ঘনা এবং এই নূতন নামেই রাষ্ট্রটি কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত হইবে।

টেলিফোন বিভাগ সম্পর্কে অভিযোগ

২৩শে শ্রাবণ "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আসানসোল টেলিফোন বিভাগের কর্ম্মপ্রণালীর সমালোচনা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রথম যখন টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করা হয় তখন নির্দিষ্ট বার্ষিক ফিয়ের বিনিময়ে বরাকর, কুমার-ডুবি, ডিসেরগড়, কুলটি, নিয়ামতপুর, বহুলা, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি কেন্দ্রের সহিত অতিরিক্ত ফি ব্যতিরেকেই কথাবার্ত্তা বলা চলিত। কিন্তু টেলিফোন কর্ত্তৃপক্ষ একের পর এক এই সকল সুযোগ-সুবিধা অপহরণ করিলেন এবং এক বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া অতিরিক্ত ফি ছাড়াই টেলিফোনযোগে কথাবার্ত্তা বলিবার যে অধিকার জন-সাধারণের ছিল তাহা সঙ্কুচিত করিয়া সেই সুযোগ কেবলমাত্র আসানসোল শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিলেন। "অথচ পূর্ব্বেকার বিস্তৃততর এলাকার সুযোগ-সুবিধার জন্য যে বাৎসরিক ফি ধার্য্য ছিল তাহাই বজায় থাকিল, তাহা হইতে এক পয়সাও কমান হইল না।"

টেলিফোন কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ কার্য্যের সমালোচনা করিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন, "টেলিফোন বিভাগের এই ব্যবস্থা কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরা মনে করি না। ইহা মনোপলী ব্যবসার একটা 'গা-জোরী' ব্যবস্থা মাত্র।...সরকারী টেলিফোন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের বক্তব্য—হয় তাঁহারা আমাদের পূর্ব্ব অধিকার ফিরাইয়া দিউন নতুবা টেলিফোন রাখার ফিয়ের পরি-মাণ কমাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দিউন। শাঁখের করাতের মত দুই দিক দিয়া আমাদের কাটিলে চলিবে কেন?"

কলিকাতায়ও টেলিফোনের বিল বিষয়ে অনেক স্থলে হিসাবের অদ্ভুত গরমিল দেখা যায়, আমাদেরও এই অভিজ্ঞতা আছে। বলা বাহুল্য বিল বেশীই হয়, কম নয়।

সরকারী শিক্ষানীতি

"বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকার ১২ই শ্রাবণ সংখ্যায় এক সংবাদে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান বৎসর হইতে বর্দ্ধমানরাজ কলেজটি 'Government Sponsored' কলেজে পরিণত হওয়ার ফলে কলেজে ছাত্র-ভর্ত্তির সংখ্যা ১,৫০০ হইতে এক হাজারে কমাইয়া আনা হইয়াছে। কলেজটিতে ছাত্রভর্ত্তির সংখ্যা হ্রাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভর্ত্তি হইতে অপারগ ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাও করা হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসর হইতে কলেজটিতে বি-কম শ্রেণী খোলা হইবে বলিয়া পূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী ছাত্র-দিগকে ভর্ত্তি হইবার ফরমও দেওয়া হয়। কিন্তু পরে আবার ঘোষণা করা হইল যে, এ বৎসর বি-কম ক্লাস খোলা হইবে না। এই বৎসর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হওয়ায় কলেজে শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুক ছাত্রসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের ছাত্রভর্ত্তি সংখ্যা হ্রাস করিবার সিদ্ধান্তের করিবার ফলে বর্দ্ধমানে এক শিক্ষাসঙ্কট দেখা দিয়াছে। কিন্তু সরকারী নীতির দুর্ব্বোধ্যতার এখানেই পরিসমাপ্তি নহে। বর্দ্ধমান বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় যথাসময়ে একটি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ খুলিবার জন্য উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট

আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কলেজ খুলিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

পুস্তক ব্যাঙ্ক

শিক্ষার ভার অনতিকাল পূর্ব্বেও পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য হিসাবেই গণ্য হইত। সম্প্রতি দেশের তরুণদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার সামাজিক দায়িত্ব জাতিগত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে বটে, তথাপি শিক্ষাব্যাপারে বেসরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক অর্থবিনিয়োগের পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য। শিক্ষা ব্যাপারে অর্থবিনিয়োগ দান হিসাবেই গণ্য হয়—ইহাকে সাধারণ ব্যবসায়ের অঙ্গ রূপে কেহই দেখিতে অভ্যস্ত নহেন। এই বক্তব্যের অর্থ এই নহে যে, শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিরল, শিক্ষা ব্যাপারটাকে সাধারণ ভাবে সুস্থ ব্যবসায়িক প্রতিপাদ্য হিসাবে কখনই দেখা হয় নাই ইহাই বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছে।

শিক্ষা ব্যাপারে অর্থ লগ্নীকরণ কেবল দান হিসাবে চিন্তা না করিয়া সাধারণ ব্যবসায়ের অঙ্গ হিসাবে দেখিলেও যে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়া ৪ঠা আগষ্ট "ইকনমিক উইকলি" পত্রিকা পুস্তক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্য পুস্তক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। উক্ত প্রস্তাবের সারমর্ম্ম হইল এই যে, যে সকল ছাত্র পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিতে অসমর্থ তাহারা পুস্তক ব্যাঙ্ক হইতে পাঠ্যপুস্তক ধার হিসাবে গ্রহণ করিবেন এবং পরীক্ষা সমাপনান্তে ঐ সকল পুস্তক ব্যাঙ্কের নিকট ফিরাইয়া দিবেন। কলিকাতার কোন একটি কলেজ এইরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত কলেজটি ১০ সেট পাঠ্য পুস্তকসহ একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তক ব্যাঙ্ক চালু করেন। প্রত্যেকটি পুস্তকই পরীক্ষার পর যথারীতি ফেরত আসে—এই সম্পর্কে কোন অভিযোগ উঠে নাই। দেখা যাইতেছে যে, ছাত্রদিগকে বিশ্বাস করিলে তাহারা সেই বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এক সাম্প্রতিক অধিবেশনে জনৈক সদস্য এম-এ এবং এম-এসসি ছাত্রদের জন্য ২০ সেট পাঠ্য পুস্তক লইয়া একটি পুস্তকব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তুলিলে উপাচার্য্য শ্রীসিদ্ধান্ত তাহা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। বি-এ এবং এম-এ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলির মূল্য এরূপ অত্যধিক যে, অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষেই তাহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত। কোন কলেজেই পাঠাগারে কোন পাঠ্য পুস্তক দু'একটির বেশী রাখা সম্ভব হয় না বলিয়া তাহাদের পক্ষে ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের চাহিদা মিটান সম্ভব হয় না।

সম্প্রতি কানাড়া ব্যাঙ্ক যে পরিকল্পনা চালু করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের দুইটি শিক্ষা তহবিলের ২৫ বৎসরের কার্য্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কানাড়া ব্যাঙ্ক 'জুবিলী শিক্ষা তহবিল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। কানাড়া ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের অঙ্গ হিসাবে ব্যাঙ্কের মোট আমানতের শতকরা এক ভাগ অর্থ ব্যাঙ্ক ছাত্রদিগের মধ্যে ঋণ-বৃত্তি (loan scholarship) হিসাবে বিতরণ করিবে এবং ঐ অর্থ যথারীতি প্রত্যর্পিত হইতেছে কিনা উক্ত নবগঠিত সংস্থা সেজন্য দায়ী থাকিবে। প্রথমে অল্পসংখ্যক বৃত্তি লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইবে। শিক্ষা সমাপনান্তে লগ্নীকৃত অর্থ ছাত্রগণ ফিরাইয়া দিতে থাকিলে ঐ অর্থ যখন আবার লগ্নীকৃত হইবে তখন বৃত্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে।

ব্যাঙ্ক ছাত্রদিগকে ঋণ-বৃত্তি হিসাবে অর্থ বিনিয়োগ করিবে এবং জুবিলী শিক্ষা তহবিল এইরূপ বিনিয়োগের সমস্ত ঝুঁকি বহন করিবে। এইরূপ ব্যাপারে বেসরকারী প্রচেষ্টাগুলির ফলাফল হইতে দেখা যায় যে, প্রকৃত ঝুঁকি নিতান্তই নগণ্য। ব্যাঙ্কের সাংগঠনিক এবং অর্থসংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকায় ছাত্রদিগের নিকট অর্থ অনাদায়ী থাকিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে। কানাড়া ব্যাঙ্কের এই প্রচেষ্টা ব্যবসায়গত এবং যুবকল্যাণ প্রচেষ্টা হিসাবে সফলতা অর্জ্জন করিবে ইহাই সকলের আশা।

জঙ্গীপুর হাসপাতাল

জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালটি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ২৮শে আষাঢ় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ভারতী" পত্রিকা লিখিতেছেন :

"সম্প্রসারিত নূতন মহকুমা হাসপাতালটির জরুরি প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা একাধিকবার পত্রিকার মাধ্যমে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছি এবং সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে হাসপাতালটির গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্য শীঘ্রই সুরু হইবে বলিয়া আশ্বাসও পাইতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজ আজ পর্য্যন্ত সুরু না হওয়ায় আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না ..."

পুরাতন হাসপাতালটিতে প্রসূতিদের জন্য যে ব্যবস্থা চালু ছিল, নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবস্থা রহিত করায় আসন্নপ্রসবাদের লইয়া জঙ্গীপুরের জনসাধারণ এক ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন। হাসপাতালে এখন পাস-করা কোন ধাত্রীও নাই ; যিনি এতদিন পর্য্যন্ত ছিলেন তাঁহার অবসরগ্রহণের পর নূতন কোন ধাত্রী নিযুক্ত হয় নাই।

"অথচ স্বাধীনতার পূর্ব্বে যখন হাসপাতালটি মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে ছিল তখনও একজন পাস-করা ধাত্রী ছিল। সরকারের পরিচালনাধীনে আসার পরও কিছুদিন সেই ব্যবস্থা চালু ছিল, এক্ষণে তাহাও উঠিয়া গেল। প্রসূতি ওয়ার্ডটি না হয় উঠাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, কোন গর্ভবতী নারীকে অন্যান্য জটিল ব্যাধির জন্য ভর্ত্তি করা হইল এবং অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালেই প্রসব-বেদনা উঠিল, তখন কি উক্ত রোগিণীকে প্রসবের কোন ব্যবস্থা নাই বলিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইবে কিংবা তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করা হইবে? যদি

হাসপাতালে রাখাই সাব্যস্ত হয় তবে কাহার রক্ষণাবেক্ষণে তাহাকে রাখা হইবে ? পাস-করা ধাত্রীর ব্যবস্থা কোথায় ?"

এইরূপ অবস্থায় যত দিন পর্যন্ত সম্প্রসারিত নূতন পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে তত দিন পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থারূপে প্রসূতি ওয়ার্ডটি চালু রাখা এবং সেজন্য একজন পাস-করা ধাত্রী নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন যে, একজন মেডিক্যাল অফিসারের পক্ষে যদি দেখাশুনা করার অসুবিধা ঘটে তবে কলিকাতা ও অন্যান্য মফস্বল শহরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্থানীয় বেসরকারী চিকিৎসকদিগকে অবৈতনিক চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

ত্রিপুরায় আসন্ন দুর্ভিক্ষ

ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক খাদ্যাভাব এবং বন্যার ফলাফল সম্পর্কে "সমাজ" পত্রিকা লিখিতেছেন, "ত্রিপুরায় বর্তমানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও তৎপরবর্তী খাদ্য এবং আর্থিক সঙ্কটে রাজ্যের সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়াছে—বিশেষতঃ অর্থনৈতিক দিক হইতে। মধ্যবিত্ত এবং তন্নিম্ন শ্রেণীর লোকদের যৎসামান্য নগদ ও অন্যবিধ সঞ্চয় যা কিছু ছিল দুর্ভিক্ষ ও বন্যাবিধ্বস্ত অবস্থা হইতে স্থিতিশীল হইতে গিয়া তাহাও নিঃশেষ হইয়াছে। পল্লী-অঞ্চলে ১৫৲ টাকা কেন, ১০৲ টাকায়ও চাউল কিনিবার সামর্থ্য এখন আর অধিকাংশ লোকের নাই। দরিদ্র ত্রিপুরার জনগণ দরিদ্রতর হইয়াছে এবং অপ্রতিরোধ্য রূপেই তাহাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীদের ভাগ্যে ইহা অপেক্ষাও ভয়াবহ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে। আউশ ধান বিনষ্ট হওয়ায় এবং যৎসামান্য পরিমাণ ধান যাহা হইয়াছিল, মহাজনদের ঋণশোধেই তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে যে ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে, আগামী ফসলও আশানুরূপ না হইবার আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়ায় তাহা আরও বেশী ভয়াবহ এবং ব্যাপকতা রূপে দেখা দিবে। "কোন কোন ক্ষেত্রে আগামী ফসলের বীজধান সংগ্রহ করিতে গিয়া বর্তমানের খোরাকের ধানও বিক্রয় করিতে হইতেছে. ফলে খাদ্যাভাব হ্রাস পাইতেছে না এবং অতিরিক্ত দর হেতু চাষের পূর্ব হইতে ক্ষেত ও ফসল রেহান দিতে হইতেছে। ত্রিপুরার কৃষকদিগকে সুদীর্ঘকালীন শোষণের উৎপীড়ন আজ যেন শতগুণে ভয়াবহরূপে গ্রাস করিতেছে, সুযোগ বুঝিয়া অবস্থাসম্পন্নেরা বীজধান সরবরাহ অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস করিয়া কৃত্রিম উপায়ে দর বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে।" বহু কৃষিক্ষেত্র বীজধানের অভাবে অনাবাদী থাকিয়া যাইতেছে।

যদি রাজ্য সরকার অবিলম্বে রাজ্যের কৃষি এলাকাগুলিতে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বহুল পরিমাণে বীজধান সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করেন তবেই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের আশা থাকিবে। তাহা না করা হইলে ভবিষ্যতে যে অবস্থা দেখা দিতে পারে তাহার আভাস দিয়া "সমাজ" লিখিয়াছেন, "চলতি খাদ্যসঙ্কটে ভারত সরকারকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খেসারত দেওয়ান হইয়াছে, আমন ফসল না হওয়ার পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করিতে না পারিলে আগামী দুর্ভিক্ষে খেসারতের পরিমাণ কয়েক কোটি টাকার মধ্যে থাকিলেই স্বল্প বলিয়া মনে করা উচিত হইবে।"

ত্রিপুরার বর্তমান দুর্গতির জন্য ত্রিপুরা সরকারের দায়িত্বের উল্লেখ করিয়া "সমাজ" বলেন যে, বর্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য চাউলের প্রকৃত অভাব অপেক্ষা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্মচারিগণই অধিকতর দায়ী। খাদ্যপরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিলে ইহাদের দৌরাত্ম্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমান দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য আনীত চাউলের মূল্য অপেক্ষা আনয়ন ও সাবসিডির জন্য বেশী অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। বর্তমানে কিছু ক্ষতি দিয়াও যদি কৃষকদিগকে সাহায্য করা হয় তবে হয়ত ত্রিপুরার আসন্ন দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব না হইতেও পারে।

"সমাজে"র উক্তি আংশিক ভাবেও সত্য হইলে সরকারের সবিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ত্রিপুরা সরকারের অযোগ্যতা

ত্রিপুরা রাজ্য হইতে প্রকাশিত প্রায় সকল পত্রপত্রিকাতেই ত্রিপুরার বর্তমান শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নানারূপ অভিযোগ করা হইয়া থাকে। ত্রিপুরার সাম্প্রতিক বন্যা এবং খাদ্যসঙ্কটকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল অভিযোগের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সরকার অবশ্য এই সকল অভিযোগ কি চক্ষে দেখেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই—তবে একই প্রকার অভিযোগের পুনরাবৃত্তিতে মনে হয় না যে সরকার এ বিষয়ে কোন দৃষ্টিপাত করেন।

১২ই আগষ্ট এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "সেবক" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যসরকার রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে সকল রিপোর্ট প্রেরণ করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা সঠিক নহে। পার্লামেণ্টে ত্রিপুরা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলে এই সকল ভ্রান্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই সরকারী উত্তর দেওয়া হয়, ফলে পার্লামেণ্ট ত্রিপুরার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হন। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া "সেবক" লিখিতেছেন :

"সংবাদে দেখা যায়, গত ৬ই আগষ্ট লোকসভায় ত্রিপুরার কোন কোন অঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যার আলোচনা করিতে লোকসভার অধ্যক্ষ মহোদয় অনুমতি প্রদান করেন নাই। তদুত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, গত ৩১শে মে হইতে ২রা জুনের পর ত্রিপুরায় কোন বন্যা হইয়াছে বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট জানেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উত্তরে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কৈলাসহর ও ধর্মনগরে যে ভয়াবহ বন্যা হইয়া গিয়াছে এবং এই বন্যায় দুই জনের সলিল-সমাধিও হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই অথবা দিল্লী হইতে এই সম্পর্কে কিছু জানিতে চাহিলে ত্রিপুরা সরকার প্রকৃত তথ্য সরবরাহ

করেন নাই। কৈলাসহর ও ধর্মনগরের সাম্প্রতিক বন্যা লোকের ঘরবাড়ী প্লাবিত করিয়াছে, পাকা আউশ ফসল ও সদ্য-রোপিত আমন ধান্যের বিস্তর ক্ষতিও করিয়াছে। এই দুই মহকুমায় গত কয়েক মাস যাবৎ ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে এবং সাম্প্রতিক বন্যায় খাদ্যাভাব ও অন্যান্য সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের নিকট আজ ইহা স্পষ্টরূপেই দেখা দিয়াছে যে, প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিয়া স্থানীয় সরকার রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করার পথ বাছিয়া লইয়াছেন। সাম্প্রতিক একটি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। উপদেষ্টা শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় এবং জেলাশাসক কৈলাসহরের সাম্প্রতিক বন্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পরস্পরবিরোধী। জেলাশাসকের বিবৃতি কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। জেলাশাসক বলিয়াছেন, কৈলাসহর মহকুমার ২৫ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া বন্যা হইয়াছে এবং আউশ কিংবা আমন ধান্যের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। উপদেষ্টা শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ আমাদের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, "কৈলাসহরে বন্যাঞ্চলে বন্যার জলে ৭৫ ভাগ ফসল বিনষ্ট হইয়াছে এবং অনতিবিলম্বে পনর হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিলে ঐ মহকুমার অর্দ্ধেক লোক অর্থাৎ ৩৩ হাজার লোক খাদ্যাভাব হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আমন ধান্যের বীজ ইতিমধ্যে প্রেরণ না করিলে আগামী আমন ধান্যের ফলন অসম্ভব।"

"সেবক" আরও লিখিতেছেন :

"চীফ কমিশনার ত্রিপুরাবাসীর নিকট সরাসরি দায়ী নহেন, অতএব তাঁহার সরকার যে-কোন বিকৃত তথ্যও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করার অধিকার পাইয়াছেন এবং বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থা এই অধিকার তাঁহাকে দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আগরতলার বাজারে যখন চাউল দিনে-দুপুরে ৪০।৪৫৲ টাকায় বিক্রি হইতেছিল তখন পার্লামেণ্টে খাদ্যসচিব আগরতলায় চাউলের দর ২৮৸০ আনা বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। খাদ্যসচিবের এই উক্তি সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাঁহার এই উক্তিতে আগরতলাবাসী কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে কি মনে করিয়াছিল তাহার ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ত্রিপুরার বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থায় যে কেবল ত্রিপুরাবাসীই নাজেহাল হইতেছে তাহা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বনামধন্য মন্ত্রিবর্গকেও বহুবিধ অসুবিধায় পড়িতে হয়—তাহাই আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

আমরা এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আসানসোলে বাসগৃহ-সমস্যা

ভারতের সকল শহরাঞ্চলেই আজ বাসগৃহ-সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন কারণেই শহরাঞ্চলে অধিবাসীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, বাসগৃহের সংখ্যা সেই অনুপাতে বিশেষ বাড়ে নাই; গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুর্ম্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতা ইহার একটি কারণ। শহরাঞ্চলে বাসগৃহের অভাবের সামাজিক ফল হইয়াছে সুদূরপ্রসারী।

সাধারণ দ্রব্যমূল্যমান বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই আজ জীবিকানির্ব্বাহ নিরতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়াছে। ফলে, একদিকে স্বল্পবিত্ত জনসাধারণের পক্ষে নূতন গৃহনির্ম্মাণ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাতে গৃহ-সমস্যার তীব্রতা কমিতে পারিতেছে না। অপর দিকে এই সুযোগে এক দল বিবেকশূন্য মুনাফালোভী বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদিগকে নানাভাবে বিব্রত করিতেছে। ক্ষেত্রবিশেষে ভাড়াটিয়ারাও যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিতেছে না তাহা নহে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে একদল সমাজবিরোধী মনোভাবাপন্ন বাড়ীওয়ালা এই সমস্যাকে মূলধনরূপে কাজে লাগাইয়া মুনাফা লুটিতেছে।

আসানসোলে গৃহ-সমস্যার সুযোগ লইয়া এইরূপ এক দল দায়িত্বজ্ঞানহীন বাড়ীওয়ালা কিরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্থানীয় সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন : "আসানসোলে বহু বাড়ীওয়ালা আছেন যাঁহারা ভাড়াটিয়াদের নিকট হইতে নিয়মিত ভাড়া আদায় করেন, কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে বাস করার সুখ-সুবিধার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখেন না। বাড়ীকে যে বাসযোগ্য রাখার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই উদাসীন। মাসে মাসে ভাড়াটা আসিলেই হইল; ইহার অধিক ভাড়াটিয়ার সহিত আর কোন সম্বন্ধ নাই। সময়মত অল্পস্বল্প মেরামত করিয়া দিলে বাড়ীগুলি যে ভাড়াটিয়াদের কতকটা আরামের যোগ্য থাকে সে বোধ বাড়ীওয়ালাদের যেন থাকিয়াও নাই। বাড়ীভাড়া যেন ষোল আনা লাভের ব্যবসাই থাকে, তাহা হইতে এক পয়সাও যেন খরচ করিতে না হয়।"

গৃহসংস্কারে বাড়ীওয়ালাদের এইরূপ নিঃশব্দ ঔদাসীন্যের ফলে ভাড়াটিয়াদিগকে নানারূপ বিপদে পড়িতে হয়। এইরূপ বিপদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি বুধাগ্রামের একটি বাড়ীতে দিনের বেলা অল্পবয়স্ক একটি ঘুমন্ত শিশুর উপর ছাদ ভাঙিয়া পড়িলে অল্পের জন্য সে রক্ষা পায়।

উপসংহারে পত্রিকাটি বলিতেছেন, "যাঁহারা ভাড়া আদায় করেন অথচ দীর্ঘদিন ধরিয়া বাড়ী মেরামত করেন না, বাড়ীতে যাহারা বাস করে তাহাদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখেন না তাঁহাদের এই সমাজবিরোধী কার্য্যের জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারা যায় সরকারকে আমরা তাহাই উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।"

পুলিস ও বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী

১৭ই জুন পুলিস কর্ত্তৃক হোসিয়ারপুরে বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী জনতার উপর গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগ করেন তাহার রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য

প্রসঙ্গে ৫ই আগষ্ট মাদ্রাজের ইংরেজী দৈনিক "হিন্দু" পত্রিকা লিখিতেছেন, বেসরকারী তদন্তটির রিপোর্ট হইতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবির সারবত্তাই প্রমাণিত হইয়াছে। মূলতঃ পুলিসী জুলুমের অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য গঠিত হইলেও কমিটি যে সকল তথ্য আহরণ করিয়াছেন তাহাতে পুলিস এবং বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী জনতা উভয়েরই ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ দিন পুলিস যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতেই কাহিনীর সমাপ্তি নহে। ১৭ই জুনের ঘটনাবলী পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক দিনেরই সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতির পরিণতিস্বরূপ ঘটিয়াছিল। কমিটির রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, কয়েকটি দল পরস্পরের সভাসমিতি বলপূর্ব্বক ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। ঐ সকল বিক্ষোভপ্রদর্শনের একটি অবাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য হইল স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যাধিক্য। ১৭ই জুনের পূর্ব্বদিন স্ত্রীলোক-বিক্ষোভকারিণীদের ব্যবহার বিশেষ নিন্দার্হ রূপ ধারণ করিয়াছিল। কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, "স্ত্রীলোকগণ যে ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে তাহাদের প্রশংসা করা যায় না। তাহারা অত্যন্ত জঘন্য এবং প্ররোচনামূলক ধ্বনি ব্যবহার করে। তাহারা যে ভাষা প্রয়োগ করে তাহা অতি নিম্নস্তরের—সেই সকল ধ্বনি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই রিপোর্টটি কলঙ্কিত করিতে চাহি না।"

"হিন্দু" লিখিতেছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের বিরূপ আচরণে কমিটি যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, সকল সুবিবেচক নাগরিকই তাহার সহিত একমত হইবেন। তবে এই সকল অশোভন ঘটনার দায়িত্ব সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতির উদ্যোক্তাদের উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত, কারণ স্ত্রীলোকগণ স্বেচ্ছায় ঐ সকল সভা-শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল এরূপ চিন্তা অলস মস্তিষ্কের পরিচায়ক। স্পষ্টতঃই তাহাদের স্বভাববিরোধী এরূপ বিক্ষোভপ্রদর্শনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদিগকে নানা ভাবে প্ররোচিত করা হইয়াছিল।

নানাবিধ প্ররোচনা সত্ত্বেও ১৬ই জুন পর্য্যন্ত পুলিস সংযম হারায় নাই। কিন্তু পরদিবস সকল প্রকার সংযম পরিত্যক্ত হয়। ১৭ই জুন অন্ততঃ কিছুসংখ্যক পুলিস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জনতাকে শিক্ষা দিতে হইবে। ঐ দিন পুলিসী আক্রমণের ব্যাপকতা, তীব্রতা এবং নির্ব্বিচার লাঠিচার্জ্জ হইতে স্পষ্টতঃই প্রমাণ হয় যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা অপেক্ষা প্রতিশোধস্পৃহাই পুলিসের মনে প্রবল আকার ধারণ করে। তদন্ত কমিটির অভিমতে কিছুসংখ্যক পুলিস যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর ছিল সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই। জনসাধারণ দৌড়াইয়া পলাইয়া গিয়া অথবা দূরবর্ত্তী গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও ঐ সকল প্রতিহিংসাপরায়ণ পুলিসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। বস্তুতঃ অধিকাংশ পুলিসই সেদিন কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিল—তাহা না হইলে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে বিক্ষোভকারী জনতার প্রতি তাহারা ঐরূপ হিংস্র আচরণ করিতে পারিত না। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি পুলিসের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া কমিটি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদিগকে ধাক্কা দেওয়া অথবা তাহাদের চুল ধরিয়া টানা প্রভৃতি ঘটনার পশ্চাতে কোনরূপ যৌন প্রেরণা ছিল না। কিন্তু পুলিস যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতেছিল তাহা সন্দেহাতীত। এই ব্যবহারের ফলে পুলিস আইনশৃঙ্খলা সংরক্ষণের ভার ব্যতীত বিচারকের ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপ ব্যবহার করিয়া পুলিস নিতান্ত নিন্দনীয় আচরণ করিয়াছে। পুলিসের কর্ত্তব্য আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সেজন্য যাহা কিছু করণীয় তাহা করা। অপরাধের বিচারের দায়িত্ব পুলিশের নহে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধের বিচার এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য সম্পর্কে পুলিশবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে সচেতন করিয়া তুলিতে না পারিলে অবশ্যম্ভাবী রূপে পুলিসের উপর জনসাধারণ আস্থা হারাইয়া ফেলিবে।

বারাসাতে চুরির প্রাদুর্ভাব

সম্প্রতি বারাসাত মহকুমায় চুরির উপদ্রব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রায় প্রত্যহই কোন-না-কোন চুরির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চোরেরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত পরিবারে হানা দিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে। এই-রূপ ঘন ঘন চুরির ফলে বারাসাত অঞ্চলে গৃহস্থদের মনে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ৩২শে আষাঢ় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বারাসাত বার্ত্তা" লিখিতেছেন যে, চোরদের সন্ধান-সংগ্রহের তৎপরতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে কোথায় কোন্ মূল্যবান দ্রব্যটি রহিয়াছে প্রখর অধ্যবসায়ের সহিত তাহারা তাহার নির্ভুল সন্ধান লয়।

বারাসাতে এই চুরির উপদ্রব প্রতিরোধে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করিয়া উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, দিনের পর দিন চোর ও চুরির সংখ্যা উদ্বেগজনকরূপে বৃদ্ধি পাইলেও পুলিশ উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিরোধ-ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। এ অবস্থায় গৃহস্থের একমাত্র সহায় হইতে পারেন পাড়ায় যুবকবৃন্দ। তাহারা যদি স্বেচ্ছাব্রতী হইয়া নিজেদের পাড়ায় প্রতিরোধবাহিনী গঠন করিয়া রাত্রে নিজ নিজ এলাকা পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারে তবেই এই উপদ্রব হ্রাস পাইতে পারে।

সর্পদংশনে মৃত্যু

প্রতি বৎসরই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বহুলোক সর্পদংশনে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। বর্ষাকালেই এইরূপ মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য ঘটে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দংশিত ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় অসহায় ভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করে। সর্পদংশনের চিকিৎসার জন্ত যে 'এন্টিভেনম' ইন্‌জেক্‌শন প্রচলিত আছে তাহা বহুস্থানেই দুর্লভ। উপরন্তু, উহার অত্যধিক মূল্য হেতু দরিদ্র রোগীদিগের পক্ষে এই ঔষধের সদ্ব্যবহার করিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

গ্রামাঞ্চলে সর্পদংশনে মৃত্যুসম্পর্কিত সমস্যাটির প্রতি জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ২৫শে শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ভাগীরথী" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, এই বৎসরও সর্পাঘাতে মৃত্যুর বহু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সর্পাঘাতে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবিধার জন্ত প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডে এবং স্থানীয় প্রবীণ চিকিৎসকদিগকে সরকারের পক্ষ হইতে বিনামূল্যে 'এন্টিভেনম' ইন্‌জেকশন সরবরাহ করিলে সমস্যাটির আংশিক প্রতিকার হইতে পারে বলিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে মন্তব্য করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

বাঙালীর বর্ত্তমান অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ তাহার পূর্ব্বসূরী প্রদত্ত গৌরবকে অবহেলা ও বিস্মৃতি। আজ লোকে ভুলিতে চলিয়াছে যে, বাঙালী যাহা কিছু অধিকার বা গৌরব আজ ভোগ করিতেছে তাহার প্রায় সবকিছুরই ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এক দল আদর্শবাদী দেশনেতা—যাঁহারা উনবিংশ শতকের শেষাংশ হইতে বর্ত্তমান শতকের প্রথম চতুর্থাংশে বাংলায় তথা ভারতের জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুরেন্দ্রনাথের আদর্শে স্বায়ত্তশাসন কি ছিল এবং বর্ত্তমানে তাহা কি দাঁড়াইয়াছে উহার পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত বিবরণে বুঝা যায়:

"রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার এক স্মৃতিসভার সভাপতিরূপে কলিকাতা মহানগরীর বর্ত্তমান মেয়র অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ ১৯২৩ সনের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সহিত ১৯৫১ সনের আইনের তুলনা করিয়া বলেন, পৌর প্রতিষ্ঠানের আগেকার সকল ক্ষমতা গিয়াছে। "পৌর প্রতিষ্ঠানে আমাদের এই ত অভিযোগ যে, আমরা কেন সরকারী দপ্তরের প্রত্যঙ্গ হইয়া থাকিব? কেন আমাদের উপর সরকারের আধিপত্য থাকিবে?"

"মেয়র বলেন, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই সুরেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। তিনি এই ক্ষেত্রে সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু মেয়র বলেন, তাহার পর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৯২৩ সনের আইনের পরিবর্ত্তে ১৯৫১ সনের আইন প্রণীত হইয়াছে।

"মেয়র অধ্যাপক ঘোষ বলেন, তাঁহার সহিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কথোপকথনকালে ডাঃ রায় জানিতে চাহেন, তিনি (ডাঃ রায়) মেয়র হইয়া যাহা যাহা করিতে পারিয়াছিলেন, আমি তাহা করিতে পারি না কেন? আমি জবাব দিয়াছি, আপনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের আইনে মেয়র ছিলেন, আমি আপনার আইনে মেয়র।

"সোমবার কলিকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এইদিন সকালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কার্জ্জন পার্কে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিমূর্ত্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীসতীনাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

"সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত রিপণ কলেজে (অধুনা পরিবর্ত্তিত নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) এক স্মৃতিসভা হয়।

"ব্যারাকপুরে গঙ্গাতীরে সুরেন্দ্রনাথের চিতাস্থলে অনুরাগী ভক্তগণ পুষ্পমাল্যাদি স্থাপন করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। অপরাহ্নে সুরেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউটে এক স্মৃতিসভা হয়।

"সন্ধ্যায় মধ্য-কলিকাতা অঞ্চলে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক স্মৃতিসভা হয় এবং উহারই সভাপতিরূপে মেয়র অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ সুরেন্দ্রনাথের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত খেদ প্রকাশ করেন এবং বলেন, সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি যে বাঙালীর চিত্ত হইতে মুছিয়া যাইতেছে তাহা এই জনবিরল সভাই প্রতিপন্ন করিতেছে। বাংলার এই আচরণে বাংলার লজ্জিত হওয়া উচিত।

"এই সভায় কার্জ্জন পার্কের নাম সুরেন্দ্রনাথ উদ্যান রাখা সমীচীন—এই অভিমত প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহাতে বলা হয়, প্রতি বৎসর এই মর্ম্মে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাহা উপেক্ষা করা হইতেছে। যে পার্কে রাষ্ট্রগুরুর মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে তাহার নাম সুরেন্দ্রনাথ উদ্যান রাখিবার জন্ত "এই সভা দাবি করিতেছে।"

স্বাধীনতা-দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী

স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাণী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে নূতন কিছুই নাই, তবে জাতীয় ঐক্যসম্পর্কিত তাঁহার বাণী তাঁহার নিজপ্রদেশের লোকেরা মানিয়া লইলে দেশের উপকার হইবে।

"নয়াদিল্লী, ১৪ই আগষ্ট—রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করিয়াছেন:

ভারতের স্বাধীনতালাভের নবম বার্ষিক শুভ দিনে আমি আমার দেশবাসীর উদ্দেশে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। আজিকার দিন আত্মোৎসর্গের দিন। আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত করণীয় রহিয়াছে, আজ সেগুলির পর্য্যালোচনা না করিয়া আমি থাকিতে পারি না। যাহাতে আমাদের এই রমণীয় দেশ হইতে দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, সেইভাবে আমাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে। আমাদের দেশের পুনর্গঠন ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কাজ অত্যন্ত জরুরি।

আর একটি অনুরূপ জরুরি কাজ হইতেছে আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধ দেশবাসীর মধ্যে জাগ্রত করা। এই কাজেই আমাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আমাদের একথা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, জাতীয় ঐক্যসাধন ব্যতীত বাস্তব সম্পদবৃদ্ধির

প্রচেষ্টা শুধু যে ব্যাহত হইবে তাহা নহে, যথার্থতঃ বিফল হইবে। সম্প্রতি কয়েক মাস আমরা রাজ্যগুলির পুনর্গঠন ব্যাপারটির চূড়ান্ত রূপায়ণের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছি। কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থে নয়, পরন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের খাতিরে আমরা রাজ্য পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্বার্থ এক ও অভিন্ন। এক সময়ে পুনর্গঠনের কাজে অবাঞ্ছনীয় পারিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মতি ও অনুমোদনসহকারে রাজ্য পুনর্গঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্য গঠনের অনুকূলে যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা সংসদের এক মহতী কীর্তি হিসাবে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পুনর্গঠনের বিষয়টিকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিব এবং বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা রূপায়ণের জন্য সদিচ্ছা ও ধৈর্য্যসহকারে অগ্রসর হইব।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখন রূপায়ণের চেষ্টা হইতেছে। আমি সানন্দে একথা স্বীকার করি যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা যে সুফল লাভ করিয়াছি তাহাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। সকল দিকে আমাদের সম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য সম্ভবপর সকল প্রকার চেষ্টা চলিতেছে। এই অবস্থায় প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের দায়িত্ব হইতেছে তাহাদের নিজেদের সামাজিক মর্য্যাদার কথা ভুলিয়া গিয়া জাতিগঠনের এই বিশাল কার্য্যে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করা। এই প্রসঙ্গে আমি কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিতে চাই। ভারী ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের কর্মসূচী বর্তমানে রূপায়িত হইতেছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই আমাদের কয়েকটি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায় অতি-প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই বিদ্যুতের সাহায্যে আমরা ক্ষুদ্র শিল্প গঠন করিতে পারিব এবং তাহার ফলে আমাদের বেকার-সমস্যা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতির সাফল্য লাভে যদিও আমরা সুখী তাহা হইলেও আমি বলিতে চাই যে, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও বিশ্বে শান্তি স্থাপনের নীতির ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে আমরা যে সুনাম অর্জন করিয়াছি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রতি যে সদিচ্ছা ও সৌহার্দ্য প্রদর্শিত হইতেছে, যদি আমরা পুনর্গঠনের কাজে সাফল্য লাভ করিতে পারি এবং সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক সদিচ্ছার মধ্য দিয়া শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারি তবেই তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

আমেদাবাদে মাৎস্যন্যায়

আমেদাবাদে কি প্রকার বিশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ের তাণ্ডব চলিতেছে তাহা এখন সর্বজনবিদিত। উহার তৃতীয় দিনের বিবরণ নিম্নে আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, অপরিণতমস্তিষ্ক তরুণের দলের এই উশৃঙ্খলতার পিছনে স্বার্থান্বেষী তথাকথিত "নেতা"দিগের উস্কানী আছে। গুজরাটে অন্যত্র আরও শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে :

"আমেদাবাদ, ৯ই আগষ্ট—সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আজ পুলিসের গুলীবর্ষণে পাঁচ জন লোক নিহত হয়। ইহা লইয়া গত দুই দিনে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইল ১২ জন। আজ সারাদিন পুলিসের গুলীবর্ষণ, লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগের ফলে মোট ৪১ জন আহত হয়। তাহাদের মধ্যে চার জনের আঘাত গুরুতর। ইহা লইয়া গত দুই দিনের হাঙ্গামায় মোট ১৪৫ জন আহত হইল। পুলিস ও রক্ষীদলের প্রায় ২৪ জন আহত হয়। দমকলবাহিনী জানাইয়াছে যে, তাহাদের দশ জন লোক আহত হইয়াছে।

জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী মধ্যরাত্রের কিছু পূর্বে জানান যে, সমগ্র শহরের অবস্থা শান্ত। পুলিস কর্মচারী আরও জানান, শহরের ১৪টি স্থানে গুলীবর্ষণ করা হয় এবং মোট ৮৯ রাউণ্ড গুলী বর্ষিত হয়।

আমেদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য বেলা দুই ঘটিকা হইতে সমগ্র আমেদাবাদ শহরে ২৪ ঘণ্টার জন্য কার্ফু জারী করিয়াছেন।

কার্ফু বলবৎ রাখার কাজে পুলিসকে সাহায্য করিবার জন্য অদ্য বেলা ৩টার সময়ে সৈন্যদল তলব করা হইয়াছে।

আজ রাত্রে জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী জানান যে, শহরের অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে। তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৭টার পর কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই বটে, তবে রাস্তায় কিছু লোক ঘোরাফেরা করিতে থাকে।

কংগ্রেস এম. এল. এ. শ্রীমগনলাল আর. প্যাটেলের পুত্র ডাঃ নান্নুভাই মগনলাল প্যাটেলের তলপেট গুলীবিদ্ধ হয় এবং তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসমর্থিত এক সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ প্যাটেল তাঁহার বাসভবনের ত্রিতলে দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় গুলীবিদ্ধ হন।

ভারত সরকার কর্তৃক দ্বিভাষী বোম্বাই রাজ্য গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক ধর্মঘট আহূত হয়। সেই অনুযায়ী শহরের ছাত্রগণ ধর্মঘট করে এবং গতকল্য বেলা ২টা পর্য্যন্ত ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার পর অবস্থা ছাত্র নেতাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়।

লোকসভায় আমেদাবাদ প্রসঙ্গ

আমেদাবাদে যাহা চলিতেছে সে বিষয়ে লোকসভায় শ্রীনেহরু ও বিরোধীদলের মধ্যে বাদানুবাদের বিবরণ আমরা আংশিক ভাবে আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত করিলাম। পণ্ডিত নেহরুর অভিযোগ

যে ভিত্তিহীন এ কথা কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিবেন না। দেশে একদল লোক আছেন যাঁহারা নিজের ও নিজ দলের স্বার্থে যে কোন প্রকার অনাচারের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত, তাহাতে দেশের ও দশের অপকার কতটা হইবে তাহার বিচার মাত্রও তাঁহারা করেন না। তবে এক্ষেত্রে দোষী কে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

"নয়াদিল্লী ১০ই আগষ্ট—'প্রকাশ্যে হিংস পন্থায়' সংসদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করার যে মনোভাব দেশে দেখা দিয়াছে, আজ সংসদে রাজ্য পুনর্গঠন বিলের তৃতীয় দফা আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাহার নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'ইহা মূলতঃ সমগ্র গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও পদ্ধতির বিরোধী।' তিনি দেশে শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং সংসদের সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপারে সহায়তা করিতে সদস্যদের নিকট সনির্বন্ধ আবেদন জানান।

বিরোধী দলের সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় বারবার বাধা দেন এবং তাঁহাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করেন।

আমদাবাদে পুলিসই হিংসায় উস্কানি জোগাইয়াছে বলা সত্যিই এক অভাবনীয় ব্যাপার—প্রধানমন্ত্রী এই কথার যখন পুনরাবৃত্তি করেন তখন প্রথম বাদানুবাদ আরম্ভ হয়।

বিরোধী সদস্যগণ—'সরকারী সিদ্ধান্তেই উস্কানি দেওয়া হইয়াছে।'

"প্রধানমন্ত্রী ক্রোধকম্পিত স্বরে বিরোধী সদস্যদের নিকট জানিতে চাহেন যে, তাঁহারা হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়াছেন কিনা। তাঁহার অভিযোগ এই, বিরোধী সদস্যরাই এরূপ কাজে উস্কানি দিতেছেন।

বিরোধী সদস্যগণ সকলে উঠিয়া দাঁড়ান এবং উচ্চৈঃস্বরে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, তাঁহারাই শুধু কঠোর ভাষা প্রয়োগে পারদর্শী নন।

"বিরামহীন চীৎকারের মধ্যে অধ্যক্ষ সকলকে শান্ত হইতে আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, শ্রীচ্যাটার্জ্জি ও শ্রীহীরেন মুখার্জ্জি কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। যখন প্রধানমন্ত্রী অনুরূপ কঠোর ভাষায় উহার জবাব দিতেছেন, তখন তাঁহাকে বাধা দেওয়া অসঙ্গত।

"আবেগপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীনেহরু রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত কংগ্রেসের নীতি সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের নীতি ভাষার ভিত্তিতে সমগ্র জাতিকে খণ্ড বিখণ্ড করার বিরোধী। অবশ্য এক ভাষাভাষী রাজ্য গঠিত হইতে পারে; কিন্তু কংগ্রেস মূলতঃ এক ভিন্ন বিষয়ের সমর্থক। ভাষা নিঃসন্দেহ গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু উহাকে রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারণের সহিত কখনও গুলাইয়া ফেলা উচিত নয়।

"তিনি বলেন যে, ভাষাগত রাজ্য গঠনের নামে গত চার মাস যাবৎ দেশে যে সব ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা অতিশয় নিন্দার্হ। একটি রাজ্যের সীমা কোথায় নির্দ্ধারণ করা হইল, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। এ সম্পর্কে বৈষয়িক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক দিকটা বিবেচ্য। রাস্তাঘাটে লড়াই করিয়া ও হাঙ্গামা বাধাইয়া এবং গুলী চালাইয়া ও অগ্নিসংযোগ করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় না।

"অতঃপর তিনি বলেন যে, সংসদের ক্ষমতায় সংশয় প্রকাশ করা দুর্ভাগ্যের বিষয়। সময় সময় সংসদ সদস্যগণই এ জাতীয় সংশয় প্রকাশে উস্কানি দিয়াছেন। ইহাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে, সংসদকে উহা বিবেচনা করিতে হইবে। যেভাবে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে এবং উহাতে যেরূপ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রায় স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। ইহা বন্ধ করার জন্য কোন কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কম্যুনিষ্ট অথবা অ-কম্যুনিষ্ট—যে দেশই হউক না কেন, ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

"প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সীমা-ঘটিত বিরোধে কোনরূপ রাজনৈতিক বা বৈষয়িক প্রশ্ন জড়িত নয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের পক্ষে উহা প্রবল ভাবাবেগের প্রশ্ন হইতে পারে। সরকার এই ভাবপ্রবণতা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যখন দুইটি ভাবাবেগের সংঘাত উপস্থিত হয় তখনই যত কিছু গোলমাল ঘটে। এ বিষয়ে যে মূলনীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়, তাহা প্রথম হইতেই মানিয়া চলা হইতেছে।

"তিনি বলেন যে, ভারতের ঐক্য, নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করাই গবর্ণমেন্টের প্রথম ও প্রধান নীতি। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই প্রতিটি যুক্তি বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সরকারের দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক। আর সবই ইহাদের অনুসারী। রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপারে জনসাধারণের সর্ব্বাধিক পরিমাণ সমর্থন লাভেই সরকার ইচ্ছুক ছিলেন। 'আসুন আমরা বলি, বহুলাংশে এই সমর্থন আমরা পাইয়াছি।'

"স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সঙ্গে সরকার পরামর্শ করেন নাই বলিয়া শ্রীচ্যাটার্জ্জি যে অভিযোগ করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী তাহা অস্বীকার করেন। শ্রীচ্যাটার্জ্জি যদি বলেন যে, এ-লোক বা সে-লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই, তাহা হইলে উহা সবটা সত্য হইবে না। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করা হয় নাই, একথা সত্য। কিন্তু কংগ্রেস-বহির্ভূত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। 'একাধিক বার এই বিষয়ে শ্রীচ্যাটার্জ্জির সঙ্গে আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।'

"সাম্প্রতিক হাঙ্গামার উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, 'একটি ভাষাগত এলাকার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহা এক বিপজ্জনক ব্যাপার। ইহাকে উৎসাহিত করা অনুচিত। আশা করি, ইহা কেউ পছন্দও করেন না। আমি আগের চেয়েও এখন ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন পরিকল্পনার বেশী বিরোধী। এই সব রাজ্য নিজ নিজ খেয়ালের বশবর্ত্তী এবং বৃহত্তর প্রশ্ন আমল দেয় না। সুতরাং কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠনের পক্ষপাতী হইলেও এক্ষণে আমার ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি এখন বৃহৎ রাজ্য গঠনে বিশ্বাসী। ভারতের ঐক্য এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা ও ভারতের

উন্নয়নের পটভূমিকায় প্রত্যেকটি বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন।'

"তিনি আরও বলেন যে, গোলযোগ ও হাঙ্গামায় শিল্পোন্নয়ন হইবে না। সুতরাং অবাধ আলোচনা, অবাধ মত-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ ও বিতর্কের সুযোগ লাভ করা যাইতে পারে, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু উহা নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিতে হইবে। রাস্তার লড়াই দ্বারা জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করা যাইত না। কিছুসংখ্যক লোক সম্প্রতি যেভাবে সত্যাগ্রহ চালনা করিতেছে তাহা গান্ধী ধারণা করিতে পারেন নাই।

"শ্রীনেহরু বলেন যে, পঞ্জাবের জন্য যে আঞ্চলিক সূত্র উদ্ভাবন করা হইয়াছে তাহা সমালোচনা করার আদৌ কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। পঞ্জাবের আন্দোলনে প্রমাণিত হয় যে, আন্দোলনকারীরা উহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই এবং উহা বুঝিতে পারিয়া থাকিলেও তাঁহারা অন্য কিছু করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্যা সমাধানের পক্ষে উহা আদর্শ ব্যবস্থা, ইহা তাঁহার বক্তব্য নয়। তবে নিখুঁতভাবে বিচার করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। 'আপনারা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন এবং সংসদ তাহা অনুমোদন করেন। উহাই আইনে পরিণত হয়। কিন্তু সারা দেশের অবস্থা কি? আপনারা উহা লইয়া লড়াইয়ে মত্ত। ইহা কি সভ্য দেশের ব্যবস্থা। ইহাই কি আমাদের রাজনীতিবিদ্‌দের পথ?'

"উপসংহারে তিনি বলেন যে, সংসদে কোন কিছু গৃহীত না হইলেই তাহার মীমাংসা পথে-ঘাটে করার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু জনসাধারণ উহার বিরোধী। ভারত এক বিরাট দেশ। এখানে ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তায় সংসদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করা মূলতঃ গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ও পদ্ধতির বিরোধী।"

পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র

নিম্নস্থ সংবাদে পাকিস্থানের "কাজীর বিচারে"র পরিচয় পাওয়া যাইবে:

"হিলি, ৩১শে জুলাই—হিলি (পশ্চিম দিনাজপুর) পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাইতেছে যে, সামরিক বাহিনীর উপর খাদ্য সরবরাহ ও বণ্টনের ভার ন্যস্ত হওয়ার পর মজুতদারদিগকে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সৈন্যগণ অনুসন্ধানকারীদের সহায়তায় শহরে ও গ্রামে ঘুরিয়া মজুতদারদের খোঁজ লইয়া বহু পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতেছে। ধান্য চাউল গম যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাই সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া নিয়ন্ত্রিত দরে (চাউল ২০৲, ধান্য ১২৲, গম ১৫৲) মজুতদারদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া উহার নিয়ন্ত্রিত মূল্য দিতেছে; কোন কোন ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্য দিতেছে কিংবা বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া মজুতদারদের উপর নানাভাবে জুলুম করিতেছে।

সম্প্রতি বগুড়া জেলার একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে সৈন্যেরা অনুসন্ধান করিয়া ১৫ বস্তা চাউল পায়। এই চাউল তাঁহার নিজের খাওয়ার জন্য রাখা হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও সামরিক আদালতের বিচারের পর শহরের সাত মাথা রাস্তায় তাঁহাকে প্রকাশ্যে ৫ ঘা বেত মারা হয়। উহার পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সমস্ত শরীরে ভালভাবে 'ঘি' মালিশ করিয়া পরে লেবুর রস মাখান হয়। তৎপর একজন বলিষ্ঠ সৈন্যদ্বারা শঙ্কর মাছের লেজের চাবুকের সাহায্যে পাঁচ বার তাঁহাকে আঘাত করা হয়। প্রত্যেক বার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পড়িতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য শহরের হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। ঐ অবস্থাতেই তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার টাকা পরিমাণ জরিমানা আদায় করা হয়। উহার পর তিন মাসের জন্য তাঁহার সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

শহরের জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীকে ২ ঘা বেত মারিবার পর তাহার সংজ্ঞা লোপ পায়। সিবিল সার্জ্জনের পরামর্শে তাহাকে রেহাই দেওয়া হয়। ধূপচাচিয়া গ্রামের ফটিকচন্দ্র কুণ্ডুর বাড়ীতে মাত্র ৫০ মণ চাউল পাওয়ায়, প্রকাশ্য রাস্তায় বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহাকে বেত্রদণ্ড হইতে রেহাই দিয়া অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সোনাতলা গ্রামের জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর নিকট ৫০০ মণ চাউল পাওয়া যায়। সৈন্যরা সম্পূর্ণ চাউল আটক করিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে নির্দ্ধারিত ২০৲ টাকার স্থলে ১৫৲ টাকা দরে বিতরণ করে। পাঁচবিবি থানায় জনৈক বিহারী ব্যবসায়ীর গুদামে কয়েক বস্তা গম পাওয়া যায়, এহেতু তাহাকে ৩ ঘা বেত ও ১০০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বগুড়া শহরের ডাঃ টি. আহম্মদ সাহেবের বাড়ীতে ২০০ বস্তা গম পাওয়া যায়। গুদামের চাবি আনিতে দেরী হওয়ায় সৈন্যরা লাথি মারিয়া দরজা ভাঙিয়া ফেলে এবং তাঁহার সমস্ত গম ১৫৲টাকা স্থলে মাত্র ৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হয়। উক্ত শহরের দানশীল ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মোঃ মজিবর রহমান সাহেবের বাড়ীতে ৫০ হাজার মণ চাউল পাওয়াতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁহার আবেদনক্রমে ও স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি আবেদনে বলেন যে, এই মজুদ চাউল প্রতি বৎসর এই সময়ে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়া থাকে। ইহা ব্যবসায়ের জন্য মজুত করা হয় নাই।

রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় মজুতদারদের খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য ইট ও সিমেণ্ট পূর্ণ বস্তা পিঠে চাপাইয়া শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে ঘুরাইয়া শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একটি পাঠান্তর

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

শ্রীকৃষ্ণকে ভারতের আত্মা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের ধর্ম, ইতিহাস, মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য—সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্‌গীতা তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী বলিয়া প্রসিদ্ধ, হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মহাভারতের যুদ্ধ আনুমানিক ১৫০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাযুদ্ধের সময় গীতা প্রচার করেন। কিন্তু বর্তমান আকারে মহাভারত এবং তাহার অংশ গীতা ৫০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নহে। এই জন্য তাঁহারা মনে করেন যে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত ভাগবত ধর্মের মর্ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহা আক্ষরিক ভাবে তাঁহার উক্তি নহে। ভক্তগণের নিকট ঐতিহাসিকদের কথার যাহাই মূল্য হউক না কেন, এই গীতায় যে পাঠান্তর ও প্রক্ষেপ আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।* অভিনব গুপ্ত (জন্ম ৯৫০—৬০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার শ্রীভগবদ্‌গীতার্থ সংগ্রহে কয়েকটি পাঠান্তর এবং কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা প্রচলিত গীতায় দৃষ্ট হয় না (দ্রষ্টব্য: ডক্টর কান্তিচন্দ্র পাণ্ডে রচিত "Abhinava Gupta", vol. I, pp. 52-55)। আমি এখানে একটি সুবিখ্যাত শ্লোকের পাঠান্তর উদ্ধৃত করিতেছি—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মাংশং সৃজাম্যহম্‌॥
(৪র্থ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক)

প্রচলিত পাঠ "আত্মানং"।

এখন বিচার করিতে হইবে এই দুই পাঠের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত পাঠ। আমাদের মনে রাখিতে হইবে "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।"

"আত্মানং সৃজাম্যহং" পাঠে ভগবানের পূর্ণাবতার বুঝাইতে পারে (আত্মাকে অর্থাৎ মহাত্মাকে প্রেরণ করি—এ অর্থও হইতে পারে) কিন্তু "আত্মাংশং সৃজাম্যহং" পাঠে ভগবানের অংশাবতার বুঝাইবে। এখন দেখা যাউক মহাভারতে এবং অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বলরামের ন্যায় অংশাবতার বলা হইয়াছে কিনা।

মহাভারতে—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশে মানুষেষ্বাসীদ্‌ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্‌।

অনুবাদ—

যিনি নারায়ণ নামে সনাতন দেবদেব, প্রতাপশালী বাসুদেব মনুষ্য মধ্যে তাঁহার অংশ ছিলেন। (আদিপর্ব ৬৭।৭১।)

পুনশ্চ মহাভারতে—

স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত, একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্‌।
তৌ চাপি কেশাবিশতাং যদুনাং
কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ।
তয়োরেকো বলভদ্রো বভুব,
যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভুব,
কেশে যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ।
(বৈবাহিক পর্বাধ্যায়)

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—

"নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুক্লকেশ বলদেব রূপে আর কৃষ্ণকেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব বলে।"

ভাগবতে—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ, ক্লেশ ব্যায়ায় কলয়া
সিতকৃষ্ণ কেশঃ।
জাতঃ করিষ্যাতিজনানুপলক্ষ্য মার্গঃ, কর্মাণি চাত্মমোহি-
মোপনিবন্ধনানি। ২।৭।২৬

বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুবাদ—

"অনন্তর ভগবান্‌ নারায়ণ অসুরাবতার রাজাদিগের সেনা দ্বারা বিমর্দিত পৃথিবীর ক্লেশ হরণের নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশস্বরূপে রামকৃষ্ণ রূপ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মহিমাব্যঞ্জক নানা কার্য্য করিলেন।"

---

* I think, too, that the original Bhagavadgita was much shorter and that the work in the present form contains many more interpolations and additions than are assumed by Garbe (Winternitz, "A History of Indian Literature", Vol. I, p. 436).

বিষ্ণু পুরাণে—

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে ॥৫৯
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥৬০

বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুবাদ—

"হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া, আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার জন্য ক্লেশ অপনয়ন করিবে।"

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি অংশাবতার হন, তবে গীতায় নিম্ন উদ্ধৃত শ্লোক ও তৎসদৃশ শ্লোকগুলি যাহা পরমব্রহ্মের প্রতি প্রযোজ্য, কিরূপে তাঁহার উক্তি হইতে পারে?

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭।৭

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই! সূত্রে মণি সকল যেমন গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতে সর্ব (বিশ্ব) গ্রথিত রহিয়াছে—

ইহার উত্তর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অনুগীতায় প্রদান করিয়াছেন।

ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।১২
পরং হি ব্রহ্মকথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।১৩

(এক্ষণে) পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে বলিতে সক্ষম নহি। আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়া সেই পরমব্রহ্ম (প্রত্যাদিষ্টবাণী) কহিয়াছিলাম। (মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব, ১৬ অধ্যায়)।

বেদান্তদর্শনেও সূত্রিত হইয়াছে যে, জীবের মুখে পরম ব্রহ্মের বাণী উচ্চারিত হয়।

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধ ভূমা হ্যস্মিন্। ১।১।২৯

শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতুপদেশো বামদেববৎ। ১।১।৩০

এই দুই সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে যে ইন্দ্রের উক্তি আছে "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব" (আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা, এইরূপ জ্ঞানে আমি যে আয়ু ও অমৃত আমার উপাসনা কর) এবং শ্রুতিতে যে বামদেবের উক্তি আছে—"অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ" (আমি মনু ও সূর্য হইয়াছিলাম) তাহা পরমব্রহ্ম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

এইরূপ মতবাদ ইসলামীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রেও (সুফীমতে) স্বীকৃত হইয়াছে। বিখ্যাত সুফীসাধক মৌলনা রুমী তাঁহার মসনভী গ্রন্থে বলিয়াছেন—

মর্দানে খুদা খুদা না বাশদ্।
ওলয়কিন্ আয্ খুদা জুদা ন বাশদ ॥
গুফ্তঃ-এ-উ, গুফ্তঃ-এ-আল্লাহ্ বুওদ্।
গরচি দর্ হুলকুমে, আব্দুল্লাহ্ বুওদ্ ॥

মর্মার্থ: খোদার লোক খোদা হন না। কিন্তু খোদা হইতে পৃথকও হন না, তাঁহার উক্তি আল্লাহের উক্তি, যদিও মানুষের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত।

প্রসিদ্ধি আছে যে, সুফীসাধক মনসুর হল্লাজ (তাপস-মালা দ্রষ্টব্য) "আনাল্ হক" (আমি সত্য খোদা) বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মবিদ্। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মতুল্য" হন ("ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি") ইহা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৭) উক্ত হইয়াছে যে, আঙ্গিরস ঘোর মুনি দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাভারতের মোক্ষ পর্বে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ উপমন্যু মুনির নিকট হইতে দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত ২৮টি আগম শিক্ষা করিয়াছিলেন। হরিবংশে কথিত হইয়াছে যে, দুর্বাসা মুনি শ্রীকৃষ্ণকে চৌষট্টিটি অদ্বৈত আগম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইহা পরবর্তী মত। উপনিষদে পূর্ণাবতারবাদ উপদিষ্ট হয় নাই, ইহা অনেক মনীষীর মত। ধর্মের ইতিহাসে পূজ্যপাদ ধর্মপ্রবর্তকগণকে পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরের সমতুল্য জ্ঞানে পূজা-অর্চনার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

গুরুদক্ষিণা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭

ব্রজবিহারী বাবু এসে যা দেখলেন—তাতে শঙ্কিত না হয়ে পারলেন না। সমস্ত আসরটা যেন থম্ থম্ করছে। একটা বিস্ফোরণ যেন আসন্ন। সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ মাঝখানকার সবচেয়ে বড় টেবিলটার উপর। খানকয়েক হাইবেঞ্চ জুড়ে টেবিলটি সাজানো হয়েছিল। অন্ততঃ জনচল্লিশেক অতিথির বসবার ব্যবস্থা টেবিলটিতে। নবগ্রামের বিশিষ্ট হিন্দুরা ওখানে বসবেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। কয়েকজন বৈদ্য কায়স্থও আছে। নিতান্ত গোঁড়া যাঁরা—যাঁরা স্বজাতি ছাড়া—উচ্চই হোক আর নিম্নই হোক—কারুর সঙ্গেই এক পংক্তিতে বা টেবিলে খাবেন না—তাঁদের জন্য অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ওপাশে মুসলমানদের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে। সাজানো-গোছানোতে কোন তারতম্যই নেই। তবুও গোলাম এসে এই মাঝের টেবিলে বসেছে।

মৌলবী জিয়াউদ্দিন সাহেব গোলামকে বলেছিলেন—ইদিকে গোলাম। আমাদের জায়গা ইদিকে।

গোলাম হেসে বলেছে—আপনাদের মোল্লা-মৌলবী গোঁড়ামি আমার নাই মৌলবী সাহেব। আমি এইখানে সবার সঙ্গে বসব। ইখানে ত দেখি বামুন-বদ্যি কায়েত সব একসঙ্গে বসেছে। মুর্গীর কোর্মার সঙ্গে চচ্চড়ি, পোলাওয়ের উপর লুচি—ইখানে ডবল ব্যবস্থা।

মৌলবী বলেছিলেন—কালীথানের কাটা পাঁঠার সুরুয়াও পড়বে। তাও খাবি তুই ?

—তা খাব। আপনি ইখান থেকে সরে থাকবেন, দেখবেন না—তা হলেই হবে। দেশের নতুন হালচাল মৌলবী সাহেব—এখন আর উসব কথা তুলবেন না।

— কিন্তু উঁয়াদের মধ্যে যদি কারুর আপত্তি থাকে—

—বলুন সে কথা। উঠে যাই।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে সে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। কেউ কিছু বলে কিনা তার প্রতীক্ষা করেছিল। বলতে কেউ কিছু পারে নি, কিন্তু মুখ সকলেরই থমথমে হয়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড একটা ক্ষোভের আভাস ছিল সেই থমথমে ভাবের মধ্যে। শুধু যেন গতিহীন হয়ে আছে। কাল-বৈশাখীর অপরাহ্নের পশ্চিম আকাশের মেঘের মত। শুধু ঝড়ের অভাবে গতিহীন-স্থির, ঝড় উঠলেই বিদ্যুৎ বিকীর্ণ করে আকাশ ছেয়ে ফেলবে।

গোলাম আবার বলেছিল—এই দেখুন সব চুপ করে আছেন। কেউ না বলেন না। সেই বঙ্গবিভাগের কাল থেকে ওঁরা বলে আসছেন—হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই। সে কি মিছা বলেছেন ওঁরা! না, কি বলছেন ছোটবাবু।

ছোটবাবু অর্থে ইস্কুলের সেক্রেটারী পবিত্রবাবু।

পবিত্রবাবু এদিক দিয়ে উদার লোক, জাতিভেদের কোন সংকীর্ণ সংস্কারই তাঁর নেই। সায়েব-সুবার সঙ্গে প্রকাশ্যেই তিনি একরকম খাওয়া-দাওয়া করে থাকেন। কিন্তু আর একটা ভেদ তিনি মানেন। সে ভেদটা পদস্থতার ভেদ। তিনি খ্রীষ্টান-মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে একসঙ্গে খান, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সিডিউল কাস্টের এম-এল-সির সঙ্গে খান, কিন্তু তাই বলে তাঁর প্রজা—এবং উদ্ধতচরিত্র এই গোলাম হোসেনের সঙ্গে খেতে পারেন না। সিডিউল কাস্টের কোন সাধারণ জনের সঙ্গে খাবেন না। শিক্ষায় সম্মানে পদস্থতায় যিনি তাঁর সমশ্রেণী তাঁর সঙ্গে খাবেন

তিনি—অন্য কারুর সঙ্গে নয়। স্বজাতি সমবর্ণ বলে তিনি তাঁর বাড়ীর রাঁধুনী-বামুন বা গোমস্তার সঙ্গে খাবেন না। পবিত্রবাবু ছাড়া আরও যাঁরা ছিলেন—তাঁদেরও মনোভাব তাই। তা ছাড়াও এ ক্ষেত্রে আরও একটু কিছু ছিল। এটি ঠিক পার্টি নয়, ডিনারও নয়, এটিতে সামাজিক সংস্পর্শ যেন একটু বেশী হয়েছে পার্টির চেয়ে।

পবিত্রবাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন—গোলামের বাচালতায়।

গোলাম কিন্তু ঠিক বাচালতা করে নাই। বেশী কথা সে বলেছে এটা ঠিক, প্রগলভতাও ছিল—তাও সত্য তবু ঠিক বাচালতা সে করে নাই। জীবনে সে অভ্যুদয়ের স্বাদ পেয়েছে। সে স্বাদের নেশায় এবং পুষ্টিতে সে সবল ভাবে মাথা তুলতে চায় স্বাভাবিক ভাবেই। সকলের সঙ্গে সমান হয়ে এই জাগরণের ক্ষণে একসঙ্গে পথচলার আকাঙ্ক্ষার প্রেরণাও তার ছিল।

ব্রজবিহারী ভাবছিলেন—তিনি গিয়ে গোলাম হোসেনকে অনুরোধ করবেন কিনা। এদিকে হিন্দুমহলে গুঞ্জন উঠতে সুরু হয়েছে।

এ কি অন্যায় ?

ওদিকে মুসলমানদের চোখের দৃষ্টিও যেন আসন্ন অপমানের আশঙ্কায় নির্নিমেষ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময়টিতেই পিছন দিকে শিবনাথের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন ব্রজবিহারী বাবু।

"—আপনাদের সকলের কাছে আজকের অপূর্ব্ব এই প্রীতি-সম্মেলনে আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

শিবনাথ একখানা চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আবার সে বললে—পুনরাবৃত্তি করলে কথাটি। বার-দুয়েক তার কণ্ঠস্বর—বক্তব্য সমবেত জনতার গুঞ্জনের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু শিবনাথ থামলে না। তৃতীয় বারেই সকলের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হ'ল। তার পরই একটি মুহূর্ত্ত এল, স্তব্ধতার মুহূর্ত্ত।

শিবনাথ সেই মুহূর্ত্তে আরম্ভ করলে জাতিভেদ শ্রেণীভেদ ধর্ম্মবিদ্বেষের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা। দীর্ঘ সে করলে না, তীব্রও কিছু বললে না। বললে এ অন্যায়, এ গত যুগের মনোভাব। সে যুগ পার হয়েছি আমরা। সকলে পারি নি। কতক পারি নি—কতক পেরেছি। আসুন, আমরা যারা, হিন্দু মুসলমান ইহুদী খ্রীষ্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ পারসীক, ধর্ম্ম-ভেদে মানুষে মানুষে ভেদ আছে বলে মানি নে, যারা ধর্ম্ম এবং জীবন বিশ্বাসকে কাচের বাসনের মত ভঙ্গুর বলে মনে করি নে—তাঁরা সকলে মিলে আসুন একটি আলাদা খাবার আসর পাতি। বিরোধ আমরা চাই নে। যাঁরা যা মানেন মানুন। আমরা যা মানি সে মেনেই চলি। আমাদের আসরে হোষ্ট হবেন আমাদের পূজনীয় আগেকার এসিস্টাণ্ট হেড মাষ্টার ব্রজবিহারী বাবু এবং চীফ গেষ্ট হবেন—শম্ভু গড়াঞী, যে ছাত্রটি এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইউনিভারসিটিতে ফার্স্ট হয়েছে তার দাদা। আর স্পেশাল গেষ্ট হবেন আমাদের বন্ধু গোলাম হোসেন।

তার পরই সে গোলামকে উদ্দেশ করে বললে—

—এস গোলাম, স্পেশাল গেস্ট বলে তোমার বসে থাকলে চলবে না। এস, সাহায্য কর আমাকে। আমাদের টেবিল-চেয়ার আমরাই পেতে নেব। এস।

গোলাম প্রসন্ন চিত্তেই ও টেবিল থেকে উঠে এল।

শিবনাথের বলার ভঙ্গি এবং বক্তব্যের মধ্যে আশ্চর্য্য একটি প্রসন্ন অথচ দীপ্ত হৃদয়ের স্পর্শ ছিল। যে স্পর্শটি আকস্মিক সমাগত কোন স্নিগ্ধ শীতল বাতাসের ঝলকের মত কালবৈশাখীর বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জকে শান্ত এবং ক্ষান্ত করে দিয়ে আসন্ন বিপর্য্যয়টাকে দূরে সরিয়ে দিলে ; এবং উল্টে দিগন্তের সন্ধ্যা-সূর্য্যের শেষ রাঙা আলোকে নিজের বুকে প্রতিফলিত করে একটি রঙ্গসন্ধ্যার বাসর সাজিয়ে দিলে।

ব্রজবিহারী বাবু অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শিবনাথকে বললেন—আমি প্রার্থনা করছি যেন তোমরা এমনি করেই সকলে মিলে সকল দ্বন্দ্ব এবং বাধাবন্ধ অতিক্রম করে নতুন দিনের সমাজ গড়ে তুলতে পার।

সুর সকল জনের মনেই লেগেছিল। পবিত্রবাবু খেলেন ও টেবিলে বসে, কিন্তু খাওয়ার পরে এসে এই টেবিলে ব্রজবাবুর পাশে একখানা চেয়ার নিয়ে বসে বললেন, শিবনাথ, তুমি আবৃত্তি কর। ওই কবিতাটি আবৃত্তি কর—হে মোর চিত্ত—পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে।

শিবনাথ ছেলেবেলা থেকেই ভাল আবৃত্তি করে।

শিবনাথের আপত্তি নাই কিছুতে। সে দাঁড়িয়ে উঠল।

আবৃত্তি শেষ করে বসে সে বললে—রবি একটা ইংরেজী আবৃত্তি করুক। বলুন ওকে।

পবিত্রবাবু প্রশ্ন করলেন—রবি ?

—আমাদের এখানে পড়ত। এবার এম-এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। অঙ্কে অবশ্য ও ভালই বটে, কিন্তু ইংরেজীতেও কম ভাল নয়। আর অভিনয় করতে পারে সবচেয়ে ভাল। বিশেষ করে ইংরেজী নাটকে অভিনয় করবার ঝোঁক খুব।

হেসে বললে—তার উপর ওর ওই সুন্দর চেহারা। ইউরোপ-আমেরিকা হলে ও চলে যেত ষ্টেজে কিংবা ফিল্মে। কিন্তু আমাদের দেশে তা ত হবে না। অভিনয় করতে গেলেই বদনাম। এ যুগে শিশিরবাবু, নরেশবাবু, তিনকড়ি-

বাবু, অহীনবাবু, দুর্গাদাসবাবু থিয়েটারে নেমেও এখনও জাতে তুলতে পারেন নি। নাও রবি, তুমি একটা আবৃত্তি কর।

রবি সারাক্ষণটাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। সে যেন মুহ্যমান হয়ে গেছে। মৃদু স্বরে সে বললে—শরীরটা আমার ভাল লাগছে না ভাই।

শিবনাথ বললে—তা না হয় একটু কষ্ট হ'ল তোমার। আমরা ত আনন্দ পাব! ওঠ-ওঠ। তুমি সেই রোমিওর পার্ট করেছিলে স্কটিশে—রোমিওর সেই জায়গাটা—

It is the east and Juliet is the Sun—

রবি একটু চুপ করে থেকে বললে—না, ও জায়গাটা নয়, আমি অন্য জায়গা থেকে আবৃত্তি করছি। লাষ্ট সিন রোমিওর—লাষ্ট পিস—How aft when men are at tne point of death—ওখান থেকে সুরু করছি।

রবি সত্যই সুন্দর আবৃত্তি করে। তার কণ্ঠস্বর ভরাট—তার সঙ্গে মাধুর্য্য আছে। উচ্চারণও চমৎকার। আকাশের দিকে মুখ তুলে উদাস কণ্ঠস্বরে সে আবৃত্তি আরম্ভ করলে।

Have they been merry!
Which their keepers call
A lightning before death. O, how may I
Call this a lightning.
O my love my wife
Death, that hath suck'd the
honey of thy breath,

শ্রাবণ-রাত্রির বাতাসের মধ্যে সজল স্পর্শের মত একটি বেদনার্ত্ততা ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতার চিত্ত বেদনায় সকরুণ হয়ে ওঠে। যারা ইংরেজী জানে না, কম জানে অর্থবোধ না হওয়া সত্ত্বেও তারাও অভিভূত হয়ে গেল। চারি পাশে ভিড় জমে উঠল। টেবিলের ধারে সর্ব্বাগ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন চন্দ্রবাবু। তাঁর চোখ দুটি আনন্দের দীপ্তিতে ঝলমল করছে। তাঁর ছাত্র এমন আবৃত্তি করছে? তা ছাড়া সেক্সপীয়রের কাব্যামৃত-ধারা পানের আনন্দ! এ শুনলে জীবনে যেন ঝঙ্কার উঠে। সঙ্গীতঝঙ্কার!

রবির আবৃত্তি শেষ হতেই চন্দ্রবাবু গিয়ে তার পিঠে হাত দিলেন। মুখ তাঁর হাসিতে ভরে উঠেছে। বললেন—তুমি আর একবার এম-এ এগজামিনেশন দাও—ইংরেজীতে।

রবি একটু হাসলে। কোন উত্তর দিলে না।

ব্রজবিহারী বাবু বললেন—তাই ত বাংলা ইংরেজী দুই হ'ল—সংস্কৃত আবৃত্তি কেউ করতে পারে না? কৈ হেড-পণ্ডিতমশাই কৈ? ছেলেরা যদি না পারে ত পণ্ডিতমশাই কিছু শোনান আমাদের। কৈ পণ্ডিতমশাই?

পবিত্রবাবু বললেন—মন্দ হয় না। পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত আর মৌলবী সাহেব ফারসী. কালিদাস আর হাফেজের বয়েৎ।

—ডাক, ডাক পণ্ডিতমশায় আর মৌলবী সাহেবকে ডাক—শিবনাথ ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললে।

ছেলের দল উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দানুষ্ঠানের আস্বাদন তারা সচরাচর পায় না। তার উপর শিবনাথ বলেছে। দেশসেবক শিবনাথ তাদের গোপন মনে অনেক আগে থেকেই গুরুর আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কয়েকজনেই ছুটে চলে গেল।

—পণ্ডিতমশাই! মৌলবী সাহেব!

ব্রজবাবু বললেন—ওঁরা আসতে আসতে শিবনাথ কিংবা রবি তোমাদের কেউ আর একটা আবৃত্তি কর।

শিবনাথই আবৃত্তি করলে—ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর। এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

ছেলেরা ফিরে এসেছিল আবৃত্তির মধ্যেই; তারা পণ্ডিত-মশাইকে পায় নি। আবৃত্তি শেষ হতেই বললে—পণ্ডিত-মশাই চলে গেছেন।

চন্দ্রবাবু বিস্মিত হলেন—চলে গেছে? কখন? কৈ তাঁকে ত কিছু বলেন নি! এই ত গণ্ডগোলের সূচনার সময়েও রামজয় ছিলেন। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন রামজয়; বলেছিলেন, এই সর্ব্বনাশের ভয়েই আমি তোমাকে বারণ করেছিলাম চন্দ্র। একসঙ্গে একদিনে এক আসরে খাবার ব্যবস্থা করো না। করো না।

শিবনাথের বক্তৃতার সময়েও ছিল। সেই সময়েই চন্দ্রবাবু আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রায় পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে এসে-ছিলেন রামজয়কে পিছনে ফেলে। তার পর আর রামজয়ের খোঁজ করেন নি। ভুলে গিয়েছিলেন। বিচিত্র ভাবে আসন্ন বিপর্যয় ক্ষান্ত হয়ে এমনই মনোরম মাধুর্য্যময় একটি পরিবেশের আবির্ভাবে তিনি আনন্দে ভুলে গিয়েছিলেন রাম-জয়ের কথা। সে চলে গিয়েছে। নিশ্চয় সে খেয়েও যায় নি। হয়ত বা নিজের বিশ্বাসে আঘাত খেয়ে মর্ম্মাহত হয়ে চলে গিয়েছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন চন্দ্রবাবু। তার পরই হঠাৎ বললেন—তা হলে এখানেই থাক মাষ্টার-মশাই। রাত্রি কম হয় নি। শিবনাথ তুমি একটু দাঁড়াও।

শিবনাথকে ডেকে বললেন—তুমি আজ যা করেছ তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আজ তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।

শিবনাথ একটু হেসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

চন্দ্রবাবু বললেন—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তোমাকে কিছু বলতে চাই আমি।

—কাল আসব আমি।

—না, আমি যাব। আমি যাব তোমার ওখানে। তোমার স্কুল-বোর্ডিঙে আসাটা ঠিক হবে না। পুলিশের এখন বড় কড়াকড়ি। আমি যাব।

রবি সিং এসে দাঁড়াল।

—রবি! কিছু বলবে?

চন্দ্রবাবুকে প্রণাম করে রবি বললে—আমি এইবার যাব, স্যার।

—যাবে? এই রাত্রে কোথায় যাবে? না-না। তোমার শোবার ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়েছে। যতদূর জানি—শম্ভু তার নিজের ঘরে শোবার ব্যবস্থা করেছে।

—আমি শিবনাথের বাড়ীতে যাচ্ছি। ওখানেই আমার গাড়ী রয়েছে। ভোরবেলা রওনা হয়ে যাব। আর শিবনাথ রাজী হলে এই রাত্রেই গাড়ী ছেড়ে দেব, রাত্রে রাত্রে দিব্যি চলে যাব।

ভোরবেলা ব্রজবিহারী বাবু শিবনাথের বাড়ী এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকলেন—শিবনাথ! শিবনাথ! শিবনাথ তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। প্রায় সমস্ত রাত্রিটাই রবির সঙ্গে গল্প করেছে। প্রায় রাত্রি তিনটের সময় রবি তার গাড়ী ছেড়েছে। ক্রোশ তিনেক পথ, সাতটা বেলা হতে হতে সে বাড়ী পৌঁছে যাবে। সে আর শোয় নি।

শিবনাথকে ডেকে দিলেন তার মা।

—শিবনাথ বেরিয়ে এল। কি স্যার! এই ভোরবেলা? ও—এই ভোরের ট্রেনে চলে যাচ্ছেন বুঝি?

—না। কিন্তু রবি কোথায়?

—রবি? সে ত চলে গেছে স্যার। সমস্ত রাত্রিই আমরা গল্প করেছি। রাত্রি তিনটের সময় আমি শোবার জন্তে উঠলাম—ও বললে আমি আর শোব না ভাই, গাড়ীতেই শুই—গাড়ী চলুক, সাতটা নাগাদ বাড়ী পৌঁছে যাব।

—চলে গেছে রবি? ব্রজবিহারী বাবুর কণ্ঠস্বরে হতাশা ফুটে উঠল।

শিবনাথ বললে—মাষ্টার মশাইকে বঙ্গবালার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে রাজী করুন স্যার। রবি বঙ্গবালাকে বিয়ে করতে চায়, সত্যি ভালবাসে। সমস্ত রাত্রি আমার সঙ্গে ওই কথাই বলেছে। এত তাড়াতাড়ি চলে গেল ওই জন্তেই। ওর বাবা মাকে বলবে, রাজী করবে, লোক পাঠাবে স্যারের কাছে। স্যার যেন ফিরিয়ে না দেন।

ব্রজবাবু স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। শিবনাথের কথা শেষ হয়ে গেল, তবুও স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

শিবনাথ বিস্মিত হ'ল এবার। ব্রজবিহারী বাবুর মুখে-চোখে যেন অপরিসীম বেদনার ছায়া পড়েছে। সে বেদনা যেন ফেটে পড়তে চাচ্ছে; প্রাণপণে তিনি আত্মসম্বরণ করে রয়েছেন। কিন্তু তাও পারছেন না; দুই চোখের কোণ থেকে দুটি জলধারা নেমে আসছে। এসেছে আগেই, হাই-পাওয়ার চশমা সীমারেখা পার হওয়ার পর শিবনাথ দেখতে পেলে। সে এবার উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে স্যার? স্যার?

—বঙ্গবালা—

—কি স্যার?

—সে বিষ খেয়েছে শিবনাথ।

—বিষ খেয়েছে?

—হ্যাঁ। কল্কে ফুলের বীজ। একটু চুপ করে থেকে আত্মসম্বরণ করে বললেন—কাল রাত্রে তোমরা সকলে চলে এলে—আমি মাষ্টার মশাইয়ের ওখানে গেলাম। ওই কথাটাই বলতে গেলাম। রবির ওই আবৃত্তি শুনে আমার মনে হয়েছিল—ওগুলি ওরই প্রাণের কথা। নইলে দুঃখের এমন সুর ফুটে উঠত না। আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম বঙ্গবালা কোথায়? কারণ ওর সামনে বা ওকে শুনিয়ে এ আলোচনা করতে আমি চাই নি। শুনলাম—সে শুয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালবেলা পায়ের আঙুলে হঁচোট খেয়ে নখ উঠে গিয়েছিল, সন্ধ্যেবেলা থেকে সেটাতে খুব বেদনা হয়।

চুপ করলেন ব্রজবিহারী বাবু। তার পর বিষণ্ণ হেসে বললেন—ওটা তার ছুতো। মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী ভালমানুষ লোক, কিছু সন্দেহ করেন নি। বললেন—বঙ্গবালার গায়ে হাত দিয়ে মনে হয়েছিল তাঁর যে, যেন কপালটা একটু গরমও ঠেকছে। নইলে আমরা যখন চা খেলাম—বঙ্গবালা যখন আমাদের পরিবেশন করলে—তখনও ত তাকে এতটুকু খোঁড়াতে দেখি নি! ওটা বঙ্গবালা বোধ হয় কাঁদবার জন্তেই অজুহাত তৈরি করেছিল। রবিকে ভালবাসা সেও ভুলতে পারে নি। যাই হোক—বঙ্গবালা ঘুমিয়েছে জেনে আমি মাষ্টার মশায়ের কাছে কথাটা পেড়েছিলাম। মাষ্টার মশায় বললেন—ও কথাটা ভুলে যাওয়াই ভাল ব্রজবাবু। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি বঙ্গবালাকেও জিজ্ঞাসা করেছি। সেও হাসিমুখে বলেছে আমাকে। আমার ছেলে নেই, ওই আমার ড্রিম—আমার স্বপ্ন সফল করবে। ওকে আমি এম-এ পাস করাব। প্রফেসরী করবে। না হয় ত—বি-এ পাস করে এখানে গার্লস হাই স্কুল করবে।

আমি এখানে প্রথম হাই স্কুল করেছি—ফর দি বয়েজ। আমার মেয়ে করবে হাই স্কুল ফর দি গার্লস। দিস ইজ মাই ড্রিম। তা ছাড়া—আরও একটা কথা তিনি বললেন। কথাটা আমি একেবারে ফেলে দিতে পারলাম না শিবনাথ।

—উনি বললেন—দেখুন ব্রজবিহারী বাবু, রবির মত ছেলের সঙ্গে বঙ্গবালার মত মেয়ের বিয়ে হওয়াও উচিত নয়। রবি রাজী হলেও দেওয়া উচিত নয়। রবি রূপবান ছেলে—গুণবান ছেলে, অবস্থাও ওদের ভাল। বঙ্গবালা আমার কালো মেয়ে। আমি গরীব শিক্ষক। আজ হয় ত একটা ইমোশনের বশে রবি বঙ্গবালাকে বিয়ে করতে চাইলেও চাইতে পারে। চাইবে না বা চায় না বলেই আমার ধারণা। আপনি যেটা বলছেন সেটা আপনার অনুমান মাত্র। আবৃত্তি ভাল যারা করে তারা হাসির কথায় হাসায়, দুঃখের কথায় কাঁদায়। ওর আবৃত্তি আবৃত্তিই শুধু। যদি আপনি যা বলছেন তাই হয়—তবে সেটা একটা সাময়িক ব্যাপার—টেম্পোরারী ইমোশন। এখন সেইটের বশে বিয়েও হয় ত করতে পারে রবি। কিন্তু এর পর—সমস্ত জীবনটা পড়ে থাকবে। রবি বিলেত যাবে। হয় ত ব্যারিষ্টার হয়ে আসবে। কিংবা একটা বড় চাকরে। হয় ত আই-সি-এস। তার পর বঙ্গবালার কালো চেহারার জন্যে ও লজ্জিত হবে অন্য সব বন্ধুবান্ধবদের কাছে। হয় ত এমন একজন কৃতী পুরুষ রূপবান ইয়ংম্যানকে দেখে অন্য মেয়েদেরও মন চঞ্চল হবে। এ সব সোসাইটির অনেক কথাই ত শোনা যায়! তখন? তখন ব্রজবিহারী বাবু—ওর অবস্থা কি হবে ভেবে দেখুন! বললেন—ব্রজবাবু, আই হ্যাড মাই স্যাড এক্সপিরিয়েন্স। আমার ইস্কুল জীবনে আদর্শ ছিল—আমার এক বন্ধু। সে বলত—তার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ। গীতা ছিল তার কণ্ঠস্থ। অনেক কৃচ্ছ-সাধন সে করত। আমাদের আমলের ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে। আমাদের আমল কেন—সকল আমলের ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেদের একজন সে। তাকে দেখলাম—ইংরেজ প্রোফেসরের মেয়েকে দেখে পাগল হ'ল। ক্রীশ্চান হয়ে বিলেত গেল। বাপ ছাড়লে মা ছাড়লে জাত ছাড়লে। আই-সি-এস হয়েছেন। এ সব ছেলেকে আমি ভয় করি ব্রজবিহারী বাবু। রবিকে আমার আরও ভয়—সে রূপবান। এ কথা ভুলে যান। এ কথা না তোলাই ভাল। বিয়ে দিলে—সেকালেই দেওয়া উচিত ছিল। রবি এখন আমাদের নাগালের বাইরে। রবি নিজে উপযাচক হয়ে বললেও এ বিয়ে আমি দেব না।

—ফিরে ঘুরে আবার বললেন—বাপের কাছে ছেলেরা অনেক কিছু—ব্রজবাবু। বঙ্গবালা আমার ছেলের মত। না হয় আমার জন্যে কষ্ট করবে। আমি উঠে চলে গেলাম। শুলাম। সকলেই শুলেন। এর মধ্যে বঙ্গবালা কখন উঠেছে, বাসার পাশেই কল্কে ফুলের গাছ আছে—সেখান থেকে ফল পেড়ে সেই গাছতলাতেই ভেঙে বীজের ভিতরের শাঁসগুলো বের করে তেল মেখে—ঘরে এসে—'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' বলে একখানা চিঠি লিখে—আর একখানা বাবাকে লিখে—শুয়ে পড়েছে। ভোরবেলা গোঙানি শুনে মাষ্টার মশায়ের স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়, তিনি মাষ্টার মশাইকে ডেকে তোলেন। তার পর দরজা ভেঙে দেখা গেল সব। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। চেষ্টাও চলছে। কিন্তু অবস্থা দেখে আমার ভাল লাগল না। বাঁচবে না। বাপকে চিঠি লিখেছে, "বাবা আমি আপনার অযোগ্য কন্যা। আপনার স্বপ্ন সফল করবার শক্তি যে আমার নাই। একথা কোন মুখে—কেমন করে আমি বলব? অথচ তাকে নইলেও আমি বাঁচব না। তাই আমি বিষ খেলাম। এ আমার বড় লজ্জা। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।" তাই আমি ছুটে এলাম। রবিকে যদি পাই।

ম্লান হেসে বললে—তাকে পেয়ে কি হবে জানি না, তবে ছুটে এলাম। সে চলে গেছে!

—মাষ্টার মশাই? শিবনাথ প্রশ্ন করলে। তিনি?

—পাথর। পাথর হয়ে গেছেন চন্দ্রবাবু।

ক্রমশঃ
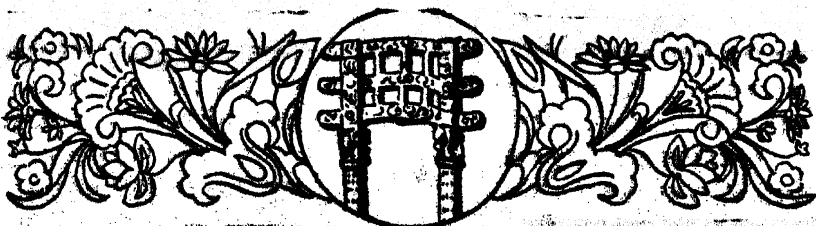
বিষকন্যা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[এককালে এ দেশে রাজনৈতিক কারণে কোন বিশেষ গুপ্ত প্রক্রিয়ার মারাত্মক বিষ প্রয়োগে সুন্দরী নারীর দেহ এরূপ ভাবে বিষাক্ত করা হইত যাহাতে সে-দেহ সম্ভোগকারীর অবিলম্বে মৃত্যু ঘটিত। এই অপরূপ সুন্দরী নারী রাজানুগ্রহ-পালিতা ও "বিষকন্যা" নামে অভিহিতা হইতেন।]

রাজন, দাসীরে কেন বল, দিতে লাজ
পাঠালে এ অভিসারে
রাজ-অতিথির দ্বারে?
লেপিয়া অঙ্গে কুঙ্কুম-চন্দন
তুলিয়া চরণে মঞ্জীর-শিঞ্জন
সাজায়ে কুসুমে চারু-বেণী-বন্ধন
আঁকিয়া নয়নে কজ্জল-রেখাটিরে
গরল-কুম্ভ সুধা-ছলনায় ভরি'
গিয়েছিনু দিতে উন্মুখ পিয়াসীরে।

মিলন-ব্যাকুল বিলাস-লীলার ছলে
সে-হাতে রেখেছি হাত,
কেঁপেছে মাধবী রাত!
প্রথম-প্রণয়-স্বপন-বিভোর তৃষিত চোখ
মোর তনুমাঝে দেখেছে নূতন স্বর্গলোক,
ভেবেছিনু মনে এ দেহ-পণ্য ধন্য হোক্
তাহারি পরশে তরুণ বক্ষতলে,
বলেছি তাহারে প্রণয়-বিভোল বাণী
মধুগুঞ্জনে মোহ-চুম্বন-ছলে—

"রূপ-বিহঙ্গী মেলিয়াছে তার ডানা,
ধরিবে না আজ তারে
কামনার অভিসারে?
তনুর পাত্র ফেনিল তপ্ত সুধায় ভরি
হে মোর তরুণ, তোমারি তরে যে রেখেছি ধরি,
কবরী-মালিকা আশ্লেষে তব পড়ুক ঝরি
ললাটে কপোলে মুছে যাক্ চন্দন,
পাওনি শুনিতে রূপ-হিন্দোলে মোর
উড়ায় দুকূল চঞ্চল যৌবন?"

একটি নিশার নিরালা মিলন হোক ক্ষণিক,
—তবু সে শুভক্ষণ
আমার পরম ধন!
অজানা মরণ আসিবে কখন সে নাহি জানে,
ভেসেছি দু'জনে কামনা-ফেনিল স্রোতের টানে,
বারে বারে তারে বেঁধেছি হিয়ায় মিলন-গানে
অসহ পুলকে মরণ-তীর্থ-তীরে,
তন্দ্রা-অবশ অচেতন তনুখানি
সারারাত আমি তনুতে রেখেছি ঘিরে।

হে রাজন্, আজ এ দেহ-শোণিতে মোর
করে শুধু ক্রন্দন
চির বিষ-বন্ধন!
রাজার নীতিতে নারীর নীতিতে প্রভেদ তাই,
সোনার বদলে দেহের বেসাতি নাহিক চাই,
গরল-সাগরে, হায় রে, অমৃত কোথায় পাই
প্রেম-বিহ্বল মোহ-চঞ্চল রাতে,
ব্যাকুলা ত্রিযামা শুকতারা পথ চাহি
শিহরি' উঠেছে বিদায়ের বেদনাতে!

তনুর প্রদীপে এ রূপশিখা কি জ্বলিবে শুধু
পতঙ্গ-দেহ মাগি
মরণ-আহুতি লাগি?
দেখাবে না পথ, দেখাবে না আলো অমানিশায়?
গৃহকোণে তারে দেবে না জ্বলিতে স্নেহছায়ায়?
একমুঠো সোনা শুধু বিষভরা তনুলীলায়
দিতে চাও তারে ঘৃণ্য এ প্রতিদানে?
প্রেমের দেউলে নারীরে ঘাতিকা করি'
রেখো না'ক আর অভিচার-অপমানে!

হিংসা-কুটিল রক্ত-ফেনিল এ রাজনীতি
জানি যে বিষক্ষরা,
চির-কলঙ্কভরা!
বিষকন্যারে হে রাজন্, আজ বিদায় দাও,
তব জয়রথে কোরো না সারথি, মিনতি নাও,
শাশ্বতী নারী করে ক্রন্দন শুনিতে পাও?
রূপ-পণ্যার জেগেছে প্রেমের ক্ষুধা,
গরল দিয়েছ তনু-যৌবনে ভরিয়া মোর,
মনোযৌবনে আজো যে ক্ষরিছে সুধা!

বারুইপুর ও বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীকালিদাস দত্ত

বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে বারুইপুর একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে পানচাষী বারুইজাতির বাস আছে। প্রবাদ তজ্জন্যই এই গ্রামটি ঐরূপ নামে প্রসিদ্ধ।১

প্রাচীনকালে আদিগঙ্গা নদী ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। উহা তখন কালীঘাট হইতে ক্রমশঃ বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, মাহিনগর, বারুইপুর, সূর্য্যপুর বা নাচনগাছা, মূলটি, দক্ষিণ-বারাসত, জয়নগর-মজিলপুর, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর ও ছত্রভোগ প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করতঃ সাগরদ্বীপের দক্ষিণে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িত।২ আজিও বারুইপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে উহার মজা গর্ভ কোথাও নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া, আবার কোথাও বা সঙ্কীর্ণ খালের আকারে বিদ্যমান আছে। উহারই উপর বারুইপুরের বর্ত্তমান হিন্দু শবদাহ-ক্ষেত্র কীর্ত্তনখোলা অবস্থিত।

আদিগঙ্গাতীরবর্ত্তী এই স্থানটির প্রাচীন ইতিবৃত্ত এখনও সংকলিত হয় নাই। সুন্দরবনের অন্তর্গত ২২ নম্বর লট ও দক্ষিণ-গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজা লক্ষ্মণসেন-দেবের দুইখানি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ ভূমিদান সনন্দ (তাম্রশাসন) হইতে জানিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, সেন রাজগণের শাসনকালে, উক্ত আদিগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ, তৎকালীন শাসন বিভাগ, বর্দ্ধমানভুক্তি ও পূর্ব্বতীরস্থ প্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অধীন ছিল।৩

দক্ষিণ-গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত উল্লিখিত তাম্রশাসনখানিতে আরও দেখা যায় যে, তদ্দারা মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেব বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বেতড্ড চতুরক নামক শাসন বিভাগে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিড্ডর-শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্ম্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। উহাতে ঐ গ্রামের নিম্নলিখিতরূপ চতুঃসীমা আছে।

উত্তরে—ধর্ম্মনগরী সীমা।
পূর্ব্বে—জাহ্নবী অর্দ্ধসীমা।
দক্ষিণে—লেংঘ দেব মণ্ডলী সীমা।
পশ্চিমে—ডালিমক্ষেত্র সীমা।৪
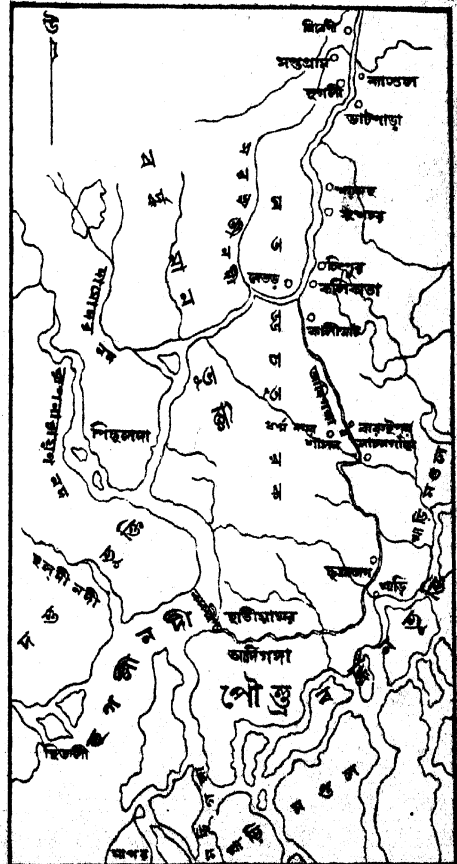
বর্ত্তমান সময় বারুইপুরের সংলগ্ন ও বারুইপুর মিউনিসি-

আদিগঙ্গাতীরে বারুইপুর
(প্রাচীন মানচিত্র হইতে)

1 Bengal District Gazeteer. 24 Parganas. P. 219. By L. S. S. O'Malley.

২। আদিগঙ্গা নদী। শ্রীকালিদাস দত্ত, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৯।

৩। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমানভুক্তি। শ্রীকালিদাস দত্ত, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, ১৩৪১।

4 Inscriptions of Bengal. Vol. III. Page 97. By N. G. Masumdar.

প্যাসিটির অধীন শাসন গ্রামের উত্তরে ধর্ম্মনগর[১] নামে একটি প্রাচীন জনপদ ও পূর্ব্বদিকে মজাগঙ্গা নামে জাহ্নবী নদীর শুষ্ক খাদ আছে। (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ঐ গ্রামটির শাসন নাম এবং উহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমার সহিত উল্লিখিত তাম্রপট্ট লিপিতে বর্ণিত গ্রামটির ঐ দুই দিকের সীমার ঐক্য দেখিলে ঐ জনপদটিই সেনরাজগণের আমলে বিড্ডর-শাসন অথবা উহার অংশ ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বারুই-পুরের নাম এনাগাৎ প্রাক্‌মুসলমান যুগের কোন লিপি বা গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যে, ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসানে, চাঁদ সওদাগরের আদি গঙ্গাপথে সিংহলে বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম উহার উল্লেখ দেখা যায়। যথা:

"কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালীকা পুজিয়া।
চুড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে॥
ছলিয়ার গাঙ্গ বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগে গিয়া রাজা চাপায় বুহিত॥"

উক্ত গ্রন্থ রচনার ৭৮ বৎসর পরে, ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিত হয়। উহা পাঠে বোধ হয়, সেই সময় বারুইপুরের কিয়দংশ আটিসারা নামেও অভিহিত হইত। ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুর হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গার তীরে তীরে পার্ষদগণসহ ছত্রভোগ-পথে নীলাচল গমন-কালে উক্ত আটিসারায় জনৈক বৈষ্ণবভক্ত শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের গৃহে একরাত্রি কীর্ত্তনানন্দে যাপন করেন। উহা এইরূপ:

"হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে॥
সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়॥
... ...
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতূহলে॥[১]

কিছুদিন পূর্ব্বে বারুইপুর বাজারের সান্নিধ্যে, মজাগঙ্গা-তীরে, শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের দারুময় বিগ্রহ একটি গৃহে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ বিগ্রহ দুইটির গঠনপদ্ধতি, আকার ও ভাবভঙ্গীর সহিত শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবকালে কালনা ও নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ বিগ্রহগুলির সাদৃশ্য দেখিলে, উহাদেরও গঠনকাল যে ঐ সময় তাহা বুঝিতে পারা যায়। উহা ভিন্ন ঐ স্থানটিতে যে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের ভিটা ছিল তাহারও অন্যান্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সে কারণ সেখানে বরানগর পাঠবাড়ী আশ্রমের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি মঠও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অধুনা ঐ মঠ ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অতি অল্পপরিসর স্থান আটিসারা নামে অভিহিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার আটিসারাকে একটি নগর ও গ্রাম বলিয়াছেন। উহা হইতে আটিসারা জনপদ যে, ঐ সময় আকারে বড় ছিল তাহা বুঝিতে পার যায়। তৎকালে বর্ত্তমান বারুইপুরের কিয়দংশ উহার অন্তর্গত থাকা সম্ভব।

এই সকল প্রাচীন বিবরণে বারুইপুর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের উক্ত প্রকার উল্লেখ ব্যতীত অন্য কোনরূপ পরিচয় নাই। অধুনা বারুইপুর মেদনমল্ল পরগণার অধীন। মুসলমান রাজত্বকালে শাসন-সৌকর্য্যার্থ যে সমস্ত পরগণা নামক বিভাগের সৃষ্টি হয় উহাও তন্মধ্যে একটি। আইন-ই-আকবরীতে প্রকাশিত রাজা তোডরমল্লের জমাবন্দীতে উহার উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে লিখিত আছে যে, ঐ সময় উহার নানাস্থানে জঙ্গল ছিল এবং বারুইপুরের জমিদার চৌধুরীবংশের পূর্ব্বপুরুষ দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে উহা সনন্দ পান।[২] তখন তাঁহাদের

১ মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেবের উল্লিখিত তাম্রশাসনখানি প্রাপ্তির স্থান দক্ষিণ গোবিন্দপুরের সন্নিকটে অবস্থিত, উক্ত শাসন গ্রামের উত্তরে ঐ ধর্ম্মনগর গ্রামটিও প্রাচীন। অধুনা উহা ধামনগর নামে অভিহিত। হাণ্টার সাহেব উহার এইরূপে পরিচয় দিয়াছেন,

"Dhamnagar is a village in Baruipur sub-division, which contains the house of a Hindu Raja, who drowned himself in order to escape being dishonoured by the Mohamadans, There is a tank in the village in the midst of which grows a pipal tree and the people have a tradition that it springs from the top of a temple buried beneath the water."

—Statistical Account of Bengal, Vol. I. Pages 120-121.

১ শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়

2 "It appears that a great part of Maidanmal Fiscal Division was formerly a dense jungle, overrun with wild beasts, and that the ancestor of the choudhuri zemindars obtained a grant of it from the Emperor of Delhi." Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. I. Page 119.
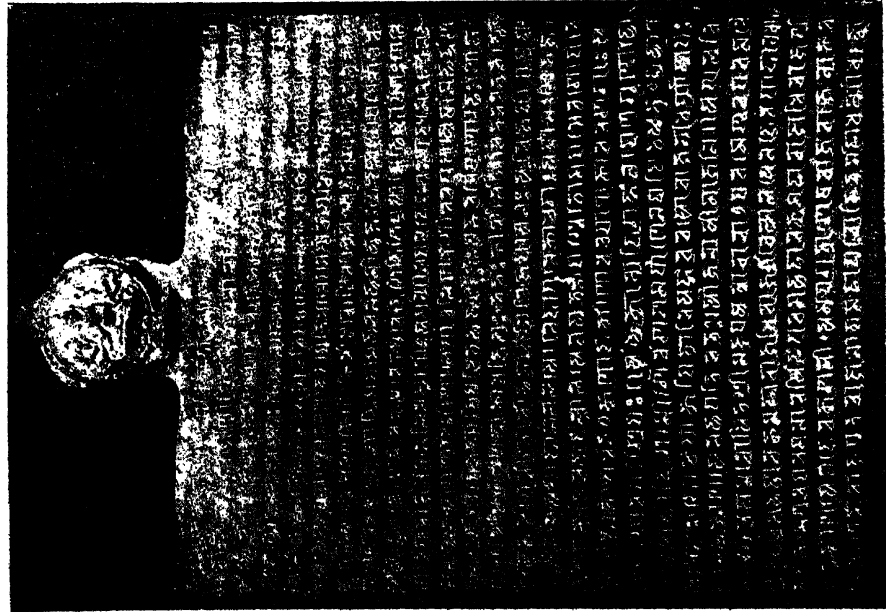
সোনারপুর থানার দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন : পশ্চাদ্ভাগ

সোনারপুর থানার দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজা লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন : সম্মুখভাগ
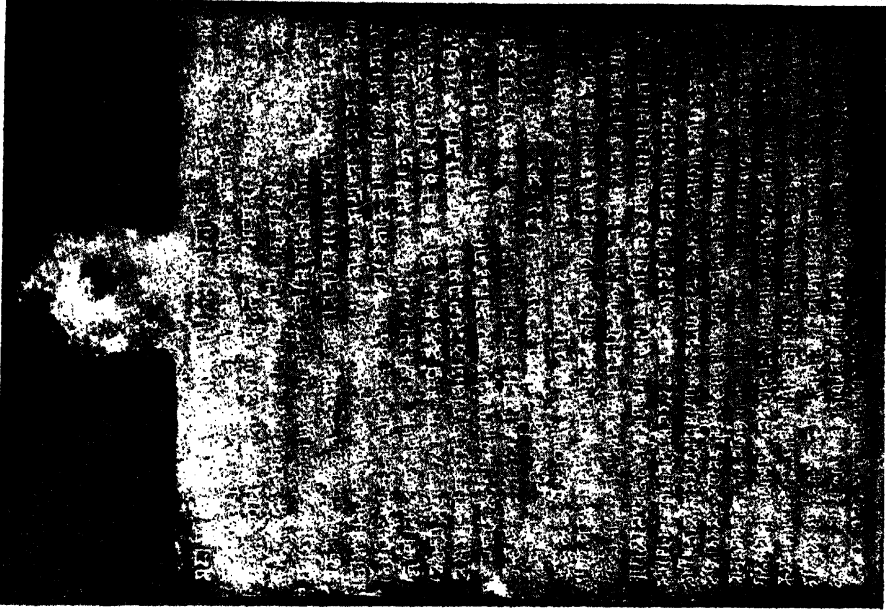
নিবাস ছিল রাজপুরে। সেখানে তাঁহাদের ভিটার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

তাঁহাদের অনেক পূর্ব্বপুরুষ রাজা মদন রায়কে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে, (১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) মুঘল শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা রাজস্ব বাকী পড়ায় ঢাকাতে ধরিয়া লইয়া যান। সেই সময় বাশড়াতে শ্বাপদসঙ্কুল গভীর জঙ্গল ছিল এবং সেখানে সেই জঙ্গল-মধ্যে মোবারক গাজী নামে একজন দৈবশক্তিসম্পন্ন ফকির থাকিতেন। রাজা মদন রায় তখন নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার দৈবশক্তিবলে ঢাকার দরবার হইতে সসম্মানে মুক্তিলাভ করতঃ শিরোপা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। গাজী সাহেবের গান নামক দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লোকগাথায় ঐ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।১ বাশড়াতে এখনও গাজী সাহেবের আস্তানা আছে। ঈষ্টার্ণ রেলওয়ের দক্ষিণ বিভাগের ক্যানিং শাখায় ঘুঁটিয়ারি সরিফ ষ্টেশনের সান্নিধ্যে বাশড়ার ঐ আস্তানায় প্রতি সপ্তাহে তাঁহার স্মরণার্থ একটি মেলা হয় এবং উহাতে বহু হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ঐ সময় সেখানে গাজী সাহেবের গানও হয়। প্রবাদ, ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মদন রায়ই গাজী সাহেবকে সর্ব্বত্র প্রচার করেন। হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে উহার যে উল্লেখ আছে তাহা এই :

"In gratitude to Mobrah Gazi the zeminder wished to erect a mosque in the Jungles of Basra for his residence, but he was prevented in a dream He then ordered that every village should have an altar dedicated to Mobrah Gazi, the King of the forests and wild beasts. These altars of Mobrah Gazi are common in every village in the vicinity of jungles, not only in Maidanmal, but in all the fiscal Divisions adjoining the Sundarbans."2

কবি রামচন্দ্র রচিত হরপার্ব্বতী মঙ্গল নামক একখানি পুরাতন পুঁথিতেও পূর্ব্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে। উহাতে আরও দেখা যায় যে, রাজা মদন রায়ের পৌত্র দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী রাজপুর হইতে প্রথমে বারুইপুরে আসিয়া বসবাস করেন ও সেখানে বহু ভূমি দান করিয়া সমাজ স্থাপন করেন। হরপার্ব্বতী মঙ্গলের ঐ অংশ এইরূপ :

"জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ যেমন মন্মানুরাগ
অধিপতি শ্রীমদন রায়।
মিঞে মোবারক গাজী আপনি হইয়া রাজী
বন মাঝে দেখা দিলা তায়।
সঙ্কেতে সহায় হয়ে নবাবে স্বপন কয়ে
শিরোপা পাইল অধিকারী।
দত্তকুল সমুদ্ভব গোষ্ঠীপতি খ্যাতিরব
কায়স্থ কুলের অধিকারী।
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ পঞ্চম তনয় নিজ
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ব অধিকারী তাহে বর্ত্ত
তদঙ্গজ শ্রীদুর্গাচরণ।
সহায় আনন্দময়ী সর্ব্বাংশে হইল জয়ী
শ্রীমতী শ্রীমতী যার রাণী।
করিয়া সমাজ স্থান কত ভূমি কৈল দান
বারুইপুরেতে রাজধানী।"

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী বারুইপুরে ঐ প্রকারে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সূত্রপাত করেন এবং তাহার ফলেই উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের বাসহেতু ক্রমশঃ এই স্থানটি সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তজ্জন্য উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার এখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাজস্ব ও শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি কার্য্যালয় স্থাপন করেন। তন্মধ্যে নিমকমহলের সদর দপ্তরখানা ও একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।১ নিমকমহলের উক্ত দপ্তরখানার তৎকালীন প্রধান শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী প্লাউডেন ঐ সময় এখানে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী আদর্শে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়টি পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুরের খ্রীষ্টান মিশনের অধীন হইয়া যায়।২

ঐ সময় হইতে শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের জুলুম ও অত্যাচারে বঙ্গদেশের নানা স্থানে অশান্তির সূত্রপাত হয় ও উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থানেও নীলচাষ হইত ও নীল প্রস্তুত করিবার বহু গৃহাদি ছিল। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধীন মথুরাপুর থানার অন্তর্গত ছত্রভোগ ও কাটানদিঘী প্রভৃতি গ্রামে ঐরূপ গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৫৫ সালের ১ম সংখ্যায় গাজী সাহেবের গান প্রকাশিত হইয়াছে

2 Statistical Account of Bengal. Vol. I, Page 120.

1 'In the early part of the 19th century it was the head-quarters of the Salt Department in the 24 Parganas, and a Salt Agent and a Medical officer were stationed there." Bengal District Gazetteer. 24 Parganas. L. S. S. O'Malley. Page 219.

2 'A school at Baruipore which had been started in 1820 by Mr. Plowden the Salt Agent, was transferred to the Society for the Propagation of Gospel in 1823."
—24 Parganas Gazetteer, Page 79. By L.S.S. O'Malley

চব্বিশ পরগণায় শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণেরও ঐ সময় সদরস্থান ছিল বারুইপুরে। অধুনা বারুইপুরের সদর রাস্তার উপর একটি বৃহৎ উদ্যানমধ্যে বড়কুঠি নামে যে অট্টালিকাটি আছে উহাই ছিল তাঁহাদের প্রধান কার্য্যালয় ও আবাসস্থান।১ তজ্জন্য তৎকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় উৎপন্ন নীল বারুইপুরের নীল নামে অভিহিত হইত এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া বাজারেও উহার বেশ চাহিদা ছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তারিখের কোম্পানীর গেজেটে উহার এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়:

"We undertand that the best indigo delivered on co: t·act for the last year has been manufactu·ed by Messrs. Win and Thos. Scott of Gazipore and by Mr. Gwilt of Barrypore."

প্রাচীন বিবরণাদিতে উল্লিখিত আছে যে, খ্রীষ্টান মিশনরীরাও ঐ সময় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার যে সকল স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করেন তন্মধ্যেও বারুইপুরের কেন্দ্রটি প্রধান ছিল। সে কারণ এখানে সর্ব্বপ্রথম একটি ইষ্টকের বৃহৎ গীর্জ্জাও নির্ম্মিত হয়। উহার মধ্যে ৬।৭ শত লোক বসিয়া উপাসনা করিতে পারিত।২ উহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। উহা ভিন্ন ঐ সময় মৃত দুই জন ইংরেজ পাত্রীর গোরস্থানও আজিও শাসনে যাইবার পথে দেখা যায়।

উপরোক্ত কারণে বহুদিন হইতে চব্বিশ পরগণায় বারুইপুরের গুরুত্ব থাকায় ইংরেজ সরকার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর বারুইপুর, প্রতাপনগর, জয়নগর ও মাতলা বা (ক্যানিং) এই চারিটি থানা লইয়া একটি মহকুমা গঠন করতঃ উহারও সদরস্থান এখানে স্থাপন করেন। উহা বারুইপুর মহকুমা নামে প্রসিদ্ধ হয় ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। তজ্জন্য এখানে মহকুমা হাকিমের আদালত ও মহকুমা পুলিশের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়।১ সার ষ্টুয়ার্ট কলভিন বেলী, পরে যিনি বঙ্গদেশের ছোটলাট হন, এই মহকুমায় প্রথম মহকুমা শাসক ছিলেন।২ তাঁহার পরে

আটিসারাতে শ্রীঅনন্তপণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত দারুময় শ্রীশ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বিগ্রহ

এখানে যে কয়জন বাঙালী মহকুমা শাসক আসেন তন্মধ্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি

১ ঐ অট্টালিকাটির পশ্চাতে নীলকরগণ একটি খাল কাটাইয়া উহা আদিগঙ্গা নদীর সহিত সংযুক্ত করেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা তখন নৌকাযোগে বারুইপুর হইতে ছুরকোণ ও কাটানদিঘী প্রভৃতি স্থানে নীলপ্রস্তুতের কারখানাগুলিতে যাতায়াত করিতেন। ঐ খালের কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান আছে।

২ Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. I. Page 99.

1 Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. I. Page 99.

2 Bengal Under the Lieutenant Governors,—Buckland. Vol. II. Page 837.

এখানে অনেকদিন ছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় এখানকার পথঘাট প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুর্গেশনন্দিনীও ঐ সময় এখানে লিখিত হয়।

মজিলপুরনিবাসী সাধক ও সাহিত্যিক কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের রচনায় উহার উল্লেখ আছে। তিনি তখন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বারুইপুরে থাকিতেন। কিরূপে তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের আলাপ পরিচয় হয় ও কিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় বারুইপুরের আদালতে বিচারকার্য্যের মধ্যেও দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিতেন তাহার যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :

"বঙ্কিমবাবু যখন বারুইপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়। তখন ইংরাজি ১৮৬৪ সাল। সে বৎসর ৫ই অক্টোবর সাইক্লোনে (cyclone) ডায়মণ্ডহারবার, কুল্পি, মুড়াগাছা, টেঙ্গরা বিচি, করঞ্জলী, গঙ্গাধরপুর, বাইশহাটা, মনিরটাট প্রভৃতি গ্রাম নষ্ট হইয়া যায়।...এই দৈবদুর্ঘটনায় প্রদেশস্থ বহুসহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুঃসংবাদে ব্যথিতহৃদয় হইয়া কয়েকজন ধনশালী পার্শী, কতিপয় ইংরাজ কর্ম্মচারী ও প্রদেশের জমিদারবর্গের কেহ কেহ যথোচিত সাহায্য দান করিয়া সত্বরই একটি প্রচুর ধনভাণ্ডার স্থাপন পূর্ব্বক ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত করেন। বঙ্কিমবাবু তখন এই অর্থের কিয়দংশ লইয়া সাইক্লোন-পীড়িত লোকের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি কয়েক ডোঙ্গা চাউল, ডাইল, চিড়া, লবণ, কয়েক পিপা সর্ষপ তৈল ও কয়েকখানা পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যাদি সঙ্গে আমাকে লোকের দুর্ভিক্ষ ও পরিধেয় কষ্ট দূর করিবার জন্য মহেশ্বর নদের (হুগলী নদীর) পার্শ্ববর্ত্তী টেঙ্গরা বিচি গ্রামের সন্নিহিত গঙ্গাধরপুরে পাঠান। গঙ্গাধরপুরে যাইবার সময় পথে বহুসংখ্যক শবদেহ খালে, বিলে, ধান্যক্ষেত্রে ভাসিতেছে এবং পথের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মধ্যেও বনে জঙ্গলে, বৃক্ষোপরি ও ভূতলেও ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে নরকের দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে, দেখিলাম। আমি ৩।৪ দিন সেখানে থাকিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি সপ্তাহের ব্যয়ের মত প্রত্যেক পরিবারকে বণ্টন করিয়া দিয়া মজিলপুরে ফিরিয়া আসিলাম এবং বঙ্কিমবাবুকে সমস্ত বিবরণ বলিলাম ও দ্রব্যাদির হিসাব দিলাম। তিনি আমার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই বঙ্কিমবাবু দুর্ভিক্ষকার্য্যের আধিক্য প্রযুক্ত ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার ভার অল্পদিনের জন্য গ্রহণ করিলেন এবং ডায়মণ্ডহারবার হইতে বাবু হেমচন্দ্র কর বারুইপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন ও দুর্ভিক্ষকার্য্যের জন্য মজিলপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমি দুর্ভিক্ষকার্য্যে বঙ্কিমবাবুকে যেরূপ সাহায্য করিতেছিলাম, হেমবাবুকে সেইরূপ করিতে লাগিলাম। সাইক্লোন প্রযুক্ত কেবল এই দুই মহকুমাই (বারুইপুর ও ডায়মণ্ডহারবার) দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়াছিল।

এ সময় ১৮৬৪ সালের নূতন রেজিষ্টরি আইন অনুসারে মহকুমায় নূতন রেজিষ্টরি অফিস খোলা হইল। হেমবাবু আমাকে তাঁহার (বারুইপুরের) নূতন রেজিষ্টরি অফিসের হেডক্লার্ক পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বঙ্কিমবাবু বারুইপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এই সময় হইতে আমি বঙ্কিমবাবুকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ ও অবসর পাইলাম। তিনি যে সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাভাবিক দয়ার্দ্রচিত্ততা প্রকাশ পাইত। এই সমস্ত মোকদ্দমার রায় তিনি অতি সুন্দর ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করিতেন। আমি তাঁহার রায়গুলি পড়িতে বড়ই ভালবাসিতাম।

এই সময়ের পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। এ সময় তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমনকি সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার study-room-এ প্রস্থান করিতেন এবং চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া ফিরিতেন না।"১

কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের রচনায় বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ সময় অবস্থানকালের আরও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। সরকারী কার্য্যে গভীর ভাবে নিযুক্ত থাকিলেও তখন উহার চাপে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কোন ত্রুটি ঘটিত না। উহার প্রতি তিনি কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন তাহা তাঁহার আদালতের কার্য্যের মধ্যেও দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্ব্বোক্তরূপ উল্লেখ হইতে জানা যায়। তিনি বারুইপুরে প্রত্যহ আদালতের বিচার ও তৎকালীন মহকুমা শাসকের গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াও রাত্রে নিয়মিত ভাবে চারি ঘণ্টাকাল অধ্যয়ন করিতেন। কালীনাথ বাবু উহারও এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :

"আমাদের বারুইপুরে অবস্থিতিকালে যখনই শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন বঙ্কিমবাবু মধ্যে মধ্যে অধ্যয়নে অসমর্থ হইতেন, তখন আমাকে রাত্রিকালে ডাকিয়া পাঠাইতেন কিম্বা সে সময় আমাকে আসিতে বলিয়া দিতেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে কোন পুস্তকবিশেষ পড়িতে বলিতেন। আমি পড়িতাম তিনি শ্রবণ করিতেন এবং স্থলবিশেষে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর ৭॥ হইতে ১১॥ পর্য্যন্ত তাঁহার পাঠের নিয়ম ছিল। আমি যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তাহা কখনই Light reading ছিল না। তৎসমস্তই গভীর চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক। একখানি পুস্তকের বিষয় আমার স্মরণ আছে, তাহাতে progressive development of species বিষয়ে লেখা ছিল।"২

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল থাকায় উক্তরূপে গ্রন্থাদি পাঠ ও শ্রবণ ব্যতীত সময় সময় সুবিধা পাইলেই হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাও জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করিতেন। কালীনাথবাবু এবিষয়ও যাহা বারুইপুরে প্রত্যক্ষ করেন তাহার উল্লেখ এইরূপ :

"এ সময় বারুইপুরের সন্নিহিত রামনগরনিবাসী ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষ সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন এবং সেখানে থাকিয়া অল্প-স্বল্প চিকিৎসা ব্যবসাও চালাইতেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন সুবিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। কোন এক বৎসর তিনি কলেজের সাম্বৎসরিক পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়া একটি সুন্দর অণুবীক্ষণযন্ত্র পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। বঙ্কিমবাবুর সহিত মহেশবাবুর আলাপ হওয়াতে মহেশবাবু সেই অণুবীক্ষণটি দিনকতকের জন্য বঙ্কিমবাবুর ব্যবহারার্থ প্রদান করেন। প্রতিদিন অপরাহ্নে সেই অণুবীক্ষণ সহযোগে কীটাণু, নানা পুষ্করিণীর দূষিত জল, উদ্ভিদের সূক্ষ্মভাগ এবং জীবশোণিত প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থজাতির পরীক্ষা হইত। পরীক্ষার সময় আমিই তাঁহার একমাত্র নিত্যসঙ্গী থাকিতাম।"৩

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কার্য্যকালে

(১) বঙ্কিমচন্দ্র (১)—শ্রীকালীনাথ দত্ত, প্রদীপ, আষাঢ়, ১৩০৬।
(২) ঐ, ঐ
(৩) ঐ ঐ

বারুইপুরের পথঘাট প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। উহা ভিন্ন তিনি তখন বারুইপুরের অধিবাসীদেরও বিপদে-আপদে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। উহারও একটা উদাহরণ কালীনাথবাবুর রচনা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও পরহিতৈষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কালীনাথবাবু লিখিতেছেন :

"একদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি অল্পক্ষণের মধ্যে থামিয়া গেল। কিন্তু থামিতে না থামিতে ভয়ঙ্কর শব্দে একটি বজ্রপাত হইল। তাহার ৪।৫ মিনিট পরে একটি লোক দৌড়িয়া আসিয়া কাছারিতে সংবাদ দিল রাজকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র বজ্রাঘাতে গতায়ু হইয়াছে। শুনিবামাত্র বঙ্কিমবাবু কাছারির সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া রাজকুমারবাবুর বাটীর দিকে ধাবমান হইলেন। আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। আমরা বজ্রাহতের বাটীতে গিয়া দেখিলাম···নীচের ঘরে তিনটি লোক একটি মাদুরে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া কি গল্প করিতেছিল। প্রধান বজ্রাহত মধ্যস্থলে ছিল। সেই বেচারাই তখন মৃত্যুমুখে পড়ে।···রাজকুমারবাবুর পরিবার মৃত পুত্রের মস্তক স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থানে মুখাবৃতা হইয়া মৃতের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। রাজকুমারবাবু সেদিন প্রাতের ট্রেনে কলিকাতায় গিয়াছেন।···আমরা বজ্রাহত বাটীতে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই নিকটস্থ পাদরি সাহেব সেখানে অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু অবিলম্বে তাঁহাকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষকে আনিবার জন্য রামনগরে প্রেরণ করিলেন, এবং কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য, অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া টেলিগ্রাম করিলেন। এদিকে ডাক্তার মহেশচন্দ্রও দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুবকটির চৈতন্যোদয়ের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবুও ডাক্তারের সঙ্গে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কোন চেষ্টা সফল হইল না।"১

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময়ের পরেও অনেকদিন বারুইপুরে ছিলেন। উহারও উল্লেখ কালীনাথবাবুর উক্ত রচনায় পাওয়া যায়। উহা এই :

"আমি আমার নূতন কার্য্যে বারাসাতে চলিয়া গেলে বঙ্কিমবাবু কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বারুইপুরে ছিলেন। তখন আমি যখনই বাটীতে আসিতাম বারুইপুরে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া আসিতাম না। তিনি সকল সময়ই তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন—আদালতের কার্য্যের সময়ও তাঁহার সে ভাবের ব্যতিক্রম দেখি নাই।"২

---

১ বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীকালীনাথ দত্ত, প্রদীপ, শ্রাবণ, ১৩০৬।
২ ঐ ঐ

২৪শে আষাঢ় রবিবার, বারুইপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম স্মৃতিসভায় পঠিত

আচার্য যোগেশচন্দ্র প্রয়াণে

শ্রীমহাদেব রায়

জন্মতিথি করি' শেষ 'স্বস্তিকে'র আম্রবনচ্ছায়ে,
শক্তি-অর্চনার তত্ত্ব গেলে রাখি শারদার পায়ে,
শারদ বোধন লগ্নে। মহাকাল ধ্বনিল অন্তরে—
শত শরতের মূর্তি, হে আচার্য, শারদার বরে
দেখ এ অঙ্গনে তব। তবু কেন লভিল নির্বাণ
বাণীর অর্চনা-রত সুবর্ণের দীপ অনির্বাণ
না ফিরিতে জন্মদিন? চির-দীপ্ত মেধাভস্মসার
মহাশূন্যে রচে শিখা দশদিকে করিয়া বিস্তার
জ্ঞানের গৌরব-দীপ্তি। বহু বিদ্যাগর্ভ বঙ্গবাণী
লভিল যে পুত্র-করে বহুধা-প্রদীপ্ত মূর্তিখানি,
আশাহতা বঙ্গমাতা সেই পুত্রশোকে মুহ্যমান,
সহস্র সন্তান তাঁর কাঁদে স্মরি মহামূল্য দান—
মূল্যঋণ শোধে ব্রত-নিষ্ঠা আজি সমগ্র জাতির
রচিবে কি আলোকিত পথ সপ্তনবতি স্মৃতির?

চতুর্দশপদী

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আবার এলাম ফিরে এক দিন। করে আকর্ষণ।
কে যেন সর্বদা ডাকে অন্ধকার সেই ত্যক্ত ঘরে—
যেখানে নামে না হাওয়া, ভৌতিক স্তব্ধতা কাজ করে,
ধুলায় ধূসর মাটি—মানুষের নেই পর্যটন,
সেখানে এলাম ফের। দাঁড়ালাম। বিস্মৃত-স্পন্দন—
অনেক আশ্চর্য সন্ধ্যা, গীতস্রোত-মূর্চ্ছনা ভিতরে ;
এখানে ওখানে ঘুরে খুঁজলাম—বহুকাল পরে
স্থানে স্থানে স্নিগ্ধ ঘ্রাণ, ধূলিস্তরে লুপ্ত পদাঙ্কন।

নিবিড় জঞ্জাল থেকে, কড়ি-কাঠে, বিবর্ণ দেয়ালে
সামান্যই ইতিকথা—বিস্মৃত-সমুদ্রতল থেকে
—মণিমুক্তা পাওয়া যায়। প্রেতায়িত ইটের কংকালে
ইতিহাস সাড়া আনে—তারপর কুয়াশায় ঢেকে
কোথায় হারায়। শুধু অস্ফুট করুণ হা-হা স্বর
সঙ্কারিত। কাঁদলাম—এলাম যে কত দিন পর।

বাহুলে মেয়ে

শ্রীহরিহর শেঠ

প্রবন্ধের নাম হইতে যদি কেহ মনে করেন, ইহা একটি বাহুলে মেয়ের কাহিনী, তবে তাহা ভুল হইবে। অবশ্য ইহা মেয়েদেরই করুণ কথা।

এবার ঝড়-বৃষ্টিজনিত ভীষণ দুর্য্যোগ যখন আরম্ভ হয়, তাহার তৃতীয় দিনে একটি কন্যার বিবাহসংক্রান্ত আশীর্ব্বাদ উপলক্ষে তাহাকে বিবিধ মূল্যবান অলঙ্কারাদি-ভূষিতা করিয়া পাত্রপক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা এবং ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত ও আপ্যায়িত করা হইল। উদ্দেশ্যবিহীন নিতান্ত লঘুভাবে হইলেও, পাত্রপক্ষের একটি বয়স্ক ব্যক্তিকে নিজ মনে মৃদুস্বরে বলিতে শুনিলাম, 'মেয়েটি বাহুলে'।

সামগ্র ভারতে কিনা জানি না, সারা বাংলা ব্যাপী ত বটেই, এই অভাবনীয় দুর্য্যোগ আজ প্রায় সাত দিন ধরিয়া চলিতেছে। কেননা মেয়েটি বাহুলে। কথাটির মধ্যে গুরুত্ব কিছু না থাকিলেও এ কথা আজ নূতন নহে। একটি ছেলে ও মেয়েতে বিবাহ হয়—কিন্তু বিবাহের সময় বৃষ্টিবাদল হইলে—কথার কথা হইলেও অনেক সময়ই শুনা যায় 'মেয়ে বাহুলে'। ছেলে কখনও বাহুলে হয় না বা হইতে পারে না। এই মত আরও কোন কোন মর্য্যাদা (?) সর্ব্বদাই আমাদের মেয়েদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। নারী প্রকৃতি, সৃষ্টিরক্ষার মূল। অন্য দেশের কথা জানি না, এখানে তার জন্ম মঙ্গলশঙ্খ-ধ্বনিতে ঘোষিত হয় না। মেয়ের বিবাহ 'কন্যাদায়', বিবাহ হইলে মেয়ে পার করা হয়, মৃত্যুতে মরণাশৌচ স্বল্পদিনের। প্রাচীন ভারতে কোনও সময়ে মেয়েদের উপনিষদ বেদাদি অধ্যয়নও নাকি নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে। বিধি-ব্যবস্থা আইন-কানুন প্রণয়নের আমরাই মালিক হইয়াছি। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত অনেককিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে। আজ আর আমাদের মেয়েরা একেবারে শিক্ষাহীনা, কেবল গো-পূজা, শিব-পূজাদিরতা, পিতামাতার গৌরীদানের পাত্রী নহে। শহর অঞ্চলে ক্রমে স্কুল-কলেজে তাঁহাদের স্থান দেওয়ার সমস্যা শিক্ষাবিভাগকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। কি বিবাহ ব্যাপারে, কি আর্থিক দিক হইতে তাহাদের জন্য পিতামাতার ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজেদের প্রচেষ্টা এবং সরকারের সহায়তা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানের বিধিব্যবস্থায় মেয়েদের বিবাহসংক্রান্ত বাধা দূরীভূত করার প্রচেষ্টার অভাব নাই।

কন্যা সম্প্রদানকালে সামর্থ্যমত সালঙ্কারা অবস্থায় দানই প্রশস্ত। কিন্তু যে দিন-কাল দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সামর্থ্যের কথা বিবেচ্য নহে; পাত্রপক্ষের দাবি অবশ্য দেয়। এটা এখন সামাজিক ব্যবস্থাই বলিতে হয়। এই সকলের কথঞ্চিৎ প্রতিবিধান জন্যই হউক বা সমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই হউক, আর নারী-জাতির প্রতি দরদের জন্যই হউক, নূতন বিধানে আজ কন্যাকে পিতৃবংশের কোন দায়িত্ব লইতে না হইলেও সে পুত্রদের ন্যায় পিতার সম্পত্তির তুল্যাধিকারিণী। দুর্ভাগ্যক্রমে বৈধব্য ঘটিলে সন্তানদের সহিত স্বামীর সম্পত্তিরও সমান অংশীদার। এই প্রসঙ্গে যে কথাটায় মনে বাধা দেয়, তাহাই এখন বলিতেছি।

অধুনা শিশু বা কিশোরী কন্যার বিবাহ আর বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু এখনও খুব কম ক্ষেত্রেই কন্যা স্বেচ্ছায় পতি নির্ব্বাচন বা বরণ করিয়া লয়—বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র বা পাত্রপক্ষের কন্যা দেখার প্রথা এখনও ঠিকই আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্যা এখন বয়স্থা এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্বের তুলনায় তাহারা বুদ্ধি, বিবেচনা, শিক্ষা এবং আত্মসম্মান জ্ঞানে অনেকেই সমৃদ্ধ। বিবাহের জন্য মেয়েদেখার মধ্যে প্রধান দেখিবার যাহা, তাহা হইতেছে কন্যার রূপ। ছেলেটির গাত্রবর্ণ যদি আবলুস কাষ্ঠের অনুরূপও হয় তাহারও আবশ্যক দুধে-আলতা বা চম্পকবর্ণা বধূ। আর কন্যা যেহেতু কন্যা, তাহার পছন্দ-অপছন্দের কোন কথা থাকিতেই পারে না। অবশ্য নূতন উত্তরাধিকার আইনের বলে কুরূপা ধনী-কন্যার পক্ষে হয়ত এখন পাত্র পছন্দ করা কতকটা সহজ হইতে পারিবে। অন্ততঃ তাহাদের বিবাহ তেমন বাধিবে না। অবশ্য ইহা স্থলবিশেষে। এ সব কথা ছাড়িয়া দিলেও, উত্তরযের যুবতী বা যৌবনসীমায় উপনীতা কন্যার রূপ যাচাই করার এই লজ্জাজনক প্রথা কি আমাদের সমগ্র নারীজাতির প্রতি অবমাননা-কর নহে? ইহা প্রতিরোধের উপযুক্ত সাহস বা বল বর্ত্তমানে সমাজের না থাকিতে পারে, কিন্তু যে সরকার অস্পৃশ্যতা দূরীভূত করিবার জন্য, জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর—এমন-কি অবৈধ সন্তানের পিতৃধনামের দ্বারা তাহাকে সম্পত্তির উত্তরাধি-কারী হওয়ার কথা পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেছেন, সে সরকার কি কোন বিধান প্রণয়নের দ্বারা এই নিন্দনীয় কুপ্রথা তুলিয়া দিবার কোন উপায় চিন্তা ও প্রতিকার করা প্রয়োজন বোধ করেন না?

চোর

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়

দু'জায়গায় টুইশানী সেরে রাত দশটার সময় বাড়ী ঢুকে হাত-পা ধুয়ে সবে খেতে বসেছি এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, মাষ্টারমশাই বাড়ী আছেন ?

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে থেমে গেলাম। মল্লিকা সামনে বসে খাওয়া দেখছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, রাত দুপুরে আবার কে এল ?

কথার উত্তর না দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম—আবার কোন ডাক আসে কিনা। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না আবার ডাক এল, মাষ্টারমশাই বাড়ী আছেন নাকি ?

খাওয়া ফেলে রেখে উঠে পড়লাম। মল্লিকাকে বললাম—দাও, এক ঘটি জল দাও—আঁচিয়ে নি, আর ভাতটা ঢাকা দিয়ে রাখ, দেখি এসে খাওয়া হয় কিনা।

মল্লিকা গজ গজ করতে করতে জল এনে দিলে। তাড়াতাড়ি কুলকুচো করে হারিকেনটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে চাপ-বাঁধা অন্ধকার, দু'পা গেলেই মনে হয় অন্ধকার যেন আমায় গিলে খেতে আসছে। চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম, এত রাতে কে আসতে পারে ? কলকাতা থেকে আসার শেষ ট্রেনও ত বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তাতে নিশ্চয় কেউ আসে নি, তবে ?

উঠোনের দরজাটা খুলে বাইরে বেরুলাম। অন্ধকারে দশ হাত দূরের জিনিষও দেখা যায় না। ভুষো-মাখানো লণ্ঠনটা মাথার উপর তুলে ধরে হাঁকলাম, কে ?

দূরে কিছু একটা নড়ে উঠল, খানিক বাদে পরিষ্কার হ'ল—মানুষই। কাছে আসতে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম—না, পরিচিতদের কেউ নন। এক হাতে একটা পুঁটলি-মত, বগলে একটা ভাঙা ছাতা, চেহারা দেখে বয়স আন্দাজ করা কঠিন—পঞ্চাশও হতে পারে, ষাটও হতে পারে, আবার সত্তর হওয়াও বিচিত্র নয়। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কপালে রগে নীল রঙের শিরা-উপশিরাগুলো মাকড়সার জাল বুনেছে, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গিয়ে দুনিয়ার অনেককিছু অবাঞ্ছিত দৃশ্য দেখার হাত থেকে যেন নিষ্কৃতি পেয়েছে। পরনের জামাকাপড় থেকে পায়ের ছেঁড়া জুতো অবধি সর্ব্বত্র দারিদ্র্যের নির্ম্মম কশাঘাতের চিহ্ন। এ ভদ্রলোককে এর আগে কখনও দেখেছি বলে ত মনে হয় না।

আমাকে ওরকম ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক যেন একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, কি ভায়া, চিনতে পারলে না, আমি সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী।

সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী ? আকাশপাতাল ভাবতে লাগলাম, আমার চেনা-জানার মধ্যে সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী কে আছে ? স্মৃতির পর্দ্দায় একের পর এক অসংখ্য পরিচিত মুখ ভেসে উঠল, কিন্তু না, সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী বলে সেখানে ত কেউ নেই।

অস্বস্তিভরে বললাম, দেখুন কিছু মনে করবেন না, আপনাকে ত ঠিক চিনতে পারছি না।

ভদ্রলোক কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন, বললেন, চিনতে পারছ না, সে কি ? সেই যে তোমাদের ইস্কুলে গিয়েছিলাম মাসকয়েক আগে একটা চাকরীর খোঁজে—মনে নেই ?

ওহো! এইবার মনে পড়েছে বটে। মাসছয়েক আগে এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন আমাদের ইস্কুলে একটা চাকরী খালি আছে শুনে। এর আগে কোথাকার এক ইস্কুলে যেন চাকরী করতেন, সম্প্রতি সেখানে কমিটির সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। আমাদের বললেন, কারও চোখরাঙানি সহ্য করতে পারি না ভাই, এই জন্যে আমার এক জায়গায় বেশী দিন চাকরী করা হয় না। এর আগেও অনেক জায়গায় করেছি, কিন্তু সব খানেই ওই এক ব্যাপার—স্পষ্ট কথা বলি বলে কারও সঙ্গে মতে মেলে না। ওরা অবিশ্যি পরে আমায় ক্ষমাটমা চেয়ে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। আর আসবে নাই বা কেন, থার্টি-ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্সড টিচার কি পথেঘাটে মেলে—কিন্তু আমি সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছি, বলেছি সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী যেখান থেকে একবার চলে আসে সেখানে আর দ্বিতীয় দিন পা দেয় না।

তার পর একটু থেকে ভারিক্কি চালে বলেছিলেন, আরে আর সবায়ের মত যদি পেটের ধান্দাতে চাকরী করতে যেতাম তা হলেও না হয় কথা ছিল। চাকরীর পরোয়া আমি করি ? ঘরে আমার জমি রয়েছে, গরু রয়েছে—খাওয়া-পরার কথা আমায় কোনদিন ভাবতে হবে না। তবে নেহাত ঘরে বসে থাকব, তা ছাড়া ছোকরা বয়েস থেকেই টিচিং লাইনের উপর আমার একটা ঝোঁক আছে, তাই এখানে-ওখানে মাষ্টারী করে বেড়াই। এখন আবার এটা একটা

'হবি'তে দাঁড়িয়ে গেছে, কিছুদিন যদি বসে থাকি ত হাঁপিয়ে উঠি।

যাবার সময় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, এটা অবশ্য 'ফিল্ড-আপ' হয়ে গেছে, কিন্তু এমনও ত হতে পারে—পরে কিছুদিন বাদে আর একটা খালি হ'ল, কিংবা এ ইস্কুলে না হোক আশপাশের কোন ইস্কুলে হ'ল। যাই হোক ঠিকানাটা দিয়ে গেলাম, যদি কোথাও খালি হয় ত একটা খবর দিও, বুঝলে?

বলেছিলাম, আচ্ছা।

তা সে ত প্রায় মাসছয়েক আগেকার ঘটনা, এত দিন বাদে সেকথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। কাছেপিঠে এর মধ্যে মাষ্টারী-ফাষ্টারীও কোথাও খালি হয় নি যে মনে পড়বে। ঠিকানা যেটা রাখতে দিয়েছিলেন তাও কোথায় হারিয়ে ফেলেছি, অতএব চিঠি দেওয়ার কথা ত আর উঠতেই পারে না। আর ভদ্রলোক যে এতদিন বাদেও সেকথা মনে রাখবেন তাই বা কে ভাবতে পেরেছে।

বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, তা হঠাৎ—

সিদ্ধিনাথবাবু কৈফিয়তের সুরে বলতে লাগলেন, গিয়েছিলাম ওপারে শুকদেবপুরে একটা পোষ্ট খালি আছে শুনে, তা গিয়ে শুনলাম পোষ্ট একটা খালি আছে বটে কিন্তু বি-টি না হলে তাঁদের চলবে না। কি আর করব, ফিরতে হ'ল সেখান থেকে। কলকাতায় যাবার লাষ্ট ট্রেন এপার থেকে রাত ন'টায় ছাড়ে আমার জানা ছিল, এসেছিলামও সেই মত, তা এসে শুনলাম ট্রেনটা বেরিয়ে গেছে আধ ঘণ্টা আগে, নতুন টাইমটেবিলে টাইম নাকি পালটে দিয়েছে। মহাবিপদে পড়লাম, রাত দুপুরে এখন যাই কোথা। হঠাৎ মনে পড়ল তোমার কথা, তুমি যেন বলেছিলে, তুমি নিত্যানন্দপুর থেকে যাতায়াত কর। ইষ্টিশান মাষ্টারকে বললাম তোমার কথা, বলতেই চিনলেন। বললেন, ভালই হ'ল মশায়। রাতদুপুরে এখন কোথায় থাকতেন, কি খেতেন তার নেই ঠিকানা, তার চাইতে চেনা-শুনো লোক যখন রয়েছে তখন চলে যান, আমি না হয় একটা খালাসী দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে সঙ্গে করে আলো ধরে পৌঁছে দিয়ে আসুক। তা সেই লোকটিই আমায় পৌঁছে দিয়ে গেল তোমার দোরগোড়া অবধি।

সিদ্ধিনাথবাবু বলা শেষ করে একটু কুণ্ঠিত হাসি হাসলেন। আমি মুহূর্ত্তখানেক চিন্তা করে বললাম, আচ্ছা, আসুন আপনি, ভেতরে আসুন।

সিদ্ধিনাথবাবুর বাঁকা দেহ সোজা হয়ে উঠল, আমি সামনে সামনে আলো নিয়ে এগোতে লাগলাম। দালানে ঢুকে সিদ্ধিনাথবাবুকে একখানা চৌকির উপর বসিয়ে রেখে বললাম, আপনি বসুন এখানে, আমি আসছি।

দালানের লাগাও রান্নাঘর। কপাট ভেজানো ছিল ভিতর থেকে, ঠেলে ভিতরে ঢুকে আবার ভেজিয়ে দিলাম। মল্লিকা বসেছিল গুম হয়ে, একটু ইতস্ততঃ করে বললাম—ইয়ে, মানে ভদ্রলোকের খাওয়া হয় নি, দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পারবে?

মল্লিকা ঝাঁজিয়ে উঠে বললে, শুধু ভাতই খেতে হবে।

ভয়ে ভয়ে বললাম, তার মানে?

মল্লিকা তরকারীর ঝুড়িটা পায়ের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে, কাল হাটবার মনে আছে?

মাথা চুলকালাম, সত্যিই ত, কাল হাটবার আমারই মনে ছিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আচ্ছা তুমি উনুনে আগুন দাও গে, আমি উঠোনের গাছ থেকে না হয় দুটো পেঁপেই পেড়ে আনছি।

সেই রাত্রে আবার লগা কাঁধে করে দুপদাপ শব্দে পেঁপে পাড়লাম। সেগুলিকে ঘরে নামিয়ে রেখে দালানে সিদ্ধিনাথবাবুর কাছে ফিরে এসে দেখলাম ভদ্রলোক নির্ব্বিকার বসে রয়েছেন।

খেতে বসিয়ে বললাম, খেতে আপনার কষ্ট হবে দাদা, ঘরে তরকারীপাতি কিছুই ছিল না।—সিদ্ধিনাথবাবু গোগ্রাসে গিলতে গিলতে এক ফাঁকে বলে উঠলেন, তাতে কি হয়েছে, বাইরে থাকতে গেলে কি আর ঘরের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আশা করতে গেলে চলে?

খেয়ে উঠে বললেন, একটা পান দিতে হবে যে ভাই, আর ভাল কথা, একটা মশারির ব্যবস্থা করো। তোমাদের এখানে যা মশা দেখছি তাতে মশারি না হলে শুতে পারা যাবে না। আমার আবার বিনা মশারিতে শোয়া অভ্যেস নেই কি না।

রান্নাঘরে ঢুকে কপাট ভেজিয়ে দিয়ে মল্লিকাকে বললাম, শুনলে তো?—মল্লিকা এবার ফেটে পড়ল, বলল, শুনলাম ত। কিন্তু ওঁর কি আক্কেল, রাতদুপুরে পরের বাড়ী এয়েছেন, দুটো খেতে পেয়েছেন এই ঢের, তা নয় আবার বিছানা করে দাও, মশারি খাটিয়ে দাও—হাজার বায়নাক্কা। নাও, এখন ছেলেগুলোকে মশায় খাক, তোমাকে শুতে মশারি নিয়ে গিয়ে ছাদের ঘরে শোও গে যাও।

অপরাধীর মত বেরিয়ে এলাম। সিদ্ধিনাথবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে নির্ব্বিকার ভাবে পান চিবোচ্ছিলেন, বললাম—আসুন, উপরে আসুন।

ছাদে উঠে সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, বাঃ, ঘরটি তো বেশ চমৎকার।

উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই বোধে চুপ করে রইলাম।

সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ মশারিটা টাঙাও, আমি একটু ছাতটায় ঘুরে আসি, কেমন?

বললাম, দেখবেন অন্ধকারে যেন পড়ে যাবেন না, না হয় আলোটা নিয়ে যান।

সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, না না, তার দরকার নেই, তারার আলোয় আলসে-টালসে বেশ দেখা যাচ্ছে। তুমি বরং মশারিটা টাঙানো হয়ে গেলে আমায় বলো।

খানিকবাদে মশারী টাঙানো হলে বললাম, মশারি আমার টাঙানো হয়ে গেছে।

সিদ্ধিনাথবাবু বাইরে থেকে উত্তর দিলেন, এই যে যাই।

ঘরে এসে বললেন, বাঃ, তুমি যে দেখছি সব কমপ্লিট করে ফেলেছ, কিন্তু আমার কোটখানাকে এখন কোথায় টাঙাই।

ময়লা তালিমারা কোট, তার আবার টাঙানোর জায়গা। একবার ইচ্ছে হ'ল বলি—মাটিতে নামিয়ে রাখুন। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে বললাম, দেখুন দিকি ওপাশের দেওয়ালে একটা হুক আছে কিনা।

সিদ্ধিনাথবাবু সেদিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বটে।

বললাম, ওইখানে টাঙিয়ে রাখুন।

সিদ্ধিনাথবাবু কোটটি খুলে সন্তর্পণে সেই হুকের মাথায় টাঙিয়ে রাখলেন। দেখলাম আদুল গায়েই কোট চাপিয়েছিলেন। আমাকে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, কি দেখছ ভায়া, কোটটা? বড় চমৎকার জিনিষ হে। শীতকালে শীত, গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম সবকিছু আটকায়। আজকালকার দিনে এমন জিনিষটি আর পাওয়া যাবে না।

তার পর এ পকেট ও পকেট হাতড়ে চ্যাপ্টা একটা টিনের কৌটো বার করলেন। ভিতর থেকে দুটো বিড়ি বার করে একটা নিজে দাঁতে চেপে ধরে অপরটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাও ভায়া, ধর।

সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললাম, আজ্ঞে না, আমার চলে না।

সিদ্ধিনাথবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, আমিও বিড়ি বড় একটা খাই না, তবে একঘেয়ে সিগারেট খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেলে মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্তে এক-আধটা খাই।

তার পর আর এক পকেট থেকে একটা দেশলাইয়ের খোল এনে ভিতর থেকে কাঠি বার করতে গিয়ে বললেন, ঐ যাঃ! আসার সময় ভেবেছিলাম ইষ্টিশান থেকে একটা দেশলাই কিনে নেব, তা আর কেনা হয় নি। তোমাকে ত একটু কষ্ট করতে হচ্ছে ভায়া, নীচে থেকে একটা দেশলাই এনে দিতে হচ্ছে।

বিরক্তি চেপে নীচে থেকে দেশলাই এনে দিলাম। সিদ্ধিনাথবাবু বিড়িটাকে ধরিয়ে অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবেই দেশলাইটা ফেলে রাখলেন কোটের পকেটে। সামান্ত জিনিষ বলে আমি আর সেকথা উল্লেখ করলাম না, ভাবলাম হয়ত সত্যিই ভুল করেছেন।

সিদ্ধিনাথবাবু বিড়ি ধরিয়ে আগে একটা সুখটান দিয়ে নিলেন, তার পর নাক-মুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি আর দেরি করো না ভায়া, শুয়ে পড়।

আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম।

বৈশাখ মাসের শেষাশেষি হবে। দিনের গুমোট আবহাওয়া কেটে গিয়ে বাইরে এখন হু হু করে হাওয়ার ঝাপটা দিচ্ছে। পাশে বসে সিদ্ধিনাথবাবু নিঃশেষিতপ্রায় বিড়িটাকে প্রাণপণে টেনে চলেছেন। টানের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের স্পর্শ পেয়ে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিটুকু থেকে থেকে দীপ্ত হয়ে উঠছে, তারই ক্ষীণ আভায় সিদ্ধিনাথবাবুর মুখের এক পাশটা অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। রক্তহীন পাণ্ডুর মুখ, শিথিল বলিরেখাঙ্কিত চামড়া, অতিমাত্রায় উঁচু চোয়ালের হাড়, দড়ির মত স্ফীত অসংখ্য নীল রঙের শিরা-উপশিরা, কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ, সবকিছু একই সাক্ষ্য বহন করছে—নিদারুণ দারিদ্র্য। এত চেষ্টা করেও সিদ্ধিনাথবাবু সে দারিদ্র্যকে যে গোপন করতে পারলেন না, এ তাঁর ভাগ্যের পরিহাস।

বিড়িটায় শেষ গোটা-কয়েক টান দিয়ে সিদ্ধিনাথবাবু সেটাকে জানলা গলিয়ে বাইরে বার করে দিলেন। মশারিটা ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভায়া, ঘুমোলে নাকি?

নিস্পৃহ কণ্ঠে বললাম, না।

সিদ্ধিনাথবাবু লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে হাত-পাগুলো টান করতে করতে বললেন, এক এক সময় মনে হয় কি জান ভায়া, মনে হয় সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যাই দিনকয়েকের জন্তে। সংসারে থাকলেই ত শুধু নেই নেই, আর দাও দাও শুনতে হবে, তার চাইতে কোথাও যদি চলে যাওয়া যায় দিনকয়েক তবু নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যাবে।

বলেই হঠাৎ চুপ করে গেলেন। একটু পরে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, অবিশ্যি অভাব-অনটন আর কার ঘরে নেই, সে কথা নয়। কথা হচ্ছে কি এই বয়সে আর দায়িত্বের বোঝা বইতে ভাল লাগে না, দেহমন দুই-ই এখন একটু বিশ্রাম চায়।

হাসি পেল, সত্যকে চাপা দেবার কি প্রাণান্তকর প্রয়াস। উনি যে দরিদ্র সে কথাটা উনি কাউকে জানতে দিতে রাজী নন, অথচ ওঁর দারিদ্র্যের জীবন্ত প্রমাণ যে ওঁর চেহারায় পরিস্ফুট সে কথাটা মুহূর্তের জন্যেও ওঁর মাথায় উদয় হচ্ছে না। অদ্ভুত মানুষের এই সামাজিক-প্রতিষ্ঠা-বোধ।

কথার ধারা অন্য খাতে বইতে সুরু করেছে দেখে সিদ্ধিনাথবাবু প্রসঙ্গ পাল্টালেন। বললেন, কোথাও কিছু নেই বুঝলে ভায়া, কর্তাদের হঠাৎ কি যে খেয়াল হ'ল হুকুম-জারী করে দিলেন বি-টি ছাড়া আর মাষ্টার রাখা হবে না। বোঝ ব্যাপারখানা। আরে আজ না হয় এত বি-টির চলন হয়েছে, নতুবা তোরা যেকালে পড়েছিলি সেকালে ক'টা বি-টি ছিল, তাদের কাছে পড়েই ত তোরা আজ এক-একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে গেলি, না কি? তা নয়, কে যে ওঁদের মাথায় ঢুকিয়েছে ভগবান জানেন, ওঁদের ধারণা হয়েছে ট্রেনিং না পেলে মাষ্টাররা আর কেউ পড়াতে পারবে না। কি ছেলেমানুষি ব্যাপার বল দিকি। আজন্মকাল আমরা মাষ্টারী করে খাচ্ছি আমরা জানব না পড়াতে, জানবে যত ওই ছ' মাসের ট্রেনিং পাওয়া তিন দিনের ডেঁপো ছোকরারা। কি যে সব ভাবে —

একটু থেমে আবার পুরনো কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, আবার শুনছি নাকি বলছে— যারা এখনও ট্রেনিং নাও নি তারা সব এই বেলা গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসো গে। ভাবো দিকি একবার ব্যাপারখানা। কলেজ ছেড়েছি আজ প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ হ'ল, এখন যদি আবার সদ্য পাস করা ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে—একসঙ্গে বসে লেকচার নোট করতে হয় তা হলেই ত গেছি। তা ছাড়া চাকরী ত আছে বড়জোর আর বছর তিন কি চার, এখন পনের টাকা মাইনে বাড়লেই বা কি আর না বাড়লেই বা কি।

একটু থেমে আবার বলতে সুরু করলেন, গিয়েছিলাম ওপারে শুকদেবপুরে একটা পোষ্ট খালি আছে শুনে, তা সেখানেও শুনলাম ওই বি-টি চাই। সেক্রেটারী বললেন, কি করব মশাই, ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, বি-টি না রাখলে গবর্ণমেণ্টের গ্র্যাণ্ট-ইন-এড বন্ধ হয়ে যাবে। কি আর করব, ফিরতে হ'ল সেখান থেকে। নিজের কপালকেই দুষলাম, ত্রিশ বছর এক্সপিরিয়েন্সের চাইতে এক বছর ট্রেনিঙের দাম হ'ল বেশী।

একটা ভারী নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ পেলাম।

খানিক বাদে আবার সুরু করলেন, ইংরেজীর টিচার হয়ে ঢুকেছিলাম পনের টাকা মাইনের চাকরী নিয়ে, তা সে কি আজকের কথা? তখন আড়াই টাকা মণ চাউল ছিল, পাঁচ সিকে জোড়া ধুতি ছিল, জিনিসপত্তরের বাজারে এখনকার মত এমন আগুন লাগে নি। পনের টাকা মাইনেয় একটা সংসার তখন হেসে-খেলে চলে যেত। আর এই সেদিনও ষাট টাকা করে মাইনে পেয়েছি, দু'মণ চাল কিনতেই সব ফাঁক। মাসের পনের দিন যেতে না যেতে স্কুল থেকে আগাম নিতে হ'ত। আর এখনকার কথা ত না বলাই ভাল, এখন মাথাই নেই তার মাথাব্যথা।

বলেই যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। আমার দিকে চেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আমি অবিশ্যি জেনারেল সেন্সেই কথাটা বলছি। আমার মত এক-আধ জনের না হয় জমিজমা থাকতে পারে, কিন্তু সবার ত আর তা নেই। শতকরা নিরানব্বই জনেরই ত এই অবস্থা, না কি ভায়া?

কণ্ঠস্বরের কৃত্রিমতাটা বোধ হয় নিজের কানেও বেজে-ছিল, তাই আপনা থেকেই চুপ করে গেলেন। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার জন্যে আমিও আর কোন উচ্চবাচ্য না করে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম।

সত্যি সত্যিই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই, মাঝ-রাতে হঠাৎ যখন ঘুমটা ভাঙল, খেয়াল হ'ল সিদ্ধিনাথবাবু পাশে নেই। ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলাম। জানালা দিয়ে বাইরের পানে এদিক-ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল সিদ্ধিনাথবাবু বসে রয়েছেন আলসের গায়ে হেলান দিয়ে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে। হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করা, মাথাটা ঈষৎ হেলে পড়েছে পেছন দিকে, কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ মেলে ঊর্দ্ধ আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে কি দেখছেন একমনে।

পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সিদ্ধিনাথবাবু তখনও তন্ময় হয়ে আকাশের তারা গুনছেন। একেবারে পাশে এসে দাঁড়ালাম, সিদ্ধিনাথবাবু তবু টের পেলেন না। খানিক অপেক্ষা করে থেকে নীচু গলায় বললাম, দাদা এখনও ঘুমোন নি!

সিদ্ধিনাথবাবু যেন চমকে উঠলেন। তাকিয়েই সামনে আমাকে দেখতে পেয়ে একটু থতমত খেয়ে বললেন, এই যে ভাই উঠি, ঘরে বড্ড গুমোট দিচ্ছিল কিনা তাই একটু বাইরে এসে বসেছি।

হঠাৎ আমার ডান হাতখানা চেপে ধরলেন সিদ্ধিনাথবাবু। নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়ে সবিস্ময়ে ওঁর মুখের পানে ফিরে তাকালাম। সিদ্ধিনাথবাবু অনুনয়ের সুরে বললেন, একটু বস না ভাই।

অভিভূতের মত বসে পড়লাম। সিদ্ধিনাথবাবু খানিকক্ষণ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলেন, তার পর হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে বলে উঠলেন, তোমার কাছে কিছু লুকোব না ভাই, অনেক দিন বাদে আজ পেট ভরে খেতে পেলাম।

ইচ্ছে হ'ল থামতে বলি, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। সিদ্ধিনাথবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় মনের অবস্থাটা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন তাই একটু ম্লান হেসে বললেন, টাকাটা যে অচল যে চালাতে এসেছিল সেও জানে, যাকে চালাতে এসেছিল সেও বুঝতে পেরেছে। এক্ষেত্রে দুই পক্ষই যদি চেপে যায় তা হলে ভদ্রতাটা হয় ত বজায় থাকে, কিন্তু তাতে কি আর আসল সত্যটা চাপা পড়ে?

কথাটার ঠিক জবাব খুঁজে পেলাম না।

একটু থেমে আবার বললেন, ছিলাম জমিদার-ঘরের ছেলে, হতে হ'ল ইস্কুল মাষ্টার, একেই বলে কপালের ফের। আর ও এই জন্যেই বোধ হয় ক্ষিধেটাকে এখনও ঠিক বাগে আনতে পারলাম না।

আবার একটু থেমে বললেন, নতুবা দেখ না, চোখের সামনে দেখছি বউ না খেয়ে মরছে, ছেলে না খেয়ে মরছে, সে সব সহ্য হচ্ছে। অথচ নিজে না খেয়ে মরতে হবে এই কথাটাই ভাবতে গেলে যেন আঁতকে উঠি। চাকরীর ছুতো করে এর-ওর তার বাড়ী ঠিক খেয়ে আসি।

কথা শেষ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু অদ্ভুত রকমের হেসে বললেন, শুনে ঘেন্না হচ্ছে না ভাই? হওয়াই স্বাভাবিক।

অন্য দিকে মুখ ফেরালাম। ছাতের কোণে তালগাছটা ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাতার স্তূপের ভেতর থেকে কোন এক মুমূর্ষু পক্ষী-শাবকের অন্তিম চীৎকার কানে আসছে, বোধ হয়, তক্ষকের কবলে পড়েছে। ওধারে নারিকেলগাছের মাথাটা হাওয়ায় দুলছে, অনবরতই যেন কার প্রস্তাবের উত্তরে 'না' জানিয়ে চলেছে। আকাশে ক্ষীণ একফালি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে, এমন আলোর জোর নেই যে, কাছের রোহিণীটাকে অবাধ ঢাকা দেয়। দূর থেকে কয়েকটা বিবদমান কুকুরের ক্ষীণ কোলাহল মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছে। পাশের আমবাগানটা থেকে একটি রাতজাগা পাখী অনেকক্ষণ থেকে একটানা ডেকে চলেছে কক্‌—কক্‌—কক্‌।

সিদ্ধিনাথবাবু বলে চলেছেন, বুঝলে ভাই, ভেবে দেখলাম পুরুষকার ক্ষুরষকার ওসব বাজে কথা, দৈবই আসল। সবাই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, তাতে কেউ যদি কষ্ট পায় পাক, তার জন্যে আর সবাইয়ের কষ্ট করতে যাওয়াটার ত কোন মানে হয় না। মনকে এক এক সময় বুঝাই এই বলে, দেখ, তুমি যদি না-ই খেতে, তাতেই কি আর সবাইয়ের খাওয়া জুটত? তা যখন জুটত না, তখন কেন তুমি উপোস করে থাকবে? একজন মরছে বলে তার সঙ্গে আর একজনের মরাটার ত কোন মানে হয় না।

একটু থেমে আবার বললেন, বাড়ীতে আমি সবাইকে বলে দিয়েছি, মনে কর আমি মরে গেছি। আমি মরে গেলে যেমন করে সংসার চালাতে এখনও ঠিক তেমনি করেই চালাও।

একটা মামুলি সান্ত্বনা-বাণী উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সিদ্ধিনাথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে পারলাম না। জীবন-যুদ্ধে হেরে গিয়ে মানুষ যখন নৈরাশ্যের শেষসীমায় এসে উপস্থিত হয় তখন সে নেতিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ওরকম নৈরাশ্য যে একদিন আমার জীবনেই আসবে না তাই বা কে বলতে পারে?

হঠাৎ সিদ্ধিনাথবাবু আমার হাত দুটো চেপে ধরে বলে উঠলেন, ভাল চাও ত এখনও এ লাইন ছেড়ে দাও ভাই। এর চাইতে যদি মুদীখানার দোকান খুলে বস তো সেও ভাল, তাতে তবু ভাত-কাপড়টা হবে, এ লাইনে তাও নেই। আদর্শবাদের গালভরা বুলি শুনতেও ভাল, বলতেও ভাল কিন্তু তাতে পেট ভরে না। তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে মাষ্টারি করা সেকালে হয়ত চলত, কিন্তু একালে আর চলে না। একালে আর সবায়ের মত মাষ্টারদেরও সমাজ আছে, সংসার আছে, সচ্ছলভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। এতে করে আদর্শের মান হয়ত কিছু ক্ষুণ্ণ হবে, কিন্তু সেটুকু মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

একটু থেমে আবার সুরু করলেন, এ লাইনের আর একটা মজা হচ্ছে কি জান, কয়েক বছর যদি মাষ্টারি কর ত আর অন্য কোন কাজ ভাল লাগবে না, আফিঙের নেশার মত পেয়ে বসবে এই মাষ্টারির নেশা। এই আমার যেমন এখন হয়েছে চাকরী নেই তবু অন্য কোন কাজ করব না। অবশ্য অন্য কোন কাজ যে পাবই এমন কোন কথা নেই—না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, কিন্তু তা হলেও পাবার চেষ্টা করি নি। এখন আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে, কেউ যদি বলে, আপনাকে মাইনে দিতে পারব না আপনি মাষ্টারি করুন, আমি তাতেই রাজী হয়ে যাব। তুমি বললে বিশ্বাস

করবে না ভায়া, এখনও আমি রোজ দশটায় বাড়ী থেকে বেরুই আর চারটায় বাড়ী ফিরি, সারাটা দিন বসে থাকি গাঁয়ের স্কুল কম্পাউণ্ডের বাইরে একটা পিটুলীগাছের গোড়ায়। বসে বসে শুনি মাষ্টারেরা পড়াচ্ছে, ছাত্রেরা পড়ছে সুর করে করে। শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে দিন কেটে যায় টের পাই না। চমক ভাঙ্গে ছুটির ঘণ্টা বাজলে, তখন তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় নেমে পড়ে পা চালাতে সুরু করি, পাছে ছাত্রেরা বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে ফেলে ঐ অবস্থায়।

কতক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে বসেছিলাম দু'জনে খেয়াল নেই। চমক ভাঙ্গল পাশের তালগাছের মাথা থেকে ককিয়ে ওঠা একটা পেঁচার কর্কশ চীৎকারে। মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম চুল ভিজে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সপ্তর্ষিমণ্ডল হেলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। সিদ্ধিনাথবাবু পাশে নিথর হয়ে বসেছিলেন, বললাম, ওঠা যাক দাদা, এইবার।

সিদ্ধিনাথবাবু সুপ্তোত্থিতের মত বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই যে ভাই উঠি।

সকাল হতেই হাটে চলে গিয়েছিলাম, ফিরে আসতেই সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, কলকাতায় যাবার ট্রেনটা ক'টায় ভায়া?

বললাম, কেন, এ বেলাই যাবেন নাকি?

সিদ্ধিনাথবাবু পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলে উঠলেন, না গিয়ে উপায় কি ভায়া। তুমি ত খানিক বাদেই খেয়ে-দেয়ে স্কুলে চলে যাবে, তখন বৌমা যদি আমায় একা পেয়ে সম্মার্জ্জনী হাতে নিয়ে তাড়া করেন তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছ? তার চাইতে বাপু সময় থাকতে থাকতেই চলে যাওয়া ভাল।

ওঁর বলার ধরন দেখে হেসে ফেললাম, বললাম, সে যা হয় হবে'খন, আপনার ট্রেনের এখন দেরি আছে। তার আগে আপনি এখান থেকে নাওয়া-খাওয়া করে যাবেন।

সিদ্ধিনাথবাবুর মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, তোমাকে আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করব ভায়া, আগেকার দিন হলে না হয় বলা যেত রাজা হও, কিন্তু এখন ত আর তা চলবে না, এখন তার চাইতে যদি পার ত বরং একটা কেউ কেটা গোছের কিছু হয়ো।

হাসতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। সিদ্ধিনাথবাবুর আসল রূপটি চোখের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। নিষ্করুণ দারিদ্র্য ওঁর মনের মধ্যে এমন একটা নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে যার ফলে কোথাও তিনি এক বেলার বেশী দু'বেলা আহার পাবার কথা ভাবতেই পারেন না। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আমন্ত্রণ জানায় তা হলে আনন্দে হয়ে উঠেন উচ্ছ্বসিত।

দেখে শুনে শঙ্কা জাগে মনের মধ্যে, আমারও কি একদিন ওই অবস্থা হবে।

ছোট মেয়ে বিনু কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাই নি, সিদ্ধিনাথবাবুই বললেন, পেছনে ওটি কে ভায়া?

চমকে পিছু ফিরে তাকিয়ে বললাম, ও, এটি আমার ছোট মেয়ে বিনু। তাকে বললাম, এই পেন্নাম কর, জ্যাঠাইশাই হন।

সিদ্ধিনাথবাবু যেন চমকে উঠলেন, বললেন, কি নাম বললে ভায়া?

একটু বিস্মিত হলাম, বললাম, ভাল নাম বিনতা, ডাক নাম বিনু।

ওঃ, সিদ্ধিনাথবাবু হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বিনু নীচে চলে যেতে বললেন, কিছু মনে করো না ভায়া, ওই নামে আমারও একটি মেয়ে ছিল কিনা, তাই হঠাৎ তোমার মুখে তার নাম শুনে একটু চমকে উঠেছিলাম।

বুঝলাম হয়ত কোন বেদনার কাহিনী জড়িয়ে থাকবে ও নামের সঙ্গে, তাই ও নিয়ে আর কোন কৌতূহল প্রকাশ করলাম না।

সিদ্ধিনাথবাবু নিজে থেকেই বলতে লাগলেন, আমার বিনুও থাকলে ঠিক অত বড়টিই হ'ত, ওই রকমই শান্ত-শিষ্ট ছিল মেয়েটি। ছোটবেলা থেকেই অসুখে অসুখে ভুগত বলে ওর অসুখ নিয়ে কেউ আর বড় একটা মাথা ঘামাতাম না। নেহাত যখন বুঝত জ্বর আসছে তখন নিজেই একটা কিছু টেনে নিয়ে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ত, তার পর জ্বর ছাড়লে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়ে ভায়েদের সঙ্গে বসে পড়ত পিঁড়ি পেতে। এই রকমই চলছিল, হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল মেয়েটার হাত-পাগুলো ফুলতে সুরু করেছে। কাছেই চেনা-শুনা এক ডাক্তার ছিল, দেখালাম, ডাক্তার দেখে বললে, এনিমিয়া—রক্তাল্পতা। বললাম, ওষুধ? বললে, এর আর ওষুধ কি? ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আমি একটা দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তাতে আর কি হবে? এর দরকার এখন পুষ্টিকর খাদ্যের। আঙুর, বেদানা, নাসপাতি এই সব খাওয়াতে হবে, পারবেন?

শুনে আর দাঁড়ালাম না ভাই। যাদের পেটে ভাত জোটে না তাদের কাছে আঙুর, বেদানার কথা বলা মানে ঠাট্টা করা নয় কি? তা ছাড়া আমার ত শুধু ওই একটির মুখের দিকে চাইলেই হবে না, আরও ক'টিকে আমায় দেখতে হবে। মনকে বোঝালাম এই বলে, কষ্ট ত

এ রকম রোগা ছেলে-পুলে রয়েছে, সবাই কি আর আঙুর, বেদানা খাওয়াতে পারছে? বাঁচার হলে এমনিতেই বাঁচবে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, অবিশ্যি বাঁচল না শেষ পর্য্যন্ত। ইদানীং তার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, ভাল করে হাঁটতেও পারত না। বেশীর ভাগ সময়ই হয় এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকত, নয় আমার কোলে কোলে ঘুরত। বললে বিশ্বাস করবে না ভাই, শেষের দিকে চেঁচিয়ে কাঁদার মত ক্ষমতাটুকুও তার ছিল না।

সিদ্ধিনাথবাবু থামলেন। আমারও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তাড়াতাড়ি এ প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার জন্যে বললাম, বেলা অনেক হয়েছে দাদা, এবার নীচে চলুন।

—এই যে ভাই উঠি, সিদ্ধিনাথবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সিদ্ধিনাথবাবু, টেনে টেনে বারকয়েক শ্বাস গ্রহণ করে বললেন, বাঃ, খাসা বাস ছাড়ছে ত হে। বৌমা কি হালুয়া-টালুয়া কিছু তৈরি করছেন নাকি?

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, দেয়াল ধরে সামলে নিলাম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর মুখের পানে চেয়ে দেখি আশ্চর্য্য! একটু আগেও সেখানে যে গভীর বিষাদের ছায়া দেখেছিলাম তার চিহ্নমাত্রও কোথাও নেই। তার জায়গায় উগ্র হয়ে ফুটে উঠেছে প্রচণ্ড লোভ। ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল, একটু আগেও মানুষটির উপর সহানুভূতি হচ্ছিল ভেবে নিজেরই যেন লজ্জাবোধ হতে লাগল।

দালানে নেমে সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, তুমি তা হলে ভাই একটু অপেক্ষা কর, আমি চট করে একবার মুখটা ধুয়ে আসি, কেমন?

উত্তর দেবার প্রবৃত্তি ছিল না, তবু বললাম, আচ্ছা।

খেতে খেতে সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, ভারি চমৎকার হয়েছে হে, কিসমিসগুলো এক একটা যা ফুলেছে যেন ঠিক রসগোল্লার মত। তার পর আমাকে নিরুত্তর দেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি হয়ত ভাবছ যার বাড়ীতে সবাই উপোস করে থাকে সে এমন নিশ্চিন্দি হয়ে খায় কি করে? কিন্তু ওই যে বললাম ভাই, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি, আমি ভাববার কে?

সামনের পেঁপেগাছটার একটা পেঁপে পেকে ছিল, সেই দিকে চেয়ে বললেন, বাঃ, পেঁপেটা ত খাসা, রাঁচির নাকি ভায়া?

বললাম, না, এমনি দিশী পেঁপে, আপনা থেকেই হয়েছে।

সিদ্ধিনাথবাবু খানিক লুব্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থেকে বললেন, দেখে কিন্তু বোঝবার উপায় নেই। পেঁপেটা দিও দিকি ভায়া বীজ করব, আস্তই দিও নিয়ে যাওয়ার সুবিধে হবে।

বললাম, আচ্ছা।

ন'টা বাজতেই সিদ্ধিনাথবাবুকে বললাম, আপনি চানটান করে নিন দাদা, আপনার ট্রেন ত ন'টা বিয়াল্লিশে।

সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, তোমার ট্রেন ক'টায়?

বললাম, আমার ট্রেন আপনার একটু পরে, দশটা চারে, আমিও অবশ্য আপনার সঙ্গেই খেয়ে নেব। আপনি আগে চানটা করে আসুন, আমি তারপর যাচ্ছি।

খেতে বসে সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, মাছের ঝোলটা বেড়ে হয়েছে হে। বৌমাকে বল না আর হাতাখানেক দিয়ে যেতে, ভাতক'টাকে সব একেবারে মেখে নি।

বললাম, ওগো, দাদাকে আর হাতাখানেক ঝোল দিয়ে যেও।

দড়াম্ করে রান্নাঘরের দরজাটা খুলে গেল। পরমুহূর্ত্তেই এককড়া ঝোল নিয়ে এসে সবটা সিদ্ধিনাথবাবুর পাতে উল্টে দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে গেল মল্লিকা, যাবার সময় দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে গেল মুখের উপর। এত দ্রুত সবকিছু ঘটে গেল যে বাধা দেবার অবসর অবধি পেলাম না।

সিদ্ধিনাথবাবু খানিক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের পানে, তার পর বোকার মত একটু হেসে বললেন, গরম কড়া কিনা, তাই হঠাৎ কাৎ হয়ে গিয়েছিল।

বলেই আবার খাওয়ায় মন দিলেন।

বেরোবার সময় কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েই সিদ্ধিনাথ-বাবু বলে উঠলেন, কি সর্ব্বনাশ!

বললাম, কি হ'ল?

সিদ্ধিনাথবাবু পাংশুমুখে বললেন, কোটের পকেটে পাঁচটা টাকা ছিল ভাই, পাচ্ছি না—কাল ট্রেনে আসতে আসতে ঘুমিয়েছিলাম সেই সময় নিশ্চয় পকেট মেরেছে। একটা টাকা ত না দিলেই নয় ভায়া, যাবার সময় ট্রেনের টিকিটটা ত অন্ততঃ কাটতে হবে। আমি অবিশ্যি গিয়েই তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব।

একটা রূঢ় কথা বেরিয়ে আসছিল মুখ দিয়ে, ওঁর মুখের পানে চেয়ে সেটাকে সংযত করে নিলাম। সেই রক্তহীন ফোলা ফোলা মুখ, শিথিল বলি-জর্জ্জরিত চামড়া, অস্তি-মাত্রায় স্পষ্ট চোয়ালের হাড়, কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ সব-কিছুর ভেতর দিয়েই দেখতে পেলাম স্পষ্ট ভিক্ষার্থীর

প্রত্যাশা। দ্বিরুক্তি না করে একটা টাকা এনে দিলাম উপর থেকে।

সিদ্ধিনাথবাবু বেরিয়ে যেতেই খেয়াল হ'ল—ওঁর ছাতাটি ঝুলছে আলমারীর মাথায়। ছোট ছেলেকে বললাম, ওরে যা দিকিনি, মাষ্টারমশাই এখন বেশীদূর যান নি, দৌড়ে ছাতাটা দিয়ে আয় দেখি।

সে তড়িৎ গতিতে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বললে, এই নাও না তোমার ছাতা, জ্যেঠামশাই ভুল করে তোমারটা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

মনে পড়ল আমার ছাতাটা ওই একই জায়গা থেকেই ঝুলছিল বটে, তবে ভুলটা ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত কে জানে।

টিফিন পিরিয়ডে টিচার্স-রুমে বসে ওই কথাই ভাবছিলাম। অভাব ত থাকে অনেকেরই. কিন্তু তা বলে অভাবের সঙ্গে স্বভাবটাও কি সবারই ওঁরই মত নষ্ট হয়। এক হিসেবে ভেবে দেখলে মানুষটার উপর ঘৃণা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু সহানুভূতির স্পর্শ থেকে গেল।

অঙ্কের টিচার হরিপদবাবু পাশ থেকে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার শচীনবাবু, এসে অবধি দেখছি অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন। বাড়ীতে গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া কিছু হয়েছে নাকি ?

মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললাম, না সে সব কিছু নয়, এই ভাবছিলাম একটা কথা।

হরিপদবাবু উৎসুক নেত্রে বললেন, কি কথা শুনিই না।

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, সিদ্ধিনাথবাবুকে মনে আছে, সেই যে আমাদের স্কুলে একবার এসেছিলেন চাকরীর খোঁজে।

হরিপদবাবু বাধা দিয়ে বললেন, থাক্ আর বলতে হবে না, তিনি কাল আপনার ওখানে গিয়েছিলেন ত ?

বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, কি করে বুঝলেন ?

হরিপদবাবু বিরস কণ্ঠে বললেন, তার কারণ আপনার মত আমিও একজন ভুক্তভোগী। আর শুধু আমিই বা কেন, রমেনবাবু, তারকবাবু, নিতাইবাবু, শিবনাথবাবু, নৃসিংহবাবু, মদনবাবু, তিনকড়িবাবু, পণ্ডিতমশাই কেউই বাদ যান নি। সব জায়গাতেই গেছেন ওই এক ছুতো করে, চাকরী-বাকরীর কিছু খোঁজ হ'ল কিনা। আরে চাকরী-বাকরীর খোঁজই যদি নিতে হয় ত একটা চিঠি দিয়ে দিলেই পারতিস। তা নয়, জানে গিয়ে যদি পড়া যায় ত একটা বেলার খাওয়া নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আর এই দুর্ব্বৎসরের দিনে বিনা টিকিটে গিয়ে যদি একটা বেলা খাওয়া পাওয়া যায় ত মন্দ কি ?

ভূগোলের টিচার যতীনবাবু নতুন এসেছেন। এতক্ষণ চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, কার কথা বলছেন হরিপদবাবু।

হরিপদবাবু বিতৃষ্ণাভরে বললেন, সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী। এককালে নাকি মাষ্টার ছিল, এখন চাকরীর ছুতো করে এর ওর তার বাড়ী খেয়ে বেড়ায়।

যতীনবাবু যেন চমকে উঠলেন। হরিপদবাবুর সেটা নজর এড়ায় নি। চেয়ারখানা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পাশে বসে বললেন, কি ব্যাপার বলুন দিকি, ভদ্রলোককে চিনতেন নাকি এর আগে ?

বেশ বোঝা গেল যতীনবাবু অস্বস্তি বোধ করছেন। হরিপদবাবু সেটা বুঝতে পেরে বললেন, আরে মশাই এ হচ্ছে নিজেদের কলীগ্‌দের মধ্যে, এখানে বললে কোন কথা ত আপনার বাইরে বেরুচ্ছে না। সিদ্ধিনাথবাবু সম্বন্ধে যদি কিছু জানেন ত নির্ভয়ে বলতে পারেন এখানে।

তবু যতীনবাবু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে যে সব টিচার ওদিকে বসে গল্প করছিলেন তাঁরা এদিকে একটা মুখরোচক বিষয়ের অবতারণা হয়েছে দেখে নিজেদের আড্ডা ভেঙে দিয়ে সবাই যতীনবাবুকে ঘিরে দাঁড়ালেন। বেশ খানিকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও উনি কোন উচ্চবাচ্য করছেন না দেখে হরিপদবাবু অধৈর্য্য হয়ে বললেন, কি ব্যাপার যতীনবাবু, আপনি যে ঠোঁটে তালা এঁটে বসে রইলেন।

যতীনবাবু অস্বস্তিভরে বললেন, দেখুন আপনারা যখন ধরেছেন আমি বলছি, কিন্তু দেখবেন কথাটা যেন বাইরে প্রকাশ না হয়।

হরিপদবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, সেদিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন মশাই। আপনার কথা আমাদের ক'জন ছাড়া আর কারুর কানে উঠবে না।

যতীনবাবু সুরু করলেন, এর আগে কিছুদিন আমি দিলঘাটা হাই ইস্কুলে চাকরী করেছিলাম, সেই সময় সিদ্ধিনাথবাবু ছিলেন ওখানকার ইতিহাসের টিচার। আমি যখন গেলাম তার কিছুদিন আগেই উনি ঢুকেছেন। শুনলাম এর আগে যে ইস্কুলে চাকরী করতেন, সেখানে ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় সম্প্রতি চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। আমাদের বললেন, চাকরীর পরোয়া আমি করি না ভায়া, থার্টি ইয়ার্স এক্স-পিরিয়েন্সড্ টিচার—আমার আবার চাকরীর ভাবনা ? যে
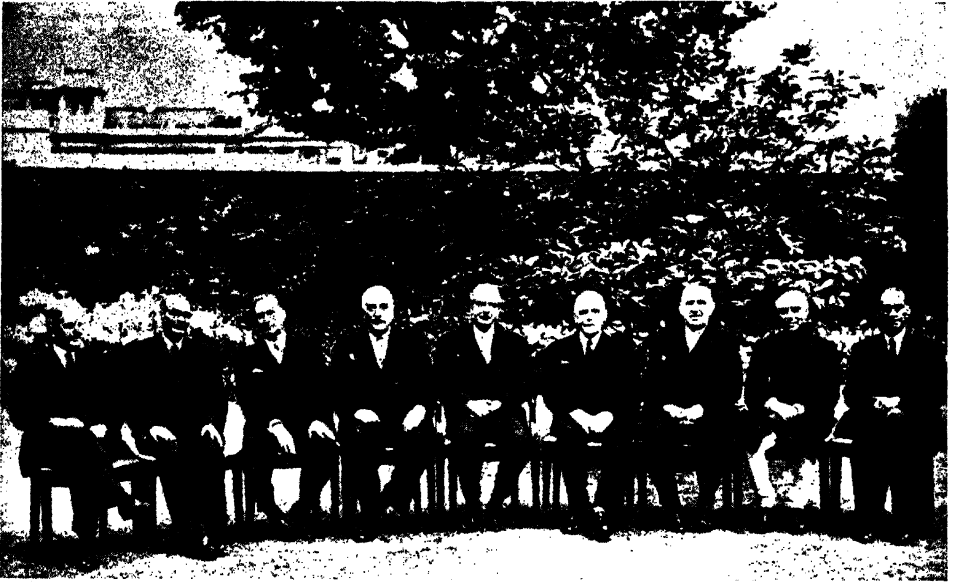
লণ্ডনে কমনওয়েল্‌থ-প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন : (ডান দিক হইতে) শ্রীবন্দরনায়ক, শ্রীজবাহরলাল নেহরু, মিঃ এস. জি. হল্যাণ্ড, মিঃ সেণ্ট লরেণ্ট, সর্ এণ্টনি ইডেন, মিঃ আর. জি. মেঞ্জিস, মিঃ জে. জি. ষ্ট্রিগডম, মিঃ মহম্মদ আলি, লর্ড ম্যালভার্ন

দার-এস-সালামে ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণন

বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পালাম বিমানঘাটিতে পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরুর অভ্যর্থনা

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণন কর্ত্তৃক রুমানিয়ার বুখারেস্টে একটি 'গার্ড অব অনার' পরিদর্শন

ইস্কুলে যাব সেই ইস্কুলেই লুফে নেবে। তাও যদি আর সবাইয়ের মত পেটের ধান্দায় চাকরী করতে যেতাম তা হলেও না হয় কথা ছিল। ঘরে আমার জমি রয়েছে, গরু রয়েছে, পেটের ভাতের কথা আমায় ভাবতে হয় না। তবে ওই যে বললাম মাষ্টারী হচ্ছে আমার একটা 'হবি', চুপচাপ ঘরে বসে থাকা আমার পোষায় না। নতুবা কি দায় পড়েছিল আমার মত লোকের ষাটটা টাকার জন্যে বিদেশে বিভুঁয়ে এত কষ্ট সহ্য করে পড়ে থাকার?

সামনে আমরা বলতাম, সে ত বটেই, আড়ালে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম। আসল অবস্থাটা ত জামা কাপড়ের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। একটা ময়লা তালিমারা কোট, তা কি শীত কি গ্রীষ্ম খালি গায়ের উপর চড়িয়ে ইস্কুলে আসেন। ঘামে ধুলোয় তার এমন চেহারা হয়েছে যে তার আসল রঙ কি ছিল তাই নিয়ে গবেষণা করা চলে। পরনের কাপড়খানার দিকে ত তাকানো যায় না, পায়ে মান্ধাতার আমলের ন্যাকড়ার জুতো। এই সব দেখে কি পরিমাণ জমিজমা আছে সে ত সহজেই আন্দাজ করা যায়।

থাকতেন স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাড়ী, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। খাওয়া-দাওয়াটা ওখানেই হয়ে যেত।

একটু চুপ করে থেকে আবার সুরু করলেন যতীনবাবু, কিছুদিন যেতেই একটা জিনিষের উপর সবারই নজর পড়ল, বুকসেলার্স পাবলিশার্সদের কাছ থেকে যে সব টেক্সট বই, নোট বইয়ের 'স্পেসিমেন কপি' আসে কিছুদিন বাদেই সব যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়। প্রথম প্রথম সবাই ব্যাপারটা দেখেও দেখলেন না। ভাবলেন পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা জিনিষ বৈ ত নয়, অভাবী মানুষ যদি নিয়েই থাকেন কি আর করা যাবে, পুরনো বইয়ের দোকানে অর্দ্ধেক দামে বেচে কতই বা আর পাবেন। তা ছাড়া টেক্সট বই, নোট বইয়ের 'প্রেজেন্টেশান কপি' ও ত এক রকম ইস্কুলেরই প্রাপ্য। তাদের ত আর বই কিনতে হয় না, যা কিছু হয় সব ওর থেকেই, তবে এক্ষেত্রে একজন টিচার সবকিছু নিচ্ছেন এই যা। কিন্তু তা বলে ওই নিয়ে ত একটা কেলেঙ্কারী করা যায় না, তাতে ওঁর ত বদনাম বটেই, ইনষ্টিটিউটেরও কলঙ্ক।

একটু থেমে যতীনবাবু বললেন, অবশ্য কেলেঙ্কারী ঠেকানো গেল না শেষ পর্য্যন্ত। একদিন টিফিন পিরিয়ডের সময় হেড মাষ্টারমশাই হন্তদন্ত হয়ে টিচার্স রুমে ঢুকে বললেন, আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। চেম্বার্সের টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ডিক্সনারীখানা পাওয়া যাচ্ছে না, আপনারা কেউ কি নিয়েছেন?

সবাই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। একে একে সকলেই জানালেন, না, তারা কেউ নেন নি।

সিদ্ধিনাথবাবু একপাশে পাংশুমুখে বসেছিলেন, হেডমাষ্টার মশাই তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, সিদ্ধিনাথবাবু আপনি? —সিদ্ধিনাথবাবু থতমত খেয়ে বললেন, না আমি নিতে যাব কেন?

বাংলার টিচার রতনবাবু বললেন, আপনাকে কাল যেন চারটের পর লাইব্রেরী ঘরে দেখেছিলাম সিদ্ধিনাথবাবু, কি বই নিচ্ছিলেন আপনি?

সিদ্ধিনাথবাবু আমতা আমতা করে বললেন, সে আমি অন্য বই নিচ্ছিলাম।

হেড মাষ্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, কি বই?

সিদ্ধিনাথবাবু বিবর্ণ মুখে বসে রইলেন, কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

হেড মাষ্টারমশাই কঠিন কণ্ঠে বললেন, দেখুন সিদ্ধিনাথবাবু, আপনার উপর সন্দেহ আমাদের এক দিনে হয় নি। তবে এত কাল যে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলি নি তার কারণ এতদিন যে জিনিষগুলো যাচ্ছিল সেগুলো এতই সামান্য যে তাই নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করাটা ঠিক হ'ত না। তবে এবার যে জিনিষ গেছে তার পর আর চুপ করে থাকা চলে না। আপনি যে নিয়েছেনই এমন কথা আমি বলছি না, তবে আমাদের সন্দেহ নিরসনের জন্যে আপনার ঘরখানা আমরা একবার দেখব। আশা করি আপনার তাতে কোন আপত্তি নেই?

সিদ্ধিনাথবাবু জড়ের মত বসে রইলেন, হাঁ, না কিছুই বললেন না। হেড মাষ্টার মশাই আদেশের ভঙ্গীতে বললেন, তা হলে আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে। টিফিন শেষ হতে এখনও দেরি আছে, এখন যদি আমরা বেরিয়ে পড়ি টিফিনের মধ্যেই ঘুরে আসতে পারব।

একজন টিচারকে চার্জে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সিদ্ধিনাথবাবু পুতুলের মত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চললেন। একদল ছাত্র মজা দেখার জন্যে পিছু নিয়েছিল, হেড মাষ্টারমশাইয়ের রক্তচক্ষু দেখে তারা ফিরে গেল।

রাস্তার পাশেই চাকরদের ঘরের সঙ্গে একখানা ঘর। দরজার সামনে এসে সিদ্ধিনাথবাবু পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে শেষে বিরক্ত হয়ে হেড মাষ্টারমশাই বললেন, চাবি বার করুন সিদ্ধিনাথবাবু।

সিদ্ধিনাথবাবু তেমনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কথা কানে ঢুকল কি না বোঝা গেল না।

হেড মাষ্টারমশাই রেগে গিয়ে নিজেই ওঁর কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবি বার করলেন। তালা খুলে ভিতরে ঢোকার আগে সিদ্ধিনাথবাবুকে বলা হ'ল, ঢুকুন সিদ্ধিনাথবাবু।

সিদ্ধিনাথবাবু তেমনি নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন. এবারেও কথা কানে ঢুকেছে কি না বোঝা গেল না।

শেষে একরকম জোর করেই ওকে ভিতরে ঢোকানো হ'ল। তার পর আমরা ঢুকলাম, ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম মুহূর্ত্তখানেকের জন্য। দারিদ্র্যের যে বীভৎস মূর্ত্তি সেদিন চোখে পড়েছিল আজও তা ভুলতে পারি নি। নীচু, খোয়া উঠা, স্যাঁৎসেঁতে ঘর, তারই এক কোণ থেকে আর এক কোণ অবধি লম্বা হয়ে শুকোচ্ছে একটা ছেঁড়া কাপড়, সে কাপড় পরে কেউ যে লজ্জা নিবারণ করতে পারে এ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঘরের পিছন দিককার জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পাছে পথ চলতে লোকের নজরে পড়ে। ঘরের এককোণে জড়ো করা রয়েছে দোমড়ানো একখানা মাদুর আর তুলো বার করা একটা বালিশ, অনুমান করলাম ওইটিই শয্যা। একপাশে একটা দড়ির আলনা থেকে ঝুলছে একখানা ওয়ার-বিহীন গলে-পড়া কাঁথা, একটা ময়লা হাতকাটা ফতুয়া আর তেলচিটে রঙীন গামছা। ঘরের মেঝেয় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে একটা কাঁচভাঙা লণ্ঠন, কানাভাঙা কলসী, চটা-উঠা কলাই করা গেলাস, মরচে-ধরা টিনের মগ, গোটাকয়েক পোড়া বিড়ি আর গুচ্ছেরখানেক দেশলাইয়ের কাঠি। একপাশে একটা আধ-খাওয়া পাকা বেলে পিঁপড়ে ধরো জায়গাটা জঘন্য হয়ে উঠেছে।

ঘরের আসবাব বলতে চোখে পড়ল একটা চটা-উঠ টিনের তোরঙ্গ, যদি কিছু থাকে ত ওরই মধ্যে আছে। হেড মাষ্টারমশাই বললেন, বাক্সের চাবিটা দিন সিদ্ধিনাথবাবু।

সিদ্ধিনাথবাবু কোটের পকেট আঁকড়ে ধরে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, চাবি ছাড়বেন না কিছুতে।

হেড মাষ্টারমশাই নিষ্করুণ কণ্ঠে বললেন, যতীনবাবু, দেখুন দিকি কুলুপটা ভাঙা যাবে কি না।

পুরনো মরচে-ধরা কুলুপ, একটা টান দিতেই সবসুদ্ধ খুলে এল। ডালা খুলতেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ভিতরে কি আছে দেখবার জন্যে।

রাশীকৃত বাজে কাগজ আর পুরোনো চিঠির স্তূপ। হেড মাষ্টারমশাই অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, আপনি বাক্স উল্টে দিন যতীনবাবু।

ওঁর কথামত বাক্স উল্টে দিলাম। বাজে কাগজ আর পুরনো চিঠির স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চেম্বার্সের সেই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ডিক্সনারী আর তার সঙ্গে খানকয়েক নোট বইয়ের 'স্পেসিমেন কপি', সেগুলো ইস্কুলে আসার পর বোধ হয় পুরো এক হপ্তাও পেরোয় নি। সিদ্ধিনাথবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখি উনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মুখের সব রক্ত সরে গিয়ে মুখখানাকে দেখাচ্ছে যেন মড়ার মুখ।

দম নেওয়ার জন্যে একটু থামলেন যতীনবাবু, তার পর আবার সুরু করলেন, সেই দিনই ডিসচার্জ্জড্ হলেন সিদ্ধিনাথবাবু। যার বাড়ীতে থাকতেন তিনিও সব শুনতে পেয়ে সেইদিনই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন। পরে শুনেছিলাম সেদিন রাত্রে নাকি উনি সেক্রেটারীর কাছে গিয়েছিলেন ফিনান্সিয়াল অবস্থার কথা জানিয়ে ক্ষমা চাইতে। সেক্রেটারী হাঁকিয়ে দেন এই বলে যে, চোরের ঠাঁই নেই আমার ইস্কুলে।

এর পর আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, তবে লোক মুখে শুনি এখনও নাকি এখানে-ওখানে চাকরীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

যতীনবাবু থামলেন।

এর পর প্রায় মাস ছয়েক কেটে গেছে। সিদ্ধিনাথবাবুর কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন টিফিন পিরিয়ডে টিচার্স-রুমে বসে হরিপদবাবু বললেন, আজ আপনাদের একটা জোর খবর দেব।

সবাই সমুৎসুক নেত্রে ওঁর মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

হরিপদবাবু বলতে লাগলেন, অনেকদিন বাদে সেই সিদ্ধিনাথবাবু আবার কাল রাত দশটার সময় এসে হাজির। দেখে ত পিত্তি জ্বলে গেল, বললাম, কি মনে করে? তাতে একগাল হেসে বললেন, এই ভায়ার কাছেই এসেছিলাম। ভাবলাম অনেকদিন কোন খবর পাই নি, একবার দেখে আসি কিছু খোঁজ-খবর হ'ল কি না।—শুনে পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে গেল। বললাম, ঢের ঢের বেহায়া লোক দেখেছি মশায়, আপনার মত দু'কান কাটা কোথাও দেখি নি। চাকরীর খবর নিতেই হয় ত একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে খবর নিলেই পারতেন, তা নয় বলা নেই কওয়া নেই রাত দুপুরে হট্ হট্ করে যে লোকের বাড়ী এসে হাজির হলেন, কে এখন আপনার জন্য ভাতের থালা সাজিয়ে বসে আছে বলুন দেখি?

একটু দম নিয়ে হরিপদবাবু আবার শুরু করলেন, একেই বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ বলে মন-মেজাজ বেশ ভাল ছিল না,

তার উপরে ও কথা শুনে গেল মাথায় রক্ত চড়ে। রাগের মাথায় মুখে যা এল দিলাম আচ্ছা করে শুনিয়ে। বললাম, খাসা ব্যবসা ফেঁদেছেন মশাই, চাকরীর ছুতো করে আজ এর বাড়ী কাল ওর বাড়ী দিব্যি খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছেন। তাও যদি বুঝতাম সত্যিকারের অভাবী লোক, তা হলেও না হয় কথা ছিল। আপনার মত গুণী লোকের আবার অভাব কি মশাই, একদিন সিঁধ দিলেই ত আপনার সাত দিনের খোরাক উঠে আসবে। অত সহজ উপায় থাকতে আপনি এই সব করে বেড়াচ্ছেন কিসের জন্যে।

সবাই নড়ে চড়ে বসলেন। হিষ্ট্রীর টিচার তারক বাবু বিস্ময়ের ভান করে বললেন, আপনি বললেন এ কথা?

হরিপদবাবু টেবিলে সজোরে একটা চাপড় মেরে বললেন, বলব না মানে? একবার ছেড়ে হাজার বার বলব, স্পষ্ট কথা বলতে হরিপদ ভয় পায় না। বললাম, 'আপনার গুণের কথা ত জানতে আর কারও বাকি নেই মশায়। সাপকে বিশ্বাস করা যায় তবু চোরকে বিশ্বাস করা যায় না। আপনার মত চোর-জোচ্চোরকে রাত দুপুরে বাড়ীতে ঢুকিয়ে শেষে কি বিপদে পড়ব?'

একটা হিংস্র উল্লাস সবার চোখে মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। একজন প্রশ্ন করলেন, তার পর?

হরিপদবাবু বললেন: তার পর আর কি। ধরা পড়ে ত বাছাধনের মুখখানি ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তখনও অবধি চৌকাঠ পেরোয় নি, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্ত্তির মত। আমার তখন খাওয়া-দাওয়া হয় নি, চোর জোচ্চোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার মত সময় ছিল না, দিলাম মুখের উপর দরজা বন্ধ করে। সকালবেলা উঠে দরজা খুলে দেখলাম নেই, ভাবলাম যাক্ আপদ বিদেয় হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া করে ট্রেন ধরব বলে ইষ্টিশানে আসছি, দেখি একটা সাঁকোর ধারে জনকয়েক কুলি জটলা করছে। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার রে? সে বললে বাবু, একজন লোক গলা দিয়েছে কাল রাত্তিরে, আজ সকালবেলা তার মুণ্ডুটা পাওয়া যাচ্ছে না।—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম, গিয়ে দেখি একটা কবন্ধ পড়ে আছে উপুড় হয়ে। সে দেহ দেখে আর কেউ চিনতে পারবে না বটে, কিন্তু আমি পারলাম। সে কোট যে একবার দেখেছে সে আর দ্বিতীয় দিন ভুল করবে না।

নতুন শহর

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রান্তর ছায় ইঁট কাঠে আর কলরবে ভরে দিশপাশ,
আর, মজুর কামিন মিস্ত্রী ছুতার করে ঠন্ ঠন্ ঠুকঠাক,
শহর গড়িছে, মুখর আকাশ, বুকে বুকে ভরে নিশ্বাস,
আর সূর্য্য যেন সে প্রাণশিখাভরা আলো মধু ঝরা মৌচাক।

কত সৌধপ্রাসাদ-শীর্ষ সুদূরে মেঘের মুকুটে ঝলকায়
হেথা ঝকঝক করে কোঠাবাড়ীগুলি মানুষে মানুষে ভরপুর
আজ সুপ্তির দেশে এলো জাগরণ, ইতিহাস পাতা ওলটায়
তাই পায়ের পরশে পথে ছায়া কাঁপে, নব নব পথ বন্ধুর।

সন্ধ্যার আলো র'ক্ ছুঁয়ে যায়, ঝিক্‌মিক্ করে কার্নিশ,
জানলার কাঁচে মুঠো মুঠো আলো আগুনের মত জ্বলছে
সোফায় কৌচে আলমারি-গায় ঝকঝকি ওঠে বার্নিশ
চা'য় পেয়ালায় ঠুনঠান্, কত কলগুঞ্জন চলছে।

রাত নামে, নেই ভূতপ্রেত-হানা মাঠ নির্জন দিক্‌হীন,
বুড়ো বটগাছে ব্রহ্মদৈত্য, মেলেনাকো তার উদ্দেশ,
কবে আলেয়ার শিখা নিবে গেছে, থেমেছে ঝিঁঝিঁর ঝিন্‌ঝিন্,
কালের পাথার পার হয়ে তরী পৌঁছলো এসে কোন্ দেশ?

আঁধার-সাগরে বিদ্যুৎ-বাতি কক্ষে কক্ষে ঝলমল,
শতেক জাহাজ থির হয়ে যেন, বুঝি বা গমন উন্মুখ,
দখিনা বাতাস কাঁপে পর্দ্দায় পালের মতন চঞ্চল,
ক্যাবিনে ক্যাবিনে কেহবা ঘুমায়, কেহ বুঝি জাগে উৎসুক

মৃত্যুনিথর মরুভূর বুকে এলো জীবনের কল্লোল,
কর্ম্মমন্ত্রে ওঠে সঙ্গীত ভোর থেকে ভর রাত্রি,
তন্দ্রা ভেঙেছে, জনতার বুকে লাগে সিন্ধুর ঢেউ-দোল,
ওঠে পড়ে ভাসে কাতারে কাতার হাজার হাজার যাত্রী।

শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রথমেই বলিতেছি আমি শিক্ষাবিদ্ নহি এবং শিক্ষাব্রতীও নহি। তবে কলিকাতার ও পল্লী-অঞ্চলের কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত বহু দিন হইতে সংযুক্ত আছি এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সহিতও ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলাম। ইহার ফলে যে সামান্ত ও অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহার উপর নির্ভর করিয়াই কয়েকটি কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

এই কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায় বা বিভিন্ন স্তরের বালক, যুবক প্রভৃতির উপযোগী পৃথক পৃথক শিক্ষা-প্রণালী এখনও চূড়ান্ত ভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতীগণও এখনও একমত হইতে পারেন নাই; নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও মতের ঐক্য নাই; যাঁহাদের উপর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার অর্পিত রহিয়াছে তাঁহারাও নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। প্রত্যেক স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ) শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বহু আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে ও হইতেছে, বহু কমিটি, কমিশন বসিয়াছে, কিন্তু কোন প্রণালী বা পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদি-সম্মত হয় নাই, পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণেরও এ সম্বন্ধে খুবই অভিযোগ আছে।

পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ (প্রধানতঃ কৃষক, শিল্পী প্রভৃতি সম্প্রদায়) বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে আদৌ সন্তুষ্ট নহেন। প্রধানতঃ, সমাজে শিক্ষিতদের একটা সম্মানজনক স্থান আছে এই ধারণায় এবং লেখাপড়া শিখিলে একটা ভাল চাকরী পাওয়া যাইবে এই আশায় পল্লী অঞ্চলের কৃষক ও শিল্পী সম্প্রদায় তাঁহাদের সন্তানদিগকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু স্থানীয় বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষা লাভের পর এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ বা আবহাওয়ার গুণে কৃষক-সন্তান বা শিল্পীর সন্তান পৈতৃক পেশাকে অসম্মানজনক পেশা বলিয়া গণ্য করিতে আরম্ভ করেন ও তৎপ্রতি তাঁহাদের ঔদাসীন্য ও অবহেলাই দেখা যায়, শিক্ষার গতি বা মান যতই বাড়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য এবং অবহেলা ততই দৃঢ় হয়। কৃষক-সন্তান পিতা বা অভি-ভাবকের সহিত মাঠের কাজে যোগদান করেন না, কুমোরের সন্তান চাকে বসেন না। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা চাকরী সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহারা বিদেশে চলিয়া যান এবং যাহা উপার্জ্জন করেন তদ্দ্বারা নিজেদের ব্যয়ই প্রধানতঃ বহন করিতে পারেন, পিতাকে বা অভিভাবককে অতি সামান্ত আর্থিক সাহায্য করেন। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়া এবং ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকগণের কথাই বলিলাম। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়া বা ম্যাট্রিকুলেশন কিম্বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকগণ যদি কোন রকমের চাকুরী সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা গ্রামেই পিতা বা অভিভাবকদের বাড়ীতেই থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেন না। তাঁহারাও খুবই অসুখী মনে দিন যাপন করেন এবং ইঁহাদের পিতা বা অভিভাবকগণ কম অসুখী হন না; একে ত শিক্ষিত সন্তানের কোন রকম সাহায্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হন, ইহার উপর শিক্ষিত সন্তানের পরিচ্ছদের এবং অন্যান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্ত অধিকতর ব্যয় করিতে হয়। আমার নিজের অঞ্চলে এইরূপ উদাহরণ আছে, এইরূপ শিক্ষিত যুবকদের এবং তাঁহাদের অভিভাবকদের অভিযোগ ও অনুযোগের কথা জানি। অবান্তর হইলেও এই প্রসঙ্গে ইহা হইতে উদ্ভূত আর একটি পরিস্থিতির কথা বলিতেছি। আমার পল্লীর গৃহের অতি পুরাতন পরিচারকের (জাতিতে দুলে) ভ্রাতুষ্পুত্র স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চাকুরীর অনুসন্ধানে আছে। সে একদিন আমার গৃহে আসিয়াছিল, পরিষ্কার ধুতি জামা জুতা পরিধান করিয়াই আমার নিকটে আসিয়াছিল এবং আমি তাহাকে আমার সামনের চেয়ারেই বসিতে বলিয়াছিলাম, সেও বসিয়াছিল, এমন সময়ে আমার পরিচারক (তাহার জ্যাঠা) আমার নিকটে আসিল—এবং ঘরের মেঝেতেই বসিল, ভ্রাতুষ্পুত্র চেয়ার হইতে উঠিল না, কিম্বা জ্যাঠাকে কোন সম্মান দেখাইল না। ভ্রাতু-ষ্পুত্রের পিতারও আমার পরিচারকের ন্তায় কৌপীন বস্ত্র, অনাবৃত দেহ, কাঁধে গামছা—চাষের কাজ করেন। অতি সাধারণ কৃষক। সেই দিনও কলিকাতায় এই রকম একটি ঘটনা ঘটিল। উড়িষ্যাবাসী একজন "হালুইকর ব্রাহ্মণ" আমার খুবই পরিচিত, কলিকাতায়ই থাকেন, আমার নিকটে প্রায়ই আসেন—এবং আসিয়া ঘরের মেঝের উপরই বসেন—হাঁটুর উপর বস্ত্র পরিধান করেন, অনাবৃত দেহ, কাঁধে একখানা গামছা থাকে। তাঁহার পুত্র আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'সর্টহাণ্ড' শিখিতেছে এবং চাকরীর সন্ধানও করিতেছে। "হালুইকর ব্রাহ্মণ" একদিন তাঁর পুত্রকে আমার নিকট লইয়া আসিলেন—বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণের হাঁটুর উপর বস্ত্র, অনাবৃত দেহ এবং কাঁধে গামছা, কিন্তু পুত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ধুতি, জামা, জুতা পরিহিত, হাতে রিষ্ট ওয়াচ আছে। ব্রাহ্মণ মেঝের উপর বসিলেন, পুত্রকে চেয়ারে বসিতে বলিলাম, তিনি চেয়ারে বসিলেন। এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি ত হইবেই, দৃষ্টিকটু হইতে পারে—কিন্তু নিবারণ করিবার উপায় নাই।

সকল সম্প্রদায়ের বা সকল স্তরের বালক ও যুবকগণের শিক্ষা-প্রণালী, শিক্ষিতব্য বিষয় প্রভৃতি একই ছাঁচে ঢালিলে সকল সম্প্রদায়ের উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা বিভিন্ন স্তরের উপযোগী বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালী, পৃথক পাঠ্য বিষয়

প্রভৃতি নির্দ্ধারিত করিলে খুব সম্ভব সমস্যার সমাধান কতকটা হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, একই সম্প্রদায়ের সকলের শিক্ষার প্রয়োজন সমান নহে, আর্থিক সামর্থ্যও সমান নহে। সুতরাং প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুসারেও শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতেছি। একজন কৃষক তাঁহার সন্তানকে স্থানীয় এমন এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন যেখানে তাঁহার সন্তান কিছু দিন অধ্যয়নের পর কিঞ্চিৎ লেখা-পড়া শিখিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরনের কৃষি-কাজও শিখিতে পারে। কৃষকের এমন আর্থিক সামর্থ্য নাই যে, বৎসরের পর বৎসর তাঁহার সন্তানের এইরূপ শিক্ষার জন্য ব্যয় ভার বহন করেন। কৃষক ইহাই চান যে, তাঁহার সন্তান শিক্ষা সমাপ্তির পর কৃষি-কাজেই ফিরিয়া আসিবে। শিল্পীর সন্তানদের উপযোগী এই রকম শিক্ষারও প্রবর্ত্তন করা উচিত।

সুতরাং পল্লী-অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এমন বৃত্তিমূলক প্রাথমিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত যাহার সুযোগ ও সুবিধা বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে গ্রহণ করিতে পারে। কৃষি-প্রধান দেশে কৃষি-শিক্ষাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে—তবে স্থানীয় প্রধান প্রধান শিল্পসমূহের উৎকর্ষসাধনের উপযোগী শিক্ষাও তাহার সহিত সংযুক্ত থাকিবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শিক্ষারই প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ স্তর থাকিবে। প্রাথমিক শিক্ষার পর যোগ্যতা অনুসারে ছাত্রগণ মাধ্যমিক এবং উচ্চ স্তরের শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। প্রত্যেক স্তরের, বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-প্রণালী এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও আবহাওয়া এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে শিক্ষাকালীন সময়ে এবং শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্রগণ গ্রামের প্রতি, নিজ নিজ পরিবেশের প্রতি এবং পৈতৃক পেশার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিবার সুযোগ না পান। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় প্রায়ই বলিতেন —"Do not lift the boys of the countryside out of their own environments. পরে তারা আর গ্রামে ফিরে যেতে চাইবে না।" তাঁহার এই কথা যে কত সত্য তাহা আমরা অনেকেই হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা আছে যে, কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করিবার পর পল্লীগ্রামের অনেক ছেলেই কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যেই থাকিতে চান—গ্রামের প্রতি যেন বিমুখ হন—কারণ গ্রামের রাস্তাঘাট ভাল নহে, সেখানে বিজলিবাতি নাই, সিনেমা নাই, হেয়ার-কাটিং সেলুন নাই, রেস্তোরাঁ নাই, খবরের কাগজ নাই; তেমন সঙ্গীও নাই। সেখানে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে হয়, মাঠে মলত্যাগ করিতে হয়, এইরূপ অনেক অসুবিধা আছে। এইজন্যই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যদি ২৪ ঘণ্টার জন্য কলিকাতার ডিক্টেটার করা হয় তিনি প্রথমেই Hardinge Hostel ভূমিসাৎ করেন। সুতরাং যতটা সম্ভব শিক্ষাকালীন অবস্থায় ছাত্রদিগকে শহরমুখী না করিয়া গ্রামমুখী করা বিশেষ দরকার।

পল্লী-অঞ্চলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘরবাড়ী ইত্যাদি এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে পল্লীর জনসাধারণ উহাকে ইন্দ্রপুরী মনে না করেন, তবে উহা নিশ্চয়ই উন্নত ধরনের হইবে এবং উহা পল্লী-অঞ্চলের আদর্শ হইবে—এবং ঐ আদর্শ অনুসরণ করা জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে। একটি উদাহরণ দিলে আমার কথাটা হয়ত স্পষ্ট হইবে; আমার গ্রামের বিদ্যালয়ের আমি সম্পাদক, প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে,বিদ্যালয়ে একটি 'সেপটিক্ প্রিভি' করিতে হইবে, আমি বলিলাম, "একটি 'সেপটিক্ প্রিভি' করিতে হইলে অন্ততঃ ৪০০৲ টাকা খরচ হইবে; বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০০ শত ছাত্র, একটি "প্রিভি" করিলে প্রয়োজন মিটিবে না, আরও একটি কথা এই যে, ফ্লাশিং-এর ব্যবস্থা করা যাইবে না—জল টানিয়া 'প্রিভি' পরিষ্কার করিতে হইবে, 'প্রিভি'র নিকটে জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে,গ্রামে মেথর নাই, 'প্রিভি' নোংরা হইলেই বা কে পরিষ্কার করিবে? সুতরাং বিদ্যালয়ের জন্য আমি 'সেপটিক্ প্রিভি'র পক্ষপাতী নহি, ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড বা বোর হোল লেট্রিনের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, বিদ্যালয়ে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড বা বোর হোল লেট্রিনের ব্যবস্থা দেখিলে গ্রামের অনেকেই হয়ত উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইহার সুবিধা দেখিয়া এই বিষয়ে প্রচার-কার্য্য করিবেন।" প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার কথা সমর্থন করিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিতেছি—জেনারেল এডুকেশন অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার সময়ে শহরের ছাত্রগণ যে সকল সুযোগ ও সুবিধা পান পল্লী-অঞ্চলের ছাত্রবৃন্দ সে সকল সুবিধা ও সুযোগ পান না। প্রায় সকল বিষয়েই তারতম্য দেখা যায়। পল্লী-অঞ্চলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, গ্রন্থাগারের অভাব, মেধাবী ছাত্রের অভাব, উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব এবং আরও অনেক বিষয়েই অপ্রতুল আছে। সুতরাং পরীক্ষার মানের তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত কিনা সে সম্বন্ধেও বিবেচনা করা দরকার।

এখন শিক্ষক সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতেছি। প্রাচীন যুগের "গুরুর কাল" আর ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং গুরুর ব্রত, আদর্শ, বিদ্যাদান প্রভৃতি আলোচনা করিলে কোন ফল হইবে না। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষক ও শিক্ষাদানের কথাই আলোচনা করিতে হইবে। আমরা জানি প্রাচীনকালের পাঠশালার দরিদ্র "গুরু-মশাই" জনসাধারণের নিকট হইতে যে পরিমাণ শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতেন বর্ত্তমান যুগে বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহা সর্বত্র পান না। ইহার কারণ অনেক থাকিতে পারে; কিন্তু এই কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, বর্ত্তমান যুগে জীবনযাত্রার মানই হইতেছে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জনের প্রধান সোপান। সুতরাং একজন শিক্ষককেও এইরূপ জীবনযাত্রার মান রক্ষা করিতে হইবে যাহাতে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে (মাধ্যমিক) শিক্ষকগণের বেতনের হার বিভিন্ন। যে সকল বিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষা

পর্ষৎ হইতে আর্থিক সাহায্য পান সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের হার সম্প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে সকল বিদ্যালয় অনুমোদিত (recognised) কিন্তু আর্থিক সাহায্য পান না বা গ্রহণ করেন না সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট নাই। আমার অভিমত এই যে, প্রত্যেক অনুমোদিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের হার সমান হওয়া উচিত। কর্তৃপক্ষের প্রতি নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন শিক্ষকের যোগ্যতার উপরেই প্রথম দৃষ্টি রাখেন এবং যোগ্য শিক্ষকের উপযুক্ত দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই যেন শিক্ষকগণের বেতন, ভাতা ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট হয়। বরং অধিকতর কৃতী ও মেধাবী স্নাতকগণকে শিক্ষকের কার্য্যে আকর্ষিত করিবার জন্য শিক্ষকগণের বেতন ভাতা ইত্যাদির হার অধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, প্রধানতঃ শিক্ষকের শিক্ষকতার গুণে, সাহচর্য্যে এবং আদর্শেই ভবিষ্যতের নাগরিক প্রস্তুত হইবে। কেবল পঠিতব্য বিষয় সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিলেই শিক্ষকের কর্ত্তব্য সম্পাদন শেষ হয় না—ছাত্রগণের মনে কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি জন্মাইয়া দিতে হইবে—এবং এই প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় সে বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে হইবে। শিক্ষকদের আদর্শেই ত ছাত্রদের মধ্যে চারিত্রিক গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হইবে। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। এই কথা প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকগণের প্রতি অধিকতর ভাবে প্রযোজ্য। প্রধানতঃ তাঁহাদের দ্বারা প্রস্তুত ভিত্তের উপরেই ত ভবিষ্যতের ইমারত দাঁড়াইবে। কিন্তু দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকগণ সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। তাঁহাদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি খুবই অল্প, আবার অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা শিক্ষাদান-কার্য্যে উপযুক্ত নহেন। সাধারণতঃ কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন ম্যাট্রিক-ট্রেনড শিক্ষক হইলেই প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকের উপযুক্ততা অর্জ্জন করিতে পারেন। যাঁহারা প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছেন তাঁহারা জানেন Matric-trained শিক্ষকের উপযুক্ততা কতটুকু। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। "স্পেশাল ক্যাডারের" শিক্ষকগণের দুরবস্থার কথা জানি, তাঁহাদের উপযুক্ততার কথাও জানি। ইহার দ্বারা বেকার সমস্যার হয়ত আংশিক সমাধান হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তারে বা উপযুক্ত শিক্ষাদানে কোন সাহায্যই হয় নাই। এমন অনেক উদাহরণ জানি তৃতীয় বা দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বহুদিন যাবৎ শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ বিপরীত অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, বর্ত্তমানে "স্পেশাল ক্যাডারে"র শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারাই ভবিষ্যৎ নাগরিকের শিক্ষার ভিত্তি গঠন করিবেন।

ভাঙা বাড়ী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

নদীর কিনারে একটি ত্রিতল বাড়ী,
কারুকাজ করা গৃহ দক্ষিণ-দ্বারী।
দাঁড়ায়ে রয়েছে ভাঙা,
জবা ফুটে আছে রাঙা,
ছাদের পাশটা আধেক গিয়াছে ছাড়ি'।

২

ঘাট হতে আর নাহিক পথের চিনে,
সরু একপদী ভরিয়া গিয়াছে তৃণে।
পরিজন কেহ নাই
জঙ্গল ভরা ঠাঁই
ফাটলেতে তার পেঁচা ডাকে রাতে দিনে।

৩

বিশাল রাজ্য সুপ্রাচীন রাজধানী
নিঠুর নিয়তি কোথায় লয়েছে টানি'।
যুগের কৃষ্টি হায়—
মিলিয়াছে সিকতায়,
বাড়ী ভাঙিয়াছে—বেশী কি হয়েছে হানি?

৪

ছোট হোক—তবু দেখে মনে পড়ে তাকে,
'ধারা' 'বৈশালী' 'মথুরা' 'অযোধ্যাকে।'
ফুরায়েছে উৎসব,
গত তার গৌরব,
বড়র বেদনা ছোটকে আগুলি' থাকে।

৫

ওই বাড়ীটির ক্ষীণ প্রদীপের আলো
দীনতায় ছবি—তবুও লাগিত ভাল।
সে আলোতে ছিল ব্যথা—
কত রূপ, কত কথা,
তারকা একটা আলেয়া হইয়া গেল।

৬

দেখি যবে তাকে মলিন চন্দ্রালোকে,
স্বপন-কুহেলি বিছায় সে মোর চোখে।
পড়ে কুতূহলী প্রাণ,
কি যেন উপাখ্যান—
লিখিত ভগ্ন চিত্রলিপির শ্লোকে।

কালিদাস-সাহিত্যে 'যমক'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্ন শব্দালঙ্কারের মধ্যে 'যমক' অলঙ্কার এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যমক বলিতে বুঝায়—একটি শ্লোকের মধ্যে একই শব্দের দুই বা ততোধিক প্রয়োগ। যমকের সর্ব্বাধিক প্রয়োগ দেখা যায় মহাকবি কালিদাসের 'নলোদয়' নামক কাব্যে। নলোদয়ের চারিটি সর্গের মোট ২১৭টি শ্লোকের মধ্যে প্রায় দুই শত শ্লোকের প্রত্যেক শ্লোকে চারিটি করিয়া একই শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, নলোদয় কাব্য কালিদাসের রচনা নয়, কিন্তু যখন শ্লোকের পর শ্লোকের প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোকে এক রকমের চারিটি করিয়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তখন মনে হয় মহাকবি কালিদাসের মত ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান কবি ছাড়া এরূপ কবি-প্রতিভার পরিচয় অন্য কোনও কবির দেওয়া কি সম্ভব? সভ্যজগতে সংস্কৃত ব্যতীত এমন কোনও ভাষা আছে বলিয়া জানা নাই, যে ভাষার কোনও কাব্যে বা পদ্যে পর পর দুই শত শ্লোকের প্রত্যেকটি শ্লোকে বা 'ষ্ট্যাঞ্জায়' একই প্রকার শব্দের চারিবার করিয়া প্রয়োগ আছে। যাহাই হউক, এখানে কতকগুলি উদাহরণ দেখানো যাইতেছে।

'যোজনি নাগোপীতশ্চচার যো বল্লবাঙ্গনাগোপীতঃ। (১, ২)
ভূর্যে নাগোপীতঃ কংসাদ্যো দ্বেষমেব নাগোপীতঃ॥' (৩, ৪)
নল ১।২

এখানে, এই শ্লোকে 'নাগোপীতঃ' শব্দের চারিবার প্রয়োগ আছে, তবে প্রত্যেকটি নাগোপীত শব্দ যে এক একটি মূল শব্দ তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্তার্থমূলক দুইটি বা তিনটি শব্দ সন্ধি ও সমাসের দ্বারা একত্র করিয়া নাগোপীতঃ শব্দ গঠন করা হইয়াছে। শ্লোকটির অর্থ মহাকবির টীকাকারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেওয়া গেল—

১ম—যোজনি নাগোপীতঃ—যঃ না+অগোপীতঃ অজনি, যে 'না' অর্থে পুরুষ ('নৃ' শব্দের প্রথমার এক বচন), 'অগোপীতঃ' শব্দের অর্থ কোনও গোপীর গর্ভে জন্ম নয়, অর্থাৎ যে পুরুষ কোন গোপীর গর্ভে জন্মান নাই—দেবকীর পুত্র।

২য়—যো বল্লবাঙ্গ নাগোপীতঃ চচার—যঃ বল্লব+অঙ্গনা+গো+পীতঃ চচার; যিনি, 'বল্লব' শব্দের অর্থ গয়লা, 'অঙ্গনা' অর্থে মেয়েরা, 'গো' মানে চক্ষু, 'পীত' অর্থে পান করা হইয়াছে, 'চচার'—বিহার করিতেন। গয়লাদের নারীরা যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা পান করিতেন, অর্থাৎ প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে দেখিতেন।

৩য়—ভূর্যে নাগোপীতঃ—ভূঃ যেন+অগোপি+ইতঃ, 'অগোপি' শব্দে অর্থ রক্ষা করা হইত, যাঁহার দ্বারা পৃথিবী রক্ষিত হইত; 'ইতঃ' শব্দটিকে পরের শব্দগুলির সহিত ধরিতে হইবে।

৪র্থ—নাগোপীতঃ—নাগঃ+অপি+ইতঃ, 'নাগঃ' অর্থে সর্প, 'ইতঃ' শব্দের অর্থ পরাজিত হইয়াছিল, সুতরাং অর্থ হইবে, যাঁহার দ্বারা সর্পও অর্থাৎ কালিয় নাগও পরাজিত হইয়াছিল।

'কংসাদ্ যো দ্বেষমেব ইতঃ'—কংসের নিকট হইতে যিনি হিংসা ছাড়া আর কিছুই পান নাই।

পুরা শ্লোকটির অর্থ হইবে, যিনি কোনও গোপীর গর্ভে জন্মান নাই (দেবকীর পুত্র), যাঁহার রূপসুধা গোপদের নারীরা চক্ষুদ্বারা পান করিতেন, যিনি পৃথিবীর রক্ষা করিতেন, যিনি কংসের নিকট হইতে হিংসা ছাড়া আর কিছুই পান নাই, এবং যিনি কালিয় নাগকেও দমন করিয়াছিলেন, তিনি বিহার করিতে লাগিলেন।

আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

'সোঽথ পরমহস্তেন প্রাপি নলেনোৎসবঃ পরমহস্তেনঃ। (১, ২)
স্ফুরিতপরমহস্তেন প্রবভৌ রবিণেব তৎপুরং পরমহস্তেন॥' (৩, ৪)
নল-১।৩৩

এই শ্লোকটিতে 'পরমহস্তেন' শব্দটির চারিবার প্রয়োগ আছে, এবং অধিকাংশ স্থলে অন্তার্থমূলক কয়েকটি শব্দকে সন্ধি ও সমাস দ্বারা যুক্ত করিয়া 'পরমহস্তেন' শব্দটি গঠন করা হইয়াছে। এখন ইহার অর্থ করা যাউক।

প্রথম চরণের অন্বয়—অথ পরমহস্তেন নলেন স পরমহস্তেনঃ উৎসবঃ প্রাপি। কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ; প্রথম 'পরমহস্তেন' শব্দের অর্থ 'পরম' অর্থাৎ সুন্দর বা আজানুলম্বিত বাহুযুক্ত নলের দ্বারা; দ্বিতীয় 'পরমহস্তেনঃ' শব্দের সন্ধি ভাঙ্গিলে দাঁড়ায়—পর+মহ+স্তেনঃ—'পর' অর্থে শত্রু, 'মহ' অর্থে উৎসব, আর 'স্তেন' কথাটির অর্থ অপহৃত, সুতরাং মানে হইবে, 'যে সভা শত্রুদের উৎসব-সভায় সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছিল—সমস্ত চরণের অর্থ হইল, অনন্তর আজানুলম্বিত, বাহু নল সেই উৎসব-সভায় (দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায়)

প্রবেশ করিলেন, যে সভা শক্রদের সকল উৎসব-সভার সৌন্দর্য্যকে পরাজিত করিয়াছিল।

দ্বিতীয় চরণের অন্বয়—তেন তৎপুরং স্ফুরিত পরমহস্তেন রবিণা অহঃইব পরং প্রবভৌ।

এখানে তৃতীয় 'পরমহস্তেন' শব্দের 'পরম' অর্থে উৎকৃষ্ট, 'হস্ত' অর্থে কিরণ রবিণা শব্দের বিশেষণ, সুতরাং অর্থ হইবে যেমন রবির প্রস্ফুরিত উৎকৃষ্ট কিরণ পাইলে। চতুর্থ 'পরমহস্তেন' শব্দের সন্ধি ভাঙ্গিলে পাওয়া যায় পর+অহঃ+তেন; 'পরং' অর্থে উৎকৃষ্ট 'অহঃ' মানে দিবস, 'তেন' শব্দের অর্থ তাহা দ্বারায়। দ্বিতীয় চরণের অর্থ হইল, রবির উৎকৃষ্ট কিরণ পাইলে সুন্দর প্রভাতের যেরূপ শোভা হয় নল প্রবেশ করাতে সেই প্রাসাদেরও সেইরূপ শোভা হইল।

সমস্ত শ্লোকটির অর্থ—অনন্তর আজানুলম্বিতবাহু নল সেই উৎসব সভায় (দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায়) প্রবেশ করিলেন, যে সভা শক্রদের সকল উৎসব-সভার সৌন্দর্য্যকে পরাজিত করিয়াছিল; এবং রবির প্রস্ফুটিত উৎকৃষ্ট কিরণ পাইলে প্রভাতের যেরূপ শোভা হয়, নল প্রবেশ করাতে সেই প্রাসাদেরও সেইরূপ শোভা হইল।

মহাকবির আর একখানি কাব্য 'রঘুবংশ' হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব—

> 'নভশ্চরৈর্গীতযশাঃ স লেভে
> নভস্তল শ্যামতনুং তনূজম্।
> খ্যাতং নভঃ শব্দময়েন নাম্না
> কান্তং নভোমাসমিব প্রজানাম্॥' রঘু-১৮।৬

এই শ্লোকটিতে চারিবার 'নভঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে, চারিটির কোনটিই সন্ধিসূত্র দ্বারা বদ্ধ কয়েকটি শব্দের সমষ্টি নয়। শ্লোকটির অর্থ হইল—আকাশবিহারীগণও (গন্ধর্ব্বেরাও) তাঁহার যশোগীতি গাহিতেন। তাঁহার একটি পুত্রলাভ হইল, যাঁহার দেহ ছিল 'নভস্তল' অর্থাৎ আকাশের মত শ্যামবর্ণ, এবং যিনি নভঃমাস অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের মত প্রজাদিগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

আর একটি উদাহরণ

> 'তেন দ্বিপানামির পুণ্ডরীকো
> রাজ্ঞামজয্যোঽজনি পুণ্ডরীকঃ।
> শান্তে পিতর্য্যাহৃত-পুণ্ডরীকা
> যং পুণ্ডরীকাক্ষমিব শ্রিতা শ্রীঃ॥' রঘু—১৮।৮

এই শ্লোকটির চারিটি চরণে চারিটি 'পুণ্ডরীক' শব্দের প্রয়োগ আছে। অর্থ দেওয়া গেল—তিনি (রাজা নভঃ) হস্তীদিগের মধ্যে পুণ্ডরীক নামক দিগ্‌গজের মত অপর রাজাদিগের অজেয় পুণ্ডরীক নামক এক পুত্রের জন্ম দিলেন, পিতার মৃত্যুর পর যাঁহাকে পুণ্ডরীকা অর্থাৎ শ্বেত-পদ্মধারিণী লক্ষ্মী পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ পদ্মলোচন শ্রীবিষ্ণুর মত আশ্রয় করিয়া রহিলেন।*

এতক্ষণ যে শ্লোকগুলি দেখাইলাম, তাহাদের চারি-চরণের প্রত্যেক চরণে একবার করিয়া একই শব্দের চারি-বার প্রয়োগ আছে, এইবার এমন শ্লোক দেখাইব যাহার প্রত্যেক চরণে একই প্রকার শব্দের চারিবার পাশাপাশি প্রয়োগ রহিয়াছে। যেমন—

> 'করমাকর মাকর মাকর মাকলয় ব্যসনং মম পাহি হরে।
> দরতো দরতো দরতো দরতো বিকৃতৈর্মকৃতাং
> সুকরত্বমপি।' নল-১।৪৫

এই শ্লোকটির প্রথম চরণ দেখিলে মনে হয় যেন 'রমাক' এই শব্দের পর পর চারিবার প্রয়োগ রহিয়াছে, এবং দ্বিতীয় চরণেও ঠিক সেই ভাবে মনে হয় বুঝি চারিটি 'দরতো' শব্দ পাশাপাশি বসানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত তথ্য তাহা নহে, মহাকবি কতকগুলি বিভিন্ন শব্দকে সন্ধি ও সমাসের দ্বারা এমন অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত যুক্ত করিয়াছেন যে, দেখিলে বাস্তবিক মনে হয় যেন একই শব্দের এক সঙ্গে চারিবার প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রথম চরণের শব্দগুলির যদি সন্ধি ও সমাস ভাঙিয়া ফেলা যায়, চরণটি তাহা হইলে, এইরূপ দাঁড়াইবে—

ক রমাকর, মাকরং আকরং আকলয় ব্যসনং মম পাহি হরে। 'ক' (সম্বোধন) শব্দের অর্থ ব্রহ্মণ্, 'রমাকর' শব্দের 'রমা' অর্থে লক্ষ্মী, সুতরাং রমাকর অর্থে বুঝিতে হইবে যিনি লক্ষ্মীশ্রী প্রদান করেন, এমন যে ব্রহ্মণ্। 'মাকরং আকরং' অর্থে মকর নামক জলজন্তুর খনি অর্থাৎ সমুদ্র, 'আকলয়' অর্থে জানিও, 'ব্যসনং' কথার অর্থ বিপদ, 'মম' মানে আমার, 'পাহি হরে'র অর্থ হে হরি, রক্ষা কর। প্রথম চরণের অর্থ হইবে—হে লক্ষ্মীশ্রী প্রদানকারি ব্রহ্মণ্, আমার বিপদ-সমুদ্রের (মকর নামক জলজন্তুর খনির) মত হইয়াছে, অতএব হে হরি, আমায় রক্ষা কর।

দ্বিতীয় চরণের শব্দগুলির—সন্ধি ও সমাস ভাঙিলে এইরূপ হয়—

দরতঃ+অদরত+উদর+তোদ+রত মরুতাং সুকর, ত্বমপি বিকৃতৈঃ (মাং পাহি)। 'দরতঃ' শব্দের অর্থ ভয়

* বাংলা ভাষাতেও 'যমকের' অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন—

> 'ভাবি হ'ল আট কালি
> খাজনা দিতে হবে কালই।
> বামুন ভেবে হ'ল কালি
> বলে 'মা, কি করলি কালী।'

হইতে, 'অন্দরত্ত' মানে অনন্ত, 'উদর' অর্থে অভ্যন্তরে, 'তোদ' অর্থে দুঃখ, 'রত্ত' শব্দে অবস্থিত বুঝায়, অর্থাৎ অনন্ত (অত্যন্ত বেশী) দুঃখের মধ্যে অবস্থিত যে ভয়, সেই ভয় হইতে। 'মরুত্তাং' অর্থে দেবতাদের, 'সুকর' মানে মঙ্গলকারী কিংবা সুন্দর হস্তযুক্ত, 'ত্বমপি' মানে তুমিও, 'বিরুতৈঃ' অর্থে আশ্বাসবাক্য দ্বারা 'মাং পাহি' কথাটা ধরিয়া লইতে হইবে, যাহার অর্থ আমায় রক্ষা কর।

সমস্ত শ্লোকের অর্থ—লক্ষ্মীপ্রদানকারি ব্রহ্মণ্, আমার বিপদ সমুদ্রের মত হইয়াছে জানিবেন ; হে হরি, দেবতাদেরও মঙ্গলকারী আপনি, আমার এই অত্যধিক দুঃখের মধ্যে অবস্থিত ভয়ের প্রকোপ হইতে সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা আমায় রক্ষা করুন।

এইবার এমন একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, যাহার অথ সহজে বুঝা যায়।

'যতো যতো যতো যতো রবের্মরীচি সঞ্চয়ঃ।
মহান্ধকার সঞ্চয় স্তত স্তত স্তত স্ততঃ॥' নল-২।৪৯

প্রথম চরণে 'যতঃ' শব্দের ও শেষ চরণে 'ততঃ' শব্দের চারিবার করিয়া প্রয়োগ রহিয়াছে। অর্থ হইবে—

প্রথম 'যতঃ' অর্থে যে হেতু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'যতঃ'র মানে যেখান হইতে, যেখান হইতে, চতুর্থ 'যতঃ' মানে চলিয়া গেল।

'ততঃ' অর্থে সেই হেতু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'ততঃ'র অর্থ সেইখানে সেইখানে ; চতুর্থ 'ততঃ' অর্থে বিস্তৃত হইল।

সমস্ত শ্লোকটির অর্থ—যে হেতু রবির কিরণসমূহ যেখান হইতে যেখান হইতে চলিয়া গেল, সেই হেতু, সেইখানে সেইখানে মহা অন্ধকারের রাশি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

আম

শ্রীস্মরজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি দুটো আমগাছ প্রকাণ্ড বাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা একটু ছোট. অপরটা বেশ মোটাসোটা—মোষের পিঠের মত গুঁড়িটা লম্বা হয়ে যেন প্রকাণ্ড দুটো হাত বাড়িয়ে ধরেছে বেল-গাছের ভেতর দিয়ে। একধারে ছোট ডালটায় ধাক্কা খেয়ে বেঁকে গেছে ধনুকের মত। এটার নাগাল পাওয়া সহজ নয়। যদি অপরটায় আম ধরে তবে লম্বা বাঁশ-বাখারি বাড়িয়ে ধরলেই ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়বে চোখে মুখে।

বত্তু, অটল আর বনমালী। ওদের প্রাণে নতুন স্বপ্ন, চোখে মুখে রক্তিম দিনের ছন্দ ; ভাবে আমের কথা। এই ছোট গাছ ঘিরে কত কথা, কত গল্প সুরু হয়। আর কয়টা দিন পরেই আমের মুখ দেখবে।

দীর্ঘ মাঘ-ফাল্গুন মাস যেন আর কাটতে চায় না। আজ চৈত্রের কাছাকাছি একটা নতুন স্বপ্ন,অজানা পুলক এনে দেয়। অড়হর গাছে চৈত্রের হাওয়ায় ভারে নূপুর বাজে। হাওয়ার দাপটে দাপটে পথের ধুলো ঘূর্ণি হয়ে উঠে ভেসে যায় চঞ্চল স্রোতে দিগন্তরে। মনে পড়ে যাচ্ছে সিঁদুরপুলী গাছটার কথা। পালেদের ছোট্ট ডোবাটার পাশ দিয়ে গিয়ে পশ্চিম ধারে একটা চাঁপা ফুলের গাছ, আর তার পাশেই একটা মন্দির। ছাতলা পড়ে কালো রঙে ছোবানো হয়ে গেছে। ঠিক ওরই পাশে গাছটা। এই ক'দিনেই কি অসম্ভব বেড়ে উঠেছে ঠিক ওর মেজদির বিয়ের পর যেমনটি হয়ে উঠেছিল ; সেই সাত দিনের পর তার চোখমুখের ভাব। তবে কি ওতেও এ বছর আম আসবে।

মুকুল এল প্রতি ডালে গুঁড়ি গুঁড়ি করে। ভেবেছিল ও-গাছে আর মুকুল আসবে না। যে গাছে পাতা গজায় সে গাছে কি আর মুকুল আসে? চিন্তায় ভুল হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় গত বছরের কথাটা। টুসী আম গাছটা আর সিঁদুরপুলী গাছটার পাতাও গজাল, মুকুলও এল, আম ধরল তার হাড়ে গোড়ে। তবুও কত গভীর ব্যথা, কত উদ্বেগ এই কয়টি দিনের মধ্যে। যে কয়টা মুকুল আসবে,কুয়াশায় দেবে ঝরিয়ে কিছুটা। যে কয়টায় আম ধরবে তাও বানরে খাবে, কিছু শুকিয়ে পড়বে গাছের তলায় ঠস ঠস করে।

চৈত্রের মাঝামাঝি এই কথাগুলিই বেদনার সুর হয়ে ভাসত বত্তুর মনের দুকূল ছাপিয়ে। আমগাছের দিকে তাকিয়ে থাকে, ফিরে দাঁড়ায় চলতে চলতে পথে। কালু চাকরকে বলে, 'কালুকা, দেখ ত এ বছর এতে আম থাকবে কি?' কালু যেন আকাশ থেকে পড়ে।

হেসে হেসে বলে, 'মোটেই এসবেনে বাবু—মোটেই না।' খেতে বসতে গিয়ে মনে পড়ে যায় একটি দিনের কথা। 'আম হলে ছুটো চাটনি বানিয়ে দিও ত মা বুঝলে?' বলে বতু ভাতের থালা কাছে নিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে উত্তরের অপেক্ষায়। রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে, ছোট বড় কত আম চিক চিক করছে। স্বপ্ন যায় টুটে। অনুতাপ জাগে, চোখের সামনে সবই আছে, হাতের ছোঁয়ায় কেন পায় না, এতই দুর্লভ বস্তু তা কে জানে!

বৈশাখের কাছাকাছি একদিন এই স্বপ্নই জাগ্রত করে ধরল চোখের সামনে কোন এক গোপন শিল্পী। গন্ধে, বর্ণে, ছন্দে, বৈচিত্র্যে একেবারে ঠিক ঠিক করে হাজির করেছে। একি স্বপ্ন! না, ছুটে এসেই দেখল বতু গাছের কাছে কেমন ধরেছে ডালে ডালে। সারা গাছটাকেই যেন ছেয়ে ফেলেছে। ছুটো গাছেই এসেছে। বেলগাছের ভিতর দিয়ে যেটা চলে গেছে সেটার নাগাল পাওয়া সহজ নয়। হাতের সামনে যা আছে তাই নিয়েই যত ভাঙাগড়া।

সেদিন থেকে আমগাছের তলা ছেড়ে আর নড়ে না বতু।—খেলাঘরের সবকিছু এনে বিছিয়ে দিলে। দেশলাইয়ের বাক্স, টিনকাটা, সিগারেটের টিন, ভাঙা টর্চ্চলাইট, গোটাকতক কড়ি, কয়েকটা নতুন কাপড়ের গোলাপী ছবি, একটা বিয়ের কবিতা, কতকগুলি লোহার চাকতি পয়সার দুঃখ বাঁচিয়েছে। পাঠশালা থেকে এসেই একবার আসত। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কেমন যেন ধোঁয়াটে স্বপ্নময় পৃথিবী। খই ফোটার মত ঘেঁটু ফুলে ভরে গেছে চারপাশ। আবার পাঠশালা যাবার আগে—পড়ায় মোটেই মন বসে না। তাই পড়ার সরঞ্জামও সব এনে বিছিয়ে বই হাতে গাছের পানে চেয়ে বসে থাকে। অবসর আর কতটুকু, তাও এই গাছতলায় গাছতলায়।

ছুলু বতুর সম্পর্কে মামা হয়। সমবয়সী কি দু' চার মাসের ছোট-বড়। নাকের কাছটায় একটা কাটা দাগ। কলকাতায় থাকে। সে এসেছিল দিনকয়েক আগে। তাকে কত আমের কথা শুনিয়েছে। গোপন পথগুলি আস্তে আস্তে চিনিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে মা চিঠি দিয়েছিল ছুলুকে। 'আয়, এসে যা হোক ছুটো কচি আম নিয়ে যা'—বাবা অম্বল খেতে ভালবাসে। ছুলুকে নিমন্ত্রণ করার পক্ষপাতী বতু অবশ্য ছিল, কিন্তু এভাবে ঝরিয়ে পেড়ে নিয়ে যাবে এ কথায় সায় দিতে পারে নি কোনদিন। তাই প্রার্থনা এইটুকু—ছুলুর এ মতিভ্রম যেন কোন দিন না হয় ভগবান। ইতিমধ্যে এদিকের ব্যাপারও অনেকটা এগিয়ে গেছে। দারুণ গরম পড়েছে তাই সকালে স্কুলের বন্দোবস্ত হয়েছে। আম ক'টিও নির্ভাবনায় বেড়ে উঠেছে সতেজ সবুজ হয়ে।

ভোরের স্কুল সব দিক দিয়েই ভাল। সকাল সকাল উঠেই একবার আমতলায় ঘুরে আসে বতু। তার পর স্কুলেও সেই আমেরই কথা। যার সঙ্গে ভাব তাকেই বলছে, চল্ না দেখে আসবি—সত্যি কি মিথ্যে—এক ডালে চৌদ্দ-পনরটা।

বৈশাখের মাঝামাঝি—সেদিন রবিবার। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে মা শুয়ে পড়েছেন ছোট ভাইকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে। পিছনে বতু আজ অনেকটা শান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে আগে থেকেই। চারিদিকেই অনেকটা নীরবতা। রাজুর মা এতক্ষণ বাসন মাজছিল। কড়ামাজার শব্দ আর জল-পড়ার শব্দ সব একে একে মিলিয়ে গেল। এবার উঠে গেছে নিশ্চয়ই। আর কিছুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু বৈশাখের এই দুপুরবেলা একটা পানকৌড়ি ডাকছে থেকে থেকে। আর নির্জ্জন জলার ধারে কোকিলের স্বরটাও নেহাত মন্দ ঠেকছে না। 'খোকার মা গো'—বলে যে পাখীটা ডাকে সেটাও ডাকছে থেকে থেকে। মাঝে মাঝে একটা আগুনের হাওয়ার মত এসে পাতলা চুল উড়িয়ে দেয়। আর একটা ডাক বতু শুনেছিল বাতাসীর মায়ের কাছ থেকে, বোড়া সাপের একটা ডাক; ওরা ঠিক এমনি করে ডাকে। বতু আজ শুয়েই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়ের হাতটা গা থেকে নামিয়েই দেখতে পেল বতু, অটল আর বনমালী দাঁড়িয়ে রয়েছে উঠানের কাঁঠাল গাছটার তলায়। আস্তে আস্তে কুলুঙ্গির ধার থেকে কাগজে মোড়া কি একটা নিয়েই ছুট দিল সোজা ছোট পুকুরের ধার দিয়ে, পিঠুলী গাছের কাছ দিয়ে আকন্দ গাছটা ফেলে রেখে, তার পর সামনেই সেই পাশাপাশি গাছ দুটো। একটা প্রকাণ্ড বড়, অপরটা অপেক্ষাকৃত ছোট। কচি কচি আম ধরেছে। বড় গাছটার একটা ডাল চলে গেছে বেল গাছের ভেতর দিয়ে, সেখানে নাগাল পাওয়া যাবে না। গাছের তলায় যেতেই মিলল একটা বড় বাখারি। কোন এক লোভাতুর তাদেরই মত এসে, অসহায় হওয়ার জন্যেই হোক বা ঠিকমত কায়দা করতে না পারার জন্যেই হোক ফেলে রেখে গেছে। বতু, অটল আর বনমালী ওটাকে ধরে ঠিক মাঝের বোঁটায় লাগিয়ে নাড়া দিতেই পড়ল গোটাকতক। কচি পাতাও পড়ল তার সঙ্গে। আরও চেষ্টা করবে ভাবল, কিন্তু ঘেমে উঠেছে অসম্ভব। এক হাতে বোঁটা লাগা আম, তাই অপর হাতে ঘামে-ভেজা চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলল, 'অটল, নিয়ে আয় থেঁতো করে।' অটল ছুটল পড়ি কি মরি করে, বতু গলা বাড়িয়ে দ্বিতীয় বার বলল, 'আর আসবার সময় একটা কলাপাতা—।'

একটু পরেই অটল ফিরে এল। বলল, 'বাড়ীর সবাই উঠে পড়েছে, বকবে যে! এই নে, কলাপাতাটা ধর।'

কোথায় যাবে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। অথচ বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। অত সহজে মেটবার নয়। সমস্ত আনন্দটুকু যেন এক মুহূর্ত্তে মুক্তিলাভ করতে চাইছে। তাই সরাসরি শান বাঁধানো ঘাটের ধারে নেমে গিয়েই ঝামা দিয়ে থেঁতো করে, কলাপাতার ঠোঙা। তার পর মুখে ধরিয়ে বতু যে লঙ্কা আর নুনের গুঁড়ো এনেছিল তাই ছিটিয়ে দিয়ে সুরু করে চোঁ চোঁ টান। কিন্তু কি চমৎকার লাগে। খেতে খেতে আর ঠিক জ্ঞান থাকে না। গল্ গল্ করে অস্বাভাবিক ভাবে গড়িয়ে পড়ে, চোখে মুখে। সবার মুখ দিয়েই একটা ঝোল টানার মত শুড়ুৎ করে শব্দ

বেরিয়ে আসে। আরও টান—তারপর হঠাৎ যেন কার শব্দ পেয়েই যে যার জায়গা ছেড়ে চোঁচা দৌড়। কিন্তু পাড়ের ধারে এসে দেখল বাঘা কুকুরটা চুক চুক করে জল চাটছে।

এর পর আরও কিছু দিন কেটেছে, তাও ওই আমেরই স্বপ্নে। গোটা পনর দিন কেটেছে। পুরো দুটি সপ্তাহে আমগুলি আরও বেড়ে উঠেছে। আবার সেই আমের গল্প, আমেরই ছেঁচকি খাওয়া। যেখানেই দু'জন, পাঁচ জন সবার মুখে একই কথা। সেই ছোট পুকুরের ধারে 'চালতা' আমগাছটা এ বৎসর ঝড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ওদিককার আশা ছাড়তে হবে। 'নাকতোলা' গাছের তলায় ঘন ডাগর ঝোপটা আর নেই—সব ফাঁকা হয়ে গেছে। 'পরী'রা কেটে নিয়ে গেছে ধান সিদ্ধ করবার জন্যে। গত বৎসরের মত বিরাট সুবিধাটুকুতে যেন বাধা দিয়েছে। দু'পাশের ফাঁকা মাঠ যেন গিলতে আসছে। আর তার পাশের কলকে ফুলের গাছের কাছে কাল বাগদীর বড় বড় চোখ দুটো জল জল করছে। সব ক'টি গাছই বেড়ে উঠেছে অযত্নে, অগোছালো ভাবে বনবাদাড়ের মাঝখানে। কোন বিলাসী মানুষের সচেতন মনের পরিচয় ঘটে নি কোনটাতেই। অথচ ফল ধরবার পর থেকেই একটা শান্তি বুকে জুড়ে দিয়ে গৃহস্থের একটা সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খেতে বসতে গিয়ে ভাত রোচে না মুখে। 'মা যদি একটু আমের অম্বল দাও ত সব ক'টা ভাত খেয়ে নিতে পারি।' বলে উঠে বতু। মা বলে, 'মুখপোড়া, সারাদিন বাকড়ে আম ছেঁচকি গিলছে তবুও আশা মেটে না—আবার আমের অম্বল।' মুখের রং পাল্টাল বেশ বুঝতে পারা গেল। মনে হ'ল বতু সুস্পষ্ট হয়ে গেছে আলোতে, চেনা হয়ে গেছে সবটুকু। ফাঁস হয়ে গেছে তার গোপন রহস্য।

আরও কিছুদিন কেটেছে। ঝড়-বাদলেও কিছু ঝরে গেছে। ছোট ছেলেরা কোন্ ভোরে ফিরছে আম কুড়িয়ে—তার পর আমের অম্বল খাচ্ছে। দুপুরে গোটাকতক দোরে পড়ে প্রখর রৌদ্রে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা 'কড়ের' মা তাই উনুনে ঠেলে দিয়ে ধান সিদ্ধ করছে। উঠানে, তক্তপোশের ধারে, ঘুটের মাচায়, কুলুঙ্গির ভিতর তেলের শিশির কাছে, আরশির পাশে ঘাপটিমারা চুপসে-পড়া সেই আমটির দিকে তাকালে রাখালীর মায়ের আশী বৎসরের দেহটির ছবি মনে পড়ে যায়। পথে আম, ঘাটে আম, ছোট-বড় গড়াগড়ি। অনেকটা ডাগর আগের চেয়ে, পরিমাণে অনেক বেশী। তবুও কিন্তু ছেঁচকির কথাটা ঠিক মনে থাকে।

ক'দিনই খেতে বসে উঠে পড়েছে বতু। আজও উঠে পড়ল। বলল, 'আর খেতে পারছি নে মা মোটে।' ভাত ফেলে উঠে রোয়াকে গিয়েই বারকতক বমি। তাতেও আমেরই কুঁচি সব। শরীরটা কাহিল হয়ে গেছে, তাই বিছানায় পড়ে থাকতে হচ্ছে আজ ক'দিন। স্কুলে যেতে হবে না, কিন্তু এ অবস্থায়ও কোথা থেকে একটা অস্ফুট আনন্দ ভর করে মনকে। যারা এমন একটি ছুটি ভোগ না করেছে তারা বুঝবে না। কোথা থেকে যে একটু শান্তি একমুঠো আনন্দের সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়ে যায়। শুয়ে শুয়ে মনের ভিতর থেকেই সবটুকুকে ভেবে নিতে গিয়ে আনন্দ। বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। ঘোষেদের বউ পাতা কুড়িয়ে ফিরছে এত বেলায়। ওপাশে বারটার ট্রেনটা ধুঁকতে ধুঁকতে চলে গেল মাটি মাড়িয়ে। নিস্তব্ধ পৃথিবীকে যেন শাসন করে গেল একবার। মা আজ বড় ব্যস্ত। কাকগুলি জ্বালাতন করছে। বাটনা-বাটার একটা শব্দ আসছে। এর পর বাসনগুলো মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর বাবা আসবে ষ্টেশনের ধার থেকে ঠিক দুপুরবেলায়। বাবাকে ভাত বেড়ে দিয়ে তবে ছুটি এ বেলাকার মত। কি রকম একটা ঘোর লেগে গেছে চোখে-মুখে। স্কুলের ছেলেরা চলে গেছে স্কুলে। এতক্ষণ হয়ত পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। আর আজকের দিনে বাবা গেল না স্কুলে, তারাই যেন সমস্ত সময়টুকুকে জড়িয়ে ধরে আলাপ জমাল। বেলা আরও বেড়ে উঠেছে। রৌদ্র পড়ে গরম চাটুর মত তেতে উঠছে পৃথিবীর মাটি। তার পর বেলা যায় পড়ে। স্কুলের ছুটি হয়। অটল, বনমালী আবার আসে। আরও আম দিয়ে যায় বতুকে জানালা গলিয়ে। নাড়ে-চাড়ে গন্ধ শোঁকে, লুকিয়ে রেখে দেয় বালিশের তলায়, কেউ যদি দেখে ফেলে।

বমি হবার পর থেকেই কিন্তু বতুর এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। স্কুল ত বন্ধ হয়েছে। এখানে থাকলে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে গাছতলায় গাছতলায়। কারও কথা কানে নেবে না। এখানে থাকলে ও নাকি পাগল করে মারবে সকলকে। একান্ত নিরুপায় হয়েই চলে যেতে হ'ল বতুকে মামার বাড়ী। এ মামার বাড়ী যাওয়া না জেলে যাওয়া বুঝতে পারল না বতু।

ঘণ্টাতিনেকের পথ। গ্রাম থেকে একেবারে শহরে। ট্রেন থেকে নেমেই বাবাকে জিজ্ঞেস করে বতু, 'এখানে কেন আম গাছ নেই বাবা? সব লাইট পোষ্ট লাগানো।' এখানকার লোকেরা হয়ত আম দেখে নি জীবনে। সামান্য আম দেখলেই লাফিয়ে উঠবে। আশেপাশে ট্রাম বাস, মোটর ট্যাক্সি—এ ছাড়া পথে আসতে আসতে যতটুকু চোখে পড়েছে হাওড়ার পুল, গঙ্গা, জি. পি. ও, মনুমেণ্ট, গড়ের মাঠ আরো সব কত বড় বড় বাড়ী ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রঙচঙে সব দোকান সাজান পরিপাটি করে। ডুবে যায় বতু এ সব দেখতে দেখতে। কিন্তু আমের রূপটুকু মোটেই ভুলতে পারছে না।

নে থেকে নেমেই হাঁটা একটু, তার পর বাস। ফের আবার খানিকটা হেঁটে এসেই মামাদের বাড়ীটা—হলদে রঙের। দরজাটা দিনরাত বন্ধ থাকে। তার ওপর আবার খিলের ওপর খিল। ওদের বাড়ীর কথাটা চিন্তা করল একবার। চারিদিক ঘেরাও নেই, দরজাও নেই; কোন কালে হয়ত ছিল, আজ রয়েছে তার শেষ চিহ্ন। চারিদিক ফাঁকা সব—কুকুর বিড়াল উঠান দিয়ে গিয়েই মাঠে নেমে যাচ্ছে। এ সময়ে ভাবতে বেশ ভালই লাগছে এখানে

নামা পর্য্যন্ত আর্দো তার ভাল লাগে নি, কেমন যেন ভার ভার।···বাবা চলে যাচ্ছে এক মাসের জন্যে শহরে, কর্ম্মক্ষেত্রে। ভোরের ঘুম-জড়ানো চোখে বতু এসে দাঁড়িয়েছে খিড়কির দরজাটার কাছে। বুঝতেই পেরেছে একটা বিদায়ের তোড়জোড় সুরু হয়েছে। মা বাসি কাপড় ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে দরজাটার কাছে। মজা ছোট পুকুরের কালো জল ভাঙা আর্শির মত সাদা আকাশের ছোট্ট একটু স্মৃতি জড়িয়ে ধরে রেখেছে—কোন তরঙ্গ নেই—উদ্দামতা নেই। সন্ধ্যায় শুক্‌নো শুকনো গলায় মিটমিটে আলোর পাশে দালানে এসে বসল গোপী কৈবর্ত্ত। এ বছর ধানের দর বাড়বে—নদীটার জল বাড়ছে—হরিহরপুরের মুসলমানেরা ক্ষেপেছে চুরি ডাকাতি বেড়ে যাবে—'আপুনিরা সাবধানে থেকো।' ওর মুখে এ সব কথা বেশ মানায়। বতু শুনছে কথাগুলো বিছানায় শুয়ে শুয়ে। রাত্রে ঝড় আর জলের গতিবেগ বেড়ে উঠল। সকালে লোকজন জড়ো হয়ে গেল বতুদের বাড়ীর পিছনটায়—কতকগুলো বড় বড় পায়ের ছাপে ভর্ত্তি।···

দুলু ওপর থেকে দেখেই নীচে নেমে এসেছে। বতু আর বতুর বাবা এসেছে। দরজা খোলা হ'ল। প্রণামের পালা সারা হ'ল। বৈঠকখানার ঘর খুলল। জলখাবার এল। গল্প জমল তার পর—অনেক কথা হ'ল, পড়াশুনার কথা। মাষ্টারদের কথা, আরও অনেক কথা। কিন্তু মনে মনে আমের কথাটা মোটেই ভুলতে পারছে না বতু।

কথা কইতে কইতে অনেকেই সরে পড়ল। দুলুর বাবা আর বতুর বাবা নিজেদের কথা বলছেন। একটু স্থির হয়ে বসে থেকেই বতু চলল চিলের ছাদে দুলুকে নিয়ে! দু'তলা বাড়ীর এই চিলের ঘরটায় কেউ বড় একটা আসে না। রোদের দিনে আমচুর বড়ি শুকোয় না তার পর ফাঁকা থাকে—চড়ুই পাখী ডাকে ক'টা। দু'জনে বসেছে মুখোমুখি হয়ে। একজন গ্রাম থেকে এসেছে, সমস্ত কথা বলতে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলে বোধ হচ্ছে। যেন খালি খালি বোধ হচ্ছে—এতখানি চলার পথ যেন বাজে। ওখানে মনে হ'ত নিজেই কত বিরাট, পৃথিবীটা খুব ছোট, আর এখানে মানুষ ক্ষুদ্র, পৃথিবীটা বৃহৎ। দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। রংটা রৌদ্রে ঘুরে কালো হয়ে গেছে। চোখ-মুখ বসা। চেহারা বেশ খারাপ হয়ে গেছে।

দুলু চেয়ে আছে মুখের দিকে তাই জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল, 'এখানে কেন আমগাছ নেই মামা। দুলু বলল, 'বাবা ত বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসে আম।

আবার একটু চুপচাপ। একটু চাইছে পরস্পরের পানে। লজ্জা ভেঙে যাচ্ছে ক্রমেই। বতু বলল, 'একটা চিঠি দিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে পেয়েছিস?' দুলু খুশির সুরে বলে, 'হ্যাঁ, লিখেছিলি এখানে আম হয়েছে খুব আসিস! তার পর কালি দিয়ে সেই আমের একটা ছবি এ কেছিস—সেই যে!—গম্ভীর হয়ে গেল বতু। খানিকটা বেশ চুপচাপ কাটল। তার পর হঠাৎ বাজীকরের মত ফস করে একটা আম ধরল চোখের সামনে। শিউরে উঠল দুলু বলল, 'কোথায় পেলি রে—এনেছিস?' কোন সাড়া শব্দ নেই। বতু আবার এ পকেট ও পকেট জামার তিনটে, প্যান্টের দুটো পকেট থেকে বার করল গোটাদশেক মাঝারি আকারের সবুজ রঙের আম। একটা মুক্তির আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠছে দুলুর ভিতরটা। কোথায় রাখে জানালার ধারে, না দরজার কাছে মাথায় আসছে না। একবার উঠে পড়েছে জায়গা ছেড়ে। বলল, 'কি হবে রে?' বতু বলল, 'লুকিয়ে রাখ, কেউ যেন না দেখে—পরে দেখবে ছেঁচকি করব'!

অম্বিকা-কালনায়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শান্তিপুরের মানুষ যদি বলে—'অম্বিকা-কালনা দেখি নি,' তার চেয়ে আশ্চর্য্যের আর কিছু নাই। অথচ এমন অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদের জীবনে অহরহ ঘটছে। শান্তিপুর থেকে অম্বিকা-কালনার দূরত্ব সামান্যই, মাত্র তিন মাইল। ভাগীরথীর এ-পার ও-পার দুটি জায়গা—খেয়া-নৌকায় পারাপারের সুব্যবস্থায় মোটেই দুস্তর নয়।

অম্বিকা-কালনা বর্দ্ধমান জেলার একটি সমৃদ্ধ গঞ্জ। ধান, চাল, আলু, পাট-কুটার লেনদেনে এর বাজার জমজমাট। এখানে আদালত ও রেজেষ্ট্রি আপিস আছে; স্কুল, কলেজ, সিনেমা, ধানকল আছে। স্থানটি আর একটি কারণে প্রসিদ্ধ বলে—এইগুলিকেও 'এহ বাহ্য' বলে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়। অর্থাৎ ধর্ম্মমণ্ডলীতে একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে অম্বিকার। সাড়ে চারশো বছর পূর্ব্বে যখন ছুৎমার্গের গ্লানিভারে হিন্দু সমাজের নাভিশ্বাস উঠেছিল, তখন নদীয়া নগরীতে পরম শক্তিধর এক মহাপুরুষ প্রেমধর্ম্মের বন্যায় সমস্ত গ্লানি ভাসিয়ে দিয়ে মানবধর্ম্মকে নব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই প্রবল প্রেম-বন্যার বেগ শুধু নদীয়া নগরেই সীমাবদ্ধ থাকে নি—তার আশপাশের বহু গ্রাম জনপদ ভাসিয়ে—পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার উপকূলভাগ প্লাবিত করেছিল। অম্বিকা ত ঘরের দুয়ারে।

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ বহুবার শান্তিপুরে আসেন। শান্তিপুর থেকে কালনায় এসেছিলেন তাঁরই এক সতীর্থ ভক্ত গৌরদাস পণ্ডিতের আশ্রমে। সে কারণে—বৈষ্ণব মহাজন ও ভক্তবৃন্দের কাছে অম্বিকা পুণ্য তীর্থভূমি। ছেলেবেলায় দেখেছি—শান্তিপুরের রাসের মেলায় বাংলা দেশের দূরদূরান্তর থেকে বহু যাত্রী আসতেন। বাংলা ছাড়িয়ে—আসাম-প্রান্তের মণিপুর রাজ্য থেকে আসতেন হাজার হাজার যাত্রী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর—বাংলা বিভাগের দরুন পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রীদল ত আসেই না, মণিপুরী যাত্রীর সংখ্যাও কমে গেছে। তখনকার দিনে, তাঁরা প্রথমে আসতেন নবদ্বীপে। পূর্ণিমায় সেখানকার রাস দেখে—শান্তিপুরে পৌঁছতেন দ্বিতীয়া তিথিতে ভাঙ্গা রাসের শোভাযাত্রা দেখতে। বাবলায় সীতানাথের পাট—ফুলিয়ায় হরিদাস ঠাকুরের সাধন গোফা প্রভৃতি দেখে এঁরা পাড়ি দিতেন অম্বিকায়। সেখান থেকে কাটোয়া ঝামটপুর প্রভৃতি বৈষ্ণব-তীর্থ দেখে কোন কোন দল বৃন্দাবন ধাম পর্য্যন্ত যেতেন। এসব দলের মধ্যে মণিপুরী দলগুলিই ছিল সবচেয়ে বড়। এক একটি দলে স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবক মিলিয়ে আশী-নব্বই জন মানুষ থাকত। এঁরা যখন হাঁটা-পথে অম্বিকা কালনার দিকে রওনা হতেন—আমরা কিশোর ছেলেরা এদের পথিপ্রদর্শকের কাজ করতাম এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ নিজ নিজ উপবীত দেখিয়ে এঁদের কাছ থেকে হাতে-কাটা সুতার চমৎকার পৈতা আদায় করে নিতাম। এই আদায় কার্য্যটি—একটি কৌতুককর খেলার অঙ্গস্বরূপ ছিল।

অম্বিকা-কালনা কি কারণে বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয়েছে—সে কাহিনী গৌর-গৌরীদাস মিলন-প্রসঙ্গে বলব।

বর্দ্ধমান রাজবংশও অম্বিকাকে ধর্ম্মমণ্ডলীভুক্ত করার জন্য বহু আয়োজন করেছেন। এঁদের প্রতিষ্ঠিত অনন্ত বাসুদেব মূর্ত্তি ও মন্দির, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বিগ্রহ, লালজীর দেউল এবং একশো-আট শিবালয় বহু ভক্তিপ্রাণ যাত্রীকে আকর্ষণ করে। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা অম্বিকা নগরের বৈশিষ্ট্য।

শান্তিপুরের অধিবাসী হয়ে তিন মাইল দূরবর্ত্তী এই পুণ্যতীর্থ না দেখার অপরাধ মনে মনে অনুভব করেছি কতবার। সত্যই কি ইতিপূর্ব্বে দেখি নি কালনাকে? দেখেছি ত অনেকবার। সে দেখার রঙ ছিল আলাদা। বর্ষার গঙ্গা দুকূল হারিয়ে যখন সমুদ্র হয়েছে, তখন শান্তিপুরের ঘাট থেকে বাচখেলার নৌকায় চেপে সারা রাত জলভ্রমণ করেছি দল বেঁধে। হরিপুর বেলেডাঙ্গা বাগাঁচড়ার কোলে কোলে চলেছে নৌকা, সাহেবডাঙ্গা মেথিডাঙ্গা পেরিয়ে গুপ্তিপাড়া ছুঁয়েছে—কালনার ঘাটে লেগেছে। অকূল দরিয়ায় সারারাত দশ-বিশ মাইল ঘুরে বেড়ানো—কি নেশা যে ধরিয়েছে মনে। সেই নেশার ঘোরে কালনার মাটি ছুঁয়েও, কালনাকে খুঁজে পাই নি। দিনের বেলায় দু'একবার লালজী দর্শনে এসেছি। সে বয়সে যা দেখার কথা তাই দেখেছি—মন্দির, বাড়ী, মূর্ত্তি। শুধু ঐশ্বর্য্যের বাহিক আড়ম্বর দেখে ফিরে এসেছি, কালনাকে ছুঁতে পারি নি। জমির দলিল রেজেষ্ট্রির ব্যাপারে কয়েকবার গিয়েছি কালনায়, দেখেছি দোকান-পসার, বাজার-হাট, পথ-ঘাট, মোক্তার-মুহুরী—মনে রেখাপাত হয় নি। ফুটবল টীমের সঙ্গে কালনা গিয়েছি—বলখেলার মাঠে হৈ-হল্লোড় হয়েছে বিস্তর—তার মধ্যে কালনা কোথায়? এ ছাড়া আত্মীয়কুটুম্বও আছেন কালনায়। নিমন্ত্রণরক্ষার্থ তাঁদের সঙ্গে মেলামেশাও হয়েছে, কিন্তু সে সময়ের কালনা আর পাঁচটা সাধারণ গ্রামের মতই। সত্য কথা বলতে কি কোন ক্ষেত্রেই কালনা একটুও রেখাপাত করে নি মনে।

তাই এবার যখন কালনার পাক্ষিক পত্রিকা ভাগীরথীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীমান বিনয়কৃষ্ণ—কালনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন—বিশেষ উৎসাহ বোধ করি নি। প্রবাসীর সহ-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলকেও ওঁরা কালনা দেখবার জন্য বহু দিন ধরে বলছেন। বাগল মহাশয়ও আজ কাল করে কালক্ষেপ করছিলেন। এবার দু'জনকেই একসঙ্গে পাকড়াও করলেন বিনয়কৃষ্ণ। শেষ পর্য্যন্ত দু'জনকেই এক যাত্রায় সমান ফল ভাগ করে নিতে হ'ল।

হাওড়া থেকে আমরা কালনা যাত্রা করলাম ; জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকেই।

হাওড়া থেকে যাত্রা—কাজেই চার মাইল পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী হ'ল। এ যেন সম্পূর্ণ একটি নূতন দেশ দেখবার জন্ম যাত্রা করলাম।

শ্রীমান বিনয় ত আমাদের সঙ্গে ছিলেনই, কালনা-নিবাসী শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাসও আমাদের সঙ্গী হলেন। বেশ কাটল গাড়ীতে। রাত আটটায় ষ্টেশনে পৌঁছে রিক্সা নিলাম দু'খানা। রাতের কালনা—যদিও বিজলী আলোয় পথ-ঘাট স্পষ্ট—দূরের বন ঝোপ প্রান্তর অন্ধকারে ঢাকা। ষ্টেশন থেকে বার হয়ে একটু দূর এসে বাঁদিকে পড়ল কারখানা। এ পথ আগে ছিল জনমানবশূন্য। সন্ধ্যার পর এ পথে ধন-প্রাণ নিয়ে চলা বিপদজনকই ছিল। খুন রাহাজানির কত ব্যাপারই ঘটে গেছে। আজ উদ্বাস্তরা এসে এর দু'ধারের বনজঙ্গল নির্মূল করে বসতি স্থাপন করেছে। কারখানার গা ঘেঁষেও ওদের ঘরবাড়ী উঠেছে। আজ প্রাকৃত কিংবা অপ্রাকৃত কোন ভয়ই নিশীথ রাতের পথিককে বিচলিত করতে পারে না।

কারখানা থেকে সামান্য এগিয়ে বাঁদিকে কালনা কলেজ ভবন। ডান দিকে রাজ-স্কুল। তার পর অম্বিকা বিদ্যালয়। ষ্টেশনের সোজা রাস্তা শেষ করে শহরের আঁকাবাঁকা সরু পথে সাইকেল রিক্সা ঢুকল। পথের একটুখানি যা আলো—চারদিকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। তারই মধ্যে পাক খেতে খেতে চলেছি আমরা। এমনি করে আধ ঘণ্টায় ঠিকানায় পৌঁছে গেলাম।

পরের দিন সকালে দেখলাম কালনাকে। শ্রীমান বিনয়ের বাড়ী ছোট দেউড়ির কাছে—একেবারে গঙ্গার কূলে। বাড়ীর সামনে কালনা-বর্দ্ধমান সড়ক। এই পথে নিত্য-নিয়মিত বাস চলাচল করে। তেমাথার মোড়ে একটি প্রকাণ্ড ঝুরি-নামা বটগাছ। ছোট ছোট পান-বিড়ি সিগারেটের দোকানও রয়েছে। পথের আশেপাশে আরও দু'একটি ছোটখাটো মুদিখানার দোকান, দু'চারখানা চালাঘর, এখানে ওখানে অযত্নবর্দ্ধিত ঝোপঝাপ। আসশ্যাওড়া, গাবভেরেণ্ডা, রাংচিতা ও বাকস গাছের ঝোপ। পিটুলি, নোনা আতা, ধলা আকড়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বড় গাছও নজরে পড়ে। সবচেয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে ঐ বিরাট বনস্পতি—বটগাছ। বিস্তৃত স্থান জুড়ে ফেলেছে ছায়া, অসংখ্য শাখায় আশ্রয় দিয়েছে নানা জাতের পাখীকে। জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রতপ্ত দুপুরে ওর তলায় এসে যে না বসেছে—সে কোন মতেই এর মহিমা বুঝতে পারবে না।

শহর দেখবার আগেই স্নান সেরে নেব ঠিক করলাম। দু' মিনিটের রাস্তা গঙ্গা। একটি প্রকাণ্ড ধানকলের পাশ দিয়ে যেতে হয়। বলা বাহুল্য—এই অঞ্চলে যত চালের আড়ত—তত রয়েছে ধানকল। অবশ্য সবগুলিই খাস কালনায় নয়। কালনা থেকে বাঘনাপাড়া যেতে মাঝ পথে পড়ে নিভুজি। এক সময়ে এই নিভুজি ধানকলের জন্ম বিখ্যাত ছিল। এখনও আছে, তবে নিভুজির সেই আগেকার দিনের জমজমাট ভাব নাকি আর নাই। তখন অধিকাংশ ধানকলের মালিক ছিলেন বাঙালী, আজ সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য।

ধানকলের পাশেই গঙ্গার উঁচু পাড়। দেড়তলা-দু'তলা সমান উঁচু। কিছুকাল পূর্ব্বে এই পাড়ে ছিল গঙ্গার ভাঙন। সে সময়ে গঙ্গার খেয়াল খুশির উপর কালনার জীবন-মরণ নির্ভর করত। এ অঞ্চলের গঙ্গা কীর্ত্তিনাশার মতই ভয়ঙ্করী—সর্ব্বনাশা খেলায় খেসারত দিয়ে কত ঘরবাড়ী জোতজমি গ্রাম-শহর গঞ্জ-বাজার যে জলসাৎ হয়েছে—তার লেখাজোখা নাই। পাথর দিয়ে বাঁধানো পাথুরে মহলটাও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছিল কয়েক বছর আগে। মহিষমর্দ্দিনীর পূজামণ্ডপও যায় যায় হয়েছিল। ভাঙনের ঘা খেয়ে খেয়ে শহর হয়েছে সঙ্কীর্ণ—দ্বিভুজের মত প্রসারিত। কতটুকুই বা শহর। আর কিছুদিন অব্যাহত থাকত যদি পাড়-ভাঙার খেলা—কালনার অস্তিত্ব তা হলে মুছে যেত। সৌভাগ্যের বিষয় এখন রুদ্রাণী পরিণত হয়েছেন বৈষ্ণবীতে—সংহারের খেলা থামিয়ে তিনি পালয়িত্রীর অভয় পাণি মেলে ধরেছেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে কালনাবাসী।

এ গঙ্গা কলকাতার আবিল-সলিলা গঙ্গা নয়। এর দু'পাশের কোথাও নেই অতিকায় কলকারখানা, চিমনির উদ্যত আয়ুধ—যা ধূমশর ক্ষেপে আকাশকে করে বাষ্পমলিন। এর কাঁচস্বচ্ছ সলিলের আয়নায়—আকাশ প্রতিবিম্ব দেখছে দিনে রাত্রিতে—মানুষ শুচিস্নিগ্ধ হচ্ছে অবগাহনে। ওপারে দিগন্তবিস্তৃত চরভূমিতে সবুজের বন্যা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুঁড়েঘর—আম জাম নারকেল গাছ। সেই প্রান্তর আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে এক সময়ে আকাশকেই জড়িয়ে ধরেছে স্নেহভরে। আকাশ মাটির এমন সহজ প্রীতিবন্ধন বড় একটা চোখে পড়ে না। দু'একটি নৌকা চলেছে মন্থর গমনে—জাহাজ ষ্টীমারের ঘর্ঘরনাদ নাই—গতির প্রতিযোগিতা নাই। তরঙ্গের উৎক্ষেপ নাই, আবর্ত্ত নাই—অথচ স্রোতময় পরিপূর্ণ জীবন।

স্নান সেরে স্নিগ্ধদেহে ফিরে এলাম।

এসে দেখি স্থানীয় কয়েকজন এসেছেন আলাপ করতে। একটু পরে মহকুমা-শাসক শ্রীদুর্গাদাস মজুমদার, তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমান মানবেন্দ্র পাল, চিত্রশিল্পী শ্রীমান মহীতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি এলেন। আলাপ সুরু হ'ল।

শ্রীযুত মজুমদার মহাশয়ের জ্ঞান ও পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসাপ্রবৃত্তি প্রশংসনীয়। শুধু মহকুমার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে ইনি নিশ্চিন্ত নন—মহকুমার আশেপাশে দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে যত ইতিহাসগন্ধী গ্রাম বা প্রান্তর আছে সবগুলির তথ্যানুসন্ধানে নিজের জ্ঞানবুদ্ধিকে সাধ্যমত নিয়োজিত করেছেন। কোন্ দেব-দেউলের গঠন-পারিপাট্যে কোন্ ভূস্বামী বা রাজবংশের প্রভাব পরিস্ফুট, কোন পাষাণ-মূর্ত্তিতে বাংলার শিল্পছোঁয়া কতটুকু লেগেছে, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবীমূর্ত্তিগুলি হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে,

প্রাচীন বট-অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে স্থিত হয়ে কি ভাবে গণমনে প্রভাব বিস্তার করেছে ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলল। ভাগীরথীর দুটি তীরে একদা যে গাঙ্গেয় সভ্যতা জন্মলাভ করে বাংলা দেশকে মহিমান্বিত করেছিল—তার সুত্রানুসন্ধান করলে দেখা যাবে বন-জঙ্গলে ঘেরা মঠ, মন্দির, অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ, সিন্দুর-আবৃত শিলা-মূর্ত্তি, পোড়ামাটির নক্সা, ইটের কারুকার্য্য প্রত্যেকটিই মূল্যবান দলিল। প্রাচীন বাংলাকে উদ্ধার করতে হলে এগুলির সাহায্য অপরিহার্য্য। একদা গাঙ্গেয় সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল নবদ্বীপ—অম্বিকা থেকে এর দূরত্ব বেশী নয়। বল্লাল ঢিবি, চাঁদ কাজির সমাধিস্থান, দাঁইহাটের ভাস্কর পণ্ডিতের ঘাট, কাটোয়ার নিমাই সন্ন্যাসের স্থান, ফুলিয়ায় হরিদাসের সাধনগোফা, বাগাঁচড়ায় চাঁদ রায়ের ভিটা, পাণ্ডুয়ার মন্দির আর প্রাচীন সপ্তগ্রামের সীমানা, হংসেশ্বরী মন্দির, বৃন্দাবনচন্দ্র, লুপ্ত সরস্বতী ও বেহুলা নদী···সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে আছে প্রাচীন বাংলার পরিচয়পত্র। কালের বালুস্তরে ঢাকা পড়েছে লেখা, প্রত্নতত্ত্বের খনিত্র দিয়ে বালু আবরণ সরিয়ে এই সব উদ্ধার করতে না পারলে নবীন বাংলার প্রাণসত্তাটিকে চিনে নেওয়াই দুষ্কর। এ সবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক প্রবাদ, কিংবদন্তী ও ছড়া। ইতিহাস তৈরীর মালমশলায় এগুলিও তুচ্ছ নয়।

অম্বিকা নগরের উৎপত্তির মূলে এমনই একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

সে অনেক দিন আগেকার কথা। জায়গাটি তখন ঘন জঙ্গলে ভর্ত্তি ছিল। রাজা-জমিদাররা শিকার বা অন্য কোন কারণে কালে-ভদ্রে এসব পথে যাতায়াত করতেন। একদা বর্দ্ধমানাধিপতি লোকলস্কর নিয়ে, হাতীতে চেপে এই পথ দিয়ে যেতে যেতে বনের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন। বুঝলেন এই ঘণ্টাধ্বনি দেব-পূজার সঙ্কেতচিহ্ন। বনের মধ্যে দেবতা? শব্দ অনুসরণ করে গভীর বনমধ্যে পৌঁছলেন রাজা। পৌঁছে দেখেন—এক তেজপুঞ্জ-কলেবর ব্রাহ্মণ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট স্থাপনা করে শক্তিপূজা করছেন। পরিচয়ে জানলেন, ব্রাহ্মণের নাম অম্বরম, ঘটস্থাপিতা উপাস্য দেবী হলেন শক্তিরূপিণী অম্বিকা। রাজা বন-জঙ্গল কাটিয়ে দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়ে দিলেন। দেশে দেশান্তরে প্রচারিত হ'ল দেবী-মাহাত্ম্য। দেবীর নামানুসারেই স্থানটির নাম হ'ল অম্বিকা।

গঙ্গাতীরে রমণীয় স্থান—দেবীপীঠ। ধার্ম্মিক মানুষ এসে বাসা বাঁধল অম্বিকায়। কিন্তু সব মানুষই তো মোক্ষকামী নয়। কেউ কেউ স্থানটিকে ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্য আহরণের অনুকূল মনে করল। এদেরই কর্ম্মতৎপরতায় অম্বিকা গঞ্জের মর্য্যাদা লাভ করল এবং ধন জনে পরিপূর্ণ হয়ে নগর পদবীতে অধিরূঢ় হ'ল।

ইংরেজ আমলের আগে পর্য্যন্ত এই নগরের নাম ছিল অম্বিকা। হিন্দুরাজত্বের অবসানে এর সমৃদ্ধি দেখে তৎকালীন বাংলা-শাসক পাঠানরা এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করে, একজন কাজীর অধীনে কিছু সৈন্য রেখে এটিকে অন্যতম শাসনকেন্দ্রে পরিণত করলেন। পাঠান রাজত্বকালে অম্বিকা নগরী আরও ঐশ্বর্য্যশালী হ'ল—তার পরিচয় বাইশটি বাজারের অস্তিত্বে জানা যায়। রেনল্ডস-এর ষ্ট্যাটিসটিক্সে এই বাইশ বাজারের উল্লেখ আছে। তারই ভগ্নাংশ স্বরূপ নিভুজী বাজার, বাজির বাজার প্রভৃতি দু'একটি বাজার আজও বিদ্যমান। এই সময়ে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা যে পাড়াতে বাস করতেন—তার নাম ছিল নৃপপল্লী—বর্ত্তমানে নেপপাড়া নামে পরিচিত।

পাঠান রাজত্বের অবসানে মোগল সম্রাট আকবর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য যখন পনেরটি সুবায় ভাগ করেন, তখন বাংলার সুবাদার এই অম্বিকা নগরীতেই রাজ্যশাসন-কেন্দ্র বহাল রাখলেন এবং এর সীমা বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম থেকে কাটোয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত করে—নাম দিলেন 'অম্বিকা-মুলুক'। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত 'অম্বুয়া মুলুক'—অম্বিকা মুলুকের অপভ্রংশ মনে হয়। ওলন্দাজদের আঁকা তৎকালীন মানচিত্রেও 'অম্বুয়া' শব্দ লিখিত আছে। তার পর ইংরেজ আমলে 'অম্বিকা' কি করে কালনায় নামান্তরিত হ'ল তার তথ্য রহস্যাবৃত।

যাই হোক, ইংরেজ আমলেও কালনার জমজমাট ভাব। ক্রমে আইন-আদালত বসল, ব্যবসায় প্রসার হ'ল, গঞ্জের ঘাট মহাজনী নৌকায় ছেয়ে গেল। ষ্টীমার খুলল হোরমিলার কোম্পানী—কালনা থেকে কলকাতা। মানুষ এবং মালের চলাচল বেড়ে গেল। ধান, চাল, পাট, গুড়কুটা, আলু, আকের গুড়, প্রভৃতি নানা পণ্যের আমদানী-রপ্তানিতে গঞ্জ সরগরম হয়ে উঠল।

নানা ব্যবসা উপলক্ষে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের মানুষ ভিড় জমাল যদি—খ্রীষ্টান পাদরীরাই বা বাদ যাবে কেন? ওরাও বেসাতি খুলল ধর্ম্মান্তরিতকরণের। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজানোর ভুয়া নীতিতে ওরা আস্থাবান নয়। কালনার পূর্ব্ব সীমায় হাঁসপুকুরে আস্তানা গেড়ে ওরা খুলল মিশনারী হাসপাতাল। বিলেত থেকে এল ভাল ভাল ডাক্তার। দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধি দুই নিরাময় করার চেষ্টা চলল যুগপৎ—ভাল ওষুধ ও মধিলিখিত সুসমাচার বিলিয়ে। রোগ আরোগ্য হতে লাগল। অশন-বসন সংস্থানের আশায় আকৃষ্ট হয়ে কিছু মানুষ গ্রহণ করল নূতন ধর্ম্ম।

এর পিঠাপিঠি ব্রাহ্মধর্ম্মের ঢেউ এসে পৌঁছল কালনাতে।

আজ অবশ্য হাসপাতাল উঠে গেছে—হাঁসপুকুরের দিকে কার্য্য-তৎপরতাও কমে গেছে। কোন ধর্ম্ম নিয়ে উগ্র উত্তেজনার প্রকাশ কোথাও চোখে পড়ে না।

আলাপ-আলোচনা অন্তে আমরা শহর দেখতে বার হলাম। প্রথমে এলাম অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে। সুউচ্চ প্রাচীন মন্দির—কালের নখরাঘাতে জর্জ্জরিত। মন্দিরের গায়ে বট অশ্বত্থ শিওয়া মাথা তুলেছে—পলস্তারা খসে খসে পড়ছে। সম্প্রতি জমিদারি-প্রথা লুপ্ত হওয়ায় দেবসেবার কায়েমি ব্যবস্থা লোপ পেতে চলেছে।

বিগ্রহের ভোগরাগ তো বন্ধ হয়েইছে—সেবাপূজাও উঠে যাবার মুখে। পূজারীরা ভক্তি অথবা মমতাবশতঃ কোন মতে পূজাটুকু চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজ সংসারের অভাব মিটিয়ে কতদিন এ ভাবে পূজা চালাতে পারবেন—জানি না।

সিঁড়ি দিয়ে উঁচু চত্বরে উঠে মন্দিরের গায়ে অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শন দেখে আমরা তো অবাক। পাথরের কাজ নয়, পোড়ামাটির কাজ। ছোট ছোট নক্‌সা, ছবি, কাহিনী। পুরাণ-কাহিনী ছাড়াও—লোকযাত্রার চিত্রও রয়েছে উৎকীর্ণ। শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাস একটি অপূর্ব্ব টেরাকোটা শিল্প-সৃষ্টির পানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। চাঁদ উঠেছে আকাশে—উৎসুক মায়েরা কেউ ছেলে কোলে—কেউ বা ছেলের হাত ধরে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন সেই দৃশ্য। একটি-দু'টি নয়—অনেকগুলি মা ও ছেলের বিচিত্র ভঙ্গীতে চিত্রখানি চিরকালের মাতৃহৃদয়কে মেলে ধরেছে। এ ছাড়া বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, ব্রহ্মার ধ্যান, লক্ষ্মীর বিবাহ, সেকালের আসা-সোটা বন্দুকধারী দ্বাররক্ষকের ছবিও রয়েছে। এই সব ছবি একটু একটু করে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরাতত্ত্ববিদরা এদিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রাচীন বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির নমুনাটুকু অন্ততঃ ধরে রাখতে পারবেন। চমৎকার মূর্ত্তি অনন্ত বাসুদেবের, কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহ বা ঠাকুরের সিংহাসন ও বেশবাস দেখলে মন বেদনায় টন টন করে ওঠে।

মন্দির যেমন পুরাতন, শহরের ধাঁচেও তেমনি পুরাতনত্ব প্রকট। পাতলা ইঁটের খাটো খাটো কোঠাঘর, আঁকা-বাঁকা সরু গলি, মজাহাজা পুকুর, লতাগুল্ম-ঘেরা ইঁটের স্তূপ, নোনাধরা দেওয়ালের পতনোন্মুখ দেহ। কিছু চালাঘরও আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ কোঠাতেই নূতনত্বের ছোঁয়াচ। বিজলী আলো রয়েছে, রেডিও বাজছে, একতলা বা তিনতলা যেমন বাড়ীই হোক—বর্ত্তমান কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা ওদের কোথাও না কোথাও রয়েছে। বর্দ্ধমান-রাজের সমাজবাড়ীর বিরাট অট্টালিকা—ভাবগাম্ভীর্য্যে এখনও অদ্বিতীয়। নূতন আর পুরাতন দুই সমাজবাড়ী মিলিয়ে কালনায় অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে। সমাজবাড়ী অর্থে রাজবংশের সমাধি-সৌধ।

এর মধ্যে আঁকা-বাঁকা গলিপথ দিয়ে বৈষ্ণব মহাজন শ্রীভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে পৌঁছলাম। এই আশ্রমের ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীশ্রী নামব্রহ্ম-জিউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি অবশ্য আছে—কিন্তু নামব্রহ্মই এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা। রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের ঊর্দ্ধদেশে ইনি স্থাপিত। নাটমন্দিরে নানা বৈষ্ণব সন্ত সাধুর ছবি ও তারকব্রহ্ম নাম প্রতিটি দেওয়ালের শোভা-বর্দ্ধন করছে। প্রাত্যহিক নামকীর্ত্তনের ব্যবস্থাও দেখলাম।

মন্দিরের পিছনে ভগবানদাস বাবাজীর সমাধি-মন্দির। যে দীন পর্ণকুটীরে বসে বৈষ্ণবচূড়ামণি অহোরাত্র নাম জপে শ্রীকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করতেন, সেই খানেই ওঁর নিরাভরণ সমাধি। জাগতিক সমস্ত উপাধি ও ঐশ্বর্য্যের ব্যাধিমুক্ত একটি নির্ম্মল পবিত্র চরিত্র।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি ইঁদারা চোখে পড়ল—যার সিঁড়ি জল পর্য্যন্ত নেমে গেছে। জনশ্রুতি—বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাস্নানে অশক্ত হয়ে পড়লে বাবাজী কূপে নেমে গঙ্গাস্নান করতেন। কেমন করে করতেন? কেন, ভক্তের আন্তরিক আহ্বানে কূপ অথবা নদী পুষ্করিণীতে গঙ্গার আবির্ভাব কি ভারতীয় সন্ত-জীবনে নূতন কথা? মন 'চাঙ্গা' (চৈতন্যযুক্ত) হলে 'কাঠিয়ায়ে' (ডোবাতে) গঙ্গার আবির্ভাব এই বহুশ্রুত প্রবচনটি কে না জানে! মন্ত্রশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি ঘটলে কূপ, পল্বল, তড়াগ, নদী—সব বারিতেই ত কলুষ-নাশিনী অভিন্নকায়া।

তার পর আর একটি আশ্রম দেখলাম—সারস্বত সাধনার পীঠক্ষেত্র। বহু পুরাতন 'পল্লীবাসী' কাগজের নাম শোনা ছিল—চোখে দেখলাম তার কার্য্যালয়। দেখে বিস্মিত হবেন না—এমন লোক এ যুগে বিরল। মাত্র কাঠা চারেক জমির উপর সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরহীন একখানা বাড়ী, যার মধ্যে খড়ের চালায় ছাওয়া দু'খানি ছোট ঘর ও তিন দিকের পাঁচিলের মাথায় একচালার বারান্দা। মাঝখানে ছোট একফালি উঠান। উঠানের একপ্রান্তে ফল-ভারে অবনত একটি কিশোর আম গাছ—মাঝখানে জবা টগর মল্লিকা গোলাপ মিলিয়ে ছোট একটি ফুলবাগিচা। মাঝখানের একচালার বারান্দায় পল্লীবাসীর হাতে-ঠেলা মুদ্রাযন্ত্রটি রয়েছে, ডান পাশের বারান্দায় কম্পোজিং সেকশনের ব্যাপার—অর্থাৎ, কাঠের কেসে হরফ সাজানো রয়েছে। আর বাম দিকের বারান্দা জুড়ে র‍্যাকে সাজানো রয়েছে পল্লীবাসীর পুরাতন ফাইল। তার একপাশে ঘরের মধ্যে সম্পাদকের দপ্তর। একখানি তক্তপোশের উপর একখানা আধ-ছেঁড়া মাদুর বিছানো। পল্লীবাসীর ফাইলে ধুলো জমেছে প্রচুর এবং কাগজও হলদে হয়ে এসেছে। শুধু কালনা কেন—বাংলার মফস্বলের অন্যতম দীর্ঘজীবী পত্রিকা এটি। পত্রিকাটির বয়স ষাট বছর। শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পল্লীবাসী প্রকাশিত হয়।

দু' একখানা ফাইল টেনে চোখ বুলিয়ে নেওয়া গেল। অনেক পুরাতন দিনের কথা—গ্রাম, সমাজ, রাজনীতির অনেক সংক্ষিপ্ত সংবাদ···ইতিহাসের এরাও হেলাফেলার সামগ্রী নয়।

ঘুরতে ঘুরতে এলাম কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকার মন্দিরে। সুসংস্কৃত নূতন মন্দির—গঠন-প্রণালীতে অভিনবত্ব আছে। চার চালার ছাউনির মত মন্দিরের মাথাটি। মন্দির-গাত্রে শিল্প-কাজ নাই। সচরাচর যে ধরনের মূর্ত্তি দেখা যায় বিগ্রহটি সে ধরনের নয়। ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি—অথচ বরাভয়দায়িনী। অম্বরীষ ঋষি যে ঘটে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেই মৃন্ময় ঘটটিও সযত্নে রক্ষিত হয়েছে মন্দিরে।

এই মন্দিরটির ঠিক সামনে শ্মশানকালীর মন্দির। শ্মশান

এখান থেকে বেশ খানিকটা দূর হলেও এককালে স্থানটি যে গঙ্গা-তটশায়ী ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

এর পর একটু এগিয়ে পড়ল কালনার বাজার। বাজারের পূর্ব্ব ধারে লালজী মন্দির। বিরাট জায়গা নিয়ে এই দেবালয়। মূল মন্দিরের দু'পাশে একশো আট শিবমন্দির। শ্বেত ও কৃষ্ণ দু' রকম পাথরে নির্ম্মিত লিঙ্গমূর্ত্তি। তিন খানি রথ রয়েছে থড়ের ছাউনির মধ্যে। মাস দুই পরে সুরু হবে রথের উৎসব। সোজা উল্টো দু'টি রথেই প্রচুর ভিড় হয়। সামনের বিস্তীর্ণ বাজারে বসে রথের মেলা। পণ্য—গাছপালা, পাখী, পেতে, ধামা, কুলো, কাঁঠাল আনারস থেকে পাঁপরভাজা পর্য্যন্ত। এখন তালপাতার সেপাই বা ভেপু বাঁশী বিক্রী হয় না, তার বদলে রঙীন বেলুন আর প্ল্যাসটিক পুতুলের রাজত্ব।

পূর্ব্বে লালজীর ভোগের বরাদ্দ ছিল রাজকীয়। প্রতিদিন সাড়ে বাহান্ন টাকার ভোগের বরাদ্দ ছিল—ক্ষীর, মিষ্টি, লুচি, ছানা, দই ইত্যাদি। দর্শনার্থী কোন বিদেশী ব্রাহ্মণ গেলে—তিনিও অতিথি হিসাবে সংকৃত হতেন। কিন্তু হায়, সেদিন আর নাই। এখন লালজীর জমিদারির আয় বন্ধ হয়েছে—মাত্র সাড়ে পাঁচ টাকায় রাজ-প্রতিষ্ঠিত সব ক'টি বিগ্রহের সেবাপূজা চালানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলিকে লালজীর বাড়ীতে আনাবার আয়োজন হচ্ছে। আপত্তি করেছেন কালনা-বাসীরা। ওঁরা বলেন, আবাস-মন্দির থেকে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে স্থানচ্যুত করে—এ ভাবে মেসবাড়ী সৃষ্টি করার কল্পনাটাই তো বেদনাদায়ক। হয় রাজা পূর্ব্বব্যবস্থা বহাল রাখুন, নতুবা রাজ্য সরকার এর ভার নিন। জমিদারির উপস্বত্ব থেকে এতকাল দেবসেবা চলেছে বটে, দেবতা তো প্রজার রক্ত শোষণ করে প্রভূত সুখ-বিলাসে পরিপুষ্ট হন নি। বরং দেবসেবার নরনারায়ণকেই পোষণ করা হয়েছে। দেবসেবকগণের কথা বলছি। পূজারী, বেশকার, সুপকার, ভৃত্য, মালী, দারোয়ান··· কত পরিজন ঠাকুরের। ঠাকুর উপবাসী থাকলে পরিবারসহ এদেরও অনশন অবধারিত। ঠাকুরবাড়ীর সর্ব্বত্রই আশঙ্কার ছায়া নিবিড় হয়েছে। চিন্তার বিষয়ই ত। স্থানচ্যুত দেবতার সঙ্গে বৃত্তিচ্যুত মানুষের কি দশা ঘটবে—সহজেই অনুমেয়।

বাজার দেখে—শহরের শেষ সীমান্তে এসে পড়লাম। ক্রমে বাড়ীঘর শেষ হয়ে গেল। মাঠের মাঝখান দিয়ে চলেছি। আশেপাশে আগাছা গুল্মের ঝোপ—চোরকাঁটা ভরা মাঠ—তার মাঝখানে পায়ে-চলা সরু পথ। গঙ্গার পাড় থেকে জায়গাটা বেশ উঁচু—শহরের সংস্রব বর্জ্জিত। একটা পরিত্যক্ত বাড়ী—একটি ভাঙা পাঁচিল পথে পড়ল। কয়েক শতাব্দীর পিছনে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

আরও খানিকটা এগিয়ে এমন একটি জায়গায় পৌঁছলাম যা সমস্ত কালনাকে আড়াল করে দাঁড়াল। সাড়ে চার শো বছর আগেকার পুরাতন ইতিহাসের পাতা খুলে গেল সামনে। এখানে মানব-মহিমা-স্নাত চির তাপস হৃদয়গুলি দিয়ে জীবনের-সঙ্গে-জীবন-যোগ-করার কাহিনী লিখে রেখেছেন মহাকাল।···অতি প্রশস্ত সিমেণ্ট বাঁধানো গোলাকার বেদী ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এক সুপ্রাচীন তিন্তিড় বৃক্ষ। গাছটির অবস্থান ভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকাণ্ড একটি আতপত্র মেলে—নিদাঘ-তাপক্লিষ্ট কোন পরম আরাধ্য জনকে স্নেহসুশীতল ছায়ায় পরিতৃপ্ত করার কি গভীর নিষ্ঠা তিন্তিড়ীর। চারদিকের শাখাবাহুগুলি প্রায় ভূমি স্পর্শ করে—পরম ধনকে যেন আগলে রেখেছে রৌদ্র-স্পর্শ থেকে।

এই বৃক্ষতলে ছিল নিমাইয়ের সতীর্থ সুহৃৎ পণ্ডিত গৌরীদাসের কুটির। সন্ন্যাস নেবার কিছুদিন আগে শান্তিপুর থেকে নিমাই এসেছিলেন অম্বিকায় গৌরীদাসের সঙ্গে দেখা করতে। নৌকার বৈঠা বেয়ে হরনদী দিয়ে নিমাই এসে পৌঁছলেন অম্বিকায়। সঙ্গে কীর্ত্তনীয়া বাসু ঘোষ। এই তেঁতুলগাছতলায় তাঁদের প্রথম মিলন হ'ল। হাতের বৈঠা গৌরীদাসকে দিয়ে শক্তি সঞ্চার করলেন নিমাই। বৈষ্ণব মহাজনের বর্ণনা :

> গঙ্গা পার হৈনু নৌকা বাহি এ বৈঠায়।
> এই লহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥
> ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে।
> এত বলি আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে॥

বৃক্ষতলে ছোট বেদীগাত্রে স্মৃতিফলকে লেখা আছে : গৌর-গৌরীদাস মিলন ক্ষেত্র।

দ্বিতীয় বার এসে নিমাই স্বহস্তলিখিত একখানি পুঁথি গৌরীদাসকে দিয়ে যান।

তৃতীয় বার আসেন সন্ন্যাস নিয়ে। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ সংবাদে গৌরীদাস মর্ম্মাহত হয়েছিলেন—তবু প্রভুকে দেখে তাঁর আনন্দ ধরে না। গৌরীদাস অনুরোধ করলেন—প্রভু যেন সন্ন্যাস নিয়ে এইখানেই বাস করেন। প্রভু বললেন, গৌরীদাস এমন কথা বলো না। তুমি আমার আর নিতাইয়ের প্রতিমূর্ত্তি পূজা কর। তুমি নিশ্চয় জেনো—তার মধ্যে আমরা বাস করব।

প্রভু নিজে উপস্থিত থেকে নিম কাঠ থেকে দুই ভায়ের প্রতিমূর্ত্তি তৈরি করালেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য দারুমূর্ত্তিদ্বয়ের অভিষেকাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করলেন। এই মূর্ত্তি দুটিই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিতাইয়ের সর্ব্বপ্রথম বিগ্রহমূর্ত্তি—গৌরীদাস প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে অদ্যাপি বিদ্যমান।

কিন্তু দারুমূর্ত্তি নড়ে চড়ে না, কথাও বলে না। গৌরীদাস বললেন, এ মূর্ত্তি নিয়ে কি করব আমি? তোমরা দু'জনে থাক।

যেমন বলা—সেই কাঠের মূর্ত্তি চলতে আরম্ভ করল—প্রকৃত নিতাই গৌর হয়ে গেলেন কাষ্ঠবৎ। অমনি গৌরীদাস দারুমূর্ত্তির সামনে এসে বললেন, না, না—আমার ভুল হয়েছে, তোমরা থাক।

যেমন বলা—দারুমূর্ত্তি স্থাণুবৎ হয়ে গেল। প্রকৃত নিতাই গৌর সজীব হয়ে উঠলেন।

গৌরীদাস ব্যাপার দেখে নিজের মন্দ ভাগ্য বলে কাঁদতে লাগলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি বললেন, সখা—দেখলে ত আমরা দুই অভিন্ন মূর্তি। যে মূর্তিকে ইচ্ছা তুমি রাখতে পার। তবে কথা দিচ্ছি—তোমার জীবনকাল পর্য্যন্ত—এই কাঠের মূর্তিতেই প্রকৃত মূর্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে ভজন কীর্ত্তনাদি লীলা করব, তুমি যা খেতে দেবে তাই খাব। আর যত দিন কোন ভক্ত পাঁচ দণ্ডকাল একাগ্র চিত্তে আমাদের দর্শন করে আকর্ষণ করে নিয়ে না যায়—ততদিন তোমার মন্দিরেই থাকব আমরা।

এই জন্য আজ পর্য্যন্ত সামান্য ক্ষণের জন্য বিগ্রহ-দর্শনের ব্যবস্থা। যাকে বলে ঝাঁকি দর্শন।

দেড় শ' বছর আগে একবার শ্রীগৌরাঙ্গ-বাণীর সত্যাসত্য পরীক্ষা হয়ে গেছে। সে বড় অদ্ভুত কাহিনী।

প্রায় দেড় শ' বছর আগে একদিন এক অকিঞ্চন বৃদ্ধ বৈষ্ণব গৌরীদাস প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরের সামনে এসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, সব জায়গাতেই ত দেখি দুয়ার খুলে দেবদর্শনের ব্যবস্থা—এমন কোন জায়গা কি নেই যেখানে মন্দিরের দুয়ার আপনা-আপনি খুলে গিয়ে ঠাকুর দেখা দেন?

যেমন বলা—মন্দিরের দুয়ার খুলে শ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রকট হলেন।

পূজারী ত স্তম্ভিত! বুঝলেন—এই অকিঞ্চন বৈষ্ণব সামান্য ব্যক্তি নন—অনায়াসে ইনি শ্রীবিগ্রহের প্রাণসত্তাকে আকর্ষণ করে নিতে পারেন।

পূজারী আকুল হয়ে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু, তুমি যদি গৌরীদাসের প্রাণধন হও ত দরজা বন্ধ কর।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব অলৌকিক লীলার আস্বাদ পেয়ে পরম আনন্দলাভ করলেন এবং সেই লীলা অহরহ আস্বাদ করবার জন্য শ্রীপাট অম্বিকায় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রয়ে গেলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ নামসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীভগবানদাস বাবাজী।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম ছায়াশীতল তেঁতুলতলায়। ঝির-ঝির করে বাতাস বইছিল, সমস্ত শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিল। অম্বিকার প্রাণসত্তাটিকে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে অনুভব করছিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ-পদপূত বৈষ্ণব-তীর্থে দাঁড়িয়ে গান্ধীজীর অতি প্রিয় ভজন গানের দু'টি ছত্র বার বার মনে পড়ছিল :

বৈষ্ণব জন তো তেনে কহী এ জে পীড় পরাঈ জাণে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তোয়ে, মন অভিমান ন আণে রে।

বৈষ্ণব জন তিনিই—যিনি পরের দুঃখ বুঝতে পারেন। পরের কষ্ট মোচন করেন, (কিন্তু) মনে অভিমান রাখেন না।

আলোর মুক্তি

শ্রীসুবোধ রায়

"আলো চাই, আলো চাই"—প্রাণ কহে কাঁদি
আঁধারের সাথে তারে কে রাখিল বাঁধি।
কেবা যেন খেলাচ্ছলে জীবন-উদয়াচলে
ডাকিয়া আনিল হায়! প্রদোষ আঁধার!
সে গভীর গুহা হতে নাহিক নিস্তার।

আঁধারে আরাম-ঘুম তাই লাগে ভাল,
"বেদনা-সাধনা-অগ্নি কেন মিছে জ্বালো?"
মন কহে বার বার! স্বপন-বিলাস তার
চুরি করে আনে কত সুবর্ণ-রতন,
লুকাতে সে চোরাধন কতই যতন!

সহসা জাগিয়া ওঠে ঝঞ্ঝা বজ্রাসুর।
রুদ্রের ভৈরব-ভেরী, হুঙ্কার মৃত্যুর
শিয়রে জাগায়ে তোলে—অশ্রুনদী কলরোলে
পরাণের কূলে আনে প্রলয়-প্লাবন,
বিভীষিকা মাঝে ঘটে নব জাগরণ।

পরাণ কাঁদিয়া বলে—"আলো, কোথা আলো?
নিজ বক্ষ-সমিধেতে জ্বালো তারে জ্বালো।
বিলাস-আরাম-শয্যা আনে যে দুঃসহ লজ্জা
যাক্ দূরে প্রদোষের স্বপন-আঁধার,
মুক্ত হোক্ আলোকের জ্যোতি-পারাবার।

ভূস্বর্গের যাত্রী

শ্রীমহাদেব রায়

পূজার ছুটির ছুই দিন আগে দুর্নিবার আকর্ষণ হইল কাশ্মীর যাত্রার। যে সুযোগ মিলিয়াছে, তাহা পরিহার করিলে জীবনে আর হইবে না। তাই শত দায়-দায়িত্বকে দূরে সরাইয়া ঐ সুদূরের আকর্ষণে বাহির হইয়া পড়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ফিরিতেছি। স্ব-গৃহ হইতে একেবারে নিঃসঙ্গ বাহির হইয়া সুদূর তীর্থে পাড়ি দিব—এ কোন্ দুর্মতি!

প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদের অভিযোগেরও অন্ত নাই। অবশ্য, সকলকে সঙ্গে পাইলে সত্যই চরিতার্থ হইতাম। পলে-পলে, দণ্ডে-দণ্ডে ইহাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া অমর্ত্যে যাত্রার রথে পথে-পথে নূতন সম্পদ বহন করিয়া লইয়া যাইতাম। ফিরিবার পথে ভূ-স্বর্গের সম্পদ ছাড়া, বন্ধুদের—সকলের অন্তরের সুধায় নিজের অন্তর ভরিয়া লইয়া পুনশ্চ এই ভূমিতে নামিয়া নূতন স্বর্গ রচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু নিরুপায়। অগত্যা গৃহ হইতে একাকী নিস্ক্রান্ত হইতে হইল।

যে অবস্থায় গৃহের জঞ্জাল ছাই-চাপা দিয়া একাকী বাহির হইয়া আসানসোলে পৌঁছিয়া সহযাত্রী বান্ধবকে ধরিলাম, সে এক বিরাট কাহিনী। সে কাহিনী বর্ণনার অবসর এখন নয়। কিন্তু বাহির হইতে না পারিলে, বন্ধুবরও যে আসানসোল হইতে নামিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া গৃহমুখী হইতে পারেন, সেই কথাই ছুইটা দিন আর ছুইটা রাত ভাবিয়াছি। কথা ছিল—তিনি কলিকাতা হইতে রওনা হইবেন, আমি মধ্যপথে আসানসোলে মিলিত হইব। দৈবাৎ বাধা ঘটিলে, আমার ত হইলই না, তাঁহারও সংশয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়শঃ দেখা যায়, উভয়তঃ সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হয়।

উভয়েরই কিন্তু সৌভাগ্য। যথাস্থলে—যথানির্দিষ্ট লগ্নে মিলিত হইলাম। যে ভাবে অনশনে—জাগরণে—বহু সমস্যার আংশিক সমাধান—স-কলহ অথবা নির্ব্বাক সমাপ্তি করিয়া বাহির হইয়াছি, ঘোড়দৌড় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যান অবলম্বন করিয়া আসানসোলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে পৌঁছিয়া শুধু এই কথাই মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী"। অন্তর্যামী অন্তরের কথা ঠিক ঠিক টের পান। অন্তরের একাগ্রতা হইলে, ভাবনা-বাসনা নিস্ফল হয় না। মানসের এই যে একটা চরিতার্থতা, এই চরিতার্থতা আসানসোল হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত পথ যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

২

দিল্লীতে আসিয়া পড়িলাম। সেই ইন্দ্রপ্রস্থ। ব্যাসদেবের বর্ণনার কথা চিন্তা করিতে করিতে মনে পড়িল কুরু-পাণ্ডবের কথা, মনে পড়িল—তাঁহাদের ইন্দ্রপ্রস্থের কথা। ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাচীন চিহ্ন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আজ আর হইবে না। সে যুধিষ্ঠিরও নাই—সে ইন্দ্রপ্রস্থও নাই। কল্পনার মেজে তাহার স্বরূপ সন্দর্শনে যেটুকু আনন্দ, সেটুকু লালন করিতে করিতে ভাবিতেছি—আজকার দিল্লীর কথা।

১২ই অক্টোবর (১৯৫৩) বেলা আড়াইটায় এই গাড়ী হাওড়া ছাড়িয়াছে। পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দিল্লী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে কয়েক ঘণ্টা অবস্থিতি ঘটিবে। তবে 'তুফানে'র সঙ্গে এবার বিচ্ছেদ হইল। রাত্রি দশটায় এখান হইতে অন্য গাড়িতে উঠিয়া পুনশ্চ অগ্রগতি। কিছুক্ষণ পুরাতন শহরের বুকে স্বচ্ছন্দে চোখ বুলাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারা যায়।
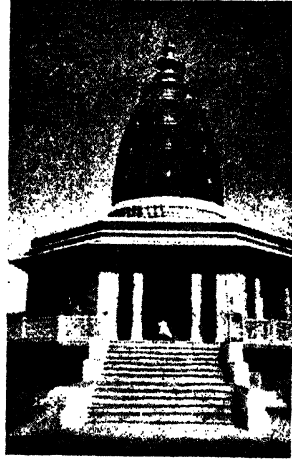
কালীবাড়ী, নয়া দিল্লী

বন্ধুর সাহচর্য্যে সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে বাহির হওয়া গেল। বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছে—রাস্তা আলোয় আলোময়। তবু ভিতরের অন্ধকার যাইবে কেন? এই যে ধূম্র-ধূলিজালের মধ্যে লোকজন গিসগিস করিতেছে, সওদাগর সওদার জালবিস্তারের সহস্র কল্পনায় বিভোর, সিঙ্গল ট্রামগাড়ী (কলিকাতার মত ছুই বগির গাড়ী নয়, এক বগির) হু-হু করিয়া চলিয়া গেল, ইহার মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থই বা কোথায়, আর নয়া দিল্লীই বা কোথায়? নয়া দিল্লী আজ শুধু ভারতেরই প্রাণকেন্দ্র নয়, জগৎ-জোড়া সম্পর্কের নূতন কেন্দ্র। না দেখিতে পাইতেছি সেই নূতনকে, না পুরাতনকে; তাই বলিতেছিলাম যে, বৈদ্যুতিক আলোকে অন্ধকার যাইতেছে না।

কোথায় কিরূপ গৃহে পণ্ডিত শ্রীনেহরু আমেরিকা, কাশ্মীরের সংযোগ-বিয়োগের চিত্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ঘর্ম্মাক্তকলেবর, তাহা কি দিল্লীর এই রাস্তা দেখিয়া বুঝা যায়? না, এই দোতলা বাড়ীগুলি

দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়—ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের কথা ? ঐ ত লালকেল্লাও কাছে, জুম্মা মসজিদও নিকটেই—দুইটিরই বাহিরের অংশ ত অনেকখানিই দেখা যাইতেছে। আলোকে না হয় ভিতরে গিয়া কক্ষে কক্ষে, সোপানে সোপানে উত্তানে উদ্যানে তাহার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য উপভোগ করা যাইত। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, সন-তারিখ, নির্ম্মাতা-উৎসাহদাতা বিভাগ-বিশেষ ইত্যাদির তত্ত্বাবধারণে বাহ্য জ্ঞানও না হয় কতকটা হইত। কিন্তু তাহাতে কি অন্ধকার যায় ? লালকেল্লা বা জুম্মা মসজিদ মোগল যুগের মহাকীর্ত্তি। উহাদের প্রথম দেখিলে, বা স্মরণ করিলে, সেই কীর্ত্তির কথাই মনে পড়ে। কিন্তু তাহার পিছনে পিছনেই আসিয়া উপস্থিত হয় ইংরেজের স্মৃতি। কোনটার কি রূপ তাহার আলোচনাও এখানে বাহুল্য। ঐ দুই স্মৃতিকে অস্পষ্ট—বা অর্দ্ধস্পষ্ট করিয়া আজ উজ্জ্বল হইয়াছে এক ভারতীয় গরিমা। 'লালকেল্লা' বলিতেই অন্তরে জাগে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বদেশবৎসল মহাবীর সুভাষচন্দ্রের বীর্য্য-বিভূতি-ধ্বনিত উক্তি—"দিল্লী চলো, লালকেল্লা দখল কর"। জুম্মার এক ভাই আমার প্রার্থনারত হইয়া থাকুন, অন্য ভাই মনে মনেও তাহার ব্যাঘাত ঘটাইবে না—এই মহাভাবে ভারতীয়ের সুপ্ত আত্মার যথার্থ জাগরণ। মত ও পথের পার্থক্য লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে যেখানে, কলহ, সেখানে ধর্মও অন্তর্হিত, জাতীয়তাও তিরোহিত। ধর্ম্ম-তিতিক্ষার পূর্ণতা ভারতবর্ষেই সাধিত হইয়াছে। আবার সে মহাভাব হইতে বিচ্যুতিও ঘটিয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মে তিতিক্ষাই মনুষ্যে দেবত্ব—কোন ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি বিরূপ না হইয়া নিজ নিজ বোধে শ্রদ্ধাপর থাকিয়া স্বরূপ উপলব্ধি কর। ইহার অধিক বোধ নাই, ইহার অধিক জ্ঞান নাই, ইহার অধিক আলোক নাই। প্রকৃত পক্ষে, জুম্মাই বলি, লালকেল্লাই বলি, কুতবমিনারই বলি, আর, আজিকার সেক্রেটারিয়েট, বিড়লামন্দির, শ্যামামন্দির প্রভৃতির কথাই বলি, চর্ম্মচক্ষুতে দেখিলেই কি দেখা হয় ? উহার অভ্যন্তরে—মর্ম্ম-গৃহে, কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতে হইবে। বন্ধুবর বহুবার দিল্লী দর্শন করিয়াছেন। বড় সুন্দর কথা বলিলেন—"অট্টালিকায় যা নেই, অট্টালিকার আত্মায় তা আছে, সন্ধান করুন। দিল্লীর মধ্যেই ভারত—মহাভারত লুকিয়ে আছে। সমগ্র ভারতের সারভূত আত্মার ছবি খুঁজে পাবেন এখানে। যুধিষ্ঠিরও আছে, পৃথ্বীরাজও আছে, কুতবউদ্দীনও আছে। ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভিন্ন দেশী মহাত্মা, দুরাত্মাও আছে—পল ব্রাণ্টনও আছে, হেষ্টিংসও আছে। কবির কথায় যে "শক-হুনদল পাঠান-মোগল এক দেহে লীন" হয়ে আছে এই ভারতে তা ত দিল্লী দেখেই বুঝতে হবে। প্রাচীনের সঙ্গে নবীন সংযুক্ত হয়েছে এখানে। ঐ ত রাজঘাট। নব ভারতের নবীন স্রষ্টা ঐখানেই শায়িত হয়েছেন শেষ শয্যায়। তাঁকে যেখানে বিভ্রান্ত ভারতীয় সন্তান ভূ-পাতিত করল, সে-ও ত ঐ অদূরেই। ভেবে দেখুন—এই রাজপথে চলতে চলতে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের করুণ সুর সংযুক্ত হয়ে আপনার অনুভূতিতে এক নবীন আবেগময়ী চেতনার সঞ্চার করছে কিনা।"

ভাবিলাম—বন্ধুবরের কথাই ঠিক। ইতিহাসও নয়, ফটোগ্রাফও নয়, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য মিশ্রিত হইয়া যে অনুভূতি আর উপলব্ধি জাগায়, তাহারই লোলুপতা—যুগে যুগে ভাবে ও রসে। তাহারই জন্য পাঠক চায় গল্প, দর্শক চায় ছবি—ভিন্ন ভিন্ন রসের রসিক বিভিন্ন আধারে চায় ভিন্ন ভিন্ন রস।

দিল্লীর প্রসঙ্গে বন্ধুবরকে যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'র কথা বলিতেই তিনি সোচ্ছ্বাসে বলিলেন—"বাস্তবিকই অতি-সরস চিত্র ! আচ্ছা, দিল্লী দেখা যাবে'খন ফেরার পথে। বই পড়ে কি দিল্লী দেখা হয় ? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নতুন মনের নতুন চোখ বুলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে কি পাওয়া যায়।…এখন চলুন—সময় হ'ল।"

দ্রুতপদে ফিরিতে হইল। ষ্টেশন বড়। দিল্লী ষ্টেশনের গাম্ভীর্য্য বিখ্যাত। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে, কি নিকটে—কি দূরে—শহর পর্য্যন্ত কি সুদর্শনা নগরীর নয়ন-মনোহর শোভা বা লক্ষণীয় পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টিগোচর হইল না। নয়া দিল্লী, কেমন চোখে দেখি নাই আজও, শুধু নামই শুনিয়াছি। বন্ধুবর আশ্বাস দিয়াছেন—ফিরিবার পথে হইবে। তাই সই। আশা মহাআশা।

৩

১৪ই অক্টোবরের প্রভাত। অমৃতসরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে জনবাহুল্যের কলকোলাহল নাই। বাহিরে পরিচ্ছন্নতার অপূর্ব্ব শ্রী বড় ভাল লাগিল। শরতের প্রভাতের সোনালী রোদ অমৃতসরকে অমৃতময় করিয়াই যেন চোখে ধরিল।

নগর-পরিক্রমায় চারি-পাঁচজন করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া টাঙ্গা ভাড়া করা গেল। সমগ্র দলটি আমাদের ছোটখাটো নয়—ছাব্বিশ জন—নয়টি নারী, দুইটি বালিকা, বাকি সব পুরুষ। পুরুষদের মধ্যে পাচক, পরিবেষক, নায়ক আছেন। তীর্থযাত্রী গাড়ির খ্যাতনামা পরিচালক শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ কুণ্ডু মহাশয়ের পরিচালনায় আমরা সব ভূ-স্বর্গের যাত্রী। কুণ্ডু মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র ফকিরচন্দ্র আমাদের নায়ক। দলের পরিচয় আপাততঃ থাক। এখন অমৃতসরের পরিচয় গ্রহণে অগ্রসর হই।

কথিত আছে—নানকের ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া আকবর গুরু রামদাসকে অমৃতসর নগর দান করেন। আজ অমৃতসর শিখদের মহাতীর্থ।

গুরু রামদাসই নাকি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া তিন-তলা মর্ম্মরের মন্দির নির্ম্মাণ করান। অতি বৃহৎ পুষ্করিণী, চতুষ্কোণ—চারি কোণ শ্বেত পাথরে বাঁধানো, উপরে কালো পাথরের কাজ আছে। পুষ্করিণীর মধ্য হইতে স্বর্ণ-মন্দির উঠিয়াছে।

কনকে মণ্ডিত মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় কনক-কিরণ—অঙ্গে-অঙ্গে, সোপানে-চত্বরে, পুকুরের জলে শরতের প্রভাত-তপনের দিব্য বিভূতি।

মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গ যে স্বর্ণ-বসনে আচ্ছাদিত, সে বসনের উপর যে শত সহস্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য, তাহার পরিচয় আর কতটুকু

সম্ভব ? গৃহে গৃহে লৌহ কপাট—তাহাদের উপরটাতেও কারুকার্য্যের প্রাচুর্য্য। সুবর্ণের উপর কারুশিল্প শুধু কি মোগল যুগের ? পূর্ব্বের পরের বহু দক্ষতার মহিমাকে এই সুবর্ণ-বসনে ক্ষোদিত চিত্রকলা বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

মস্তকে আচ্ছাদন দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। শিখেরা গুরু গোবিন্দের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া মস্তকে কেশপাশ ধারণ করিয়াছে

লক্ষ্মীনারায়ণ (বিড়লা) মন্দির, নয়া দিল্লী

—এবং সেই মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া রাখাও গুরুরই আদেশ। পুষ্করিণীর বুকের উপর উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ইষ্টক-প্রস্তরের পথ অতিক্রম করিয়া মূল মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। একতলা, দোতলা, তিনতলা পর্য্যবেক্ষণ পরিক্রমা করা গেল। স্বর্ণে স্বর্ণময় মন্দিরের এক অঙ্গ হইতে আর এক অঙ্গে চোখ ফিরাইয়া দেখি সবই বিস্ময়। বিস্ময়কে রূপ দান করিতে না পারিলে কি মহিমময়ের মহিমাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় ? অভ্যন্তরে পূজার বস্তু শুধু এক বৃহৎ হস্তলিখিত পুস্তক—নাম 'গ্রন্থসাহেব'। অক্ষর-ব্রহ্ম অক্ষরের মধ্যে বিধৃত। পাঠক-পূজক—পঠনে পূজনে—আরাধনে ভজনে সেই একের মহিমাকে অন্তরে বরণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

দোতলার অনতিবৃহৎ ভজন-সভায় শুনিলাম—মহিমময়ের মহিমা-জ্ঞাপক অন্তর-গলানো সুরের রস। ভজনের স্বর-বিতানে লীলাময়ের লীলা-চাঞ্চল্য যেন সমগ্র অন্তরে অজ্ঞাত এক লোকের আকর্ষণের কম্পন জাগাইয়া গেল। দ্বিতলের দরজার বাহিরে আসিতে শুনিলাম—কেহ বলিতেছে—'সুন্দর'—কেহ তাহার ইংরেজী শব্দটির প্রথম অংশে অধুনাতন কৌলীন্যবর্দ্ধক অযথা জোর দিয়া বলিতেছে—'ব্যী-ইউটিফুল'।

না, অমৃতসরের সুপ্রশস্ত সুবর্ণ-মন্দিরের অঙ্গে অঙ্গে যে লাবণ্য, তাহার পরিচয় দিতে আর পারিলাম না। দুই একটি অংশের প্রতি-কৃতি দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। বাহিরের অঙ্গনে উত্তর দিকে এক প্রকাণ্ড কুলগাছ—কিংবদন্তী উহা পাঁচ শত বৎসরের অধিক কাল দাঁড়াইয়া আছে। অতি পুরাতন গাছ বটে।

স্বধাম খড়্গপুরে কর্ম্মনিরত এক পাঞ্জাবী অফিসারের সঙ্গে সহসা সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাঁহার স্বদেশ—আমাদের বিদেশ। সপরিবারে স্বদেশে আসিয়া দেবধামে পূজা দিতে আসিয়াছেন। তীর্থযাত্রায় পথে সহসা স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতে অন্তরে এক ভাব-চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। দলে দলে পাঞ্জাবী নর-নারী নিজেদের পোশাক পায়জামা আর অঙ্গাবরণে আবৃত হইয়া গ্রন্থসাহেবকে পূজা দিতে, প্রণাম করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহাদের মুখে-চোখে একটা আসন্ন তৃপ্তির সুপরিস্ফুট ভাব-মহিমা। বহিরাগত যাত্রীদের মুখে-চোখে নূতন দর্শনের কৌতুক-কৌতূহলের ছবি। মন্দিরের নির্ম্মাণ-বৈচিত্র্যে, অপরিমেয় সুবর্ণ-সম্ভারে সে কৌতুক যতখানি চরিতার্থ, ধর্ম্মকে ধরিবার জন্য ততখানি আগ্রহ কি এই দর্শকদলের আছে ? পূজারী, পূজারিণীরা যে আসিতেছে, তাহাদেরই বা কতখানি আকুলতা সেদিক দিয়া ? তীর্থে তীর্থে তীর্থপতির স্বরূপ অপেক্ষা বাহিরের ঐশ্বর্য্যই গতানুগতিক তীর্থ-মোহকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে। তীর্থ-ভ্রমণে অন্তরের সঙ্গে এই একটা চিরন্তন রফা করিয়া মানুষ চরিতার্থতার তৃপ্তি চায়।

সন্ধ্যাবেলায় "তাজ"
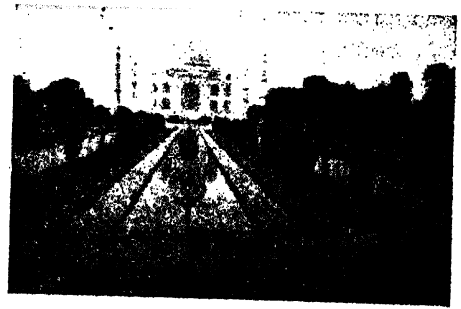
অথবা, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, তাহার সেইরূপ পূজা। অন্তরের মধ্যে যিনি লুকাইয়া হাসিতেছেন, তাঁহাকে যে যতখানি শক্ত করিয়া ধরিবে, ততখানিই ভাবিতে পারিবে—তাহার কমিবেশি হওয়ার তো কোনই উপায় নাই। হাজারকরা নয় শত নিরানব্বই জন আমরা ছুটি নূতন বহিরঙ্গ দর্শনের অপরিতৃপ্ত কৌতূহল মিটাইতে। নতুবা অমৃতসরের সুবর্ণ-মন্দিরে গ্রন্থসাহেবের সুস্পষ্ট পরিচয়, কি নানকের প্রকৃত পরিচয় লওয়ার জন্য কে কতখানি গা করিতেছে ? অথচ, হেন নর নাই, হেন নারী নাই যে সুবৃহৎ পুষ্করিণীতে সঞ্চরণশীল অগণিত মহাকায় "মহাশোল" মৎস্যের স্বচ্ছন্দ গতি-লীলা দেখিয়া অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া স্থির হইয়া না দাঁড়াইয়া আছে। অথবা, ইহাও তো সেই লীলাময়েরই লীলা।

যাঁহার উদ্দেশে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াই পরম তৃপ্তি, তাঁহার প্রীত্যর্থে কে কতখানি ত্যাগস্বীকার করিতে পারি, সেই ত্যাগেরই মহিমময় রূপ তো মন্দিরের ঐশ্বর্য্যসম্ভারে।

দর্শকের দল প্রখ্যাত মন্দির হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। হিন্দুর বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির এ শহরের এই লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দির। কিন্তু সুবর্ণ-মন্দিরের কলা-চাতুর্য্য, মাধুর্য্য-গাম্ভীর্য্য, বৈভব-গৌরব দর্শন করিয়া আর কি এখানে তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায়? তরুণ-তরুণীরা বাহির হইতে পারিলেই যেন বাঁচেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এক এক কক্ষের সমক্ষে দাঁড়াইয়া দেব-বিগ্রহের স্বরূপ শুনিতে শুনিতেই ললাটে যুক্ত-করের স্পর্শ দান করিয়া বিদায় মাগিতেছেন।

ইহার পরই পৌঁছানো গেল জালিয়ানওয়ালাবাগে। সরু-গলিপথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। ইংরেজের অপকীর্ত্তির সুস্পষ্ট স্মৃতি-চিহ্ন দেখিয়া বক্ষের স্পন্দন যেন সহসা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল। হঠাৎ যেন এক ঝলক রক্ত মাথায় উঠিয়া গেল। জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস পড়িয়া এ জাতীয় গভীর বেদনাবোধ হয় নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিয়া আজ যে অনুভূতি হইল, তাহা সুতীব্র। জালিয়ানওয়ালা নামে এক পাঞ্জাবীর বাগান ছিল এটি। ক্রমে মিউনিসিপ্যালিটি উহা ক্রয় করে। ইহা কিন্তু কুখ্যাতিলাভ করিয়াছে ইংরেজের অপকীর্ত্তিকে বক্ষে ধারণ করিয়া। ঘটনাটির চিহ্ন বাগানের বাড়ী এবং হলের দেওয়ালে, উত্তর দিকের দোতলা-তেতলা বাড়ীর দেওয়ালে, উত্তরদিকের এক বিশালকায় কূপে সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। দেওয়ালে সেই কবেকার গুলির দাগ আজও স্পষ্ট। গুলির চোটে কোন দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় কোম্পানী-বাগান দেখা গেল—ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাগান। দেশবাসীর প্রমোদকল্পে রচিত, ক্রেতাদের উদ্যান অবশ্যই নয়। রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোম্পানীই বা আজ কোথায়? রজনীতে উজ্জ্বল আলোকে সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিল। কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বলা চলে। ইহার কৃত্রিম শোভাসজ্জা রক্ষাকল্পে সরকার সমানেই যত্নবান রহিয়াছেন বোঝা গেল।

আজ শারদীয়া ষষ্ঠী। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে পূজার অঙ্গনে এতক্ষণ দেবী দুর্গার আমন্ত্রণ অধিবাসের মন্ত্রধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। আর আমরা কয়েকজন তীর্থ-সহচরে মিলিয়া মেঘাচ্ছন্ন শারদ শুক্লা ষষ্ঠীর অর্দ্ধস্পষ্ট কৌমুদীতে অমৃতসরের কোম্পানীর বাগান পিছনে ফেলিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

৪

১৫ই অক্টোবর। শারদীয়া সপ্তমীর সন্ধ্যা। সপ্তমীর চাঁদ মেঘে ঢাকা। পাঠানকোটের রাজপথ প্রশস্তও নয়—পরিচ্ছন্নও নয়। অসময়ে শহর দেখার উদ্দেশ্যই বা কতটুকু সাধিত হইবে? বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের ও আমার মাথার টুপি কেনা গেল। কাশ্মীরের শীতে শিরস্ত্রাণ। কেহ বলিতেছে, বরফ পড়িতেছে—প্রচণ্ড শীত পড়িয়া গিয়াছে। এত বিলম্বে কেন বাহির হইলেন? শুনিয়া হৃৎপিণ্ডের রক্ত চঞ্চল হইতেছে। তৃতীয় সঙ্গী কৃতবিদ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত সামন্ত, মিতভাষী সুরসিক। পাঠানকোটের রাস্তায় রাস্তায় সুস্মিত মিত ভাষণে টুপি কেনার ব্যাপারকে রসের আসরে পরিণত করিলেন। একটি কথা তাঁহার মনে আছে—পাঠানকোটের টুপিতেও যদি কাশ্মীরের শীত না যায়, তবে কলিকাতার শীতবস্ত্র আনা ত একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল।

বন্ধুবর সামন্ত এক কক্ষের সঙ্গী এই চার দিন। ইহারই মধ্যে ইহার অন্তরের পবিত্রতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। আলাপে-আলোচনায় ইহারই মধ্যে দেখিয়াছি, ইহার স্বভাব-কোমল মানসের পটে সুদীর্ঘকালের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা একটা দিব্য ভাবের রস-মনোহর ছবি অঙ্কন করিয়াছে। দূর দেশে যাত্রার পথে এহেন সঙ্গীকে একই কক্ষে এত অন্তরঙ্গ ভাবে পাওয়া সৌভাগ্য বিবেচনা করিয়াছি। পার্শ্বের কক্ষেই কালীবাবু আছেন সপরিবারে। স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা সঙ্গে আছেন। কালীবাবু ব্যবসায়ী মানুষ —কিন্তু আচরণে ব্যবসাদার নহেন। পাশের কক্ষ হইতে অহরহ আমাদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে নিরত। অথচ কি স্পষ্টবক্তা। দিব্যি আরামে চলিয়াছি। এতগুলি লোকের সংসার। দ্বিতীয় শ্রেণীর বগী—কুণ্ডুবাবুর তীর্থযাত্রী স্পেশাল ট্রেন। পরিচালকদের পরি-চালনায় ত্রুটি নাই। বরং বিস্মিত হইতে হয়—গাড়ীর মধ্যে এমন পঞ্চোপচারের প্রাতরাশ, দশোপচারের মধ্যাহ্ন আর ষোড়শোপচারে নৈশ ভোজ্যের আয়োজন করে কি করিয়া?

কাহার নিকট কতটা ঋণী হইতেছি, তাহা ব্যক্ত করার সাধ্য নাই। স্বল্প কথায় সর্ব্বজনের ঋণ স্বীকার করিয়া যতটুকু ঋণমুক্তি লাভ করিতে পারি। বৃহৎ সংসারে ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ভুল বোঝাবুঝি আছেই, আমাদের মধ্যেও যে তাহা না ঘটিয়াছে, তেমন নয়। তবু বলিব—সকলের মধ্যে এমন একটা সৌভ্রাত্র, এমন একটা সহানু-ভূতি, এমন সমবেদনা—এমন একটা সহায়তাদানের ভাব সজাগ ছিল যে, উহা সুদূরের যাত্রাপথে—তথা পুনর্যাত্রাপথে মহামূল্য পাথেয় রূপে গণ্য হইয়াছে।

এই তিন দিনের মধ্যেই নায়ক ফকিরচন্দ্রের বন্ধু কালোবাবু, টি-টি-আই শ্যামবাবু (ইহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত), মেদিনী-পুরের রেণুমাতা তাঁহার দুই কন্যাসহ এক পরিবারভুক্ত গোষ্ঠীর আচরণে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। আসানসোলে এই গাড়ীতে উঠিয়াই সৌম্যদর্শন সুবোধবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপে আকৃষ্ট হই। তীর্থে তীর্থে তিনি নিজের ক্যামেরায় ছবি তুলিয়াছেন আর জনে জনে উপহার দিয়াছেন।

সঙ্গীদের বেশীর ভাগ পনেরই তারিখের পূর্ব্বাহ্ণেই জালামুখী তীর্থে যাত্রা করিয়াছেন বাসযোগে—রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেখা নাই। ১৬ই প্রভাতে সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন। সারা রাত্রি ব্যাপিয়া যে দুর্ভোগ ভুগিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করিতে প্রত্যেকেই

ব্যস্ত। একজন নাকি হারাইয়া গিয়াছিলেন, তাই ফিরিতে বিলম্ব—আর সমস্ত রাত্রি বেঘোরে বেজায় শীতে শোচনীয় অবস্থা। শীতের দুঃসহ ক্লেশ সকলকেই ভোগ করিতে হইয়াছে। বিছানা-পত্র ত সঙ্গে লইয়া যান নাই। জগন্মাতার অন্ত মূর্ত্তি জ্বালামুখী—প্রদীপের শিখারূপে পার্ব্বত্য মন্দিরে নিজের প্রভা বিস্তার করিতেছেন—বলিতে বলিতে সবিতাদি যেন ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

সুবর্ণমন্দির, অমৃতসর

ইহারই সেখানে ক্লেশ হইয়াছে বেশী। মুখে-চোখে শ্রান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট—অথচ, অন্তরের আনন্দ-হর্ষ যেন উপচাইয়া পড়িতে চাহিতেছে সেই মুখে-চোখেই। আশ্চর্য্য এই স্ত্রীলোকটি। দেহ-ভার বহনের ক্ষমতা নাই, এদিকে সুদূর তীর্থে বাহির হইয়াছেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিতে কেহ সঙ্গে নাই। পতি যে তাঁহার কোন প্রাণে একাকিনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, ভাবিতেও রোমাঞ্চ হয়। অঙ্গের স্থূলতায় সবিতাদি একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ—ট্রেন কিংবা বাস হইতে নামিবার সময়ে তাঁহার পা রাখিবার জন্ত একটি টুল,কিংবা চৌকি—অভাবে বাক্স পাতিয়া দিতে হইতেছে, নতুবা কাঁপিয়া অস্থির। কিন্তু এই নামার সময়েই তাঁহার যত হৃৎকম্প। দূর পথের গতি-বিধিতে কিন্তু তাঁহার সাহস আর শক্তি দেখিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। সবিতাদির এই দেহের মধ্যে যে স্নেহপ্রবণ সুকোমল হৃদয়টি লুকাইয়া আছে, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াই আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। অথচ, তাঁহার কতটুকুই বা সহায়তা করিতে পারিয়াছি।

৫

১৬ই অক্টোবর মহাষ্টমী—শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর ভট্টাচার্য্যের উপবাস। জগন্মাতার পূজা গাড়ীর কামরাতেই। ভক্তিসহকারে চণ্ডীপাঠ শুনিতে শুনিতে যেন এই দেশের ঋষিদের মুগ্ধ চিন্তার রাজ্যে গিয়া উপনীত হইলাম। কাশ্মীরের যাত্রাপথে আনুষঙ্গিক এই মহামূল্য ফললাভের কথা জীবনে বিস্মৃত হইবার নয়।

অপরাহ্নে রেলের কামরা ছাড়িয়া শ্রীনগরের বাস ধরিলাম। এবার জম্মু দিয়া শ্রীনগরে যাত্রা। আগে রাওলপিণ্ডি দিয়া শ্রীনগরে যাওয়া যাইত। সে পথ ছিল সোজা। দেশ-বিভাগের ফলে সে পথ এখন বন্ধ হইয়াছে। এখন জম্মু হইয়া দীর্ঘতর পার্ব্বত্য পথে শ্রীনগর যাইতে হয়। জম্মু হইতে শ্রীনগরের পার্ব্বত্য পথ নব-নির্ম্মিত। ভারত সরকারের সহযোগিতায় জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজা এই পথ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বলা বাহুল্য—এই পথের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা জম্মু-কাশ্মীর সরকারের হাতে।

এই পথে পাঠানকোট হইতে শ্রীনগর ২৬৬ মাইল। পার্ব্বত্য পথ জম্মু হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে 'বানিহাল পাস' পর্য্যন্ত। বানিহাল নয় হাজার ফুট উঁচু। সেখান হইতে ক্রমশঃ তিন হাজার ফুট নিম্নে অবতরণ করিয়া কাশ্মীর উপত্যকায় পৌঁছিতে হয়—কাশ্মীর উপত্যকা ছয় হাজার ফুট উঁচুতে এক বিশাল সমতল ভূমি।

পাঠানকোট হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত বাসের ভাড়া সাধারণতঃ ২৭৲ টাকা। কাজেই যাতায়াতে ৫৪৲ টাকা। এবার পূজার আগে কিছুকাল যাবৎ শ্রীনগরের পণ্যসম্ভারের বিক্রয় কম হওয়ায় জম্মু কাশ্মীর সরকার সমস্ত প্রদেশ হইতেই ভ্রমণকারীদের আহ্বান করিয়াছেন, যাহাতে বিভিন্ন পণ্যের বিক্রয় বেশী হয়—ঘাটতি পূরণ হইয়া যায়। পাঠানকোট পর্য্যন্ত রেলের ভাড়া (ভারতের যে-কোন

অমৃতসরের সুবর্ণ-মন্দিরের একাংশ

স্থল হইতেই) কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঠানকোট হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত বাসের ভাড়া ৫৪৲ টাকা স্থলে মাত্র ২৭৲ টাকা। তাই এবার চতুর্দ্দিক হইতেই কাশ্মীরে যাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী। এবার যত বাঙালী কাশ্মীরে আসিয়াছেন, বা যত জিনিষ-পত্র কিনিয়াছেন, আগেকার সংখ্যা কিংবা পরিমাণের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না—এবার যাহাকে বলে 'রেকর্ড'। এ অক্টোবরে তাই হঠাৎ শ্রীনগরের বাজারে জিনিষপত্রের দাম দ্বিগুণ। এমনি ত কোন জিনিষ দর না করিয়া সেখানে কিনিবার উপায় নাই, তার উপর ক্রেতার ভিড় হইলে ত কথাই নাই। আর সেই ভিড়ই হইয়াছে এবার বেশী।

পাঠানকোট হইতে ভি. লুথ্র কোম্পানীর দুইটি বাসে আমরা সমস্ত যাত্রী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া শ্রীনগরে যাত্রা করিয়াছি। একদল কিছুক্ষণ আগে, অবশিষ্ট কয়েকজন পিছনে। পিছনের দলে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য, ডক্টর সামন্ত, কালীবাবু, শ্যামবাবু আর আমি কাছাকাছি আছি। একজন পাচক ও একজন ভৃত্য সঙ্গে। আমাদের বাস জম্মুতে পৌছিতে রাত্রি সাড়ে আটটা হইল। কাজেই জম্মুতেই অবস্থিতি করিতে হইল। বাস অবশ্য এই পার্ব্বত্য পথে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত চলিবার অধিকার পাইয়াছে। কিন্তু আজ ইহার পর রাত্রি বারোটার মধ্যে কোন বাসযোগ্য স্থলে 'বাস' পৌছিবে না—জম্মুর মত স্থানে ত নহেই। তাই রাজনগরের আশ্রয়ে আমাদের রাত্রিবাস স্থির হইয়া গেল। রাত্রিবাসের কথা বলিবার আগে জম্মু পর্য্যন্ত পথের পরিচয় একটু দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

পাঠানকোট হইতে দুই-চার মাইল পশ্চিমে আসিয়া উত্তরমুখী হইলাম। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ। দুই পাশে শরবন। দক্ষিণে এবং কোথাও কোথাও বামেও আম্রকানন ভূ-প্রকৃতিকে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। শরতের অপরাহ্নের স্নিগ্ধ, মায়াময় শ্যামলিমায় শ্যামল শুভ্র শরবনের চিক্কণতা পল্লবঘন আম্রকাননের স্নিগ্ধতার পাশে পাশে এক সগোত্র মিশ্র রূপ-চিত্রের নয়নমনোহর যাদু রচনা করিয়াছে। এই যাদুর উপর আর এক নয়নভুলানো ইন্দ্রজাল দেখিলাম দক্ষিণে দক্ষিণবাহী খালে। ইরাবতীর জল খাল কাটিয়া দক্ষিণে ভারত-ভূমিতে চালনা করা হইতেছে। খালের মধ্যে স্রোতের গতি—ভরা নদীর স্বচ্ছ সলিলে নৃত্যশীল তরঙ্গের বুদ্বুদ-চিত্রিত ছবি নয়ন-সমক্ষে ধরিল—সুগভীর স্রোতের জল শ্যামল স্বচ্ছ—তাহাতে পুঞ্জীভূত শ্বেত বুদ্বুদের রাশীকৃত রজতশুভ্র রূপদ্যুতি নৃত্য করিতেছে—'ছলছল কলকল টলটল' তরঙ্গেই স্রোত নিম্নে চলিয়াছে। বেলা চারিটায় লখনপুরে পৌছিলাম। ভারত-রাষ্ট্রের সীমারেখা। এখানে আমাদের ছাড়পত্র অনুসারে মালপত্র দেখাইয়া ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিতে হইবে। সে পালা সারা হইল। আমাদের দুই দলের দুইটি বাসই এখানে মিলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ফকির কুণ্ডু অল্প সময়ের মধ্যেই দুই ভাগের দুর্ভোগের পালা সারিয়া ফেলিলেন, আমাদের গায়ে এতটুকুও আঁচড় লাগিল না। আগের বাসটি আগে ছাড়িয়া দিল। সেটি থামিবে গিয়া 'কুড' নামক পার্ব্বত্য বসতিতে। আমাদেরটি থামিবে জম্মুতে।

লখনপুর ছাড়িয়া বাস ইরাবতীর পুলে উঠিল। প্রকৃতপক্ষে এই ইরাবতীই অধুনাতন ভারতের যথার্থ সীমারেখা। ইহা পার হইলেই জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য। প্রশস্ত পার্ব্বত্য নদী ইরাবতী। ইহারই জল পূর্ব্বোক্ত ঐ খাল দিয়া চালনা করা হইতেছে। এখানে নদীকে দেখিলাম শুষ্ক। নদী পার হইয়া বঙ্গজননীর সুসন্তান শ্যামাপ্রসাদের ধৃত হওয়ার স্থান প্রত্যক্ষ করিলাম। বুকের ভিতরটা সহসা যেন হু হু করিয়া উঠিল।

বেলা চারটায় পাঠানকোট ছাড়িয়াছি। রাত্রি সাড়ে আটটায় জম্মু পৌছানো গেল। পাঠানকোট হইতে জম্মু পর্য্যন্ত এই রাস্তাটি সমতলের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জম্মু শহর সমতলে নহে, পার্ব্বত্য উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সুরম্য স্বাস্থ্যপ্রদ রাজ-নিবাস। রাস্তার পাশে এক হল-ওয়ালা বিপণিশ্রেণীর একটি পাঞ্জাবী হোটেলে ডাল-রুটি খাইয়া পাশেরই এক এক কামরার ভাড়াটিয়া অতিথি-নিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। শ্যামবাবু পরদিনের যাত্রার লগ্ন স্থির করিতে বহু ছুটাছুটি করিলেন। ভি লুথ্রের অন্য গাড়ীতে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। সে গাড়ী কখন, কি সর্ত্তে বাহির হইবে জানা যাইতেছে না। অধিনায়ক সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তবু আমরা ফাঁপরে পড়িলাম। সকলেরই দুশ্চিন্তা। একটি করিয়া দড়ির খাটিয়াতে জনে জনে শয্যা বিস্তার করা গেল। কিন্তু সুনিদ্রার ক্ষেত্রই নয়। বাড়ী যেন পোড়োবাড়ী, বিশেষ পরিচ্ছন্ন ত নয়ই প্রশস্তও নয়। উচ্চ ভূমিতে হইলেও চারিদিকে চালুতে, নিম্নে জঞ্জাল—জঙ্গল প্রচুর, কাজেই মশকাদির অভাব নাই। তাহার উপর মহাষ্টমী বলিয়াই নাকি পাশেরই শিবমন্দিরে অষ্টপ্রহর তুলসী-রামায়ণ পাঠ হইতেছে। মিষ্ট কণ্ঠ কানে ভাল লাগিলেও, নিদ্রার ব্যাঘাতের বহু কারণের উপর এটিও একটি অতিরিক্ত কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাহত নিদ্রার রাত্রি সঙ্গসুখে কাটিল বলিয়া অনিদ্রার অস্বস্তি তেমন অনুভব করা গেল না।

উষায় পার্ব্বত্য নগরীর আলোক-অন্ধকারে মিশ্রিত অর্দ্ধপরিস্ফুট শ্রী মনোহর লাগিল। প্রভাতের আলোকে সুরম্য প্রাসাদ, সুদৃশ্য মন্দির, নয়নাভিরাম কানন, দূরে সুউচ্চ তুষারশুভ্র পর্ব্বতশিখরশ্রেণীর আকাশস্পর্শী বেষ্টন, নগরীর খণ্ড খণ্ড উচ্চ ভূমি, উঁচু-নীচু পরিচ্ছন্ন রাজপথ—সব মিলিয়া জম্মু চোখের উপর অপূর্ব্ব নূতন রূপে প্রতিভাত হইল। জম্মু প্রশস্ত রাজ্য। তাহার রাজ-নিকেতন জম্মু নগরী। জম্মুর মহারাজা গুলাব সিং কাশ্মীর ক্রয় করিয়া জম্মু ও কাশ্মীর উভয় রাজ্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। এখন বহু ঝঞ্ঝাবাত্যা অতিক্রম করিয়া জম্মু, কাশ্মীর এক সঙ্গে যুক্ত হইয়া 'জম্মু-কাশ্মীর' নামে যুক্ত সরকারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। শীতকালে কাশ্মীরে যখন অত্যধিক তুষারপাত হয়, তখন জম্মু শহরেই মহারাজা সপার্ষদ অবস্থান করেন। জম্মু শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য রঘুনাথজীর মন্দির আর রাজপ্রাসাদ। এখন আর দেখা হইল না, ফিরিবার পথে দেখা যাইবে। বেলা এগারটায় নয় জন আরোহীর বাস ছাড়িল। আমরা ছিলাম সাত জন। দুই জন বাহিরের আরোহী উঠিলেন।

৬

পার্ব্বত্য পথে এই সব বাসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক যাত্রী কোন-ক্রমেই লওয়া হয় না, লওয়া চলে না। এ পথে বাস চালনা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। এই সব বাসের চালকের দক্ষতা একান্ত প্রশংসনীয়। বেশীর ভাগ পঞ্জাবের অধিবাসীই এখানে বাসচালকের কাজ গ্রহণ করে। কি তাহাদের কুশলতা! অতি অল্প ব্যবধানে

দিক্ হইতে দিগন্তরে ঘূর্ণ্যমান বাস চড়াই-উৎরাইয়ে দ্রুতগতিতে ছুটিতেছে, অথচ চালক একটা হর্নের শব্দ করে না। বিপরীত দিক হইতে সমানে বাস ছুটিয়া আসিতেছে, ঘন ঘন মোড় ফিরিতে হইতেছে, তবু চালক যেন নির্ব্বিকার। অতি উর্দ্ধে চলিবার সময় নিম্নে দেখা যায় বিপরীতমুখী বা একই দিক হইতে আগত বাসের গতি—মনে হয় ধীরে চলিতেছে, পর্ব্বতের গাত্রে অসংখ্য রাস্তা, উপর হইতে যেন পর্ব্বতের সুষমাসুন্দর দেহে কণ্ঠের হারাবলী বলিয়া মনে হয়। অতি উর্দ্ধে বাসে ভ্রমণকালে যেমন একটা বিস্ময়ের আনন্দ সমস্ত অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া যায়, তেমনই অন্তরে একটা ভয়ের শিহরণও জাগিয়া উঠে।—স্বর্গের দোলায় দোদুল্যমান হওয়ার আনন্দ এক দিকে, আর চালকের যৎসামান্য অনবধানতায়, পতনের আশঙ্কাও

ডাল হ্রদ, কাশ্মীর

অন্য দিকে। আঁকাবাঁকা বিঘ্নসঙ্কুল এই পার্ব্বত্যপথে চালক এতটুকু অসাবধান হইলেই, হাজার হাজার ফুট নিম্নে সমস্ত যাত্রী লইয়া বাসের চুরমার হওয়ার কথা। কিন্তু সেরূপ দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না।

রাত্রি ন'টায় পার্ব্বত্য বসতি "বানিহালে" অবস্থান করিতে হইল। শীতের প্রকোপ এ যাত্রায় এই প্রথম অনুভব করা গেল। পার্শ্বভাগে পার্ব্বত্য তটিনী চন্দ্রভাগা বহিয়া চলিয়াছে। সুগভীর স্রোত তাহার। অপরাহ্নের রৌদ্রছায়ার খেলায় চন্দ্রভাগার বঙ্কিম গতি দেখিয়া অভিনব রূপমোহে অভিভূত হইয়াছি। এখন দেখিতেছি—"বানিহালে"র উচ্চভূমির দ্বিতল বসতিগৃহের দ্বিতীয় তল হইতে তাহার উষার মনোহারিত্ব। এই বিপুল সৃষ্টিতে সমুদ্রের বিশালতা দৃষ্টিকে করে সম্মুখে প্রসারিত, তুঙ্গ পর্ব্বতের উচ্চতা করে উর্দ্ধে উত্তোলিত, আর উচ্চ পার্ব্বত্য পথে বঙ্কিম স্রোতস্বতীর পাশ দিয়া চলিতে চলিতে মনে হয়—সুন্দরের সঙ্গে নয়নের আনন্দের সহযাত্রা। চন্দ্রভাগার পাশ দিয়া অগ্রসর হইবার সময় তাহার পুলক অনুভব করিয়াছি। দ্বিতলে উষার শৈত্যে কম্বলাবৃত হইয়া ঋষিরের মত বসিয়া থাকিলেও পার্শ্ববর্ত্তিনী স্বচ্ছ-প্রবাহা ঐ তটিনীর সঙ্গে শান্ত শীতল পরিবেশে নয়নের যেন প্রীতি-মধুর সহযাত্রা অনুভব করিতে লাগিলাম।

শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া ভোজনগৃহে গিয়া প্রাতঃরাশ সারা গেল। ওদিকে নয়নপাত করিয়া দেখি—পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় সূর্য্যের কিরণ হরিতের উপর গলিত স্বর্ণের আভরণ বিস্তার করিয়াছে। যাত্রীরা কিন্তু এবার চঞ্চল হইয়াছে। আর এখানে নয়—'আগে চল্ আগে চল্ ভাই'। চালক এখনও প্রস্তুত হইতে পারে নাই, কিন্তু বিলম্বই বা তার কতটুকু! দু'দশ মিনিট মাত্র। ধৈর্য্যহীনতার এই সঙ্কণে মানবের শোভনতা—শালীনতার চিহ্ন যেন কোথায় লুপ্ত হইয়া যায়। ড্রাইভার নীরবে ধীর স্থির গতিতে বাসে উঠিয়া নির্ব্বাক কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া বাস ছাড়ার সঙ্কেতধ্বনি করিল। যাত্রীদলের কণ্ঠে তখন তুমুল আনন্দধ্বনি। বেলা এখন আটটা।

গিরিসঙ্কটের নাম বানিহাল। সাত শত ফুট দীর্ঘ প্রসিদ্ধ সুড়ঙ্গ-পথ পার হইলাম। গিরিসঙ্কটে অগ্রসর হইয়া অতি উচ্চে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সমান গতিবেগে অগ্রগমন আর অতি নিম্নে নিরীক্ষণে যুগপৎ এক অব্যক্ত আনন্দ ও আশঙ্কার বিচিত্র আলেখ্য মানসপটে চিত্রিত হইয়া উঠে। এই মানসচিত্রের প্রতিচ্ছবি ভাষার রেখায় বুঝি কোনক্রমেই সুস্পষ্ট হওয়ার নহে। নয় হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া আরোহীদের মুগ্ধ কণ্ঠে ভীষণ-সুন্দর দৃশ্য দর্শনের আনন্দ-

চশমশাহী

ধ্বনি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভয়ালের সুন্দর রূপই যেন এখানে মানসের অব্যক্ত আনন্দ রচনা করে। কখনও বামে, কখনও-বা দক্ষিণে দেখিতেছি উত্তুঙ্গ তুষারকিরীট গিরিমৌলি। অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে তুঙ্গতায় বেষ্টন করিয়া উত্তুঙ্গ ধরাধরকে যেন ধরণীর যথার্থ ধারকরূপে চিত্রে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। চিরস্মরণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সাদরে স্মরণের মণিকোঠায় সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম।

কোথায় শ্রীনগর এখনও অনুমানই করিতে পারিতেছি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতল ভূমিতে অবতরণ করিলাম। এইবার

কাশ্মীরের উপত্যকা সুরু হইল বুঝিলাম। এই ত এক নূতন অভিজ্ঞতা—বিচিত্র-দর্শন নবভূমি প্রত্যক্ষ করিলাম। বঙ্গভূমিরই অনুরূপ শ্যামল শস্যক্ষেত্রকে দুই পাশে রাখিয়া পীচঢালা সুপরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাজপথে যানটি আমাদের হু হু করিয়া চলিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে সরল সমুন্নত সফেদা বৃক্ষের সারি বরাবর সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছে। ইহারা যেন উপত্যকাভূমির গৌরবে উজ্জ্বল অঙ্গরক্ষী সাজিয়া আছে।

এযাবৎ পর্ব্বতগাত্রে দেখিয়া আসিতেছিলাম—ক্রমোন্নত পর্ব্বতের দেহেও সোনালি ফসলের চতুষ্কোণ ক্ষেত্রগুলি খাঁজ কাটা খাঁজ কাটা—ধান, গম তরকারির চাষ। সূর্য্যের সোনার কিরণে পক্ক শস্য ঝলমল করিতেছে। স্থানে স্থানে নির্ঝরিণীর জল আটকাইয়া চাষের ব্যবস্থা। গিরিগাত্র কত উর্ব্বর হইতে পারে, তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া সমতল ভূমিতে নামিয়াছি। নয় হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেখান হইতে তিন হাজার ফুট নামিলে এই কাশ্মীরের উপত্যকা। সমুদ্রতল হইতে ছয় হাজার ফুট উচ্চে এই যে আশী মাইল দীর্ঘ ও পঁচিশ মাইল প্রস্থ—অর্থাৎ, দুই হাজার বর্গমাইলের সুশ্যামল সমতল ভূমি, এই ত এক মহাবিস্ময়। শুধু এই একটি কারণেই ইহার "ভূস্বর্গ" নামের সার্থকতা অনেকখানি উপলব্ধি করিলাম। সফেদাবৃক্ষের সারির মধ্য দিয়া উভয় পার্শ্বে বঙ্গভূমির সমগোত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া চলিয়াছি। একেবারে বাংলা দেশ! কিন্তু এ কি ফসল? অতি ক্ষুদ্র হরিদ্ গুল্মের মস্তকে পাংশু পুষ্প সুশোভিত হইয়া বড় বড় চতুষ্কোণ ভূখণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। জাফরানের গাছ। বাংলা দেশের সিমগাছে যে রকমের ফুল হয়, অনেকটা সেই রঙের ফুল। গাছ কিন্তু অতি ছোট। ঐ ফুল হইতেই রক্তরাগ জাফরানের জন্ম বলিয়া শুনিলাম। কত আদরণীয় সামগ্রী—এক তোলার দাম চার টাকা। সেই ফুলে আলো জাফরাণের লীলাভূমি সন্দর্শন করিলাম—চোখ জুড়াইয়া গেল। ক্ষেত্রময় জাফরানের রং—ভূস্বর্গের সার্থক এক বর্ণসুষমায় নয়ন ভরিয়া গেল। অভিনব দর্শনে অন্তরলোক ভাবসৌন্দর্য্যে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

কাশ্মীর উপত্যকার শ্যামলাঞ্চলা ভূমির বক্ষে পপলার-শোভিত প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথে ত্রিশ-বত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীনগরে যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা বারোটা। আকাশে-বাতাসে আলো-ছায়ায় শীতের মধ্যাহ্নের প্রভাব সুপরিস্ফুট। টাঙ্গার ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম—শ্রীনগরের এমনকি শ্রী! ভূস্বর্গের রাজধানীর এমনকি রূপ-লাবণ্য!

সহসা অদূরে এক প্রকার মহীরুহের পত্রাবলীর বর্ণবৈভব চোখে পড়িল—পার্ব্বত্য পথেও স্থলে স্থলে দেখা গিয়াছে, তবে এমন শ্রেণীবদ্ধও নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠও নয়। এ যেন অভিনব বৃক্ষের অভিনব নন্দনবন। নাম নাকি চিনার। বঙ্গদেশের মহুয়াবৃক্ষের সঙ্গে ইহার কায়ার কতকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহার পত্রাবলীর বর্ণবৈচিত্র্যই সমধিক শোভা-সজ্জার নিলয়। ক্ষণে ক্ষণে ইহাদের বর্ণের পরিবর্ত্তন নয়নগোচর হয়। তবে, স্বর্ণবর্ণ আর ঈষৎ লোহিতের মিশ্রণে অহরহ ইহাদের অপরূপ রূপমাধুর্য্য; বিশ্বে উহার তুলনা আছে কিনা জানি না, কিন্তু পত্রের এ সৌন্দর্য্য আর কোথাও চোখে পড়ে নাই কোনদিন।

আমাদের বাসও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "চিনারবাগে"। চিনারের বাগান। সারি সারি মহাকায় মহীরুহ বর্ণ সজ্জায় বরবপু আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অদূরেই "ডাল হ্রদের ফটক। ফটকের রশি দুই দক্ষিণে—অনতিপরিসর অগভীর পয়োবিস্তারী খালের উপর আমাদের গৃহ-তরী নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। গৃহ-তরীর নাম জেসমিন। ইহাতেই শ্যামবাবু, বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য দুইটি কন্যাসহ শ্রীমতী বেণুবালা, সবিতা দিদি, স-সন্তান দাশবাবু আর আমি। বৈঠক গৃহসহ পাঁচ-পাঁচটি পৃথক কক্ষ এই নৌ-গৃহে। এইরূপ চারিটি নৌগৃহে আমাদের সমগ্র দল বিভক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ বাস সুরু করিল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

আচার্য যোগেশচন্দ্র

শ্রীসুখময় সরকার

নয় বৎসর পূর্বের কথা। আমি তখন বাঁকুড়া কলেজের ছাত্র। একদা এক প্রবীণ অধ্যাপক আমায় বলিলেন, "তুমি যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয়কে জান?" আমি বলিলাম, "নাম শুনেছি, আর অনেকদিন আগে একবার দেখেছি—যখন রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় এসেছিলেন, তখন তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন।"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "এখন তাঁর বয়স হয়েছে; নিজে কিছু লিখতে পারেন না। প্রবন্ধ লিখবার জন্য একজন অনুলেখক দরকার। আমাকে একটি ছেলে যোগাড় করে দিতে বলেছেন। যদি ইচ্ছা কর, শীঘ্র একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।"

আমার এক সতীর্থ ইতিপূর্বে কিছুদিন বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনুলেখকের কাজ করিয়াছিল, কাজটা সহজ ছিল না বলিয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। বাঁকুড়া কলেজের পশ্চিমে দুই-তিন মিনিট হাঁটিয়া গেলেই তাঁহার স্বস্তিকাঙ্কিত দ্বিতল আবাস-গৃহ। বাড়ীটির চারিদিক তরুলতায় আবেষ্টিত। দুইটি উচ্চ ইউক্যালিপটাস গাছ প্রবেশ-দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বাড়ীটির গাম্ভীর্য বর্ধিত করিতেছে। শহরের কোলাহল এখানে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রবেশ-দ্বারের দুইটি অনুচ্চ স্তম্ভের উপর ভূতলের সহিত প্রায় ২৩° ডিগ্রী কোণ করিয়া নির্মিত দুইটি শঙ্কু। প্রথমে ইহাদের প্রয়োজন বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিয়াছি সেগুলি সূর্যঘড়ি। উহাদের সাহায্যে স্থানীয় কাল নির্ণীত হয়, মধ্য-দিবায় শঙ্কুর ছায়া থাকে না। গৃহটির প্রাচীর-গাত্রে দৃষ্টি পড়িল। একটি চতুষ্কোণ বেষ্টনীর মধ্যে খোদিত আছে:

পূর্বালিন্দং গৃহং যস্মাৎ স্বস্তিকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
স্বস্ত্যর্থং স্বস্তিকাঙ্ক্ষ স্বস্তিকাখ্যং কৃতং ততঃ॥
শকগতে ১৮৪৮

বারান্দায় উঠিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত একটি অপরূপ সূর্যমূর্তি। পরে শুনিয়াছি, ইহা কোতুলপুরের নিকটে এক গ্রামে পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে পাওয়া গিয়াছিল।

চতুর্দিকের পরিবেশ স্বভাবতঃই একটা মানসিক পরিবর্তন ঘটাইয়া মনকে বিদ্যানিধি মহাশয়ের দর্শন লাভের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। সতীর্থ কপাটে টোকা মারিতেই ভিতর হইতে একটু সাড়া পাওয়া গেল। এক মিনিট পরে স্বয়ং বিদ্যানিধি মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন। বার্ধক্য-কৃশ, আকুঞ্চ-দেহ, শিথিলচর্ম, পলিত-কেশ শ্মশ্রু, প্রসন্নদৃষ্টি যেন এক ঋষিমূর্তি। দেখিলেই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। শীতের বৈকাল। হিমানী-পাত আরম্ভ হইয়াছে। জরাক্রান্ত দেহকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এক অদ্ভুত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন। পুরাতন পশমী পেণ্টুলনের উপর মোটা তসরের ধুতি, পায়ে মোজা ও শান্তিনিকেতনের নাগরা, ঊর্ধ্বাঙ্গে পর পর দুইটি কি তিনটি চাদর।
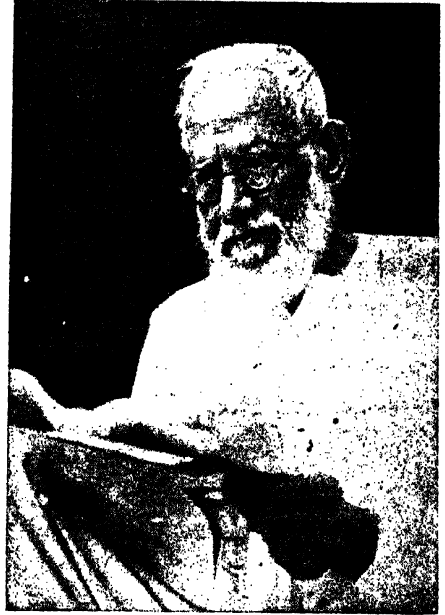
আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়

আমরা প্রণাম করিতেই বলিলেন, "কে?"

আমার সতীর্থ খুব জোর গলায় সংক্ষেপে আমার পরিচয় এবং আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলে তিনি বলিলেন, "বেশ বেশ! দেখি তোমার খাতাটা।"

আমার হাতে একটা খাতা ছিল। তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার জননীর লিখিত গীতার কয়েকটি শ্লোক ছিল। অত্যন্ত মোটা লেনসের চশমার কাছে খাতাটি ধরিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, "এ কার লেখা?"

"মায়ের।"

"মায়ের ? তোমার মামাবাড়ী কোথায় ?"

"বেলেতোড়ে।"

"বটে ! বিশ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের গ্রামে ? তুমিও দেখছি পণ্ডিতার পুত্র।" এই বলিয়া তিনি খাতার আর একটা পাতা উলটাইয়া আমার হাতের লেখা দেখিলেন এবং বলিলেন. "তোমার হাতের লেখাটি ত চমৎকার। কিন্তু গু, শু, ঙ—এ সব পুঁটলি দিয়ে লিখেছ কেন ? তবে দেখছি, তুমি রেফ-যুক্ত দ্বিত্ব বর্জন করেছ। পারবে, তুমি পারবে। তোমার বানান ভুল হয় ?"

"না।"

"আচ্ছা। তা হলে কাল থেকে কলেজ ছুটি হলেই এখানে চলে আসবে। গায়ে চাদর দিয়ে আসবে। ফিরবার সময় ঠাণ্ডা পড়তে পারে।"

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমায় দেখিয়া বলিলেন, "বাঃ! ঠিক সময়ে এসেছ। ঐ যে আলমারিতে কতকগুলো ফাইল দেখছ ওর মধ্যে যেটার উপর লেখা আছে 'ভাষা ও সাহিত্য', সেইটা নিয়ে এস।" ফাইল আনিতে গিয়া দেখি, কোনটার উপর 'ভাষা ও সাহিত্য', কোনটার উপর 'উদ্ভিদবিদ্যা', কোনটার উপর 'শিল্প ও কলা', কোনটার উপর 'জ্যোতির্বিদ্যা', কোনটার উপর 'সমাজতত্ত্ব', আবার কোনটার উপর 'শিক্ষা-সংস্কার' লেখা রহিয়াছে। আর একটা বেশ মোটা ফাইলের উপর লেখা আছে 'চণ্ডীদাস'। তখন এসবের মর্ম কিছুই বুঝি নাই ; ধীরে ধীরে সমস্তই বুঝিয়াছিলাম।

প্রথম দিনেই তিনি আমায় একটা প্রবন্ধ লেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ভৃত্য গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, তিনি তামাক টানিতে টানিতে বলিয়া যান, আর আমি লিখিতে থাকি। প্রবন্ধের নাম 'জয়দেবের লবঙ্গাদি বসন্ত-পুষ্প'। লেখা শেষ হইলে 'প্রবাসী'তে পাঠানো হইল, প্রকাশিত হইল। কয়েকদিন পরে লেখা হইল 'জয়দেবের দুকুল'। তাহাও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইল।

একদিন হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ওদিকে কি দিয়ে ঝুড়ি তৈরী হয় ?"

আমি বলিলাম, "বাঁশ, বেত—"

"বেত !" তিনি বিস্মিত হইলেন। "বাকুড়া জেলায় বেত ! আচ্ছা, তুমি শনিবারে বাড়ী গিয়ে একটা বেত নিয়ে এস ত।" বেত আসিল। কিন্তু এ কি বেত ! কাঁটা নাই, বাঁশের মত পাতাও নাই। তিনি যেন মহা সমস্যায় পড়িলেন।

"দেখ ত অমরকোষ। হেমচন্দ্র দেখ। ভাবপ্রকাশ দেখ। বৈদ্যক-নিঘণ্টু দেখ।"

আলমারিতে স্তরে স্তরে বই সাজানো। সমস্ত বই খুঁজিয়া সিদ্ধান্ত হইল, বাঁকুড়ায় আমরা যাহাকে 'বেত' বলি, তাহাই 'বেতস' ; ইহা বেত্র নহে। বেতসের পর্যায় শব্দ অনেক আছে ; তন্মধ্যে বঞ্জুল, নিচুল, বানীর—এই তিনটি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, "তাই ত ! জয়দেবের 'মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জ', কালিদাসের 'বানীর-গৃহ', ভবভূতির 'নীরন্ধ্র-নীল-নিচুলানি' নিশ্চয় এই বেতস। লেখ, লেখ, একটা প্রবন্ধ লেখ। একটা নয়, দুটো। বাংলায় 'প্রবাসী'র জন্য, ইংরেজিতে 'মডার্ন রিভিয়ু'র জন্য।" প্রবন্ধ লেখা হইল। প্রবাসী ও 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হইল।

এইরূপে আমি কেবল যন্ত্রের মত তাঁহার প্রবন্ধ লিখিতে থাকি ; কিন্তু তাঁহার রচনার মূল্যও বুঝি না, আর তাঁহার প্রত্যেকটি রচনা যে মৌলিক গবেষণাপ্রসূত তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও ছিল না।

কিছুদিন পরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে স্যর যদুনাথ সরকার, সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস ও মনোজ বসু, পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিতে আসিলেন। নূতন চটিতে 'অপূর্ব কুটীরে'র সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভা হইল। সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাকে অশেষ সম্মানে এবং আচার্য উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। ডক্টর সুনীতি-কুমার প্রমুখ মনীষিগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-নির্গলিত বাণী পঠিত হইল। সেই দিন হইতে বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রকৃত পরিচয় ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল।

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই নানা বিদ্যায় তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। প্রথম প্রবন্ধগুলি রচনাকালে মনে হইত, তিনি উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। কিন্তু অল্পদিন পরে 'বাংলাভাষার প্রসার চিন্তা', 'বাংলা নবলিপি', 'ভারতের বিচার্য', 'কন্যাদের বিবাহ' ইত্যাদি প্রবন্ধের অনু-লিখন করিতে করিতে বুঝিলাম, তিনি ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রতত্ত্বেও ব্যুৎপন্ন। শারদীয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্য প্রথম বৎসর 'শারদোৎসব', পর বৎসর 'আচারের উৎপত্তি ও প্রয়োজন', ক্রমে ক্রমে 'বার মাসে তের পার্বণ', 'পুরাণে চন্দ্র', 'অগস্ত্যোপাখ্যান', 'রামোপাখ্যান' ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখিত হইল। আর মনে হইল, ইনি বৈদিক সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিদ্যায়ও পারঙ্গম। 'কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার' লিখিত হইলে বুঝিলাম, ইনি অসাধারণ শিক্ষাবিদ্। এইরূপে ধীরে ধীরে সকল

বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার দেখিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। প্রত্যহ নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়া একদিকে যেমন নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম, অন্য দিকে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া একপ্রকার অস্বস্তিও হইত। এক-একদিন রাত্রে নিদ্রা হইত না। অথবা তরল নিদ্রায় তাঁহাকেই স্বপ্ন দেখিতাম। পরে পরে বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণায়ক 'ধ্রুবতারা' ও 'রুদ্র' প্রবন্ধ লেখা হইল। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রচার্য তত্ত্ব বুঝিতে পারিলাম। প্রাণে স্বস্তি আসিল। বুঝিলাম, পুরীর পণ্ডিত-সভা তাঁহাকে যে 'বিদ্যানিধি' উপাধি দিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সার্থক।

পাশ্চাত্ত্য বিদ্বান্‌দের বিদ্বেষপ্রসূত মত খণ্ডন করিয়া তিনি উপজীব্য, ব্যাখ্যা ও গণিতফল—এই তিন উপায়ে অভ্রান্ত ভাবে ভারতকৃষ্টির কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। অখণ্ডনীয় জ্যোতিষিক প্রমাণদ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন, ঋগ্‌বেদ-সংহিতা খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ ৮০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয় এবং কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রী-পূ ১৪৪২ অব্দে সংঘটিত হয়। আমি আজন্ম হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি নিরতিশয় ভক্তিমান ; কিন্তু তাহা যেন কতকটা অন্ধের ভক্তি ছিল। আচার্য যোগেশচন্দ্রের সংসর্গে আসিয়া আমার ভক্তি অধিকতর দৃঢ়মূল হইয়াছে, কারণ ইহা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাঁহার প্রবন্ধের জন্য আমাকেই চিত্র লিখিতে হইত। কোন্ চিত্র কিরূপ হইবে, তাহা তিনি কম্পিত হস্তে একটা পেন্সিল দিয়া স্কেচ করিয়া দিতেন। যখন আঁকিতাম, তখন সকৌতুক প্রসন্ন নেত্রে লক্ষ্য করিতেন। জ্যোতিষিক প্রবন্ধের জন্য চিত্রে কোনও তারা (star) ছোট-বড় হইয়া গেলে খুঁত খুঁত করিতেন। মনের মত হইলে আনন্দে অধীর হইয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতেন। একদিন একটা চিত্র লিখিতেছি, আচার্যদেব পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময় সহসা সমস্ত ঘরখানা আরক্ত আলোকে ভরিয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওহে উর্বশী এসেছে, চল, চল, দেখে আসি। অনন্তকে* ডাক, গাড়ী নিয়ে আসুক।"

মোটরগাড়ীতে চড়িয়া উর্বশী দেখিতে চলিলাম। শহর ছাড়াইয়া অহল্যাবাঈ রোড্ চলিয়া গিয়াছে ; গাড়ী প্রায় দুই মিনিট ছুটিয়া বিস্তীর্ণ মাঠের ধারে উপস্থিত হইল। ভাদ্র মাসের বৈকাল, মাঠ জলে পূর্ণ। দূরে দূরে পলাশ, মহুয়া ও শালের বন। এক মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ জ্যোতিতে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছে। আচার্যদেব নির্নিমেষ নেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করিলেন। ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। পরদিন আমি আসিতেই বলিলেন, "দেখ, আলমারিতে একটা ফাইল আছে 'বৈদিক কৃষ্টি' ; তাতে একটা ছাপা প্রবন্ধ আছে 'উর্বশী'। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বের কর। একটু সংশোধন করে নাও।" উর্বশী প্রবন্ধ সংশোধিত হইল। উর্বশী কে, এখানে তাহার আলোচনা সম্ভবপর নহে। পরে এই প্রবন্ধটি 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

প্রথম পরিচয়ের দিনকয়েক পরে আমি তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার জন্ম কোন্ সালে ?" মৃদু হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন—

"সপ্তদশ গজপৃষ্ঠে ইন্দু অন্তরিত।
তুলাদণ্ডে বেদ লয়ে গুরু উপনীত।"

কিছু না বুঝিয়া আমি হাঁ করিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "বুঝলে না ? ১৭৮১ শকে ৪ঠা কার্ত্তিক, বৃহস্পতি-বারে আমার জন্ম।"*

আর একদিন বলিলাম, "আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন এক ভদ্রলোক আমায় বলেছিলেন, আপনি নাকি ব্রাহ্ম। সত্য কি ?"

তিনি বলিলেন, "কেন, সে লোকটির এমন ধারণা হবার কারণ কি ?"

"আমি জানি না। তবে অনুমান হয়, আপনার আমলের বহু মনীষীই—যেমন রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ, জগদীশচন্দ্র—ব্রাহ্ম ছিলেন ; এই জন্যই বোধ হয় তিনি আপনাকেও ব্রাহ্ম মনে করেছেন।"

"না, আমি ব্রাহ্ম নই। আমি হিন্দু, আমি শাক্ত। আমার পিতাও শাক্ত ছিলেন। আমার পূর্বপুরুষ রাজা রণজিৎ রায় ঘোর শাক্ত ছিলেন ; গভীর রাত্রে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে জপ করতেন। ভারত-ইতিহাসে গুর্জর-প্রতিহারদের কথা পড়েছ ত ? আমি তাদেরই বংশধর।"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "ব্রাহ্ম বলতে তোমরা কি বোঝ, কে জানে ? রামানন্দবাবু ত ছিলেন কুসংস্কারমুক্ত খাঁটি হিন্দু। তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বিজয়াদশমীর দিনে আমি তাঁকে সম্ভাষণ জানাতে যেতাম, তাতে তাঁর কি আনন্দ! তাঁর বিন্দুমাত্র হিন্দুবিদ্বেষ ছিল না। তিনি নিজেকে উচ্চ, অপরকে নীচ মনে করতেন না। এই উদারতার জন্য হিন্দুমহাসভা একবার তাঁকে সভাপতিত্বে বরণ করেছিলেন।"

যোগেশচন্দ্র শাক্ত, শক্তির উপাসক। কিন্তু কে এই শক্তি। তিনি কখনো তাঁহাকে 'জগদম্বা' কখনো 'রাণী

* অনন্তকুমার রায় আচার্যদেবের দ্বিতীয় পুত্র।

* সপ্তদশ=১৭, গজ=৮, ইন্দু=১। তুলা—কার্ত্তিকমাস, বেদ=৪, গুরু=বৃহস্পতিবার।

বিশ্বেশ্বরী' বলিতেন। 'রাণী বিশ্বেশ্বরী' পুস্তকে তিনি এই শক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, বিদ্যুৎপ্রভা, মহিমময়ী সেই নারী স্বচ্ছন্দে হরিপৃষ্ঠে বসিয়া আছেন। তাঁহার পাদাঙ্গুষ্ঠে দীর্ঘ রশ্মি, রশ্মির প্রান্তে কতকগুলা পিণ্ড বদ্ধ রহিয়াছে এবং তিনি বালিকার ন্যায়, সূত্রবদ্ধ লোষ্ট্রে ঘূর্ণনের ন্যায় সেই বিপুল পিণ্ডগুলা অঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন দ্বারা ঘুরাইতেছেন। তিনি কভু হসিত-বদনা, কভু ভীমা।......গৃহিণী যেমন যষ্টিদ্বারা দুগ্ধ আবর্তন করেন, এক বর্ষীয়সী দিগন্তব্যাপী 'নভস্ব' (Nebula) আবর্তিত করিতেছেন। ফেনপুঞ্জ বলয়াকারে ভ্রমণ করিতেছে, অধোগত উর্ধ্বগত হইতেছে, আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতেছে।...এক বালিকা অণুকে কন্দুক করিয়া উৎক্ষেপ করিতেছে, লুফিয়া ধরিতেছে। এক নয়, দুই নয়, শত নয়, কোটি নয়। আহা কি কান্তি! কি মুক্তাফলের লাবণ্য সর্বাঙ্গে মূর্ছিত হইতেছে! কি প্রসন্না! কি মুগ্ধা! কি অভিরামা! মনে হইতে লাগিল, কত কালের চেনা, জানা, হাতে মানুষ-করা আমার বিজয়া কন্যা ক্রীড়া করিতেছে।"

আচার্য যোগেশচন্দ্রের বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেই এই শক্তির কথা আসিয়াছে। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'তে যিনি "ওঁ ঐং বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্‌" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুত হইয়াছেন, ইনি সেই অনন্ত লীলাময়ী মহাশক্তি। দর্শন-ব্রহ্মা ও সাহিত্য-সাবিত্রী যোগেশচন্দ্রের হৃৎপদ্মাসনে সৃষ্টির ধ্যানে বিভোর হইয়া অঙ্গাঙ্গি ভাবে নিরন্তর বিরাজ করিতেন। বিজ্ঞান ছিল তাঁহাদের পাদপীঠ, কলা তাঁহাদের ছত্র-চামর এবং ভক্তি তাঁহাদের অঙ্গ সুরভি। যোগেশচন্দ্রের সকল বৈজ্ঞানিক রচনার মধ্যে জ্ঞানের পরমান্ন ভক্তির কর্পূরে সুবাসিত হইয়াছে। তিনি যেন তর্জনী উত্তোলন করিয়া পাঠককে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, "বিজ্ঞান শিখ, কিন্তু সাবধান! নাস্তিক হইও না।"

আর একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ত বাঁকুড়ার লোক নন, জন্মস্থান কোথায়?"

তিনি বলিলেন, "আরামবাগের নিকটে দিগড়া গ্রামে। কিন্তু আমি এখন পুরাপুরি বাঁকুড়ী হয়ে পড়েছি হে। এখন আর মনেই পড়ে না যে, আমি হুগলী জেলার মানুষ, বাঁকুড়াকে ভালবেসে ফেলেছি।"

"আপনি কি অবসর নেবার পর এখানে এসেছেন?"

"না। দশ বৎসর বয়সে আমি এখানে প্রথম আসি। তখন আমার পিতা এখানকার সবজজ। অক্টোবর মাসে এসেছিলাম। তিন মাস বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়েছিলাম। তাতেই একটা প্রাইজ পেয়েছিলাম। পর বৎসর জানুয়ারী মাসে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ইংরেজিতে হাতেখড়ি হ'ল। অক্টোবর মাসে পিতার কাল হ'ল। আমি দেশে ফিরে গেলাম। ম্যালেরিয়ায় ধরল। সে কি সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া! দু'বৎসর বেঁচে ছিলাম কি মরে ছিলাম, জানি না। ম্যালেরিয়ায় তখন দেশ উজাড় হতে চলেছে। আমি ওখানকার যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, তখন সে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা মাত্র সাত জন। বৎসর দুই পরে ম্যালেরিয়া কমলে বর্ধমান মহারাজার স্কুলে ভর্তি হলাম। সেখান থেকেই এণ্ট্রান্স পাস হয়েছিলাম।"

পরে নানা প্রসঙ্গে তাঁহার উচ্চ শিক্ষালাভের কথা এবং কটকে র‍্যাভেনশ' কলেজে প্রায় ছত্রিশ বৎসর অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার কথা বলিতেন। তার পর ষাট বৎসর বয়সে তিনি কিরূপে বাঁকুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিলেন, তাহার কথাও মাঝে মাঝে বলিতেন। কটকে তাঁহার সমস্ত যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়াছে। সেখানে কি ভাবে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত, তাহা মাঝে মাঝে তন্ময় হইয়া বর্ণনা করিতেন। যখন গান্ধীজী চরকা-আন্দোলনের সূচনা করেন তাহার বহু পূর্বে বিদ্যানিধি মহাশয় কিরূপে কটকেই উন্নত প্রণালীর চরকা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং 'প্রবাসী'তে তাহার সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন; কেমন করিয়া কটকে স্বদেশীভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন, এই সকল বর্ণনা শুনিতে শুনিতে মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ জন্মিত। কেমন করিয়া খণ্ড-পড়ারাজ্যে তিনি 'পঠানী সামন্ত'কে (চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত) আবিষ্কার করিলেন, সে কাহিনী বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। বাঁকুড়ায় আসিবার পর ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তিনি 'বাঁকুড়া-লক্ষ্মী' পত্রিকায় বৃক্ষরোপণ ও পালনের উপকারিতা সম্বন্ধে এক বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখেন; ইহাতে প্রাচীন শাস্ত্রের উক্তি এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পরম্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমরা 'বনমহোৎসব' করিয়া থাকি, মনে করি ইহা নূতন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এই উৎসব প্রচলন করিবার কয়েক বৎসর পূর্বেই যোগেশচন্দ্র এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন।

কাল অতিক্রান্ত হইতে লাগিল, আচার্যদেবের সহিত পরিচয় নিবিড়তর হইল। তিনি আমায় ভালবাসিলেন। তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে ভালবাসারও সৃষ্টি হইল। আমি কোন দিন কোনও কারণে আসিতে না পারিলে তিনি বলিতেন, "তুমি আমার হাত, তুমি আমার চোখ, তুমি না আসাতে আমার সব কাজ বন্ধ হয়ে আছে।" আমি শত কাজ ফেলিয়াও তাঁহার নিকট না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। পূর্বে আমার ধারণা ছিল, মানুষ বৃদ্ধ হইলে খিটখিটে হয়, পণ্ডিত হইলে দাম্ভিক হয়; কিন্তু যোগেশ-

চন্দ্রের সংসর্গে আসিয়া আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ দুরীভূত হইয়াছে। যে-কেহ তাঁহার সহিত কিছুকাল মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই জানেন আচার্য যোগেশ-চন্দ্র ছিলেন "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" ইত্যাদি শ্লোকের জীবন্ত ভাষ্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ যখন তাঁহাকে সংবর্ধিত করিতে আসেন, তখন সংবর্ধনা সভায় তিনি বলিয়াছিলেন,"কলকাতা থেকে এত জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান ব্যক্তি আমাকে সংবর্ধনা করতে এসেছেন, এতে আমার লজ্জা হচ্ছে, নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে; কারণ আমি এমন কিছু বড় কাজ করি নি, যার জন্য এত সম্মান আমার প্রাপ্য হতে পারে।"

আর এক দিনের কথা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাঁকুড়া শাখার অধ্যক্ষ স্বামী অরূপানন্দজী তাঁহাকে সঙ্ঘের বার্ষিক মহোৎসব-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিলেন, "স্বামী, (তিনি 'স্বামীজী' বলিতেন না) আমি এতকাল যে বিদ্যার চর্চা করে এসেছি, সে সব ত অপরা বিদ্যা। আপনারা পরাবিদ্যার সাধক; সে ক্ষেত্রে আমি আপনাদের কাছে শিশু মাত্র। আমি ধর্মসভার সভা-পতি হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

কেহ তাঁহার 'বিদ্যানিধি' উপাধির অর্থ 'বিদ্যার সমুদ্র' বলিলে তিনি বলিতেন, "না, ও ব্যাখ্যা চলবে না। আমি বিদ্যার নিধি নই, বিদ্যাই আমার নিধি, আমার মাথার মণি।"

ভগবদ্গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ পড়িয়াছি,— "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।" বিদ্যানিধি মহা-শয়ের চরিত্রে আমি এই লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার ইংরেজি গ্রন্থ Ancient Indian Life-এর জন্য তিনি যখন রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার পাইলেন, সাহিত্য-সাধনার জন্য কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁহাকে জগত্তারিণী সুবর্ণপদক দানে সম্মানিত করিলেন, 'পূজাপার্বণ' নামক সম্পূর্ণ মৌলিক ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি যখন রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার লাভ করিলেন, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে যখন কলিকাতার বিদ্বৎসমাজ তাঁহাকে 'আচার্য' উপাধি দানে ও অশেষ সম্মানে ভূষিত করিলেন, তখন তাঁহাকে যেমন 'বিগত স্পৃহ' দেখিয়াছি, আবার তাঁহার প্রাণপ্রিয় গুণবান্ পুত্র ক্যাপ্টেন সত্যকুমার রায়ের মৃত্যুতেও তাঁহাকে সেইরূপ 'অনুদ্বিগ্নমনা' দেখিয়াছি। আমি তাঁহাকে দুই বার চক্ষুরোগে এবং বর্ষাকালে প্রায়ই উদরাময়ে ভুগিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও অপ্রসন্ন দেখি নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে অনেক সুখের এবং অনেক দুঃখের কারণ ঘটিয়াছে, সে সব আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ নির্বিকার থাকিতেন। কারণ ইহা অল্পদিনের সাধনার ফল নহে।

দীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে আমি তাঁহাকে কখনও রোগে শয্যাগত থাকিতে দেখি নাই। নিরানন্দ কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় তিনি জানিতেন না। তিনি বয়োধর্মে ক্ষীণ-দৃষ্টি, ক্ষীণ-শ্রুতি ও ক্ষীণ-শক্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু জীবন তাঁহার নিকট দুর্বিষহ হইয়া যায় নাই, সংসার হইতে পলায়নের জন্য তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত ছিলেন না। বেদের ঋষির ন্যায় বোধ হয় তাঁহার অন্তরে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইতে থাকিত, "জীবেম শরদঃ শতম্, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্, প্রব্রবাম শরদঃ শতম্, অদীনাঃ স্যামঃ শরদঃ শতম্, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।"

বিপুল খ্যাতি এবং বিপুলতর পাণ্ডিত্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসিকতা নষ্ট করিতে পারে নাই। শহরের অসংখ্য ছেলেমেয়ের এবং যুবকযুবতীর তিনি ছিলেন 'দাদু'। আমাকে তিনি মাঝে মাঝে 'গণেশ' বলিয়া ডাকিতেন। অর্থাৎ তিনি বেদব্যাস আর আমি তাঁহার অনুলেখক গণেশ। বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতা সম্বন্ধে যখন প্রবন্ধ লেখা হইত, তখন তিনি মাঝে মাঝে স্মিতহাস্যে বলতেন, "গণেশ, বেশ বুঝে বুঝে লিখবে। কারণ আমার এই লেখাই ত 'কমপ্লিট' নয়। আমার লেখার মধ্যে যে অভাব রয়ে গেল, তোমাকে তা পূরণ করবার চেষ্টা করতে হবে।" তাঁহার কথা শুনিয়া লজ্জিত হইতাম; তাঁহার অসমাপ্ত কার্য আমি সম্পূর্ণ করিতে পারি! আবার তিনি যে আমায় গৌরব দান করিতেন, তাহাতে আনন্দে আমার বুক ফুলিয়া উঠিত।

বিশ্বভারতীর জন্য 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে পর তিনি একদিন আমায় বলিলেন, "বাঁকুড়ায় অনেক পূজা-পার্বণ প্রচলিত আছে, যা আমি জানি নে। তুমি সেগুলোর একাউন্ট লিখতে চেষ্টা করো।' তাঁহার উৎসাহে আমি 'জিতাষ্টমী' লিখিলাম এবং তাঁহারই আবিষ্কৃত সূত্রাবলম্বনে উক্ত পার্বণের কালনির্ণয় করিলাম। প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইলে তাঁহার আহ্লাদের অবধি রহিল না। কারণে অকারণে, কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেই তাহাকে বলিতেন, "সুখময়, আমার উত্তর-সাধক হবে।"

অল্পবুদ্ধি আমি মনে করিতাম, সত্যই বুঝি আমি তাঁহার উত্তর-সাধক হইতে পারিব। তাঁহার সেই উৎসাহের শক্তিতে দিনকয়েকের মধ্যে 'ইন্দ্রপরব', 'ইতুপূজা', 'ভুমু পূজা', 'শিবের গাজন', 'ধর্মের গাজন' 'রোহিণী উদয়' ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। সে সকল প্রবন্ধ যখন তাঁহার নিকট পাঠ করিয়া শুনাইতাম, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অনির্বচনীয় ভাব বিকশিত হইত. অধরে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া

উঠিত। কয়েক দিন পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধি, দানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু হায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখনও তাঁহাকে 'ডক্টরেট' দেন নাই। পরলোকগমনের মাত্র তিন মাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল।

একদিন তিনি আমায় বলিলেন, "গণেশ, আর বোধ হয় বেশী দিন নয়। খুচরো প্রবন্ধ লিখে আর সময় নষ্ট করব না। যে সব প্রবন্ধ আগে লেখা হয়েছে আর তুমি ইদানীং যে সব প্রবন্ধ লিখলে, সেগুলো একত্র করে বইয়ের আকারে প্রকাশ করতে হবে। এক এক জাতের প্রবন্ধ এক-একটা বাণ্ডিল করে বাঁধো। বিশ্বভারতী আমার একখানা বই ছাপতে চান। তাঁদের 'পূজাপার্বণ' দেব। এম. সি. সরকার একখানা বই চান। ওঁদের দেব 'পৌরাণিক উপাখ্যান'। আর সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করবেন 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল'। তা ছাড়া গুরুদাস চাটুজ্জেকে একখানা আর ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীকে খান দুই বই দিতে হবে। সোসিওলজিক্যাল টপিক নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো একত্র করে নাম দাও 'কোন্ পথে ?' ভাষা সম্বন্ধে সব প্রবন্ধ একত্র করে নাম দাও 'কি লিখি ?' চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও একখানা পৃথক বই হবে। তা ছাড়া আমার আগেকার ছাপা 'শঙ্কুনির্মাণ', 'রত্নপরীক্ষা' আর 'পত্রালী' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ করতে হবে। কিছু কিছু সংশোধন দরকার। সব রেডি কর।"

কাজ আরম্ভ হইল। প্রথমে 'পূজাপার্বণ' শেষ হইল। বিশ্বভারতী তাহা প্রকাশ করিলেন। তার পর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট 'কোন্ পথে' পাঠানো হইল এবং প্রকাশিত হইল। পরে 'পৌরাণিক উপাখ্যান' প্রকাশ করিলেন এম. সি. সরকার। গত বৎসর সাহিত্য-পরিষদ 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' প্রকাশ করিয়াছেন। ওরিয়েণ্টের নিকট দুইখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাঠানো হইয়াছিল; তাঁহারা কি করিলেন, বলিতে পারি না। এখনও বোধ হয় 'চণ্ডীদাস' ও 'দেশীয় কলা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া তাঁহার আলমারিতেই পড়িয়া আছে।

অবস্থা-বিপর্যয়ে আমাকে বাঁকুড়া ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতে হইল। যখন বিদায় লইতে গেলাম তখন সেই জ্ঞানতপস্বীর চক্ষুও অশ্রুতে ভরিয়া গেল এবং কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন শুধু একটি কথা, "মঙ্গল হোক।" একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলাম, কিন্তু পত্রালাপ কখনও বন্ধ হয় নাই। প্রত্যেক পত্রে তিনি আমার কল্যাণ কামনা করিতেন এবং লিখিতেন, "লোক অভাবে আমার শব্দকোষ সংশোধন করিতে পারিতেছি না—তুমি কি আর বাঁকুড়ায় ফিরিবে না ?" এ বৎসর পূজার সময় বাঁকুড়ায় ফিরিয়া যাইব এবং তাঁহার জ্ঞান-সাধনায় সহায় হইব, এই ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ।

জ্ঞানতপস্বী তাঁহার সাধনা প্রায় সমাপ্ত করিয়া চিদানন্দলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। আমাদের জন্য তিনি যে জ্ঞানের ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, সুচিরকাল আমরা তাহা হইতে অমৃত আহরণ করিয়া জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহার কয়েকটি কাজ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। কয়েকটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া আলমারিতে পড়িয়া আছে, কে তাহা প্রকাশ করিবে ? তাঁহার অতুলনীয় গ্রন্থ 'এষ্ট্রনমিক্যাল ল্যাণ্ডমার্কস অব ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুইটি' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি টেবিলের উপর ফাইলে বাঁধা পড়িয়া আছে, তাহা প্রকাশের দায়িত্ব কে লইবে ? তাঁহার আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপি ট্রাঙ্কের মধ্যে বোঝাই করা আছে, তাহাই বা কে প্রকাশ করিবে ? কে তাঁহার শব্দকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার ভার লইবে ? "চণ্ডীদাস স্মৃতি-মন্দির" প্রতিষ্ঠার জন্য বাঁকুড়া-পশুচিকিৎসালয়ের নিকটস্থ জমিটুকু প্রার্থনা করিয়া আচার্যদেব বহুবার জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। কিন্তু বাঁকুড়াবাসীর সাড়া নাই। বাঁকুড়ায় পুরাকৃতি ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কতবার কতরূপে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু খুব কমই সহযোগিতা পাইয়াছেন। বাঁকুড়ার কত মূল্যবান প্রাচীন পুথি, কত সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধ, জৈন, সূর্য ও চণ্ডীমূর্তি যে অবহেলায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঁকুড়াবাসী প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মতিথি পালন করিত, সেদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিত, অনেকে অনেক প্রকার প্রতিশ্রুতি দিত, কিন্তু পর দিন তাহা আর কাহারও মনে থাকিত না। জ্ঞানের ঐ উজ্জ্বল দীপ দিগ্‌বিদিকে রশ্মি বিকিরণ করিতে করিতে নির্বাপিত হইল; কিন্তু আমরা এমনই হতভাগ্য যে, সেই আলোকস্তম্ভটির আমাদের ঘরের আঁধার দূর করিতে পারিলাম না।

সূর্যস্নান

শ্রীউমা দেবী

১

সূর্যালোকে স্নান করি প্রতিদিন প্রভাত-সন্ধ্যায়,
উজ্জ্বল রৌদ্রের আভা ঝলসায় মসৃণ ত্বকের
সহজ সোহাগ-সুখে। হৃদয়ের অলকানন্দায়
বিম্ব-প্রতিবিম্বে জ্বলে মণি-মুক্তা দীপ্ত আবেগের।
সূর্য কত দূরে আছে? কত কোটি সহস্র যোজন?
তবু সে ধরেছে আজ রশ্মিময় রাজছত্রখানি,
পৃথিবী পায়ের তলে ছিল লঘু শ্যামল চিক্কণ
অকস্মাৎ সূর্যস্নেহে হয়েছে সে দৃপ্ত রাজেন্দ্রাণী।
সূর্য যতদূর থাক—প্রতিদিন প্রভাত-সন্ধ্যায়
আমি স্নান করি তার বহমান কিরণের স্রোতে,
নয়নে ছোঁয়াই, রাখি নিশীথের শিথিল তন্দ্রায়
চিত্ত বিকশিত করি পুষ্প-প্রায় প্রভাত-আলোতে।
মুঠি ভরে তুলে নিই রাগরক্ত সূর্যের আবীর
ছড়াই—রাঙাই সুখে দুই হাতে সৈনিকের তীর।

২

এত নীল গাঢ় নীল—এত নীল আকাশ তোমার
সে নীলে নয়ন যেন ডুবে যায় পাখীর মতন,
একটু ঝিলিক শুধু লাগে এসে রোদের সোনার
একটু হাওয়ায় কেঁপে ভেঙে যায় দেহ-আয়তন।
তোমার রূপের গর্বে গরবিণী করেছ আমায়,
নীরন্ধ্র যৌবন-বনে আমি যেন নব পর্যটক—
কান পেতে শুনি কি যে মর্মরিত অরণ্যছায়ায়
অজস্র লাবণ্যলোভী নিরলস তরুণ পাঠক।
এত নীল গাঢ় নীল—এত নীল আকাশ তোমার,
সে নীল লাবণ্য-স্রোতে ভেসে উঠি বুদ্বুদের মত,
ভেসে উঠি, ভেঙে যাই—ডুবে যাই, শত বাসনার
সোনালি আলোক লেগে জ্বলে উঠি উষায় সতত।
সে নীল নিবিড় হলে রজনীর তিমির ছায়ায়
তোমার রূপের গর্বে দীপ্তি পাই নক্ষত্র-মালায়।

৩

এমন বর্ষার দিনে বার বার শুধু তারি নাম
মনে মনে ফিরে ফিরে বারে বারে করে গুঞ্জরণ,
সোনার সুতার মত ঝরে যায় বৃষ্টি অবিরাম
বিকালের আলো-লাগা সোনা-ঝরা চিকণ বর্ষণ!
আমিও বাড়াই হাত, করি দেহ মুক্ত আবরণ
নরম বৃষ্টির কণা গায়ে লাগে রেশমের মত,
চোখ বুঁজে অনুভব করি ক্রমে প্রবল বর্ষণ
অজস্র সোহাগে নামে নাম-মধু পান করি যত।
আহা—তারি ছায়া বুঝি এত দিনে ছেয়েছে আকাশ,
আহা তারি তনুস্পর্শে বুঝি এত শীতল পবন,
কোমল ধারায় তারি হৃদয়ের আদর আভাস—
সহসা মেঘের ফাঁকে হাসে তারি চোখের কিরণ।
রৌদ্রালোক লেগে ধরা অকস্মাৎ করে ঝলমল
হৃদয় কখন হ'ল তারি সঙ্গে প্রশান্ত নির্মল!

৪

সৈনিক তোমার চক্ষে নীলদ্যুতি শাণিত ইস্পাত,
যে নীলে ধিক্কৃত হয় আকাশেরও উদার মহিমা,
যে নীল-চাঞ্চল্য ক্ষুব্ধ সমুদ্রকে করে না দৃকপাত
সে নীল আশ্বাসে আজ হৃদয়ের আশারা অসীমা।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীরভোগ্য নারীর হৃদয়,
হৃদয়-নদের আশা-তরঙ্গের তুরঙ্গ চঞ্চল,
কোমল কাতর কৃতি আজ আর শুনো না নির্দয়
ঝরানো বকুল ফুলে বেঁধোনা এ শাড়ীর অঞ্চল।
হে সৈনিক! সূর্য তুমি, চিনে নাও আপন সংজ্ঞায়—
শীতল মেরুর দেশে গলে যায় পার্বত্য তুষার,
বাতাসে বরফ জমে, পাখীদের পাখা ঝরে যায়,
অস্ত্রঝঞ্ঝনায় আনো মাঙ্গলিক নবীনা উষার।
সৈনিক! তোমার চক্ষে নীলদ্যুতি শাণিত ইস্পাত
খণ্ডিত এ পৃথিবীর শবাধারে করো না দৃকপাত।

দুরন্ত দিয়াশলাই

এণ্টন শেখভ

অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মৌলিক

৬ই অক্টোবর। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণ রাশিয়ার কোন এক প্রদেশের দ্বিতীয় বিভাগের পুলিস সুপারের আপিস। ফিটফাট পোশাকে সজ্জিত এক যুবক সেখানে প্রবেশ করল। খবর পাওয়া গেল যে, মার্ক ইভানোভিচ ক্লাউজভ নামে একজন অবসরভোগী উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী খুন হয়েছেন। যুবকের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ—তার হাবভাবে প্রবল উত্তেজনা। তার চাহনিতে বিভীষিকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—হাত দুটি তার থর্ থর্ করে কাঁপছে।

"কার সঙ্গে আমার কথা বলবার সৌভাগ্য হচ্ছে?" পুলিস সুপার জিজ্ঞেস করলেন।

"সিয়েকভ, ক্লাউজভের দেওয়ান। কৃষি ও যন্ত্রপাতি বিশারদ। পুলিস সুপার উপযুক্ত সাক্ষীসাবুদ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিম্ন-বর্ণিত অবস্থা লক্ষ্য করল।

কৌতূহলী জনতা ক্লাউজভের বাসগৃহের চারদিকে জমায়েত হচ্ছে। লোমহর্ষণ খুনের সংবাদ চারিদিকে বিদ্যুদবেগে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ছুটির দিন। আশপাশের গ্রামগুলি ভেঙে সেখানে যেন জড়ো হয়েছে। কথাবার্তার গল্পগুজবে চারিদিক সরগরম। কারও মুখ বিবর্ণ, কারও বা চোখে জল। ক্লাউজভের শয়নকক্ষের দুয়ার ভেতর হতে তালাবন্ধ।

ভাল করে দরজাটা পরীক্ষা করে সিয়েকভ বলে উঠল, "জানালা দিয়ে নিশ্চয়ই খুনীরা পালিয়েছে।"

তারা জানালার লাগাও বাগানে প্রবেশ করল। গা ছমছম করা একটা অলক্ষুনে ভাব যেন জানালাতে লেগে আছে। জানালার গায়ে ফিকে সবুজ রঙের এক পরদা, তার একটি কোণ ভিতরের দিকে মুড়ে আছে। সেটির ফাঁক দিয়ে ভিতরে চেয়ে দেখা সম্ভব হচ্ছিল।

পুলিস সুপার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কেউ কি জানালা দিয়ে ভিতরে চেয়ে দেখেছেন?"

বাগানের মালী ইফ্রেম বলে উঠল, "না, হুজুর। আতঙ্কে সবাই যখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, তখন কারও কি ভেতরে চেয়ে দেখবার সাহস আছে?—বেঁটে পক্বকেশ বৃদ্ধ মালী হলে কি হবে, কথা ক'টা সে বহুদিনের অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সরকারী কর্ম্মচারীর মত বলে উঠল।

জানালাটির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুলিস সুপার বললেন, "হায়, মার্ক ইভানিচ, তোমার কপালে যে অশেষ দুর্গতি আছে তা কত বার তোমায় বলেছি—কিন্তু তুমি তাতে কানই দাও নি। লাম্পট্যের পরিণাম কখনও ভাল হয় না।"

সিয়েকভ বলে উঠল, "ইফ্রেম না থাকলে ব্যাপারটা আমাদের ধারণার বাইরেই থেকে যেত। অঘটন যা কিছু ঘটেছে তা সে-ই প্রথম আবিষ্কার করেছে। ভোরবেলাতেই আমার ওখানে গিয়ে সে বলেছে, "এত বেলাতেও কর্ত্তা আজও ঘুম থেকে উঠছেন না কেন? সারা হপ্তা তিনি ঘরের বাইরে আসে নি।—ওর কথা শুনে আমি যেন থ' মেরে গেলাম। আমার মনে হঠাৎ আতঙ্ক ঝলকে উঠল। তাই ত গত সপ্তাহের শনিবার থেকে তার সঙ্গে ত আমার দেখা হয় নি। আজ হচ্ছে আর এক রবিবার। সাত-সাতটা দিন হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়।"

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুলিস সুপার বলে উঠলেন, "আহা, বেচারী—এমন একজন সুচতুর, সুশিক্ষিত, সদাচারী ভদ্রলোক—এ মুলুকে তার যে আর জুড়ি নেই, সে যে কেউ জোরগলায় বলতে পারে, কিন্তু একেবারে লম্পট, মাতাল—স্বর্গের দুয়ার ওর জন্য খোলা থাক। তার বিষয়ে কোন কিছুতেই আমি আশ্চর্য্য হব না।"

সাক্ষীদের একজনকে ডেকে সে বলল, "ষ্টিফান, এখখুনি আমার বাড়ী গিয়ে আনড্রস্কাকে পুলিস ক্যাপ্টেনের কাছে পাঠিয়ে দাও। ঘটনাটি সে তাঁকে জানিয়ে আসুক। তাকে বল মার্ক ইভানিচ খুন হয়েছে। হাঁ, আর ইন্সপেক্টরের কাছে দৌড়ে যাও। কাজ ফাঁকি দিয়ে আরাম করে সে কত দিন আর বসে থাকবে? সে যেন চট করে এখানে চলে আসে। তার পর যত শীগগির পার তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিকোলাই ইরমোলিসের কাছে যেয়ে তাকে এখানে এখখুনি আসতে বল। আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়াও, আমি একটা চিঠি দিচ্ছি।"

পুলিস সুপার বাড়ীর চারদিকে সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন রাখলেন। তার পর দেওয়ানের ওখানে চা পান করতে গেলেন, দশ মিনিট পরে ওখানে টুলের উপর বসে তাকে অতি যত্নে মিষ্ট দ্রব্য ও চা নিঃশেষ করতে দেখা গেল।

সে সিয়েকভকে বলে যাচ্ছিল, "একবার ভাবুন দেখি, একবার ভেবে দেখুন—একজন ভদ্রলোক দস্তুরমত প্রতিষ্ঠাবান ভদ্রলোক—পুশকিনের ভাষায় যাকে 'দেবকুলপ্রিয়' বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে—তার কি পরিণাম—কোথায় কোন অন্ধকূপে সে নেমে গিয়েছিল। লাম্পট্যের শেষ ধাপে সে নিজেকে ফেলে দিয়েছিল, আর দেখুন সে রাতারাতি খুন হয়ে গেল।"

দু'ঘণ্টা বাদে তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে গাড়ী করে থামলেন। বেশ লম্বা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। নিকোলাই ইরমোলিচ চুবিকভ নামে পরিচিত বাট বছরের বৃদ্ধ পঁচিশ বছর ধরে এই বিভাগে পরিশ্রম করে চুল পাকিয়েছে। সচ্চরিত্র, সুচতুর, পরিশ্রমী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক বলে সারা জেলার লোকে তাকে সম্মান করত।

তার সঙ্গে ছিল তার অনুচর ডুকভস্কি, ছাব্বিশ বছরের দীর্ঘকায় তরুণ, তার সহকারী ও সেক্রেটারী হিসাবে সে এসেছিল।

সিয়েকভের কক্ষে প্রবেশ করে সকলের সহিত করমর্দন-পর্ব্ব শেষে চুবিকভ বলে উঠল, "ভদ্রমহোদয়গণ, এ কি সম্ভব? এ কি সম্ভব? মার্ক ইভানিচ! খুন? না, এ অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব?"

পুলিশ সুপার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, "যা বলেছেন! হায় ভগবান! গত সপ্তাহের শুক্রবার দিনই না তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল, টারাপস্কোভোর সেই মেলাতে, তার খাতিরে আমায় তার সাথে এক গ্লাস 'ভডকা' মদ্য পর্য্যন্ত পান করতে হ'ল।"

'যা বলেছেন', পুলিস সুপার আবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল। তারা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তাদের বিস্ময়, আতঙ্ক ভাষায় প্রকাশ করে প্রত্যেকে চা-পানের পর ঘটনাস্থলে ফিরে এল।

পুলিস ইন্সপেক্টর জনতার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "পথ ছেড়ে দাও।"

গৃহে প্রবেশ করে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমই শয়নকক্ষের দরজাটা পরীক্ষা করে দেখা সুরু করলেন। দরজাটা দেবদারু কাঠের তৈরী ছিল, হলদে রং করা ঐ দরজাটা নিয়ে কেউ যে ঘাটাঘাটি করে নি তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। প্রমাণ-স্বরূপ কোন চিহ্ন তাতে বর্ত্তমান নেই। দরজাটা ভেঙে তারা ঘরে ঢুকতে উদ্যত হ'ল।

কুঠার ও বাটালির আঘাতে খট খট কড় কড় শব্দে অবশেষে বেশ বিলম্বে দরজাটা যখন খুলে গেল, ম্যাজিষ্ট্রেট তখন আশপাশের লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যারা ঘটনাটির সাথে জড়িত নন, তাঁরা দয়া করে সরে যান, তদন্তের সুবিধার জন্যই আমি আপনাদের এই কথা বলছি—ইন্সপেক্টর, কাউকে ঢুকতে দিও না।"

চুবিকভ, তার সহকারী ও পুলিস সুপার দরজাটি খুলে ফেলল, এবং বেশ সসঙ্কোচে একজনের পর একজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। দৃশ্যটি ছিল এই: নিরালা জানালা, তার পাশে মস্ত-বড় একটা কাঠের পালঙ্ক। তার উপর প্রকাণ্ড পালঙ্কের গদি। অবিন্যস্তভাবে একটি লেপ গদিটির উপর পড়ে আছে। মেঝের কোঁচকানো অবস্থায় একটা বালিশ পড়ে রয়েছে। রূপার একটা রিষ্টওয়াচ শয্যার পাশে ছোট একটি টেবিলের উপর রাখা। পাশে ছড়ানো রয়েছে বিশ কোপেক মূল্যের রৌপ্যমুদ্রা। গন্ধকের তৈরী কয়েকটা দেশলাই কাছে পড়ে আছে। সেই শয্যা, টেবিল আর এক কোণে একটি চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র ঘরে ছিল না। খাটের নীচে দৃষ্টিপাত করে পুলিস সুপার দুই ডজন শূন্য মদের বোতল, একটি পুরানো টুপী আর এক কলসী 'ভডকা' মদ্য দেখতে পেল। ধুলামাখা একপাটি বুটজুতা নীরব সাক্ষী হয়ে টেবিলের নীচে পড়ে ছিল। ঘরের ভিতর চারিদিক লক্ষ্য করে চুবিকভ ভ্রূকুটি করে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় রেগে বলল, "বদমাশের দল!"

ডুকভস্কি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু মার্ক ইভানিচ কোথায়?" কর্কশ স্বরে চুবিকভ জবাব দিল, "থাক তোমার আর এতে মাথা গলিয়ে কাজ নেই। ভাল করে দরজাটা একবার পরীক্ষা করে দেখ। জীবনে আমার এই দ্বিতীয় বার অভিজ্ঞতা হ'ল।" তার পর নিম্ন কণ্ঠে পুলিস সুপারকে বলে উঠল, "ইভগ্রাফ কুজমিচ, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। আপনার তা মনে আছে নিশ্চয়ই। ধনী ব্যবসায়ী পোর্টিটভ খুন। ঠিক একরূপই ঘটনা। বদমাশেরা তাকে খুন করে লাসটি জানালা দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল।"

জানালার কাছে গিয়ে পরদাটা একধারে একটু টেনে চুবিকভ সাবধানে ওতে ধাক্কা দিল। জানালা খুলে গেল।

"খুলে গেল দেখছি, তা হলে নিশ্চয়ই এটা আটকানো ছিল না, হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম, জানালার গায়ে কিছু চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ কি? এই দেখ এইখানে হাঁটুর চিহ্ন, কেউ এদিক দিয়ে বাইরে চলে গেছে, জানালাটা আমাদের সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

ডুকভস্কি বলল, "মেঝের টাটকা কোন বিশেষ চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না, রক্ত কিংবা কোন আঁচড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না, একটা খালি সুইডেনের দেশলায়ের বাক্স কুড়িয়ে পেলাম। এই যে এটা এখানে। মার্ক ইভানিচ কখনও ধূমপান করত বলে ত মনে পড়ে না। সে ত গন্ধকের দেশলাই ব্যবহার করত, সুইডেনের দেশলাই ত কখনও তার কাছে দেখি নি, যাক দেশলাইটা ঘটনাটির হয়ত বা একটু সঙ্কেত দিতে পারে।"

তার দিকে হাত তুলে চুবিকভ জোরে বলে উঠল, "ওহে, দয়া করে বাজে বক বক বন্ধ কর না। এখনও ও ওর দেশলাই নিয়ে মেতে আছে। এ সব উত্তেজনাপ্রবণ লোকদের আমি সইতে পারি না। দেশলাই খুঁজে খুঁজে হয়রান না হয়ে তুমি বরং বিছানাটা একবার পরীক্ষা কর।"

শয্যা পরীক্ষা করে ডুকভস্কি জানাল, "রক্ত কিংবা কোনকিছুর দাগ এতে লেগে নেই। টাটকা ছেঁড়া কোন স্থানও দেখতে পাচ্ছি না। বালিশের উপর যেন কামড়ানোর দাগ বসে আছে। বীয়ার জাতীয় কোন তরল পদার্থ লেপের উপর ছিটকে পড়েছিল, গন্ধ ও স্বাদে তা বেশ টের পাচ্ছি। শয্যার সাধারণ অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন এখানে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি কিংবা হাতাহাতি হয়ে গেছে।"

ধ্বস্তাধ্বস্তি যে হয়ে গেছে তা তুমি না বললেও আমি জানি। ধ্বস্তাধ্বস্তির কথা ত তোমার কাছে জানতে চাই নি, সে চিহ্ন না খুঁজে বরং তুমি···।"

একপাটি বুটজুতোও এখানে দেখতে পাচ্ছি, আর একপাটি কিন্তু নেই।"

"বেশ, তাতে হ'ল কি?"

"কেন, সে যখন পা থেকে জুতো খুলেছিল, তখন ওরা তাকে শ্বাসরোধ করে মেরেছে। দ্বিতীয় বুটজুতোটি তার আর খুলবার অবসরই হয় নি, তার আগেই তারা তাকে···।"

"ও দেখি আবার বকা সুরু করল, ওকে শ্বাসরোধ করে মেরেছে তা তুমি কেমন করে জানলে?"

"বালিশের উপর দাঁতের দাগ রয়েছে। বালিশটাও কুঁচকে পড়ে আছে, বিছানা থেকে ছ'ফুট দূরে ওটা ছুড়ে ফেলা হয়েছে তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

"তবু তর্ক করছে, বাক্যবাগীশ কোথাকার! আমাদের বরং বাগানটির ভেতরে যাওয়া উচিত। এখানে বক বক না করে তুমি বরং বাগানটি ঘুরে দেখে এস,তোমার সাহায্য ছাড়াই এখানের কাজ আমি সারতে পারব।"

বাগানে গিয়ে তাদের প্রথম লক্ষ্য ও পরীক্ষার বস্তুই ছিল ঘাসের উপর কোন চিহ্ন আছে কিনা। দেখা গেল জানালার নীচের ঘাসগুলি কে যেন মাড়িয়ে গেছে। জানালারকাছে লতানো কুঞ্জটাও পদদলিত বলে মনে হ'ল। কতকগুলি ভাঙা গাছের ডগা আর কিছু ছেঁড়া ন্যাকড়া ডুকভস্কি কুড়িয়ে পেল, লতার উপর ঘন নীলবর্ণের পশমী সুতাও কয়েকগাছা পাওয়া গেল।

ডুকভস্কি সিয়েকভকে জিজ্ঞেস করল, "ওর পরনে সবশেষে কি রঙের সুট ছিল?"

"ক্যাম্বিস কাপড়ের সুটটার রং ছিল হলদে।"

"চমৎকার! তা হলে ওদের কারও পোশাক নিশ্চই গাঢ় নীলবর্ণের ছিল।" লতানো কুঞ্জের কিছু অংশ ছেঁটে দেওয়া হয়েছিল। কাগজে মোড়া অবস্থায় কর্ত্তিত অংশ কিছু পড়ে ছিল। ঠিক সেই সময় পুলিস ক্যাপ্টেন সিটাকভস্কি ও ডাক্তার টুটিয়েভ এসে পৌঁছল। সম্ভাষণ-পর্ব্ব শেষ হলে পুলিস ক্যাপ্টেন তার কৌতূহল চরিতার্থ করতে প্রস্তুত হ'ল। ডাক্তার চেহারায় বেশ লম্বা কিন্তু, বেজায় কৃশকায়, চোখ দুটি কোটরে ঢুকে গেছে, নাকটা তার ছিল লম্বা আর চোয়ালটা বেশ দৃঢ়। কোন সম্ভাষণ না করে, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে সে নির্ব্বিবাদে একটি গাছের গুঁড়ির উপর বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "সার্ব্বিয়ানরা আবার বিদ্রোহ আরম্ভ করেছে, ওরা যে কি চায় তা বুঝে উঠতে পারি না। অষ্ট্রিয়া অষ্টিয়া, এ তোমারই কাজ!"

বাইরে থেকে জানালাটা পরীক্ষা করে কোন ফলই হ'ল না, আশপাশের ঘাস ও ঝোপঝাড় থেকে মূল্যবান কয়েকটি তথ্য আবিষ্কৃত হ'ল—ডুকভস্কি ঘাসের উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত রক্তের দাগ দেখতে পেল—জানালা হতে বাগানে কয়েক গজ পর্য্যন্ত দাগটা লেগে ছিল। একটা ঝোপের মধ্যে বাদামী রঙের বড় ঝোপে এসে মিশে দাগের রেখাটি শেষ হয়েছে, সেই একই ঝোপের নীচে আর একপাটি বুটজুতো পাওয়া গেল—যার জুড়ি জুতোটি শয়নকক্ষে পাওয়া গিয়েছিল।

'দাগটা পুরাতন রক্তের চিহ্ন', ডুকভস্কি বেশ পরীক্ষা করে বলে উঠল।

রক্তের কথা শুনে ডাক্তার উঠে একবার পরীক্ষা করে দেখল। সে বলল, "হ্যাঁ, এ রক্তের দাগই বটে।"

ডুকভস্কির দিকে চেয়ে একটু বিদ্রূপের সুরে চুবিকভ বলে উঠল, "রক্ত যখন পাওয়া গেছে তখন নিশ্চয়ই ওকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়নি।"

"শোবার ঘরে ওকে শ্বাসরোধ করে অচৈতন্য করা হয়েছিল, আবার যদি ও বেঁচে ওঠে এই ভয়ে কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওকে একেবারে খুন করা হয়েছে। এইখানে সে যে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল,ঝোপের নীচে অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্তের ছোপেই তা বোঝা যায়। তারা হয় ত তখন তাকে বয়ে নিয়ে যাবার কিংবা বাগানের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য কোনকিছুর সন্ধানে ফিরছিল।"

"বেশ, কিন্তু বুটজুতোটি?"

"বুটজুতোটি হতে বোঝা যায় আমার অনুমান সত্য। বুটজুতো খুলে সে যখন শোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তাকে খুন করা হয়েছে। সে একপাটি কেবল পা থেকে খুলেছে, আর একপাটি—যেটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে সেটা প্রায় আধখানা খুলেছিল, তার দেহ যখন টেনে নেওয়া হচ্ছিল তখন আর একপাটি আপনা হতেই পা থেকে খুলে যায়।"

চুবিকভ ঠাট্টা করে বলল, "আহা, কি তথ্য আবিষ্কারের ক্ষমতা! ওর দিকে একবার চেয়ে দেখুন, কি সুন্দর ভাবে সে সবকিছু বের করে ফেলেছে। তোমার অনুমানগুলি আগে থেকেই প্রচার না করা শিখতে চেষ্টা কর। বাজে তর্ক না করে কিছু ঘাস নিয়ে পরীক্ষাও ত করতে পার।"

চারিদিক পরীক্ষার পর, ঘটনাস্থলটির একটা খসড়া তৈরি করে তারা রিপোর্ট লিখতে ও খাওয়া-দাওয়া সারতে দেওয়ানের গৃহে চলে গেল।

খাবার টেবিলেও তাদের আলোচনা চলতে লাগল। 'রিষ্টওয়াচ, রৌপ্যমুদ্রা এবং অন্যান্য যাবতীয় জিনিষ কিছুই খোয়া যায় নি, এমনকি হাতের স্পর্শ পর্য্যন্ত তাতে পায় নি। চুবিকভ বলা আরম্ভ করল, "দুয়ে দুয়ে চারের মতই স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে, অর্থলাভে এই খুনটা করা হয় নি।"

ডুকভস্কি যোগান দিল, "শিক্ষিত কোন লোক এ কাজটা করেছে।"

"কি থেকে তুমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে?"

"সুইডেনের এই দেশলাইয়ের বাক্স থেকে আমি এটা অনুমান করছি, চাষাভুষো লোকেরা এখনও এর ব্যবহার শেখে নি। জমিদার তালুকদার গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকই এর ব্যবহার জানে। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বদমাশেরা সংখ্যায় অন্ততঃ তিনজন ছিল, দু'জন তাকে ধরেছিল আর তৃতীয় জন তার শ্বাসরোধ করেছিল। ক্লাউজভ যে বেশ বলিষ্ঠ ছিল তা গোড়া থেকেই তারা অনুমান করেতে পেরেছিল।"

"সে যদি নিদ্রিত থাকে তা হলে তার গায়ের জোরে কি আসে যায়?

"পা থেকে যখন সে তার বুটজুতো খুলছে তখন খুনীরা তার

ওপর আক্রমণ চালায়, বুটজুতো খুলবার সময় সে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে ছিল না।"

"সব কিছু অনুমানের উপর ভিত্তি করে গল্প খাড়া করে কোন লাভ নেই, বরং খাবার দিকে মন দাও।"

ইফ্রেম মদের পাত্রটা টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে বলে উঠল, "হুজুর, আমার মনে হয় এই জঘন্য কাজটা নিকোলাস্কা ছাড়া আর কেউ করে নি।"

সিয়েকভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, "খুবই সম্ভব।"

"এই নিকোলাস্কাটি কে?"

ইফ্রেম বলল, "হুজুর, কর্তার বেয়ারা, ও ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারে না। ও একটা বদমাশ, হুজুর। একে পাঁড় মাতাল তার উপর লম্পট। ভগবান যেন ওরূপ আর একটি মর্ত্তলোকে না পাঠান। কর্তার 'ভডকা' সে নিয়ে আসত, তাকে ঘুম পাড়িয়ে যেত। ও ছাড়া আর কে এর মধ্যে থাকতে পারে? হুজুর, তা ছাড়া শুড়ীখানায় শয়তান একদিন আমার কাছে গর্ব্ব করে বলেছে যে কর্তাকে ও খুন করবে। সবের মূলে রয়েছে সেই আকুস্কা, সেই নচ্ছার মেয়ে। পূর্ব্বে সে এক সৈনিকের সঙ্গে ও ঘর করত, কর্তার নজর ঐ দিকে যায়, মেয়েটাকে কর্তা নিজের মহলে নিয়ে আসে, নিশ্চয়ই ও ব্যাটা এতে ভয়ানক চটে যায়। মদের ঘোরে এখনও সে রান্নাঘরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সে এখন কেঁদে কেঁদে আকুল, কর্তার জন্যই সে যে কাঁদছে এই কথা সবাইকে বোঝাতে চাইছে।

সিয়েকভ তখন বলে উঠল, "নিশ্চয়ই আকুস্কার জন্য যে কেউ ক্ষেপে যেতে পারে। সে একটা সৈনিকের স্ত্রী, একটি চাষী মেয়ে কিন্তু, মার্ক ইভানিচ তাকে স্বর্গরাজ্যের অপ্সরা মনে করত, ওর মধ্যে মায়াবিনীর কোন শক্তি ছিল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট লাল একটি রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "আমি মেয়েটিকে দেখেছি, আমি ওকে চিনি"। ডুকভস্কির মুখ লাল হয়ে উঠল, সে তার চোখ নামাল। পুলিস সুপার আঙুল দিয়ে খাবারের পাত্রে টুংটাং আওয়াজ করতে লাগলেন। পুলিস ক্যাপ্টেন কাশতে কাশতে তার হাত-ব্যাগের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। ডাক্তারের মনেই কেবল আকুস্কা কিংবা অপ্সরার প্রসঙ্গ কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল না। চুবিকভ নিকোলাস্কাকে হাজির করতে হুকুম দিল। নিকোলাস্কা এসে হাজির হ'ল। মেজাজ খিটখিটে, অল্প বয়স, নাকে চাকা চাকা দাগ, বুকটা তার ভিতরে বসে গেছে। পরনে মনিবের দেওয়া পুরানো প্যান্ট। সিয়েকভের ঘরে প্রবেশ করে সেলাম ঠুকে চুবিকভের সামনে সে বসে পড়ল। ঘুমের ঘোর তার চোখে তখনও লেগে আছে, মদ এত বেশী টেনেছিল যে ভাল করে দাঁড়াতেও পারছিল না।

চুবিকভ প্রশ্ন করল, "তোমার মনিব কোথায়?"

"হুজুর, তিনি খুন হয়েছেন।"

এই কথা বলতে বলতে নিকোলাস্কা ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"খুন যে হয়েছে তা আমরা জানি, কিন্তু তার লাসটা কোথায়?"

"সবাই বলছে সেটা নাকি জানালা দিয়ে টেনে বাইরে নেওয়া হয়েছে, আর বাগানের ভিতর গোর দেওয়া হয়েছে।"

"বেশ···তদন্তের ফলাফল তা হলে রান্নাঘরে জানাজানি হয়েছে ···মোটেই ভাল নয়···তোমার মনিব যখন খুন হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে? সেদিন শনিবার ছিল—তাই নয় কি?"

বকের মত লম্বা ঘাড়টা উঁচু করে মাথা তুলে নিকোলাস্কা চিন্তা করতে লাগল। "হুজুর তা আমি বলতে পারি না···বড় বেশী মদ খেয়েছিলাম···কিছুই মনে নেই।"

হাত দুটি কচলাতে কচলাতে দাঁত বের করে ডুকভস্কি আস্তে আস্তে বলে উঠল, "একটা ওজর।"

"বেশ, তোমার মনিবের ঘরের জানালার নীচে রক্তের দাগ কেন?"

নিকোলাস্কা মাথা খাড়া করে চিন্তা করতে লাগল। পুলিস ক্যাপ্টেন বললো, "আর একটু চটপট চিন্তা করে দেখ দেখি।"

"এখখুনি বলছি হুজুর, ও একটা সামান্য ব্যাপার। একটা মুরগীর গলা কেটে দিয়েছিলাম। ওটা আমার হাত থেকে পাখা নাড়তে নাড়তে দৌড়ে চলে যায়, ওর রক্তই ওখানে লেগে আছে।"

প্রতি সন্ধ্যায় নূতন নূতন স্থানে নিকোলাস্কা সত্য সত্যই যে একটা করে মুরগী মারত তা ইফ্রেমও স্বীকার করল। এ ক্ষেত্রে আধখানা ধড়কাটা একটি মুরগীকে যদিও কেউ বাগানে দৌড়ে যেতে দেখে নি তথাপি এটা রীতিমত অস্বীকার করা গেল না। ডুকভস্কি হেসে বলল, "আর একটা ওজর একেবারে নির্ব্বোধের ওজর।"

"আকুস্কার সঙ্গে তোমার কোন ব্যাপার ঘটেছিল?"

"হ্যা, সে বিষয়ে আমিই মহাপাপী।"

"তোমার মনিব বুঝি তোমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়েছে।"

"না মোটেই নয়। আমাদের সামনে উপস্থিত এই ভদ্রলোক আইভান মিহালিচ সিয়েকভ উনিই আমার কাছ থেকে ওকে ফুসলে নিয়ে গেছেন, তার পর কর্তা ওর কাছ থেকে ওকে কিনে নিয়েছে। এই হচ্ছে আসল ঘটনা।"

সিয়েকভ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বাঁ দিকের চোখটা সে কচলাতে লাগল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওকে লক্ষ্য করে ডুকভস্কির তার কারণ নির্দ্ধারণ করতে দেরি হ'ল না, দেওয়ানের পরনের সেই গাঢ় নীলবর্ণের প্যান্ট—এতক্ষণ যেটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল, এখন তার নজরে পড়ল, লতানো ঝোপে পাওয়া সেই নীল সুতোর কথা তার মনে পড়ে গেল, চুবিকভও তার দিক থেকে সন্দিগ্ধভাবে সিয়েকভের পানে তাকাতে লাগল।

নিকোলাস্কাকে সে বলল, "তুমি এখন যেতে পার।"

"মিষ্টার সিয়েকভ আমি আপনাকে এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি? গত সপ্তাহের শনিবারে আপনি নিশ্চয়ই এখানে ছিলেন?"

"হ্যাঁ, দশটার সময় আমি মার্ক ইভানিচের সাথে নৈশ ভোজন শেষ করেছি।"

"বেশ তার পর?"

সিয়েকভ ঘাবড়ে গেল—টেবিল থেকে সে উঠে পড়ল।

ভাঙা ভাঙা জড়ানো কথায় সে বলতে লাগল,"তারপর···তারপর আমার ঠিক মনে নেই—ঐ সময় আমি একটু মাত্রা ছাড়িয়ে মদ্য পান করেছিলাম। কখন এবং কোথায় যে আমি ঘুমিয়েছিলাম তাও আমার স্মরণ হচ্ছে না···আপনারা সবাই আমার দিকে অমন ভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আমিই যেন তাকে খুন করেছি—আপনাদের ভাবে তাই মনে হচ্ছে।"

"ঘুম থেকে উঠে আপনি কোথায় পড়ে আছেন দেখলেন?"

"চাকরবাকরদের রান্নাঘরে আমি ঘুম থেকে জাগি···সকলেই তারা তা স্বীকার করবে। কিন্তু কি করে সেখানে গেলাম তা আমি বলতে পারব না।"

"অযথা উত্তেজিত হবেন না—আপনি আকুষ্কাকে চেনেন কি?"

"হ্যাঁ তবে বিশেষ ভাবে নয়।"

"সে কি ক্লাউজভের জন্য আপনাকে ছেড়ে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ,···ইফ্রেম, হুজুরদের আর কিছু খাবার দিয়ে যাও, ইভগ্রাফ কুজমিচ, আপনি এক পেয়ালা চা খাবেন কি?"

তার পর পাঁচ মিনিটের জন্য একটা অস্বস্তিকর পীড়াদায়ক নীরবতা, ডুকভস্কি নির্ব্বাক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার সিয়েকভের মুখের উপর ন্যস্ত। সিয়েকভের মুখখানা বিবর্ণ, নীরবতা ভেঙে গেল চুবিকভের কণ্ঠস্বরে।

সে তখন বলছে, "মৃতের ভগিনীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য আমরা ঐ বড় বাড়ীটাতে যেতে চাই। তার কাছে নিশ্চয়ই তথ্যপূর্ণ সাক্ষ্য মিলবে।"

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পাওনা ধন্যবাদটি সিয়েকভকে জানিয়ে চুবিকভ আর তার সহকারী বড় বাড়ীটাতে চলে গেল। পঁয়তাল্লিশ বছরের এক ভদ্রমহিলা সামনে দাঁড়িয়ে--ক্লাউজভের ভগিনী। তিনি তখন বিগ্রহ-পূজায় রত। ওদের হাতের ব্যাগ ও মাথার টুপি দেখেই তিনি বিবর্ণ হয়ে গেলেন।

আরম্ভটা চুবিকভই করল। "আপনার বিগ্রহ-সেবায় বাধা দেওয়ার জন্য মাপ চাচ্ছি। একটা অনুরোধ আপনার কাছে আমাদের আছে। আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যে সবাই সন্দেহ করছে—আপনার ভ্রাতা কোন প্রকারে খুন হয়েছেন। ভগবানের বিধান আপনি ত জানেনই—মহামান্য জার কি সামান্য চাষী কেউই মৃত্যুর হাত এড়াতে পারে না। আপনার কাছ থেকে কি কিছু তথ্য এ বিষয়ে আমরা সংগ্রহ করতে পারি—যা এ ঘটনায় কিছু আলোকপাত করতে পারে।"

কথা কয়টা শুনে মারিয়া ইভানোভনার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মুখটা হাতদুটি দিয়ে আবৃত করে মারিয়া বলে উঠল, "দোহাই আপনাদের ও বিষয় আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, আমি কিছুই—একেবারে কিছুই বলতে পারব না, আমি কিছুই পারব না, আমি কি করতে পারি? না—না, আমার ভায়ের সম্বন্ধে কোন কিছুই আমি বলতে পারব না। তার চাইতে বরং মরা আমার পক্ষে সহজ।"

চোখের জলের বান ডাকিয়ে মারিয়া ইভানোভনা অন্য ঘরে চলে গেল। ওর ঐ ভাব দেখে সরকারী কর্ম্মচারীদ্বয় পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে পশ্চাদপসরণ করল।

বেরুতে বেরুতে ডুকভস্কি শপথ করে বলল, "একটা পিশাচী, একেবারে আস্ত পিশাচী, মনে হয় ও কিছু জানে এবং জেনেও লুকোচ্ছে, আর ওর ঝিটার ভাব দেখেও কেমন একটু বেখাপ্পা মনে হ'ল, একটু দাঁড়াও না, পিশাচীর দল সব কিছু আমি টেনে বের করছি বলে।"

সন্ধ্যাকাল। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ। চুবিকভ ও তার সহকারী গাড়ী করে বাড়ী ফিরছে। মনে মনে সারাদিনের ঘটনাগুলি মিল খুঁজে বেড়াচ্ছে, উভয়েই পরিশ্রান্ত, উভয়েই নীরব। রাস্তায় কথাবার্ত্তা বলা চুবিকভের ধাতের বাইরে। যদিও বাচাল তবুও ডুকভস্কি বৃদ্ধের সম্মানার্থ নিজেকে সামলে নিচ্ছিল, শেষের দিকে অবশ্য আর নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারল না, ও বলতে সুরু করল, "ঐ নিকোলাস্কা যে এর সঙ্গে জড়িত তা নিঃসন্দেহ। ওর চেহারা দেখলেই এটা বেশ বোঝা যায়। ওর ওজরগুলিই ওকে ধরিয়ে দিয়েছে। অপরাধের উস্কানি আসলে ওই দিয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ও কেবলমাত্র ভাড়া-করা খুনী। আপনার এ বিষয়ে কি মত? বিচক্ষণ সিয়েকভও এতে নিতান্ত বাজে অংশ গ্রহণ করে নি। তার নীলবর্ণের প্যাণ্ট, তার হস্ত-বুদ্ধিতা, খুনের পরে ভয়ে চাকরদের রান্নাঘরে রাত্রিযাপন, তার ওজর ও আকুষ্কার প্রসঙ্গ সবই তাকে দোষী সাব্যস্ত করে।"

"বলে যাও বন্ধু, তোমারই জয়গান ঘোষিত হবে, তোমার মতে আকুষ্কাকে চিনলেই খুনী দলের একজন হতে হবে। ওহে উগ্রমস্তিষ্ক, তোমার অপরাধের তদন্ত না করে বোতলের দুধ খাওয়া উচিত। ধর তুমিও আকুষ্কার পিছনে ধাওয়া করতে—তার কি এই অর্থ হয় যে তুমিও ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত।"

'আকুষ্কা মাসখানেকের মেয়াদে আপনার গৃহেও পাচিকা ছিল, তবু সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলেছি কি? সেই শনিবার রাত্রে আমি আপনার সঙ্গে তাস খেলেছি, আপনাকে দেখেছি তাই বলে কি আমি আপনার পিছু পিছু ধাওয়া করব তাই বলতে চান, মশায়, স্ত্রীলোকটির প্রশ্ন এখানে আসছে না। প্রশ্নটি হচ্ছে বিশ্রী বিরক্তিজনক, হীন প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি—বিচক্ষণ যুবা প্রতারিত হতে চায় নি—দেখতে পাচ্ছেন তার অহঙ্কার। প্রতিশোধ সে নিতে চেয়েছিল। তার পর তার পুরু ঠোঁট দুটিতে তার কামুকতার লক্ষণ প্রকট। আকুষ্কার সঙ্গে অপসরার তুলনাকালে কেমন করে

সে তার লালসার ভাব প্রকাশ করছিল—ঐ শয়তান যে কামানলে দগ্ধ হচ্ছে তা নিঃসন্দেহ। আহত আত্মমর্য্যাদা আর অপরিতৃপ্ত কামনা তাকে বিষিয়ে তুলছিল। খুন করার পক্ষে ঐ যথেষ্ট। দু'জন আমাদের হাতে ধরা পড়েছে, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিটি কে? নিকোলাস্কা ও সিয়েকভ তাকে ধরেছিল। কে তা হ'লে তাকে শ্বাসরোধ করে কাবু করেছে? সিয়েকভ ভীরু প্রকৃতির—সহজেই সে দমে যায়—একটা কাপুরুষ বললেও চলে। নিকোলাস্কার স্তরের লোক বালিশ দিয়ে মুখ চেপে ধরে না—তারা বরং কুঠার কিংবা হাত-দা দিয়ে খুন করে—কোন তৃতীয় ব্যক্তি অবশ্যই তার শ্বাসরোধ করে ধরেছিল, কিন্তু কে সে?" টুপিটা তার চোখের উপর ডুকভস্কি টেনে নিল, সে গভীর চিন্তামগ্ন। গাড়ীখানা ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহ পর্য্যন্ত না যাওয়া অবধি সে চুপ করেই ছিল।

গৃহে প্রবেশ করে ওভারকোট খুলতে খুলতে সে বলল, "ঠিক মনে পড়েছে, ঠিক মনে পড়েছে, নিকোলাই ইরমোলিচ এটা যে এতক্ষণ কেন আমার মনে পড়ে নি তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না। তৃতীয় ব্যক্তি কে তা জানতে চান?"

"দয়া করে একবার থাম না। খাবার তৈরী হয়েছে, খেতে বস। চুবিকভ ও ডুকভস্কি খেতে বসল, ডুকভস্কি এক গ্লাস ভডকা ঢেলে পান করল। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে চোখ দুটি বিস্ফারিত করে বলতে লাগল, তৃতীয় ব্যক্তি একজন স্ত্রীলোক। সে সিয়েকভের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্লাউজভের শ্বাসরোধ করেছিল, হাঁ আমি সেই নিহত ব্যক্তির ভগিনীর কথাই বলছি—মারিয়া ইভানোভনা।"

চুবিকভ ভডকা পান করতে করতে একটু কেশে নিয়ে ডুকভস্কির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

"তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ? মাথায় কি কিছু গোলমাল আছে? মাথা ধরেছে কি?"

"আমি বেশ ভাল আছি। ধরুন আমি প্রকৃতিস্থ নই, কিন্তু আমাদের উপস্থিতিতে স্ত্রীলোকটির থ' মেরে যাওয়ার মানে কি করেন? কোনকিছু জানাতে তার আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে—আপনি মনে করেন? ধরুন এটা সামান্য বিষয় মেনে নিলাম। বেশ! কিন্তু তাদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটাও একবার ভেবে দেখুন। তার ভাই ছিল তার দু'চক্ষের বিষ। সে গভীর ভগবদ্‌বিশ্বাসী প্রাচীনপন্থী আর তার ভাই ছিল লম্পট, দুশ্চরিত্র, নাস্তিক—তাদের দু'জনের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। লোকে বলে, সে যে শয়তানের অনুচর তা তার ভগিনীকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল। সে তার ভগিনীর সামনেই ধর্ম্মের কথা বলত।"

"বেশ, তাতে হ'ল কি?"

"কিছুই বুঝছেন না বুঝি? স্ত্রীলোকটি ছিল প্রাচীনপন্থী খ্রীষ্টধর্ম্মে ঘোর বিশ্বাসী, অন্ধ বিশ্বাসের মোহে সে তাকে হত্যা করেছে। শুধু, লম্পট, চরিত্রহীন এক ব্যক্তিকেই সে কেবল হত্যা করে নি, তার সঙ্গে খ্রীষ্টবিরোধী অবিশ্বাসী এক ব্যক্তির কবলতার হতেও পৃথিবীকে রক্ষা করে সে তার ধর্ম্মের জন্য একটা মহান্ কাজ করেছে বলে বিশ্বাস করে। এসব প্রাচীনা, মোহমুগ্ধ অন্ধবিশ্বাসীদের আপনি চেনেন না। আপনার ডষ্টয়েভস্কি পড়া উচিত। লিয়েস্কভ ও পেটচারস্কি এ বিষয়ে কি বলেন জানেন? এ নিশ্চয়ই সে—আমি আমার জীবনপণ করে বলতে পারি। সেই তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। পিশাচী! আমরা যখন গেলাম তখন সে কি তার বিগ্রহসেবার ভান করছিল না শুধু আমাদের ধোকা দেবার জন্য। সে তখন মনে মনে বলে যাচ্ছিল, "আমি এখানে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে থাকব—ওরা আমাকে ধর্ম্মশীলা, শান্ত, সমাহিত মনে করে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে না।" পাপকার্য্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এইভাবে কাজ করে। নিকোলাই ইরমেলিচ দয়া করে এই কাজটার সম্পূর্ণ তদন্তের ভার আমার হস্তে অর্পণ করুন, আমিই কাজটা শেষ করি, আমিই আরম্ভ করেছি—আমাকেই শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে যেতে দিন।"

চুবিকভ মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল। ভ্রূকুটির সঙ্গে সে বলল, "কঠিন তদন্তগুলি আমিই শুধু করতে পারি। এতে মাথা না গলানোই তোমার পদের যোগ্য। আমি যা বলি তাই তুমি লিখে যাবে, এই তোমার কর্ত্তব্য কাজ।"

কপাটটা খটাস করে লাগিয়ে ডুকভস্কি লজ্জারক্ত মুখে অধোবদনে বেরিয়ে গেল।

ওর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে চুবিকভ বলে উঠল, "আস্ত ক্ষ্যাপা কোথাকার, বেশ চালাক চতুর—কেমন অতিমাত্রায় চটপটে, মেলা থেকে একটা চুরুটের বাক্স কিনে ওকে আমার উপহার দিতে হবে।"

পরদিন ভোরবেলা। ক্লাউজভকার চেয়ে তরুণবয়সী এক চাষী এসে উপস্থিত। মাথাটা তার দেহের আয়তনে বেশ বড়। ঠোঁট দুটি খরগোসের মত। তার নাম হ'ল ডানিস্কো; একটি মেষ-পালক। তার কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য মিলল।

তার বক্তব্য, "আমি একটু মদ খেয়েছিলাম। গভীর রাত পর্য্যন্ত আমি আমার বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম। মদ খেয়ে বাড়ী ফেরবার পথে গাটা একটু ঠাণ্ডা করবার জন্য স্নান করতে নামলাম। তখন কি দেখতে পেলাম জানেন? দু'জন লোক কালো একটা কি ভারী জিনিষ বয়ে বয়ে নদীর তীর ঘেষে যাচ্ছে। ওদের লক্ষ্য করে চীৎকার করে বললাম, "তোমরা বাপু কে? ওরা ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তারা মাকারেভ শাকসব্জীর ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। ওটা আমাদের মনিবের দেহ না হয়েই যায় না। যদি না হয় তবে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ে।"

সেই দিনই সন্ধ্যায় সিয়েকভ ও নিকোলাস্কাকে গ্রেপ্তার করে রক্ষী-পরিবেষ্টিত করে জেলা সদরে চালান দেওয়া হ'ল, শহরে কয়েদখানায় তাদের আটক করে রাখা হ'ল।

দুই

বার দিন পর।

ভোরবেলা। সবুজ রঙের একটা টেবিল। আয়নে বসে

ক্ষারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিকোলাই ইয়মেলিচ। সংবাদপত্রে ক্লাউজভ হত মামলার ঘটনা সে পড়ছিল। খাঁচায় আবদ্ধ নেকড়ে বাঘটির চুকভস্কি কক্ষটির মধ্যে চঞ্চল পদে পায়চারি করছিল।

াচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলে উঠল, "সিয়েকভও াল্যাস্বার অপরাধ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত আছেন, কিন্তু মারিয়া নাভনার অপরাধ আপনি অস্বীকার করছেন কেন? তার ক্ষ যথেষ্ট সাক্ষ্য কি পাচ্ছেন না?"

"আমি যে এটা একেবারেই বিশ্বাস করছি না তা কি আমি ছি? এ হতে পারে আমি স্বীকার করি—কিন্তু আমি এ বিষয়ে ন্ত নই···কোন অকাট্য প্রমাণ, কোন স্পষ্ট সাক্ষ্য এ বিষয়ে পাচ্ছি না, সবই মনগড়া···অন্ধ বিশ্বাস, মতভেদ, মন-চ্যি ইত্যাদি।"

"হায় রে, আইনজ্ঞের দল! পরিত্যক্ত একটা কুঠার আর াখা একটা বিছানা এই ত আপনারা চান। বেশ, আমি ই আপনার কাছে প্রমাণ করছি। ঘটনাটির মনস্তাত্ত্বিক সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য ছেড়ে দিন। আপনার এই মারিয়া নোভনাকে সাইবেরিয়া পাঠানো উচিত। আমি এটা প্রমাণ ত প্রস্তুত আছি। যদি মনগড়া প্রমাণ আপনার কাছে যথেষ্ট য় তবে না হয় কিছু বাস্তব চাক্ষুষ প্রমাণই দিচ্ছি···তাতে নি বুঝতে পারবেন—আমার সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য! কেবল আর ় আমাকে বলে যেতে দিন!"

"তুমি কি বলতে চাও?"

"সেই সুইডেনের দেশলাই! আপনি কি ভুলে গেছেন! আমি ওটা ভুলি নি! নিহত ব্যক্তির কক্ষে কে ওটা জ্বালিয়েছিল আমাকে বের করতে হবে! নিকোলাস্কা কিংবা সিয়েকভ কেউই জ্বালায় নি—কেননা তাদের তল্লাসী করে এরূপ কোন দেশলাই ায়া যায় নি, কিন্তু কোন তৃতীয় ব্যক্তি ওটা জ্বালিয়েছিলেন—নই মারিয়া ইভানোভনা। আমি এটা প্রমাণও করব, কেননা াকে সেই অঞ্চলটা ঘুরে একটু তদন্ত করতে দিন।"

"বেশ, বেশ, এবার বস দেখি—আমরা বরং আসামীদের একটু া করি।" ডুকভস্কি বসে পড়ল। লম্বা নাকটা তার সংবাদ-ত্রর অন্তরালে ডুবিয়ে দিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট চেঁচিয়ে বলল, "নিকোলাই টেটসভকে নিয়ে এস।"

নিকোলাস্কাকে এনে হাজির করা হ'ল। মুখখানা তার কবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দেহ কাঠির মত কৃশ। সে ানক ভাবে কাঁপছে।

চুবিকভ বলা সুরু করল, "টেটসভ, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তুমি চুরির য় দণ্ডিত হয়েছিল। আবার ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তুমি দ্বিতীয় বার ায় অপরাধে দণ্ড পেয়েছিলে?···সব আমরা জানি।"

নিকোলাস্কার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। ম্যাজিষ্ট্রেটের এ বিষয়ে ীর জ্ঞান তাকে অবাক করে দিল, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই বিস্ময় । শোকে রূপান্তরিত হ'ল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, । মুখচোখে জল দেবার জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

ম্যাজিষ্ট্রেট আবার চীৎকার করে বললেন, "সিয়েকভকে নিয়ে এস।"

সিয়েকভকে হাজির করা হ'ল। বার দিন পরে যুবকটির মুখাকৃতি আর চেনা যায় না। সে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মুখখানা রক্তহীন, পাণ্ডুর আর চাউনি উদাসীন।

চুবিকভ বলে উঠল, 'বসুন মিঃ সিয়েকভ। আশা করি আজ আপনার একটু সুমতি হয়েছে। আগের মত মিথ্যে কথা বলবেন না। এত দিন ক্লাউজভ হত্যার ব্যাপারে আপনি নির্দোষ এই কথাই বলে এসেছেন—যদিও আপনার বিপক্ষে প্রচুর সাক্ষ্য বর্তমান। আপনার আচরণ যুক্তিহীন, অপরাধ স্বীকার দোষক্ষালনের পথে বেশ সহায়তা করে। এই শেষবার আমি আপনাকে আবার বলছি। এবারও যদি আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার না করেন ত কাল কিন্তু আর সময় পাবেন না, বলুন, বলুন, বলে ফেলুন···।"

সিয়েকভ ধীরে ধীরে বলে উঠল, "আমি কিছুই জানি না, আমার বিপক্ষে আপনাদের কি যে সাক্ষ্য তাও আমার জানা নেই।"

'ও আপনার বৃথা চেষ্টা। বেশ, তা হলে ঘটনাটি আমিই বলছি। শনিবার সন্ধ্যার সময় আপনি ক্লাউজভের কক্ষে বসে তার সঙ্গে একত্রে ভডকা ও বীয়ার পান করেছিলেন, ডুকভস্কি সিয়েকভের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল—ঘটনাবিশ্লেষণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে আর দৃষ্টি নামায় নি। নিকোলাই আপনাদের পরি-চর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। রাত বারটা হতে একটার মধ্যে মার্ক ইভানিচ শয্যাগ্রহণ করবে বলে আপনাকে জানায়। সে প্রতিদিনই সেই সময় নিদ্রার জন্য শয়ন করে। যখন সে তার পা থেকে বুটজুতো খুলে ফেলেছে এবং আর এক পাটি বুটজুতো খুলতে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে আপনাকে তার জমিদারী সম্বন্ধে গোটাকয়েক উপদেশ দিচ্ছিল তখন কোন সঙ্কেত পেয়ে আপনি ও নিকোলাই একযোগে আপনাদের মাতাল মনিবকে ধরে গায়ের জোরে চিৎ করে বিছানায় ফেলে দিলেন, একজন তার পায়ের উপর আর একজন তার মাথার উপর বসে পড়েন। তার পর যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আপনারা আগেই এ বিষয়ে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলেন এবংযিনি আপনার পরি-চিত—কালো পোশাকপরা সেই স্ত্রীলোকটি তখন ঘরে প্রবেশ করে। সে বালিশটা তুলে নিয়ে ঐ দিয়ে তার শ্বাসরোধ করে। এই হাঙ্গামার সময় বাতি নিভে যায়। স্ত্রীলোকটি তার পকেট থেকে সুইডেনের এক দেশলাই বের করে বাতি জ্বালায়, কেমন, তাই নয় কি? আপনার মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে আমি সত্য ঘটনা বলে যাচ্ছি। তার পর এই ভাবে তাকে মেরে ফেলে এবং এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে আপনারা তার লাসটা জানালা দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে আসেন। লতানো ঝোপটার কাছে ওটা ফেলে রাখেন। যদি সে হঠাৎ চেতনা ফিরে পায় এই ভয়ে আপনারা কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওকে আঘাত করেন। তার পর লাসটা বয়ে নিয়ে গিয়ে আর একটা ঝোপের কাছে কিছুক্ষণ ফেলে রাখেন—কিছুকাল বিশ্রাম ও চিন্তা করে আবার ওটা নিয়ে চলেন। বেড়া ডিঙিয়ে অবশেষে ওটা নিয়ে আপনারা রাস্তায় চলতে থাকেন।

তার পর নদীর তীরে পৌঁছে একজন চাষীকে দেখে আপনারা ভয় পেয়ে যান। কিন্তু এ কি, এ কি, আপনার হ'ল কি?"

ধোপার কাচা কাপড়টির ন্যায় সাদা হয়ে সিয়েকভ টলতে টলতে উঠে পড়ল।

সে বলে উঠল, "আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! বেশ তাই—তাই হোক, কেবল দয়া করে আমাকে একটু বাইরে যেতে দিন।"

সিয়েকভকে বাইরে নিয়ে আসা হ'ল। আরাম করে সটান হয়ে দাড়িয়ে চুবিকভ বলে উঠল, "যাক অবশেষে ও এটা স্বীকার করে নিল। একেবারে দমে গিয়েছিল, কি কায়দা করেই না আমি তাকে ধরে ফেলেছি।"

ডুকভস্কি হাসতে হাসতে বলল "আর সেই কালো পোশাক-পরা স্ত্রীলোকটির কথাও অস্বীকার করে নি। তা সত্ত্বেও ঐ সুইডেনের দেশলাইটি নিয়ে আমি বড় গোলে পড়েছি—এ আর আমার সহ্য হচ্ছে না—আচ্ছা আমি তা হলে আসি।"

ডুকভস্কি টুপি পরে বাইরে বেরিয়ে গেল। চুবিকভ আকুস্কাকে জেরা করা আরম্ভ করল। আকুস্কা যে এ বিষয়ে কিছুই জানে না, তাই সে জানাল।

সন্ধ্যা ছয়টা। ভয়ানক উত্তেজিত ভাবে ডুকভস্কি ফিরে এল। জীবনে আর কখনও সে এত উত্তেজিত হয় নি। তার হাত দুটি এমন ভাবে কাঁপছিল যে, সে তার ওভারকোটটিও খুলতে পারছিল না। মুখখানা তার উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কোন খাঁটি সংবাদ না নিয়ে সে ফেরে নি।

ঝড়ের বেগে চুবিকভের কক্ষে প্রবেশ করে একটা আরাম-কেদারায় ঝুপ করে বসে পড়ে সে বলে উঠল, "পেয়েছি, পেয়েছি। আমি দিব্যি করে বলছি, আমার যেন আমার নিজের প্রতিভায় আস্থা হচ্ছে না। শুনুন, আমাদের সবকিছু গোল্লায় যাক, শুনে একেবারে থ' মেরে যাবেন। বেশ কৌতুকের কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়। তিন জন এ যাবৎ আপনার খপ্পরে আছে—তাই নয় কি? আমি চতুর্থ এক আততায়ী আবিষ্কার করেছি—সে স্ত্রীলোক। আর কি স্তরের স্ত্রীলোক জানেন? তাকে শুধু স্পর্শ করবার লোভে আমি দশ বছরের আয়ু কমিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ঘটনাটি শুনুন, আমি গাড়ী করে সারা ক্লাউজভকা ঘুরে বেড়ালাম—আঁকাবাঁকা ভাবে অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে তদন্ত করলাম। পথে সুইডেনের দেশলাই খুঁজে খুঁজে সারা দোকানপাট, সরাইখানা ইত্যাদি দেখে বেড়ালাম। প্রত্যেক স্থানেই নেই, নেই শুনতে পেলাম। এ পর্যন্ত আমি খুঁজেই আসছিলাম। অন্ততঃ বিশবার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে পড়েছিলাম। সারাদিন ধরে কেবল খুঁজেই যাচ্ছি। কেবল এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার খোঁজার জিনিষ আমি পেয়ে গেছি। এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে এক দোকানে এক ডজন ঐ দেশলাইয়ের বাক্স পেয়ে গেলাম। দেখা গেল তার মধ্যে একটা বাক্স খোয়া গেছে—আমি তখখুনি জিজ্ঞেস করলাম, কে এই দেশলাইটা কিনেছে? উত্তর পেলাম, কোন ভদ্রমহিলা—তার নামধাম এই সেই ইত্যাদি। তাঁর ঐ দেশলাই বেশ পছন্দ হয়েছিল—কেননা ওটা জ্বালাবার সময় বেশ কড় কড় শব্দ হয়, কলেজ থেকে তাড়ানো আমার মত একটা ভবঘুরে বেহায়া লোক দ্বারা কি মহৎ কায অনেক সময় সাধিত হতে পারে তা আমাদের ধারণার বাইরে। আজ থেকে আমি নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শিখব! চলুন, চলুন এবার কাজ আরম্ভ করি।"

"যাব, কোথায় যাব?"

"তাঁর কাছে সেই চতুর্থ আততায়ীর কাছে—আমাদের তাড়াতাড়ি করা উচিত। তা না হলে অধৈর্য্য হয়ে আমি একেবারে ফেটে যাব, জানতে চান কি কে সেই স্ত্রীলোক? সম্পূর্ণ আপনার ধারণার বাইরে, আমাদের বৃদ্ধ পুলিশ সুপার ইভগ্রাফ কুজমিচের তরুণী ভার্য্যা অলগা পেট্রোভনা, তিনিই হলেন চতুর্থ ব্যক্তি,তিনিই সেই দেশলাই কিনেছেন।"

"তুমি···তুমি···তুমি কি বিকৃতমস্তিষ্ক?"

"কেন—এ খুবই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ, তিনি ধূমপান করেন, দ্বিতীয়তঃ, তিনি ক্লাউজভের সঙ্গে গভীর প্রণয়াবদ্ধ। ক্লাউজভ কোন এক আকুস্কার জন্য তার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করেছিল। হায় রে—প্রতিহিংসা! আমার এখন মনে পড়েছে। একদিন রান্নাঘরে ওদের দুজনকে ফিসফাস করতে দেখেছিলাম। স্ত্রীলোকটি ওকে শাপান্ত করছিল, ও মনের সুখে মেয়েটির দেওয়া চুরুট টেনে টেনে ধোঁয়াটি ওর মুখের উপর ছাড়ছিল, থাক আসুন, আমার সঙ্গে আসুন···তাড়াতাড়ি করুন—সন্ধ্যা যে প্রায় হয়ে এল আমাদের এখনই রওনা হওয়া উচিত।"

"মস্তিষ্ক আমার এতদূর বিকৃত হয় নি যে, একটা দুঃস্থ বালকের জন্য একজন শ্রদ্ধেয়া ভদ্রমহিলার শান্তির ব্যাঘাত করতে যাব।"

"শ্রদ্ধেয় ভদ্র, আপনি একজন গণ্ডমূর্খ—তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হবার মোটেই যোগ্য নন। কোনদিন আপনাকে আমি তিরস্কার করতে সাহসী হই নি—কিন্তু এবার আমাকে তাই করতে বাধ্য করলেন। আপনি একজন নীচ মূর্খ বৃদ্ধ, আপনার মাথা খারাপ! আসুন নিকোলাই ইরমোলিচ, আমি আপনাকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট অস্বীকার করে হাত নাড়লেন আর গভীর বিরক্তিতে থুতু ফেলতে লাগলেন।

"আমি আপনাকে করজোড়ে মিনতি জানাচ্ছি—আমার জন্য নয়, তবে ন্যায়বিচারের জন্য। আমাকে দয়া করুন—জীবনে শুধু একটি বারের জন্য দয়া করুন।"

ডুকভস্কি হাঁটু গেড়ে তার সামনে অনুনয় জানাতে লাগল।

"নিকোলাই ইরমোলিচ ভাল করে কথা শুনুন। যদি আমি ঐ স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভুল করে থাকি তবে আমাকে লম্পট, গর্দ্দভ যা খুশি বলবেন। ভয়ানক জটিল ধরনের ঘটনা—তা ত আপনি জানেনই। অনেকটা উপন্যাসের মত। এই কাজের খ্যাতি সারা রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে। তারা কেবল প্রধান প্রধান জটিল

ঘটনার জন্যই আপনাকে ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তদন্তে নিয়োগ করবে। অপরিণামদর্শী বৃদ্ধ, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট ভ্রূযুগল কুঁচকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও টুপিটা মাথায় তুলে নিয়ে প্রস্তুত হলেন।

তিনি বললেন,"বেশ, চল, তোমার মাথায় দেখছি শয়তান চেপেছে। চল, চল—যাওয়া যাক।"

ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ীটা পুলিস সুপারের গৃহের দরজায় যখন থামল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

চুবিকভ কলিং বেল টিপতে গিয়ে বলল,"আমরা নরাধম, পশু—কেবল শান্তিপ্রিয় লোকদের ব্যাঘাত করে বেড়াই।"

"কিছু ভাববেন না, মনে কিছুই করবেন না, ঘাবড়াবেন না। আমরা বলব যে, আমাদের গাড়ীর একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে।"

চুবিকভ ও ডুকভস্কি দরজায় তেইশ বৎসর-বয়স্কা দীর্ঘগঠন স্বাস্থ্যবতী এক স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পেল। কালো কুচকুচে তার ভ্রূযুগল আর ঠোঁট দুটি ছিল রক্তের মত লাল। অলগা পেট্রোভনা নিজেই সেখানে দাঁড়িয়ে। মুখখানা তার হাসিতে উদ্ভাসিত করে সে বলে উঠল, "বা, কি সুন্দর···আপনারা ঠিক আমাদের নৈশ ভোজনের সময় উপস্থিত হয়েছেন। ইভগ্রাফ কুজমিচ বাড়ীতে নেই···সে পুরোহিতের ওখানে গেছে। ওকে ছাড়াই আমরা আরম্ভ করতে পারি, বসুন, তদন্তের জন্য আপনারা এসেছেন কি?"

বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করে আরাম-কেদারায় বসে চুবিকভ বলা সুরু করল, "হ্যাঁ, গাড়ীর একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে, বুঝেছেন···।"

ডুকভস্কি ফিস ফিস করে বলল, "ওকে চট করে এ বিষয়ে জেরা করে বোকা বানিয়ে দিন।"

"একটা স্প্রিং···হ্যাঁ-হ্যাঁ আমরা এইমাত্র এখানে এসেছি।"

"ওকে ঘাবড়ে দিন, আমি বলছি—আপনি যদি বিস্তারিত বলা সুরু করেন তা হলে সে সব বুঝে ফেলবে।"

দাঁড়িয়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে চুবিকভ বলল, "তোমার যা খুশি তাই কর—আমাকে রেহাই দাও—আমি পারি না—তোমার রান্না জিনিষ তুমিই খাও।"

পুলিস সুপারের স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিজের লম্বা নাকটা কুঁচকে ডুকভস্কি বলল, "হ্যাঁ, সেই স্প্রিং—আমরা দেখুন—নৈশ ভোজনে আসি নি—ইভগ্রাফ কুজমিচের সঙ্গেও দেখা করতে আসি নি। আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই—দেখুন, মার্ক ইভানিচ যাকে আপনি হত্যা করেছেন—সে কোথায়?"

পুলিস সুপারের স্ত্রী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভাঙা ভাঙা কথায় বলতে লাগলেন, "কি? কোন্ মার্ক ইভানিচ?"

সহসা তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। "আমি—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"সরকারের আইন বিভাগের তরফ থেকে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি। ক্লাউজভ কোথায়? এ ঘটনা আমাদের সব জানা হয়ে গেছে।"

ডুকভস্কির দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "কার কাছে শুনলেন?"

"কোথায় সে দয়া করে আমাদের জানাবেন কি?"

"কিন্তু কি করে আপনারা জানতে পেলেন? কে আপনাদের বলল?"

"আমরা সব জানি, আইনশৃঙ্খলার দিক থেকে আমি আবার আপনাকে সে কোথায় জিজ্ঞেস করছি।"

ভদ্রমহিলার হতবুদ্ধিতায় একটু সাহস পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট তখন তাঁর কাছে গেলেন।

"আমাদের বলে ফেলুন—আমরা চলে যাচ্ছি নতুবা···"

"তাকে পেয়ে আপনারা কি করবেন?"

"ওসব প্রশ্নের দরকার কি? আমরা আপনার কাছে সংবাদ জানতে চাচ্ছি। আপনি কেঁপে উঠছেন—হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন হ্যাঁ সে খুন হয়েছে আর আপনিই যে তাকে খুন করেছেন তা আমরা জানি। আপনার সহকারীরাই আপনাকে ধরিয়ে দিয়েছে।"

পুলিস সুপারের স্ত্রীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। হাত কচলাতে কচলাতে তিনি ধীরে ধীরে বলে উঠলেন, "এদিকে আসুন। তাড়াতাড়ি করুন। ঐ বাগানবাড়ীর মধ্যে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ভগবানের দোহাই আমার স্বামীকে এ কথা বলবেন না। আমি আপনাদের অনুনয় জানাচ্ছি, তাঁর পক্ষে এ সংবাদ বিষময় হবে।"

মস্ত বড় একটা চাবি দেওয়াল থেকে নিয়ে পুলিস সুপারের স্ত্রী তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে লাগলেন। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে তাঁরা বাগানের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। চারিদিক অন্ধকার। কিছুক্ষণ আগে এক পসলা ঝির ঝির করে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রমহিলা আগে আগে চলতে লাগলেন। লম্বা লম্বা ঘাসবনের মধ্য দিয়ে জল কাদার মধ্যে চপ চপ শব্দ করতে করতে চুবিকভ ও ডুকভস্কি তার পিছু পিছু যাচ্ছিল। মস্ত বড় বাগান। আর জলকাদা তাদের পায়ে ঠেকল না। সামনে চষা জমি। অন্ধকারে গাছের অবয়বগুলি একটু একটু দেখা যাচ্ছে। তরুশ্রেণীর ফাক দিয়ে আবছা অন্ধকারে একটি ছোট বাগানবাড়ী নজরে পড়ল।

ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "ঐ হচ্ছে বাগানবাড়ী, কাউকে বলবেন না যেন, এই আমার অনুরোধ।"

বাগানবাড়ীর দরজায় চুবিকভ ও ডুকভস্কি মস্ত বড় একটি তালা লাগানো আছে দেখতে পেল।

চুবিকভ তার সহকারীকে বলে উঠল,"তোমার দেশলাই ও মোমবাতি নিয়ে প্রস্তুত থাক।"

তালাটা খুলে ফেলে পুলিস সুপারের স্ত্রী অতিথিদের বাগানবাড়ীতে প্রবেশ করতে দিলেন। ডুকভস্কি মোমবাতি জালিয়ে পথ দেখে চলতে লাগল। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, টেবিলের উপর একটি ভোজনপাত্র। ঠাণ্ডা রান্নাকরা তরকারী ওতে রয়েছে। আর এক পাত্রে একটু চাটনি।

"এগিয়ে যাও।"

তারা পরের কক্ষটির মধ্যেও প্রবেশ করল। সেখানেও একটা টেবিলের উপর রান্না-করা এক ডিশ মাংস। এক বোতল ভডকা, ছুরি, কাঁটা, চামচ ইত্যাদি সবই রয়েছে।

"কিন্তু কোথায় সে, সেই লাসটা কোথায়?"

পুলিস সুপারের স্ত্রী কাঁপতে কাঁপতে বিবর্ণ হয়ে ফিস ফিস করে উত্তর দিলেন, "সে উপরের তাকে আছে।"

মোমবাতিটা এক হাতে নিয়ে আর এক হাত দিয়ে ধীরে ধীরে ডুকভস্কি উপরের তাক পর্য্যন্ত উঠে গেল। মস্ত বড় একটা পালকের গদি। তার উপর শায়িত একটা স্থির, অচঞ্চল, দীর্ঘ মনুষ্যদেহ। শরীর থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ বেরুচ্ছে। অনেকটা নাকডাকার মত। চীৎকার করে ডুকভস্কি বলে উঠল, "ওরা আমাদের সবাইকে জব্দ করেছে। সব গোল্লায় যাক! এ সে নয়! কোন জ্যান্ত নিরেট গর্দ্দভ এখানে শুয়ে আছে। ওহে, তুমি কে? তুমি জাহান্নমে যাও!"

দেহটি যেন শিস দেবার মত একটি শব্দ করে নিশ্বাস টেনে নিল, তার পর একটু নড়ে উঠল। ডুকভস্কি কনুই দিয়ে তাকে গুতো দিলে। সেই দেহটি তার হাত দু'টি তুলে, সোজা হয়ে মাথা খাড়া করে উঠে বসল।

ভীষণ মোটা কর্কশ কণ্ঠে সে বলে উঠল,"কে আমাকে গুতোচ্ছ? তুমি কি চাও, বলত?"

মোমবাতিটা অপরিচিতের মুখের কাছে তুলে ধরে ডুকভস্কি আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল। দেহটির রক্তিম নাসিকা, অবিন্যস্ত চুল, ঘনকৃষ্ণ গোঁফ—এক প্রান্ত ঊর্দ্ধপানে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করছে, এই সব লক্ষণ হতে তাকে অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ প্রাক্তন সামরিক কর্ম্মচারী ক্লাউজভ বলে চেনা গেল।

"আপনি···মার্ক···ই-ভা-নি-চ। অসম্ভব!"

ম্যাজিষ্ট্রেট উপরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন।

"হ্যাঁ, এ আমিই, আর আপনি ডুকভস্কি। এখানে আপনারা কি মাথামুণ্ডু চান বলুন ত? আর নীচে ঐ কদাকার মাথাটি কার? ভগবান, তোমার কাছে ক্ষমা চাই, এ দেখছি আমাদের তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট! সারা দুনিয়া পড়ে থাকতে কি জন্ম আপনারা এখানে পচে মরতে এসেছেন?"

তাড়াতাড়ি নেমে এসে ক্লাউজভ চুবিকভকে আলিঙ্গন করল, অলগা পেট্রোভনা এই অবসরে দরজার ফাঁক দিয়ে অন্তর্হিত হ'ল।

"যাক যে কারণেই আপনারা এখানে এসে থাকুন, চলুন এখন একত্র বসে একটু মদ্যপান করা যাক। লা-লা-লা-লা-লা-লা চলুন একটু মদ চালাই! কে আপনাদের এখানে আনল? আমি যে এখানে আছি কেমন করে তার খোঁজ পেলেন? যাক তাতে কিছু আসে যায় না! একটু মদ্য পান করুন!"

ক্লাউজভ আলো জালিয়ে তিন গ্লাস ভডকা ঢেলে নিল।

অঞ্জলি সঞ্চালন করে ম্যাজিষ্ট্রেট বলে উঠল, "আসল কথা কি জানেন? আমরা আপনাকে একেবারেই চিনতে বা বুঝতে পারছি না। একি আপনিই না আর কেউ?"

"আসুন ত মশায়···আমাকে লম্বা একটা ধর্ম্মের বক্তৃতা দিতে বলেন কি? বিন্দুমাত্র ঘাবড়াবেন না! এই যে, ডুকভস্কি মহোদয়, আপনার ভডকাটি পান করে ফেলুন! বন্ধুগণ, চলুন আমরা বাকী সময়টা···এ কি, আপনি অমন হাঁ করে কি দেখছেন? খেয়ে ফেলুন!"

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত হাত তুলে ভডকাটা পান করে ম্যাজিষ্ট্রেট বলে উঠলেন, "এ সব সত্বেও আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি এখানে কেন?"

"আমি এখানে থেকে যদি আরাম পাই তবে কেনই বা থাকব না?" ক্লাউজভ ভডকা পান করে একটু মাংস চিবিয়ে নিল।

"আমি এখানে পুলিস সুপার মহাশয়ের স্ত্রীর সঙ্গে অজ্ঞাতবাস করছি তা ত দেখতেই পাচ্ছেন। ভূতের মত পোড়ো বাগান-বাড়ীর ভাঙা ভিটেয় বন্যপ্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে বাস করছি—যাক তা হলে এবার ওটা পান করে ফেলুন। বুড়ো দাদু বুঝতেই ত পারছেন মেয়েটির জন্য মনটা আমার যেন কেমন করে উঠছিল। তার প্রতি আমার করুণা উথলে উঠল। আর সেই জন্য আমি এই পরিত্যক্ত বাগানবাড়ীতে আস্তানা গড়ে তুললাম,ক'দিন আমার বেশ ভূরিভোজন হচ্ছে। সামনের সপ্তাহে এই নিবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব। যথেষ্ট তৃপ্তি পেয়েছি।"

ডুকভস্কি বলে উঠল, "একেবারে ভৌতিক ব্যাপার!"

"এখানে ভৌতিক আবার কি আছে?"

"একেবারে ধারণার অতীত! দোহাই ভগবান, আপনার এক পাটি বুটজুতো কি করে বাগানে পড়েছিল?"

"কোন বুটজুতো?"

"যার একপাটি আমরা শয়নকক্ষে পেয়েছি।"

"ও জেনে আপনাদের কি লাভ? ও ত মশায়, আপনার ব্যাপার নয়। কিন্তু আগে মদটা ত পান করুন। সব জাহান্নামে যাক। আমাকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিয়ে যখন তুলেছেন তখন মদ আপনার খেতেই হবে। শুনুন, ঐ বুটজুতো সম্বন্ধে মজার এক গল্প আছে। অলগার এখানে আসবার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। একটু মাত্রা ছাড়িয়ে খেয়েছিলাম। আমার বাড়ীর জানালার নীচে এসে সে আমাকে গালিগালাজ করতে থাকে। মদের ঘোরে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে একপাটি বুটজুতো আমি ওর দিকে ছুড়ে মারি। সে জানালা বেয়ে উপরে এসে বাতি জালল, আর মদ খাওয়ার জন্য লাঠি দিয়ে বেশ কয়েক ঘা আমার পিঠে দমাদম মারল। এখানে এত দিন যথেষ্ট ভূরিভোজন হয়েছে। ভডকা আরও কত সুস্বাদু জিনিষ! কিন্তু, এ কি, আপনারা আবার চললেন কোথায়? চুবিকভ, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েকবার ঘৃণায় থুথু ফেলে বাগানবাড়ীর বাইরে চলে এলেন, অবনত মস্তকে অধোবদনে ডুকভস্কি তার অনুসরণ করল।

উভয়েই নীরব। তারা গাড়ীতে গিয়ে বসল, তার পর গাড়ী চালিয়ে চলে গেল।

পথটা এত দীর্ঘ ও জনবিরল জীবনে আর কখনও তাদের মনে হয় নি। উভয়েই নির্ব্বাক। ক্রোধে উত্তেজনায় সারা পথটা চুবিকভ কাঁপছিল।

জামার কলারটা উঁচু করে ডুকভস্কি মুখখানা ঢেকে বসেছিল। তার ভয় হচ্ছিল পাছে চারিদিকের এই অন্ধকার আর এই টিপ টিপ বৃষ্টি তার মুখ হতে লজ্জার কাহিনীটা টের পেয়ে বসে।

গৃহে ফিরে ম্যাজিষ্ট্রেট ডাক্তার টুটিয়েভকে তার জন্য অপেক্ষা করতে দেখতে পেল। ডাক্তার টেবিলে বসে 'নেভা' সংবাদপত্রের পাতা উল্টাতে উল্টাতে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল।

বিষণ্ণ হাসিতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভিবাদন জানিয়ে সে বলে উঠল, "পৃথিবীতে আজ কিনা হচ্ছে, অষ্ট্রিয়া আবার উঠে পড়ে লেগেছে এবং গ্লাডষ্টোনও এতে জড়িত আছেন।"

টুপীটা টেবিলের নীচে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চুবিকভ কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল, "ওহে নরাধম, আমাকে আর জ্বালিও না বলছি। হাজার বার তোমাকে বলেছি যে, রাজনীতির চর্চ্চা আমার ভাল লাগে না। এখন রাজনীতি আলোচনার সময় নয়।" তার পর ডুকভস্কির দিকে চেয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতটা ওর দিকে সঞ্চালন করে বলে উঠল, আর তুমি যতদিন জীবিত আছ আজকের এই ঘটনা আমি ভুলব না।"

"কিন্তু ভাবুন ত, সেই সুইডেনের দেশলাই, গোড়াতেই কেমন করে আমি ধরে ফেলেছিলাম।"

"চুলোয় যাক তোমার দেশলাই! ওটা নিয়ে তুমি গিলে খাওগে! এখন বিদায় হও, আমাকে আর বিরক্ত করো না। আমি কি যে করে ফেলব তা আগে থেকে কিছু বলতে পারি না। তুমি আর আমার সামনে এস না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপীটা হাতে নিয়ে ডুকভস্কি বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে সে মনে মনে স্থির করল, "আজ আমাকে পুরোমাত্রায় মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে পড়ে থাকতে হবে।" এই ভেবে সে শুঁড়ীখানার দিকে চলতে লাগল।

বাগানবাড়ী থেকে গৃহে ফিরে পুলিস সুপারের স্ত্রী বৈঠকখানায় তার স্বামীকে অপেক্ষা করতে দেখলেন।

তাঁর স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট এখানে কেন এসেছিল?"

"তারা যে ক্লাউজভকে খুঁজে পেয়েছে তাই জানাতে এসেছিল। এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে তারা তাকে অবস্থান করছে দেখতে পেয়েছে, কি মজার ব্যাপার ভেবে দেখ দিকিন।"

পুলিস সুপার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার পর দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ করে বলে উঠল, "হায়, মার্ক ইভানিচ—মার্ক ইভানিচ, তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম মদ্যপান ও লাম্পট্য কখনও কারও ভাল করে না। আমি তোমাকে ঠিক এইরূপই বলছিলাম, কিন্তু তুমি তাতে কর্ণপাতও কর নি!"

অমিতাভ

শ্রীউমাপদ নাথ

এই পৃথিবীর কুলালচক্রে ভব ভবিষ্ণু নিতি;
সত্য এখানে জরা ও মরণ, মিথ্যা সুখ ও স্থিতি।
অনিত্য মায়া জাঁকায় আসর; অন্ধ মোহের ডোর
দিবালোকে পরে সাধুর সজ্জা, রাত্রে সিঁদেল চোর।
রাজার হস্তে শাসনদণ্ড, জোয়াল প্রজার কাঁধে:
উভয়ের চোখে বলদের ঠুলি—মৃত্যু দুয়েরে বাঁধে।
সেই ভবপীঠে এসেছিলে তুমি। মৃত্যু, জরা ও রোগ
দেখিলে চক্ষে মানুষেরে সদা দিতেছে কি দুর্ভোগ।
লৌকিক পথে করিলে সাধনা, বিচার করিলে মনে
কোথা সে রন্ধ্রে শনির প্রবেশ ঘটে যেথা প্রতিক্ষণে।
শত জিজ্ঞাসা করিলে হাজির—একটি জবাব চাই,
দেহ হোক লয়, অবদ্ধ তবু ছাড়িব না এই ঠাঁই।

কঠোর পণের দৃঢ়তর ছবি উপোসী অস্থিগুলি
রহিল অটল। সে চিত্র আঁকে এমন কি আছে তুলি?
এক যুগ-কাল ক্ষয় হয়ে গেল, তুমি তবু অক্ষয়,
আসন ছাড়িলে যেদিন সেদিন দুই হাতে বরাভয়।
তপ্ত কটাহে ঢেলে দিলে তব শান্তির শীত নীর,
খুলে দিলে চোখ—সৃজিলে ধর্ম্ম, তথাগত মহাবীর!
আমরা এখনও চাই নির্ব্বাণ—জীবন-দীপের নহে,
নিত্য ক্লেশের; লক্ষ মৃত্যু এখানের কালীদহে।
সহস্র নাগে বেষ্টিত প্রাণ, মৃত আয়ু ক্ষীয়মাণ:
অন্তরে চাহি তোমার হাতের সুদক্ষ পরিত্রাণ।
ওগো অমিতাভ, নিয়ে চলো সেই আলোকের মহাদেশে
চিত্ত যেখানে নিয়ত নীরব, আনন্দ অবশেষে।

আমরা এখনও প্রতীক্ষা করি, উঁকি দিই প্রতি ঘরে
গোপনে কোথায় আসিলে বা তুমি যুগ-নির্ব্বাণ তরে।

গান

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী

নিকটতম তুমি দূরে নও
তুমি দূরে নও
তুমি দূরে নও—
হৃদয়ের প্রীতি-পুষ্পে
তুমি প্রীত হও
তুমি প্রীত হও !

বাণী তব কানে শোনা যায়
রূপ তব চোখে দেখা যায়—
স্পর্শ তব লাগে সারা গায়
কে বলে তোমা দূরে রও !

মোহে যবে রই অচেতন
জাগাইতে কত না যতন—
কত না দুখ-বেদনায়
বারে বারে কর সচেতন !

কাহারেও ছাড়িবে না যে
সকলেরে টানিবে কাছে—
ধন্য তব প্রেম দয়াময়
হৃদয়ে হৃদয়ে ধরা দাও ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

	১´					0					১´					0				
॥	প্‌া	ধ্‌া	সা	সা	।	সা	-া	সা	রা	।	রা	গা	গা	-া	।	-া	-া	গা	রসা	।
	নি	ক	ট	ত		ম	০	তু	মি		দূ	রে	ন	০		০	ও	তু	মি০	

১´ 0 ১´ 0 ॥
সা সরা রা -া | -া -া সা ন্া । ধন্া ধন্া সা -া | -া -া -া -া ।
দূ রে ন ০ ০ ও তু মি দূ রে ন ০ ০ ০ ও ০

১´ 0 ১´ 0
সা সা সা রা | গা পা পপা -মা । গা -া -া -া | -া -া গা রসা ।
হৃ দ য়ে র প্রী তি পু৹ ষ্ পে ০ ০ ০ ০ ০ তু মি৹

১ 0 ১´ 0
সা রা রা -া | -া -া সা ন্া । ধন্া ধন্া সা -া | -া -া -া -া ।
প্রী ত হ ০ ০ ও তু মি প্রী ত হ ০ ০ ০ ও ০

১´ 0 ১´ 0
॥ { রা রা রা রা | গা পা পা পধা । ধা -া -া -া | -া -া -া -া ।
{ বা ণী ত ব কা নে শো না৹ যা ০ ০ ০ ০ ০ য়্ ০

১´ 0 ১´ 0 [-া]
পা -র্সা না ধা | পা পগা পা মা । গা -া -া -া | -া -া -া (মা) } ।
রূ প্ ত ব চো খে৹ দে খা যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ }

১´ 0 ১´ 0
গপা পা পা হ্মা | পা পা পা হ্মা । ধপপা -া -া -া | -া -া -মা -গা ।
স্প র্শ ত ব লা গে সা রা গা৹৹ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

১´ 0 ১ 0
গা পা মা গা | রসা -ন্া সা গরা । গা -া -া -া | -া -া -া -া ॥
কে ব লে তো মা৹ ০ দূ রে৹ র ০ ০ ০ ০ ০ ও ০

১´ 0 ১´ 0
॥ { সা সা সা সা | ন্া ধ্া ন্া সা । রা -া -া -া | -া -া -া -া ।
{ মো হে ম বে র ই অ চে ত ০ ০ ০ ০ ০ ন্ ০

১´ 0 ১´ 0 [-া -া]
ন্‌া সা রা গা | রা গা পা মা I গা -া া -া | -া -া (-রা -া)} I
জা গা ই তে ক ত না য ত ০ ০ ০ ০ ০ ন্‌ ০}

১´ 0 ১´ 0
গা পা পা হ্মা | পাঃ -হ্মঃ পা না I ধপা -া -া -া | -া -া -মা -গা I
ক ত না হু খ ০ বে দ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্‌

১´ 0 ১´ 0
গা পা মা গা | রা সা ন্‌ধ্‌া ন্‌া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
বা রে বা রে ক র স০ চে ত ০ ০ ০ ০ ০ ন্‌ ০

১´ 0 ১´ 0
I {রা রা রা -া | গা পা পা পধা I ধা -া -া -া | -া -া -া -া I
{কা হা রে ও ছা ড়ি বে না যে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ 0 ১´ 0 [-া]
পা র্সা না ধা | পা পা গপা মা I গা -া -া -া | -া -া -া (-মা)} I
স ক লে রে টা নি বে০ কা ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০}

১´ 0 ১´ 0
গপা পা পা হ্মা | পা -া পা হ্মা I ধপপা -া -া -া | -া -া -মা -গা I
ধ ন্য ত ব প্রে ম্‌ দ য়া ম০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্‌

১´ 0 ১´ 0
গা পা মা গা | রা সন্‌া সা গরা I গা -া -া -া | -া -া -া -া II
হৃ দ য়ে হৃ দ য়ে০ ধ রা০ বা ০ ০ ০ ০ ০ ও ০

দিন ও রাত্রি

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

উষা এসে খুলে দেয় পূর্বাশার উদয়-তোরণ ;
রাত্রির নিথর বুকে জাগে মৃদু পুলক-কম্পন,
ায়-আগমনক্ষণে উৎকন্ঠিতা প্রেয়সীর হৃদয়ের যেন দুরুদুরু !
তার পরে হয় সুরু
সপ্তাশ্ববাহিত এক-চক্র রথে
সবিতার প্রদক্ষিণ ক্রান্তি কক্ষ-পথে।
তমস্বিনী যামিনীর যোগনিদ্রা ভেঙে যায় ;
আলোকের আঁধারে লুকায়
রাত্রির বুকের মণিগুলি ;
স্বপ্ন যাই ভুলি !
স্বপ্নাসবে অবলীঢ় মন
রূঢ় দিবালোকে দেখে সংগ্রামের কঠিন স্বপন।
অস্ফুট জ্যোতির পদ্ম একে একে দলগুলি খোলে,
বর্ণালীর সপ্তরশ্মি পরকাশে আলোকের শুভ্র-শতদলে !
নিকট নিকটতর হয়, দূর যায় আরো দূরে সরি,
নেপথ্যে রহিয়া যায় রাত্রির কণ্ঠের হার—স্নিগ্ধ শতনরী !
চক্র ঘুরে যায় ;
প্রতীচীর প্রত্যন্তসীমায়
কারা যেন আবীর ছড়ায় !
রাত্রি, দিন আর—
দুই রূপ একই সত্তার ;
গোধূলির দেহলীতে 'শুভ-দৃষ্টি' হয় দু'জনার !
সহসা ঝাঁপায়ে পড়ে ক্ষীয়মান তপনের কোলে
নিশীথিনী ঝাঁপে তারে পুঞ্জপুঞ্জ নিবিড় কুন্তলে।

দীর্ঘ-বিরহের পরে এ ক্ষণ-মিলন ;
অনুরাগে আঁকে রবি বিদায়ের রক্তিম চুম্বন !
প্রভাত-সন্ধ্যায় দেখি পিরীতির বিপরীত রীতি ;
দিনের চিতায় ঘটে সহমৃতা রাত্রির বিস্মৃতি।
দিন-রাত্রি, রাত্রি-দিন এই মত যায় আর আসে,
লুকোচুরি খেলা ভালোবাসে।
পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি দিয়ে ভাবি যা গিয়াছে
অখণ্ডের অন্তরেতে আছে, তাহা আছে।
জন্ম-মৃত্যু 'মান'-চিহ্ন জীবন-ছন্দের,
অন্তরা-সঞ্চারী ঘুরে শেষ হয় সমে আনন্দের !
মৃত্যু সে তো লুপ্তি নয়, জীবনের ক্ষণ-আবরণ ;
সুপ্তিতে প্রতীত হয় লুপ্তির বিভ্রম !
সাহাহ্নের দিন মোর অলক্ষ্য-অদূরে
অপেক্ষা করিয়া আছে মরণ-বঁধুরে।
বিদেহী বিরহী মন পাবে না কি ফিরে
মৃত্যুর পাথারে তার হারানো মণিরে ?
তিমিরের বক্ষ বিদারিয়া জ্বলিবে না আলোকের জয়,
হবে নাকি জীবনের নব অভ্যুদয় ?
নাই যদি হয় ?
অসত্তার অতলেতে জীব-সত্তা যদি পায় লয় ?
শুষ্ক এই শূন্যবাদে মন নাহি ভরে
চিত্ত-সূচী চেয়ে রয় ধরিত্রীর 'চৌম্বক-উত্তরে'।
মন মোর মরিতে চাহে না
না শুধিয়া ধরণীর স্নেহের এ দেনা।
এ মা'টিরে কোন্ প্রাণে ভুলি ?
সাধ হয় জন্মে জন্মে অঙ্গে মাখি এর পুণ্য ধূলি !

লবণ-উৎপাদন ও কুটীরশিল্প

অধ্যাপক শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বিশ্বাস (সান্যাল)

লবণের উৎপত্তি : মানুষের নিত্য ব্যবহারের একান্ত আবশ্যক দ্রব্যগুলির মধ্যে লবণ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। নানা ক্ষেত্রে ইহার নানাবিধ প্রয়োগ ছাড়াও শরীর ধারণের জন্য ইহা অপরিহার্য্য। মানুষ যখন হইতে কাঁচা মাংস আহারের অভ্যাস ত্যাগ করিল, তখন হইতেই তাহাকে খাদ্যের মাধ্যমে পৃথক ভাবে লবণ গ্রহণের অভ্যাস করিতে হইল। কাঁচা মাংসে প্রতি আড়াই মণে অন্ততঃ আধ সের নুণ থাকে। কাঁচা মাংস ব্যতীত শাক-সব্জী, ফল, মাটি, সাধারণ জল, সর্ব্বপ্রকারের শিলা প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই কম বেশী ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ভূমণ্ডলে যে সব বস্তু অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে অক্সিজেন, সিলিকন, এলুমিনিয়ম প্রভৃতির সহিত লবণের নামও উল্লেখযোগ্য।

সাঁকোর নীচে সমুদ্রের সহিত যুক্ত খাল, অদূরে গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কারখানা

কিন্তু নানা বস্তুতে লবণের অস্তিত্ব থাকিলেও উহা কেবলমাত্র কয়েকটি উৎস হইতেই লাভজনক ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব। সমুদ্র, লবণ-হ্রদ, লবণ-কূপ প্রভৃতির লবণোদক হইতে এবং শুষ্ক লবণ-হ্রদ (যেমন সম্বর-হ্রদ) ও লবণ-পাহাড় হইতে প্রভূত পরিমাণে লবণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবার সমুদ্র হইতেই উৎপন্ন হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লবণ। সমুদ্রজাত লবণ সম্বন্ধে বলা যায় যে, পৃথিবীর মোট তের কোটি নব্বই লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী যে সমুদ্র রহিয়াছে তাহার সমগ্র নিম্নদেশ যদি সমুদ্রজাত বিভিন্ন প্রকারের লবণ* একই উচ্চতায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ঐ স্তরের উচ্চতা দাঁড়াইবে ১৯৬ ফুট, আর উহার ১৫৫ ফুটই হইবে আমাদের সাধারণ লবণ।

লবণোদক উত্তোলনের পাম্প-গৃহ ও সঞ্চালন নালাসমূহ

বাংলার লবণ : লবণ-উৎপাদন-প্রথা ভারতের একটি প্রাচীন শিল্প। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ লবণে স্বাবলম্বী ছিল। শেষোক্ত সময় হইতে ইংরেজ সরকার বিলাতের লবণশিল্পের সমৃদ্ধির জন্য লিভারপুল ও চেশায়ার কোম্পানীগুলিকে ভারতে নুণ আমদানী করিতে উৎসাহ দিতে থাকে এবং তদবধি ভারতীয় নুণের উপর নিয়মিত শুল্কভার চাপাইয়া এই লবণশিল্পকে অনিবার্য্য ধ্বংসের পথে আগাইয়া দেয়।

ভারতবর্ষ পুনরায় ১৯৫৩ সনে লবণ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ভারত ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সনে কিছু কিছু নুণ নেপাল, পূর্ব্ব-পাকিস্থান, জাপান এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকায় রপ্তানি করিতেও সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বার্ষিক প্রায় সাত কোটি মণ নুণ প্রয়োজন হয়। সোডা-অ্যাস, কষ্টিক-

---

* সমুদ্রের জলে ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেট, ক্যালসিয়ম সালফেট, ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়ম সালফেট, পটাসিয়ম ক্লোরাইড, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিকেই রসায়নশাস্ত্রে লবণ বলা হয়—খাদ্যের সহিত যে নুণ গ্রহণ করা হয় তাহা সোডিয়ম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ নামে পরিচিত।

সোডা প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া ওঠায় ফলে ইহার প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানে, ক্ষুদ্র বৃহৎ যে-কোন আয়তনে লবণ প্রস্তুত প্রক্রিয়া জীবিকার্জনযোগ্য একটি লাভজনক শিল্প। কিন্তু এই শিল্পে বঙ্গদেশ এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য ও বিবিধ শিল্পের প্রয়োজনে বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ মণ নুণ ব্যবহৃত হয়; ইহার মধ্যে মাত্র দুই লক্ষ মণ বাংলা দেশে প্রস্তুত হয়। ইহার পর দুর্গাপুরে সোডা-অ্যাস কারখানার কাজ সুরু হইলে অতিরিক্ত পনর লক্ষ মণ নুণের প্রয়োজন হইবে। এই মোট পঁয়ষ লক্ষ মণ লবণ পশ্চিমবঙ্গেই প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। লবণ-শিল্পে বাংলার একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে, এই কারণে লবণ-প্রস্তুত-প্রণালীর, বিশেষ করিয়া সমুদ্রের লবণোদক সম্পর্কীয় প্রক্রিয়ার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

লবণ প্রস্তুতের সাধারণ প্রণালী: পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ

পাম্পের সাহায্যে লবণোদক উঠাইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রেরণ

দেশসমূহ অল্পাধিক লবণ উৎপাদন করিয়া থাকে। লবণ উৎপাদনে বিভিন্ন দেশে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসৃত হয়:

(১) সমুদ্র, লবণ-হ্রদ ও লবণ-কূপের লবণোদক এবং লবণাক্ত মাটির দ্রাবণযুক্ত জল হইতে সূর্য্যতাপে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া।

(২) লবণোদক কৃত্রিম উপায়ে আগুন বা ষ্টীমের সাহায্যে বাষ্পীভবন অথবা 'শূন্যে বাষ্পীভবন' (evaporation in vacuum) প্রক্রিয়া। শেষোক্ত প্রথা সাধারণতঃ বিশুদ্ধ নুণ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

(৩) লবণোদক হিম প্রয়োগে জমাটকরণ প্রক্রিয়া। লবণোদক সম্পৃক্ত জমাইলে নিম্নতাপমাত্রায় অধিকাংশ জল বরফে পরিণত হয় এবং সম্পৃক্ত লবণোদক পৃথক হইয়া পড়ে; পরে এই সম্পৃক্ত লবণোদক হইতে কৃত্রিম তাপপ্রয়োগে লবণ প্রস্তুত হয়—এই প্রথায় উত্তর ইউরোপের অতিশয় শীতপ্রধান দেশগুলিতে নুণ প্রস্তুত হয়।

(৪) পাহাড়ের লবণ-খনি হইতে সাধারণ উপায়ে খনন-প্রক্রিয়া (যেমন সৈন্ধব লবণ—ইহার খনি পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত সুলেমান রেঞ্জে অবস্থিত); অপর এক ক্ষেত্রে, প্রথমে লবণ-পাহাড়ের মধ্যে নলদ্বারা জল প্রবেশ করাইয়া লবণোদক সংগ্রহ করা হয়, পরে কৃত্রিম তাপ প্রয়োগে উহা হইতে লবণ প্রস্তুত করা হয় (হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি পাহাড় অঞ্চলে, যেখানে নুণ পাহাড়ে মাটির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, সেই সব স্থানে এই পদ্ধতিতে নুণ সংগৃহীত হয়—এই প্রথায় গুণে এবং পরিমাণে নুণ ভাল হয় না)।

সমুদ্র-লবণ উৎপাদনে আবশ্যক ব্যবস্থা: পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র সুন্দরবন ও কাঁথির সমুদ্র-উপকূলই লবণ উৎপাদনের উপযোগী স্থান। কাঁথি উপকূলে মাত্র দুইটি (পুরুষোত্তমপুরে দি গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী ও দাদনপাত্রবাদে দি বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী) এবং সুন্দরবন অঞ্চলে একটি (শিশিরগঞ্জে পাইওনীয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী) উল্লেখযোগ্য কারখানা। এই সব কারখানায় সূর্য্যতাপে সমুদ্রের লবণোদক বাষ্পীভূত করিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়; ইহাদের নুণ মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নুণ অপেক্ষা উচ্চ স্তরের এবং খাদ্যের সহিত গ্রহণের খুব উপযোগী। অবশ্য কিছু-সংখ্যক লোক মাত্র কয়েক একর জমি লইয়া ক্ষুদ্রাকারে সূর্য্যতাপে সমুদ্রের লবণোদক সংগ্রহ করিয়া ঘরে আগুনের জ্বালে নুণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় প্রস্তুত নয় বলিয়া অনেকের নুণ নিম্নস্তরের হইয়া পড়ে। সূর্য্যতাপে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লবণ উৎপাদনের কারখানায় জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজন:

(১) নিয়মিত ভাবে কম খরচে সমুদ্রের জল সরবরাহের ব্যবস্থা—ইহার জন্য কারখানাটি সমুদ্রের যথাসম্ভব নিকটে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনটি পন্থায় লবণোদক সংগৃহীত হইয়া থাকে।

(ক) স্বল্পপরিসর খালের সাহায্যে কোটালের সময় সমুদ্রের জল কারখানায় রিজার্ভয়ার অংশে স্লুস গেট দ্বারা প্রবেশ করাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

(খ) সমুদ্র হইতে কারখানার ধার দিয়া খাল লইয়া গিয়া প্রতি জোয়ারের সময় (সাধারণ জোয়ার-ভাটা প্রত্যহই হয়) পাম্পের সাহায্যে প্রয়োজনমত লবণোদক উঠাইয়া লইতে হয় (কোম্পানী অথবা সমবায় প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক)।

(গ) জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল আসে—এমন স্থান পর্য্যন্ত পাইপ লাইন লইয়া গিয়াও জল সংগৃহীত হইয়া থাকে।

(২) একটি বিস্তীর্ণ উন্নত জায়গা, ইহার কিছু অংশে থাকে আপিস, গুদাম (স্থায়ী গুদামঘরটি সমুদ্র-উপকূল হইতে দূর অঞ্চলে নির্ম্মাণ করাই বাঞ্ছনীয়), কয়েকটি লবণ চূর্ণ করার যন্ত্র ইত্যাদি; বাকি অধিকাংশ স্থান 'আল' দিয়া ঘেরা কতকগুলি ক্ষেত্র, নালা, পথ এবং বাঁধে বিভক্ত থাকে। ক্ষেত্রের 'উপরিতল', নালা এবং আলের ধারগুলি এমন বস্তু দ্বারা তৈয়ারী হওয়া আবশ্যক যেন বিভিন্ন জমির

মধ্য দিয়া গমনকালে লবণোদক কোন অবস্থাতেই জমিতে বিশেষ শোষিত হইয়া না যায়! আঠালো মাটির সহিত লবণোদক মিশ্রিত করিয়া মথিয়া লইলে উহা দ্বারা লবণোদক-প্রবাহের স্থানগুলিতে আস্তরণ দেওয়া যায়। বিভিন্ন কারখানায় এই ব্যবস্থায় আস্তরণ দিয়া ভাল ফল পাওয়া যাইতেছে।

লবণ প্রস্তুতের একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার যে ক্ষেত্রগুলি প্রয়োজন হয়, তাহা তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত থাকে:

(ক) রিজার্ভয়ার: ইহা জল ধরিয়া রাখার জন্য বৃহদায়তনের একটি আলবন্দী ক্ষেত্র। এখানে সমুদ্র হইতে উত্তোলিত লবণোদক ১৮ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীরতায় সঞ্চয় করা হয়; উহা একটা নির্দিষ্ট ঘনত্বে না আসা পর্য্যন্ত এখানেই আবদ্ধ থাকে। লবণোদকের ভাসমান মলিন বস্তুগুলি এখানে তলায় থিতাইয়া পড়ে।

(খ) কন্‌ডেন্সার: ইহা কয়েকটি আলবন্দী ক্ষেত্রের সমষ্টি; ইহার মোট ক্ষেত্রফল সাধারণতঃ রিজার্ভয়ার অংশ অপেক্ষা বেশী। ইহার মধ্য দিয়া রিজার্ভয়ারে নির্দিষ্ট ঘনত্বপ্রাপ্ত লবণোদক প্রায় ৮ ইঞ্চি গভীরতায় সঞ্চালিত হয়; আঁকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত হইবার কালে বাষ্পীভবনের ফলে লবণোদকের ঘনত্ব বাড়িতে থাকে।
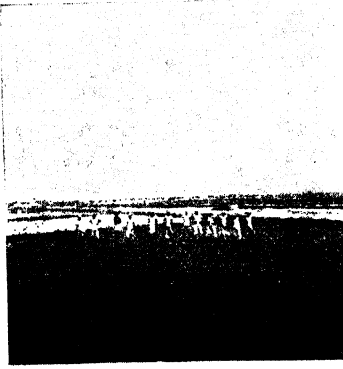
আঠালো মাটি ও লবণোদক দলিয়া কৃষ্টালাইজার-ক্ষেত্রের উপরিতল প্রস্তুত করা হইতেছে

(গ) কৃষ্টালাইজার: ইহা একটি আলবন্দী ক্ষেত্র। ইহার মধ্যে, কন্‌ডেন্সারে নির্দিষ্ট ঘনত্বপ্রাপ্ত লবণোদক প্রায় দুইইঞ্চি গভীরতায় রক্ষিত হয়। এখানে লবণোদক আরও বাষ্পীভূত হয় এবং লবণ ছোট বড় দানায় (করকচ) শেষদ্রব (mother liquor) হইতে ধীরে ধীরে পৃথক হইতে থাকে। লবণ জমা হইবার পর শেষদ্রব নিঃশেষে বাহির করিয়া দিবার জন্য ক্ষেত্রটি এক দিকে একটু ঢালু করা থাকে।

কৃষ্টালাইজারের গঠনই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহার উপরিতল বা ধার দিয়া শোষণদ্বারা যাহাতে লবণোদকের অপচয় না ঘটে তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। এখানে সম্পৃক্ত লবণোদকের অপচয় ঘটিলে সময়ের এবং পূর্ব্বাংশে অর্থব্যয়ের তুলনায় লবণ প্রস্তুত হইবে কম। বিশেষজ্ঞরা শোষণজনিত অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যে অক্সিক্লোরাইড সিমেণ্ট (ইহা ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়ম অক্সাইড ও তামার গুড়ার সাহায্যে প্রস্তুত হয়) কৃষ্টালাইজারের উপরিতল নির্ম্মাণের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বস্তু বলিয়া অনুমোদন করেন।

(৩) পথ ও বাঁধ: বিভিন্ন ক্ষেত্র পরিদর্শন, সংস্কার, কৃষ্টালাইজার হইতে লবণ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কতকগুলি প্রশস্ত (প্রায় চার ফুট) পথের প্রয়োজন হয়। সমগ্র কন্‌ডেন্সারটির মধ্যে মধ্যে আবার কতকগুলি অল্পপরিসর (প্রায় আড়াই ফুট) বাঁধ থাকে, এইগুলিও পরিদর্শন এবং সংস্কারকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাঁধগুলির প্রত্যেকটির এক এক প্রান্তের কিছু অংশ উন্মুক্ত থাকে, যাহাতে লবণোদক আঁকা-বাঁকা পথে কনডেন্সারের বিভিন্ন ক্ষেতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সহজে বাষ্পীভূত হইতে পারে। পথ ও বাঁধগুলির ধার ক্রমশঃ নীচের দিকে ঢালু থাকিলে বিভিন্ন ক্ষেতের লবণোদকের ঢেউ উহাদের ক্ষতি করিতে পারে না। স্থানে স্থানে এই পথ ও বাঁধগুলি বিভিন্ন ক্ষেতের আবেষ্টনী বা আলের কাজও করে।

(৪) নালা: ইহাদের সাহায্যে প্রয়োজনমত লবণোদক রিজার্ভয়ারে, সেখান হইতে কন্‌ডেন্সারে অথবা সেখান হইতে কৃষ্টালাইজারে প্রেরণ করা হয়। ইহা আবার লবণ পৃথক হইবার পর শেষদ্রবকে কৃষ্টালাইজার হইতে বাহির করিয়া দূরে পাঠাইবার কাজেও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিভিন্ন কাজের জন্য পৃথক পৃথক নালা থাকে।

(৫) ঘনত্বমাপক: 'বমে' এককে (Degree Baume—তরল পদার্থের ঘনত্ব মাপার জন্য এক ধরণের একক) লবণোদকের ঘনত্ব মাপার জন্য ল্যাক্টোমিটারের ন্যায় ইহা একটি কাঁচের যন্ত্র। লবণ-শিল্পে ইহা একটি সরল অথচ অতি-প্রয়োজনীয় যন্ত্র। সামান্য নির্দ্দেশ পাইলে নিরক্ষর লোকও ইহা ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়।

লবণ প্রস্তুতের একটি সম্পূর্ণ পদ্ধতিতে আবশ্যক মোট জমির পরিমাণ নির্ভর করে কৃষ্টালাইজারের ক্ষেত্রফলের উপর। কৃষ্টালাইজার ক্ষেত্রটি প্রস্থে ৩৫ ফুট হইতে ৪০ ফুটের মধ্যে হইলে উহার উভয় পার্শ্বের পথের উপর দাঁড়াইয়া লম্বা হাতলযুক্ত কাঠের পাটার সাহায্যে অনায়াসে লবণ সংগ্রহ করা যায়—কৃষ্টালাইজারের জমিতে দাঁড়াইয়া লবণ সংগ্রহ করিলে উহার উপরিতলের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে; দৈর্ঘ্যের পরিমাণ মোট জমির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লওয়া হয়। যদি কৃষ্টালাইজারের ক্ষেত্রফল ৩৫ ফুট × ৪৫ ফুট অর্থাৎ ১৫৭৫ বর্গফুট লইতে হয়, তাহা হইলে রিজার্ভয়ার কনডেন্সার অংশে অন্ততঃ উহার দশ গুণ অর্থাৎ ১৫,৭৫০ বর্গফুট (আবহাওয়া ভেদে এই জমির পরিমাণ কম বা বেশী হইতে পারে) জায়গা থাকা প্রয়োজন। আবার রিজার্ভয়ারের তুলনায় সাধারণতঃ কনডেন্সার অংশে জায়গা রাখা হয় বেশী (আদর্শ ব্যবস্থায় রিজার্ভয়ার অংশে তিন ভাগ এবং কনডেন্সার অংশে প্রায় চার ভাগ)।

প্রকৃত প্রণালী : বৎসরের সকল ঋতু লবণ প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী নহে। বাংলা দেশে সাধারণতঃ ডিসেম্বর হইতে জুনের
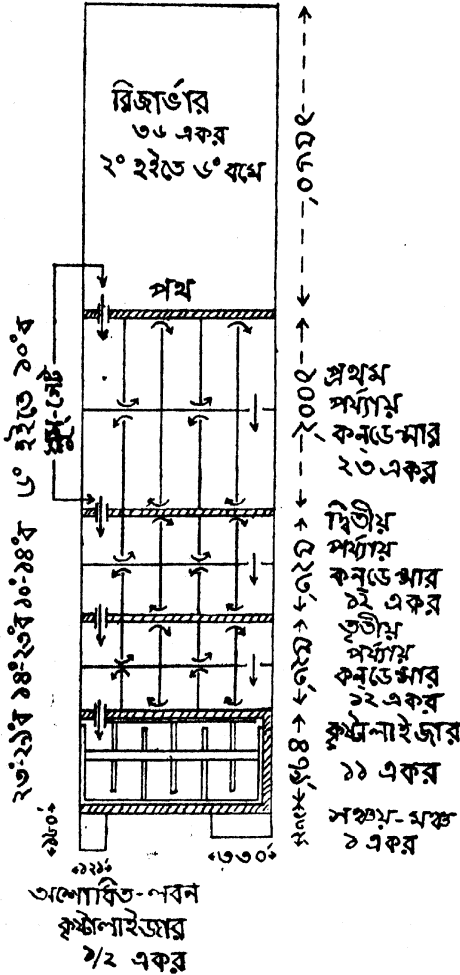
একশত একর জমিতে কারখানা নির্মাণের নক্সা

মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মাত্র সাড়ে ছয় মাস কাল (যদি বর্ষা আগে সুরু না হয়) লবণ প্রস্তুতের অনুকূল সময়। কিন্তু মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে স্থানে স্থানে আট মাসেরও বেশী সময় ব্যাপী লুণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার কারণ প্রথমতঃ, বাংলায় বর্ষা হয় বেশী; দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা প্রভৃতি নদনদী হইতে বিপুল পরিমাণে 'মিষ্ট জল' সমুদ্রে মুক্ত হওয়ার জন্ত বাংলা উপকূলে সমুদ্র-জলের লবণের ভাগ অন্যান্ত স্থান অপেক্ষা কম দাঁড়ায়—শেষোক্ত কারণে বাংলা উপকূলের লবণোদকের স্বাভাবিক ঘনত্ব সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে কাজে লাগাইবার মান অপেক্ষা নীচে থাকে।

নবেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রথমে সমুদ্র-জল যখন ২°বমে'তে পৌঁছায়, তখন উহা পাম্পের সাহায্যে বা অন্ত উপায়ে রিজার্ভয়ারে সঞ্চয় করা হয়। এখান হইতেই সুরু হয় লবণ প্রস্তুতের প্রকৃত প্রণালী। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া লবণোদক সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—প্রথমতঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে লবণোদকের একটা বিস্তৃত উপরিতল প্রাপ্তির জন্ত বাষ্পীভবন ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘনত্ব লাভ হেতু লবণ ব্যতীত ক্যালসিয়ম কারবনেট, ক্যালসিয়ম সালফেট প্রভৃতি লবণোদকের অন্যান্ত দ্রব্যগুলি পৃথক হইয়া পড়ে।

রিজার্ভয়ারে সঞ্চিত অবস্থায় লবণোদকের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হইতে থাকে এবং কয়েক দিনের মধ্যে উহার ঘনত্ব বাড়িয়া যায়। ঘনত্ব যখন প্রায় ১০° বমে'তে আসে, তখন হইতে ক্যালসিয়ম কারবনেট নীচে জমিতে থাকে; এই বস্তু ক্ষেত্রের উপরিতলকে দৃঢ় করে, ফলে জমিতে লবণোদকের শোষণ হ্রাস পায়। লবণোদক দশ ডিগ্রী ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে উহা কনডেন্সারে সঞ্চালিত হয়।

লবণোদক কনডেন্সারের মধ্যে প্রবেশ করার পর হইতে বাঁধমুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হইবার কালে উহার বাষ্পীভবন ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং ঘনত্ব বাড়িতে থাকে। প্রায় ১৭° বমে'তে ক্যালসিয়ম কারবনেট সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়ে। এই ঘনত্বে আবার দেখা যায় ক্যালসিয়ম সালফেট ধীরে ধীরে জিপসমরূপে তলায় জমা হইতেছে। ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে জিপসম জমিতে থাকে। এখানে ঘনত্ব ২২° না হওয়া পর্য্যন্ত লবণোদক আবদ্ধ থাকে। কোথাও কোথাও কনডেন্সারের দুই বা তিন অংশে ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রিজার্ভয়ারের স্তায় কনডেন্সারের ক্ষেত্রও উক্ত কারবনেট এবং জিপসমের সাহায্যে দৃঢ় হইতে থাকে। জিপসম একটি প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক দ্রব্য; কিন্তু জমি প্রস্তুতের সুবিধার্থে উহা প্রথম কয়েক বৎসর সংগ্রহ না করাই বাঞ্ছনীয়। লবণোদক বাইশ ডিগ্রীতে পৌঁছিলে উহা ক্রুষ্টালাইজারে প্রেরিত হয়।

লবণোদকে লবণের সহিত অন্যান্ত দ্রব্য দ্রবীভূত থাকে বলিয়া ক্রুষ্টালাইজারে আসার পর লবণোদক সাধারণতঃ ২৩.৫° বমে'তেই সম্পৃক্ত হইয়া পড়ে; এই অবস্থায় লবণের দানা শেষদ্রব হইতে কেবল পৃথক হইতে আরম্ভ করে। ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে লবণ জমা হইতে থাকে, উহার দানাও ক্রমে বড় হইয়া কয়রকচরূপে দেখা দেয়; এই সঙ্গে কিছু কিছু জিপসমও জমিতে থাকে। লবণ শেষদ্রব হইতে ত্রিশ ডিগ্রীর ঊর্দ্ধেও পৃথক হয়, কিন্তু কোন ক্রমেই ২৯.৮ ডিগ্রীর ঊর্দ্ধে ক্রুষ্টালাইজারে লবণ জমিতে দেওয়া

সমীচীন নহে। কারণ এই সময় হইতে ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়ম সালফেট প্রভৃতি দ্রব্য শেষদ্রব হইতে পৃথক হইয়া লবণের সহিত নীচে পড়িতে থাকে; ঘনত্ব আরও বাড়িতে থাকিলে উক্ত বস্তুগুলির পরিমাণও বাড়িতে থাকে; আহার্য্য নুণের সহিত অধিক পরিমাণে এই বস্তুগুলির বিদ্যমানতা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অবশ্য সাধারণ নুণের মধ্যে জিপসম ও উক্ত দ্রব্যগুলি কিছু পরিমাণে থাকিয়াই যায়। কাজেই ২৯'৮° হইলেই শেষদ্রব কৃষ্টালাইজারের বাহিরে সরাইয়া দিতে হয়।

শেষদ্রব হইতে স্পর্শমুক্ত, পরিষ্কার করকচ নুণ সংগ্রহ করিতে হইলে কৃষ্টালাইজার হইতে শেষদ্রব বাহির করিয়া দিয়া পুনরায় উহাতে সম্পৃক্ত (প্রায় ২৩°) লবণোদক প্রেরণ করিতে হয়। এই সম্পৃক্ত লবণোদকের উপস্থিতিতে পূর্ব্বের লবণ দ্রবীভূত হয় না, উপরন্তু কাঠের পাটার সাহায্যে লবণ-সংগ্রহের সময় উহা ধৌত এবং পূর্ব্বের শেষদ্রব হইতে স্পর্শমুক্ত হইয়া উঠে। লবণ প্রস্তুত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি দ্বারা কৃষ্টালাইজারে পর পর কয়েকবার লবণ জমাইয়া পরে উপর উপর হইতে তুলিয়া লইলেও নির্মল করকচ লবণ পাওয়া যায়। সংগৃহীত করকচ কয়েক দিন কৃষ্টালাইজারের ধারে পথের উপরে শুকাইয়া করকচ চূর্ণ করার যন্ত্রে পাঠাইতে হয় (কুটীর-শিল্পে একটি সিমেণ্ট-করা স্থানে ছোট লোহার রোলারের সাহায্যে নুণ চূর্ণ করা যাইতে পারে); সেখানে করকচ চূর্ণ হইলে উহা গুঁড়া নুণরূপে গুদামে সঞ্চিত হয়।

কৃষ্টালাইজারে কাঠের পাটার সাহায্যে লবণ সংগ্রহরত একজন শ্রমিক

যে শেষদ্রব কৃষ্টালাইজার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতে আর একটি পৃথক কৃষ্টালাইজারে পুনরায় বাষ্পীভবন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, এপসম সল্ট পটাসিয়ম ক্লোরাইড প্রভৃতি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যও প্রস্তুত করা যায়। ত্রিবাঙ্কুর, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি কতিপয় স্থানে কোন কোন সংশ্লিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

কাঁথি অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের কয়েকটি বাস্তব তথ্য পরিবেশন করিলে বিষয়টিতে আর একটু আলোকপাত করা হইবে। কাঁথির গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী সমুদ্র হইতে দেড় মাইল দূরে ৮০ একর (মোট জমি ১২৫ একর) উন্নত জায়গায় লবণ প্রস্তুত করিতেছে। কারখানার ধার দিয়া একটি খাল গিয়াছে; প্রয়োজনীয় লবণোদক ৩০ ও ২২ অশ্ব-শক্তির দুইটি পাম্পের সাহায্যে উঠাইয়া লওয়া হয়। মোট উন্নত জায়গার ৬৮ একর স্থানে একটি কৃষ্টালাইজার এবং রিজার্ভয়ার-কনডেন্সার মিলাইয়া দশটি রাখা হইয়াছে। ডিসেম্বর হইতে প্রায় ছয় মাস এখানে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নুণ প্রস্তুত হয়। লবণ তৈরির কয়েক মাস ষাট-পঁয়ষট্টি জন শ্রমিক
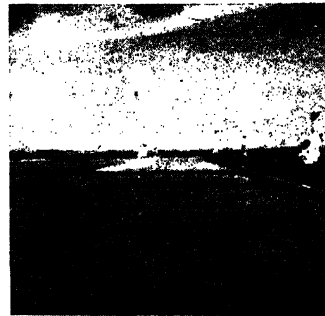
মৃত্তিকানির্ম্মিত একটি কৃষ্টালাইজারের স্থানে স্থানে সংগৃহীত লবণের স্তূপ

কাজ করে। উৎপন্ন লবণের পরিমাণ প্রতি বৎসর বাড়িতেছে—১৯৫৪ সনে প্রস্তুত হইয়াছে ২৩,০০০ মণ, ১৯৫৫ সনে ৩২ ০০০ মণ—কোম্পানী আশা করেন, তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে ৪০,০০০ মণ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন। প্রতি মণ নুণের উৎপাদন-মূল্য দাঁড়ায় দেড় টাকা, শুল্ক দিতে হয় মণপ্রতি দুই আনা, আর বিক্রয় করা হয় প্রতি মণ দুই টাকায়। সমস্ত নুণ কাঁথি অঞ্চলেই কাটতি হইয়া যায়। এখানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নুণ প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু রিজার্ভয়ার ও কনডেন্সার আদর্শ ব্যবস্থা অনুযায়ী সাজানো হয় নাই, আর সংশ্লিষ্ট কোন রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ধারের ব্যবস্থাও নাই।

অপর একটি কারখানায় কুটীরশিল্পের ভিত্তিতে মাত্র আড়াই একর জায়গায় প্রথম বৎসর ১০০ মণ এবং দ্বিতীয় বৎসরে (মাত্র পাঁচ মাসে) প্রায় ১,৩০০ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতি—সূর্য্য-তাপে লবণ প্রস্তুতের মোটামুটি প্রণালী হইলেও সময় এবং আর্থিক ব্যয়ের অনুপাতে লবণের পরিমাণ নির্ভর করে কতকগুলি বাহ্যিক অবস্থার উপর। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও আর্দ্রতা, বায়ুর গতিবেগ, লবণোদকের উপরিতলের মুক্ত ক্ষেত্রফল প্রভৃতি বাষ্পীভবনের সাধারণ নীতি ব্যতীত লবণোদকের প্রাথমিক ঘনত্ব, লবণোদক সরবরাহের ধারাবাহিকতা, বারিপাত, ভূমির দুর্ভেদ্যতা, বন্যা ও ধূলার ঝড় হইতে রক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণগুলির দ্বারা লবণের উৎপাদন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একটি কারখানা স্থাপনে প্রথম অবস্থায় কিছু কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন হয়; এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুন্দরবন অঞ্চলে সূর্য্য-তাপ ভিন্ন কৃত্রিম তাপের সাহায্যেও সমুদ্রের লবণোদক হইতে লবণ প্রস্তুতের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেখানে সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিলে কম খরচে লক্ষ লক্ষ মণ ঝোপঝাড়ের কাঠ যোগাড় হয়। সেখানে আগুনের তাপ ও লবণোদকের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করিয়া মোটামুটি ভাল নুণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে সব অঞ্চলে জমি এবং কাঠ কোনটারই প্রাচুর্য্য নাই সেখানে কাঠের মিতব্যয়িতার জন্য আয়ত্তাধীন জমির মধ্যে লবণোদকের ঘনত্ব বাষ্পীভবনের সাহায্যে কিছুদূর বাড়াইয়া লইয়া, পরে বড় বড় পাত্রে কৃত্রিম তাপ-প্রয়োগে লবণোদক সম্পৃক্ত করিয়া উহা হইতে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে (Burma Process)।

যন্ত্রে করকচ চূর্ণ করার প্রক্রিয়া পরীক্ষারত কয়েক জন ছাত্র

লবণের ব্যবহার: লবণের ব্যবহার নানাবিধ। সংক্ষেপে, ইহা পাকাশয়, রক্ত প্রভৃতির মধ্যে নানা ক্রিয়া সম্পাদনদ্বারা শরীরের স্বাভাবিক সজীবতা বজায় রাখে; গভীর উত্তপ্ত খনিতে কিংবা কারখানার অত্যধিক গরম স্থানে তাপজনিত মাংসপেশীর আকুঞ্চন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহা জলের সহিত ব্যবহৃত হয়; ইহা থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অপূর্ণতাজনিত কতিপয় গলগণ্ড দমনে পটাসিয়ম আইয়োডাইডের সহিত ব্যবহৃত হয়। খাদ্য-সংরক্ষণ-প্রক্রিয়ায়, যেমন মৎস্য, মাংস, মাখন, পিষ্ট-ফল, তরিতরকারি প্রভৃতি লবণ প্রয়োগে সংরক্ষিত হয়।

লবণ হইতে সোডা-অ্যাস, কষ্টিক-সোডা, ক্লোরিন, সোডিয়ম-সালফেট প্রভৃতি বহু রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে; ইহাদের প্রত্যেকটি আবার বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। চামড়া ট্যান করার কাজে, সাবান প্রস্তুতে, মাটি ও চীনা-মাটির পাত্রে চিক্কণ-লেপ (glaze) প্রয়োগে এবং বস্ত্রাদি রঞ্জনে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

লবণের আধুনিক প্রয়োগ দেখা যায়, কৃষিক্ষেত্রে কতিপয় সব্জী ও ফলের চাষে সার হিসাবে ব্যবহারে, এবং কাঠ 'পরিপক্ব-প্রক্রিয়া' (seasoning) ও রাস্তা নির্ম্মাণ বিষয়ক গবেষণাকার্য্যে।

করকচ চূর্ণ করার যন্ত্র হইতে চূর্ণীকৃত লবণ নামিয়া আসার দৃশ্য

কুটীর-শিল্পরূপে লবণ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা: লবণের বহুবিধ ব্যবহার এবং বাংলা দেশে লবণ উৎপাদনে বিরাট ঘাটতি থাকায় বাংলার সমুদ্র-উপকূলে লবণশিল্পের প্রভূত সম্ভাবনার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুন্দরবন এবং কাঁথি অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের জন্য সরকারের বহু খাস-জমি পতিত আছে (সুন্দরবন অঞ্চলে ৪৯০০ একর এবং কাঁথির উপকূলভাগে ৫৬০০ একর জায়গা এখনও অনুন্নত রহিয়াছে)। সরকারী হিসাবে দেখা যায়, ইহার প্রতি একর জায়গা উন্নত করিতে ৬০০৲ টাকার মত প্রয়োজন হয় (ইহা অপেক্ষা কম খরচে বেশী জমি উন্নত করার সম্ভাবনাও রহিয়াছে)। শোনা যায়, সরকার এই জমিগুলি উন্নত করিয়া লবণ উৎপাদনের কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন; প্রয়োজনীয় লবণোদক সরবরাহের ব্যবস্থাও সরকার হইতে করা হইবে বলিয়া জানা যায়।

কিন্তু যাঁহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের ব্যক্তিগত অথবা সমবায়-প্রচেষ্টায় কায়িক পরিশ্রম দ্বারা লবণ উৎপাদনের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারের এই পরিকল্পনায় কোন ব্যক্তি মাত্র কয়েক একর জমি লইয়াও সাধারণ কৃষিকার্য্যের তুলনায় অনায়াসে কুটীর-শিল্প হিসাবে নুণের চাষ করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ লাভ করিবেন। এই পরিকল্পনায় বাংলার আবশ্যক মোট ৬৫ লক্ষ মণ লবণই প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য কাঁথি অঞ্চলে বেসরকারী জমিও উন্নত করিয়া কুটীর-শিল্পের আয়তনে লবণ উৎপাদনের সুযোগ রহিয়াছে।

স্বাধীনতালাভের পর লবণ উৎপাদন বিষয়ে ভারত সরকারের নীতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি (১৯৩১) অনুযায়ী গ্রামবাসীদিগকে লবণ উৎপাদনে যে সুযোগ

নৌকায় লবণ বোঝাই করার দৃশ্য। এই লবণ বঙ্গোপসাগর ও গঙ্গার মধ্য দিয়া কলিকাতা অঞ্চলে চালান দেওয়া হয়

দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বর্তমান সরকারের নীতি অনেক উদার। উক্ত চুক্তিতে লবণ উৎপাদনের স্থানগুলির নিকটবর্তী গ্রামবাসীদিগকেই শুধু লবণ প্রস্তুত ও উহা সংগ্রহ করার অনুমতি দেওয়া হইত। কিন্তু এই সামান্য সুযোগও ছিল আবার নানা বাধানিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বগ্রামের বাহিরে লবণ বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল; উহা পদব্রজে ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে এক স্থান হইতে
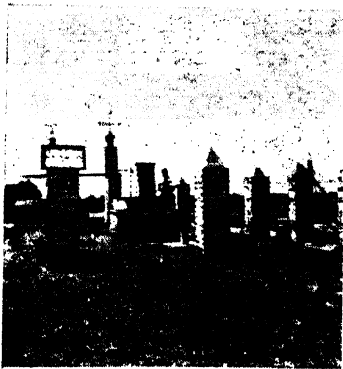
সমুদ্রোপকূলবর্তী আবহাওয়াজ্ঞাপক মানমন্দির

অপর স্থানে বহন করা চলিত না। ভারত সরকারের নূতন নীতি অনুযায়ী নিজ অধিকারভুক্ত দশ একর পর্যন্ত জমিতে যে-কোন ব্যক্তি অবাধে, বিনা শুল্কে এবং বিনা লাইসেন্সে লবণ প্রস্তুত করিতে পারেন—উৎপন্ন লবণ সঞ্চয়, পরিবহন এবং বিক্রয়ের বেলায়ও কোন বাধা-নিষেধ নাই। সরকারের এই নীতি কুটীর-শিল্পে লবণ উৎপাদন ব্যাপারে খুবই উৎসাহোদ্দীপক।

সিমেন্ট-নির্ম্মিত কৃষ্টালাইজারে লবণ-সংগ্রহ
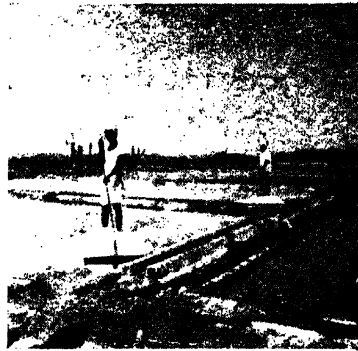
পরিশেষে বলা প্রয়োজন, বঙ্গোপসাগরের ঝটিকাপ্রবাহে বাংলার সমুদ্র-উপকূল মধ্যে মধ্যে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে, ফলে এখানকার লবণশিল্পের প্রভূত ক্ষতি হয়। কিন্তু ইহাতে পশ্চাৎপদ বা ভগ্নোদ্যম হইবার কারণ নাই। এই অবস্থায় সরকারী সাহায্যে বা ঋণগ্রহণ দ্বারা পুনরায় কাজ আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কয়েক বৎসরে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভব। সদিচ্ছা লইয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙালী যেখানেই শ্রমশীলতা প্রদর্শন করে, সেখানেই তাহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ইহা অবিসংবাদী সত্য।*

---

* প্রবন্ধের তথ্যগুলি (১) লবণ বিশেষজ্ঞ কমিটির ১৯৫০ সনের রিপোর্ট, (২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-সংস্থা, (৩) কাঁথির কারিগরী সাহায্যকারী কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়রের আপিস এবং (৪) দি গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কারখানা হইতে সংগৃহীত।

আলোকচিত্রগুলি গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী ও বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

করঙ্কবাহী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বহুকাল পরে সেদিন প্রভাতে
প্রথম নয়ন মেলি
মনে হ'ল আজ দেখে নিই ভাল করে
ফেলে-আসা দিন, রাত্রি, দিনের শেষে।
আজ মনে পড়ে কদাচ কখনো
চমক লেগেছে হঠাৎ হাওয়ার ডাকে,
চোখে মুখে আলো পড়েছে কখনো
ললিতে কঠোরে অপরূপ সূর্যের।
বনে বনে মন ছুটেছে কখনো,
সুগন্ধঘন ফুলের কেয়ারি হতে
দু'একটি ফুল তুলিয়াছি আনমনে।
সে ফুল কখন ঝরিয়া গিয়েছে প্রিয়ার কবরী হতে
কিছু ত পড়ে না মনে।
পূর্ণিমারাতে অঢেল জ্যোৎস্না
অমাবস্যার নীরন্ধ্র কালো রাতি
কখন এসেছে কখন গিয়েছে চলে
কিছু আজ মনে নাই,
মনে নাই মোর কণ্টকবনে কুসুমচয়নে এসে
শোণিতলেখায় কার প্রিয় নাম
লিখে নিয়েছিনু বুকে ;
কোন নিরুপমা দিয়েছিল হাতে
তার জীবনের প্রথম ফুলের কুঁড়ি।

আজ মনে হয় যেন
স্বপ্নের ঘোরে ছিনু এতদিন
সে স্বপ্ন যেন আধ-আধ মনে পড়ে—
মনে পড়ে যেন এতকাল আমি ছিলাম ঘুমের দেশে
সেথা ঘুম ঘুম সবার নয়ন
চোখে মুখে আঁকা চেনা ও অচেনা ছবি,
সে ছবি তখন ছিল না আমার চোখে
ছিল না'ক তার সুখশিহরণ দেহে
ছিল না আমার মনের গোপন কোণে
কোনো অভিলাষ সুখমিলনের
বিরহ-কাতর ব্যথার বিহ্বলতা।
ছিল না আমার স্বপ্নে কি জাগরণে
ইহকাল পরকাল ;
এ জগৎ হতে দূরান্তরের আর এক জগতে যেন
চলেছিনু আমি চির পথিকের করঙ্ক বহি হাতে ;
কৃপণের ধন রেখেছিনু তাতে সাজাইয়া সযতনে
অনেক দিনের পথে পথে চাওয়া
অনেক পাওয়ার অমূল্য ধনগুলি ;
আজি ঘুম ভেঙে প্রথম আলোকপাতে
দেখিনু অবাক হয়ে
মুঠি মুঠি সোনা সূর্যকিরণে
মুগ্ধ নয়নে আলোর ঝিলিক হানে।
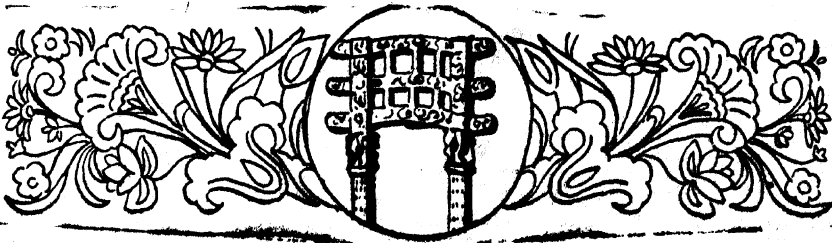
অগ্নিসদৃশ সৎপুরুষ তিলক

বিনোবা

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

সৎপুরুষ দুই প্রকারের। এক হইতেছে, সূর্যের মত আলো দান করিয়াও তাঁরা অলিপ্ত থাকেন, কাহারও উপর আক্রমণ নাই। তাঁর আলোর ব্যবহার লোকে যেভাবেই করুক, তার পাপ-পুণ্যের ভাগী সূর্য নয়; কিন্তু আলো তাঁর সকলের পক্ষে সমান লাভজনক। দ্বিতীয় হইতেছে—উনানে প্রকাশ আগুনের তুল্য, তাঁহারা রান্নার কাজে সহায়তা করেন। সূর্য ব্যাপক। অগ্নি বিশিষ্ট। সূর্য ভাত রাঁধে না। সেবার রূপে অগ্নি এরূপ কার্য করিয়া থাকে। দুইয়েরই আলো আছে, উষ্ণতা আছে। কিন্তু একের মুখ্য ধর্ম আলো আর অপরের মুখ্য ধর্ম উষ্ণতা। এই যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস সূর্যসদৃশ সৎপুরুষ ছিলেন আর তিলক ছিলেন অগ্নিসদৃশ সৎপুরুষ। অগ্নির মত সেবাকারী সৎপুরুষের স্মৃতি আত্মীয়ের স্মৃতিরই মত। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও তিলককে আমাদের নিজেদের আত্মীয় মনে হয়।

যে ভাব আমাদিগকে তিনি দিয়াছিলেন তাহা আজও কাজ করিতেছে। হয়ত কিছুদিন পরে তিনি লুপ্ত হইয়া যাইবেন। তখন তাঁহা দ্বারা প্রসূত ভাব বা গুণ কার্য করিবে। এভাবে মনুষ্য-জীবনের স্মৃতি অব্যক্ত হইতে থাকে, কিন্তু তাহা কাজ কম দেয় না, বরঞ্চ অধিক দেয়। অব্যক্ত আকর্ষণ, ব্যক্ত আকর্ষণ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী শক্তিশালী।

যেদিন তিলক গেলেন, সেদিন গান্ধীজীর উদয় হইল। কেহ কেহ এই উপমাও দিয়াছিল—পূর্ণিমাতিথিতে যেমন সূর্য অস্ত যায় আর পূর্ব দিকে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় তেমনই তিলক মহারাজ গিয়াছেন আর গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগের আরম্ভ হইয়াছে। দাদাভাই নৌরোজী জনসাধারণকে স্বরাজ্যের 'নিশ্চয়ে' উদ্বুদ্ধ করেন আর গীতার সেই আদ্য শিক্ষা আমাদের সামনে ধরেন—যতদিন বুদ্ধি 'নিশ্চয়' না হয় ততদিন কর্মযোগের প্রারম্ভ হইতে পারে না। গীতা দ্বারা তিলক এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, 'নিশ্চয়' হইলে পর সাধককে নিশ্চয়ে একাগ্র হইতে হয়। সব দুঃখের আকর গোলামী—একথা বলিয়া তিলকজী তাদের সম্বন্ধ স্বরাজের সহিত জুড়িয়া দিতেন। 'নিশ্চয়ে' 'একাগ্রতা' আসিয়াছে ত 'ফলের চিন্তা ছাড়িয়া সাধনা' আরম্ভ করা চাই এবং সকল শক্তি ও চিন্তা সাধনায় লাগাইয়া দেওয়া চাই—গীতার এই তৃতীয় শিক্ষা গান্ধীজী আমাদের দিয়াছেন। এভাবে এই তিনের পথপ্রদর্শনে যে মহাপ্রযত্নের সৃষ্টি হইয়াছে তার ফলস্বরূপ আমরা স্বাধীন হইয়াছি।
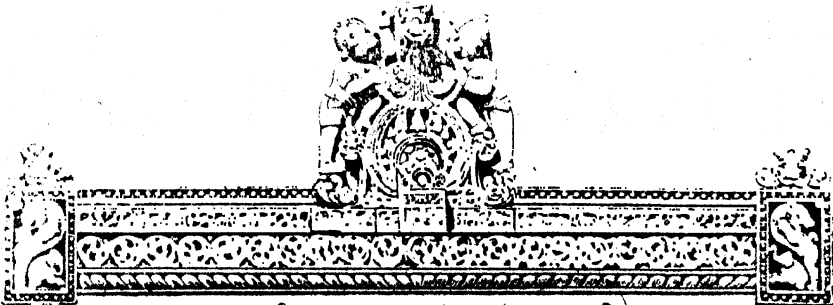
লোকমান্যের জীবন-দর্শন

দাদা ধর্মাধিকারী

অনুবাদক – শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

লোকমান্যের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তাই তাঁহার বিভূতিতে বৈচিত্র্যের বিলক্ষণ স্ফূর্তি হইয়াছিল। কিন্তু এক দিকে তাহা সীমাবদ্ধও ছিল। দেশবাসীর দোষ-প্রদর্শনের দিকে তিনি তাঁহার চতুরস্র প্রতিভার ব্যবহার কচিৎই করিয়াছেন, করিয়াছেন তাহা পক্ষান্তরে তাহাদের মনে আত্মগৌরব ও আত্মাভিমান জাগ্রত করার দিকে। গণিত ও জ্যোতিষে ব্যুৎপত্তি তাঁহার গভীর ছিল। বেদের প্রাচীনতা সপ্রমাণ করার নিমিত্ত এবং আর্যদের আদি নিবাসে তথ্য নিরূপণের জন্য তিনি নিজ জ্যোতিষজ্ঞানের নিয়োগ করিয়াছিলেন। কালগণনার ভারতীয় পদ্ধতিকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকসম্পাতে সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীদপ্তরী মহোদয়ের দ্বারা তিনি 'করণগ্রন্থ' লিখাইয়া লন আর স্বয়ং 'পঞ্চাঙ্গ-সংস্কার সমিতি'র সভাপতি হন। আজও মহারাষ্ট্রে 'তিলক-পঞ্চাঙ্গ' নামে এক পঞ্চাঙ্গের (পঞ্জিকার) প্রচলন আছে। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ, গণিতজ্ঞ তথা জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তা, ইতিহাস-সংস্কারক, পঞ্জিকা-প্রবর্তক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রহস্যের রচয়িতা, এক বিদগ্ধমান্য দার্শনিক ইত্যাদি অনেক রূপে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার বিবিধ প্রবৃত্তির মূলে ছিল একই দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—তাঁহার পুরুষার্থের প্রবাহ একই খাতে বহিয়াছিল—আর তাহা হইতেছে ভারতের মহিমা ও মর্যাদা বাড়ানো, ভারত কোন গুণে অপর কোন দেশ হইতে হীন নয়, একথা সপ্রমাণ করা। তাঁহার কাছে দেশ ছিল সর্বস্ব। কেহ কেহ ত এ পর্যন্তও বলিয়াছেন যে, দেশের অভ্যুদয়ের জন্য যদি তাঁহাকে স্বর্গ ও ধর্ম, এমনকি সত্যও ত্যাগ করিতে হইত ত তাহা করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সত্য ও অহিংসা পরম ধর্ম ত বটেই। কিন্তু মাতৃভূমি এই দুইয়ের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। স্বদেশ-নিষ্ঠা তিলকের পক্ষে ছিল এক অতি তীব্র স্বাভাবিক প্রেরণা। তাই তাঁহার সমগ্র জীবন দেশভক্তি ও স্বাধীনতা-প্রীতির এক রোমাঞ্চকর মহাকাব্যের রূপ ধারণ করিয়াছিল। 'সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি' (যে দেবতাকেই নমস্কার কর, অন্তে তাহা কেশবের চরণেই গিয়া পৌঁছে), তদ্রূপ তাঁহার প্রতিভার সকল বিকাশ ভারতের মহিমা বাড়ানোর জন্য অন্তে জন-আত্মাতেই অর্পিত হইত।

'দেশ বড় কি দেব বড়?' 'মানব বড় কি দেবতা বড়?' ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁহার সামনে কখনই উপস্থিত হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, "গোলামের দেবতা নাই। গোলামের মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় কোন দেবতা আসেন না। যেখানে মানব নাই, দেবতা সেখানে কোথা হইতে আসিবেন?" এই দৃষ্টি হইতে নৈতিক আন্দোলনের ও ধর্মীয় উৎসবের সমাবেশও তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে করিয়াছিলেন। গণপতি উৎসবের মত নিছক ধর্মীয় উৎসব তিলকের প্রেরণায় লোকজাগৃতির এক মহান্ সাধনে পরিণত হইয়াছিল। মদ্য-পান নিষেধ নৈতিক আন্দোলন, কিন্তু সরকারকে অসুবিধায় ফেলিবার জন্য তিলক উহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল—উহার ফলে সরকারের আয় কমিবে, সরকার বিব্রত হইবে।

সংক্ষেপে, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, কলাত্মক, সাংস্কৃতিক তথা নৈতিক আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলনের সহায়ক করা ছিল লোকমান্য তিলকের লক্ষ্য। স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা, মদ্যপান-নিবারণ, বয়কট এ সবকেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গরূপে ব্যবহার করাতে ছিল তাঁহার আগ্রহ। গঠনকার্য যেমন ছিল গান্ধীজীর আন্দোলনের মুখ্য কথা, তদ্রূপ তিলকের এই সকল উদ্যোগ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ।

ইংরেজ সরকারের সহিত আচরণে তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি বলিতেন 'প্রতি-সহকার'। মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে তিনি ভারত সরকারকে তারযোগে জানান যে, সংস্কার সম্বন্ধে প্রতি-সহকার নীতি তিনি অনুসরণ করিয়া চলিবেন। তখন হইতে ঐ শব্দটিকে লোকে তাঁহার জীবন-বিষয়ক ব্যবহারনীতি বলিয়া গণ্য করিতে থাকে। যাঁহারা নিজেদের লোকমান্যের অনুগামী বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা বলেন যে, রাজনীতিক্ষেত্রে 'অসহযোগ' ছিল গান্ধী-নীতির দ্যোতক আর 'প্রতি-সহকার' বা 'প্রতি-সহযোগ' ছিল লোকমান্যের নীতির সূচক। প্রশ্ন উঠিতেছে—ভাল, অসহযোগ বা প্রতি-সহযোগ কি জীবনের সিদ্ধান্ত হইতে পারে? অসহ-

যোগকে গান্ধীজী মানব-জীবনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সমাজে যখন মন্দের প্রতিকার করার আবশ্যকতা দেখা দিত তখন উহার প্রতিকারার্থ লোককে তিনি অহিংসার অনুকূল অসহযোগের আশ্রয় লইতে বলিতেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন নিজেই এক কু পদার্থ ছিল, তাই উহার সহিত অসহযোগের নীতি গান্ধীজী অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অসহযোগ মন্দের সহিত, ব্যক্তির মন্দ আচরণের বা ব্যক্তির সহিত কখনও নয়, এই সাবধানতার শঙ্খ-নিনাদ সব সময় তিনি করিতেন। গান্ধীজীর অসহযোগ ছিল ইংরেজ সরকারের সহিত, ইংরেজদের সহিত ছিল না। তাৎপর্য এই যে, সহযোগই কেবল জীবনব্যাপী নীতি হইতে পারে; অসহযোগ হইতেছে নৈমিত্তিক প্রতিকার-পন্থা। উহা মানুষের নিত্যধর্ম নয়, অবশ্য নৈমিত্তিক কর্তব্য।

'প্রতি-সহযোগ' জীবন-দর্শন হইতে পারে না

'প্রতি-সহযোগ' শব্দটিই তাৎপর্য্যপূর্ণ। উহার অর্থ: অপরের সহযোগের জবাবে সহযোগ। এখানে সহযোগের দায়িত্ব প্রতিপক্ষের উপরে। একদিক হইতে অভিক্রমই উহার হাতে চলিয়া যায়। সে যদি সহযোগ করে ত আমরা সহযোগ করিব, যদি অসহযোগ করে ত আমরা অসহযোগ করিব! আর সে যদি কিছু না করে ত আমরাও কিছু করিব না! ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের নিজস্ব কোন জীবন দর্শন এবং নিরপেক্ষ ব্যবহার-নীতি নাই। আমাদের জীবন আর জীবন-নীতি এক জবাবী প্রতিধ্বনি মাত্র হইয়া যায়। ইহাই যদি লোকমান্য তিলকের জীবন-নীতি হইত তবে তিনি নিজের দিক হইতে দেশসেবা আরম্ভই করিতেন না। আর না করিতেই ঐ লোকোত্তর পরাক্রম ও ত্যাগ। তাঁহার লোকসংগ্রহ ও লোককার্য নিরপেক্ষ সহযোগের উদাহরণ, প্রতি-সহযোগের নয়। ইংরেজ রাজত্বকে তিনি যদি এক দুর্ঘটনা ও অনিষ্টের আকর মনে করিতেন তবে উহার সহিত তাঁহার সাধারণ নীতি ও সাধারণ বৃত্তি কেবল অসহযোগেরই হইতে পারিত। এমন অবস্থাও ত দাঁড়াইতে পারিত, যে অবস্থায় ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্যই উহার সহিত সহযোগ করা বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইতে পারিত। সে অবস্থায় সহযোগ বাস্তব পক্ষে ঐ রাজ্যের সহিত অসহযোগ বলিয়াই গণ্য হইত। বেশী করিয়া বলিলে একথাই বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজ সরকারের সহিত ব্যবহারে তখনকার অবস্থায় প্রতিসহযোগ এক সাময়িক নীতি ছিল। উহা কখনও লোক-মান্য সদৃশ লোক-সংগ্রহপরায়ণ ব্যক্তির জীবন-দর্শন হইতে পারে না। সাধারণতঃ সর্বভাবে সহযোগ আর যেখানে আবশ্যক সেখানে পরিমিত অসহযোগ, ইহাই ব্যতিক্রমশূন্য জীবন-নীতি হইতে পারে। ইহাতে অসহযোগের পরিস্থিতি সৃষ্টির দায়িত্ব প্রতিপক্ষের। আমরা যখন 'প্রতি-সহযোগ' বলি তখন সহযোগ আরম্ভ করার দায়িত্ব অন্যের উপর ছাড়িয়া দিই আর নিজেরা প্রতীক্ষা করিতে থাকি। কিন্তু যখন প্রত্যসহযোগ (প্রতি+অসহযোগ) বলি, তখন অসহযোগের কারণসৃষ্টির দায়িত্ব অপরের উপর ছাড়িয়া দিই আর সহ-যোগের মুখ্য ধর্মের অভিক্রম (initiative) নিজ হাতে রাখি। অতএব লোকমান্যের রাজনীতির যথার্থ বর্ণনা করিতে গেলে উহাকে 'প্রতি-সহযোগ' বা 'প্রতি-সহকার' না বলিয়া 'প্রত্যসহযোগ' বা 'প্রত্যসহকার' বলা অধিক সঙ্গত হইবে। তার কারণ অসহযোগই বহুক্ষেত্রে 'প্রতিযোগী' (বিরুদ্ধ), অর্থাৎ অপরের সহিত সহযোগ করা যখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে তখনই অসহযোগের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। সহযোগ নিত্য ও নিরপেক্ষ। অসহযোগ প্রাসঙ্গিক ও নৈমিত্তিক। অন্যের জীবনের সহিত সহযোগ, কিন্তু উহার মন্দের সহিত অসহযোগ—ইহাই কেবল জীবনের সূত্র হইতে পারে।

এই দৃষ্টিতে আমরা যদি লোকমান্যের জীবন দর্শন ও ব্যবহার-নীতির বিচার করি তাহা হইলে সত্যাগ্রহে সেই দর্শন ও সেই নীতির পূর্ণবিকশিত রূপই দেখিতে পাইব। অর্থাৎ তিলক ও গান্ধী, গোখলে ও তিলক, গান্ধী ও মার্কস, এরূপ শৈববৈষ্ণববাদ পদ্ধতির সাম্প্রদায়িক মতবাদ হইতে আমরা নিজ লোকজীবন মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইব। স্বাধীনতার মন্ত্রদ্রষ্টা লোকমান্য তিলকের পুণ্যতিথি উপলক্ষে আমরা যেন এই সংগঠনী সৃষ্টি স্বীকার করিয়া লই। ১৯২০ সনের ৩১শে জুলাই মধ্যরাত্রগতে লোকমান্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয় আর ১৯২০ সনের ১লা আগষ্ট প্রাতঃকালে অসহ-যোগের সূত্রপাত হয়! গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন, 'লোকমান্য চলিয়া গিয়াছেন, লোকমান্য চিরায়ু হউন'।

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধাবলী

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবাসীর প্রথম বর্ষ হইতে ইহার নিয়মিত লেখক-শ্রেণীভুক্ত হন। অর্দ্ধ-শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল তিনি এই পত্রিকায় রচনা পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই সকল রচনার একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী এখানে প্রদত্ত হইল। বিদ্যানিধি মহাশয় পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত তাঁহার বহু পুস্তকে এই রচনাগুলির কতকাংশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পার্শ্বের সাংকেতিক চিহ্ন প্রবাসীর বর্ষ ও মাসের নির্দ্দেশক, যেমন, ২।৯= ২য় বর্ষ, ১৩০৯, নবম সংখ্যা, পৌষ।

ফিনল্যাণ্ডের প্রাচীনতম কৃষক সমিতি

১৮০৩ সনে দক্ষিণ ওস্ট্রোবোথনিয়ার ইলমায়োকি যাজক-পল্লীতে কৃষকদের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপে, হয়ত বা সমগ্র পৃথিবীতেই এইটিই এই ধরনের প্রথম সংস্থা। ইলমায়োকি দীর্ঘকাল যাবৎ ফিনল্যাণ্ডের অধ্যাত্মশক্তির কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। যাজক-পল্লীর সেই পুরাতন নৈতিক শক্তি এখনও লোপ পায় নাই। পুরনো কৃষক সমিতির কাজ এখনও পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে, যদিও ইহার কর্মপ্রচেষ্টা আজ খাঁটি কৃষিকর্ম অপেক্ষা যাজক-পল্লীর প্রাচীন ঐতিহ্যকে বজায় রাখিবার দিকেই অধিকতর কেন্দ্রীভূত।

কৃষক সমিতি কর্তৃক ইলমায়োকিতে সংরক্ষিত একটি 'উইণ্ড মিল' বা বায়ুচালিত যন্ত্র

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে—দেশে অনুরূপ সমিতিসমূহ গড়িয়া উঠার সত্তর বৎসর আগে, যখন উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ফিনল্যাণ্ডের জীবনে দেখা দিয়াছিল চাঞ্চল্য এবং বিপর্য্যয়, রাশিয়ায় সেই সময় চলিতেছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি, ফলে সমগ্র ইউরোপেই যেন আলোড়নের সৃষ্টি হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই সঙ্কট-সময়ে, বিশেষ ভাবে ওস্ট্রোবোথনিয়ার সমতল অঞ্চলসমূহে ইলমায়োকির ন্যায় যাজক-পল্লীগুলিতে জনগণ তরবারির উপর যতটা লাঙ্গলের ফালের উপর ততটাই উচ্চ মূল্য আরোপ করিতে শিখিল। হয় ত সেখানে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইহা অধিকতররূপে উপলব্ধ হইয়াছিল যে, যুদ্ধে ফিনল্যাণ্ডের যত সন্তান মরিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে দুর্ভিক্ষে।

দীর্ঘকাল পূর্ব্বে ঐ বৎসরের একটি স্মরণীয় দিবসে সাত জন মহৎ লোক একত্রে আসিয়া পৌঁছিলেন ইলমায়োকিতে। তাঁহারা মিলিত ভাবে "অর্ডার অব দি নাইটহুড অব পীস" নামে একটি শান্তি-সংসদ গঠনে উদ্যোগী হইলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে

এই সাত জনেই একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া একটি সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য—"কৃষি-কর্ম্মে যথোচিত পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক ইহার সদস্যদের অবস্থার উন্নতি-বিধান এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রচেষ্টায় সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ-সৃষ্টি।"

প্রকৃতপক্ষে ইলমায়োকি কৃষক সমিতির জন্ম হয় ১৮০৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর। ইহার প্রথম সভা সম্পর্কে সংরক্ষিত 'মিনিট'গুলিতে অনেক চিত্তাকর্ষক বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "যেহেতু সমিতি এই অভিমত পোষণ করে যে, কৃষিকর্ম্ম মুখ্যতঃ নির্ভর করে তৃণভূমি কর্ষণের উপর সেইজন্য ইহা শৈবালাচ্ছাদিত, জলায় উৎপন্ন ঘাসে পূর্ণ একটি প্রান্তরকে কৃষিকার্য্যের উপযোগী এবং ইহাতে তৃণবীজ বপন করিতে হইলে একরপ্রতি কত খরচ পড়িবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সমিতি অধিকতর যত্নের সহিত ফার্টিলাইজার সংগ্রহের একটি উপায় উদ্ভাবন এবং সেগুলিকে ঢাকিয়া একস্থানে গুদামজাত করিয়া রাখা অথবা খোলা জায়গায় ফেলিয়া রাখা এ দুইয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ তাহা নির্দ্ধারণ করাও স্থিরীকৃত করিয়াছে।

সে ছিল এক প্রাণবন্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার সময়। পরীক্ষণের পর চলিল পরীক্ষণ এবং অচিরে ইহার ফল পরিলক্ষিত হইল সমগ্র যাজক-পল্লীতে। ফিনল্যাণ্ডের যাবতীয় যাজক-পল্লীর মধ্যে ইলমাজোকি যাজক-পল্লীতেই প্রথম ঘরের ছাদে টালি ব্যবহৃত হইল। ইহা কার্য্যকরী হইল কৃষক সমিতির পরামর্শক্রমে। বার্চ্চ গাছের ছালের দাম যে চড়তির পথে, উক্ত সমিতিই প্রথম তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে এক বোঝা বার্চ্চ গাছের ছালের দাম ছিল চার রিক্স ডলার, আর এখন তাহা দাঁড়াইয়াছে দশ রিক্স ডলারে। এমনকি তাহারও আগে ১৮০৫ সনে সমিতি ইলমা-জোকির জন্য গ্রামীণ অর্ডিন্যান্স বা বিধির একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। তাহাতে ক্ষেতে বা বাগানে বেড়া দেওয়া, জল নিষ্কাশন, অগ্নিকাণ্ডে সাহায্যমূলক ব্যবস্থা এবং সাধারণ ভাবে জনসমাজ উপকৃত হয় এমন সব অন্যান্য কৃত্য সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ অর্ডিন্যান্স জেলার গবর্ণর কর্তৃক অনুমোদিত এবং এক হাজার কপির এক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

হয়ত ইহা অপেক্ষাও প্রবলতর হইয়াছিল ডেরি ফার্ম্ম বা গো-মহিষাদি রক্ষণ-কেন্দ্রের উপর সমিতির প্রভাব। সমিতি প্রথম প্রজননের (breeding) জন্য অশ্ব ক্রয় করে ১৮১৯ সনে। পরের বছর একটি ইংলণ্ডীয়-আরব্য প্রজনন-অশ্ব ক্রীত হয় এবং তিন বৎসরের মধ্যে ইহা বারটি বাচ্চার জন্মদান করে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সমিতি ইংলণ্ড হইতে একটি বার্কশায়ার শূকর এবং শূকরী সংগ্রহ করে। স্পেন হইতে ইতিপূর্ব্বেই ভেড়ার পাল সংগৃহীত হইয়াছিল।

যতই বৎসর গড়াইয়া চলিল ততই কৃষি-উন্নয়নকল্পে সমিতির কার্য্যাবলীর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল সমগ্র পশ্চিম ফিনল্যাণ্ডের উপরে। অতঃপর ১৯০৯ সনে প্রকৃত কৃষিসম্পর্কিত কাজের ভার দেওয়া হইল তরুণদের হাতে এবং সমিতি হইয়া

ইলমায়োকির করি পরিবার কর্তৃক নির্মিত করি ঘড়ি। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পকর্মের একটি দুর্লভ নিদর্শন

দাঁড়াইল স্থানীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অভিভাবকস্বরূপ। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইল ইলমায়োকি মিউজিয়ম। আজিকার দিনে ইহাই ফিনল্যাণ্ডের বৃহত্তম গ্রামীণ মিউজিয়ম এবং কৃষক সমিতিই এখনও ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে।

মিউজিয়ম ভবনকে প্রায়শঃই গীর্জ্জা বলিয়া ভুল করা হয়। অবশ্য ইহার হেতুও আছে। ইহার গঠনকৌশল ইলমায়োকির প্রাচীন গীর্জ্জার অনুরূপ এবং আগেকার দিনে অপরাধিগণকে যেখানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত তাহার পার্শ্বে 'ওল্ড চার্চ্চ পার্কে' ইহা অবস্থিত।

মিউজিয়মে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার হইতে সমিতির কর্ম্মতৎপরতা এবং জন্মস্থানের প্রতি ইলমায়োকির অধিবাসীদের গভীর প্রীতি এ দুয়েরই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সংগ্রহশালা দর্শকের মনকে ১৫৯৬ সনের

সমিতির সাত জন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যের অন্যতম কুসতা এডলুফ ওয়াসাস্তয়েনার একটি গাড়ী। তিনটি শ্বেত অশ্ববাহিত এই শকটটি মিউজিয়মে উপহার দেওয়া হয়

এই মিউজিয়মে কল্লি পরিবার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ঘড়ি একটি গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইলমায়োকি যাজকপল্লী হইতেই উদ্ভব হইয়াছিল ঘড়ি নির্ম্মাতা কল্লি পরিবারের। কল্লিঘড়ি ফিনল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র এবং সম্ভবতঃ এই দেশের সীমানার বাহিরেও পরিচিত।

একটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ মিউজিয়মে নূতন সংযোজিত হইয়াছে—ইহা ফিনল্যাণ্ডের বৃহত্তম বেসরকারী মুদ্রা-সংগ্রহসমূহের অন্যতম। এইটি গড়িয়া উঠিয়াছে ইলমায়োকির মুদ্রাতত্ত্ববিদগণের দানে।
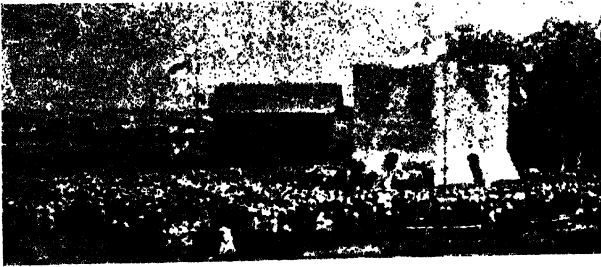
"ক্লাব ওয়ারে" খ্যাতকীর্ত্তি জাক্কো ইলক্কার সম্মানার্থে নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ। পাঁচ জন অনুগামীসহ তাঁহাকে এখানে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়

'ক্লাব ওয়ারে'র মহান কৃষক-নেতা ইলক্কার শৈশবকালে লইয়া যায়। সেই অতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ওস্ট্রোবোথনিয়ার পাঁচ শতাব্দীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক দ্রব্য এখানে সংরক্ষিত আছে।

ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কিত বিভাগটি এই দিক দিয়া অতুলনীয় যে, যে সকল লোক ইহা সৃষ্টি করেন তাঁহারা আজও জীবিত আছেন এবং ওখানে গিয়া নিজেদের তৎকালীন সাজসরঞ্জাম দেখিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় মিউজিয়মের বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়কের কথা। এই ব্যক্তিই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রসদের ঝুলিতে করিয়া আনা সাদা পতাকাটি সংগ্রহশালায় দান করেন—এই পতাকার নীচে দিয়াই ব্রিটিশ কূটনৈতিকগণ পুরোভাগের সৈন্য-বাহিনীকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি যখন পতাকা দান করেন তখন তাঁহার পরনে ছিল যুদ্ধকালীন একটি পরিচ্ছদ।

যাজক-পল্লীর কর্ষিত অঞ্চলের আয়তন প্রায় দশ হাজার বিঘা—এই বিস্তীর্ণ জমির উপর অন্ততঃ চার হাজার গোলাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। শতাব্দীকাল যাবৎ এই সকল তৃণক্ষেত্রের উপর গো-মহিষ চরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের চারণভূমিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বহু বিচিত্র রোমান্টিক কাহিনী। তৃণভূমির মাঝ-খানে সমিতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে একটি অট্টালিকা। ইহার বুরুজের উপর হইতে যে দৃশ্য নজরে পড়ে তাহা বাস্তবিকই রমণীয়।

অন্যান্য ভবনগুলির মধ্যে কোন কোনটি স্মৃতিসদন—সমিতিই এগুলির তত্ত্বাবধান করেন—কোনটিতে আছে বায়ুচালিত যন্ত্র, কোনটি বা শস্যাগার। সমিতির বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মিঃ ভিলহো সিরয়া খুব যথাযথ ভাবেই ইহার উদ্দেশ্যের কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। কৃষক সমিতির কল্যাণে যাজক-পল্লীটি দক্ষিণ ওস্ট্রো-বোথনিয়ার একটি আদর্শ পল্লী এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হয়।

ন. ভ.

আন্দামানে সমাজ-কল্যাণকর্ম্ম

নির্ম্মল এস, পেণ্ডারকার

ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি আন্দামান, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে এত বিভিন্ন জাতির লোক যে থাকতে পারে এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

যে সকল আরণ্য অঞ্চলে আদিম জাতীয় লোকেদের বাস সেগুলো সভ্য মানুষের সংস্পর্শ লাভ করে নি। সুতরাং সমগ্র ভূমির শতকরা আশী ভাগেরও অধিক নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ এবং জারোয়াদের অধ্যুষিত বলে দুর্গম।

হয়ত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিবশে জারোয়ারা যে-কোন অপরিচিত লোক দেখলেই গুলি চালায়। তাদের বশে আনবার চেষ্টা চলছে একমাত্র পুলিস বিভাগের মাধ্যমে। উক্ত বিভাগের লোকেরা ছোট নৌকা করে নিয়মিত ভাবে দ্বীপে যায়। তারা সমুদ্রতীরের কাছে রান্নার বাসন-কোসন নিরাপদ দূরত্ব রাখে এবং জারোয়ারা যখন সেগুলো কুড়াতে থাকে তখন তাদের উপর (অবশ্য সমুদ্র থেকে) নজর রাখে। তাদের বশীভূত করবার এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি দ্বারা এ পর্য্যন্ত কিন্তু সামান্যমাত্রই সাফল্য অর্জ্জিত হয়েছে। পোর্ট ব্লেয়ার, মায়া বন্দর মিডল আন্দামানস্ এবং লং আইল্যাণ্ডের অন্যান্য স্থানের বসতিসমূহের জনসমষ্টির অধিকাংশই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত কয়েদীদের বংশধর। তাদের মধ্যে জনকতক এখন বাগান ইত্যাদির মালিকানার দরুন প্রভূত বিত্তশালী হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বেশ কয়েক জনকে বাস্তবিকই সুশিক্ষিত বলা যেতে পারে। শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয় স্থানীয় প্রশাসন বিভাগে। অন্যান্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনায় নিপুণ (Skilled) এবং অ-নিপুণ (unskilled) শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগানো হয়। তা ছাড়া প্রধানতঃ বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ভারত থেকে শরণার্থী এবং শ্রমিকদের সমাগম তো চলছে অবিচ্ছিন্ন ভাবেই। এই সমস্ত লোকেদের জন্যই এখানে কিছু কিছু সমাজ-কল্যাণ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

স্থানীয় শ্রমজীবীদের একটা বৃহৎ অংশকে স্বভাবতঃই বন-বিভাগে কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশের অতি সামান্য আয়, স্বল্প শিক্ষা অথবা শিক্ষাহীনতা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অভাব ইত্যাদির দরুন তাদের জন্যে কোনও জনহিতৈষণামূলক সামাজিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছে।

করাতের কলে কর্ম্মে নিযুক্ত আছে ১,২০০ শ্রমিক। এই মিলের অশক্ত এবং বৃদ্ধ কর্ম্মীদের জীবিকানির্ব্বাহের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ১৯১৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ত্তমান শ্রমিক কল্যাণ সমিতি এবং এর নামকরণ করা হয় "আন্দামান মাইনর ফরেষ্ট ইণ্ডাস্ট্রিজ সোসাইটি"। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—জরাগ্রস্ত এবং অশক্তদের সেই সকল কাজে পুনর্নিয়োগ করে সাহায্য করা যেগুলিতে তারা তাদের যেটুকু কর্ম্মক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ করতে পারে। বেতের কাজ, বাস্কেট তৈরি, সমুদ্রশঙ্খ ইত্যাদি পালিশ করা—এ সকল হচ্ছে তাদের সাধারণ বৃত্তি। কারুকার্য্য-করা খণ্ড খণ্ড খোলার জিনিষ সমন্বিত প্রদর্শন-গৃহ এবং মিলের গৃহে রক্ষিত সূক্ষ্ম বেতের কাজ দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। স্থানীয় বাজারে এই সকল দ্রব্য বিক্রী হয় এবং বাইরে সেরা বাজারে পাঠানো হয়। এ সকল থেকে যা আয় হয় তা তাদের জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট। এখানে একথা উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ এই সকল দ্বীপে কল্যাণকর্ম্মের উন্নয়নকল্পে ১৯৫৫-৫৬ সনের জন্যে ৩,৫০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করেছেন।

সরকারী বিদ্যালয়টি অনেক দূরে বলে উক্ত অঞ্চলে শিশুদের জন্যে একটি স্কুল খোলা অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৩ সনের ১লা এপ্রিল হাডো'তে শিশুদের জন্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সমিতি আর একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোড়ায় "এ. এম. এফ. আই. এস", "শ্রমিক কল্যাণ ফণ্ড" এবং সহানুভূতিশীল সাধারণের দানে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হ'ত। ১৯৫৫ সনে স্থানীয় সরকারের তরফ থেকে বিদ্যালয়টি ৫০০৲ টাকা সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালিত হচ্ছে একটি বড়

হলে—এটি আসলে কিন্তু কারখানার শ্রমিকদের ক্লাব ঘর। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অর্থসংস্থান হলে, এটিকে যত সত্বর সম্ভব কোনো উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে নেওয়া। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে মাত্র চতুর্থ মান পর্য্যন্ত। প্রধান শিক্ষককে নিয়ে এখানে শিক্ষক আছেন চার জন। ছাত্রদের নিকট থেকে নামমাত্র বেতন হিসাবে প্রতি মাসে নেওয়া হয় চার আনা করে। ছাত্রদের উৎসাহিত করবার নিমিত্ত তাদের বিনামূল্যে বই, শ্লেট, ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বিদ্যালয়ের খরচ চালাতে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে কতকটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, কেননা ছাত্রদের নিকট থেকে সংগৃহীত বেতনের দ্বারা যা আয় হয় তার পরিমাণ এর ব্যয়ের তুলনায় খুবই কম।

বিদ্যালয়টি পরিপাটীরূপে সাজানো গুছানো। জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ছবি,মানচিত্র,আবহাওয়ার চার্ট ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা হয় দেওয়ালে এবং প্রত্যেকটি ক্লাস এমন ভাবে নিজের কাজ চালিয়ে যায় যাতে অন্যান্য ক্লাসের কার্য্যপরিচালনায় খুব কম ব্যাঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা নব্বই জন। শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে হিন্দী। তামিল, তেলুগু এবং বাংলা ভাষায়ও ছাত্রদের পাঠাভ্যাস করানো হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ মানের ছাত্রেরা বাড়তি কাজ হিসাবে বাস্কেট তৈরি, কাঠের কাজ ইত্যাদিও করে থাকে। ছেলেরা তাদের নিজেদের ছোট ছোট হাতে তৈরি ডেস্ক ব্যবহার করে বলে গর্ব্ববোধ করে। নিম্নমানের ছাত্রেরা বেতের কাজ, কাগজের কাজ, নাট্যাভিনয়, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি বিষয় শিক্ষালাভ করে। সাধারণ পাঠ্যতালিকার অতিরিক্ত "আন্দামানের কাঠ" সম্পর্কে একটি বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, আমি বাস্তবিকই তার প্রশংসা না করে পারলাম না। শিশুদিগকে কাঠের প্রকারভেদ এবং রকমারি কাঠের ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই কারখানার শ্রমিকদের সন্তান এবং যেহেতু তাদের পক্ষে মিলের কর্ম্মে নিযুক্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান সেজন্যে এবিষয়ে জ্ঞানলাভ তাদের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য।

শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতিও দেওয়া হয় সমান মনোযোগ। নিয়মিত পাঠ আরম্ভ হওয়ার আগে তাদের রোজ শারীরিক ব্যায়াম করতে হয়। বিশ্রামের সময় সকল শিশুকে গুঁড়ো দুধ এবং যারা বেশী দুর্ব্বল তাদের দেওয়া হয় ভিটামিন ট্যাবলেট। নিয়মিত ভাবে ওজন নিয়ে তা লিখে রাখা হয়। অপ্রচুর অর্থের যাতে পরিপূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার হয় সে জন্যে চরমতম কর্ম্মনৈপুণ্য বজায় রেখে চলা হয়।

১৯৫৫ সনে লং আইল্যাণ্ডে খোলা হয় আর একটি স্কুল, বর্ত্তমানে তাতে আছে একটি মাত্র ক্লাস। গ্রামবাসীদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দিকেও মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে—তাদের গুঁড়ো দুধ এবং ভিটামিন ট্যাবলেট দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে জঙ্গলের অভ্যন্তরভাগেও এ সকল বিতরণ করা হয়ে থাকে। "এমফিস" স্বয়ং খুব বড় সংস্থা না হলেও এটি যেমন কর্ম্মশক্তিতে তেমনি নূতন পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ। মনে হয় এই সংস্থাটি প্রতি নববর্ষে নূতন দায়িত্বভার গ্রহণ করে নিজের কর্ম্মক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করছে। ১৯৫৪ সনের ১লা আগষ্ট এই সংস্থার উদ্যোগে হাডো শিশুদের জন্যে একটি শিশু-রক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিও কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সনের জন্যে সমপরিমাণের ভিত্তিতে ৩,০০০৲ টাকা এবং ১৯৫৫-৫৬ সনে অসমপরিমাণ সাহায্যের ভিত্তিতে দেড় হাজার টাকা দান হিসাবে লাভ করেছে।

ঐ অঞ্চলের যে-কোন শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোক তার শিশুকে উক্ত শিশুরক্ষণাগারে পাঠাতে পারে। এখানকার শ্রমজীবী সম্প্রদায় কিন্তু এত অনুন্নত যে, কোন ভাবাদর্শকে গ্রহণ করতে তারা পরাঙ্মুখ। ওখানে শিশুদের পরিচর্য্যা করা হ'ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু মায়েরা গোড়ার দিকে শিশুদের পাঠাত অকাতর অনিচ্ছার সহিত।

এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু মনে হয় যে, শিশু-রক্ষণাগার এখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয় নি। বর্ত্তমানে শিশুদের মোটসংখ্যা মাত্র বার থেকে তেরোটি। সকাল সাতটা থেকে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত একজন তত্ত্বাবধায়িকা (Matron) এবং দু'জন আয়া তাদের দেখাশুনা করে। শিশুদের স্নান করিয়ে পরিষ্কার পোশাক পরানো হয়। তার পর তাদের দেওয়া হয় গুঁড়ো দুধ এবং ভিটামিন ট্যাবলেট। শিশু-রক্ষণাগার তাদের জন্যে 'লিনেন'যুক্ত কাঠের তৈরি ছোট খাটের ব্যবস্থা করে থাকে। প্রত্যেক শিশুকে তার কাপড়-চোপড়, তোয়ালে, লিনেন ইত্যাদির জন্যে আলাদা করে একটি ড্রয়ার দেওয়া হয়েছে।

যথোচিত বিশ্রামের পর শিশুরা খেলনা নিয়ে খেলায় ব্যাপৃত হয়।

তাদের সম্পত্তি হচ্ছে দোল খাওয়ার জন্যে কাঠের ঘোড়া, কাঠের ব্লক, রঙীন ছিদ্রযুক্ত গুটিকা এবং অনুরূপ নানা টুকিটাকি জিনিষ। এ পর্য্যন্ত এখানে যত শিশু প্রতিপালিত হয়েছে তন্মধ্যে কনিষ্ঠতমটির বয়স প্রায় দেড় মাস। শিশুদের বয়স অত্যন্ত কম বলে তাদের লেখা এবং পড়া সম্পর্কে কোন পাঠ দেওয়া হয় না, কিন্তু যাদের মধ্যে অল্পবয়সেই মানসিক সক্রিয়তার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায় তাদের রঙীন গুটিকা গুনতে শেখানো হয়। সাড়ে এগারটার সময় তাদের দেওয়া হয় অন্নপূর্ণা ক্যাফেটেরিয়া থেকে আনীত খাদ্য। তাদের মধ্যে

যে সকল ছোট বাচ্চার পক্ষে কঠিন খাবার গলাধঃকরণ করা সম্ভব নয় তাদের আবার খাওয়ানো হয় গুঁড়ো দুধ। যে পাত্রে এই খাবার পরিবেশিত হয় তার পরিচ্ছন্নতার দিকে থাকে তত্ত্বাবধায়িকার সজাগ দৃষ্টি। শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং মাঝে মাঝে ওজন নেবার জন্যে একজন লেডি ডাক্তার শিশু-রক্ষণাগার পরিদর্শন করেন। শিশু-রক্ষণাগারের তত্ত্বাবধানে আসার পর শিশুদের স্বাস্থ্যের রীতিমত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পরিচালকগণ আশা করেন যে, এ সকল সুফল শিশুরক্ষণাগারের প্রতি শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের আস্থা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হবে—আজ অবশ্য তাদের অধিকাংশই এ সম্বন্ধে উদাসীন।

সময়ের স্বল্পতানিবন্ধন পোর্ট ব্লেয়ারের পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে অনুষ্ঠিত সমাজকর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু আমি অবগত হই যে, ক্ষুদ্র আকারে সমাজ-কল্যাণ প্রচেষ্টা সেখানেও চলছে। প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে সেখানে বাঙালী, দক্ষিণ ভারতীয় এমনকি ব্রহ্মদেশীয় কারেনদের পর্য্যন্ত সামাজিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এখানকার লোকসমষ্টির জাতিগত বৈসাদৃশ্য কিন্তু সমাজ-কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনাপূর্ণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার পথে কোন দিক দিয়েই বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি। আমি এটা উপলব্ধি করলাম যে, ভাষা আচার-ব্যবহার অথবা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পার্থক্য এমন কোন প্রতিবন্ধ নয় যার দরুন মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি ব্যাহত হতে পারে।

গৃহসজ্জা সম্পর্কে কতিপয় নির্দেশ

ঘরের প্রবেশ-পথ সকল সময়েই রাখতে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পা-পোষ শুধু বিছিয়ে রাখলেই হ'ল না, তা ব্যবহার করা দরকার, আর শিশুদের এই শিক্ষা দিতে হবে যে, তারা যেন পায়ের ধুলোকাদা ঝেড়ে ঘরে ঢোকে।

ঘরের দেয়ালে অসংখ্য পেরেক মারবেন না এবং উদ্ভট পাঁচ-মিশেলি ছবি আর তার সঙ্গে বিভিন্ন বৎসরের এবং ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার একই কক্ষে ঝুলিয়ে রেখে জগা-খিচুড়ির সৃষ্টি করবেন না; কিংবা "লঙ্কায় সীতা" প্রতিকৃতির পাশেই পাখা-হাতে রক্তিম গণ্ডযুক্ত জাপানী সুন্দরীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছবিসমূহ স্থাপন করাটাও ঠিক হবে না। যে সকল ফিকে-হয়ে-যাওয়া গ্রুপ ফোটোগ্রাফে আপনাকে এবং আপনার পূর্ব্বপুরুষদের দেখায় মটরদানার মত সেগুলি টাঙানো থেকেও আপনি স্বচ্ছন্দে বিরত থাকতে পারেন। প্রাচীর-সজ্জার জন্যে একটি কিংবা দুটি ছবিই যথেষ্ট। আপনার আত্মীয়স্বজনের ছবি টাঙানোর ভাবাবেগ চরিতার্থ হতে পারে একটি উৎকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ এলবামের দ্বারা যা আপনি নিজেই তৈরি করতে পারেন। কথাবার্তার সময় দেয়ালের উপর পা তুলে দেবার অভ্যাসকে উৎসাহ দেবেন না। দেয়ালের কাজ ঘরের ভার রাখা—পায়ের নয়। ঠিকমত বলতে গেলে এই বিষয়টি যদিও গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জার আওতায় পড়ে না তথাপি এই অভ্যাস আপনার গৃহস্থালির পরিচ্ছন্নতার পক্ষে ক্ষতিকর বলে এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা উচিত।

সিলিং—ঘরকন্নাদের সিলিঙের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত রকমারি নক্সার জাল বুনতে দেবেন না। এটা যে কেবল দেখতেই কুশ্রী তা নয়, এতে কালি-ঝুল লেগে থাকে এবং ঘরও অপরিষ্কার দেখায়।

প্রচুর ঝালর-লাগানো বস্ত্রাবরণী দ্বারা সিলিঙের বাতি-গুলোকে ঢেকে রাখবেন না। এতে যে কেবল আলোই বাধাপ্রাপ্ত হয় তা নয়, এই আবরণীগুলো হয়ে দাঁড়ায় ধুলো, ময়লা এবং মাকড়সার জালের আধার, একটি সাদাসিধে ঝুড়ি বা এনামেলের আবরণই হবে কাজ চলবার পক্ষে যথেষ্ট।

বাস-কক্ষ—বাস-কক্ষে সকল রকমের আসবাবপত্র জড়ো করে রাখবেন না। আসবাবপত্র যেন গোটা মেঝের তিন-ভাগের এক ভাগের বেশী জায়গা জুড়ে না থাকে। আসবাব-পত্র বলতে কিন্তু বুঝতে হবে হাল্‌কা, ব্যবহারোপযোগী কাঠের অথবা বেতের জিনিষ; মোটা গদি স্প্রিং ইত্যাদি লাগানো "ভিক্টোরিয়ান সোফাসেট" নয়।

সংসারের যাবতীয় বিছানাপত্র গুটিয়ে বাস-কক্ষের এক-কোণে জড়ো করে রাখবেন না। এই উদ্দেশ্যে সৌরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত "বাক্স দিওয়ান" বিশেষ উপযোগী। এর সুবিধা হচ্ছে এই যে, এতে সমস্ত বিছানাপত্রের স্থান ত হয়ই, তা ছাড়া আরামে বসাও যায়।

জানালাগুলোকে আলমারীরূপে ব্যবহার করবেন না। প্রায়শঃই অনেক বাড়ীতে এমন সব জানালা দেখতে পাওয়া যায় যা সকল সময়েই বন্ধ রাখা হয় এবং সেগুলোতে এলো-মেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকে শিশি-বোতল, টিন, পুরনো

খবরের কাগজ এবং এমন সব অন্যান্য জিনিষ যা কোন-না-কোন সময়ে সহজে নাড়াচাড়া করা যেতে পারে। দিনের অধিকাংশ সময়েই জানালাগুলি যতদূর সম্ভব খোলা রাখতে হবে।

যে সকল পরিবারকে ক্রমাগত একস্থান হতে অন্য স্থানে বদলী হতে হয় তাদের আসবাবপত্রের সমস্যার সমাধান হতে পারে ব্লকে'র দ্বারা। ১৪ ইঞ্চি চওড়া, উঁচু এবং লম্বা কাঠের ব্লক তৈরি হতে পারে হয়—সকল দিক ঢাকা অবস্থায় অথবা একটা দিক খোলা রেখে। এই ধরনের কতকগুলি ব্লকের দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন মিটতে পারে। একটি ছোট টেবিল ঢাকনা এবং কারুকার্য্যবিশিষ্ট পাত্র (vase) যুক্ত একটি ব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে ঘরের মাঝখানের টেবিলরূপে। কক্ষের আয়তন অনুসারে, এই সকল ব্লক পাশাপাশি দুই-তিন সারিতে রেখে বিভিন্ন আকারের দিওয়ান তৈরি করা যেতে পারে। এর উপরিভাগে সুজনি দিয়ে ঢেকে একটি গদি স্থাপন করে শয়নাদির উপযোগী দিওয়ান তৈরি হয়। অতিরিক্ত ব্লকগুলিকে অনুরূপ ভাবে পুস্তকাধার এবং কোণের টেবিলরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে বেগ পেতে হয় না। এগুলিকে আকর্ষণযোগ্য করে রাখবার জন্যে প্রয়োজন—মাঝে মাঝে বার্নিশ করা, আর এটা ত আপনি নিজেই করতে পারেন। বিচিত্রিত মৃৎপাত্রগুলি নয়নানন্দকর। আপনার অনিয়মিত অবসর সময়ে রং-তুলি দিয়ে ভাসা ভাসা ভাবে সখের কাজ করবার চেষ্টা করবেন। কয়েক প্রকার পোষ্টারের রং আর একটি তুলি বিকশিত করে তুলবে আপনার ভিতরকার সৃজনীশক্তিকে। প্রাথমিক প্রয়াস যদি সাফল্যমণ্ডিত না হয় এবং একটি রং আর একটি রঙের উপর গড়িয়ে যায়, তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি দেখবেন যে মাত্র একটি রঙীন পাত্র আপনার গৃহকোণকে শোভমান করে তুলতে পারে। আপনি যদি নক্সা আঁকায় চেষ্টা করেন তা হলে নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যগত রচনা শৈলী এবং নমুনার অনুসরণ করে চলবেন। সাধারণ পরিবেশের সঙ্গে এই পদ্ধতিরই সামঞ্জস্য বেশী।

হরেক রঙের খাদির তৈরী তাকিয়াগুলোর ধুলোবালি ঝেড়ে সাফ করে পাঁচিলের নিকট মাদুরের উপর রাখলে তাতে কক্ষের একটি বিশিষ্ট রূপের খোলতাই হয়। চর্ব্বি-জাতীয় জিনিষ অথবা কেশ তৈলের দাগ যাতে দেওয়ালের সৌন্দর্য্য নষ্ট না করে সেজন্যে দেওয়ালে মাদুর এঁটে-দেওয়া যেতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন নোটিশ বোর্ডে আঁটবার কতকগুলো আলপিন এবং নক্সাহীন সাদাসিধা বুনট।

কক্ষের ভিতরে সারি সারি কাপড়-চোপড় থাকলে সমস্ত জায়গাটাই একটা অপরিচ্ছন্ন ভাব ধারণ করে। শুকাবার জন্যে কাপড়-চোপড় মেলে দিতে হবে উঠানে অথবা বাইরে একসারিতে। জানালায় এবং দরজার খিলের উপর যাতে সার্ট ইত্যাদি ঝুলিয়ে না রাখতে হয় সেজন্যে পোশাক-পরিচ্ছদের একটি র‍্যাকের ব্যবস্থা করা উচিত।

বাসগৃহ যাতে দেখতে সুন্দর হয় খুশীর সঙ্গে সে বিষয়ে উদ্যোগী হোন এবং এ সম্বন্ধে চিন্তা, পরীক্ষা ও ঠিকমত সাজানো-গুছানোয় কিছু সময় ব্যয় করুন। শেষ পর্য্যন্ত দেখবেন, ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু মিলিয়ে আপনার মনে এই ছাপ পড়বে যে, কক্ষটি অনাড়ম্বর ভাবে পরিচ্ছন্ন, কিন্তু রুচিসম্মত রূপে সজ্জিত।

পার্ব্বতীবাঈ

নীরা কার্ভে

১৮৭০ সালে রত্নগিরি জেলার দেবরুখে পার্ব্বতীবাঈয়ের জন্ম হয়। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং ভগিনী ছিল দশটি। তাদের ছিল ছোট একটি জোত আর নিজস্ব একটি বাড়ী। তা ছাড়া পার্ব্বতীবাঈয়ের বাবা শ্রীবালকৃষ্ণ যোশীর ছিল ছোটখাটো মহাজনী ব্যবসা। তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা দিন দিন হচ্ছিল অধিকতর শোচনীয় এবং সেজন্যে তাঁর মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'ত। দশ বৎসর বয়সে শ্রীমহাদেবরাও আঠাভালের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'ল। মহাদেবরাও গোয়ায় শুল্ক আপিসে মাসিক পনর টাকা বেতনে কাজ করতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁদের কয়েকটি সন্তানের জন্ম হ'ল, কিন্তু বেঁচে রইল মাত্র একটি ছেলে—নাম তার নারায়ণ। পার্ব্বতীবাঈয়ের স্বামী যখন গোয়া থেকে বদলী হলেন তখন কতকটা আরামে তাঁদের জীবন কাটতে লাগল, কিন্তু বিধাতা কপালে সুখ লেখেন নি। নূতন জায়গার আবহাওয়া তাঁর স্বামীর সহ্য হ'ল না, সেখানে যাবার পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং পার্ব্বতীবাঈয়ের বয়স যখন কুড়ি বৎসর, মাত্র

তখন তাঁর জীবনে নেমে এল বৈধব্যের অভিশাপ। নিজস্ব একটি বাড়ী কিংবা সঞ্চিত অর্থ কিছুই রেখে যান নি মহাদেবরাও। তখন আবার বাপমায়ের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া পার্ব্বতীবাঈয়ের গত্যন্তর রইল না। সেখানে যাবার পরে দেশাচার অনুসারে পার্ব্বতীবাঈয়ের মস্তক মুণ্ডিত করা হ'ল। প্রতি মাসে এই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তির দুঃখ যে কি গভীর তা কল্পনা করতে পারবেন কেবল ভুক্তভোগীরাই। এমনি ভাবে সেখানে পার্ব্বতীবাঈ জীবন কাটাতে লাগলেন এবং তাঁর অবস্থা তার পিতামাতাকে করে তুলল অত্যন্ত অসুখী। হয় ত এমনি ভাবেই তাঁর দিন চলে যেত, কিন্তু অধ্যাপক কার্ভের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর (বায়া) বিবাহের দরুন ঘটল এর ব্যতিক্রম। পার্ব্বতীবাঈও ছিলেন তাঁর মায়ের মত একটু রক্ষণশীল এবং এই বিয়ে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। সদ্যবিবাহিতা বায়ার কিন্তু ইচ্ছা যে, পার্ব্বতীবাঈ থাকেন তাদের সঙ্গে পুণায়, কিন্তু তাঁর মা ছিলেন এর বিরোধী। তাঁর আশঙ্কা ছিল, পার্ব্বতীবাঈও না শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বোনের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ইচ্ছুক হয়ে আবার বিয়ে করে বসেন। অবশেষে পার্ব্বতীবাঈ তাঁর দেবরের সঙ্গে মিরাজে অবস্থান করা স্থির করলেন আর ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন পুণায়।

ছয় মাস পরে একদিন অধ্যাপক কার্ভে, বিধবারা যাতে নিজেদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন তদুপযোগী শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি হোম বা সদন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর আদর্শের কথা পার্ব্বতীবাঈকে বুঝিয়ে বললেন। তিনি পার্ব্বতীবাঈকে এ বিষয়ে ভেবে দেখতে এবং তিনি তাঁকে সাহায্য করতে রাজী আছেন কিনা তা জানাতে অনুরোধ করলেন। পার্ব্বতীবাঈ তাঁকে বললেন যে, তিনি তাঁর আদর্শ উপলব্ধি করতে পারছেন না বটে, তবে হোষ্টেলে রাঁধুনী হিসাবে কাজ করতে পারবেন। আন্না (ড. কার্ভে এই নামেই সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন) কিন্তু জানতেন যে, এর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্টতর কাজ করবার যোগ্যতা তাঁর আছে এবং তিনি যাতে 'টিচার্স সার্টিফিকেট' পেতে পারেন সেজন্যে তাঁকে 'হোম ক্লাসে' যোগ দেবার নির্দ্দেশ দিলেন। এমনি ভাবে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পার্ব্বতীবাঈ একেবারে গোড়া থেকে পড়াশুনা সুরু করলেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিক্ষাক্রম (course) সমাপ্ত করলেন।

ইতিমধ্যে আশ্রমের কাজ যথারীতি সুরু হয়ে গেছে। আন্নার সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবার এবং তাঁর পরিকল্পনাসমূহের কথা শুনবার সুযোগ লাভ করলেন পার্ব্বতীবাঈ। এমনি ভাবে বিধবাদের স্বাবলম্বিনী করবার জন্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর মনে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হ'ল। অবশেষে ১৯০২ সনে বিধবাদের কল্যাণব্রতে জীবন উৎসর্গ করতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হলেন এবং আশ্রমে যোগদান করলেন আজীবন কর্ম্মী (Life worker) হিসেবে। এই সংস্থায় তখন আবাসিক হিসাবে থাকতেন আঠার জন শিক্ষার্থিনী। তাদের আহার এবং বাসস্থান ব্যবস্থার তদারক করতেন পার্ব্বতীবাঈ। আশ্রমে কর্ম্মীর সংখ্যা কম থাকায় তাঁকে একাধারে হতে হয়েছিল তত্ত্বাবধায়িকা (Superintendent), শুশ্রূষাকারিণী (Nurse) এবং সেবিকা (Attendent)। কিছুকাল পরে আরও কর্ম্মীরা এসে আশ্রমে যোগ দিলেন এবং পার্ব্বতীবাঈকে পাঠানো হ'ল অর্থসংগ্রহের জন্যে। বিশ বৎসরের অধিককাল প্রচুর বাধা ও অসুবিধার ভিতর দিয়ে তিনি ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং সংগ্রহ করেন প্রায় এক লক্ষ টাকা। তাঁর কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দরুন বিধবাদের শিক্ষাদান সম্পর্কে সমাজে সাধারণের মনোভাবের যে পরিবর্ত্তন হয়, তার মূল্য ছিল এই সংগৃহীত অর্থের চেয়ে ঢের বেশী। মহারাষ্ট্রের বাইরে ভ্রমণকালে ইংরেজী ভাষা জানা না থাকায় পার্ব্বতীবাঈ অসুবিধা বোধ করতেন, ফলে যদিও তখন তিনি পা দিয়েছেন চারের কোঠায় তথাপি ঐ ভাষা শিখবার বাসনা তাঁর মনে জাগল। আন্না তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন একটি কনভেণ্ট স্কুলে, কিন্তু শিক্ষকগণ তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন বলে এখানে তার বিশেষ উন্নতি হ'ল না।

একবার আন্নার মনে হ'ল যে, পার্ব্বতীবাঈ যদি বিদেশে যান তা হলে ইংরেজী ত তিনি শিখতে পারবেনই, উপরন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে নারী-কল্যাণ-সংস্থাগুলি কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাও স্বচক্ষে দেখবার সুযোগলাভ করবেন। এমনি ভাবে খুব কম ইংরেজী-জানা, একজন গোঁড়া হিন্দু বিধবা আমেরিকায় প্রেরিত হলেন ১৯১৭ সনে—সে আজ চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা।

গোড়ায় তিনি থাকতেন ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলিতে ওয়াই. ডবল্যু. সি. এ. হোষ্টেলে। তাঁকে অনেক ধকল সহ্য করতে হ'ত। বহু পরিবারে এবং একটি হাসপাতালে তিনি কাজ করতেন পরিচারিকা রূপে। ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে তিনি চলে যান নিউইয়র্কে, কিন্তু সেখানে গিয়েও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল—ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত একটি শ্রমিক-কল্যাণ সম্মেলনে নারী-শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ লাভ করলেন তিনি। এখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল নারী-শ্রমিকদের এক নেত্রীর সঙ্গে। তিনি শুধু যে তাঁকে কাজই দিলেন

তা নয়, নিজের বাড়ীতে তাঁর থাকার ব্যবস্থাও করলেন। তাঁরই আনুকূল্যে একজন তর্জ্জমাকারীর সহায়তায় পার্ব্বতী-বাঈ কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করতে সমর্থ হলেন। এমনি ভাবে ১৯২০ সনে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে তিনি কিছু অর্থসংগ্রহ করেন এবং আশ্রমের জন্যে দান হিসেবে একটি মোটরকারও পেয়েছিলেন। কাজ থেকে অবসর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত, এমনকি তার পরেও তাঁর কর্ম্মপ্রচেষ্টা ছিল অব্যাহত। দীর্ঘকাল বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে তিনি পারেন নি বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি এমন এক পুত্রের জননী হয়েছেন যিনি বাস্তবিকই মহারাষ্ট্রের রত্নস্বরূপ। পার্ব্বতীবাঈয়ের এই কৃতী সন্তান হিঙ্গন সংস্থার জন্য দান করেছেন এক লক্ষ টাকা।

পার্ব্বতীবাঈ লোকান্তরিতা হন ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসে, পঁচাশী বৎসর বয়সে। হিঙ্গন কলেজটির নূতন নামকরণ করা হয়েছে তাঁরই নামানুসারে। আশ্রমের উন্নতিকল্পে তাঁর ত্যাগ ও সেবার জন্যে সকলের মনে যে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত, এটা হচ্ছে তারই দ্যোতক। চলিত বৎসরে এই ট্রেনিং কলেজের জন্যে একটি স্বতন্ত্র ভবন নির্ম্মিত হবে—বর্ত্তমান বৎসরেই অনুষ্ঠিত হবে হিঙ্গন স্ত্রীশিক্ষা সংস্থার হীরক-জয়ন্তী উৎসব।

কুষ্ঠরোগীদের পুনর্ব্বাসন

টি. এন. জগদীশন

'অক্সফোর্ড কনসাইজ ডিক্সনারী' অনুসারে পুনর্ব্বাসন কথাটার মানে হইতেছে "সুযোগ-সুবিধা, খ্যাতি অথবা যথোচিত অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা"। কাজেই পুনর্ব্বাসনের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখন কাহারও ক্ষতি সাধিত এবং তাহার মর্য্যাদা অথবা অবস্থার হানি হয়। কোনও ব্যক্তি যখন রোগে ভোগে তখন কখনও কখনও সে অশক্ত হইয়া যাইতে পারে; কাজেই তাহার পুনর্ব্বাসনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তা ছাড়া নিজের কাজ করিতে গিয়া অথবা যুদ্ধজনিত দুর্ঘটনায় কোনও ব্যক্তি যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখনও তাহার পুনর্ব্বাসন-ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। গত যুদ্ধের সময়ে পুনর্ব্বাসন কথাটির তাৎপর্য্য বিষয়বস্তুর দিক দিয়া সমৃদ্ধতর হইয়াছে। তখন পুনর্ব্বাসন কথাটার মানে দাঁড়াইল আর্থিক প্রাচুর্য্যের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা অপেক্ষাও বেশী কিছু। এই বিষয়টির উপর যথাযথভাবেই জোর দেওয়া হইল যে, প্রকৃত পুনর্ব্বাসন তখনই হয় যখন পুনর্ব্বাসিত ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক সামাজিক পারিপার্শ্বিকে বাস এবং কাজকর্ম্ম করে। কেননা সকল মানবীয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কর্ম্মে নিয়োগ নয়—কল্যাণসাধন; এবং ব্যাপকতর সামাজিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সুযোগ-সুবিধাসমূহও কল্যাণপ্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত।

পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে এই আধুনিক ধারণা কুষ্ঠরোগীদের বেলায় কতটা প্রযোজ্য তাহা দেখা যাক। কুষ্ঠব্যাধির ক্ষেত্রে পুনর্ব্বাসনের সমস্যা দেখা দেয় দুইটি কারণে। এই রোগ সম্বন্ধে সাধারণের মনে বদ্ধমূল কুসংস্কারের জন্য কোনও কুষ্ঠরোগীর কর্ম্মক্ষমতা বিনষ্ট না হইলেও অথবা যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষ, সে রোগসংক্রমণ-দোষ হইতে মুক্ত এবং তাহার দ্বারা সাধারণের বিপদাশঙ্কা নাই একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাহার পক্ষে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা অথবা কাজে ফিরিয়া যাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাধির ফলে ক্ষতের আকারে রোগীর এমন কতকগুলি বিকলাঙ্গতা এবং অক্ষমতার সৃষ্টি হয় যে, রোগী দেখে তাহার পক্ষে নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি চালাইয়া যাওয়া দুরূহ ব্যাপার। এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণের কুসংস্কার ছাড়া ব্যক্তিগত অক্ষমতাও লাভজনক কর্ম্মানুষ্ঠানের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ফলপ্রদ আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার দরুন যাহাদের রোগ থামিয়া যায় তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তির পথে বলিয়া কুষ্ঠব্যাধি সম্পর্কিত পুনর্ব্বাসন-সমস্যা এখন বিশেষ জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কুষ্ঠব্যাধি হইতে যাহারা আরোগ্যলাভ করে সেই বিপুল-সংখ্যক লোকের কর্ম্ম এবং অন্নসংস্থান সম্পর্কিত বর্ত্তমান

পরিস্থিতি এত জটিল যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একথা ঠিকই বলা হইয়াছে যে, আজিকার দিনে যিনি কুষ্ঠ ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহার অবস্থা ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা বাস্তবিকই শোচনীয়, কেননা শেষোক্তের পক্ষে কুষ্ঠ স্বাস্থ্য নিবাসে অথবা উপনিবেশে আশ্রয়লাভ করিয়া উপযুক্ত পরিচর্য্যাধীনে থাকার ব্যবস্থা হইতে পারে।

যে রোগীর দেহ বীজাণুমুক্ত হইয়াছে, কুষ্ঠ-প্রতিষ্ঠান যেমন তাহাকে স্থান দিতে নারাজ তেমনি নিজের বাড়ীতেও সে অবাঞ্ছিত। ইহা খুবই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার যে, কুষ্ঠ-প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাধীন রোগীরা মুক্তির দিনটিকে ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। "ক্ষুধার্ত্ত মেষ প্রত্যাশী হইয়া তাকায়, কিন্তু তাহাকে খাবার দেওয়া হয় না।"

এখন, খাওয়ানোই যদি একমাত্র প্রয়োজনীয় কাজ হইত তাহা হইলে ব্যাপারটা খুবই সহজ হইয়া যাইত। "ক্ষুধার্ত্ত ভেড়ার পালে"র বুভুক্ষা খাদ্য ছাড়া অন্য জিনিষের জন্য ঢের বেশী। সংসারে একটি আশ্রয় পাইবার জন্য—এমন সম্মান-জনক আশ্রয় যাহা তাহাদিগকে দিবে স্বাবলম্বনের মর্য্যাদা—তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

পুনর্ব্বাসন উপনিবেশগুলি স্বভাবতঃই এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবে। "বিরাটায়তন জমি লইয়া সেখানে এমন একটি কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করা হোক যেখানে থাকিবে কোনও একটি কুটীর-শিল্প চালু করিবার প্রবণতা"— এই ধরনের নির্দ্দেশ প্রদান করা হইবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি আমাদিগকে কতকগুলি পুনর্ব্বাসন উপ-নিবেশ প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করিতে পারে। আমি কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, কতকগুলি বৃহদায়তন উপনিবেশ খোলার প্রয়াস বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা তাহার দরুন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে সুস্থতালাভের পর এক প্রতিষ্ঠান হইতে অপর প্রতিষ্ঠানে গিয়া আশ্রয়লাভ করিবার সুবিধাটুকু মাত্র হইবে। যে ব্যবস্থার ফলে প্রাক্তন রোগীদের বিশেষ বিশেষ কলোনিগুলিতে স্থায়ীভাবে থাকিতে হয় তা পুনর্ব্বাসনের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করিয়া দেয়, কেননা পুনর্ব্বাসন মানেই স্বাভাবিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা। স্বল্পকালীন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন হইবে না, কেননা তাহাতে কুষ্ঠব্যাধির বিরুদ্ধে প্রচলিত কুসংস্কার গভীরতর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যে বিষয়টি আমি উল্লেখ করিতেছি, অভিজ্ঞ কর্ম্মীদের মধ্যেও তাহা ধীরে ধীরে শিকড় গাড়িতেছে। "আমেরিকান লেপরসি ফাউণ্ডেশনে"র প্রেসিডেন্ট মিঃ পেরি বার্জ্জেস তাঁহার "বর্ন অব ফোর ইয়ার্স" পুস্তকে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন :

"যদিও এখনও পর্য্যন্ত আমি ইহা উপলব্ধি করিতেছি যে, কতকটা স্বাধীন জীবনযাপন-প্রণালী এবং কর্ম্মসূচী সংবলিত এই সকল স্বাবলম্বী উপনিবেশের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা পুরনো পৃথক-করণের পদ্ধতি অপেক্ষা প্রভূত পরিমাণে উন্নততর, তথাপি আমাকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই কয় বৎসরে আমার মতের বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উপনিবেশসমূহ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বধারণা সম্পর্কে আমি আর তেমন উৎসাহী নই। বিষয়টি সামগ্রিক ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায় ইহার দরুন সাধারণের অজ্ঞতা, ভয় এবং কুসংস্কার গভীরতর হইয়া, বিপদাশঙ্কা বাড়িয়া উঠিবে মাত্র।"

তাহা হইলে আমরা কি করিব? আমার মনে হয় বর্ত্তমান সময়ে যে কাজটির ব্যবহারিক উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী তাহা হইতেছে—বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাক্তন কুষ্ঠরোগীদের জন্য কতিপয় আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। ইহা সত্য যে, সাধারণতঃ কুষ্ঠ উপনিবেশে কোন না কোন প্রকার বৃত্তি-শিক্ষার পদ্ধতি চালু থাকে। কিন্তু কুষ্ঠ মিশনের মিঃ বেইলি দেখাইয়াছেন যে, এই পদ্ধতি ও পুনর্ব্বাসন-ব্যবস্থার মধ্যে একটা ফাঁক সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা, উপনিবেশে রোগী যে বৃত্তি শিক্ষা করে এবং অন্যবিধ যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তাহা এমন নয় যাহার দৌলতে সে বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে লাভজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে। কাজেই আমি প্রস্তাব করি যে, এই সকল নূতন শিক্ষণকেন্দ্রে আমাদিগকে সযত্নে এমন কতকগুলি বৃত্তি নির্ব্বাচন করিতে হইবে যাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষ অথবা একযোগে কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা অনুসৃত হইতে পারে। তৈরী জিনিষগুলি হইবে সাদাসিধা ধরনের, কিন্তু সেগুলির জন্য যাহাতে বড় বাজার পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা অবশ্যকরণীয়। এই উদ্দেশ্যে সরকারী বিভাগ-গুলির দ্বারস্থ হইতে হইবে এবং এমন কতকগুলি সাদাসিধা জিনিষ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা সমীচীন যাহা ব্যাপক আকারে তাহাদের প্রয়োজনে লাগিবে। আজিকার দিনে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদের চাহিদা দেখা দিয়াছে তখন আমাদের কেন্দ্রসমূহের পক্ষে কোন কোন বিশেষ বিষয়ে কারিগর, যন্ত্র-শিল্পী ইত্যাদি তৈরি করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন বিশেষ ভাবে উপযোগী হইবে। পরিণামে কুষ্ঠ-ব্যাধিমুক্ত পুরুষ অথবা নারী যথোচিত শিক্ষালাভ এবং প্রস্তুতির পরে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন এবং লাভজনক বৃত্তি অবলম্বনে উদ্যোগী হইতে পারিবে। এই সকল জিনিষ বাজারে বিক্রয়ের সমস্যা লইয়া যেন প্রাক্তন রোগী মাথা না ঘামায়। 'হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘে'র মত কোন এজেন্সি অথবা বস্তুতঃ যে-কোন সমাজকল্যাণ সংস্থা, কর্ম্মীর দ্বারা উৎপাদিত জিনিষগুলি লইয়া গিয়া তাহার তরফে বাজারে বিক্রি

করিবার জন্য আগাইয়া আসিবে। উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে অম্বর চরকা তাহার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যাহারা কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত তাহারা অনায়াসে ইহা দ্বারা কাজ করিতে সমর্থ হইবে। প্রস্তাবিত শিক্ষণকেন্দ্রগুলির সহিত এমন কোন সংস্থার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক যাহা পুনর্ব্বাসন-সংক্রান্ত শল্য-চিকিৎসা (Surgery) এবং শারীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছে। ইহা এখন উপলব্ধি করিতে পারা গিয়াছে যে, কুষ্ঠ হইতে সঞ্জাত অক্ষমতা এবং বিকলাঙ্গতা বহুলাংশে পরিহার্য্য এবং ইহা সারানোও যাইতে পারে। ভেলোরের ডাঃ পল ব্র্যাণ্ড এই দিক দিয়া স্মরণীয় কাজ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, যথোচিত শারীর চিকিৎসা এবং শল্য-চিকিৎসা দ্বারা কুষ্ঠরোগীদের বিকল হাত আবার কর্ম্মক্ষম হইতে পারে। যাহাদের কুষ্ঠরোগ আছে তাহাদের জন্য সর্ব্বাধিক উপযোগী এবং ফলপ্রদ কাজের পদ্ধতি আবিষ্কার করিবার জন্যও ডাঃ ব্র্যাণ্ড পরীক্ষণ চালাইতেছেন। যন্ত্রপাতি অদল-বদল করিয়া তিনি এই সকল হস্ত দ্বারা কাজের উপযোগী নূতন যন্ত্রপাতি চালু করিতেছেন। ভেলোরস্থ নবজীবন নিলয়মের যে সকল রোগী শারীর চিকিৎসা এবং শল্যচিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে তাহারা এমন কয়েক প্রকারের খেলনা তৈরি করে যেগুলি বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করেন ডাঃ ব্র্যাণ্ড। তিনি কিন্তু ইহা বুঝিতে পারেন যে, খেলনা তৈরি তাঁহার কেন্দ্রের পক্ষে উপযোগী হইলেও অন্যান্য কেন্দ্রের পক্ষে ঐ সকলের উপযোগিতা নাও থাকিতে পারে, কাজেই আমাদিগকে খুব সুস্পষ্টরূপে চিন্তা করিয়া অন্যান্য সম্ভাব্য বৃত্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ডাক্তার ব্র্যাণ্ড সত্যই বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত না রোগী নিজেই আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে নিজের তত্ত্বাবধান এবং জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় সেই পর্যন্ত তাহার সামগ্রিক পুনর্ব্বাসনই হইবে আমাদের চরম লক্ষ্য, ইহা অপেক্ষা স্বল্পে আমরা তুষ্ট হইব না।"

আমার আশঙ্কা হয় যে, যাহা করা হইতেছে তাহা অপেক্ষা যাহা করা উচিত তৎসম্বন্ধে আমি বেশী কথা বলিতেছি। আর ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ভাবী কৃত্যসমূহের পরিকল্পনা করিতে হইবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে। সাধারণ সমাজকর্ম্মী স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিবেন, "সামাজিক সমস্যাসমূহের অন্যতম কুষ্ঠব্যাধি নিবারণে উৎসাহী সমাজকর্ম্মী আমি, কিন্তু কুষ্ঠরোগীদের পুনর্ব্বাসন সংক্রান্ত পরিস্থিতির জটিলতা দূরীকরণের জন্য আমি কি করিতে পারি?" ইহার উত্তরে বলা যায়, আপনার কতকগুলি করণীয় কাজ আছে। প্রথমে কিন্তু জানা এবং উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, আজ কুষ্ঠ একটি চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধি; কুষ্ঠব্যাধি হইতে সৃষ্ট বিকলাঙ্গতা ও অক্ষমতা নিবার্য্য এবং ইহার প্রতিকার করাও যাইতে পারে। আপনি এমন উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারেন, কেবলমাত্র যাহাতে কুষ্ঠরোগীদের জন্য পুনর্ব্বাসনমূলক ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে অবলম্বিত হইতে পারে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় যাহা আশা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ। কুষ্ঠ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আমরা প্রত্যেকে যদি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করি তাহা হইলে পুনর্ব্বাসন বলিতে একটি অবজ্ঞাত শ্রেণীর প্রতি দয়াপ্রদর্শনের অতিরিক্ত আর কিছুই বুঝাইবে না। আমি এই আশা পোষণ করি যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, দেশের বিভিন্ন অংশে আমার পরিকল্পিত শিক্ষণকেন্দ্রের অনুরূপ কেন্দ্রসমূহ খোলা হইবে। আমার আশা এই যে, প্রতিষ্ঠার পর এই সকল কেন্দ্রের প্রতি সাধারণভাবে সমাজকর্ম্মীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে যে নূতন আদর্শ আমি উপস্থাপিত করিয়াছি সেগুলি যাহাতে ঐ সকল কেন্দ্রে কর্ম্মে রূপায়িত হয় সে বিষয়ে তাহারা অবহিত হইবে। আজিকার দিনে কুষ্ঠরোগীদের সেবাকার্য্যে নিরত কর্ম্মীদের যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তন্মধ্যে একটি এই যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের সমাজকর্ম্মীরা কুষ্ঠব্যাধি সম্পর্কে প্রায়শঃই সেকেলে ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহার দায়িত্ব কুষ্ঠরোগীদের সেবাকার্য্যে নিরত কর্ম্মীর যতটা, সাধারণ সমাজকর্ম্মীরও ঠিক ততটাই। আমাদিগকে এই বাণী চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং আমাদের কথায় যাহাতে সকলে কর্ণপাত করে সেই দাবি উত্থাপন করিতে হইবে।

এখনো অনেক দুঃখ

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

এখনো অনেক দুঃখ বাকি
এখনো রাত্রির দেশে তুমি উষা রয়েছ অ-ধরা।
ঘুমের তিমিরতীরে
বেদনার জাল পেতে রাখি—
ধরা যদি পড়ো, জানি
সাথী হতে হবে স্বয়ংবরা॥

যাদের চাহি না, হায় নিত্য তারা আসে কৃপা করি'
মুখে হাস্য, মনে ক্ষোভ, জনতার মাঝে রহি একা।
যাদের সময় হয়
আমার সময় নিতে হরি'
তাদের মতন হলে
হয়তো এখনি দিতে দেখা॥

গোপনে স্বপ্নের মত ঘুমের অতলে গান করি
আমার বুকের ভাষা ভালবাসা পায় না কোথাও,
তুমি তো সামান্যা নও
তাই বুঝি দূরে সুর ধরি'
ঘুমের অতলে রহি
চিত্ত শুধু আশ্বাসে দোলাও?

ঘুম হতে ওঠো প্রিয়, সত্যকার জাগরণে জানি,
আমার জাগার গানে ওরা তো মানে না, পরিহাসে,
তুমিও মানো না, তাই
এখনো জাগো না অভিমানী,
এখনো বালিকা বুঝি?
মন নেই মিলনবিলাসে?

যে-মেয়ে শৈশবে আজও খেলা করে পুতুলের পাশে
মা হয়ে খাওয়ায় দুধ, মেয়ে হয়ে নিজেই পুতুল—
জেগে জেগে ঘুম যায়,
একটুতে কাঁদে, কভু হাসে—
তুমি কি উপমা তার?
তুমিও মাটির সমতুল?

মাটির উপমা তুমি? মাটির পৃথিবী মনোরম?
মন ছাড়া সব আছে, মন ছাড়া দিতে পারো সব!
দীপ্ত চোখ, লুব্ধ ঠোঁট
মুগ্ধ হাসি অনন্ত উপমা?
পতঙ্গের পক্ষপাশে
তুমিও কি অগ্নির তাণ্ডব?

নির্মনের অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত মত্ততার ফুল—
এ ফুলে ভ্রমর যারা কি যে মধু পায় জেগে জেগে
অভিমানে তেড়ে বেড়ে
অহরহ শ্মশান তো হল,
মারণের অভিচারে
রাত্রিরে রাঙায় রণোদ্বেগে!

এখনো অনেক দুঃখ বাকি
এখনো রাত্রির দেশে কাঙালজীবনে নাই ঘুম,
উষার সন্ধানে কবি
আজও আমি তিমিরে একাকী
প্রথম প্রেমের মত
প্রত্যাশায় নিথর নিঝুম!

আমার প্রথম মোকদ্দমা

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

অনুবাদক—শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

[অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যবহারজীবী হিসাবে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে অনেকেই জানেন, কিন্তু ব্যবসার প্রারম্ভে প্রথম মোকদ্দমা পাইয়া তাঁহার মনে কি ভাব উদয় হইয়াছিল, কি ভাবে হাকিমের কাছে তিনি সেই মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং সে বিষয়ে তাঁহার নিজেরই বা কি বক্তব্য আছে তাহা হয়ত অনেকেরই জানা নাই। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে ও উপকারার্থে এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য তাঁহার লিখিত প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করা হইল]

ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল আমি আইন ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছি। সেজন্য ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, এই ব্যবসায়ে কি করিয়া সফলতালাভ করা যায় লোকে তাহা জানিতে চাহিবে, কিন্তু উত্তরে আমি কোন কারণই দর্শাইতে পারিব না। প্রশ্নোত্তর ধরণে আমি আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

প্রশ্ন—সফলতা লাভ করিতে হইলে আইন বিষয়ে পাণ্ডিত্যই কি একান্ত আবশ্যক ?

উত্তর—হাঁ, কতকটা আবশ্যক বটে, তবে আইন বিষয়ে পাণ্ডিত্য বলিতে শুধুই আইন-জ্ঞান ও তাহার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা বুঝিলে চলিবে না, আইনের ব্যবহারিক কার্যাকারিতাও বুঝিতে হইবে। তবে সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে ইহাই যে একান্ত আবশ্যক এবং নিশ্চয়ই একজনকে বড় আইনজ্ঞ করিবে তাহা বলা যায় না।

প্রশ্ন—বসিয়া থাকিলেই কি ব্যবসায়ে সাফল্য ও উন্নতিলাভ হইতে পারে ?

উত্তর—ব্যবসার কোন এক অবস্থায় ইহার খুব প্রয়োজন হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রারম্ভে ইহার কোন সুযোগই আসে না।

প্রশ্ন—তবে কি সাধারণ জ্ঞানের ও পরিশ্রমী হওয়ার আবশ্যকতা আছে ?

উত্তর—এগুলি অনেকটা সাহায্য করে বটে, কিন্তু শুধু এগুলিতেই হয় না এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

প্রশ্ন—তবে কি বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং মানবচরিত্র ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকিলে কিছু সাহায্য হয় ?

উত্তর—ঐগুলি খুবই দরকার বটে, তবে শুধু ঐগুলিতেই হইবে না।

প্রশ্ন—তবে সফলতালাভ করিতে হইলে এই সমস্ত গুণগুলির সমন্বয়ই কি আবশ্যক ?

উত্তর—সত্য কথা বলিতে কি, এক ব্যক্তিতে এই সমস্ত গুণাবলীর সমন্বয় দেখা যায় না। দেখা গেলেও উহা খুবই দুর্লভ। আর যদি এই গুণসমূহের সমন্বয়ই ব্যবসায়ে সাফল্যলাভে একান্ত আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আইন ব্যবসায়ে কেহই সফলতালাভ করিতে পারিত না। সেই জন্য আমি প্রথমে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই বলিতে হয়, আইন ব্যবসায়ে কিসে সাফল্য অর্জ্জিত হয় তাহা জানা বড় কঠিন ব্যাপার। সাফল্য খানিকটা সুযোগ-সুবিধার উপর এবং অনেকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু ইহা যে শুধুই আকস্মিক তাহাও বলা যায় না। বিবাহ যেমন ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, আইন-ব্যবসাও সেইরূপ লটারি বা স্ফূর্ত্তি-খেলার মত তাহা বলা যায় না।

আমি যখন আইন ব্যবসা আরম্ভ করি তখন উপরে বর্ণিত অনেক গুণই আমার ছিল না, কারণ তখন আমার বয়স খুবই কাঁচা। যে অবস্থায় আমি এই ব্যবসায়ে যোগদান করি তাহা বলিলে আমার মনে হয়, অনেক নূতন ব্যবহারজীবীর উপকার হইবে। উপমাস্বরূপ বলা যাইতে পারে—ভগ্নপোত যাত্রীরা বালুকাময় বেলাভূমিতে পদচিহ্ন দেখিয়া যেমন আশায় বুক বাঁধে, এই ব্যবসায়ে নবীন আগন্তুকেরাও সেইরূপ আশান্বিত হইবেন।

আমি যখন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করি—কলিকাতায় যেটুকু সাধারণ বিদ্যালাভ করা যায়, তখন তাহাও আমি অর্জ্জন করি নাই। আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম। তখনকার দিনে বি-এ পরীক্ষা জানুয়ারী মাসে হইত। কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া বি-এ পাসের পর, কিংবা অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেবের মত গিলক্রাইষ্ট বৃত্তিলাভ করিবার পর, বিলাত গেলে আমার সুবিধা হইবে, আমার পরিচিত দু'এক জন অধ্যাপক আমাকে এইরূপ পরামর্শ দেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া বি-এ পরীক্ষার ছয় মাস পূর্ব্বেই বিলাত যাত্রা করি। অভিভাবকদের সম্মতি না লইয়া পলাইয়া গিয়াছিলাম বলিয়া আমার আর অপেক্ষা করিবার অবসর ছিল না। সুযোগ আসিবামাত্রই আমাকে 'চম্পট' দিতে হয়। ছয় মাস বা ততোধিক কাল অপেক্ষা করিতে হইলে আমার এই দুঃসাহস দেখাইবার সুযোগ হয়ত আর আসিত না। অভিভাবকেরা আমার এই অভিপ্রায় অবগত হইবার পর বাধা দিবার জন্য সম্ভবতঃ যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। সুতরাং ভরা বর্ষার সময় "সিটি অফ আগ্রা" জাহাজে কলিকাতা হইতে বরাবর লণ্ডন গিয়া পৌঁছি ত্রিশ দিনে—তখনকার দিনে জাহাজে ত্রিশ দিনই লাগিত। বিলাতে পৌঁছিয়াই আমি 'লিঙ্কনস ইনে' ভর্ত্তি হই। পাঁচ বৎসর আমি ঐখানেই পড়িয়াছিলাম। যে সামান্য অর্থ লইয়া আমি বিলাত যাত্রা করিয়াছিলাম ইনের ফি ইত্যাদি দিতে তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তাহা হইলেও ছাত্র পড়াইয়া আমি

এখন রেক্সোনায় নতুন একটা কিছু আছে !

তৎলব্ধ অর্থ দ্বারা ফরাসী, জার্মান, স্পেনিস ও ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা করিয়া আনন্দলাভ করিতাম।

তিন বৎসরের মধ্যে 'ইন' ও আইন বিদ্যা-সমিতি হইতে আমি বহু পুরস্কার এবং বৃত্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমি ব্যারিষ্টারির শেষ পরীক্ষা দিবার জন্য কোন দিন চেষ্টাও করি নাই, পাস করার কথা দূরে থাকুক। ঐ বৎসরে ঈষ্টার টারমে শেষ পরীক্ষায় পাস করিবার জন্য 'বারষ্টো বৃত্তি' দেওয়া হয়। আমি উহাই লাভ করিবার চেষ্টায় অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ অসুখে পড়ায় পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইতে পারি নাই। পরবর্তী শীতকাল আসিবার পূর্ব্বেই চিকিৎসকগণ আমাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। সুতরাং আমি ক্রমে ক্রমে যে সব পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করিয়াছি তাহারই জোরে শেষ পরীক্ষা না দিলেও আমাকে ব্যারিষ্টার করিবেন কিনা আমি 'ইনের বেঞ্চার'দের তাহা জিজ্ঞাসা করি। লর্ড হবহাউস ঐ বৎসর 'ইনে'র কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি আমাকে বিপন্মুক্ত হইতে খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। উপরোক্ত পুরস্কার ও বৃত্তি পাওয়ার সময় যাঁহারা আমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, 'বেঞ্চার'গণ তাঁহাদের মতামত লইয়া আমাকে পরীক্ষা দেওয়া হইতে অব্যাহতি দেন (একমাত্র তাঁহাদেরই অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল) এবং ৭ই জুলাই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি ব্যারিষ্টার হই।

সুতরাং আমি যখন আইন ব্যবসায় আরম্ভ করি তখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন 'ডিগ্রি' ছিল না; ব্যারিষ্টারির শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ হইলেও তাহাও আমি পাস করি নাই। আইনের ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের জন্য আমি—প্র্যাকটিস করেন এমন ব্যারিষ্টার বা সলিসিটারের চেম্বারেও কোনও দিন প্রবেশ করি নাই এবং সেজন্য আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। ভারতবর্ষের কিংবা ইংলণ্ডের কোন বিতর্কসভায় আমি কোন দিন সদস্য ছিলাম না বা কোন দিন কোন তর্কযুদ্ধেও যোগদান করি নাই। আমি যেরূপ স্বল্প বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান লইয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলাম, খুব কম লোককেই সেরূপ ভাবে ঐ ব্যবসা আরম্ভ করিতে দেখা যায়। যে স্থলে আমি

ব্যবসায় আরম্ভ করি—সেখানকার কোন জজ, ব্যারিষ্টার বা সলিসিটারদের আমি চিনিতাম না ; এবং আমাদের পরিবার সেখানে সম্পূর্ণই অপরিজ্ঞাত ছিল। ব্যবসায় করিতে অন্ততঃ যে সব বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে জানাশুনা থাকিলে সুবিধা হয় তাহার কিছুই আমার ছিল না। বহু দিন হইতে চলিল কিন্তু বর্ত্তমানে আমি যখন সেই সময়কার কথা চিন্তা করি তখন আমার নিজের অযোগ্যতা ও দুঃসাহসিকতার কথা মনে করিয়া আশ্চর্য্য হই। আইন ব্যবসায়ে সফলতার পক্ষে যেমন গুণ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে অজ্ঞতাই অসাফল্যের আংশিক বা একমাত্র কারণ বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা লর্ড চ্যান্সেলার লর্ড ওয়েষ্টবেরী সম্বন্ধে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। লর্ড চ্যান্সেলার হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল সর্ রিচার্ড বেথেল। লর্ড চ্যান্সেলার হইবার পর, আইন বিষয়ে কোন এক বিশেষ ধরণের মত দিলে, সলিসিটার সর্ রিচার্ড বেথেলরূপে তিনি সেই বিষয়েই বহু পূর্ব্বে কিরূপ বিপরীত মত দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন লর্ড ওয়েষ্টবেরী বলিয়াছিলেন—"বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এরূপ মত দিতে পারে, সে বর্ত্তমানে আমি যে উচ্চপদে সমাসীন তাহা অধিকার করিয়াছে।"

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পূজার ছুটির পর হাইকোর্ট খুলিলে আমি ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করি। আইন ব্যবসার পক্ষে তখনকার কোর্টের অবস্থা আমার খুব সুবিধাজনক মনে হয় নাই। সংখ্যা ও গুণ হিসাবে কলিকাতার আইন ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষের সমস্ত আইন ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা তখন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। মহা মহা রথীরা তখন এখানে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, যথা—পল, উড্রফ এবং এভান্স ; মনোমোহন ঘোষ, ডব্লিউ. সি. বনার্জ্জী এবং টি. পালিত ; সি. পি. হিল, টি. এ. আপকার এবং এম. পি. গ্যাসপার ; জুনিয়রদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ মিত্র এবং লালমোহন ঘোষ ; উইলিয়াম গার্থ এবং আর্থার ডুলে। তাঁহাদের সকলেরই জুনিয়র হিসাবে মাঝামাঝি রকমের কাজ (মক্কেল) ছিল। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক বেকার জুনিয়র (ভারতবর্ষীয়ই বেশী) ছিলেন—যাঁহাদের নাম, যশ বা অর্থপ্রাপ্তি না হওয়ায় বৎসরের পর বৎসর বাসগৃহ হইতে বার লাইব্রেরী পর্য্যন্ত আসা-যাওয়া করিয়াই কালক্ষেপ করিতে হইত। এই শেষোক্তদের সংস্পর্শেই আমাকে বেশী আসিতে হইয়াছিল এবং আমার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আমার ন্যায় সহায়সম্বলহীন আগন্তুকের এখানে নাম করার আশা খুবই কম। ভবিষ্যতের আশা-ভরসা খুবই অপ্রীতিকর মনে হইতেছিল, কি করিব বুঝিতে পারিতেছিলাম না এবং অন্য কিছু করিবার মত আমার শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল না। প্রত্যহ আমার মত নিরানন্দ ও হতাশভাবাপন্ন শতাধিক সমব্যবসায়ীদের সহিত একই ভাবে বার-লাইব্রেরীতে অপেক্ষা করিয়া কালক্ষেপের পালা আরম্ভ হয়।

কিন্তু ঘোর দুর্দিনের পরেও আমার সুদিন আসে। আমার সুদিন এইভাবে আসিয়াছিল—সলিসিটার আপিসের এক শিক্ষানবীশ (articled clerk) প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে আমার সহিত চার বৎসর পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার সহিত আমার কোন অন্তরঙ্গতা বা হৃদ্যতা ছিল না। এই ব্যক্তির নাম যাদবচন্দ্র দত্ত। পরে ইনি হাইকোর্টের একজন চতুর ও কর্ম্মদক্ষ এটর্নী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অল্প বয়সেই গতায়ু হন। তিনি সত্যই সজ্জন ব্যক্তি। আমি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করার কয়েক মাস পরে এক শনিবার অপরাহ্নে তিনি একটি অসমর্থিত মোকদ্দমার কাগজপত্র (যাহার উপর দুই মোহর অর্থাৎ ৩৪৲ টাকা ফি লেখা ছিল) সহ আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। শুধু তাহাই নহে, আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তিনি আমায় নগদ ৩৪৲ টাকা দেন। তখনকার দিনে কোন এটর্নীই কোন জুনিয়র ব্যারিষ্টারকে মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত নগদ পারিশ্রমিক দিতেন না। এইরূপ জুনিয়রদের পারিশ্রমিক পাইতে পরবর্ত্তী পূজার অবকাশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। সুতরাং এই মোকদ্দমাটি দ্বিগুণ সমাদরের সহিত আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। হাকিমের নিকট মুখ খুলিবার সুযোগ হইবে বলিয়াই যে শুধু এই মোকদ্দমা এত সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহাই নয়, তখন টাকার এত দরকার ছিল যে, নগদ অর্থপ্রাপ্তি হইবে বলিয়াই আমি মোকদ্দমাটি লইয়াছিলাম। আপনারা কি মনে করেন, এই মোকদ্দমা পাইয়া আমি খুব উল্লসিত হইয়াছিলাম বা বাগ্মিতা দেখাইবার ইচ্ছায় খুব অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম ? সে সব কিছুই মনে করিবেন না। মোকদ্দমা পাইয়া আমার ভীষণ ভয় হইয়াছিল। ভয় এইজন্য পাছে আমি এটর্নীর প্রার্থিত ডিক্রী না পাই, কিংবা কোর্টের রীতি, কার্য্যবিধি বা বক্তৃতা দিবার কলা-কৌশলে অনভ্যস্ত থাকায় শুধু ৩৪৲ টাকার লোভে (যদিও টাকার তখন একান্ত প্রয়োজন ছিল) আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া ফেলি। প্রথম অর্জিত অর্থ পাইয়া খুশীমনে কোন প্রকারে গৃহে পৌঁছিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সোমবার সকালে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ভয়ই আমাকে মারাত্মক ভাবে পাইয়া বসিয়াছিল। সোমবার আসিল এবং আমি মোকদ্দমার কাগজপত্র লাল-নীল পেন্সিলে দাগ দিয়া আর মোকদ্দমার প্রত্যেক কথাটি আমার স্মৃতি-পটে মুদ্রিত করিয়া লইয়া হাকিমের সম্মুখে যেখানে আইনজীবীরা বসেন, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পরবর্ত্তীকালে হাকিমের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমি সত্যই মোকদ্দমাটির কাগজের লাল ফিতা খুলিয়াছি কিনা (অর্থাৎ মোকদ্দমাটি সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছি কিনা) জানিবার জন্য আমার এটর্নী যেরূপ ব্যাকুল থাকিতেন তাহার সঙ্গে তখনকার সময়ের কত প্রভেদ! জাষ্টিস ট্রেভেলিন ছিলেন জজ। তিনি নিজেও কিছুদিন পূর্ব্বে হাইকোর্টেরই ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি ছিলেন দয়ালু ও অমায়িক প্রকৃতির লোক। ব্যারিষ্টারি করিবার সময় তিনি অনেক নূতন অনভিজ্ঞ ব্যবহারজীবীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যথাসময়ে মোকদ্দমার ডাক হইলে আমি কাগজপত্র সহ প্রস্তুত

হইয়া দণ্ডায়মান হইলাম, কারণ মামলাটি আমার মানসপটে অঙ্কিত ছিল। আমি বলিলাম—"হুজুর, নিম্নলিখিত অবস্থায় টাকা ধার দেওয়ার জন্ত এইটি একটি হ্যাণ্ডনোটের মামলা।"

জজ প্রশ্ন করিলেন—"কি ভাবে জারি হইয়াছিল?" আমি তাঁহার প্রশ্নের কোন অর্থ না বুঝিয়াই কখন, কবে ও কি অবস্থায় টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে যাইতেছিলাম। জজ কিন্তু সে সব না শুনিয়া ইতিমধ্যেই সমনজারির এফিডেভিট পাঠ সমাপ্ত করেন। পরে আমি জানিয়াছিলাম—অসমর্থিত মোকদ্দমায় কিভাবে সমনজারি হয় সেইটিই বিশেষ জরুরি ব্যাপার। প্রতিবাদীর উপর সরাসরি সমন ধরানো হইয়াছে এবং এ বিষয়ে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না বুঝিয়া তিনি আমাকে আর বেশী বলিতে না দিয়া সাক্ষী ডাকিতে বলিলেন। কি করিব আমার আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এটর্নীকেই আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান বা অনুপস্থিত সাক্ষীকে ডাকিয়া দিতে বলিব, না কোর্টের চাপরাসীকেই সাক্ষীকে ধরিয়া আনিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে বলিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু আসলে আমাকে সে সব কিছুই করিতে হয় নাই। কারণ আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান এটর্নীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না করিতেই সাক্ষী কাঠগড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এটর্নী এখন আমায় সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতে বলেন, কিন্তু আমি কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই জজ আরজিতে গ্রথিত হ্যাণ্ডনোটটি সাক্ষীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করেন—প্রতিবাদী সেটি তাঁহার উপস্থিতিতেই সহি করিয়াছিল কিনা? সাক্ষী সে প্রশ্নের উত্তর দিলে এবং আমি তাঁহাকে আর কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই জজ আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—আসল-বাবদ ও সুদ-বাবদ কত তাঁহার প্রাপ্য। এবারও সাক্ষী উত্তর দেওয়ার পর জজ হুকুম দেন—এত টাকা আসল ও এত টাকা সুদের জন্ত ডিক্রী দেওয়া হইল। অতঃপর জজ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, "মিঃ সিংহ, মোকদ্দমা শেষ হ'ল, আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই।" আমিও মামলা শেষ হইল জানিয়া স্বস্তি বোধ করিলাম।

সুতরাং কোর্টে প্রথম মোকদ্দমা করার অভিজ্ঞতা ত আমার এই; কিন্তু সত্যই যদি ইহাকে আদৌ মোকদ্দমা করা বলে তবেই যে ভাবে মোকদ্দমা করিয়াছিলাম, তাহাতে যে দ্বিতীয় মোকদ্দমা পাইবার আর আশা নাই, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে খুব অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা বলা যায় না। কারণ আমার ঐ এটর্নী শিক্ষানবীশ বন্ধুটি পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখুন, মোকদ্দমা পরিচালনা করা কত সহজ, আমি নিশ্চিত যে দ্বিতীয় মোকদ্দমা আমি যখন আনিব তখন আপনি আরও সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে তাহা করিতে পারিবেন।" কিন্তু এই দ্বিতীয় মোকদ্দমা আসিতে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, এবং সুদীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল নিজের উপর যুক্তিসঙ্গত আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে।*

* "My First Brief"—By Lord Sinha (*The New Empire*, 24th. December, 1925) হইতে অনূদিত।

দেশ-বিদেশের কথা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে সাংস্কৃতিক সম্মেলন

গত ৭ই ও ৮ই জুলাই পুরীধামে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বর্গ-দ্বারস্থিত শাখাকেন্দ্রের দ্বাবিংশতি অধিবেশন উপলক্ষে দুইটি বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উৎকলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার ডক্টর শ্রীনীলকণ্ঠ দাস এম.এল.এ. এবং উড়িষ্যার রাজস্ব ও শিক্ষা-সচিব শ্রীরাধানাথ রথ যথাক্রমে সম্মেলন দুইটিতে সভাপতিত্ব করেন। ভারতের অন্যতম প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা ও লোকসেবক সমাজের সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীলিঙ্গরাজ মিশ্র, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বামী পরমানন্দজী, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী জাতিগঠনে ধর্ম্মের দান সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীসত্যবাদী ত্রিপাঠী, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর হোতা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। স্বামী বেদানন্দজী মাননীয় অতিথিবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া সঙ্ঘের সেবা ও গঠনমূলক কার্য্যের বিস্তৃত আলোচনা করেন।

অতঃপর রক্ষীদল বিবিধ ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করে। ভজন-কীর্ত্তন, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ দরিদ্রনারায়ণ সেবা, ছায়াচিত্রযোগে ভাষণ, ধর্ম্মব্যাখ্যান প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীযুক্ত রথ সঙ্ঘ-পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী কর্ত্তৃক সমাগত ভক্ত জিজ্ঞাসুগণকে সাধনোপদেশ প্রদত্ত হয়।

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন

সম্প্রতি শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ১০৫।২ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনে (যক্ষ্মা হাসপাতাল) স্বর্গত কালীচরণ ও গৌরমোহন পাইন স্মৃতিকক্ষ এবং পরলোকগত বীরেন দত্তের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত শল্যচিকিৎসাগারের উদ্বোধন ও তিনটি স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন।

উক্ত স্মৃতি-কক্ষটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মেসার্স জি. এম. পাইন নামক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ ও শ্রীচৈতন্যচরণ পাইন সেবায়তনকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। শল্যচিকিৎসাগার স্থাপনের জন্য বীরেন দত্তের মাতা শ্রীমতী সুপ্রভা দত্ত দান করিয়াছেন প্রথম কিস্তিতে দশ হাজার টাকা। ইহা ছাড়া লোকান্তরিতা বীণাপাণি ঘোষের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার স্বামী ৺জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের একজিকিউটরগণ পনর হাজার টাকা এবং পরলোকগত বীরেন্দ্রকুমার সাহার স্মৃতিরক্ষার্থ মেসার্স বি. কে. সাহা ম্যাণ্টাল ওয়ার্কস সাড়ে সাত হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহারই স্বীকৃতিস্বরূপ স্মৃতিফলক তিনটি স্থাপিত হয়। স্মৃতি-কক্ষ ও শল্যচিকিৎসাগারের উদ্বোধন এবং স্মৃতিফলকগুলির আবরণ উন্মোচন করিতে গিয়া শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেন, "শ্রীভগবান আমাকে লোক-কল্যাণমূলক এই কার্য্যের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। অযাচিত ভাবে যাহা পাইয়াছি, তাহা যেন দরিদ্র ও আর্ত্তের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারি। আর সেই সেবায় যাহা কিছু পরমার্থ, তাহা যেন আপনারা সকলে ভোগ করেন। আমার গুরু মহারাজ বলিতেন—আমরা মালী, বীজও আমাদের নহে, জমিও আমাদের নহে, কিন্তু কোথায় বীজ ফেলিলে তাহার বিকাশ ঘটিবে সেটুকু আমরা জানি।"

সভাপতি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন, দেশের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগের বিস্তার বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমতাবস্থায় এই হাসপাতালে যে কিছু রোগী চিকিৎসায় সুযোগ পাইতেছে ইহাও একটা সৌভাগ্য। সেবায়তনের এই আদর্শ সমগ্র দেশে প্রসারলাভ করুক।

অধ্যাপক ড. শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী উদ্যোক্তাদিগের সেবাব্রতের প্রশংসা ও এই প্রয়াসের সাফল্য কামনা করিয়া বক্তৃতা দেন।

ভাণ্ডারের সভাপতি ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত ও অন্যতম কর্ম্মী শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সভাস্থলে নিম্নলিখিত দানগুলি সংগৃহীত হয়: শ্রীচৈতন্যচরণ পাইন ২,৩০১৲, শ্রীমতী শান্তা চৌধুরী (জামশেদপুর) ১০০১৲, ডাঃ এস. সি. লাহা ১০০০৲, শ্রীসাধনচন্দ্র হালদার, শ্রীশরৎকুমার রায়, শ্রীমহাদেবচন্দ্র পালিত ও শ্রীমতী মাধবীলতা দত্ত প্রত্যেকে ১০১৲, শ্রীসুনীল ঘোষ ৫১৲। শ্রীমতী জ্যোৎস্না বসু ও শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেবী প্রত্যেকে এক গাছা সোনার চুড়ি দান করেন।

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের *ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়।
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই
লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

আলোচনা

"মধুসূদন দত্ত কি এক জন ?"

শ্রীস্নেহাংশু আচার্য্য

গত ১৩৭২ আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল দুটি প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। যোগেশবাবু ঠিকই বলেছেন যে, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়াও আর একজন মধুসূদন দত্ত তখনকার দিনে হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন এবং পরে উক্ত হিন্দু কলেজেই তিনি শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হন। এই দ্বিতীয় মধুসূদন দত্ত ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে সুবর্ণবণিক ছিলেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে কিছুদিন লেখাপড়া করে মধুসূদন হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন হিন্দু কলেজ গরানহাটা গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ী থেকে উঠে এসে পটলডাঙ্গায় হেয়ার সাহেবের জমির উপর তৈয়ারী কলেজ-বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মধুসূদন কলেজে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সিনিয়র স্কলারশিপ অধ্যয়ন শেষ করে মধুসূদন নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন পড়েছিলেন। কিন্তু শবব্যবচ্ছেদে মাতার আপত্তি হওয়াতে তিনি ঐ কলেজ ছেড়ে দেন। মেডিক্যাল কলেজ ছাড়ার পর মধুসূদন ১৮৩৬ সন হইতে হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে কাজ করেন। হেয়ার সাহেবের অন্তিমকালে (১লা জুন ১৮৪২) মধুসূদন হিন্দু-কলেজের শিক্ষক ছিলেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যু-সময়ে তিনি তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন।

পরে মধুসূদন হিন্দু কলেজের শিক্ষকতাকার্য্যে ইস্তফা দিয়ে মুৎসুদ্দি হন। এবং 'গিলবোর্ণ' কোম্পানী ও অন্যান্য স্থানে কাজ করেন। ৩৩নং ফিয়ার্স লেনে নিজের উপার্জ্জনে একটি দোতালা বাড়ী কেনেন।

এই মধুসূদন বহু দিন ৮নং ওয়ার্ডের কমিশনার ছিলেন। যে বৎসর সরকার কমিশনারদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেন, সেই বৎসর মধুসূদন ও অপর সাতাশ জন কমিশনার সরকারের এই আচরণের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। এ ছাড়া তিনি বহু দিন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন।

১৯০০ সনে ২১শে নবেম্বর তারিখের 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদ এই ভাবে প্রকাশিত হয়:

"Obituary—The death is reported at Calcutta on Monday, of Babu Madhusudan Dutt, a well-known resident of this city. The deceased was an orthodox Hindu and one of David Hare's favourite scholars. He was educated in the Hindu College, where after finishing his education he served as a teacher for a few years. He afterwards became a Banian to the late firm of Messrs. Gilbourne & Co., and served in other mercantile firms also. He was a Municipal Commissioner and Honorary Magistrate for several years."

আশা করি, এই উদ্ধৃতাংশ দুই জন মধুসূদনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীকরণে সবিশেষ সহায়ক হবে। কবি মধুসূদনের ছয় বৎসর আগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু লোকান্তরিত হন, কবি মধুসূদনের মৃত্যুর সাতাশ বৎসর পর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বিরাশী বৎসর। এঁর জীবনের অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য ১৩০১ সনে শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত (মধুসূদন দত্তের পৌত্র) প্রকাশিত জীবনচরিতে আছে।

সামান্যবাদ (Universals)—শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, কাব্য-ন্যায়তীর্থ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২।০ টাকা।

সভ্য জগতের প্রায় সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে, দার্শনিক সূক্ষ্ম বিচারই সারস্বত ক্ষেত্রে জাতির সমৃদ্ধি সূচনা করে। ন্যায়দর্শনের বিচিত্র ক্রমবিকাশ প্রধানতঃ পূর্ব্ব-ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে প্রায় সহস্র বৎসরব্যাপী বাদ-বিচারের ফলে সাধিত হইয়াছিল। যে সকল বিষয়ে বৌদ্ধদের সহিত হিন্দুদের গুরুতর মতভেদ প্রকট হইয়া উঠে—তন্মধ্যে একটি হইল সামান্যবাদ। বৌদ্ধমতে (ভাবরূপ) সামান্য বা জাতিপদার্থ নাই। উদয়নাচার্য্যের অল্প পূর্ব্বে বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত জিতারি "জাতি-নিরাকৃতি" নামে ক্ষুদ্র প্রকরণ রচনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে পাঁচটি অধ্যায়ে তর্কবহুল সামান্যবাদের বিশ্লেষণ ও ক্রমবিকাশ যথাসম্ভব সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। যে সকল মূলগ্রন্থ হইতে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাদের আলোচনায় প্রবীণ পণ্ডিতদের মাথাও ঘূর্ণিত হয়। উদীয়মান অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য নবীন বয়সেই ঐ সকল গ্রন্থের দুরূহ গ্রন্থি ভেদ করিয়া মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহা বিশ্লেষণাত্মক রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই পরম কৃতিত্বকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি এবং আশা করি, ঈশ্বরবাদাদি অন্যান্য তর্কজালজড়িত বিষয়েও তাঁহার নিপুণ লেখনী পরিচালিত হইবে। এ জাতীয় দার্শনিক সূক্ষ্ম বিচারমূলক বাদগ্রন্থের রচনা বাংলা সাহিত্যের একটা দৈন্য দূর করিয়া কৃতার্থ হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (সরল বাংলা অনুবাদ)—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। প্রথম খণ্ড : বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ। ওরিয়েন্টাল পাবলিশিং কোং, ১১ডি আরপুলি লেন, কলিকাতা—১২। পৃ ৪২—মূল্য ৸০ আনা।

উপনিষদের নিগূঢ় অধ্যাত্মবিদ্যা পৌরাণিক যুগে "শতসাহস্রী" এক মহারামায়ণ হইতে সঙ্কুচিত হইয়া প্রচলিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে পরিণতি লাভ করে। বাইশ হাজার শ্লোকাত্মক এই গ্রন্থ এত উপাখ্যান ও বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে অনেক সময় মূল বিষয় হারাইয়া যায়। অধ্যাত্মশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রে সম্যক্ কৃতপ্রবেশ না হইলে ইহার অনুবাদ করা কঠিন। বিনয় সহকারে সরল অনুবাদ বলিয়া প্রকাশিত এই রচনা বস্তুতঃ এক অভিনব বস্তু। অধ্যায়বিভাগ তুলিয়া দিয়া, উপাখ্যান ও দৃষ্টান্তভাগ সংক্ষিপ্ত করিয়া, ঋষির ভাষা ও ভাবপ্রবাহ অবিকৃত রাখিয়া গ্রন্থের মর্ম্ম সরল বাংলায় প্রকাশ করা প্রায় অসাধ্য। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি গ্রন্থকার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সারসঙ্কলন ও অনুবাদক্ষমতাবলে এই অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এ জাতীয় বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণকালে প্রায়ই অশুদ্ধিবহুল হয়—সুখের বিষয় গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে অশুদ্ধিবর্জ্জিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, গ্রন্থের বাকী অংশ সঙ্কলন করিয়া সুযোগ্য গ্রন্থকার বাংলা দেশে অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের ধারা সংরক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নরেশ গ্রন্থাবলী—(প্রথম খণ্ড)। উত্তরায়ণ (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৫৸০ আনা।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র একদা আক্ষেপ করিয়াছিলেন, 'দেহ-পট সনে নট—সকলি হারায়।' কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উক্তিটি বহুলাংশে সত্য। চোখের সামনে দেখিলাম—কয়েকজন শক্তিমান কথা-সাহিত্যিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেন এবং সাহিত্য-জগৎ হইতে অপসৃত হওয়ার স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা বিস্মৃতির গর্ভে চলিয়াও গেলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। জীবিত লেখকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও প্রায় বিস্মৃতের দলে। বহুকাল লেখনী-চালনা না করার ফলে আধুনিক পাঠক-মহলে ইনি একরূপ অপরিচিতই। অথচ এক সময়ে শরৎচন্দ্রের পরে ইঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি লইয়া কম হৈ চৈ হয় নাই। সমাজ-প্রচলিত কতকগুলি ধারণা, রীতি ও ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড কশাঘাত—ইঁহার কাহিনীর বিষয়বস্তু। 'রাজশ্রী' ও 'শুভা' উপন্যাস দুখানির নাম প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থাবলীতে 'রাজশ্রী', 'কাঁটার ফুল' ও 'সতী' এই তিনখানি উপন্যাস সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। জমিদারী-প্রথা বিলোপ করিয়া প্রজাকে ভূমিস্বত্বে স্থিতবান করার দৃষ্টান্ত 'রাজশ্রী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু। 'কাঁটার ফুলে' একটি অস্পৃশ্য মেয়েকে উর্দ্ধসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়, 'সতী' উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে লেখকের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বিদ্যমান। সবগুলি কাহিনীই বিশিষ্ট এবং বিদ্রোহের সুরে অনুপ্রাণিত।

ইতিমধ্যে যুগপরিবর্ত্তন হওয়াতে পুরাতন সমাজে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—কতকগুলি সমস্যা পূর্ব্বের মত তীব্র নাই। এ সব সত্ত্বেও নরেশচন্দ্রের কাহিনীগুলির বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্য-কর্ম্মের মধ্যে উদার মানবতাবোধের মূল সুরটি আধুনিককালের পাঠকেরা ধরিতে পারিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ডালডা
আমার
পক্ষে
ভালো

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না—প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ১৪, আনন্দ চাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা—৩। মূল্য তিন টাকা।

বইখানি চব্বিশটি কাহিনীর সমষ্টি। বিভিন্ন লেখক নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে কাহিনীগুলি বিবৃত করিয়াছেন। লেখকদের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত; কয়েকজন অপরিচিত। পরিমল গোস্বামী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নলিনীকুমার ভদ্র, গোপাল ভৌমিক, মন্মথকুমার চৌধুরী, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, প্রভৃতি অনেকেই লিখিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ একবার এক ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, এ কথা অনেকেরই অপরিজ্ঞাত। গল্পটির নাম 'ফ্যানটম আওয়ার', প্রেত-মুহূর্ত। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত সেই অপূর্ব্ব গল্পটিও পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাহিনীগুলি নানা ধরনের। গল্পচ্ছলে কথিত সত্য ঘটনা বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। এগুলি ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া রচনার মধ্যে একটা আন্তরিকতার ছাপ আছে। মনের মধ্যে বিস্ময় জাগাইবার শক্তি অনেকগুলি গল্পেই আছে। কাহিনী-বর্ণিত ঘটনাগুলির নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়া মনোবৈজ্ঞানিকের পক্ষে হয়ত অসম্ভব নয়, গল্পগুলির অন্তর্নিহিত বিস্ময়টুকু কিন্তু সাধারণ লোকের মনকে আলোড়িত করিবে। ছোট গল্পের আঙ্গিকে লেখা অনেকগুলি কাহিনীই সুরচিত। তন্মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মিডিয়াম', প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'অবাঞ্ছিত উপদ্রব', নলিনীকুমার ভদ্রের 'অদৃশ্য হস্ত', চিত্তরঞ্জন দেবের 'অবনীন্দ্রনাথের রোগমুক্তি', কিশণচাঁদ বর্ম্মণের 'সাপের বিষ', পরিমল গোস্বামীর 'অধর সরকার' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না" পাঠকের উপভোগ্য হইয়াছে।

ছোটদের গোর্কির "মা"—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র অনূদিত। শিশু-সাহিত্য সজ্ঞ, ১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর্গত যে কয়খানি উপন্যাস রসজ্ঞের নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ম্যাক্সিম গোর্কির "মাদার" তাহাদের অন্যতম। নিপুণ চরিত্রচিত্রণে, স্বাভাবিক ঘটনাসংস্থানে, বাস্তবের বিচিত্র প্রকাশে এবং আদর্শের মহিমায় বইখানি অতুলনীয়। গ্রন্থকার ছোটদের জন্য এই প্রসিদ্ধ উপন্যাস-খানির অনুবাদ করিয়াছেন। শিশু-সাহিত্যে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু মৌলিক রচনায় নয়, অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। ছোটদের জন্য লিখিত বলিয়া এই রুশীয় উপন্যাসখানিকে কিছু সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে। কাজেই লেখক ভাবানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ স্বচ্ছন্দ সাবলীল অনুবাদ শিশু-সাহিত্যে বিরল। গোড়ায় গোর্কির জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ছোটদের জন্য রচিত হইলেও বইখানি বড়দেরও উপভোগ্য। বইখানি যে জনপ্রিয় হইয়াছে পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

প্রিয়া ও পৃথিবী—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য ২৲ টাকা।

গল্পে, কবিতায়, চরিত-রচনায় অচিন্ত্যকুমার সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। কল্লোলযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের তিনি অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি পাঠকদের অপরিচিত নয়; পুরাতন হয়েও তারা নূতন, রস-মাধুর্য্যে, প্রাণশক্তিতে ভরপুর। দেহ-আত্মার মিলিত চেতনায় প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশ লক্ষ্য করি প্রথম কবিতায়। অপর কবিতা-গুলিতেও প্রকৃত কবি-মনের পরিচয় পাই। 'আমরা' কবিতায় শুনি যুগ-মানসের বাণী:

"না-মানা যুগের মোরা মানুষ, বেসাতি মোদের কালি-কলুষ
চোখে জ্বলিতেছে তাজা জলুস, কিছু না পাওয়ার নেশা।"

আজ 'পরম পুরুষের' গ্রন্থকার 'প্রিয়া ও পৃথিবী'র কবিকে আড়াল করে আছেন, কিন্তু তবু মনে হয়, কবি-মনটিতেই বোধ হয় ওঁর প্রকৃষ্টতম পরিচয়।

মন্দিরের চাবি—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, ৪।২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৲ টাকা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তি-মন্দিরের দ্বার উন্মোচনের জন্য কত বীর আত্মোৎসর্গ করে গেছেন। তাঁদের আত্মদানের ফলে আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তবু আমরা আমাদেরই সমাজের এক অংশকে পূজা-মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি। এই অন্যায়ের অবসান হউক, সর্ব্বমানবের পুণ্য মিলনে সমাজ সুস্থ, সুন্দর ও সবল হউক, এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে কবির অন্তর থেকে। তিনি মুক্তির পূজারী—কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বহু কবিতা রচনায় তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। 'দীনেশ গুপ্তের শেষ পত্র' এক গৌরব-দিনের স্মারক। বিদেশীর ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে যাঁরা মাতৃভূমির মুক্তিকল্পে জীবন দিয়ে গেছেন, তাঁদের নাম দেশবাসীর অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে থাকুক। তাঁদের পুণ্যস্মৃতি জড়িত হয়ে রইল এ গ্রন্থের সঙ্গে। আদর্শের মহিমায় এবং রচনার পরিচ্ছন্নতায় আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি হৃদয়গ্রাহী।

সতর বৎসর পূর্ব্বে বইখানি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, সম্প্রতি সরকারের অনুমোদন লাভ করে নব-সজ্জায় পুনঃপ্রকাশিত হ'ল।

নির্ম্মলা শিক্ষা পেলো...
মালতীর ছোট্ট ছেলে মুন্না সবসময় নিচের বাসাতে খ্যালনা ফেলতো।
মুন্না! দুষ্টু ছেলে! আবার তুমি খেলনা ফেলেছো।
নির্ম্মলার বাসা
মুন্নার খ্যালনাটা মালতীকে ফিরিয়ে দাওনা কেন?
না এখন না - ছেলেটাকে ভালমত শিক্ষা দিতে হবে...
পরে
দেখ! এবার ফেলেছে একটা তোয়ালে!
(ভাবলো) কিন্তু কি পরিস্কার করে কাচা! সত্যিই আশ্চর্য্য...
মালতির বাসা
নির্ম্মলা! তুমি বুঝি মুন্নার খ্যালনা নিয়ে এসেছো...!
হ্যাঁ - আর তোমার তোয়ালে-টাও নিয়ে এসেছি - আচ্ছা আমায় একটা কথা বলবে -
বলতো, তোয়ালেটা এত ধবধবে সাদা কি করে করলে? আমি তো কখনও তোমার বাড়ী থেকে কাপড় আছড়াবার আওয়াজ পাইনি।
কিন্তু আমি তো আছড়াইনা, - আমি যে সানলাইট সাবান ব্যবহার করি।
আছড়ালে কাপড়ের বুনুনী ফেঁসে যায় আর সেইজন্যে ছেঁড়েও তাড়াতাড়ি।
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে।
সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনা বিনা আছাড়েই পরিস্কার করে কাচে - আর সেইজন্যে কাপড় টেকেও বেশী দিন।
সত্যিই! সানলাইট সাবানে বিনা আছাড়েই সাদা আর ঝকঝকে পরিস্কার হয় - কাপড় টেকেও বেশী দিন আর আমার খরচও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেকসই করে।
S. 238-X52 BG

নব্য-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য ২৲ টাকা।

"ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী মনোময় পুরুষ দিয়েছে এক বাস্তবের পরিচয়—কিন্তু সে একটি বাস্তবমাত্র। এ ছাড়াও বাস্তব আছে। অধ্যাত্ম-পুরুষ যে জগতের পরিচয় দেয়, তাও তেমনি বাস্তব, হয়ত, আরও বেশী বাস্তব—কারণ জড়-বাস্তবের নিভৃত মূলই সেইখানে।" বিজ্ঞান-পন্থার অপূর্ণতা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পূর্ণ সত্যকে জানতে হলে বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে যেতে হবে। যুক্তি সহকারে মনোজ্ঞ ভাষায় লেখক এই কথাই বলতে চেয়েছেন। চিন্তাশীলতা ও প্রকাশ-দক্ষতাগুণে তিনি প্রবন্ধ-সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। এ গ্রন্থেও তাঁর মনস্বিতার পরিচয় পরিস্ফুট। এর কোন কোন প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশুতরু—শ্রীকল্যাণী প্রামাণিক। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৲ টাকা।

বাণী ও বীণা—শ্রীরণেশ মুখোপাধ্যায়। বাণীবিতান, গোবরডাঙ্গা, ২৪-পরগণা। মূল্য ১৲ টাকা।

মনোগন্ধা—শ্রীরাধামোহন মহান্ত। ভারতী গ্রন্থ প্রকাশনী, বালুরঘাট, দিনাজপুর। মূল্য ২৲ টাকা।

নিরবদ্য—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷৹ আনা।

মধুবাগ—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। ৫০এ সাতকড়ি মিত্র লেন, কলিকাতা—১১। মূল্য ৷৷৹ আনা।

কত সময়ে দেখেছি, নাম-করা কবির কবিতা পড়ে খুশী হতে পারি না, অথচ নাম-না-জানা কবির কোনও কোনও রচনায় প্রকৃত রসের সন্ধান পাই। এই পাঁচখানি কবিতার বই পড়তে গিয়ে সেই কথা মনে হ'ল। সব ক'খানি সার্থক রচনা নয়, কিন্তু অন্ততঃ প্রথম দু'খানিতে কবি-মনের পরিচয় আছে।

'শিশুতরু'র কবি রবীন্দ্ররীতির অনুরাগী, ফলে তাঁর ভাষায় এবং ছন্দে মার্জ্জিত শ্রী ও লাবণ্য এসেছে। ভাবের ক্ষেত্রে তিনি আপন মনেরই অনুসরণ করেছেন।

'বাণী ও বীণা'র—দুপুর, খোকনসোনা, চৈত্র এল, রূপকথা, আকাশ-সাগর এবং শিশুপাঠ্য কবিতা—'কেমন জব্দ' উপভোগ্য। 'মনোগন্ধা'তেও কবিত্বের সৌরভ আছে। ছোট্ট কুঁড়েঘর, আগামী এবং ঋতুচক্রে কল্পনার মায়া-স্পর্শ লেগেছে।

'নিরবদ্যের' কবিতাগুলি অনবদ্য মনে হ'ল না।

'মধুবাগে' ভ্রমরগুঞ্জন শুনলাম, মধুসঞ্চয় বোধ হয় এখনও বাকি।

১। ভূদানের জয়গান। ২। সত্যের জয়গান।—নিশিকান্ত মজুমদার। পোঃ কেওড়াতলা, ২৪-পরগণা। মূল্য প্রত্যেকখানি ৵০।

প্রথমখানি পদ্যে, দ্বিতীয়খানি পদ্যে ও গদ্যে রচিত আদর্শমূলক প্রচার-পুস্তিকা।

অন্ত-যমক কাব্য—শ্রীকেশবলাল দাশ। গীতিকাঞ্জলি-ভবন, বনগাঁ, ২৪-পরগণা। মূল্য ৪৲ টাকা।

লেখক মলাটে নামের পূর্ব্বে 'কবি' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কবিতার দৃষ্টান্ত :

"কুকুর পুকুর হতে মারিল কাতর।
কাতরে হেরিয়া কর্ত্তা হলেন কাতর॥"

এ জাতীয় ছড়া-কাটার দিন চলে গেছে ভেবে আমরাও কাতর।

মৌনমুখ—শ্রীকুমুদকান্ত চক্রবর্ত্তী। ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

বস্তি-জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস। জীবনের ক্লেদপঙ্ক ও মহত্ত্ব—উভয়ের চিত্রই ফুটেছে। রচনায় পরিণতি না এসে থাকলেও শক্তির পরিচয় আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পথের কথা—শ্রীবিজয়কান্ত রায়চৌধুরী, এম-এ। ডি. এম. লাইব্রেরী. ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা—১৭৯, মূল্য ২৲।

লেখক বহু দিন যাবৎ সাঁওতাল-পরগণার মিহিজামের অধিবাসী। পল্লীতে বাস করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের পথ কিরূপে সুগম করা যায়, প্রবন্ধগুলিতে লেখক সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপদেশগুলি মূল্যবান এবং বর্ত্তমান বেকার ও বাস্তুহারা সমস্যার দিনে বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য। স্বাধীন ভারতের সরকার ও জনগণ দেশের পল্লী-জীবনে নূতনভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে চান এবং এজন্য ইতিমধ্যেই বহু কোটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল হইয়াছে কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়। সমালোচ্য পুস্তকের লেখক ও দেশের অন্যান্য যাঁহারা আজীবন পল্লীবাসী এবং গ্রামের প্রতি যাঁহাদের দরদ আছে সেই সকল কর্ম্মী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং উপদেশ সরকার যদি কাজে লাগান তাহা হইলে পল্লী-উন্নয়নের আদর্শ যে কার্য্যে পরিণত হইতে সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক যে সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এই—অর্থসমস্যা ও গ্রাম, চাষের গোড়ার কথা, লাভজনক ফলের আবাদ, মৎস্য-সমস্যা, দুগ্ধসমস্যা, যক্ষ্মাসমস্যা, গ্রাম ও স্বাস্থ্য, অর্থসমস্যা ও কলকারখানা, আদর্শ ও জগৎ, খাদ্যসমস্যা ইত্যাদি।

গ্রন্থকার নিজে একজন প্রবীণ, অভিজ্ঞ চিকিৎসক, সুতরাং তাঁহার লিখিত রোগ এবং প্রতিকার সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলিও খুবই মূল্যবান।

১৯৩৪ সনে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এত দিন পরে ইহার দ্বিতীয় পরিবর্ত্তিত সংস্করণ প্রকাশ হওয়াতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই পুস্তক হইতে গ্রামের কল্যাণকামীরা অনেক কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ পাইবেন।

১। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রগঠনের পথে, ২। উন্নততর কৃষিকার্য্য, ৩। উন্নততর স্বাস্থ্য, ৪। উন্নততর বাসগৃহ।

উপরোক্ত পুস্তকগুলি ভারত সরকারের 'দি পাবলিকেশন্‌স ডিভিশন, দিল্লী' হইতে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

প্রথম পুস্তকে স্বরাজলাভের খুব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় পুস্তকে কৃষির উন্নতিবিধানের জন্য কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ আছে, প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে যে, এই দেশে জাপান প্রভৃতির অনুকরণে উন্নততর কৃষির ব্যবস্থা না করিলে খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব নহে।

তৃতীয় পুস্তিকায় সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কি করা অবশ্য-কর্ত্তব্য তাহা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনা এবং সরকারের কার্য্যাবলীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

চতুর্থ পুস্তিকায় স্বল্প ব্যয়ে কিরূপে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা যায় তৎসংক্রান্ত নানা জ্ঞাতব্য তথ্য আছে।

রুশিয়া, চীন, আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচার-পুস্তিকায় বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। এই সময়ে আমাদের সরকার দেশবাসীর মধ্যে দেশীয় ভাষায় বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্য্যাবলীর বিষয় প্রচারে উদ্যোগী হইবেন ইহা খুবই বাঞ্ছনীয়। ভারতের জনগণের সহযোগিতার উপরেই যে সরকারের যাবতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে একথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
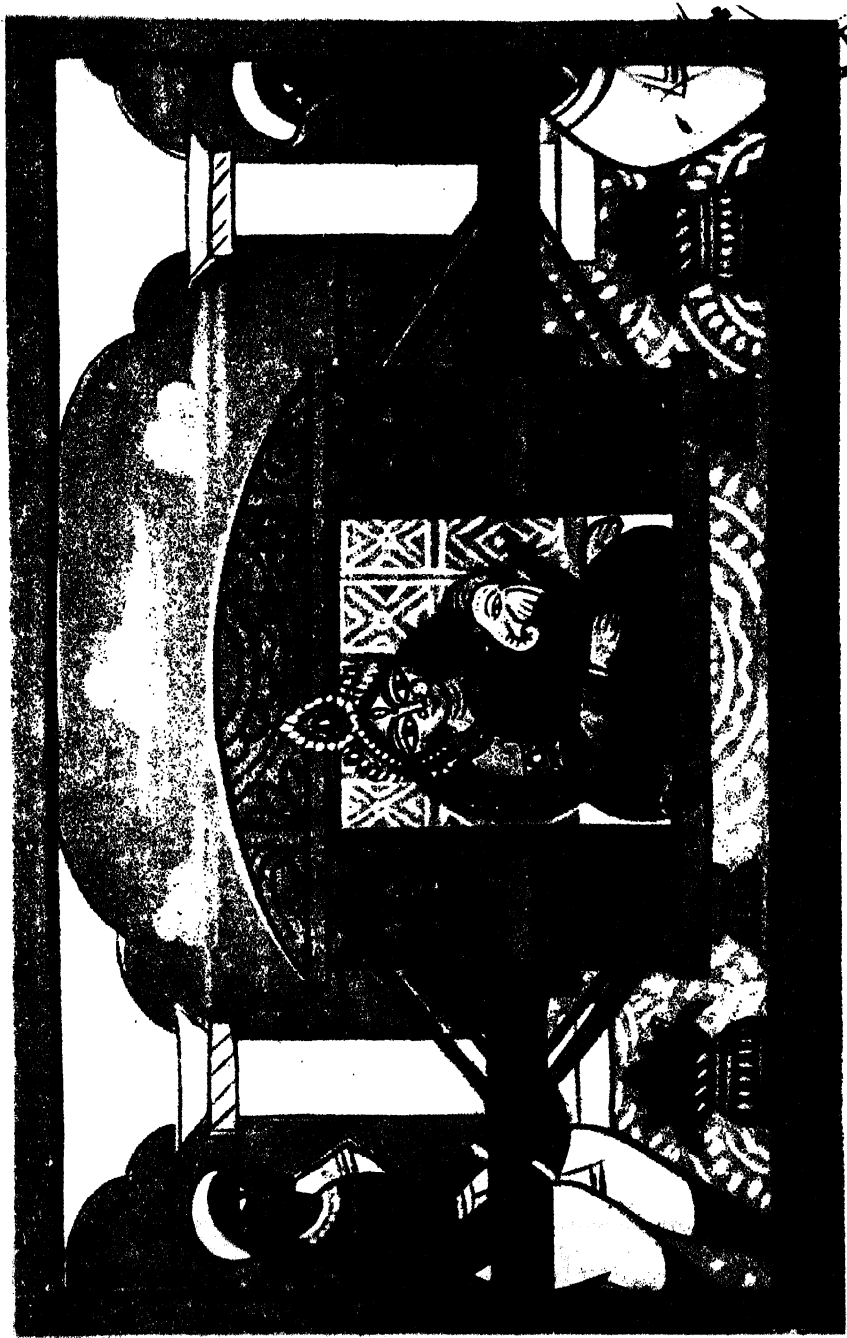
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আগমনী

শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বিহার-শহীদ স্মারক

অভিযানে নিহত বালকের মৃতদেহ বহন [ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৬৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা
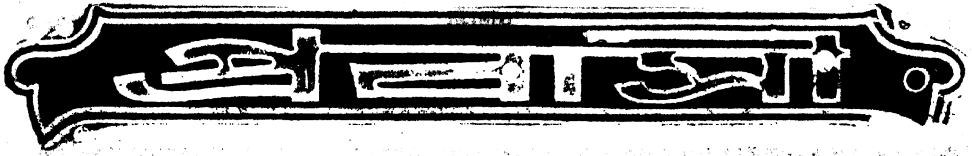
বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের অবস্থা

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জাপান যাত্রার প্রাক্কালে সাংবাদিক বৈঠকে এক বিবৃতি দিয়াছিলেন। তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি, উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ছিল। সেই বিবৃতি আমরা এই মাসের বিবিধ প্রসঙ্গের শেষের দিকে উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে ঐ বিবৃতির কিছু আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই বলি যে, এদেশের, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ভূমির সন্তান যাহারা তাহারা সম্পূর্ণভাবে এতদিন অবহেলিত হইয়া আসিতেছে। তাহাদের ও শাসনযন্ত্রের মধ্যে কোনও সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগের চিহ্ন এতাবৎ আমরা দেখি নাই। খাদ্য ও খাদকের মধ্যে সম্পর্ক যাহা, দুগ্ধবতী গাভী ও পশ্চিমা গোয়ালার সম্পর্ক যাহা তাহাই আমরা এতদিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। বাঙালীর সমস্যা যাহা কিছু তাহার নির্ণয় এতাবৎ শুধু দুই জাতীয় লোকের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ভিন্ন প্রদেশীয় বণিক সম্প্রদায়, দ্বিতীয়তঃ উদ্বাস্তু। পশ্চিম বাংলার সন্তান-সন্ততি বলিতে আমাদের দয়াময় শাসকবর্গ বুঝিয়াছেন তাঁহাদের দলগোষ্ঠীগত যাহারা তাহারা মাত্র। প্রকৃত-পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বলিতে তাঁহারা কলিকাতার বাহিরে যে কিছু আছে তাহা ভুলিয়াই থাকেন। তবে মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে সজাগ যাঁহারা তাঁহারা নির্ব্বাচনের কথা মনে রাখিয়া নিজ নিজ দলের চাঁইদের উপদেশমত কিছু কিছু লোকদেখানো কাজই করিয়াছেন। অবশ্য কোথাও কোথাও চাঁইয়ের দল বেশী সজাগ হওয়ায় অল্পবিস্তর উন্নয়ন খাতের টাকা আদায় করিয়াছেন। তাহাও উপকারে লাগিয়াছে শহরে—গ্রামাঞ্চলে অতি সামান্য। আজ নির্ব্বাচনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং এই বিবৃতি।

অবশ্য উন্নয়ন কিছুমাত্র হয় নাই এ কথা আমরা বলি না। খাদ্য-পরিস্থিতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সরল হইয়াছে। তাহার জন্য কতকটা কৃতিত্বের দাবী প্রাদেশিক সরকার করিতে পারেন। যদিও মূল্যবৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টিতে চাষীর উৎসাহ বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধিই মূল কারণ এবং অন্য যাহা তাহাও কেন্দ্রীয় সরকারের অতি অনিচ্ছা ও অবহেলা সত্ত্বেও, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাপ্রসূত উপকার। ইহা ভিন্ন মফস্বলে স্থানে স্থানে পথঘাটের উন্নতি হইয়াছে, যাহার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই দুই জন মন্ত্রীর প্রাপ্য, যাঁহারা কংগ্রেসী হইয়াও কংগ্রেসী চক্রান্তে নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছিলেন। অন্য অন্য বিষয়ে যাহা উন্নয়ন হইয়াছে তাহার পনের আনা মুনাফা লইয়াছে অবাঙালী।

সমস্যার কথা ডাক্তার রায় বলিয়াছেন অবশ্য। কিন্তু মূল সমস্যার কথা তিনি উল্লেখই করেন নাই। সেটি পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সমস্যা। অবশ্য ডাক্তার রায় যদি এক দল লোকের মত মনে করেন যে, ঐ নির্ব্বিবাদী ও প্রায়-নির্জ্জীব প্রাণী-সমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষার কোনও প্রয়োজন নাই তবে আমাদের কিছুই বলিবার থাকে না। কেননা প্রাণহীন, শক্তিহীন আক্ষেপ ও প্রলাপ-সর্ব্বস্ব মনুষ্যের অধিকার বলিয়া কিছুই নাই।

অথচ এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত—যাহাদের একদল বিকৃতমস্তিষ্ক অর্ব্বাচীন "বুর্জ্জোয়া" আখ্যা দিয়া ভূমানন্দ লাভ করেন—শুধু বাংলার ও বাঙালীর নহে, সমস্ত ভারতের প্রগতির অভিযানে প্রধান সহায়ক ছিল। দেশের সংস্কৃতি, প্রগতি ও স্বাতন্ত্র্য লাভে তাহার অবদান ও আহুতি অতুলনীয়। আজ বাঙালীর যে দ্রুত অবনতি ও দুর্দ্দশা চলিতেছে তাহার মূল কারণ তাহার অসহায় ও বন্ধুহীন অবস্থা। সে নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়াছে সর্ব্বতোভাবে। ভাবের উচ্ছ্বাসে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া এখন তাহার দুরবস্থার শেষ নাই। তাহার শিক্ষার মানের চরম অবনতি ঘটিয়াছে। জীবনযাত্রার মান ত কোথায় নামিয়া গিয়াছে তাহা বলা ভার। তাহার অভাব-অভিযোগ শুনিবারও কেহ নাই, প্রতিকারের কথা ত দূরে থাক।

উপরন্তু রহিয়াছে—ও থাকিবে—উদ্বাস্তু সমস্যা। আমরা জানি পূর্ব্ববঙ্গ-আগত উদ্বাস্তু কি নিদারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এবং এ কথাও আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় সরকার কি ভাবে ঐ সমস্যা ফেলিয়া রাখিয়াছেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়াছেন তাহার অপব্যবহারই বেশী হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের একটা ধারণা দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বাসন অসম্ভব; সহস্র কোটি টাকায়ও কিছু হইবে না। আমরা বলিতে বাধ্য যে, সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়, কেননা সমস্যার মূলে যে বিষাক্ত কারণ রহিয়াছে তাহার প্রতিকারের চেষ্টামাত্রও হয় নাই।

ধর্ম্মনিষ্ঠা না রাষ্ট্রদ্রোহিতা ?

বোম্বাইয়ে অবস্থিত ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত "ধর্ম্মগুরু" শীর্ষক পুস্তকে ইসলামের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যে ভারতীয় মুসলমানদের একাংশ যে পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন সমুচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন, ধর্ম্মীয় রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া সে সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা প্রয়োজন। ভারতের অনতি-প্রাচীন ইতিহাসের কথা স্মরণ রাখিলে এইরূপ আলোচনার তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করা সহজতর হইবে।

মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতার জন্যই ভারত আজ দ্বিধাবিভক্ত। ভারত-বিভাগে মুসলমানদের কোন লাভ হয় নাই—পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হইয়াও পাকিস্থান মুসলমানদের কোন উল্লেখযোগ্য কল্যাণসাধন করিতে পারে নাই। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা আজ পাকিস্থানের মুসলমান নেতৃবৃন্দের নিকটও এরূপ পরিষ্কার হইয়াছে যে, যাঁহারা প্রাক্-স্বাধীন যুগে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠনের ধুয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এখন পাকিস্থানে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠনের বিরোধিতা করিতেছেন। বিলম্বিত হইলেও তাঁহাদের এই মানসিক পরিবর্ত্তন প্রগতিকামী জনমতের অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তিত আত্মসচেতনতা এখনও দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

দেশবিভাগে যদিও সাধারণভাবে মুসলমানগণ লাভবান হন নাই তথাপি তাহাতে হিন্দুদের ক্ষতি হইয়াছে অপরিসীম। আজ লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবার উচ্ছন্ন যাইবার মুখে। পরিস্থিতির এই বিবর্ত্তনে হিন্দুদের দায়িত্ব একেবারেই যে নাই তাহা নহে, কিন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদের স্বেচ্ছাচারিতা-জনিত অন্যায়ের তুলনায় হিন্দুদের সেই দায়িত্ব রাজনৈতিক দিক হইতে নিতান্তই নগণ্য। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে মুসলমানদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার প্রয়াস করার মধ্যেই হিন্দুদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার নিকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। মুসলমান-প্রধান পাকিস্থান যে সুপরিকল্পিত উপায়ে হিন্দুদিগকে উৎখাত করিয়াছে, হিন্দু-প্রধান ভারত মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা করে নাই। বোধ হয় সেই উপকারের ঋণ পরিশোধ করিবার প্রচেষ্টা হিসাবেই তাহারা বিশ্বের নিকট ভারতের মর্য্যাদা সর্ব্বপ্রকারে অবনমিত করিতে প্রবৃত্ত করিতেছে।

তাহা না হইলে "ধর্ম্মগুরু" পুস্তকটি সম্পর্কে যে ধরনের আন্দোলন চলিয়াছে তাহা ঘটিত না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারপিট, লুঠপাট, সবই হইয়াছে। বদ্ধভাবে হিন্দু-মন্দির অপবিত্র করা হইয়াছে। ভারতের বুকের উপর দিয়া রাষ্ট্রদ্রোহী স্লোগান তোলা হইয়াছে—"পাকিস্থান জিন্দাবাদ।" পাকিস্থান জিন্দাবাদ বলিতে আমাদেরও অবশ্য কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে তাহা বলা হইতেছে এবং কি উদ্দেশ্যে তাহা বলা হইতেছে তাহাই বিশেষরূপে বিচার্য্য। "পাকিস্থান জিন্দাবাদ" ধ্বনির সহিত হিন্দুস্থানকে (যদিও ভারতের নাম হিন্দুস্থান নহে) নিপাত করিতে চাহিলে সমগ্র ঘটনাবলীর তাৎপর্য্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ভারতীয় মুসলমানদের একাংশ যে অশোভন আচরণ করিয়াছেন তাহার কারণ কি? "ধর্ম্মগুরু" পুস্তকটি কোন হিন্দু (এমনকি কোন ভারতীয়েরও) লেখা নহে। ইহা কোন নূতন পুস্তকও নহে যে, মুসলমানগণ প্রথম প্রকাশে উত্তেজিত হইয়াছেন। প্রায় পনর বৎসরেরও অধিককাল, দুইজন শ্বেতাঙ্গ মার্কিন নাগরিক কর্তৃক লিখিত এই পুস্তকটি বাজারে চলিতেছিল, কিন্তু কোন মুসলমান তাহাতে আপত্তি করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। যেই মাত্র পুস্তকটি একটি ভারতীয় প্রকাশভবন কর্তৃক পুনঃ-প্রচারিত হইল তখনই ঐ সকল মুসলমানদের খেয়াল হইল যে, ইসলাম ধর্ম্মকে উচ্ছন্নে দিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইহার পরও যখন আপত্তি তোলা হইল প্রকাশভবন কর্তৃক তৎক্ষণাৎ পুস্তকটির প্রচার বন্ধ করা হইল—আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও। ইহার পরও যে, কোন মুসলমানের বিক্ষোভের কারণ থাকিতে পারে, তাহার কোন বিচারসহ যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু যেখানে ধর্ম্মের সম্মানের প্রশ্ন গৌণ, হিন্দুস্থানের মুর্দ্দাবাদই আসল উদ্দেশ্য সেখানে ত এই সকল যুক্তি কাজে আসিবে না—যেমন আসে নাই প্রাক্-স্বাধীন যুগে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনপ্রণালী সম্পর্কে। তখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোলামি ও স্বার্থসাধনই সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের সম্মুখে সর্ব্বাগ্রগণ্য কর্ত্তব্য ছিল। সেইরূপ স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগে ভারতকে উচ্ছন্নে দেওয়ার চেষ্টাই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া তাহারা স্থির করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তথাকথিত কংগ্রেসী মুসলমান নেতৃবৃন্দও এই সকল আপত্তিকর আন্দোলনকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন।

৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে, ৭ই সেপ্টেম্বর পাটনা শহরে দ্বিতীয় দিন কৃষ্ণপতাকা সহ বিক্ষোভ-প্রদর্শনের পর উত্তর-প্রদেশের কংগ্রেসী এম. এল. এ. মৌলানা এম. রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের এক সভায় "ধর্ম্মগুরু" পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কে শ্রীমুন্সীর কৈফিয়তে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং শ্রীমুন্সী ও ভারতীয় বিদ্যাভবনের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানান হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ধর্ম্মীয় মতবাদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যকারী পুস্তক প্রকাশের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জন্যও দাবি জানান হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভারত ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে জিগীর তোলা হইয়াছে, পুস্তকটির লেখক অথবা প্রথম প্রকাশকের বিরুদ্ধে তাহার কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই। কারণ বোধ হয়, তাহারা শ্বেতাঙ্গ মার্কিন, খ্রীষ্টান—অর্থাৎ মনিব-মুরুব্বী; ভারতীয় হিন্দু অথবা মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান নহে।

ভারতীয় মুসলমান-সমাজের যে অংশ সুস্থ মনোভাবাপন্ন এবং চিন্তাশীল তাঁহাদের নিকটও আজ একটি বিরাট প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারাও কি ধর্ম্মীয় গোঁড়ামিকে বিচার-বুদ্ধির উপর

স্থান দিয়া এখনও নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকিবেন ? কোন ঘটনার গুণাগুণ বিচার না করিয়া কেবলমাত্র ধর্ম্ম বিপন্ন এই জিগীর তাঁহারা কি এখনও নীরবে সমর্থন করিয়া যাইবেন ? "ধর্ম্মগুরু" পুস্তকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে সকল কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হইয়াছে কোন হিন্দুই তাহা সমর্থন করেন নাই। হিন্দুমহাসভার ন্যায় হিন্দু প্রতিষ্ঠানের সভাপতিও ঐ সকল মন্তব্যের নিন্দা করিয়াছেন। অপর ধর্ম্ম সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে অনুরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য এখনও আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভারতীয় মুসলমানদের ধর্ম্মীয় গোঁড়ামির ব্যাপকতা অন্যান্য কোন রাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যেই নাই। ইন্দোনেশিয়া, মিশর প্রভৃতি রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ইসলামের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের বাহক হইয়াও অশোভন ধর্ম্মীয় গোঁড়ামি প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেন না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধনের প্রয়োজন ব্যতিরেকে পাকিস্থানের মুসলমানগণও কোন অশোভন ধর্ম্মীয় গোঁড়ামি প্রকাশ করেন না ("ধর্ম্মগুরু" পুস্তকটি সম্পর্কে ঢাকায় যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হইয়াছে, ভারতীয় মুসলমানদের আচরণের তুলনায় তাহার সংযমের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না)। একজন মুসলমান মৌলবী হওয়া সত্ত্বেও মৌলানা ভাসানীর পক্ষে অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি উদার মনোভাব গ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না। ভারতীয় মুসলমানগণ যে কেন এরূপ অযৌক্তিক মনোভাব ত্যাগ করিতে পারেন না তাহা নিতান্তই রহস্যময়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের চিন্তানায়কগণের আচরণ সম্পর্কেও অনিবার্য্যরূপেই কয়েকটি মন্তব্য আসিয়া পড়ে। ফাঁকিবাজি দ্বারা বাজিমাতের যে বিপজ্জনক ঝোঁক আজ সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছে, শ্রীমুন্সীর ব্যবহারে তাহারই প্রতিফলন দেখিয়া আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভারতীয় বিদ্যাভবনের পুস্তক নির্ব্বাচন ও প্রকাশ সম্পর্কিত দায়িত্ব তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। না পড়িয়া তিনি কোন্ বিচারে "ধর্ম্মগুরু" পুস্তকটি প্রকাশের সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। শ্রী কে. এম. মুন্সীর মত খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতও যে এরূপ আচরণ করিতে পারিলেন, প্রকৃতই তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়!

সুয়েজ খাল ও পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট

মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণে ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশেষভাবে ব্রিটেন যে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অযৌক্তিকতা এরূপ প্রকট যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের নিতান্ত অনুগত সদস্যগণও অস্বস্তি প্রকাশ করিয়াছে। সুয়েজ খাল যে মিশরের অবিচ্ছিন্ন অংশ এবং সুয়েজ খাল কোম্পানীকে জাতীয়করণের অধিকার যে মিশরের রহিয়াছে সে সম্পর্কে কেহই প্রশ্ন তুলিতে সাহস করে নাই। সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ চলাচলে যদি মিশর বিধিনিষেধ আরোপ করিত তবে অবশ্য প্রতিবাদের একটি কারণ থাকিত। কিন্তু মিশর স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছে যে, সুয়েজ খাল দিয়া কোন দেশের জাহাজ চলাচলেই মিশর বাধা দিবে না। উপরন্তু, কোম্পানীর অংশীদারগণকে মিশর ক্ষতিপূরণ দিতেও স্বীকৃত হইয়াছে।

এই সকল দিক পর্য্যালোচনা করিলে বোঝা যাইবে যে, সুয়েজ খাল জাতীয়করণের বিরুদ্ধে ব্রিটেন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ যে আপত্তি তুলিয়াছে তাহার মূল কারণ সামরিক। যদিও ১৮৮৮ সনের কনষ্টান্টিনোপল চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধকালীন এবং শান্তিকালীন সকল সময়েই সুয়েজ খাল সকল দেশের জাহাজের নিকট অবারিত থাকিবে বলিয়া বলা হইয়াছিল তথাপি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের অনুমতি ব্যতীত সুয়েজ খাল দিয়া কোন রাষ্ট্রেরই জাহাজ যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুয়েজ খালের উপর ব্রিটিশ প্রভুত্বের প্রকৃতি স্পষ্ট ধরা পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তীকালেও ব্রিটেনের পরোক্ষ সমর্থনে মিশর সুয়েজ খাল দিয়া ইস্রাইলের জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ও ইটালী যখন উত্তর আফ্রিকায় তুর্কি সাম্রাজ্যভুক্ত ট্রিপলী আক্রমণ ও অধিকার করে তখন স্থলপথে তুর্কি ফৌজের প্রতিরোধ অভিযান সুয়েজ খাল পার হওয়ার বাধা পায় ইংরেজের কাছে। ফলে ব্রিটিশ-মিত্র ইটালী প্রায় বিনা যুদ্ধে তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশ দখল করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাহাজের অবাধ গতিবিধি রুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ব্রিটেন বর্ত্তমানে যে আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে, উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে তাহার বিশেষ কোনই গুরুত্ব নাই। অপরাপর রাষ্ট্রের নিকট সুয়েজ খালের কর্ত্তৃত্ব ব্রিটেনের হাতে থাকা অপেক্ষা মিশরের হাতে থাকা অনেক দিক হইতেই অধিকতর সুবিধাজনক মনে হইতে পারে। সুয়েজ খাল সম্পর্কে ব্রিটেনের উদ্বেগের প্রধান কারণ এই যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহ হইলে সুয়েজ পথে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল আমদানীর পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। উপরন্তু সুয়েজের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিলে অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তারেরও সুযোগ থাকে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক জাহাজের গতিবিধির স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্রিটেনের উদ্বেগ তাহার আসল উদ্দেশ্যের উপর ধূম্রজাল সৃষ্টি করিবার একটি প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যুদ্ধব্যতিরেকে আর যতপ্রকারে সম্ভব ব্রিটেন মিশরের উপর চাপ দিয়াছে। সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ব্রিটেন মিশরের ষ্টার্লিং মুদ্রা আটক করিয়াছে। যুদ্ধের হুমকী দিয়া মিশরকে কাবু করিবার প্রচেষ্টায় সাইপ্রাসে সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজের সমাবেশ করিয়াছে। পক্ষান্তরে এই অছিলায় সাইপ্রাসের স্বাধীনতার দাবিও ব্রিটেন দূরে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

২৬শে জুলাই মিশর সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করে। এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনটি প্রধান পাশ্চাত্ত্য শক্তি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ

লণ্ডনে মিলিত হন মিশরের বিরুদ্ধে যুক্তব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য। সম্ভবতঃ আসন্ন নির্ব্বাচনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার সশস্ত্র সংঘর্ষে আগ্রহান্বিত না হওয়ায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধোদ্যমে বিশেষ বাধা পড়ে এবং অবশেষে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সুয়েজ সমস্যা সমাধানের আয়োজন করা হয়। উপরোক্ত তিনটি পাশ্চাত্য রাষ্ট্র ব্যতীত আরও একুশটি রাষ্ট্রকে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয়। তন্মধ্যে মিশর ও গ্রীস সম্মেলনে যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়। ১৬ই আগষ্ট হইতে ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত লণ্ডনে বাইশটি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে সুয়েজ সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অযৌক্তিক মনোভাব বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। এবং সেহেতু অতি স্বাভাবিক কারণেই সম্মেলনে কোন সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

সম্মেলনের প্রথম দিনেই মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ জন ফষ্টার ডালেস পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে একটি চার দফা পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ব্যতীত পাকিস্থান, তুরস্ক, ইথিওপিয়া সমেত উপস্থিত অপরাপর সকল রাষ্ট্রই ডালেস প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ শেপিলভ একটি সাত দফা খসড়া পরিকল্পনা সম্মেলনে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু ভারতীয় প্রস্তাব পেশের পর ভারতীয় প্রস্তাবের অনুকূলে সোভিয়েট প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়। মিশরও ভারতীয় প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা করিতে সম্মত হয়, কিন্তু ভোটের জোরে ভারতীয় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

মিঃ ডালেসের প্রস্তাবে বলা হয় যে (১) সুয়েজ খাল পরিচালনার ভার একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর অর্পিত হইবে। একটি চুক্তি অনুযায়ী এই বোর্ড গঠিত হইবে এবং ইহাতে মিশরেরও প্রতিনিধি থাকিবে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই এককভাবে ইহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। (২) যথোপযুক্ত ব্যবস্থার মারফত মিশর তাহার ন্যায্য পাওনা পাওয়ার অধিকারী হইবে এবং এই ব্যবস্থা এইরূপ হইবে যাহাতে মিশরের স্বার্থ এবং সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। (৩) জাতীয়কৃত সুয়েজ খাল কোম্পানীকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে; (৪) শেষোক্ত দুইটি বিষয় অর্থাৎ মিশরকে ন্যায্য প্রাপ্য দান এবং কোম্পানীকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে মতবিরোধ ঘটিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্ত্তৃক মনোনীত একটি সালিশ তাহার নিষ্পত্তি করিবেন।

সোভিয়েট প্রতিনিধি শেপিলভ ডালেস-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ঐ প্রস্তাবে প্রকৃত অবস্থা অথবা মিশরের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রক্ষা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। তিনি বলেন যে, সুয়েজ খাল পরিচালনাকল্পে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থ হইবে—মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সমতুল। সুয়েজ খাল সমস্যার দুইটি দিক—একটি জাতীয়করণের প্রশ্ন এবং অপরটি অবাধ জাহাজ চলাচলের প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কেই আলোচনা চলিতে পারে। সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর জোর দিয়া শেপিলভ বলেন, মিশরের সহিত আলোচনা ব্যতিরেকে কোন সমাধানই কার্য্যকরী হইতে পারে না। এই আলোচনার জন্য ১২ই সেপ্টেম্বর একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য মিশর যে প্রস্তাব করে শেপিলভ তাহার সমর্থন করিয়া বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ এবং মিশরের উপর ঐ বৃহত্তর ছেচল্লিশটি রাষ্ট্র সম্মেলন আহ্বানের ভার দেওয়া হউক।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলুইন লয়েড রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ত্তৃক উত্থাপিত বৃহত্তর সম্মেলনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান সম্মেলনের আলোচনার মধ্য হইতে একটি নীতি ঘোষিত হউক। সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর একটি খসড়া নীতি ঘোষণা (draft declaration of principles) রচনা করিয়া তাহা উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করেন।

২০শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণ মেনন ভারতের পক্ষ হইতে পশ্চিমী পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া একটি পাঁচ দফা পরিকল্পনা সম্মেলনের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন।

শ্রীমেননের প্রস্তাব নিম্নরূপ :—

(ক) সুয়েজ খালের পরিচালনা সংক্রান্ত ১৮৮৮ সনের কনষ্টান্টিনোপল চুক্তিটির অন্তর্গত নীতিসমূহ পুনর্ব্বিবেচনা এবং বর্ত্তমান সময়ে উহার যে সমস্ত সংশোধন করা প্রয়োজন তাহা করিয়া খালটির সংরক্ষণ ও ন্যায়সঙ্গত জলকর (খালটি ব্যবহারের জন্য) আদায়ের ব্যবস্থার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখের জন্য ঐ চুক্তি পর্য্যালোচনা করা হউক। জলকর যাহাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে আদায় করা হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুয়েজ খাল রক্ষা ও পরিচালনা করিতে হইবে এবং উহার সুযোগ-সুবিধাও যাহাতে সকল জাতিই পাইতে পারে সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে। খালটিকে সর্ব্বাবস্থায় ও সময়ে উপযুক্ত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

(খ) 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা এমনকি ১৮৮৮ সনের চুক্তির স্বাক্ষরকারী ও খালের সমস্ত ব্যবহারকারীদের একটি সম্মেলন আহ্বানের বিষয় পর্য্যন্ত বিবেচনা করা হউক।

(গ) মিশরীয় মালিকানা ও মিশরকর্ত্তৃক খাল পরিচালনা ক্ষুণ্ণ না করিয়া খালের ব্যবহারকারীদের স্বার্থ ও সুয়েজ খালের জন্য গঠিত মিশরীয় কর্পোরেশনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার বিষয় বিবেচনা করা হউক।

(ঘ) ভৌগোলিক দিক হইতে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে খালের ব্যবহারকারীদের লইয়া একটি উপদেষ্টা সংস্থা গঠন করা হউক এবং এই সংস্থার উপর সংযোগ রক্ষা ও পরামর্শদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হউক।

(ঙ) মিশর সরকার সুয়েজ খালের জন্য গঠিত মিশরীয় কর্পোরেশনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট পেশ করিবেন।

এই পাঁচ দফা পরিকল্পনার মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, দ্রুত সুয়েজ খাল সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা অবশ্যপ্রয়োজন। এই কথা মনে রাখিয়াই প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা আরম্ভের জন্য একটা পথের সন্ধান দিবার নিমিত্ত এই প্রস্তাব করা হইতেছে—

(১) মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি, (২) সুয়েজ খাল মিশরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি জলপথ বলিয়া স্বীকৃতি, (৩) ১৮৮৮ সনের কনষ্টান্টিনোপোল চুক্তি অনুযায়ী সকল জাতির অবাধে খাল ব্যবহারের অধিকার স্বীকার, (৪) ন্যায়সঙ্গত জলকর ধার্য্য করিতে হইবে এবং খালের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের অধিকার কোনওরূপ বাছ-বিচার না করিয়া সকল জাতিকে দিতে হইবে এবং (৫) খালটি সর্ব্বসময়ের জন্য উপযুক্তভাবে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং (৬) খালটির ব্যবহারকারীদের স্বার্থের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১৮৮৮ সনের চুক্তিতে সুয়েজ খালের অবাধ ব্যবহারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। শ্রীমেননের পরিকল্পনায় ঐ বিষয় উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৬ সনের ৩১শে জুলাই মিশর ঘোষণা করে যে, মিশর তাহার সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক বাধ্যবাধকতা, ১৮৮৮ সনের চুক্তি এবং ১৯৫৪ সনের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তিতে প্রদত্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিবে।

কিন্তু ভারতের প্রস্তাবগুলি পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের মনঃপূত হইল না। ২২শে আগষ্ট শ্রী মেনন পুনরায় সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-দিগকে অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহারা মার্কিন প্রস্তাবটি না গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার সেই আবেদন নিষ্ফল হয়।

সম্মেলনের ফলাফল কিরূপে মিশরের নিকট উপস্থিত করা হইবে সেই সম্পর্কেও ভারত ও পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের সমর্থনে নিউজিল্যাণ্ড প্রস্তাব করে যে, ডালেস প্রস্তাবের সমর্থনকারী দেশগুলির মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধি মিশরের নিকট মার্কিন প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিবেন এবং তাহার ভিত্তিতে মিশর একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত কিনা তাহা জানিয়া আসিবেন।

ইন্দোনেশিয়া, সিংহল ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনসহ ভারত নিউজিল্যাণ্ড-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলে যে, মার্কিন প্রস্তাবটি সম্মেলনের একাংশের সমর্থন পাইয়াছে—এই অবস্থায় উহাকে সম্মেলনের অভিমত বলিয়া চালানো উচিত হইবে না। নিউজিল্যাণ্ড পরে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লয় এবং পক্ষান্তরে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রবর্গের পক্ষ হইতে ঘোষণা করে যে, তাহারা অষ্ট্রেলিয়া, ইরাণ, ইথিওপিয়া, এবং সুইডেনকে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ রবার্ট মেঞ্জিসের সভাপতিত্বে মিশরের সহিত মার্কিন প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছে।

সম্মেলনের কার্য্যবিবরণী-সম্বলিত একটি দলিল মিশরের নিকট প্রেরণের জন্য সম্মেলনের সভাপতি মিঃ সেলুইন লয়েডকে অনুরোধ করিয়া ক্রান্স একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহাও গৃহীত হয়। এই-রূপেই সুয়েজ সম্পর্কে প্রথম লণ্ডন আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের অবসান হয়।

২৪শে আগষ্ট লণ্ডনে এক বিবৃতিতে ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেনন বলেন যে, সুয়েজ সম্মেলনে ভারত যে প্রস্তাব পেশ করিয়া-ছিল তাহার পিছনে ভারতের কোন কায়েমী স্বার্থ জড়িত ছিল না। আলোচনার উপযোগী মনে করিয়া যে-কোন পরিকল্পনা লইয়াই মিশর আলোচনা করুক না কেন ভারত তাহাতেই খুশী হইবে। তিনি আরও বলেন যে, মিশর যদি মেঞ্জিস মিশনের সহিত দেখা করেন তবে ভারত খুশীই হইবে। ২৭শে আগষ্ট কায়রো হইতে ঘোষণা করা হয় যে, প্রেসিডেণ্ট নাসের পঞ্চশক্তি সুয়েজ কমিটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত আছেন। পঞ্চশক্তি প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ মেঞ্জিস সাক্ষাৎকারের স্থান হিসাবে জেনেভা অথবা কায়রোর উল্লেখ করেন। শেষ পর্য্যন্ত কায়রোতেই আলোচনা হওয়া স্থির হয়।

৩০শে আগষ্ট কায়রো হইতে প্রকাশিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পশ্চিমী পরিকল্পনার সমর্থনে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ারের বিবৃতির সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে, ডালেস পরিকল্পনা সুয়েজ সমস্যা মীমাংসার ভিত্তি হিসাবেও গ্রহণযোগ্য নহে।

প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত আলোচনার জন্য মিঃ মেঞ্জিসের নেতৃত্বে পঞ্চশক্তি প্রতিনিধিদল ২রা সেপ্টেম্বর কায়রোতে উপনীত হন। ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মেঞ্জিস মিশন প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত আলোচনা চালান। আলোচনা বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হয় বলিয়াই প্রকাশ। শেষ পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে পশ্চিমী পরিকল্পনা গ্রহণ করাইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া মেঞ্জিস মিশন ১০ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১১ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে একটি যুক্ত ইঙ্গ-ফরাসী বিবৃতিতে বলা হয় যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনায় প্রেসিডেণ্ট নাসেরের অসম্মতির ফলে অত্যন্ত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ১২ই সেপ্টেম্বর সুয়েজ সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে একটি জরুরী বিতর্কের উদ্বোধন করিয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যর এণ্টনী ইডেন বলেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স রাষ্ট্র-সঙ্ঘ স্বস্তি পরিষদে সুয়েজ পরিস্থিতির কথা জানাইয়া দিয়াছে। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই সমস্যার উত্থাপন সম্ভাবনার বহির্ভূত মনে করেন না—তবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। স্যর এণ্টনী সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, "কিন্তু আমরা প্রয়োজন হইলেই জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অগ্রসর হইয়া রহিয়াছি। ব্রিটেন তাহার সামরিক সতর্কতা কোনক্রমেই শিথিল করিবে না। এক মাস পূর্ব্বে যদি সামরিক সতর্কতা

যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমানেও উহা যুক্তিযুক্ত।"

সার এণ্টনী বলেন, "কর্ণেল নাসেরের কার্য্যকে জাতীয়করণ বলিলে সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে। আমি 'বলপূর্ব্বক অধিকার' কথাটি বেশী যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। ইহাতে যদি কেহ ক্ষুব্ধ হন ত আমি বলিব যে আমি কাহাকেও আঘাত দিতে চাহি না—আমাদের একটি নূতন ও অত্যন্ত কুৎসিত শব্দ সৃষ্টি করিতে হইবে, যে আখ্যার নির্ভুলতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। কর্ণেল নাসের যাহা করিয়াছেন তাহা হইল খালটির আন্তর্জ্জাতিক সত্তার বিলোপসাধন।"

সার এণ্টনী ইডেন উক্ত ভাষণে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে বলেন যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি "ব্যবহারকারী সমিতি" গঠন করিবেন যাহা সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। তিনি বলেন যে, মিশর যদি এই "ব্যবহারকারী সমিতি"র কাজের বিরোধিতা করেন বা সহযোগিতা না করেন তবে মিশর ১৮৮৮ সনের কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তি ভঙ্গ করিবে।

পরদিন ১৩ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালেস "ব্যবহারকারী সমিতি" গঠনের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, মিশর যদি ব্যবহারকারী সমিতির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন জাহাজকে সুয়েজ খালপথে যাইতে না দেয় তবে গুলীর জোরে সুয়েজ খালে যাতায়াতের কোন অভিপ্রায় যুক্তরাষ্ট্রের নাই।

"ব্যবহারকারী সমিতি"র প্রস্তাবে সুয়েজ খাল লইয়া সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় লোকসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বশেষ প্রস্তাবটি দ্বারা মিশরের রাষ্ট্রীয় অধিকার লঙ্ঘন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা আলোচনার পথ বন্ধ করিবারই চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐরূপ একতরফা প্রস্তাবে সমস্যা সমাধানের কোনই উপায় নাই।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে শ্রীনেহরু "বিস্ময় এবং দুঃখ" প্রকাশ করেন।

সুয়েজ খালের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ১০ সেপ্টেম্বর মিশরের পক্ষ হইতে প্রেসিডেণ্ট নাসের রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী দেশগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া এক আলোচনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ব্রিটেন সেই প্রস্তাব বিবেচনা করিতে অস্বীকার করে। মিশরের প্রস্তাবটি ভারত পরিপূর্ণরূপে সমর্থন করে এবং উহা আলোচনা করিয়া দেখিবার জন্য ভারত ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আগষ্ট মাসে লণ্ডন সম্মেলনে যোগদানকারী বাইশটি রাষ্ট্রের আর একটি সম্মেলন আহ্বানের অনুরোধ জানায়। হাউস অব কমন্সে ১১ই সেপ্টেম্বর সার এণ্টনী ইডেন যে ভাষণ দেন তাহার পূর্ব্বেই ভারতের অনুরোধ ব্রিটিশ সরকারের হাতে পৌঁছায়, কিন্তু ব্রিটেন ভারতের প্রস্তাব সম্পর্কেও কোন বিবেচনা করা প্রয়োজন বোধ করে নাই।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১২ই সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে সুয়েজ অঞ্চলে শান্তিভঙ্গের যে আশঙ্কা দেখা দেয় সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৫ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণক্রমে সিংহল, ব্রহ্ম, পাকিস্থান ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ ভারত সরকারের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। মিশর সরকারের আমন্ত্রণক্রমে ভারতের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ১৬ই সেপ্টেম্বর কায়রোতে উপনীত হন।

ইতিমধ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং প্রাক্তন সুয়েজ খাল কোম্পানীর চাপে উক্ত কোম্পানীর অ-মিশরীয় পাইলট কর্ম্মচারীবৃন্দ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ম্মত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই ভাবে দক্ষ কর্ম্মীদিগকে অপসারণ করিয়া সুয়েজ খাল পরিচালনায় বাধা দিবার যে চেষ্টা করা হইয়াছিল কার্য্যতঃ তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মিশরীয় পাইলটগণ যথেষ্ট দক্ষতার সহিত উপযুক্তসংখ্যক জাহাজকে খালের মধ্য দিয়া পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং যুগোশ্লাভিয়া হইতে কিছুসংখ্যক দক্ষ পাইলট আসিয়া পড়ায় সুয়েজ খালপথে জাহাজ চলাচলে এখনও কোন বিঘ্ন দেখা দেয় নাই।

যদিও সুয়েজপথে জাহাজ যাতায়াতে এখনও পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন দেখা দেয় নাই তথাপি পশ্চিমী জাহাজ কোম্পানীগুলি তাহাদের জাহাজে বাহিত মালের ভাড়া শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি

সম্প্রতি রাজ্যসভায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে তিনটি সমস্যা কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, এবং এই তিনটি সমস্যা হইতেছে—ক্রমহ্রাসমান বৈদেশিক মুদ্রার আয়, দেশে মূল্যবৃদ্ধি এবং উপযুক্ত শিক্ষিত শ্রমিকের অভাব। দেশের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, ইহার ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয় সরকারী খাতে নির্দ্ধারিত ৪,৮০০ কোটি টাকা হইতেও অধিক হইবে। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি উভয়েই পরস্পরকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছে। এই অবস্থায় পরিকল্পনা কমিশন নূতন নূতন করবৃদ্ধি দ্বারা রাজস্ব আয়বৃদ্ধির পরিকল্পনা করিতেছেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, পরোক্ষ কর ধার্য্যদ্বারা ব্যবহার হ্রাস তথা মূল্যনিয়ন্ত্রণ করা। সম্প্রতি মিল বস্ত্রের উপর উৎপাদন-শুল্ক ধার্য্য এইরূপ চিন্তাধারার বাস্তব রূপ। অন্যান্য প্রকার ব্যবহার্য্য শুল্কের আরোপ সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন চিন্তা করিতেছেন। অদূর-ভবিষ্যতে হয়ত মোট বাৎসরিক সম্পত্তির উপরও প্রত্যক্ষ কর ধার্য্য করা হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমহ্রাসমান সঞ্চয় আর একটি কঠিন সমস্যারূপে

উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ মুদ্রার সঞ্চয় বৃদ্ধি করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ কোটি টাকা খরচা করিয়া কয়েকটি মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করিতেছেন। ইদানীং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং মুদ্রার পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। গত তিন বৎসর ধরিয়া গড়ে প্রায় ৭৩০ কোটি টাকা করিয়া ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত থাকিত; বর্ত্তমানে ইহার পরিমাণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৬৩১ কোটি টাকায়, অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং হ্রাস পাইয়াছে। যাহা হউক সম্প্রতি যে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গম ধার ব্যাপারে চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি খানিকটা পূরণ করা সম্ভবপর হইবে। আশা করা হইতেছে যে, আগামী বৎসর আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি কিছু শান্ত হইলে ভারতবর্ষ আমেরিকার নিকট হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিবে এবং তাহার দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ঋণ দ্বারা সন্তাকার ভাবে দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি হইবে না, এবং সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন দেশগুলির সহিত পারস্পরিক ভিত্তিতে বাণিজ্যিক চুক্তি করিতেছেন; সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যে দ্রব্যবিনিময় চুক্তি হইয়াছে তাহার জন্য স্বর্ণ কিংবা বৈদেশিক মুদ্রা খরচা করিতে হইবে না, ইহাতে প্রায় ৪৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিবে।

মূল্যপরিস্থিতি স্থায়ী না হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খরচ যে আরও বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সজাগ আছেন। সাধারণ পাইকারী দ্রব্যমূল্যমান বৃদ্ধি পাইয়া সম্প্রতি ৪২০তে দাঁড়াইয়াছে, গত বৎসর এই সময়ে ইহার পরিমাণ ছিল ৩৪২। গত বৎসর এই সময় সর্ব্বভারতীয় ব্যবহারিক দ্রব্যের মূল্যমান ছিল ৯২; এ বৎসর ইহা এখন দাঁড়াইয়াছে ১১০এ। মূল্যমান হ্রাস করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতেছেন এবং আর্থিক ঋণ লইতেছেন; তৃতীয় পন্থা হিসাবে কোনও কোনও বিলাস-সামগ্রীর আমদানীর উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে। মূল্যপরিস্থিতিকে আয়ত্তে রাখার জন্য প্ল্যানিং কমিশনের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে যাহাতে কয়েকজন সভ্য সদাসর্ব্বদা মূল্যপরিস্থিতিকে নিরীক্ষণ করেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, গত পাঁচ বৎসরে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি হইয়াছে মোট ৫০৬ কোটি টাকা; বৎসর হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৫২ সনে ঘাটতি ছিল ২৩২ কোটি টাকা, ১৯৫২-৫৩ সনে ৩১ কোটি টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সনে ৫২ কোটি টাকা, ১৯৫৪-৫৫ সনে ৮৫ কোটি টাকা এবং ১৯৫৫-৫৬ সনে ১০৫ কোটি টাকা। বিগত পাঁচ বৎসরে বিদেশী সরকারসমূহের নিকট হইতে দান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে ৯৭ কোটি টাকা এবং অদৃশ্য খাতে পাওয়া গিয়াছে ৩৮৩ কোটি টাকা। অদৃশ্য আমদানী খাতের মধ্যে পড়ে আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে ঋণ, বিদেশীদের ভ্রমণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা লাভ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে বিভিন্ন খাতে সাহায্যলাভ (যেমন, Point Four Programme এবং Technical Aid Programme)। এই সকল সাহায্য ও দান ধরিলে দেখা যায় যে, গত পাঁচ বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে চলতি হিসাবে ২৬ কোটি টাকা আর মোট লেন-দেন ব্যাপারে ঘাটতি হইয়াছে ১২৩ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতবর্ষের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,২০০ কোটি টাকায়। বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি প্রায় গতানুগতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার প্রধান কারণ ১৯৪৯ সনের মুদ্রাবিনিময় মূল্যহ্রাস। ভারতীয় মুদ্রা-মূল্যহ্রাসের পর হইতেই ভারতের আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন ব্যাপারে ঘাটতি স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে, রপ্তানীর পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং সেই খাতে ভারতের প্রাপ্য মুদ্রার পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে, কারণ ডলার দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ তাহার রপ্তানীর জন্য প্রতি ১০০৲ টাকায় ৪৪৲ টাকা কম পায়। শুধু তাই নহে, ডলার দেশগুলি হইতে আমদানীর জন্যও ভারতবর্ষকে শতকরা ৪০৲ টাকা বেশী দিতে হয়, সুতরাং দেখা যায় যে, মুদ্রাবিনিময় মূল্যহ্রাস যেন শাঁখের করাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহা দুইদিকেই কাটে—আমদানী ও রপ্তানী উভয় ব্যাপারেই ভারতবর্ষকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার আর একটি অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইয়াছে যে, ভারতের আভ্যন্তরিক মূল্যমান তথা উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ডলার দেশগুলি হইতে (প্রধানতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) ভারতবর্ষ অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতি আমদানী করিতেছে, ইহার ফলে তাহাকে অতিরিক্ত হারে ডলার প্রদান করিতে হয়, কিন্তু আমদানীর তুলনায় ডলার দেশগুলিতে ভারতবর্ষের রপ্তানী প্রায় সীমাবদ্ধ, ইহার ফলে ডলার ঘাটতি ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের একটি আনুষঙ্গিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডলার দেশগুলিতে ভারতীয় রপ্তানী হ্রাসের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ ডলার দেশ হইতে আমদানী যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেওয়ায় এই দেশগুলিও ভারতবর্ষ হইতে আমদানীর পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে; গত পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষ ডলার দেশগুলিতে ৬৬৬ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে এবং ৮৬৩ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে; মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯৬ কোটি টাকায়। ষ্টার্লিং দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের গত পাঁচ বৎসরে ৭ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে; ইউরোপের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থাভুক্ত দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের ঘাটতি হইয়াছে ২৬২ কোটি টাকা এবং ষ্টার্লিং এলাকার বাহিরে অবশিষ্ট দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি টাকা।

এই ঘাটতির অধিকাংশই পরিপূরিত হয় বিদেশ হইতে বিনা-মূল্যে প্রাপ্ত অর্থসাহায্য, বিদেশী ঋণ ও আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত ঋণ দ্বারা। তাই জোরগলায় কেন্দ্রীয় সরকার বলেন, বহির্ব্বাণিজ্যে চলতি হিসাবে (Current Account) তাঁহাদের

লাভ হইয়াছে। কিন্তু মূলধনী লেনদেন ব্যাপারে দেনার দায়ে যে তাঁহাদের টিকি বিক্রী তার ফিরিস্তি তাঁরা কায়দা করে চাপিয়া যান। আর বিদেশের দানে ভিক্ষার ঝুলি হয়ত ভর্ত্তি হয়, কিন্তু তাহা চিরন্তন কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না এবং তাহার দ্বারা দেশের আত্মমর্য্যাদা বাড়ে না ; কৃপার পাত্র হইয়া থাকা যায়। বহির্বাণিজ্যে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার পরিস্থিতি যেন বন্যাবিধ্বস্ত পদ্মার তীরভূমি যার তলা বহুদূর পর্য্যন্ত জলে খাইয়া গিয়াছে, কখন ধ্বসিয়া পড়িবে কে জানে। তাই উপরের অবস্থা দেখিয়া সত্যিকার অবস্থা বিচার করা যায় না।

মূল্যমানবৃদ্ধির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। ব্যবহারিক দ্রব্যের উপর অধিক হারে উৎপাদন শুল্ক বসাইয়া দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস করা যায় না এবং তাহাতে দ্রব্যমূল্যও কমিবে না। ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি খরচে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য, এ হেন অবস্থায় বেশী দ্রব্য ব্যবহার করিও না বলিয়া উপদেশ দেওয়া নিরর্থক, ইহাতে আসল সমস্যার সমাধান হয় না, ধামাচাপা দেওয়া হয় মাত্র। অধিক পরিমাণে ব্যবহারিক দ্রব্য সরবরাহ মূল্যমান বৃদ্ধির একটি উত্তম উত্তর।

চা-অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট

১৯৫৪ সনের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকার চা-অনুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন ; এই কমিশন সম্প্রতি তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কমিশন আশা করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতে ৭১ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ আগামী পাঁচ বৎসরের পর ভারতের চা উৎপাদন আরও ৪.৫ কোটি পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইবে। কমিশনের অভিমতে চা-শিল্প ভারতের বৃহত্তম সংস্থাগত কর্ম্মপ্রদানকারী মালিক ; ইহাতে প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। যদিও ইদানীং ভারতে আভ্যন্তরিক চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তথাপি চায়ের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। চা-উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে কর্ষিত এলাকা এবং উৎপাদনের পরিমাণে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। চা-শিল্প ভারতের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনকারী শিল্প এবং ভারতে প্লাই কাঠের সবচেয়ে বড় ক্রেতা।

উত্তর ভারত, ডুয়ার্স এবং পশ্চিম বাংলার তেরাই অঞ্চলে একরপ্রতি গড়ে চা উৎপাদনের হার সর্ব্বাধিক। দক্ষিণ ভারতে আন্নামালাই এলাকায় একরপ্রতি চা-উৎপাদনের হার অধিক। দক্ষিণ ভারতে সারা বৎসরই চায়ের চাষ করা হয়, যাহা উত্তর ভারতে হয় না। চা-শিল্পে মোট ১১৩ কোটি টাকা নিয়োজিত আছে। ইহার মধ্যে ৭২.৫৫ কোটি টাকার (অর্থাৎ ৬৪.২ শতাংশ) মালিক বিদেশীরা, এবং ৪০.৫১ কোটি টাকার মালিক ভারতীয় শিল্পপতিরা (অর্থাৎ ৩৫.৮ শতাংশ)। গত ১৯৩৯ সন হইতে ১৯৫৩ সনের মধ্যে ভারতীয় মালিকানায় পরিমাণ ১০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই পরিমাণে বিদেশী মালিকানা হ্রাস পাইয়াছে।

কলিকাতার ১৩টি এজেন্সী হাউস উত্তর ভারতের ৭৫ শতাংশ চা-উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাদের মধ্যে ৭টি কোম্পানী ৫০ শতাংশ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাঁচটি কোম্পানী ৩৬ শতাংশ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৫৪ সনে কলিকাতার নীলামে বিক্রীত চায়ের পরিমাণের অর্দ্ধেক আটটি এজেন্সী হাউস ক্রয় করিয়াছিল। কলিকাতায় খুচরা চা বিক্রয়ের ৮৫ শতাংশ দুইটি বিখ্যাত কার্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত হয়।

অনেকের ধারণা ছিল যে, আন্তর্জ্জাতিক চা চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে ভারতে চায়ের উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। কমিশন কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইহাদের অভিমতে আন্তর্জ্জাতিক চা চুক্তির সভ্য হওয়াতে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি হয় নাই, কারণ এই চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমিতে চা চাষ করা যাইতে পারে ততখানি জমিতে এখনও চাষ আবাদ করা হয় নাই, সুতরাং চায়ের কৃষি-জমি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আন্তর্জ্জাতিক চা চুক্তিকে চালু রাখার জন্য কমিশন অভিমত দিয়াছেন, কারণ ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় চা-শিল্পকে পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হয়। তবে ভবিষ্যতে চুক্তিগ্রহণকালীন ভারতবর্ষ যেন তাহার আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা বজায় রাখে।

ভারতের আভ্যন্তরিক বাজারে চায়ের কাটতি বৃদ্ধি করার জন্য কমিশন বিশেষ সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাদের মতে, আভ্যন্তরিক বাজারের ক্রয়শীলতা অত্যধিক এবং চা-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে আভ্যন্তরিক বাজারের উপর। রপ্তানী বৃদ্ধিকল্পে একটি রপ্তানী উন্নয়ন কমিটি নিয়োগের জন্য কমিশন অভিমত দিয়াছেন, এই কমিটি বর্ত্তমান চা বোর্ডের অধীনে কর্ম্ম করিবে। আভ্যন্তরিক বাজারের গুরুত্ব থাকিলেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, চায়ের আন্তর্জ্জাতিক বাজার হারাইলে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। বিলাতের নীলাম ব্যবস্থাই আজ প্রধান সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। বিলাতে ভারতীয় চায়ের নীলাম-ব্যবস্থা থাকার ফলে মধ্য-প্রাচ্যের বাজারে ভারতীয় চা রপ্তানী হ্রাস পাইতেছে। অথচ বিলাতের নীলাম-ব্যবস্থা না থাকিলে ঐ দেশে এবং ডোমিনিয়ন দেশগুলিতে ভারতীয় চা রপ্তানী ব্যাহত হইবে। লণ্ডনে নীলাম হওয়ার ফলে ইউরোপের বাজারে ভারতীয় চায়ের কাটতি আশানুরূপ হইতেছে না। এই কারণে সম্প্রতি একটি টী ডেলিগেশন বিলাতে গিয়াছে উদ্দেশ্য—কি ভাবে বর্ত্তমান নীলাম-ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করা যায়।

মূল্যবৃদ্ধি ও সরকারী নীতি

গত কয়েক মাস যাবৎ নিত্যব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যের বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কৃষিজাত এবং শিল্পজাত উভয়বিধ দ্রব্যেরই বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সনে যে অস্বাভাবিক মূল্যহ্রাস দেখা দিয়াছিল, বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধি আংশিকরূপে তাহার সমপূরক হইলেও মূল্যবৃদ্ধির গভীরতর কারণ রহিয়াছে। কৃষিজাত

দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস হওয়ায় জন্যই মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তথায় চাউলের বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ—ঘাটতি রাজস্বনীতি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি (deficit financing)। কিন্তু সরকার পক্ষ এখনও তাহা পুরাপুরি স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। পরিকল্পনা-কালে উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ফলে স্বাভাবিকরূপেই মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। ইহার উপর ঘাটতি রাজস্বনীতি অনুসরণ করিয়া চলিলে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমালোচনা মুখ্যতঃ এই দৃষ্টিকোণ হইতেই করা হইয়াছিল। এই অবস্থার প্রতিকারের উপায়ও অবশ্য সরকারের হাতে রহিয়াছে—তবে সেই সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার মত প্রশাসনিক যোগ্যতার নিতান্তই অভাব। ইহার উপর নানারূপ প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক গোঁড়ামির জন্য সমস্যার বৈজ্ঞানিক এবং নিরপেক্ষ আলোচনা ও সমাধান কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনসাধারণের দুর্ভোগ কিন্তু বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর্থিক সঙ্গতির দিক হইতে যে যত দুর্ব্বল, চাপ তাহার উপর সেই পরিমাণে বেশী পড়িয়াছে। অর্থাৎ, যে অসাম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্য লইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল, পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার পদ্ধতিতে সেই অসাম্যকে আরও বাড়াইয়া তোলা হইতেছে। আহার, বাসস্থান ও পরিধেয়ের সংস্থান করা আজ বিশেষ দুর্ঘট হইয়াছে—শিক্ষার কথা ত না বলাই ভাল।

মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য সরকার কাপড়ের উৎপাদন-শুল্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে, মূল্যমান আরও বৃদ্ধি পাইলে জনসাধারণ কম কাপড় কিনিবে এবং তখন কাপড়ের মূল্য পুনরায় হ্রাস পাইবে। অর্থনৈতিক তর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টি করিতে এই সকল যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। হয়ত উন্নততর জীবনযাত্রার মানসম্পন্ন দেশে এই সকল অর্থনৈতিক যুক্তির বাস্তব উপকারিতাও রহিয়াছে। কিন্তু যে দেশে বার্ষিক জনপ্রতি কাপড়ের ব্যবহার দশ গজও নহে সেই দেশে আরও কম কাপড় কিনিবার পরামর্শ দেওয়া জনসাধারণকে বিদ্রূপ করার নামান্তর নহে কি ?

জাতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশন

জাতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশন ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীএইচ. এস. প্যাটেল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। কর্পোরেশনের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে বোম্বাই নগরে। ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সদর দপ্তরও বোম্বাই নগরেই স্থাপিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় জীবনবীমা কর্পোরেশনের পাঁচটি আঞ্চলিক প্রধান কার্য্যালয় থাকিবে—কলিকাতা, কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে। সমগ্র ভারতে কর্পোরেশনের তেত্রিশটি বিভাগীয় আপিস এবং ১৮০টি ব্রাঞ্চ আপিসও স্থাপিত হইবে। পনর জন সদস্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সর্ব্ব-ভারতীয় নীতি নির্দ্ধারণের ভার উক্ত বোর্ডের উপরই অর্পিত হইয়াছে।

গত জানুয়ারী মাসে জীবনবীমা জাতীয়করণের ঘোষণা যখন সরকারী ভাবে করা হয় তখন তাহা যেরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল—জীবনবীমা কর্পোরেশন সেইরূপ অবিমিশ্র সানন্দ অভ্যর্থনা লাভ করে নাই। বিভিন্ন দিক হইতেই কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন হইয়াছে। কর্পোরেশনের সংগঠন, কর্ম্মচারী নিয়োগ-নীতি এবং সদর কার্য্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েই নানাবিধ প্রশ্ন উঠিয়াছে। সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্পীকার লোকসভায় জীবনবীমা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী নিয়োগনীতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে বিশেষ অনিশ্চিয়তা দেখা দিয়াছে।

জীবনবীমা জাতীয়করণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে জীবনবীমার প্রসারসাধন। কিন্তু জীবনবীমা কর্পোরেশন যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে উহা গ্রামাঞ্চলে সাফল্যজনক রূপে কাজ করিতে পারিবে না বলিয়া 'ইকনমিক উইকলি' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন।

সাঁজা চাষীর খাজনা হ্রাস

১২ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নবনিযুক্ত আইনমন্ত্রী শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র সরকারপক্ষ হইতে জানান যে, বর্ত্তমান বৎসর হইতে সরকার রাজ্যের সাঁজা চাষীদের একরপ্রতি দেয় খাজনার হার ৬০ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৯ টাকা ধার্য্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থার ফলে পূর্ব্বে যেখানে ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার সাজা চাষীর নিকট হইতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা খাজনা আদায় হইত, এখন হইতে সে স্থলে মাত্র ৪৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে।

উৎপন্ন শস্যের হিসাবে খাজনা দিবার প্রথা—সাজা, গুলা, কুত্থোমার প্রভৃতি নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও হুগলী প্রভৃতি আটটি জেলাতেই বিশেষভাবে সাজা প্রথার প্রচলন রহিয়াছে। সরকার কর্ত্তৃক জমিদারী-ব্যবস্থার বিলোপসাধনের পর সরকারই এই সকল অঞ্চল হইতে সাজা খাজনা আদায় করেন। ফসল হউক আর নাই হউক প্রথা অনুযায়ী চাষীকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য খাজনা হিসাবে প্রতি বৎসরই দিতে হয়। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন শস্যে দেয় খাজনার মূল্য অন্যান্য একই ধরনের জমির নগদ টাকায় দেয় মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সরকার বিভিন্ন চাষীদের দেয় খাজনার মধ্যে এই বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই সাজা খাজনা হ্রাস করিয়া সাজা কৃষকদিগের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

সাঁজা চাষীদের খাজনা হ্রাস সম্পর্কিত সরকারী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বারাসাত বার্ত্তা" সম্যক্‌ জমিতে সাজা প্রথার ও নগদ টাকার দের খাজনায় বিশেষ তারতম্যের উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন যে, সরকার কর্ত্তৃক জমির মালিকানা গ্রহণ করিবার পর অবস্থার জটিলতা আরও বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। "পূর্ব্বে সাজা চাষী ফসল দিয়া উপরস্থ মালিকের খাজনার দায় হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সরকার কর্ত্তৃক জমিদারী গ্রহণের পর ফসলচুক্তি খাজনার ক্ষেত্রে বড় অসুবিধা দেখা দিয়াছিল। সরকার ধান্য লইয়া খাজনা মিটাইতে পারিতেছিলেন না, খাজনা আদায়কারী তহশীলদারেরা ঐরূপ ক্ষেত্রে ধান্যের একটি দাম ধরিয়া নগদ টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন। উহার ফলে পাশাপাশি দাগের জমির মধ্যে দেয় খাজনার ব্যবধান আরও বড় হইয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওলাধান্য (ধানের পরিবর্ত্তে সমমূল্যের টাকা) দিয়া খাজনা প্রথা তুলিয়া দিয়া একরপ্রতি নয় টাকা (অন্তর্বর্ত্তীকালীন) খাজনা প্রবর্ত্তন করিয়া শুধু কৃষিজীবীদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন মাত্র নহে, প্রগতিশীল নীতির সম্যক পরিচয়ও দিয়াছেন।"

পাকিস্থানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

পাকিস্থানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর হইতে পাকিস্থানের রাজনৈতিক পটভূমিকায় যে অস্থিরতা দেখা দিয়াছে এখনও পর্য্যন্ত তাহা স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। এইরূপ অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণ প্রথমতঃ অর্থনৈতিক, দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক এবং তৃতীয়তঃ দলগত। এই সকল কারণপরম্পরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কোনটিকেই পৃথক করিয়া দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত প্রশাসনিক এবং ভৌগোলিক কারণও রহিয়াছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান—যাহার ফলে পাকিস্থানের দুইটি অংশ সহস্রাধিক মাইল দ্বারা বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে—পাকিস্থানের রাজনীতিতে একটি বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। স্বাধীনতালাভের প্রথম ধাক্কা কাটাইবার পূর্ব্বেই যাহার প্রকাশ পায় পূর্ব্ব বাংলার ভাষাভিত্তিক আন্দোলন এবং তাহা দমনকল্পে পাকিস্থান সরকারের কঠোরতার মধ্য দিয়া। পূর্ব্বপাকিস্থানের বাঙালীরাই পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক; কিন্তু অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং সরকারী প্রতিপত্তির দিক হইতে তাহারা পশ্চিম পাকিস্থানের অধিবাসীদের অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে। বাঙালীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টার মধ্যেই পাকিস্থানের রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রত্যক্ষ কারণ নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে লীগ দল শোচনীয় রূপে পরাজিত হইল, কিন্তু কেন্দ্রে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। উপরন্তু ষড়যন্ত্র করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক সরকারকে পদচ্যুত করা হইল। পরে যখন এই রাজনীতির বিফলতা প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল তখন গণপরিষদ ভাঙিয়া দিয়া নূতন পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচিত হইল, কিন্তু সেখানেও গণতন্ত্রবিরোধী পদ্ধতিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের সমতা বজায় রাখা হইল। পশ্চিম পাকিস্থানে লীগনীতির অসারতা প্রতিপন্ন হইতে তখনও বিলম্ব ছিল, সেই সুযোগে কেন্দ্রে লীগদলেরই আধিপত্য বজায় রহিল। কিন্তু ঘটনার বিবর্ত্তনে সেই ব্যবস্থাও বেশীদিন স্থায়ী হইল না। অবশেষে লীগদলকে গদী ত্যাগ করিতে হইল। বিরোধী আওয়ামী লীগের নেতা (অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) জনাব এইচ. এস. সুরাবর্দ্দী পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন।

পাকিস্থানের মুসলিম লীগ দলভুক্ত প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলী ২৩শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর) প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জ্জার নিকট তাঁহার মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লীগদলের সদস্যপদেও ইস্তফা দেন। চৌধুরী মহম্মদ আলী বলেন যে, লীগ সদস্যদের কুৎসারটনার জন্যই দুঃখের সহিত তাঁহাকে লীগের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছে। লীগ ত্যাগ করার পর তিনি আর প্রধানমন্ত্রী থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না বলিয়াই তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদেও ইস্তফা দিতে মনস্থ করেন। প্রেসিডেণ্ট মির্জ্জা তাঁহাকে নূতন করিয়া মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিলে তিনি তাহাও প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট বিরোধীদলের নেতা সুরাবর্দ্দীকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হন। ১২ই সেপ্টেম্বর সুরাবর্দ্দী প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করেন।

পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ দল সংখ্যালঘিষ্ঠ। জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইল ডাঃ খাঁ সাহেবের রিপাবলিকান পার্টি। ডাঃ খাঁ সাহেব প্রথমে আওয়ামী লীগের সহিত সম্মিলিতভাবে মন্ত্রীসভা গঠনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, রিপাবলিকান দল সর্ত্তহীনভাবে মিঃ সুরাবর্দ্দীকে সমর্থন করিবে। নবগঠিত সুরাবর্দ্দী মন্ত্রীসভায় ১২ জন সদস্য থাকিবেন। বর্ত্তমানে নয় জনের নাম প্রকাশ করা হইয়াছে—চার জন আওয়ামী লীগের সদস্য এবং পাঁচজন রিপাবলিকান দলের সদস্য। মন্ত্রীদের নাম: জনাব এইচ. এস. সুরাবর্দ্দী, আবদুল মনসুর আহম্মদ, আহম্মদ দিলদার এবং আহম্মদ আবদুল খালেক (সকলেই আওয়ামী লীগের সদস্য); এবং গোলাম আলী তালপুর, সর্দার আমীর আজম, আমজাদ আলী, মিঞা জাফর শা এবং ফিরোজ খাঁ নুন। অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম পরে ঘোষণা করা হইবে বলিয়া জানান হয়।

প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দ্দী ও প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জ্জা উভয়েই বাঙালী হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্থানের একদল রাজনৈতিক নেতার ঈর্ষা জন্মিয়াছে বলিয়া "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সংবাদদাতা লিখিতেছেন। সুরাবর্দ্দীর প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের সংবাদে পূর্ব্বপাকিস্থানে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রীসভায় পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রাক্তন গবর্ণর ফিরোজ খাঁ নুনকে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করায় পূর্ব্বপাকিস্থানে বিশেষ বিরূপ মনোভাব দেখা দিয়াছে।

জিন্নাহ খাঁ নূন বাঙালীদিগকে আরবী বর্ণমালার মাধ্যমে বাংলা শিক্ষাদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙালীরা তাঁহার মনোনয়নে সন্তুষ্ট হয় নাই।

পাকিস্থানের মন্ত্রীসভা বদলের সংবাদে মার্কিন মুলুকেও বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অন্যতম দাবি ছিল পাকিস্থানকে সকল যুদ্ধজোটের বাহিরে রাখা। সিয়াটো এবং বাগদাদ্ চুক্তি এই নীতির বিরোধী। সুরাবর্দী এখনও তাহার পররাষ্ট্রনীতি সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন নাই।

ইতিমধ্যে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের রাজনৈতিক পটভূমিকাতেও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আবুহোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রণ্ট সরকার পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির কোনটিরই সমাধান করিতে না পারায় উহা ক্রমশঃই জনসমর্থন হারাইতে থাকে। ইহার প্রতিফলস্বরূপ বিধানসভায় যুক্তফ্রণ্ট দলেও ভাঙন দেখা দেয়। যুক্তফ্রণ্ট সরকার নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য গণতন্ত্রবিরোধী কার্য্যক্রম গ্রহণ করে এবং বিরোধী (আওয়ামী লীগ) দলকে ক্ষমতার আসন হইতে দূরে রাখিবার জন্য গবর্ণর ফজলুল হককে চাপ দিয়া বিধান সভার নির্দ্দিষ্ট অধিবেশন স্থগিত রাখে। কিন্তু এত করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত আবুহোসেন মন্ত্রীসভা টি‍ঁকিতে পারিল না। পনর মাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ৩০শে আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রী আবুহোসেন সরকার গবর্ণরের নিকট তাঁহার মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং যথারীতি তাহা গৃহীত হয়।

৩১শে আগষ্ট রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জ্জা পূর্ব্ব-পাকিস্থানে শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া ১৯৩ ধারা প্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট-ত্রাণের উহাই একমাত্র উপায় ছিল। ঐ দিনই প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের গবর্ণর আবুল কাসেম ফজলুল হক পূর্ব্ব-পাকিস্থান বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা আতাউর রহমান খাঁকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। ইতিমধ্যে খাদ্যাভাবে জর্জ্জরিত গ্রামবাসী জনতা ভুখা মিছিল বাহির করিলে ২০শে ভাদ্র ঢাকায় পুলিস তাহাদের উপর গুলী চালনা করে, ফলে প্রায় ২৪ জন আহত হয়। প্রতিবাদে পরদিন ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক সর্ব্বাত্মক হরতাল হয়। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গবর্ণর ইস্কান্দার মির্জ্জাকে ঢাকায় আসিবার জন্য অনুরোধ জানান।

গবর্ণরের আহ্বানে আওয়ামী লীগের নেতা আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হন এবং ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি কার্য্যভার গ্রহণের শপথ নেন। প্রথমে পাঁচ জন লইয়া মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। আতাউর রহমান খাঁ, আবদুল মনসুর আমেদ, শেখ মুজিবর রহমান, (সকলেই আওয়ামী লীগের সদস্য), ফকিরউদ্দিন চৌধুরী (স্বতন্ত্র দল) এবং মাহমুদ আলী (গণতন্ত্রী দল)। পরে আওয়ামী লীগ হইতে আরও চার জন এবং সংখ্যালঘুদের মধ্য হইতে মন্ত্রীসভায় তিন জন সদস্য মনোনীত হন, যথা: শ্রীমনোরঞ্জন ধর ("কংগ্রেস), শ্রীশরৎ মজুমদার (কংগ্রেস) এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইউ. পি. পি.); জনাব যাসিউর রহমান, আবদুর রহমান খান, খয়রাত হোসেন এবং মহম্মদ মনসুর আলী (সকলেই আওয়ামী লীগের সদস্য)। এই সাত জন ১৮ই সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ করেন।

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আতাউর রহমান প্রথমেই পূর্ব্ব-পাকিস্থানে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির আদেশ দেন। ৫ই সেপ্টেম্বর গুলী চালনা সম্পর্কে একটি বিচারবিভাগীয় তদন্তেরও আদেশ দেওয়া হয়। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের খাদ্যসঙ্কট মোচনের জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া আতাউর রহমান খান বলেন, "খাদ্য পরিস্থিতিকেই অগ্রাধিকার ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইবে।"

সরকারের দুর্নীতিপোষণের অভিযোগ

২০শে ভাদ্র "বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকা লিখিতেছেন:

"বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালের নানা অভাব-অভিযোগ ও অব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এবং ঐ সঙ্গে হাসপাতালের দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতা চাহিয়াছি। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার কথা, বাস্তব ঘটনা হইতে আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, কি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, কি কংগ্রেস সরকার দুর্নীতি দমনে কাহারও সাহস ও আন্তরিকতা নাই। মাঝে মাঝে দুর্নীতি দমনের ভড়ং দেখাইলেও ঐ কার্য্যে অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার মত নৈতিক শক্তি কংগ্রেসের নাই। কংগ্রেস সরকারের লোক-দেখানো দুর্নীতিদমন অভিযান যে কতবড় নির্লজ্জ ধাপ্পা তাহা বর্দ্ধমান হাসপাতালের আর-এম-ও ঘটিত ব্যাপারে বর্দ্ধমানের জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

পত্রিকাটি এই সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ: বিজয়চাঁদ হাসপাতালের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ পাইয়া স্থানীয় সমাজকর্ম্মীদের সহায়তায় ১৪ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এনফোর্সমেণ্ট পুলিস হাসপাতালের রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার শ্রী চক্রবর্ত্তীকে উৎকোচ গ্রহণকালে নাকি হাতেনাতে ধরিয়া ফেলেন। পুলিস উক্ত চিকিৎসকের নিকট হইতে চিহ্নিত ষোল টাকার নোট হস্তগত করেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় নাই। ২১শে জুলাই বর্দ্ধমান জেলা মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভায় এই সম্পর্কে পূর্ণ তদন্তের দাবি জানান হয়, কিন্তু সরকারপক্ষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, যেহেতু রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার একজন গেজেটেড অফিসার, ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা উক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। এই অবস্থায় আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি অভিযুক্ত অফিসারটিকে নাকি মাসিক পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত সহ কলিকাতার একটি হাসপাতালে বদলির আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"বর্দ্ধমানের ডাক" এই প্রসঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, হাসপাতালের দুর্নীতি সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্ত রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার পত্রিকাটির উপর বিশেষ বিরূপ হন এবং তিনি "বর্দ্ধমানের ডাকে"র বিরুদ্ধে সরকারের নিকট নাকি একটি লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করেন। সম্প্রতি কোন কারণ না দেখাইয়া সরকার পক্ষ হইতে উক্ত পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপন দান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিগত তিন বৎসর যাবৎ সরকার ঐ পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছিলেন; হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়ার কারণ সম্পর্কে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্ত্তা শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুরের সহিত দেখা করিলে শ্রীমাথুর নাকি বলেন যে, এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। বর্দ্ধমানের জেলাশাসকও নাকি পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেন যে, "বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকার বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোন অভিযোগ নাই এবং তাঁহারা ঐ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার জন্ত কোন সুপারিশ করেন নাই। এই সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্তই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্যের প্রচার-অধিকর্ত্তার নিকট ইহার পর একটি পত্র দেওয়া হয়, কিন্তু কোন উত্তরই পাওয়া যায় নাই।

"বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকার এই অভিযোগের একটি সরকারী উত্তর বিশেষ প্রয়োজন।

ধুলিয়ানের দুরবস্থা

মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান শহর এককালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং সুপ্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চল ছিল। বৎসরের পর বৎসর পদ্মানদীর ভাঙনের ফলে পুরাতন ধুলিয়ান শহরের অধিকাংশই আজ নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ক্রমাগত ভাঙনে ধুলিয়ানের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া ১৮ই ভাদ্র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন, ধুলিয়ান আজ ধ্বংসের পথে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত্তিকার ক্ষয় প্রতিরোধ করিয়া এবং নদীপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ধ্বংসোন্মুখ অঞ্চলগুলিকেও বাঁচাইবার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ভারতেও বাঁধ প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা নদীনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও ধুলিয়ানের দুরবস্থার প্রতি সরকারী মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। গঙ্গায় একটি বাঁধ দিলেই ধুলিয়ান শহরের ভাঙন প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র তাহাই নহে, "সেই সঙ্গে জেলার অর্দ্ধেকেরও অধিক অঞ্চল উপকৃত হইত। গঙ্গাব্যারেজ হইলে ভাগীরথী নদী চিরপ্রবহমাণা নদীতে পরিণত হইত। ভাগীরথীর সহিত যে সব অঞ্চলের নিগূঢ় সম্পর্ক সে সব অঞ্চলও ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিত। বন্যার প্রকোপ কমিয়া যাইত। জলশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদন করাও সহজ হইত।"

কিন্তু গঙ্গাবাঁধের এত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতে একটি বাঁধ নির্ম্মাণ আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনাতে এই বাঁধের কথা সম্পূর্ণরূপেই বাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে অবশ্য ঐ বাঁধনির্ম্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে; তবে এখন পর্য্যন্ত ঐ সংক্রান্ত কোন কাজই আরম্ভ করা হয় নাই।

ধুলিয়ান শহরের আর একটি স্থায়ী সমস্যা হইল বন্যার প্রকোপ। সাঁওতাল পরগণা হইতে বাহির হইয়া একটি পাহাড়ী নদী ধুলিয়ানের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পাহাড় হইতে যখন নদীপথে নামিয়া আসে তখন তাহার প্লাবনে সবই ভাসাইয়া লইয়া যায়। 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' লিখিতেছেন:

"এই বৎসর হঠাৎ প্রবল বন্যা আসিয়া শস্য ও গবাদির ভীষণ ক্ষতি করিয়াছে। গত ২৪শে আগষ্ট বন্যার জল বৃদ্ধি হইয়া ধুলিয়ান অঞ্চলের চরম ক্ষতি করিয়াছে। বৎসর বৎসর কি এই ভাবে উক্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?..."

পত্রিকাটির অভিমতে একটি সুপরিকল্পিত নদীনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা দ্বারা এই বন্যার প্রকোপজনিত সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। ময়ূরাক্ষী খাল নির্ম্মাণের পর নদীনিয়ন্ত্রণের উপকারিতা বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে মুর্শিদাবাদ জেলারও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার সমস্যাবলী ও সমস্যাপূরণের ব্যবস্থা—এ সম্পর্কে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতি ২২শে ভাদ্রের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:

"পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জাপান পরিভ্রমণে যাইবার প্রাক্কালে বিগত ২১শে ভাদ্র রাইটার্স বিল্ডিংএ এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক সংখ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু আগমন এবং বেকার সংখ্যার বৃদ্ধিহেতু এই রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর যে প্রবল চাপ পড়িয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমবায়ের ভিত্তিতে সারা রাজ্যব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পগুলি গড়িয়া তুলিতে পারিলে ঐ সব সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হইতে পারে।

রাজ্যের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনাকালে ডাঃ রায় বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে মজুত চাউল ও গম দিয়া যে সাহায্য করিতেছেন তাহাতে তাঁহারা অন্ততঃ আগামী ফসল না উঠা পর্য্যন্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে সঙ্কট কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন, এরূপ আশা রাখেন।

জাপান পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, জাপানের শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদনই গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে হইয়া থাকে। তাই জাপানে ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পগুলির কি ভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দ্রব্য-সম্ভার উৎপন্ন করা হইতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্যই তিনি

জাপানে যাইতেছেন। ভারতে বিভিন্ন শিল্পকে ভারত সরকার এই বিচারের ভিত্তিতে অর্থ ঋণ দিয়া থাকেন যে, সংশ্লিষ্ট শিল্প যত পরিমাণ পাইতে চাহে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ সিকিউরিটি উহাকে দেখাইতে হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলির পক্ষে ঐ ধরনের সিকিউরিটি দেখান সম্ভব নহে। অথচ সরকারের দিক হইতে সমস্যা এই যে, উপযুক্ত সিকিউরিটি না থাকিলে প্রদত্ত ঋণের টাকা পরে ফেরত পাইতে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এই জন্য এই দেশে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নতি তত আশাপ্রদ হইতেছে না। কিন্তু তিনি শুনিয়াছেন যে, জাপান সরকার আইনগত বিধানাবলীর সাহায্যে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে যথোচিত অর্থসাহায্য দিবার একটা উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি জাপানে এইটাই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, এবং জানিতে চেষ্টা করিবেন যে, জাপান কিভাবে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির মূলধন জোগায় এবং রাষ্ট্রের সেই প্রাপ্য ঋণের টাকা কিভাবে শিল্পগুলি হইতে আদায় করিয়া লয়।

রাজ্যের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন, ইহা আনন্দের কথা যে, গত পাঁচসালার মধ্যে শেষ তিন বৎসরে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সনে এই রাজ্যে প্রচুর ফসল হয়। কেহ কেহ এই ফলনবৃদ্ধি জলবৃষ্টি ভাল হওয়ার জন্য হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তিনি বলিতে চাহেন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হওয়ার ফলে এই রাজ্যে খাদ্যশস্যের বর্দ্ধিত ফলন এত উল্লেখযোগ্য হইয়াছে যে, এমনকি ১৯৫৫-৫৬ সনে প্রবল বন্যা হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্য কোনক্রমে জনসাধারণকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রিলিফের কাজ চালাইয়া যাইতে হইয়াছে। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরে এই রাজ্যে খাদ্যোৎপাদনের অবস্থা ১৯৪৩ সনের মত নীচু পর্য্যায়ে কোন সময়ই নামিয়া যায় নাই। গত এপ্রিল মাস হইতে এই রাজ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু উহা শুধু এই রাজ্যেই নয়, অন্যান্য রাজ্যেও খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট চাউল ও গম দিয়া এই রাজ্যকে সাহায্য করিতেছেন।

উদ্বাস্তু-সমস্যা সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন যে, এই রাজ্যটি উদ্বাস্তু-সমস্যায় অতিশয় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিশ লক্ষের অধিক উদ্বাস্তু পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে এই রাজ্যে চলিয়া আসিয়াছে। ফলে, এই রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য নানারূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে যে জমি আছে তাহা উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন সমস্যার সমাধানের জন্য নিঃসন্দেহে অপ্রচুর। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব কৃষিজীবীদের শতকরা ৭০ জনেরই পরিবার পিছু দুই একরেরও কম জমি আছে। এই অবস্থায় উদ্বাস্তুদের জন্য রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক পশ্চিমবঙ্গে জমি সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান করিতে অল্পবিত্তর সমবায় পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের উন্নতি বিধান করিতে হইবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই রাজ্যে বেকার লোকের সংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে—আর ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বেশী—তাহাতে বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। সত্য বটে যে, তাঁহারা ছোট বড় শিল্প গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ সব শিল্প-পরিকল্পনার কর্ম্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইলেও সম্ভাবনার তুলনায় বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুততর হইয়াছে। তবু এই ক্ষেত্রেও সমবায় ভিত্তিতে অধিক সংখ্যায় কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে কিছু সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী চাউল, অত্যাবশ্যক অন্যান্য দ্রব্য—বিশেষ করিয়া মাছ ও সরিষার তেলের দাম বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এই সব দিকে জনসাধারণের আর্থিক চাপ যাহাতে কিছু হ্রাস পায় তজ্জন্য দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। রাজ্য সরকার সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রে কতকগুলি আর্থিক সুবিধা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ২৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের মাগগীভাতার হার দুই টাকা করিয়া বৃদ্ধি, ন্যায্য মূল্যের দোকানে চাউল কিনিতে মণকরা ২ টাকা করিয়া কম দাম দিবার সুযোগ ও পূজার সময়ে ছয় মাসের কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য এক মাসের বেতন অগ্রিম দিবার ব্যবস্থার কথা মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন এবং জানান যে, পূর্ব্বোক্ত দুইটি সুযোগ দানের জন্য রাজ্য সরকারের বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ এবং অগ্রিম বেতন বাবদ বার্ষিক প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা লাগিবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং স্পনসর্ড কলেজগুলির অধ্যাপকদের বেতনের সমহার প্রবর্ত্তনের কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

পূজার সময় অল্পমূল্যে বস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে ডাঃ রায় বলেন যে, কমমূল্যে বস্ত্র সরবরাহের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু বস্ত্র দিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ঐ বস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু ঐ বস্ত্র যাহাতে চোরাবাজারে না যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাজ্য সরকার ঐ পরিকল্পনাটি কিভাবে কার্য্যকরী করা যায় তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু চোরাবাজারে যাইবে না, অথচ প্রকৃত যাহাদের দরকার তাহারা কাপড় পাইবে এরূপ ব্যবস্থা করা অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন কাজ।

ডাঃ রায় প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলাফল পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঐ পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হইয়াছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের গর্ব্ববোধ করিবার সঙ্গত কারণ বর্ত্তমান। কংগ্রেস সরকার ১৯৪৭ সনে প্রথম যখন এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ইহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ১৯৫১-৫২ সনে যখন প্রথম পাঁচ-

সালা পরিকল্পনা চালু করিবার উদ্যোগ হয় তখন এরূপ হিসাব ধরা হইয়াছিল যে, পাঁচ বৎসরে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। অথচ প্রথম পাঁচসালা শেষে দেখা গেল, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন উন্নয়নকার্য্যের জন্ত মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৯৪৭ সন হইতে হিসাব ধরিলে এই রাজ্যে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাবদ মোট ৯০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিয়া ডাঃ রায় মনে করেন। পাঁচসালা সময়ে উন্নয়নকার্য্যে ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৩৬·৯ ভাগই সমাজসেবামূলক কার্য্যাদির জন্ত ব্যয়িত হয়। ঐ একই সময়ে প্রায় ১৩ কোটি টাকা রাস্তা উন্নয়নের জন্ত ব্যয় করা হইয়াছে। ডাঃ রায় বলেন যে, একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া সত্যই আনন্দ হয় যে, রাজ্যের জনসাধারণ বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছে।

বিধানমণ্ডলীর কর্ম্মক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারের সাফল্য সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন যে, গত পাঁচ বৎসরের শাসনকালে কংগ্রেস সরকার বহুবিধ জনহিতকর আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে জমিদারী দখল আইন এবং ভূমি সংস্কার আইন দুইটি সত্যই বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা। ঐ দুইটি আইন যদি যথোপযুক্তভাবে কার্য্যকরী করা যায় তাহা হইলে তাঁহারা এই রাজ্যের সমগ্র চেহারাটাই পাল্টাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীতে সর্ব্বশেষ যে পঞ্চায়েত বিল পাশ হইল তাহাও বিশেষ কল্যাণকর ব্যবস্থা।"

উদ্বাস্তু সমস্যা

পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদিগের পুনর্ব্বাসনের অন্তরায় যাহা আছে তাঁহার একটি বিবৃতি সম্প্রতি পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী শ্রীরেণুকা রায় দিয়াছেন। উহা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"২১শে আগষ্ট—বুধবার নয়াদিল্লী বঙ্গভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় বলেন যে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান বৎসরে কেন্দ্র হইতে আরও বেশী পরিমাণ টাকা রাজ্য গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীমতী রায় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা লইয়া কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে দিল্লীতে রহিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬-৫৭ সনের জন্ত যে টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার। অন্যথায় পুনর্ব্বাসনের কাজ বিলম্বিত হইবে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯৫৫-৫৬ সনের কার্য্যবিবরণীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন বাবদ মোট ব্যয়ের একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উদ্বাস্তুদের জন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ২৮৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২০১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্থানের বাস্তুহারাদের জন্ত। ইহাদের সংখ্যা হইতেছে—৪৭ লক্ষ। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত ৩৯ লক্ষ উদ্বাস্তুর জন্ত মোট ব্যয় হইয়াছে ৮৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ব্যয়ের পরিমাণ হইল ৬৮ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট নিম্নরূপ:

(১) পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের বাবদ: ১৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা।

(২) পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং

(৩) পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বাবদ: ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ৬৬ কোটি টাকা মোট বরাদ্দের মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের জন্ত রাখা হইয়াছে মাত্র ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অংশ হইতেছে ১৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। এই টাকার মধ্যে পুনর্ব্বসতির জন্ত নির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে মাত্র ৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পর্য্যায়ক্রমিক কার্য্যসূচী স্থির করিয়াছেন তজ্জন্ত সাড়ে দশ কোটি টাকার দরকার। পরিকল্পনা কমিশন স্থির করিয়াছিলেন যে, উদ্বাস্তুরা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়া আসিতেছে তাহাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ সংশোধনের প্রশ্নটি পরে বিবেচনা করা হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা বিবৃত করিয়া শ্রীমতী রেণুকা রায় বলেন যে, বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা হইতেছে ৩০ লক্ষ ৯ হাজার এবং উদ্বাস্তু শিবিরগুলির লোকসংখ্যা হইতেছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার। যে সকল উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের সুযোগ লাভ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ১৮ লক্ষ ৮ হাজার। ১৯৫৫-৫৬ সনের শেষ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বাসন ঋণ বাবদ মোট ৩৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এখনও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের চলিয়া আসার বিরাম নাই। কাজেই ইহাদের সকলের পুনর্ব্বাসন একটা গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্যার গুরুত্ব লোকে এখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছে বটে, কিন্তু বাংলার বাহিরের বেশীর ভাগ লোকেরই অবস্থার গুরুত্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের উপর ইহার চাপ সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের আর কোন উপায় নাই। আর পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে সমাধানের কোন উপায় যদি উদ্ভাবিত না হয়, তাহা হইলে আমরা হয়ত এমন অবস্থায় পৌঁছিব, যখন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের জন্ত দাঁড়াইবার মত স্থানই শুধু অবশিষ্ট থাকিবে।"

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু

কিছুদিন যাবৎ পুনর্ব্বার উদ্বাস্তুর দল পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে। উপরন্তু তাহাদিগকে রাজনৈতিক ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করার প্রথা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতি প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। সংবাদপত্রের এ বিষয়ে দায়িত্ব যাহা তাহা আমরা পালন করিতেছি না। বিশেষতঃ এক শ্রেণীর সাংবাদিক ভুল তথ্য ও সম্পূর্ণ বিপরীত জিগীরের সমর্থন করিয়া উদ্বাস্তু ও তাহার আশ্রয়দাতা এই দুইয়েরই সম্বন্ধ তিক্ত হইতে তিক্ততর করিয়া ফেলিতেছেন। সৌরাষ্ট্র হইতে প্রত্যাগত উদ্বাস্তুর প্রকৃত সংবাদ নীচে দেওয়া হইল। উহাদের বিষয় বাংলা সংবাদপত্রে কি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও আমরা জানি :

"নয়া দিল্লী, ১২ই সেপ্টেম্বর—অদ্য লোকসভায় শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তীর এক প্রশ্নের উত্তরে পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বলেন যে, গত ৬।৭ মাস যাবৎ প্রতি মাসে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে ৩০ হাজারের অধিক উদ্বাস্তু ভারতে আসিতেছে। পক্ষান্তরে ১৯৫৪ সনে প্রতি মাসে ১০ হাজার এবং ১৯৫৫ সনে প্রতি মাসে ২০ হাজার উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়াছে।

শ্রীখান্না আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারকে পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধ করিতেছেন যে, নবাগত উদ্বাস্তুদিগকে দ্রুত পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হউক। পশ্চিমবঙ্গে যে ৩০ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু রহিয়াছে তাহাদের পুনর্ব্বাসনই কঠিন দেখা যাইতেছে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করেন, সৌরাষ্ট্রের বাঁটোয়া ক্যাম্পে প্রেরিত ৭০ জন উদ্বাস্তু যুবতীকে গত আগষ্ট মাসে একদিন গভীর রাত্রিতে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিতে হইয়াছিল কিনা এবং স্থানীয় লোকগণ তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল কিনা? ক্যাম্পে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটিয়াছিল?

শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না উত্তরে বলেন, প্রকৃত ঘটনা এই যে, ১৭ই আগষ্ট অপরাহ্নে বাঁটোয়া ক্যাম্পের ২৪ জন নারী, ১০ জন পুরুষ ও ৭১ জন পোষ্য একুনে ১০৫ জন ক্যাম্প ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা করে।

তাহাদের ক্যাম্প ত্যাগের কারণ—(১) ক্যাম্প পশ্চিমবঙ্গ হইতে বহু দূরে অবস্থিত, (২) যে ক্যাশ ডোল দেওয়া হয় তাহা অপর্য্যাপ্ত, (৩) ক্যাম্পে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা অপর্য্যাপ্ত, (৪) তাহারা পশ্চিমবঙ্গ হইতে দূরে কোন স্থানে বাস করিতে অনিচ্ছুক।

ক্যাম্পের ঘটনা সম্বন্ধে কোন নিরপেক্ষ তদন্ত করান হইবে কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী বলেন যে, সরকার তদন্তের কোন কারণ দেখেন না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত জি. বি. পন্থ অদ্য লোকসভায় বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে ত্রিপুরায় এত অধিকসংখ্যক উদ্বাস্তু আসিয়াছে যে, তথায় আর নূতন উদ্বাস্তুর স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

তিনি আরও বলেন যে, উদ্বাস্তুগণ জাল এমিগ্রেশন কার্ড দেখাইয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতেছে। এইরূপ প্রবেশ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। আশা করা যায়, অতঃপর জাল এমিগ্রেশন কার্ড লইয়া কোন ব্যক্তি ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না।

পণ্ডিত পন্থ বলেন যে, গত কয়েক মাসে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুদের আগমন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে ২০,০২২ জন উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোন মাসে এত অধিকসংখ্যক উদ্বাস্তু ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে নাই। গত ৭৮ মাসে ৫০ হাজারের অধিক উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে।"

পাকিস্থানের ঋণ-প্রার্থনা

পাকিস্থানে খাদ্য সমস্যা ক্রমেই সঙ্গীন দাঁড়াইতেছে। তাহার আভাস নিম্নের সংবাদে পাওয়া যায় :

"ঢাকা, ১৩ই সেপ্টেম্বর—পাকিস্থান গতকল্য ভারতের নিকট ৩০ হাজার টন খাদ্যশস্য ঋণস্বরূপ চাহিয়াছে। এই পরিমাণ খাদ্যশস্যের অধিকাংশই চাউল।

পূর্ব্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আতাউর রহমান অদ্য প্রাতঃকালে করাচী হইতে এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সাংবাদিকগণকে ইহা জানাইয়া বলেন যে, পাকিস্থানের খাদ্যসচিব বর্ত্তমানে রোমে আছেন। ইটালী হইতে ৫০ হাজার টন চাউল ক্রয় করিবার জন্য তাঁহাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই পরিমাণ চাউল তথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মিঃ আতাউর রহমান বলেন যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানে দ্রুত খাদ্যশস্য প্রেরণার্থ ভারত তাহার বন্দরের বিবিধ সুযোগ পাকিস্থানকে দিতে চাহিয়াছিল। করাচীর কেন্দ্রীয় সরকার দুই মাস পূর্ব্বে পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে ইহা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব প্রাদেশিক সরকার ভারতের এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোন উৎসাহই দেখান নাই।

তিনি বলেন যে, সরকার আগামী বৎসরের জন্য পাঁচ লক্ষ টনের সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ভাণ্ডার গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ টন হিসাবে তিন বৎসরের জন্য পনর লক্ষ টনের সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ভাণ্ডার গঠনের পরিকল্পনাও করা হইতেছে। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে দুই হাজার টন চাউল আসিতেছে। কিন্তু জাহাজের অসুবিধাই প্রধান সমস্যা।"

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বাহিরের উস্কানির ফলে এদেশে সম্প্রতি যে সকল হাঙ্গামা ঘটিয়াছে তাহার একটির সংবাদ নীচে দেওয়া হইল :

"জব্বলপুর, ১৩ই সেপ্টেম্বর—আজ শহরে এক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় দুই জন লোক আহত হইবার পর শহরে ১৪৪ ধারা জারী

করিয়া জনসমাবেশ ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। গোহালপুর মহল্লায় এই হাঙ্গামা হয়। আজ সন্ধ্যা ৬টা হইতে আগামী কল্য সকাল ৬টা পর্য্যন্ত কার্ফু জারী করা হইয়াছে।

গত রাত্রে মতিনালা মহল্লায় গণপতি উৎসব উপলক্ষে স্থাপিত গণপতি মূর্ত্তিটি ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়; ইহার প্রতিবাদে আজ হিন্দুদের দোকানপাট বন্ধ থাকে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিস মতিনালা মহল্লার একজনকে গ্রেপ্তার করে। ইতস্ততঃ মারপিটের ফলে ২০ জনের অধিক লোক আহত হইয়াছে। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় একশত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

হনুমন্তিয়া মহল্লায় ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্যের অভিযোগে পুলিস ৫০ জনের অধিক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইটপাটকেল নিক্ষেপ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, ঘর-বাড়ীর ক্ষতি সাধনের কয়েকটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিড়ি শ্রমিকগণ যে অঞ্চলে বাস করে ঐ অঞ্চলের রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে তামাক ও তৈয়ারী বিড়ি ছড়ান দেখা যায়।

১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া অনুমান পাঁচ শত ছাত্র কৃষ্ণ-পতাকাসহ শহরের প্রধান বাজার পরিভ্রমণ করে; কিন্তু কিছুকাল পরই ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া যায়। সকালবেলার দিকে দুই-একটি দোকান লুঠের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু পুলিস আসিয়া পড়ায় উহা ব্যর্থ হয়।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও ইতস্ততঃ মারপিটের ফলে শহরে ২০ জনের অধিক ব্যক্তি আহত হয়। শহরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা সম্পর্কে অদ্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় এক শত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।"

"জব্বলপুর, ১৩ই সেপ্টেম্বর—গণপতি উৎসব উপলক্ষে প্রধানতঃ মুসলিম এলাকা মতিনালা ওয়ার্ডে স্থাপিত গণেশ মূর্ত্তিটি গতকল্য ভগ্ন হওয়ার প্রতিবাদে অদ্য এক মিছিল বাহির করা হয়। প্রকাশ, কতিপয় মুসলমান রাষ্ট্রবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। মিছিলকারীরা এই সমস্ত মুসলমানের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্তের দাবি জানাইয়া ধ্বনি করিতে করিতে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

শহরে অননুমোদিতভাবে অবস্থানের জন্য পুলিস একজন পাকিস্থানী মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই পাকিস্থানী মুসলমানটি মুসলিম লীগের আইন-সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য মৌলানা বুরহান-উল হকের পুত্র।"

শিক্ষকের বেতন

এতদিন পরে আমাদের সরকারী মহলে শিক্ষা সম্পর্কে কিছু চৈতন্যের উদয় হইয়াছে দেখিয়া আমরা কিছু আশান্বিত হইয়াছি। শিক্ষকের ভদ্রস্থ রক্ষা করা যে কত বড় অত্যাবশ্যক সরকারী দায়িত্ব তাহা সভ্য-জগতে সকলেই জানে। আমাদের শুধু অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত কংগ্রেসী দলের চাঁইদের সে জ্ঞান ছিল না। সংবাদটি আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নরূপে দিয়াছেন:

"রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী অক্টোবর মাস হইতে এই নূতন গ্রেড চালু করা হইবে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে আগামী পাঁচ বৎসরে এই খাতে মোট ৩ কোটি ৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ বহনে সম্মত আছেন।

এই নূতন গ্রেড প্রবর্ত্তনের পর যে সকল বেসিক ট্রেনিং প্রাপ্ত ম্যাটিকুলেট শিক্ষক মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা ২৫৲ টাকা পাইতেন, তাঁহাদের মাসিক বেতন ৫৫৲ টাকা হইবে এবং মাগগী ভাতা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। ক শ্রেণীর ট্রেইণ্ড ম্যাটিকুলেট প্রাথমিক শিক্ষক পাইবেন বেতন ৫৫৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা ১২॥০ (বর্ত্তমান বেতন ৫০৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা ১২॥০), খ শ্রেণীর ম্যাটিকুলেট অথবা ট্রেইণ্ড শিক্ষক পাইবেন মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা ১২॥০ (বর্ত্তমান বেতন মাসিক ৪৫৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা ১২॥০); গ শ্রেণীর নন্-ম্যাটিক অথবা 'আনট্রেইণ্ড' শিক্ষক পাইবেন মাসিক বেতন ৪০৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা ১২॥০ (বর্ত্তমান বেতন মাসিক ২০৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা১২॥০)। এই শ্রেণীর শিক্ষকেরা বর্ত্তমানে সমাজসেবামূলক কাজের ভাতা হিসাবে মাসিক ৭॥০ টাকা পান; অক্টোবর মাস হইতে তাঁহারা এই ভাতা আর পাইবেন না।

সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের বিদ্যালয়সমূহ ও রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মোট ১৪,৩৫৮ জন প্রাথমিক শিক্ষক আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী স্পনসর্ড কলেজসমূহে অধ্যাপকগণের পদানুযায়ী বেতনের হার প্রত্যেকটি সমান রাখা হইবে বলিয়া রাজ্য সরকার স্থির করিয়াছেন, এরূপ জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৩৩টি স্পনসর্ড কলেজের মধ্যে ১৩টি বিভিন্ন জেলা সদরে ১০টি সহরতলী অঞ্চলে থাকিবে। ইহা ছাড়া মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ৪টি এবং সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের অধীন ৬টি কলেজ থাকিবে।

এই সকল স্পনসর্ড কলেজের প্রত্যেকটিতে অধ্যাপকমণ্ডলীর বেতনের হার নিম্নরূপ:

প্রিন্সিপাল—৫০০৲-৭০০৲; ভাইস-প্রিন্সিপাল—২৫০৲-৪৫০৲ এবং অতিরিক্ত মাসিক ভাতা ৫০৲; সিনিয়র লেকচারার—২৫০৲-৪৫০৲; লেকচারার—১৫০৲-৩৫০৲; ডেমনেষ্ট্রেটার—১০০৲-১৫০৲। প্রকাশ, উক্ত কলেজগুলির ঘাটতি টাকা রাজ্যসরকার বহন করিবেন।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় আগামী ২৫শে আশ্বিন ১৩৬৩ (১১ই অক্টোবর ১৯৫৬) হইতে ৭ই কার্ত্তিক ১৩৬৩ (২৪শে অক্টোবর ১৯৫৬) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপিস খুলিবার পর হইবে। এই সূত্রে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, প্রবাসী-অপ্রাপ্তি—এতদ্‌বিষয়ক চিঠিপত্র "ম্যানেজার প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য। কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী।

মৃত্যুঞ্জয়

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ওঁ প্রাণায় নমো যস্য সর্বমিদং বশে।
যো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরো যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণং সর্ব উপাসতে।
প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমাঃ প্রাণমাহুঃ প্রজাপতিম্ ॥
প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা প্রাণং দেবা উপাসতে।
প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
অন্তর্গর্ভশ্চরতি দেবতাস্বাভূতো ভূতঃ স উ জায়তে পুনঃ
যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
ওষধয়ঃ প্রজায়ন্তেথো যাঃ কাশ্চ বীরুধঃ ॥
যদঙ্গ স তমুৎখিদেন্ নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্ন রাত্রী
নাহঃ স্যান্ন ব্যুচ্ছেৎ কদাচন ॥

অথর্ববেদ, ১১।৪।১—২১।

"সমস্ত জগতে এক বিরাট প্রাণের লীলা চলিয়াছে। বিশ্বের সর্বত্র এই প্রাণের প্রভাব। সমস্ত সৃষ্টিই এই প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণ সর্বনিয়ন্তা, সকলকে চালনা করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য এই বিরাট প্রাণেরই অভিব্যক্তি। এই প্রাণ সমস্ত প্রজার—সমস্ত প্রাণীর রক্ষক। অতীত, অনাগত, বর্তমান, সকল কালের সকল সৃষ্টি এই প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যাহাকে আমরা জীবন বলিয়া আঁকড়িয়া থাকি, যাহাকে আমরা মৃত্যু মনে করিয়া ভয় পাই, সেই তথাকথিত জীবনমৃত্যু এই বিরাট প্রাণের অঙ্গ, অংশস্বরূপ।

"এই অখণ্ড, অনন্ত প্রাণই জীবনরূপে, মৃত্যুরূপে, শোক-রূপে, রোগরূপে, বিরহদহন দুঃখরূপে, আমাদের ন্যায় সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্রদৃষ্টি প্রাণীর নিকট খণ্ডরূপে, বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত হয়।

'যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ'
'প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা'
'জীবনমৃত্যু নাচিছে তাহার পায়ের তলে'
'অন্তর্গর্ভশ্চরতি দেবতাস্বাভূতো ভূতঃ স উ জায়তে পুনঃ'
'শূন্যে শূন্যে চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা যত।
অনন্ত প্রাণের মাঝে কাঁপিছে নিয়ত।'

'সেই একই প্রাণ, চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ময় পদার্থের অন্তরে দিব্যলোকে বিরাজ করিতেছে। আবার বরষায় বারিধারারূপে এই পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। বৃক্ষরূপে, লতারূপে, তৃণরূপে, পুষ্পরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে।

"এই বিরাট প্রাণ, যদি এক মুহূর্তের জন্য, এক নিমেষের জন্যও সরিয়া যাইত, তবে তৎক্ষণাৎ চন্দ্রসূর্য নিভিয়া যাইত, দিবারাত্রি বন্ধ হইয়া যাইত, বিশ্বসৃষ্টি লুপ্ত হইত।

"সৃষ্টির সর্বত্র এই প্রাণের উপাসনা চলিয়াছে। আমরা এই মহাপ্রাণকে প্রণাম করি।"

যে বিরাট প্রাণের অনুভূতি প্রাচীনযুগের বৈদিক ঋষি এই বৈদিক সূক্তের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিরাট প্রাণের অনুভূতিই আধুনিক যুগের ঋষি-কবি তাঁহার এই "প্রাণ" শীর্ষক কবিতার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন :

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকশে পল্লবে পুষ্পে ; বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্।
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন ॥" নৈবেদ্য।

আমাদের কবি এই অনন্ত প্রাণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন—এই প্রাণ মাতৃরূপে বিরাজ করিতেছেন। জীবনমৃত্যু তাঁহার দুই স্তন। প্রাণিগণ সেই মাতৃরূপা অনন্ত প্রাণের ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্যপান করিতেছে। যখন তিনি স্তন হইতে স্তনান্তরে তাহাদের সরাইয়া লইতেছেন, তখন তাহারা শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিতেছে :

"স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

'মৃত্যু', নৈবেদ্য।

সৃষ্টির এই অনন্ত প্রাণের ভাণ্ডার তাঁহার দৃষ্টিগোচর

হইয়াছিল। তিনি জানিতেন, এই ক্ষুদ্র মানবজীবন নিঃশেষ হইলেই প্রাণ নিঃশেষ হয় না। সুতরাং এই সীমাবদ্ধ মানবজীবনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা নিতান্তই হাস্যকর।

"...মৃত্যুভয়
কী লাগিয়া হে অমৃত। দু'দিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান—
এত প্রাণদৈন্য প্রভু, ভাণ্ডারেতে তব?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব?" নৈবেদ্য।

কিসের ভয়? কিসের ভাবনা? এই বিশ্বে প্রাণের হাট বসিয়াছে। সেই প্রাণের হাটে বারে বারে আমাদের তরী ভিড়িবে:

"আমাকে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে
বারে বারে এই জীবনের প্রাণের হাটে।" গীতবিতান।

নানা রূপে, নানা ভাবে এই বিশ্বজগতে আমরা আনা-গোনা করিব। আমাদের এই আসা-যাওয়া চিরদিনের:

"নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।"
'চির-আমি', গীতবিতান।

এই 'অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসিতে' পারিয়াছিলেন তিনি। তাই জীবনমরণ তাঁহার নিকট দোলারোহণের ন্যায় আনন্দদায়ক মনে হইত। তিনি বলিয়াছেন, যেন কোন্ এক গানের তালে তালে কেহ আমাদের কোলে লইয়া নিজে দুলিতেছেন এবং দোলা দিতেছেন। এই দোলায় দুলিতে দুলিতে যখন আমরা সম্মুখের দিকে আসিতেছি, তখন আনন্দে হাসিয়া উঠিতেছি। আবার দোলা যখন পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতেছে, তখন ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতেছি:

"চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল!
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল!
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ।
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সমুখে যেমন পিছেও তেমন,
মিছে মোরা করি গোল।
চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।"
'মরণদোলা', উৎসর্গ।

ভারতবর্ষ জীবনমৃত্যুকে এই রূপেই দর্শন করিয়াছে। বৈদিক ঋষি গাহিয়াছেন:

নমস্ত অস্বায়তে নমো অস্তু পরায়তে।
নমস্তে প্রাণ তিষ্ঠত আসীনায়োত তে নমঃ॥
অথর্ব, ১১।৪।৭।

"হে অনন্ত প্রাণ! কখনো তুমি সম্মুখে আসিতেছ। কখনো তুমি পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতেছ। কখনো তুমি দণ্ডায়মান। কখনো তুমি উপবিষ্ট। যখন তুমি সম্মুখে, তখনও তোমায় নমস্কার। যখন তুমি পশ্চাতে, তখনও তোমায় নমস্কার। যখন তুমি দণ্ডায়মান, তখনও তোমায় নমস্কার। যখন তুমি উপবিষ্ট। তখনও তোমায় নমস্কার।"

যাহা আমাদের নিকট বিভীষিকাময় মৃত্যু তাহা কবি ও সাধকের নিকট নব নব দেশে, নব নব রমণীয় রাজ্যে প্রবেশ করিবার লোভনীয় পথ:

"নব নব প্রবাসেতে, নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে; * *
নব নব মৃত্যু-পথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।"
'জন্ম ও মরণ', উৎসর্গ।

"মরণেরি পথ দিয়ে ওই আসছে জীবন মাঝে"

ভয় কি? আসুক মৃত্যু। সেই অজানা, অচেনাকে প্রিয়তমরূপে বরণ করিয়া লইব।

"মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য-অনুগতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।
বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।

সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই বা আপন, কেই বা অপর
বিজনরাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।" গীতাঞ্জলি।

পরিণতবয়সে দেহত্যাগের এক বৎসর পূর্বেও কবি এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এখানে তিনি মরণকে বধূ এবং জীবনকে বর বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন:

"ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ—
দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।"
'ধূসর গোধূলিলগ্নে', জন্মদিনে।

মরণকে তিনি মধুররূপে দর্শন করিয়াছেন; অথচ এই পৃথিবীকে, এই মানবজীবনকে তিনি প্রাণভরে ভালবাসিতেন। এই পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত তাঁহার নিকট মধুময় ছিল:

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, 'তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।'"
'মধুময় পৃথিবীর ধূলি', আরোগ্য।

পৃথিবীকে এত ভালবাসিলেও তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন:

"কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল-মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে!" 'জন্মমরণ', উৎসর্গ।

মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে তিনি বলিয়াছেন:

"—আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়;
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে।
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সংগমে।"
'পথের শেষে' জন্মদিনে।

সর্বদেশের সর্বমানবের চেতনাকে যাহা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, মহাকবির সেই চেতনার নির্ঝরিণী 'পরিপূর্ণ চৈতন্যের 'সাগর-সংগমে' মিলাইয়া গিয়াছে।

সেই 'দৃষ্টি হইতে শান্তিঝরা' 'নয়নভুলানো' 'প্রসন্ন প্রশান্ত' প্রাণবান্ পার্থিব রূপ আর আমরা দেখিতে পাইতেছি না!

ইহা কম দুঃখ নহে। কিন্তু তিনি আমাদের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তেমন অপূর্ব সম্পদ, উত্তরাধিকারীর জন্য, কবে, কোথায়, কোন্ পিতা, কোন্ গুরু, কোন্ কবি রাখিতে পারিয়াছেন?

যে সম্পদ হাতে লইয়া আজ প্রত্যেক ভারতবাসী, প্রত্যেক মানব, দৃপ্তকণ্ঠে বলিতে পারে:

"যেনাহমমৃতঃ স্যাম্—"

"যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারি"—এমন মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন।

ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।*

---

* ২২শে শ্রাবণ প্রভাতে, শান্তিনিকেতন-মন্দিরে অস্থায়ী আচার্যের ভাষণ।

ভাস্করের "ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

দশ বেদান্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম "ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ" প্রবর্তক ভাস্কর তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের জন্যই জগতে অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর সুবিখ্যাত "ঔপাধিবাদ" সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হচ্ছে।

রামানুজ, নিম্বার্কপ্রমুখ ত্রিতত্ত্ববাদী ও ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিকদের ন্যায় ভাস্করের মতেও, চিৎ বা জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অনুপরিমাণ ও বহুসংখ্যক।

কিন্তু এই সকল বৈদান্তিকদের সঙ্গে ভাস্করের মূলীভূত প্রভেদ হ'ল এই যে, তাঁর মতে জীবের উক্ত কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব ও বহুত্ব আদিম বা অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান ও অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী নয়, অর্থাৎ নিত্যও নয়, স্বাভাবিকও নয়, কিন্তু কেবলমাত্র "ঔপাধিক", আগন্তুক ও অনিত্য, অথবা যতদিন পর্যন্ত উপাধি থাকে তত দিন পর্যন্তই কেবল স্থায়ী।

এই প্রসঙ্গে ভাস্করের নিজস্ব, মৌলিক উপাধিবাদের বিষয় আলোচ্য। ভাস্করীয় উপাধিবাদানুসারে সংসারাবস্থায় বা ব্রহ্মের কার্যাবস্থায় জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন; কিন্তু প্রথমে বা ব্রহ্মের কারণাবস্থায়, জীব ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল; এবং পরে বা প্রলয়কালে ও মোক্ষকালে জীব পুনরায় ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন হবে।

এরূপে সংসারাবস্থায় বা ব্রহ্মের কার্যাবস্থায়, জীব অংশ, কার্য ও আশ্রিত রূপে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন, যেহেতু অংশ অংশী থেকে, কার্য কারণ থেকে, আধেয় বা আশ্রিত আধার বা আশ্রয় থেকে ভিন্নাভিন্ন। ভাস্কর বলছেন:

"তথা কার্যকারণয়োর্ভেদাভেদাবনুভূয়তে।"

(ব্রহ্মসূত্র—ভাষ্য ২-১-১৮)

এস্থলে ভাস্কর প্রধানতঃ কার্যকারণ সম্বন্ধের সাহায্যেই ঈশ্বর ও জীবজগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন। কার্য-কারণ সম্বন্ধ 'তাদাত্ম্য' বা 'অনন্যত্ব' সম্বন্ধ। 'অনন্যত্ব' কিন্তু 'অভিন্নত্ব' নয়, 'ভিন্নাভিন্নত্ব'। প্রথমতঃ কারণই কার্যরূপে পরিণত হয়, সেজন্য কার্য কারণের অবস্থাবিশেষ মাত্র এবং কারণাত্মক বা কারণস্বরূপ। কারণ ব্যতীত কার্যের স্থিতিই অসম্ভব, ত্রিকালেই কার্য কারণাধীন। অশ্ব ও মহিষ যেমন পরস্পর ভিন্ন, কার্য ও কারণ তেমনি দেশতঃ ও কালতঃ ভিন্ন কোনও দিনও নয়। এইদিক থেকে কারণ ও কার্য অভিন্নস্বরূপ।

কিন্তু পুনরায় কারণ ও কার্য ভিন্নস্বরূপও সমভাবে। এই ভিন্নতার কারণ নিয়ে বলা হচ্ছে। যেমন, সমুদ্র ও তরঙ্গ, অগ্নি ও শিখা, বায়ু ও প্রাণাদি বৃত্তির সম্বন্ধ। তরঙ্গ সমুদ্রাত্মক, সমুদ্রস্বরূপ বলে সমুদ্র থেকে অভিন্ন; পুনরায় তরঙ্গরূপে সমুদ্র থেকে ভিন্ন। শিখা অগ্নি থেকে অগ্নিস্বরূপ বলে অভিন্ন, শিখারূপে ভিন্ন। প্রাণাদি বায়ু থেকে বায়ুস্বরূপ বলে অভিন্ন, প্রাণাদি রূপে ভিন্ন। এরূপে কারণ ও কার্য সম্পূর্ণ অভিন্নও নয়, সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়, কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। কার্য-কারণ সম্বন্ধকে শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধও বলা যেতে পারে, যেহেতু কার্য কারণের শক্তিবিক্ষেপ বা শক্তির প্রকাশই মাত্র। যথা—সমুদ্রের শক্তির প্রকাশ তরঙ্গ, কিন্তু পাষাণে সে শক্তি নেই বলে, পাষাণে কোনদিন তরঙ্গ দৃষ্ট হয় না। এরূপে শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ "অনন্যত্ব" বা ভিন্নাভিন্নত্ব সম্বন্ধ।

সুতরাং সংসারকালে ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ কেবলাভেদও নয়, কেবল ভেদও নয়, কিন্তু ভেদাভেদ। একদিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন; অন্যদিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। এই অভিন্নতা ও ভিন্নতার হেতু কি? প্রথমতঃ অভিন্নতার হেতু পূর্বেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ কার্যরূপী জগৎপ্রপঞ্চ কারণরূপী ব্রহ্মের স্বরূপের পরিণাম, অবস্থান্তর বা অভিব্যক্তিই মাত্র। সেজন্য জীবজগৎ ব্রহ্মস্বরূপ বা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভিন্নতার হেতু হ'ল "উপাধি"। এই "উপাধি"ই ব্রহ্মস্বরূপ বা ব্রহ্ম থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন জীবজগৎকে সংসারাবস্থায় ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বা পৃথক্ করে রাখে। আশ্চর্যের বিষয় যে, এ স্থলে ভাস্কর পরিণামবাদসম্মত ও বিবর্তবাদসম্মত উভয় প্রকারের উদাহরণই দিয়েছেন। তাঁর মতে, জীব ব্রহ্মের অংশ—অনাদি, অবিদ্যা ও কর্মাত্মক উপাধিজনিত অংশ—যেমন স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ, কর্ণমধ্যস্থিত আকাশ মহাকাশের অংশ (উপাধি—কর্ম); বা দেহমধ্যস্থিত প্রাণ বায়ুর অংশ (উপাধি—দেহ)। প্রথমটি পরিণামবাদীদের, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বিবর্তবাদীদের প্রিয় উদাহরণ। ভাস্কর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম উদাহরণটির কথাই বলেছেন; অথচ সাধারণ পরিণামবাদীদের ন্যায় স্ফুলিঙ্গকে অগ্নির পরিণাম সাক্ষাৎ ভাবে না বলে, তিনি তাকে অগ্নির উপাধিজনিত অংশই মাত্র বলছেন। যেমন তিনি ১-৪-২১ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বলেছেন

যে, অনাদি, অবিদ্যা ও কর্মরূপ উপাধির দ্বারা বিচ্ছিন্ন জীব ব্রহ্মের অংশ ; যেমন, স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ, কর্ণপটাহ মধ্যস্থিত আকাশ আকাশের অংশ, শরীর মধ্যস্থিত প্রাণ বায়ুর অংশ। সেজন্য সংসারী জীব ঈশ্বর থেকে ভিন্নাভিন্ন: স্বরূপতঃ অভিন্ন, উপাধিবশতঃ ভিন্ন।

২-৩-৪৩ সূত্রভাষ্যে, ভাস্কর বদ্ধ জীবকে কি অর্থে ব্রহ্মের "অংশ" বলা যায়, সে বিষয় পরিষ্কার ভাবে বলেছেন। "অংশ" শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন "অংশের" অর্থ হতে পারে "কারণ" বা দ্রব্যবিভাগ। প্রথম অর্থে তন্তুকে বস্ত্রের অংশ বলা হয়, যদিও তন্তু বস্ত্রের কারণস্থানীয়। দ্বিতীয় অর্থে বলা যেতে পারে "আমরা পরিষদদ্রব্যের অংশী", বা সেই সকল দ্রব্য বিভাগ করে আমরা গ্রহণ করছি। কিন্তু জীবকে যখন ব্রহ্মের অংশ বলা হয়, তখন এই দুটি অর্থে বলা হয় না, অন্য অর্থে বলা হয়।

"উপাধ্যবচ্ছিন্নস্যানন্যভূতস্য বাচকোঽয়মংশ শব্দ প্রযুক্তঃ যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গস্য।" (২-৩-৪৩, পৃ. ১৪০)

এ স্থলে "অংশ" শব্দটির অর্থ : উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন, অনন্য অংশ, যেমন স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ। অর্থাৎ সমগ্র দ্রব্যটি থেকে একটি অংশ উপাধি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন হয়ে যায়, অথচ দ্রব্যটি থেকে সেই অংশটি "অনন্য" বা স্বরূপতঃ অভিন্ন। সমগ্র দ্রব্য থেকে এরূপে স্বরূপতঃ অভিন্ন, অথচ উপাধি দ্বারা ভিন্ন অংশটিই প্রকৃত "অংশ"। এই অর্থেই জীব ব্রহ্মের অংশ।

এস্থলে ভাস্কর পূর্বের ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশ-কর্ণছিদ্র, বায়ু-প্রাণ এবং একটি নূতন মন-বৃত্তির উদাহরণ দিয়েছেন। কামপ্রমুখ মনোবৃত্তি যেমন মন থেকে উপাধিবশতঃ ভিন্ন, যদিও স্বরূপতঃ অভিন্ন, জীবও ব্রহ্ম থেকে ঠিক তাই।

"স চাভিন্নাভিন্ন-স্বরূপোঽ ভিন্নরূপং স্বাভাবিকমৌপাধিকং তু ভিন্নরূপম্।" (২-৩-৪৩)

অর্থাৎ জীব ঈশ্বর থেকে ভিন্নাভিন্ন—সংসারকালে ভিন্ন, মুক্তি ও প্রলয়কালে অভিন্ন। ঈশ্বর থেকে জীবের ভিন্নতা ঔপাধিক, অভিন্নতা স্বাভাবিক।

ভাস্কর তাঁর উপাধিবাদ প্রপঞ্চনা কালে বারংবার "অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের" উদাহরণ দিয়েছেন বলে, বোঝা যায় যে, তাঁর মতে "উপাধি" মিথ্যা বা অসত্য নয়,—কারণ, স্ফুলিঙ্গ ত অগ্নির সত্য বাস্তব অংশই, মিথ্যা বা অবাস্তব নয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ভাস্করের মতে অনাদি, অবিদ্যা ও তজ্জনিত সকল কর্মই 'উপাধি' (১-৪-২১)। অন্য একস্থলে ভাস্কর বলছেন যে, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ, এবং তাদের গুণ কাম-লোভাদিই 'উপাধি'। (২-৩-২৯-৩০)। অতএব ভাস্করের মতে অনাদি অবিদ্যাবশতঃ জীব নিজেকে ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন বলে মনে করে এবং সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ফলে, সে জন্মজন্মান্তরভাগী হয়ে জড় দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এরূপে এই অচিৎ বা জড় বস্তুই উপাধিরূপে জীবকে সংসারকালে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন করে তোলে।

অতএব ভাস্কর "উপাধি"র সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, যা "ঔপাধিক" তা "অপারমার্থিক" বা মিথ্যা নয়। "ন চৌপাধিক-কর্তৃত্বম্ অপারমার্থিকম্।" (২-৩-৪০)। "স্বাভাবিক" ও "ঔপাধিকে"র মধ্যে প্রভেদ এই নয় যে, প্রথমটি সত্য, দ্বিতীয়টি অসত্য—প্রভেদ কেবল-মাত্র এই যে, প্রথমটি নিত্য বা চিরকালস্থায়ী, দ্বিতীয়টি অনিত্য বা অল্পকালস্থায়ী। ভাস্করের মতে যা অনিত্য, অর্থাৎ আগন্তুক, কালক্রমে আগত, প্রথম থেকে, অনন্তকাল থেকে বর্তমান নয়—তা অসত্য নয়। যেমন, একটি বস্তুতে বা পাত্রে প্রথমে তাপের অস্তিত্ব না থাকতে পারে, যদিও পরে অগ্নির সংস্পর্শে এলে সেই একই বস্তুতে বা পাত্রে তাপের আবির্ভাব হয়। এস্থলে সেই বস্তুর "তাপ" নামক গুণটি অনিত্য নিশ্চয়, কারণ তা নিত্যকাল বস্তুটিতে বিদ্যমান নয়, কালক্রমেই তাতে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু এই ভাবে "অনিত্য" হলেও তাপ নিশ্চয়ই "অসত্য" নয়। সেজন্য ভাস্করের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত উপাধিটি বর্তমান, ততক্ষণ ঔপাধিক গুণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সত্য—উপাধির বিলয়ে স্বভাবতঃই তারও বিলয় হয়। যেমন, যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি বা পাত্রটি অগ্নির সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হয়ে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটির বা পাত্রটির তাপও বিদ্যমান এবং সেই তাপ সম্পূর্ণ সত্য। অগ্নির অভাবেই তাপেরও অভাব হয়। এই ভাবে তাপ পূর্বেও ছিল না, পরেও থাকবে না এবং সেজন্য তা অনিত্য, কিন্তু কোনক্রমেই অসত্য নয়। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী যে বর্তমান, তা অনিত্য হলেও তাকে অসত্য বলবে কে? কারণ যেটুকু তার সসীম অস্তিত্ব, সেটুকুই ত সত্য।

এরূপে শঙ্করের "উপাধি" ও ভাস্করের "উপাধি"র মধ্যে প্রভেদ অনেক। শঙ্করের মতে, যা ঔপাধিক তা অপারমার্থিক, কারণ যা পারমার্থিক তা কোনদিনই বাধিত হয় না, অস্তিত্ব-বিহীন হয় না। এরূপে শঙ্করের মতে "সত্য" এবং "নিত্য" সমার্থক। যা সত্য, তা নিত্যকাল সত্য, চিরস্থায়ী, অবাধিত-স্বরূপ। কিন্তু ভাস্করের মতে, "সত্য" ও "নিত্য" সমার্থক নয়—যা সত্য, তা নিত্যও হতে পারে অনিত্যও হতে পারে। অল্পস্থায়ী বস্তুও এই অর্থে সত্য বস্তু।

এরূপে ভাস্করের মতে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভেদ স্বাভাবিক, অর্থাৎ সত্য ও নিত্য, অতীত, বর্তমান,

ভবিষ্যৎপ্রমুখ সর্বকালে, সৃষ্টি, প্রলয়, মুক্তিপ্রমুখ সর্বাবস্থায় বিদ্যমান। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ—ঔপাধিক, অর্থাৎ সত্য ও অনিত্য, কেবল সৃষ্টি বা সংসার অবস্থাতেই বিদ্যমান।

উপাধির বিলয়ে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন উপাধি ঘট ভগ্ন হলে, ঘটাকাশ মহাকাশের সঙ্গে এক হয়ে যায়, যেমন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লবণকণা সমুদ্রজলের সঙ্গে এক হয়ে যায়—তেমনই প্রলয় ও মুক্তিকালে জড়দেহাদি রূপ উপাধিবিমুক্ত জীবও ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়। সেই অবস্থায়, জীব ব্রহ্মেরই ন্যায় সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বাত্মক হয়।

ভাস্কর মতে "উপাধি"র প্রকৃত অর্থ কি তা উপলব্ধি করলে, তিনি কি অর্থে জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও অণুত্বকে "ঔপাধিক" বলে গ্রহণ করেছেন তা স্পষ্ট হবে। তাঁর মতে জীবের কর্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হ'ত, তা হলে সে সর্বদাই কর্মকারী, ক্রিয়াশীল হ'ত। কিন্তু সকাম কর্মের ফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী ও ভোগের ফল সংসার বলে, সে ক্ষেত্রে জীবের সংসারদশাও কোনদিন শেষ হ'ত না। সেজন্য স্বীকার করতেই হয় যে, জীবের কর্তৃত্ব নিত্য ও স্বাভাবিক নয়, অনিত্য ও ঔপাধিক, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত জীব দেহমনঃ-সংশ্লিষ্ট বা জড়-উপাধি-সংশ্লিষ্ট থাকে, ততদিন পর্যন্তই কেবল সে কর্তৃত্বশীল, যেমন যন্ত্রাদিসমন্বিত হলেই তক্ষ কর্তা, সময়ে নয়; অথবা ইন্ধন সংশ্লিষ্ট হলেই অগ্নি ধূমস্রষ্টা, অন্যথায় নয়। বলা বাহুল্য, "উপাধি"র পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে, জীবের ঈদৃশ ঔপাধিক কর্তৃত্ব কোনক্রমেই অপারমার্থিক বা মিথ্যা নয়। অর্থাৎ, জীব নিত্যকর্তা বা সর্বদাই কর্মকারী না হলেও, সংসারদশায় তার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপেই সত্য। সেই সময়ে অবশ্য জীব ব্রহ্মের অধীন।

একই ভাবে জীবের ভোক্তৃত্ব ও অণুত্বও ঔপাধিক, অথবা জীবের সংসারকালীন গুণই মাত্র। স্বভাবতঃ জীব কর্মফল ভোগবিহীন ও সর্বব্যাপী।

জীবের বহুত্বও এই ভাবে ঔপাধিক কিনা, সে বিষয়ে ভাস্কর স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। তা সত্ত্বেও ভাস্করের মতে মুক্ত জীব ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যান, যেমন লবণকণা সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়; সুতরাং জীবের বহুত্বও যে তাঁর মতে ঔপাধিকই মাত্র, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কেবল জীবের জ্ঞাতৃত্ব ঔপাধিক নয়, স্বাভাবিক। জীব ব্রহ্মস্বরূপ বলে, সর্বকালে, সর্বাবস্থাতেই সে ব্রহ্মেরই ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা।

অশ্বারোহী বীর

শ্রীকালিদাস রায়

অশ্বারোহী বীর তুমি, কোষে তব অসি খরশান,
বর্শা তব শোভে বাম হাতে।
ভালে দৃপ্ত কান্তি কই? কি চিন্তায় মুখ তব ম্লান
চোখে কেন দীপ্তি নাহি ভাতে?
জিপ্‌চারী যত সেনা উপেক্ষিয়া তোমা চলে যায়
রণে কেহ ডাকে না'ক তোমা?
তোমার গিয়াছে দিন! নানা রণযন্ত্রে ধরা ছায়,
আসিয়াছে গোলাগুলি, বোমা।
গেছে সে শৌর্য্যের দিন, গর্ত্ত খুঁড়ি লুকায়ে সৈনিক,
দূর হতে মারণাস্ত্র ছাড়ে,
মুখোমুখি যুদ্ধ নেই, নিরাপদে রহি বৈমানিক
হত্যা করে হাজারে হাজারে।

এই কাপুরুষ-যুগে বীর তব ফুরায়েছে কাজ
কি হবে শানায়ে আর অসি?
সমুদ্রের পরপারে শোন গর্জ্জে আণবিক বাজ,
গ্রামে ফিরে খাও জমি চষি।
কি হইবে অশ্বটির? ও অশ্বেরে ভালবাসো বড়?
বেচিতে হইবে বড় ক্লেশ?
জানো কি খেলিতে পোলো? তার চেয়ে এক কাজ করো,
জকি হয়ে খেল গিয়ে রেস।
দিন ফুরায়েছে বলি হে বীর হয়ো না ম্রিয়মাণ,
ফুরায় যে সকলেরেই দিন।
সগৌরবে রবে তুমি, না ডাকুক রণ-অভিযান,
কাব্যে তুমি রবে মৃত্যুহীন।

কালিদাস সাহিত্যে আইন আদালত

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

কালিদাসের কাব্য ও নাটকগুলি পড়িলে মনে হয় মহাকবির সময় এখনকার মত পৃথক আদালত বলিয়া কিছু থাকিত না, এবং বেতনভোগী বিচারক নিযুক্ত করার প্রথা তখনও চালু হয় নাই। রাজসভার এক অংশে একটি 'ধর্ম্মাসন' বা 'ব্যবহারাসন' পাতিয়া রাখা হইত এবং দিনের এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেশের রাজা রাজকার্য্য সারিয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া সেই ধর্ম্মাসনে বসিতেন, আর প্রজাদের মধ্যে যাহাদের নালিশ করার কিছু থাকিত রাজার সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে তাঁহার নিকট আর্জ্জি পেশ করিতে হইত। আইনজীবী অর্থাৎ উকীল-মোক্তারদের তখনও সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদীদের যাহা কিছু বক্তব্য সমস্ত নিজেদের বলিতে হইত, সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণ করার ব্যবস্থাও ছিল, রাজা তাহাদের অভিযোগ ও প্রত্যুত্তর শুনিয়া বিচার করিতেন এবং রায় দিতেন। রাজা যদি অসুস্থ হইয়া পড়িতেন বা অন্য কোন কারণবশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিতেন, তখন তাঁহার কোনও মনোনীত মন্ত্রী তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ সেদিনের বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া মামলার পূর্ণ বিবরণ রাজার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

কালিদাসের যে আইন সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল তাহা 'বিক্রমোর্ব্বশী'র নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায়:

বিভাবিতৈকদেশেন দেয়ং যদভিযুজ্যতে॥"

বিক্রম, ৪র্থ অঙ্ক

অর্থাৎ, সাক্ষ্যের দ্বারা যদি কোনও বস্তুর একাংশের চুরি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমস্ত বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে হয়।"

এখানে বুঝা যাইতেছে যে, তখনকার দিনে দেশের এই আইন ছিল—যদি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাইত যে, কোনও ব্যক্তি অপহৃত দ্রব্যের একাংশ চুরি করিয়াছে, তাহা হইলে অপহৃত সমস্ত বস্তু প্রত্যর্পণ করার দায়িত্ব তাহার উপর আসিত, ও না পারিলে দণ্ডভোগ করিতে হইত। মহাকবি এই আইন যে জানিতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এই শ্লোকটিতে কতকগুলি আইনঘটিত পারিভাষিক শব্দও রহিয়াছে, যেগুলি মহাকবির ভাল ভাবে জানা ছিল। যেমন, 'বিভাবিত', ইহা একটি পারিভাষিক শব্দ যাহার অর্থ মল্লিনাথ করিয়াছেন, 'সাক্ষ্যাদিভিঃ সাধিতঃ'—অর্থাৎ, বিভাবিত মানে সাক্ষ্যদ্বারা যাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

'অভিযুজ্যতে' কথাটিও আইন সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দ বলিলেও বলা যাইতে পারে, অর্থ—যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছে।

'রঘুবংশের' সপ্তদশ সর্গে সূর্য্যবংশের এক রাজা অতিথির জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে মহাকবি বলিতেছেন—

স ধর্ম্মস্থসখঃ শশ্বদর্থিপ্রত্যর্থিনাং স্বয়ং।
দদর্শ সংশয়চ্ছেদ্যান্ ব্যবহারানতন্দ্রিতঃ॥

রঘু—১৭।৩৯

রাজা অতিথি সর্ব্বদা অর্থী (বাদী) এবং প্রত্যর্থী (প্রতিবাদী)-দিগের জটিল মামলাগুলি স্বয়ং আলস্যবিহীন হইয়া 'ধর্ম্মস্থ' অর্থাৎ সভ্যদিগের সহায়তায় দেখিতেন। এখানেও দেখা যাইতেছে, রাজা স্বয়ং বিচার করিতেন, এবং যে সমস্ত মামলা জটিল বলিয়া তাঁহার মনে হইত, সভাসদ-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া সেগুলির বিচার করিতেন। আইন সম্বন্ধে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ এ শ্লোকেও পাওয়া গেল, যেমন 'অর্থী'—বাদী; 'প্রত্যর্থী'—প্রতিবাদী; 'ব্যবহারান্'—মামলাগুলির; এবং 'ধর্ম্মস্থ'—যাহার অর্থ মল্লিনাথ করিয়াছেন 'সভাসদ্'। আমার মনে হয়, তখনকার দিনের ধর্ম্মস্থগণ, যাঁহাদের সহিত রাজা পরামর্শ করিয়া জটিল মামলাগুলির বিচার করিতেন, তাঁহাদিগকে আধুনিক কালের 'জুরি' বলা যাইতে পারে। 'ধর্ম্মস্থ'দিগকে 'জুরি' বলা যাইতে পারে বলিলাম এই জন্য যে, মল্লিনাথ এখানে যাজ্ঞবল্ক্যের একটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যেখানে মহর্ষি বলিতেছেন, 'ব্যবহারান্নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ' অর্থাৎ রাজা মামলা-গুলি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিয়া দিবেন। এই সকল বিদ্বান ব্রাহ্মণ যে কেবল রাজসভার সভ্যদের মধ্য হইতে লওয়া হইবে যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বিধান দেন নাই, কিংবা রাজসভার বাহির হইতে সাধারণ সৎ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের পরামর্শ লওয়া নিষিদ্ধ একথাও বলেন নাই; সুতরাং যে-কোনও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের, মামলার বিচার করার সময় রাজা পরামর্শ লইতেন ইহা যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এখনকার সময়ের জুরি বলিলে অত্যুক্তি হইবে কেন? তাহা ছাড়া সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম্ম' শব্দে আইনও বুঝায়, সুতরাং ধর্ম্মস্থ বলিলে বুঝিতে হইবে সেই সব সভ্য, আইন সম্বন্ধে যাঁহাদের অল্পাধিক জ্ঞান ছিল।

মহারাজ অজের প্রসঙ্গে মহাকবি বলিতেছেন:—

'নৃপতিঃ প্রকৃতীরবেক্ষিতুং ব্যবহারাসনমাদদে যুবা।'

রঘু—৮।১৮

অর্থাৎ, যুবক রাজা প্রজাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ বুঝিবার জন্য 'ব্যবহারাসনে' বসিতেন। 'ব্যবহার' শব্দে আইনঘটিত ব্যাপার বুঝায়, সুতরাং 'ব্যবহারাসনে' বসিতেন এই কথার অর্থ সভার মধ্যে যে পৃথক্ আসনটি বিচারকার্য্য সম্পন্ন করার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, যুবক রাজা সেই আসনে বসিয়া প্রজাদের মধ্যে কে দোষী কে নির্দ্দোষ বিচার করিয়া দেখিতেন।

তখনকার দিনে হয়ত 'রাজকার্য্য' বলিলে বুঝাইত প্রজাশাসন, রাজস্ব আদায় ইত্যাদির তদারক করা, আর 'পৌরকার্য্যে'র অর্থ ছিল প্রজাদের আইনঘটিত সমস্যার মীমাংসা করা, উত্তরাধিকার নির্ণয় করা ইত্যাদি। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র ষষ্ঠ অঙ্কে এই শব্দ দুইটির একত্র প্রয়োগ দেখা যায়। মহারাজ দুষ্যন্তের এক মন্ত্রী রাজা অসুস্থ বলিয়া রাজ-সভায় আসিতে না পারায়, তিনি রাজার হইয়া সমস্ত কাজ সারিয়া এক পত্রে রাজার জ্ঞাতার্থে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'রাজকার্য্যস্য বহুলতয়া একমেব ময়া পৌরকার্য্যং প্রত্যবেক্ষিতং তদ্দেবঃ পত্রারোপিতং প্রত্যক্ষীকরোতু'—অর্থাৎ 'রাজকার্য্য আজ অত্যন্ত বেশী থাকায় মাত্র একটি পৌরকার্য্য দেখিবার ফুরসত পাইয়াছিলাম, এই পত্রে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল, মহারাজ দেখিয়া লইবেন।'

এই পৌরকার্য্যটি কি তাহা মন্ত্রী রাজাকে জানাইতেছেন, 'ধনবৃদ্ধি নামক কোনও বণিকের নৌকা দুর্ঘটনায় জলে ডুবিয়া মৃত্যু হওয়ায় এবং তাহার সন্তানাদি কেহ না থাকায় তাহার সঞ্চিত বহু কোটি মুদ্রা রাজসরকারের প্রাপ্য হইতেছে।' মন্ত্রী মহাশয় আরও জানাইতেছেন যে, বণিকের কয়েকটি বিধবা পত্নী রহিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সে যুগে যদি কোনও ধনী ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী বা পত্নীরা স্বামীর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিতেন না, জীবনস্বত্ব ভোগেরও তাঁহাদের অধিকার ছিল না, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইত।

'শকুন্তলা' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ইহাও দেখা যায় যে, চুরি করার অপরাধ প্রমাণিত হইলে রাজা ইচ্ছা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শূলে চাপাইয়া মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন (শূলাদবতার্য্য হস্তিপৃষ্ঠে সমারোপিতঃ)।

মৃত্যুদণ্ড যে কেবল শূলে চাপাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল তাহা নহে, তরবারির দ্বারা কাটিয়া ও মারিয়া ফেলার ব্যবস্থা করা হইত। 'বিক্রমার্কচরিতে' পাওয়া যায়, গহনার লোভে পড়িয়া এক শিশুহত্যাকারীর সম্বন্ধে রাজসভার সদস্যেরা রাজাকে বলিতেছেন, 'ওকে শতখণ্ডে কাটিয়া শকুনিদের ফলার করিয়া দেওয়া হউক।'

পত্নী ত্যাগ করা তখনকার দিনে স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত, স্বামী ইচ্ছা করিলে যে কোনও কারণে অনায়াসে পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারিতেন, আইনের কোনও বাধা ছিল না।

'শকুন্তলা'র পঞ্চম অঙ্কে কণ্বশিষ্য শারঙ্গরব শকুন্তলাকে রাজসভায় আনিয়া দুষ্যন্তকে বলিতেছেন :

তদেষা ভবতঃ পত্নী ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা বিশ্বতোমুখী ॥

অর্থাৎ, 'ইনি আপনার পত্নী, ত্যাগ করিতে হয় ত্যাগ করুন, গ্রহণ করিতে হয় গ্রহণ করুন, পত্নীর প্রতি স্বামীর যা খুসী করার অবাধ অধিকার আছে।' তবে যে কোনও কারণে বা বিনা কারণে পত্নীত্যাগ আইনে বাধিত না বটে, লোকে কিন্তু অকারণে পত্নীত্যাগকারীকে ঘৃণা করিত; 'শকুন্তলা'র সপ্তম অঙ্কে দেখা যায়, রাজা দুষ্যন্ত অকারণে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করায় মারীচাশ্রমের তাপসীরা বলিতেছেন, 'সে ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগকারীর নাম কে উচ্চারণ করিবে।'

মহাকবির যুগে 'অসবর্ণ বিবাহ' আইনের চোখে অসিদ্ধ ছিল না। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে পাওয়া যায় মহারাজ অগ্নিমিত্রের এক পত্নীর একটি অসবর্ণ ভ্রাতা ছিল, সুতরাং অগ্নিমিত্রের শ্বশুর যে ক্ষত্রিয় ছাড়া অপর জাতের একটি নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে, এবং অসবর্ণ বিবাহের সন্তান হইলেও সমাজে তাঁহার পদ-মর্য্যাদা কিছু কম ছিল না, কারণ ঐ নাটকে দেখা যায়—বিদিশারাজ তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের সীমানারক্ষার্থ এক দুর্গের সেনাধ্যক্ষ করিয়া দিয়াছিলেন।

সেকালে 'গান্ধর্ব্ববিবাহ'ও যে আইনত সিদ্ধ ছিল তাহাও শকুন্তলা নাটক পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে কেবল চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করিয়া গোপনে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়াছিলেন, যে বিবাহে পুরোহিত ছিল না, এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া বা কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধব-গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান এ সবের কিছুই হয় নাই, তবু সকলে শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের ধর্ম্মপত্নী বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের পুত্র সর্ব্বদমন ভরত নাম লইয়া পিতৃসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

জ্বালা

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

কাশীতে গোধূলিয়ার দক্ষিণ দিকটায় একটা আস্তাবল ছিল সেকালে। তার এক ধারে লক্ষ্য করলে দেখা যেত, সাইনবোর্ড—ডাঃ অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তখন সবে খদ্দর আর স্বদেশী চালু হয়েছে। গান্ধী আসেন নি। অনুশীলন সমিতি, সুরেন বাঁড়ুজ্যে আর বারীণ ঘোষ আসর জাঁকিয়ে আছেন। ভদ্রলোকের সেই সময় থেকে খদ্দর পরার অভ্যাস ছিল।

আমার আজ ঠিক মনে নেই—ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর ক'জন ছেলে; কারণ বাড়ীটা ছেলেদের আড্ডা ছিল। ক'টি আবার ভাইপোও ছিল। ভাই মৃত, তাই তাঁর নিজের ছেলেদের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিল সবাই। বোধ হয় সাতটি বা আটটি ছেলে ছিল।

হারাধনের দশটি ছেলের মত পর পর দু'তিনটি জেলে গেল, একটি ফাঁসী গেল, একটি ফেরার হ'ল, ডাক্তার নিজে মারা গেলেন। বাড়ীতে সর্ব্বদা পুলিশ মোতায়েন। আর ছেলেগুলি হ'ল নজরবন্দী। সে বাড়ী যেন এক ভীমরুলের চাক। তার ত্রিসীমানায় পারত-পক্ষে কেউ যেত না। আমার যেতে হ'ত মাঝে মাঝে, ওদের মৃতাশৌচ বা জাতাশৌচ পরলে শালগ্রাম শিলার পূজা আরতি ইত্যাদি করতে।

ওদের বাড়ীর সমীরের বয়স আমার বয়স প্রায় এক, কিছু বড় হবে হয়ত সমীর।

সেবার শুনলাম ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মারা গেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করলাম শালগ্রাম-পূজা ইত্যাদিতে ডাক পড়ল না। কথায় কথায় মাকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, "হ্যাঁ মা, ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মারা গেলেন, কৈ পূজোর জন্য কেউ গেল না ত।" মনে মনে সন্দেহ ছিল—পুলিস এপিডেমিকের ভয়ে ও-বাড়ী যাওয়া পুরুতবাড়ী থেকেও বন্ধ হয়েছে হয়ত।

মা অভিভূতভাবে বললেন, "শালগ্রাম ওরা আর পূজো করে না। ওদের বাড়ীর শালগ্রাম ত আমাদের বাড়ীতে উনি এনেছেন। এখন পূজো এখানেই হয়।"

বাবাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। সমীরদের বাড়ীতে এক-কালে [illegible] আড্ডা দিয়েছি; সুখে দুঃখে ডাক্তার চক্রবর্ত্তী ও তাঁর স্ত্রী—আমরা তাঁকে জেঠাইমা বলতাম, আমার বাবা ও মা সবাই যেন একই [illegible] পরিবারভুক্ত ছিলেন। আজ সেই পুরানো বন্ধুর [illegible] একটা [illegible] করতে পারি নি।"

[illegible] এইটুকু—

[illegible] আন্দোলনের [illegible] ধরা পড়েছে—[illegible] [illegible] পেয়েছে। [illegible] ও [illegible] পেয়েও সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছিল। কাশীতে ধরপাকড় বাঙালীপাড়ায় একটু বেশী কড়াকড়ি ভাবেই চলতে লাগল। বিভূতি বাঁড়ুজ্যে, শচীন বক্সী, রাজেন লাহিড়ী, এরা সব কাশীর আসামী এবং পাঁড়েঘাট থেকে মুন্সীঘাট, গণেশ মহল্লা থেকে রাণামহল—এইটুকু জায়গার মধ্যেই অজস্র গলিঘুঁজিতে এদের কাজ। কাশীর বাঙালী ছেলেদের জব্দ করতে তখন যতীন বাঁড়ুজ্যে বড় আর যতীন বাঁড়ুজ্যে ছোট—দুই জাঁদরেল দারোগাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তবু ছোকরারা দমে না। রোজই একটা না একটা 'ডাকাতি' লেগে আছে। পুলিশ ত নাজেহাল।

এর মধ্যে নতুন এই শিকরেগুলোর জ্বালায় বাজ আর ঈগল হাতছাড়া হবার জো। আট থেকে বারো বছরের ছেলেগুলি রোজার উৎপাত সুরু করেছে। যেমন লর্ড উইলিংডনের দরবার ফতোয়া বা অর্ডিনান্স ছাড়ার অন্ত নেই, তেমনি তার জবাবে কংগ্রেস-মার্কা গোপন অর্ডিনান্স বেরুতেও দেরি হয় না। সরকার বললেন, কংগ্রেস দপ্তর বে-আইনী, কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিল, সহরের সব বাড়ীর গায়ে "কংগ্রেস দপ্তর" নোটিস লাগাও। হ'লও তাই। রাতারাতি কাজ শেষ। বিস্মিত নগরবাসীরা সকাল হতেই দেখল, তাদের বাড়ীর গায়ে লালমাটির ছোপ-ধরানো ছাপা হরফ—"কংগ্রেস দপ্তর"—এমনি প্রত্যেক বাড়ীতে। যাঁরা উক্ত নাম জল সংযোগে মুছে দিলেন, তাদের বাড়ীতে ঢিল, পথে কলার খোসা, গঙ্গার পা-পিছলানো, বাজারে ধাক্কা প্রভৃতি অহিংস দুর্ঘটনা এত বৃদ্ধি পেল যে, একালের চ্যাংড়াদের নিন্দায় কাশীর ঘোলাটে বাতাস আরও বেশী ঘোলাটে হয়ে উঠল।

এ সবই যে, ঐ শিকরেগুলির কাজ সরকার বাহাদুর তা জানতেন। অর্ডিন্যান্স বিলির ব্যাপারে এই অনুমান প্রত্যক্ষ হয়েও দাঁড়িয়েছে। এবার কর্ত্তারা নতুন ব্যবস্থা চালালেন। সমীরদের মত ছেলেদের ধরে দিনকতক চুনার দুর্গে আটকে রেখে সটান মারধোর লাগানো, জলে চুবানো, তার পর পথে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু আরও বাড়তে লাগল অত্যাচার। পরে সমীর হারিয়ে গেল।

সমীরের মার বিশেষ করে সমীরের জন্যই ভাবনা ছিল। বসন্তে সমীরের একটা চোখ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া ওর শরীর দুর্ব্বল। কিন্তু দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ওদের সুন্দর "গুষ্টি"র মধ্যেও সমীর দেখতে ছিল আরও সুন্দর ও নম্রস্বভাব। মাথার চুল, [illegible] কালো আর কুঞ্চিত। অমন গোলগোল গুটি-পাকানো চুল [illegible] চোখে পড়ত না। বড় বড় ভাসা চোখ। দেখলেই [illegible] হয়ে উঠত ওর কাছ অবয়বের সৌকুমার্য্যে।

সমীরের মা, আমাদের জেঠাইমা, বার বার বাবার কাছে আসতেন, আর কান্নাকাটি করতেন। ডাঃ চক্রবর্তীর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি রোজ নিত্যনিয়মিত দোকান খোলেন, বন্ধ করেন। যেন এ সব ঘটনা তাঁর অক্ষরেখার বাইরের গ্রহবিবর্তন। সুতরাং জেঠাইমার ভরসা একমাত্র আমার পিতৃদেব।

কিন্তু সমীর তখন রাজনৈতিক কাজে পাকা ঘুটি। দাবার ছকে বড়ে পেকে যেমন গজ-মন্ত্রী হয়ে বসে ওর অবস্থা তাই। ওকে কেউ খুঁজে বার করতে পারল না। দু' এক দিন এ বলে দেখেছি, ও বল্লে দেখেছি, ব্যস—কিন্তু দেখা তাকে যায় না।

বহু কাল কেটে গেছে। সমীরের কথা সাধারণ লোকে ভুলতে বসেছে। হঠাৎ সমীর কাশীর সমাজে এসে মূর্তিমান বিদ্রোহের মত উপস্থিত। সে বিবাহ করে ফিরেছে, সঙ্গে তার স্ত্রী। স্ত্রীটি আর কেউ নয় গঙ্গা—আমাদের রাজাঘাটের বজ্রী মাঝির মেজমেয়ে। কাশীতে এই মাঝি-মাল্লাদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই পরিষ্কার বাংলা বলতে কইতে পারে। কিন্তু তাই বলে বাঙালী অবাঙালী সমাজে মিল খায় নি, তার কারণ কাশীর হিন্দুস্থানীর গোঁড়ামি। বজ্রী মাঝির মেয়ে গঙ্গার রং ছিল মিশকালো, কিন্তু বাকি সবকিছু রমণীয়ত্বে ভরা। তবে সমীরের চেয়ে বয়সে সে সামান্য কিছু বড়। বজ্রী নিজে মেয়েকে তো ঘরে ঢুকতে দেয়ই নি, তার ওপর বার বার গিয়ে ডাক্তার চক্রবর্তীকে বলে এসেছিল সমাজে এ পাপের প্রশ্রয় যেন তিনি না দেন। ডাক্তার চক্রবর্তী আর কিছুর জন্ম না হোক নিজের এবং ভায়ের মেয়েদের বিবাহ ইত্যাদির কথা ভেবে সমীরকে ঘরে জায়গা দিলেন না।

সমীর আর গঙ্গা একটুও দমল না। বাঙ্গালীটোলাতেই ঘর ভাড়া করে তারা থাকতে লাগল এবং সদর্পে বলতে লাগল যে, তারা স্বামী-স্ত্রী। সমীরকে যেদিন ডাক্তার চক্রবর্তী বাড়ী থেকে বের করে দেন সেইদিনই তিনি তাঁর প্রিয় শালগ্রামটিকেও বাড়ীর বাইরে এনে বাবার জিম্মায় দিয়ে যান। বাবার কাছেই শোনা কথা—বলে যান নাকি—"সমীরকে ঘরে রাখার সাহস আমাদের হয় না। তাকে নিগ্রহ করে শালগ্রাম পুজোর সার্থকতা আমার কাছে রইল না ছোটকর্তা। আপনি নিন শালগ্রাম—আর দেশমাতা নিন সমীরকে। তা হলেই আমার ছুটি। ব্যস।" এ ঘটনার কিছুদিন পরেই ডাক্তার চক্রবর্তী মারা যান।

সমীর তো এসে রইল গঙ্গাকে নিয়ে। আমার সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হয়, গঙ্গার ধারে নাইতে গিয়ে দেখা হয়। দেখলেই হাসে। আমি সাহস পাই না। কেমন যেন ওকে আমার চেয়ে বেশী ভারিক্কি বোধ হয় যদিও তখন বি-এ পড়ি। ও পুলিসকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পাকা তিন বছর ঘাপটি মেরে রইল, এখন আবার একটা অসবর্ণ বিবাহ করে সমাজের বুকে চেপে বসে আছে—সবটা জড়িয়ে বড়ই অদ্ভুত ঠেকে, মনে হয় সমীর আমার চেয়ে অনেক বড়। অভিজ্ঞতায় বড়, কাজে বড়, হৃদয়ে বড়, সাহসে বড়। আর বড় জগতের সবার বড় রহস্য-লোকের আবিষ্কর্তা হিসাবে—অর্থাৎ নারী-হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তার কাছে। গঙ্গাকে ও বিবাহ করেছে।

সমীর জীবিকার জন্ম বেছে নিয়েছিল চমৎকার একটি উপায়। সে সকালবেলায় খবরের কাগজ বেচত, আর সারাদিন বিশ্ববিদ্যালয় হোষ্টেলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করত। এমনি করে তার অসামাজিকতার যত প্রচার সমাজের ভেতরে বাধার প্রাচীর তুলতে লাগল, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের আদর্শের আলো তত উঁচু থেকে ওর অন্তর বাহিরকে প্লাবিত করতে থাকল।

আর গঙ্গাও চুপ করে বসে থাকত না। গুটিগুটি সে ম্যাট্রিক পাস করল, আই-এ দিল, বি-এ পাস করল।

আমিও এতদিনে ট্রেনিং কলেজে মাষ্টারি পড়তে গেছি। দেখি গঙ্গাও আমাদের সঙ্গে পড়ছে।

সমীর এর মধ্যে জেলে গেছে। মাস কয়েক হ'ল ছাড়া পেয়েছে বটে, কিন্তু তার আর সে চেহারা নেই। একেবারে ভেঙে গেছে স্বাস্থ্য। পেটের ভেতর একটা যন্ত্রণা সদাসর্বদা ওকে যেন শূলবিদ্ধ করে রেখেছে। মর্ফিয়া না খেলেই যন্ত্রণায় চীৎকার করে।

এই সময়টা আমি ওদের খানিকটা কাছাকাছি এসে পড়লাম।

সমীর একদিন ঘড়ঘড়ে গলায় বলল—"স্বদেশী-টদেশী সবই ভুয়ো। সত্যি এই মনটা। বাঁধে না দড়িতে, বাঁধে না জেলে, মন একেবারে মড়ার বাড়া করে রাখে। ইংরেজের সঙ্গে লড়েছি, সমাজের সঙ্গে লড়েছি—হেরে গেলাম এই মনটির কাছে। এই রোগ, এই যন্ত্রণা! আমার মন খাক্ হয়ে গেছে..."

"কি বলছিস তুই?" বললাম আমি, 'তোর মন তো রাজা রে, কে করলে তোর মনকে এমন?"

"প্রেম! লোকে বলে গঙ্গাকে ভালবাসতাম না, কর্তব্যবোধে বিয়ে করেছিলাম। নাইন্টি পার্সেন্ট ওয়ার্কাররাই তাই বলে। গঙ্গা আর আমি একটা গ্যাঙ্গে ওয়ার্ক করেছি। একদিন চুনারের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। ওর মাথায় মাছের ঝাঁকা, আমার কাঁধে বাঁক; বাঁকে বড় বড় রুই কাৎলা। মাছগুলোর পেট হাতড়ে আর কে দেখছে। কিন্তু শুনলাম, মোগলসরাইয়ে সেদিন বাঁড়ুজ্যে নিজে আছে। সাহস হ'ল না। একটি পাথরকাটার বাড়ীতে খড়ের গাদায় রাত কাটালাম। শীতকাল। খড়ের মধ্যে শুলাম। ও ছিল জলন্ত কয়লা। পোড়ালে না, আলো ধরিয়ে দিলে। তার পর দেখেছি যতক্ষণ ও আমার চোখে চোখে থাকত ততক্ষণ জ্বালাটা থাকত না। অদর্শনেই মরে যাই। তাই আর বড়াই করি না। দেশ নয়, জাতি নয়, কৃতজ্ঞতা নয়, পুরস্কার নয়, নিজের প্রাণের দায়ে ওকে মাথায় তুলে করে রেখেছি।"

"বড় আনন্দ হ'ল ভাই। তোর কথায় আজ সাহস পেলাম।" "কিসের সাহস?" "শচীনদা আর সুরেনদাকে দেখে দেখে মনে হ'ত এক একজন সন্ত্রাসবাদী যেন এক একখানা কষ্টিপাথর। আমাদের তোদেরও প্রেম হয়?"

"প্রেম? প্রেম এর নাম? প্রেম কি মানুষকে ক্ষয় করে

দেয় ? এ জ্বালা, দাবদাহ, তুষানল। এখন বুঝি। জেল থেকে বেরিয়ে শৈবেশকে দেখলাম। বললাম, "গঙ্গা কৈ, গঙ্গা আসে নি ?" ও বললে, 'তার কলেজ, আসতে পারে নি।' মনে হ'ল ছুটে আবার জেলে ঢুকে পড়ি।"

বললাম, "এ তোর অন্যায় রাগ। আমি ওর সঙ্গে পড়ি। আমি জানি ও সত্যই মন দিয়ে পড়াশুনা করে…"

আঁতকে উঠল যেন সমীর। বললে, "চুপ কর, চুপ কর তুই। মা জানি নি, বাপ জানি নি, দেশ জানি নি, পার্টি জানি নি— নিজের আজন্মবর্দ্ধিত সংস্কারকে অবহেলায় ত্যাগ করেছি ওর কাছে আত্মদান করে—ওকে দিয়ে এই দুরন্ত, অনন্ত মন। দেহ তো চাই নি তার বিনিময়ে। চেয়েছি শুধু মন! সে মন আবার সে পড়াশুনোয় দেয় কি করে ? সে মন আর কাকে কি করে দেওয়া যায় ?" খানিকটা চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, "গঙ্গা আর আমার নেই। দেশেরও নেই। সে এখন তার নিজের ; সে এখন তার নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। বর্ত্তমান, অতীতের সম্রাজ্ঞীর মহিমাকে তুচ্ছ করে সে তার নিজের ভবিষ্যতের নিকট দাসখত লিখে দিয়েছে।" থেমে আবার বলল, "এ আমার আঁতের ব্যথা। ডাক্তার বলে ইন্টেষ্টাইন, আমি বলি অন্তর— 'আঁত' কথাটি কোথা থেকে এল কে জানে…" বলে হাসবার চেষ্টা করলে।

সত্যই ওর ইন্টেষ্টাইন্যাল টিউবারকিউলোসিস—গঙ্গা জানে। কলেজের পাশে কুলবাগানে কুল খেতে গিয়েছিলাম। দেখি গঙ্গা আর দু' চারটি মেয়ে। ওরই মধ্যে একটু সুবিধামত কথাটার আঁচ দেবার চেষ্টা করতেই ও বললে—"প্রেম করে প্রেমিক মরে ; কথাটা আজ নূতন নয়। কিন্তু কৃষ্ণবিরহে কি রাধার ইন্টেষ্টাইন্যাল টিউবারকিউলোসিস হয়েছিল ?" হেসে বলল, "যদি হ'ত তা হলে কীর্ত্তনীয়াদের পদাবলী কেমন হ'ত, জানতে সাধ যায় ঠাকুর মশায়।" হাসতে হাসতে ব্যঙ্গ করতে লাগল।

অবাক হয়ে গেলাম। "আচ্ছা, ওর টাকাতেই ত পড়ছ। তবু এসব কি করে বলছ ? ও তোমার জন্ত কি ত্যাগ করছে জান ত গঙ্গা ? কি জীবন ? কি সমাজ ?"

একটা কুল কামড়াতে কামড়াতে ও বলল, "তোমরা না পুরুষ ? কর্ত্তব্য আর কাঁদুনিতে জোট পাকাও কি করে ? টাকা জিনিষটা খরচের জন্তই। রোগে খরচ না করে শিক্ষায় খরচ করছি। শুনতে রূঢ় হলেও, প্রয়োগে যুক্তিযুক্ত। রোগীর জন্ত হাসপাতাল আছে, ছাত্রের জন্ত বিদ্যালয়। হাসপাতাল ফ্রী, বিদ্যালয় টাকা চায়। আমি ত কিছু অপব্যয় করি নি। আর যেন কি বললে ? কৃতজ্ঞতা—না ?"

"ঠিক তা ত বলি নি ;" থতমত খেয়ে আপত্তি জানালাম।

"বলছ নৈ কি ? ওর ত্যাগ। জীবন আর সমাজ। সত্যিকার জীবন ত ত্যাগ করার জন্তই। ত্যাগই যদি সে করতে পারত, এ কথা উঠত না। চেষ্টা করেও কি জন্য তোর ভবঘুরেপনা ছুটির কথা ভাবতেও পারে না। মেয়ে মানুষকে মানুষ আর মেয়ে বলে যারা প্রেম করে তারা ত্যাগ করেছে কি হয় ত জান না ? কিন্তু এসব কথা বলছি কেন ? নিশ্চয় তিনি তোমায় আলোচনা করতে পাঠান নি।"

রাগ করে বললাম, "থাক, গঙ্গা থাক। তোমার কাছে এর বেশী আশা করাই অন্যায় হয়েছিল। সমীর বন্ধু। তার কষ্ট দেখতে না পেরে বলছি।"

'তার কষ্ট ? সে খবর কি তুমি রাখ ?"

"থাক কথা বাড়াব না তোমাদের কথায় যাওয়া আমার অন্যায়ই হয়েছে।"

"একটা অন্যায় নয় ; অনেক অন্যায় করছ। সমাজত্যাগের কথাটা বড্ড শোনালে, বামুনের ঘরের ছেলে হয়ে, মাঝির ঝিকে, কলির ব্যাসদেবরা…। শুনে যাও, শকুন-সমাজ থেকে শকুন যখন ময়ূর সমাজে যায়, তখন ময়ূরের ব্যথা কি হয় সে খোঁজ ময়ূর নিকগে, শকুনের ব্যথা শকুনই জানে। বোঁটা থেকে বিচ্ছেদ কাঁটা-ফলেরও বা, অমৃত-ফলেরও তাই। এগুলো বেদান্তের ভেল্কি নয়, একেবারে খাঁটি সত্য।"

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। বললাম, "তবে কোন লজ্জায় এখনও ওকে নিয়ে ঘর করছ, ওর টাকায় আছ ?"

জ্বল জ্বল করছে ওর চোখ দুটো। যেন তাকাতে পারা যায় না। ও বলল, "শুনবে কেন ? শুনবে ? ওর ঘর করি ওর মৃত্যু অবধারিত জেনে। ওর টাকা নি, ও খুশী হবে বলে।" তার পরেই বিষাক্ত হাসি হেসে বললে, "তা ছাড়া টাকাটা কাজেই লাগাচ্ছি। যতদিন পারি, যতটা পারি শুষে নিই ?"

ঘৃণায় ক্ষোভে ক্লান্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বিষ ঢেলে বললাম, "ও! কি লোভ টাকায় তোমাদের ?"

"আজ জানলে ? এত উপায় থাকতে মেয়েরাই টাকার জন্ত অলঙ্কারের জন্ত দেহের ব্যবসা অবধি করে, তা জান না ?"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, "তোমারও কি তবে এটা ব্যবসা ?"

হাসতে হাসতে বলল, "নয় কেন ?…কিন্তু চটছ কেন তুমি ?"

"চটি নি—বরং শান্ত ভাবেই বলছি—ছেড়ো না ওর হাড়ে যত টাকা সব শুষে নাও। মলেও ছেড়ো না—মড়া বেচলেও কঙ্কালটারও দাম পাবে, জানা আছে ত !"

না দমে গঙ্গা বললে, "না জানা থাকলে, মোটা কমিশনে তোমায় তখন দালাল রাখা যাবে। কঙ্কালখানা যদি পাই ত বেশী দামেই বেচব, ছাড়ব না। হাড় ঘষে ঘষে পাশার খুঁটি করে বেচব দাম হবে লাখ টাকা—" বলেই ছুটে চলে গেল।

কোথায় যেন অবাক হলাম। একটা দারুণ অপরাধবোধ জ্বলে জ্বলে আমায় পোড়াতে লাগল। সমীর বলেছে অন্তত

অজ্বালা, আগুন ধরায় না, জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সেই জ্বালা। সমীরের জ্বালা।

যতই চেষ্টা করি পড়ায় মন দিতে, পারি না। হোষ্টেল সুপার বন্ধুলোক। গিয়ে একটা কিছু অজুহাত দিতেই বললেন, "সাঁতার কেটো না মিথ্যার সমুদ্রে—বাইরে যেতে চাও যাও। পুলিস হাঙ্গামা করো না। বাঙালী ছাত্রকে আমার ঐ এক ভয় করে, আর কিছু নয়।"···

আমি সমীরের বাড়ী এসেছি। বেশী রাত নয়। গলির মধ্যে বিরাট বাড়ী। অমন বিশ ঘর লোক থাকে। সদর দেওয়া হয় না অনেক রাত পর্য্যন্ত। চারতলার উপর সমীরের ঘরে আলো জ্বলছে। উঠে গেলাম। শীতের রাত। দরজা দেওয়া। গঙ্গা হয়ত পড়ছে। আমি জানালার গরাদের ফাঁকটা দিয়ে একটু দেখবার চেষ্টা করে যা দেখলাম—স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

গঙ্গা আর সমীরকে দাম্পত্য জীবনের কোন নিরবকাশ ছবিতে দেখব না—জানতাম। কেবল দেখতে চেয়েছিলাম গঙ্গার পড়ায় কতটা বাধা পড়বে। ছাত্রজীবনে অন্ত কারুর পড়ার খতিয়ান উঁকি দিয়ে দেখার লোভ হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু পরিবর্ত্তে যা দেখলাম তা অদ্ভুত। সমীর যেন মড়ার মত নিশ্চপ পড়ে আছে। গঙ্গা তার মাথাটা কোলে করে বসে আছে, ওর দু'গালে জল চক্ চক্ করছে।

আমি যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে পা টিপে টিপে পালালাম।

পরের দিন ক্লাস—পরের দিন গঙ্গা। শীতের বাতাসের সঙ্গে রোদের তেজ মিশে প্রকৃতিকে সতেজ শিহরণে রোমাঞ্চিত করছিল। গাছে, ঘাসে, পাতায়, ফুলে রং আর রোদ মিলে মনকে খুশীতে ভুলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ যদি ঘরে প্রজাপতি ঢোকে, বা মৌমাছি গান গেয়ে যায় প্রোফেসারের কথাগুলো যেন ভুলে যাই। চোখ চেয়ে আছে গঙ্গার মুখে, মন বাঁধা পড়ে আছে কাল রাতের দৃশ্যে, বুদ্ধি কপাল চাপড়াচ্ছে গতকাল দুপুরের কথাবার্ত্তার বন্ধ কপাটের পাশে।

কি করে কখন কথাটা পাড়ব পাড়ব করে সেদিনটা গেল, তার পরদিনও গেল। রোদের তাত আরও রসগর্ভ, বাতাস আরও যৌবনদীপ্ত, মৌমাছি আরও দুরন্ত, প্রজাপতি আরও চকিত। সাহস হচ্ছে না গঙ্গার তরঙ্গের সামনে পড়ে নাকেহাল হবার।

পরের দিন গঙ্গা ক্লাসে এল না।

বিকালে ওর বাড়ী গেলাম। গঙ্গার ক্লাস কামাই হয় না। সমীর একা বাড়ী ছিল। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বিছানা থেকে পড়ে গেছে। আর গায়ে এই শীতেও ঘাম। আমি যেতেই ছেলেমানুষের মত ডুকরে কেঁদে উঠল। "এসেছিস—বিষ দিয়ে দে আমায়, বিষ দিয়ে দে। কত খেলেছি, কত দিনের সাথী তুই—কর, আমার এই উপকার কর। বিষ দিয়ে দেরে—আমায় এই নরক থেকে মুক্তি দে।"

আমি কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছিয়ে দিলাম। বললাম, "গঙ্গা কৈ?"

সমীর ফিসফিস করে বললে, "কাল রাতে একটি মাঝির ছেলে—মনে হ'ল তুলসীঘাটের ঘাসীরামের ছেলে ত্রিলোক—ডাক দিলে। প্রায়ই রাতে ওর সঙ্গে চলে যায়···আমি বললাম—'আজ যেও না কাল আমার ব্যথা বাড়ার দিন। আমি আর বেশী দিন নেই···কালই হয়ত শেষ হয়ে যাব।' রইল না। বললে, 'মরবে কেন? মরবে না এত সহজেই! যন্ত্রণা ত হবেই, আমি থাকলে তার কতটুকুই বা লঘু হবে। যে ডাক এসেছে, জান ত তাকে আমি ঠেলতে পারব না।' তখন যে ভিতরে বাইরে কি জ্বালা কি বলব! সহ্য না করতে পেরে বললাম, 'পারবেই না ত, পারবে কেন; এ যে তোমার মাঝি-পাড়ার ডাক!' কিন্তু রইল না, চলে গেল। বিষ দিও, এখনই দিও; নইলে আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে যাব।"

আমি দেখলাম মর্ফিয়া রয়েছে; সিরিঞ্জও রয়েছে। খুব অল্প করে একটা ফোঁড় দিলাম বসিয়ে। চলে যেতে পারলাম না। মর্ফিয়া দিয়ে চলে যাই কি করে? রইলাম। ও ঘুমিয়ে পড়ল, আমি আর গেলাম না। গঙ্গার বই নিয়েই পড়তে লাগলাম। রাত হ'ল গভীর। শীত করতে লাগল, অগত্যা গঙ্গার বিছানায় শুয়ে পড়লাম, ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল। আলো জ্বলছে। দেখি এক বিছানায় একই লেপের ভিতরে গঙ্গা আর সমীর ঘুমুচ্ছে। সমীর আমায় দেখল, আঙুল দিয়ে ইশারা করল—শব্দ করতে বারণ করল। সমীরের শীর্ণ আঙুলগুলি গঙ্গার মাথার চুল নেড়ে দিচ্ছে।

আমি ঘর ছেড়ে এলাম। শুকতারা তখন বাসরজাগা শেষ করে অস্তঘাটে গা ধুতে পা বাড়িয়েছে।···

পরের দিন কলেজে গঙ্গা নেই। আবার গেলাম বিকেলে। সমীর আজ ভাল আছে।

"গঙ্গা কৈ?"

"কি কাজে গেছে। কাল তোর খুব কষ্ট গেছে না? গঙ্গা তোর খুব প্রশংসা করছিল। বলছিল, 'আমার চেয়েও ও তোমায় বেশী ভালবাসে।' তাই নাকি রে? গঙ্গার চেয়ে বেশী ভালবাসা? হাঃ হাঃ হাঃ! সে আবার কেমন ভালবাসা? কিন্তু খুব এসে পড়েছিলি কাল। না এলে মরেই যেতাম!"

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললাম, "সেটা আর এমন খারাপ হ'ত কি? তুইও ত তাই চাস।"

হেসে বললে, "যন্ত্রণা যখন হয়, তখন তাই চাই। কিন্তু এখন আর মৃত্যু চাইতে ইচ্ছে করে না।"

"ত্রিলোকের কথা মনে হলেও করে না?"

ম্লান হেসে বললে, "সে আর আমি কি করব! চাঁদ কোন্ গগনে মোমাকেরা করে, ভেবে ভেবে মন খারাপ করলে কি আর চাঁদের দিকে চাওয়া যায়?"

"থাক আমার চাঁদ রে!" বিরক্ত হয়ে বললাম।

"রাগ করিস কেন? খাবার জিনিষ, ধরার জিনিষ, ছোঁয়ার জিনিষের বাছবিচার চলে। যা আলো, যা মায়া, যা স্বপ্ন, তার আবার বাচ-বিচার কি? আমার স্বপ্ন অন্য কেউ দেখলে কি স্বপ্ন এঁটো হয়, না অপবিত্র হয়?"

"আর কাল তোমাদের সেই খোয়া? সেই কুন্তলদাহন? সেও কি জ্যোতি আর স্বপ্ন?"

"আয়, আয়, বোস। বড্ড রাগ তোর। রাগ হলেই সংস্কৃত বলতে থাকিস, বেশ লাগে শুনতে। একটু হর্লিকস করে দে। নিজে চা করে খা।"

"আমার কথার জবাব দে।"

"হ্যাঁ, সেও জ্যোতি, মায়া, স্বপ্ন।"

"কাল বলেছিলি জ্বালা, আজ হ'ল জ্যোতি?"

"জ্যোতিই জ্বালা, জ্বালাই জ্যোতি। আমি যখন হীরে তখন তা জ্যোতি, আমি যখন কয়লা তখন তা জ্বালা। দোষ গঙ্গার নয়, দোষ প্রেমের নয়, দোষ আমার এই রোগজর্জর দেহখানার; দোষ এই রোগপাণ্ডুর মানসলোকের।"

পরের দিন আমি গঙ্গাকে না বলে পারি নি—"ত্রিলোকের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করতে টাকার বাধা আছে বুঝি?"

কলেজে বেশী কথা বলার দায় ছিল তখন। গঙ্গা বললে, "আপনারা ভদ্রলোক। বড় ধাক্কা খেলে মাটির প্রতিমার মত গুড়ো হয়ে যাবেন। ত্রিলোক—আমি—আর টাকার হিসেব করতে গিয়ে ভদ্রতার লাজলজ্জাটুকু আর খোয়াবেন না। ও লজ্জা আমাদের অমানান হলেও আপনাদের মুখোশ—পরম প্রয়োজনীয়।"

কার আর এর পরে মেজাজ ঠিক থাকে!

কিন্তু শেষরাতে হষ্টেলে ধাকাধাকি। বেশী রাত অবধি পড়া অভ্যাস। সকালের ঘুমটি নষ্ট হওয়া আমার সয় না। বিরক্ত হয়ে উঠে দেখি ও পাড়ার বিশু পানওয়ালা চিঠি নিয়ে হাজির। গঙ্গা লিখেছে—"এখনি আসুন।" রাতের আকাশে তখনও ঘুম জড়ানো। নক্ষত্রগুলি কুয়াশার পারে বড় বড় চোখে মিট মিট করে চাইছে।

গিয়ে দেখি গঙ্গা প্রায় সব গুছিয়েই ফেলেছে। শবদেহটা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে আছে। ঘর একেবারে নিশ্ছিদ্র খালি। হাতে একখানা ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিয়ে বলে দিল—"শ্মশানে যেতে পারব না, দাহও করতে পারব না। ভোর হয়ে এল। আলো ফোটার আগে আমায় অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। বিশুকে বলেছি, আরও লোক আসবে। সূর্য্য ওঠার আগেই আগুন ধরিয়ে দিও। কেমন?"…তার পর চোখের পানে চেয়ে বলল, "না দিলেও ক্ষতি নেই। নিতান্তই যদি না দাও, পচেই যায়, হাড় কখানা রেখে দিও। লক্ষ টাকায় বিক্রী করব; মনে আছে তো?"

ততক্ষণে বিশু আর দু'জন লোক এসে পড়েছিল। আরও এক জন লোক। সে ত্রিলোক।

গঙ্গা আসন্ন যুদ্ধের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে বিচক্ষণ সেনাপতির মত দৃঢ় কণ্ঠে বলে, "বিশু সব ঠিক?"

বিশু বলে, "হ্যাঁ!"

"ত্রিলোক, তুমি?"

ত্রিলোক বলে, "ভেবে নাও, যদি যেতে চাও এখুনি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না।" [illegible]। "কিন্তু যাবে কি? ভেবে নাও।"

গঙ্গা স্থির কণ্ঠে বললে, "ভেবেছি!" সমীরের মুখের ঢাকাটা খুলে খানিকটা চেয়ে ঢাকাটা গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। বললে, "চল—আর নয়।" চলে গেল।

পুড়িয়ে দিলাম সমীরকে। সমীরের মা শ্মশানে এসে যে কান্নাটা কেঁদেছিলেন তা দেখলে পাষাণও গলে যায়।…

এলাহাবাদে ইংরেজীর অধ্যাপনা করি। তার পেলাম হর্দোই থেকে। গঙ্গা লিখছে—"এখুনি আসবে!"

হর্দোই ষ্টেশনে নেমে দেখি গাড়ী নিয়ে লোক তৈরী।

গাড়ী থামল হর্দোই মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের আবাসস্থলে। তারই একটা ঘরে গঙ্গা শুয়ে। বসন্ত হয়েছে। মরছে।—

আমি বসলাম পাশে।

গঙ্গা বলল, "একটা কথা না বলে মরতে পারছি না ভাই। আমি মাঝির মেয়ে, গঙ্গায় বাস। এখানে আমি মরতে চাই না। বসন্ত হয়েছে। কেউ আমায় যেতে দেবে না। কাশীতে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু একটা কথা রেখ—আমার চিতার ছাই নিয়ে তোমার বন্ধুকে যেখানে পুড়িয়েছিলে, ছড়িয়ে দিও। গঙ্গায় হাড় ফেল, না ফেল জানতে চাই না। কিন্তু এইটে কর। সেই গঙ্গা, সেই কাশী আমার।"

আমি ম্লান হেসে বললাম, "কেন, ত্রিলোক?"

মুখ ফিরিয়ে নিল গঙ্গা।

সে কাঁদছিল।

"কাঁদছ তুমি?"

"না। রোগের যন্ত্রণা। বোবা যন্ত্রণায় ওরকম জল পড়ে।"

ত্রিলোকও খানিক পরে লক্ষ্ণৌ থেকে বাসে এসে পড়ল।

কিন্তু ততক্ষণে গঙ্গা মরে গেছে।…

চিতা জ্বলছিল।

সেই সময়ে ত্রিলোকের কাছেই প্রথম শুনি যে আসছে আগষ্টে বিদ্রোহ হবে। জোর তৈরি চলছে। গঙ্গা আর সমীর এই সময়ে থাকলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাজ খুব ভাল চলত। কাশী থেকে লক্ষ্ণৌ—এর মধ্যে দুটি ভাল ঘাঁটি রইল না। এরা ছিল টাকা সংগ্রহ আর চলাচলের মুখ্য কর্মী। কাগজ বিক্রীর অজুহাতে ধনী সমর্থকদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ যথাস্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব বহে থেকে গঙ্গা হাতে করেছে তখন থেকে সে [illegible] হয়ে এই কাজ করেছে। যদি কখনও [illegible]-জীবনের নেশায় সমীরকে একটু বেশীরকম [illegible], সমীর [illegible] ওকে ওর [illegible]

চালিত করেছে। প্রেম নয়, সমীরের রোগ নয়, একমনে এক-ভাবে কাজ করেছে।

সমীর শয্যা নিল। সমীরের স্থান নিল ত্রিলোক। সংগ্রাম চলল অব্যাহত।

"এ কথা সমীর জানত না?" অপরাধীর মত প্রশ্ন করি।

"জানত না? আমি তো তারই হাতে গড়া। তবে শেষটায় গাল দিত। রোগের যন্ত্রণায় সহ্যশক্তি কমে গিয়েছিল। গঙ্গাকে এক দণ্ড ছাড়তেও মায়া হ'ত। তবু গঙ্গা চেষ্টা করেও থাকতে পারে নি তো। যখনই ভাল হ'ত বলত, 'আমি এক জন; আমার জন্য ব্রত তুমি নষ্ট কর না। বহুর ব্রত তোমার মাথায়। যোগীর কথায় কাজ করা তোমার চলবে না।' বলতে গেলে একরকম তাড়িয়েই দিত।"

"কিন্তু..."

"হ্যাঁ, শেষ অবধি বলত, আর ক'টা দিন গঙ্গা? তার পরে তো দেশ থাকবে, যন্ত্রণায় বলত। এমনকি অপবাদও দিত মাঝে মাঝে।"

"আমিই গঙ্গাকে শেষে বলতাম সমীরের কষ্ট আমার সহ্য হয় না। চুলোয় যাক্ দেশ। আরামে মরতে দাও ওকে।" গঙ্গা সমীরকে বলত, নিজের সিঁথির সিঁদুর দেখিয়ে, "এই সিঁদুরের মত দেশ। মিটে গেলেও প্রীতি যায় না। একবার লাগালে হয়; নেবাও নেবে ন', ধুয়ে দাও ঘোচে না, মাথার মাণিক। দেশ তোমার পরে নয়; তোমার সমানে সমানে, মাথায় মাথায়। তোমায় আমি খুব চিনি। গঙ্গা তোমার কেউ নয়, দেশই তোমার সব। যেদিন গঙ্গা দেশ ছেড়ে তোমায় নিয়ে থাকবে, সেদিন তুমি গঙ্গাকে আর কাছে থাকতে দেবে না। আর ফিরে এসে যদি দেখি গঙ্গায় অভাবে মরে রয়েছ, তবু জানব আবার মিলন হবে।' আমার সামনেই বলেছে একদিন অনেক আঘাত খেয়ে।"

"তোমার সামনে?"

"হ্যাঁ। গঙ্গা আমার খুড়তুতো বোন ছিল। আমার দিদি।"

"দিদি? অথচ..."

"হ্যাঁ আপনিও, সমীরদাও ভুল করেছেন। আমার জো ছিল না কিছু বলি। গঙ্গার সর্ত্ত ছিল পরিচয় লুপ্ত করে দেবার। নইলে এ ব্রতে আমি হাত দিতে পারতাম না।"

"এসবের দরকার আমার চিত্তকে স্পর্শ করে না। এতো গুপ্তি কেন? মরবার সময়েও ত আমায় কিছু বলতে পারত।" মনে মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করছি।

"কার মরবার সময়ে?"

"কেন সমীরের মৃতদেহ যেদিন ফেলে আসে সেদিন?"

"ওঃ, সেদিন! জৌনপুর প্যাসেঞ্জার না ধরতে পারলে একটা ভয়ানক অপরাধ হ'ত সেদিন। কারুকে টাকা দেবার কথা ছিল। কে জানি না। কিন্তু জৌনপুর সবাইয়ে যেতেই হ'ল সেদিন। একটুও সময় ছিল না।...আর তার পর কাশীতে ও আর কিছুতেই যেতে চাইল না।"

আমার মনে হ'ল হ'দিনের হুটি ছবি:

একদিন যেদিন গঙ্গার চোখে হঠাৎ জল দেখেছিলাম, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে। আর অন্যদিন সমীরের বুকে গঙ্গার মাথা। সমীর গঙ্গার চুল নেড়ে দিচ্ছে।

আজ গঙ্গা সেই বুকে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম পেয়েছে।

স্মরণী

শ্রীশান্তি পাল

সোনার প্রতিমা ভাসায়ে দিয়াছি অশ্রুমতীর জলে,
প্রাণের বাসনা বলি দিছি সব যুপকাষ্ঠের তলে।
প্রাণ-উৎপল শুধু পড়ে আছে শূন্য বেদীর মূলে,
চাঁদমালাখানি রহিয়া রহিয়া বাতাসে উঠিছে দুলে।
আজি মনে পড়ে পুরাতন কথা প্রথম মিলন-রাতি,
শত উদ্বেগে, শত উৎসবে উন্মুখ হয়ে মাতি,
মুখে মুখ দিয়া বুকে বুক দিয়া কানে কানে কত কথা;
কত বছরের মৌন ব্রতের পরে সেই মুখরতা।
শ্যাম শষ্পের গালিচা ফেলিল উষর মরুরে ঢাকি।
রতি-মদনের, গৌরী-শিবের হ'ল যেন মাখামাখি;
উতল হয়ো না,—কহিল আমারে, বিদায়বেলার কালে,
চোখের আড়ালে গেলে নাহি যাবে প্রাণের অন্তরালে,
কত না সুষমা কত না মাধুরী কত না মায়ার ডোরে,
বাঁধিয়া আমারে উঠেছিল ফুটে, আমার আঙিনা ভরে।
আজি মনে পড়ে সেই মুখখানি স্নিগ্ধ নয়ন দুটি,
সেই বাহুলতা সেই আঁখিজল সেই হেসে লুটোপুটি।
সেই স্মৃতি নিয়া বিজনে বসিয়া বিরহ-পাথার মাঝে,
জীবনের পাতা উলটি' দেখিতে কত ব্যথা বুকে বাজে।
তার কায়া নাই, ছায়া জেগে আছে, পাছে পাছে মোর ঘুরে,
গভীর নিশীথে শুনি গ্রহতারা কাঁদিছে বেহাগ-সুরে।
সারা ধরণীতে কোথা বসন্ত, জ্বলে দুরন্ত চিতা,
মরম চিরিয়া লিখে যেতে চাই মরণের জয় গীতা।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন স্কুলে "অপরের মতামত"

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পৃথিবীর অনেক দেশেই গ্রীষ্মকাল কেবল ছুটির মাস নহে—সময়টা আন্তর্জাতিক মেলামেশা এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানেরও বটে। জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে অতলান্তিকের উভয় তীরের ছাত্র, শিক্ষক এবং নানা দেশের লোক দলে দলে এই সময় সাগর পাড়ি দিয়া সভা সম্মেলনে যোগ দেয়। এই সম্মেলনগুলিতে এরূপ লোকসকল সমবেত হয় যাহাদের মত একেবারে পরস্পরবিরোধী। কিন্তু আশ্চর্য্য মনে হইলেও এই সকল সম্মেলন হয় খুবই কার্য্যকরী এবং সার্থক। লোকে ইহাতে নূতন জ্ঞান লাভ করে, কারণ আলোচনা হয়—অপর দেশের লোকের সঙ্গে এক শান্ত এবং বন্ধুত্বের পরিবেশের মধ্যে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন স্কুল এরূপ একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্মেলনের নিদর্শন। এই স্কুলের উদ্যোক্তারা প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালীন ত্রৈমাসিক আলোচনী (সেমিনার) সভায় কয়েকজন বিদেশী চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেন। যাঁহারা আমন্ত্রিত হন তাঁহাদের মধ্যে থাকেন—প্রতিভাবান এবং উদীয়মান তরুণ শিক্ষক, সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক ও শিল্পী—অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে যাঁহাদের নিজ নিজ দেশে চিন্তানায়ক হইবার সম্ভাবনা আছে।

গত বৎসরের সেমিনারে যোগ দিয়াছিলেন ইউরোপের নানা দেশ হইতে কুড়ি জন আর এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কুড়ি জন। অবশ্য এশিয়া বলিতে এখানে কয়েকজন ভারতবাসী, ইন্দোনেশীয়, এক জন মিশরীয়, এক জন তুর্কী, কয়েক জন পাকিস্থানী, এক জন ইস্রায়েলী এবং এক জন জাপানীকে বুঝাইতেছে।

যদি বলা হয়, অতিথিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল তবে অল্পই বলা হইবে। আমেরিকায় যতটা শান্তিতে এবং আরামে তাঁহারা থাকিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এক জন মহিলা-কবি হারভার্ডে আসিবার পথে 'কুইন মেরী' জাহাজে তাঁহার পাসপোর্ট হারাইয়া ফেলেন। ইমিগ্রেশন অফিসার তাঁহাকে অবশ্য আমেরিকায় পদার্পণ করিতে দিলেন—মাত্র হাসিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ক্রীস্টোফার কলম্বসের পরে এই প্রথম আজ আইন অমান্য করা হইল।" দুই সপ্তাহ পরেই মহিলা-কবি ডাকে পাসপোর্ট ফেরত পাইয়াছিলেন। 'কুইন এলিজাবেথ' নামক জাহাজে পাসপোর্টখানি পাওয়া গিয়াছিল—সেখানে পাসপোর্ট কিরূপে গিয়াছিল কেহ জানে না।

হারভার্ডে দুই মাস অবস্থানকালের মধ্যে সেমিনারের সভ্যগণ আমেরিকার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নেতার কথা বা বক্তৃতা শোনার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মিষ্টার হারল্ড ষ্ট্যাসেন, মিষ্টার জেম্স্ বার্নহাম এবং অন্যান্য বিখ্যাত রাষ্ট্রবিদ্গণ, শিল্পপতি, শ্রমিক-নেতা ও চিন্তাজগতের অন্যান্য নেতৃস্থানীয়গণ আমন্ত্রিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিদেশী শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাখ্যা করেন।

এই সকল মামুলি বক্তৃতার পরে তাহাদিগকে বোষ্টনের চতুষ্পার্শ্বের কারখানা, শ্রমিকসঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র, সংবাদপত্রের কার্য্যালয় প্রভৃতি দেখানো হয় এবং এইরূপে সেমিনারের সভ্যেরা মার্কিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে। গত বৎসরের ছাত্রেরা কেবল মার্কিন জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াই খুশী হয় নাই, কোন কোন সভ্য সৎকারগৃহ দেখিতে চাহিয়াছিল। অবশ্য তাহাদের এই ইচ্ছা পূরণ করা হইয়াছিল। পরিদর্শনের সময় সেমিনারের প্রত্যেক মহিলা-সভ্যাই উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকার জাতীয় ক্রীড়া 'বেসবল' দেখিবার জন্যই উৎসাহ ছিল বেশী। ইহা দেখিতে কেহই ছাড়ে নাই। যে সকল বিদেশী এই খেলা প্রত্যক্ষ করে নাই তাহারা হয়ত মনে করিবে যে, আমেরিকানরা কখনো খেলায় উত্তেজিত হয় না। অবশ্য যাহারা খেলা দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা খেলার কিছু বুঝে নাই, তবুও তাহারা খুবই আনন্দ পাইয়াছিল। তাহারা খেলার খুবই তারিফ করিয়াছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাভ হইয়াছিল সেমিনারের বিভিন্ন সভ্যগণের মধ্যে যে যোগাযোগ বা মিলন হয় তাহা দ্বারা। তাহারা একুশটি বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিল, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিশেষ সুযোগ লাভ করে। বহু সভা ও সম্মেলনে নানা দেশের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশের সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ হইতে জাতীয় জীবনের চিত্র উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সকলেই অপর দেশের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের খবরাখবর জানিবার সুযোগও পাইয়াছে।

একজন ইতালীয় সভ্য—যিনি দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার সমস্যা সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক, তিনি ভারত, ইন্দোনেশীয়া এবং পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা করিতে পারিয়া সুখী হইয়াছিলেন। সোভিয়েটের বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানিতে উৎসুক একজন ফরাসী প্রতিনিধিকে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশীয় কেন্দ্রের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। জার্ম্মান সভ্যগণ তাঁহাদের দেশকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করা সম্পর্কে দুই দলে বিভক্ত ছিলেন, এজন্য তাহাদের সহিত ফরাসী সহকর্ম্মীদের বহু মজার তর্কবিতর্ক হইয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত এই সেমিনারে কোন নির্দ্দিষ্ট সূচী ছিল না—যে-কোন সাম্প্রতিক বিষয় লইয়া আলোচনা সুরু হইত। ১৯৫৪ সনের আলোচ্য বিষয় ছিল—জার্ম্মান জাতির পুনরায় অস্ত্রসজ্জা (reacmament), গতবারের (১৯৫৫) বিষয় ছিল নিরপেক্ষতা (neutrality)।

সেমিনারের প্রত্যেক সভ্যকেই তাহার নিজের পছন্দমত যে কোন বিষয়ে আমেরিকান শ্রোতাদের নিকট বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হইত। ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় সভ্যেরা যখন তাঁহাদের দেশের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন তখন বক্তৃতাগৃহ শ্রোতৃমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ থাকিত। ফরাসীরা যখন 'মেণ্ডেস ফ্রান্সের পরে ফরাসী দেশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিত তখনও শ্রোতাদের বেশ সমাগম হইত, কিন্তু আলোচনার সময় দেখা যাইত, আমেরিকান শ্রোতারা ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর 'ব্যবসায়ী যুগল' কথাকে বুঝিতে অক্ষম।

বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে প্রায়ই মতের মিল হইত-না, তবুও এক সৌহৃদ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আলোচনা চলিত। শ্রোতারা বক্তার নিকট হইতে জানিতে চাহিত তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী—তাহা তাহাদের মনের মত হোক বা না হোক। আবার বক্তাও শ্রোতৃবৃন্দ মনের কথা জানিতে চাহিত। ইহাতে বাগবিতণ্ডা কলহের সৃষ্টি হইত, দূরের কথা বন্ধুত্বের সৃষ্টি করিত—বিদেশী এবং আমেরিকান শ্রোতার মধ্যে নূতন সৌহার্দ্দ্যের সূত্রপাত হইত।

এরূপ বিভিন্ন সেমিনারের আলোচ্য বিষয়গুলির ফলাফল পর্য্যালোচনা এবং যাহারা এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সেমিনারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের এক-একটি সম্মেলনে আহ্বান করিলে সুফল লাভের আশা করা যায়। প্রতি দিন সমস্যাগুলির পরিবর্ত্তন হইতেছে সুতরাং উপাত্ত(data)গুলিরও সংশোধন প্রয়োজন। এজন্য পূর্ব্বে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে যোগদানকারী সকলকে আগামী গ্রীষ্মকালে দিল্লীতে এক সম্মেলনে আহ্বান করিবার কথা হইয়াছে। এইরূপে দেশ-বিদেশের তরুণগণের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদান বর্ত্তমানে যেরূপ চলিতেছে, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা আরও বাড়িয়া চলিবে এবং স্থায়ী মিলনক্ষেত্র রচনা হইবে।

(ইউনেস্কো)

মেলি আঁখি জীবনের প্রথম প্রভাতে

শ্রীমায়ারাণী মৌলিক

মেলি আঁখি জীবনের প্রথম প্রভাতে—
আমারে পেয়েছ তুমি আপনার সাথে
শৈশব-ক্রীড়ায়, মমতারূপিণী আমি ছিনু তব সাথী
কৈশোরের, আমি তব কিশোরী বান্ধবী,
আমি তব যৌবনের প্রথম উন্মেষ।
মধু যামিনীতে তুমি বাসরশয্যায়, প্রতীক্ষা
করেছ যার আকুল আগ্রহে
আমি ছিনু উপলক্ষ তার।
তোমারি প্রদীপে আলোরূপে বিচ্ছুরিত
হয়েছি স্নিগ্ধ, নিত্য তব ধূপে
নিজেরে দহিয়া আমি বিলায়েছি গন্ধ আপনার।
নিদাঘ মধ্যাহ্নকালে বিশ্রামের ক্ষণে
দূরাগত বেণুস্বরে আমার কণ্ঠস্বর
পেয়েছ শুনিতে। ভ্রান্তিরূপে
কত বার এসেছি সম্মুখে, আমিই করেছি পার
সেই ভ্রান্ত পথ হাত দুটি ধরে।
ভোগে আমি সঙ্গিনী তোমার, ত্যাগে আমি
চির দিন গুরু। সংসারের রুক্ষ
পথে চির দিন আমি তব পথ-প্রদর্শিকা।
জীবনের সায়াহ্নে আমারে ডেকেছ তুমি
আকুল আহ্বানে, কৃতাঞ্জলিপুটে
অর্পণ করেছ ভক্তি আমার চরণে
বিদায়-গোধূলি ক্ষণে মৃত্যুরূপে
মুক্তিরূপা আমি, তোমারে বেঁধেছি চির
অচ্ছেদ্য বন্ধনে।
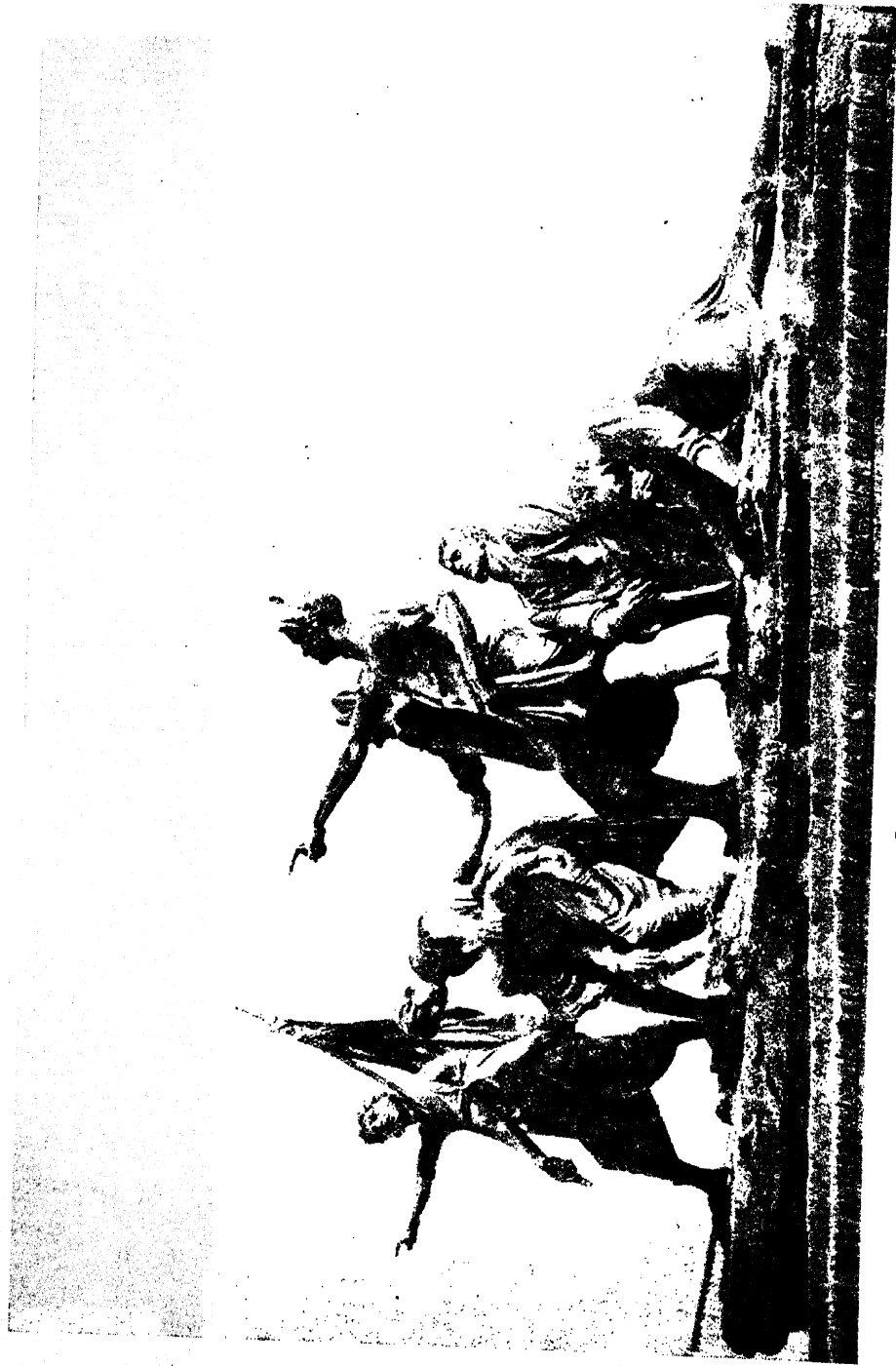
বিহার-শহীদ স্মারক, সমগ্র কম্পোজিশন

[ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সখী-সংলাপ" ফটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

লোকমান্য বাল-গঙ্গাধর তিলক

জন্ম—২৩শে জুলাই, ১৮৫৬ মৃত্যু—১লা আগষ্ট, ১৯২০

জীব-জগতে রূপ ও রং

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাণীজগৎ রূপ ও রঙের সমারোহে, স্বভাবজ চাতুরী ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ জীবজন্তু এদের ভিতর বিকশিত হয়ে উঠেছে সুন্দর বর্ণচ্ছটা, বিশ্ব-প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, পৃথিবীর মনোরম কান্তশোভার সঙ্গে বর্ণ মিলিয়ে তাল রেখে নিখুঁত ভাবে গড়ে উঠেছে এরা। বর্ণ-বৈচিত্র্য যেমন সারা জীবকুল জুড়ে, বিপুলা ধরণী যেমন বিভিন্ন প্রতিবেশে প্রতিপালন করেছে নূতন নূতন জীবদের—তেমনি নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়, প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন পটভূমিকায় এদের জন্ম মৃত্যু, আহার-বিহার, সংসারযাত্রা ঘরকন্না। নিত্যদৃষ্ট পোকাদের কথাই ধরা যাক: কি বিপুল বৈষম্য এদের—আকারে, প্রকৃতিতে ও বর্ণে। শ্যামাপোকাদের লক্ষ্য করে দেখবেন, পরস্পরের ভিতর দুস্তর ব্যবধান। পাখীরা সংখ্যাতীত। সংখ্যার দিক থেকে যেমন প্রজাপতি মথ শামুক-শুক্তির তুলনা মেলা ভার, তেমনি আকৃতিতেও এদের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। জীবকুলের দৈহিক রূপান্তরের জন্য প্রতিবেশ অনেকটা দায়ী। অবশ্য পরিবর্তন রাতারাতি হয় না, দুই-এক জন্ম বা বংশ-পতিতেও নয়, সহস্র সহস্র বৎসর অবলীলাক্রমে পার হয়ে যায় কথঞ্চিৎ অদলবদল হতে। উদাহরণস্বরূপ তিমি সীল সিন্ধুঘোটকদের কথা উল্লেখ করা যায়, এরা মাছ গোত্রের নয় মোটেই—হাতী বাঘ বরাহদের মত স্তন্যপায়ী। বৃহদায়তন দেহ নিয়ে গমনাগমনে অসুবিধা নিবন্ধন এবং আত্মরক্ষার্থে একদা এদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল গভীর সমুদ্রজলে, জলে বাস করে ক্রমশঃ এরা জলচর হয়ে উঠেছে।

প্রাণীদেহের পরিবর্তনের মূল কারণ—স্থানীয় জলবায়ু, গাছপালা ভূমির অবস্থান খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির তারতম্য। সমগোত্রের ভিতরেও অনেক পরিবর্তন হয়ে যায় এগুলির বৈষম্যে। দুর্যোগ দৈব-দুর্বিপাক (যেমন তুষারযুগের হিমবাহ ইত্যাদি পরিস্থিতিতে) প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হলে জীবকুলেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। খাদ্যান্বেষণে বা আত্মরক্ষার্থে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে পরিবর্তন হয়, যেমন হয়েছে ডোরাকাটা জেব্রা, লম্বাগলা জিরাফ ও বিশালদেহী গণ্ডারদের মধ্যে। অথচ এদের পূর্বপুরুষ এক। মাংসাশী, উদ্ভিদ-ভোজী ও তৃণভুকদের পূর্বপুরুষ একই শাখার অন্তর্গত, খাদ্যের বৈষম্য জীবনযাত্রা-পদ্ধতিকে ক্রমান্বয়ে ভিন্ন মুখে পরিচালিত করে অবশেষে স্বতন্ত্র প্রজাতির (species) সৃষ্টি করেছে। জীবনের প্রধান কথা—প্রতিবেশের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলা। যে ব্যক্তি বা জাতি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে অসমর্থ, প্রকৃতির রাজ্য থেকে তার চিরতরে বিদায় অবশ্যম্ভাবী। তাই আত্মরক্ষার তাগিদে জীব পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মিলে-মিশে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে চায়, অর্থাৎ ব্যক্তির মনে আত্মরক্ষাবৃত্তি সবচেয়ে প্রবল হওয়ায় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে স্বভাবে, ব্যবহারে, আচারে-আচরণে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অভিলাষ সুতীব্র। নিম্ন-জীবকুলে হয় ত শ্রেণীভেদে, জাতিভেদে এ বাসনায় তারতম্য বর্তমান, তবু এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তা হলে দেখা যাচ্ছে—দৈহিক আকৃতি গঠনের এবং পরি-বর্তনের মূলে রয়েছে প্রতিবেশের প্রভাব।

আত্মরক্ষা-পদ্ধতি সাধারণতঃ দুই রকম। প্রথমতঃ, শারীরিক শক্তিমত্তার সাহায্যে প্রতিবেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ, কৌশল অবলম্বন ও নিত্য নব উপায় উদ্ভাবনে প্রতিবেশকে আপন বশে রাখা। দৈহিক পরাক্রম, বিশাল অবয়ব ক্রোধ-প্রবণ, হিংস্রস্বভাব-যুক্ত প্রাণীর অভাব হয় নি পৃথিবীতে কোনদিন। অসুরসদৃশ ডাইন-সর-টেরডক্টিল গোষ্ঠী, অমিতপ্রতাপ খড়্গদন্তী বাঘ, বিশাল মেগুথী-থেরিয়াম—আবির্ভাবের প্রথম যুগ থেকেই এদের রূপ ভয়াল ছিল না। জৈব-বিবর্তনের ধারায় লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে এরা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্রথম ডাইনসর আধুনিক কুকুরের চেয়ে বৃহৎ ছিল না, আবার এদেরই বংশধর একদিন এক শত ফুট দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। স্থূল, মাংসল দেহ, বিশ ফুট দীর্ঘ গলা, পঁচিশ ফুট লেজবিশিষ্ট 'ডিপ্লোডেকাস' বাস করত জলাবাদা অঞ্চলে নির্বিঘ্নে, যুগ যুগ ধরে এদের শারীরিক আয়তনই বৃদ্ধি হয়েছিল, বুদ্ধির বিকাশ আদৌ ঘটে নি। হাতীর অদ্ভুত রূপ যেমন সাধারণের কাছে বিস্ময়কর, বিজ্ঞানীর কাছেও তেমনি। খাদ্যসংগ্রহের কাজে গজদন্ত ছুরির ব্যবহার (মূল উৎপাটনে) হ'ত অধিক, তাই এদের বৃদ্ধি। অস্থিহীন শুণ্ডের ব্যবহার জলপানের প্রয়োজনে, তথা ডালপালা ভাঙার জন্য-প্রয়োজন প্রকাণ্ড উপরোষ্ঠ। ক্ষুদ্র জীবেরাই কালক্রমে বিশাল হয়ে উঠে, কঠিন বর্মে বা আঁশে দেহ আবৃত হয়ে যায়, আত্মরক্ষা এবং আক্রমণে সুসজ্জিত হয়ে উঠে, দন্ত খড়্গ শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ-নখযুক্ত শক্তিশালী থাবার উদ্ভব হয়। এরা সাধারণতঃ বলবান ও বৃহদায়তন।

অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান প্রাণী আত্মরক্ষা করে চাতুর্য দ্বারা, শত্রুকে ধাপ্পা দিয়ে প্রতারণা করে পালিয়ে। শারীরিক পরাক্রম সর্বক্ষেত্রে সুফলপ্রদ হয় না, সেখানে কাজে লাগে উদ্ভাবনী শক্তি। সদা-সতর্ক তৎপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সম্ভাব্য বিপদ এবং অভ্যাগত শত্রুর গতিবিধির দিকে, চক্ষু কর্ণ নাসিকা যেন বিপদজ্ঞাপক যন্ত্র, সামান্য সন্দেহেই পশ্চাদ্দিকে চম্পট দিতে দ্বিধা করে না। এই ধারায় ছদ্ম-রূপতার অভিব্যক্তি হয়েছে—এবং বর্ণভঙ্গির সুসামঞ্জস্যবিধানে প্রতি-কূল আবহাওয়া ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান অনেক ক্ষেত্রে দেখা

গিয়েছে। দারুণ শীতে আঁশের বিলুপ্তি হয়ে দেহ রোমশ হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে হস্তে গজিয়েছে পালকের আচ্ছাদন। তুষারযুগে অনেক দানবাকৃতি প্রাণীরা নির্মূল হয়ে গিয়েছিল অথচ স্তন্যপদ চতুর প্রাণীরা অঙ্গে রোমশ আচ্ছাদনের উদ্ভব হওয়ায় হিমশীতল পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিল। পুরাকালে ম্যামথদের বিচরণভূমি ছিল তুষারাবৃত সাইবেরিয়া-প্রান্তর, সেজন্য এরা ছিল লোমশদেহ। এখনকার হাতীরা থাকে গ্রীষ্মাঞ্চলে—দেহ নির্লোম। পর্ব্বত-উপত্যকার জীব—লামা ইয়াক আলপাকা কস্তুরী চমরী গাইদের দেহ আবৃত ঘন লোমে। জলের বাসিন্দাদের দেহ নগ্ন চিক্কণ, এক কুমীরের শক্ত আঁশ ছাড়া, জলচারী প্রাণীদেহে আবরণ বড় একটা দেখা যায় না। উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল স্থানে কোমল দেহরক্ষায় আঁশের উপযোগিতা। গণ্ডারের গায়ের উপরিভাগের চর্ম্ম সুকঠিন, তাকে ছুটাছুটি করতে হয় ঘাসঝোপের জঙ্গলে। কণ্টকীলতা, বৃক্ষাদিতে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে অবশিষ্ট থাকত না কিছুই যদি না পুরু চর্ম্মের আবরণে দেহ ঢাকা থাকত।

এটা জানা কথা যে, শত শত শতাব্দী ধরে এক একটি ভিন্ন প্রতিবেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে। কোন প্রান্তরে যদি বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গিয়ে ঊষর মরু দেখা দেয়, রসালো লতাপাতা হয় নিশ্চিহ্ন সেখানে সাধ করে পড়ে থাকবে কোন নির্ব্বোধ। কিন্তু প্রাণীদের মধ্যে এমন এক দল ছিল, যারা কাঁটাগাছ খেয়ে, বহুদিন জলপান না করে মরুবালুকার উপর থপাথপ পা ফেলে চলাফেরা করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল—উট তাদের বংশধর। গায়ের রঙ, কুঁজ-বিশিষ্ট আকৃতি, দুই-ই মরুভূমির রঙ ও রূপের সঙ্গে চমৎকার মিশ খেয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার মরুতে দুই এক জাতের গিরগিটি আছে—পৃষ্ঠদণ্ড সমন্বয়ে তাদের চর্ম্ম যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে বোধ হয়, তারা যেন কাঁটাগুল্ম-সমন্বিত রৌদ্রদগ্ধ বালুকার চিক্কণ অঙ্গ। সুন্দরবনের দীর্ঘ ঘাস পাতা ঝোপের জলাজমিতে রাজাবাঘের রক্তিম আস্তরণের উপর কালো ডোরা দেখতে ভাল, আবার উত্তমরূপে আত্মগোপন করে থাকবার পক্ষেও প্রশস্ত। উপরের দিকে যেমন তৃণ-লতাগুল্মের জড়াজড়িতে ডোরা মিশে যায় বেমালুম, দূর হতে কিছু দেখা দুষ্কর—নীচের দিকের শ্বেত তেমনি ভূমির রঙে অবলুপ্ত।

লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাকে শত্রুর শ্যেন দৃষ্টি থেকে গোপন রেখে শিকারের প্রতীক্ষায় থাকা প্রায় সকল মাংসাশী জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম। এতে যুগপৎ আক্রমণ আত্মরক্ষা চলে। চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের অনুরূপ হয়ে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ উভয়ই এক একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি, জীবজগতে এদের প্রয়োগ অবাধ। নিরামিষাশী ও নিরীহ প্রাণীদের পক্ষে বহির্জগতের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে দেহ একীভূত করে রাখা অপরিহার্য্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্য্যরশ্মি সাধারণতঃ পড়ে খাড়াভাবে, মসৃণ দেহে ছায়া ও প্রতিফলন সুস্পষ্ট করে তোলে বেশ দূর থেকেও। সেকারণে এখানকার জীবজন্তুদের পশ্চাদ্ভাগকে উদরাপেক্ষা ধূসর করে আলোছায়ার প্রতিফলনকে নিষ্ফল করতে হয়েছে। জেব্রার কালো ডোরা, জিরাফ ও চিতার ধূসর বুটি, নিকট হতে চকচক করে, কিন্তু তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে এবং বৃক্ষলতাদি-সমাকীর্ণ জঙ্গলে সূর্য্যের আলো এদের একেবারে লুপ্ত করে দেয়, আধ-আলো আধ-ছায়া আঁধারের মাঝে সাড়া পাওয়া কঠিন। মেরুপ্রদেশ তুহিন এবং শীতের রাজ্য, শ্বেত সেখানে রাজা; পশুপক্ষী জলচর সবাই শুভ্র হিমানীবর্ণের, সীল সিন্ধুঘোটক ভল্লুক পেঙ্গুইন সবার চর্ম্মেই শ্বেতের প্রাচুর্য্য। গভীর সমুদ্রের অধিকাংশ প্রাণীই নীলাভ-শ্বেত, চতুষ্পার্শ্বস্থ নিথর অন্ধকার অবস্থার সহিত এদের রঙের অপরূপ সমন্বয়। সমুদ্রের শুক্তি শঙ্খ অনেকেই দেখেছেন, কাঁকড়া ইত্যাদি অন্যান্য প্রাণীরাও বর্ণচোরা, কাঠবিড়াল ও অধিকাংশ পক্ষিকুল গাছপাতা মেটে বল্কল ছোট ডালপালার সঙ্গে আশ্চর্য্য অন্তরঙ্গতায় মিশে থাকে—চেনা কঠিন। পেচক সাধারণতঃ ধূসর বল্কল রঙের। কোকিল কাক ফিঙা বুলবুল বৌ-কথা কও এরা কৃষ্ণ বর্ণের, টিয়া চন্দনা নীলকণ্ঠেরা সবুজ নীল, বৃক্ষে আত্মগোপনের পক্ষে উভয়ই উপযুক্ত। আকাশে যারা উড়ে বেড়ায় তাদের গায়ের ছাই রং আকাশের আশমানী রঙের সঙ্গে মিলে থাকে, আর পীতাভ মৃত্তিকার ছায়া নিম্নভাগে পড়ে নীলাভশ্বেত আভায় মিলিয়ে যায়। প্রতিবেশানুরূপ নিজেদের বর্ণ ও আকৃতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে হিংস্র প্রাণীরা আক্রমণের সময়। বাঘের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কুমীরদের সময় সময় শুষ্ক কাঠের গুঁড়ির মত নিঃসাড়ে পড়ে থেকে শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরতে বা লেজের ঝাপটায় তাকে অতর্কিতে জলে ফেলে দিতে দেখা গেছে। জাগুয়ার ব্রেজিলের ঘন অরণ্যানীর সঙ্গে মিশে থাকে; মালয়ের স্যাতসেঁতে বনে চুপিসাড়ে পড়ে থাকে বিরাট পাইথন, আসামে এবং বর্ম্মায় বোয়াময়াল গাছের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ওৎ পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিকার-প্রতীক্ষায়। মাংসাশী প্যাণ্ডার শ্বেত ও কৃষ্ণ রং বেশ মিশে যায় পাহাড়ী বাঁশ-ঝাড়ের পরিবেশে। অনেক ভ্রাম্যমাণ যাযাবর প্রাণীর রং ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তনশীল—যেমন, ক্যাটল মাছ ও আমাদের নিত্যদৃষ্ট বহুরূপী। লেমিং ও আর্টিক শৃগাল, আলপাইন শশক, নকুলজাতীয় আরমিন ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বর্ণপরিবর্ত্তনে সক্ষম। আমেরিকান স্কাঙ্ক পূতি-গন্ধ নির্গত করে আত্মরক্ষার প্রয়াসে।

রক্ষাবর্ণ ছাড়া জীবকুলে আর এক উপায়ে সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হয়। প্রাণীজগতে উচ্চ স্তরে বর্ণবৈচিত্র্যের উন্মেষ প্রণয়-অভিসার-লীলা হতে। ইতর প্রাণীজগতে দেহের আচ্ছাদন দেহের ছন্দ-সুষমা শ্রী সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দৈহিক শক্তির অধিকারী হয় পুরুষ, স্ত্রী-জাতীয়া ইতর প্রাণীরা সাধারণতঃ রূপহীন, বিশেষত্ববর্জ্জিত। জীবন-সংগ্রাম যেমন আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তীব্র, প্রণয়-ব্যাপারেও তেমনই কঠোর সংগ্রামশীলতা। রূপগুণের পসরা সাজিয়ে বসতে হয় বেচারা পুরুষদের, জয়মাল্য সমেত সঙ্গীলাভের আশায়। প্রেমের হাটে উমেদার অগণিত, কোন ভাগ্যবানের অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে তা নির্ভর করে অনেকটা বাহ্যিক মর্জ্জির উপর। বসন্তসমাগমে প্রাণী-জগতে দেখা দেয় সৌন্দর্য্যের সমারোহ। সাড়া পড়ে যায় যথাসম্ভব বিচিত্র বর্ণসম্পদে নিজ নিজ দেহ সুসজ্জিত করবার—স্বর্গ-পাখী,

টুনটুনি, জলমোরগ, চন্দনা, কেজ্রেন্টদের কারও পক্ষ, কারও পুচ্ছ, কারও ঝুঁটি সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্যে, রূপের ছটায় বর্ণসমাবেশে হয়ে উঠে মনোহর, তখন পরস্পরকে পরাজিত করতে অক্লান্ত চেষ্টা। মেঘ-মেদুর আকাশতলে ময়ূরীর সপ্রশংস বরণদৃষ্টি এসে পড়ে অপূর্ব্ব পেখমবিস্তারে নৃত্যরত ময়ূরের পানে। বলশালী প্রাণীরও চিত্তভূষণ হয়। মত্ত বারণ নামে মরণপণ রণে স্ত্রীলাভের আশায়, কুরঙ্গের শৃঙ্গোদ্গম হয়, সিংহ কুমীররা যেন নবযৌবন ফিরে পায়, ম্যানড্রিলরা অদ্ভুত রক্তবর্ণ হয়ে উঠে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে যুদ্ধে নামে বনমানুষরাও, প্রত্যেকে হয় সৌন্দর্য্যে, না হয় অস্ত্রসজ্জায় বিক্রমে হয়ে উঠতে চায় অনুপম। পাখী ও প্রজাপতিদের মধ্যে দেখা যায়—উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে পক্ষ আন্দোলনে প্রণয়িনীর চক্ষে নিজেদের সুন্দর প্রতিপন্ন করবার অকুণ্ঠ প্রয়াস। জীববিদ একে অভিহিত করেছেন যৌন-নির্ব্বাচন নামে। এখানে উদ্যোগী মনের সক্রিয় প্রভাব অবিসংবাদিত রূপে দেহকে অপরূপ শোভায় দেয় সাজিয়ে, অথবা নবচেতনার উন্মেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উদ্বুদ্ধ করে। ফ্রয়েড বলেছেন—রুচি, রসময় কল্পনা ও সৌন্দর্য্যভাবের জন্ম প্রেমকে কেন্দ্র করে—ডারউইনের যৌন-নির্ব্বাচন আলোচনায় তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত এবং মানব-আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হতেই এই ভাববৃত্তির গঠন হচ্ছিল জৈব-বিবর্ত্তন ধারায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, ফুলের সুষমা ও গন্ধের বৈচিত্র্য-সম্পাদন পতঙ্গকুলের অবদান। চমৎকার রং ও সৌগন্ধের আকর্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গকুল মধু-লোভে এসে বসে ফুলে ফুলে, একটির পরাগ অন্যটিতে মাখিয়ে বংশবিস্তারে সাহায্য করে। ভ্রমর-সমাগম না হলে বর্ণ হয় মলিন, গন্ধ থাকে না, ফুলের জীবনই ব্যর্থ।

রূপ ও রঙের ব্যাপ্তি জীবজগতে অত্যন্ত অধিক এবং জীবন-সংগ্রামে এর মূল্য প্রায় অপরিমেয়। রক্ষাবর্ণের আরও প্রকারভেদ আছে যার সাহায্যে ভীরু নিরীহ অমেরুদণ্ডী (সময় সময় মেরু-দণ্ডীরাও) জীব আত্মরক্ষার পন্থা উদ্ভাবন করে। এই অপরূপ পন্থার পিছনে সহজাত বুদ্ধির কোন প্রভাব নেই এমন কথা জোর করে বলা চলে না। এর নাম অনুকৃতি, সাধারণতঃ কীটেরা ভোল পাল্টে শত্রুর চক্ষে ধুলা দেবার প্রয়াস করে নানা ভাবে। প্রজাপতি ও শুয়াপোকার কয়েকটি 'জাত' সুস্বাদু—পশুপক্ষীর ভোজ্য; আবার কয়েকটি 'জাত'কে সকলে সযত্নে এড়িয়ে চলে, এরা বিস্বাদ, অনেকে দুর্গন্ধযুক্ত। অনেক স্থলে স্বাদু কীটেরা ভোল বদলে অবিকল দুর্গন্ধ কিংবা বিস্বাদ কীটের মত হয়ে থাকে—প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এইরূপ পরিবর্ত্তনে হয়ত কুলস্মৃতির প্রভাব থাকে। আফ্রিকার এক জাতের মাছি বর্ণ আকার আচরণে অনেকটা মৌমাছির ন্যায়, সেই সুযোগ নিয়ে ডিম পাড়ে এদেরই গৃহে—ঠিক কোকিলের অনুরূপ আচরণ। ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা, ভালমন্দ সন্তান-সন্ততির মনে খানিকটা দানা বাঁধে—সে যতই অল্প হউক না কেন। বাবুই প্রভৃতি কয়েক জাতের পাখীদের নীড়-রচনা সুন্দর কারুশিল্প, ও য়াপোকা বা মথের গুটিনির্মাণ ও উত্তর আমেরিকার বীবরদের ঝরণায় বাঁধ দিয়ে জাঙ্গাল নির্ম্মাণ স্থাপত্য-বুদ্ধির চমৎকার নিদর্শন। কীটকুলকে অনেক স্থলে আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত পরি-বর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে নিতে দেখা গেছে। নির্ম্মল উন্মুক্ত প্রকৃতির অঙ্গে যে ময়লা-ধুলোর প্রলেপ পড়েছে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশে, কারখানা-সমন্বিত শহরগুলির আকাশে যে সব মথ ও কীট ভেসে বেড়ায় তারা ধূসর-কৃষ্ণ, অথচ এক শতাব্দী পূর্ব্বে এ রঙের কোন কীট ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্যমের সকল প্রয়াস এক্ষেত্রে, সন্তান-সন্ততি প্রাণধর্ম্মের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলেছে এগিয়ে। গাছ, সতেজ পাতা, ঝরাপাতা, কচি ডাল, শুষ্ক ডাল বল্কলের আকৃতি গঠন পরিবেশ এবং রঙে একাত্ম-হয়ে-থাকা কীট আছে প্রচুর। সজিনা ফুলে এক জাতের মাকড়সার বাস, তারা শ্বেত; পূর্ণ সবুজ মাকড়সা দেখা যায় কুমড়ো শাক, লাউ শাকে। প্রজাপতির জীবনযাত্রা-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একবার দেখলাম—পাতার উপর পাখীর বিষ্ঠা যেন ঈষৎ আন্দোলিত হ'ল, ভাল করে চেয়ে দেখলাম অবিকল ঐ বর্ণের এক শূক। এক বৈজ্ঞানিক গিরগিটির শূক-শিকার পর্য্যবেক্ষণে নিরত ছিলেন। শূকটি অকস্মাৎ তির্য্যক গতিতে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন মনে হতে লাগল—কচি ডাল একটি, গিরগিটিপুঙ্গব ত হতভম্ব ও প্রতারিত। বাঁশ-পোকাদের বিচিত্র অনুকৃতি আশ্চর্য্যান্বিত করে পর্য্যবেক্ষককে, অধিকাংশ সময়েই এরা অচঞ্চল অবস্থায় ক্যাঁকড়া ও ছোট ছোট ডালের পরিবেশে নিখুঁত ভাবে আত্মগোপন করে থাকে—সরু সরু হাত পা দেহ ও রঙে কোন তফাৎ ধরা পড়ে না। ঘাস-পাতা রঙের ছোট প্রজাপতি, অবিকল পত্রাকৃতি ডানার কীট অনেকেই দেখেছেন। এদের দেহগঠন-কৌশলে কি মনে হয় না যে, বংশপরম্পরায় প্রতিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়াসের এ হ'ল সুষ্ঠু পরিণতি! আমেরিকায় এক জাতের ম্যান্টিস—পক্ষবিস্তারে ঠিক পাতার মত, কোন ক্ষুদ্রাকৃতি জীব এর ভ্রম করে পাতায় বিশ্রাম করতে, অমনি উদরসাৎ হ'ল। এমন অনেক প্রজা-পতি শুটিপোকা মথ আছে যারা বিপদের আশঙ্কামাত্রেই এমন রূপ-ধারণে অভ্যস্ত যে, তার তারিফ না করে পারা যায় না। অনেকে মৃতের মত নিশ্চল নিথর হয়ে পড়ে থাকে, কেউ কেউ ধাপ্পা দিতে ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কেনিয়ায় এক জাতের গিরগিটি আছে—বিপদের আভাস পেলে তাদের মুখাবয়ব এমন ভয়াল রূপ পরিগ্রহ করে যেন পুরাকালের ডাইনসর। কীটবিদ গ্রেগরি আফ্রিকায় এক জাতের ফড়িং দেখেছিলেন যারা সাপের মত হিসহিস শব্দ করতে ওস্তাদ।

সমুদ্রতলের অধিবাসীদের অনেকের রক্ষাবর্ণ তথা পরিবেশের উপযোগী আকৃতির উদ্ভব হয়েছে। প্রবালদ্বীপসমূহের প্রতিবেশী মাছগুলি ঠিক ঐ বর্ণের; অতলান্তিকে সারগেসো সাগর জলজ গুল্মলতায় বদ্ধ, সেখানে মাছ ইত্যাদি জীব অদ্ভুত ভাবে প্রতিবেশ-অনুরূপ হয়ে উঠেছে। জল-অশ্ব নামে মাছের প্রতিকৃতি অনেকেই হয় ত দেখেন নি। এদের আকৃতি কিন্তু একেবারে

নড়াচড়ায়োগের প্রায়। আবার অনেকে দেহের সঙ্গে তৃণ পাতা ইত্যাদি বহন করে বেড়ায় শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে, কাঁকড়া সী-এনিমন এ বিষয়ে সুদক্ষ; শুক্তি-শামুকের খোলসেরও ব্যবহার হয় এ কাজে। নানা ভাবে দেহকে পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে অদৃশ্য রাখলে শুধু যে শত্রুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে জীবনরক্ষা হয় তাই নয়, শিকার ধরাও চলে বেশ সহজে। পশ্চিম ইণ্ডিজের সূর্য্যমাছ (এঞ্জলারের জাতি) গভীর জলের প্রাণী; উজ্জ্বল দ্যুতি-সংযুক্ত টোপ এর উপরোষ্ঠ থেকে একখানি লম্বা বড় দিয়ে গাঁথা, থাকে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব্বভাগে ১১০ ফ্যাদম নীচে; জোনাকির মত উজ্জ্বল জ্যোতিতে প্রলুব্ধ হয়ে আসে জলজ প্রাণীরা এবং পৌঁছয় সোজা এদের উদরে। সুগভীর সমুদ্রের অনেক প্রাণী ফসফরাসের মত নীলাভ উজ্জ্বল দ্যুতিবিশিষ্ট। নিকষ তিমিরলোকে বাস অতএব দেহস্থিত এই জান্তব জ্যোতি পথ আলোকিত করে থাকে খানিকটা, ভূমধ্যসাগরের জেলীমাছ, জাপান সাগরের স্কুইড, মধ্য-আতলান্তিকের হাঙ্গর, সমুদ্রতলস্থিত নানা জাতের চিংড়ি ও অন্যান্য পোকা অত্যদ্ভুত আলোকবিচ্ছুরণে সক্ষম। জলতলের অসংখ্য রহস্যময় বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রাণীর দেহস্থিত সক্রিয় আলো অন্যতম। আত্মরক্ষা, বিশেষতঃ খাদ্য-সন্ধানে এর উপযোগিতা সমধিক।

প্রাণীজগতে আত্মরক্ষা আত্মগোপন শিকার বংশরক্ষা প্রণয়ে সাফল্য প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বলাভের জন্য রূপ রং ও অনুকৃতির উদ্ভব এবং ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালে হয়েছে এর পরিস্ফুরণ। জন্মগত এই স্বভাবগুলির উদ্ভব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে, এই হ'ল প্রাচীন পোল্টন মুলার প্রমুখ জীবতত্ত্ববিদদের অভিমত। চতুর পিতামাতা, সন্তানসন্ততি ও তাদের বংশ জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করে, একটি ধারা কোন বিশিষ্ট উপায়ে জীবন যাপন করে। তাদের স্বভাব বদলায়, ধরণ-ধারণ আচার-আচরণে ধীরে ধীরে আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জমে জমেই সৃষ্টি হয় জাতীয় বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কুলস্মৃতি; কৌশল আয়ত্ত করে পরিবেশে বদলায় রূপ রং দেহাকৃতি। যারা প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনই সব মনে করে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণ করতে অনিচ্ছুক তারা নিম্নস্তরের প্রাণী। শুয়াপোকা গুটিপোকার আত্মরক্ষা পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলে ব্যক্তিগত প্রয়াসের মূল্য বুঝতে পারা যাবে। ঠিক মনের অংশটুকু বললে হয় ত সবখানি বলা হয় না, প্রাণের সর্ব্বময় প্রচেষ্টা ব্যতীত আক্রমণাত্মক অনুকৃতি ও সাবধানী বর্ণ নিরর্থক, অন্ততঃ এদের প্রয়োগ ও ফলপ্রদ কার্য্যকারিতা ত বটেই। নিরীহ কীট পতঙ্গ শূক প্রজাপতি মথদের শত্রুসংখ্যা নগণ্য নয়। হন্তাদের চেয়ে এরা দ্রুতগামী বা সতর্ক নয়, সেজন্য তিল তিল করে গোড়াপত্তন করতে হয়েছে—রূপ ও রং বদলে বিরক্তিকর অথবা বিপজ্জনক প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে, ভয় দেখিয়ে বা ঘৃণা উদ্রেকের প্রবঞ্চনায়। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূল্যের কথা, কিন্তু একটি দুটি জন্মে এ হেন বুদ্ধি-গঠন অসম্ভব। প্রাণান্তকর প্রয়াসে সঞ্চিত হয়েছে আত্মরক্ষার অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করেছে নূতন পন্থা, অভিনব পদ্ধতি, বংশপরম্পরায় স্তূপীকৃত হয়েছে জাতিগঠনের উপাদান—একেই আমরা বলেছি কুলস্মৃতি। রূপ রং অনুকৃতি এরই অমূল্য দান।

আগমনী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

থামে না থামে না, বৃষ্টি থামে না, আকাশ আকুল মেঘে,
নীলের বিলাস মুছে গেছে বুঝি কালোর ছোঁয়াচ লেগে।
দূর দিগন্তে উঁকি দিয়ে গেল, তাহারে গেল না পাওয়া,
বনে প্রান্তরে এখনো যে ফেরে মত্ত উতল হাওয়া,
অশ্রুত সুর—বাজে নি মধুর এখনো দূরের বাঁশী,
এখনো ফোটে নি, এখনো ঝরে নি শুভ্র পুষ্প রাশি।
বেদনা-বিবশ এখনো দিবস, রাত্রি জ্যোৎস্নাহারা,
ঝ'রে পড়ে শুধু ঝর ঝর স্বরে এখনো বৃষ্টিধারা।
তোমরা জানো না কেউ,
মনের মাঝারে উঠেছে আমার অশ্রু জলের ঢেউ।

তবু জানি জানি বর্ষা থাকে না, অম্লান হয় দিন,
শরতের সুরে সহসা কখন্ বাজে জীবনের বীণ্।
যবনিকা কবে উঠে যায়, হেরি ঊর্দ্ধে অসীম নীল,
মনের সঙ্গে খুঁজে পাই সেই মুক্তাকাশের মিল।
রজনী সে হয় রজত-বরণী, ধরণী মাধুরীভরা,
স্বর্ণ-আলোকে উচ্ছলি ওঠে তটিনী কলস্বরা।
স্নিগ্ধ বাতাসে কুসুমের মৃদু গন্ধ ভাসিয়া আসে।
এস গো আলোকে, এস আনন্দে, এস জীবনের পাশে।
গাই তারি আগমনী,
মধুর মন্ত্রে হৃদয়ে হৃদয়ে সে গান উঠুক রণি'।

গুরুদক্ষিণা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তার পর চলে গেল অনেক দিন।

অনেক সংঘাত অনেক সংঘর্ষ অনেক ঝড় অনেক প্লাবন অনেক ভাঙাগড়া—অনেক বৎসর মাস। প্রায় পঁচিশ বৎসর। দুটো যুগ। বারো বছরে নাকি একটা যুগ। কিন্তু যুগান্তর বললে ভুল হবে। যুগান্তর ত বারো বছরে অনেক হয়েছে, কিন্তু বহু যুগান্তরেও এত বড় পরিবর্তন হয় নি। কালান্তর হয়ে গেল। একটা বিস্ময়কর কালের সূর্যোদয় হ'ল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল।

বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। দেশ ভাগ হ'ল। ভারতবর্ষ পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেলে। ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনির মধ্যে, জীর্ণদেহ শীর্ণকায় কোটি কোটি মানুষের আনন্দ-কলরোলের মধ্যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ল।

চৈতন্য ইনষ্টিটুশনেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে পরিবর্তন ভাঙার দিকে নয়, গড়ে গড়ে সে বড় হয়েছে। অনেক বড়। বড় বড় বাড়ী হয়েছে; ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কত শিক্ষক এসেছেন—চলে গেছেন। পুরনো কালের শিক্ষক আর কেউ নেই—থাকবার মধ্যে আছেন চন্দ্রবাবু। সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ চন্দ্রভূষণ বাবু। মাথার চুলগুলি সাদা হয়ে গেছে। তবু তাঁর দেহ এখনও সমর্থ আছে। তবে তিনি আর এখন হেডমাষ্টার নন—তিনি চৈতন্য ইনষ্টিটুশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে এক ঘণ্টা করে ইংরেজী পড়ান, আর ইস্কুলের পরিচালনার দিকটা দেখেন। ঠিক সেই সাড়ে দশটায় এসে সিঁড়ির উপর দাঁড়ান। সামনে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছেলেরা এসে দাঁড়ায়। কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলে সুর করে স্তোত্রপাঠ করে—

ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণঃ—

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে

ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণঃ।

ত্বমস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম্‌॥

পাঁচ শ'র কাছাকাছি ছেলের সংখ্যা। সমবেত কণ্ঠ আকাশ স্পর্শ করে। প্রার্থনার শেষে ক্লাস আরম্ভ হয়—চন্দ্রভূষণ বাবু সেই প্রাচীন নিয়মমত একবার সকল ক্লাস ঘুরে আসেন। সঙ্গে থাকেন নতুন হেড মাষ্টার। নতুন হেডমাষ্টার এখন বসন্তবাবু; চন্দ্রবাবুর কাছে সে বসন্ত। এই ইস্কুলেরই ছাত্র। বিল্বগ্রামের পাশের গ্রামেই বাড়ী। মাখনবাবু সেকেণ্ড মাষ্টার চলে যাবার পর সে সেকেণ্ড মাষ্টার হয়ে ঢুকেছিল। এখানে চাকরি করতে করতেই সে এম-এসসি এবং বি-টি পাস করেছে। সেকেণ্ড মাষ্টার থেকে হয়েছিল এসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার—তার পর হেডমাষ্টার হয়েছে। ইস্কুলের ক্লাসগুলি দেখে আসার পর চন্দ্রবাবু ইস্কুলের হিসেবনিকেশ, চিঠিপত্র এবং ইস্কুলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে থাকেন। আপনার মনে কাজ করে যান। জেয়াউদ্দিন চলে গেছে। রামজয় চলে গেছে। সঙ্গী নাই, সাথী নাই। চন্দ্রবাবু একা। থাকবার মধ্যে আছে জীবনের সাথী ইস্কুল—চৈতন্য ইনষ্টিটুশন।

দুপুর বেলা বারোটার পর তিনি বাসায় যান। শূন্য ঘর—কেউ নাই। বঙ্গবালার মৃত্যুর পর সত্যবতী বেশী দিন বাঁচেন নি। বছর দুয়েক বেঁচে ছিলেন; তাও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চুপচাপ বসে থাকতেন। শুধু কুমারী বয়স্কা মেয়ে দেখলেই অধীর অস্থির হয়ে উঠতেন। বলতেন—বিয়ে হয় নি কেন? হ্যাঁ গো মা বিয়ে কর না কেন? অভিভাবিকা সঙ্গে থাকলে তাদের কাউকে মিনতি করতেন—বিয়ে দাও মা, মেয়ের বিয়ে দাও। দেরি করো না। দেরি করো না। কাউকে কটুকাটব্য করতেন—স্বার্থপর, লজ্জা নাই; ঘেন্না, ঘেন্না, ঘেন্না। বেরিয়ে যাও—তোমাদের মুখ দেখলে পাপ—মুখ দেখলে পাপ!

ভাগ্য ভাল সত্যবতীর—দু'বছরের বেশী যন্ত্রণা সইতে হয় নি। চন্দ্রবাবু তাঁর মৃত্যুশয্যায় বসে মনে মনে প্রার্থনা করতেন—মুক্তি দাও—ভগবান—সত্যবতীকে তুমি মুক্তি দাও।

নিঃসঙ্গ ঘরে এসে স্নান সেরে তিনি পূজায় বসেন।

সে পূজা তাঁর নিজস্ব মতের পূজা। ওই বঙ্গবালার মৃত্যুর পর থেকে তিনি পূজা করছেন। বঙ্গবালার মৃত্যুর দিন রাত্রে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন ইস্কুলের সিঁড়ির উপর। রাত্রি তখন অনেক। সমস্ত বোর্ডিং স্তব্ধ। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মাষ্টার ক'জন শুধু অসহায়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। না পারছেন কাছে এসে বসতে, না পারছেন ঘরে গিয়ে শুতে। কাছে বসেছিলেন শুধু ব্রজবিহারী বাবু। তাঁর মত লোকও কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একা কথা বলছিলেন শুধু চন্দ্রবাবু। সে কথা শুধু ইস্কুলের কথা। ইস্কুলের নতুন একখানি বাড়ী হবার কথা হচ্ছিল তখন। চন্দ্রবাবু সেই নতুন বাড়ীর কথা বলে যাচ্ছিলেন।

বাড়ীখানা পূর্ব্বদ্বারী হলে কিন্তু আয়তনে কিছু ছোট হবে। না ব্রজবিহারী বাবু? মানে এবার যে রেজাল্ট হয়েছে—তাতে ছেলে আমাদের বাড়বে। যে প্ল্যান করেছিলাম, আমার বিবেচনায় সে প্ল্যান বদলে বড় করা উচিত।

কি বলবেন ব্রজবাবু? কি উত্তর দেবেন?

চন্দ্রবাবু উত্তরের প্রতীক্ষা করেন নি। বলেই চলেছিলেন—আর ওই খড়ের চাল বোর্ডিংটা। ওটার অবস্থা বড় খারাপ হয়েছে। ওটাকে ভেঙে—মাটির দেওয়াল—পাকা মেঝে আর রাণীগঞ্জ টাইলের ছাদ—বাংলো টাইপের একটা বোর্ডিং। এখন একোমোডেশন ওতে পঁচিশ-ছাব্বিশ জনের—ওটাকে পঞ্চাশ জনের একোমোডেশন করে করলে—ব্যস—এখনকার মত নিশ্চিন্ত। কি বলেন?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারেন নি। তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন—হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। মনে হচ্ছিল—চন্দ্রবাবু জলে ডুবে যাচ্ছেন—তিনি তাঁকে উদ্ধার করতে এসে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তিনিও জলে যাচ্ছেন। তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না। পঙ্গু হয়ে গেছেন।

তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন রামজয় পণ্ডিত। পণ্ডিত শ্মশানে গিয়েছিলেন—সেখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন বাড়ী কিন্তু বাড়ীতে থাকতে পারেন নি, থাকতে চেষ্টা করেও পারেন নি—এই প্রায় মধ্যরাত্রে উঠে এসেছেন চন্দ্রকে দেখতে।

রামজয় এসে পাশে বসে চন্দ্রভূষণের পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন—চন্দ্র—চিতা মৃতকে ভস্ম করে, আমরা কলনীর জলে বঙ্গমার চিতা নিভিয়ে এসেছি; চিন্তা—শোক—জীবন্তকে দগ্ধ করে, অশ্রু জলে নেভে না, ওকে চোখের জলে নেভাতে হয়। তুমি একটু কাঁদ চন্দ্র।

ব্রজবিহারী বাবু সুযোগ পেয়ে উঠে চলে গিয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—কান্না ত আসছে না রামজয়! আর আমি কি কাঁদতে পারি? মৃত্যু অনিবার্য্য, শোক মিথ্যা; আমি শিক্ষক, আমি জ্ঞানের তপস্বী, আমি কি করে কাঁদব—এই এত ছেলে যারা আমার কাছে শিক্ষা পেতে এসেছে, এরা ভবিষ্যতে শোকে দুঃখে যে তা হলে বানের মুখে কুটোর মত ভেসে যাবে। আর—

কথা বন্ধ করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলেছিলেন—কান্না নাই। কান্না আসছে না।

রামজয়ও এবার স্তব্ধ হয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—অগস্ত্য ঋষির গল্প বল তুমি। রামজয়, জ্ঞান আমার চোখের জলের সমুদ্র অগস্ত্যের মত নিঃশেষে পান করে নিয়েছে।

রামজয় বলেছিলেন—তুমি দীক্ষা নাও চন্দ্র।

—দীক্ষা?

—হ্যাঁ। হিন্দুর সন্তান, দীক্ষা নাও। তুমি পাবে।

—পাব? মানে বলছ—

—ভগবানের দয়া।

উত্তর দেন নি চন্দ্রবাবু। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আকাশের দিকে মুখ তুলে বসে থাকতে থাকতে বলেছিলেন—ওঃ কালপুরুষ নক্ষত্রের পিছনে লুব্ধকটা জ্বলছে দেখ! ডগ-স্টার!

তার পর বলেছিলেন—ওই হ'ল কর্কট। দাঁড়াটা দেখছ? ওরই পাশে সিংহ। ওই তুলা।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—রাত্রির আকাশের দিকে তাকালে ঈশ্বরকে না মেনে উপায় থাকে না।

এর পর তিনি গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। মহাকবির কাছে গিয়েছিলেন—বলেছিলেন—আমি শোকার্ত্ত। আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। বিশ্বসংসার শূন্য। সান্ত্বনা কিসে আমাকে বলুন।

মহাকবি তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—আনন্দের ধ্যানে।

—আনন্দের ধ্যানে? কিন্তু আনন্দকেই যে আমি হারিয়েছি।

মহাকবি বলেছিলেন—যাঁর সৃষ্টিতে রূপ রস সঙ্গীত কোমলতা মিষ্টতার শেষ নাই—তিনিই আনন্দ। তাঁর ধ্যানেই শোকও মধুর হয়ে ওঠে, শূন্য পূর্ণ হয়।

ওখানেই উপাসনা মন্দিরে তিনি মহাকবির উপাসনা শুনে এসেছিলেন। গান শুনেছিলেন—

মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হ'ল শেষ।

আর শুনেছিলেন—

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু!

ফিরে আসবার সময় মহাকবিকে প্রণাম করে বলেছিলেন—আমি পেয়েছি।

মহাকবি বলেছিলেন—তাঁকে ধ্যান কর। সব বেদনা ওই ধ্যানেই বিগলিত হয়ে আনন্দে পরিণত হবে। পাহাড়ের মাথায়—বরফ হিমশীতল; মৃত্যুর স্পর্শ তাতে। সেই বরফ গলে জলধারা হয়ে নামে, সে তখন সাক্ষাৎ জীবন। নিজের বেদনাকে আনন্দের ধ্যানে বিগলিত করো।

ফিরে এসে সেই দিন থেকে তিনি এই পূজা করেন। উপচার নেন না, উপকরণ নেন না। শুধু বসে ধ্যান করেন। মনে মনে বলেন—

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু।

পূজা শেষ করে আহারান্তে আবার যান ইস্কুলে।

সন্ধ্যায় নিজে বসে উপাসনার আসর পরিচালনা করেন। তারপর বোর্ডিঙের প্রতি ঘরে ছাত্রদের কাছে গিয়ে হেসে বলেন—কি অনুপপাত্ত বল!

ছেলেদের 'অনুপপত্তি'র গল্প জানতে বাকী নেই। চন্দ্রবাবুই বলেন—প্রায়ই মধ্যে মধ্যে 'বুনো রামনাথের' কথা বলেন।

ছেলেরা মিলিয়ে পায় ওই গল্পের সঙ্গে চন্দ্রবাবুর জীবন।

চন্দ্রবাবু মাইনের সব টাকাই ছাত্রকল্যাণে ব্যয় করেন। নিজের জন্য বরাদ্দ মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা।

হঠাৎ সেদিন।

১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাস। সেদিন শনিবার। চন্দ্রবাবু ডাকলেন—রমণ।

রমণ—রাধারমণ ইস্কুলের চাকর। কেষ্ট চলে গেছে। তার জায়গায় রমণ এসেছে। রমণ এসে দাঁড়াল।

চন্দ্রবাবু বললেন—যাও, এই নোটিশ সব ক্লাসে ঘুরিয়ে নিয়ে এস।

ইস্কুলের ছুটির শেষে সব ছাত্রকে হলে সমবেত হতে হবে। চন্দ্রবাবু কিছু বলবেন।

চন্দ্রবাবুর মুখ থমথম করছে। এ তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না, এ তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না—ছেলেরা তাঁর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে।

দরখাস্ত করেছে—বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে তারা বিজ্ঞানবাদে বিশ্বাসী। তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট চন্দ্রবাবু ইস্কুলের হিতাকাঙ্ক্ষী স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি হলেও সেকালের মানুষ। একদিকে তিনি গোঁড়া ঈশ্বরবিশ্বাসী ধার্ম্মিক—অন্য দিকে তিনি প্রায় ডিক্টেটারের মত অটোক্র্যাট। প্রতিটি ছাত্রকে তিনি ইস্কুলের প্রথমেই হিন্দুমতে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠে বাধ্য করেন। কেউ আপত্তি জানালে তাকে শাস্তির ভয় দেখান। তাঁর ভয়ে আমরা আমাদের বিশ্বাসমত চলতে পারি না। ভারতবর্ষ ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে ধর্ম্মের এই কঠোর অনুশাসন অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। অতএব আমাদের প্রার্থনা—ইস্কুলের প্রারম্ভে প্রার্থনা-সভায় যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় এই নির্দ্দেশ দেওয়া হউক।

এ দরখাস্তের ভাষা তাঁর পরিচিত। লেখক কে তা তিনি জানেন।

সীতেশ এ দরখাস্তের লেখক। সীতেশ তাঁরই ছাত্র। এখান থেকে কিছু দূরে তার বাড়ী। সীতেশ কৃতী ছাত্র। এখন এখানকার এসিস্টাণ্ট হেড মাষ্টার। তিনিই তাকে এখানে এনেছেন। কিছুদিন আগেও তিনিই তাকে রাজনৈতিক আবর্ত্তের সংঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি জানেন। সীতেশই যে ছেলেদের মধ্যে এই নিরীশ্বরবাদের প্রবর্ত্তক তা তিনি জানেন। ছেলেদের নিয়ে সে ছুটির পর আজ এখানে কাল ওখানে সভা করে বেড়ায়—তা তাঁর অবিদিত নয়। এই সংগঠনের নাম ময়দান ক্লাব।

এই ময়দান ক্লাব যখন সীতেশ প্রথম তৈরি করে তখন তিনি এটা কল্পনা করেন নি; তিনি উৎসাহিত করেছিলেন।

হঠাৎ সব প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সেদিন—এই দিন পনের আগে রামজয় তাকে বলে

গিয়েছিলেন। রামজয় অনেক দিন ইস্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন। তবু মধ্যে মধ্যে রামজয় আসেন। ইস্কুলের বর্ত্তমান হেড পণ্ডিত রামনাথ সেও এখানকার ছাত্র; বি-এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ—রামজয়ের ভক্ত এবং দীক্ষায় তার শিষ্যও বটে। রামজয় পুত্রহীন, তার দৌহিত্রেরা যজমানদের সাধারণ কাজগুলি চালায় বটে কিন্তু বিশেষ ক্রিয়া তাদের দিয়ে হয় না; তখন রামজয় নিজে যান। বেশী দূরের জায়গা হলে রামনাথকে পাঠান। রামনাথ রামজয়ের কাজ করে আসে, রামজয় রামনাথের ইস্কুলের কাজ চালিয়ে যান। গত বার রামনাথ কঠিন রোগে প্রায় ছয় মাস শয্যাশায়ী ছিল, রামজয় ছয় মাস তার কাজ করে দিয়েছিলেন। পনের দিন আগে রামজয়ের এক শিষ্যের বাড়ীতে বিশেষ একটি ক্রিয়াতে রামজয় রামনাথকে পাঠিয়ে নিজে দিনতিনেক পড়িয়ে গেছেন। শেষ দিন বলে গেলেন—আমি আর আসব না হে। তুমিও এবার সর। মানে মানে সরে পড়। আমার কথা শোন।

হেসে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—কেন?

—মানে ভগবানের রাজ্য গেল এইবার ভূতের রাজ্য হ'ল—ভূত নয় চন্দ্র প্রেত। সরে পড়। সরে পড়। আমি এই আজই সরলাম—আর কোনদিন আসব না হে। রামনাথের সাহায্য নিয়ে যজমানি চালাতে হলে আসতে হবে সুতরাং যজমানিও শেষ।

—কি হ'ল?

—সীতেশকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার প্রিয় ছাত্রকে।

বলেই রামজয় চলে গিয়েছিলেন। সীতেশকে ডাকতে হয় নি; সীতেশ নিজেই এসেছিল—চারটি ছাত্র নিয়ে। মিণ্টু, জীবেন, সরোজ, দিগেন। তাদের হাতে এক দরখাস্ত।

—এরা এসেছে সার একটা দরখাস্ত নিয়ে।

—কিসের দরখাস্ত?

—পণ্ডিতমশায়ের সম্বন্ধে এরা কিছু বলতে চায়।

—রামজয় সম্পর্কে?

—হ্যাঁ। ওদের যাচ্ছেতাই বলেছেন। জীবেন একটা কবিতা লিখেছিল—তাই পড়ে—

জীবেনের খাতার সংস্কৃতের টাস্ক দেখতে গিয়ে পণ্ডিত কবিতাটি পেয়েছিলেন। কবিতাটি পড়ে বলেছিলেন—অ বাবা গোপাল—অ মাণিক, জীবেনচন্দ্র—

—আমাকে বলছেন সার?

—বলছি আমার চোদ্দপুরুষের ছেরাদ্দ করে—তোমার ছাপার পুরুষের মুখে ছাই দিয়ে—হ্যাঁ বাবা বরাহজোলাল এ কোন পচা বিলের শালুক তুলেছ বাবা? এ্যাঁ? এ কি? বলে নিজেই পড়েছিলেন—

> জাকজালেম মক্কা কাশীর মন্দিরচূড়া
> গির্জের চূড়া মসজিদের মাথা
> কাঁপছে—থর থর কাঁপছে—
> মানুষ জেগেছে—মাতন লেগেছে
> তারা হৈ হৈ করে চাপছে
> ও চূড়ার মাথায়।
> ভাঙবে—চুরমার করে ভাঙবে—
> ওগুলোর ভিতরের কদর্য্য অনাচার
> ভণ্ডামি আর বিশ্বের সেরা মিথ্যা—
> ঈশ্বর—যার অস্তিত্ব
> ওগুলোর অন্ধকারের ছায়াবাজিতে
> সে উড়ে যাবে—উপে যাবে।
> বাজাও দামামা। পোড়াও ক্রশ।
> ভাঙো, চুরমার কর পুতুল।
> ফুঁ দিয়ে ওড়াও মিথ্যে।

আর তিনি পড়তে পারেন নি। রাগে অধীর হয়ে খাতাখানা আছড়ে ফেলে দিয়ে জীবেনকে যা মুখে এসেছে তাই বলেছেন।

জীবেনের প্রপিতামহ করত গুরুগিরি। পিতামহ করত পুরুতগিরি। বাবা পুরুতগিরিও করে, চাকরিও করে। জীবেনের বাপও রামজয়ের ছাত্র। তাই বাপ-পিতামহ প্রপিতামহ তুলে বলেছেন—ওরে বেটা—ওই ভণ্ডামি, ওই মিথ্যাচারের অন্নেই যে তোর পেট ভরে রে বরাহ।

জীবেন বলেছিল—তাই ত আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না ভেতরের কথা।

রামজয় আর একবার গালিগালাজ করে উঠে চলে এসেছেন। হাত ধুয়ে লাইব্রেরী হয়ে ইস্কুল থেকে চলে গেছেন। এখন ছেলেদের দরখাস্ত—রামজয় পণ্ডিত যেন আর এ ভাবে ইস্কুলে না আসেন। তিনি অক্ষম বৃদ্ধ, পড়াতে পারেন না। তার উপর তিনি পড়ান না, শুধু গল্প করেন।

দরখাস্তখানা পড়ে চন্দ্রবাবুর ব্রহ্মরন্ধ্র যেন ফেটে যাবে বলে মনে হ'ল। বজবালার মৃত্যুর পর ক্রোধ তাঁর হয় নি। এই প্রথম।

চন্দ্রবাবু দরখাস্তখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

—যাও। তোমরা যাও।

ছেলেরা চলে গিয়েছিল। সীতেশ ছিল।

—সীতেশ।

—স্যার।

—এ দরখাস্ত তোমার লেখা?

—হ্যাঁ স্যার। ওরা আমাকে লিখে দিতে অনুরোধ করেছিল। আমি উচিত মনে করেছিলাম। কারণ ছেলেদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। আপনার জানা উচিত।

তার পরদিন থেকেই তিনি লক্ষ্য করছেন জীবেনদের দল স্তোত্রপাঠের সময় থাকে না। স্তোত্রপাঠ শেষ হবার পর ইস্কুলে ঢোকে।

দিনতিনেক পর তিনি ওদের ডেকেছিলেন। আসতেই প্রশ্ন করেছিলেন—তোমরা দেখি স্তোত্রপাঠের সময় থাক না, কেন জীবেন?

—আসতে দেরি হয়ে যায়, স্যর।

— সকলেরই? এবং আগে হ'ত না—হঠাৎ হতে লাগল?

চুপ করে ছিল সকলে। ঠিক এই সময়ে সীতেশ পাশের ভুগোলের ম্যাপের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিল—স্পীক আউট! সত্য কথা বল!

জীবেন এবার বলেছিল—ভাল লাগে না।

—ভাল লাগে না?

—হোয়াট?

—আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। ধর্ম্মেও না।

—কিন্তু এ ইস্কুলে স্তোত্রপাঠের নিয়ম কম্পালসারি। ইংরেজ আমলেও বন্ধ করতে পারে নি।

—ইংরেজের সে অধিকার ছিল না। আমাদের আছে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রবাবু।

সীতেশ বলেছিল—বেশ ত তোমরা এস, ইচ্ছে হলে চুপ করে থেকো। নয় ত ক্লাসে বসে থেকো।

—নো। স্তোত্রপাঠ না করলে এ ইস্কুলে পড়া হবে না। দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্ড। গো।

ছেলেরা চলে যেতেই তিনি সীতেশকে বলেছিলেন—তোমার ময়দান ক্লাব তুমি বন্ধ কর।

—বন্ধ করব?

—হ্যাঁ।

—না স্যার-তা আমি করব না।

সীতেশ চলে গিয়েছিল।

তার পর এই দরখাস্ত। উপর থেকে দরখাস্তখানি পাঠানো হয়েছে তাঁর মতামতের জন্য। না—কৈফিয়তের জন্য।

এ দরখাস্তও সীতেশের লেখা। এতেও লেখা আছে—চন্দ্রবাবু বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি গোঁড়া ধার্ম্মিক। ইস্কুলের কোন ছেলেই প্রার্থনা-সভায় যেতে চায় না। কিন্তু তাঁর কঠোর শাসন ডিক্টেটরশিপের নামান্তর।

দমনের হাতে নোটিশ দিয়ে মাথা ধরে তিনি বসে রইলেন।

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

টক্‌টক্ শব্দে ঘড়িটা চলছে।

ঢং শব্দে একটা বাজল।

—মাষ্টারমশাই!

— কে?

—আমি স্যার বসন্ত।

—বসন্ত!

—হ্যাঁ স্যার। আপনি এখনও স্নান করেন নি, খান নি!

—আজ ছুটির পরই ছেলেদের ডেকেছি। আজ দেড়টায় ছুটি।

—আজ থাক স্যার।

—থাকবে? কেন?

—হ্যাঁ স্যার। মনে হচ্ছে গোলমাল হবে।

—গোলমাল?

—হ্যাঁ স্যার। আমার অনুরোধ আজ থাক।

—না। থাকবে না বসন্ত।

—স্যার।

—না—না—না। তুমি বলছ ওরা আমার কথা শুনবে না?

সীতেশ ঘরে ঢুকল।

—না স্যার। ওরা আপনার কথা শুনবে না। ওরা ষ্ট্রাইক করবে।

—অলরাইট।

উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্রবাবু। দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে এসে হলে দাঁড়ালেন—তার পর চলতে সুরু করলেন—সঙ্গে সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন—গুড বাই বয়েজ, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ডস। আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। আই সাবমিট মাই রেজিগনেশন। তোমাদের মঙ্গল হোক। আমি ঈশ্বর মানি—তোমরা ঈশ্বর মান না—তোমাদের শিক্ষা দেবার শক্তি আমার নেই। গুড বাই। গুড বাই। টলছেন তিনি, গলা কাঁপছে।

গোটা ইস্কুলটা স্তম্ভিত।

সীতেশ যেন কেমন হয়ে গেল।

বসন্ত নির্ব্বাক। যখন তার কথা সে খুঁজে পেলে তখন সে ছুটে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে ডাকলে—মাস্টারমশাই!

দীর্ঘ পদক্ষেপে টলতে টলতে চন্দ্রবাবু তখন পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। সামনের দিকে।

— মাষ্টারমশাই! মাষ্টারমশাই!

পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন চন্দ্রবাবু। কর্ম্ম তাঁর শেষ হয়েছে। বিড়বিড় করে কি বললেন—যেন বললেন—

—বসু মা! বঙ্গবালা!

সমাপ্ত

ভুবনেশ্বরে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ধ্যার কালো ছায়া ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ট্রেন এসে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে থামল। মামার এবং জিনিষ নামানোর পালা সাঙ্গ হতে না হতে কে কে মোট বইবে তা নিয়ে কুলিদের দ্বন্দ্ব শুরু হ'ল। যাই হোক, মোট-বহন সমস্যার যদি বা সমাধান হ'ল, রিক্সা-ওয়ালারা আবার 'রণং দেহি রব' ঘোষণা করলে। গরীব ওরা। দুটো বেশী পয়সা বাঙালী বাবুদের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে, এই নিয়েই ওদের যত বাগবিতণ্ডা। চারখানা রিক্সা করে আমরা কোন ক্রমে ষ্টেশনের গণ্ডী পার হলাম। ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার রাজধানী হয়েছে। তা ছাড়া এটি একটি নামকরা তীর্থস্থানও বটে। কিন্তু ষ্টেশনের কোথাও পারিপাট্য বা আভিজাত্যের ছাপ নেই। ভুবনেশ্বরের নামের গরিমার সঙ্গে ষ্টেশনের সামঞ্জস্য নেই। আলোগুলি এত ক্ষীণ যে, সমস্ত ষ্টেশনটাই যেন কালো কালো আবছায়াতে ঢাকা।

বিন্দু-সরোবর

চলেছি রিক্সায়, পিছনে ফেলে রেখে 'ক্যাপিটাল'। ক্যাপিটালের বিজলীবাতিগুলি দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন আকাশের উজ্জ্বল তারা—সত্যিই অন্ধকার রাত্রে ভারি সুন্দর লাগে এ দৃশ্য। আমাদের গন্তব্য স্থান পুরাতন ভুবনেশ্বরের রামকৃষ্ণ মিশন। পথে আলো নেই বললেই হয়। বহু দূরে দূরে এক একটি মিটমিটে বাতি জ্বলছে। মনে হচ্ছে যেন প্রেতপুরীর মধ্য দিয়ে রিক্সা চলেছে। দু'একবার রিক্সাওয়ালারা পথের বাঁকে আসল পথ ছেড়ে পাশের নালার উপর দিয়ে রিক্সা চালিয়ে ফেললে অন্ধকারে। রিক্সা উল্টে যায় নি এটা ভাগ্য বলতে হবে।

রাত্রি প্রায় আটটার কাছাকাছি, রামকৃষ্ণ মিশনের গেষ্ট হাউসে আশ্রয় লাভ করলাম। নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা সঙ্গেই ছিল। এখানকার মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে আমাদের শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তত্ত্বাবধান করে গেলেন।

পরের দিন প্রত্যূষে ঘুম ভাঙতেই ভুবনেশ্বর ষ্টেশন ছেড়ে পুরীর পথে অগ্রসর পুরী এক্সপ্রেসের হুস হুস শব্দটাই সর্ব্বপ্রথম কানে এল। চোখে পড়ল, জানালার ফাঁক দিয়ে মিশনের বাগানের সারি-বাঁধা নাগেশ্বর ও নাগলিঙ্গম গাছগুলি। এ বাগানের অনেক গাছই
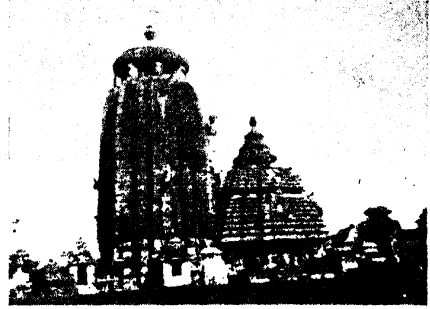
লিঙ্গরাজের মন্দির

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্বহস্তরোপিত। পন্নাগ, কালিঙ্গা প্রভৃতি গাছগুলি স্বামীজী দক্ষিণ ভারত হতে সংগ্রহ করে সযত্নে এই বাগানে রোপণ করেছিলেন। স্থানটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে তিনি প্রায়ই ভুবনেশ্বরের মিশনে অবস্থান করতেন। গেষ্ট-হাউসটি বলাঙ্গীরের মহারাণীর দান। এক সময় এটি তাঁর স্বাস্থ্য-নিবাস ছিল। বহির্বাটীতে তাঁর মেমসাহেব গভর্নেস বাস করতেন। এখন এটিও অতিথি অভ্যাগতদের বাসস্থান রূপেই মিশন-কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন।

সেবাশ্রমের পরিবেশটি চমৎকার। বাগান-ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ী। থরে থরে ফুল ফুটে রয়েছে নানান রকমের। ইউক্যালিপটাস গাছ, ঝাউচারা, আম্রকুঞ্জ, আতাগাছ, শ্রীফলবৃক্ষ, আরও কত কি! সকালে গুন গুন গান করতে করতে ব্রহ্মচারী মহারাজেরা পুষ্পচয়ন করছেন।

প্রস্তরনির্ম্মিত লাল রঙের গেষ্ট হাউসটি, দু'পাশে তিনখানা করে ছ'খানা ঘর নীচে। ছ'খানা ঘর উপরে। মাঝে হলঘর। সেখানে দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে মহাপুরুষদের বড় অয়েল পেন্টিং, মেঝের বসানো আছে মার্ব্বেল পাথরের বড় গোল টেবিল; তার উপরে সুদৃশ্য আলোর সেজ। মেঝেটিও মর্ম্মরমণ্ডিত।

স্বামীজী বললেন, 'কেদার-গৌরীকুণ্ডে স্নান করে লিঙ্গরাজের পূজো করাই শ্রেয়ঃ।' বেরিয়ে পড়লাম কেদার-গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশে। অমিতাভ ক্যামেরা সঙ্গে নিলে, আমরা নিলাম জলের পাত্র, দুধকুণ্ডের জল আনব, ও জলের হজমী শক্তি সর্ব্বজনবিদিত।

কেদার-গৌরীকুণ্ড ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বোত্তর কোণে প্রায় আধ মাইল দূরে। এটি একটি পাথরে বাঁধানো নৈসর্গিক প্রস্রবণ। দক্ষিণ দিকে স্নানের জন্য পাষাণ-সোপানশ্রেণী, প্রস্তরনির্ম্মিত একটা বাঘের মুখ দিয়ে জল গৌরীকুণ্ডে ঝরে পড়ছে। সেই জল কেদার কুণ্ডে আসছে আর সেইখানেই জনসাধারণের স্নানপর্ব্ব সমাধা হচ্ছে। এই কুণ্ডের তলদেশেও প্রস্রবণ আছে। জলের রং দুধে নীল, জল সুশীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ। শিবপুরাণের মতে গৌরীদেবী স্বহস্তে এই কুণ্ড খনন করেন। কপিলসংহিতা বলেন, এই কুণ্ডের জল পান করলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কুণ্ডের তীরে কেদারেশ্বর শিবের মন্দির ও গৌরীদেবীর মন্দির আছে। গৌরীদেবীর মন্দিরটি লাল পাথরের এবং স্থাপত্য-শিল্প-সম্ভারে সমৃদ্ধ। কেদারেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীন। এর গর্ভগৃহ মূল মন্দির অপেক্ষা প্রাচীনতর। প্রবেশ-

বহু বাহুবিশিষ্ট শিবমূর্ত্তি

দ্বারের চৌকাঠের দক্ষিণ বাজুতে অস্পষ্ট শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। গৌরী-মন্দিরে উৎসব হয় শীতলা ষষ্ঠীর দিন। তখন ভুবনেশ্বরের বিজয়মূর্ত্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে গৌরীদেবীকে বিবাহ করতে আসেন। আনন্দে অবগাহন স্নান সারা হ'ল। সত্যই কুণ্ডটির জলের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। স্নান করে উঠতেই পাণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ। সে আক্রমণ হতে অব্যাহতি পেয়ে ভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দিরের দিকে যাত্রা করলাম শিব-পার্ব্বতীকে প্রণাম করে।

পথে বিন্দুসরোবর পড়ল। বিন্দুসরোবরের প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীটি এই :—শিব-শম্ভু পৃথিবীর সকল তীর্থ-সলিল বিন্দু বিন্দু সংগ্রহ করে অসুর-নিধনে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পার্ব্বতীর তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য এই বিন্দুসরোবরের প্রতিষ্ঠা করেন। মহাদেব ত্রিশূল দ্বারা শৈলবিদারণপূর্ব্বক প্রথমে একটি বাপী প্রকাশ করেন। এটি শঙ্কর বাপী নামে খ্যাত। কিন্তু পার্ব্বতী দেবী কোন প্রতিষ্ঠিত সরোবর হতে জলপানের অভিলাষ প্রকাশ করায় এই বিন্দুসরোবরের প্রতিষ্ঠা হয়। অনন্ত বাসুদেব ক্ষেত্রপাল রূপে বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে বাস করেন। পশ্চিম তটে বহু শিবালয় শোভা পাচ্ছে। সরোবরের মধ্যেও একটি মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রার সময় ভুবনেশ্বর ঠাকুরের সুবর্ণ-বিগ্রহকে চতুর্দ্দোলা বা মণিবিমানে চড়িয়ে নৌকাযোগে বাদ্যভাণ্ড সহকারে প্রতিদিন বহন করে এনে জলমধ্যস্থিত মন্দিরে স্নান, বিহার ও অর্চ্চনাপর্ব্বের সমাধা করা হয় —এই সকল অনুষ্ঠান চলে বাইশ দিন ধরে। বিন্দুসরোবর দৈর্ঘ্যে তিনশ' ফুট, প্রস্থে সাতশ' ফুট এবং এর গভীরতা প্রায় ষোল ফুট।

রাজারাণীর মন্দির
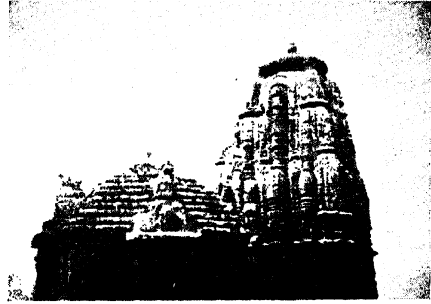
রাস্তার উপরেই অনন্তবাসুদেবের মন্দির। মন্দিরটি প্রাচীন এবং শিল্প-নৈপুণ্যের একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন। বিমান, জগমোহন নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ এই চার অংশে মন্দিরটি বিভক্ত। গর্ভ-গৃহে একটি বেদীর উপর দণ্ডায়মান অনন্ত, সুভদ্রা ও বাসুদেব এই তিনটি মূর্ত্তি। অনন্তদেবের মূর্ত্তির মাথায় সপ্তফণাযুক্ত সর্প। দক্ষিণ হস্তে হল ও বামহস্তে মুষল। গর্ভ মন্দির অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রদীপের শিখাও মূর্ত্তিদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মন্দিরগাত্রে ভট্টভবদেবের শিলালিপি সংলগ্ন আছে। এই শিলালিপি অনুসারে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মন্দিরটি একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। আবার কারও কারও মতে মন্দিরটি অনঙ্গ ভীমদেবের কন্যা হৈহয়রাজবধূ চন্দ্রিকা দেবী বা চন্দ্রা দেবীই নির্ম্মাণ করান। মন্দিরটি দর্শন করে যেমন আনন্দ পেলাম, দুঃখ পেলাম তেমনি এর অব্যবস্থা দেখে।

অনন্ত বাসুদেবকে প্রণাম করে লিঙ্গরাজের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম। পথে দুটি ত্রিতল প্রস্তরনির্ম্মিত ধর্ম্মশালা পড়ল। এদের মধ্যে দুধওয়ালা ধর্ম্মশালাটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। ধর্ম্মশালা পার হতেই ভুবনেশ্বরের মন্দিরের প্রস্তর-প্রাচীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে যুগে মন্দিরকে সুরক্ষিত করার জন্য তার চতুষ্পার্শে দুর্ভেদ্য প্রাচীর-বেষ্টনী নির্ম্মাণ করা হ'ত, নতুবা বিধর্ম্মীর আক্রমণে সে মন্দির বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য সুদৃঢ় পাষাণ-প্রাকার থাকা সত্ত্বেও কালাপাহাড়ের নিষ্ঠুর হস্ত হতে উড়িষ্যার খুব কম মন্দিরই পরিত্রাণ পেয়েছিল। লিঙ্গরাজের মন্দিরেও কালাপাহাড়ের বিধ্বংসী হস্তের ছাপ জাজ্বল্যমান। অনেকগুলি মূর্ত্তির হস্ত, পদ বা মস্তক বিনষ্ট হয়ে গেছে। কালের স্থূল হস্তাবলেপেও হয়ত কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়ে

থাকবে। তবুও একথা অনস্বীকার্য্য যে, উৎকীর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে শিল্পীর সাধনা এমন ভাবে বিধৃত হয়ে আছে যে, লিঙ্গরাজ মন্দির আজ প্রায় আটশ' বছর পরেও কলিঙ্গ-স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে বিদ্যমান।

বিশাল সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রহরারত দুটি সিংহমূর্ত্তি। ভেতরে প্রবেশ করেই চোখে পড়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তার দক্ষিণে, বামে, সম্মুখভাগে অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের মন্দির। লিঙ্গরাজের মন্দিরটিই প্রধান। মন্দিরের গর্ভ গৃহে বসুধা বিদীর্ণ করে উত্থিত ভুবনেশ্বর মহাদেব বিরাজ করছেন। মস্তকে তাঁর ব্রহ্মা, নাভিদেশে বিষ্ণু, পাদ-

রাজারাণী মন্দিরের শিল্প-সুষমা

দেশ বিধৌত করে প্রবাহিত গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। পাণ্ডাঠাকুর এই রূপই বললেন। তিনি কয়েকটি চিহ্নও দেখালেন সঙ্কীর্ণ জলধারায়। মন্দিরচত্বরে নাটমন্দিরের পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের বিশাল বৃষভমূর্ত্তি উপবিষ্ট। পাণ্ডাঠাকুর এখানে একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করলেন। বৃষটি তিনটি পদ তুলে আছে। চতুর্থ পদ তুলে দাঁড়াবে কলিযুগের শেষে। বৃষটি তখন বিন্দুসরোবরের জল পান করবে, লিঙ্গরাজকে পিঠে নিয়ে প্রলয়-তাণ্ডবে সারা পৃথিবী ধ্বংস করে আবার নূতন সৃষ্টির সূচনা করবে। অবশ্য বৃষের পা তিনটি একটু তোলা বটে, শয়ন করেছিল, উত্থানের উদ্যোগ করছে—এই ভঙ্গিমাতে স্থপতি এটিকে স্থাপন করেছেন। পাণ্ডাঠাকুরের মুখে মৃদু হাসি এবং কথায় দৃঢ় বিশ্বাসের আভাস। তাই তর্ক পরিহার করে মন্দিরের দিকে চোখ ফেরালাম।

ভুবনেশ্বরের মন্দির উচ্চতায় প্রায় একশ' পঁয়ষট্টি ফুট। পশ্চিম দিকের চত্বরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু শিবালয় আছে। পাণ্ডাঠাকুরের কথায় একটি কুড়ি ফুট উচ্চ মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। এটি নাকি মূল মন্দির অপেক্ষাও প্রাচীনতম। এটির গর্ভগৃহ চত্বরের সমতল হতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট নিম্নে। পাণ্ডাঠাকুরের মতে এইখানেই আদি লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। পশ্চিম কোণে ভুবনেশ্বরীর মন্দির, অপর পার্শ্বে গোপালিনীর মন্দির। লিঙ্গরাজের মন্দিরের সম্মুখভাগে ভোগ-মণ্ডপ। তৎপশ্চাতে পর্য্যায়ক্রমে নাটমন্দির, জগমোহন, মূলমন্দির ও গর্ভগৃহ। জগমোহনের ছাদ ভোগমণ্ডপের ছাদের মত চূড়াকার, উচ্চ চারিটি সুবৃহৎ পাষাণস্তম্ভ দ্বারা বিধৃত। এটির দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের বাম পার্শ্বে চতুরস্রগৃহে পিত্তলময়ী অর্চ্চা মূর্ত্তিগুলি রক্ষিত। এগুলি ভুবনেশ্বরের উৎসবকালীন বিজয়মূর্ত্তি।
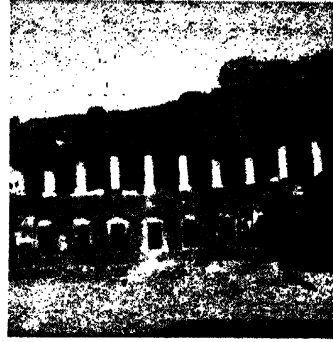
রাণীগুম্ফা, উদয়গিরি

মন্দিরের একপার্শ্বে রামায়ণের, অপর পার্শ্বে মহাভারতের ঘটনাবলী খোদিত। দক্ষিণে গণেশমূর্ত্তি। এটিও শিল্পনৈপুণ্যে অপূর্ব্ব। এত বড় সিদ্ধিদাতা মূর্ত্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। উত্তর দিকের পশ্চাদ্‌ভাগে নিশাপার্ব্বতী মূর্ত্তি বিরাজমানা। এই মূর্ত্তিটি কোণারক হতে স্তনযুগল ও নাসিকা ছিন্ন অবস্থায় ভুবনেশ্বরে আনীত হয়। কালাপাহাড়ের হাতে মূর্ত্তিটি লাঞ্ছিত হয়েছে। তাই মন্দিরের ভেতরে এর স্থান হয়নি, মন্দিরের পিছনের অপ্রধান অংশে অনাদৃত ভাবে পড়ে আছে। অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশলে মণ্ডিত এই মূর্ত্তিটি। এর অঙ্গের অলঙ্করণ আর শাড়ী পরার বিচিত্র ভঙ্গিমা নয়নের পরিতৃপ্তি-সাধন করে। এই মূর্ত্তিটি সার্থক শিল্পীর শিল্প-ব্যঞ্জনায় ভাবরূপকে মুগ্ধ দর্শকের দৃষ্টিতে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। রাজানুগ্রহ এবং অখণ্ড অবসর না পেলে এরূপ কারুশিল্পের বিকাশ কখনই সম্ভবপর নয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির কেশরী-রাজবংশের যযাতি কেশরী, অনন্ত কেশরী এবং ললাটেন্দু কেশরীর অতুলনীয় কীর্ত্তি।

লিঙ্গরাজের পূজা সেরে বেলা প্রায় এগারটায় সেবাশ্রমে ফিরে এলাম। মধ্যাহ্নে কিছু বিশ্রামের পর বেলা তিনটের সময় রিক্সা করে ছ'মাইল দূরবর্ত্তী উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, পাহাড় দুটি দেখার জন্য যাত্রা সুরু করলাম। লালমাটি ও কাঁকরের রাস্তা। ধূসর প্রান্তর আর শ্যামল বনানী, দূরে দূরে শিশু পাহাড়গুলি যেন আকাশ স্পর্শ করার উদগ্র কামনা নিয়ে সবে হামাগুড়ি দিতে সুরু করেছে। হয় ত কোন এক অনাগত যুগে এরাই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালায় পরিণত হবে। বাঁদিকে দউগিরি দাঁড়িয়ে আছে অশোকের শিলালিপি বক্ষে ধারণ করে। উড়িষ্যার নবনির্মিত রাজধানীর মধ্য দিয়ে রিক্সা চলেছে। মাঝে মাঝে বড় বড় অট্টালিকাগুলি অতিক্রম করে যাচ্ছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এ স্থানটি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য

ছিল। কত নাগ-নাগিনী অবলীলাক্রমে এখানকার বিরাট বিরাট মহীরুহে দোলা খেত। আজ এ নগরী, একটা প্রদেশের সংস্কৃতি-কেন্দ্র। ক্যাপিটালের পরেই এরোড্রোম অতিক্রম করা গেল। এবার আবার প্রকৃতির হাতছানি। কিছুক্ষণ পরে পথের ধারে একটি কুণ্ড নজরে পড়ল। রিক্সাওয়ালারা বললে, এর নাম ভীম-কুণ্ড। ভীম একাদশীতে এখানে বড় মেলা বসে। আরও মাইল দুই অতিক্রম করে আমরা বৌদ্ধ জৈন যুগের গৌরববাহী উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে উপনীত হলাম। দু'ধারে দুটি পাহাড়। মাঝে রাস্তা। এই রাস্তা চলে গেছে কটক ও পুরী পর্য্যন্ত। এই রাস্তাই দুটি পর্ব্বতের মধ্যে একমাত্র ব্যবধান। পর্ব্বত দুটির পূর্ব্বনাম কুমার পর্ব্বত ও কুমারী পর্ব্বত। পরিব্রাজক হিউ-এন্-সাং তাঁর রোজ-নামচায় পর্ব্বত দুটির এই নামেরই উল্লেখ করেছেন। এখানে এক সময় পুষ্পগিরি সঙ্ঘারামে বৌদ্ধ ও জৈন যতিরা পঠন, মনন,

উদয়গিরির আর একটি গুম্ফা

নিদিধ্যাসনে ব্যাপৃত থাকতেন। পুষ্পগিরি নামের সার্থকতা আজও উপলব্ধি করা যায়। পাহাড় দুটিতে অজস্র পুষ্প থরে থরে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। কেউ কেউ মনে করেন, অশোকের গুরু উপগুপ্তও এই পর্ব্বতের গুহাতে যোগসাধনা করেছিলেন। দুটি পর্ব্বতেই ছোট বড় সুন্দর সুন্দর অনেক গুহা বা গুম্ফা আছে। এদের মধ্যে বৈকুণ্ঠ গুম্ফা, ব্যাঘ্র গুম্ফা, সর্পগুম্ফা, তত্ত্বগুম্ফা, অনন্তগুম্ফা, দুর্গা-গুম্ফা, গণেশগুম্ফা নির্ম্মাণ-কৌশলে সমধিক প্রসিদ্ধ। কয়েকটি গুহাতে পালি ভাষায় সুপ্রাচীন শিলালিপি ক্ষোদিত আছে। গুম্ফা-গুলির প্রশান্তি ও অখণ্ড স্তব্ধতা যোগসাধনার পক্ষে একান্ত অনুকূল।

উদয়গিরির সবচেয়ে বড় গুম্ফা হ'ল, রাণীগুম্ফা। নামের ইতিহাস কি তা জানি না। কোন সে রাণী যাঁর জীবনালেখ্য পালি-ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বিধৃত হয়ে আছে? কোন সে ভিক্ষুণী যিনি পার্থিব ভোগপ্রাচুর্য্য পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিয়ে গিরিকন্দরে শিলাসনে পরমার্থচিন্তায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন? কালের যবনিকা সে মহীয়সী মহিলার প্রকৃত পরিচয় মুছে দিয়েছে। তবুও গুম্ফা জেগে আছে। গুম্ফাটি ত্রিতল। উপরে নীচে বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপর হতে নীচে পাহাড়ের স্বাভাবিক জল-ধারাকে পয়ঃপ্রণালীযোগে সুন্দর ভাবে জলসরবরাহ-কার্য্যে লাগানো হয়েছিল। সে চিহ্ন স্থানে স্থানে খণ্ডিত হলেও আজও বিদ্যমান। কতকগুলি গুহার নির্ম্মাণকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী, আবার কতকগুলি আরও অনেক পরেকার।

খণ্ডগিরি

হস্তীগুম্ফাতে চেদীবংশীয় কলিঙ্গরাজ খারবেলের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। খণ্ডগিরিতে জৈন সম্প্রদায়ের তিন রকমের তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি নূতন পরিচ্ছন্ন মার্কেল পাথরের মন্দিরে রক্ষিত আছে। এখান-কার দেবসভা গুম্ফার দেবদেবীমূর্ত্তিগুলি এখনও অম্লান। সূর্য্যের আলোক মিলিয়ে যাবার পূর্ব্বে আমরা খণ্ডগিরি হতে নেমে পড়লাম, পিপাসার্ত্ত হয়ে স্থানীয় ধর্ম্মশালার কূপের জল পান করলাম। ধর্ম্ম-শালাটি ভাল। রিক্সাওয়ালাদের তাগিদে আর অধিকক্ষণ থাকা সম্ভব হ'ল না, তাই উদয়গিরি, খণ্ডগিরি পশ্চাতে ফেলে রেখে পুরাতন ভুবনেশ্বরের দিকে যাত্রা সুরু করতে হ'ল।

পরের দিন প্রত্যুষে মুক্তেশ্বর ও রাজারাণীর মন্দির দেখার জন্য যাত্রা করলাম। আজই দ্বিপ্রহরে নীলাচলে নীলমাধব দর্শনে চলে যেতে হবে। এখানে মন্দিরের প্রাচুর্য্য লক্ষণীয়। এখানকার আনাচে কানাচে সাড়ে সাতশ মন্দির-কেশরী রাজবংশের আমলে বৌদ্ধ-জৈনদের সঙ্গে পাল্লা দিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পাণ্ডাদের অত্যুৎসাহে গড়ে উঠেছিল একান্ত রাজানুগ্রহে। আজ তার অধিকাংশ ভগ্ন, কিন্তু তবুও অনেক-গুলি অতীতের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। একদিকে বৌদ্ধদের প্রভাব—অপর দিকে সেই প্রভাবের গর্ব্বকে খর্ব্ব করার জন্য ব্রাহ্মণ-দের অক্লান্ত চেষ্টা। তাই ভুবনেশ্বরে গড়ে উঠল অজস্র মন্দির। বৌদ্ধদের জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মফল—জ্ঞানমার্গের ব্যাপার। সাধারণ মানুষ তা বুঝত না। তবুও তারা মানত বৌদ্ধদের, গ্রহণ করত তাদের ধর্ম্ম। এ যেন গড্ডলিকা। কিন্তু বেশীদিন এ গড্ডলিকা-প্রবাহ চলল না। স্রোত বইল উল্টাদিকে। ব্রাহ্মণেরা প্রচার করলেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। সদ্‌গুরুকে দক্ষিণা দিলে গুরু

পরিত্রাণ করেন কর্ম্মফল থেকে। লোকে ব্রাহ্মণদের কথায় ভুল করলে। সাধারণকে সংসারী করার জন্যে মন্দিরে মন্দিরে তাই বুঝি প্রেমাভিসারের চিত্র চিত্রিত হ'ল। বৌদ্ধধর্ম্মের উপর সাধারণের আস্থা কমে গেল, হ'ল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান। উদয়গিরি খণ্ডগিরি শুধু স্মৃতি-স্মারণিক হয়ে রইল।

খণ্ডগিরির একটি গুম্ফা

মুক্তেশ্বরের মন্দিরের প্রবেশ-পথে ভগ্ন সখীর আটটি মূর্ত্তি একটি প্রস্ফুট পদ্মের চারিধারে নৃত্যরত অবস্থায় শোভা পাচ্ছে। মন্দিরটি প্রাচীন ও অন্ধকারাবৃত। অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত দেবতাকে আঁধার-যবনিকা তুলে দর্শন দুর্লভ, পূজক অর্থলোভী। তিনি দক্ষিণা কত দেব সেইটে স্থির করতেই অনেকখানি সময় নষ্ট করালেন। যাই হোক, তবু তিনি মন্দিরগাত্রে কয়েকটি দুর্লভ শিল্প-সুষমার নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। একটি মস্তক কিন্তু আট বাহু এবং অনুরূপ পদ-বিশিষ্ট একটি মূর্ত্তিকে তিনি বিভিন্ন ভাবে হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করে চারটি বিভিন্ন মনুষ্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করালেন। এখানকার বহুবাহু-বিশিষ্ট শিবমূর্ত্তি শিল্প-কলার এক অনুপম নিদর্শন। সময় অল্প, তাই দ্রুতগতিতে মিউনিসিপ্যাল পার্ক অতিক্রম করে রাজারাণীর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম। কিংবদন্তী আছে যে, কোন এক রাজার রাণী বিরাগিণী হয়ে চলে যান। রাজা তাঁর জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। কথাটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না, তবে মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য যে উচ্চশ্রেণীর এ বিষয়ে ভিন্নমত নেই। প্রস্তরে ফুটে রয়েছে থরে থরে পদ্ম। মিথুনমূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন বিমোহন ভঙ্গীতে

মিউনিসিপাল পার্ক—দূরে মুক্তেশ্বরের মন্দির

দণ্ডায়মান। আবার ঠিক তার পরেই স্নেহময়ী জননী সন্তানকে বক্ষ-সুধা পান করিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করছেন। অশ্বারূঢ়া বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তি, বেণীরচনারত চকিত-নয়না বামাকুল, কুণ্ডলীকৃত নাগিনীমূর্ত্তি, অষ্টবসুমূর্ত্তি প্রভৃতি শিল্পের দিক থেকে অনবদ্য অবদান। মানবের জন্মরহস্য থেকে আরম্ভ করে তার সমগ্র জীবনধারা যেন পাষাণে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় রূপায়িত হয়ে আছে। যেন কোন শিল্পী একান্তে রং তুলি দিয়ে একদিকে মানব-জীবনের উদগ্র কামনা এবং অপর দিকে স্নেহ, মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যবিধান করেছেন। মন্দিরটি নিঃসন্দেহে স্থাপত্যশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।*

* প্রবন্ধের আলোকচিত্রগুলি শ্রীঅমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত।

বাংলার মহিলা-সাহিত্যিক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

অনেকেরই হয়ত জানা আছে, মাত্র দেড়শ' দু'শ' বছর আগেও আমাদের দেশে লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে—এটা একটা প্রায় বদ্ধমূল সংস্কার ছিল। অবশ্য মেয়েরা লেখাপড়া একেবারেই য শিখতেন না তা নয়—যেমন, হটী বিদ্যালঙ্কার, ময়মনসিংহ গীতিকায় কবি চন্দ্রাবতী প্রমুখ বিদুষী মহিলাদের নাম আমরা জানতে পারি, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। সাধারণ ঘরে দু'-একটি প্রতিভাশালিনী মেয়ে হয়ত কোনক্রমে সামান্য পড়াশোনা শিখতেন, কিন্তু সে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

আমরা ছোটবেলায় 'নারী-শিক্ষা' নামে একখানি বইয়ে "জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন" শীর্ষক একটি লেখায় নিম্নোক্ত কথাগুলি পড়ি—"মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবেক" ইত্যাদি।

ইংরেজ আমলে রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে সমাজে নানা পুরানো প্রথা ও সংস্কারের পরিবর্ত্তন হতে সুরু হ'ল। রাজার মত বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তির চেষ্টায়ই যে বিশেষ ভাবে সমাজ উন্নয়ন বা সমাজের সংস্কার সুরু হয়েছিল একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। তার আগে আমাদের দেশের মহিলারা ছিলেন শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন। যখন আমরা বহু সাহিত্যিক মহিলার দানে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ দেখতে পাই, তখন স্বতঃই সেই অন্ধকার যুগের কথা মনে পড়ে যে কালে হয়ত কত প্রতিভা অনাদরে অবলুপ্ত হয়েছে। উপযুক্ত সুযোগের অভাবে বিকশিত হতে পারে নি কত মহিলা-কবির কবিত্বশক্তি।

সেকালে বামাবোধিনী পত্রিকায় অনেক মহিলার রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু প্রথম প্রতিভাশালিনী মহিলা লেখিকা বলতে পারা যায় স্বর্ণকুমারী দেবীকে। ইনি স্বনামধন্যা। মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, শিশুপাঠ্য বই, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয় লিখেছেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী' সম্পাদনার ভারও পরে তিনি নিয়েছিলেন।

এর বহু পরে আমরা পেলাম আর একজন মনস্বিনী লেখিকাকে। বহুমুখী প্রতিভায় অধিকারিণী বলা যায়—শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে। ইনিও নানা বিষয়ে লেখনী চালনা করেছেন, কিন্তু কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

এঁর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পেয়েছি নিরুপমা দেবীকে। 'দিদি' 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'শ্যামলী' ইত্যাদির আর এক প্রতিভাশালিনী প্রখ্যাতা লেখিকা।

অনুরূপা দেবীর অগ্রজা সুরূপা দেবীও ছিলেন একজন সুলেখিকা, —ইন্দিরা দেবী এই ছদ্মনামে লিখিত তাঁর উপন্যাসগুলি সুখপাঠ্য।

১৩১৮ সাল থেকে যেন অকস্মাৎ বাংলা কথাসাহিত্যে বহু লেখিকার আবির্ভাব হতে লাগল। তাঁদের ভাবধারা নূতন, রচনা-শৈলীও অভিনব। তাঁরা সাহিত্য জগতে কতকটা আলোড়নের সৃষ্টি করলেন।

বছর কয়েক পরে বেরুল 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় সংযুক্তা দেবীর 'উদ্যানলতা'। সীতা দেবী ও শান্তা দেবী দুই বোনে মিলিত ভাবে উপন্যাসখানি লিখেছিলেন। তখন এই উপন্যাস সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের মনে কি কৌতূহলই না জেগেছিল। তখনকার দিনে মেয়েরা এমন নতুন ধরনের প্লট নিয়ে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন নি। কবি কামিনী রায়ের পর যে সকল উচ্চশিক্ষিতা লেখিকার দানে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হয়েছে তন্মধ্যে এঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সে সময়কার লেখিকাদের মধ্যে শৈলবালা ঘোষজায়া, আমোদিনী ঘোষ, গিরিবালা দেবী, সরোজকুমারী দেবী ও সরোজ-কুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জনের রচনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এঁরা বেশীর ভাগই কথাসাহিত্যেই নাম করেছেন। কিন্তু শুধু কথা-সাহিত্যে নয়, কাব্যসাহিত্যেও মহিলাদের দানের পরিমাণ কম নয়।

গত শত বর্ষের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে বহু প্রতিভাশালিনী মহিলা কবির আবির্ভাব হয়েছে। সেকালের মহিলাদের মধ্যে মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রসন্নময়ী দেবী, সরলা দেবী প্রভৃতির নাম সুপরিচিত। বিনয়কুমারী ধর, লীলা দেবী—এঁদের অল্পবয়সে মৃত্যু হয়েছে, বইয়ের সংখ্যাও কম, তাই এঁদের কাব্যকৃতি আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হতে চলেছে। অবশ্য কবি লীলা দেবীর নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর লীলা-পুরস্কার নামে একটি স্মৃতি-পুরস্কার-দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলা কবিদের মধ্যে কামিনী রায়ের রচনা যেমন বলিষ্ঠ ভাবময় তেমনি চিন্তোদ্দীপক। আলোছায়া, "মাল্য ও নির্মাল্য", অম্বা নাটিকা তাঁকে অমর করে রেখেছে। প্রায় তাঁর সমকালীন লেখিকা 'অর্ঘ্য', 'প্রবাহে'র কবি শ্রীমতী সরলাবালা সরকার। ইনি অন্যান্য নানা বিষয়ে আজও লিখে চলেছেন।

আধুনিক কালের কবিদের মধ্যে আমরা পাই বাতায়নের কবি উমা দেবীকে। তিনি ও নিরুপমা দেবী এক সময়ে কাব্যসাহিত্যেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনিও এক সময়ে নবপর্য্যায় 'পরিচারিকা' সম্পাদনা করতেন, এখন কস্তুরবা গ্রাম উদ্যোগ কর্ম্মী। কবি রাধারাণী দেবী অপরাজিতা দেবী এই ছদ্মনামেও অনেক কবিতা লেখেন। পড়লে মনে হয় যেন দুই ভাবে দুই ভঙ্গীতে দুই জন

লেখিকার অপূর্ব্ব কাব্যরচনা। উমা দেবী (রায়), রাণী রায়, আশা-পূর্ণা দেবী এঁরাও শক্তিশালিনী লেখিকা। আধুনিক মহিলা কবিদের মধ্যে শ্রীউমা দেবীর রচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

প্রবাসিনী বঙ্গমহিলাদের মধ্যেও আমরা অনেক লেখিকাকে পেয়েছি। পূর্ণশশী দেবী (আম্বালা), প্রতিভা দেবী (এলাহাবাদ), হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী (পাতিয়ালা, হিন্দী লেখিকা), কবি সরোজ-কুমারী দেবী (সম্বলপুর) প্রভৃতি আরও অনেক প্রবাসিনী সাহিত্য চর্চ্চা করেছেন। বিমলা দেবীও (জয়পুর) কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। এঁর কণিকা ও কবিতা উপভোগ্য।

চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের মধ্যে 'বঙ্গনারী' অনিন্দিতা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। ছদ্মনাম 'বঙ্গনারী' নামে লিখতেন। "আগমনী" নামে এঁর একখানি সুচিন্তিত প্রবন্ধ সংগ্রহ আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী "নারীর উক্তি" নামক পুস্তকখানিতে প্রচুর চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। কবি রাধারাণীও নানা সমস্যা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

পত্রিকা সম্পাদনা ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে থাকেন নি। স্বর্ণ-কুমারী দেবীর "ভারতী" সম্পাদনার কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। তার পরে তাঁর দুই কন্যা সরলা দেবী ও হিরণ্ময়ী দেবীকেও আমরা ভারতী সম্পাদিকা রূপে দেখতে পাই। "মেয়েদের কথা" নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন কল্যাণী দেবী। "জয়শ্রী"র লীলা রায়, "মহিলা"র আশা দেবী, "মহিলা মহলের" কমলা দেবী—এঁরাও পত্রিকা-সম্পাদিকা হিসাবে নাম করেছেন। এই প্রসঙ্গে সেকালের "ভারতমহিলা" "সুপ্রভাত" সম্পাদনাতে কুমুদিনী বসু (মিত্র) ও সরযূবালা দত্তের কথাও স্মরণীয়।

অনুবাদ সাহিত্যেও নারীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—শ্রীমতী পুষ্প বসু, নারায়ণী দেবী প্রমুখ কেউ কেউ। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় আমরা পেয়েছি ডক্টর রমা চৌধুরীকে।

রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' ভ্রমণ সাহিত্যে এক অনুপম সৃষ্টি। শিশু-সাহিত্যে সুখলতা রাও, ইন্দিরা দেবী, লীলা মজুমদারের লেখা স্মরণ করে রাখবার মত।

রন্ধনকলায় পটীয়সী প্রজ্ঞাসুন্দরীর রন্ধনবিদ্যা সম্পর্কিত বইগুলির মধ্যে "আমিষ ও নিরামিষ আহার" প্রভৃতির নাম করা যায়। উপনিষদের অনুবাদে শ্রীমতী চিত্রিতা গুপ্ত এক নতুন পথ দেখিয়েছেন। বহু বঙ্গমহিলা সাহিত্য-শিল্পকলা ইত্যাদি নানা উপচারে বঙ্গবাণীর অর্চ্চনা করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি নি। সরসীবালা বসু, সরসীবালা সিংহ, ইন্দিরা গুপ্ত, হেমনলিনী দেবী, নীহারবালা দেবী প্রভৃতি বহু লেখিকার সুলিখিত রচনা এখনো পুরানো 'ভারতী', 'প্রবাসী' 'পরিচারিকা', 'ভারতমহিলা', 'সুপ্রভাতে'র পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। অতি সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক রচনার ক্ষেত্রে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য।

এযুগের প্রথম কবি কামিনী রায়ের ভাষায় বলি—

"আজ মনে আশা জাগে, এক পরম আশা
তোরা শুনে যা আমার আশার স্বপন
শুনে যা আমার আশার কথা।"

এ ছিল তাঁর ভারতের স্বাধীনতার আশার স্বপন।

আজকের দিনে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ মহিলাদের দানে পুষ্ট হচ্ছে দেখে মনে আশার সঞ্চার হয়। মনে হয় আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে এমন প্রতিভার বিকাশ করে হবে যা দেশ-কাল অতিক্রম করে ভাস্বর হয়ে নিরবধিকালের মাঝে আসন পাবে।

সাধারণের মধ্যে অসাধারণ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যাঁহাদের ভাগ্যে খ্যাতি জুটে, জনসাধারণের সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা নিতান্ত মুষ্টিমেয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদের যশঃ ছড়াইয়া পড়ে, তাঁহারা কোনও এক বিশেষ গুণের পরিচয়ে অকস্মাৎ এরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। এরূপ যশের আবির্ভাব-তিরোভাবের কোনও স্থিরতা নাই। যাঁহারা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এবং মরণের পরেও খ্যাতির অধিকারী হইয়া যান, তাঁহারা ভাগ্যবান।

পরিচয় লাভ করিবার সৌভাগ্য লইয়া অনেকেই হয়ত জন্মায় নাই। কিন্তু এই জনসাধারণের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের স্থানীয় লোক ব্যতীত অপরে কোনও নাম শুনে নাই। কবি টমাস গ্রে "Elegy" কবিতায় ইহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সাধারণতঃ মহত্ত্বের যে সকল বীজ হয়ত সাধারণ লোকের মধ্যে খুব বেশী থাকে, কতক সুপ্ত, কতক প্রকাশিত, কিন্তু ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ বলিয়া নাম-প্রচার যে পরিমাণ হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ত্যাগ, সংযম প্রভৃতি গুণের পরিমাণের তুলনাই হয় না। ডবলিউ. ডি. চ্যানিং বলেন :

> "Among common people will be found more of hardship borne manfully, more of unvarnished truth, more of religious trust, more of that generosity which gives what the giver needs himself, and more of a wise estimate of life and death, than among the most prosperous."

ভাবার্থ—"ধনী বিত্তশালী অপেক্ষা সাধারণের মধ্যে সাহসের সহিত বিপদে সহিষ্ণুতা, খাঁটি সত্যের প্রতি অনুরাগ, নিজের যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা পরার্থে দান, জীবন ও মৃত্যুর প্রতি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করিবার লোক অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।"

পণ্ডিতপ্রবর ঋষিকল্প স্বর্গত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের রত্নমালা" গ্রন্থে এরূপ কয়েকটি সাধারণের মধ্যে অসাধারণ গুণের অধিকারী মহাপুরুষের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র ঘরে অনুসন্ধান করিলে আমরা অনেকের মধ্যে এরূপ মহাপুরুষের মাঝে মাঝে পরিচয় পাইয়া থাকি। মনীষী উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মলাভ করিয়া শিক্ষা, সেবা, ত্যাগ এবং চরিত্রের দৃঢ়তা ও মাধুর্য্যে বহু খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনের প্রাক্কালে "সোম প্রকাশ"—সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি এ. এস. স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি নরকুলে ধন্য, লোকে তাঁহাকে না ভুলিয়া মনের মন্দিরে নিত্য সেবা বা পূজা করিয়া থাকে। আবার তাঁহার আদর্শে যে সকল ছাত্র নিজেদের গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমসাময়িক ছাত্র যুবকদের মধ্যে আপন আপন বৈশিষ্ট্যে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল ছাত্রদের মধ্যে স্বর্গীয় উমাচরণ ঘোষ অন্যতম।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতৃপিতামহের বাসভূমি বলিয়া অধুনা-প্রসিদ্ধ ২৪-পরগণার কোদালিয়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে উমাচরণ ২২শে পৌষ ১২৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসারে সর্ব্বদাই অভাব ছিল। সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের ছেলে—অলৌকিক বা আকস্মিক গৌরব লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। এই পর্য্যন্ত বলা যায়, পল্লীতে বাসকালে এমন কোনও জন-হিতকর কাজ ছিল না, যাহাতে উমাচরণকে পাওয়া যাইত না। সে যুগে বাঙালীর গ্রাম্য যে সকল খেলা দৌড় সাঁতার শক্তির পরীক্ষা ছিল, উমাচরণের নাম ছিল সবার উপর। তাঁহার দীর্ঘ সুদৃঢ় দেহ, বলিষ্ঠ গঠন প্রায় অনন্যসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সরকারী চাকুরিতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিভিল সার্জ্জন সাহেবের নিকট উপস্থিত। সাহেব একবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "Take off your coat, young man;" উমাচরণ অনাবৃত দেহে সন্দেহাকুল চিত্তে অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন, সাহেব কিন্তু কাগজ লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন। শেষ হইলে কাছে আসিতে বলিলেন, নিজে দাঁড়াইয়া উঠিয়া উমাচরণের এক কাঁধে হাত দিয়া একটা ঝাকুনি দিলেন এবং বলিলেন, "There's your certificate, my boy, you need no examination"। তাঁহার চাকুরি-ক্ষেত্র ব্রহ্মে এক পুলের উপর তিনি একদিক হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছেন, উল্টা দিক হইতে তিন শিখ জোয়ান আসিতেছেন। ঠিক পার হইবার সময়, পাশাপাশি হইলে একজন ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আচ্ছা মরদ হ্যায়।" দুঃখীর ঘরে অভাবের মধ্যেও কেমন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহার জীবনের ইতিহাসে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি গ্রাম্য কদভ্যাস কুসংস্কার প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। গুরু উমেশচন্দ্রের শিক্ষা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহা কর্ম্মজীবনে পালন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। মাতৃভক্তি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি যে প্রেম ছিল, তাহা নিতান্ত বিরল। বয়সে প্রায় আড়াই বৎসর বড় হইয়াও, তিনি ভ্রাতার প্রতি স্নেহপূর্ণ যে সম্ভ্রম দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, সৎ গুণের পরিচয় পাইলে বয়সের তারতম্য উপেক্ষা করিয়া যাহা তিনি নিজ ত্রুটি বলিয়া মনে করিতেন তাহাতে যথেষ্ট কুণ্ঠাবোধ করিতেন।

যৌবনে তিনি ধ্রুপদ শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং অতি শীঘ্র বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া শ্যামাচরণ সঙ্গীত

শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং একদিন দুই ভ্রাতায় কলিকাতার বাসা হইতে আখড়ায় যাইতে থাকেন। প্রায় আখড়ার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার স্মরণে আসে যে, প্রবেশ করার সঙ্গেই আখড়ায় তাঁহার হাতে সাজা হুঁকা তামাক দেওয়া হইবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্তরে লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়েন। কনিষ্ঠের সম্মুখে ধূমপান করার কুণ্ঠা, তাঁহার বদভ্যাসের কথা কনিষ্ঠের সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িবার চিন্তায় তিনি গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠেন। পা আর চলে না দেখিয়া শ্যামাচরণ জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার হঠাৎ কোনও অসুখ হইল কিনা? বহু কষ্টে আমতা আমতা করিয়া, ভ্রাতাকে লুকাইয়া তিনি যে ধূমপান অভ্যাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। বলিলেন, "দেখ, আখড়ায় গেলেই সেখানে ওস্তাদ—সেখানে সবাই তামাক খায় কিনা—হুঁকো এগিয়ে দেবেন—।" কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ বলিয়া উঠিলেন, "তামাক খেতে শিখেছ, বুঝি?" শ্যামাচরণ প্রকৃত ব্যাপার অন্তত: বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া তিনি লজ্জার মধ্যেও স্বস্তি বোধ করিলেন। শ্যামাচরণ বলিলেন, "খেতে হয় তুমি খেও, গান শিখতে গিয়ে আমি নেশা শিখতে পারব না।" এই ভাবে একটা সম্মতি পাইয়া তিনি সেযাত্রা রক্ষা পাইলেন বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং শ্যামাচরণের মৃত্যুর বহুকাল পরেও নিজ বার্দ্ধক্যে পুরাতন স্মৃতির মধ্যে কনিষ্ঠের নিকট নিজ দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হওয়ার কাহিনী সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত বলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, সে যুগে বড় আখড়ায় নেশার মধ্যে তাম্রকূট একটি সামান্য উপকরণ ছিল, অন্যান্য যাহা ছিল তাহা উমাচরণকে কখনও স্পর্শ করে নাই। আর এই ধ্রুপদ শিক্ষা তাঁহার জীবনে বহুকাল পরে এক পুরাতন সম্পর্ক পুন: স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার কাহিনী পরে বলিব।

তামাক ব্যতীত বাতরোগে ভুগিয়া তিনি অহিফেন সেবন সুরু করিয়াছিলেন প্রৌঢ় বয়সে। পঞ্চাশ বৎসর তামাক খাইবার পর এক সময় তাঁহার অসুস্থতার জন্য ডাক্তার বলিলেন, "দিন দুই তামাক বন্ধ রাখলে কেমন হয়, উমাচরণবাবু?" তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ভালই হয়।" দু'তিন দিন গেল, যাহাদের অভ্যাস তাঁহাকে যথানিয়মে তামাক সাজিয়া দেওয়া, তাহারা জিজ্ঞাসা করে যে, কখন গড়গড়া আনিয়া দিবে? ডাক্তারবাবু দিনকয়েক পরে আসিয়া তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া তামাক আরম্ভ করিবার পরামর্শ দিলেন। তখন উমাচরণ বলিলেন, "ওটা ছেড়ে দিয়েছি, অভ্যাস-বশে খেতাম; রোগ যখন অভ্যাসে বাধা দিলে, তখন তাকে আর প্রশ্রয় দিই কেন?" তার পর বহু বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, তামাক আর ব্যবহার করেন নাই।

সেইরূপ তাঁহার আফিম ব্যবহার পরিত্যাগের কাহিনী সংক্ষিপ্ত হইলেও তাঁহার মনের শক্তির পরিচয় দেয়। তাঁহার এক পুত্র বেশী চা পান করিতেন; এবং প্রায়ই অজীর্ণ রোগে ভুগিতেন। চিকিৎসক চা পরিত্যাগ করিতে বলেন, অন্তত: চা ব্যবহার হ্রাস করিবার নির্দ্দেশ দেন। তিনি সেই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করেন। তাহার উত্তরে পুত্র বলিয়াছিলেন, "আমায় চা ছাড়তে বলেন. আপনি কি আফিম ছাড়তে পারেন?" তদুত্তরে পিতা সামান্য দুটি কথা উচ্চারণ করিলেন, "বলিস কি?" বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে তিনি আফিম পরিত্যাগ করিলেন—প্রায় কুড়ি বৎসরের অভ্যাস, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পুত্র চা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে তিনি কতগুলি মত পোষণ করিতেন এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেন। বহু বিষয়ে তিনি সংস্কারমুক্ত ছিলেন। পুত্র-কন্যাদের বিবাহের ব্যাপারে তিনি ঠিকুজী-কুষ্ঠীর বিচারে আস্থাবান ছিলেন না। তিনি এ বিষয়ে দুটি গল্প বলিতেন। একটি এখানে উল্লেখ করা গেল:

এক মহাতপা ঋষি দয়াপরবশ হইয়া কাক-মুখ হইতে পতিত এক স্ত্রী-মূষিক শিশু পালন করেন। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার তপের বিঘ্ন হওয়ায় বয়:প্রাপ্তা হইলে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান সুপাত্রে অর্পণের জন্য চিন্তা করিলেন। অমিতবীর্য্য সূর্য্যদেবকে দান করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে স্মরণ করিলে সূর্য্যদেব আসিয়া প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার শক্তি বিচার করিয়া যদি পাত্রী দানে আপনার ঈপ্সা হইয়া থাকে তবে ইহাও বিচার্য্য যে, পর্জ্জন্যদেব যখন আমায় ঢাকিয়া ফেলেন তখন আমার আর কোনও শক্তিই থাকে না; অতএব তাঁহাকেই কন্যা দান করা উচিত।" মেঘ আসিলেন; বলিলেন, "পবন আমাকে উড়াইয়া দিতে পারেন, সুতরাং তিনি আমা অপেক্ষা বলবান এবং উপযুক্ত পাত্র।" পবন বলিলেন, "হিমালয়কে তিনি শত চেষ্টায়ও পরাজিত করিতে পারেন নাই।" হিমালয় আসিয়া বলিলেন, "তাঁহার বহিরাবরণ ঠিক আছে, কিন্তু সহস্র সহস্র ইঁদুরে তাঁহাকে অন্ত:সারশূন্য করিয়াছে। অতএব সপ্রমাণিত হইল যে, জগতে ইঁদুরই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান। ঋষি মনে মনে হাসিলেন; বলিলেন, "ভবিতব্য"। শুভদিন দেখিয়া মহাসমারোহে ইঁদুরের সহিত সগোত্রে বিবাহ হইয়া গেল।

সত্যের প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ ছিল। প্রথম যৌবনে সরকারী চাকুরি পাইবার পরেও তিনি এক ফৌজদারী মামলায় আসামীর দণ্ড গ্রহণ করিতে পশ্চাদপদ হন নাই। তাঁহার গ্রামবাসী এক সমৃদ্ধ এবং বয়স্ক গোয়ালা তাঁহাকে "দাদা" সম্বোধন করিতেন। তিনি দুষ্টপ্রকৃতিবশত: উমাচরণের জ্যেষ্ঠপুত্রকে সঙ্গী ভাবে লইয়া একদিন তাড়ি খাওয়াইয়া দেন। উমাচরণ সপ্তাহ শেষে বাড়ী আসিয়া শুনিলেন এবং সেই ভদ্রলোককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুক! তুমি সতীশকে তাড়ি খেতে শিখিয়েছ নাকি?" হঠাৎ প্রশ্নে ভদ্রলোক চমকিয়া গিয়া আমতা আমতা করিতে থাকেন। তখন প্রশ্ন করিলেন, "স'তে তোমাকে কি বলে,—?" "কাকা"। দৃঢ়স্বরে উমাচরণ বলিলেন, "তবে এই হ'ল কাকার কাজ? তোমার পুরস্কার হওয়া চাই।" বলিয়া পা হইতে চটি লইয়া ভদ্রলোকের এক গালে

প্রহার করিলেন এবং বলিলেন, "ফের যদি শুনি, তার জন্তে আর একটা গাল আর এক পাটি চটি তোলা রইল।"

ঘটনা হইল উমাচরণের ভিটার উপর, সাক্ষী কেহ রহিল না। কেবল মাত্র উমাচরণ এবং —র মুখে শোনা কথা। নালিশ হইল; ফৌজদারী কোর্টের আসামী সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত; সাজা হইলে চাকরি যাইতে পারে, বদনাম এবং আপিস রেকর্ড প্রভৃতি খারাপ হইবে। উমাচরণের পক্ষে ভাল উকিল নিযুক্ত হইল। উকিলবাবু মহা সন্তুষ্ট যে, কোন সাক্ষীই নাই; আসামীকে ঘটনা অস্বীকার করিবার পরামর্শ দিয়া নিশ্চিন্ত; বাজি মাৎ হইবে। আসামীর কাঠগড়ায় উমাচরণ। ফরিয়াদীর উকিল সাক্ষী খাড়া করিবেন, ফরিয়াদীর জবানবন্দী হইবার পর, দ্বিতীয় সাক্ষী ডাক হইবার পূর্ব্বে ফরিয়াদী হাকিমকে বলিলেন, "হুজুর! (অভ্যাসমত বলিয়া বসিলেন) দাদাবাবুকে, অর্থাৎ আসামীকে ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হউক।" কাজ সহজ করিবার জন্ত হাকিম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলেন উমাচরণবাবু? তবে আপনি আসামী, আমার প্রশ্নের উত্তর এখন নাও দিতে পারেন।" মুহূর্ত্তের জন্ত কাছারি নিস্তব্ধ নীরব; আসামীর উকিল জিজ্ঞাসুমুখে উদগ্রীব হইয়া আছেন; মনে একটা বিশ্বাস লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান আসামী নিতান্ত একটা বোকার মত জবাব দিবেন না। উমাচরণ সহজকণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ হুজুর, আমি দোষী—কাকা হয়ে ভাইপোকে তাড়ি খাইয়েছে, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারি নি।" হাকিম নামমাত্র জরিমানা করিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিলেন।

মিথ্যার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, অতিরঞ্জিত করিয়া কথা বলিলে তিনি বিরক্ত হইতেন।

অপরাধ করিয়া সত্য কথা বলিলে তাঁহার নিকট সাত খুন মাপ ছিল। স্কুলে ছেলেদের বয়স কমাইয়া লিখাইবার কথা তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিত; পাওনাদারকে সত্য বলিয়া ঋণ পরিশোধের সময় লইতে তাঁহার লজ্জা ছিল না। আবার যেদিন যে অর্থ দিবার স্বীকৃতি দিতেন, তাহাতে কোনও রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিবার সুযোগ থাকিত না। "বড়বাবু" কথা দিয়াছেন জানিলে উত্তমর্ণ নিরস্ত হইয়া যাইত। এই সত্যপালন ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্ত তাঁহাকে কখন কখনও মিউনিসিপ্যালিটি স্কুল-কমিটিতে অপ্রিয় হইতে হইয়াছে, কিন্তু বিচলিত দেখা যায় নাই।

অর্থ সম্বন্ধে তিনি নিরাসক্ত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে উৎকোচ গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কেহ কোনও দিন তাঁহাকে উৎকোচ দিবার প্রস্তাবে সাহস পায় নাই। উপার্জ্জনের অর্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতাচরণকে সমস্ত পাঠাইয়া দিয়া শেষে নিজের খরচটুকু মাত্র রাখিয়া দিতেন। পেন্সনের পর তাঁহার টাকা ছেলেরা খরচ করিয়াছে; তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা তিনি কখনও লন নাই। তাহারা কে কত পায় তাহা নিজে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন না।

পাঁজির নজির দিয়া কাজকর্ম্মে বিঘ্ন উপস্থিত করা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। নিজে কোনও তর্কে বিশেষ যোগ দিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার এক গল্প ছিল:

অতি প্রত্যূষে এক তিলকচন্দনধারী মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পথিপার্শ্বে প্রস্রাব করিতে বসিয়াছেন; ঘটনাচক্রে তাহা পূর্ব্বমুখ বা দিক। তিনি উঠিবার পূর্ব্বে অপর এক পণ্ডিত আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইতেই দ্বিতীয় পণ্ডিত সংস্কৃতভাষায় বহু শ্লোক সাহায্যে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, পণ্ডিত হইলেও তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ব্যবহারিক জ্ঞান কণামাত্র থাকিলে পূর্ব্বাস্য হইয়া তিনি মূত্রত্যাগ করিতেন না। প্রথম পণ্ডিত শাস্ত্রাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া নিজ কার্য্যের সমর্থন এবং প্রতিপক্ষের ভুল বুঝাইতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল; দু'জনেই গলদঘর্ম্ম, মুখে অনর্গল সংস্কৃত বাক্য নির্গত হইতেছে এবং ফেনা উঠিয়া গিয়াছে; মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা নাই।

হেনকালে এক কৃশ বৃদ্ধ কৃষক, মাথায় জড়ানো একখানা ছোট গামছা, পরিধানে (গান্ধীজীর ধরণে) কটিবস্ত্র, হাতে-পায়ে, গাত্রে কৃষি লক্ষণ কর্দ্দমের চিহ্ন, ক্ষীণ যষ্টি হাতে ধীর পদক্ষেপে বিবদমান পণ্ডিতদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। ক্লান্ত তর্ক-চূড়ামণিরা মুক্তির আশায় সেই কৃষককে মধ্যস্থ মানিয়া লইলেন।

বলিলেন, "বাবা, তুমি বুড়ো হয়েছ, জগতে অনেক কিছু দেখেছ, শুনেছ। তুমি আমাদের এই তর্কের মীমাংসা করে দিয়ে যাও। তুমি বলত বাবা, পূর্ব্বাস্য হয়ে প্রস্রাব করা প্রশস্ত না পশ্চিমাস্যে প্রশস্ত?" দ্বিতীয় পণ্ডিতও প্রায় সেইরূপে পশ্চিমাস্য উপবেশনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে বলিলেন।

কৃষক ত হতভম্ব হইয়া পড়িল। সে বলিল, "দা'ঠাকুররা, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, তোমাদের মত পণ্ডিতের ঝগড়ায় কি আমি সালিশ দাঁড়াতে পারি? একটু একটু পায়ের ধুলো দাও, আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের মঙ্গল হোক, গ্রামবাসী সকলের মঙ্গল হোক, আমায় ছেড়ে দাও, দা'ঠাকুর, অনেক বেলা হয়েছে, বাড়ী যাই।"

তাঁহারা নাছোড়বান্দা; এই পথ ছাড়া তাঁহাদের মুক্তি নাই। আবার মধ্যস্থ যাকে তাকে মানা যায় না। এই বৃদ্ধ কৃষক যদি উপায় না করে তবে দিন যামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ সকল সময় তর্ক হইতে পারে, কিন্তু মীমাংসা কৈ?

তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কৃষক সম্মত হইয়া তাঁহাদের তর্কের বিষয় বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি বলছ দা'ঠাকুর, ঝগড়া ত দেখছি তোমাদের 'আস্য' নিয়ে, পুব-পশ্চিম সে ত পরে মীমাংসা হবে।" কৃষক শুনিল আস্য মানে, চলতি কথায়, "মুখ"।

তখন সে যোড়হস্তে তটস্থ হইয়া বলিল, "আমার পক্ষে কি এর বিচার করা সম্ভব? আমি মুখ্যু মানুষ, এসব ত বড় কথা। তা

ছাড়া কাজের খাতিরে আমাদের এই সকল বিচার করবার সময় কৈ দা'ঠাকুররা।"

এই বলিয়া সে প্রথমে এক পণ্ডিতের মুখের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিল, "এ দা'ঠাকুর যে মুখে বলছেন আমরা এ মুখেও মুতি : আবার (অন্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া) ও দা'ঠাকুর যে মুখে বলছেন, ও মুখেও মুতি। আমাদের অত মুখের বিচার করতে গেলে কাজ চলবে কি করে ?"

তখন পণ্ডিতরা বলিলেন, "ঠিক হয়েছে, আমাদের তর্কের যেমন বিষয়বস্তু, মীমাংসা তদনুরূপ হয়েছে। এ হাঙ্গামা না করে চলে গেলে আর মুখ অপবিত্র হ'ত না।"

অযথা যুক্তিতর্ক নিবারণের ইহা অপেক্ষা সরল উদাহরণ মেলা কঠিন। ইহাতে গ্রাম্যভাষার দোষ আছে, সন্দেহ নাই : কিন্তু সাধু ভাষায় ইহাকে প্রকাশ করিতে গেলে প্রচুর অর্থহানি ঘটার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

এই ভাবে তিনি নানা গল্পের ভিতর দিয়া আত্মীয়-পরিজন বন্ধুমণ্ডলে শিক্ষা দিতেন। একদিন শ্যামাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র তামাক সাজিয়া আনিয়া তাঁহার তক্তাপোশের ধারে দাঁড়াইয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছে এবং কলিকার নীচের রন্ধ্র হইতে সুবাসিত ধূম নির্গত হইতেছে। তিনি বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন। সেই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "ভাখ, ছোট ছেলেরা যে তামাক খেতে শেখে তাতে তাদের দোষ কতটা—আর আমার মত অভিভাবকের দোষ কতটা তা কেউ বিচার করে না, ছেলেটারই নিন্দে করে, তাকে মারধোর করে। তোর মুখটা কলকের আগুনের আভায় কত সুন্দর দেখাচ্ছে, আর তোর নাকে তামাকের মিষ্টি গন্ধ যাচ্ছে, যে গন্ধের লোভ আমার মত বুড়ো মানুষকে টানে বলে এত বড় একটা নেশা তোর বাপের ধমক খেয়েও ছাড়তে পারি নি। তুই কলকের আগুন দিয়ে আনছিস সেই ভেতর বাড়ী থেকে ; যাতে আমার লোভ, তাতে ছেলে বয়সের পরীক্ষা হিসাবে তুই যদি একটা টান্ দিস, তাতে দোষ তোর বেশী, না আমার বেশী ? এটা বিচার করবে কে ?"

এই বলিয়া একটু থামিলেন ; পরেই বলিলেন, "আমি কি বলি, জানিস ? তুই তামাক খেতে শিখলে তার অপরাধ হবে তোর জ্যাঠাবাবুর, তোর ত নয় ? আমি জানি, তুই এমন কাজ করতে পারিস না, যাতে আমার বদনাম হতে পারে ; সে কাজ তোর দ্বারা সম্ভব নয়। কি বলিস ?"

ভ্রাতুষ্পুত্র বলিল, "সে ত ঠিক কথা।"

তাহাতেও তাঁহার মন নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। কৈশোরে নূতন জ্ঞান লাভের প্রেরণা, তামাকের (সুগন্ধের) প্রতি লোভ, হয়ত বা সঙ্গীদের কাহারও কাহারও কদভ্যাস প্রভৃতির প্রভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র তামাক-টানা শিখিতে পারে, সেই জন্য বলিলেন—"এ কথা কি ভুলতে পারি, তুই শ্যামাচরণের ছেলে, যে জীবনে একদিন এক টিপ নস্যি পর্য্যন্ত নিলে না।"

যেটুকু দুর্ব্বলতা কিশোরের মনে উদয় হইতে পারিত, তাহার চরম অস্ত্র পিতার নাম, পিতার গুণগ্রামের অবতারণা করিয়া একেবারে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

উমাচরণের বয়স যখন ৭০ বৎসর তখন একদিন শুনিলেন কোদালিয়ার পাশের গ্রামে একটি রজকবংশীয় যুবক যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছে। একদিন রজকরা সংখ্যায় অনেক ছিল। কিন্তু ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে পাশাপাশি তিন-চারটি গ্রামের রজক জুটিলেও ঘটনাকালে সমর্থ পুরুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। যক্ষ্মায় মৃত্যু হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কেহ শব স্পর্শ করিবে না। রজক জাতির পুরোহিত ১০-১২ ক্রোশ দূরে ভিন্ন গ্রামে থাকেন ; কেহ সংবাদ দিতে যাইবার মত লোক নাই ; গেলেই যে পুরোহিত ঠাকুরকে পাওয়া যাইবে এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। সবিশেষ প্রশ্নে উমাচরণ এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন।

গ্রামের মধ্যে শব পড়িয়া রহিল, সংসারে অতি বৃদ্ধা মাতা আর এক বালিকা বধূ শব আগলাইয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে, পল্লীর বাতাস সেই করুণ সুর সাধ্যমত বহন করিয়া প্রতিবেশীদের পৌঁছাইয়া দিতেছে। উমাচরণের কানে কথাটা পৌঁছিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র উমেশচন্দ্রের স্পর্শলাভে ধন্য হইয়াছিল। উমাচরণ সেই কথা স্মরণ করাইয়া উমেশচন্দ্র কর্ত্তৃক শববহনের কাহিনী বিবৃত করিলেন। সেই মহাপুরুষের ছাত্র বলিয়া তখনও তাঁহার কি গৌরব ! সেই বৃদ্ধ বয়সেও সকল সময় শিক্ষাগুরুর নাম স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। গ্রামের মজুর ডাকিয়া শববহনের জন্য চালি প্রস্তুত করাইলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্যে শব চালিতে উঠাইয়া একদিকে নিজে অপরদিকে সেই বালিকা বধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্যে গৃহ হইতে শব বাহির করিয়া আনিলেন। দেশের "বড়-বাবু" বৃদ্ধ উমাচরণের সঙ্কল্প ও কার্য্য পদ্ধতি দেখিয়া রজকদিগের মধ্যে সমর্থ লোক আসিয়া সমস্ত ভার লওয়ায় উমাচরণ গৃহে ফিরিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল উমেশচন্দ্রের কাহিনী বলিয়া আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন।

উমাচরণ বাংলার একাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফিসে নিযুক্ত হইয়া উক্ত আপিস হইতে বদলি হইয়া ব্রহ্মের একাউণ্টাণ্ট জেনারেল আপিসে চলিয়া যান। ব্রহ্মের সমস্ত আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরীক্ষক বা "ইন্সপেক্টর" হিসাবে কার্য্যব্যপদেশে সারা ব্রহ্ম রেলে, গো-শকটে, অশ্ব ও হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়াছেন। যৌবনে তিনি ব্রহ্মে পৌঁছেন এবং সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরকাল সেখানে কাটাইয়াছেন। মাঝে মাঝে ছুটি পাইয়া কোদালিয়ায় আসিতেন। তখন যে সকল ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙালী ব্রহ্মে গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককেই নানারূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ দোষ স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু দ্বারকানাথ, উমেশচন্দ্রের স্নেহধন্য উমাচরণের নামে অতি নিন্দুকেও কোনও দিন কলঙ্কলেশ অর্পণ করিতে পারে নাই। তিনি অল্পকাল মধ্যেই

সারা ব্রহ্মের বাঙালীদের মধ্যে "কর্ত্তামশাই" বলিয়া পরিচয় লাভ করেন, কারণ কোনও গুরুতর বিষয়ে তিনি প্রধান হইয়া মত দিতেন, গুরুকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন। তাঁহার দায়িত্ববোধ ছিল অপরিসীম এবং বহু অপরিণামদর্শী যুবক উমাচরণ এবং তাঁহার বন্ধু কুঞ্জবাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) সাহায্যে কত গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন এবং তাহাদের ও তাঁহাদের অভিভাবকগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাহার হিসাব কে রাখে? উমাচরণ ১৯০৬ সনের শেষ ভাগে ব্রহ্ম হইতে অবসর লইয়া আসেন কিন্তু "কর্ত্তামহাশয়" নাম সেখানে তাহার পরেও বহু বৎসর যাবৎ লোকে সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছে:

উমাচরণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতা শ্যামাচরণ দেহরক্ষা করেন। শ্যামাচরণ বিধবা পত্নী, অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই পুত্র ও অনূঢ়া এক কন্যা রাখিয়া গেলেন। বিবাহিতা কন্যা কাশীতে স্বামীগৃহে বাস করিতেছিলেন। মধ্যবিত্তের সংসার; ইহার উপর সম্বলহীন দু'তিনটি পোষ্য বাড়ীতে। এক মাসে (ডিসেম্বর ১৯০৬) নিজের পেন্সন, নির্দিষ্ট ভাতা ও শ্যামাচরণের মৃত্যু সব মিলিয়া মাসিক সাড়ে চারি শত টাকা আয় কমিয়া উমাচরণের পেন্সন মাত্র সম্বল করিয়া নিজ বিরাট পরিবার ও শ্যামাচরণের সংসারের ভার তিনি লইয়া বসিলেন। কেহ তাঁহাকে এই ভাবে নত হইয়া পড়িতে দেখেন নাই। কেবল বৃদ্ধা মাতা যখন শোকে চীৎকার করিতেন, তিনি নিকটে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। শ্যামাচরণের শ্যালকরা তখন সিমলা-কলিকাতা দপ্তরের বড় কর্ম্মচারী, উমাচরণ একদিনের জন্য শ্যামাচরণের পুত্রদিগকে মাতুলালয়ে বাস করিয়া জীবনে উন্নতিলাভ করিবার পরামর্শ দেন নাই। অর্থাভাবের মধ্যে কোদালিয়ার বাড়ীতে একসঙ্গে বহু লোক বাস করা হেতু পারিবারিক মতবিরোধ, বিতণ্ডার বহু ঊর্দ্ধে উমাচরণ আপনাকে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ কোনও দিন তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখেন নাই। পুত্রাধিক স্নেহে শ্যামাচরণের সন্তানদের তিনি পালন করিয়াছেন; সংসারে অভাবের মধ্যেও ভ্রাতুষ্পুত্রদের শিক্ষার কোনও অসুবিধা হইতে দেন নাই।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ভ্রাতা শ্যামাচরণের শিক্ষার সুযোগ দিবার জন্য উমাচরণ "পড়া" বন্ধ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হরিনাভি স্কুলের ছাত্ররা সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলায় এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছাত্রেরা তাহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন। উমাচরণের জ্ঞানের গভীরতার অত্যন্ত সুনাম ছিল। কলিকাতার ঠাকুর বাড়ীর কোনও পদস্থ কর্ম্মচারী তাহা অবগত ছিলেন। যখন রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরেজী রচনার গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তখন উমাচরণের ডাক পড়িল। উমাচরণ কৃতিত্বের সহিত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিচালনা করিয়াছেন এবং বৃদ্ধকালেও রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে রচিত বহু কবিতা নিজে আবৃত্তি করিতেন। শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতিশক্তি অটুট ছিল। উমাচরণ বলিতেন, রবীন্দ্রনাথ যখন দশ বা একাদশ বর্ষ বয়সে অভিমন্যু বধের উপর কৌরবদের সম্বন্ধে লিখিলেন যে তাহারা নিজেদের মধ্যে যতই উৎসব করুক, অন্যদিকে "জনরব শত জিহ্বা করিয়া বিস্তার' পৃথিবীর লোকদিগকে জানাইতেছে, "সপ্তরথী বেড়ে মারে একাকী কুমার" তখন উমাচরণ বুঝিয়াছিলেন যে, একদিন ঐ বালক জগতে কবিত্বের একটা বড় আসন লইবে। "এত অল্প বয়সে ঐরূপ ভাব ও ভাষা কোথা থেকে আসে" জিজ্ঞাসিত হইয়া "মাষ্টারমশাই" ছাত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, লেখক তাহা নিজেই জানেন না; বোধ হয় আপনা থেকে এসে কলমের মাথায় দেখা দেয়। উমাচরণ অনেক কবিতা মুখস্থ বলিতেন, যাহা কবির সংগৃহীত রচনাবলীর মধ্যে দেখা যায় না।

গুরু-শিষ্যের এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহু বৎসরের ব্যবধানেও নষ্ট হয় নাই। উমাচরণ অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। "বড়লোকের" সহিত গায়ে পড়িয়া আলাপ রাখা বা তাহার সুযোগ গ্রহণ করা তিনি আত্মসম্মানের হানিকর বলিয়া মনে করিতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন যশঃপ্রতিভায় সারা পৃথীবিতে খ্যাত, তখনও উমাচরণ দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না বা যোগাযোগ রাখিতেন না। পেন্সন লইবার পরে একদিন কলিকাতা হইতে ঘুরিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে তিনি পরিবারের লোকদিগকে বলিয়া কোদালিয়া হইতে রওনা হইলেন। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন যে, তিনি রবি ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। হঠাৎ উদ্দেশ্য বা কি এবং ফলাফল কি হইল জানিবার জন্য শ্রোতারা উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। ছাত্রের কৃতিত্বে তিনি যে আনন্দ ও গৌরবলাভ করিয়াছেন তাহা এতদিন জ্ঞাপন করা হয় নাই; মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া ত্রুটি সংশোধন করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

ফল যাহা হইয়াছে তাহাতে বক্তা শ্রোতা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রবেশ দ্বারে গিয়া জানিলেন, ভিতরে রবীন্দ্রনাথ আছেন, কিন্তু দ্বারোয়ান পথ ছাড়ে না, দর্শনের উদ্দেশ্য না জানিলে পথ ছাড়িতে পারে না। উমাচরণ কেবল মাত্র বার্দ্ধক্য ও বহু দূর হইতে আসিয়াছেন এই দুই দাবীতে দ্বারোয়ানকে পথ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। এখন আর তাঁহার কোনও বিলম্ব সহ্য হয় না। "বুড়ো লোক" শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাতের অনুমতি দিয়াছেন। ঘরে প্রবেশ করিলে নমস্কার করিয়া—প্রতিনমস্কার পর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বে—উমাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিনতে পারেন?" গুরু-শিষ্যের দু'জনেরই দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু, সাক্ষাতের ব্যবধান হয়ত চল্লিশ বা ততোধিক বৎসর। বিস্ময়ে দুই জনেই বিমূঢ়; একজন চিনিয়া, অপর জন না বুঝিয়া।

কবি বৃদ্ধকে আসন গ্রহণের উপরোধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আগন্তুকের স্বর তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া থাকিবে; কেবল বলেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান কিছু বলবেন না।"

আর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা ললাট পার্শ্বে মৃদু আঘাত

করিতে লাগিলেন, যেন মস্তিষ্ক ধাক্কা খাইয়া পুরাতন স্মৃতিকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেয়। "হঠাৎ বিস্মৃতি ছুটে, সাধু (কবি) ফুকারিয়া উঠে, ঠিক বটে ঠিক!"—

"কে? মাষ্টারমশাই না?" গুরু ইহাতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিয়া মাত্র বলিতে পারিলেন, "চিন্‌লেন কেমন করে?"

কবির প্রথম অনুযোগ, যদি তাঁহার অনুমান সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে "চিন্‌লেন" অর্থাৎ আপনি সম্বোধনে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইতেছে। তখনও পর্য্যন্ত আগন্তুককে আসন গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয় নাই। "মাপ করবেন, মাষ্টার-মশাই, নমস্কার করি নি, বসতে বলতেও ভুলে গেছি।" আরও বলিলেন, "আপনার গলা (স্বর), মাষ্টারমশাই! আপনার সেই ধ্রুপদের সুর আমার কানে বেজে উঠল। এখনও (গান) চর্চ্চা ছাড়েন নি ত, মাষ্টারমশাই।"

উমাচরণ বলিলেন যে, সুযোগের এবং সঙ্গীর অভাবে আর সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্ভব হইয়া উঠে না; একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর বহুক্ষণ পুরাতন কাহিনী আলোচনা হইল, যে আসরে মাষ্টারমশাই গান করিবার সম্ভাবনা, ছাত্রের সেখানে উপস্থিত থাকিবার কি আগ্রহ ছিল, সে কথাও হইল। মাঝে মাঝে কেন আসেন না, সে অনুযোগ করিলেন কবি। পরেই বলিলেন যে গুরুকে আসিতে বলায় নিশ্চয়ই তাঁহার অপরাধ হইয়াছে, কিন্তু গুরু স্বেচ্ছায় তাঁহার বাল্যে সে অধিকার দান করিয়াছেন, কারণ তিনিই আসিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, এখন যেন সেই অধিকার হইতে শিষ্যকে বঞ্চিত না করেন; কারণ ইহাতে তাঁহার একটা পুরাতন অধিকার বা স্বত্ব (prescriptive right) জন্মিয়া গিয়াছে।

এই আলাপসূত্রে পরে রবীন্দ্রনাথ উমাচরণকে তাঁহার পতিসার জমিদারীর হিসাবরক্ষক করিয়া পাঠাইয়াছেন; উমাচরণের বার্দ্ধক্য ও অপরাপর অসুবিধার আপত্তি উপেক্ষা করিয়াছেন। যে পত্র দ্বারা তিনি কর্ম্মচারীর নিকট উমাচরণের পরিচয় করাইয়া দেন, তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ আর পাইবার উপায় নাই। রাজ সমাদরে মাস কয়েক সেখানে থাকিয়া উমাচরণ ফিরিয়া আসেন; বৎসরাধিক কাল বাদে আবার ডাক পড়িলে উমাচরণ গিয়া বলিয়া আসিলেন, যে ভাবে জমিদারীর খাতাপত্র রাখা হয়, তাহা ইংরেজী প্রথায় "অডিটের" উপযুক্ত নয়; আর জমিদারীর যে অবস্থা তাহাতে কবির সম্পত্তি কাব্যেই থাকা ভাল, আর্থিক ব্যবস্থায় কড়াকড়ি হইলে কিছু অনর্থ ঘটিতে পারে সুতরাং যতটা "কড়ি" আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা শ্রেয়ঃ। হাস্যপরিহাসে কিছু সময় কাটিল। উমাচরণ আর পতিসর যান নাই, কবির সহিতও আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

ছাত্র-গৌরবে উমাচরণের অহঙ্কার করিবার কথা। স্বর্গীয় লোকেন পালিত তাঁহার অপর ছাত্র। দানবীর সার তারকনাথ পালিতের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং বিদ্যা ও বিনয়ের অধিকারী হইয়া লোকেন্দ্র সকল শ্রেণীর লোকের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সার টি. পালিতের গৃহে উমাচরণের যে "খাতির" ছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

লেডী পালিত পুত্রদের শিক্ষার প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাঁহার শিক্ষা ও শাস্তি দিবার ভঙ্গী কিরূপ বিস্ময়কর ছিল এই সময় তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকেনের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। পাঠে বিশেষ মনোযোগ ছিল না এবং অপরের পাঠে অসুবিধা করিতেন। উমাচরণ নবনিযুক্ত শিক্ষক; ঐ ছাত্রটিকে তখনও বিশেষ আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। "বড় লোকের ছেলে", শাস্তি দিতেও সাহস হয় না। তিনি জানিয়াছিলেন ছেলেদের শিক্ষার ভার তাঁহাদের মাতাঠাকুরাণী স্বহস্তে রাখিয়াছেন এবং ছেলেরা মাতাকে বেশ ভয় করে।

উমাচরণ একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, যদি ঐরূপ দুষ্টামি চলিতে থাকে তাহা হইলে তাহার মাকে খবর দিতে হইবে। কোনও দিন উমাচরণ লক্ষ্য করেন নাই; সেদিন দেখিলেন কালো চওড়া কস্তাপাড় শাড়ীর নিম্নাংশ দুই ঘরের মধ্যে ঝোলান দরজার নীচে এক বার সরিয়া গেল মাত্র, মানুষ লক্ষ্য করা গেল না। স্বর শোনা গেল, "ছেলে মাষ্টারমশাইকে দেওয়া আছে, আস্তাবলে ঘোড়ার চাবুক আছে। যদি শাসন করতে হয়, মাষ্টারমশাই করবেন, পড়ার সময় ওটা মাষ্টারমশায়ের কাজ; ছেলের মার নয়।" কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল, ছাত্র ও শিক্ষক কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইল না। ছেলে সেই দিন হইতে যে শান্ত হইল, আর কদাপি অবাধ্য হয় নাই। উমাচরণ বুঝিলেন ছাত্ররা কি করে এবং তাহাদের পড়া কেমন হয় তাহা লক্ষ্য করিবার সতর্ক প্রহরী পাশের ঘরে থাকেন।

এক সময় উমাচরণের এক বন্ধুপুত্র লোকেন পালিত মহাশয়ের সুপারিশের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করে। সে অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারেন নাই; তাহা ছাড়া ছাত্রের সহিত বহু বৎসর সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন লোকেন পালিত মহাশয়ের সরকারী কার্য্য-কাল অবসান হওয়াতে নূতন এক কাজে লিপ্ত আছেন। আর হয়ত সাক্ষাৎ হইবে না এই মনে করিয়া সেই যুবককে সঙ্গে লইয়া পালিত মহাশয়ের আপিসে উপস্থিত হইলেন। এক টুকরা কাগজে নাম লিখিয়া পাঠাইবার এক মিনিটের মধ্যে ডাক পড়িল। তখন দুই-তিন বন্ধুর সঙ্গে মধ্যাহ্ন জলযোগ চলিতে-ছিল। ঘরে প্রবেশ করিতে যে স্বল্প সময় লাগিয়াছে, তাহার মধ্যেই সমস্ত প্লেট, গ্লাস প্রভৃতি অপসারিত হইয়াছে বা হইতেছে, বন্ধুরা প্রায় তড়িতাহতের মত স্থানচ্যুত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছেন। বোঝা গেল, সেই কাগজের টুকরা একটা বিপ্লব ঘটাইয়াছে। উমাচরণ যখন প্রবেশ করিতেছেন তখন দেখিলেন লোকেন দাঁড়াইয়া তাঁহার মূল্যবান কোটের এক কোণ দিয়া একটি ছোট গ্লাসের অবস্থান চিহ্ন জলের দাগ মুছিতেছেন আর মাষ্টার মহাশয়ের আগমন-পথ দরজার দিকে ব্যস্ততার সহিত লক্ষ্য

করিতেছেন। লোকেনের অবস্থা দেখিয়া সহজেই মনে হইল যে, গোল জলের দাগ একটি পেগ বা অতিক্ষুদ্র উত্তেজক পানীয় ধরণের আধার সূচিত করে বলিয়া গুরুর সম্মুখ হইতে সেই চিহ্ন দূর করিবার প্রচেষ্টা। বেহারা সবই ঠিক করিয়াছে, কিন্তু ঐ সামান্য জলের দাগের আজ কি দাম তাহা জানিত না বলিয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করে নাই। প্রকৃত পক্ষে দুই হাতে কোটের কোণ টানিয়া জল মুছিবার চেষ্টা করিতে না গেলে উমাচরণ তাহা লক্ষ্যও করিতেন না। সমাদর-আপ্যায়নের আতিশয্যে উমাচরণ অভিভূত হইয়াই ফিরিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট জলের দাগ মুছিবার প্রচেষ্টার মধ্যে লোকেন যে গুরুভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া তিনি বিমোহিত হইয়াছেন এবং শতকণ্ঠে শিষ্যের শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছেন।

গুরুশিষ্যের এ সম্পর্ক আর বিদ্যমান নাই, সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন পালিত প্রভৃতি স্বনামধন্য বাঙালীও বোধ হয় খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের "রাখাল মহারাজ" প্রথম জীবনে উমাচরণের সহিত এক মেসে বাস করিতেন। তিনি বলিতেন, ঐ ভদ্রলোকের ইতরভদ্রনির্বিশেষে অমায়িক ব্যবহার ও কথা বলার ভঙ্গী মেসের সকলকে মুগ্ধ করিত; প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনও চেষ্টা নাই, অথচ সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। উত্তরকালে সাংসারিক অশান্তি, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে উমাচরণ গিয়া রাখাল মহারাজের সহিত নিরিবিলি আলাপ করিয়া আসিতেন। মহারাজের জন্য শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

যৌবনে তিনি গুরুতর কারণে কচিৎ অতিরিক্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বাড়ীর ব্যবহারের জিনিষপত্র আছাড় দিয়া ভাঙিয়া ফেলিতেন —তাঁহার পরবর্ত্তী কোনও রাগের কারণ হইলে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বের কোনও ভগ্ন তৈজসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেন এবং ক্রোধ দূর হইলে বিশেষ অনুতপ্ত হইতেন। তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর সংসারে একসঙ্গে অত লোক, অত অর্থাভাব এবং ক্রুদ্ধ হইবার অপরাপর যথেষ্ট কারণ প্রায়ই থাকিত, কিন্তু তাঁহাকে শান্তভাবে তাহা দমন করিতে দেখা যাইত এবং যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ক্রোধের কারণ হইত, পরে তাহাকে কাছে বসাইয়া নানা গল্প-উপদেশ দ্বারা দোষত্রুটি দেখাইয়া ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিতেন।

সাধারণতঃ তাঁহার স্বভাব ছিল শান্ত, ধীর, স্নেহশীল, গম্ভীর ও স্পষ্টভাষী আবার মজলিসে বসিলে গল্প, কথায়, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেন। গৃহপালিত পশু বিশেষতঃ গাভীর উপর ছিল তাঁহার অশেষ যত্ন। একই সময় তাঁহার বাড়ীতে দুইটি খুব বড় দুগ্ধবতী গাভী ছিল, একটি সাদা এবং অপরটি মিশ কালো এবং নাম কালিন্দী। এইটি বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিল এবং তাহার পালক এবং উমাচরণের মাতা ছাড়া কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, তীক্ষ্ন শৃঙ্গ নাড়িত। অন্যমনস্ক হইয়া তাহার নিকট গিয়া পড়িলে আর রক্ষা ছিল না। সেই গাভী ছিল উমাচরণের অদ্ভুত বশীভূত। রাস্তা হইতে তিনি দুই-তিন বৎসর অন্তর ফিরিতেন, কিন্তু তাঁহার আসিবার পর সেই গাভীর দড়ি খুলিয়া তাঁহার নিকট আনিতে হইত, তাহা না হইলে হয় ত দড়ি ছিঁড়িয়া চলিয়া আসিত। ছুটির যে কয়টি দিন তিনি বাড়ী থাকিতেন সে কয় দিন সেই দুর্দ্দান্ত গাভী বাড়ীর বাহিরে উঠানে বাগানে তাঁহার নিকটে নিকটে ফিরিত আর তিনি তাহার গলকম্বলে হাত বুলাইতেন। খাঁচার পাখী দেখিলে তিনি বড়ই ব্যথা পাইতেন, কারণ এ ভাবে স্বাধীনতা হরণ করিয়া আনন্দ লাভ করা তিনি পছন্দ করিতেন না।

অযথা মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া তাঁহার বড়ই পীড়াদায়ক ছিল। একবার বাড়ীতে এক পরিচারিকা আসে; বেশ পরিষ্কার স্নানাদি করিয়া শুচি শুদ্ধভাবে বাড়ীর কাজকর্ম্ম করে। কয়েকদিন বাদে তাহার গ্রাম হইতে উমাচরণের এক বৃদ্ধ আত্মীয় আসিয়া পরিচারিকাটিকে দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এই স্ত্রীলোকটি জাতিতে বাগ্দী; একেবারে অস্পৃশ্য, জল আচরণীয় ত নয়ই। সুতরাং বাড়ীটা ম্লেচ্ছের বাটী, সেখানে জাতিধর্ম্ম সবই বিপন্ন।

উমাচরণ শুনিয়া বহু অনুনয়ে আত্মীয়কে নিরস্ত করিলেন কারণ এ কথা মেয়েটির কাণে গেলে সে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইবে। আত্মীয় কয়েক দিন থাকিবার জন্য আসিয়াছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবার ভয়ে অবস্থানকাল সংক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন বাড়ীর বয়স্কা বৃদ্ধাদের পালা। উমাচরণ বলিলেন, যে নোংরা অপরিচ্ছন্ন সেই অশুচি; ভগবানের দৃষ্টিতে ত মানুষে মানুষে কোনও ভেদাভেদ নাই। তাহা ছাড়া একটি নিরীহ নিরপরাধ স্ত্রীলোক বাড়ীর মেয়ের মত থাকিয়া সকলের সেবা করিতেছে, তাহাকে জাতির দোহাই পাড়িয়া বিদায় দিলে সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা রুষ্ট হইবেন —সকলের অপেক্ষা বড় কথা সে কি মনে করিবে; বাড়ীর অপরাপর মেয়ে হইতে সে ভিন্ন কিসে? কি তার অপরাধ? তাহার মনে ব্যথা দিলে বাড়ীর হঠাৎ কোনও অকল্যাণ হইতে পারে সে কথা সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত।

সকলেই বুঝিয়া বা মানিয়া না লইয়াও নিরস্ত হইল; কিন্তু তিনি তাঁহার বৃদ্ধ মাতার জল রান্না প্রভৃতির জন্য বাড়ীর অপর এক মহিলাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভার দিলেন; কারণ তিনি লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার যুক্তি মাতার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে; অন্তরে নহে। তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কারের উপর আঘাত করিলে মাতা মনে দুঃখ পাইতে পারেন সুতরাং সেখানে তিনি আর পীড়াপীড়ি করিলেন না।

তাঁহার চরিত্রে কৃতজ্ঞতা ছিল অতিমাত্রায় জাগরূক। তাঁহার প্রয়োজনে যিনি একসময় কোনও সাহায্য করিয়াছেন, তাহা তিনি কখনও ভুলিতেন না। নিতান্ত ন্যায়নীতির বিরুদ্ধ না হইলে সর্ব্বতোভাবে উপকারীর ঋণ পরিশোধ করিতে যত্নবান্ থাকিতেন। পল্লীর এক যুবক তাঁহার সেবায় জন্য প্রাণে তাঁহার সহিত করেক

বৎসর কাটাইয়াছিলেন ; তাঁহার আহারাদির তত্ত্বির-তদারক করা ছাড়া বিদেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ রোগে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। উমাচরণের সহিত এই সেবক একসঙ্গে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। উমাচরণের পরিবারে তাঁহার নাম ছিল অমৃত কাকা বা "খুড়ো"। কেহ তাঁহাকে কখনও অসম্মানের কথা বলিতে সাহস করে নাই। প্রত্যুত, যাহারাই বাড়ীতে নিয়মিত মজুর দিত, পারিচারকের কাজ করিত তাহারা কেদার কাকা, ননীকা, হরিদা এবং পুরাতন গয়লানীরা মানকুমারী দিদি, পঞ্চি পিসি প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত হইত। ইহার কোনও ব্যতিক্রম হইত না, হইবার প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হইত না। ইহাই ছিল বাড়ীর বা পরিবারের আবহাওয়া।

পল্লীর মঙ্গলজনক কাজে ডাকিলে তাঁহাকে সর্ব্বদাই পাওয়া যাইত। তাহা ছাড়া নিজ ভিটার উপর চাষবাস লইয়া নিজ হাতে কাস্তে খুর্পি লইয়া সর্ব্বদা কাজ করিতেন। বাড়ীর কোথাও জঞ্জাল, লতা-পাতা ঘাস জন্মিয়া থাকিতে পারিত না ; সর্ব্বদা তিনি তাহা পরিষ্কার করিতেন। তাঁহার পরিচ্ছন্নতা-প্রীতি চাষের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইত। নূতন চাষে তাঁহার যত্ন ছিল অশেষ এবং দেশ-দেশান্তরে গিয়া নানাবিধ আমগাছে কলম বাঁধিয়া আনিয়া বাগানে বসাইতেন। ফলে তাঁহার বাগানে যতপ্রকার ভাল জাতের আমগাছ পাওয়া যাইত, তাহা কোথাও কচিৎ দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রকাণ্ড ভিটায় নারিকেল গাছ ছিল না ; তাঁহার মাতার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বংশে কোন অতীত যুগে নারিকেল গাছ বসাইয়া একটা "হানি" হইয়াছিল ; সুতরাং নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করা ঐ সংসারের চিরাচরিত প্রথাবিরুদ্ধ। পল্লীগ্রামে এই প্রথা সাধারণতঃ শাস্ত্রবাক্য পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়া থাকে। তিনি বহুকাল মাতৃবাক্য পালন করিলেন। মাতার মৃত্যুর পর তিনি ভিটার উপর শতাধিক নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিলেন। বলিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যদি অমঙ্গল হয় তাঁহার অপরাধে অপরের সাজা হইবার কথা নহে। বলা বাহুল্য, ইহার পর সুস্থ শরীরে তিনি অনেক কাল জীবিত ছিলেন এবং পরিবারেও কোনরূপ গুরুতর অমঙ্গল হয় নাই। তাঁহার বংশধরেরা ডাব ও ঝুনা খাইয়া, বিক্রয় করিয়া আনন্দে দিনাতিপাত করিয়াছে।

মৃত্যুকে তিনি অতি স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্ব্বদা তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক পত্র লিখিয়া রাখেন। মৃত্যুর পর তাহা একটি চাবিহীন সামান্য কাঠের বাক্স হইতে পাওয়া যায়। এই বাক্সর মধ্যে জনমজুরদের জন্য দেয় রোজের সামান্য টাকা-পয়সা, চাষ সংক্রান্ত ছুরি এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি থাকিত। সংসারে ইহাই তাঁহার অবলম্বন ছিল। বহু লোকের পরিবারে তিনি সম্পূর্ণরূপে জনক রাজার মত নির্লিপ্ত ভাবে কালযাপন করিতেন।

জানুয়ারী ১৯২৫ সনের ২৪ তারিখে তিনি লেখেন :

"আমার মৃত্যুর সময় হইয়াছে ; গত ২৩ পৌষ তারিখে আমি ৭৩ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ৭৪ বৎসর বয়সে পড়িয়াছি, সুতরাং আমি দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে আমার মৃত্যু হইলে আক্ষেপের কারণ নাই। আমার মনে হয় আমি হঠাৎ মারা যাইব। তোমাদিগকে কিছু বলিয়া যাইতে পারিব না। তজ্জন্য তোমাদের (পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র) অবগতির জন্য আমার ইচ্ছা লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছি :

"যতদিন একান্নভুক্ত পরিবারে থাকিতে পার থাকিও। কিন্তু যখনই দেখিবে যে, কোন কারণে পরস্পর মনোমালিন্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তদ্দণ্ডে পৃথক-অন্ন হইবে। মনোমালিন্য আরম্ভ হইবামাত্র পৃথক হইলে তাহা আর বাড়িতে পারিবে না, পরস্পর ভ্রাতৃভাব থাকিবে। নতুবা মনোমালিন্য হইতে ক্রমশঃ শত্রুভাব জন্মিবে, তাহাতে পরে বিষময় ফল ফলিবে। একান্নভুক্ত পরিবার বরাবর কোথাও থাকে না, থাকিতে কখনও শুনি নাই। যদিও তোমরা থাকিতে পার, সংসার বৃদ্ধি হইলে তোমাদের পুত্রেরা কখনও থাকিতে ভাবিবে না।

"বিষয় সম্পত্তি প্রায় কিছুই নাই। সামান্য বাড়ীঘর ও বাগান যাহা আছে, তোমরা যখন পৃথকান্ন হইবে, আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর আপোষ বিভাগ করিয়া লইবে। সালিশী ডাকিবারও প্রয়োজন নাই। পরস্পরের সুবিধামত বিভাগ করিয়া লইও। যদি তাহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে মনে কর, তাহা কেহই ধরিও না। সামান্য বিষয় লইয়া কখনও আদালতে যাইও না।

"তোমাদের ও তোমাদের পুত্রকন্যাদের ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করি।"

অপস্মার রোগে তিনি পরম শান্তির মধ্যে ১৩৩২ সন ১লা ফাল্গুন ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই উপদেশপূর্ণ গল্প শোনা যাইত। তাহা পারিবারিক "হিতোপদেশ" বা "পঞ্চতন্ত্র" বলিলে ভুল হয় না।

ভূস্বর্গের যাত্রী

শ্রীমহাদেব রায়

৭

নৌগৃহের অভ্যন্তরে বসতির কক্ষে কক্ষে শয্যাস্থান, শৌচাগার, বৈঠকের গৃহ। মেঝের কার্পেট পাতা, কার্পেট কাশ্মীরের স্বকীয় সাধারণ সম্পদ। বৈঠকখানায় চেয়ার, টেবিল, সোফা, টেবিল-আয়না, ছবি—কক্ষ সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত। পথের ক্লান্তিতে ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্নে কোথাও আর বাহির হওয়া সম্ভব হইল না, রাত্রিতে সুনিদ্রার আশায় শয্যাগ্রহণ করা গেল। কিন্তু তৃতীয় প্রহরে শৈত্যের আধিক্যে নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিচে কম্বল পাতা আছে তোশকের উপর, উপরেও লেপের উপর কম্বল দিলে তবে এ শীতের হাতে পরিত্রাণ। আমার একটি মাত্র কম্বল সম্বল—সেটি নিচে পাতা। উপরের লেপ বরফ হইয়া আসিতেছে। পাশেই বন্ধুদ্বয় সুখে নিদ্রা যাইতেছেন দেখিতেছি। লেপ-কম্বল জড়াইয়া বক্রধনুর আকারে প্রহরার্দ্ধ কাল পড়িয়া রহিলাম। শেষে আর না পারিয়া তারস্বরে চণ্ডীপাঠ সুরু করিলাম—বন্ধুদ্বয়ের নিদ্রা ভাঙিল, বাঁচিলাম। এবার সমানে আনন্দভোগ করার অবসর হইল। আমি ভজন সুরু করিলাম—বন্ধুদ্বয় শ্রোতা।

নৌগৃহে দশ দিন অবস্থান করিতে হয়। আট আটটি রাত্রি আমার এক কম্বলে এই দুর্ভোগে কাটিয়াছে। নবম দিনে শ্রীনগরের নূতন কম্বল ক্রয় করিয়া সুখে নিদ্রা দিয়াছিলাম। দুই রাত্রি যে দুর্ভোগের হাত হইতে বাঁচিয়া সুখে নিদ্রা দিতে পারিয়াছি, তাহাও কম কথা নয়। অক্টোবরেই এখানে চতুর্দ্দিকে তুষারপাত হয়। শুনিলাম, নবেম্বরে স্থানীয় লোকেরা অনেকেই অগ্নি-গর্ভ হইয়া—অঙ্গাবরণের মধ্যে আগুনের পাত্র রাখিয়া সর্ব্বদেহে তাপ-সঞ্চারের ব্যবস্থা করে।

দাশবাবু উড়িষ্যাবাসী বাঙালী। ধনী হইলেও ধনের অহঙ্কার নাই। যাহাকে বলে—অমায়িক সজ্জন। ছেলেটিও তাঁহার তেমনই সরল। কাশ্মীরের জিনিষ কেনার এক বিড়ম্বনা দেখিলাম। কোনও জিনিষ দর না করিয়া কোথাও কেনার উপায় নাই, সে দোকানেই কি আর ফেরিওয়ালার নিকটই বা কি! এমন একটি দোকান শ্রীনগরে মিলিবে না যেখানে একদরে জিনিষ বিক্রয় হয়। শুধু শ্রীনগর কেন, সমগ্র কাশ্মীরেই দ্রব্যসামগ্রীর যথার্থ মূল্যের দ্বিগুণ কিংবা তাহারও বেশী মূল্য হাঁকিয়া বসে, কত কমাইবে কমাও। কাশ্মীরে আসিয়া যিনি স্বয়ং প্রথম সওদা করিতে ছুটিবেন তিনি ঠকিবেনই। বাঙালী বেশী আসিলে হঠাৎ জিনিষের দাম বাজারে তিন গুণ চড়িয়া যায়—যায় শাক-বেগুন পর্য্যন্ত। যাঁহারা স্থানীয় বাজারের হাল-চাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বা সুপরিচিত, তাঁহাদের সঙ্গে না গেলে ঠকিতেই হইবে। দাশবাবু একাই নিজের শাল ও কম্বল কিনিয়া এবং ছেলের নূতন গরম কোট-প্যাণ্ট করাইতে গিয়া রীতিমত ঠকিয়াছেন। তবু তাঁহার আত্মতৃপ্তি আছে, বেশী দাম লয় নাই নিশ্চয়ই। কি জানি তাঁহার মন খারাপ হয়, এজন্য আমরা কেহ উচ্চবাচ্য করিলাম না।

ঝিলম নদী

দর্শনীয় স্থানের পরিচয়লাভের মানসে পরদিন পূর্ব্বাহ্নেই তথ্য সরবরাহের আপিস ইনফরমেশন ব্যুরোতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বাহ্নে অফিসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। পুনরায় অপরাহ্নে গেলাম—এবার দেখা হইল। ঐকান্তিক সৌজন্যে অফিসর শ্রীত্রিসল আমাদের সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীনগরের দ্রষ্টব্য স্থলগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া অবশেষে প্রসঙ্গক্রমে ভারত সরকার ও জম্মু-কাশ্মীর সরকারের পারস্পরিক সম্মতিতে যৌথ কার্য্য-কারণ-ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করিলেন। সম্প্রতি শিক্ষার সৌকর্য্যবিধানে স্থানীয় সরকার যে মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন, ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া সমধিক উল্লাস বোধ করিলাম।

সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে বন্ধুবর ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ঝিলমের উত্তরের উপকূলে নগরীর শ্রেষ্ঠ অংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুন্নত রাজপথে পরিক্রমা সুরু করিয়াছি। স্থান-কালের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে অপ্রত্যক্ষ স্মৃতি-রেখা সার্থকরূপে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল—"সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা"। অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তরাগ যখন স্রোতের উপর পড়িয়াছে, তখন সমুদ্ভাসিত তরঙ্গিত সুধায় যেন নবজবার সঙ্গে সম্মিলিত নব পলাশের রাগরশ্মির নৃত্য-ছন্দ অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলাম। পরপারে দক্ষিণ তটে সারি সারি দেবদারুর ছায়া স্রোতের তলদেশে সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি রচনা করিয়াছে। ঊর্দ্ধে বৃক্ষের সুশ্যামল পত্র-পল্লবাচ্ছাদিত দেহ যেমন মন্দিরাকৃতি, স্রোতের মধ্যে প্রতিবিম্বের আকারও তদ্রূপ। স্রোতের

তলায় সারি সারি ছায়া-রূপ—বড় মনোহর। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিলাম—"আঁধারে মলিন হ'ল খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।"

আজই প্রথম কবিগুরুর 'বলাকা' কবিতার যথার্থ মর্ম্মবোধ করিলাম। এতদিন যেন উহা সুস্পষ্টই হয় নাই। কবির নিজেরই লেখা কবিতাটির ইতিহাস মনে পড়িল। কার্ত্তিকের নির্ম্মল আকাশের নীচে বোটের ছাদে বসিয়া কবি পায়ের তলায় ঝিলমকে দেখিতেছেন সায়াহ্নে। কবি বলিয়াছেন—'আমি ঝিলম নদীর যেখানে ছিলাম, সেখানে নদীটি খুব বেঁকে গেছে।' বস্তুতঃ, আমরা দেখিয়াছি—শ্রীনগরের কটিদেশে ঝিলমের গতি যেন কতকগুলি বক্র স্রোতোরেখার শ্রেণী। অদূরে 'শঙ্করাচার্য্য' পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিলে,

নেহরু পার্ক, 'ডাল' লেক

এই স্রোতোরেখাগুলিকে পর পর চিত্রিত ভূজঙ্গ-গতি তরলায়িত শ্যামল সুন্দর স্থল-রেখাচিত্রের মত মনে হয়। শ্রীনগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বদিন (২৬শে অক্টোবর) 'শঙ্করাচার্য্যে' আরোহণ করিয়া এই চিত্র-শাবলী বিমুগ্ধ নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছি। দর্শনের তৃপ্তি ছন্দোবদ্ধ করিয়া বিশিষ্ট সুরসিক ও রসস্রষ্টা বান্ধবদের করকমলে উপহারও প্রেরণ করিয়াছি। দুইটি ছত্র প্রত্যক্ষ করা ছবির সঙ্গে মনে গাঁথা আছে।

"ভুজঙ্গের গতি দেহ শ্রীশঙ্করে ঘেরি
আঁকাবাঁকা ঝিলমের স্রোতোরেখা হেরি।"

প্রথম দিনের ঝিলম দর্শনে 'বলাকা'র রস-স্বরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে যেন একটা ছন্দের নর্ত্তন রচনা করিল। একদিকে দেখিতেছি—বক্র তটিনীর পরিবেশে নয়ন-মনোহর সুষমার আলেখ্য, অন্যদিকে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি—কবির মানস-গত চিরন্তন গতিধর্ম্মের কথা। "বুনো হাঁসের" মতই আমরাও চিরন্তন গতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই জীবনের যাত্রাপথ অতিবাহন করিতেছি। লোকে লোকান্তরে—জীবন হইতে জীবনান্তরে এই গতি-ধর্ম্মের জয়। 'বলাকা' পাঠ আজই সার্থক মনে হইল।

সন্ধ্যার পর বোটে ফিরিলাম। আমাদের বোটগুলির মালিক স্থানীয় অধিবাসী জনাব সালাম খাঁ। বলিষ্ঠ, সমুন্নতকায়, ঋজুদেহ, সুপুরুষ বর্ষীয়ান—লেখাপড়া বেশী না জানিলেও বহু পরিচয়ের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধমনা। আমরা ইনফরমেশন বুরোতে গিয়াছিলাম। শুনিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া খুন। হিন্দী ভাষায় তিনি মন্তব্য করিলেন—আমার কাছেই ত সমগ্র কাশ্মীরের পরিচয় পাইতে পারেন। প্রসঙ্গক্রমে অফিসারদের সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

৮

আগেই বলিয়াছি—চারিটি নৌ-গৃহে আমাদের সমগ্র দল বিভক্ত হইয়া আছে। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে সব পরিক্রমায় বাহির হয়। কোন দিন দুই দলে, কোন দিন বা একই সঙ্গে সকলে একযোগে বাসে যাত্রা করিয়াছি দূরবর্ত্তী স্থলের দৃশ্য দর্শনে। 'পহলগাঁও' বা, 'গুলমার্গে' যাত্রা এই ভাবে। কাছাকাছি স্থলে বা শহর পরিক্রমায় বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য আর আমি প্রায়শঃ একসঙ্গে বাহির হইয়াছি। খালে 'ডালে' প্রধান যান নৌকা। এখানে বলে 'শিকারা।' শিকারাগুলি সব সাজানো—ছক-কাটা, গদি আঁটা মনোহর বর্ণের ঝালর তাহাতে। সব যেন নব বর-বধূর স্বচ্ছন্দ-বিহারের উপকরণে সুমণ্ডিত।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরই শিকারায় উঠিয়া একদিকে না একদিকে যাত্রা আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যক্রমের অন্তর্গত হইয়াছে। শিকারায় উঠিয়াই আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন। আমার তন্দ্রা ভাঙাইবার জন্য বন্ধুবরের কত চেষ্টা। কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতেন—"Beauty goes a-begging claiming a look-up". একবার চোখ দু'টো দয়া করে' খুলুন না! সত্য সত্যই এ সুর-পুরীর সবই সুন্দর। নারীকুল বর্ণ-বিস্তার, গঠন-সৌষ্ঠব এবং লাবণ্যশ্রীতে সুর-সুন্দরীদেরই গৌরব প্রকাশ করিতেছে। পুরুষদের বলা চলে রীতিমত সুপুরুষ। ভূ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ত কথাই নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—স্বর্ণ-বর্ণ আর লোহিত আভার মিশ্রণে চিনারের পত্রাবলীই শ্রীনগরের অতুলনীয় শ্রী-সুষমার শ্রেষ্ঠ উপাদান রচনা করিয়া রাখিয়াছে। তার পর, স্বচ্ছসলিলা হ্রদ সরোবর আর বাঁকা নদী একদিকে যেমন জলময়ী সৃষ্টির গলিত সৌন্দর্য্য-দ্যুতি বিস্তার করিতেছে, অন্য দিকে তেমনই স্তব্ধ গিরিশ্রেণী উন্নত শিরে নগরীকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া যেন দিব্য লাবণ্যের মায়াজাল রচনা করিয়াছে।

তবু বহু বঙ্গবাসীই শ্রীনগরের শ্রী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। নগরীর পুরাতন হর্ম্ম্যরাজির পুরানো ইষ্টকের মলিন বর্ণ, আর ঝিলমের ঘাটে-ঘাটে গৃহ-পরিস্রুত কর্দ্দম-পানীয় এবং বহু ইষ্টকালয়ে অঙ্গরাগের অভাব তাহাদের নিতান্ত বিরাগ উৎপাদন করিয়াছে। নগরীর যে অংশে ভবনাদির বা রাজপথের কৃত্রিম শোভাসজ্জা—সেইটুকুই বা তাঁহাদের একটু নয়ন রঞ্জন করে, ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য, পর্ব্বতের উপর এমন জলের লীলা, অসংখ্য গৃহ-তরীর চাকচিক্য কোনটিই তাঁহাদের মন ভুলাইতে পারে নাই।

বন্ধুবর ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন—ছয় হাজার ফুট উর্দ্ধভূমিতেই সমতল বঙ্গের সাদৃশ্য রচনা করিয়া জলে স্থলে যে সুইজারল্যাণ্ডের লাবণ্যকে অতিক্রম করিয়াছে, সেই ভূ-প্রকৃতির যথার্থ সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার দৃষ্টি চাই। ইহাকেই বলে—eyes and no eyes—চোখ থাকিতেও যাহারা অন্ধ, তাহাদের চোখ কে খুলিয়া দিবে ?

কাশ্মীরে অবস্থিতির তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২০শে অক্টোবর মধ্যাহ্নে ডাক্তার সামন্ত, কালীবাবু এবং শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য সহ নৌ-বিহারে ঝিলমের সপ্ত সেতু অতিক্রম করিতেছিলাম—সেতুগুলির নিম্ন দিয়া নৌকা-বিহার। কাষ্ঠনির্ম্মিত সাতটি সেতু ঝিলমের উভয় তটস্থিত বসতির মধ্যে সংযোগ রচনা করিয়াছে—নদীর দুই তটেই নগরী। মজবুত কাঠে সেতু রচনার কৌশল মুগ্ধ নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। কালীবাবু সেতু-রচনার কলা-কৌশল বুঝাইতেছিলেন—পূর্ত্ত-বিভাগের কাজে তাঁহার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কম নয়। ঝিলম হইতে বহু খাল কাটিয়া নগরীকে বেষ্টন করা হইয়াছে। সেই সব খালে অসংখ্য মহাকায় কাষ্ঠ ভাসিতেছে। ঐ সকল কাষ্ঠেই সেতুগুলি রচিত। ঐ সব কাঠ চেরাই করিয়াই নৌ-গৃহও রচিত হয়। ইষ্টকালয়ের সংখ্যা কম, ভাড়ার বাড়ী নিতান্ত অল্প, নৌ-গৃহই ভাড়াটিয়াদের, এমনকি স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যেও অনেকের বসতির উপায়।

প্রথম বা প্রধান সেতুটির নাম—"আমীরা (সংক্ষেপে, মীরা) কদল"। সেতুকে কাশ্মীরী ভাষায় বলে 'কদল'। এই প্রথম সেতুর উপরিভাগে নগরীর যে বিপণিশ্রেণী, উহাই শ্রীনগরের মধ্যে সর্ব্বাধিক পণ্যবহুল।

স্রোতের উজান পথে যাইতেছি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অভিমুখে। রঘুনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতার শুভ্র-দেহ সুচিক্কণ প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলাম—হিন্দু ব্যবসায়ীর নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির। এ অঞ্চলেও সেই ত্রেতাযুগের অবতার সপার্ষদ অর্চ্চিত হইতেছেন দেখিয়া উত্তর ভারতে ধর্ম্মার্চ্চনার একটা ভাবসাম্য উপলব্ধি করিলাম। দেবাদিদেব মহাদেব আর হনুমৎ-সেবিত লক্ষ্মণ সমেত শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা সমগ্র অঞ্চলে। শিলা-দেহ বিষ্ণু এবং সূর্য্যের পূজাস্থানও পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে সেগুলি সংখ্যায় অল্প।

মন্দিরের বহির্ভাগে প্রশস্ত চত্বরের বক্ষে দুইটি যুবতী ছাত্রীকে এক সংস্কৃতের অধ্যাপকের নিকট বেদান্তশাস্ত্রের পাঠ লইতে দেখিলাম। প্রাপ্তবয়স্কা ছাত্রীদের এই ভাবে প্রাচ্য শাস্ত্র অধ্যয়নের সুব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া নয়ন-মন বিমুগ্ধ হইল। বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য সহ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়ানো শুনিতেছিলাম—বেশ ভাল লাগিতেছিল। কালীবাবু তাড়া দিলেন—শিকারাওয়ালা চঞ্চল হচ্ছে, আসুন তাড়াতাড়ি।

অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে আমাদের নৌগৃহে পদধূলি দিতে সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়া পুনশ্চ শিকারায় উঠিলাম। ধীরে ধীরে সাতটি সেতু অতিক্রম করিয়া অবশেষে ঝিলমের 'এনিকাটে' গিয়া উপস্থিত হইলাম। অপরাহ্নের হৈমন্তিক রবি-রশ্মি এনিকাটের উচ্ছ্সিত তরঙ্গের বক্ষে নৃত্য করিতেছে। এনিকাটের দক্ষিণ দিকে বিরল-বসতি গৃহাবলী যেন পল্লীর সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।
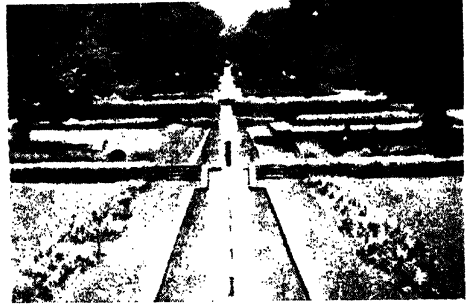
নিশাতবাগ

এনিকাট দিয়া ঝিলমের জল ভিন্ন পথে চালনা করিয়া স্বরাষ্ট্রের কৃষির কল্যাণে নিয়োজিত করা হইতেছে—প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে এই পয়োরাশির কল্যাণে বঞ্চিত হইয়াছে, সেকথা মিথ্যা নয়।

খরস্রোতা গম্ভীরা তটিনী ঝিলমের বক্ষে সপ্ত-সেতুস্থানের মাধুর্য্য-দর্শন সমাপ্ত করিয়া অবশেষে এনিকাটের সুপ্রশস্ত বক্ষে লহরী-লীলায় রশ্মির হাস্য উপভোগ করিলাম। আজিকার পরিক্রমা সার্থকতায় মণ্ডিত হইল। দিনটা সার্থক হইল।

পরদিন মধ্যাহ্নে দুই বন্ধুকে শিকারাযোগে উত্তরমুখী হইলাম। চিনারবাগের খাল হইতে ডাল হ্রদে গিয়া পড়িলাম। শাজাহান ও জাহাঙ্গীরের রচিত কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ দুটি উদ্যান—নিশাতবাগ ও শালিমারবাগ দেখিতে চলিয়াছি। প্রথমে সোজা শালিমারবাগে নৌকা লইয়া যাইতে বলিলাম, ফিরতিপথে নিশাতবাগ দেখিয়া আসার সঙ্কল্প।

ডাল হ্রদের বক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছি। চোখে পড়িল ভাসমান সব্জির বাগান। দূরে দেখা যাইতেছে—বাংলা দেশের বাবলা গাছের মত গাছ ডাল হ্রদের বুকের উপর—সারি সারি গাছ। এ গাছ কাশ্মীরের ভূমিতে আগেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জলেও যে এ গাছ জন্মে তাহা এই প্রথম দেখিলাম। ইহার নাম 'উইলো'। 'উইলো' গাছে অনেক স্থলে হাউস বোটও বাঁধিয়া রাখা হয়।

এই হ্রদের জলে কমল, কুমুদ প্রভৃতি জলজ পুষ্প ত জন্মেই, আশ্চর্য্যের কথা জলের উপর ফসলও হয়। কেমন করিয়া হয়, তাহাই বলিতেছি। দেখিতে অনেকটা উলুখড়ের মত, কিন্তু বেশ শক্ত ও স্থূল এক প্রকার তৃণ জন্মায় এই জলে। উহার উর্দ্ধভাগ কাটিয়া লইয়া মাদুর তৈয়ারি করা হয়। নিম্নভাগ জলের মধ্য হইতে উপরি-ভাগ পর্য্যন্ত ভাসিতে থাকে। তাহার উপর জলের শ্যাওলার সঙ্গে

মাটি দিয়া তাল পাকাইয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। ঐগুলিতে এক একটি তরকারির বাগান হয়—লাউ, কুমড়া, বেগুন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ভাসমান শস্তের বাগান এক একটি মাপিয়া বিক্রয় করা হয়। কথনও কখনও এই সব সব্জিবাগ মালিকের অজ্ঞাতসারে অনেকে সরাইয়া লয়। কাশ্মীরে 'ফসল চুরি'র তথ্য উপলব্ধি করিলাম। প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝা যাইত না—প্রত্যয় জন্মিত না।

নিশাতবাগের আর একটি দৃশ্য

ডাল হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই ক্রোশ, প্রস্থে এক ক্রোশের কিছু বেশী। শিকারায় অগ্রসর হইতে হইতে দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে 'নগিনাবাগ' দেখা গেল। ওখানে আর যাওয়া হইবে না। দূর হইতে চিনারের বর্ণ-বৈভব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যথাস্থানে অবতরণ করিয়া সে সৌন্দর্য্য আর প্রত্যক্ষ করা হইবে না। শুনা গেল—সাহেবেরা ওখানে স্নান-পানে আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। অদূরেই 'হরিপর্ব্বত'। হরিপর্ব্বতের কেল্লার মধ্যে নাকি কালীবাড়ী আছে। হ্রদের বক্ষে পর্ব্বত—তাহার উপর দুর্গ—সৌন্দর্য্যে ও তুঙ্গতায় মিশ্র-মনোহর রূপের গরিমা দূর হইতে অনুভব করিলাম।

শিকারাওয়ালাকে নির্দ্দেশ দিলাম—প্রথমেই চল সোজা শালিমারবাগে, তার পর নিশাতবাগ হইয়া ফেরা যাইবে। কাছাকাছি পৌঁছিয়া নৌকা রাখিয়া স্থলপথে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলাম। শালিমারবাগের ফটকে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকের রূপমাধুর্য্য একবার দেখিয়া লইলাম। ধাপে ধাপে সিঁড়িতে উঠিয়া উচ্চ ভূমিতে দেখা গেল একখণ্ড সুবিশাল উদ্যান-ভূমি। আবার ধাপে ধাপে সিঁড়িতে উঠিয়া উচ্চতর ভূমিতে এমনি আর এক উদ্যান। এ ধরণের সতেরটি স্তরে উদ্যানাবলী সুসজ্জিত। প্রতিটি উদ্যানের মধ্যভাগে চতুষ্কোণ সুবৃহৎ চত্বর—তাহার চারিধারে বাঁধানো পায়ে চলার পথ। এই সব চত্বর বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও লতায় মণ্ডিত—অসংখ্য পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত। প্রতিটি উদ্যানে মহীরুহও অনেক—চিনার বৃক্ষও বেশী।

ক্রমাগত উপরে উঠিবার পথে পথে এইরূপ মনোহর পুষ্প-সজ্জা, আর বিটপীর শোভা। সর্ব্বোচ্চ স্তরে মহামহীরুহের কাননের নির্জ্জনতায় বসিয়া দূরে নিম্নভাগে প্রশস্ত ডাল হ্রদের বক্ষে অস্তগামী সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্শন এক উপভোগের বিষয়। শুনা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এই স্থলে বসিয়া মুগ্ধ নেত্রে 'ডালে'র শোভা উপভোগ করিতেন। স্তরে-স্তরে উদ্যান-রচনার এমন কারুকৌশল আর কোথাও প্রত্যক্ষ করি নাই। উপযুক্ত স্থলে যথাযোগ্য রূপ-রচনার প্রযত্ন আজও পান্থকুলের পরম আনন্দ এবং গভীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। তবু ত উদ্যানের আজ আর আগেকার সে রূপ নাই। প্রতিটি স্তরের চতুষ্কোণে যে অসংখ্য কৃত্রিম জলের ফোয়ারা, সেগুলি নির্জ্জলা অবস্থায় আজ যেন নির্জীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ হেন কাননেরও আজ যেন উদাস মূর্ত্তি—যেন সে উল্লাস নাই, আনন্দ নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই।

এবার ডাল হ্রদের ভিন্ন স্রোত ধরিয়া কতকটা দক্ষিণ-পূর্ব্বে আসিয়া নিশাতবাগে অবতরণ করা গেল। শালিমারবাগেরই অনুরূপ গঠন-কৌশল এ উদ্যানেরও। সেই স্তরে স্তরে সর্ব্বোচ্চ উদ্যানতলে উঠিতে হইবে। এক এক স্তরে সুবিশাল মনোহর উদ্যান। কতগুলি সিঁড়ি, খেয়াল করিয়া গোনা হইল না। তবে দেখিয়া মনে হইল—শালিমারবাগের মত এ উদ্যান ততখানি উদাস মূর্ত্তি ধারণ করে নাই। জলের ফোয়ারাগুলির অবশ্য একই অবস্থা—যেন উদাসীন। জলসরবরাহের ব্যবস্থা অবশ্যই আছে, নতুবা, স্তরে স্তরে বিচিত্র পুষ্পের কানন কিরূপে ভারে ভারে পুষ্পের সজ্জা লইয়া বিরাজ করে। সরকারের সযত্ন প্রয়াসের কথা কিছু শুনা গেল। কিন্তু তাহা রূপ-বিলাসী সম্রাট শাজাহানের স্বরচিত উদ্যানের রূপ-রক্ষায় পর্য্যাপ্ত প্রযত্ন বলিয়া প্রত্যয় হইল না। শুনা যায়—রাজমহিষী মমতাজের পিতা আসফজার তত্ত্বাবধানে এই উদ্যান রচিত হয়। রাজপরিবারের প্রাচীন স্মৃতির সঙ্গে চিনারের রক্তরাগ হৃদয়কে অনুরাগের মোহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ডালের বুকে অস্তরবির রশ্মিরেখার প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে নিশাতবাগে সাজাহান ও মমতাজের বিহার-চিত্র মানস-পটে সমুদ্ভাসিত হইল।

শ্রীনগরের বহু দর্শনীয় রূপৈশ্বর্য্যের বিপুল আয়তন রচনা করিয়াছে এই দুইটি উদ্যান। শ্রীনগরের অভ্যন্তরে নাগরিক রূপ-রচনার ক্রটি বা স্বল্পতা কোন কোন দর্শককে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ক্রোড়ে বা বক্ষোদেশে এই যে মনুষ্যহস্ত-রচিত রূপ-সজ্জা, ইহা কাহাকে না বিমুগ্ধ করিবে!

১০

পরদিন সকালে সকলে মিলিয়া বাসে পহলগাঁও যাত্রা করা গেল। পহলগাঁও শ্রীনগর হইতে ষাট মাইল দূরে। যাওয়ার পথে

দক্ষিণে, বামে জাফরানের ক্ষেত আর লিদার নদী হইতে আগত ঝিলামমুখী খালের স্বচ্ছ ধারা দৃষ্টির উপর কোমলতার তুলি বুলাইয়া দিল।

শ্রীনগর হইতে ষোল মাইল দূরে পড়ে অবন্তীপুর। কেহ কেহ বলিল—মহাভারতের সুবিখ্যাত অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ ওখানে বিদ্যমান। কাশ্মীরের বিশেষ বিবরণে দেখা যায়—উহা কাশ্মীর-রাজা অবন্তীবর্ম্মণের কীর্ত্তির সাক্ষী হইয়া আছে।

মধ্যাহ্নের কাছাকাছি পহলগাঁওয়ে পৌঁছানো গেল। স্তরে স্তরে উন্নত হইতে উন্নততর গিরিমালা স্থানটিকে তিন দিকে অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে পাইনের ঘন বন লঘু হরিতের উপর গুরু হরিতের শোভা রচনা করিয়াছে। নিম্ন-ভাগে 'লিদার' নদীর স্বচ্ছ ধারা নয়ন-মনোহর। তিন দিকের বৃত্তাকার গিরিশ্রেণী তুষার-কিরীট শীর্ষে ধরিয়া হরিতের উপর শুভ্র শোভার মনোহারিত্ব সম্পাদন করিয়াছে।

এই কয়দিনে কাশ্মীরের যতখানি সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছি, পহলগাঁওয়ের শোভা তাহাকে হার মানাইল।

অমরনাথ যাত্রার প্রথম গ্রাম হিসাবেই ইহার নাম হইয়াছে পহলগাঁও। অমরনাথ এখান হইতে মাত্র একত্রিশ মাইল। কিন্তু ক্রমোচ্চ পার্ব্বত্যপথেই অগ্রসর হইতে হয়। ঝুলন (শ্রাবণী) পূর্ণিমাতে তুষারের শিব-মূর্ত্তি দর্শন অমরনাথের তীর্থকৃত্যরূপে একান্ত আকর্ষণের বস্তু হইয়া আছে। তাহা ছাড়া, প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদেও অমরনাথের বৈশিষ্ট্য গরিমাদীপ্ত।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন সুরু হইয়া গেল। নাগরিক ভাষায় যাহার নাম 'পিকনিক', আর বাল্যের গ্রাম্য সৌন্দর্য্য যে নামের সঙ্গে বিজড়িত, সেই বনভোজন পর্ব্বের প্রাথমিক অধ্যায় রচিত হইতে লাগিল। সঙ্গীরা অনেকেই অশ্বারোহণে ক্রমোন্নত পার্ব্বত্য-পথে বিহার করিতে ছুটিলেন। স্থানীয় কাশ্মীরীরা ঘণ্টা হিসাবে বা পথের দূরত্ব হিসাবে ভাড়ায় ঘোড়া দিতেছে। ঘোড়ার মালিকই ঘোড়াকে চালনা করিবে। আরূঢ় ব্যক্তি লাগাম ধরিয়া বসিয়া থাকিলেই হইল। যাহার কোনদিনই অশ্বারোহণের অভ্যাস নাই, সেও স্বচ্ছন্দেই দিব্যি আরামে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। অশ্বগুলি পার্ব্বত্যপথে লঘু গতি, দ্রুত গতি—দুইয়েই বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। অশ্বারূঢ় পর্য্যটকের পতনের বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা থাকে না।

তবু বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য আর আমি অশ্বারোহণের সুখ-সম্ভোগে আকৃষ্ট না হইয়া ডাকঘরে গেলাম চিঠি লিখিতে। শহরটাও একটু দেখার অভিলাষ। দুইখানি পোষ্টকার্ডে সুবন্ধিত দুই আত্মীয়কে পহলগাঁওয়ের প্রাকৃতিক সুষমার কথাই বেশী করিয়া জানাইলাম।

সত্য সত্যই কাশ্মীরের পার্ব্বত্য সুষমা হিসাবে পহলগাঁওয়ের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। গুল্মার্গকেই অবশ্য সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। পহলগাঁও তাহারই পরবর্ত্তী। তবে স্থানের জাতি-বিচার হিসাবে দুইটি নানা বিষয়ে পৃথক-ধর্ম্মী। গুল্মার্গ এক জাতির, আর পহলগাঁও আর এক জাতির। ধরিতে গেলে, গুল্মার্গের অধিকতর উচ্চতাই সৌন্দর্য্য-নিলয়ের প্রশস্ততার উপাদান রচনা করিয়াছে। এক হিসাবে পহলগাঁও গুল্মার্গের মহিমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে পহলগাঁও কাশ্মীরের মধ্যে অতুলনীয়। স্বীয় পরিবেশে ইহার প্রাকৃতিক গরিমাও যে অতুলনীয় তাহাও স্বীকার করিতেই হয়।

পহলগাঁওয়ের খালসা হোটেলটিও বেশ সুন্দর। মাসিক এক শ' টাকা হইলেই হোটেলে একজনের খরচ চলিয়া যায়। ঘরগুলি সব কাঠের তৈয়ারী।
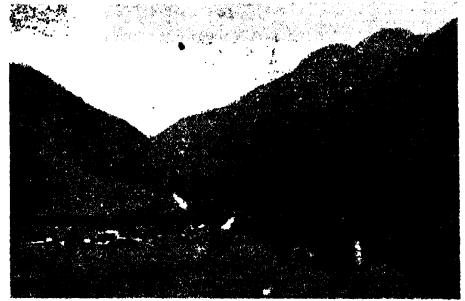
পহলগাঁও

পহলগাঁওয়ে খাদ্যদ্রব্যও বেশ সস্তা। মধু, মাখন, ঘৃত, দুগ্ধ—সবই সুলভ। স্থানীয় অধিবাসীরা কিন্তু বেশীর ভাগই দরিদ্র।

বেলা দুইটায় শ্যামল-তৃণাচ্ছাদিত সমতলে পাতা পাতিয়া সকলে মিলিয়া কলমুখর ভোজনানন্দের পর্ব্ব সমাধা করা গেল—খিচুড়িতে সুরু করিয়া পাঁপরে পরিসমাপ্তি।

স্থানটি ছাড়িয়া আসিতে মন চাহে না। তবু তো আসিতেই হইবে। আমাদের পুনর্যাত্রা সুরু হইল।

পহলগাঁও হইতে শ্রীনগরে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বিশ মাইল দক্ষিণে মার্ত্তণ্ড-মন্দির দর্শনীয়। শোনা যায়—সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। মন্দির-নির্ম্মাণের সুযোগ্য স্থল নির্ব্বাচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকের পরিবেশ যেন অলৌকিকতার আবরণে দেব-মহিমায় পুণ্যপীঠ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে শ্বেত-প্রস্তরের সূর্য্যমূর্ত্তি দেব-বিগ্রহরূপে পূজিত হন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর—এই পঞ্চবিধ দেবোপাসকে ভারত পঞ্চ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এ অঞ্চলে প্রাচীন সৌর উপাসনার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিলাম এরূপ ভারতে আর অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। এক কোণার্কের সূর্য্য-মন্দির বাদ দিলে, সূর্য্যপূজার স্থায়ী চিহ্ন ভারতে অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না।

চারি মাইল দক্ষিণে আসিয়া চোখে পড়িল—'অনন্তনাগ' তীর্থ। কাশ্মীরী ভাষায় 'নাগ' শব্দের অর্থ প্রস্রবণ। এখানে একটি গন্ধকের প্রস্রবণ আছে। অনন্তনাগ তীর্থে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার শ্বেত-

প্রস্তরের মূর্ত্তি দেখা গেল। প্রাচীন শিল্পীর শিল্প-কুশলতা দেব-দেহের গঠন-পারিপাট্যে আর সুষমা-সৌষ্ঠবে যেন দীপ্ত হইয়া আছে। অনন্তনাগ তীর্থের পার্শ্ব দিয়া মার্ত্তণ্ড খালের জল বহিয়া যাইতেছে—স্বচ্ছধারা। পহলগাঁও হইতে লিদার নদীর এই খাল বাহির হইয়া ঝিলমে গিয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীরে পার্ব্বত্য নদী, প্রস্রবণ আর খালের জলে যতখানি চাষ হয়, বৃষ্টির জলে ততখানি হয় না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এখানে নিতান্ত কম। প্রাকৃতিক নদী বা প্রস্রবণ থাকা সত্ত্বেও খালের জলের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সবিশেষ প্রশংসনীয়। খালের জলেই ধানের চাষ হয় বেশী। গম বা মকাইয়ের ত কথাই নাই।

অনন্তনাগ তীর্থে বাহিত জল বাঁধানো চৌবাচ্চায় আংশিক আবদ্ধ হইয়া বঙ্গদেশের 'ল্যাটা' জাতীয় মাছে পরিপূর্ণ হইয়া আছে।

এই তীর্থের সংলগ্ন শহরের নাম ইসলামাবাদ—বড় বাণিজ্যকেন্দ্র একটি। এখানকার পশমে তৈয়ারী বড় গালিচা বা গালিচার আসন প্রসিদ্ধ। স্থানীয় ভাষায় গালিচার নাম 'গাব্বা'। কালীবাবু বহু টাকার গাব্বা কিনিলেন। এক একটি প্রকাণ্ড কক্ষ আচ্ছাদনের উপযোগী। কিন্তু দরকষাকষি করিয়া কেনার মধ্যে দেখিলাম বিক্রেতার প্রথম দাবির সঙ্গে প্রদত্ত ক্রয়-মূল্যের বহু পার্থক্য। আগেই বলিয়াছি, কাশ্মীরে দর না করিয়া কোন জিনিষই কেনা যায় না। বিক্রেতা প্রথমে যাহা দাবি করিবে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ স্বীকার করিলে শেষ পর্য্যন্ত দাবির অর্দ্ধেকে গিয়া দাঁড়াইবে।

১১

২৫শে অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ণে অনেকে মিলিয়া চশমাশাহী দেখিতে গেলাম। ডাল হ্রদ দিয়া শিকারায় না গিয়া এবার গেলাম টাঙ্গায়। কাশ্মীরী ভাষায় 'চশমা' শব্দের অর্থও প্রস্রবণ। চশমাশাহী প্রস্রবণের জল অতি স্বচ্ছ, পরিপাকের পক্ষে একান্ত অনুকূল পানীয়। অনেকেই প্রস্রবণের উদ্গত বারিরাশি অঞ্জলি ভরিয়া আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলেন।

তার পর সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরের চত্বরে উঠা গেল। অদূরেই শ্রীনগরের মর্ম্মবিদারী সুবিখ্যাত শ্বেত প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। শ্যামাপ্রসাদের অন্তিমের কারাগৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই মনটা যেন উদাস হইয়া গেল। ললাটে সংযুক্ত করপুট স্পর্শ করিয়া সেই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করিলাম। স্মৃতিগত মনোবেদনার সঙ্গে চশমাশাহীর সমুচ্চ চত্বরের গাত্র-ভিত্তির লতা, পাতা ও পুষ্পের মনোহর বর্ণ-বৈচিত্র্য মানস-পটে চির-করুণ রাগরেখা আঁকিয়া গেল। অভিজ্ঞ টাঙ্গাওয়ালার মুখে শুনিয়াছি, ঐ প্রাসাদে বড় বড় লোক আসিয়া বাস করেন। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর হইতে ঐ গৃহে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই—জনশূন্য বন্ধপুরী নিষ্প্রাণ কায়া লইয়া অসীম শূন্যে রুদ্ধ শ্বাসের স্মৃতি-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। যেদিন প্রথম নিশাতবাগ দেখি, সেদিনই দূর হইতে এই প্রাসাদ প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়: সেদিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা। কোজাগরীর সায়াহ্নে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষ-বিষাদের ভাবমিশ্র অভিব্যক্তি হইয়াছিল সেদিন নৌগৃহে পৌঁছিয়া।

> ডাল হ্রদে, আর শালিমার বাগে
> করিনু বিহার নব অনুরাগে,
> মরমের আঁখি সে নিশাতবাগে
> শ্বেত-প্রাসাদের হিয়া
> দেখিল—কাঁদিছে বাংলা মায়ের
> বরণীয় সেই বীর তনয়ের
> স্মৃতি-তর্পণে আজি মরতের
> ব্যথা-স্মৃতিটুকু দিয়া।

সেদিন শ্রীনগরের বক্ষে বঙ্গের কোজাগরীই যেন লক্ষ্য করিতে-ছিলাম। বঙ্গশ্রীই যেন শ্রীনগরের শ্রীরূপে মূর্ত্তিমতী—এই ভাব-দৃষ্টির অন্তরালে বঙ্গজননীর সুসন্তানের বিয়োগ-ব্যথা আশ্রয় লইয়াছিল।

দেখিলাম—

> হোথা জ্যোছনায় ঝিলমের তীর
> মায়াময়ী দেবদারু অটবীর
> রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুক্তাময়ীর
> চিত্রিত রূপে হাসে,
> চাঁদিনী পশিছে মর্ম্মের মূলে
> ঝিলম উঠিছে তাই দুলে' দুলে'
> আলোকিতা গৃহ-তরী কূলে কূলে
> মায়াপুরী যেন ভাসে।
> স্নিগ্ধ আলোকে শ্রীনগর হাসে
> রজত-ধারায় ধরাতল ভাসে
> কোজাগরী হেথা যেন পরকাশে
> বঙ্গের জ্যোছনায়,
> চির-নিদ্রায় তনয় যাহার
> অভিভূত, উঠে তারই হাহাকার
> শ্বাসে-উচ্ছ্বাসে মর্ম্ম-বিদার
> পাষাণ-দ্রব হিয়ায়।

কোজাগরীর সন্ধ্যায় সৌন্দর্য্যানুভূতির অন্তরালে যে করুণ গাথা আশ্রয় লইয়াছিল, আজ চশমাশাহীর সৌন্দর্য্যের পাশে তাহাই প্রত্যক্ষরূপে নবীভূত হইয়া হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

চশমাশাহী হইতে আজ আবার উত্তর মুখে শালিমারবাগে চলিলাম। শালিমারবাগ পর্য্যন্ত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ উর্ব্বর ভূমির মত ধান্যভূমি বা তরিতরকারির ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হইল। শালিমারবাগে নামিয়া আজও একবার এই মনোহর উদ্যানের প্রথম স্তরে উঠিয়া অলক্ষণের মত চতুর্দ্দিকের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলাম। অপরাহ্ণের

সূর্য্য ডাল হ্রদের অভ্যন্তরে রশ্মিরেখার প্রতিবিম্ব রচনা করিয়াছে। হ্রদের বারিরাশির মধ্যে পর্ব্বতের প্রতিবিম্বও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

সেখান হইতে আরও উত্তরে গিয়া "পীরসাহেবে"র পীঠ দর্শন করিলাম। পীরসাহেবের নাম—সৈয়দ মীরাক। সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার। শুনা গেল—তিনি পারস্য হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন। পীরসাহেব কথা বেশী বলেন না। যে-কেহ গিয়া দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া আসে। প্রশ্নের বা উত্তরের ক্ষেত্র নয় এটি। যাঁহারা যান, সকলকেই মিছরি বা, ফল (আখরোট কি বাদাম) দিয়া আপ্যায়িত করেন। বর্ষীয়ান হইয়াছেন—বয়স আশীর উপর হইবে। কিন্তু মুখে চোখে একটা সমুজ্জ্বল দিব্য বিভা। একত্র অবস্থানকারী শিষ্য গোলাম মহম্মদ ও এনায়েত হোসেনের সঙ্গে বার্ত্তালাপে বুঝিলাম—বর্ণ-ভেদের বোধাতীত এই মহাপুরুষ মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ থাকেন।

বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য সমগ্র জীবন ধরিয়া মহাপুরুষ দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। আজ উনি পীরসাহেবের দর্শনমাত্রেই অলৌকিক শক্তি উপলব্ধি করিয়া ফিরিবার পথে আমায় মহাপুরুষদের কথাই বলিতে লাগিলেন। সমস্ত পথ তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে নিজের ব্যর্থ জীবনের নিষ্ফল বিলাপ অন্তরের মধ্যে গুমরিয়া ফিরিতেছিল।

পীরসাহেবের পীঠের কিছু উত্তরেই 'হারওয়ান' হ্রদ। এই হ্রদের স্বচ্ছ, সুপেয় পানীয় সমগ্র শ্রীনগরে পরিবেশন করা হয় কাঠেরই পাইপ দিয়া।

শান্ত, স্থির পরিবেশে, সন্ধ্যার আলোকে বাম ভাগে তখত-ই-সুলেমান পাহাড়ের গায়ে রাজভবনের বহির্ভাগ দেখিতে দেখিতে ফিরিতেছি—প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দীর্ঘ ভবন—অভ্যন্তরে আলোকমালায় আলোকিত।

দক্ষিণ পার্শ্বে ডাল হ্রদের উপর 'নেহরু পার্ক' তখন আলোক-মালায় ঝলমল করিতেছে।

টাঙ্গাওয়ালা আবেগভরে বলিয়া উঠিল—আভি ক্যা দেখতে হৈ বাবু? শেখ আবদুল্লাকে টাইম ও পার্ক সামকো হররোজ উছলতা কুছলতা। বর্ত্তমানে জম্মুর পথে কুতের দক্ষিণে কারাভবনে আবদ্ধ প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লার সময়ে নিত্য সন্ধ্যায় এই পার্ক মহোৎসবের হর্ষে মুখরিত থাকিত। পার্কটি 'শের-এ-কাশ্মীর' শেখ আবদুল্লারই প্রতিষ্ঠিত।

১২

কাশ্মীরের 'উলার' হ্রদে নৌ-বিহার এক প্রশস্ত দৃষ্টিবিস্তারের সুপরিসর ক্ষেত্র সম্মুখে ধরে। হ্রদের পরিধি প্রায় পনের মাইল। কাশ্মীর-উপত্যকার মধ্যভাগে কিয়ৎ উত্তর-পশ্চিমে এই হ্রদ। এই হ্রদে অপরাহ্নের নৌ-বিহারে ঝটিকায় নৌকাডুবির আশঙ্কা সমধিক।

শ্রীনগর হইতে প্রায় সাতাশ মাইল দূরে 'ট্যাঙমার্গ'। ট্যাঙ-মার্গ হইতে নৌকায় বা ডুলিতে 'গুলমার্গে' উঠিতে হয়। গুলমার্গের উচ্চতা প্রায় ৯০০০ ফুট। গুলমার্গের অর্থ গোলাপবাগ—গোলাপের বাগিচা।

সমগ্র কাশ্মীর-উপত্যকার মধ্যে গুলমার্গের পার্ব্বত্য সুষমা যে অতুলনীয় সেকথার উল্লেখ আগেই করিয়াছি। সুশ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মুক্ত গিরিগাত্রের আশেপাশে ঘন পাইনের বন। শিলঙের শোভার সঙ্গে ইহার যেন অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। আগে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ইংরেজই ছিল বেশী। এখন অনেক কম।

গুলমার্গের ৪০০০ ফুট ঊর্দ্ধে খিলেনমার্গ। প্রাকৃতিক পার্ব্বত্য সুষমায় খিলেনমার্গ যেন কাশ্মীরের শিরঃশোভা রচনা করিয়া রাখিয়াছে, আর, গুলমার্গ হইল কণ্ঠভূষা।

শালিমারবাগ

এইরূপ পার্ব্বত্য সুষমার আধার কাশ্মীর-উপত্যকায় আমাদের মাত্র দশ দিনের অবস্থিতি। তাহাতে কি সমস্ত জিনিষ দেখা হয়, না সর্ব্বত্র যাওয়া সম্ভব? বহু দর্শনীয়ের মধ্যে ক্ষীর-ভবানী দর্শনও আমাদের অদৃষ্টে ঘটিল না। শ্রীনগর হইতে বাসযোগে প্রায় বিশ মাইল দূরে মন্দির। ভক্তের দৃষ্টিতে মহামায়া এখানে নিশ্চয়ই ক্ষীর-প্রিয়া হইয়াছেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় নাকি দেবীর তিথি-উৎসব পালন করা হয়।

আগামী কাল এই রূপৈশ্বর্য্য-নিকেতন পরিহার করিয়া যাইতে হইবে। তখ্‌ত-ই সুলেমান বা, শঙ্করাচার্য্যগিরিতে আজ পূর্ব্বাহ্নে আরোহণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম। প্রেরণা যোগাইলেন কালী-বাবু আর কলিকাতার ডাক্তার বাবু। 'দেখবেন কি শান্ত পবিত্র পরিবেশ, কি জ্যোতির্ময় দেব-দেহ, কি চতুষ্পার্শ্বের শোভা!' আরোহণ করিয়া দেখিয়াছি—বন্ধুদ্বয়ের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

বন্ধুবর ভট্টাচার্য্যকে আরোহণকালে রীতিমত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল। অপেক্ষাকৃত হীনবল এবং ক্ষীণতনু হইয়াও আমি বরং স্বচ্ছন্দেই আরোহণ করিলাম। হাজার ফুট উচ্চে উঠিয়া স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শনে পরম পরিতৃপ্তি বোধ করিলাম উভয়ে তিন বার দেবদেহ প্রদক্ষিণ করিয়া যখন মন্দিরের মধ্যে উপবেশন করিলাম, তখন অনুভব করিলাম—যেন এক মহা-শান্তি বিরাজ করিতেছে। ভারতের বহুস্থলে বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বহু শিবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এখানকার এ শিবলিঙ্গের তুলনা খুঁজিয়া পাই না। পর্ব্বতের উপরে দেবমন্দিরের বহির্ভাগেও

নিবিড় শান্তি—অভ্যন্তরে দেব-দেহে অপূর্ব্ব স্বর্ণ-শ্যাম কান্তিতে সমুজ্জ্বল দ্যুতি।

আরও উপভোগের বিষয় এই যে, এখান হইতে নিম্নবর্তী সমগ্র শ্রীনগরের শোভাসন্দর্শন যেন অভিনব আলেখ্যদর্শন। দূরে আঁকা-বাঁকা ঝিলমের সর্পিল গতির দিকে চাহিলে চোখ আর ফিরানো যায় না। সমগ্র শ্রীনগরের শোভানিরীক্ষণ সম্পর্কেও সেকথা প্রায় সমানেই প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া, শ্রীনগরের পরিধি অতিক্রম করিয়াও চতুর্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত অবাধ দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া যায়। কাশ্মীরের উপত্যকাকে একরূপ সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করারই যেন পরম সুযোগ। উদ্ধদেশ হইতে আরক্ত চিনারের ফাঁকে ফাঁকে নগরীর ভবনশ্রেণী, উন্মুক্ত সমতলে অবস্থিত গৃহাবলী ঠিক যেন সমস্তরে সুশোভিত সহস্র চিত্রের সমাবেশ বলিয়া মনে হয়। অন্যদিকে সুপ্রশস্ত ডাল হ্রদের বক্ষে অসংখ্য সজীব বাগান শ্যামল জলাধারে সুশ্যামল চতুষ্কোণের চিত্র রচনা করিয়াছে।

দিব্য উপভোগের মধ্যে কতিপয় ছত্র রচনা করিয়া বন্ধুবরকে শুনাইলাম—

> রক্ষী-ঘেরা পুরী যেন পপলার-চিনারে,
> শ্যামল শস্যের ক্ষেত ডালের মাঝারে
> সম-চতুষ্কোণ—শ্যাম-সৌন্দর্য্য-নিলয়
> নয়নের-তৃপ্তি-চিত্র কি বৈচিত্র্যময়!
> দূরে হিমশীর্ষ শৈলমালা স্বর্গ চুমি',
> নিম্নে যেন স্বপ্ন-রাজ্য বৈজয়ন্তীভূমি,
> আঁকাবাঁকা তলোয়ারে বারংবার হেরি—
> অতৃপ্ত আঁখির-নেশা রহে মোরে ঘেরি।

১৩

স্বর্গ হইতে বিদায়ের পূর্ব্ব রাত্রিতে নৌগৃহের বৈঠকে কত আলোচনা কাশ্মীরের! ট্যুরিষ্ট ম্যাপে কাশ্মীরের কথা পড়া গেল।

কাহিনীতে রহিয়াছে—উপত্যকাটি এককালে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল। উন্নত ভূমিতে অতিকায় এক দানব বসবাস করিত। নর-হত্যা করিয়া সে নর-মাংসেই জীবনধারণ করিত। মহামুনি কাশ্যপের তপস্যায় মহাদেবী আবির্ভূত হইয়া দানবকে নিধন করেন। দেবীর হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটি প্রস্তরে এক মহা-পর্ব্বত হয়। মহামুনি কাশ্যপ পর্ব্বতের মধ্যে হ্রদের জল নিষ্কাশনের পথ করিয়া দেন। মুনির নাম অনুসারে উপত্যকার নাম হয়—'কাশ্যপ মীর'। উহা হইতেই নাকি 'কাশ্মীর' নাম হইয়াছে। তথ্যের রহস্য আজ কে উদ্ঘাটন করিবে? তবে ভূতত্ত্ববিদেরাও নাকি অনেকে এ বিষয়ে একমত যে, কাশ্মীর এককালে জগতের মহাসমুদ্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত এক বিশাল সমুদ্রই ছিল।

আজ কাশ্মীরে শতকরা দশ জন হিন্দু, নব্বই জন মুসলমান। হিন্দু রাজা ললিতাদিত্য বা অবন্তীবর্ম্মণের কোন দুর্নামের কথা ইতিহাসে দেখা যায় না। 'রাজতরঙ্গিণী'তে কাশ্মীরের বহু ইতিকথা লিপিবদ্ধ আছে।

মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইলে হিন্দু-নির্যাতন সুরু হয়, হিন্দুর কীর্ত্তিও ধ্বংস হইতে থাকে। এ বিষয়ে সেকেন্দর শাহের কুখ্যাতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান সম্রাট জয়নাল আবেদীন মহামনা আকবরের ন্যায় উদার ছিলেন। প্রজাদের তখন সুখও ছিল।

সম্রাট আকবর কাশ্মীর জয় করেন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তদবধি মোগল সম্রাটগণ এখানে রাজত্ব করিতে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জম্মুর রাজা গুলাব সিং শিখযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ এক কোটি টাকা দিয়া ব্রিটিশরাজের নিকট হইতে কাশ্মীর ক্রয় করেন। ভূতপূর্ব্ব রাজা হরি সিং—গুলাব সিং-এরই বংশধর। হরি সিং-এর পুত্র করণ সিং বর্ত্তমানে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা।

দেশটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তবে বহুকালের পীড়নে দেশ-বাসীর মেরুদণ্ড যেন আজ ভগ্ন। অধিকাংশ অধিবাসীই অতি দরিদ্র। শীতের দেশ। অথচ অধিকাংশ লোক শীতবস্ত্রে বঞ্চিত। উড়িষ্যাবাসী কিংবা মাদ্রাজপ্রদেশবাসী অতিদরিদ্র মানব-সমাজের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহাদের আরও দরিদ্রই মনে হয়। যাহারা ভারবাহী কুলির কাজ করে তাহারা বেশ বলিষ্ঠ। ইহাদের আচরণে একটা ভীরুতা লক্ষ্য করা যায়। যাহারা শ্রমিক সংগ্রহ করে তাহাদের নিকট ইহারা পর্য্যাপ্ত শ্রমমূল্য পায় না। তাই এই সব শ্রমিক কাজের জন্য হাহাকার করিলেও লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়। সংগ্রহকারীরা অন্য লোকের দ্বারা প্রহার করাইয়া এই সব শ্রমিককে কাজে লাগায়। অম্লান বদনে ইহারা ঐ প্রহার সহ্য করে দেখিয়াছি।

কাশ্মীরের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পশমিনা—একপ্রকার ছাগলের লোম। পশমিনা অল্প দামেরও আছে, বেশী দামেরও আছে। এক গজ পশমিনার মূল্য এক শত টাকা পর্য্যন্ত দেখা যায়। পশমিনা হইতে শাল তৈয়ারী হয়। কাশ্মীরী শাল সুবিখ্যাত। শালে পাড়ের কাজও অতি মনোহর। কাশ্মীরী তোষ, ধোসা, মলিদাও কম প্রসিদ্ধ নয়।

কাশ্মীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্ম শিল্প সুপ্রসিদ্ধ। শালের মত শাড়িরও পাড়ের কাজ উল্লেখযোগ্য। কাঠের বাসন, খেলনা, আসবাব, রূপার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য—সব কিছুতেই নয়নমনোহর কারুকার্য্য। এই সব দ্রব্যের উপর কাশ্মীরী শিল্পীদের যে কারুকার্য্য তাহার তুলনা ভারতের অন্যত্র মিলিবে না।

কাশ্মীরের রেশমও প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরী রেশম ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। আবার ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রেশমও কাশ্মীরে আমদানী করা হয়। বিদেশী রেশম হইতে কাশ্মীরে শাড়ি তৈয়ার করা হয়। পশমিনা এবং রেশমে মিশাইয়া একপ্রকার রিংশাল তৈয়ার করা হয়—উহা স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য্য। এক একটি রিংশাল এত হালকা যে মুঠার মধ্যে রাখা যায়।

শ্রীনগরে রেশমের কারখানা একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। কিরূপে রেশমের তন্তু তৈয়ার হয় তাহা দেখিবার জিনিষ। তাহা

ছাড়া শাড়ি, শাল, আলোয়ান, কাঠের খেলনা আসবাব প্রভৃতি তৈয়ার করার ছোট-বড় শিল্পাগার নগরীর সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে।

কাশ্মীরের গিরিজাত প্রস্তর বহুপ্রকারের—স্বল্পমূল্য হইতে বহুমূল্য প্রস্তরের ফেরিওয়ালা বা বড় ব্যবসায়ী অসংখ্য।

বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পসম্ভারে সুসমৃদ্ধ এই দেশও নিজের দারিদ্র্যকে দূর করিতে পারে নাই, ইহাই নিতান্ত দুঃখের কথা।

ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল। ফেরিওয়ালাদের ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ লইয়া ফেরি করিতে দেখা যায়—শাল, শাড়ি, পাথর ও জাফরান। শিকারা লইয়া কত লোকে বিভিন্ন দ্রব্যের সওদা করিয়া ফেরে। শিল্পজাত দ্রব্যের দরকষাকষিতে আর জিনিষ কোনক্রমে ক্রেতার হাতে গছাইয়া দিতে ইহাদের অসীম ধৈর্য্য। এরূপ সুপটু বিক্রেতা কম দেখা যায়।

১৪

২৮শে অক্টোবর বুধবার পূর্ব্বাহ্নেই পুনর্যাত্রার পর্য্যায় সুরু হইল। পথে 'কুড' নামক গিরি-নিবাসে রাত্রি যাপন করা গেল। যাত্রীদের শয্যা-ব্যবস্থায় প্রথম একটু বিভ্রাটের সূচনা হইলেও, অঙ্কুরেই উহার অবসান ঘটিল। পরদিন প্রভাতে বাসে উঠার সময় পূর্ব্বরাত্রির উষ্মা সহসা একটা তিক্ততার সৃষ্টি করিল। এই সময়ে পরিচালক ফকিরচন্দ্র কুণ্ডুর ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

বেলা দশটায় জম্মুতে পৌঁছিয়া 'মেট্রো' হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। বহু যাত্রী জম্মুর সুবিখ্যাত মন্দির দেখিয়া আসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন—"এক লক্ষ শালগ্রাম-শিলার নিত্য পূজা হচ্ছে।"

পাঠানকোটে পৌঁছিয়া কুণ্ডু স্পেশালের নির্দ্ধারিত দ্বিতীয় শ্রেণীর বগিতে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণে তৎপর হইলেন। এখন ঘরের টান। পিছনে ফেলিয়া-আসা ভূ-স্বর্গের মায়া এখনও কিন্তু আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

এক বান্ধবকে পত্রে লিখিলাম :

ক্ষীণ পুণ্যে সেই মর্ত্যলোকে পুনরায়
মাগিতে হইল স্বর্গ হইতে বিদায়
শঙ্করে জানায়ে নতি। আটাশে প্রভাতে
স্বর্গ চিনারের বন রাখিয়া পশ্চাতে
চলি দ্রুত রাজপথে। দীর্ঘ গিরি-পথ
শত ক্রোশ রূপে রসে ভরি মনোরথ
নব রক্ত-রাগে রাঙাইয়া ভাবে ভাবে
বিলাল ঐশ্বর্য্য-রাশি, ইরাবতী-পারে
সমাপ্তি রচিল আসি,—পুনঃ গৃহ-পথে
সাজিতেছে জনে জনে সেই বাষ্প-রথে
স্বর্গ-বাস করি শেষ। এখনও নিমেষ
পড়িতে চাহে না যেন স্মরি' সেই দেশ—
দশ দিন সমারোহ উপভোগে যার
হয় নাই অবসান কৌতুক হিয়ার
একটি দিনের তরে। হ'ল তাই ক্ষীণ
পুণ্য স্বল্পকালে—যেন অতিথির দীন
প্রবেশিনু মহীলোকে স্বর্গ-বাস ছাড়ি,
এ ভূলোকে চলে তীর্থে তীর্থে তাড়াতাড়ি…

৩০শে অক্টোবর সকালে দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। একমাত্র দিল্লীতে প্রচলিত মোটর সাইকেল যানে পর পর রাজঘাট, কুতুব মিনার সেক্রেটারিয়েট, পার্লামেণ্ট ভবন, কালীবাড়ী ও বিড়লামন্দির দর্শন করা গেল।

ফিরিবার পথে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিল্লী দেখানোর আশ্বাস দিয়াছিলেন বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য। আজ কিন্তু কয়েক ঘণ্টায় দিল্লী পরিক্রমা সম্পন্ন করিতে হইল। আজই তিনি আমাদের ছাড়িয়া একাকী গৃহমুখী হইবেন।

রাজঘাটে মহাত্মার সমাধিভূমি—অতি প্রশস্ত শান্ত পরিবেশে স্থির-কায়া সমাধিভূমির মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত চত্বরে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির মহাপীঠ। ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া সকলেই মানস-পূজা সম্পাদন করিলেন। স্মৃতি-পূত মানসে যেন মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার কমল ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন কীর্ত্তির অবশেষ কুতুব মিনার, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, লালকেল্লা ও জুম্মা মসজিদের সঙ্গে নবীন কীর্ত্তি পার্লামেণ্ট ভবন, সেক্রেটারিয়েট, কালীমন্দির—বিশেষ করিয়া বিড়লা মন্দিরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অতি দ্রুতগতির মধ্যে দিল্লীদর্শনের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে হইল। নবীন কীর্ত্তির মধ্যে বিড়লামন্দিরের প্রশস্তি অল্প কথায় হইবার নয়। কয়েক ঘণ্টায় দেখিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার সামগ্রীও ইহা নয়। সুবিশাল মন্দির, অতুলনীয় দেব-বিগ্রহ, গাত্র-ভিত্তিতে অপরূপ কারুকলা তথা শাস্ত্র-বচন—সব মিলাইয়া নবীন ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। কোটি কোটি অর্থব্যয়ে উহার নির্ম্মাণ ও অপরূপ শোভাসজ্জা রচনা করা হইয়াছে।

নয়া দিল্লীর পথে চারি পাঁচ শ্রেণীতে অজস্র সাইকেলের গতি এক নয়নমনোহর শৃঙ্খলার চিত্ররূপে অবলোকন করিলাম।

বন্ধুবরের সঙ্গ হারাইয়া যাত্রীদলের মধ্যে এক একদিনে আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন, প্রয়াগ ও বারাণসীর ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়াছি। আগ্রার তাজমহল, আগ্রার কেল্লা, ইৎমদ উদ্দৌলা—মথুরার পথে আকবরের সমাধিভূমি সেকেন্দ্রা, মথুরায় দ্বারকারাজ, বৃন্দাবনের প্রবেশমুখে অপেক্ষাকৃত অল্পায়তন বিড়লামন্দিরে সুন্দরতর বিষ্ণুমূর্ত্তি, গীতারথ, গীতাস্তম্ভ, বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে অসংখ্য মন্দির, বিগ্রহ ও বন, প্রয়াগের প্রবাহ-সঙ্গমে শুভ্রতা-নীলিমার অপূর্ব্ব সমন্বয়, ভরদ্বাজের আশ্রম, আনন্দ-ভবন এবং বারাণসীতে দ্বিতীয় বার দশাশ্বমেধ, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ঘাট, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, বেণীমাধবের ধ্বজা, ভারত-ভবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া যেন পৃথক পৃথক ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়াছি।

শেষ বিদায়

শ্রীঅন্নদামোহন বাগচী

[উত্তরপাড়া—গঙ্গার উপর একটি বাড়ী। পশ্চাতে গঙ্গা বয়ে চলেছে। দরজা খুললে সবই দেখা যায়। সময়—পূর্ব্বাহ্ণ। একটা খাটের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রোগজীর্ণ মাইকেল মধুসূদন শুয়ে আছেন। চেহারা ক্লিষ্ট ও কান্তিহীন। শুধু প্রতিভাদীপ্ত অপূর্ব্ব-উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখেই তাঁকে চেনা যায়। পায়ের দিকে গৌরদাস বসাক উপবিষ্ট। পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে—কেউ যেন নিজের দৈহিক গ্লানি সজোরে চেপে রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে অপরিসীম যন্ত্রণার অভিব্যক্তি কণ্ঠে সহসা প্রকাশ পাচ্ছে। এ কণ্ঠ মাইকেল-পত্নী হেনরিয়েটার।]

মধুসূদন। (বালিশ থেকে মাথা তুলে, কান পেতে আর্ত্তনাদ শুনে বিচলিত কণ্ঠে) না, না গৌর, এ কিছুতেই হতে পারে না।

গৌর। (সবিস্ময়ে) কেন, কি হতে পারে না মধু ?

মধু। হেনরিয়েটাকে এ অবস্থায় ফেলে আমার কিছুতেই হাসপাতালে যেতে মন সরছে না ভাই।

গৌর। তোমার সবই ভাল মধু—ঐ এক দোষ। চিত্তের অস্থিরতা কোনদিনই তোমাকে লক্ষ্যে পৌঁছুতে দিল না।

মধু। এবং দেবেও না কোনদিন। (সহসা বালিশ থেকে মাথা তুলে তীব্র কণ্ঠে আবৃত্তির সুরে) ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিশাল বারিধিরাশি—উর্ম্মিমালা গলে, যেমতি আছাড়ি পড়ে দিগন্তের বুকে প্রচণ্ড আক্রোশে, সহস্র ফেনিল বাহু মেলি ধরিবারে চায় বুঝি বিধাতার পদ। তেমতি—বঞ্চিত আমি ধরণীর রূপরসগন্ধগানে—কোন অভিশাপে ? কিসের লাগিয়া ভাগ্যে মোর এত বিড়ম্বনা ? বিক্ষুব্ধ পরাণ নিতি শুধাইছে এই কথা স্রষ্টারে আমার !

গৌর। থাক ভাই—আর না। তোমার এই শরীরে এত কথা বলা ঠিক নয়। মুখে মুখে কবিতা-রচনার স্ট্রেন তো আর কম না।

মধু। কথা কইতে আমাকে বাধা দিও না গৌর। আর কয়দিনই বা কইতে পারব ?

গৌর। পাগল ! ও-কথা বলতে নেই। ছিঃ !

মধু। সত্যি আমি পাগল গৌর। আমি উন্মাদ···আমি চির অশান্ত।

গৌর। (হেসে) তোমাকে উন্মাদ বলব—এত বড় ধৃষ্টতা আমার কেন—কারও নেই ভাই।

মধু। একজন বাদে। উন্মাদ বলে আমাকে গাল দিলেন। শুনে এতটুকুও রাগ হ'ল না। মনে হ'ল ঐ তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে উনি যেন এক গৌরবের মুকুট আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন। মাথা নত করে বসে রইলাম—অপমানে নয়, প্রাপ্তির পূর্ণতায়।

গৌর। কে তিনি ? বিদ্যাসাগর ?

মধু। ওঃ···নো···নো। বিদ্যাসাগর—ছাট ওসান অফ লার্নিং। হি ইজ রিয়েলি গ্রেট। হি হ্যাজ দি জিনিয়াস এণ্ড উইজডম অফ এন এনসেণ্ট সেজ, দি এনার্জি অফ এন ইংলিশ-ম্যান—এণ্ড দি হার্ট অফ এ বেঙ্গলী মাদার। তাঁর কথা আমি মুখে বলে শেষ করতে পারব না গৌর। তিনি আমাকে কিনে নিয়েছেন সব দিক দিয়ে। তাঁর মহত্ত্ব দিয়ে—তাঁর দয়া, দান, আর দাক্ষিণ্য দিয়ে। বিদ্যাসাগর ইজ আনডাউটেডলি গ্রেট—কিন্তু আমি যাঁর কথা বলছি—হি ইজ গ্রেটার।

গৌর। কে তিনি—বলেই ফেল না।

মধু। মানুষ তেতো তাড়াতাড়ি গিলে—কিন্তু মিষ্টি-মিঠাই রসিয়ে রসিয়ে খায়। ছোট মাছ বঁড়শির একটানে ডাঙায় উঠে পড়ে, কিন্তু বড় মাছকে খেলিয়ে তুলতেই যে আনন্দ ! অধীর হয়ো না বন্ধু, তিনি হচ্ছেন পরমহংসদেব। ছাট গ্রেট সেণ্ট এণ্ড এ মাইটিয়ার ফিলজফার।

গৌর। (করজোড়ে উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে—হেসে) তাঁর সম্ভাষণের ভাষাই পৃথক।···

মধু। (মৃদু হেসে) ভাষা যাই হোক—তার তাৎপর্য নির্ভর করে প্রয়োগের উপর। উনি সেদিক দিয়ে খুবই ট্যাক্টফুল। এই জীবনে দেশে-বিদেশে কত রকমেরই যে লোক সব দেখলাম—কেউ বা স্বার্থপর,—কেউ কুটিল—কেউ কুচক্রী। আর তারই মাঝে মাঝে মেঘের কোলে বিদ্যুৎঝলকের মতই কত নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, আর মহৎ। নিষ্করুণ ব্যথার মাঝে যেন শান্তির প্রলেপ !

গৌর। তুমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলে কেন ?

মধু। আমি কি গিয়েছিলাম ? উনিই আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে টানে—তেমনি। রাণী রাসমণির ছোট জামাই মথুর বিশ্বাসের বড় ছেলে দ্বারিক আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। তখন বারুদ-ঘরের সাহেবদের সঙ্গে ওদের যে মামলা চলছিল—সেই ব্রিফটা কোনগতিকে আমার হাতে এসে পড়ে এবং সেই সূত্রেই আমার সেখানে যাওয়া।

গৌর। কি হ'ল শেষ পর্য্যন্ত সে মামলার ফল ?

মধু। সাহেবরা হেরে গিয়ে এক্সপ্লোসিভ ষ্টোর ওখান থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হ'ল। (একটু থেমে) হাঁ, কি বলছিলাম—, ছাট পরমহংসদেব। যখন দ্বারিকের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গেলাম—তখন কেন জানি না ওঁকে দেখবার জন্য বড্ড কৌতূহল হ'ল। গেলাম। দোরগোড়ায় জুতো খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কে যেন একজন আমার পরিচয় দিল ওঁকে। উনি ঘরভর্তি

লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন রীতিমত খোশগল্পের আমেজ নিয়ে। আমার নাম শুনে এক ঝলক আমাকে দেখেই মুখ বন্ধ করলেন। কি ব্যাপার? না—ও ধর্ম্মত্যাগী···ওর সঙ্গে কথা বলব না। এখন কথা বললে তো আর ওকে বাদ দিয়ে বলা সম্ভব নয়। তাই বলব না তো কারও সঙ্গেই বলব না।···সবই বুঝলাম। অবশেষে প্রণাম করে বললাম: ছেলে ভুল করে গায়ে ধুলোমাটি মাখলে বাবা মা কি সন্তানকে ত্যাগ করেন? আমার কথা শুনে মুখ খুললেন, বললেন: তুই একটা আস্ত উন্মাদ! কি পেলি ধর্ম্মত্যাগ করে? ওরে—ওখানে যে সবই এক। যত গোলমাল সব এই এখানে। শুনে রাগ তো হ'লই না, মনে হ'ল—অন্তরের সব ক্ষোভ সব গ্লানি কে যেন আগুনে জল ঢেলে নিভিয়ে দিল। অবশেষে কথা না বলার ত্রুটি ও ধরে নিলেন—একখানা রামপ্রসাদী গান শুনিয়ে দিয়ে। উঃ কি বিরাট পারসোনালিটি!

[পাশের ঘর থেকে হেনরিয়েটার কাতরোক্তি ভেসে এল। মধুসূদন বিচলিত হয়ে উঠলেন।]

ঐ···ঐ শোন গৌর! আমাকে একটিবার ওর কাছে নিয়ে চল ভাই। আমি একবার ওকে দেখি।

গৌর। (সমবেদনার কণ্ঠে) দেখবে বৈ কি ভাই, ব্যস্ত হয়ো না।

মধু। (গৌরদাসের হাত চেপে ধরে) দোহাই গৌর, তুমি আমাকে কলকাতায় যেতে বলো না ভাই। চাই না আমি হাসপাতালে যেতে। ওকে ছেড়ে আমি স্বর্গে যেতেও চাই না। ও যদি না আমার পাশে থাকে, আমার যে সবই অন্ধকার গৌর।

গৌর। সেই জন্যই তো তোমার তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা দরকার।

মধু। কলকাতার হাসপাতাল ছাড়া এখানে কি আমার চিকিৎসা কোনমতেই সম্ভব নয় গৌর?

গৌর। (অধোবদনে) সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকম চেষ্টাই ত করলাম ভাই—হয়ে উঠল না। এই সময় সাগরদাঁড়ি থেকে তোমার আত্মীয়েরা যদি কিছু টাকা পাঠাতেন তা হলে—ইট উড হ্যাভ বিন অফ ইম্‌মেন্‌স ভ্যালু। তোমাকে হাসপাতালে পাঠাবার কোনই দরকার হ'ত না। যে ভাবেই হোক এখানেই দু'জনকে ম্যানেজ করতে পারতাম।

মধু। (তীব্র রোষে) আত্মীয়! আত্মীয় কাকে বলছ? আত্মীয় তারা আমার নয়—তারা আমার শত্রু। আমার যথাসর্ব্বস্ব তারা লুটেপুটে খাচ্ছে আর আমি এখানে দুয়ারে দুয়ারে পরের সাহায্য ভিক্ষে করছি। আমারই বাড়ীতে তারা বাস করছে—আর আমি আছি পরের বাড়ীতে। আমারই পয়সায় সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ে দশ গাঁয়ের লোকের চিকিৎসা হচ্ছে—আর আমি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে চলেছি। আর আমার স্ত্রী দু'ফোঁটা ওষুধের অভাবে রোগের যন্ত্রণায় দিনরাত আর্ত্তনাদ করছে। আত্মীয় তারা আমার নয়—তারা দুরন্ত কালসাপ। (উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন।)

গৌর। এই দেখ! কথায় কথায় তুমি ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ মধু—এখন থাম ভাই।

মধু। উত্তেজনা কোথায় দেখলে গৌর! এ ত শুধুই আত্ম-দাহ! কিন্তু যদি পারতাম সেই ভলকানিক ইরাপশান্ দেখাতে··· অন্তরের কপাট খুলে দেখাতে পারতাম যদি, সেই প্রচণ্ড বিসু-বিয়াসের অগ্নিদাহ—তবেই হয় ত আমার সকল জ্বালা, সব অশান্তি চিরদিনের মত থেমে যেত।

গৌর। এই দেখ···তুমি ঘেমে উঠলে! দুর্ব্বল শরীরে এতটা সইবে কেন?

(পকেট থেকে রুমাল বের করে মধুসূদনের কপালের ঘাম সযত্নে মুছিয়ে দিতে দিতে)

আর একটি কথাও না বলে একটু শুয়ে পড় ত। দশটা বাজে—গাড়ী আসবারও সময় হয়ে গেল।

(জোর করে মধুসূদনকে শুইয়ে দিলেন।)

মধু। একটা কাজ তোমাকে করতে হবে গৌর। আমার অবর্ত্তমানে কোনদিন যদি 'মেঘনাদ বধে'র নতুন এডিশান ছাপা হয়—তা হলে একটা জায়গা থেকে কয়টা কথা বাদ দিতে হবে। ঐ যেখানটায় আছে 'গুণবান যদি পরজন—আর গুণহীন স্বজন, তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ—পর—পর সদা।' আজ আমার মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টির ঘোর কেটে গেছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—আত্মীয়ের চেয়ে পর ঢের আপন। আত্মীয় মারতে চাচ্ছে—আর পর তার অনন্ত করুণার পক্ষপুট বিছিয়ে ধরে তাই প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে। আমি ভুল লিখেছিলাম ভাই।

গৌর। এইবার আমি গরম দুধ আনি—তুমি খেয়ে নাও। গাড়ী আসবার সময় হয়ে এল।

মধু। (ব্যাকুল কণ্ঠে) আর যদি কোনদিন ফিরে না আসি, এই যাওয়াই যদি আমার শেষ যাওয়া হয়? তা হলে···তা হলে··· আমার হেনরিয়েটার কি হবে গৌর? কে ওকে দেখবে? কোথায় ও দাঁড়াবে?

গৌর। (ধরা গলায় নত দৃষ্টিতে) মে গড ফরবিড···যদি তেমন দুর্দিন আসেই—আই এসিওর ইউ নট টু বি লিষ্ট ওয়ারিড

মধু। (আশ্বস্ত কণ্ঠে) মে গড ব্লেস ইউ গৌর। তোমাকে আমি আর একটা ভার দিয়ে যাব ভাই।

(বালিশের তলা থেকে একটা কাগজ বের করে গৌরের হাতে দিয়ে)

কাল অনেক রাতে—বাড়ী যখন নিশুতি হয়ে গেল, গঙ্গার কণ্ঠের কুলুকুলু গান শুনতে শুনতে এটা লিখেছি। জীবনে অনেক আশা ছিল—কিছুই তার ফলল না। তাই আর বড় কিছু আশা করতে ভয় হয় গৌর। হয় ত আমার দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া লেগে তা নির্ম্মূল হয়ে যাবে। তাই ছোট্ট একটুখানি আশাকে বুকের কোণে আঁকড়ে ধরেছি। যদি সার্থক না হতে পারে···তা হলে যেন আশাহত বুকের পাঁজরা না ভেঙে ফেলে। ছোট্ট আশার মত ছোট্ট ব্যথার কাঁটা হয়েই যেন তা ফুটে থাকে।

গৌর। (কাগজখানা হাতে নিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন)

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে
তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এ সমাধি-স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম)
মহীর পদে—মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি—শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ি—কপোতাক্ষ তীরে—
জন্মভূমি। জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নাম—জননী জাহ্নবী।

(পাঠ শেষ করে সবিস্ময়ে মধুসূদনের দিকে চেয়ে)

এর মানে ?

মধু। আই উইশ ইট টু বি এনগ্রেভড ওভার মাই গ্রেভ হোয়ার আই লাই ইন ইটার্ন্যাল স্লীপ।

গৌর। (কোঁচার খুটে চোখ মুছে অভিভূত কণ্ঠে) বেশ, তাই হবে ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

(বাইরে গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ হ'ল)

গৌর। (একবার বাইরে উঁকি মেরে দেখে) ঐ ত—কলকাতায় যাবার গাড়ী এসে গেছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি দুধটা নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

[দেয়াল ধরে হাতড়ে হাতড়ে হেনরিয়েটার প্রবেশ। প্রচণ্ড জ্বরের তাপে চোখ লাল—নাসারন্ধ্র স্ফীত···সমস্ত শরীর টলছে। শরীরের সুতীব্র গ্লানি জোর করে চেপে রাখবার একটা আকুল প্রয়াস চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। কোনমতে এগিয়ে এসে হেনরিয়েটা মধুসূদনের মাথায় কম্পিত হাত রাখলেন।]

মধু। (চমকে) কে ? হেনরিয়েটা ! তুমি ? তুমি কেন এ শরীর নিয়ে এখানে এলে ডার্লিং ? যাবার আগে আমি ত তোমার কাছে যেতামই।

(হাত ধরে পাশে বসিয়ে সস্নেহে)

তোমার কাছে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত আমার শেষ বিদায় নেওয়া যে অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

(হেনরিয়েটা কোন কথা না বলে মধুসূদনের কোলের উপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মধুসূদনও অশ্রুসজল নয়নে পরম স্নেহে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।)

হেনরিয়েটা। (অশ্রুসিক্ত নয়নে, কম্পিত কণ্ঠে) আমার জন্য তুমি একটুও ভেব না। থিঙ্ক ফর ইওরসেলফ। আই হ্যাভ গট ইওর লাভ এজ মাই গাইড। ইট উইল লিড মি টু দি এণ্ড। ডোণ্ট ইউ ওয়ারি ডার্লিং···ডোণ্ট ইউ···

(আকুল আবেগে দুই হাত দিয়ে মধুসূদনের মুখখানা তুলে ধরে)

প্লীজ···প্লীজ ডার্লিং, ডোণ্ট ইউ শেড টিয়ার্স। ডোণ্ট ইউ নো···ইট উইল ব্রেক মাই হার্ট ইনটু পিসেস। প্লীজ গিভ মি এ পার্টিং স্মাইল···এন ইটারন্যাল চিয়ার টু ফরগেট মাই সরোজ এণ্ড ডিস্ট্রেস।

মধু। (হেনরিয়েটাকে জড়িয়ে ধরে) হেনরি ! হেনরি ! মাই বিলাভেড হেনরি ! তুমি আমাকে কিছুতেই যেতে দিয়ো না হাসপাতালে। ওখানে গেলে আমি আর বাঁচব না। তুমি আমাকে ধরে রাখ শক্ত করে···কেউ যেন আমাকে ছিনিয়ে নিতে না পারে।

হেনরিয়েটা। ডোণ্ট বি সিলি ডার্লিং। হাসপাতালে তোমাকে যেতেই হবে। এণ্ড আই উইল ওয়েট টিল ইউ কাম ব্যাক কমপ্লিটলি রেকভার্ড।

মধু। যদি এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হয়···আর যদি ফিরে না আসি···তবে···তবে কি হবে ?

হেনরিয়েটা। (মধুসূদনকে সত্রাসে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে) ও···ডার্লিং···নো···নো। ডোণ্ট ইউ সে সো···

নেপথ্যে গৌর। মধু !

মধু। (হেনরিয়েটার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চোখ মুছে) এস।

(গৌরের প্রবেশ। পিছনে দুধের বাটি হাতে কবি-কন্যা শর্মিষ্ঠা।)

গৌর। দুধটুকু খেয়ে নাও আগে—নইলে জুড়িয়ে যাবে।

মধু। সবই একদিন জুড়িয়ে যাবে গৌর—থেমে যাবে এই অফুরন্ত কোলাহল। থামবে না শুধু জীবনের স্রোত আর তার অনন্ত প্রবাহ। 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে—চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবননদে !'

গৌর। এখন কাব্য রাখ তো—লক্ষ্মীছেলের মত খেয়ে নাও আগে।

মধু। (শর্মিষ্ঠার দিকে হাত বাড়িয়ে) দে মা খেয়ে নিই। তোর গৌরকাকা না হলে হয় তো মেরেই বসবে যাবার দিনে। ওর অসাধ্য কিছুই নেই।

গৌর। তুমি এই শরীর নিয়ে আবার এঘরে কেন এসেছ হেনরিয়েটা ? যাবার আগে আমরাই তো যেতাম তোমার কাছে।

হেনরিয়েটা। প্লীজ গৌর—ডোণ্ট এবিউজ মি টু-ডে। আজকের মত আমাকে রেহাই দাও—

গৌর। তুমি তো জান না—তোমার গায়ে কত জ্বর এখন ?

হেনরিয়েটা। জানি। আই ক্যান ফিল। কিন্তু না এসে যে পারলাম না গৌর। তুমি তো সবই জান। সংসারে ও ছাড়া যে—আই হ্যাভ গট নান সো বিলাভেড···সো ডিয়ার।

[দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। নেপথ্যে গাড়োয়ানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

গাড়োয়ান। বহুৎ দের হোতা হ্যায় সাব। এতনা ধুপমে বহুৎ তকলিফ হোগা সব কোইকো। জলদী কর্‌য়িয়ে—

গৌর। (ব্যস্তভাবে) এই যে হয়ে গেছে···আমরা এলাম বলে। না, না, আর দেরি নয়। মধু, তুমি আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে নেমে এস।

[হাত বাড়িয়ে দিলেন। মধুসূদন গৌরের হাত ধরে অতি কষ্টে অতি সন্তর্পণে নেমে এলেন গাট থেকে]।

মধু। (হেনরিয়েটার হাত চেপে ধরে) ডার্লিং তা হলে যাই।

[হাতে চুম্বন করলেন]।

হেনরিয়েটা। (অশ্রুসজল নেত্রে) যাও। মে গড গিভ ইউ কুইক রেকভারি।

মধু। (শর্মিষ্ঠার কাছে গিয়ে) মা, ভাল হয়ে থেকো। আর তোমার মাকে দেখো।

[গৌরদাসের হাত ধরে এগিয়ে যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে হেনরিয়েটার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন]

শর্মিষ্ঠা। (উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে এসে) বাবাকে এ তুমি কি বললে মা? 'যাও' যে বলতে নেই—বলতে হয়—'এসো'।

[হেনরিয়েটা উদভ্রান্তের মত উঠে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে যেতে চাইলেন, কিন্তু চৌকাঠে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ বেরিয়ে আসতে গিয়ে যেন মাঝপথে থেমে গেল জোর করে। ঐ অবস্থায় মেঝেয় পড়ে থেকেই মধুসূদনের গমনপথের দিকে চেয়ে উন্মাদিনীর মত আর্ত্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন।]

হেনরিয়েটা। লিসন্ ডার্লিং। তুমি···তুমি এসো···আবার এসো···

[এ আহ্বান কেউ শুনতে পেল না। মধুসূদন ও গৌরদাস ততক্ষণে লন পার হয়ে গাড়ীর মধ্যে উঠে পড়েছেন। অসহ্য যন্ত্রণা ও আকুল আর্ত্তিতে মেঝেয় মুখ গুঁজে হেনরিয়েটা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। কান্নার চাপে পিঠের দিকটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল। শর্মিষ্ঠা সজল চোখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—রোরুদ্যমানার ব্যথাতুর চিত্তের বিক্ষোভ কতক্ষণে শান্ত হয়। বাইরে ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে যাবার শব্দ হ'ল।]

যবনিকা

আনন্দ-বিলাস

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরী-রাণী! তোমার চুমার উছল-সুরা চঞ্চলিয়া
প্রাণের 'পরে স্বপ্ন জাগায় বাতাস-মুখর অলিন্দে,—
তোমার গোলাপ-পাপ্‌ড়ি অধর আবেগ ভরে বিহ্বলিয়া
সুধার ধারে অঝোর ঝরে আমার অধর-অনিন্দ্যে।

মিলন-পাগল মলয়-অনিল ঢেউ তুলেছে বিভঙ্গে,
সুবাস যে তার কেশের 'পরে নৃত্য জাগায় স্বচ্ছন্দে!
সাগর-দোলায় দুল্‌ছে যেন উতল-ফেনতরঙ্গে,
সুনীল-আকাশ আলোয় আলো প্রাণের চরম আনন্দে!

আজকে সাঁঝে তরুণ পরাণ তাজা রঙের দীপ্তিতে
উঠল জেগে চপল হাওয়ায় হাস্নু হানার গন্ধেতে!
মুগ্ধ আঁখি অরূপ রূপে, হৃদয় খুশী তৃপ্তিতে,
ভাবনা সকল যায় দূরে যায়, মুক্ত সকল দ্বন্দ্বেতে!

চাঁদের আলো ফুলের চোখে নয়ন হেরে রূপ যবে:
পাপড়িগুলো উল্লাসে তাই বিলায় আমোদ গন্ধেতে!
তারার আলো ঠিক্‌রে পড়ে মিলন-রাতের উৎসবে—
বাতাস বিভোর সৌরভেতে মত্ত-মাতাল ছন্দেতে!

পুষ্প-হাসি রাশি রাশি ঝরল যে তাই আচম্‌কায়:
গানের রেশে সুরের কলি পুষ্পিত তার স্পর্শেতে!
সকল বেদন উধাও-হাওয়ায় কোন্ সুদূরে মূর্চ্ছা পায়!—
কান্না সুরু হলো তবু—সে কি মিলন-হর্ষেতে?

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন

শ্রীআশুতোষ বাগচি

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রমুখ বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের কাল থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরে যুগে যুগে বহু কবি-কোবিদ-কণ্ঠ বঙ্গ-কাব্য-নিকুঞ্জ ললিত-মধুর সঙ্গীতে নিরন্তর ঝঙ্কৃত করে রেখেছে—কখনও ছেদ পড়েনি। 'নূতন যুগ-সূর্য্য' রামমোহন ভারতে যে নব-যুগের উদ্বোধন করেন তারই উষাকালে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। তার পরে, ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার পর থেকেই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রঙ্গলাল প্রভৃতি কবি-মনীষিগণের—শেষে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা ভাষায় যে ভাবগঙ্গাবতরণ হয়েছে তার ভীম-কান্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ, তার নিত্য-নব-ছন্দের বিচিত্র ঊর্ম্মি-লীলা বাঙালীর চিত্তকে উদ্বেলিত মোহিত করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের অল্প দিন পরেই ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ কান্তকবি রজনীকান্ত সেন পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদ তখন কাটোয়ায় মুন্সেফ, আর জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ রাজসাহীর শীর্ষস্থানীয় উকীল। এরা দু'জনেই সংস্কৃত ও ফার্সিতে বিদ্বান ছিলেন, গুরুপ্রসাদ ইংরেজীও ভালো জানতেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, সেকালে জজ সাহেবের অনুগ্রহে উকিল হওয়া যেত, কেবল তাঁর কাছে নাম-মাত্র একটা পরীক্ষা দিতে হ'ত। গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদ—দুই ভাইয়ে হরিহরাত্মা সম্বন্ধ ছিল।

কর্ম্মোপলক্ষে গুরুপ্রসাদ কিছুকাল বৈষ্ণবপ্রধান কালনা-কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে ছিলেন; তখন তিনি সযত্নে বৈষ্ণব-মহাজনপদাবলী অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন, আর নিজে ব্রজবুলিতে প্রায় সাড়ে চার শ' পদ রচনা করে ১২৮৩ সালে 'পদচিন্তামণি' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর সঙ্গীতে শিক্ষা না থাকলেও স্বাভাবিক পটুতা ছিল। যখন তিনি স্বরচিত পদগুলি গাইতেন, তখন তাঁর দুই চোখে ধারা বয়ে যেত—শিশু রজনীকান্ত পিতার এই ভাবাবেগ দেখতেন।

রজনীকান্তের মাতুলও বাংলাভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ছোট ছোট কবিতা লিখতেন। কবির মাতা মনোমোহিনীর কাব্য-সাহিত্যে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল; তিনি কবি হেমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন; অনেক সময় ছেলেকে নিয়ে গদ্য-পদ্য গ্রন্থ আলোচনা করতে ভাল-বাসতেন। কবির জন্মের পর মাতা শিশুকে নিয়ে স্বামীর কাছে কালনাতে যান। কান্তকবির শৈশবকাল পিতার কর্ম্মস্থানেই কাটে; তাই তিনি আশৈশব নবদ্বীপ-অঞ্চলের ভাষাতেই অভ্যস্ত হন। একটু বড় হতেই তাঁকে রাজসাহীতে জ্যেঠার কাছে রেখে সেখানকার জেলা স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। ছেলেবেলায় তিনি খুব অস্থির ও দুরন্ত ছিলেন—সারাদিন খেলাধুলায় মেতে থাকতেন। বালকের বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল, তাই সারা বৎসর তেমন পড়াশুনা না করেও পরীক্ষায় বরাবর সগৌরবে উত্তীর্ণ হতেন। তাঁর জ্যেঠতুত দাদা কালীকুমার বালকের লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি ছিলেন একজন এম-এ, বি-এল। এই কালীকুমার বালকের স্বাভাবিক কবিতা-রচনাশক্তিকে উৎসাহ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেন।

১২৮৮ সালে রজনীকান্ত এন্‌ট্রান্স পাস করে রাজসাহী কলেজে এফ-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। ১২৯০ সালে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর বিবাহ হয়। পত্নী হিরণ্ময়ী ভাল বাংলা লেখাপড়া জানতেন; স্বামীর কবিতা পড়ে অনেক সময় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন আর কবিতার বিষয় নির্ব্বাচন করে দিতেন। রজনীকান্ত এই সময়ে সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য ও নাটকগুলি যথেষ্ট যত্ন করে পড়েন। ১২৯১ সালে এফ-এ পাস করে তিনি কলিকাতায় সিটি কলেজে বি-এ পড়েন।

পূজার ছুটিতে রজনীকান্ত যখন বাড়ী যান সেই সময় (১২৯২ সালে) তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, আর তার কয়েকদিন পরেই তাঁর জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথও পরলোক গমন করেন। এর পূর্ব্বে (১২৮৪ সালে) কবির দুই উপার্জ্জনশীল জ্যেঠতুত দাদা বিনোদনাথ ও কালী-কুমারের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ গোবিন্দ-নাথ তখন অবসর নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন; দুইটি যুবক কৃতী পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে তিনি এক ফোটা চোখের জল ফেলেন নি। গোবিন্দনাথ যখন ওকালতি করতেন তখন বহু ছাত্র ও দুঃস্থ লোক তাঁর বাসায় আশ্রয় পেয়েছে। গুরুপ্রসাদ তাঁর বেতনের সব টাকাই অগ্রজকে পাঠিয়ে দিতেন। দান-ধ্যানে দু'ভাইয়ের উপার্জনের প্রায় সমস্তটাই ব্যয় হয়ে যেত; যা-কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হ'ত তার সমস্ত অর্থ রাজসাহীর ইন্দ্রনাথ কাঁইয়ার কুঠিতে গচ্ছিত ছিল। কুঠি ফেল পড়ায় তাঁদের সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট হয়; আর অল্পকালের ব্যবধানে পরি-বারের উপার্জনশীল ব্যক্তি কয়জনেরই মৃত্যুতে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তাঁরা দরিদ্র হয়ে পড়েন। যাহোক, দারুণ অসচ্ছলতার মধ্যে সিটি কলেজ হতে ১২৯৫ সালে রজনীকান্ত বি-এ পাস করেন এবং ১২৯৭ সালে বি-এল পাস করে রাজসাহীতে ওকালতি আরম্ভ করেন।

কর্ম্মজীবনের সুরু থেকেই কবিতা-রচনা, গীত-চর্চ্চা, নাটক-অভিনয় প্রভৃতিতে রজনীকান্তের অধিক আকর্ষণ ছিল, আর বেশী সময় আমোদ-প্রমোদেই কেটে যেত। ওকালতিতে তাঁর মন ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৩১৭ সালে কুমার শরৎকুমার রায়কে

কান্তকবি একখানি পত্রে লিখেছিলেন, "আমি আইনব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম; আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।" ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও রাজসাহীতে ওকালতি করতেন। নাট্যামোদী বলে রাজসাহীতে তাঁরও খুব নাম ছিল; আমাদের ছেলেবেলায় তাঁর প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর এই নাট্যপ্রীতির পরিচয় পেয়েছি। রজনীকান্ত কায়মনে তাঁদের সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের অভিনয়ে রজনীকান্ত রাজার ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন।

রজনীকান্ত গোড়ার দিকে যে-সব কবিতা লেখেন তা প্রকাশ করতে চান নি—স্বভাবতঃই তিনি আত্মপ্রচার-বিমুখ ছিলেন। রাজসাহীর একটি সাহিত্য-প্রাণ যুবক সুরেশচন্দ্র সাহা ১৩০৪ সালে 'উৎসাহ' নামে একখানি মাসিকপত্র বের করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় রজনীকান্তের কয়েকটি কবিতা 'উৎসাহে' প্রকাশিত হয়। ১৩০৭ সালে সুরেশচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে তাঁর শোকসভায় রজনীকান্তের একটি গান গাওয়া হয়, তার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি :

অফুটন্ত মন্দার-মুকুল ;
সে কেন ফুটিবে হেথা ?—বিধাতার ভুল !
কোন্ অভিশাপভরে, ধরায় পড়িল ঝরে,
শচীর কুন্তলরূপী বিলাসের ফুল।

স্থানীয় সকল অনুষ্ঠানেই রজনীকান্তকে গান রচনা করতে ও গাইতে হ'ত। উপস্থিতমত (improptu) কবিতা ও গান রচনায় তাঁর অসামান্য শক্তি ছিল। সাময়িক প্রয়োজনে অত্যল্প সময়ে লিখিত হলেও গানগুলি উচ্চস্তরের ছিল। নিম্নোদ্ধৃত গানটি তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ :

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভোনীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা ;
ধায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্য্যগরিমা-কীর্ত্তিকাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব-গগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি', ডাকিছে সুপ্তি-মগনে ;
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে ?
জাগাও বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের 'তোমরা ও আমরা' কবিতার প্যারডি লেখেন 'আমরা ও তোমরা' নাম দিয়ে; রজনীকান্ত 'তোমরা ও আমরা' নামে দ্বিজেন্দ্রলালের প্যারডির পাল্‌টা প্যারডি লেখেন। তার একটু এখানে উদ্ধৃত করি—'আমরা মাদুরে পড়িয়া নিদ্রা যাই গো, আর তোমাদের চাই গদি ; আমাদের শাক-পাতাটা হলেই চলে গো, আর তোমরা বোলাও দধি ! তথাপি যদি কোন কাজে পাও ত্রুটি গো, স্বাস্থ্যে হালুয়া লুচি ও ব্যাধিতে রুটি গো, না হ'লে আমরি ! কর কি ভ্রূকুটি গো, কিংবা চড়টা চাপড়টা দাও'—ইত্যাদি রজনীকান্ত অনেক উপাদেয় হাস্য-ব্যঙ্গ-কৌতুক কবিতা রচনা করেন। এ বিষয়ে রজনীকান্ত অনেকটা ডি, এল, রায়ের অনুসরণ করেন, আর এ জন্য সকলে তাঁকে রাজসাহীর ডি, এল রায় বলত। এখানে তাঁর বহু কৌতুক-কবিতার একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করি :

'রাজা অশোকের কটা ছিল হাতী,
টোডরমলের কটা ছিল নাতি,
কালাপাহাড়ে কটা ছিল ছাতি,
এসব করিয়া বাহির বড় বিদ্যে করেছি জাহির।
দণ্ডক কাননে ছিল কটা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ
কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এসব করিয়া বাহির···।
ক' আঙ্গুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়েতে ছিল কটা টিকটিকি,
গৌতমসূত্রে বেশমসূত্রে প্রভেদ কি কি,
এসব করিয়া বাহির···।
কৃষ্ণের বাঁশিতে ছিল কটা ছ্যাঁদা,
দিলীপের বাগানে ছিল কি না গাঁদা,
কোন মুখ হয়ে হয় লঙ্কা বেঁধা,
এসব করিয়া বাহির···।
বাদশা হুমায়ুন কাটতো কি না টেড়ি,
Alexander খেতেন কিনা Sherry
মীরাবাঈ কানে পরত কিনা ঢেঁড়ি,
এসব করিয়া বাহির···।
পেয়েছি একটা তাম্রশাসন,
ক্রতুর ক'খানা ছিল কুশাসন
কবে হয় কুশের অন্নপ্রাশন,
এসব করিয়া বাহির বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

রজনীকান্ত অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করেন; সেগুলিতে সুর-সংযোগ করে এবং নিজে গান করে দিনের পর দিন বন্ধু বান্ধবদের আনন্দবিধান করতে থাকেন; কিন্তু সেগুলি ছাপতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে তাঁর হিতৈষী সুহৃদ অক্ষয়-কুমারের ঐকান্তিক আগ্রহে ও পীড়াপীড়িতে ১৯০২ সনে কবির প্রথম পুস্তক 'বাণী' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার ১৩১৯ সালের

কার্ত্তিক-সংখ্যা 'মানসী'-তে এই কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশের নিম্নের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন : "কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রজনীকান্ত রচনা-প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সঙ্গীত আমার সমক্ষে রচিত হইয়াছে ; মজলিসে সভামণ্ডপে পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত হইয়াছে। তথাপি সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইতস্ততের অভাব ছিল না। রজনীকান্তের গুণগ্রাহিতা ছিল, সহৃদয়তা ছিল, রচনা-প্রতিভা ছিল, কিন্তু আত্ম-প্রকাশে ইতস্ততের অভাব ছিল না। কিরূপে তাহা কাটিয়া গেল, তাহা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের একটি জ্ঞাতব্য কথা।

"সেবার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় যাইবার জন্য একখানি ডিঙ্গী নৌকায় উঠিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় তীর হইতে রজনী ডাকিলেন,—'দাদা ঠাঁই আছে ?''

"তাঁহার স্বভাব এইরূপই প্রফুল্লতাময় ছিল। অল্পকাল পূর্ব্বে 'সোনার তরী' বাহির হইয়াছিল। রজনী তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; হয়ত আশা ছিল, আমি বলিয়া উঠিব—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।'

"আমি বলিলাম,—'ভয় নাই, নির্ভয়ে আসিতে পার, আমি ধানের ব্যবসায় করি না।'

এইরূপে দুইজনে কলিকাতায় চলিলাম। সেথান হইতে রবীন্দ্র-নাথের আমন্ত্রণে বোলপুরে যাইবার সময়ে রজনীকান্তকেও সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার আমন্ত্রিত সুধীবর্গের নিকট উৎসাহ পাইয়াও রজনীকান্তের ইতস্তত দূর হইল না। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্ত বলিলেন—'সমাজ-পতি থাকিতে আমি কবিতা ছাপাইতে পারিব না।'

"মুখে যে যাহা বলুক, সমাজপতির সমালোচনার ভয়ে কবিকুল যে কিরূপ আকুল, তাহার এইরূপ অভ্রান্ত পরিচয় পাইয়া প্রিয় বন্ধু জলধরের সাহায্যে সমাজপতিকে জলধরের কলিকাতার বাসায় আনাইয়া নূতন কবির পরিচয় না দিয়া, গান গাহিতে লাগাইয়া দিলাম। প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গীত-সুধাপানে আহারের কথাও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাহাকে কিছু করিতে হইল না ; সমাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন। ইহার পর এলবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতের পরে রজনীর সঙ্গীত যখন দশ জনে কান পাতিয়া শুনিল, তখন রজনীর ইতস্ততঃ মিটিয়া গেল।"

১৩১২ (ইং ১৯০৫) কান্ত-কবির দ্বিতীয় কবিতা-গ্রন্থ 'কল্যাণী' প্রকাশিত হয়। ('বাণী' 'কল্যাণী' পর্য্যায়ের ভাষা ও ভাব-সমৃদ্ধ আর একটি গীতি-গুচ্ছ কান্ত-কবির তৃতীয় পুস্তক 'অভয়া'।) এই সময় বাংলা দেশে প্রবল স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। কান্ত-কবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে-রে ভাই' 'আমরা নেহাত গরীব আমরা নেহাত ছোটো' প্রভৃতি 'স্বদেশী' গান বাংলার হাটে-মাঠে-বাটে বালক-বৃদ্ধ সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে, আর কবির খ্যাতি দেশময় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নব-গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে কান্তকবি কলকাতায় আসেন। ২১শে অগ্রহায়ণ পরিষদ-ভবনের দোতলায় স্থানাভাবে একতলার হলঘরেও সভা হয়—রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। ভিড় ঠেলে উপরে যেতে না পারায় কান্তকবি নিচের সভাতেই যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ সভায় সমাগত সকলের নিকট কান্ত-কবির পরিচয় দিয়ে তাঁকে স্বরচিত গান গাইতে অনুরোধ করেন। তিনি দুটি গান গেয়ে সমবেত জনমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করেন।

এর প্রায় দু'মাস পরে ১৩১৫ সালের ১৮ই ও ১৯শে মাঘ রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হয় ; আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "সেই সময় রজনীবাবুর সহিত পরিচয়ের প্রথম সুযোগ ঘটে। সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা-সঙ্গীত প্রভৃতি করাইবার ভার তিনিই লইয়াছিলেন—তিনি থাকিতে এ ভার আর কে লইবে ? সম্মিলনীর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরে রাজসাহীর সাধারণ পুস্তকাগারে সম্মিলনে উপস্থিত সাহিত্যিকগণের আনন্দবিধানার্থ আয়োজন হয়। সম্মিলনের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে ক্ষেত্রে রজনীবাবুই অভ্যর্থনাব্যাপারে প্রাণস্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া স্বরচিত হাসির গান একটা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ; সভাস্থল হাস্যরবে মুখরিত হইয়া উঠিল নির্ম্মল হাস্যরসের উৎস হইতে নিঃসৃত সুধাপান করিয়া সকলেই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইলেন। জানিতাম, আমাদের এই দুর্দ্দিনে প্রাণে প্রফুল্লতা সমাগম করিয়া সজীব রাখিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের এক দ্বিজেন্দ্রলালই আছেন, জানিলাম উভয়ে সহোদর—রজনীকান্ত তাঁহার যোগ্যতম সহকারী।

সভাভঙ্গের পর রজনীবাবু আমার নিকট আসিয়া আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিলেন। এরূপ সাদর সানুরাগ সম্ভাষণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁহার গানে ও কবিতায় যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহার সহৃদয়তায় ততোধিক মুগ্ধ হইলাম।"

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবি মারাত্মক কর্কট রোগে আক্রান্ত হন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য তাঁর উপার্জ্জন বন্ধ হয়ে যায় ; নিঃস্বপ্রায় কবি চিকিৎসার্থ যখন মেডিক্যাল কলেজের কটেজ ওয়ার্ডে ছিলেন তখন বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যিক ও বিদ্বজ্জনের চির-সহায় স্বর্গত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আর রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কুমার শরৎকুমার রায় কবিকে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করেন। তা ছাড়া, সেদিনের বরেণ্য বাঙালীমাত্রেই হাসপাতালে কবির সঙ্গে দেখা করেন এবং অন্য প্রকারে সাহায্য করে রোগ-তাপিত ও দৈন্য-পীড়িত কবির মানসিক শান্তি বিধানে

যথাসাধ্য চেষ্টা করে বাঙালী জাতির মুখরক্ষা করেন। নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে দুর্বল শীর্ণদেহ কবি দুখানি ছোট কবিতা-গ্রন্থ রচনা করেন। তার একটির নাম 'অমৃত'—রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র অনুসরণে, আর একটি—'আনন্দময়ী' ভক্ত-কবি রামপ্রসাদের ধরনে।

রবীন্দ্রনাথ কান্ত-কবিকে দেখতে একদিন (২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭) হাসপাতালে যান। কবির রোজনামচা থেকে তার কিছু বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করি :

রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন আর কান্ত-কবি লিখে উত্তর দিচ্ছেন।

এই trachestomy করে বেঁচে আছি। আর কথা কইতে পারি না। আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান, মহাপুরুষ।

—আমি যখন বুঝলেম যে এই উৎকট ব্যথা Penal Code নয়—এ কেবল আগুনে ফেলে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্ছে, আমাকে কোলে নেবে বলে—তখন বুঝলাম প্রেম। তার পর সব সচ্ছি। একবার দেখতে বড় সাধ ছিল, নইলে হয়ত কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত—সে দেখা আমার হ'ল। এখন বলুন, শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

—কি শক্তি আপনার নাই? অর্থ-শক্তি? তার যে গৌরব তা আমি এই খাবার রাস্তায় বেশ বুঝতে পাচ্ছি। তার জন্যে মানুষ 'মানুষ' হয় না। এই যে মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা আমার জন্য দিবারাত্রি দেহপাত করছে, এরা কি আমাকে অর্থ দেয়? ওদের প্রাণটা দেখুন, ওরা কত বড়লোক।

—* * * আমি 'রাজার' অভিনয় করেছি। অমন কাব্য অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পার্ট আজও আমার অনর্গল মুখস্থ আছে, আমার মাথা যেমন ছিল, তেমনই আছে—

"এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

একবার দেবতাকে শোনাতে পারলাম না।

—* * আমার ছেলেমেয়েদের মুখে একটি গান শুনুন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তিবালা ও ছেলে ক্ষিতীন্দ্র গাইল 'বেলা যে ফুরায়ে যায় খেলা কি ভাঙে না হায় অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী।' কান্ত-কবি নিজে তাদের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজালেন। সেই দিন বিকেলে তিনি এই গানটি রচনা করেন ও রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন—

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে, গর্ব্ব করিতে চুর,
[illegible] ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছে দূর।
ঐ গুলো সব মায়াময় রূপে,

ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল করেছে দীন আতুর;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া, গর্ব্ব করিতে চুর।
যায়নি এখনো দেহাত্মিকামতি,

শ্রীরজনী কান্ত সেন

এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই দেহটা যে আমি সেই ধারণায় হয়ে আছি ভরপুর;
তাই সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব্ব করিছে চুর।
ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার কবিতা ভালবাসে দেশ,
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে, বেদনা দিল প্রচুর;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে গর্ব্ব করিতে চুর।

রবীন্দ্রনাথ ১৬ই আষাঢ় কান্ত-কবিকে নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি প্রেরণ করেন :

"সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, ও স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক [illegible]—

এ রাজ্যেতে

যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরও তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য।

* *

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন ; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি।"

বৎসরাধিককাল দুঃসহ রোগযন্ত্রণা ভোগ করে ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র রাত্রি সাড়ে আটটার কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যুবক-দল বহুদিন পূর্ব্বে কান্ত-কবির রচিত সুপরিচিত গান 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে' গাইতে গাইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তাঁর নশ্বর দেহ বহন করে নিয়ে যায়।

ভক্ত পিতার কবিত্ব-শক্তি ও গানের কণ্ঠ ও কানের উত্তরাধিকার নিয়েই কান্ত-কবি জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃ-মাতৃকুলের অনুকূল পারিবারিক প্রতিবেশ, জননীর কাব্যানুরাগ ও সাহিত্যালোচনা, জ্যেষ্ঠ কালীকুমারের সহৃদয় উৎসাহ বালক-বয়সেই তাঁর প্রতিভার উন্মেষে যথেষ্ট সহায়তা করে। যৌবনের কর্ম্মস্থলে অক্ষয়কুমারের মত সুপণ্ডিত, মার্জ্জিতরুচি সাহিত্যিক-বন্ধুর নিত্য সঙ্গ ও উদ্দীপনা তাঁর কবি-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে যে প্রভূত সহায় হয়েছিল এরূপ অনুমান হয়। কবি দীর্ঘায়ু হলে বাংলা কাব্য-সাহিত্য তাঁর রচনা-সম্পদে আরও সমৃদ্ধ হ'ত—এতে সংশয় নাই।

তাঁর কবিতা-গ্রন্থগুলিতে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর কবিতা বা গান আছে। স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক গানগুলির ভাষা বিদ্যুদ্‌গর্ভ, তার ধ্বনি মেঘ-মন্দ্রের মত গুরুগম্ভীর—জয়দেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ভাবসম্পদ অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁর ভক্তিরসাপ্লুত গানগুলি সব চেয়ে গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী বলে মনে হয়—কবির একান্ত-হৃদয়ের আত্মনিবেদনের (ইম্‌প্রেশন) ছবিগুলি চিরদিনের জন্য অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিগত কয়েক বৎসরে উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, রামেন্দ্র-সুন্দরের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে বাঙালীর ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। কান্ত-কবি লোকান্তরিত হয়েছেন ১৩১৭ সালে। এখন আর বোধ হয় কপিরাইটের বাধা নাই। কবির পুস্তক-সংখ্যা মাত্র সাতখানি। পরিষদ যদি তাঁর সবগুলি কবিতা সংগ্রহ করে একত্রে প্রকাশ করেন তবে আর একটি মহৎ কাজ হয়।*

* এই প্রবন্ধ-রচনায় স্বর্গত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের 'কান্ত-কবি রজনীকান্ত' গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি।—লেখক

দুই নম্বর গুমটি

শ্রীবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

তিনশ' পঞ্চাশ নম্বর ডাউন ট্রেনটা এখন যাবে। এখন এই ভোর পাঁচটায়। গুমটি-ওয়ালা মদন সিং এসে দাঁড়িয়েছে বাইরে, ঠিক গুমটি গেটের পাশে, হাতে সবুজ বাতি। লাইন ক্লিয়ার। কিন্তু আজ এত দেরি করছে কেন গাড়ীটা ? চঞ্চল হয়ে ওঠে মদন, তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে।

অবশেষে গাড়ীটা এল। ধোঁয়ায় ধূলি উড়িয়ে, কয়লা ছড়িয়ে, ঝড়ের মত, অতি দ্রুত গতিতে। সবুজ বাতি দেখাল মদন।

বর্ষাকালের সকাল। ভোর হলেও চারদিক থমথমে মেঘম্লান—ব্যর্থপ্রেমিকের মুখের মত। কেবল ঐ ষ্টেশনের আলোগুলি জ্বলছে টিমটিম করে।

গাড়ী পেরিয়ে গেল। গাড়ীর পেছনে মিলিয়ে-আসা ঐ লাল আলোর বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললে মদন, শালার গাড়ী, এই বর্ষায় সকালে যাবি ত যা, সময়মত চলে যা, যাতে দু'মিনিট দাঁড়িয়েই আবার ঘরে ফিরে শুতে পারি, ঘুমোতে পারি সকাল সাতটা পর্য্যন্ত।

সাতটায় তাকে উঠতে হবে। সাতটা দশ মিনিটে লালগোলা মেল। তখন গুমটি গেট বন্ধ করতে হবে, সবুজ পতাকা দেখাতে হবে।

কিন্তু পাঁচটায় আসে না এ গাড়ী, কোনদিনই আসে না। এ গাড়ীর নাম গয়া-প্যাসেঞ্জার। গয়া থেকে আসে ব্যাণ্ডেল-নৈহাটি হয়ে। আগে এ লাইনে আসত না এ গাড়ী। তখন সুবিধে ছিল মদনের। রাত বারোটা সাতচল্লিশে বার্ণপুর প্যাসেঞ্জার পার করে দিয়ে দিব্যি ঘরে এসে শুতে পারত মদন, ঘুমাতে পারত আরাম করে, আর পারত পার্ব্বতীর পাশে শুয়ে তার দেহের উত্তাপ উপভোগ করতে। কিন্তু এখন আর তা হয় না। এখন ভোরে উঠতে হয়। তা হোক, তাতেও অসুবিধে ছিল না মদনের যদি সময়মত চলে যেত এ গাড়ী। কিন্তু কোন দিনই সময়মত আসবে না এ ট্রেন। আর মদন বাইরে এই বর্ষার দিনে, প্রচণ্ড শীতে, সবুজ বাতি হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে, ভিজবে, কাঁপবে শীতে। ঘোড়ার ডিমের চাকরি। যদি সে সব ছেড়ে চলে যেতে পারত! কিন্তু যাবে কি করে মদন? সাইত্রিশ বছরের মদনের ঘরে, কুড়ি বছরের পার্ব্বতী। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কবোষ্ণ প্রেম, আর গভীর অনুরাগে ভরা, মধুর বুক, লতানো দেহসৌষ্ঠব। যখন চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবে মদন, তখনই ভাবে পার্ব্বতীর কথা। পার্ব্বতীর টান, তার চোখের নীরব কান্নার শিখা, আর মনের হাতছানি, আজও সে বাধা ঠেলতে পারে নি মদন, কাটাতেও পারে নি।

এতক্ষণে আকাশটা ঝরঝরে হয়ে চনচনে রোদ উঠেছে। দাঁতন ভাঙতে যাচ্ছিল মদন। কিন্তু ও কি? সিগন্যাল-পোষ্টের নীচে কালোমত ওটা কি? কুকুর নয় ত? এক রাশ জমে-থাকা থক্‌থকে রক্তের মধ্যে পড়ে আছে জন্তুটা। মাথাটা নেই, কাটা পড়েছে ট্রেনে।

তাড়াতাড়ি হেঁটে এল মদন, না, কুকুর নয়, পাঁঠা। টেনে তুলে সে, হাসল মনে মনে, পাঁঠাও নয়, ছাগী। তা ছাগীই সই—ডান হাতে ছাগীটাকে তুলে নিয়ে ফিরে এল মদন। কাক উড়ল মাথার ওপর, পাখা ঝাপটাল দু'একটা চিল, ফোটা ফোটা রক্ত ঝরল প্রাণহীন দেহটি থেকে।

রেল লাইনের ধারে বাস করে মদন। ট্রেনে কাটা-পড়া ছাগল গরু আর হাঁস মুরগী প্রায়ই তার কপালে জোটে। ভাগ্য তার আর কিছুতে না হোক, এদিকে প্রসন্ন। গো-মাংস সে খায় না, বিক্রী করে দিয়ে আসে আর্দ্দালী বাজারের হানিফ কসাইয়ের কাছে। পাঁঠার ছাল বেচে দেয় লোকমন মিঞা বাড়করের দোকানে। আর পাঁঠা ছাগলের মাংস সে নিজে কতক খায়, কতক বিক্রী করে দিয়ে আসে হরেন বাবুর রেস্তোরাঁয়। সে মাংসে বাবুরা আরাম করে চপ-কাটলেট খায়। এ মন্দ নয়, বরং ভাল ব্যবসা—ভাবছিল মদন, খোয়া-পাথর আর রেললাইন থেকে পা বাঁচিয়ে হেঁটে যেতে যেতে। আরও লাভের উপায় আছে মদনের। কাঁচা টাকা আর সোনার বোতাম, ফাউন্টেন পেন আর হাতঘড়ি, আংটি আর মনি-ব্যাগ—এ সব লাভ হামেশা হয় না, হয় মাঝে মাঝে, যখন বাড়ী থেকে বাবু সেজে বেরিয়ে, রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে কেউ কাটা পড়ে দুর্ঘটনায়। নিজের বাড়ীর কাছাকাছি হলে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মদন। এতে মোটা লাভ, তার এক মাস কি দু'মাসের মাইনের চেয়েও অনেক বেশী। কিন্তু সে দুর্ঘটনা ত সব সময়ে হয় না, যখন হয়, কপাল খোলে মদনের। যখন হয় না, তাতেও দুঃখ কি আপসোস করে না মদন।

গয়া প্যাসেঞ্জার এ ছাগল খতম করল, তা ভালই হ'ল, খাওয়াও চলবে, চামড়াও বিকোবে—ঘরে ফিরে এসে পার্ব্বতীকে বললে মদন।

উঠানে কুয়োর ধারে স্নান করছিল পার্ব্বতী। ভিজে কাপড়ের আড়ালে উঁকি দিচ্ছিল সুডৌল বুক, আর জল-ঝরা শরীরের চোখ-ভোলানো লাবণ্য। মাথার ঘোমটা আর গায়ের কাপড় একটু টেনে সে হাসল তার রূপোবাঁধানো দাঁত মেলে, কানপাশা দুলিয়ে।

মাথায় পাগড়ি বেঁধে, একটা বিড়ি ধরিয়ে মাংস কাটতে বসল মদন। স্থূল শরীর তার, ভুঁড়িটা কক-বিকক পোড়াচ্ছে, সে ভুঁড়ে এক-

জোড়া ছুঁচালো গোঁফ। গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিলে ঈষৎ হাসির রেখা, খুশী হয়েছে মদন।

রক্তমাখা হাত নেড়ে, ছাগীর ছাল ছাড়িয়ে, মদন মনে মনে বললে, অনেক মাংস হবে আজ। তার পর পার্ব্বতীকে ডাকলে মদন।

পার্ব্বতী কাছে এল। একমুহূর্ত তাকাল মাংসের দিকে, বললে, এততগুলো মাংস পাক করবে কে?

—কেন তুমি করবা?

—হামি পারব না। সাচ্চা কথা তুমাকে বুললাম, হাঁ।

—না পারবে ত বেচে দেব। খাওয়াও হবে, দুটো পয়সাও হবে। মদন হাসল পার্ব্বতীর দিকে তাকিয়ে। এদিকে বেলা বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। রোদ উঠল ঘরের চালে, গাছের পাতায়।

বেলার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল মদন। পার্ব্বতীর পানে চেয়ে বললে, অ পার্ব্বতী, ফেলেগ দেখাও না, নৈহাটি লোকাল আসছে—এখুনি আসবে।

একগাল হেসে, সবুজ পতাকা হাতে, বারান্দায় এসে দাঁড়ায় পার্ব্বতী। সিগন্যাল ডাউন, গুমটি গেট বন্ধ, লাইন ক্লিয়ার। মাটি কাঁপিয়ে, ঝড় তুলে, ধুলো-ধোঁয়া উড়িয়ে হেলে-দুলে চলে গেল নৈহাটি লোক্যাল। আর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পার্ব্বতী, এত বড় গাড়ী, সরু সরু দুটো লাইনে কি ভাবে দৈত্যের মত ছোটে। এত লোক কোথায় যায় রোজ? সে নিজে গুমটি-ওয়ালার স্ত্রী হয়েও কতকাল ট্রেনে চড়ে নি। ভিতরে এসে একটা লাঠি হাতে মদনের পাশে বসল পার্ব্বতী। মাঝে মাঝে লাঠি ঘুরাল মাথার উপর—কাক চিল তাড়াবে সে।

মদনের পাশে বসে আব্দার করলে পার্ব্বতী, অনেকদিন সে ট্রেনে চড়ে নি, শ্যামনগরে মেলাতে যাবে ট্রেনে চড়ে। হাসল মদন, বললে, মাষ্টারবাবু ছুটি দিচ্ছেন না, তার কি করব। ছুটি দিলে ত তোমাকে মেলাতে নিয়ে যেতেই পারি।

মুখ কালো করে বললে পার্ব্বতী, ছুটি আর তুমাকে দিবে নি, মাষ্টারবাবু, হাঁ।

একটু থেমে মাংসগুলোর দিকে আর একবার তাকিয়ে পার্ব্বতী বললে, এততগুলান মাংস, শিবু-বোনাইকে কিছু দিলে হ'ত।

বুকের ভিতর কে যেন হিংস্র আঁচড় বসালে মদনের। গম্ভীর মুখে হাতের কাজ করে চলল সে, একভাবে, একমনে, কোন জবাব দিলে না পার্ব্বতীর কথার। শিবু-বোনাই ওরফে শিবুকে বিশ্বাস করে না মদন, এমনকি, শিবু সম্বন্ধে ধারণাও খুব ভাল নয় মদনের। শিবুকে সে পছন্দ করে না মোটেই। তবুও পার্ব্বতীকে একথা কখনও বলে নি মদন, প্রকাশও করে নি কোন দিন, নিজের মনোভাব।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এসে মদন দেখলে, উঠোনে খাটিয়া পেতে বসে শিবু, আর ঘরের চৌকাঠের উপর বসে আছে পার্ব্বতী। পাশে হ্যারিকেনটা নিভে আসছে। দুজনে হাসছে, গল্প করছে, আর বিড়ি ফুঁকছে। মদন গিয়েছিল কুলি-প্যাভের বস্তিতে, কুলি-সর্দ্দারের ঘরে। ফিরে এসে শিবুকে দেখে খুশী হ'ল না মদন। শিবু হাসল দাঁত বের করে, কুথায় গিছলে মদনদা?

—কুলি-প্যাভে, বলেই ঘরে ঢুকল মদন। একটু পরে ফিরে এল জামা খুলে, একটা বিড়ি ধরিয়ে। শিবুর দিকে তাকাল মদন—দু'চোখে অবজ্ঞা। শিবুকে মদন চেনে, প্রায়ই তাকে দেখে টিটাগড়ে ঐ বস্তির পাশে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে কোন রাত-জাগা মেয়ের হাত ধরে কথা বলছে সে। মাথায় বড় বড় চুল, পেশীবহুল বলিষ্ঠ শরীর, চাকরি করে কাঁকিনাড়া পাটকলে, ছুটির পর প্রায়ই এসে বসে মদনের উঠানে। পার্ব্বতীর সঙ্গে কথা বলে, দু'চারটে কথা বলে মদনের সঙ্গে, তার পর ফিরে যায়। মদনও যে কেন না তা কে বলবে? কিন্তু মনে যা ভাবে মদন, মুখ ফুটে তা বলতে পারে না। কারণ, একদেশের লোক শিবু, তার উপর দূরসম্পর্কের আত্মীয়, তা ছাড়া অন্য কারণও আছে। মদন যে এর আগে আর একবার বিয়ে করেছিল, তা শিবু ছাড়া, এখানে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে, আর কেউ জানে না। ঝগড়া-বিবাদ করলে শেষে পার্ব্বতীর কানেই কথাটা তুলে দেবে শিবু, এই আশঙ্কা মদনের। আর পার্ব্বতী যদি শোনে একথা—তা হলে?

তা হলে কি হবে তাই ভেবেই শিবুকে কিছু বলে না মদন। সবকিছু সয়ে যায় মুখ বুজে। সাইত্রিশ বছরের মদনের আশঙ্কা হয় কি জানি কখন, কুড়ি বছরের পার্ব্বতী বেঁকে বসে, ঘরে ফিরে যায়। যদি বলে, তোমার ঘর আর করব না—যদি সে সুখী না হয় মদনের সংসারে। কাঁচের মত ঠুনকো মন পার্ব্বতীর, সে মন যদি ভেঙে যায়!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছিল মদনের—দোজবরে সব পুরুষেরই যেমন হয়। পার্ব্বতীই একদিন বলেছিল, শিবু দাস ঠিক আমার বোনাইয়ের মত দেখতে। আমার সে বোনাই বেঁচে নেই আজ পাঁচ বছর, কলেরা হয়ে মরেছিল। সেই থেকে শিবুর উপর পার্ব্বতীর দুর্ব্বলতা যেন ধরা পড়েছে মদনের চোখে। এতে খুশী হয় নি মদন বরং চিন্তিত হয়েছে। শিবুকে পার্ব্বতী ডাকে শিবু-বোনাই। এ ডাক মদনের মনে হিংসা জাগায়, জাগায় আশঙ্কা আর সন্দেহ।

শিবু নেমে যাওয়ার পরই, একটা দুর্ঘটনা ঘটল, ঠিক মদনের গুমটির পাশে, গেটের লাগোয়া লাইনে। গাড়ী থামতে থামতেও এগিয়ে গেল অনেক দূর, প্রায় প্লাটফর্মের কাছাকাছি। রেলের গার্ড, ড্রাইভার, পুলিশ আর জনতার ভিড় যেখানে হয়েছে তারও বেশ খানিকটা আগে। বছর ত্রিশের ট্রেনে-কাটা-যাওয়া লোকটির পাশে গিয়ে বসল মদন—আঙুল থেকে ছিনিয়ে নিলে আংটি, কব্জি থেকে ঘড়ি আর পকেট থেকে মনিব্যাগ, কলম।

লোকজন এল, পুলিস এল। জেরা চলল, কার পরিচিত, কোথায় থাকত তার খোঁজখবর নেওয়া হ'ল। আর মদন একপাশ

জমে-থাকা বক্তের পাশে দাঁড়িয়ে জিব দিয়ে দুঃখসূচক শব্দ করতে লাগল, চুক্‌চুক্‌। আর কাঁচড়াপাড়া লোক্যাল ট্রেনটাকে সে গাল দিলে, শালার কাঁচড়াপাড়া লোকালরা, উজবুক, বুরবক শালা—

ঘড়ি সে বিক্রি করে দিলে বিস্কুটওয়ালা লোকমন সেখকে, পেন দিলে পলতা জলকলের মজিদ মিঞাকে আর আংটিটা সে কাউকে দিলে না। ব্যাঙ্কের টাকা আর দু'আনী সোনার আংটিতে লিক্‌লিকে সরু হার গড়ালে মদন। শ্যামনগরে রথের মেলা এল। পার্ব্বতী বললে, মেলায় নিয়ে যাবা না?

পার্ব্বতীর হাত ধরে মদন বললে, মাষ্টারবাবু ছুটি দিল নি, কি করে মেলাতে যাব। আর উ মেলাতে কি আছে? তার চেয়ে ভাল জিনিস তুমাকে আমি দিব, লিচ্চয় দিব। পার্ব্বতী কিন্তু এতেও খুশী হ'ল না, গজরাতে লাগল। তখন পার্ব্বতীর গলায় হার পরিয়ে দিলে মদন, আদর করলে। এবার পার্ব্বতী তুষ্ট হ'ল।

আর এক দিন। সন্ধ্যায় ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতে ডাক পড়ল মদনের। মদন গিয়ে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। ষ্টেশনমাষ্টার বললেন, আমার নাতির মুখেভাত, একটা পাঁঠা বা খাসি জোগাড় কর। বাজার থেকে কিনবি না, গ্রাম থেকে আনবি। দু'টাকা সস্তা হবে।

—আজ্ঞে তা গুমটি গেটের কি হবে? কেলেগ ধরবে কে? মাথা চুলকাল মদন।

—কেন তোর বউ দেখবে, পারবে না?

—আজ্ঞে পারবে।

পরদিন সকালে মদন বের হ'ল। ষ্টেশনমাষ্টারের নাতির মুখে-ভাত। মাংসের ব্যবস্থা করতে চলল মদন।

আষাঢ় মাস। আকাশে ঘনঘটা মেঘ। বৃষ্টি পড়ছিল ক্রমাগত, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস। সারাদিন এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে ত্রিশ টাকায় দুটো খাসি কিনে ফিরল মদন। ফিরল তিন মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে। রেল লাইন ধরে ধরে খাসি দুটোকে নিয়ে হেঁটে আসছিল সে।

তখন বৃষ্টি আরও জোরে চেপে এল। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না মদন, রেললাইনের নুড়িতে হোঁচট খেয়ে রক্ত ঝরছিল পা থেকে। তবুও হেঁটে আসছিল সে।

প্রায় এসে পড়েছে মদন। এই ত সেই কালভার্ট, যার পাশে উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল। আর ঐ ত সম্মুখে ব্যারাকপুর ষ্টেশন, আলো জ্বলছে ষ্টেশনের। কিন্তু এ কি? কালভার্টটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মদন। প্রবল বর্ষায় মাটি ধুয়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে শক্ত মাটিতে জমাট করা কালভার্টের বাঁধ, আর যেন ধ্বসেও গেছে খানিকটা। বেরিয়ে পড়েছে পলেস্তারা, ভাঙা জীর্ণ ইটের সারি। মাষ্টারবাবুকে জানাতে হবে, বলতে হবে কালভার্টের অবস্থা, ভাবলে মদন আরও খানিকটা এগিয়ে।

সারা শরীর ভিজে গেছে মদনের, মাথাটাও ভিজেছে। টুপটাপ জল ঝরছে গায়ের জামা থেকে, মাথা থেকেও। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এল মদন।

ষ্টেশনমাষ্টার খুশী হলেন খাসি দুটো দেখে। দুটোই একরকম, জোড়া মেলানো যেন। খয়েরি রঙের খাসি, কপালে সাদা ডোরা-কাটা, হৃষ্টপুষ্ট তেলচকচকে চেহারা দুটোরই। খুশী হয়ে হেসে ষ্টেশন মাষ্টার বললেন, পরশু এসে দুপুরে এখানে খাবি।

—আজ্ঞে, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মদন।

ফিরে আসার সময়ে খাসি দুটো মদনের দিকে চাইল, শীতার্ত সিক্ত শরীরে দু'জোড়া অসহায় আর ভীরু চোখের চাউনি বড়ই করুণ যেন। ওদের দিকে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে আবার পথ ধরলে মদন। সারা পথ কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে আসছিল সে। ভাবছিল, ঘরে ফিরে পার্ব্বতীকে বলবে, একটু গরম গরম 'চা-প্যানি' খাওয়াতে—শরীরটা যেন ভিজে আয়সক হয়ে গেছে মদনের। দু' পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল মদন। এই যা, ভুলে গেছে সে, একদম ভুলে গেছে মাষ্টারবাবুকে—কালভার্ট ধ্বসে পড়ছে। যাক্‌, কাল সকালে যখন আসবে তখনই বলবে সে। এখন এই রাত্রে, বৃষ্টিতে ভিজে আর যেতে ইচ্ছে করল না মদনের। তা ছাড়া তার ঘরের কাছেই এসে পড়েছে মদন। ঐ ত তার গুমটি, গুমটি গেটের লাল আলো জ্বলছে সংকেত-প্রহরীর মত। আরও হেঁটে এল মদন, পা চালিয়ে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে দেখলে বাইরে থেকে গুমটি বন্ধ, কিন্তু বন্ধ জানালার ফাঁকে ফাঁকে একটু আলোর ছটা, আর ঘরের ভেতর লণ্ঠনের মৃদু আলো। বৃষ্টি থামে নি। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে তখনও। আর গুমটির পাশে সমকোণ-আকৃতি নিমগাছ থেকে জল ঝরছে, শোকাশ্রুর মত। ভেতরে বারান্দায় উঠতে ঘর থেকে কলকল হাসির শব্দ পেলে মদন, পেলে হাতভরা চুড়ির রিণি-রিণি আওয়াজ। আর এক পাট খোলা জানালায় দেখলে···

দেখেই থমকে দাঁড়াল মদন। সমস্ত শরীরটা এল স্থির হয়ে। এই মুহূর্ত্তে নিজেকে নিদারুণ স্নায়বিক আঘাত-পাওয়া কোন মানুষের মত মনে হ'ল মদনের। আর মনে হ'ল দুটো কান, কপাল, আর মাথা যেন পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।

কোন কথা বললে না মদন। তেমনি পা টিপে টিপে বেরিয়ে গুমটি ঘরের বাইরের বারান্দায় এসে বসল সে। তার পরের মুহূর্ত্ত-গুলো কাটল নিদারুণ উত্তেজনায়, ঝড়ের মত। মনে হ'ল যেন তার চোখের উপর দিয়ে ঝড় তুলে, হুঙ্কার করে ছুটে যাচ্ছে শত শত গাড়ী প্যাসেঞ্জার, নৈহাটি আর কাঁচড়াপাড়া লোক্যাল ট্রেন। দুটো হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে বসে রইল মদন। তার পর এক সময়ে শুনলে, ভিতরে কপাটখোলার শব্দ হ'ল, আর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল শিবু দাস। বাইরের জানালাও খুলল, সেখানে পার্ব্বতীর মুখ মিলিয়ে গেল।

বুকে চলেছে তোলপাড়, লুকিয়ে রইল মদন অন্ধকারে, ঝোপের পাশে। শিবু দাসের মুখোমুখি হ'ল না সে। আর তখন বৃষ্টিভেজা সেই রাত্রে, থেকে থেকে ঝড় বইতে সুরু করল, ঝড়ে দুলে উঠল,

কেঁপে উঠল, রেল লাইনের দু'পাশের ঝাড়ঝাড়ালি, শাখাপ্রশাখা—নীল লতা আর হাতিশুঁড়ার বন। তারাও যেন মাথা কুটল সে ঝড়ো হাওয়ায়।

সে রাত্রে পার্ব্বতীকে বলি বলি করেও কিছু বললে না মদন। রাত্রে পার্ব্বতীর হাতের রান্না খেতে পর্য্যন্ত ঘৃণা বোধ হ'ল মদনের। সে কিছু খেলে না, বললে, শরীর খারাপ। এমনকি পার্ব্বতীর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও যেন ইচ্ছা করছিল না মদনের। ঘিনঘিন করছিল সারা গা, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মনে হচ্ছিল, পার্ব্বতীর ঐ শরীর ত শিবুর জেহলত্র হয়েছে। ঐ বাহু, সেখানেও ত শিবুর উত্তপ্ত রক্তের স্পর্শ। আরও মনে হ'ল মদনের, দেবে নাকি পার্ব্বতীর গলাটা টিপে, কিংবা ঘরে-তুলে-রাখা গাঁইতির আঘাতে দেবে নাকি মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ করে? অন্ধকার দুর্য্যোগভরা বর্ষার এই রাত্রে কেউ জানবে না, শুধু মদন নিষ্কৃতি পাবে পার্ব্বতীর হাত থেকে। এ পার্ব্বতী তাকে সুখী করবে না, শান্তিও দেবে না। শুধু পুড়িয়ে মারবে তিলে তিলে ক্ষয় করে, প্রতারিত করবে প্রতিদিন, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে।

শিবু। পার্ব্বতী। পার্ব্বতী ডাকে শিবু-সোনাই। নির্লজ্জ! দাঁতে দাঁত ঘষে মদন, ফুলতে থাকে হিংস্র কোন বন্য জানোয়ারের মত।

হয় ত পার্ব্বতীকে খুন করত মদন বর্ষণমুখর ঐ নিশীথ রাত্রে। কিন্তু তখনই মনে পড়ল মদনের। মনে পড়ল, বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ের কোমল মুখ। যে তার প্রথম জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ আর কামনা-বাসনা বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে, তপস্যা করছে বন্ধ্যা নারীর মত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর সন্তান-সন্ততিতে ভরা সংসার—কবে সে পাবে? কিন্তু সে নিজেও ত প্রতারণা করেছে, ছলনা করেছে। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ের কথা বলে নি পার্ব্বতীকে, গোপন রেখেছে।

বিছানায় শুয়ে পড়ল মদন। কিন্তু ঘুম এল না সে রাত্রে। পার্ব্বতীও শুতে এল মদনের পাশে, অন্যদিনের মত। আজ কিন্তু রোজকার মত পার্ব্বতীকে কাছে টেনে নিলে না মদন, বরং তার কাছ থেকে হাত দুই সরে গিয়ে শুয়ে রইল, বালিশে মুখ গুঁজে। আর স্বামীকে বার বার নীচু চোখে তাকিয়ে দেখলে পার্ব্বতী।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে মদন অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুধু একবার বললে, ঐ শিবু রোজ রোজ আসে কেনে? উয়ার মতলব কি?

—আমি কি জানি? জবাব দিলে পার্ব্বতী, আর কোন কথা বললে না পার্ব্বতী। স্বামীর মনের কথা জানতে পেরেছিল কিনা কে জানে? স্বামী সন্দেহ করছে হয়ত, অনুমান করলে পার্ব্বতী। সেকথা ভাবল মদনও। পার্ব্বতী কি জানতে পেরেছে মদনের মনের কথা? কি ভাবছে সে—এই মুহূর্ত্তে তারই পাশে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে।

পরদিন ভোরবেলা। তখনও ফরসা হয় নি আকাশ। শুধু পাখীদের ঘুম ভেঙেছে গাছের ডালে ডালে। মদন উঠল ঘুম থেকে অন্য দিন যেমন উঠত। এখনি আসবে তিনশ' পঞ্চাশ নম্বর ডাউন ট্রেন, পরা প্যাসেঞ্জার। জমটি-লেট বন্ধ করবে সে, ফ্ল্যাগ ধরবে। তার পর গাড়ী চলে যাবে ঝড়ের মত। পার্ব্বতীকে কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখলে না মদন। কোথায় গেছে পার্ব্বতী? হয় ত বাইরে হাত-মুখ ধুতে, হ্যাঁ, সত্যিই তাই গেছে পার্ব্বতী, রোজ যেমন যায়। কুয়োর পাড়ে রেখে গেছে তার জলপেড়ে সাদা শাড়ী।

বাইরে এসে দাঁড়াল মদন। সিগন্যাল পড়েছে, পরা প্যাসেঞ্জার আসছে। ঐ ত বাঁকের মুখে ইঞ্জিন। কিন্তু ও কি? হঠাৎ থেমে পড়ল যেন। হ্যাঁ, থেমেই পড়েছে গাড়ীটা, কালভার্টটার কাছে।

সে কি? ড্রাইভার নামছে, গার্ডসাহেব নামছে; অনেক যাত্রীও নামছে। সবাই ছুটছে কালভার্টের দিকে। ফ্ল্যাগ হাতে ছুটল মদনও। কাছে এসে দেখে—পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী! মাথাটা ঘুরে গেল মদনের। পায়ের নীচে মাটিও যেন সরে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি যেন অন্ধকার হয়ে এল, মনে হ'ল পার্ব্বতী এখানে কেন? তবে কি···

তবে কি আত্মহত্যা? গাড়ীর নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পার্ব্বতী? কিন্তু কেন? গত রাত্রের সব ঘটনা চোখের সামনে ভাসতে লাগল মদনের। এ কি তারই পরিণাম? অনুতাপ থেকে আত্মহত্যা?

একরাশ রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পার্ব্বতী। থেঁতলে বিকৃত হয়ে গেছে সর্ব্বাঙ্গ, কেটে দু'ভাগ হয়ে গেছে শরীরের নিম্নাংশ। আর রেল লাইনের পাশে পাথর, স্লিপার আর ঘাসে ছড়িয়ে থাকা রক্ত জমে আসছে ধীরে ধীরে, যেন নরবলি হয়ে গেছে একটু আগে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গার্ড সাহেব বললেন, এ আত্ম-হত্যা।

ড্রাইভার বললে, না, তা নয়, সিগন্যাল ডাউন, গাড়ী নিয়ে আসছিলাম, দেখলাম কালভার্টের কাছে লাইনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত তুলছে। যেন থামাতে চায় গাড়ী। কিন্তু ব্রেক কষতে কষতে ঠিক সময়মত গাড়ী থামানো গেল না। নেমে দেখি কালভার্ট ধ্বসে গেছে। ও হয় ত দুর্ঘটনা বাঁচাতে গিয়েছিল।

খবর পেয়ে শিবুও এল। মাথা কুটল, মাথার চুল টেনে টেনে ছিঁড়ে সে বলল, আ ভগবান! এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল ভগবান! দু'চোখে অশ্রুবন্যা, শিবু বলতে লাগল, কাল রাত্রে তুমি ফিরতে দেরি করলে মদন-দা, আমি কি করি, শেষে পার্ব্বতীর সঙ্গে কড়ি খেলে সময় কাটালাম আর ওকে পাহারা দিলাম। বড় ভয় পেয়ে-ছিল পার্ব্বতী।

পাশে বসে মুখ নীচু করে সব শুনতে লাগল মদন। দু'চোখ ঝাপসা, ঝাপসা চোখেই সে একবার শিবুর দিকে তাকাল। কোন কথারই উত্তর দিলে না মদন। কি জবাব দেবে? সব জবাব দিলে শুধু কান্নায়। অজস্র কান্নায় সে তার প্রেম ভালবাসা, শ্রদ্ধা নিবেদন করলে পার্ব্বতীকে।

দুই নম্বর গুমটির পাশে চার জোড়া রেল লাইন, সোজা সমান্তরাল, কখনও বা বিসর্পিত। আর সে রেল লাইনের পাশে পাশে পাথর-স্লিপার আর সিগন্যাল পোষ্ট ছড়িয়ে আছে, এগিয়ে গেছে অনেক দূর, যত দূর এগিয়ে গেছে এ রেল লাইন। এই রেল লাইনের ধারে দুই নম্বর গুমটিতে এখনও বাস করে মদন। এখনও লাইনে দুর্ঘটনা ঘটে, ছাগল-পাঁঠা-গরু কাটা পড়ে, মানুষও কাটা পড়ে। কিন্তু কিছুই ছোঁয় না মদন।

চোখের সম্মুখে ট্রেনে কাটা-পড়া কাউকে দেখলে, মনে পড়ে মদনের, তারুণ্যের কোমলতা আর অনাস্বাদিত জীবনের বহু নীরব কামনাভরা একখানা মুখ, সে মুখ পার্ব্বতীর। গুমটিওয়ালার স্ত্রী পার্ব্বতী, ট্রেন দুর্ঘটনা বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে। ভেঙে যাওয়া, বেদনার্ত্ত মনেও ক্ষণিকের তরে গর্ব্ব অনুভব করে মদন—গুমটি-গেটের পাশে, সবুজ বাতি হাতে দাঁড়িয়ে কখনও কখনও তার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

নব দেবালয়

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে আধ্যাত্মিকতা যে রূপ লাভ করেছে, এমন পৃথিবীর অন্যত্র কচিৎ দেখা যায়। সেই জন্য ভারতীয় ভাস্কর্য্যকে অপ্রাকৃত বলা হয়েছে। অধুনাতম সময়েও ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের ধারা প্রবাহিত রয়েছে, দেখতে পাওয়া যায়। ইদানীং যে সব নূতন নূতন প্রাসাদ ও অট্টালিকা মাথা তুলেছে, তার অধিকাংশই ঐশ্বর্য্য ও ব্যবহার-সৌকর্য্যের দিক থেকে গড়া। তবে অনেক স্থলে মিশ্রশিল্পও চোখে পড়ে। বহু ব্যয়ে এবং অল্প ব্যয়ে অনেক হর্ম্ম্য, দেবালয় এবং আশ্রমও নির্ম্মিত হয়েছে, যার ভিতর আধ্যাত্মিক রূপ ফুটে বেরিয়েছে। এই প্রবন্ধে একটি দেবালয়ের পরিচয় দেব, যা স্বল্প ব্যয়ে অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে গঠিত, কিন্তু ভাল করে দেখলে যার ভিতর ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ আধুনিক রূপের প্রকাশ দেখা যায়।

এই দেবালয়টি কলিকাতায় ৭৮বি, আপার সার্কুলার রোডে শহরের ভিতর অবস্থিত। ১৮৮৩-৮৪ সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় দেবালয়টি নির্ম্মাণ করান। এটি 'নব দেবালয়' নামে পরিচিত। ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয় একটি বক্তৃতায় কেশবচন্দ্রকে স্রষ্টা ও শিল্পী বলেন। কথাটি অতি সত্য। কেশবচন্দ্রের বহুমুখীন প্রতিভা—যেমন সমাজ-গঠনে, নব ধর্ম্মরচনায়, 'নবসংহিতা' প্রণয়নে, 'নববৃন্দাবন' নাটকে, তেমনি আবার কমলকুটীর, কমলসরোবর, যোগ-কুটীর, নব দেবালয়, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতির গঠনে প্রকাশ পায়। তিনি যে ভারতীয় ভাস্কর্য্য সাধনারও সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, নব দেবালয়টি তার একটি সাক্ষ্য।

১৮৬৮-৬৯ খ্রীঃ তাঁর অনুপ্রেরণায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটির চূড়ার উপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং অনেক অর্থব্যয়ে তা সম্পন্ন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তখনকার নূতন আদর্শটিকে স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। সে সময়ে ছিল 'শ্লোকসংগ্রহের' যুগ, অর্থাৎ ভারতবর্ষে সম্মানিত সকল ধর্ম্ম ও সকল শাস্ত্রের একত্র সমাবেশ সাধনের প্রয়াস। রাজা রামমোহন রায় পূর্ব্বেই যুক্তি বিচারের সাহায্যে, বিভিন্ন ধর্ম্মের শাস্ত্রের ভিতর যে সাধারণ সত্য নিহিত আছে, তা প্রকাশ করে যান এবং জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষ একত্রে সেই সাধারণ সত্যের ভূমিতে মিলবে, সেই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মাণ করেন ১৮৩০ খ্রীঃ। তার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে, তারই নূতনতম বিকাশ দেখা গেল ব্রহ্মানন্দের 'শ্লোকসংগ্রহ'* প্রকাশে। 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে'র গঠনে হিন্দুর মন্দির, খ্রীষ্টানের গির্জ্জা, মুসলমানের মসজিদের আকৃতির সম্মিলনে সেই আদর্শ প্রকাশিত হ'ল। সকলের একত্র সমাবেশই হ'ল তখনকার অধ্যাত্ম আদর্শ। এই আদর্শ সনাতন কাল থেকেই ভারতের জীবনে দেখা গিয়েছে। নূতন যুগে তাই আবার নূতনতম ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

এই সমন্বয়ের চিন্তা ও আদর্শ ক্রমশঃ বিস্তৃতি এবং গভীরতা লাভ করে নববিধানের নূতন আদর্শ দেখা দিল। ইতিহাস নূতনরূপে গৃহীত হ'ল—যুগে যুগে যত ধর্ম্মবিধান সমাগত হয়েছে, সকলের ভিতর অঙ্গাঙ্গী যোগ নববিধানে প্রকাশিত হ'ল। নববিধানের মূলকথা হ'ল সকলকে গ্রহণ এবং যে পথে মানুষকে সেই সমন্বয়ে অগ্রসর করে দেয়, তার সাধন। বুদ্ধদেব যেমন একদিন 'মধ্য পথের' কথা বলেছিলেন, কোন দিকেই চূড়ান্ত ভাবে ঝুঁকে পড়বে না, মাঝখানে চলে আসবে, তা হলেই 'আমিত্বের' এমন অবস্থা হবে যে, সত্য বা প্রজ্ঞা তার কাছে সহজে প্রকাশিত হবে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নব-

---

* এইটি ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিধানে ঘোষণা করলেন যে, বর্ত্তমান যুগে যে বহুর প্রকাশ, বহুর সামীপ্য ঘটেছে, তার সকলকেই নিতে হবে। কি করে? প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির 'সামঞ্জস্য' করে। যদি কোনটির সঙ্গে কোনটির সামঞ্জস্য না হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তার ভিতর গলদ আছে। আবার নূতন করে নূতন চোখে দেখবে, সামঞ্জস্য প্রকাশিত হলে তখন বুঝবে যে, সত্য লাভ করেছ। সামঞ্জস্যেই সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ, সামঞ্জস্যেই অহিংসা ও অনন্ত-মিলনের উপায়। এই সামঞ্জস্য অন্তরের বস্তু, বাহিরের নয়। 'নব দেবালয়ে'র অনাড়ম্বর আকৃতিতে সকল ধর্ম্মের বাহিরের পূজাগৃহাকৃতি বা শাস্ত্র-বাক্য-সংগ্রহ স্থান পায় নি। আরও ভিতরে যেখানে 'চারি বেদের মিল হয়েছে'* তার পরিচয় দেয় 'নব দেবালয়'। দেশে দেশে, কালে কালে প্রকাশিত পথগুলির সামঞ্জস্যের যে আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তঃপুর দেখা যায়, তারই ছবি এখানে চিত্রিত হয়েছে।

পুরাতন পত্রিকায় নব দেবালয়ের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত হ'ল। ব্রহ্মানন্দের সহ-সাধক গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ১লা আশ্বিন, ১৮০৬ শক (১৮৮৪ খ্রীঃ) 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় লেখেন :

"গত বৎসর শ্রীআচার্য্যদেব কেশবচন্দ্র যখন রুগ্ন ও ভগ্ন দেহে হিমালয়-শিখরে বাস করিয়া 'যোগ-বিজ্ঞান' ও 'নব-সংহিতা' এই দুই অমূল্য তত্ত্বশাস্ত্র জগতে বিতরণ করিয়াছিলেন, তখনই স্বীয় কলিকাতাস্থ ভবনে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত প্রত্যাদিষ্ট হন।" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সমস্ত জীবন প্রত্যাদেশের ঝড়ে গড়া, তাই স্বল্প ৪৫ বৎসরের জীবনের ভিতর তিনি আমাদের এমন সকল জিনিষ দিয়ে যেতে পেরেছিলেন, যা কল্পনার অতীত। 'নব দেবালয়'টিও দেখা যাচ্ছে, প্রত্যাদেশের ঝড়।

গিরিশচন্দ্র আরও লিখেছেন—"মার আজ্ঞা হইয়াছে, তাঁর ঘর হইবেই। তিনি আপন বাড়ীর কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া ইট কুড়াইয়া জননীর আলয় নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দেবালয়-নির্ম্মাণের জন্ত ব্যাকুল হইয়া কলিকাতার বন্ধুদিগের নিকটে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন ও দেবালয়ের একটি আদর্শ স্বয়ং অঙ্কিত করিলেন।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, 'নব দেবালয়ে'র আদর্শ কেশবচন্দ্র স্বয়ং অঙ্কিত করেন—হিমালয় শিখরে বসে। সে সময়ে তাঁর অসুস্থতায় ঔষধরূপে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে ছুতারের কাজ, ছবি আঁকা প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকতে হ'ত। নব দেবালয়ের আদর্শ অঙ্কন তার ভিতর করেছিলেন।

* 'ব্রহ্মগীতোপনিষদ' উপদেশ।

২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৩ খ্রীঃ তাঁকে সিমলা থেকে কলিকাতায় আনা হয়। তাই গিরিশচন্দ্র লেখেন :

"এখানে পদার্পণ করিয়াই তিনি দেবালয়-নির্ম্মাণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ও প্রচারক ভাই রামচন্দ্র সিংহের প্রতি তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। দেবালয়ের চূড়া ইত্যাদির আদর্শ অঙ্কিত করিয়া পাঠাইবার জন্ত জলপাইগুড়ির একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায়কে* অনুরোধ করিয়া পাঠান।"

এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে, চূড়াটির প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। স্ব-অঙ্কিত আদর্শকে ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে ঠিক করিয়ে নেবার ব্যবস্থাও তিনি করছেন। তিনি কেবল ভাবুক নন, কত তাঁর গভীর জ্ঞান, কত দিকে তাঁর চিন্তা, তারও সাক্ষ্য এতে পাওয়া যায়। নব দেবালয়ের ভিত্তি-নির্ম্মাণ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

"ভিত্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে পর, আচার্য্যদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, প্রত্যেক প্রেরিত (তাঁর সহ-সাধক) কোদালীযোগে ভিত্তির কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন করিবেন; তদনুসারে সকলেই কোদালী হস্তে করিয়া কিছু কিছু ভূমি খনন করেন।...প্রার্থনান্তে স্বয়ং ভিত্তি স্থাপন করেন ও দুই একখানা করিয়া ইট গাঁথিতে প্রেরিতদিগকে বলেন। একে একে সকল প্রেরিতই গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকের গাঁথনি জমাট হয় না। তাহা দেখিয়া তিনি বলেন যে, তোমরা দুইখানা ইট জুড়িতে পারিতেছ না, তোমাদের দ্বারা মিলন অসম্ভব। যাহা হউক, কিঞ্চিৎ অধিক এক মাসের মধ্যে প্রাচীর ও ছাদ হইয়া দেবালয় একপ্রকার প্রস্তুত হইয়া উঠে।"

১লা জানুয়ারী ১৮৮৪ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র যথারীতি 'নব দেবালয়' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৮ই জানুয়ারী ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া পরম জননীর ক্রোড়ে স্থানলাভ করেন। এই দেবালয়টি তাঁর শেষ দান ও তাঁর আধ্যাত্মিক শিল্পপ্রতিভার জলন্ত সাক্ষ্য-স্বরূপ আজও বর্ত্তমান। প্রতিষ্ঠার দিনে তিনি যে প্রার্থনা করেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হ'ল :

"এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুজালাম, এ স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব। আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়া দি। প্রিয় ভাইগণ, তোমাদিগকেও

* ইনি ব্রহ্মানন্দের কনিষ্ঠ ভগিনীপতির ভ্রাতা।

বলি, তোমরাও মার ঘরখানি সাজাইয়া দিও। কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও; মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মার পূজা করিও না। মা তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন, তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া, দেবদেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান, এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ, পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে।...মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য্য। মা আমার ইহলোক পরলোক। মা আমার সম্পদ, সুস্থতা, বিষম রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ সুখ।"

২

এবার 'নব দেবালয়ে'র শিল্প-নৈপুণ্যের আলোচনা করা যাক। রয়াল একাডেমী অব আর্টের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিল্পী বন্ধুবর শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বসে বহুক্ষণ ধরে 'নব দেবালয়' দেখবার সুযোগ ঘটেছে। ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে, ভারতীয় শিল্পরীতিকে, নববিধানকে কি চমৎকার মূর্ত্তি দান করা হয়েছে এই 'নব দেবালয়ে'; বাহিরকে ছেড়ে, ভিতরে প্রবেশ করে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, অতীত ও বর্ত্তমান, সকল ধর্ম্মের সাধনার মর্ম্মকথার অপূর্ব্ব সমন্বয় করা হয়েছে। অতি সহজ অনাড়ম্বর, কিন্তু বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পের নিখুঁত আদর্শ এই নব দেবালয়ের গঠনে প্রকাশ করেছেন। সমন্বয়াচার্য্য কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ও ইঙ্গিতে ঐ সময়েই মহামহা সমন্বয়ভাষ্য রচিত হয়েছিল,—বেদান্ত সমন্বয় ভাষ্য, শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা সমন্বয় ভাষ্য, নানক প্রকাশ, কোর্‌আন্‌শরীফ ও হদিস্, Oriental Christ ও ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকায় অতুলনীয় সমন্বয় সাহিত্য প্রকাশ পেয়েছে। আবার 'নব দেবালয়ে' নববিধানের আধ্যাত্মিক আদর্শকেও প্রকাশ করেছেন।

প্রথমেই চোখে পড়ে নব দেবালয়ের পাদদেশে দুটি গুম্ফাকৃতি কোটর। ঐ দুটি যেন বলছে যে, ধ্যানে চিত্তের একাগ্রতা সাধন না করে উপরে উঠা যায় না। তার পরে, চার ধাপ সিঁড়ি ও তার দু'ধারে দুটি ছ'কোণা থাম। ছ'কোণা থাম দুটি মনে করিয়ে দিল বৈচিত্র্যের কথা।

"রূপভেদপ্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতিরূপং ষড়ঙ্গকম্।"

বিশ্ব বৈচিত্র্যে গঠিত—সেই বৈচিত্র্যে সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হতে হবে।

উপরে উঠবার চারটি সিঁড়ি, যেন সাধনমার্গের চারটি ধাপ—যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান। 'ব্রহ্মগীতোপনিষদে' ব্রহ্মানন্দ কয়েক বৎসর ধরে সাধু অঘোরনাথ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতিকে এই তত্ত্বই শিক্ষা দিয়েছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রশস্ত রোয়াক। ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন, এটি ভক্তদের জন্যে, তাঁরা মার নাম কীর্ত্তন করে নৃত্য করবেন অনুরাগ ও মত্ততায়।

ভিতরে প্রবেশের দরজা চারটি, তার মধ্যে আবার একটি ছোট। যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানই আবার পরীক্ষা করে নেবার জন্যে সামনে দণ্ডায়মান। যোগের দরজাটি ছোট, যোগীকে দেহ সঙ্কুচিত করে ঢুকতে হবে। প্রতি দরজার উপরে শিবমন্দিরের আকারের আর্চ—মঙ্গলময়ের কৃপা মাথার উপর যেন সদাই উপস্থিত—তার ভিতরে জ্যোতির প্রতীক-স্বরূপ নানা বর্ণের কাঁচের ভিতর একটি প্রদীপ ও আলোক-শিখার মত রেখা অঙ্কিত। কার্নিশগুলি ভিতর দিকে ঢোকানো, যেন অন্তর্মুখীনতারই পরিচয় দিচ্ছে। দরজার আশেপাশে দেওয়ালের গায়ে গায়ে আটটি থামের আকৃতি বৌদ্ধ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক সত্য ও যোগশাস্ত্রের অষ্টসিদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবার কেশবের প্রিয় চূড়াটির দিকে একবার দেখি। সবার উপরে নববিধান-অঙ্কিত রৌপ্য-পতাকা যেন সত্যের মহিমা ঘোষণা করছে। তার পরেই ক্ষুদ্রাকৃতি শিবমন্দিরের মতন গঠন যেন 'শিবমে'র প্রতীক হয়ে, তার পাদদেশে অঙ্কিত লতাপাতা ফুল 'সুন্দরমে'র প্রতীকরূপে শোভা পাচ্ছে। 'সত্য শিব সুন্দরে'র অপূর্ব্ব সমন্বয়! তারপর ভারতীয় মন্দিরের গঠনরীতি অনুসারে আবার অপেক্ষাকৃত বড় শিবমন্দিরের ও তার পাদদেশে লতাপাতা ফুলের যোজনা করা হয়েছে। এই শিবমন্দিরটির মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি* ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, Religion-এর সঙ্গে Science-এর মিলনের নিদর্শনরূপে শোভা পাচ্ছে। বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হ'ল নববিধানের নূতন কথা—সেটিও এখানে সুন্দররূপেই স্থান পেয়েছে। চূড়াটির ভিতর সত্য শিব সুন্দরের অপূর্ব্ব সমন্বয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের ভিতর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থান করে দিয়ে, অতীত ও বর্ত্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সাধন করেছেন।

এবার দেবালয়ের ভিতরে প্রবেশ করি। ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় ভিতরকে বলেছেন—"মার খাস দরবার।" সত্যই খাস দরবার, যেন গম্ গম্ করছে। একটি উচ্চ বেদী, তার উপর আচার্য্যের বসিবার আসন, গৈরিকবস্ত্র, একতারা,

* তাই গিরিশচন্দ্রের প্রবন্ধেও ঘড়িটির উল্লেখ আছে।

সম্মুখে কমণ্ডলু, নববিধান-অঙ্কিত রৌপ্য-পতাকা ও পুঁথি। বেদীর সম্মুখভাগে ও উভয় পার্শ্বে প্রেরিত মণ্ডলীর নামাঙ্কিত মর্ম্মর প্রস্তর ও বসিবার আসন। পশ্চিম পার্শ্বে মহিলাদিগের উপাসনায় বসিবার স্থান।

সহজ অনাড়ম্বর স্থাপত্যের ভিতরেও যে গূঢ় আধ্যাত্মিকতাকে এভাবে প্রকাশ করা যায়, তা উপলব্ধি করে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করলাম। কোন সত্যই হারিয়ে যায় নি—কোন সত্যই অব্যবহার্য্য হয় নি—সমস্তই যে বর্ত্তমানের উপকরণ হয়ে রয়েছে—এই সত্যই আজ সমস্ত পৃথিবীকে কেবল উপলব্ধিতে নয়—সর্ব্বাঙ্গীণ জীবনে সার্থক করতে হবে—তবেই নূতন জগতের অভ্যুদয় হবে। কেশবের এই বাণীই 'নব দেবালয়ে'র ভিতর দিয়ে ঘোষিত হচ্ছে।

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য এই যে, বহু মনীষী ব্যক্তির সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ ও সুবিধা আমার ঘটিয়াছে। এই সকল মনীষী ব্যক্তিদের মধ্যে ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয় একজন ছিলেন। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম—Small things show a man, অর্থাৎ ছোটখাটো জিনিষের দ্বারাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়; এই কথাটা আমি খুবই মানি। সেইজন্য তাঁহার মত বিরাট মানুষের দুই-একটি ক্ষুদ্র কাজের উদাহরণ ও দুই-একটি সাধারণ কথা বলিয়া তাঁহার ভিতরকার মানুষটির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। বাস্তবিক তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার মত অযোগ্য মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সন ও তারিখ মনে নাই (সম্ভবতঃ ইংরেজী ১৯২৬ সন), তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, তিনি তখন Inspector of Colleges। গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর অভিমুখী মেল জাহাজে তিনি চাঁদপুর যাইতেছিলেন, কুমিল্লা বা ঐ দিকের অন্য কোন কলেজ পরিদর্শনের জন্য। গোয়ালন্দের পরবর্ত্তী ষ্টেশন (ফরিদপুর-টেপাখোলা) হইতে আমি ঐ জাহাজে উঠি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি 'কেবিনে' প্রবেশ করি। উক্ত 'কেবিনে' দুইটি শয্যা ছিল, একটি শয্যাতে ড. মুখার্জ্জী শয়ান ছিলেন—তখন তাঁহাকে চিনিতাম না, আর একটি শয্যা খালি ছিল, এবং আমি সেই শয্যাটি দখল করিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া ড. মুখার্জ্জী উঠিয়া বসিলেন এবং আমার পরিচয় গ্রহণ করিলেন, নিজের পরিচয়ও দিলেন—তাঁহার নাম আমি শুনিয়াছিলাম। তাঁহার পদধূলি লইয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলাম। আমি বিদেশী পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত ছিলাম। প্রণাম করিবার পরে তিনি যেন অন্যরকম মানুষ হইয়া গেলেন—আমি দেখিতে পাইলাম আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি তাঁহার চোখেমুখে ফুটিয়া উঠিল। এমনকি তিনি আমার পারিবারিক সকল পরিচয় গ্রহণ করিলেন। আমি কৃষি বিভাগে কাজ করি শুনিয়া তিনি কৃষি-বিষয়ক উন্নতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন, বলা বাহুল্য, তাঁহার নিকট আমাকে অনেক বিষয়েই হার মানিতে হইল—দেশের যুবকগণকে গ্রামমুখী ও কৃষিমুখী করিবার দিকেই তাঁহার আগ্রহ বেশী দেখিলাম। এই সম্পর্কে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সহিত জাহাজে আমি বেলা দেড়টা হইতে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ছিলাম। অপরাহ্নে তিনি একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ খুলিয়া কিছু আহার্য্য দ্রব্য বাহির করিলেন—এবং উহা দুই ভাগ করিয়া একভাগ আমাকে খাইতে দিলেন—পাঁউরুটি, কলা, সন্দেশ প্রভৃতি ছিল। ঐ ব্যাগের মধ্যে তাঁহার হুকা, কলিকা, তামাক, টিকা প্রভৃতিও ছিল। তাঁহার পরিচারক তামাক সাজিয়া আনিল। ঐ জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ও ছিলেন। চাঁদপুর পৌঁছিয়া ড. মুখার্জ্জীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যখন বিদায় গ্রহণ করিলাম—তিনি বলিলেন, "কলিকাতায় যাইলে আমার সহিত দেখা করিবেন, আপনার নিকট হইতে কৃষি সম্বন্ধে আমার অনেক জানিবার বিষয় আছে।"

ইহার পর তাঁহার সহিত অনেক দিন দেখা না হইলেও মাঝে মাঝে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইত। সেই সকল চিঠিতে কৃষির উন্নতির কথাই থাকিত। ঠিক স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু মনে হয় এই সময় তিনি "Calcutta Review"-এ কৃষি সম্বন্ধে দুই-একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মধুপুরেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অধিকতর সুযোগ হইয়াছিল। মধুপুরে অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের বাড়ীতে আসিতেন এবং আমিও সেখানে যাইতাম। সেখানেই দিনের পর দিন তাঁহার সহিত দেশের নানাবিধ সমস্যা (প্রধানতঃ কৃষি) সম্বন্ধে আলোচনা হইত; পরে মধুপুরে 'বাহার বিবা'য় তাঁহার বাড়ীতে আমার যাতায়াতও আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময় শ্রীমতী বন্ধবালা মুখোপাধ্যায়ের স্বহস্তে

প্রস্তুত নানাবিধ উপাদেয় আহার্য্য ভোজন করিবারও সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ড মুখার্জ্জীও মধুপুরে 'অরুণোদয়ে' (আমার শ্বশুরালয়ে) আমার সহিত দেখা করিবার জন্য কয়েকবার আসিয়াছিলেন। তিনি যখন আসিতেন আমি খুবই লজ্জিত হইয়া পড়িতাম। তিনি বলিতেন, "কেবল Return visit দিতে আসি নাই, গল্প করিতেও আসিয়াছি।" মধুপুরেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহাকে একটি পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলাম এবং এই বিষয়ে তাঁহার আর্থিক সাহায্য চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহা রক্ষা করিবার পর এই বিষয়ে মনোযোগ দিব। আমার পরিকল্পনাটি মোটামুটি এইরূপ ছিল: মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কুড়ি জন যুবককে কোন কৃষিক্ষেত্রে হাতেকলমে দুই বৎসর কৃষি-শিক্ষা দিবার পর তাঁহাদের লইয়া একটি সমবায় সমিতি গঠিত করিতে হইবে। প্রত্যেকের মূলধন হইবে পাঁচ হাজার টাকা; কিন্তু এই মূলধনের টাকা তাঁহারা অগ্রিম দিতে সক্ষম হইবেন না; কোন দানশীল দেশ-প্রেমিক ব্যক্তি এই উদ্দেশে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন। প্রত্যেক যুবককে পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে এক লক্ষ টাকা তাঁহাদের মূলধনের জন্য বণ্টন করা হইবে। বৃহৎ আকারের একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবে এবং উহা সমবায় প্রণালীতে পরিচালিত হইবে। উক্ত মূলধনের অনুপাতে প্রয়োজনমত ঋণ সমবায় বিভাগ হইতে পাওয়া যাইবে। কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবার পর তৃতীয় বৎসর হইতে প্রত্যেক যুবক প্রতি বৎসর এক হাজার টাকা করিয়া দিয়া পাঁচ বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ করিবে। এইরূপে সাত বৎসর পর উহাদিগকে প্রদত্ত এক লক্ষ টাকা ফিরিয়া আসিবে। সেই সময় পুনরায় কুড়ি জন যুবককে ব্যবহারিক কৃষি-শিক্ষা দিবার পর উপরোক্ত প্রণালীতে আর একটি সমবায় কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবে—এইরূপ ভাবে প্রতি সাত বৎসর অন্তর একটি করিয়া কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবে। এই সম্বন্ধে উপযুক্ত নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইবে। ড. মুখার্জ্জী পরিকল্পনাটি মোটামুটি সমর্থন করিয়াছিলেন। মধুপুরে অবস্থানকালে তিনি আমাকে তাঁহার জীবনের অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, সে সব কথা যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি শিক্ষাপ্রদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কোন "ইউরোপীয়ান ফার্ম্মে" একটি উচ্চপদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখনকার দিনে এইরূপ উচ্চপদ বাঙালীকে বা ভারতীয়কে দেওয়া হইত না। সেইজন্য সেই ইউরোপিয়ান ফার্ম্মের কর্ত্তৃবৃন্দ তাঁহাকে একটি ইংরেজী নাম গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবেক ইহাতে সায় দেয় নাই—ইহার ফলে তিনি সেই পদ পান নাই। এইরূপ তাঁহার জীবনের অনেক কথাই আমাকে বলিয়াছিলেন।

বক্তৃতাদানরত ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

কলিকাতায় মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত, এবং চিঠি পত্রের আদান-প্রদান চলিত। পরে তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে স্মরণে

রাখিয়াছিলেন। ১৯৫১ সনের ২৪শে জুলাই আমার গ্রামে (হুগলী জেলার আটপুর গ্রাম) খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহোদয়ের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার প্রথম ভূমি-সেনা (Land army) গঠিত হয়—এবং বনোমহোৎসব অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত

শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির, আঁটপুর

হয়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে বলিলেন যে, ড. মুখার্জ্জী 'ভূমি-সেনা' হইবার জন্য এবং আটপুর যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রফুল্লবাবুর নির্দ্দেশে ২০শে জুলাই ডক্টর এইচ. কে. নন্দী (কৃষি বিভাগের অধিকর্ত্তা), শ্রী এস. সি. রায় (কৃষি বিভাগের উপ-অধিকর্ত্তা) এবং আমি ড. মুখার্জ্জীর ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীতে তাঁহাকে আটপুরে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে যাই, তিনি আটপুর যাইতে সম্মত হন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ নির্দ্দিষ্ট দিনে আটপুর যাইতে সক্ষম হন নাই। সেই দিন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহোদয় আটপুর যান। ড. মুখার্জ্জী তাঁহার মারফত আমাকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। সেইপত্রে তিনি নিকট-ভবিষ্যতে আটপুর যাইবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন।

উক্ত ইংরেজী ১৯৫১ সনের নবেম্বর মাসের প্রথমেই তিনি পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করেন—রাজভবনে যাইবার দু' তিন দিন পূর্ব্বে (২৮শে অক্টোবর) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কর্ম্মচারী শ্রীসুশীলকুমার আচার্য্য ও আমি ড. মুখার্জ্জীর সহিত তাঁহার ডিহি শ্রীরামপুরস্থ ভবনে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় সেখানে শ্রীমহীতোষ রায় চোধুরী এম-এল-সি এবং আরও দু' একজন ছিলেন। ড মুখার্জী অনাবৃত দেহে চেয়ারে বসিয়া ডাবা হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। আমাকে বলিলেন, "এইবার আমার প্রচুর অবকাশ থাকিবে, তোমার সঙ্গে কৃষি-বিষয়ক আলোচনা করা যাইবে।" মধুপুরে ঘনিষ্ঠতা হইবার পর হইতেই তিনি আমাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই সময় একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে। ঐ পাড়ারই একটি যুবক ড. মুখার্জীর নিকট আসেন। যুবকটি ইলেকট্রিকের কাজকর্ম্ম জানেন। তিনি ড. মুখার্জীকে বলিলেন, "আপনি লাটসাহেব হইয়াছেন আমাকে একটা কাজ দিন"। ড. মুখার্জী বলিলেন, "আমার বাড়ীতে দু' একটি আলো জ্বলে আমি তোমাকে আর কি কাজ দোব?" যুবকটি বলিলেন, "আপনার এই বাড়ীতে নয়, লাটসাহেবের বাড়ীতে"—তখন ড. মুখার্জ্জী বলিলেন, "সে বাড়ী ত আমার হইবে না, আমাকে থাকিতে দিবে, তবে ভাড়া দিতে হইবে না—যাহাদের বাড়ী তাহারাই ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা করিবে।" তার পর ড. মুখার্জী যুবকটিকে বলিলেন, "লাটসাহেব হইয়াছি বটে, কিন্তু ইহার জন্য ভবিষ্যতে আমাকে খুবই মুশকিলে পড়িতে হইবে, এই চাকরী চলিয়া যাইবার পর কোন জায়গায় আমার আর কোন চাকরী মিলিবে না—চাকরীর জন্য যাহাদের নিকট দরখাস্ত করিব সকলেই বলিবে তুমি লাট-সাহেব ছিলে তোমার উপযুক্ত আমরা তোমাকে কি চাকরী দিব? তুমি বাপু হাতের কাজ শিখিয়াছ তোমার কোনদিন কাজের অভাব হইবে না, আমারই হইবে।" এইরূপ হাসি কৌতুকের মধ্যে তাঁহার এই ক্ষুদ্র উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রমের মর্য্যাদা ও হাতে-কলমে কোন কাজ শেখার প্রতি তাঁহার কত অনুরাগ ছিল। শ্রীসুশীল আচার্য্য মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম ড. মুখার্জী কড়া-পাকের সন্দেশ খাইতে খুব ভালবাসেন—যাইবার সময় সুশীলবাবু বলিয়াছিলেন কিছু কড়াপাকের সন্দেশ লইয়া গেলে ভাল হয়; কিন্তু আমরা লইয়া যাইতে পারি নাই। এই কথা তাঁহাকে বলাতে তিনি বলিলেন, "আজ যদি লইয়া আনিতেন ভালই হ'ত—রাজ-ভবনে গেলে ত আর লইতে পারিব না—অনেক বেড়া টপকাতে পারলে তবে আমার কাছে সন্দেশ পৌঁছবে—আবার বটে যাবে লাটসাহেব ঘুষ নেয়।"

১৯৫২ সনের মার্চ্চ মাসের ১৬ই তারিখে আটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়—প্রদর্শনী উদ্বোধন করিবার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি। তাঁহাকে আটপুর যাইবার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মনে করাইয়া দিই—এবং বলি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জুলাই মাসে আপনার আটপুর যাওয়া হয় নাই, কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল একেবারে লাটসাহেব হিসাবেই আমার গ্রামে যাইবেন। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যাবলী দেখিয়া তিনি এবং তাঁহার সেক্রেটারী শ্রী এইচ. সি. সেন বলেন, মার্চ্চ মাসের একটি দিনও খালি নাই। শ্রীযুক্ত সেন আরও বলেন, ইহার উপর মার্চ্চ মাস—দারুণ গ্রীষ্ম—মোটরে যাইবার রাস্তা

নাই; মার্টিন কোম্পানীর হাল্কা রেলে যাইতে হইবে—পঁচিশ মাইল যাইতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগিবে। আমি স্পেশাল ট্রেনের কথা তুলিয়াছিলাম—যাহাতে কম সময় লাগে। স্পেশাল ট্রেনের কথা শুনিয়া ড. মুখার্জী বলিলেন আমার জন্য আবার স্পেশাল ট্রেন। আমি স্পেশাল ট্রেন চাই না। রাজ্যপালের নানাবিধ অসুবিধার কথা ভাবিয়া সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সেন তাঁহার আটপুর যাইবার তত পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু কি জানি কেন ড. মুখার্জী এত অসুবিধা সত্ত্বেও আটপুর যাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—এবং ২৮শে মার্চ্চের প্রাতের ও মধ্যাহ্নের নির্দ্দিষ্ট কাজ বাতিল করিয়া ঐ দিন আটপুর যাইবার দিন ধার্য্য করিলেন। তিনি বলিলেন, মাননীয়া শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার সহিত যাইবেন, আমারই অতিথি হইবেন। ঠিক সাধারণ মানুষেরই মত জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি খাওয়াইব। কি খাওয়াইব তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন অত বেশী করো না, শুক্তোটা করো। এইখানেই শেষ হইল না, তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সেন বলিলেন, "আপনি এখন রাজ্যপালের আটপুর যাইবার দিন ঘোষণা করিবেন না। হুগলী জেলার শাসকের মতামত লইতে হইবে।" ২০শে মার্চ্চ আমি শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের চিঠিতে জানিতে পারি যে, ২৮শে মার্চ্চ রাজ্যপাল আটপুর যাইবেন। চিঠির সঙ্গে তাঁহার বিস্তৃত 'প্রোগ্রাম'ও পাইলাম। চিঠি পাইবার পরই পুলিস বিভাগের উচ্চ, মধ্য, নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ আমার আটপুর গৃহে গমন করিয়া নানাবিধ অনুসন্ধান করিলেন—যথা রাজ্যপাল কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া কোন কোন স্থানে যাইবেন—কোথায় কি অনুষ্ঠান হইবে, আমার ক্ষুদ্র ভবনের কোন ঘরে রাজ্যপাল বিশ্রাম করিবেন, কোন ঘরে মধ্য ভোজন করিবেন—ইত্যাদি। সকল স্থানেই তাঁহাদিগকে রাজ্যপালের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পুরাতন নিয়মাবলীর কি এখনও অবসান হয় নাই? তাঁহারা উত্তরে "না" বলিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, যে মানুষটি আসিতেছেন তাঁহার প্রতি কাহারও কোন বিদ্বেষ ত থাকিতে পারেই না, বরং ভালবাসা ও প্রীতিতে জনসাধারণ তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিবে।
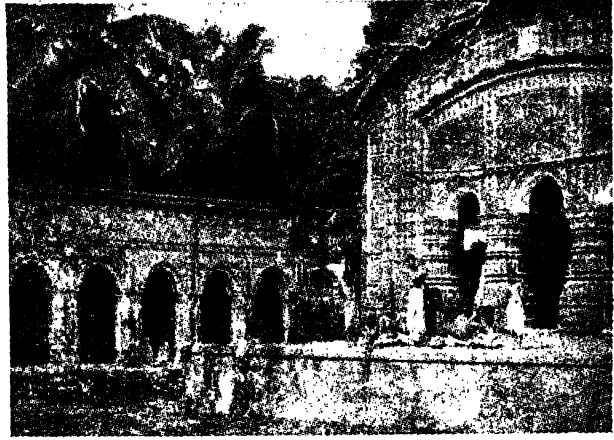
২৮শে মার্চ্চ রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী বেলা ১০টার সময় মার্টিনের রেলে আটপুর পৌঁছিলেন, তিনি কলিকাতা হইতে ডোমজুড় পর্য্যন্ত মোটরে গিয়াছিলেন এবং ডোমজুড়ে ট্রেনে উঠিয়াছিলেন। অবশ্য ট্রেনের সহিত তাঁহার জন্য একটি "সেলুন" সংযুক্ত ছিল, কলিকাতা হইতে ডোমজুড় ৮।১০ মাইল। ডোমজুড়ে তাঁহার অভ্যর্থনায় জন্য সরকারী বিভাগের এবং মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ত ছিলেনই, আমাদের পক্ষেও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীসুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। অতি সাধারণ ধুতি, কোট পরিহিত সাধাসিধে মানুষটি সেলুনে উঠিলেন, সঙ্গে কেবলমাত্র একটি ছোট সুটকেস—কে বলিবে রাজ্যপাল! লোকজন চতুর্দিকে, পুলিস পাহারার অন্ত নাই, কিন্তু যাঁহার জন্য এত আয়োজন তাঁহার সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নাই—সাধারণের মধ্যেই তিনি যেন একজন। তাঁহার সেলুনে অনেকেই উঠিয়া পড়িলেন—কোন আপত্তি নাই—বরং খুসী। সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিবার পর জামার পকেটে হাত দিয়া বলিলেন সিগারেট আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ষ্টেশনের ভেণ্ডারের নিকট হইতে সিগারেট কিনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ধর মহাশয় তাঁহাকে সিগারেট দিলেন। এই রকমই ছিলেন আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী। আত্মভোলা মানুষ।

মন্দির, আঁটপুর

শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ মাননীয়া শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জী রাজ্যপালের সহিত আঁটপুর যাইতে পারেন নাই। আঁটপুর ষ্টেশনে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল—ষ্টেশনে আঁটপুরের 'ভূমি-সেনানীর দল' কোদাল স্কন্ধে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার অভ্যর্থনার অন্যান্য আয়োজনও ছিল—যেমন ব্যাণ্ড, বালিকাগণ কর্ত্তৃক শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি। পথের দুই পার্শ্বে বালক-বালিকাগণও পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ষ্টেশন হইতে আঁটপুর মিত্র-বাড়ী ৪।৫ মিনিটের পথ; মোটরে যাইতে যাইতে রাজ্যপাল আমাকে বলিলেন—"আমার জন্য এত আয়োজন করেছ কেন, এত খরচ কেন করলে, এত লোককে কেন কষ্ট দিলে?" আমি যথাযথ উত্তর দিলাম; বাস্তবিক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ কিছুই খরচ হয় নাই, এমনকি একটি কটকও প্রস্তুত করা হয় নাই। যা সামান্য

আয়োজন ছিল, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল। এত ভীড়ের মধ্যেও তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ভূমি-সেনার কোদালসমূহ নূতন ও চক্‌চকে, কোদালে মাটির কোন দাগই ছিল না। মোটরে যাইতে যাইতেই বলিলেন—"কোদালগুলো কি ঘাড়ে বইবার জন্য, মাটি কাটবার জন্য নয়?" এই কথা তিনি অনেক দিন ভুলিতে পারেন নাই; আটপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বহুদিন পর যখন ড. হীরেন্দ্রকুমার নন্দী (কৃষি বিভাগের অধিকর্ত্তা) তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাকেও তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন—ড. নন্দীর মুখে এই কথা শুনিয়াছিলাম।

বেলা ১০টা হইতে প্রায় বেলা ২টা পর্য্যন্ত রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী আটপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। আটপুর মিত্র-বাটির রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শিশু-প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ, মিত্র-বাটীর আটচালায় পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ, মিত্র-বাটীর প্রাচীন বকুলতলার সম্মুখস্থ মাঠে খেলাধুলা দেখা প্রভৃতি তাঁহার "প্রোগ্রামে"র মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল। শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরের উপরেও তিনি উঠিয়াছিলেন এবং উঠিবার সময় আর সকলের মত জুতাও খুলিয়াছিলেন; মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। খেলা-ধুলার মধ্যে মদ্রদেশীয় একজন লোক একটি খুব লম্বা বাঁশের উপর তাহার চৌদ্দ পনর বৎসর বয়স্কা মেয়েকে উঠাইয়া নানা রকম অদ্ভুত ও লোমহর্ষক খেলা দেখাইয়াছিল। পরে সে যখন রাষ্ট্রপালের নিকটে আসিয়া বখশিশ ও সার্টিফিকেট চাহিয়াছিল, রাজ্যপাল বিরক্তিসহকারে তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার মেয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ আর তোমাকে আমি বখশিশ ও সার্টিফিকেট দিব, যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তোমাকে জেলে পাঠাইতাম। রাজ্যপাল মহোদয়ের এই উক্তি শুনিয়া আমাদের সকলেরই চেতনা জাগিল যে, এইরূপ খেলায় কোন উৎসাহ দেওয়া মনুষ্যত্বের বিরোধী।

আটপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন রাজ্যপালের "প্রোগ্রামে"র মধ্যে ছিল না, কিন্তু লেখকের অনুরোধে তিনি উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে স্বীকৃত হন; এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে উহা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ঘোষণা করিবার পরই জেলাশাসক কি জানি কেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন তাঁহার অনুমতি না লইয়া রাজ্যপালকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা বলা ও ঘোষণা করা আমার পক্ষে খুবই অন্যায় ও অসঙ্গত কাজ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া জেলা শাসকের সহিত স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ও আমার অপ্রীতিকর এবং অবাঞ্ছনীয় তর্ক-বিতর্ক হয়। জেলাশাসক আরও বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজ্যপালকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইতে দিবেন না। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জেলার পুলিস বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীর এই বিষয়ে কোন আপত্তি ছিল না। রাজ্যপালকে যখন জেলা শাসকের আপত্তির কথা শুনান হইল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, যখন ঘোষণা করা হইয়াছে তখন তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন, আরও বলিয়াছিলেন—"উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এখনও ইংরেজ আমলের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই; গ্রামের জনসাধারণের সহিত তুমি জড়িত—ইহাদের সহযোগিতাতেই ত গ্রামের উন্নতি সম্ভবপর হইবে—তোমার ঘোষণার পর আমি যদি বিদ্যালয়ে না যাই তুমি লোকের বিশ্বাস হারাইবে এবং তোমার পক্ষে উন্নয়নের কাজ করা কঠিন হইবে।" আটপুর হইতে ফিরিবার সময় তিনি বিদ্যালয় পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু ট্রেন ছাড়িবার সময় হওয়ার জন্য তিনি বিদ্যালয়-গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম তাঁহার জন্য ট্রেন ৫।৭ মিনিট দেরী করিয়া ছাড়িবে—এই আশ্বাস ষ্টেশন-মাষ্টার আমাকে দিয়াছেন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি চাই না আমার জন্য ট্রেন দেরীতে ছাড়ে—ইহার ফলে কত লোকের কত দিকে কত অসুবিধা হইতে পারে—এইজন্য অন্যান্য ট্রেনের যাতায়াতের ব্যাঘাতও ঘটিতে পারে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আটপুরে আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আটপুরে গমন উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু সম্ভ্রান্ত বেসরকারী ব্যক্তি এবং বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আটপুর গমন করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে F. A. O-র Veterinary Expert Dr. Forsythe-ও ছিলেন। সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াই ড. মুখার্জ্জী ঠিক নিজের বাড়ীর মতই দেহ অনাবৃত করিলেন—হাত, মুখ ধুইলেন, পরে বিছানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দেহ অনাবৃত রহিল—সেই অবস্থাতেই সকলের সঙ্গে দেখা করিলেন—Dr. Forsytheকে বলিলেন, see, how I live in private। Dr. Forsythe বিছানার এক ধারে বসিয়া তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। অনেক মহিলা, যুবতী, বালিকা প্রভৃতি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন—সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে আপন জনের মত কথা। বালিকা ও যুবতীদের বলিলেন—সাবান মেখো, পাউডারও মাখতে পার, কিন্তু লিপষ্টিক কখনও ব্যবহার করো না—ঠোঁটে, গালে, নখে রং মেখো না। আমার পরিচারকের বালক পুত্র একটা বড় তালপাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল, তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন—তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে বলিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—আমার গৃহে প্রবেশ করিবার পরই রাজ্যপালের একজন চাপরাশী ছোট সুটকেশটির ভিতর হইতে একটি ডাবা হুঁকা, তামাক, টিকা প্রভৃতি বাহির করিল এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। আমার এক পুত্র কলিকাতা হইতে রূপা-বাঁধান হুঁকা, তামাক, টিকে প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিল—সেও তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। রাজ্যপাল বলিলেন, রূপা-বাঁধান হুঁকার তামাক খাইবেন না, তাঁহার নিজের হুঁকায় খাইবেন—তবে আমার পুত্র কর্ত্তৃক আনীত তামাক খাইয়া দেখিবেন—তাঁহার তামাক ভাল না আমার পুত্রের তামাক ভাল। নিজের তামাক ও পুত্রের তামাক খাওয়ার পর পুত্রকে বলিলেন,

দক্ষিণ দিক হইতে—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং তদীয় পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে

তোমারটাই ভাল হে, যাবার সময় যা থাকবে নিয়ে যাব। বাস্তবিকই ফেরবার সময় শালপাতায়-মোড়া অবশিষ্ট তামাকটুকু নিজেই সুটকেশে পুরে নিলেন। আমার কেন, অনেকেরই ধারণা এই যে, তামাকের ভালমন্দ তিনি তেমন বিচার করেন নি, আমার পুত্রের প্রতি প্রীতিবশতঃই তাহার আনীত তামাক তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—আমার পুত্রকে আনন্দ দেবার জন্যই।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আমি রাজ্যপালকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের সহিত চেয়ারে বসিয়া টেবিলে খাইবেন, না মেঝেতে সাধারণের সঙ্গে কুশাসনে বসিয়া কলাপাতায় খাইবেন—তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—আমি এই খালি গায় মেঝেতে বসে সকলের সঙ্গে খাব—খেলেনও তাই—কলাপাতা, মাটির খুরি ও গেলাস। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য—তাঁহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল! ইনি কি মানুষ না দেবতা। খাবার সময় সকলের সঙ্গেই কত রকমের হাসিঠাট্টার গল্প—আর রান্নার ভূয়সী প্রশংসা—অথচ বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সাধারণ ব্যঞ্জনাদিই প্রস্তুত হইয়াছিল। আমি বিভিন্ন স্থানের খাওয়া দাওয়া দেখিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। আমার ভাগিনেয় ড. পূর্ণেন্দুকুমার বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) রাজ্যপালের সহিত এক পংক্তিতে খাইতে বসিয়াছিল। তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম রাজ্যপাল শুক্ত খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন একটা তরকারির নাম করুন, যা ভারতের আর কোথাও প্রচলিত নেই, কেবল বাংলা দেশেই প্রচলিত এবং বাংলা দেশের প্রিয়।". কেহ বলিল, মোচা, কেহ বলিল থোড়। রাজ্যপাল বলিলেন, 'শুক্ত।' আমি তাঁহাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, আপনাকে সামান্য আহার্য্য দিব—সবই আমার গ্রামে উৎপন্ন—কলিকাতা হইতে কিছুই আনি নাই, দই ও মিষ্টি খাইবার সময় তিনি বলিলেন, দই ও মিষ্টি নিশ্চয়ই কলকতা থেকে এনেছ—আমি তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলাম, তাঁহার ধারণা ভুল—এ দুইটি জিনিষও আমার গ্রামের। তিনি আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন যখন বলিলাম একটি মিষ্টির দাম ছয় পয়সা মাত্র। ভোজন সমাপান্তে তিনি আমাকে বার বার বলিতে লাগিলেন—তুমি নিজে উপস্থিত থেকে আমার চাপরাশীদের এবং আর সকলকে খাইয়ে দাও—তাড়াহুড়োতে ওদের যেন না খেয়ে ফিরে যেতে হয়—আমি তাঁহাকে উত্তরে বলিলাম—আপনার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই প্রায় খাওয়া হয়ে গেছে—আমি পৃথক পৃথক স্থানে একই সঙ্গে সকলের খাবার ব্যবস্থা করিয়াছি—আপনি আসিয়া দেখুন! বাড়ীর আশেপাশে—রাস্তায় পুলিস বিভাগের যে সকল লোক পাহারা দিতেছিলেন তাঁহাদের খাওয়ার কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাও তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি বলিলাম, সে ব্যবস্থাও

হইয়াছে এবং তাঁহাকে ব্যবস্থা দেখাইলাম। তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ভোজনের পর তিনি যখন শয্যায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে তামাক দিবার কথা কেহ বলিল। তিনি বলিলেন, এখন তামাকের কথা শুনিলে তাঁহার চাপরাশী খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবে—এখন বলিও না, এমন দরদী মনই তাঁহার ছিল। এই কথা শুনিয়া আমার পুত্র তামাক সাজিয়া আনিল। আমার গৃহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমার পুত্র তাঁহাকে অনুরোধ করিল বাড়ীর উঠানে যাইয়া তাহাদের সহিত ছবি তুলিতে হইবে। যদিও তাঁহার A. D. C. সময়ের অল্পতার জন্য তাড়া দিতেছিলেন—তথাপি রাজ্যপাল ছবি তুলিতে স্বীকৃত হন, বাস্তবিক তিনি কোন অনুরোধ সহজে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। ছবি তুলিবার সময় আমার পুত্র তাঁহার গলায় একটি মালা পরাইয়া দেয়, তিনি মালাটি খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—তোমাদের সঙ্গে ছবি তুলছি আবার মালা পরব কেন?

রাজ্যপাল যখন আঁটপুর ত্যাগ করেন বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই একবাক্যে বলিল, "আবার আসিবেন—আমরা আবার আপনার দর্শন লাভ করিতে চাই।" আমাদের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী সেলুনের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া দুই হস্তে সকলকে নমস্কার করিলেন—মুখে মধুর হাসি, গভীর আনন্দের ভাব। বাস্তবিক আঁটপুর পরিত্যাগের পর সকলেই একটা শূন্যতা অনুভব করিয়াছিল। প্রিয়জন চলিয়া গেলে হৃদয় যেমন ব্যথিত হয়—রাজ্যপাল চলিয়া যাইবার পর সেইরূপ ব্যথা অনেকেই অনুভব করিয়াছিল। আমার নিজের কথা না বলাই ভাল।

আঁটপুর প্রদর্শনী সম্বন্ধে রাজ্যপালের অভিমত এই:

It gave me great pleasure to attend the Rural Welfare Show organised by the Rural Welfare Society at Autpur (Hooghly) on the 28th March, 1952. Besides a Baby show, arrangements were made for an exhibition of improved varieties of vegetables, paddy and fruits and also of fertilizers conducive to such improvement. Exhibitions of this kind held in typical villages are calculated to give a fillip to scientific agriculture and betterment of the conditions of life in our rural areas so essential to our national economy. I congratulate the Rural Welfare Society on the enterprise shown by it in the matter under the able guidance of its energetic Secretary, Sri Debendra Nath Mitra.

Sd/- H. C. Mukherjee.
(Governor of West Bengal).

Raj Bhavan
Calcutta.
The 9th April, 1952.

ইহার পর অনেক সভা সমিতিতে তাঁহার সহিত যখন দেখা হইত তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "গ্রামের কাজ কেমন চলছে?" আমি বাধাবিপত্তির উল্লেখ করিতাম—তিনি বলিতেন "ছেড়ো না।" বহুদিন পর আমার বন্ধু শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ধর আমন্ত্রিত হইয়া যখন তাঁহার ভবনে যান—তখনও রাজ্যপাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেবেন কেমন আছে, তার Rural welfare work কেমন চলছে?"

বাস্তবিক আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি অফুরন্ত ছিল। একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি ষ্টেট বনমহোৎসব কমিটির একজন সভ্য। রাজ্যপাল উহার সভাপতি। ১৯৫৪ সনের জুন মাসে রাজভবনে এক সভায় স্থির হয় যে, একজন সরকারী বিশেষজ্ঞ এবং একজন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ বেতারের মারফত কথাবার্ত্তার ভিতর বনমহোৎসবের কথা বলিবেন। এই বেসরকারী ব্যক্তিটি কে হইবে এই আলোচনা যখন চলিতেছিল, তখন রাজ্যপাল আমার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন—ঐ ত আমাদের বেসরকারী লোক রয়েছে। ১৯৫৫ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী আঁটপুর বার্ষিক পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে জানাই যে, তিনি রাজ্যপালের সহিত অসুস্থতাবশতঃ আঁটপুর যাইতে পারেন নাই, এইবার তাঁহাকে যাইতেই হইবে—এইবারে আমি রাজ্যপালকে নিমন্ত্রণ করি নাই। শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় মহোদয়াকে লিখিত চিঠির উত্তর রাজ্যপাল মহোদয় নিজে আমাকে দিয়াছিলেন।

(Governor of West Bengal)
No. 344-H.E.
Raj Bhavan
Calcutta,
14th February, 1955.

My dear Rai Bahadur,

I am replying to your letter No. 166-EX, dated the 12th February, addressed to my wife, in which you ask her to be present at Autpur, your native village, in connection with the prize distributions of the Rural Welfare Show and of the local High School.

As Mrs, Mukherjee has to make a broadcast on the afternoon of the 27th February, she regrets she is unable to accept your invitation and has asked me to offer you her apologies.

With best regards.

Yours Sincerely
Sd/- H. C. Mukherjee.

Rai Bahadur D. N. Mitra.
175 A, Raja Dinendra Street.
Shambazar, Calcutta—4.

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। আমি মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যাপটিষ্ট গার্লস

স্কুলের এড-হক কমিটির সম্পাদক। এই কথা রাজ্যপাল জানিতেন এবং দেখা হইলেই স্কুলের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। গত ৬ই জুলাই আমি রাজ্যপালকে এক পত্রে কলিকাতার ব্যাপটিষ্ট গার্লস হাই স্কুলের প্রাঙ্গণে ২১শে জুলাই সকাল ৯টার সময় 'বনমহোৎসব' অনুষ্ঠানে তাঁহাকে পৌরোহিত্য করিবার জন্য অনুরোধ করি এবং মাননীয়া শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি কামনা করি; সেই সঙ্গে ইহাও লিখি যে, কার্যের অতিরিক্ত চাপে তিনি একান্তই যদি না আসিতে পারেন, আমরা মাননীয়া শ্রীমতী বঙ্গবালাকে আমাদের মধ্যে পাইলে খুবই উৎসাহিত ও আনন্দিত হইব। সত্য কথা বলিতে কি আমি পত্র লিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার আসার সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ ছিল। ৭ই জুলাই 'হরতাল' ছিল, ৮ই জুলাই রবিবার ছিল। ৯ই জুলাই আমি রাজ্যপালের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পি. আর. সিংহ মহাশয়ের চিঠিতে জানিতে পারি যে, রাজ্যপাল এবং মাননীয়া শ্রীমতী বঙ্গবালা উভয়েই আমাদের নিমন্ত্রণ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। এত শীঘ্র যে এইরূপ উত্তর পাইব, ইহা মোটেই আশা করি নাই। ২১শে জুলাই ঠিক ৯টার সময় রাজ্যপাল ও মাননীয়া শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় ব্যাপটিষ্ট গার্লস হাই স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন তাঁহারা ব্যারাকপুর রাজভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। উভয়ের মুখেই কি হাসি, কি আনন্দ—এই বিদ্যালয় তাঁহাদের নিকট অতি পরিচিত—তাই এই বিদ্যালয়ে আসার জন্য এত আনন্দ। সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা—অল্প বয়স্ক একজন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে পরিচয়কালে রাজ্যপাল বলিলেন, আমি যদি ছাত্রী হতাম তোমার কাছে পড়তাম না, এরকম আরও কত কথা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে শিক্ষা-বিভাগের অধিকারিক ড. পরিমল রায় যখন বাংলায় ভাষণ দিতে-ছিলেন তখন রাজ্যপাল আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ড. রায়ের ইংরেজী বক্তৃতা শুনিয়াছি, খুব ভাল বলেন, বাংলাতেও দেখছি কম নয়। পরে রাজ্যপাল নিজে যখন ভাষণ দেন তখন তাঁহার ভাষণে বলিয়া-ছিলেন, "ড. রায়ের ভাষণের পর আমার আর কিছু বলবার নেই। তাঁর কাছে মনে মনে হার মানলেও বাইরে কিন্তু হার মানব না।" এই রকমই সহজ, সরল, খোলা মানুষ ছিলেন—আমাদের রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী।

রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে প্রথমেই বলিলেন, "আমি ভাবছিলাম এত জায়গায় এত লোক আমাকে ডাকছে—আমার পাড়ার লোক আমাকে ডাকছে না কেন—তাই আপনাদের আমন্ত্রণ পেয়ে এক পেয়ালা চা খেয়েই ব্যারাকপুর থেকে ছুটে এসেছি।" তখন কে জানিত নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁর এত নিকটে। তাই মনে হয় সেদিন যদি রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীকে আমাদের মধ্যে না পাইতাম—জীবনে আর পাওয়া যাইত না। তাঁর আগমন উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে জনসমাগম, যে উদ্দীপনা, উৎসাহ, আনন্দ দেখিয়াছি তাহার স্মৃতি চিরকাল মনের মধ্যে জাগরূক হইয়া থাকিবে। অতিথিগণকে স্বাগত জানাইবার সময় অন্তরের সহিত বলিয়াছিলাম—"আপনাদের পদধূলিতে এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পবিত্র হয়ে রইল, এই দিনটি বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।" মৃত্যু তাহাই করিল। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আর তিনি কখনও আসিবেন না। আমাদের একটি আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গেল। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনার এ আসা আসা হ'ল না—একদিন আপনাকে informally আসতে হবে, এবং স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণের ও ছাত্রীবৃন্দের সঙ্গে মাটিতে বসে কলাপাতায় খেতে হবে।" তিনি বলেছিলেন, "পূজোর আগেই আসব—এক মাস আগে নোটিশ দিও।" আর বলেছিলেন, তোমার গ্রামের মত গুড় খাওয়াবে ত?

২১শে জুলাই ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ে আসিয়া-ছিলেন—আর ৭ই আগষ্ট অপরাহ্নে আকস্মিকভাবে তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহার জীবনও যেমন মধুর, শান্ত ছিল—মৃত্যুও তেমন মধুর ও শান্ত হইল—২০।২৫ মিনিটের মধ্যেই ঈশ্বর তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। আমার প্রতি তিনি যে স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। সারা ভারতবর্ষের ও বিদেশের অগণিত ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজেই তৃপ্ত হইলাম।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন:

"Whether as Vice-President of the Constituent Assembly or as Governor, Dr. Mukherjee never lost the character of a simple citizen of India. He was a man of scholarship learning and deep humanity. He had lived unostentatiously and died quietly. He was a great public servant and a fine example of a great christian.

প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যেক কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য।

পাপ

শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায়

ভবনাথ ডাক্তার এক হাতেই মাথার চুল ধরে টানতে লাগলেন, যদি তাঁর আর একটা হাত আজ থাকত ! তা হলে হয়ত এই রোগীকে ও রকম ভাবে তাঁর চোখের সামনে মারা যেতে হ'ত না। এ অঞ্চলে এমন এক জন অভিজ্ঞ ডাক্তার নেই যার উপর এই রকম একটা সূক্ষ্ম অথচ বেপরোয়া অপারেশনের ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারতেন। তবু শেষ চেষ্টায় মহিম ডাক্তারকেই ডাকতে পাঠালেন তিনি—বললেন, আমার নাম করে বলগে এখখুনি আসতে —একটুও দেরি করো না।'

রোগীর চোখ তখন ঘোলাটে হয়ে আসছে, হাত নেড়ে সে বারণ করল ডাক্তারকে। মুখ থেকে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ শুধু বেরুল। ভবনাথ ডাক্তার ওর মুখের কাছে নিজের মাথাটা নিয়ে গেলেন। শুনলেন, বিকৃত কণ্ঠে রোগী বলছে, আর দরকার নেই ডাক্তারবাবু এ আমার পাপ, আপনার পাপ।

চমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু। রোগীর জটা ও শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হ'ল একে যেন কোথায় কোনদিন দেখেছেন। কিছুতেই ঠিক মনে করে উঠতে পারলেন না। রোগী নিজেই বলল, আপনি আমায় চিনতে পারলেন না ডাক্তারবাবু, আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছিলাম। চিনেছিলাম আমার দুশমনকে সামনে দেখে। কিন্তু আপনার উপর আমার কোন রাগ নেই। রোগী হাঁপাতে লাগল। ডাক্তারবাবু বললেন, থাক্, তুমি আর কথা বল না, আমার যতখানি করবার ছিল আমি করেছি। একটা অপারেশন করতে পারলে শেষ চেষ্টা করা যেত, কিন্তু—

একটু করুণ হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, জান ত আমার ডান হাতটা নেই, তাই পারলাম না।

রোগীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, ডাক্তারবাবু, পাপ আমার, আমি, আমিই—

চমকে উঠলেন ভবনাথ ডাক্তার। ঝুঁকে পড়ে বললেন, তুমি ? রামলাল ?

একটু হাসল রামলাল—চিনতে পেরেছেন তা হলে ? একটু উঠে বসবার চেষ্টা করতেই সে সংজ্ঞাহীন হয়ে গড়িয়ে পড়ল। ডাক্তার পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঘাটের কাছে অশ্বত্থ গাছটা যেখানে অন্ধকারে জমাট বাঁধিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার তলায় নৌকাটা একবার পাক খেয়েই মুখটা ঘুরিয়ে তড়িৎ-গতিতে এগিয়ে এসে কাদায় মুখ গুজল। নৌকা থেকে উপিন্দর মাঝি তড়াক করে নেমে নৌকায় মুখটাকে দু-হাত দিয়ে সামলে ধরল। আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘাট পিছল, তার উপর ভাঁটা পড়ে যেতে অনেকখানি কাদা মাড়িয়ে তবে ডাঙায় উঠতে হয়। চারিদিকে একটানা ঝিঁঝির আর্তনাদ আর জোনাকির মিটমিট আলো ছাড়া আর কিছু শ্রুতি বা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, শুধু ইছামতীর জলের ছলাং ছলাং শব্দ ছাড়া। ভবনাথ ডাক্তার টর্চ ঘুরিয়ে ফেলতেই অশ্বত্থ গাছটার তলা থেকে কে একজন গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন ভবনাথ ডাক্তার। এবার সম্পূর্ণ ভাবে টর্চটা তার দিকে ফেললেন, একটা মানুষকে ভূতের মতন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। উপিন্দর হাঁকল,—কে ওখানে ?

লোকটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এল গাছের তলা থেকে। রামলালের অগ্রসরমাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে উঠলেন ভবনাথ। উপিন্দর নৌকার ওপর রাখা সড়কিটা বাগিয়ে ধরল।

রামলাল এগিয়ে আসতে আসতে বলল—একটু আস্তে কথা বলবেন ডাক্তারবাবু। আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। বড় বিপদ।

—তোমাকে যে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে ?

—তা জানি, কিন্তু এখন আমার ধরা দিলে চলবে না। সময় হলে নিজেই ধরা দেব।

—কি ব্যাপার ? ভবনাথ ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

—আমার ছেলের বড় অসুখ। মহিম ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন শেষ চেষ্টা একবার করে দেখতে আপনার কাছে। আমার নিজের বাড়ীতে থাকবার উপায় নেই, কি করে যে খবর নিচ্ছি আর কি করেই যে দিন কাটাচ্ছি তা ভগবানই জানেন। রামলালের গলার স্বর অদ্ভুত করুণ। অমন যে দাগী আসামী, যে খুনজখমকে গ্রাহ্য করে না ডাক্তারের টর্চের আলোতে তার চোখের জল চক্ চক্ করে উঠল।

পুরা দেড় দিন বাইরে কাটাবার পর ভবনাথ ডাক্তার ক্লান্ত। প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন তিনি—তোমরা আমায় কি ভেবেছ শুনি ? আমি একটা ভূত না দেবতা ? আমারও কি দেহ নেই, বিশ্রাম নেই, নাওয়া-খাওয়া নেই ? তা ছাড়া তোমায় এখন পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে, তোমার সঙ্গে গিয়ে আমার একটা ফ্যাসাদ হয় তাই তুমি চাও ?

যে লোকটা কোনদিন কোন কিছুতেই ভয় পায় নি, শত অত্যাচারেও যে লোকটা অনতিদূরের অশ্বত্থ গাছের মতনই

অবিচলিত সেই রামলাল এবার ভবনাথ ডাক্তারের পায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল। বলল—এবারকার মতন দয়া করুন ডাক্তারবাবু। আর কখনও এমন কাজ করব না।

ডাক্তার একটু হাসলেন। বললেন, ও কথা ত তুই অনেকবারই বলেছিস। জমিদারবাবুর পা ছুঁয়েও ত কতবার প্রতিজ্ঞা করেছিস, কিন্তু পেরেছিস কি স্বভাব ছাড়তে ?

রামলাল বলল—আমি আমার ছেলের দিব্যি দিয়ে পিতিজ্ঞে করছি ডাক্তারবাবু ; ছেলে ভাল হয়ে গেলে আর কখনও এ কাজে হাত দেব না।

অবশেষে ভবনাথ ডাক্তারকে নৌকার মুখ ঘোরাতেই হ'ল। ক্রমাগত আধ ঘণ্টা হাল ধরে থেকে উপিন্দর ক্লান্ত। অবস্থাটা রামলাল বুঝল। কোন কথা না বলে সে হাল ধরল এগিয়ে। সে যে কত বড় পাকা মাঝি তা তার নৌকা-চালানো দেখেই ভবনাথ ডাক্তার বুঝলেন। বুঝলেন যখন ঐ ইছামতীর উপর দিয়ে সে খাড়াই পার হবার চেষ্টা করল। ভবনাথ ডাক্তার বললেন—তুই ত বেশ পাকা মাঝি দেখছি। তা এ কাজ করিস না কেন ?

—বুঝি সবই ডাক্তারবাবু, কিন্তু মন না মতি ? রাত্তিরের আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে তখন কে যেন আমায় ডাকে, ঘরে থির থাকতে পারি নে। রক্তের মধ্যে কি যেন কিলবিল করে ঘোরে।

ডাক্তার কোন কথা বললেন না। নৌকা নদী ছেড়ে খালের ভেতর ঢুকল। ডাক্তার বললেন—এখানে নৌকা ঢোকালি যে ?

—এখানে না' না থামালে ধরা পড়বার ভয় আছে। আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। বলে সে আঘাটায় নৌকা বাঁধল। নৌকা থেকে নেমে ভবনাথ ডাক্তার রামলালের পিছু পিছু বনের মধ্যেকার সরু পথ দিয়ে এগিয়ে চললেন। ভবনাথ ডাক্তারের মতন লোকেরও একবার গাটা ছমছম করে উঠল। চারিপাশে অন্ধকার যেন জটা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে খুন করে ফেললেও কেউ সাক্ষী থাকবে না। ভবনাথ ডাক্তার বুকপকেটে একগাদা নোট একবার চেপে ধরে দেখলেন। না, কাজটা তিনি ভাল করেন নি। উপেন্দ্রকে সঙ্গে করে আনলেও হ'ত। রামলাল দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। জীবনে ও যে খুন করেছে ক'টা তা ডাক্তারবাবু বলতে পারেন না। কিন্তু রোগের কথায় খেয়াল থাকে না। কেস যত জটিল হয়, ভবনাথ ডাক্তারের আগ্রহ সেই দিকে তত বেশী হয়। বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ রামলাল বলল—এখানে বাত্তি জ্বালাবেন না। বলে, সে একটু থেমে মুখ দিয়ে পেঁচার ডাকের আওয়াজ নকল করে তিন বার ডাকল। ডাক্তারের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। এ রকম পরিস্থিতির মধ্যে তিনি জীবনে পড়েন নি। অমন ডাকসাইটে প্রতাপ ভবনাথ ডাক্তারেরও বুকে কি যেন একটা অজানা আশঙ্কার উদ্রেক হ'ল। তাঁর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতির ভেতর ঢিপঢিপ শব্দ শুনতে পেলেন। রামলাল কি যে ইঙ্গিত বুঝল সেই জানে, ভবনাথ ডাক্তারকে বলল —আসুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার এগিয়ে চললেন। ডাকতে হ'ল না, খিড়কি-দরজা খোলাই ছিল। ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার দেখলেন, সেই অন্ধকারের ভেতরেও, একটি নারীমূর্ত্তি দাঁড়িয়ে ছিল, সে-ই দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরে ঢুকে ডাক্তার দেখেন এক কোণে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। আর মেঝের ওপর একটা ছেলে, বছর দু'তিন হবে—নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার বললেন—প্রদীপে চলবে না, লণ্ঠন জ্বাল। তার পর অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। একদৃষ্টে রামলাল তাকিয়ে ছিল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার ঘাড় ফিরাতেই রামলাল বলল—কি রকম দেখলেন, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার বললেন—অত উতলা হয়ো না, কিন্তু কথা দিতে পারছি না। আজকের রাত্তিরটা যদি টিকে যায় ত বাঁচলেও বাঁচতে পারে। এখনই আমার একটা ওষুধ দরকার। কিন্তু—

রামলাল সাগ্রহে তাকাল। ওর দিকে চেয়ে ডাক্তার বললেন —এ ওষুধ এখানের কোন ডাক্তারখানায় পাবে না। আমার বাড়ীতে আছে। তা তুমি গেলেই ত ধরা পড়ে যাবে। ওষুধ আনবে কে ?

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন—তুমি এক কাজ কর। উপেন্দরের কাছে যাও, তাকে এই চিঠিটা দিয়ে বল—আমার কম-পাউণ্ডারকে ডেকে চিঠিটা দিতে। সে ওষুধ বার করে দেবে। তুমি ততক্ষণ উপেন্দরের বাড়ীতে অপেক্ষা কর। এ ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি নে। তোমার কাছে টাকা আছে ?

শুষ্ক মুখে তাকাল রামলাল, ঠোঁটটা জিব দিয়ে চাটল একবার। ঝনাৎ করে বাইরে শেকলের শব্দ হ'ল। রামলাল বাইরে গেল। কিছুক্ষণ পরেই একগাছা সোনার চুড়ি এনে হাজির।

যেন সাপ দেখে চমকে উঠলেন ভবনাথ ডাক্তার। বললেন—না না চুড়িটুড়ি থাক। আচ্ছা তুমি যাও।

রামলাল হেঁট হয়ে ডাক্তারবাবুর পায়ের ধুলো নিল। ধরা-গলায় বলল, আপনি আমার যা উপকার করলেন ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ও সব থাক্। চোখ তাঁর রাগে লাল হয়ে উঠেছে। এ চোখের সামনে ভয় পায় না এমন কোন লোকই এ অঞ্চলে নেই। ডাক্তার ভবনাথ একরোখা লোক, কটুভাষী। নিন্দা-প্রশংসায় এখানে তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতি সমান ভাবে জড়ানো। অদ্ভুত তাঁর চিকিৎসার ধারা, অনেক রোগীকে তিনি প্রায় যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু লোকটি অত্যন্ত বদমেজাজী। তাঁকে ঘিরে দু'একটা কুৎসা যে এ অঞ্চলে রটে নি তা নয়, কিন্তু সাধারণে বুঝতে পারে না, এর কতখানি সত্যি, কতখানি মিথ্যে। কারণ, কুৎসা রটানোর মূলে তাঁর শত্রুপক্ষীয় লোক। আর ভবনাথ ডাক্তারের কোন রকম নোংরা কাজে লিপ্ত থাকার কোন প্রমাণই নেই। তবু লোকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানেই থাকে।

রামলাল তাড়াতাড়ি চলে গেল। ডাক্তার তাঁর ব্যাগ থেকে ওষুধপত্র বার করে একবার শূন্য ঘরের চারিদিকে তাকালেন। তার

পর অন্তরালবর্তিনীকে উদ্দেশ করে জোরে বললেন—এখুনি খানিকটা গরম জল চাই।

দাওয়ার ওপর থেকে ডাক্তার ভবনাথ একটি মেয়েকে নীচে উঠানে নেমে যেতে বুঝলেন। তার পর শুনলেন রান্নাঘরে জল গরম করার শব্দ। কিছুক্ষণ পরেই জল গরম হয়ে এল। ডাক্তার বললেন—এখানে একবার আসতে হবে। বাচ্চাটাকে ধরতে হবে। ডাক্তার ছেলেটিকে আস্তে আস্তে তুলে ধরে ওর বুকে ফ্লানেলের টুকরো জড়াতে লাগলেন।

মেয়েটিকে ভবনাথ ডাক্তারের যতখানি আড়ষ্ট মনে হয়েছিল ঠিক ততখানি আড়ষ্ট আর মনে হ'ল না। বরং ডাক্তারের কাছে তার কার্য্যকলাপ সাধারণ মেয়েদের চেয়ে বেশী চটপটে মনে হ'ল। শুধু চটপটে নয়, মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতীও মনে হয়। ডাক্তার তাকে ছেলেটির হাত সোজা করে ধরতে বললেন—আর ইন্‌জেকশনের নীডলটা মুহূর্তে মুহূর্তে একবার মেয়েটির দিকে তাকালেন। মেয়েটির ঘোমটা খসে গেছে, একদৃষ্টে সে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মেয়েটির দিকে চোখ ফেরাতেই ডাক্তারের হাতের নীডলের ওপর স্পিরিট যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। অনিন্দ্য মেয়েটির মুখ, অপূর্ব্ব তার মাদকতা। একটু বিষণ্ণ ভাব মেয়েটির চোখ-দুটোতে এনে দিয়েছে ঘাসের উপর প্রভাতের শিশিরের কোমলতা। রাত্রি-জাগরণে, ক্লান্তিতে, উদ্বেগে সে মুখ যেন আরও বিষণ্ণ কোমল হয়ে উঠেছে। এই ঘরে, এই পরিস্থিতিতে এই রকম একটি মেয়ের সাক্ষাৎ যেন একটা অভাবনীয় ব্যাপার। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে ডাক্তার দেখলেন তার নিটোল দুটি হাত, তার মরালশুভ্র গ্রীবা, উত্তুঙ্গ শিখরচূড়ার রূপ দেখলেন তার বুকে।

ভবনাথ ডাক্তার শুনেছিলেন রামলালের বৌ খুব সুন্দরী। এ নিয়ে অনেক আলোচনাও তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু সে যে এমন অপরূপ এ তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল। ডাক্তারের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যেতেই মেয়েটি মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল। আর তার চোখে পড়ল ডাক্তারের বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি। নাকি ইছামতীর জলে পূর্ণচাঁদ উঁকি মারল, তার কালো জলে ধীরে ধীরে? একটু তাকিয়ে থেকেই সে তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। ডাক্তারও অপ্রতিভ হয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। কিন্তু হঠাৎ এ কি হ'ল তাঁর? তিনি ভুলে গেছেন এক নিভৃত পল্লীর এক নিরালা গৃহে তিনি বসে আছেন, তাঁর সামনে ভেসে উঠল প্রথম যৌবনের দিনগুলি। অনেক স্বপ্ন অনেক কল্পনায় গড়া তাঁর দিন-গুলি।...

রামলাল ফিরে এসে ওষুধ দেওয়ার পর ছেলেটির মুখের ভাব লক্ষ্য করতে করতে তিনি অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তার পর যখন রামলালের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন পূবের আকাশ সাদা হতে আরম্ভ করেছে। রামলালকে বললেন; ভয়টা কেটে গেছে, তবে সাবধানে থাকতে হবে। সেদিন আরও একটা কাজ তিনি করলেন, যা তিনি জীবনে করেন নি। রামলালের হাতে তাঁর বিগত দেড় দিনের সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ ঢেলে দিয়ে এলেন, অর্থগৃধ্নু ডাক্তার ভবনাথ।

এর পর তিন দিন পর পর একই সময়ে রামলাল এসেছে সেই অশ্বত্থ গাছের তলায়, নিয়ে গেছে ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিজে। ডাক্তারও যেন ঠিক সেই সময় নৌকা ভিড়িয়েছেন ঘাটে। রোগী ছাড়াও কি যেন একটা আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে যেত।

জমিদার চন্দ্রকান্তবাবুর আশ্রিত রামলাল। পুরুষানুক্রমে এই জমিদার-বংশের সঙ্গে তাঁরা জড়িত। বার ভুঁইয়ার আমল থেকে এই জমিদারবংশ আর রামলালের বংশ পাশাপাশি কাজ করেছে অনেক রাত্রিতে, এই ইছামতীর বুকে ডুবেছে অনেক নৌকা, ঝরে গেছে অনেক নির্দ্দোষ প্রাণ। পুলিস অনেক বার রামলালকে ধরে নিয়ে গেছে, কিন্তু পেছনে দাঁড়িয়েছেন চন্দ্রকান্ত-বাবু। এও কারুর অজানা নয়। অনেক বারই প্রমাণাভাবে সে খালাস পেয়েছে, কিন্তু বহু বৎসরই তার কেটেছে জেলে জেলে। পুলিসের দারোগাবাবু একবার রামলালের বউয়ের সঙ্গে কি এক অভদ্র ব্যবহার করেন। পদ্মিনী, রামলালের বউ, সেকথা চন্দ্রকান্তবাবুকে জানায়। চন্দ্রকান্তবাবু দারোগাকে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়ে কি কথা বলেন। তার পর থানার দারোগা বা জমাদার কেউই ওধারে এগোতে সাহস করত না। চন্দ্রকান্তবাবুর আশ্রয়ে পদ্মিনী বনপদ্মের মতনই ফুটেছিল। ভবনাথ ডাক্তার এ কথাটা জানতেন।

চতুর্থ দিনের দিন রামলাল এল না। সে রাত্তিরে নদীর ধারে ডাক্তার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কেউই এল না। বাড়ীতে এসে তিনি ঘুমোতে পারলেন না। তার পর ভোরের দিকে একটা অত্যন্ত খারাপ স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

পরদিন শুনলেন, রামলাল ধরা পড়েছে। তবে তার ধরা দিতে আপত্তি ছিল না, ছেলে ভাল হয়েছে এতেই সে সুখী। দারোগাকে বলেছিল, আর দু-এক দিন পরে হলে দারোগাকে আর কষ্ট করতে হ'ত না, নিজেই সে থানায় যেত।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় ভবনাথ ডাক্তার বললেন উপেন্দ্রকে নৌকা ঠিক করতে। ঘোলার দিকে যাবেন। না এসে ডাক্তার পারলেন না। পদ্মিনীর সঙ্গে ডাক্তারের কি যেন এক নীরব বোঝাপড়া চলছে। ডাক্তার দেখেছিলেন তার চোখে এক ভীরু কপোতীর শঙ্কা—যে শুধু খুঁজছে একটি নীড়, যেখানে সে পেতে পারে পরম আশ্রয়। শুধু চকিত চাহনির ভিতর ডাক্তার পদ্মিনীর আর এক রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যে চানে পদ্মিনীর চোখের বিদ্যুৎ মাটির প্রদীপশিখার মতনই নরম হয়ে আসছে।

আর পদ্মিনী দেখেছিল ডাক্তারের ভেতর একই রূপের আর এক অভিব্যক্তি—রামলাল ইছামতীর এক পাড়, যে পাড় ইছামতী শুধু তার শক্তি দিয়ে ভাঙে, যে শক্তিতে আছে ধ্বংস করার এক উদগ্র আবেগ; পদ্মিনীর রূপ সে চোখে নেশা ধরাতে পারে নি। সে রাত্তিরের অন্ধকারের ভেতর আর এক আহ্বান শুনতে পায়।

আর ডাক্তারের ভেতর পদ্মিনী দেখেছিল সেই শক্তির আর এক রূপ। এ শক্তি ইছামতীর আর এক পাড় গড়ে—যে পাড়ে নূতন নূতন চর পড়ে, নূতন শ্যামলিমা দেখা দেয়। রামলাল জীবনকে শেষ করে যে শক্তিতে, ডাক্তার ভবনাথ জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় সেই শক্তিতে। পদ্মিনী দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। সেদিন ডাক্তার পদ্মিনীর বাড়ীতে তার ছেলেকে পরীক্ষা করছিলেন এমন সময় পদ্মিনী ঘরের ভেতর ঢুকল। ডাক্তার তার দিকে তাকালেন। পদ্মিনীর চোখের সঙ্গে ডাক্তারের চোখ মিলল। তার পর পদ্মিনী বলল—আমার বুকটা কেমন করছে ডাক্তারবাবু।

ভবনাথ ডাক্তার লাফিয়ে উঠে তাকে ধরতেই পদ্মিনী ডাক্তারের কোলে ঢলে পড়ল।

দু'বছর পর রামলাল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরে এক গভীর রাত্তিরে। এবার আর সে পেঁচার ডাক ডাকল না। কিন্তু ঘরের দরজায় তার সাঙ্কেতিক আওয়াজে যখন পদ্মিনী সাড়া দিল না তখন সে অবাক হ'ল। এক লাফে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরের দাওয়ায় উঠে দেখে দরজার গোড়ায় একজোড়া জুতা। দেখে সে থমকে দাঁড়াল। তার পর কি ভেবে আর সাড়া দিল না। বাড়ীর বাইরে একটা ঝোপের ভেতর অপেক্ষা করতে লাগল সে। কিন্তু শেষ রাত্তিরের আলোতে সে লোকটাকে চিনতে ভুল করল না।

ডাক্তারের দরজা ভেঙে সেদিন কে যে ঘরে ঢুকেছিল তা জানা যায় নি। কিন্তু যেই ঢুকুক তার উদ্যত অস্ত্র ডাক্তারের গলার কাছে নেমে থেমে গিয়েছিল কি ভেবে কে জানে। শুধু ডাক্তারের ডান হাতটা ছিন্ন করে দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। ডাক্তার পুলিসের কাছে বলেন তাঁর কাকেও সন্দেহ হয় না।

তার পর বহু বৎসর কেটে গেছে। রামলাল চন্দ্রকান্তবাবুরই অধীনে আর এক মহলায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে। এখান থেকে সে জায়গাটা অনেকটা দূর। ডাক্তার আর রামলালের খবর রাখেন নি, পদ্মিনীরও না। এক হাত কাটা নিয়েই তিনি এখনও ডাক্তারি করেন এবং তাঁর খ্যাতি চিকিৎসক হিসেবে বেড়েছে বৈ কমে নি। কিন্তু সেই কটুভাষী অর্থগৃধ্নু ডাক্তারের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তাঁকে কেউ চড় মারলেও তিনি প্রতিবাদ করেন না। সে রকম রোগীকে তিনি যে শুধু বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন তা নয়, ক্ষেত্রবিশেষে নিজের পয়সায় তার ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করেন। ডাক্তারের নাম এখন সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

রামলালের চোখের দু'কোলে জল বাঁধ মানল না। কখন যে তার জ্ঞান হয়েছে ডাক্তার টের পান নি। নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে ছিলেন। রামলালের হাতটা নড়তেই তাঁর তন্ময়তা ভাঙল। রামলাল ফিসফিস করে বলল—মরবার সময় আপনি আমায় মাপ করবেন ডাক্তারবাবু। আপনার হাতটা আমিই নিয়েছিলাম, কিন্তু মারতে পারি নি ছেলেটার মুখ চেয়ে। পদ্মিনীকে আমি ঘরে রাখতে পারি নি—ছেলেটা মারা যাবার পর সে যে কোথায় চলে গেল। সারা জীবন তাকে খুঁজে বেড়িয়েছি, কিন্তু—

রামলাল চোখ বুজল। আস্তে আস্তে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। শেষ কথা বলে সে ঢলে পড়ল—মাপ চাই ডাক্তারবাবু—

ভবনাথ ডাক্তার তীব্র আগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠে রামলালের হাতটা একহাতে ধরে যখন ঝাকুনি দিলেন তখনও রামলাল সাড়া দিল না।

একটা হাত না থাকার জন্যে যে ডাক্তার একটু আগে আক্ষেপ করছিলেন, মৃত্যুপথযাত্রী রামলালের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে না নেওয়ার জন্যে তাঁর আক্ষেপ যে কত গভীর তা কে বুঝবে! একটু, আর একটুও যদি বেশী সময় পেতেন ভবনাথ ডাক্তার!

কেনোপনিষদের বৈশিষ্ট্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

সামবেদীয় "তলবকার ব্রাহ্মণের" নবম অধ্যায়ে এই উপনিষদখানি গুরু-শিষ্য সংবাদ আকারে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ব্ব আট অধ্যায়ে বিবিধ যজ্ঞ ও উপাসনা অনুষ্ঠানের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং ভগবদ্‌মুখী করার প্রসঙ্গ আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'কেন' শব্দ থাকায় এই শ্রুতির নামকরণ "কেনোপনিষদ" হয়েছে।

এই উপনিষদের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে: ঋষি সোজাসুজি ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করেন নি, কিংবা 'নেতি নেতি' শব্দে দিক-দর্শনের প্রয়াসী হন নি। ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির অংশাংশের সামান্য একটু পরিচয় দিয়ে, জীবের ভগবদ্‌ অনুভূতি ও সাক্ষাৎকারের সঙ্কল্প, ঋষি সাঙ্কেতিক ভাষায় 'আদেশ' বলে প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গের আলোচনা করা যাচ্ছে।

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ—প্রভৃতি চারি প্রশ্নে শিষ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, চিৎ-জড় সম্বন্ধনির্ণয়ের অবতারণা করেছেন। প্রথম প্রশ্ন: অন্তঃকরণ কাহার সত্তায় স্ফূর্ত, সঞ্চালিত ও বিষয়ে ধাবিত; দ্বিতীয় প্রশ্ন: প্রথম (প্রধান?) প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত; তৃতীয় প্রশ্ন: বাগিন্দ্রিয় কাহার শক্তিতে ক্রিয়াবন্ত; চতুর্থ প্রশ্ন: কোন্‌ দেব চক্ষুকর্ণকে (কার্য্যে) নিযুক্ত রেখেছেন।

গুরু বললেন, (যিনি) শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাগিন্দ্রিয়ের বাক্‌, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু, (তাঁকে জেনে) ধীর (জ্ঞানী) পুরুষ জীবন্মুক্ত হন এবং মৃত্যুর পরে অমৃতত্ব লাভ করেন। ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রাণ বা অন্তঃকরণ তথায় (ব্রহ্মসমীপে) যায় না। ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ আমি জানি না; মন ও ইন্দ্রিয়গুলি যা গ্রহণ করে, তৎ অন্যৎ, তাহা অন্য (ব্রহ্ম নন)। আচার্য্য আমাকে এই রকম বুঝিয়েছেন।

এর পরের পাঁচ শ্লোকে গুরু আরো স্পষ্ট বলেছেন, যাঁর শক্তি নিয়ে বাগিন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত, বাক্য তাঁকে কেমন করে প্রকাশ করবে? [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছিলেন, পৃথিবীর সকল বস্তু এঁটো হয়েছে, কেবল ব্রহ্মই উচ্ছিষ্ট হন নি।] যিনি মনকে মননশীল করেছেন, তাঁকে মন জানবে কেমনে? [যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।] যাঁর শক্তিতে চক্ষু দেখে, তাঁকে চক্ষু দেখবে কেমন করে? যাঁর দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় শুনে, শ্রোত্র তাঁকে শুনবে কেমনে? প্রাণ যাঁর দ্বারা ক্রিয়াবন্ত, প্রাণ তাঁর হদিস পায় না: তিনিই ব্রহ্ম, নেদং যদিদং উপাসতে। একেবারে সাফ বলে দিলেন, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন ও প্রাণ দ্বারা তুমি যাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানে যজ্ঞ, উপাসনা কর, যথার্থ ব্রহ্মের স্বরূপ তা নয়।

শেষে গুরু বললেন, ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে তোমাকে যা উপদেশ দিলাম, তা শুনে তুমি যদি ভাব, তাঁকে বিলক্ষণ জেনেছি, তবে তোমার বড় ভুল হবে। শিষ্য এর উত্তরে নিবেদন করলেন, ব্রহ্মানুভূতি ভালরকম আমার হয়েছে, তা বলি না, তবে কিছুই বুঝি নি তাই বা কেমন করে বলি?

এর পরের তিন শ্লোকে শ্রুতি ঔপনিষদিক মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। যে মহাপুরুষ ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন, তিনি নিরভিমান হন এবং বলেন, অসীম ব্রহ্মসাগরের কণামাত্রের দর্শন পেয়েছি। আর গর্ব্বভরে যিনি জানান, ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছি, প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিকট ব্রহ্ম অজ্ঞানিতই রয়েছেন। প্রতিবোধবিদিতং শব্দের অর্থ আমার মনে হয়, বোধিবিজ্ঞান, যা অনুভূতি-সাপেক্ষ, তাই অমৃতলাভের সেতু। 'আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং, বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতং' এই পদটি প্রায়ই উদ্ধৃত হয়। আত্মা (গুহাহিতং, হৃদয়কমল মধ্যস্থিত পরমাত্মা) হতে বীর্য্য (পরাবিদ্যা-লাভের শক্তি) আসে, বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়। তৃতীয় শ্লোকে শ্রুতি বলেছেন, দুর্লভ এই মনুষ্যজন্মে ব্রহ্মকে সর্ব্বভূতে বিচিন্ত্য, অবস্থিত জানাই সত্যম্‌, কল্যাণ, নতুবা মহতী বিনষ্টিঃ।

এর পরে গুরু এক আখ্যায়িকার অবতারণা করে পরম ব্রহ্মের অচিন্ত্য বীর্য্য, অপূর্ব্ব মহিমা ও অপার কারুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যায়, পূর্ব্বকল্পের সাধনবলে কতক দেবতা ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্যের তদারকিতে নিযুক্ত আছেন। ব্রহ্মার অসুর-বংশীয়েরা মধ্যে মধ্যে শাসনকার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই অসুরেরা "পঞ্চশীলের" মান-মর্য্যাদা মানে না, আপোষ-মীমাংসায় ভূর্ভুর্ব্ব-লোকের বিস্তৃত ভূখণ্ড তাদের দেওয়া সত্ত্বেও যখন তারা স্বর্গরাজ্যে হানা দিয়ে ধনরত্ন, স্ত্রীকন্যা হরণ করে তখন অহিংসপন্থী দেবগণও যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। পুরাণে পড়ি, একবার অসুরদের ভারী ভারী মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে দেবগণের পুরাকালীন অস্ত্রাদি হীনপ্রভ হয়েছিল। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পুত্রকলত্র, বিত্ত ও রাজ্য ফেলে পালিয়ে বেড়ান। অবশেষে ব্রহ্মার পরামর্শে উত্তর-হিমালয়ের প্রসিদ্ধ 'বিজ্ঞানী' দধীচির আশ্রমে আসেন ও তাঁর পূত অস্থি এবং প্রাণ-বিনিময়ে নির্ম্মিত বজ্রনামা 'এটম বোমা' সংগ্রহ করে অসুরদের মার দিয়ে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ঋষি এমনি এক যুদ্ধের পরবর্ত্তী দৃশ্য বর্ণনা করেছেন।

অসুরদের পরাভূত করে দেবগণ সুরপুরে সুখাসীন; নৃত্যগীত-বাদ্য ও সোমরস বণ্টনের আনন্দে সকলে নিজ নিজ বলবীর্য্য ব্যাখ্যানে প্রমত্ত; "ব্রহ্মদেবেভ্যো বিজিগ্যে" ব্রহ্মই যে দেবগণের

বিজয়ের মূলে, এই সত্য একেবারে বিস্মৃত, অহঙ্কারে মাতোয়ারা দেবগণ আকাশে প্রোজ্জ্বল দিব্য এক যক্ষমূর্তি দেখলেন। তাঁরা অগ্নিকে বললেন, 'জাতবেদ' জেনে এসো কিমিদং যক্ষং। অগ্নিদেব ত্বরন্ত যক্ষসমীপে উপস্থিত হলেন। যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, কো অসি? অগ্নি বুক ফুলিয়ে বললেন, আমি জাতবেদ, চরাচরে প্রসিদ্ধ অগ্নি। যক্ষ বললেন, কিং বীর্যং? অগ্নি উত্তর দিলেন, আমি চরাচর বিশ্ব পুড়িয়ে ছারখার করতে পারি। যক্ষ একগাছি তৃণ অগ্নির সম্মুখে রেখে বললেন, এই তৃণটি দহন কর। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও অগ্নিদেব তুচ্ছ একগাছি তৃণ দগ্ধ করতে অপারগ হয়ে দেবসভায় ফিরে হেঁটমুখে বললেন, ঐ দিব্য যক্ষকে জানা আমার শক্তিতে কুলোয় নি। তখন পবনদেবকে পাঠানো হ'ল। তিনিও প্রভঞ্জন-মূর্তিতে উনপঞ্চাশ বায়ু প্রয়োগ করে তৃণটিকে একচুল স্থানভ্রষ্ট করতে পারলেন না। শেষে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, হে মঘবন, আপনিই জেনে আসুন, কিমিদং যক্ষং। শশব্যস্তে ইন্দ্রদেব সেস্থানে যেতেই যক্ষ অন্তর্দ্ধান করলেন ও সেই আকাশে বহু শোভমানা হৈমবতী উমা আবিভূ তা হলেন। ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, (ভগবতী) কে এ যক্ষ এসেছিলেন? 'সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহিয়ধ্বম ইতি।' (ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী শঙ্করী) ইন্দ্রকে জানালেন, উনিই ব্রহ্ম, ওঁর মহিমাতেই তোমরা বিজয়ী হয়েছ।

শ্লোকে নিবদ্ধ ঐ বাক্যগুলিকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। ভগবতীর দর্শনমাত্রেই ইন্দ্রদেবের হৃদয়ে পরাজ্ঞান স্ফূর্ত হয়েছিল। পরবর্তী ৪।৪ ও ৪।৫ শ্লোকদ্বয়ে যে বিদ্যুৎ-ঝলকের উল্লেখ আছে তা থেকে অনুভব করা যায় যে, শ্রুতিতে ছন্দোবদ্ধভাবে বর্ণিত ব্রহ্মদর্শন ও পরাজ্ঞান লাভ এক নিমিষে সংঘটিত হয়, পার্থিব সময়ের মাপ-কাঠিতে উহা গণনা করা উচিত নয়। লেখকের গীতানুরাগী এক প্রবীণ বন্ধুর দৃঢ় প্রত্যয় যে, শ্রীভগবদগীতার প্রত্যেক শ্লোক হুবহু ঐ ছন্দাকারে শ্রীভগবানের মুখপদ্ম থেকে বিনিঃসৃত হয়েছিল। কেউ যদি অনুযোগ করেন যে, ধনুর্দ্ধরাগ্র যোদ্ধারা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্ত, তখন এ দুই-আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী প্রশ্ন ও উত্তর কি সহজবুদ্ধি গ্রহণ করতে পারে? ভাবের আতিশয্যে তিনি বলেন, "শ্রী ভগবানের অচিন্ত্য মহিমায় সকলি সম্ভবে।" মাত্র ১৫.২০ মিনিট ঝিমানোর মধ্যে পুরা এক জীবননাট্য অনেকেই দেখেছেন। তবে যোগারূঢ় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিমেষমধ্যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগের গূঢ়মর্ম এবং বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে তাঁর প্রিয়তম সখার ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ও অজ্ঞান মোহ নষ্ট করেছিলেন, তা বুঝতে বাধা কোথায়? 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো এলে ঘরময় তা ছড়িয়ে পড়ে, একটু একটু করে অন্ধকার দূর হয় না।' শান্ত, সমাহিত ধ্যান-পরায়ণ ঋষিদের হিরণ্ময় কোষে যে সমস্ত ভগবদ্ চিৎকণ 'ব্যুত্থিত' (প্রকাশিত হয়েছিল), তাই গুরু-শিষ্যপরম্পরায় শ্রুত এবং অর্বাচীন কালে মুদ্রিত ছন্দোবদ্ধ উপনিষদাবলী।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়—১। করুণৈক সিন্ধু শ্রীভগবান্ তাঁর ভক্ত দেবগণকে মিথ্যাভিমানরূপ পতন হতে রক্ষা করবার জন্য যক্ষরূপে এসেছিলেন। ২। সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত পুরুষোত্তম ভগবান্ দেবগণকে তাঁর বলবীর্যের ক্ষুদ্র একটু নমুনা প্রত্যক্ষ করিয়েই অন্তর্হিত হলেন। এতদ্বারা দেবগণের অহমিকা একেবারে চূর্ণ হয়েছিল। ৩। যক্ষ-রূপী ব্রহ্মের অন্তর্দ্ধান ও হৈমবতী উমার আবির্ভাব এবং ইন্দ্রকে দিব্যজ্ঞান প্রদান দ্বারা শ্রুতি কি ইঙ্গিত করেছেন যে, আদ্যাশক্তি ভগবতীই জীবকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন; প্রধান উপনিষদগুলির কোথাও এই ভাবের ইঙ্গিত পাই নি। মুণ্ডকের প্রথম শ্লোকেই গৃহী ব্রহ্মাকে 'সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিদ্যামে'র উপদেষ্টা বলা হয়েছে। এ অবশ্য 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যা', আরণ্যক কৃষ্টির পরিচয়; জীবকে দর্শন দ্বারা পরাবিদ্যা প্রদানের আলোচনা নয়।

পরবর্তী দুই শ্লোক কেনোপনিষদের বৈশিষ্ট্য। ভগবদ্ দর্শনের যে সাঙ্কেতিক আদেশ সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে, তার তাৎপর্য্য অনুভবসাপেক্ষ: ৪৪ শ্লোক ইষ্টদর্শন ও তদনুভূতির সূত্র—"তস্য এষ আদেশো, যৎ এতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ, ইতি ইত্ ন্যমীমিষত আ, ইতি অধিদৈবতম।" অর্থ: এ বিষয়ে এই আদেশ, এটা বিদ্যুৎ চমকানোর মত, যথা আঁখির এক পলক-মত; এ আধিদৈবিক। ব্রহ্মদর্শন—"বিজলী চমকে, অরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।" নেত্রের এক পলক মাত্র স্থায়ী এই দর্শন। এর পরের ৪.৫ শ্লোকে দর্শনান্তে পরম ব্যাকুলতা ও বিরহের অভিব্যক্তি সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে। "অথ অধ্যাত্মং, যৎ এতৎ গচ্ছতি ইব চ মনঃ অনেন চ এতৎ উপস্মরতি অভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ।" অর্থ: এখন আধ্যাত্মিক, যে, মন যেন চলছে, নিরন্তর স্মরণ করছে, অনেন (এই মন দ্বারা) সঙ্কল্প (তীব্র আকাঙ্ক্ষা) জাগে। অদর্শন জনিত 'তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা' মাত্র পাঁচটি শব্দে সারাজীবনের বিরহবেদনার রূপ ফুটে উঠেছে।

দুইটি বিষয়ে এখানে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ইষ্ট ও ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "মাকে সর্বদা দর্শন করি, কত রূপে, কত বর্ণে। কিন্তু অখণ্ডের ঘরে যখন চলে যাই, মনবুদ্ধির পারে, আরও উর্দ্ধে, তখন জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সব একাকারে লয় হয়। সে অবস্থা থেকে বহু স্তর নীচে নেমে তবে মনবুদ্ধির লোকে ফিরে আসি। আরও নেমে এলে তবে তোদের কিছু জানাতে পারি।" রূপ ও অরূপ, সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মদর্শনের এমন সরল সহজ বিবৃতি শাস্ত্রেও দুর্লভ!

শ্রুতি দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য, তস্যৈ স আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং।' (কঠ ২।২৩; মুণ্ডক ৩।২।৩)। ইনি যাকে বরণ করেন, এঁর দ্বারাই লভ্য; তাকেই পরমাত্মা নিজ তনু (যথার্থ স্বরূপ) জানিয়ে দেন। প্রবচন, মেধা, বহুশ্রুতি এমন-কি কেবল তপস্যার দ্বারা তিনি লভ্য নন। ঋষি শ্বেতাশ্বতর 'তপঃ প্রভাবাৎ, দেবপ্রসাদাৎ চ' ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

নিরাধারা ব্রহ্মে স্থিত জীবের পক্ষে সম্ভব নয়, যে দেহপাত হয়, এ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ দেব অপিচ শ্রুতি, স্মৃতি বলেছেন। চকিতের ন্যায় যক্ষ ও হৈমবতী উমার রূপদর্শনের উল্লেখ এখানে আছে। ব্রহ্ম-দর্শন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, 'ব্রহ্ম সাগরের দর্শন, স্পর্শন বা এক গণ্ডুষ জলপান করলে জীব অমর হয়ে যায়, দিব্য-জ্ঞানে সমাহিত থাকে।' "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।" অখণ্ডের ঘরে রূপের কল্পনা নাই, জ্যোতির উল্লেখ আছে। 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ম্ অগ্নিঃ। তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (কঠ ২।২।১৫)। অর্থাৎ, যে আলো বা জ্যোতির জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয় প্রদান করে, সূর্য্য-চন্দ্র তারাপুঞ্জ-বিদ্যুৎ-অগ্নি প্রভৃতি যে আলো প্রকাশ করে, ব্রহ্মরূপের কণামাত্র নিয়ে সে-সব উদ্ভাসিত, প্রকাশিত। ভাষায় সেই দিব্যরূপের বর্ণনা ব্যর্থই হবে।—তিনি যখন যক্ষ, উমা, অথবা ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত কোন মূর্ত্তি গ্রহণ করে সাধককে কৃপা-পূর্ব্বক দর্শন দেন, তখন তাও পার্থিব কোন আলো বা জ্যোতির সদৃশ কি তুল্য হতে পারে না। ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে, 'নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী বিনিন্দিত।' একজন লিখেছেন, 'শত চন্দ্রোদ্ভাসিত পুঞ্জী-ভূত জ্যোৎস্নাসাগর।' বাউল গানে আছে, 'প্রভাত-সন্ধ্যায় দীপ্যমান করে।' "সো প্রভু যব আওল, সকল আঁধিয়া শ্যাম ভেল, গুপত কুছু না রওল, মেরা পরাণ পুতল ভরল। মুঝে পাগল বনাওল—নিঠুর নীমিখে মিলাওল।" একজন লিখেছেন,..."সেই চিদানন্দ ঘন শ্যামসুন্দর, আর সেই শ্যাম শ্যাম অঙ্গকান্তি—চিত্তাকাশ পরিব্যাপ্ত করেছিল। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, তথা দ্বৈত-অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত—সকল তত্ত্ব ঐ এক অনুভূতিতেই পরিস্ফুট। আছে মাত্র ঐ রূপ-বিগ্রহ, বাকি সব তাঁরই অঙ্গকান্তি, যতদূর যতদূর দৃষ্টি চলে ঐ শ্যাম শ্যাম আভা। উহাই অব্যক্ত মূলাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। "অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ।" ইনি 'শ্যাম' শব্দে ভাব ব্যক্ত করেছেন।

দ্রষ্টার সমীপে তখন কোন গোপন রহস্য নাই; প্রাণপুত্তলী আনন্দে, দিব্যসত্তায় ভরপুর। ক্ষণিকের এই দর্শন সারাজীবনের হাসি-কান্না ও বিরহে পর্য্যবসিত হলেও 'ঐ মধুরং মধুরং বপুরপি মধুরং' দিব্য স্মৃতি জীবকে 'অভীক্ষ্ণং উপস্মরতি' নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ রাখে। এই চকিত দর্শন যে মনবুদ্ধির কল্পনা নয়, ওদের এলাকার বাইরে, তা অচিন্ত্য, অব্যক্ত রূপমাধুরী এবং জীবনব্যাপী অদর্শনে ও ব্যর্থ প্রয়াসে প্রতীত হয়। 'আমি না ভাবিতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।' সেই শ্যামশ্যাম আভা মনোময়—বিজ্ঞানময় কোষ ছাপতে পারে না, শত সাধনায়ও ফুটে উঠে না।

এর পরে ৪,৬ শ্লোকে ব্রহ্মোপাসনার প্রকরণ-স্বরূপ, প্রাণি-মাত্রেরই প্রিয়তম ও প্রাপনীয় এই ব্রহ্মকে 'তদ্বন' নামে উপাসনা করবার উপদেশ দিয়ে বলেছেন, জীব মাত্রেই তাঁকে চায়। অতএব ব্রহ্মদর্শন, নিরন্তর উপস্মরণ ও উপাসনা-পদ্ধতির বর্ণনা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। উপসংহারে, শিষ্য পুনরায় বলেছেন, গুরুদেব আমাকে উপনিষদ উপদেশ করুন। ঋষি উত্তরে জানালেন, তোমাকে রহস্যময়ী ব্রহ্মবিদ্যা বলেছি, তুমি গ্রহণ করতে পার নাই। এ তপ, দম, কর্ম্ম, বেদ বেদান্ত জ্ঞানে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ, অপাপবিদ্ধ হবে তখন অন্তে স্বর্গলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

মহিলার কৃতি

হাপাভেসির রেক্টরের পত্নী মিসেস নোরা পয়হোনেন এমন একজন কৃতী মহিলা যিনি গল্পগুজবে সময় কাটান না, কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লইয়া সকল সময় ব্যাপৃত থাকেন।

ফিনল্যাণ্ডের এই কৃতী মহিলা সম্পর্কে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হেলসিঙ্কির একটি পত্রিকায় এ ধরনের উক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। রেক্টরের পত্নী কর্তৃক গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং উদ্যান-রচনা-বিদ্যা শিক্ষা-দানকল্পে প্রতিষ্ঠিত রমণীয় বাগান এবং জোত-সমন্বিত "হাপাভেসি ডোমেষ্টিক সায়েন্স স্কুল" নামক সংস্থাটির কাজ এখনো পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। বৎসর দুই পূর্ব্বে রাষ্ট্র ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন তাঁহার সমশ্রেণীয়া নারী-দের জীবন ছিল গৃহকোণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী এবং সূচিশিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন রেক্টরের পত্নীর পক্ষে ফিনল্যাণ্ডের উত্তর অঞ্চলে উদ্যান-রচনা এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মত অভিনব উদ্যোগে হাত দেওয়া কেমন করিয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তৎকালে অবশ্য অনেক শিক্ষিত পরিবারের কন্যারা সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য প্রবল প্রেরণা অনুভব করিতেছিলেন। গোড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইবার ইচ্ছা ছিল লপেরির রেক্টরের কন্যা নোরা পয়হোনেনের, কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে হইল। অতঃপর এই কারেলিয়ান তরুণী পরিণীতা হইলেন। বিবাহের অনতিকাল পরেই তাঁহার স্বামী ওস্ট্রোবোথনিয়ার হাপাভেসিতে রেক্টরের পদ লাভ করেন।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অনেক দিক দিয়াই ছিল দরিদ্র, আর রন্ধন-বিদ্যায় তারা ছিল কারেলিয়া এবং পূর্ব্ব ফিনল্যাণ্ডের বাসিন্দা-গণ অপেক্ষা অধিকতর অনগ্রসর। ওখানে রান্নাবান্নায় যে স্বল্প-পরিমাণ তরিতরকারী ব্যবহৃত হইত তাহা দেখিয়া ধর্ম্মযাজকের এই

রচনারত নোরা পয়হোনেন

তরুণী বধূ নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। শালগম ও গোল আলু ছাড়া আর কিছুর ব্যবহার তাহারা জানে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। নোরা পয়হোনেন ইহার প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন এবং উত্তর অঞ্চলের এমন দূরবর্তী একটি জেলায় তরিতরকারী ও ফলমূল উৎপাদন-কার্য্যে অগ্রণী হইলেন যেখানকার লোকেরা তাহাদের এলাকায়ও যে তরিতরকারীর

প্রচুর ফলন হইতে পারে একথা বিশ্বাস করিতে চাহিত না। আজিকার দিনে কিন্তু ওষ্ট্রোবোথনিয়ার অধিকাংশ পরিবারের খাদ্য—মুখ্যতঃ শূকর মাংসের 'সসে'র সঙ্গে গোল আলু, মাংস এবং গোল আলু অথবা দুধ এবং গোল আলু মাত্র এই কয়টি উপকরণেই পর্য্যবসিত নহে।

শ্রীমতী পয়হোনেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হাপাভেসি রেক্টরিতে তাঁর স্বগৃহে প্রথম শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠিত করেন—এটি চৌদ্দ বৎসরকাল এখানেই ছিল। অবশেষে পয়-হোনেন-পরিবার কর্ত্তৃক হাপাভেসির আলাম্মা জোতটি ক্রীত হয় এবং ইহার গড়ানে জায়গায় নোরা পয়হোনেন একটি রমণীয় উদ্যান তৈরি করেন। উহাতে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তুষার-কঠিন জামজাতীয় (berry) ফলের ঝোপ এবং রকমারি আপেল ফলের গাছ জন্মানো লইয়া পরীক্ষণ চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস প্রায়শঃই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইত, অবশ্য মাঝে মাঝে সাফল্যলাভও করিতেন তিনি। কিন্তু কখনো তিনি হতাশ হইতেন না এবং ভগবানের সাহায্যের উপর তাঁহার বিশ্বাসও শিথিল হইত না। তিনি যখন প্রথম এখানে আসেন তখন আলাম্মা জোতে ছিল একটি মাত্র গাছ যাহা আজও প্রধান অট্টালিকাটিকে দান করে স্নিগ্ধ ছায়া। এখন উদ্যানের শোভাবর্দ্ধক অসংখ্য গাছ এবং বনঝোপ ছাড়া ফলের বাগানে আছে প্রায় দুই শত ফলবান বৃক্ষ আর তৃণাচ্ছাদিত ও কৃত্রিম উত্তাপে রক্ষিত উদ্ভিদ-নিকেতনে (greenhouse) জন্মাইতেছে দ্রাক্ষালতা। এখন নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের সবগুলা গৃহেরই লাগাও আছে অন্ততঃ কয়েকটি 'বেরি' ঝোপ এবং ষ্ট্রবেরি উৎপাদনের ক্ষুদ্র একখণ্ড জমি; আর কন্দমূলের চাষ তো হইয়া দাঁড়াইয়াছে অতি সাধারণ ব্যাপার। যে ওষ্ট্রবোথনিয়ার লোকেরা সহজে 'ঘাড় নোয়াইতে চায় না, 'ঘাস-পাতা' আহারে তাহাদের রুচি জন্মাইতে গিয়া গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত কন্যা এবং তরুণী বধূদের অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

বিগত শতাব্দীতে হাপাভেসি রেক্টরিতে উদ্যানরচনারত মেয়েদের কোদাল চালনা এবং জলপাত্র বহন

পরবর্ত্তীকালে ফিনল্যাণ্ডের সকল স্থান হইতে শিক্ষার্থিনীরা আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছে এই প্রতিষ্ঠানে। ফলে, শালগম এবং গোল আলু ছাড়া অন্যান্য তরিতরকারীও যে ফিনল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতে পারে এই জ্ঞান প্রসারলাভ করিয়াছে। কতিপয় শিক্ষার্থিনী আসিয়াছিল সুইডেন হইতে। ক্রমে ক্রমে সেণ্ট পিটার্সবার্গ এবং ষ্টকহোমে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনসমূহে বিদ্যালয়টি পুরস্কার, এমনকি প্রথম পুরস্কার পর্য্যন্ত লাভ করিতে লাগিল। হাপাভেসির প্রদর্শিত ফলমূলাদির প্রতি সাধারণের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইল দুইটি কারণে। প্রথমতঃ সেগুলি উত্তর অঞ্চলে উৎপন্ন এবং দ্বিতীয়তঃ গুণের দিক দিয়াও অতি উৎকৃষ্ট। নিঃসন্দিগ্ধরূপে ইহা প্রমাণিত হইল যে, কতকগুলি বিশেষ জাতের উদ্ভিদ ছাড়া, দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাসমূহের অনুরূপ সব্জী-বাগানের (kitchen-garden) চারাগাছ উত্তর ফিনল্যাণ্ডেও জন্মায় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলের গাছ লইয়া হাপাভেসি স্কুলে যে পরীক্ষণ চালানো হয়, উত্তর ফিনল্যাণ্ডে তাহাই ঐ ধরনের প্রথম পরীক্ষণ। বারংবার ব্যর্থতার পর অবশেষে সাফল্য অর্জ্জিত হইল। পরীক্ষণকার্য্য কিন্তু শেষ হয় নাই, এখনো তাহা সমান উৎসাহের সঙ্গেই চলিতেছে। ১৯৩৬ সনে কোপেন-হেগেনে অনুষ্ঠিত বিরাট ফল প্রদর্শনীতে উক্ত বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত আপেলগুলি সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

যে বিদ্যালয়টির ছাত্রীসংখ্যা গোড়ায় ছিল আট জন মাত্র, আজ তাহা পরিণত হইয়াছে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে—এখন এখানে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এবং কতিপয় গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টির এই উন্নয়নের জন্য স্বভাবতঃই যেমন ইহার প্রতিষ্ঠাত্রীকে তেমনি উত্তরসাধকদিগকে আর্থিক দিক দিয়া বিরাট ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রেক্টর-গৃহিণী উদ্যান-রচনা বিষয়ে তাঁহার উৎসাহকে সঞ্চারিত করিয়া দেন আপন সন্তান-সন্ততির মধ্যে, তাদের দ্বারা আবার অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে তাঁর নাতি-নাতনীরা। কাজেই বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধান-গণ এবং ইহার শিক্ষক-শিক্ষিকারা হইতেছেন পয়হোনেন-পরিবারের

তৃতীয় 'পুরুষ'। শ্রীমতী পয়হোনেনের পরে প্রধান শিক্ষিকার পদে অধিষ্ঠিতা হন তাঁহার কন্যা মাইজু, তার পরে উক্ত পদ লাভ করেন তাঁর আর এক মেয়ে এলমা। এলমার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র মার্তি, তাঁর বিধবা পত্নী ইরজা পয়হোনেন বর্তমানে বিদ্যালয়টির শীর্ষস্থানীয়া। ইরজা পয়হোনেনের কন্যাদ্বয়—আন্না পয়হোনেন এবং আন্না-লিসা মালকাভারা এবং তাঁর স্বামী মারত্তি মালকাভারা এই তিন জনেই সম্প্রতি উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত আছেন। ইদানীং রাষ্ট্র তাহাদের মাহিনা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীমতী ইরজা পয়হোনেন বলেন যে, তাঁহার শাশুড়ীর আমলে

মাইজু এবং এলসা কর্তৃক 'বেক্টরি'তে উৎপন্ন বিরাট আকারের শশা প্রদর্শন

যখন প্রতিষ্ঠানের কর্ম-সম্প্রসারণকল্পে নূতন গৃহনির্মাণের এবং পুরনো ঘরগুলি মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিত তখন তাহাদিগকে প্রায়শঃই এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত যে, "ভগবানই করিবেন টাকাকড়ির ব্যবস্থা"। সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন হওয়ার যে আত্মপ্রসাদ তাহাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রণীদের একমাত্র পারিশ্রমিক। এলমা পয়হোনেন সম্বন্ধে এই ধরনের একটি পারিবারিক কাহিনী প্রচলিত আছে। "এই বৎসর এলমার পালা। তিনি পাইয়াছেন নূতন জুতার ফিতা আর একটি সাবানের ট্যাবলেট।"

বয়স্ক-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিনা মাহিনায় শিক্ষাদান, শিশুদের মধ্যে উদ্যান-রচনা সংক্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টা সংগঠন, নিজের প্রিয় গাছ-পালা সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত বক্তৃতাপ্রদান ইত্যাদি স্থানীয় অন্যান্য কল্যাণকর্মেও ছিল নোরা পয়হোনেনের ঐকান্তিক আগ্রহ। নিজের কন্যা মাইজুর সহযোগিতায় তিনি উদ্যান-রচনা সম্পর্কে সর্বদা ব্যবহারোপযোগী একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত করেন।

মিসেস পয়হোনেনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গোড়াকার দিকের ফলমূল ও তরিতরকারীর একটি প্রদর্শনী

আলাম্মার গ্রীনহাউস হইতে স্থানীয় গৃহিণীরা লইয়া আসেন টম্যাটো এবং শশার চারাগাছ, ঈষৎ বিব্রত চাষীরা "মায়ের দিনের" জন্য কিনিতে আসে গোলাপফুলের শুকনো পাপড়ি, ওদিকে বিদ্যালয়ের লিলি অব দি ভ্যালি আর সুগন্ধি টিউলিপ পুষ্পসমূহ সুশোভিত করে নিকটবর্তী শহরগুলির পুষ্প-ব্যবসায়ীদের গৃহের বাতায়নকে। হাতে ষ্টিক এবং মাথায় গরমকালের টুপী-পরা নোরা পয়হোনেনকে আজ আর তাঁর প্রিয় গ্রীষ্মকালীন উদ্যান-ভূমিতে বিচরণ করিতে এবং জোতের সহকারীকে বৃক্ষরোপণের জন্য নূতন স্থান নির্দেশ করিতে (তিনি অনবরত তাঁর বাগানের রূপের অদলবদল করিতেন) দেখা যায় না সত্য, কিন্তু তাঁর কৃতি-সমূহের ফল আজ অনুভূত হইতেছে সমগ্র ফিনল্যাণ্ড জুড়িয়া।

ন. ভ.

সর্প-দংশন-চিকিৎসা

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ

সাপ একটি নিছক বাস্তব পদার্থ। কিন্তু এ সত্ত্বেও সর্প-দংশন-চিকিৎসার নামে কত বুজরুকিই না আমাদের দেশে প্রচলিত আছে! কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, মশায়, মন্ত্রে না বিশ্বাস করলেন, কিন্তু দ্রব্যগুণ? দ্রব্যের গুণে বিশ্বাস করব না, কেমন করে বলি! কিন্তু দ্রব্যগুণ বলতে 'দ্রব্যের গুণ' ত বোঝায় না—বোঝায় দ্রব্যের অলৌকিক গুণ, অর্থাৎ যে গুণ এ দ্রব্যে নেই সেই গুণ। অন্ততঃ সাধারণ্যে এই অর্থে দ্রব্যগুণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাজেই দ্রব্যগুণ শব্দটির মারপ্যাঁচের আড়ালে অনেক কিছু বুজরুকিই গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

এই সব বুজরুকিকে অবশ্য পুষ্ট করছে সাপুড়েরা—যারা সাপ-খেলা দেখিয়ে দু'পয়সা রোজগার করে। বিষ-দাঁতওয়ালা কোন সাপের ঘাড় চেপে ধরে সেই সাপ যদি কেউ জনসাধারণকে দেখায়, তা হলে তারা খুব বিস্মিত হবে না। তারা ভাবে, ঘাড় চেপে রাখা হয়েছে—সুতরাং সাপ কামড়াবে কেমন করে। কিন্তু যদি কোন সাপকে ছেড়ে দিয়ে খেলা দেখানো হয়, সেই সাপের বিষ-দাঁত ভাঙা থাকলেও যে খেলা দেখায় তাকে জনসাধারণ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করে। আসলে কোন্ সাপের বিষ-দাঁত আছে, কোন্ সাপের বা বিষ দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার ধৈর্য্য বা সময় আমাদের নেই। উদ্যতফণা বিষধর সাপ দেখে আমরা ভয় পাই। সুতরাং সেই সাপকে নিয়ে যখন কেউ খেলা দেখায়, তখন আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না—তাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করি এবং তার নানাবিধ বুজরুকিতে বিশ্বাস করি।

সর্প-দংশন-চিকিৎসার নামে আমাদের দেশে যে সমস্ত সংস্কার প্রচলিত আছে, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা অবশ্য এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তা সত্ত্বেও এগুলি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, সর্প-দংশন-চিকিৎসার একটি বড় কথা হ'ল সময়। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। সাধারণতঃ দেখা যায়, কাউকে সাপে কামড়ালে ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক সময় নষ্ট করা হয়। ফলে শেষ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করা হলেও সর্পদষ্ট ব্যক্তি বাঁচে না।

এন্টিভেনিন ইন্‌জেক্‌শন

অনেকেই প্রশ্ন করেন, সর্পাঘাতের সত্যি সত্যি কোন ঔষধ আছে কিনা? এ প্রশ্ন অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ কিছুদিন আগেও সর্পাঘাতের কোনও কার্য্যকরী ঔষধ ছিল না। কিন্তু এন্টিভেনিন ইন্‌জেক্‌শন আবিষ্কৃত হওয়ার পর সে কথা আর বলা চলে না।

একটি সুস্থ ও সবল ঘোড়ার পায়ে কয়েক মাস ধরে সইয়ে সইয়ে অতি অল্প পরিমাণ সর্প-বিষ ইন্‌জেক্‌শান দেওয়া হতে থাকে। মারাত্মক পরিমাণের সর্প-বিষ না দেওয়াতে ঘোড়াটি মরে না—বিষক্রিয়ার কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায় মাত্র। প্রতি বারে অবশ্য বিষের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, মারাত্মক পরিমাণের সর্প-বিষও ঘোড়াটিকে কাবু করতে পারছে না! এর কারণ সুস্পষ্ট। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিতভাবে সর্প-বিষ ইন্‌জেক্‌শন করার ফলে ঘোড়াটির রক্তে জন্মে বিষসহন ক্ষমতা। ফলে, মারাত্মক পরিমাণের বিষ ইনজেক্‌শন করলেও ঘোড়াটির কিছু হয় না। এইরূপ ঘোড়ার রক্ত থেকে সর্পাঘাতের একমাত্র কার্য্যকরী ঔষধ এন্টিভেনিন তৈরী করা হয়। আমাদের দেশে বোম্বাইয়ের হপকিন ইনষ্টিটিউটে (Haffkine Institute) এই ঔষধ তৈরির ব্যবস্থা আছে।

বিষের ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে বিষধর সাপগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: (ক) স্নায়ুর উপর প্রধানতঃ যাদের ক্রিয়া এবং (খ) রক্তের উপর প্রধানতঃ যাদের ক্রিয়া। আগে এই দুই জাতের সাপের জন্যে দু'রকম এন্টিভেনিন তৈরি করা হ'ত। সেক্ষেত্রে অসুবিধা ছিল যে, ইন্‌জেক্‌শন দেবার পূর্ব্বে কোন্ জাতের সাপ কামড়েছে তা জানা দরকার হ'ত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দু' জাতির সাপেরও জন্যে একই ইন্‌জেক্‌শন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

তরল অবস্থায় এন্টিভেনিনের কার্য্যকারিতা বেশী দিন থাকে না। সেইজন্যে পল্লী-অঞ্চলে এন্টিভেনিন সংগ্রহ করে রাখার বিশেষ অসুবিধা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এন্টিভেনিনকে শুষ্ক করা সম্ভব হয়েছে। তাই এই ঔষধের কার্য্যকারিতা বহু দিন পর্য্যন্ত অটুট থাকে। ইনজেক্‌শন দেবার সময় শুষ্ক এন্টিভেনিন পরিস্রুত জলে মিশিয়ে নিতে হয়।

সর্ব্বতোভাবে ভাল ফল পেতে হলে সর্পদষ্ট ব্যক্তির শিরার মধ্যে এন্টিভেনিন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া দরকার। কিন্তু শিরার মধ্যে ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া বিচক্ষণ চিকিৎসক ব্যতীত নিরাপদ নয়। এন্টিভেনিন ঔষধ আছে অথচ আশেপাশে নির্ভরযোগ্য কোন চিকিৎসক নেই—এক্ষেত্রে কি করা যাবে? ত্বকের নীচেই এন্টিভেনিন ইন্‌জেক্‌শন করা উচিত। ত্বকের নীচে ইন্‌জেক্‌শন তত ফলপ্রসূ না হলেও অনেক উপকার

করে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি নিজেও ত্বকের নীচে এন্টিভেনিন ইন্‌জেকশ্যন দিতে পারে—অবশ্য অচেতন হয়ে পড়লে আলাদা কথা।

অতীত সংস্কারের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ এবং এন্টিভেনিন ইন্‌জেকশ্যনের দুষ্প্রাপ্যতা—এই দুই কারণে আমাদের দেশে বহু সর্পদষ্ট ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টেরও কর্ত্তব্য আছে। সুদূর পল্লীঅঞ্চলে এন্টিভেনিন ইনজেকশ্যন যাতে সুলভ হয় এবং পল্লীবাসীরা এর ব্যবহারে যাতে সচেতন হয়ে উঠে, সে সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সাপ কামড়ায় খুব আকস্মিকভাবে। সুতরাং হাতের কাছে বা আদৌ এন্টিভেনিন ইন্‌জেকশ্যন পাওয়া না যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত :

(ক) বাঁধন : সাপের বিষ রক্তের সঙ্গে দেহের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং কাউকে সাপে কামড়ালে দষ্ট স্থানের কিছু উপরে তৎক্ষণাৎ একটি জোর বাঁধন দেওয়া উচিত। আরও কিছু উপরে দ্বিতীয় একটা বাঁধনও দেওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ সরু শক্ত দড়ি জোরে বেঁধে বাঁধন দেওয়া হয়। শণের দড়ি হলে ভাল হয়। রবারের সরু নল পাওয়া গেলে সবচেয়ে ভাল। অভাবে নিজের কাপড় বা পৈতা ছিঁড়ে বা রুমাল দিয়ে বাঁধন দেওয়া যেতে পারে। দড়ির বাঁধনকে অধিকতর সুদৃঢ় করার জন্যে একটি সরু কাঠ, উড পেন্সিল বা গাছের ডাল ইত্যাদি আড়াআড়িভাবে এ বাঁধনের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে পাক দেওয়া যেতে পারে। এরূপভাবে বাঁধন দিলে সর্পদষ্ট ব্যক্তির কষ্ট হতে পারে; কিন্তু সেকথা ভাবলে চলবে না। সোজা কথা, বাঁধন এমনভাবে দেওয়া উচিত যে, দষ্ট স্থানের রক্ত দেহের হৃৎপিণ্ডে বা অন্যান্য স্থানে যেন ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

অবশ্য বাঁধন দিলেই হবে না। বাঁধনের দ্বারা অনেকক্ষণ রক্ত চলাচল বন্ধ রাখলে বাঁধনের নীচে পচ ধরতে পারে। এই কারণে দশ বা পনের মিনিট অন্তর তিন-চার সেকেণ্ডের জন্যে বাঁধন সামান্য আলগা করে দিতে হয়।

(২) কর্ত্তন : সাপ ছোবল মারার জন্যে দষ্ট স্থানে যে বিষ ঢোকে, যতদূর সম্ভব তা বার করে দিতে হবে। বিষ বার করতে হলে রক্ত বার করতে হবে—কারণ রক্তের সঙ্গেই বিষ বেরিয়ে আসবে। যে জায়গায় বিষদাঁতের দাগ দেখা যাচ্ছে, সে জায়গাটা ঢেরা চিহ্নের (×) আকারে সিকি ইঞ্চি লম্বা ও সিকি ইঞ্চি গভীর ভাবে কেটে দিতে হবে। সাধারণতঃ বিষদাঁতের দুটি দাগ দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক দাগের জায়গা অনুরূপভাবে কেটে দিতে হবে। কাটবার সময় সম্ভব হলে খেয়াল রাখা উচিত, হাতের উপর যে সূক্ষ্ম ঝিল্লী আছে তা অথবা কোন প্রধান রক্তবহা-নাড়ী যেন নষ্ট না হয়।

খুব ধারাল ছুরি, ক্ষুর বা সেফটি-রেজরের ফলা ইত্যাদি দ্বারা কাটা যেতে পারে। কাটবার আগে উহা আগুনে পুড়িয়ে বা ফুটন্ত গরম জলে কিছুক্ষণ রেখে শোধিত করে নিতে হয়—যাতে তার গায়ে কোন মারাত্মক জীবাণু না লেগে থাকতে পারে।

দষ্ট স্থানে সাপের বিষদাঁত অনেক সময় আটকে থাকে। বিষদাঁত তুলে ফেলা উচিত। বড় একগাছা চুল দষ্ট স্থানে টান করে বুলালে বিষদাঁত লেগে আছে কিনা বোঝা যাবে।

(৩) শোষণ : বিষদাঁতের দাগের জায়গা কাটার ফলে আপনা থেকে যে পরিমাণ রক্ত বেরোয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ রক্ত বার করা দরকার হয়ে পড়ে। শোষণের দ্বারাই এই অতিরিক্ত রক্ত বার করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শোষণের দ্বারা অতিরিক্ত রক্ত বার করা একান্ত আবশ্যক।

পায়ে বা হাতেই সাধারণতঃ সাপে দংশন করে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে বাঁধন দেওয়া সহজ। কিন্তু গলা, পিঠ ইত্যাদি জায়গায় সাপে কামড়ালে বাঁধন দেওয়া ত চলে না। সে ক্ষেত্রে শোষণের দ্বারা অতিরিক্ত রক্ত বার করা অপরিহার্য্য হয়ে উঠে।

অতিরিক্ত রক্ত বার করতে হলে চিকিৎসকদের দ্বারা ব্যবহৃত রক্ত-শোষণ যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া সবচেয়ে ভাল। কাঁচের বা ধাতুর তৈরী একটি ছোট পাত্রের সঙ্গে রবারের পাম্প যুক্ত থাকে। পাত্রটি দষ্ট স্থানের উপর উপুড় করে রেখে পাম্প টিপলেই দষ্ট স্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে ঐ পাত্রের ভিতর জমা হতে থাকে। সর্প-দংশন চিকিৎসার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে দু'রকমের পাত্র থাকা দরকার : (১) দেহের কোন সমতল অংশে সাপে কামড়ালে তার জন্যে প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাসের গোল মুখবিশিষ্ট পাত্র এবং (২) আঙুল ইত্যাদি দেহের কোন গোলাকার অংশে সাপে কামড়ালে তার জন্যে সরু ডিম্বাকার মুখবিশিষ্ট পাত্র।

দষ্ট স্থান থেকে রক্ত শোষণের জন্যে স্তন্য-শোষকযন্ত্রও (Breast pump) ব্যবহার করা যেতে পারে।

রক্ত-শোষণ-যন্ত্রের অভাবে রক্ত শোষণের জন্য কেউ কেউ নিম্নলিখিত দুটি উপায়ের একটির সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন : (১) একটি ছোট কাঁচের বা পিতলের গেলাসের ভিতর সামান্য স্পিরিট ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দষ্ট স্থানের উপর উপুড় করে জোরে চেপে ধরতে হয়। গেলাসটি দষ্ট স্থানে আটকে যায় এবং দষ্ট স্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে তার ভিতর জমা হতে থাকে। অথবা, (২) দষ্ট স্থানের পাশে আটা বা ময়দা দিয়ে একটা ছোট প্রদীপের মত তৈরি করে তার মধ্যে কর্পূর জ্বালিয়ে একটি গেলাস তার ওপর উপুড় করে জোরে চেপে ধরতে হয়। এ ক্ষেত্রেও গেলাসটি দষ্ট স্থানে আটকে যায়—এবং দষ্ট স্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে তার ভিতর জমা হতে থাকে। বলা বাহুল্য, খুব সতর্কতার সঙ্গে এ দুটি উপায়ের সাহায্য নেওয়া উচিত। কারণ সর্পদষ্ট ব্যক্তির গায়ের চামড়া পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

একটি কথা আমাদের খুব ভাল করে স্মরণ রাখা দরকার। সাপের বিষ প্রাণহানিকর হতে হলে সরাসরি আমাদের দেহের

রক্তের সঙ্গে মেশা দরকার। যে ব্যক্তির মুখে (দাড়ি ইত্যাদিতে) ও পাকস্থলিতে কোন ঘা বা কাটা নেই, সে যদি সাপের বিষ এমন কি খায়, তা হলেও তা তার পক্ষে মারাত্মক হবে না। রক্তে মেশবার আগে পেটের মধ্যে সাপের বিষ তার প্রাণহানিকর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

সর্প-বিষ সরাসরি রক্তের সঙ্গে না মেশা পর্যন্ত প্রাণহানিকর নয় বলে রক্ত-শোষণ-যন্ত্রের অভাবে কোন সুস্থ ব্যক্তি সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্ট স্থান চুষে রক্ত বার করে দিতে পারে। এতে তার কোনও ক্ষতি হবে না। সর্পদষ্ট ব্যক্তির কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া এই কাজের ভার নিতে পারেন। সাপ যদি এমন কোন জায়গায় কামড়ায় যে জায়গা সর্পদষ্ট ব্যক্তির নিজের পক্ষে চোষা সম্ভব, তা হলে সে কাজ সে নিজেও করতে পারে।

প্রত্যক্ষ ভাবে মুখ দিয়ে রক্ত চোষার লোকের যদি অভাব ঘটে, তা হলে দষ্ট স্থানে শিঙ্গা বা সরু বাঁশের নল বসিয়ে রক্ত শোষণ করে নেওয়া যেতে পারে।

বলা বাহুল্য, রক্ত শোষণের জন্যে উপরি-উক্ত যে কোন উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হোক না কেন, প্রয়োজনবোধে তার পুনরাবৃত্তি করা দরকার।

(৪) ব্যবস্থা : বেশ খানিকটা পরিষ্কার জলে পট্যাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের মাত্র কয়েকটা দানা গুলে যে পাতলা দ্রবণ (weak solution) তৈরি হবে,তা দিয়ে দষ্ট স্থান ধুয়ে ফেলা উচিত। সর্প-বিষ পট্যাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সংস্পর্শে এলে নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলে পট্যাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের গাঢ় দ্রবণ (অর্থাৎ একটু-খানি জলে অনেকগুলি দানা দিয়ে তৈরী দ্রবণ) অথবা পট্যাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানা দষ্ট স্থানে দেওয়া উচিত নয়। এতে ফল খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(৫) আশ্বাসদান : সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেন অত্যধিক ভীত না হয় অথবা ছুটাছুটি না করে। নতুবা রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে সর্পবিষ দেহের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেখানে নির্বিষ সাপে কামড়ালেও সর্পদষ্ট ব্যক্তি এত ভীত হয়ে পড়েছে যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির মন যাতে অস্থির হয়ে না পড়ে, সেই কারণে তাকে সব সময়ে আশ্বাস দিতে হবে। এই আশ্বাস দান যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়, কতগুলি বিষয় স্মরণ রাখলে তা বোঝা যাবে। ভারতবর্ষে প্রতি একশত সাপের মধ্যে মাত্র কুড়িটি মারাত্মক বিষধর সাপ। আবার এই কুড়িটি মারাত্মক বিষধর সাপের মধ্যে অর্দ্ধেক অর্থাৎ মাত্র দশটি সাপের কামড় শেষ পর্য্যন্ত প্রাণহানিকর হয়। তা হলে মোটামুটি বলা চলে, প্রতি একশত সর্পদষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নব্বই জন বিনা চিকিৎসাতেই বেঁচে উঠতে পারে। অবশ্য কেবল বাংলা দেশ ধরলে মারাত্মক বিষধর সাপের অনুপাত সামান্য বেশী—এবং সেই হিসাবে বিনা চিকিৎসায় সর্পদষ্ট ব্যক্তির বেঁচে উঠার অনুপাত সামান্য কম। যা হোক, আমাদের দেশে সাপের ওঝার বুজরুকির দাপট এত বেশী কেন, বুঝে দেখুন।

মারাত্মক বিষধর সাপ কামড়ালেই যে মানুষ মরতে বাধ্য এ কথা ঠিক নয়। ঠিকমত কামড়াতে না পারায় যে পরিমাণ বিষে মানুষ মরে, সে পরিমাণ বিষ ঢালবার সুযোগ সে নাও পেতে পারে। ঠিক পূর্ব্বে হয় ত সে অন্য কোন জন্তু-জানোয়ারকে কামড়েছে। সুতরাং যে পরিমাণ বিষে মানুষ মারা যায়, সে পরিমাণ বিষ তার বিষ-গ্রন্থিতে তখন নাও থাকতে পারে।

মারাত্মক বিষধর সাপে কামড়েছে কিনা, সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে এ কথা জানতে পারলে বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু তা জানবার উপায় এই প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে একটা কথা মনে গেঁথে রাখা যেতে পারে যে, যে-কোন সাপের কামড়ের পর দশ মিনিট কেটে যাওয়া সত্ত্বেও সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে বিষধর সর্প-দংশনের যদি কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তা হলে ঐ কামড়ে কোন ভয়ের কারণ নেই।

সর্পদষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাকে গরম চা বা কফি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অতি-উত্তেজক দ্রব্য কোন ক্রমেই দেওয়া উচিত নয়।

সর্প-দংশন-পেটিকা : আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে সাপের কামড়ে অনেক লোক মারা যায়। ভারতবর্ষ ছাড়া আরও কয়েকটি দেশে সাপের অভাব নেই। কিন্তু সে সব দেশে সাপের কামড় থেকে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়ে ফেলা হয়েছে।—সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থায়। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ কোন ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। আমাদের দেশের প্রত্যেক চিকিৎসকের উচিত, সঙ্গে একটা করে সর্প-দংশন-পেটিকা রাখা। এই সর্প-দংশন-পেটিকায় নিম্নলিখিত জিনিষ-গুলি থাকবে :—(১) খানিকটা রবারের সরু নল, (২) এক-পাশ ধারাল গুটিকয়েক সেফটি-রেজরের ফলা, (৩) অন্ততঃ দুটি এন্টিভেনিন অ্যাম্পুল, (৪) সর্প-দংশন-চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত রক্ত-শোষণ-যন্ত্র, (৫) পট্যাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কয়েকটি দানা, (৬) খানিকটা পরিস্রুত জল, (৭) খানিকটা ব্যাণ্ডেজ।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন সরকারী কর্ম্মচারী বা সেবাব্রতী ব্যক্তি কাজের প্রয়োজনে পল্লী-অঞ্চলে গেলেন। কিন্তু তাঁকে আর ফিরে আসতে হ'ল না—সাপের কামড়ে তাঁর প্রাণ গেল। সেদিন শিক্ষা-বিভাগের এক মহিলা কর্ম্মচারী পল্লী-অঞ্চলে কোন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যান—কিন্তু রাত্রেই সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সাপের কামড়ে মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি বেদনাদায়ক। এই সব সরকারী কর্ম্মচারী ও সেবাব্রতী ব্যক্তিরা পল্লী-অঞ্চলে সফরের সময় যদি একটি করে সর্প-দংশন-পেটিকা সঙ্গে করে নিয়ে যান, তা হলে হঠাৎ সাপে কামড়ালে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করতে পারবেন।

তুরুপ

শ্রীউমাপদ নাথ

বয়স হলেও বয়সের ছোঁয়া লাগে নি দেহে। চোখ রাঙিয়ে তাকে শাসিয়ে রাখেন গৌরীশঙ্করবাবু। স্বচ্ছ পাতলা কাচের কোমর-চাপা গ্লাসটার বাইরে থেকেও চোখে পড়ে ভিতরকার জাফরানি পানীয়ের রক্তচক্ষু আস্ফালন। সেটা শুধু পানীয়ের নয়, গৌরীশঙ্করবাবুরও ভিতরের জিনিষ।

বড় বাংলো-বাড়ীটার গেটে চকচকে ব্রোঞ্জের প্লেটে কালো হরফে লেখা রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর, সি. আই. ই। দুখানা কোলিয়ারী, তিনটে আয়রণ মাইন, দুখানা ভ্যানাডিয়াম ডিপজিট আর দুখানা কেওলিন কোয়ারির মালিক রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর। নামমাত্র পার্টনার অবশ্য আছে একজন সঙ্গে। রণছোড়লাল টেগাবিরিয়া, মাত্র চার আনার অংশীদার। কিন্তু চার আনার শরিক হলে কি হবে, রেসের সুদক্ষ ঘোড়ার কাছে রেসকোর্স যেমনি, টেগাবিরিয়ার কাছে ব্যবসাও তেমনি; নখের আয়নায় ধরে গিয়েছে হার-জিতের অমোঘ ইঙ্গিত।

টেগাবিরিয়ার সাফল্য তার নিজস্ব অর্জ্জন। নিজের মেহনতের সাক্ষী, অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফসল। প্রথম জীবনে বিয়ে করবারই ফুরসত হয় নি। বলেছে, আগে সাকসেস, তার পর সংসার। সাফল্যের অনেকখানি হাতের মুঠোয় এনে বিয়ে করল এই ক'মাস আগে চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে। বয়স বেশী হলেও বৌটি পেয়েছে নিখুঁত। সুশীলার বাবাও বরের বয়স দেখেন নি, দেখেছেন বরকেই। তাঁর দৃষ্টিতে ও বয়সটুকু কিছুই নয়, যখন সৌভাগ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যও রয়েছে সুন্দর।

সুশীলার বয়সও সেইজন্যে একটু বাড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন তার বাবা। চল্লিশ ছাড়িয়ে পঁচিশে পড়ে পাত্রস্থ হয়েছে সুশীলা। যৌবনের মধ্যাহ্নে জ্বলজ্বল করছে তখন। আয়ত চোখের স্বচ্ছ হ্রদ দুটোয় নীল নির্জ্জনতার নিমন্ত্রণ।

টেগাবিরিয়ার তবু ফুরসত নেই সেই নিমন্ত্রণ-লিপি পড়ে দেখবার, সেই স্নিগ্ধ সলিলে একটু অবগাহন করবার। মগজের মধ্যে কিলবিল করে শুধু কোলিয়ারি, কেওলিন, আয়রণ আর ভ্যানাডিয়াম। কিন্তু বৌকে সুপয়া বলতে বাধ্য হয়েছে টেগাবিরিয়া। বিয়ের পরই ত চার আনা থেকে পাঁচ আনায় উঠেছে তার শেয়ার। রায় বাহাদুর বলেছেন, তোমার সিনসিয়র মেহনতের মূল্য এটা।

এক আনা শেয়ার বাড়াটা বড় কম কথা নয়। ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে চাপাতে চাপাতে একটা খুশির শিস দিয়েছিল টেগাবিরিয়া। কাঞ্চনদেহ সুশীলার অঞ্জনপরা চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের ঠোঁটের আগায় একটু হাসির ভাব এনেছিল, তার সুলক্ষণের পুরস্কার দিয়েছিল—আদর করে নামের শেষ অক্ষরটাকে বাদ দিয়ে।

আর রায় বাহাদুর? তিনি হলেন আলাদা ধরনের মানুষ। যেমন গাড়ীর ঘোড়া আর যুদ্ধের ঘোড়া, খটাখট এগিয়ে চলে নাক দিয়ে তেজ আর খবরদারির তপ্ত হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে—পিছনে ভ্রূক্ষেপহীনতার ধূলিজাল উড়িয়ে দিতে দিতে। দু' একটি চোটকে থোড়াই কেয়ার করেন তিনি। ঘায়েল হয়েও বলেন, পরোয়া নেই—ঠিক হ্যায়।

'ওর' থেকে ভ্যানাডিয়ামটাকে নিংড়ে নিতে পারলে মস্ত একটা সমস্যার সমাধান হয়। সারা ভারতে ভ্যানাডিয়ামের ডিপজিট অতি অল্পই। রায়-টেগাবিরিয়ার হাতে তার প্রায় অর্দ্ধেকটাই। এই ভ্যানাডিয়ামকে কাজে লাগাতে পারলে কৃত্রিম উপায়ে কলঙ্কহীন ষ্টীল তৈরি করবার আর দরকার হবে না। ষ্টীলের চাইতেও হবে এটা অনেকগুণ বেশী মজবুত। উচ্চ ধরনের ইস্পাত-শিল্পের একটা লোভনীয় জীবন্ত সম্ভাবনাকে চোখের সামনে এগিয়ে ধরে রায়-টেগাবিরিয়ার ভ্যানাডিয়াম-রেঞ্জ দুটো।

রায় বাহাদুরের হাত থেকে ঐ ভ্যানাডিয়ামের পাহাড় দুটোকে ছিনিয়ে নেবার স্বপ্ন দেখল টেগাবিরিয়া। ব্যবসায়ীর মগজে ঝিলিক মেরে উঠল সর্ব্বগ্রাসী লোভাগ্নির একটা জ্বালাময় ঝলক। টেগাবিরিয়ার চোখের সামনে সোনার মিনার, আর মনে চিন্তার জট—বুদ্ধির মারপ্যাচ। খেয়াল-খুশির মানুষ রায় বাহাদুরকে হাতে আনা যাবে না তার কুটবুদ্ধির জালে ফেলে?

মার্কিন কোম্পানীর বিরাটাকার যন্ত্রপাতি সব এসে পড়ে রয়েছে, খাড়াও হয়ে গিয়েছে প্রায় অর্দ্ধেকটা কারখানা। 'ওর' হলেই এখন কাজ আরম্ভ করা যায়।

ভ্যানাডিয়ামের রকে ব্লাষ্টিং আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খাদানে খাদানে পাথর ভাঙবার কাজ চলছে অবিরাম। রায় বাহাদুর এখন বেশীর ভাগ সময় পাহাড়ের উপরেই থাকেন। নতুন ছোট বাংলো তৈরি হয়েছে সেখানে। দিনান্তে একবার নেমে আসেন নিচে। টেগাবিরিয়ার সঙ্গে কারখানার কনষ্ট্রাকশন একবার ঘুরে দেখেন। নিচের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ দেখবার ভার রয়েছে টেগাবিরিয়ার উপর।

তার সমগ্র বিচক্ষণতা নিয়ে কাজের তদারক করে চলেছে টেগাবিরিয়া। দিনরাত কাজ চলেছে। রাত্রেও বাসায় যাবার অবসর পায় না আজকাল, ষ্টাফ-কোয়ার্টার্সেই থাকার বন্দোবস্ত

করে নিয়েছে। নিজের আদরের জিনিষের মত করে গড়ে তুলেছে, ভ্যানাডিয়াম ওয়ার্কসটা।

রঙিন পানীয়ের ভিতর অতুলনীয় সৌভাগ্য আর কৃতিত্বের স্বপ্নজাল বুনে চলেন রায় বাহাদুর পাহাড়ের মাথায় বসে, আর নিচে টেগারিয়ার চোখে ক্ষুরতীক্ষ্ণ হয়ে উঠে বুভুক্ষার ইস্পাত-ঔজ্জ্বল্য। যেমন করেই হউক ভ্যানাডিয়ামটা তার চাই-ই।

ঘনায়মান সন্ধ্যায় পাহাড়ের গায়ের স্পাইরাল সড়কটা মনে হয় দীর্ঘকায় কুণ্ডলীকৃত একটা সরীসৃপের মত। সেই কুটিল নির্জ্জনতার গা বেয়ে বেয়ে সাবধানে উঠে আসে হাল্কা ষ্টেশন-ওয়াগনখানা। মাথায় উঠে আবার মুখ ঘুরে যায় গাড়ীর, রায় বাহাদুর বাংলোয় নেই। খবর পাওয়া গেল নিচে গিয়েছেন। কিন্তু নিচে আবার কোথায় গেলেন রায় বাহাদুর এই সন্ধ্যেবেলায়! বড় বাংলোয় গেলেন নাকি? বড় বাংলো মানে নেমপ্লেট-আঁটা সেই খাস গৃহ—গৃহিণী আর গৃহস্থালি রয়েছে যেখানে। কিন্তু গৃহের বেড়া ত অনেক দিনই ভেঙে ফেলেছেন রায় বাহাদুর, নিজের খেয়াল নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন খাস কুঠিতে। শুধু টেগারিয়া কেন, ছোট বড় কর্ম্মচারীরা সবাই জানে এ কথা। এমনকি বাজারের লোকেরাও।

গাড়ী ঘোরাতে ঘোরাতে সুভদ্রার দিকে একবার পিছন ফিরে তাকাল টেগারিয়া। তেমনি জড়সড় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে সুভদ্রা। ঘন মৌনের মধ্যে আর একটা ঘনত্ববিশেষ। টেগারিয়া ডাক দিল, সুভদ্রা!

সুভদ্রা তেমনি নিঃশব্দ। তার মনের গভীরে আরও নিঃশব্দে বয়ে চলেছে দুর্দ্দান্ত একটা ঝড়—একটা প্রচণ্ড বাত্যা-বিক্ষোভ। সেই কালবৈশাখীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে ও কেমন করে? যতই ছোট হোক, অনুভূতির শুঁয়োগুলো কি আর খসে পড়ে মানুষের মন থেকে! ওরও সতীত্ব আছে, নারীত্ব আছে, মন আছে—শুধু যৌবনবতী একটা জীবমাত্র নয়। ভাবনায় আড়ষ্ট হয়ে থাকে সুভদ্রা।

না খেয়ে খাদানে এসেছিল একদিন রঘু। খাদানে ভাত নিয়ে এসেছিল সুভদ্রা। স্বামীকে ভাত-জল খাইয়ে ঘরে ফিরে গেল, অজ্ঞাতে সারা অঙ্গে বয়ে নিয়ে গেল বড় সাহেবের দুর্দ্দম লোভদৃষ্টির তীক্ষ্ণ শরগুলো। জাতে যাই হোক না কেন, সুভদ্রা যেন রূপের খনি। প্রকৃতির মেয়ে সুভদ্রা অপ্রকৃতিস্থ করে গেল রায় বাহাদুরকে। তাঁর কাছে মনে হ'ল একখানা রূপোর খনির চেয়েও ওর দাম বেশী।

কথাটা প্রকাশ পেল টেগারিয়ার কাছে। ক্ষুধার্ত্ত টেগারিয়ার হাতে একটা সুযোগ উপস্থিত হ'ল যেন। যেন এসে গেল একখানা উঁচুদরের রঙের তাস। তুরুপ মেরে বাজি জিতে নেবার একটা সুযোগ ত বটেই।

অনেক তকলিফ করে ভেট যোগাড় করে এনেছিল আজ টেগারিয়া।

মালিকের মোটরে বসে হিমদেহ বিবশ-অঙ্গ ঐ সুভদ্রা! ডাকের সাড়া দিতে ইচ্ছে করল না তার। অসংখ্য প্রশ্নের ভিড়ে ওর মন তখন বিক্ষুব্ধ। একটা স্থবির আতঙ্কের মত এক কোণে দেহটাকে জড়ো করে রেখেছে মাত্র।

সামনেই ছোট একটা কালভার্ট। তলা দিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী। শুধু বর্ষাকালেই জেগে ওঠে, এখন কেবল শুক্‌নো খাদটা। কালভার্টের সামনেই খুব ঘোরালো একটা বাঁক। পাশ দিয়েই খাড়া খাত। ব্রেকে চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে নামাতে লাগল গাড়ী। রাস্তার সবটাই বাঁক, লাইটের ফোকাসে সামনের দু-তিন গজ ছাড়া বাকী রাস্তাটুকু সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে। হর্ণ দিতে দিতে সাবধানে গাড়ী নামাতে লাগল টেগারিয়া।

হঠাৎ আর একটা হর্ণ এল কানে। গাড়ী আসছে নিচে থেকে। বড় সাহেবের গাড়ী নিশ্চয়ই। যাক, সাহেব তবে ফিরছেন। দেখতে দেখতে নিচের গাড়ীটা এগিয়ে এল অনেকটা নিকটে—হয়ত কয়েক গজের আড়ালেই। ইলেকট্রিক হর্ণের একটা পাল্টা জবাব দিয়ে গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল টেগারিয়া। ক্রসিং একোমোডেশন নেই এখানে। হয় টেগারিয়াকে পিছুতে হবে, নয় সামনের গাড়ীকে।

নিচের গাড়ীখানা কাঁচ করে এসে থামল টেগারিয়ার গাড়ীর সামনে। হাঁ, রায় বাহাদুরের গাড়ীই। ফিকে সবুজ রঙের সেই নিউ মডেল ক্যাডিলাকখানা। রায় বাহাদুর নেমে পড়লেন গাড়ী থেকে, সামনে টেগারিয়াকে দেখেই বাতি নিবিয়ে দিলেন চট করে। কিন্তু তার আগেই টেগারিয়া দেখে ফেলেছে ওকে। মাথা ঘুরে গেল টেগারিয়ার। চার আনা—পাঁচ আনা—ভ্যানাডিয়াম, সব ঘুরতে লাগল কারখানার ঐ নতুন-বসানো মেন ড্রাইভের মত। আড়ষ্ট সুভদ্রার চেয়ে অনেক বেশী আড়ষ্ট হয়ে গেল তার স্নায়ুগুলো।

রঙের উপরেও বড় রঙ উঁচিয়েছেন রায় বাহাদুর। ষ্টেশন-ওয়াগনের সামনে বাতি-নেবা ক্যাডিলাকের গদীতে সেই রঙের টেক্কাটি আগেই এক ঝলক দেখে ফেলেছে টেগারিয়া।

ভাবী গৃহিণীদের জন্য কলেজ

ডাঃ হেলেন আদিসেশিয়া

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অথবা পাশ্চাত্ত্যে যাহা গার্হস্থ্য অর্থনীতি বলিয়া অভিহিত হয় তাহা আজ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিদ্যালয় উভয় স্তরেই অধ্যয়ন এবং আচরণের বিষয়রূপে দ্রুত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে। খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষণ অধিকারে (Directorate of Extension and Training) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্প্রসারণ কর্ম্মের (Home Science Extension Work) সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী স্তরে ইহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান-অনুশীলন এবং জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনাসমূহে ইহার স্থান সম্বন্ধে প্রাকৃত জনের মনে এখনও অস্পষ্টতম ধারণা বিদ্যমান।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের ধারণা

সাময়িক পর্য্যবেক্ষকের নিকট গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের মানে— কোন ব্যয়সাধ্য স্কুল অথবা কলেজে রন্ধন, সেলাই এবং কাপড়চোপড় ধোলাই করা শেখা। দোষৈকদর্শীদের মতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বালিকাদের যে প্রণালীতে ভাত এবং ডাল রান্না করিতে শেখায়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক তাহা "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি" বলিয়া বর্ণিত হয়। ইহার দরুন তাহাদের পিতামাতার যা খরচ পড়ে তা বিস্ময়কর, অথচ তিন চার দশক আগে তাহাদের পিতামহীরা কোন স্কুলে না গিয়া ঐ সকল জিনিষ উৎকৃষ্টতররূপে রাঁধিয়া, ভোজনবিলাসীদের রুচিকর খাদ্য যোগাইয়া তাহাদের রসনার পরিতৃপ্তিবিধান করিতে সমর্থ হইত। যাহারা ঠিকমত ওয়াকিবহাল নহে, তাহাদের মতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় (College) এমন একটি স্থান যেখানে বালিকা পতিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অকাজে সময় নষ্ট করে। যে রসিক স্বামীর স্ত্রী গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট তিনি ঠাট্টা করিয়া বলেন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে শেখানো হয় প্রাথমিক সাহায্য—দগ্ধ খাবারের প্রতি প্রযোজ্য প্রাথমিক সাহায্য।

এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার মূলে রহিয়াছে কতকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক অনুসৃত সীমাবদ্ধ পাঠক্রম। যে সকল স্বল্প-মেধা ছাত্র এরূপ বিষয়সমূহের অনুশীলন করে যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার তেমন প্রয়োজন হয় না তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার সমস্তরে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানকে স্থাপিত করার জন্যও এই সকল প্রতিষ্ঠান দায়ী। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বস্তুতঃ যে অবস্থায় আছে তৎসম্পর্কিত প্রকৃত সত্যের সঙ্গে উপরোক্ত ধারণার ব্যবধান খুব বেশী নয়।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের মূলসূত্র এবং ক্ষেত্র

ব্যাপকতম এবং সর্ব্বাপেক্ষা দার্শনিক অর্থে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান হইতেছে বাঁচিয়া থাকার শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের জন্য ব্যবস্থিত, অধিকতর বিদ্যালয়গত কলাপ্রধান শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে ইহার পার্থক্য এইখানে যে, সমসাময়িক জীবনধারা এবং চিন্তাধারার সঙ্গে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান-শিক্ষার রহিয়াছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সমকালীন জীবন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া তো দূরের কথা, ভারতীয় জীবনের যে মূলগত ভিত্তি গৃহ এবং পরিবার তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান সমস্যাসমূহও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অধ্যয়নের খাঁটি কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের মূলনীতি-সমূহের উদ্ভব হইয়াছে—বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, বিভিন্ন কলাশাস্ত্র এবং মানবতা সম্পর্কিত অনুশাসনাবলী হইতে। উপরোক্ত মৌলিক বিষয়সকল অনুশীলনের ফলে উদ্ভূত বিষয়-সমূহের মাধ্যমে, মানুষের আধ্যাত্মিক মানসিক এবং শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের এবং যে সকল কারণ এই ধরনের বৃদ্ধির জন্য দায়ী সেগুলির সঙ্গে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। একটি উন্নতিশীল সমাজের তরুণদের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইহা বিকাশলাভ করিয়াছে। মূল্যবান উপপত্তি (Theory) এবং আচরণের মাধ্যমে ইহা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জ্জনের পন্থাসমূহ প্রদর্শনের প্রয়াস পায় এবং এমনি ভাবে কিরূপে সাফল্য ও সন্তোষের সঙ্গে জীবন যাপন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেয়। ভারতীয় জীবন-সঙ্কটের জটিল প্রকৃতির কথা ইহা স্বীকার করে এবং এমন

শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস পায় যাহা শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান-সম্মত গার্হস্থ্য জীবন-গঠনের মূল নীতিসমূহের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি এই সঙ্কটের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে আপোষরফা করিয়া চলিবার সামর্থ্য প্রদান করিবে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের পাঠক্রম

এই উদ্দেশ্য কেমন করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে? গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কলেজে পাঠ্যতালিকার বিষয়বস্তু বলিতেই বা কি বুঝায়?

গৃহে সুখে-স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ ভাবে বাঁচিয়া থাকা, স্বাস্থ্য-নীতির উচ্চ মান, পুষ্টি এবং পথ্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী, গৃহের সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য, গৃহস্থালির কাজে টাকাকড়ির নিপুণ ব্যবহার, সৎ নাগরিকত্ব এবং সামাজিক দায়িত্ব—গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠক্রমে এইগুলিই হইতেছে মূলগত বিবেচ্য বিষয়। বিজ্ঞানসম্মত গৃহস্থালির মূলনীতিসমূহের অঙ্গীভূত এই সকল বিষয়ের দরুন—রন্ধনবিদ্যা, ধোলাইখানা, সূচিকর্ম্ম, গার্হস্থ্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, পথ্যাপথ্য বিচার, পুষ্টি, শারীরবৃত্ত এবং শারীর স্থান, স্বাস্থ্যনীতি, মাতৃনীতি, প্রাথমিক সাহায্য ও গৃহে পরিচর্য্যা এবং তৎসহ অশক্তদের পথ্য, গৃহিণীপনা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পৌর বিজ্ঞান, ভাষা-শিক্ষা, শিক্ষার মূলনীতি, শিক্ষা সংক্রান্ত মনস্তত্ত্ব, শিশু-মনস্তত্ত্ব এবং পিতৃ-মাতৃকৃত্য (parentcraft) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়সমূহে ব্যাপকভাবে আচরণমূলক শিক্ষাদান, নার্সারী স্কুলে শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ এই সকল বিষয়ক ঔপপত্তিক এবং ব্যবহারিক উভয়বিধ জ্ঞান গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাঠ্যতালিকার সহায়ক স্বাস্থ্যপ্রদ কর্ম্ম-প্রচেষ্টাসমূহও—নাট্যাভিনয়, সাহিত্য এবং বিতর্ক-সভা, ব্যায়াম, সুকুমার কলা এবং সমাজ-সেবাও ইহার অন্তর্গত—ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৃহরচনার নূতন দিগন্ত

বিতর্কের অবকাশ থাকিলেও একথা বলা চলে যে, ভারতের গৃহরচনা-কলা ভারতীয় সংস্কৃতির মতই প্রাচীন। ইহা একদিকে যেমন মূলগতভাবে সত্য, অন্যদিকে তেমনি গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের আনুকূল্যে ভারতীয় গৃহিণী বিজ্ঞানের এবং বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের সেরা জিনিষকে কাজে লাগাইতে পারেন। জীবনচর্য্যার কৌশল সম্বন্ধে একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টিতে ইহা তাঁহাকে সহায়তা করিয়া থাকে এবং ইহারই দৌলতে তিনি নিজের চিন্তা এবং কর্ম্মকে যাচাই করিয়া দেখিবার এমন প্রচুর সুযোগ লাভ করেন যে, তাঁহার জীবন গড়িয়া উঠে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর এবং ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে সাহায্য করিবার অবস্থায় তিনি উপনীত হন। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানকে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ভাবেই অপরিহার্য্য জাতীয় সেবামূলক কৃত্য বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সূচনা এবং গতি-প্রকৃতি

সাধারণ খেলাধুলা, যৌথ কর্ম্মপ্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতাসমূহের সামাজীকীকরণ, পুতুল রাখা, দোকানে ক্রীড়া এই সকল প্রাগ্-বিদ্যালয় কর্ম্মসূচী গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের প্রাথমিক নীতি-সমূহের উপলব্ধিকে সহজসাধ্য করিয়া থাকে। কেননা শৈশব-জীবন বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় এই সকল অভিজ্ঞতা হইতেছে জীবন-চর্য্যার কৌশলের মূলগত ভিত্তি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিখানো হয় শারীরবৃত্ত, স্বাস্থ্যনীতি, সাধারণ বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের মাধ্যমে। অনেকগুলি উচ্চ বিদ্যালয় রন্ধনবিদ্যা, ধোলাইখানার কাজ এবং সূচীশিল্প শিক্ষা প্রবর্তন করিয়া থাকে। উত্তর প্রদেশে আবার উচ্চ বিদ্যালয়-স্তরে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে। কিন্তু বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাকালের খুঁটিনাটির দিক দিয়া ভিন্ন ভিন্ন কলেজে ইহার বিভিন্নতা দেখা দেয়। কোন কোন পাঠক্রম শিখানো হয় দুই বৎসরের অধিক কাল, অন্যান্য-গুলির শিক্ষা-সমাপ্তিতে আবার তিন হইতে চার বৎসরেরও বেশী সময় লাগে। অবশ্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদান প্রথম প্রবর্তিত হয় লেডি আরউইন কলেজে; বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে প্রথম উক্ত বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কৃতিত্ব কিন্তু মাদ্রাজের, ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয় বরোদা এবং এলাহাবাদে। ১৯৫১ সনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (Ministry of Education) আমন্ত্রণে লেডি আরউইন কলেজ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের মধ্যে ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, মৌলিক বিজ্ঞানসমূহ পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সেখানে পুষ্টি ও পথ্যাপথ্য বিষয়ে উচ্চ স্তরের বিদ্যালয়গত শিক্ষাদানের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, আবার কোথাওবা গার্হস্থ্য কলা-কৌশলের ব্যবহারিক দিকসমূহের উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়া থাকে।

ডিপ্লোমা স্তর, আণ্ডার গ্রাজুয়েট স্তর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বা স্নাতকোত্তর স্তর এই ত্রিবিধ স্তরেই গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে—তদনুসারে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় মুখ্য বিষয়রূপে। ইহার

পাশাপাশি অনুরূপ ভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে গ্রাজুয়েট-দিগকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানেরও রেওয়াজ আছে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রসার: 'দি লেডি আরউইন কলেজ'

প্রায় চার দশক পূর্ব্বে একদল পুরোবর্ত্তিনী নারী—যাঁহারা নিখিল ভারত নারী সম্মেলনে যে সকল আদর্শকে দায়স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, সেই সকল আদর্শদ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা নারীদের জন্য প্রচলিত শিক্ষা, বিশেষ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রদত্ত শিক্ষা-পদ্ধতি সযত্নে যাচাই করিয়া দেখেন। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার ফলে নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রমের একান্ত ভাবে বিদ্যালয়গত পদ্ধতি এবং সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত ইহার পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুতির এবং ভারতীয় নারীজাতির বিশিষ্ট প্রকৃতির (Genius) অনুকূল একটি নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তিপত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত এই অগ্রণী নারীদল এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠেন যেখানে তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠিবে। তাঁহাদের নিকট ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইল যে, এই ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তরুণী নারীরা সার্থক ভাবে বাঁচিয়া থাকার এবং গৃহ-রচনার উপযোগী ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে।

নিখিল ভারত নারী সম্মেলন শ্রীমতী হান্না সেনকে মহিলাদের জন্য এমন একটি কলেজ সংগঠন এবং প্রশাসনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন যেখানে ভারতীয় নারী লাভ করিবেন বাঁচিয়া থাকার জন্য তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার ব্যবহারিক সুযোগ-সুবিধা এবং তাহা হইবে তাঁহার বিশিষ্ট সমাজের মূলগত প্রয়োজন, ধরণধারণ এবং সংস্কৃতির উপযোগী। শ্রীমতী হান্না সেন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অধ্যয়নের অগ্রণী প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতে—না সমগ্র এশিয়াতে এই কলেজকে দান করিয়াছেন ইহার বর্ত্তমান মর্য্যাদা। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১২ জন ছাত্রী লইয়া ইহার কাজের সূচনা হয় আর আজ ইহার ছাত্রীদের মধ্যে আছে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া পূর্ব্ব-আফ্রিকা, জ্যামাইকা, ম্যাডাগাস্কার, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পর্য্যন্ত আগত চারি শতাধিক ছাত্রী।

১৯৪৭ সনে হিংসাবিদ্বেষ এবং দাঙ্গাহাঙ্গামার নিরানন্দ দিনগুলিতে ঐ মহাবিদ্যালয় কর্ত্তৃক বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। ইহা পাকিস্থান হইতে পলায়িত বারো লক্ষ ছিন্নমূল নরনারীর জন্য দেশের সকল স্থান এবং বিদেশ হইতে দান হিসাবে প্রাপ্ত বস্ত্রসমূহের বিহিত ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বস্ত্র-সংগ্রহ-ভাণ্ডার রূপে কাজ করিয়াছিল। দান হিসাবে প্রাপ্ত বস্ত্র সংগ্রহ, সেগুলি পৃথক পৃথক শ্রেণীতে সাজানো, ধোলাই করা, রোগবীজাণুমুক্ত করা, বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদগুলিকে নির্দ্দিষ্ট আকারে তৈরি করা, এবং বিভিন্ন বাস্তুহারা শিবিরে সেগুলি সরবরাহ ইত্যাদি কাজে শক্তি নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে মহাবিদ্যালয় একটি গোটা কার্য্যকালের (term) জন্য নিজের স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা স্থগিত রাখে। ১৯৪৭ সনে বিভিন্ন উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু-শিবিরে বিমানযোগে প্রেরিত বহু মণ চাপাটি এবং শুকনো ডাল রন্ধনে সহায়তার জন্য মহাবিদ্যালয়ের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিল উদাত্ত আহ্বান।

সরকারের তরফ হইতে অনুপূরক (supplementary) খাদ্যশস্য সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য মহাবিদ্যালয়ের নিকট বারকতক অনুরোধ আসিয়াছে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি সেই অনুরোধ রক্ষাও করিয়াছে। অতি-সাম্প্রতিক কালে মহাবিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ, খাদ্যের অঙ্গ হিসাবে এ পর্য্যন্ত উপেক্ষিত সাধারণ ভারতীয় শাকসব্জিসমূহে ভিটামিন পদার্থ আবিষ্কারের গবেষণায় ব্যাপৃত আছে।

১৯৩২ সনে ডিপ্লোমা প্রদানকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে যে মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, দিন দিন তাহার শক্তি-বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে ১৯৫১ সনে ইহা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়া গেল। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে বি-এসসি ডিগ্রি দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, অতঃপর শিক্ষক-শিক্ষণে বি-এড ডিগ্রি দানেরও রেওয়াজ হইল। পুষ্টি বিষয়ে এবং শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ বিষয়ক জ্ঞানসহ গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে একটি "মাষ্টারস ডিগ্রি" প্রদানের পরিকল্পনাও খানিকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

সম্প্রতি গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্পর্কে অধ্যয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং প্রধান প্রধান গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে অতি শৈশব-কালের শিক্ষাবিভাগের সংযোজনা—গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান-অধ্যয়নের এই বিকাশোন্মুখ অধ্যায়কে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। দি লেডি আরউইন কলেজ নার্সারি স্কুল কর্ত্তৃক দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এক দিকে যেমন ইহা দ্বারা শহরতলীর শিশুদের, বিশেষ ভাবে শ্রমোপজীবিনী মায়েদের শিশুদের জন্য প্রাগ্-বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রয়োজন মিটাইবার নিমিত্ত কলেজের সমাজসেবামূলক যে উদ্দেশ্য তাহা সাধিত হয়, অন্যদিকে তেমনি শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্পর্কে গবেষণাকার্য্য প্রবর্ত্তনের জন্য উদ্ভাবিত এক দ্রুত প্রসরণশীল পরিকল্পনার

অন্তর্ভুক্ত একটি গবেষণাগারের কেন্দ্রস্থল রূপেও ইহা কাজ করিয়া থাকে। সম্প্রতি লেডি আরউইন কলেজে অনুষ্ঠিত শিশুকল্যাণ সম্পর্কিত প্রথম ভারতীয় সম্মেলনে এই অঞ্চলে ব্যাপক অধ্যয়ন এবং গবেষণার উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে এবং ভারতের জাতীয় পুনর্গঠন-প্রচেষ্টায় সহায়তা করিবার আমন্ত্রণ মহাবিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

শিশু-কল্যাণের নূতন সীমান্তরেখা

শ্রী কে. জি. সৈয়ীদাইন

এই সম্মেলন কর্তৃক "শিশু-কল্যাণের নূতন সীমান্তরেখা" নামে যে মুখ্য বিষয়বস্তু নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহার উপযোগিতা এবং চিত্তাকর্ষণ ক্ষমতা আপনারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা তাহা জানিতে আমার ইচ্ছা হয়। যে যুগে আমরা বাস করিতেছি এক অর্থে তাহা সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বহু দিক দিয়া নূতন সীমান্তরেখার সম্মুখীন হওয়ার পুলক-শিহরণ অনুভব করিতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দী সম্বন্ধে সামগ্রিক ভাবেই একথা বলা যাইতে পারে যে, ইহা এমন এক শতাব্দী যখন পৃথিবী তথা ভারতের নিকট একদিকে যেমন উপস্থাপিত হইয়াছে বিরাট চ্যালেঞ্জ, সৃষ্টি হইয়াছে নানা সুযোগ-সুবিধা, অন্য দিকে তেমনি বহু দুঃখদুর্গতিও বিশ্ববাসী তথা ভারতবাসীকে করিয়া তুলিয়াছে জর্জ্জরিত, এবং অনেক দিক দিয়া ইহা আমাদের জীবনের পদ্ধতিকেই বদলাইয়া দিয়াছে।

আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শান্তির পথে অবস্থানুযায়ী আমাদের নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ, এমন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যাহা কোনও বিশেষ শ্রেণীকে নয়, কিন্তু আমাদের সমগ্র জন-সমাজের প্রত্যেককে উৎকৃষ্ট ধরনের জীবন-যাপনে সমান অংশীদার করিবে—ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থার মাধ্যমে আমরা এই 'চ্যালেঞ্জের' সম্মুখীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। অভিনব এবং প্রসরণশীল সীমান্তরেখা আবিষ্কার করিতে গিয়া নূতন মহাদেশ আবিষ্কারকদিগকে যে ধরনের এডভেঞ্চারের সম্মুখীন হইতে হয়, আমার মতে উপরোক্ত এডভেঞ্চার তদপেক্ষা কম রোমাঞ্চকর এবং চিত্তাকর্ষক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, আমেরিকায় গত শতাব্দীতে ছিল—নৈসর্গিক সীমান্তরেখাকে সম্প্রসারিত করিবার পরিকল্পনা আর সেই উদ্দেশ্যে জঙ্গল এবং জলাভূমি পরিষ্কার করা হইত, নির্ম্মাণ করা হইত নূতন নগরী এবং শহর, বশীভূত করা হইত প্রকৃতির দুরন্ত শক্তিনিচয়কে। আজ আমাদিগকে এ ধরনের প্রাকৃতিক সীমান্তরেখা আবিষ্কারার্থ অজ্ঞাত স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু আমাদের কৃত্য বাস্তবিকই ঢের বেশী তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং ইহার জন্য আমাদের অদৃষ্টে পুরস্কারও জুটিবে অধিক। আমাদিগকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, আধিব্যাধি এবং কুসংস্কারের সীমান্তরেখাকে এমন ভাবে সম্প্রসারিত করিতে হইবে যে, আমাদের দেশের সেই সকল লক্ষ লক্ষ নর-নারী যেন পরিপূর্ণ ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী হয় যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সুযোগলাভে বঞ্চিত ছিল। দুনিয়ার প্রাকৃতিক রূপকে আকর্ষণযোগ্য করা একটা বড় রকমের কৃতি সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেয়ঃ সামাজিক নীতির দ্বারা সংঘটিত সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার; সমাজের ক্ষত যাহার দৌলতে হয় নিরাময়, সামাজিক অন্যায় অবিচারকে যাহা করে দূরীভূত এবং যাহা পরিহার্য্য দুর্ভাবনার বোঝা হইতে মানুষের ভারাক্রান্ত মস্তিষ্ককে নিষ্কৃতি দেয়। ইহাই সেই মহান্ কৃত্য যাহা লইয়া সম্প্রতি আমরা ব্যাপৃত আছি। কি পরিমাণ সাফল্যলাভ আমরা করিব তাহা নির্ভর করে আমাদের মানসিক সততা এবং আমাদের হৃদয়ের সংবেদনশীলতার উপর।

এখন আমি আমাদের প্রযত্নসমূহের লক্ষ্যবস্তুর লক্ষণ-নির্দ্দেশ করিতেছি। আমাদের বাস্তব কর্ম্মসূচীসমূহ যে ভাবে পরিকল্পিত তাহাতে অগ্রাধিকারগুলি সম্পর্কিত ধারণা ঠিকমত স্পষ্টীকৃত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিত নই। ইহা কতকটা প্রমাণিত হয় এই বিষয়টি হইতে যে, আমরা অত্যন্ত বৃহৎ শিল্প এবং যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কিত পরিকল্পনার রূপায়ণে প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু যথোচিত সমাজসেবা-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হই নাই! যে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার ফলে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নির্দ্দিষ্ট এবং সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করি এবং এই যুক্তির বৈধতা আমি অস্বীকার করি না যে, ধন প্রথমে উৎপাদন করিতে হইবে, তারপরে আসিবে

হয় সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যসমূহের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার, নতুবা জনগণের মধ্যে বিতরণের প্রশ্ন। আমি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই যুক্তিও গ্রহণ করিতে রাজী আছি যে, বর্তমান 'পুরুষে'র লোকেরা পরবর্তী বংশধরদের জন্য উৎকৃষ্টতর এবং প্রশস্ততর জীবনের সৌধ-রচনাকল্পে "নিজেদের পাকস্থলীকে আঁট করিয়া বাঁধিবে" এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক পিপাসাকেও যতদূর সম্ভব সংযত করিবে। আমি কিন্তু একথা মনে না করিয়া পারি না যে, উন্নততর উৎপাদন এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রবর্তনা এই উভয় দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতেই ঐ যুক্তির উপর খুব বেশী জোর দেওয়া বা ইহাকে খুব দূরপ্রসারী করা সমীচীন হইবে না এবং এটা প্রত্যাশা করাও আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় যে, বর্তমান 'পুরুষে'র লোকের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য অবিমিশ্র ত্যাগ স্বীকার করিবে। কেবলমাত্র অন্ন-বস্ত্র এবং আশ্রয়ের ব্যাপারে নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবসরবিনোদন এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধেও এমন-কতকগুলি ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা আছে যাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য এখনই আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন—এমন কি ইহার দরুন যদি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আমাদের গতি কতকটা মন্দীভূত হয় তাহা হইলেও ঐ দিকে আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি আমরা তাহা করিতে পারি তাহা হইলে আমরা কেবল যে, জনগণের কর্মনৈপুণ্যই বাড়াইতে পারিব তাহা নয়, তাহাদের কল্যাণবোধও জাগ্রত হইবে এবং বৃহৎ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের রূপায়ণের জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী উৎসাহেরও সৃষ্টি হইবে। জনগণের আদর্শবাদকে উদ্বুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়মিত হইবে বাস্তবতাবোধ এবং এই উপলব্ধি দ্বারা যে, আত্মার আকৃতি যদি বা থাকে মানুষের রক্ত-মাংসের শরীর কিন্তু দুর্বল।

এই কথাগুলি সাধারণ ভাবে যেমন সমাজসেবা-কর্মের ক্ষেত্রে তেমনি সমগ্র জন-সমাজের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু শিশু-সমাজের সমস্যার নিরিখে যখন আমরা এই সমস্যাকে বিচার করিয়া দেখি তখন বিষয়টি প্রভূত পরিমাণে জোরালো হইয়া উঠে এবং আপোষরফা করিবার অবকাশ অল্পই থাকে। পাশ্চাত্যের জনৈক শিশুহিতৈষী বিংশ-শতাব্দীকে "শিশুদের শতাব্দী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় না যে, এখনও পর্য্যন্ত আমরা আমাদের দেশের তরফ হইতে ঐ দাবি করিতে পারি। এ বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নাই যে, যেমন আমাদের সামাজিক বিবেকবুদ্ধি তেমনি বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদাগুলির জন্যও এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠাই প্রয়োজন। আর সকল বিষয়ে আমরা খরচ কমাইয়া আনিতে পারি, কিন্তু আমাদের শিশুদের বেলায় ব্যয়-সঙ্কোচ করা সমীচীন হইবে না। সংস্কৃতি-সম্পন্ন এবং সভ্য বলিয়া আমাদের সকল দাবি ফাঁকা আওয়াজের মত শুনাইবে যদি না অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেশের শিশুদের জন্য উন্নততর ব্যবস্থা—একেবারে মূলগত ভাবে উন্নততর ব্যবস্থা করিতে পারি। প্রায়শঃ বিভিন্ন দিক দিয়া যে সকল ওজুহাত দেখানো হয়, অন্ততঃ এক্ষেত্রে তৎসম্বন্ধে আমাদের পক্ষে অসহিষ্ণু হইয়া উঠাই সমীচীন হইবে। প্রথম তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম দুর্দিনে গ্রেট ব্রিটেন যদি এই সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে পারে যে, প্রাপ্তবয়স্কদের উপর যতই বিপদপাত হউক না কেন, শিশুদিগকে দুর্গতি ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে কোন যুক্তিবলে অপেক্ষাকৃত কম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমাদের লক্ষ্য হইবে ইহা অপেক্ষা নিম্নগামী। আপনারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—অবশ্য যদি এখনও ইহা যথারীতি আপনারা অবগত না হইয়া থাকেন—এই উভয় যুদ্ধেরই পরিসমাপ্তির পর দেখা গেল যে, উচ্চতা, ওজন এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সকল দিক দিয়াই ব্রিটিশ শিশুদের উন্নতি হইয়াছে, যুদ্ধকালে তাহাদের মাধ্যাহ্নিক খাদ্য সরবরাহের কাজ এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাঘটিত কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয় নাই। এমনকি যে, বোমাবর্ষণের ফলে লণ্ডন নগরী জনশূন্য হইয়া যায় তাহাও শিশুদের সমক্ষে গ্রামীণ অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া এই বিষয়ক শিক্ষালাভের সুযোগ উপস্থাপিত করে। এক দেশের পক্ষে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে, অন্যদেশও নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাহা করিতে পারে—অবশ্য ইহার জন্য প্রয়োজন সেই একই ধরনের দৃঢ় সঙ্কল্প এবং মূল্যবোধ।

অবশ্য এই ধারণা আমি জন্মাইয়া দিতে চাই না যে, আমাদের দেশে শিশুদের জন্য কিছুই করা হইতেছে না। ইহা আত্মপ্রসাদের বিষয় যে, যেমন সরকারী তেমনি স্বেচ্ছা-মূলক সংস্থাসমূহও শিশু-কল্যাণকর্মের উন্নয়নকল্পে বেশ কতকগুলি কর্মসূচীর প্রবর্তন করিয়াছে এবং পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মত শিশুদের পরম বন্ধু এবং অনুরাগী রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত সরকারের পক্ষে ইহার অন্যথাচরণ করাও সম্ভবপর হইত না। প্রধানতঃ নারী এবং শিশু-কল্যাণকর্মে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের প্রতিষ্ঠা এই দিক দিয়া একটি বাস্তব এবং বৃহদায়তন প্রচেষ্টা। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও বহুবিধ কৃত্য রহিয়াছে—যেমন প্রাক্‌প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিশু-বাগ (Children's Park) খোলা, বালভবন এবং শিশু-যাদু-

ঘরের পরিকল্পনা প্রণয়ন, 'শঙ্কর'স উইকলি'র সহিত সংশ্লিষ্ট সেই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহার দৌলতে আমাদের শিশুদের লেখা এবং ছবি সমগ্র বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, শিশুদের স্বাস্থ্যঘটিত সমস্যার প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান যত্ন, শ্রম ও সমাজসেবা শিবিরের (Labour and Social Service Camps) স্কুলে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক এবং পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রবর্ত্তন, যুব হোষ্টেল, দেশ-প্রদক্ষিণ-পরিকল্পনা, অল্পবয়স্ক অপরাধপ্রবণ এবং শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়া অপটু অন্যান্য শিশুদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ। এ সমস্ত ভাল ব্যবস্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের দেশের সমস্যার সামগ্রিক পরিসরের তুলনায় ইহা যথেষ্ট ভালও নয়, যথোচিত কল্পনাশক্তির দ্যোতকও নয়। এই ধরনের সম্মেলনের এবং শিশু-কল্যাণমূলক ভারতীয় পরিষদের (Indian Council for Child Welfare) মত সংস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—সরকার এবং সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ গভীরভাবে এই সমস্যার উপর কেন্দ্রীভূত করা এবং বর্ত্তমান কর্ম্মসূচীতে কোথায় ফাঁক রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার ও এমন কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশপ্রদান যাহা বর্ত্তমান কর্ম্মপ্রচেষ্টাসমূহের সংহতিবিধান করিয়া তাহাদের গতি-বেগকে করিয়া তুলিবে দ্রুততর।

এই সম্পর্কে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় তন্মধ্যে যেটিকে আমি মুখ্য সমস্যা বলিয়া মনে করি, আপনাদের বিবেচনার্থ তাহা কি আমি সাহসপূর্ব্বক উল্লেখ করিতে পারি? প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার-সমূহ, সরকারী উদ্যোগে সংগঠিত পর্ষদ, কমিটি এবং ডিপার্টমেণ্টসকল, স্থানীয় সংস্থাগুলি, স্বেচ্ছামূলক সংগঠনসমূহ —তন্মধ্যে কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত, কতকগুলি আবার এখনও নির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করিতে পারে নাই—প্রভৃতি এমন অনেকগুলি বিপুলসংখ্যক সংস্থা আছে যাহাদের কর্তৃত্বাধীনে শিশু-কল্যাণকর্ম্ম পরিচালিত হইতেছে এবং এমন বহু কল্যাণকৃৎ উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও আছেন যাঁহারা শিশু-কল্যাণক্ষেত্রে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। এই সকল কল্যাণ-কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে কড়াকড়িবিশিষ্ট সারূপ্য অথবা বহু বিধিনিষেধের বেড়াজালে এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে আবদ্ধ করার সমর্থন আমি করিতেছি না সত্য, কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, যে অ-যথেষ্ট জনবল এবং অপ্রচুর অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, যাহাতে তাহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় সেজন্য পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টাসমূহের সংহতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রয়োজনাবলী সম্বন্ধে সযত্ন অনুসন্ধানের ফলে ইহা প্রমাণিত হইতেপারে যে, এক দিকে যেমন কতকগুলি ক্ষেত্রের চাহিদা অপেক্ষাকৃত উত্তম-রূপে মিটানো হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি এমন কতিপয় ক্ষেত্র আছে যেগুলির প্রতি মোটেই নজর দেওয়া হয় না, এবং শেষোক্ত গুলিই হইতেছে উপযুক্ত ক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্তব্য সরকারী এবং বেসরকারী আর্থিক সাহায্য সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ভাবে কেন্দ্রীভূত করা যাইতে পারে। বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে মানসিক জড়তাগ্রস্ত শিশুদের প্রতি যে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না, সেকথা আমি উল্লেখ করিতে পারি। অথবা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে বলিতে পারা যায়, জনাকীর্ণ নাগরিক অঞ্চলে শিশু বাগ (Childrens Park) এবং ক্রীড়াভূমির অবিদ্যমানতার কথা যাহার দরুন শারীরিক এবং সামাজিক উভয় দিক দিয়াই তাহাদিগকে বহুবিধ বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়।

অপেক্ষাকৃত সামান্য অর্থবল দ্বারা কি কি ধরনের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সংগঠিত করা সম্ভব তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে, বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিপুণ তথ্যানুসন্ধান এবং মূল্য-নির্দ্ধারণকে ভিত্তি করিয়া করিয়া গঠিত ব্যাপক কর্ম্মনীতি হইতে, এবং এজন্য আমাদের বহু বৎসর অপেক্ষা করিবারও প্রয়োজন নাই। আমি ইহার কারণ খুঁজিয়া পাই না যে, কেন কোন পৌর কর্তৃপক্ষ সাধারণ পার্কে শিশুদের জন্য এমন সুপরিকল্পিত প্রান্তসমূহ পৃথক করিয়া রাখেন না যেখানে তাহারা স্বাধীনভাবে খেলাধুলা করিতে এবং কতকগুলি যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং সাদাসিধা উপকরণের সাহায্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করিতে পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন সংহত কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং তাহা কেবলমাত্র রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারী স্তরে নয়, উপরন্তু—এবং বাস্তবিকই তাহা কোন কোন দিক দিয়া অধিকতর গুরুত্ব-পূর্ণ—স্থানীয় স্তরেও। আমাদের দেশে আশু-প্রয়োজনীয় যে জিনিষটির অপ্রতুল তাহা জাতীয় এবং রাজ্য উভয় স্তরে উচ্চাঙ্গের নেতৃত্বের অভাব ততটা নয়—ভগবানকে ধন্যবাদ যে এই মহার্ঘ্য বস্তুর কিয়ৎ পরিমাণ অধিকারী আমরা এবং ইহারই সহায়তায় আমরা অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বিপদ-আপদ কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছি—যতটা স্থানীয় নেতৃত্বের ও পৌর গৌরববোধের। নিজেদের সমাজের ঐ সকল সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত ছোট এবং বৈপ্লবিক শক্তিশালী দলসমূহের অবিদ্যমানতাও আমাদের আর একটি গুরুতর অভাব। আমার মতে এই ক্ষেত্রে কাজের অগ্রসূচনা করার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সংস্থা হইতেছে

ানীয় কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন সংস্থাসমূহ—নেতৃত্বের ্মিকাও স্বতঃই তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা তাহাদের পক্ষে অধিকতর হজসাধ্য হইতে পারে। কেননা এ বিষয়ে যদি একটা পেরিকল্পিত কর্ম্মনীতি থাকে তাহা হইলে পিতা-মাতা অথবা াধারণের পক্ষে তাহাদের শিশুদের জন্যই উদ্দিষ্ট কল্যাণ-রিকল্পনাসমূহ সম্পর্কিত অনুরোধ এড়ানো কঠিন হইয়া াড়ায়। উপরন্তু যে সকল উদ্দেশ্য দূরবর্ত্তী ও নৈর্ব্যক্তিক, কাজেই বাস্তব নয় অথচ যেগুলির জন্য সাধারণ নাগরিক-দিগকে বিভিন্ন প্রকারের কর দিবার জন্য অনুরোধ করা হয় তদপেক্ষা যে সকল ভালো কাজ ধরাছোঁয়ার মধ্যে আছে এবং সরাসরি এখানে এবং এখনই আমাদের জন্য করা হইতেছে তাহার নিমিত্ত টাকা দেওয়া অধিকতর সহজ।

দ্বিতীয়তঃ রহিয়াছে আইন প্রণয়নের সমস্যা—অবশ্য এ সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলিতে চাই না। নিকৃষ্টতম ধরনের শোষণ এবং সামাজিক অনাচারের হাত হইতে শিশুদের রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি বিচ্ছিন্ন আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যাপকভাবে আমরা পরিস্থিতিটিকে বিচার করিয়া দেখিতে সমর্থ হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। ইহা করা প্রয়োজন উচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে এবং আমি আশা করি যে, শিশু-কল্যাণ আইন এবং কার্য্যতঃ তাহাদের প্রয়োগ (Childwelfare laws and their Enforcement) সম্বন্ধে এই কনফারেন্সে যে আলোচনীয় পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা এই দিকে পথনির্দ্দেশের সহায়ক হইবে।

তৃতীয়তঃ আসে আর্থিক সংস্থানের প্রশ্ন। দেশের দারিদ্র্যসত্ত্বেও, একথা সত্য যে আমাদের এমন অনেক বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র দাতব্য ট্রাষ্ট বা অছি কর্তৃক ব্যবস্থাকৃত সম্পত্তি আছে যেগুলির সামগ্রিক আয় কোটি কোটি টাকায় গিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বর্ত্তমানে এই সমস্ত ফণ্ড যথোচিতরূপে ব্যবহৃত হইতেছে না। ইহার জন্য কখনও কখনও দায়ী অব্যবস্থা অথবা অবিশ্বস্ততা—এবং কখনওবা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। আমাদের সমাজে যে সকল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহার দরুন "দাতব্য উদ্দেশ্যসমূহ'' কথাটি অধিকতর যুক্তিযুক্তভাবে এবং কল্পনামূলক ভাবে ব্যাখ্যা করার এবং যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেখানে এই সকল ফণ্ডের—যাহা মোটের উপর জাতীয় সম্পত্তি—যাহাতে যথোচিত ব্যবহার হয় সেজন্য আইনের সাহায্যপ্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আমি অবগত আছি যে, কোনও কোনও রাজ্যে এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু অধিকতর সাহসের সহিত এই সমস্যার সমাধানকল্পে কাজ সুরু করা আবশ্যক এবং শিশু ও অন্যান্য বঞ্চিত শ্রেণীর প্রয়োজনকে, মূল দাতারা যে উদ্দেশ্যে ঐ অর্থদান করিয়াছিলেন তাহার উপরে স্থান দিতে হইবে, কেননা বর্ত্তমানে এক্ষেত্রে বরং সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়া থাকে। হয় ত এই ইঙ্গিত দেওয়া পুরাপুরি 'অধর্ম্ম' নাও হইতে পারে যে, অনেকগুলি বহুদিন প্রতিষ্ঠিত ট্রাষ্টের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উক্ত উদ্দেশ্য যথারীতি সিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বৃহত্তর সূত্র ছাড়া, যুক্তরাজ্যের "শিশুকে বাঁচাও ভাণ্ডারে"র (Save the Children Fund) "এক সপ্তাহে এক পেনি" (Penny a week) এই আবেদনের অনুরূপ ক্ষুদ্র কিন্তু ব্যাপক পরিকল্পনাসমূহও আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। এই সমস্ত সংগঠিত প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা স্থানীয় কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যসমূহের নিমিত্ত বেশ মোটা রকমের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি। এরূপ সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, দরিদ্র এবং প্রায়-দরিদ্র লোকেরা কেবলমাত্র তাহাদের অপেক্ষা বিত্তশালী ব্যক্তিদের দয়ার দানের উপর নির্ভরশীল না হইয়া নিজেদের শ্রম এবং স্বল্প-পরিমাণ অর্থ একত্র জড়ো করিয়া তাহাদের শিশুদের একান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে পারে। এমনি ভাবে বহু সজাগ এবং সমাজ-সচেতন জন-সমষ্টি বাহিরের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের চেষ্টায়ই বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং শিশুবাগ গড়িয়া তুলিয়াছে। কল্যাণকর্ম্মের এই গণ্ডীকে প্রশস্ততর করিবার জন্য আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হইবে। বস্তুতঃ এই ধরনের হিতকর্ম্মের অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে যদি পরস্পরের হাতে হাত মিলাইয়া সমাজ-সেবাকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। জাতি হিসাবে এখনও আমরা সমবায় পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিবার উপযোগী শক্তি অর্জ্জন করি নাই, কিন্তু এই নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—কেননা ইহা ছাড়া যেমন আমাদের প্রকৃত মূল্যনির্দ্ধারণের অনুশীলন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ হইবে না, তেমনি আমাদের প্রচেষ্টাসমূহও ফলপ্রদভাবে কার্য্যকরী হইবে না। বস্তুতঃ সমবায়মূলক কর্ম্মের মেহাইয়ের উপরেই ব্যষ্টি এবং সমষ্টির চরিত্র ও মতবাদ নির্দ্দিষ্ট রূপ লইয়া গড়িয়া উঠে এবং এমন কোনও সমাজ-কল্যাণকর্ম্মও নাই যাহাতে আমরা শিশু-সেবামূলক কৃত্য অপেক্ষা অধিকতর সার্থকতার সহিত এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করিতে পারি। এই ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং এই পরিষদের মত যে সকল সংস্থা যেমন 'ক্লিয়ারিং হাউস' তেমনি

যোগাযোগ স্থাপনকারী এজেন্টরূপে কাজ করিয়া থাকে সেগুলির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে আসিতেছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্ম্মে নিয়োগের সমস্যা—এতদ্ব্যতীত বিশেষ ফললাভ সম্ভবপর নয়। অবশ্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের উৎসাহক সেই সকল লোকের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না, যাঁহারা সমাজকর্ম্মকে কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন। কেননা, তাহা নির্ম্মমভাবে ঐ কর্ম্মক্ষেত্রের উপর গণ্ডী টানিয়া দিবে এবং অনেক স্বতঃপ্রবৃত্ত, নিষ্ঠাবান ও আদর্শবাদী কর্ম্মীকে করিবে নিরুৎসাহ। তাহা সত্ত্বেও একথা আমি ভাল করিয়াই উপলব্ধি করি যে, এই ক্ষেত্রে সংগঠনের স্তরে এবং প্রতিকার্য্য বহুবিধ দুরূহ সমস্যার সমাধানকল্পে গবেষণার ক্ষেত্রে—উভয়ত্রই বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অনেকে এটা বুঝিতে পারেন না যে, শিশু এমন একটি অত্যন্ত সুকুমার এবং জটিল জৈব সত্তা, কোন অজ্ঞ আনাড়ী লোকের দ্বারা যাহার যথোচিত তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষাদান সম্ভবপর নয়। যে-কোনও সমাজে অথবা সম্প্রদায়ে সামাজিক শক্তিসমূহের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক ক্রিয়া যে কত জটিল সে সম্বন্ধেও তাঁহারা সমভাবে অনবহিত। এখন সযত্ন গবেষণা এবং প্রকৃত মূল্যনির্দ্ধারণ ব্যতীত এ বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হওয়া আমাদের পক্ষে হয়ত সম্ভবপর নয় যে, আমাদের কল্যাণেচ্ছা-প্রণোদিত কিন্তু ভ্রান্ত জ্ঞান-প্রসূত নীতি এবং কর্ম্মপন্থাসমূহের কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া, কি ব্যষ্টিগত কি সমষ্টিগত উভয় ভাবেই শিশুদের উপর হইয়া থাকে। সুতরাং আমি এমন একটি জাতীয় নীতির সপক্ষে ওকালতি করিব যাহা কর্ম্মীদের শিক্ষাদানকে দিবে উচ্চ অগ্রাধিকার। এই বিষয়টি প্ল্যানিং কমিশনেরও সুস্পষ্ট স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে এবং কমিশন কর্তৃক ইহার উপর গুরুত্বও আরোপিত হইয়াছে।

আমি আর আপনাদের সময় লইতে চাই না। আমি জানি না যে, আমি এমন কিছু বলিয়াছি কিনা যাহা ইতিমধ্যে আপনারা অবগত হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ, আমি যতটা দাবি করিতে পারি তদপেক্ষা ঢের বেশী এই সকল বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন। কিন্তু আমাদের আসন্ন সমস্যা নূতন কথা বলা ততটা নয় যতটা সেই সকল আদর্শ এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার বাস্তব রূপায়ণের জন্য তৎপর হওয়া যেগুলি ইতিমধ্যেই কি এই দেশে কি অনুরূপ সমস্যাসমূহের সম্মুখীন অন্যান্য দেশে উভয়ত্রই অনুমোদিত হইয়াছে। সুতরাং আসুন এই পবিত্র ধর্ম্মযুদ্ধে আমরা আগাইয়া চলি *

* 'দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ারে'র ন্যাশনাল কনফারেন্সে' শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারীর ভাষণ।

বাউল গান

শ্রীকামিনীকুমার রায়

বাউল গান সংগ্রহের দিকে অনেকদিন হইতেই সুধী-সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই এই গানের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। আমি এখানে আমার বিবিধ সংগ্রহ হইতে কয়েকটি বাউল গান পাঠক-পাঠিকাদের পরিবেশন করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাজিগ্রামনিবাসী শ্রীশ্যামসুন্দর শীল হইতে এই গানগুলি সংগৃহীত। শ্যামসুন্দর নিজে বাউল নহেন, কিন্তু তাঁহার এই সত্তর বৎসর বয়সে বহু বাউলের সঙ্গে তিনি ঘুরিয়াছেন এবং তাঁহাদের মুখে বাউল গান শুনিয়া শুনিয়া স্মৃতিপটে সেগুলি ধরিয়া রাখিয়াছেন।

বর্ত্তমানে অবসরমুহূর্ত্তে, কখনও বা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি কোনও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই স্বাভাবিক কণ্ঠে দুই-একটি মাত্র গান গাহিয়া থাকেন। তিনি অতি সরল ভাবেই স্বীকার করেন, এই সকল গানের গূঢ়ার্থ তিনি জানেন না, জানিতে কখনও চেষ্টাও করেন নাই। বাউলদের সংস্রবে যাইবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল, বাউল গান তাঁহার ভাল লাগে, তাই আনন্দের খোরাক হিসাবেই এই গান তিনি শিখিয়াছেন এবং গাহিয়া থাকেন। এই সকল গানের কথা আপাত দুর্ব্বোধ্য হইলেও যে গভীর তত্ত্ব ইহাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, সুর তাহার প্রকৃত বাহন রূপে তাহা শ্রোতার অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছাইয়া দেয়।]

১

আপন দেশে যে জন বসে
চিন্‌তে পারে আপনারে
ধন্য বলি তারে।
বিজাতি এক অধিকারী
বিলাতে আসল বাড়ী
কলিকাতা হয় কাচারি
হুগলী নদীর পাড়ে।
লাকসাম হইতে লাইন খুলিয়ে
বাহাত্তর হাজার আমদানী মাল
রপ্তানী হয় করাচী বন্দরে।
উত্তরে নেপাল ভুটান
পশ্চিমে বেলুচিস্থান
দক্ষিণে লঙ্কাপুরী
মণি‌পুর পুব ধারে।
আর এক খানা আছে জানা দিল্লীপুর শহরে
খাটবে না তার আইনের বিচার
তাহার নিকট কুচবিহারে।
আপন দেশ গয়া কাশী
সদায় বাজে শঙ্খ বাঁশী
হরিদ্বারে শব্দ করে, শুনা যায় কানপুরে
লণ্ডন থাইক্যা চাইয়া দেখ
সিন্ধু নদীর পাড়ে।
গঙ্গা আর যমুনা মিলে
ত্রিবেণী নামটি ধরে।
সোনার ভারত হইল মুরদ
জালালুদ্দিন চিনল নারে
মেয়ে মেয়ে বেচাকেনা
রমণীর বাজারে।

২

ছাড়িলে এই দেশ
পাবিনে উদ্দেশ
কেন ঘুর' দেশ বিদেশ
ঘরে আইসে না।
কাম ক্রোধ লোভ মায়া
এই সমস্ত ছাইড়া দিয়া
মাইঝ ঘরেতে বস যাইয়া
মনরে আমার।
আসিয়া ঘরের দুয়ারে
ডাকিতেছে তোমারে
তুমি থাক দূরে দূরে
কাছে আইস না।
ঘরের ভিতর ঢুকলে পরে
দেখতে পারবে নজর কইরে
হায়রে কলিকাতা শহর
চিড়িয়াখানা।
(কত) হস্তী বাঘে খেলা করে
সাপ পলায় ময়ুরের ডরে
ফুল বাগিচা সরোবরে
আজব কারখানা।

ঢাকার নবাবের বাড়ী
তিনি থাকে দিল্লীপুরী
মণিপুরে তার কাচারি
সঙ্গে দুইজনা।
দুই পাশে দুই ফেরেস্তা
আইন মত করে ব্যবস্থা
দোয়াত কলম কাগজের বস্তা
সঙ্গে রাখে না।
মণিপুরে বইছে কর্ত্তা
যাইতে অতি সোজা রাস্তা
মাল বিকাইছে অতি সস্তা
ডাইনে পাশে ডাকাইত
দালান বাড়ী করছে পাকা
বাকী রাখছে না।
হায়রে কলিকাতা শহর
জলের উপর বান্ছে ঘর
করিতেছে থর থর
ঠিক থাকে না।

৩

পারঘাটায় মানুষ কি আর মারা যায়।
ঘাটে লাগাইয়া তরী, আশাগাড়ি,
বইসে ভাবছ কিনারায়।
জোয়ার ভাটা যে নদীতে
আসা যাওয়া সেই পথেতে
মানুষের স্তন মিশাইয়া
মনের মানুষ ধরা যায়
বালুচড়ায় কুম্ভীরের ভিড়
শেষে পাবে পথের উদ্দিশ
দিবে হলদি গায় মাখিয়ে
ভব নদীর পাড়ে গিয়ে
কুম্ভীর পৃষ্ঠে পাড়া দিয়া
সহজে পার হওয়া যায়।
আলেকচান কয় মনরে সোনা
কোন্ নদীর জল হয় যে সোনা,
কোন্ নদীর জল মাখন ছানা
হংস হইয়ে ভেসে যায়।
পারঘাটায় কি…

৪

আজগবি কল গহুর চান্দের ঘরে।
চৌদিকে ব্রহ্মাণ্ডের খবর
আন্ছে প্রেম তারে।
রসের খাম্বা প্রেমের তার,
দেখতে লাগে চমৎকার,
আনন্দে ভুবন শোভা করে।
যে ধইরাছে আসন তারে
জড় বাতাসে পায় না তারে,
ভবনদী পার হইয়া যায়
তারে তারে তারে।
না জাইনে মোর তারের কল,
কাম-তারে খোয়াইলে বল,
এমনি রসে শরীরের বল তাই ঝরে (?)
প্রেমের বাক্স নাক্সাকার
মধ্যে আছে চক্রাকার
এক টিপেতে সব শহরের
খবর কইতে পারে।

৫

নবদ্বীপে এল নূতন গোমস্তা।
হরির নাম সম্বলে, যে জন চলে
বাণিজ্যে সোজা রাস্তা।
নৌকা খোল নিষ্কপটে,
লাগাইয়া সুজনার ঘাটে
মাল কিনিও ভবের হাটে
রসিকজনার নিকটে।
কত বিক্কারা মাল হাটে আসে,
খরিদ করলে ঠেকবে শেষে,
লাভ হবে না কিন্তু শেষে
আসলে হবে খাস্তা।
পরমহংস পুঞ্জ মাত্র,
শ্রীগুরু মূলাধার পাত্র
জমা খরচ দেশকালপাত্রে
রাইখ অতি পরিষ্কার।
হরেকৃষ্ণ হরি বইলে
দিত প্রেমের প্রসার খুইলে
ভাবের ভাবী গায়ক পাইলে
খুইলে দিত প্রেমের বস্তা।
মাণিকচান কয় রাজ বেপারী,
হাটে গেলে নয় বেপারী
খুব হুসিয়ারে প্রেম বাজারে
করতে হয় দোকানদারী।
আসলের ধন চুরি হইলে
ঠেকবে রে নিকাশের কালে,
নিবেরে যমরাজায় জেলে
ঘট্‌বে বিষম ব্যবস্থা।

শোভা সেন
সর্বদা ব্যবহার করে থাকেন
লাক্স
টয়লেট
সাবান
"একমাত্র বিশুদ্ধ সাবানই
এত শুভ্র হতে পারে"
তিনি বলে থাকেন
লাক্স টয়লেট সাবান বিশুদ্ধ। এই
সাবানটীর দুধের মত শুভ্রতাই আপাত
দৃষ্টিতে এর বিশুদ্ধতার পরিচায়ক।
এই শুভ্র বিশুদ্ধ সাবানটী নিজে পরীক্ষা
করে দেখুন। অল্প সময়ের মধ্যেই
আপনি দেখবেন সরের মত মোলায়েম,
সুগন্ধী এই ফেণা কি ভাবে আপনার
ত্বকের যত্ন নেয়··· কি ভাবে ত্বককে
সুন্দর করে তোলে! সর্বাঙ্গীন সৌন্দ-
র্য্যের জন্যে এবং খরচ সাশ্রয়ের জন্যে
বড় সাইজের সাবান ব্যবহার করুন।
LUX
TOILET SOAP
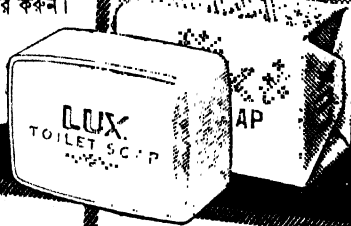
রবীন্দ্র-সঙ্গীত

শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠসঙ্গীতবিদ্‌দের সমপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের আসন এ কথা বলতে কোনও বাধা নেই। এখানে আমি তাঁকে শুধু সঙ্গীত-বিদদের কোঠায় ফেলে আলোচনা করতে চাই না, আমি বলতে চাই সঙ্গীতস্রষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' পাঠে জানা যায়, বাল্যকালে তিনি ওস্তাদী সঙ্গীতের আব-হাওয়ায় বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। একথা বলাই বাহুল্য সে যুগে আজকের মত আধুনিক সঙ্গীত জন্মলাভ করে নি। কীর্তন, বাউল আর শ্যামাসঙ্গীত অবশ্য ছিল, কিন্তু সে-সব মুখ্যতঃ বৈরাগী ও সাধকদের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। ওস্তাদরা সে যুগে সঙ্গীত-শিক্ষার জন্যে ছাত্রদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী ভারতীয় সুরবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলতেন।

রবীন্দ্রনাথের মনে সে পদ্ধতি যে বেশ স্থায়ী আসন নিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রথম জীবনের অত্যুৎকৃষ্ট গানগুলিতে। ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সুরঝঙ্কার তাঁর কবি-মনে সে সময় বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমনকি এ প্রভাব তাঁর জীবনে শেষ পর্যন্ত ছিল—তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন পরিণত বয়সে যখন তাঁর কবিচিত্ত যথেষ্ট বিকশিত হয়ে উঠেছে, বাংলার মৃত্তিকা, আকাশ, বাতাস অপূর্ব্ব শ্যামলিমায় যখন তিনি অনুভব করলেন বাংলা দেশের গান হবে বাংলারই মৃত্তিকাসঞ্জাত, বাউলের একতারার সুরঝঙ্কার আর কীর্ত্তনের আখরে যখন তিনি তন্দ্রাবিষ্ট—তখনও তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে সকল গানের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতকেও তিনি ধরে রেখেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সাহায্যে সঙ্গীতের ভিৎকে দৃঢ় করতে হবে। হয়ত তিনি বুঝেছিলেন, স্বরসাধনায় সিদ্ধি-লাভ করতে হলে প্রাচীন রীতিকে মেনে নিতে হবে। তাঁর প্রথম জীবনের অমর গানগুলিতে তিনি পূর্ব্বের দেওয়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের

সুর বজায় রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। পরে কীর্তন, বাউল সুরকে সম্মানের আসনে তিনি বসিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সুরকে বিদায় দেন নি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলোচনা করতে গিয়ে এই কথাই শুধু মনে হয় বার বার—আসলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মাধুর্যের উপাসক। এর মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন সত্য শিব আর সুন্দরকে। ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মাধুর্য যেমন তিনি মেনে নিয়েছেন, তেমনি পরিণত বয়সের গানগুলির সঙ্গে প্রচলিত পল্লী-গীতি সুরের মিতালিও ঘটিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যেখানে মাধুর্য যেখানে সৌন্দর্য, সেখানেই আনন্দ—সর্বোপরি সঙ্গীতের চরম সার্থকতা।

সমন্বয় তাই আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে। শুধু কানের পরিতৃপ্তি বা সাময়িক তৃপ্তিবিধানই সঙ্গীতের ধর্ম নয়, এর ফল সুদূর-প্রসারী। মনকে ভাবের প্রাচুর্যে ভরিয়ে দেয় গান। এই জন্যে সঙ্গীতের সুর, তান, ছন্দ, লয় যেমন তার অঙ্গ তেমনি বাণীও তার একটি অঙ্গ। এই অঙ্গটিকে পরিপুষ্ট করে তুললেন রবীন্দ্রনাথ।

এই কারণে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এত সমাদর লাভ করতে পেরেছে। তাই দেখতে পাই আজ অর্ধশতাব্দী ধরে এই সুসম্পূর্ণ সঙ্গীত শুধু যে বাংলার ঘরে ঘরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তা নয় ভারতের, চতুর্দিকে এর প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পী—তাই শুধু কীর্তন আর বাউল সুর নয়, নানারূপ সুরের মিশ্রণে তিনি এক বিশিষ্ট সঙ্গীত-তরঙ্গেরও সৃষ্টি করলেন। ভাষা, কাব্য, সাহিত্য, ভাস্কর্য—যে-কোনও শিল্পই হোক না কেন সবই যুগে যুগে তার রূপে, তার ছন্দে নূতনত্ব এনেছে। সঙ্গীত কেন তবে এক বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত থাকবে। সঙ্গীতকে তাই তিনি নূতন রূপ দিলেন—এক কথায় বলা যায় 'মুক্তি'। সঙ্গীতের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এই পরিবর্তনের ধারা দেখতে পাওয়া যায়। এই থেকেই যুগে যুগে সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ ঢঙ আর বিশেষ বিশেষ ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

কালের মন্দিরা বেজে চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে—তার সঙ্গে সুরেরও হয়েছে পরিবর্তন। প্রকৃত স্রষ্টা কখনও পুরাতনকে আকড়ে ধরে থাকতে পারেন না। সৃষ্টির ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বৈচিত্র্যকে করেন আহ্বান।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত বৈচিত্র্যের মূর্ত প্রতীক। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটা অভাব ছিল—সেটা হচ্ছে বাণীর অভাব, যেমন সুর তার উপযোগী তেমনি বাণী ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের এই অভাব পূরণ করেছেন। ভাব আর সুরের অপূর্ব

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মত উচ্চ পর্যায়ে স্থান দেওয়া যায় কি না? আমার মতে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত অবশ্যই ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মর্যাদা পেতে পারে। তার কারণ—রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সবকিছুই আছে। এই সঙ্গীত হচ্ছে সুরের অক্ষয় ভাণ্ডার। পূর্ববর্তী কালে রচিত তাঁর গানগুলি, যেমন—"মন্দিরে মম কে," "কমল মুকুলদল খুলিল", "শুনলো শুনলো বালিকা" "বিদায় করেছ যারে নয়নজলে", "তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে", "মরণ তুহু মম শ্যাম সমান" প্রভৃতি অসংখ্য গান ক্লাসিক্যাল রীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ সুরে সংগঠিত। এর পর তিনি লোকগীতিতে আকৃষ্ট হন, আকৃষ্ট হন বাউল আর কীর্তনে। সেই সকল সুরেও তিনি গান বেঁধেছেন। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। রুচি অনুযায়ী বেছে নেওয়া যায় তাঁর গান।

এ কারণে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সকল সঙ্গীতশিক্ষার্থীর পক্ষে আয়ত্ত করতে বার বার চেষ্টা না করার, বা নির্বাচন না করার কোনও কারণ দেখি না। যাঁর যে দিকে রুচি তিনি সে ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত থেকে তাঁর ইচ্ছামত গান নির্বাচন করে নিতে পারেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সকল শিক্ষার্থীর পক্ষেই অপরিহার্য।

এমন প্রাণবন্ত চিত্তদ্রাবক সঙ্গীতের আরও প্রসার ঘটুক এই কামনাই সকল সঙ্গীতবিদের হৃদয়ে যেন জাগরূক থাকে।

———

ডালডা
আমার
পক্ষে
ভালো
DALDA
ডালডা
ডালডা মার্কা বনস্পতি
দিয়ে রান্না করুন
শুধু রান্নার জন্যই ভালো নয় — পুষ্টিকরও বটে!

ভারতে জ্যোতিষচর্চ্চা ও কোষ্ঠী-বিচারের সূত্রাবলী— শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল জ্যোতিঃশাস্ত্রী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য দশ টাকা।

প্রাচীন ভারত জ্ঞানবিজ্ঞানের যে সকল ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ তাহাদের অন্যতম। জাতকের জন্মকালে তাহার জন্মস্থানের আকাশে, ভ-চক্রে রব্যাদি নবগ্রহের—পাশ্চাত্য-মতে হার্শেল (প্রজাপতি), নেপচুন (বরুণ) ও প্লুটো (রুদ্র) এই তিনটি গ্রহেরও, অবস্থান হইতে তাহার জীবনের ফলাফল নির্দ্দেশ ফলিত জ্যোতিষের উদ্দেশ্য। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না তাহা লইয়া বাগবিতণ্ডার অন্ত নাই। কিন্তু বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত এই শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্প্রতি শিক্ষিতসাধারণের অবজ্ঞামূলক মনোভাব দূরীভূত হইয়া কতকটা অনুরাগের লক্ষণ প্রকট হইতেছে। এই সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রে পারঙ্গম শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল মহাশয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-বিষয়ক এই বিরাট গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া এক মহান্ কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই পুস্তকে স্বল্প পরিসরের মধ্যে, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত ভারতে ফলিত জ্যোতিষচর্চ্চার যে চিত্তাকর্ষক এবং ধারাবাহিক ইতিহাস—ইহা আংশিক ভাবে প্রথম প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়—প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে লেখকের জ্ঞানের পরিধি এবং তথ্যপরিবেশন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষের ইতিহাস আলোচনার পথিকৃৎ হইবার গৌরব বাগল মহাশয়ই প্রথম অর্জ্জন করিলেন। তাঁহার এই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতে ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা শুরু হয় প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋগবেদের কাল হইতে। লেখক বলিতেছেন—"ঋগবেদের সময় মাত্র ফলিত জ্যোতিষের জ্ঞান সাধারণ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।"

মিশর দেশে প্রথম রাশিচক্রের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে, লেখক যুক্তিতর্ক এবং প্রমাণ-প্রয়োগে তাহার নিরসন করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, রাশিচক্র প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ভারতবর্ষে এবং গ্রীসের মাধ্যমে ইহা পাশ্চাত্যে প্রচারিত হইয়াছিল। লেখক বলিতেছেন—"বস্তুতঃ নানা প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ইহাই অনুমান করা সঙ্গত হইবে যে, ভারতীয় আর্য্যগণের সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের প্রস্রবণ গ্রীকদেশের মধ্য দিয়া অন্তঃসলিল-প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া ইউরোপে বেগবতী স্রোতস্বতীরূপে পরিণত হইয়াছিল।" (পৃ. ৮)। ভারতীয় জ্যোতিষে গ্রীক এবং আরবীয় জ্যোতিষের প্রভাব সম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। জ্যোতিষশাস্ত্র লইয়া সামান্য নাড়াচাড়া যাঁহারা করেন তাঁহারাই দ্রেক্কাণ (Decarate) শব্দটির সহিত পরিচিত আছেন। ইহা মূলতঃ মিশরীয় ভাষার শব্দ। গ্রীক এবং ল্যাটিন জ্যোতির্ব্বিদগণ মিশরীয় জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে এই শব্দটি ধার করেন, পরে ভারতীয় জ্যোতিষেও রাশির এক-তৃতীয়াংশ বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। দশম ভাব বুঝাইতে ব্যবহৃত "মেষুরণ" এবং মূল কেন্দ্র অর্থে প্রযুক্ত "কণ্টক" (kentra শব্দের রূপান্তর) শব্দদ্বয়ও মূলতঃ গ্রীক শব্দ। বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর জ্যোতিষিগণ যে তাজিক জ্যোতিষ হইতে বর্ষপ্রবেশ গণনা করিয়া থাকেন তাহা আরবের দান। "আরবী 'তাজিক' গ্রন্থ নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।" এমনি ভাবে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষের স্বকীয়তা এবং পরবর্ত্তীকালে গ্রীস, রোম, আরব প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাবে ইহার 'বিকৃত রূপ' এ দুয়েরই সঙ্গে গ্রন্থকার সাফল্যের সহিত পাঠকসাধারণের পরিচয়সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতিষের এই আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস শুধু যে আমাদের কৌতূহলই নিবৃত্ত করে তাহা নয়, জাতীয় গৌরব সম্বন্ধেও আমাদিগকে সচেতন করিয়া তোলে।

ঐতিহাসিক দিকের কথা ছাড়িয়া, এবার কোষ্ঠীবিচারের সূত্রাবলী সম্বন্ধে আলোচনায় লেখক যে মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার একটু পরিচয় দিই। এ বিষয়ে বর্ত্তমান পুস্তকের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত আরবীয় মঞ্জিল বা নক্ষত্রচক্র এবং চৈনিক সিউ বা নক্ষত্রচক্র, গ্রীক-মিশরীয় রাশিচক্র, জাপানী রাশিচক্র ইত্যাদির চিত্র। এই সমস্ত ইতিপূর্ব্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক কোন বাংলা গ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট
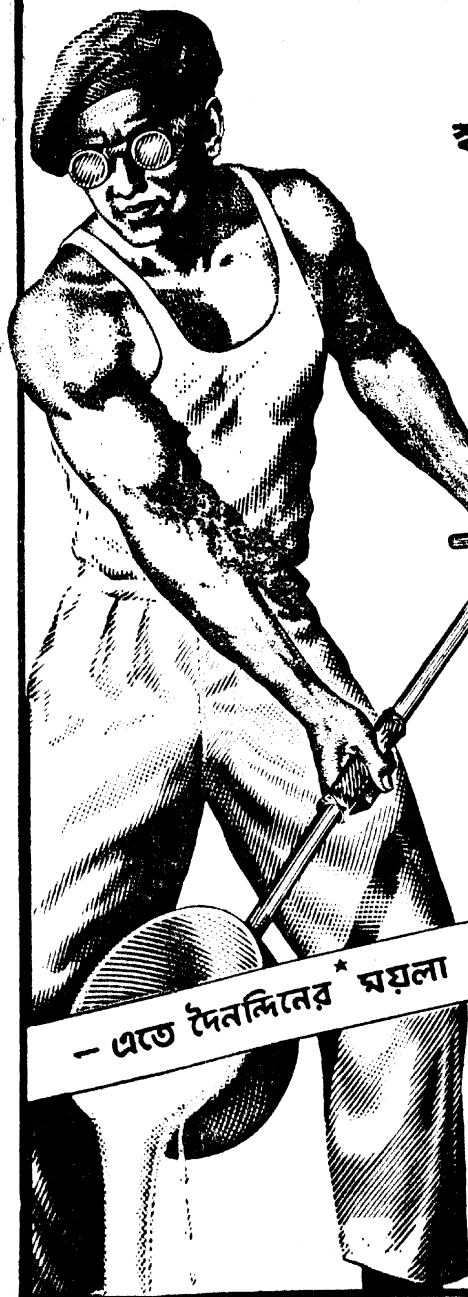
স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে
চান করে –
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
– এতে দৈনন্দিনের * ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রীক জ্যোতিষী টলেমীর মতে গ্রহগণের শুভ এবং পাপ সংজ্ঞা, গ্রহগণের জড়ধর্মী কারকতা এবং পিথাগোরাসের সূত্রানুসারে সপ্তগ্রহের প্রভাবে সুরসপ্তক সম্পর্কিত আলোচনা পাঠকদের সমক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটা নূতন দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

পুস্তকখানির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের যাবতীয় জটিল বিষয় বিশদভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের ন্যায় সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহাকে অনাবশ্যক ভাবে ভারাক্রান্ত এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য করিয়া তোলা হয় নাই। অষ্টম অধ্যায়টি—যাহাতে বরাহের 'বৃহজ্জাতক', 'বাদরায়ণ জাতক' কল্যাণবর্ম্মার 'সারাবলী' 'সুশ্রুতসংহিতা' প্রভৃতি অবলম্বনে যৌন নিয়মরক্ষা সম্পর্কে জ্যোতিষিক আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত দম্পতিকে সযত্নে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ইহাতে গ্রহপ্রভাবে সুসন্তানের জন্ম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ, জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে যৌন উদ্দীপনার কারণ ইত্যাদি বিষয় এমন সহজবোধ্য ভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, সাধারণ পাঠকেরও অল্পায়াসে বিষয়জ্ঞান জন্মিবে। স্ত্রী-জাতক (সপ্তদশ) অধ্যায়ে দম্পতির পারস্পরিক প্রীতির আকর্ষণ, স্বামী এবং স্ত্রীর মনের সাম্য লক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সারগর্ভ জ্যোতিষিক বিচার-সঙ্কেত প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রত্যেক বিবাহিত নরনারীর অনুধাবনযোগ্য।

পরিশিষ্ট সহ একবিংশতি অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত এই বিরাট গ্রন্থে উপরোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়া গ্রহফল, নক্ষত্রফল, রাশিফল, দ্বাদশ ভাব বিচার, গোচরফল বিচার, বিংশোত্তরী ও অষ্টোত্তরী দশা বিচার ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে চন্দ্রস্ফুট অনুযায়ী বিংশোত্তরী ভোগ্য দশা, অষ্টোত্তরী দশার সারণী, বিষুবকাল বা Sid[illegible] Time এবং মানবের শরীরচিহ্নাদি দ্বারা জন্মপত্রিকা গণনাপদ্ধতি [illegible] হওয়াতে গ্রন্থখানি শুধু সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণই নয়, জ্যোতির্বিদগণের পক্ষে বি[illegible] ভাবে সহায়কও হইয়াছে।

জ্যোতিষ গুরুমুখী বিদ্যা। প্রাচীন ভারতে গুরুর প্রমুখাৎ [illegible] শিষ্য এই বিদ্যায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিতেন। এই বিষয়বস্তু অনুযা[illegible] পরিকল্পিত প্রচ্ছদপটটি খুবই সুসঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে। ইহা প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষচর্চ্চার গৌরবোজ্জ্বল দিনের—অদিতিকালের পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বিষু[illegible] মিলনের সময় কৃতযুগের আবির্ভাবের আদিমতম জ্যোতিষচর্চ্চার নিদর্শন[illegible] চিত্র। বালগঙ্গাধর তিলক এবং আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি [illegible] মনীষিগণ ৮০০০—৫০০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ইহার কাল নির্ণয় করিয়াছেন অদিতিতে যে যজ্ঞের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি বহু ঋকমন্ত্রে তাহার প্রমাণ [illegible]

কালপুরুষের অঙ্গবিভাগের (পৃ. ১৭১) যুক্তিগত ভিত্তিপ্রদর্শনে [illegible] গ্রন্থকারের মৌলিক পরিকল্পনার পরিচায়ক। কালপুরুষের মস্তকোপ[illegible] রাশিচক্রের চিত্রে বর্ত্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে বিষুবরেখার উপ[illegible] মেষরাশিকে স্থাপনপূর্ব্বক পর পর দ্বাদশ রাশির চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া তি[illegible] বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এই মূল্যবান গ্রন্থের নিন্দা করিতে যদিও মনে সরে না তথাপি—'বু[illegible]লাভ', 'উদ্দেশ্য সফলকাম হইল', 'নিজের আত্ম-পরিচয়' প্রভৃতি ই[illegible] কয়েকটি ছোটখাটো ভাষাগত ত্রুটির দিকে আমরা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষ[illegible] করিতেছি। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে পুস্তকখানি শুধু পূর্ণাঙ্গ [illegible] সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া বাহির হইবে।

ভারতে জ্যোতিষচর্চ্চা ও কোষ্ঠী-বিচারের সূত্রাবলী রচনায় লেখক [illegible] বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন, শ্রমশীলতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ জ্যোতিষে গভী[illegible] ব্যুৎপত্তি, বিচার-নৈপুণ্য এবং বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। ঐকান্তিক যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে রচি[illegible] এই গ্রন্থখানি আকরগ্রন্থের মর্য্যাদালাভ করিয়াছে, ইহার দ্বারা আমাদে[illegible] মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে—আগামী বহু বৎসর ইহা জ্যোতি[illegible] শাস্ত্রালোচকদের দিগদর্শনের সহায়ক হইবে।

শ্রীনলিনীকুমার [illegible]

জলধর সেনের আত্মজীবনী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু। [illegible] পাবলিশার্স। ৬১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

জলধর সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল তিনি য[illegible] 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তার আগে হিমা[illegible] ও 'প্রবাসের পত্র' পড়ে আমরা এই পরিব্রাজকের অনুরাগী হয়ে উঠেছি[illegible] মানুষটির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে মুগ্ধ হই। কখনও কারুর প্রশংসা ছাড়া নি[illegible] শুনি নি তাঁর মুখে। তিনি ছিলেন উদার আত্মভোলা মানুষ। সুদীর্ঘকা[illegible] সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করার ফলে তাঁর মধ্যে একটা উদাসী মনোভাব যেন স্থায়ীভাবে আসন নিয়েছিল। দুঃখে-বিপদে তাঁকে সর্ব্বদা অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে-সম্পদে বিগতস্পৃহ দেখেছি। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে তি[illegible] কখনও সচেতন ছিলেন না। পরোপকার ও আর্ত্ত মানবের সেবাই ছিল তাঁ[illegible] ধর্ম্ম। পাগল হরনাথের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন তিনি। গৃহী হয়েও তি[illegible] একান্তভাবে গৃহগত-প্রাণ হতে পারেন নি। কিন্তু গৃহস্থের কর্ত্তব্যে তাঁকে কখনও অবহেলা করতে দেখি নি। সাধকের লক্ষণ ছিল তাঁর মধ্যে, আমরা তাঁকে "দাদা" বলতাম। সাহিত্য-সমাজে তিনি ছিলেন সকলের জলধর দাদা।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমালোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করে জলধ[illegible]

সেনের অনুরাগী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। লেখক "জলধরদাদা"র নিজের মুখে তাঁর ছেলেবেলার কথা থেকে সুরু করে কাঙাল হরিনাথ ও লালন ফকিরের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত বিবিধ গল্প শুনে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় এই কাহিনীগুলি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল।

আত্মকথা ছাড়াও এই গ্রন্থখানির শেষে জলধরদার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংশ্লিষ্ট করায় পুস্তকখানি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের লিখিত জলধর সেনের সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য 'পরিশিষ্ট' রূপে সংযুক্ত হওয়ায় বইখানি অধিকতর মূল্যবান হয়ে উঠেছে। একদা বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে রসিকজন-সমাজে যিনি আপন চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি উপহার দিয়ে লিপিকার একটি মূল্যবান সাহিত্যকৃত্য সম্পাদন করেছেন বলে মনে করি। বইখানির রচনা-কৌশল উপভোগ্য।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

রামকমল সেন ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা।

এখানি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত ৭২তম গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' কিংবা 'নাট্যশালার ইতিহাস' ছাড়াও বাংলার বহু কৃতী সন্তানের জীবনবৃত্ত আধুনিক যুগের সামনে ধরিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাগল এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়দ্বয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। ইহাদানেও সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা সমৃদ্ধ। পুস্তকগুলির বৈশিষ্ট্য হই অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর-স্ফীত উচ্ছাসপূর্ণ স্তুতিগান এগুলিতে কল্পনা-রঞ্জিত ঘটনার সমাবেশও চোখে পড়ে না—শুধু মানুষ ও কর্ম্মকৃতির তথ্যপূর্ণ বিবরণে এক একটি চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দেশ এবং বাঙালীকে জানিতে হইলে তাহার নানাদিক প্রসারী কর্ম্মপ্র সদ্‌গুণরাশির বিবরণ জানা প্রয়োজন। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র এই দিক দিয়া এক একখানি চমৎকার দর্পণস্বরূপ। আত্মবিস্মৃত ব সামনে এইগুলি সাজাইয়া দিয়া রচয়িতারা অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়া

নীল পাখী—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাই ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা।

"ব্লু-বার্ড" মরিস ম্যাটারলিঙ্ক কৃত পৃথিবীখ্যাত একখানি রূপক না বাংলা ভাষায় এই নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন—শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযামিনীকান্ত সোম। কিন্তু গল্পের আকারে সর্ব্বপ্রথম ইহার রূপদান শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩১ সালে। সম্প্রতি এখানির তৃতীয় চলিতেছে।

রূপক নাটক—ছোট ছেলেরা তো দূরের কথা—বয়স্কেরাও ভাল বুঝিতে পারেন না। বিষয়ের সঙ্গে মূল সুরটিকে বজায় রাখিয়া কিশো চিত্তোপযোগী করিয়া সে জিনিস পরিবেশন করাও কম কঠিন নহে। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত অনায়াসে সাবলীল ভাষায় কাহিনীটিকে চিত্তহারী ও সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। নীল পাখী হইল আনন্দ। স্বপ্নে জাগ্রতে এই আনন্দ আয়ত্ত করিবার জন্য মানুষ সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করিতেছে এখানে পৃথিবীর সমস্ত শিশুর প্রতিভূস্বরূপ দুটি ছোট ছেলেমেয়ে পদে পদে বাধা ও বিরোধ ঠেলিয়া আনন্দলাভের জন্য যাত্রা করিয়াছে। এই আনন্দ সন্ধান-কাহিনীটিকে লেখক সুকৌশলে সর্ব্বজনের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

করে দেখ—(দ্বিতীয় খণ্ড)। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯ মূল্য পাঁচ সিকা।

বিজ্ঞানের প্রতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ বাড়াইবার জন্য হাতে-কলমে শিক্ষণীয় কতকগুলি বিষয় বইটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এগুলি একাধারে আনন্দবর্দ্ধক এবং শিক্ষাপ্রদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফায়ার তৈরীর ব্যবস্থা, কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা, ডিমের লাটু, পৃথি ঘূর্ণনের পরীক্ষা, চুম্বকের খেলা, জলের উপাদান বিশ্লেষণের ব্যবস্থা, ইচ্ছামত ফল ধরানো, মাছ কি জলে ডুবে মরে প্রভৃতি বিষয়গুলির উল্লে করা যায়। শুধু কিশোররা নয়—বড়রাও এই প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা প্রমোদিত ও উপকৃত হইবেন। বলা বাহুল্য, বইখানির প্রথম খণ্ড বহু কিশোর কিশোরীকে উৎসাহিত করায় দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে—পরিষদের উদ্দেশ্যও সার্থক হইয়াছে।

পথ্যবিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ। বঙ্গজ্যোতি প্রকাশকমণ্ডলী। ২৩৮-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯ মূল্য তিন টাকা।

সুনির্ব্বাচিত পথ্য যে রোগ আরোগ্যের পরম সহায়ক—এটি সর্ব্বকালে চিকিৎসা-বিজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকে। ঔষধ না খাইয়া শুধু

নির্ম্মলা শিক্ষা পেলো...
মালতীর ছোট্ট ছেলে মুন্না সবসময় নিচের বাসাতে খ্যালনা ফেলতো·
মুন্না! দুষ্টু ছেলে! আবার তুমি খেলনা ফেলেছো।
নির্ম্মলার বাসা
মা এখন না - ছেলেটাকে ভালমত শিক্ষা দিতে হবে...
মুন্নার খ্যালনা টা মালতীকে ফিরিয়ে দাওনা কেন?
পরে
দেখ! এবার ফেলেছে একটা তোয়ালে!
ভাবলেম্ কি পরিস্কার ক্কাচা! সত্যিই আশ্চর্য্য...
মালতির বাসা
নির্ম্মলা! তুমি বুঝি মুন্নার খ্যালনা নিয়ে এসেছো...!
হ্যাঁ· আর তোমার তোয়ালে-টাও নিয়ে এসেছি - আচ্ছা আমায় একটা কথা বলবে-
বলতো, তোয়ালেটা এত ধবধবে সাদা কি করে করলে? আমি তো কখনও তোমার বাড়ী থেকে কাপড় আছড়াবার আওয়াজ পাইনি।
আমি যে সাবান ব্যবহার করি।
আছড়ালে কাপড়ের বুনুনী ফেঁসে যায় আর সেইজন্যে ছেঁড়েও তাড়াতাড়ি।
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে।
সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনা বিনা আছাড়েই পরিষ্কার করে কাচে — আর সেইজন্যে কাপড় টেকেও বেশী দিন।
সানলাইট সাবানে বিনা সাদা আর পরিস্কার কাপড় টেকেও দিন আর আমার খরচও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
Rs.10,000 Reward!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেকসই করে।
S. 234-X52 BG

বিধান মানিয়া ছোটখাটো রোগ বা উপসর্গ আরাম হয়, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কিন্তু আমাদের কর্ম্মব্যস্ত জীবনে পথ্য সম্বন্ধে খুটিনাটি উপদেশ দেওয়া বা নেওয়ার সুযোগ ... একটা হয় না, অজ্ঞতাও ইহার অন্যতম কারণ। অভিজ্ঞ ... আলোচ্য পুস্তকখানিতে বহুদিনের এই অভাবটি দূর ... য়াছেন। পথ্য সম্বন্ধে তিনি শুধু দীর্ঘদিনব্যাপী অভিজ্ঞতার কথাই বলেন নাই, বিভিন্ন রোগ অনুযায়ী আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পথ্যগুলির বিচার, শ্রেণীবিভাগ, খাদ্যমূল্য প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। বইখানি অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রতি গৃহস্থ-ঘরে রাখার উপযোগী।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বাঙালী জাতি পরিচয়—শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ। সাহিত্য সংস্থা, ১৫৩।১, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

বঙ্গসমাজ বহু জাতিবর্ণে বিভক্ত। এক এক জাতির মধ্যে আবার বহু শাখাপ্রশাখা। এক ব্রাহ্মণের মধ্যেই রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, আচার্য্য, সপ্তশতী প্রভৃতি নানা শ্রেণী আছে। এত জাতিবিভাগ বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। রক্ষা এই, এখানে দক্ষিণের মত 'পঞ্চম' নাই। এই গ্রন্থে শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তিলি, কর্ম্মকার, তন্তুবায় কংসবণিক, উগ্রক্ষত্রিয়, কুম্ভকার, সূত্রধর, তাম্বুলবণিক, মাহিষ্য, নাথ বা যোগী, সদ্গোপ, কপালী, এবং নমঃশূদ্র—এই আঠারটি জাতির পরিচয় দিয়াছেন। এই জাতি-পরিচয় দিতে গিয়া গ্রন্থকারকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, বহু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, বহু পুস্তক পাঠ করিতে হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সহিত প্রত্যেক জাতির গোত্র, পদবী ও শ্রেণীর কথা লেখক আলোচনা করিয়াছেন, জাতির উদ্ভব এবং ঐতিহ্যের কথাও বলিয়াছেন। শুধু অতীত লইয়া সন্তুষ্ট হন নাই, বর্ত্তমানে এই সব জাতির শিক্ষাদীক্ষা কিরূপ, বৃত্তি কি, কর্ম্ম কি, ইহাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি কাহারা, কাহারাই বা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এইরূপ বহু জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বিভিন্ন সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে নানাবিধ সামাজিক বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৬০ পৃষ্ঠার হইলেও বইখানি বহু তথ্যে সমৃদ্ধ। যাঁহারা সমাজতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা এই পুস্তক হইতে নানা ভাবে সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন। বইখানি সুলিখিত। সাধারণ পাঠকও নানা বিষয় জানিতে পারিয়া আনন্দলাভ করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ জীবনালেখ্য—শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। পটুয়াপুকুর, সা... বাগান, কলিকাতা—২৮। মূল্য আড়াই টাকা।

সর্ব্ববিদ্যাধিপতি মহাপুরুষ সর্ব্বানন্দনাথ বাংলার শাক্তসম্প্রদায়ের মুকুটমণি। তাঁহার অলৌকিক সিদ্ধিবৃত্তান্ত তৎপুত্র শিবনাথ "সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—তাহা বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় তাঁহার জীবনালেখ্য এতকাল দুষ্প্রাপ্য ছিল—গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে এই অভাব মোচন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং মহাপুরুষের বংশধর এবং বিশেষ আবেগসহকারে ও প্রচুর অনুসন্ধান করিয়া অদ্যাপি হিমালয়ে অলৌকিকভাবে বিদ্যমান উক্ত মহাপুরুষের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শিবনাথের গ্রন্থে নাই এইরূপ অনেক বৃত্তান্ত ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শক্তিসাধনা বাংলার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—কিন্তু শক্তিসাধকের জীবনী বাংলা ভাষায় অত্যন্ত বিরল। আমরা তজ্জন্য সাদরে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনীও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থটি মুদ্রাকরপ্রমাদ ও অশুদ্ধির হাত এড়াইতে পারে নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যা দেখেছি যা শুনেছি তার কিছু—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, ৫৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃঃ ... । মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকারের বয়স এখন তেয়াত্তর বৎসর। এই দীর্ঘ জীবনের কাহিনী তিনি অতি সরল ... ভাষায় সংক্ষেপে এই পুস্তকখানিতে পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি সুখ্যাত অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের অন্যতম ভ্রাতা। একটি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মপরিবারে তাঁহার জন্ম। পরিবার বৃহৎ হওয়ায়, এবং দীর্ঘকাল ভিন্ন স্থলে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত থাকায় গ্রন্থকার নানা ধরণের লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং বিবিধ সমাজকল্যাণকর কার্যে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিজের কথাপ্রসঙ্গে সে সকল বিষয়ও তিনি কিছু কিছু লিখিয়াছেন। বইখানি সুপাঠ্য। এই শতাব্দীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপী এই জীবনে অনেক জ্ঞাতব্য এবং ... ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা সাধারণ পাঠকেরও ভাল লাগিবে এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। বর্ত্তমান বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার পক্ষে এই ধরনের বইয়ের বিশেষ উপযোগিতা আছে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রাজকন্যা—শ্রীবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সিগনেট বুক শপ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ধূলি-মলিন এই জীবনপথ; শুধু কবির চোখে সেই চিরন্তনী রাজকন্যার স্বপ্ন। তারই আভায় প্রতিটি মুহূর্ত্ত মায়াময়। ফুল পাতা পাখী তার রহস্যপুরীর খবর নিয়ে আসে, বিশ্বভুবন তার রূপের রাজ্য।

আমলকী শাখায়
মেতেছে 'বসন্তবৌরিয়াল।
... বাজে গরুর গলায়
ঠুনঠুন পাখী ... কী জীবন ছড়ানো এখানে।"

এমনি সর্ব্বব্যাপী জীবন-স্পন্দন অনুভব করেছেন কবি।